





# ଓଡ଼ିଆ ସୂଚୀପତ୍ର



ବିଷୟ	ଲେଖକ-ଲେଖିକା	ପୃଷ୍ଠା
୧। କଥାସୂତ	(ସ୍ୱବାସୀ) ...	୧
୨। କବିତା ସମ୍ପାଦନା	(କବିତା) ଅଭିଜିତକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନା ...	୨
୩। ଐତିହାସିକା	... ଅଭିଜିତକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ...	୩
୪। ପୃଥିବୀ ବିଦ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଲିକ୍ ଇଣ୍ଡିକ୍ସ	(ପୃଥିବୀ) ଭୀରବ୍ରାହ୍ମ ...	୪
୫। ନାଟ୍ୟର ସ୍ୱ	(କବିତା) ଶେଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ...	୫
୬। ଏ ହାତ ତୋହାର ନାମେ	(କବିତା) ମୋକ୍ଷମ୍ଭ ହାଲଦୀ ...	୬
୭। ଶ୍ରୀମତୀ ଜିନ୍ଦେଗୀ	(କବିତା) ଶ୍ରୀମତୀ ଜିନ୍ଦେଗୀ : ଅଭିଜିତକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ...	୭
୮। ଉଦାର ଆକାଶେ	(କବିତା) ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ ...	୮
୯। ଚିନ୍ତା ନିରନ୍ତର	(କବିତା) ସୁରସିକ ...	୯

ଦେଶ ସେବା ନିଯୋଜିତ,

## ଏଆଲବାଟ୍ ଡେଭିଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍

କଲିକାତା—୧୦

ନୀତି ଓ ବିଜ୍ଞାନାଲୁଷ୍ଟାୟୀ ଓଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣର ଅଗ୍ରଣୀ

—ବ୍ରାହ୍ମ ସମୂହ—

ବୋଷ୍ଟ - ମାନ୍ଦ୍ରାଜ - ଦିଲ୍ଲୀ - ନାଗପୁର

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ - ଶ୍ରୀନଗର - ଗୋହାଟୀ

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১০। ছিটগ্রন্থ কে নয়	(আলোচনা) মনস্বত্বিক ...	১৪
১১। অনেক রোগের একই কারণ	(আলোচনা) নাস' মিত্র ...	১৫
১২। সর্বমতে যদি ভূত ঢোকে	(প্রবন্ধ) অমলকুমার ...	১৬
১৩। কীট-প্রতিকার বিষয়	(আলোচনা) তথ্যাবেদী ...	১৮
১৪। শেখপীরের সনেট	অনুবাদক : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	১৯
১৫। রাণী	(গল্প) শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ...	২০
১৬। ডক্টর তাহা হোসেন	(জীবনী) রেজাউল করিম ...	২১
১৭। শেখপীরের প্রসঙ্গ	(সংগ্রহ) ...	২২
১৮। লণ্ডনের ভাষাশাস্ত্র পোস্টেট গ্যালারী	(প্রবন্ধ) অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	২৩
১৯। বর্গ ও কার্টের আসবাবপত্র	(প্রবন্ধ) আশীষ বসু ...	২৪
২০। ব্যাবিলনের আইন	(রম্য-আলোচনা) বাহুবল্লভ মুখোপাধ্যায় ...	২৫
২১। শেখপীরের প্রসঙ্গ	(সংগ্রহ) ...	২৬
২২। পত্রাঙ্ক—	... ..	২৭

“জীবনী জিজ্ঞাসা” গ্রন্থাবলী

মণি বাগচী রচিত

পট্টপুরু সুরেন্দ্রনাথ	৬০০
মামমোহন	৪০০
পাইকেল	৪০০
হাবি দেবেন্দ্রনাথ	৪৫০
কেশবচন্দ্র	৪৫০
মার্চাধ প্রফুল্লচন্দ্র	৪৫০
মেশচন্দ্র	৫০০
ম্যাসী বিবেকানন্দ	৫০০
শঙ্করাচরণ আশুতোষ (বঙ্গ)	

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রচিত

কিশোর বিজ্ঞানী

হাতে কলমে বিজ্ঞান গবেষণা গ্রন্থ

মূল্য ২.৫০

প্রতিভা সাহিত্যিক সুবোধ বসুর

রাজধানী

ইতিহাসের নতুন পালার দিল্লী আজও রাজধানী। আজকের রাজধানীর সমাজ জীবনের উপর মহলের অন্তঃসারশূন্য তকমা-আঁটা আভিজাত্যের প্রতি লেখকের কোঁতুক কটাক্ষে উপস্থানের কাহিনী অনাবিল রসের উৎসে পরিণত হয়েছে।

নবতম সংস্করণ : মূল্য ২.৫০

পরিচালক রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৫.০০

: শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫.০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪.০০

বলাই দেববর্মা : প্রজাবাক্য উপাখ্যান ৫.০০

প্রভাত গুপ্ত : রবিকবি ৬.০০

শুশীল রায় : জ্যোতিরিস্মরণ ১০.০০

মণি বাগচী : শিল্পিকুমার ও বাংলা থিয়েটার ১০.০০

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ১৫.০০

থাক্তা আহমদ আব্বাস : কেঁরে নাই শুধু একজন ৪.০০

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩ কলেক্টর। কলিকাতা-২ এবং ১৩৩৫ রাসবিহারী আভিনিউ। কলিকাতা-২২

## পৃষ্ঠাপত্র

বিষয়	লেখক-সম্পাদক	পৃষ্ঠা
২৩। চারজন— (বাঙালী পরিচিতি)		
(ক) অজিত দত্ত	...	৩৭
(খ) প্রেমেন্দ্রকুমার সেন	...	৩৮
(গ) শিবানী ঘোষাল	...	৬
(ঘ) সাগরময় ঘোষ	...	৪০
২৪। আলোকচিত্র—	...	৪০ (ক), ১২০ (খ)
২৫। সবুজ বীণ (জমশ-কাহিনী)	প্রতিভা স্তব্দ	৪১
২৬। জাগ্রত আমি (কবিতা)	কুফা ঘোষ	৫০
২৭। কিস্তক-গাসিই (উপন্যাস)	অজিতকুমার রায়চৌধুরী	৫১
২৮। এক কলেক্টর চারটি মেয়ে (উপন্যাস)	রাণু ভৌমিক (দাস)	৬৬
২৯। বিজ্ঞান ভারতী—	...	৭৭
৩০। আকাশ ও মাটি (কবিতা)	লক্ষ্মীকান্ত রায়	৭১
৩১। অগ্নি-শিশু প্রসঙ্গ (নৃত্যিকথা)	অমির ভট্টাচার্য	৮০
৩২। বারোশি জঙ্গল কাণ্ড (কবিতা)	শক্তি মুখোপাধ্যায়	৮৬

## বুতন বছরের বুতন বই

ঐতিহাসিক মধুসূদানী নিগুটানন্দ্রের  
স্ববৃহৎ উপন্যাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর  
সর্বাধুনিক মনস্তত্ত্বগূর্ণ উপন্যাস

# একটি বেগমের অশ্রু

# নিঃস্বপ্ন যৌবন

রেলপথে মাসেলিং ইয়ার্ডের পটভূমিকায় বিচিত্র জীবন রসের কাহিনী  
অগ্নিমিত্রের

## নীল ক্রৌঞ্চের ডানা

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

**চন্দ্রা** ৫.০০

অ্যাক্টন চেষ্টা

**বেদনাহত** ৪.০০

পোপাল ভৌমিক

সাহিত্য সমীক্ষা

৪.০০

॥ জ্ঞানভীষ ॥

১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## ১ যুগাপত্র

বিবরণ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩৩। স্বাতন্ত্র্য মঞ্জি	(উপাঙ্গ) অজিতকুমার বসু	৮৭
৩৪। অজ্ঞান ও প্রাণ—		
(ক) নিষ্ঠুর পরিহাস	(গল্প) শিবানী ঘোষ	৯২
(খ) একটি রাত্রি দু'টি মন	(গল্প) অনিতা সরকার	৯৪
(গ) হৃদয়	(কবিতা) গ্যালিয়েন : অম্বাবিকা—প্রতিমা রায়	৯৭
৩৫। পূর্ণ প্রাণে চাবার বাহা	(উপাঙ্গ) ক্যাথরিন হিউম : অম্বাবিকা—প্রতিমা রায়	৯৮
৩৬। জ্বর পাতে	(উপাঙ্গ) হুগো দাম্পত্য	১০১
৩৭। শেখরীয়ার প্রসঙ্গে	(গল্প) ...	১১৪
৩৮। নামে কি বার আসে	(প্রবন্ধ) জ্যোতিপ্রসাদ বসু	১১৫
৩৯। প্রচ্ছন্ন-পরিচিতি—	...	১০৬
৪০। ছোটদের আসর—		
(ক) গল্পের নামাঙ্কন	(গল্প) শিবরাম চক্রবর্তী	১১৭
(খ) জুসেবচরের গল্প	যোগেন্দ্রনাথ ভট্ট	১২০
(গ) রূপকথার অন্তরালে	(স্বা-স্রব্দ) অমল সেন	১২১

<p>মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭ সুভাষচন্দ্র বসুর তরুণের স্বপ্ন ২৥০ চিত্রনের সন্ধান ২</p>	<p>যোগাশ ভট্টাচার্যের নতুন উপাঙ্গাস শেষ প্রদীপ শিখা চার টাকা পঞ্চাশ নং পঃ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপাঙ্গাস জুবানবন্দী ৬৥০</p>	<p>তারানাথর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের আসর ৩ ভুবনপুরের ছাট নতুন উপাঙ্গাস প্রকাশিত হইতেছে ভগদীশচন্দ্র ঘোষের নতুন উপাঙ্গাস শহীদ ৫০০ যাত্রিদল ৬৥</p>
<p>ভপতী রায়ের উপাঙ্গাস একটি সোনা মন ৬ নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সম্ব প্রকাশিত মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫৥০ সুমথ ঘোষের সম্ব প্রকাশিত উপাঙ্গাস মেঘ ডাঙা রোদ ৫৥০ অনাথবন্ধু বেদন্ত সাহিত্যের পতি ও প্রকৃতি ৫৥১ দায়রা আদালতের আভিনায় অভিব্যক্ত আসামীদের জীবনলেখ্য চিত্রগুপ্তেশ্বর এরা অভিব্যক্ত আসামী ৩৥০</p>	<p>অভিযাত্রীর উপাঙ্গাস স্মৃতির মুকুর ৬০৫ অনির্বাদ্য শিখা ৫ নষ্টচন্দ্রের আলো ৬ প্রবোধ সাত্ত্বালের গল্প সংকলন ৪৭ বন্দীবিহঙ্গ ৩৥১ এক বাণ্ডিল কণা ৪৭ জমতা ৩৭ অশোকচন্দ্র গুহ অনুদিত বনেদী ঘর ৩৥১ নগরীতে ঝড় ৫৭ বিধবাশ চট্টোপাধ্যায় অনুগ্রহ বাসর ৩৭ ডায়নামিট ২৥১ প্রমথনাথ বসির নীলবর্ণ শূণাল ৪৭ বাংলার কবি ৪৭ বা হলেও হতে পারতো ৩৥১ রামপদ ঘোষোপাধ্যায় চরিত্র মন ৩৭ মাটির গন্ধ ৪৭ মনকৈতকী ৬৭ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপাঙ্গাস সুন্দরী কথাসাগর ৫৥১</p>	<p>আন্তরিক মুখো—জানালার ধারে ৪৭ বনকুল—উজ্জ্বল ৩৥১ বিকৃতি মুখো—আনন্দ নট ৩৭ শক্তিপদ রাওভর—বনমাদেশী ৩৥১ আশাপূর্ণা দেবী—অভিজ্ঞান ৩৥১ সত্যরত্ন বৈত্র—বহুবিহঙ্গ ২৥১ মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩৭ ইন্দুবাঈ ভট্টাচার্য—আন্তরিক কাঞ্চন ৩৭ লো দেবী—জীবন তীর্থ ৩৭ অখিল নিরোয়ী—বহুবিহঙ্গ ৩৭ বামনদেব ঘোষ—আমার পৃথিবী ভূমি ৩৭ প্রভাতী দেবী—উজ্জ্বল অস্ত ২৭ বিমল কর—দ্বিবারাঙ্গি ৩৭ গজেন্দ্র মিত্র—দোহাঙ্গপুরী ৪৭ হরপ্রসাদ চক্রবর্তী—একটি আশ্রয় ৩৥১ রাজকুমার মুখো—লয়তানের জলা ২৭ তারকদাস চট্টা—কুমারী ধরম ৫৭ কুশাশু বন্দ্যো—কালো চোখের তারা ৩৥১</p>
<p>শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২২৮৪</p>		

## যুটীপত্র

বিবরণ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৪১। অনিন্দ-বৃন্দাবন (সংকৃত কাব্য)	কবি কর্ণপুর : অম্বাবানক—প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
৪২। সাহিত্য পরিচয়—	...	১২৯
৪৩। শেখরীন্দ্র প্রসঙ্গে (সংগ্রহ)	...	১৩৬
৪৪। লাচ-গান-বাজনা—		
(ক) ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ)	কল্যাণ গুহ	১৩৭
(খ) রেকর্ড পরিচয়	...	১৩৮
(গ) আমার কথা (আত্ম-পরিচিতি)	কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
৪৫। বার্ষিক্য বারাদশী (রস-রচনা)	নীলকণ্ঠ	১৪০
৪৬। হরীজননাথ (কবিতা)	বীণা কুহু	১৪৪
৪৭। আর এক আকাশ (উপভাস)	তপসী দাস	১৪৫
৪৮। নভোনাথ (উপভাস)	প্রবোধ বিজ	১৪৬

### ॥ গ্রন্থাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ॥

নব্ব ও উপভাস	প্রবন্ধ ও ইতিহাস	লোকবিজ্ঞান
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	মুজফ্ফর আহমদ	এল, লান্ডাও ; ওয়াই, কুবার
উত্তরকালের গল্প-সংগ্রহ ১০.০০	প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ২.০০/২.৫০	অপেক্ষিকতার তত্ত্ব ১.৫০
অমরেন্দ্র বোষ	নরহরি কবিরাজ	এম, ভি, হিরেল্লিকাক
চরকাশেখ ৩.৭৫	স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালী ৫.০০	বান্ধুগুল ১.৭৫
অরুণ চৌধুরী	হীরােননাথ মুখোপাধ্যায়	ইলিন ও সেগাল
সীমানা ১.৭৫	INDIA'S STRUGGLE FOR FREEDOM ৮.০০	মানুষ কি করে বড়ো হল ৩.৫০
প্রবন্ধ	মুজফ্ফর আহমদ	ভি. আই গ্রন্থ
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	THE COMMUNIST PARTY AND ITS FORMATION ABROAD ৩.৫০	অতীতের পৃথিবী ১.৬২
ভারতীয় দর্শন ২.০০	অতীত সেন	রুশ বিপ্লবানকারিত্বিকারদের চাঁদে অভিযান ৩.০০
রেবতী বর্মা	Notes on the Bengal Renaissance ১.২৫	এক. আই চেতনন
সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ৩.৫০	মহিস কর্ণফোর্ড	আয়নোক্ষিকায়ারের কথা ১.৫০
প্রমোদ সেনগুপ্ত	DIALECTICAL MATERIALISM	অধ্যাপক এ. কানন
নীল-বিজোহ ও বাঙালী সমাজ ৪.০০	Vol I 2-75 Vol II 3 25 Vol III 3-75	মানব দেহের গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ ৭.০০

### গ্রন্থাবলী বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বাঙ্ক চার্টার্ড স্ট্রীট কলিকাতা—১২ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪

# সূচীপত্র

বিষয়

লেখক-লেখিকা

পৃষ্ঠা

## ৪৯। রঙ্গপট—

(ক) মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার	...	হেনরি ব্রাউন : জুহাধিকা—রাণু ভৌমিক	১৬১
(খ) চাকলতা	...	...	১৬৪
(গ) বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	...	...	৬
(ঘ) পৌরনিক নিবেদিত 'কাঁদার রাণী'	...	...	১৬৫
(ঙ) সবাদ-বিচিত্রা	...	...	১৬৬
(চ) রঙ্গপট প্রসঙ্গ	...	...	১৬৮
(ছ) পৌরনিক সমাচার	...	...	১৬৯

## ৫০। সম্পাদকীয়—

(ক) স্বাগত নববর্ষ	...	...	১৭১
(খ) জরতু শেখপীর	...	...	১৭২
(গ) শেখ আবদুল্লাহর মৃত্তি	...	...	১৭৩

## সদ্য প্রকাশিত

ত্রিবিধ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রখ্যাত বাঙালী লিকারী ও শিকার-প্রিয়

ব্যক্তির রচনার সমুদ্র

**বিখ্যাত শিকার কাহিনী**

অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত তিন রঙের প্রচ্ছদশট

আবালবুদ্ধবিনিতা সকলের উপযোগী গল্প

উপভাসের চেয়েও আকর্ষণীয়

মূল্য : ৮-৫০

অজিতকুমার আইমান-র

**দূর ভূগমে**

ভূরভূগমের পাড়ি শেষ করে বাড়ি কিরলেই পরিচিত সবাই গল্প শুনে চায়। পথের লকরের যেমন শেষ নেই। বলার আগ্রহেরও তেমনি সাধা নেই। এ গ্রন্থখানি সেই দূর দেখার কাহিনী। ৩১খানি আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ।

মুখোপাধ্যায় বলেন—“...তার বর্ণনার আছে...এক দৃশ্য দৃষ্টি। অমূল্য দিলে তার লেখনীর আচড়ে হুটে উঠেছে দুর্গম পথের এক নতুন দিক।

মূল্য : ৬-০০

অত্যান্ত গোস্থানীয়

**প্রতীক্ষিতা শব্দী**

অকরণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের বলিষ্ঠ সংগ্রামের এক ইতিহাস। এই উপভাসের পটভূমিকা একটি উদ্বাসনের জ্বরদখল করা একটি বাড়ি। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র জীবননাট্য সৃষ্টি হয়েছিল তারই কাহিনী। চার রঙের প্রচ্ছদশট।

মূল্য : ৮-৫০

বীপক চৌধুরীর

**কীর্তিনাশা**

৫-০০

কাজী নজরুল ইসলামের

**গুলবাগিচা**

৩-৫০

ঐতিহাসিক অনুদিত

**বঞ্চিতা**

৩-৫০

ঐবাসবের

**দূর কিনারে**

৫-০০

প্রফুল্ল রায়ের

**মরসুমের গান**

৫-০০

শচীন সেনগুপ্তের

**আতর্নাদ জয়নাদ**

১-৫০

বিধনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

**পিয়ালী মন**

৩-৫০

নীলকণ্ঠের

**ট্যান্ডির মিটার উঠছে**

৪-০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

**কাচের স্বর্গ**

৩-০০

দি নিউ বুক এন্সোয়রিয়ম : ২২/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। লোক-সংবাদ—		
(ক) নির্বাসিতের ঘটক	...	১৭৪
(খ) দেউড়ী কাগজিনী সরকার	...	৫
(গ) দেউড়ী বিশ্ববাসিনী সিংহরায়	...	৫
(ঘ) দীপা চৌধুরী	...	৫



## বস্ত্রশিল্পে মোহিনী মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, নদীয়া । বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

১২ নং ক্যান্সি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## সোনার বাঙলার সোনার কাব্য কুতিবাসী রামায়ণ

আদি কবির মহাকাব্য সংস্কারে সংহার করিতে সাহসী  
হই নাই। মহাকাব্য কুতিবাসীর এই সর্বাঙ্গসুন্দর ছাড়াবাদ-  
হীন সুপরিষ্কৃত রাজাধিরাজ সংস্করণ সবত্র সপ্তকান্ত রামায়ণ  
প্রকাশিত। উপহারে প্রিয়জনরঞ্জন ৪০ খানি চিত্রে  
চিত্রবর। মূল্য ৮ টাকা।

## নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগোবিন্দ ও প্রকৃষ্ণ

শ্রীপ্রমথনাথ মহামহার বি-এল প্রণীত

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

মূল্য দুই টাকা মাত্র

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

# স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থটিথ

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মৃতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই চৈত্রের বই

‘বনফুল’-এর উপগ্রাস

সপ্তর্ষি ৬.০০



এ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

ডঃ হৃত্যঙ্করপ্রসাদ গুহ'র **আকাশ ও পৃথিবী** ১০.০০

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন :—

“.....বাংলার বিজ্ঞান অমূল্যলনে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হলো—তা তোমাকে আরও উৎসাহিত করুক। আশা করি তোমাদের মত শিক্ষকদের সম্পর্কে এসে ভবিষ্যতের ছাত্রকুল দেশে বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য কুশলী কর্মী হিসাবে গড়ে উঠবে। এখন যেমন নিজের হাতে কাজ করার ডাক এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে অল্প-শিক্ষিত কারীদের বিজ্ঞানের মূল কথাগুলিও শিখান দরকার হয়ে পড়েছে। তোমাদের হাতেই বাংলা মার ভবিষ্যৎ স্তম্ভ রইল। আমাদের যবনিকার অন্তরালে যেতে বেশী দেরী নেই।”

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাহ্যকথানি আঁড়নব গ্রন্থ :

কাজী আবদুল ওহুদের	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ	১২.০০
শান্তিনিকেতনের কানাই সামন্তর	রবীন্দ্র-প্রতিভা	১০.০০
শান্তিনিকেতনের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের	রবি-কথা	৩.৫০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের	সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ	৩.৫০
বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	কবি-প্রণাম	৫.০০

“....রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আগে ও পরে কবির উদ্দেশে ও উদ্দেশে রত কবিতা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছে তা থেকে বাছাই করে ‘বন্দনা’, ‘সঙ্গীত’ ও ‘বিদ্যাপ’ এই তিন অংশে শতাধিক কবিতা ও সঙ্গীত এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। সংকলনের সর্বপ্রথমে কবির বড়দাদা শ্রীজ্ঞাননাথ ঠাকুরের আত্মবর্চন এবং সর্বশেষে অন্ততম তরুণ কবির প্রদ্বাঙ্গলি ১০০-ভাবীকালে ধীরে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করবেন এই সংকলনটি তাঁদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হবে।” —দৈনিক বঙ্গবন্ধু

আমাদের স্ব-নির্বাচিত গ্রন্থরাজি বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার

লেখকের জীবনী ও স্বহস্তলিখিত ভূমিকা সম্বলিত

প্রবোধকুমার সান্নাল : প্রেমেন্দ্র মিত্র : তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : প্রতিভা বসু : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বুদ্ধদেব বসু : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : আশাপূর্ণা দেবী : প্রবাসীকর আতর্ষী : প্রমথনাথ বিষ্ণু : শিবরাম চক্রবর্তী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জগদীশ গুপ্ত। প্রত্যেক খণ্ড চার টাকা।

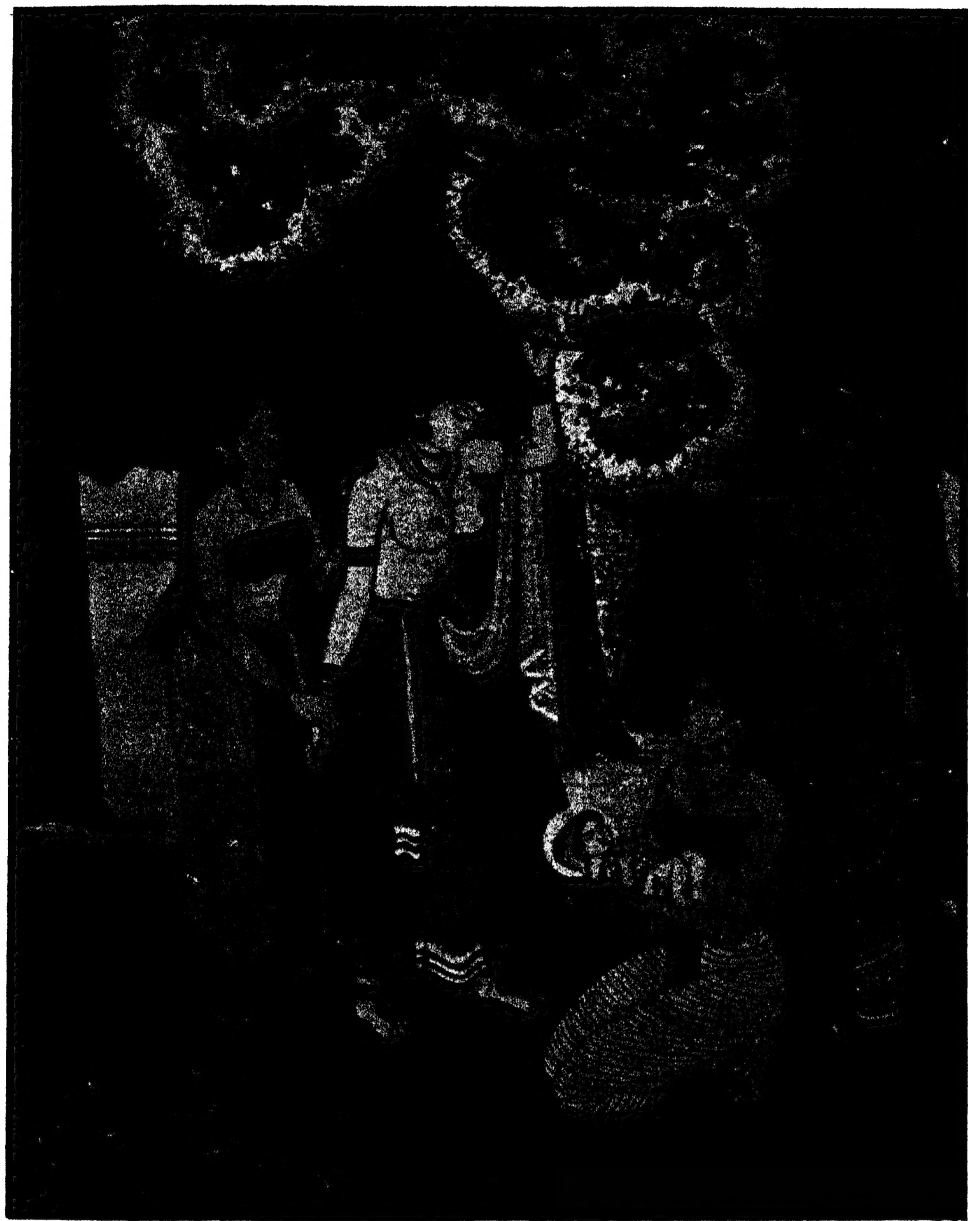
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

প্রায় : কালচার

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১





॥ বাসিক বসুধতী ॥

॥ বৈশাখ, ১৩৭১ ॥

(জলরঙ)

বুদ্ধের জন্ম

—শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্তী



৪৩শ বর্ষ  
বৈশাখ ১৩৭১



প্রথম খণ্ড

প্রথম সংস্করণ



# মাসিক বঙ্গমজা

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

ঠাকুরদর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত।

দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে—বুঝি অ'দান-প্রদান সামঞ্জস্য কবিবার চক্ৰ—গীত আরম্ভ করিল। দালানের

এককোণে খামে ছেলান দিয়ে চোবেজি নিমাইতেছিলেন। চোবেজি মন্দিরের পুজারী, পাচলওয়ান, সেতার—তুই লোটা ভাঙু হুঁবেলা উদরস্থ কারতে বিশেষ পটু এবং অস্ত্রান্ত আরও অনেক সদগুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজির কর্ণপট্ট প্রবেশবশত ডেদ করিতে উত্তত হওয়ায়, সখিরা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জলা চোবেজির বিয়ারিশ ইকি বিশাল বক্ষস্থলে 'উপায় হুদি লীছন্তু'—হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢলু ঢলু ছাট নয়ন ঠহন্তত বিক্ষিপ করিয়া, মনশ্চাক্ষুর কারণামুসন্ধারী চোবেজি আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজিত সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্মবাড়ির কড়া মাজার জায় মর্মপশী স্বরে—নারদ, ভরত, হুম্যান, নায়ক—কলাবজগুটির সপিণ্ডিকরণ করিতেছে। সখিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিষয়রূপ পুরুষকে, মর্মান্বিত চোবেজি তীব্র বিরক্তিবাক্তবশত জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বলি, বাপু তে—ও বেসুর বেতাল কি চাঁৎকার করছে?'

ক্ষিপ্ত উত্তর এলো—'স্বর তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজির মন ভিজ্জিচি।'

চোবেজি—'হু, ঠাকুরজি এমনই আহাম্মক কি না? পাগল তুই—আমাকেই ভিজ্জতে পারিস্ নি—ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশি মূখ'?

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমার উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই

## কথামৃত

লোকের কাছে স্তন মহাশুশি; থেকে থেকে বিকট চাঁৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভর কি? আমার কি পাবে কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খা বটিকেল আওরাজে বারবার

বসতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয় তাহার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আজ তিনি সলাই প্রভুর জন্ত প্রাণ পরিত্যক্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভাবে ভাবনা যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। ভোলাচাঁদ চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওবায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ ও লোকটিও দুটামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমারই ভুলি নি!!

ভোলাপুত্রি বেজায় বেদান্ত—নকল কথাতেই তাঁর ভ্রম স্বয়ং পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুত্রির চারিদিকে যদি লোকগুলো অশ্রদ্ধাভাবে হাহাকার করে—হাঁকে ম্পর্শও করে না; তিনি অশ্রদ্ধাভেদের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি বেলে, শোকে, অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাহেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বর্য চিন্তা করেন। তাঁর সামনে বলবান দুর্ভাগ্যকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুত্রি—'আত্মা মরেনও না, মারেনও না' এই ঐশ্বর্যবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুব যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুত্রি বড়ই নারাজ। পেড়ালীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে গুণম সেয়ে এসেছেন। এক জায়গায় যা পড়লে কিন্তু ভোলাপুত্রির আত্মকায়মুক্তির যোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাজক্ষামুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরীজীর মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীবজগতে

আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কোন মুহূর্ত্তমাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়ে আহ্বায়ক ঠাওরেছেন।

বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা-ভাঙ এবং দুঃস্থিতিগুণাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি?

রামচরণ—সে সোজা কথা মহাশয়—আমি সকলকে উপদেশ করি।

রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?

লক্ষ্মী সহরে মহরমের ভারি ধুম। বড় মসজিদ ইমামবাড়ার জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বেহুতার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরাণী, আছদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজারা জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্মী সিরাদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম হাসেন হোসেনের নামে আর্জনাও গগন স্পর্শ করছে—সে ছাত্রিফাটান মসিয়ার কান্তরানি কার বা শ্রমের ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের ভীষণ হ'য়ে উঠেছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হইতে দুই ভঙ্গ-রাজপুত্র তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর সাহেবদের—যেমন পাড়াগেয়ে জমিদারের হ'য়ে থাকে—বিভাঙ্কান ভরে বচ। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ গাফের বিদ্রোহ উদারণ সমেত লক্ষরী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা কাবা চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়ানার রঙ-বেরঙ সহর-পসন্দ চঙ অতদূর গ্রামে গিরে ঠাকুর সাহেবদের স্পর্শ ক'রতে আজও পারে নি। কাজেই ঠাকুররা সরল সিধে, সর্বনা শিকার ক'রে জমামরদ কড়াঙ্কান আর বেজার মজবুত দিল।

ঠাকুরঘর ত' ফটক পার হ'য়ে মসজিদ মধ্যে প্রবেশোক্ত, এমন সময় সিপাহী নিবেদন করলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে সে, এই যে দারপাশে খুব খাড়া দেখছ, গুকে আগে পাঁচ ছুতা মার, তবে ভিতরে যেতে পারে।

মুষ্টিটি কার?

জবাব এলো—ও মহাপাণ্ডী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হায়েন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, এ শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ মূর্তি পাঁচ ছুতার জায়গার দশ ত' নিশ্চিত থাকে।

কি কর্মের বিচিত্রগতি—উন্টা সমঝ'লি' রাম—ঠাকুরঘর গলগলাকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ মূর্তির পদতলে কুমড়া গড়াগড়ি আর গলগলধ্বরে স্ততি—ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অজ্ঞ ঠাকুর আর কি দেখব? ভল বাবা অজিদ, দেবতা তো তু'হি জায়, অসু মাজরা শারোকো কি অভিতকু রোবত। (বল বাবা ইয়েজিদ, এখনি মেরেচো শালাদের—কি আজও কাঁদছে ॥)

সম্মতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে মন্দিরে নিয়ে যাবার বাস্তবাই বা কত! আর সেখা নাই বা কি? বেদান্তীর নিগুণ ব্রহ্ম হোতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্যমামা, ই'দুরচড়া গণেশ, আর কুচদেবতা যষ্টী, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণতরে চের মাল আছে, যার এক একটা কথাই ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সেদিকে দৌড়েছে। আমাদেরও কৌতূহল হোল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিরে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ বাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ড, একশত হাত, হ'শ পেট, পাঁচশ' ঠ্যাঙলো মূর্তি খাড়া। সেইটার পারের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম যে, ওই ভেতরে যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড়া বা ছুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এ'র কথা চাই—যিনি দারদেশে; আর ঐ যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, শাস্ত্র সকল দেখছ; ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এ'র লুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি?—উত্তর এলো, এ'র নাম 'লোকাচার'। আমার লক্ষ্মীরের ঠাকুর সাহেবের কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ভল বাবা 'লোকাচার' অসু মারো' ইত্যাদি।

গুড়গুড় কুন্ডব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিখ্যাতদ্রোহের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিরেপার; বন্ধুরা বলে তপস্কার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নভাবে! আবার দুঃস্থর বলে, বছরে দেড় কুড়ি ছেলে হ'লে ঐ রকম চেহারা'ই হ'য়ে থাকে। বাই হোক কুন্ডব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিষটি নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যাপ্রবাহ ও চৌধুরাশ্রিত গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুণ দুর্গাপূজার বেড়াবার-মুক্তিকা হ'তে মায় কাদা পুনবিবাহ দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কর্তে তিনি অবিচল। আবার প্রমাণ প্রয়োগ—সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমন সোজা ক'রে নিয়েছেন। বলি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্তর্য ধর হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কুন্ডব্যালগুটি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, কুন্ডব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ো!! অতএব গুড়গুড়ো কুন্ডব্যাল বা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হ'লে, লোকগুলো একটু চমকে হোয়ে উঠেছে, সকল জিনিষ বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কুন্ডব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মার্কিন, যে সকল মুসলিম মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রছি, তোমরা যেমন ছিলে, তেমনই থাক। নাকে সরিষার তেল দিয়ে খুব ঘ্রামোও। কেবল আমার বিশারের কথাটা ভুলো না। লোকেরা ব'ললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে কিহতে হবে, কি আপদ!!! 'বৈতে থাক' কুন্ডব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে গেলো। হাজার বছরের অভ্যাশ কি ছোটো? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গীট কি কাটে। তাই না কুন্ডব্যাল দলের আদর। 'ভল বাবা 'অভ্যাশ' অসু মারো' ইত্যাদি।

—স্বামী শিবকানন্দ্রের বাণী হইতে

শ্রীমতী  
শ্রীমতী

শ্রীমতী

৬৮

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের গৌরভক্তরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত! কিন্তু তাদের পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে পা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ দিয়ে চলে যাওয়া যায়?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যত্নন্দন আচার্য এসে হাজির।

যত্নন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যত্ননাথকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

‘আমার যে পুজুরী ছিল সে আর পুজো করতে আসছে না।’ বললে যত্নন্দন, ‘তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।’

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখ-নিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, ‘বেশ তো, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যাই।’

যত্ননাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অল্পমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, ‘যাও।’

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞায় আবৃত, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। যত্ননাথ কল্পনাও করতে পারল না, এই

ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

প্রভুই তো শান্তিপু্রে রঘুনাথকে বলেছিলেন, ‘এখন ঘরে ফিরে যাও, অলিপ্ত হয়ে বিষয়কর্ম করো। আমি ইতিমধ্যে নীলাচল থেকে ফিরে আসি, তারপর কোনো ছলে তুমি আমার কাছে এসে হাজির হও। ভয় নেই, কৃষ্ণই সেই ছল রচনা করে দেবেন।’

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক পৌঁছানো নিয়ে কথা।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্তচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে, ছুটে চলেছে। স্বর নয় না, ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না— এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যত্নন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁছেছে রঘুনাথ।

‘চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাও নি মনে হচ্ছে।’ জিপগেস করল গোয়ালী, ‘হুখ খাবে?’

রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালী হুখ এনে দিল। তাই খেয়ে সারীরাত্ত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পূব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পাত্র পৌঁছল। কোথায় রঘুনাথ! কই আমাদের সঙ্গে আসে নিতো! কাকে ফেরাব?

গোবর্ধনের লোকই কিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সময়ে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো বন্ধন, কখনো দুগ্ধপান, কখনো বা নিরঙ্গু উপবাস। হঠাৎ অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কবে?

বারো দিন পরে—তারার মধ্য তিন দিন শুধু ভোজন হয়েছে—রঘুনাথ ক্লান্তমে পৌঁছল।

‘এই যে রঘুনাথ! উছলে উঠল রঘুনাথ।

‘এসেছ? এস।’ তার হঠ রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, ‘তোমার পাপ সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে বিষয়রূপ থেকে বিচলিত করে নিয়ে এল।’

রঘুনাথ বললে, ‘আমি কৃত্ত জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।’

‘এর বাপ আর জেঠা,’ সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, ‘বিষয়বিষয়েই সুখসেবা বলে মনে করে। এদের অনেক দান ধ্যান, কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্ত কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কি রকম কৃষ্ণ হয়ে গেছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল, ‘স্বরূপের রঘুনাথ।’ বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, ‘তাই হবে।’

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, ‘কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো।’ রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: ‘তুমি যাও সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথকে দর্শন করে এস।’

পাঁচদিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর যত্নেই আছি, দিবি

মুখের কাছে অনায়াস খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আত্মস্বল্পস্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গদাধরকে, বললে, ‘ভিক্ষে করে খাব।’

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, ‘রঘুনাথ আর থাকছে না আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে থাকছে।’

এই তো নিক্ষিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু বললে, ‘বা খুব ভালো করছে।’

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্তে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়—সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে, দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্ষাময়ই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষাময়ই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

‘বৈরাগী কবির সদা নামসঙ্কীর্তন।

মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥

বৈরাগী হইয়া যেন করে বারাপেক্ষা।

কাষিসন্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥

বৈরাগী হইয়া করে জিহবার লালস।

পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্তন।

শাকপত্র ফলমূলে উদর-ভরণ ॥

জিহবার লালসে যেন ইতি-উতি ধায়।

শিশোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥’

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ। বললে, ‘বলুন আমার কী কর্তব্য। প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কী?’

প্রভুকে বিশেষ সন্ত্রস্ত করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ বললে, ‘রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।’

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, ‘স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা

## অঞ্চল অধির শ্রীগৌরানন্দ

শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরিবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।’

‘গ্রাম্যবর্তী না শুনিবে, গ্রাম্যবর্তী না কহিবে।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥

অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥’

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ শুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, ‘তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি। কোথায় আছে কী করে বলব। তুমি যে আগে থেকেই এখানে চলে এসেছ তা কে জানে?’

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌড়ভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দ কাছের লোক পাঠাল গোবর্ধন।

‘গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন?’

‘দেখলাম বৈ কি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।’

‘সে কি বাড়ি ফিরবে?’

‘মনে হয় না।’ বললে শিবানন্দ, ‘তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করেছে। তার ভ্রম্য পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষা দেয় তো খায়, না দেয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।’

গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুঃখজনক যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্তে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, ‘এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌঁছাবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।’

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তেরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর

টাকা পাঠিয়ে দিল। লোক বলতে দুই চাকর এক ব্রাহ্মণ আর টাকা চার শো মুদ্রা।

যথারীতি পৌঁছল সকলে নীলাচলে। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে মহাপ্রভুকে মাসে দু’দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হলেন। মাসে দু’দিন।

দু’দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আটপাণ মাত্র কড়ি লাগে। সেই মাত্র আটপাণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্তে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্তে। তাও এক মাসে আট পণ্ড।

টানা দু’বছর এ ভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ। তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

‘কী ব্যাপার?’ স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন

প্রভু, ‘রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?’

স্বরূপ বললে, ‘রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।’

‘কী বিচার?’

‘বিষয়ীর অব্য দিয়ে প্রভুকে সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তারই জন্তে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিঙ্ঘময়।’

প্রভু হাসলেন। বললেন, ‘বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আর মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি ফুরিত হয় না। বিষয়ীর হচ্ছে রাজস-নিমন্ত্রণ। দত্ত আর প্রতিষ্ঠা লোভই এই নিমন্ত্রণের হেতু। এতে দাতা-ভোক্তা দুয়েরই সঙ্কোচ ঘটে। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিচ্ছে

গই নি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ।’

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

‘হাঁ! হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্তে আর সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না?’ প্রভু জিগগেস করলেন স্বরূপকে।

‘কে দেবে, কে না দেবে, এই আশা-নিরাশায় চিন্তা চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।’

‘ঠিক করেছে।’ প্রভু সমর্থন করলেন: ‘সিংহদ্বারে ভিক্ষারূতি বেশাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালভ ঈদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে-মনে মাশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই, উদগত মনে খে কৃষ্ণকীর্তন করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা দ্বার মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।’

শঙ্করারণ্য সরস্বতী পৌবধনের শিলা আর গুজামালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে পহার দিয়েছিল। লীলাস্ররণের সময়ে ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় পরতেন, কখনো বুকে, কখনো তার জাগ নিতেন আর খনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে ান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্ত শিলা নয়, এ ামার কৃষ্ণকলেবর। তিন বছর এই শিলা-মালা ারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, ‘রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর মি সাদৃশ্য পূজো কর। একপাত্র জল নাও আর াও আটটি তুলসীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, দ্বায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণ-প্রমথন পেয়ে যাবে।’

স্বরূপই সব জোগাড় করে দিল। শিলার পবার জন্তে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ ত বস্ত্র আর জলের জন্তে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পূজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ ার কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদত্ত পৌবধন-শিলা। চই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ ামাশ্রিতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পূজায় চ সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর বোড়শোপচার পূজায় ই। আর এ শিলা কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন স দাঁড়িয়েছে।

স্বরূপ বললে, ‘আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।’

স্বরূপের আদেশে পৌবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাক্ষসখর্ষে পালিত রঘুনাথ সর্বস্ব-ত্যাগের পরমদৈন্তে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে পরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুজামালা দিয়ে রাধিকার চরণে। প্রভু তাই যুগলকিশোরেরই ভজনা করতে বলছেন।

আনন্দে রঘুনাথের বাহবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর।

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ। কোথাও এতটুকু সময় ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। ‘রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষণের রেখা।’ পাষণের রেখা যেমন নিটুট তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন রাত্রির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্তে বরাদ্দ মোটে চারদণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত উন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনোদিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া কাঁথা-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে, আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন। ঘুরে ফিরে আমারও এখন সেই আত্মসেবা!

যে জ্ঞানদূতায়, অর্থাৎ জ্ঞানবলে যার বাসনা নাশ হয়েছে, সে নিজেকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে জেনেছে, সে কিসের আশায় কোন অভিসন্ধিতে দেহে আসক্ত হয়ে দেহকে পোষণ করে বেড়াবে?

কয়েকদিন পরে রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে। কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষা নিয়ে



## অবশ্য অবির অগৌরব

আসে তারই জন্তে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে।  
সুতরাং সেই চাকল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদার খেতে  
লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদার সমস্তই রোজ বিক্রি হয়  
না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু'-তিন  
দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না।  
তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়।  
অনেক সময় অরের এমন হ্রবস্থা, গরুও তা মুখে  
তোলে না। সেই গলিত প্রসাদারই রঘুনাথ  
মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে  
গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত-শক্ত ভাত ক'টি হুন মেখে  
খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে না দুর্গন্ধ হয়? প্রসাদ  
তো চিদবস্তু। সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না।  
সে চিরন্তন অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি  
কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুম্বার কি কখনো উষ্ণ হয়?  
তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল  
অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টি বিচারেই  
প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে  
চিন্ময় ভগবদ বিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য  
প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই  
প্রাকৃত জনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ  
প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাধিক  
সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ  
খাওয়া।

‘বা, আমাকে কিছু দাও।’ স্বরূপ হাত বাড়াল।  
খেয়ে বললে, ‘তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও,  
আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন  
স্বভাব?’

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

‘সে কী?’ নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের  
কাছে: ‘নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে  
ভাগ দিচ্ছ না কেন?’ বলেই হরিতে একগ্রাস মুখে  
পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্তে হাত বাড়িয়েছেন,  
স্বরূপ বাধা দিলেন। বললে, ‘না, এ তোমার যোগ্য  
নয়।’

প্রভু বললেন, ‘কী যে বলো তার অর্থ নেই। কত  
প্রসাদ খেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো  
খাই নি।’

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরান্বিতবকল্পতরু  
এব্ধে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের  
দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের  
বুকের প্রিয় গুঞ্জাহার আর গোবর্ধনশিলা দিয়ে  
দিলেন উপহার, সঁপে দিলেন স্বরূপগোবর্ধমীর হাতে,  
সেই শ্রীগৌরান্ব আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ  
করুন।

রঘুনাথ আর কা করে? রাত্রিকালে সকলের  
অপোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন  
বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল  
বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে।  
স্বরূপের অন্তর্ধান হলে বৃন্দাবন চলে এল। ঠিক করল  
রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাছাড়া থেকে  
লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে  
আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে  
আমাদের কাছে প্রভুর লীলাবিহার বর্ণনা করো। এত  
দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে-সব চিত্তচমৎকার  
কাহিনি।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্নজল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্ন  
কথন। ‘আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। তিন  
ছটাক মাঠাই তার সারা দিনের আহার। প্রত্যহ  
নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর  
বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন  
রাধাকৃষ্ণের মানসসেবা। রাধাকৃষ্ণে তিনসন্ধ্যা স্নান,  
আর ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলেই আলিঙ্গন। দিবারাত্রির  
আট প্রহরের মধ্যেই সাড়ে সাত প্রহরই ভজন  
আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তা-ও সব দিন নয়।  
যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই  
ঘুম যায়।

কিন্তু এবার কে এল লীলাচলে?

এ যে কানীর সেই বল্লভ ভট্ট। কী চায়?  
কী বলে?

[ক্রমশঃ]

# কৃষ্ণজুবুর্বেদীয় তৈত্তিরায়োপনিষদ্

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

## দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী

### যষ্ঠোহিনুবা ক

অসম্মেব সব ভবতি...তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে।

তদপ্যেয় শ্লোকো ভবতি।

যে মনে করছে ব্রহ্ম অসং  
নিজে সেও জেনো মিথ্যা।  
যে জানে হৃদয়ে, ব্রহ্ম সত্য,  
জানীবা তাকেই সত্যস্বরূপ বলে।

‘অসম্ম সেই জানের আত্মা’—একথা শ্রবণ করে, শিষ্য প্রশ্ন  
করে—

মৃত্যুর পরে আনন্দ-লোকে,  
অবোধ কি যেতে পারে ?  
না কি পারে না ?  
জীবনাবসানে,—(আত্মসাধনে)  
জানীই কি লাভ করে,—  
সে মহাসত্য চির আনন্দ,—  
সে পরম আত্মাকে ?—  
না কি করে না ?—

(শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরদানের জগ্গা ভূমিকা করছেন গুরু) —

বহু হব আমি,—জন্ম লভিব, নানা রূপে-রূপে,—  
কোটি বিচিত্র জীবনে,—

এই হোল তাঁর কামনা।

এই কামনার তপ করলেন তিনি।

তপ করে করলেন,—

এই চরাচর সৃষ্টি।

সৃষ্টি করে, তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রবেশ করে তিনি এই সমস্তই হলেন।

(কাথকারণে ভেদ রইল না আর)

এই সৃষ্টিকে সব দিক্ দিয়ে,

ব্যাপিয়া সর্বরূপে।—

বিরাজ করেন তিনি।—

এই যত কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য রূপরাশি,

এই বাহ্য কিছু অমৃত আর মৃত;

কথিত এবং অকথিত তাহ,—

অনাশ্রয় আর আশ্রয়,—

এই বাহ্য কিছু (সাধারণভাবে) সত্য এবং মিথ্যা,—  
সকলি তাহাতে পূর্ণ।

বাহ্য কিছু আছে সকলি ব্রহ্মময়।

ব্রহ্মবাদীরা তাই তাঁর নাম

‘সত্য’ বলিয়া জানে।

এ-বিষয়ে জেনো, আর একটি শ্লোক আছে।

### সপ্তমোহিনুবা ক

অসম্মা ইদমগ্র আসীৎ।.....

তত্ত্বেব ভিন্নং বিদ্যোহময়ানত। তদপ্যেয় শ্লোকো ভবতি।

আগে এ জগৎ অসংরূপেই ছিল।—

অসং হইতে সত্য জন্ম নিল।—

অসং হইতে সত্যে তাহার (প্রকাশের চিরলীলা)।

নিজেই নিজের রূপকার,

তাই ‘স্বকৃত’ তাহার নাম।

যিনি স্মৃকৃতন, তিনিই পবন বস।

সেই বসন্তের এই জীবকুল

চির আনন্দে মগ্ন।

(রয়েছেন তিনি, আকাশে বাতাসে,

অগ্নিতে অগ্নিতে লিপ্ত)

আনন্দরসে,—মর্মে মর্মে,—

এ আকাশ আছে সিক্ত।

না হলে কেই বা প্রাণে ও অপাণে,

শ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁচত।

(তিনি রসস্বরূপ বলেই জীবের জীবনে আনন্দ আছে। সেই  
পরম রসের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ, শোক, দুঃখ, আশা, আনন্দ বিভিন্ন  
উপলব্ধিতে জীবের বিচিত্র সুখ।)

(ব্রহ্ম সত্য,—রয়েছেন তিনি। কারণ)

সাধক যখন অতীক চিন্তে নিজেকে স্থাপিত করে,

বচনা গীত আশ্রয়তীত অভয় ব্রহ্মনাথ,—

পরম অভয় চিন্তে গ্রহণ করে,—

তখন সে হয় পূর্ণ ব্রহ্মভাবে।

দ্বিতীয়বিহীন সর্বব্যাপী অভয় ব্রহ্মনাথ,

মুক্ত অবোধ অবিবেকী জীব যখন করেছে,

বিন্দুও ভেদ কল্পনা,—

তখন তাহার হয়েছে মৃত্যুভয়।

মননবিহীন ভেদবর্শীর কাছে,

অভয় ব্রহ্ম ভয়ের মতন লাগে।

এ-বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে। ২।৭।

[ক্রমশ]

অমুবাদিকা—চিহ্নিতা দেবী

পৃথিবী বিখ্যাত জ্যামিতিক

# ইউক্লিড

তীরন্দাজ



ইউক্লিড

মানব-সভ্যতার বিকাশ যেমন সঞ্চিত সমানভাবে হয় নি, তেমনি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতিও দীর্ঘদিন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে অধিকৃত রাখতে পারে নি। তার কারণ, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রাচীন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক ঠাঁইস্থান আজ বিশ্বস্তির গর্ভে বিলীন, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার বীনতর নগর বা দেশ প্রতিযোগিতায় তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা এবং বারাণসী—শিন্দমেও তেমনি ছিল যথাক্রমে এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া এবং রোম। পাশ্চাত্যের তিনটি স্থানের মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ এথেন্স এবং আলেকজান্দ্রিয়া কার্ণত একই জ্ঞানবৃক্ষের দুটি মূল ছিল বলা চলে, বর্ষাৎ গ্রীক। এথেন্স চলতো প্রধানত দর্শন এবং সাহিত্যের চর্চা আর আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধানত চলতো ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর চর্চা। যার বেশির ভাগই আজকের দিন 'বিজ্ঞান' হিসেবে মাথায় লাগে করেছে। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য ইউক্লিডের ঠাঁইস্থানও ছিল এই আলেকজান্দ্রিয়া।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী-বীর আলেকজান্দার খৃঃ পূর্ব ৩৩২ সালে দ্বিজিত মিশরে ভূমধ্যসাগরের কূলে নিজের নামানুসারে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। কি স্থলপথ, কি জলপথ উভয় দিক দিয়ে তারাতের সহজ উপায় ছিল বলেই অল্পকালের মধ্যেই আলেকজান্দ্রিয়া ম যুগের পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অদ্বিতীয় হিফেবেড়ে উঠেছিল। এথেন্স নিজে আসবার পূর্বেই আলেকজান্দ্রিয়ার এই যে প্রতিষ্ঠা এর মধ্যে একটা নতুন দিকও ছিল। ত'লো এই বন্দর নগরটির আন্তর্জাতিক চরিত্র। এথেন্স যেমন হল সর্বৈব গ্রীক, আলেকজান্দ্রিয়া ঠিক তেমনি ছিল গ্রীক গাষার আশ্রয়ে সারা বিশ্বে জ্ঞানের আলো আদান-প্রদানের ক্ষেত্র। এথেন্স ছিলো প্রধানত গ্রীসের একান্ত নিম্ন মননশীল জনী প্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র। আর আলেকজান্দ্রিয়াতে মূলত গ্রীক প্রতিভাই পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে ভাষাভাষার আদান-প্রদানের সুযোগ পেয়ে একটা নতুন সভ্যতার পন্থন করেছিল লা চলে। এ সভ্যতাকে গ্রীক বললে যেমন একেবারে ভুল বলা হয় না, তেমনি আলেকজান্দ্রিয়ার বললেও তেমন কিছু বাড়িয়ে বলা হয়

না। আলেকজান্দ্রিয়ার বলতে প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিকতার চরম প্রকাশ বোঝাত সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু জনবসতির দিক দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচীন তিনটি জাতির মিলিত নগরী ছিল বলা চলে। সে তিনটি জাতি হলো যথাক্রমে গ্রীক, ইহুদী এবং মিশরীয়।

আলেকজান্দার দেহত্যাগ করেন খৃঃ পূর্ব ৩২৩ সালে, অর্থাৎ এই নগরীর প্রতিষ্ঠার মাত্র নয় বৎসর পরে। আলেকজান্দারের দেহত্যাগের পরে নানা দেশে তাঁর অধিকৃত দেশগুলির বেশির ভাগই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন দেশে প্রধানত স্থানীয় সেনাপতিগণের মধ্যেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বাটোয়ারা হয়ে যায়। আলেকজান্দ্রিয়া সহ মিশরের বিধাট অংশটি অধিকার করে নিয়েছিলেন আলেকজান্দারের অন্ততম প্রধান সেনাপতি টলেমী (প্রথম)।

জ্ঞান-বিজ্ঞান অমূল্যবস্তুর জন্তে আলেকজান্দ্রিয়ার যে প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি তার পেছনে প্রথম টলেমীর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ এই টলেমীই আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! এই মিউজিয়ামটি থেকেই পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই একদিকে সৈ যুগের পৃথিবীতে সমস্ত সভ্যদেশ থেকে ছাত্র আসতো অধ্যয়নের সুযোগ পাবার আশায়। অন্যদিকে আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ বিজ্ঞানচর্চার এমন একটা আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দর্শন এবং বিজ্ঞানের নানা বিভাগের শিক্ষকতার জন্তেও বলতে গেলে ইয়োরাপ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সেরা অধ্যাপকগণের একটা বড়ো অংশ আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই ক্ষুদ্র অতীতকালেও প্রায় ৭,০০,০০০ বটে সংগৃহীত হয়েছিল এই নগরের লাইব্রেরীতে। সে যুগের বই মানে প্যাপিরাসের রোল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে কখনো যুক্ত ছিলেন এ রকম যে সমস্ত জ্ঞানীশ্রুগণ পরবর্তীকালে অমর হয়েছেন তাঁদের কীর্তির জন্তে তাঁদেরই অন্ততম হলেন ইউক্লিড। ইউক্লিড জাতিতে ছিলেন গ্রীক। ইউক্লিডের জীবনের প্রথম চল্লিশটা বছর স্বদেশের রাজধানী এথেন্সেই কেটেছিল বলে জানা যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের অধ্যাপকগণের অন্ততম ছিলেন এই ইউক্লিড। অনেকের মতে ইউক্লিডই ছিলেন

আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম ব্যবস্থাপক। প্রাচীন পৃথিবীতে ইউক্লিডই সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ ছিলেন কি না সে বিষয়ে সকলে একমত নয়। যদি শুধু জ্যামিতির দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ যে কেউই ছিলেন না একথা সে সময়ে তারপরের ছ'পাঁচ বছর পাব এমন কি আঙ্ককের মনেও বসে দাঁড়াতে পারে থাকেন।

অধ্যাপনার সময়ে তাঁর নব সটিকভাবে জ্যামিতির বিষয়বস্তুটি কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এটা জ্যামিতির প্রত্যেক অধ্যাপকেরই একটা হুর্ভাবনার বিষয় ছিল। সে যুগে; কারণ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বলতে যা বোঝা যা যেমন ছিল না কিছু তেমনি বিষয়টিও এতই দুর্বল ছিল যে, অনেক প্রবীণ অধ্যাপকও কতৃপক্ষেই কাছ থেকে অনুমুদ্র হয়েও জ্যামিতির কোনও পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিতে রাজী হন নি। কিন্তু নিজের বিষয় সম্পর্কে ইউক্লিড এতই আস্থা রাখতেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় জ্যামিতির একমাত্র পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

জ্যামিতিশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল অবশ্য ইউক্লিডেরও কয়েক হাজার পূর্ব—সেই স্তরও ব্যাবলন প্রাচীন মিশরের গৌরবময় যুগে। কিন্তু সে সময় থেকে কয়েক হাজার বছর এই শাস্ত্র ছিল ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের বিষয়। অর্থাৎ এত এত বছর ইচ্ছা, আগ্রহ এবং অব্যবসায়ের ফলে এই শাস্ত্র কোনও প্রকারে আরও কয়েক পারলেও তাঁরা সে জ্ঞান বেভাবেই হোক না কেন তাঁদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন—কিন্তু অপর দিক দিয়ে নিজে পাবে এমন কিছু করতেন না—অর্থাৎ অশ্রমে শিক্ষার সুযোগ করে দিতেন না। চলছিল এইভাবেই, ইউক্লিডই স প্রথম এই দুরহ শাস্ত্রটিকে পাঠ্যপুস্তক রূপে গ্রন্থাবলীর মধ্যে বসিয়ে দিয়ে সাধারণের দ্বারা প্রচার পথ খুলে দিলেন।

## শান্তির ঘুম

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

পৃথিবীর করুণ মাটির মতো  
উদ্ভল এক কামনার  
একগ্র কান-পাতা ছিলো :  
কিবা গুলু প্রজাপতির  
ডানায়—হারায়  
পরম শান্তির ঘুম  
চেরেছিলো  
পৃথিবীর মাথায়।  
কিন্তু সে মাটিতে দুর্বীর  
পালব শক্তি  
কেড়ে নেয় শান্তির ঘুম।  
অন্ধকার অঁধি  
সন্ততার ডেউ তুলে যায়  
শাস্ত্র সমুদ্রে বকে  
উদ্ভল জলে ধারায়—  
মনে হয়  
সেইই আগামী দিনের শান্তির ব্যঙ্গনা।

ইউক্লিডের বইয়ের ইংরেজী নাম Elements of Geometry.

Elements-এর প্রথম থেকে ষষ্ঠ ভাগে গ্রেস জিওমেট্রির সূত্র শিক্ষা করবার পদ্ধতি রয়েছে; পঞ্চম ভাগে শাস্ত্রের প্রোপারশনও রয়েছে। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম ভাগে এর ছয় পরিমাপ শিখার সূত্রাবলী এবং দশম থেকে ত্রয়োদশ ভাগে বস্তুতে সাতটি জিওমেট্রির সূত্রাবলী।

প্রায় আটশত শত বছর আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাক এবং প্রতিষ্ঠা অগ্নিভাবেই চলেছিল কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর অনেক জায়গার মতো আলেকজান্দ্রিয়াতেও নামে আসে অন্ধকার। ক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীওপগণ যথোপযুক্ত সমাদরের অধীনে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আশ্রয় বিহীন হয়ে লাগলেন। নতুন প্রতিভার বাটরে থাকা আগমনও কাঁধে বন্ধ হয়ে গেলো—কারণ ইসলামের জ্ঞানের পরে বিজ্ঞানের কোন কোনাে জ্ঞানে প্রোভেন অসম্ভব হতো না।

ইসলামের যে প্রধান দেশ অর্থাৎ আরব—সথানে কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনক দিক বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্র সংক্রমে চর্চা হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পরে সেখানেও কার্গত অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা দূর হয়ে যায়। ইসলামের এ অন্ধকারের প্রভাব কাটিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারকে সাত-আট শ' বছর আত্মগোপন করেই থাকতে হয়েছিল। তারপর মধ্যযুগে আরব নতুন করে ইউক্লিডের সূত্রাবলী ইরোরাপে প্রচারিত হলো।

ইউক্লিডের সূত্রাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল ১১২০ খ্রিষ্টাব্দে। ইংরেজী ভাষায় এর চরম প্রথম প্রকাশপাণ্ড করে ১৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে—তার হেনরী বিলিংসলীর এ অনুবাদের মোট পৃষ্ঠ সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

## এ রাত তোমার নামে

গোবিন্দ হালদার

এ রাত তোমার নামে জাগ জেগে গান লিখে বাই :  
নক্ষত্রের লিপি দিয়ে যদি তবু কথা বোনা যায়—  
সাগর কল্লোল তবু তবু হ'লে কেমন শোনার  
মিলন যোগবী নয়, বিচ্ছেদের কল্পনা নাই।

এ রাত জাগর স্বপ্ন : এ রাত কবিতা লেখার  
যে আসব না কোনদিন শুধু তবু পদধ্বনি শোনা—  
তাও যাদের শব্দ গেলে অকারণে মিছে কাল গোপা,  
হারানো স্মৃতির ঘরে তবু সব মমিকে দেখার।

এ রাত একাকী আমি অন্ধকার সঙ্গী শুধু যাব—  
অনিদ্র সাগর আছে বক্ষ মের অতলাস্ত্র সুর :  
রাতের নক্ষত্র সব শব্দ হ'লে আমার ভাষার  
তোমার স্বদে তবু কোনদিন হবে কি বিধুর ?

এ রাত তোমার নামে জেগে তাই গান লিখে বাই :  
মিলনের রাগে নয়, বাজে সেখা করুণ শানাই।

# আঁদ্রে জিদের সৎগে

লেরঁ পিয়্যার-কঁা

প্রচণ্ড শীত। দুর্গম বেস কারী পথ। হাঙা সারাবার দিকে মালিকের কান মনোযোগ নেই। আমি 'ম'রামি'র দিকে চলছি। দূর থেকে শব্দের জানালাগুলোকে মনে হচ্ছিল চিলেকোঠার জানালার মত... যখন সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। পরিত্যক্ত একটি বাগানের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। বাড়ির এমন কি হল-ঘরের দরজাও খোলা। দূর থেকে একটি আদেশবাক্যক বঠবর ভেসে এ—'দরজা বন্ধ করে দাও। আমি এখনি আসছি।'

একজন ভক্তলোক বরিয়ে এলেন—গায়ে ওজারকোট, মাথায় টুপি। আমি—'আপনি 'ক' বোরিয়ে যাচ্ছেন'—না, আমার 'ক' হয়েছে।'

তৎক্ষণাৎ ফিন আমায় সাদর অভিবাদন করে বললেন—'আমি আপনার জন্মই অপেক্ষা করছিলাম'।

রাত আটটা। সকালে টেলিফোনে তাঁর কম্পিত বঠবর তখনও কানে বাজছিল—'কি ব্যাপার? কি চাই?'

ঘরের এককোণে আঙুন দলছে। হিষ্‌ মাঝে মাঝে আঙুনের কাঠগুলো ঠিক করে দিচ্ছন। ঘরটা এত বড় যে, ঐ আঙুনেও যথেষ্ট গরম হয় নি। ব্ললললকে ঘর সিঁচি বা দেয়াল-কাগজগুলোও ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। মেঝেতে কার্পট নেই—সর্বত্র পাথর। এককোণে একটি খেলবার টেবিল—সব দিকের 'ক' মোটাই ইত্যাদি রেখেছেন। টেবিল আর আঙুনের মাঝখানে দুটি চেয়ার। 'Si Le Grain ne meurt' গ্রন্থখানির সমালোচনা সম্পর্কে আমায় আলোচনা করতে লাগলুম।

বন্ট। বাজল। জিদ আবার পরিব্রাজকের টুপি গায় কোটাটা পায় হরজা খেলবার অভিযানে চললেন। না, কান পরিচারক নয়—তাঁর ভাই আর মার্ক। তাঁরা চা তৈরি করছেন। মার্ক খাতা-পত্রের সরিয়ে রেখে চাহের কাপগুলো টেবিলের ওপর রাখলেন। নোটবইগুলো স্থানচ্যুত হওয়াতে জিদ আপত্তি করলেন। মুচকি হেসে মার্ক বললেন—'আমি আবার ঠিক করে রাখব।'...এঁরাই তাঁর সাথী, এঁদের নিয়েই তাঁর সংসার।...

আমার সংগে কথা বলতে বলতে জিদ একটা হল-ঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন। সেখানে একটা ভারী কাঠের টেবিলের চারদিকে চার-পাঁচজন তরুণকে উপবিষ্ট দেখলাম। এটি টেবিলের ওপরে বৈজ্ঞানিক কাড্ডারতির পরিবর্তে দেখতে পেলাম আবরণহীন শুষ্কমাত্র একটি বাঘ। মেয়ালের সংগে লগানো একটি ট্রাক। বাড়িটা যেন সত্যিকারেরই একটা ক্যাম্প, আর বাড়ির বর্তা অভিযাত্রী।

টেবিলের ওপর রয়েছে টুকটাকি অনেক জিনিস—ফ্রিয়ার টুকরো, বাতুর বটিন, প্রজেক্টর, কয়েকখানা বই—এক কাপ Revue de France.

আমাকে এক কপি 'Numquid et tu' উপহার দেবেন বলে আবার টুপি আর কোটাটা গায় চাপিয়ে ওপরে উঠে গেলেন—বাইয়ের ঠাণ্ডা সিঁড়ি দিয়ে নয়—ভেতরের ছোট সিঁড়িটা দিয়ে।...বড়ির সবাই তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্যের সমান অস্বীকার।...শেষে আমরা একটা ঘরে এসে বসলাম।

'আমি একসঙ্গে অনেকগুলো কাজের ভার নিয়েছি। 'Nourritures Terrestres'-এর ওপর আরও খানিকটা লিখব। আমি যে সত্যিই প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছি সে বিষয়ে একটা বই লিখব। আমার বিশ্বাস, কেউ কখনও সত্যিকারের স্তব্ধের কথা বলেন নি।...কখন যথেষ্ট...এই বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় নোট রয়েছে আমার কাছে।' এই বলে তিনি কয়েকটা পড়ে শোনালেন।

'একজন মহিলার কাগজে আমি কিছু লিখতে চাই। পরিবার, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে লিখব। আমি যখন আত্মবিশ্লেষণ করি তখন লোকে বলে 'নাসিওনিস্ট' (আত্মপ্রোক্ষিক)। কি পরিহাস!'

লবিকের স্তব্ধতা।...একটু বিধাব্রতভাব...জিদ তাঁর আসনটা আমার আরও কাছে নিয়ে এলেন।

'আপনার সংগে আলোচনা ওরফার আগে যত চাই যে, আমার ভয় হয় যদি আপনি আঘাত পান।'

'তারপর ধর্ম থেকে আপনি কি বলেন?' এই প্রশ্ন তুলেই আমি বলে চললাম—'তার বছর বয়সে মনে সামান্য জ্বলে, সেই থেকে আমার কাছে আর ঘরের স্থান নেই। তবুও কিছুকাল শ্রুতি ভগবানের সংগে বাস করেছি। একদিন তিনিও তালিয়ে গেলেন। আজ—'

জিদ, আমার দিকে হুকু, অথচ মনোযোগ তাঁর।

'বলুন, আপনাকে জিজ্ঞাস্য করছি। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শুনিছি।' বললেন জিদ।

আমি—'এসব ব্যাপার এত পুরোণ যে মনে হয় যেন আমার ধর্ম-জীবন শুরু হয়েছিল মায়ের কোল থেকেই। সেসব অস্ত্র প্রথম আজ আমার বা ভাষ্যের তুলছে—'

'তাহলে আপনার মন আর অশান্ত নয়? প্রশ্ন করলেই জিদ।

এই কথাতেই তিনি আসতে চেয়েছিলেন। জিদের সামনে শুধু একটি মাত্র প্রশ্ন : কারও মন অশান্ত কি না?

'একটুও অশান্ত নয় আমার মন।' বললাম আমি।

—'আমারও নয়। এখন আর অশান্ত হই নে। যখন অনাসক্তির, সাম্যবস্থা বা উচ্চাবস্থার কথা বলে, তখন এই কথাই বলতে চাই। কিন্তু অস্ত্র আরও একটা ব্যাপার আছে। সেই জন্মেই এই বিষয়ে আমি কিছু লিখি নি। এই প্রশ্ন আমার বিজ্ঞানী করে তোলে এবং বিনা উত্তরজনার এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না। আমার কিছু সংখ্যক বন্ধু-বান্ধব এবং জী যদি আঘাত পান সেইজন্মে এ বিষয়ে আমি কিছু লিখি নি। Gospel সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আমি মনে নিতে পারি না। বলা হয়েছে যথার্থ খুঁটান

ন্য হলো ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই এবং ক্যাথলিকদের ব্যাখ্যাই একমাত্র যথার্থ ব্যাখ্যা। একটা বই লিখবার ইচ্ছে আছে যার শিরোনাম হবে—‘খৃষ্টের বিরুদ্ধে গীর্জা’। কিন্তু বিষয়টি এত পুরোণ যে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। এ বিষয়ে অনেক নোট আছে আমার।

Gospel-এর ভাষ্য করেছি বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে খৃষ্টের বাণী-প্রচারকরা সুখী-ই ছিলেন। খৃষ্টের প্রথম অলৌকিক ঘটনা জল মদে রূপান্তরিত করার মত তাঁর প্রথম বাণীটিও ছিল এই :—‘সুখী তারা যারা...সুখা...’ এখানেই বাণী-প্রচারকদের আসলো। আমি কোন ব্যাখ্যা করি নি শুধু আমার মনোভাব প্রকাশ করেছি মাত্র। বাণী-প্রচারকদের আমি ভালবাসি :—তাদের সাগেই আমি বাস করি।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা। আবার শুরু করলেন জিদ্ : ‘পলিক্রাভেসের গল্প জানেন ? আমি বাইবেল আর গ্রীক-পুরাণ আশ্বাস্য করেছি। আমি ব্যাখ্যা করবার কোন প্রচেষ্টা করি না শুধু জানতে চাই গভীর ভাবে—যেমন করেছি L’ enfant prodigue-এর ক্ষুদ্র।’

স্বাঃ, আপনাকে বলছিলাম পলিক্রাভেসের গল্পের কথা। আস্তে আস্তে পলিক্রাভেস তার বা কিছু ছিল সব বিলিয়ে দিতে লাগল। যতই সে বিলিয়ে দেয় ততই ক্ষুদ্রত্ব করে অপার ক্রম। শেষে একমাত্র বিয়ের আটটি ছাড়া আর সব কিছুই বিলিয়ে দিল। তারপর এই আটটি নিয়েই শুরু হল তার যাত্রা।...একদিন সেটাও দিল ফেলে জলে, কিন্তু একটা মাছ ফিরিয়ে এনে দিল তাকে সেই আটটি।...বলতে চাই বিবাহ-বন্ধন কখনও ভেঙে যায় না।...

আমার মনে হল মনের অশান্তিভাবের অনুপস্থিতির জন্মই অশান্ত হয়ে উঠলেন তিনি। দেখলাম তাঁর ধার্মিক মন এখনও পরাজয় স্বীকার করে নি।

জিদ্ উঠে পড়লেন। ডেজান দরজার কীক দিয়ে আমি সেই পাঁচজন তরুণকে দেখতে পেলাম। আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেল। তিনি আমার দুই হাত ধরে জোরে চাপ দিয়ে কোন কথা না বলে শুধু একটু হেসে আমার বিদায় দিলেন।\*

অনুবাদ : সুবীরকান্ত গুপ্ত

\* মূল ফরাসী রচনা থেকে অনূদিত।

## উদার আকাশে

রমেশ্রনাথ মল্লিক

ভিজ়ে মাটি মাঠ মাঠে ছড়িয়েছি আশাদের বীজ,  
বিশ্বাস মনের মধ্যে, কামনা আনন্দে গিজ গিজ  
অবস্থ করবে জানি কোনদিন কোন আশর্ষের  
স্বপ্নভাড়া স্বপ্ন আসলো ছড়ানো সকালে অনন্তের।

অম্লর বীজের যদি দোলা লাগে মনের কিনারে  
মাঠে আর সমাজের রক্তে রক্তে যে কোন প্রকারে ;  
বিকল্পে তখন ভাবি—এই চাই, আর কিছু নয়,  
শুধু থাক হৃদয়ের সত্য মূল্যে অল্প পরিচয়।

অল্প আশা অনেকের মাঝে মাঝে জেগে উঠে থাকে  
বাসনা বিস্তীর্ণ কোন শব্দ ছেড়ে চার স্তম্ভটাকে,  
প্রতিবাদ আর যত বাধাভরা জীবনের খাঙ্গে—  
দীর্ঘশ্বাস উঠে উঠে সংকীর্ণ ই গভীর আকাশে।

সে আকাশ ছেড়ে দাও,—উদার আকাশে এসো চলে  
ওপরের নীল আর নিচেরই সবুজ অঞ্চলে ;  
যেখানে সীমান্তরেখা ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে যায়  
কতই গুদার্ষ্য মন ভরে ওঠে উদ্বীর্ণ যথাতার।

ভিতরে বাইরে মন পঙ্কজাতীর গতি উজানের  
চঞ্চল জীবনযাত্রা ;—শ্রোতৃটুকু নির্ভল প্রাণের  
অফুরন্ত আশাশ্রম অহুভূতি, ছোট ছোট তেউ  
একটু একটু নিম্ন চলাছে তবুই সত্যি কেউ।

# টীকা নিম্নয়োজনে

ভৌগোলিক বা আবহাওয়ার কারণের জন্তে পৃথিবীতে এ রকম অনেক দেশ আছে যেখানে মদ খাওয়াটা বেঁচে থাকবার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। যারা সর্বক্ষণ বাড়ির বন্ধ পরিবেশের মধ্যে থাকে, যেমন অল্পবয়স্কেরা কিংবা অতিবয়স্কেরা, তাদের বাদ দিয়ে আর সমস্ত নর-নারীকেই এই সমস্ত দেশে মদ খেতে হয়। বলাই বাহুল্য, এ সব দেশগুলি সবই শীতপ্রধান অঞ্চলের। কাজেই এ সমস্ত দেশে এই যে প্রয়োজনবশত মদ খাওয়া, এইটাই ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ঠিক যেটুকু শরীর রক্ষার জন্তে প্রয়োজন তার চাইতে অনেক বেশিই তারা খাচ্ছে। এই সমস্ত দেশে জনসাধারণের মধ্যে মদের নেশাটা কিছুটা অন্তর্কীতভাবেই হয়ে যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু আবার এ রকম অনেক দেশ আছে যে সমস্ত দেশ ভৌগোলিক বা আবহাওয়ার কারণের জন্তে মদ খাওয়ার প্রয়োজন নেই বললেই চলে, অর্থাৎ মদ খেয়ে শরীর গরম রাখবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবু যদি দেখা যায় এ সমস্ত দেশেও জনসাধারণের মধ্যে মদ খাওয়াটা ক্রমশ বাড়তির দিকেই আছে তা' হলে ব্যাপারটা আশঙ্কাজনক বলে স্বীকার করতেই হবে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের মদ খাওয়ার একটা হিসেব পাওয়া গেছে। এটা ১৯৬২ সালের হিসেব। ১৯৫২ সালের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই একদিকে যেমন মদ খাওয়ার অভ্যাস ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করছে, মাথাপ্রতি তার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। ধরে নেওয়া হয় যে ১৫ বছরের নীচে যারা, তারা সন্তপান করে না; তা' হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মাথা প্রতি বাৎসরিক মদের খরচটা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :—

	৫'৭৫ গ্যালন
আলাস্কা	৩'৫৪ "
নিউ হাম্পশায়ার	৩'৫০ "
কনেকটিকাট	৩'০২ "
নিউ জার্সি	২'৯৭ "
ডেলাওয়ার	২'৮৪ "
ফ্লোরিডা	২'৭১ "
ক্যালিফোর্নিয়া	২'৬৫ "
ম্যাসাচুসেটস	২'৬০ "
নিউ ইয়র্ক	২'৫৭ "
মেরিলাণ্ড	২'৪৯ "
ইলিনয়	২'৪৫ "
ভারমন্ট	২'২২ "
কলর্যাডো	২'১৭ "

লুইসিয়ানা	২'১৫ গ্যালন
মিনেসোটা	২'০৭ "
ভার্জিনিয়া	২'০২ "
উইসকনসিন	২'০১ "
ওয়াইওমিং	১'৯২ "
ওয়াশিংটন	১'৯১ "
বোড আইল্যান্ড	১'৮৫ "
মনটানা	১'৭৯ "
নেব্রাস্কা	১'৭৪ "
মিশৌরি	১'৭৩ "
ওরেগন	১'৭৩ "
সাউথ ডাকোটা	১'৭১ "
মিচিগান	১'৬৮ "
আরিজোনা	১'৬৭ "
ওহিও	১'৬৫ "
নর্থ ডাকোটা	১'৬৪ "
সাউথ কারোলিনা	১'৫৫ "
জর্জিয়া	১'৫৪ "
পেনসিলভানিয়া	১'৫১ "
নিউ মেক্সিকো	১'৪৮ "
সাউথ ক্যারোলিনা	১'৪৫ "
কেনটাকী	১'৪০ "
ইদাহো	১'৩৬ "
কানসাস	১'৩৩ "
টেক্সাস	১'২৯ "
ওকলাহোমা	১'২৮ "
ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া	১'২৫ "
উটা	১'২৫ "
ইণ্ডিয়ানা	১'২০ "
আইওহা	১'১০ "
টেনেসী	১'০৬ "
আরকানসাস	১'০১ "
আলাবামা	১'০০ "

এর মধ্যে হাওয়াই এবং মিশিসিপি রাজ্যের স্থাথা নেই। কারণ হাওয়াইয়ের স্থাথা পাওয়া যায় নি। আর মিশিসিপি রাজ্যে মদ তৈয়ারি বা তার বিক্রি আইনত হতে পারে না, অর্থাৎ সেখানে প্রহিবিশন। কাজেই এ রাজ্যের নাগরিকেরা সরকারের মতে মদ পান করে না।

বলাই বাহুল্য এ রাজ্যের প্রাচীন পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের ইতিহাসের—তাঁই একটা হস্তাকর ব্যাপার। কারণ এই সময়ে, খ্রিঃ ১১৬২ সালে বাইরে থেকে প্রায় দশ লক্ষ গ্যালন মদ আমদানী হা হলেছে এবং এই আমদানী থেকে রাজ্য সরকারের ৩৩,০২,৩৮৫ গার কর আদায় হইয়াছে।

একটি কথা বলা দরকার। ওপরে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের গরিকদের যে মজতপানের পরিমাণ পেয়েছি তা বিপুল মদ, অর্থাৎ কার, বিয়ার জাতীয় হাঙ্গা পানীয় নয়।

বিয়ার পানের আলাদা হিসেব পাওয়া গেছে। মার্কিন দেশবাসীরা ১১৬২ সালে গড়ে জনপ্রতি ১৫\*১ গ্যালন বিয়ার পান করেছেন।

মার্কিন দেশে মদব্যবসায়ী থেকে আবৃত্ত করে সরকার তথা সমাজসেবী সকলেরই বিগাস যে, মদ এবং বিয়ার এই দুই জাতীয় পানীয়েরই একমিকে যেমন প্রচলন বাড়ছে অঙ্গদিকে তেমনি এটা যাদের পুরনো অভ্যাস তাদের মধ্যেও এর প্রাতি যৌকটা ক্রমশ বাড়ছে। এই অবস্থাটা ওদেশের সামাজিক তথা নৈতিক জীবন সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করছে ?

—সুরসিক

## হিটগ্রস্ত কে নয় ?

যদি বলি আমি হিটগ্রস্ত তা' হলে তাতে অন্য কারো অন্ত্রখী হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। যদিও কথাটা ঠিক হ'লে কি না সে বিষয়ে সম্মত থেকে যাবে, কারণ মনোবিজ্ঞানীরা মনে যে, বিয়ার প্রকৃতই হিটগ্রস্ত তাঁরা; কদাচিৎ সে কথা বৃহত্তে পারেন : প্রায়ই দেখা যায় যে, সে সত্যটা বৃহত্তে পারার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রস্ত ব্যক্তির 'হিট'-এর পরিমাণ প্রায় বারো আনা কমে গেছে। হলে ব্যাপারটা ঠাডাচ্ছে এই যে, আমি প্রকৃতই হিটগ্রস্ত নই বা না! থেকে থাকলেও বর্তমানে আমার হিট-এর বারো আনা কমে ছ।

তবু বর্তমানের আলোচনার প্রয়োজনে ধরে নিলাম আমিই গ্রস্ত। তা' ছাড়া আর কাকেই বা বলা যায় সে কথা। আমার পাঠীরা কেউ হিটগ্রস্ত এ কথা বললে রক্তাক্ত হয়ে যাবে—যদি। আমার বন্ধুরা অনেকেই হিটগ্রস্ত তা' হলেও গরীব লেখকের গ্য বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে; যদি বলি আমার প্রতিবেশীরা কেউ হিটগ্রস্ত হলে এখনি কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হয়ে যাবে—আর যদি বলি আমার ঈশ্বর হিটগ্রস্ত। তা হলে তো বৃহত্তেই পারছেন, যা হবে তা ক্ষেত্রেরও বেশি। তাই বলছিলাম, অন্য কেউ নন—আমি নিজেই গ্রস্ত।

অবশ্য একটা কথা বৃক ঠুকে বলা যায়। তা হলে এই যে, আমার পাঠী, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশিগণ বা আমার স্ত্রী বা আপনারা কেউ গ্রস্ত না হলেও পৃথিবীতে হিটগ্রস্ত আরো অনেকেই আছেন।

বিয়ারট পৃথিবীতে আমি একাই হিটগ্রস্ত নই—আরো যেক্ট আছেন; চাই কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা বীর নানা দেশে জীবনযাত্রার যে সমস্তা এবং জটিলতা দেখা ছে, তাতে আজকের দিনে হিটগ্রস্তের অভাব নেই বলেই কে মনে করেন। অবশ্য, এ'রকম বেয়াড়া লোকও কিছু; দেখা যায় বিরা প্রকাজেই বলে থাকেন যে হিটগ্রস্তের সংখ্যা ৫০ স্টো কোন সমস্তা নয়। আসল কথা হচ্ছে কে হিটগ্রস্ত নয়

সেইটে নিশ্চিতরূপে বৃহত্তে পারা। এ শ্রেণীর বেয়াড়া লোকদের ডিগ্রির যে কোনো রকমের হাস্যামোক্ত্যের বন্ধি নিয়ে এরকম কথাও সরাসরি অনেকে বলে থাকেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষই কমবেশি হিটগ্রস্ত—অর্থাৎ কি না শুধু ডিগ্রির তফাৎ।

কথাটা বললে মনেতে খুব ভালো শোনায় না—তবু মনে হয় শেষোক্ত কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অর্থাৎ আমরা সকলেই হিটগ্রস্ত তফাৎটা শুধু ডিগ্রির।

পনোমো-বোলো বছর আগে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক নিতান্ত কোভের সঙ্গেই বলেছিলেন : মশাই, ডাক্তারী কমবেশি বা হোক কিছু কিছু শিখেছি। কিন্তু সে বিভ্রুটা আর দেখাবার সুযোগ বছরে ক'বারই বা পাই, যদিও রোগী দৈনিক গড়ে অন্তত তিরিশটা দেখে থাকি। আমাদের দেশের লোকেরা একজন ডাক্তারের কাছ থেকে শুধু সেইটাই আশা করেন যা একমাত্র ভগবানের পক্ষেই করা সম্ভব। অর্থাৎ মরা বা প্রাণ-মরা নিদেনপক্ষে পনোরো আনা পরিমাণ মরা লোককে ডাক্তারবাবু বাচিয়ে তুলবেন এইটাই সবাই আশা করেন। বাড়ির একশ' কি দু'শ গলকের মধ্যে হাসপাতাল থাকলেও অনেক সময়ই দেখা যায় যাকে হাসপাতালে শেব পর্যন্ত আনা হলো সে মৃত্যুতে তাব উপযুক্ত স্থান ছিলো। তুলসীভালা। তখন রোগীর বা করবার তুলসীভালা নারায়ণই করে থাকেন। ডাক্তারবাবুবা কিছু করতে পারেন না।

অর্থাৎ কি না ডাক্তারবাবু বলতে চান যে, আমাদের দেশের লোকেরা রোগ সম্বন্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খেটে সচেতন নন। বা সচেতন থাকলেও চিকিৎসার জ্ঞাত সাধারণত যে পরিমাণ অর্থ বা সময় বাব কদা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাধারণ অন্ত্র-বিস্ত্রের জ্ঞে তা তাঁরা করতে চান না। এখানে অন্ত্র বলতে আমরা পারীক্ষিক অন্ত্রের কথাই বলছি। যোগটা বখন বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তখন আমরা ডাক্তার ডাকি বাধ্য হয়ে।

কিন্তু যে সমস্ত ব্যারি শরীরের সীমার মধ্যে থেকেও ঠিক পারীক্ষিক



## অনেক রোগের একই কারণ

নর, অর্থাৎ মানসিক গোলামাল সে ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখাবার অভ্যাস এখনো আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দেখা যায় না। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরে অবস্থা আমাদের খুব সম্ভব কলেরা, বসন্ত, বন্ধ্যা বা ক্যান্সার রোগগ্রস্তদের চাইতেও শোচনীয়। ঐ সমস্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অপরের সাহায্য বা অনুকম্পা লাভ করে থাকে। কিন্তু মানসিক রোগগ্রস্তরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরের সাহায্য বা সহানুভূতি তো লাভ করেই না, উপরন্তু উপহাসের শিকার হয়ে পড়ে। এই রকম চলতে চলতে আত্মকের দিনে সাধারণ লোকের মধ্যে এই রকম একটা ভাব দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের কারো যদি মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আর পাঁচজন কেউ না বুঝতে পারে ব্যাপারটা। যখন ডাক্তারের সাহায্য নিলে অচিরেই স্বাভাবিক আত্মার ফিরে আসবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে, ঠিক তখন কি না লোকে হাসবে এই কথা মনে করে আমরা প্রিয়জনকে ডাক্তার না দেখিয়ে বাড়ির পেছনের ঘরে সরিয়ে দিই। অর্থাৎ এমনভাবে তাকে 'ম্যানেন্স' করা হয় যাতে অপরের সম্পর্কে এসে তার

সামান্য বিকৃতিটা ধরা পড়ে না যায়। এর ফলে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগী 'এক' হয়ে পড়ে। এই যে নিঃসঙ্গতা এই অবস্থাটা তার সামান্য রোগটিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ লক্ষণীয়ভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং প্রায়শই দেখা যায় অজ্ঞ ব্যাকে দেখা গেলো একই বেন কেমন কেমন—হুই, তিন কি চার সপ্তাহের মাঝার সে একেবারে 'পাগল' হয়ে গেছে। তখন আর ব্যাপারটা চেপে রাখা যায় না। অথচ এ লোকের পাগল হবার কথা ছিলো না। পরিবারের লোকজনের অহেতুচ লজ্জা বা নিবৃত্তিটা এবং পাড়া-পড়শীর সাধারণ মানসিক সহানুভূতির অভাবে একটু মানুষকে 'পাগল' করে দেওয়া হয়েছে। যে রোগী, তার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে অপর্যায় বা আসামীর মতো ব্যবহার করেছি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অথচ আমরা একবারও একটা সহজ, সরল কথা বুঝবার চেষ্টা করি না যে, শারিরিক কোন ব্যাধি হলে (যৌন ব্যাধি ছাড়া) যেমন লজ্জার কোনো কারণ থাকে না, মানসিক ব্যাধির বেলায়ও ঠিক সেই কথাটাই প্রযোজ্য।

—নট্যাত্মিক

## অনেক রোগের একই কারণ

একজন বিশেষ নামডাকওয়ালা ডাক্তারবাবু একবার হিম্মিসিং খেয়ে গিয়েছিলেন। কি করে বলছি শুনুন।

একদিন সকালবেলা বখানিরম চেম্বারে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরেই এক ভয়লোক এসে একটি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তারবাবু তাঁর চেম্বারের সামনের ঘরটার বসেছিলেন। সেখান থেকে রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায়। উনি লক্ষ্য করছিলেন বেশ কিছুটা দূর থেকেই বয়স্ক ভয়লোক আসছেন কিশোরটি হাত ধরে। ওঁরা যে শেষ পর্যন্ত জায়গা চেম্বারে আসতে পারেন তা আশে মনে হয় নি ডাক্তারবাবু। কারণ কোনোরকম রোগেরই কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। ভয়লোকের শরীর স্বাভাৱ্য ভালো, কিশোরটিও বয়সের অনুপাতে বিশেষ সুস্থ বলেই মনে হয়েছিলো ডাক্তারবাবু।

কিন্তু ওঁরা ডাক্তারবাবুর চেম্বারেই ঢুকলেন। উনি প্রথমটা মনে করলেন যে নিশ্চয়ই 'কল' দিতে এসেছেন। কিন্তু না, তা নয়। ক' জানা গেলো ঐ কিশোরটিই রো।। রোগটা কি? না, সর্দি। প্রথমটা ডাক্তারবাবু মনে মনে একটু বিরক্তই বোধ করলেন। কারণ, ওঁরা থাকেন দূরে, বেশ কিছুটা দূরে। সেখান থেকে এই পর্যন্ত আসতে ওঁদের অন্তত তিরিশ কি চল্লিশটা ডাক্তারখানা পেরিয়ে আসতে হয়েছে। সে সমস্ত ডাক্তারখানার যে কেউ, অর্থাৎ যে কোনো ডাক্তারবাবুই তো পারতেন ছেলেটির সর্দির একটা উপশমের পরামর্শ দিতে। এ ক্ষেত্রে আবার আমার মতো একজনের কাছে আসা কেন? মনে মনে ভাবলেন ডাক্তারবাবু।

বয়স্ক ভয়লোক বিনাভাবে জানালেন আপ'র নামডাক অনেক শুনেছি তাই এসাম। আমার এই ছোটো ছেলেটির জন্তে।

—কি হয়েছে?

—সর্দি-কাশি। প্রায় বছরখানেক হলো ভুগছে।

—আঁা?

এতক্ষণে টনক নড়লো ডাক্তারবাবু। মুহূর্তের মধ্যেই ডাক্তারদের স্বভাবসিদ্ধ উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে বুঝ নিলেন যে কিছু একটা জটিল ব্যাপার। এতক্ষণে মনে যে হাত-ভাবটা ছিল সেটা নিম্নে, লোপ পেলে। এখন ডাক্তারবাবু তাঁর সমস্ত দেহমন নিয়ে অতিমাত্রায় সজাগ। কিশোরটির দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করে বললেন : এক বছর ধরে ভুগছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আট-দশজন ডাক্তারবাবু দেখেছেন ওকে। তাঁরা তো কেউই ডাক্তার হিসেবে খারাপ নন। অনেক ভারি অসুখ তাঁরা অনেকেই সারিয়েছেন, দেখেছি এবং শুনেছি। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে, ছেলেটার এ সর্দি-কাশিটা কিছুতেই সাধছে না।

বলতে বলতে ভয়লোক একটা প্যাকেট খুলে একতাড় প্রোগ্রিক্রিশন এবং বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল টেস্টের রিপোর্টগুলি তুলে দিলেন ডাক্তারবাবু হাতে, সেইসঙ্গে একখানা এক্স-রে প্লটও।

একে একে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। প্রোগ্রিক্রিশনগুলির পরে বৃক্কের এক্স-রে প্রেটখানাও দেখলেন। দেখলেন কয়েকজন 'সাধারণ' ডাক্তারবাবু সাধারণ সমস্ত রকম গুণ্ণপত্র নিয়েই চিকিৎসা করেছেন ছেলেটির। সর্দি-কাশির প্রায় সমস্ত রকম গুণ্ণেরই পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিশোরটির ওপর। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের বিশেষ কোনো দুর্বলতাজনিত ব্যাপার ধারণা করে এক ডাক্তারবাবু ফুসফুসের প্রেট তুলিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোনোরকম সুস্থ পাওয়া যায় নি, বা থেকে ওর এই স্বাভাবিক সর্দি-কাশির কোনও সম্ভাব্য কারণ পাওয়া যায়।

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নামডাক হাত-যশের বিকল্পে সত্যি চ্যালেঞ্জবরণ একটা জটিল কেস এসে পড়েছে—বিশিও শুনতে

সর্দি-কাশি—মানে আজকের দিনে বার জন্মে বিভিন্ন কোম্পানীর অন্তত একশ' রকমের বিভিন্ন ওষুধ আছে।

বয়স ভদ্রলোককে ডাক্তারবাবু বললেন : সারিয়ে তুলতে পারবে আশা করি, তবে সময় দিতে হবে, অন্তত দু' মাস।

ভদ্রলোক রাজী হলেন তাতেই, আর সেইদিন থেকেই সূক্ষ হলো চিকিৎসা—পরীক্ষামূলক চিকিৎসা, যাকে বলে থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেন্ট (অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের ওষুধ দিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা)।

দু'দিন বাদে এলো আর এক রোগী। তরুণ যুবক, বয়স তিরিশের বেশি নয়। ক্রমশ শরীর দুর্বল হয়ে আসছে। মাস-আষ্টক ধরে নানাবিধ চিকিৎসার পরেও রোগ নির্ণয় করাই সম্ভব হয় নি পাঁচ-ছয়জন ডাক্তারবাবুর পক্ষে। এক্ষেত্রেও ডাক্তারবাবু থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেন্ট আশ্রয় করলেন—বলে-করেই।

আরো কয়েকদিন পরে এলো এক রোগিণী। বাহ্যিক বিকৃতশক্তি বলেই মনে হয়, কিন্তু কোনো রকম ওষুধেই কোনো ফল এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যায় নি। এমন কি প্রচুর ঘূমের ওষুধ দিয়েও রোগিণীকে ইচ্ছানুরূপ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারেন নি কোনো ডাক্তারবাবু।

বলাই বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও ঐরবাবু তাঁর থেরাপিউটিক এক্সপেরিমেন্ট সূত্র করলেন।

## সরষেতে যদি ভূত ঢোকে

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা বোধ হয় আর কোনো কিছুব সঙ্গেই তুলনীয় নয়। শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শন ও নীতিশাস্ত্র কোনোটাই বিজ্ঞানের সঙ্গে সমানভাবে তাল বেগে এগুতে পারছে না এবং কয়েক বছর আগে, মনে পড়ে প্রখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই এই জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন যে, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্রষ্টাদের এই যে অক্ষমতা এর ফলেই জ্ঞানগরিমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়সাম্য বসিত হচ্ছে না এবং তার ফলেই হঠাৎ অতিমাত্রায় বেড়ে-ঠোঁ বিজ্ঞান আজকের দিনে মানুষের অল্প সমস্ত দিকের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারছে এবং কখনো কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ ভুল পথে অর্থাৎ যুদ্ধের পথে পরিচালিত করছে। কথাটা নিসন্দেহে ভাববার মতো। আমরা এই গুরুগম্ভীর তথ্যটা অবশ্য অগ্র কারণে অবতারণা করলাম। সেই কথাতেই আসছি এবার।

আজকের দিনে বা বিজ্ঞানের অমোঘ-সত্য এমন অনেক বিষয়ই পঞ্চাশ-ষাট কি একশ' বছর আগে প্রস্তাবিত বিষয়মাত্র ছিল। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবার পরে ক্রমশ ঐ পরীক্ষামূলক বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই আজকের দিনে বা প্রস্তাবিত সত্য, অদ্বৈতবিষয়ে যে তা সত্যে পরিণত হলেও হতে পারে এমন কথা মনে করবার সম্ভব কারণ আছে।

বর্তমানে আমরা মানুষের মনের এমন কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বলবো, যা এখনো একবারে সর্বদম্ভ বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে সর্বত্র গৃহীত হয় নি—কিন্তু এর সবগুলিই কালে কালে সত্য বলে স্বীকৃত হলেও হতে পারে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিনের প্রতিক্রিয়া, রক্ত-দেহের, অটোভ্যাকসিন ইত্যাদির পরে আরম্ভ করলেন গ্লাণ্ড এবং হরমোনের পরীক্ষা। একটি করে গ্লাণ্ডগুলির কার্যক্রম পরীক্ষা করবার পরে এক জায়গার এসে থেমে গেলেন। থামতে হলো ডাক্তারবাবুকে। থামতে যে পারলেন এ জন্মে তিনি নিজেও কম খুশি হলেন না। কারণ তাঁর নামডাক হাতবশ—সবকিছু প্রকৃতই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো।

তিনটি ভিন্ন জাতের ব্যাধির জন্মে ডাক্তারবাবু একই জায়গার কারণ খুঁজে পেলেন—থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের গোলমাল। থাইরয়েড গ্লাণ্ড—গলার মধ্যের ছোট চাকতির মতো এই বস্তুটি যথেষ্ট হরমোন নির্গত করছে না। আর তার ফলে এক-একজনের ভেতর দেখা দিচ্ছে এক-এক রকম ব্যাধি।

এরপর থেকে আরো অনেক ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে দেখেছেন ওপরে যে তিনটি ধরনের ব্যাধি আমরা দেখলাম তা ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি—যেমন প্রায়ই মাথা ধবে, কোষ্ঠকাঠিন্য, হঠাৎ এক এক সময় চোখে ঝাপসা দেখা, অকালে শীতের দ্রব, খসখসে চামড়া ইত্যাদি অনেক রকম ব্যাধিরই একটি মাত্র কারণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের গোলমাল।

আজকের দিনের বেশিরভাগ ডাক্তারবাবুকেই তাই দেখা যায় এই থাইরয়েড গ্লাণ্ড সম্পর্কে সব সময় সতর্ক থাকেন। —নার্স মির

মানুষের মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের প্রকাশিত ধারণাগুলি অনেক সময় জন্মসাধারণ খুব ভালোভাবে নেন না। অনেকেই মনে করেন যে, মন অর্থাৎ আত্মা সে তো ভগবানের অংশ, সে কি আর বিজ্ঞানের বাঁধাধরা চক্কেল মধ্যে ধরা দিতে পারে কখনো। এর উত্তরে একটি রুঢ় কথা আগেই বলে নেওয়া ভালো। ত' হলো এই যে, আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে মাথা আর না ঘামানোই ভালো। ভগবান যেমন মানুষকে ত্যাগ করেছেন মানুষের আত্মা নামক পৃথক বস্তুটিও তেমনি মানুষকে পরিভাগ করেছে। আজকের দিনে বা আমরা পাচ্ছি সে নিছক 'মন'—বিজ্ঞানের ভাষায় চেতনা বা বাক্তিসত্তা। কারো কারো শরীরে এই মনই হয় তো কখনো কখনো আত্মার উল্লীত হয় বটে—কিন্তু তবু সে মনই—পৃথক কোনো সত্তা নয় এবং এ আত্মাকে বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ীভূত হবার পক্ষেও আমরা কোনো বাধা আছে বলে মনে করি না।

মানুষের এই মন যতক্ষণ স্বাভাবিক থাকে ততক্ষণ সে কোনো আলোচনার বিষয়ই নয়। কিন্তু অস্বাভাবিকতার কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করলেই এ মন আলোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে।

মানুষের মনের যে অস্বাভাবিকতা তা এ যুগে কিছু নতুন দেখা দেয় নি। স্মরণাতীতকাল থেকেই চলেছে এ জিনিসটা। শো'না বার, গ্রীসের পুরা-কাহিনীর অন্ততম নায়ক ওডিসিয়ুস একবার কোনো একটা যুদ্ধে যাতে অংশগ্রহণ করতে না হয় সেইজন্মে উদ্ভাবন হয়ে যাবার ভাণ্ড অসংখ্য। অর্থাৎ কি না, সেই স্মৃতির অতীতেও মানসিক অস্বাভাবিকতা একটা স্বীকৃতি ব্যাবহী ছিলো। তবে এ ব্যাধির

## সর্বশেষে যদি ভূত ঢোকে

প্রাচুর্য্য প্রাচীনকাল তো ঘরের কথা 'দু'শো-একশ' বছর আগেও ততোটা ছিল না। শিল্পসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে যে ক্রমিক দিকগুলির সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত তারই জন্তে, অর্থাৎ তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই মানসিক অস্বাভাবিকতা ব্যাধির আশ্রয় এতো বাড়-বাড়ন্ত—এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

এই অস্বাভাবিক কিন্তু সত্য অবস্থার প্রতি নজর পড়তেই বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেও নিছক দর্শনশাস্ত্রেরই একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত মনোদর্শন মনোবিজ্ঞানের রূপ নিতে থাকে ক্রমশ। দার্শনিকগণের ধ্যানের বিষয় বৈজ্ঞানিকগণের ল্যাবরেটরীতে আর পাঁচটা 'আইটেম'-এর পাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালে। ব্যাপারটা চর্চা মন্ডল হলে অবশ্যই প্রায় শোকাবহই মনে হয়। যে মন আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা কি না বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার বিষয় হবে? কিন্তু সত্যের সঙ্গে আপোষ করার কোনো চর্চালতা প্রকাশ পাবার আশঙ্কা নেই—তাই বলতে হয়—দেখ কি তাতে? যে মন নিয়ে এতো টানা-টোঁড়া তা যে ঐ বৈজ্ঞানিকগণেরও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাঁরা নিজেরাও মনে করেন। কাজেই মন নিয়ে পরীক্ষা চালানোর ফলে যদি মনের কিছু অমর্যাদা সত্যি হয় তা হলে বৈজ্ঞানিকগণের মনও তার থেকে বেহাই পাচ্ছ না। কতদূরকে সুন্দর করার দায়িত্ব, অস্বাভাবিক স্বাভাবিক করার গুরুদায়িত্ব বহন করে যে মন, তার মধ্যেই যদি অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তা' হলে কবরীর কি? অবশ্যই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিতে হবে।

ব্যাপারটাকে ধরা গোলা মনে নিতে পারেন (ধরা পারেন তাঁদের সখ্যা ক্রমশই বাড়তির দিকে) তাঁদের জন্তে বৈজ্ঞানিকেরা একটা সহজ সরল ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছেন। এই ফর্মুলায় ফেলে যে কেউ নিজে নিজেই পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর মনটা কি পরিমাণ স্বাভাবিক বা তাঁর মনে কোনো বস্তুকে অস্বাভাবিকতা বাসা বাঁধছে কি না। আর বাসা যদি সত্যি বাঁধতে আরম্ভ করে থাকে তা' তারই বা পরিমাণ কতোটা।

ফর্মুলাটি খুবই সহজ বলতে হবে। কারণ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই যে কোনো ব্যক্তি সংভাবে চেষ্টা করলে তাঁর নিজের মানসিক অস্বাভাবিকতার একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পেতে পারে—এই ব্যক্তির যদি যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকে—সোজা কথার বাক্য বলে মনের জোর—তা হলে নিজের পূর্ণাঙ্গ রোগনির্ণয়ও তাঁর পক্ষে করতে পারা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

আমুন এবার ফর্মুলাটি পরীক্ষা করা যাক :—

- ১। আপনি কি নিজেকে স্পর্শকাতর মনে করেন?
- ২। নতুন মানুষেরদের সঙ্গে পরিচিত হতে আপনি কি আগ্রহী?
- ৩। সামাজিক মেলামেশা আপনার ভালো লাগে কি?
- ৪। আপনি কি দীর্ঘসময় নিঃসঙ্গ থাকতে চান?
- ৫। আপনি কি নিজের প্রতি কল্পনা পোষণ করেন?
- ৬। আপনি কি প্রায়ই নিজের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন?
- ৭। আপনি কি সর্বদাই নিজের দোষ চাকতে ব্যস্ত থাকেন?
- ৮। আপনার বিবেচনা শক্তিতে খুবই বেশি বলে আপনার ধারণা?

৯। আপনি কি মনে করেন যে, জীবনে দাঁড়াবার জন্তে যথেষ্ট সুযোগ আপনি পান নি?

১০। কারণ জানা না থাকা সত্ত্বেও আপনার কি প্রায় সময়ই মনে হয় যে স'মানে খুব শীগ'গিরই কোনো বিপদ আসছে?

১১। আপনি কি কোনো কাজ করার সময় এই কথাটাকেই প্রোথাক্ষ দেন যে অস্ত্রে কি ভাবে?

১২। জ্বাঘ্য প্রমাণ ছাড়াই আপনি কি একে দৃঢ় নিশ্চয়তা বোধ করে থাকেন যে আপনি নিজে আর পাঁচজনের চাইতে ছোট কি বড়?

১৩। নিজেকে কি আপনি আত্মসচেতন মনে করেন?

১৪। আপনি কি স্বভাবতই সম্ভ্রমপ্রবণ?

১৫। আপনি কি বস্তুবাদের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষাবোধ করেন?

১৬। অপরকে সমালোচনার ক্ষেত্রে সবসময়ই আপনি একটা উদগ্র প্রেরণা বোধ করেন কি ভেতরে ভেতরে?

১৭। পূর্বণো বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে বা নতুন বন্ধু স্থাপন করতে আপনার অস্ববিধে হয় কি?

১৮। সামান্য ব্যাপার বাড়িয়ে বলতে আপনার ভালো লাগে কি?

১৯। আপনি কি নিজেকে একটু অতিমাত্রায় আশাবাদী বলে মনে করেন?

২০। আপনার কি মাঝে মাঝেই মনে হয় যে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেলেও যেতে পারে?

২১। কোনো তরুণ-তরুনীকে একত্রে দেখলেই কি আপনার মনে নানা বিস্তী চিন্তা ধান বাঁধতে আরম্ভ করে?

২২। (নারী হলে) আপনি কি নারী-বন্ধুর সঙ্গই বেশি কামনা করেন?

২৩। (পুরুষ হলে) আপনি কি পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গই বেশি কামনা করেন?

২৪। বিয়ে জিনিসটাকে আপনি খারাপ মনে করেন কি?

২৫। ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে আপনার রাগ হয় কি?

২৬। আপনি কি মনে করেন যে আপনার কোনও স্বপ্ন আপনার নিজের কোনো চেষ্টা ছাড়াই অলৌকিকভাবে পূর্ণ হবে?

২৭। চলতি দুনিয়ার ব্যাপার-তাপাধ দেখে আপনি বিরক্তবোধ করেন কি?

২৮। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কি একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন?

২৯। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি কি আপনার বিরোধীদের কথা শুনতে একেবারেই নারাজ?

৩০। অপরের খারাপ দিকটা, দোষের দিকটাই কি আপনার প্রথম নজরে আসে?

৩১। উচ্চাশা পোষণ করাটা কি আপনি নিরর্থক মনে করেন?

৩২। বয়স অগ্রগতিতে দায়িত্ব নিতে আপনি কি নিজের আগ্রহে অভাববোধ করেন—বয়স আরো কিছুটা কম হলে (অর্থাৎ দায়িত্ব না নিতে হলে) ভালো হতো মনে হয় কি?

৩৩। আপনার কি কেবলই মনে হয় যে আপোষাণের সবাই প্রায় সময়েই আপনার কিছু একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে?

৩৪। আপনার কি অতিরিক্ত ফিটকাট থাকতে ভালো লাগে ?  
৩৫। আপনার কি প্রায় সময়েই মনে হয় যে কেউ আপনার বন্ধু নেই, কেউ আপনার ভালো চায় না বা কেউ আপনার সম্পর্কে আগ্রহশীল নয় ?  
৩৬। নিজেকে কি আপনি কৃশাচার্য্যর মনে করেন ?  
প্রায় দেড়শ'টি প্রশ্নের মধ্য থেকে বাছাই করে ৩৬টি এখানে দেওয়া গেল। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এর অর্ধেক উত্তর বার 'হ্যাঁ' হবে তিনি অস্বাভাবিকতার দিকে এগোচ্ছেন মনে করতে হবে; বার

অর্ধেকের বেশি 'হ্যাঁ' হবে তাঁর অবিগমে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন; বার ১ থেকে ১২টি 'হ্যাঁ' হবে তাঁর পক্ষে একটু সতর্ক থাকলেই চলে; আর বার ১টি বা তার কম 'হ্যাঁ' উত্তর হবে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যে ডাক্তারবাঘুরা মনের রোগের চিকিৎসা করেন তাঁদের মতোই স্বাভাবিক, হয় তো তাঁদের চেয়েও বেশি স্বাভাবিক, কাজেই নির্ভরবার থাকতে পারেন। একটু সাহস করে দেখুন না—আপনার 'হ্যাঁ'-এর সংখ্যা ১-এর কম হবার খুবই সম্ভাবনা।  
—অনুসন্ধানী

## কচি-প্রতিভার বিশ্ব

কচি-প্রতিভার কার্যকলাপ দেখে বহুকাল থেকেই মানবমন তথা নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিম্বিত হয়েছেন এবং নানা জ্ঞান নানাতাবে বাস্তব বুদ্ধির অগম্য এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বাস্তবিক যদি দেখা যায় আড়াই কি তিন বছরের কোনো শিশু যদি বাইবেলের সমস্ত গল্পগুলি আপনাকে মুখে মুখে স্তনিরে দিতে পারে, তা হলে আপনি বিশ্বের ব্যাকহারা হবেন না কি ? নিশ্চয়ই হবেন, সন্দেহই হবে। শিশু, বালক বা কিশোরের মধ্যে আশ্চর্য প্রতিভার এই যে আকস্মিক প্রকাশ এটাকে কেউ ব্যঙ্গগত ব্যাখ্যা বলে ব্যাখ্যা করেছেন, কেউ বা বলেছেন এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত জীবনের একটা আকস্মিক ঘটনা। হঠাৎ এর প্রকাশ ঘটে তারপর আবার তেমনই হঠাৎই এর শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আবার এ জিনিসটা অল্প বয়সেই শেষ হয়ে যায় না; সারা জীবন ধরেই এর প্রকাশ ঘটতে থাকে, অথচ পূর্ণপূর্ববঙ্গের কারো মধ্যে এ রকম অসাধারণ কিছু দেখা যায় নি। এই শেখোক্ত অবস্থাও বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বেলাতে ঘটেছে দেখা গেছে বলেই অনেকে মনে করেন যে, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ—কাজেই সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

এর কোনটা যে সত্যি তা আজ পর্যন্ত নিশ্চয় করে বলায় কোনো উপায় নেই। তবে মনোবিজ্ঞানের যে রকম দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তাতে হয়তো অল্প ভবিষ্যতেই এ সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

কেন হচ্ছে, কি রকম করে সম্ভব হচ্ছে তা না জেনেও যে আশ্চর্য ব্যাপারগুলি ঘটে গেছে কয়েকজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে, তার মধ্য থেকেই কয়েকটি দেখা যাক।

প্যলিভার্স ট্রাভেলস-এর অমর রচয়িতা ফ্রান্সিস হুইট-এর জীবনে দেখা গিয়েছিল যে বয়স তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি বাইবেলের সমস্ত কাহিনী মুখে মুখে বলতে পারতেন এবং নিতুলভাবে পড়তেও পারতেন তার যে কোনো অংশ। স্নানাময়্য ত্রাম্বয়েল জনসন দু'বার কানে শুনে লা পাড় ফেলা যে কোনো জিনিস মুখ করে ফেলতে পারতেন।

প্রখ্যাত জন কী হার্ট মিলের জীবনে দেখা গেছে যে বয়স আট

পূর্ণ হবার আগেই উনি বিশ্বের বই পড়ে ফেলেছেন তাও আবার নানা বিষয়ে। এইটা দেখে একজন উক্তি করেছিলেন যে মিলের হাতে-খড়িটা নিশ্চয়ই মাতৃগর্ভে জগ্ন অবস্থাতেই হয়ে থাকবে। তা না হলে মাত্র আট বছর বয়সের একজন বালক দু'শোখানা বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের কথা জানতে পারে কি করে ? আসল কথা হলো ইতিহাসকারের ছেলে হিসেবে মিল কয়েক মাস বয়স হবার পর থেকেই গল্প শুনেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন—এবং গল্প হিসেবে পড়লে বা শুনে কেউ সহসা তা ভোলে না। অবশ্য তাই বলে মিলের স্মৃতিশক্তি যে কচি-প্রতিভা হিসেবে কিছুদিনের জন্যে সক্রিয় ছিলো তা নয়—প্রায় সারা জীবনই তিনি বিশ্বব্যাপক স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন।

বায়রনও খুব অল্পবয়স থেকে পড়াশুনা আরম্ভ করে যখন পাঁচ বছরে পড়লেন তখন প্যারাডাইস লস্ট-এর দু'হা সমস্ত জারগার ব্যাখ্যা করতে পারতেন—গ্রীক ও রোমান পৌরাণিক উপাধরণসহ।

জার্মানীর লুবেক শহরে ক্রিস্টিয়ান হাইনেকার নামে এক ভ্রলোকের আবির্ভাব হয়েছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইনি তিন বছর বয়সেই মাতৃভাষা ছাড়া আরো তিনটি ইয়োরাপীয় ভাষা—যথা গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় রীতিমতো দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। এই চারটি ভাষা ছাড়াও ইতিহাস এবং ভূগোলেও আশ্চর্য দখল হয়েছিল। আর সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এর যখন তিন বছর বয়স পূর্ণ হলো তখনই একদিন শিশুটি ভবিষ্যবাণী করলো নিজের যত্না সম্পর্কে। বললো যে, আগামী বছর অল্প দিন আমি মারা যাবো—আর ঠিক তাই-ই সত্যে পরিণত হয়েছিলো।

বিখ্যাত জার্মান শ্রবকার মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই নিজে সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুরারোপ করে কুড়ি-বাইশ জন বাদক নিয়ে কনসার্ট পরিচালনা করতেন।

স্নানাময়্য জার্মান সঙ্গীত-বিদ্যার মংসার্ট তাঁর ছয় বৎসর বয়সের সময়ে বেহালা, পিয়ানো এবং অর্গ্যান বাজাতে এতোই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন যে, ইয়োরাপের বড়ো বড়ো শহর থেকে তাঁর আমন্ত্রণ

আসতো অনুষ্ঠান করবার জন্তে। মংসার্ট মার। যান তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে এবং তিন চার বছর বয়স থেকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি একদিকে যেমন নিজস্বতায় ভাস্বর, তেমনি তা হতো অভিনব।

ব্যারিটন মেকলে (লর্ড) তাঁর সাত বছর বয়সেই একখান। পৃথিবীর ইতিহাস রচনার প্রবৃত্তি হয়েছিলেন। বৃহৎ আকারে রচনার কাজে হাত দেবার আগে উনি যে সংক্ষিপ্ত রচনাটি করেছিলেন, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে তাতে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান কোনো ঐতিহাসিক তথ্য বাদ পড়ে নি।

কচি-প্রতিভার প্রকাশ যেমন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তেমনি দেখা যায় অন্তের ক্ষেত্রে। বিরাট বিরাট অঙ্ক দশ কি বারো বছরের বালক মুখে মুখে করে দিলো এরকম অনেক ঘটনাই নিশ্চয় অনেকের জ্ঞান। আছে। এবার বলছি শুধুমাত্র একটি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা। টমাস শ্রাফোর্ড নামে আট বছরের একটি বালক। অন্তে, বিশেষ করে গুণ অন্তে তার এমন আশ্চর্য প্রতিভা ছিলো যে, তার সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা কাহিনী প্রচারিত হয়ে ছিলো এবং একদিন এক গণিত-বিশেষজ্ঞ তার বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন : খোকা, বলতে পারো ৩৬৫, ৩৬৫৩৬৫৩৬৫৩৬৫৩৬৫৩৬৫ সংখ্যাটিকে ঐ সংখ্যাটি দিয়ে গুণ করলে গুণফল কি হবে? উপস্থিত সবাই বিশেষ করে বালকটির বাড়ির লোকজন একটু বিভ্রত্বোধ করল। কারণ অতো বড়ো অঙ্ক ঐটুকু বালক মনে মনে কি করে করবে। বালকটিও প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলো। তারপর কি হলো শুধুমাত্র ঠিক এক মিনিট সময় গুরু লেগেছিল উত্তরটি তৈরি

করতে। এই এক মিনিট ধরে ও যেন পাগল হয়ে গেছে এমনভাবে কখনো মাথা চুলকোতে লাগল, কখনো হাসতে লাগল, কখনো লাফাতে লাগলো এবং সব্বার শেষে মোজের গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করল। তারপর আঙুলে আঙুলে গা-খাড়া দিয়ে উঠে বৈদিক থেকে একটি একটি করে সংখ্যা বলে গুণফলটি জানিয়ে দিলো : ১৩৩.৪১১,৮৫০,২৯৮,৫৬৬,১২৫,০১৬,৬৫৮,২১১,১৪১,৫৮৩,২২৫।

সবাই তো অবাক। অবাক হবারই কথা।

এখন পূর্বজ্ঞ বা বলসাম এ সবই বইপত্র বেঁটে জানা—এর ছ' চারটে, হয় তো বা এগুলির চাইতেও চমকপ্রদ ছ' চারটে অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে বা ভবিষ্যতে পড়বে। কিন্তু এঁরা সকলেই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোক—এঁরা অতীতের ইতিহাস।

সব শেষে আসুন আপনারদের একটি ব্যক্তিগত জানা-শুনোর মধ্যের ঘটনা বলি। কোলকাতার টালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি বছর নরেক বরসের ছেলে আছে। এর মধ্যে আজ কিছুদিন ধরে একটা আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সারেল কলেজের ফিজিক্স-এ ডক্টরেট এক অধ্যাপিকাও বালকের এই ক্ষমতাটির রহস্ত ভেদ করতে সক্ষম হন নি। এই বালকটিকে ছয়-সাত মাস আগের বা পরের যে কোনো মাসের যে কোনো তারিখের কথা বললেই দশ কি পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে সে বলে দিতে পারে সেদিন কি বার ছিলো। বালকটি যে স্বপ্ন করে রেখেছে সব তা মনে হয় না—কারণ আমার পাঁচ-সাত জন মিলে ঝড়ের বেগে একজনের পর একজন বিভিন্ন তারিখ বলে দেখেছি প্রতিবারেই সে নিতুলভাবে সেই সমস্ত তারিখগুলি কি কি বার ছিলো তা বলেই আমাদের বিম্বিত করেছে। —তথ্যাবলী

## শেক্সপীয়ারের সনেট

বসন্তের দিবা কি গো তুলনা তোমার,  
তুমি যে সুন্দরী আরো, অরি লজ্জালীলা !  
বাস্তব করে দহা হাওরা ফুলদলে, আর  
'মধু'র পতনি থাকে অতি অল্প বেলা।  
কখনো প্রাপ্ত অতি স্বর্গের নয়ন,  
বরণ তাহার প্রায় মনে হয় রান ;  
হারার সৌন্দর্য ক্রমে সৌন্দর্যের ধন,  
পরিবর্তনের ফেরে হয় স্রিয়মাণ।  
কিন্তু তব অনন্ত বসন্ত কোনো দিন  
হ'বে না মলিন ; হারাবে না এই দান,  
গর্বে তোমা মৃত্যু নাহি বলিবে অধীন,  
অমর সঙ্গীতে তুমি র'বে বর্তমান !

মানব রহে গো যদি এ মর ধরায়,—  
র'বে ইহা ;—সঞ্জীবিত করিত তোমার।

অমুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অজর আমার কাছে তুমি সঙ্গী সুন্দরন সখা :  
যে সৌন্দর্যে শুভদৃষ্টি হয়েছিল আপাততমার,  
আজও তা তোমাতে দেখি : অখচ বনশ্রী পলাতক।  
ইতিমধ্যে তিনবার, মাঘবের মদির সঞ্চর  
তিনবার হ্রত শীতে, তিনবার ঋতুর বিকারে  
হেমন্তের অমৃগত বসন্তের স্থান সমারোহ,  
সুগন্ধী ফান্সনজর পরিপূর্ণ ক্রোড়ের অঙ্গারে :  
এখনও অক্ষুর শুষ্ক সজোজাত তোমার সমোহ।  
তবু, শব্দপটমর, সূন্দরের ললটফলকে  
কালের কীলক, হার অগোচর চোখে ঘূর্ণমান ;  
হয়তো তোমার কর্ত্তি ক'রে বার পলকে পলকে,  
আসক্তির অমিকোই প্রবক্তিত আমার নয়ন।

অজাতবাহু ক্যবদ্ধ, তাই বলি অতীতপ্রভাব  
সে-মৌল মাধুর্য আজ, তুমি বার উত্তরপূর্ণব।

অমুবাদ—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

# রাণী

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

পূর্বের আকাশ রাত্তা হয়ে উঠল।

ঘরের ভেজানো দরজা খুলে বাইরে আসতেই কানে এলো ওদিকের টোল থেকে কয়েকটি ছাত্রের অধ্যয়নের শব্দ। উঠানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া রক্তিম আলো দেখেই বুঝতে পারলো অন্ধ দিনের চেয়ে উঠতে আজ একটু বেলা হয়ে গেছে। সাত তাড়াতাড়ি ছোট্ট উঠোনটা খাঁট দিয়েই এটা-সেটা টুকটাকি জরুরী কাজগুলো দিয়ে গামছা নিয়ে পূর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে পড়লেন পণ্ডিত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পত্নী। সন্নিল মেঠো পথ বেখানে ঘাটে যাবার প্রশস্ত রাস্তার এসে মিশেছে, সেই সঙ্গমে ঝাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ পত্নী একটু অবাক হয়ে দেখলেন—ঘাটের পাথে আজ এত ভিড় কেন? আজ কেন উৎসব অনুষ্ঠান বা পালা-পার্বণের দিন, সহসা মনে করতে পারলেন না। তিনি ঘাটের দিকে চলতে শুরু করলেন। হঠাৎ মনে পড়ল আজ কি যেন এক ব্রত উদযাপন উপলক্ষে রাণী গঙ্গাস্নান করতে আসবেন। রাণীর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ঘাটে প্রস্তুতি চলছে গতকাল থেকে। কুকরাম-পত্নী গতকাল স্নান করতে গিয়ে দেখে এসেছেন, ঘাটের খানিক অংশ চাঁদোয়া আর সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। গঙ্গাস্নানে পূণ্য সঞ্চয় করার লোভে এলেও, তিনি মহারাণী, অন্ধ সকলের চেয়ে পৃথক্, অন্ধ সকলের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। তাই ঘাটে এই বিশেষ ব্যবস্থা।

ঘাটের কাছে পান্ডি আর বেহারী-বরকলাজ দেখে কুকরাম-পত্নী বুঝতে পারলেন রাণী এসে গেছেন। আঙুলে আঙুলে তিনি মেরেঘের ঘাটে এসে দেখলেন সখী, দাসী পরিবৃত্তা মহারাণীকে। মুগ্ধ হলেন তাঁর বেশভূষার, জলদ্বার-আভরণ আর সৌন্দর্যে। পা-পা করে সোপান বেয়ে নেমে এসে ভুঁলিগেন গঙ্গায়। পাশেই স্নান করছেন মহারাণী। আরও অনেকেই আছেন—এ পাশে ও পাশে। কেউ রাণীকে দেখছেন সোজাসজি, কেউ বা আড়ে। কারও চোখে বিশ্বাস, কারও চোখ বিমুগ্ধ, আবার কারও চোখে দীর্ঘ।

তিনি আবার দেখলেন রাণীকে, চোখ ভরে দেখলেন, বুক-জলে ঝাঁড়ানো রাণীর মাথার রূপার ষটি করে দাসীরা জল তুলে ঢালছে, দেখলেন রাণীর সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য। দেখে দেখে আপন মনে একটু হেসে ফেললেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে রাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করতে লাগলেন।

জানি সেরে আদিক করতে করতে হঠাৎ তাঁর আচমনের জল ছিটিয়ে পড়ল রাণীর গায়ে। রাণীর জ্বজ্বাড়া এক হয়ে গেল। বিরজিতরা দৃষ্টান্তে তিনি চাইলেন। দাসীরা হৈ-হৈ করে উঠলো, তাদের মধ্যে প্রধানী যিনি তিনি একটু তাক্সিলাস্বরে বললেন—তুমি কার গায়ে জল ছিটালে জানি—চেনো না একে? ইনি নববীণের মহারাণী। যাও যাও সেরে যাও।

মুহূর্ত্তাধা কুকরাম-পত্নীর আত্মাভিমান আঘাত লাগল। তিনি সগর্বে উদ্ধতস্বরে বললেন—রাণী! রাণী আবার কে? আমিই নববীণের রাণী—যতদিন আমার হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিঁদুর জলজল করবে ততদিন আমিই রাণী। এই বলে আর কোনও দিকে না চেয়ে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন। তাঁর অপস্রম্যমান উদ্ধত গতিভঙ্গি অঙ্কিত রইল রাণীর ললাটে। বক্রনৈত্র কিছুক্ষণ তাঁর অমুগমন করল গতিপথে।

ঘরে এসে স্বামীর কাছে সমস্ত কথা বললেন। কুকরাম নিজ গৃহীণীকে চিনতেন। চিনতেন তাঁর অপরিমিত কথার জন্ত। স্বভাবসিদ্ধ মুহূর্ত্তে ভংসনা করলেন। এর বেশি কিছু করা কুকরামের স্বভাববিরুদ্ধ। পণ্ডিত কুকরাম ভট্টাচার্য পরম বৈষ্ণব, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বৈষ্ণবোচিত সকল গুণই তাঁর মধ্যে বিরাজিত। বৈষ্ণবোচিত সকল আদর্শকে তিনি অস্ত্রবের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সেগুলিকে তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নিলাভী, নিস্পৃহ শাস্ত্রবিদ কুকরাম ভট্টাচার্য। বিশ্বজন সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল। তাঁর বক্তৃতা অর্থ আর যশের চূড়ার অধিষ্ঠিত। কত ছাত্র দেশ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য সন্তোষ নির্লোভী, অর্থের প্রতি নিস্পৃহ। এই দীন পূর্ণকুটীরে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। মাঝে মাঝে এখান সেখান থেকে দু-একটি ছাত্র আসে। এলে দু-একটি প্রাণী বাড়ে। এই পর্যন্ত। তাঁরা এতেই সন্তোষী। একজন শাস্ত্রালাচনা আর পুঁথি নিয়ে থাকেন আর একজন সাংসারিক শত অনটনের মধ্যেও হাসিমুখে সংসারের হাল ধরে থাকেন। কখনও কোন অভিযোগ বা অহুযোগ করেন না।

মহারাণী স্নান সেরে মনে চিন্তা নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। চিন্তা—মহারাণীকে খবরটা জানাতে হবে আর ব্রাহ্মণী সম্বন্ধে সমস্ত কিছু অমুসন্ধান করতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন সেরে বিত্তোৎসাহী ও প্রজ্ঞারজন মহারাজ রামকৃষ্ণ বাম প্রৈতিদিনের অভ্যাসমত এলেন শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে। এই স্রবোগের পূর্ণ ব্যবহার করলেন মহারাণী। একথা সেকথার পর একে একে আককের কাহিনী ব্যস্ত করলেন খুব স্বাভাবিকভাবে। শেষে মহারাণী একটু কটাক্ষভরে বললেন—সুনতে পাই। মহারাজ নাকি নববীণের পণ্ডিতদের ঘরেষ্ট অর্থ ও জমি দান করে নববীণের অধিপতির সুনাম কিলেছেন। কিন্তু আজকের এই ব্রাহ্মণ-পত্নীকে দেখে সেকথা তো মনেই হল না, তাঁর মধ্যে তো স্বচ্ছলতার কিছুই দেখতে পেলুম না। এমন কি তাঁর গায়ে একরঙা বাণ্ড নেই। সোনালীনা তো ঘুরের কথা। তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় আপনায় রাজত্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কি রকম অকথা! যাক্ আমার অমুরোধ, ঐ ব্রাহ্মণীকে আপনি কিছু আর্থিক সাহায্য করুন, আমার মনে হয় দারিদ্র্য, অভাব-অনটনে স্কিষ্ট হুংখী ব্রাহ্মণী হঠাৎ

আমার ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষিত হয়ে আমাকে অমনভাবে ঐ রকম কথা বলেছেন।

মহারাজা বীরভাবে মহারাণীর কথাগুলি শুনলেন। ব্রাহ্মণীর অনুসন্ধান করতে মহারাজকে বাধ্য করলেন। মহারাণীর কটাক্ষ অধিক সন্ধান করতে হলো না—সহজেই শাস্ত্রবিদ পরমবেদক কুমারাম ভট্টাচার্যের ব্রাহ্মণীর সংবাদ পেলেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি সহস্র মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিত কুমারামের পর্ণকূটরে উপস্থিত হলেন মহারাণীর অনুরোধ রক্ষা করতে। কুমারাম তখন অধ্যাপনার ব্যস্ত। মাটির দাওঘার মাত্র বিছিয়ে বসে ছাত্ররা অধ্যয়ন করছে, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ এসে হাজির।

মহারাজকে তাঁরই কূটরে দেখে কুমারাম তো অবাক। তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে মহারাজকে অভ্যর্থনা করলেন। কপালে চিত্তার রেখা কূটে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন—এই নীনের কূটরে মহারাজের আবির্ভাব কেন? তবে কি? গল্পার ঘাটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর বাবহারের কথা। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখিত হলেন। স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের জন্য নিজের মহারাজার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন—স্বল্পবুদ্ধি ব্রাহ্মণী মহারাণীর মর্শা রাখতে পারেন নি, সত্যি আমি দুঃখিত, আমি তাঁর হয়ে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আপনার কাছে। মহারাজ এসেছেন শুনে ব্রাহ্মণীও দরজার পাশে অলসে ঈড়িয়ে বসেছেন।

মহারাজ বললেন—পণ্ডিত মশাই, আমার কাছে ক্ষমা চাইবার দরকার নেই। আপনার গৃহিণী তো কোন অন্তর্য কথা বলেন নি, বরং সত্য কথাই বলেছেন। আমারই নানা দিক থেকে ত্রুটি রয়ে গেছে আপনার কাছে।

কুমারাম বললেন—সে কি মহারাজ, আপনি ষিটোৎসাহী, প্রজ্ঞারঞ্জন, মহাপ্রতিপালক। আপনার কোন ত্রুটি তো আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি।

মহারাজ—হ্যাঁ, প্রতিপালনের ত্রুটি হয়ে গেছে, আপনি দয়া করে আমার কথা রাখুন—তা হলেই আমার ত্রুটি সংশোধন হবে। আমি আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নেই। আপনার মত বিদ্বজ্জনের যদি সাংসারিক বিষয়ে আবদ্ধ থাকতে হয়, তো সে ত্রুটি রাজ্যের। আপনার কেন? তাই আমি অতি বিনীতভাবে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এনেছি—যদি তা গ্রহণ করেন, তবে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই খুব খুশি হবে।

ব্রাহ্মণ মহারাজের অঘাটিত দানে মানসিক দৈন্ত অনুভব করতে লাগলেন। করজোড়ে বিনীতভাবে বললেন—মহারাজ, অর্থের প্রার্থী আমরা নই, টাকা আমাদের প্রয়োজন নেই, আমরা এমনিতেই বেশ সুখে আছি। আর টাকা থাকারও অনেক বিপদ, একে চোর ডাকাতের ভয়, টাকা রাখলে তাকে আগলে নিয়ে থাকতে হয়, তাতে শাস্ত্রালোচনার ব্যাঘাত ঘটবে। শাস্ত্রালোচনার পরিবর্তে অর্থ বৃদ্ধির

কামনাই জাগবে। না, মহারাজ নিরাপদে টাকা রাখার জায়গা আমাদের নেই, আপনি টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণী অন্তরাল থেকে তাঁদের কথা শুনছিলেন—স্বামীর মুখে টাকা রাখার স্থান নেই শুনে তিনি আর থাকতে পারলেন না—মহারাজের উল্লেখ্যে অলক্ষ্য থেকেই একটু চেঁচিয়ে বললেন—মহারাজ, টাকা রাখার আমাদের যথেষ্ট জায়গা আছে, কিন্তু টাকা আমাদের নেই।

ব্রাহ্মণ তো অবাক, এ কি কবলে ব্রাহ্মণী, লোভ, টাকার লোভ, এতদিন এইভাবে সসার করে এখন এই সামান্য টাকার লোভ, হিঃ! হিঃ! তিনি দুঃখিত ও লজ্জার অধোবদন হলেন—আর ব্রাহ্মণীকে তিরস্কার করলেন।

কিন্তু মহারাজ বুঝলেন—ব্রাহ্মণী টাকা চান আর টাকা নিতেও রাজী তাই এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন—দেখি, আপনিই টাকা রাখুন, আপনার কাছে টাকা থাকলে তার সন্ধ্যাবহারই হবে। আমি পণ্ডিত মশাইকে বুকিয়ে বলাছি।

ব্রাহ্মণী অন্তরাল থেকেই বললেন—ঈড়ান মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি টাকা রাখার পাত্র নিয়ে আসি—সেই পাত্রেই আপনি নিজ হাতে টাকা রেখে দেবেন।

এই বলে ব্রাহ্মণী ছুটে পাড়ার বত গরীব দুঃখীদের কাছে গিয়ে বললেন—ওরে টাকা নিবি তো আর, মহারাজা টাকা দিতে এসেছেন আমার বাড়িতে আর।

রাজার আসার সংবাদে—রাজার আগে থেকেই অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। নিমেষে টাকা পাঁচার কথায় বহু লোক তাঁর কূটরের সামনে জড়ো হল।

ব্রাহ্মণী ফিরে এসে মহারাজকে বললেন—মহারাজ আমার টাকা রাখার পাত্র আমি এনেছি। এই লোকদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে টাকা রাখুন। তাহলেই আমার টাকা নিরাপদেই থাকবে। চোর ডাকাতের সাধ্য হবে না—সে টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে—আর স্বামীরও শাস্ত্রালোচনার বিষ হবে না, টাকা নিরাপদেই থাকবে।

মহারাজ ব্রাহ্মণীর কথায়, ব্রাহ্মণীর এই উপস্থিত বুদ্ধিতে, স্তম্ভিত ও আশ্চর্যগীত হলেন। ব্রাহ্মণীর কথামত প্রত্যেককে একটি করে টাকা দিলেন। জনতা আর ফুরার না—টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। তখনও অনেক লোক। ব্রাহ্মণী মহারাজকে শুনিতে বললেন—মহারাজ, এখনও টাকা রাখবার অনেক জায়গা আছে। কিন্তু টাকা আমাদের নেই।

মহারাজ পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন—ব্রাহ্মণীর ওদাং, লোভহীনতা আর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা আর মনে মনে বললেন—হে বাঙলার মহারসী নারী তোমাকে শতকোটি প্রণাম। তুচ্ছাচ্ছাদিত গৃহে তোমার বাস, অভাবসঙ্কুল সংসারের পীড়নে দেহ ক্ষীণ, দারিদ্র্যাবশত শাঁখা আর দিন্দুর তোমার অস্ত্রগণ—ভবুও তোমার মনের দিক থেকে তুমি শুধু রাণী নও—একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী। তাই তোমাকে আমার প্রণাম।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# ডক্টর তাহা হোসেন

রেজাউল করীম

মিশরের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে—তিনজন দেশপ্রেমিকের দান অপরিসীম—মুফতী আব্দুল্লাহ, সাদ জুগলুল পাশা এবং অন্ধকবি ডাঃ মোহাম্মদ তাহা হোসেন। সৈয়দ জামালুদ্দিন আব্দুলগানির অন্ত্যন্ত শিষ্য মুফতী আব্দুল্লাহ মিশরের আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁরই প্রভাবে মিশর মধ্যযুগের আদর্শ অভিক্রম করে নতুন যুগে পদার্পণ করে। সাদ জুগলুল পাশা মিশরের রাজনৈতিক চেতনা সম্পাদন করেন; তিনি বহু দিক দিয়ে মিশরকে বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত করেন। এই দুইজনই আজ পরলোকে। ডাঃ মোহাম্মদ তাহা হোসেন এখনও জীবিত। আছেন। তিনি পণ্ডিত, কবি ও পরম বিজ্ঞানসাহী। তিনি মিশরে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করেন। সারা মিশরে ‘অজ্ঞজনের অন্ধ-গুহায়’ তিনি করেছেন আলোক বিস্তার। মিশরের রাজনৈতিক গণযোগালের মধ্যেও তাঁর প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

অন্ধকবি তাহা হোসেন শুধু কাব্যচর্চাই করেন না, তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত নন। এজন্য বতরুঁ রাজনীতি চর্চার প্রয়োজন ততটুকু তিনি ক’রে থাকেন। কবি আর রাজনীতি এ-যুগে এবই জমে প্রায় দেখা যায় না। তাহা হোসেন তার ব্যতিক্রম। মিশরের সাম্প্রতিক সামরিক বিপ্লবের পূর্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর অধিকার করেছিলেন। আজ তাঁর হাতে কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তবুও তিনি সকল দলের শ্রদ্ধার পাত্র। জেনারেল নেজিব তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। নেজিব রাজতন্ত্র রহিত ক’রে দিয়েছেন। কিন্তু এখনও মিশরের শাসনতন্ত্র রচিত হয় নি। সেনাদলের হাতেই মিশরের শাসনভার জন্ম। একদিন নেজিব তাঁর সেনাদলের বড় বড় অফিসারদের

নিরে এক সভা আহ্বান করেন। আর এই চৌধুটি বছরের অন্ধকবি তাহা হোসেনকে আহ্বোধ করেন, তাদেরকে কিছু বলবার জন্ম। এই সভায় স্বাধীনচেতা কবি গণতন্ত্র স্বপক্ষে একটি সুচিন্তিত ভাষণদান করেন। তিনি সেনাদলকে সাবধান করে দেন যে, কেবল শৃঙ্খলা ও নিয়মাহুর্বির্তিতা যথেষ্ট নয়। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যে কোন সরকার শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে। কিন্তু অস্ত্রের সাহায্যে যে সরকার শৃঙ্খলা ও নিয়মাহুর্বির্তিতা আদায় করে, সে সরকার জনসাধারণের কল্যাণ করতে পারে না। এই ধরণের শৃঙ্খলা ও নিয়মাহুর্বির্তিতার চাপে মানুষ অমানুষ হয়ে পড়ে। কারাগারের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মাহুর্বির্তিতা থাকে, স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মধ্যে সেই ধরণের আত্মগত্যা ও শৃঙ্খলার নিয়ম প্রবর্তন করলে জাতির আত্মা নির্জীব হয়ে পড়ে।

তাঁর এই অমূল্য উপদেশ সেনাদলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করল কি না জানা যায় নি। তবে তাঁর সংসাহসকে ধ্বংস দেওয়া যেতে পারে যে, তিনি সেনাদলের সামনে সত্যকথা বলতে একটুও কুণ্ঠিত হন নি। জেনারেল নেজিব কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনে হুঙ্কারে উঠলেন। তিনি সেনাদলকে আহ্বান করে বললেন : ‘আমি আশা করি আপনারা ডাঃ তাহা হোসেনের কথাগুলি মুখস্থ করবেন। তাঁর এই কথাগুলি আমাদের সংগ্রামের প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত।’

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ডাঃ তাহা হোসেন মিশরের রাজনৈতিক ও সাম্প্রতিক জীবনে নানা প্রভাব বিস্তার ক’রে আসছেন। একদিকে অজ্ঞতা দূর করবার জন্ম তাঁর অক্লান্ত সাধনা, আর অন্ধমূঢ় শাসক-শ্রেণীর অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে তাঁর অবিরাম সংগ্রাম। রাজা ফারুককে



## ডাঃ তাহা হোসেন

করতে তিনিও কম সাহায্য করেন নি। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে তিনি দেশবাসীর মনোভাবের পরিবর্তন করেন। স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা—ত্রিবিধ স্বাধীনতার জ্ঞান তিনি সংগ্রাম করেছেন। আর এই জ্ঞান তিনি রাজশক্তির চক্রাংশ হ'য়ে উঠেছিলেন। প্রত্যেক মিশরবাসীকে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টার ফলে সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। সমগ্র আর্থিক জগতে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের এইটাই প্রথম প্রচেষ্টা।

ডাঃ তাহা হোসেন দরিদ্র কৃষক-পরিবারের সন্তান। যখন তাঁর বয়স মাত্র তিন বছর, তখন তাঁর চোখ দুটি চিরকালের তরে নষ্ট হ'য়ে গেল। কিন্তু অন্ধ হয়েও তিনি হতাশ হন নি। মিশরে পল্লী অঞ্চলে আধুনিক ব্রেল প্রথা আরম্ভ হবার লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ চক্রাংশ বালকের সঙ্গে তিনি লেখাপড়ার অভ্যাস করতে লাগলেন। তাঁর ছিল অমর্য উম্মাহ ও কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা। অন্ধ তাঁর বিদ্যার্জনের পথরোধ করতে পারল না। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন :

‘অন্ধ হওয়ার সঙ্গেও আমি কোনদিন হতাশ হয়ে পড়ি নি।’

শৈশবে তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। তিন বছর বয়সেই ভাইবোনদের কথাবার্তা শুনে তিনি উপলব্ধি করলেন যে জগতে এমন জিনিস আছে, যা তাঁর নিকট অদৃশ্য; যা তাঁর নিকট সম্পূর্ণ অপরিসীম। পরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তারা দেখতে পায় আর তিনি অন্ধ। মিশরের গ্রামাঞ্চলের বহু ছেলেদেরই চক্ররোগ হয়, আর তার ফলে তারা চির অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাহা হোসেনকে অন্ধ-জ্ঞানার্বেষণে বাধ্য দিতে পারল না। বয়ঃ বলা যেতে পারে যে, অন্ধত্বের জটাই তাঁর জ্ঞানের আগ্রহ খুব বেড়ে গেল। দরিদ্র পরিবারের এই অন্ধ বালকটি প্রথমে স্থানীয় পাঠশালায় প্রেরিত হলেন। তাঁর গৃহে অপুরে পড়ে যেত, আর তিনি শুনে শুনে পড়া তৈয়ার করতেন। এইভাবে সমস্ত কোরান-শরীফ মুখস্থ হয়ে গেল। এমন প্রতিভাবান বালকটিকে কেউ অবহেলা করতে পারল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিশরের বিখ্যাত শিক্ষানিকেতন ‘আল আজহারে’ প্রেরিত হলেন। সেখানে বহু পরীক্ষায় সদস্যমানে উত্তীর্ণ হলেন। একটা বৃত্তিও পেলেন। তারপর কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে থেকে ১৯১৪ সালে তিনি পি এইচ ডি উপাধি পেলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উচ্চশিক্ষার জন্য ফ্রান্স প্রেরণ করল। সেখানেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করলেন। তারপর একজন ফরাসী মহিলায় পাণিগ্রহণ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই তিনি কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। তাঁর শিক্ষার ধারা ছিল প্রচলিত ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর পূর্বে কোন অধ্যাপকই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা কববার কথা বলতেন না। কিন্তু ডাঃ তাহা হোসেন চিরাচরিত প্রথা ভেঙে দিলেন। তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি জাগ্রত করতে সাহায্য করতে লাগলেন। সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মের মাদ্ধাতার আমলের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য বর্তমান যুগের তরুণ মনকে সন্তুষ্ট করতে

পারে না। তারা চার বৈপ্লবিক আদর্শ ও বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা। তাহা হোসেন ছাত্রদের চিন্তার মধ্যে সেই বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন।

তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, প্রত্যেকটি বিষয় নিজের স্বাধীন মত দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের মন যদি প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে বলে, তবে তাই করবে, তবুও অপূরণে মতকে গ্রহণ করবে না। তোতাপাখির মত অপূরণে বুলি আওড়ানো অপেক্ষা নিজের মতের মূল্য অনেক বেশি—নিজের সে মত যদি ভুল হয় তবুও। মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের শিক্ষা দিবার রীতি ছিল না। সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্থান ছিল না। যুগ যুগ থেকে যে সব বিশ্বাস সকলেই বিনা বিচারে মেনে আসছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ছাত্রগণকে তাই শিক্ষা দিতেন। কোথাও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। ইসলামের পৌরাণিক উপকথাগুলি লোকে আশুবােক্যের মত বিশ্বাস করত। তার বিরুদ্ধে কান্না কিছু বলবার অধিকারও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু এই অন্ধ অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারাকে একেবারে বদলিয়ে দিলেন। এই সময় তিনি একথানা বই লিখলেন তাতে ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কারকে কঠোরভাবে আক্রমণ করলেন। এই গ্রন্থে তিনি অসীম সাহসে ঘোষণা করলেন যে, আরবদের মধ্যে প্রচলিত বহু কথা গালগল্প ব্যতীত আর কিছুই নয়।

রক্ষণশীল সমাজ এই প্রকার স্বাধীনচেতা মানুষকে সহ্য করতে পারে না। সুতরাং অন্ধকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হল। বাধ্য হ'য়ে সরকার একটা তদন্ত কমিশন গঠন করলেন। এই তদন্ত কমিশন দেখল যে, ডাঃ তাহা হোসেনের রচনাবলী সমুদ্রে প্রবোদিত; আর খাটি সত্য। কিন্তু রক্ষণশীল দল তাতে সন্তুষ্ট হল না। মিশরের পার্লামেন্টের একদল সদস্য দাবী করল এই সব রচনা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু অপর একদল সদস্য তাহা হোসেনকে সমর্থন করল। ফলে পার্লামেন্টে তুফুল বাদামুবাণ্ড আরম্ভ হল। মরিশমণ্ডল এই ইস্ততে আহ্বার প্রস্তাব দাবী করলেন। ভোটের মন্ত্রিমণ্ডলই জয়ী হ'লেন। এইভাবে ডাঃ তাহা হোসেনের প্রভাবে মিশর স্বাধীন চিন্তার পথ অনেকটা প্রদর্শিত হল।

১৯৩০ সালে ডাঃ তাহা হোসেন কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) নির্বাচিত হলেন। তিনি বাক-স্বাধীনতার চরম সমর্থক ছিলেন। আর এই ইস্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশরের প্রধানমন্ত্রী সিনকী পাশার বিরোধ দেখা দিল। তিনি দাবী করলেন যে, ডাঃ তাহা হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টরের আসন থেকে সর্বপ্রকার সরকারী কার্যের সমালোচনা বন্ধ করতে হবে অথবা পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ডাঃ তাহা হোসেন একটুও বিচলিত হলেন না।

তিনি দৃঢ়ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, ‘মহাশয়, আপনি বুখাই ক্রোধ প্রকাশ করছেন!—স্বাধীন চিন্তা আমার প্রাণবায়ু, স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত মিশরের উন্নতি নাই।—’

কিন্তু সিনকী পাশার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি ডাঃ তাহা হোসেনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। প্রধানমন্ত্রী এই হুঁচকিহারে তিনি দমে গেলেন না। তিনি দিনেকের

রেও তাঁর আদর্শ বর্নন করলেন না। অতঃপর দেশে শিক্ষা-কেন্দ্র সমিতি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। নানা স্থানে সভা-সমিতি করে তাঁর আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ লিখে দেশের একটা চাক্ষুষ স্মৃতি করলেন। এই সময় তাঁর নামের পরিচয় ছিল অতি সামান্য। পীড়িত সন্তানদের পরিচয় তাঁর অধিকাংশ আর খরচ হয়ে গেল। তিনি স্বপ্নগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

তিনি এই বলে মনকে প্রবোধ দিলেন : দরিদ্রকে তার ভাগ্যের ঠগের সন্তুষ্ট হ'তে হবে—তা না হলে কেমন করে সে তার ভাগ্যের পরিবর্তন করবে। দারিদ্র্য, অভাব ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে দূর হবেন না। তিনি স্বাধীন চিন্তার অধিকার চাইলেন শুধু নিজের জ্ঞান নয়—সমগ্র দেশবাসীর জ্ঞান। তিনি অক্লান্তভাবে মাজ-প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগলেন। বন্ধনশীল সমাজ তাঁকে নানাভাবে অপদস্থ করতে চত্বর্ন হ'ল। কিন্তু তিনি হাস ছেড়ে দিলেন না। হীরে হীরে তাঁর অর্থক সংগ্রহ করতে লাগলেন। মিশরে একটি বিষ্ঠা দল গড়েঠাল—যারা তাঁর পাশে এসে পীড়াল। মিশরের সর্বত্র শিক্ষা-বিস্তারের জ্ঞাতা : তাহা হোসেন যে চেষ্টা করে আসছিলেন, এতদিন পরে তা কিছুটা সফল হ'ল।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে যখন নতুন পার্লামেন্ট ঘাট হ'ল, সেই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘটিত হ'ল।

যৌবনাটি এই : আজ থেকে সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হবে। কিন্তু তাহা হোসেন এই সামান্য সংস্কারে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত।

ইতিমধ্যে তাঁর বিরোধী দলের প্রভাব হ্রাস পেতে লাগল। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে 'টেকনিক্যাল' পরামর্শদাতা নিযুক্ত হলে। এই পদে থাকাকালীন তিনি কয়েকটি নতুন সংস্কার প্রবর্তন করলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জ্ঞান সুরকারী ব্যারে টিফিন বা জলযোগ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়াতেও একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় আট হাজার।

১৯৫০ সালে আবার যখন নতুন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হ'ল, তখন ডাঃ তাহা হোসেন শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন।

তিনি বললেন : 'মিশরের জ্ঞান বৈধরণের শিক্ষার দরকার যদি আমাকে সে বিষয়ে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়, তবেই মন্ত্রিমণ্ডল গ্রহণ করব।'

ডাঃ তাহা হোসেনের নামের মহিমার জ্ঞান নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার করে নিলেন। মন্ত্রিমণ্ডল পাওয়া মাত্র ডাঃ তাহা হোসেন সমগ্র দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে আর একটা আইন পাশ করিয়ে নিলেন যার ফলে পনেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মিশরবাসীর জ্ঞান শিক্ষালাভ করা বাধ্যতামূলক হ'ল। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান নীতি গ্রহণের ফলে একটা নতুন সমস্তা দেখা দিল—এর জ্ঞান চাই হাজার হাজার শিক্ষক—কোথায় এত শিক্ষক

পাওয়া যাবে? কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি পশ্চাদপদ হলেন না। দেশব্যাপী একটা বিরাট প্রোগ্রাম করে ফেললেন। কতকগুলি গ্রামে মডেল স্কুলঘর তৈয়ার করালেন। কোন কোন অঞ্চলে বাসোপযোগী ঘরকেই স্কুলঘরে পরিণত করলেন। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যে এই নতুন ধরণের স্কুলের সংখ্যা ছাব্বিশ শ'য়ে পীড়াল। উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করার জ্ঞান নানাভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। আঠারো মাসে প্রায় ১২০০০ হাজার শিক্ষক তৈয়ার হ'য়ে গেল। একটা কৃশণ সরকারের নিকট থেকে অর্থ আদায় করার জ্ঞান তাঁকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হ'ল। অর্থ আদায়ের শ্রেষ্ঠ কৌশল এই ছিল যে, তিনি সব সময়ে পকেটে পদত্যাগপত্র রেখে দিতেন। সরকার অর্থের অভাব দেখালে সেই পদত্যাগপত্র দাখিল করে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি চাইতেন। একবার মন্ত্রিমণ্ডল তাঁর শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত ২৫০০০ পাউণ্ড দিতে অস্বীকৃত হলেন। এই টাকা নতুন শিক্ষকদের বেতনের জ্ঞান প্রয়োজন ছিল। তিনি বিধাইনচিহ্নে সেই মুহূর্তে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। স্বতন্ত্রা মন্ত্রিমণ্ডল আর বিরুদ্ধি না করে তাঁকে সেই টাকাটা দিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে ডাঃ তাহা হোসেন আরও অনেক ভাল কাজ করেছেন। মিশর ও পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক-বন্ধন দৃঢ় করার জ্ঞান তিনি নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থের আরবী অনুবাদে ব্যবস্থা করেন। হাজার হাজার মিশরীয় ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জ্ঞান ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশের ব্যবস্থা করেন। এইসব সাংস্কৃতিক কাজ করার সময় তিনি প্রধান বাধা পেয়েছিলেন মিশরের রাজা ফারুকের নিকট থেকে। এই রাজা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর পূর্বপুরুষ মহম্মদ আলির কোন গুণই তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু দৃঢ়চেতা ডাঃ তাহা হোসেন এ-হেন দৃষ্টিক রাজাকেও পরোয়া করতেন না। তিনি প্রয়োজন হলে ফারুকের এবং সাদোপাদার কঠোরভাবে সমালোচনা করতেন। তাঁর পরিচালিত স.বাদপত্র 'দি ইজিপশিয়ান ক্রাইব' স্বাধীন সমালোচনার জ্ঞান বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এই পত্রিকাখানি এরূপভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করত যে, রাজদরবার ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। এই সময় ডাঃ তাহা হোসেন এই পত্রিকার 'অনেকি ইন প্রভন'মেন্ট' (শাসনকার্যে সততা) এই শিরোনামের একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধটির ফলে তিনি সরকারের বিরাগভাজন হলেন। রাজার বিরুদ্ধে উদ্বেজনামূলক লেখার জ্ঞান তিনি দৃঢ় হইলেন এবং অর্ধদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজা ফারুক তাঁকে অপদস্থ করার কোন সুযোগ ছাড়তেন না। একবার রাজার মনোনীত একটি কমিটি ডাঃ তাহা হোসেনকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা তাঁকে সে-টাকা ত' দিলেনই না, তদুপরি সেই কমিটিকে ভেঙ্গে দিলেন।

শিক্ষা বিস্তারের প্রধান শত্রু ছিলেন রাজা ফারুক। তিনি ক্রমেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তাঁর এই স্বৈরাচার বেশিদিন টিকল না। ১৯৫২ সালে জেনারেল নেজিব ফারুককে পদচ্যুত করেন। এই পদচ্যুতি গণ-বিপ্লবের ফল হয় নি—হয়েছে সাময়িক বিপ্লবের ফলে। এর পেছনে ডাঃ তাহা হোসেনের কোন হাত ছিল না। যখন রাজা পদচ্যুত হলেন, তখন ডাঃ তাহা হোসেন ইউরোপে

## জীবন তথা হোসেন

ছিলেন। তবে একথা সত্য যে, ডাঃ তাহা হোসেন দীর্ঘদিন ধরে রাজা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অক্লান্ত-অভিনান চালায়ে আসছিলেন। দেশের জনসাধারণ রাজতন্ত্রবিরোধী হয়ে উঠছিল তাঁরই প্রচারাচর্যের ফলে। সেইজন্য দেশবাসীর মন থেকে ফারুকের প্রভাব কমে গিয়েছিল। মিশরের বর্তমান সরকার একেবারে ডিক্টেটোরিয়াল। কবি তাহা হোসেন নেজিব সরকারকে সমর্থন করেন। তার কারণ এই যে, নেজিব সরকার দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছে যে, অদূরভবিষ্যতে মিশরে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে। নেজিব গণতান্ত্রিক শাসন রচনা করবার জন্য যে কমিটি গঠন করেছেন, তাতে ডাঃ তাহা হোসেন অন্ততম সদস্য মনোনীত হয়েছেন। জেনারেল নেজিব এই অঙ্কবির একজন গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক। কবি অবৈতনিক উচ্চশিক্ষার জন্য যে স্বীয় রচনা করেছেন, নেজিব তাকে বাস্তবরূপ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বর্তমানে কয়েকটি কমিটির সদস্যগণ তিনি গ্রহণ করি শাস্ত্রভাবে কাজ করছেন। তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখন তিনি মিশরের একটি দূরবর্তী শাস্ত্র অঞ্চলে সাদাসিধেভাবে বাস করেন। তাঁর ঘরে গ্রীক, ফরাসী, আরবী ভাষার হাজার হাজার গ্রন্থ আলমারীতে সাজান আছে। প্রতিদিন কেউ না কেউ তাঁকে এইসব বই পড়ে শানায়—বৃদ্ধবয়সে মিলটনকে যেমন বই পড়ে শোনান হ'ত। মিলটনের মতই তাঁর একটি প্রিয় জিনিস হচ্ছে

সঙ্গীত। তিনি আরবী ও পাশ্চাত্য গান ভালবাসেন। তাঁর ঘরে সঙ্গীতের সরঞ্জামের অভাব নেই।

মিশরের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ আরম্ভ হয়েছে। ডাঃ তাহা হোসেন এই কাজে বহু সাহায্য করেছেন। প্রবন্ধ, কবিতা, রচনা—এসব কাজও সমায় তাতে চলছে। তত্বপূরি আছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তৃতা। একবার নেজিবই বলেছিলেন, অজ্ঞ কোন আয়োদ্য-আজ্ঞা দে সময় কাটানো অপেক্ষা ডাঃ তাহা হোসেনের বক্তৃতা শুনলে অনেক লাভ হবে। লেখার ক্ষমতা মিশরের বাইরেও তাঁর মধ্যেই সমাধার আছে। ১৯৪৭ সালে যখন আঁজ্রে জিদ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নোবেল প্রাইজ পেতে পারে এমন ক'জন কবি ও শিল্পীর নাম করতে পারেন? উত্তর আঁজ্রে জিদ বলেছিলেন,—“I have but one choice—Taha Hossain.”

বাস্তবিকই তিনি মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁর খ্যাতি পাশ্চাত্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত। অক্সফোর্ড, রোম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারারী ডিগ্রী প্রদান করেন। গত বছর UNESCO তাঁকে একটি শাখার ডিরেক্টার জেনারেল করতে চেয়েছিল। কিন্তু নেজিব তাঁকে ছাড়তে রাজী হন নি। নেজিবের ইচ্ছা যে, শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় তাঁকে কোথাও যেতে দিতে পারে না।

## শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে

ইংলণ্ডের অধিত্য কবি শেক্সপীয়র প্রণীত জাতি প্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতলীর উপাখ্যানভাগ বাংলা ভাষায় সজ্জিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। শেক্সপীয়র পূর্বপ্রশংখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তি ও রচনা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেক, তিনি চারিখানি খণ্ডকাব্যের ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকাব্যের রচনা করিয়াছেন। অনেক বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অধিত্য কবি ছিলেন, এমত নহে, এ পর্যন্ত জগৎকে যত কবি আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অস্বাভাব্য বা পক্ষপাতবিশিষ্ট কি না, মাদুশ ব্যক্তির তথ্যচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রমাণভূত। প্রদর্শন মাত্র। জাতি প্রহসন কাব্য্যাংশে শেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি ধারণনাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে হাস্যরোগ উপস্থিত হয়। জাতিবিলাসে শেক্সপীয়র সেই অপ্রতিম কৌশল নাই; স্তব্ধ ইহা হাস্য লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা পুস্তকে ইয়ুবোপীয় নাম সূত্রাঘ্য হয় না; বিশেষত বাহার ইয়ুবোপী জ্ঞানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠে। এই সোয়ের বিহার বাসনার জাতিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদেবীয় নাম নির্দেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে একবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোন অংশে হানিকর বা সোবাধ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের বৈকল্য উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেকল নয়। [১৮৬৩]

—স্বরূপচন্দ্র বিজয়াগার

ফার্দিনান্ডের সহিত প্রণয় ব্যাপারই মিরান্দার প্রধান পরিচয়। আর বড়ের সময় ভগ্নতরী হতভাগদের জন্য ব্যাকুলতার তাহার ব্যক্তি স্বয়ং কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে। শকুন্তলার পরিচয় আরো অনেক ব্যাপক। দৃশ্যস্ত না দেখা দিলেও তাহার মাহুর্ষ বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিত! তাহার হৃদয়লতিকার চেনন অচেনন সকলবেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সন্মদ করিয়া রাখিয়াছে। সে তপোবানের তরুণলিক জলসেচনের সঙ্গে সঙ্গে সোদরস্নেহে অভিযুক্ত করিয়াছে। সে নবকুমারমোহিনী বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আপনায় কোমল স্নয়নের মুখে গ্রহণ করিয়াছে। শকুন্তলা যখন তপোবান জাগ করিয়া পতিগৃহে বাইতেছে তখন পদে পদে তাহার আকর্ষণ, পদে পদে তাহার বেদনা। স্নেহের সহিত মাহুর্ষের বিচ্ছেদ যে এমন মর্মান্তিক সঙ্কল্প হইতে পারে, তাহা ভগ্নতরীর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়। টেম্পেস্টে বহিঃপ্রকৃতি এরিয়েলের মধ্যে মাহুর্ষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তবু সে মাহুর্ষের আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে। মাহুর্ষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছক কৃত্তের সঙ্ঘর্ষ। সে স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তি দ্বারা পীড়িত আবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ করিতেছে। তাহার স্নয়নের স্নেহ নাই, চক্ষে জল নাই। মিরান্দার নারীস্বভাবও তাহার প্রতি স্নেহ বিস্তার করে নাই। দীপ হইতে বারাকালে প্রাশ্নেরো ও মিরান্দার সহিত এরিয়েলের স্নিগ্ধ বিদায় সম্ভাষণ হইল না। টেম্পেস্টে পীড়ন, শাসন, ধন—শকুন্তলার প্রীতি, শাস্তি, সন্ধ্যা। টেম্পেস্টে প্রকৃতি মাহুর্ষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত স্নয়নের সঙ্ঘর্ষে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলার গাছশাল-পশুপক্ষী, আবহাভাব রক্ষা করিয়াও মাহুর্ষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেল [১১০২] —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# লণ্ডনের শাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী

ডক্টর শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়



কোন জাতই তার অতীতকে অস্বীকার করে বড় হতে পারে

না। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কলা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার সংরক্ষণের মাধ্যমেই সেই দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ লাভ করে। আধুনিক হুনিয়ার ইংরেজরা জাত হিসাবে বোধ হয় এ কথার সত্যতা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিল।

জগতের এক প্রাচীন সভ্যতার দেশ থেকে আমরা এখানে আগতক। কিন্তু এদেশে আসার আগে কখনো বুঝতে পারি নি যে প্রাচীনের প্রতি আমাদের অবহেলা কত গভীর। বতই দেখছি ততই অস্বাভাবিক যে যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু স্বর্গীয়, যার পেছনে কোনও একটু ইতিহাস আছে, তাকেই সম্বৃত্ত রক্ষা করার জন্য এদের কি অকুণ্ঠ প্রয়াস! ছোট বড় যেকোন শহরেই সরকারী-বেসরকারী, অসংখ্য গ্যালারী, মিউজিয়াম দেখলে আমাদের আত্মবিকার আসারই কথা।

যাক সে সব কথা! আজ বরং আমরা বিখ্যাত শাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী নিয়ে কিছু আলোচনা করি।

লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্র, কর্মক্ষেত্র 'ওয়েস্ট এণ্ডের' মধ্যে দিয়ে সোজা চলে গেছে জনবহুল রাস্তা চেম্বার্স ক্রস রোড। 'টুইনন্' কোর্ট রোড টিউব স্টেশন থেকে শুরু হয়ে সেন্টার স্কোয়ার স্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পড়েছে 'ট্রিগ্গার' ওপার। ট্রিগ্গার পাশেই বহু প্রচারিত 'ট্রাফালগার স্কোয়ার'। এখানে গগনচুম্বী ভবনের ওপর বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি লর্ড নেলসনের বিশাল মূর্তি। সারা ট্রাফালগার স্কোয়ার জুড়ে ব্যাংকে ব্যাংকে পারবারের আসা-যাওয়া দাঁড়িয়ে দেখার মত দৃশ্য।

স্কোয়ারের চারপাশের রাস্তার সর্বত্র গাড়ির ভিড় লেগেই আছে। কর্মব্যস্ত মানুষ শশব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। কোঁচুলী পর্যটকের দল ফাঁটা তুলতে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে একটা জীবন্ত ভাব।

এই ট্রাফালগার স্কোয়ারের এক পাশেই লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত দু'টি

রাণী আলেকজান্দ্রা (১৮৪৪-১৯২৫)

—তার লিউক ফিল্ডস অঙ্কিত

জাতীয় চিত্রশালা অবস্থিত। একটি হল শাশানাল আর্ট গ্যালারী আর তার পাশেই শাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী। এদেশের এবং বিদেশের সেরা শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিবর্দন রাখা আছে শাশানাল আর্ট গ্যালারীতে।

পৃথিবীর সর্বকালের বিখ্যাত প্রতিভূ-চিত্রকলার সগ্রহ হিসাবে শাশানাল পোর্ট্রেট গ্যালারী প্রায় অদ্বিতীয় বলা চলে।

প্রতিকৃতি-চিত্রের দিকে ইংরেজদের ঘোঁকটা বরাবরই বেশি। শুধু ধনী বা অভিজাতই নয়, সাধারণ মজলুম-হুঁহু চাইতো বাপ-ম্ম আর পরিবারের ছবি আঁকিয়ে রাখতে। দশ-একাদশ শতক থেকেই এ-বিষয়ে এদেশের লোকদের আগ্রহ দেখা যায়। তখন ক্যানভাস, কাঠ, কাগজ বা অস্ত্র-কিছুর ওপর ছবি আঁকার রেওয়াজ এদেশে চালু হয় নি। তাই এ-সময় শিল্পীরা গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে বাড়ির দেওয়ালেই পরিবারের ছবি আঁকে আসতেন। কিন্তু দুর্গ, স্ব-বাড়ি পুরোণো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেলে সেই সংগে ছবিও নষ্ট হয়ে যেত। তাই সে-সময়কার এ ধরনের শিল্প-নিবর্দন প্রায় দুস্তাপ্যই বলা চলে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক থেকে ইংলণ্ডে ডাচ ও অস্ট্রিয় বিদেশী শিল্পীদের আসা-যাওয়া শুরু হ'ল। এঁরা সাধারণত ভাগ্য অধ্বংয়ের আশাতেই এদেশে উপস্থিত হতেন। কিন্তু এদেশের ধনী ও অভিজাত সমাজে এঁরা সাময়িক গৃহীত হলেন। এঁরাই এদেশে প্রথম ক্যানভাস বা অস্ট্রিয় উপাদানের ওপর ছবি আঁকার প্রবর্তন ঘটান যা' সহজেই ফ্রেমে ঝাঁপিয়ে দেওয়ায় বুলিয়ে রাখা যেত। এঁদের ছবি আঁকার রীতিও ইংলণ্ডের শিল্পধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করলো।

## পঞ্চদশ শতাব্দীর পোর্ট্রেট গ্যালারী

শুধু তাই নয়, চিত্রের সম্বন্ধেই হওয়া এসময়ে ইংলণ্ডের অভিজাতদের মধ্যে একটা ফ্যাশান হয়ে পড়ল। প্রত্যেক ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলেরদের শিক্ষার অঙ্গতম অঙ্গ ছিল শিল্প-কলার পারদর্শিতা লাভ করা। চিত্রকলার ওপর যৌকটা ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই ক্ষেত্রে দেশে লেখাপড়া শেষ করেই এদেশের বাড়িঘরের ছেলেরা বেড়াতে যেতেন ইটালীতে। ইটালীর ফ্লোরেন্স, 'ভেনিস', নেপলস নগরী তখন চিত্রশিল্পের জন্ম বিধিবিধি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর শিল্পসিদ্ধরা তখন গিয়ে সমবেত হতেন ইটালীতে। ইংলণ্ডের এই শিক্ষিত যুবকরা ইটালীতে গিয়ে শুধু যে শিল্পের চর্চাই করতেন তা নয়, দেশে ফিরে আসার সময় ইটালীর সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা কিছু ছবিও তাঁরা কিনে আনতেন পরিবারের সংগ্রহ হিসাব।

এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই চিত্রশিল্প ও চিত্রকলার ওপর বেশ জ্ঞান ও আগ্রহ আছে এমন অসংখ্য পরিবার দেখা দিল। বিখ্যাত ভাট শিল্পী ফ্রান্সো হুইটন বখন অষ্টম হেনরীর চিত্রশিল্পী হয়ে ইংলণ্ডে এলেন, শিল্প সম্বন্ধে ইংল্যান্ডের গভীর আগ্রহ ও রসবোধ দেখে তিনি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এদেশে চিত্রশিল্পের নতুন জন্ম বলতে হবে। তার আগে আঁকা প্রায় সব ছবিই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার ফ্রান্স হুইটনের আসার সংগে সংগেই এদেশে প্রতিকৃতি চিত্রকলার নিত্য-নতুন ধারার প্রবর্তন হ'তে থাকল। হুইটন, তাঁর ছেলে, স্যার এ্যাটনো ভ্যান ডাইক, স্যার পিটার ব্রুকিং ও ইন্ডিয়ান জোফানীর মত বিখ্যাত বিদেশী শিল্পীর দল ইংলণ্ডে একের পর এক এসে হাজির হলেন। সেই সংগে যাত্রাকরী ক্ষমতা নিয়ে জম্মালেন স্যার টমাস লরেন্স, স্যার জোহান্না রেন্ডল্‌স, রামসে, হগার্থ টার্নারের দল। এঁরা যুগপৎ রাজা ও দেশের আপামর জনসাধারণের সমাহৃত ও সমর্থন লাভ করলেন। ফলে পঞ্চদশ শতক থেকে প্রতিকৃতি চিত্রের ক্ষেত্রে সেই যে নতুন নতুন জোয়ারের দেখা দিল, তা আজও অব্যাহত রয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সব শিল্পীদের আঁকা সমস্ত ছবিই ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন পরিবারে, অভিজাতদের দুর্গ প্রাকার বা রাজার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। তাদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা কেউ কখনো চিন্তা করে নি। যন্ত্রের অভাব ও অজ্ঞান নানা কারণেও অনেক মূল্যবান ছবি নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

এই সমস্ত ছবির যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও জনসাধারণের কাছে তা' প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ১৮৪৫ সালে বনামদত্ত কাল্পাইল সাহেব প্রথম এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ পঞ্চম আল' স্ট্যানহোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন গুপ্তী লোক। শিল্পের প্রতিও তাঁর ছিল একনিষ্ঠ জন্মদাগ। তিনি কাল্পাইলের অভিমতটি তুলে ধরে একটি জাতীয় প্রতিকৃতি চিত্রশালা গড়ে তোলার জন্তে আন্দোলন শুরু করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এ্যালবার্ট ও তখনকার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ বেনজামিন ডিসরেইলী তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেন।

লর্ড স্ট্যানহোপের আন্দোলনের তীব্রতার সরকারের চিন্তা নড়ল। ১৮৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন 'জ্যালাল পোর্ট্রেট গ্যালারী

প্রতিষ্ঠার জন্ত পালার্মেন্টে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়ে নিলেন। এর পরিচালনার জন্ত উপযুক্ত অর্থও পালার্মেন্ট সাদরে মঞ্জুর করলো। এক শক্তিশালী কমিটির ওপর এর পরিচালনা-ব্যবস্থা ভর্তুকি করা হ'ল। ঐতিহাসিক প্যালার্মেন্ট, লর্ড সলসবেরী, লর্ড পামারস্টোন, কাল্পাইল সাহেব প্রভৃতি জ্ঞানীশুণী ব্যক্তিরা পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য হলেন। প্রথম সভাপতির পদে বৃত্ত হলেন এর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড স্ট্যানহোপ।

প্রায় শূন্য থেকেই জ্যালাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর ওপর দু'টো দায়িত্ব এসে পড়লো। প্রথমত দেশের বিখ্যাত লোকদের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করা। সেখানে দু'টো কথা তাঁদের মনে রাখতে হয়েছে। প্রথমত বনামদত্ত সমস্ত মনীষীদের কথা। তাঁদের অনেক প্রতিকৃতি আছে যা' কোন নামকরা শিল্পীদের দিয়ে করানো নয় অথচ যার শিল্পমূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট বলতে হবে। তাঁদের সংগ্রহের এটা হ'ল অঙ্গতম মাাপকাঠি।

তাঁদের সংগ্রহের দ্বিতীয় মাাপকাঠি হ'ল, সেরা শিল্পীদের যে কোন কাজ, তা রাজা-মহারাজার প্রতিকৃতিই হোক বা সাধারণ মানুষের ছবিই হোক। তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাজের গুণাগুণ বিচার করতে চাইলেন।

কিন্তু আগেই আমরা বলেছি সংগ্রহ ছাড়াও আর একটা দায়িত্বও জ্যালাল পোর্ট্রেট গ্যালারীর হাতে এসে পড়েছিল। সেটা হ'ল চিত্রসম্বন্ধে জনসাধারণের জিজ্ঞাসার যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া এবং শিল্প সম্বন্ধে ব্যক্তিগত নানা দাবী-দাওয়ার সম্ভববিধান করা।



উইলিয়াম ওয়ারহাম (১৪৫০-১৫৩২)

ফ্রান্স হুইটন আঁকিত বসিমা অঙ্কিত

কোনো ভুলোক হয় তো সত্যের বা জাঠারো শতকের কোন একটা ছবি এখন গ্যালারীতে হাজির করলেন, তাঁকে বলে দিতে হবে কে এই ছবি এঁকেছেন, ঠিক কোন সময়ের ছবি বলে এটিকে তাঁর। আশা করেন, ছবিটির শিল্পগুণই বা কেমন ইজ্যাবি নানারকমের প্রশংসা। আর থেকেই জাশানা গ্যালারীর কতৃপক্ষ এই সমস্ত প্রশংসাকে সত্যক অঙ্গগতান চালিয়ে এসেছেন এবং তার সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ মূল্যবান প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে।

জাশানা পোর্ট্রেট গ্যালারীর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগেই। এমন আর একটি গ্যালারীর কথা আমার জানা নেই। এডিনবারা, প্যারিস কিংবা রোমের মিউজিয়াম দেখে তাদের নানাদরনের শ্রেষ্ঠের কথা আমার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রতিভূতিরচিত্রের এমন সুবিলুপ সংগ্রহ এবং শিল্প নিয়ে পড়াশুনো করার জন্য এরকম স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারের জুড়ি বোধ হয় নেই।

সৌভাগ্যবশতই এখানে এক দারিদ্রপূর্ণ পদে আমার কিছুদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। তখন চিত্র সংগ্রহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ সবচেয়ে এখানকার আধুনিক ব্যবস্থা দেখে আমি অবাক হয়েছি। সারা পৃথিবীতে কোন্ চিত্রকর বা ভাস্করের কোন কোন কাজ



লন্ডনের টেবিলে সপরিবারে রাজা বর্ড

—জমস গান অর্ড (১৯০০)

কোথার রাখা আছে এখানকার চিত্রশিল্পীকে দেখে তা খুঁজে বার করতে আশনার মধ্যেই বিলম্ব হবে না। এতো গেল পরিচালনার একটা দিক মাত্র।

যদি মুজিসানার কথা বলেন তাহলে বলবো, যুগে-যুগে বাপসা হয়ে গেছে এমন সব ছবিকে পরীক্ষা করে অনতিবিলম্বেই এখানকার বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারেন যে কোন্ শিল্পী কোন্ সময় মাপাদ এ ছবিটি এঁকেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা সমীচীন বোধ করছি। ইদামী-কালে জাশানা গ্যালারীর যে জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা তার পেছনে অলক্ষ্যে কাজ করেছে এর বর্তমান 'কিপার ও ডিরেক্টর' স্যার কিংসলী এ্যাডাম্সের জীবনভোর পরিশ্রম ও সাধনা। এই শুভকেশ, সৌম্য-দর্শন, সুশুশিত ভল্লোকটি আজও যে গভীর মমতা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তা দেখলে দুঃখ না হয়ে উপাশ নেই। এপার্টেইন সাহেবের কয়েকটি ভাস্কর্য সংগ্রহ করে একদিন তিনি যেন তাঁর খুশি ধরেই রাখতে পারছিলেন না! এরকম মানুষ সারা প্রতিষ্ঠানকেই অল্পপ্রাণিত করে থাকেন।

জাশানা পোর্ট্রেট গ্যালারীর ব্যয়ভার সরকারই বহন করে থাকেন। এ-ছাড়াও নতুন নতুন সংগ্রহের জন্য সরকার প্রত্যেক বছরই অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এ-ছাড়াও অনেক সদাশর ভল্লোক তাদের পারিবারিক চিত্রসংগ্রহ এই প্রতিষ্ঠানকে দান করে যান। এমনি করেই জাশানা পোর্ট্রেট গ্যালারীর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জগতে আজ তার তা'ব জুড়ি নেই।

আমাদের দেশের বহু ছবিই তো অব্যত নষ্ট হয়ে গেছে। রামপ্রসাদ ভাবতচন্দ্রের কথা নয় ছেড়েই দিলাম, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিভাসাগর, বাকিমচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালকার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির কোন ভাল প্রামাণ্য তৈলচিত্র আছে কি না আমাদের জানা নেই। থাকলেও তার যথোপযুক্ত সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত আমরা করি নি। জাশানা গ্যালারীর মত জাতীয় চিত্রশালার পত্তন যত বিলম্বিত হবে দিনে দিনে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও ততই লুপ্ত হতে থাকবে। সেই সমূহ ক্ষতির হাত থেকে আজ দেশকে কে-ই বা রক্ষা করবে!

জাশানা পোর্ট্রেট গ্যালারীতে রাখা শিল্পী জোফানীর জাঁকা কয়েকটি ছবিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা ও তার সমিহিত অঞ্চলের ইং-বাগ সমাজের সামাজিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন অনেক কথাই তার থেকে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

রবি বর্দা, অবনীন্দ্র ঠাকুর, বামিনী রায়, নন্দলাল বোস, অজুল বোস প্রভৃতির জাঁকা বহু মূল্যবান ছবি আছে বা' পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দর্শনের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে। এই সব শিল্পীদের জীবনব্যাপী সাধনার ফল বা'তে নষ্ট না হয়ে যার এবং আমাদের দেশের জনসাধারণ বা'তে তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, তার জন্যে অবিলম্বেই কোন ব্যবস্থা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—লণ্ডন বি সি বিচার বিচার সৌজ্ঞেয়।

# কাঠ ও কাঠের আসবাব পত্র

আশীষ বসু

পশ্চিম বাঙলার জঙ্গলে কাঠ পাওয়া যায় না একথা বলবে না, তবে আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের তুল্য যে কাঠ বেশি লাগে অর্থাৎ সেজন্য তা আসে মধ্যপ্রদেশের, উড়িষ্যার আর আসামের জঙ্গল থেকে। বাঙলার হর আম, জাম, শিশু, আবলুস, শাল, দেবদারু, ছাতিম, কদম, সুন্দরী ইত্যাদি গাছ। ভারতের জঙ্গলে বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি ঘনফুট কাঠ পাওয়া যায়—যার অর্ধেক অতি অল্প এক অংশই হয় বাঙলার, তবু আসবাব তৈরির কাজ বাঙলাতেই হয় বেশি আর তার বনোদ্যানও অনেকদিনের।

কাঠের ব্যবহার বাঙলা দেশে হয়েছে নানানভাবে। জাহাজ আর নৌকা তৈরির কাজে, কাঠ খোদাইয়ে, ঘর তৈরি করার কাঠামোর, গরুর গাড়ির চাকা, জানলা, দরজা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস বানাতে, কাঠের খেলনায় এবং সবশেষে কাঠের আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে।

কথিত আছে, চাঁদ সদাগরের সপ্তাড্ডির এক-একখানি ডিঙা তৈরি করতে বোল শ' কারিগরকে পুরা এক বছর করে পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ভোজ প্রবীত 'মুক্তি কলতরু' গ্রন্থে সেকালের অনেকগুলি জাহাজের নাম পাওয়া যায়। যেমন প্রাবিনী, গামিনী, সত্বরী, লোলা, ডীম, মধ্যমা, ক্ষুদ্রা ইত্যাদি। ফা-হিয়েনের মতো পৃথক বলেছেন যে, তাম্রলিপ্তের চেয়ে বড়ো বন্দর তিনি এদিকে দেখেন নি। বাঙলার জাহাজ তৈরি হত 'তেহরু' নামক একপ্রকার কাঠ দিয়ে। পৃথকদের মতে ভিনিসীয় জাহাজের চেয়েও বাঙলার জাহাজ ছিল বেশি মজবুত।

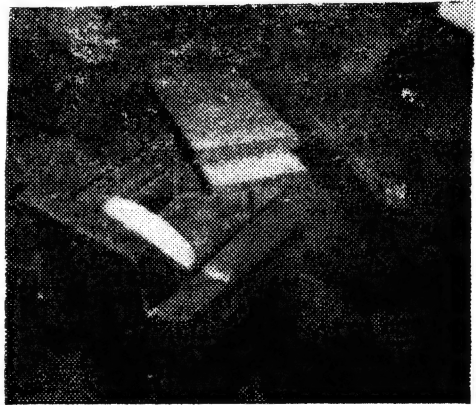
বাঙলার হুজুর বা কাঠের কারিগরের হাতের একচালা, দোচালা, চৌরী আর অটোচালা পদ্ধতির ঘর তৈরির বিশেষত্ব সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হয়েছে। ঘর তৈরি ছাড়াও সেকালের হুজুর নানা ছোটখাট কাজে সদাই ব্যস্ত থাকতো। যেমন বইয়ের বা পুঁথির মলাট তৈরি, নানারকম কাঠের জিনিস—যেমন চাকি-বেলুন, বারকোশ, পিঁড়ে, জলচৌকি, হাতা ইত্যাদি সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি এমনি ছিল সব কাজ।

আসবাবের ব্যবহার যদিও বখেঁট পুরানো, তবু তাকে একেবারে ঐতিহাসিক বলা চলে না। কাঠকে আসবাবের কাজে লাগানো হয়েছে কবে একথা সঠিকভাবে বলা শক্ত।

পুত্রঘরেরা সারা বাঙলা জুড়েই বসবাস করছে। কাঠের কাজই তাদের প্রধান উপজীবিকা। বর্ধমানের হরিপুর, ময়লাকোট,

কাটোরা, জামুরিয়া, পূর্বখলা, কালনা, পাইহাট। বাকুড়ার বিষ্ণুপুর, হাপানিয়ার-শুভনিয়া ইত্যাদি। হুগলীর সিরামপুর, চন্দননগর, মশাট, ইলিপুর। হাওড়ার আমতা; মুর্শিদাবাদের খাগড়া, বেশডালা। চবিশ পরগণার ভাটপাড়া, কাঁচড়াপাড়া। মেদিনীপুরের দামপুর, কোলাঘাট, নাড়াজোল। বীরভূমের রাজনগর, করিখা, হুগরাঙ্গপুর, খররাসোল, শিউড়া। কলকাতার চাঁপাতলা, এটালী। এরা কাঠের কাজ করে, তবে সবাই যে কাঠের কারিগরই বানায় তা নয়।

কাঠের তৈরি যেসব আসবাবপত্র কলকাতার বাজারে বিক্রি হয় তার একটি অতি বৃহৎ আদে কলকাতার আশপাশ এবং মফস্বল থেকে। যেমন জামাকাপড় বিক্রি হয় কলকাতার সর্গাই, সেলাই হয় মেট্রোকল্লেই বেশি। কাঠের আসবাবের মধ্যে তেমন চন্দননগর থেকে আসে বসবার চেয়ার, হাওড়ার আমতা থেকে আসে খাট, পালঙ্ক।



বসবার ঘরের জন্য অতি সৌখীন সোফাসেট—তিন পিসের।

৩' ডানলোপিলোর গদিসহ, শিশু দেওরা ডানলোপিলোর বাগিশ, ট্যাপেট্রির কাপড় মূল্যবান—রায় ১৮৫.০০ টাকা। সড়ক একসেট তিন পিসের কফি টেবল, একটি ৩ ফুট লম্বা ও পাশের দু'টি পেগ টেবল—রায় ২৭৫.০০ টাকা





বুকশেল—৪' ৮" x ৩' ৬", নব্ব্ব বিশট, ওপরের  
দুটিতে কাচ লাগানো, নীচেরটিতে কাঠের ব্লাইডিং ডোর।  
এটিটির দাম ৪২৫ টাকা।

টিট আসে মেরিনীপুর থেকেও। কলকাতার দোকানদারেরা পাইকারী  
গমে তা কেনেন এবং খুচরা বেচেন ক্রেতাদের কাছে।

আসবাবপত্র কেনাবেচার ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে কলকাতার  
বচেয়ে প্রসিদ্ধ হল বৌবাজার, ওয়েলিংটন, পার্ক স্ট্রীট, শিয়ালদা অঞ্চল।  
যেকটি গুরোনো দোকানের নাম জানতে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো  
গিবে। যেমন সি সি স্টীল এ্যাণ্ড কোম্পানী, মতিলাল দাস এ্যাণ্ড  
ফাল্পানী (চন্দননগর), লীলা কোম্পানী, মহেশ্বে শোখ কোম্পানী,  
জনীকান্ত দে, এস জি হোসেন, মডার্ন ফার্নিচার্স, চ্যাটার্জি ফার্নিসিং  
ফাল্পানী, প্রবর্তক ফার্নিচার্স, স্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট, এ সি নন্দী এ্যাণ্ড  
ফাল্পানী ইত্যাদি। এদের মধ্যে দু-একটি দোকান উঠেও গেছে।

এই কলকাতার আসবাবের কাজে নাম করে গেছেন দয়াল পাণ্ডা,



ডিসপেন্স ক্যাবিনেট—৩' ৮" x ১৪" x ৪' গ্রেট কাচের সেলফ।  
সামনে গ্রেট কাচ, দু'দিকে দরজা। এটিটির দাম ৪৫০ টাকা।

গুরুবামী, জেঠা ভালজে, আলিবাঁধি মিত্রী, আলাবান্ন মিত্রী, সুরেন্দ্রনাথ,  
মাইতি, নিতাই বাটালীওলা, হরিগোপাল মিত্রী প্রভৃতি বাদের হাতে  
কাজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

প্রসঙ্গক্রমে ল্যাজারাম, শিখ প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের  
নাম করতে হয়। এ শিল্পটির উন্নতিতে এদের দানও কম নয়।

কাঠের আসবাব তৈরি করতে লাগে সাধারণ কয়েকটি যন্ত্র।  
যেমন র্যান্ডা, করাত, বাটালী, তুরপুন, মাটাম ইত্যাদি। আর লাগে।  
হাত, আসল কারিকুরি সেই হাত দু'খানিরই।\*

\* সঙ্গে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মডার্ন ফার্নিচার্স থেকে  
গৃহীত। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের তৈরি অতি মূল্যবান সেগুন  
কাঠের ফ্রেম ও সেগুন ভিনিয়ার্ড সলিড বোর্ড দিয়ে। উত্তম।  
পালিশসহ। ছবি তুলেছেন শ্রীশ্রবান বন্দ্যোপাধ্যায়।

## শেকস্পীয়র প্রসংগ

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু  
সন্দেহ হয় কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর  
কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্বায়ে স্থান দেওয়া হইতে  
পারে না। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিভাষ্য অবনতি  
হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেকস্পীয়রের নাম  
মনে রাখিয়াও অকৃতোত্তরে বলা হইতে পারে, ইউরোপ মহাদেশেও  
একবারের বেশি হোমারের জন্ম হয় নাই। [১৯২৪]

—রামেন্দু সন্দর ত্রিবেদী



# ব্যবিলনের আইন

## বাস্তবদের মুখোপাখ্যায়

সুমেরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সুমেরু (Sumer)

থেকে ইউফ্রেটিস নদীর গা' বেয়ে বেশ কিছুটা উপরে উঠে ব্যবিলনে 'সভ্যতা' এল ভরা-সৌর্যন নিয়ে। সংঘম যেমন মানুষের যৌবনকালকে সূচী করে তোলে, তেমনি আইন ও শৃঙ্খলা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার বা পূর্ণতা দান করার সবচেয়ে বড় মৃতসজ্জীবনী। উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার অভাবে কচিকিশলয়ের মৃত্যুর মতো অনেক প্রাচীন সভ্যতা বিশৃঙ্খলা আর ব্যাভিচারের অসীম শাসনের জন্ত আজ অতলান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইতিহাস বড় কোব তাদের জন্ত দুঃখ করেছে, না হয় তো চার লাইনের প্রশস্তিতে তার কাজ শেষ করেছে।

ব্যবিলনে যখন সভ্যতার শিকড় অমূল প্রসারিত তখন সেখানকার রাজা হামুরাবি (খৃঃ পূঃ ২১২০—খৃঃ পূঃ ২০৮১) প্রথম যুগে পেরেছিলেন, সমাজকে ভ্রাতৃত্বভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে লিখিত আইন প্রয়োজন। প্রথা শুধু মানুষকে সুবিধা দান করে, কিন্তু সমষ্টির কল্যাণের জন্ত মাঝে মাঝে প্রথাগত সুবিধাকে খর্ব করতে হয়।

এই আইনগুলি মুখণ্ডে লিখিত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যবিলনের দেবতা মারদুকের মন্দিরের চত্বর খুঁড়ে বার করেছে। এই মুখণ্ডের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। অর্ধেকের উপর বুটশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। বহু বংশেরের অল্পাঙ্ক প্রচেষ্টার এই মুখণ্ডের লেখাগুলি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে।

আইনের শুরুতেই বলা হয়েছে, ব্যবিলনের সর্বোচ্চ বিচারক হচ্ছেন রাজা। আইনগুলি ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা বিচারের তার পুরোহিতের হাতে জড়। প্রতিশোধই হচ্ছে বিচারের অন্তর্নিহিত ভাব। বোধ হয় এইজন্য আইনের বিভিন্ন অচ্ছেদের শুরুতেই লেখা আছে—

‘আই যর এন আই, টুখ ফর এ টুখ’

কেউ অসন্ত বাড়ি থেকে চুরি করলে তাকে পুড়িয়ে মারা হতো। মশির থেকে চুরি করা হলো জঘন্যতম অপরাধ—বাড়ি ভেঙ্গে বাড়ির মালিক মারা গেলে, সেক্ষেত্রে রাজমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করা হতো। কিন্তু বাড়ির মালিকের ছেলে মারা গেলে সেক্ষেত্রে রাজমন্ত্রীর ছেলেই শাস্তিযোগ্য ছিল। নাবালিকা ধর্ষণকারীকে তার দু'পায়ের গোড়ালী হারাতে হতো। চরিত্র নম্র মুখণ্ডে স্পষ্টই লেখা আছে—

‘কোন ধাত্রী যদি কোন নারীর সন্তোজাত সন্তানকে অপর কাহারো সন্তোজাত সন্তানের সংগে পাঠে দেয় তবে তাকে প্রকাশ্য রাস্তাপথে তার শুনবর খাতকের হস্তে হারাতে হবে। বিবাহিতা নারী অপর পুরুষের সংগে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হলে সারাজীবন বিবস্ত্র অবস্থার কাটানোই ছিল আইনের বিধান।’

যুদ্ধে কাপুরুষতা দেখানো, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মৃত্যু ঘটানো বা কোন পুরোহিতের দ্বার মদের দোকানে প্রবেশ ইত্যাদি হলো কঠোর শাস্তিযোগ্য।

ব্যবিলনবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, সত্যতা ও নিরপরাধ সব সময় ভালো সঁাতার পক্ষে থাকে। এইজন্য অভিযুক্ত পুরুষ বা নারীকে তার অপরাধের অসারতা প্রমাণের জন্ত ইউফ্রেটিস নদী সঁাতরে পার হতে হতো। ভূবে মরলে মৃতের সম্পত্তি অভিযোগকারীর প্রাপ্য ছিল।

দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড কার্যকরী করার প্রথাও ছিল অদ্ভুত। তখনও জেলপ্রথা, ক্রুশবিদ্ধ করা বা ক্রীসিকার্টে ঝোলানো প্রচলিত হয় নি। সামান্য অপরাধের জন্ত অঙ্গহানি করা হতো। অপরাধের মান অনুযায়ী অপরাধীকে পুড়িয়ে মারা, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়া বা মাটিতে আদ্যে পুতে নরখাদক জন্ত দিয়ে থাকানো বা প্রতিদিন কিছু কিছু করে অঙ্গচ্ছেদ করা ছিল স্বাভাবিক নিয়ম।

পরবর্তী যুগে ব্যবিলনের শাসকগণ ক্রমবর্ধমান সামগ্রীর মূল্য, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির সংগে পালা দেওয়ার জন্ত সমস্ত অপরাধই অর্ধের বিনিময়ে মকুব করে দিতে শুরু করেন। আবার শ্রেণিগত বিরোধের সুযোগ নিয়ে শাসকগণ অপরাধীর শ্রেণিগত অবস্থা অনুযায়ী অর্ধ দাবী করলেন। যেমন একজন দাস একজন পদস্থ কর্মচারীর সঁাত ভেঙ্গে দিলে তাকে দিতে হতো বাট সেকেল (ব্যবিলনের প্রচলিত মুদ্রাকে সেকেল বলা হতো)। আবার একজন পদস্থ কর্মচারী দাসকে হত্যা করলে তাকে দিতে হতো পাঁচ সেকেল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুবাটের মতে, প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই ডবিষ্যতের শ্রেণিগত বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

ব্যবিলনের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম কন্যাকে ওদের ভগবান মারদুকের সেবার নিযুক্ত করার জন্ত মন্দিরে পাঠানো ছিল অবশ্যকর্তব্য। তাদের গর্ভজাত সন্তানরা ভগবানের সন্তান নামে পরিচিত হতো। হামুরাবি প্রথম সিকে পুরোহিতদের এইভাবে ধর্মের নামে নীতিহীন ভোগোন্মত্ততা বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি সফল হন নি। তবে আইন করে এই সব আইনের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তানদের আইনের আওতার এনে পুরোহিত শ্রেণীর স্বত্বাচার ও ভোগ-সন্তোষের স্পৃহাকে সংযত করেন।

সামাজ্য জীবন তখনও চিন্তার ভটলি আবারে ও কুটিলতার অন্ধকারে স্পূর্ণ নিমজ্জিত হয় নি বলে, সত্য কথা মানুষ বলতো, পরলোকের ভয় তাদের সত্যতা ভীষণভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই ব্যবিলনের আইনে দেখা যায়, কেউ যদি ভগবানের নামে শপথ করে বলে যে তার বাড়িতে চুরি হয়েছে এবং চোর ধরা যায় নি, তবে তার হিসেব মতো অপদ্রত জিনিসগুলির মূল্য টাড়া তুলে দিতে নগরবাসীরা বাধ্য থাকতো। টাকা ধার নিয়ে তার স্ত্রী না দেওয়া হলো বড় ধরনের অপরাধ। একটি মুখণ্ডে বিচারালয়ের একটি মামলার চুনানী লিপিবদ্ধ আছে। মামলার বিবরণে জানা যায়, একজন প্রেসিডেন্ট (অনেকটা আমাদের দেশের প্রাক্তন জমিদারের মতো) নিজের

লুক থেকে নিচুই কিছু টাকা খণ নেয়। কিন্তু ঠিক মতের সুদসহ ঐ টাকা সিলুকে না রাখতে পেরে আদালতে জেতার বিরুদ্ধে নিজেই মামলা করু করে বিচারকের কাছে বিচার আর্শনা করে।

অবশ্য ঐতিহাসিকগণ ঠিক পরবর্তী মুংখণ্ডে অর্থাৎ বাতে সম্ভবত মলার 'রাব' লেখা ছিল সেটার সন্ধান পায় নি বলে তাদের পক্ষে মলার 'নিশ্চিন্তি' জানা সম্ভব হয় নি।

আগেই বলেছি, বিচারের মূল অন্তর্নিহিত ভাব ছিল প্রতিশোধ। ফের 'হল' যে মুংখণ্ডটি সম্প্রতি পাঠোদ্ধার করেছেন তাও একটি মলার স্তনানী। এই স্তনানীতে এই 'প্রতিশোধ' স্পষ্টাটি বেশ ঠিক। মামলার বিবরণীতে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি তার চাদের র থেকে হুঁকে এক ভদ্রলোকের সংগে কথা বলতে গিয়ে তার ধার উপর পড়ে। ফলে, তলার ভদ্রলোক মারা যায়। সেই মৃত লোকের পুত্র সেই ছাদের উপরের ভদ্রলোককে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। আদালতে উপস্থিত হয়। বিচারক রায় দিলেন যে, এখন মৃত স্ক্রু পুর ঐ ছাদ থেকে ঠিক ঐ জায়গায় হত্যার দায়ে অভিযুক্ত স্ক্রু মাথায় পড়বে।

এমনি ধরণের আরও অনেক ব্যবিলনের আদালতের বিচিত্র কাহিনী গানের অপেক্ষায় আছে।

ব্যবিলনের শেষ স্বাধীন নৃপতি মদমত্ত অবস্থায় যে 'দেওরাল লিখন' ধছিলেন তা আর কিছুই না—যে আইন ও শৃঙ্খলার দেশ ও জকে বেঁধে তাঁদের দেবতা 'মারহুকের' যে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, সেখ নৃপতি বেল সাজার হারাচ্ছেন। বিলাস আর ঐর্ষ্যে গা দিয়ে বাড়িচার আর অত্যাচারকে ব্যবিলনের সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ

করে ইহুদী দেবতা 'দেহভোর' পবিত্র সোনার পায়ে মদ ঢেলে নিজেই আর দেশের সর্বনাশ টেনে এনেছিলেন। বেল সাজার বুকে পাবেন নি, মারহুকের অপমানে দেবতা ক্রটি হয়। তাই এ দেওরাল লিখন ভগবান 'মারহুকের' অভিশাপ।

পরের দিন পারসিয়ানরা বেল সাজারকে হত্যা করেছে—লুণ্ঠন করেছে নগরী। চলছে অবাধ হত্যা। রক্তনদীতে স্নান করে নিজেদের ধ্বংসের কবলে আশ্রয় দিয়ে বেল সাজার আর ব্যবিলনের নাগরিকরা নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো।

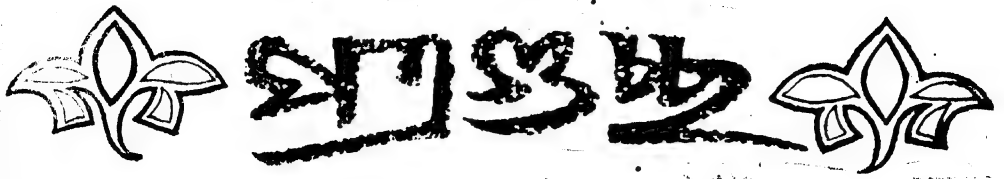
পারস্যবাসীরা ব্যবিলন থেকে যা নিয়ে গেছে তার হয় তো কিছুই নেই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়েছে ব্যবিলনের প্রথম দিকের নৃপতিদের তৈরি সমাজ বন্ধনের উপায়—সেই আইনগুলি।

এখনও ঐতিহাসিকগণ বা ভ্রমণকারীরা জ্যোৎস্নারাতে নির্জন সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে 'মারহুক' আর হামুয়াবির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যেন অক্ষুটস্বরে স্তনতে পায়, যেখানে আইন নেই, যেখানে আইনের বর্ষা প্রয়োগ নেই—সেখানকার ধ্বংস মৃত্যুর মতই অনিবার্য। পৃথিবীতে ক্রমাগত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকদের সেদিকে খেয়াল নেই। তারা প্রাচীনকালের প্রাপ্ত জিনিসগুলি পরীক্ষা করে চলছে, মাহুব যেমন পিতা বা পিতামহদের অনাবিষ্কৃত কীর্তি-কাহিনী স্তনতে পেলো উল্লসিত হয় তেমনি প্রাচীনকালের কোন কিছুই মধ্যে প্রগতিশীলতার কোন সন্ধান পেলে এই সাধনায় নিমগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকদের আনন্দের আর গর্বে সীমা থাকে না। ব্যবিলন নিয়ে আজও পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নি। আরও কিছু পাবার আশায় ব্যবিলনের সবকিছু তর-তর করে অহুসন্ধান চলছে।

## শেকস্পীয়র প্রসংগে

কবিদিগের আশ্রয় কৌশল দেখ; তাহার। পরামর্শ করিয়া জলা ও মিরন্না চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন নাই, অথচ একজনে ট চিত্র প্রণীত করিলে যে রূপ হইত, ঠিক সেই রূপ হইয়াছে। একজনে দুইটি চিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার র-লক্ষণে ও মিরন্নার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি তেনে যে শকুন্তলা সমাজপ্রভু সত্যসম্পন্ন, লজ্জাশীলা, অতএব ায় প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; । মিরন্না সত্যসম্পূর্ণ, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব ার প্রণয়-লক্ষণ থাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত হইবে। পৃথক পৃথক : প্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।—বখন ওখেলো ৭ রাক্ষসের জার নিশীথ-ব্যাশারিনি সুপ্তা হুম্বরীর সমুখে 'বধ ব' বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দসুহিমোনা কেবল বলিলেন, তবে । আমাকে রক্ষা করুন। বখন দসুহিমোনা, মরণভর

নিতান্ত ভীতা হইয়া এক দিনের জন্ত, এক রাত্রির জন্ত, এক মুহূর্তের জন্ত জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মৃত তাহাও স্তনিল না—তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালে বখন ইমিলিয়া আসির তাঁহাকে মুমুর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কার্য কে করিল' তখনও দসুহিমোনা বলিলেন, 'কেহ না আমি নিজে। চলিলাম। আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।' শকুন্তলা অর্থে 'মিরন্না', অর্থে 'দসুহিমোনা'। পরিণীতা শকুন্তলা দসুহিমোনার অমুরূপিনী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্নার অমুরূপিনী। সাগরবৎ সেকস্পীয়রের এই অল্পম নাটক, ক্রমোন্নতি বিলাস তরঙ্গমালার সংস্কৃত; দুঃস্বপ্ন রাগ ঘেব ঈর্ষাদি বাত্যাৱ সস্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুঃস্বপ্ন কোলাহল, বিলাস উর্মিমাল—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার চার, ইহার রক্তরাজি, ইহার মুহু গীত—সাহিত্যসংসারে তুল'ভ। [ ১৮৮৭ ] —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



## দেশগৌরব সূভাষচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

অগ্রজ দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

(শেষাংশ)

বাংলা সরকার এবং আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন।

আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা কনফারেন্স যোগদান কংগ্রেস জগা এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্বাচনে একজন সভাপন-প্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করবার জগা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের যেকোনো হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সঠিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কাংরে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কনফারেন্সের সময় কলিকাতায় আড়দারদিগের ধর্মঘটের সম্মাননা তওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জগাও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্যন্ত আমি যাত্রা করিয়াছি তাত্রা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার প্রত্নপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলি, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিস্টার মোবারকী একটি বিষয় বিশেষ স্মরণহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমি নির্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতৃমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়ও তাঁহাদের সঠিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টসাধ্য। প্রচেষ্টার লোকের তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সঠিত বিরূপ গভীর রেহের বন্ধন আঁড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অসম্ভবমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্তই সরকার এইরূপ স্মরণহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয় নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে বিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে,

সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি কষ্ট পাইরাছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রকৃতি আমাদানী, সরকারী কর্মচারী হওয়া প্রকৃতি বড়গতের অভিব্যাপ্তি আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে আমি নির্দোষ। আমার বিশ্বাস পরলোকগত শ্রম এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা শ্রম জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জগা ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সম্ভাব্যজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাংলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জগা বা আমার গৃহাধি বন্ধার জন্ত কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই।

ঐ বিষয়ে আমি বড়সাঁটের নিকট আবেদন করিলে বাংলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে যোগাইতে হইবে। এ কিরূপ মুক্তি সহজ প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আমার বিরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অস্ত্রত সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জগা আমার স্বাস্থ্যহানি হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবে না? ইউরোপে যতদিন সন্তোষাঙ্গা পুনঃপ্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপে বাইবার পূর্ব আমাকে একবার বাড়ি যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনাবাধার দেশে ক্ষমিত দিতেন, তাহা হইলে এই দান সন্দেহতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবারকী বলিয়াছেন, সরকার ও সূভাষচন্দ্র উভয়েই বুদ্ধিতে পারিতেন যে, অর্ডিনাল আইনের কার্যকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকার সূভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবারকীর সঠিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনাল আইনের কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা বহুই লাকালারি কর্তৃক না কেন বা শাসন পরিষদের সম্মতভাবে সরকারের ব্যয় না-মঞ্জুর করেন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা

করিলে আমাদিগকে ব্যবস্থাক্ষেত্র আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাছেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মজুমদার আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈবাস্তবগামী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি মৈত্রাগ্রহণী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অন্তর্ভুক্তি বড় করিয়া দেখি। বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মঙ্গল ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু তথ্যশি আমি মান স্থির করিয়াছি, সম্মুখীন হইতে চিরকালের জগৎ নির্বাসন আপেক্ষা জেলে থাকিয়া মুক্তকে বরণ করাষ্ট শ্রেয়। এই অন্তত ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, ক'র দাঁত আমা বিশ্বাস করি:—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে বাহা কি বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বিচারি। আমার মুক্তির সভাবনা সুদূরপর্যন্ত বলিয়া কেহ মনে ধুঁকিতে না হয়। পিতামাতার ক্রোধাপেক্ষা আধিক। সে জগৎ ক্রীড়াদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মুখীনভাবে অনেক বড় সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজেকে শাস্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নিরীকারভাবে সকল অপরিবারীক সম্মুখীন হইবার জগৎ প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কুতূহলের জগৎ আমা প্রেরিত করিতেছে—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের ভাবধারা জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না। ভবিষ্যৎ বাস্তবগণ আমাদের প্রিয় বন্ধনীর উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া কাল কাটাতে পারিব।

অমুগ্ধ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন।

ইতি—

(ঈংরাষ্ট্র হইতে অনূদিত)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখিত

The Union Society  
Cambridge.

২৪ মাৰ্চ, ১৯২১

কথাম পুস্তক দিবেন।

কংগ্রেসের পূর্বে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছি—দাশা করি বহুসংখ্যক তাহা পাঠিয়াছেন।

আপনি বেশ চর ভ্রমের স্বামী হইবেন যে, আমি ঢাকার ছাত্র সমাজ একতরফী কর্তৃক হঠাৎ আঁকি। আমি কি কি বাস্তব জগৎ উপস্থাপন হইতে পারি তাহা আপনাকে পূর্ণপাঠ্য জ্ঞানইহা দিবে দেশে এমন কি বকম কাজের সুবিধা আছে তাহা এখন হইতে ভাল বুঝতে পারিতেছি না। আপনারা এখন কমপক্ষে ত্রয়োদশ আছেন—তাঁহা আপনারা খুব ভালরকম জানেন কি বকম কাজের সুবিধা এখন আছে এবং এখন কি বকম কমিউনিস্টের দরকার।

আমার এই অনুরোধ যে, যে পত্র আমা ঢাকার ছাত্রের খবর না

পাঠিতেছেন সে পত্রই যেন এ বিষয় কাগজেও কিছু না বলেন। ঢাকার ছাত্রেরা আমি জুন মাসের শেষ দেশে ফিরিতে ইচ্ছা করি এবং বাক্স সময় মত Passage পাই। দেশে 'চা'ল কি বকম কাজ হইতে পারি তাহা জানিবার জগৎ উৎসাহ আছে—কারণ মনটাকে সেভাবে প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। তা ছাড়া দেশে গিয়ে যে বকম কাজ আবস্ত করিব, তদুপযোগী সেখানকার খাতিয়ে কাজও সম্ভব। আশা করি, আপনি যত শীঘ্র পারেন এ বিষয়ে একটা উত্তর দিবেন।

আমার নিজের বক্তব্য মতলব মনে আসিতেছে—আপনাকে তাহা ক'রিতেছি।

(১) 'জাতীয় কলেজে' আমি শিক্ষকতা করিতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র আমার ব্যক্তিগত পড়া আছে।

(২) আপনারা যদি কোন দৈনিক খবরের কাগজ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি Sub-Editorial Staff-এ কাজ করিতে পারি।

(৩) আপনারা যদি 'কংগ্রেসের' সেক্রেটারি একটি Research Department বলেন, তাহা হইলে আমি তাহাতেও কাজ করিতে পারি। আমার গত পাবে আমি এসব কাজে পানিকটা লিখিয়াছি। আমার মনে হয়, একদল Research-Students আমাদেব চাই। তাহারা জাতীয় জীবনের এক একটা মতলব লইয়া সেই সংক্রান্ত facts সংগ্রহ করেন। কংগ্রেসের একটি Committee নিযুক্ত করিবে—এই Committee সেই সব facts বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে কংগ্রেসের একটি policy ঠিক করিবে।

Currency and Exchange সংক্রান্ত আমাদেব Congress-এর কোন fixed policy নাই তারপর Labour and Factory Legislation সংক্রান্ত কংগ্রেসের কোন fixed policy নাই। তারপর Vagrancy and poor Relief সংক্রান্ত আমাদেব কংগ্রেসের কোন fixed Policy নাই, তারপর 'স্বাভা' পাইলে আমাদেব Constitution ঠিক বকম হইবে সে সংক্রান্ত বাস্তব কংগ্রেসের কোন fixed policy নাই। আমার নিজের মনে হয় যে, Congress League Scheme একবারে পুড়ান হইতে পারে। স্বাভাবিক ভিত্তির উপর আমাদেব এখন ভারতের Constitution ইংরাজী করিতে চাই।

আপনি তরঙ্গ বলিতে পারেন যে Congress এখন existing order ভিত্তিতে বাস্তব স্তরগত ভাঙার কার্য সম্পূর্ণ না হইলে constructive কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব কিন্তু আমার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের যেকোন সমগ্রা সংক্রান্ত একটা policy ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা চাই। সুতরাং এখন থেকেই গবেষণা আরম্ভ কর দরকার। কংগ্রেসের complete programme প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমা 'স্বাভা' পাইব সেদিন কোন বিষয়ে কোন policy-র জগৎ আমাদেব ভাবিতে হইবে না।

তারপর কংগ্রেসের একটি Intelligence Department চাই—যখানে দেশের সব খবর পাওয়া যেতে পারে। এই

**পত্রিকাক**

**Department** থেকে ছোট ছোট স্ট্র প্রকাশ করা হয়। এক একটা বইতে এক একটা বিষয় থাকে। যথা—গত দশ বৎসরের মধ্যে কত কল্ল এবং কত মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন কোন বোগ কত মৃত্যু হইয়াছে।

জারপত্র, গত দশ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব (Revenue and Expenditure) বক্ত হইয়াছে—কোন কোন দিক থেকে দশ হইয়াছে—এবং কোন কোন বিষয় ব্যয় হইয়াছে জানা আবং এতটা বস্তু প্রকাশ হইবে। এইরূপে আমাদেব জাতীয় জীবনের সব দিককার খবর ক্ষুদ্র পুস্তাকের ভিতর দিয়া দেশময় প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জনসংস্কারের ইচ্ছা 'সকল শ্রমিকের দিক দিয়া ব্যয় করিবার অনেক সুবিধা আছে। এই ব্যক্তের সঙ্গে Co-Operative Banks প্রতিষ্ঠা করিয়া যাক।

(৫) Social Service.

আমাদের নিজের মনে চাচ্ছি যে, কত বিষয়ের কাজ করিবার সুবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে বিস্ময়ান্বিত করিতে হইবে, আপনি আমাকে কোন বিস্ময়ান্বিত করেন। আর শিক্ষকতা এক Journalism যেমন হয় আমাদেব মানব মূল্য কত হইবে। এই নিয়ে আমি এখন আরম্ভ করিতে পারি তারপর সুবিধামত মজা কাজেও হাত দিতে পারি। আমাদেব পত্রিকার পাতা মানব সমাজের হৃদয় বহা, সুতরাং যেমন সমাজ আমি কিছু বলি না, পাঠক-পাঠিকা চাইলেই আমাদেব সমাজ হইবে।

আমি যদি বন্ধুত্বপূর্ণ হইতাম কাক নামান্ত পারি, তত্বে হইলে আমাদেব বিশ্বাস, আমি আমাদেব সঙ্গে এগানকার দুই-একজন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই কাজে জানিতে পারি।

স্বদেশ সেবার সমাজসংস্কার আন্দোলন চাচ্ছি আপনি তাহাও বক্তব্যের প্রদান পুরোচিত। আমাদেব সমাজ বক্তব্য আমি তাহা শেষ করিছি—এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে স্থান দিন।

আমি চাইব যে 'জিগলে' এখানে পাঠককে জিজ্ঞাসা করিবে আমি দেশে কিরূপে কাজ করি। সুতরাং নিজের সমাজের জন্য এবং পাঠকদের জন্য Self Justification-এর জন্য আমি জানিতে উৎসুক আপনি আমাকে কি কাজ দিতে পারেন।

আমি কহি আপনি এসব কথা আপনাদের গোপন রাখিবেন।

আপনি আমাদেব প্রণাম জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ

অন্ধ্রো বাসন্তী দেবীকে লিখিত

Censored and Passed Mandalay Jail  
C/O D. I. G., I. B. C. I. D.  
1/2/26  
for D. I. G., I. B. C. I. D. 13, Elysium Row  
Bengal (Calcutta)  
23.1.26.

শ্রীচরণ—

হা. অনেকদিন ধাবং আপনাদের কোনও খবর পাই নাই। দুই-তিনদিন পূর্বে মেজলাসের পত্র আপনাদের খবর পেলাম। অনেকদিন থেকে আপনাকে পত্র দিবার ইচ্ছা হচ্ছে—উত্তর পার্শ্বের জন্য মনে—যদিও উত্তর পেলে ব্যর্থ হইবে নাই সুখ হইবে। পত্রটা লিখলে হয় তো মনটা

চাচ্ছি। হা—এই কল। কিছুদিন পূর্বে আপনাদের খবর পাবার জন্য মিঃ হালদারকে পর দিই। তিনি উত্তর দেন কিন্তু আমায় দুর্ভাগ্য, সে পত্র পুঙ্খিল কর্তৃক আটক হয়। জানি না আপনাদের খবর পাবার জন্য আমার মনে কেন উদ্ভিগ্ন হয়।

মধ্যে আমার ইচ্ছা হেরেছিল সরকারের নিকট কোনো দরখাস্ত দিই আপনাদের সঠিক একবার দেখা করার ভ্রমুয়তির মজা। রক্তবন্দনের মধ্যে কাছাকাছের সঠিক দেখা বরাত পেতে হইবে—এমন কি পাঁচ-সাত দিন পর্যন্ত বাড়তে থেকে আসতে পারি। কিন্তু নেবে দখলুয় দরখাস্ত কর কোনও লাম নাটী কারণ সে সৌভাগ্য আমাদেব ভাগ্যে ঘটিব বল ভরসা হয় না। প্রার্থনা করাই সার হবে—আর লাভের মধ্যে অনেক আরও উপস্থি করা হবে এবং বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অর্থহীন অপত্তি করা হবে। তাই অনেক চিন্তার পর দরখাস্ত করার মনে থেকে দূর করি।

আপনাদের শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ হইতে খুব চিন্তিত হয়েছি। কি কবি আমরা এত নিঃসহায় যে, কিছুই করিতে পারি নাই। আমাদেব বঙ্গাল যে কি আছে তাহাও জানি না। কত কথা বলতে ইচ্ছা করে—কত কথা বলবার আছে—কিন্তু বলবার সময় এখনও আসে নাই। এ পত্রও অনেক বিধার পর লিখিতে বসিছি—কারণ এ পত্র অনেক হাত দিয়ে যাবে।

সবকালেই কল্যাণের নিকট আপনাদের স্বামী পাঠ করলাম। এই কল্যাণের পাঠের পরেই বক্তব্যের মধ্যে আমাদেব স্তম্ভিত হইতে কি জন্য আমি কহিতে চাই বক্তব্যে পারি না। নিজের পর্যন্ত-প্রমাণ বিপদ ও দুঃখবিশিষ্ট হইলে মনে পড়বে কল্যাণের স্তম্ভিত হইতে এতটুকু না হইবে পারি না। কল্যাণের স্তম্ভিত হইতে এতটুকু না হইবে আমি বক্তব্যে হইতে এবং বক্তব্যের জ্ঞানাত্মক—বক্তব্যের বক্তব্যের প্রকাশের প্রয়োজন নাই। কারণ বক্তব্যের প্রকাশের মূল সম্বন্ধ এমত। এত বক্তব্যের পরেই আমি পেলে আপনাদের দরখাস্ত আমাকে 'ম' বলে সাংস্থান করবে কন? বাক্যে মা বলা হয়, তাহাকে কি বক্তব্যের জ্ঞানাত্মক? মন্তব্য প্রাণ যদি সমাজের মূল্য হইতে তবে কাক প্রাণ কীভাবে? বক্তব্যের জ্ঞানাত্মক কি মন্তব্য-সমাজের পত্র সম্বন্ধে অপমান করা হয় না? আশা করি আপনাদের সকল শোক ও বিপদের মধ্যে আপনি ভুলিবেন না। বাস্তব কত সম্বন্ধ আপনাকে 'ম' হইতে থাকে। তত তো একথা মনে পড়লে আপনি কিছু সাহস পাতে পারেন। তাহা নিঃসহায় ও নিঃসহায় হলেও আপনাদের বিপদকে তারা নিজের বিপদ বলে মনে করে নিচ্ছে।

আজ আপনাদের বৈধ ও সঠিকতা আপনাদের দেশবাসীকে—আমাদের সকলকে—বৈধ ও সঠিকতার শিক্ষা দিচ্ছে। আপনি যদি এত সঠিক পারেন, আমরা কি তার কিয়দংশও সঠিক পারি না? আশীর্বাদ কর—এত বড় বিপদ আমাকে না বেন—যেন সঙ্গে সঙ্গে সহ্য করার শক্তি আসে। ভগবানের কৃপায় আজ পর্যন্ত এই শক্তি পেয়ে আসি—চিরকাল যেন এই শক্তি পাই। এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার কীভাবে আর নাই। আজ তবে আসি মা।

আর কি লিখি? কি লিখিতে কি লিখি? আমি না।  
Srijukta Basanti Devi  
C/O Mr. Justice P R Das.  
Patna  
ইতি—  
আপনাদের সন্তক  
শ্রীমদ্রবীন্দ্র

বসন্তী : বৈশাখ '২৬

## স্বর্ণা বিচারিত বসুকে লিখিত

শ্রীশ্রীশ্রী সত্য

মাম্বালয় জেল

৭।৮।২৫

পুল্লীয়া মেজদাদিদি,

আমি অনেকদিন হ'ল আপনাকে কোনও পত্র দিই নাই। এ-সপ্তাহে মেজদাদাকে লেখবার মত কিছু নাই তাই আপনাকে লিখতে বসেছি। আপনাকে কাজের সখ্যে লেখবার প্রয়োজন নাই তাই স্বতন্ত্র সখ্যে লিখব।

আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে—মহাভাবে গুণ দত্তাৎ। অর্থাৎ যেখানে মধুর অভাব, সেখানে গুণ দিয়ে মধুর কাজ সারা উচিত, তাই ছোট ছেলেপুলের অভাব এখানে বেড়ালছানা দিয়ে মোটান হয়। আমি ছোট ছেলেমেয়ে খুব পছন্দ করি; কিন্তু বেড়ালছানা আমার ভাল লাগে না—বিশেষত যেখানে সব কইটা বেড়ালই বদরঙের। তা' আমার কথা কেহ শুনতে চায় না। আমাদের মধ্যে কেত কেত বেড়াল ভালবাসে—আর যে সব গরীব কয়েদীরা আমাদের গৃহস্থালীর কাজ করে, তারাও বেড়াল ও বেড়ালছানাকে ভালবাসে। এই সব লোকের বেড়াল-প্রীতির ফলে এখানে বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখানে বেড়াল সবচেয়ে ভালবাসে যে লোকটি মেথরের কাজ করে—তাকে সবাই 'ময়লা-লু' বলে, তার আসল নাম 'লবানা'। আর ময়লা সাফা করে বলে তার নাম সবাই রেখেছে 'ময়লালু'—বনী ভাষার 'লু' মানে 'লোক' বা 'মাছুষ'। সে ময়লা সাফা করে, অতএব তার নাম 'ময়লালু'। 'ময়লালু' কথাটা ভাল লাগে না বলে 'ময়লালু'—তার থেকে তার ভাল নাম পাড়িয়ে গেছে 'ময়র'। আমাদের 'ময়র' যখন ধোর—তখন তার মাথার কাছে বেড়াল, বুকের উপর বেড়াল, পায়ের কাছে বেড়াল। চতুর্দিকে বেড়ালের পরিবারের'বারা পরিবৃত্ত হয়ে সে ঘুরে। নিজের খাবারের অংশ থেকে সে খাবার বাঁচিয়ে বেড়ালকে খাওয়ায়—আর আমাদের কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে বেড়ালছানাকে দুধ খাওয়ায়। আর সে যখন একবার তু বলে ডাক দেয়, রাজ্যের বেড়াল তার কাছে ছুটে আসে। ইতি বেড়াল কাহিনী সমাপ্ত।

আমাদের গৃহস্থালী নেহাৎ ছোট নয়। পরিবারের সংখ্যা নয়জন। তবে বলা বাহুল্য যে, সকলেই পুঙ্খ। চাকর-টাকর নিয়ে মোট বিশ জনেই বেশি বৈ কম নয়। জেলের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র জেলে আমরা বাস করি। এখানকার লোকেরা কি বাবু কি চাকর—জেলের অজ্ঞাত কয়েদীদের সঙ্গে মিশতে পায় না। আমাদের সসায়ের মধ্যে বাবুর্চী, হালালী, মেথর, খাড়া'র ইত্যাদি সব বকম লোক আছে। বসন্তবাক্সি ছাড়া এই ক্ষুদ্র জেলের মধ্যে রাসাবার, পুকুর, খেলবার জন্ত টেনিসকোর্ট প্রভৃতি আছে। স্নানের ঘর গত চার মাস ধরে তৈরি হচ্ছে কবে তৈরি শেষ হবে তা ভীষণমান ভিন্ন আর কেউ বোধ হয় বলতে পারে না।

বৃহত্তই পারছেন যে, এই বৃহৎ সসায়ের সকলই কয়েদী—কেহ চণ্ডপ্রাণ কয়েদী, আর কেহ আমার মত বিনা বিচারে সরকারের হুকুমে কয়েদী। আপনারা চোর-ডাকাতের নাম শুনে বোধ হয় নাক সিঁটকান, কিন্তু এখন জেলের কয়েদীদের উপর আমার আর ঘৃণা

ভাব নাই। এদের মধ্যে অনেকে বিশদে পাড়ে অথবা বাধ্য হয়ে অস্ত্রায় করে এবং অনেকেই বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আছে এবং ভাল অবস্থার পড়ল তারা যে ভাল হাত পারে, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে বলে—'গৃহীণী গৃহং উচ্যতে' অর্থাৎ গৃহীণী না থাকলে গৃহ না কি গৃহই নয়। আমাদের এখানে গৃহ আছে, কিন্তু গৃহীণী নাই। গৃহীণীর অভাবে আমাদের একজন ম্যানেজারবাবু নিযুক্ত করা হয়েছে—বলা বাহুল্য যে, ম্যানেজারবাবু আমাদের মত একজন বিনা শিচায়ে কয়েদী। তিনি হিসাবপত্র রাখেন; দৈনিক বাজারের কর্ণ তৈরি করে দেন এবং গৃহস্থালীর কাজ সবক্ষেত্রে তিনি সর্বেস্বর্গ্য; আমাদের এই বিশাল সংসার তাঁর অঙ্গুশিচালনার চলে। খাওয়া-পায়ের জন্ত তাঁকে আমরা দায়ী করি এবং খাওয়া খাবার হলে তাঁকে গালাগালি দিতে ছাড়ি না। আমাদের এই সসায়ের নাম রাখা হয়েছে—অমুক বাবুর হোটেল।

এখানকার খাওয়া-দাওয়া সাধারণত মন্দ নয়—তবে আজ কয়েকদিন হ'ল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোল বেঁধেছে। ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে, তা এখন বুঝতে পারছি না। বাঙ্গালীর মিঠার লাগে এখানে জিনিষপত্র মন্দ পাওয়া যায় না—তবে জিনিষপত্রের নাম বড় বেশি। ম্যানেজারবাবুর কুপার এখানে আমাদের উঠানের এককোণে মৃগীশালা খোলা হয়েছে—এই ঘরের মধ্যে কতকগুলি মোরগ ও মৃগী স্থান পেয়েছে। সকল সন্ধ্যা এই সব পক্ষবিশিষ্ট জীবের 'কঙ্কর কো' শব্দে আমি অস্তির হয়ে উঠি—কিন্তু এই মধুর রব না শুনে ম্যানেজারবাবুর না কি ঘুম হয় না।

উঠানের মধ্যে একটা ছোট পুকুর আছে। তাতে আমাদের নাক পর্যন্ত জল ধরে। সেই পুকুরের জল পরিষ্কার থাকলে আমরা লক্ষ্যবন্দ করে একটু সাঁতার কাটবার চেষ্টা করি। অবশ্য বেখানে ডোববার ভয় নাই—সেখানে সাঁতার ভাল হয় না। কিন্তু আমি গোড়ার বলেছি, মধুর অভাবে লোক গুণ্ড খায়—আমরাও নদীর অভাবে বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিয়ে মনকে প্রবোধ দিই।

ম্যানেজারবাবুর চেষ্টায় এই উঠানের মধ্যে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। তবে তার মধ্যে গন্ধহীন সূর্যবুখী ফুলট বেশি, এ-রাজ্যে সুগন্ধি ফুল পাওয়া সহজ নয়। জামি না এটা দেশের গুণ কি জেলের গুণ। জেলের মধ্যে যে সব রজনীগন্ধা ফুল ফোটে সেগুলোই সুগন্ধি নাই বলে মনে হয়।

আমার কাহিনী আজ এখানেই অসমাপ্ত রাখতে হবে—তা না হলে এ সপ্তাহের ডাক বাবে না। কাহিনী সকলকে পাড়ে শোনাবেন, মেজদাদাকেও। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়িতে পত্র দিই। যদি কোনও সপ্তাহে আমার পত্র না পান তবে এখানকার সুপারিন্ট্যান্ডেন্টকে পত্র বা টেলিগ্রাম দিয়ে আমার খবর নেবেন।

আপনারা সকলে কেমন আছেন—এবং আমার কাহিনী ভাল লাগল কি না জানাবেন। যদি ভাল লাগে তা হলে আমি আরও লিখতে পারি। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি—

সত্য

[এম সি সত্যের প্রাণ সল প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিশিরসুয়ার বস্ত্র কর্তৃক সরলিত হুজুখজর বহর পত্রাবলী হইতে মুদ্রিত]

## অজিত দত্ত

[প্রথিতযশা কবি, বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক]

বাঙলা কাবোর রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষুদ্রদায়িত্ব পালনে ঐরা পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গ হাত মিলিয়েছেন লক্ষপ্রতিষ্ঠ কবি ও বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতী অজিত দত্ত তাঁদেরই পঞ্জিতে স্থানাদিকাগী।

বিক্রমপুরে আদি নিবাস। পিতামহ স্বর্গত বার চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর ছিলেন একজন যশস্বী ও স্বনামধন্য পুরুষ। বাবা স্বর্গত অতুলকুমার দত্তকে মাত্র চার বছর বয়সে অজিত দত্ত হারান। পিতামহের স্নেহছায়া পিতৃহীন শিশুর মনে সান্নিধ্য প্রদেয় এনে দেয়। ৬ই আশ্বিন ১৩১৪ (২৩শ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) কবি অজিত দত্তের জন্ম।

ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ১৯২৪ সালে। ১৯২৬ সালে কৃতিত্ব অর্জন করলেন আই-এ পরীক্ষাতেও। কলকাতায় এলেন বি-এ পড়তে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বিভাগগত কলেজে বি-এ পড়তে থাকেন। তারপর পারিবারিক জীবনে ঘনিষ্ঠ এল ঘন দুর্ভোগ। অগ্রজ হাশেম লোকান্তরিত (১৯২৬), ঢাকার ফিরে যেতে হল বেদনাবিহীন অমৃতকে। মা শোকে নিশাতারা। পারিবারিক অনেক দায়িত্ব এসে গেল উনিশ বছরের সন্তানবয়সে আশাবাদী এক ক্ষুদ্রনামুখ তরুণের উপর। কলকাতায় পড়ার বাসনা ত্যাগ করতে হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও বাঙলার অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হলেন বি-এ পরীক্ষায় (১৯২৯), পরের বছর ঐ বিষয়েই স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও হলেন সমুত্তীর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন নিয়ম ছিল যে, অনার্স নিলে বি-এ পড়তে হবে তিন বছর, আর এম-এ এক বছর। আসলে পাঠ্য সময় একই ছিল তাই ১৯৩০ সালেই তিনি অর্জন করলেন এম-এ উপাধি। ডঃ শ্রীচরণ গোেলন বিদেশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অল্পপস্থিতিতে তাঁর শৃঙ্গ আসনে মাত্র তিন মাসের মধ্য অস্থায়ীভাবে অভিযুক্ত হলেন অজিত দত্ত। সাহিত্যবোধী স্বর্গীয় পাঁচকড়ি কল্যাণাধ্যায়ের সম্পাদনকৃত 'নায়ক'-এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন স্বর্গীয় কুমার কান্তিক মল্লিক। নায়কের নব রূপায়ণের জন্য তাঁর দিক থেকে ডাক এল। নবরূপায়িত নায়কের সম্পাদনভার গ্রহণ করলেন কবি অজিত দত্ত এবং স্বর্গত সাংবাদিক অমূল্যচন্দ্র সেন। ১৯৩২ সালে তিনি যুক্ত হলেন রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজিয়েট স্কুলে বাঙলাভাষার প্রধান শিক্ষক হিসাবে। বিদ্যালয় থেকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সমালীন করলেন অধ্যাপকের আসনে তাঁদের মহাবিদ্যালয়ে।

তারপর কর্মজীবনে পথ পরিবর্তনের সময় এল। শিক্ষাজগৎ থেকে জিরে এল জগতে। ইন্ট্রিয়ন টি সেস কমিটির প্রচারবিভাগে যোগ দিলেন। ১৯৪৪ পর্যন্ত সেখানে যুক্ত ছিলেন। তারপর প্রচার-অধিকর্তা হলেন ক্যালকাটা জাদুনালা ব্যাঙ্কের। আয়ুমানিক ১৯৪৯ সালে নিগন্ত পাবলিশার্স-এর তিনি পুনঃ করলেন। তাঁর পরিচালনার প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি বহুই সাফল্য এবং জনম অর্জন করেছিল। আজকের দিনে বহু জনপ্রিয় পত্রিকার প্রথম গ্রন্থ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়। হরিনারায়ণ চন্দ্রপাণ্ডায়ের ইয়াবতী, সত্যোবকুমার ঘোষের কিছু গোয়ালার গদী,



স্বর্গীয়জন মুখোপাধ্যায়ের অমৃত নগর প্রভৃতি পাঠক সমাদৃত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের গৌরব এই প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত। নিগন্ত পাবলিশার্স থেকে একটি করে সুপাঠ্য এবং কচিশোভন বাবিকীও প্রকাশিত হোত।

আবার আহবান এল শিক্ষাজগৎ থেকে। শক্তিম্যান কবিকে চাইল শিক্ষাজগৎ দেশের শিক্ষাধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে। ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত হলেন চন্দ্রনগরের সরকারী কলেজে, সেখান থেকে বদলী হলেন বারাসতে, সেখান থেকে এলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯৫৬ সালে যোগ দিলেন বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর আজ আই বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, আজও তিনি সগৌরবে সেখানে অধিষ্ঠিত।

জীবনের প্রথম পর্বেই সাহিত্যের মত্তে তিনি দীক্ষিত। সরস্বতীর আরাধনা তাঁর শুরু হয়েছে জীবনের বোধনলগ্ন থেকে, কিন্তু আজও সে সাধনার বিরতি নেই, আর সেই একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বাঙলার কাব্যলোক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে জাতির রসপিপাসু অন্তরের সঞ্চয় বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বৃদ্ধদের বয়স সঙ্গ বৃদ্ধদের বন্ধনও ছেলেবেলা থেকে। ছাত্রজীবনেই বই বন্ধ সম্পাদনা করতেন 'প্রগতি' নামক পত্রিকাটি। আই-এ পড়ার সময় তাঁর চেয়ে এক বছরের পূর্বসূরী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৩০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুমুমের মাস' প্রকাশিত হল। পাতাল কন্ঠা, নষ্ট চাঁদ, পুনর্মহা, ছাগার আলপনা, জানালা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁর স্বজনীশক্তির এক-একটি অসামান্য নিদর্শন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মন পূর্বনের নাও নামক রম্যরচনা গ্রন্থ দুটির প্রণেতা তিনি। বাঙলা সাহিত্যে হান্তময় নামক গ্রন্থটিও কখন নিজেই তাঁর বলিষ্ঠ বন্ধনী থেকে। তাঁর কবিতা-বলী একটি সম্বলন বর্তমানে ভাষ্যপ্রকাশের দিন গুণছে।

কবি অজিত দত্তের পুরা নাম অজিতকুমার দত্ত। নামের মধ্যম বর্ধন করা বা নামকে সংক্ষিপ্ত করার পক্ষপাতী তিনি নন কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে 'অজিতকুমার দত্ত' নামের আর একজন লেখকের আবির্ভাব ঘটায়—নাম-সমস্তার সমাধান স্বরূপ নামের মধ্যম বর্ধন করতে তিনি বাধ্য হন—তবে তা শুধু সাহিত্য-ক্ষেত্রেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি তাঁর চিরকালের আদর্শই অনুসরণ করে চলেছেন।

## প্রমোদকুমার সেন

[গ্রামোফোন শিল্পের প্রসারের ইতিহাসে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব]

যাঁদের বংশে নেতৃত্ব এবং সৃষ্টি পারচালনা দেশের গ্রামোফোন-শিল্পকে সমৃদ্ধ শিখরপ্রাপ্তে উপনীত করেছে সেই তালিকার শ্রীপ্রমোদকুমার সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এ দেশে গ্রামোফোন শিল্পের অগ্রগতি ও প্রসারে তাঁর অভিনবনীর প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

আদি নিবাস বিক্রমপুর। কল্যাণ শিল্প। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্ম। প্রমোদকুমারের যখন দু' বছর বয়সে সেই সময়ে পিতৃদেব ব্রজেননাথ সেন বদলা হয়ে যান লাহোরে। সিনলায় বাণ্যকালান বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করেন তিনি। প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন লাহোর থেকে। আত্মশিক্ষা ১৯২৮ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় হন সম্মানে উত্তীর্ণ।

তারপর তৎকালীন নরেন্দ্রবংশের পরিসংখ্যান বিভাগে এবং ডেরাহুনের একটি স্থপার মিলের সঙ্গে কিছুকাল কর্মজীবন থেকে ১৯৩৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীতে (বিক্রয় বিভাগ) যোগ দিলেন। ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে রেকর্ডিং-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। হিন্দী বেকার্ড-এর ভার নিলেন ১৯৪১ সালে। কল্যাণ শাখার দিল্লী-ম্যানেজার হয়ে দিল্লী গেলেন ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৯ সালের শেষভাগে বদলা হলেন বোম্বাইয়ে কল্যাণের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হয়ে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বদলা হয়ে এলেন কলকাতায়। গ্রহণ করলেন ব্যবসায় রেকর্ডিং-এর ভার—তদুপরি সর্বভারতীয় এলাকার কল্যাণের সোসাইটি ম্যানেজারের দায়িত্বের ভার উপরেই হস্ত হ'ল। ১৯৫৪ সালের প্রারম্ভে তিনি বদলী হলেন দমনমে এক্সপোর্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভারপ্রাপ্ত হয়ে। রেকর্ডিং এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিসাবে ব্যবসায় বেকার্ড সঙ্কলিত তার তাঁর প্রাতই অর্পিত হ'ল—সারা ভারতবর্ষ তাঁর কাজের এলাকা হিসাবে নির্দিষ্ট হ'ল।



প্রমোদকুমার সেন

এরপর তাঁর অধিকৃত পদের নামান্তর ঘটল, তার ফলে তিনি অতিষ্ঠ হতে থাকলেন এ গ্রাণ্ড আর (আর্টিস্ট গ্রাণ্ড বিশপটিয়ার) ম্যানেজার হিসাবে। কপিরাইট এবং রজালিট সঙ্কলিত কার্যগুলি এর লগ্নের থেকেই পরিচালিত হয়। বোম্বাই অস্ট্রিট ইউনিয়নে আই এল ও এবং বার্ন ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত ডিপ্লোম্যাটিক বনফায়েল ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্টর অফ ডি বেকার্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স, ব্রডকাস্টিং অরগানাইজেশনস এ্যাণ্ড আর্টিস্ট-এ যোগদান করেন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ডি ফোনোগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রী (লগুন) প্রতিনিধিরূপে (১৯৬০)। এই স্তর ধরে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লীতে অস্ট্রিট ইউনিয়নে এবং বার্ন ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে তিনি যোগ দেন। উক্ত ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ডি ফোনোগ্রাফিক ইণ্ডাস্ট্রীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে। এই সম্মেলনে লগুন আয়োজিত আগামী বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণও তিনি পেয়েছেন কিন্তু এ আমন্ত্রণ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেননি।

প্রথম ব্যবসায়িক দক্ষতা এবং প্রগতি শিল্পচর্চনার তাঁর মধ্যে এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর পরিচালনাধীনে গ্রামোফোন শিল্প সঙ্গীতপিপাসুদের অন্তর কাগর কাগর ভরিয়ে দেশের সংস্কৃতির মজিনা যে উত্তরোত্তর বিবর্তিত করে চলেছে সে সন্দেহে স্থানত হওয়া কোন অবকাশ থাকে না। ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের অমর গানগুলির প্রচলন এবং লজ প্রেরক বেকার্ডগুলির মাধ্যমে দেশবাসীর সংস্কৃতিক অভ্যুত্থানকে বহিত করে তোলার ক্ষেত্রে গ্রামোফোন বেকার্ডসের তথা শ্রীসেনের কৃতিত্ব এম গৌরবের ভূমিকা মুঠো মুঠো সাধুবাদ ও প্রশংসার নিঃসংশয় অধিকারী।

গ্রামোফোন বেকার্ডসের মাধ্যমে তিনি যেভাবে দেশবাসীর সংস্কৃতিক পিপাসা ভরিয়ে তুলে দেশবাসীকে উত্তরোত্তর সজীভূতচরিতন করে তুলেছেন—তা তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা এবং সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগেরই এক উৎকৃষ্ট পরিচায়ক।

## শিবানী ঘোষাল

[স্বনামধন্য সমাজসেবিকা]

বাংলাদেশের নবগঠনে এবং গৌরববর্ধন বিষয়বস্তিত

ঠাঁক পরিবারের দিগ্বিজয়ী পুরুষের মত কল্পনা অবদানদেয় গুরুত্ব অস্বীকার্য নয়। ঠাকুরবংশের একাধিক দুঃস্বপ্ন আপন আপন ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভা এবং শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন বা দিয়ে চলেছেন তা জাতের সত্ত্বের ক্ষেত্রে কতখানি সহায়তা করেছে তার মূল্যায়নের ভার ইতিহাসের। স্বর্ণকুমারী দেবী, ইন্দ্রা দেবী-চৌধুরাণী, লেডী প্রতিকা চৌধুরী, সুনন্দা দেবী, কবি লীলা দেবী, ডঃ বাণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই তালিকার এক-একটি স্মরণীয় নাম। বিশিষ্ট সমাজসেবিকা স্রীমতী শিবানী ঘোষাল সেই তালিকারই আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। সংসারধর্ম পালনরত একজন গৃহবধূর একক সাধনার এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার এক জন-কল্যাণধর্মী প্রবর্তন প্রতিষ্ঠান কিভাবে গড়ে উঠে, বিরাট বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যাপক প্রসারিত হয়ে বহু লাবারী জীবনে প্রতিষ্ঠা ঘটল,



বহু শিল্পের ভবিষ্যদের কল্পনার অঙ্গলবৃত্ত করে গিল—শিবানী ঘোষালের জীবন ভারী বিচিত্র ইতিহাস।

অমরকোটি স্ববাস্য বায়কানাতের বনাবস্থায় বৈমাত্রেয় অল্পজন্ম রক্তপ্রসূ উনবিংশ শতাব্দীতে জাত প্রথম স্রবণীয় বাঙালী পুণ্যলোক মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের পৌত্রের পৌত্র স্বর্গীয় অববিন্দনাথ ঠাকুর এবং প্রথম মহিলা চিত্রশিল্পী স্বর্গগতা সুনন্দনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া অমুজা দেবীর কন্যা শিবানী দেবীর জন্ম এই অক্সাণ ১৩২৪ (নভেম্বর ১৯১৭)।

বধাসময়ে বালাশিক্ষা শুরু হ'ল। তারপর একদিন মহারাজা রমানাথের ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদে এক মাঘের সন্ধ্যায় শাখ বেজে উঠল। উগ্ৰধ্বনি শোনা গেল, একটি তেতো বছরের মেয়ের জীবন চিরকালের মত জড়িয়ে গেল এক বাইশ বছরের তরুণের আনন্দ, বেদনা, ভাব, অমুজুতির তরঙ্গ-তরঙ্গ। ১৯৩০ সালের জামুয়ারী মাসে শিবানী দেবীর বিবাহ কলকাতা হ'ল আড়িয়দহের সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গাল পরিবারোক্ত এবং দানবীর স্বর্গীয় কালীচরণ ঠাকুরের অল্পতম দৌহিত্র-পুত্র জীথুজি অসিতকুমার ঘোষালের সঙ্গে। বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতে অবিখ্যাত ঘোষাল ভ্রাতৃত্ব অসিতকুমারের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।

তারপর একটানা কুড়ি বছর গৃহধর্মই পালন করে গেছেন শিবানী দেবী বাঙলা দেশের কল্যাণ কুলবধূর মত। অল্প বিরাট পরিবারের কন্যা এবং অভিজাত পরিবারের বধূ—তাই গৃহকর্মের কঁকে কঁকে অধ্যয়ন ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ছেদ অব্যক্ত কোনদিনই পাড়েনি, তবে ১৯৫০ সাল তাঁর জীবনে এমন দিন এক বিরাট পরিবর্তন, ঐ সময়ে তাঁর জীবনের গতি এক বৃহত্তর পটভূমির দিকে মোড় ফেরল। মধ্যমগ্রামে তাঁদের বাগানবাড়ি। ঐ সমস্ত বাগানে কিছুদিন বাস করেন। পল্লীর 'মঙ্গল শোভা', তার জামসমারোহ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যখন মনকে কাণ্ডাক্ষ কাণ্ডার ভায়ে দেয় আবার অন্যদিকে নিঃসঙ্গতার মৌ-বেদনা সমানভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রায় ঐমাত্র বয়সে বাগানল শিবানী দলী, প্রাচীণ সংসারের জীবনব্যয় খুঁটির দেখতে কাগলেন তাদের মূল, যেন অমুজুতির ভাণ্ডার হ'ল দিগ্গজ উপলব্ধি করত থাকলেন। তাঁর সন্ধানী চোখে তখন তাদের জীবনব্যবহা একটি নির্দিষ্ট আকর্ষণ ফুট উঠল। তিনি দেখলেন এরাও ২০ গুণের অধিকারী। এদের গুণগুলির স্বাধীন শিক্ষণ ফুটল এরাও যেমনই স্বাধীন, পার আবার সেই সঙ্গেই বহু সমস্যার সমাধান হয়, এক পরিবারের সমাধান করে। এর এবং বাগান ভারী এক প্রেমশীল আবেগের কবচেন (১৯৫১-৫৩)। এদেরই নিয়ে প্রকৃতি, কাকতালগনগর মহিলা শিক্ষাশিক্ষা মন্ত্রণার (১৯৫০), তার উদ্যোগে কলকাতা-দলীতন শিল্প-চর্চা-কর্ম; এই প্রাচীন গানের প্রাণ উদ্বেগই ছিল মেয়েদের স্বাধীন করে তোলা, জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের পিছনে না থেকে তারা বৈশ্ব পুরুষের পাশে স্থান পায় ভারী শক্তি সরবরাহ করা। প্রায় এক শতাব্দী মহিলা আজ এখানে শিল্পের বিলাস বিভিন্ন কাজ শিখিয়ে যাচ্ছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে এদের একটি পৃথক বিভাগ আছে। এতদ্ব্যতীত কীবা প্রকৃত, তাঁত বোনা এবং বুদ্ধি নির্বাণ প্রকৃতি কাকগুলিও নির্দিষ্ট শিক্ষণ সময়ে মধ্যে দেখানো হয়ে থাকে। বাঙলার আর্গিশল



শিবানী ঘোষাল

কাঁথার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ এই প্রতিষ্ঠানকে এককালীন দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রি এবং সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই প্রতিষ্ঠানকে পর্য্যাপ্য করে থাকেন। পরলোকগত জননন্দ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন ও তাঁর কাঁথাদলী ও পরিচালন পক্ষকে বিশেষভাবে প্রীত করে। বিরাট বিশাল এলাকা জুড়ে এর ক্ষতি। এর এই ব্যাপক উন্নতি ও আশাব্যক্তি সাফল্য শিবানী ঘোষালের অনন্ত সংগঠনপ্রতিভা, অল্পমাত্র কর্মশক্তি ও প্রেরণ সমাজচেতনায় অর্জন করা। অতি অল্পসময়ের মধ্যে বজ্রজনের কল্যাণ সাধন করে এই প্রতিষ্ঠানটি আজ যে ব্যাপক সমৃদ্ধির সম্মুখীন হয়ে চলেছে তা তাঁরই ফলপ্রসূ নেতৃত্বের এবং দক্ষতার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

১৯৫৪ সালে শিবানী ঘোষাল সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অফিসে স্টেং বোর্ডের সভাপতি প্রোজেক্ট ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এই আসন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। পুনর্বার বিভাগের অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম ট্রেনিং সেন্ট্রের পরিচালক আসনেও তিনি ছিলেন সমাদৃত। বর্তমানে তিনি আকাশবাণী (পল্লীমঙ্গল বিভাগ) জামাদাস জিগ্রাফি, কালকাতা অফিসের ডায়, উত্তর কলিকাতা মহালা সমিতি, বৈশ্ববাস্য কমিটি ওয়েলফেয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড সারসংক্ষেপ (উত্তর কলিকাতা শাখা) মধ্যমগ্রামের ছুটি না ব্লক প্রকৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অল্পতম উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত। বিশেষ শিল্প প্রাচীন মুকুলবীথির তিনি সন্মানিত। বহু পত্র-পত্রিকার তাঁর লেখা কবিতা ও স্মৃতিচিত্র, সারগর্ভ, সমাজকেন্দ্রিক প্রবন্ধদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। জনজীবন সম্বন্ধে তাঁর প্রাণন বস্তু যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থাকুন তার জন্য কিছু কাজ করা তাঁর বাসনা, শুধু নামেই কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকা তাঁর অধিপ্রাণ নয় তাই আরও বহু প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাড়া দিতে পারেন নি।

## সাগরময় ঘোষ

[খনামধ্য সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবী]

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-স্বত্বকে স্বত্বের রূপায়ণের ক্ষেত্রে ঘোষের সহযোগিতা বিশেষভাবে অবগীর এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাস গঠনে ঘোষের অবদান অপরিমীয় স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ সেই তালিকার একটি অত্যুজ্জল নাম।

অর্ধশতাব্দীকাল আগে কথা। কালীমোহন সেদিন পশ্চিমের যাত্রী। জাহাজ ভেঙ্গে চলেছে অর্ধ জলের উপর দিয়ে। বাড়লা দেশ থেকে খবর গেল তাঁর সহমিথী শ্রীযুক্ত মনোরমা ঘোষ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন চাঁদপুরের ভবনে (৭ই আষাঢ় ১৩২০, জুন ১১:৩)। সোনার বাড়লা, জননী ভদ্রভূমি গরীয়সী বাড়লা, ভুবনমোহনমোহিনী বাড়লা থেকে কালীমোহন সেদিন ভৌগোলিক বিচারে অনেক—অনেক দূরে, তাঁর সামনে সেদিন শুধু জল, অগাধ সমুদ্র, সীমাহীন সাগর, উত্তাল উর্মি মাথার উপর বিরাট আকাশ ছাড়া পরিপার্শ্ব সহই সাগরময়। নবজাতকেরও তাই নামকরণ হল সাগরময়—আজকের দিনের বহুপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও স্থলেখক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ। বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিন্দেব ঘোষ ও সম্প্রতি অকালে পরলোকগত শক্তিমান সাংবাদিক ও দক্ষ লেখক শুভময় ঘোষ যথাক্রমে তাঁর অগ্রজ ও অল্পতম অঙ্কুর।

শান্তিনিকেতনে আই এ, পঞ্চম তিন লাভ করেছেন শিক্ষা। সিটি কলেজ থেকে তিনি সম্মানে হন বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ। ছাত্র-জীবনেই জড়িয়ে পড়লেন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। কারাবাসও ঘটেছে ছ মাস।

তদানীন্তন অবিভক্ত বঙ্গ-সরকারের শিক্ষাবিভাগে শুরু হ'ল তাঁর কর্মজীবন। সরকারী চাকরী ধরে রাখতে পারল না তাঁর সাহিত্যরস-পুষ্ট পিশাস্ত্রচিন্তকে। গতাহুগতিকতা, হুকে বাঁধা বৈচিত্র্যাবহীন জীবন কোন আবেদন ভাগ্যে পারল না জীবনপন্থাসী এই তরুণের মনে। রূপ-রসের অসীম আকাশে যে তরুণ পাড়ি চমাতে চায় ফাইল কটকিত সরকারী দপ্তর কি তার মন ভরাতে পারে? পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্গল ইন্ডিনিটিতে যোগ দিলেন সাগর-ময়। সেখানেও প্রথমে মনোমত কাজ পান নি। নরেন্দ্রনাথ



সাগরময় ঘোষ

বুকেছিলেন এই তরুণ জীবনের অপ্রাপ্তি। নবশক্তি পত্রিকার তিনিই ছিলেন স্বাধিকারী। স্বর্গীয় অর্ধশত মনবর্ষের সঙ্গে সম্পাদকীয় কার্যে সহযোগিতা করার জন্য নরেন্দ্রনাথ বহুগুরুকে পাঠালেন 'নবশক্তি'তে। বঙ্গল ইন্ডিনিটির প্রচার অধিকর্তার আসনে সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কাছে প্রভূত উৎসাহ সেদিন পেরেছিলেন সাগরময়। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গেও সেদিন নরেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন অল্পতম অংশীদার হিসাবে। নরেন্দ্রনাথ সাগরময়কে পাঠালেন যুগান্তর পত্রিকার অল্পতম সহকারী সম্পাদক হিসাবে। কথাসিঁদী প্রাণেশকুমার সাত্তাল, সাহিত্যিক বাবাবর, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেদিন যুগান্তরের সঙ্গে বর্ধপুত্র জড়িত। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশ পত্রিকার যোগ দিলেন সাগরময়। বর্তৃপক্ষ সাংবাদিকতার, সংবাদ বিভাগের এবং 'দেশ' পত্রিকার—এই তিনটি কাজের ভার তার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন যে কোন একটি বেছে নিতে, বলা বাহুল্য সাগরময় শেষেরটি বেছে নিলেন। প্রথম দিন অবশ্য সাংবাদিকতার কাজই তিনি করেছিলেন, সাহিত্যরচা দীর্ঘশেষে সেনের পরলোকগমনে আরোহিত স্মৃতিসভার সাংবাদ প্রকাশ করার ভার পড়ল সাগরময়ের প্রতি।

আজ পশ্চিম বছর (অর্থাৎ তাঁর জীবনের অর্ধাংশ) তিনি দেশের সঙ্গে যুক্ত। 'সাপ্তাহিক দেশ'-এর স্বাধীনতা স্ত্রীত্ব এবং ব্যাপক প্রসিদ্ধির মূল তাঁর প্রতিভা ও নৈপুণ্য যে কতখানি দায়ী সে সন্দেহ পাঠকসমাজে কিছুই অজানা নেই। দীর্ঘ পশ্চিম বছর ব্যাপী তাঁর এই পত্রিকাটিকে উত্তরোত্তর আরও উন্নত করে তোলার অবিরাম সাধনা সাহিত্য সমাজে আজ অক্ষুণ্ণ সাধুবাদ ও স্বীকৃতিতে বিভূষিত।

সাগরময় ঘোষের প্রথম দেখা প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। প্রবাসীতেও তারপর তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। অষ্টাদশী, পরম রত্নীয়, শতবর্ষের শতগল্প, অনেক দিনের অনেক কথা প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থগুলি তাঁর সম্পাদনা কৃতিত্বের এক একটি প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর। সম্পাদকের বৈঠকে ও একটি পেরেকের কাহিনী গ্রন্থ দুটি তাঁর মৌলিক রচনার সার্থক দৃষ্টান্ত। তাঁর ধণ্ডাকাংগার বাঘ নামক উপন্যাসটি ছোট্টের জজ্ঞে রচিত।

১৯৪৭ সালে শ্রীমতী আরতি সরকারের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তাঁরা একটি কন্যা ও একটি পুত্রের জনক-জননী।

সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিক হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও কেবল তাঁর মধ্যেই তাঁর দক্ষতা সীমাবদ্ধ নয়। অভিনয়, সঙ্গীত এবং খেলাধুলাতেও তিনি বহুষ্ঠ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি গুরুরূপে পেরেছেন স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একাধিক রবীন্দ্রনাটে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শান্তিন্দেব ঘোষের পারচালনার 'তাঁদের দেশ' এ তাঁর পাজীর ভূমিকার অভাবনীয় অভিনয় দশকদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। ১৯৬১ সালে তিনি ইরোরাপ পরিভ্রমণ করেন।

মাসিক বহুমতী তিনি নিঃসমিত পড়ে থাকেন। প্রাচীন ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখে ও সম্মান দিয়ে মাসিক বহুমতীর নতুনের আবাহন অর্থাৎ নব নব পটভূমিতে নিত্য পদক্ষেপ তাঁকে আনন্দ দেয় তাঁর মতে সেইখানেই সম্পাদকের কৃতিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং কুশলতা।



মালেকা

মাসিক  
বসন্তী  
বৈশাখ / '৭১

ফুলের মেলা  
—বিনয় মুখোপাধ্যায়



দই চাই !

—ভোলানাথ দেব



পথ ভুলে

—কান্তিকান্ত ঘোষ



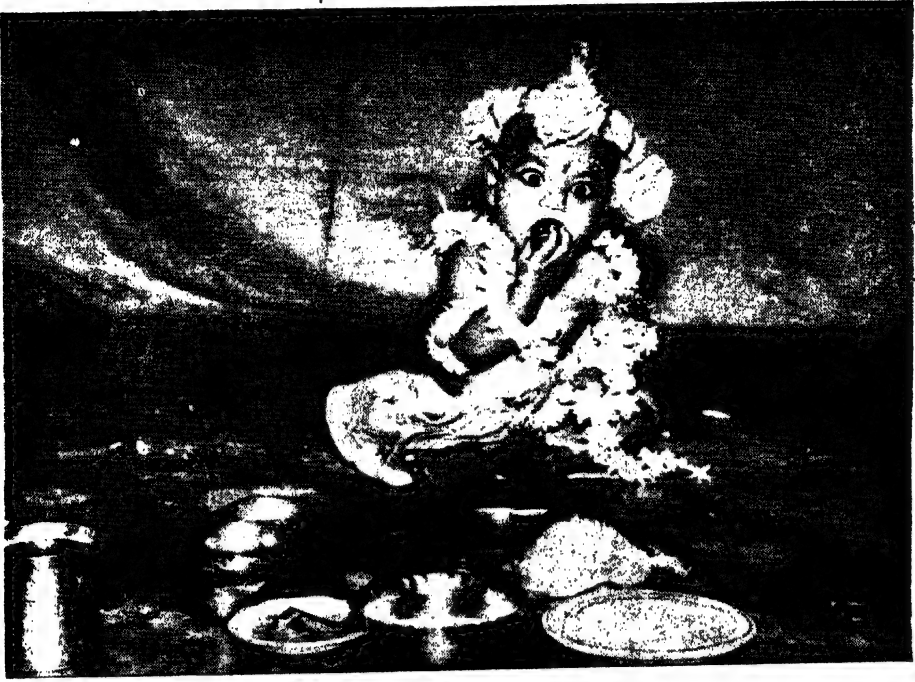
মুক্তির আহ্বান

—ভোলানাথ দেব

মাসিক

বঙ্গুমতী

বৈশাখ / '৭১



নারায়ণের 'তে

—তারাপদ দা



মাসিক  
বহুমতী  
বৈশাখ / '৭১

হে ভারতবাসী—

—দেবু দাস



অশ্রুক্ষণ

—আশুতোষ সিংহ

মাসিক বঙ্গমতী  
বৈশাখ / '৭১

# সবুজ দ্বীপ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতিভা গুপ্ত

আন্দামানে হাশা চারটি দ্বীপের মধ্যে মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি দ্বীপে মানুষের বসতি আছে এবং অসংখ্য দ্বীপগুলি এখনও জনমানবহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্ল্যারের রীতিমত আধুনিক সংসার। বিজলী বাতি, পাকা রাস্তা, হাইস্কুল, হাসপাতাল, রেডিও স্টেশন, সিনেমা হাউস সবই এখানে আছে। অল্পদিনের জন্য পোর্টব্ল্যারে এলে চমৎকার লাগে। অনেক ভ্রমলোক বাঁরা সরকারী কাজে সাতদিনের জন্য প্রেনে করে এসে প্রেনে করে ফিরে যান তাঁরা বলেন, আন্দামান স্বর্গের থেকেও সুন্দর। সুন্দর, খুবই সুন্দর আন্দামান। এত সুন্দর একটা দেশ ভারতবর্ষের এত কাছে আছে, অনেকে তা ভাবতেও পারেন না। দূরত্ব হিসাবে কাছে হলেও বাতাসাত্তের অনুবিধার জন্য আন্দামানকে অনেক সময় বিলেতের থেকেও দূর মনে হয়।

মিঃ আরজার 'আন্দামান সম্বন্ধে' বলেছেন, "There are many parts which are lovelier than several famed beauty spots in the world with lagoons that looked like dream pictures, enchanting forests and fine sandy beaches".

সৌন্দর্য আছে ঠিকই তার কতদিন আর প্রকৃতির শোভা দেখে মন ভরে? বেশদিন থাকতে হলে রাত্রি এসে যায়। সেই একই লোকজন, একই কথাবার্তা দিনের পর দিন। ভাল কোন সিনেমার বই আসে না। কদাচং হুই একটি ভাল বই আসে। একটি সিনেমা হল আছে, বেশির ভাগই সেখানে 'হাটারওয়ারা' 'সাইকেলওয়ারা' জাতীয় বই আসে। সিনেমার মানোজ্ঞার ব্যঙ্গানী। তাকে মলেছিলাম, 'ভাল বই আনেন না কেন?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ভাল বই' serious বই এখানে চলে না। আমাদের বেশির ভাগ শ্রমিক সম্প্রদায়। সিরিহাস বই আনলে আমাদের আর্থিক ক্ষতি।' কাজই মানসিক খোঁচকি কিছু নেই। ক্লাব অবস্থা আছে অনেকগুলি। বাঙালীদের 'অতুল স্মৃতি সন্নিতি', তামিলদের 'তমিজির সভ্যতা', তেলুগুদের 'এক এসোসিয়েশন', মালয়ালমের 'করেন্দা সমাজ' ছাড়া আছে হিন্দী সাহিত্য কলামন্দির ও অফিসারদের 'আন্দামান ক্লাব'। কালে ভজ্রে এই সব ক্লাব থেকে আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর করেন্দী উপনিবেশ তুলে দেওয়া হলে পর দেখা গেল, যে সব করেন্দীরা জমিজমা নিয়ে বাস করছিল তারা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যেই সব জমিজমা খালি পড়ে রয়েছে। এই ভূমি বাতে নষ্ট না হয় এই সিদ্ধান্ত ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্ধারদের, বিশেষ করে চাবাক্সের লোকদের এখানে পুনর্বাসনের প্রস্তাব করলেন। দ্বীপান্তরের দেশ কোথায় সেই আন্দামান? প্রথম দিকটার উদ্ধাররা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু শেষে তারা দলে দলে এখানে আসতে লাগল। মনে আছে ১৯৪৯ সনে প্রথম দলটি যখন আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, কাগজে সে খবর পড়ে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল কি হতভাগ্য এই লোকগুলি যাদের নির্বাসন দেবার জন্য আন্দামানে পাঠিয়ে দিল। আজ পৃথক ১৬ হাজার উদ্ধার নরনারী এখানে এসেছে। তারা এখানে settlers বলে পরিচিত। প্রথমে পোর্টব্ল্যারের আশে পাশে তাদের ভূমি দেওয়া হয়েছিল। এখন আর ভূমি না থাকার দূরে দূরে এবং অসংখ্য দ্বীপে তাদের বসতি করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্ধারদের পুনর্বাসন আর এক অধ্যায়।

পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি থেকে ছিন্নমূল হয়ে এরা এসে পড়ল কলকাতায়। আর একবার ছিন্নমূল হয়ে এল বাংলা দেশ থেকে আন্দামানের জঙ্গলে। এলো এরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। টাকা নেই, পয়সা নেই, সহায়-সম্বল, আত্মীয়-স্বজন কিছু নেই। অজানা অচেনা ভায়গার



টাক কমিশনারের কাছে অভিযোগরত উদ্ধারদল



তু ধু ভাগ্যের ওপর ভরসা করে নতুন করে বাঁচবার আশায় এতদূরে সাগরপারে এসে পড়ল। সরকার থেকে তাদের সর্বস্বত্বকারের সাহায্য করা হয়েছে। প্রথমদিকে তাদের থাকবার জঙ্গ ব্যারাকের মত ঘর করে দিয়েছে, প্রতি পরিবারে বয়সলোককে ৩০ ও শিশুকে ১৫ হিসাবে ডোল দেওয়া হয়েছে। চাষ করার জঙ্গ বলদ ও বাড়ি করার জঙ্গ মালপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন আবহাওয়ার চেনা জগৎ ছেড়ে লোকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়ল, এই সমুদ্রঘেরা অনেকাংশে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এ দেশের চোরা আলাদা, মানুষ আলাদা, ভাষা আলাদা। কিসের ভরসায় তারা বুক বাঁধবে? কিন্তু উপায় কি, বাধ্য হয়ে দীরে দীরে তারা এখানকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল। সরকার থেকে জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করে দিল, কিন্তু এই পাহাড়ী অঞ্চলে পাথর ও অকৃত্রিম শিকড় ভরা জমি পরিষ্কার করে চাষবাসের উপযোগী করতে এদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হল। সব উদ্বাস্তুই কিন্তু চাষাশ্রমী ছিল না। তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষিত লোকও ছিলেন। জীবনে তাঁরা কোদালি মরেন নি, বাধ্য হয়ে তাঁদের কোদালি হাতে মাঠে নামতে হল।

আন্দামানের জমিতে ধান হয় প্রচুর পরিমাণে। বছরে একবার ফসল ফলে, কিন্তু এত অপূর্ণাঙ্গ পরিমাণে হয় যে, সারা বছর খেয়ে বিক্রী করেও বেশ টাকা উপার্জন হয়। পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। সেই নদী-নালায়ভরা দেশ থেকে উদ্বাস্তুরা প্রথম যখন আন্দামানে এসে, পাহাড়ী জমি দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। বাংলা দেশের জমি আর আন্দামানের জমি তাদের কাছে মনে হল আকাশ-পাতাল তফাৎ। এখন অবস্থা এরা এখানকার আবহাওয়ার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ছাড়াও তাদের লড়াই করতে হয়েছে স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধে। লোকাল বর্নাদের ধারণা তারা আন্দামানের লোক, son of the soil, এখানেই তাদের জন্ম কর্তৃক সব, কাজেই আন্দামানের উপর তাদের পূর্ণ অধিকার। উদ্বাস্তুরা তাদের দেশে

অনধিকার প্রবেশ করেছে। সাধ্যমত তারা প্রতিটি বিষয়ে উদ্বাস্তুদের উত্থাপ্ত করেছে। বিশেষ করে সাউথ আন্দামানের লোকাল বর্নরা উদ্বাস্তুদের সেখানে কিছুতেই থাকতে দিতে রাজী হয় নি। তদানীন্তন হোম সেক্রেটারী গোপালবাহী আরেক্সারকে লোকাল বর্নদের দ্বারা গঠিত 'আন্দামান এসোসিয়েশন' জানাল, সাউথ আন্দামান আমাদের, আজ একশ বছর ধরে আমরা এখানে আছি। তোমরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মিডল আন্দামান ও নর্থ আন্দামানে বসাতো।' তাদের সে আপীল গ্রাহ্য হয় নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন আন্দামানে এলেন, লোকাল বর্নরা তাঁকে বলল, 'আমাদের দেশে আমরা উদ্বাস্তু চাই না, তোমরা তাদের এখানে পাঠাও না।'

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, এক ভাই বিপদে পড়লে কত ভাই সাহায্য না করলে কি চলে? স্বাধীনতার জঙ্গ পূর্ববঙ্গের দান বাঙালীদের অনেকখানি।

পূর্ব বাঙালার এই লোকগুলি দীরে দীরে তাদের অজান্তে পরিণত হচ্ছে আন্দামানের অধিবাসী-ত। তারা কথা বলে পাঁচটা হিন্দী শব্দ মিশিয়ে। ছেলেমেয়েরা কথা বলে হিন্দীতে, পাড়াশোনা করে হিন্দীতে। কতদিন কত বাঙালী ফিরিওয়াল আমাদের বাড়ি এসেছে, কথা বলেছে হিন্দীতে। আমি কতজনকে ধমক দিয়ে বলেছি বাংলায় কথা বল না কেন? হিন্দী বলতে লজ্জা করে না? তারা সন্তুষ্ট হয়ে জবাব দিয়েছে, 'অভ্যাস হইয়া গেছে মা, হিন্দী না কইলে আমাদের অন্তর্বিদা হয়।'

এখানে আসার পূর্ থেকেই উদ্বাস্তু-কলোনীগুলি দেখবার জঙ্গ ব্যস্ত হয়েছিল। কেমন করে এতদূরে আমাদের দেশের নিগ্রাফ চাবী ভাইরা বসবাস করছে, নিজের চোখে তাদের দেখবার সুযোগ বুঁজছিল। অনেক চেষ্টার পর একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশেপাশে ম'লুটন, শৌসদারী, হাবাটাবাদ, তিব্বত এই সব গ্রামগুলি দেখবার জঙ্গ। এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু বসতিগুলি বেশ ভালো হয়েছে। কলোনী বলতে যা বোঝায় এগুলি কিন্তু ঠিক তা নয়। তিন-চারটি করে

উদ্বাস্তু পরিবার এক এক জায়গায় বসানো হয়েছে। আবার হরত মাইলের পর মাইল জঙ্গল, আবার তিন-চারটি উদ্বাস্তু পরিবার। যেখানে যেখানে ধানী জমি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে সেখানে কয়েকটি করে পরিবার বসানো হয়েছে। আমাদের দেশের মত ক্ষেত থেকে চাবীরা পূর্ থেকে থাকতে পারে না। রাত্রিবেলা হাতী ও হরিণের পাল ক্ষেত-নষ্ট করে দেয়। পঞ্চাশ বছর আগে একজন কয়েক্ট অফিসার চার জোড়া হরিণ এনে সখ করে আন্দামানের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই চার জোড়া থেকে পঞ্চাশ বছরে পঞ্চাশ হাজারও বেশি হরিণ আন্দামানের জঙ্গল ছেয়ে ফেলেছে। চাবীরা হরিণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। হরিণ মারবার জঙ্গ দুইটি চিতাবাঘ এনে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কোন খোঁজপার আর পাওয়া যায় নি।



আন্দামানে বাঙালীবস্তু



বর্তমানে কোন বাঘ বা কোন হিংস্র জন্তু আন্দামানের জঙ্গলে আনা। সরকারের ইচ্ছা নয়, কারণ জঙ্গলের কাছেই সব উদ্ভাস্ত-কলোনীগুলি। আরোগ্যের ভয় তো আছেই, তার ওপর বাঘের উৎপাত হলে আর রক্ষা নেই। চাষীদের জমির কাছাকাছি থাকতে হয়। টিয়াপাখীও বড় অসুচার্য করে। পক্ষপালের মত ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে সমস্ত শস্য শব করে দেয়।

আমরা অনেক বাড়িতে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমাদের দেখে সকলে খুব খুশি। বেশিরভাগ উদ্ভাস্তরা বরিশাল ও খুলনা জেলার লোক। আমাদের বসতে পিড়ি পেতে দিল, ঘরের ভাতা মুড়ি এনে দিল। একপাশে চৈবিঘর, একপাশে রান্নাঘর, মাঝখানে শোবার ঘর। উঠানটি মাটি দিয়ে নিকোনো বকবকে, পাশে গোলাভর্তি ধান। ঠিক যেন বাংলা দেশের গ্রামের একটি বাড়ি। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম 'তোমাদের এখানে মন বসেছে তো?' সে জবাব দিল, 'মন কি আর বসে মা, তবে আপনাদের আশীর্বাদে খাওয়া-পরাই তুংখ আমাদের নাই।' সমস্ত আন্দামানের মধ্যে যতগুলি উদ্ভাস্ত-কলোনী দেখেছি, তার মধ্যে সাউথ আন্দামানের হাটাটাবার, মংলুটন, মিডল আন্দামানের রঙ্গত ও নর্থ আন্দামানে ডিগলিপূরের বসতি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এদের মধ্যে বেশ বড়ো পরিবারও আছে। সাউথ আন্দামানে শৌলদারীও আমার খুব ভালো লেগেছে। এটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় উদ্ভাস্ত-কলোনী। প্রায় তিনশ' পরিবারের বাস, বেশির-ভাগ লোক বরিশাল জেলার নমঃশূর।

আমাদের নিজেদের দেশ পূর্ববঙ্গে, তাই উদ্ভাস্তদের ওপর আমাদের খুব দুর্বলতা আছে। যত উদ্ভাস্ত অঞ্চলে গিয়েছি, বরিশালে বাড়ি শুনে সকলে মিঃ গুপ্তকে ছেকে ধরেছে যেন তাদের কত আপনজনকে পেয়েছে। অসংক্ষেপে সকলে নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগের কথা প্রাথমে বলেছে। তিন-চারটি কলোনীর মধ্যে একটি করে বাংলা ভাষায় প্রাইমারী স্কুল আছে। পোর্টব্লেরায়ের আশে-পাশের গ্রামের লোকেরা ভুগেই আছে। সহরের সঙ্গে যোগাযোগে তাদের কোন অসুবিধা নেই, রেগুলার বাস সার্ভিস আছে। এদের পরিবার পিছু দশ একর জমি দেওয়া হয়েছে। পাঁচ একর খানের জঙ্গ, পাঁচ একর বসতবাড়ি ও বাগবাগিচার জঙ্গ।

আবার এমন সব দুর্ব-দ্রাস্তের দ্বীপগুলিতে পুনর্বসতি হয়েছে, যেখানে নিকটতম সহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ছয় মাসেও হয় কি না সন্দেহ। কুড়ি পচিশ মাইল জলপথে ও স্থলপথে গেলে তবে পুরের লোকালয়ে পৌঁছাতে পারে। অনেক দ্বীপে জলের দাক্ষিণ অভাব। সারা গ্রীষ্মকাল জলের জঙ্গ লোকগুলি হাতাকার করে। টিউবওয়েল বসালে নোনা জল ওঠে, কুয়া খুঁড়লে কখন নোনা জল ওঠে, নয়ত গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। একবার Havelock Island-এ গিয়েছিলাম। সেখানকার উদ্ভাস্তরা বলেছিল, তারা সমস্ত গ্রীষ্মকালে নান করতে পারে না জলের অভাবে। যা জল তারা পায়—রান্না করে আর খেয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না।

নর্থ আন্দামানে Smith Island বলে একটি দ্বীপে পচিশ থেকে ত্রিশ ঘর উদ্ভাস্ত বসানো হয়েছিল। ঘরে বসে বড়কর্তার দ্বাশ দেখে আর বই পড়ে পুনর্বসতির চাট তৈরি করেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

তাদের কার্যই থাকে না। শ্রিখ আরল্যাণ্ডে একটি ঝরণা আছে এই সংবাদে ওপর ভিত্তি করে সেইখানে উদ্ভাস্তদের বসানো হল। একটি ঝরণা আছে ঠিকই, তবে কলোনী থেকে বহু দূরে পাঁচাডের নীচে গিয়ে তবে জল আনতে হয়। সব সময় সেখান থেকে জল আনা সম্ভব নয়। তাই কলোনীর কাছে কুয়া কেটে দেওয়া হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে সব কুয়া শুকিয়ে গেল, জল নেই কোথাও, লোকগুলি জলের অভাবে ছটকট করছে, কিন্তু পোর্টব্লেরায়ের খবর পাঠানো যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে যখন তারা পোর্টব্লেরায়ের খবর পাঠাল, তখন কয়েকজন আঁশের গেজেন হুচক ব্যাপারটা দেখে আসবার জঙ্গ। তার মধ্যে মিঃ গুপ্তও ছিলেন। সেখানে গিয়ে সকলের চক্ষুস্থির। জল কোথায়? কুয়াগুলি শুকনো খটখটে। লোকগুলি ব্যাধ হয়ে নোনাজল খাচ্ছে, ফলে শরীরের চামড়া কেটে কেটে গিয়েছে। বাস্তবী দেখে, মিঃ গুপ্তের কাছে এসে কয়েকজন হাতজোড় করে কৈদে বলল, 'কর্তা, আমরা তো মরছি! আমাদের গোলাপিনগো বাঁচাইবেন।' এই অবস্থা দেখে উদ্ভাস্ত পরিবার কয়টিকে অঙ্গ দ্বীপে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রিখ আরল্যাণ্ডের বসতির পিছনে যে টাকা খরচ হয়েছে তা ব্যর্থ হয়েছে।

রক্তনী সরকার একজন উদ্ভাস্ত ডপ্তরলোক। এখন আন্দামান Advisory ommittee-র একজন সভা। ইনি ১৯৪৯ সনে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে আন্দামানে আসেন। তিনি একদিন বলছিলেন, 'আমি সারাজীবন ধরে কংগ্রেসের কাজ করেছি, চটগ্রামে আমাকে কে না চেনে? আমতা যখন কলকাতার বাইরে উদ্ভাস্ত-ক্যাম্পে ছিলাম, একদিন কয়েকজন কংগ্রেসের নেতা সেখানে গিয়ে আমাদের বললেন, 'আন্দামান খুব ভাল জায়গা, আমরা নিজেরা দেখে এসেছি, তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

আমরা যখন আন্দামানের জাঙ্কজে চড়লাম, সকলে কান্নাকাটি শুরু করল। কোন অনিদিষ্ট পথে পাড়ি দিচ্ছি ভেবে আমরা সকলেই খুব উদ্ভিন্ন হলাম। জাঙ্কজ কতৃপক্ষ আমাদের বেশ ভালমত দেখা শোনা করেছে। পোর্টব্লেরায়ের এসে জেটিতে নামবার আগেই আমাদের দলেদলে ভাগ করে দিল। তারপর এখানে আসার পর নৌ সহর,



উদ্ভাস্ত গৃহ ও ধানী জমি

মলুটন, হাফেগঞ্জ, ওরাওর, মানবুর ও কলিনপুরের ক্যাম্প পাঠিয়ে দিল। প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন ধীরে ধীরে আমাদের সব অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। চাবী না হলেও আমাদের লাঙল ধরতে হয়েছে এই বা ফুৎখ। সরকার আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। অনাবাদি জমি আবাদি করে দিয়েছেন, তবে সেট জমি নিয়ে প্রথম দিকে আমাদের অপ্রাস্ত্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখানে এসে আমাদের দেশের মত কোকিলের ডাক, বৌ-কথা কও পাখির ডাক শুনেছি, মন আমাদের উদাস হয়ে গিয়েছে। 'রূপচাঁদা' মাছ খেয়ে দেশের জন্ত মন কেঁদেছে। মনকে বুঝিয়েছি আমাদের টেংগাম ও তো এই রকমই দেখতে—

“শৈলসঙ্কতা, সাগরচুখিতা, নদীমেখলা।”

সরকার থেকে উদ্যোগের সর্বপ্রকার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা-বাট, স্কুল, ডিসপেন্সারি, বা বা প্রয়োজন। অনেক বিষয়ে এদের অভিযোগ থাকলেও নিজস্ব কমিউনিটি পেরে, বাড়ি-ঘর করে পূর্বদিকের ভাগ্য-বিভাগিত মানুষগুলি আবার নতুন করে বেঁচে উঠেছে।

আন্দামানের জঙ্গল এত গভীর কিন্তু কোন হিঙ্গ জন্ত নেই। বাও দুইটি চিতাবাঘ আনা হয়েছিল, তারও কোন খোঁজ নেই। সাপ আছে প্রচুর কিন্তু বিষাক্ত সাপ নেই। প্রথমটার বিশ্বাস হয় নি, সাপের কামড় আঘাত বিদ্যাক্ত ভর না সেটা কি করে সম্ভব? আমরা যখন গেস্ট হাউসে দিলাম একদিন রাত্রিবেলা কেয়ার টেকারকে সাপে কামড়ান, রান্নাঘরে কাজ করার সময়।

আমরা তো ভয়ে মরি। কেয়ার টেকারের কিন্তু কোন ভয় দেখলাম না, খানিকটা গরম জল নিয়ে পায়ে ওপর ঢেলে কি সব লাগাল। খানিক পরে উঠে কাজ-কর্ম শুরু করল। সাপ হতে বিদ্যাক্ত নেই আন্দামানে কিন্তু যা একটি সাংঘাতিক বিষাক্ত প্রাণী আছে তার তুলনা হয় না। সেটি হল ‘কানখাজুরা’, আমাদের দেশের ‘চালা’



আন্দামানের কানখাজুরা

জাতীয়, কিন্তু বিরাট বড়, প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া। কানখাজুরার কামড় সাপের কামড়ের থেকেও যন্ত্রণাদায়ক। শিশুদের কামড়ালে আর রক্ষা নেই। হালফ করে বলতে পারি মহাভারতের কর্ণ যদি আন্দামানের কানখাজুরার কামড় খেতেন তবে পরশুভারমের মাথা কোলে করে তখন বসে থেকে তাঁকে আর বাতাহুরি নিতে হত না। আর আছে আন্দামানের সমুদ্রে অসংখ্য হাঙ্গর। যেখানে সেখানে কেউ সমুদ্রে নামতে পারে না। একমাত্র করবাইনসু কেভে হাঙ্গর নেই তাই সমুদ্রে স্নান করতে হলে সকলে সেখানেই যায়। এখানকার জঙ্গলে বেতগাছ হয় অসংখ্য। এক বরকমের বুনো বেত গাছ আছে বার ডগা কাটলে চমৎকার পানীয় জল বেরায়। বর্ষা দেশে এই বেতগাছকে বলে life saver, দুখনখা তেওয়ারীর দল এই বেতগাছের জল খেয়ে বহুদিন পথ চলেছিল। অনেক কয়েক্ট অফিসারের কাছে গল্প শুনেছি জঙ্গলে কাজ করার সময় অনেক সময় তাঁদের পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত এই বেতগাছের জল দিয়ে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সব করতে হয়।

আন্দামানের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল দেখবার মত। প্রত্যেকটি খাড়ির দুই পাশে অসংখ্য গাছ, ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের। জোয়ারের সময় গাছগুলি অর্ধেক পর্যন্ত জলের নীচে চলে যায়। বোট করে ঘাটার সময় কতবার ইচ্ছা হয়েছে, যেখানে যেখানে ম্যানগ্রোভের কাঁকে কাঁকে খালের মত দেখা গিয়েছে, তার ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত ঢুক বাট। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করেছি ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের। ম্যানগ্রোভের গাছ এখানে জালানী কাঠের জন্য ব্যবহার হয়। আন্দামানে কয়লা পাওয়া যায় না, রান্না করতে হয় কাঠ দিয়ে। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের ফলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয় সবাইকে। জিওলোজিস্টরা বলেন, ম্যানগ্রোভের জঙ্গল না থাকলে সমুদ্র কোনদিন আন্দামানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত তাই ঠিক নেই। ম্যানগ্রোভের কাঁকে কাঁকে জলা জায়গাগুলি বড় সাংঘাতিক। সন্ধ্যার পর যখন অসংখ্য sand fly ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় তখন সেখানে ঠাঁড়ায় কার সাধ্য। পোকাকুণ্ডলি খুব ছোট তার কামড়ের জ্বালা লাল পিঁপড়ের থেকেও বেশি। গল্প শুনেছি বহু আগে পেনাল সেটলমেন্টের সময় অবাধ্য কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্য রাত্রিবেলা ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে বেঁধে রাখা হত। এক রাত্রি শ্রাও ফ্লাইয়ের কামড় খেয়েই তারা সম্পূর্ণরূপে বরলে যেত।

পোর্টব্লেকারের বাইরে অজান্তে রাপে যেতে গেলে সাধারণত কেবী স্কিমার ‘চলুকা’তেই সবাই তামাচ করে। সরকারীকাজে অফিসাররা যখন বান তখন প্রত্যেকের নিজের নিজের departmental বোটই যাতায়ত করেন। বেশিরভাগ সময় তিন-চারজন অফিসার মিলে একসঙ্গে ‘চুর প্রোগ্রাম’ ঠিক করেন।

রঙ্গতে সেবার বিশেষ কাজ পড়ায় গুপ্ত সাহেবকে একাই যেতে হল। সেই সুযোগে আমিও তাঁর সঙ্গে রওনা দিলাম। রঙ্গতের উদ্বাস্ত-কলোনিগুলি দেখার ইচ্ছা ছিল বহুদিন ধরেই। এই সুযোগ আর ছাড়লাম না। বাক্সিবেলা খেয়েদেয়ে মোটর বোটে গিয়ে শুয়ে রইলাম। মাঝরাতে রওনা দিতে ভোরবেলা এসে Long Island-এ পৌঁছালাম। লং আইল্যান্ড খুবই ছোট দ্বীপ। ফরেস্ট ছাড়া এখানে অল্প কোন বিভাগের বিশেষ কোন কাজ নেই। অল্প কয়েক ঘর লোক। জেটি থেকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকখানি উঠে তারপর বাড়ি-ঘর আরম্ভ। সমুদ্রের ধারেই ফরেস্টের খুব সুন্দর একটি ডাকবাংলো। ওখানকার ফরেস্ট অফিসার মিঃ ভাট্টার বাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে লং আইল্যান্ড দেখা শেষ করে আমরা রওনা দিলাম রঙ্গতের দিকে। রঙ্গত থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মোটর-বোট থেকে নেমে ট্রাকে করে কাঁচা রাস্তা দিয়ে এসে তবে রঙ্গতে আসতে হয়। ভারি সুন্দর একটি উপত্যকা। দুই পাশে সব উদ্বাস্তদের বাড়ি-ঘর। এখানে পি ডব্লিউ ডির প্রচুর কাজ। পূর্বের জনমানবহীন দ্বীপটি ধীরে ধীরে বেশ একটি বদ্বীপ লোকালয়ে পরিণত হচ্ছে।

রঙ্গতের উদ্বাস্তদের সবলেরই বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। প্রচুর তরী-তরকারী ও ধান এখানে জন্মায়। বাড়ি বাড়ি ঘরে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজনকে কিক্রেস করলাম, সুযোগ পেলে তোমরা দেশে ফিরে যেতে চাও ?

সে উত্তর দিল, 'একুণি, এই মুহূর্তে সব ছেড়ে চলে যাব। দেশে গিয়ে আধপটা খেতে হর তাও খাব। পরাধটা আমাদের সেখানেই পড়ে আছে যে মা'।

রঙ্গত থেকে গেলাম বেটাপুর (Betapur)। বেটাপুর যাওয়ার আমরা খুব উপভোগ্য করেছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রলি করে অনেক দূর যেতে হয়। দুই ধারে ঘন জঙ্গল, গায়েব ওপর মাঝে মাঝে গাছের ঈলাপালা এসে লাগছে, তারই মাঝখানে দিয়ে ট্রেনের মত ট্রলি ছুটে চলেছে। বেটাপুরেও ফরেস্টের কাজই বেশি।

রঙ্গতের গেস্ট হাউসটি পাহাড়ের ওপর ঘন

জঙ্গলের মধ্যে। ধারে-কাছে কোন বাড়ির নেই। রঙ্গতে কোন বিজলীবাতি নেই। সন্ধ্যার পর চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে নিবিড় জঙ্গল। বাক্সিবেলা গেস্ট হাউসের ওপরতলার রইলাম আমরা দুইজন ও আমাদের ছোট মেয়ে দোলন। নীচে আউট হাউসে পিওন ও ওখানকার চাকিদার। কি অন্ধকার, লষ্ঠানর আলোর বেন সে অন্ধকার আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। রাত্রে গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা গা চম্‌চম্‌ ভাব মনে আসছিল। কেমন একটা uncanny ভাব চারদিকে। মনের কথা প্রকাশ করতেই ঠর কাছে বকুনি যেতে হল। কি আর কথা যার সাবরাত ভয়ে ভয়ে প্রায় জেগেই কাটলাম। ভোরবেলা উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ বেন 'জুড়িয়ে গেল। রাতের কথা মনে করে তখন বেশ লাজবানি করছিল।

পাঁচ সপ্তাহে রওনা দিলাম আমরা মায়া বন্দরের দিকে। দুপুরবেলা মায়া বন্দর পৌঁছলাম। পোর্টব্রোয়ারে পাইল নাম করতে হয় মায়া বন্দরের। এটি হল আন্দামানের দ্বিতীয় সহর। সহরে যদিও বিজলীবাতি নেই, মোটর গাড়ি চালাবার রাস্তা নেই, সিনেমা হল নেই, তবুও মায়া বন্দর এখানকার একটি বদ্বীপ সহর। মায়া বন্দরকে বলা যার কার্টের দেশ বা Timber Town. কার্টের জঙ্গলই মায়া বন্দরের প্রসিদ্ধি। মিডল আন্দামানের বত কার্ট সব চালান যায় মায়া বন্দর থেকে। এখানেই জঙ্গলের কাজ সবচেয়ে বেশি। ক্রীযুত পি সি রে সমস্ত মিডল আন্দামানের জঙ্গল গভনমেন্ট থেকে ইজারা নিয়েছেন। মায়া বন্দরের আকাশ-বাতাসে কার্টের গন্ধ। চারিদিকে খালি নানা ধরনের কার্ট। কাঁচা কার্ট, ভেজা কার্ট, চেরা কার্ট, কার্টের গুড়ি ও কার্টের গুড়ো—এ ছাড়া মায়া বন্দরে আর কিছু নেই। জেটির গায়েই একটি Saw Mill. তারপর খানিকটা উঁচুতে পি ডব্লিউ ডির এবং পি সি রে কোম্পানীর গেস্ট হাউস। মায়া বন্দরও খুব ছোট জায়গা। মিডল আন্দামান ও নর্থ আন্দামানের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, বেশ কয়েকজন সরকারী অফিসার এবং পি সি রে কোম্পানীর ম্যানেজার এখানে থাকেন। মায়া বন্দরে পানীর জলের বড় অভাব।

এরপর আমরা গেলাম মায়া বন্দরের কাছেই বর্মীদের 'ওয়েবি' গ্রামে। বর্মীরা খুব খাতির করে চা খাওয়া, তাদের দুলে নিয়ে গিয়ে বর্মীভাষায় গান শোনান। এখানকার কারেনরা সবলেই হিন্দী বলতে পারে। 'ওয়েবি'তে প্রচুর কমলালেবু জন্মায়।

পরদিন ভোরবেলা চললাম ডিগলিপুর। পোর্ট কর্নওয়ালিসের জেটি থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ট্রাকে পাঁচ মাইল পাহাড়ী পথে উঠে তবে ডিগলিপুর। এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় Saddle Peak (১৪০০ ফিট) আন্দামানের মাইট এভারেস্ট। ডিগলিপুরে যেতে পথে একটি ছোট মনি পড়ল। জল অবশ্য তখন প্রায় ছিলই না,



মায়া বন্দর

মাদের ট্রাকটি জলের ওপর দিয়েই পার হল। বর্ষাকালে এই নদী ন জলে টাইমুর হয়ে ওঠে, তখন শুষ্ক হয় কুমীরের উৎপাত। প্রতি র কত লোক যে কুমীরের পেটে যার তার ঠিক নেই, বিশেষ করে রাস্তার। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়ই মারা পড়ে। আবার রাস্তা প্রতি বছর অনেক কুমীর শিকারও করে।

ডিগলিপুরের উদ্বাস্ত বসতি বেশ ভাল লাগে দেখতে। গ্রামে রঙের প্রথম বাজার। দুই ধারে দোকান পাট সারি সারি। কথায়-কথায়, চাল-চলনে এখানে পূর্ব-বাঙলার আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার ঝাঁকায়। উদ্বাস্তদের তরফ থেকে আমাদের চা আর কিছুটা ওয়াল। আমি একটি ছেলেকে বললাম, 'তোমাদের এখানে এসে ন-বিছুট খাব কেন?' মুড়ির মোহা, চিড়ের মোহা খাওয়াবে না?

ছেলেটি বলল, পানের বার আপনাকে নিশ্চয়ই মোরা বার নাড় খাওয়াব মা।'

পোর্ট কন'ওয়ালিসের বন্দরটি বেশ হয় সারা আন্দামানের সবচেয়ে রম্য বন্দর। সমুদ্র ছয় মাইল ভেতরে ঢুক গিয়েছে, চওড়ায় প্রায় এক মাইল। তিনদিকে ঘেরা পাহাড়। করোদী উপনিবেশের গাড়া থেকে সেট '১৯৫৮ সন থেকেই এখানে naval arsenal খালার প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। ক্যাপ্টেন ব্রেরার প্রথমবার জরিপ করতে এসে এই রম্যটি দেখেই বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ নেভির প্রায় অর্ধেকই এখানে ভিড়ানো যায়।' গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা আছে পোর্ট কন'ওয়ালিসে আবার জেটি তৈরি করে পোর্টটি চালু করার। এখানে জেটি তৈরি হলে আর আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড সাইথ আন্দামান থেকে নর্থ আন্দামান পর্যন্ত সম্পূর্ণ হলে কলকাতা থেকে পোর্টব্লেরার দূরত্ব দুশো মাইল এবং সময় একদিন হয়ে যাবে।

ডিগলিপুুর আসার আগে গিয়েছিলাম Interview Island. এককালে এই দ্বীপে বহু আন্দামানী বাস করত। এখন একটি

প্রায় একশ' বছরের বৃদ্ধা আন্দামানী স্ত্রীলোক এখানে আছে। আর আছে ফরেস্টার কাজে কিছু সন্নী লোক। ইন্টারভিউ দ্বীপে দুইটি জিনিষ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটি হল অদ্ভুত একটি দীঘি। বিরাট একটি হাজার মধ্যে অপরূপ এক জলাশয়, মাথার ওপর আন্দামানের মত একটি অতিকার পাথর, তার নীচে টলটলে মিটি জল। সমুদ্র থেকে অল্পদূরে। মাটির নীচে থেকে অনবরত জল উঠছে আর সে জল মিটি জল। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেলায় সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। একবার এক ফরেস্ট অফিসার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে চঠাৎ আবিষ্কার করেন দীঘিটি। আর দেখেছি এখানে সমুদ্রের জলের মধ্যে নানা রঙের নানা আকারের কোরাল (coral) ফুলের মত, পাতার মত গাছের মত অল্প কোরাল। ভাঁটার সময় জল নেমে যাওয়ায় গুপ্তগাত্যে নিজেই জলে নামলেন কোরাল তোলার জ্ঞা। কাঁচা অবস্থার কোরালগুলি স্পঞ্জের মত নরম থাকে। শক্ত না হলে সমুদ্র থেকে তোলা যায় না। নানারকম কোরাল তুলে বাটে রাখা হল। মনের আনন্দে কোরাল তো অনেক তোলা হল তারপর তার দুর্গন্ধে বাটে টেকা দায়। অসম্ভব আঁশটে গন্ধ। বাড়ি এনে মাসের পর মাস বোদ আর বুটের জল খাইয়ে তবে কোরালগুলি ঘরে রাখবার উপযুক্ত হল।

আন্দামানের অনেক দ্বীপে এখনও মানুষের পা পড়ে নি, এমন কি পোর্টব্লেরার কাছাকাছি গভীর জঙ্গলের মধ্যে কি আছে না আছে অনেকই খবর রাখেন না। প্রত্যেক বছর জিওলজিস্ট পাটি আন্দামানের জঙ্গলের মধ্যে জরিপ করার জ্ঞা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের কাছে নতুন নতুন জায়গার খবর পাওয়া যায়। এ বছর জিওলজিস্ট পাটি এসে চাক কামিশনারকে বলেছিলেন, পোর্টব্লেরার থেকে দূরে মানার ঘাটের কাছে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা খুব সুন্দর একটি 'ওয়ারটার ফলস্' দেখতে পেয়েছেন। তবে রাস্তা খুঁজি খারাপ।

এক ছুটির দিনে আমাদের বিরাট একটি দল রওনা দিলাম ররণ দেখার উদ্দেশ্যে। মানার ঘাটের কাছে রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। রওনা দেবার আগেই শুনেছি রাস্তা খুব খারাপ আর জঙ্গলে অসম্ভব জাঁক। দলের ভেতলোকেরা সকলেই গামবুট পরে তৈরি, আমরা মেয়েরা সকলেই চটি পরে রওনা দিলাম। রাস্তা যে এত খারাপ আগে বুঝত পারি নি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম দুক দুক বন্ধে। জাঁকের প্রতিবেদক হিসাবে ঘুরে পোটলা ও ডেটেলের শিশি সঙ্গে নিয়ে। আগের রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তাঘাট জলে-কাদার ভর্তি। যেতে যেতে সকলেই একবার করে উদ্ধাস্ত হয়ে বলে উঠেছে। 'আহা কি সুন্দর ঢুঙ্গ'। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই জাঁকের ভয়ে চোখ মাটির দিকে, আশেপাশে তাকাবার সময় কোথায়? আনখাইল' বেশ নিরাপদেই এলাম। তারপরেই



এখানে আরল্যান্ডে বাড়ীল

স্বপ্ন হল জোঁকের রাগ। একজনকে জোঁকে ধরে, চাঁকায় করে লাফালাফি করে সকলে অস্থির, অবশ্য গাম্বুট পরা ভদ্রলোকেরা ষণ বুক ফুলিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলেন। হুদ দিয়ে জোঁক ছাড়িয়ে আবার পথ চলা শুরু হল। একজন সঙ্গীর পরামর্শে পায়ের পাতায় খুব করে ডেটলা বসে নিলাম।

এবার শুরু হল চড়াই। চলেছি তো চলেছি। পিছল পথ এক পা উঠলে তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়েও পিছল পাহাড়ে পা রাখা যাচ্ছে না। থেমে থেমে যে উঠব তার উপায় নেই। খামলেই জোঁক কিসবিল করে ধরবে। হাতের কাছে যা পাঞ্জি গাছের শিকড়, যোপঝাড় তাই ধরে ধরেই পাহাড়ে উঠছি। যামে ততক্ষণে নেয়ে উঠছি। ওপরে চেয়ে দেখছি খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। কতদূর? আর কতদূর? সবাই বলে এখনও অনেক দূর। রাস্তার কষ্ট বত না হোক আমার যত আতঙ্ক জোঁকে। যত এগোচ্ছি তাদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে; রাস্তার মধ্যে পাতার কীকে কীকে কিসবিল করছে। চেতারাটা দেখলেই গায়ের মধ্যে শিরশির করে। কখন বে পায়ের পাতায়, হাঁটুতে, হাতে বেয়ে বেয়ে উঠছে টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় প্রতি পাঁচ মিনিট পরে আমি বলছি, 'কিরে বাই আমি, আর পারছি না'।

উনি বলতে থাকেন, 'সবাই যাচ্ছে, তোমাকে নিয়েই যত মুশ্কিল'।

চেয়ে দেখি দলের সকলেই এমন কি আমার বাক্স মেয়েটা পর্যন্ত জোঁকের কামড় ভ্রমণে না করে এগিয়ে যাচ্ছে। অগত্যা আমি আর না গিয়ে কি করি? দুর্গম চড়াই প্রায় এক মাইল ওঠার পর আমাদের পথপ্রদর্শক বলল তুল রাস্তায় আসা হয়েছে। এবার উপায়? আবার সেই পাহাড়ী পথে নামতে শুরু করলাম। কতবার যে গড়িয়ে কানার মধ্যে আছাড় খেলাম তার ঠিক নেই। সবচেয়ে শক্তিশালী করেছিল আমার পায়ের চটজোড়া। বার বার কানার মধ্যে বসে যাচ্ছিল। প্রতি পদক্ষেপে যদি মনে হয় এট বৃষ্টি জোঁকে ধরল তা হলে আর চলার আনন্দ থাকে কোথায়? অনেকটা নেমে এসে অল্প পথ ধরে এগোতে লাগলাম। এ পথটা অপেক্ষাকৃত ভাল। আরও প্রায় এক মাইল এসে বানিকটা নেমে ফলশূঁটির সামনে ঝাঁড়ালাম। কি অপূর্ণ দৃশ্য। কত উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের ওপর দিয়ে বেগে ঝরনার জল নীচে পড়ছে। অনবরত ঝরঝর করে জল পড়ার মাওয়ায় হচ্ছে। আশপাশের পাথরগুলি হাওয়া পড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জল জমে রয়েছে তার গুরেই উপলব্ধির ওপর দিয়ে কলকল শব্দে মলের স্রোত নীচের দিকে নেমে গিয়েছে বাই মুড় হয়ে গেলাম। চাক কমিশনা রথটির নামকরণ করলেন 'বহুধারা'। আমার কন্ঠ হচ্ছে করছিল নাম দিই 'পাগলা ঘোরা'।

শিহন পানে নাইকো বাধা

পিছনে টান নাইকো মোটে।

পাগলা ঘোরার পাগল নাটে

নিত্য-নূতন সঙ্গী ভোটে।

লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে

ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হতে।

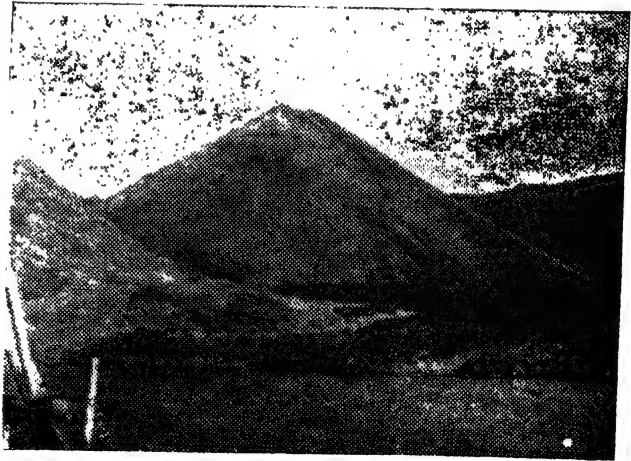
চড়াচড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে

নৃত্য করে মত্ত স্রোতে।

আন্দামানের একমাত্র আগ্নেয়গিরি Barren Island. এখন অংশ নির্বাচিতপ্রায়। ক্যাপ্টেন ব্লেকার যখন ১৭৮১ সনে ব্যারেন আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি তখন এখানে অগ্ন্যংপাত হতে দেখেছিলেন। তারপর আর কোন লেখকের বই থেকে অগ্ন্যংপাতের খবর আর পাওয়া যায় নি। আর একটি সম্পূর্ণ নির্বাচিত আগ্নেয়গিরি Narkondam Island. কবে এখান থেকে আগুন বের হতে দেখা গিয়েছে, কেউ বলতে পারেন না। ব্যারেন দ্বীপের মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বের হয়।

প্রথম দর্শনে অদ্ভুত লাগে আগ্নেয়গিরি ব্যারেন আগ্নেয়গিরি দেখতে। ঠিক পিরামিডের মত কোণাকৃতি গাছপালা শূন্য একটি পাহাড়। ওপরে ওঠা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দলের সকলে লাঠিতে ভর দিয়ে, থেমে, জিরিয়ে, পাথরের খাঁজে-খাঁজে পা রেখে অতি কষ্টে ওপরে উঠলাম। এই আগ্নেয়গিরির মুখে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। কবে শেষ অগ্ন্যংপাত হয়েছিল জানি না, চারদিকে পড়ে রয়েছে ছড়ানো লাভার স্রোত পাথরের মত শক্ত অবস্থায়। ওপরে যাও বা ওঠা হল—নীচে নামা আরও কঠিন হয়ে ঝাঁড়াল। কত কসরৎ করে যে নামা হল তার ঠিক নেই। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সে রাত্রি ব্যারেন আগ্নেয়গিরি কাটানো হল, কেউ বোটের ভেতর, কেউ বোটের বাইরে।

নারকোণ্ডামও সোজা সমুদ্র থেকে পিরামিডের মত উঠে



আগ্নেয়গিরি ব্যারেন আগ্নেয়গিরি

গিয়েছে। কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্নও কোথাও নেই। ব্যারেন অফিসগুলো প্রচুর ছাগল দেখতে পাওয়া যায়। নারকোণামে কিছুই দেখা যায় না। মিঃ পোর্টম্যান বলেছেন হয়ত নরক অন্ডম থেকে এখানকার নাম হয়েছে নরকন্ডম বা নারকোণাম। বরমণ্ডল উপকূলের ব্রাঙ্কলার নাকি এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় এই অদ্ভুত গঠনের ঝিনু পাহাড়ী দ্বীপটি দেখে নরকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নরকন্ডম'। কে বলতে পারে হয়ত এই 'অন্ডম' কথা থেকেই পরে সারা অঞ্চলের নাম হয়েছে আন্দামান।

পোর্টব্ল্যারে ফিরে আসার পথে গেলাম Oral Kachcha. ক্রীকের মধ্যে দিয়ে ছোট একটি জেটতে গিয়ে মোটর-বাট থামল। ওরাল কাছার পাহাড়ের ওপর ফরেস্টের ডাকবাংলো। কাজকর্ম যা হয় সব ফরেস্টের। চারদিকে কি গভীর জঙ্গল। সব জারোয়া অধিকৃত অঞ্চল। ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে অর্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। ওরাল কাছার কাছেই Spike Island. এই দ্বীপে প্রায়ই জারোয়া আসা-যাওয়া করে। প্রতি বছর সরকার থেকে নানারকম উপহারসামগ্রী এখানে রেখে যাওয়া হয়। জারোয়ারা হুগোব বৃককে সেগুলি নিয়ে যায়। আমরা যখন গেলাম, আগের বারের সন্ধ্যা জিনিষপত্র কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। বোঝা গেল—জারোয়া সে সব জিনিষ নিয়ে গিয়েছে। নুহন করে আবার বালতি, স্য, দেশলাই, দা, লাল-কাপড় সব রেখে দেওয়া হল। লাল-কাপড় জারোয়াদের খুব প্রিয়। চিরাচরিত প্রথায় এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে—উপটৌকন দিয়ে জারোয়াদের বশ করতে। বহুবার জিনিষপত্র সন্ধ্যা হয়েছে, বহুবার তারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছে; কিন্তু ঘাপোষ করতে রাজী হয় নি আজও, কানদিন হবে কি না, সন্দেহ!

Local Administration—চীফ কমিশনার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বমহকর্তা। তাঁকে সাহায্য করার জন্তু আছেন

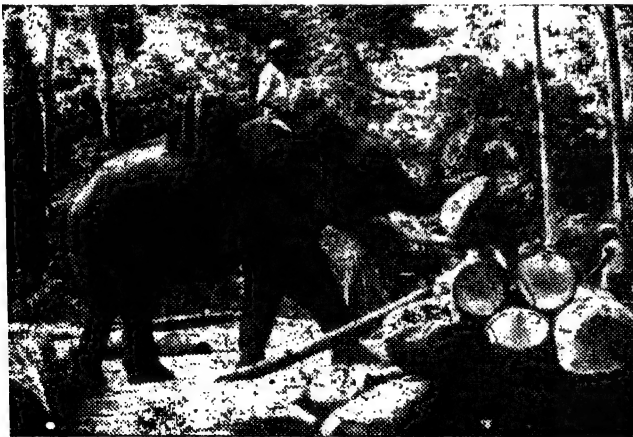
একজন ডেপুটি কমিশনার ও দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। এছাড়া ফরেস্ট, পি ডব্লিউ ডি, মরিন, এগ্রিকালচার, কন্টেক ইণ্ডাস্ট্রি, মেডিসিন, এডুকেশন এবং আরও অসংখ্য বিভাগীয় অফিসাররা আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্তু প্রচুর চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক বিভাগের সিনিয়র অফিসারদের ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে তিন বছরের জন্তু ডেপুটেশনে পাঠান হয়। বারাই ডেপুটেশনে আসেন তাঁরাই শতকরা ৩০-৩৫ শতাংশ বেশি বেতন আন্দামান-অ্যালাউন্স হিসাবে পান।

ফরেস্ট—১৮৮৩ সনে প্রথম বন-বিভাগ দপ্তর খোলা হয়। আন্দামানের অরণ্য বহুসম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার প্যাডক, গর্জন, মাল্‌বল উড পৃথিবীবিশিষ্ট। এই সব কাঠ দিয়ে বাড়ি-ঘর, জাহাজ-নৌকা, আসবাবপত্র খুব ভালো তৈরি হয়। এত অপূর্ণাঙ্গ বনসম্পদ বোঝ হয় ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। কাঠের জন্তু একদিক জঙ্গল কাটা হচ্ছে, অন্যদিক নতুন করে গাছ লাগান হচ্ছে। জঙ্গল যাতে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে না পড়ে সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ নজর আছে। জঙ্গল যদি রক্ষা করা না হয়, তবে বিপদের সন্ধানবাও আছে। অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে soil erosion-এর আশঙ্কা আছে, বার ফলে একদিন হয়ত দেখা যাবে—সমুদ্রের বৃককে এক সারি রুদ্ধ পাথর ছাড়া কিছু নেই। তাই গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাছ লাগানোর কাজও পূর্ণাঙ্গতমে চলছে। আরও একটা বড় কথা, আন্দামানের লোকেরা বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে। সমস্ত দ্বীপগুলি যদি অরণ্যহীন হয়ে পড়ে, তবে বৃষ্টির অভাবে এখানকার লোকদের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হবে। জঙ্গলের কাজে হাঠীকে ভারি সুন্দরভাবে কাজে লাগান হয়। গাছ কাটার পর সেগুলি নিপুণভাবে শুঁড় দিয়ে যখন সরিয়ে নিয়ে ট্রিলিতে তুলে দেয়, দেখতে ভারি মজার লাগে।

পি ডব্লিউ ডি—পি ডব্লিউ ডি আন্দামানের সবচেয়ে বৃহৎ

প্রতিষ্ঠান। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নতির জন্তু পি ডব্লিউ ডি প্রচুর কাজ করছে। বহু বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল, জেটি, রাস্তা সব তৈরি হয়েছে। সাউথ আন্দামান থেকে নর্থ আন্দামান পর্যন্ত একটি বিরাট রাস্তা তৈরি হচ্ছে Andaman Trunk Road. লম্বা প্রায় 'আড়াইশ' মাইল হবে। ভবিষ্যতে 'উইক-এণ্ড' করার জন্তু নর্থ আন্দামান থেকে সাউথ আন্দামান পর্যন্ত যাওয়া তখন খুব সহজসাধ্য হয়ে যাবে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের বৃকের ওপর দিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই রাস্তা তৈরি হচ্ছে। অনেক জারগার জারোয়া এলাকার পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি করার সময় অনেক পি ডব্লিউ ডির মজুত জারোয়াদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

সেন্ট্রাল পি ডব্লিউ ডি থেকে ইঞ্জিনিয়াররা সকলে এখানে ডেপুটেশনে আসেন। আন্দামানে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজকর্ম করা খুবই অসুবিধাজনক।



কর্মরত হাতী

## সবুজ দ্বীপ

সমস্ত মালপত্রের জন্ত মেনল্যাণ্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। কবে জাহাজ এসে, কবে মালপত্র আসবে তবে কাজকর্ম হবে। তার ওপর যদি নামলে তো কথাই নেই। সব বন্ধ। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে মজুর নিয়োগ। রাঁচি ও মাদ্রাজ থেকে মজুরেরা এক বছরের চুক্তিতে কাজ করতে আসে। তারা ফিরে গেলে আবার নতুন মাল আসে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে কোন মজুর পাওয়া যায় না। এত নানারকম প্রতিবন্ধক যে, কোন ঠিকাদার এখানে কাজ করতে ভরসা পান না।

জেটির অভাবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যাওয়ার এতদিন খুবই অসুবিধা ছিল। পি ডব্লিউ ডি'র কল্যাণে অনেক ছোট ছোট জেট তৈরি হওয়ার সে অসুবিধাগুলি দূর হয়েছে। বিশেষ করে দূর-দূরান্তের দ্বীপগুলির উদ্বাস্তদের পায়ে হেঁটে নয়ত ডিকি করে মাইলের পর মাইল এসে তবে অল্প লোকালয়ে আসতে হয়েছে। জেটির অভাবে সে সব দ্বীপে ফেরিবাট যেতে পারত না। এখন জেট হওয়ার সপ্তাহে একদিন করে ফেরিবাট করেই সকলে পারাপাস হয়। যে সব উদ্বাস্ত-কলানীর দ্বীপে জেট তৈরি হয়েছে তা হলো—

- (১) কদমতলা
- (২) উত্তরা
- (৩) ছামকুণ্ড
- (৪) টুগাপুর
- (৫) কালারা।

বস্ত্রের জেটও প্রায় শেষ হয়ে এসে।

মেরিন—আন্দামানের যানবাহনের মধ্যে জলবানই আসল। কলকাতা বা মাদ্রাজ থেকে আসতে হলেও জাহাজ, আর এক দ্বীপ থেকে অল্প দ্বীপে যেতে হলেও মোটরবাট। জাপানীরা চাল গেলে মেরিনে কয়েকটি ভাড়া-চোরা বাড়িঘর, কয়েকটি ছোট বাট এবং কিছু পুরাণো সাজসরঞ্জাম ছাড়া কিছুই ছিল না। এখন এখানে একটি ছোট ভাই ডফ আছে, বেশ ভালো একটি কারখানা আছে এবং ছোট বড় অনেক বাট আছে। 'চলুঙ্গা' Cholunga নামে একটি ছোট কুঁয়া Inter-Island-Ferry-Service করে। রাত্রিভাঙ্গা কোন বাট চলাসে কবে না, চারদিকে এত পাঁহাড় যে থাকে খাওয়ার আশঙ্কা আছে। যে চাইটি জাহাজ মেনল্যাণ্ড ও পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে যাতায়াত করে, তাতে সরকারী লোক ছাড়া বেশরকারী লোকের প্যাসেঞ্জ পাওয়া হয়ই ব্যাপার।

এগ্রিকালচার—আন্দামানের প্রধান শস্য ধান। প্রচুর ধান জন্মায় এখানে। নারকেল ও সুপরি হয় অশ্বখণ্ড। পেনাল সেটলমেন্টের গোড়া থেকেই নারকেলের চাষ আরম্ভ হয়। রাজার রাজার নারকেল গাছ সরকার থেকে এখনও প্রতিবছর লাগান হয়। সরকারি Coconut Plantation ছাড়া অনেক

প্রাইভেট কোম্পানীরও এখানে নারকেলের ও সুপরি বাগান আছে। এত ধান হওয়া সত্ত্বেও আন্দামানের পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। বেশিরভাগ খাদ্যদ্রব্যের জন্ত মেনল্যাণ্ডের ওপর নির্ভর করতে হয়। জাহাজ যদি কখনও আসতে দেরি করে তবে বাজারে চাল, ডাল, তেল, ঘি, আলু, পেঁয়াজ কিছুই পাওয়া যায় না। আন্দামানের জমিতে ধান ছাড়া তম্রিতরকারীও প্রায় সবই জন্মায়, তবে বড় চেষ্টা করেও আলু, পেঁয়াজ জন্মানো যাচ্ছে না, শীতের তরকারীও আশানুরূপ হয় না। ফুলও খুব ভালো হয় না।

কর্টজ ইণ্ডাস্ট্রি—কার্টের বেশ বলে খুব সুন্দর সুন্দর কার্টের আসবাব তৈরি হয়। সমুদ্রের শব্দ বিদ্রূক দিয়ে নানারকম সৌখীন জিনিষ তৈরি হয়। আগে শোণের ব্যবসা করে অনেকে প্রচুর রোজগার করেছেন। এখন আন্দামানের সিপি অর্থাৎ শেল-এর ব্যবসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নারকেলের চোবড়ার পাপোষ, কার্পেট, বেতের বুড়ি, চেয়ার, টেবিল এ সব জিনিস খুবই সুন্দর তৈরি করে।

মেডিসিন—পোর্টব্লেয়ারে এবং অজান্টা কয়েকটি দ্বীপে বেশ ভাল সরকারী হাসপাতাল আছে। কিলিংসার দিক দিয়ে এখানে খুব সুবিধা। ডাক্তাররা সকলেই বেশ অভিজ্ঞ এবং বেশ যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করেন। কোন প্রাইভেট ডাক্তার এখানে নেই। সেলুলার জেলের একটি উইং-এ এতদিন হাসপাতালটি ছিল। সম্প্রতি নতুন হাসপাতাল খোলা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'গোবিন্দবল্লভ পঙ্ক' হাসপাতাল। সরকারী ডাক্তাররা প্রাইভেট প্রাকটিস করেন না বলে সাধারণ লোকদের খুব অসুবিধা হয়। রোজ রোজ অসুস্থ ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসপাতালে বাওয়া খুবই কষ্টকর। পোর্টব্লেয়ারে একটি ভাল টি-বি হাসপাতাল আছে।

এলেকশন—পোর্টব্লেয়ারের দুইটি হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল আছে, একটি মেয়েদের ও একটি ছেলেদের। শিকার মাধ্যম হিন্দী ও



আন্দামানের নারকেল বাগিচা



উর্। ফুলগুলি সবই অশৈতনিক। প্রত্যেক দীপেই হিন্দী প্রাইমারী ফুল আছে, উদাস্ত-কলানীগুণিতে বাংলা প্রাইমারী ফুল আছে। কিন্তু পোর্টব্লোয়ে কোন বাংলা হাইফুল নেই। পঞ্চম শ্রেণীর পর বাঙালী ফুলমেয়েদের হিন্দী পড়তে হয়। স্থানীয় বাঙালী ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগ বাংলা শেখে না। উদাস্ত ছেলেমেয়েদেরও একই অবস্থা। আশঙ্কা হয় কুড়ি-পঁচিশ বছর পর এই যোগ হাজার পূর্ববঙ্গের বাঙালী নিজেদের ভাষা, নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভুলে যাবে, তাদের মধ্যে বাঙালী কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানকার হাইফুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকলেও বাঙালী শেখার কোন বন্দোবস্ত নেই। শিক্ষকের সমস্যাও প্রবল। যদিও মেনল্যাণ্ডের থেকে অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয় তবুও কোন ভাল কোয়ালিফাইড শিক্ষক এখানে আসতে চান না। এক বছরের বেশি হল স্থানীয় বাঙালীদের চেষ্টায় একটি বাঙালী ফুল পোর্টব্লোয়ে স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্তি-রক্ষার্থে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'রবীন্দ্র বাঙালী বিদ্যালয়।' সকলে মিলে চাপা তুলে ফুলের খরচ চালানো হচ্ছে। সরকারী ফুলগুলি অশৈতনিক হওয়াতে বাঙালী ফুলও অশৈতনিক রাখতে হয়েছে। কিন্তু এরকমভাবে চাপা তুলে ফুল চালানো খুবই কঠিন। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়।

আন্দামানে পানীয় জলের বড় অভাব। যদিও চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে কিন্তু গ্রীষ্মকালে পোর্টব্লোয়ের এমন অবস্থা হয় যে, রাগা হয় তো স্থান হয় না, স্থান হয় তো রাগ হয় না। সম্প্রতি পি ডব্লিউ ডি ডেয়ারী ফার্মের কাছে বিরাট একটি Reservoir তৈরি করেছে। আশা করা যায় এর পথে পোর্টব্লোয়ের জলের খুব অভাব হবে না। স্বাভাবিকী ত্রিলাবাহাফুদ শাস্ত্রী বিজ্ঞানভারতীর উদ্বোধন করেন এবং নামকরণ করেন 'জহর সরোবর'।

আন্দামানের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। এখানে আসতে হলে প্রথমদিকেই সকলকে বা হাল্কা পোহাতে হয়, যেমন, টাকা নেওয়া ইনজেকশন নেওয়া ইত্যাদি তারই ফলে ছোঁয়াচে রোগ এখানে প্রবেশ করতে পারে না।

সম্প্রতি পোর্টব্লোয়ে All India Radio-র উদ্বোধন হল এবং আধুনিকতার দিকে আন্দামান আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

উদ্বোধন উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। সহরের গণ্যমান্য অতিথিদের নিমন্ত্রণ হয়েছে। রেডিও স্টেশনে জারগা কম থাকার, বাঙালীদের ক্লাব অতুল মৃত্তি সমিতিতে অহুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। সমস্ত অহুষ্ঠানটি টেপ রেকর্ডিং করে রেডিও স্টেশন থেকে বীল করা হবে।

## সমাপ্ত জাগ্রত আমি

কৃষ্ণা ঘোষ

চেয়েছো অবোধে দিই নি কিছুই এমন নয়,

দিরেছি স্পর্শ পেয়েছি হামিরা অন্ধকার।

সেই ভালো আমি যদিও জেনেছি দুঃসময়

চক্রং য় প্রথম প্রহরে আশ্বর্যই মন।

সাড়ে ছয়টার সময় উৎসবের শুরু হল। উদ্বোধন সঙ্গীত 'বন্দোমাতরম'-এর পর স্টেশন ডাইরেক্টর এবং চীফ কমিশনার ভাষণ দেন। তাঁদের ভাষণের সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে চলল টিনের চালের ওপর বৃষ্টির চকচক শব্দ ও বাতাসের আছাড়ি-পিছাড়ি। ভাগ্য ভালো—ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ধরে এল। অহুষ্ঠান-মুঠার মধ্যে বাংলা, হিন্দী, তামিল, মালয়ালীক ভাষায় দেশোদ্দোধক সঙ্গীত ছিল। বাংলায় 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' দিয়ে অহুষ্ঠান আরম্ভ হল। শেষ হল কবি শ্রীবেঙ্গারিয়ার আন্দামানের ওপর লেখা একটি গান দিয়ে:

'কালে কালে বাদল, নীলা হায় জলধি জল,

যাহুয়ালা টাপুও কি হাওয়া বড়ি চঞ্চল।

ধূপ হায় স্ক্রানাহারি, চান্দনী রূপাহারি

ভোর হায় আকুরি, শাম হায় সিন্দুরি

খাড়ি খাড়ি নাচাত হায় নারিয়েসকি জঙ্গল।'

পোর্টব্লোয়ে এলে এখানে নানান দেশের লোক, নানান দেশের ভাষা, নানান দেশের সংস্কৃতি দেখে মনে হয় এও ছোটখাট একটি ভারতবর্ষ। জনপ্রিয় holiday resort বানাবার উদ্দেশ্যে, টুরিস্টদের সুবিধার জন্য আন্দামান সরকার প্রভুত চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের লোকদের অবস্থা মনে হবে, অতদূরে অজানা দেশে কে যায়? তার চেয়ে ধারে কাছেই তো কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। আন্দামান যে কত সুন্দর, তা এখানে না এলে কেউ বুঝতে পারবেন না। কবির করে বলতে ইচ্ছা করে—আন্দামান ধীপপুঞ্জ শব্দের বলয় পরে, প্রবালের মালা গলায় দিয়ে, সবুজ বসনাঞ্চল ছড়িয়ে তার অক্ষরস্বন্দ সৌন্দর্যের ভাঙার খুলে বসে আছে কিন্তু তার সে সৌন্দর্যে মাড়া দেয় কর ভন? যে সবুজ সমুদ্রের কোলে সে বসে আছে, সেখানে পৌঁছান সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন সবুজের সমারোহ, এমন স্থানীয় সবুজের নিবিড়, মিলন, এমন চির সবুজের দেশ ভারতবর্ষ আর কোথায় আছে কি না জানি না। স্বতন্ত্র পরিবর্তন হয়, গাছের পাতা বিবর্ণ হয়, তারপর ধরে পড়ে। এখানে তা চিরও পাতলা যায় না। গাছে পুরোটা পাতা থাকতে থাকতেই নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। পৃথিবীর evergreen forest-এর মধ্যে নাকি আন্দামানের নামও পড়ে। দূরত্ব যদিও অনেক বেশি, বাতাসাতের খরচও অত্যধিক, তবুও আশা করি নতনের আশায় অল্প ভবিষ্যতে অনেকে ছুটির সময় পুরী, দার্জিলিং-এর দিকে না গিয়ে আন্দামানের দিকে পাড়ি দেবেন। এমন সবুজ দ্বীপ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। সবুজ, সবুজ, চির-সবুজের দেশ এটি Happy Island, —আন্দামান।



# কিন্তু ক'রাগিনী

অজিতকুমার রায়চৌধুরী

১৯

মনি যে বেড়েছে তা দীর্ঘ দত্ত জানলেন মুকুন্দপুরে গিয়ে।

মুকুন্দপুরে কুঞ্জ রাহাও সেদিন মিটিং করার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তা হল না। ফলে দীর্ঘ দত্তের সভায় আশাতীত লোক সমাগম হল। সভায় প্রথমে বক্তৃতা দিলেন স্থানীয় কয়েকজন বক্তা তারপর উঠল মানব পাল। হাতের আস্ত্রিন গোটাতে গোটাতে জনতাকে সাবোধন করে বললে—বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আজ পাশেই আরও একটা সভা হবার কথা ছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা সে সভা আজ করলেন না, অনিবার্য কারণ দেখিয়ে সে সভা বন্ধ রাখলেন। কিন্তু কি অনিবার্য কারণ তা আপনারা জানেন কি? বলে কোমরে হাত দিয়ে উত্তরটা শোনবার জন্তে থেমে গেল।

জনতার মধ্যে দীর্ঘ দত্তের লোক ইতস্তত ছড়ান ছিল, তারা জবাব দিলে—না, না, কারণ জানি না।

মানব বললে, জানবেন কি করে? ভবে শুভন।—বলে সকালবেলা কুঞ্জ রাহা নিজের স্বাধীনতার জন্তে নিজের একমাত্র মেয়ের কি সর্বনাশটা করতে বাচ্ছিলেন তা ফলাও করে সকলকে শুনিয়ে বললে—বন্ধুগণ, আমাদের অনেকেই ঘরে শিক্ষিতা অনুটা কষ্টা আছে অর্থাভাবে তাদের বিয়ে আমরা দিতে পারছি না। কিন্তু তাই বলে এইভাবে তাদের সর্বনাশ করার কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে আসে কি?

সভার ভেতর থেকে ধনি উঠল—না, না, না।

অথচ আজ এমন একটা জবজ্বল লোকের সাক্ষাৎ মিলল, যে এম এল এ হবার জন্তে বাণেশের মর্মান, কষ্টার সম্মান, তার ভবিষ্যৎ সব কিছুই ধুলোর মিশিয়ে দিতে বাচ্ছিল। এম এল এ হবার জন্তে যে লোক এত নীচে নামতে পারে মজী হবার সুযোগ পেলে সে কি চোরাকারবারী, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাবে না?

—মেলাবে, মেলাবে, মেলাবে।

—তবে? আপনারা কি এই রকম লোককে এ জেলা থেকে এম এল এ করে পাঠাতে চান?

—না কখনই না।

—তবে কাকে পাঠাবেন? কাকে আপনারা ভোট দেবেন?

—দীর্ঘ দত্তকে, দীর্ঘ দত্তকে।

—কেন দীর্ঘদত্তকে ভোট দেবেন?

—কারণ আছে, কারণ আছে।

—কি কারণ?

—আপনি বলুন, আপনি বলুন।

—ভবে শুভন। চুল দাড়ি কাটলেই মানুষ ছোট হয়ে যায় না, কারণ কোন কাজই ছোট নয় কোন মানুষই নীচ নয়। তাই বলে সব মানুষই সমান নয় তার মধ্যে স্তর আছে ওর-তম আছে। মানুষ তার শিক্ষা, দীক্ষা ও রুচি অনুসারে এক এক শ্রেণীর হয়। রাস্তায় বসে যে লোকটা জুতো সারাজে, চলতি কথায় তাকে আমরা বলি মুচি, সে যদি স্বজাতি হয় তবুও তার সঙ্গে নির্ভর ঘরের মেয়ের বিয়ে দিতে আমরা হামলে পড়ি না, কিন্তু সেই লোক যদি বিদেশ থেকে ট্যানি-এ ডিগ্রা নিয়ে জুতো তৈরি বা সারাবার কারখানা খোলে তখন “কি হবে—?”

উত্তর এল—হামলে পড়বো, হামলে পড়বো।

—ঠিক, হামলে পড়বো। কেন না সে তখন আমার সমান হয়েছে। তেমনি কুঞ্জ রাহা যার হাতে মেরেকে মূণে দিচ্ছিলেন তার যদি চুল দাড়ি ছাঁটা বিবয়ে বিদেশী ‘এমসি’ বা ‘মাস্টার ক্লিপার’ ডিগ্রী থাকতো তা হলে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু সে লোকটা অত্যন্ত সাধারণ একজন নাগিত। অথচ আপনারা জানেন কুঞ্জ রাহা যার মেয়ে মেম সাহেবকে খুলে লেখাপড়া শিখছে, মুন্দরী, আপনারা কি বলতে চান যে রাহা বশায়ের কন্সার ঐ নাগিতের চেয়ে ভাল পাত্র জুটতো না?

সভার এককোণ থেকে জবাব এল—কেন আপনিই তো হাতের গোড়ায় ছিলেন। এই কথায় সভায় কিছুটা হটগোলের সৃষ্টি হল। বৈদিক থেকে কথটা শোনা গিয়েছিল মানবের চেলারা সেইদিকে গেল। নিরীহ কয়েকজন লোকের ওপর চোটপাট হল বটে, কিন্তু আসল আসামী ধরা পড়ল না।

মানব পাল বলতে লাগল—বন্ধুগণ, সাধারণ মানুষ হিসেবে দীর্ঘদত্তের করবার কিছুই ছিল না। বাপ তার মেরেকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে কি বলি দিচ্ছে এমন তো রোজ হয় আমরা দেখেও দেখি না। কি দরকার পনের ব্যাপারে নাক গলাবার? প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দীর্ঘদত্তের বরং এতে মজা দেখাই উচিত ছিল, সাধারণ মানুষ হলে তিনি তাই করতেন। কিন্তু বন্ধুগণ, দীর্ঘ দত্ত এই জেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তিনি শুধু বড়লোকই নয় বড়মানুষও বটে। ক্রোধাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকেই জব্ব করবার জন্তে নিজের একমাত্র কন্সার সর্বনাশ করতে বাচ্ছে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, বিপদের মুঁকি নিয়ে সেই মেরেকে তিনি উদ্ধার করলেন এবং তাঁকে পূত্রব্দ করে নিজের সংসারে গ্রহণ করলেন। ক’টা লোক একাজ করে, ক’টা লোক একাজ পারে?

আবার সভার ভেতর থেকে জবাব এল—কেউ পারে না, কেউ পারে না।

মানব পাল গর্কে উঠল—কেউ পারে না নয়, অন্তত একজন যে পেরেছেন তা তো আমরা দেখলামই, তবে ও কথা বলছেন কেন? বলুন, কোটিতে একজন পারে।

—কোটিতে একজন পারে, কোটিতে একজন পারে।—সভা থেকে জবাব এল।

মানব যুগি হয়ে বললে—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনারা। কিন্তু আমরা কানাপুথায় শুনেছি দীঘুবাবুর বিরুদ্ধে মেয়ে কোসলানোর মামলা আনবার চোড়জোড় চলছে।

কথাটা শুনে দীঘু দস্ত ভয় পেলেন। মানবের সার্ট ধরে টান মেয়ে তাকে ধামিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু মানব ধামাবার পাত্র নয়। বলতে লাগল—এ কথাটা বল এটা দীঘুবাবু চাইছেন না। তিনি বলতে চাইছেন যে যাই হোক তিনি মাথা পেতে নেবেন। কেনও রকম পুরস্কারের আশায় তিনি এ কাজ করেন নি মাহুয হিসেবে মাহুযের কর্তব্য করেছেন মাত্র। কাজেই মামলার কথা না তোলাই ভাল। আমি বলি, না, দীঘুবাবু যেমন তাঁর কর্তব্য করেছেন তেমনি আমাদেরও কর্তব্য আছে। যদি নারীত্বাভা প্রার্থে উৎসর্গপ্রাণ এই মহান ব্যক্তিকে ফুসলানোর দারে আদালত প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে আমরা কি করব?

গগনভেন্দ্রী ধনি উঠল—হরতাল, সর্বাঙ্গিক হরতাল।

—ঠিক। সর্বাঙ্গিক হরতাল। তবে সে পরের কথা। মামলা হলে তবেই হরতাল। এখন কথা হচ্ছে আমাদের ভাগ্যক্রমে যখন আমরা এমন একজন মহামানবকে আমাদের জেলার প্রতিনিধি করে পাঠাবার সুযোগ পেয়েছি তখন সে সুযোগ যেন আমাদের আর পাঁচজনের কথার না হারাই। সুতরাং আমাদের আর কোনও বিদ-সঙ্ঘাত থাকা উচিত নয়। দীঘুবাবু ও তাঁর গুরু মার্কো বাল্ল ছুট্টা আর কোনও কিছু যেন আমাদের চোখের সামনে না ভাসে, মনের কোণে ঠাঁই না পায়। আগুন, এই সভায় আমরা দীঘুবাবুকে কথা ক্বিই যে, তাঁকেই আমরা ভোট দেব। ভোট ফর—।

—দীঘু দস্ত।—সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, এমন কি দীঘুবাবু নিজেও।

—এই তো চাই। এবার বলুন, নারীত্বাভা দীঘু দস্ত—।

—জিলাবাদের।

আগে শীতকাল বলে সাতটা না বাজতে বাজতেই হেমনে ডাক্তার, হেড পণ্ডিত-শাই, গুই চাট্জ্য, বিছে উকীল ইত্যাদি মহা মহারথারা উঠি-উঠি করতেন এবং সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই শিথির ত্যাগ করতেন। কিন্তু সেদিন সাড়ে আটটা বাজলেও কেউ ততবার নাম করলেন না এবং অবস্থা দেখে কেউ যে সেদিন উঠবেন এমনটিও মনে হল না।

অবস্থা শোচনীয়। দুপুর থেকেই দীঘু দস্তর সতীলক্ষী স্ত্রীর কথা সহরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে। লোকে বস্ত্র দস্ত করছে, ম্যা ল্লোলোক বটেন—সাক্ষ্য দেব। এমন দেবার পতি মানব হতে পারেন না, অতএব দীঘু দস্ত সাক্ষ্য দেবতা। ‘অডান্ট ফ্রানচাইস’ এর

কল্যাণে অনেক ভূমিমালা ভোটের হলেও দেবতা ফেলে দানব বা মানবকে ভোট দেবে এমন যাঁড় এই ধর্মপ্রাণ দেশে বড় একটা নেই। সুতরাং কুঞ্জ রাহা হারাব কি হবে তা না বললেও চলে। ফলে, ধীর জন্তু রাহামশাদের এই হাল হল সেই বিছে উকীলের ওপর সবার আক্রোশ দুপুর থেকে বার বার হল ফুটিয়ে চলেছে।

বিছে উকীল নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বাধ্যবাধন হজম করলেন, কিন্তু বার বার একই কথা শুনতে শুনতে শেষে অতিরিক্ত হয়ে বললেন—এখন তো সবাই আমার দৃষ্টিতে, তখন দেখে বার বার বলছিলেন, উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন,—উকীলবাবু একটা ব্যবস্থা করুন। তাই তো আমি—

গুই চাট্জ্য উত্তেজিত হয়ে বললেন, কে বলছিল? আপনারা বলে বেড়াতে গেলে সবাইকে জড়ালে চলবে না, নাম করুন।

—আপনি, ডাক্তারবাবু।

—আমি।—গুই চাট্জ্যের আর বাক্য-কৃতি হল না।

হেমন ডাক্তার গরম হয়ে বললেন, আমি আপনাকে বলেছি যে ও বিয়ে কাঁচিয়ে দিন? শুধুমাত্র কুঞ্জাবু।—

—কুঞ্জাবু শুনাযনি কি? মটরে করে কলকাতার পালিয়ে বাবার পরামর্শ দেন নি? তাতে কি বিয়ে পাকা হ'ত?—বিছে উকীল স্তম্ভিত গলা চড়িয়ে বললেন—চূপ করে কেন? আমিই বরং তখন আইন ভুলে বলেছিলাম যে আইনত এ বিয়ে বন্ধ করবার আমাদের কোনও অধিকার নেই, চাট্জ্যমশাই তখন তো শকুন বানিয়ে গো-ভাগাড় দেখিয়ে ছেড়ে ছিলেন।

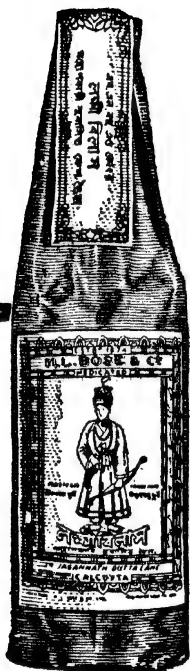
কি? গুই চাট্জ্য মশাই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন তার আগেই জেড পণ্ডিতমশাই বললেন—বাক্ গো পুরান কাহ্নী ঘেঁটে লাভ মেই। এখন এক কাজ করুন কুঞ্জাবু অখিলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন। এ বিয়ে বলতে গেলে বিয়েই নয়। কোথাকার কে এসে ঘরের ঝেঁঝে টেনে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরিবে দেবে অমনি তাই যদি যেনে নিতে হয় তা হলে সমাজ থাকে না। আজ যদি চাট্জ্যমশাই আত্মপারবারকে টেনে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরিবে বলেন যে এ আজ থেকে, আহা! চটবেন না চাট্জ্যমশাই ওটা আমি কথার কথা বললাম।

—চটি নি পণ্ডিত। ওটা যে উপমা দিচ্ছ তা বাস্তবের মত ক্ষমতা জ্ঞেমানদের চাট্জ্য মশায়ের কাছে। কালিদাস কিছু কিছু এককালে পড়েছি—তাই কর কুঞ্জাবাজী তাই কর। আমিও ঐ কথাটা ই লবাহলুম, তা পণ্ডিত আগেই বললেন। তাই কর। আমি ব্রাহ্মণ তোমার গুরুজন, আমি বলছি এতে তোমার কোনও পাপ হবে না।

কুঞ্জ রাহা হাত জোড় করে বললেন; তা হয় না গুইকাকা, মায়ের সামনে মেয়ে যখন একজনকে গ্রহণ করেছে তখন অন্য লোকের সঙ্গে আর তার বৈধিতে পারব না। আমার একমাত্র মেয়ে তাকে ত্যাগ করতে হবে, সমস্ত সম্পত্তি পারিবারিকে দান করতে হবে, তা হোক, তবুও মায়ের সামনে সে যাকে গ্রহণ করেছে তাকে নাকচ করতে পারব না। মার ইচ্ছেই বোধ হয় এটা। আমি কে? ভাবছি আমার যদি আজ আরও গোটা কয়েক মেয়ে থাকতো তা হলে তাদের একটাকে অখিলের সঙ্গে।—উঃ! ভগবান সে পথও মেয়ে রেখেছেন।

—তা কি আর জানি না বাবাজী, সবই জানি। মায়ের কত বড়

ହୁଲସନ୍ଦେ  
କି ଥୁବ  
ଚିନ୍ତିତ?



ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ଓଷଧୀର  
ଅକଳ ଅମୟର  
ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼େ ।

**ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ**  
ତେଲ

ଏମ୍. ଏଲ୍. ବସୁ ଏଓ କୋଂ (ପ୍ରାଇଭେଟ) ଲିଃ  
ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ହାଉସ :: କଲିକତା-୨

ভক্ত তুমি। কিন্তু পোড়া মন মানে না তাই এটা-সেটা পাঁচ রকম বলি। আজ বাদে কাল ভোট, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে সব বরবাদ হয়ে গেল। মনের জোর আছে বলেই এখনো সিধে হয়ে বসে আছে আমি হলে টাল খেয়ে পড়তুম—গুঁই চাটুকে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন।

এটা চাটুকে মশাই ঠিকই বলেছিলেন। ভেতরে ভেতরে রাহা মশাই সত্যিই টাল খেয়েছেন। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে যে কাজ করতে বাচ্ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার তার পরিণামে ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠলে তিনি শিউরে উঠছিলেন। এই চরম সর্বনাশের হাত থেকে যিনি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন সেই বৌঠাকরুণের উদ্দেশ্যে মাথাটা তাঁর বার বার মুখে পড়ছিল। বৌঠাকরুণ শুধু তাঁকে বিপদ থেকেই উদ্ধার করেন নি যা তাঁর মনে মনে বাসনা ছিল অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বাসনা আজ বলে নয় ভবিষ্যতেও পূর্ণ হ'ত কি না সন্দেহ—সেই মনোবাহাও অস্বাচিতভাবে পূর্ণ করেছেন। ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে বৌঠাকরুণের পায়ে ধুলো নিয়ে আসেন, কিন্তু সালোপান্না তা হলে টিটকারী দিয়ে ধূলপান্নি উড়িয়ে দেবে এই ভয়ে সে কাজটা করতে পারছিলেন না। মনে মনে তাঁর পায়ে ধুলো নিয়ে রাহা মশায় বললেন, বৌঠান আমার তুমি ছোট ভাই-এর মত স্নেহ কর, ভালবাস তা' জানতুম, কিন্তু সেটা যে এত গভীর তা' জানা ছিল না। ছেলের বৌ করে কেবল রাগিনীকেই নয় আমার আঁখি চোখপুরুষকে—নাঃ—অতটা বলা ঠিক হবে না, আমি অবধি বলাই ভাল, মেরে কেটে না হয় আর এক পুরুষ—খা'গে ও কথা না হোলাই ভাল। হ্যাঃ—আমার গিনী তোমার ছেলে শুকদেবের—মোজাভটা আবার খিচড়ে গেল। ছেলে হিসেবে শুকদেব অবশ্য মন নয় কিন্তু শুধু তো মায়ের ছেলেই নয়, বাপেরও। আর বাপের বেটা ও সিপাহীর বোড়া উভয়েই খোরা খোরা গুণ ইনহেরিট করে। কাজেই দীর্ঘ দস্তের নষ্টামির কিছুটা শুকদেবের মধ্যেও থাকবে। কুঞ্জ রাহা চিন্তিত হলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বার করলেন যে মাটি বেখানকারই হোক ছাঁচ যদি ভাল হয়, মালও তা হলে ভাল হবে। রাহামশাই আরও কিছু চিন্তা করে বার করতে বাচ্ছিলেন এমন সময় কাদা ঘোষাল এল।

কাদার প্যাট ধুলো মাথা, কোমরে র্যাপার জড়ান, সাট-এর জায়গায় জায়গায় পানের পিক, মাথার চুল উন্মোখা, চোখ দুটো আধখোলা অত নীতের মধ্যেও কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম।

হেড পণ্ডিতমশাই কোনও কথা না বলে নাকে চাদর দিলেন।

গুঁই চাটুকে মনে মনে বললেন, গুরোটা টেনেছে দেখছি।

হেমন ডাক্তারও মনে মনে বললেন—মুঠসেল।

বিচ্ছে উকীল জিজ্ঞেস করলেন—এত দেরি যে। আর সব কোথায়?

কাদা কোনও জবাব না দিয়ে ফরাসের একপাশে ধপ করে শুয়ে পড়ে হাঁফাতে লাগল। হেমন ডাক্তার বললেন—কি হে উকীলবাবু? কথার জবাব দিলে না যে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—দিচ্ছে দিচ্ছে, দেখছেন না কেমন হাঁফাচ্ছে একটু বিশ্রাম করুক।

কাদা অতি কষ্টে উঠে বসে বললে—বলুন তো শ্র। ডাক্তারবাবু যেন সব সময় তাঁর বেতো ঘোড়ায় জিনু দিয়ে বসে আছেন। ভালো খালা। বলুন শ্র উকীলবাবু কি বলছিলেন।

হেড পণ্ডিতমশাই বললেন—বল দেখি কি খবর, সেই তখন থেকে হা-পিতাস করে সব বসে আছি। বল, কা'চ বার্তা।

কাদা বুড়ো আঙুল নেড়ে বললে—বাহত! আপনাদের কাঁচকলা।

কুঞ্জ রাহা বললেন—এত দেরি যে! আর হুঁজন কোথায়! কাতিক, গজেন—

—জোশীদ। মুকস্বপুুরেই রয়ে গেল, কেতো আর বিষ্টু ডাইভার গাড়িতেই ঘুমুচ্ছে। কেতো তবু কিছুক্ষণ আগে অবধি জেগেছিল, কিন্তু বিষ্টুর কথা আর বলবেন না। শব্দ শুঁড়ির দোকান ছাড়তে না ছাড়তেই চুলতে আরম্ভ করলে, গাড়ি চালাবে কি। আমি তো শ্র ভয়েই মরি, গাছের সঙ্গেই ভিড়িয়ে দেয় কি খানায় নামিয়ে দেয় কে জানে। কোনও রকমে ফটনটি করে শালাকে জাগিয়ে গাড়ি নিয়ে এসে পৌছেছি।

গুঁই চাটুকে বললেন—মুকস্বপুুরের মিটিং-এ ছিলি?

—ছিলুম না মানে? তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলুম?

—ছিলি তো সেই কথা বল না। সেই কথার জন্যে সব বসে আছে, আর ও নিয়ে এস ফটনটির কথা। এত দেরি হল কেন, তাই বল না।

কাদা আবার ফরাসে শুয়ে পড়ে বললে—সকথা জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দিও না দাঃ।—সেলে কুঞ্জ রাহাকে হাতজোড় করে বললে—সে বড় লজ্জার কথা শ্র শুণ্যবেন না।—আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কুঞ্জ রাহা দেখলেন এর মতে মত দেওয়াই ভাল, বললেন—বেশ তো, ঘুম পাচ্ছে ঘুমোও। গুঁইকাকা ওকে আর বিরক্ত করে কাজ নেই। ও ঘুমোক।

কাদা আঙুলে আঙুলে উঠে বসে বললে—না শ্র, বিরক্ত আর কি। ঘুমটু ম পরে হবে মন। দেরি হল কেন বলছেন? সব ডাকবালোর মাঠ ছাড়িয়েছি, অমনি গাড়ির বারোটা বেজে গেল। আমি আর কেতো মিলে ঠেলছি তো ঠেলছি, গাড়ি শালায় আর তা'ত'বার নামটি নেই। বিষ্টু বললে, চ' শালাকে ফেলে রেখে হেঁটে মেরে দি, কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।—তারপর হেসে বললে—আপনার ভুতের ভয় আছে কি না জানি না শ্র কিন্তু আপনার গাড়ির বোধ হয় ভুতের ভয় আছে, কঁাকা মাঠে পড়ে থাকবার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে গর করে উঠল। বেশ চমকে লাগল কিন্তু কপালে লিখিত গেরো কোন শালা কি করিয্যতি। আবার ক্রম আওরাজ, টায়ার গেল, গাড়ি কেরো'থ খেয়ে পড়ল, তবে বাঁচোয়া কাছেই শব্দ শুঁড়ির দোকান, লোকে গিজ গিজ করছে। হুঁবেটাকে মাল খাওয়ার লোভ দেখিয়ে বিষ্টুর সঙ্গে লাগিয়ে দিলুম, ওরা টায়ার ঠিক করতে লাগল। আমি আর কেতো পোকানে চুকে মুখে দানপানি দিয়ে চাক্সা হলুম, মেহনতটা তো শ্র কম হয় নি। তারপর আবার অখিলের দোকানে এসে গ্যাঁজালুম, তা ভাতেরও বটখানেক গেল। এখন আপনাই বলুন দেরি হবে কি না।

কুঞ্জ রাহা মনে মনে চটে গেলেও মুখে বললেন—তা তো বটেই।

হ্যা ভাল কথা গজেন মুকস্বপুুরে রয়ে গেল কেন সে কথা তো বললে না।

কাদা বিরসবদনে বললে—জোশীদ! একবার শে'ব চেষ্টা করবে

## শিল্পক রাগিণী

কান্দা বদি লোকজন জুটিয়ে কাগ একটা মিটিং করা যায়।  
কিন্তু কান্দা বললেন—কি হয়েছে?

—আপনার ছাদ হয়ে গেছে।

এই কথার সকলে সিঁধে হয়ে বসলেন যেন শ্রাব্দের নেমস্তূত্র খেতে  
বসেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থেকে সকলের মেজাজই আবার গরম  
হল। কারণ, পরিবেশনকারী কথাটা বলেই সেই যে আবার শুলেন  
আর সহজে যে উঠবেন এটা মনে হল না।

কুঞ্জ রাহা এবার কড়া স্বরে বললেন—কাদা, উঠে বস কি  
হয়েছে।

কাজ হল। কাদা উঠতে উঠতে বললে—বলছি স্ত্র, কি বলব  
আর রাজামুদ্রা ডেবে ঠিক করার জন্যেই গড়িয়ে নিচ্ছিলুম।

যতটা সম্ভব বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে কাদা বললে—মানব পালের  
বড় হিংস্র হয়েছে। শালা বলে কি না কুঞ্জ রাহা জঘন্য লোক, মেয়ের  
সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল, নাপুত্রের সঙ্গে বেঁচে দিতে যাচ্ছিল। বেশ  
করছিল, তাতে তোর বাবার কি রে। এই বলে দিলুম স্ত্র, শালাকে  
ঠিক ছোঁবল মাঝে।

কুঞ্জ রাহা রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন—আর কি বললে?

কাদা যতটা সম্ভব বিস্তারিত চোখে বললে—বলবার আর কি  
বাকি বইল স্ত্র, শুধু বাপ তোলে নি। ও হ্যাঁ, তারপর বললে,  
দীঘ দত্ত দেবতা, অনেক বুকি নিয়ে পরের মেয়েকে বাঁচিয়ে নিজের  
ছেলের বেঁচে করেছে। কত বড় হারামী দেখুন স্ত্র, একবারও বললে  
না যে, বাপ-বেটা মিলে অনেক দিন থেকেই তালে ছিল কি করে  
মেয়েকে হাত করে স্ত্রের সম্পত্তি বাগানো যায়।

—হঁ। তারপর, আর কি বললে?

—আর কি বলবে খোড়ার ডিম। সবাইকে বলে দিলে মহামানব  
দীঘ দত্তকে ভেট দিতে। একদিন যেন দীঘ দত্ত আর গরু এ দুটো  
কথা সবাই জপ করে। আর হ্যাঁ—এ শালায় মাথায় কিছুই নেই।  
আর একটু হলে ভুলেই মেয়ে দিতুম। মানব পাল বললে যে,  
তার নাকি কানাবুয়ার স্তনেছে দীঘ দত্তের নামে স্ত্র নেয়ে  
ফুসলোনের মামলা আনবে। স্ত্র সব শালা তেড়িয়া-মেড়িয়া হয়ে  
এই মায়ে তো সেই মায়ে,—বলে স্বর নামিয়ে বললে—আর  
স্ত্র, এইখানে আপনার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছে।

সবাই বললে মাংসা হলে সকলশে হরতাল হবে। শেষকালে  
লবাই মিলে গলা ফাটিয়ে বললে, নারীতাতা দীঘ দত্ত জিন্দাবাদ।  
জোশীদা' বললে—

হেডপন্ডিত মশাই বাধা দিয়ে বললেন—নারীতাতা নয়—  
নারীতাতা।

—তা হবে। জোশীদা' বললে, কাদা তোরো ছোট গিয়ে খবর  
দে, আমি রাতটা থেকে দেখি কাল মিটিং-ফিট করা যায় কি না। কি  
বলব রাত্তা দিয়ে আসছি স্ত্র লোকে চোঁকোতে চোঁকোতে বাড়ি যাচ্ছে,  
নারী—পন্ডিত মশাই বা বললে তাই, দীঘ দত্ত জিন্দাবাদ।

কুঞ্জ রাহা ফরাসের ওপর ঘুঁষি মেয়ে বললেন—নারীতাতা। দেখাচ্ছি  
মজা। মানব পালের কথাই ফলিয়ে দেবো। বিজ্ঞবাবু কালই মামলা  
দায়ের করুন, দীঘ দত্ত আমার মেয়েকে ফুসলে বার করেছে। যেটাকে

যানি টানিয়ে ছাড়বে। বড় অধিকার দিয়ে ডায়েরী করিয়ে নাজেহাল  
করেছিল, এবার দেখাব মজা।

বিচ্ছে উকীল মাথা চুলকে বললেন—মামলা কি করে হবে?  
মেয়ে তো আপনার ঘরেই আছে।

শুই চাটুজা বললেন—আপনি তো মশাই আচ্ছা উকীল।  
উকীলরা হাজার সজে মামলা করে, আর আপনি এত বড় একটা কাণ্ড  
হয়ে গেল তবু বলছেন কি না মামলা কি করে হবে?

—না—মানে মেয়ে বদি দস্তদের বাড়িতে থাকতো তা হলেও কথা  
ছিল। তা ছাড়া বৌদি নিজেকে মেয়েকে ও বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন,  
তারপর পাড়িয়ে থেকে মায়ের মন্দিরে—মানে—ঠিক বিয়ে নয়,  
এ আর কি, তাই দিয়েছেন—

কুঞ্জ রাহা বললেন—শুইকাক। আমি আবার মেয়ের বে' দেবো।

—আলবাৎ দেবে। কেন দেবে না স্ত্র—এবার চাটুজা  
মশাই ফরাসে ঘুঁষি মারলেন।

হেমন ডাক্তার বললেন—মেয়ে রাজী হবে তো।

কাদা তাকিলোর সঙ্গে বললে—হুঃ! মেয়ের বাপ রাজী হয়ে  
বসে আছে, আর মেয়ে রাজী হবে না। কিন্তু স্ত্র পাশ্চাট কে?

—অখিল।

কাদা মাথা নেড়ে বললে—ওর বাপ রাজী হতে পারে কিন্তু ও রাজী  
হবে না।

—হবে না কেন?

—ঐ যে বললুম স্ত্র আসবার পথে অখিলের লোকনে গেলিছে  
এসেছি তাতাই বুঝলুম ও রাজী হবে না। এ আমাদের 'জোশীদা'  
পেরাজী নয়। মিটিং স্ত্রনেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রান আটছে। আমার  
বললে, বাবার সময় নাপুত্রে শালাকে আবার বিয়ের টোপ ফেলে  
দেখিনু তো। স্ত্রনে আমার তো চোখ টারা, বললুম—বল কি  
জোশীদা'। বললে—বা বলছি কর না। ঐ অখিলের সঙ্গে রাগিণীর  
বে' দিলে তবুই দীঘ দত্ত টুট হবে। তুই গিয়ে কুঞ্জবাবুকে মিটিং-এর  
খবর দে' তাহলেই দেখবি সব স্ত্রনে বলবে মেয়ের আবার বে' দেবে।

হেমন ডাক্তার গদগদ কণ্ঠে বললেন—নিজের ভাই বলে বলছি না,  
গজুর মত বুদ্ধি সারা বাংলা দেশে খুব কম ছেলেই আছে। তোমার  
আগে থেকেই বলে দিলে যে অখিলকে আবার টোপ ফেলে দেখ কাদা!  
কি বুদ্ধি দেখেছ।

—না জোশীদা'র বুদ্ধি হবে না, আপনার হবে। কাদা খিঁচিয়ে  
উঠল, তারপর নরম স্বরে কুঞ্জ রাহাকে বললে—অনেক করে বললুম  
স্ত্র, কিন্তু নাপুত্রে শালাকে পটানো গেল না। বললে, অখিল নাপিত  
হতে পারে কিন্তু তার ইজ্ঞ আছে। সে এঁটো পাতে ভাত খায় না।  
মানোটা বুঝুন স্ত্র, ঐ যে মা কালীর সামনে বলেছে যে, আমি দীঘ দত্তের  
ব্যাটাকে—ঐতেই শালা ধরে নিলে এঁটো পাত। কথাটা স্ত্রনে  
আমারও মেজাজ বিগড়ে গেল, মেয়েই দিতুম, কিন্তু শালা ফুর নিয়ে  
তেড়ে এল তাই পালিয়ে আসতে হল। সমস্যাটা খারাপ বাচ্ছে  
আমাদের, তাই আর কিছু বললুম না, ভোটটা কাটুক, ঠিক ছোঁবল  
মাঝে শালাকে।

কুঞ্জ রাহা কয়েক সেকেন্ডে ভাবলেন—তারপর বললেন—ঠিক  
আছে। বিজ্ঞবাবু, আপনার বৌদিকে বাড়ি গিয়ে বলবেন, আমি রাজী

টি। কালই আমি নিজে—না কাল নয় এখনই চলুন আপনার দায় কাছে যাই। হাঁ করে রইলেন কি, আপনার ভাইপোর সঙ্গে 'নীর' বে' দেব।

বিচ্ছে উকীল আমতা-কামতা করে বললেন—হলে মন্দ হ'ত না।

—কিন্তু কি ?

—প্রফেসর মণ্ডলের মেয়ে বিথির সঙ্গে এর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

হোমেন ডাক্তার বললেন—ওরা তো থাকান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দাদা আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ধোপে টেকে নি।

মির মেয়ে পছন্দ হয়েছে। তা ছাড়া প্রফেসরের হাতে পরস-কড়ি ছে আর আমার ভাইপো বাবাজীরও—

গুঁই চাটুজো বললেন—হিঁ হু হয়ে শেষকালে খীকান মেয়ে যাবে নবোন ? জাত ক্রম আর রইলো না দেখছি।

কাদা বোঝাল বললে—যা বাবা। এ যে সেই নল-দমস্তী প্রে।। পোড়া শোলমাছও জলে গেল। সব বরই একে একে কেটে

হছে। শেষকালে দেখছি আমাদেরই না বরের পিঁড়িতে বসতে হয়।

কথটা শুনেই কুঞ্জ রাহা একদৃষ্টে কাদাকে দেখতে লাগলেন।

কাদা সেটা লক্ষ্য করে বললে—দোহাই শ্রম, কথটা বললুম বলে মাকে যেন বকে বসবেন না, তা হলে আশ্রোও কিন্তু কেটে পড়বে।

বছেড়ে দিন। যা হবার হয়ে গেছে। এখন মেয়েকে ও বাড়িতে

জানবেন না আর ছোঁড়াটাকেও এ বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

হুক দু'জনে দু'দিকে লায়লা-মজলুম মত। বছরখানেক ঘুরলেই

বেন শুকদেব ছোঁড়া বের জন্তে খেপে উঠেছে, বরেন বাবে

খার। দীর্ঘ দন্ত ঠিক তখন ছেলের আবার বে' দেবে। বাস

শনিও মেয়ে কলকাতার নিয়ে গিয়ে ভাল পাস্তর দেখে খুলিয়ে

।। হাতে আর মোটে সময় নেই এখন ল্যাজ গুটিয়ে থাকলে

বে না। কাল থেকে আদা-জল খেয়ে লাগতে হবে। তবে

বেন শ্রম মেয়ে বেন ও বাড়িতে না যার আর ছোঁড়াটাও বেন এ

ভুতে না আসে। মানে শুনেছি ওদের নাকি...খা-কপে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—মিশবে কি, মেয়েকে ঘরে তালি দিয়ে রাখব

জ বেরাতে না পারে।

বিচ্ছে উকীল তাড়াগাড়ি বললেন—খবরদার, খবরদার অমন

টিট করবেন না। একেই তো মেয়েকে বলি দিতে বাড়িলেন বলে

াম রটেছে, তারপর যদি শোনে যে ঘরে তালি দিয়ে রেখেছেন

হলে এ জেলায় বাস করা দায় হবে। কাদা ঠিকই বলেছে,

তুমিও নেহাৎ খারাপ কথা বোলো নি, যদি কথা না শোনে তো কি হবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন শ্রম, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ঘুরে অল্প নিয়ে খাইয়ে দিন, তারপর ঘুরে মাথা জাড়া করে দিন। মেয়েছেলে জাড়া মাথা নিয়ে আয়নার মুখ দেখবে না, চৌকাট পার হওয়া তো ঘুরে কথা।

গুঁই চাটুজো বিরক্ত হয়ে বললেন—মুখাটার কথা শোন। মেয়ের মাথা জাড়া করে দিয়েছে শুনলে লোকে ফুল-চন্দন দিয়ে কুঞ্জবাবাজীকে পূজা করবে, না।

—তা' উকুন হলে মাথা জাড়া করে না তো কি করে ? লোককে তাই বলা হবে যে বড় উকুন হয়েছিল তাই কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নিসিহ বিছানা পাত, কেতাকে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আর। আমি শ্রম আজ এখানেই থাব।

এর পর সত্য ভঙ্গ হল।

২০

পরদিন মিটিং করতে গিয়ে বোকা গেল যে অবস্থা সুরিখের নয়। মিটিং-এ লোক হল ষটে, কিন্তু তারা খালি টিটকিরি সিতে লাগল। ফলে, বড়তা জমল না, কাদার দলবলের সঙ্গে চৌকাঠিকি লাগল। কিন্তু তাতেও কাদা সুরিখে করতে পারলো না। দন্ত বনাম রাহা'র এই গজ-কচ্ছপের লড়াইতে লাং হল প্রাণবলভের। তিনি দু'জনেই এক পাল্লায় চাপিয়ে পোস্টার ছাড়লেন, একটি মেয়ের সর্বনাশ করতে চেয়েছে আর একটি সেই মেয়েকে হাত করে সম্পত্তি মারবার তালে আছে। দু'টোই সমান। অতএব, ভোঃ ভোঃ ভোটাংবুল, ওদের দু'জনের দিকে ফিরেও তাকিও না, প্রাণবলভই তোমাদের একমাত্র বলভ হোক।

কুঞ্জ রাহা'র বৈঠকখানার অবস্থা সেদিন বড় করুণ। রখী-মহারখী'র সব নীরবে বসে আছেন। কান্তিক নুসিহ প্রভৃতি কাদার শিব্যার জানলার কাছে ঈড়িয়ে কিসুফিসু করে কথা বলছে। জি-ও-সি গজেন ও কাদা ঘরে নেই। সবাই তাঁদেরই অপেক্ষার আছেন।

অবশেষে ওরা এল। গজেন ঘরে ঢুকই চলে যাবার জন্ত দরজার দিকে পা বাড়তেই গুঁই চাটুজো বললেন—ও কি চললে যে, খবর-টবর বল।

—কি খবর চান ?—নির্বিকারভাবে গজেন বললে।

গুঁই চাটুজো বিপদে পড়লেন, কি জবাব দেন ? আমতা-আমতা করে বললেন—এই মানে ধর মিটিং—

—মিটিং-এর খবর শুনে আর কি হবে। ও-সব ভোট-ফোট তুলে যান। দাদা, বাড়ি বাবে তো না তোমার আসতে দেখি আছে।

—না দেখি'আর কি। তোর কি শরীর খারাপ হয়েছে।

—না। কাদা, তুই থাক, যা জানিস বল।—গজেন চলে গেল।

—লাও ঠালা। হু-মুখের কন্ডোটা আমার ঘাড়ের পড়ল।—

কাদা হতাশ হয়ে বললে।

গজেনের অমন ভাবে চলে যাওয়াতে সবাই শঙ্কিত হলেন। গজেন বরাবরই কম কথা বলে ইদানীং ভোটের ব্যাপারে ক্যাম্পেনিং-এর জি ও সি'হওয়াতে পদ-গৌরবের চাপে একেবারেই বাকরোধ হয়ে

## কিংবদন্তি রাগিণী

গিয়েছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা তো বলতই না, আর বাও বা বলত দু'চারটে কথা, তা-ও কাদার সাথে। সেই গজেন একসঙ্গে এতগুলো কথাই শুধু বললে না, ভোট তুলে বাবার পরামর্শও দিয়ে গেল, শ্রুতরা অবস্থা সে শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেনাপতির ওপরেই যুদ্ধের হারজিত নির্ভর করে। রাজার কাজ তো খালি রাজদণ্ডটি সামলান আর বিদেশী ব্যাকে টাকা পাচার করা। সেই সেনাপতি যদি যুদ্ধ ভুলে বাবার উপদেশ দেয় তা হলে রাহা মশাইকে কখনো শিশু গ্রহণের ভুল অপেক্ষা করতে হয়, কুঞ্জ রাহা অবশ্য আগেই মনে মনে ভোটের আশা ছেড়েছিলেন, কিন্তু তার দলের কারো কারো তখনও আশা ছিল। যতক্ষণ শাস ততক্ষণ আশ।

হেমেন ডাক্তার বললেন—কি ছে কাদা, কি ব্যাপার বল দেখি। যুগখানা তোলই না। মাথা নীচু করেই বসে বসে।

—কি আর করব বলুন? যদি কেটে ফেলা 'বত তা' হলে বাদ দিয়ে নিশ্চিত হতুম। আপনাদের পাঁচজনকে দরতে কাদা খোঁষালের মাথা আর নজর বুক-পকেটের নীচে এর আগে নামে নি, কিন্তু ব্যাক একেবারে 'ভুঁ'য়ে মিশিয়ে গেল। শ্রেক, এই ভোটের ভঞ্জে।

ভোট মানেই কুঞ্জ রাহা। তিনি ক্র হুঁচকে বললেন—আবার কি হল?

—কি হবার আর বাকি রইল স্তর। পই পই করে সবাই মিলে বললে মোরটার ওপরে নজর রাখবেন, বেন ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে না মেশে, তা হল কই? তা আপনারাই বা অপরাধ কি? আপনার এমন মাথার ঘায়ে কুজুর পাগল। ভোট সামলাবেন, না মেরে সামলাবেন।

কুঞ্জ রাহা বেগে গিয়ে বললেন—ইয়ালী রেখে স্পষ্ট করে বল।

—সেই তো স্তর আমে-দুখে মিলে গেল। শুকদেব ছোঁড়ার সঙ্গে—

—কে বললে?

—ক আবার বলবে স্তর, নিজের চোখে জুবিলা ট্যাঙ্কে আড্ডা মারতে দেখলুম। বিশ্বাস না হয় জোশীদাকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করুন। ওদের দেখে জোশীদা'র বললে, কাদা ঐ প্রাণ আর রাখবো না, তুই বাড়িতে খবর দিস, জলে ডুবাই মরব। রাঁপ দেয় আর কি, অনেক কষ্টে হাতে পারে ঘরে বাগে আনি। মুখে রক্ত তুলে খাটছে জোশীদা, তাই চোটেটা খুব লেগেছে। তা ছাড়া অত করে বলা হল মোর ঘরে রাখবার ভঞ্জে। শ্রেক একটা হয়ে যেত। তবে এও ঠিক জোশীদা'র কিছু হলো কাদা খোঁষাল লঙ্কাকাণ্ড করে ছাড়ুক, বাগের খাতিরও রাখত না।

হেমেন ডাক্তার বেন চোখের সামনে ভাই-এর জলে ডোবা লাগ দেখলেন, কড়কটে বললেন—কি সর্বনাশ, তারপর?

—বা: বাকী আরো মশাই সর্বনাশ আর হল কোথায়। হল কি এখন এখানে থাকতুম। জানেন স্তর, তবে সত্যি কথা বলি, জোশীদা বার বার বলছে, কাহু মেয়েটা ছোঁড়াটার সঙ্গে মিশবে না তো? মিশলে কিন্তু পেজটিজ টিল হয়ে যাবে। বললুম, না, স্তর ঠিক আটকে রাখবে। জোশীদা'র মাথা নেড়ে বললে, ও না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তুই বর তকে তকে থাকিস। না হয় কাককে দিয়ে মজর রাখ। জোশীদার কথা ঠিক বলে গেল। তালো শিটেকে

কেইবাধুর চারের পোকানে বাগিরে রেখেছিলুম। শুকদেবকে মহাবীরের সঙ্গে বেরতে দেখে শিটেও ভাবের পেছু নেয়। তারপর কিছুদূর গিরে দেখে কবরেজের মেয়ের সঙ্গে অমুপান আসছে।

বিছে উকীল বিম্বিত হয়ে বললেন—কবরেজের মেয়ের সঙ্গে অমুপান। সে আবার কি?

কাদা রান চেপে বললে—অতি দুখেও হাসি আসে। কবরেজের মেয়ে হচ্ছে তুলুকা আর অমুপান হচ্ছে স্তরের মেয়ে। শিটে শালার দেওরা নাম। কবরেজের বাড়িতে অমুপান লাগে তো, তাই বললে। শিটে বোটা ব্যাকার দলে ছিল কি না, তাই মাঝে মাঝে এইসব পিনিক কাটে যে শুনে মরা মানুষকেও ঠাঁত বার করতে হবে।

কুঞ্জ রাহা বললেন—শিটে দেখেছে?

—শুধু শিটে কেন, আমরাও দেখেছি। সাইকেল চেপে ঘুরে আমাদের খুঁজে বার করে। ভাগ্যি ভাল যে আমাদের পার, নইলে ওর কথা আমরাও বিশ্বাস করতুম না।

—তোমরা দেখলে?

—শুধু দেখলুম। কথা অবধি বলেছি। শুকদেব মহাবীর হুঁজনেই কথা বললে। আপনার মেয়ে অবিব্রি মাথা নীচু করে ছিল। কবরেজের মেয়েও কথা বললে। মহাবীর ছোঁড়ার আবার ইংরিজী ছাড়া বুলি কেটে না। ভোটটা থামুক, ছোঁড়াটাকে নোব একহাত। তবে আপনার জামাই, মানে—

—কাদা—কুঞ্জ রাহা গর্জে উঠলেন। —কি—মানে—স্তর।

—তোমার সাধনান করে দিচ্ছি। ঐ জামাই কথাটা বেন বিতীরাবার না শুনি। —বলে গট-গট করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

রাগিণী স্তর ছিল, বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বাপ জিজ্ঞেস করলেন—বিকলে জুবিলা ট্যাঙ্কে গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বেড়াতে।

—বেড়াতে। না বেড়াতে রাজকস্তুর ঘুম হয় না। ব্যরণ করি নি? পাঁজী, বদমাইসু।

রাগিণী অবাক হয়ে বাগের মুখের দিকে চেয়ে রইল, এমন কথা এর আগে বাগের মুখে শোনে নি। সে অসুটবলে বললে—হারা।

—খবরদার বাবা বলে ডাকবি না, আমি তোমার বাবা নই। লোকের কাছে আমার খুণ দেখাবার উপায় নেই। একটা লম্পট ছোঁড় তার সঙ্গে আমার মেয়ে—

রাগিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে—হারা, তুলে যেও না তিনি আমার স্বামী। মা কালী সাক্ষী রেখে আমার মা তাঁর হাতে আমাকে তুলে দিয়েছেন, আর আমিও তাঁকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছি।

—ও-সব কালী-কালী আমি মানি না। আমরা বিবেক, কৃষ্ণ আমাদের দেবতা।

—তুমি না মানতে পার, আমি মানি। তিনিই আমার স্বামী।

—স্বামী। বাগের সামনে স্বামী-স্বামী বলতে লজ্জা করছে না। চলে যা'তোমার স্বামীর কাছে, দু'হ' আমার বাড়ি থেকে।

—বেশ।

রাগিণী খাট থেকে নেমে ছুঁপা যেতে না যেতেই কুঞ্জ রাহা তার হাত ধরে এক হেঁচকা টান মেয়ে বললেন—কোথার বাচ্চিস? এত তেজ।

রাগিণী আতঁদ করে উঠল।

ওপরে কি হচ্ছে শৈলজা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, খেপা এসে চুপি চুপি বলতেই হাতের কাজ ফেল তিনি ওপরে উঠে এলেন। ওপরে এসে দেখলেন কুঞ্জবাবু যা' মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছেন আর রাগিণী নীরবে তাই মুখ বৃজে শুনে যাচ্ছে।

শৈলজা বললেন—আচ্ছা, এই নিশ্চিন্তি রাতে লোক না হাসালেই কি হ'ত না। কি পাগলামি করছ?

—আমি হাসাচ্ছি, না তোমরা মামে-ঝিয়ে হাসাচ্ছে। পাগলামি। আমি পাগল হই এই তো তোমরা চাও।

—আমরা চাইব কেন, চার তোমার ঐ বৈঠকখানার ভুতের দল। বাবা ভোট-ভোট করে তোমার মাথার হাত বুলিয়ে নিজের পকেট ভরির করছে।

—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে। আমার চোদপুকুরের ডাণ্ডি যে, ঐ সব মামী লোক আমার বাড়িতে পারের ধুলা দেন।

—মামী লোক না ছাই? খ্যাংরা মারি অমন মানের মুখে।

—তা তো মারবেই। কি ঘরের মেয়ে দেখতে হবে তো। মামী ঘরের মেয়ে হ'ত তো বুঝতে পারতে মান কি জিনিষ।

—দেখ, আমাকে বাইছে তাই বল, কিন্তু আমার বাপ ভাইকে গালাগাল দিও না—ভাল হবে না। কোন ঘরের কি মান তা আমার জানা আছে। তোমার বরি মানের ঘরই হোত তা হলে নাপিতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে ছুটতে না।

—কেন ছুটেছিলাম তা তোমরা কি বুঝবে। ও যদি আমার মেয়ে হোত তাহলে ঘরের মান রেখে বাপের কথা মুখ বৃজে মেনে নিত, এইভাবে এক বদমাইস লম্পট ছোঁড়ার সঙ্গে জুবিলা ট্যাঙ্ক গিয়ে ঢলাতো না।

—বাবা। তোমাকে আবার বলছি আমার স্বামীর সখকে ওভাবে কথা বলবে না।

—শুনছ মেয়ের কথা, বাশকে শাসাচ্ছে স্বামীকে পুজো না করলে ভাল হবে না। কই এখন তো একটা কথাও মেরেকে বলছ না। আমি তখন একটা কথা বলতে না বলতেই তো কৌস করে উঠেছিলে যে, আমার বাপ ভাইকে গালাগাল দিও না। এখন যে মেয়ে তার বাপের শ্রদ্ধ করছে,—কিছু বল।

—পারি না বাপু তোমার সঙ্গে তর্ক করতে।

—তা পারবে কি করে। পাগল তো এখনও হই নি যে তর্কে হারাবে, বসিও মামে-ঝিয়ে চাইছ যে পাগল হয়ে বাই। তা না হলে বা আমি খেঁচা করি, ঠিক তাই বেছে বেছে করতে না হুঁজনে। ছুঁকো বাবা আমার বাপ-ঠাকুরদার নিশ্চ না করে জল খায় না তুমি কি না আমার পরিবার হয়ে সেই বাড়ির বৌ-এর পায়ে ধরে বললে যে আমার মেরেকে বাঁচাও, মেয়ে বেন তোমার জলে গড়েছিল। আমার বাবা বলে খনে দানো, এ বাড়ির নাম বাদের মুখে আনতে খেঁচা করে বলে পাঁঠা-বেচা ঘর, তারা করবে তোমার মেরেকে ছেলের বৌ? তাই যদি করবার ইচ্ছে থাকত তাহলে আজ বিকলে অমন ভাবে

হাটের মাঝে আমার গালামন্দ দিত না। ও সব সম্পত্তি হাতাবার ফিকির। বলেই মেরের মুখের সামনে আতঁল নাড়তে নাড়তে বললেন—এই তোমার বলছি আমার কঠিন হতে বলো না। কাদার মত গুঁচা লোক সেও যে বলবে নিজের মেরেকে যে কন্ট্রোলে আনতে পারবে না সে একটা কাছাছাড়া লোক—তা আমি আর সন্ধ্য করব না। তোমার স্বাধীনতার আমি হাত দেব না, যেমন চলে ফিরে বেড়াচ্ছ, কলেজ যাচ্ছ—বাও, বিশ-পঞ্চাশ টাকা হাতখরচা করছ কর, শাড়ি গরনা কেন; কিন্তু খবরদার ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে মিশতে পারবে না, দেখা হলে কথা কইতে পারবে না, বা হয়েছে তা ভুলে যেতে হবে। মনে থাকে যেন—বলেই পাছে কোনও জবাব শুনেও হয় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে পা বাড়াতোই কানে এল—আমি তা পারব না।

ফিরে আসতে হল, বললেন—পারবি না?

—না।

...চোপেরও।—কুঞ্জ রাহা গর্জে উঠলেন।

মেয়ে চুপ করে গেল ষটে কিন্তু বাপ কি বলবেন খুঁজে পেলেন না। গর্জনের পর বর্ষণ না হলে লজ্জার পড়তে হয়। বাহা মশায় ভেবেছিলেন যে, কাশীর মত লোকও তাঁকে কথা শোনার বললে মেয়ে বাগে আসবে তিনি জানতেন মেয়ে তার কাশকে ছুঁচকে দেখতে পারে না। সেইজন্মেই তিনি কাদার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হল না দেখে বিপদে পড়লেন। রাহামশায় জানতেন মেয়ের স্থপা যেমন তীব্র নিজের গোঁ বজায় রাখবার বেলায় মনও তেমনি দৃঢ়। কাজেই একবার যখন 'না' বলেছে তখন কোনমতেই হ্যাঁ বলান বাবে না। ছেলে নয় যে কবে উত্তম মধ্যম দিয়ে বাড়ির বার করে দেবেন, আপদ বিদায় হবে। এখানে সে দাওরাই প্রয়োগ করলে কেলেঙ্কারী বাড়বে ছাড়া কমবে না। মেরেছেলে...মেরেছেলে...বার দুই কথাটা কুঞ্জবাবু আওড়ালেন। মেরেছেলে যখন তখন মেয়েলী অজ্ঞপ্রয়োগ করলে কেমন হয়? যখন কিছুতেই কাজ হচ্ছে না তখন চেষ্টা করতে দোষ কি। বললেন—বদি ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে মিশি' তা হলে বেন আমার মরা মুখ দেখিস।

শৈলজা বললেন—এ তুমি কি বললে?

জীও কজ্জার মুখের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জবাবু বুঝলেন যে কাজ হয়েছে। বললেন—ঠিকই বলেছি।—বলে বীরদর্পে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে খবরটা দীঘ দস্তর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল এবং দস্ত মশাইয়ের কানেও উঠল। খবরটা শুনেই তিনি জলে উঠলেন, এও বড় স্পর্ধা। ছড়ার ছাড়লেন, শুকদেব, শুনে বাও।

সে ছড়ার শু শু কিন্তুকই নয় তার মাও শুনলেন এবং আওরাছটার যথেষ্ট আকর্ষণী শক্তি থাকতে ছেলের সঙ্গে তিনিও ওপরে উঠে এলেন।

কিংবদন্তি ঘরে পা দিতেই দীঘবাবু বললেন—খবরদার মিশতে পারবে না।

কিন্তুক অবাক, কার সঙ্গে মিশতে পারব না? বললে—মানে?

—মানে আবার কি? এর মধ্যে কোন কথাটা বোঝ না যে মানে বুঝতে ধারাপাত খুলতে হবে। গাধার মত প্রহর।



## কিশক রাগিণী

—কার সঙ্গে মিশব না তা বলবে ত'।

—কার সঙ্গে আবার,—বোঝে না। যেন কিছু। পাঠা-বেচাদের  
ছলের সঙ্গে, খবরদার যদি তিনি তা হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—কেন, কি হল আবার ?

—কেন আবার কি, আমার ছকুম ১০০ কোথার তোর মেয়েকে  
ছলের বো করে কলেঙ্কারীর হাত থেকে বাঁচালুম, চিরঞ্জীবন কেনা  
সোলাম হয়ে থাকবি তা নয় বলে কি না সম্পত্তি হাতাবার ফিকির।

তকুবালা বললেন, ও তোমাদের ভোটের ব্যাপার। ভোট খেমে যাক  
এ কারা ছোড়াছুড়িও খামখে।

—থামবে ? কারা ছোড় না হয় বন্ধ হল কিন্তু দিবাটা ?  
মেয়েকে যে বলেছে যদি ওর সঙ্গে মেশে তবে বাপের মরা মুখ দেখবে  
তার কি হবে।

কিশক বললে—হত মেয়েলী দিবা।

—মেয়েলী ফেরেলী বুঝি না। আমিও বলছি যদি ঐ মেয়েটার  
সঙ্গে মিশবি তবে আমার মরা মুখ দেখবি।

—আমি মানি না এসব। কিশক মাথা ঝেঁকে উত্তর দিলে।

তকুবালা ভাড়াভাড়ি ছেলের মুখ চাপা দিয়ে বললেন—ছিঃ বাবা,  
এ কথা বলতে নেই।

কিশক মার হাত সরিয়ে বললে—এ সব কুসংসার, বা লোকে  
বলে তাই কখনও হয়।

—হয় বাবা হয়, কখনও কখন ঠিক তাই হয়।

দীঘুবাবু দমে গেলেন। এ তো আচ্ছা ছেলে। এত বড় একটা  
দরিদ্রের উত্তরে অঙ্গনবন্দনে বললে কি না—আমি মানি না এসব।  
এখন যদি সত্যই মেশে আর দ্বার আশঙ্কামত যদি কথাটা ঠিক  
করে যায়। তা হলে !!! দীঘুবাবু চোখে অঙ্ককার দেখলেন।  
বললেন, তা মানবি কেন ? আমি মুখ্য বাপ, মেয়েলী দিবা দিই।  
আমি মরে গেলেই বা কি বেঁচে থাকলেই বা কি। বলি লেখাপড়া  
তো শিখছি—এটা পড়িসু নি যে পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি  
পরমসুপ পিতা—

তকুবালা বললেন—পর মনস্তা ! নয় পরম—

দীঘুবাবু ধমকে উঠলেন—থাম থাম তোমাকে আর ভবতারণের  
পরিবারের মত শ্লোক আওড়াতে হবে না। এই আমি বলে রাখছি  
শুকদেব আমার আলিও না, আজ বাদে কাল ইলেকশন—আমার  
মাথার ঠিক নেই। শেষকালে ছুঁচোথ যেমিকে বার সেদিকে চলে  
যাব। বা বলেছি সেটা খেয়াল থাকে যেন।

কিশক মুখ ফিরিয়ে বললে—আর আমি যদি বলি যে তোমার  
কথা ফিরিয়ে না নিলে আমার মরা মুখ দেখবে, তা হলে ?

তকুবালা ঝিষ্টভাবে বললেন—শুকদেব !

—শোন, গুলধর ছেলের কথা শোন। বলে কি না আমি যদি  
বদি...লেই দীঘুবাবুর খেয়াল হল যে এখনও পাকাপাকি ভাবে  
কথাটা বলে নি, যদি দিয়ে একটা ছমকি ছেড়েছে মাত্র। পাছে  
বদিটা লোপ করে বাকিটুকু বলে বসে এই ভয়ে আর দুইতকাল অপেক্ষা  
না করে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তকুবালা ছেলের হাত ছুঁতে গিয়ে বললেন—আমার কথা দে বাবা,  
ওর কথা অবাধ্য হবি না।

—মা, তুমি—।

—স্বামী, বাবা আমার। রাগটা পড়ুক, আমি ঠেকে বুঝিয়ে মত  
করাব। ওর কথা অবাধ্য হসু নে।

—বেশ, তাই হবে ১০০-জগতটা ভীষণ স্বার্থপর, সবাই নিজের  
স্বার্থ দেখে। মা-ও ছেলের পানে তাকায় না।

কিছুক্ষণ পরে একটা মিশির কৌটো থেকে ছুঁটিপ মিশি ঝাঁতে  
উঠল, খবরও চলাচল হ'ল।

পরদিন পড়ার ঘরে বসে কিশক চিঠি লিখছিল, মহাবীর এল।  
চিঠি শেষ করে কিশক বললে—তোর কথাই ভাবছিলুম।

—গুড হেভেনস ! গিনী ফেলে শেষে এই নয়ে পৈসের চিন্তা।

কিশক জান হেসে বললে—ঠিক বলেছি। শোন, তোকে  
একটা কাজ করতে হবে।

—কি ?

—তুমুকে দিয়ে এই চিঠিটা ওর কাছে পৌঁছে দিতে হবে আর  
জবাবটাও তুমুকে নিয়ে আসতে হবে।

—তোর সঙ্গেই তো একটু বাধে দেখা হবে, তুই নিজেই দিসু।

—দেখা হবে না।

চোখ কপালে তুলে মহাবীর বললে—মানে। কি হল আবার ?

—কি হবে শুনে। তুই বং চিঠিটার ব্যবস্থা করে দে' ১০০  
দেখা আর এক্ষীনে হবে না, বাবা এমন কি মায়ও ইচ্ছে নয়  
যে দেখা করি।

—মা ! মানে কাকীমা ? কি বলছিল বা-তা !

কিশক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলো।

—কাকীমাও বললেন ঐ কথা !

—তাই ত' শুনলাম।

মহাবীর রেগে গেল, বললে, সাথে বলি ভ্রাদার যে খ্যাত গড  
আমার বাপ-মা বেঁচে নেই। কিছু মনে করো না ভ্রাদার, আমি হলে  
এ আদেশ মানতুম না—নো, নেভার। রাগিণী দেখবি মানবে না।

—মানবে। বাপ-মার মরা মুখ দেখতে কে চায় ?

—কে মরবে না শুনি। ভোট মাইগু, তুমি মরবে না ? এগেন  
ভোট মাইগু, দীঘুক' মরবেন না ? তবে ? দু'দিন আগে আর  
পরে। জেনারেলি বীর ষড় তাঁরা আগে মারা যান। বাপ-মা বয়সে  
বড় হন কাজেই তাঁরা আগে চোখ বোজেন, অফকোর্স উল্টোটাও  
হয়। মরাটা যখন সার্ভেন তখন তাদের দেখাশোনায় দোষ কি ?  
তোরা না দেখা সাফাৎ করলে যদি দীঘুক' অমর হয়ে থাকতেন  
তা হলে না হয় কথা ছিল। দূর দূর। ওসব কথা কান  
দিসু নি। মরা মুখ দেখবি। বল হ্যাঁ, তাই দেখব। বেশ  
তো একটা এক্সপেরিমেন্টই কর। তুই পাখে বসবি না। ওপনুলি  
না হয় সিক্রেটলি মেলামেশা কর। আমি লিখে দিচ্ছি কিন্তু  
হবে না।

—তা হয় না। আমি মাকে কথা দিয়েছি। তুই চিঠিটার  
ব্যবস্থা করে দে তাই।

দরজার ঢোকা পড়ল। মহাবীর উঠে দরজা খুলে দিলে মামা  
চুকল।

মহাবীর বললে—ঠিক টাইম্-এ এসেছি। এদিকে কারবার হয়ে গেছে তা শু নহিস। দীহুকা' ভেটো ছেড়েছেন।

—কি ছেড়েছেন ?

—করগেট্ট ইট। ভেটো কি তোকে বোঝাতে গেলে হাত কাবার হয়ে বাবে। সট-কাট-এ বলি—বলে ব্যাপারটা শুনিবে বলতে,—একটা ব্যাবস্থা করবি না চূপচাপ বসে থাকবি।

ব্যবস্থা করবার কথা মামা তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটা এগিয়েই আবার সরিয়ে নিলে। মহাবীর সিগারেট নিতে বাচ্ছিল হাত টেনে নেওরতে বললে—আবার বাধারিটা টেনে নিলি কেন ?

মামা ডান হাতে সিগারেট নিয়ে বললে—আর বলিস কেন, লজ সাহেবকে দেখে বিড়ি লুকোতে গিয়ে তালুতে ছাঁকা লেগে যা হয়ে গেছে।

—তা হলে তো হয়ে গেল। কাজবন্দ করছিস কি করে ? তোর তো বাঁ হাতে খোঁচা না খেলে ত্রেন খোলে না।

—চালাচ্ছি কোনও রকমে কিন্তু সত্যিই মাথাটা তেমন খেলছে না। তবে শুকিয়ে এসেছে।

—এদিককার কি হবে ? মঙ্গলবার ইলেকশন শুকুরবারে রেজাল্ট বেরবে। একজন কাং হবেনই ছ'জনও হতে পারেন। তারপর আর এগোন বাবে এ ব্যাপার নিয়ে ?

—কুজ রাহার কোনও আশা মেই। দীহুকা'ই জিতবেন তবে লড়তে হবে প্রাণধরভের সঙ্গে।

—তুই কি মনে করিস হেরে যাবার পর কুজবাবু এসে বলবেন দীহুকা' বা হেরে গেছে হেরে গেছে, এস এইবার পাঁচজন ডেকে একটা হৈ-হৈ করে সম্বাদটা পাকা করি। তারপর ধর পড় ফরিড বদি দীহুকা'ই হেরে যান, ভোটের কথা কিন্তু বলা বার না তখন বলতে পারবি, যে কাঁকা বা হবার হয়ে গেছে এবার ছেলেটার দিকে নজর দিন, কুজবাবু কাছে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে গাড়ান। মাথার বাও বা হ'এক ড্রপ মাল ছিল বাঁ হাতটা বাওরাতে তাও উবে গেছে দেখছি।

কিংবদন্তি একটা কথাও বলে নি, এবার বললে—তোদের কিছু করতে হবে মা। যা' আমায়ের অদৃষ্টে আছে তাই হোক।

মহাবীর বললে—তোদের অদৃষ্টের বাইরে নিয়ে যাবার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতা পুরুষেরও নেই আনরা তো চার। আমরা তোদের জন্তে কিছু একটা করব এটাও বদি তোদের অদৃষ্টে লেখা না থাকে তা হলেও কিছু হবে না।

—ওসব বুঝি না, তোর চূপ করে থাক।

—আর তোর আধমরা হয়ে থাক, কেমন ?—মহাবীর রেগে গেল।

—উপায় কি।

মামা বাঁ হাতটা মাথার বুলিয়ে বললে—তা হলে আর আধমরা কেন, পুরোই মর। ল্যাটা চুকে যাক।

মহাবীর বললে—বাঁ হাত মাথার বুলোতে বুলোতে এত বড় একটা কথা বখন বলি তখন মনে হচ্ছে মাথার কিছু মাল ফেরৎ এসেছে। ভাল করে খুলে বল দেখি।

—ও রাজী হবে কি না আগে জিজ্ঞেস কর।

—তুই বল না। ও রাজী হবে না ওর খাড় রাজী হবে। অফকাস বদি ওর অদৃষ্টে রাজী হওয়া লেখা থাকে। বল।

খামের ওপরে কোনও নাম লেখা ছিল না, তাই খামটা হাতে নিয়ে রাগিনী ততক্ষণে জিজ্ঞেস করলে—কি রে ?

—তোর চিঠি। শুকসেবকা' লিখেছে।

—ওঃ—নিবিড়ভাবে হু'হাতের মধ্যে খামটাকে ধরে রাগিনী বললে—তোর সঙ্গে দেখা হল বুঝি ?

—না, বীর গিয়েছিল তাকে দিয়ে পাঠিয়েছে। শুনেছি সব। তুই পড়ে জবাব লিখে দে, আমি ততক্ষণ মাসীমার কাছে গিয়ে বসি।

—কেন—তুই—না হর—থাক না, বাঁবি কেন ?

—না, থাকতে নেই। বলে নীচে চল গেল।

ততক্ষণা চলে যাবার পর রাগিনী সন্তর্পণে খামের একপাশ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে চোখের সামনে খুলে ধরল। দীর্ঘ চিঠি, মনের নানা কথা দিয়ে ঠাসা। চিঠি নয় যেন পরিপক্ব একটা কাঁঠাল, এক একটা লাইন এক একটা কোয়ার মত হসে ডতি, রাগিনী না পড়ে চিঠিটা হাতে করে বসে উইল। পড়লেই তো শেষ হয়ে বাবে। তার চেয়ে এই বেশ। এইভাবে চিঠি হাতে নিয়ে অনন্ত সম্ভাবনাকে হাতে করে বসে থাকি। বসেও থাকতে হঠাৎ মরণে এল ততক্ষণা নীচে বসে আছে একটু বাদেই এসে হাজির হবে।

চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে যেটুকু লেখা আছে তাও ছোটখাট একটা চিঠি। যে চিঠির শেষে অনেকখানি জারগা কাঁকা থাকে সে চিঠি পড়লে মনে হয় পত্রলেখকের মনের সবটা জুড়ে আমি নেই, ঐ চিঠির কাঁকা জারগার মত ওর মনের অনেকখানি জারগায়ই কাঁক। পড়ে আছে যেখানে আমি নেই। কিন্তু যে চিঠি বিয়ের পর কস্তার প্রথম স্বপ্তরবাড়ি যাবার মত এক পা এগিয়েই ফিরে ফিরে মার বৃকে কান্নার ভেঙে পড়ার মত শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না, বার বার পুনশ্চ-র বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মনের কথা জানার সে চিঠি পেলে মন ভরে ওঠে, বোঝা যায় মনের কোথাও কাঁক নেই, সবটা জুড়ে আমি আছি। রাগিনী বার বার চিঠির 'পুনশ্চ' অংশটুকু পড়তে লাগল।

বৃদ্ধি দিয়েছিল মামা। কিংবদন্তি আলাদা আরও একটা চিঠি লিখতে বাচ্ছিল। মামা বললে—আলাদা চিঠি লিখবি কেন ? তোর ঐ চিঠিতে জারগা নেই ?

—আছে।

—তা হলে চিঠিটা বার করে পুনশ্চ দিয়ে লেখ। মেয়েদের চিঠিতে 'পু' থাকলে ওরা ভাবি খুশি হয়। বলে 'পু' দেওয়া চিঠি আর তুম্বের চিঠি দুই-ই এক জিনিষ, বসে টিটবুর। লেখ, পু: দিয়ে আরম্ভ কর।

কিছুক্ষণ পরে নীচে থেকে ততক্ষণা এসে দেখে চিঠিটা হাতে নিয়ে রাগিনী চূপ করে বসে আছে। ততক্ষণা বললে—পড়েছি।

যেন সখিৎ ফিরে গেল এমন ভাবে রাগিনী বললে—কি ?

—পড়েছি।

—হ্যাঁ। বলে একটু হেসে বললে—তোকে বলতে পারলুম না তত্ব, কিছু মনে করিস না।

ততক্ষণা লক্ষ্য করল আগের সেই মনমরা ভাবটা আর নেই।

বললে—খুশি হয়েছি। দেখছি।

—কন হয় না ? চিঠিতে খুশির খবর আছে যে।

—খুশির খবর না ছাই। বীক ঠিকই বলছে, তোরা ভাবি তুই। আমরা হলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম।

—তাতে একসঙ্গে থাকতে পারতিনু বটে কিন্তু আমাদের মত নিবিড় ভাবে পরস্পরকে পেতিসু না।

—সামর্থ্য বাদে নেই তারাই কবিত্ব করে নিজস্বের দুর্বলতা চাকে।

রাগিনী হেসে বললে—সামর্থ্য আছে কি না সে পরিচয় দেবার সময় তো পালিয়ে যাব নি।

—আচ্ছা, তুই কি ঠান্ডিমিদের মত বিশ্বাস করিস বে—

—না করি না। কিন্তু মা বিশ্বাস করেন, জেটিমা বিশ্বাস করেন, মাসীমা বিশ্বাস করেন, তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না। তবু, আঘাত নিয়ে ঘর বাথলে সে ঘর ভেঙে যায়।

—তা হলে এইভাবেই থাকবি?

—সেখা বাকু...তার রোমিও জুলিয়েটের গল্প মনে আছে।

তবুকা উজ্জ্বল হয়ে বললে—তা' আর নেই। লেসলী হাওয়ার্ড, নর্মানিয়ারার, জনবারিয়ার, বেসিল স্ম্যাথবোন। কি ফাইন বই বলত, স্পেশালী ব্যালকনীর সিন্টি।

—গল্পটার কথা বলতি।

তবুকা আমতা-আমতা করে বললে, গল্পটা মানে...বিয়ে হল পোপনে, বাড়ির অমতে...পরপর রাত্তির বেলা ব্যালকনীতে মিলন হ'ত, শেষ গালে হু'জনেই সুইসাইড করলে, তাই না?

রাগিনী মুহূর্তে হেসে বললে—মনে আছে দেখছি। শেষকালে হু'জনেই সুইসাইড করলে।

—তোদের তো বাড়ির অমতে কিছু হয় নি।

—সেইখানেই আমাদের ট্রাজিডি।

—তোদের ট্রাজিডি নিজস্বের হাতে এ। আমরা হলে ট্রাজিডি বৃষ্টির কমন্ডি করতাম। নেও' সে বসে আর ট্রাজিডি কমন্ডি করতে হবে না, ঘুরে আসি।

—কোথায় যাব?

—কোথায় আবার, জু'বলা ট্যাঙ্কে। বীক শুকনোবাক'কে নিয়ে আসবে বলছে।

—না থাক, তুই ঠকে বলিস, হ্যা।

—হ্যা।

—হ্যা। ও বুঝবে। তবু 'হ্যা' বলবি, আর কিছু নয়। এই আমার চিঠির জবাব।

জিতবেন যে এতে দীর্ঘ দস্তের কোনও সম্ভব ছিল না। ভবতারণ হুঁটি গণনা করে দেখেছেন যে সমস্ত অতীত শুভ, দস্তমশায় বা করবেন তাতেই সফলকাম হবেন। সময় শুভ সম্ভব নেই। চালের দর বেড়ে গেছে, শুদোমে হাজার দশেক চাল ধরা আছে। ছেলেটা চুপচাপ ছিল এখন উঠে এসে বাশের পাশে ঝাড়িয়েছে, খুব ঝাটছে। দেবতার বাতে বিপ্লবে না বসেন সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মার বাড়ি গভ্র সপ্তাহ থেকে পূজা পাঠান হচ্ছে রেজাণ্ট বের হওয়া অবধি চলবে। প্রাণবল্লভ আর কুজ রাহাও পূজা পাঠাচ্ছেন। কাজেই মা শেষ অবধি কি করেন বলা যায় না। মনে হয় তিনি তিন

জনের পূজা খেয়ে শ্রেক চেপে যাবেন। কারণ, তিনজনেই তাঁর সন্তান কাজেই মার পক্ষে কোনও একজনের ওপর কৃপাটুপাত সম্ভব নয়। কিন্তু দৈব বলই শ্রেষ্ঠ বল। তাই বাড়িতেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ বন্ধ করা হবে। উঠানে বজ্জের আয়োজন করছেন ভবতারণ হুঁতিন জন ব্রাহ্মণ তাঁকে সাহায্য করছেন। স্নান করে পটবস্ত্র পরে দীহুবাবু আসেন বসে তদারকি করতেন। এক কাশে সামিয়ারার তলার ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন চলেছে। হেঁইই ব্যাপার।

ভোটের পর বাইরে থেকে পুলিশ পাহারার ব্যালট বাজলো একে একে ট্রেজারী অফিসে এসে জমা হতে লাগল। ফিম্কারদের দেখবার জন্তে যেমন ভিড় চর, ব্যালট বাজ দেখবার জন্তে হেমনি ভিড় জমে গেল ট্রেজারী অফিসের সামনে। 'গক মার্কা' বাজ এল বলে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি গকর দলের হাঙ্গা ধনি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে জজনা-কজনা'চলে বাজটা হাঙ্গা না ভাবি। ভেতরে কটা ব্যালট পেপার আছে এই গবেষণার একসঙ্গে গোটা কয়েক মাথা ঘামতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই গবেষকের দল ব্যালট পেপারের নিতুল সংখ্যাটা বলে দেন।

ভোট গণনা শুরু হল। বাজ খুলতে না খুলতেই মানব পাল সাইকেলে চেপে চোড়া নিয়ে চোটেতে শুরু করলে, দীর্ঘ দস্ত লীজি বাই খাউজের ভোটসু। ঐ সময়টুকুর মধ্যে হাজার ভোটে যদি দীর্ঘ দস্ত জিততে থাকেন তা হলে তাঁর 'রাইডেল'র বসে থাকবেন এটা আশা করা যায় না। প্রাণবল্লভের দলের চোড়া গর্জে উঠল, প্রাণবল্লভ নট অনুজি লীজি বাট গ্যালপিং। এর পর নিত্যন্ত মরা মাহুব চাড়া আর কেউ চুপ করে থাকবে না। কুজ রাহা আশা ছাড়লেও কাশা ঘোষালের দল আশা ছাড়ো নি। তবে তারা চোড়া নিয়ে বের হল না। গজেন পোকার ছাড়বার ভকুম দিলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বিরাট এক পোকার বুলছে, তাতে লেখা—কুজ রাহা লীজি বা গ্যালপিং নন, তিনি 'জেটি'। 'ভেটপ্লেনের' মত বেগে জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা গোটা তিনেক নাগাদ খুশি মনে দীর্ঘ দস্ত বাড়িতে এসে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। না, আর ভর নেই। এখনও হুঁটো দেটাবের বাজ খোলা হয় নি বটে, কিন্তু তাতেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। সে হুঁটো ব্যবসাকেন্দ্র, সবাই জানাশোনা। ভোট সব কজার মধ্যে। প্রাণবল্লভ হুঁহাজার ও কুজরাহা পাঁচ হাজার ভোটে পেছিয়ে আছেন। আর দেখতে হবে না। দস্তবাড়িতে স্মৃতির কোয়ারা ছুটল, বাড়ির নামনে সারি সারি মটর গাড়ি এসে গাঙু। ব্যাণ্ডপার্টির দল এল। শেষ খবর আসবে আর দস্তমশায়ও গাড়িতে চাপবেন নগর পরিক্রমায়; তবু ভূত-ভোজনের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

পাকা খবর ক্রমশ লাগল। আগতে দীহুবাবু প্রথমটা নবাবী করদার ডাকিরা টেস দিয়ে হাসি হাসি মুখে খবর শুনিছিলেন, তারপর দেখা গেল উঠে বসেছেন এবং মুখের হাসিটি গিলিয়ে গিয়ে এক শোচ করে কালি পড়ছে। বাড়ির কোলাহলও হীরে হীরে খেমে যেতে লাগল। পাকা খবর এসে বলে। সাড়ে ছটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই

পাকা খবর এল। ফতেপুরের ভোটে প্রাণবল্লভ কেলাকতে করেছেন দীক্ষ দত্ত সুনলেন এবং শোনার শেষে এ্যাঃ এ কি হল। বলে জ্ঞান হারিয়ে ঢল পড়লেন। খবর শেষে তরুবালা গুপ্ত থেকে নেমে এসেন এবং ক্রীকান্তকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে মামাকে বললেন—শুকদেব কোথায়? তাকে ডাকো। মহাবীর সবাইকে বাইরে যেতে বল।

বাইরে কোলাহল এবং সেই সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাজনার আওয়াজ কানে এল। তরুবালায় কথায় বার। বাইরে গিরেছিল তার আবার ছড়গুড় করে ঘরের ভেতর চুকে পড়ল। সদর দরজা এবং বাইরের ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করে দেওয়া হল। কি ব্যাপার? না, ভোটজরী বিজয়লাসে যেতেছেন। তাঁর দলবল খেউড় ছড়াতে ছড়াতে নগর পরিষ্কার বরিরে দস্তবাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে।

রাস্তার বাণ্ডবাত্ত ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে দীক্ষ দত্তর কুশপুস্তলিকা দাখ করা হল। পাশেই ঘরের মধ্যে দত্তমশাই অজ্ঞান হয়ে পাড়ে আছেন, ডাক্তার এসে পৌঁছয় নি, শিয়রে স্ত্রী। রাস্তার কুশপুস্তলিকা জলছে আর তার পাশেই এক ছোকরা স্ত্রীলোক সেজে বিকৃত অলভঙ্গী করে বিলাপ করছে, পাছে স্ত্রীলোকটিকে চিনতে কষ্ট হয় এই জন্তে তার বুক পিঠে কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে গুরু স্ত্রী। লরীতে সা সাজান হয়েছে। একজন প্রাণবল্লভ সেজে বসে আছেন, তাঁর পা দুটো সামনে ঠাঁট গেড়ে বসে থাকা দু'জন লোকের মাথার ওপরে। দস্তবাড়ির সামনে এক ঘটীর ওপর উদ্ভাস হৈ-হল্লার পর বিজয়ীদল বাহাভাড়ির দিকে রওনা হল। সহরের লোক দেখা গেল বেশ রসিক। তারা প্রাণবল্লভের উচ্চশ্রাসার আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলল। ভাগ্যে তারা প্রাণবল্লভকে ভোট দিতেছিল, তাই না এমন শোভাবাত্রা দেখতে পেল। কিন্তু হু'একজন বেরসিক ছিলেন বীরা মনে মনে ছিঃ ছিঃ করতে করতে নিজেরে অর্ধটিকে বিস্তার দিতে লাগলেন। তা এমন বেরসিক সব সময় সব দেশেই আছে।

ডাক্তার এসে দেখে অবুধ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দীক্ষ দত্ত চোখ খুললেন। তরুবালা বললেন—আমার চিন্তে পারছ?—

—পারছি। কি হয়ে গেল!—দীক্ষ দত্ত আতঙ্কিত বলে উঠলেন। দেখা গেল অজ্ঞান হলেও আসল বিষয় ভোলেন নি।

তরুবালা মাথনা দিয়ে বললেন—কিছুই হয় নি। সবচেয়েই হারজিত আছে। অমন মুহুর্তে পড়লে চলে? এগারে হয় নি, সামনের বারে হবে।

মামা শুকনো মুখে ঝাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে তরুবালা বললেন—শুকদেবকে পেলো?

দীক্ষাবু বললেন—শুকদেবের জন্তেই এই শান্তি হল। ছেলের মনে কষ্ট দিয়েছি, সেই জন্তেই এই কষ্ট পেলাম। শুকদেব কোথায়?

মামা মাথা নীচু করে বললেন—তাকে তো কোথায়ও পেলাম না।

দাপাতে দাপাতে বেশী এল।

—সবন্য! হয়েছে মা, সবন্যশ হয়েছে। গিনীদিদি আর তোমাদের শুকদেবদাদাবাবু গলায় দড়ি দিয়েছে।

তরুবালা চাৎকার করে বললেন—কি বলছিল তুই?

—গিনীদিদি চিঠি লিখে গেছে—আমরা মরতে চাই।

খেপীর কাছে মরতে চলা মানেই গলায় দড়ি দেওয়া।

—শুকদেব! আত্মনাদ করে তরুবালা মুগ্ধিত হলেন।

দাড়ি সাতটা বাজল।

শ্রীতকালের সাড়ে সাতটা, বেশ রাত। তারপর জুব্বিলা ট্যাক্সের আশে পাশে তাকালে তো কথাই নেই, মনে হবে রাত দুপুর। ঘুরে বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক-আধজন লোক যাচ্ছে। পথের ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরগুলো পথচারীদের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে খেউ খেউ করে উঠছে। ট্যাক্সের পূর্বদিকে কিছুটা দূর দিয়ে রেল লাইন, তার ওপাশে লখা একটা উঁচু টিলা, টিলার মাথার ওপর দিয়ে ডিক্র্যাফ্ট সিগনালের রক্তচকুটা দেখা যাচ্ছে। থেকে থেকে শেরালের দল ডেকে উঠছে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সের শান্ত জলে মাছের লেজের কাপটা বুত একে দিচ্ছে। নীড়চ্যুত কোনও কোন পাখী হঠাৎ মাথার ওপর এক চক্ক পাক খেয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাতাস বইছে, মনে হচ্ছে বেন কারা ফিসফিস করে কথা কইছে। ভূতের ভয় অবশ্য কিশুকের নেই, কিন্তু ভূতের ভয়ে না হোক ঠাণ্ডার ঠেলাতেই পীতকপাটী লাগবার ঝোপাড়।

অন্ধকারে কিশুকের বাড়িটা অলঙ্ঘ্য, রেডিরাম ডায়াল বাড়ি আই এ পাশ করার পর বাড়ি থেকে পেরেছিল। বাড়িটা দেখে কিশুক পীতে পীত চাপতে চাপতে বললেন—রাফেল!

রাগিণী কিশুকের ঠাঁটুর ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে কাত হয়ে ছিল, বললেন—কিছু বললে?

—না, বড্ড মশা!

রাগিণী আবার চোখ বুজল। রাগিণী জানে, তাকে চিঠিতে জানান হয়েছে চিরমিলনের পরম লগ এসেছে। সে জানে আজ মর্ত্যলোকের সব বন্ধন কাটিয়ে অমরলোকে, প্রেতলোকেও বলা যেতে পারে, চলে যাবে। কিশুকের কথা অমুযায়ী সে বাড়িতে চিঠি লিখে এসেছে—বাবা, ভোট গোণার চরম উত্তেজনার তোমরা বখন ভূবে থাকবে তখন আমি মায়ের মন্দিরে জীবনের সাথী বলে যাকে বরণ করেছি, তারই হাত ধরে জুব্বিলা ট্যাক্সের ঘন নীল জলের তলার আশ্রয় নিয়ে চিরমিলনের রাজ্যে চলে যাব। যেখানে বাধা নেই, বিচ্ছেদ নেই, মাথার দিবি নেই। ভোটে তোমাদের একজনের না একজনের হার হবেই। শপথের বে কঠিন শৃঙ্খল আমাদের শৃঙ্খলিত করছে তা থেকে উদ্ধারের কোনও আশা নেই। তা ছাড়া আমরা চাই নে যে আমাদের জন্তে তোমাদের কোনও একজন অপরের কাছে মাথা নীচু কর। তোমাদের যে কোনও একজনের মাথা নীচুতে আমাদের দু'জনেরই মাথা কাটা যাবে, তাই এ শপথ বেছে নিলাম। পাঁচ বদি আমাদের ক্ষমা করো।—ইতি, তোমাদের গিনী।

কিশুক জানে যে বসিও সময় সাতটার ঠিক করা হয়েছে তা হলেও পনের-বিশ মিনিট গ্রেস দিতে হবে। সভা-সমিতি হলে আরও বেশি সময় গ্রেস দিতে হ'ত, কিন্তু এত বড় একটা সাংঘাতিক ব্যাপারে মিনিট কুড়িই যথেষ্ট। কিন্তু, একি হ'ল সাড়ে সাতটা বেজে গেল। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে? রাগিণীকেই বা কি বলে ভোলাবে? ওর ধৈর্য আর বাধা মানছে না। মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে

## কিংবদন্তি রাগিণী

পারলে ও বেন বাঁচে। গুর যা অবস্থা তাতে না। শেষকালে কোনও কথা না শুনে হাত ধরে টানতে টানতে--ভাবতেও কিংবদন্তি কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ঘোমে উঠল। শেষকালে কি সত্যকি...

—এই!—রাগিণী মদিরকণ্ঠে ডাকল।

—উঃ!—কিংবদন্তির শুকিয়ে যাওয়া গলার ভেতর দিয়ে কোনও রকমে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

—আর দেরি কেন? কর যে বয়ে যায়। শুনেতে পাচ্ছ না আমাদের ডাকছে।

—কে?

—ট্যাঙ্কের ঐ শাস্ত্র গভীর নীল জলের ভেতর থেকে দু'খানি অদৃশ্য হাত আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ঐ দেখ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?...আসছি গো, আমরা আসছি।

কিংবদন্তির দেহের রক্তশ্রোত থেমে গেল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাও আবার অদৃশ্য হাত! বললে—থ্যাং!—তারপর কিড়বিড় করে আপন মনে বললে—কি হবে। এখনও কাকর পাতা নেই।

—কি বলছ?

—না, কিছু না।...আচ্ছা, তোমার ভয় করছে না।

—কিসের ভয়?

—ধর। এই মুহূর্তের। জলে ডুব মরাটা শুনেছিলুম ট্রাবলসাম্। নিখাস নেওয়া যায় না, জল খেয়ে পেট ফুলে ঢোল হয়ে যায়। তোমার খুব কষ্ট হবে।

—আমার কষ্টের জন্তে ভাবি না। তবে তুমি বই পায়ে তাতেই আমার কষ্ট। জল খেয়ে তোমার পেট ফুলে উঠবে, নিখাস নিতে পারবে না, ছটফট করবে! অথচ আমি তোমার পাশেই থাকব, ভবুও কিছু করতে পারব না।

—নিখাস নিতে পারব না। ছটফট করব! মানে...বলছিলাম কি...মানে তোমার ভয় করছে না।

—একটুও না, তুমি পাশে থাকবে আমার ভয় কিসের?

—না, ধর, মরবার সময় আমি হয়ত তোমার পাশে রইলুম না, ছটকে সরে—

—তা'কি করে যাবে। তোমার হাত শক্ত করে ধরে থাকব, ছটকে যাবে কি, হাতই ছাড়তে পারবে না।

—হাত ছাড়তে পারব না?

—না, ইহলোক থেকে অমরলোকে আমি তোমার হাত ধরেই পৌঁছব। যারা ট্যাঙ্কের মাঝখান থেকে আমাদের দেহ ছুঁতে তুলবে তারা দেখবে আমি তোমার হাত ধরে আছি।

—ট্যাঙ্কের মাঝখানে আমি যাব কি করে? আমি ত'সাঁতার জানি না।

—আমি জানি, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—ও হাঁ। তুমি ত'সাঁতার জান। ভাল সাঁতারই জান না।

—নিশ্চয়ই। হানডেড ইয়ার্ডস্ ব্রেক্ট ট্রাক্ আর ফোর ফট ইয়ার্ডস্ ফ্রী স্টাইলে আমার কুল রেকর্ড আছে। আমি তোমাকে



বয়সখানি হোক

নিম টুথ পেট সব বয়সের পক্ষেই  
সহান উপকারী মাজন।

নিম টুথ পেট-ই হল একমাত্র টুথ  
পেট যার মধ্যে নিমের বিজ্ঞানরক,  
দুর্গন্ধনাশক ও কবায় গুণের সঙ্গে  
আধুনিক দস্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির  
সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ  
পেট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টার্টার  
নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের  
এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের  
দুর্গন্ধ দূর করে প্রাণাস সুরভিত্ত করে।

নিম-এর তুলনা নেই।

**নিম টুথ পেট**

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২১।

চিহ্নে চিহ্নিত নিমের  
উপকারিতা সত্যকীর  
পৃথিক পাঠানু হয়।

NTP/211B

মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। তুমি ত' সঁাতার জানি না, তোমার তলিয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। মুশকিল হবে আমার।

—কেন?—যতটা সময় কথা বলে নেওয়া যায়, কিংবদন্তি মনে মনে বললে।

—আদি যে সঁাতার জানি। যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণ ডুবতে পারব না। তোমার এদিক থেকে ভারি স্থিতি, তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। শোন, আমি তোমার হাত ধরব যখন, তখন তুমিও লস্কর করে আমার ধরে থেক। তা হলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ত ডাড়াডি তলিয়ে যেতে পারব। নইলে মুশকিল হবে। সঁাতার কাটিতে হবে।

—কতক্ষণ একনাগাড়ে সঁাতার কাটিতে পার?—

—তা ঘটাব্যনেক ত' পারবই। আগে আরও পারবুম।

—এর মধ্যে বাড়ি থেকে যদি টের পেয়ে এসে যায় তা হলে তোমার জল থেকে টেনে তুলবে।

—তা পারে। ঐ কাঁদা ঘোবাল আবার জলের পোকা। ওর সঙ্গে পারব না।

—তোমার টেনে তুলে নিয়ে বাবে আর আমি একলা জলের তলয়ার পড় থাকব।

রাগিনী তাড়াতাড়ি বললে—ঠিক বলেছ তবে আর দেরি নয়। এস, জলে নামি।

—জলে নামব?—

—হ্যাঁ। এখনও বাড়ির লোক টের পাব নি। আর দেরি করলে সব মাটি হয়ে বাবে। এস।

—আর—আর একটু বসি।

—না, এখানে বসলে দেরি হয়ে বাবে। বসব সেই অমরলোকে গিয়ে। কয়েক মিনিটের ত' ব্যাপার। ওঠ।

—তা-তা-বাট। তবে বলছিলুম কি, শেষ বিচার নেবার আগে এই সুলসর স্ট্রিকে আর একটু—ভুরুদেব বলেন নি, মরিতে চাহি না আমি সুলসর ডুবনে। আমিও তাই বলছিলাম যে।—

—মরিতে—চাহি না? তবে আমরা এলাম কেন?

—না, না তা নয়; (মনে মনে,—এখনও কান্নর পাতা নেই। সাতটা পক্ষাণ)।

মরবার আগে এই সুলসর স্ট্রিকে আরও একটু উপভোগ করি। তা তুমি যখন বলছ তখন আর দেরি।—

দূরে বড় রাস্তা দিয়ে হেডলাইট আলিয়ে ছ'বানা মটরগাড়ি আসছে দেখা গেল। গাড়ি ছ'বানা ট্যাক্সের ভেতর ঢুকল। ওরা নিশ্চয়ই। এবার তা হলে মরা যেতে পারে! কিংবদন্তি বললে—তাহলে আর দেরি করা কেন, এস।

রাগিনী হতাশার সুরে বললে—লাভ নেই। গাড়ি আসছে দেখছ না, ওরা ঠিক আমাদের খুঁজে বার করবে। ভয়ঙ্কর আমাদের বসবার জায়গা জানে।

—তবে চল অন্ত আরগার—ঐ ঘন বোপের আড়ালে লুকোই।

—লাভ নেই। উঠে গাঁড়ালেই হেডলাইটের আলোর দেখা বাবে।

—তা হলে কি হবে?—কিন্তু কি হবে না কিছুতেই, মরণ পণ করে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন মরতেই হবে। এসো জলে নামি।

কিংবদন্তি হাত ধরে টান মারলেও রাগিনী নড়ল না। মটরগাড়ি ছুটো এসে পড়েছে। কিংবদন্তি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু একি! গাড়ি ছুটো তো থামল না। সোজা রেল লাইনের দিকে চলে গেল। রেল লাইন পার হল তারপর ডালডাঙার রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিংবদন্তি অপস্রমান গাড়ি ছুটোর দিকে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে থেকে বললে—চলে গেল।

গাড়ি ছুটো চলে বাবার পর রাগিনী খুশিতে ডগমগ হয়ে বললে—জান, আমি একমুখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, এ গাড়িতে যেন আমাদের কেউ খুঁজতে না আসে। ভগবান আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। মৃত্যুতে আর আমাদের কোনও বাধা আসবে না। নাও, ওঠ—বলে জলের ধারে গিয়ে জুতোঝোড়া খুলে শাড়িটা খঁট করে পরে আঁচলটা ভাল করে কোমরে জড়িয়ে তৈরি হয়ে বললে—ওঠ।

কিংবদন্তি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হ্যাঁ, উঠি। চললো খুলে ফেলি কি বল?

বড় রাস্তার গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কিংবদন্তি আরও মরীচিকার পান্নে তাকাতে রাজী নয়। জুতো খুলে উঠে জলের কাছে গিয়ে পাড়তে রাগিনী ওর বুক বেঁধে পাড়িয়ে বললে—একটা চুষ খাও।

—জ্যাঁ!

—মৃত্যুর আগে পৃথিবীকে সাক্ষী রেখে আমাদের প্রথম ও শেষ চুষন।

—চুষ খাব?

—হ্যাঁ, ম্যান্টারদের মত।

—ম্যান্টারদের মত?

—হ্যাঁ। ইংলিশ কিম্বো দেখ নি, হীরো কেমন করে চুষ খায়।

—কিন্তু আমি তো মানে—কোনও দিন চুষ—

একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠে ডাক শোনা গেল—সুকদেব, গিনী, কিং—

কিংবদন্তি লাকিয়ে উঠে পেছন দিয়ে তাকিয়ে দেখে গাড়িগুলো যেমেছে আর তার ভেতর থেকে সবাই নেমে প্রাণপণে ওদের দিকে ছুটে আসছে। কিংবদন্তি একবার সামনের জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ওর জানা আছে যে পাড় থেকে পাঁচ-সাত হাত অবধি ডুব-জল হবে না, লোকেরা পাড়িয়ে জান করে। রাগিনীর হাত ধরে একটা টান ধরে বললে—চলে এস।

রাগিনী তৈরি ছিল না। আচমকা হ্যাচকা টান সামলাতে না পেরে সে কিংবদন্তির গায়ের ওপর পড়ে গেল এবং টাল সামলাবার জন্যে কিংবদন্তিকে জড়িয়ে ধরল, তারপরই দেখা গেল হুঁজনেই জলে গড়িয়ে পড়েছে।

অজ্ঞাত হলে কি হয়, কিংবদন্তি পড়ল নীচে তার ওপরে রাগিনী। রাগিনী পাড় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে পারল না তার নিজের উঠে পাড়তে এবং কিংবদন্তিকে টেনে তুলতে কিছুটা সময় লাগল। সেই স্বল্পকালের মধ্যেই দমবদ্ধ হয়ে জল থেকে জলে তুবে মরাটা যে কি জিনিষ তার অ্যাপেল কিংবদন্তি পেল।

দীর্ঘ দস্ত ও হুজ রাহা সললবলে এসে হাজির হলেন। একসঙ্গে গোটা দশ-বারো টক্টর আলো এখানে-ওখানে দুরন্তে দুরন্তে অবশেষে

## কিশোর রাগিনী

কিশোর কিশোরদের গায়ের ওপর পড়তেই প্রায় সবাই একসঙ্গে হাসতে শুরু করে—এ যে এ যে। বেঁচে আছে।

মা। ঘোষাল গায়ের সোফটারটা খুলে জলের দিকে ছুটতে ছুটতে বলে—মা শেতল, মুখ রাখিসু মা! আরের মেয়ে জামাইকে যেন কিশোর অনন্তে পারি। বললেই ঝাপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েই অনন্তের করে দিঠে দাঁড়িয়ে বললে—দূর শালা, এ যে পাছের চোটোও ভেঙে না দেখছি। খুঁটমুটি ভিজ্জে মলুম।

দীঘলবাবু কিশোরকে জড়িয়ে ধরে হাইমাউ করে কেঁদে উঠলেন। কুহু বাজা রাগিনীর হাত ছুঁতে ধরে বললেন—তোরা এত অধম বাপের অপরাধের কথা ভুলে যা মা। আমি কথা দিচ্ছি তোরা আর শ্রদ্ধাধরের মধ্যে কোনদিনই বাধা পড়বে না। শুভদের আমার পরম আদরের জিনিষ, সে আমার জামাই। দীঘল' গিনীকে আশীর্বাদ করুন।

দীঘলবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—আশীর্বাদ করার যোগ্য আমি নই। আমার ঘরের হস্তাধিক আমি অপমান করেছি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এখন গিনী-মা যদি তব নিজের ঘর বুকে নিয়ে তাহলে বুঝে কিছুটা পাপ কমল। তাড়াতাড়ি চল, শুভদের মা কেমন আছেন কে জানে।

কিশোর শীত ঠেকানু করে কাঁপছিল, কোনও রকমে বললে—মার কি হয়েছে?

—অজ্ঞান হয়ে আছেন। মা মা বললে।

—অজ্ঞান! কেন!

—তোমাদের কথা শুনে।—দীঘল দন্ত বললেন।

কিশোর ও তার বন্ধুরা এক গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছাড়বার পর পকেট থেকে বিড়ি বার করে মামা বললে—খাবি, আবহুলের লোকানের মিঠেবড়া ভাল খুঁতোর বিড়ি। এক টান মারলে ঠাণ্ডা বাপ বাপ বলে পালাবে

—না। তোদের এত দেরি হল যে। সাতটার ভতর আসবার কথা ছিল না? আর একটু লেগে হয়ে গিচ্ছল।

মহাবী বললে—তাঁহলে গেলে আর কি করব। পর পর ডবল পতন ও মুচ্ছা। প্রথমে দীঘল' তারপর কাকামা।

—বাবাও অজ্ঞান হয়েছিলেন?

মামা বললে—হ্যাঁ। ভোটো হেরে গেছেন।

হেরে গেছেন!

মাসকেল বললে—প্রাণবল্লভ শেষকালে হু হু করে বেরিয়ে গেল। তা ভালই হয়েছে। কুহুবা, দীঘল' হুঁজনে হেরেছেন ভালই হয়েছে।

মামা বললে—শেষ খবর যখন এল তখন সাড়ে ছ'টা। বলতে বাব যে তোকে

পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক সেই মুখে দীঘল' পড়ে গেলেন। জল আন, ডাক্তার আন। নাড়ী দেখি কুহুই-এর ওপর উঠেছে। কি করি। চোখে কানে পথ দেখছি না। সত্যি সত্যিই চোখের সামনে যখন একজন মরতে বসেছে তখন কি আর বাধা মরবার জন্তে ছেলেখেলা করছে তাদের কথা মনে থাকে। বল তুই-ই বল। ডাক্তার এসে কোঁড়াফুঁড়ি করে তবে দীঘল'র নাড়ী বাগে এল। চোখ খুললেন, হাঁপ ছেড়ে বীচলুম। তখন তাদের কথা—মাইরী বলছি মনেই ছিল না।

কিশোর বার দুটো হেঁচো বললে—তা থাকবে কেন? আমবা মরি আর বাঁচি তাতে তাদের কি। কিন্তু এ প্রানটা তুই-ই দিয়েছিলি।

—তুই মিথ্যা রাগ করছিস। ঐ অবস্থায় পড়লে লোকে নিজের হাত পা খুঁজে পায় না। তবে হ্যাঁ ভগবান আছেন, ঠিক ঐ সময়ে ও বাড়ির খেপী এল। সে যখন বললে যে তাদের দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মনে পড়ল তাদের ত' সাতটার মরবার কথা। যা বাক্য। এতক্ষণে বোধ হয় কারবার হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ধেঁকতে যা বখুড়ীমা পড়ে গেলেন। বোঝ কি গেরো! গেল আরও প্রানের বিশ মিনিট।

মাসকেল বললে—তাহলেই বল, আমাদের অপরাধ কোথায়। ওয়াইফ-এর পরই বীরা আপনার লোক সেই বাপ মা তাঁহাই যদি অবুঝের মত আনটাইমলি অজ্ঞান হন তাহলে—

মহাবীর মুখ দিয়ে একটা আওরাজ করে বললে—সাথে বলি ব্রাদার যে খ্যাঙ্ক গড় আমার—।

শেষ

# আর্নিকল

## আর্নিকল হেয়ার অয়েল



আর্নিকল, ডুমরাজ, পাইলোকারপাশ প্রভৃতি ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত। ইহা অকালপক্কতা ও পতন নিবারক এবং কেশবর্দ্ধক ও মস্তিস্ক শীতলকারক।

মহেশ নেবোরেটরিজ  
প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১১

এজেন্টস  
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১  
ফোন : ২২-২৫৩৬



# এক কলেজের চারটি মেয়ে

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রাগু ভৌমিক (দাস)

বাণী কমল ভরতে ভরতে পুতুল ভাবে—হ্যাঁ, সব প্রায়শই উত্তর পেয়েছিল। কিন্তু কত দীর্ঘ দীর্ঘে। আজও শেষ হয় নি উত্তরের পালা। লোকটাকে এখনও সম্পূর্ণ চিনতে পারলো না সে।

পরদিন গিয়ে লোকটির দিকে তাকায় নি কিংবা তার মানের জটিলতার কথা ভেবে মানের সময় নষ্ট করে নি। কাজ করতে এসেছে—কাজ করে যাবে। বাস।

—ওর বাস্তুতা দেখে হেসে বলেছিল আরে, অত ব্যস্ত কিসের।

—কাজগুলি জেনে নিতে পারলে আমার পক্ষে সহজ হবে।

—কাজের মালিককে জেনে নিতে পারলে আরও সহজ হতো না?

—একটি লোককে জানা কি অতই সহজ। পুতুল তির্যকভাবে তাকায়।

জলে উঠেছে। ঝকঝকিয়ে জলে উঠেছে লোকটির মুখ। জলে উঠেই নিতে যায়। ঠাণ্ডা বিদ্রোপে বলে, পৃথিবীতে সব মানুষকেই জানা খুব সহজ। একই ফরমুগায় পড়ে। বাকি শুধু কয়েকজন।

কয়েক-কজন থেমে থেমে টেনে টেনে উচ্চারণ করে বৃন্তের মত নরেশের চারিপাশে ঘুরে গেল কথাটা।

—কাজ কিছুই না, গাদা গাদা লেখা নকল করা। এখানে-ওখানে টুকরো কাগজে ছড়িয়ে আছে গল্প, গান, কবিতা। সুন্দর বীধান খাতায় সেগুলিকে নকল করতো পুতুল। পুরাণো লেখাগুলি ফাইলে সাজিয়ে রাখতো।

—ভাগ্যস হাতের লেখাটা ভাল ছিল নইলে তো আর চাকুরী পেতাম না—পুতুল বলেছিল একদিন।

—চাকুরী দিতাম। যে কোন একটা—হাতের লেখার কাজ, না হলে মন্ডল লেখার কাজ—

চমকে তাকায় পুতুল। নরঘোবনা নারীর সন্দিগ্ধ চোখ।

—একদৃষ্টে তাই দিকে তাকিয়ে আছে নরেশ। মুখের ভাষার সঙ্গে সে দুটির কোন সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য নেই। বিরক্তিতে তাকিয়ে আছে ছুটি চোখ—

পুতুলের মুখের লজ্জার লালিমা, দ্বিধা অসহায় কাকণোর দিকে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে সেই চোখ দুটি। ঘষা কাচের মত ছুটি চোখ।

তারপর পুতুল যখন স্থির হয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে তখনই স্তন্যপায়—লেখা দিয়ে চাকুরীতে বহাল করি নি—চাকুরী দিয়েছি লেখিকাকে দেখে।

এবারে পুতুল চোখ তুলতেই পারে না। মনে হয়, চোখ তুলালই ও দেখবে মুক্ত রাফুসে ক্ষুণ্ণভরা ছুটি চোখ। কলম খেমে যায়। কি এর পর? এখনই হয় তো এগিয়ে আসবে লোকটা—তারপর...

বইয়ে পড়া সিনেমায় দেখা কতগুলি ছবি। বই-খাতা-টেবিল উল্টে ফেলে একটি তরঙ্গী ছুটে চলেছে। পেছনে ছুটি হাত—ছুটি চোখ—অকৌপাশের দৃঢ় বীধান আর বাফুসে ক্ষুণ্ণ।

পালাও...পালাও...দূরে...আরো দূরে...বহুদূরে। নেই—পেছনের কালো ছায়া সারে গিয়েছে...স্থির হয়ে পীড়িত বীফাতে থাকে সে। কিন্তু...পীড়াতেও সে পারে না। পায়ের তলায় মাটি নেই—চাকুরী নেই তার।

অনেকক্ষণ ওভাবে স্থির হয়ে বসে থাকে পুতুল। কলমটা শরীরের চাপে ঢুকে যায় কাগজে। কিন্তু না...

নেই কোন পদশব্দ। কোন স্পর্শ।

মুখ না তুলেই জু ছুটি তুলে তাকায় পুতুল। সেই চোখ—ঘষা কাচের মত ছুটি চোখ। সে চোখে মুগ্ধতা নেই, বিষম নেই, শ্রদ্ধা নেই। তবু, চকচক করছে চোখ দুটি। কিসের আলো ওখানে প্রতিফলিত?

আলো! কোন আলো!

অনেকদিন পরে এই আলোর রং চিনতে পেরেছিল পুতুল।

—একটি কবিতা বলছি লিখে নিন—সহজ সাধারণ কাঠে আদেশ। তাকিয়ে দেখে পুতুল। চোখ দুটিও সহজ সরল হয়ে উঠেছে।

—কেমন হয়েছে?

—খুব ভাল। আচ্ছা, আপনি লেখা চাপেন না কেন?



## এক কলেজের চারটি মেয়ে

—কেন ছাপবো? পাণ্ডা গম্ভীর প্রশ্ন। কণ্ঠে অপমানিতের উগ্রতা।

—মানে...এই সবাই তো ছাপে...

—সবাই ছাপে বলেই আমি ছাপবো না। সবাই যা করে আমি তা করি না। সবাই যা বলে আমি তা বলি না। সবাই যা চায় আমি তা চাই না।

এত গাঙ্গীর্ষ, এত জোরে কোনদিন কোন কথা বলে নি নরেশবাবু। সাধারণত তাঁর সমস্ত কথাগুলিই একটু হাক্কা—একটু আলগা।

সমগ্র ঘরময় সেই গম্ভীর গলার কথাগুলি ঘুরে বেড়ায়। সবাই যা বলে আমি তা বলি না...সবাই যা করে...আমি তা করি না...

অনেকক্ষণ পরে পুতুল আবার বলে, কিন্তু লেখাগুলি তো নষ্ট হয়ে যাবে।

—ধুলোর চেয়ে বাতাস ভাল।

—মানে?

—এক টাক...হুঁটাকা...আট আনা...শেষটা সের দবে বিক্রীত হওয়া—সেলফ, টেবিলে উঠানে ছাই হওয়া—এই তো ছাপা বইয়ের ইতিহাস-ভাগ্য। তার চেয়ে না-ই বা গেল সে লোকের ঘুরারে ঘুরারে...শুধু তাওয়া হয়ে থাক...যে জানতে চায় সেই শুধু জাম্বুক...

—কি করে?

—এখানে। এই ঘরে। এই ঘরে সাজিয়ে রাখব আমার সব লেখা। যে জানতে চায় সে আসবে এখানে—দেখবে আমার মৃতি, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক আর আপনাদের হাতের অমূল্যলখনে লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে দেখবে তারা। সমগ্র হয়ে উঠবে লেখার রূপ।

মাঝে-মাঝে এমনিভাবে কথা বলতো নরেশ। শক্তিতরা সৌন্দর্যময় বাক্য। মাঝে মাঝে ভালো লেখা লিখতো নরেশ। কিন্তু প্রায় সময়ই তার লেখা বাজে। মনের কতগুলি নোরা ছাপ।

আর কখন কখন অকার্যেই আঘাত করতো পুতুলকে। লাল হয়ে উঠতো পুতুল লজ্জায়, অসহায় ব্যথায়।

ইজিচেরারে শুয়ে একদুট্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতো নরেশ। ঘণ্টা কাটের মত দুটি চোখে জলতো সেই আলো—যে আলোর রং পুতুল চেনে না।

পুতুলের চাকুরী ছেড়ে না দিতে পারার অসহায় যন্ত্রণার দিকে তাকিয়ে বকবাকিয়ে উঠতো এই আলোর রং।

পাঁচ মিনিটের যন্ত্রণা—তারপরেই কি শান্তি...অন্তত পাঁচ দিন। কোন একটা আঘাত দিয়েই চূর্ণ করে যেত নরেশ। ও চোখের আলো নিয়ে শান্ত স্বপ্নের হয়ে উঠতো চোখ দুটি। একদম বদলে যেত সে। সাদা, বিষন্ন চেহারা। দূষিত খানিকটা বাষ্প বের করে দিয়ে সুস্থির হয়েছিল সে।

হুঁদিন, তিন দিন বেশ চলে যায়। চমৎকার ভঙ্গলোক।

কিন্তু অলক্ষিতে জমছে বিষ—একফোটা হুঁফোটা...তারপরেই হঠাৎ বিস্ফোরণ...

চাকুরীতে যোগ দেবার তিন-চারদিন পরেই একটা কবিতা নকল

করতে দিয়েছিল নরেশ। কবিতার নাম ছিল—ঘোবন দেখিয়ে চাকুরী করতে এসেছিল যে মেয়েটি। অশ্লীল শব্দে ভরা—অপাঠ্য কবিতা।

প্রথম দু'লাইন নকল কবেই কলম থেমে গিয়েছিল পুতুলের। নাম নেই কিন্তু পুতুলের বিষয়ণে ভর্তি কবিতাটা। একটা শিশুও বুঝতে পারবে...

অপমানে, লজ্জানার চোখ জলে ভরে উঠেছিল পুতুলের। কোনদিকে তাকাতে পারে নি সে। গোপনে চোখ মুছতে মুছতে নিজ হাতে, বকবাক করে কালিতে নকল করেছিল সেই অপমানকর কবিতা।

—এ সবই আমার প্রাপ্য। চাকুরী-জীবনের মাশুল...

চোখ নীচু করে কবিতাটা নকল করে ভিজে ভিজে নীচু চোখেই বাড়ি চলে গিয়েছিল সে। বাড়িতে গিয়ে কথা বলে নি কারো সঙ্গে—অনেকক্ষণ একা কেঁদেছিল। আর যাব না—এখানে আর যাব না—বারবার নিজের মনেই বলেছিল—মুক্তিতেই শেষ করে দেব এই যন্ত্রণা... কিন্তু...

চারিপাশে কতগুলি মুখ, পুতুলের চাকুরীর সংবাদে ছান্দে বকবাকিয়ে উঠেছিল মুখগুলি। কি করে সেই মুখের আলো নেভাবে পুতুল আর কেনই বা।

—কেন? কি কারণে? তার চাকুরীদাতা তাকে গালি দেন নি, শুধু একটা কবিতা লিখে ব্যঙ্গ করেছেন। সে কবিতার তার নাম নেই, তবে কেন ইচ্ছে করে সেই ব্যঙ্গ গায়ে মাথিয়ে নিচ্ছে পুতুল।

জল শুকিয়ে গেছে—চোখের নীচে শুধু কঠিন হুঁটি রেখা। হাতের তালু দিয়ে রেখা হুঁটি মুছে নেয় পুতুল—মন নিয়ে এ সস্তা সেটিমেটাল হবার সময় আমার নেই। মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই চাকুরী করতে যাব আমি। তালাবন্ধ আলমারীর কোণে অনেক কাপড়ের নীচে রেখে যাব মনকে। তা হলে, কোন অপমানই গায়ে লাগবে না আমার।

পরিদিন ওখানে গিয়ে দেখলো ঘর খালি। পাখা খুলেই একটুকরো কাগজ উড়ে এসে পড়ে ওর সামনে—সুধা-নর বোবনের ছাপা—চাকুরী ছলনা...

তার নিজের হাতে কপি করা কালকের কবিতার একটু টুকরো। এ কি? তাকিয়ে দেখে টুকরো কাগজের বাস্রে নরেশের লেখা মূল কবিতাটি এবং তার লেখা কপি দুটোই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

মনকে আলমারী বন্দী করে রেখে এলেও মন একটু অবাক হয়ে ভাবে—আশ্চর্য! কিন্তু, তখনই তাকে সংযত করে পুতুল। এখানে তোমার ভাবনার বা সমালোচনার কোন প্রয়োজন নেই; তুমি শুধু মরার মত শুয়ে-শুয়ে দেখে যাও।

কিছুক্ষণ পরেই নরেশ চাকর দিয়ে কতকগুলি কাজ পাঠিয়ে দিল ওকে। কতগুলি চিঠি লেখা। কতগুলি কাজ করা। সেই ছিন্ন কাগজগুলির উপর আরো অনেক কাগজ পড়লো—একটু পুর পুতুল নিজেই ভুলে গেল...ভুলে গেল কবিতাটির কথা—ভুলে গেল সেই অপমান, বেদনা।

আকাশের মতই মন। ক্ষণে ক্ষণে বদলায় তার রং।

কয়েকদিন কেটে গেল কাজের ব্যস্ততার নর, কাজের আনন্দে।

বেশ লাগে এখানে কাজ করতে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কাজ। কখন চিঠি লেখা, কখন গল্প, কবিতা, উপগ্রাস নকল করা, কখন বা বই থেকে কিছু পাড়ে শোনানো, কখন পাতার পর পাতা শুধু অম্বাদ করা।

সেদিন কাগজে মাজিন দেবার জগা লাল পেন্সিলটা সফ করে কাটছিল পুতুল। কতগুলি শব্দ কানে গেল—টিক অর্থবোধ না হলেও কেন যেন বেশরো একলো কথাগুলি। মুখ ফিরিয়ে তাকাল পুতুল।

আর সেইদিনই প্রথম দেখালা নরেশের ঘা কাডের মত ছুটি চোখ। দেখালা আর চমকে উঠলে—একদিনের মূণ নয়—নতুন একটা মুখ নিয়ে বসে আছে নরেশ—নাকটা ফুলে উঠেছে একটু—সমগ্র মুখে ত্রিশ্রতার মূত আভা।

—চাকুরী করাট বিরক্তিকর—নরেশ বলে।

—কেন? বিশ্রিত চর পুতুল। ভয়ও পায় একটু। কাজে কোন জটিল হয়েছিল কি?

—চাকুরী করব কুপ, মজুর—কালো, কুংসিত, বাডারা; আপনাদের মত সুন্দরী, নবযৌবনা মেয়ে কেন কাজ করবে! নীরে নীরে জ্বিলের রসে জারিয়ে-জারিয়ে কথাগুলি বলে নরেশ।

এই আকস্মিক অভাবিত আঘাতের অর্থবোধ করতে পারে না পুতুল। শুধু বেদনার মুখখানা নীল হয়ে ওঠে।

—বিশেষতঃ—নরেশ আবার শুরু করে।

‘বিশেষতঃ’ কি তা শুনতে চায় না পুতুল। যেটুকু শুনতে তাতেই ভরা পূর্ণ হয়ে গেছে তার। কিন্তু সে শুনতে না চাইলে কি হবে? নরেশ তাকে শোনাবেই।

—বিশেষতঃ বারা স্বামী ত্যাগ করে আসে—

নীল হয়ে গেছে পুতুলের সমগ্র দেহ। বেদনার প্রতিমূর্তি মত স্থির হয়ে বসে থাকে সে। আরও অপমান, আরও লাঞ্ছনা সহ্য করবার জগা প্রস্তুত করে নেয় মনকে। কিন্তু না। সমগ্র ঘর শান্ত নীরবতা।

সেই নীরবতার কারণ জানবার জগা তাকিয়ে চমকে ওঠে পুতুল। চকচক ছুটি চোখ লেহন করছে তার সর্বত্র। প্রাগৈতিহাসিক একটি হিন্দু মন্ত দুর্গম ফুদার অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে।

বিশ্বব্রহ্মের অভ্যাবতে অপমানের বেদনাও ভুলে যায় পুতুল। অবাধ-চোখে দেখে সেই আদিম ভক্তের ফুদানিবৃত্তির আনন্দ।

কয়েকদিনের শান্ত পরিবেশের পর আবার সেই ফুদা। হিন্দুরিয়ার মত কয়েকদিন পরে পরে শুরু হয় তার আক্রমণ। কোন না কোন বিষয় নিয়ে আত্মকে অপমানিত করে শতমুখে পান করে সেই বেদনার ধারা।

একদিন বেলা তিনটের সময় একটি ছোট ছেলোদোরের সামনে এসে দাঁড়ায়। পুতুল আগেই শুনেছিল নরেশবাবুর ছুটি বোন এখানে থাকে—একটি বিধবা অপরাধা সখা। অনেকগুলি ছেলোমেয়ে, নানিত-নাতনী। তাদেরই কেউ হবে—ছেলোটিকে চিনতে না পারলেও এটুকু বোঝে পুতুল।

বেশ দেখতে ছেলোট। একবার তাকিয়ে এটুকু ভেবে নিজের স্বাস কাজ করতে থাকে পুতুল। প্রায় দশ মিনিট পরে তাকিয়ে অবাধ হয়ে বাজ—নরেশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলোট।—কালো লোখ ছুটিতে ভীত অসহায় আভি।

মুখ তুলে একবারও তাকায় নি নরেশ; পাড়ে চলেছে একমনে; ছেলোটও দাঁড়িয়ে আছে একভাবে। দুটি পাখরের মূর্তি।

না তাকালেও নরেশের মুখভাবে ঈষৎ পরিবর্তন। মুহু হিশ্রতার আভায় ছেয়ে গেছে সেই মুখ।

—তা হলে আমি শুধু একা নই—পুতুল ভাবে, আরও অনেক শিকার আছে নরেশবাবুর।

আরও কিছুক্ষণ এভাবে কাটাবার পর নরেশ যেন হঠাৎ তাকিয়ে দেখতে পায় ছেলোটিকে। বলে, কি রে ভান্সু আমি ভেতরে আর।

আশ্চর্য। এই একটি কথাতেই সহজ হয়ে ওঠে ভান্সু। ক্রতপায়ে ঘরে এসে ঢোকে—সংসার খরচের টাকা চেয়েছে ওর মা। ভান্সুর হাতে কতগুলি টাকা দিয়ে দেয় নরেশ। সংসারের সহজ এক ছবি।

সেদিন, পরদিন, পুতুল শুধু এই দুইটি কথা ভাবে। ও বুঝতে পারে নরেশ অসহৃদ। বেদনার রস ভিন্ন নিবৃত্তি হয় না সেই অসহৃদ ফুদা! আর এই ফুদা নিবৃত্তির প্রয়োজনামুখারী এক ক্ষমতা রয়েছে তার স্বভাবে। সে জানে, কাকে কিভাবে আঘাত করলে সে বাখা পাবে সর্বাধিক।

গোড়া থেকেই পুতুলের চরিত্রের একটা দিক বুঝে নিয়েছে সে। পুতুলের দুর্বলতা—কোন কোণে সামান্য আঘাত করলেও বেদনার নীল হয়ে উঠবে পুতুল। এবং সেই একটু দিকেই থেকে থেকে বারবার তার আঘাতের প্রবৃত্তি। তুচ্ছতাই হলেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রস বের করে।

একদিন পুতুলের কাজ, কাজের ধরণ এমন কি কাজ করতে বসবার ধরণ পর্যন্ত নিয়ে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করছিল নরেশ। শেষে সহ্য করতে না পেরে পুতুল বলে, তা হলে আমাকে রেখেছেন কেন?

—তোমাকে রেখেছি কাজের জগা, তোমাকে রেখেছি তোমারই জগা। আবার সেই এক ধরনের কথা। যে কথায় কিছুমাত্র সত্য নেই। নরেশ তা ভাসভাবেই জানে এমন কি পুতুলও বুঝে নিয়েছে তা।

সম্বোধন নেমেছে আপনি থেকে তুমিতে। এ যমুনা দেয়ারই একটা উপায়। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা সহ্যও পুতুলের মুখে কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

সেইদিকে তাকিয়ে উৎফুল্লকণ্ঠ নরেশ বলে, বুঝলে, বা আমার ভাল লাগে তা কাঞ্চন মূল্যে কিনে নি।

—না। না। না। বারবার মনে জপতে থাকে পুতুল। কিছুতেই সংঘম তারাব না আমি। কিছুতেই মুখে ফুটেই দেব না বেদনার ছায়া—ওর ফুদা মোটা না। কিন্তু সামনে আসনা থাকলে দেখতে পেত সমস্ত মুখ ওর বেদনার নীল-কালো হয়ে উঠেছে।

অনেকদিন ভেবেছে পুতুল। কাজ করতে করতে নরেশের দিকে তাকিয়ে কলম খেঁমে গিয়েছে—খোঁতে বসে অসহনস্বভাবে হাত স্তটিয়ে নিয়েছে সে—অস্পষ্টভাবে সামনে হেসে উঠেছে নরেশের মুখ আর ছায়া ছায়া ভঙ্গ—কেন? এমন অদ্ভুত লোক—নরেশ—কেন...কেন...কি চায় ও—

দুইটি প্রশ্ন! কেন এমন করে? কি চায় ও? বারবার মন দোলায়িত হয়ে উঠেছে তার—



সন্ধ্যা রায়ের সৌন্দর্যের গোপন কথা...

## ‘প্রতিদিন লাক্স ব্যবহারেই আমার স্বক লাভ্যময় থাকে’

লাভ্যময়ী চিত্রতারকা সন্ধ্যা রায় বলেন,  
আমার রূপচর্চার নিত্যসঙ্গী লাক্স টয়লেট  
সাবান। লাক্সের স্নেহের যত নরম ফেনা  
আমার ত্বকে কোমল সুন্দর করে তোলে...  
অপূর্ণ মিষ্টি গন্ধে লাক্স মন ভরিয়ে দেয়।  
আপনিও আপনার ত্বক সৌন্দর্যের জন্য  
লাক্স ব্যবহার করুন।



লাক্স টয়লেট সাবান — চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য সাবান

মাদা ও রামধনুর চারটি রঙে  
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 176-140 BO

বঙ্গবন্ধু : বৈশাখ '৭১

জারপর একদিন সবই জানতে পারল।

অফিস-বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে পুতুল। এই ছায়াঢাকা সবুজ পথের শেষ সীমানার প্রকাণ্ড মাঠের মাঝেই নরেশের বাড়ি।

ক্লান্ত হয়ে গাছের তলার ঈড়ায় পুতুল। সড়ক থেকে অনেকটা দূরে এককোণে এই বাড়ি। ইটতে ইটতে বখন মনে হয় আর পারছে না। ভাবে রিক্সা করে এলে বেশ হতো। তখনই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে পৌছে গেছে—

—এসে গেছি, আর হু' চার মিনিট—পুতুল ভাবে, কিন্তু এই কম মিনিটের পথ—

কাল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আক্রমণ ছিল নরেশের। বেরিয়ে আসবার একটুকণ আগে হঠাৎ শুরু করে সে, পাড়ার লোকেরা কি বলছে কে জানে?

—কি বিষয়ে? জিজ্ঞাসা করেছিল পুতুল।

—তোমার আমার বিষয়ে।

আর কোন কথা বলে নি পুতুল। তাকায় নি। 'তুমি' সোধাদিন-সুনেই সে, বুঝতে পেরেছে নরেশের মনোভাব। হিংস্র কুখ্যাত জেগে উঠেছে—তার মনে।

প্রথম দিনের অকস্মাৎ 'তুমি' সোধাদিনের পর বহুদিন কেটে গেছে। নরেশ 'আপনি'ই বজায় রেখেছে সব সময়ে। শুধু মাঝে কয়েকবার জ্ঞানি হিংস্র কুখ্যাত জেগে উঠেছে 'তুমি'।

—বলবেই তো, নরেশ বলে, এ রকম ব্যবহারে বলবে না—

ঘড়িতে ঢা-ঢা শব্দে চারটে বেজে ওঠে।

—আমি যাই। পুতুল বলে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়ে সে। অফিস টাইম শেষ হয়ে গেছে—এখন সে মুক্ত।

আজ পুনরায় সেই অফিসে ঢুকবার মুখে ঈড়িয়ে মন ভরে বিকল হয়ে ওঠে। পা হুটো কেঁপে ওঠে খরখরিয়ে। নিশ্চয়ই কালকের চেপে রাখা আক্রমণ আজ শুরু হবে দিগুণ বেগে।

নীল আকাশের নীচে খানিকটা সবুজ রং। বাগানী কাণ্ডে হেলান দিয়ে সেই সবুজের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে পুতুল। হাওয়া বয়ে যায়—একরাশ উজ্জ্বল হাসি হেসে ওঠে সবুজ পাতাগুলি।

হাসি। সবুজ হাসি। রক্ত পৃথিবীর বুকে, সীমাহীন স্বদরহীন নীলাভার নীচে ঈড়িয়ে আছে এই গাছ। তবু সে হাসছে—

হাসি—

উজ্জ্বল সবুজ হাসি—

শক্ত হাতে বাগ ধরে এগিয়ে যায় পুতুল। নরেশের দিকে না তাকিয়েই গতদিনের অসমাপ্ত কাজ করতে শুরু করে। মনে মনে এক কঠিন সংকল্প করেছে সে।

—কেনই বা বলবে না, নরেশের গলা শোনা যায়, গতকাল কথা যেখানে ছেদ পড়েছিল ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেছে সে। যেন কাল নয় এখনই এই মুহূর্তে কথা শুরু হয়েছিল। শুধু একবার মুখটা গুরিয়ে নিয়েছিল পুতুল তাই ছেদ পড়েছিল কবিকের।

আশ্চর্য! টেবিলের কোণে চোখ রেখে পুতুল ভাবে, আশ্চর্য। কালের সেই ঘটনার পর কেটে গেছে পুরো একটি রাত, পূর্ণ প্রায় একটি দিবা। কত পরিবর্তন ঘটে গেল সমগ্র পৃথিবীতে। সারা দিনের উত্তপ্ত জলে বাওয়া সূর্য অপরাহ্নে সাতটা বা ছড়িয়ে আকাশকে

রাঙার অস্ত গেল। শান্ত স্তব্ধ ধূসর সন্ধ্যা—নীলব নগ্ন মোহময় রাত্রি—নতুন প্রভাতের নতুন উজ্জ্বল—

আর ও কি না স্থির হয়ে বসে রইলো ওর সেই বিবেকবৃত্তের মধ্যবিন্দুতে।

—সেক্রেটারীর সঙ্গে 'বস'-এর প্রেমকাহিনীর ঘটনা লোক স্বতঃসিদ্ধরূপে হয়ে নেয়। পুতুলের কানে এ কথাটা যেতেই চিন্তা ডুলে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে মাঝখানের অনেকগুলি কথা স্তন্যে পার নি সে।

—কাজেই তোমাকে ওরা আমার প্রেমিকা ভাববে তাতে আশ্চর্য কি! কথা শেষ করে নরেশ প্রত্যাশাভরা হুঁচোখ মেলে তাকায়। শান্ত হৈষ্যে বসে আছে পুতুল। জু হুঁচি এবটু কুঁচকে উঠেছে। কিন্তু মুখে যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই বরং একটু বিজ্ঞপের আলো।

বিহ্বলতার ছায়া নামে নরেশের মুখে। হতাশ হয়ে গেছে—একটু যেন ভয়ও পেরেছে। ঠিক বা ঘটা উচিত ছিল তা ঘটছে না—কেন—

—সকলেই বখন আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা ভাবছে তখন আমাদের পবিত্র থেকে কি লাভ? কঠে জোর দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে নরেশ।

জোরে কেসে ওঠে পুতুল। প্রাণ খোলা উঠ হাসি। সে রকম হাসি আজ পর্যন্ত কখনও হাসে নি পুতুল। বিষর নীল আকাশের নীচে একরাশ সবুজ—পাপড়ির হাসি—

সেই হাসির সামনে একান্ত অপ্রতিভ হয়ে কুঁকড়ে লুটিয়ে যায় নরেশ। হঠাৎ যেন ভয় পেরে গেছে ও। আর সেই অসহায়, অক্ষম, আক্রোশের দিকে তাকিয়ে হুঁচোখ জলে ভরে ওঠে পুতুলের। নিজের বস্ত্রাণা লোকে মেটাতে চার অপরের মুখের বস্ত্রাণার ছবি দেখে। যে পারে ছুতো জোটাতে পারে না সেই পথে পথে খুঁজে বেড়ায় পদতীন মানব। প্রায় দুই ঘটা কেটে যায়। পুতুল নিজের মনে কাজ করছে। নরেশ মুখ ফিরিয়ে শুদ্ধ হয়ে বসে আছে।

—হাসছিলেন কেন? হঠাৎ মুখে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে নরেশ। কঠে সেই পুরাণো আক্রোশ, কিন্তু চোখে একটু ভয়ের ছায়া।

—এমনি।

—এমনি কেউ হাসে না। শুধু—

—কি?

—শুধু পাগল আর নির্দোষরা অকারণে হাসে।

—তবে আমি হয়তো তাই।

—কি?

—পাগল কিংবা নির্দোষ। কিংবা, দুই-ই।

—না, আপনি পাগল বা নির্দোষ নন। এবং—

পুতুল মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে থাকে। অসমাপ্ত কথা স্তন্যবার আগ্রহ দেখায় না।

—এবং অকারণে হাসেন নি আপনি।

—তা হলে, আপনি জানেন আমি কেন হেসেছি? ইম্পাতের মত হুঁচোখ পুতুলের। ক্রোধের আগুনে ঝলকে ওঠে সেই দুই চোখে।

—আমি—ই—অ—জ—নি—

পুতুল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নরেশের দিকে। বলকে ওঠা ইম্পাতের মত উজ্জ্বল কঠিন দুই চোখের আলোতে জেসে ওঠে ঈষৎ

## এক কলেক্টর চারটি ঘরে

পাতলা চুল—ক্লান্ত দুটি চোখ। তীক্ষ্ণ বৈকি আসা নাক, দু' গালের দু'টি গর্ত। বলিষ্ঠ বুক... আরও... আরও নীচে নেমে আসে পুতুলের চোখ। পোষাকের আবরণ ভেদ করে সবই দেখতে পাচ্ছে সে...

...কামর-দুটি পা—আর চেয়ারের চারটি পায়... আর... তারপরে মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে থাকে। আর তাকান না।

পাখির নয় বরফের মৃতির মত স্থির হয়ে বসে থাকে নরেশ। সমস্ত শরীরে কি যেন এক শীতল শিহরণ। ঠিক সেদিন যেমনি লেগেছিল—সেদিন...

এই মুহূর্তে চোখ তুলে তাকালে চমকে উঠতো পুতুল—কি অদ্ভুত এক ভাব ফুটে উঠছে নরেশের চোখে—ওর কুয়াশাধূসর দুই চোখে মৃত্যু-শান্ততা, ভয় পেয়ে চৈতন্যে উঠতো পুতুল, একি আপনি মনে যাচ্ছেন নাকি?

মৃত্যু! নরেশ ভাবে, কতটুকু বয়স! তুমি দিতে পার? কতটুকু! তোমাকে পার হয়ে এসেছি আমি। ঈশ্বর, তোমাকে খুঁজেছি পৃথিবীর কোণে কোণে, আকাশ-বাতাসে। স্কাথও পাই নি। তোমাকে ডেকেছি বার-বার। তুমি সাড়া দাও নি। কতবার প্রতীক্ষাকরণে আহ্বান জানিয়েছি তোমাকে। তীক্ষ্ণ, কাপুরুষ, সামনে এসে দাঁড়াও নি তুমি। তারপরে বুকেছি, পড়ে, গলে বীভৎস বিকৃত হয়ে গেছে তুমি। তুমি অসুস্থ, তুমি অক্ষম। তাই তুমি ছাপু মত পদার আড়ালে বসে আছ।

বরফের মত ঠাণ্ডা চোখ দুটি বৃজে ফেলে নরেশ... সেই মৃত-শীতল রাজ্যে কতগুলি ছায়া... কঙ্কাল... আর ছায়া...

...দীর্ঘ, ঋজু চেহারা... একটু বাকান মাংসল নাক... আর টোট দুটো... সেই ছোট ছেলে নরেশও ভাবতো... বাবার টোট দুটো যেন কেমন... ঠিক অপরের মত নয়—বড় হয়ে একটা বিশেষণ খুঁজে বের করেছিল সে sensuous...

বাষাৎ দিনের মধ্যে কতটুকুই বা দেখতে পেত নরেশ। অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন তিনি—উঠতেন খুব দেরিতে... নিজের ঘরেই বসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন... ফিরতেন আবার সেই রাতে... রবিবারও সেই একই প্রোগ্রাম—ন'টার পরিবর্তে তরত! দশটা—কারণ রবিবার ঘুম থেকে উঠতেই দেরি হয়ে যেত...

কাজেই মাকে ঘিরেই সব। আদর আবার... মাকে খুব ভালই বাসতো নরেশ। প্রথম সন্তান... বোনরা হয়েছ অনেক পকে... মায়ের মুখে সব সময়ই কি রকম বিবাদ আর কারুণ্যের ছায়া ঘিরে থাকতো—ছেটি নরেশ মায়ের কাছে কাছে ঘুরতো আর ভাবতো, মা বোধ হয় এখনই কেঁদে ফেলবে...

মাকে এতটুকু কষ্ট দিতে চাইতো না সে। এমন কি কোন-কিছু চাইতে হলে আগে ভেবে নিত—মায়ের এতে অস্বিধে হবে কি না! কতদিন, কত জিনিষ কিনতে খুব ইচ্ছে হয়েও মাকে

বলে নি... নিজের মনেই চেষ্টা রেখেছে শিশুমনের সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

একদিন ভোরে উঠে দেখল বাবার ঘরের সামনে ভিক... ডাক্তারের নাম লেখা তিনটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে... ছুটাছুটি করতে চাকররা... মাকে দেখতে পেল না কোথাও... পুরো দুদিন মাকে দেখল না সে... তৃতীয় দিনে একটি চাকর এসে ওকে কোলে নিয়ে বাবার ঘরে গেল... সাদা চাদরে ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে নরেশ বাবা... তাঁকে ছাড়িয়ে ওর চোখ খুঁজে বেড়ায়... কোণে মা... বোজা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা... মাকে কঁাদতে দেখে ও নিজেও কেঁদে ওঠে...

মায়ের সেই কারা থামলো দু'মাস পরে। তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ অসুস্থ মানুষ হয়ে গেলেন... বিবাদের ছায়া চলে গেল।

সব সময় তিনি ব্যস্ত সম্পত্তির হিসেব নিয়ে। আর এই কাজে তার একমাত্র সহকারী নরেশ। কাজের সহযোগিতায় স্বপ্নের বাঁধন আরও নিবিড়তর হল।

সেই মাকেই কিনা শেষটা অপমানিত করলো নরেশ। আশ্রু তা কার জন্ম? সেই মেয়েটি। ডাক্তারিনে জন্মান সেই মেয়েটির জন্ম।

মীরাকে প্রথম যেদিন দেখেছিল তখন প্রথম বারিক জেপিতে পড়ে নরেশ। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে—গাড়িতে ফেরবার পথে দেখতে পেল সহপাঠী অমল দাঁড়িয়ে আছে বাস-স্টপে। বাসে ওঠা অসম্ভব—তবুও কোন দুর্ভাগ্য দাঁড়িয়ে আছে ও। নরেশ ভকে ডাকতেই, খুশি মুখে এসিয়ে এসে বলল, বাঁচালি ভাই—একা হলে তো যেমনি ভাবে হোক যেতে পারতুম। সঙ্গে যে একটা পুঁটলি—

পুঁটলি কোথায়? নরেশ অবাক হয়ে ওর খালি হাত পা এবং চারিপাশ দেখে।

সচল পুঁটলি। আমার বোন মীরা।

মীরার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিল অমল এক মীরারই একান্ত অমুরোখে ওদের বাড়িতে নামতে হল। সোকারক বলে দিল, দু' ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যেতে...

সেদিন নরেশ প্রথম বুকেছিল, মানুষ কত গরীব। হাতলভা কাপে ওকে চা খাইয়েছিল মীরা। মেয়েটির মনে যেন একান্ত জেন—নরেশকে দেখাবই দারিদ্র্যের নগ্নতা। বেশ লেগেছিল মীরাকে।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

# বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভ্য রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মাংস টান ভাব, চেনুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহায়ে অরুচি, শূলপনিন্দ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাবুল-কো সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য যেমন ১০৮ গ্রাম প্রতি কোটা ৩ টাকা, একটো ৩ কোটা ৮-৫০ মঃ ৬০ জা. মাং. ও পাইকারী দর পৃথক

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ (হেড অফিস- কলিকাতা, পুর্বে পাঞ্জাবি)

আরও অনেকদিন ওখানে গিয়েছিল নরেশ। প্রথমদিন ভেবেছিল, কি করে মাফ্য এত গরীবভাবে বাঁচে। পরে ভাবতে, এই দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও মীরা কি করে এত সুন্দর হল!

সত্যি বড় সুন্দর ছিল মীরা। কীতে কীতে চেপে নরেশ ভাবে, হ্যাঁ, মীরা সুন্দরই ছিল—পৈশাচিক সৌন্দর্য। ওর কালো চোখে, উজ্জ্বল রংয়ে একটা লালসার ব্যাপ্তি—

আজ তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু তখন! তখন মীরার চোখে, চেহারার দেখেছিল আশ্রমের দীপ্তি।

আট বছর। পুরো আট বছর তারা কাটিয়েছিল এভাবে। নরেশ যেত—কখন কোন সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে যেত হাতে করে। মীরাকে জোর করে কিনে দিত শাড়ি ব্লাউজ, গরনা। এইভাবেই কেটে গেল আট বছর।

মা সবই জানতেন। তবুও তিনি না জানার ভান করে নানারকম বিয়ের প্রস্তাব তুলতেন। নরেশ নানা বাজে অজুহাতে সবগুলো নাকচ করতো।

ছুকনেই জানতো—মীরার কথা উঠলেই সংঘর্ষ বাঁধবে। কাজেই এড়িয়ে চলাই ভাল। কিন্তু এড়িয়ে থাকতে দিল না মীরা। মান-অভিমান, চোখের জল, কথা বন্ধ করা, ভীতি প্রদর্শন। বিষ খাওয়া, গলার দড়ি দব, আরও কত কি। অতিষ্ঠ করে তুললো জীবন।

মনে মনে স্থির করে নরেশ, যেভাবেই হোক বলতে হবে মাকে। বিয়ের কথা তুলতেই চটে করে বলে দেবে মারাব কথা। কিন্তু মা আর বয়ের কথাই তোলেন না।

দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই গল্পই বদাচ্ছিলেন মা। বউট সুন্দরী, শিক্ষিতা—

—ওর চেয়ে সুন্দরী বউ এনে দেব। আচমকা বলে ওঠে নরেশ।

একটু অবাক হয়ে তাকান মা। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করেন না। তবু নরেশ দমে না। কোণের পরী-মুন্ডটির দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, ভেবে দেখগাম বিয়ে করাই ভাল। এ ভাবে ছদ্মছড়া হয়ে থেকে লাভ কি।

—যা হোক, তবু যে সময় থাকতে তা বুঝছ তাও আমার ভাগ্য—একটু হাসেন মা।

—তাহলে পাত্রী বেছি। পরমুহূর্তেই প্রশ্ন।

—পাত্রী। এই-না-ভরানক লজ্জা করে নরেশের। তবু সে হেসে বলে, না-মানে পাত্রী ঠিকই আছে।

—তাই বল। বিদ্রূপ বেঞ্জে ওঠে মায়ের কণ্ঠে। বউয়ের পরে বিয়ে—বিয়ের পরে বউ নয়।

কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা।

—পাত্রীটি কে তুমি? মায়ের স্বর একটু রুক্ষ। নিশ্চয়ই তোমার বছর সেই অসভ্য বোনটা নয়? ও মেয়েকে ঘরে আনিব না আমি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নরেশ। তারপরে যা কখনও কল্পনা করে নি, তাই করে বলল। মায়ের স্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল সে।

—মেয়েটি অসভ্য কেন বলছ মা? শাক্তকণ্ঠেই বলতে চায়। ভুবু বুকত পারে ওর গলা ফদ হয়ে উঠছে।

—অসভ্য নয় তো? কোন মেয়ে বিয়ের আগে এভাবে মিশতে পারে পুরুষের সঙ্গে।

—সে তো আমার সঙ্গে মিশেছে। দ্বিধায় স্বর জড়িয়ে আসে তবু বলে নরেশ।

—যে মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে, সে দশজনের সঙ্গেও পারে।

—মা। চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ।

—তুমি চোঁচালে কি হবে? আমি যা সত্য বলে বুঝা তাই বলবো। তুমি কি করে জানো, তোমার অবর্তমানে সে কি করছে!

—ওর বাড়িতে আরো লোকেরা রয়েছে না?

—লোকেরা রয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে মা বলেন, যেসব লোকেরা একটা লোকের সঙ্গে মিশতে দিচ্ছে তারা আরও পাঁচটার সঙ্গেই বা বেবে না কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্তব্ধ বিকৃতকণ্ঠে নরেশ বলে, মা, তুমি যাই বল না কেন, মীরাকে আমি বিয়ে করবই।

তারপরেই পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কথা নয়—এমন কি নিঃশব্দে শব্দও নয়। সব চুপ। হঠাৎ ঢ-ঢ- করে বিকৃত বিকট শব্দে বাড়িটা বাজতে থাকে। বাজতে শুরু করে আর থামতে চায় না। বেজেই চলেছে—

আর সেই শব্দের সঙ্গে মিশে'বার মায়ের কণ্ঠ, তা হলে, তুমি তোমার গছন্দমতই বিয়ে কর। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইলো না।

ঝড়ির শেষ ঘণ্টা শেষ হবার আগেই বেরিয়ে গেলেন মা। এক কথায় সব শেষ হয়ে গেল।

শেষ! নরেশ ভাবে, সব শেষ। এতদিনের ভালবাসা—মাত-পুত্রের নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বড় হয়ে গড়ে উঠেছিল যে স্বপ্নের বাঁধন—সবই শেষ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। এক কথায়।

তেজস্বর ঘরে আশ্রয় নিলেন মা। কিছুদিন পরে তিনি তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর নামের সম্পত্তি থেকে মাসে মাসে তাঁকে টাকা পাঠাবেন সরকারমশাই।

—আমি যাই। চারটে বেঞ্জে গেছে। পুতুল উঠে দাঁড়ায়।

—ঃ। হ্যাঁ। উত্তর দেয় নরেশ। অতীত থেকে এক মুহূর্তে চলে আসে বর্তমানে।

পুতুলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘাশ ফেলে সে। টাকার জন্তো কি না করে লোক, বিশেষত মেয়েরা। এই মেয়েটি একশটি টাকার জন্তো দশটা থেকে চারটে পছন্দ কাজ করছে—কত অজ্ঞায় অপমান সহ্য করছে।

—কিন্তু, কেন অকারণে পুতুলকে অপমানিত করে সে। কেন! নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই জবাবদিহি চায়।

—কেন? না করে পারে না সে। যে কোন মেয়েকে দেখলেই মনে হয় মীরার কথা। যে মেয়ে পুরো দশটি বছর অভিনয় করেছিল মিথ্যা প্রেমের।

প্রেম। অভিনয়। আর সে কিনা বিশ্বাস করেছিল সবই সত্য। মীরার মুখের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করেছিল সে। বিশ্বাস করেছিল লোক মীরা নিজের জীবনের চাইতেও ভালবাসে। তাকে নইলে

## এক কলঙ্কের চারটি মেয়ে

বাঁচবে না সে। বিবাহ-পূর্বে একদিন পরিস্রাসভের নরেশ জিজ্ঞাসা করেছিল, যদি আমি মরে হাই তবে তুমি কি করবে?

—সহমরণে যাব। উত্তর দিয়েছিল মীরা। ওর কালা চোখের তারার দিকে তাকিয়ে নরেশ বিস্ময় করেছিল সে কথা। কি অদ্ভুত। কি অসম্ভব সেই কল্পনা, পাখরের বুকে ফুস—মক্ষর গায়ে বর্ণা।

জেবেছিল, মীরা তারই... একান্তই তার। ভাবনে প্রতি ক্ষুর তাদের একত্রে গেঁথে তুলবে—মরণকে পরাজিত করবে তাদের অমর প্রেম। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল সে।

অহঙ্কারে মাথা উঁচু হয়ে উঠেছিল তার। আকাশ, বাতাস, মাঠ, মাটি সব তার। একজননের প্রেমে সব কিনে আবার বিলিয়ে দিয়েছে সে।

সব শেষ হয়ে গেল। ত্রিশ বছর বয়সেই সব শেষ হল। ত্রিশ বছর। সে বয়স যৌবন-কামনার পরিপূর্ণতা আসে জীবনে—দুধ ধীরে ধীরে ক্ষীরে পরিণত হয়েছে—সেই বয়সেই সব শেষ।

একদিন...

ডাক্তার বললো, সিফিগিটিক প্যারালিসিস।

নরেশ বিস্ময়-বেদনা ভরা হু' চোখে তাকাল ডাক্তারের দিকে নয় মীরার দিকে। হু' হাত বাড়িয়ে মীরাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো বুকে। ওর মনে হল, একবার শুধু একবার যদি সে মীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে তবেই ব্যাধির এই বাভৎসল্য থেকে মুক্তি পাবে সে। মানবের জীবনে এমন এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন সে মুক্তি ভুলে শুধু ভাবের সমুদ্রে ভেসে থাকতে চায়।

—মীরা... আকুল কণ্ঠে ডাকলো নরেশ।

জানলার কাছে অভ্যন্তরিক মুগ ফিরিয়ে বসে আছে মীরা। নরেশের মন গলে গেল। তারি দুঃখে দুঃখিত হয়ে কানছে সে।

—মীরা... মীরা...

কোন উত্তর নেই।

—মীরা, একবার কাছে এস।

নরেশ আবার আহ্বান জানায়। উঠতে চেষ্টা করে। অসম্ভব। কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাখর হয়ে গেছে।

ভক্তকণ্ঠে মুখ ফেয়ার মীরা, সেট

মুখের দিকে তাকিয়ে বললে যায় নরেশ। আগুনের মত চুপা অলছে সেই মুখে।

—তোমার লজ্জা করে না। তীব্র তীব্র বিদ্বেষভরা কণ্ঠ।

—লজ্জা। কেন

—কেন? একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করলে তুমি।

জ কুঁচকে অবাঁক হয়ে তাকায় নরেশ। এই একটি কথার সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পায় মীরার মনের। দশ বছরের প্রেম যে মনের চারিপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই মনের দুসার, খুলে যায়—

## —প্রত্যেক মানুষের জেনে রাখা উচিত—



চুল পাকলে অথবা  
ম্মাথার চুল উঠ গেলে  
আপনার সৌন্দর্য্য  
নষ্ট হয়ে যায়...

## ইলোরা কুঁচ আয়েল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা জাড়া রাখে

ইলোরা কেমিক্যাল . কলিকাতা-২

—স্বার্থপর। চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ, তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ।

একবারও ভাবছ না আমার কথা।

—তোমার নিজের দোষে তুমি শাস্তি পাচ্ছ।

—আমার নিজের দোষ। আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ, কোথায় আমার দোষ!

—তোমার না হোক, জন্মস্থলে পোষেছি তুমি এই ব্যাধি।

—হ্যাঁ। জন্মস্থলে পোষিত। কিন্তু জন্মস্থলে যে সম্পদ পোষেছি, তাঁকি সমান ভালে ভাগ করে নিই নি আমি। কোথায় থাকতে তুমি এতদিন। ডাক্তারবনে জন্মেছিলেন কবে পাঠে গলে শেষ হয়ে যেতে।

আর কোন কথা বলে না মীরা। বেরিয়ে যায়। সেদিন আর সে ঘরেই চুকলো না। অনেকবার তাকে ডাকলো নরেশ—চাকর দিয়ে বাথবার ডেকে পাঠাল—কিন্তু মীরা এল না।

শুধু সেদিন নয় তার পনের দিনও মীরা এল না ও ঘরে। তৃতীয় দিন জানতে পারল, মীরা চলে গেছে।

অবাক হল না নরেশ। সে যেন জানত। সেদিনের মীরার মুখ এই আভাষই নিয়েছিল তাকে। কাউকে কোন খোঁজ করতে বললো না সে। সরকারমশাইকে ডেকে শুধু একটা টেলিগ্রাম করতে বললো মাকে।

—বটরিমণি, আমার কাছ থেকে কালই এক হাজার টাকা নিয়েছিলেন আপনার অগ্রহৃতার জগু—ভীক অপ্রতিভ মুখে রকার বলে।

—তবে তো কমই নিয়েছে। গভীরকণ্ঠে উত্তর দেয় নরেশ।

কম নয়। মা এসে সিন্দুক খুলে জানা গেল গহনা একটিও নেই। মদ্য দশ হাজারের কম নয়। নরেশের চোখ দু'টো কর্কটকি ওঠে।

—দশ বছর প্রেম করেছে দশ হাজার নিয়েছে—এমন আর বেশি কে? কঠিন বিদ্রোপ বলেছিল সে।

দেয়াল থেকে একটা টিকটিকি ধপ করে মাটিতে পড়ে। চেয়ার একটু ঠেলে টিকটিকিটা কাছ ঘায় নরেশ। লাঠি দিয়ে উল্টে দেয় ওকে। নিজের মনে বিড়বিড়িয়ে বলে, আমি শত্রুকে ভালবাসি, কিন্তু হতুকে নয়। ঘৃণা চাই প্রেম না। ঈশ্বর, তোমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না আমি। আমার অগ্রহৃতার প্রথম দিনে তোমাকে বারবার আমি ডেকেছিলাম—একবার, শুধু একবার শক্তি দাও আমাকে। মীরার মূগে ঐ ঘৃণা নিবিড় ছবি দু'হাতে মুছে নেব আমি। আমার প্রার্থনা তুমি শোন নি।

মানবকে ভালবেসেছিলাম আমি। বিশ্বাস করেছিলাম মানবীর প্রেম। কিন্তু এখন দেখছি সবই মিথ্যা, ভালবাসার অস্তিত্ব শুধু চারটি অক্ষরে সীমাবদ্ধ। ভালবাসা স্তন্যে ভাল, পড়াতে ভাল, ভাবতে ভাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে জন্মবাস, 'নেই। আছে শুধু স্বার্থপরতা। বুদ্ধি দিয়ে, কথা দিয়ে সেই রকম রেখে মিথ্যা প্রচার করার নামই ভালবাসা।

আমি ঘৃণা করি পৃথিবীকে। ঘৃণা করি পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে। ঘৃণা করি পৃথিবীর ধূলিকণা। ঘৃণা করি নিজেকে। ঘৃণা করি সেই দিনটা যেদিন আমি জন্মেছিলাম। ঘৃণা করি বেঁচে থাকার দিনগুলি।

ঘৃণা করি মৃত্যুর আগামী দিবসটি। ঘৃণা করি এই অসহ্য ব্যাধিকে। কেন সে আমার দেহ পসু করে দিল? ঘৃণা করি আমার স্তন্য মনকে। কেন সে নিজের পসু হল না? ঘৃণা... ঘৃণা... ঘৃণা... আকাশকে আমি কালো করে তুলবো, বাতাস হয়ে উঠবে ঘৃণার বিষে ভারী, আর পৃথিবী পুড়িয়ে দেব ঘৃণার আগুনে। ঘৃণা... ঘৃণা... ঘৃণা... মুষ্টিবদ্ধ দু'হাত আকাশের দিকে তুলে চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ। উঠে ঈর্ষাতে চায় সে। ধমকেতুর মত তীব্র এক জ্বালা বুকে নিয়ে ঘর বেড়াতে চায় নীল আকাশের শূন্যতায়। কিন্তু... এক আর্ত অসহায় চিকিৎসার মাটিতে ভেঙে পড়ে সে।

কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। একটা লোককে মাঝখান থেকে কে যেন ভাঁজ করে দিয়েছে। দুটা হাত পা মিলে গেছে একসঙ্গে—বিস্তৃত এক জীব। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে এক সঙ্গে পিঠ ও পেট—

—মিশে যাক সব এক হয়ে যাক... বিড়বিড়িয়ে বলে নরেশ, একই দেহে এই তফাৎ সইতে পারছি না আমি।

অবশ পা ছুঁতে ঘষতে থাকে মুখ ও মাথা। পাচের বিষ ঢুক যাক চোখে, নাকে, মুখে মাথায়। সঞ্চারিত হোক সমগ্র দেহ। যাক সব এক হয়ে যাক...

বিছু না। শুধু জ্বালা... জ্বালা... চোখে, ঠোঁটে, নাসিকার অগ্রভাগে জ্বালা... যে জ্বালায় শুধু যন্ত্রণা মরণ নেই... যে জ্বালা দাহ করে ভস্ম করে না...

একটুকণের শাস্তি আর শুদ্ধতা। পরস্পরই বিপুল তীব্রতার চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ—উঃ, আমি আর পারি না। চেয়ারে হেঁচন দিয়ে বসে সে। যন্ত্রণার চাপে বুজ আসে চোখ দুটি—মণি দুটি ভেতরে ঠেলে ঢুকে যেতে চায়—ভিতরে আরও ভিতরে কালো গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দুটি কালো... এক কি।

—পাশে ঈর্ষিয়ে একটি মেয়ে।

অনেকক্ষণ তারিখে থাকে নরেশ। তখনও তার মন যন্ত্রণার উত্তেজনায় সোঁত রক্তে। হঠাৎ তাকিয়ে চিনতে পারে না...

এক... দুটো... তিন... মন ফিরে এসেছে সেই পূর্ণাঙ্গা পৃথিবীতে। বর্জ্যা, বুদ্ধি, চিত্ত, বিবেচনার শক্তি আবির্ভাব ঘেরা পৃথিবী।

পুতুল... পুতুল... বস...

আর হঠাৎই যেন চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। পুতুল বস... তারই অগ্নিতে একশ' টাকা মাইনের কর্মচোর ঈর্ষির জ্বালা তার পাশে। শুধু এই মুহূর্তে নয়—বহুংগ ধরে। সে দেখেছে—তাব নগ্ন আত্মাকে দেখেছে সে। পুতুলের শাস্ত, স্থির, আত্মস্থতা, ঘৃণা হাজার আন্তন ধরিয়ে দেয় তার মনে। রাগে মুখ কালো হয়ে যায়। জ্ঞ ওঠে কুঁচকে। মনের ওমানো সমস্ত ক্রোধ ও প্যাশন একসঙ্গে ঠেলে বেরুতে চায়।

—কেন ঈর্ষিয়ে আছি এখানে? কোন অধিকারে? বিত্তী ভাবে চেঁচিয়ে বলে ওঠে সে।

কোন উত্তর দেয় না পুতুল। শুধু ওর চকচকে কালো চোখ দুটি আরও বড় হয়ে ওঠে।

—কোন অধিকার অনধিকার প্রবেশ করেছেন আপনি? চোর। চুপিচুপি আমার ঘরে এসে ঈর্ষিয়ে আছি। রাগে অন্ধ হয়ে পাগলের



## এক কলেক্সের চারটি মেয়ে

মত চোঁচাতে থাকে সে। চরিত্রহীন!...একটি পুরুষের নয়তা দেখতে লজ্জা করে না তোমার। আমার আত্মার নয়তা দেখবার লজ্জা তুমি...জু...আপনি...এ কি আপনি কীদছেন।

কালো চোখ দু'টিতে শ্রাবণ রাতের বর্ণণ।

—হী। আমি কীদছি পুতুল বলে। আমি কীদছি। কিন্তু আমি নিজের অপমানে বা আপনার দুখে কীদছি না। কীদছি পৃথিবীর দুখে।

—পু-খ-বীর দুখে। নরেশ বীরে বীরে অজানিতেই বলে। পরক্ষণেই চোঁচের ওঠে, পৃথিবীর দুখে। পৃথিবীতে কোন দুখ নেই—আছে শুধু ঘৃণা...নিরুজা ঘৃণা...

—ঘৃণা! পুতুল উত্তর দেয়, না! ঘৃণার হাওয়ার পৃথিবী পূর্ণ থাকলে মানুষ সর্বপ্রথম নিজেকে হত্যা করতো।

—হত্যা করতো!

—হী। আপনি ভাবেন নিজেকে আপনি ঘৃণা করেন। যদি তাই সত্য হত তবে একমুহূর্তে দেরি না করে আত্মহত্যা করতেন আপনি, দুখ আছে আপনার মনে। তাই অপেক্ষা করছেন মুহার—পরিণতির। বলতে পারেন, কি তফাৎ পশু ও মানুষের?

—কি? খলিত্বের নরেশ বলে।

—মানব দুখে অমুভব করে, পশু করে না। পশুর দুখা আজি, কাম আছে কিন্তু...

—কিন্তু?

—কিন্তু দুখবোধ নেই। এখানেই সে মানব থেকে পৃথক।

মৃতশিশুর স্মৃতি বৃকে নিয়ে পশুমাথা সমস্তজীবন কাটায় না। শোক দুখে ওরা ভাগ করে না আহাির নিম্না মৈথুন। আরও আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন?

স্বপ্নাক্ষর ব্যক্তির মত মুখ তোলে নরেশ—যেন বস্তুব্যো কতকটা বুঝতে পারছে সে, সবটা বুঝতে পারা অসম্ভব।

—আশ্চর্য এই যে, আনন্দ আছে ভদের মনে। আনন্দ অমুভব করতে পারে ওরা কিন্তু দুখ—ঐক তেমনি অববোধ্য চোখে তাকিয়ে থাকে নরেশ।

—দুখের সেনালী আপেল মানব একা খেয়েছে। তাই তাকে এভাবে ঘিরে ধরেছে—দুখের সৌন্দর্য, দুখের মর্হমা, দুখের শক্তি, দুখের ব্যথা, দুখের মুহূর্ত। দুখকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না সে, দুখকে বাদ দিয়ে বাঁচতে চায় না সে।

—দুখহীন জীবন তো পশুর জীবন। একটু থেমে যোগ করে পুতুল।

স্বপ্নভরা চোখ দু'টি বুজ যায়।

—কত দুখ আমাদের। খেতে পাবার দুখ, খেতে না পাবার দুখ, অকাজের দুখ, বৈচে থাকার দুখ, মুহার দুখ, দুখের দুখ...

—আবেশে চোখ বুজে উঠেছে আপনার। হঠাৎ জেতে ওঠে নরেশ, যেন কত আনন্দ পাচ্ছেন।

—আনন্দ? হী, দুখে আনন্দই পাই আমরা। তাই দুখকে বয়ে নিয়ে বেড়াই, একটু একটু করে বড় হতে থাকে সে—শিশুর মত তাকে লালন করি বৃকের মধুতে। কখন সে বলিষ্ঠ মূহিতে সামনে



## এতীশ কবিরাজের মহাভুক্ষরাজ

### তৈল

ইহাই একমাত্র কেশতৈল আয়ুর্বেদীয়  
ভেষজের গুণাগুণ ঐকরূপাধিয়া।  
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য  
ডাঃ ভজান চন্দ্র শ্রোমস  
কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।



আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

এসে পড়ায়। তার দিকে তাকিয়ে মনে পাই, শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয়...

—কিন্তু, যখন সে বিরাটাকার দৈত্যের মত তোমাকে গ্রাস করতে চায় তখন...? বিক্রমে তৈলাক্ত হয়ে ওঠে নরেশের কণ্ঠ।

—হী। স্বীকার করে পুতুল। কখনও সে বড় হয়ে ওঠে... অনেক... অনেক বড়। তার মাথা আকাশে ঠেকে, কালো হয়ে ওঠে সমস্ত পৃথিবী তার দেহ ছায়ায়। হুকার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সে, কেন? কেন মুক্তি দিলে আমার? এবারে, আমি তোমাকে শেষ করবো। আমার এই হাতের মুঠোর পিসে, গলিয়ে দেব তোমাকে।

—শুধু বলেই খামে না, পিষে চূর্ণ করেই দেয়। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে নরেশ।

—না। তা দেয় না। শাস্ত গান্ধীর্থে উত্তর দেয় পুতুল। ক্ষণতরে বিহ্বল হয়ে বাই আমরা, কিন্তু তখনই মন স্থির করে সেই দৈত্যকে পুনরায় বন্দী করে সেই ছোট মাটির পাত্র—ফেলে দিই সমুদ্রে।

—সমুদ্রে? রাগ ভুলে, বিহ্বলকণ্ঠে বলে ওঠে নরেশ?

—হী সমুদ্রে। নীলজলে ভেসে চলে যায় সেই দৈত্য। তারে পীড়িয়ে থাকি আমরা—মাথার উপরে নীল আকাশ—পেছনে সবুজ মাটি।

—ওপরে নীল আকাশ পেছনে সবুজ মাটি, বিক্রমে ভেঙে ওঠে নরেশ।

একটু পরে আবার বলে, কি করবে সেই লোক? যার মাথার ওপর নেই নীলাকাশ, পেছনে সবুজ মাটি।

—সকলেরই আছে। কার নেই অসীমব্যাপ্তিতা নীল মন? কার নেই সবুজ জ্বন?

নিজের মনেই বলতে থাকে পুতুল, এখানে এগে দেখি আপনার দুঃখ। ভাগ্যের নির্ভর কশাঘাতে আপনি আজ পঙ্গু। চার ঢাকার একটি গাড়িতে আপনার পৃথিবী সীমায়িত। সেই পৃথিবীকে গিয়ে বিবেচ, বিরক্তি, অপমানের ছালা।

—আপনার কত টাকা। কিন্তু অর্থ আপনাকে মুক্তি দিতে পারে না পঙ্গুতা থেকে। তব এই অর্থই গ্রহে নিয়েছে আপনার

চারিপাশে অসহায় কতগুলি মানব। যারা অলসীন না হয়েও শক্তিশীল। তাদের অপমানিত করেই গানের ছালা যেটান আপনি।

—আর, এইকু পথ পেরিয়ে এগিয়ে বাই আমি। একটি ছোট বাড়ি দুটো ঘর অনেক লোক। সেখানে দেখি দুঃখের আর এক রূপ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এসে আমার বোন ছোট একটি বাটাতে শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছে। ছোট বোনগুলি তাকিয়ে আছে সোলুপদৃষ্টিতে। ওদের নির্দিষ্ট অংশ ওরা পেয়েছে, কিন্তু ওদের খিদে মেটে নি। খিদে কখনও মেটে না ওদের। উম্মনের ধারে বসে মা বিনা ভেলে রাঁধবার প্রাবাস্ত প্রহাস করছেন। আর একটি ঘরে ফিরে এসে আঁহস থেকে ২বে পাওয়া লাহুনার কথা ভাবছে আর অনাগত অপমানের হিসাব করছে।

নরেশ শুদ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে।


—টাকা। কিছু টাকা। তাদের সমস্ত দুঃখ তুলিয়ে দিতে পারতো কিছু টাকা। যে টাকা আপনার কোন উপকারে আসে নি, যে টাকার জোরে আপনি শুধু অপমান করেছেন অপরকে, সেই টাকার অভাবেই তাদের এত দুঃখ। যুবতী মন্দের মনে প্রেম নেই, আনন্দ নেই, শিশুর মনে সরলতা নেই, চাঞ্চল্য নেই। তারা শুধু ভাবে... অভাব, অনটন, অর্থসোলুপতা এই নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের পৃথিবী। হাত, পা, নাক, চোখ, মুখ, দেহের কোন অঙ্গের কথাই ভাবে না তারা—সারা শুধু ভাবে পেটের ক্ষিদে কত।

বাড়ির সামনে এসে পুতুলের মনটা কিন্তু হোটে যায়। একগাদা শ্লোক পীড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। দূর থেকে অতগুলি লোকের জটলা দেখে কি যেন এক অজানা আশঙ্কার মন কেঁপে ওঠে পুতুলের। সে নিজের কারণ জানে না, কিন্তু ওর মনে হয় যে ব্যাপারটা তাদের বাড়ি সজ্ঞাস্ত।

পা দুটো কি রকম ভারী হয়ে উঠেছে। তবুও অনেক কষ্টে সেই পাখরের মতো পা দুটো টেনে, টেনে পুতুল এগিয়ে যেতে থাকে।

কয়েকটি ছেলে পীড়িয়ে আছে। ওর দিকে সেই দলটি একদৃষ্টে তাকায়। ওদের মুখে বিরক্তির কুন্দন। শুধু একটি ছেলে পীড়িয়েছিল একটু এলিফে। তার উদাস মুখের দিকে চোখ পড়তেই...

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।



ডার্লি ও কান্ডিও

# দুলালের

## তালমিছুরী

## এম্পিরিন শ্রীস্বাধীনসহায় গৃহসরকার

এম্পিরিনের নাম শোনে নি বা এম্পিরিন ব্যবহার করে নি এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। সারা পৃথিবীর লোকে এই বস্তুটিকে যে পরিমাণে ব্যবহার করে, তা ঊনালে অবাক হতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৬২ সালে আড়াই কোটি পাউন্ডের বেশি এম্পিরিন তৈরি হয়। প্রায় ১৫০০ কোটি এম্পিরিনের বড়ি এই বৎসরে ব্যবহার হয়। তা ছাড়া, কেরিন বা কোডিনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এর ব্যবহারও প্রায় এই পরিমাণ হবে। সচরাচর স্বপ্ন, বেদনা এবং শরীরের কোন স্থানে প্রদাহ কমাবার জন্যই এর ব্যবহার হয়, একথা সকলেই জানে।

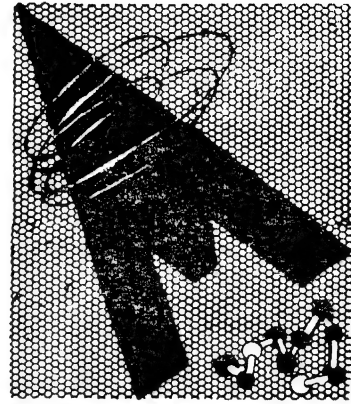
এম্পিরিনের রাসায়নিক নাম এসেটিল স্যালিসিলিক এসিড। জার্মান ভেবজনিরীতা ব্যায়ার কোম্পানি এই ব্যবসায়িক নামটি প্রথমে দেন। বর্তমানে শুধু এই নামে নয় আরও অনেক নামে এটি বিক্রি করা হয়।

এম্পিরিন তৈরির অনেক আগেই স্যালিসিলিক এসিডের ও তা থেকে তৈরিনানা ভেবজের উপকারিতা জানা ছিল। উইলো নামক গাছের ছালের কাঁথ'বে নানা জ্বরের উপশম করতে পারে একথা ১৭৬৩ সালে এডওয়ার্ড স্ট্রোন নামক একজন ইংরাজ পুরাতন লন্ডনের রয়েল সোসাইটির পত্রিকার প্রথমে প্রকাশ করেন। নানারকম জ্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরেও এর ব্যবহারে কিছু উপকার হোত! কারণ এতে অবস্থিত স্যালিসিন শরীরে স্যালিসিলিক এসিডে পরিণত হয়। অবশ্য এই উইলো গাছের ছালে কুইনিন না থাকায় ম্যালেরিয়ার নিরাময় ঘটত না। সিঙ্কোনা ছাল দামী হওয়ায় অনেকে তার ভেজাল হিসাবে উইলো ছাল ব্যবহার করত।

১৮২৯ সালে লেরো নামক একজন ফরাসী ভেবজবিদ এই ছাল থেকে স্যালিসিন নামক স্লুকোসাইড পৃথক করেন। এই বস্তু স্যালিসিন এলকোহল ও স্লুকোজের রাসায়নিক সম্মেলের ফল। এ থেকে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করেন ইতালীয় রাসায়নিক পিরিয়া ১৮৩৮ সালে। এর আগে জার্মান রাসায়নিক লুইগ 'মেডোহাইট' নামক একটি সুগন্ধি গুণ থেকে এই এসিড তৈরি করেন। ১৮৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্টর ও ফরাসী দেশে কাস্চর 'উইন্টার গ্রীন' নামক গুণ থেকে মেথিল স্যালিসিলেট নামক সুগন্ধি উদ্বারী তেল পৃথক করেন এবং তা থেকে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করেন। এই এসিডের যৌগিক পরে অল্প অল্পে গাছেও পাওয়া যায়।

১৮৫২ সালে গার্লিং ও ১৮৫৯ সালে কোল্বে এই এসিডের প্রচুর প্রকৃতির সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৭৪ সালে স্চুভাক্তার ম্যাকলাগান নিজের শরীরে স্যালিসিন প্রয়োগ করে প্রমাণ করেন যে বহুটি বিষক্রিয়া নাই। পরে তিনি একটি বাতজ্বরের রোগীকে ঔষধি প্রয়োগ করে আশ্চর্য সফল পান। ১৮৭৬ সালে রাইস এবং স্ট্রাকার জার্মানিতে এই রোগের চিকিৎসার স্যালিসিনের উপকারিতার কথা প্রকাশ করেন। পরের বৎসরে সে নামক ফরাসী ডাক্তার সাক্ষ্যবাস্ত এবং নিউয়র্ক সিটি ও মাথাধরার এর উপকার প্রমাণ করেন।

স্যালিসিলিক এসিডের এই সব গুণ থাকলেও তার একটি প্রধান দোষ এই যে, গুঁড়া বা বড়ির আকারে খাওয়ার পরে পাকস্থলীতে



## দ্বিগুন বার্তা

অল্পবিস্তর প্রদাহ ঘটে এবং পরিমাণ বেশি হলে মুখ ও গলায়ও কিছু প্রদাহ হয়। এই দোষ দূর করার জন্য এর সোডিয়ামথিট লবণ ব্যবহার শুরু হয় কিন্তু তার স্বাদ মিষ্ট হ'লেও অকচিৎ। সরল রাসায়নিক পরিবর্তন এই এসিড থেকে এসেটিল স্যালিসিলিক এসিড প্রথমে তৈরী করেন গেরহার্ট ১৮৫৩ সালে। এই পরিবর্তন ঘটাবার অতি সহজ এবং সস্তা উপায় আবিষ্কার করেন জার্মান ব্যায়ার কোম্পানীর ডাক্তার হফম্যান। এ কারখানায়ই ডেনার নামক ভেবজবিদ এই বস্তুর উপকারিতা ভালভাবে প্রমাণ করেন এবং মাঝে মাঝে নিজের প্রদ্রাবে কতখানি এম্পিরিন নির্গত হচ্ছে তা নির্ধারণ করে দেখান যে, এম্পিরিন অশ্লিষিত অবস্থায়ই শরীরে রোগলক্ষণের উপশম করে স্যালিসিলিক এসিড তৈরি করে নেয়।

জার্মানিতেই ১৮৯৯ সালে প্রথমে এই গুণের ব্যবহার হয়। পাকস্থলীতে প্রদাহ উৎপাদন করে না এবং স্বাদও অপ্রীতিকর নয় এই দুই গুণেই এর আদর বাড়তে থাকে। ১৯০০ সালে উইটগওয়ার প্রমাণ করেন যে বেদনা দূর করতেও এম্পিরিন যথেষ্ট শক্তিশালী। মাথাধরা, আধকপালে এবং ক্যালার রোগের যন্ত্রণা দূর করার জন্য এর ব্যবহার বাড়তে থাকে।

জার্মানিতে উইটগওয়ার এবং ওপ্লেমুট ১৮৯৯ সালে চিকিৎসার এম্পিরিনের ব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করেন। তাঁরা স্যালিসিলিক এসিডের প্রদাহকারিতা এবং সোডিয়াম স্যালিসিলেটের অপ্রিয় স্বাদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে এম্পিরিন এই দুইয়ের চেয়ে অনেক ভাল। এম্পিরিনের অল্পত বেদনানাশক শক্তির বিষয়েও উইটগওয়ার জোর দেন। দাম খুবই সস্তা হওয়ায় এই সময় বহু চিকিৎসক এই বিষয়ে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। মাথাধরা, আধকপালে মাথাধরা এবং ক্যালারের বেদনা দূর করার জন্য এর ব্যবহার উত্তরোত্তর লাভানুত থাকে। এম্পিরিনের বড়ি গিলে খাওয়া যে উচিত নয়, গুঁড়া করে জলের বা লেবুর জলের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, এই সতর্কবাণী অনেক লোকে অগ্রাহ্য করার, পাকস্থলীর প্রদাহে কষ্ট পেতে থাকে। এম্পিরিনের সোডিয়াম বা ক্যালসিয়ামথিট লবণ ব্যবহারে অন্তর্বিধা

হয় না। অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহারে এম্পিরিন বা স্যালিসিলিক এসিড পাকস্থলীতে ক্ষত উৎপাদন করতে পারে।

কোন কোন লোকের এর ব্যবহারে এলাস্টিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রদাহিত হার কমান, বেদনা নাশ, বাতের কষ্ট লাঘব এবং প্রস্রাবে ইউরিক এসিড নিঃসরণের ক্ষমতা এর ব্যবহার। মফিনের বেদনানাশক ক্রিয়া আরও প্রবল হ'লেও তার প্রধান অসুবিধা এই যে, তার ব্যবহার হ'লে একবারের পরে অভ্যাসে ঠাণ্ডার তখন আর মফিন না হ'লে চলবে না। চর্মের ঘর্ষ নিঃসরণ বাড়ার বলে এম্পিরিন এর কমাতে সাহায্য করে। গ্রন্থিতে বাতের প্রবাহ ও বেদনা দূর করে আক্রান্ত অঙ্গের সচলতা ফিরিয়ে আনে। সাধারণ বাত প্রস্রাবের সঙ্গে ইউরিক এসিডের নিঃসরণ বাড়িয়ে গাঁটের নড়াচড়া ফিরিয়ে আনে।

ঘর্ম ও গুহ্মের আকারে এম্পিরিন সমান ওজনের সোডিয়াম স্যালিসিলেটের মতই ফল দেয়, তবু এর নিজস্ব কতকগুলি গুণ আছে। শুধু শরীরে স্যালিসিলিক এসিড উৎপাদনের উপরেই এই গুণগুলি নির্ভর করে না। ব্যবহারের হ'লে ঘটার মধ্যে রক্তে অবিকৃত আকারে এক্সে পাওয়া যায় এবং এই দুই ঘটাই এর বেদনানাশক ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। প্রস্রাহের কোন কোন ক্ষেত্রে এম্পিরিনের উপকার স্যালিসিলেটের উপকারের চেয়ে বেশি হয়। ফেনিল বিউটাজোন নামক যে ঔষধ সম্প্রতি বাতের ক্ষত ব্যবহার হচ্ছে, তার চেয়েও এম্পিরিনের প্রদাহনাশক শক্তি বেশি। অবশ্য এম্পিরিনের কতক অংশ শরীরে স্যালিসিলেটে পরিণত হয় বলে তার উপকার মাত্রা অল্পসরে পুরাপুরি ঘটে না। কোন নতুন আবিষ্কৃত ঔষধের উপকারিতা প্রমাণ করার জন্তে গোড়াতেই মানুষের উপরে পরীক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। একজন্ত যে রোগের জন্ত ঔষধটি ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়, সেই রোগ লক্ষণগুলি কোন ক্ষুদ্র প্রাণিতে তৈরি করতে পারলে পরীক্ষার সুবিধা হয়। এর, গ্রন্থিবাত এবং বেদনা এইভাবে পরীক্ষাধীন করেকটি প্রাণিতে উৎপন্ন করা যায়। এর উৎপাদন সবচেয়ে সহজ। নানারকম ব্যাক্টেরিয়ার পোষক জ্রাব থেকে 'পাইরোজেন' নামক বিষবস্তু সহজেই আলাদা করা যায়। প্রোটিনাস ব্যাক্টেরিয়া থেকে পাওয়া এই বস্তু অতি ক্ষুদ্র-মাত্রায় (১ গ্রামের ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) প্রাণীশরীরে সূচি-প্রয়োগ করে খরগোষের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বাড়ান যায়। পরীক্ষার আগে এম্পিরিন খাওয়ালে এ ক্ষর ঘটে না। তেমনি ইঁদুরের শরীরে কোন প্রাণীর প্রীহা থেকে প্রাপ্ত কোবের সঙ্গে যক্ষার জীবাণু অল্পমাত্রায় সূচিপ্রয়োগ করলে কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রন্থিবাতের সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। লেজের এবং অঙ্গান্ত সন্ধিস্থানে ফুসা এবং প্রদাহ কয়েকমাস পর্যন্ত থেকে যায়। শুধু যক্ষা বীজাণু বা তার নিবাস সূচিপ্রয়োগ করলেও এই ফল দেখা যায়। সন্তবত মানুষের বাতও এইরকম ব্যাক্টেরিয়া থেকে উৎপন্ন বিষবস্তুর বিক্রিয়াতেই ঘটে।

বহু পরীক্ষার দেখা গেছে যে, গ্রন্থিবাত এডিনাল গ্রন্থি থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি বহুমূল্য হরমোনই সবচেয়ে ফলদায়ক হয়। সম্প্রতি ইম্পিউর্যাল কেমিকাল ইন্সটিটিউট নিউইয়র্ক দেখিয়েছেন যে, এম্পিরিন, সোডিয়াম স্যালিসিলেট, ফেনিল বিউটাজোন এবং এমিনোপাইরিন মানুষের ও ইঁদুরের বাতে যথেষ্ট উপকার দেয়। আবার সেবিং কর্পোরেশনের দু'জন ডাক্তার দেখিয়েছেন যে, এম্পিরিন বেদনা-নাশক হিসাবে মফিনের ১৫ থেকে ৩৫ ভাগ ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ

মফিনের ১০ গুণ ওজনের এম্পিরিন দিলেই সমান ফল পাওয়া যায়। এতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, কারণ এম্পিরিনের দাম মফিনের ৫০ ভাগেরও কম। আর এ বস্তু মফিনের মত 'নেশা'র পরিণত হয় না।

শরীরে আঘাত বা প্রস্রাহের ফলে বেদনা কেন বা কিভাবে জন্মে এ বিষয়ে পরীক্ষার জানা গেছে যে, এই অবস্থার আহত স্থানে কতকগুলি বিশেষ পলিপেপটাইড বা 'কিনিন' সৃষ্টি হয়। ডাঃ লিম দেখিয়েছেন যে, এম্পিরিন স্নায়ুর উপরে কিনিনের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে। ব্রোডকানিন নামক এই বস্তু পেটে যে মোচড়ান বেদনা উৎপাদন করে, এম্পিরিনে তার নিরাময় সহজেই হয়। কোন কোন ফুলের রস বা কোন কোন প্রাণীর লোম বা পালকের স্পর্শকণা প্রস্রুতি বিভিন্ন প্রদাহক বস্তু শ্বাসনালাতে ঢুকে যে ইপানির মত শ্বাসকণ্ডের সৃষ্টি করে, তা শরীরের আশ্রয়ক প্রস্রুতির অধাতাবিক প্রবল ক্রিয়া বলা যায়।

গিনিপিগের শরীরে অল্পমাত্রায় ডিমের স্বেত অংশ বা ষোড়ার রক্তরস প্রথম সূচিপ্রয়োগে স্তরস্তর বেশি ফুল দেখা যায় না। কিন্তু কয়েকদিন বাদে আর একবার একই বস্তু ষোড়ার সূচিপ্রয়োগ করলে শ্বাসনালাতে অতিরিক্ত প্রদাহ, শ্লেষা নিঃসরণ এবং আক্ষেপ দেখা যায়; এই শ্বাসকণ্ড এত গুরুতর হতে পারে যে এতে প্রাণটিও মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থাকে anaphylactic shock বলে। প্রথম সূচিপ্রয়োগের ফলে রক্তে যে এন্টিবডি তৈরি হয়, দ্বিতীয়বারে সূচি-প্রয়োগের পর সেই এন্টিবডি পূর্বে এন্টিজেনের সঙ্গে প্রবল ক্রিয়ায় মিলিত হয়। 'শক' তারই পারণাম। ডিমের স্বেতাস্রের জ্রাবণ করায়িত আকারে মানুষের শ্বাসনালাতে ঢুকিয়ে এই রকম ইপানি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর অনেক আগে ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হেনরি ডেল ও শ্যাটিফ লরেন দেখান যে, হিস্টামিন নামক বস্তুর জ্রাবণ সূক্ষ্মমাত্রায় সূচিপ্রয়োগ করলে 'শকের' অবস্থা তৈরি করা যায়। তাঁরা বিজ্ঞাতার প্রোটিনের (যেমন ডিমের স্বেতাস্র) ক্রিয়া এবং হিস্টামিনের ক্রিয়ার বিশেষ তত্ত্বও করা যায় না। ১৯৩২ সালে নানা বেশে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, শক অবস্থার গিনিপিগের শরীরে হিস্টামিনের আধিক্য ঘটে। কয়েকটি কৃত্রিম হিস্টামিন-রোধক বস্তুর প্রয়োগে যে হিস্টামিনের এই বিবিক্রিয়া রোধ করা যায়, তা ১৯৩৭ সালে বোভে ও স্টাউভ দেখিয়ে দেন। তবে হিস্টামিন ছাড়া শক উৎপাদক অল্প বস্তুর সন্ধান করে S. R. S-A (Slow Reaching Substance in Anaphylaxis) নামক আর এক বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর রাসায়নিক প্রকৃতি এখনও সঠিক জানা যায় নি। ১৯৬১ সালে এডিনবার্গের ব্রুকল্যান্ড ও সাহাড়া পূর্বে উক্ত কানন জাতীর কোন কোন বস্তু পৃথক করেন। ১৯৬২ সালে লণ্ডনে হলগেট এবং কলিয়ার দেখান যে S. R. S-A বা কিনিনের ফলে যে শ্বাসকণ্ড জন্মে, অল্পমাত্রায় এম্পিরিন দিয়ে রাখলে তা নিষারণ করা যায়। তবে হিস্টামিনের ক্রিয়া এম্পিরিনের প্রয়োগে বন্ধ করা যায় না। সুতরাং এম্পিরিনের সঙ্গে এন্টি-হিস্টামিন একত্রে প্রয়োগেই এই পূর্ণ সুরক্ষা পাওয়া যায়। কলিয়ার ও তার সহকর্মীরা এই বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও এই বিষয়ে অনেক পরীক্ষা চলছে।\*

\* 'সামেটিক্যাল আমেরিকান' পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে এই প্রবন্ধের প্রধান তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

## গ্যাস টার্বাইন চালিত অভিনব

### মোটর গাড়ি

অমুসন্ধানী

আমেরিকার ক্রাইসলার কর্পোরেশন একটি বিশ্ববিখ্যাত মোটর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগে গ্যাস টার্বাইন চালিত গোটো পঞ্চাশেক মোটর গাড়ি তৈরি হয়েছে। এই সব নতুন ধরনের গাড়ি তিন মাস ধরে চালিয়ে এদের দোষত্রুটি ও গুণাগুণ—যেমন কতটা টেকসই হবে ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোম্পানী কর্তৃপক্ষ দু'শো লোককে আমন্ত্রণ করেছেন। গাড়িগুলি দেখা শোনা পরিচর্যা এবং ইনসিওর ইত্যাদি করে থাকেন ঐ কোম্পানীই। বারো তিনমাস ধরে এই সব মোটর গাড়ি ব্যবহার করবেন, তাঁদের দিতে হবে কেবল ইন্ধনের বা তৈলের মূল্য আর কিছু নয়।

গ্যাস টার্বাইন চালিত মোটর গাড়ি আর প্রচলিত মোটর গাড়ির শক্তি উৎপাদনী যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। প্রচলিত মোটর গাড়ির ইন্টারনাল কম্বাশান ইঞ্জিনে গ্যাসোলিন ও শব্দর মিশ্রিত উপাদান গাঢ়িতিক চালিত করে। এটিই শক্তির উৎস এবং পিস্টনসমূহকে ধাক্কা দেয়। আর টার্বাইন ইঞ্জিনের উত্তপ্ত গ্যাস স্প্রিং করা হয় টার্বাইনের চাকার মধ্যে ...। তাই চাকাটিকে ঘোরায়, ঐ গ্যাসই টার্বাইন ইঞ্জিনের শক্তির উৎস।

এই অভিনব গাড়ি উদ্ভাবনের মূল রয়েছেন জজ জে জে হুয়েনবার। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন : প্রচলিত মোটর গাড়ি থেকে বাতাস দূষিত হওয়ার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনা নতুন পদ্ধতিতে অনেকখানি দূর করা হয়েছে। নতুন গাড়ির ইঞ্জিন ঘোঁরা, কার্বন ডায়োক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন ছাড়বে না এবং বাতাসও দূষিত হবে না। কেরোসিন, ডিজেল তেল ওজাঙ্গ যে সব উপাদান পাইপের মাধ্যমে পরিবাহিত হতে পারে ও বাতাসের সম্পর্কে জলে উঠে সে সবই এই গ্যাসটার্বাইন ইঞ্জিনেও ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। এই সব ইন্ধনের সাহায্যে এ সব গাড়ি স্তম্ভভাবেই চালিত হবে।

কালো রং-এর এই গাড়িটির নক্সা ও যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করেছেন ক্রাইসলার এবং ইতালীর থিরা কোম্পানী এটি তৈরি করেছেন। কালো রং-এর এই গাড়িটির ছাদটি কাল ভিনাইল দিয়ে তৈরি এতে চারজন বসতে পারে। এটি দৈর্ঘ্যে ২০'১'৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭২'৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৫৩ ইঞ্চি। সামনের চাকার থেকে পেছনের চাকার দূরত্ব ১১০ ইঞ্চি। এই গাড়িগুলি দেখতে ১৯৬৩ সালের 'ফোর্ড থাণ্ডার বন্ট' গাড়ির মতো।

এই সব গাড়িতে ব্যবহৃত হয় ১৩০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। ক্রাইসলার এট ইঞ্জিন সম্পর্কে বলেছেন : ক্রান্তের দিক থেকে দু'শো হর্স পাওয়ারের ডি ৮ ইঞ্জিনের সমশক্তি বিশিষ্ট এই সব ইঞ্জিন। ঐ ডি ৮ ইঞ্জিনের সঙ্গে শক্তি উৎপাদনের অজ্ঞাত সাক্ষ্য-রঞ্জামও যুক্ত থাকে। ক্রাইসলারের পিস্টন চালিত গাড়ি যে ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা রয়েছে তা সামান্য অদল-বদল করে ঐ স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা ১৩০ হর্স পাওয়ারের ঐ সব নতুন ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়দের ধারণা প্রতি গ্যাসন ইন্ধনে ঐ গাড়ি ত্রিশ রাস্তার ১৮ মাইল পর্যন্ত চলবে।

পিস্টন ইঞ্জিনে যে পরিমাণ যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় তার এক পঞ্চমাংশ থাকে টার্বাইন ইঞ্জিনে। এতে হাত লাগানো মাত্রই যে তাপমাত্রায় গাড়িটি চালু হতে পারে সেই তাপমাত্রায় এর গ্যাস পৌঁছে যায়। সব আবহাওয়ায়ই কার্যকর না করে এটি চালু করা যায়। তারপর ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্য এতে জলেরও কোন প্রয়োজন হয় না। "স্পার্ক প্লাগ" আজ মাত্র একটি। এর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা খুবই সরল ও সরল। নির্দিষ্ট সময়ান্তর এতে তেল বদলাবারও কোন প্রয়োজন হয় না। ঐ সব গাড়ির চালক গাড়ি চালাবার সময়ে দুটি রাখেন বা দিকের পায়রাফিটারের মাঝখানে স্পার্কমিটারের এবং ডান দিকের ট্যাকোমিটারের উপর। পায়রাফিটার নির্দেশের ইঞ্জিনের তাপমাত্রার স্পীডো মিটার দেয় গতির মাত্রার। প্রতি মিনিটে টার্বাইনের ঘূর্ণনের মাত্রা করে ট্যাকোমিটার। সামনের দুটি আসনের মাঝখানে থাকে একটি বাজার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন ও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার অজ্ঞাত যন্ত্রপাতি।

রাস্তার নামানো মাত্র এই গাড়ির স্বল্পকাল চলা গতি ইঞ্জিনে কোন রকম ঝাঁকুনি না দিয়ে চলা, মন্দ গতিতেও ইঞ্জিনের প্রচণ্ড ক্ষমতা সংরক্ষণে দুটি আকর্ষণ করে থাকে।

## আকাশ ও মাটি

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

এ পৃথিবী থেকে আকাশ অনেক দূর—  
আকাশের কাছে, মাটির অনেক ঊর্ধ্ব,  
বদী না আকাশ ছুঁতে দেয় বন্দর,  
রাস্তার পৃথিবী বাঁচবে না কোনদিন।

মাটির তৃষ্ণা আকাশ শুধুই জানে,  
অঝোরে ধায় করে তৃষ্ণার জল—  
কৃতজ্ঞ মাটি চরে থাকে দূর পানে,  
কিছু দিতে চায়, কোথা তার সখল ?

ভালাবাসা আমি অনেক দেখেছি আর  
শুনছি অনেক কাহিনী ভালাবাসার।  
কাছেতে পাবার কোন আশা নেই জেনে,  
আপনার বলে কে কবে নিয়েছে মেনে ?

নিঃশেষ করে আপন স্রবতি ঢেলে—  
করেছে আকাশ এ মাটিকে স্থলর,  
আবশ্য মাটিতে তবু কি কোথাও বেলে,  
ভালাবাসাতেই ভরে আছে স্তম্বর।

# 

অমিয় ভট্টাচার্য

আবার কুদিরামের ভাগিনেয় ও বালাদেশী ললিতাবাবু অগ্নিগঞ্জের বাসায় এসেছিলেন। এ দিনটি কুদিরামের কীসির দিন।

১১ই আগস্ট। বাস্পকঙ্কঠে ললিতাবাবু বললেন,—‘কুদিরামের জন্মদিনটি তবু কোথাও কোথাও পালন করা হয়। কিন্তু আজকের দিনটি বৃষ্টি অনন্তকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। দেশবাসী কোনোই মর্যাদা দেয় না একে। অথচ এই দিনটিই তো অগ্নি-দীক্ষার দিন। মামা তো শুধু নিজের ছালা আগুনে নিজেদেরই জ্বালাত দেয় নি, সে যে জাতিকে অগ্নিমনে দীক্ষা দিয়ে গেছে তার মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে। জাতির প্রথম শহীদ কুদিরাম,—অথচ জাতি তার শহীদ হবার দিনটিকেই স্মরণ করে না কোনো স্মৃতিস্তম্ভ। এ দ্বিহাট ইতিহাসের পাতার থেকেও যেন একটি বোবা তারিখ হয়ে রইল।’

কিছুক্ষণ দম নিয়ে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলেন,—‘অন্য আমাদের হুখ কোনদিনই ভোলবার নয়। কীসির আগে একবার তাকে দেখতে পেলাম না। শেষ যেদিন দেখা হয়, মামা বলেছিল, ‘আবার কিরে আসবো। বোনের বিয়ের জোগাড় কর।’ সবই হল, মামা কিরে এল না। দেশবাসী স্তনল, আমাদের সঙ্গে কুদিরাম দেখা করতে পারল না শেষ মুহুর্তে।—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আমাদের দেখা করতে না পারার পেছনে বিধাতার যে কত বড় একটা ইচ্ছা ছিল, তা কে বুঝে? হয়ত অগ্নিশিখা আমাদের মমতার বীধনে বন্ধ হয়ে বৃকের আগুন হারিয়ে ফেল জড় মৃত্যিকার শিক্তে পরিণত হবে,—হয়ত মৃত্যুক মহীরান করতে পারবে না নিজের তপশ্শক্তিতে, তাই বিধাতা আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্ভব করে তোলেন নি। কিন্তু আমরা নেহাতই মাটির মানুষ, তাই চিরকাল বিচ্ছেদের দুঃখই অনুভব করছি।—কেনম করে ভুলবো সেই দিনগুলি, যখন মামার কীসির পর উদ্ভাসভাবে ঘুর বেড়িয়েছি মেদিনীপুরের অসিত-গলিতে, যেখানে মামার স্মৃতি এখনো জল জল করছে চোখের সমুখে। সত্যিই এসে বসে আছি একা, দেখছি চেরে, ঐ তো সেই ছোট মাটি, যেখানে মামা লাঠিখেলার মহড়া দিত জ্ঞানেন্দ্র বসু, সন্তান বসু সঙ্গে, গোলকুরারচকে এসে দাঁড়িয়েছি,—ঐ তো সেই ঘরটি যেখানে বৃদ্ধা কালীমুত্রির সামনে বিপ্লবীদের দীক্ষা হত ঐকমগ্বদগীতা মাথায় নিয়ে,—পুরোনো কেল্লার মাঠে একা বসে আছি, বাউল গেরে চলছে,—

‘একবার বিনার দাও মা ঘরে আসি,

হাসি হাসি পরব কীসি।’ দেখবে ভগৎবাসী!....

হুঁ চোখ জলে ভরে উঠেছে, বাপসা দেখছি সব, হঠাৎ বেজে উঠল মামার কণ্ঠ—‘হাবল মরতে ভর পাবি কেন? গীতা পড়িস নি?’ ঠিক যেমন করে বলতো সে আমাকে গভীর নিশীথে আমাদের মাদিকপুরের সেই ছোট বৈঠকখানা ঘরে।

বৃদ্ধ আর বলতে পারলেন না। কারার ভেঙ্গে পড়লেন। অনবধক ঠকে অতীতে টেনে নিয়ে হুখ দেওয়ার লজ্জার আমিও শুক হয়ে বসে রইলাম।

ললিতাবাবু বললেন—‘হিঃ, আমি বড় দুর্বল। বয়সের ভার বইতে না পেরে একটুই ভেঙ্গে পড়ি। আমাকে ক্ষমা করবেন।’

প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আমি বললাম,—‘আজ আপনার কাছে এসেছি কুদিরামের বাণ্যের আরো কাহিনী শুনবো বলে। যদি আপনার কষ্ট না হয়—’

—‘না, না।’ বাধা দিয়ে বললেন ললিতাবাবু। ‘কষ্ট কিসের? চোখে জল আসে সত্যি; কিন্তু এতক্ষণ বড় পবিত্র। নিজেই শুধু মনে হয় মামাকে স্মরণ করে কান্দলে, কেন না, মামা নিজেই ছিল অগ্নিশিখা। জীবনের শেষ ক’টা দিন তার স্মৃতিতেই উজ্জ্বল হয়ে থাকুক, এই আশীর্বাদ করবো।’ হঠাৎ সোজা হয়ে বললেন বৃদ্ধ, চোখ দু’টি কিসের আবেশে স্তিমিত হয়ে এল, শুনাব অতীতে যেন ডুবে গিয়েছেন, ডুবুরি মতন রক্ত কুড়িয়ে আনতে।

অবশেষে বললেন,—‘মামার কাহিনী বলতে কত কথাই না মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে ব্যথা পাঠ, যখন মনে হয়, মামার শেষ দু’টি বাসনার কোনোটিই বৃষ্টি কণ্ঠ পূর্ণ মগ্নর করেন নি। কীসির আগে মামা দু’টি ইচ্ছাই জানিয়েছিল,—একটি, জন্মভূমি মেদিনীপুরকে শেষবারের মত প্রত্যক্ষ করা, আর একটি, মাকুসমা বড়দিদি অপক্কপা দেবী (আমার মা) এবং অজ্ঞাত আত্মীয়সহ এই হতভাগ্যের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। মজফেরপুরের জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট কীসির আগে কুদিরামের শেষ ইচ্ছা জানিয়ে আমার পিতৃদেব ৮৮মৃত্যুলাল রায়কে এক পত্র লেখেন। পিতৃদেব আমাদের সমীপে নিয়ে মজফেরপুর ব্যতীর সব ব্যবস্থা করে ঠাব উপরিতন করচারী জেলাজজ ফরেস্টার সাহেবের কাছে কয়েকদিনের ছুটির আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত দিলেন।

ফরেস্টার সাহেব জরুতিকূটিল নেড়ে পিতৃদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘Is your wife loyal?’

আপনারা হয়ত জ্ঞানেন না, কিন্তু আমি তো জানি, একদিকে বিপ্লবী জালকের প্রতি স্নেহ, অন্য দিকে জাবিকার জন্য রাজত্বগতা, ঐ দুই বিরুদ্ধ-শক্তির মধ্যে পিতৃদেবের মনে অহনিশি কি এক বড় বর বেত তবুও স্বাধীনচেতা পিতৃদেব বেদনা-দগ্ধ কণ্ঠে বিজ্ঞ মিশিরে সাহেবে প্রসঙ্গে উত্তর বলে বললেন,—‘I am loyal. Hindu women are loyal to their husbands. So, she is loyal. পিতৃদেবের স্পষ্টীকৃত সাহেবকে বিচলিত করল। ক্রোধে অগ্নিশিখা হয়ে ছুটির দরখাস্তখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গর্জন করে উঠলেন,— ‘Why leave for few days? Why not for good?’

মামার বাসনার সমাধি ঘটে গেল। আমাদের কেউই উপাচার্য হতে পারলাম না, তাঁকে শেষ দেখতে। বিমিত আতঙ্ক দেশবাং স্তনল, কুদিরামকে কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই কীসির আগে দেখা করবে দেওয়া হয় নি।’

‘হ্যাঁ, আতঙ্ক।’ উল্লেখ অগ্র কোনো রকমে চেপে ব

## অগ্নি-শিশু-প্রসঙ্গ

বলতে শুরু করলেন, 'সে কি আতঙ্ক! ফুদিরামের কীরীষ আগে থেকেই সাবা দেখে, বিশেষত এই মেদিনীপুর সহরে সে কি ধরপাকড়! বুটশিশিরের সে কি কল্পরায়! ঘরে ঘরে খানা-তলাস। ঘর ঘরে বিভীষিকা! মেদিনীপুরের পুলিশ রাজা থেকে শুরু করে ডিখারী পর্যন্ত প্রায় সব শ্রেণীর ১৫০ জন ব্যক্তিকে এক বোমা তৈরির বড়ঘরের মামলায় অভিযুক্ত করল। ১৯০৮ সালের ৮ই জুলাই, মীরবাজারে সন্তোষ দাস নামে এক পুলিশ কর্মচারীর বাড়ির ড্রেন থেকে আবিষ্কৃত হল এক মারাত্মক বোমা। সন্তোষ দাসের সঙ্গে বিশিষ্ট নাগরিক বোগাজীবন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছাপাস্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কবে কোন দিন, প্রায় এক বৎসর আগে ফুদিরামের একান্ত সহযোগিতায় জমিদার অবিনাশচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুরে জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের আগার ও বাসস্থানের আয়োজন করেছিলেন,—শুধু এই ছাত্রই, অবিনাশ-বাবুকে বিনা জামিনে এক মাসের উপর জেল হাজতে থাকতে হল। এদিকে বটল আবার আর এক কাণ্ড! লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামে এক দরিদ্র ব্যক্তিকে ফুদ মামা একপানা শাস দিচ্ছেল। (সে কাহিনী পরে বলছি।) সে যেচোরা পিয়েছে সেখানা বাজারে বেচেতে। অননি তার উপর ক্রোধ বহিত হল, 'কোথায় পেলে এ শাল?' উত্তরে লক্ষ্মী বলেই ফেলল, 'ফুদিরামবাবু গিয়ে দিতে দিয়েছেন।' বাস আর যায় কোথায়? জেনুটি পড়ল লক্ষ্মীনারায়ণের গতিবিধির উপর। মজার কথা শুনুন। একদিন কোন এক বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্মী ভিক্ষা চাইছে, 'বোমা, দুটি ভিক্ষা দাও না!' পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন লালমোহন দারোগা। তিনি 'বোমা' শুনতে শুনলেন 'বোমা'। বাসু-সহরে শুরু হল প্রচণ্ড ধরপাকড়। মামলার পর মামলা সাজানো হল। আমাদের বাড়িও খানা-তলাসী হল। পিতৃদের রক্ষা পেলেন কুন্তন মানীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। সে সব কাহিনী আপনাকে বলছি! \* মোটারে উপর, সরকারী কর্মচারীরা প্রহ্লাদের মর্জীবে ঐক্যবদ্ধ দপনের মত সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে যেন বিপ্লবী ফুদিরামকে দেখতে লাগলেন। বোমাতঙ্ক, ফুদিরামাতঙ্ক, দুই আতঙ্ক বেসামাল হয়ে উঠল বুটশিশিহ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অগ্নাঙ্ক সরকারী কর্মচারীরা কোনো নেটিভকে তাঁদের বাগলোর চুকতে দিতেন না। প্রত্যেক কর্মচারীর সঙ্গে থাকত দুটি পাঠান শরীর-রক্ষা, হাতে টোটাভরা রিভলভার।

আজ্ঞা ভাবি,—প্রথম সেই আলোচনের ধাক্কা কেমন করে আমরা কাটির উঠছিলাম? কে দিয়েছিল আমাদের সেই শক্তি? কোন প্রস্তুতি ছিল না, মানসিক কাঠামো ছিল অপরিবর্ত, অথচ কেন এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছিতে একটা সহরের অধিবাসী নীরবে সহ করল সেই অভাবনায় নিষাধান,—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের উপক্রমণিকা রচনা করতে? সে যেন বড়ের অব্যবহিত পূর্বর এক তেজঃপূর্ণ স্তব্ধতা। মনে হত, ফুদে মামাই যেন স্রুদ্র মজঃকরপুর থেকে ডাক দিয়ে আমাদের বলছে,—'আমার জীবনে লভিরা জীবন, আগে রে সকল দেশ!'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর প্রশ্ন করলাম,—'আচ্ছা ললিতাবাবু,

মেদিনীপুরে রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়েছিল, তাতে ফুদিরামের অংশ কি ছিল?'

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন ললিতাবাবু। যেন অতীত হাতে একটা রত্ন পেয়েছেন, এমনি উল্লাস।

—সেদিনের কথা ভুলব কেমন করে? ১৯০৭ সালের ৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সেই অধিবেশন শুরু হল। এই উপলক্ষে কলকাতা থেকে এলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জে: চৌধুরী, মৌলভী দেদার বক্স, মৌলভী দীন মহম্মদ প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ। কিন্তু প্রথম থেকেই শ্রুত হল,—বিচ্ছেদ। দুইটি দল,—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। শেষোক্ত দলের নেতা শ্রীধরবিন্দ, আর তাঁরই নির্দেশ চালিত হল ফুদে মামা ও সন্তোষ বাস। সে কি প্রচণ্ড উল্লাস ও উৎসাহ। মামার সেই হেজোদপু ভঙ্গীট এখনো মনে আছে। নবীনের উত্তম ও প্রবীণের বুদ্ধি। কোন সমঝোতা নয়, চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা আদার করতেই হবে, তা' সে যে পথেই হোক!...এই হল চরমপন্থীদের মনোভাব। নরমপন্থীদের আপোষমূলক মতবাদের সঙ্গেই বাধল প্রচণ্ড বিরোধ। দুই জায়গায় দুই সভা। মরিকবাবুদের বাসমজের আড়িনার বসলো নরমপন্থীদের সভা, সভাপতি ফারোদবিহারী দত্ত। আর টাউনহলের সমুখস্থ ময়দানে বসল চরমপন্থীদের সভা,—সভাপতি আবদুল হক। প্রথম দিনেই বিচ্ছেদ, কোলাহল। আর ফুদে মামা সেই বিরোধের কুক্ষিক্ষেত্রে যেন সশস্ত্র গৈরিক সেনাপতি। পাকজন্তু মিনাদ করলেন শ্রীধরবিন্দ। শুধু তাই নয়, সভাভঙ্গের পর প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন ফুদিরামকে।

আর এই ঘটনার পানরো দিন পরেই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের বিরোধ যে দৃষ্টর অবতারণা করল, ইতিহাসের পাতায় তা' এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শ্রীধরবিন্দের আশীর্বাদ মামা কবচের মত বুকে ধরে রাখত। তাই তো মেদিনীপুরের রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মামা যখন কঠিন আশ্রয় বোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, কোনো চিকিৎসার কোনো ফল হল না, না আর আমি আবুল হয়ে ৯সি.দ্বন্দ্বী মাতাকে ডাকতে লাগলাম,—তখন মামা হঠাৎ বলে উঠল: 'কোনো ব্যাধিরই সাধ্য নেই আমাকে মার। আমি কিছুতেই মরব না, ভর নেই তোমাদের। আমাকে শ্রীধরবিন্দ আশীর্বাদ করেছেন।

তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমি ভুলতে পারি না। আমরা মধ্যে যে শক্তি তিনি দিয়েছেন, যে কোনো রোগকেই তা ঠেকিয়ে দিতে পারে। মামাকে সেই আমি শেষ সেবা করেছি। এখনো সে দিনটো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমি বললাম,—'ফুদিরাম ঠিকই বলেছিল ললিতাবাবু। কিছুই তাকে মারতে পারে নি। মৃত্যুও তাকে মারতে পারে নি। ভারতের ম্যাক্সইনী যতীন দাসের আত্মোৎসর্গের পর কাজী নজরুল ইসলামের লেখা সেই কবিতা লাইন মনে পড়ে,—

'যে জীবন কেহ লইল না, তাহা মৃত্যু লইল আসি।'

কি অদম্য সাহস ছিল ফুদিরামের, ভাবলে অবাক হতে হয়।

আট বছরের ছেলে ফুদিরামকে জ্যাঠাতো ভাই অবিনাশবাবু

• 'মাসিক বহুমতী'র ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশ।

তমলুক থেকে চিঃঃ হলেন আনন্দপুরে ভগ্নী নন্দীবালায় বিবাহ উপলক্ষে। বিবাহের পর অবিনাশচন্দ্র ক্ষুদ্রিরামকে আনন্দপুরের খুলেই জন্ম করে দিলেন, তমলুক পাঠালেন না।

এক বৎসর কোনরকমে কাটল। কিন্তু তারপরই খুদিরামের মন চঞ্চল হয়ে উঠল মাতৃসমাঝাদিনি অপরাধ দেবীকে জ্ঞাত। তমলুকে যেতেই হবে তাকে—মদিনীপুর হয়ে। তা সে যেমন করেই হোক।

আনন্দপুর থেকে মেদিনীপুরের দূরত্ব বোল মাইল। তখনকার দিনে গোপবান ছাড়া অজ্ঞ কোন যান ছিল না। মেদিনীপুরে আসতে। পথের দু'ধারে খাপসকসকল দুর্গম অরণ্য, মাঝে মাঝে জনহীন প্রান্তর। নয় বছরের ছেলে সুদ্রিগ্রাম বাড়িদির কাছে চুটে আসছে, একা, পানব্রজে। গভীর, অন্ধকার রাত। হাতে নিত্যসঙ্গী বাঁশের লাঠি, মুখে ঐকান্তিকতার শব্দস্বরূপ নাম, কোনদিকে জ্ঞানপ (নই, লক্ষ্য) মেদিনীপুর... আর মেদিনীপুরও পেরিয়ে তমলুক বাড়িদির মোহাফল।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে পথের পাশে শয়ানের দল হৈকে উঠল—  
'ক্যা ভয়া! ক্যা ভয়া!'

‘হা হা হবে হেসে উঠে কুদিরাম জবাব দিল—‘কুহ নেহি ছয়া!  
মং ডেরা ভেটয়া!’

অন্ত জোনাকি হলছে কেন ? দু'ধারের ঝোপ-জঙ্গলে অচেন  
জোনাকি ঘেন আলোর আদর জমিয়েছে । বড়দিদি বলতেন, বাঘ  
যেখানে থাকে, জোনাকি ভিড় করবেই সেখানে ! তা'হলে কি—

চিন্তা কি? লাঠি আছে। হঠাৎ ছুটে। লাফ দিয়ে, কালী মায়  
কি জয় বলে ফুড়িয়া বন বন লাঠি ঘোরাতে লাগল। বিদ্যাদ্বগে  
দুঃক্ষে। কোন দৃশ্যমনের সাধ্য নেই, তার সামনে এগোয়। অথচ  
ফুড়িয়া অবলালাত্রিঃ এগিয়ে চলছে সামনের দিকে দীর্ঘ দূরত্বে  
যাও করে দিচ্ছে লাঠির ঘণ্ডার :

ঐত্ৰ্য্যে যখন ক্ষুদ্রিতাম,—দুর্ভিক্ষ ক্ষুদ্রিতাম—মেদিনীপুর পিহবন্ধ  
কুস্তিভাস বনুর বাটীতে উপস্থিত হন, তখনো আকাশে শুকতার। অস  
ল করছে। পাখীর কাকলী শ্রুত হয় নি। সহর নিরুন্ম।

কড়া নেড়ে কুদিগাম ভাগালে। সবাইকে ১০-কুস্তি বাসবাবু নিজের  
চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। বললেন,—‘আমি কি স্বপ্ন  
দেখছি ? এতটুকু ছেলে তুমি, যোগে মাইল পথ হেঁটে চলে এলি ?  
ভাও গভীর রক্তকার রাত পেয়েছে ?’

দুগুণকণ্ঠে ফুদিরাম বলল, 'হ্যাঁ কাকাবাবু, তবু আমি এতটুকু ক্লান্ত  
হই নি। আরো বোন্দো মাইল আমি এখনো হাঁটতে পারি।...  
বড়দিদির কাছে যে আমাকে যেতেই হবে।'

আর এক রাত ।

অশুভগা দেবী দাসপুর থেকে গোঁ-বাঁনে পুত্র-কন্ডাদের নিয়ে  
মেদিনীপুরে আসা-ছেন। সঙ্গে অভিভাবক দশ বছরের ছেলে কুন্দিরাম।  
একজন বিখ্যাত মুসলমান গাড়োয়ানের পরিচালনার দীর্ঘপথ অতিক্রম  
করেছে এই ক্ষুদ্র দলটি। আর সে কি পথ! শুণু দীর্ঘই নয়,  
জাব্বহ। হাব্যাময়, দম্ভা অধিকৃত। যে কোন যুদ্ধে সর্গর্ভনে  
দম্ভা-রা গুণিয়ে পড়েতে পারে গাড়ির উপর। একপ বটনা বিরল ছিল  
দে-খেনকার দিনে—যখন দম্ভা-রা পথিকের সর্ব্ব লুণ্ঠন করে তাকে  
হত্যা করে না পাণ্ডা-তা।

গাড়ির ভেতরে বসে কুদিরাম, শিশুকন্যা কোলে অপরূপা ও  
কিশোরীমোহন (ললিতমোহনের ছোট ভাই)।

ফাস্তানের বিশ্রহর। জনহান পথ। ছায়া-বঞ্চিত দগ্ধ দিনকে  
সচকিত করে মাঝে মাঝে শুধু দূর গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে  
আসছে:

কেশপুর থানার প্রান্তর-সর্বস্ব একটি গ্রামে গাড়ি পৌছতেই  
গাড়োয়ান ফাজিল বলে উঠল,—‘সামাল মা ঠাকরুন ! আমড়াকুচি !’

আমড়াচুটি। তখনকার দিনের এক কুখ্যাত জাতক। নাম সনসেই গা শিউরে ঘেঁষে ১০-এ পুসের নীচে ডাকাতে কাটা কত মাছের হুগু এখানে গাড়াগড়ি বাসছে। যতপুরে দুষ্ট যার, জনমানবের বসতি নেই। ততপুরের জাঁকী ঘোদে ঘন এক অশুভ ছায়া কৈশে কৈশে উঠেছে পিঙ্গল বিভাদিকার আকার নিয়ে।

তবু এখানেই ধামতে হবে, উপায় নেই। বাঘেরা মুগ্ধা-ভুগুর  
কান্ড হতে পড়েছে। আমলোব আমড়া-চুরি মাইলটাক দূরে গাড়ি  
ধামিয়ে ফাজিল বলল,—ভয়ের জায়গাটা পেরিয়ে এসেছি না ঠাকরপ।  
আপনান্না এখানেই একটু বিশ্রাম করুন। আমিও পাশের গাঁ থেকে  
নান্না সেরে আসি।

তাই হল। একটা গাছের ছায়ায় সবাই নেমে বসল। ফাজিল  
চলে গেল।

‘কছুক্ষণ পরই, এ কি! এগিয়ে আসছে ওরা কারা? ভীষণ দর্শন তিনটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি, হাতে মজবুত লাঠি। তৈলাক্ত দেহে রোদের ঝিলিক ধারালো হিংস্রতায় বলাক উঠল। গর্জ্জ উঠল দম্ভ্যর, ‘মাল সাফ করে। মার, মার, মার।’

অপরূপা দেবী অসহায় দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রারামের দিকে তাকায়েন।  
নিঃসহায়ের সহায় দশ বছরের কিশোর ক্ষুদ্রারাম।

উপায় স্থির করতে তার এক সেকেন্ডের বেশি সময় প্রয়োজন  
হল না। তৈলসিক্ত শ্রির সহচর লাঠিগাছটি নিয়ে মালবোঁটা দিয়ে  
কাপড়খানা পরে অগ্নিশক্ত কুদরাম দু'বার লাফ দিয়ে বলে উঠল—  
'আর ডাকাত। জর মা!'

লাঠিখেলায় বরাবরই ওস্তাদ। ভাগিনের কিশোরীমোহনকে নিয়ে মেদিনীপুরের আখড়ার সেই মহড়া, সে কি বুধা বাবে? সেই যে—  
অবিরল ইটপাটকেল ছুড়ছে কিশোরী আর সমান চোটে ফুদিরাম  
প্রতিহত করছে প্রত্যেকটি আঘাত—একটি ঢিলও তার গায়ে লাগছে  
না, সর্বাঙ্গ দেখে অর্ধাক হয়ে ভাবছে, মহাভারতের পাতা থেকে বীর  
অভিমুখ্য বেরিয়ে এল বৃষ্টি!

সেই তাক, সেই কসরৎ দেখাতে হবে ডাক্তার বেটাদের।

—‘এই কিশোরী।’ হৃদয় দিল ক্ষুদিরাম,—‘ছুড়ে দে আমার দিকে বা পাস, আমি লাঠি চালাই,—সই যেমন আমরা করতাম সহরে।’

কিশোরী আদেশ পালনে একটুও বিলম্ব করল না। হাতের কাছে টিল, পাটকেল, হুঁড় বা শেল ছুড়তে শুরু করলেন। আমার দিকে, আর সুরিয়ার দিকে তাকিয়ে কঁচিয়ে উঠল।  
 ঠক্, ঠক্, ঠক্। সে কি বেগ! যেন গুলী ছুটছে লাগি থেকে।  
 চেয়ে থাকা যায় না। বুক কেঁপে ওঠে।

অপরাধী দেবীর আর ভয় নেই। জয় মা সিদ্ধেশ্বরী ! শক্তি



ফিরে পেরেছেন তিনি। ঘন ঘন উৎসাহ লিখে লাগলেন ফুরিয়ারকে :  
তিনিটি প্রাণীর মধ্যে সাহস ঘন আগুন হয়ে জ্বলে উঠছে। কে  
এগোবে তাদের কাছে ?

বাঁকড়া চুল উড়িয়ে, চোখে আগুন ছুটিয়ে ফুরিয়ার লাঠি বোরাচ্ছে  
বন বন, ডাকাতেস; তাকিয়ে দেখছে অবাধ বিম্বয়ে, ঢিলগুলো লাঠির  
গায়ে লেগে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে—ঐ কিশোরটির গা কি একটা ঢিলও  
স্পর্শ করতে পারবে না ?

—‘কয়টা ছাড়াব।’

সর্দার জঙ্ঘার ‘দয়ে উঠল—‘সাবাস্ বাবু সাহেব।’ পরকণ্ঠেই  
হুঁতাত তুলে এগোতে এগোতে বলল—‘খামান; খামান বাবু। ডর  
নেই। মারের দিবি, কিছু বলবো না।’

দুটপুটে লাঠিগাছটি ধরে ফুরিয়ার এগিয়ে এল।

সর্দার বিস্ত্র লাঠি ছুড়ে ফেলে দিল দূরে, জঙ্ঘার দ্বিগে সঙ্গীদের  
বলল—‘সেলাম কর খোকাবাবুকে, হতভাগারা! ফেলে দে লাঠি।’

পাশুহুর্ভেই সঙ্গীরা লাঠি ফেলে দিয়ে সেলাম করতে করতে এগিয়ে  
এল।

সর্দার গদগদকণ্ঠে ফুরিয়ারকে বলল—‘কেয়া কসরং খোকাবাবু।  
কার কাছে শিখেছেন আপনি চাঠিখেলা ? এ যে ভেকির মত মানুষ  
হচ্ছে বাবুসাহেব।’

ঘর্ষক কলেবর ফুরিয়ার মাটিতে বসে পড়ে হাঁকতে হাঁকতে  
বলল—‘ফিগুপুসের এক ওস্তাদ শিখিয়েছে আমাদের। বা কসরং  
দেখলে, এ সব তাঁরই।’

তবে উঠে সর্দার বলল—‘আপনারা লেখাপড়া শিখে বড় হবেন,  
জজ-ম্যাজিস্টার হবেন, এ সব লাঠিখেলা শিখে কি করবেন, বাবু ?’

ঠাং উঠে কাঁড়ালো ফুরিয়ার। মুঠি দুটক হল। নাসা হল  
বিফারিত। মা সপেশী শ্রীত হয়ে উঠল। সগর্জন বলল—‘আমাদের  
দেশ পরাধীন জানো না ? জানো না, ইংরেজ ফিরঙ্গীরা নবাব  
সিরাজদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধে কাঁকা কোশলে হারিয়ে আমাদের দেশ  
কেড়ে নিয়েছে এখন আমরা হিন্দু মুসলমান, সবাই মিলে আমাদের  
দেশ ফিরঙ্গীর কবল থেকে উদ্ধার করব।—হ্যাঁ, উদ্ধার করতেই হবে।  
এর জন্য চাই শক্তি, চাই বাহুবল..’

সর্দার আর স্থির থাকতে পারল না। কচি এক ছেলের মুখে সে  
যেন শুনলো বিবেকের বাণী। বাধা দিয়ে বলে উঠল—‘তোবা।  
তোবা! আমাদেরও একটা বড় দল আছে খোকাবাবু, এই কেশপুর  
খানার। আমরা সবাই আপনাদের সাহায্য করব। লড়াই করব  
জান দিয়ে। জানেন বাবু, আমাদের একজন ওস্তাদ আছে,  
মেদিনীপুরের অলিগঞ্জ, তাঁর নাম আবদুল রহমান..’

উজ্জসিত হয়ে ফুরিয়ার বলে ওঠে—‘আরে, তিনি তো আমাদেরই  
মহান্নার এক নামকরা ওস্তাদ। আমরাও তো তাঁরই সাক্ষর।  
তা হ’লে তোমরা তো আমাদের গুরুভাই—’

মুহূর্তে দুই বীর অলিগঞ্জাবদ্ধ হল।

—মেদিনীপুরে আমার সঙ্গে দেখা করবে, সর্দার। তুল হর না  
যেন।’ অপরাধী দেবীর দিকে চাইল ফুরিয়ার। অর্ধ বুঝলেন  
বেহমতী গিদি। গাড়ি থেকে নামলো, চিড়ে, গুড়, মুড়ি কড়াই ভাঙা।  
কিশোরী কোঁসর বঁধে লেগে গেল পরিবেশন করতে। ডাকাতে হল

হুঁকার দিয়ে উঠল—‘জয় খোকাবাবু কী জয়।’ তারপর চলল সোজান  
ভোজনোৎসব।

দীর্ঘবাস ফেলে লালিতাবাবু বললেন—‘মামাব সাহসিকতার এই  
ঘটনার শেষ সাক্ষী কিশোরীমোহন এতদিন পরলোকে চলে গেছে  
মামার সঙ্গে মিলতে। স্বর্গের কোন এক নিভৃতপ্রান্তে হমত আজ  
অগ্নি-কন্দুক নিয়ে মামা কিশোরীকে তালিম দিচ্ছে। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ  
করতে আমি কবে সেখানে গিয়ে মিলবো, বলতে পারেন ?’

আবেগে বুকের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

ফুরিয়ারের বুকে ছিল আগুন—কিন্তু অন্তরের নিভৃত ছিল মমতায়  
অমৃত। তারই একটি কাহিনী :

বাক্সে একখানা দামী শাল ছিল ফুরিয়ারের। ওষ বাব  
ত্রৈলোক্যানাথকে নাড়াঙ্গোর রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ শালখানা উপহার  
দিখেছিলেন। ফুরিয়ার ব্যবহারই করত না সেখানা আর তার  
শাল গায়ে দেবার ফুসতই বা কোথার ? সাধাশ্রিত কাটে এত  
ঘরান্ড কর্মোৎসবের মধ্যে, আর রাত কাটে বিপ্লবীদের আগ্রের  
সম্মেলনে।

শীতের এক নিস্তেজ মধ্যাহ্ন। নবীনশাগের লক্ষ্মীনারায়ণ দাও  
কাঁপতে-কাঁপতে বাচ্ছে পথ দিয়ে; ফুরিয়ার তথুনি বাড়ি ফিরেছে  
দ্বান করতে যাবে। লক্ষ্মীনারায়ণকে বসে পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল:  
‘কি রে, নারায়ণ, কি হয়েছে ? শীত করছে খব ?’

কাঁপতে কাঁপতেই লক্ষ্মীনারায়ণ বলল, ‘আজ্ঞে, আমাদের জীবনে  
তো অল্প কোনো কাল নেই, সব সময়ই আমাদের শীতকাল। তাই  
সব সময়ই আমরা কাঁপি।’

—‘তার মানে ?’ অক্ষুট আঁতনারের মত শোনালো ফুরিয়ার  
প্রশ্নটা।

—‘আজ্ঞে, খেতে পাই না, পরতে পাই না, শীত তাই তো  
আমাদের পেরে বসে বেশি করে।...’

ঠাং ফুরিয়ার চলে গেল অন্যরে। বাক্স থেকে দামী শালখান  
নিরে এল। তারপর নারায়ণ গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘জাখ;  
এবার শীত একটু বমেছে তো ?’

লক্ষ্মীনারায়ণ যেন গ্রহণ করতে পারছে না এই অক্ষুট  
পরিস্থিতিটিকে, বিশ্বাস করতে পারছে না এই আকস্মিক  
বাদান্ততাকে। তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।  
তারপর অক্ষুটবরে বলল, ‘সত্যি দিচ্ছেন খোকাবাবু ?’

—‘সত্যি নয় তো কি মিছেমিছি ? তুই শীতে কাঁপি, আর  
আমি শাল’ বাক্সে রেখে দেবো পোকাকর খাবার হজতে ? বা—  
বা—পালা শীগগির।’

অড়ভুড় করে বিম্বিত লক্ষ্মীনারায়ণ শালখানা গায়ে দিয়ে পথ  
ধরলো। ফুরিয়ার নিনিমেবে তাকিয়ে রইল পথে-পথে ভিক্ষে করে  
করা শীর্ণ ব্যক্তিটির দিকে। লক্ষ্মীনারায়ণ অদৃশ্য হয়ে গেলে চোখ  
ফিরিয়েই দেখল, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপরাধী দেবীর দেবের স্ত্রী।  
তিনি সবই দেখেছিলেন আড়াল থেকে। এবার চেঁচিয়ে উঠলেন—  
‘আচ্ছা, এ কি পাগলের মত কাণ্ড করলি বল তো ? তুই ভাবছিলি,  
ওই শাল গায়ে দেবে লোকটা ? ও তো একুপি বেচে ফেলবে। তা হ্যাঁ,

তুই কি জানিস না, শালখান ছিল তোর বাবার স্মৃতি? এমনি করে তাঁর অপমান করলি?’

দূরে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে বাস্পকরুণ বসন্ত ফুঁদিয়ে, ‘আমি জানি ছোট্ট লোকটা শালখান বিক্রি করে ফেলবে। কিন্তু বিক্রি করে যা পাবে, তা দিয়ে কয়েকদিনের জুও ওর পরিবারের সবার প্রাণসংহতি চলেবে।...আর বাবার স্মৃতি? সেই স্মৃতির প্রতি কি বেশি সম্মান দেখানো হবে, যদি শালখান বাজার বন্ধ থেকে অবশেষে পড়ে ছিড়ে যায়?’

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল অগ্রিশিশু। তার স্বভাববিশিষ্ট ভঙ্গীতে দুটি মুষ্টি সামনের দিকে ঢুড়ে দুশব্দে বলল,—‘ওই শালের বদলে, বরং যদি একটি প্রাণও রক্ষা পায় যদি একটি সসারের দুইবেলার ক্ষম ও জোটে, ধনা হাবে বাজার রাখা আমার বাবার শাল। বাবার স্মৃতিতে এর চেয়ে বড় মর্যাদা আমি কোনদিনই দিতে পারব না।’

কিছুক্ষণ থেমে অগ্রেগালু হকঠে বলল ফুঁদিয়ে, ‘সত্যি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ছোট্ট ছোট্ট, যখন দেখি, রাস্তার দু’পাশে বন্ধালমার কাঁচালীর দল গরম কাপড়ের অভাবে খরখর করে বীপাচ্ছে, অন্যভাবে কুঁকড়ে-ওঠা দেহগুলি সূর্যের প্রোচাশা করে প্রস্তর গুলচে, আর যখন তারই পাশে বেশি, বিনাসী ছোকরাব দল বুক ফুলিয়ে দামী শাল গায়ে নিয়ে সিগারেট ফুকতে ফুকতে চলেছে, আর সেই সিগারেটের আশ্বিন সেই কাঁচালীদের দিকে তাকিচ্ছিলার সঙ্গে ঢুড়ে দিচ্ছে...’

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল ফুঁদিয়ে, ‘কিন্তু জানে কি ঐ স্বার্থপর বিনাসী বাবুর দল, যে একদিন ঐ আশ্বিনই দাবানল হয়ে ছলে উঠে, গোটা শোখক সমাজকে জড়িয়ে ছাই করে দেবে।’

এইরকম গোপন দিন যে কতবার করেছে ফুঁদিয়ে, তার হিসেব কেউ রাখে নি। নিজে থাকত একটা ছোট্ট কামিজ গায়ে দিয়ে, প্রসাধনের কোন বালিই ছিল না। অরিকল কেশলম, অস্ত্রাভ, অজুগ ফুঁদিয়ে বকতিন যে কাঁচালীদের বাড়ি গিয়ে তাদের সেবা করে এসেছে, অত্যাগ বিবরণ করে এসেছে, তার সঙ্গী বীরা এখনো জীবিত আছেন, সবাই জানেন।

একদিনের ঘটনা। ১৯০৪ সাল। কলকাতায় ফুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত ফুঁদিয়ে। শিক্ষক অনন্তলাল সান্ত্র ঐ শ্রেণিতে ইতিহাস পড়ান। তাঁর শাস্তিবিধান ছিল নানানাকম—তার মধ্যে একটি হচ্ছে, পড়া মুগস্থ না হলে, ছাত্রের কোন কৈফিয়ৎ না নিয়েই ছাকে যেক্ষর উপর ঠাঁড় করাণো।

একদিন রাস সন্সর আগে, ফুঁদিয়ে ঘরে ঢুকেই এক কাণ্ড করে বসল। কোন কথা না বলে সটান সেক্ষর উপর ঠাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই অবাক। কিন্তু ফুঁদিয়ের ব্যস্তিদের প্রোচাশা এমনি, কেউ কোন প্রশ্ন করলেও সাহস পাচ্ছে না। অনন্তলাল রাসে ঢুকেই ফুঁদিয়েকে ঐ অবস্থায় দেখে কিছুক্ষণ জড়িত হয়ে বসেই বসে; তারপর বললেন—‘কি রে ফুঁদ, ব্যাপার কি? মেঘ না চাইতেই জল। পড়ানাই শুরু করলাম না, আগেই ঠাঁড়িয়ে গেলি?’

নিরুত্তরপূর্ণ ফুঁদিয়ে জবাব দিল,—‘কাজ আমার ইতিহাসের পড়ার বখশ্ব হয় নি। তা’ পড়া না হলে আপনি তো কৈফিয়ৎ না নিয়েই সেক্ষর উপর ঠাঁড় করিয়ে দেন। তা’ আমি আগে থেকেই

ঠাঁড়িয়ে আছি। এখন বেতটা পিঠের উপর পড়ক, তাইই অপেক্ষা আছি।’

গল্পের মানুষ অনন্তলাল। তবু তিনিও ফুঁদিয়ের কথায় ছোট্ট উঠলেন—‘শে! বেশ! তা পড়টা হয় নি কেন, বল তো বাপু কৈফিয়তটা না হয়, তোমার বেলায় স্ক্রিপ্ট সাই করলাম।’

—‘বিশ্বাস করবেন, যা বলব?’ ফুঁদিয়ের বঠে খুব কঠিন জোরালো আওহাজ।

অনন্তলাল এবার বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কোন ছাত্রের কাছ থেকে তিনি তাঁর শিক্ষকভাণে এমন জোরালো প্রশ্ন শোনেন নি। স্বজ্ঞ, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অনন্তলাল অজ্ঞান মত বললেন,—‘আব কারা কথা বিশ্বাস না করলেও, তোমার প্রোচাশা কথা বিশ্বাস করব।’

—তবে সন্তুন্ন স্তার। আমাদের বাবার পাশে একটা ভান্ডা ঘরে এক বড়ি থাকে। মুড়ি বেচে তার দিন চলে। কাল সন্ধ্যায় তার বোনিপো’র হল বলেবা। বাড়িতে আর কেউ না। ডাক্তার ডাকবে কে? স্ক্রিপ্ট সাই বা করবে কে? যখন টুকলাম তার বাড়িতে, দেখি, বড়ি বাসে শুধু ‘হায় হায়’ করছে। এদিকে রোগী ডেবরমির মধ্যে অসাড় হয়ে পড়ে আছে।...দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনলাম। তারপর অল্প পথা দেওয়া, নোরা পরিচার বরা, বৃত্তিকে সাধনা দেওয়া—সারাদিন কাটালে সেখানে। সবাইকে সেখানেই ছিলাম। রোগী এবট স্তব্ধ হতে চলে এসেছি। আপনায় ইতিহাসের পড়া পড়বো কখন বলুন, স্তার?’

‘ফুঁদিয়ে বঠে বন্ধ হয়ে এল। বোধ হয়, চোখের সামনে তার ভেসে উঠেছে, ঐ রকম কত অগণিত রোগী দেশের অস্তিত্ব গলিতে বিনা স্ক্রিপ্টায়, বিনা স্ক্রিপ্টায় সূর্যের কোল ঢলে পড়ছে, স্কোপের অস্ত্রাভ কত ফুল কুড়িয়েই বিনীত হয়ে যাচ্ছে, দেশের কত স্বপ্ন, কত ভবিষ্যৎ, এমনি করেই শোণীয় অসীতে গণিত হচ্ছে।

অনন্তলাল স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ফুঁদিয়ের দিকে তাকিয়ে বসেই বসে। তারপর স্মৃতিতরুণে বললেন,—‘তা ফুঁদিয়ে, তুমি আমার ইতিহাসের পড়া আর পড়বে না, তুমি নিজেই রচনা করবে এক ইতিহাস। আমি বুঝছি। তুমি এবার বেক্ষ থেকে নেমে বোসো তো বাবা। নইলে আমাকেই বসে পড়তে হবে, কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে।’

কঠিনের কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠেছিল আশ্বিনের ফুল,—ফুঁদিয়ে। যেখানে অজ্ঞান, উৎপীড়ন, সেখানে তার অগ্র-শাসন, আবার যেখানে নিহাতিতের বেদনা, সেখানে তার কুশল-মঙ্গলবতা। একটি ছোট্ট ঘটনা...

ঐ কলকাতায় ফুলেই এক দরোয়ান ছিল ফুল এবং কলসের অধ্যক্ষ মৈত্র মশাইয়ের খুব প্রিয়পাত্র। ছাত্রদের সঙ্গে ঐ দরোয়ান অত্যন্ত অভিন্ন ব্যবহার করত। সময় সময় তার উৎপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে যেত। ছাত্রেরা মৈত্র মশাইয়ের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল পেত না। ফলে দরোয়ানের স্পর্ধা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। চরমে উঠল সেই দিন, যেদিন সে বিনয়রুপ দে নামে ফুঁদিয়ের একজন সহপাঠকে অকথা, অজ্ঞান ভাষায় গালাগালি দিল। বিনয়রুপ মেদিনীপুরের বিশিষ্ট এক ভক্তপরিবারের সন্তান। এক

## অগ্নিশিশু প্রসঙ্গে

অশিক্ষিত, অসভ্য দরওয়ান তাকে চূড়ান্ত অপমান করবে, তা সে সইবে কেন ?

ফুদ্রামের কাছে বিনয়কৃত অভিযোগ করল। বলল—‘তুমি ছাড়া কেউ পারবে না ও ব্যাটাকে শাস্তি করাতে।’

ক্রোধে জ্বল উঠল ফুদ্রামের উদ্ভীষ্ট যৌবন। দুর্ভাগ্য যৌবন হিতাহিত মানে না, বিচারের অপেক্ষা রাখে না। শালীনতা, শোভনতা ছুঁপিয়ে মাড়িয়ে একটি অভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত একটি ভদ্র-সম্ভ্রান্তকে অপমান করেছে,—এই সংবাদই যথেষ্ট। ফুলের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে এসে দরওয়ানকে পাঁচড়াও বহল ফুদ্রাম। তারপর বেদম প্রহার। সে কি নিপীড়ন। তুচ্ছ নিঃশ্বাস, শিকারের উপর লাফিয়ে পড়েছে। সবাই স্তম্ভিত। এমন কি মৈত্র-মহাশয়ও।

নির্ধর প্রহারে দরওয়ানকে প্রায় অচৈতন্য করে ফুদ্রাম ছুটে গেল মৈত্র মহাশয়ের কাছে। ইফাতে ইফাতে বলল,—‘শান্তি দিন আমাকে। আমি শোষী। ঠা, মেরেছি আমি দরওয়ানকে।... শান্তিই আমার প্রাণ্য। আমি যতটা মেরেছি, আমাকে তার চেয়ে বেশি মারলেও আমি মুখ বৃক্ষ সস্থ করব, কেন না, সে তো আমার পাওনা। পাওনা পেলে কেউ কি হুগে পায় ? কিন্তু আর, ঐ দরওয়ানকে আপনি দয়া করে সতর্ক করে দেবেন, সে যেন ভবিষ্যতে কোনো চারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে।’

মৈত্র মহাশয় কিছুক্ষণ নীরব থেকে কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন,—‘আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও।’

ফুল বসবার পর ফুদ্রামের ডাক পড়ল অধ্যক্ষের ঘরে। সহপাঠীরা বচাবলি করল,—‘ফুদের এবার আর রক্ষে নেই; পিঠের ওপর কখনো বেত ভাঙেন প্রিন্সিপাল, কে জানে ?’

ফুদ্রাম কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে অধ্যক্ষের কামরায় এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত মুখমণ্ডল। নির্ভীক বঠম্বর,—‘ডেকেছেন কেন, স্যার ?’

মৈত্র মহাশয় গম্ভীর। ফুদ্রামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তর্কাতর্কি মুহূর্তে বলে উঠলেন—‘তুমি কি চাও ?’

—‘শান্তি।’

—‘শান্তি তোমাকে আমি দেব না ফুদ্রাম। অজ্ঞায়ের প্রতিকার করতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়াই জায়সঙ্গত। বিশেষত উদ্দাম যৌবন ঐ রকম নির্ভরভাবেই অজ্ঞায়ের শাস্তি দেয়। তাই স্বাভাবিক। তোমাকে আমি শান্তি দিতে পারি না। জ্বায়ে বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান করাও তো অজ্ঞায়। তুমি ঠিকই করেছ। দরওয়ানকে আমি সতর্ক করে দিয়ে বলেছি,—এরপরও তার আচরণের যদি পরিবর্তন না হয়, তবে তার চাকরি থাকবে না।’

চলে এলো ফুদ্রাম। কিন্তু একি ! তর্কাতর্কি নির্ভীক প্রশান্তমুখে বিদায়ের ছাড়া কেন ? তবে কি অধ্যক্ষের বিচারে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে ?

না, তা নয়। শক্তিমান যৌবনকে বতই গৌরব সে দিক, তবু হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, বেপারোয়া যৌবনকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। যে যৌবন মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার আবার কিসের গৌরব ? সে তো ভুল্লর এক ফুলশক্তি। নিঃসহায় দরওয়ানকে নির্ধরভাবে প্রহার করার গৌরব কি ? শৌর্য কি ? মানবতার আবালাতে ফুদ্রাম

তাই অপরাধী ; তাকে শাস্তি অধ্যক্ষ দেন নি, নিজেকেই সে ভার নিতে হবে।

সন্ধ্যার পুরোনো কেল্লার মাঠ বসে আবারে কাদল ফুদ্রাম। হান্ধা হল মন। অনেকটা ক্লান্ত যেন ঘুর গেল।

পরদিন ভোরে আনন্দনগরে প্রাপ্ত একপানি তসরের চাদর নিয়ে চুপি চুপি দরওয়ানর ঘরের দরজায় যা দিল।

দরওয়ান বেরিয়ে এল। ফুদ্রামকে দেখে সভরে শিঁহিয়ে আসতেই ফুদ্রাম জড়িয়ে ধরল তাকে।

এ কি ! এ তো প্রহার নয়, এ যে উপহার। বিশ্বয়ে দরওয়ান যেন পাখর হয়ে গেছে। চাদরখানা আদর করে দরওয়ানর গায়ের জড়িয়ে দিয়ে ফুদ্রাম বলল,—‘বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে ভাই। তুমি আর আগের সে লোক নও। আমাকে ভালোবাসবে তো ভাই এখন থেকে ? আমার গুণের বাগ নেই তো ?’

কৈদে উঠল দরওয়ান—‘বাবু, আমি গোপালজীর নাম লিয়ে বলছি, কোনো লেডকার উপর থারাবি বাত কভি বলব না।’

—‘আমি জানি, তুমি খুব ভাল লোক। ঐ চাদরখানার সঙ্গে আমাকেও মনে রেখো ভাই তোমার দোস্ত, বলে, কেমন ?’

চোখের জলে দরওয়ানর হাসি যেন ফুলের মত জ্বল উঠল।

—‘আপনাকে আমি দেওতার চেয়েও বেশি ভালোবাসব বাবু।’

ফুদ্রামের কাহিনী শুনে ললিতবাবুর বাসা থেকে যখন পথে বেরিয়ে পড়লাম, রাত তখন গভীর। পাড়া নিরুন্ম। কোথায় যাবো ? বাসার ? কান্না পথে ? অনেক পথ। আর সব পথেই তো ফুদ্রাম। মেদিনীপুর ফুদ্রামকে যেন দরওয়ানকে দেওয়া উপহারের চাদরের মতই জড়িয়ে রেখেছে। উদভ্রান্ত মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চৌটারাজ্য, নিমন্তলার চক, কর্নেল গোল—অবশেষে গোলকুরার চক। ঐ তো, ঐ তো সেই জায়গাটা, যেখানে ছিল কালীমন্দির, যেখানে ফুদ্রাম, সন্তান বোস, জ্ঞানেন্দ্র বোস লাঠি খেলার মতড়া দিত,—স্বাধীনতার শপথ নিত। আজ সেখানে কিছু নেই, শুনতে পাচ্ছি, রিক্ততার হাতাকার, অবহেলার কলুশান, আর—

পেছনে কতগুলি ছেলের কলরব শুনলাম। সিনেমার শেষ শো দেখে কিরু—

—‘বৈজ্ঞান্যমালার ড্যান্সটা দেখলি—ওরাওরাফুল মাইরি। কাটারি মেরে দিচ্ছে রে !’

—‘কেন দেব আনন্দকে বুঝি তোমার ভালো লাগলো না ? কি নাইস্ ফিগার ! যেন এ্যাপোলো—’

—‘যাই বলো, আশা পারেথের সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না।

এ্যাক্টিং—ঐ মেরে দেয় ! ওফ্—

—‘হা হা হা—কটা ছবিই বা দেখেছি, তুলনা করতে আসছি।’

সবাই আমাকে দেখে দাঁড়ালো। করেকজন আমাকে চেনে। একজন বলল, ‘এখানে কি করছেন, স্যার ?’

বললাম—‘ললিতবাবুর বাসা থেকে ফিরছি।...তা, তোমরা কি সিনেমা দেখে এলে ?’

—‘হ্যাঁ হ্যাঁ! দেখবেন ছবিটা—ওয়ার্ডারফুল হয়েছে। যেমন ডিরেকশন, তেমন গান আর।’

—তা তোক। অচ্ছা তোমরা শক্তিচর্চা কিছু করনি?—এই ধরো, লাঠিখেলা, কুস্তি—

আস্তিনের আড়ালে সবাই হাসতে লাগলো, বেশ বুঝলাম। রাস্তার পাশেই একটা কক্সালসার ভিখারী বেশ হয় জ্বরে ধুকছে। তার অস্পষ্ট গোষ্ঠার সঙ্গে, ছেলেরের হাতিটা কেমন যেন এক বেখাপ্পা পরিবেশের সৃষ্টিকার। আমি অভিজ্ঞতের মত ক্ষুদ্রদামের শক্তিচর্চার আখড়ার জংগলার নিক তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটা কুলি শ্রমীর লোক পাশের বস্তি থেকে বেরিয়ে এলো কাদতে কাদতে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—‘আপনারা বিচার করুন বাবু? ওই শালা দোগলু আমার বিটির দিকে খারাপ চোখে তাকাই’ল, আমি তাকে গাল দিইছি, আর সে আমাকে এমন করে মারল—’ বলল আবার হাঁটমাউ কান্না।

কোলগুলা সমস্তের বলে উঠল—‘তা বাবা, খানায় যা না, আমরা কি করব?’

করেকজন নাক সিঁটকিয়ে বলল—‘আর এই সব বস্তিগুলোও

হয়েছে একটা গোলমালের আখড়া—কেবল ষগড়, মারামারি,—মিউনিসিপ্যালিটির উচিত’—

বলতে বলতে এগিয়ে চলল ছেলের দল। কুলিটা কাদতে-কাদতে আবার গিয়ে তার নোংরা কোটরে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু আমি তো কোথাও চলতে পারছি না। মনে হল, কোন এক দৈবশক্তি আমাকে গোলকুরার চকের এই কাঁকা জারগাতে বন্দী করে রেখেছে। মনে হল, আমাকে ঘিরে আছে এক অগ্নিবলয়, কতগুলি অগ্নিময় মুখ আমার দিকে চেয়ে যেন বলছে, আমরা আছি, আমরা যুগে-যুগে থাকব আমাদের নিষ্ঠা নিয়ে, কর্মশক্তি নিয়ে, আবেশ নিয়ে : যখনই জ্ঞাতি হবে নির্বোধ, আদর্শচ্যুত, যখনই দুর্বলের উপর চলবে নির্ধাতন, তখনই আমরা আমাদের বিপ্লব দেশকে নিয়ে যাব অগ্নিতর্থে, সেইখানে সবাইকে জ্বলন করিয়ে শুদ্ধ করাবো,—তবেই তা খাটি ‘মাহুঘ গড়ে উঠবে’—

তাই নিয়ে চ, ওগো! বিমুত অগ্নি-সাধকের দল নিয়ে চলো অগ্নিতর্থে,—কেউ না জামুক, আমি জানব, আমি বলবো সবাইকে,—যেচে আছে অশ্লিষ্ট, তার খেলা আজও শেষ হয় নি।

## বারৌণী জংশনে কাক

### শক্তি মুখোপাধ্যায়

এখন মধ্যাহ্ন। সমস্তপুরের গাড়ি ছেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ প্রাটফরম নিরু্যম।

অত্যধিক অলসতা চতুর্দিকে আবেশে মাড়া।

মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে চা’ওলা ছুটে গেল, শেষ ঘটা বেজেই চলেছে।

উত্তর সামান্তবাহী ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল;

গাড়ি আসবে হয়তো এখন।

বাইরে ভীষণ রৌদ্র।

ক্যাবের আলোতে দগ্ধ রেসলাইন অনেক উজ্জ্বল।

এখন মধ্যাহ্ন। পাখাগুলো অবিশ্রাম ঘুরছে ওপরে;

উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। একটা নিটোল কালো কাক

লোহার রেলিঙে বসে ডাকছে কা-কা-...।

ওধারে প্রাটফরম গাড়ি আসছে; ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল কাক—

কা-...কা-...কা-...কা-...

কাছাকাছি কিছুক্ষণ বসে শ্রান্ত হয়ে

অস্থায়ী নীড়ের কাছে ফিরে এসে।

কাকটা থাঁজছে কাকে? কেউ কি হারিয়ে গেছে?

মনের প্রেরণী!

আজ কোন পরদেশীর ডাকে

ওয়েহে ট্রেনের সঙ্গে উড়ে উড়ে চলে গেছে

বানপুর-...গারক্ষপুর-...গাশা-...বেরিলি।

উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। আর একটা ট্রেন ছাড়ল

নবম্ব জানলার ধারে

বৈদ্য যোগ্য চিকিৎসা ছাপো, আত্ম-স্বকনের দিকে চেয়ে।

কিছুক্ষণ কাঁধাকা ডাকডাকি-...তারপর-...প্রাটফরম নিরু্যম।

আদর্শ ওয়ে আছে লাকটা হারিয়ে বাওয়া গাড়ির পিছনে।

গভীর শোকের মধ্যে ভুব দিয়ে ডানা মুড়ে লোহার রেলিঙে

ঠোটটাকে নিচু করে চুপ দিয়ে আছে;

ছ’চোখে অবসন্ন হৃৎপুরের বিষণ চাউনি।

উত্তপ্ত হাওয়া আসছে। পাখা ঘুরছে। ক্লান্ত দেহ এখন পরবাসী।

অনির্বাণ মনের দীপনিখাতে

নীলব এক যন্ত্রণার আলা বৃকে নিয়ে

ভাবনার সমুদ্র উপকূলে

অসময়ে মৃত্যুকে ডকে এনে কি লাভ!

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

# বাস্তবিক মজ্জিন



[৮ নম্বর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

আজ রাতেই বাস্তবীক বিবির সঙ্গে দেখা হইবে, বৃদ্ধ বোম্বেলো পাঠকের মুখে এই প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা শুনিবামাত্র মন ঝঙ্ক হইয়া উঠিল—উৎসেগে, আশঙ্কায়, উদ্গ্রাব কোঁড়হলে। সে চাকুলে সম্ভবত কিছুটা আনন্দও মিশ্রিত ছিল—এক অধারণ, অদ্ভুত, রহস্যময় বস্তু চোখের সামনে দেখিবার সুযোগ পাইব, সেই চিন্তার আনন্দ। বাঁচিয়া থাকিতেই লোকের মুখে মুখে যে কিস্কন্দা হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃষ্ট ছাড়া 'জেনানা' বাস্তবীক বিবিকে চাকুল করিব, জীবনে একটা অভিজ্ঞতার মতন অভিজ্ঞতা হইবে। এ অভিজ্ঞতা আমি চাহি নাই, বিধাতাই আপন খেলায় আমার উপর চাপাইয়া দিতেছেন। বিধাতার পাতা ফাঁদ হইতে আমি বেচারী এ্যাটর্নি। যত পালোয়ানই হই না কেন, রেহাই পাইব কিরূপে? কিন্তু এত লিখিয়াও আমার তখনকার মনের ভাবনা কিমত ফুটাইতে পারিতেছি না? উপজ্ঞাসিক বন্ধিমবাবু এ অবস্থার পড়িলে পারিলেও পারিতে পারিতেন। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া আমার কেবলই মনে পড়িতেছিল, বন্ধিমবাবুর 'হুর্গেশনন্দিনী' উপজ্ঞাসের নায়ক জগৎ সিংয়ের কথা। জগৎ সিংহও লড়াই করিতে করিতে আঘাত পাইয়া অচেতন হইয়াছিলেন এবং পরে প্রথম চোখ মেলিয়াই দেখিয়াছিলেন, তিনি এক অপরিচিত ঘরে বন্দী। আমার অবস্থাও তেমনি। উপজ্ঞাসটি পড়িবার সময় ভাবিয়াছিলাম এমন ব্যাপার বুঝি-বা কেবল উপজ্ঞাসেই ঘট, বাস্তব জীবনে নহে। কিন্তু আমার অবস্থা দেখিয়া নিজের মনে

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, তবে কি আমি কোনও উপজ্ঞাস কাহিনীর নায়ক হইতে চলিয়াছি? অমনি মনে আগর চট করিয়া খটকা লাগিল। আমার মনের ভিতরে নানারকম ভাবনার ঝড় বহিতে লাগিল। তা হোক, তবু মনে মনে স্থির করিলাম মনের কোণে যে ভয়ের আভাসমাত্র আছে, তাহা বাস্তবীক বিবিকে কোনো মতেই জানিতে দিব না। সে যত বড় দাপটের দ্বীলোকই হোক না কেন, আমি পুরুষ হই তাহার কাছে এতটুকু হার মানিব না, এতটুকু খাটো হইব না। জীবনে কখনও কাত্যকেও পরোয়া করিলাম না, কখনও কোনও ভয়েই এ সদয় কম্পিত হইল না। আজ তুচ্ছ একটা দ্বীলোককে পরোয়া করিব, তাহার ভয়ে সদয় কম্পিত হইবে? হিঃ! এরূপ ভাবিয়াই মনে প্রশ্ন জাগিল 'ঠাকুরঘরে কে?' জবাবে 'আমি তে। কলা খই না'র মতো। এই সব অবাস্তব কথাই বা আমার মনের ভিতর ভিড় বহিতেছে কেন? তবে কি আমি ভিতরে ভিতরে ভয় পাইয়াছি। কি? নিজের কাছেও তাহা স্বীকার করতে চাহিতেছি না?

বোম্বেলো পাঠক আমার মনের ভিতর গোলমাল কিছু কিছু তুলিতে পাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন, 'বাবুজি, আজ ডারে এই বিষম চোটিটা যে শ্যামসনের হাতে আপনি খাইয়াছেন, আপনার হাতে শ্যামসন খায় নাই, ইহা আপনার বড় দোষাঙ্গ্য জানিবেন।'

কথাটা বড় অদ্ভুত লাগিল। বলিলাম, 'কেন?'

পাঠক মহাশয় বলিলেন, 'আপনার আঘাতে শ্যামসনের এইমত অবস্থা হইলে আপনার দোষণস্বরূপ ঘটিল।'

'সে কি?'

বসুমতী : বৈশাখ '৭১

‘বাতাসী আপনাকে ক্ষমা করিত না। শ্রামসন তাহার বড়ই প্রিয়পাত্র, কলিজার টুকরা। শ্রামসনের উপর বাতাসী যেমন খুশি। বাতাসীকে তেমন খুশি আর কাহারও উপর দেখি নাই।’ সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধনার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল নওজওয়ান শ্রামসনের সুপুরুষ রূপ। অসামান্য মল্লযোদ্ধা হইলেও যুবক শ্রামসনের মুখমণ্ডলে ক্ষমতা নাই, অসামান্য লাভ্যা আছে। অথচ সেই লাভ্যে পৌরুষ জলু জলু করিতেছে। শ্রামসন অসিতবরণ নহে, গৌরব। কুন্তি-লড়িবার সময় তাহার শক্তির রক্ততা ও অহঙ্কারটাই এত বেশি চোখে পড়িয়াছে যে, তাহার লাভ্যের দিকটা আদৌ খেলালে আসে নাই। বোমভোলা পাঠকের কথা শুনিয়া সে দিকে খেয়াল হইল। মনে পড়িল পলাবলী কীর্তনে শুনিয়াছি :

‘চল চল কাঁচা আগের লাভণি  
অবনী বহিয়া যায়।’

শ্রামসন সম্পর্কে বৈষ্ণব কবির পদ মনে পড়াত। একটু বাড়াবাড়ি, কারণ শ্রামসন দুর্বার কুন্তিগীর, চল চল নহে এবং বৈষ্ণব নহে। কিন্তু যাহা মনে পড়িয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। মন নিবহুশ, সে কখন হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে তাহার উপর কাহারও হাত নাই। বুঝলাম শ্রামসন-মুগ্ধা বাতাসী বিবি শ্রামসনের মর্মান্তিক আঘাতকারীর প্রতি মূশংস হইতে বিধা করিত না।

‘কিন্তু আমার প্রাণদংশের ঘটনা, এ কথার অর্থ?’

‘বাতাসী খুব সস্তব আপনাকে হত্যা করাইতি।’

বোমভোলা পাঠক কথটা এত অনায়াসে, এত সহজ নির্লিপ্ততার স্তরে বলিলেন, যেন মানুষের প্রাণনাশ অতি তুচ্ছ, সহজ, সাধারণ, নৈশনিন ব্যাপার; ইহাতে শিহরিত, চমকিত, ভীত হইবার কিছুই নাই। খুব সহজভাবে বলিলেও কথটা বোমভোলা পাঠক যে কিছু বাড়িয়া বলে নাই, তাগাও মুশ্ঠাভাবে অনুভব করিলাম। তবু সহজ নির্লিপ্ততার ভাণ করিয়া এবং মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলাম : ‘কিন্তু এটা তো মগের মূলুক নয় পাঠকজি, ইংরাজের মালখ।’

বোমভোলা পাঠক অস্মানবদনে বলিলেন, ‘বাতাসীর তাহাতে কিছু যায়-আসে না, বাবুজি। ইংরাজ সরকারের আইন, শাসন সবই পাকা, খুব কড়া; কিন্তু তাহাকে অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুঠ দেখাইবার ক্ষমতা, সাহস, বুদ্ধি, সঙ্গতি সমস্তই বাতাসীর আছে। যদি সৌভাগ্য হয়, তাহার প্রেমাপং আপনি দেখিতে পাইবেন।’

মনে মনে বলিলাম, ‘সেই দুর্ভাগ্যে আমার প্রয়োজন নাই।’

অনুভব করিলাম বাতাসী বিবিকে বৃদ্ধ বোমভোলা পাঠক যেমন ধরলে কস্তাখানীয়া হিসাবে স্নেহ করেন; তেমনি অজ্ঞভাবে আবার ভয়, সন্ত্রাস, সম্মান ইত্যাদিও কম করেন না। মনে হইল তাহার দৃঢ়বিশ্বাস বাতাসী বিবি অলৌকিক শক্তিশালী অঘটন-ঘটন-পটায়ী বাতুকরী। সেই বাতুকরীর বিশেষ প্রিয়পাত্র সুপুরুষ যুবক শ্রামসন। কিন্তু পাঠক মহাশয়ের মুখে আগে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহার সহিত এ কথটা বেন খাপ খাটতেছে না বলিয়া মনে হইল। বলিলাম : ‘পাঠকজি, আপনি বলতেছেন বাতাসী বিবি শ্রামসনের খুব ভক্ত।

তাহা হইলে সে তাহাকে এত সহজে, এত হঠাৎ, এমন খাম-খামালা ভাবে বাতিল করিয়া দিতে পারিল কিরূপে?’

বোমভোলা পাঠক বলিলেন, ‘বাতাসীর কাছে বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ক্ষমা নাই। এই দুটি অপরাধকে সে যে কি বিষম ঘৃণা করে তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না বাবুজি। এ ইঙ্গিত তো একটু আগেই আপনাকে দিলাম।’

আশ্চর্য। এই অবস্থাতেও র কবিতা মনে পড়ল। কবি ভীরতন্ত্রের কবিতা :

‘বড় পিরানি বালির বাথ,  
কণে হাতে দাড়ি ক্ষণেক চাঁদ।’

অতীত, অস্থির, চঞ্চল, দ্রুতপরিবর্তনশীল এই ভাবনা নারীর মতিগতি। যে ছিল তাহার একান্ত অনুগ্রহভাজন, বাহার প্রতি অনুগ্রহের মজা আরো বাড়াইবার জ সে তাহাকে এইখানে এই ঘরে পরম আদরে আলস্য দিবার উজ্জাগ করিয়াছিল, সেই আদরের শ্রামসনকেই এমন অনায়াসে, পরম অনাদরে বাতিল করিয়া দিল বাতাসী বিবি। আমি নিমাত্ত অতিথি। সাময়িক উত্তেজনার বেশে এবং নেহাতই ইচ্ছতের দ্বায়ে শ্রামসন আমার প্রতি আতিথেয়তা এবং ভক্ত-কুন্তির নীতি ভঙ্গ করিয়া বেইমানী করিয়া ফেলিয়াছে, সেই অপরাধ বাতাসী বিবির কাছে এমন দুঃসহভাবে অমার্জনীয় হইয়া উঠিল যে, অস্তরের জ্বলন্ত হইতে সে একটানে শ্রামসনকে ধুলার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল? একটা মস্ত অপরাধ-সংঘটনী দলের সর্গারণীর এমন কঠোর নীতিজ্ঞান?

বোমভোলা পাঠক মনে মনে কি যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। বাতাসী বিবির চরিত্র-বহুত্ব সম্বন্ধে যে আমি মনে মনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম, তাহা কি তিনি টের পাইয়াছিলেন? মনে হইল—কহ আড়ি পাতিয়া শুনিতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্তই চারিদিকে একবার তাকাইয়া নিয়া তিনি আমার আরো একটু কাছে আগাইয়া আনিয়া, যেন শুধু আমিই শুনিতে পাই, এইরূপ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ‘বাবুজি, বৃদ্ধের কথায় অপরাধ লইবেন না এবং দয়া করিয়া বৃদ্ধের অনুরোধটা রক্ষা করিবেন, এই বিষয়াসেই আপনাকে বলিতেছি। বাতাসীর মেজাজে বা মর্দাদায় যাতে এতটুকু ধা লাগে এমন কিছু আপনি বলিবেন না বা কারিবেন না। আপনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান পুরুষ, আমার ইঙ্গিত বুঝিয়া লইবেন।’

ইঙ্গিতটা বৃদ্ধের ভাবভঙ্গি এবং কণ্ঠধ্বরের রকম হইতেই বুঝিতে পারিলাম। পরিষ্কার বোধ হইল, আমি বাতাসী বিবিকে খুশি করিতে পারিলে আমার মঙ্গল, না পারিলে অমঙ্গল এবং এই অমঙ্গলের মাত্রাটা নির্ভর করিবে বাতাসী বিবির অখুশির মাত্রার উপর। অর্থাৎ এই পুরীতে আমার বিপদের আশঙ্কা আছে, যদি দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী ভয়ঙ্করী বাতাসী বিবির সহিত সাক্ষাৎকারের সময়ে বুদ্ধিজাত্য-বশত বেকাঁস কিছু বলিয়া বা করিয়া ফেলিয়া তাহাকে চটাইয়া দিই।

‘কিন্তু আমি অতিথি। আতিথ্যের প্রতি কি বেইমানী করিবে বাতাসী বিবি?’ নিজেকে প্রশ্ন করিলাম।

‘তা না করিতে পারে। কিন্তু এখানকার আতিথ্য যখন ফুয়াইবে, তখন?’ পাণ্ডা প্রশ্ন করিলাম নিজেকেই।

পাঠকজি বলিলেন, ‘আপনার অকারণ ভীতির কারণ হইতে চাই না বাবুজি। কিন্তু এই কথটা মনে রাখিবেন, কবিদের ভুলে আপনার অভিনিবেশে আপনি নিজেকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে

# একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলুন



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ

গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। মাত্র ৫ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং আপনার জমা টাকার ওপর প্রতি বছর ৩% হিসেবে সুদ পাবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই আপনার কাছাকাছি স্থানীয় শাখায় দেখা করুন। ব্যাংক সম্পর্কে আপনার যেকোন সমস্যার সমাধানে বহুবিধ ও সৌজন্যপূর্ণ সেবার জন্য আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতায়ে সমিতিবদ্ধ • সমস্তদের খ্যাতিয় শীমাবদ্ধ

NGS/598 BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১১, নেতাজী সড়ক রোড ; ২১, নেতাজী সড়ক রোড, (লয়েন্স ব্রাঞ্চ) ; ৩১, চৌরঙ্গী রোড, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লয়েন্স ব্রাঞ্চ) ; ৫, চার্চ লেন ; ১১, ব্র্যাবোর্ন রোড ; ১৬, কনভেন্ট রোড, ইটালী ; ১৭এস/এ, বলিন্দী রাস্তা এভিনিউ, নিউ আলিপুর ; ১৬৩, হাসবিহারী এভিনিউ।

পারেন। আপনি নিতান্তই দৈবক্রমে এই পরিস্থিতিতে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইহার সহিত আপনি একবারেই পরিচিত নহেন; এখানকার হালচাল সম্পর্ক আপনার কোন ধারণা নাই! এবং বাতাসীর মতো অজুত নারী-চরিত্রের সঙ্গে আপনার পরিচয় নাই। তাই আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন মনে করিলাম। এত কথা আপনাকে বলিতাম না, আপনার স্বপ্নে এত বেশি উৎসাহ নিতাম না, যদি না—

বলিতে গিয়া আমিরা গেলেন বোমভোলা পাঠক। বলিলাম, 'বলুন, পাঠকজি!'

পাঠকজি বলিলেন, 'যদি না আপনার মুখের চেহারায়া একটি আশ্চর্য বিশেষের দৈবতে পাইতাম। এক্ষণে আপনাকে বলি নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলিয়া পারিলাম না। বাবুজি, আপনি কি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন?'

শেখের প্রশ্নটি বড় হঠাৎ, বড় অজুত, বড় চমক-লাগানো। কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়িয়া গেল। শেখপীরারের 'জুলিয়াস সীজার' নাটক অধ্যাপক নাগ পড়াইতেন, সেই কথা। একটি দৃষ্টে রোমের সর্বজন-সম্মতিত মনো চরিত্রের নাপবিত্র ক্রটিস এবং কুটচকী সীজার-বিভো ক্যাসিয়াস মুখোমুখি, মঞ্চে আর কেহ নাই। একথা দেখা বলিতে বলিতে ক্যাসিয়াস হঠাৎ ক্রটিসের মুখের উপর একটি চমক-লাগানো প্রশ্ন ছুড়িয়া মারিলেন:

'টেল মি, ক্রটিস, ক্যান ইউ সী ইজার ফেস?' (Tell me, Brutus, can you see your face?) অজুত প্রশ্ন: 'তুমি কি নিজের মুখ দেখিতে পাও?' এমন প্রশ্ন ক্যাসিয়াস ছাড়া বোধ হয় আর কাহারও মাথায় কখনও চোকে নাই।

এমন বেগুলা প্রশ্ন শুনিয়া ক্রটিসও প্রথমটা ধাঁধার পড়িলেন। তারপর ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিয়া জবাব দিলেন, 'না ক্যাসিয়াস, নিজের মুখ ভো আমি দেখিতে পাই না। শুধু আরনার সামনে পাঁড়াতলে আয়নার আমার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই।'

মুখের প্রতিবিম্ব মাত্র, মুখ নহে। প্রতিবিম্ব দেখা আর মুখ দেখা এক কথা নহে। আরনার বৃক প্রতিবিম্ব আমার মুখের চেহারায়া স্বরূপ দেখিতে পাই না। ডান দিকটা বা দিকে এক বা দিকটা ডান দিকে দেখি। সুতরাং অজ্ঞে আমার মুখের যে চেহারা দেখে, আমি আমার মুখের সে চেহারা দেখিতে পাই না।

কিন্তু বোমভোলা পাঠক আমার মুখে কি আশ্চর্য বিশেষ দেখিতে পাইলেন? ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। আয়নার তো রোজই অস্তিত্ব একবার নিজের জীমুখখানি দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য তো দূরব কথা, কোনো রকম বিশেষকষ্ট দেখিতে পাই না। নিজের আয়নায় দেখা চেহারা মনোমুগ্ধ দেখিতে দেখিতে তাহাতে বিশেষকষ্ট খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা বিফল হইল।

আমার চেষ্টা বিফল হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একগানা বড় আশ্চর্য স্থল বড় পরিচয় মুখ মনে পড়িয়া গেল, যাহার বিশেষজ্ঞর তুলনা ছিল না, আমার মনে হয়, তুলনা কোনদিন মিলিবেও না।

সঙ্গে সারা হৃদয় বড়ই বিবাদের ভরিয়া উঠিল। এমন গভীর বিবাদ—এত বেদনাময়, অথচ এত মধুর—যেন আর কোনাধিন অনুভব করি নাই।

মনোরমা, সেই আশ্চর্য মুখখানি তোমার। জানি না—এই অনবধিখে তুমি এখন কোথায়। বলিতে লজ্জা করিব না, অনেকদিন তোমায় ভুলিয়া ছিলাম; অনেকদিন পরে তোমার মুখখানির কথা তোমার কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল কাল সন্ধ্যায় বাতাসী বিবির ডেরায় বাধ্যতামূলক শয়নাবস্থায় বোমভোলা পাঠকের একটিমাত্র কথায়। বোমভোলা পাঠক আমার মুখে আশ্চর্য বিশেষকষ্ট আবিষ্কার করিয়াছেন শুনিয়া প্রথমে মনে লাগিয়াছিল বিশ্বাসের দোলা; তার পরেই মনে চলিয়া গিয়াছিল সেই দূরের অতীতের সন্ধ্যায়, যে সন্ধ্যায় তুমি অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া আমার কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলে, আমাকে ধন্য করিয়াছিলে। সেই শুভদৃষ্টির লাগ্নেই আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম মনোরমা এবং তোমার ঐ আশ্চর্য স্মন্দর, স্বর্গীয় স্তন্যমাংসখানো মুখখানো দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। হাতে কর্ণ পাইয়া আশাতীত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম। দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া যে তিলোত্তমা-রূপিনী মানসীর প্রতিমূর্তি বল্লভায় গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার সেই মানসী প্রতিমূর্তি তোমার সঙ্গে তুলনায় তুচ্ছ হইয়া গেল।

তুমি সেই স্মন্দর অতীত আমার মুখে আশ্চর্য বিশেষকষ্ট আবিষ্কার করিয়াছিলে, মনোরমা! কতবার লক্ষ্য করিয়াছি তুমি অপলকে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আছে, যেন আমার মুখের রূপ ছই চোখ দিয়া পান করিতেছ। ধরা পড়িয়া গিয়া কতবার লজ্জা পাইয়াছ, যেন বিয়ম অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছ। তবু অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিল, বার বার লজ্জা পাইয়াও তুমি বার বার অপরাধ করিতে। কৈশোর হইতেই শুরু করিয়া যৌবনেও আমি ছিলাম শক্তির পুংগব, শক্তির সাধক, কুস্তি লড়ার একাগ্র নেশায় মাতিয়া থাকিতাম। দেহে অসাধারণ শক্তি আছে এই মহানন্দে মগ্ন থাকিয়া, দেহে বা মুখের চেহারায়া রূপ আছে কি না সে প্রশ্ন একবারও চিন্তা করি নাই। গিড়দেবও ছিলেন শক্তিময় পুরুষ; আমি পালেয়ান হইতেছি এই আনন্দে তিনিও আমার রূপের কথা একেবারেই ভাবেন নাই। আমরা বংশানুক্রমে সুপুরুষ, চেহারাটা অনাশ্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওরা, তাহার জন্ত কিছুমাত্র চেষ্টা বা সাধনার প্রয়োজন হয় নাই, তাই ও-কথা চিন্তাই করি নাই। মনোরমা, আমি তোমার চোখে প্রথম আবিষ্কার করিলাম—আমি স্মন্দর, আমি সুপুরুষ।

ফুলের মত স্মন্দর তুমি, আমার ভয় হইয়াছিল কি জানি, তুমি হয়তো আমি নিয়মিত কুস্তি লড়ি বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু তুমি করিয়াছিলে ঠিক তাহার বিপরীত। তুমি লুকাইয়া, চুরি করিয়া একদিন আমার কুস্তি দেখিয়াছিলে এবং মুগ্ধ হইয়াছিলে। তাহা তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম। আজ এখনও যেন পরিষ্কার কানে শুনিতে পাইতেছি তোমার মধু-বরানো কণ্ঠের সেই কথা: 'দুষ্টির মাটিতে কি স্মন্দর তোমাকে দেখাছিল। আমি দেখছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে, আর চোখ ফেরাতে পারছিলাম না' আমার এত স্মন্দর দেহে এত শক্তি কি করিয়া লুকাইয়া থাকে তাহা ভাবিয়া তুমি বিশয় প্রকাশ করিয়াছিলে, মনোরমা।

আমরা দু'জনেই দু'জনকে পাইয়া আশাতীত স্তব্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই স্তব্ধ বিধাতার সহিল না। বেশিদিন আমরা দু'জনে দু'জনকে পাইলাম না। শিশু নিমাইকে মাছুহীন করিয়া তুমি চলিয়া



## বাতাসী মজিল

গেলে, বাইবার আগে আমার পদধূলি মাথার নিয়া প্রার্থনা জানাইয়া গেলে জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি তোমার স্বামী হই। জন্মান্তর আছে কি না এবং থাকিলেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আমার থাকিবে কি না তাহা জানিতাম না কিন্তু বাধ্য হইয়া চোখের জলে তোমাকে বিদায় দিলাম। কিছুমতেই তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তোমার আমার বড় কাদরের নিমাই অতি শৈশবেই তোমাকে হারাইল। অসহ্য মাথাতে মনে হইল আমার জন্ম চূড়ার হইয়া গিয়াছে, এ ভাবনে তাহা আর জোড়া লাগিবে না, আনন্দ কাহাকে বলে তাহা এ ভাবনে আর কখনো জানিতে পারিবে না।

কাজে এবং কৃতিতে দশখল থাকিয়া দুঃখের দুঃসহতা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং ছুঁতনের ভালবাসা একা বাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে তোমার আমার একমাত্র সন্তান নিমাইকে মানুষ করিতে লাগিলাম। নিমাইয়ের যত্ন করিয়া শাস্তি পাইতাম। জানিতাম, নিমাইকে তুমি ভালবাস এবং নিমাইয়ের মধ্যে তুমি আছ। কৃতি লড়িয়া শাস্তি পাইতাম। কারণ আমার কৃতি দেখিয়া তুমি খুশি হইয়াছিলে, কৃতি তোমার ভালবাসায় ধুয়া হইয়াছে। দিনরাত যেন তোমাই প্রভাবাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বাস করিতাম। তারপর মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকিতে থাকিতে জলের কথা ভুলিয়া যায়, তাহার বিবর্তি মহানুভবের মধ্যে থাকিয়াও আমরা হাওয়ার উপস্থিতিটা খেয়াল করি না, তেমনি তোমার স্মৃতি-আচ্ছন্ন আবহাওয়াতেই তোমাকে যেন দীরে দীরে ভুলিয়া গেলাম, ভুলিয়া রহিলাম। তোমার স্মৃতি মনের গহনে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমাইয়া রহিল। তার অনেকদিন পর তোমার কথা ঠিক মনে পড়ার মতো মনে পড়িল—দাতকাল বাতাসী বিবির ডোয়ায়, বোমভোলা পাঠকের কথা শুনিয়া। এমন অল্পত সন্তানবার কথা স্বপ্নেও কি কোনোদিন বন্ধন করিতে পারিয়াছিলাম?

কিন্তু পুণর্জন্ম বিশ্বাস ববি কি না, এ প্রশ্ন বোমভোলা পাঠক করিলেন কেন? তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। পাঠকজি বলিলেন, ‘আপনার মুখে দিকে তাকাইয়া আমার মঙ্গল ভাইয়ার মুখের কথা মনে পড়িয়া গেল, বাবুজি। মঙ্গল ভাইয়ার চেহারার সঙ্গে আপনার চেহারার বড় আশ্চর্য মিল মনে হইতেছে।’ বলিয়া আমার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন বোমভোলা পাঠক। অল্প অতীতে, ১৮৫৭ সালে ব্যাবাকপুরের মিলিটারি ছাউনিতে যে প্রথম বিদ্রোহী সিপাহীর ফাঁসি হইয়াছিল, ভারতে বিদেশী হাতে প্রথম ভারতীয় ফাঁসির শহীদ সেই মঙ্গল পাণ্ডুর মুখের চেহারার সঙ্গে আমার মুখের চেহারার সাদৃশ্য দেখিতেছেন বুদ্ধ বোমভোলা পাঠক, কিশোর বয়সে যিনি স্বফল মঙ্গল পাণ্ডুর ফাঁসি দেখিয়াছিলেন! আমার জীবনে সে এক অল্পত অভিজ্ঞতা, বিচিত্র শিহরনময় অল্পতুতি।

‘বাবুজি, সেইজ্ঞাই আপনার জন্ম আমি এত মাথা ঘামাইয়াছি, ঘামাইতেছি।’ বলিলেন বোমভোলা পাঠক। ‘আপনি এই বিজানায় বেহুশ ছিলেন তাই টেরও পান নাই কিভাবে বুদ্ধ আপনার সেবা করিয়াছে। এই হাত দুটি শুধু মানুষ মারিতে, মানুষকে জখম

করিতে আর আইন ভাঙিতেই শেখ না, বেগী ও আহত মানুষের সর্বপ্রকার সেবা-সুসমা করিতেও শিখিয়াছে। আপনার সেবা আমি নিজের হাতে করিয়াছি, বাতাসী তাহা দেখিয়াছে, খুশিও হইয়াছে।’

আমার মুখে শহীদ মঙ্গল পাণ্ডুর মুখের কিছুটা বা অন্যকথানি আন্দল সত্যই ছিল, না উহা বৃদ্ধের খেয়ালী মগজের কল্পনা তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বোমভোলা পাঠকের কথা বৃকের ভিতরে বেশ একটু ভরসা অল্পত করিলাম। ভাবিলাম যাক, এই বেজারগায় আমার একজন অল্পত নির্ভরযোগ্য বন্ধু আছে। একপ ভাবনা আগেও একবার ভাবিয়াছিলাম; ভাবনাটা এইবার একটা শক্ত, নির্ভরযোগ্য ভিত্তির আশ্রয় পাইল।

বুদ্ধ কিছুক্ষণ আমাকে নানা কথায় আশ্রয় সন্মতভাবে ভুলাইয়া রাখিলেন। বেলিলাম হাতের দক্ষতার চাইতে তাঁহার মুখের দক্ষতাও কিছুমাত্র কম নহে। কথাও বাতাব এই বোমভোলা পাঠক। তাঁহার কথা যুগ্মভাবে শুনিতে শুনিতে কোথা দিয়া যে কতটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, মন তাহার দিগব রাখিতে পারিল না। তারপর যখন তিনি বলিলেন, ‘বাবুজি, এবার আমি বিদায় নিব।’ তখন বুলিলাম দক্ষা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে। বিদায় নিবার আগে আমাকে তিনি এক গোলস পানীয় পান করাইয়া গেলেন—নানাবিধ ফলের রস একত্রে মিশ্রিত, স্বাদে ও গন্ধে পরম উপাদেয়। মনে হইল পানীয়ে কোনরূপ শক্তিশালী অথচ সুস্বাদু তরল ঔষধও মিশ্রিত আছে, কারণ পানীয়ট পান করিয়া যেমন ত্রিধু তেমনি স্বস্ত ও সন্তোষ বোধ করিলাম, এক্ষণ শুইয়-শুইয়া যে ঈষৎ বিরক্তির ভাব হইয়াছিল তাহাও যেন দূর হইয়া গেল। আমি বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলাম।

বলিলাম, ‘পাঠকজি, আমাকে একা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, লক্ষ্য রাত সামনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার যদি কখনও কিছু দরকার হয়? যদি—’

পাঠকজি বলিলেন, ‘আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকুন। সে ভাবনা আপনার নয়।’

‘তবে কাহার?’

‘আপনি বাটার অতিথি, তাহার।’ বলিয়া বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন বোমভোলা পাঠক।

নিরাশা ঘরে একা শুইয়া আবাস-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর ভূতের প্রবেশ, দক্ষায় যে ঘরের দীপগুলি জালিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে বলিল বিবিসাহেবের ভকুমে এ ঘরের দীপগুলি সে নিভাইয়া দিয়া যাইতে আসিয়াছে, কারণ, বিবিসাহেব বলিয়াছেন, আলোতে আমার বিশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটবে। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, ‘যে একবারে অন্ধকার থাকিবে?’

‘না সাহেব। বাতিরে চাঁদের বোশুনি আছে।’ অর্থাৎ বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরের ভিতরের অন্ধকারকে কিছুটা হ্রাস করিবে।

ভূত ঘরের দীপগুলি নিভাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই প্রায়শ্চক্কর এক ঘরে শুইয়-শুইয়া আমার বার বার মনে হইতে লাগিল যেন কাহার মুখ পদধূলি এইদিকেই আগাইয়া আসিতেছে। [ক্রমশঃ]

মাসিক বহুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিশ্বয়

বহুমতী : বৈশাখ '৭১

৯১

# ঐন্দ্র ও প্রাণ

## বিষ্ঠুর পরিহাস

শিবানী ঘোষ

নানাদিক থেকে নানাভাবে ললিতাকে দেখেছে উদিতেন্দু।

কখনও দূর থেকে, কখনও খুব নিকটে এসে। কখন উজ্জল সূর্য-কিরণে, কখনও স্তিমিত নীপালোকে। কখনও নির্জন, কখনও বহুজনের মাঝখানে। কিন্তু প্রতিবারই একটা নীরব দীর্ঘশ্বাস ঘেরিয়ে এসেছে তার বক্ষ ভেদ করে। উদিতেন্দুর আশা ছিল—তার স্ত্রী হবে গৌরবর্ণা। কিন্তু তা হয় নি। তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী ললিতা কালো। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিস্থিতিতেই দেখা যাক না কেন, তাকে কালো ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

বিয়ের আগে উদিতেন্দু নিজের চোখে দেখে নি ললিতাকে। মায়ের দেখাতেই সে মত দিয়ছিল বিবাহে। তাঁর মুখেই সে শুনেছিল মেয়েটি গৌরবর্ণা। কিন্তু বিবাহের পর সে দেখলো মায়ের কথা প্রকৃত সত্য নয়। মেয়েটি ক্রান্তবর্ণা। বলা যেতে পারে উজ্জল শ্রামবর্ণা।

অবশ্য এ নিয়ে কোনদিন মুখ ফুটে কোন কথা প্রকাশ করে নি উদিতেন্দু। কারণ তাতে অন্তরে আঘাত পাবেন তার মা এবং তরত ললিতাও। বিনা কারণে অপরকে আঘাত দেওয়াটা মাম্বিক-রুচি সম্পন্ন উদিতেন্দুর বিবেকে বাধে।

এ কথাটা অন্তরে ঢেপে রাখলেও উদিতেন্দুর মনস্তত্ত্ব ললিতা যে একবারে উপলব্ধি করতে পারে না, তানয়। তার রূপ নই এটা বিশেষ সীড়া দেয় তার স্বামীকে, এটা সে বুঝতে পারে সহজেই। সত্যি তার গায়ে রঙটা যদি এবটু ফর্সা হত, তা হলে এদিক থেকে অন্তত তার স্বামী অসুখী হতেন না। এটা ললিতার পক্ষেও আনন্দের হত। কারণ স্বামীর সুখেই তাঁর আনন্দ। তবু ললিতা তার রূপগৌরবের প্রাণি ঢেপে আপন গুণের সাহায্যে কিছুটা প্রসন্নতা আনে তার স্বামীর অন্তরে। উদিতেন্দু খুশি হয়। তবু এক এক সময় মনটা বেদনাতুর হয়ে ওঠে। মনে হয় ললিতা যদি আর এবটু ফর্সা হত।

ঘবে থেকে কলকাতার ফেরার পথে উদিতেন্দু সেই পুরোনো কথাগুলোই ভাবছিল ট্রেনে বসে। সে মেডিক্যালেন ছাত্র। স্কিন স্পেশালিস্ট। 'পিগমেন্টেশন' নিয়ে সে পড়াশোনা করেছে বিস্তর। কিন্তু তবু মাহুঘের গায়ে রং কি করে ফর্সা করা যায়, তার কোন হিন্সই সে পায় নি।

আজ কিন্তু সেই জিনিসই এসে পড়েছে উদিতেন্দুর হাতের মুঠায়। মাত্র কটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে। তাহেই যে কোন মাহুঘ বেশ খানিকটা ফর্সা হয়ে যাবে। এটা পশ্চিম দেশের একটা নতুন প্রবিদ্ধার। আর এটি বার আবিষ্কার তাঁর অরীনেই রিসার্চ করার সৌভাগ্য ঘটেছিল উদিতেন্দুর। আর সেই গবেষণার জন্যই সে গিয়েছিল ওয়েস্ট-ভার্নান।

দীর্ঘ দু'বছর পরে আজ বাড়ি ফিরছে উদিতেন্দু। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে দেখে নি ললিতাকে। কয়েকটা চিঠি অবশ্য আদান-প্রদান হয়েছিল। কিন্তু তাও প্রথম নিকে। শেষ দিকে ললিতা তাকে আর চিঠি দেয় নি। কারণটা কি—তা আজও অস্পষ্ট রয়েছে। বহুখানেক আগে লেখা ললিতার শেষ চিঠিটা পকেট থেকে বের করে উদিতেন্দু আর একবার পড়ে,—

প্রিয়তম, ক'দিন হল কি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যে দিন কাটাচ্ছি তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমার বিদেশ যাওয়ার দুশ্চিন্তা অবশ্য খুবই আছে। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা তার চেয়েও সাংঘাতিক। আমার কেবলই মনে হচ্ছে—আমার মতো বিধি মেরেকে কেন তুমি বিয়ে করতে গেল। বিয়ের আগে তুমি যদি একটাবার আমাকে দেখতে যেতে, তা হলে খুবই ভাল হত। আমার মত রূপহীনা কালো মেয়েকে তখন তুমি অনায়াসেই অপছন্দ করতে পারতে। তোমার মত বহুগুণসম্পন্ন সংস্কারী আমার দিক থেকে হয়ত গর্বের বস্তু হয়েছে, কিন্তু যখন তোমার দিকটা চিন্তা করি তখন অন্তরটা বেদনায় মুগ্ধে যায়। মনে হয়—তুমি বড় বেশি বঞ্চিত হয়েছো। তারপর কিছুদিন হল আমি আয়নার সামনে ঝাড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শিউরে উঠছি। মনে হচ্ছে আমাকে আরও বিধি দেখতে হয়ে যাচ্ছে। ওগো, আমার এ কি চরম শাস্তি! তুমি এলে এ মুখ আমি তোমাকে কেমন করে দেখাবো? আমার যে বুক ছেড়ে কান্দতে ইচ্ছে করছে...

এই পর্যন্ত পড়ে চিঠিটা ভাঁজ করে জানুয়ারি দিকে মুখ ফেরার উদিতেন্দু। এর পর আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। শুধু ভালবাসা জানিয়ে তার নামটা লেখা।

এই চিঠিটা শেষেই উদিতেন্দু পত্র লিখেছিল ললিতাকে। সেই পত্রে সে তাকে জানিয়েছিল তার আন্তরিক সন্ধান। লিখেছিল ললিতা কালো বলে তার জীবনে কোন ফোভ নেই, কোন দুঃখ নেই। এ নিয়ে সে যেন মিথ্যা দুশ্চিন্তা না করে। আর বহুখানেক পড়েই সে বাড়ি ফিরবে। তখন বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত এমন একটা জিনিস সে সংগে নিয়ে যাবে, যার সাহায্যে তার দেহের উজ্জল শ্রামবর্ণ নিঃসন্দেহে উজ্জল কান্ডনবর্ণে পরিণত হবে। কাজেই উপস্থিত সে যেন এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করে।

এই পত্রের উত্তর আর পায় নি উদিতেন্দু। এর পরও সে আরও চার-পাঁচটা চিঠি দিয়েছে ললিতাকে, কিন্তু তারও কোন জবাব আসে নি। ললিতার চিঠি না দেওয়ার কারণ কি হতে পারে, এই নিয়ে সে অনেক চিন্তা করেছে। কিন্তু তার কোন কুল-কিনারা পায় নি। অবশ্য বাড়ির অভ্যন্তর-বহুজনের চিঠি উদিতেন্দু নিরমিত পেয়েছে এবং তার জবাবও দিয়েছে। তাহেই সে বার বার জানতে চেয়েছে ললিতার কথা। তার কি হয়েছে, কেন সে চিঠি দেয় না, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই সে করেছে। কিন্তু তাঁদের সকলের জবাবী-চিঠিতে উদিতেন্দু ঐ একই কথা জেনেছে যে, ললিতার তেমন কিছুই হয় নি। শুধু মিথ্যে একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেরে বসেছে, সেই কারণেই সে চিঠি দেয় না।

ললিতার দুশ্চিন্তাটা কি, এই নিয়েও সে প্রশ্ন করেছে সকলকে। কিন্তু তারও কোন সঠিক উত্তর সে পায় নি। এক একবার মনে হয়েছে—তবে কি ললিতার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে—তাই যদি হবে, তবে

## অবন ও প্রাণ

তাকে জানাতে লোক সন্মোচন বোধ করবে কেন? অন্তত তার বৌদি, কাকীমা কিংবা জামাইবাবু চিঠিতে সে কথা নিশ্চয়ই জানাতেন। বহু চিন্তার পর উদিতেন্দু অমুমান করে, ললিতার হৃদয়ঙ্গম আসলে আর কিছুই নয়। সে কালো, এই আত্মবিশ্বাস তার চিরকালই আছে। বর্তমানে সেটাই একটু বেড়েছে। কারণ, উদিতেন্দু এখন এসে পড়েছে কস। মানুষের দেশে। এ অবস্থার কোন যেতান্বিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ললিতাকে পরিত্যাগ করার হৃদয়ঙ্গম কেবল সাধারণ মেয়ের মনে জাগাই স্বাভাবিক। ললিতারও তাই হয়েছে। কথাটা ভেবে মনে মনে হেসেছিল উদিতেন্দু। ললিতা তাকে আজও চিনতে পারে নি। আপন দ্বীপে অবেহলা করে পরজীতে আকৃষ্ট হওয়ার মানুষ উদিতেন্দু নয়। কাজেই এ কথা জানিয়ে এবং বুঝিয়ে সে পর দিয়েছিল ললিতাকে। কিন্তু সে-চিঠিরও জবাব এল না কেন, সেটাই ভাববার বিষয়।

হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে বহু থেকে কলকাতা অভিমুখে। জানলার ধারে মুখ রেখে আঙ্গুলিক চলমান গাছপালার পানে তাকিয়ে উদিতেন্দু মনে মনে রোমন্থন করে চলে সেই সব কথাগুলোই।

পরদিন নিদিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামতেই মালপত্র নিয়ে নেমে আসে উদিতেন্দু। তাকে অভিনন্দন জানাতে স্টেশনে ইতিমধ্যেই এসেছিলেন তার বৌদি, কাকীমা, জামাইবাবু এবং আরও অনেকে। সে গাড়ি থেকে নেমে পদধূলি নেয় গুরুজনদের। কিন্তু এদিক-ওদিক

তাকিয়ে সে বিম্মিত হয়। কৈ ললিতা তো আসে নি। উদিতেন্দুর মনে পড়ে ছ'বছর আগে বিশেষ যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন সে এই স্টেশনে এসেছিল সেদিন ললিতা তার সাথে না এসে থাকতে পারে নি। তার সেদিনের অঙ্গসজ্জা চোখ দুটো এবং বিরহ-বেদনা মাথানো যুগ্মশূল আজও উদিতেন্দুর মনে আছে। কিন্তু আজ ললিতার কি হল? এই প্রবাসের পর আজ সে প্রথম ফিরলো, এমন দিনে সে কি এবং স্টেশনে আসতে পারতো না? কথাটা সে জিজ্ঞেস করে বৌদি এবং কাকীমাকে। তারা উভয়ে নীর্ব্বাণ ফলে বললেন যে তাকে আনবার জন্যে তারা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে এল না।

মোটের বাড়ি ফেরার পথে অভিমানে পুঞ্জীকৃত মেঘ জমে ওঠে উদিতেন্দুর অন্তরে। ললিতা যদি আজকের দিনেও তাকে এইভাবে এড়িয়ে চলে তবে সেও এর প্রত্যুত্তর দেবে একইভাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে পুনরায় হ'ন্ডা করে নেয় তার মন। ললিতা অবুরের মতো কাজ করলেও আজকের দিনে সে অন্তত সে রকম আচরণ করণে সাধেই করবে না। যাই হোক না কেন, আজকে সে সহজভাবেই দেখা করবে ললিতার সাথে।

বাড়ি পৌঁছে উদিতেন্দু প্রথমে পদধূলি নিল মায়ের। তারপর একথা সে কথার পর সে জানতে চায় ললিতার কি হয়েছে।

তার মা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু বলেন—পাশের ঘরে বৌমা রয়েছে; তুই গিয়ে তাক, সব বুঝতে পারবি।

**উৎসর্বে**  
**বেতারসীঃ রেশম বস্ত্র**

**স্ট্রিক স্টোর্**

**বহু বাজার মার্কেট**  
**কলিকাতা-১২**  
**ফোন: ৩৪-৪৮০০**

মায়ের কথাটা কেমন যেন একটা সন্দেহের খোঁচা মারে উদিতেন্দুর অন্তরে। তবে কি সত্যি ললিতার কিছু হয়েছে? আর বেশি চিন্তা করতে পারে না উদিতেন্দু। সে ক্রম চলে যায় ললিতার ঘরে। সেখানে গিয়ে দেখে সে বাগিশে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানায়। উদিতেন্দু তার পিছন থেকেই বলে—ললিতা, ফিরে জাখো আমি এসেছি।

এর কোন জবাব দেয় না ললিতা, সে একইভাবে শুয়ে থাকে বিছানায়। উদিতেন্দু আর একটু এগিয়ে এসে বলে—ললিতা, তুমি কালো বলে অনেক দুঃখ করেছে। এবং এখনও হয়ত ঐ একই কারণে আমাকে মুখ দেখাচ্ছে না। কিন্তু এ নিয়ে আর দুঃখ করো না। আমি এমন একটা জিনিষ এনেছি যার সাহায্যে কালো মানুষকে অনারসেই ফর্সা করা চলে। তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস করতে পারছো না। কিন্তু জেনে রাখো, এটা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার। দু'দিন পরে এই গুণের যখন বজলপ্রচার হবে তখন একথা সকলেই বিশ্বাস করবে। কাজেই তুমি নিশ্চিত থাকো। মাস থানেকের মধ্যেই তুমি যেখণ্টে ফর্সা হয়ে যাবে, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

কথাটা শুনে ছুঁকরে কঁদে ওঠে ললিতা। বিস্মিত হয় উদিতেন্দু। ওর কি হয়েছে? এমন করে মুখ ঢেকে কান্দছে কেন? উদিতেন্দু এগিয়ে এসে ভোর করে ফিরিয়ে দেলে ললিতার মুখ। হঠাৎ দেখেই সে চমকে উঠেছে। একি, ললিতার একি হয়েছে! চোঁটে গালে কপালে সাদা সাদা দাগ! এ যে দ্বন্দ্ব। ইস, কি বিলী হয়ে গেছে তার মুখখানা!

উদিতেন্দু সেখানেই বসে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে। তার মনে হল এ যেন বিশ্বের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। সে ললিতাকে ফর্সা করতে চেয়েছিল। আড়ালে বসে বিধাতা হয়ত তা শুনছিলেন। তাই নিজের হাতে তিনি তাকে গৌরবর্ণা করে চলেছেন। আজ উদিতেন্দুর প্রথম মনে হল গৌরবর্ণা ললিতা কত না সুন্দরী ছিল।

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে উদিতেন্দু। তারপর স্যাটিকেশ খুলে সে বের করে নেয় বিদেশ থেকে আনা তার গুণগুণ্ডো। সেগুলোর পানে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে। কালো মানুষকে ফর্সা করার জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। এ নিয়ে সে অনেক পড়েছে, অনেক গবেষণা করেছে। আজ মনে হল সে এই নিয়ে পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে বেশতমামুখকে কালো করার অবশ্য গুণ যদি আবিষ্কৃত হত তা হলে সমগ্র মানব জাতির একটা পরম উপকার হত। এই কথা মনে উদর হওয়ার সাথেই সে ডাক্তারবিনের দিকে ছুড়ে ফেলে দেয় বিদেশ থেকে আনা তার গুণগুণ্ডো। মনে হ'ল এগুলোর সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় না হলেও কোন ক্ষতি নেই।

একটি বারি দু'টি মন

শ্রীঅনিতা সরকার

আকাশে মেঘ নেই—বাতাসও নেই এককোঁটা কোথাও, অসহ্য গুমোট। চার দেওয়ালের মধ্যে হাঁকিয়ে উঠছে মানুষগুলো—অসহ্য এই প্রতীকার গুরুভার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছলারীবাদী।

ফতেচাঁদ জগৎশেঠের সুবিশাল প্রাসাদের অন্তরমহলের ছাদে মনে নেই কতক্ষণ—বোধ হয় একযুগ ধরে, হয়ত বা তারও বেশিক্ষণ ধরে কাঁড়িয়ে আছে ছলারীবাদী—শেঠজীর বড় আগ্রহের বিষয়। কহা—ঐ দেবদাক গাছটা মতই নিখব-নিশ্পন্দ। অনেক ভাবছে—বিশ্ব কি ভাবছে জানে না, এই ভাবনার কারণও স্পষ্ট নয় তার কাছে। শুধু এইটুকু বুঝছে—বাঁহরের স্তব্ধতা ভারসাম্য রক্ষা করছে ভেতরের চঞ্চলতার। কেন এই চঞ্চলতা? যুদ্ধের সংবাদ? ছলারীবাদী, তুমি কি জানো কোন সংবাদে খুশির বজাং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমার মন? সিরাজের বিজয় সংবাদ?

শিউরে ওঠে শ্রেষ্ঠীকহা।

না—না! আর না। বাংলার বৃকে কোন অভাগীর চোখের জল যেন আর না ধরে। জলে পুড়ে থাক হয়ে যাবে সারা দেশটা তাদের কঙ্কর আগুনে। এখনই ত' ছপছে—আর না। বন্ধ হোক এই অভিশপ্ত অশ্রুপ্রাণী—শান্তি আশ্রক দেশে—আশ্রক নিশ্চিন্ততা। স্বামীর বৃকে মাথা রেখে শান্তিতে মরার সৌভাগ্যটুকু অন্তত ফিরিয়ে দাও বাংলার লক্ষ মেয়ের কাছে।

কিন্তু—!

ছলারী, তোমার কালো চোখে ও কিসের আলো? জানি সেই নারীর মত অকুমাংর মুখমণ্ডলটা ভেসে উঠছে মনের পর্যায়ে। কি কচি কি মিষ্ট কিন্তু কি ভয়ঙ্কর। কীটদষ্ট গোলাপ—দূর থেকে কতই না মনোহর—জানি ছলারীবাদী, তুমি চোখ বুজছ তার কাছের বীভৎসতায়।

হঠাৎ পিছন ফিরে বুঝতে পারে নি কিছুই। এক অনিন্দ্যহৃদয়ীর আকস্মিক উপস্থিতিতে বিস্মিত হয়েছিল—বুঝতে পারছিল না কি করবে। কে এ। তাদের হারমে নেমে এসেছে এই অপরাধী।

বেশিক্ষণ সময় দেয় নি সিরাজ—সেদিনের ভাবী নবাব। তার পেশীবহুল হাতটায় টেনে নিয়েছিল ছলারীর অপরিস্রব হাত দু'খানা।

—আমি সিরাজ। তোমার রূপের কথা শুনে দিল আমার দেওয়ানা, পিয়ারী।

কে জানে, ভয়ে না বিশ্বাস—যুবায়ের না আনন্দে—একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল ছলারীর কুমারী-ছনয়ের অন্তস্তল থেকে। ছুটে এসেছিল আশপাশ থেকে দাসীর দল। সমুদ্র বিপদ দেখে সিরাজও দেরি করে নি বেরিয়ে যেতে। তারই মধ্যে দু'একজন দাসীর চোখে ধরা পড়েছিল চন্দ্রাবেশী আগন্তকের সত্য পরিচয়। সারা বাড়ি চাপা হৈ-হৈ-এর মধ্যে সখিৎ ফিরে পেয়েছিল ছলারী।

তার কোন—শেষ করতে পারেন না উদ্বিগ্ন উদ্ভাস্ত জগৎশেঠ।

ঘাড় নেড়ে জবাব দিয়েছিল ছলারী।

বোঝা যায় নি, কতটা বিশ্বাস করেছিলেন শেঠজী, কিংবা আদৌ বিশ্বাস করেছিলেন কি না। তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টার প্রয়োগ পোলন নিশ্চয়।

লজ্জা করে না, মা। সন্নেহে হাত রাখেন একমাত্র মেয়ের মাথায়।

## অনন ও প্রাণ

না, বাবা। দুলারীর অকুট কঠ বৃষ্টি হারিয়ে যায় বাবার প্রশস্ত বৃকে।

শেঠজীর বৃক ভিজ়ে যায় মেয়ের চোখের জলে।

তবে কীদছিস্ কেন ?

জানি না।

এই ভয়ঙ্কর জানিনার দুঃসহ গীড়নে বৃষ্টি পাগল হয়ে যাবেন জগৎ শেঠ। ফুলের মত সুন্দর দুলারীর মুখে হাসি নেই।

কেন ?

জানি না।

সম্প্রদায় সমুদ্র সাঁতার কেটেও শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে ধনকুবেরের আদরের দুলালী।

কেন ?

জানি না।

কোন অস্তগ করেছ ?

জানি না।

বৈজ্ঞানিক একই জবাব দেন।

কি জানি, কিছুই বুঝি না, শেঠজী।

এ বয়সের ব্যাবি শেঠজী, জামাই খুঁজুন। সব স্তন বলেছিলেন বন্ধু রাজা রাজবল্লভ বায়।

খমখম করে শেঠজীর মুখ।

তবে কি—?

ঠিক তাই। সেদিন না বুঝলেও আজ বোঝে বৈ কি জীবনের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণে আমূল ভুল উঠেছিল একটা অনাব্রাত কুমারী মন। ভীত হয়েছে নিজের সম্ভাব্য পরিণাম ভেবে—সমস্ত অস্তুর দিয়ে ঘুবা করেছে ভাবী নবাবের দ্বাভাবজনক চৌর্ধবৃত্তির।

কিন্তু—

লজ্জা। হয় স্বীকার করতে নিজের কাছেও—মনে আকাশের তারা, পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা উৎকর্ণ তার অক্সার স্বীকারোক্তি স্তনতে—চারিদিক থেকে ছুটে আসছে অস্বস্তীকর দিকারপানি—তবু আজও চোখ বুজলেই স্তনতে পায় সেই দুঃসাহসী উজ্জ্বল তরুণের আর্তি—আমার দিল দেওয়ানা, পিয়ারী।

খেতে-সুতে, উঠতে-বসতে নিদ্রা-জাগরণে সিরাজের নিষ্ঠর মিষ্টি কথাগুলো তাড়া করে বেড়াত দুলারীকে। উঃ। সে এক দুঃখর। আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল যে নারী, সে চিন্তে পাবে নি নিজেকে—আপন নাভির গাছ পাগলা মূগী ভাক সচলিত দুটিতে যুবে-ফিরে দেখতে চেয়েছে নিজের পরিবর্তনকে—আশিতে-আশিতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে নিজের প্রাঙ্কুটিত যৌবনকে, সবিস্ময় লজ্জায়। তবু দিশা পায় নি।

সত্যি কি তাই ?

দুলারী, আজ সঙ্গে সঙ্গে তোমার যৌবনের পশরা—কিন্তু তুমি বঞ্চিত। জগতের কোনো মধুকরকে তুমি আমন্ত্রণ জানাতে পারবে না, পান করতে তোমার অন্তরের মধু। আজ স্বীকার করো—ওভারটের স্বপ্নীয় মুহুর্তে তোমার হুঁটি ব্যাকুল চক্ষু কি খোজে নি সেই নারীর স্নহুকার কিন্তু কামনাপঙ্কিল মুখটি জীবনের ভাবী সঙ্গীর মুখ ?

ভয় পাও ?

তবে থাক। মিও না উত্তর এ প্রশ্নের। জানি জবাবও নেই এই জিজ্ঞাসার। সব প্রশ্নের কি উত্তর আছে—সব সমস্যার সমাধান ? তার মধ্যে থাক তবে এটাও। সারা রাজপুতানা বুঁজে রূপবান জামাই এনেছিলেন শেঠজী। তার সবল বাহুর নিবিড় আলগনে যদি অল্প কারও চকিত স্পর্শের ছায়া ভেসে ওঠে তবে, থাক সে ছায়া হয়েছে। কাজ কি তাকে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলার ? দীর্ঘখাস ফেলে দুলারীবাদি।

আজ সিরাজের ভাগ্যপত্রিকা। কে জানে হয়ে গেল কি না।

রাত এখন কত ? বৃষ্টির বাকা পুঙ্খ মধ্যরাত্রির ইঙ্গিত দেয়।

ঘীর পায়ে নীচে নেমে আসে দুলারী।

নিজের শোবার ঘরে বাওয়ার আগে বাবার ঘরের দিকে পা বাড়ায় সে। কি করছেন বাবা ? ঘুমোন নি নিশ্চয়। একটু শোন নি কি ? নতুন নবাবের কাছ থেকে অভিনব উপঢৌকন পাওয়ার পুর থেকে রাতটা যে ঘুমোবার ক্ষেত্র, তা ভুলে গেছেন বোধ হয়।

সুবে বাড়ার নবাবের নবাবী রক্ষা হয় বীর টাকায় তাঁর বাড়ি উপঢৌকন আসবে বৈ কি নতুন নবাবের কাছ থেকে। পাঠিয়েও ছিলেন নবাব উল-মুলক সিরাজউ-দৌল্লা-হায়বৎ লক্ষ বাহাদুর শেঠজীর পদমধ্যাদার উপবৃত্ত আধারে মণিমুকা খচিত স্বর্ণপাত্রে জরির কাজকরা টকটকে লাল ভেলজেট মোড়ো বহুব্লামান উপহার—আপন পুরের চেয়ে প্রিয়তর জামাই-এর দ্বিগুণের।

না মুখিত হন নি জগৎ শেঠ—মুহুর্ত। ভাঙানোর চেষ্টাও করেন নি দুলারীবাদি-এর—শুধু রাতের পুর রাত পাঘচারী করেছেন স্তন্যার্থ বারান্দার একপ্রান্ত থেকে অল্পপ্রান্তে। শুকনো চোখে তাকিয়ে দেখেছেন একদিন নয়, দু'দিন নয়, তিনদিন তিন রাত পরে হাকিম-বৈজ্ঞের অনেক চেষ্টার ফলে চোখ মেলেছে বিধবা দুলারী। একবার হাতটা ভুলে ধরেন নি মেয়ের মাথায়। তাঁর হাতটাই যে অতচি হয়ে গেছে চিরজন্মের মত। এই হাত দিয়েই তাঁ গ্রহণ করেছিলেন নবাবের উপঢৌকন। হাম রে! ভেবেছিলেন, নবাব হয়ে স্নবুদ্ধি হয়েছে মির্জার।

স্নবুদ্ধি !

হ্যাঁ তা হয়েছে বই কি—তা হলে বুঝল কি করে জগৎ শেঠ স্বৈচ্ছ্য বাদশাহী ফরমান আনার চেষ্টা করেন নি। তাই প্রেক্ষিত দরবারে জগৎ শেঠের চূড়ান্ত অপমান—তাঁর গালে চড় মারলেন নবাব সিরাজউদৌল্লা।

চমকে উঠেছিল সমস্ত দরবার। সিরাজের সিংহাসনখানাও বৃষ্টি কৈশে উঠেছিল সে শব্দে।

কিন্তু শেঠজী কি একে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ? অন্তত দুলারীর সে বিষয়ে লক্ষ্যে আছে।

তাক্সাম থেকে বখন নামলেন শেঠজী তখন একটা বৃঁকা হাসির আভাষ ছিল তাঁর চোখে। ভেবেছিল কোন স্নহঃবাধ আছে বৃষ্টি। কোন কিছু বৃষ্টি শেঠজীকে মনে করিয়ে দিয়েছে—জীবনটা শুধু কাল নয়, হাসির স্থান আছে। দুষ্কর বৃকে এগিয়ে গিয়েছিল দুলারী বাবার কাছে।

সিরাজ আজ প্রেকাশ দরবারে আমার চড় মেরেছে হুলারি।  
অবার সেই হাসি।

চমকে উঠেছিল হুলারি—না, সংবাদের অস্বাভাবিকতায় নয়—বাবার  
বলার ধরণে। যেন একটা মজার মত মজা হয়েছে এতদিনে।  
কিছুকণ কথা ছিল না পিতা-পুত্রীর মধ্যে।

চল বাবা আমার চল বাই।

—এ্যা!

এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় বাবা।

জানি। কিন্তু বাবো কোথায়।

কেন দেশে—রাজস্থানে। আমাদের অভাব ত' নেই বাবা।

পারবে না ফুল ফোটাতে রাজস্থানের মরুভূমিতে?

না মা, না—গাছ মরে গেছে, ফুল আর ফুটবে না।

তবে?

মরা গাছ—গাছ নয় কাঠ, তা দিয়ে আগুন জ্বলে, ফুল তাতে  
ফোটে না।

তুমি কি বিদ্রোহ করবে?

বিদ্রোহ আমি করব না মা, করবে জন্তো। আমি শুধু  
আমার শুকনো হাড় ক'খানা দিয়ে আগুন আরও জ্বরে আলিয়ে  
তুলব তা' হলেই ব্যস।

বাবা!

থাক মা, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভেই থাক। আমার এখন  
যাবের টাকা দিয়ে সিরাজের জন্তো মিনে আনতে হবে বাদশাহী  
করমাস।

তবে যে বললে—

পাগলী বিদ্রোহ ত' নবাবের বিরুদ্ধে। সিরাজ নবাব হোক,  
তবে ত'। ভয় নেই মা, রাজপুত জগৎ শেঠ প্রতিজ্ঞা করছে তোর  
কাছে—তোর স্বামীর প্রতিবিন্দু রক্তের স্বপ্ন সিরাজকে শোধ  
করতেই হবে। আমি বেশে—সুদ ছাড়া আর কলজে ছেঁড়া  
সমান কথাই। এবার তুমি যাও। এখনই সিপাহসালার  
আসবেন এখানে।

তারপর থেকে আসছে—কেবল আসছে। সিপাহসালার,  
রাজা রাজবল্লভ, রায়হুল্লাহ, ওরটিস আরও কত। ক'জনকে জানে  
হুলারি। জগৎ শেঠের প্রাণদান নবাবী দরবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল  
না কি? এ দরবারে সবাই এসেছে শুধু সিরাজ আসে নি দ্বিতীয়বার।

বাবা!

চমকে উঠেন ধনুকের—সামনে খোলা টাকা আনার খতেন।

তুমি এখনও হিসেব দেখছ? জানো, এখন কত রাত?

হিসেব? হ্যাঁ তা হিসেব বৈ কি। তবে দেখি নি—করছি।

বেশ করছ—এখন গুটিয়ে রেখে শোবে চল। খাতাশত্রু বন্ধ  
করতে থাকে হুলারি।

খাতা বন্ধ করলে যে হিসেব বন্ধ হয় তা অনেকদিন ছেড়ে  
দিয়েছে ক্ষতচোদ জগৎ শেঠ, মা, এ হিসেবের খোলাও নেই বন্ধও নেই  
এ রাধের চিতা, শুধুই জ্বলে নেড়ে না।

তুমি আবার ঐ সব ভাবছ ত'।

আমি ত' ভাবি না মা, সে নিজেই আসে। হঠাৎ একসময়  
দেখি ধরা পড়ে গেছি তার হাতে। সে যাক, তুমি এখনও  
শোও নি কেন, মা?

কি জানি, কেমন যেন লাগছে।

হঃ! দীর্ঘদ্বার বেরিয়ে আসে শেঠজীর বুক থেকে।

বাবা!

কি মা?

কাজটা কি ভাল হোল?

কোন কাজটা মা?

এই ইংরেজের সাহায্য নিয়ে সিরাজকে পরচ্যুত করার চেষ্টা?

উপায় আর নেই।

কেন? আলির মত মৌরজাফর কি পারতো না সিরাজকে  
পরচ্যুত করতে?

না।

কেন? জাফরআলি ত' সিপাহসালার।

'না' মা, জাফরআলি সিপাহসালার হ'তে পারে কিন্তু, সে  
আলীবর্দি নয়। নর্তকীর পদসেবী জাফরআলির শক্তি কোথায়  
নিজের শক্তিতে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে?

তবু তোমরা তাকেই বসাতে চাইছ বাংলার মসনদে।

ঐ ত' বললাম, উপায় নেই মা।

আবার নীরবতা নেমে আসে পিতা-পুত্রীর মধ্যে। একই  
ধাতে বইছে দু'টি ধারা—একপাড় প্রতিশোধ কামনার দুর্বার,  
অন্যপাড়ে নারীস্বায়ত্ত্বের সমস্ত দুঃখ মথিত অমৃতধারা—কল্পণায় শ্রামল,  
ক্ষমায় স্তম্ভর।

তোমার কি মনে হয় স্লাইড জিতবে?

নিরানব্বই কেন একশ' ভাগ বিশ্বাস তাই ছিল। কিন্তু—

এর মধ্যে আর কিন্তু কোথায় বাবা? প্রায় সমস্ত সৈন্যই  
তোমাদের হাতে, কেবল মীরমদন মোহনলাল কি পারবে স্লাইডের দুর্ধর্ষ  
ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে!

কি জানি মা, ঠিক বুঝতে পারছি না। বাবার সময় ওদের চোখে  
যে আগুন দেখছি তাতে বুঝতে পারছি না ওরা গজ-ঘোড়া, না মজী।  
না মা, শেষ খবর না আসা পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়ার মত মনেদ্র বল  
অনেকদিন হারিয়েছি। আর বিশ্বাস নেই—আছে শুধু চিন্তা।  
আর না, যাও মা রাত জোরের দিকে ঢলে পড়ছে।

ওঠার চেষ্টা করে না হুলারি।

কি কিছু বলবি?

না, ভাবছি রাণীমার কথাই ঠিক কি না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের  
কাটা ঝাল কুমীরের পথ না হয়।

হোক কুমীর, জলে ওঠে জগৎ শেঠের রাজপুত রক্ত। তবু  
হাস্করকে আর সুযোগ দোব না শত শত নিরপরাধের জীবনে দীত  
বসাতে। আমার গালের দাগ অনেকদিন আগেই মুছেছে, তোর  
সালা সিঁথিটা ত' কোনদিন লাল হবে না হুলারি। তবে কিসের  
আশায়, কোন ভবিষ্যতের সুখদায় দেখার জন্তে আমি ভাববো অপ্র-  
পঞ্চাৎ? দেশ? পাঁচল' বছর হুসনমান শাসনে যদি আমরা  
স্বাধীন থাকতে পারি, তবে ইংরেজও আমাদের এর চেয়ে বেশি

পরাধীন করতে পারবে না। চামুণ্ডার রক্তচক্ষু মেটে শিবের বুকে  
পা দিয়ে—নিজের কল্যাণকে ধ্বংস করেই তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ।

আমি সেকথা বলি নি, বাবা। বাবার এ রূপ দেখে নি  
কোনদিন।

জানি, তুমি কি বলতে চাও। মসীজীৱী বেণে জগৎ শেঠের  
সবচেয়ে বড় শত্রু, অসীজীৱী বেণে ইংরেজ। জানি, আমার ব্যবসা  
যাবে, আমার টাকা যাবে, আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে অদৃশ  
ভবিষ্যতে—তবু থামতে পারে না পিতা জগৎ শেঠ, ভুলতে পারে না  
মামুষ জগৎ শেঠ চরম অসম্মান, রাজপুত্র জগৎ শেঠ, শেঠ হলো শাস্তি  
নেই তার সিরাজের রক্ত ছাড়া।

মাথা নীচু করে উঠে যায় দুগারী। ভুলে যায় সে এসেছিল  
বাবাকে ঘুমোতে বলতে। জগৎ শেঠের মনে চকিতে একটা আলাদায়ক  
অশুভ চিন্তা উঁকি মেলেই আত্মগোপন করে—

রাজপথে অশ্বফরের শব্দ। উৎকর্ষ হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব।

না—খামল না। পার হয়ে গেল তাঁর সদর দরজা। হয়তো  
কোন প্রহরী টহল দিতে বেরিয়েছে—অরক্ষিত নগরীর পথে পথে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। এখনও এলো না কোন  
সংবাদবাণী দূত! মোহনলাল মীরমদন কি তবে তাঁর আশঙ্কাকেই  
সত্যি করে তুললো? তাদের চোখের আশ্রু কি সিরাজের আকর্ষণ  
পাপকেও পুড়িয়ে খাঁটি করে তুলতে পারে? মীরজাফরের বেইমানী  
কি তবে আফিমের নেশার লুটিয়ে পড়লো নতুন কোন বাইজীর  
আঁচলের তলায়? আরও একদিন রয়ে গেল সিরাজের নবাবী! হা  
ভগবান! জগৎ শেঠের বিনিমিত্র চোখে কিছুমাত্র আর আসবে না—  
খোলা চোখেই কি তাকে জমাতে হবে শেষ পাড়ি?

না—এ অসম্ভব! হিসেব নিয়েই কারবার তাঁর—তাঁর হিসেবে  
ভুল অসম্ভব। ধনকুবের জগৎ শেঠ ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুল নেই  
সর্বস্বত্ব জগৎ শেঠের।

খট—খট—খট...

হ্যাঁ, আবার!

হ্যাঁ, খেমেছে, তাঁর দেউড়িতে খেমেছে স্ত্রবে বাংলার নতুন নবাব  
মীরজাফরের দূত—কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতের বাংলার ভগ্নদূত।  
হোক, তবু—

কে? রামসিং?

সিপাহীসালার সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বহুং আচ্ছা! আজ নয়, কাল শুনবো। হুতের বিজ্ঞানের  
ব্যবস্থা করে দাও।

ও-বরে বিনিমিত্র দুলালা চমকে ওঠে মধ্যরাত্রির দেউড়িতে ঘোড়ার  
পায়ের শব্দে। দ্রুত উঠে আসে বাবার ঘরে। বিছানায় বাওয়ার  
সময় হয় নি শেঠজীর—বহু বিনিমিত্র রক্তনীর রক্তাঙ্গ লুটিয়ে দিয়েছে তাঁকে  
গদগির ফরাসেই।

যুমোক। গভীর ঘুমের প্রলেপে দূর হ'য়ে যাক হৃদয়ের সমস্ত  
আলা।

পা টিপে বেরিয়ে যায় দুলালী।

শুধু এককোটা চোখের জল বেইমানী করে গড়িয়ে পড়ে মেঝের  
বহুমূল্য কার্পেটে—জল শুবে নেয় সেই মুহূর্তেই; কিন্তু লাগ কি মোছে?

হাফেজ্

[ Richard Le Gallienne-এর অনুবাদ হইতে ]

প্রতিমা রায়

গোলাপ ত' সে গোলাপ নহে

তুমি না দেখিলে প্রিয়ে

বসন্ত বাহে সুরার বিরহে

সহিব তারে কি নিয়ে?

কুসুমভূষা কপোল ফুল,

বিহনে কুঞ্জ মাঝে,

অবাধে মলয় যে সুবাসা বয়

লাগে তাকি কোন কাজে?

গোলাপী বাহর বাঁধন রাখর

যদি নাহি নিতে পাই

আঁখির ভ্রুয়ার সে রূপ দিশায়

আশ্রুনে জমিবে ছাই।

তোমার ও রক্ত অধরাসক্ত—

মধু সে মধুর নয়,

ওঠে যদি এ ওঠে মিলায়ে

না করিমু মধুময়।

দখিনার বার যে পুলক ছায়

চিরজাম তবু শাখে,

কুহ যদি তার স্ততি নাহি গায়

বুখা বলি আমি তাকে।

চিত্তে আমার কোন রূপ আর

কোন স্মৃতি নাহি জাগে,

সে শুধু জাগায় প্রিয়তার কায়ার

নানা রূপে নানা রাগে।

সুরার সুধার প্রণয় আবার

সেও সখী তব দানে

জীর্ণ মনের শেষ চরনের

সংসত্তা বয়ে আনে।

হাফেজ্, তোমার হৃদয় সোনার

আখরে নয়ত আঁকা,

পরম প্রিয়র যুগখানি আর

কোর না তাহাতে বঁকা।

বহুমতী : বৈশাখ '৭১

করিডর দিয়ে চলে আসছেন ফাদার ভেরময়লেন, মনে হবে বেন  
বীতর বড় শিব্যদের কেউ। আগে না দেখলেও এর যে

আসার সম্ভাবনা আছে তা জানত, কিন্তু দেখে মনে হ'ল না যদি জানত  
তা হলেও দেখামাত্রই চিনতে পারত এঁকে। বৃকতে পারত এই  
কিছুই কুষ্ঠ-কলোনির 'সাদা সাধু' বলে খ্যাত। তিনি ডাকলে  
নাকি অরণ্যের সব মানুষ তাঁর পায়ে এসে পড়ে। কেন পড়ে তাই  
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফুলের আটের প্রফেসর সিক্টার মনিক একবার  
বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর মাইকেলস্কোলোর জাঁকা মোজেরের সজীব  
স্বপ্নরূপ বলে।

লম্বা-চওড়া মানুষটি, পরণে সাদা সূতি আলখাল্লা আর মাথায়  
একটা মস্ত বড় টুপি—সূর্যের তাপ এড়ানো যায় তাতে। পায়ে  
জারি বৃত্ত। চওড়া বৃক মস্ত লম্বা তুষারগুস্ত দাড়ি, বাক। ছুটি  
মোটা অর নীচে কুচকুচে কালো একজোড়া চোখ। এমন হালসর,  
ককুশাভরা চোখ কখনও দেখে নি সে।

এত লম্বা, কাছে এসে ষাঁড়িয়েছেন, নিজের সঙ্গে তুলনার  
তাকে একটা স্তম্ভের মত উঁচু লাগছে। একটা স্তম্ভের মত।

চোখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে হাসল সে, ফাদার ভেরময়লেন,  
আপনাকে আমরা আশাই করছিলাম। আমি এখানে নতুন,  
আপনার শেষবারের পরীক্ষার পর এসেছি—আমি সিক্টার লুক।

—সিক্টার লুক! আমি 'তামার কথা শুনেছি।

কালো চোখে উজ্জল দৃষ্টি। গভীর কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক জোর পড়ে  
না কখনও, ধীর, প্রশান্ত।

—এ ডামের খবর থেকেই জেনেছেন সিক্টার। ওর ভাবা তো  
উনি খবরের কাগজের মত পড়ে ফেলেন কি না।

সচকিত হয়ে হেয়ার ডেসারটির দিকে চাইল। সিক্টার লুক, এতক্ষণ  
তাকে সম্ভাষণ করতেও মনে ছিল না।—লোকটাকে দেখলে অপ্রত্যা  
হয় কেমন। বেশ রাগশিখল ছোটখাট মানুষটি, দেখলেই পাশ

কাটির সরে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয় তা—  
বে মানুষটির সঙ্গে এসে ও ষাঁড়িয়েছে তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত  
কালো মানুষগুলোকেও এড়িয়ে চলেন না। তাদেরই সঙ্গে  
তাঁর বাস।

সুতরাং চোঁটার একটু হাসি টেনে আনতে হ'ল মুখে, ম'সিমে  
এটিনে, আপনার খরিকার মালাম গুজেল মেটারনিটির বাইশ  
নম্বর ঘরে আছেন। যদি বলেন তো এমিলকে ডেকে দিতে পারি—  
আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে

চোখ দুটো নাচালো একবার লোকটা, গোকটার চাড়া দিল।

—ও না সিক্টার, দস্তবাদ। পথ আমার চেনা। সারা কলোনিতে  
এমন ঘর নেই যেখানে আমি বাই নি, অবস্ত—

থেমে গিয়ে নীচ হয়ে অভিযান করল একটা, আপনার  
সংক্রামক রোগের প্যাভেলিরনটার ছাড়া—আপনারা তো কড়া নিয়মে  
ওটা একেবারে আলাদা করে রেখেছেন।

আর একটা জায়গা আছে তেমন—নানদের ডরমিটোরি। এই  
উপনিবেশের একভাগ মেয়ে অন্তত ওর ঐ অন্তর কোঁতুলীদৃষ্টির  
আওতার বাইরে থাকতে পেয়েছে, ভগবানকে দস্তবাদ। লোকটা  
যেন ছোট্ট একটা। নোত্রো পাখি—কলোনিমর ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড়  
করছে খুঁটে-খুঁটে, টুকরে টুকরে ছড়িয়ে তারপর চারদিকে।

এটিনে ফাদার ভেরময়লেনকে শুভেচ্ছা জানালো, টেস্টগুলোর  
কলাফল আপনার ভাল হোক ফাদার। এখানে থাকতে থাকতে  
দাড়িটা যদি একটু-আধটু ছোট্ট-টেটেটে আঁচড়ে নিতে চান তো আমি  
খুশি হয়ে করে দেব।

ফাদার ভেরময়লেন মুখ টিপে হেসে মাথা নাড়লেন।

—উঁহু! উঁহু! ও রকম একটু-আধটু অদল-বদলও মনে  
নিতে রাজী হবে না আমার ছেলেরা।

সিক্টার লুক মনে মনে বলছে আমিও না, ও মুখে এটিনের  
কৃত্রিমতার স্পর্শ আমারও সহ্য হবে না।

মেটারনিটির দিকে শশব্যস্তে পা বাড়াল এবার এটিনে।

## পূর্ণপ্রাণে চাবার খাশ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম





—কিছুকণ পরে একবার আসবেন সিক্টার, দেখে যাবেন অগ্নি-পরীকার আগে কি মুন্সের আমি করে দিয়েছি তাঁকে।

আসবেন কি না প্রশ্ন করা নয়, বলে গেল যেতে।

উত্তর কিছু দেয় নি সে, নীরবে ফাদার ভেরময়লেনের সঙ্গে ল্যাংগোরেটোরির দিকে পা বাড়িয়েছে—টেক্ট শুরু করবে। সব টেক্টগুলো শেষ করতে দু' সপ্তাহ লাগবে।

ঊরু চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে চলা শক্ত। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বাচ্ছিল প্রায়। সেদিনই পরে যখন তাঁর অতীত-কাহিনী শুনে নিশ্বাস ফেলে ভাবল গুরুবল, সকালে মনের কথাটা প্রকাশ করে বলে নি। যে কথা ভেবে ক্ষণপূর্বের মনোবেদনা ও ভুলেছিল, ভাগ্যে সে। ব্যস্ত করে নি। ভাবছিল যে ক'দিন জাচ্ছেন এখানে নিশ্চয়ই একটা-দু'টো ম্যাস পরিচালনা করবেন উনি। ঐ আশ্চর্যমুন্দর গলার স্যাক্রিফাইস গাইবেন—আগেকার দিনে এমন উদাত্ত ভরাট গলাতেই এ গান গাওয়ার রীতি ছিল। সলেমনের সন্ন্যাসীরা এখনও নিশ্চয় এমন করেই গান...দরদভরা কণ্ঠ, বিরুতি নেই কোথাও, ব্যস্ততা নেই। ধীর, ভাবগম্ভীর, সুস্পষ্ট।

ল্যাংগোরেটোরিতে এসে ফাদার ভেরময়লেন টুপিটা খুললেন। চুলগুলো ঠিক তাঁর দাড়ির মতই সাদা। ঐ সাদা চুল আর সাদা দাড়ি তাঁর কালো ক্রা আর উজ্জ্বল কালো চোখে দ্বিগুণ বিচিত্রতা এনেছে। বার্ষিক্য তাঁর কোন কোন আগে এসেছে কেবল শুভ্রতার রং নিয়ে, অজান্তে অগকে স্পর্শও করে নি।

হাত শ্লাইডগুলো ঠিক করছে আর মন ভাবছে এই মানুষের সন্ন্যাসজীবনে কি এমন ঘটনা এমন মানসিক আঘাত দিল তাঁকে... ঐ সাদা রং যে স্বাভাবিক নিঃস্বাস লাগে নি তা তো নিশ্চিত। পথ তৈরি হয়েছে যতদূর তারও বহুদূরে জংলী গাঁয়ে একা থাকেন তিনি। ভাগ্যবিধিত দেশীর কৃষ্ণরোগীদের হেঁচর সেবার সঙ্গে মানসিক উন্নতিবিধানের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে। ডাক্তারের কাছে শুনেছে শতাধিক রোগী আছে সেখানে, অধিকাংশেরই এমন গুরুতর অবস্থা যে নিজেদের জাতের লোকেরা তাদের ত্যাগিয়ে দিয়েছে।

এমন বিপদসংকুল কর্মক্ষেত্র কেন বেছে নিয়েছেন ফাদার, সে প্রশ্ন অর্থহীন। সে নিজে নান, কাজেই খুব ভাল করেই জানে শুধু ভগবৎ প্রেমেই এ কাজ বেছে নিয়েছেন তিনি।...খুব কঠোর মধ্যে, বিপদের মধ্যে কাজ করার লোভ তার নিজের মনেই কি নেই। তবে নানদের নিজস্ব ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, এই যা।

বিকলে এটিনে দেখল সিক্টার লুক ডেব্রি বসে ফাদার ভেরময়লেনের কেস-রেকর্ড দেখছে।

দেখে আহতকণ্ঠে অভিযোগ জানাল, আপনি তো এলেন না সিক্টার।

শ্রিতহেসে চোখ তুলে তাকাল সিক্টার লুক, রুল বলেছে হাসিমুখে থাকবে সর্বদা, কাজে তোমার মাধুর্য বা শিষ্টাচারের অভাব না ঘটে।

—ব্যস্ত ছিলাম বড়।

—অপূর্ণ মন্দর করে দিয়েছি তাঁকে তাঁর অগ্নিপরীক্ষার আগে।

—অগ্নিপরীক্ষা কিসের ম'সিয়ে এটিনে? একেবারে স্বাভাবিক ডেলিভারি হবে ঊরু।

এটিনে তার ডেব্রি ঠেস দিয়ে ঝাঁড়াম, হ্যা...তা হবে হয় তো।

কিন্তু আর একটা মেয়ে যদি হয়...আমি তো সেই অগ্নিপরীক্ষার কথাই বলছি সিক্টার। এবারও যদি ফেলে না হয় তা হলে ম'সিয়ে গুজেল হয় নিজের গলা কাটবেন নয় তো বোঁয়ের। কিংবা হয় তো আর একটা বিয়ে করে বসবেন। একটা ছেলের জন্ম কি আকুল প্রার্থনা তাঁর যদি দেখতেন। তাঁর ব্যাক-ব্যবসার উত্তরাধিকারী চাই তো। মাদামেরও ঐ এক প্রার্থনা। এই সবই তো বলছিলেন আমাকে এতক্ষণ—চোখের জলে বুক ভেসে বাচ্ছিল।

—ভগবানের বা ইচ্ছে তাই মেনে নিতে হবে, উপায় কি। হয় তো সেই সময়টার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছেন, তাই কঁদেছেন...অথবা আপনাদের অতি-সহায়ত্বিত ধাক্কায়।

নিজের গলার স্বরে ব্যঙ্গের আভাস নিজের কানেই বাঁধল। ভর-আতকে মনটা আড় মুহুতেই।

সমুখস্থ মূর্তিটি কিন্তু খেয়ালও করে নি। বরং মনে মনে একটা প্রশংসা করা হয়েছে, নীচ হয়ে সবিনয়ে একটা অভিমান করে ফেলল।

চকিতে একবার চাটটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলল, হ্যাঁ সিক্টার, ও গুণটা আমার আছে। ফাদার ভেরময়লেনের উপস্থিতি এত সহায়ত্বিত হয় আমার। দেখুন, হুঁ শব্দটি না করে কি কঠিন প্রাশিক্ষিত জীবন কাটাচ্ছেন।

—প্রাশিক্ষিত।

চুপ করে থাকবারই ইচ্ছা ছিল, অফুরন্ত বিষয়ে কথাটা আপনিই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

—ও! আপনি তা হলে জানেনই না। কিন্তু ঊরু সেবাসক্তের ভায় যখন নিয়েছেন ঊরু অতীতের কাহিনীটা জানাও আপনাদের উচিত সিক্টার।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল এটিনে, আর কেউ না শুনে ফেলল। ওকে থামিয়ে দেওয়া উচিত এখনও—মন বলছে। কণ্ঠে স্বর ফুটেছে না।

ছোট কালো ব্যাগেভরা চুল কৌকড়ানোর সরঞ্জাম, কামানোর ক্ষুর, আর মলম-টলম—তারই সঙ্গে এখানকার খোসগন্ধের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায় লোকটা।...কিন্তু এখন যে কাহিনী বলতে শুরু করেছে ও তাঁর জাত আলাদা। যখন যুবক ছিল, হঠাৎ এ কাহিনী কানে এসেছিল তাঁর। বলতে গিয়ে বোধ-বেধে গেল বারবার, খোসগন্ধের পর্ধ্যয়ে পড়ে না বলেই গেল। এ কাহিনী পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার নয়।

কণ্ঠস্থের আশ্চর্য সমবেদনার সুর ফুটেছে মানুষটার, এত যে হাত-মুখ নাড়াছিল এতক্ষণ, কোন ব্যথার মধ্যে সব চললতা হারিয়ে সেই মানুষ আপনি স্থির হয়ে গেছে।

অনেকবছর আগে একজন ফাদার এক প্রচার-মিশনে জংলের মধ্যে সফরে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এক গ্রামে তিনি একটি শ্বেতাংগ মানুষ দেখতে পেলেন। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, একদল বাট ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলছেন। দেখে মনে হ'ল না আর কোন শ্বেতাংগ মানুষ থাকেন এখানে, এই জঙ্গলদের মধ্যে ভিত্তিই বোধ হয় একা—ব্যাপারটা দুর্বোধ্য কেমন। শ্বেতাংগ মানুষটি এগিয়ে এলেন... চোখভরা প্রীতি, সেই সঙ্গে কি একটু শংকরও আভাস মিশে আছে...

সন্ধ্যার নিজের কুঁড়েঘরে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে, একই কথাবার্তা বলবেন ১০-১৫মের কথাবার্তা সারারাত্রে বোধ হয় খামে নি-শেষকার মানুষটি বলেছিলেন একদিন তিনি একজন প্রিন্ট ছিলেন, কংগোর এসেছিলেন যখন তখনও রাস্তা তৈরি হয় নি, টেলিফোনের লাইন বসে নি। নানা কাজে মাসের পর মাস এই দেশে ঘুরেছেন—ব্রাদারদের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না, সভ্যতার সাথে সব সম্পর্কই ছিল। ক্রমে ক্রমে ভয়ঙ্কর একটা নিঃসংগতার অমুভূতি প্রাস করে ফেলতে লাগল তাঁকে, বছর দু'রেক পরে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। সব ছেড়ে দিয়ে জংগলে চলে গেলেন একদিন, তাঁর সেই বহুব্রের মিশনের সাথে যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা আর করলেন না। তাকে তারাও শেষ পর্যন্ত ধরে নিল তিনি হারিয়ে গেছেন আর না হয় তো জঙ্গলের হাতে বন্দী হয়েছেন। আর তা যদি না হয় তো শিকারী বেড়ালের পেটে গেছেন। এমনধারা তখন প্রায়ই ঘটত। তারপর করুণাপরবশ হয়েই হোক, নিঃসংগতার জন্মই হোক, কিংবা ভালবেসেই হোক তিনি স্বর বাঁধলেন একটি দেশীয় মেয়েকে নিয়ে। তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল।

—কেউ অবিশ্বস্ত জানে না সেই স্বাদ্যাদি কি বলেছিলেন, তবে জনশ্রুতি ক'সত্তাও পরে সেই শেষকার মানুষটি এক বৃশ-মিশনে এসে তিনটি কালো বাচ্চা দিয়ে গেলেন, নানরা তাদের মানুষ করবেন, লেখাপড়া শেখাবেন।

সম্রাটকে বলতে বলতে এটিনে খামল একবার।

সিঁকার লুকের মনটা ধিধালিল—একটা দিক আগ্রহাতিশয্যে ধরধর করে কাঁপছে, অথি হয়ে ভাবছে এটিনে বলে চলক-অজ্ঞ দিকটা লজ্জিত সজ্জ-বায়ের বায়ে প্রার্থনা করছে ঈশ্বর যেম তাকে ক্ষমা করেন।

তারপর সেই প্রাক্তন প্রিন্টটি আবার উধাও হয়ে গেলেন কোথায়।

অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, এমন সময় জংগলে শুভ্র শোনাল সেল সেই সাধা চামড়ার মানুষটিকে আবার দেখা গেছে—ইয়েরোপ থেকে ফিরে এসেছেন, সম্ভবত রোম থেকে, আর আবারও তিনি প্রিন্ট হয়ে গেছেন। মনে হয় ধর্মীর গুপ্তগোলাদের কাছে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বাকি জীবনটা কুঠরোগীর সেবার উৎসর্গ করবার অমুভূতি প্রার্থনা করেছিলেন। অমুভূতি মিলেছিল, সেই সঙ্গে আবার ম্যাস উচ্চারণের অমুভূতিও।

গলা খাটো করল এটিনে, তা হলেও তিনি বোধ হয় কোনদিনই কুঠ-কলোনীর বাইরে ম্যাস উচ্চারণ করবেন না। সেখানে সবাই তাঁকে পূজা করে সিঁকার—আপনার একবার দেখে আসা উচিত। একবার এক কেশতদুরন্ত শিকারীদের সাথে আমি যাচ্ছিলাম ঐ কলোনীর পাশ দিয়ে—সবাই ভয় পেয়েছিল, আমি কিন্তু গিরেছিলাম সিঁকার ভেতরে...

থেকে গেল, আর কথা সরছে না মুখে। মনে হচ্ছে এবার বুনী কঁদে ফেলবে মানুষটা!

—আপনার একবার বাওয়া দরকার সিঁকার...

এটিনে চল যেতে চাটুগুলোর দিকে নির্নিয়মে চেয়ে বসে রইল, চোটা করছে ল্যাবরেটোরি টেক-রিপোর্টার 'সংকেতগুলোর' দিকে মন দিতে।

...নাইজাল—নেগেটিভ ১০০—ব্রাদ নেগেটিভ ১০০—ফিজিক্যাল—নার্ভ পুঙ্ক হয় নি, চামড়ার সংবেদনশীলতা অক্ষুণ্ণ আছে ১০০

প্রথম পর্যায়ের রেকর্ডগুলো এত পুরোনো। যে প্রায় পড়ার অব্যোধ্য। কতকাল ধরে এই দুর্ভাগ্য সেবার ব্যাপৃত আছেন ফাশার ভেরময়লেন, আর কতদিন এইভাবে ল্যাব-টেক্ট করিয়ে আসছেন—ওরাই তার নীরব সাক্ষী।

প্রায়শ্চিত্তের চূড়ান্ত একেই বলে। কিন্তু এ স্মরণও আসে না সবার। এভাবে আত্মপ্রাণি মোচনের স্মরণ দেবানুগৃহীত কল্পনের ভাগ্যেই কেবল মেলে।

ডাক্তার কখন করিডর পেরিয়ে এসেছেন ওকে খুঁজতে, টেরও পায় নি। নানরা যেমন মুহু একই ভূমির শব্দে পরস্পরের মনোব্যোগ আকর্ষণ করেন, তেমনই একটা অক্ষুণ্ণ শব্দে তত্ত্বগত হয়ে পড়ল ওর, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ডাক্তার ডেক্সের সামনে ঝাঁড়িয়ে।

—ফিজিক্যালটাও লিখে ফেলতে পারেন, এখন অবধি নেগেটিভ—অলৌকিক কাণ্ড বাবা!

শুনবে যে ও স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচল চেষ্টা সম্বন্ধে গোপন করা গেল না তা।

একপলক তাকে দেখলেন ডাক্তার অভিনিবেশ সহকারে, তঁ। গল্পটা জানা হয়ে গেছে দেখছি।

অল্প একটু মাথা নেড়ে শুধু স্বীকৃতি জানাল ও। দেখতে পাচ্ছে ডাক্তারের চোখে সেই অবজ্ঞার দৃষ্টিটা ফুটেছে। ধর্ম-জীবনের কোন প্রসংগ এসে পড়লেই ঐ অবজ্ঞার দৃষ্টি ফুটেবে ওর মুখে, জানা কথা।

—মানে হচ্ছে সিঁকার, তাগের নামে এই নির্ভেজাল পাগলামিটারও পুরো অর্থ আছে আপনার কাছে!

সিঁকার লুকের শাস্ত্রদৃষ্টির আভাস কণ্ঠে ফুটল তার, আছে ডক্টর। আমি ঈর্ষা করি ওকে। ভগবানের অসীম ভালবাসা ওর ওপর...

সেই থেকে দেখছে বছরে দু'বার ফাশার ভেরময়লেন হাসপাতালে আসেন লেপ্‌সি চেক করতে—মার্চে' একবার, গরমকালের বর্ষাটা যখন শেষ হয়ে যায় আর একবার সেপ্টেম্বরে, বৃষ্টিহীন শীতের শেষে। কিপুসির ওখার থেকে আসেন—ধানিকটা পথ তাঁর বয়রা তাঁকে নৌকো বেয়ে পৌঁছে দেয়, তারপর নলীটার কাছাকাছি কোথাও থেকে ভিকার জেনেরেলের মোটর তুলে নেয় তাঁকে।

প্রতিবার ক্লিনিক্যাল রিপোর্টটার নেগেটিভ ফলাফল লিখতে লিখতে সিঁকার লুক শঙ্কিত বিষয়ে ভাবে, এ রকম আর কতদিন চলতে পারে!

ডাক্তার বলেন, কেবল আর কিছুদিন সময়ের গুয়াস্তা সিঁকার, এর বেশি কিছু নয়। বলেন যখন, কণ্ঠস্বরে ক্রোধ থাকে, আন্তরিক মমতায় মুখখানা কোমল।

মাচ' আর সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায়ই তাঁর কথা ওর মনে পড়ে। এমন পরিপূর্ণ স্মৃতি মানুষ ধর্মজীবনে সে আর দেখে নি, এমন কোমল দরালু মনও না। শুধু ধর্মজীবনে কেন পূর্বজীবনেও দেখে নি।

একদিন তাকে বলেছিলেন, মানুষের কল্যাণরূপের মাকেই ঈশ্বরের প্রকাশ সমধিক আর এই রূপই সবচেয়ে সহজে মানুষকে হিসা ভুলিয়ে দিতে পারে।

তিনি যে সম্পূর্ণ একা নিরস্ত হয়ে অমিচ্ছ উপজাতিদের মধ্যে বান



বাড়ীতেই সার্ফে কাচুন, দেখুন কত তফাৎ! সার্ফে সব কাপড় সবচেয়ে ধবধবে, সবচেয়ে পরিষ্কার আর সবচেয়ে সহজে কাচা হয়। সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি! বাড়ীর সব জামাকাপড়ই সার্ফে কাচুন ... ছেলেকেদের জামাকাপড় সার্ফে, - শাড়ী, সবকিছুই।

# সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

GU. 44-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

বহুশতা : বৈশাখ '৭১

১০১

তাদের কুঠরোগগ্রস্ত লোকগুলোকে ভোগাড় করে আনতে, তবু কেন তাঁর নিজের কিছু হয় নি কোনদিন—প্রসঙ্গটা উঠেছিল তাই নিয়ে, তবু সে জানি উনি যে কথা বললেন সে ঠর দরবিশ্বাসের কথা। এই ঠর নীতি, ঠর জীবনদর্শন—যখন যেখানে থাকেন যার সঙ্গে, তারই ওপর ঠর নীতির প্রভাব পড়ে। ফাদার ভেরমলেন যখন হাসপাতালে থাকেন আবহাওয়াটাই বদলে যায়। ডাক্তার একেবারে অল্প মানুষ হয়ে ওঠেন। কোয়ার ডেসার এটিন রোজ দেখা করতে আসে তাঁর সঙ্গে আর হরেকরকম গল্প বলে যার—উপনিবেশ-জীবনের অনেক ছোট ছোট সত্য কাহিনী, পরচর্চার কালি তাতে নেই। রিক্রিয়েশনে বলা চলে এমন সব গল্প।

হাসপাতালে থাকতে শুরু করে ফাদার ভেরমলেনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হ'ল। রাউণ্ড ঘুরতে ঘুরতেও দেখা করে যায়, এমনভাবে কথা বলে যেন কত বছর কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলে নি।

প্রথম যখন দেখা হয় তাঁর সঙ্গে, তার মাস ছয়েক পরে মাদার ম্যাথিল্ডা নানদের ডরমিটোরি থেকে তাকে হাসপাতালের ছোট একটা ঘরে বদলি করেছেন। কন্ভেন্টের কোন নিগুঢ় প্রধামুদারে গিনের বেলা ডরমিটোরিতে চাষি দেওয়া থাকে, ফলে হাসপাতালের কাজের মধ্যে বিকলের দিকটায় সুবিধে পেলে যাতে সে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে তার একমাত্র উপায় হাসপাতালেই তার শোবার বন্দোবস্ত করা। এ রকম একটু-আধটু বিশ্বাসের পরামর্শ ডাক্তার দিয়েছেন সুপিরিয়রকে। এ রকম স্বল্পকাল বিশ্রামও বিশেষ দরকার, তাকে সুস্থ রাখতে যদি চান। এখনও দিনে সে যোল ঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছে, ফলে ভোরবেলা সার্জারিতে গ্র্যাসিস্ট করার আগে রাতে প্রায়ই চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমুতে পায় না।

বিধানটা অসাধারণ কিছু, অবাক হবার মত কিছু। সেদিন তাই শুধু অবাকই হয়েছিল, সম্প্রতি একদিন যে নিজের ওপর সমস্ত সংঘ হারিয়ে ভেঙে পড়েছিল তার সঙ্গে এ বিধানের সামান্ত্রিক কোন যোগাযোগও যে থাকতে পারে ভাবে নি।

সেদিন সকালে খাবারঘরে একাই ছিল সে, দু'টো অপারেশন শেষে এসে দেয়তে প্রার্থনাশ খাচ্ছিল। কফির বাটিটা হঠাৎ হাত কসকে পড়ে ভেঙে গেল, সমস্ত সাধ। হাবিটটা কফির ছিটের বাদামি হয়ে গেল একেবারে। সিস্টার লুক ভুলে গেল অণ্ডে সার্ভিস জানলা দিয়ে চেয়ে আছে। হতবুদ্ধি হয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ভাঙা বাটিটার দিকে—নতুন একটা প্রারম্ভিকের পথ খোলা হ'ল। হঠাৎ কি হ'ল—মুখটা নীচু করে দু'হাতের পাতায় ঢেকে ফেলে অদম্য কান্নার ভেঙে পড়ল সে। অণ্ডে ভীত-বিস্ময়িত চোখে তাকিয়ে দেখল একপলক, এক দৌড়ে মাদার ম্যাথিল্ডাকে খবরটা দিতে ছুটল তারপর। কোন নানকে কাঁদতে কখনও সে দেখে নি।

তারপর একসময় আদেশটা এল। সেই সঙ্গে অনুমোদন, কাজের চাপ না থাকলেই ডিউটি থেকে সরে এসে সে যেন একটু ঘুমিয়ে তের। বিষয়ে সিস্টার লুক হতবাক একেবারে—তার জন্ম মাদার ম্যাথিল্ডা উদ্বেগ কমিউনিটি থেকে তার আনন্দিক বিচ্ছেদের খুঁকিও যেনে নিচ্ছে।

—বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হ'ল।

তোমাকে বলবার আগে কিভাবে ভগবানের কাছে নির্বেশ প্রার্থনা করেছি আমি বিশ্বাস করতে পার। বতকশ আমি সরিয়ে রাফি তোমাকে, বস্তুত করে রাখি তোমার কমিউনিটি-জীবন থেকে—এই যে সামান্য ক'টা ঘণ্টা ময় পর্যন্ত হাত বাড়তে হয়েছে আমায়—তার প্রতিটি ঘণ্টা ক্ষতিকর—আমাদের সবার পক্ষেই—আর তোমার পক্ষে তো বিশেষ করে।

মাদার ম্যাথিল্ডার মুখের রান হাসিটুকু সিস্টার লুক দেখল চেয়ে চেয়ে।

—আমি বুঝতে পেরেছি মাই মাদার। সুপিরিয়র যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার চাইতেও একটু বেশিই বুঝেছি। আবার খুঁকি নিচ্ছেন মাদার ম্যাথিল্ডা, এ খুঁকির তীক্ষ্ণতা আরও বেশি। রাতে কোন নানবে শূদ্ধ সেল যেমন চোখে পড়ে তেমন আর কিছু নয়। আর রিক্রিয়েশনে সুপিরিয়র যখন প্রসঙ্গত বলবেন—যেন অতি তুচ্ছ একটা কথা—একটি নাসি সিস্টার কাজের সুবিধার জন্য কিছুদিন হাসপাতালে শোবে, অনেকগুলো তির্যকদৃষ্টির আঁচ লাগবে দেহে—পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তাতে।

তার কারণ সুপিরিয়র যাই বলুন, কন্ভেন্টে আলাদা স্তরে পাবার অর্থ বস্তুত হওয়া নয়। বরং গুরুতর অসুস্থ না হয়ে পড়া সম্বন্ধে ছোট্ট একটা সাধা ঘরে থাকতে পাওয়া বিশেষ অসুগ্রহের পর্যায়ে পড়ে।... চারপাশে আর বিশটা মেয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে হবে না তোমায়, গরমে তারা এপাশ-ওপাশ করার তাদের খড়ের বিছানার খসখসু আওয়াজও না। কমিউনিটি-মানুষের সামনে লাইন না দিয়ে অন্ধকার প্রত্যাঘে একা একা ভ্রান করে নেওয়া, একা প্রার্থনা করতে পাওয়া, একা ভাবতে পাওয়া—মুক্তির আশ্বাস বয়ে আনবে ওরা।

আশীষ নিতে নতজানু হ'ল সিস্টার লুক।

—প্রার্থনা কোর আমার সঙ্গে যেন এ বছর শেষ হবার আগেই রেভারেন্ড মাদার ইমামুরেল ট্রিপিক্যাল মেডিসিন পড়া একটি নানকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আহা, নতুন বাড়িটা শেষ হবার আগেই আমার যদি নাসি সিস্টারটি পেয়ে যেতাম—

প্রার্থনা করার প্রতিজ্ঞা করে মাথা নেড়েছে সিস্টার লুক। কিন্তু এমন একটা নিজস্ব ঘর পাবার পর সে প্রার্থনা পুরাপুরি আন্তরিক হবে কি। অন্তত বতদিন দু'টো কাছই একা চালিয়ে নেবার শক্তি আছে। নিজের সে নিশ্চয় করে বলতে পারবে না।

কিন্তু সে তার মনের সামান্য বাস্তব-প্রতিধাত নিয়েও ফাদার ভেরমলেনের সঙ্গে আলোচনা করে। ভাঙে না যে এটা সোজাসুজি তারই মনের সমস্যা, সতর্কভাবে ঘুরিয়ে বলে। যেন ঠঠের সম্বন্ধেই বলেছে সাধারণভাবে, 'যেন ব্রতী-জীবনের সব সিস্টার আর ব্রাদারদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে।

উত্তরে ফাদার ভেরমলেনের মতামত আর মন্তব্যগুলো সর্বদা একই সুরে বাঁধা থাকে।

—আমরা সকলেই তাঁর সম্ভান,—ভাউ বারা নিয়েছে তারাও যেমন, বারা নের নি তারাও তেমনই। আমাদের ভালর জন্মে বা ঘটা উচিত তিনি তাই ঘটান।...

ছ'মাস অন্তর অন্তর তিনবার ফাদারের র্লিনিক্যাল রেকর্ড তৈরি

## পূর্ণপ্রাণে চাচার বাবা

রা হয়ে গেল। নেগেটিভ। চার্ট ভর্তি শুধু নেগেটিভ চিহ্ন—  
ব টেম্পের ফলাফল নেগেটিভ।

ডায়রি রাখার অভ্যাস নানদের নেই, তবু এই ব্রিনিফ্যাল  
রকডগুলো এক ধরনের ডায়রিই বলতে গেলে। এতটুকুও ডায়রি  
ঠান করে অল্প ডায়রি নিজে হাতে লেখা ডায়রির দিকে  
গিয়ে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়  
কান্নার কোন প্রসংগগুলো জন্মে রেখেছিল সে মনের মধ্যে কান্নার  
লে আলোচনা করবে বলে। পড়তে পড়তে পিছিয়ে যেতে যেতে  
রোমনা প্রসংগগুলো মনে পড়ে বাজে বত, বাঁধে বাঁধে একটা প্রত্যয়  
পাচ্ছে নিজের মনে। বুঝতে পারছে অবশেষে তার সুখের দিন শুরু  
রেছে এবার। নিখুঁত সমস্তের জীবনে এবার প্রবেশ করতে পেরেছে  
—প্রকৃত নানের জীবন বা হওয়া উচিত সেই জীবনে। মন শান্ত  
রেছে অনেক, চিন্তার আর ভূত-ভবিষ্যতের উৎসীড়ন নেই।

তার হাতের প্রথম এনট্রি—সেপ্টেম্বর, '৩৩ সাল। সেবারই  
এর কমিউনিটিতে ঘূমানো বন্ধ হয়। কমিউনিটি-জীবনের প্রতি  
পের তপস্চারণ নিয়ে ওর যেহুইট কাকার এক সরস মন্তব্য কান্নারকে  
নিরেছিল ও—কথাটা এত বেশি সত্য, ওরা হেসেছিল প্রাণভরে।  
জনে যেন কি একটা বড়মন্ত্র করেছে আর আলীবারের মত ছোট  
কটুখানি নির্জনতা স্বাধিকারে পেয়েছে মুহূর্তের জগত, সেখানে আর  
হুইট নেই!

'৩৪ সাল, মার্চ। বানর-প্রসংগ আলোচনা করেই কেটেছিল  
পাছ হয় সেবার। সে তখন বানর-বহুল জারগা দিয়ে পরিদর্শন-সফরে

যেত কিনা। দেখতে গাছের ডালে বানর বসে আছে দেখে তাকিয়ে  
থাকলে কিংবা সেকথা উচ্চারণ করলে এমিলনের মতো আলোকপ্রাপ্ত  
লোকও আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এই প্রসঙ্গে কান্নার ভেরমরলেনের  
কাছে বুদ্ধা সিন্ধার ইউচারিসিসিয়ার গল্প করেছিল। তাঁরই সঙ্গে  
যেত সে অধিকাংশ সময়—বানর দেখলেই ডাইভারকে তিনি বলাবেনই  
ইয়াবো—শুভদিন। সেই সঙ্গে তাকে চুপি উঁচু করতে হবে।  
তার বিশ্বাস তাঁর প্রচার-মিশনের এই বিশেষত্ব এ দেশের মানুষগুলোর  
কুসংস্কার দূর করবে। শিক্ষিত করে তুলবে।

আর এদিকে বানরদের শুভেচ্ছা জানাবার পরই কৃষ্ণকার  
মানুষগুলো অসুস্থ হয়ে পড়বে ঠিক। অসুস্থ অসুস্থ—জ্বর, কাশি,  
মাঝে মাঝে থুথুতে 'পাস' পথক।

শেষবার কান্নার ভেরমরলেন এসেছিলেন—সেপ্টেম্বর '৩৪। সেবার  
ও তাঁর কুঠরোগীদের কথা বলেছিল অনেকেরই নাম ধরে ধরে।  
কারণ ইতোমধ্যে সে অল্প অল্প কন্‌গ্রেগেশনের আর তিনজন  
নানের সঙ্গে তাঁর কলোনি ঘুরে এসেছে। অগোপন গর্বে কান্নার  
পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছেলদের সঙ্গে, সাহায্য করবার  
জগত বানদের নিজের হাতে তৈরি করে নিয়েছেন তিনি ১০০ সেই  
থেকে যখনই মাইক্রোস্কোপ টিউব দিয়ে নলাকৃতি মাইক্রোস্কোপ  
টেরিয়ারের দিকে তাকিয়েছে, প্রাথমিক চোখের সামনে ভেসে উঠেছে  
হুঁখানি তামাটে বলিষ্ঠ হাত—অংগহীন কালো মানুষগুলোকে মান  
করাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে, বাড়ল নেই বানদের তাদের খাইয়ে  
দিচ্ছে চামচ দিয়ে।

স্বাধীনতা বিপ্লব

সর্বশক্তি দিয়ে তা বন্ধা করুন

—জওহরলাল নেহরু



নির্ভর প্রয়োজন হ'লে কিনুন

যদি না কিনেও চলে তাহলে একবারেই কিনাবেন না। এত  
তবে যে টাকা বাঁচাব তা সরকারের প্রতিরক্ষা সক্ষম পত্রগুলি  
লব্ধি করুন। এত যে আপনি শুধু ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে রোধ  
করতে সাহায্য করবেন তাই নয়, প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাবার  
পক্ষে অনেক জিনিষ পোতও সাহায্য করবেন

আপনার সক্ষম প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সাহায্য করে

বহুদলী : বৈশাখ '৭১

১০৩

আর এই এখন মার্চ, '৩৫। ফাদারের আসবার সময় হয়েছে আবার। বর্ষার অবস্থাটা দেখে, সে প্রার্থনা করে নিরাপদে যেন নদীপথটা পার হয়ে আসতে পারেন তিনি। এলেন যখন সেই সবে বর্ষার পালা চুকেছে। বর্ষার কালা মেঘ এখানে ঘেঁষে আসে কেপটাউনের দিক থেকে। মহাদেশটার এ প্রান্ত থেকে ঝড়ে পড়তে পড়তে বিষুবরেখার দিকে চলে যায়। যেখানে থাকে যতদিন শীত আর রুদ্ধতা আনে, পেরিয়ে চলে গেলে গ্রীষ্ম আসে, ফুল ফোটে।... আর যেতে যেতে ঐ বর্ষার ধারাটা গিয়ে বিলীন হয়ে যায় কোন অসূরে সেই চিরশামল বনানীর অস্পষ্টতার মধ্যে। তবু চোখের আড়ালে গিয়েও কল্পনাক থেকে সরে না মুহূর্তও।...এমিল বলে ঐ বনে সব কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ফাদার ভেরমরলেনকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে জানাল, ফাদার অণ্ডে ফিরেছেন। কেনিয়া সঙ্করে গিয়েছিলেন, ইম্মু হয়েছে বলে চিকিৎসার জন্তে এখানে এনেছি তাঁকে আমরা। এবার আপনি এসে গেলেন যখন, দাখা খেলতে খেলতে শখা-চ্যাগুগো। তবু বোধ হয় একটু কড়াবো তাঁর।

—সব সময় তোমাকে কি বলি সিক্টার?

মুখভরা হাসি, গলার স্বরটা গাঢ়। দুই হাত প্রসারিত করে দিচ্ছেন সামনে উত্তরটা যেন সোজাঅজি তাদেরই দিতে হবে।

নাসের চোখ, স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে তাকিয়েছে অমূল্যমানী দৃষ্টিতে। না, মশ্গু হু'খানি হাতে বিকৃতি কিছু নেই, কোন অস্ত্র দাগও না— ভিতরের কোন ভাঙনের প্রকাশ নেই কোথাও।

স্বখা হয়ে চোখ তুলে তাকাল।

—বলি নি যা বাটা চাই তাই তিনি ঘটান—এ ক্ষেত্রে যেমন যা ঘটছে শুধুই আমার ভালর জন্তে! দাখাখেলার পুরানো বধুটি ফিরে এসেছে আবার। একে তুচ্ছ বলে ভাবি কি করে! ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমার, কিন্তু আমার তো রীতিমত কৃতজ্ঞ লাগছে তাঁর প্রতি।

সেমিন বিকলে ফাদার অণ্ডের জন্ত একটা বিশেষ 'ড্রিক' তৈরি করে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিল সে। বাইরে বজ্রপাতের আগে বিদ্যুতের আলো বলসে উঠছে বাবরার, এমিকে ঘরের মধ্যে রেবারের উত্তেজনার আগুন ঠিকুরোচ্ছে বাতাসে। খোলা বাজারে যসে আরম্ভা যেমন করে খেল, তেমনি করে খেলছেন ফাদাররা— গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছেন কখনও, মাথার ওপর হু'হাত তুলে ফেলাছেন কখনও বা।

ফাদার অণ্ডে তিন'ঘর লাকিরে ফাদার ভেরমরলেনের রাজার ঘরে গিয়ে বসলেন।

...কড়কড়, শব্দে বাজ পড়ল।

বিকারিত চোখে এমিল ছুটে এল হঠাৎ।

—এ্যাথল্যান-কল মামা লুক...হঠাৎ একটা বজ্রার তোড় এসে তিনটে লোক, ডুব যাচ্ছে...

যে হাতে রাজার সারিতে গিয়ে বসেছিলেন, সেই হাতেই বোর্ড থেকে 'বুটিগুলি সব তুলে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিলেন ফাদার অণ্ডে, সম্ভবত একজন প্রিক্ট, তোমার লাগবে সিক্টার। এমিল, আমার কনভেন্টে কোন কন, ফাদার জোঁক ডাক।

—কয়েলিগাম, তিনি নেই।

ফাদার অণ্ডে খেলার সংস্কার দিকে চাইলেন এবার, তা হলে তুমি বাও।

সংস্কারি বালার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—যদি দরকার হয় আমি না হয় সাংসাদলের সংগে একজন সাধারণ ব্রাদার পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের পেছান।

...নীচু কর...চাপ দাও...হেড়ে দাও...উঁচু কর...নিজের ডেজের কাছে দ্রুতপদে যেতে যেতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার পদ্ধতিটা মহড়া দিয়ে নিল সিক্টার লুক।

সিক্টার অরেলিকে বলল, মাদার ম্যাথিল্ডাকে বলে দিও, প্রীজ।

শুনলে তার চোখে যে সত্যক সংকেত ফুটল দেখেও দেখল না, সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে ভুল হ'ল তার। ভাবল ও বলতে চাইছে সত্যক থেক।

...বিপন্ন ঐ প্রাণগুলোর কাছে সময় থাকতে গিয়ে যদি পৌছোতে পারে সত্যক থাকবে বেমন করে নিজের জ্ঞান...চিন্তার ধারাটা এই খাতের বয়ে গেল, একবারও বুঝল না ঐ শাস্ত্র ছুটি চোখ ব্যাকুল সম্মুখে বলছে এতদিন পরে এ কি অবিমূর্তকারিতা তোমার!

উঁচু-নীচু অসম রাস্তা, এ্যাথল্যানটা কানকানি খেতে খেতে চলেছে। স্থির হয়ে বসাই শক্ত।

...শেফার' পদ্ধতিতে রোগীকে উপুড় করে দিয়ে মুখটা নীচু করে দেবে রোগীর, তার কোমরের দু'দিকে দু'টো হাঁটু দিয়ে বসে দু'হাতে নীচের পাঁজরগুলোর পিছন দিকটার ওপর জোরে চাপ দিতে হবে।

...নীচু কর...চাপ দাও...হেড়ে দাও...উঁচু কর...প্রতি পা সেকেন্ডে।

ফাদার ভেরমরলেন বলে আছেন, পাঠাডের মত নিশ্চল, অস্বচ্ছ। তাঁর মিসালের পত্রচিহ্নটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রাক্রামেন্টের অংশটার রাখলেন।

এমিলের তোতলামির মধ্যে থেকে পুলিশ-টাকের দেওয়া খবরটা উদ্ধার করা গেছে কোনরকমে। খনি থেকে তিনটি ইতালীয় যুবক হাঁস শিকার করতে গিয়েছিল। হঠাৎ অলক্ষিতে নলখাগড়ার বনের মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের মত উঁচু একটা বজ্রার তোড় এসে উল্টে দিল তাদের ভেলা, ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের। লোকগুলো এসে পড়ল মাখনদীতে বালির চড়ায়। তারই ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে গিয়ে ভারি রবারের বৃত্ত ক্রমই ডুবে যেতে লাগল, বালির চড়াগুলো সবই চোরাবালি। এমনি সময়ে একটি দেশীয় ছেলে শহরে ফিরছিল...

ফাদার ভেরমরলেন চোখ তুলে না তাকিয়েই বইয়ের নিশানটা কয়েকপাতা পিছিয়ে এনেছেন, সে জানে কোথায়। অস্ত্রমকালে উপনীত মৃত্যুযজ্ঞাকারতর আত্মাদের জন্ত প্রার্থনা আছে যেখানে।

প্রথমে ওদের দেখে মনে হচ্ছিল বালির তৈরি আবক্ষ-মূর্তি বৃষ্টি। দু'জন নীচু হয়ে বুটগুলো খুলে ফেলতে চেষ্টাছিল, হাতগুলো পাতলা ফাদার মাখামাখি। সবাইই বুজলো হাঁ করা, তারের মাছুবদের ছুড়ে দেওয়া গাছের ছোট ছোট ডালগুলো ধরার চেষ্টার বাবরবারে চেঁচিয়ে উঠছিল তারা।

হঠাৎ দেখা গেল ফাদার ভেরমরলেন নদীর ধারে ফাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন। পুলিশ-টাক জোর করে টেনে ফেরালেন।

## পূর্ণাংশে চাবার বাঁধা

ঝড়ের ওপর গলা তুলে চেঁচিয়ে বললেন ওদের কাছে বাঁধার জন্ত সব বকম উপায় পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা, নিরাপদে কোথাও পা রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

স্রোতের তোড়ে ওরা তীরমুখো হয়েছে এবার। চোরাবালির চাপে মুখগুলো সিঁহরের মত রাঙা, এত কাছে এসে গেছে যে তীর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় ওদের আঁতর্নাদ আছড়ে এসে পড়ছে তীরে।—তঁরাও প্রচণ্ড একটা বাজের শব্দ সেই ভরকর শব্দ হুব গেল। শুধু দেখা যাচ্ছে ওদের আতঙ্কিত মুখগুলো—নিখিল দোভে ওরা নলখাগড়ার গাছগুলো উপড়ে তীরের দিকে ছুড়ে ছুড়ে যেখানে লোকগুলো বুখাই দড়ি ছুড়ে ছুড়ে তাদের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে, ঝড়ে দড়ি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বারবার।—

ক্রমেই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেমন, উন্মত্ত প্রাণসে অন্তরের পথ উন্মোচিত করে অনায়ে আরও—অকস্মাত ওদের চোখে পড়ল ফাদার ভেরমরলেন তুণ্ডি করছেন জলের ওপর। এপ্রাশে সরে আসবার যে আশ্রয় চেষ্টা চলছিল নিবন্ধ, মুহূর্তে খামল সেটা—বিফারিত চোখের দৃষ্টি প্রিস্টিটির মুখ নিবন্ধ।

—মুক্তি প্রার্থনা বিমোহিত তিনি।

—এলোমেলো কোড়ে। হাওয়া এবার অমাবসিক একটা আঁতর্নব বয়ে নিয়ে এল তীরে।

ফাদার ভেরমরলেনের কণ্ঠের ঝড়ের ওপরে উঠেছে, ব্রোঞ্জের ঘটীর ধ্বনির মত গম্ভীর, উল্লসিত কণ্ঠস্বর।

কাদা শিকারীদের কাঁধ ছুঁয়েছে।

—সর্বশক্তিময় প্রার্থার নামে, পরম পিতার নামে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাও হৃদয়ান আশ্বাগণ—

জীবনে আরও একবার এই ধরনের মুখ দেখেছিল সিঁটার লুক—উন্মাদাশ্রমে, টিভের ঢাকনার ফাঁক দিয়ে।

—ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাও এলেন ও আর্কেঞ্জেলের নামে, আর সেই রাজাধিরাজের নামে—

কাদা ঠেলে উঠেছে চিবুক পর্যন্ত—চাখগুলো ঠেলে ঝেঁয়ে আসতে চাইছে, কোটির থেকে। এবার ঐ কাদা গড়িয়ে ওদের খোলা মুখ চুষবে, সিঁটার লুক চোখ দুটো বন্ধ করে কেল—তার আগেই।

গম্ভীর উল্লসিত কণ্ঠে এতটুকু কন্সনও নেই। প্রার্থনাগুলো কানে বাজছে একের পর এক, শেষ নিবেদনে এসে পৌঁছেছেন ফাদার ভেরমরলেন।

—উহার কন্সিত হইতেছে, সেজ্ঞ উহারে কমা করিও, উহার কন্সন করিতেছে, সেজ্ঞ উহারে কমা করিও তোমার ঐ মিলনতীর্থে উহারে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইও না।

ইস।

চারপাশে অকুট আকর্ষণের গুঞ্জন বলে নির্গত মাথাগুলো অজ্ঞান হয়ে গেছে। চোখ মেলে তাকাল সিঁটার লুক।

সামনে বালির চড়া একখানা বেশী কাপড়ের মত বিছানা, নিটোল, মল্লং।

এমিল পাশে ঝাঁপিয়েছিল গুটহটি মেরে, নীচু গলায় তাকে বলল দেহগুলো না তেলা পর্যন্ত পুলিশের সাঙ্গে থাকতে। ওরা বলেছে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে।

—গ্র্যাণ্ডলাস আমি সোজা ফেরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সে আর ফাদার ভেরমরলেন ফিরে এলেন কনভেটে। দু'জনেই নির্বাক, স্তব্ধ।

উত্তরকালে যখনই মনে পড়ত ঘটনাটা চোখের সামনে ভাসত শুধু বৃষ্টিপাত জীবন্ত সেই তিনটি মুখ—নলখাগড়ার বনে বাতাসের কায়া। সেই সমস্ত সময়টা নিজে সে যে কি করেছিল তা কিন্তু একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে। নিজেকে তার মনে পড়ে বনভ্রমণে ফেরার পর থেকে।

প্রথমেই গেল অশিবিচরের কাছে প্রত্যাভর্তনের আশীর্বাদ নিয়ে, খবরাখবর জানাতে। বাগানটা পেরিয়ে যেতে যেতে বস্ত্রবাটা মোটাটুকু শুকিয়ে নিল। মাদার ম্যাথিল্ডা কংগোর মৃত্যুর সব ভাংকররূপেই দেখেছেন, বিস্তারিত বিবরণ কিছু জানতে চাইবেন না। সেজ্ঞ সে কৃতজ্ঞ।

মাদার ম্যাথিল্ডার নিকটস্থ ভাবটাও প্রথম খোঁজ করে নি। বৃষ্টিতে-ভেজা ছাঁচটা দেখেও একটা সহানুভূতির কথা নয়, ফিরে এসেছে দেখে স্বস্তির হাসি নয় একটু। রিপোর্ট দাখিল করতে গিয়ে



**সুবর্ণ জয়ন্তী**  
১৯১৪-১৯৬৪

আমাদের জুয়েলারী প্রতিষ্ঠানের

**৫০** তম

বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

( অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭১ )

**রায় কাজিন এণ্ড কোং**

জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স

৪. ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১



সবে এইটুকু জানিয়েছে আজ সন্ধ্যার হাসপাতাল মর্গে তিনটি লাশ আসবে বলে মনে হয়, মাদার ম্যাথিডা হাতটা একটু তুললেন।

অদ্ভুত বিকৃত গলায় বললেন, ঘটনাটা আমি জানি সিস্টার লুক। ঘটনাস্থানেক ধরে টেলিফোনে পুলিশের সঙ্গে, ইটাগীর কনসালের সঙ্গে, এমন কি খবরের কাগজের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।

মাদার ম্যাথিডার গভীর থমথমে মুখ সত্ত-সমাপ্ত বিয়োগান্ত নীটকটার ওপর বনিকা টেনে দিল।

—কাজেই ও কথা থাক, তুমি শুধু তোমার কাজের কৈফিয়ৎ নাও—আমার কাছে অহুমতি না নিয়ে কেন তুমি কনভেন্টের বাইরে গিয়েছিলি?

—কিন্তু মাই মাদার, সিস্টার অরেলির ওপর তো আপনায় বলে দেবার ভার দিয়ে গিয়েছিলাম আমি।

..ভার দিয়ে গিয়েছিলাম! কথাটা বলে প্রথম চৈতন্য ফিরল তার। ১০০ এক করেছে সে।

ঘরে নিয়েছিল যাবার অহুমতি পেয়েই গেছে, নিঃসামুগ্ধ আঁশ্রমোদনের অপেক্ষা না করে চলে গেছে তাড়াহুড়ো করে। কিন্তু এও না বলে বাওয়ারই সমতুল্য, কাজেই এটা কোন ভজ্জুহাত নয়। কোন নান কোন কারণেই তার অপিরিয়রের অহুমতি ছাড়া কনভেন্টের বাইরে বাবে না, এটাটা রীতি। চান্সপাশে সারা সূহরে যদি আশুন লেগে সব ধসে হরে যায় কি বন্ধার জলে প্রবিক্ত হয়ে যায়, হাজার লোক যদি রাস্তায় পড়ে সাহাব্যের জন্তু আর্জানার করে..না, তবুও না। তুমি কখনও তোমার কনভেন্টের চৌহদ্দি পেরোবে না অপিরিয়র বতকণ না বাক্সের আশীর্বাদ দিয়ে বলেন, বাও..।

..বাধ্যতার অভাব, হে ঈশ্বর, এই এতদিন পরেও..

মাদার ম্যাথিডার বলার ছেদ পড়ল না, ওর বিমিত অভিযুক্তিটা বেন শোনে নি।

—শুধু যে অহুমতি না নিয়েই কনভেন্টের বাইরে গেছ তুমি তাই নয়, তার ওপর—এক তাতেই আরও বেশি দুঃখ পাচ্ছি আমি—বদান্ততারও এত অভাব তোমার মধ্যে।

..বদান্ততা! উদ্ধারের এই একটাই পথ চোখে পড়েছিল, কথাটা তারই মূলে ছুরির ফলার মত এসে বিঁধল।

—আমি হয় তো এর দায়িত্ব সিস্টার অরেলির ওপর দিতাম, কিংবা আর কারো ওপর, তোমার অধীনে যারা কাজ করে—কত সপ্তাহ তারা বাইরে যায় নি। তুমি সিস্টার লুক, খুঁকি আর উদ্ভেজনার গন্ধে সবাইকে ফেলে এগিয়ে গেছ একা, একবারও সিস্টারদের কথা ভাব নি। একবারও ভাব নি নতুন কোন অভিজ্ঞতার জন্তে তাদের কতটা বাসনা হ'তে পারে—তা হ্যাঁ..এখানে যেমন ঘট গেল সে রকম দুঃখের ঘটনার ক্ষেত্রেও কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একবারও ভেবে দেখ নি যে কোন সিস্টার এই ঘটনার ছোট খবরটুকু কেটে নিয়ে পারিবারিক ক্র্যাপবুকে রাখবার জন্তে বাড়িতে পাঠাতে কতটা আনন্দ পেত। কাগজের অফিস থেকে এর মধ্যেই তোমার নামটার জন্তে আমার কোন করেছিল। ১০০ বৃত্তে পারছি প্রথমে জীবন রক্ষা করতে ছুটে গেল বাওরাটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তোমার, কিন্তু বৃত্তে পারছি না সেই প্রথম বৃত্তের চিন্তাটাই এত বড় হ'ল কি করে তোমার কাছে, পরে সব দিকগুলো ভেবে তুমি সংযত হলে না কেন।

বৃত্তে পারছে না এমন নয় যে তার মনের ভালমন্দ সবচেয়ে অভিমাত্রায় সচেতন না হলে অপিরিয়র এমন বিধিধি বিধিধি কথা বলতে পারতেন না। তবুও প্রতিটি কথা ছুরিকাঘাতের বেদনার মত লাগছে। অপিরিয়র খেমেছেন, তবু চোখ তুলে তাকাতে পারে নি। চোখের জলে নিজের জন্তু করুণা ভিক্ষা করে নেবে না সে কিছুতেই। চোখ তুলে তাকালে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতেও পারবে না কিন্তু।

তথাপি কি ছিল ওর মুখে, অপিরিয়রের তুহিন-শীতল বর্ধস্বর একটু তরল হ'ল।

—কাজের মধ্যে উপারতা দেখানো সহজ অনেক, সবাই শাকী থাকে, দেখে, মুগ্ধ হয়। সাংসারিক মাহুসও প্রশংসার লোভে, বিশিষ্টতার লোভে উদার হতে পারে সময় সময়। সবার অলঙ্ক্যে নীরবে বে চিন্তা ঔদার্যের মন্ত্র দেয়—যার জোরে সব কাজে অজ্ঞদের এগিয়ে দিয়ে সব শেষে নিজের ঠাই নেবার মত শক্তি আসে মনে..মাত্র তারই অভাব ঘটেছে তোমার মধ্যে।

সেখান থেকে সোজা চ্যাপেল চলে এল। নিজেকে শাস্ত করে নিতে হবে। হাসপাতালে ফিরবে যখন, দেখে মনেও হবে না কোন কিছু ঘটেছিল। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, শুধু চাবুক-বাণ্ডা চৈতন্যে নিজের পতনের রূপটা ঐ ক্ষমাহীন চোরাবালির মত নীচের দিকে টানছে তাকে।

শিবাক্ত একটা মারকুশা। কালো, রোমশ। বোধীর ধাপে গুটিয়ে গিয়ে রয়েছে।

সিস্টার লুক একদুটে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

..লাফিয়ে পড়..লাফিয়ে পড়..ছামি নড়বোও না..

বীরে বীরে শাস্ত হয়ে আসছে মনটা।

..কেন আবার এ অবমাননার মধ্যে টেনে আনলে তুমি আমার? মনে করেছিলাম পরীক্ষা তোমার শেষ হয়েছে বৃষ্টি। ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত তোমাকে খুশি করতে পেরেছি এবার, এটা তারই সংকেত। ১০০ কেন সব দিক বিবেচনা করে দেখলাম না আমি? কেন তুমি দয়া করলে না আমার? ..কেন? কেন?..তুমি তো জানতে আমার মন, তুমিই তো বিশ্বাস করিয়েছিলে স্বার্থের প্রলোভনে ছুটিছ না আমি.. তবু কেন এমন বেদনা দিলে আমার..কেন মাদার ম্যাথিডার মুখে ঐ কাঠিন্ত্রের আবরণ আমার দেখতে হ'ল..

মনে হচ্ছে মারকুশাটা চেয়ে চেয়ে দেখছে বৃষ্টি তাকে।

..এর চেয়ে ওটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ুক না, কেন তুমি করছ না তা? নাকি আমাদের মত অযোগ্যদের নিয়ে অজ্ঞ উদ্বেগ আছে তোমার। ১০০ হে প্রভু, তাকে আমি অপমান করেছি, এ দুঃখ রাখবার আমার জায়গা নেই।

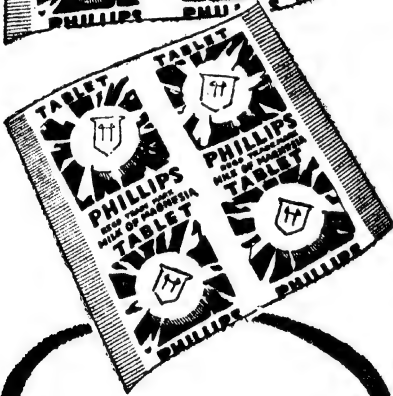
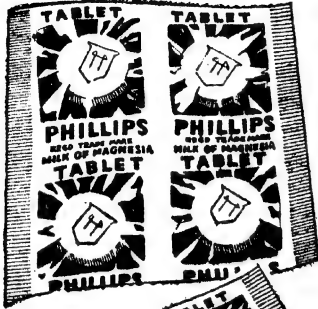
নির্বেশ আকাশে অপরাহ্নের সূর্য দীপ্যমান। চ্যাপেল থেকে ঝেরিয়ে পারে পারে সিস্টার লুক হাসপাতালের দিকে এগুলো।

লগ্নবুকের পাতায় সিস্টার অরেলির ছাপা হরফের মত স্মরণ হাতের লেখাটা জলজল করছে, তার অহুপস্থিতিতে বা কিছু ঘটেছে সব নোট করা। পড়তে গিয়ে খবরের কাগজের সংবাদটার কথা মনে পড়ে গেল। ১০০ তীব্র একটা যন্ত্রণার অহুহুতি চলে উঠতে চাইছে। মিশনের কোন নানার উল্লেখ করতে হ'লে সন্ধ্যা-জীবনের নানার সঙ্গে পূর্বজীবনের পদবিটাও উল্লেখ করা হয়..



অল্প অজীর্ণ, পেটের গোলমাল, বুক জ্বালা থেকে

এবং আরও অনেক



৪ ট্যাবলেটের প্রতি  
প্যাকেটের মূল্য ২০ নয়া পয়সা

8/11-1404/1941

**এখন**

অধিকতর নিরাপত্তার জন্য  
এ্যান্টিমনিয়াম ফরেল প্যাকে পাওয়া যায়।

# ফিলিপ্স

অফ

মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

## ট্যাবলেট

ফিলিপ্স ট্যাবলেটে আছে খাঁটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া যা পরিবারের সকলের পক্ষে সবচেয়ে দ্রুত কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য অম্লনাশক।

যখনই অম্লজনিত বদহজম আপনাকে পীড়া দেবে তখনই শুধু কয়েকটি ফিলিপ্স ট্যাবলেট চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার অস্বস্তিকর বুক জ্বালা আর পেট ফাঁপা ভাব কমে যাবে, পাকস্থলী স্বস্থ হবে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে।

বাড়ীর সকলের জন্য সুবিধাজনক প্যাক ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী:

দে'জ মেডিকেল স্টো'স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

সিঁটার লুক জানিডিমালের পরিষেত ওটা সিঁটার অয়েলি ডিলেটাওয়ার হতে পারত। কল্পনার দেখছে ডিলেটাওয়ারদের বাড়িতে ক্র্যাপবুখানা বার করা হয়েছে, কাটাংগার একটা কাগজের কোন একটা স্তম্ভের ক'ইঞ্জির একটা খবর কেটে নিয়ে আটকে রাখতে হবে তাতে। তার মূল্য অনেক, নিঃসঙ্গ বাবা-মাকে নতুন আশ্বাস দেবে ওটা—ইপরে সমাপ্তি। কজাটি তাঁদের লোক-চক্ষুর অন্তরালে চিরন্তনে হারিয়ে যায় নি।

চিন্তাটা ক্রমেই পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে মনটাকে, জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সিঁটার অয়েলির দিকে তাকাল।

—সিঁটার অয়েলি, মোটারনিটিতে ফিরে বাবার পাখে ইলুগাকে একটু বলে দেবে চাপেলে মস্ত বড় একটা বিবাক্ত মাকড়শা রয়েছে। সিঁটাররা কেউ কেউ ভয় পেতে পারেন দেখে।

ডিউটিতে ফিরল, সই করল লগে।

বলল, 'কেউ যদি খোঁজে আমার; ল্যাবে আছি।

ল্যাবোরেটোরিটা উত্তপ্ত হয়ে আছে খুব, নির্জনও। ডাক্তার চলে গেছেন আজকের মত। ফাদার ভেরমরলেনের ল্যাবরেটোরি হাইড্রোস্কোপ নিয়ে বসে মাইক্রোস্কোপ হাই পাওয়ারে সেট করল।

হাত দু'টো কাজ করে চলেছে, মনের সঙ্গে তার যোগ কমই। মনটা বাবে বাবে সারা দিনটার ওপর দিয়ে ঘুরে আসছে। নিজের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের প্রতিফলন দেখছে। বিশ্লেষণ করে করে দেখছে, বাধ্যতার ব্রত থেকে তার আশ্বকের এই ঝলনটাকে, দেখছে মনের কোন অঙ্গকার কোণ এই বিচ্যুতির প্রেরণাচনা যোগাল। ...অথচ এই তিন বছরে দিনের পর দিন কতবার মানার মাঝিন্ডার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কি এটা করতে পারি। কন্ডেট থেকে বেরোতে চলেই জিজ্ঞাসা করেছে, এ্যাপ্ল্যান্স কল এলও ব্যতিক্রম ঘটে নি। তিন বছর এখানে, তার আগে আরও পাঁচ বছর।

...আমি কি পারি মাই মানার?...

এ সপ্তাহে চার নম্বর রুমাল একথানা ব্যবহার করতে পারি মাই মানার? তিনটে রুমালে কাপড় ঢালাতে পারি নি।

দু'টো মিলের মধ্যে এক গলাস জল খেতে পারি মাই মানার?

দেশীর হাসপাতালে ঠাণ্ডা করা ফল আজও কি নিতে পারি মাই মানার?

মাই মানার, এই মেডিক্যাল জার্নালখানা উজ্জর দিয়েছেন পড়তে, পড়ব তো?

শুধুমাত্র এই বাধ্যতার নামে কতবার এমনি ছোটখাট অমুমতি প্রার্থনা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। চট করে এককোঁক সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসার ব্যাপারটা ঘৃণাকরও কোনদিন জানতে দেয় নি ডাক্তারকে। জানে জগতের চোখে এটা সম্পূর্ণ অর্থহীন, হয় তো নাসীহত। ...কিন্তু সে কথা থাক, সে নিজে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে? এতবার এবং এত ঘন ঘন যে এম সঙ্গে সে নিজের মনের দাঙ্কিক দিকটার একটা বিরোধ বাধা স্বাভাবিক ছিল তাও সে ভুলেছে নিজেই।

হাইড্রোস্কোপ পরিষ্কার করে রাখল।

রাতে একবার ঘুম থেকে উঠে ম'সিমে ভাইডেবটকে দেখতে যেতে পারি মাই মানার? আজকের রাত বোধ হয় আর ঠর কাটবে না।

বলতে ভুলে গিয়ে সেই বে অপরাধটা করেছিলাম, কুলপার শুনে

আপনি যে প্রাশ্নচিত্ত ঠিক করে দিয়েছেন তার বাইরে সেজন্তে একবারের খাওয়া বাদ দিতে পারি?

ভাবনাগুলো স্বগতোক্তি মতো লাগছে। সংসারের সীমানার দাঁড়িয়ে নানের অন্তরটা পড়ার মত। ...একটা শুকনো হাইড্রোস্কোপ নিয়েছে। ...মনটা বিশ্লেষণমুখী। ...ফাদার ভেরমরলেনের মত আশ্বারা বাধ্যতার ব্রত হতে একবারইমাত্র চ্যুত হতে পারে, তা সে চ্যুতি বত বড়ই হোক। আর তারপর বহুতর ক্ষুদ্র বিচ্যুতির কুটিল পথ ছেড়ে চিরন্তনে সরল একমুখী প্রাশ্নচিত্তের পথ বেছে নেয়।

প্রথম হাইড্রোস্কোপ চুকিয়ে দিয়েছে মাইক্রোস্কোপের নীচে। স্থূল পদার্থটা খোঁয়া খোঁয়া মেঘের মত, দেখতে না দেখতে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা খুব সফ কি এককোঁক চলে গেল—মিউকাস মেনেরেনের এই একটাই অলক্যান্ডিটা সেল।

কিছু না, কিছু না। নেগেটিভ।

হাইড্রোস্কোপ টিক দিয়ে সরিয়ে রাখল।

মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজ করতে করতে সব সময়ই যেমন হয়, মনটা আপনাই শান্ত হয়ে আসছে। এঞ্জেলসের আগে আরও খান-কয়েক হাইড্রোস্কোপ দেখে নেবার সময় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় হাইড্রোস্কোপ লাগিয়ে মাথাটা নীচু করে আই-পীসের ওপর হুকুল। ...গভীর সমুদ্রের ছবি যেন—নলাকার মাইক্রোস্কোপের মাঝে মাঝে লাঠির মত ভাসছে ওপরে—...প্রসিদ্ধ ব্যাসিলাসের দু'পাশে সমান ব্যাধানে কালো দাগধরা কবিকা'গুলো ছড়ানো।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুট একটা আত্মনাদ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। হাতটা কাঁপছে। জোর করে স্থির রাখতে চেষ্টা করেছে, এ্যাদজাক্টমেন্ট স্ক্রুটা টিকমত ঘোরাতে স্থির স্থপ্ততা চাই।

...আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে—...ভুলই হয়েছে আমার ... আরও শূন্য ফোকাস ঘুরিয়ে পরীক্ষাধীন বীজকোষটাকে তার নীচে আনল—কৃষ্ণ বীজাণুর সনাক্তকরণ উপাদানটা ধরা পড়বে।

পড়ল। আরও তিনটে দেখা যাচ্ছে।

মাইক্রোস্কোপের ওপর হাতটা বৃষ্টি জমে গেছে তার, আপনাদের অজান্তেই হাতটা ঘুরছে এ্যাদজাক্টমেন্ট স্ক্রুটার ওপর—নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎবোর মতন ঐ ভীষণ পদার্থগুলো একবার করে আসছে ফোকাসের মধ্যে, একবার করে বাইরে চলে যাচ্ছে।

ফিল্মের নীচে তিনটে, ওপরে একটা।

...হে প্রভু, কোথায় তোমার দৈবানুগ্রহ? আজই নদীতীরে যে মানুষটি তোমার স্তব করছিলেন, প্রতিদিনে এই কি তাঁর প্রাণ্য ছিল।

...আত্মপক্ষ কি করে সমর্থন করবে তুমি? এ কি দ্রাব্য বিচার।

মনে হ'ল ফাদার ভেরমরলেন এসে দাঁড়িয়েছেন ল্যাবোরেটোরিতেই তার পাশে, গলাটা এতই স্পষ্ট।

বলছেন, আমাদের ভালোর জন্য আর তাঁর অধিকতর গৌরবের জন্য যা চাই তাই ঘটান তিনি। জানে টেক্টর ফলাফল বখন জানাবে তাঁকে ঠিক এই কথাই বলবেন তিনি। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বলবেন, যেমন বলেন সর্বদা—নির্ভরতা চিড় খাবে না কোথাও।

চোখ দু'টো জ্বালা করে জল ভরে এল। ফিল্মের ওপর ঐ মারাত্মক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজাণুগুলো বাপসা লাগছে।

এঞ্জেলসের শান্ত আহ্বান এসে পৌঁছোলো। বট। বাজছে। [ক্রন্দন।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

# হৃদয় পাথো



( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

সুলেখা দাশগুপ্ত

শিবানী যে নিবিষ্টতার সঙ্গে কাগজপত্র শুছিয়ে বসে কাজে মন দিয়েছিল সেই নিবিষ্টতা ছিঁড়ে দিয়ে গেল মিঃ বোস। মিঃ বোস চলে গেলেও আর মন দিতে পারলে না হাতের কাজে। কলমের বন্ধ মুখটা। কলমের ভেতরই ঘোরাতে ঘোরাতে নিতান্ত অসহনমূলকভাবে কি যেন ভাবতে লাগল শিবানী।

মিস জেনি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বারকয় লক্ষ্য করল তাকে। তারপর বাঁ হাতের তালুর উপর কফির পেয়ালাটা প্রায় ঠাঁট ছোঁরাবার ভঙ্গিতে মুখের কাছে ধরে রেখেই বলল, আচ্ছা মিসেস সেন—বলেই নেমে গেল মিস জেনি।

শিবানী কলমের মুখ ঘোরানো বন্ধ করে জেনির দিকে তাকালে।

মিস জেনি তার ইংরেজী উচ্চারণে টেনে টেনে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো মিসেস সেন তোমার ?

করো।

কিছু মনে কোরবে না ?

না।

তবু যেন একটু ইতস্তত করতে লাগল জেনি কথাটা বলার আগে। কাকর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোঁতুল প্রকাশ করাটা ওদের দমায়ে একেবারেই ভ্রমভাবিক।

‘প্রতিবেশীর সঙ্গে দ্রুতি রাখো, কিন্তু তার বাড়ির বেড়া ডিঙিও না’—ইংরেজ দেশের প্রবাদ।

যেহা হই সেইজমাই একটা বাঙালী সঙ্গিনী হলে যেভাবে কথাটা মনে হওয়া মাত্র ঝপ করে বলে ফেলত, মিস জেনি তা পারলে না। বিধা ফরলো একটু। তারপর বিধাটা বেড়ে ফেল বলল, মিসেস সেন, মিঃ বোসকে যে পছন্দ করো না তুমি—এ তো সত্য ?

না।

সত্য নয় এ ?

না সত্য নয়।

মিঃ বোসকে পছন্দ করো তুমি ?

তাও করি না।

পছন্দ করো না অপছন্দও করো না।

না।

তবে করো কি ?

কিছু যে একটা করতেই হবে তার মানে কি ?

মিস জেনি চূপ করে রইল।

চূপ করে রইল শিবানীও।

ঠাণ্ডা কফিটা একচুমুকে খেয়ে নিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে জেনি বলল, না, মিসেস সেন, তুমি বাই বলো—আমি নিশ্চয় জানে যে মিঃ বোসকে তোমার ভালো লাগে না।

মিস জেনি, তুমি কিন্তু শব্দ পাটে ফেললে।

কি রোকম ?

পছন্দ-অপছন্দ কথা দুটো ভাসমান শব্দ। ও কথাই উত্তর ভাসা কথাই দেওয়া চলে। কিন্তু ভালো লাগা কথাটা অনেক গভীরের। ওখানে ভাসা কথাই উত্তর চলে না। তুমি যদি পছন্দ করা না-করাই কথা জিজ্ঞাসা না করে ভালো লাগা না-লাগার কথা জিজ্ঞাসা করতে তবে ঐ উত্তর আমি দিতাম না।

তবে কি উত্তর দিতে ? আমি যদি জিজ্ঞাসা করতাম মিঃ বোসকে যে তোমার ভালো লাগে না, এ তো সত্য—তবে কি বলতে মিসেস সেন ?

বলতাম সত্য।

ডোট মাইণ্ড—কিছু মনে করো না মিসেস সেন। তবে তুমি খেলছো কেন মিঃ বোসকে নিয়ে ?

খেলছি !

খেলছো না ?

একেবারেই না মিস জেনি—একেবারেই না। না-এর ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে-দোলাতে শিবানী বলল, একেবারেই খেলছি নে আমি। খেলাটাই কি জীবনে কম আনন্দের ছাঁদ না কি—যদি সত্যিকারের

খেলার সঙ্গী মেলে? কিন্তু সত্যিকারের জীবনসঙ্গী মেলার মত সত্যিকারের খেলার সঙ্গী মেলাও দুর্লভ। ও মেলে না। আর তাই যদি না মিলল তবে খেলে আনন্দ কি? ত্রেটামেন কি বৈট ধরবেন তোমার আমার প্রতিপক্ষ দেখলে? এ খেলা নয়। এ কেবল যখন চতুর্দিক গড়ের মাঠ থেকে তখন যদি কেউ ডেকে বলে, চলে, একটু গড়ের মাঠটা ঘুরে আসি—তখন 'চলে' বলে উঠে পড়া। এখানে খেলা নেই। পছন্দ নেই, অপছন্দও নেই। কিছুই নেই।

থাকে যদি তো আছে একটু বেড়ানো। তা-ও বড় করণ।

'মিসেস' কথাটাই বলে দিচ্ছে শিবানী বিবাহিতা। তারপর শিবানী স্বামীর কথাও বলেছে। তবে কেন শিবানীর চারদিক শূন্য—কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। বেড়া ডিঙিয়েছে কিন্তু বেডক্রম ডিঙোতে পারে না মিস জেনি।

মিস জেনি গালে হাত রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে শিবানীর কথা শুনছিল।

শিবানী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি বললাম বুঝলে?

জেনি মাথা নেড়ে আনাল সে বুঝেছে।

কিন্তু শিবানীর সন্দেহ গেল না। এতগুলি বাংলা কথা—বতই স্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে সে বলে থাক, জেনির পক্ষে বোঝা সহজ নয়। বলল, বলত কি বলেছি?

মিস জেনি ইংরেজিতে শিবানীর কথাগুলি গড়গড় করে বলে গেল।

শিবানী চেয়ার থেকে উঠে একটু বুকে জেনির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আঃ! চমৎকার—চমৎকার!

জেনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করল শিবানীর সঙ্গে।

শিবানী চেয়ারে পিঠ ছেড়ে বসে বলল, আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি মিস জেনি। কিন্তু আমার কাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যেন বাংলা বলা ছেড়ে দিও না—বুঝলে?

মিস জেনির কানে শিবানীর পরের কথাগুলি ঢুকলই না। সে একরকম আঁতকে উঠে বলল, কাজ ছেড়ে দেবে তুমি মিসেস সেন! কেনো?

ভালো লাগে না।

না, না তা হবে না—মিস জেনি ব্যাকুলকণ্ঠে বলল। কিসের জোজ্ব ছাড়বে? মিঃ বোসের জোজ্ব? লোকটা উত্যক্ত কোরছে? আমি তাকে ঠিক করে দেবে।

শিবানী বলল, না জেনি সেভক্স নয়। আমার চাকরী করতে ভালো লাগে না।

বিষয়মুখে জেনি বলল, আমি জানে তুমি ধনী-লোকের স্ত্রী আছো।

হ্যাঁ, সেইজন্মই তো চাকরী করা।

না, আমি বুঝতে পারছি সে জোজ্বই তুমি কাজ কোরবে না। দরকার না থাকলে কোরবে কেন। এখনই ছেড়ে দেবে?

না। কবে ছাড়ব ঠিক বলতে পারছি নে।

আমার খুব খারাপ লাগবে তুমি চলে গেলে।

আমারও তোমার কথা খুব মনে হবে—বলেই হেসে শিবানী

বলল, এমন দুঃখ-দুঃখ মুখ করে আমার! চিরবিদায়ের সুরে কথা বলছি কেন মিস জেনি বল তো? তুমি আমার ছাত্রী। তুমি যাতে বাংলা বলা ছেড়ে না দাও, তুলে না বাও—এ যে আমার দেখতেই হবে। আচ্ছা, মিস জেনি বলত আমার বাড়িতে যদি আমি একটা বাংলার ক্রাশ খুলি তবে কেমন হয়? তুমি ছাত্রী যোগাড় করে আনতে পারবে না?

উৎসাহে লাফিয়ে উঠল মিস জেনি—সে বেশ হবে। অনেক নিয়ে আসব আমি ছাত্রী।

অত উৎসাহ বোধ করা না মিস জেনি, ছাত্রী যোগাড় কাজটা সহজ হবে না। তাদের আসবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে আমাদের। কি করে ওদের উৎসাহিত করা যায় বল তো? যারা নিঃশ্রমিত ক্রাশ করবে তাদের ভালো ভালো শাড়ি উপহার দেব আমরা—কেমন হয়?

মিস জেনি হাসিমুখে বলল, শাড়ি! ওং, সে বড় সুন্দর উপহার—লাভনীর উপহার হবে। দেখবে দলে দলে ছাত্রী আসবে তোমার কাছে। আমি তো একদিনও গর-হাজির হোব না। রাতনো নখে ববচুলের ভেতর হাত ঢালাতে-ঢালাতে বলল, কিন্তু এই ববচুলে শাড়ি ভালো লাগে না। থোপা করব তোমাদের মতো চুল রেখে। তোমাদের শাড়ি আর থোপা দুটোই ভারী সুন্দর জিনিস মিসেস সেন।

তুমি যেদিন মিস থেকে মিসেস হবে সেদিন তোমাকে থোপা বেঁধে বেনারসী পরিয়ে দেবো আমি—

খুশিতে বলমূল করে উঠল মিস জেনি। বলল, তোমাদের কনে-পোষাক সত্যি বড় সুন্দর। আমিও বিয়ের সময় তোমাদের পোষাক পরব। তুমি করে দেখে—ঠিক?

ঠিক। শিবানী কলম খুলে কাগজপত্র কাছে টেনে আবার কাজে বসবার যোগাড় করতে লাগল।

মিস জেনি টাইপ মেশিনের ভেতর কাগজ ঢোকাতে-ঢোকাতে বলল, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে মিসেস সেন তুমি আর অফিসে আসবে না।

না মিস জেনি—আরো কিছুদিন আমি কাজ করব।

অফিস থেকে ফিরে বেশ তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো শিবানী।

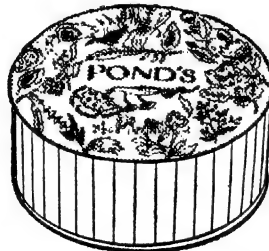
শিবানী এখন নিঃসঙ্কেটে গিয়ে সোজা ইন্ট্রনাখের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার বিছানার সুরে পড়ে অনর্গল কথা বলে যায়। অফিস, অফিসার, মিঃ বোস, মিস জেনির কথা থেকে দরোয়ানটার বৌর অন্তর, বেয়ারাটা বোকা ওর দেশের জমি ওর ভাই ঠকিয়ে নিয়েছে, কোরাণী স্বধীরবাবু শালীর গানের মার্কটারের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার কথা, কিছু বাদ থাকে না।

উড়বার মুখেই যেমন চড়ুই পাখিগুলি কেবল এ-ডালে, ও-ডালে, সে-ডালে উড়ে উড়ে বেড়ায় শিবানীর কথাগুলিও যেন তেমনি মনের সুরে কেবল কথার এ-ডালে, ও-ডালে, সে-ডালে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ইন্ট্রনাথ অভিনিবেশ সহকারে কখনো সিগারেট টানতে টানতে, কখনো ডিকের গেলোসে শাশু চুমুক দিতে দিতে শুনে চলে। হঠাৎ মাঝপথে



## পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডারে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল - মনোরম মুখশ্রী

পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডারে আপনার রং একেবারে অকৃত্রিম দেখাবে—মুখশ্রী হবে আশ্চর্য উজ্জ্বল। এই পাউডার মুখে পড়ার পর আলতোভাবে লেগে থাকে—কখনও জেবড়ে যায় না বা দাগ পড়েনা; মুখের এতটুকু দোষত্রুটিও লম্বন্ধে নিখুঁতভাবে ঢেকে রাখে। পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার হালকা ও মিহি—রকমারি রঙের পাবেন। একবার মাখলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার মুখখানি লাভণ্যে মনোমুগ্ধকর থাকবে।



## পণ্ডস

ড্রীমফ্লাওয়ার  
ফেস পাউডার

সীলিত-পণ্ডস ইন্স (সীলিত হয়ে থাকিল মুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

হয় তা শিবানী হেসে উঠে বলে, কেমন সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেছি আমরা। তাই না?

ইন্দ্রনাথ বলেছে, তোমার কি এতদিন আমাদের সম্পর্কটাকে মিথ্যা মনে হয়েছে?

একেবারে। ইন্দ্রনাথের মাথার লম্বা লম্বা চুল হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে শিবানী বলেছে।

তখন ইন্দ্রনাথকে ঘেন কিছু আনমনা দেখিয়েছে। আবার বলেছে যে, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে তখন আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটাকে তোমার?

হ্যাঁ, একেবারেই মিথ্যা মনে হয়েছে। শিবানীর এই জবাবের পর ক্রমে উপর দিয়ে হেসে যাওয়া একখণ্ড কালো মেঘের মতো একটা মেঘের ছায়া যে ইন্দ্রনাথের চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেছে তা শিবানী দেখে নি বা দেখেও না দেখার ভাগ করেছে। ইন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় কি ওর মনেই নেই।

ইন্দ্রনাথ বলেছে, আমার জটী ঘটতে পারে। তখন আবার ফের তোমার আমাদের সম্পর্কটা মিথ্যা মনে হবে।

হাওয়ার শুকনো পাতা স্বরাবার মতো ঘর ভরে কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন শিবানী। বলেছিল, বাঃ, যা-তা বলে সম্পর্ক যা-তা হয়ে যাবে না? চাল-চলন ব্যবহার স্বত শোভন হবে ততই না সম্পর্ক সুন্দর হবে। মা-বাবা, ভাই-বোনের যে রক্তের সম্পর্ক তাই মিথ্যে হয়ে যায় যদি ব্যবহার না জানে, আর এতো পাতানো সম্পর্ক। যাবে না মিথ্যা হয়ে তুমিই বোলা? রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে কি লিখেছিলেন জানো? লিখেছিলেন, দ্বীর সঙ্গে ব্যবহারেরও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে তা জানতে হবে তোমাকে। জানতে হবে দ্বীর জীবনযাত্রার বিভিন্ন খণ্ডে স্বামীকেই বোগাতে হয়। জানতে হবে, স্বামীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তিতেই দ্বীর ইচ্ছা বা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনবোধের সমাপ্তি ঘটে না। তার মন বলে একটা নিজস্ব মন আছে। সে মনকে পাওয়া বা হারানোর প্রশ্ন আছে—

তোমার মুখস্থ!

কোথায় মুখস্থ। একি মুখস্থ বললাম। যেমন যেমন মনে এলো বলে গেলাম। বেশিটাই ভুলে গেছি। আচ্ছা আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা পড়ে শোনার বন্দন। দেখো কি অপূর্ণ চিঠি। জীবনটা স্মরণ করে তোলা যে একটা সন্ত সাধনার ব্যাপার—যেন সেই সাধনার বাণী ঐগুলি।

বাণী মাহুঘের মনে স্থায়ী কাজ করে বলে তোমার মনে হয়? ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রেখেছিল শিবানী। আঙুলে বলেছিল, হয়।

আমার হয় না। ইন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে বলেছিল। পাণ্টা প্রায় করেছিল শিবানী, বীজ থেকে গাছ হয়? প্রশ্নটা ধরে উঠতে না পেরে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, বৃক্ষতে গায়লাম না প্রশ্নটা?

সোজা তো। বৃক্ষতে না পারায় কি আছে। বীজ থেকে গাছ হয় কি না বল না।

হয়।

হলো না। এক কথায় ওভাবে বীজ থেকে গাছ হয় বলা চলে

না। মাটি সরেস না হলে বীজ থেকে গাছও গজায় না, ফলও মেলে না। মনোবীদ্যের বাণীও সেই রকম। যে ক্ষেত্রে পড়ে সে ক্ষেত্রটির ওপর নির্ভর করে—ক জ হওয়া, ফল মলা। কাজেই যদি না আসত তবে মনোবীদ্যের বাণী আঁস্কাবুড়ে ফলে দেবার জিনিস হতো।

আমার জমিটা কি তোমার তৈরি জমি মনে হচ্ছে।

দুট্টা চোখে মিটি মিটি হেসেছিল শিবানী। বলেছিল, জমি সব সময় তৈরি না-ও পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় তৈরি করে নিতেও হয়।

শিবানী জানে না ইন্দ্রনাথ সেদিন মনে মনে বলেছিল কি না যে, তাই নাও শিবানী। কিন্তু হঠাৎ আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ শিবানীকে।

তব্বত করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে আজ শিবানী ইন্দ্রনাথের ঘরে সোজা ঢুক গেল না। গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি নেই। তার মানে ইন্দ্রনাথ এখনও ফেরে নি। মিঃ বোস এসে যে ওর কাজের মনোযোগটা নষ্ট করে দিয়েছিল, তারপর আর শিবানী কাজ করতে পারে নি। গোটক'র চিঠির জবাব লিখে মিস জেনির হাতে দিয়ে পাঁচটার আগেই চলে এসেছে।

জান করল শিবানী গুনগুন সুরে গান করতে করতে। প্রসাধন করল বারান্দায় বসে পিঠে চুলের বোঝা ছড়িয়ে কাচির সঙ্গে গজ করতে করতে। তারপর একটা বই নিয়ে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বসল, দে কাচি আর এককাপ চা দে। আর আলোটা জ্বলে দিয়ে যা।

কাচি আলোর নুইটে টিপ দিল। নিম্ন আলো বার হুই দপ দপ করে জলে উঠল। শিবানী বই মেলে বসল আর কাচি গেল চা আনতে। কয়েক পাতা পড়ে চোখ তুলে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে বইল শিবানী। রাস্তার বাতিগুলো একসঙ্গে জলে উঠল। এবার সন্ধ্যা হলো। হাতের বইটা রেখে উঠে শিবানী গিয়ে রেলিং ধরে ঝাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথ এলে আজও তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে। ললিতাদের বাড়ি থেকে দেরি বরে এলে প্রতীক্ষারত ইন্দ্রনাথ সেদিন বেলাবে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর ওর মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো বড় দেওয়া আর কিছু নেই।

কাচি চা এনে দিল।

এতক্ষণে তুমি চা নিয়ে এলি।

যেন কেউ গুনে ফেলবে এমনি চুপি চুপি গলায় কাচি বলল, নতুন ম্যানেকারবাবু কোনদিনও চা'র সঙ্গে কিছু খান না। দিলেও ফিরিয়ে দেন। আজ বলে পাঠিয়েছেন কিছু খাবার পাঠাতে। আবহুল বলল, দুপুরে নাকি খাওয়া হয় নি ম্যানেকারবাবু।

কেন?

তা বলতে পারব না। কিন্তু তোমার বাড়িতে মা কেবল কেক-পেটি, বিস্কুট-ক্ৰী—ও সব কি ডায়েটের ক্ষিণে মেটে। তোমাদের বাবুটি স্বত রান্নাই আচ্ছ লুচি ভাজতে জানে না। দিলাম আমি চট করে ক'খানা লুচি জেজ। তোমাকে এনে দি যা, গরম হু'খানা?

গরম লুচি যদিও বাসি লুচির মতো লাভলি নয়, তা—নিম্নে আয় হু'খানা।

লাভলি শব্দটির তথ্য না বুঝলেও ওটা যে প্রশংসাসূচক শব্দ এটা জানে কান্দি। বলল, তোমার যা—কথা না। বাসি লুচি গরম লুচির চাইতে ভালো এমন কথা শুনি নি।

তুই কি করে শুনিবি? রমলকে চিনিস তুই? তার কথা শুনেছিস তুই?

রমলা গরম লুচির চাইতে বাসি লুচিকে ভালো বলে? এমন মেয়ে তো দেখি নি বাবু।

তুই দেখবি কি করে। এ মেয়ে তো ভগবানের সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিকের সৃষ্টি। তাকে দেখতে হলে পড়তে-জানতে লাগে—তা সাহিত্যের ভালো লাগা আর বাস্তবের ভালো লাগা সব সময় এক নাও হতে পারে। তাই গরম লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার আগে নিয়ে আয়।

কান্দি চলে গেল।

শিবানী চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ফের গিয়ে রোয়ার বসল। মনের ভেতরে একটা চঞ্চলতা যেন হঠাৎ আদ্য-বাওয়া লাগিয়ে দিয়েছিল। কক্ষণটা ভালো নয়। ইন্দ্রনাথের এবার এসে যাওয়া উচিত। এতটা দেরি এর ভেতর আর সে করে নি।

মেমসার্ব—আবদুল এসে সেনাম দিয়ে জানাল, ম্যানেজার সাহেব বসলেন সাহেব খবর দিয়েছেন একটু দেরি হতে পারে আসতে।

যা বাস্তবের গোকা হয়ে গেল শিবানীর। কিন্তু এট মুহূর্তে যে ভেতরটা ওর জলে উঠল ত—আর কিছুই জ্ঞান নয়, ইন্দ্রনাথের সাদারণ ভব্যতটুকুর অভাবে। ম্যানেজারের মুখ খবর পাঠানো। আজ তার মাথায় ফের এসে শয়তান ঢেপেছে। তাই সাহস হয় নি চিঠি লিখবার। নিজেকে সন্তুষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার কোথায়।

আবদুল জানাল, হলঘরে চা খাচ্চেন।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আবদুল চলে গেল।

শিবানী যে কিছু ভাবতে লাগল তা নয়। চূপচাপ শুধু বসে রইল। একবার কেবল তার মনে হলো কান্দি নিশ্চয়ই আবদুলের কথা শুনেছে। নইলে গরম লুচি নিয়ে আর এলো না কেন। প্রথমে ভেবেছিল ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাবে। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে নিজেই নীচে নেবে গেল সে।

অরুণ তখন সাবমাত্র প্লট কাছে টেনে থাবার উন্মোচন করছিল, শিবানীকে দেখে প্লট থেকে হাত টেনে নিয়ে উঠে পাড়ালো। তারপর হুঁতাত এক করে নমস্কার জানালো।

অরুণের সারিনয় নমস্কারের বিনিময়ে অতি সংক্ষেপে দায়সারা ভাঙতে একটা প্রতিনমস্কার দিল শিবানী। এমন দায়সারাভাবে নমস্কারের বিনিময় কিছুটা অহঙ্কার প্রকাশের জন্মই করল শিবানী। আজকের এই আসাটা তাকে ছোট করছিল। সে বড় হলো।

অরুণকে সে এর আগে দেখে নি। সে শুনেছে

নতুন ম্যানেজার বা ইন্দ্রনাথের নতুন শি এর কথা—যাস, এই পর্যন্ত। এই প্রথম দেখল। দেখে অবাক হল। প্রথম ধাক্কার অবাকটা অবজ্ঞা শিবানীর অরুণের পোষাকের উপর দিয়েই গেল। ধৃত, পাঞ্জাবী-পরা চপ্পল পায়ে এমন বাড়াকী ছেলেকে ইন্দ্রনাথের ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত দেখবে, এটা আশা করে নি। তারপর অবজ্ঞা অরুণ ওকে অনেক বিস্মিতই করল।

থাওয়া ফেলে উঠে পড়েছে—আর একটু সময় পার করে আসা উচিত ছিল ওর। কিন্তু ম্যানেজার সাব চা খাচ্ছেন—আবদুলের এ কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু এখন আর—আচ্ছা, আপনি খেয়ে নিন। আমি পরে আসছি বলে শিবানীর চলে যাওয়া চলে না। যেনাবে এসে ঘরে ঢুকছে, ঠিক সেইভাবে কাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা না করলে ফিরে গিয়ে ঘরে এসে আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, ও যা জানতে চায়। ও জানতে চায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ম্যানেজারের বাড়ি ফেরবার আগে কখন দেখা হয়েছিল। কিছুই না। কোন মানে নেই এ জিজ্ঞাসার। কোন সম্মান নেই এ জিজ্ঞাসার। তবু যে শিবানী এটা জানবার জটাই এসেছে, একেবল ওর অর্ধদৈর্ঘ্য চরিত্রের প্রতিক্রিয়া। উত্তেজনা ঘটলে কিছু না করে ও শাস্ত থাকতে পারে না। কাঁচটা আত্মমর্মানীয় বাদছে, তাই আত্মমর্মানীকে সে অহঙ্কারের বর্ম দিয়ে আবৃত করে রেখেছে।

অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ সেনের সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছে?

আমি বাড়ি আসবার আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলাম অফিসে।

আপনি কখন বাড়ি এসেছেন?

আধঘণ্টা হবে।

মিঃ সেন আপনাকে যে সংবাদ আনায় রিতে বলেছিলেন সে সংবাদটা নিজে গিয়ে না দিয়ে বেয়াড়াই দিয়ে বলে পাঠালেন কেন?

অরুণ সোজা হয়ে পাঞ্জাবীর হুঁ পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে কাঁড়িয়ে বলল, দেজলু আমি সত্যি হুঁখত।

মিঃ সেন কোথায়?

আমি যখন এসেছি তখন পর্যন্ত অফিসে ছিলাম।

এ পর্যন্ত একেবল ছিল। এবার মাত্রজ্ঞানকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিল শিবানী।

**গোপাল বাবুর**

**বিখ্যাত :- বাতের ওষধ**

বাতের যন্ত্রনা কি কষ্টদায়ক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন সর্ব প্রকার বাত যে কোন স্থানে হোক না কেন ২/৩ দিবসে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। বহুপ্রকার চিকিৎসা করাইয়া যাহারা হতাশ হইয়াছেন একবার পরীক্ষা করুন।

হেড অফিস :- **গোপালপুর আয়ুর্বেদ ফার্মেসী**।

পো:- গোপালপুর, জেলা-২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

কলিকাতা ট্রিকিট **শঙ্কর ফার্মেসী** ৪ নং ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ।

কলিকাতা-৪ ফোন- ৩৫-২১৫০

মি: সেনা একা কোথায় গেছেন আপনি বলতে পারেন ?

অরুণ চপ।

তার মানে অরুণ জানে কিন্তু বলতে বিধি কনছে ? খুবই আশঙ্কিত। শিবানী গভীর গলায় বলল, আপনি জানেন কি— তিনি কোথায় গেছেন ? জানাল বলুন। যেন গলায় গাভীর চাপে অরুণের ঘিধাকে ঝাড়িয়ে দিতে চাইল।

কিন্তু অরুণ তেমনি দ্বিধ তার গাড়িতে রইল।

এর মানে কি ? অরুণের না বলটা বিধান ? সে জানে কিন্তু বলবে না—এই বোঝাতে চার সে ? মাথার ভেতর যেন আগুন অলে উঠল শিবানীর। কঠিনকণ্ঠ বলল, আমি জানতে চাইছি—আপনি বলুন। যেন আদেশ করল শিবানী।

এবার একফণে খুব স্পষ্ট করে শিবানীর দিকে একবার তাকাল অরুণ। তারপর চোখ ফিরাই নিয়ে শাড়িগলার বলল, তা হয় না।

তা হয় না !! উত্তরটা'র যেন ভয়ে গেল শিবানী। বিমুঢ়ভাবে তাকিয়ে বইল অরুণের দিকে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরই দুটপারে বাটবের দিকে যেতে যেতে আদেশ করল অরুণকে, আগুন আমার সঙ্গে—রাস্তার এসে টাঙ্গ করবে—দরবারের গতিতে এ কোর নিয়ে আঁচলটা শস্তমুঠিতে ধরে হল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল শিবানী।

কিন্তু ধামতে হ'লো তাকে, গাড়ি-বারান্দার ইস্ত্রনাখের প্রকাণ্ড ডিমলাটা। আজ নিজের গাড়ি ছেড়ে নিয়ে বেরিয়েছেন ইস্ত্রনাখ। তারপর খুঁটটা বাদ দিয়ে চেপে ধরল—তারপরে প্রাশস্ত গাড়ি-বারান্দার সিঁড়িগুলি টপ টপ করে নেমে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে গাড়ি অরুণকে বলল, আপনি গিয়ে উঠে বসুন। মি: সেনাকে বিশেষ জরুরি দরকার আমার। আমার সেখানে নিয়ে যাবেন।

অরুণ একফণে কিছুই বুঝিল না। কেবল নীরবে শিবানীকে অনুসরণ করছিল। এবার নির্দেশ শুনে শুভ হয়ে গাড়িতে রইল। কিন্তু গাড়িবার সময় ছিল না। ড্রাইভার ছুটে ছুটে এসে হাজির হয়েছে। শিবানী উঠে বসেছে। অরুণকেও সামনের আসনে গিয়ে উঠে বসতে হলো।

ড্রাইভার গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইলো কোথায় যাবে।

শিবানী অরুণের পেছনের দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে থেকে আদেশ করলে, বলুন কোথায় যাবে।

এক মুহূর্ত—

তারপরই ড্রাইভারের আসনের দিকে সরে আসতে আসতে অরুণ বললে, আপ উভার জাইয়ে লাগাজী। হাম্ চালায়েজে।

[ ক্রমশ।

## শেক্সপীয়ার প্রসংগে

অল্প প্রদেশের কথা সঠিক বলতে পারব না তবে বাংলা দেশের ও সার্বভৌমত্বের কথা কিছু বলতে পারব। মহাকবির প্রভাব উন্নত ও বিশ শতাব্দীর রচনার নানান ভাবে পড়েছে। মহাকবির সম্পর্কে বিভিন্ন পন্থার আলোচনাও কম হয় নি। মোটামুটি বাংলা সার্বভৌমত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে তিনটি ভাগে বোঝা হতে পারে। প্রথম মহাকবির রচনা অমুখ্য, 'হীরা' মহাকবির উপর রচনা, তৃতীয় মহাকবির রচনার প্রভাব প্রভাবিত রচনা। এই সমগ্র যোগাযোগটিকে বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার চর্চা বর্ণে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলা দেশে শেক্সপীয়ার সোপাইটিও কম দিন স্থাপিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে একটি বিচিত্র ঘটনা মনে আসছে। আমি সুপরিবারে কলকাতার বসবাস করছি ১৯৪০ সাল থেকে। সেই সময়েই যে পাড়ার প্রথম বাসা কবেছিল সেটি পাড়ারই একখানি বাড়িতে একটি মার্বেল ট্যাবলেটে কালে অক্ষর লেখা দেখেছিলাম—শেক্সপীয়ার সোপাইটি। ট্যাবলেটটি সেই ১৯৪০ সালেই প্রাচীন হয়ে এসেছিল। বাড়িটাও পুরানো, ভীর্ণ হয়ে এসেছে। তাইই একতলায় দরজার পাশে, রাস্তার ধারেই ট্যাবলেটখানি। তাতে তখন মসলা হয়েছিল, খোঁদিত অক্ষরের মধ্য থেকে কালো মসলা জারগার জরগার উঠে গিয়েছে মোট কথা সেই ১৯৪০ সালেই সে যথেষ্ট প্রাচীন হয়েছিল। শেক্সপীয়ার-চর্চা বাংলা দেশে যে পরিকল্পনা মত কিছু আরম্ভ হয়ে ছিল তা নয়। সহজ স্বাভাবিক চিন্তের আবেগের ও স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তার মধ্য দিয়েই সে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বিভিন্ন পন্থেই বিভিন্ন জন আলোচনা করেছেন।

—তারাপদ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

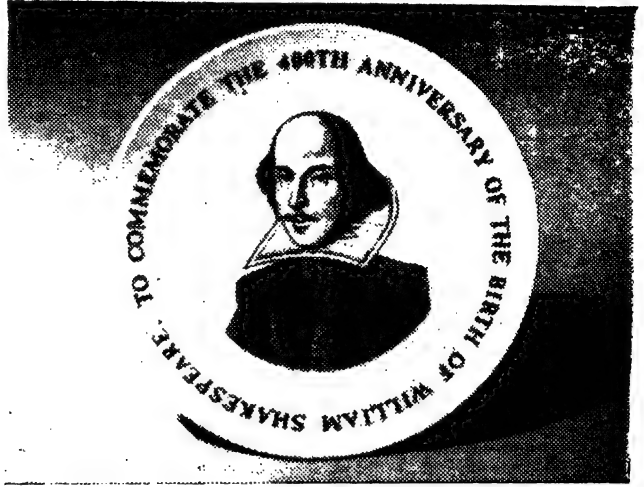
কোনো বিশেষ ভাবার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও একটি বিশেষ কবির কাব্যের বসাবাস করবার পক্ষেও ...সমালোচনা তেমন অল্পকূল নয়। গেরবিনুস (Gervinus) অথবা ডাউডেনের (Dowden) সমালোচনা পড়ে কতন পাঠক শেক্সপীয়ারের কাব্যের বসগ্রাহী হয়েছেন। জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ফ্রেডে কাব্যসমালোচকদের বিজ্ঞপ্তি করে বলেছেন: পৃথিবীতে কোনো দেশে কোনো কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্বভৌমত্বের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে, না, লোকমতে বাবা বড় কবি বলে গণ্য ও শ্রদ্ধা, তাঁদের সখ্যক্রে তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ ? ইতালীতে দাড়ে ও বিলাতে শেক্সপীয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ। শেলি শেক্সপীয়ারের ফিলসফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত না আলোচনা হয়েছে। এমন কি ফিলসফি অব রাবীন্দ্রনাথ নামক একটি গ্রন্থ আছে। অপরপক্ষে উপনিষদ, কাব্য কি দর্শন, তা আজও মনীষিবৃন্দ ঠিক করতে পারেন নি; আমাদের নিত্যকর্মের ভাবার সঙ্গে কবির ভাবার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদপত্রের ইংরেজি ভাষা ও শেক্সপীয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে কোনো সংবাদপত্রের একপৃষ্ঠা পড়ার পরে শেক্সপীয়ারের নাটকের একপৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রত্যয়মান হবে। [ ১৯২৭ ]

—প্রমথ কৌমুদী



# নামে কি যায় আসে

জ্যোতিপ্রসাদ বসু



শেক্সপীরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় Lamb লিখিত শেক্সপীরের বচনার সারাংশ কাহিনীর মাধ্যমে। তার কলে শেক্সপীরের অমর রচনাবলীর আখ্যানভাগটুকু আমি আরও করতে পেরেছি, কিন্তু তার প্রকৃত সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয় নি। সাহিত্যের প্রতি অগ্রগণ্য আমার এমনিতেই অল্প, ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি ত' বটেই। তাই, আমাকে অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে, শেক্সপীরের সম্পর্ক কোনও প্রাঙ্গণ আমার করলে আমার অবস্থা পাঁড়াবে অনেকটা ল্যাঞ্চেই মত। যে ল্যাঞ্চার বানান ছোট হাতের ১ দিয়ে।

Lamb-এর দয়ার বেগুন শেক্সপীরের প্রধান প্রধান কাহিনী ও চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা জন্ম গেছে, তেমনই লোকমুখে শুনতে-শুনতে শেক্সপীরের হুঁটে-চারটে নাটকের উদ্ভব ও আজ আমার কঠিন। সময়ে-অসময়ে সেগুলি আমি কাজেও লাগিয়ে থাকি। যেমন ধরুন—কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পাঁড়িয়ে 'টু-বি' বাসের দিকে তাকিয়ে জ্বরের কথাকার শিবরাম চক্রবর্তী'র ভঙ্গিতে আমার মনে পড়ে যায়—'টু বি আর নট টু বি'—শেক্সপীরের সেই এক অবিমরবীর উক্তি। কোন নাটকে, কি পরিবেশে, কোন নায়কের মুখ থেকে এই বাণী নিঃসৃত হয়েছিল, সে প্রশ্ন আমার করলে আমার অবস্থা হবে সেই ল্যাঞ্চার মত বার বানান ছোট হাতের ১ দিয়ে। কিন্তু কেন জানি না কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পাঁড়িয়ে উদ্ভট আমার মনে পড়ে বাবেই। 'টু-বি' বাসে বাবো কি বাবো না, এই প্রশ্ন মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গে Lamb-এর বইয়ের প্রথম পাতার আঁকা শেক্সপীরের ছবিটি আমার মনে জগজগ করে উঠবে।

সেই চিন্তার আমি যখন মগন, হুঁটে একটা বাস সেই কীকো চলে বাবে আমার নাকের সামনে দিয়ে। তারপর হঠাৎ আমার সখিৎ কিংবদন্তি নিজের দেহটাকে কোনমতে ঠেসেচুলে নিষ্ক্ষেপ করণ সামনের বাসটির মধ্যেই। আরকাল ট্রামে-বাসে নিজে থেকে ওঠা-নাশা ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে নিষ্ক্ষেপ করতে

পারলে ওঠা-নাশা, এলিভেটরের সাহায্যেই যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়।

বাসের মধ্যে কলেজ-ইউনিভার্সিটি ফেরত ছাত্র-ছাত্রীদের বেগম ভিড়ে শেক্সপীরকে আবার মনে পড়ে, এদের চোখে রোমও জুলিয়েট বা এ্যাণ্টনি-ক্লিওপেট্রা বা ট্রান্সল্যান্ড-ফ্রেসিডার ছাড়া দেখে। এরা নিশ্চয়ই শেক্সপীরের পড়ে। অধ্যাপকদের নিবল কচকাচিতে তেঁতো হয়ে বাওয়া লেবুর মতই শেক্সপীরের বান এদের পিপাসাত বসনার। ঠিক আমাদের কালেরই মত। হলিউডের সেন্স-গ্যাপীলার ফরমুলার ফেলা। শেক্সপীরের ছবি এরা হরত এখন দেখে ছ ১০০

চল্লিশ জন বসবার ভাংগার চারশো জনের অকথা চাপাচাপিতে খাসকন্ড ককনের মত এই বাসে চল্লিশ-এর চোখ দিয়ে চারশো বছরের পুরণো শেক্সপীরকে দেখার চেষ্টা কার আমি। কেবল সে যুগের চামড়া-খাঁটে জামা, ছুঁচোর মত সরু মুখ জুঁতা এদের আবার স্পর্শ করেছে। অতীতের শোশাকে এরা যেন বর্তমানে থেকেই ফুঁত হয়ে বাচ্ছে।

এ যুগের বার। তরুণ তারা ববীন্দ্রনাথকে দেখে নি, জবে ববীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মশতবার্ষিকী দেখেছে। ঠিক তেমনই শেক্সপীরকে আমরা কেউই দেখি নি। তাঁর চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী দেখছি। প্রথম শতবার্ষিকীতে ববীন্দ্রনাথকে বতখানি চেনা গেছে (১) জন্মের হিসেবে শেক্সপীরকে তার সিকভাগও কি আমরা চিনতে পারব? অবচ, শেক্সপীরের চতুর্থ-শততম জন্মের ৩৩ এদেশের বালখিলাদের আগ্রহের সীমা নেই। টম-ডিক-স্টার এমন কি আন্ত উৎসাহী পল্লভাও শেক্সপীরের সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে। এ যেন জন্মের তগবানবন্ত অধিকার। শেক্সপীরকে নিজের নামজাকে কতখানি কাজে লাগানো যায়, তার জন্য এদের মধ্যে ব্যাকুলতা শেক্সপীরের ট্রাজেডিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

অবচ, এই নাম সম্পর্কে কত উগাশীন ছিলেন শেক্সপীর। তিনিই বলেছেন, নামে কি যায় আসে। তাঁর চতুর্থ-শততম

শ্রদ্ধাবাসরে তাঁর আত্মা যদি উপস্থিত হ'ত তা হলে বুঝত যে এ যুগে নামই সব, নামের জগ্গাই থাকিছু। নাম-মাহাত্ম্যই আমরা খোঁচে আছি এবং নামের ভগ্ন যতদূর সম্ভব নামতে রাখি আছি আমবা। নামে গিয়ে নাম করতে পারাই এখন জীবনের চরম সার্থকতা।

কি নাম হবে, কি হবে নাম হবে, এই হল জীবনের প্রদোষ ও অপরাধে আমাদের—বিশেষত বাঙালী—একমাত্র চিন্তা! আজকে যে কোনও নবজাতকের নামের ব্যয় দেখলে আমার চমক লাগে। যত ছলা-কলা আর বাতাসের আমাদের শুধু নামমই। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সিনেমা—সবকিছু থেকে বেছে বেছে আমরা নাম রাখি। এই নাম দিয়ে যেন নামাবলী তৈরি করছি আমরা।

এত নাম, এত বিভিন্ন ধরনের নাম কোথা থেকে আসে? শুধু ব্যক্তিগত নাম নয়, দাকনের নাম, বাড়ির নাম, ব্যবসায়ের নাম, পত্রিকার নাম, উপস্থানের নাম, পোষা পশুদের নাম—নামের আর অন্ত নেই, অন্ত নেই বৈচিত্র্যের, বর্ধকৃত বল্লভার। অনেক ফেদে, এমন দোকান বা বাড়ি বা ব্যবসা বা পত্রিকা—একটা নাম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে রাখতে হয় আর একটি নাম লাগবে। দু'ভাগ থেকে তিন ভাগ, তিন থেকে চার—একমু লেতেই থাকবে। নামত্যাগ সাইতাবে নাম ভেঙেও শেষ করে উঠতে পারবেন না আপনি।

শুধু নামকরণেই নামের শেষ নয়। পরবর্তী জীবনে চলবে নাম নিয়ে কেনাবেচা। এ বাজারে সুনামের চেয়ে দুর্নামের দর বেশি। ওতে তাড়াতাড়ি ফল দেয়। কতটা নাম, সুনামটো হোক আর দুর্নামটো হোক, আপনি কিনতে পারলেন তার ওপরই নির্ভর করবে জীবনের সাক্ষ্য। যেমন করে হোক একবার নাম কিনতে পারলেই হ'ল। তারপর সেটা বেচেই চলবে। আপনি যত বেচবেন আপনার অধস্তনেরা তত কিনবে, কিনে কিনে তারা ওপরে উঠবে। আপনাকে বেয়ে বেয়েই উঠবে। এমনই করে চলবে পরম্পরা।

এমন করেই চলেছে; সত্যি বলতে কি নাম ভাঙিয়েই আমাদের থাকিছু। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে দিকপালেরা জন্মেছিলেন তাঁদের কীর্তির প্রসাদে আমাদের এখনও কোনোমতে চলেছে। তাঁদের শতবার্ষিকী নিয়ে তাই আমবা উঠে-পড়ে লাগি। শতবার্ষিকীর নাম শুনে আমরা স্থির থাকতে পারি না। (সৌভাগ্যের কথা যে, আজকাল প্রতি বছরেই একটা-না-একটা শতবার্ষিকী লেগেই আছে।) তখনি তার জন্ম সমিতি, উপসমিতি, টালা, সরকারী খয়রাতি, নাচগানের আদর, স্তব্ধনিয়মের বিজ্ঞাপন আলোচনী ইত্যাদি বাঁধা ফরমুসার কাজ শুরু করে দিই। তাই শেক্সপীয়ার 'বিদেশী' হলেও তাঁর চারশতম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের প্রবল উৎসাহ। তার ওপর তিনি ছিলেন নাট্যকার। এতে আমাদের বড় সুবিধে। নাচগানের আসর জমাতে একটুও সময় লাগবে না।

কিন্তু এই নামাবলীর দেশে শেক্সপীয়ারকে সন্মান করা যায় কি? সেইটেই এল প্রশ্ন, বিশেষ করে যে শেক্সপীয়ার লিখেছেন, নামে কি আসে? শেক্সপীয়ার নিজেকে কি নাম করেনি? তা না করলে তাঁর নাম ভাঙিয়ে আজ চারশো বছর পরেও আমরা টিকিট বেটু ছিঁকি করে, কি করে টালা তুলছি?

অজ্ঞা, শেক্সপীয়ার যখন ঐ উক্তি করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় বাঙালীর কথা জানতেন না, স্বতরাং ভবিষ্যৎ বাঙালীর কথা ভেবে তিনি লেগেন নি। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি তাঁর নিজের কথা ভেবেই করেছিলেন ঐ উক্তি। কারণ, তখনকার দিনে এমন একটা সন্দেহ খুব প্রচলিত হয়েছিল যে, শেক্সপীয়ার নামে কোনো লেখকই নেই আসলে ঐ লেখাগুলো শেক্সপীয়ারের গুরু ক্রিস্টোফার মার্লেয়ারিট। যেটো লিখক না কেন, লেখাগুলো যে অনবদ্য সৌন্দর্য্য বিমিত ছিল না। লেখকের আসল নামে কি যায় আসে?

সে যাই হোক, আমাদের কাছে এই নাম-সর্বস্ব বাঙালী জাতি কাছে নামই সব। নাম গানই আমাদের ধর্ম। ইষ্ট ও অশিষ্ট দুয়েই নাম আমাদের জুগ করতে হয়। অশীতের নাম ভাঙিয়ে এবং বর্তমানে সেই অশীতের নামকে ভাঙিয়ে আমরা করে থাকি। নাম করতে করতেই নিশেষ হয়ে যাব আমরা একদিন। তবে বৃহত্তর জগতে আমাদের নাম প্রায় শেষই হয়ে আছে বলেতে পারেন। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এক বিকিউজি প্রসঙ্গ ছাড়া আমাদের নাম ওঠে না বললেই চলে। সেটা ঈশ্বার জগুই বলুন, তাঁর জগুই বলুন আর যেকারণেই বলুন। মৈদিক থেকে বলতে গেলে আমরা নামমাত্র জাতিতে পরিণত হয়েছি বলা যায়।

ভেবে দেখবেন যে, নামেই আজ বাঙালী দেশ। কিন্তু তার অর্থ নৈতিক বনিয়াদে বাঙালী নেই। অর্থ নৈতিক কাঠামো থেকে যে বাক গেল, এ-যুগে তার আর কি থাকে? একদা যে বাঙালীর নামে গর্ব ছিল, আজ সেখানে শুধুই হজ্জা আর গ্লানি। সত্যিই শেক্সপীয়ার মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, নামে কি যায় আসে? নামে বাঙালীর শির, কিন্তু তার মালিক কে? সেখানকার শ্রমিক কে? নামে বাঙালীর সাংস্কৃতিকত্ব এই কোলকাতা শহর, কিন্তু তার জন্ম আর তার সৌখের প্রধান মালিকানা কার?

তবু, এখনও হয়ত ছিটকোটো ঐতিহ্য আছে, অধিকার আছে। যত শতবার্ষিকীর নম্রোগানে আমরা বিভোর হ'ব ততই আমাদের ভবিষ্যৎ ফর্সা হবে। তখন আমরা হ'ব বাঙালী জাতির নামান্তর মাত্র। সত্যিই কি তাই হবে? হুঁ বি আর নট হুঁ বি। তাই নিয়েই ভাবনা!

অসহায়, ষাটসকল ডেসাডিয়ানার মত টু বি বাসের গহ্বরে, বৈশাখের অপরাহ্নের ভাঙ্গাশয় গরমে, এটনি-ক্লিওপেটো, রোমিও জুলিয়েট আর ট্রুলাস-ক্রেসিডাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সেই প্রশ্নই আমার মনে আসে।

## প্রত্যয়ে প্রচন্দনসা

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কবিত্বক রবীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীশ্রু সাহা।

এটা ঠিক গল্প নয়। গল্পের নামান্তর।

আমার গল্পও অসংগঠিত। এক

উদীয়মান তরুণ লেখকের কাহিনী।

একটা বয়েস আছে—যে বয়েস গৌফ আর সাহিত্য একাধারে দেখা দেয়। সকলেরই সেই বয়সটা এসে থাকে, যথা সময়েই আসে, যখন সে সেফটি রেজর আর পার্কার কলম নিয়ে পড়ে। একসঙ্গে চর্চা করে দুয়েরই। গাল-গল্পের দিকে (গাল আর গল্প দু'দিকেই) ঝোঁক দেখা যায় তার।

কলেজ-জীবনেই এটা হয়ে থাকে। ব্যাণ্ডার লেজ খসে যেমন সে ব্যাণ্ড হয় তেমনি কলেজ-জীবনে (বা কলেজ ত্যাগের ঠিক আগেটায়) ছেলেদের প্রবীণত্বের ভেদ দেখা দেয়। সেইটাই তার সাহিত্য। সাহিত্য-সৃষ্টি।

যেমন আমাদের নামগের এখন দেখা দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটি গল্পও দেখা দিয়েছে। অনিবার্ণরূপেই।

গল্পটা যে আমার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে তার একটা নাম-করণের জন্ত। জুতসই একটি নাম দিতে হবে লেখটার। গল্প লেখা সহজ কিন্তু তার নাম দেওয়া নাকি তত সোজা নয়। ছেলেমেয়েদের নামকরণের সময় কেনন বেগ পান বাপ-নারা। কিন্তু তার আগে কি অতোটা উদ্বেগবোধ করে-ছিলেন? তেমনি গল্পের আনুদানির সময় খোঁজা থাকে না, খামখেয়ালে কলম চালাও কিন্তু পরে আনুদানির সময়েই চ্যাবা!



কিন্তু কি নাম দিই? লেখক আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, নামটা যেন যথোচিত হয়। ঠিকমতো নাম না হওয়ার জন্তই অনেক ভালো গল্পের বদনাম হয়ে থাকে। যেমন অনেক ভালো ছেলে, রূপে-গুণে নিখুঁত, শুধু কেবল বিচ্ছিরি নামের জন্তেই কোনো মেয়ের ভালোবাসা পায় না। দামোদর, গোবর্ধন, গদাধরচন্দ্রকে কেন? আধুনিক! ভালোবাসতে যাবে? আপনাবাই বলুন।

মানগের এই গল্পটা নাকি ভিটেকটিভ।

তাই অনেক ভেবে-চিন্তে—আপনারাও তাবুন—যদি, ধরুন, এটার নাম দেয়া যায়—

কে? কি? কবে? কেন? কোথায়?



রাত তখন তিনটে। কলিকাতা নগরী শুষ্ক। মাঝে মাঝে দূর থেকে দু-একটা ঘেয়ো কুকুরের আর্তনাদ ভেসে আসে। বাঁটের কনষ্টেবল বৃটের আওয়াজ করতে-করতে ডিউটি থেকে ফেরে। এমন সময়ে নিমন্তক মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে দেখা দেয় একটা লোক—কালো পোষাকে তার সবাংগ ঢাকা—এগিয়ে চলেছে। লোকটি একটা তেতলা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। হঠাৎ দূর থেকে এগটা তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ শোনা যায়। লোকটা দেওয়ালের সঙ্গে একেবারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁটের কনষ্টেবল ভজন সিং তখন পাহারা থেকে ফিরছে। লোকটা যদূর লজ্জব গা সেঁটে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। পাশের ঘুমানো কুকুরটা বা খেয়ে চাঁৎকার করে উঠল।

: কোন হায়? পরেশ দেখতে পেয়েছে। নিমন্তক.....

: কোন হায়?—পরেশ এগোয়, লোকটিও পেছায়।

: সুখদেও ভেইয়া হো.....!—পরেশ চাঁৎকার করে ওঠে।

শুড়ুম, শুড়ুম... পরেশের আর্তনাদ... নিমন্তক। বৃটের আওয়াজ—জানায় সুখদেও এসে গেছে। কিন্তু লোকটা—ভজন সে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

: কেয়া হয়, পরেশ ভেইয়া? সুখদেব প্রায় করে।

: সাহেব.....। পরেশের গোঙানি চিরতরে শুক হয়ে যায়।

: আরে! গোঁসি কিয়া! সুখদেও বিস্মিত হয়ে থানায় ছোটো।

: স্তার, ফের সেই ফিরিস্তি জন্ সাহেব ফিরে এসেছে। এর মধ্যেই সে একটা কনষ্টেবলকে খুন করেছে... রায়বাহাদুর বস্তুর বাড়িতে ডাকাতি করেছে। বহু মণি-মুক্তো রায়বাহাদুরকে হারাতে হয়েছে। ... লালবাজারের CID কমে বসে গিডেকটিং অধেন্দু মুখার্জীকে ডিপার্টমেন্ট হেডের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়।

: একটু মন দিয়ে চেষ্টা করুন। এবার যেন জন্ পালাতে না পারে।—হেড বলেন।

সাস্তুভেলী হোটেল। পুলিশের খাতায় এর নাম আছে। একটা কোণে ফরেট কনসার্ট বাজছে রেডিওতে। একটা যুজ্জ্বল শোনা যায়। এক ফিরিস্তি সাহেব ট্যাক্সি থেকে নেমে রেঙ্করেঙ্ক চুকে পড়লেন।

: বয়! কাফি। বয় ছুটল কিচেন-কমে। সাহেবের দৃষ্টি একটু অব্যাবহিকভাবেই যেন চারিদিক বোরাফেরা করছে। পাশেই দুটি লোক—দেখে সভ্য শ্রেণীর বলেই মনে হয়—নিয়ন্ত্রণে কথাবার্তা করছে। সাহেব কক্ষিতে চুমুক খুঁস, কিন্তু পাশের লোক দুটির কথা শুনেও তাঁকে বড় উৎসাহিত বলেই মনে হয়।

: না, আজ আর হবে.....। আজ জন্মের কাছে এখনই.....। একটা লোকের অশ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। লোকটা উঠে পড়ে, সাহেবও যেন অভিযন্ত হয়ে উঠে পড়ে। লোকটা বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে কি যেন বহলে। ... ট্যাক্সিও ছুটল। সাহেবও নিজের কারটার উঠে আগের ট্যাক্সিটাকে অনুসরণ করে। এমন সময়ে ঐ হোটেলের সামনে একটা ভিক্কুকে ট্যাক্সি ধামাতে দেখা যায়। ভিক্কু পিছনের সীটে উঠে বসে... ট্যাক্সি ড্রাইভার ভীষণ আপত্তি তোলে। কিন্তু ভিক্কুর হাতে একটা দশ টাকার নোট দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে তার দেহি হয় না।

: তাড়াতাড়ি, আগের ট্যাক্সিটাকে ধরতেই হবে। ... ভিক্কু বলে ওঠে।

: জী হজুর। ... বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার চাবি ঘুরায়। ছুটছে তিনটে ট্যাক্সি। ... কিন্তু শেষেরটা একটু পেছনে।

: আরো জোরে চালাও। ... ভিক্কু বলে ওঠে। ড্রাইভার পিছন ফিরে গাফা চামড়া দেখে অবাক হয়ে যায়। আগের ট্যাক্সির পিছনের নম্বরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও ... আরও কাছে। শুড়ুম... দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ট্যাক্সির সাহেব বেরিয়ে আসে। এমন সময়ে শেষের ট্যাক্সিটা গা ঘেঁসে সাঁৎ করে বেরিয়ে যায়।

: ওঃ জন্। আচ্ছা দেখা যাক কে হারে কে জেতে, সাহেবের মুখে একটু তীক্ষ্ণ হাসি মিলিয়ে যায়। তখন শেষের ট্যাক্সিটা বাক ঘুরে একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে।

পাশেই ফুটপাথের উপর একটা মোটর-সাইকেল... সাহেব তাতেই উঠে ষ্টার্ট দেয়। মোড় ফিরেই সাহেব দেখে দূরে আগের গাড়িটা ফের একটা মোড় ফিরল। সাহেব একহাতে মুখোশটা খুলে ফেলে দেয়। ... কিন্তু কখন পরে দেখা যায় আগের ট্যাক্সির পিছনে নীল চশমা পরে এক মাদ্রাজী মোটর-সাইকেলে এগুচ্ছে। ট্যাক্সি এসে থেমে যায় একটা সোতলা বাড়ির সামনে। সাহেব বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। মাদ্রাজীও মোটর-সাইকেল থেকে নেমে বাড়ির পিছন দিকে যায়। পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ছোট্ট একটা লন। তারপর বাংলা প্যাটার্নের একটা সোতলা বাড়ি। চারিদিক নিমন্তক। মাদ্রাজী হাতে ছোট্ট একটা ব্রাউনিং পিস্তল নিয়ে আস্তে আস্তে উপরে ওঠে। একটা বর, দরজা তোলানো... নাঃ, কিছু নেই। খুট, করে একটা আওয়াজ... মাদ্রাজী পিছন ফিরে দেখে সাহেব তার দিকে পিস্তল উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

: হালো, মাদ্রাজী। কি মনে করে এখানে? তোমার

ত আভিধির অভ্যর্থনা ঠিক ভঙ্গিভাবে হলো না বলে, সত্যি  
লজি, অত্যন্ত দুঃখিত। চোরের ওপর বাটপাড়ি করা  
নামার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সাহেব হো হো  
হয়ে হেসে ওঠে।

: কিন্তু জন, তুমি ভুলে গেছ যে তোমারও লীলা  
এখানেই শেষ। পুলিশ জেনে গেছে।

: कि व्रक्य ?

অধেন্দু জনের পিছনে তাকিয়ে যেন একই উপহাসের হাসি মুখে টেনে আনে। সন্দিগ্ধ জন পিছনে তাকায় বারেকের জন্ত। পাশেই একটা ঘর...দরজা খোলা। অধেন্দু চট করে চুকে পড়ে। অনু এবার হাসিমুখে দৃষ্টি ফেরায়...বিক্ত! অধেন্দু কোথায়?

জন্ বারান্দার নীচে দৃষ্টি ফেরায়...না, নেই ত'।  
ঘরে ঢোকে...

: হাওস আপ। এইবার তোমার পালা।—দরজার  
আড়াল থেকে বেরিয়ে অর্ধেক জনকে অবাধ করে  
দেয়।

: তুমি আমাকে ধরবে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ : হ্যাঁ । এমন সময়ে  
জন অবিবাহিতভাবে এক উল্টা-ডিগবাজি দেয়।  
গুডমু...না লাগে নি। জন্ তার ঠিক পছন্নের খোলা  
জানালা দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে একবারে নীচে।  
গরব্ব-ব-ব-ব্ব-ব্ব বৌ...মোটর আওয়াজ করে ওঠে।  
অর্ধেক জানালা দিয়ে দেখে একটা মনোপ্লেন শানিকট।  
ছুটে গিয়ে আকাশে উঠে পড়ে।

অর্ধেক ফোন ধরে... 'লালবাজার'। ... অর্ধেক টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াতে থাকে। একটা চিঠি...

মিষ্টান্ন জন, সুন্দরবন  
এখানে সব ঠিক । জাহাজ স্বর্ণমতীতে  
...ল্যাটিচিউড । ...লিটিচিউডে অপেক্ষা  
করছে । তাড়াতাড়ি এসো । ইতি—

ব্রহ্মোৎপত্তি ।

বাইরে মোটরের আওয়াজ। অর্ধেকু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

: আ রে অরুণ বে। ঠিক সময়েই এসে গেছো। এদের হাবিলদারকে দ্বিটো মার্চ করতে বল, আর তুমি দু'জন ভাল সার্জেন্ট নিয়ে আমার সঙ্গে-তড়াতাড়ি। অথেন্ন যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অন্তিমুখী সূর্যের আলো স্বর্ণরঙে ছড়িয়ে পড়েছে।  
একটা মোটরবোট... দেখা যায় অবিচ্ছিন্নগতিতে এগিয়ে  
চলেছে।

: আরো জোরে... আরও । অর্ধেক ডাईভারকে  
তাড়া দেয় ।...

: ঐ যে, আহাৰ । দেখেছো অৰুণ । অৰ্ধেন্দু চিৎকার

করে ওঠে। তারা তাঁর ঘেঁষে চলে, বাত জ্বাজ্বল  
লোকেরা দেখতে না পায়। ক্রমে জাহাজে...।  
মৃত্যুনিখর নিস্তক চারিদিক। মাঝিরা বোধ হয়  
পারে গেছে। তারা উপরের ডেকে যায়। এটা দরজা  
ঈষৎ ভেজানো। ভিতরে চাপা ফিসফিস আওয়াজ।  
অধেন্দু ইসারা করে অরুণকে। সবাই এসে দরজায় লাইন দিয়ে  
দাঁড়ায়। একজন মার্জেস্ট যায় পিভনের জানলার দিকে।  
জনের ডিগবাহীরা সঙ্গে অধেন্দুর যথেষ্ট বশিষ্ঠতা হয়েছে।

∴ প্রেনটা এখন কি করা যায়।

: ওটা এখন এখানকার আড্ডাতেই থাকুক ।

: চিঠিটা এনেছে ?

: কৈ না ! যাঃ ভুলে গেছি ।

: তা হলে ত' সর্বনাশ । পুলিশ সব জানতে পেরেছে ।

আর আমাদের বাঁচোয়া নেই।

: ভেবো না তুমি রমেশ, আর আধঘণ্টার ভিতরই আমি India leave করছি।

: কিন্তু দু'গের সঙ্গেই জানাচ্ছি, তোমার সে ইচ্ছাপূরণ  
হলো না।—বলতে বলতে অধেন্দু ঘরে ঢোকে। তাকে  
দেখে জন চমকে ওঠে।

গুড্ডম্, গুড্ডম্...অরণের আতীনাদ । গুড্ডম্—দেখা যান  
জন অক্ষুট আওয়াজ করে চেয়ারে বসে পড়ল ।

: জন্ তোমার সঙ্গে আজ বহিঃপ্রকৃতি বিচ্ছিন্ন হলো।...

শ্রীমানসকুমାର সিংহ

কেমন লাগলো আপনাদের ?

না না, গল্পের কথা বলছি না। আমার নামকরণটা কেমন হয়েছে তাই আমার ভিজ্ঞাশ।

গল্পের কে যে কোনটি, আর সে যে কি করছে, কোথায়  
করছে আর কেনই বা করছে তার কিছুটি কি বোঝা যায় ?

যায় না। যাবার কথাও নয়। কারণ এটি একটি ডিটেক্টিভ গল্প যে।

সাধারণ একটা মুণ্ডহীন দেহ নিয়ে গোয়েন্দা কাহিনীর শুরু হয়ে থাকে। একটি লোকের মাথা নেই। (তা বলে সে গুরু নয়) অবহেলিত পৰিত্যক্ত হয়ে কোথাও পড়ে আছে তাই নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা হয়। গোয়েন্দারা তার পেছনে লাগে।

তেমনি গোয়েন্দা কাহিনীর বেলায় হচ্ছে দেহহীন হুণ্ড।  
গল্প-দেহের মাথাটা অর্থাৎ নামটা—যটা লেখার শীর্ষদেশে  
থাকে—সেটা ঠিক থাকলেই হলো। দেহের বালাই নাই বা  
থাকলো, গল্পের হাত-পা ভঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হৃদিশ নাই মেলে  
যদি, কোনো ক্ষতি নাই। নামটা যদিও চমকবদার নয়,  
গোয়েন্দা কাহিনীটিও চমৎকার! সে-বই কাটবে বেশ।

আবার ভাবছি, মানসের এই গল্পটার নামান্তর করে যদি 'সিংহনাদ' রাখা যায় ?



### ত্রিযোগেশ্বরনাথ গুপ্ত

ভূদেব ছিলেন সিনিয়ার স্কলার—কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, অধ্যাপকগণের পরম প্রিয়—চাকরীর জন্য কলকাতা শহরে ঘুরে মেডালেন, কোথাও তা' জুটল না।

সংসারে অর্থাত্তাব—সত্য বিয়ে করেছেন। বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন ভূদেব।

একদিন সন্ধ্যাকালে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ফিরেছেন...শুনতে পেলেন বাবা-মার কলহ।

মাতা বলছেন : বোকে এবার আনতে হবে।

বাবা জবাব দিচ্ছেন : সে কি করে হয়, ঘরে যে একশের চালও নেই। আমি আধপেটা খাই, বোমাকে এনে কি খাওয়াব। ছেলের তো আজ ও চাকরী হল না। শান্তি হলো না বো' আনবার।

মা আরো বললেন : আমি নিজে না খেয়েও বোকে ঘরে আনবো।

বাবার কথা ভূদেবের বুকে শেলের মতো বাজল। আমি ঘরে না চুকে আবার বেরিয়ে পড়লেন—যেদিকে ছ' চোখ যায়। হাতে একটি পয়সা নেই, পায়ে হেঁটেই চুঁচুড়া এসে পৌঁছলেন। ভূদেব মনে মনে সঙ্কল্প করে বেরিয়েছেন, চাকরী না পেলে জীবন আর রাখবেন না গদ্যার জলেই প্রাণ বিসর্জন দেবেন। যেমনি মনে মনে স্থির করা—অমনি গঙ্গায় একগলা জলে ডুব দিগেন। সর্ব শরীর ঠাণ্ডা জলে নীতল হয়ে গেলো—চাঁদর দিয়ে মাথা মুছে তীরে উঠলেন। আত্মহত্যার চিন্তা আর রইলো না।

সন্ধ্যার প্রাকাল। ভূদেব আপন মনে চুঁচুড়ার পথে পথে ফিরছেন। একমাত্র লক্ষ্য—চাকরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল—ক্ষিণে তেষ্ঠায় দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। এক হালুইবর ব্রাহ্মণের দোকানে লুচি ভাজা হচ্ছে—তার গন্ধ আকাশে-বাতালে ভেসে আসছে। দোকানের কাছে এসে যেখানে লুচি ভাজা হচ্ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যে বামুন ভাজছিল তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

ভূদেব  
চন্দ্রের  
গল্প

দুই

শিখের জালা—বড় জালা। ভূদেবের উদর জলে উঠলো।

হাটতে হাটতে দূরে এক প্রকাণ্ড দালান দেখে তার ভেতর চুকে পড়লেন। বাড়ির বর্তা বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তার গলায় যজ্ঞোপবীত। ভূদেব স্নানমুখে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের মনে করণার উদ্রেক হলো। ইজ্ঞেস করলেন : কে তুমি বাপু। কি চাও, তোমার মুখ এমন শুকনো কেন?

ভূদেব বললেন : দেড়দিন যাবৎ আমার খাওয়া হয় নি। আমি ভাত খেয়ে পরে বলবো।

বুদ্ধ বললেন : এমো, বস! বাল্যদিতে জল আছে হাত-পা ধুয়ে নাও।

তার পায়ে দিল না জুতো—পা ভর্তি হলো।

বুদ্ধ নিজেই বললেন : তুমি আঁত মুপুরুষ। তোমার শরীরের গঠন অত্যন্ত স্নলক্ষণযুক্ত। তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান যুবক বলে মনে হচ্ছে। বাড়ি হতে বুঁবা বাবা-মার সঙ্গে রাগ করে বেরিয়েছো।

ভূদেব বললেন : না তো!

বুদ্ধ শুধোলেন : তোমার নাম কি!

তিনি উত্তর করলেন : আজ্ঞে, আমার নাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধ আর বিশেষ কিছু না বলে ভেতর থেকে এক গেলাস সরবৎ আনিয়া তাঁকে পান করতে দিলেন।

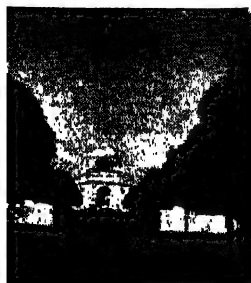
এক গেলাস বেলের সরবৎ আগার সঙ্গে সঙ্গে ভূদেব স্বস্ত্য আশনে বসে পান করলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ন প্রস্তুত হলো। রাজি তখন প্রায় আটটা বেজে গেছে। বুদ্ধ আপন ছেলেদের সঙ্গে ভূদেবকে গাদরে খাবার জায়গায় নিয়ে গেলেন। ছেলেদের সম্বোধন করে বললেন : কাতিকসদৃশ রূপবান এই ব্রাহ্মণ যুবকটি আজ প্রায় দেড়দিন যাবৎ অনাহারে আছে। আজ আমাদের আতিথি। এখানে অন্ন গ্রহণ করবে।

বুদ্ধের কথা শুনে বাড়ির বোঁ-বাবা এবং গৃহকর্তা স্বয়ং যুবকটিকে দেখবার জন্য উপস্থিত হলেন। গৃহকর্তা আজ স্বয়ং রান্না করেছেন। তিনি নিজে রুপোর থালে অন্ন, দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত, পায়েস, সন্দেশ, দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। তা' ছাড়া নানারকম ব্যঞ্জনের অভাব ছিল না।

ভূদেব আসনে বসলেন। এত জিনিষ এবং আদরস্বয়ং দেখে তার হুঁচোখের কোণে জল গাঁড়িয়ে পড়লো। তিনি ভাতে আর হাত দিতে পারলেন না।

মাসিক বহুভাষী। বৈশাখ / '৭২



কালের গ্রহরী  
— প্রবাল ভট্টাচার্য

পুতুল স্নান  
— ডাঃ সোমেন গুপ্ত

আলো কলিচন্দ্র



দাঙ্গিলাং ছহিতা

—ববীল সরকার

মাসিক  
বসুমতী বৈশাখ / '৭১





—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কি  
শো  
রি  
ণী



—শকুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায়



মাসিক  
বঙ্গমতী  
বৈশাখ / '১১

পারাবাট  
—সখীন দাস



শীত-বসন্ত

—হুশার্ণা দাশ



ওস্তাদ

—কুবী মল্লিক



অফিসার

—গৌতম ব্রূথোপাখ্যার



ঘোড়সওয়ার

—অসিত মিত্র

মাসিক বহুমতী । বৈশাখ / '৭১

খাত্ত-অন্বেষণ

—পি জি দাশ



## ছোটদের আসর

বুদ্ধ একরূপ অবস্থা দেখে গিষ্টিয়ে বললেন : তুমি কঁাদছো কেন। তুমি খাও। কান্না কিসের।

ভূদেব কঁাদতে কঁাদতে বললেন : আমার মা খেতে পান না, বাবা খেতে পান না, স্ত্রী খেতে পান না। আমি কি করে নানাবিধ সামগ্রী দিয়ে সাজানো ভোজ্যদ্রব্য উদরে দেবো।

বুদ্ধ অনেক বোঝানেন : তখন ভূদেব অন্নগ্রহণ করলেন। কিন্তু বেশি খেতে পারলেন না।

ঐ গৃহে তিনি বুদ্ধের ছেলে এবং নাতনীগণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ঠিক হলো তিনি ওখানে আহার, পোশাক ইত্যাদি ছাড়া মাসিক আট টাকা করে বেতন পাবেন। তখনকার দিনের আট টাকা, এখনকার ত্রিশ টাকার

সমান হবে। প্রতি মাসে ঐ টাকা কয়টি ভূদেব পিতাকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন, সংসার বেশ ভালভাবেই চলতে লাগলো।

বুদ্ধ ভদ্রলোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সাহায্যে শীঘ্রই চন্দননগরে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি সে স্কুলে মাসিক মোলো টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। এমন চাক্ষুষ টাকা আয়ে সংসার আগের চেয়ে সুখে ও স্বচ্ছলভাবে কাটতে লাগলো। ভূদেবচন্দ্র পরে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁর এক প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন।

# বুদ্ধের অন্তরালে

শ্রীঅমল সেন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষ থেকে জাপানে গিয়েছিল একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে, একজন জাপানী-বৌদ্ধকে সে একখানা আয়না দিয়েছিল। আয়নাখানা ছিল ভালো ক'রে কাপড় দিয়ে মোড়া। সে জাপানী-বৌদ্ধকে সেই আয়না নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে বলৈছিল। জাপানী-বৌদ্ধটি আবার তা তার স্ত্রীর কাছে দিয়ে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে বললো। কোতুহল মেয়েদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, একথা আর কে না জানে? স্ত্রীর মনে, মেয়েদের মনের সেই চিরন্তন কোতুহল জেগে উঠলো। সে ভাবলো, কি এমন জিনিস যা আমারও দেখতে মানা! দেখতে হবে তো! জাপানী ভদ্রলোক কাজে বেরিয়ে যেতেই স্ত্রী সেই কাপড়ের মোড়ক খুলে ফেললো। আয়নাটা বেরিয়ে পড়লো। জীবনে কখনো সে আয়না দেখে নি। জিনিসটা হাতে নিয়ে সে অবাধ হ'য়ে দেখলো তার মধ্যে একটি সুন্দর মেয়ে ব'সে আছে। দেখে হিংসায় তার গা জ্বলে গেল—ও এই ব্যাপার! লুকিয়ে লুকিয়ে এই মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে আমাকে আবার সোহাগ জানানো হচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক! রাগে সে আয়নাখানা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। তা সেই মুহূর্তে ইকুরো ইকুরো হ'য়ে ভেঙে গেল। এমন সময়ে তার স্বামী এসে অবেদুন্দলো। এ কি কাণ্ড! আয়না জিনিসটা সেও জীবনে কখনো দেখে নি। একইকুরো আয়না যেরে থেকে হুড়িয়ে নিয়ে সে চোখের সামনে ধ'রলো, আয়নায় ভেসে উঠলো দিব্যকান্ধ এক পুরুষের মূর্তি। সে যে তার

নিজেরই চেহারা স্বামী বেচারীও তা বুঝলো না। সেও রেগে উঠলো। স্ত্রীকে ভৎসনা ক'রে বললো—এই তুমি, যাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, আদর-সোহাগ করি! একজন পরপুরুষের সঙ্গে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম ক'রছো! দু'জনে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। লড়াই যখন খুব জোর চ'লছে তখন সেই ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণ এসে ঢুকলেন ঘরে, তিনি লড়াই থামিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা ক'রলেন। আয়নাই যে তাদের ঝগড়ার আসল কারণ সেটা বুঝতে দেরি হ'ল না। তিনি স্বামীকে আয়নার রহস্য বুঝিয়ে বললেন—

‘আয়নায় যে পুরুষের মূর্তি তুমি দেখেছ, সে তোমার নিজেরই ছবি,—তোমার স্ত্রী যাকে ভালোবাসে সে তো তুমি। স্ত্রীকে বললেন, আয়নায় যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছ, যাকে তোমার স্বামীর প্রেমিকা বলে তুমি সন্দেহ করেছ, সে মেয়েটি তো তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। তারপরে তিনি তাদের দু'জনকে আয়নায় মুখ দেখবার কায়দা শিখিয়ে দিলেন। গোলমাল মিটে গেল।

নিরামিষভোজী ও অমিষভোজীদের একটা লড়াই চ'লে আসছে বহুকাল ধ'রে। খাটি নিরামিষভোজী যারা তারা অমিষভোজীদের বরদাস্ত ক'রতে তো পারেই না, অজুৎ ও অম্প'ত্রদের মতো ঘৃণা করে।—দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঘৃণা তীব্রভাবে প্রকাশ

পেতে দেখেছি। আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা বাদে ভারতের প্রায় সর্বত্রই সব রাজ্যের লোকেরা মাছ-মাংস যারা খায়, তাদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। আমি বাঙালী—মাছ খাই। মাছ খাবো না এই অঙ্গীকার করাতে দিল্লীতে আমি বাড়ি ভাড়া পেয়েছিলাম। মহাত্মার তত্ত্ব আশ্রিত আমি ও নিরামিষ-ভোজীদের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা বড় ছন্দর গল্প আছে।

শ্রীকৃষ্ণের একদিন হাঁচা হ'ল—নিরামিষভোজীদের মনে নিরামিষভোজী যে সবচেয়ে পবিত্র ভোজ ব'লে একটা ধারণা আছে, তাদের সেই ধারণার অসারতা বুঝিয়ে দেবার। তিনি কৌশল ক'রে এক নিরামিষভোজীর পায়ে একটা বড় কাঁটা বিধিয়ে দিলেন। নিরামিষভোজীর পা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। কাছাকাছি একটা নদী ছিল, সে সেখানে পা ধুয়ে স্নান হবার জন্তে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বালকের বেশ ধরে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

এ কি তোমার রক্তের রং লাল কেন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা মাছ-মাংস খাও না। খাও তো শুধু ফল-মূল, শাক-সব্জী!—তোমাদের রক্ত সাদা রক্তকণিকায় তৈরি—তাই তার রং হবে সাদা। তা না হ'লে আমি-ভোজীদের মতই লাল রক্ত হ'ল। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

ইসপল ফেলের সেই 'যার কাজ তারে গাজে অস্ত্রের পিঠে লাঠি বাজে' নীতিমূলক কুকুর ও গাধার গল্পটি সকলেরই জানা গল্প। ধোপার গাধার কাজ হ'ল কাপড়ের বোকা বওয়া—কুকুরের কাজ হ'ল বাড়িতে চোর ঢুকলে বেউ ঘেউ শব্দে চোর তাড়ানো এবং মনিবকে সতর্ক ক'রে দেওয়া। কুকুর তার কাজ না ক'রে চুপ ক'রে বসেছিল দেখে গাধা গিয়েছিল কুকুরের কাজ করতে। গভীর রাত—ধোপা ছেলে-মেয়ে-বো নিয়ে শান্তিতে ঘুমচ্ছে, এমন সময়ে বাড়িতে চোর ঢুকলো। মনিবের উপর কুকুরের রাগ ছিল ব'লে কুকুর চুপ ক'রে রইলো। গাধা ভাবলো, এ কিরকম ব্যাপার হচ্ছে? মনিবকে সজাগ ক'রে দেওয়া তো দরকার। সুতরাং সে ডাকতে শুরু করলো। চোর অবশ্যই পালালো এবং ধোপা তার আসার কথা কিছু জানতেও পারলো না। সে এসে শান্তির ঘুম নষ্ট করার জন্য একটা লাঠি নিয়ে গাধাকে বেদম প্রহার করলো।

কমতার লাগা মাছুষকে অনেক সময় এমন অন্ধ করে দেয় যে, তার বিচার-বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পায়। শেষকালে সে অন্ধ বেগে বিনাশের স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে অবলুপ্ত হয়। এই নীতিকথাই একটা রূপকের মধ্যে ছুটিয়ে তোলা হয়েছে পঞ্চতন্ত্রে।

এক বনের রাজা ছিল এক সিংহ, তার অত্যাচারে প্রজাতির পশুরা অস্থির। এক শ্রমিকের মনে সিংহের এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার—শুধু তাই নয়, সিংহের

অত্যাচার চিরতরে বন্ধ করার একটা ফন্দি জাগলো। একদিন সে সেই সিংহের কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ, আপনার রাজত্বে আমরা বেশ সুখে শান্তিতেই তো ছিলাম, কিন্তু কয়েকদিন হ'ল কোথা থেকে আর একটা সিংহ এই বনে এসে আমাদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার শুরু ক'রেছে।

সিংহ তো এই কথা শুনে রেগে অস্থির। তার রাজত্বে দ্বিতীয় রাজার আবির্ভাব। শেয়ালকে সে বললো, চলো তো দেখে আসি কোথায় সে পাশুও!

বুদ্ধিমান শেয়াল একটা জলপূর্ণ কুয়ার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো সিংহকে নিয়ে, সিংহের ছায়া প'ড়লো জলের মধ্যে। সেই ছায়াটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে শেয়াল বললো, ঐ দেখুন মহারাজ সেই সিংহ। মূর্খ সিংহ তার কল্পিত প্রতিদ্বন্দীর ছায়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধ রাগে এবং কুয়ার জলে তলিয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্রে আর একটা গল্প আছে 'শুভ্র সৌধ নির্মাণ।' বহুনা-বিলাসী মানুষ বহুনা ক'রতে ভালোবাসে, বহুনার জগতে বিচরণ করে আনন্দ পায়। মানুষ জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন মিথ্যা, অলৌকিক এবং ভিত্তিহীন। তারপর একদিন যখন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তার সে স্বপ্ন ভেঙে যায় তার তখন আর ছুখের অবশিষ্ট থাকে না। এই তত্ত্বটাই ব্যাখ্যা ক'রে বলা হ'য়েছে 'শুভ্র সৌধ নির্মাণ' গল্পের মধ্য দিয়ে।

এক ব্রাহ্মণ যুবক যজ্ঞমান বাড়ি থেকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ সেয়ে দক্ষিণা বাবদ একসরা ছাতু নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ব্রাহ্মণভোজনটা একই গুরুভোজন হ'য়ে গিয়েছিল, ভারি পেট নিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। একটা বড় বটগাছ দেখতে পেয়ে ভাবলো, গাছের ছায়ায় ব'সে একই বিশ্রাম নেওয়া যাক। গাছের তলায় সে ব'সলো ব'সে থাকতে থাকতে তার মনে চিন্তার উদয় হ'ল। সে বহুনার রাশ খুলে দিল। এই এক সরা ছাতু নিয়ে সে কি ক'রবে? বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রবে। বিক্রি করে যে টাকা পাবে তাই দিয়ে সে অনেকগুলি গরু কিনবে। গরুর দুধ বিক্রি ক'রে যখন তার অনেক টাকা হবে তখন সে হাজার বিধা জমি কিনবে, আর একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তুলবে। তখন তো সে মস্তরমতো বড়লোক হ'য়ে যাবে। একটি ভ্রমরী মেয়েকে তখন সে বিয়ে ক'রবে, আর তার একটি ছেলে হবে। তারপর...তার বহুনার বেগ উদ্যম হ'য়ে উঠলো... একদিন সেই কামা শুরু ক'রবে। ছোট ছেলেমেয়েদের কামা সে মোটে লম্বা ক'রতে পারে না। জীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রবে ছেলে কাঁদছে কেন? জী মৃৎখামটা দিয়ে উত্তর দেবে, জানি না। তখন তার হ'য়ে যাবে ভয়ানক রাগ, সে জীকে মারবে লাথি। বহুনার সঙ্গে তার হাত-পাও কাজ ক'রে যাচ্ছিল। সত্যি সত্যিই সে পা তুলে মারলো এক-লাথি,

## ছোটদের আসর

আর সেই লাথি লেগে ছাড়ুর সরা উটে গিয়ে সমস্ত ছাড়ু মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার শূন্যে নির্মিত সোণও ভেঙে গেল।

সমগ্র জগৎ আজ এক মহা সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। শত্ৰুপাণি দুইটি মহা শক্তিশালী জাতি আজ ক্ষমতার দস্তে অন্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে। কখন যে যুদ্ধ বাধবে তার ঠিক নেই। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি সত্য সত্যই বাধে তবে আধুনিক যে সমস্ত পৃথিবী-বিক্ষণসী মহাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার কল্যাণে গোটা পৃথিবী রণাভ্যন্তরে যেতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না। তখন কোথায় থাকবে দেশের সীমানা, ভাগ নিয়ে কোন্‌দল, মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই? এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যে কত মিথ্যা, কত অর্থহীন, যুদ্ধ যে বিনাশ ডেকে আনে যুগযুগমানদের সেই সত্যই প্রমাণিত করেছেন লীলাবতী সমান শক্তিশালী ও সমান দীর্ঘ দুইটি গোত্রেরা সাপের নারায়ক লড়াইয়ের গল্পের মধ্য দিয়ে। একটি সাপ অপর সাপটিকে লেজের দিক থেকে গিলতে সুরু করলো, দ্বিতীয় সাপটিও প্রথমটিকে একই রকমভাবে গিলতে আরম্ভ করলো, ফল কি হ'ল? দু'জনের কারুই অস্তিত্ব রইলো না। আজকের দিনে যুদ্ধের ঘনায়মান কালো মেঘ দেখে লীলাবতীর এই গল্প থেকে আমাদের সত্যক হবার উপদেশ নেবার প্রয়োজন আছে।

অনেক সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণেই আমরা ঝগড়া করি, ঝগড়া করে নিজেদের শক্তিশাল্য করি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনি নিজেদের। অথচ একটু ধৈর্য ধরে যদি আমরা চিন্তা করি, একই যদি পরমতসহিষ্ণু হ'ল তবে আমরা বেঁচে যেতে পারি। কিন্তু তা হয় না, আমাদের সে বুদ্ধি যোগায় না। এই উপদেশই দিয়েছেন আমাদের একজন গল্পকার তাঁর একটি গল্পে। দুটি লোকের মধ্যে ঝগড়া সুরু হ'ল—আধ ডজন বেশি না ছটা বেশি। একজন বলছে, ছ'টা আধ ডজনের চেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলছে, কিছুতেই নয়, তা হ'তেই পারে না।

সমস্তার মীমাংসা আর কিছুতেই হয় না। তখন দু'জনের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হ'ল এবং সে লড়াই শেষ হ'ল দু'জনের মৃত্যুতে। ঝগড়ারও শেষ হ'ল।

বাংলায় একটা কথা আছে 'অল্প বিজ্ঞা ভয়ঙ্করী', সংস্কৃতও অল্পরূপে একটা কথা আছে 'গণ্ডুশ জল মাত্রাণ সফরী ফরফরায়তে।' এর অর্থ হ'ল যার বিজ্ঞা যত কম সে তত বেশি নিজেকে বিশ্বাস বলে জাহির করার জন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও অনেকে সামান্য লেখাপড়া শিখে মনে করে অনেক শিখে ফেলেছি, প্রচুর জ্ঞানলাভ হয়েছে। আসলে সে যে একেবারেই কিছু শেখেনি

একথা তার বুঝার উপায় থাকে না, ফলে অল্প জ্ঞান নিয়ে অতিরিক্ত অহঙ্কারের অসারতা কোন কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়লে প্রমাণিত হয়, এইটেই একটা গল্পের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। এক ছুতোর মিস্ত্রীর মনে মনে ভারি অহঙ্কার ছিল। সে ফুট-গজ-ইঞ্চির হিসাব খুব ভালো জানে, গড়পড়তা কোন জিনিসের কতটা হয় তা তার মতো আর কেউ হিসাব ক'বে বের করতে পারে না। একদিন সেই ছুতোর মিস্ত্রী কাজ উপলক্ষে আর একটা গ্রামে যাচ্ছিল, পথে একটা নদী পড়লো। খেয়া পার হ'তে হবে খেয়ানোকোয়, কিন্তু পয়সা ব্যয় ক'রতে, বিশেষ করে খেয়ানোকোর মাঝিকে অনর্থক পয়সা দিতে সে যাবে কেন? সন্ধ্যা পর্যন্ত সে নদীর ঘাটে ব'সে রইলো। অন্ধকার যখন গাঢ় হ'ল তখন সে জলে নামলো। সে সাঁতার জানতো না, কিন্তু জলের গভীরতা পড়পড়তা কতটা তা সে মনে মনে আগে থেকেই হিসাব করে রেখে দিয়েছিল, মনে ক'রেছিল হেঁটেই নদী পার হতে পারবে। হিসাবটা এই রকম—নদীর দুই পাড়ের দিকে জলের গভীরতা হ'চ্ছে ছয় ইঞ্চি ক'রে। আর মাঝবানের গভীরতা হ'চ্ছে দশ ফুট। তা হ'লে জলের গড়পড়তা গভীরতা দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৩৬ ফুট। ছুতোর মিস্ত্রী নিজে ছিল পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। হিসাব-টিসাব ক'বে মিস্ত্রী তো জলে নামলো এবং নদীর গভীর জলে সে নিমেষের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল! এতো যে গভীর তার হিসাব-জ্ঞান তা তাকে রক্ষা করতে পারলো না।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ভগবানকে নিয়েও মানুষের মত ঈর্ষাতার অস্ত নেই। যুগে-যুগে, দেশে-দেশে, মুনি-ঋষি ঐ মহাপুরুষেরা ভগবানের রূপ ধ্যান ক'রেছেন, ফলে বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। ভগবানের সামগ্রিক রূপ কি তা কেউ স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'যত মত তত পথ।' ভগবান মহাসাগরের মত অসীম, তাঁর অস্ত কেউ পায় না। দেশ দেশ থেকে বিভিন্ন নদীর স্রোত যেমন গিয়ে মহাসাগরে মিলে যায় তেমনি মানুষ আপন আপন জ্ঞান বিশ্বাস নিয়ে যে ধর্মমতই অঙ্গুলরণ করুক ভগবানের চরণেই তার শেষ আশ্রয় মিলবে। শুধু ভগবানের নয়, কোন জিনিসেরই সামগ্রিক রূপ একবারে মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। অংশবিশেষই আমরা দেখি। আমাদের দেখা যেমন অসম্পূর্ণ, আমাদের জ্ঞানও তেমনি অসম্পূর্ণ। অথচ সেই অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই আমাদের জ্ঞানের বড়াই, আমরা সবজাত্য সেজে বসি। এমনি ক'রে অবতারবাদে আমাদের দেশ ছেয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে অন্ধদের হাতী দেখার গল্প মনে পড়ে। হিন্দুস্থানের আটজন অন্ধকে একটা হাতীর কাছে দাঁড় করিয়ে হাতীটাকে পরীক্ষা ক'রে তার চেহারা কেমন বলতে

ধলা হ'ল। প্রথম অঙ্ক লোকটি হাতীর পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলো,—হাতী দেখতে খামের মতো। দ্বিতীয় লোকটি হাতীর পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠলো হাতী দেখতে দেওয়ালের মতো। তৃতীয় অঙ্ক লোকটি লেজ হাত দিয়ে বললো, হাতীর চেহারা মূল্যবান মতো। এমনিভাবে হাতীর শরীরের যেখানটায় যার হাত পড়লো সে সেইভাবে হাতীর চেহারার বর্ণনা দিল, কিন্তু কারও বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ সত্যকে প্রকাশ করতে পারে নি। এমনিই হয়, অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, কোন জিনিসের সবটা দেখতে পায় না সে, ভাব সে না দেখে দেখার ভাণ করে, না জেনে জানার ভাণ করে।

আধুনিক রূপকণ্ডার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ত্রীশতাব্দীর অহিংস সাপের গল্প। এক সাধু একটি জাত সাপকে অহিংস হবার জন্তে উপদেশ দিয়েছিলেন। সাপ সেই উপদেশ একান্তভাবে মেনে চলে, কারকে সে দংশন করে না—এমন কি হিম্‌হিম্‌ শব্দ পর্যন্ত করে না। সাপের এই অবস্থা দেখে পাড়ার ছেলেরা বেশ মজা পেয়ে গেল। তারা তাকে নানারকমভাবে জ্বালাতন করতে শুরু করে দিল। কেউ লেজ ধরে টানে, কেউ মাথায় ঢোকা দেয়, কেউ বা দূর থেকে ঢিল ছুড়ে মারে। কিন্তু সাপ সব সহ্য করে। কারকে কিছু বলে না।

অবস্থা তার দিনের পর দিন কাহিল হয়ে উঠলো। হয় তো বা নারাই যাবে শেষ পর্যন্ত। তখন সে সেই সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বললো, প্রভু, আর যে সহ্য করতে পারছি না।

সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, কি হ'ল?

সাপ বললো, ছেলেগুলো আমাকে আর বাঁচতে দবে না, নানারকমভাবে তারা আমার জীবন আঁতড়াইতে তুলেছে।

সাধু বললেন, তোমাকে অহিংস থাকতে বলেছি, কারকে গম্ভীরে নিষেধ করেছি সত্য, কিন্তু হিম্‌হিম্‌ করতে তো নষেধ করি নি। হিম্‌হিম্‌ করো, দেখবে কেউ আর তোমার ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না।

সাপ সেইদিন থেকে হিম্‌হিম্‌ শব্দ করতে আরম্ভ করে দলে, ছেলেরা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে গেল।

আর একটা সাধুনিক গল্প আছে এক বক তার সুন্দর দাদা ধবধবে ছানাটাকে তুলে এনে কারকে দেখিয়ে জজ্ঞেস করলো—এ রকম সুন্দর সাদা ছানা তোর কখনো বে?

বক তার নিজের ছানাটাকে এনে বকের মুখের সামনে লে ধরে বললো—আমার ছানার মতো এমন কুকুচে গলো একটা ছানা তোর দেখা তো!

বস্তুত এই রূপকথার প্রতিপাদ্য কথা হচ্ছে প্রত্যেক যৈর চোখে তার নিজের সন্তানই সবার চাইতে সুন্দর।

সন্তান দেখতে যেমনই হোক সব মাই তাঁর নিজের সন্তানকে স্নেহের ধারায় আঁখিযুক্ত করে কোলে তুলে নেন। আর একটা গল্প আছে এক সিংহ-শাবক এবং কুকুরের বাচ্চার। সিংহ-শাবকের চেহারার মধ্যে এমনই একটা গাঙাধ ও তেজস্বিতা ঘুটে বেরচ্ছে যা কতই তাকে রাজ-মর্যাদায় ভূষিত করে। তার জন্তে তাকে সোনার শিকল গলায় পরতে হয় না। অলংকার গায়ে দিতে হয় না। কিন্তু কুকুরকে সোনার শিকল পরিয়ে সোনার অলংকার দিয়ে সাজালেও সিংহের মতো তার কখনো চেহারা হয় না। সিংহের মর্যাদা কুকুর কখনো পেতে পারে না, পায় না। সিংহের আসন চিরদিন উপরে।

পারস্য দেশে তিন নেশাপোষের একটা মজার গল্প আছে। তিনজন নেশাপোষ—একজন খেয়েছে মদ, একজন গাঁজা এবং তৃতীয় ব্যক্তি আফিং। তিনজনই নেশায় বঁদ। রাতের বেলা তারা তিনজনই পিয় গোচীরঘেরা ইস্পাহান শহরের সদর ফটকের কাছে দাঁড়ালো। ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। কি করে ঢুকবেন তারা? কি করে ভিতরে ঢোকা যায় তিনজন ভাবতে বসলো ও খানিকক্ষণ পরে মাতাল ব্যক্তি তার সঙ্গীদের বললো, 'এসো এক কাজ করা যাক। বাটিকার বেগে এসো আমরা ফটকের ওপর কাঁপিয়ে পড়ি, তা হ'লেই ফটকের খিল খুলে যাবে।' কিন্তু হাজার লোক একমুদ্রে তার ওপর কাঁপিয়ে পড়লেও সে দরজা এতটুকু নড়ানো যেতো কি না সন্দেহ।

আফিংখোর বললো, 'এসো রাতটা আমরা ফটকের বাইরে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। ভোর হ'লে পরে শহরে ঢোকা যাবে।

আর তৃতীয় লোকটি, যে গাভ্র খেয়েছিল সে বললো—'এসো আমরা চাবির গর্তের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি মেয়ে শহরে ঢুকে পড়ি।'

পৃথিবীর নানান দেশে, বিশেষত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে কত যে অসংখ্য রূপক, রূপকথা, গল্প ও কাহিনী ছড়িয়ে আছে তার ইরশাদ নেই। সে সব গল্প ও কাহিনী কিভাবে এবং কোথায় যে সৃষ্টি হ'ল তা জানা যায় না, যেমন জানা যায় না—কে প্রথম রান্না করার পছা আবিষ্কার করেছিল কিংবা যুদ্ধে তীর-কשתকের ব্যবহার করার বুদ্ধি প্রথম কার মাথায় এসেছিল! সমস্ত বড় বড় আবিষ্কারের মূলে একই রহস্য, একই প্রক্রিয়া কাজ করেছে। পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এমনিভাবে যুগে যুগে মহা মহা সভ্যতার দান—এই সভ্যতাই মানুষকে তার আদিমতম অন্ধকারময় পশুজীবন থেকে হাত ধরে এনে পৌঁছে দিয়েছে আজকের এই আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার মণিকোঠায়, পশু থেকে মানুষকে উন্নীত করেছে দেবতায়। আজ আমরা আণবিক সভ্যতার সিংহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

তারপরে এল বসন্তকাল।

যে খেলাটি এই সময় উৎসব-সাজে গেছে উঠে চারুকতর করে তোলে লোকাচারগুলিকে, তার নাম 'হোলাকা'। এই খেলা সকলের প্রিয়। ক্রীড়াপ্রিয় স্বর্গের দেবতারাও দেখতে ভালবাসেন, খেলতে ভালবাসেন সেই খেলা। ব্রজমণ্ডলে এ খেলা যখন নববলে বলীয়ান হয়ে আরম্ভ হয়, তখন নিয়মের বালাই থাকে না এককোটিও। তখন সকাল বিকেল সন্ধ্যা রাত্তির জ্ঞান থাকে না খেলোয়াড়ের।

বেগুখানি হাতে নিয়ে সেই খেলায় আজ মেতে উঠেছিলেন বনমালী। সঙ্গে তাঁর কুতুহলী হলী-অগ্রজ শ্রীবলরাম। উৎসবের মহিমায় লজ্জার স্থান ছিল না বন্দাবনে। ক্রমশঃ ঘিরে ক্রমশঃ গাইতে গাইতে খেলায় মেতে উঠেছিলেন ক্রমশঃ অম্বরগিণীরা, আর রামগান গাইতে গাইতে বলরামকে ঘিরে মেতে উঠেছিলেন তাঁরও অম্বরগিণীদের দল। একটি মণ্ডলেই দুই সাতা পৃথক পৃথক বিহার করছিলেন...মান ও উচ্চতা বজায় রেখে। দু'জনেই হরণ করছিলেন নিজের নিজের ক্রীড়াঙ্গনীদের মন। কোতুকেরও অমৃতসে চিবণ হয়ে উঠেছিল মণ্ডল। বসনে ভূষণে অলঙ্কারে দু'জনেই সাজাচ্ছিলেন মনোরমাদের। চমৎকৃত হয়ে উঠেছিলেন সেই বিদগ্ধ মুগ্ধ সূচতুর সন্দরী-সমাজ, দু'জনের প্রেমালোকে; এবং দু'জনেই অক্ষত আনন্দে শুনিছিলেন সুন্দরী কণ্ঠের সপ্তস্বর, মুচ্ছনা ও কম্পনের বিমোহন দক্ষতা।

দেশাচার-অম্বরগানের দুই ভাইয়ের ক্রীড়াঙ্গনই হয়েছিলেন তাঁদের প্রণয়ী সহচরেরা। এ খেলায় তাঁরাও হর্ষমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন...অবশ্য এদের বয়সে স্বীকার না করেই। বাস্তব তালে তালে তাঁরাও দাঁড়িয়ে কণ-রমা করতালি, বন্ধার দিয়ে উঠেছিল তাঁদেরও হস্তবলয়, অম্বুল বোল তুলেছিল মধুরতার। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল চর্চরী-রাগের দ্বিপদিকা। এ যেন এক কস্তুরীমাখা কাস্ত-গানের মহোন্মাদ। পরিজনদেরাও যোগ দিচ্ছিলেন সেই গীতোন্মাদে।

ময়ূর-ডাকা মধুরাত। তরুণ-তরুণ গহন রমণীয় কানন। জ্যোৎস্নার শান্তি। হোলি খেলাচ্ছিলেন দুই ভাই।

নৃত্যগীত-কুতুহলী হলীর তখন এক বিচিত্র মস্ত অবস্থা। চৌদিকে তাঁর প্রেমিকাদের ভিড়, আর সেই রূপের নীড়ের মাঝখানটিতে তিনি নাচছেন...গণ্ড-মণ্ডল-চলেক-কুণ্ডলঃ...বারুণী-মদ-বিষ্মৃগীতেশ্বঃ।

হিমগীর অঙ্গ থেকে খেয়াল নেই কখন যবে পড়ে গেছে ঘন নীল উত্তরীয়। আধখানা বুক খোলা। ভিমির-ঘেরা দূর শশাঙ্কের যেন প্রতিচ্ছবি।

তিনি নাচছিলেন। চর্চরী-দ্বিপদিকাদি গীতের তালে তাল রেখে তিনি নাচছিলেন। এ যেন এক প্রমদ-বিহবল মূর্তিমান মত্তের নৃত্য-প্রকাশ। নাচছিলেন আর হাসছিলেন, হাসছিলেন আর গাইছিলেন, গাইছিলেন আর প্রেমগীদের

কবি কণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বন্দাবন

অম্ববাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একবিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

সঙ্গে খেলছিলেন, খেলছিলেন আর ছুড়ছিলেন আবীর-গুলাল...যেন শ্রীমদনের সুরভি-সিন্দুর।

চন্দ্রাবলী এদিকে তাঁর আপন সখীদের নিয়ে চেউ তুলেছেন হাসির; ললিতাদি আপন সখীদের নিয়ে রাখা বাণ ছুড়েছেন পরিহাসির; যুগপাদের নিয়ে হান্ত-পরিহাসে গা ভাসিয়েছেন শ্রীমা আর ভদ্রা। হাসি-চাঁচা-তামাসার বিলাসে এবং মদিরার প্রকোপে যখন টানা টানা ও বিশাল হয়ে উঠল সকলের চোখ, তখন তাঁরা ইনি গুঁর গায়ে উনি এঁর গায়ে ছুড়তে আরম্ভ করে দিলেন সৈন্দুর-রেণু আর কৌকুম-রেণু। আর রঙ্গে রঙ্গে রঙ্গিলা হতে হতে বীণায় বীণায় বন্ধার তুলে সকলে মিলে আরম্ভ করে দিলেন দ্বিপদিকায় মস্ত গান।

নীরব থাকতে পারলেন না ক্রমশঃ। অধরে মুরলী ধরে তিনি তখন প্রকাশ করলেন তাঁর মুরলীর ভাষা। সে ভাষার অক্ষুট মধুরতায় কোথায় যেন পালিয়ে গেল সখীদের সুচির-সঞ্চিত গীত-গর্ব। তাঁরা গান ভুললেন, ঘিরলেন তাঁকে এবং ঘিরতে ঘিরতে আমোদের ছরত আবেগে ছুড়তে লাগলেন কাম্বীররেণু...একত্রে।

মদবিহবল কলভ-রাজ যখন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় গান শুনে, তেননি হল শ্রীকৃষ্ণের দশা। তিনি মুখ নীচু করে...নিষ্পন্দ-মাহিমায়...সহ করতে বাধ্য হলেন বস্তুত-কক্ষণ করতলের সেই কুঙ্কমের আকর্ষণ। সে আনন্দে প্রমদাদের ভুরু যেন আর নাচে না। আরো নাচে না কেন জানেন? তাঁরা বিষ্ময়ে বিলীন হয়ে শুনেতে পেলেন...চর্চরীরোগের সোহাগে, ...ও যে থাকে না, ও যে থাকে না শ্রীহারির ঐ বেগুনা।

২। শ্রীবলরামকে অবলম্বন করে নিতান্ত উন্মাদার মত আবীর-খেলায় মেতে উঠেছিলেন যে শব-সুন্দরীরা, খেলার বিক্রমক্রমে সাবলম ভ্রমণ করতে করতে তাঁরা যখন শ্যামিষ্ঠ্যে এসে পড়লেন ক্রমশঃমণ্ডলের, মদাক্ত কুজরাগিংহের মত বলরাম তখনও নাচছেন। তাঁর খেয়ালই নেই, তিনি এসে পড়েছেন তাঁর ছোট ভাইটির নর্মলীলার এলাকায়। কিন্তু তালে ভুল

করলেন না তাঁর অসুখাগিগীর দল। তাঁদের চোখে ঝিলিক খেলে গেল রসিকতার। তাঁরা যেমন গাইতে লাগলেন তেমনি আবার গাওয়াতেও লাগলেন; আর তালে তালে উদ্ভাল হয়ে উঠতে লাগল তাঁদের হাতের চঞ্চল বলয়ের লয়দার ঝঙ্কার। তাঁরা যেমন নাচতে লাগলেন তেমনি আবার নাচাতেও লাগলেন; আর তাঁদের চরণে চরণে ফুটতে লাগল মঞ্চ-মঞ্জীরের ভূক-হুকার। আর সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক উপহাসের মাধবী-বর্ষণে তাঁরা অদূর থেকেই দেবরের সঙ্গে সাক্ষাতক বিকীর্ণ করতে লাগলেন কৌতুহী কেলিধূলি।

আর যায় কোথায়। কৃষ্ণপাক্ষের ইঙ্গিত এল, আর উদ্ভায় হয়ে উঠলেন তাঁর সহচররা। তাঁরা একসঙ্গে এমন বিক্রমে ওড়াতে লাগলেন লাল সাদা আর হলুদ রঙের সুগন্ধি ফাণ্ডা, যে রঙের ঝড়ে সত্যিই বুঝি বলরামের সখীরা উড়ে যান! কৃষ্ণের গম্ভীর মুখের স্নিগ্ধতায় ও মুগ্ধতায় নীরবে লাঠিতে লাগল নানান ধরণের হাসি; বাজতে লাগল বেণু... পরিহাস ছাড়িয়ে। কিন্তু কৃষ্ণবধূরা নীরব থাকবার মেয়ে মন। তাঁদের মণ্ডল থেকে সবল-স্বননে ভেসে আসতে লাগল কেকোৎকণ্ঠী কত পরিহাসের পারিপাট্য, হো: হো: হো:, হি: হি: হি:... কত হাততালির হাতশ!

৩। এ আবার কোন হাল হালে প্রচণ্ড হৈ-হৈ! ...জান হল মদমন্ত রোহিণী-সুতের। রেগে উঠলেন

তিনি মাতাল হাতীর মত। খেলাই হয়ে উঠল সংগ্রাম। কেলিধূলি বিবেকপ করতে করতে তিনি ছুটলেন।

৪। তাঁকে আসতে দেখেই, সরে পড়লেন কৃষ্ণ-বনিতারা;... সিংহাবলোকন ছায়ে লজ্জাদেবী যেমন করে সরে পড়েন ছুঁপা এগিয়ে একবার ফিরে, জয়াকাজ্জ্বলী প্রতিভা যেমন করে সরে পড়ে অপ্রতিভ হয়ে। ওমা, উনি যে ভাস্কর-শ্রেণীর;... তাঁর সঙ্গে কি খেলা চলে? অতএব, সরে পড়লেন কৃষ্ণের বনিতারা।

কিন্তু এগিয়ে এলেন কৃষ্ণের সহচররা। তাঁরা এগোতেই, অনন্তনাগের মত তাঁর বিপুল বাহ মেলে, হাসতে হাসতে ভূজোপশীড়-বন্ধনে তাঁদের প্রত্যেককে বৃকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এক-কুণ্ডলী ভগবান শ্রীবলরাম। তাঁদের রঙিন করে দিলেন কেলিধূলির সন্মুখ বর্ষণে।

৫। কিন্তু সহচররাও কেউ কম যান না। চক্রপাণি কৃষ্ণের তাঁরা না সহচর? শ্রীবলরামের বিরাট ভূজবন্ধন থেকে সবলে নিজেনের মুক্ত করে নিয়ে তাই তাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করলেন বলরামকেই। এ-সব খেলায় কি, গণনার মধ্যে ধরতে আছে বড়দের মর্যাদা বা গৌরব? অতগুলো সুলার মুখের রম্য ছক্কারে হকচকিয়ে গেলেন শ্রীবলরাম। আবারের বীরত্বে তাঁকে স্বীকার করতেই হল পরাজয়।

স্বাধীনতা বিপ্লব

সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করব

—জওহরলাল নেহরু



প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আগবাবও দায়িত্ব রয়েছে

কুমারদেব ভাণ্ডারী নিয়মিত রূপে জন্ম, সম্পূর্ণতর প্রচেষ্টা, নিয়মিতরূপে ও তাপসভ্যতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছাত্র কাজ করার উৎসাহ দায়িত্ব আগবাব দেবের প্রতিরক্ষা পাড়ে চুলাতে সাহায্য করতে পারেন।

আগবাব নিয়মানুবর্তিতা দেশকে শক্তিশালী করে



৬। নন্দকুমার তো হেসেই আকুল। তাঁর মুরলীধর রাঙা অধর যেন আন করে বলল জ্যোৎস্নায়। তিনি না না করে বারণ করতে করতে বললেন,—

‘এ তোমাদের ভারী অত্যাচার। আদবেই রুচিবর নয়। একদিকে আর্থ একলা, আর একদিকে তোমরা সকলে। এ জয় জয়ই নয়, এতে আছে, অনার্থ মনের পরিচয়।’

শুনেই দেখানে ছুটে এলেন শ্রীবলরামের নিতান্ত অমুরাগবতীরা। তাঁরা তো বলরামের চেহারা দেখে অবাক।

প্রথমা বলে উঠলেন,—‘কি রূপ গো সই কি রূপ! একটা হীরের ধানকে যেন দুইয়ে দিয়েছে পদ্মরাগমণির জৌনু।’

দ্বিতীয়া বলে উঠলেন,—‘না না, অত ধোয়া রঙ নয়, অত নরম রঙ, নয় গো সত্যিই যেন একটি মহাস্কটিকের অঙ্করের উপর উজ্জ্বল হয়ে চলে পড়েছে জবাফুলের রাঙা আবেগ।’

তৃতীয়া বলে উঠলেন,—‘না না, কে বলেছে ঢলে পড়েছে গুঁর রঙ? কি রূপ লো সই, কি রূপ! যেন তুষার পাহাড়ের মাথায় অরুণ আভা লেগেছে প্রভাত-রবির।’

চতুর্থী বললেন,—‘কি যে তোদের উপমা র চঙ। অমন রং-রঙে শিঁহুরে আবার দেখেও তুষারের উপমা ভাবতে পারলি? আমার কি মনে হচ্ছে জ্বালিস সই? উনি যেন

একটি খেতকমল, আর গুঁকে আক্রমণ করেছে চক্রবাক-ওড়া কোকনদের রক্তকানন।’

পঞ্চমী বলে উঠলেন—‘আর থাক খুব হয়েছে। সত্যিই উনি যেন সন্ধ্যার রক্তমা-লাগা ভরা চাঁদের ছবি।’

আনন্দে নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে, বাজনা বাজাতে-বাজাতে, তাঁরা ঝুম-ঝুম করে এগিয়ে এলেন, ঘিরে ফেললেন সিন্দূর-রেখাঙ্কিত তাঁদের প্রিয় নায়ককে। বলরাম তখনও নাচছেন, মত্ততা ও কৌতুক তখনও তাঁকে নাচালে।

তারপরে দু’পক্ষেরই অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল আবার কুসুম গুলালের অস্ত্র নিয়ে কেলি-যুদ্ধের। কৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না।

হোলিখেলায় বিক্রম দেখাতে দেখাতে যখন একই অস্ত্রাঙ্গে সরে গেছেন বল-পক্ষীয়েরা তখন কৃষ্ণ-পক্ষীরা একটি মহিলা... কাপিশায়ন—মদিরা পান করে কাম-হেলায় তখনও ঝাঁর বিহ্বল তস্থ... উৎসবীকণ্ঠে বলে উঠলেন,—

৭। ‘সারা গায়ে অঙ্কুর গন্ধ উড়িয়ে কৃষ্ণ আমার কি বাশরীই না বাজাচ্ছেন!... কেমন করে সরানো যায় ঐ বাশরী? ঐ ছোট বাশরী। ওটিকে সরালেই কৃষ্ণের আমার খতম হয়ে যাবে সব উল্লাস। উঃ, ওটির যেই সংযোগ হয় অধরে, যেই বাজে, অমনি আমাদের গানের বৃকে ঢিপ

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্যা

হিমালী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্যের  
মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই  
এর পরিচর্যা করা উচিত। উপযুক্ত  
উপাদানে প্রস্তুত হিমালী  
গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাভণ্য  
ও মসৃণতা বাড়ায়।



হিমালী  
আইভেট লি:  
কলিকাতা-২



চিপ পড়তে থাকে শেল। ঐ বাঁশীটিকে বশে আনবার একটা ব্যার করতেই হবে উপায়।’

বলতে বলতে ভাবতে ভাবতে তিনি পৌঁছে গেলেন এক সখীর কান থেকে আর এক সখীর কানের কাছে। ময়ূষণ ও সুরচাক নিপুণতার উদ্ভাবনে তিনি বাতিবাস্ত। ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন,—

‘সাক্ষাৎ সমক্ষে ঠাঁর হাত থেকে যে ছিনিয়ে নেব মুরলী তা অসম্ভব। আর মুরলীটিরও বিবারণ নেই, বিবশ হতেও জানে না। তা হলে এখন কেমন করেই বা এই চুরি বিচ্ছেদ ঘটাই?’

মুচকি হেসে হেসে, কানে কানে কথা কইতে কইতে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠল সকলের—ফোটা পায়ের মত।

৮। ‘পুরুষ-মুসভটিকে কেমন করে বশে আনা যায়’—এই প্রশ্নটি মনের মধ্যে আলোড়ন করতে করতে, তাঁরা উপস্থিত হয়ে গেলেন বুভাভুগানন্দিনীর কাছে। নিহুতে তাঁকে বললেন, ‘ও বাঁশীটির উপর যে আপনার লোভ আছে, ও বাঁশীটিকে যে আপনি বশে আনতে চান তা আমাদের অজানা নেই। ওটিকে যদি পেতে চান, তা হলে এখন একই ঢল করে মানিনী সেক্ষে বসে থাকুন। কৃষ্ণের বংশী-বাদন-প্রগল্ভতা ঘুচে যাবে; আর আমাদেরো ফলাও হবে সঙ্গীতের অতি নৈপুণ্য।’

সখীদের এই নিহুত আলাপচারী যদিও কর্ণগোচর হল না কুমুদাসবের, তবুও যিনি প্রতিভাধর তাঁর সহজাত বাচালতার ফুল ফুটে গন্ধ ছুটে আর কতক্ষণ! তাঁর তো আর কাউকে ভয়ের বাংলাই নেই। সখীদের গুজুগুজুনি ফিলাফিসনি দেখেই তিনি সটান পৌঁছে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। বললেন, ‘বয়স্য, মুরলীর গানের সঙ্গে এক চালে চলতে পারছে না ঐ মহিলাগুলির সঙ্গীত। তাই বোধ হচ্ছে, ষড়যন্ত্র চলেছে মুরলী-চুরির। অতএব মুরলীটি মদীয় হস্তে সমর্পণ করে কণ্ঠযোগেই গান চালান। আমার ব্রহ্মণ্য-প্রতাপের ধারে-কাছেও যৌষতে পারবেন না গুরা।’

কৃষ্ণ বললেন,—‘বয়স্য, বসন্তোৎসব তো আপনার। আর

আমারো তো অদেখা নয় ব্রাহ্মণের প্রভাব ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তির বিরূপ ছটা। আজ মুরলীটাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যে একলা আপনার সবচেয়ে বেশি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।’

উত্তর এল,—‘কি যে বলেন বয়স্য! ষাঁর ময়ূষণ গুণে আপনি আজ সর্বোৎকর্ষশালী শালীনতার শেষধাপে চড়েছেন, তিনি...সেই আমি...মুরলী রক্ষা করতে পারব না, সেটা কি একটা কথার কথা হল? ব্রহ্মাও চোখ চমকিয়ে দেখতে পাওয়া দূরে থাক ধরতেও পারবেন না আমাকে এই সংসারে। আমার মত জনৈক প্রিয়পাত্রের অবিস্বাস-স্থাপন করাটা উচিত হবে কি বন্ধু?’

কৃষ্ণ বললেন,—‘আহা তাও কি হয় বন্ধু! কিন্তু এই মহোৎসবের তৃপ্তি-সলিল অশেষ গভীর, আর প্রেমদারাও নিতান্ত গরবিনী। এখন তাঁরা যদি আপনার করতল থেকে ছিনিয়ে নেন মুরলী, তখন মহাশয় কি উপায় আবিষ্কার করবেন শুন? শ্রীমতী মুরলীদেবীটিকেই বা ফিরে পাওয়া যাবে কেমন করে?’

‘তা হলে দর্শন করুন আমার তপঃপ্রভাব।...এই বলেই কৃষ্ণের হাত থেকে নিঃসঙ্কোচে মুরলীটি ছিনিয়ে নিয়ে, বগলদাড়া করে, কুমুদাসব বলে উঠলেন,—‘বয়স্য, কণ্ঠযোগেই এবার গান চালান।’

‘যেমন আপনার অভিরুচি’—এই বলে কৃষ্ণ উপক্রম করলেন গাইতে।

যে মুহূর্তে চর্চরী-রাগিণীতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁগাবিনিন্দিত কণ্ঠে আবিস্ভূত হল কলগানের অতিমাধুর্য, সেই মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন কালিন্দী, অশ্রুবর্ণ করতে লাগলেন বৃন্দাবনের তরুণতা এবং কান খাড়া করে গান শুনতে লাগলেন বনের হরিণগীরা। শুনতে শুনতে তাঁদের দু’কানের পাশ দিয়ে দরদরধারে করে পড়তে লাগল ঘাম; এবং সেই ষেদাষুকে গীতমাধুরীর ধারা-স্রবণ ভেবে হরিণগীরা লেহন করতে লাগলেন পরস্পরের কান—হর্ষ-শিহরিত আবেশে। [ক্রমশঃ]

কুমারীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুজ



মার্কনী ফ্যান

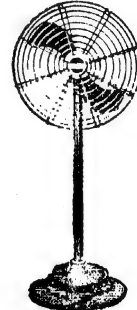
১৩টি কিলোওয়াট পর্যন্ত  
কোন বাড়তি খরচ নেই  
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো  
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা

ইইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে



# সাহিত্য পরিচয়

## শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবাবরণ

## বাড়ি পাগিয়ে

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি কালবিজয়ী নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠববর্ধনের ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য অবদান সম্বন্ধে অজ্ঞান মনে নতুন কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। তাঁর সম্বন্ধে এ যাবৎ কত আলোচনাগ্রন্থ য় রচিত হয়েছে তারও তুলনা মেলে না। এই গ্রন্থটি সেই তালিকার একটি সংখ্যাবৃদ্ধি করলেও গ্রন্থটি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের অবিকারী। আপন পটভূমি অনুযায়ী গ্রন্থটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অতুষ্কি হয় না। গ্রন্থটিতে শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি কাহিনীর সাংগঠনিক তাদের রচনা-ইতিহাস পরিবেশন করা হয়েছে। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনাদির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের, তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচ্যমূলক রচনাদির এবং বিভিন্ন লেখক রচিত তাঁর জীবনীগ্রন্থের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্মিলিত হয়েছে। পাঠকের যাবতীয় শরৎ-জিজ্ঞাসার অবদান ঘটাতে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। একটি গ্রন্থের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি রচনার কাহিনী এবং তাদের ইতিহাসের সম্মিলিত—পাঠকের কাছে এফ অসাধারণ লাভ। সঙ্কলক স্বনামধন্য সাহিত্যিক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। গ্রন্থটি সম্পাদনে তিনি যে অভাবনীয় কুশলতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাবিহীন। শরৎ-সম্পর্কিত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অপূর্ণ সংযোজন যুগপৎ বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের অধিকারী। সাধারণ্যে শরৎ-চর্চার প্রসার ব্যাপকতর করে তোলার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের সহায়তা অপরিহার্য। প্রকাশক—শ্রী সত্য, ১৬৩, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫। দাম—দুই টাকা।

## আনন্দ ভৈরবী

আধুনিক কবিত্বের প্রেমোদ মুখোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর পূর্ণাঙ্গিতা প্রেমের কবিতা সমষ্টিতে হয়ে এই গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। কবিতাগুলি তাঁর স্বজনীশক্তির এক বলিষ্ঠ পরিচায়ক। মানবজীবনের প্রেমকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর স্বচ্ছ কবিত্বশ্রুতিতে প্রেমের এক বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হয়ে তাঁর অমূল্যতম স্বরূপে এক অভিনব চেতনার সঞ্চার করেছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অনবদ্য কাব্যে। ছন্দ, দালিত্য ও প্রেমাদর্শনে কবিতাগুলি ভরপুর। তাঁর ভাবে প্রগাঢ়তা স্নানপূর্ণ, ব্যঙ্গনার এবং অমূল্যত্বের মিশ্রণ। কবিতাগুলিকে যথেষ্ট রসমুগ্ধ করে তুলেছে। ভাবার প্রাঞ্জলতা এবং সুসজীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর জীবনসচেতনতা কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। প্রকাশক—এম্ সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, দক্ষিণ চ্যার্টার্ড ষ্ট্রীট। দাম—দুই টাকা।

পিন্না সুস্মারও তেলেগু সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাম। বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় করানোর বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য বেঙ্গল অনুবাদকারী অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদক অন্যতম। আলেখ্যগ্রন্থটি একটি কিশোর উপন্যাস। ভারতীয় বা বাংলা সাহিত্যে কিশোর উপন্যাস-এর সংখ্যা খুবই কম। অনুবাদ কর্মটি তেলেগু ভাষায়। একটি বাড়ি পাগানো কিশোরকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। ঘটানি একটি কিশোর, পিতার শাসনের ভয়ে বাড়ি থেকে পাগিয়ে গিয়ে কত চোর, বদমাস, গুপ্তা ও সমাজবিরোধী লোকের কবলে পড়েছিল এবং তাদের কবল থেকে কিভাবে নিজে উদ্ধার পেলে ও একটি বালিকাকে নবযাত্রীদের হাত থেকে রক্ষা করলে, সেই কাহিনীটিই লেখক এতে সুন্দর ও মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরনের অনুবাদ যেকোন সাহিত্যের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। অনুবাদকের আন্তরিকতা ও সাবলীল ভাষা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঙালীর। প্রজন্ম সুন্দর, ছাপা ও বঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—পিন্না সুস্মারও। অনুবাদ—বোখানা। বিশ্বনাথন। প্রকাশনার—শ্রী বাসুদেব লাহিড়ী; ইস্ট লাইট বুক হাউস। ২০, ষ্ট্রাও রোড, কলিকাতা—১। দাম—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

## অমৃত সঞ্চয়

বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে যে স্বজন স্বনামধন্য লেখিকা আছেন, মহাশেখা ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাশেখা ভট্টাচার্যের পরিচয় নতুন করে দেওয়া বাহুল্য। ১৮৫৬ থেকে ১৮৯৯ সালের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে এই আলেখ্য উপন্যাসটি। স্বাধীনতা, তালুকদার, সিপাহী, কৃষক বিক্ষোভ, বাঙলা ও বিহারে নীলকরদের অত্যাচার; অশিক্ষা কৃষাক্ষার ক্ষমতা, লোভ, ঐর্ষ্যের আভিষ্য। হিন্দু-মুসলমান ও ইঙ্গসমাজের সভ্যতার কোলাহল। ভারতবর্ষে যে বিরাট বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠেছিল সেই সময়কার কাহিনীটি লেখিকা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। উপন্যাস রচনা করতে গেলে একটি নিশ্চিত গল্পের প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই গল্পটুকু ছাড়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, সাধারণ মানুষের চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রজা-সংস্কার, যানবাহন-পোশাক-পরিচ্ছদ, তুচ্ছ ও উচ্চ মানবিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে তুলতে সাধ্যমতো যত্নের কসুর করেন নি। বিদেশী-দেশী প্রায় একশ'টি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থটিতে। তাদের মধ্যে বিদেশী ম্যাকমাহন ও ভারতবাসী ভবানীশঙ্কর দুটি স্বতন্ত্র চরিত্র। ইত্যাদি মহাশেখার চরিত্রটি

সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভাগ্যহীনা পুরজুঁয়ারা চরিত্রটি বড়ই মর্মস্পর্শী। চম্পা, চিত্রাঙ্গদা, চন্দন, দুর্গা প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে লেখিকার সুগিয়ারান পুষ্টা বায়। গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি যথেষ্ট শ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বহু শ্রমের বিস্ময়ে তিনি বহু দুর্ভাগ্যবশত তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ সম্বলিত করেছেন এবং বহুতরঙ্গের চিত্র পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই সন্মত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিঃ, ১০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—আট টাকা। পূজার নয়া পয়সা।

### স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ

স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মজয়ন্তীবার্ষ সপ্ততি শেষ হ'ল! সমগ্র বিশ্বে বাঙালীরা বিবেকানন্দের শতবর্ষপূর্তি বহু বিচিত্র সমারোহে উদ্‌যাপিত করেছে। মেদিনীপুর কলেজ কর্তৃক সেই মহামানবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ আলোচ্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে স্বামীর সম্পর্কে বহু মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা বাঙলায় ও ইংরেজিতে প্রকাশ করে প্রকাশক মহাশয় সত্যই ধন্যবাদার্থী হয়েছেন। পত্রিকাটিতে ধারা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন তাঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল স্বর্ষকী হিববার বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্বিকী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, জীবনরূপ শেঠ, স্বামী লোকেশবানন্দ, কালীকিশোর সেনগুপ্ত প্রভৃতি। পত্রিকাটির বহুল-প্রচার কামনা করি। সম্পাদনা—শ্রীমানোমোহন দত্ত। প্রকাশনায়—সম্পাদক দ্বারা, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর। দাম—হই টাকা।

### নবনাট্যরূপ গিরিশচন্দ্র ঘোষের

#### মায়াবসান

অমর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি নাটককে নব-ভাবধারায় মনোপ্রাণিত করেছেন লেখক। বলা বাহুল্য বেশ কিছুদিন ধরেই নাট্যাভিযান ও নাট্যানন্দনের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আলোচ্য রচনা তারই অন্ততম ফসল; এ ধরনের প্রয়াসে অভিনয়োপযোগী নাটকের সন্ধান মেলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে এ ধরনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মূল নাটকের বস্তু্য কোথাও গুরু না করে যেভাবে বর্তমান নাট্যকার নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছেন, তাতে তিনি বিশেষ সাধুবারে অধিকারী। নাট্যসাহিত্যের পরিসরে তাঁর এই অবদান একটা চিহ্নিত স্থানের দাবী কবতে পারে স্বচ্ছন্দেই। ছাপা, বাঁধাই ও অপরূপের আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নবনাট্যরূপ—অমর মুখোপাধ্যায়—প্রকাশনায়—এস সি সরকার এন্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১ গি, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২, দাম—ছ'টাকা। পূজার নয়া পয়সা।

### Sarat Chandra Chatterjee

শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন লেখক বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে। শরৎচন্দ্রের রচনার সাহিত্যিক মর্ম যদিও কান নতুন মূল্যায়নের মুখোপেক্ষী নয়, তা হলেও

আলোচ্য রচনা বিশদ পাঠকের সামনে এক নতুন দৃষ্টিদর্শনের সন্ধান দেবে, প্রাজ্ঞ লেখকের চোখে নতুন করে শরৎ-সাহিত্যের রসমাধুর্য ধরা দেবে নতুন আলোর উজ্জ্বলিত হয়ে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়ার বিদেশী পাঠকও স্বচ্ছন্দে এর মর্মে প্রবেশ করতে পারবেন; শরৎচন্দ্র দেশ-কালের অতীত সাহিত্যশিল্পী, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিদেশীরা পাঠ্যযোগ্য ভাষায় এ ধরনের রচনা রচিত হওয়ার প্রয়োজনও সমধিক। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্তমান গ্রন্থ নিঃসন্দেহ মূল্যবান এক সাযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—হুমায়ুন কবির, প্রকাশনায়—শিল্পী সংস্থা, ১৬৩ আহিরীটোলা ট্রাট, কলিকাতা—২। দাম—তিন টাকা (ভারতে) দাম—ছয় শিলিং (বিদেশে)।

### দৃশ্যাস্তর

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি ছোট গল্প সংকলন। বর্তমানে ছোট গল্পের চাহিদা এবং প্রচলন সমধিক, সেজন্যই বহু নবগত ছোট গল্প লেখকও সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটির লেখক তাঁদের অগ্রতম। ভদ্র পরিমাণ নয় গুণগত উৎকৃষ্টতাই এই গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব। মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন রচনাশৈলীর সার্থক পরিচয় ঘটিয়ে লেখক বালা গল্পকে নতুন মনোদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এই সংকলনটিতে। রচনারাশির কারণে এ মনোভিত্তিক বিশ্লেষণে, ঘটনা সংস্থাপনের স্বাভাবিকতায় প্রাতি গল্প ভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মোট এগারোটি গল্প স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে, আন্তরিকতার ও উচ্ছ্বাসে প্রাতিটি রচনাই সমভাবেই অনন্ত মাহুতের অন্তরের গভীরে যেসব আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব-প্রতিষ্ঠা ও বেদনার আলোড়নের সৃষ্টি করে, লেখকের বলষ্ঠ লেখনীতে ফুটে উঠেছে তারই প্রতিকৃতি, আর সেইজন্যই রচনাগুলি হয়েছে সফল ও সার্থক। গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—চিত্তি ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীরামদত্ত পাল, ২৪এ, কলেজ রো, কলিকাতা-১। দাম—তিন টাকা। পূজার নয়া পয়সা।

### চিত্রলেখা

জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যকার আনাটোল ফ্রান্সের 'থেরিস' নামক উপন্যাসটিই বর্তমান গ্রন্থের মূল উৎস। মূল রচনার মতই এতেও পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন প্রভাটের সমাধান খুঁজেছেন লেখক। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে কি না এ কথা এক্ষেত্রে অবাস্তব, কারণ তিনি একান্তভাবেই আন্তরিক আর এটা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধই যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনই সম্পূর্ণ বিষল হয় না। লেখক চিত্রিত স্থিতিতেও নিপুণ, চিত্রলেখা, কুমারগিরি বিশাল দেব প্রভৃতি চরিত্রগুলি যথেষ্ট উচ্ছল ও প্রাণবন্ত, তাঁর ভাবারীতিতেও বেশ একটা সহজ স্রবসা রয়েছে, যদিও বর্তমান মূল হিন্দী থেকে ভাষান্তরিত অনুবাদকর্ম মাত্র, তবু সম্ভবত অনুবাদকের দক্ষতার মূল রচনার ভাষা-লালিত্য অনেকটাই ধরা দেয়। বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখায় যে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলেছে, বর্তমান রচনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রচ্ছদশিল্প স্ন্যম, ছাপা ও বাঁধাই যথায়থ। লেখক—ভগবতীচরণ বর্মা, অনুবাদ—হুমল সরকার। প্রকাশক—এস সি সরকার এন্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১ গি, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা। পূজার নয়া পয়সা।

## অরণ্য - ভারত ( শিকার-কাহিনী )

বন বা বন্যদের নিয়ে কিছা শিকারের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পূর্বে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অরণ্য-ভারতের লেখকের চোখে অরণ্য অল্পম হয়ে ধরা দিয়েছে ও অরণ্যচারী খাপদ ও সবুজ প্রকৃতির মধ্যে সন্মিলন হয়ে উঠেছে। অরণ্যের মিশ্র বঙ্গনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবে চিত্রিত হয়েছে। শুধু স্তম্ভন নয়, ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থানের শিকারের কাহিনীও বিজ্ঞানমূলক এই গ্রন্থটিতে। লেখকের দীর্ঘ দুঃসাহসিক চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অরণ্য-জীবনের অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলি বড়ই মর্মস্পর্শী। সেই মনোমগ্ন অরণ্যচারীর পরিবেশ মনকে আনন্দে অভিভূত করে তোলে। অরণ্য-ভারত সত্যি একটি অপরূপ শিকার-কাহিনী। লেখকের বর্ণনাত্মক স্মৃতি, ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীল। চিত্রগুলি গ্রন্থটিকে স্তম্ভিত করে দেয়। নিঃসন্দেহে। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বিশ্বকাম সিংহ। প্রকাশনা—শ্রীমতী শিপ্রা রাইচৌধুরী। ৮৪ পৃ, নিম্ন গোছামী সেন, কলিকাতা-৫। পরিবেশনা—দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং প্রাইন্টিং, ৫৪৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা।

## শেষ বসন্ত

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু একটু নতুন ধরণের। এক বৈজ্ঞানিকের ধর্মোত্তরকে কেন্দ্র করে আঁকিত হয়েছে এর পাত্র-পাত্রী। বর্তমান জীবনিক বিপ্লবকেই সেন অভিমুখ করেছেন লেখক চিত্রাবলী মেঘনাদের মতন। বৈচিত্র্যের একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যায় রচনাটির মাঝে—যা সত্যি কোঁচলপ্রদ। অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ক্রেটিয়ন। লেখক—মহিলাস্বর্গ রায়, প্রকাশক—রূপা এ্যাণ্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

## পঞ্চশর

আলোচ্য রচনার বিষয়বস্তু বিদেশী এক নামকরা নাটক থেকে গৃহীত। হাফা হা'সর ছোঁয়ায় উজ্জ্বল নাটকটি পাঠকের মনোমগ্ন করবে বলেই মনে হয়, নাট্যকারের সাবলীল শৈলীও বেশ উপভোগ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—দীপ্তেন রায়, ৪৪২বি, হাজরা রোড, পরিবেশক—গ্রন্থলাক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—দু'টাকা।

## পঞ্চমাস্ত

'আগাথা কুটি' রহস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ এক চিহ্নিত নাম, বসন্ত একমাত্র কনান ডায়ালের অমরত্মক 'শার্লক হোমস' রাতের মস্তুরোমাঙ্কের পরিসরে শ্রীমতী কুটির অবদান 'হাকুলি পারে' প্রায়

অনন্তই; কি ঘটনা সংস্থাপনে কি রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রীমতী কুটি অতুলনীয় এবং সেজন্যই আজ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসীরা কানে 'আগাথা কুটি' এই নামটি শুধু স্তম্ভিতই নয়, স্তম্ভিত ও টেকে। এই সুবিখ্যাত লেখিকার রচনার সঙ্গে বাস্তবী পাঠকের পরিচয় করানোর ভার নিয়েছেন 'ত্রিবেণী প্রকাশন'। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁদের এই প্রচেষ্টার পঞ্চম ফল, মূল রচনার ভাবমাদুর্য প্রায় অবিকল বজায় রয়েছে, অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই যে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায় বর্তমান রচনা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বলা বাতিল্য এজন্য যে কৃতিত্ব তা সর্বশেষেই অনুবাদের প্রাপ্য। অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। বইটির অঙ্গসজ্জাও শোভন। লেখিক—আগাথা কুটি, অনুবাদক—নীরঞ্জননাথ চক্রবর্তী, প্রকাশনা—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, জামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা।

## মা বুকের মুখ

বর্তমান গ্রন্থে লেখক একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যিক, গ্রন্থের অঙ্গসজ্জাই বীর পেশা তাঁর হাতে বিষয়বস্তুও যে সমানভাবে শিল্পাত্মক হয়ে উঠতে পারে, আলোচ্য উপজাতি তাঁরই স্বাক্ষরবাহী। এক গ্রাম, যুবকের জীবনায়ন করতে চেয়েছেন লেখক, বর্তমান রচনার তাঁর সে উদ্দেশ্য খণ্ডিতভাবে সফল, কারণ এতে নায়ক কামিনীর প্রথম যৌবনের হাসনা ও বাথামেশা দিনগুলির কথাই শুধু বিবৃত হয়েছে। লেখক সক্ষম একটুকরো ভূমিকার জানিয়েছেন যে, উপজাতি এখানেই শেষ নয়, এর কোঁচলবে পর্বতী খণ্ড পর্বত; আশার কথা, কারণ আলোচ্য খণ্ডে তিনি পাঠকের উৎস্রুতা ও মনোযোগ এ দু'টোই সমানভাবে জগাতে পেরেছেন। আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ শৈলী এক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক। আমরা বইটি পড়ে খুশি হয়েছি। প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—পূর্ণদীপ্তী, প্রকাশনা—ত্রিবেণী প্রকাশন। ২, জামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা।

## আদি থেকে আধুনিক

আলোচ্য গ্রন্থটি এক একাংক নাটক, নাট্যকারের তত্ত্বাবধায় সহজ, তত্ত্বা পথে কেমন করে মানব থেকে সেবতা হওয়া যায় নাট্যকারের মূল বস্তুবা সেটাই। নাট্যের গতি লক্ষ ও দুর্বল, নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে নাটক হয়ে উঠতে পারেন, এক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অভ্যর্থিত। 'আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—বসন্তনাথ ভট্ট, প্রকাশক—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১-১-১ এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—এক টাকা।

এই যে শ্রদ্ধাভাজন সগুণীর জলরাশি স্মৃতি কলসের দুই তীক্ষ্ণ কনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন স্তম্ভের উদ্ভাস আর কি আছে। এই মলমল-স্বপ্নের বসন্তের ইহাতে পিতৃ-পিতামহ সেবিত আজন্ম পরিচিত বাস্তব পর্বত যখন স্নেহ-সজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অস্তিত্ব উর্বর-সুন্দর জামল হইয়া উঠে।

—বসন্তনাথ

# ॥ ১৩৭০ সালের উল্লেখযোগ্য বর্ষ ॥

## প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ সংকলন

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২'৫০	মানারঞ্জন গুপ্ত
আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (এল লান্ডাও, শুয়াই রুমান)	১'৫০	বিনয় মজুমদার অনূদিত
		জ্ঞানদাল বুক এজেন্সি
উনিবিংশ শতাব্দীর বাংলা	১০'০০	যোগেশচন্দ্র বাগল
কবিত্ত্ব	৪'৫০	অমূল্যদত্ত মুখোপাধ্যায়
কথাসাহিত্য	৫'০০	নারায়ণ চৌধুরী কনটেম্পোরারী
		পাবলিশার্স
কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র	৮'০০	ডঃ সুরধাক্ষর চট্টোপাধ্যায়
		এমুথাক্সি
কবিত্ত্বরূপের সজ্জা	৪'০০	ডঃ রণেন্দ্রনাথ দেব বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাক্য ও কাব্য	৫'০০	হরিশ্চন্দ্র মিশ্র বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
ধরে চলে	৪'৫০	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
জাতীয় সমস্যার স্বামী		
বিবেকানন্দ	৩'০০	স্বামী সুলকরানন্দ বিবেকানন্দ সোসাইটি
ঐতিহাসিকনাথ	১০'০০	ডঃ সুবীণী রায় জিজ্ঞাসা
নন্দলাল বসু	৬'৫০	কানাই সামন্ত কথাসিঙ্গ প্রকাশনী
নাট্যতত্ত্বময়মালা	১৩'০০	ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বিজ্ঞানদায় লাইঃ
নৈরাজ্যবাদ	১০'০০	ডঃ কল্যাণনাথ বসু রূপা গ্রাণ্ড কোং
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	৩'০০	গোপালচন্দ্র দাস সাহিত্য সদন
বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ	১০'০০	ডঃ হরপ্রসাদ মিশ্র
বাংলার লোকসাহিত্য (২য় খণ্ড)	১২'৫০	ডঃ অশ্বিনীনাথ ভট্টাচার্য
বাংলা ছোট গল্প	৬'০০	ডঃ শিশিরকুমার দাশ বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা	৫'০০	অসিতকুমার ভট্টাচার্য
বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক	৫'০০	ডঃ দেবেন্দ্র চৌধুরী বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি	৬'০০	কুন্দরাম দাস বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
বাংলা ছন্দের নানা কথা	৩'০০	হলাচন্দ্র দাস মডার্ন বুক এজেন্সি
বিষয়বিশেষ	১০'০০	অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় শাক্তী প্রকাশ বসু
		ও শঙ্কর সম্পাদিত বাক্ সাহিত্য
বিষয়-সাহিত্যের লেখক	৫'০০	ভবানী মুখোপাধ্যায় এম্ সি সরকার
বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে	৬'৫০	আশা রায় মিত্রালয়
ভক্তিকবি মধুসূদন রায় উৎকলে নবযুগ	৬'০০	১৩৩১ দেবী
ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন	৬'০০	মৌর্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপা গ্রাণ্ড কোং
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প	১০'০০	জ্যোতি গুপ্ত
সাহারানী কল্যাণী	২'১৫	যোগেন্দ্রনাথ বাগচী
		কুন্দরাম ধর্মশোশান, ঝড়দহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩'০০	নিতাই বসু
মার্কসবাদ	১'৫০	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
		জ্ঞানদাল বুক এজেন্সি
মুফক্কর আঃমদ	১'৫০	"
মুখ্যমুখ্য আদিবাসী	১'১৫	প্রমথ গুপ্ত
মেঘনাদবধ কাব্য	৪'০০	ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত
মৃগচাঁর স্বামী বিবেকানন্দ	২'০০	প্রবন্ধকুমার দাশগুপ্ত
রসশেখর রাজশেখর	১'০০	নিতাই বসু
রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা	৫'০০	তারকনাথ ঘোষ ওরিয়েন্ট বুক কোঃ
রবীন্দ্রনাট্য পরিচয় (১ম খণ্ড)	৫'০০	ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
		বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ
রূপদর্শিকা	১০'০০	অসিতকুমার তালদার
লক্ষ্মী ও গণেশ	৪'০০	অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ
		পুরোগামী প্রকাশনী
শিল্পী স্বাধীনতা ও সমাজ	৪'৫০	শান্তি বসু
শুভ বিবাহ কথা	৪'০০	দ্বিব্যদশী
সমাজ শিক্ষা প্রসঙ্গ	৬'০০	মমতানাথ রায়
সাম্প্রতিক	৮'৫০	অমিয় চক্রবর্তী
সাহিত্যসংগ্রহ বিবেকানন্দ	৩'০০	ডঃ অমীর হোসেন কল্লোল প্রকাশনী
সাহিত্য ও সংজ্ঞা চিন্তা	৩'৫০	নিখিলরঞ্জন রায়
সাহিত্যিকোষ (নটিক)	৫'০০	অলোক রায় সম্পাদিত
স্বাধীনতা সংগ্রামে বালাব নারী	১০'০০	কমলা দাশগুপ্ত
স্বর্গীয় শতাব্দী	৩'৫০	নিখিলরঞ্জন রায় আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স
স্বর্গাঙ্গের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য	৮'০০	বার্ণিক রায়
<b>উপন্যাস</b>		
অনিমিত্তা	৪'৫০	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এম সি সরকার
আনাস	৫'০০	চতুর্মুখ
আবর্তন	৪'৫০	বিমল কর
আবর্ত	৫'০০	বিশনাথ রায়
আলোর সংগঠন	৪'০০	মিহির আচার্য
আইসেলো বেল	৬'৫০	নালবর্তী
উপন্যাসিকা	৪'০০	বীরেন্দ্রনাথ দাশ
কৃত্তসংগ্রহ	৫'০০	নারায়ণ দাশগুপ্ত
এম, এল, পাম্পা	১'০০	ঐশ্বর্যাবর্ত
এক স্তম্ভন এক বেগম	১'০০	বীরেন্দ্রনাথ দাশ
একক ধনক শতক	১৪'০০	বিমল মিত্র
একটি চতুর্বি শাখি ও		
কালো ঘের	৫'০০	তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি সোনা মন	৬'০০	তপতী রায়

## সাহিত্য পরিচয়

কবিতা কানন	৪'৫০ মনীন্দ্রনাথ রায়	বাক-সাহিত্য	নীল আশু	৬'৫০ সারাজ রায়চৌধুরী	বাক-সাহিত্য
কনখল	৭'০০ মনীশ ঘটক	বিত্তোর লাইব্রেরী	নীলবর্তী	৭'৫০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
কত রঙ	৪'০০ প্রভাত দেবসরকার	গ্রন্থপীঠ	নুরজাহান	৬'০০ সুকল্যা	কল্পনা প্রকাশনী
কাঁচ-কাটা হীরে	৩'৭৫ প্রবোধকুমার সান্নাল	মিত্র ও ঘোষ	পরম্পরা	৪'৫০ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ
কাগজের দেওয়াল	৩'৫০ মিহির সেন		পাহাড়ী সন্ধ্যা	২'৫০ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	রিডার্স কর্পার
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা	৪'০০ বিমল মিত্র	গ্রন্থপ্রকাশ	পদ্ম-পলাশ	৪'০০ সুখান্ত সরকার	গ্রন্থলোক
কল্যাণী লোকাল	৫'০০ চতুর্ঘর্ষ	সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ	পায়ে পায়ে প্রহর	৭'৫০ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	
গড় কুটো	৪'০০ বিমল কব	আনন্দ পারিঃ প্রাঃ লিঃ	পারাবার	৩'০০ সুদীপক মুখোপাধ্যায়	
গঙ্গা হৃদি	৬'৫০ শক্তিপদ রাজগুরু		পাত্র পাড়ী	২'৫০ শংকর	বাক-সাহিত্য
গড় নাসিমপুর	৮'০০ বারীন্দ্রনাথ দাশ	ক্লাসিক প্রেস	পাহাড়তলির দুই কল্যা	২'০০ বীর সরকার লোক সাহিত্য	সংসদ
গীতাকাপুরের আত্মহত্যা	৫'০০ গৌরঙ্গপ্রসাদ বসু	বাক-সাহিত্য	পাঁচ নম্বর ঘরের বাসিন্দা	২'৫০ বৃক চক্রবর্তী	সুরবি
গোপনপত্র	৪'০০ অচিন্ত্যকামার সেনগুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ	পাঁতায়রের পুনর্জন্ম	৩'৫০ বনমূল	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড
তুসুল	৪'০০ বিজ্ঞান চক্রবর্তী		প্রতিধ্বনি	৩'০০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য	বসু চৌধুরী
গিরিকল্যা	২'৭৫ শিশির সরকার	বিত্তোর লাইব্রেরী	প্রথম পদক্ষেপ	৩'৫০ রামশ্রী মুখোঃ আধুনিক সাহিত্য ভবন	
গ্রীষ্ম বাসর	২'৭৫ জ্যোতির্বিদ্য নন্দী	ত্রিবেণী প্রকাশন	প্রেম ও প্রয়োজন	৪'৫০ তারাকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিবেণী প্রকাশন
ছায়া দিগন্ত	৪'০০ নিরল সরকার		বহিরঙ্গ	৩'৭৫ আশাপূর্ণা দেবী	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিঃ
জলছবি	৪'০০ আশাপূর্ণা দেবী		বহুকল্যা	২'৫০ বিশ্বনাথ রায়	
জঙ্গলগড়	৪'০০ তারাকমল বন্দ্যোঃ	গ্রন্থপ্রকাশ	বধু মল্লার	৫'০০ হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	
জিয়া ভরলি	৫'০০ সুবোধ ঘোষ	আনন্দ পারিঃ প্রাঃ লিঃ	বর্ণালী	৩'০০ সুবোধ ঘোষ	রবীন্দ্র লাইব্রেরী
জীবনবাদ	৪'০০ আশাপূর্ণা দেবী	গ্রন্থপ্রকাশ	বসন্ত রজনী	২'৫০ সারাজকুমার রায়চৌধুরী	বোল-একাল
জালামুখী (অনন্তগোপাল শিষ্যে)	২'৫০ শুধাকান্ত রায়চৌধুরী	কনসিট	বসন্ত রজনী	৫'৫০ বিক্রমদিত্য	বাক-সাহিত্য
মড	৭'০০ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ	বসন্ত রজনী	৮'৭৫ হরিনাথ চট্টোঃ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিঃ	
টুনি মেম	৭'৫০ সৈয়দ মুক্তাব আলী মিত্র	ও ঘোষ	বসন্ত রজনী	৮'০০ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কথাকলি
তমসা	২'৫০ তারাকমল বন্দ্যোঃ	মুকুল পারিঃ	বসন্ত রজনী	৪'৫০ অজিতবৃক বসু	বিহার সাহিত্য ভবন
তপতীর তৃষ্ণা	৪'০০ রমাপতি বসু		বসন্ত রজনী	৮'৭৫ দীপকুমার রায়	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিঃ
তারার আলো	৩'৫০ সনৎকুমার বন্দ্যোঃ	গ্রন্থপ্রকাশ	বসন্ত রজনী	৩'০০ সুবোধ ঘোষ	ত্রিবেণী প্রকাশন
তারুণ্যের কাল	২'৫০ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ	রবীন্দ্র লাইব্রেরী	বসন্ত রজনী	৩'০০ শরদিন্দু বন্দ্যোঃ	আনন্দধারা প্রকাশনী
তিন কাহিনী	৬'০০ বনমূল	গ্রন্থপ্রকাশ	বসন্ত রজনী	৪'৫০ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
তিমির বিদার	৩'০০ সমর বসু	কনটোল্পবাহী পারিঃ	বসন্ত রজনী	৩'৫০ প্রতিভা বসু	সুরভি প্রকাশনী
দুই পাখি	৩'৫০ প্রবোধকুমার সান্নাল	বাক-সাহিত্য	বসন্ত রজনী	২'৫০ সনৎকুমার বন্দ্যোঃ	আর এন চ্যাটার্জি
দুই অংগ	৬'০০ সমরেশ বসু	আনন্দ পারিঃ প্রাঃ লিঃ	বসন্ত রজনী	৭'০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স
দোলনা	৫'০০ আশাপূর্ণা দেবী		বসন্ত রজনী	৪'০০ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	গ্রন্থপ্রকাশ
দৈনন্দিন	৩'০০ বিভূতিভূষণ মুখোঃ	বাক-সাহিত্য	বসন্ত রজনী	৪'৫০ কালীপদ ঘটক	মিত্র ও ঘোষ
দুগ্ধ দুগ্ধান্তর	৩'০০ চিত্তরঞ্জন ঘোষ		বসন্ত রজনী	৫'০০ প্রবোধ সরকার	সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
দ্বি নায়িকা	২'০০ সৌদামিনী মজুমদার		বসন্ত রজনী	৪'৫০ শংকর	বাক-সাহিত্য
দ্বিচারিত্রী	২'৭৫ দিলীপকুমার রায়	বাক-সাহিত্য	বসন্ত রজনী	৩'৫০ মেম চট্টোপাধ্যায়	
দ্বিতীয় অন্তর	১'৫০ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ	বাক-সাহিত্য	বসন্ত রজনী	৪'০০ নবেন্দ্র ঘোষ	
ধূসর গোখলি	৪'৫০ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ	বসন্ত রজনী	৫'৫০ চতুর্ঘর্ষ গোখলি	
নতুন হাওয়া	৪'৫০ বিমল কব	ত্রিবেণী প্রকাশন	বসন্ত রজনী	৫'০০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র	
নকল মাহুয	৪'৫০ শক্তিপদ রাজগুরু	সাহিত্য জগৎ	বসন্ত রজনী	৪'০০ অজিত মুখোপাধ্যায়	পেলিক্যান প্রেস
নভরানা	১'০০ অমরেন্দ্র দাস	সুরভি প্রকাশনী	বসন্ত রজনী	১'০০ অমরেন্দ্র দাস	ক্যালকাটা পারিঃ
নিষাদ	২'৫০ চিত্ত সিংহ	সুজনী	বসন্ত রজনী	৮'০০ দীপক চৌধুরী	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিঃ
নিষিকটু	১ম পর্ব ৭'৫০ ; ২য় পর্ব ৮'০০	মনোজ বসু গ্রন্থপ্রকাশ	বসন্ত রজনী		
মিশিঙ্গ	২'৫০ প্রবোধকুমার অধিকারী		বসন্ত রজনী		

বিবিধ রচনা

লড়াই থেকে ফরা	৪'৫০	বরেন বসু
লসিতা	২'৫০	নীলকণ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশ
লক্ষ তারার অঙ্ককার	৩'০০	নিময় চাঁধুরী কনটেম্পোরারী পাব্লিশিং
লাকেহা	১৪'০০	প্রথমখনাথ বিদ্যা মিত্র ও ঘোষ
লাহোর বাস	২'০০	আশা দেবী
শাহানী একটি ঘরের নাম	২'০০	আব্দুল আজীজ আল-আমান
সর্বহার্য	৪'০০	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম সি সরকার
সফ্যাদীপের শিখা	৪'০০	তরুণকুমার ভাদুড়ী মিত্র ও ঘোষ
সপ্তস্বরা শিনাকিনী	৩'০০	অবধুত জাশনাল পার্লিশার্স
সাধের শারিকা	৮'০০	প্রফুল্ল রায়
সিংহ সেনাপতি	৮'০০	রাজল সাক্ষ্যারন আর এন চ্যাটার্জি
সংস্কৃত শিবির	৮'০০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশ
সুনন্দা	৩'০০	স্ববীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র লাই:
সেদিন রাতে	৩'৫০	সুব্রতমার বিশ্বাস আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাব্লিশিং
সেতুবন্ধ	৩'০০	প্রতিভা বসু আনন্দধারা প্রকাশ
সোহাগ-রাত	৪'০০	সুমনাথ ঘোষ মিত্র ও ঘোষ
স্বক প্রহর	৫'০০	প্রমোদ মিত্র গ্রন্থ প্রকাশ
হৃদয়ের রঙ	৪'০০	জ্যোতিবিন্দু নন্দী

গল্প ও গল্প সংকলন

অলোকদৃষ্টি	৩'৫০	সতীনাথ ভাদুড়ী বাক্স-সাহিত্য
আলোর বৃত্ত	৩'৫০	সমরেশ বসু বেঙ্গল পাব্লিশিং
অয়ন	২'০০	তারাক্ষর বন্দ্যো: রবীন্দ্র লাই:
অধুনিক কণ্ঠ গল্প	৫'০০	ইলা মিত্র অনূদিত জাশনাল ব্লু: এ
উত্তরকালে গল্প সংগ্রহ	১০'০০	মানিক বন্দ্যো: জাশনাল ব্লু: এ
গল্প-সমগ্র	১০'০০	রমাপদ চাঁধুরী আনন্দ পাব্লিশিং
গল্প-পঞ্চাশৎ	২০'০০	তারাক্ষর বন্দ্যো: মুকুন্দ পাব্লিশিং
গোলাপ ঝাঁটা	৩'০০	পারিজাত মল্লিক
চিত্রালী	৬'০০	স্ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর এম সি সরকার
ছবি	৪'০০	জরাসন্ধ মিত্র ও ঘোষ
জ্ঞানাকী মন	২'০০	পরিতোষ মজুমদার মণ্ডল ব্লু: হা:
দ্বিধা	৩'০০	রবীন্দ্র বসু
প্রেমের গল্প	৩'০০	বিভূতিভূষণ বন্দ্যো: বিভূতি প্রকাশ
বিন্দু ও ত্রিভূজ	৩'২৫	চিত্রিতা দেবী ডি এম লাই:
ষিদেশিনী (অনুবাদ)	১০'০০	মীনাকী দত্ত সম্পাদিত ন: সা: ভবন
যৌ	২'৫০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যথার দান	৩'৫০	নজরুল ইসলাম
ভাসে আমার ভেলা	১২'০০	বৃক্শদেব বসু এম সি সরকার
মহাশুদ্ধের পরে	২'৫০	বৃক্শ চক্রবর্তী
লেখিকা-মন	৮'০০	বাণী রায় সম্পাদিত সাহিত্যারন
সজ্জবদল	২'০০	আশাপূর্ণা দেবী
স্বপ্ন নামে শুষ্ক পাখি	৪'০০	নবেন্দু ঘোষ বাক্স-সাহিত্য
দ্বীপ মানেই ইন্দ্রী	২'৫০	শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থ প্রকাশ

অপরাধী চাষা	৬'০০	দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত কনটেম্পোরারী পাব্লিশিং
আমেরিকার ডায়েরী	১'৫০	দেবজ্যোতি বর্মণ বাক্স-সাহি:
আমার দেখা ববীন্দ্রনাথ ও		
ঐর শাস্তিনিকেতন	৪'৫০	প্রমোদমিত্র ঘোষ
আনন্দ কী হেমিংওয়ে	১'০০	(ফিলিপ ইয়াং) রাথালচন্দ্র ভট্টাচ
		এশিয়া পাবলিশিং কে
আমাদের গুরুদেব	৩'৫০	সুদী: জ্ঞান দাস বিশ্বভার:
আচার্য সত্যেন্দ্র বসুর জীবনী	২'০০	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতিহাসের নায়িকা	২'৫০	আঃমান মিত্র
ইন্দ্রজিতের আসর	৩'০০	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনন্দ পাব্লিশিং
ইন্দ্রিয়া দেবীর পত্রাবলী	৫'০০	বাক্স-সাহি:
উইলিয়াম যক্ষনার	১'০০	বৃক্শগোপাল চট্টো: এশিয়া পাব্লিশিং
একটি পেরেকের কাহিনী	২'০০	সাগরময় ঘোষ এস গুপ্ত জাদা
এভারেস্ট ডায়েরী	১'০০	স্ববীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আনন্দ পাব্লিশিং
এরা অভিমুখ আসাম	৩'৫০	চিত্রগুপ্ত
বিল্লর পাহাড়ী	৬'০০	ব্রজমোহন ভট্টাচার্য
গুরুদেব	৫'০০	রাণী চন্দ্র বিশ্বভার:
চকিত চমকে	২'১৫	বিনয়জীবন ঘোষ ইণ্ডিয়ান অ্যাচে
চোখের আলোর দেখেছিলাম	৫'০০	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঊষী	৫'০০	শ্রীপাঙ্ক
টমাস উলফ (হিউ হলম্যান)	১'০০	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত
		এশিয়া পাব্লিশিং কে
দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)	১২'৫০	সাহিত্য সং
নরনারায়ণ পরিচিতি	২'৫০	ড: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত
		বৃক্শগোপাল প্রা: দি
নটনটীদের বিচিত্র কাহিনী	৩'০০	দেবনারায়ণ গুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ
নিজে ব্যবসা করুন	৩'০০	শিল্পকুশলী আর্ট এন্ড লেটার্স পাব্লিশিং
নীল দুর্গম	৬'৫০	শঙ্কু মহারাজ মিত্র ও ঘো
পলাশীর পর বঙ্গার	১'৫০	তপনমোহন চট্টো: ত্রিবেণী প্রকাশ
পত্রাবলী	৮'০০	সুভাষচন্দ্র বসু এম সি সরকার
প্রাগৈতিহাসের মানুষ	৮'০০	শচীন্দ্রনাথ বসু
বরণীয় মানুষ, অরণীয় বিচার	৫'০০	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থ প্রকাশ
বাংলা-ডয়েটস্ পাঠমালা	৫'০০	সাধনা সোম ও লুসি কর্ণেল সেন
বাস্তবতার বিবেকানন্দ	২'০০	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বিবেকানন্দ স
বিষয়-শিরোনাম (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	৫'০০	বৃক্শময় ভট্টাচার্য
বিচিত্র মানবী	৫'০০	শ্রীপাঙ্ক প্রা
বিখ্যাত শিকারী-কাহিনী	৮'৫০	বিত্ত মুখোপাধ্যায়
		দি নিউ বুক এম্পোরিয়
বিষ্ণুপুর ঘরাণা	৫'০০	দিলীপ মুখো: বৃক্শগোপাল প্রা: দি
বীর সাধক বিবেকানন্দ	২'০০	স্বজিতকুমার নাগ আদিত্য
		প্রকাশনা
ভারতদর্শন	৮'০০	কমল বন্দ্যোপাধ্যায়



## সাহিত্য পরিচয়

রত্নের বাহুবল	১৫'০০ বোধিসত্ত্ব
রত্নের নী-শিল্প	১৫'০০ রাধাকৃষ্ণ মুখো: কিতাব মহল
হাম্বন্ধের অন্তরালে	৪'০০ চিত্রাব সেন
হাথী গালা	৬'৫০ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন
ন মধুকর	৮'০০ নির্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্নের চিঠি	৪'০০ শুভময় ঘোষ গ্রন্থ প্রকাশ
জানহাটান ও মাটিনী	৫'০০ শিবতোষ মুখোপাধ্যায় কনটোম্পোরারী পাবলিশার্স
মবার পতনের ভূমিকা	২'৫০ ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ
বীন্দ্র অভিধান (৩য় খণ্ড)	৬'০০ সোমেন্দ্রনাথ বসু
হস্তময় প্যারিস	৩'০০ দিগ্বীপ মালিকার গ্রন্থ প্রকাশ
বার্ট ফ্রাঙ্ক (লরেন্স টমসন)	১'০০ বাণী রায় অনুদিত এশিয়া পাবলিশিং কোং
গাময়ণ-সার	৬'৫০ আচার্য যতীন্দ্র রামাচন্দ্র দাস শ্রীবল্লভ ধর্মসাপান খড়হ
শব্দভারত (দেবতার কথা)	৫'০০ সুবোধকুমার চক্রবর্তী এ. মুখার্জি শিল্পার আনন্দকথা
	২'৫০ সাধনা বসু (কম্বলখক কল্যাণক বন্দ্যোঃ) গ্রন্থ প্রকাশ
শশির-সান্নিধ্যে	৬'০০ রবি মিত্র দেবকুমার বসু গ্রন্থ প্রকাশ
শব্দভারতের আপন দেশে	৪'০০ রাণু সান্মাল আনন্দ পাবলিশার্স
মকালের কথা	২'০০ মুজফফর আমের ক্লাশনাল বুক এজেন্সি
সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার	৫'০০ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোঃ ভেনায়েল প্রিণ্টার্স
সংস্কৃতি চন্দ্রনগর পরিচয়	২'০০ হরিহর শেঠ চন্দ্রনগর পুস্তকাগার
গায়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)	বিনয় ঘোষ সম্পাদিত বীক্ষণ
বর্গের সন্ধানে মানুষ	৩'০০ শৈল চক্রবর্তী ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
হস্তরেখা অভিধান (কিরো)	পরীক্ষিত অনুদিত আর্ট এ্যান্ড লেটার্স
কণদর্শন	৪'৫০ ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত মিত্র ও ঘোষ
কীডাসনট নগেন্দ্রপ্রসাদ	
সর্বাধিকারী	৪'০০ শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ এন পি সর্বাধিকারী স্মারক সমিতি

## Old Bengali Language and Text

১২'০০ ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

## কাব্য ও কাব্যসংকলন

মৃগচর	২'০০ রঞ্জিত সিংহ
মৃগে জলের শব্দ	২'০০ পরেশ মণ্ডল
মরিচা নীলমা	২'৭৫ আহসান হাবীব
মানবের ফেরিওয়ালা	২'৫০ হরপ্রসাদ মিত্র সিগনেট বুক শপ
ঈশ্বর-পঞ্চাশ	৫'০০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য
মবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাঃ	
শ্রেষ্ঠ কবিতা	৬'০০ কলিকাতা বুক হাউস
মবিতা : ১১৫৬-৬১	৪'০০ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোঃ কবিপত্র প্রঃ ভবন

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা	২'০০ বরুণাসিদ্ধি দে	গ্রন্থ প্রকাশ
কাচের মানুষ	৬'০০ দিনেশ দাস	ত্রিবেণী প্রকাশন
কাছেই জানালা	৩'০০ অনিলেন্দু চক্রবর্ত	নিউ বুক এম্পোরিয়াম
ঘনিষ্ঠ তাপ	৬'০০ অরুণ মিত্র	ত্রিবেণী প্রকাশন
চেরি	২'০০ সুনীতিকুমার মুখোঃ বিহার সাঃ ভবন	
ছায়া হরিণ	২'৭৫ আহসান হাবীব	
নাগকেশর	১'৫০ সাত্যকি ডি এম লাইব্রেরী	
নির্ধাসন	২'০০ পরিমল চক্রবর্তী কবিপত্র প্রঃ ভবন	
নীল পাখি ধূসর আকাশ	২'০০ শান্তিকুমার রায় এশিয়া পাব্লিঃ কোঃ	
প্রেমের কবিতা	৩'০০ সুকুমার ঘোষ ও রাণা বসু সম্পাদিত	ব্যবোরা
প্রথম ভালোবাসা	২'০০ পরিমলেশ্বর মজুমদার	গ্রন্থ প্রকাশ
ফিরে ফিরে	১'২৫ গৌর পাল	
বসন্ত বিলাপ	৪'০০ চিত্তরঞ্জন মাইতি রূপা এ্যান্ড কোং	
মাতৃবন্দনা	৫'০০ হেনস্টেড ভট্টাচার্য সংকলিত	এস সি সরকার এ্যান্ড সন্স
সপ্ত সিদ্ধি দশ দিগন্ত		
(অমৃতদ)	১২'০০ শব্দ ঘোষ ও অলোকবর্জনা দাশগুপ্ত	সম্পাদিত নতুন সাহিত্য ভবন
সাত বা সাত আকাশ		
(বিদেশী কবিতা)	৩'০০ শান্তিকুমার রায় অনুদিত এশিয়া পাব্লিঃ	
স্বকাল-পুরুষ	৫'০০ আনন্দ বাগচি	
স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ	৫'০০ বিজু দে সঘোষি	পাবলিকেশনস্

## অনুবাদ সাহিত্য

অমৃতের পুত্র	৫'৫০ সীতা মুখোপাধ্যায়
(ক্রোনা আপিংস)	
অজ্ঞাত এক রাগিণী (সুন্দরী আসসানদাস উত্তর চন্দ্রানী)	
	২'৫০ বোম্বায়া বিশ্বনাথন রেখা প্রকাশনী
স্বর্গের সংহিতা	৪'০০ রমেশচন্দ্র দত্ত
কাল মাত্র (ই. স্ত্রপানোভা)	২'০০ বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত
	ক্লাশনাল বুক এজেন্সি
ডাঃ জিভাগো (পাস্তেরনাক)	১২'৫০ দীপক চৌধুরী
	বেঙ্গল পাবলিশার্স ও রূপা এ্যান্ড কোং
তারুণ্য (মল্লিয়ার)	৪'৫০ লোকনাথ ভট্টাচার্য
প্রতিবেশিনী	৪'৫০ বোম্বায়া বিশ্বনাথন
	ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং
প্রদোষের প্রান্তে	
(মেরি এলেন চেজ)	১০ রাণু ভৌমিক অনুদিত
	এশিয়া পাবলিশিং কোং
পঞ্চমাক (জাগাথা ক্রিকি)	৪'৫০ নীরেন্দ্রনাথ চক্রঃ
বেণুধনে মৃধা (চেন চি-ই)	১'২৫ রাণু ভৌমিক
বেদনাহত (শেখত)	৪'০০ গোপাল ভৌমিক
	জ্ঞানতীর্থ

## শিশু-সাহিত্য

পার্লক হোমস ফিরে এলেন (কোনান ডয়াল)

১০০০ অঙ্গীশ বর্ধন আলফ. বিটা পাব্লিশ

জ্ঞানেশ্বর (জ্ঞানদেব) ২০০০ গিরিশচন্দ্র সেন

সেই বৃদ্ধ রূপসী (উইলো ক্যাথার)

২০০ রাণু ভৌমিক এশিয়া পাবলিশিং কো

## নাটক

উত্তরফাঙ্কনী	২০৫ মাণিক সরকার
উষাসিকী	২০৫ সুশীল মুখোপাধ্যায়
ওরা থাকে ওখানে	২০৫ প্রেমেন্দ্র মিত্র আর্ট থ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
কথা কও	২০৫ সুশীলচন্দ্র সরকার
খর নদীর প্রোতে	২০০ সুশীল দত্ত
গেটম্যান	২০০ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়
জগাধিচূড়া	অনিলকুমার মুখোঃ বরেন্দ্র লাইঃ
ডিরোজিয়ে	২০৫ চিত্তরঞ্জন ঘোষ
নারী	১০০ কালাপদ চক্রবর্তী
নাম নেই	২০০ কিরণ মৈত্র
প্রতিদর্শন	১০০ কালাপদ চক্রবর্তী
বিয়ের বাজার	২০০ প্রকাশচন্দ্র বসু
বিপ্লবী বিবেকানন্দ	১০৫ অমল সরকার
বিপ্লবী	২০৫ অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় বরেন্দ্র লাইব্রেরী
মহাকাশ	২০০ মন্ট গঙ্গোপাধ্যায়
শরৎ নাট্যসংগ্রহ (১ম)	৫০০ শরৎচন্দ্র চট্টোঃ
শৃঙ্খল	১০৭৫ বনমল
সৈনিক	২০৫ ধনঞ্জয় বৈরাগী

অঙ্কের খেলা (ইংরাজ  
পেবেরমান)

৩০০ বিমলেন্দু সেনগুপ্ত অনুদিত

জ্ঞানাল বুক এজেন্সি

আগারসেনের অমর গল্প ১০৭৫ দেবদাস দাশগুপ্ত অনুদিত বাক্স-সাঃ  
আকাশ যোথানে মাটির কাছে ২০০০ অনিলেন্দু চক্রবর্তী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১০০ রাণা বসু

আবার ঘনাদা ২০৫ প্রেমেন্দ্র মিত্র

আবিস্কারের অভিযানে ৫০০ সদরাজিৎ কর অনুদিত

(রানেক ইল্যাপ) এশিয়া পাবলিশিং কো

আশা দেবীর হাসির গল্প ১০৫ একে সরকার

ঈশপের গল্প ১০২৫ স্বথলতা রাও

উপলব্ধিকেশোর ৩০৫ লীলা মজুমদার

গল্প বলি শোন ১০৫ প্রমুখ পাল

ছোটদের কোন্ডী (ক্রসলী) ২০০ পরাসিৎ অনুদিত

ছোটদের বাসারদেব ২০০ শশীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

রচিত মহানরত

তোতাপাখির পাকামি ২০০ শিবরাম চক্রবর্তী

নতুন পৃথিবীর অভিযাত্রী: অমর রাগা অনুদিত

(এডিথ ম্যাককাল) এশিয়া পাবলিশিং কো

নানান দেশের রূপকথা ৩০০ স্বথলতা রাও

মৃগহি বিবেকানন্দ ২০৭৫ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

রাত ঘখন নিশুব ১০৫ সজিতকুমার নাগ

রায়বাড়ির রহস্য ১০৫ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

বেঞ্জামিন ম্যাককালিন ২০০ জয়ন্ত চৌধুরী

হানাবাড়ির কারখানা ২০৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোনালী রূপকথা ৩০০ বিশ্বনাথ সম্পাদিত

## শেক্সপীয়ার প্রসংগে

...কাব্যে যে মৃতিটি ফুটল। ওঠে, তাহার ব্যক্তিগত এত নিখুঁত, এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যে—তাহার তুলনা সেই: তাহা যেন আট নয় স্বয়ং প্রকৃতি। পুত্রহত্যা আকিলিসের হস্ত চূষন করিবার সময়ে হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা প্রিগ্রামের মুখে যে আত্মচীৎকার শুনি, সে যে কোনও পুত্রশোকাভূত বৃদ্ধ পিতার বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই একমাত্র ট্রয়রাজ প্রিগ্রামেরই শোকাচ্ছাদ। ওই বিলাপভঙ্গী ঐরূপ অবস্থায়, কোপান-স্বভাব জ্বর লিয়ারের মুখে মানায় না। শেক্সপীয়ারের নাটকগুলিতে ঐরূপ দুঃস্থ অনেক আছে। হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য লওয়া যাক। হ্যামলেট এই প্রথম হোরসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা দুর্গমধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকটা ক্রত ও সক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা এই ঐক্যলৌকিক ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া হইয়া হ্যামলেট বলিয়া উঠিলেন, 'আমি যদি সে সময়ে সেখানে থাকিতাম।' হইবার উত্তরে হোরসিও নিতান্ত প্রাকৃতিকভাবে মতই বলিল, 'তাহা হইলে আশনি খুব বিমিত্ত হইতেন।' এইবার হ্যামলেট বাহা

বলিলেন তাহাতে কি অপূর্ণ নাটকের কল্পনার পরিচয়!—বলিলেন, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব—বিশুদ্ধ ছিল কি?' শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী ব্যতীত আর কোনও কবির রচনার এখানে কি দেখিতাম? যে ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দর্শ্য। নন্দ্রজ কক্ষচ্যুত হওয়া অপেক্ষাও বুদ্ধিজীবী, তাহারই সম্পর্কে হোরসিওর এই অতিক্ষুণ্ণ প্রশ্ন শুনিয়া হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতেন, 'কি বলিলে?—বিশ্বিত হইতাম।' তারপর, ইহা তাহার পক্ষে কতখানি বিশ্বাসকর সেই দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন—কবি-প্রেরণার দিব্যশক্তি তাহাকে এমনই পাইয়া বলিয়াছে যে, হ্যামলেটের মত চরিত্রের অন্তরনিহিত ভাবাবেগ ব্যস্ত করিবার ভাষা ছুটিল ন—তাই ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আত্মগত পরিহাসের ছলে কতকটা মনে মনেই বলিয়া উঠিলেন, 'খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।' এই হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই ঐরূপ অবস্থায় ওইরূপ উত্তর এমনভাবে দিতে পারিত না। [১০০ (৭)]

—মোহিতলাল মজুমদার



# নাট্য গান বাজনা



## ভারতের প্রাচীন সংগীত প্রসঙ্গে

কল্যাণ গুহ

সংগীত বলতে কি বুঝি। এও এক প্রশ্ন, প্রথম থেকেই আরম্ভ করবো, ভারতের প্রাচীন সংগীতের ইতিহাস যখন জানিতে পারি, কত চন্দ্র, কত বান্দ, কত পান, কত রূপ, সৃষ্টির আলোর আর সৃষ্টির আলোর চারিদিক উদ্ভাসিত। আমার দৃষ্টিতে যেভাবে প্রাচীন সংগীতকে দেখেছি বা দেখছি তারই কিছু আপনাদের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

আমরা যেমন নানান সংগীতের স্বরকানিতে বেশ মশগুল হয়ে আছি ও আধুনিকতার নামে যে কলকসানি চলেছে, আগের দিনের সংগীত কি এই পরিণতির দিকে চেরে বসেছিলেন? পুরানো ইতিহাস থেকে এ বিষয় কিছু খবরাখবর পেতে ইচ্ছে হয়। বাদশাহ আলোউদ্দিন বা আকবরের আমল থেকেই ধরা যাক। ('যদিও আলোউদ্দিন বা আকবরকে প্রাচীনকালের বলে ধরা যায় না—যেমন বুদ্ধদেব বা বিক্রমাদিত্যকে ধরা যায়') আকবরের আমল থেকেই সংগীত চিন্তার মূল হয়, এর আগের ইতিহাসে শুধু পাওয়া যায়—গায়ক, বাদক, নর্তক। প্রাচীন সংগীতের বহু কথা, বহু পাণ্ডুলিপি ভারতের অনেক গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়—আবার অনেক অদৃশ্য।

ভারতের নাট্যশাস্ত্র, নারদ শ্রেণীত সংগীত মকরল, মতঙ্গর বৃহদশ্বী, শঙ্করদেব শ্রেণীত সংগীত রত্নাকর, লোচন পণ্ডিতের রাগ-ভঙ্গী, দামোদর শ্রেণীত সংগীত মণ্ডল, অহোবালের সংগীত পারিজাত। এই সব বই বহু মূল্যবান চিন্তামূলক কথার ভরা। যেন প্রাচীন সংগীতের মধু-স্বরূপ।

প্রাচীনত্ব বলতে আমরা বুঝ—সংগীতের যা কিছু আয়োজন, নিশ্চর তা কোনও উদ্দেশ্যমূলক। সংগীত ক্ষেত্রে এমন অনেক কিছু আছে বা চিরদিনের সত্য, সেখানে প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব বলে ভাগ করা চলে না।

সংগীত বলতে গান, বাজনা, নাচ (গীত, বান্দ, নৃত্য) তিনের—সমষ্টি হচ্ছে সংগীত। এখানে বলতে পারি—গীতবান্দ বা নৃত্যবান্দ হলেও সংগীত—ওরে শুধু নৃত্যকে যদি সংগীত মনে করি তা হলে এটো ভুল হবে।

এক কথার বা অল্প বলতে গিয়ে বলতে হয়—সংগীতের প্রধান আশ্রয় গান-বাজনা ও নাচ হল সহকারী।

ভারত বলেছেন—যেখানে গান করবে আর ছেলেরা বাজনা খাজবে, কার—'বামাকঠ' মধুর হয়। অবশ্য রত্নাকরে দেখতে পাওয়া

যায় গায়ক-গায়িকার উভয়ই কথা আছে। দোষগুণও বেশ ভালো ভাবে বোঝানো আছে।

এখন বান্দর কথা আসি।

বাজনা চার রকমের, তারের বাজনা যাকে 'তত' জাতীয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যন্ত্র জাতীয় বাজনা যাকে 'অবনত'। অবনত হচ্ছে গান বা নৃত্যকে যে বোলার মাধ্যমে সজীবতা দান করে। বাঁশ, বেণু, ঘুংলী ইত্যাদি ফুৎকার বাতুলিকে হবির এক কান্ড (আধুনিক কী) জাতীয় ধাতুময় (solid) বাতুলিকে ঘন বাতুল বলা হয়েছে।

বীণাকে বাজনার মধ্যে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে—'সর্বদেবময়ী তন্মাদ বীণায় সর্বমঙ্গলা।'

বীণা বলতে এক রকমের বীণা বোঝায় না। রত্নাকরে এগারো রকমের বীণার কথা লেখা আছে, যেমন—একতন্ত্রী, নকুল, চিত্রতন্ত্রিকা, চিত্রা, বীণা, বিপকা, মত্ত কোকিলা,—খালাপিনী, কিরী, শিনাকী, নিঃশব্দবীণা।

সংগীত মকরলে আবার প্রায় কুড়ি রকমের বীণার কথা আছে। কিন্তু ছাংখের কথা এত রকম বীণার রূপ বর্ণনা এখনও বুঝে পাওয়া যাচ্ছে না (যতদূর অনুসন্ধানে জেনেছি)। রত্নাকরে কিছু বীণার রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শুধু বীণার কথা লিখে পাতার পর পাতা ভরানো যায়।

নকুল বীণা ছাট তারের বন, একতন্ত্রী ও ত্রিতন্ত্রিকা এক তার ও তিন তারের বন, চিত্রা সাততন্ত্রী, বিপকা নবতন্ত্রী। চিত্রা ও বিপকা মনে হয় আমাদের সেতার ও সুরমুগার।

শিনাকী বীণার কথা পড়ে মনে হয়—শিনাকী আমাদের এসবায়ের আগের রূপ।

এখন 'ঘন' বান্দর কথা।

প্রায় পনের রকম বীণীর রূপ দেখতে পাই।

ঐ পনের রকম বীণী বা বীণীর রূপ ছাড়াও—পাব, পাবিকা, ঘুংলী, মধুকরী, কাহল, তুতুকিনী, ঢুকা, শুল ও শঙ্খের—বর্ণনাও স্মরণভাবে দেওয়া আছে। মধুকরী বর্ণনা পড়তে পড়তে বুঝ না হয়ে পারা যায় না।

মধুকরী—তামার তৈরি, 'বিশিষ্ট মুখরু ব্যাপারের কথা পড়লে মনে হয়—আধুনিক পাশ্চাত্য ক্লারিনেট জাতীয় বান্দ, কাহলও তামার হয়ে থাকে—খুঁটার ফুলের মত এর বদন, তিন হাত দীর্ঘ।

এবার বলি মৃদু ভাষায় বাহুর কথা ।

মুগ্ধ ভাষী বাঙালীর ভেতর অনেক বকর ত্রেণ পাওয়া যায়। যেমন—পটর (মার্গণ্ড দেশী) ক'রওয়, কবলা, টুকসী, ডকা, মাদ'ল, কোড্ডক, ত্রিশী, করটা, ঢকা প্রভৃতি। পটহ হচ্ছে একরকম কোড়গু ঢোলক। (এক ক'ব ক'বুড়িক ঢাক বসে থাকে না) মর্দল, মুগল এবং মুসুরের বিপর্যয়কারী প্রজাতির বলেছে—

‘এবং তল ধরো কানি—

গম্ভীরে। ভবতি ধ্বনিঃ' ।

এর ধ্বনি হেথধ্বনির মত স্তম্ভীয় হইবে। কালিহাসির মেঘনুত এই ধ্বনির বহুবল উল্লেখ আছে। উপরের বাহন: ডাঙা আবার কয়েকটি বাহন। সঙ্গীতে ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে আছে—  
খড়স, বাঁশতাল, ঢংস, বুড়ুকা, কুচুবা, হুজাল, ডমরু, মণ্ডি, উল্লু, ডঙ্ক, সের্কা, বহরী, ভাপ, থ্রিবলা, হুন্সুতি ভেরী, এমন বহরীর ব্যতীত আরো।

পশ্চিম ভারত 'লিউনি' নামে যে গান প্রচলিত আছে সেই গানের  
সঙ্গে ও গল্পের সঙ্গে বাজানো হয়। এক বাস্তব সমারোহ দেখে  
মনে হয়—প্রাচীনকাল যখন গায়কবৃন্দ বলতো তখন বাস্তব বললেও  
লোভ প্রভৃতি ন।

প্রাচীরেরা উন্মুক্ত স্থানকেই ভালবাসতেন ।

পোলা দ্বাওদার দ' ।

আর্থনিক যুগ্ম-বান্ধবেরা মনে করেন, 'খুলি আওতা' ও 'খুলি আওতা' এরকম কোনও যিনিও সমর্থন চাই হ্যাঁ। বান্ধবী বান্ধবী ও কঠোর। প্রবাসিন্দার 'সুখ' ১০ ১ গীত হ'লকমভাবে ভাগ করা হয়েছে। একটি হল মার্গ। আর্থনিক

‘ব্রজসুন্দর’ সঙ্গীতকে চতুর্বিধ থেকে আটটি করেছেন। ভবত তাকে নির্বিঘ্নে করে প্রভাগ নবাস ব্যবস্থা করে গিয়েছেন যাতে সঙ্গীত সুষ্রাব্য মনোহর ও উপাদেয় হয়।’

সমীচ বন্ধাকর দেখা বার প্রাচীনেরা দুইকর ফল কল্পনা করে  
 নিখতিমান-দুই ব-...। দু-... হাঙ্ক-... যোজন রসভাবির  
 দুই কুদুই ফল ভবে-... বিশেষ পারলৌকিক অঙ্গল সামান ।' প্রাচীনেরা  
 বেশ জাতির সগেই বলে গেছেন-... যেন বার্য করকার ভেমন দেখে  
 দরকার

রাগ-রাগিণী কথ' এলেও প্রাচীনকে মরণ করতে হয়, প্রজা  
করতে হয়। বহু রাগ-চিন্তার খোঁজক পাই।

অত্যাধুনিক যুগে 'রাগ' চিন্তা আস্তে আস্তে নির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করেছে ।

প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের একটা যুগসূত্র রমে গেছে, যেমন দেখুন—'বৈজ্ঞানিক ও তানসে. হুসেইন ঐশান গান পরবর্তীকালের আলাপ ও অধ্যয়ন।'

আজ্ঞে আজ্ঞে রাগ-রাগিনী কল্পনা শুধু ধ্যানমূর্তি ধারণ করেছে।  
এবার আমরা একটু গীত-এর কথায় আসি—

ভর্ত্ত যাকে 'গীত' বলেছেন, শক্তি দেব তাঁকে পান বলেছেন, গীত' ব্যাপারে রক্তকর-সমাধায়ে থাকবে। বাগ্, পোখার (ব্যাক্যদাদি) থাকবে এবং পোখার সনত সগীতই হলে প্রাতিষ্ঠিত অতঃপর ভালও থাকবে। গীতের লক্ষণ সম্পর্ক বলা হচ্ছে—রক্তকর স্বরসংভব গীত।

সমস্ত মানুষের মধ্যে, 'রাগ' নামে একটি সংস্কার (Instinct) আছে। এটি ভক্ত-নামের কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচয় প্রাপ্ত আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতিতে এটি একটি অসংকীর্ণ বস্তু। এটি রাগকে জাগ্রত করে দেবার উপায়—একবারেই এটি।

যখন এই 'রাগ' সঙ্গারকে উজ্জ্বলিত করে এবং অন্তঃকরণের মধ্যে একটি আলোড়ন সত্তে আরম্ভ করে, এই আলোড়নের অবস্থাই হল 'রঞ্জন'।

আরো ৩ বাকি থাকল। এশা কহিল বিনষ্ট পাঠকদের সামনে  
পরের প্রবেশে আরো ১৬২ হাজির করতে পারবে।

## রেক-পরিচয়

‘হিজ, মাস্টার’ ও ‘কল্যাণদাস’ প্রকাশিত নতুন বেকডের  
সংক্ষিপ্ত পাঠ্য—

এইচ্ এম্ ভি

এন ৮০৫৬—‘বঁধুদা নিদ নাহি জাঁখি পাত্তে’ ও ‘এসো হুঁজনে  
খেলি হালা’—অতুলপ্রসাদের ছ বান বাহাই করা গান। দরদাকণ্ঠে  
পরিবেশন করেছেন শিল্পী রূপ চট্টোপাধ্যায়।

এন ৮৩-৫৭—মোব পাথকের বৃদ্ধি ও মনে রয়ে গেল মনে  
কথা—এবিশ্রুতি হ'বান মধুসূত্রাক্তে শাওবেশন করেছেন শিল্পী  
সুখিতা সুখোপাধ্যায়।

## কলহিয়া

জিই ২৫১৭২—হাতের প্রাতি রেখার রেখার এবং 'বহু, কাউ  
 বিনা কিছু চলে না'—কৌতুকগীতি হ'খানি পরিবেশন করেছেন  
 মিষ্ট দাশগুপ্ত।

জিই ২৫১৭৩—রবীন্দ্রগীত-সাদিকা খোঁজা বন্দোপাধ্যায়ের কাছে  
ছ'খানি রবীন্দ্রগীত—'ভরা থুৎ নুত গুহার' ও 'একদিন চিনে নেবে  
তারে'। পরিবেশনে অনুবৃত্ত।

ডাঃ বসু  
অশোক কার্ডিয়েল  
হার্টের শাস্ত্র, ব্যক্তি  
ও পৌরুষ বর্ধন করে  
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ  
কলিকাতা-১

## আমার কথা (১১০)

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

আমার জন্মদিনের সঙ্গীত প্রথম মহিলার জনপ্রিয়তার বিচারে যে শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম সেট ভুলিবার লিপিবদ্ধ হওয়ার এক সুযোগ। দ্বিতীয় ১৯৩৫ সালের ১লা অক্টোবর কলকাতার তাঁর জন্ম। সুগায়ক শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ তিনি। গায়ক হিসাবে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি বর্তমানমাত্রের অকানা নয়, সম্প্রতি পণ্ডিতবর্গের সাক্ষ্যে তার পরিচালিত যত্নসহকারী একটি বিশিষ্ট চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দর্শকসমাজের ভোলবার নয়। বালিগঞ্জ গার্লস স্কুলে শিক্ষালভ করেছেন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়। স্কুলের পড়াশুনা ছাড়া বাগার অনিন্দ্যকায় ভেলেবেলা থেকেই গানের চর্চা করে আসছেন। বাড়ির সামগ্রিক পরিবেশটি ছিল সঙ্গীতময়ী। সেট আবহাওয়ারপূর্ণ তাঁর মনে তাই বাল্যকাল থেকেই গানের রসে বিভোর। সঙ্গীত হাট তাঁর অন্তরে এত সজ্জা বাস বাঁধতে পেরেছিল যুক্তশিক্ষালয় এবং অতুলপ্রসাদের গান এখনও তিনি শিখে আসছেন বাবার কাছে।

১৯৬১ সালে দক্ষিণী থেকে তাঁর সমানকার পরীক্ষার ব্যর্থত কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরণী। ১৯৫৭ সালে তাঁর গায়কী যুক্তশিক্ষালয়ের দুটি গানের প্রথম রেকর্ড হয়। গান দুটির প্রথম কথাগুলি—‘মল্লর আম্রিণ: বহু: গুল: কামে: এবং সে: কেন: দেখা: নিল: র:’। রবীন্দ্রনাথের স্তব্ধসিকার সময়ে তাঁর গায়কী রবীন্দ্রনাথের ‘না না গো না’ এবং



কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়



বিখ্যাত

‘শঙ্খ ও গদ্য’

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহর ব রুপ

রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিয়েল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২২২৫

না বলে যায় পাছে ম গান ছাঁখানি রেকর্ডে হয়ে রাখা হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই তাঁর প্রথম রেকর্ড। লড়া প্রেরণ: রেকর্ড গৃহীত রবীন্দ্রনাথের ‘তাসব দেশ’-এর টেক্সটের চরিত্রটির ভিত্তি বর্ণনা এবং সত্যতানে শিলাঘার ভূমিকার গানগুলি গান। এ ছাড়া আরও বহু রেকর্ডে তাঁর অল্পময় সুরশালিতা ও কঠোরদৃষ্টি ধরা আছে—বা জোড়সাধারণকে অতুলনভাবে মুঠ-মুঠা এমন বিতরণ করে শিপাস্থকগণকে পরিতৃপ্তিতে ধারণিত করে দেয়। পিতৃদেব ছাড়াও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল হোম, শুভ ঠাকুরতা এক দিলীপ রায় (হুই) এত ও বিশদ গায়ক-গায়িকার নিকট গানের পাঠ নিয়েছেন। তাঁর পাওরা রবীন্দ্রনাথের, যুক্তশিক্ষালয়ের এবং আধুনিক গানের রেকর্ডগুলির সঙ্গে সাধারণের আভা আর অপরিচয় নেই, তবে তাঁর গায়কী মজলসীতির রেকর্ড এখনও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি। নির্বীণমাণ হারাহবি ‘অমূল্য হৃদয়ে’ তিনি অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেছেন। সুরসাধক দিলীপকুমার রায়ের গানও তিনি গেয়ে থাকেন। শিল্পজীবনে তিনি অল্পময় অমৃতেশ্বর এবং অমৃতজি উসাহ লাত করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রকুমার সেন (পি কে সেন নামে সমাধিক পরিচিত) এবং শ্রীযুক্ত পবিত্র মিত্রের কাছ থেকে। এই উৎসাহ এবং অমৃতেশ্বর ও তার জীবনে অবিস্মরণীয় এবং এক বিশেষ মূল্যবাহী।

১৯৬০ সালে বাম্পট চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীযুক্ত মিহির রায়ের সঙ্গে শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় পারিবারিকভাবে আবদ্ধ হন।

# বার্ধক্য

## বারানসী

নীলকণ্ঠ

ছেতল্লিগ

‘ঈশ্বরই বোগী, বোগীই ঈশ্বর’

শ্রীশ্রীবিষুদ্বানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ :  
লালা কথা [ পূর্বাধ্ব্য ]

আমার বন্ধু রামপরায়ণ রায় তখন বাংকোর ম্যানেজার।

সেই সময় একটি লোক তাকে ঠকায়। শেষ পর্যন্ত রামপরায়ণ তাকে ধরতে পারে। রামপরায়ণের বুদ্ধি, পরিশ্রম, জেদ, লেগে থাকা, লক্ষ্যশীল অনেক কিছুই তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এর মধ্যে একটি বুদ্ধির অতীত কুপা ছাড়া রামপরায়ণের এই সব গুণ কত কাজে লাগত বলা সহজ নয়। কারণ, লোকটিকে যেদিন কলকাতায় আবিষ্কার করে রামপরায়ণ সেদিনই সে দার্জিলিং থেকে এগেছে এবং সেদিনই আবার কলকাতা ত্যাগ করবে। কয়েকখণ্টা মাত্র সে কলকাতায় ছিল। ধরা পড়ার পর সে রামপরায়ণকে প্রশ্ন করে : আপনি আজই আমাকে খুঁজতে এখানে এলেন কেন ? রামপরায়ণ বলে যে এর জন্তে দায়ী একটি কালীভক্ত ডোম। মধ্য কলকাতার এই অবাঙালী ডোমটির নাম ছিলো বাঙালী। সে রামপরায়ণকে বলে, যাকে খুঁজছিল সে এখন কলকাতায় আছে। না বলেছে তোর বাড়ির উত্তর দিকে সে আছে, তুই তার দেখা পাবি।

রামপরায়ণ আজও ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। কিন্তু এ দুটি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে সে করতে পারে নি আজও। এই সত্যতা, এই স্বীকৃতি, এই সত্যভাষণের জন্তে আমি মনে করি তার চেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত কেউ নয়। সত্যকে যে অস্বীকার করে না, ঈশ্বর তাকেই শিকার করেন সর্বাগ্রে।

রামপরায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় অলৌকিক বৃত্তান্ত উপস্থিত কুরবার মাঝখানে আমি একবার কাশী ঘুরে এসেছি। আরেকবার। ষাঁর উদ্দেশ্যে এবার বেরিয়েছিলাম তাঁর নাম বীতরাগানন্দ। কাশীতে তিনি কাকুর কাছে বাসাবা, কাকুর কাছে বামপুরিয়া বাসা। আমার পৌত্রবার আগেই তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘজীবী

বীতরাগানন্দের বিচিত্র জীবন ও বাণী বার্ক্যে বারাগসীর পাতায় আমি প্রকাশ করব পরে। এখন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের গুরু শ্রীবিষুদ্বানন্দের কথা বলি। বিষুদ্বানন্দের কাছেই গোপীনাথ দীক্ষা নেন। অনেকে তুল ধারণা আছে যে, গোপীনাথ আনন্দময়ী মায়ের শিষ্য। তিনি আনন্দময়ী ম-কে ভক্তি করেন। তাঁর সংগে কলকাতায় অথবা অত্র যে যান কখনও বহনও, কিন্তু তাঁর গুরু ওই বিষুদ্বানন্দ।

একদিন ডক্টর গোপীনাথের বাড়ির দোতলায় যেখানে তাঁর সংগে সকলে দেখা করেন, গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। গোপীনাথ তখনও পূজো থেকে ওঠেন নি। সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, পূজো করতে বতষ্কণ লাগে ?

পূজা তো একমিনিটেই হয়ে যায়,—আত্মবৃত্তিক প্রজ্জ্বলিত ইত্যাদিতেই সময় যায়।

আপনার মরদেহত্যাগী গুরুদেবের সংগে এখনও যোগাযোগ আছে ?—

না হলে তো বাঁচাই যেত না—

পল ব্রাটনের বইতে বিষুদ্বানন্দকে ‘ম্যাজিসিয়ান’ বলায় আমি আপত্তি করি। গোপীনাথ বলেন : না। ম্যাজি বলতে এক সময়ে শিদ্ধপুরুষকেই বোঝাতো।

পল ব্রাটন,—বিষুদ্বানন্দর যে অলৌকিক বিহুতির কথা তাঁর ইংরেজি বইতে বলেছেন, গোপীনাথ আমায় এবার কাশীতে বলেছেন যে, তা তাঁর গুরুদেবের ক্ষমতার আংশিক পরিচয়ও নয়। স্বর্গকে দেশলায়ের আলোয় দেখার তুল্য। কুড়ি বৎসর প্রায় মরদেহী গুরুদেব-সং করেন গোপীনাথ। এত অজস্র অলৌকিক ঘটনা তাঁর এবং অত্রান্ত গুরুতাই ও ভক্ত-আগন্তকের সামনে ঘটেছে যে, তাঁর গুরুদেবের যে পাঁচ খণ্ডে জীবন-বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অকিঞ্চিৎকর। গোপীনাথ আরও বলেছেন যে, মহাপুরুষের জীবনী রচনা করা যায় না। বিষুদ্বানন্দ তাঁর জীবন যেভাবে রচনা করেছেন, মহাশয়-কলমের সাধ্য নেই সে জীবনী-রচনার। কৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে বাকিম লাক্ষ্য লাভ করেন নি,—এ কথা নিষিদ্ধ বলছেন ডক্টর গোপীনাথ। এরপর যেবধা তিনি শ্রীশ্রীবিষুদ্বানন্দ-প্রসঙ্গে লিখেছেন

## বাব কো বারাগী

সেকথাই মুখে বললেন আমাকে। তখনও তিনি দীক্ষা নেন নি শ্রীগুরুচরণে, নেব-নেব করছেন। একদিন যোগী কে এ জিজ্ঞাসার উত্তরে গোপীনাথ-গুরু গন্ধাবা,—বিশুদ্ধানন্দ বললেন : যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তিনিই যোগী।

গোপীনাথ বললেন : এ কি বলছেন ? যা ইচ্ছে করতে পারেন যিনি তিনি তো দীক্ষার।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন : দীক্ষারই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

‘যোগী পার্ একসেলেস্টা’ কথাটা আমাকে বলবার সময় ব্যবহার করেছিলেন উক্তর গোপীনাথ, দীক্ষার সম্পর্কে বিশুদ্ধানন্দের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। দীক্ষাকে যোগী বলায় গোপীনাথ আবার বলেন : যোগী তো উপাস্ত্র নয়, যোগী তো উপাসক—

দীক্ষারও উপাসক ?

কার ?

তোমরা ঠীকে মা বলো,—ঊঁর !

নাভিপদের যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তা প্রতীক না, সত্যি সত্যিই মহাম্যদেহের মধ্যে স্থলপদ্ম দল মেলবার জন্তে প্রস্তুত রয়েছে, এই শিষ্য-জিজ্ঞাসার জবাবে বিশুদ্ধানন্দ বলেন : কুণ্ডলিনী ভাগলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এ পদ্ম সকলের শরীরেই আছে—বিস্তৃত মুদ্রিত হয়ে আছে। কুণ্ডলিনীর আগরণ আর অন্ত হৃদয়ের উদয় একই বস্তু। এই

জ্ঞানহৃদয়ের উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে। একই খেমে গোপীনাথ-গুরুদেব বলেন আবার : আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।

বলতে বলতেই নাভিগ্রন্থ উন্মোচিত হয়,—বেরিয়ে আসে রক্তকমল।

গোপীনাথ বলেছেন যে, সেই পদ্মের দল তিনি গুণবার চেপ্টা করেন। কয়েকটি গুণেও ছিলেন। খানিকটা উঠে পদ্ম আবার অন্তপ্রবেশ করে। গোপীনাথ জিজ্ঞেস করেন তাঁর গুরুদেবকে : যদি হাত দিয়ে পদ্মটি চেপে ধরতাম তা হলে কী হতো ?

হাতমুদ্রু সৌম্যে যেত পেটের মধ্যে—এনার্জিতে পরিণত হতো হাত।

প্রত্যক্ষ-দর্শনের পর বিশুদ্ধানন্দ-বাণী মন্ত্রিত হয় :

‘বিস্ময় নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এসব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না ভাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থিবন্ধন আছে, ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা ছাড়া মাত্র।’

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ :

তৃতীয় ভাগ : লীলা-কথা : পূর্বার্ধ]।

একটি ফুলকে আরেকটি ফুলে, পদ্মকে জবা, জবাকে পদ্ম করা বিশুদ্ধানন্দের খেলা ছিলো। এই খেলার কথায় উক্তর

● সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বার্ষিক সুদ

৩%

● মেয়াদী আমানতে (মেয়াদ অনাদ্যায়ী)  
সর্বোচ্চ বার্ষিক সুদ

৫%

● আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয়  
ব্যাংকিং কার্য করা হয়।



সেবার

প্রতীক

**ইউনাইটেড ব্যাংক**

**অব ইণ্ডিয়া লিঃ**

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইড হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

গোপীনাথ পতঞ্জলির লেখার কথায় এসে পড়েন একদিন। গোপীনাথের মতে—পাতঞ্জল দর্শন ও তাঁহার যোগভাষ্যর মতে গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন : গ্রন্থ থেকে জ্ঞান জন্মায় না। শুধু জ্ঞানের কোনই মূল্য নেই।

গোপীনাথ ধামলেন না। এক পদার্থের অল্প পদার্থে রূপান্তরকে জ্ঞাতস্তর-পরিণাম বলে। পাতঞ্জল দর্শন ও ব্যাস-ভাষ্যে তাঁর কারণ রহস্তের উপাদান আছে।

বিশুদ্ধানন্দ হাসেন : তুমি কি বলিতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়ে কেউ যোগী হতে পারবে ?

১৯১৮ সালে গোপীনাথ দীক্ষিত হন। গন্ধে ভূবন ভরে যখন-তখন যেখানে-সেখানে আঁবুত হতেন তাঁর গুরুদেব।

গোপীনাথ লিখছেন, ১৯২২ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা যখন জীবন মরণ সমস্রার মধ্যে তাঁর গুরুকে পুরীতে তার করেন তিনি। দেওঘাটার মধ্যে রোগিণীর ঘর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হয়। বোকা যায় গুরুদেব এসেছেন। রোগিণী ঘুমিয়ে পড়লো। রোগমুক্ত হলেন গোপীনাথ-পত্নী।

কেন সারান গুরু এভাবে রোগ, তার উত্তর হচ্ছে বিশুদ্ধানন্দ-বাণীতে :

‘বৎস, শুধু যে কি বস্তু তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু বহুস্তে গ্রহণ করেন।... আমি সবদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি। তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।’

[ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ গুরু :

ভূতীয় ভাগ ; লীলা কথা : পূর্বাধ ]

ভ : গোপীনাথের উপাস্থিতিতে একজন অধ্যাপক বিশুদ্ধানন্দকে বলেন, বিশুদ্ধানন্দের শরীর ও অধ্যাপকের শরীরে কোনও তফাৎ নেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মতোই যোগীর শরীরেরও ক্ষুধাতৃষ্ণা সমান। যোগীকেও খাচ্ছে-পেছাব করতে হয়।

বিশুদ্ধানন্দ হেসে তাঁর এখানে হাত দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ওপারে চালিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে একটি পান ছিলো। অধ্যাপককে বললেন, পানটি নিয়ে আসতে। অধ্যাপক বাইরে গিয়ে পানটি নিয়ে এলেন। অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোবার ব্যাপারটা যে সম্ভব নয়, বাস্তব সত্য তাই দেখানোই পানটি নিয়ে আসতে বলার মধ্যে নিহিত ছিলো। তারপর অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন বিশুদ্ধানন্দ : তুমি পার এ রকম করতে। পার না। তা হলে বল না, যোগীর শরীর আর সাধারণ শরীরে কোনও পার্থক্য নেই। আছে। যোগীর শরীরই অঘটন-ঘটন পটীয়াসী।

গোপীনাথ বলেছেন, তাঁর গুরুদেবের শরীর তীব্র সাধনার

পরিবর্তিত হয়ে যায়। বা হতে পারত শব তাই হয়ে উঠেছে নিত্য-নব উৎসব। খাঁস-প্রশ্বাসের জন্তে বাহ্য বায়ুর প্রয়োজন হয় নি। নাক দিয়ে খাঁস ফেলা অথবা টানা কোনও কিছুই তিনি ভোয়াক্তা করতেন না। আভ্যন্তর স্বপ্ন ও বিশুদ্ধ বায়ুই তাঁর খাঁস-প্রশ্বাসের কাজ করত। সে বায়ুর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হতো চতুর্দিক। তাঁর গায়ের ঘামেও সেই একই সুবাস,—যে কোনও গন্ধ জল যার তুলনায় তৃষ্ণ। তাঁর শরীরে এত তড়িৎশক্তি ক্রিয়া করে যে গায়ে বোলতা বসলে গুড়ে মরে যায়। তাঁর চোখ দিয়ে যে তেজ বেরোয় তাতে হিংস্র পশু মুখ ঢাকে; জ্যোতির্ময় কঠিন শিবলিঙ্গ ভেঙে ইকরো ইকরো হয়ে যায়। একবেলা আঁত অল্প আহার এবং প্রান্ত্র নিদ্রাহীন থাকে তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সিদ্ধিসংখ্যা অগণ্য। গোপীনাথকে মহাসিদ্ধির মর্যাদাটনে বিশুদ্ধানন্দ তাঁর তত্ত্বনীকে এত বড় এবং ক্ষীত করেছিলেন যা বিশ্বেরও বিষয়।

এর একটি কথাও আমার নয়। স্বয়ং গোপীনাথকে তাঁর গুরুদেবের চারিত-কথায় প্রকাশ করেছেন।

গোপীনাথ-গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ, লোকে বাকে অলৌকিক বলে তাকে অলৌকিক বলেন নি। বলেছেন, স্বপ্ন-বিরজান। মানুষ মাত্রই সাধনার শব্দকে সব কংতে পারে। তবে শুধু বই পড়ে তা সম্ভব নয়। যোগক্রিয়ায় তা সম্ভব। যোগকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেন। এই পুরুষকারে প্রারব্ধকেও পরিবর্তিত করা যায়, একথা তিনি বলেছেন।

পুরীতে বিশুদ্ধানন্দের কাছে বসে আছেন ভক্তের গোপীনাথ। ছাত্রজন তত্ত্ব আফিক-সভ্যসাধ গুরুদেবকে বাতাস করছেন। গোপীনাথের মনে শ্রীকৃষ্ণের অংগ-গন্ধের কথা ভেসে আসছে (‘মৃগম নীলোৎপল’)। সংগে সংগে গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন গোপীনাথ : গোবিন্দলীলামুতে কৃষ্ণের গায়ের যে গন্ধের কথা রয়েছে সে গন্ধ কেমন ?

গুরুদেব বললেন : বলে বাও কি কি উপাদানের সংযোগে ঐ গন্ধের বাতাস পাওয়া যায় বলে লেখা আছে ? গোপীনাথ একেবারে উপাদানের নাম করেন, বিশুদ্ধানন্দ শ্রোত্রে হস্ত গলাল করেন। নীলপদ্ম, কস্তুরী ইত্যাদি সব উপাদান উল্লেখ করা হলে, গুরুদেব হস্তমুষ্টি গোপীনাথকে আশ্রণ করতে বলেন। দিব্যগন্ধে ঘর ভরে গেছে তখন। বাতাস মাতাল হয়েছে, আকাশ আবুল।

গোপীনাথের প্রশ্ন অন্তঃপর : নাম শোনামাত্র এত বিভিন্ন পদার্থ কি করে আকর্ষণ করলেন ?

গুরুদেবের উত্তর : এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যতদূর পবিত্র স্বরশ্রবণ বিস্তার আছে, ততদূরে বা কিছু থাক তাকেই টেনে আনা যায়। সমস্ত জগৎ বধাতার যে কোশলে চলে তা বোঁদন ধরতে পারবে, সেদিন বুঝবে, একটি ব্রহ্মাও রচনাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

গোপীনাথ বলেছেন : তাকে স্বরশ্রবণ থেকে সচেতন



আনন্দের

দিনে

উপভোগ্য

# কোলে

বিস্কুট, লাজস ও টফি



কোলে বিস্কুট কোং  
প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১০

জীব পৰ্বন্ত সৃষ্টি করতে দেখেছি। মাছি, শতপদী ও চামচিকে আমার চোখের সামনে তৈরি হয়ে উড়ে যেতে দেখেছি। মহুবা-সৃষ্টি এখনও সম্ভব হয় নি বটে, তবে চেষ্টা করলে কালে তাও অসম্ভব হবে না।

ঔর গুরুদেব এর অপরূপ বাখ্যা করেছেন এই বলে—  
বাস্তবিক পক্ষে কোনও বস্তুরই বিনাশ হয় না। একখানা বই অগ্নিতে ভস্মসাৎ করে ফেলে দেশান্তরে ও কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তকই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি তা দৃষ্টিগম্য না হয়ে স্থায়ী বস্তু বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে কোনও বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, একথা না মেনে উপায় কি? যদি গন্ধার ঘাটে একবার দুধ নিক্ষেপ করা যায় এবং অল্প ঘটি থেকে বিশ্লেষণপূর্বক ঠিক সেই দুধই বার করে দেখানো যায় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে সুরূপনিবৃত্তি কখনই হয় না কোনও জিনিসের। এইজন্মেই জীব লোক-লোকান্তরে, এমনকি ব্রহ্মলোকে গেলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিদ তাকে আকর্ষণ করে আনতে পারেন।

একথা কি অন্ধবিশ্বাসের না বাস্তব বিজ্ঞানের?

বিশুদ্ধানন্দের কথাই তো কবিরও কথা:

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?

ডক্তর গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ কাশীতে ষাঁর প্রিয় নাম ছিলো গন্ধাবা, তিনি ওখানেই ধামেন নি।

তিনি আরও এগিয়ে এসে বলেছেন: চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু, জরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেমভক্তি প্রভৃতি ভাব পবন্ত—বিজ্ঞানের আলোকে স্পষ্ট দেখা যায়।

একটি কথা বিশুদ্ধানন্দ তবু বলেন নি। সে কথাও সত্য। সে কথা হচ্ছে, স্বর্ষবিজ্ঞানে সব করা যায়, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ কী এবং কে, তা ধরা যায় না। স্বর্ষবিজ্ঞান তাঁর খেলা। কবি বলেছেন যে, দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। ধ্যানী বলেছেন যে, তুমি কেবল গানের ওপারে নও, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দু'য়েরই ওপারে তুমি দাঁড়িয়ে। বিশুদ্ধানন্দ কেবল উদযোগী নন; তিনি যোগী। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

বিশুদ্ধানন্দ তাঁর জীবনে তাঁর বাণীকে মূর্ত করেছেন। বহু আশ্চর্য ঘটনার উৎপাদক তিনি। বহু আশ্চর্যের ক্ষমতার তিনি অধীশ্বর। বস্তুত, তিনি যত সাধারণ পরিভাষায়

যাকে অলৌকিক ঘটনা বলে তার নায়ক। এমন আর কো-  
হয় কেউ নন। তার দ্বারা আমি একথা বলতে চাইছি ন-  
যে, অজ্ঞাত যোগীরা তাঁর মতো শক্তিমান ছিলেন না। না।  
তা আমার বক্তব্য নয়। তাঁরা ছিলেন, আছেন এবং  
থাকবেন। তবে বিশুদ্ধানন্দের মতো এত ক্ষমতার অবা-  
প্রদর্শন আর প্রায় দেখা যায় না। কেন?

কেউ কেউ মনে করেন বিভূতি দেখানো উচিত নয়।  
কাকর ধারণা,—বিভূতি তুচ্ছ জিনিস। তার প্রতি শ্রদ্ধা  
করবার কারণ নেই। বর্তমান ভারতের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডক্তর  
গোপীনাথ কবিরাজ এ বিষয়ে যা বলেন সেইটাই শেষ কথা:  
যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলে মনে  
হয়। লোকোত্তর ব্যাপার মাত্রই বিভূতির নিদর্শন বটে,  
কিন্তু তা যোগবিভূতি নয়। পরম পদার্থের সংগে সংযোগ  
হলে জীবগণ অতিক্রম হয়ে যে ঐশ্বর্য্যভাব জাগে তা-ই  
যোগবিভূতি।

অজ্ঞাত গোপীনাথ বলেছেন:

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অধ্যাত্মপথে সিদ্ধির কোনও  
সার্থকতা আছে কি না? অজ্ঞকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বিশ্বাস  
স্থাপনের উপযোগিতা ছাড়াও সিদ্ধিলাভে নিজের কোনও  
কল্যাণ হয় কি? এর উত্তর হচ্ছে,—নিশ্চয়ই হয়। ভোগ  
না করে ত্যাগ যেমন কপটচার মাত্র, তেমনই ঐশ্বর্য্য লাভ না  
করে আত্মসমর্পণ অসম্ভব।

আবার:

‘তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের উদয় মান্যার  
অতীত না হওয়া পর্যন্ত হয় না। যোগিগণ পরমপদার্থে যুক্ত  
হইয়া জগতের কল্যাণার্থ এবং স্বেচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ  
করিতে পারেন এবং কারিগর্য্যও থাকেন।’

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ: তৃতীয় ভাগ:

জীলাকথা; পূর্বাধ]

বিশুদ্ধানন্দ স্বর্ষবিজ্ঞান প্রত্যক্ষশিক্ষা দেবার জন্তে  
লেবরেটার পথস্ত্র প্রাতিষ্ঠান পথে এগিয়ে ছিলেন। লোকে  
বলে বিজ্ঞান সকলের সামনে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারে।  
যোগীরাও যে তা পারেন, মহত্তম মানবতীর্থ ভারতবর্ষে তার  
প্রমাণ আজও আছে। টেলিভিশন তা দেখায় না। তার  
জন্তে চাই ভিগান।

[ক্রমশ:।

রবীন্দ্রনাথ

ঐবীণা কুণ্ড

ছায়া সুনিবিড় কাকলি দিবার তাল গাছ ঘেরা তাঁর,  
তুলসী মঞ্চ, মাধবী কুঞ্জ, নদী সরোবর নীর  
বলবন্ধু মধুর মুরতি, পল্লী মায়েল ছবি  
তোমার মনের পরতে পরতে মধু যোগায়েছে কবি,

বিশ্বমাতার প্রাণপতলে বক্ষমায়ের বাণী,  
পৃথ প্রভাতে কাকলীর মত তুমিই শুভায়েছ আনি।  
ভারতের সেই পবিত্র গাথা ঋষি কণ্ঠের স্বরে  
কে শোনাবে আশি তেমনি আবার নিখিল লোকের তরে।

# আর এক আশা

তপসী রায়।

( সম্পূর্ণ উপন্যাস )

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

সত্যব্রতর প্রথম জীবন সত্যিই নিদাক্ষণ সত্য আর বাস্তবতার ভরা।

সে বাস্তব বৃষ্টি কোনদিনই ভোলবার নয়।

সত্যব্রতর বাবা ছিলেন কুল-মাস্টার। কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল বেশ ধনী মত। চালচলন বলতে তাঁর নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ আর বিলাসিতা নয়।

খরচ, অসম্ভব খরচ করতেন তিনি তাঁর পরিবারের জন্ত, পাড়ার জন্ত, প্রত্যেকটি লোকের জন্ত।

ফল যা হয়। আয়ের বেশি ব্যয় হওয়ার জগৎ মাত্র তিনদিনের করে হঠাৎ বখন তিনি মারা গেলেন তখন সত্যব্রত সবে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন, অবিবাহিতা দু'টি বোন আর বিধবা মা তহবিলশূন্য বয়ঃ প্রচুর খণ্ডের বোকা।

পাড়ার লোকদের পরামর্শে এরও ওপর ঋণ করে বাবার মত মহৎ লোকের শ্রাদ্ধশাস্তি চুকিয়ে দেবার পর সে বখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তখন আশ্রয় করবার মত কোন তৃণগাছিতও খুঁজে পেলো না, বরং চারদিক থেকে প্রচুর সমালোচনাই কানে আসতে লাগল।

বাবার মত নির্বুদ্ধি লোক যে হয় না এখন তারাই সমন্বয়ে প্রচার করতে লাগল, বাবা একদিন তাঁরই কাছে উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতায় চিরদিন কেনা রইল ব'লে জানিয়ে গেছে।

চোখে অন্ধকার দেখল সত্যব্রত।

আর পড়াশোনা চালানর কথা ভাবা তো পাগলাম। কি করে যে এই চারটি প্রাণীর চার বেলার আহার জুটবে সে ভাবনাই তাঁকে আর পাগল করে তুলল।

কাজের সন্ধানে সব জায়গায় ঘুরতে লাগল সে। কিন্তু চাকরি না পোওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময়ও যে নেই তার হাতে। আত্মবিশ্বাসী বাগের শোধান কিছু কিছু আদর্শতে ইতিমধ্যেই অবিবাস

এসে গেছে তার। কিন্তু তখন মন্থপথে জীবনযাপনের আশা ত্যাগ করে নি সে।

ইতিমধ্যে সে দু'টো টুইশ্যানি করে মাসে তিরিশ টাকার মত রোজগার করছিল। কিন্তু সমুদ্রে এক আঁজলা জলের মত সেটা কোন কাজেই লাগছিল না।

ভাল লাগছিল না তার সেই বোল বছরের ছেলের এই নিত্য প্রানিময় জীবন। কিন্তু কি-ই বা করা যেতে পারে। যে দিদির গিয়ে হয়ে গেছে তার দারিদ্র্যের সংসারেই পাঠিয়ে দিল ছ' বোনকে। তবু যা হোক পেটে দু'টো খেতে পারে। মা পেল না। তা হলে সত্যব্রতকে দেখবে কে ?

বাবার ভাড়া করা সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে তারা উঠে এল বস্তির মধ্যে খাপরার চাল দেওয়া এরখানা ঘরে।

আর এখানেই সে নতুন জীবনের দেখা পেল।

তাদের পাশের ঘরেই থাকত কমলা বলে একটি মেয়ে তার মাসীর সঙ্গে। অসম্ভব দরিদ্র তার, কিন্তু ঐ খোলার ঘরেও তাদের খাওয়া দাওয়া আর কমলার সাজসজ্জা দেখে অবাধ লেগে যেত সত্যব্রতর। স্বভাবধর্ম চুপা করত সে এদের। মাকে এখানে এনে তুলতে হয়েছে ভেবে নিজের ওপর দিক্কার আসত তার। বস্তবার ভেবেছে আত্মহত্যা করে এই জঘন্য জীবনের শেষ আনবে। কিন্তু পারে নি। এত সহজে জীবনের কাছে হার মানবে ? হ'তে পারে না।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে।

এর মধ্যে কতরকমের জীবিকার সন্ধানই না করল সত্যব্রত, কিন্তু অবস্থা যে কে সেট। মায়ে শরীর খারাপ হয়েছে আরও বেশি, পরিশ্রমে, হৃদযন্ত্রের আর অনাহারে।

শেষের দিকে অবশ্য সে একটা কাবখানার চাকরি পেয়েছে আর সেই বস্তির বাড়ি ছেড়ে ভদ্র পাড়ায় চলে এসেছে। কিন্তু ভদ্রতার আবরণটুকু বজায় রাখতে, তাকে না করতে হয়েছে এমন কাজ নেই।

এ বাড়িতেই মাসের মূহুর্তময় বন্ধু তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল ওদেরই পাশের বাড়ির পরিমল ঘোষরা। সত্যাত্তর আশা হ'ল পৃথিবীতে তবু ভাল লোক আছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে জগৎ সম্বন্ধে তার সমস্ত ধারণা বদলে গেছে। আদর্শবাদের কথা তো চিন্তাও করে না। আশে পৃথিবীতে যে সব চিন্তা করে তার কোনটাই ভুলোচিৎ নয়।

পরিমল ঘোষরা এই সময় সত্যিই নানা সাহায্য করে তাদের ঝাঁপের বেগে, মা মারা যাবার পর দেশ থেকে ছোট বোন সবিতাকে এনে নিয়েছে। মেজ বোনের বিয়ে দিদিই দিয়েছে তার এক খুড়তুত দেওরের সঙ্গে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘোরে সত্যাত্তর নানা কাজের জমা। কি করে কোথায় যার তা জানে না সবিতা, শুধু জানে দাদাকে বড় বেশি পরিশ্রম করতে হয়। দাদাকে তত আঁকড়ে ধরে সে। ওদের অভিভাবক হিসেবে যে পিসিমাকে দেশ থেকে সত্যাত্তর আনিয়ছে তিনিই সামলাবার চেষ্টা করেন ওদের ভাতা জোড়াতালি দেওয়া সংসারটা।

কিন্তু সেই পরিমলেরই বড়ো কাকা, যখন একদিন সবিতাকে জাঁচল টেনে ধরে তাঁর লুক্কাত প্রকাশ করে বসলেন তখন সবিতা বৈদে ভাঙ্গল সারাসন্ধ্যা আর সত্যাত্তর এক নতুন সত্য আবিষ্কার করলেন।

তাই যখন ধনীপুত্র ব্রজহুলালের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল তখন সবিতার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবার জন্ম তৎপর হলেন তিনি।

তিনি জেনেছেন সবিতা শুধু মেয়ে নয়, তার মধ্যে আকর্ষণ করবার

ক্ষমতা আছে তা না হ'লে পরিমল ঘোষের কাকার মত মান্তগণ লোকও তাকে চাইবে কেন?

তারপর চলল নতুন খেলা।

দিনের পর দিন সবিতাকে সামনে রেখেই ঐ ব্রজহুলাল খেলা করা। পাড়ার লোকে ছি ছি বলল, মাথুয়ের চামড়ায়, এ কাজ কেউ পারে না বলে দিক্কার দিল, কিন্তু সত্যাত্তর জ্ঞানপ নেই। তিনি তখন মরিয়া। অনেক সঙ্ক করেছেন আর নয়। সহজ উপায়ে টাক রোজগারের পন্থা জেনে গেছেন তিনি। নিশ্চিত আরম্ভে পা ছেড়ে দিয়ে একে একে বণ শোধ করলেন তিনি।

উদ্দেশ্য তাঁর ভালই ছিল। সবিতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া।

কিন্তু সবিতাই গোল বাঁধাল।

পাণ্ডিয়ে গিয়ে বিয়ে করে তাঁদেরই পাড়ার মিউনিসিপ্যালিটির কেবাবী, রাজনীতি করা রুগ গোবিন্দ বোসকে।

বোনের সেই নিবুদ্ধিতা আর মুঢ়তা জীবনেও ক্ষমা করেন নি তিনি। জন্মের মত তাঁর জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন তাঁর বড় মেয়ের পাত্রী সবিতাকে।

হ্যাঁ তাই তাঁর সিদ্ধান্ত।

এরপর থেকে তাই তিনি করে আসছেন।

প্রয়োজন নেই বলে পিসিমাকে পাঠাতে হয়েছে দেশে আর খুড়তুত ভাই রবীন আশ্রয় পেয়েছে, রবীনকে সত্যাত্তর প্রয়োজন ব'লে। সবিতাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন, খুবই ভালবাসতেন। সুখে-দুখে সময় কাটিছিল তাঁর ওরই মধুর সাহচর্যে। কিন্তু নিজেরই সে ভালবাসার ছেল ঘটিয়েছে সবিতা।

জীবনে বহু পোড়া-খাওয়া সত্যাত্তর জীবনে নিবুদ্ধিতা আর আবেগের স্থান নেই আজ।

রবীনের সঙ্গে সত্যিই অরুণার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে।

রবীন শিল্পী, তার ওপর ছোটবেলা থেকেই সে বেশ একটু আত্মকেন্দ্রিক, তাই বোধ হয় তার পক্ষে সত্যাত্তর সংসারেও নিজেকে নিয়ে শান্তির সঙ্গে থাকা সম্ভব হল।

অরুণাও খুব মিতুলক নয়। কিন্তু কেমন করে ছুটি অমিতুলক লোক বেশ মিশে গেল।

রবীনের ওপর কেউ লক্ষ্য রাখে না। নিজের প্রডাকশানের প্রয়োজনে তাকে কাছে রেখেছেন সত্যাত্তর। কাজ ছাড়া থেকে কথাও বলেন না তিনি। রবীনও যেন বেঁচে গেছে। সে তার সিঁড়ির নীচের ছোট ঘরটিতে বসে নিজের মনে ছবি আঁকে যায়।

অরুণার সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব, কিন্তু ইলার সঙ্গে নয়।

ইলাকে সে বহুদিন দেখেছে লম্বা বেগী দুপুরে ফুলের বাসে চড়ে ফুলে বেড়িয়ে যেতে, মাঝে মাঝে একঘরে ও-ঘরে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আলাপ হবার কোন সুযোগ পায় নি, তার মনেও আসে নি আলাপ করার কথা। তাই ইলার অস্তিত্ব সহ্য করে সে তেমন সজাগ হয় নি।

ঠিক দুপুরেই তার ওপরে বাবার অধিকার। অরুণা তাকে এই সময়ই আসতে বলেছে। রবীন বুঝেছে অরুণার মনোগত ইচ্ছা নয় যে রবীন অরুণা ছাড়া আর কারও সঙ্গে আলাপ করে।

## আর, ডাব্লিউ, এ, সি, চ্যারিটী ফাও (লটারী) কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনহিত কার্যের জন্ত  
অনুমোদিত

টিকিট বিক্রয় বদ্ধ ১৬-৫-৬৪ খেলা—৩১-৫-৬৪

প্রতি টিকিট—১১ এক টাকা

প্রস্তাবিত পুরস্কার ৪,৫১,৩৫৫ টাকা

পশ্চিমবঙ্গীয় লটারীর বৃহত্তম

২টি প্রথম পুরস্কার প্রতিটি ১,১৫,০০০

\*দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৫,০০০

\*তৃতীয় পুরস্কার ২৫,০০০

চতুর্থ পুরস্কার ১২,৫০০

আরও ১২৬৪টি বিভিন্ন পুরস্কার আছে। বিস্তারিত  
বিবরণের জন্ত লিখুন

সেক্রেটারী আর, ডাব্লিউ, এ, সি, চ্যারিটী ফাও (লটারী)

৭১এ, আন্তোনি মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫

# অর্থ সুখে অর্থ কামে...



কেয়ো-কার্পিন কেশের সৌন্দর্য লাভের  
অবধারিত উপায়। কচিলীলা যে কোন রমণী,  
নবীনা বা প্রবীণা—জানেন যে শিশুকাল  
থেকেই চুলের যত্ন নেওয়া উচিত আর  
এবং নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন ব্যবহারেই  
দীর্ঘ, পূর্ণ, সূচিকণ কেশদামের অধিকারিনী  
হওয়া যায়।



## কেয়ো- কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল।

দে'জ মেডিকেল স্টোর্স' প্রাইভেট লিঃ  
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস,  
পাটনা, গোহাট, কটক, জয়পুর।

এ ইচ্ছেটুকুর রবীন অমর্যাদা করতে চায় না। রেহকাডাল এই ছোপটা অক্লবাকে ভালবাসে ভক্তি করে। কেনকালেই মুখ ফুটে কিছু বলা তার স্বভাব নয়। কিন্তু অক্লবার কাছে চাইতে হয় নি। সে তার ব্যক্তিত্বের সম্মান দিয়েছে। তাকে একজন মানুষ বলে গণ্য করেছে, তার কাছে সময়মত পরামর্শ চেয়েছে, তাকে শিল্পী বলে সম্মান করেছে।  
অক্লবার কাছে সে কৃতজ্ঞ।

রবিবার সকাল বেলাতেই কাজ থেকে ফিরে, একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এসে রবীন।  
অক্লবা রজনীগন্ধা ভালবাসে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই ওর সঙ্গে দেখা হল ইলাব।

সত্বে জান করে লম্বা কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে ইলা। একটা হালকা গোলাপী শাড়ি ছাড়া সেই রং-এরই ব্লাউজ পরেছে সে। কপালের মাঝখানে একটি টিপ।

মুগ্ধ হয়ে গেল রবীন।

এই কিশোরীকে সে আজ দেখল না, যেন আবিষ্কার করল। রজনীগন্ধার মতই তার ছড়ান শরীর যেন অসুখী শিশুটার রবীনের শিল্পনকে ভরিয়ে দিল।

মুখোমুখি হতেই অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল রবীন। আর এগিয়ে বাওয়া হল না। কি ভাবতে ভাবতে আন্তে আন্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল, একেবারে তার নিজের ঘরে, তার ছোট্ট নীড়টিতে।

রজনীগন্ধার গোছটা পাশে বেখে ঢুপ করে বলে রইল রবীন।  
চলবে একটা শূন্যতা যেন তাকে ঘিরে ফেলল।

কতক্ষণ এমন ভাবে বসেছিল খেয়াল নেই।

হঠাৎ কি মনে হতে তার অসমাপ্ত ছবিটা শেষ করবার জ্ঞান তুলিতে রং তুলে নিল।

রবীনের চোখ দিয়ে যেতে দেখে ইলাও যেন একটু অবাক হয়ে গেল। প্রথমে ভাল অক্লবাকে ডাকবে, তারপর কি ভাবে নিজের নীচে নেমে এল।

একমনে ছবি আঁকছে রবীন।

আগে অনেকবার দেখেছে রবীনের ইলা। ঐ বড় বড় চুল আর চোখের মালিক জামাবর্ণ ছেলের চেহারা অক্লবীর কিছু খুঁজে পায় নি ইলা। এর কথা ভাবতে নি কোনানি, কিন্তু আজ তার দৃষ্টিতে সে অবাকই হল। নেমে এসে রবীনের দেখে একটু থমকে পীড়াল ইলা।

আধ ভোজন দরজার কাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট ক্যান্ডাসের ওপর একমনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছে রবীন। ছবিটা দেখা যাচ্ছে না।

কিসের ছবি?

ভাল করে দেখবার জ্ঞান আরও একটু এগিয়ে এসে ইলা। একেবারে দরজার কাছে সরে এসে। একেবারে চোখোচোখি হয়ে গেল রবীনের সঙ্গে। একটু তুলিতে শেষ টান দিয়ে তুলিটা রাখতে গিয়েই রবীন দেখতে গেল ইলাকে।

দেখতে পেল নয়, আবিষ্কার করল বলা চল।

চিরকালের লাচুক রবীন সোজা ডাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ ইলাব অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে।

ইলা এবার লজ্জা পেল।

অপনি বুঝি এ ঘরে থাকেন?

ঈশ্বর হেসে নীচু গলায় বলল। হ্যাঁ।

সখিৎ ফিরে পেল রবীন, উঠে পীড়াল। আশুন না...বসবেনই বা যে কোথায়।

একটিমাত্র কোবাসিন কাঠের বাজ উপড় করে তারই ওপর বসে ছবি আঁকে রবীন, সারাদিনই সে এই ঘরে ছবি আঁকে আর কাজ থাকলে বাইরে। রাতে কবিরের একটা কোচ শুয়ে ঘুমটুকু সেয়ে নেয়।

তবু এ সবে কোন অসুবিধে বোধ করে নি সে। সুবিধে অসুবিধের কোন অনুভূতিই বুকি নেই তার। কিন্তু আজ তার সত্যিই মনে হল একটা বমার জায়গার বড় অভাব।

একটা চোয়ার...

ঠিক আছে...ব্যস্ত হবেন না। আমি তো বসব না।

ইলা অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে।

কেন বসুন না।

রবীন আবার অমর্যাদা করল। না, বৌদি এখনই ডাকবে?  
...আমি ছবিটা দেখছিলাম।

ছবিটার খুব কাছে সরে এসে ইলা। একটু সরে পীড়ালেও ওর প্রায় বুকের কাছে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখতে চেষ্টা করল ইলা।

ওর সত্বে জান করা চুলের আঘাত আর জান শেষের দেহদৌরভ রবীনের অসুস্থতিকে যেন প্রবলভাবে নাড়া দিল। একটা নারী তার অতি স্নিকটে দাঁড়িয়ে আছে তার সমস্ত মাধুর্য আর রহস্য নিয়ে।

রবীন অনায়াসেই অনুভূতিতে বিহ্বল হল।

কি আঁকছেন এটা? মুখ নেই অথচ শাড়ি জামা পরা?  
এ আবার কি?

আপন মনেই হাসল ইলা।

মুখ খুঁজে পাচ্ছি না—

ইলার মুখের ওপর থেকে চোখ না নামিয়েই উত্তর দিল রবীন।

খিল খিল করে হেসে উঠল ইলা।

নিজেরের আধীর-রজন হাড়ি অল্প কোন পুরুষের সান্নিধ্যে কখনও যত্নে নি ইলা। আজ রবীনেরকে তার সন্ধান নেই কোন। আসলে সন্ধান যেন ওর স্বভাবের মধ্যেই নেই, অক্লবা ঠিকই বলে ও ব. হরিণী।

রবীনের কথাই জবাবে তাই সে অত্যন্ত সতর্কগলায় বলে উঠল ওমা দেকি? মুখ নেই মানুষ? স্বচ্ছকাটা নাকি?...

চলে প্রায় গড়িয়ে পড়ল ইলা।

আর অবাক হার ওকে দেখতে সাগল রবীন।

ইলা...ইলু।

ওপর থেকে বিনয়ের ডাক এল।

বাই নানা ডাকছে।...শেষ হোক আবার এসে দেখব।

একটু পীড়ান।

## দায় এক আকাশ

রজনীগন্ধার গুচ্ছটা ওর হাতে তুলে দিল রবীন। সমস্তাটার একটা সমাধান হ'ল বেন।

কি ব্যাপার? হুল?

কেন হুল ভালবাসেন না?

ওর দিকে গভীর চোখে তাকাল রবীন। ভালবাসি।...কিন্তু তখন তো না দিয়েই চলে এলেন।

এখন দেওয়াটা ভাল হ'ল না?

ইলা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে রবীন।

সে দুষ্টির সামনে এই প্রথম লজ্জা পেল ইলা।

আমি বাই।...

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ইলা।

ওর বুকা যেন নড়ে উঠেছে হঠাৎ। তুলিটা হাতে নিয়ে আবার প্যাকিং বাস্কেটর ওপর গিয়ে বসল রবীন।

এবার সে মুখ আঁকবে।

সত্যব্রতর নিজের কোম্পানীর প্রথম চিত্তার্থ হিসেবে কাগজে কাগজে নাম ঘোষিত হল।

'জীবনভূকা'।

মর্শকদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হল সত্যব্রতর ছারালোক কোম্পানী।

নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজের ভণ্ডাসর মুখোমুখি হলে দেখাবেন সত্যব্রত এ ছবিতে, আর নারিকার ভূমিকায় থাকবেন স্বয়ং সত্যব্রত।

দীর্ঘ দু'বছর পর আবার তিনি চিত্রজগতেই ফিরে আসছেন— তাঁর স্বামীরই প্রোৎসাহিত ও পরিচালিত হই-এ।

এ নিয়ে 'সাদু' পড়ে গেল চিত্রজগতে। দেখলেন তো? তখনই বলেছিলাম আবার ফিল্মে নামবে সত্যব্রত।

ডিরেক্টর বোস বললেন ধনঞ্জয় চৌধুরীকে। আরে এর বাবুই আলাদা।

বোসের টিন থেকে ধনঞ্জয় চৌধুরী সিগারেট টেনে নেন। চৌধুরীকে নাকি নিজের টিন থেকে সিগারেট খেতে কেউ কখনও দেখে নি।

তুমিই চৌধুরী।

বোস গা এলিয়ে বসলেন।

কি?

আরে আসল খবরটাই শোন নি?

কি তোমার আসল খবর?

আরে, শুধু নামছে না, এবার একটা নাচের রোলো আছেন সত্যব্রত।

নাচ? বলেন কি? প্রায় আঁতকে উঠলেন ধনঞ্জয়।

তা অবাক হবার কি আছে?

সমর বারিক বললেন।

সি ওরাজ্ঞ আনডাউটডলি এ মোস্ট ট্যালেন্টেড, ক্যার, তাঁর পক্ষে যে কোনো রোলই ভালভাবে এবং বেশ সাক্ষ্যসুস্থলিই করা সম্ভব।

এই তো সব তুল করেন আপনাতা। ধনঞ্জয় চৌধুরী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

## সিঙ্গারের নিবেদন সিন্ধ্যাক আর্ট নিটার

সিঙ্গার গর্বের সঙ্গে সিঙ্গাক আর্ট নিটার উপহার দিকে। এটি স্বর্ণাঙ্কন, সহজে চালনাযোগ্য আধা-স্বয়ংচালিত হাতে বোনার কল হাতে করতে হটার মধ্যেই আপনি পুরো মাপের একটি কাম্বো করতে পারবেন। উল, সাধারণ পুতো কিংবা কৃত্রিম সূতো দিয়ে এতে নির্বৃত্ত বোকা যায়।

সিঙ্গারের এই কলের সাহায্যে আপনি ক্রত, সহজে সুবে, ক্রত মহাক লাভ করতে পারবেন। অতি সামান্য পুঁজি দিয়ে আপনি একটি অতি লাভজনক কল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মত চালাতে পারেন।

যদি রাখবেন ডানডে বোতা কামাকাপড়ের জাহিনা প্রচুর এবং সঙ্গে সঙ্গে কাটটি হয়।

সিঙ্গার সুবিধাজনক বিভিন্ন সুবিধা দেয়। আমাদের বিভিন্ন বস্ত্রের পরিমল্লতা সম্বন্ধে বোঝা যায়।

আপনার কাছাকাছি অনুসন্ধানিত সিঙ্গারের বিক্রেতার কাছে কিংবা দোকানে পাওয়া যায়।



সেই স্টোরে এসকি  
সিঙ্গার ম্যাসিঞ্জ মোশিন কোম্পানী  
কল • কলিকাতা • দিল্লী • মদ্রাস  
সিঙ্গার কোম্পানী লিমিটেড



কিসের তুল ?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন সময় বারিক ।

আরে এইসব মেয়েরা ভাবে নারিক। হ'লেই বুঝি কে-কোন  
চরিত্রেই নামা চলে। কেন ? না-১০-নতিনি একজন কার ১০০

অবচে জানেন ? এসব বিষয়ে কত ভাবিত হয় । হোয়েম আই  
ওয়ার্ড ইন্-বাবে তখন মিঃ ওয়ারিগা-....

রাখুন মশাই আপনার ওয়ারিগা-...

বাঁপিয়ে উঠলেন যেন সময় বারিক । আপন'র বাবু আর  
মিঃ ওয়ারিগা শুনে শুনে তা'র নান আমাদের বালাপালা হ'য়ে  
পেল ১০০-নতুন কিছু বগুন তে মশাই, কি নতুন শোভান ।

আপনাকে নতুন কিছু শুনিয়া আমার লাভ ?

মনে-মনে অঙ্গে উঠলেও, মুখে নিম্প্রভাভ এনে সিগারেটে  
লম্বা টান দিয়ে বললেন ধনঞ্জয় চৌধুরী ।

আমি ভাবছি অন্য কথা ১০০

সে কথার কোন নজর না দিয়ে বারিক বললেন—

কি ?

ডিরেক্টর বোস কোতুহলী হ'লেন ।

আমাদের স্বার্থের কথা ভেবেছেন ?

আমাদের স্বার্থ ?

রীতিমত অবাধ হলেন বোস ।

একটা কথা কি আপনাদের মনে হয়েছে ?

কি ?

সুচরিতা আবার ফিসে এল এটা ভাল কথা । ওর অবজ্ঞাই  
এখনও মাঝেট ভ্যালু আছে । বিশেষ করে ওর আশা প্রায় সকলেই  
ছেড়ে দিয়েছিল, বিয়ের পর কতদিন বাদে এই যে নামল তাতে ওর  
চাহিদা বেড়েছে বেশি ।

তাতে কি ?

বাঃ, এইসময়—আমাদের নেক্‌স্ট বইটার জন্য যদি কনট্রাক্ট  
করে রাখি তা হলে কেমন হয় ?

ভাল প্ল্যান সন্দেহ নেই । কিন্তু বেড়ালের গলার বট  
বাধবে কে ?

কেন ?

বিয়ের ইমিডিয়েট পরে সুচরিতার সেই কাণ্ড মনে আছে তো ?  
মিস্ত্রির অবস্থা কিছু ভাঙে নি, কিল খেয়ে কিল চুরি করল ১০০-কিন্তু  
আমার বিশ্বাস ও টাকা খোঁকা মিস্ত্রির পকেট থেকেই গেছে ।

কিসে বুঝলে ?

খুব সহজ বোঝা, সত্যাতক যে জানে, সেই বুঝবে । দক্ষিণায়ণ  
দেবার মত কাঁচা ছেলে সত্যাতক নয় ।

সে আর বলতে ?

কথাটা ধনঞ্জয় চৌধুরীর খুব মনে ধরল । আমি লোকচরিত্র  
টিনি মশাই বুঝলেন । আর লোকচরিত্র না বুঝলে, অমন সব ব্যস্ত  
চরিত্র সৃষ্টি করি কি করে ?-তা ছাড়া কিছু পড়াশুনা তো

# লেক্সিন

সর্প দংশনের স্থবিখ্যাত মহোষধ

সর্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে । কাকড়াবিছা

ও অগ্ন্যা বিষাক্ত দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

“Snake Bite” পুস্তক আবার পাওয়া যাইতেছে ; দাম ৫/-

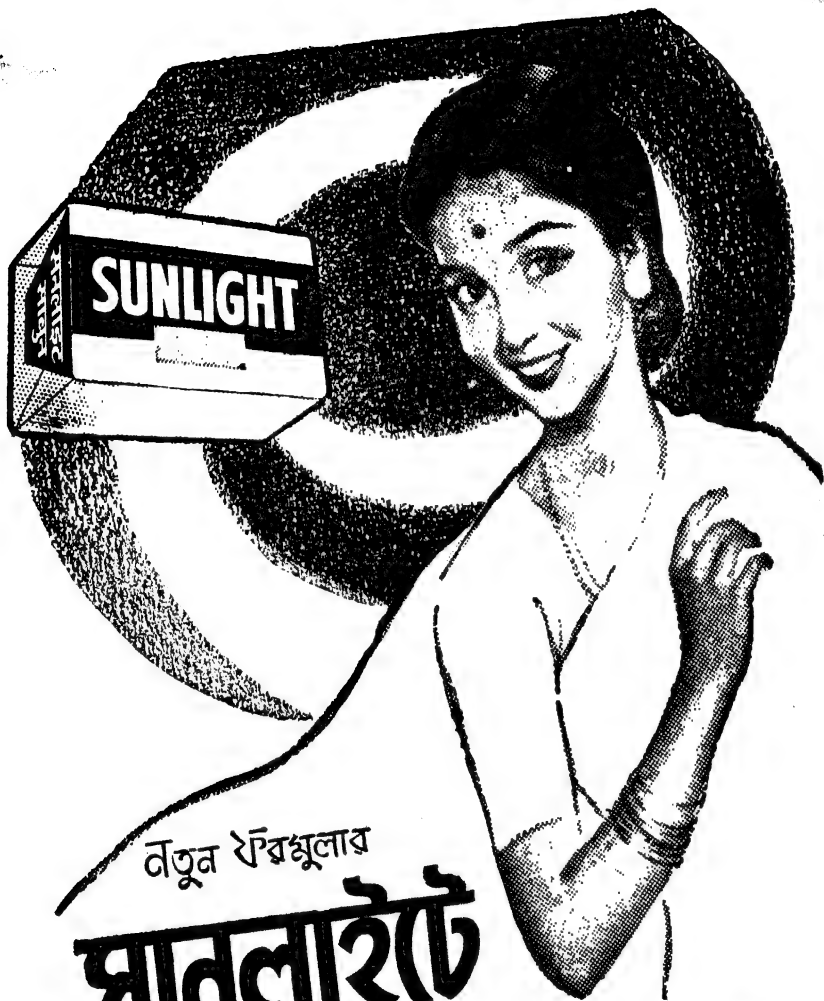
বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয় ।

পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম

কলিকাতা অফিস :

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫





নতুন ষাঁড়ধূলার  
**স্নাতলাইটে**

**আরও ঝলমলে কাচা হয় !**

নতুন ফরমুলার স্নানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী স্বন্দর নতুন গড়ন ! আর  
 সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে করে কাচার কী আশ্চর্য নতুন শক্তি ! প্রতি-যোগ কাচবার  
 পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা... আরও ধীরে, আরও ঝলমলে হয়ে উঠছে !

S. 53-140 BQ

বিশুদ্ধান লিভারের তৈরী

বহুমুখী : বৈশাখ '৭১

১৫১

আছেই। প্র্যাকটিক্যালি কোন বিদেশী নভেল তো আর আমার  
অজানা নয়।

লোক বলে সেটা তো নাকি আপনার কাল।

বঁাকা হেসে বললেন বারিক।

মানে?

রীতিমত চটে গেলেন চৌধুরী।

মানে আর কি? তারা বলে, আপনি নাকি বত রাক্ষস ইংরেজী  
আর বাংলা গল্পের জোড়াতালিতে আপনার সব বাহিনীগুলো হুটি  
করেন।

হু শেজ জাতি?

যেন গর্জে উঠলেন চৌধুরী। হাত থেকে কলস সিগারেটটা পড়ে  
গেল।

বাঃ। পারটিকুলারলি আর কার নাম করব? কেন আপনিই তো  
জানেন সেদিন ঐ দিনেমা পত্রিকাতে আপনার সম্বন্ধে লেখে নি?

ইয়েস আই রিমেম্বার। দোজ ফুলস...

ইউ স্ট্রাড, রিমেম্বার মুচকি হাসলেন বারিক।

হাসছেন কি? ভাবছেন ছাড়ব ওদের? ওদের সম্বন্ধেও ব্যবস্থা  
করব আমি।...আমি ওদের এগেনস্টে কেস আনব।...একবারে  
মানহানির মামলা।

বোসের টিন থেকে আবার একটা সিগারেট নিলেন তিনি। আর  
এইজন্টাই কলকাতার আমার ভাল লাগে না। এরা বড় বেশি ঢালাক  
ভাবে নিজেদের...বাঙালীর স্বভাবই এই—খালি শেহুনে লাগা।  
...হোয়েন আই ওরাজ ইন বয়ে...০০

সত্যি তুংব হয় আপনার জন্ত, কেন যে এ দুর্ভাগা বাংলা  
দেশে...

বারিক খোঁচা মারলেন আবার। আর বেশি চটে তার উত্তরে  
কটমট করে তাকিয়ে কি বলতে গেলেন চৌধুরী, ডিরেক্টর বোস ওদের  
ধামিয়ে দিলেন।

আচ্ছা! ছেলোমামুং তো আপনারা, কি নিজেদের মধ্যে তর্ক করে  
সময় নষ্ট করছেন।...আর তো সময় বেশি নেই।

কিসের?

চৌধুরীর চমক ফিরল যেন।

বাঃ, আর আর্থবটার ভেতরই বাজোরিয়া আসছে, বগড়া জুলে  
মনে রাখবেন ওকে কঁাসানো চাই-ই আমাদের।

সে আর বলতে। নড়েচড়ে বসেন চৌধুরী।

কিন্তু মুক্শল হচ্ছে বাজোরিয়ার মস্তিষ্কপ্রসূত গল্পটি কেমন হবে  
তাই ভাবছি।

জত ভাববেন না। বারিক আবার বললেন।

আপনার পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু আমাকেই তো আক্টর অল্  
সিনারিও করতে হবে, স্তবরাং ভাবতে আমাকে হবে বৈ কি।

আরে ভাল লাগতেই হবে যে কোন উপায়ে। পাঁচ লাখ খরচ  
করবে এই বটীতে বাজোরিয়া মাইও জাই।...এক বড় শীও ছাড়া  
যায় না।

সে তো বাটেই।

তোমারে গা ছেড়ে দিয়ে সিগারেট টানতে থাকেন ধনঞ্জয় চৌধুরী।

আর্থবটার আগেই বাজোরিয়া এসে উপস্থিত। ঠিক কাঁট  
মিলিয়ে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে অপেক্ষা করছিল না কি লোকটা?

তিনজনে ঝাড়িয়ে উঠে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের ছাপ-পড়া মেঘবহুল দেহ নিয়ে  
সবিনয়ে জোড়হাতে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলেন বাজোরিয়া। বছরদিন  
বাংলা দেশে আছেন। বেশ ভাল বুকতে পারেন বাংলা, ভাষা, ভাষা  
বাংলা বলতেও পারেন।

বোসেন, আপনারা সব বোসেন।

গোলটেবিল ঘিরে সকলে ঘন হয়ে বসলেন।

বোসের সিগারেটের টিন খুলে বাজোরিয়ার সামনে ধরলেন ধনঞ্জয়  
চৌধুরী। বোস মনে মনে হাত কামড়ালেন। তারই পরসার কেনা  
টিনে ধনঞ্জয় প্রথমেই বেশ ফিফ্টটা করে নিলেন। এ সব ব্যাপারে  
সত্যিই চৌধুরী একেবারে সিদ্ধহস্ত।

মাপ করিবেন। ও সব হামি খায় না।

হাতজোড় করে পঁচের মাড়িগুলো সব বার করে হাসলেন  
বাজোরিয়া। যেন সিগারেট না পেয়ে বিশেষ অপরাধ করে ফেলছেন  
তিনি।

তাই নাকি? খুব ভাল।

নিজে একটা সিগারেট তুলে ধরালেন ধনঞ্জয়। এ সব সংঘম  
ক'জনের আছে? বিশেষ করে এ লাইনে? সত্যি এ্যাডমিরেবল...  
ওর কথাই আলাদা। উনি পাকে থেকেও পাকাল মাছ।

অযোগ্যতা হারাতে চাইলেন না বোস।

কথাটা কি হ'ল?

হাসিমুখে তাকালেন বাজোরিয়া।

অর্থাৎ আপনাকে উনি প্রশংসা করছেন। আপনি সিদ্ধপুরুষ,  
মহাপুরুষ এই আর কি।

বেশি বলছেন আপনারা...০০...০০...বিশেষ খুশির সঙ্গে বাজোরিয়া  
প্রতিবাদ করলেন।

না না সত্যি। আপনার মত একাধারে অর্থের সঙ্গে প্রতিভার  
এমন সমিশ্রণ কোথায় পাওয়া যায়?

এগিয়ে স্কুকে পড়ে বললেন বোস। ধনঞ্জয় সোজা করে টানটান  
হয়ে বসলেন, বোস বেশ বলছেন কথাগুলো। তাই বলে উনি কি  
বাদ বাবেন? যুখে একটা শ্রদ্ধার ভাব এনে বললেন, সত্যি  
মিঃ বাজোরিয়া, আপনি নিজে কাহিনী লিখেছেন শুনে অবধি উৎসুক  
হয়ে আছি। নিজে সাহিত্যিক হ'য়ে সাহিত্যিকের প্রতি আলাদা  
একটি দুর্বলতা আছে আমার। হোয়েন আই ওরাজ ইন...০০

তা হলে আমাদের কাজ শুরু করা বাক।

বোস তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন।

হ্যাঁ। এখন আমি আপনাদেরকে আমার স্টোরিটা স্ট-এ বলিয়েব।

সে তো নিশ্চয়ই। আপনার অমূল্য সময়। সার্টেই বলুন।

আমরা একটু আঁচ পেলেই বুকে নেব।

বাজোরিয়া নড়েচড়ে বসলেন। মুখটা হঠাৎ ছুঁচোলে করে চশমাটা  
একবার খুললেন। চশমাটা হাতে ধরাই রইল। বাজোরিয়া চোখ  
বুললেন।

এঁরা সকলে চোখোচোখি করলেন। ইসারা হ'ল।

## আঁর এক আঁকাশ

হঠাৎ চোখ খুললেন বাজোরিয়া আর অমনি সকলে সেইগুলোকে এগিয়ে নিয়ে এলেন। চোখে সকলের ঐশ্বর্য্য ফুট রইল।

মেরা আইডিয়া এ ছাড়া কি...

বাজোরিয়া আরম্ভ করলেন। পহেলা, এক ট্রেন চলি ছাড়া...

উদ্ভূত কান্ধামে এক আদমি সো বহা ছাড়া।

আচ্ছা আচ্ছা...

গল্প যেন প্রথমেই বেশ জমে উঠেছে।

...এক স্টেশনপর এক লেডুকী...বহু—খুপ্‌সুরত...

বাজোরিয়া চোখ বুজলেন।

কল্পনার যেন দেখতে পাচ্ছেন সেই বহু খুপ্‌সুরত লেডুকীর পা ওলা উড়ন্ত ওড়না আর ঐশ্বর্য্য দেহবস্ত্রের। শুধু বাজোরিয়া নয় সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ভাবতে বসে গেলেন।

গল্প এগোতে লাগল এইভাবে।

বাজোরিয়ার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসতে লাগলেন চৌধুরী, বোস আর ক্যামেরাম্যান বারিক।

বাজোরিয়া আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন, আর সকলে মাঝে মাঝে আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, আহা এর কি তুলনা হয়, ইত্যাদি ভক্তি সহযোগে শুনে যাচ্ছেন।

হঠাৎ বাজোরিয়া থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আপলোঁগ বলিয়ে তো এবার কি হোবে?

চমক ভাঙল সকলের। কিসের কি হবে? কেউই তো শুনছেন না, কেবল সিগারেটের টিন ঘুরছে হাত থেকে হাতে।

এবার সত্যিই ভাবিয়ে তুললেন আপনি?

ডিরেক্টর বোস হঠাৎ পা নাচাতে শুরু করলেন। এ রিয়েল সাসপেন্স।

দু'হাতের আঙুল জুড়ে কোলের ওপর রেখে পা নাচাতে লাগলেন তিনি।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন বারিক। চোখ বুজে মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমি ভাবছি অদ্ভুত একটা অ্যাংগল হবে—ক্যামেরা।

কপালে হাত চাপা দিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন তিনি।

আর মাড়িগুলো সব বার করে হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া

পরম আত্মপ্রসাদে।

আমার মনে হয় এখন হিরো...সিগারেটের বাকি অংশ ফেলে দিয়ে বললেন চৌধুরী।

ওঃ নেহি নেহি...

প্রায় আতর্জন করে উলেন বাজোরিয়া। আতি হিরো কা কেহা কান্?

না না—হিরোইন আই মীন...

ও বিলকুল নেহি...

আবার সজোরে প্রতিবাদ করলেন বাজোরিয়া।

হামি কি ভাবছি জানেন?

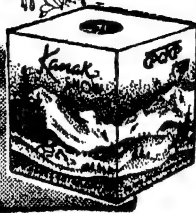
সকলে একসঙ্গে তাকালেন বাজোরিয়ার দিকে।

হামি ভাবছি, এই টাইমমে উ যো নানেনওয়ারী ছায়া না?

উনকি এক গানো শুরু হো য়ায়েগা...কেহা?



আনন্দ উৎসবে  
ক. হোডের  
প্রসারিত সামগ্রী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০

কিঁচল বেটার, কিঁচল বেটার ১০০-রিয়েলি চমৎকার।

বারিক প্রশংসা করলেন।

বোকা বোকা মুখ করে বসে রইলেন ধনঞ্জয়। বড় চাল চালল ওরা। কিছু না বললেই হোত, শুধু একটা মতামত আর গুরিঝিলাটি দেখাবার লোভ সামলাতে না পেয়ে এভাবে অপ্রস্তুতে পড়লেন তিনি।

আচ্ছা আবার সুযোগ খুঁজতে হবে।

গল্প শেষে বাজোরিয়া নিজেই একটু সহজভাবে ছেড়ে দিলেন গরীতে। জাবটা এটী তার কর্তব্য সারা, এবার এই বিরাট সমস্যামূলক কাহিনী নিয়ে ওরা কি করে দেখা যাক।

এরাও সত্যি সমস্যার পড়লেন, গল্প নিয়ে নয়, গল্পের মাথাখুঁতড়ীদের বোধগম্যই হয় নি। তাঁদের সমস্যা এখন কিভাবে আর কি কথা এগোবে, আসল কথার আসা যাবে কখন।

ডিরেক্টর বোসের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বাজোরিয়া, আচ্ছা, আভি বলিয়ে তো, আপনারা হিরো কাকে লিভেন সমঝেছেন?

বেশ গবিতভাবেই বললেন বোস এ হেন একটা সাজেশন্ দিতে পারার জন্য।

কোন?

ভুঙ্ক কুঁচকে প্রশ্ন করলেন বাজোরিয়া।

জয়ন্তকুমার।

প্রমাণ গণলেও পুনরুক্তি করতে বিধা করলেন না বোস?

কেন না, বইটার হিন্দী ভাঙ্গান তো হবে, এখন ফিল্ম লাইনে মানে বাংলা স্ক্রীনে ওর মত হিন্দী উচ্চারণ আর কারই বা আছে?

কেন মোহনলাল?

বারিক ব্যাপারটা বুঝেছেন। অজ্ঞ নাম সাজেস্ট করা ভাল। স্মুতার্য আবার বললেন, মোহনলাল তো বেশ ভাল হিন্দী বলে। ইফ নট বেটার জ্ঞান তোমার জয়ন্তকুমার, তা ছাড়া দেখতেও বেশ সুপুরুষ।

জয়ন্তর কাছে লাগে না।

তা হোক, অতটা না হ'লেও, ওরও একটা ডিফারেন্ট মার্কেট ভ্যালু আছে।

দু'জনের তর্কের ভেতর কোন কথা না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া।

আচ্ছা, আপনার কি মত?

বোস প্রশ্ন করলেন।

আমার?

চোখ বুজে হাসলেন বাজোরিয়া।

হ্যাঁ, আপনার মতই তো প্রশ্ন, আপনার থেকে কে বেশি বুঝবে? বারিক মোক্ষম কথা বলে ফেলার মত গবিত হাসি হাসলেন।

তা হলে শোনেন মিঃ বোস।

বলুন।

হামি বলি, আমাদের উচিত হোবে কি, মার্কেট ভ্যালুর হোতে অবিক ভাবতে হোবে নিউ ফাইও কোন হিরো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই। দেখুন, এত বড় কথাটা আমাদের মাথাতাই আসে নি।

হেঁ হেঁ! হাসতে লাগলেন বাজোরিয়া।

আমাদেরও তাই মত? কি বল?

চৌধুরী আর বারিকের দিকে তাকিয়ে ইসারা করলেন তিনি।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ আর বলতে। দু'জনেই সমর্থন করলেন।

তা যদি বলেন, সেও আমাদের একটি ছেলের বোজ আছে ১০০ সুরজিৎ বলে একটি ছেলে আসে এখানে। তার মা বাঙালী, বাবা পাঞ্জাবী। ও যেমন বাংলা বলে তেমন চমৎকার হিন্দী, পাঞ্জাবী। আর চেহারাখানাও অপূর্ব। ওকেই নিলে হয়, চমৎকার হবে, কি বল তোমরা?

আবার ইসারা করলেন তিনি চোখের ইঙ্গিতে। বিজ্ঞ নিরাশ করলেন ওদের বাজোরিয়া।

না মোশর, ও-সব হোবে না। হামি একটা হিরো ঠিক করিয়েছি। আজকালকার দিনে সোব দিক বুঝে তো কাম করতে হোয়। কেন না সমঝিয়ে, হিরোর কোদর খুঁই তো বেশি।

আপনি নিজে ঠিক করলে তো কথাই নেই। সে তো সব থেকে ভাল। কে বলুন তো?

রহস্যময় হাসি হাসতে লাগলেন। আর সকলে ভাবতে বসে গেলেন।

সেই রাজকুমার?

বোস সাংসাহে বললেন হঠাৎ।

মিটিমিটি হেসে মাথা নাড়লেন বাজোরিয়া। ঐ খুঁপসুহত হিরোইনের সঙ্গে তো মানানো চাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো বটেই।

আমি জানি...আই নো...

বারিক মুখ ধুললেন। আপনার সঙ্গেই যোবে...ভাট, জেটল-ম্যান...কি যেন নাম? কঙ্গী লখা মত....

না—

এবার গভীর গলায় বললেন বাজোরিয়া, তারপর চোখ বুজে চশমাটা খুলে ফেললেন। ভাবতে গেলেই চোখ বুজে চশমা খোলাই বোধ হয় বাজোরিয়ার অভ্যাস।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন চশমা পরে নিয়ে। সকলে নিখাস বন্ধ করে অপেক্ষা করলেন।

মায়র লোচুতা ১০০

কা?

ইয়ে ফিল্ম মে মায়র খোদ এ্যাপিয়ার হো বাউজা, কেয়া আচ্ছা নেহি?

হ্যাঁ হ'য়ে গেল সকলের মুখ। বলে কি লোকটা? কেপে গেল নাকি? এই ঘটনাক্রমে মত চেহারা নিয়ে ফিল্ম? আয়না দেখে নি নাকি কেমনদিন?

তবু ভাব দেখালেন অজ্ঞ রকম।

যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেলেন সবাই। এ হেন আশাতীত ধবর পেয়ে ধস্ত হলেন যেন সকলে এমন ভাব।

ঠিক এই কথাই আমি ভাবছিলাম, আর সেইজন্যই আপনারদের মত সব বাজে নাম সাজেস্ট করে সময় নষ্ট করি নি। [আগামীবারে সমাপ্য।

# বঙালী

প্রমোদ মিত্র

দিগন্তে কুহেলী—শ্রীপার্থ বর্ণিত :

ঠিক রাত সাড়ে এগারটার ফোন বাজল।

বেশ কিছুদিন ধরেই এমন নিয়মিতভাবে ঠিক এই সময়টাকেই বাজছে যে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নেওয়া যায় বললেই হয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে এই সময়টার বেশ অস্বস্তির মধ্যে কাটাই। এক একদিন মনে হয় ফোনটা আর ধরব না। বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে পামুক। আর কাউকে দিয়ে আমি কলকাতায় নেই বা ঘুমিয়ে পড়েছি গোছের মিথ্যা কিছু বলিয়ে দিতেও ইচ্ছে করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি না। এখনো অন্তত পারি নি।

ফোনটা কোন এক অপ্রতিরোধ্যের তাগিদে গিয়ে তুলে নিতে হয়।

কে ফোন করছে জেনেও হালো বলে কৌতুহল প্রকাশ করি তারপর।

দেবরাজের ঈষৎ ধবংগলায় সেই কুণ্ঠিত প্রশ্ন শোনা যায়,—ঘুম ভাঙলাম?

না, এখনো শুষ্টে যাই নি।

লিখছিলেন বুঝি?

না, রাতে আমি লিখি না ত'জানো!

ওঃ হ্যাঁ। গলার স্বরেই দেবরাজের মুখের অপরাধীর মত ইতস্তত ভাবটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে আবার দ্বিধাজড়িত ভাবে বলে,—তোমার এখন বিরক্ত করতাম না ভাই। কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে এল...

প্রায় প্রতিদিনই হঠাৎ এমনি একটা দেবরাজের মান আসে রাত এগারটার পর আর আমার বৈধি ধরে তা স্তনতে হয়।

বৈধি ধরে বলাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রথম প্রথম বেশ আগ্রহ ভরেই শুনেছিলাম। তার বক্তব্যের মূল বিষয় সবক্ষে কৌতুহল এখনো বেশি বই কম নয়। কিন্তু দেবরাজের প্রতিদিন ঘুরিফিরিয়ে একই স্মৃতির পাতা ওটানো। একটু রাস্তিকর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমার কাছে এসব কথা তুলে সে যে সহানুভূতিটুকু চায় তা আন্তরিক ভাবে দেবার সাধ্য আমার নেই বলেই আরো অস্বস্তি বোধ করি।

সহানুভূতি তার প্রতি নেই এমন নয়, কিন্তু সে তার হতাশ নিঃসঙ্গতার ভয়ে শুধু। তাকে সমর্থন করে তার সমস্যাটা না হতে

পারলেও রাত এগারটার পর কেন সে আমার উৎসাহের অভাব সবক্ষে সচেতন হয়েও দ্বিধাজরে ফোন না করে পারে না তা আমি বুঝি।

ফোন ছাড়া আর কিছু করা যেন তার সাহসের বাইরে।

প্রথম প্রথম কয়েকবার তাকে সোজাসুজি এসে দেখা করলে বলেছি। বলেছি ফোনে কি সব কথা শোনা বা বলা যায়। বহুকাল তোমায় দেখি নি। একদিন চলেই এসো না। আমার বাড়িতে আসতে অস্ববিধে হয় তোমার বাসায় যেতে পারি। না হলে অন্ত একটা কোন জায়গা ঠিক করো। সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে বসে যাবে। আমায়ও অনেক কথা শোনবার আছে, তোমারও বলবার।

দেবরাজ আপত্তি করে নি। জায়গা আর সময়ও পরস্পরের সুবিধে বিচার করে ঠিক করেছি। কিন্তু দেবরাজ আসে নি।

কয়েকদিন তারপর লজ্জাতেই বোধ হয় ফোনও করে নি।

কিন্তু সে আর কতদিন? হুণ্ডাখানেক যেতে না যেতে আবার সেই মাঝরাতের ডাক।

প্রথমেই ক্ষমা চাওয়া।—আমি বড় লজ্জিত পার্থ। সেদিন কিছুতেই কথা রাখা সম্ভব হ'ল না। একটা জরুরী কাজে সকালেই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হল।

প্রথমবার তার এ কৈফিয়ৎ একরকম বিশ্বাসই করেছিলাম। বলেছিলাম, থাক তাকে আর কি হয়েছে? কাল বরং ওই রেষ্টোরাঁতেই এসো না। ঠিক ছুটি থেকে আমি অপেক্ষা করব।

না, না ও রেষ্টোরাঁ'র নয়।—দেবরাজের গলায় যেন আতঙ্ক,—ওখানে বড় ভিড়।

ভিড় ছ'টার পর আর থাকে না।—দেবরাজকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, সিনেমার শো আরম্ভ হয়ে গেলে চৌরঙ্গীর প্রায় সব রেষ্টোরাঁ'ই খানিকক্ষণের জল্পে বেশ কাঁকা হয়ে যায়।

হ্যাঁ তা যায়, তবে—তবে...কি জানো—বেশ একটু ইতস্তত করে দেবরাজ বলেছিল,—ও রেষ্টোরাঁ-টেষ্টোরাঁ'র ঠিক প্রশংসনীয় কথা বল যায় না। কখন কে ঠিক পার্শ্বের সীটে এসে বসে পড়বে তার ত' ঠিক নেই। বেশ, তা হলে এসপ্লানেডে ট্রাম কোম্পানীর কন্টেইনার-বিজিএর তলার অপেক্ষা করব। ঘড়িটার ঠিক নিচে। ছুটি থেকে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে এসে

দেবরাজ রাজী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু সেবারও ছুটা থেকে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরিয়ে থেকেও তার দেখা পাই নি। মনে মনে তার মুণ্ডুপাত করতে করতে বাড়ি ফিরেছিলাম।

না, শুধু রাগই করি নি—বেশ একটু বিষয়বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। ফোনে যে নিত্য আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্তে যাকুল সে আমার সঙ্গে সামনা-সামনি সাক্ষাৎ কি এড়িয়ে চলতেই চায়? তার কারণই বা কি হতে পারে।

সেদিন রাত্রিই আবার ফোন বেজেছিল যথাসময়ে।

ফোন তুলেই কোনো সন্তোষের জন্তে অপেক্ষা না করে সরাসরি মনের খাঁজ প্রকাশ করেছিলাম,—কি ভেবেছ তুমি বলে ত! আমি কি তোমার খাস তালুকের প্রজা না তোমার কাছে চাকরীর উমেদার। দু'দিন ত'দিন কথা দিয়ে এরকম খেলাপ করার মানে কি?

ওধার থেকে জড়িত স্বরে কি একটা বলবার চেষ্টা করেছিল দেবরাজ। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম,—আর কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা কোরো না। তার বললে সত্যি করে বলে ত' আমার সঙ্গে দেখা করতে কেন তোমার আপত্তি।

কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ। ওদিকের ফোনে যেন কেউ নেই।

তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অস্বুঁকণ্ঠ বলেছিল দেবরাজ,—দেখা করতে আমার বোলো না পার্থ। আমি পারব না।

অবাক হয়েছিলাম শুধু তার কথার নয়, তার গলার অপ্রত্যাশিত অসীম কাতরতাতেও।

রাগ-অজ্ঞান সব ভুলে গিয়ে বিমুগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার মানে? তুমি আমার ফোন করতে পারো অথচ দেখা করতে পারো না আমার সঙ্গে? বেশ, কোথায় তুমি আছো বলে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব: দশ বছর বাদে তোমার গলার স্বরই শুধু ফোনে শুনিছি, চোখে তোমাকে দেখি নি। বোলো কোথায় তুমি আছ। কি তোমার ঠিকানা?

আবার খানিকক্ষণের নীরবতা। তারপর দেবরাজের যখন-কাতর স্বর,—ঠিকানাও আমি বলতে পারব না। দোহাই তোমার জিজ্ঞাসা কোরো না।

ঠিকানা জিজ্ঞাসা করব না! একটু বিবস্ত্রিত সঙ্গেই বলেছিলাম,—এ ত' আছা মজার ব্যাপার দেখছি! তুমি যে রীতিমত একটা রহস্য গল্প বানিয়ে তুলছ দেবরাজ। দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই। তারপর হঠাৎ একদিন রাতে ফোন করে বলল। সেই থেকে নিত্যই প্রায় ফোন করে যাচ্ছ। পূর্বোক্ত শ্রুতির রোমন্থনই তোমার বিলাস বলে বুঝেছি। তোমাদের সে জীবনের সঙ্গে আমারও যত স্পর্শই হোক সম্পর্ক একটা ছিল। তাই তোমার সেদিনকার ভূমিকা যাই হোক আমি জানি তা স্মরণ না করতে পারলেও তোমার তরফের কথা শুনে উৎসুক হয়েছি। কিন্তু ফোনে কথা বললেও সামনা সামনি

## অলৌকিক দৈবশক্তির স্রব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তরিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্বিদ, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিম্নলিখিত ভবিষ্যৎ কলিত ও পণ্ডিত সত্যের সত্যপতি এবং কান্টন বারানসী পণ্ডিত মহাসত্যের দ্বারা সত্যপতি। ইনি দেখিবার মানবজীবনের কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোম্পা বিচার ও প্রভৃতি এবং অন্তঃকরণ ও হৃদয় প্রভৃতির প্রতিকার করে শাস্তি-বন্দ্যাদি, তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও প্রত্যক্ষ কলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের হৃদয়গত প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাবের কবরাজ পরিভ্রম কঠিন রোগাদির নিরাময় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, বঙ্গ-ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, আলিয়, মিজাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীকণ্ঠে তাঁহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবারো বাক্যে করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে বাহারা মুখ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্-হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া বহুমাভা মহারাজী জিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ভার মদখনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সজ্জাবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ভার মদখনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বকীয়া গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শীলসরসেবের রাষ্ট্রকর্ত, কেন্দ্রবদ্ধ হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল ভার কল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. কচল

প্রত্যক্ষ কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অভ্যাসকর্ম কবচ

ধর্মজ্ঞা কবচ—ধারণে বহুমান্য প্রভৃৎ ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বোক্ত)। সাধারণ—১৯৮০, পশ্চিমালী বৃহৎ—২৯৮০, মহাপশ্চিমালী ও সর্ব কলদায়ক—১২৯৮০। (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও সন্তান কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কবচ)। সর্বজাতী কবচ—ধারণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষার ফল ৯৮০, বৃহৎ—৩৮৮০। মোহিনী (বনিকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত ধনী ও পুত্র বনীবৃত্ত এবং চিরস্বচ্ছ ও মিত্র হয় ১১৮০, বৃহৎ—৩৮০, মহাপশ্চিমালী ৩৮৮০। বর্গজ্ঞানকর্ম কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোত্তি, উপরিহ মানবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলার জয়লাভ এবং প্রবল শক্তিশালী ৯৮০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৮০, মহাপশ্চিমালী—১৮৮০। (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাগ্যবান সন্তানী জরী হইয়াছেন)।

(হাণ্ডিভা ১৯০৭ প্রঃ) আল ইণ্ডিয়া এন্টোলজিক্যাল এণ্ড এন্টোনমিক্যাল সোসাইটী (রোলটর্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), বর্তমান স্ট্রিট 'জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন' (প্রবেশ পথ ৮৮/২, ওয়েলসলী স্ট্রিট গেট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৫—৫০০৫। সদর—বৈকাল ৫টা হইতে ৮টা। ব্রাক অফিস ১০৫, প্রেস স্ট্রিট, 'বসন্ত নিবাস', কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৫৫। সদর প্রান্তে ৯টা হইতে ১১টা।

## নভেম্বর

তুমি কেন আসতে পারো না। কেন জানাতে পারো না তোমার ঠিকানা! তুমি ত' ফেরারী আসামী নও দেবরাজ। যাই তুমি করে থাকো তার বিচার শুধু তোমার নিজের কাছে।

সেই বিচারই আমি করতে চাইছি পার্শ্ব। তাই বরবার জন্তাই তোমার ফোন ডাকি। এবমাত্র তুমিই আমার সাহায্য করতে পারো। আমাকে বিষয় তুমি কোরো না।

দেবরাজের কণ্ঠের এ করুণ মিনতির পর আর বিকল্প হয়ে থাকে। সন্তব হয় নি। বলেছিলাম,—তা করব না। কিন্তু তুমি তা হলে আমার কাছে শুধু অশরীরী ধনি হয়েই থাকবে! সে ধনিও আমার একরকম অচেনা।

কেন? দেবরাজের গলার স্বর যেন একটু তীক্ষ্ণ তুলিয়েছিল।

হেসে বলেছিলাম, দশ বছর আগেকার তোমার গলার স্বর যা মনে আছে ফোনের যান্ত্রিক বিকৃতির ভেতর দিয়ে তা মিলিয়ে নেওয়া যায় না বলে। আচ্ছা তবু তোমার শর্তই না হয় মেনে নিলাম দেবরাজ, কিন্তু কেন তোমার এ রকম অদ্ভুত আত্মগোপন তাও কি বলতে পারো না!

না, তাও জানতে চেষ্টা না। জানাবার সময় যদি হয় আমি নিজেই জানাবো। দেবরাজের কণ্ঠ অসহায় কাহুরতাই ফুটে উঠেছিল।

সহানুভূতির সঙ্গেই এবার হেসে বলেছিলাম, তোমার সব কথাই মেনে নিচ্ছি দেবরাজ। কিন্তু আমার অবস্থাটাও আশা করি বুঝতে পারছ। আমাকে শ্রোতা ও সাক্ষী হিসেবে রেখে জীবনের একটা অধ্যায় তুমি বিচার করতে চাও, অথচ আমার কাছেই নিজেকে তুমি অর্ধেকটা ঢাক। দিয়ে রাখছ। এ যেন এমন একটি বই-এর সমালোচনায়

সাহায্য করতে আমার ডাকা বার অনেকগুলো পাতা আমার পড়া বারণ বলে বই থেকে সম্পূর্ণ ছিঁড়ে রাখা হয়েছে। সেই অজানা গোপন পাতাগুলো সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল মনের মধ্যে চেপে রেখে দিয়ে দিনের পর-দিন তোমার অশরীরী ধনিমূর্তির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে হবে। এ যন্ত্রণা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতেও ত' পারে।

তা আমি বৃষ্টি পার্শ্ব। বৃষ্টি তোমার ওপর এ একরকম আত্যাচার,—দেবরাজের কণ্ঠ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল,—কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে এ সব কথা শোনাতে পারি না। সেদিন ক'টা জীবনের স্মৃতি যেখানে জট পাকিয়ে গিয়েছিল সেখানে তুমিই ছিলে একমাত্র দরদী দর্শক। আমাদেরও অগোচর কিছু খেই হয়ত তোমার-ই জানা থাকতে পারে। তুমি ছাড়া আর কেউ সে দৃষ্টান্ত গ্রন্থের জটিলতা বুঝবে না। আমার,—ন', শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের খাতিরে তোমাকে তাই একটু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে পার্শ্ব।

সেই পরীক্ষাই দিয়ে এসেছি এ পর্যন্ত।

দেবরাজ প্রায় প্রতিদিনই ফোন করেছে রাত এগারটার পর। মাঝে মাঝে অব্যবহার্য কয়েকদিনের জন্তা নীরবও হয়ে গেছে একেবারে। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু করেছিল তেমনী অকস্মাৎ দেবরাজ হয়ত এই বিচিত্র দৃষ্টিমন্ডনের পালায় ছেদ টেনে দিয়েছে অস্বাভাবিক করে কিছুটা স্থিতি পেলও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি নি। রাত এগারটার পর থেকেই একটা অস্থিরতা অনুভব করছি। কানের সঙ্গে মনটাও ওই ফোনটার দিকেই অস্বস্তিকরভাবে সজাগ হয়ে থেকেছে।

তারপর আবার একদিন ফোন বেজে ওঠায় খুশি না উত্থাপ্ত বোধ করেছি নিজেই বলতে পারব না।

## রেণুকা ট্যালকম পাউডার

সুস্বাদু সুগন্ধে ভরা রেণুকা  
ট্যালকম পাউডার (এ্যাক্টামার মুক্ত)  
আপনার দেহের ঘামাচি নিবা-  
রণে সহায়তা করবে। সর্ব-  
প্রকার ত্বক বিকৃতির আশঙ্কা  
থেকে নিরাপদে রাখবে।  
দেহের দুর্গন্ধ দূর করবে।  
একমাত্র রেণুকা ট্যালকম  
পাউডারই এ্যাক্টামার মুক্ত।



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিমিটেড  
কলিকাতা-২৯

দেবরাজ ফোনে সব সময়ে যে দীর্ঘ আলোশ করেছেন এমন নয়। এক-একদিন বলার মত কোন কথা না থাকলেও শুধু আমার উপস্থিতির আধাসটুকু পাবার জন্তেই যেন সে ফোন করেছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

স্মৃতির খেই টেনে টেনে দেবরাজ যে-সব কথা আমার স্মরণে আছে তার আকর্ষণ যতই থাকে দেবরাজের নিজের চরিত্রের দুর্বোধ পরিণতিই আমাকে উদ্ভিগ্ন উৎসুক করেছে আরো অনেক বেশি। সবকিছু মিলিয়ে তার বর্তমানের নানা অদ্ভুত আচরণের মানে বোঝবার চেষ্টায় আকাশ-পাতাল ভেবেও কোন কূল পাই নি।

এ কি এক ধরনের অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ! কিন্তু তা ভেবে নিলেও যেন সব রকমের মীমাংসা হয় না।

আজই বিস্তৃত রাত এগারটার পর তার ফোনের জন্তে অপেক্ষা করতে করতে মনের মধ্যে একটা চকিত বিভ্রান্তের ইঙ্গিত যেন বিলিক দিয়ে গেল।

ফোন বাজল ঠিক সেই মুহূর্তেই।

ফোনেটা তুলে ধরে ওদিকের সম্ভাব্যের জন্তেই নীরবে অপেক্ষা করে রইলাম।

আলো! কে পার্শ্ব!

হ্যাঁ।

আমার নিঃস্বপ্নাকর্ষ লক্ষ্য না করবার মত নয়। ওদিকে সেই কুণ্ঠিত স্বর আরো একটু কাতর শোনা—আজ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলে? না?

না, ঘুমোই নি। তোমার ফোনের জন্তেই অপেক্ষা করছিলাম।

ও—তাই নাকি!—ওধারে বাধিত হওয়ার চেয়ে গলার স্বরে কি রকম একটা থতমত খাওয়া ভাব।

—তোমার গলাটা কেমন ভারি ভারি শোনা! প্রথম। তাই ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি।

একই থেমে দেবরাজ আবার বললে,—কাল তোমার দীঘলওয়ারার যে ঘটনার কথা বলেছি তা শুনে কি তোমার মনে হচ্ছে? তা থেকে কিছু কি ভেবে পলে?

হ্যাঁ পোলাম। শুধু ওই ঘটনা থেকেই নয়, এ পর্যন্ত যা কিছু তুমি বলেছ করেছ সে সবকিছু থেকেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কি?—আগে ও উৎকর্ষা মেশানো কঠোর।

ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নে বললাম,—তুমি দেবরাজ নও!

আমি দেবরাজ নই!—ফোনের ওধারে একটা চমকিত বিহ্বলতা গলার স্বরে ফুটে উঠল,—কি তুমি বলছ পার্শ্ব?

ঠিকই য় বলছি তা তুমি জানো। তুমি দেবরাজ নও, তাই তুমি আমার সঙ্গে সামান্য-সামান্য দেখা করতে পারো না, তাই তোমাকে গভীর রাতে শুধু ফোনে আমার কাছে স্মৃতির অলস স্মৃতিগুলো মেলে ধরতে হয় দেবরাজ সোজা।

কিন্তু—কিন্তু—দেবরাজ সাজার এ ছলনা কেউ করতে বাবে কেন? যাবোঁসে অস্বপ্ন বলে। পৃথিবীর সেই চিরন্তন ত্রিভুজ নাটকে একটি অসামান্য ভূমিকা যে নিজের মৃত্যুর ব্যর্থ করার মানিতে দগ্ধ হচ্ছে বলে।

ফোনের ওধারে অফুট একটা শব্দ হতেই আবার বললাম,—বুঝা

প্রতিবাদ করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি তুমি অস্বপ্ন। তুমি আমার একদিনে যা যা বলেছ এক অস্বপ্ন চৌধুরী ছাড়া আর কারুর তা অত বিশদভাবে জানবার কথা নয়। দেবরাজ ভালোমনে দেখাটুকি সবসময় মিলিয়ে সাধারণ মানুষের খুব বেশি কিছু নয়। সন্তা কাঠের মত সে দপ করে অলে উঠতে পারে, কিন্তু নিভতেও দেরি লাগে না। এত অনির্বাক্য দাহও দেবরাজের হৃদয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের তিনজনকেই কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে আমি জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম অস্বপ্ন। বাইরে থেকে দেখতে তুমিই ছিলে সবচেয়ে কঠিন নির্বিকার, কিন্তু ওই মুখোশের তলায় যে মানুষটি ছিল তার কিছু অভাস আমি পেয়েছি। আত্মবিচারের এ যন্ত্রণা সাধ করে বরণ করবার উৎসাহ একমাত্র তোমাই হতে পারে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। দশ বছর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি অস্বপ্ন। সবাই জানে তুমি স্বেচ্ছায় নিজের প্রেতের খাতিরে এমন নিলিঙ্গতার শিখরে নিজেকে নির্ধারিত করেছ কোনো ছন্দবাহকের ডেউ যেখানে পৌছোয় না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি কিছুটা তুমি ভালো নি দীঘলওয়ারার সেই অরব্যাস, দেবরাজ আর নানা আশ্রয় তোমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে। নিজেকে তুমি ক্ষমা করতে পারো নি তাই দেবরাজ সেজে তোমাদের কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা জড়িত একটিমাত্র মানুষের কাছে নিজেকে মেলে ধরে আত্মবিচারের চেষ্টা তোমার না করলে নয়।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে থামলাম।

ওধারের ফোনেটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখবার শব্দ শোনা গেল।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ তীব্র একটা অনুশোচনা জাগল মনে। কথাগুলো অন্য কোনভাবে বোধ হয় বলা উচিত ছিল।

সম্প্রদায় হল রাত এগারটার পর এমন করে ফোন আর অনেকদিন বোধ হয় বাজবে না। কোনদিন আর বাজবে কি না কে জানে।

নীনা অস্বপ্ন আর দেবরাজ।

কাহিনী প্রাধানত এই তিনজনকে নিয়ে।

সেই চিরন্তন ত্রিভুজেরই তিনটি বাহু বললে কিন্তু একটু ভুল বোঝানো হয়। ভালোবাসা আর ঈর্ষার দ্বন্দ্বের সেই মানুষলী ত্রিভুজ ঠিক নয়। বেশ একটু পার্থক্য আছে। পার্থক্য প্রাধান চরিত্রগুলি ঠিক সাধারণ মানের নয় বলে। কোন সম্প্রদায় সরল বোধ্য তাদের বোঝানো যায় না।

এ কাহিনীর মধ্যে আমার জড়িয়ে পড়াও বোধ হয় নিয়তির নির্দেশ।

কারণ কাহিনী যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে আমি অমুপস্থিত, যখন তাতে ছেদ পড়েছে তখনও আমি ছিলাম না। মাঝখানের কয়েকটা অব্যায় শুধু আমার সামনে উদ্ঘাটিত।

সে কটি অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যও আমার হত না, যদি না নিত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের একরাত্রি প্রায় দুঃস্বপ্ন বুক সাগর ডিঙোবার একটি হাওয়ারই জাহাজে আমার রওনা হ'তে হ'ত। সেই উত্তাপপূর্ণ থেকেই শুরু করা বিধেয়।

এবার পোর্টে পৌছোতে পারব এমন আশা ছিল না।



হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট মজির :



আমি তো  
যথাসাধ্য  
ভালভাবেই  
কারেছি  
স্যার...!

“এই জেজর  
যথাসাধ্য!!  
হুঁঃ...”

চমকিত  
গোলিফান্ডার  
সংগ্রহ



স্বপ্নাশ! নতুন শিল্পোচ্চাশে চট করে পদোন্নতি হবে, আর  
এও আশা করেছিল যে ভাড়াভাড়ি বদলি হবে। তাকে  
কখন বদলান যে তা হবার জো নেই, সে গজগজ করতে  
ছাপল। আমি তাকে বদলাব, “বহৎ আচ্ছা, যেরে এবার  
জ্যেদার মুখনাড়া তরু হল—কারখানার যেন যথেষ্ট হয়নি।  
তবে সে বদল, ‘বদলির কথা ভাবছি না, তোমার জ্যেদেই  
আমার ভাবনা। কিছুদিন থেকেই বেবছি, তুমি যেন উৎসাহ  
হয়িয়ে কেনেছ, যেন কত বেশী জাতিতে পেয়ে রয়েছ।  
কারখানার ডাক্তারবাবুকে একবার দেখাও না।’



আমার জী বাঁচি কথাই অবশ্য বলছে। পরদিনই আমি কারখানার  
ক্লিনিকে গেলাম। সেবু ডাক্তার বললেন, ‘মানসিক দুশ্চিন্তা আর একটান  
বাঁটনির রূপ তোমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই বা। পুষ্টি বাক্সকে  
পারশেই শরীরে বদল পাবে। আমি বলি, তুমি হরলিক্স খাও।’



আচ্ছা ৩৭ বসতে হবে হরলিক্সের। বাঁচি  
দুখের সঙ্গে পেয়াই করা গম আর মটের বাঁশি  
পুষ্টির সারাংশ নিশিয়ে তৈরী হয় হরলিক্স।  
জাই থেরে থেরে থেরে আমি শক্তিসামর্থ্য  
কিরে পেলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমার  
পদোন্নতি হল, অল্প আয়সায় বদলিও হল।  
আমার জী আর আমার গ্রে কী আনন্দ!  
বৈচে থাক্ আমার হরলিক্স।



হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি প্রদে তোলে!

কথার পিঠে কথার তোড় খানিকটা বাঁধা দস্তুর মেনে চলে বলেই আশা শব্দটা কলমে পিছলে এসে গেল, নইলে মনের সত্যিকার ভাবটা সম্পূর্ণ বিপরীতই বোধ হয় ছিল।

এয়ার পোর্টে সে রাতে সময়মত পৌঁছাতে না পারলে হতাশ হয়ে খুব ভেঙে বোধ হয় পড়তাম না। যাকে অনিবার্য কারণ বলে সে রকম একটা কিছু ফলে প্লেন-এ চড়া সেদিন বন্ধ হলে বোধ হয় খানিকটা স্বস্তিই পেতাম। যে রকম অবস্থায় বাড়ি থেকে দু'পা যেতে হলে ভাবতে হয়, তাইতে একেবারে আরব-সমুদ্র লঙ্ঘন করার কল্পনার তেমন উৎসাহ বোধ না করা এমন কিছু অস্বাভাবিক বোধ হয় না। তার ওপর এক হিসেবে এ ব্যাপারে একেবারে আনন্ডি। আকাশ-পথে এমন দীর্ঘ সাগরপাড়ি আগে কখনও দিই নি। দু'যোগটার তাই একটা অন্তত সন্তোষের আভাসই পেয়ে মনটা যে একটু দমে গেছিল তা অকপটে স্বীকার করছি।

সাধারণ দু'যোগ ত' নয়, যেন প্রলয়েরই কিছুটা নমুনা।

সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল হাওয়ার সঙ্গে বিরঝিরে বৃষ্টি। দুপুরে বৃষ্টি থেমে হাওয়ার বেগ বাড়ায় ধারণা হয়েছিল সমুদ্রের দিকে আকাশের চেহারা কিছুটা প্রসন্ন হতেও পারে। তার বদলে বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল মুহুরিয়ারে।

বোম্বাই-এর বর্ষার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তাদের এ বৃষ্টির প্রচণ্ডতা বোঝানো যাবে না। এ যেন কোন আশ্রিত যুগের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া আকাশের ঝাঁকরা দমকলের জলের তোড়ে আকাশের কোন দানব যেন হিন্দু আক্রোশে মাটির পৃথিবীকে ধুয়ে ভাসিয়ে দিতে চায়।

একবার শুরু হলে সে বৃষ্টির কোণ যেন কিছুতে শান্ত হবার নয়। এ আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরুপায় নগর মুখ্যমান হয়ে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিফল বিপর্যস্ত।

বোম্বাই শহরের সুবিখ্যাত একটি হোটেলের জায়গা দেওয়া হয়েছিল আকাশপথের সাগরপারের রাজী হিসাবে। সেখান থেকে হাওয়াই জাহাজ কোম্পানীর কোচ এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেবে এই ব্যবস্থা।

রাত সাড়ে আটটার কোচ আসবার কথা। শরীরটা সারাদিন ভালো ছিল না। রাতের খাওয়াটা বাদ দিয়েই নিচে লবীতে গিয়ে অপেক্ষা করছি। সঙ্গে আমারই মত ভই প্লেনের একজন সহযাত্রী। তিনি আমার চেয়েও বেশ একটু উদ্বিগ্ন মনে হ'ল। এ রকম দু'যোগে প্লেন ছাড়ে কি না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যে তাঁর চেয়ে বেশি গুরুত্ববাহী নই এ কথাটা ভালো করে বোঝাতে না পেয়ে শেষকালে দূরের চেয়ে কাছেই ভাবনাটাই যে বড় হয়ে উঠেছে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

বললাম—প্লেন ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, এয়ার পোর্টে ত' আমাদের পৌঁছান দরকার। তারই-ত' কোন ভরসা দেখছি না। রাত নটা বাজে, এখনও ত' কোচের দেখা নেই।

কোচ আসবে না না কি!—ভদ্রলোক একেবারে আঁতকে উঠলেন। তারপর বিজ্ঞকেই যেন ভরসা দেবার জন্তে বললেন, কিন্তু কোচ ত' আসতে বাধ্য। আমাদের সময় মত এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেওয়া ত' প্লেন কোম্পানীরই দায়। আমাদের না নিয়ে কি প্লেন ছাড়তে পারে না কি। প্লেন কি করতে পারে না পারে তার প্রশ্ন পাবার আগেই খোজ নিয়ে বা জানলাম তাতে একেবারে হতবুদ্ধি। সাধারণত এ সব

ব্যাপারে যা প্রশ্ন অবিশ্যি কান্নর না কান্নর ভুলে বা অবহেলার সেই ধরণের গাফিলতিই ঘটেছে। উড়োজাহাজ কোম্পানীর কোচ নাকি কিছু পূর্বে আমাদের হোটলে এসেছিল এবং আমরা দু'জন লবীতে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোন যোগাযোগ না করে অল্প কয়েকজন নিম্নী-কলকাতার যাত্রীদের নিয়ে ফিরে গেছে।

আমাদের অবস্থাটা এবার অনুমান করা যেতে পারে।

নিজেই আমি অসহায় আনন্ডি, তার ওপর ততোধিক দিশাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় এক সহযাত্রী।

কি হবে মশাই! আমাদের ওই একরাশ ভাড়ার টাকা মারা যাবে! এয়ার পোর্টে একবার কোন কথা যায় না! একটা ট্যান্ডি চেষ্টা করুন না!

চেষ্টা যা করার করতে কিছু বাকি রাখলাম না। কিন্তু ওই অসম্ভব দু'যোগের মধ্যে কোথায় ট্যান্ডি? ট্যান্ডি জটিলও ওই প্রায় ত'ওরের মধ্যে সর্ব্ব্ব শ্রান্তাক্রমে জল খই খই বাস্তায় আধা জলযান হয়ে যেতে রাজী হবে কি না সম্ভব।

এয়ার পোর্টে ফোন করেও কোন সুরাহা হল না।

তাঁরা নিরুপায় ভাবে জানালেন যে, আমাদের আনতে যে 'কোচ' হোটলে এসেছিল তা এখনও এয়ার পোর্টে ফেরে নি! স্তব্ধতা তাঁদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কোচ এয়ার পোর্টে ফেরবার পর আর আমাদের নিতে আসার যে সময় থাকবে না তা তাঁরা উহু রাখলেও বুঝতে অনুবিধে হ'ল না।

সত্যিই শোচনীয় অবস্থা। মনে মনে এই রাত্রে প্লেনে চড়ে সাগর পার হওয়া সম্বন্ধে যত আশঙ্কাই থাক এ রকম লজ্জাকরভাবে 'কোচ'-এর তাক্ষিল্যে বাতাবল হওয়াটা নিশ্চয় চাই নি।

হতাশ হয়ে বখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখনই প্রায় অলৌকিক এক অঘটন ঘটল।

হোটলের লবীর যে কাউটারে দাঁড়িয়ে কোন করছিলাম তার একপাশে একটি স্বতন্ত্র মহিলাকে রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সঙ্গে দু' একবার কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসতে ইতিপূর্বে দেখেছি।

সহযাত্রীটিকে নিয়ে কাউটার ছেড়ে ট্যান্ডির জন্তে শেষ চেষ্টা করতে চলে আসবার সময় পেছন থেকে তাঁরই আহ্বান শুনে চমকে ফিরে দাঁড়লাম।

মাফ করবেন! আপনারা কি এয়ার পোর্টে যেতে চান। সাড়ে এগারটার ফ্লাইট?

বরষা বৃষ্টি নয় কোন সুল্লরী যুবতী বোতাল মেয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিস্রিত দু'জন ভারতীয়কে নিজে থেকে এরকম সম্ভাষণ করা তখনকার দিনে ভারতের মাটিতে অসম্ভব আমার কাছে কল্পনাতীত।

একটু ধতমত খেয়েই তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারি নি।

আমার সহযাত্রীর কিন্তু ও-সব বিশ্বাস বিমূঢ়তার বাল্যই নেই।

তিনি ব্যাকুলভাবে বিচিত্র ইংরাজীতে আমাদের বিপন্ন অবস্থার কথা সবিস্তারে জানাতে শুরু করলেন।

মেয়েটি বাধা না দিলে কতকগুলি যে খেদোক্তি চলত বলা কঠিন।

একটু হেসে সে বললে,—কোন ভাবনা নেই। আমি ওই ফ্লাইটেই বাছি। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

নীনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত সেইখানেই।

[ক্ৰমশঃ]

## উস্কিনোভ বরফ চেকভের অক্ষমতাকে

প্রশংসাই করেছেন যেন চেকভ, সর্বদা সেগুলি খুঁজে বেড়াতে নাকি প্রকৃতপক্ষে সমস্তার সমাধানে অক্ষম হয়ে জনগণকে ঠকাবেন না বলেই তিনি তাদের কি অবস্থা করতেন তা বলতে পারতেন না। নাটকগুলি মহৎ সৃষ্টি—কারণ যদিও তারা কোন উত্তর দিতে পারে নি, কিন্তু প্রাণপণে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে এবং এইভাবে একটি একটি ঐতিহাসিক জগতকে দৃষ্টমান করেছে। মানুষের গুণাবলী বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ফেল কোন লাভ নেই। 'চেরী অর্ক্যাডে'র কথা মনে পড়ছে—তার সমসাময়িক ইতিহাস। যেখানে জমিদার কুঠার দিয়ে চরিত্রের সুলভ কিং নিফল। মূলদেশে আঘাত করছে—সেখানে চেকভ যে শুধুমাত্র চিত্রোপন তাই প্রকাশ করেছেন তাই নয় সেই খুল বাস্তবতা একটা যুগকে চিত্রিত করেছে। শূন্যতার মধ্যে এই চরিত্রগুলি নিফল নয়। নতুন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তারা নিফল; এবং চেকভও তাদের জগৎ কাঁদতে রাজী নন। তাঁর নাটক কর্মজীবন আরম্ভ করার এবং যেভাবেই হোক এই ফলপ্রসূ সমাজে অংশগ্রহণ করে নতুন সুলভতার জগৎ সৃষ্টি করার জন্য বক্তৃতার পূর্ণ। এই শ্রীর ব্যক্তিগতও যে শক্তি তাদের সরিয়ে দিচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে



প্রায় মিল হবে যে উপস্থাপন লিখল যোঁপাসো মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন! হাঁ, নিশ্চয়ই। চেকভ নাটক না লিখলে তাঁর সাহিত্যিক মন আরও নীচে নেমে যেতো। আমি ক্ষুদ্রতায় নিন্দা করছি না—শুধুমাত্র পূর্বকীচত করতে চাইছি। খুবই ভালো লেখক কিন্তু একই নীচের নিকট। পাঠকের কৌতূহল উদ্ভুক্ত রাখবার এবং চরিত্রগুলির জগৎ শুধুমাত্র ভালো মনোবিকল্পনাকারী অথবা নাট্যকার হলই চলে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, জগতের কষ্ট তুমি তোমার নাটকে এনেছো এবং রূপ দিয়েছ। নিশ্চয়ই

## মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৪

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাউন

তিনি কোন একটা সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন। নাট্যকার যেভাবে প্রশ্ন করেন, যে অন্তর্ভুক্ত সংবাদের মধ্যে চরিত্রদের স্থাপন করেন তাতেই তাঁর উত্তর নিহিত থাকে। উস্কিনোভ বলতে চেয়েছেন যে, তিনি উদ্ভট আবিষ্কার করতে ভালোবাসেন, কিন্তু চেকভ নিষ্ঠুর নন—আর জীবনের প্রকৃত উদ্ভটত্ব হচ্ছে নিষ্ঠুর ক্রোধ যা পেরেক বিদ্ধ করতে হবে। বরফ অম্লকম্পাভের পীড়িত তার মন জোর করে অশ্বেষণ করিয়েছে এবং উদ্ভটত্ব গ্রহণ করিয়েছে এবং এভাবেই জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছেন। উস্কিনোভের চরিত্রসৃষ্টি থেকে বিচার করলে আমার মতে চেকভ ওর চেয়ে অনেক চিত্তাশীল লেখক।

এই সব মত স্তম্ভে কল্পনা করতেও অসম্ভব হলে যে, চেকভ শাখলিন গারদের জীবনবৃত্তান্ত দেখবার এবং প্রকাশ করার জন্য স্থাপ্য বিপন্ন করেও রাশিয়া পার হয়ে গিয়েছিলেন। এটা, আমার নিকট সৌন্দর্যবোধের পরিণামক, তাঁর শিল্পজ্ঞানোচিত অমূল্যতার প্রকাশ। যদি তিনি টলটল ও ডক্টরভস্কির মহাব্যবহার প্রতি নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে নির্দেশদানই তার কারণ নয়—কারণ হচ্ছে যে, সেই নির্দেশ তাঁর নিকট অত্যন্ত গারে পড়া ও অন্তর্য মনে হয়েছে।

আপনি জানেন, ছোট ছোট রচনাতেও চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি করা যায়। আমার মনে হয় উস্কিনোভের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার মতের



গৃহকোণে মনরো

চেকভ উত্তর খুঁজেছিলেন এবং তিনি যতটা জানেন ততটা বলেছেন। তিনি যে উত্তর দেন নি তা নয় কিংবা উত্তর দেওয়া অসম্ভবও ভাবেন নি, কিন্তু সেই পরম অজ্ঞানার সামনে গিয়ে তিনি থেমে গিয়েছেন... এইকু তফাৎ এটা সাধারণ নম্রতা—উস্কিনোভের বস্তুবোধের সঙ্গে এবং বিন্দুমাত্র মিল নেই। চেকভ লিখেছেন—‘যে সচেতন জীবনের পেছনে কোন নির্দিষ্ট দর্শন নেই তা জীবন-ই নয়—একটা ভারী বোঝা—একটা হুঃখণ্ড। যে লেখক সারাজীবন ধরে ‘উত্তর’ খোঁজবার ও দেবার চেষ্টা করেন নি তিনি কখনও এ কথা লিখতে পারেন না। এই উস্কির সঙ্গে যীবা উত্তর খুঁজে পেয়েছেন অর্থাৎ যীবা এক আঘাতে সব নিয়ম সমাধান করতে চান তাঁদের প্রতি বিরক্ত মনোভাবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

পূর্বকল্পিত দর্শনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে যারা নাটক রচনা করতে চায়, তাদের প্রতি আমিও বিরক্ত বোধ করি। কিন্তু অস্তিত্বের বিশৃঙ্খলা প্রকাশ করাই যে সাহিত্যের সর্বোত্তম কাজ তা না দেখলেও অসম্ভব। যদি কোন লেখক ইয়েনস্কার মতো আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজের জ্ঞান কাজ করতে থাকে তা হলেও সে একটা আদর্শবাদ-ই অনুসরণ করছে। মানবজীবনের শেষ স্তর বিশৃঙ্খলা এই ধারণাও মানবজীবনের শেষে বিশেষ কোন অন্তর্নিহিত অর্থ নেওয়া বা আদর্শবাদেই নামাস্তর।

উস্কিনোভ বা ইল্জিত গিয়েছেন সে রকম কোন আদর্শবাদের কথা আমি বলছি না। আমি শুধু এমন একটি রূপময় চাইছি যেখানে জীবনধর্মী সাবালক তরুণ এমন একটি নাটক দেখতে পাবে, যা তাকে যুগ-সচেতন করে তুলবে, যা সর্বদিকে সব বিষয়ে অমুভূতি ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্ড্রিয়াভুতির জগতই অভিনয়—আমার ভালো লাগে না। মানুষকে কতগুলি স্নায়ুর সমষ্টি দেখে আমি স্তম্ভ হয়ে গেছি। সেটা ডাক্তারীশাস্ত্রের ব্যাপার এবং আমরা প্রায় সেই অবস্থাতেই পৌঁছেছি।

আপনি যা বলেছেন তা থেকে আমি যদি উস্কিনোভের মতবাদ বুঝে থাকি তবে তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অসম্ভবের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয় বরং সমাজ ও সাহিত্যের ভেদেখার জ্ঞান চিন্তা। তিনি সাহিত্যকে সম্পূর্ণ পৃথক—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও ভাবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে চেকভ একজন অমুভূতি সম্পন্ন আলোচকার, যার মনে দগ্ধ কল্পনা এবং আরও অনেক গুণ আছে। আমিও তাই বলি কিন্তু কল্পনাই তাঁকে বিবেকবান করেছে এবং সে কল্পনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে মানবতার পৌঁছেতে। অবশ্য মহৎ সাহিত্য্য সৃষ্টির জন্য এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় সূত্র নয়—গেটের মধ্যে এরকম নেই কিন্তু চেকভ



আমি মনরো।

করেছেন এবং আমি দেখছি এটা তাঁর লেখার চমৎকার গুণ এবং কোনভাবেই বাধা নয়।

ব্রাণ্ডন। মিসেস মিলার, আপনার সম্বন্ধে শেষ কথা যা বলা হয় তা হচ্ছে যে, আপনি সমাজ থেকে হস্তান্তরিত। আপনি কি কোন ছবিতে নিজেকে অধিকতর আমেরিকান ভেবেছেন।

মনরো। ভেবে দেখি... হ্যাঁ ‘গ্র্যাসফান্ড জাঙ্গল’... ‘সাম লাইক ইট হট’... বলতে গেলে, ‘দি প্রিন্স এণ্ড দি সো গার্ল’—এও আমি আমেরিকান ভাবে ভাবিত হয়েছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, চিত্রনাট্যমুদ্রার আমাকে বলতে হবে, আমি চটপট করে গিয়ে মিকিকে শুভ্রাঙ্গি বলে আসব। আমি স্তর লয়েল অলিভারকে বললাম, আমেরিকাবাসী হয়ে একথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব—যদি আমি ব্রিটিশদের মতো ভাবভঙ্গী না করি এবং তা হলেও সবাই আমাকে উপহাস করবে।

তিনি বললেন, না না, আপনি এটা বলুন। আমি বললাম, সোজা এই। ঠিক এই। তখন আমি বললাম, দেখুন আমি চটপট করে গিয়ে বলতে পারি না, কারণ ‘সিপ’ অর্থ কোন খাত কামড়ে নেওয়া অথবা পানীয় থেকে একচুম্বক খাওয়া—‘চুম্বক’। একটু ‘চুম্বক’—কিন্তু ‘সিপ ডাউন’ বলতে পারি না—তা হলে দেশের কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না।

ব্রাণ্ডন। তুলনায় নিজেকে প্রকৃত আমেরিকান মনে হচ্ছিল... মনরো। হ্যাঁ, অনেক আমেরিকানকে দেখেছি। যারা ইংলণ্ড থেকে ব্রিটিশ উচ্চারণ নিয়ে ফিরে আসে। কাজেই আমার মনে হল... হ্যাঁ, এই সেটে আমিই তো একমাত্র আমেরিকান—আমাকেই খেয়াল রাখতে হবে।

মিলার। সমস্ত চরিত্রগুলিই শ্রেণী হিসাবে এখানে অপরিচিত এবং তারা অভিজাত হাবভাব ও স্ফূর্ত কথাবার্তার সাবান ফেনার ভেসে বেড়ায়...

ব্রাণ্ডন। যখন আপনি অলিভারের বিপরীতে অভিনয় করছিলেন তখন কি তা এখানকার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক মনে হয়েছিল।

মনরো। হ্যাঁ। আমি ঠকে চাই এবং শুধু ঠকেই।

ব্রাণ্ডন। কেন?

মনরো। কারণ, আমি স্তর লয়েল ও আমাকে একসঙ্গে দেখতে চাই। এক্সেপ্টদেরও একথা বলে দিয়েছি। আমি বলছি, আর অন্য কোনভাবেই নিজেকে দেখতে চাই না।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি ক্ল্যাসিকাল স্কুলের অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য উৎসুক।

মনরো। না বর্তমানকালে বসে ক্ল্যাসিক ট্রেনিং-এর জন্য ব্যস্ত নই। আমি ‘ভেবেছিলাম—মিলিতভাবে এটা ভালো—একটু বেথান্সা মজাদার এবং ঠিক যেন জীবনের মতো।

ব্রাণ্ডন। ঐ লেডি-চ্যাটারলীরা লাভারের উপরে রকম আর কি।

মনরো। বেশ। আমার মনে হয় নি।

ব্রাণ্ডন। বেশ। আমি ভাবছিলাম যে আপনি হয় তো ঐ বাক্য বলে উচ্চারণে স্তম্ভ—সেখানের একজন অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখতে চেয়েছিলেন কি রকম লাগে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা আপনার মনোগত ইচ্ছা ছিল না...

মনরো। না। আমি কখনও কি রকম লাগে দেখবার জন্মে অভিনয় করি না—তা কোন চরিত্রই হোক কি কোন অভিনেতার সঙ্গেই হোক। জীবনের ক্ষেত্রেই কোনটি কি রকম তা দেখতে পাওয়া যায়। আর, কাজ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তরকম ব্যাপার।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি অভিনেতাদের শিক্ষার জন্ম ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল থিয়েটার খুবই চমৎকার, কিন্তু কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও দরকার। অভিনেতার পথে সে শিক্ষাও শুভকর—ইংলণ্ডে যার অভাব আছে বলে আমার স্বামী বলেন। তিনি অভিনয়ের জন্ম আমেরিকানদের খুঁজছেন না, অথবা আমেরিকান হতে চাইছেন না—তিনি সাধারণ, প্রতিদিনের লোক খুঁজছেন। কিন্তু অভিনেতার। অল্প শ্রেণীর হয়ে গেছে—তা তারা জীবনের যে শ্রেণী থেকেই আনুক না কেন—এবং তা তাদের অভিনয়কে প্রভাবিত করে।

কিন্তু, অভিনেতার সঙ্গে কাজ করা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যাপার এবং আমি অনেক কিছু শিখেছি মানে—পূর্ণবেশ্য করে।

ব্রাণ্ডন। কি ধরণের জিনিস?

মনরো। জানি না—সে সব আমার মনের মধ্যে রয়েছে—আমি হুপিং যে আমি সে-সব প্রকাশ করতে পারছি না—কিন্তু নৃতন একটা কিছু জন্ম হয়েছে।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি বুটশ অভিনেতাদের আমেরিকানদের চেয়ে বেশি রীতিসম্পন্ন মনে করেন?

মনরো। আমার প্রিয় অভিনেতা মার্লন ব্রাণ্ডো। আমার মতে তিনি যেকোন রীতিতে অভিনয় করতে পারেন। কিন্তু, বর্তমানে তিনি ঠিক পথে যাচ্ছেন না।

ব্রাণ্ডন। এট কি আপনার অভিনেত্রী মনের অথবা নারীমনের প্রতিক্রিয়া?

মনরো। হুঁটোই। যদিও, বেশিমানার অভিনেত্রীর।

ব্রাণ্ডন। অনেক সমালোচক বলেন যে 'রাগী যুবক দল' আমেরিকা দ্বারা প্রভাবিত।

মিলার। আমার মতে তাদের লেখার আমেরিকার সুর আছে। তাই বলে একথা বলতে চাইছি না যে, লুক ব্যাক ইন এ্যান্ডার-এর মতো বই আমেরিকার প্রভাব ছাড়া লেখা যেতো না—কিন্তু ঐ সব সাক্ষিত্যে এমন একটা সহজ স্বজ্ঞাত। এমন কি বুকবুলা ভাব জোর করে চাপানো আছে যার সুর আমেরিকান—এবং যা ইংলণ্ডের সঙ্গে মেলে না—কারণ তা তির্যক ও সুদূর—অস্পষ্ট গত দুই দশকের ধারাবাহিকতার তাই দেখছি। এই লেখাগুলি আমার অত্যন্ত বেশি যত্নের মনে হয়। আমাদের দিক থেকে, এটা মার্ক টোয়েন্টের সময় থেকে খুবই সাধারণ পর্যায়ে নেমে গিয়েছে এবং এখন সে ভাবেই পুনরাবিষ্কার। সেই যে তিনি একেছেন সাধারণ লোকের ভুললোকদের জন্ম করে দিচ্ছে এবং এট ভাবেই চিত্রাচিত্রিত শ্রেণী বিভাগ নষ্ট করে দিচ্ছেন—তার কথা বলছি। এ যেন গ্রামের ছেলের রাজা আর্বারের কোর্টের বিরুদ্ধে জরালভ।

আমেরিকার নাটকগুলি খুব বেশিমানার ঘটনাপ্রধান তুলনায় চিন্তাশীলতা অপেক্ষাকৃত কম। বা ঘটনায় দেখানো যায় না এমন কোন বিষয় এদের না। খুব কমই নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করে।

বাস্তব লোকদের মতো এরাও ভাণ করে যেন কি করছে তা জানে না।

এটা কোন-কিছুর বিষয় হতে চার না নিজেই সেই বিষয় চায়। কিন্তু যে নাটকে হুঁটোই একসঙ্গে পাওয়া যায় তারই মান উঠতে ওঠে।

এটা করা কঠিন, কিন্তু বর্তমান সময়ে আমার মতে এই সবচেয়ে ভালো।

আমি জানি না জন ওয়েন, কিসলী এমস্, জন অসবোর্নের মতো লেখক এসব সঙ্গে সচনত কি না—তাদের হবার কোন কারণও নেই কিন্তু তাদের সব সৃষ্টিতে এরই প্রতিধ্বনি।

ব্রাণ্ডন। আপনি তো ধর্ম্মলোক নাটক স্তনতে অভ্যস্ত নন—তা হলে গ্রেহাম গ্রীন কি রকম লাগে?

মিলার। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাট্যকার হিসেবে তাঁর কাজ একটু কমুলা ঘেঁষা মনে হয়। তাঁর দর্শন শাস্ত্রামুখ্য ধাঁধা প্রকৃত কিন্তু তা যেন একটা বাজে স্বীকৃতিতে শেষ হয়েছে। তিনি ধর্ম্মাস্ত্রের যে দুঃখগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করেন সেগুলি পড়ে আমার একপ্রকার নাটকের কথা মনে হয়েছে বাইরের দিক থেকে হয় তো সম্পর্ক নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আছে; এ হচ্ছে ত্রিশ দশকের বামপন্থীদের ধর্ম্মাস্ত্রের নাটক। তিনি

হুঁটোই যন্ত্রের মধ্যে আটকে গেছেন। একমিকে তাঁকে এক সমান স্তরে লেখা রাখতে হয়েছে কারণ তাঁর রচনারীতি ও বর্তমান জীবনযাত্রার মান এই স্তরের। অন্তরিকৈ তাঁকে আধ্যাত্মিক সমাধান করতে হয়েছে—যার সঙ্গে নাটকের গতিই কোন সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর বাস্তববাদ থেকে পালিয়ে যেতেন ইঙ্গিত সত্য বলে প্রমাণ করা কঠিন। তাই, যতক্ষণ না তিনি তাঁর মতে সর্বপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ—নাফির অজ্ঞ এক অমুভূতিও ভগ্নাত প্রবেশ করা—না পৌছন হতক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ভালোই লাগে। উদাহরণ স্বরূপ, 'পাটিন সেড'

নাটকটির কথা মনে হচ্ছে: নাট্যকাহন্যগী তোমাকে আগে থেকেই একটা জগতের অস্তিত্ব ভেবে নিতে হবে। তিনি সাধারণ মনস্তত্ত্ব নিয়ে লিখছেন—কিন্তু আমার মতে সাধারণ মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক বিষয় চালানো যায় না। তাঁর এই বাস্তবপ্রধান আকার কি করে এই আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব। এটা করতে চলে প্রথম থেকেই একটা প্রেরণাময় জগৎ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তা হলে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। হয় তো তা ব্যাখ্যা করতে পারি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু তিনি যে রকম মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন কর্তব্য বা ধারাবাহিক মনস্তত্ত্ব তাতে এরকম প্রেরণাময় পরিণতি থাপ খায় না। আমি তাঁর বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি—এমন কিস্তীর সন্তটকে। কিন্তু তিনি যেন শেষের দিকে একটা জ্যামিতিক অঙ্ক করেছেন। সবাই এভাবে অমুভব করে না। তারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভ্রমক ভাবে, কিন্তু এমন হতে পারে—যে তাঁর অভিজ্ঞতাকে দিনের আলোর আলোকিত পৃথিবীর দিক থেকে দেখতে হবে কারণ গ্রীনের দৃষ্টিভঙ্গী উজ্জ্বল দিনের।

[আগামী সংখ্যায় চলবে] অমুভাবিকা—রাখু জৌহিক



মেরিলিন—পিছন থেকে

## চাকলতা

কবিসার্থভৌম রবীন্দ্রনাথের সুভীত জীবনচেতনা ও প্রথম ছন্দসমৃদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর অমর লেখনীনিঃসৃত যে ছোটগল্পগুলির মধ্যে—নষ্টনীড় তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অঙ্গতম। ১৩০৮ সালে নষ্টনীড় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেদিন রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ। চাক, অমল ও ভূপতি—জীবনের এই তিনটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে জীবনপিপাসু স্রষ্টা তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির ভাণ্ডার করে গেলেন আরও সমৃদ্ধ। গভীর হৃদয়চেতনা এবং সুন্দর জীবনবোধ থেকে জাত এই চরিত্র তিনটির ভিতর দিয়ে কবি জীবনের চাওরা-পাওয়ার এক অপূর্ব হিসাব মিলিয়েছেন।

এই চাওরা-পাওয়ার বন্দনা এবং বেদনার মধ্যে দিয়ে জীবনের যে বিচিত্র আলোখা ফুটে ওঠে তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে কবিলেখনীতে। শুধু সাহিত্যের বা ব্যাকরণের ভাবাই নয়, এই জীবনচিত্রের পরম প্রকাশে কবি আশ্রয় নিয়েছেন হৃদয়ের ভাবার, সেই কারণেই তাঁর রচনা নিত্য-নতুন, চিরজীবন্ত।

নষ্টনীড়ের চলচ্চিত্রায়ন ঘটেছে দিকপাল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়। সত্যজিৎ রায় ইতঃপূর্বে যে ছবিগুলি উপহার দিয়েছেন, এই ছবিটি শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষে তাদের প্রত্যেকটিকে গেছে



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—ছায়াছবির বাইরে

অতিক্রম করে। চলচ্চিত্রে নষ্টনীড়ের নাম পরিবর্তিত করে নারিকার নামানুসারে তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘চাকলতা’। অমর সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে দক্ষ পরিচালকের কুশলী হাতের স্পর্শে এই কাহিনীর সার্থক রূপান্তর ঘটেছে রূপালী পর্গায়। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের মূল সুর যে উচ্চগ্রামে বাঁধা ছায়াছবিতে সে সুর কোথাও বিলুপ্ত না হয়েই ব্যাহত হয় নি, কাহিনী পরিবেশনে পরিচালকের আশাতীত দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ যে রসসঞ্চার করে গেছেন তাঁর কাহিনীতে সেই রস যথাযথভাবে সঞ্চারিত হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পকর্মে। কাহিনী পরিচর্চায়, বিভ্রাস্তে এবং সর্বোপরি প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সত্যজিৎ রায় এক যুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিতে রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের গানের স্মৃতি-প্রয়োগ ছবিটির মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। ছবিটির শিল্পকর্ম প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়শ্রেণি প্রথমেই উল্লেখ করি শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের নাম। প্রথ্যাত অভিনেতার স্বনামধন্য পুত্র তিনি। এ বাৎসরিক চিত্রে এবং নাটকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, ‘চাকলতা’র ভূপতির বলিষ্ঠগভীর চরিত্রটি রূপায়ণের ভার পড়ল তাঁর উপর। বলা বাহুল্য সেই দারিদ্র্য তিনি সগৌরবে পালন করে এক অভিনয়দায়ী নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চাকলতা যেমনই জীবন্ত তেমনই বিষ্ময়কর। চরিত্রটির ভাব ভাবা তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘অমল’ যথেষ্ট সাধুবাদের দাবী রাখে। তাঁর অভিনয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শবাহী। গভীর উপলব্ধির মধ্যে চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, দর্শকসমাজে এই তিন শিল্পীর অনবদ্য অভিনয় যে আবেদন জাগিয়েছে তার প্রভাব সহজে অতিক্রম্য নয়।

## বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

বাঙাল্যভাবার জীবনীচিত্র নিমাণে বীরা প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন এবং যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন প্রবীণ চিত্রকার মধু বসুর আসন তাঁদের পুরোভাগে। তাঁর নবতম চিত্রাবদান ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও এ যুগের অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ছবিটিতে স্বামীজীর নররূপ পরিগ্রহ থেকে তাঁর বিশ্ববিজয়ের প্রস্তুতি পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের অঙ্গতম প্রণম্য রূপকার। বিদেশের দরবারে ভারতের শাস্ত্র মহিমার প্রচারে এবং বিদেশী সমাজে ভারত-চেতনার জন্মদানে তাঁর অবদানও অনন্ত। পৌরুষের প্রতিমূর্তি এই পুষ্পপুঙ্খের দিব্যজীবনী রূপায়ণে বতদূর নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন এই ছবিটিতে তার ‘পরিপূর্ণ’ প্রকাশ ঘটেছে। কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে অক্ষুণ্ণ পরিভূতি দেওয়ার উপকরণ বিতমান। কাহিনী গ্রন্থনায়, ব্যক্তনায়, চরিত্র পরিচর্চায়, ঘটনাবিস্তারে তথা সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতার ছবিটি সবিশেষ সাধুবাদের দাবী রাখে। একাবিক ঐতিহাসিক চরিত্র এই ছবিতে সমাধিষ্ট হয়েছে, তাদের পরিচর্চা ও বিশ্লেষণও হয়েছে যথাযথ। বিবেকানন্দের পৌরুষপুং, ব্যক্তিবদান, রসগভীর চরিত্রটি সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে। এই জাতীয় ছবি শুধু নিছক আনন্দ বিতরণই করেনা, আজকের পথদারী দিকজ্ঞপ্তি



ও সি গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'কিছু গোলাপের গলি'র সৃষ্টি-এ নায়িকা স্মিতা দেবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন সহকারী পরিচালক শশাঙ্ক সোম।

স্বপ্নোন্মুখ জাতির সামনে তার অতীতের মহিমার ও ঐতিহ্যের এক মহান আলোকে তুলে ধরে তাকে নতুন করে জাগার মুঠে মুঠে প্রেরণা জোগায়। সেই দিক দিয়ে এই ছবিটিও এক বিশেষ স্বীকৃতির অধিকারী।

ছবিটির স্ফূরণ যেমনই বিষয়োপযোগী তেমনই মনোরম আবার তেমনই সমরোপযোগী বসিষ্ঠ। স্ফূরণচর্চনার কৃতিত্ব সহ-পরিচালক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। সুরকার অনিল বাগচী অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীমতী ইতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাম ভূমিকার আবির্ভূত হয়েছেন অনরেশ দাস। স্বামীজীর ভূমিকায় এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব নয়। এই ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা তাঁর অধিকারগত হয়েছে। এই ছবিটিতে তাঁর অভিনয় আরও উন্নত, আরও বলিষ্ঠ, আরও প্রাণবন্ত। ভগবান রামকৃষ্ণের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবনেশ্বরী দেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় মর্যাদাপূর্ণ।

অজ্ঞাত চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত মিহির ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, প্রেমাক্ত বসু, গঙ্গাপার বসু, চন্দ্রশেখর দে, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জীবন ঘোষ, শ্রীপতি চৌধুরী, গোপাল মজুমদার, পতাকী মুখোপাধ্যায়, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, সুরভ সেন, শ্রীতি মজুমদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা দেবী, শীলা পাল।

সামগ্রিকভাবে ছবিটি দর্শকচক্ষে এক ভক্তি ও শৌর্যসম্বিত মিশ্র অমৃতের সৃষ্টি করে এবং তাঁর আবেদন গভীরভাবে দর্শকের হৃদয়ে রেখাপাত করে।

### শৌভনিক নিবেদিত 'বাঁসীর রাণী'

গত শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে মহীয়সী তরুণীর আবির্ভাব দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ অধ্যায় যুক্ত করে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ত্যাগোজ্জ্বল, মহিমা সম্বিত, উৎসর্গিত জীবনকাহিনী আজকের দিনের দর্শক সমক্ষে নাট্যাকারে উপস্থাপিত করে প্রভূত অভিনয়শিল্পের অধিকারী হলেন বিখ্যাত নাট্যসংস্থা শৌভনিক। শতাধিক বৎসর পূর্বে লক্ষ্মীবাঈয়ের পুণ্য আবির্ভাব, তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা—‘মেরে বাঙ্গী নেহি হুকে’ হৃদয় বিদেহী শাসকগোষ্ঠীর আরাধনাক্রান্তি বৃষ্টিয়ে দিয়ে তাদের নীতিমতে তন্তু চকিত করে তুলেছিল। জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আত্মাহুতি ভাবীকালের অসংখ্য



শৌভনিক নিবেদিত 'বাঁসী-কী-রাণী'র একটি আবেগসমৃদ্ধ দৃশ্য  
অশোক মিত্র ও নিবেদিতা দাস



## সংবাদ বিচিত্রা

মুক্তিসাধকের মনে যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জ্বলিয়েছে, তার তুলনা মেলে না। আজকের এই জাতীয় যৌর যুদ্ধোৎসবের দিনে এই সব পবিত্র জীবনকাহিনীর প্রচার যত ঘটে ততই দেশের মঙ্গল। আজকের পঞ্চাশত মানুষকে লক্ষ্মীবাঈয়ের মত এই পুণ্যভ্রাতা ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নারীদের জীবন নতুন পথের দিক নির্দেশ দেবে, অন্ধকার চলার পথ অতিক্রম করার আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবে, নতুন আদর্শে উদ্বোধিত করবে।

তিন অঙ্কে এবং একটি দৃশ্যে নাটকটি পরিবেশিত। নিবেদিতা দাস রচিত এই নাটকটির মধ্যে যুগপৎ বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। নাটকটির গতি কাব্যও শিথিল নয়। সর্বপ্রকার জড়তা, অস্পষ্টতা এবং কৃত্রিমতা থেকে নাটকটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। নাটকটির আবেদন দর্শকচিত্ত স্পর্শ করার যোগ্যতা বহন করে। নাটকটি পরিচালনা, প্রযোজনৈপুণ্য, উপস্থাপন কুশলতা প্রাণেশ্বরের অধিকারী। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। নাম ভূমিকার নিবেদিতা দাসের অভিনয় অনবদ্য। গভীর উপলব্ধির দ্বারা এই তেজস্বিনীর চরিত্রটি সর্বপ্রকারের করে ফুটিয়ে তুলেছেন। অজ্ঞাত ভূমিকায় কৃষ্ণ কুণ্ড, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, গোপেন মুখোপাধ্যায়, সুমিত্র মিত্র, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, নিম্ম ভৌমিক, অলকা পাল প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দের সম্মিলিত অভিনয়কৃতিত্বও নাটকটির সাংকততার ক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী।

১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী ছবিগুলি সবচেয়ে বেশল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এদের বিচার ও সিদ্ধান্ত অনুসারে মহানগর, নির্জন সৈকতে, সাত পাকে বাঁধা, পলাতক, উত্তরফাস্তনী, নিশীথে এবং ছায়ামূর্তি 'শ্রেষ্ঠ' বাঙলা ছবি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবিগুলির মধ্যে বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, সঙ্গীত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন যথাক্রমে তপন সিংহ (নির্জন সৈকতে), অম্বপকুমার (পলাতক), অরুণা সেন (উত্তর ফাস্তনী), বিকাশ রায় (উত্তর ফাস্তনী), ক্রমা গুহাচক্রবর্তী (পলাতক), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (পলাতক)।

বাঙলা ছবির দর্শকসমাজে বর্তমানে যে সংবাদটি যথেষ্ট অনিশ্চয় সঞ্চারের ক্ষমতা রাখে, সেটি বৈজয়ন্তীমালার বাঙলা চিত্রে অবতরণ। প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা শ্রীমদসালের সঙ্গে অতুল জনপ্রিয়তার অধিকারিণী বিশিষ্ট শিল্পী বৈজয়ন্তীমালা এই সম্পর্কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। বাঙলা ছবিতে ইতিপূর্বে তিনি কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নি। শ্রীমদসালের অজ্ঞাতম আগামী অবদানে তাঁর বাঙলা ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটবে। চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে, এই ছবির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণরূপে না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা



সুপ্রিয়া জোহুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : কথোপকথনরত





মাধী মুখোপাধ্যায়—ছাত্রছাত্রীর বাইরে

অন্য কোন বাঙলা ছবিতে অভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না।

বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে রাজ্যসরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটি উক্ত বিষয়ে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে জানা গেছে যে, তাঁদের মতে বাঙলা চলচ্চিত্রের অবস্থা শোচনীয়। আর্থিক দুর্বলতাই এর প্রধান কারণ। এই বিরাট শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কুশলী কর্মীদের পারিশ্রমিক তিনশ' টাকারও কম, তত্পরি তাঁদের কর্মের কোন স্বাক্ষরও থাকে না। অগণিত কলাকুশলীর জীবিকা এই ছাত্রাচিত্রশিল্পে অর্ধ বিনিয়োগে প্রয়োজকদের তরফ থেকেও আশাত্মক উপসাহ পরিচালিত হয় না। প্রকাশিত রিপোর্টটি চিত্রপ্রমিক-মহলে যে এক সুগভীর হতাশার সঞ্চার করবে, এ বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। চলচ্চিত্র সংস্কৃতির অগ্রতম অঙ্গ। ছাত্রাছাত্রী গণ আমোদ-প্রমোদেরই অগ্রতম উপকরণ নয়, লোকশিক্ষারও অগ্রতম বাহন। তাকে বিপন্ন করার জন্য দরবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন জাতীয় কর্তব্যেরই এক নামান্তর। এ বিষয়ে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আজকের দিনের চিত্রজগতে শ্রী আর. ডি. বনসাল এক সুপরিচিত নাম। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রের প্রযোজক হিসাবে ইনি খ্যেত

প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। বাঙলা ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার প্রথম আবির্ভাব ঘটানো ছাড়াও তাঁকে কেন্দ্র করে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল অর্থব্যয়ে তিনি একটি ভোক্তাপুরী চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এই ছবিটিতে বাঙলা ও বোম্বাই—উভয় রাজ্যেরই তারকাদের সমাবেশ ঘটবে। ছবিটির নামকরণ হয়েছে—মোরে মন মিটুয়া।

কোন নাটকের বা ছাত্রাছাত্রীর অন্তর্গত কাহিনী এমন—এক সহ্য ঘটনা। বাস্তব হলো রূপ বাস্তব। এ কাহিনীতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। মায়ের বিরুদ্ধে মেয়ে অভিযোগ আজ আদালত প্রাপ্ত অর্থাৎ পৌছেছে। কাঠগড়া পর্যটকই এখনও বাকি। বিগতযুগের সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শোভনা সমর্থ (৪২) এর বিরুদ্ধে সই জাল করার অভিযোগ এনেছেন তাঁরই কন্যা বর্তমানকালের অগ্রতম বিশিষ্টা অভিনেত্রী নুতন সমর্থ (২১)। অভিযোগও একটি নয়, একাধিক। তন্মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা ঈকি দেওয়ার দায়ও অন্তর্ভুক্ত নয়। বিচিত্র এই জগৎ আর বিচিত্র সেই বস্তুর্তি—যাকে ছাড়া জীবনে এক যুগুত চলেও না, আবার বার জন্মেই এত অনর্থ। মাতা-পুত্রের সুপরিচিত স্নেহবন্ধনও বার কাছ তৃণবৎ ভেঙ্গে যায়।

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর বহুকাল পূর্বেই একটি



শমিতা ঠাকুর : খেলার মাঠে নিঃসঙ্গ দর্শক

রাষ্ট্রপতির নোয়াপদক প্রাপ্ত অসমীয়া, মহারাষ্ট্ৰীয় ও তামিল ভাষায় গৃহীত শ্ৰেষ্ঠ ফিচারফিল্ম যথাক্রমে 'মণিরাম দেওয়ান', 'হা মাজা মর্গ একালা' ও 'নম্ম ওক পেন' ছবি তিনিটির এক-একটি দৃশ্য



জাতীয় সংগ্ৰহশালা গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু জাতীয় বিপ্লবের জন্তু শ্ৰেষ্ঠাৰ্হাট মূলতৰী রাখতে বাধ্য হতে হয়। বৰ্তমানে পরিকল্পনাটি রূপায়ণের ব্যাপারে সরকারী দপ্তর সচেষ্ট হয়েছেন বলে জানা গেল। পুণ্যর ফিল্ম ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াৰ এই সংগ্ৰহশালা সংগঠিত হতে চলেছে। এই সংবাদ চিত্ৰমোদীদেৱ দরবারে যথেষ্ট আনন্দ বহন করবে এবং আমবাও পরিকল্পনাটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা কৰি।

বৰ্ণবৈষম্য অবসানের সাম্প্ৰতিক ইতিহাসেৰ উজ্জ্বলতম নাম মহান রাষ্ট্রনাযক কেনেডিৰ আকস্মিক এবং কৰুণ মৃত্যুৰ বছৰ ১৯৬৩-ৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ অঙ্কৰ লাভ কৰলেন নিগ্ৰো অভিনেতা সিডনী পয়টার (৩৭)। অঙ্কৰেৰ ৩৬ বছৰেৰ ইতিহাসেও এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কাৰণ প্ৰথম এই একজন নিগ্ৰো শিল্পী এই সন্মানে বিভূষিত হলেন। নিগ্ৰোদেৱ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বে মহান সাধনাৰ প্ৰেসিডেণ্ট কেনেডি আত্মহত্যাৰ্গ কৰে গেলেন, এই ঘটনা সেই সাধনাৰই অঙ্গতম ফলস্বৰূপ বলা যেতে পারে। এই ঘটনা লেচ্চিত্ৰৰাজ্যেৰ ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ অধ্যায়েৰ সূচনা কৰল।

১৯৬৩ সালেৰ শ্ৰেষ্ঠ কমেডি অভিনেত্ৰী হিসাবে এল্লিবিটাৰ ম্যাগাজিন লয়েল এ্যাণ্ডৱাৰ্ড পেনেল সাতাশ বছৰ বয়স্কা অভিনেত্ৰী জেন ফীডা। এল্লিবিটাৰ ম্যাগাজিনেৰ প্ৰকাশক জে. ইমামুয়েলেৰ দ্বাৰা এই পুৰস্কাৰটি প্ৰতি বছৰ প্ৰদত্ত হয়ে থাকে। চিত্ৰমোদীদেৱ অনেকেৰই জ্ঞাত আছে যে, কুমাৰী ফীডা বিশিষ্ট চিত্ৰতাৰকা হেনৰি ফীডাৰ (৫১) কণ্ঠ।

নাইৰোব থেকে প্ৰকাশ মাইল দূৰবৰ্তী অঞ্চলে 'মিস্টাৰ মোসে'ৰ চিত্ৰগ্ৰহণকালে গ্যাস সিলিণ্ডাৰগুলিৰ এক ভয়াবহ বিস্ফোৰণ ঘটে যায়। গত এই এপ্ৰিল এক অগ্নিকাণ্ডেৰ দুঃসংঘৰ্ষেৰ সময়ে এই ছবিটনা অস্থগ্ঠিত হয়। এই ছবিটনাৰ অঙ্গতম শিকাৰ চিত্ৰতাৰকা রবার্ট মিচাম (৪৭) এবং কাৰ্লস বেকাৰ (৬৩) নিশ্চিত মৃত্যুৰ কবল থেকে ঈশ্বৰেৰ অসীম অনুগ্ৰহে কোনক্রমে রক্ষা পান।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

### আরোহী

প্ৰখ্যাত কথাশিল্পী বনকুলেৰ দুটি গল্প অবলম্বনে বিখ্যাত পৰিচালক তপন সিংহেৰ পৰিচালনাৰ 'আরোহী' ছবিটি রূপায়িত হচ্ছে। সুরযোজনা কৰেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগত অঙ্কৰ গঙ্গোপাধ্যায়, চায়া দেবী, শিপ্ৰা মিত্ৰ প্ৰভৃতি শিল্পিবৰ্গ বিভিন্ন চৰিত্ৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰবেন।

### একটুকু বাসা

তৰুণ পৰিচালক তৰুণ মজুমদাৰেৰ আগামী অবদান 'একটুকু বাসা'। শক্তিমান সাহিত্যকাৰ মনোজ বসুৰ লেখনী এৰ গল্পাংশেৰ জন্মদাতা। সৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায়, অম্বপকুমাৰ, ববি বোষ ও সন্ধ্যা রায় প্ৰমুখ শিল্পীদেৱ এই ছবিৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰেৰে রূপায়ন কৰতে দেখা যাবে।



## বিভাস

সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'বিভাস' ছবিটি অল্পকাল পূর্বে কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। সম্প্রতি সেন বালে এ্যাণ্ড এ্যাসোসিয়েটস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্মী-শিল্পীরা 'বিভাস'-এর নাট্যরূপ নিবেদন করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকুমার ঘোষ, রথীন দাশগুপ্ত, বিমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যানু দাশগুপ্ত, প্রবীর ভট্টাচার্য, দিলীপ সেনগুপ্ত, বরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন বসু, তাপসকান্তি লাহিড়ী, অজয় দাশগুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র দে, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, বেব সাহা প্রভৃতি।

মধু বসু পরিচালিত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের রূপসজ্জায় যথাক্রমে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেশ দাস

পরশমল দীপটীস প্রযোজিত 'অন্তরাল' ছবিটির চিত্রায়ন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিকাশ রায়, তরুণকুমার, অমৃণকুমার, দিলীপ রায়, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দীপিকা দাস প্রমুখ তারকার দল।

## সৌখীন সমাচার

### চরিত্রহীন

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'কে মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন পি এ্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হন নবোজ রায়, উপেন রায়, প্রভাস চক্রবর্তী, অচিন্ত্য বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায়, রাণু রায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, শাশ্বতী রায়, নমিতা দত্ত প্রভৃতি। নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন সায়ু চট্টোপাধ্যায়।

### গণ্ডার

ইউজ' ইউনেস্কোর 'ল রাইনোসারাসে' বিদগ্ধ নাট্যকার মহারাজকুমার সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দ্বারা বঙ্গীকৃত হয়ে 'গণ্ডার' নামে অভিনীত হ'ল বঙ্গীয় নাট্য সংসদের সঙ্গ্রহলের দ্বারা। চরিত্রগুলির রূপদান করলেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আদিৎ কুণ্ডু, দিলীপ রায়, চিত্ত পোষাণী, রমেন লাহিড়ী, অমৃণাক সেন, বোড়লী মজুমদার, প্রবীণ গুপ্ত, মিনতি ঘোষ, ইন্ চট্টোপাধ্যায়, মায়ী রায় প্রভৃতি।

হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'সন্ধ্যারোপের শিখা' চিত্রের প্রধান ভূমিকায় সূচিত্রা সেন



[বর্তমান সংখ্যার রূপটি বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বহুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভট্টাচার্য, শান্তিময় সান্যাল ও বীরেন ধর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।]



বাঙলা দেশের জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের মধ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী একটি বিশেষ উল্লেখনীয় নাম। বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত অভিনয়ে দর্শক সমাজে তিনি একটি বিশেষ আসন অর্জনে সমর্থ হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের চিত্রজগত থেকেও তাঁর আহ্বান এসেছে। 'আশ কী পরছাইয়া' চিত্রের একটি প্রেমমধুর দৃশ্যে ধর্মেশ্বর সঙ্গে তাঁকে দেখা যাচ্ছে

# সম্মাদকীয়

## স্বাগত বববর্ষ

**নিদিষ্ট** নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত কাল পূরণ করিয়া ১৩৭০ সাল বিদায় লইল। কিন্তু যে ইতিহাস রাখিয়া গেল তাহার সহিত জাতির জীবনের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় জীবনের অসংখ্য আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ, বাত, প্রতিগাত, নব নব কীর্তি, বধা, দুঃখোণের সাক্ষী হইয়া ইতিহাসে অজাঙ্ঘা বিগত সাঙ্গত্বের মত ১৩৭০ও একটি অক্ষর অমরত্বের আসন অধিষ্ঠিত হইল।

১৩৭১ সাল তাহার আগমনবার্তা ঘোষিত করিয়াছে। আমরা এই নবীন বর্ষকে অন্তর হইতে স্বাগত জানাই। নববর্ষ শুধু বাঙালির নয় সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর নিকট একটি বহু-প্রতীকিত, আনন্দময়, জাতীয় উৎসবের দিন। ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই যথেষ্ট পরিভ্রমতার সহিত উদ্‌ঘাষিত হইয়া থাকে। ইহার আবাহনে দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া যায়, বিভেদ-বিদ্বেষ ক্ষণকালের জন্য মাছুরের অন্তর হইতে নির্বাসিত হয় এবং মানুষের মন ভরিয়া উঠে এক অনির্বচনীয় মিলনানন্দের রসঘন অমৃতভূতিতে। শত্রে-মিত্র নিবিশেষে সেদিন এক জাগতিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রাতির বন্ধনে পরস্পর পরস্পরের নিকট ধরা দেয়।

বাঙলা দেশেও পুরাতনকাল হইতে বর্ষারত্ব এক বিশেষ উৎসবের দিন বলিয়া পরিগণিত। বাঙলার ঘরে ঘরে নববর্ষোৎসব তাহার 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'-এরই অঙ্গতম। এইদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে যে প্রাণের স্পন্দন আভাসিত হয় তাহার তুলনা মেলা ভার। যে অদ্ভুতপূর্ণ প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় পাওরা যায় তাহা অতুলনীয় বলিলেই চলে। নগরে, গ্রামে, ঘোবালয়ে, প্রাসাদে, পূর্বনূর, সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই তাহার আবাহনে ভরপুর, তাহার জয়ধ্বনিতে মুগ্ধ।

পরলো বৈশাখের নবাবরণাগোস্তাসিত পূণ্যপ্রভাতে তাহার নিকট আমরা নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করি। বর্ষদেবতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া আমরা লাভ করি জড়তা, দীনতা, সশয়ের অগভীর অন্ধকূপ হইতে মুক্তির পূণ্যমন্ত্র; আলোর, সত্যের, শক্তির পবিত্র মন্ড্রে দীক্ষিত হইয়া জীবনের সীমাহীন চলার পথে পদাধিপতির শক্তিসংকর করি। বৃদ্ধ-রবীন্দ্রের আবির্ভাবজন্য বৈশাখ সর্বপ্রকার নিজীবতার, স্থবিরতার এবং দুর্বলতার অবসানের এক অমায়িক আশ্বাস। কখনও সে শান্ত তাপস, সৌম্য সন্ন্যাসী, কখনও সে রক্তভৈরব, ভয়ালজীবণ। কখনও সে বৈরাগ্যের মন্ড্রে শান্তিপাঠে তপোমগ্ন, কখনও তাহার প্রলম্বপিনাকে সমগ্র জগৎ ভীত, ত্রস্ত, প্রকম্পিত। তাহার প্রথম উদ্ভাণের অন্তিতে জগতের বত হ্রস্বতা, নিজীবতা ভস্মীভূত হইয়া বাইতেছে অজ্ঞদিকে শূণ্য, শুষ্ক, ধূসর পৃথিবীর উপর তাহার আবির্ভাব নূতন সৃষ্টির ইয়ারং গড়িয়া তুলিতেছে। তাহার আবির্ভাবে সমগ্র ধরণী হইতে মুছিয়া যায় জরা, যুষ্টিয়া যায় রানি, পৃথিবী শুভিষ্মক হয় পূণ্যস্রোতে। বৈশাখ নূতন জীবনের বার্তাবহ। নব নব স্বপ্ন, নব নব প্রতিক্রিয়া, নব

নব সম্ভাবনার স্বর্ণরাজ্যের শক্তিমান দূত। তাই প্রথম উবার প্রণবধ্বনির মতই বাঙালীর মর্মস্পর্ক হইতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়— 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।'

নিয়তির বিধানে বাঙালীর ভাগ্যের গতিপথ আজ পরিবর্তিত হইয়াছে। ভাগ্যের যে আকাশ একদিন ছিল নীলে নীলে ঘননীল, অক্ষরন্ত আলোয় ভরপুর, অসংখ্য তারার সমাকীর্ণ সে আকাশে আজ ঘোর কৃষ্ণ মেঘের মিছিল, কটিকা-বন্ধার দূরন্ত গজন, বজ্রের হুকার আর বিদ্যুত্তের বিসিক। বাঙালীর ঘরে ঘরে আজ বুকভরা হাহাকার। বাঙলার নর-নারী আজ যেন বেরনার প্রতিমূর্তি। অভাবে, অনটনে, বেকারিতে, বঞ্চনায় বাঙালীর প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। পূর্ববঙ্গের নরপশুদের হস্তে চরমতম কুৎসিত পাশব লাঞ্ছনার বাঙালী আজ এক সর্বনাশা ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন। অন্ন, বস্ত্র, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, বঞ্চা, প্রাণবন, বিপর্যয়, মহামারী আবার চীন ও পাকিস্তানের যুগ্ম, শত্রুতা, সীমান্ত লঙ্ঘনের আশংকা, দেশের অভ্যন্তরে সমাজ-বিরাগী দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের বিবেকবন্ত্রিত কার্যকলাপ সমগ্র বাঙালীর জীবন হইতে শাস্তি ও স্থিতির তিলমাত্র স্পর্শটুকু কাড়িয়া লইয়াছে। সহস্র সমস্তা জর্জরিত, বেদনাশ্রীপীড়িত বাঙালীর জীবন হইতে হাসির ফিলিক, গানের সুর, আনন্দের উৎস কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

তাই, এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিনটিতে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা যে—যে বেদনা, বঞ্চনা, লালা, লাঞ্ছনা, ক্ষয়, ক্ষতি, পুজুতা, হাহাকার আজ বাঙালীর জীবনযাত্রাকে দুর্গহ করিয়া তুলিয়াছে তাহার অবসান ঘটুক। একদা শৌর্ধে, বীর্ঘে, শিকার, সন্তুষ্টিতে, সর্বপ্রকার নৈপুণ্যে, কুশলতায়, বক্ষতার যে বাঙলা অতুলনীয় ছিল—যাহার অপরিমাপ্য অবদান ভারতকে সর্বদিক দিয়া সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে; জানে, পরিমায় জগতের বৃহৎসমাজে বাহ্যব কল্যাণে ভারতের পক্ষে একটি শীর্ষ আসন অর্জন করা সম্ভবপর হইয়াছে, বাহ্যব কালজরী সম্ভাবনামের জানে, কবে ও সাধনার নব নব সম্ভাভা, সন্তুষ্টি ও চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটনাচ্ছে সেই বাঙলার পূর্ব পৌরব, ঐতিহ্য ও সম্মান পুনরায় ফিরিয়া আসুক। সমগ্র বাঙলা আবার পরিপ্লাবিত হউক নব নব সৃষ্টির জোয়ারে, উদীপিত হউক এক নবতম চেতনায়, জাগ্রত হউক অক্ষরন্ত শক্তিকে মূলধন করিয়া। বাঙলা দেশের প্রতিটি গৃহ পরিপূর্ণ হউক আনন্দে, হাসিতে, গানে; 'সুশোভিত হউক লাবণ্যে, দীপ্তিতে, সুবহার; উদ্ভাসিত হউক আলোয়, প্রাচুর্ঘ্যে এবং সজীবগায়। এই শুভদিনটিকে কেন্দ্র করিয়া আমরা আমাদের অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে সর্বৈব শুভকামনা জানাই এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দীর্ঘজীবন, উত্তরোত্তর জীবিত্ব এবং সর্বাঙ্গীণ শান্তি একান্তভাবে কামনা করি।

## জয়তু শেক্সপীয়ার

নিশ্চয়ই ও নিতান্তের মধ্যেই জগৎশ্রষ্টার বিশ্বলীলার পরম প্রকাশ। অনিত্য এই জগতে চিরকালের জন্য কিছুই থাকে না। ভাঙাগড়ার মতোই জগতের অগ্রগমন। নব নব সৃষ্টির ছাড়ানায় ধ্বংসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পৃথিবীর নিশ্চিষ্ট নিয়মে যেকিছুই মহাকালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই জগতের স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু মহৎসৃষ্টি চিরকালই এই নিয়মের বাহিরে। মহৎসৃষ্টিব মুক্তা নাই। মহাকাল পারে না এই সৃষ্টিকে জয় করিতে। তাহার অবস্থান কালের পরিধি হইতে বহু দূরে। মহৎসৃষ্টির মধ্যেই যুত্বকে জয় করিয়া থাকেন মহৎশ্রষ্টার দল। বাঁহারা নিয়ত পাড়ি জমান রূপ হইতে রূপান্তরে, সীমা হইতে অসীমে, অরূপ হইতে অপরূপে; ক্ষুণ্ণার সর্বোত্তম অতিক্রম করিয়া স্রাব্য মহাসমুদ্রে বাঁহারা হন উত্তীর্ণ, জীবনের মধ্যে বাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন জীবনান্তিরের, নীরের ভিতর বাঁহারা সন্ধান পান ক্ষীরের, ইন্দ্রিয়সর্বস্বদের নিকট বাঁহারা আনিয়া দেন অতীন্দ্রিয়ের ঠিকানা সেই কথাচিরী এবং চিত্তলেখকের দলের নিকট চিরকালের ভিত্তিতেই কাল পরাজিত। তাঁহাদের চরণপ্রান্তে কাল প্রণামে অবনত। সেই কারণেই শেক্সপীয়ার অমর। সম্প্রতি তাঁহার চতুর্ভাষী পূর্ণ হইল। সময়ের এই দ্রুতর ব্যবধান পারে নাই তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে বিন্দুমাত্র ঘ্রান করিতে। বরং সময়ের ধাপে ধাপে অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুণ্যস্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। বিশ্ববাসীর হৃদয়ের গভীরে তাঁহার অটল আসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।

একদা অভিনয়ের তীরে নবজীবনের যে মহান বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, আজকের শ্রোতে শ্রোতে দেশকাল সময়ের সীমা ছাড়িয়াই সেই নবজীবনবাণী ছড়িয়া পড়িল সমগ্র বিশ্বে। সেই নবজীবন বেদের পবিত্র পঙ্ক্তি সারা বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ষ্ট্রিটফোর্ডের আকাশে সেদিন যে অশেষ শক্তিমান জবাক্তম সঙ্গীশ মহাহুতিমান স্বর্গ উদ্ভিত হইলেন, তাঁহার অনন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রসঙ্গ রশ্মি আজ সমগ্র বিশ্বে বিকিরিত হইয়া দূরীভূত করিয়াছে জগতের মানসিক তমঃ। আজকের তীব্রতাই যে আলো সেদিন পৃথিবীর নিগদিগন্তে সঞ্চারিত হইল, তাহারই রশ্মিতে জীবনের এক বৃহত্তর ও মহত্তর রূপ আজ আমাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত।

শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আলোকে উদ্ভাসিত যে ইংল্যান্ডকে আজ আমরা দেখিতেছি, সেই ইংল্যান্ডের গঠনকাণ্ড শুরু হইয়াছিল প্রথম এলিজাবেথের সময়ে, অর্থাৎ বোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এলিজাবেথের সময়ে সকল দিক দিগা ইংল্যান্ডে যে ব্যাপক নবজাগরণ সৃষ্টি হইয়াছিল শিক্ষাসমাজে সে বিশ্বয় আজ আর কিছুই অবিস্মৃত নাই। সেদিন যে দিকপালের দল নূতন জীবনের, নূতন প্রতিশ্রুতির, নূতন সম্ভাবনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে উত্তরসাধকের দল তাহারই উপর ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ে সর্বাশেখা শ্রমবীর ঘটনা মহাকবি শেক্সপীয়ারের আবির্ভাব। সমগ্র ইংল্যান্ড সেদিন সন্ধান পাইল এক অতুল্য

নব সৃষ্টির এক দুর্বার প্রাবন, জীবনপ্রকাশের এক শ্রোতোযুগ সেদিন কি এক অভূতপূর্ব বায়ব স্পর্শে থুলিয়া গেল। সাংস্কৃতিক জগতে পদার্পণ করিয়াই শেক্সপীয়ারও যেন বলিলেন—VINI, VIDI VICI.

তাঁহার পর সময়ের বাড় বহিরা গেল; কত ভাঙাগড়ার মধ্যে অগ্রসর হইতে থাকে পৃথিবী; কত সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান ঘটিল; কত বক্তা, বড়, প্রাবন, হুভিস্ক, মহামারী পৃথিবীকে ওলট-পালট করিয়া দিল; কত যুদ্ধ, রণোদ্ভাতা, ধ্বংসোন্মুখী অভিযান পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল; কত সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল আবার কত নূতন চেতনা, নূতন স্বপ্ন, নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হইল; কত নব সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, কত নব নব কল্পনা মানুষের চিত্তে জন্ম লইয়া রূপ পরিগ্রহ করিল—কিন্তু মানুষের হৃদয়ে শেক্সপীয়ারের যে আসন—সহস্র জাগতিক পরিবর্তন সেই আসন হইতে তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই। শেক্সপীয়ার আজ শুধু ইউরোপের নন, আজ তিনি সমগ্র জগতের। বিশ্বজোড়া ব্যাপ্তি তাঁহার, আমাদের জীবনে তাঁহার স্বাক্ষর অমলিন। দিক হইতে দিগন্তের, কাল হইতে কালান্তরে তাঁহার অভিসারও অব্যাহত। তাঁহার কালজয়ী রচনা তাঁহাকে আজ সারা পৃথিবীর হৃদয়ের ধন, মনের মানুষ এবং একান্ত আপনার করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার কাব্য, তাঁহার নাটক, তাঁহার অবিস্মরণীয় সংলাপসমূহ নিখিল বিশ্বের নরনারীর মনে-প্রাণে মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাই আজ জগৎজোড়া তাঁহার আসন। তাঁহার নবজীবনের উদাত্ত আহ্বান, নূতন জীবন সাহিত্যের শুভ মন্ত্রোচ্চারণ পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশের স্তায় অভিনয়ের শ্রোতে শ্রোতে গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিত হইয়া বাঙালীর পিশাহুচিত্তে এক অভিনব সুরঝঙ্কার তুলিয়াছে। বাঙালীর নিকট তিনি বিদেশী নন। বাঙালার শেক্সপীয়ার-চর্চায় ইতিহাসও কম সমৃদ্ধ নহে। পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশের মত বাঙালার অসংখ্য কবি, গুণী ও রসিকদের অপূর্ণ ব্যাখ্যা, বিচিত্র বিশ্লেষণে তিনি আজ বাঙালার একেবারে গৃহের আলিনায় উপনীত হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিশ্লেষণের আলোয় বাঙালীর জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি আজ এক বিচিত্র দীপ্তিতে প্রদীপ্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি যে, বর্তমান যুগে আমাদের নাট্যকলার বখেট দৈন্য দেখা দিয়াছে। নাটকের আঙ্গিকের বিকৃতিসাধন বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই 'দুরবস্থা' হইতে মুক্তির চাবিকাঠির সন্ধান আছে শেক্সপীয়ারের নাটকে। আমাদের দেশের নাট্যকারগণ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে শেক্সপীয়ারের ধারা অনুসরণ করিলে বাঙালার নাট্য সাহিত্য নিঃসন্দেহে লাভবান হইবে।

তাঁহার শুভ জন্মদিনের পরম ক্ষণে সারা পৃথিবীর প্রজাবনত প্রণাম আজ তাঁহার উদ্দেশে বিশেষভাবে উৎসর্গিত হইতেছে। তাঁহার বল্লনার আজ দিগদিগন্ত মুখরিত, সাংস্কৃতিক প্রতিটি মন্দিরে প্রতিটি তীর্থে আজ তাঁহার পূজা; এই পরমলগ্নে জগতের প্রণামের মালার আমাদেরও একটি প্রণামের ফুল যুক্ত করিয়া দিতেছি। শেক্সপীয়ারের জয় হউক।

## শেখ আবদুল্লাহ মুক্তি

কাম্বীর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বর্তমানে মুক্তি পাইয়াছেন। দীর্ঘ একাদশ বৎসর কারাবাসের পর তিনি মুক্ত হইয়াছেন। মধ্যে ১১৫৮ সালে একবার তাঁহার সমুখ হইতে কারাগৃহের লৌহকপাট অগ্নিমুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই পুনর্বার তাঁহাকে সরকারী আদেশে কারাস্ত্রাগারেই বাসা বাঁধিতে হয়।

শেখ আবদুল্লাহ এই মুক্তিপাভ কাম্বীর সমস্তার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল। এই অধ্যায়টি গৌরবের কি বেনদার, ইহাতে অফুর্ন্ত আনন্দের স্বাক্ষর কি অবিরাম বেনদার ক্ষতপ্রসঙ্গ— দেশের রাজনীতিকজগৎ এবং বুদ্ধিজীবীজগতে সেই প্রসঙ্গই আজ সর্বাঙ্গেকা দৃষ্ট আকর্ষণ করিয়াছে।

শেখ আবদুল্লাহ এই মুক্তিকে আমাদের রাষ্ট্রীয় মহলের বাহারা কাম্বীর সমস্তার সমাধানের অন্ততম সহায়ক বলিয়া গণ্য করিতেছেন— তাঁহাদের এই চিন্তাধারার মধ্যে হুখের বিষয় কোন বুদ্ধির দীপ্তি উঁকি মারিতেছে না। এই জাতীয় চিন্তাধারার মধ্যে কোন প্রথর রাজনৈতিক জ্ঞানের ছাপ অমুপস্থিত, এই ধারণাকে 'সোনার পাখরের বাটীর সহিতই তুলনা' করা চলে। শেখ আবদুল্লাহকে কারাভাঙ্করে রাখিলে কাম্বীর সমস্তা ক্রমশঃই জটিল হইতে থাকিবে বলিয়া বাহারা মনে করেন—এই বোর জাতীয় দুর্ঘোষণের দিনে—সারা দেশের এক চরম মুহুর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিলে সমস্তা যে জটিলতর হইবে—বুদ্ধিমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্কে সে চিন্তাটি কি বাচকের তরেও উল্লিখিত হয় নাই? আবদুল্লাহ এক রাজনৈতিক চরিত্র। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পাতাদের দ্বারা পূর্ণ হয় ইনি তাঁহাদেরই একজন। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইঁহার মুখের কথাব সহিত মনের কথাব আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অবিকাল ক্ষেত্রেই ইঁহার কথাব এবং কাজে গরমিল। বাহারা নিজেরই কথা ও কাজে সাহিত্য নাই তাঁহারা দ্বারা বৃহৎ রাষ্ট্রের বা জনপদের সাহিত্যসাধন কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্য পাবে তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। তিনি নিজেকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করেন আবার তিনিই উপদেশ বরণ করেন 'সাদা মুসলমান' হইতে। তিনি নিজেকে গান্ধীশিষ্য বলিয়া দাবী করেন আবার তাঁহারই শোভাযাত্রার পুরোভাগে বিভূষিত হয় জিন্না ও আয়ুবের প্রতিরূপিত। তদুপর ইঁহার চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য নিজের ক্রিয়াকলাপকে নির্ধিঁধার অস্বীকার করা। ইঁহার অভিধানে 'জাতি', 'নীতি', 'বৈবেক' প্রমুখ শব্দগুলি বিনি খুঁজিতে থাকিবেন, বলা বাহুল্য, তাঁহার অভিলাষ পূরণ হইবে না, তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে সর্বাপেক্ষা ব্যর্থতা। ভারতবর্ষের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অজানা নয়। বহির্জগতে ভারতীয়রা স্থান স্থানে কিভাবে নির্ধাক্ষিত হইতেছেন, সে সবক্ষেত্রে কাহারও কোন অস্পষ্টতা নাই। যাবের এবং বাহিরের সমস্ত সমস্তা ও দুর্ঘোষণা এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের চরম ব্যর্থতা—ভারতকে সর্বনাশের প্রায় শেষবিন্দুতে উপনীত করিয়া তুলিতেছে। শেখ আবদুল্লাহ কেন গ্রেপ্তার বরণ করিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অজানা নাই। এই দীর্ঘকাল শেরওয়ানী পরিহিত মাছুষটি যখন দেখিয়াছিলেন স্বতন্ত্র কাম্বীরে। স্বতন্ত্র কাম্বীর অর্থে ভারতের

॥ পাড়বার মত কয়েকখানি ভাল বই ॥

অধ্যাপক শ্রীবিভুরজন গুহ

॥ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা ॥ ১০.০০

[ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের জন্য  
মনোবিজ্ঞানের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ ]

॥ মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ ॥ ৫.৫০ নং পঃ

॥ মনোবিজ্ঞান রূপরেখা ॥ ১০.৫০ নং পঃ

॥ সমাজ দর্শন ॥ ৮.০০

॥ নীতিবিজ্ঞান রূপরেখা ॥ ৭.০০

॥ পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা ॥ (যহর)

॥ ভারতীয় দর্শন ॥ (ঐ)

অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

॥ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ ৮.৫০ নং পঃ

বিভুরজন গুহ ও সুবন্দা ঘোষ

॥ পৌষ কাণ্ডের পালা ॥ (গল্প সংকলন) ৩.০০

॥ যষ্টিমধু ॥ (গল্প সংকলন) ২.২৫ নং পঃ

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

॥ শতপুষ্প ॥ (কবিতা সংকলন) ৪.০০

॥ জনপদের ছন্দ ॥ (রম্যরচনা) ৩.৫০

অনীতা বসু

॥ ছায়া মিছিল ॥ (গল্প সংকলন) ২.৫০ নং পঃ

জনার্দন চক্রবর্তী

॥ স্বপ্ন বাসর ॥ (উপন্যাস) ৩.৫০ নং পঃ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ উদাত্ত ভারত ॥ (কবিতা সংকলন)

পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৮.০০

জগদানন্দ বাজপেয়ী

॥ মায়ামুহুর ॥ (কবিতা সংকলন) ৪.৫০ নং পঃ

কাজী নজরুল ইসলাম

॥ বনগীতি ॥ ২.৫০ নং পঃ

॥ জুলফিকার ॥ ২.০০

॥ চক্রবাক ॥ ২.২৫ নং পঃ

॥ ফগিমনসা ॥ ১.৫০ " "

॥ সর্বহারী ॥ ১.৫০ " "

॥ সঞ্চয়ন ॥ ১.৫০ " "

॥ নলেজ হোম ॥

৫২, বিধান সঙ্গী, কলিকাতা-৬



অখণ্ডতার অধীন। আমরা যে আদর্শ অখণ্ড ভারতেরই রূপ কল্পনা করি। থাকি, তাঁহার চিন্তাধারা এবং অভিসন্ধি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা চিন্তার, কল্পনার, স্বপ্নে কাশ্মীরকে ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই জানি, আমরা ইতিহাসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ।

শেখ সাহেবের স্বপ্ন, চিন্তা, কল্পনা এক্ষেত্রে একেবারে বিপরীত। কাশ্মীরকে যদি স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলিও যদি একযোগে বা একের পর এক আপন আপন স্বাভাৱ্য দাবী করিয়া বসে তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব কি করিয়া বজায় থাকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার আবশ্যক আছে। এই পরিশ্রেক্ষিতে শেখের স্বপ্নকে একটি সর্বনাশা চক্রান্ত বা ভারতের ঐক্য, সংহতির বিরুদ্ধে এক কুৎসিত যড়যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে বিন্দুমাত্র অযৌক্তিক হয় না।

শেখ সাহেব পাশাউপর্বত-উপত্যকাদি ডিভাইয়া ভারতের মাটিতে পদার্পণ করা মাত্রই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া ঘেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন মির্জা আফজল বেগ এবং মুহল্লা সারা ভাই। আজ তাঁহার একনিষ্ঠ সাহায্যকারিণী শ্রীমতী মুহল্লা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া তাঁহার প্রতিটি গতিবিধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

## ॥ শোক-সংবাদ ॥

### নির্বাসিতোষ ঘটক

চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ ঘটক-পরিবারের স্বর্গত আশুতোষ ঘটকের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ব্যবসায় জগতের অজ্ঞাতম দিকপাল স্বর্গত ভবতোষ ঘটকের অজ্ঞাতম ভ্রাতুষ্পুত্র বিশিষ্ট শিল্পশক্তি নির্বাসিতোষ ঘটক গত ১৪ই বৈশাখ মাসে ৪২ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল বহুমতী সাহিত্য মন্দিরের কর্মধ্যক্ষে আসেন ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিখ্যাত শৌচপ্রতিষ্ঠান কে, সি, ঘটক এ্যান্ড সান্স প্রাইভেট লিমিটেড, কুমুমিকা আরবন এ্যান্ড কনষ্ট্রাকশন ওয়ার্কস, চন্দননগরের জ্যোতি টেক্স প্রমুখ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ইনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বরূপ পরিচালনায় এবং অসামান্য কর্মক্ষমতার এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট উন্নত এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। বহুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা সুলেখিকা ভক্তি দেবীর সঙ্গে ইনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। যুগ্মকালে ইনি সহধর্মিণী, একটি পুত্র শ্রীমান শুভতোষ, একটি কন্যা

আবদুল্লাহ এই দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলিতে বাধা নাই, আমাদের সন্দেহের পাত্র এবং পাত্রী। আফজল বেগ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কিন্তু মুহল্লা সারা ভাই ভারতের কণ্ঠা ইহাও সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আবদুল্লাহ রাজাজীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের সেই প্রবীণ নেতার সহিত আবদুল্লাহ যোগাযোগও উপলক্ষ্যীয় নয়। কেহই অনবগত নন, যে দক্ষিণ-ভারতে আজ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এক চাপা অসন্তোষ বহুকাল ধরিয়াই পুঞ্জীভূত হইতেছে, কখনও কখনও এই অসন্তোষ চাপাও থাকিতেছে না, এক্ষেত্রে প্রবীণ রাজাজীর সহিত আবদুল্লাহ যোগাযোগ কেহ যদি সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে কি না বুদ্ধিজীবীমহল তাহার বিচার করিবেন।

একশে, এই সকটঘন পরিস্থিতিতে আমরা দেখিতেছি আবদুল্লাহ মুক্তি সমস্তার সমাধানের পরিবর্তে সমস্তার বিবর্ধনের কারণ হইয়া ঠাড়াইতে পারে। অতএব, তাঁহার গতিবিধি, যত্নাদি এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে বড়া নজর রাখা হউক এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে তাঁহার রাজনৈতিকজীবন পরিচালিত হউক নচেৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে সর্বনাশের কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, বাহ্যিক পরিণতি হইবে আরও ভয়াবহ।

২২এ বৈশাখ ১৩৭১।

কুমারী সুরেতা এবং আরও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও অমুহুরাগী বন্ধু-বান্ধব বেথে গেছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি ও সদগতি কামনা করি।

### লেডী কাদম্বিনী সরকার

নব্যভারতের ইতিহাসসচর্চার জনক আচার্য শ্রাব বহুনাথ সরকারের সহধর্মিণী লেডী কাদম্বিনী সরকার গত ৬ই বৈশাখ ৮৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন।

### লেডী বিল্বাসিনী সিংহরায়

স্বর্গীয় শ্রাব বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের সহধর্মিণী লেডী বিল্বাসিনী সিংহরায় গত ১২ই বৈশাখ ৬৫ বছর বয়সে শ্বেদনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

### লীলা চৌধুরী

বাঙালার জাতীয় জীবনের অজ্ঞাতম স্বর্গীয় দিকপাল চৌধুরী ভ্রাতৃবৃন্দের অজ্ঞাতম স্বনামধন্য স্বর্গীয় মন্থননাথ চৌধুরীর সহধর্মিণী লীলা চৌধুরী গত ১৭ই চৈত্র কুমুরে গতায় হয়েছেন। এর জননী ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা সৌদামিনী দেবীর কন্যা। বিগত যুগের স্বনামধন্য চিত্রতাবকা শ্রীমতী দেবিকারাগণী এর কন্যা এবং ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জয়হননাথ চৌধুরী তাঁর দেবহপুত্র।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

৬৭ বি বহুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা, ১৩৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীহরনার ভবনস্থলার কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকা-সমালোচনা

মানুষকে—গত মাঘ সংখ্যার আপনার সম্পাদকীয় মন্তব্য ‘দিল্লীর দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী’ পড়ে খুবই আনন্দ বোধ করলাম, এই ভেবে যে, বাংলার এত সংবাদ পত্র-পত্রিকার মধ্যে তবু একজন আছেন যিনি এ বিষয় চিন্তা করেন। এর স্রষ্টা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ বাংলা ও বাঙালীর চরম দুর্ভাগ্যের দিন। তার ক্রমে ক্রমে সর্বভারতীয় সরকারী-বেসরকারী সর্ব বিষয় হতে অপরিসারিত হচ্ছে, কিন্তু কেন? সত্যি কি বাঙালী আজ ভারতের অঙ্গান্ত প্রদেশের চেয়ে অধুনাধিক? যেমন আজ ১৭ বছরের মধ্যে এক ডঃ হরেন মুখার্জী ছাড়া আর একজনও লাট সাহেব উপযুক্ত হন নি বা নেই? এই রকম অঙ্গ বিভাগেও সেই একই ব্যাপার, বাংলা দেশে কোনও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা দূরে থাকুক, একে একে বহু সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অঙ্গ প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। অবচ উৎসাহ ও কর্মহীন বাঙালীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারীভাবে এর প্রতিকারের কি রকম চেষ্টা হচ্ছে, তা অঙ্গ প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। সেখানে ‘Son of the soil’ এর কড়া পাহারা। যাই হোক আমার মনে হয় বাংলা দেশের সমগ্র সংবাদপত্র ও পত্রিকা এই বিষয়ে আন্দোলন করে দেশবাসীকে সচেতন করে দেবেন যাতে তাঁরা এই জীবন প্রতিযোগিতার স্রষ্টা সক্ষম হতে আশ্রয় চেষ্টা করবেন। নমস্কারান্তে, ইতি—শ্রীডালি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮, থার্ড এভিনিউ, ফুন্ট, ইকান’ রেলওয়ে।

মহাশয়, এই পত্রের সর্বাগ্রে আপনি ও ‘মাসিক বহুমতীর’ সমস্ত কর্মবুদ্ধির জন্তে রইল আমার ভালোবাসা। ‘মাসিক বহুমতী’ যে আধুনিক যুগের মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে অগ্রতম শ্রেষ্ঠ তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। সত্যি আজকের ‘মাসিক বহুমতীর’ উজ্জতির পদক্ষেপ দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। আমি আজকের পাঠক নই—পনের বছর ধরে আমি এর অমূল্য পাঠক একজন। তাই সেই পনের বছর আগেকার ‘মাসিক বহুমতীর’ সঙ্গে আজকের ‘মাসিক বহুমতীর’ কোন বিষয়ে তুলনা করা চলে না—কি ছাপায়, কি পাতায়, কি অভ্যন্তর বিষয়ে সেই মাসিক বহুমতী কালের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘূর্ণাপক খেতে খেতে আজকে সে যে রূপ নিয়েছে তা অভাবনী তাই আজও তার সর্বত্র জগদান। বর্তমানে প্রকাশিত উপজাতি নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘তালপাতার পুঁথি’ মনোরম উপজাতি। সুবোধ চক্রবর্তীর ‘মৌন মন’ আশা করি পাঠকমহলে ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে—‘চারজন’ বিভাগটি প্রশংসার দাবী রাখে। আগামী বৈশাখ সংখ্যার প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুনীলের জন্তে ধন্যবাদ (অবশ্য আপনি ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন)। একটা অমুরোধ যদি পায়ের এর পরে বিমল কর বা জ্যোতিবিন্দু নন্দীর উপজাতি ছাপাতে চেষ্টা করবেন। নমস্কারান্তে—অক্ষয় বসু, মাগধুরী নতুন পল্লী, বর্ধমান।

প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয়, আমি আপনার মাসিক পত্রিকার একজন নিঃশর্ত পাঠক। প্রায় আট বছরেও বেশি হইতে চলিল আমি আপনার এই বহুলপ্রচারিত পত্রিকাটির সঙ্গে জড়িত। পূর্বে চাইতে বর্তমানে ইহার অনেক উন্নত হইয়াছে। বিশেষত এর ‘সম্পাদকীয়’, ‘বঙ্গপট’ ও ‘আলোকচিত্রগুলি’ যথেষ্ট সুস্বাদু পরিচায়ক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে কক্ষ্য করিতেছি যে, গত কয়েকটি সংখ্যা হইতে ইহার ‘খোলাখুলা’, ‘আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি’ এবং ‘দিনপত্রী’ (দেশ-বিদেশ) বিভাগগুলিকে একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্বাদ কিছুটা সম্পাদকীরের মাধ্যমে পাইলেও, ‘খোলাখুলা’ বিভাগটি সম্পূর্ণ উঠিয়া যাওয়াতে খুবই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। তাই আমি যথেষ্ট আশা রাখি যে, আপনি উপরোক্ত বিভাগটি পুনঃসংযোজন করাইয়া পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর ও চিত্তাঞ্চক করিতে এবং আমাদের সুখী করিতে এতদূর কার্য্য করিবেন না। নমস্কারান্তে—ইতি, শ্রীকল্যাণ রায়, পোঃ রানাঘাট, চুড়ি পাড়া, জেঃ—নদীয়া।

## বেচতে চাই

মহাশয়, দয়া করিয়া মাসিক বহুমতী পত্রিকা মারফৎ আপনার অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে জানাইবেন যে, নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বহুমতী পত্রিকাগুলি আমি প্রতি কপি একটাকা করিয়া বিক্রয় করিতে চাই। এই পত্রটি আপনার মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার চিঠি-বিভাগে বিজ্ঞাপিত হইলে বাধিত হইব। আপনার মূল্যবান উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম—

- ১। ১৩৫১ জ্যৈষ্ঠ—কাতিক, মাঘ—চৈত্র।
- ২। ১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন, অগ্রহায়ণ—চৈত্র।
- ৩। ১৩৬১—৬২ বৈশাখ—চৈত্র।
- ৪। ১৩৬৩—৬৪ বৈশাখ—ফাল্গুন।
- ৫। ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৮ বৈশাখ—চৈত্র।

সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—শ্রীকান্তনী বসু, ‘উমা নিকেতন’ ১১।এস।১২।এইচ রাজা মণিন্দ্র রোড, কলিকাতা—৩৭।

মহাশয়, আপনার জনপ্রিয় ‘মাসিক বহুমতী’ মারফৎ পূর্ব পাকিস্তান-এর গ্রাহকদের কাছে অমুরোধ করিয়া জানাইবেন যে, আমি নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক বহুমতীগুলি বেচিতে চাই। কেহ কিনিতে চাহিলে নিয় ঠিকানার পত্রালাপ করুন। আপনার পত্রিকা মারফৎ এই পত্রখানা প্রচার করিলে বাধিত হইব।

মাঘ হইতে চৈত্র	১৩৬৭	বাং
বৈশাখ " "	১৩৬৮	"
" " "	১৩৬৯	"
" " আষাঢ়	১৩৭০	"

পত্রিকাগুলি তিনকপি করিয়া বাধান অবস্থায় আছে। নমস্কারান্তে ইতি—শ্রীবীন্দ্র ভৌমিক, পোঃ কামদেবপুর, জেলা-মুন্সি, পূর্ব-পাকিস্তান।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী প্রমতি মুখোপাধ্যায় অথবা আর এন মুখোপাধ্যায়, ২২ ইউ এফ, তানসেন মার্গ, নিউ দিল্লী \*\*\* শ্রী টি কে মুখোপাধ্যায়, অথবা এনপ্রো ইন্টার ক্রাশনাল লিং, ডাব—চিনচোড়, জেলা পুনা—১৯, মহারাষ্ট্র \*\*\* শ্রীমতী অঞ্জলি বোস, ৪১৩৩ ডব্লিউ ই এ কারোল বাগ, নিউ দিল্লী—৫ \*\*\* সচিব, অভোনানন্দ গ্রন্থাগার, শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রম, ডাক—দ্বারাকপুর, জেলা—বীরভূম \*\*\* শ্রীবিজয়কুমার চক্রবর্তী, ক্রাশনাল ডেয়ারী হিসার্চ ইনস্টিটিউট, ডাক—কান্দুয়া, পূর্ব পাঞ্জাব \*\*\* শ্রীমতী প্রতিমা রায়, অথবা শ্রী এন রায়, ডেপুটি সি সি এস (এস-ই রেলওয়ে) ৭১১১ এ, নফর কুতুব রোড কলিকাতা-২৬ \*\*\* শ্রীচিন্তনরঞ্জন ঘোষ অথবা এন-সি ঘোষ এ্যাণ্ড সন্স, (ওয়েলডিং বিভাগ), ১, এ হল দাঁ রোড, ডাক—বজ্রজং, ২৪ পরগণা \*\*\* শ্রী এস আর দত্ত, এস বি এ আই এন এইচ এস কল্যাণী, ডিশাখাপ্তম, জাভাল বেস, এপি \*\*\* শ্রীকৃষ্ণকুমার স্তব্ধ এম-এল-এ বারানসী ঘোষ রোড, ডাক—তাল-পুকুর, জেলা—২৪ পরগণা \*\*\* শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুকসীয়া কলিয়ারী, ডাক—মালদা, জেলা—খানাবাদ \*\*\* শ্রীমতী শশীলাবালা সাহা, অথবা শ্রীঅজিতকুমার সাহা, ১৩০, নেতাজী স্তম্ভাব রোড, ডাক—বাগড়া, জেলা—যশিন্দাবাদ, পঃ বঙ্গ \*\*\* প্রধান শিক্ষক, দেউলপাড়া ব্রহ্মীনাথ বিদ্যা নিকেতন, ডাক—দেউলপাড়া, জেলা—ভগলী, (তারকেশ্বর হয়ে) \*\*\* শ্রীঅমল্যরতন ভৌমিক, অফিস অফ দি এগ্রিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব মেদিনীপুর ডিভিসন, ডাক ও জেলা—মেদিনীপুর, \*\*\* শ্রীশিবচরণ চক্রবর্তী, ১১৬, ওলাইচকী রোড, কলিকাতা-৩৭ \*\*\* শ্রীদীপক চৌধুরী, সহকারী ম্যানেজার, নিউ এক্সপ্রেসিভ ফ্যাক্টরী, ডাক—সরভাক্রানগর, জেলা—ভাগুরী, মহারাষ্ট্র \*\*\* সচিব, শৈল জগুতি পাবলিক গ্রাম্য গ্রন্থাগার, ডাক—সোলাখালি, জেলা—মেদিনীপুর \*\*\* কুমারী প্রতিমা ধর, ৩৭১১এ, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ \*\*\* শ্রীমতী বেলা মজুমদার, ১৪, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিকাতা-২৬ \*\*\* শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ অর্থায়ক—মেসার্স এন সি ঘোষ এণ্ড কোং, ডাক—বেটানিক্যাল গার্ডেন, পোন্ড্রা, জেলা—হাওড়া \*\*\* শ্রীমতী চবি সরকার, ১৩১বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ \*\*\* শ্রী একে পালিত বি-এ, উকিল, ডাক—আম্বা, জেলা—গঙ্গাম, উড়িষ্যা \*\*\* সচিব, বি ইউ সি গ্রন্থাগার, ৫১বি, গরচা রোড, কলিকাতা-১১ \*\*\* শ্রীঅমরকান্ত চক্রবর্তী, মাসিলি টি-বি হাসপাতাল, Dakara-ya Project, ডাক—মাসিলি, জেলা—কোরাপুট, উড়িষ্যা \*\*\* শ্রী এস, এন, দত্ত, অধ্যক্ষ টেকনিক্যাল স্কুল, ডিজেস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, বেনারস, ইউ-পি \*\*\* শ্রীমতী বাণী মিত্র, ৫৬, ডানলপ স্ট্রাফ কোর্টার ডাক—সাহাগঞ্জ, জেলা—ভগলী \*\*\* ডাঃ ডি বজ্জা, এম-বি-বি-এস, পি-সি-এফ-এস Asstt. Surgeon i c পি আর, ডিসপেন্সারী, ডাক—নিরমল (সিমলা হিলস্ হয়ে) জেলা—কুলু (পাঞ্জাব) \*\*\* শ্রীমতী মারা বসু, ৪৫, গলফ ক্লাব রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ \*\*\* শ্রীমতী শীপা বসু, অথবা—ডাঃ সরোজকুমার বসু এম-বি-বি-এস, কুইন্স রোড, বিহার \*\*\* প্রধান শিক্ষক, কাইজুরি উচ্চ বিদ্যালয়, — (সমসতাই হয়ে), জেলা—২৪ পরগণা।

বৈশাখ (১৩৭১) হইতে চৈত্র পর্যন্ত মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫/- পাঠাইলাম। দয়া করিয়া প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী উবারানী ঘোষ, অর্থায়ক—ডাক্তার জি, সি ঘোষ এম-বি, ডাকঘর—শিলিগুড়ি, জেলা—দার্জিলিং।

আমি মাসিক বসুমতীর প্রায় ৩৬ বৎসর গ্রাহিকা আছি। বার্ষিক মূল্য ১৫/- পাঠাইলাম। বাহিরে ছিলাম বলিয়া চাঁদা পাঠাইতে কিছু দেরি হইয়া গেল। পত্রিকা পূর্ববৎ নিয়মিত পাঠাইবেন। শ্রীমতী নলিনী দিল্লী, কলিকাতা।

Herewith remitting Rs. 15/- for the renewal subscription of the Monthly Basumati for one year. Please send the magazine every month. —The Librarian, Kendrapara Public Library, Po. Kendrapara, Cuttack.

I send herewith the annual subscription to the Monthly Basumati for the current session. Please send the magazine regularly.—The Secretary, Bharati Bhavan Sadharan Pathagar, Kaligaon. Malda, W. Bengal.

Sending Rs. 15-00 being the annual subscription for one year. Please enlist me a subscriber from the month of Baisakh.—Sri. Pranati Mukherjee, C/o, Sri R. N. Mukherjee 22, U F, Tansen, Marg, New Delhi.

We have remitted the annual subscription of Rs. 15-00 Kindly send the magazine regularly, B. Bhattacharjee, Special Officer, Pearaaherra Tea Estate Po. Pearacherra, Dt. Tripura, India.

১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত বার্ষিক চাঁদা ১৫/- পাঠাইলাম। প্রাপ্ত সংবাদ দিবেন ও প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী শান্তিলতা পাল। বঙ্গপুত্র, মেদিনীপুর।

Please accept the subscription of Rs. 15-00 for the year 1964-65 and send the Monthly Basumati every month.—Sm. Ava Bose C/o Shree Shrish Chandra Bose, Chandni Chawk, Cattack—2.

I am remitting the annual subscription of Rs. 15-00 for the year 1371 B.S. Please acknowledge receipt. Sm. Lilarani Dey C/o. Ajit Kumar Dey. Vill & Po.—Kashiara, Dt. Burdwan.

১৩৭১ সালের আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫/- পাঠাইলাম। প্রাপ্ত সংবাদ দিবেন এবং পূর্ববৎ নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। একে করণ, 'আশীর্বাদ', ডাকঘর—জনকা, মেদিনীপুর।

# সুচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। কথাশ্রুত ( যুগবাণী )	...	১৭৭
২। মেয়ে কান ( সত্যচটনা )	বীক চট্টোপাধ্যায়	১৭৮
৩। তেরিডিটি বা বাশাহুহনিকত। ( সংগ্রহ )	...	১৮২
৪। একাগ্রতা ( প্রবন্ধ )	রবীন্দ্রনাথ বসু	১৮৩
৫। নব্য আফ্রিকার একটি কবিতা	...	১৮৫
৬। এ জন্ম গাঁথ : ছিল ( কবিতা )	কপাট ব্রহ্ম	১৮৬
৭। বিবাহিতা স্ত্রী ( রম্য আলোচনা )	শ্রীমতী	১৮৭
৮। বোবা রাতে ( কবিতা )	জ্যোতিষ্মা রায়	১৮৮
৯। গল্পাঙ্কল ( কবিতা )	...	১৮৯
১০। জীবন মানেই সমস্যা ( প্রবন্ধ )	তথ্যাহেবী	১৯০
১১। সংবাদপত্র ও জনচেতনা ( প্রবন্ধ )	সংবাদিক	১৯১

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাহ্ম সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীনগর - গোহাটী

## মহাপত্র

বিবরণ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১২। বাঘের পোট যেতে যেতে	(রমা-আলোচনা)	শিকারী ... ১১১
১৩। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুচি একজন মোরে	(সংগ্রহ)	... ১১২
১৪। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরচন্দ্র	(জীবনী)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ১১৩
১৫। বিচ্ছেদের পর	(কবিতা)	গোবিন্দ প্রসাদ বসু ... ১১৮
১৬। তৈত্তিরীয়োপনিষদ	...	অম্ববাদিকা—চিজিতা দেবী ... ১১৯
১৭। জগদ্বল্লভ ও বাঙলা	(প্রবন্ধ)	সুকল্যাণ শর্মা ... ২০১
১৮। নেহরু-সত্যো-রহস্য	(আলোচনা)	জ্যোতিপ্রসাদ বসু ... ২০৩
১৯। সেই শ্রবণীয় দিনগুলি	(নেহরু-ভীষনপঞ্জী)	তথ্যবিদ ... ২০৭
২০। মৌন মন	(উপভাস)	সুবোধকুমার চক্রবর্তী ... ২০৯
২১। টিক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	(গল্প)	অরবিন্দ ভট্টাচার্য ... ২১৬
২২। আলোকচিত্র—	...	... ২২৪ (ক), ৩০৪ (খ)
২৩। পদ্মগুচ্ছ—	...	... ২১৭
২৪। তোমাকেই	(কবিতা)	রহুল গামজাতক : অম্ববাদিক—অরুণাচল বসু ... ২২০
২৫। চারজন—	(বাঙালী-পরিচিতি)	
(ক) নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২২১
(খ) শশাঙ্কশেখর সান্যাল	...	২২২

ভাস্কররঞ্জন রায় প্রণীত	আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত	স্কুলের ছেলেমেয়েদের বই—
শ্রীমা সারদামণি ৩.২৫	৭১ সালের নূতন উপভাস	ইন্দিরা দেবী
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৪.০০	দু'য়ে মিলে এক ৪.০০	ইন্দিরাদির গজের খুলি ২.৫০
ভগিনী নিবেদিতা ৪.০০	বনফুল, রাসদ্বন্দ্ব, প্র. না. বি. অবধুত, ধনঞ্জয় বৈ ভাস্কর, শ্রীনাথ, নীলকণ্ঠ, রূপধর্মী, সত্যবতি, সুবোধ, মহাবীর ইত্যাদি ছদ্মনামীদের লেখা—	পূর্ণ চক্রবর্তী
অমরেন্দ্র বোষ প্রণীত	ছদ্মনামা ৩.৫০	সিন্ধবাদ নাবিকের কাহিনী ১.৫০
বিষ্ণুনাথ শ্রীশ্রীতৈলচন্দ্রস্বামী ৪.০০	অবধুত বিরচিত নূতন ধরণের উপভাস	আলিবাণা ১.০০
বাটগাঁও রাসেলের (নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত)	কৌশিকী কানাড়া ৩.৫০	হরীন্দ্র চক্রবর্তী আলাদিন ১.২৫
শিক্ষাপ্রসঙ্গ ৪.০০	শিবরাম চক্রবর্তী (পতাস)	যশোদাকিশোর রায়
পরিব্রাজক প্রণীত	ডালবাসার অ, আ, ক, খ,	জুহুদরবনের গল্প ১.০০
শিক্ষায়তন ৩.০০	লিও তলস্তয় (উপভাস) হাজীমুরাদ ৪.০০	মুরারীমোহন বীট
নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র প্রণীত	মণি সিংহ (") জলভরঙ্গ ৪.০০	সোনালী পাখী ১.২৫
বনের বাসিন্দা ৩.০০	পূর্ণ চক্রবর্তী (") পারশু উপভাস ৩.০০	শিবরাম চক্রবর্তী
[অজয় হাফটোন ছবিগছ নূতন ধরণের বই]	মণিলাল বন্যোপাধ্যায় সাথী ২.০০	রসময় যার নাম ১.৭৫
	ঐ বধুবরণ ২.৫০	ফাস্ট বয় ১.৭৫
		কাকাবাবুর কাণ্ড ১.৫০
		স্বপনকুমার গজের ঝর্ণা ১.৫০
		দেবদাস দাশগুপ্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত)
		আজব কল ১.৫০
		মণি সিংহ (সিনেমায় রূপায়িত)
		চোর ৩.০০
		ইজিত ২.০০

কলিকাতা পুস্তকালয় : ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

## পৃষ্ঠাপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
(গ) গীতা মুখোপাধ্যায়	...	২২৩
(ঘ) বগাইলাল মুখোপাধ্যায়	...	২২৪
৬। স্বীকৃত ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)	হিমাংতভূষণ সরকার	২২৫
৭। সৈকন্ত (কবিতা)	কনক মুখোপাধ্যায়	২৩২
৮। বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ (কাহিনী)	শচীন্দ্রনাথ বসু	২৩৩
৯। গির্জায় শঙ্খধ্বনি (সংগ্রহ)	...	২৩৯
১০। এক কলেজের চারটি মেয়ে (উপন্যাস)	রাণু ভৌমিক (দাস)	২৪০
১১। বিজ্ঞান বার্তা—	...	২৪৯
১২। ঘুম—আয়—আয় (সংগ্রহ)	...	২৫১
১৩। উদ্ভিদ-অভিধান	...	২৫২
১৪। অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞ—		
(ক) বসন্ত প্রবাসের দিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	কৃষ্ণা বসু	২৫৬
(খ) মৌন বন্ধন (গল্প)	মীরা দাস	২৬১
(গ) ভাষনা থেকে (কবিতা)	কৃষ্ণা ঘোষ	২৬৬
(ঘ) বাঘাবর (কবিতা)	প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়	ঐ
১৫। মিস শেলী দত্ত (গল্প)	রণজিতকুমার সেন	২৬৭

### “জীবনী-জিজ্ঞাসা” গ্রন্থসমূহ

॥ মণি বাগচি রচিত ॥

রামমোহন (২য় সং)	৫.০০
ইকেল	৪.০০
হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৪.৫০
কশবচন্দ্র	৪.৫০
।।চার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৪.৫০
মেশচন্দ্র	৫.০০
মাসী বিবেকানন্দ	৫.০০
ঐগুরু সুবেন্দ্রনাথ	৬.০০

### জীবনী-জিজ্ঞাসা--৯

“FREEDOM FIRST, FREEDOM SECOND, FREEDOM ALWAYS.”

একদা ঝাঁর কণ্ঠ থেকে বজ্রনির্ঘোষবৎ এই মহান্ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, বাংলায় সেই চিরনির্ভীক সন্তান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাতাপকৃষ, স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্থ।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনীকার

মণি বাগচি প্রণীত

শিক্ষায়তন

আশুতোষ

॥ ভূমিকা : অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ॥

বাংলা ভাষায় ইহাই আশুতোষের চরিত্র ও প্রতিভার পূর্ণ-পরিচয় সম্বলিত এবং ইতিহাস-নির্ভর তথ্য সমৃদ্ধ প্রথম জীবনচরিত্র।

॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯ এবং ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-৯

## যুটীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩৬। অভিনয়ের নায়ক	( গল্প ) পার্থ চট্টোপাধ্যায় ...	২৭২
৩৭। পূর্ণ প্রাণে চাবার বাহা	( উপন্যাস ) ক্যাথরিন হিউম : অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়	২৭৬
৩৮। আনন্দ-বৃন্দাবন	( সংস্কৃত-কাব্য ) কবি কর্ণপূর : অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	২৮৮
৩৯। বাতাসী মস্তিষ্ক	( উপন্যাস ) অভিজিতবুদ্ধ বসু ...	২৯৩
৪০। ঐ প্রেম আজ নয়	( কবিতা ) দ্বিজীপ দাশগুপ্ত ...	২৯৮
৪১। রত্নপট—		
( ক ) মনুরো-মিলার সাফাংকার	... হেনরি ড্রাওন : অনুবাদিকা—রাণু ভৌমিক	২৯৯
( খ ) প্রাচীন ভারতীয় রত্নমণ্ড	... ধ্যানেশনাথ চক্রবর্তী ...	৩০১
( গ ) মাসিক বহুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে শ্রীমত্যাজিৎ রায়	... ...	৩০৫
৪২। হৃদয় পাতে	( উপন্যাস ) সুসেখা দাশগুপ্ত ...	৩১১
৪৩। প্রচ্ছন্ন-পরিচিতি—	...	৩১২
৪৪। ছোটদের আলস—		
( ক ) হাজার আলোর অন্ধকারে	( গল্প ) স্বপনবড়ো ...	৩১৩
( খ ) একদিন যা হয়েছিল	( রূপকথা ) দৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	৩১৫
( গ ) ভালো আবৃত্তি করতে হ'লে	( প্রবন্ধ ) অশীশ মণ্ডল ...	৩১৭
৪৫। সাহিত্য পরিচয়—	...	৩১৮

# বস্ত্রশিল্পে মোহিনী ঈশ্বরের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন  
১ নং মিল— ২ নং মিল—  
কুষ্টিয়া, নদীয়া। বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা



অলোক এণ্ড কোং

ই-৭৮, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-১২

সোনার বাঙলার সোনার কাব্য  
কৃতিবাসী রামায়ণ

আদি কবির মহাকাব্য সংস্কারে সংস্কার করিতে সাহসী  
হই নাই। মহাকাবি কৃতিবাসীর এই সর্বস্বত্বস্বন্দর ছাড়বান-  
হীন সুপরিষুদ্ধ রাজাধিরাজ সংস্করণ সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ  
প্রকাশিত। উপহারে প্রিয়জনরঞ্জন ৪০খানি চিত্রে  
চিত্রময়। মূল্য ৮ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

## মুদ্রাপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৪৬। নাচ-গান-বাজনা—		
(ক) রাগসংগীত কোন্ পথে ?	(প্রবন্ধ) মহম্মদ গুপ্ত	৩২২
(খ) আমার কথা	(আত্ম-পরিচিতি) কল্যাণী রায়	৩২৪
৪৭। নভোনিল	(উপন্যাস) প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩২৫
৪৮। বারকো বারাগলী	(তীর্থ-দর্শন) নীলকণ্ঠ	৩২৬
৪৯। প্রেম	(কবিতা) সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়	৩৩১
৫০। আর এক আকাশ	(উপন্যাস) তপতী রায়	৩৩২
৫১। সম্পাদকীয়—		
(ক) মহানারকের মতা প্রয়াণ	...	৩৪৭
(খ) স্বাগত লালবাহাদুর !!	...	৩৪৯
৫২। শোক-সংবাদ—		
(ক) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	৩৫০
(খ) হিমালয় রায়	...	ঐ

<p>মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭ সুভাষচন্দ্র বসুর তরুণের স্বপ্ন ২১০ নূতনের সন্ধান ২</p>	<p>গোপাল ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস শেষ প্রদীপ শিখা চার টাকা পকাশ নং পঃ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস জীবনবন্দী ৬১০</p>	<p>তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস ডুবনপুরের হাট ছয় টাকা জগদীশচন্দ্র ঘোষের নূতন উপন্যাস শহীদ ৫১১ যাত্রিদল ৬১১</p>
<p>তপতী রায়ের উপন্যাস একটি সোনা মন ৬ নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সত্ত্ব প্রকাশিত মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫১০ সুমথ ঘোষের সত্ত্ব প্রকাশিত উপন্যাস মেঘ ডাঙা রোদ ৫১০ অনাথবন্ধু বেদজ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫১১ দায়রা আদালতের আভিনায় অভিনয় আসামীদের জীবনালেখ্য চিত্রগুপ্তের এরা অভিস্রুত আসামী ৩১০</p>	<p>অভিযাত্রীর উপন্যাস স্মৃতির মুকুট ৬৫০ অনির্বাক শিখা ৫ নষ্টচন্দ্রের আলো ৬ পূর্ণচন্দ্র শ্রী ই-এর উপন্যাস পথ হতে পথে ৩ অশোকচন্দ্র গুহ অনুদিত বনেদী ঘর ৩১১ নগরীতে বাড়ি ৫ বিহনাথ চট্টোপাধ্যায় অরণ্য বাসর ৬ ছায়ানট ২১১ প্রমথনাথ বিন্দীর নীলবর্ণ শূগাল ৪ বাংলার কবি ৪ যা হলেও হতে পারতো ৩১১ রামপদ মুখোপাধ্যায় দুরন্ত মন ৩ মাটির গন্ধ ৪ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সুন্দরী কথাসাগর ৫১১</p>	<p>অন্তিম মুখে—জানালার ধারে ৪ বনফুল—উজ্জ্বল ৩১১ বিভূতি মুখে—আনন্দ নট ৩ শক্তি পদ রাঙ গুরু—বনমাধবী ৩১১ আশাপূর্ণা দেবী—অভিজ্ঞান ৩১১ সত্যব্রত মৈত্র—বনছবি ২১১ মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মুখ্য ৩ ইন্দুমতী ভট্টাচার্য—আতপ্ত কাঞ্চন ৩ বেলা দেবী—জীবন ভীর্ণ ৩ অখিল নিয়োগী—বহুধর্মী ৩ রামপদ ঘোষ—আমার পৃথিবী ভূমি ৩ প্রভাবতী দেবী—উদয় অন্ত ২ বিমল কয়—দ্বিবারাত্রি ৩ গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরী ৪ তারশঙ্কর বন্দ্যো—রবিবারের অসর ৩ রাজকুমার মুখে—শয়তানের জলা ২ তারকপদ চট্টো—কুমারী ধরম ৫১ কৃষ্ণাঙ্ক বন্দ্যো—কালো চোখের তারা ৩১১</p>
<p>শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২২৮৪</p>		



# রাশ্মিডামা কেমিক্যাল এর প্রস্তুত!

...তিনটি উচ্চাঙ্গের কেশরসায়ন।

- আয়না তেল
- তিল তেল
- নারিকেল তেল

শুক, শুষ্ক, স্নিগ্ধ।

সকল জাতের চুলের পক্ষে  
আদর্শ কেশতৈল।

গন্ধ নাধুর্য্যে প্রশংসার দাবী রাখে।



মোটক ওজন ও মাপই হ'ল একমাত্র আইনসঙ্গত  
পরিমাপ—গাড়ির হিসাবে বেচাকেনা করবেন না



কেবলমাত্র

# মিটারে

কিনুন



বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের এই প্রথম  
অভিনব রহস্য রচনার সংকলন।

## র হ স্যে র স্বা দ স্ববন্ধু ভট্টাচার্য সম্পাদিত

এতে লিখেছেন :—তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বনফুল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুবোধ ঘোষ ॥  
বিমল মিত্র ॥ নবেন্দু ঘোষ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥  
রমাপদ চৌধুরী ॥ বিমল কর ॥ সমরেশ বসু ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারী ॥ চিরঞ্জীব সেন ॥  
অঙ্গীশ বর্দন ॥

এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার-ধন্য

শঙ্করনাথ রায়ের

### ভারতের সাধক

১ম—৬.৫০ (৪র্থ মুঃ), ২য়—৬.৫০ (৩য় মুঃ)

৪র্থ—৬.৫০ (২য় মুঃ), ৫ম—৬.৫০ (২য় মুঃ)

তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

নীলকণ্ঠের স্মরণীয় গ্রন্থ

### বার্দ্ধক্যে বারানসী ৫.৫০

(প্রথম পর্ব)

প্রথম পর্বের দ্বিতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

দারেশ শর্মাচার্যের

মাহ্যাকঙ্কণ ৩.৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অজ্ঞাতবাস ৫

ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি ৪.৫০ (২য় মুদ্রণ)

সৌরীন সেনের সুন্দর উপাখ্যান

### অন্য কোনখানে ৫.৫০

C.F. Andrews-এর What I owe to Christ-এর সার্থক অনুবাদ

### ঋণাজালি ৪.৫০

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর

কনকদীপ ৩

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

ত্রিশকু ৩

শিবনাথ শাস্ত্রীর Men I have seen-এর সার্থক অনুবাদ

মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে ৩.৫০

অনুবাদিকা—মায়া রায়

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥

স্বপ্ন কি সত্য হয়? স্বপ্নে দেখা এক প্রগলভার আত্ম-কথার  
রোমাঞ্চিক উপাখ্যান।

প্রাণতোষ ঘটকের স্বপ্ন-অভিসার

নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা রতন সান্ত্বালের

### নদী প্রান্তরে

॥ খণ্ডে খণ্ডে বিতক্ত একটি আশ্চর্য আর অপূর্ব ঐতিহাসিক উপাখ্যান ॥

সুদীপ্ত আচার্যের ভারতের বাঈ বেগম প্রথম পর্ব মোঘল আফগান

॥ মোঘল আফগান ইতিহাসের তথ্যের ভিত্তিতে যত প্রেমের পূর্ব কাহিনী ॥

শঙ্করনাথ রায়ের

অসামান্য প্রতিভার

একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর

## অ র ত তী র্থ

প্রকাশের

প্রত্যক্ষায়



বাহাদুর মাস্তকা

৮৭, বর্মভল ষ্ট্রট, কলিকাতা

# স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থাতিথ

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মৃতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই চৈত্রের বই

‘বনফুল’-এর উপগ্রাস

স প্ত র্ষি

৬.০০



এ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ'র

আকাশ ও পৃথিবী

১০.০০

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপগ্রাস ও গল্পগ্রন্থ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

অমৃত সঞ্চয়

৮.৭৫

দিলীপকুমার রায়ের

জাবি এক হয় আর

৮.৭৫

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বাসর লগ্ন

৮.৭৫

সন্তোষকুমার ঘোষের

পারাবত

৩.০০

বিমল মিত্রের

পুতুল দিদি

৩.০০

‘বনফুল’-এর

ত্রি বর্ণ

১০.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

বার ঘর এক উঠোন

৮.০০

দুই পথিক

২.৫০

নীররাত্রি

৩.৫০

স্বাবর

৮.০০

নবেন্দু ঘোষের

প্রথম বসন্ত

২.৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কাঞ্চনমূল্য

৬.০০

পাপুই দ্বীপের কাহিনী

৩.৩০

রিক্শার গান

৫.০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



ନାମିତ୍ତୁ ସମସ୍ତେ

|| ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୭୧ ||

ଆମ ବାଣୀ

—ଦ୍ଵିନିହାରକମ ସେନାପତି

( ୫୫୫୫ )



৪৩শ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১



প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা

# মাসিক বঙ্গমজা

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়।

ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সন্মত।

পুরাণাদি অজ্ঞাত পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা ঋতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

'সত্য' দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পক্ষে স্মৃতি-গ্রাহ্য ও তত্প্রাপ্যস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় শূন্য যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

'বেদ'-নামধের অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিত্তমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বাহ্যর সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবিস্কৃত হন, তাহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।

এই ঋষি ও বেদভ্রষ্ট হলাভ করাই বথার্থ ধর্মাত্মত্ব। যতদিন ইহার উন্মেষ না হয়, ততদিন 'ধর্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্মরাজের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জ্ঞানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিরা বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, বা কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

অলৌকিক জ্ঞানবেত্ব কিংবা পরিমাণে অসম্পূর্ণ ইতিহাস

## কথামৃত

পুরাণাদি পুস্তকে ও য়েচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সঙ্গ্রহ বলিয়া আর্ষজ্ঞাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ'-নামধের চতুর্বিজ্ঞত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজ্যই এবং আর্ষ বা য়েচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্ষজ্ঞাতির আবিস্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও ব্রূহিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই 'বেদ'।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল, মায়াদিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি-নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচার সকলও সংশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসংবাদী ইহায়া পুহাত হইবে। সংশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্ষজ্ঞাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়্য-পারলৌকিক-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ-কাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্ৰতিহত বিধায়—সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

—হামা বিবেকানন্দের বাণী হই

নিৰ্ণয় অত্যাচাৰই শুধু নয়—বিবিধ ধৰণেৰ অনাচাৰ,

বিশেষ কৰে মেয়েদেৱ প্ৰতি জঘন্য আক্ৰমণেৰ জঙ্ঘা অচিৰেই কুখ্যাত হয়ে উঠল নাংসী কৰ্নেল ৱেইন হাৰ্ড ভন মেলজাৰ। জাৰ্মান অধিকৃত ফৰাসীদেশেৰ ছোট শহৰ, কোলমাৰ। মাত্ৰ হাজাৰ পঁয়তাল্লিশ অধিবাসী। এই শহৰটিৰ ইতি-কর্তা-বিধাতা হয়ে যেদিন বিপ্লৱ বছৰেৰ শ্ৰোট অতি নিষ্ঠুৰ-স্বভাব কৰ্নেল এল, সেদিন থেকে লোকেদেৱ আৰ শান্তি ৰইল না। শিহৰিত আতঙ্কে প্ৰত্যেকেৰ দিন-ৰাত্ৰি প্ৰায় বিনিস্ত অতিবাহিত হতে লাগল, বিশেষ কৰে তৰুণী মেয়েদেৱ। সুন্দৰী তৰুণী দেখলে আৰ ৰক্ষে নেই। জাৰ্মান কৰ্নেলৰ লালসাসিক্ত নগৰ-দণ্ডী তাকে আঘাত হানবেই।

১৯৪০-এৰ ১৬ই আগষ্ট! যথানিয়মে সন্ধ্যাৰ কিছু পূৰ্বে কৰ্নেল তৰ ৰেঞ্জ গাড়িতে-কৰে টহল দিছিল। সহসা ফুটপাথ দিয়ে যাওয়া একটা সুন্দৰী কিশোৰীৰ দিকে তৰ নজৰ পড়ল। মেয়েটিৰ নাম জেনেভিভ, বছৰ বোল-সাতের বয়স। দেহাকৃতি অতীব সুন্দৰ।

—গাড়ি থামাও! কৰ্নেল হাঁকলো।  
শোফাৰ মুহূৰ্ত্ত ত্ৰেক কবলো।

তাৰপৰ পাৰ্শ্বনালা বডিগাৰ্ড জনৈক 'সার্জেণ্ট ও শোফাৰ হু'জনে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটোৰ দিকে এগিয়ে গেল। জেনেভিভ ওদেৱ পূৰ্বেই দেখেছিল। দেখেই নিকটবৰ্তী বাড়িৰ দরজাৰ দিকে দৌড়ল। কিন্তু সেখানে পৌছবার পূৰ্বেই সার্জেণ্ট তাকে মুখ চাপা দিয়ে ধৰে ফেললো। হু'জনে মিলে প্ৰায় পাজাকোলা কৰে এনে গাড়িৰ পেছনেৰ সিটে কৰ্নেলৰ পাশে বসিয়ে নিল, বললে, চুপ কৰে বসে থাকো—চাঁহকাৰ কৰবাৰ চেষ্টা কৰো না বা কৰ্নেলকে আঘাত কৰবাৰ চেষ্টা কৰো না। মেয়েটি ফাকাশে হওয়া চোখে পাশেবদা কামাসিক্ত কৰ্নেলৰ দিকে তাকালো। তাৰপৰ যখন মনে পড়লো পৰিগতিৰ কথা তখন অঝোৰভাবে কান্দতে লাগল।

সে ই ৰা জে  
মি উ নি সি পা ল  
বিকি-এৰ উপরতলা  
কৰ্নেলৰ কোয়াৰ্টাৰে  
মে ৱে টি ৰ প্ৰ তি  
অবৰ্ণনীৰ অত্যাচাৰ  
সংঘটিত হল। পৰদিন কিশোৰী জেনেভিভ আত্মহত্যা কৰে অপমানৰ  
হালা ছুড়াল।

—আমাৰ মেথেকে যে অত্যাচাৰ কৰে মেয়েছে সেই জানোয়াৰটাকে আমি হত্যা কৰবই। সঙ্গত-ক্ৰোধ গৰ্জে উঠে শপথ নিল পিতা এলবাট।

চমশাপৰা নিৰীহ ধৰণেৰ চাপোৰা মাহুৰাটী কি ছত্ৰই বা আছে এতে

# মেয়ে ঠাণ্ড



(সত্য ঘটনা)

বী  
ক  
চ  
টো  
পা  
ধ্য  
য়



বড় একটা ধাৰা কৰ্নেলকে নিহত কৰবাৰ! জীবনে সে কখনো কোন আশ্ৰয়ান্ত ছুয়ে দেখে নি। মিউনিসিপাল বিকি-এ লুকিয়ে ওঠবাৰ মুখে সে ধৰা পড়ে গেল। হু'জন গেস্টাপো এজেন্ট-এৰ অকথ্য অত্যাচাৰে সে গব স্বীকাৰ কবল। সঙ্গে সঙ্গে কৰ্নেল বিচাৰেৰ ৱাৰ দিলো। তবে বেশ নাটকীয়ভাবে ও উদ্ভুক্তস্থানে শান্তি দেওৱাৰ পক্ষপাতী ছিল কৰ্নেল। তাৰ দ্বাৰা লোকেদেৱ মনে ভীতিৰ সকাৰও কৰা যায়।

বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ '৭১

তাই পরদিন সেন্ট জোসেফ চার্চের সম্মুখে শত শত শহরবাসীর চোখের সামনে এলবার্টকে ফাঁস দেওয়া হয়।

সেদিন রাত্তিরে রেন্ট্রেরেটের মালিক এবং ঐ শহরের দেশপ্রেমিক গুপ্তদলের পাণ্ডা পিয়ারে সেদিলত তার সহকারীকে বললে, এলবার্ট যা করতে গিয়েছিল, তা যে-কোন বাপের পক্ষেই করা উচিত। কিন্তু সে একটি মুর্থ। তাকে সাধারণ ভঙ্গিভাবে হত্যা করলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু ওভাবে সমর রাস্তার ফাঁস দেওয়া অসভ্য জঙ্গীর কাজ।

পিয়ারের চোখে আগুন বিছুরিত হচ্ছিল অসহ্য ক্রোধে। একটি সিগারেট ধরিয়ে সে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল, মানবতার নামে শপথ করছি, ঐ কর্নেল ভন মেলজারকে হত্যা করবই আমি এবং অনতিবিলম্বেই করব।

—খুব সহজ হবে না সে কাজ, অপর এক সহচর চিন্তিতমুখে বললে।

কি ভাবে কার্য হাসিল হবে সে পরিকল্পনা খুলে বলতে সহকর্মীরা স্বীকার করল যে, ইয়া এভাবে করলে সম্ভব। সেদিলত বললে, তা হলে আর দেরি নয়। একটি সন্দরী তরুণী সংগ্রহ কর। যে টাইপ করতে জানে এবং যে মেয়ে নাংসীদের প্রাণের থেকে ঘৃণা করে।

হুঁদিন বাদে অপরূপ রূপসী একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হল সেদিলতের কাফেতে। তেইশ বছরের বিধবা মিমি আউট্রি। স্বামী দেশপ্রেমিক গুপ্তদলের সদস্য ছিল। শত্রুর হাতে নিহত হয়েছে সে।

মেয়েটিকে ঘরের এককোণে টেবিল নিয়ে গিয়ে সেদিলত বললে, কর্নেল একজন মেয়ে টাইপিষ্ট ও পার্শ্বনাল সেক্রেটারীর জগা বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আসল উদ্দেশ্য অল্প মিসট্রেস রাখা। তুমি সে বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন কর। তারপর সমস্ত-সুযোগ উপস্থিত হলে ছুরিকাঘাত করবে জানানোয়ারটাকে।

একটি লিপিক্টকের মত দেখতে স্পিউ-এর ছুরি ওর হাতে দিয়ে বললে, আমি তোমার শিথিরে দেব কি ভাবে এই ক্ষুদ্র অস্ত্র দিয়ে এক আঘাতেই নিমেষে ও নিশেধে হত্যা করা যায়।

পরদিনই মিমি আবেদন করল চাকরীর। অসাধারণ লাভবানময়ী মেয়ে। কর্নেল দেখামাত্র তাকে নিবৃত্ত করে নিল। কিন্তু চুনিয়ার কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। চাকরির সিকিউরিটি অফিসারকে মিমির দেহতত্ত্বাসীর আদেশ দিলে। নাংসীদের নিখুঁত তত্ত্বাসী-কালে আবিষ্কৃত হয়ে পড়ল যে লিপিক্টকটি একটি লুকায়িত অস্ত্র।

পরদিন সেই একই স্থানে, চার্চের সামনে মিসেস মিমি আউট্রির ফাঁস হয়ে গেল। তার মৃতদেহে একটি কাগজ লটকে দেওয়া হল, তাতে লেখা : নাংসীদের সঙ্গে এরকম বজ্রাতি যে করবে, একই পরিণতি হবে তার।

এই বিভৎস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে গিয়ে, দ্রুতপায়ে সহকারী গিয়ে সেদিলতের কাফেতে ঢুকে এককাপ কফির অর্ডার দিল। সেদিলত কফি দিতে এলে নিম্নবরে মিমির ফাঁসির সমস্ত কাহিনী বলল তাকে।

চলন তাকজব হয়ে গেল সেদিলত। নাংসীদের অত্যাচার বড় ভয়াবহ। তবে কি ফাঁসি দেওয়ার পূর্বে মিমির কাছ থেকে গুপ্তদলের অস্ত্রসিদ্ধি সব জেনে নিয়েছে ওরা।

—আমি তা হলে কিছুদিন গিয়ে ওয়ার থাকি। যেটার না আমার অমুসরণ করে। তুমি আমার পিছুপিছু বাবে। যদি কোন চরের সন্ধান পাও তো সহসা চাঁৎকার করে উঠবে ‘আমার মানিবাগ চুরি গেছে’ বলে। সেই গোলমালের মুখে আমি লুকিয়ে পড়ব।

—ঠিক আছে, সহকারী বললে, আগে বাইরের রাস্তাটা আমি একবার দেখে আসি। কফি শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদেই দ্রুতপায়ে ঘুরে এল। টোষাকো কাউন্টারে গিয়ে বললে,—সিগারেট কিনতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর বখন দেখলে কেউ কাছে নেই তখন ফিসফিস করে বললে, সর্বনাশ হয়েছে পিয়ারে। নাংসীরা এই এলাকাটাকে ঘিরে ফেলেছে।

চমকে উঠল সেদিলত, চাপাধরে বললে, এফুণি পালাও। নিজেকে গ্রেপ্তার করিয়ে কোন লাভ হবে না। বলে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে পয়সা নিল।

—ভয় নেই পিয়ারে সব সময়ই তোমার পেছনে আমরা আছি, বলে সহকারী দ্রুত কাফে ত্যাগ করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাংসীদৈনন্দনগণ এবং গোমড়াযুগ্মা এক তরুণ অফিসার দরজা ঠেলে কাফেতে প্রবেশ করল। সেদিলত এক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে হইল তারপর এগিয়ে গেল। সে জার্মানদের বোঝাতে চায় ফরাসীরা ভীষণ কাপুরুষ নয়, যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে তারা সক্ষম।

চৌত্রিশ বছরের দেশপ্রেমিক যুবক সেদিলতের কর্মবাহুতা শুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন ১৯৪০-এর জুনে নাংসীবাহিনী এসে প্রবেশ করে প্যারিস নগরীতে।

হিটলার ফরাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন—‘আপনারা আজ থেকে আমাদের অধগত হয়ে থাকবেন।’

এর ক’দিন পরেই কোলমার শহরে অন্তত পদার্পণ করে বর্বর ভন মেলজার। এসে ঘোষণা করে সে হল এখানকার রাইখস্কমিশার। হাউটরান (রাষ্ট্র) বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ। তাদের কাহারলী অলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করাই আছে : লুইন আর অত্যাচার নিয়ে বিজিত-জনশাসন। কর্নেল ফরাসীদের সর্বাধিক ঘৃণা করত, কেন না এই জাতের গুপ্ত-প্রতিরোধকারীদের দৌরাষ্ট্রো তার মহান বাহিনীর বহু সৈন্যের প্রাণ গেছে ও যাচ্ছে এবং সংঘাতীত সামরিক বস্ত্র ধংসগুণে বিনষ্ট করে দিচ্ছে ওরা। সেই প্রতিহিংসার সন্ত্রাসের রাজত্ব করে তুলেছে এ শহরটিকে, ধনে-প্রাণে-অপমানে জর্জরিত ও বঞ্চিত করে তুলেছে জনজীবনকে।

কিছু কিছু ঘৃণা সহযোগিতা, বিস্মাস্থাতকতার ঘটনা যে নেই এমন নয়। কিন্তু অবিকাশ ফরাসীই গোপনে শপথ নিয়েছে নাংসীদের সর্বপ্রকারে হয়রানি করবার, ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলবার জন্ত। ক্রুদ্ধ ভাষান সামরিক-বিভাগ এই উৎপাতের প্রতিশোধে আদিম বর্বর ও অকথ্য নিধম অত্যাচার চালিয়ে দমন করবার চেষ্টা করছে প্রতিরোধ দলকে। সেই অকল্পনীয় অত্যাচারে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি যে কোন দ্রুতত্রে ভেঙে পড়বে।

এরপর সহসা অদৃশভাবে এক দুর্ভাগ্যময় সঘনিক্তি জেগে উঠল সারা অধিকৃত ফরাসী দেশে। গেরিলা সঙ্গ্রাম শুরু হয়ে গেল। কোলমার শহরে গুপ্তদলের ভাষ পড়ল প্রাক্তন বন্ধার ও বেস্ট্রের মালিক শিয়ারে সেলিতের উপর। অসীম মনোবল ও শক্তির যুবক সে।

বহুকালপূর্বে পুড়ে-বাঁধা একটি বাড়ির 'সেলার'-এ ওরা হেড-কোয়ার্টার করল। বর্তমানে সে স্থানটি মিউনিসিপ্যালিটির জঙ্গল ও ভাঙা কাচ পূর্ণ, আগাছা জন্মেছে। কাকের সাধ্য নেই যে, সন্দেহ করে ওরই মাটির তলার ঘরে গুপ্তদলের ঘাঁটি, গুদাম ও হেড-কোয়ার্টার। খাত, পানীয়, অন্ত্রশস্ত্র গোলা-বাক্স সমস্ত কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত সেখানে। এ স্থানের নাম দিয়েছে ওরা 'গুহা'। এখান থেকেই ও নাৎসীদের ধ্বংস করে, নাৎসী গাড়ি নষ্ট করে, সববাহ ধ্বংস করে এবং বাইরে চালান যাবার জন্তে গুদামে জমা বস্তুসমূহে অগ্নি সংযোগ করে।

এদের ছালায় নাৎসীদের দৃষ্টি বিব্রত, ভীত হয়ে উঠেছে। যা কখনো নাৎসীরাহিনীতে শোনা যায় নি তা-ও হয়েছে, অনেক সৈন্য পালিয়েছে। কর্নেল মহা ক্ষেপে গেছে, গর্জন করে আদেশ দিয়েছে সৈন্যদের ক্ষতি করলে সাংঘাতিক পরিণাম হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দলবলসহ সেদিলত বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কোন ডরকে তোয়াক্কা না করে।

কিন্তু মিমি আউডির ফাঁসি একটা চরম আঘাত এনেছে তার মনে। সাংঘাতিক অমৃত্যু এসেছে। তার জন্তেই বুকি মেয়েটা প্রাণ হারালো। এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই। আগেই বোঝা উচিত ছিল মিমি ধরা পড়বে। কেন সে আরও সাবধান করে দেয় নি। আক্ষশয়ের আর সীমা হইল না তার। ঐ ঘৃণ্য কর্নেলটা যে নিশ্চিহ্ন পাহারায় থাকে একথা তার ভাষা উচিত ছিল।

নাৎসী লেফটেন্যান্ট কর্কশকঠে জিগ্যোস করলে, তুমিই কি এ কাকের মালিক?

—হ্যাঁ স্যার, সেদিলতের মনে সেই যুহুর্ন্তে জেগে উঠল এক বাসনা। মেয়ে না কি ঝাঁপ। ওর পকেট থেকে পিস্তল বের করে শেষ করবে না কি এ কয়টা নাৎসীকে।

—আমরা তোমার এ দোকান তল্লাসী করব, লেফটেন্যান্ট বললে, গতকাল এখানে যে সেক্টি, নিহত হয়েছে তার অন্ত্রশস্ত্র এখানে আছে কি না দেখ।

সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেল প্রতিটি বাড়ি তল্লাসী করতে করতে চলেছে তারা। সেদিলত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভেবে যে, ওরা তা হলে তাকে গ্রেপ্তার করতে আসে নি। সে টোবাকো কাউটারে ফিরে গিয়ে সব সের। দু'টা সিগার নিয়ে এল। একটা লেফটেন্যান্টের হাতে দিয়ে দেশলাই জ্বাললে।

—ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট সিগার ধরিয়ে বললে, আমাদের ঘৃণা করে না এমন একজন ফরাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম।

পরদিন সকালে সহকারী কফি খেতে এলে সেদিলত বললে, আমার স্মারকটি পরিকল্পনা আছে... এর জন্তেও চাই 'শুন্দরী' একটি মেয়ে... তবে এবার আর তাকে ঐ জঙ্গীদের হাতে মরতে হবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় দলীয় আইন-ব্যবসারী এক যুবকের সঙ্গে কাফেতে

এসে প্রবেশ করল অপরাধী একটি মেয়ে। তেইশ বছরের মার্গো সার্ডিন, একজন লাইব্রেরিয়ান। হু'-ড'বার মন্ত নাৎসীসৈন্যের ঘারা পথে সে ধর্মিতা হয়েছে ইতিপূর্বে। বলে নাৎসীদের যে কোন অনিষ্ট করতে সে সব সময় রাজী।

সেদিলত সব ধূলে বলল মেয়েটিকে। প্রথমবারের বিফলতা, তার ভাব্যহ পরিণাম।—এবার মেয়েটি শুধু টোপ-এর কাজ করবে। আমি ও আমার সহকর্মীরা হত্যাকাণ্ড সমাধা করব।

—কি ভাবে, মনোমত ভুক্ত তুলে প্রশ্ন করে মার্গো।

—তা বলব না। ধরা পড়লে তোমার কাছ থেকে ওরা কোন কথা পাবেও না।

—তা হলে এবারও প্রায়নটা বিফল হবে।

—তা হতে পারে। কেন না নাৎসীরা মুখ নয়। তোমার এটা জেনে নিতে হবে যে, সামান্য একটু ভুল হলেই ওরা সন্দেহ করবে এবং অকথ্য অত্যাচার করে সব কথা আদায় করে নেবে। সে অত্যাচার তুমি কল্পনাও করতে পার না।

মেয়েটি কিছুক্ষণ গভীরভাবে ভাবল। তারপর সহসা বলে উঠল, ঠিক আছে। আমি রাজী।

—বেশ, সেদিলত নিশ্চিন্ত হল, তুমি চাকরীর আবেদন করবে। কর্নেলের পার্সোনাল সেক্রেটারীর চাকরী। পরে তুমি আবেদন অত্যাচার করবে, চাকরী করবার তোমার সময় হবে না, একথা কর্নেলকে জানাবে। তৎপূর্বে তোমার রূপ-সৌন্দর্যের মোহিনী মায়া প্রয়োগ করবে, জানোয়ারটার ওপর। তুমি তোমার স্প্যাটে কর্নেলকে আমন্ত্রণ জানাবে।

—তা হলে আপনি বলছেন সত্যি সত্যি ঐ পাশব প্রবৃত্তির লোকটাকে নিয়ে আমি...।

—হ্যাঁ। শুধু এক রাত নয়, বহু রাত। প্রথম, দ্বিতীয় এমন কি অনেকদিন পঞ্চম ওর সন্দেহ থাকবে যে এর পেছনে তোমার কোন যড়যন্ত্র আছে তাই সঙ্গে আনিবে প্রহরী। তারা এসে সমস্ত তোমার স্প্যাট তল্লাসী চালাবে গুপ্ত অন্ত্র বা গুপ্তদলের সন্ধান। তারপর এক সময় যখন সে ভাবে তুমি প্রকৃতই বিশ্বাসী ঠিক সে সময় আমরা গিয়ে ওকে হত্যা করব।

মার্গোর মুখাবয়ব ঘৃণায় কঠোরভাব ধারণ করল, বলল, ও লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা চিন্তা করলেই গায়ে কাঁটা দেয়... ঠিক আছে, তবুও আমি রাজী। সীমাহীন ঘৃণা আমার ওদের ওপর।

পরদিন চাকরীর আবেদন করল। কিন্তু ইতিপূর্বে লুক্কায়িত ছুরির ঘটনাটি হওয়ায় পুরোপুরি তল্লাসী করবার পূর্বে কর্নেল কোন আবেদনকারীগিকে দেখা পর্যন্ত দিচ্ছে না। বারপাক-নাই অশালীন ও অশোভন প্রক্রিয়ায় তল্লাসী চালালো সিকিউরিটি অফিসারেরা। মার্গো দীর্ঘ-মুখ চেপে আরক্তিম অবস্থায় তা-ও মেনে নিল। তারপর যথারীতি কর্নেল দর্শন এবং মোহিনীশক্তি প্রদর্শন।

সে রাত কর্নেল মার্গোর স্প্যাটে কাটাল।

পরবর্তী কদিন ধরে কর্নেল-এর সঙ্গে একই গাড়িতে করে শহরময় টহল দিয়ে বেড়ালো মার্গো এবং প্রতি রাতে কর্নেল এসে বসবাস করতে লাগল মেয়েটির স্প্যাটে।

দিন দশেক ধরে কর্নেল সমভিষাহারে 'এই রকম জন্মের পর



## যেয়ে কীদ

একদিন মার্গো রাস্তা দিয়ে পায়ে বেঁটে আসছিল সেমিলতের কাফেতে কফি খেতে, অন্তর্নিহিত উদ্বেগ ছিল সেমিলতকে সবাধা দিওনা। সহসা রাস্তার মাঝে একদল লোক মার্গোকে ধরে ফেলে এবং কর্নেলের সঙ্গে যোরবার জঙ্গ ভেবে নিল সে বিশ্বাসঘাতিনী দেশদ্রোহী নারী, ফলে বারোয়ারী প্রহারে তাকে হত্যা করে ফেলল। পরে উলঙ্গ মৃতদেহকে ল্যাংগোটে পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল—সঙ্গে স্বত্তিকারিহিত একটি ছাকড়া কোমরে বেঁধে দিল। তারপর উদ্ভূত জনতা হাওয়া হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগল না।

কয়েক মিনিট বাদে যখন কানে এল এ ঘটনা সেমিলত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। 'একটা আকুল কান্না এসে গলায় আটকে গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, ফের আমারই জন্তে মেয়েটা প্রাণ হারালো, ছি! ছি!

একহুতা বাদে দুর্ধমনীয় এই দেশপ্রেমিক যুবক কর্নেলকে হত্যা করবার আরেকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলল। এটাতেও টোপ হিসেবে একটি সুন্দরী তরুণীর প্রয়োজন। সহকারীদের কাছে বলল, তোমরা বল আরেকটি মেয়ের জীবনের খুঁকি নেওনা কি আমার উচিত হবে? তারপর সবার মুখের দিকে উৎস্রক চোখে তাকিয়ে বলল, যদি নিউও তা হলে কে হবে সেই মেয়ে? সমস্ত ফরাসি মেয়েরা জানে মিমি আর মার্গোর দশা কি হয়েছিল।

আইন-বাবাদারী যুবকটি বললে, আমি একটি মেয়েকে জানি যে আমাদের চেয়েও তীব্রভাবে ঘৃণা করে নাৎসীদের, মেয়েটির ভাই ও স্বামীকে ঐ জানোয়ারটা হত্যা করবার আদেশ দিয়েছে। কারণ? চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণোত্তোগী মত্ত নাৎসীদৈগ্ধ ক'জনকে তারা প্রহার করেছিল। এই অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়।

পরদিন মেয়েটি এল। নাম ইওভেন মিটজ্জার। পরিচাস ছলে বললে আমার আর কি ক্ষতি করবে ওরা। যা করবার তা করেছে, আমার প্রিয় স্বামী, ভাই দু'জনকে খুন করেছে ওরা।

হু'দিন বাদে পরিকল্পনা মাফিক ইওভেনে প্রলোভিত করে নিয়ে এল কর্নেলকে তার গ্যাটে। গ্যাটটি সেমিলতই ওর নামে ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বাবার আগে ছয় জন নাৎসীদৈগ্ধ তন্ন তন্ন করে গ্যাটটি তল্লাস করে।

কর্নেল ভন মেলজার নিয়মিত রাত্রি বাস করতে লাগলো মেয়েটির সঙ্গে তার গ্যাটে। নবম রাত্রিতে সেমিলত তার চারজন সহকারী নিয়ে, এস-এস গার্ডদের পোষাক পরে একটি পেট্রলকার চালিয়ে এসে উপস্থিত হল ইওভেনের বাড়ির দরজায় (গতরাত্রে চারজন জার্মান সৈন্যকে হত্যা করে তাদের পোষাক ও গাড়িটি নিয়ে নেয়)।

বাড়ির দরজার জার্মান প্রহরীকে সেমিলত চোস্ত জার্মান ভাষায় বললে, একজন পলাতক আসানীর খোঁজে এসেছি আমরা। কর্নেলের আদেশে দাঁড়ানো এই প্রহরীটি কিংবদন্তি স্পন্ন ব্যক্তি।

—এ বাড়িতে কোন পলাতক আসামী নেই, প্রহরী বলে ওঠে।

—তুমি এতটা নিশ্চিত হলে কি করে?

—যদি খানেক আগে আমরা বাড়িটা তল্লাসী করেছি।

—তা হলে অবশ্য আমাদের আর তল্লাসীর প্রয়োজন নেই, সেমিলত বললে, অবশ্য এমনও তো হতে পারে, সে লোকটা দোতলার লুকিয়ে আছে।

—অসম্ভব! প্রহরী বললে, দোতলার আরও দু'জন প্রহরী রয়েছে।

—এত প্রহরী! সেমিলত কপটবিশ্বাসে জিগোস করলে, কি ব্যাপার হয়েছে এ বাড়িতে?

—কর্নেল ভন মেলজারের বর্তমান মেয়েবন্ধু এখানে থাকে। এবার যা জোগাড় করেছে কর্নেল, বলতে নেই, বহুত আচ্ছা টীজ। উঃ কি লাভলি ফিগার--

কথা শেষ হল না তার। সেমিলত তার বৃকে একটি ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করে দিল। তারপর সদলবলে দোতলার উঠে এল। দোতলার দু'জন প্রহরী আছে এটা জানা গেছে।

সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে দেখে সবাই একযোগে সহসা উঠে এল বাহান্দার। একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন প্রহরী। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো,—কি ব্যাপার। তোমরা ওপরে কেন? নীচের ঐ গ্যাডোলাটা বলে নি কিছু? বাও, গেট আউট!

সেমিলতের রিভলবার গার্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী দু'জন মেঝেতে পড়ে গেল।

অবশেষে সহকারী একজন এক লাঞ্ছি মেরে দরজা খুলে সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো একজন।

কর্নেলের অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থা ও পরিবেশ। আরক্তিম মুখে, বিশ্বয় বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকালো ওদের দিকে।

সেমিলত বলে উঠল, হে ফরাসী ভদ্রলোক, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

—আমি ফরাসী নই--কি--কি ব্যাপার কি--কোন ইডিয়ট তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে?

ইওভেনের দিকে ফিরে সেমিলত বললে, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও, নয়ত তোমাকেও আমরা গ্রেপ্তার করব, বলে চোখ ইসারা করে মুহূ হাসল সে। মেয়েটি নতমস্তকে বেরিয়ে গেল।

তারপর সেমিলত কর্নেলকে হাতকড়া পরাবার আদেশ দিল সহকর্মীদের। পিঠিমাড়া করে হাতকড়া লাগানো কালীন ত্রুদ গর্জন করতে লাগল কর্নেল। কেবলই বলতে লাগলো এই অনধিকার প্রবেশের জন্ত, এই ভুলের জন্ত তাদের পরে অকল্পনীয় পরিতাপ করতে হবে।

কর্নেলের মুখে একটা কাপড় ভাঁজ দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। রাস্তায় এসে পেট্রনের সিটে বসিয়ে দিল। তারপর ছুরিকা হত একতলার প্রহরীর দেহটা টেনে এনে গাড়িতে তুললো। গাড়ি ছেড়ে দিল।

হু'মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় দেখা গেল একদল সুরামত্ত নাৎসী সৈন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে করতে পথ চলেছে। গাড়ি থামাল সেমিলত। ঐ সৈন্যদের দিকে চেয়ে বললে, বন্ধুগণ দেখে যাও এই ফরাসী লোকটা আমাদের এক সত্যথ্যকে হত্যা করেছে। বলে কর্নেল ও প্রহরীর মৃতদেহটা নির্দেশ করল।

—বন্ধুগণ এসে এ লোকটাকে কীসি লটকে ঝুলিয়ে দিই। আমাদের কর্নেল ভাববে এ লোকটাকে দেশদ্রোহী ভেবে ফরাসীরাই লটকে দিয়েছে।

মত্ত সৈন্তরা চিংকার করে উঠল—বহুৎ আছা। ঢালাও একুশি খুনি ফরাসীটাকে খুলিয়ে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল ভন মেলজারের মৃতদেহ একটা ল্যাং-শোর্টে গলার দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে লাগল। সেমিলত ও তার সহকর্মীরা ইতাবসরে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ঝুলন্ত দেহের কাছে এসে একটি প্রকৃত গাড়ি থামল ও সুরামত্ত সৈন্তদের শ্রেণীর করল।

## হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা

অভিজ্ঞ চিকিৎসক ‘অগাস্ট উইসমান’ একদা ঘোষণা করেন যে, কোন মানুষ জীবিত থাকাকালে যদি কোন পীড়া বা কু-অভ্যাসের শিকার হয়, তা’হলে তার প্রভাব বংশানুক্রমিক হওয়ার আশঙ্কা নেই বলাটাই সঙ্গত। ১৮৯১ সালের জন্মানসে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের ঐ ধরনের মন্তব্যে একটা বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়াই দেখা দিয়েছিল সেদিন; ‘বংশগত’ কথাটার গুরুত্বই যেন উড়িয়ে দিতে চেষ্টাছিলেন তিনি। সন্মাত্রের হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা বা উত্তরাধিকারকে সবদেখে এবং সবকালেই মানুষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে থাকে, যার জন্য পাগল বা কোন দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পুত্রকন্যারও সমাজের চোখে একরকম পারিষদ বা অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হয়, খুব বিশেষকণ্ড ছন্দরবান মানুষও ঐ ধরনের ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়ের বিবাহ দিতে চান না সহজে, এটা ধরেই নেওয়া হয় যে আপহৃদন্তিতে স্তম্ভ ও সহজ মনে হলেও ঐ ধরনের ছেলেমেয়েরা অলক্ষ্যে বংশগত রোগ বহন করেই এবং যদি বা কদাচ তা না-হয় তা হলেও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যে করবেই তাতে সন্দেহমাত্র নেই; অর্থাৎ কার্যে ঘৃণ্য দরলে একদিন না একদিন যেমন সমস্ত কাঠটা বরবাদ হয়ে যেতে বাধ্য, যুগধরা বা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বংশও তাই। কিন্তু ‘ডাঃ অগাস্ট উইসমান’ প্রথম প্রতিবাদ করলেন ঐ-ধরনের মতবাদের, বলিষ্ঠকণ্ঠে জানালেন যে, এ ভুল, এ অজ্ঞার, কোন ব্যাধি বা অনিষ্টকর অভ্যাস কখনও কখনও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়ে থাকি, তা যেনে নিলেও একথা কখনই সত্য নয় যে, সে-রকমটাই ঘটা অনিবার্য। নব-নারীর এমন অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অনেক সময়ই তাদের সন্তান-সন্ততিতে অশাশ্ব, আবার অনেক ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের মাঝে তার পূর্বপুরুষের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না; এজন্যই খুব সাধারণদর্শন দম্পতির কোলেও মাঝে মাঝে দেখা দেয় কুপূর্বদর্শন শিশু, আবার অত্যন্ত স্তম্ভদর্শন দম্পতির পুত্র-কন্যারও মাঝে মাঝে হয় শুণ্ড সাধারণ রকমেরই নয়—অসাধারণ রকমের কুৎসিত। এর মধ্যে আবার মতভেদও দেখা যায়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ল-অক্ষ-হেরিডিটি বা উত্তরাধিকার, ধানিকটা বাতাবিক ব্যাপার হলেও যে ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসগণ্ড সে ক্ষেত্রে তা বংশানুক্রমিক হওয়ার কোন আশা বা আশঙ্কা নেই; অর্থাৎ জীবদশায় পিতা বা মাতার কোন একজন যদি মৃত্যুপানের অভ্যাস করে বা কোন দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগে তা’হলেই তাদের পুত্র-কন্যার জীবনেও যে উত্তরকালে

দু’দিনব্যাপে কর্মলগ্নকে যে খুলিয়ে দিয়েছিল তার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল।

সেমিলত-এর কাফেতে এসে সেই লেকটেন্যান্ট বসছিল একদিন, সৈন্তগুলি এক আজগুবি মিথ্যা কথা বলছিল। কর্নেল ও মৃত এক সৈন্তসহ নাকি আমাদের এক পোটলকার গুদের কাছে গিয়েছিল। অবশ্য কেউই গুদের কথা বিশ্বাস করে নি।

লেকটেন্যান্টকে কফি দ্বিত্ব দিতে হেসে সেমিলত বললে, ওরকম আজগুবি কথা কেউ বিশ্বাস করে। যতদূর গাঁজাখুর কাহিনী, হ’।

তার প্রভাব পড়বে এমন কোন কথা নেই। উত্তরাধিকারকে একেবারে অস্বীকার না করেও অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে মানুষ যেসব অবস্থার সমুখীন হয়, তার প্রভাব কখনই বংশানুক্রমিক হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির জনক-জননীর মধ্যে একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অপরজন কৃষ্ণচর্মের অধিকারী হলে সন্তানের বর্ণ বাদামী বা জামাল হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু কোন ব্যক্তির বর্ণ সূর্যালোকের অব্যবহিত দক্ষিণের প্রভাবে মলিন হয়ে এলে তার প্রভাব মোটেই বংশানুক্রমিক নয়। যে কোন ব্যাধি সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে, কোন শিশু যদি বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, তা হলে যেমন বলা চলে না যে, তার পিতা-মাতার মধ্যে কারুর অঙ্গহীনতার দোষ আছে—তমনিই পাগল বা দুগী রোগগ্রস্ত বা বন্ধ্যা রোগগ্রস্ত পিতা বা মাতার সন্তানের মধ্যেও যে উত্তরকালে ঐ রোগগুলি আত্মপ্রকাশ করবেই, এ কথাও কোন ভিত্তি নেই। অগাস্ট উইসমানের চাক্ষুসিকর ঘোষণার প্রায় দশ বছর আগে আর এক সুখ্যাত বিজ্ঞানী ‘রবার্ট কক্’ এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন; বার্লিন শহরে চিকিৎসা ও মনো-বিজ্ঞানের এক মহতী সভায় তিনি ভাববদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ‘টিউবারকুলাসিস’ বা বন্ধ্যারোগ বিশেষ এক ধরনের জীবাত্মর আক্রমণে মানবদেহে সংক্রামিত হয়ে থাকে, উত্তরাধিকার বা বংশানুক্রমিকতার এ ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই নেই। অবশ্য ঐ রোগ যে সংক্রামক সে ক্ষেত্রে কোন দ্বিমত নেই। ক্যান্সার রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সকলেই অবহিত, প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে ভীষণ শত্রু মানুষের বোধ হয় আর কিছু নেই, কিন্তু বংশানুক্রমিক হওয়া তো নূরের কথা—ক্যান্সার রোগ যে সংক্রামকও নয়, এ কথা আজ এক প্রতিষ্ঠিত সত্য, তবু নিজেদের অজ্ঞতা-বশতই অনেক সময় আমরা নিকট আত্মার মধ্যে এরূপ দেখা দিলে সংক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে পড়ি। পাগলামী বা উদ্ভ্রান্ততা বহুদিনাবধিই বংশানুক্রমিক ব্যাধি হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে, কিন্তু এ ধারণাও ভুল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবেই এ ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে এবং সে সব ক্ষেত্রে অন্তত এ ব্যাধিকে বংশানুক্রমিকতার অভিব্যোগে চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরই নির্ভর করে, আজ মানুষকে আশ্বাস ও আশা দেয় যে হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতা একটা কবীর কথা মাত্র, কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় মানুষের জীবনকে অভিপ্লব করতে সক্ষম নয়।

একাগ্রতা বলতে আমরা সাধারণত কোন একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া বুঝি, কিন্তু মনো-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কথটির একটি স্বল্প তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। একাগ্রতা কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার শেষ নেই। তাঁরা মনে করেন একাগ্রতা সম্পূর্ণ অভ্যাস-নির্ভর নয়—তার পেছনে কিছুটা সহজাত অঙ্গুপ্রেরণা আছে।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন কোন অদ্বীত বিষয়ের প্রতি মন যখন একান্তভাবে প্রাণীকৃত হয় তখনই তাকে মনের একাগ্রতা বলা যায়। একাগ্রতা সামান্যতম পরিশ্রমের ফল নয়। এমন অনেকে আছেন যারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মনকে একাগ্র করতে পারেন না—বিপরীতে এমন অনেকেই আছেন যারা সহজে একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেন। তাই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, একাগ্রতা যেমনই নয় পুরোপুরি অভ্যাসনির্ভর, তেমনই নয় সম্পূর্ণ সহজাত।

একাগ্রতার মূল কথা মনোযোজন বা concentration (স) (অর্থাৎ সমস্ত চিন্তাশক্তি একটিমাত্র বিষয়ে নিয়োজিত করা)। কোন বিজ্ঞান-বিষয়ক চিন্তা নিয়ে আমি যখন মগ্ন থাকি তখন অত্যাধিক বিষয়ের প্রতি আমার মন থাকে উদাসীন অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে আমি স্নানাহারের কথা ভুলে যাই। তাই একাগ্রতাকে বলা হয়—

“The state of consciousness, that degree of being consciousness, which guarantees the best results of mental labour.”

কোন বিষয়ের প্রতি মনের একাগ্রতা স্থাপনের জন্যে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

ক॥ কেন্দ্রীকরণ

খ॥ অপসারণ

মনের একাগ্রতা উপরের দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। মনের কেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় বাহ্যিক জগতের নানা ঘটনার ভিড় থেকে মনকে সরিয়ে এনে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর মনকে কেন্দ্রীভূত করা। এই কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াই মনোযোজন বা প্রথম স্তর। যতক্ষণ না কোন বিষয়ের প্রতি মনের কেন্দ্রীকরণ সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা আনয়ন

১। প্রত্যক্ষ একাগ্রতা (voluntary attention) প্রধানত ছ’রকমের—(ক) উত্তেজনার পুনরাবৃত্তি (repetition of stimuli); (খ) নূতনত্ব (novelty); (গ) চরম উত্তেজনা প্রয়োগ (intensive stimuli); (ঘ) গুণ (quality) (ঙ) গতির পরিবর্তন (movements); (চ) মনের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে বাহ্যিকের জগতের মিল (congruity)।

# একাগ্রতা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসম্ভব। দ্বিতীয় স্তরে আমরা নির্বাচিত বিষয়টির চেতনার কেন্দ্রে মনকে স্থাপন করি। একাগ্রতার তৃতীয় স্তর অপসারণ বা displacement। অপসারণ বলতে বোঝায় মনের বিভিন্ন ঘটনাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। বিহিজগতের নানা প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ঘটনা মনের কোণে স্থান পাবে। সেই ঘটনাগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা সম্ভব হয়। (২) ঘটনাগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়া বললে একেবারে নিশ্চয় হওয়া বোঝায় না। কেন না কোন ঘটনাই সহজে অচেতন মনের গহন কোণে হারিয়ে যায় না—তা অধচেতন (sub-conscious) মনে অবস্থান করে। তারপর আবার যখন প্রয়োজন হয় পুনরায় তখন সেগুলিকে চেতন-মনের কেন্দ্রে স্থাপন করা যায়। সুতরাং অপসারণ প্রক্রিয়ার ফলে কোন কিছু ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কোন একটি ছাত্র পড়ার টেবিলে রসায়ন শাস্ত্রের বই নিয়ে বসেছে—কিন্তু পড়ায় কিছুতেই মন বসছে না। কেবলই মনে পড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা দেখা ফুটবল খেলাটির কথা। এখন ছেলের পড়তে চাইলেও পারবে না, যতক্ষণ না সে খেলার কথা মন থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই খেলা দেখার চিন্তাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার নাম অপসারণ বা withdrawal এবং পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার নাম কেন্দ্রীকরণ। মনের কেন্দ্রীকরণ যে মুহূর্তে সমান হয় তখন সচেতন মন কেবলমাত্র একটি বিষয়ের প্রতিই নির্বিষ্ট থাকে এবং তখন কোন কিছুই মনকে সহজে একাগ্রতা থেকে সরিয়ে পাবে না।

২। ‘‘Attention appears in the human mind at three stages of development : as primary attention ; determined by various influences that are able to produce a powerful effect upon the nervous system ; as secondary attention, during which the centre consciousness is held’’ by a certain perception on idea, but is held in face of opposition ; and lastly as derived primary attention which this perception on idea has gained an undisputed ascendancy over its rivals—’

কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা স্থাপন করেকটি হেতু বা condition-এর ওপর নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানে এই হেতুগুলিকে মানসিক, শারীরিক এবং জাগতিক এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

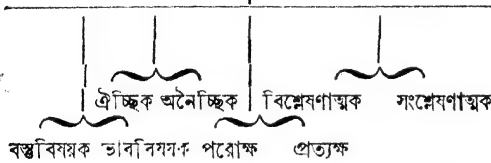
প্রথমত যে বিষয়ের ওপর আমাদের যত বেশি অমুরাগ বা interest সেই বিষয়ের ওপর আমাদের একাগ্রতা তত বেশি নির্ভরশীল। যে পড়াশুনায় বেশি অমুরাগী—যে এক মনে লেখাপড়া করতে পারে, আবার যার খেলাধুলার প্রতি বেশি অমুরাগ সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। (৩)

দ্বিতীয়ত, একাগ্রতার আর একধরণের হেতু আছে যা একান্তই শরীর-নির্ভর (শারীরিক)। দেহ যদি সুস্থ হয় তা হলে সহজেই আসক্ত-বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া যায়। যেমন সকালে উঠে পড়লে তা বেশ ভালো মনে থাকে, কেন না রাত্রের একটানা বিশ্রামের পর মস্তিষ্ক সতেজ থাকে। অকসেসে প্রথম দিকে যেমন মন দিয়ে কাজ করা যায়—দিনের শেষে আর তেমন একাগ্রতা থাকে না ক্লাস্ত শরীরের ভেত্রে।

তৃতীয়ত একাগ্রতার আর একটি প্রধান হেতু হল, চিরাচরিত ঘটনার মধ্যে নতুনত্বের আমেজ। জাগতিক-ক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে নতুনত্ব নেই—কিন্তু হঠাৎ যদি কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, তখন তার প্রতি দৃষ্টি তথা মন আকৃষ্ট হয়।

মনোবিজ্ঞায় একাগ্রতার নানা বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :—

#### একাগ্রতা



বস্তুবিষয়ক একাগ্রতার উপাদান আসে বহির্জগৎ থেকে—বিপরীতে ভাববিষয়ক একাগ্রতার উপাদান আসে অন্তর্জগৎ থেকে। যেমন বাইরে কেউ হঠাৎ কেঁদে উঠলে সেদিকে যখন আমরা একাগ্র হই তখন তা বস্তুবিষয়ক একাগ্রতা। কিন্তু অতীত দিনের চিন্তা ভাব্যতের সুখবপ্ত ভাববিষয়ক একাগ্রতার দৃষ্টান্ত।

কোন কিছুতে সাক্ষ্যল্যাব্দের জন্ম যদি চেষ্টা করা হয় মনেপ্রাণে তখন তা ঐচ্ছিক (Active) একাগ্রতার দৃষ্টান্ত—কিন্তু পড়ার ইচ্ছা নেই, অথচ পরীক্ষার জন্ম পড়তেই হবে—এটি অনৈচ্ছিক (Passive) একাগ্রতা।

চিত্তাকর্ষক বিষয় প্রত্যক্ষ একাগ্রতার অন্তর্ভুক্ত। মনোরম উপভোগ পড়তে যত ভালো লাগে, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের বই পড়তে সকলের মধ্যে তত বেশি অমুরাগ দেখা যায় না। পরোক্ষ একাগ্রতা বিষয়ের ওপর যত বেশি না-নির্ভরশীল, তার চেয়ে অনেক বেশি তার মাধ্যমের ওপর। ক্রিকেট ব্যাট দেখার প্রতি অমুরাগ নেই—কিন্তু ব্রাডম্যান ব্যবহার করেছেন এমন ব্যাট দেখার জন্মে আগ্রহের সীমা থাকে না।

বিশ্লেষণাত্মক একাগ্রতার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে একাগ্রচিত্তে বিশ্লেষণ করা বোঝায়। যেমন একটি ব্যাটেলিয়ানের প্রত্যেক সৈনিককে পৃথক পৃথক করে দেখা। বই ছাপাবার সময় প্রমাণ দেখাও এই জাতীয় একাগ্রতার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। প্রমাণ দেখবার সময় প্রত্যেকটি বানানকে, প্রত্যেকটি অক্ষরকে একমনে মিলিয়ে দেখতে হয়। সংশ্লেষণাত্মক একাগ্রতার বৈশিষ্ট্য হল অংশসমূহের সমষ্টি ও সম্পূর্ণতা। ভালোভাবে পড়তে শিখে গেলে তখন আর বানান করে পড়বার প্রয়োজন হয় না।

একাগ্রতার এই বিভিন্ন রূপই শরীরের ওপর নির্ভরশীল। কোন বিষয়ের প্রতি একাগ্র হতে হলে বিষয়টির ওপর লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়, চোখ খোলা রাখতে হয়, কোন কিছু শোনার জন্মে কান খাড়া করে রাখতে হয়, নিশ্বাসের সাহায্যে গন্ধ উপভোগ করতে হয়। এগুলি সমস্তই শারীরিক ক্রিয়া। একাগ্রতার শারীরিক লক্ষণ-গুলোকে পারিভাষিক সংজ্ঞায় একাগ্রতার শারীরিক সহভাবী (concomitant) বলে।

একাগ্রতার জন্ম সব সময়েই পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। মনোবিজ্ঞানে এই পূর্বপ্রস্তুতি Spare of Attention নামে পরিচিত। এই প্রস্তুতি শারীরিক ও মানসিক উভয় রকমেরই হয়। দৈনিক পরিবর্তন এই জাতীয় প্রস্তুতির প্রধান লক্ষণ। যেমন কোন একটি অভিনয় দেখবার জন্ম দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে সজাগ হতে হয় এবং সেন্সারি একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গান শোনার ব্যাপারটি দেখা যাক। সুরের তরঙ্গ গিয়ে প্রথমে কর্ণপটেই আঘাত করছে এবং তা ক্রমশ মস্তিষ্কের শ্রবণ দেখায় গিয়ে পরিবর্তন ঘটানো। তখন মনের একাগ্রতা প্রথমে গান শোনার জন্মে উদ্ভব হয়ে উঠেছে। আবার ছাত্রাভিবি দেখার সময় চোখ এবং কান—উভয়ই একাগ্রতার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মনেপ্রাণে কোন বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীভূত করার সময় দৈনিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন কোন একটি অজানিত বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম—ধরা যাক বাঘ শিকারের জন্ম অরণ্যে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হয়। তখন লক্ষ্য করণে দেখা যাবে যে, একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার ফলে চোপলকহীন এবং বিক্ষারিত হয়েছে, মুখে রক্তের আভা দেখা

## নব্য আফ্রিকার একটি কবিতা ও এ হৃদয় গাঁথা ছিল

দিয়েছে—দীতে দীত ডেপে বসেছে। এ সবই হার্মোন বা উত্তেজক রসের কাণ্ড।

মনের একাগ্রতা শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই।—অনেকে মনে করেন একাগ্রতার শক্তি কিছুটা সহজাত, ফলে অনেকের পক্ষেই কোন একটি বিষয়ের

প্রতি মনকে স্থির করা সম্ভব হয় না। সব সময়ই তাঁদের মন ভ্রাম্যমাণ—ফলে কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে—সব ক্ষেত্রেই অববিধেয় পড়তে হয়। আবার অনেকের একাগ্রতার ক্ষমতা স্বভাবমুগারী, সেজন্য তাঁরা যে বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা স্থাপন করেন, তা অল্পক্ষণেই তাঁদের মনে গেঁথে যায়।

## নব্য আফ্রিকার একটি কবিতা

আফ্রিকা : ডেকিড দিওপ

[ কবিতার মূল ভাষা ফরাসি। কবির দেশ 'সেনেগাল'। কবির জন্ম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। ইনি একটি বিমান দুর্ঘটনার ১৯৬০ সালে নিহত হন। ]

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা  
গবিত সিপাইদের আফ্রিকা সাতপুরুষের ভিটের  
যে আফ্রিকার গান আমার ঠাকুমা গাইতেন  
দূরের নদীটির তীরে  
কখনো তোমাকে জানলাম না  
কিন্তু আমার শিরায় বইছে তোমার রক্ত  
তোমার অল্পম কালো রক্তেই তো সিঁকিত হচ্ছে ছুঁমি  
রক্ত তোমার স্বদেশের  
স্বদেশ তোমার স্বর্গের  
অম তোমার দাসত্বের  
দাসত্ব তোমার সম্ভানের  
আফ্রিকাই বলেছে আমাকে আফ্রিকার কথা  
কুঁকোঁ পিঠ এই কি তুমি  
যে পিঠ ভেঙে পাড়ছে অপমানের পাহাড়  
যে পিঠ রক্তাক্ত নিয়ে ধরণর করে কাঁপছে  
থর মধ্যাহ্নে চাবুককে নিচ্ছে মেয়ে  
কিন্তু একটি গভীর কণ্ঠ জবাব দিলে আমার  
প্রবল মানবক বুক ওই দৃঢ় জামল  
বুক ওইখানে  
বিস্মিত একাকিণী সাদা এবং ক্যাকাসে ফুলের মণ্ডলে  
ওই তো আফ্রিকা তোমার আফ্রিকা  
বাড়ছে ঠোঁটে একগোঁথা।

অনুবাদক—পৃথীন্দ্র চক্রবর্তী

## এ হৃদয় গাঁথা ছিল

রূপাটী ব্রহ্ম

এ হৃদয় গাঁথা ছিল সুখে-দুখে, মর্ত্য-মানবীর,  
অপরূপ বাখা-খোঁত, রসসিক্ত, ঔষিক কণায়—  
পেরেছে-সে সময়ের-অঙ্গ হ'তে সকাল-সন্ধ্যার  
পৃথীর বর্ণালী বিভা, অম্লকম্পা অনির্ঘটনীয়।—  
উপশ্লব্ধ গতি-রাগ, জাগরণ, সন্মোহ, তস্ত্রিমা,  
প্রেমের প্রতীতি আর বন্ধুত্বের নিবিড় গৌরব—  
আজ সব অম্লকম্পা—নির্জন-আসন্ন, পুষ্পোৎসব—  
পশুমের স্পর্শ-স্বপ্ন, সুকোমল কপোল-লালিমা।—

হেথা জল ভরসিত হাতভঙ্গ কোঁচুল বাতালে  
যুঁকে নিচ্ছে জ্যোতির্মালা অহনিশ।—মায়া-কুজ-কটিকা  
অতঃপর প্রসারিত, রক্ত করি' উছল নাচন  
ভ্রাম্যমাণ রূপের-ভঙ্গিমা, রাখে সেধা কি-আশ্বাসে  
নিরলে মহিমা এক, ঘনীভূত স্থাতি-বিচ্ছুরিকা,  
মহাব্যাপ্তি-মহাশাস্তি বিহ্বলময়ী—রাত্রির-গুণ।—

অনুবাদক—শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ।

# বিবাহিতা স্ত্রী

নর-নারীর মিলনকে যেদিন থেকে সমাজের স্বীকৃতি দেওয়ার আইন প্রচলিত হয়েছে, অর্থাৎ বিবাহ-প্রথার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিবাহিতা পত্নীর সামাজিক অবস্থাবিহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে।

আদিতে পুরুষের কাছে পত্নী একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গবাহক সম্পত্তি মনেই গণ্য হত, বাক্যে সে হরণ করে বা ক্রয় করে রাখ করে নিয়েছে।

আদিযুগের স্বামীর চোখে পত্নী তাই একটা সম্পত্তি, একটা ক্রীতদাসী ও শূন্য-সঙ্গিনী বাস্তব আর কিছু ছিল না; সম্ভবত সে কথা মনে রেখেই নারীর অধিকার সম্পর্কীয় আন্দোলনের এক মুখপাত্র একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, 'স্ত্রী-ই মানুষের আদিমতম পূর্বপালিত জীব।'

ক্রমে ক্রমে যখন নাগরিক সভ্যতার রস আবাদন করতে শিখল মানুষ, তখনই পুরুষের কাছে স্ত্রীর প্রয়োজন অনেকাংশে হ্রাস পেতে লাগল, উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, প্রাচীন গ্রীক নগরীতে ও আজকের দিনের যে কোন শহরের মত পরগা খরচা করলেই রাত্রির আনন্দ ও পেটভরা ভোজ্যপান ছুটে বাঙার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না।

অতএব তখন থেকে বিবাহিতা স্ত্রীকে রাষ্ট্র ও পিতৃপুরুষের জন্ত এক ব্যয়সাধ্য কর্তব্য পালন করার দায়িত্বস্বরূপই মেনে নেওয়া হল।

তখন অবধি স্ত্রীর রাষ্ট্রীয় অধিকার বলতে অবশ্য কিছুই ছিল না। প্রায় একটা শিশুর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকারেরই সমগোত্রীয় ছিল পূর্ববরাহা যে কোন পত্নীর অধিকার, বিবাহ-সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার ছিল না, স্বপ্ন দেওয়ার বা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না এবং কাকুর বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য গ্রহণ করারও উপায় ছিল না কোন, প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সর্বতোভাবেই স্বামীর অধীন সজীব অথচ নিষ্ক্রিয় এক জীব বিশেষ।

রোমে ব্যাণারটা ক্রমে ক্রমে একটা নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ল, শাসক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা থাকার তারাই দেশের সমৃদ্ধির মোটা আশীদার হয়ে কাড়ানোতে ক্রমে এমন হল যে, ধনী ব্যক্তির এমনভাবে কলার দাম্পত্যজীবন গড়ে দিত যাতে তারা বরাবর শিশুর অধীনেই পরিচালিত হতে পারে এবং এর ফলে স্বামীর বদলে শিশু বা পিতৃব্যবসায় পুরুষরাই পরিবারস্থ রমণীদের প্রাধিকার হয়ে উঠল।

এর অবশেষে কলস্বরূপ মেয়েরা স্বামীর কাছে আর ততটা প্রাধান্য দিতে চাইল না এবং ক্রমে ক্রমে প্রাচীন রোমের বিলাসী ধনী-সম্প্রদায়ভুক্তারা স্বামীর প্রভুত্ব সরাসরি অধিকার করে চলেতে শুরু করল। কিন্তু মাত্রা ছাড়ানোর জন্তই এ অবস্থাও স্থায়ী হতে পারল না, ক্রীশ্চান ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আবার শাসিত করার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল নবোন্মুখ, রমণী ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করার মতই স্বামীর আনুগত্য মেনে নাও।

বিধান দিলেন তখনকার ক্রীশ্চান ধর্মের অন্ততম প্রধান হোতা 'সেন্ট পল'।—ক্রীশ্চান ধর্মের আদিযুগে পত্নীর নিজস্ব বলতে আর কিছুই রইল না যেতে কিন্তু তাও পুরুষকে কালিজে অধিবাসিত কিছুই এনে দিতে পারল না। মেয়েদের শরতানের দায়পালন বলে অভিহিত করে ফতোয়া দিলেন তৎকালীন ধর্মীয় হর্ষ-কর্তা

বিবাহিতা এবং নিজের স্বীকৃতি ইচ্ছাযুক্ত গভোগ করলে 'দেশে দেশের চোখে বিকৃত হল পুরুষ।

যে অত্যধিক মাত্রায় স্ত্রীকে ভালবাসে, সে পুরুষ সম্প্রদায়তীয় আর কিছুই নয়—বলকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন সেন্ট জেরোম—মধ্যযুগে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল 'শিভালারী' নামে এক মনু কথ্য, এক নতুন ধারণা; জোর-জবরদস্তির বদলে নারীর প্রতি সম্মানে, শ্রদ্ধায় গৃহগত হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিল পুরুষের মনে, একটা চুপনোর আশার মাসের পর মাসও অকাতরে গার করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না সেদিনের সেই শিভালারাস পুরুষের দল, বিপদা কুমারীকে রক্ষা করার জন্ত মধ্যযুগীয় শিভালারাস নাইটের সৃষ্টি হল রাতারাতি। রমণীর মুখের একটুকরো হাসিতেই সেদিন বহু বীরপুরুষের বক্ষরক্ত উড়াল হয়ে উঠত, মুছকেড়ে, দুগধার অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন থেকে নানাবিধ ললিতকলার পারদর্শিতা প্রমাণের জন্তও টোলেটলি হুড়োহুড়ির সীমা রইল না এবং এসবেরই মূল রইল একটাই আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়তমার চিত্ত প্রসাদন; অবশ্য এখানে চুপি চুপি বলে নেওয়াই ভাল যে, প্রায়শ সেই কাম্যকামিনীটি হতেন নিজের স্ত্রী নয় পরস্ত্রী।

বলা বাহুল্য মাত্র এ যুগের মত সে যুগেও পরনারী থুসিস নামক রোগটির প্রাণাণ বড় কম ছিল না। 'বিবাহিতা স্ত্রী তখন নেহাই অপরিভাজ্য এক সামগ্রী মাত্র, অপরের স্ত্রী জাগাত অজ্ঞপ্রেরণা। সঞ্চারিত করত ভাবাবেগ পুরুষস্বদয়ে, মাতিয়ে তুলত তার করনাকে, তাত্তিরে তুলত তার দেহের প্রতিটি তন্ত্রীকে।

রেনেসাঁর যুগে আবার একটা পরিবর্তনের আভাস দেখা দিল, বিবাহ-পূর্ব প্রেমের পঙ্কতি চালু হল অর্থাৎ বিবাহের জন্ত প্রেম নয়, প্রেমের জন্তই বিবাহ এই ভাবধারা জন্মলাভ করল।

'ভালবাসার জন্মের হাত ধরেই বাব বিবাহবেলাতে' নইলে নয়। এই প্রতিজ্ঞা কালিজে হল প্রায় প্রতিটি বয়স্ক ছন্দে।

প্রেমজ-বিবাহ প্রথার প্রচলনও এই যুগ থেকেই। প্রাচীন ধারার অভ্যন্তর সমাজ প্রথমে চমকে গেল, শাসনের প্রচেষ্টার দৃঢ় হল, অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মেনে নিল নর-নারীর যৌথজীবনের এই নব পদ্ধতিকে।

কিন্তু এইবার পুরুষ কিছুটা অসুবিধার পড়ে গেল, জোর করে বা ক্রয় করে যে নারীকে এতদিন সে নিজের সম্পত্তিরূপে পেয়ে এসেছে তার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাপন করাটা বত সহজসাধ্য হয়েছে—এই প্রেমজ-বিবাহের পত্নীর সঙ্গে চলাটা দেখা গেল তত সহজ নয়, মেরে-ধরে বশ মানানোটা যে একেবারে অচলই এই মোটা কথাটা বুঝতে মোটাবুদ্ধি পুরুষেরও সেরি হল না, অথচ কি করলে যে এই আপাত-সুখুমায জীবনটিকে পুরোপুরি আয়ত্তে পাওয়া যায় সেটাও ঠিক করে সমঝে উঠতে পারল না সে।

দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে বুড়ি বুড়ি উপদেশেভরা অসংখ্য বেসব ঘটনাদি এ সময় প্রকাশিত হতে শুরু হয় তাতেই বোঝা যায় যে, এই সময় থেকেই 'বিবাহিতা স্ত্রী'কে নিয়ে প্রথম সমস্তার পড়ে যায় পুরুষ এবং হালে পার্নি না গেলে বিবাহ-বিচ্ছেদের দায়িত্ব হয় সে এমুগেই প্রথম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তো অবস্থা চরমে উঠে গেল, মেয়েরা তারম্বরে অভিযোগ করতে শুরু করলেন যে, যেহেতু তারা কোমল, অসলা ও স্বামীর অধীন, সেহেতু অনেক অজ্ঞান-অজ্ঞান

## বোবা রাতে ও গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

যুববৃজে সবে এসেছেন অতাবধি কিং আর তাঁরা তাসইতে প্রস্তুত নন ;  
অতএব উত্তাল হয়ে উঠল নারীপ্রগতির আলোলন, মেরো শিকার,  
অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবীতে তুমুল ঠটগোলার  
হুট করে শেষে জয়যুক্তা হলেন ; প্রথম প্রথম একটু-আটটু তড়পালেও  
শেষপর্যন্ত পুরুষ সচক্ষেই সবকিছু মেনে নিল ; পুরুষের এই বঙ্গভার  
আর যে কারণই থাক না কেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যুগ-যুগান্ত ধরে নারীর  
উপর কড়'খ করাটা বোধ হয় তাদের নিজের কাছেই ক্লান্তিকর হয়ে

## বোবা রাতে

### শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বোবা রাতের নরম নিকষ-কালো আঁধারে  
শুনেছি কি কোনোদিন কান পেতে  
অস্তরের অন্তর থেকে উৎসারিত  
গভীর নিঃসীম শূন্যতার শব্দহীন আর্তনাদ ?  
গৃহকপোতের পাখার কাপ্টায়  
আর স্বরাপাতার মর্মরে কোনোদিন—কোনো বিনিময় ব্যাকুল যুহুর্তে  
জেগে উঠে নি ময়ূচৈতন্তের কেন্দ্রস্থলে  
চূর্ণার বেদনার নৈর্বাঙ্গিক ধূসর হাহাকার ?  
আন্তর্য জীবনের অর্থহীন অস্তিত্ব,  
হৃষ্টের মর্ম্মলের অঙ্কলীন কাষণ্য  
অতল রাতের সিল্লিমস্তম্বের ক্লান্ত প্রহরে  
তোমাকে ক'রে তোলে নি উদ্ভিস্ত বিবশ বিহ্বল—  
কোনোদিন—কোনো স্তব্ধ, ধ্যানমৌন যুহুর্তে ?  
শ্লিষ্ট কটিকপাতের মতো তোমার কোমল স্রব্ধি  
আর স্তব্ধিত, স্বর্ণাভ নৈশ স্বপ্ন ভেঙে হয় নি শতচূর্ণ ?  
অস্তরের নিভৃত অন্তরালে জেগে উঠে নি  
অনন্ত অভিন্নব উত্তরোল উন্মুখর সশরশূল জীবন-জিজ্ঞাসা,  
নক্ষত্রের অগ্নি-অক্ষরে মেলে নি যার কোনো উত্তর,—  
বা' শুধু জমাট, নির্মম নৈঃশব্দ্যের বৃকের উপর  
অভূত প্রোতাস্থার মতো নিফল হাহাকারে মাথা কুটে ম'রেছে ?  
শাস্ত জীবনের মৃত অসঙ্গতি কোনো নিদ্রাধীন হুঃসহ রাতে  
তোমাকে করে তোলে নি অস্থির, উদ্ভার, উৎস্রক, চঞ্চল ?  
ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—  
তবু অন্ধ, উদাসীন, হুঃসহ প্রকৃতির অসহায় ক্রীড়া-কল্লুক ।  
পশুত্ব আর দেবত্বের অদ্ভুত সমাবেশ,—  
এই তো তুমি আর আমি ।  
মরণের বেলাবালাকার ব'সে অবোধ শিশুর মতো  
রক্তা বীশি বাজিয়ে চলা !  
বৌবনের পুষ্পিত প্রোলাপের পাশে জরায় মোহমূল্যগর,—  
এই তো ক্ষণলীয়মান দুর্লভ জীবন ।  
এই হুঃসহ প্রহসন, এই দুর্বোধ্য প্রচণ্ড প্রহেলিকা,  
এই নির্বোধ, অচিন্ত্য অসঙ্গতি  
তোমায় স্বপ্নের স্তলভ শাস্তিকে করে নি বিদ্রিত, ব্যাহত—  
কোনোদিন—কোনো নিরুদম, নিকন্তর  
বোবা রাতের উদাসীন অন্ধকারে ?

উঠেছিল, আর সেজতাই অবস্থাটার একটু পরিবর্তন হোক এসবকে  
তাজর অবচেতন মনেই একটা তাগিদ দেখা দিয়েছিল । আজকের  
পুরুষ তাই আর স্বামী নয় সখা মাত্র । ভালবেসে নিজের সাথীকেই  
পাশে পেতে চায় যে, 'দ্বী'ও তাই আজ স্বামীর সম্পত্তিমাত্র নয় ।  
প্রকৃতভাবেই জীবনসঙ্গিনী ।

আজকের বিবাহিতা দ্বী কাসুর দাসী নয়, সম্পত্তি নয়—  
স্বাধিকারের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ মানুষ । —শ্রীমতী

## গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা

### জ্যোতির্ময়ী রায়

অস্তরের অন্তরালে হ'তে শোনা যায় ডাক !  
'আসে শোন, পঁচিশে বৈশাখ ।  
বাজা তোর শুভ্র নব শ'াখ ।  
নব বরষের এই শুভদিনে,  
ধ'রেছিল অন্ধে বহুমতী সে চিতনবীনে ।  
জনমের পুণ্যদিন তাঁর আসে ফির,  
সহস্র সহস্র হুটী,—দুতিমালা ঘিরে ।  
তুলিবার নাই কোন ক'াক ।  
বরে নে যে—পঁচিশে বৈশাখ ।  
বাজা, ওরে বাজা নব শ'াখ ।'  
আকাশের গ্রহরাজ—রবি,—  
আলো করে দান,  
জীয়ার জগৎ আর বাচার পরাণ ।  
বিশ্বের বিশ্বরকর দীপ্তোজ্জ্বল 'রবি'—  
জ্ঞানালোক আলিরাছে ঘরে ঘরে,  
আনন্দের হাট বসারেছে, লেখনীতে কবি ।  
যার বাহে শখ, সাধ, বাহা প্রয়োজন—  
নিতে পারে দেখে শুনে বিবিধ রতন ।  
ভরা আছে তারে ভরে,—সে মহা ভাগুরে—  
জীবন-শোভন ।  
'ঘূচাতে আঁধার আর ভরাতে ভুবন । -  
তুইও ভরে রাখ ।

সে মহামণির কণা মনের কোণেতে  
তোরও তোলা থাক—জীবনের ধন ।  
মহিমাযিত দিন ঐ এলো—পঁচিশে বৈশাখ ।  
বাজা ওরে, বাজা শুভ শ'াখ ।'

# জীবনমাত্রের সমস্যা

মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যা প্রকৃতই কঠিন এবং দুঃস্থ। সহজ-সরল এমন কোনো কর্ম্মশীলা নেই যার সাহায্যে এই সমস্ত সমস্যার প্রকৃত এবং স্থায়ী সমাধান হতে পারে। স্থায়ী বলতে একেবারে চিরস্থায়ী অবস্থা। তো আমরা নিশ্চয়ই বুঝবো না—এমন কি হাজার বছরের কথাও নয়—এই পঞ্চাশ, ষাট কি বড়ো জোর একশ' বছরের মতো কোনো একটা সমস্যার সমাধান করতে পারলেই (বিশেষ করে সমস্যাটি যদি মানুষের পারম্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে হয়) আমরা মনে করতে পারি যে, সমস্যাটার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলতে আসলে আমরা যা বুঝে থাকি তা হলো এই যে, সমস্যার কাঠামোতে বড়ো রকমের কোনো একটা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তার দ্বারাই আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়।

মানুষের সমস্যা সমাধানের অমোঘ উপায় হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থিয়োরীর উদ্ভব হয়েছে। বে-গুলিকে প্রায় সমস্ত সময়েই অমোঘ উপায় বলে প্রচার করা হয়েছে বা এখনো হয়ে থাকে—কিন্তু বা প্রকৃতই অমোঘ নয়। যেমন নর-নারীর সম্পর্ক। কখনো দেখা গেছে কোনো মগাপণ্ডিত বলছেন যে, নারীকে পুরুষের কাছ থেকে বতো করে রাখা যায় ততোই মঙ্গল—যেমন এককভাবে উজ্জয়ের পক্ষে তেমনি সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে। আবার ঠিক তার পরের বুগেই দেখা গেছে নামডাক কিংবা পণ্ডিত ডিগ্রির ভায়ে প্রায় সমানভাবে আনত অস্ত্র কেনও পণ্ডিত একেবারে সমান জোরের সঙ্গেই বলছেন যে, নর-নারীর সম্পর্ক কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না যদি তাদের একেবারে প্রথম থেকেই বিনির্ভিতভাবে হেলামেশার সুযোগ দেওয়া যায়। এরা বস্তুই পাম্পনের কাছে থাকতে পারে ততোই মঙ্গল। প্রথমোক্ত পণ্ডিতগণের সহস্রাব্দ যেমন সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না, এই শেষোক্তগণের মধ্যেও ঠিক তেমনি নয়। যে সমস্ত যুক্তি এবং তর্ক এঁরা নিজ নিজ থিয়োরীর সর্বধনে উত্থাপন করে গেছেন তা সবই যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি সবই আবার অসার নয়। আসল কথা হলো তাঁদের থিয়োরীর ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে নানা দোষত্রুটি ধরা পড়েছে।

নর-নারীর সম্পর্কের চূড়ান্ত যে অবস্থা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কজনিত সমস্যা, এ ব্যাপারেও আমরা দেখছি যুগে যুগে নানা বিভিন্ন থিয়োরীর কথা বলা হয়েছে একেবারে অজান্তে এবং অমোঘ সমাধান হিসেবে। কখনো আমরা শুনেছি যে খ্রীষ্টধর্ম ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর নানা জটিল সমস্যার নিশ্চিত সমাধান হতে পারে না। কখনো শুনেছি 'শুধু খ্রীষ্টধর্ম নয়, সেইসঙ্গে চাই খ্রী-শিকার ব্যাপক প্রচার— তা হলেই বাহ্যিক দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তব রূপায়ণের পাঁচশ বছরের মধ্যেই স্থায়ী সমাধান হিসেবে এ দু'টো মতেরই অসারতা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে। তারপর শোনা গেছে—

শুধু ধর্ম বা শিক্ষা কি করতে পারে, আসল কথা হলো মানুষের সমা- সামন্ততন্ত্ররূপ বিলিবাধা। একটা অভিশাপ, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটলে স্বামী-স্ত্রীর বাহ্যিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমরা দেখছি তারপরে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে একে একে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটতে লাগলো, তখন স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের সূত্রের সন্ধান চলেতে লাগলো ঠাট্টা ইঞ্জিনের মধ্যে; অর্থাৎ কি না ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাবার ফলে ক্রমশ যে শিল্পব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটলো তার মধ্যে। আজ এক শতাব্দীর ওপর হয়ে গেল আমরা শুনে আসছি যে, শিল্প-ব্যবস্থা এবং তার যে সংগঠন অর্থাৎ ধনতন্ত্র-এর অবসান ঘটলে কমিউনিজমের প্রবর্তন করতে পারলেই সমস্ত সমস্যার মতো স্বামী-স্ত্রীর সমস্যাও অবসান ঘটবে।

ভাগ্যের কথা যে, গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশে একদিনে বাতাব্যতি রাষ্ট্রব্যবস্থা কমিউনিজমের হাতে চলে যায় নি—কারণ তা হলে আজকের দিনে আর কারো পক্ষেই বাস্তবগত মত প্রকাশের সুযোগ থাকতো না। কমিউনিষ্ট এবং ফ্যাসিস্টদের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উভয়েই সমস্যা-সমাধানের একটা অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে। অস্তুত বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমরা এই জিনিসটাই দেখে আসছি। কমিউনিষ্ট বা ফ্যাসিস্টরা কর্ণধার এরকম বেশিরভাগ রাষ্ট্রই সমস্যা বলা বিশেষ কিছু নেই, সমস্যার কথা শুধোনে কেউই বড়ো একটা উচ্চারণ করে না, কারণ তা হলে তার বা ডাদস (সংখ্যার তার) যতোই হোক না কেন) গলাফাটা যাবার সম্ভাবনা। এই উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে পারলে ধীরে ধীরে হতে পারেন তাঁদের কথা আলাদা, তা ছাড়া আমরা আজ সবাই কমিউনিষ্ট বা ফ্যাসিস্ট দেশগুলির ভেতরকার নানা সামাজিক সমস্যার কথা বা জানতে পেরেছি, তা থেকেই বুঝতে পারি যে পূর্ববর্তী উপায়গুলির মতোই কমিউনিজম মানুষের সমাজব্যবস্থার ক্রমবিকাশের একটা ধারা বিশেষ—যতোই না কেন তাকে বিকাশের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ বৈপ্লবিক আখ্যায় ডুবিতে করা হোক।

একটা কথা বলা সরকার। তা' হলো এই যে, মানুষ তার কোনো সমস্যারই সমস্ত দিক একেবারে বুঝতে পারে না। তা সম্ভবও নয়; কারণ, নূতনতর অবস্থার পুরনো সমস্যাই অনেক নূতন দিক ধরা পড়ে, আর নূতন সমস্যার সৃষ্টি তো হয়ই। কাজেই একথা বলা চলে যে খ্রীষ্টধর্ম, খ্রী-শিক্ষা, সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব বা তার অবসান, ধনতন্ত্র, কমিউনিজম বা ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পরিবর্তনই মানুষের নানা সমস্যার (সমস্যার যে দিকগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলাম) কিছু না কিছু সুরাহা করেছে বটে, কিন্তু নতুন আরো বিস্তার সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা' হলো—সামাজিক সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান সম্ভব নয়। অর্থেৎ পৃথিবীর



মাছুষ কমিউনিজমের আদ্য পায় নি এখনো—কিন্তু এরই মধ্যে কমিউনিজমের পরে কি হতে পারে বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শুধু আলোচনা নয়—সমাজতত্ত্ববিদগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

সমাজের এই যে একটা সদা-পরিবর্তনশীল অবস্থা—এই যে একটির পর একটি খিমেখিমি আংশিক ব্যর্থতা এবং সর্বদা একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা যায় সর্বত্র; এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অনেকের পক্ষেই একটা চূড়ান্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে, কারণ আমরা সকলেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে, এইবার আমাদের সব সমস্তার সমাধান হয়ে যাবে—

অর্থাৎ অল্পক ভিনিসটা হলেই হ'ল আর কি, বাস্, তা' হলে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু তা' সত্যি নয়। সমাজের সমস্তার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে এবং চলেবে। আজকের দিনের মাছুষকে তাই এই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনযাত্রাকে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে এবং আগামী দিনের মাছুষকেও ঠিক সেইভাবেই তৈরি করতে হবে। আমাদের ঠাকুরদার আমলে জীবনযাত্রা যে রকম ছিলো—আজকের দিনে আমাদের জীবন সে তুলনায় অনেক জটিল, কাজেই আমাদের পরে যারা আসছে তাদের জীবন যে আরো অনেক—অনেক—অনেক বেশি জটিল হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। —তথ্যাব্যবহী

## সংবাদপত্র ও জনচেতনা

খবরের কাগজ পড়বার অভ্যাসটি আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, মনে হয় কখনো যদি একটানা সাত দিন পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজ প্রকাশ বন্ধ যায় তা' হলে 'কি হলো পৃথিবীর'—এই কথাটা ভেবে ভেবেই লক্ষ লক্ষ মাছুষ পাগল হয়ে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ম্যাক্স নোর্দে একখানা বই লিখেছিলেন 'ডিক্লনারেশন'। সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ক্রটি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব গভীর চিন্তার ছাপ রয়েছে এ বইতে। তাঁর সময়ে প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রচার ও প্রসার যে হারে বেড়ে চলছিলো তা দেখে নোর্দে'র কিছুটা সিরিয়াস ধরণের ভাবুক মনটি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। নোর্দে'র আশঙ্কা ছিলো যে, খবরের কাগজ পড়বার দিকে সব দেশেই ঝাঁকটা এমন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে যে, অচিরেই সিরিয়াস বই পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং খবরের কাগজ-পড়া জ্ঞান নিয়েই মাছুষ নিজেকে বখেট স্তানী এবং ভাগ্যবান মনে করবে।

'ডিক্লনারেশন' প্রকাশিত হবার পরে একাত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর সমকালে সমস্ত খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা দুই, তিন কি চার লক্ষ ছিলো আজকের দিনে সেই সমস্ত কাগজই বিশ, ত্রিশ কি চল্লিশ লক্ষে পৌঁছেছে। তা' ছাড়া আরো শত শত খবরের কাগজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জন্মলাভ করেছে—বাদের অনেকেরই প্রচার-সংখ্যা বিশ-পঁচিশ হাজার থেকে আরম্ভ করে পনেরো-বিশ লক্ষে পৌঁছে গেছে। মাছুষের ক্রটিগঠনে খবরের কাগজের যে প্রভাব নোর্দে দেখেছিলেন তা প্রবানত ইউরোপ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তারপর থেকে এই দু'টি অঞ্চল বাদ দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অনেক নতুন নতুন খবরের কাগজের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু কমবেশি যে সাড়ে তিশশত দৈনিক খবরের কাগজ আছে, তার ভেতর পাঁচ-সাতখানা বাদ দিয়ে আর সবগুলিই সৃষ্টি হয়েছে বিগত একাত্তর বছরের মধ্যে এবং এই সময়ের

মধ্যেই ভারতের মতো একটা বিরাট দেশে শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকগণ উপনিবেশিকতার অভিযাণ, শাসকজাতির অন্ধ অনুকরণ বর্জন করে একটি বিস্তৃত এবং লক্ষ্যশালী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 'সিরিয়াস' বইয়ের প্রচারও কিছু কম হয় নি। কাজেই নোর্দে'র আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নি বলেই মনে হয়।

অবশ্য এখানে একটি কথা বলা দরকার। সত্তর কি আশি বছর আগে যেমন, ঠিক তেমনি চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগেও, পশ্চিম-ইউরোপ বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খবরের কাগজগুলির সামনে আমাদের দেশের মতো কোনো জাতীয়-মুক্তি জর্জনের সমস্যা ছিলো না, কাজেই চটকদার এবং মুখরোচক খবর পরিবেশন করাটী তাদের প্রধান কাজ ছিলো। নোর্দে'র খবরের কাগজের দ্বারা মাছুষের ক্রটি-বিকৃতি ঘটবার যে আশঙ্কা করেছিলেন তা মূলত খবরের কাগজের ঐ হাড্ডা দিকটা দেখেই।

এয়ারিকটল মাছুষকে 'রাজনৈতিক জীব' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন বাইশ শত বছর আগে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, তারও অন্তত বাইশ শত বছর আগে থেকে মাছুষ কার্বন রাজনীতিচর্চা করে আসছে। কিন্তু তা ছিলো খুবই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ দেশেই কয়েকটি পরিবার রাজনীতি সঞ্চাচ্ছে সচেতন থাকতো। ক্রমশ রাজনীতি সঞ্চাচ্ছে আগ্রহ বাড়তে বাড়তে ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গেছে দেশের বেশিরভাগ মাছুষ প্রাণের দারে দেশের রাজনীতি সঞ্চাচ্ছে সচেতন। আর কম্প বিপ্লবের পর থেকে তো রাজনীতি সঞ্চাচ্ছে আগ্রহ নেই এ বকম মাছুষ খুঁজে বের করতে হবে। সবাই আজ তাত্র দেশের তো বটেই গোটা পৃথিবীর রাজনীতি সঞ্চাচ্ছেই কমাবেশি সচেতন—কর্তৃত্ব কি না ততখাটো শুধু জিজ্ঞাস্য।

আজকের পৃথিবীতে সজাগ মানসিকতার জন্মে তাই খবরের কাগজের অপরিহার্যতা সঞ্চাচ্ছে বিস্তৃত নেই। আর, বাস্তবিকপক্ষে যে কোনো দেশের জনসংখ্যার অল্পশাতে খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা

দেখে সে দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা সৰ্ব্বদা মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। এমিক দিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার দাবী অগ্রগণ্য। পশ্চিম-জার্মানী, ফ্রান্স, ব্রুটন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডাতে দেখা যায় প্রতি হাজারজন নাগরিক প্রায় তিনশ' পঞ্চাশখানা খবরের কাগজ প্রতাহ কিনছেন। সে তুলনার রাশিয়াতে হাজার প্রতি খবরের কাগজ কেনেন মাত্র দু'শো জনে। এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে জাপানই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে খবরের কাগজের প্রচার পশ্চিম-জার্মানী, ব্রুটন বা ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনীয়।

খবরের কাগজের প্রচার অবশ্য দু'টো জিনিসের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত জনগণের শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত তাদের আর্থিক অবস্থা। জাপান যেমন খবরের কাগজের প্রচার বিষয়ে পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলি অর্থাৎ পশ্চিম-জার্মানী, ব্রুটন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ, শিকার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। এই সমস্ত দেশের মতোই জাপানে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দু'জন। এদিক থেকে এই সমস্ত দেশগুলি রাশিয়ার চাইতেও বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে; কারণ, রাশিয়ার অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা আটজন। সাড়ে নয় কোটি মানুষের দশ জাপানে প্রত্যাহ তিন কোটি বট লক্ষখানি খবরের কাগজ বিক্রি হয়, অথচ বাইশ কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যাহ সাড়ে চার কোটি খবরের কাগজ বিক্রি হয়।

জাপানকে বাদ দিলে গোটা এশিয়া এবং আফ্রিকাতে আর একটি মাত্র দেশ পাওয়া যায় যেখানে শিক্ষার প্রসার পৃথিবীর প্রথম সারি দেশগুলির সমপর্যায়ের পৌঁছেছে। দেশটি খুবই ছোট, আরতনও, জনসংখ্যার দিক থেকেও। কিন্তু সব ব্যাপারেই এর উন্নতি বিশ্বরকর ১৯৫৬ সালের হিসেবে দেখা গেছে এদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৫০,০০০ শতকরা নিরক্ষরের সংখ্যা সাতজন। দেশটি হলো ইস্রায়েল। ইস্রায়েলে প্রত্যাহ প্রায় ২,৬৮,০০০ খানা খবরের কাগজ বিক্রি হয়।

এখন পর্যন্ত দেখা যায় শিক্ষার প্রসার ইউরোপে—সবচাইতে কম হয়েছে পর্তুগালে। এদেশে এখনো শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন নাগরিক নিরক্ষর। কিন্তু পর্তুগালেও প্রতি হাজারে প্রত্যাহ বাটখানা কাগজ বিক্রি হয়। দুই আমেরিকার মধ্যে নিরক্ষরতা সবচাইতে বেশি দক্ষিণ আমেরিকার বোলিভিয়াতে। এদেশে এখনো শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ নিরক্ষর। প্রত্যাহ হাজারে কুড়ি জনে এদেশে খবরের কাগজ কিনে থাকেন।

ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা—পৃথিবীর এই চারটি মহাদেশে সংবাদপত্রের প্রচার সৰ্ব্বদা আমাদের কিছু ধারণা হলো। আসুন এবার আফ্রিকা এবং এশিয়ার অবস্থা দেখা যাক।

আফ্রিকার তিনটি দেশ—মিশর, আলজিরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে সংবাদপত্রের প্রচার মোটামুটি ভালো বলা যায়। কারণ, দক্ষিণ-আফ্রিকাতে শতকরা পঞ্চাশ জন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও প্রতি হাজারে বাহায় জন নাগরিক প্রত্যাহ খবরের কাগজ কিনে থাকেন। মিশরে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা পঁচাত্তর জন, খবরের কাগজের প্রচার হাজারে আটশাখানা। আলজিরিয়াতে নিরক্ষর শতকরা আশিজন, খবরের কাগজ কেনেন হাজারে পঁচিশজন। মরক্কো, লিবিয়া এবং টিউনিসিয়া দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপিয়গণের সান্নিধ্যলাভ

করা সত্ত্বেও যেমন ব্যাপক নিরক্ষরতা দ্বা করতে পারে নি, তেমনি খবরের কাগজের প্রচারও জনসাধারণের মধ্যে খুবই কম। কোথাও হাজারে একখানা কোথাও বা দু'খানা। আফ্রিকার নতুন দেশগুলি যারা বেশিরভাগই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে স্বাধীনতালাভ করেছে—তাদের মধ্যে বেশিরভাগ দেশেই জনগণকে শিক্ষিত করে তুলবার জন্যে ব্যাপক সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী দশ কি পনেরো বছরের মধ্যে এই সমস্ত দেশের অবস্থার আবুল পরিবর্তন ঘটবে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমস্ত দেশে গড়গড়তা প্রতি তিন হাজারে একখানা খবরের কাগজ বিক্রি হয় হয়ে নেওয়া যায়।

এশিয়ার মানচিত্রে খুললেই প্রথম যে দেশগুলির প্রতি চোখ যায় সে হলো আরতনে বড়ো করেকটি দেশ। যথা: চীন, ভারত, বাধা, ইন্দোনেশিয়া, পায়ত্ত, পাকিস্তান এবং সৌদি আরব। চীনের জনসংখ্যা বাহাত্তর কোটি ছিল ১৯৬১ সালে। বর্তমানে নিশ্চয়ই আরো বেড়ে গেছে। '৬১ সালে দেখা গেছে এদেশে প্রতি হাজারে চৌদ্দখানা খবরের কাগজ প্রত্যাহ প্রচারিত হয়। সে তুলনার ভারতের অবস্থা খারাপই বলতে হবে, কারণ ভারতে প্রতি হাজারে খবরের কাগজ প্রচারিত হয় মাত্র নয়খানা। পাকিস্তানে খবরের কাগজ চলে হাজারে মাত্র দু'খানা। নিরক্ষরের সংখ্যা চীনে শতকরা পঞ্চাশ জন, ভারতে প্রায় আশি জন আর পাকিস্তানে পঁচাশি জনেরও বেশি। বাধায় নিরক্ষরের সংখ্যা চীনেরই মতো যদিও, কিন্তু খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা সেখানে হাজারে মাত্র আটখানা—এর একটি প্রধান কারণ জনসাধারণের দারিদ্র্য। ইন্দোনেশিয়ার সংবাদপত্রের প্রচার হাজারে মাত্র দু'খানা এবং নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় বাট জন। পায়ত্তে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় নয়। খবরের কাগজ চলে প্রতি হাজার জনে মাত্র তিনখানা। এরপর বলতে হয় মুসলিম জগতের শিরোশোভা সৌদি আরবের কথা। এখানে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় আটানব্বই এবং গড়ে প্রতি দেড় হাজার জন নাগরিক একখানা খবরের কাগজ কিনে থাকেন।

কিন্তু আর্থিক অক্ষমতা যে খবরের কাগজ কিনে পড়বার পক্ষে একটা খুব মারাত্মক প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোরিয়া এবং ফিলিপাইনের তুলনা করলে। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা কোরিয়ার চাইতে ফিলিপাইনে অনেক ভালো; নিরক্ষরতার হারও কোরিয়াতে যেখানে শতকরা বাট, ফিলিপাইনে সেখানে শতকরা পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু তবু দেখা যায় ফিলিপাইনের চাইতে কোরিয়াতে প্রত্যাহ খবরের কাগজ বিক্রি হয় অনেক বেশি। দু'কোটি দশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মানুষের দেশ ফিলিপাইনে মোট বাইশখানা খবরের কাগজের ৪,১৫,০০০ কপি প্রত্যাহ বিক্রি হয়; অথচ কোরিয়াতে দেখা যায় দু'কোটি চৌদ্দ লক্ষ মানুষের মধ্যে পঁয়তাল্লিশখানা খবরের কাগজের দশ লক্ষ কপি প্রত্যাহ বিক্রি হয়েছে। গড় সংখ্যার আনলে দেখা যাবে ফিলিপাইনে, যেখানে গড়ে প্রতি হাজার জন মানুষ কুড়িখানার মতো খবরের কাগজ কিনছেন প্রত্যাহ—সেখানে কোরিয়াতে কিনছেন প্রায় পঞ্চাশখানা।

প্রসঙ্গত বলতে হয় সিঙ্গাপুরের কথা। জনসংখ্যার ফিলিপাইনের দশ ভাগের একভাগ এই ছোট বন্দরে প্রত্যাহ ফিলিপাইনের সমসংখ্যক অর্থাৎ ৪,১৫,০০০ হাজার খবরের কাগজ বিক্রি হয়ে থাকে। অবশ্য

আমাদের দেশে ইদানীং এক শ্রেণীর লোক দেখা যাচ্ছে (এরা বেশির ভাগই হতাশ রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী) যারা কিছুকাল ধরেই এই রকম একটা কথা প্রচার করছে যে, পাকিস্তানে বিপ্লব হলো বলে, আর বেশি দেরি নেই। এটা যে কতো অমূলক ধারণা—ও দেশে যাবার কাগজের প্রচার দেখতেই তা বোঝা যায়। যাবার কাগজের প্রচার যদি জনচেতনার কিছুটা পরিচয়ও বহন করে থাকে, তা হলে মনে হয় যে, পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে কখনো কিছু পরিবর্তন ঘটলেও তার গতি নীচের দিকেই হবে, উপরের দিকে নয়। যে দেশে শ্রান্ত হাজার হ'জন মাছুষ খাবার

ভারতে খবরের কাগজের প্রচার আশাহুরূপ বাড়ছে না কেন ?  
পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে 'প্রেস' স্বাধীন, তার অন্ততম হলো ভারতবর্ষ ।  
এ দেশে খুবই উন্নত ধরনের সাংবাদিকতার ছাপ বহু কাগজই বহন  
করে থাকে । ইংরেজী এবং হিন্দী ছাড়া আঞ্চলিক ভাষাতেও পত্রের  
কাগজের কোনই অভাব নেই । রাজনীতি সম্পর্কে, দেশ বিদেশ  
সম্পর্কে, চাই কি গোটা ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমরা এতোই উৎসাহী যে  
আমাদের সমকক্ষ না কি খুঁজে পাওয়া ভার—এমন কথাও অনেক  
ধুরন্ধর রাষ্ট্রনৈতিক নেতা বলে থাকেন—কিন্তু তবু ভারতে খবরের  
কাগজের প্রচারের অবস্থাটা এতো শোচনীয় কেন ? —সাংবাদিক

## 222

কিন্তু এইভাবে ঘটানেক চলবার পয়েও বন ঝাঁটির সন্ধান মিললো না, তখন একটু-একটু করে ভয় দানা বাঁধতে আরম্ভ করলো মনে। তারপর চীৎকার আরম্ভ করলাম। নানা জনের নাম ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে চোঁচাতে আরম্ভ করলাম। বাঘ হয় মিনিট পনেরো সমানে টেচিয়েছিল। কিন্তু আমাদের গলবলের কারোই গলা ভেসে এলো না উত্তরে। এদিকে তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। ঠিক এমন সময় কিছুটা দুবেই মনে হলো বেন একটা বাঘ গোড়াচ্ছ। এরপর মনে হলো যে চীৎকার করাটা নেহাৎ বোকামি হচ্ছে। জঙ্গলের ভিত্ত-জানোয়ারদের সব ডেকে বুম ভাঙানো হচ্ছে। এইটা মনে হতেই এবার জামা-কাপড় সব শরীরের সঙ্গে আঁটো-সাঁটো করে জড়ির নিলাম। প্রতি পদক্ষেপেই যে আমি নতুন দিকে পা বাড়াত্তিলাম এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কাটারীধানা মুঠোর মধ্যে রেখে বনবাগাড় ভেঙে চলতে লাগলাম আমি। একে ছোটো এবং মাঝারী গাছপালায় জঙ্গল তার কুক্ষপক্ষের রাত, কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ দুটোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলো। ডাইনে-বঁয়ে দু'শাপ থেকেই নানা জঙ্গলজানোয়ার এদিক-ওদিক চলাফেরা করছিল রকমারি শব্দ এবং নানা অজ্ঞতপূর্ব ভাব তখন বুঝতে পারছিলাম। ওরা বাঘ ক্রি আমাকে ওদের রাজত্বের নতুন কোনো বাসিন্দা ধরে নিয়েছিলো। বাঘের শুণু গোঙানি নয় এবার হু' একটা গর্জনও কানে এলো। আমি ততক্ষণ সমস্ত রকম দৃষ্টিভঙ্গির উৎসর্গ উঠে গেছি। টালীগঞ্জ, খুড়ি, বাকের বলে টলিউডের একেবারে খাস স্টুডিয়ে পাড়ার ছেলে আমি টার্ন থেকে বাহাদুর কা খেল কোনো 'বেল'ই বাদ বার না—এ হেন আমি, হাতে বন কাটারী রয়েছেই একখানা—বাঘই হও আর ভুত-প্রেত, দৈত্য-দানব বে-ই হও বাপু এক-আধটা বাতে বসাতে পারি আমি শুধু সেই চিন্তায় বিভোর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সুযোগ আর হয়ে উঠলো না। ষট্টা দুয়েক নিরাক্ষরিত মতো চলতে চলতে একসময় নম্বরে এলো একটা আলো—মিটিমেট আলো। আরো থানিকটা এগোতে বুঝলাম, আলোটা স্থির। সেই বরাবর আরো থানিকটা এগিয়ে বুঝলাম একটা ঘরের ব্যাঙ্গাঙ্গ আলো জ্বলছে।

এবার উর্ধ্বাঙ্গে দৌড়তে লাগলাম আলো লক্ষ্য করে। বনবাগাড় মাঠঘাট পেরিয়ে এগোতে-এগোতে ঘরটার পেছন দিকে গিয়ে পৌঁছতে বুঝলাম, বড় বাস্তার পাশের একটা দোকানঘর। পাঁচ-ছয়জন লোক বসে রয়েছে সামনের দিকে। কান এলো ওদের কথা—আমারই কথা বলছিলো ওরা : আরে, কলকাতার ছেলে—এই গভীর জঙ্গল—

## পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুচি একজন মোয়ে

মোয়ে মুচি দেখেছেন? খুব সম্ভব দেখেন নি। অথচ পৃথিবীর সেরা মুচি একজন মোয়ে। মাম তার বিজিত ঈগ্লসলাইয়ার, বয়স ২৮, থাকে মিউনিখে। সম্ভ্রতি ইংল্যান্ডের ব্র্যাকপুলে আন্তর্জাতিক জুতো মেরামত প্রতিযোগিতার যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বছর বছর যে জুতো মেরামত প্রতিযোগিতা হয়, এই বছরেই একজন মোয়ে তাতে প্রথম হ'ল। কাগজে প্রতিযোগিতার আইনকাহুন পড়ে শ্রীমতী ঈগ্লসলাইয়ার তার বিয়ের জুতোজোড়ার ছেঁড়া তলি, গোড়ালি এবং অজান্তে অংশ এমন লক্ষ্যতার সঙ্গে মেরামত করলে যে, কার সাধ্য বোঝে সেই জুতোজোড়া পুরোনো, সারিয়ে নতুন

আরে সে কি আর আছে এখনো—গ্যাট হয়ে বসে থাক কত আর খুঁজবি, বাবুরা এলে বলবি দেখে এলাম দুটো বাঘে টেনে হিঁড়ে খেয়ে ফেলাছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বললেই বা কি—বাঘের পেটে তো ডকে যেতেই হবে।

বুঝলাম আমার বন্ধুবান্ধবরা এদেরই নিয়োগ করেছিলো ঐ জঙ্গল থেকে আমাকে খুঁজে বার করার জন্তে। এবার যদি সামনা-সামনি আমাকে দেখে তা হলে ওদের কান কি দুর্ভাগ্য হয়ে যায়—এই আশঙ্কা করেই আমি নিঃশব্দে আরো কয়েক মাইল এগিয়ে একটা থানার এসে রাতের মতো আশ্রয় নিয়ে ছিলাম।

পরে জয়সন্ধান করে জামা গিয়েছিলো যে, আমি ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে (spiral) গোটা জঙ্গলটা ঘুরে বাস্তার এসে পড়েছিলাম।

কেন যে এমনটা হয়েছিলো তা অনেক সময়ই বুঝবার চেষ্টা করেছি কিন্তু বুঝতে পারি নি। মানুষ হারিয়ে গেলে বা তার চোখ বেঁধে দিলে কেন যে ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে সে কথা কখনো ভেবেছেন কি?

কিছুদিন পূর্বে ঠিক এই সম্পর্কে একখানা বিজ্ঞানসম্মত মাসিক পত্রিকার ব্যাপারটা সবচেয়ে এক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব্ধ ফল দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

আমেরিকার কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান অধ্যাপক ডক্টর শেফার নানা জাতের কীটপু এবং বিজাপু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্রত্যেকেরই চলার ফলে এক একটি ক্রমবর্ধমান বৃত্তের সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ ওদের দ্বারাটাই ঐ রকম।

মানুষের বেলায় ব্যাপারটা ঘটে একটু অল্প কারণে। আমাদের প্রত্যেকেরই ডান আর বাঁ এ দু'দিকের অঙ্গ অসম। কারো ডান পায়ে জোর বেশি, কারো বাঁ পায়ে। কারো ডান পা-টা একটু খাটো কারো বা বাঁ পা-টা। ফলে কি হয়—একবার মানুষ হারিয়ে গেলে কোন দিকে যেতে হবে সেই লক্ষ্য যদি ঠিক না থাকে, তা হলে যে পা-খানায় বেশি শক্তি বা বেশি লম্বা, সাধারণত লম্বা বায় সেই পা-ই আমাদের তার নিজের দিকে ধোরাত্তে থাকে—অর্থাৎ ডান পা ডান ক্রমবর্ধমান বৃত্তে, বাঁ পা বাঁ ক্রমবর্ধমান বৃত্তে।

কিশোর বয়সে হারিয়ে যাওয়ার ঐ ব্যাপারটার জন্তে মাঝে মাঝেই নিজের কাছে লক্ষ্যবোধ কমতাম—কিন্তু এতদিনে বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যা পাবার পরে বুঝতে পাচ্ছি আমার হারিয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছিল।

—শিকারী

## পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুচি একজন মোয়ে

ক'রে তোলা হয়েছে। সেই জুতোজোড়া সে ইংল্যান্ডের প্রতিযোগিতার পাঠিয়ে দিলে আর প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী শত শত মেরামত করা জুতোর মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর বির্জিতের মেরামত করা জুতোজোড়াই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করলেন। অথচ বির্জিত না মুচির মোয়ে, না মুচির বৌ, তার স্বামী একজন বাস্তাদার। ১৯৬২ সালে মুরেমবার্গের জুতো মেরামত প্রতিযোগিতাতেও বির্জিত প্রথম হয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে সোনার মেডেল পেয়ে সে সাংবাদিকদের বলেছে যে, 'জার্মানিতে তৈরি' উদ্ভিন্ন সম্মান রক্ষা করতে গেলে সে আর সত্যিই গর্ভিত। [ডি এ ডি]

—বিএস

# প্রভু প্রভু শ্রীমদ্রামানন্দ প্রভুপ্রভু প্রভু

৬৯

বল্লভ প্রভুর চরণবন্দনা করলে।

আর প্রভু তাকে ভাগবতবৃত্তিতে অর্থাৎ ভগবদ্-ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বল্লভ বললে, 'কত দিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। সন্দেহ কী, তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলে লোকে পবিত্র হয়। দর্শন করলে যে হবে তা বলাই বাহুল্য। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। কৃষ্ণের নিজের শক্তি ছাড়া কার সাধ্য তার নাম প্রবর্তন করে। সুতরাং তুমি কৃষ্ণশক্তির আধার। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণশক্তি ছাড়া কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হয় না। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, আর কেউ নয়। সুতরাং তুমি যখন সকলের মনে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান তুলছ তখন তুমি কৃষ্ণছাড়া আর কী।'

'কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনামসম্বীর্জন।

কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্তন ॥

তাহা প্রবর্তাইলে তুমি, এই ত' প্রমাণ।

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন ॥

জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশ।

যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেম ভাসে ॥

প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।

কৃষ্ণ এক প্রেমমাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে ॥'

প্রভু বললেন, 'তোমার ভুল হচ্ছে, আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সঙ্গ করাই

আমার মন নির্মল হয়েছে। তাঁর কৃপার এমন শক্তি যে, যেক্ষকেও কৃষ্ণভক্ত করে দিতে পারে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে শাক্য ঈশ্বর, সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। যদুদর্শনে সে পণ্ডিত আবার সে ভাগবতোক্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্ধ-শিরোমণি। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?'

বল্লভ ভট্ট সন্নিহনে তাকাল প্রভুর দিকে। মনে মনে বললে, 'শেখবার আর বাকি কী।'

'রামানন্দই বোঝালে,' বললেন প্রভু, 'ঐশ্বর্য-জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষোবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয় সে যে সত্ৰাজ্ঞী। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমছাড়া কৃষ্ণকে বাঁধবে কে? শুধু পেয়েছিল যশোদা, পেয়েছিল তার সাথির দল।

'শুদ্ধভাবে সধা করে স্বন্ধে আরোহণ।

শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন ॥'

ঐশ্বর্য দেখলেও, যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয় না। তার কেবলা-প্রীতি। আর এই কেবলা-প্রীতিতেই কৃষ্ণ বশীভূত। এই সব নিরৈশ্বর্য প্রেমের কথা রামানন্দ শিখিয়েছে আমাকে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।'

বল্লভ ভট্ট মাথা হেঁট করল। এ যুগি তারই

প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে সে শুক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসামুহুতি। রামানন্দ জ্ঞানেরসে-তত্ত্ব-প্রমে অনর্গল।

‘আর দামোদর স্বরূপ? সে তো মূর্তিমান প্রেমরস।’ প্রভু বললেন বিহ্বলস্বরে, ‘ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি দামোদরের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে মাননীয় বলতে মর্যাদাবান বলতে তাদের অসম্মতি। এই তো গোপীপ্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসার ভৎসনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাভিশায়ী প্রেমের কথা দামোদর আমাকে বলেছে।’

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে।

‘আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। ভাগবত-প্রধান হরিদাস, দিনে তিন লক্ষ নাম করে। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা! তারপরে বৈষ্ণবভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর জগদানন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর, শঙ্কর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি। এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।’

বল্লভ ভট্টের মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আমিই ভালো জানি, ভাগবতের অর্থও আমার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতেই বোধহয় তার এখানে আসা। প্রভু তা টের পেয়েছেন। কই তাকে তো কোনো বিষয়েই পারঙ্গম বলে তিনি স্বীকার করছেন না। তাঁর পার্শ্বদেবেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন ছার, আমার থেকেও আমার পার্শ্বদেবরা বেশি অভিজ্ঞ, বেশি রসগুণাকর।

‘আপনার সে সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়?’ কুরুষরে জিগপেস করল বল্লভ।

‘এখানে যখন এসেছি তখন দেখতে পাবে।’

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভু সকাশে এসে পড়ল বৈষ্ণবেরা। কী তাদের দেহজ্যোতি, বল্লভ বিস্মীর্ণ হয়ে গেল, এদের কাছে সে সূর্যের কাছে ঋতাতের মত।

প্রভু সকলের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তবে প্রসাদ লাগাও।

মহাপ্রসাদের আয়োজন করল বল্লভ। গৌড়-

ভক্তেরা অঙ্গনে বসল সারি-সারি। প্রভুর এক পাশে অধৈত আরেক পাশে নিত্যানন্দ। বল্লভ নিজেই পরিবেশন করতে লাগল। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। নামানন্দের গর্জন।

রথযাত্রার দিন প্রভু কীর্তন করলেন, আর কীর্তনের সঙ্গে সে কী ডুবনডুলানো নৃত্য! সে কী প্রমোদয়। বল্লভের মনে আর সন্দেহ রইল না, ইনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

যাত্রা-অন্তে বল্লভ প্রভুর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, ‘ভাগবতের কিছু টীকা লিখেছি, আপনাকে শোনান্ত চাই।’

প্রভু বললেন, ‘ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। তা’ছাড়া আমি অধিকারীও নই যে, ভাগবতের অর্থ গুনি। আমি শুধু কৃষ্ণনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যা পূরণ হয় না।’

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যাবুদ্ধির জোরেই সে টীকা লিখেছে, ভজনাগ্নিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা’হলে ভাগবতের অর্থ তাতে ক্ষুরিত হবে কী করে?

‘আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।’ বল্লভ অহুরোধ করল, ‘তুমি একবার শোনো দয়া করে।’ প্রভু বললেন দৃঢ়স্বরে, ‘আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। এক অর্থ শুধু মানি। সে হচ্ছে শ্রামশূন্যর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও তাতে আমার দরকার নেই।’

বিমনা হয়ে বল্লভ ঘরে ফিরে গেল। অভিমান পুঞ্জিত হয়ে রইল হৃদয়ে।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজী হল না।

লজ্জিত ভট্ট চুঃখিত হয়ে গদাধর পণ্ডিতের শরণ নিল। বললে, ‘তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। শোনো আমার নামব্যাখ্যা। অন্তত তুমি যদি শোনো তাহলেও আমার এ কলঙ্কের ঝালন হয়।’

গদাধর সঙ্কটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না, আমি গুনি কী করে?

কোনো মতামত পাবার আগে বল্লভ নিজের থেকেই পড়তে শুরু করল। দেখি কেমন না শোনো! গায়ের জোরে শোনাব।

পদাধরের সঙ্কট গুরুতর হল। অখণ্ড শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না বল্লভকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই, তিনি অমৃত্যুমুখী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—আমি শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চূপচাপ আছি।

কেন চূপচাপ থাকবে? পার্শ্বদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো, স্থান ত্যাগ করে অগ্রজ চল যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতরো বিনয়, কেমনতরো চক্ষুলাজ?

পদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে পৌরের প্রতি তার কী দারুণ ভালোবাসা।

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানই বা মন্দ কী! বেশ, সেই শাস্ত্রজ্ঞানেরই বিচার হোক। তোমরাও তো সকলেই পণ্ডিত, বৈয়াকরণিক। এস, বিতর্কবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে দেখা যাবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

পার্শ্বদদের তর্কে আহ্বান করল বল্লভ। দেখি তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের দৌড়।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল: 'জীব তো কৃষ্ণের প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। কী, যথার্থ তো?'

'যথার্থ' বললে অদ্বৈত।

'যে স্ত্রী পতিব্রতা সে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও?'

অদ্বৈত বললে, 'তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন, তাঁকে জিগগেস করো।' প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করল। 'তিনিই সমাধান করে দেবেন।'

প্রভু বললেন, 'পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্ত্রীকে স্বামী আদেশ করেছে, নিরস্তুর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করেছে, লঙ্ঘন করেছে না। নাম নিচ্ছে আর তার ফল পাচ্ছে। ফল কী? ফল হচ্ছে প্রেমফল।'

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। ছুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল। প্রত্যহই আমি পরাজিত হই,

এমন কি একদিনও হবে না যে আমার কথাই প্রবল হবে।

আরেক দিন গেল বল্লভ। দেখি এবার আমাকে কী করে ঠেকায়।

কে না জানে শ্রীধর স্বামীই ভাগবতে সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। প্রভুও তাই স্বীকার করেন, তাঁর পার্শ্বদরাও তজ্জপ। সেই টীকা আমি খণ্ডন করেছি, যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তাঁর সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। বেশ তো, বোসো স্থির হয়ে, শোনাচ্ছি এখনি তারপর একবার যখন আমার ব্যাখ্যা স্থাপিত হবে তখন দেখব তোমরা কী বলো। আমার প্রাধাত্য তখন স্বীকার না করে যাও কোথায়?

'আমি ভাগবতে শ্রীধর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি।' গর্বভরে বললে বল্লভ, 'দেখিয়ে দিচ্ছি তাঁর ব্যাখ্যায় পূর্বাগর সামঞ্জস্য নেই। আমি স্বামী মানি না।'

ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।

লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন ॥

সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।

একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি ॥

প্রভু উপেক্ষার হাসি হাসলেন। বললেন, 'যে স্বামী মানে না, তাকে তো বেশার মধ্যেই গণনা করা হয়।'

'প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।

বেশার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥'

অর্থাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গল-মাধুর্যে জগতের শোধান করবেন বলেই পৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণও একদিন ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করেছিলেন। গর্বাঙ্ক জীব প্রথমে বুঝতে পারে না, পরে যখন অন্ধতা ঘুচে যায়, চোখ খোলে, তখন বোঝে কোথায় তার মঙ্গল। বোঝে আঘাতই প্রভুর হিতম্পর্শ।

বল্লভ বুঝল। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন, এখন আমার প্রতি কেন তাঁর বৈরুপ্য? প্রভুর সভায় বিতা বিচার করবো, আমি জয়ী হবো, এই গর্বেই আমি ভরপুর ছিলাম, আমার প্রতি

প্রভুর যে উপেক্ষা তা শুধু এই ঔদ্ধত্যকে শাসন করবার জন্তে। সকলের হিত করাই ঈশ্বরের স্বভাব, আমি মুর্থ, তাই আমি তাঁর হিতৈষণাকে সম্মান করি নি। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন।

‘অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা।’

এই অপমানই আমার মঙ্গল মহোষধ।

প্রভুর চরণে এসে পড়ল বল্লভ। বললে, আমি অজ্ঞ, তোমার সামনে আমি পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম। তোমার কৃপাঞ্জন আমার গর্বাক্ততার মোচন হল। কৃপা করে আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।’

প্রভু কোমলাঙ্গনয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, ‘তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকার অনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।’

‘যদি আমার উপর প্রসন্ন হলে’, বললে বল্লভ, ‘তবে আরেক দিন আমার নিমন্ত্রণ নাও। স্বর্ণসহ এস আমার কুটীরে।’

তাই গেলেন প্রভু।

প্রণয়স্থলে গদাধরের প্রতি রোষ প্রকাশ করলেন। কেন সে সেদিন বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন উত্তরে গদাধরও বোধহয় রোষ প্রকাশ করবে। বলবে, আমি কী করব, জোর করে শোনাতে আমার কী করবার আছে? কিন্তু গদাধরের ক্লিষ্ট-স্বভাব, সরল স্বভাব, তার রোষ না হয়ে ত্রাস হল।

ক্লিষ্টগীরও তাই হয়েছিল। কৃষ্ণ বললে, ‘তুমি কী ভেবে যে আমাকে মনোনীত করলে বুঝতে পাচ্ছি না। কত বিভূতিশালী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল—শিশুপাল, শাশু আর জরাসন্ধ। কত তারা ধনী-মানী, রূপে-বলে সুসমৃদ্ধ। আমি তো নিতান্ত গুণহীন। রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছি, বল-বৃদ্ধি বলতে আমার কিছু নেই। আমি নিষ্কিঞ্চনেরও নিষ্কিঞ্চন। তুমি রূপোত্তমা, উদ্ভম-অধমে মিত্রতা হয় না, পরিণয় তো দূরের কথা। বিদর্ভনন্দিনী, তুমি-দূরদর্শিনী-নও, তাই আমার মতন

অভাজনকে বরণ করছ। আমি গৃহে-দেহে উদাসীন জ্ঞী-পুত্রে আমার কামনা নেই, আমি আত্মলাভেই পরিপূর্ণ। সুতরাং কোনো ক্ষত্রিয় বীরকে ভজনা করো। আমাকে ভজনা করলে তোমার সুখ কোথায়?

ক্লিষ্টগীর কৃষ্ণের পরিহাস বুঝল না। সে ভয় পেল। তার হাতের বালা শিথিল হল, তার হাতের ব্যজন খসে পড়ল মাটিতে।

বালগোপালের উপাসনা করত বল্লভ, গদাধরের সঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের উপাসনা করতে ইচ্ছে হল। গদাধরকে বললে, ‘আমাকে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিন।’

গদাধর বললে, ‘আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। আমার প্রভু গৌরাক্ষের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাইতেই তিনি অসন্তোষ দেখান।’

স্বরূপ বললে, ‘তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্তেই তাঁর এই পরিহাস। তিনি দেখতে চান তুমিও ক্রুদ্ধ হও কি না।’

‘আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ?’ গদাধর বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, ‘তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অমুরাগ, সবই শিরোধার্য করি। তিনি সর্বজ্ঞের শিরোমণি, তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে!’

শুধু এতে হল না, গদাধর কঁদতে-কঁদতে প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, ‘আমি তোমাকে খেপাতে চেষ্টা করলাম, তা, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।’

গদাধরের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই রুচিকর। প্রভুই আমার জীবনসর্বস্ব, গদাধরের ভাবে-ব্যবহারে তাই পরিস্ফুট। তারই জন্তে প্রভুর এক নাম ‘গদাধর-প্রাণ-নাথ’। আরেক নাম ‘গদাইয়ের গোরাঙ্গ’।

এক ভুবনপাবনী গঙ্গা থেকে যেমন শত ধারা প্রবাহিত, তেমনি প্রভুর এক লীলায় বহুতত্ত্বের প্রকাশ। সৌজ্ঞ্য, ব্রহ্মগুণতা, দৃঢ়প্রেমমুদ্রা, অভিমান-প্রক্ষালন। বল্লভ যখন জোর করে তার টীকা পড়ছে, সৌজ্ঞ্য-বশতই গদাধর তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। আর



ব্রাহ্মণের প্রতি যথার্থ মর্যাদাবোধের থেকেই এই সৌজ্ঞেয় উৎপত্তি। নিষেধ করলেই বরং ব্রাহ্মণকে অসম্মান করা হত। তৃতীয়ত প্রভুর উপেক্ষাতেও পদাধরের প্রেম ম্লান হল না, শিথিল হল না। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা, উপেক্ষাতেই বল্লভের অভিমান-পঙ্ক ঘোত হয়ে গেল।

বাইরের উপেক্ষাতে কী এসে যায় যদি ওড়ুর অন্তরে অনুগ্রহ থাকে।

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা কে বোঝে? গৌরে যার দৃঢ় ভক্তি তার কাছেই সমস্ত অর্থ পরিচ্ছন্ন।

প্রভুর সম্মতি মিলে গেল। বল্লভ পদাধরের কাছ থেকে কিশোর গোপালের মন্ত্র নিলে।

এ আবার কে এল নীলাচলে?

এ যে দেখি রামচন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী তো আগেই এসেছে, সে ও দেখি এখন উপস্থিত।

রামচন্দ্র আর পরমানন্দ দু'জনেই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। রামচন্দ্র আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠ-বুদ্ধিতে পরমানন্দ তাকে প্রণাম করলে। প্রভুও তাকে দণ্ডবৎ করলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তিনজনে তারপরে কতক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করলে, কৃষ্ণকথার আলাপন করলে।

জগদানন্দ এসে নিমন্ত্রণ করলে। জগদানন্দের প্রসাদ নিয়ে এল, প্রচুর প্রসাদ। এদেরকে নিন্দা করবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র অত্যধিক ভোজন করলে। অবশেষ-প্রসাদ জগদানন্দকে খেতে দিলে জগদানন্দও খেল পেটভরে।

তারপরে রামচন্দ্র নিন্দা শুরু করলে—অতি-ভোজনের নিন্দা। শুনেছি চৈতন্যের লোকেরা বেশি খায়, তাই অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। স্বচক্ষে তাই দেখলাম এখন। বেশি খেয়ে ও বেশি খাইয়ে নিজের ও অন্তরে দু'জনেরই ধর্মানাশ করে।

যে বেশি খায় তার বৈরাগ্য কোথায়? তাতে বৈরাগ্যের আভাসও নেই। বেশি খেলে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে। আর দেহ যদি অবসন্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে তা হলে বৈরাগ্য হবে কী দিয়ে?

‘বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্তন।

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।’

নিজে আগ্রহ করে অত্যধিক খেল, অত্যধিক খাওয়াল, দোষ চাপাল জগদানন্দের উপর।

এমনি নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রের।

মাধবেন্দ্রের অন্তকালে শিষ্য রামচন্দ্র এসেছিল। ‘মথুরা পেলাম না—মথুরা কোথায়’ বলে আক্ষেপ করছেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র তাঁকে উপদেশ করতে লাগল। শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ—কত বড় ঔদ্ধত্য। রামচন্দ্র ও-সব চিন্তা করেও দেখল না, বললে, ‘তুমি কেন কাঁদছ? তুমি তো নিজেই পূর্ণব্রহ্মানন্দ, তোমার কিসের অভাব? যে চিদব্রহ্ম সে কি কখনো কাঁদে?’

শুনে মাধবেন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ভগবানের দাস, ভক্ত, তাঁকে কি-না অভেদ জ্ঞান করতে বলছে? ‘দূর হ পাগিষ্ঠা।’ মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠল: ‘কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না বলে আমি আপন দুঃখে মরছি, এ কোথা থেকে জ্বালা বাড়াতে এল? আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে এসেছে। আমার দৃষ্টির থেকে বার হয়ে যা।’

রামচন্দ্রের দুর্বাসনা জাগল। আমি ব্রহ্ম—এই জ্ঞান লাভ করব তবে ছাড়ব। শুক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সহকর্মী রাখল না। আর অবিশ্রাম নিদ্দুক হয়ে উঠল।

আরেক শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে দেখ। অহোরাত্র মাধবেন্দ্রের সেবা করছে, মলমূত্র মার্জন করছে স্বহস্তে। নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা বলছে, কৃষ্ণ-শ্লোক পড়ছে, কৃষ্ণ-স্মরণ সমুদ্রে নিমগ্ন করে রাখছে। পরম পরিভুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র তাকে বর দিলে, ‘কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হোক।’

মহতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কী ফল তাই রামে-ঈশ্বরে দেখালাল মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র নিন্দার সাগর আর ঈশ্বর প্রেমের সাগর হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে প্রথম প্রেমাস্কুর রোপণ করে চলে গেলেন মাধবেন্দ্র। সে অন্ধুর পুষ্টি হল ঈশ্বর-পুরীরূপে। তারপরে ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হয়ে দাঁড়ালেন পরিণত বৃদ্ধ।

আর রামচন্দ্র কী করছে? সে শুধু পরের ছিজ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এদিকে নিজের থাকা-খাওয়া সম্বন্ধে স্থিরতা নেই, সন্ধান করে ফিরছে কে কোথায় থাকে বা কী খায়? বিশেষ করে প্রভুর স্থিতি-গতি ভোজন-ভ্রমণই তার লক্ষ্যের বস্তু।

আর কিছু দোষ পেল না, একদিন প্রাতে গিয়ে

দেখল প্রভুর ঘরে পিপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা! রামচন্দ্র তখন সিদ্ধান্ত করল, কাল রাতে এ-বাড়িতে মিষ্টান্ন আনা হয়েছিল, তাই এই পিপীলিকার সার। মিষ্টান্ন আর কার জন্যে আনা হবে? নিশ্চয়ই কৃষ্ণচৈতন্যের জন্যে। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খাচ্ছে। মিষ্টান্ন খেলে ইন্দ্রিয় দমন হবে কী করে?

চাক পিটতে লাগল রামচন্দ্র। সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খায়।

নিন্দে করে বেড়াচ্ছে, আবার কী নিরাজ্ঞ, নিত্য আসছে প্রভুর কাছে। আর প্রভু তাকে গুরুবুদ্ধিতে সন্তুষ্টমান করছেন। প্রভু জানেন রামের কী ব্যবহার, তবু তাকে আদর করতে তাঁর কার্পণ্য নেই।

একদিন তো রাম মুখের উপর সরাসরিই বলে বসল। ঘরে যখন পিপড়ে হাঁটে তখন নিশ্চয়ই তুমি মিষ্টান্ন খাও। বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ-কী ইন্দ্রিয়-লালসা।

পিপড়ে স্বভাবতই যত্নতর ঘুরে বেড়ায়, তা নিয়ে আবার ওরু কী। আর যে নিন্দা ভিত্তিহীন তাকে কেই বা মূল্য দেয়? কিন্তু, না, তবুও, প্রভুর মন সন্তুষ্ট হয়ে গেল। গোবিন্দকে ডাকিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আমার ভিক্ষে হবে পিণ্ডাভোগের এক চৌটি মাত্র, আর ব্যঞ্জন পাঁচ গণ্ডার। এর একতিল বেশি আনবে না। বেশি এনেছ দেখলেই আমি নীলাচলে ছেড়ে চলে যাব।'

শুনে বৈষ্ণবেরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। পিণ্ডাভোগ তো নিতান্ত ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র। এত অল্পে প্রভুর জীবনধারণ হবে কী করে? সকলে রামচন্দ্র পুরীকে তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু উপায় কী?

তারপরে বরাদ্দ পেটুকু আনা হল, তারও অধেক মাত্র প্রভু গ্রহণ করলেন। বাকি অধেক গোবিন্দের জন্যে।

প্রভু অর্ধাশনে রইলেন। গোবিন্দও অর্ধাশনে। ভক্তবৃন্দ বললে, আমরাও তবে কোন মুখে পেটভরে খাই।

গোবিন্দ আর কালীশ্বরকে প্রভু বললেন, 'তোমরা অমৃত ভিক্ষে করে খিদে মেটাও।'

'তোমাকে ক্ষীণ দেখছি, অর্ধাশনে আছ না কি?' রামচন্দ্র প্রভুসকাশে এসে বিক্রপ করল: 'অর্ধাশনে থাকারও সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। অর্ধাশনে থাকলে শুষ্ক-বৈরাগ্য দেখা দেয় আর শুষ্কবৈরাগ্য তো ভজনে বিঘ্ন ঘটায়। যথাযোগ্য আহার না পেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে, ক্ষুধারই বা কিসে নিবৃত্তি হবে? আগারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে সমস্ত কর্মচেষ্টায় নিয়মিত হওয়াই তো যোগীর কাজ।'

'আমি অজ্ঞ।' বললেন প্রভু, 'আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তাই আমি ভাগ্য বলে মানছি।'

পরমানন্দ পুরী এসে বসল। বললে, 'রামচন্দ্রের কথায় আপনি তর ছাড়বেন কেন? ও নিদ্রা, ওর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। খাইয়ে ও খাওয়ার নিন্দে করে, খেয়ে করে খাওয়ারো নিন্দে। গুণের মধ্যে মিশ্রণ করে দোষের আরোপ করে।'

'তোমরা কেন তাঁর দোষ ধরছ?' বললেন প্রভু, 'যতি হয়ে জিহ্বালম্পট হওয়া অত্যাঁয়। প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু মাত্রই সে গ্রহণ করে।'

'হ্যাঁ, তাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।' বললে ভক্তদল, 'রামের শাসনে তুমি যে সঙ্কোচ ঘটিয়েছ তা দেহরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়।'

ভক্তেরা পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিল। আমাদের বাড়িতে-বাড়িতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের ইচ্ছামতই তোমাকে খেতে হবে। ভক্তদের আনন্দিত করতেই তো তোমার অবতরণ।

[ক্রমশঃ।

## বিচ্ছেদের পর

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

রূপের ডালি চাঁদ উঠছে

শিমুলবনের কাঁকে,

তোমার দুটি দীঘল আঁখি

আমার কেন ডাকে?

নদীর পারে বুশির লহর,

মাদল বাঁশী বাজে;

আমার কাছে আসবে না আর—

ভাঙতে পারি না বে।।

## দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী

### অষ্টমোহমুখ্যাক:

তীৰ্ণাশ্রমাত: পবতে । ভীষ্মোদিত পুৰ্ব্ব:.....

.....তে যে শত: মাছুষা আনন্দা: ॥ ২৮।১

স একো মনুষ্যগুৰ্ব্বাপানন্দ:.....স একো আজ্ঞানজানী

দেবানামানন্দ: ২৮ ২

শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত তে যে শত:মাজ্ঞানজানী:.....

.....স এক ইন্দ্রপানন্দ: ২৮ ৩

শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত.....স একো ব্রহ্মা আনন্দ:

শ্রোত্রিয়স্তচাকামহতস্ত ॥ ২৮ ৪

স যশচায়া পুরুষে । যশচায়াবদিতো:.....

এতমানন্দময় মন্থানমুপসংক্রামতি তদপোষ্য স্নানো ভবতি ॥ ২৮ ৫

তীৰি ভয়ে ভয়ে বাতাস বইছে ।

স্বৰ্ণ উঠছে আকাশে—

অগ্নি ও চাঁদ জ্বলেছে তাঁহারি নিয়াম ।

তীৰি ভয়ে ভয়ে, মৃত্যু ছুটছে জীবনের পৃষ্ঠাত ॥ (কঃ ২ ৩ ৩)

(স্থষ্টিকে প্রবাহিত রাখবার জঙ্গ, আত্মা আপন অন্তর্গতত্বের মধ্যে বিচিত্র সব নিয়মের সঞ্চার করেন—সেই নিয়মের শাসনে অথবা ভয়ে বিশ্বাসের চলছে সত্য—কিন্তু তাঁর দ্বারা একথা অপ্রমাণ হয় না, যে, আত্মা মূলত আনন্দস্বরূপ) ।

সেই আনন্দের এই রূপ ;—

যদি সে বয়সে যুবা হয়,

জ্ঞানী আর গুণী

শ্রেষ্ঠ দৃশ্য হয় বলিষ্ঠকায় ।

ধনময়ী এই বসুমতী যদি তারই নিজের হয় ।—

তবে, তার সেই মহানন্দ মাছুষের চিরকায় ॥ ২৮।১

মাছুষের সেই আনন্দ যদি শতগুণে বেড়ে যায়,—তবে সেই স্তম্ভে নর-গন্ধর্বের ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র ভোগ । তাদের তেমন শত আনন্দে পিতৃগণ ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ । তাদের তেমন শতগুণ স্তম্ভে, কর্মদেব ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র স্তম্ভ ;—তাদের তেমন শত আনন্দে বৃহস্পতির ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটিমাত্র স্তম্ভ । তাদের তেমন শত আনন্দে বৃহস্পতির ও কামনাহীন শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ । বৃহস্পতির শত আনন্দে প্রজাপতির ও কামনাহীন জ্ঞানীর একটি আনন্দ । প্রজাপতির তেমন শত আনন্দে ব্রহ্মা অথবা হিরণ্যগর্ভের এবং কামনাহীন জ্ঞানীর একটি আনন্দ । সেই যে আনন্দ, যা এই পুরুষে,—

আর যা ওই সূর্যে,—তারা এক ।

যে এরকম জানে,—সে এই ভোগলাক

পার হয়ে,—প্রথমে অন্নময় কোশে

প্রবেশ করেন । পরে ক্রমশ

প্রাণময় কোশ ও মনোময় কোশের মধ্যে

সামুদ্র লাভ করেন ।

তারপরে বিজ্ঞানময় ও তা থেকে

আনন্দময়ে সঞ্চার করেন ।

এ-বিষয়ে আরো একটি শ্লোক আছে ॥ ২৮.৫

## কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

## তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### নবমোহমুখ্যাক:

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সত, আনন্দং ব্রহ্মণা বিদ্বান ন বিভেতি কুন্তশ্চনতি ।

এতং তি বাব ন তপতি\*\*\* -ইত্যুপনিষৎ ।

কথা যেটা হতে ফিরে আসে ঘুরে,

মনও থাকে খুঁজে পায় না ।—

অথচ সেই পরমানন্দ,

যে জেনেছে, তার কিছুতেই নেই ভয় ।

কেন ভালো কাজ করি নি গো, আমি,—

কেন সন্ধ্যা করেছি ?—এই অনুতাপ

জ্ঞানীকে তাপিত করে না ।

এই দুইরূপে স্থির অভিন্ন

আত্মাকে লাভ করে,

নন্দিত হয় সে ।

( এই বল্লীর ) এই তো উপনিষৎ ॥ ২.১

জ্ঞানীর পক্ষে পূণ্য-পাপে ভেদ নেই সত্য । তাঁদের ক্রমময় অস্তুরে সবই ঈশ্বরের প্রকাশ । কিন্তু সেইজন্মেই এই শ্লোকটিকে আবার বিশেষ করে 'উপনিষৎ' বলে বলা হয়েছে । এটা রহস্যবিত্তা, উপনিষদের গোপন কথা । অধিকারীর কাছে এ বাণী অমৃতস্বরূপ,— কিন্তু অনধিকারীর কাছে বিষ ।

পূণ্য পাপ তুল্য মূল্য এ কথা মনে করে মাছুষ যথেষ্ট পাপাচরণে প্রবৃত্ত হবে, এ শ্লোকের সে অর্থ নয় ।—পরমজ্ঞানের মধ্যে সমস্ত বিপরীত বুদ্ধি এক হয়ে মিলেছে,—এই হোল এ শ্লোকের তাৎপৰ্য ।

## ভূগবল্লী

(শাস্তি পাঠ)

### প্রথমোহমুখ্যাক:

ভূগবৈ বাকুণি,—শিতরত্নপদসার ১০০০

.....স তপোহতপ্যত,—স তপন্তস্তা ॥ ১

বরুণপুত্র ভূগু এলেন পিতার কাছে । বললেন,—‘হে ভগবন্,— আমার ব্রহ্মের বাণী বল ।’

পিতা বললেন,—

এই দেহ, এই প্রাণ, এই চক্ষু, কর্ণ,—

এই বাক্য এবং মনেই (ব্রহ্মের প্রকাশ ;—

এরই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার ।)

তিনি আরো বললেন,—

‘বা’ হতে জন্ম নিয়েছে বিশ্ব,—  
যার দ্বারা বেঁচে আছে,—  
প্রলয়ে আবার বাহার মধ্যে,—  
নিঃশেষে হবে লয়।  
তারি সন্ধান কর,—তুমি জেনে,—  
তিনিই পরম ব্রহ্ম।’

এই উপদেশ পেয়ে,—তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা  
করে,—৩:১

### দ্বিতীয়োহনুবাকঃ

অন্নং ব্রাহ্মণ্যি ব্যক্তনাং.....তপস্তপ্তা।।

তিনি জানলেন অন্ন ব্রহ্ম :—

অন্নট প্রাণ লভেছে জন্ম।  
অন্নট প্রাণ বাঁচছে,—  
অন্ন আবার ফিরে যায় শেষে,  
প্রাণের মহালাগ্নে।  
(কল্পরূপ জড়সদ্যতেই বিশ্বরূপের জন্ম)

এই জ্ঞান লাভ করে তিনি আবার গেলেন, পিতা বরুণের  
কাছে; বললেন—

ভগবন্, ব্রহ্ম পদে লগ্নাও গো আমার,  
বল ব্রহ্মের বাণী!

তিনি বললেন,—

তপস্যা করে ব্রহ্মের তুমি  
লও পরিচয় জানি! তপস্যাই ব্রহ্ম!  
তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩:২

### তৃতীয়োহনুবাকঃ

প্রাণোব্রাহ্মণ্যি.....তপস্তপ্তা।। ৩:৩

জানলেন,—

প্রাণই ব্রহ্ম!  
প্রাণেই জন্ম পড়েছে বিশ্ব,—  
প্রাণেই রয়েছে বেঁচে,  
প্রাণেই আবার ফিরে চলে যাবে,  
মহাপ্রলয়ের শেষে।

এই কথা জেনে তিনি পিতৃসকাশে গেলেন আবার, বললেন,—

ভগবন্,—ব্রহ্মাপদেশ দাও গো আমার  
বল ব্রহ্মের বাণী!  
তিনি বললেন—তপস্যা করে ব্রহ্মের তুমি।  
লও পরিচয় জানি।—তপস্যাই ব্রহ্ম!  
তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩:৩

### চতুর্থোহনুবাকঃ

‘মনো ব্রাহ্মণ্যি.....তপস্তপ্তা।। ৩:৪

জানলেন,—মনই ব্রহ্ম!

এ মহাবিশ্ব জন্ম নিয়েছে মনে,—  
জাতক বিশ্ব মনেই রয়েছে বেঁচে।

মনেই আবার এবারে গিয়ে তারা

মনে মনে হয় শীন!

এই কথা জেনে তিনি,—

আবার গেলেন পিতৃসকাশে :—বললেন,

ভগবন্, ব্রহ্ম পদে লগ্নাও গো আমার,

বল ব্রহ্মের বাণী!

তিনি বললেন,—তপস্যা করে।

ব্রহ্মের তুমি লও পরিচয় জানি।

তপস্যাই ব্রহ্ম!

তিনি তপস্যা করলেন,—তপস্যা করে,—

### পঞ্চমোহনুবাকঃ

বিজ্ঞানং ব্রাহ্মণ্যি ব্যক্তনাং.....তপস্তপ্তা।। ৩:৫

জানলেন,—জ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই ভূতরাশি জ্ঞানই জন্মে,

জ্ঞানেই রয়েছে বেঁচে।

যত্নের শেষে,—আবার তাহারা

জ্ঞানেই প্রাণীমাণ।

এই কথা জেনে তিনি,

আবার গেলেন, পিতা বরুণের কাছে,—বললেন,—

বলো বলো মোরে বলো ভগবন্,

বলো ব্রহ্মের বাণী।

তিনি বললেন,—তপস্যা করে,

লও ব্রহ্মের জানি। তপস্যাই ব্রহ্ম।

তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করে,—৩:৫

### ষষ্ঠোহনুবাকঃ

আনন্দো ব্রাহ্মণ্যি ব্যক্তনাং.....

মহান কীর্ত্যা ৩:৬

জানলেন,—আনন্দই ব্রহ্ম।

আনন্দরূপে জন্ম নিয়েছে

নিখিল ভুবনরাশি।

সেই আনন্দে জীবন রয়েছে বেঁচে।

আনন্দে ফিরে চলেবে আবার,

আনন্দে হবে শীন।

ভুগু বাক জেনেছিলেন,—

বরুণ বাক বলেছিলেন,—

এই সেই ভাগ্যী, সেই বারুণী বিজ্ঞা।

অন্নময়কাশ (স্থূলপেহ) হতে,

স্বরূপকাশের আনন্দবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

অন্ন হতে আনন্দে সঙ্গারিণী এই বিজ্ঞাক,

যে এমনি করেই জানে, সার্বক তার প্রতিষ্ঠা। (ব্রহ্মে)

সে অন্নবান্ অন্নভোক্তা, ধনজনপুত্রপুত্রপিতৃবৃত্ত।

ব্রাহ্মভোক্তা মহান।—মহান তার কীর্তি। [ক্রমণ।

অনুবাদিকা—চিত্রিতা দেবী

# জওহরলাল ও বাঙলা

আজকের সমগ্রাঙ্গুল পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে যে তু-তিনজননের নাম উল্লেখের দাবীকার তাঁদেরই মধ্যে একটি উজ্জ্বলতম নাম—জওহরলাল নেহরু। তাই, জওহরলালের প্রায়শ 'বিশ্বরক্ষমণ্ড' থেকে মহানায়কের মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তুলনীয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অল্প প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারী ব্যাকুল প্রত্যাশায় 'যে তু-তিনজন বর্ণধারের দিকে তাকিয়ে আছে সারা ভারতের গর্ভ ও গৌরব নেহরু তাঁদেরই একজন। নেহরু কি বলবেন—নেহরুর এ বিষয়ে মত কি—আচার্য নেহরু এ সম্বন্ধে কি উপদেশ দেন—এই চিন্তার বিশ্বাসীর আগ্রহের অস্ত ছিল না। তাঁর অটু-বাস্তব, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিশ্বসমাজে তাঁকে বিপুল শ্রদ্ধা ও পরম সমাদরের আসনে অধিষ্ঠিত করতে বেশি সময় নেয় নি। কিন্তু, এই বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তার সপ্তবর্ণে সমারুত থেকেও বিশ্ববাসী পটভূমির উপর তাঁর কর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তর থেকে বাঙলা দেশ বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হয় নি, তাঁর সচস্র কর্মব্যস্ত মনে বাঙলা দেশ সর্বদা যে মনোভাব ছিল, তা তাঁর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাঙলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, কোনপ্রকার রাজনীতির সম্পর্কের সূত্র ধরে নয়। সে সম্পর্ক স্বপ্নের। সে বেন এক নাড়ীর টান।

বাঙলা দেশের সঙ্গে নেহরু পরিবারের সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন তাঁর দেশপুঞ্জ পিতৃদেব মোতিলাল নেহরু। অব : দেখা যাচ্ছে এই সম্পর্ক পুরুষায়ুক্রমিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে জড়িত ছিলেন মোতিলাল। দেশবন্ধুর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্ব কম দৃঢ় ছিল না। দেশপ্রিয় বতীন্দ্রমোহন ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের ঐতিহাসিক যে অধিবেশনে মোতিলাল পৌরোহিত্য করেন সুভাষচন্দ্রকে সেই অধিবেশনে দেশবাসী দেখেছেন সর্বাধিনায়করূপে। বাঙলার চিকিৎসকগুলোর সঙ্গে নেহরু-পরিবারের সংযোগ কম নয়। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি দেশবিশ্রুত চিকিৎসকদল নেহরু-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসক হিসাবে নেহরু-পরিবারে আবির্ভাব পরবর্তীকালে রূপ নেয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। নেহরু-রায়ের সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। ব্যক্তিগত অবিস্ফেস্ত বন্ধুত্বের পারস্পরিক বন্ধনে পরস্পর ধরা দিয়েছিলেন। তাঁকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার বাঙালী রাষ্ট্রনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। মৃত্যুর পূর্বে সহস্র চিন্তার মধ্যেও বিধানচন্দ্র খোঁজ নিতে ভোলেন নি নেহরুর স্বাস্থ্যের। জিজ্ঞেস করেছিলেন—'নেহরুর শরীরটা কেমন আছে—তাঁর প্রাণে নেহরু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন—'নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছি।'

বাঙলা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নেহরু চিরদিনই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সে সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের অস্ত ছিল না। নতুন ভারতের রূপকার হিসাবে তিনি শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করেছেন রামমোহনের উদ্দেশে। ভগবান খ্রীষ্টীয়ামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে রচনার মাধ্যমে নেহরু যে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন তা শুধু নিছক ভাবার সমাবেশ বা উচ্চাসসর্বধ নয়—সেই শ্রদ্ধা তাঁর

গভীর উপলব্ধি ও অমুভূতির পরিচয় সর্বতোভাবে বহন করছে। তাঁর শ্রদ্ধার আলোয়, ব্যাখ্যার প্রোজ্ঞলভ্য এবং বিশ্লেষণের কল্যাণে শ্রদ্ধাৰ্ধ উজ্জল হয়ে উঠছে।

গান্ধী-শিষ্য নেহরু রাষ্ট্রনেতা হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, চিন্তানায়ক, মনীষী। তিনি অকপটে বলেছেন যে, রাজনীতিকৃত্তে গান্ধী তাঁর দীক্ষাদাতা হলেও অস্ত্রের দিকে তিনি রবীন্দ্র অমুগামী। রবীন্দ্রভাবধারার পুষ্ট তাঁর মন। এ কালের শ্রেষ্ঠপুরুষ নেহরু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে বসে জীবনের দীক্ষা নিয়ে নিজেকে ভরিয়ে তুলেছেন। কবী ইন্দ্রিকে শকালাভের অস্ত পাঠিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। পরম আগ্রহ সহকারে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন



বাঙলার দোসর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু  
[ 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার সৌজন্যে ]

রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত করেছেন রবীন্দ্রবাণী। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তিনি তত্ত্ব ভারতের স্বত্বরাজ। যত কিছু নির্ভাবতা, প্রাণপূজতা, গুরুত্ব—তারই মধ্যস্থলে গুরুদেবের মতে জওহরলাল অকুণ্ঠ সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়া, অনন্ত প্রাণের বার্তাবহ। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের প্রাণ পূর্ণ ছিলেন জওহরলাল। সহস্র কাজের ব্যস্ততার, সারা বিশ্বের ভাবনার মধ্যে জড়িত থাকে সবেও বছরে একবার করে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন তাঁর বহু হর নি। মহানগরীতেও তাঁর আগমনে কখনও ছেদ পড়ে নি। শান্তিনিকেতনে প্রতিবারই আচার্যের আনুষ্ঠানিক কাজগুলি শেষ করে সাক্ষাৎ করেছেন প্রিয়বন্ধু শিল্পাচার্য মল্লিকের সঙ্গে, করেছেন বহুপত্নী জীবিত। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জওহরলালের বিশিষ্ট বন্ধুদের অন্ততম। পারিবারিক দিক দিয়েও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয় না হলেও তিনি কুটুম্ব

পরিবারভুক্ত ছিলেন। নেহরুর মন্ত্রিকালে বিশ্বভারতী পরিণত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার জাতীয়সঙ্গীত হিসাবে নির্বাচিত করলেন জনগণমন।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধেও নেহরুর জন্তরে ছিল সুগভীর ভক্তি কলকাতার এলোই স্বর্ণিত প্রাধান্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করতেন প্রচুর বাসন্তী দেবীর সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুতে বাসন্তী দেবী বলেছেন যে জওহরলাল ছিলেন তাঁর পুত্রতুল্য। মিহিজামে চিত্তরঞ্জনের পুণ্য নামযুক্ত ভারত-বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি নেহরু সরকারের এক উজ্জ্বল কীর্তি।

বহু-পরিবারের সঙ্গেও নেহরুর যোগাযোগ কম ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রিসভার স্বর্ণিত শরণক্ষেত্র বহুও যোগ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র আর জওহরলালের বন্ধুত্ব এক জাতীয়তাবাদের পরিণত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ-হিন্দ-কৌজের

যুগ সৈনিকদের স্বপক্ষে সওয়াল করেছিলেন ব্যারিষ্টার জওহরলাল আর সেইদিনই দীর্ঘকাল পরে এবং শেষবারের মত ব্যারিষ্টারীর গাউন তাঁর অঙ্গে শোভা পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্রও বন্ধু হলেও জওহরলালকে অগ্রজের আসনে বসিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতার বাঙলার সাহিত্যিকবৃন্দ আয়োজিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে ভাষণদান করে গেছেন নেহরু। আধুনিক বাঙালী কলাসেবীরাও তাঁর সম্মেলন সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত নন। বাঙালী চলচ্চিত্র সেবীদের মধ্যে দেবিকারাবী, বিমল রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ দিকপালের মল তাঁর প্রীতি ও স্নেহের সার্বক অধিকারী। বিশ্বখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্করেরও একটি বিরাট ভাগ আছে এই প্রীতি ও স্নেহের মধ্যে। প্রাথমিক কথাসিঙ্গীত রাজ্যসভার সমস্ত তারাবন্ধর বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির প্রসারিতা বিশেষভাবে অর্জব্য।

নেহরু তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক বঙ্গসম্ভানকে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শরণক্ষেত্র বহু, ভ্রাম্যপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ক্ষিতীশচন্দ্র নিরোগী, অম্বোজকুমার সেন, হুমায়ুন কবির, সুরেন্দ্রকুমার সেন, অরুণচন্দ্র গুহ, মনমোহন দাস অনিলকুমার চন্দ, পূর্ণেন্দ্রশঙ্কর নন্দর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙলার মেয়ে মনস্বিনী সরোজিনী নাইডুর পরিবারের সঙ্গেও নেহরুদের ছিল গভীর জড়তা। নেহরুর আসলে বাঙলার মেয়ে সরোজিনীকে দেখা গেল উত্তর প্রদেশের প্রদেশপাল রূপে, দেখা গেল বঙ্গসম্ভান হুচেতা কৃপালনী ও বীরেন মিত্রকে উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী রূপে। লঙ্কারণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের ভার পড়ল হুজুমার সেন ও তাঁর মৃত্যুর পর শৈবাল গুপ্তের প্রতি। রাজধানীর মেয়েদের আসন অলঙ্কৃত করলেন অরুণ আসক আলি, হু ও বিদ্যাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আসন অলঙ্কৃত হল বাক্যকমে জননবাথ চৌধুরা



গুরু-শিষ্য : পণ্ডিতবর রাজনৈতিক সম্মেলনে, দীর্ঘ ১৯৬০।

স্বল্পত মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিত্বের ভার পেলেন বি এন চক্রবর্তী। ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পিত হল ডঃ বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুবীরজ্ঞান দাসের প্রতি। অডিটর জেনারেলের সম্মান অর্পিত হল অশোককুমার চন্দ এবং অরুণকুমার দাসের প্রতি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হলেন পি সি ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অতুল্য ঘোষ, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা। স্মরণ থাকতে পারে যে, কিছুকাল পূর্বে দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করাই নেহরুজী সরাসরি উপস্থিত হন রোগশয্যা-শায়িত অতুল্য ঘোষকে দেখতে। এ ছাড়াও প্রশাসনিক ও কূটনৈতিকক্ষেত্রে

নেহরুর আমলে আরও অসংখ্য বাঙালী মর্যাদা ও স্বীকৃতিলাভ করেছেন। এ ছাড়াও এই সত্তের বছরে তাঁর সরকার বহু বাঙালী শুণিজনকে তাঁদের সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ নানাভাবে সম্বর্ধিত করেছেন।

নেহরুজী আজ নেই। তাঁর প্রয়াণে সারা বাঙালি আজ শোকস্তম্ভ। স্বাধীনতা যুদ্ধের অস্ত্রতম অক্লান্ত বোদ্ধা মহানায়ক নেহরুর অভাবে বাঙালার বেদনা আজ অপর্যায়। বর্তমান বিশ্বের অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ভারতের অবিসংবাদিত কর্ণধার, বাঙালার পরমবন্ধু জওহরলাল নেহরুর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা স্নগতীর শ্রদ্ধা অর্পণ করি।

—সুকল্যাণ শর্মা।

## নেহরু-হত্যা-রহস্য

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরলোকগমনে আমার মনে এক নিবাকরণ আশঙ্কার ছায়া পড়েছে। আপনারা বসবেন, আশঙ্ক। 'ত' সকলেরই মনে। পণ্ডিতজী স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাত সত্তেরো বছর ধরে অধিতীয় পূর্বের মতই আমাদের প্রাণরূপ ছিলেন, সর্বজন-সম্মত একক নায়করূপে নিরুদ্রণ করে চলেছিলেন আমাদের ভাগ্য। গান্ধীজীর বখাৰ্ঘ উত্তরসাধক জওহরলালের নিশ্চিত নেতৃত্বের ছায়ায়

আমরা পরম শান্তিতে ছিলাম। কী দেশের অভ্যন্তরে, কী বাইরে, নেহরু ছিলেন ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি। এই নিথিকে হারিয়ে ভারতের জনগণ আজ শোকাক্ত ও বিচলিত। সকলের মনেই আজ এক আশঙ্কা, এরপর কী হবে? এই দেশ কী আবার এক বিশ্বস্ত অধিনায়ক বুঁজে পাবে? কে সেই শক্তিধর? নেহরুর পর কে? নেহরুর পর K, সেইটাই বড় কথা। কেনেডি বিষায় নিয়েছেন,



বর্গত প্রধানমন্ত্রীর মরদেহের সম্মুখে শোকসন্তপ্তা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়কে সাধনা দিচ্ছেন।

নেহরুও চলে গেলেন। বাকি আছেন ক্রুশেভ বা সক্ষেপে যিনি K। শাস্তির দুই হুত বধন তিরোহিত, তখন অনিবার্যভাবেই তিনি ভয়স্বল্প। নেহরুর পর তাই K, সে বিষয়ে কোনও বিমত নেই, থাকতে পারে না।

আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন, অকারণ কথটা বুরিয়ে বলা হচ্ছে, সমস্তটা তা ঠিক নয়। নেহরুর পর কে মানে হ'ল তাঁর স্বগভিষিক্ত কে ছবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে। তার জবাবে বলতে হয় যে এটা কোনও সমস্যাই নয়। নেহরু নেই প্রধানমন্ত্রীরূপে এটা একটি ঘটনা, আর তাঁর অবর্তমানে অন্য এক ব্যক্তি আসবেন সেই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এটা একটি দুর্ঘটনা মাত্র। দুর্ঘটনা এই কারণে যে, পণ্ডিতজীর বিকল্পরূপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন কোনও ব্যক্তি ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষে নেই, অতীত নেই রাজনৈতিক জগতে। চার্চিল অবসর গ্রহণ করার পর ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী আসছেন, বাচ্ছেন, কিন্তু চার্চিলের সমকক্ষ কে এসেছেন? কে আসতে পারেন?

আমাদের দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত। শুধু গণতন্ত্র নয়, এদেশের গণতন্ত্র পাটি-গণতন্ত্র। কাজেই, এক প্রধানমন্ত্রীর স্থলে আর এক প্রধানমন্ত্রী আসবেন, আসবেনই নিয়মাত্মক পদ্ধতিতে। দলপতি নির্বাচনে নেতাদের মধ্যে যতই প্রচুর স্বার্থাঘেবণ থাকুক না কেন, কার্যকালে সকল বিরোধী শক্তিকে হতাশ করে, প্রতিটি মুখ, সমালোচককে নির্বাক করে এক সর্ববাদিসম্মত অধিতার দলপতি সকালের পূর্বের মতই নিশ্চিন্তে দেখা দেবেন। (আমার এতোখা পড়ার সময় এই কথার প্রমাণ আপনাদেরই হাতে থাকবে!) বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে বীরা ভিতর থেকে জানেন,

বীরা ভিতরে ভিতরে জানেন, তাঁদের ভিতরে এই নিয়ে কোনও উৎসর্গ নেই, নেই কোনও শঙ্কা। কাজেই, আমার আশঙ্কা সেদিক থেকে নয়।

আমার আশঙ্কার মূল অনুসন্ধানক্রমেতে হলে চলে যেতে হবে (যালা) বছর আগেকার এক বিব শীতের সন্ধ্যার, দিল্লী নগরীরই এক প্রাসাদ-উজানে—ইতিহাসকে সচকিত করে যেদিন গান্ধীজীকে আমরা হত্যা করেছিলাম। অতি অকস্মাৎ, অতি সংক্ষেপে তিনটি মাত্র গুলীতে ত্রিশ কোটিরও বেশি মানুষের প্রাণ তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। বাতক নাথুরাম ছিল আমাদেরই মধ্যে একজন, নিমিত্তমাত্র। তাঁর পিছনে ছিল আরও অনেকে। ত্রিশ কোটি জনতার ভিড়ে তাদের সকলকে চিনতে পারা সম্ভব হয় নি।

সেইদিনই রাতে বাশপঙ্কজকর্তে পণ্ডিতজী বলেছিলেন, Light is out. এই কথাটা যে আমরা এত lightly নেবো, নিশ্চয়ই সেটা ধারণা করতে তিনি পারেন নি সেদিন, পরবর্তীকালেও বোধ করি, না। যদি তা না হ'ত তা হলে আজ (যালা) বছর পক্ষে আমরা একই শোকাবহ দৃষ্টের পুনরাবৃত্তির করতে পারতাম না। গান্ধীজীর পর যে জালা জালাতে চেয়েছিলেন তাঁর মানসপুত্র জওহরলাল, সে জালা নিভিয়ে দিতাম না এমন করে।

এত নিলজ্জ ও নিষ্ঠুরভাবে আমরা হত্যা করতে পারতুম না আমাদের পরমপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীকে।

যতই আশপ্তিকর শোনাক না কেন কথটা, আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে নেহরুকে আমরা হত্যা করেছি। গান্ধীজীর মত সর্বসমক্ষে আকস্মিক ক্ষিপ্তপ্রায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নি। এই ঐতিহাসিক



ঐনেহরুর বৃত্তসেহবাহী শকট প্রধানমন্ত্রীর ভবন হইতে বাহির করা হইতেছে



নিধন-বজ্র বহু সময় নিয়ে বীরে বীরে অঙ্গুষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধীজীকে অবলীলাক্রমে আর পশ্চিমীজীকে অবলীলাক্রমে হত্যা করেছি আমরা। দিনে দিনে, তিলে তিলে, এই মহানারক নিয়ে চলছিলেন আমাদের মহিমাযুক্ত জীবনের দিকে, আর দিনে, দিনে তিলে তিলে, এক মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যুর দিকে তাঁকে আমরা ঠেলে দিয়েছি। আমরা তাঁকে উভয় করেছি ছোট-বড় অধিকারের দাবীতে, মুক্তিহীন প্রেরে স্তম্ভ করেছি তাঁর চিন্তাশক্তিকে, প্রতিবাদের প্রতিবন্ধকে হুগম করেছি তাঁর যাত্রাপথ। তিনি মহাসৈনিক, তাই তিনি বিক্রম চান নি। আর আমরাও রাতের পর রাত তাঁর নির্যাস করছি। গান্ধীজীর অস্ত্রধারনের সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গিয়েছিল। দারুণ অন্ধকারে আমাদের নজরেই আসে নি এসব।

আর আজ? শাস্তিঘাটের চিতার আগুনে অনেক কিছুই লুপ্ত করে দেখা যায়। সে আগুন নেভাতে শোকোচ্ছ্বাসের প্রাণ দিকে দিকে। শাস্তির হৃত নেহরুর তিরোধান বিশ্বশাস্তি বিব্রিত হবে, তাই বিদেশী কণ্ঠে আজ গভীর উৎকণ্ঠ। তাঁর আরত্বকর সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই দেশী-অন্তরে কণ্ঠের প্রতিজ্ঞা। শত্রুযুগে আজ আপোষের বাণী বিভেদ ও অবিশ্বাস ভুলে বাওয়ার আবেদন। অথচ,

জীবনকালে নেহরুর শাস্তি বাণী বারবার উপেক্ষিত হয়েছে, এমন কি রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারেও। নিজ দেশে দেশ গঠনের কাজে ব্যয়ে ব্যয়ে পদে পদে স্ফুট হয়েছে বাধা, সক্রিয় অসহযোগ। গণতন্ত্রের প্রধান উল্লসিত দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বার্থাঘেবণ, গণ-আন্দোলনের নামে বিশ্বশ্রমের অহরহ প্রকাশে বাসের ছিল অনলস প্রচেষ্টা—তাদের কুখ্যেও আজ শোকবার্তা, তাদের চোখেও আজ কুটীরাজ। সৈনিকের ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা একটি নাথুরামের মতই, আজ কত নাথুরাম আপন-আমার চারপাশে মিশিয়ে আছে। আপন-পর চেনা যায়।

অকুরন্ত প্রাণের সম্পদে মৃত্যুর বিশদকে রান করে রেখেছিলেন তিনি। বিশ্বাসঘাতক চীনের কুখ্যাস খোলায় পর থেকেই বেন কুখ্যাস দিয়ে ঢেকে গেল তাঁর কুখ। চির-বোঝনের প্রতীক নেহরুর কুখ বয়সের কুখ্যাস প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। দেখলাম পর পর—কোলকাতার ময়দানের শেব সভার, ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসী আসনে— ছায়াছন্ন তাঁর সেই সূর্যকুখ। দেখলাম, তিনি কত বদলে গেছেন।

কিন্তু, দেখেও দেখলাম না আমরা। কেন দেখলাম না? কেন তাঁকে বিক্রম দিলাম না? কেন আমরা তাঁর আরত্বকর গুণসেব প্রতিশ্রুতি নিয়ে সজ্জবদ্ধ হলাম না তাঁকে সামনে রেখে, তাঁকে পিছনে



প্রধানমন্ত্রীর গৃহের রক্ত-হত্যারের শিখরে উষ্মগাকুল নব-নারীর ভিত্ত

রেখে বা করব বলে আজ এত সোয়গোল তুলছি? হঠাৎ কেন তাঁকে ঘেরাঘেরের উদ্ভুল উদ্ভা থেকে নামিয়ে আনা হল দিল্লীর উচ্চ কারাগারে? (রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলেই তাঁর আকস্মিক লোকান্তর সম্ভব হয়েছে। রক্তের চাপ কেন বাড়ে, কি কি কারণে বাড়ে তা আপনান-আমার অজ্ঞান।) এ দারিদ্র্য কার? কাদের? কোন, কোন নাথুয়ামের? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

হয় তো ইতিহাস সেবে একদিন। কাল-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, নিতুল কষ্টপাথর। আজ হঠাৎ আমরা ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না সব কিছু। আমরা আমাদের উদ্ভেল স্বর নিয়ে জরাজের পর তরাজে আছড়ে পড়েছি প্রধানমন্ত্রীর বাসগৃহের তোরণ-বারে, তাঁর শোকবাড়ার কিনারা-কিনারা। সেখানেও বেষ্টে বিশ্বালা ও অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের আচরণে। শেষ পর্যন্ত বাতক-জনতার মধ্য থেকে ভিড়ে পিষ্ট হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তিনটি মৃতদেহ, নাথুয়ামের হাত থেকে নিঃসৃত গাছী-বাণী তিনটি বুলেটের খোলার মতই।

বোলো বছরেও আমরা বলাই নি। আমাদের হৃদয়-বৃত্তি

আজও গেল না। তাই আমার শব্দ। বিবর শীতের সন্ধ্যা নয়, অবসর ঠাণ্ডের মধ্যাহ্নেই এবার আঁধার নেমেছে। নিভে গেছে আলো। এবারের বাতক কে? কে, কে? পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঁজে মহছি।

বোলো বছর আগেকার তিনটি বুলেটের খোল আর আজকের এই তিনটি মাছুষের খোলে চরিত্রগত কোনও ভেদ নেই। সেই অকৃত্রিম তিন, একই ত্রাহস্পর্শ। তিনে-তিনে ছয় বা নয়, আত্মিক হিসাবে দু'টাই ষাঁটি। আমাদের ভাগ্যে বৃষ্টি এবার একসঙ্গে নয়-ছয়ের পালা।

শুধু তাই নয়। হিউম-কোম্বিনেশন-ব্রাঙ্কের ত্রাহস্পর্শে দিল্লী নগরীতে মুহু ভূমিকম্প ইতিমধ্যেই অদ্ভুত হয়েছে। ত্রিমূর্তি মার্গে অমরমূর্তি নেহরুর অস্তিম শোকবাড়ার পাশে এটি ত্রিমূর্তির ত্রাহস্পর্শ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। তাঁরও জন্ত আমার মনে আশঙ্কার ছায়া।

—জ্যোতির্জ্ঞান বসু



প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ লণ্ডনের সংবাদপত্র কিতাবে প্রকাশিত

# সেই স্মরণীয় দিনগুলি

(নেহরু-জীবনের সাক্ষিপু ঘটনা)

[গভীর দুঃখের সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করতে হচ্ছে যে, বর্তমান বিশ্বের অশ্রুতম শ্রেষ্ঠমানব আচার্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লোকান্তরিত হয়েছেন। নিষ্ঠুর নিরতি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার, বিশ্লেষণ, নিন্দা, স্তুতি থেকে নতুন ভারতের রূপকার জনগণবান্ধিত এই মহান দেশনায়ক আজ বহু উর্ধ্বে। তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবন দেশমুক্তির দুর্বীর তপস্যার অক্লান্ত কর্মের এবং নবভারত রূপায়ণের এ অসামান্য প্রামাণ্য ইতিহাস। সেই ত্যাগব্রতী ঘটনাবল্ল প্রেরণাদায়ক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ অল্পপাঠ্যের লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বর্গত মহান দেশনায়কের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের প্রত্নজাগ্রতিধরণ তাঁর মহান জীবনের একটি সাক্ষিপু বিবরণী পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা হ'ল।—স]

১৮৮১—১৪ই নভেম্বর জন্ম। জন্মস্থান—এলাহাবাদ। পিতা— ১৯৩২—উত্তর-প্রদেশের ভূমি আন্দোলন এবং কারাবরণ ও দুই বছর  
মতিলাল নেহরু। মাতা—স্বরূপরানী নেহরু।  
গ্রেপ্তারবরণ।

১৯০০—ভদ্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের জন্ম।

১৯০৫—১ম শিক্ষার্থী বিলাত যাত্রা।

১৯০৭—ভদ্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা হাতী সিংয়ের জন্ম।

কেন্দ্রিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যোগদান।

১৯০৮—প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স লাভ।

১৯১২—শিক্ষা সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

৬—কমলা দেবীর সহিত বিবাহ। লন্ডনে  
অগ্রহস্তিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

১৯১৭—কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম।

১৯১৮—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসাবে  
মনোনীত।

১৯২২—প্রেল ৬৬ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমনের  
বিশিষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন ও কারাবরণ।

আগস্ট মাসে মুক্তিলাভ এবং অক্টোবর মাসে  
বিশেষ বৃত্তি বর্জন ও পুনর্বার গ্রেপ্তারবরণ।

১৯২৬—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক  
নির্বাচিত। আইন অমান্য আন্দোলন ও  
গ্রেপ্তারবরণ।

১৯২৭—মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতা  
দাবী পেশ। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক  
নির্বাচিত।

১৯২৯—কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে নিখিল ভারত  
কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত।

১৯৩০—লবণ সত্যাগ্রহ ও কারাবরণ।

১৯৩১—পিতৃবিয়োগ।



বঙ্গী নেহরু

- ১১৩৪—কলিকাতার আপত্তিজনক ভাষণদানের<sup>১</sup> জন্য দুই বছর কারাদণ্ড।
- ১১৩৬—পত্নীবিয়োগ। নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।
- ১১৩৭—মাতৃবিয়োগ। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদে পুননিয়োগ।
- ১১৪০—দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ এবং কারাবরণ।
- ১১৪১—জেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ।
- ১১৪২—বিখ্যাত আগরু আলোচনায় শুরু হবার প্রাকালে কারাবরণ। কক্স জিমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহ।
- ১১৪৪—ভরীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের মৃত্যু।
- ১১৪৫—তিন বছর পর বন্দী থেকে মুক্তিলাভ। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বীর সৈন্যদের বিচার। নেহরু সওয়াল।
- ১১৪৬—নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত। দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান।
- ১১৪৭—ভারত বিভাগ। বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা লাভ। দিল্লীতে এশিয়া সম্মেলন আহ্বান। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ।
- ১১৫০—পাক-ভারত বিরোধ অবসানের জন্তে করাচী গমন। নেহরু-সিরাঙ্ক চুক্তি।
- ১১৫১—নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত। সভাপতির বক্তৃতাদান।
- ১১৫৩—ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে ভাষণ।
- ১১৫৪—ডাক-টিকিট শতবার্ষিকী উদযোজন। পাঞ্জাবে ভাকরা নাকরা খালের উদযোজন। চীন গমন। উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের সঙ্গিত সাক্ষাৎকার। নেহরু ও চৌ এন লাই-এর যুক্ত-বিবৃতি। পঞ্চশীল ঘোষণা।
- ১১৫৫—ইকোনোমিয়ার বালু শহরে আফ্রিকা ও এশিয়ার উনত্রিশটি রাষ্ট্রের সম্মেলন। নেহরু কর্তৃক ভাষণদান ও অংশগ্রহণ। পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ। সোভিয়েত দেশ বাক্স। নেহরু কর্তৃক নয়াদিল্লীতে ক্রুশ্চভ ও বুলগারিনের স্বাধীনতা 'ভারতবর্ষ' সম্মানলাভ।
- ১১৫৬—নেহরু কর্তৃক লোকসভার বুটেন ও ফরাসীদের সুরেজ বাল আক্রমণের নিন্দা।
- ১১৫৭—দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন ও কংগ্রেসের নেতা হিসাবে নেহরুর মন্ত্রিপদ গঠন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শতবার্ষিকী উৎসবে নেহরুর বক্তৃতাদান। মাইথন বীধ ও দামোদর করপোরেশনের উদযোজন।
- ১১৫৮—দিল্লীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কিরোজ খাঁ নূনের সঙ্গিত আলোচনা ও সীমান্ত সম্পর্কে যুক্ত ইস্তাহার। নয়াদিল্লীতে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি মিনের সঙ্গিত সাক্ষাৎকার। দিল্লীতে নেহরু ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস সাক্ষাৎকার।
- ১১৫৯—দালাই লামার ভারত আগমন। নেহরু কর্তৃক আশ্রয়দান। ম্যাকমাহোন লাইনকে চীন-সরকার ভারত-চীন আন্তর্জাতিক সীমারেখা বলে মানতে বাজি নয় বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট চীনের প্রধানমন্ত্রীর পত্র প্রেরণ।
- ১১৬০—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের ভারত সফর। নেহরুর সঙ্গিত আলোচনা। বিলাত গমন। কানরোতে নেহরু-নাসের আলোচনা। নেহরুর পশ্চিম-পাকিস্তান সফর। সিঙ্কুদের জলচুক্তিতে স্বাক্ষর। রাষ্ট্রসভার সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্তে নিউইয়র্ক গমন। জাভাতা কিরোজ গান্ধীর মৃত্যু।
- ১১৬০-৬১—কমনওয়েলথস প্রধানমন্ত্রীর সম্মেলনে যোগদানের জন্য লণ্ডন গমন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো ভ্রমণ। বেলেগ্রেড নিরপেক্ষ শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদান।
- ১১৬২—তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন ও তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। আকস্মিক অসুস্থ ও বিজ্ঞানের জন্য কান্সার গমন। কলকাতা বাক্স, চীনকে ভারত থেকে বিতাড়নের কঠোর নির্দেশ। চীনের ভারত আক্রমণ, নেহরুর বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ।
- ১১৬৩—কামরাজ পরিকল্পনার আগ্রহ।
- ১১৬৪—ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থ। নেহরুর সাধাণিক-সম্মেলন। ২৭শে মে, ৭৫ বছর বয়সে নয়াদিল্লীতে মহাপ্রয়াণ।



পিতৃবিয়োগে শোকসন্তপ্তা জিমতী ইন্দিরা গান্ধী

—তথ্যবিদ সংগৃহীত

# মৌলমর্না

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি)

শ্রীমদ্বৈধকুমার চক্রবর্তী

সাতাশ

বাহিরের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে বসে কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর কথা ভাবছিল। রাতি থেকে কিরে আসবার পরে সে আরও গম্ভীর আরও বিমগ্ন হয়েছিল, আরও কম সময় সে এই বারান্দায় এসে বসে। মাঝে মাঝে সে নিজের কাকরের রাস্তার উপরেও নামত। বিকেলবেলায় হেঁটে বেড়াতে থাকত। অনেকদিন সে তার গুদাম থেকে ফেরার সময় তাকে বাহিরেই দেখতে পেয়েছে। আজকাল আর তাকে বাহিরে দেখতে পাওয়া যায় না। আজকাল সে ঘরের ভিতরে জগদীশের পশেই বেশি বসে থাকে। কাঠুরে চৌধুরী সাদে কথা বলে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

দময়ন্তীর এই পরিবর্তনের কারণ কি, বাস বাস সে তাই ভাবছিল। হাতে চুকট আছে, সে চুকট পুড়ে চাই হাজ, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। তারই কোন অপরাধ হল কি না সেটুকু কাঠুরে চৌধুরী ভাবছিল।

কোন অপরাধের কথা কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ল না। ছোটখাট অপরাধের তো হিসেব থাকে না, আর অন্তর্যমানে যে অপরাধ হয় তার স্বরূপ কেউ রাখে না। মানুষের কথা হল সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস। এই কথার জটিল মানুষ মানুষের প্রিয়-অপ্রিয় হয়, কথা দিয়েই মান-অপমান, কলহ-সন্ধি হয়, রাগ-অসুখ-গণ্ড প্রকাশ করে কথা দিয়ে। কথা না থাকলে রাস্তার সমাজ চমকত না। কাঠুরে চৌধুরী মনে করতে পারে না, এই কথা দিয়ে সে কোনদিন তাকে আঘাত করেছিল কি না।

বোধ হয় করেছে। সে কোনদিন ভেবে কথা বলে না। যা মনে আসে তাই সে বলে ফেলে। এটুকু দোষের জন্য তার বন্ধু হয় না, বিবাদ হয় সকলের সঙ্গে। অথচ তার বিবাদ বরবার বাসনা ভেঁ করেও সাদে নেই। বাদের সঙ্গে শুধু কাজের সহজ তার তাকে জালবাসে। ঠাকুরসাহেব তাকে ভালবেসেছিলেন, ভালবেসেছিলেন যে সাহেব। তার গুদামের লোকেরাও তাকে ভালবাসে। যে কাকি দেয় তাকে যেমন লাখি মারে, তেমনি যে কাছ করে তাকে নেয় বৃকর ভিতর টেনে। কাজের পরিমাণ দেখে যেমন মজুর দেয়, তেমনি উপরি পরমা দেয় কাজে অসুখ-গণ্ড দেখে। কাজ করতে যারা ভালবাসে, কাঠুরে চৌধুরী কাছে তাদের অক্ষুণ্ণ আনব।

কাঠুরে চৌধুরী ভেবে দেখল, জগদীশকেও সে কোন অপ্রিয় কথা বলে নি। ঠাকুরদের চলে যেতে বাধ্য দিয়েছে। সে তো নিজের

ইচ্ছায় দেয় নি, দিয়েছে ডাক্তারের কথা। ডাক্তার সেন বলেছেন এখন তাকে নড়ানো উচিত হবে না। এখন একভাবে শুয়ে থাকি ভাল। আর দময়ন্তী এখন এখানে আছে, তখন তার কিসের কষ্ট। সে তো সবই জানে, সবই পারে, বোঝেও সবই। জগদীশকে সে কি বোঝাতে পারে না!

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, দময়ন্তী নিজেই তাকে ভুল বুঝেছে। হয়তো তার কোন কথায় কিংবা আচরণে সে আহত হয়েছে। প্রতিবাদ করে নি, শুধু মুখ বুজে সাহ্য গেছে। হিঃ হিঃ! একজন অসহায় মহিলার সম্মান সে রাখতে পারল না! তার আশ্রয়ে আছে বলই তাকে অপমান করল! দিক তাকে। এর চেয়ে নাচ কাজ আর কি হতে পারে! গ্রে সাহেবও এই কথা বলতেন, আশ্রয় দিয়ে যে দাম চায় সে শরতান। আশ্রয় কাউকে দিও না, দিলে তার পুজো করবে ছুঁবেলার। সেই তোমার দেবতা।

গুস্তান গে সাহেবের মুখ এ কথা শুনে কাঠুরে চৌধুরী আন্দর্ভ হত। অস্তিত্বি নারায়ণ, এ হল হিন্দুদের কথা। দীর্ঘদিন এদোশ থেকে গে সাহেব কি হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন!

বুড়া এ কথাও বলতেন যে এ যুগে ভালমানুষের কোন দাম নেই। ভালমানুষি তোমার বাড়িতে বেথে বের হবে। বাহিরের পৃথিবীতে ভালমানুষি দেখিয়েছ কি হবে। লোকে তোমাকে বোকা ভাবে, ঠকিয়ে নেবে, তারপর বদনাম করবে। কাজে কড়া হও, কঠিন হও, নির্ভর হও। লোকে তোমার স্তখ্যাতি করবে। দম্ভার একটু ছোটকোটা পেয়েই লোকে ছুঁতাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

গ্রে সাহেব বলতেন, এ নিয়ম তোমার-কামার জন্তে। সমাজে যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো অজ নিয়ম। তার জন্তে দল পাকাত, মিথ্যা বল, ছনিয়ার সমস্ত অজায়ক অজভাবে প্রেশর দাও। পারবে না?

কাঠুরে চৌধুরী এ প্রশ্নের উত্তর দিত না।

সাহেব বলতেন : চৌধুরী, ক্ষমতার লোভই সবচেয়ে বড় লোভ। সে লোভের এমন নেশা যে কোন প্রলোভনেই মন ভোলে না। মদ, মেয়েমানুষ, টাকা সবই ঐ ক্ষমতার লোভের কাছে মাথা হেঁট করে। মার না খেলে এ লোভ যায় না। সে নিদার মার নয়, চাষকেশও নয়, সে মার যমের মার। যম যখন মাথার শিরের এসে পাড়ায়, বলে উঠেছে কি এই দণ্ড দেখ। শুধু তখনই হয় লোভের কথা নিচু!

কাঠুরে চৌধুরী বলেছিল : তাতেও বোধ হয় হয় না।

চক-চক করে আরও খানিকটা মদ খেয়ে গ্রে সাহেব বলেছিলেন :

ঠিক বলছে। অত্যন্ত মুক্তকে তারা ভয় পায় না। ভয় পায় না হত্যার বড়স্বাক।

তবে ?

কঠি রোগে বধন শয্যাশায়ী হয়, আর ডাক্তার বলে, না, উঠেছ কি মরেছ, তখনই পরিবর্তন আসে।

একটু খেমে গ্রে সাহেব বলতেন : ভগবানের লোভের চেয়ে ক্ষমতার লোভ এইখানেই থাকে। বম্বুত এসে বধন মাথার শিরে দাঁড়ায়, তাকে তখন ভয়ের মনে হয় না। হাতজোড় করে বলে হে সুল্লর, তুমি কি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে এসেছ ?

ক্ষমতার লোভ ছিল না কাঠুরে চৌধুরীর, ভগবানের লোভও না। কিসে তার লোভ, আজও সে কথা সে ভেবে পায় নি। বোধ হয় কোনদিন ভেবেও দেখে নি। নিতান্তই সাময়িক তার বাসনা, কামনা। তাকে লোভ বলে না। কাজ নেই, এই বারান্দায় বসে বসে আকর্ষণ মদ গিলেছে। ওরা ওরা নিমন্ত্রণ করেছে তাদের গ্রামে, সে তাদের সঙ্গে মদ খেয়ে নেচে এসেছে। জল্লর বধন ভাল লাগে নি, তখন শহরে গেছে। পুস্তকের সান্নিধ্য বধন তিস্ত মনে হয়েছে, তখন ডেকেছে মেয়েমানুষ। বধন সবকিছুতে ঘেঁষা হয়েছে, তখন ভগবানের কথা ভেবেছে। পৃথিবীতে কি ভগবান নেই ? কে দেখেছে ভগবান ? ভগবান যেন ভূতের মতো। সকলেই আছে বল, কিন্তু দেখে নি কেউ। ভূত থাকলে গ্রে সাহেব কি ভূত হয়ে সামান্য অসুস্থতেন না ? তাঁর এত সাধের ব্যবসার কথা কি একেবারেই ভুলে যেতেন।

তার মনের গোপনে কোন গভীর বাসনা লুকিয়ে আছে কি না, কাঠুরে চৌধুরী তা ধরতে পারল না। দময়ন্তীরা কি তার সত্যতার সন্দেহ করছে।

কাঠুরে চৌধুরীর হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল। বোধ হয় সে তাদের দুবিতার দু' একদিন পরের কথা। অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে দময়ন্তী বলেছিল : আপনাকে একটা অনুরোধ করতে আমার খুবই লজ্জা করছে।

এই রকম কথা উত্তরে কি বলা উচিত কাঠুরে চৌধুরী তা ভেবে পার নি। বলেছিল : বলুন না।

আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

নিশ্চয়ই না।

দময়ন্তী তবু সন্তোষ করেছিল বলতে। আর কাঠুরে চৌধুরী কক্ষ-ভাং বলেছিল : আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না।

না না, বিশ্বাসের কথা নয়, এ বড় লজ্জার কথা। আমার প্রস্তাব শুনে আপনি হয় তো হাসবেন।

হাসব না।

দময়ন্তী একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলেছিল : আপনার সঙ্গে যে আমার পুরনো পরিচয়, এ কথা প্রকাশ করবেন না।

এই কথা। এর জন্তে এত লজ্জা।

প্রতীক্ষিত দিতে কাঠুরে চৌধুরী একমুহূর্ত বিধা করে নি। কিন্তু এই অনুরোধের অর্থ সে আজও বুঝে নি। এতো তাদের কলঙ্কের কথা নয়, পূর্বরোগেরও কাহিনী নয়। এ ভুলই পরিচয়ের কথা। প্রকাশ হলে কি দময়ন্তীর ক্ষতি হবে। কে জানে।

মাথায়ের চরিত্র যে কত বিচিত্র হতে পারে কাঠুরে চৌধুরী সেই কথাই ভাবছিল। নরোত্তম খেমলানির বাড়িতে এই দময়ন্তীকে দেখে যে তাকে কত সরল কত কোমল ভেবেছিল। তাকে আজ কোনমতেই চেনা যায় না। মেছোট সতিতাই বলে গেছে। শক্ত হয়েছে, কঠিন হয়েছে। বৃদ্ধিও হয়েছে আগের চেয়ে পাকা। কাঠুরে চৌধুরী আজ আর তার মনের ঠেঁ পাচ্ছে না।

এর জন্তে দময়ন্তীকে দোষ দেওয়া যায় না। জীবনের স্তরভেদই সত্যনেকগুলো কঠিন দাক্ষ্য পেল। স্বামী যদি পঙ্কু হয়ে যায় তো তার জীবনটাই তো স্তব্ধ হয়ে যাবে। কি নিয়ে বাঁচবে সে, কেমন করে বাঁচবে।

কিছুদিন থেকে এই দময়ন্তী তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসে না, ভাল করে কথা কয় না, আগের মতো তার কাছে এসেও বসে না। কি একটা হয়েছে, কি একটা নতুন বেদনা। সেই বেদনার কথা বলতে না পেরে যখন বুঝি আরও বেড়েছে।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল দময়ন্তী আজও ছেলেমানুষ আছে আগের মতোই। কেঁদে যে হাঙ্গা হওয়া যায়, সে কথাও তার মনে আসছে না। তাকেও সে এ কথা মনে করিয়ে দেবার সুযোগ দিচ্ছে না। এ কার উপরে অভিমান।

সহসা কাঠুরে চৌধুরী দেখল, দময়ন্তী তার ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসছে। বারান্দার ওদারটার অন্ধকার বেশি। শোলা দরজা দিয়ে যে আলো আসছে, সেই আলোতে দময়ন্তীকে দেখা গেল।

কাঠুরে চৌধুরীর কি মনে এল সেই জানে, লাক্ষিয়ে উঠে এগিয়ে এল। খপ করে দময়ন্তীর একটা হাত চেপে ধরে বলল : আসুন এইদিকে।

দময়ন্তী এই আক্রমণের জন্তে প্রস্তুত ছিল না। চমকে উঠেছিল, কিন্তু আতঁনাদ করে ওঠে নি। কাঠুরে চৌধুরীকে চিনতে পেরে নিশ্চয় একটা অনুরোধ করেছিল। সে কথায় নয়, সে কাজে। যে হাতখানা মুক্ত ছিল, সেই হাতের তর্জনী ঠেকাল নিজের ঠোঁটে। নিশ্চয় অনুরোধ—কথা বলবেন না।

বারান্দার অপরপ্রান্তে টেনে এনে দময়ন্তীকে কাঠুরে চৌধুরী একটা ডেক-চেয়ারে বসিয়ে দিল, নিজে বসল অন্ধটার। কিন্তু আর কোন কথা কইল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দময়ন্তী বলল : আপনাকে কথা কইতে কেন বারণ করলাম জিজ্ঞেস করলেন না ?

উত্তর সে নিজেই দিল : ও একটু ঘুমিয়েছে। জাগলেই আমাকে তার পাশে গিয়ে বসতে হবে।

কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জগদীশ্বর এই কথা বলেছে, না দময়ন্তী বৈজ্ঞান্য এ কাজ করে।

দময়ন্তী অল্প কথা বলল : খানিকক্ষণ আপনি জোরে জোরে হাসবেন না।

সংক্ষেপে কাঠুরে চৌধুরী বলল : বুঝেছি।

বোঝেন নি আপনি বুঝতে পারবেন না।

দময়ন্তীর গলার স্বর কান্নার মতো প্রথম শোনাল। কাঠুরে চৌধুরী প্রতীক্ষা করতে পারল না।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল  
করে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস  
নিয়মিত ব্যবহারেই  
হা সম্ভব।



সতর্কীকরণ :-

কিনিবার সময়  
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র গুপ্তি  
পিলফার গ্রাফ ক্যাপের  
উপর R.C.M. মনোগ্রাম  
ও প্রস্তুতকারক  
এম. এল. বসু এণ্ড কোং  
দেখিয়া লইবেন।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস - কলিকাতা - ৯

অনেকক্ষণ পরে দময়ন্তী বলল : আপনি তো সুস্থ মানুষ, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি কি ভুল বুঝছি আপনাকে ?

তা না হলে আপনি আমার ওপর কেন রাগ করলেন ?

কই, আমি তো রাগ করি নি।

করেছেন। আমার ওপরেই আপনি রাগ করেছেন ! কিন্তু আমার কথা একবার ভেবেছেন কি ? কত কষ্টসহ্য আমি ! কত নিরুপায় ! দময়ন্তী দু'হাতে তার মুখ ঢাকল।

বিশ্ময়ে কাঠুরে চৌধুরী আজ হতবাক হয়ে গেছে। এত ব্যথা ছিল, এত অভিমান ছিল দময়ন্তীর মনে। কিছুটা সে জানতে পারে নি।

উত্তেজনার কাঠুরে চৌধুরী উঠে ঝাঁড়াল, খামখেয়ালির মতো পারাচারি করল অল্প একটু জায়গায়, তারপর বসে পড়ল।

দময়ন্তী কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁছে। তার কাছে যেতে কাঠুরে চৌধুরীর ইচ্ছা হল। তার মুখ তুলে চোখের জল মুছিয়ে দেবার ইচ্ছা হল কিন্তু পাওল না। হাত বাড়িয়েও সে হাত গুটিয়ে নিল। দময়ন্তীরা সভ্য-জগতের মানুষ, তাকে ভুল বুঝবে।

মানুষ কেন মানুষকে ভুল বোঝে ? কেন তার কাজের বিচার করে না কাজ দিয়ে ? কেন সবকিছুর কাষকাষণ বিচার করে একটা সাধারণ ঘটনারও উদ্দেশ্য বার করে ? পরের হাস দেখে কি আমরা হাসি না, না পরের দুঃখে দেখে কখনও কাঁদি না। বারও চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া কি পাপ ! কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এই সমাজটাই মানুষকে অমানুষ করেছে। সভ্যতার নামে আমরা মানুষকে বর্জন করেছি।

নিজেকে সামলাতে দময়ন্তীর অনেক সময় লাগল। খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল : জীবনে যা সবচেয়ে ঘৃণা করেছি, তাই আমার জীবনে সত্য হল।

কি সেই কথা ?

এই লুকচাঁচুরি।

কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য হয়ে বলল : লুকচাঁচুরির কি আছে ?

কিছু নেই।

দময়ন্তী হাসল, সে হাসি মানে হল কান্নার চেয়েও কষ্টকর। কাঠুরে চৌধুরী আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশায় দময়ন্তীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দময়ন্তী নীরব হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল : আপনার সঙ্গে আমি সহজভাবে মিশতে পারি নে, পারি নে সহজভাবে কথা কইতে। হাসতে পারি নে, কাঁদতেও পারি নে। এমন করে কি মানুষ বাঁচতে পারে ?

কিন্তু কেন পারেন না ?

আমার স্বামী আমাকে ভুল বুঝবেন।

কাঠুরে চৌধুরী চমকে উঠল, বলল : ভুল বুঝবেন আপনাকে !

সেই তো সবচেয়ে বড় ক্ষোভের কথা। জীবনে কি এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আছে ?

নেই।

কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পৃথিবীটাই তার কাছে মিথ্যা মনে হচ্ছে। স্বামী যদি সত্যি সন্দেহ করে তা হলে সাধারণ মানুষ সত্যিকে কি চোখে দেখবে ! জগদীশ এত নীচ।

দময়ন্তী বলল : আমি সব বুঝি। বিবাহান শুয়ে শুয়ে মানুষটা এইরকম হয়ে গেল। আরও কত নীচে নামবে, সেই ভেবে আমার ভয় করছে।

না না, নীচ নামতে তাকে দেবেন না। দরকার হলো—

কি করবেন ?

আমি এখন থেকে সরে যাব।

দময়ন্তী হাসল, বড় নিসঙ্গ হাসি।

কাঠুরে চৌধুরী বুকি জমজমা পেল, বলল, না না, হাসবার মতো কথা আনি নি। প্রয়োজন হলে আমি আমার কারখানার গিয়ে থাকব, আপনার অপমান হতে দেব না। আমার এইটুকু উপকার আপনি করবেন।

একি আপনার উপকার মিষ্টার চৌধুরী ?

কাঠুরে চৌধুরী সঠিক কনি হয়ে উঠল, বলল : আমার মায়ের কথা আপনি জানেন না। আমার বাবার অত্যাচারে তাকে মরতে হয়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

দময়ন্তী সোজা হয়ে বলল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : তখন আমি নিতান্তই শিশু। যদি আমার মায়ের দুঃখ বুঝতে পারতাম, তা হলে তাকে মরতে হত না। আমার বাবাকে খুন করে মাকে আমি বাঁচাতাম।

কাঠুরে চৌধুরী চৌচোখের দলি বাত্বের মতো হল ছল করে উঠল। দময়ন্তীর মনে হল, এখনও এই লোকটার সমস্ত অন্তর স্বলছে। আজও সে তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পাতে। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরীকে দময়ন্তী আর ভয় দায় না। বলল : কি হয়েছিল ?

জানি নে। শুধু এইটুকু জানি যে, 'মার মা খুব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তারপর তিনি আত্মহত্যাতে চান নি। আপনিই বলুন, স্ত্রীকে যে অপমান করে সে মৃত্যু ? তাকে বাঁচতে দেওয়া উচিত ?

দময়ন্তী শিউরে উঠল। তার মনে হল, এই লোকটার কাছে সব কথা বলা উচিত হবে না। জগদীশ তাকে অপমান করেছে জানলে সে তার গলা টিপে মরতে দিবা করবে না। আর কিছুদিন পরে জগদীশ যে তাকে অপমান করবে তাতে সন্দেহ নেই। যে নিজের পিতাকে আত্মও ক্ষমা করতে পারে নি, সে কি জগদীশকে করবে !

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর দময়ন্তী বলল : একটা কথা আপনি আমার কাছে লুকিয়েছিলেন।

কি কথা ?

আমার বাবার কাছে আপনি খবর পাঠিয়েছিলেন।

কে বলল আপনাকে ?

আমি জানতে পেরেছি।

নিশ্চয়ই আপনাকে ওরা বলেছে।

বললে ভাল করত।

তবে ?

আমি নিজেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

কাঠুরে চৌধুরী যেন আকাশ থেকে পড়ল : আপনি গিয়েছিলেন তাঁর কাছে ? কবে গিয়েছিলেন ?



## মৌন বন

সেদিন রাঁচি থেকে ফেরার পথে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি।

কি বললেন তিনি ?

বললেন, আমার মতামত তো আগেই আমি জানিয়েছি।

আপনি আমাকে বলেন নি বলে আবার আমাকে বললেন।

আর কিছু বললেন না ?

একটা ভাল উপদেশ দিলেন।

আগ্রহে কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল।

দময়ন্তীর ঠোঁট কাঁপছিল খর-খর করে।

কি উপদেশ দিলেন ?

বললেন, বিব দাও ঐ হতভাগাকে।

উদ্বেজনায় কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়াল। বলল : আপনি কোন উত্তর দিলেন না ? দিয়েছি। বলাই, পাঠিয়ে দিও।

বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে দময়ন্তী কঁদে উঠল।

বড় অসহ্য দেখাল কাঠুরে চৌধুরীকে, বড় বেদনার্ত। দময়ন্তীর জগে এখন তার বই হচ্ছে না। কষ্ট কেন হচ্ছে তা সে বুঝতে পাচ্ছে না। বুকের ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করছে। মনে হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডটা কেউ উপড়ে ফেলতে চাইছে। নরোত্তম খেমলানি কি দময়ন্তীর পিতা ?

চলং একটা শব্দ শুনে কাঠুরে চৌধুরী স্থির হয়ে দাঁড়াল। দময়ন্তীও তাকাল মুখ তুলে। জগদীশের ঘুম ভেঙেছে, যন্ত্রণায় সে বুকি কাতগাছে।

উঠে দাঁড়িয়ে দময়ন্তী বলল : আমাকে ক্ষমা করবেন।

তারপর আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

## আটাশ

ডাক্তার সেন মাঝে মাঝে জগদীশকে দেখতে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন : কমন আছেন ?

জগদীশের আর উত্তর দিতে ভাল লাগে না। বলে : দেখুন।

ডাক্তার সেনের দেখবার কিছুই নেই। যা দেখবার, তার জন্তে ডেসার আসে। পরিষ্কার করে পাউডার মাগিয়ে যায়। বেড সোফা বড় খারাপ জিনিস, বড় কষ্টদায়ক। প্রাক্টারবীধা শরীরে সারাক্ষণ শুয়ে থাকলে বেড সোফার হাত থেকে অব্যাহতি নেই। সেইজন্মেই ডেসারের দরকার। জগদীশ ভালই আছে।

ডাক্তার বললেন : একটু চায়রফুল থাকুন।

আর চায়রফুল !

জগদীশের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সে যেন জেঁচি কাটল।

দময়ন্তী তাড়াহাড়ি বলল : সারাদিন শুয়ে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার বললেন : সে তো সত্যি কথা।

আর বেঁচেছেন ও আষ্টপুঠে। কোনখানটা বাদ রাখেন নি।

ডাক্তার হেসে বললেন : ওপর দিকটা তো খুলেই রেখেছি।

শিরদাঁড়ায় সামান্য আঘাত দেখলে গলা থেকেই বেঁধে দিতাম।

জগদীশ বলল : খাটিয়ায় তুলে দিলে আরও ভাল করতেন।

ছিঃ ! ছিঃ !

মন মাতানো

গন্ধে

ভরা বলেই

সবার পছন্দ



# হিম্মানী

শক্তি পাউডার

উন্নত কৃষ্টির

পরিচায়ক

হিম্মানী প্রাইভেট লিঃ

কলিকতা-২



বসন্তমতী : জ্যৈষ্ঠ '৭১

২৩৬

দময়ন্তীর কষ্ট হয় এ সব কথা শুনে। কিন্তু বায়ে বায়ে বলতেও জগদীশের কষ্ট হয় না।

ডাক্তার তাঁরও পূর্বনো কথা আবার বললেন : ফিমার ফ্র্যাকচারে এত বাঁধাবিধি করতে হয় না। তার নেকটা ভেঙেই গোলমাল বেধেছে, কাবু হয়েছে হিপ জয়েন্ট। তাড়াহাড়ি যাতে উঠে দাঁড়াতে পারেন, তার জল্পেই এত সাবধান হয়েছি।

জগদীশের উরু ভেঙেছে একদিকে, কিন্তু দু'টো দিকটো তিনি বঁধে দিয়েছেন। যেদিকটা ভেঙেছে সেদিকটা বঁধেছেন কোমর থেকে পায়ের গোড়া পর্যন্ত, অঙ্গদিকটার ইটিং উপর পর্যন্ত। নিত্যকর্মের জগা নিচের দিকটা খানিকটা খোলা রেখেছেন। কোমরটা শক্ত করে বাঁধা। নড়াচড়ার জন্য তাকে দময়ন্তীর সাহায্য নিতে হয়। মাসখানেক যত্নবা ছিল, এখন আর বাঁধা নেই। এখন শুধু শুয়ে থাকা, আর কোন রকমে সময় কাটানোই কাজ। কাঠুর চৌধুরী তার জন্য নানা রকমের বই আনিতে দিয়েছে। ডিক্টেব্রি বই-এর নেশা আছে বলে ঐসব বই-ই বেশি—ক্রিস্টি, গার্ডনার, চেটিন, কাঠুর চৌধুরী নাম শোনে নি এমন সব লেখকেরও বই এনে দিয়েছে। কিন্তু জগদীশের মন সেদিকে যায় নি। মন তার ফিরে ফিরে অন্তরিকে যায়। অশান্ত হয়, বিরক্ত হয়, কলহ করে দময়ন্তীর সঙ্গে।

ডাক্তার বললেন : বড় কষ্টক। বুদ্ধি, কিন্তু উপায় কি বলুন।

জগদীশ বলল : আর কতদিন এত রকম করে শুয়ে রাখবেন ?

বলেছি তো, আপনাকে বঁধে ধরতে হবে।

বঁধেরও একটা সীমা আছে।

আপনি বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ। আপনার বঁধে তারানা উচিত নয়।

দময়ন্তী এই উপদেশের গুরুত্ব বুঝে। ডাক্তারের কাছে সে খোলাখুলি সব স্বেচ্ছা নিয়েছে। বলেছিল : আমাকে আপনি কাঁকি দেবেন না ডাক্তারবাবু, আমাকে সব খুলে বলুন।

ডাক্তার ইতস্তত করছিলেন।

তাই দেখে দময়ন্তী বলেছিল : আপনি তো সব দেখতেই পাচ্ছেন, বুঝতেও পাচ্ছেন সবট। মিস্টার চৌধুরার আমরা আত্মীয় নই, আশ্রিত। আজ হোক, কাল হোক, নিজের পায়ের আমাদের দাঁড়াতেই হবে।

ডাক্তার আর বিধা করেন নি, বলেছিলেন : হাড়টা বড় বেয়াদু। আরগার ভেঙেছে। ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত।

দময়ন্তীর বৃকের ভিতরটা মুচড়ে উঠেছিল, কবিরে উঠেছিল গলা। বলেছিল : কোনদিনই কি উঠে দাঁড়াতে পারাবেন না ?

না না, সে ভয় নেই। উনি নিশ্চয়ই দাঁড়াবেন।

তবে ?

সহজভাবে চলাফেরা করবেন, না লাঠির সাহায্য নিতে হবে, তা এখন বলতে পারি নে।

কবে পারবেন ?

আরও মাস দু'রেক পরে একবার খুলে দেব, যদি বুঝতে পারি বলব। তা না পারলে হাড় জোড়া লাগবার পরেই বোঝা যাবে।

দময়ন্তী কেনে নিয়েছে যে জগদীশকে মাস দু'রেক শুয়ে থাকতেই হবে। তারপরেই তার ভবিষ্যৎ জানা যাবে সঠিকভাবে। দময়ন্তীর বেশ প্রচণ্ড উত্তরও সেদিন পেয়ে গেছে। ডাক্তার সেনকে জিজ্ঞাসা

করেছিল : আমার আর একটা প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি আর আপনাকে আলাতন করব না।

বলুন।

উনি কোনদিন তাঁর চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন না ?

ডাক্তার হতস্তত করেছিলেন এ কথার উত্তর দিতে।

দময়ন্তী বলল : দ্বিধা কাটেন কেন, বলুন আপনি। দরকার হলে আমি যোজ্ঞগারের চেষ্টা করব।

ডাক্তার সেনের এমটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : তাই করুন।

চীৎকার করে দময়ন্তী কঁদে উঠল না, ভেঙে পড়ল না আগের মতো। শুধু শুক্ক হয়ে বসে রইল।

দময়ন্তীকে ডাক্তার সেন সাশ্রা দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন : বসে বসে উনি সব কাজই করতে পারবেন, কিন্তু ঠাণ্ডা পুরনো চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। ওতে দৌড়-ঝাঁপের কাজই তো বেশি।

দময়ন্তী বুঝেছে যে জগদীশ খোঁড়া হয়ে থাকবে সামাজীবন। লাঠি যদি নাও নিতে হয়, তবু সে বুড়িয়ে যাবে। এ যুগের জীবন-যুদ্ধে খোঁড়া মানুষের কোন স্থান নেই। দময়ন্তীকেই এবারে তার নিজের পায়ের দাঁড়াতে হবে।

এ কথা জানবার পরে দময়ন্তীর বৃকের তার অনেকটা নেমে গেছে। এই রকম শুয়ে থাকাই জগদীশের জীবনের শেষ নয়, তাকেও চিরদিন একটা পঙ্গু স্বামীও পরিচ্যা করতে হবে না। প্রত্যাহ বেডপ্যান বঁটা একটা অসহ্য কাজ। কাঠুর চৌধুরী এ কথা বুঝেছিল। এ কাজের শারির্য দিতে চেয়েছিল অজ্ঞ কাজেকও। কিন্তু দময়ন্তী নিজেরই স্বামী হতে পারে নি। একজন মেথর তাকে এত কাজে সাহায্য করে।

দময়ন্তী আরও একটু আশ্বাস পেয়েছে। সে নিজের একটা কাজ পেয়ে গেলে কাঠুর চৌধুরার আশ্রয় অনার্যাসে ছাড়তে পারবে। জগদীশ আর কিছু না পাক্ক, নিজের ভারটা তো নিজে বইতে পারবে। তা হলেই দময়ন্তীর চলবে। সে লেখাপড়া শিখেছে, নিজে রোজগার করে কি সে তার পঙ্গু স্বামীকে শ্রমে রাখতে পারবে না ? নিশ্চয়ই পারবে। এই ক'দিনেই সে মনের বল সংগ্রহ করেছে অনেকখানি।

ডাক্তার সেনকেও সে অমুখোষ করেছে একটা সলনসই কাজ জুটিয়ে দিতে। যে কোন কাজ। মোটা ভাত-কাপড়ই তার সম্ভব থাকবে। ডাক্তার সেন বলেন নি যে এ কঠিন কাজ। বলেছেন : দেখি চেষ্টা করে।

দময়ন্তী তার বন্ধুবান্ধবকে কোন চিঠি লেখে নি। তারা হয় তো কলকাতার ব্যবস্থা করবে। সেখানে খরচ বেশি, জগদীশকেও এখন নিয়ে যাওয়া যাবে না। এ অঞ্চলে তলে অমুখোষ নেই। একটা অ্যাথলেট যোগাড় করে জগদীশকে সরানো চলবে। ডাক্তার সেন নিজে এ দায়িত্ব নিতে পারবেন বলেছেন।

কিন্তু যে মানুষটা শুয়ে আছে—সে কোন স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে না। জেগে জেগেও সে যা দেখছে তা দুঃস্বপ্ন। বিছানার ভয়ে ভয়ে তার মনের বল তারিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তার মেরুদণ্ডটাই গেছে ভেঙ্গে। এই ভাঙা মেরুদণ্ড তার কোনদিন জোড়া লাগবে না, কোনদিন যে আর সাজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। জগদীশের মনে হচ্ছে যে

## নৌন বন

ডাক্তার তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে, আর দমরস্তী সেবা কতটুকু অকারণে? দেহটাই যদি বিকল হয়ে যায় তো শুধু প্রাণ নিয়ে সে কি করবে। দমরস্তীই বা তার পক্ষু দেহটাকে কতদিন শ্রদ্ধা করবে।

ভালবাসা।

জগদীশ তাকে এই ভালবাসার নামে। একটা খোঁড়াকে কেউ ভালবাসতে পারে, না ডালবেসেছি বলেই সেই খোঁড়াকে সারাজীবন আঁকড়ে থাকা যায়। কোন শব্দ মাহুকের পক্ষে এ অসম্ভব। দমরস্তী তাকে কীকি দেবার চেষ্টা করছে। তার দুর্বলতা সে দূর দিতে চায় না। এ পতিভক্তি নয়, এ সৌজ্ঞ। দমরস্তীর শিক্ষার স্বভাবে যে সৌজন্য আছে, এ তারই প্রমাণ। জগদীশ নিরবে সব দেখে।

এরপর ডাক্তার সেন কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। জগদীশ গুম হয়ে গিয়েছিল, আর দমরস্তী মাথা নীচু করে তাকে দেখছিল।

ডাক্তার সেন কাঠুরে চৌধুরীর অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় সে ফিরে আসে। এ সময় এলে তার সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয় খানিকক্ষণ। লোকটার আকার-প্রকার যেমনই হোক, প্রাণ আছে অপরাধ, প্রাণের উত্তাপ আছে। তাই অমন প্রাণথুলে হাসতে পারে। কাঠুরে চৌধুরীও সঙ্গে দেখা করে ডাক্তার সেন ফিরবেন।

সহসা বাহিরে কাঠুরে চৌধুরীর চাংকার শোনা গেল : ওরে ফেলব, খুন করে ফেলব তোকে।

এ শব্দের সবাই একসঙ্গে চমকে উঠলেন। দমরস্তী ছুটে বেরল, ডাক্তারও বেরলেন তার পিছনে। বেরিয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন।

লব্যাটের বোঁকে কাঠুরে চৌধুরী শূন্ত তুলে ধরেছে। দু'টো শক্ত মুষ্টিতে ধরেছে তাৎ দুই বাহু, ঘেন ছুড় ফেল দেবে এমনভাবে ছুঁয়ে বলল : আমি মেমসাহেব বলি বলে কি তুই সত্যিই মেমসাহেব হয়েছিস।

দমরস্তীর পাশে দাঁড়িয়ে লব্যাট ঠকঠক করে কাঁপছিল, সাহস পাচ্ছিল না কিছু বলবার।

দৌড়ে এসে দমরস্তী টেটিয়ে উঠল : কি করছেন আপনি! ছেড়ে দিন, নামিয়ে দিন ওকে।

কাঠুরে চৌধুরী ঘেন তার সমস্ত শক্তি সহসা হারিয়ে ফেলল। বল কার নামিয়ে দিল মেয়েটাকে। হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, কোন কথা কইল না।

ছাড়া গেয়ে লব্যাটের বোঁ পালিয়ে গেল। লব্যাটও অদৃশ্য হল। ডাক্তার সেন এগিয়ে এসেছিলেন। কাঠুরে চৌধুরীকে বললেন : বসুন।

আর দমরস্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনি একটু মিস্টার মেহতার পাশে গিয়ে বসুন।

দমরস্তী আর অপেক্ষা করল না। নিজের ঘরে ফিরে গেল। এঁরা দু'জনে বললেন মুখোমুখি হয়ে।

ডাক্তার সেন বললেন : একটা চুকট আছে?

নিঃশব্দে কাঠুরে চৌধুরী তার চুকটের বাস এগিয়ে দিল।

ডাক্তার সেন একটা চুকট নিলেন, দেশলাই বার করলেন নিজের পকেট থেকে। তারপর সেটা ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : কি হয়েছিল? কিছু না।

ডাক্তার সেন অনেকক্ষণ ধরে চুকট টানলেন, তারপর বললেন : অজ্ঞায় কিছু বলেছিল বোধ হয়?

কাঠুরে চৌধুরী কোন কঠিন উত্তর দিল না। বলল : জগদীশবাবুকে কেমন দেখলেন?

ভাগ।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর ডাক্তার উঠ দাঁড়ালেন, বললেন : আজ আসি।

আমুন। বলে কাঠুরে চৌধুরী নমস্কার করল।

ডাক্তার সেন নিজের গাড়িতে এসেছিলেন। নিজেই পাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। [ক্রমশঃ]



ডার্লি ও কার্বিডে  
**দুলালের**  
**তালমিছুরী**

# টিক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ছোট একটি কালো কুকুর মাত্র ছিল সে। অথচ মিত্রবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্যরা চিনত তাঁকে। অনেকের জীবন পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল তাঁর জ্ঞান।

আফ্রিকার এল আলামিন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল টিক। পথঘেটে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

হঠাৎ এক আশ্রয়ের চোখে পড় গেল সে। তাঁকে তুলে নিয়ে কুটনের অষ্টমবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিংস রয়াল রাইফল কর্পস-এর ফার্স্ট ব্যাটেলিয়নের তাঁবু কাছে গেল আশ্রয়টি।

সে সময় চা খাচ্ছিলেন সবাই। টিককে দেখে বড় ভাল লেগে গেল কর্পোরাল জন সেইদবির।

—ওকে দেবে আমাদের ? চা খাওয়াব, বললেন তিনি।

রাজী হয়ে গেল লোকটি।

কয়েক সপ্তাহ পরেই সেইদবির বাড়ি ফিরে গেলেন। টিককে দিয়ে গেলেন টিমি ওয়াকারের হাতে।

টিক এবং ওয়াকারের মধ্যে অচিরেই অত্যন্ত গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবার জন্য ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন যখন যাত্রা করল,

তখন টিকও গেল ওয়াকারের সঙ্গে। উত্তর আফ্রিকার ক্ষিপ্র মাশাল গোমেলের আফ্রিকা কর্পসের পিছু ধাওয়া করল মিত্রবাহিনী— সেই সময় টিক তার অদ্ভুত ক্ষমতার বলে কয়েকবার ওয়াকার এবং তার সঙ্গীদের প্রাণরক্ষা করল।

গোলা আসছে কি না তাঁর টিক সঙ্গীদের চাইতে অনেক আগেই বুঝতে পারত। গোলাবর্ষণ শব্দ পেলেই সেইদিকে টিক মাথা ঘুরিয়ে বসে থাকত। ওয়াকার এবং তার সঙ্গীরাও সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ত মাটিতে। এইভাবে বহুবার তারা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।

মনোবল ফিরিয়ে আনবার কাজে টিক অবশ্য ছিল। একবার ওয়াকার তীব্র গোলাগুলি বর্ষণ সহ্যে আহতদের সরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য এগিয়ে গেল। সঙ্গে গেল টিক।

একটি নিকটবর্তী ট্রেনে করেকজন সৈন্য লুকিয়ে ছিল ভয়ে। টিককে এইভাবে নির্ভর রেখেই দেখে একই যেন লক্ষ্যতই হ'লেন তাঁদের লেফটেন্যান্ট। ডেকে বললেন সবাইকে—উঠ এসো তোমরা। দেখছ না, এই কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পায় নি। আর তোমরা কি না ট্রেনের ভেতরে বসে আছ ?

অগত্যা উঠে এল সবাই।

ফরেজগোত থাকবার সময় একবার প্রাণসংশয় হ'ল টিকের। টিককে একটি খালি বাড়িতে রেখে আহতদের তুলে আনবার জন্য গেল ওয়াকার, ফিরে এসে দেখতে পেল যে সে অত্যন্ত গুরুতর রকম জখম হয়েছে একটা বোমার আঘাতে। দরদর করে রক্তপাত হচ্ছে নাক দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটল ওয়াকার।

—অসম্ভব, বললেন ডাক্তার, বরং ওকে মেরে ফেল গুলী করে। মেরে ফেলবে ? অসম্ভব। ওয়াকার ক্যাম্প ফিরে গেল ওকে নিয়ে। শরীরের মধ্য থেকে সবগুলি কানের টুকরো বের করল এক এক করে। নিজের জামা দিয়ে ব্যাওয়েজ তৈরি করে দু'মাস শুজাব করল সে টিকের। অবশেষে টিক সেরে উঠল।

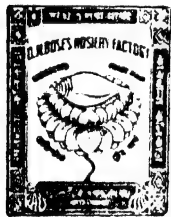
স্বস্থ হয়ে উঠবার পরই সে ওয়াকারকে মিলিটারী মেডাল পেতে সাহায্য করল।

একদিন রাত্রিবেলা ইটালী অগ্নিগ্না সীমান্তে তীব্র গোলাগুলির সম্মুখীন হতে হ'ল ওয়াকারের ব্যাটেলিয়নকে। টিককে সঙ্গে নিয়ে পুরো নয় ঘণ্টা ধরে অসীম সাহসের সঙ্গে ওয়াকার আহতদের নিরাপত্তা স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করল। সবশেষে তিরিশ জন আহত সৈন্যকে সরিয়ে নিয়ে এল ওরা।

পুরো পাঁচ বছর রণাঙ্গনে থাকবার পর ছাড়া পেল ওয়াকার। দেশে ফিরে গেল সে টিককে নিয়ে।

ইতিমধ্যে বহু লোকের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে টিক। সারা কুটনের মানুষ তাকে দেখবার জন্য উল্লাসে। বহু প্রদর্শনী করা হ'ল তাকে নিয়ে। পশ্চাৎচিকিৎসালয়ের জন্য বহু টাকা সংগ্রহ করে দিল সে।

টিকের কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি সে পেল ১৯৪১ সালে। ওয়েস্ট্রি কেটড্রামে একটি কুকুরের প্রদর্শনীতে দশ হাজার মানুষের সামনে সে ডিকিন মেডেল লাভ করল। ভিক্টোরিয়া ক্রসের সমতুল্য এই মেডেল প্রাপ্তি তাকে কুটনের সর্বশ্রেষ্ঠ চতুষ্পদের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত  
'শঙ্খ ও পদ্ম'

মার্কী গোষ্ঠী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—ব্রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৯৯৫



## দেশগৌরব স্মৃতিচন্দ্র বসুর পত্রাবলী

জননী প্রভাবতী বসুকে লেখা

শ্রীশ্রীদুর্গা সত্যায়

কটক

রবিবার

পরম পুত্রনন্দী, শ্রীমতী মাকামাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেন্দু

মা, তাঁ তব্বৎ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে ২ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধর্মবীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বর্গে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিচের অশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেব মা, ভারতে যাহা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভাষণ বৃষ্টি আবার মনোহর শব্দ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—বহুদলিলা পুষ্পতোষা গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চসিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবাঁমাত্র বা ভাবিবাঁমাত্র রামায়ণের পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিন স্তম্ভ—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী-তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখের বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদনকমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাঙ্গনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজনে মহা আনন্দে কাগ কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শাস্ত্রের জ্ঞান হাহাকার করিতেছি। ভগবানের চিন্তন ও পুস্তক ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্ত্যে বোমন ও অশ্ব থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নামকীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন উৎসর্গ দৃষ্টি তুলি, ম, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি। দেখি—পূণ্য-সলিলা জাহ্নবী সলিলভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাম্বাধিকর সেই পবিত্র তপোবন—দিবসারাত্রি মহাবির পবিত্র কঠোরপুত্র পুত্র বেদমন্ত্র শঙ্করিত—দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অভিনাসনে বসিয়া আছেন—তাঁহারা পদতলে দুইটি শিখা—কুশ ও লব—মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধর্মনিতে আবৃত্তি হইয়া কুবর্ণ ও নিজের বিব হারাইয়া, ঋণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে—গো-কূল গঙ্গার সলিল পান করিবার জন্ত অশিয়াছে—তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে—শুনিয়া কর্ণধর সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া

আছে—সমস্তক্ষণ নিনিমেয় দৃষ্টিতে মহাবির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণে সবই পবিত্র—সামন্ত তৃণের বর্ণনা পবিত্রও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনভারিণী কন্যু-হারিণী ভাগীরথী চলিয়াছেন—তাঁহারা তাঁর যোগকূল বসিয়া আছেন—কেহ অবনিমালিত নেত্রে প্রাতঃসন্ধ্যার নিমগ্ন—কেহ কাননের পুষ্পরাগি তুলিয়া প্রীতি গড়গা, চন্দন ধূপ প্রভৃতি পবিত্র অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিতেছেন—কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন, কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছেন—কেহ গুণ গুণ করিয়া গান করিতে ২ পুজার জন্ত বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র—সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পূণ্যপ্রাক্ত অধিকূল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই ষাগ-বজ্র, পূজা-হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পবিত্রও নাই। আমরা এখন এক হুঁস শরীর পরদাসস্বাধ্যাসী, নষ্ট ধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি! হায়! পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না? এ ত আমাদের দেশ—কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আশংগ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এখন ছারখার হইয়াছে। দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি।

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বাস তখন পাগলের চেরেও পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি—ভাব না কি লিখিতেছে বা কেন লিখিতেছে। ইচ্ছা হয় তাই লিখি, মন বলে—লেখ—তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জনা করবেন।

পূণ্যপাদ স্বর্গীয় গুরুদেব মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয় যখন ভাবি তখন দুঃখিত হইব কি আনন্দিত হইব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য যখন এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন যে কোথায় যাব বা কিরূপে অবস্থা ভোগ করে তাহা আমরা জানি না। তবে চরমদশায় আমাদের জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত বিলীন হইয়া যাব—সেইদিন আমাদের পক্ষে মহা আনন্দের দিন—কোমল দুঃখ নাই—কোনও কষ্ট নাই—পুনর্জন্ম-কষ্ট আর আমাদের ভোগ করিতে হয় না—তখন আমরা নিত্যআনন্দে বিভাজ করি। যখন ভাবি তিনি সেই

র'টি  
রবিবার

নিভানন্দ ধামে গিয়াছেন—তিনি অমরগণের সহিত এক পাক্ষিক্তে বসিয়া স্বর্গীয় স্বর্ষা পান করিতেছেন, তখন আর দুঃখিত হইবার কারণ দেখি না। তিনি যখন সেই সদানন্দপুরে গিয়া মহামুখে আছেন তখন আমরা যদি তাঁহার সুখেই স্বর্ষা হই তবে আমাদের শোকগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। দয়াময় ভগবান্ যাগ করেন জগতের মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা প্রথমে ২ বৃক্ষিতে পারি নাই, কারণ তখন ফল ধরে নাই। যখন ফল পাকে তখন আমরা জন্মের ভিত্তরে বৃক্ষিতে পারি 'বাস্তবিক দয়াময় হরি বাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।' ভগবান যখন তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন তখন মিছামিছি আমাদের শোকাকুল হওয়া উচিত নহে—কারণ তিনিই তাঁহারই—তাঁহার ইচ্ছা হইলে অমনি তিনি কাড়িয়া লইলেন—আমাদের তাহাতে অধিকার কি আছে।

আবার ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি তাঁহার বিশদগামী আত্মবুদ্ধকে ধর্মপথ দেখাইবার জন্য এবং পবিত্র সনাতন ধর্ম দীক্ষিত করিবার জন্য পুনরায় মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই করিবেন তবে তাহাতেও আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। বাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, আমরা ত' তাঁহার বিরোধী হইতে পারি না। জগতের মঙ্গলই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা ভারতবাসী—অতএব ভারতের মঙ্গলই আমাদের মঙ্গল। তিনি যদি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃকল ভারত-সন্তানদিগকে ধর্মনিষ্ঠ করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের ব্যর্থপনাই আনন্দিত হওয়া উচিত। গীতার ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

‘দেহিনোহিন্দিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তর প্রাপ্তিবীরন্তত্র ন মুচ্যতি।’

আমরা সকলে ভাল আছি। তাঁহার হাতেই আছি—তিনি যেরূপ রাখিয়াছেন সেইরূপই আছি। আমরা সকলে তাঁহার ক্রীড়াপুতনী—আমাদের ক্ষমতা কতটুকু—সবই তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা বাগানের মালী—বাগানের মালিক তিনি। আমরা বাগানে কাজ করি, কিন্তু বাগানের ফলে আমাদের কোনও অধিকার নাই। আমরা বাগানে কাজ করি বাগানে বাহা ফল উৎপন্ন হয় তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিই। কার্যে আমাদের অধিকার আছে—কার্যে আমাদের কর্তব্য—কিন্তু ফল তাঁহার—আমাদের নয়। তাই ভগবান গীতার বলিয়াছেন—

‘কর্মণ্যাবধিকারস্তে মা ফলস্য কদাচন।’

লিলা এখন কোথায় ও কেন আছে? জানি না কোথায় আছে তাই পত্র দিলাম না। মায়িমা ও বৌদিদিরা কোথায় ও কেন আছে? দাদারা কেন? কেমন আছে? আপনাদের প্রশ্ন আমি জানি। আপনি পুঁঝাও কেন আছে? আপনাদের প্রশ্ন আমি জানি। নূতন মায়াবাসু কেন আছে? কেমন আছে?

গুলিলাম হোটেলামিমার বড় অসুখ হইয়াছে। তিনি কেমন আছে? সাবধা কি বলে? ইতি—

আপনারই সেবক  
দ্রুত

পরম পুজ্যনাথ

শ্রীমতী মাতাচাকুরাণী

শ্রীচরণে—

মা,

অনেকদিন হইল কলিকাতার কোন সংবাদ পাই নাই—আশা করি আপনার সকলে ভাল আছেন—বোধ হয় সমস্তাভাবে পত্র দিতে পারেন নাই।

মেজদাদা কি রকম পরীক্ষা দিলেন। আপনি কি আমার চিঠির সমস্তটা পড়িয়াছেন? যদি না পড়িয়া থাকেন, তবে আমি বড় দুঃখিত হইব।

মা, আমার মনে হয় এ যুগে দুঃখিনী ভারতমাতার কি একজন স্বার্থভাগী সন্তান নাই—মা কি প্রকৃতই এত ভতগয়া! চার। কোথায় সেই প্রাচীন যুগ! কোথায় সেই স্বার্থভাগী কুল বাঁচার ভারতমাতার সেবার জন্য হেলায় এত অমূল্য মানব জীবনটা উৎসর্গ করিতেন।

মা, আপনি ত' মা, আপনি কি শুধু আমাদের মা? না মা আপনি ভারতবাসী মাতারই মা—ভারতবাসী যদি আপনার সন্তান হয় তবে সন্তানদের কষ্ট দেখিলে মার প্রাণ কি কাঁদিতা উঠে না? মার প্রাণ কি এতটা নিষ্ঠুর। না কখনই হইতে পারে না—মা ত' কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না। তবে সন্তানদের 'ই শোচনীয় দুঃখব্ধার সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। মা, আপনি ত' ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন—ভারতবাসীর অবস্থা দেখিলে এবং তাতাদের দুঃখের কথা ভাবিলে আপনার প্রাণ কি কাঁদে না? আমরা মূর্খ—আমরা স্বার্থপর হইতে পারি কিন্তু মা ত' কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না—মার জীবন যে সন্তানের জন্য। যদি তাহাই হয় তবে সন্তানের কষ্টের সময়ে মা কি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তবে কি মা স্বার্থপর। না, না, কখনই হতে পারে না—মা কখনও স্বার্থপর হতে পারে না।

মা, শুধু দেশের কি এরূপ শোচনীয় অবস্থা! দেখুন ভারতের ধর্মের 'ক অবস্থা! কোথায় সেই পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্ম, আর কোথায় আমাদের অধঃপতিত ধর্ম। কোথায় সেই পবিত্র আর্ষকুল—বীদে পদধূলি লইয়া পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আর কোথায় আমরা তাঁহাদেরই অধঃপতিত বংশধর। সে পাত্র সনাতন ধর্ম কি লোপ হইতে চলিল! দেখুন না চারিদিকে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামি—তাই ত' লোকের এত পাপ, এত কষ্ট, দেখুন না সেই ধর্মপ্রাণ আর্ষজ্ঞানীর বংশধর এখন কিরূপ বিদ্রোহী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। বীতার নাম, গুণগান ও ধ্যানই জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল তাঁতার নাম সমস্ত জীবন ভক্তির সহিত একবার বরজনা লোক আত্মকাল ডাকে। মা এসব দেখিলে এবং ভাবিলে, আপনার প্রাণ কি কাঁদে না, আপনার চক্ষে কি জল আসে না? সত্য সত্যই কি আপনার প্রাণ কাঁদে না—কখনই হইতে পারে না। মার প্রাণ ত' কখনও নিষ্ঠুর হয় না।

মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তানদের কি দুঃখব্ধ। পাপে, তাপে, স'প্রকার কষ্টে, অজ্ঞাভাবে, ভ্রান্তবাসর ভ্রমে—এক চিন্তা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের অভাবের জন্য তাঁহার যেন নরকের আগ্নিকূণে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই

পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম এখন লোপ পাঠাতে চলিল। অবিবাস, নাস্তিকতা এবং কুসংস্কার আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর ঘাণপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তার উপর, আজকাল ধর্মের নামেই যত কলহ হইতেছে—তীর্থস্থানেই যত পাপ! দেখুন না পুণ্য পাপাশ্রমের কি ভাষণ অবস্থা! 'ছি! ছি! ছি!' প্রাচীনকালের সেই পবিত্র ব্রাহ্মণকে দেখুন, আর আধুনিক কালের পাপী ব্রাহ্মণকে দেখুন! আজকাল যেখানে ধর্মের নাম সেইখানে যত ভণ্ডামি এবং যত অর্থ।

হায়! হায়! আমাদের কি অবস্থা! আমাদের ধর্মের কি অবস্থা!

মা, এসব কথা যখন আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে তখন কি আপনার প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে না? আপনার প্রাণ কি কঁাদে না?

আমাদের দেশে — কত দিন দিন এইরূপ অধঃপতিত হইতে থাকিবে—তখন ভাবতমাতার কোন সন্তান কি নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া মা-এর ভক্ত নিজের জীবনটা উৎসর্গ করিবে না?

মা, আমরা আর কয়দিন ঘুমাইয়া থাকিব? আর কয়দিন আমরা পুতুল লটকা খেলিতে থাকিব? আমরা ক্রন্দন কি আমাদের কর্তব্য আসে না? আমাদের লুপ্তপ্রায় সনাতনধর্ম কানিতেছে—তাহার ক্রন্দন কি প্রাণকে অস্থির করিতেছে না?

বসিয়া ২ আর কয়দিন দেশের এবং ধর্মের এত অবস্থা দেখিব? আর বসি চলে না—আর ঘমান চলে না—এখন নিস্তা ত্যাগ করিয়া অলপ্ত ত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে বাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কখন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর ভক্ত কর্মসাগরে বাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?

চুপশি জনমের পর আমরা এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যজাত পাইয়াছি—বুদ্ধি, বিবেক, আত্মা প্রকৃতি পাইয়াছি, কিন্তু এ সমস্ত পাইয়াও যদি পশুর জায় আশ্রয়-নিষ্কাশ্য পরিভূত থাকি—পশুর জায় ইন্দ্রিয়ের দাস স্বাকার করি—পশুর জায় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকি—পশুর জায় যদি ধর্মতন জীবন অধিবাসিত করি তবে কেন এই মনুষ্য ভগ্নে আমাদের ভগ্ন? পরেও ভগ্ন জীবনই প্রকৃত জীবন!

মা, এসব আপনাকে কখন লিখিতেছি—জানেন? আর কাহাকেই বা বলিব? কে বা শুনিবে? কে বা এ সমস্ত দুঃস্বপ্নে পোষণ করিবে? যাহাদের জীবন স্বার্থময়—তাহারা ত' এ সমস্ত কথা জারিতে পারে না—বা ভাবিবে না—কারণ তাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইবে কিন্তু মার জীবন ত' স্বার্থময় নহে! মার জীবন ত' সন্তানদের ভর—দেশের ভর। যদি ভারতের ইতিহাস পড়েন ত' দেখিবেন কত ২ মা, ভারতমাতার সেবার ভক্ত জীবনধারণ করিয়াছেন এবং উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেখুন অত্যাশঙ্কিত মারাবাই, দুর্গাতী, আর কত আছেন—আমার নাম মান নাট। আমরা মাতৃভক্ত পুত্র—সুতরাং মাতৃ-উপদেশ এবং মাতৃশিক্ষা আমাদের যত উপকার ও উন্নতি করিতে পারে—আর কিছুতেই তত হয় না।

মা যদি সন্তানকে বলেন—তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক—তবে আর কি! বুদ্ধি সন্তানই হইতাম। তাহা হইলে বুদ্ধিতে

হইবে এ কলিযুগে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুদ্ধিতে হইবে ভারতের বাহ্য কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই! আর কিছু হবে না! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—বদি প্রকৃতই আর কোন আশা নাই—বদি বসিয়া ২ কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? তবে যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিব না—তবে এ জীবনে আর কাজ কি

আমি যেন চিরকালই সকলে সেবক হয়ে থাকিতে পারি। আশা করি ওখানকার কুশল। এখানে সব মঙ্গল। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। পত্রের উত্তর দিবেন। এ পত্রের উত্তর দিবেন।

ইতি—

আপনার

চিহ্নেহাযীন

সেবক

স্বভাব

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

বাঁচি

রবিবার

পরম পুণ্য

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণে

মা,

আপনার পত্র অনেকদিন হইল পাইয়াছি—তাহার উত্তরও লিখিয়াছিলাম কিন্তু পরে যখন পড়িয়া দেখি যে, আবেশের ঘোরে অনেক ভাঙে কথা লিখিয়াছি—তখন আর পাঠাইবার ইচ্ছা হইল না—তাই ছিঁড়িয়া ফেললাম। আমার এক অভ্যাস পত্র লিখিতে বসিলে সংযম রাখি না—তাহাতে হৃদয় ঢালিয়া দিই। বিষয় কথা-পূর্ণ পত্র আমার লিখিতে বা পড়িতে ভাল লাগে না—তাই আমার এইরূপ অভ্যাস—আমি চাই ভাবপূর্ণ পত্র। আমার পত্র লিখিবার ইচ্ছা না হইলে লিখি না আর যখন ইচ্ছা হয় তখন উপরি ২ অনেক পত্র লিখি।

শারীরিক সুস্থতা জানান আমি অনেক সময়ে আবশ্যক মনে করি না—ভগবানের উপর বিশ্বাস করিয়া থাকিলে কোনও চিন্তা, উদ্বেগ বা ভয় আসে না। আর যদিও কাহারও অমঙ্গল ঘটে তাহাতেই বা আমরা কি করিতে পারি। আমাদের এমন কোনো শক্তি নাই যে, ইচ্ছামত কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারিব। তবে আর মিছে ভাবনা কেন? আমরা বাহার কোড়ে আছি তিনি ত' আমাদের রক্ষা—যখন ত্রিলোকধারিণী বিশ্বজননী স্বয়ং আমাদের রক্ষা—তখন এত চিন্তা এত ভয় কেন? অবিবাসই দুঃখের এবং সর্বপ্রকার বিপদের কারণ কিন্তু মানুষ তাহা বুদ্ধিতে চাহে না—এক মনে করে যে ইচ্ছা করিলে কাহাকে ভাল করিয়া তৈরিতে পারে, হার রে মুখতা!

মেসোমহাশয় আট-নয় দিন হইল কলিকাতার গিয়াছেন এবং সেখানে ভাল আছেন। তিনি খুব ভাল ভালবাসেন এবং বর্জ্য অবস্থার ভাব তাহার খুব উপকারী। কিন্তু কলিকাতার ভাল ভাব

আনাইরা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারেন তাতা হইলে তিনি বড় উপকৃত হন. তিনি এ বিষয়ে আপনাকে লিখিতে বলিয়াছেন।

এখানকার মঙ্গল জানিবেন। আপনারা সকলে ভাল আছেন ওনিয়া সুখী হইল। মজাদার কবে ফিরিবেন?

বোধ হয় যে মাসের মাঝামাঝি আমাদেব পরীক্ষার খবর বাতীর হইবে। কতদূর সত্য জানি না—তবে স্তনিয়াছি ইতিমধ্যে আনকে নম্বর পর্যন্ত জানিতে পারিয়াছে।

সেজদিদির কি আঁসবেন?

আমি এই অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানুষ জীবনের এত সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, তৎক্ষণাৎ মনে দিনরাত ভয়ানক কষ্ট হয়। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয়।

যদি মনুষ্যবৃত্তি লাভ করিয়া মানুষজীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র, সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বরলাভ না করিতে পারে তবে মানুষবৃত্তি বুধা—জ্ঞান, পুণ্ড, ধ্যান সবই বুধা—সব কেবল ভণ্ডামি। এখন আর বাস্তব কথার পর্যন্ত সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না—ইচ্ছা হয় কেবল একটা ঘরে বসে হয়ে থাকি আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধ্যান, চিন্তা এবং পাঠে অতিবাহিত করি। দিন দিন যে আমার যম্যম্পদের নিকটবর্তী হইতেছি, কবে আর আমার সাধনা করিব আর কবেই বা তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার কোড়ে শান্তি স্থব ও বিশ্রাম করিব। সে আনন্দময়ক না পাইলে কিছুতেই আনন্দ নাই। লোকে যে কি করির টাকা ধন-সম্পত্তি বিষয় প্রভৃতি লইয়া সমস্ত থাকে তাতারও আমার নিকটে সময়ে সময়ে এক বিশেষ সমস্তা বলিয়া বোধ হয়। যিনি আনন্দের নিধি তাঁহাকে বাদ দিলে যে আর কিছুতেই আনন্দ থাকে না। যিনি আনন্দের আকরধরপ তাঁহাকে ধরা চাই—তবে ত' আনন্দ পাইব।

যদি চৈতন্য না হয়—যদি ভগ দর্শন না হয়—তবে সমস্ত জীবনটাই বুধা গেল। পুণ্ড, জ্ঞান উপাসনা প্রভৃতি আমার বাধা করি—তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগদর্শন বা ঈশ্বরলাভ। এট উদ্দেশ্য সিদ্ধ

[ এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ও শিবিরকুমার বসু কর্তৃক সংকলিত স্তবাক্ষর বস্তুর পত্রাবলা চহিতে গৃহীত ]

## তোমাকেই ভাবি

রত্নল গামজাতক

[ রত্নল গামজাতক বিশিষ্ট সাক্ষিত্যে করি। কিছুকাল আগের ভারত এসেছিলেন। এ দেশের সঙ্গীত স্ত্রীমন্ডলে তাঁর নাম বিশেষভাবে পরিচিত ]

যখন বর্ষন নাথে তখনও তোমাকে ভাবি আমি,  
অর্চনা শাখার ধরে থাকা থোকা যখনও তুমি;  
তোমাকেই ভাবি এল শীতল কামরু চায় নাখি;  
এবং বোনের দাড়ে যখন চৌকি ছাড়াই;

তোমাকেই আমি ভাবি চাহকেরা চলে মুখোমুখি,  
আবার বিদায়বেলা যখনও—তোমার ভাবনাই;  
যখনও রব ভাগে শুভবুৎ প্রাণলিঙ্গ সুখী—  
কৃত স্ত্রী স্ত্রীর বেল, আমি কিং তোমাকেই চাই।

আমি চাই অন্তিমি প্রতি দণ্ড যদি তোমাকেই—

তুমিও অন্ত প্রেমে আমার একান্ত হও—প্রত্যাশিত ঐ।

অনুবাদ : অরুণাচল বসু



## নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

[কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র, বিধানসভার সদস্য এবং

প্রখ্যাত শিল্পনায়ক]

বাংলার বাণিজ্যিক স্ত্রীশিক্ষা ও ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রে বীদর নৈপুণ্য পরিবেশে উদ্ভবপ্রাপ্ত ক্রীষক নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর সেট তালিকার একটি উজ্জ্বল নাম। সমাবলীশীল স্বাধীনতা ও জনগণের পৌরস্বাস্থ্যের ইতিহাসেও তিনি একটি বিশেষ চরিত্র।

বর্তমান জেলার অন্তর্গত পুন্ড্রিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায়দের আদি নিবাস। বাবসাহী হিসাবে মুখোপাধ্যায়রা ছিলেন যথেষ্ট স্বীকৃতির অধিকারী। বাবসাহির দক্ষতা নরেশনাথের উত্তরাধিকারসূচক বৈশিষ্ট্য। পূর্বপুরুষের ইতিহাসে খুঁজে পেতে হবে যে এক অভ্যন্তরীণ বাবসাহি সাফল্য কীভাবে কবলগত। এই বাবসাহি স্বাধীনতা সন্তান নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিগতযুগের এক থাকনামা পুরুষ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট বাৎসরিক। গ্রন্থকার হিসাবেও শক্তির অধিকারী। নবজাগরণের অজস্র রূপকার যুগান্তকারী নরেশনাথ ঠাকুরের অজস্র পৌরী স্বাধীনতা কুমুদিনী দেবীর সঙ্গে ইনি পরিচয়পূর্ণ আনন্দে। কুমুদিনী ছিলেন শিল্পাচার্য অমলিন্দ্রনাথের পিতৃস্বামী। প্রসঙ্গত অল্পবয়সে যে, কুমুদিনী দেবীর ঘরে টাটকো পৌরস্বাস্থ্য চিত্রগুলি শিল্প অমলিন্দ্রের মনে সর্বপ্রথম শিল্পের আনন্দপূর্ণ গান দেয় এবং তাঁর মনে শিল্পসচেতন করে তোলে। তাঁদের পৌরী স্বাধীনতা নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নরেশনাথ তাঁদের ২১ নং বেনিফিটপূর্ণ রেড্ডেড বাসভবনে ১৩০৭ সালে ১১ই চৈত্র (২২৭ মার্চ ১১০১) জন্মগ্রহণ করেন। নরেশনাথের জন্মের সপ্তমীটা উমিলা দেবী ছিলেন দানবীর কালীকৃত ঠাকুরের অজস্র পৌরী।

১৯১৬ সালে সেন্ট জেভিয়ারের ছাত্র হিসাবে ব্রিটিশের পৌরস্বাস্থ্য পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ব্রিটিশ কলেজের (বর্তমানে স্বাধীনতা কলেজ) ছাত্র হিসাবে ডিস্কালিফাইড বি-এ পরীক্ষার সাফল্যলাভ করেন ১৯২১ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও আইন পড়া শুরু হ'ল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং অর্থনীতি ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য বিষয়।

১৯২২ সালের শেষভাগে অসচ্চরিত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার ছেদ টানতে হল নরেশনাথকে। বিদেশী শুল্কস্বাধীন দেশজাতীয় স্বাধীনতাচর্চা জনগণনাথকর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আহুদান ছিলেন দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে এই মহান মুক্তিবাহুর আশ্রয় গ্রহণ করার। দেশবন্ধুর আহুদানে সেদিন বাংলা সাড়া দিল তাঁর উজ্জ্বল এক ক্ষুদ্র সন্তাননাথ আর দুর্বীর পরিচরিত্র নিয়ে সমবেত হলেন নরেশনাথ তাঁরই একজন। স্বাধীনতা ক্ষেত্রে দেশবন্ধু তাঁর দীক্ষাগুরু। দেশগোবিন্দ স্বাধীনতার সঙ্গে স্বাধীনতা একযোগে কাঁট করেছেন নরেশনাথ।

কৌট-বাসায়ীরাপ বাবসাহি জগতে ১৯২২ সালে প্রবেশ করেন নরেশনাথ। ১৯২৮ সালে কৌটশিল্প সম্বন্ধে পুন্ড্রস্বাস্থ্যের জল নিযুক্ত ট্যারিফ কমিশন সাফা দেওয়ার জন্য তিনি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৪ সালেও এই কমিশনেই সাফা দেওয়ার জন্য পুন্ড্রস্বাস্থ্যের বাণ্যায়িত্ব কীভাবে প্রতিদিনিকরণে প্রেরণ করেন। কাগজী বাবসাহি তিনি আত্মনিয়োগ কবলেন ১৯২১ সালে। আজকের দিনে জাগাজী



বাবসাহির ক্ষেত্রে তিনি একটি স্বীকৃতি সন্তান সন্তান সমাধীন এবং বিপুল খ্যাতি ও অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে তিনি আজ চাত মিলিয়েছেন। কলকাতার ইন্ডোরেস গ্যাসোসিটেশন ও শিপন কন্ট্রাক্টার্স গ্যাসোসিটেশনের তিনি বর্তমানে সভাপতি, বেলস চেম্বার অফ কমার্স, ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, লন্ডন চেম্বার অফ কমার্সের তিনি একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য।

কংগ্রেসী সদস্য স্বর্গত ডাঃ কুমারস্বরূপ বাবক পরাভিত্ত করে নির্ধারিত সমস্ত হিসাবে নরেশনাথ পৌরস্বাস্থ্য নির্বাচিত হন ১৯৩৬ সালে। নির্বাচনের পর নরেশনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দেশনাথক শরণস্বরূপ ও দেশগোবিন্দ স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে ইনি সহ-পৌরপাল নির্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৫২ সালে সহ-পৌরপালের আসনে তিনি সমাধীন হন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন পৌরপাল জননাথক নির্বাচিত হওয়ার পরলোকগমনে সহ-পৌরপাল নরেশনাথ পৌরপালের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মহানগরীর পৌরপালের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন শিল্পপতি নরেশনাথ। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত



নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

পৌরসভার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের পর চৌঃস্বী কেন্দ্রে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতীর্ণ হন নরেশনাথ। বলা বাহুল্য, সগৌরবে জয়লাভ করেন (১৯৬৩)।

নরেশনাথকে শুধু দেশসেবী এবং শিক্ষাপতি বললেই সব বলা হয় না। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতও। তিনি কয়েকবার সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। মেরু হিসাবে তিনি মার্কিন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং চীন বড়ক আমন্ত্রিত হন। ১৯৫২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্যাসিফিক মেমস' কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান পান। টোকিওর গভর্নর তাঁকে 'গোল্ডেন কী অফ টোকিও' প্রদানে সম্মানিত করেন। ভারতীয়দের মধ্যে এই সম্মান প্রথম দ্বারা লাভ করেন নরেশনাথ তাঁদের অজ্ঞাতম। যক্ষ্মা রোগ সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট প্রাণবন্ত। এটি দুঃস্বপ্ন ব্যাধির কবল থেকে নতানগরীর মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার স্যানিটোরিয়ামগুলি পরিদর্শন করে সেখানকার চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি অনুপ্রাণন করে দেশে ফিরে এসে কলকাতার চারটি টি-বি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সত্যতা করেন। মেরু হিসাবে কলকাতার বহুবিধ নাগরিক উন্নয়নের জন্য তিনি দায়ী। টালিগঞ্জের জন্য বৃহৎ পরিকল্পনা, জল সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রমুখ বহুবিধ জনকল্যাণকর কার্যাবলির মূলে তাঁর নাম বিশেষভাবে শ্রাব্য। বঙ্গী সংস্কার এবং অজ্ঞাত সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলিতে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ।

অসংখ্য ব্যবসায়িক এবং লোককল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত। সচিবতা, সমাজতা, ললিতকলাকেন্দ্র প্রায়সমূহ তাঁর পৃষ্ঠপোষক থাকে বহুতঃ নর। রোম আর প্যারিসে প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি সত্ত্বেও ইনি যথেষ্ট কনুশীলন করেছেন।

লক্ষ্যী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য দেশবিশ্রুত শিক্ষাবিদ স্বর্গত ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সৌহৃদ্যী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্ত্রীসহ পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় ভগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা শ্রীমতী দেবীসহ ইনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

তাঁর সত্ত্বেও আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতজীবনের সদালাপিতা, নবুৎসাহস ও আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব প্রকৃতি গুণাবলীও কোনক্রমেই অম্লান্য নয়।

## শশাঙ্কশেখর সান্ডাল

[ বিশিষ্ট আইনজীবী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের সদস্য ]

প্রাক স্বাধীনতার কাল হইতে বর্তমান বিজয় বাংলার আইন সভার আসন বসিয়া যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় রাতনৈতিক নেতাজেঁঁ সুতীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবণে মাঝে মাঝে সরকার পক্ষকে বিচলিত করিতে দেখা যায়, বিধান-পরিষদের নির্ধারিত সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্ডাল তাঁদের অন্তর্গত।

গণতান্ত্রিক দেশে আইন সভাই যদি গণতন্ত্র রক্ষার ধারক ও



শশাঙ্কশেখর সান্ডাল

বাহক হয় তবে শ্রীসান্ডালের মত সাংবিধানিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের আইনসভার উপস্থিতি অপরিহার্য। ছাত্রজীবনে প্রবন্ধ রচনার এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তাঁহার কৃতিত্ব পরবর্তী জীবনে আইনসভার আসনে বিশেষভাবে প্রমাণিত।

স্বর্গত ভবতারণ সান্ডালের পুত্র শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্ডাল ১৯০১ সালে বহরমপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর শহরেই বাংলার শিক্ষা আরম্ভ করিয়া মাত্র পঞ্চদশ বৎসরে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হন। হুর্ভাগ্যের বিষয় তদানীন্তন প্রচলিত আইনে ১৭ বৎসরের কম বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তর্কশাস্ত্রে সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।

অন্তঃপূর শ্রী সান্ডাল ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স লইয়া ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২১ সাল ডিগ্রি পরীক্ষার বৎসর। অহসহযোগ আন্দোলনের প্রাচল ছাত্র সমাজ উদ্বেলিত। ১৯২১ সালের পরিবর্তে ১৯২২ সালে অনার্সসহ ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ডিগ্রি লাভ করিবার পরে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীসান্ডাল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিলেন প্রবন্ধ রচনায়। রাস্তানীতির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক অভিন্ন এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত রচনার খাতার তাঁহার নম্বরই ছিল সর্বোচ্চ। এম-এ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আইনের ডিগ্রিও লাভ করিয়াছিলেন তিনি। শিক্ষা শেষে প্রবেশ করিলেন আইন ব্যবসারে। ১৯২৬ সালের তরুণ আইনজীবী আজ পরিণত বয়সেও পশ্চিম বাংলার আইন ব্যবসায়ীদের অজ্ঞাতম। ১০ বৎসর কাল আইন ব্যবসারে লিপ্ত থাকার পর ১৯৩৭ সালে রাজনীতিকক্ষেে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৪৫ সালে বাংলার কংগ্রেস দলের চীপ হটপ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সহিত

সেটাল এসেমব্লীতে মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ স্বীকৃতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন শ্রীসাত্তাল। অতঃপর ১৯৫৮ সালে নির্দলীয় সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি নির্দলীয় সদস্য শ্রীসাত্তাল পশ্চিমবঙ্গের আইন-সভার আসনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

গুরু রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী হিসাবেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি তিনি। কি খেলায় কি গানে রাজনায় এবং এমন কি নৃত্যেও তাঁহার দক্ষতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গানে এবং নৃত্যে দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ পদক লাভ করিয়াছেন কয়েকবার। কর্মবল্লভ জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছাইয়াও জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত হয় নাই শ্রীসাত্তাল। মৌলিক অধিকার সমক্ষে উল্টেট লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমানে তিনি সাধনা করত।

## গীতা মুখোপাধ্যায়

[ প্রখ্যাতনাট্যী সমাজ সেবিকা ]

যাঁদের জীবনের সকল আলো নিজে গেছে, চারপাশে শুধু অঁধারের সমারোহ, ভাগ্যের আকাশ ভরে আছে ঘন কৃষ্ণ মেঘে হাসি মিলিয়ে গেছে, সংগ্রাম সফল পরিবেশের মধ্যে করত হয় জীবনের পথ পরিক্রমা সেই সব অসংখ্য দুঃস্থিয়ার। চলচ্ছবিস্ত্রীক বিকলাঙ্গদের সহস্র বেদনা, অপরিণীত ছায়া ও অপার বন্ধনা আবৃত করে দিয়েছেন মাতৃজ্ঞাতির যে প্রতিনিধিরা সামান্যই স্নেহের প্রলোপে তাদের কলাপ সাধনের পুণ্যকর্মে ধীরে নিজেদের করেছেন উৎসর্গ শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকার বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সেই সবহার্য অসহায়দের জীবন বন্ধন একেবারে শুকিয়ে যায় এই কলাগমরী জননীদের তখনই তাদের জীবনে করুণাধারার মত আবির্ভাব, তাদের জীবন আলোর আলোর ভরিয়ে তোলাই এঁদের সাধনা।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বংশধর বনামধন্য স্বর্গীয় রায়বাহাদুর মল্লিনাথ রায়ের বন্য গীতা দেবীর জন্ম ১৩২৮ সালের বোধনদিবসে (এপ্রিল ১৯২১)। সুপ্রবীণ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় তাঁর জ্যেষ্ঠতাত। বিচারপতি অজিতনাথ রায় তাঁর পিতৃব্যপুত্র। স্বর্গীয় সরলা দেবী চৌধুরী প্রাতিষ্ঠিত কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষামন্দিরে তিনি পাঠ নিতে থাকেন। ১৯৩৪ সাল থেকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ভর্তি হ'লেন বেণুন কলেজে। ১৯৩৮ সালে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষার সম্মানে হন উত্তীর্ণ। আই-এ পরীক্ষার পর কুমারী গীতা রায় বিবাহবৃন্দে আবদ্ধ হন খড়দহের সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় পরিবারে। শুধু নিজস্ব বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আজকের দিনের প্রখ্যাতকণা বিচারপতি, সাহিত্যসমীক্ষক, পণ্ডিতপ্রবর প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সেদিন একজন উদারমান ব্যারিস্টার।

কলেজজীবনে তিনি ইউনিয়ন সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯৩৫-৪৭ শেষভাগে কে পি টমাস আয়োজিত ও সেট জেভিয়ার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ইংরাজী ভাষার অল ইণ্ডিয়া ইন্টার-কলেজ ডিবেট প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মময় জীবন শুরু হ'ল বলতে গেলে ১৯৫৪ সালে। গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশনে জড়িয়ে পড়লেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। সীমাবদ্ধ গৃহকোণ থেকে বৃহত্তর পটভূমিতে পদার্পণ, নানা কাজের ব্যস্ততার শুরু আশ্চর্য এক নতুন জীবনের। তবে, এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য তা হ'ল কর্মের সহস্র ব্যস্ততা ও সমারোহের মধ্যে সংসারধর্ম পাশন থেকে তিনি খিনুমাখ বিচুতা হন নি। বাইরের জগতের বিরাট পরিসর তাঁকে তাঁর নিজস্ব সংসার থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি। সেইখানেই তাঁর সর্বশেষ কৃতিত্ব। ১৯৫৫ সালে যুক্ত হলেন রেডক্রসে। ১৯৫৮, '৫৯ ও '৬০ সালে তিনি রেডক্রসের ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। ওয়েস্টবঙ্গ জুনিয়ার রেডক্রসের চেয়ারম্যানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে রেডক্রস শতবার্ষিকী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিতা করলেন এ সংবাদ অতি অল্পকালপূর্বেই ঘোষিত হয়েছে। সেট জন গ্র্যাণ্ডুল গ্র্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা), দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সাস্তাল-সাবিস শাখার, উইমেনস ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের, ভারতসেবক সমাজের মহিলা শাখার তিনি সভা প্রাণী। কলকাতা শিল্পমেলার মহিলা-শাখার তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। সেট জন গ্র্যাণ্ডুলের নাসি ভিভিসানের মহিলা ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার হিসাবে যিনি লেফট্যানেন্ট কর্নেলের সমান পদমর্যাদার অধিকারিণী। মহিলাদের মধ্যেই তিনিই প্রথম যিনি স্মিট বিবরে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং লেফট্যানেন্ট



শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়

কর্নের পদমর্যাদার অধিকারিণী। ১৯৬১ সালে রাণী এলিজাবেথের কলকাতা পরিদর্শনের সময় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু তাঁকে প্রেসিডেন্সি সমাজসেবিকা হিদ্দাবে রাণী সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গার্লস গাইডের সঙ্গে তিনি বর্তমানে এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেট কমিশনাররূপে জড়িত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও শত্ৰুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের পরিদর্শন কমিটি, এল আই সি পূর্বকালের ও জাতীয় সঙ্ঘ উপদেশন সমিতির এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ উইমেনের তিনি সদস্য। 'রিফিউজ'-এর এবং লাইট হাউস ফর ড্রাইগেব কাঙ্ক্ষরী সমিতির তিনি সদস্য।

তাদের একমাত্র সন্তান পার্শ্ববিহারী প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং এন সি সির সেকেন্ড বেঙ্গল অর্ডার স্মারকপ্রাপ্ত করপোরাল।

সাধারণের তিনি একনিষ্ঠ পাঠিকা। কাব্যরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। থিয়েটারিক্যাল সোসাইটির বিভাবিক মুখপত্র 'ব্রহ্ম বিজ্ঞ' পত্রিকার তিনি সম্পাদিকা।

## বলাইলাল মুখোপাধ্যায়

[প্রতিভাধর শিল্পী]

নিজেকে প্রচারের সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে বাংলা দেশে যে ক'জন শিল্পী একাগ্রচিত্তে শিল্প সাধনা করে চলেছেন উত্তরপাড়ার বলাইলাল মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম, অদর্শতাক্ষী ধরে পট ও তুলির মধ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন বলাইবাবু, সাধনার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে যে হাজার হাজার সম্পদ তার আদর এদেশে বহু হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে বিদেশে। বাংলা দেশে খুব কম শিল্পরসিকই জানেন এই প্রতিভাধর শিল্পীর নাম; তার কারণ 'নীরবে কাজ বার বাণ, কোনদিকে তাকিয়ে না'—মহর্ষি রমণের এই নীতিবাক্য তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে উত্তরপাড়ার এক নিভৃত, নিরালা কুঠিরে বসে বছরের পর বছর শুধু একেই চলেছেন।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বাগের সন্তান বলাইলালের জন্ম উত্তরপাড়াতেই ১৯০০ সালে। পিতামহ স্বর্গত মনোহর মুখোপাধ্যায়ের নাম জ্ঞানেন না বাংলা দেশে বাধ করি এমন লোক কেউ নেই। একদিকে দাদুর স্নেহাশীষ আর একদিকে স্কুলের তদানীন্তন অঙ্কন শিক্ষক জ্যোতির্দেব ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র বলাইলাল রায়ফলের ছবি এঁকে ছাত্রজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন। ইউরোপীয় স্কুল-ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে এসে শুধু যে বলাইলালের আঁটের তারিফ করলেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বার দিয়েও গেলেন এ সব ছেলেকে স্কুলে রেখে নষ্ট করে লাভ নেই, এর আঁট স্কুলে বাড়িয়া উঠিত।

মাত্র পনেরো-বোল বৎসর বয়সেই বলাইলাল মামুষের বিভিন্ন ভাবনা সঙ্গকভাবে আঁকা আঁকতে শুরু করেন : তারপর ১৯২০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত শিবব্রত সমরসিং ও পি কে কুণ্ডের শিক্ষকতার তিনি দু'বৎসর নতুন নতুন আঁট শিখে ফেললেন।

১৯২৮ সালে একটি লোকানে বসে কালেক্টরের পাতায় তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার ক্যানালি জাকসনের ছবি স্কেচ করে বাড়িতে নিয়ে এলেন, তারপর তৈলচিত্রে সেই ছবিখানি এঁকে দিল্লীর একটি প্রদর্শনাতে পাঠিয়ে দিলেন। গভর্নর দিল্লীতে গিয়ে তাঁর নিজের



বলাইলাল মুখোপাধ্যায়

তৈলচিত্র দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। অভিভূত হবার আরও কারণ ছিল এই কারণে যে শিল্পী তাঁকে দেখেন নি, অথচ এতো প্রাণবন্ত ছবি আঁকলেন কি করে! খোঁজ পড়লো বলাইবাবুর; লিটপ্রাসাদে তাঁকে ডেকে আনা হল। গভর্নর বললেন—ও ছবি তাঁর চাই-ই, কত মূল্য লাগবে?

বলাইবাবু কোন মূল্য নিলেন না, শিল্পী হিসেবে তিনি যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, এইটুকুই তাঁর যথেষ্ট মূল্য। গভর্নরকে তিনি ছবিটি উপহার দিলেন, বিনিময়ে গভর্নর তাঁকে একটি সার্টিফিকেট দিলেন। সেই সার্টিফিকেটই উত্তরকালে বলাইবাবুকে বিদেশীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আঁকলেন তিনি মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র; কলিকাতা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে সেটি গোল তেহরাণে। ষাটক-এ ভারতীয় বদিক সভা তাঁর আঁকা আর একটি মহাত্মা গান্ধীর প্রতিরূপিত কাশানাল পাটটি গ্যালারীতে রাখলেন।

শিল্পী বলাইবাবুর আর একটি অপরূপ ক্রটি ল্যাণ্ডস্কেপ্। তিমালয়ের এভারেস্ট থেকে শুরু করে যে কোন পর্বতসঙ্কুল স্থান তাঁর তুলির আঁচেড় এতোই স্বাভাবিক রূপ পেয়েছে যে দেখলে বোঝাই যায় না যে, এটা ছবি দেখছি না সেই জায়গার ঠাঁড়িরে আছি।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে প্রতি বছর অসংখ্য ভ্রমণকারী ভারতবর্ষ দেখতে আসেন; তিমালয় শুধু দেখেই তাঁদের আশ মেটে না; বাবার সময় তাঁরা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি খোঁজ-খবর করে নিয়ে যান। বলাইবাবুর ছবি তাই আজ বিদেশে সমাদৃত এবং বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে তাঁর সুনাম সর্বত্র স্বীকৃত।

# গোলকচন্দ্র

মাসিক বসুমতী  
জ্যৈষ্ঠ / '৭১



কাজের ফাঁকে

—কুমার ঘোষ



গোপালকৃষ্ণ

—শান্তিময় সাত্তাল

শহর কলকাতা

—এস ধর





শুক্র-শিষ্য সংবাদ  
—বৈজনাথ ভট্ট

বাসিক বহুমতী  
জ্যৈষ্ঠ / '৭১

স্পোর্টসম্যান  
—সাগর রঞ্জন



গা.  
স  
বা



কলমটি

—যত্ন চক্রবর্তী

সুদ্রুগহিণী

—দেবু দাস





পার্বত্য লেক

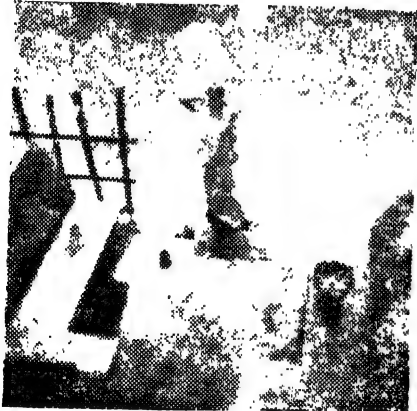
ভারত সরকার (প্রচার বিভাগ)

১৯৪৯



স্থাপত্য

—সুনীল দে



স্নানার্থী

—কুমার ঘোষ

মাসিক বসুমতী । জ্যৈষ্ঠ / '৭১

অতীতের রাসমঞ্চ

—নবগোপাল সিত





সিক বসন্ত  
জ্যৈষ্ঠ / '১১

মজুরাণীর দল

—রামকিরণ সিংহ

। ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার নাম,



# দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

ত্রিহিমাংসভূষণ সরকার

দ্বীপময় ভারত অল্পত দু'শো পঞ্চাশটি ভাষা এবং উপভাষা  
বিশ্বমান, কিন্তু এই সমস্ত ভাষার মধ্যে একমাত্র যবদ্বীপীয়  
ভাষাই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন সাহিত্য বর্তমান আছে। পূর্বে এই  
ভাষাকে কবি-ভাষা বলা হইত, কিন্তু অনেকে এটি পরিচয় বা অভিজ্ঞানের  
পক্ষপাতী নহেন; কারণ ইহা দ্বারা আবহমানকাল প্রচলিত  
(traditional) এমন একটি সাহিত্যিক রীতিকে বুঝাইতেছে, যাহা  
প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক, রচনার ক্ষেত্রেও সমভাবে  
প্রযোজ্য। সুতরাং পণ্ডিতগণ জ্ঞাতার সুপ্রাচীন ভাষার আখ্যা  
দিয়াছেন প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা শ্রবণীয়  
যে সম্প্রতি-যুগে সম্ভবত এই সম্ভবতঃ প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার  
অর্থ, দেব-ভাষা নামেই আখ্যাত করা হইত। কারণ,  
নাগবক্তাগমের ২৫ সর্গের প্রারম্ভে ডঙ্ক আচার্য উত্তর সম্বন্ধে  
বলা হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন 'বিদ্বৎস্বরূপ আগম কবিঃ' অর্থাৎ  
তিনি ছিলেন অগমশাস্ত্রের বিদ্বৎ এবং কবি কবি (ভাষা)  
জানিতেন। মহাযুগে এই ভাষা কবি-ভাষা অথবা অল্পত যবদ্বীপীয়  
নামেই পরিচিত হইত না কেন, বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ প্রাক্-  
মুসলিম এই সাহিত্যকে প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা নামে আখ্যাত  
করিয়াছেন এবং আমরাও ইহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

প্রাচীন যুগের এই যবদ্বীপীয় সাহিত্য গদ্য এবং পদ্য উভয়  
শৈলীতেই রচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা কাব্যগুলি  
কাকাবিন নামে বিখ্যাত। এই কাকাবিনগুলির স্বকীয় একটি  
বৈশিষ্ট্য আছে এবং ইহাদের প্রকৃতি ও পরিণাম একই প্রকারের।  
কাকাবিন-সাহিত্যের এই বিশেষণ ব্যুত্থিত হইলে এই শ্রেণীর সমস্ত  
গ্রন্থ নিষ্ঠাসহকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে, নতুবা মনের মধ্যে একটি  
বিকৃত বা অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইবে। কেবলমাত্র একটি কাকাবিন-  
গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থগুলির তাৎপর্য ও বিশেষণ সম্পূর্ণরূপে  
স্বয়ংসম হইবে না।

এই কাকাবিনগুলির পরিণামও বিস্ময়কররূপে একই প্রকার।  
ইহাতে যে শতাব্দিক ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আজ তাহার দ্বিতীয়  
অবশিষ্ট আছে। কাকাবিন-সাহিত্যের এই বিশেষণের দিকে পূর্ববর্তী  
কোন কোন লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। (১)

যবদ্বীপের বহু উচ্চপদস্থ নরনারী এবং বিভিন্ন নরপতি প্রাচীন  
যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব  
যবদ্বীপাধিপতি ধর্মবংশ, কাম্বোজ, জয়োভয়, হরম ভূকক প্রভৃতি  
রাজগণ এই বিষয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

রাজ্যন্তঃপুরের মহিলাগণও যে এই বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন তাহার  
পরিচয় রহিয়া গিয়াছে নাগবক্তাগমের ১৫ সর্গে। কাহারা  
কাহারা আবার পুঁথিপত্রাদি সংগ্রহ করিবারও বাতীক ছিল। প্রশংসক  
তাঁহার ঐতিহাসিক কাব্যে তাঁহার কবিবন্ধুর হুল্লভ পুস্তকসংগ্রহ  
করার বাতীকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (২১ সর্গ)।

কাকাবিন-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই শ্রেণীর  
আরো দু'একটি শাখা সাহিত্যের উল্লেখ করিব। নাগবক্তাগমকাব্যে  
(২৩২) একপ্রকার বর্ণনামূলক কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার  
নাম হইল বচন। শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'বচ'—থাক্ত হইতে  
পরিগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি সাধারণতঃ স্বদেশী ছন্দে বিরচিত  
হইলেও ইহাতে সম্ভবতঃ সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন  
বাধা ছিল না। এতদ্ব্যতীত আরো এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ কাব্য  
বিস্তারিত ছিল; উহার নাম ছিল লম্বঙ্গ। আমরা উক্তগার বিরচিত  
সুতসোম নামক কাব্যের (চতুর্থ শতাব্দী) শেষের দিকের একটি  
চরণে পাইতেছি 'কবি গীত লম্বঙ্গ' অর্থাৎ গীত এবং লম্বঙ্গের কবি।  
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এই লম্বঙ্গ শ্রেণীর কবিতা বা প্রশস্তি  
সম্ভবতঃ কবিগণের মতই সংস্কৃত ছন্দে বিরচিত হইত। তিনি  
নাগবক্তাগমের ১৭ সর্গের দুইটি বিপরীত মাত্রার অর্থচরণকে  
ইহার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন (২)

তবে ইহা স্বীকার্য যে এই সমস্ত বচন এবং লম্বঙ্গ পর্যায়ে কবিতা  
বা প্রশস্তি বর্তমানে হুল্লভ এবং সমস্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় পুঁথি  
এখনো পঠিত কিংবা আলোচিত হয় নাই, তাহার মধ্যে এই শ্রেণীর  
রচনা আছে কি না তাহা নির্ধারণ করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত  
কাকাবিনের সহিত বচন এবং লম্বঙ্গের কি সম্বন্ধ ছিল বা আদৌ  
ছিল কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বিষয়।

যবদ্বীপের বাহিরে মালয় অঞ্চলে এবং বলীদ্বীপেও একটি  
সাহিত্যের জগৎ বিস্তারিত ছিল। ইহা প্রাচীনতম নির্ণয় রহিয়া  
গিয়াছে প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন বলীদ্বীপীয় ভাষার বিরচিত  
অল্পশাসন লিপিসুলিতে। কেবলমাত্র নিলাসিপি বা তাম্রশাসনে  
উৎকর্ষ হইয়াছে অথবা ইহা মলয়ভারবিহীন এই অপর্যবে বদি  
আমরা ইহাদিগকে সাহিত্যিক পদমর্যাদা দিতে চাই হই, তাহা  
হইলে সম্ভবতঃ অজ্ঞার হইবে, কারণ যে উপকরণেই লিপিত হইয়া থাকুক না কেন উহা যে সেই যুগের রচনার নিদর্শন হইবে  
কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং রচনার উৎকর্ষ বা মূল্যায়ন দিয়া  
সাহিত্যিক প্রচেষ্টার এই প্রথম নিদর্শনকে স্বাগত জানায়া সম্ভব  
হইবে না: সাহিত্যের অপর প্রথম প্রয়াস হিসাবে ইহাদিগকে

১। Treuw, Het Bhomakavya, Groningen,  
1946, p. I; C. Hooykaas, VKI, 16 (1955, pp. 6-7

অভ্যর্থনা জানাইতে হইবে। এই দিক দিরা বিচার করিলে আমাদেরগকে প্রাচীনতম শিলালেখ-তাম্রশাসনগুলির তারিখগুলি স্মরণে রাখিতে হইবে। স্মারাত্রার প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন মালয়ের মত ভাষার রচিত সর্বপ্রাচীন লিপিটি (শিলালিপি) ৬০৫ শকাব্দে (৬৮৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকর্ণ হইয়াছিল। ইহার আরম্ভে আমরা পড়িতেছি :

‘স্বস্তি শ্রী শকবর্ধাতীত ৬০৫ একাদশী স্তম্ভপক্ষ বৃন্দ বৈশাখ  
চপ্তম হিম্ম নারিক দি সাধো মঙ্গলপ্ সিদ্ধান্ত দি সপ্তমী স্তম্ভপক্ষ  
বৃন্দ জ্যেষ্ঠ ডপ্তম হিম্ম মঙ্গলপ্ দরি মিনাক্ত তাবন্ মমাব  
বন্ বঙ্গ দুহ লক্ষ দঙ্গন্ কো দুহ রতুন্ চার দি সাধো  
দঙ্গন্ জালন্ সরিবল্লুরাতুন্ সপুল্ল দুহ বক্তক দালম্ দি মত  
জপ্ সুখ চিত্ত দি পক্ষমী স্তম্ভপক্ষ বৃ (ন) -লয়ু হুদিত দাতম্  
ময়ু অং বহুঅ-লয়ু হুদিত দাতম্ ময়ু অং বহুঅ-...ঐবিজয় সিদ্ধান্ত  
সুভিক-’

অম্বুদপ ভাষায় রচিত আরো দুইটি অম্বুশাসনলিপি ৬০৬ এবং ৬০৮ শকাব্দে উৎকর্ণ হইয়াছিল। (৩)

ইহার প্রথমটি পাওয়া গিয়াছিল স্মারাত্রার পাশেবঙ্গ অঞ্চলে, দ্বিতীয়াটি বঙ্গবীপের কোটাকাপুর নামক স্থলে। এই সমস্ত অম্বুশাসন-লিপির সংস্কৃত শব্দগুলি সহজেই বোধগম্য, কিন্তু ইহার অপরাপর অংশের ভাষা পণ্ডিতগণের নিকট অনেকটা দুর্বোধ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। লিপিশুলিতে ব্যবহৃত এই ভাষার নাম প্রাচীন মালয় কিংবা কিউনে লুয়েন বাহাই দেওয়া হউক না কেন, এই ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো একান্তই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। যদি আমরা ইহা প্রাচীন মালয়-ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, প্রাচীন মালয়-সাহিত্যের আদিপর্বের নাম ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে উৎকর্ণ শিলালিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বলিবিপের তারিখ-সম্বলিত সর্বপ্রাচীন অম্বুশাসনলিপিটি ৮১৬ খৃষ্টাব্দে উৎকর্ণ হইয়াছিল। উহা বলিবিপীর ভাষাতেই রচিত হইয়াছে। (৬) এই সমস্ত অম্বুশাসন-লিপি আমরা প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন বলিবিপীর সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিলেও একথা স্বীকার্য যে, এই ভাষাতে লিখিত প্রাচীনতম নিদর্শন লোপ পাইয়াছে অথবা নির্বাকাল এই ভাষাতে কোন পুঁথি লিখিত হয় নাই। সুতরাং দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণত প্রাচীন বলিবিপীর ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিয়া থাকি।

৩। এই সমস্ত অম্বুশাসনলিপি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য : Coedes in BEFEO, XXX, pp. 29-80; Ferrand in J. As, 1932, pp. 271-326; Van Ronkel in Acta Orientalia, Vol. II, p. 12; Krom in TBG, 59, p. 17; Kern, VG VII, p. 205, See also Coedes, Les etats etc, p 142 ff.

৪। তারিখ-সম্বলিত অম্বুশাসনলিপিশুলির তালিকা দ্রষ্টব্য : Van Stein Callenfels, OV, 1924, pp. 28 35, Stutterheim, Oudheten van Bali I (1929) pp. 190 ff.

এই সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা বলিবিপীর লিখনরীতি বা হস্তাক্ষর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। খুব প্রাচীনকালের হস্তলিখিত পুঁথি এখন আর বিদ্যমান নাই, সুতরাং বলিবিপের প্রাচীন অক্ষরগুলির নিদর্শন খুঁজিতে গেলে তাম্রপত্র এবং শিলালেখগুলির সাহায্যই লইতে হইবে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলিবিপের সর্বপ্রাচীন অম্বুশাসনলিপিশুলি পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরে উৎকর্ণ হইয়াছিল। পূর্ণ বর্ণণের শিলালিপিশুলি, তুক্রমাসের শিলালিপি এবং সস্ত্রয়ের চন্দ্রলিপিটি দক্ষিণ ভারতের পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরেই স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে উৎকর্ণ দিনজলিপিতে আমরা প্রাচীন বলিবিপীর হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম নিদর্শন পাই, ইহা পল্লবগ্রন্থ হস্তাক্ষরের বিবর্তিত রূপে এবং স্বকীর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই লিপিকে অনেক কবি-লিপি আখ্যা দিয়াছেন।

তথ্য লিপি বা হস্তাক্ষরেই এই পরিবর্তন পূর্ববর্তিত হয় নাই। ইহার কিছুকাল পর হইতেই অম্বুশাসনলিপিতেও স্বদেশী ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃত, প্রাকৃত-সংস্কৃতের মিশ্রণ এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধ সংস্কৃত অম্বুশাসন-লিপিশুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পল্লববাসিন্ত দক্ষিণ ভারতের অম্বুশাসনলিপিতেও এই প্রতিকলিত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তম শতাব্দী হইতেই পল্লবগণের অম্বুশাসনলিপি রচনার অনেকটা তামিল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা একান্ত আশ্চর্য্য কারণ নাও হইতে পারে যে প্রায় একই সময়ে স্মারাত্রা, প্রাচীন মালয়, কাঞ্চোড়িয়াতে খেনর, চম্পাতে চাম এবং বলিবিপে প্রাচীন বলিবিপীর ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। (৭)

প্রাক-মুসলিম যুগের এই হস্তাক্ষরকে স্থানীয় লোকেরা অক্ষর-বৃন্দ বলিয়া থাকেন। ডঃ গণ্ডা ইহার অর্থ করিয়াছেন ‘অক্ষর বৃন্দ’ বা বৌদ্ধহস্তলিপি।

এই হস্তাক্ষরকে ‘বৌদ্ধহস্তলিপি’ কেন বলা হইবে তাহার কারণ বোকা দুঃসাধ্য। প্রথমত বলিবিপে বৌদ্ধধর্মের প্রতাপ তাত্ত্বিক শৈবধর্মীপেকা কখনো প্রবলতর ছিল না। দ্বিতীয়ত এই হস্তাক্ষর যদি শেষ দিনজ-অম্বুশাসনলিপির বিবর্তিত রূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে অক্ষর-শৈব বলাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। সুতরাং ইহাকে বৌদ্ধহস্তলিপির সহিত সংযুক্ত করা অসঙ্গত। আমরা মনে হয় যে, অক্ষর-বৃন্দ বারা অক্ষর বোধ বা অক্ষর সম্বন্ধে জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। আজিও বাংলা দেশের প্রথম শিক্ষার্থীদের পুস্তকব নাম বোধোদয়, বর্ণবোধ ইত্যাদি দেখা যায়। অক্ষর-বৃন্দ শব্দগুচ্ছ অক্ষর-বৃন্দ শব্দের বিকৃত রূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রাচীন বলিবিপে পল্লবগ্রন্থ এবং কবি-হস্তাক্ষর ব্যতীত আরো একটি হস্তাক্ষর কিছুদিনের জন্য প্রচলিত হইয়াছিল। ডঃ বসু ইহার নাম দিয়াছেন প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষর। এই হস্তাক্ষর দিনজ-অম্বুশাসনের প্রায় সমসাময়িক বলদন (৭৭৫ খৃঃ), কেলুরক (৭৮২ খৃঃ) প্রভৃতি লিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কাঞ্চোড়িয়া প্রভৃতি দেশে, উত্তর-ভারতে, নেপালেও এই হস্তলিপির পরিচয় পাওয়া যায়। (৮) বলিবিপে এই

৭। Vide Chhabra in ASBLI (1935) p. 63.

৮। Bosch in TBG, vol 68 (1928) pp. 1ff,

## দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

প্রাক-নাগরীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, ইহার বিলম্বও তেমনি আকস্মিক। করণ পরবর্তী যবদ্বীপীয় লিপিগুলি কবি-হস্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এই কবি-হস্তাক্ষর দিনজলিপির যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আধুনিক যবদ্বীপীয় হস্তাক্ষরে পরিণত হইয়াছে। (৭)

এই লিপি হইতেই আবার স্মৃশনীয়, মাদুরীয় এবং বলিদ্বীপীয় হস্তাক্ষরের জন্ম হইয়াছে। মধ্যযুগের স্মৃশাত্তার হস্তাক্ষরও কবিলিপির বংশধর। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে, মধ্যস্মৃশাত্তার বটক হস্তাক্ষর ইন্দোনেশীয় পল্লব-হস্তাক্ষরের প্রকারভেদে মাত্র। এমন কি, দক্ষিণ স্মৃশাত্তার বেজঙ্গ এবং লম্পোঙ্গ হস্তলিপির সহিত এই কবিলিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার চম্পাদেশের চাম-হস্তাক্ষরও ভারতবর্ষ হইতে পরগৃহীত হইয়াছে। এই চাম ভাষার সহিত ইন্দোনেশীয় ভাষার নিকট সম্পর্ক ভাষাতত্ত্ববিদগণের নিকট অপরিস্ফুট নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যবদ্বীপের লিখিত ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হইল সংস্কৃত ভাষার রচিত অমুশাসনলিপিগুলি। যবদ্বীপের প্রাচীন লিপিগুলি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে সংস্কৃতশ্লোক এবং সংস্কৃত শব্দ হইয়াছে। স্তবকাব্য ইহা হইতে অমুমান করা যাইতে পারে যে, যবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার গভীর অমুশীলন হইত। পার্শ্বস্থ দ্বীপ স্মৃশাত্তাতেও কখনো সংস্কৃতের প্রচলন দেখিতে পাই। স্মৃশাত্তার পালেম্বাঙ্গ অঞ্চলে কখন বৃক্শের বেষ্ট অমুশাসনলিপিটি আমরা পূর্ব উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা পালি ভাষায় লিখিত। সত্যমায়ের জীবনে সংস্কৃতের কি স্থান ছিল তাহা উপলব্ধি হইবে। এই অমুশাসনলিপিটির প্রারম্ভিক শব্দগুলি এবং 'বুলন' শব্দ ব্যতীত অত্যাঙ্গ সময়-পরিমাপক শব্দগুলি বিভক্তি-বিহীন সংস্কৃতে বিরচিত। পরবর্তী তালোক্ত তুবা অমুশাসনলিপিটিতেও অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবেশিত হইয়াছে। অমুশাসনলিপিগুলির কথা বাদ দিলেও যবদ্বীপ ও স্মৃশাত্তার যে গভীরভাবে সংস্কৃত ভাষার অমুশীলন হইত, তাহার আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি চৈনিক পরিব্রাজক ইংসিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে।

ইংসিজ জীবজৈব (দক্ষিণ-পূর্ব স্মৃশাত্তার) দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি ৬৮৫ হইতে ৬৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারি বৎসর কোচিং (জীবজৈব) অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষার লেখা অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অমুবাদ করিয়াছিলেন। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্টন হইতে কয়েকজন সহকর্মী সাগ্রেহ করিয়া লইয়া জীবজৈবে আসেন এবং সেখানে দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

এই দুইখানি গ্রন্থই মুখ্যত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্ভা। (৮)

অতঃপর ৬৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পাণ্ডুলিপিগুলি চীনে প্রেরণ করিলেন এবং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং সেখানে উপনীত হইলেন। ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে যাতায়াত করিবার সময় ইংসিজ জীবজৈবে ছয় মাসকাল থাকিয়া শব্দবিজ্ঞা বা সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুনিকি, তংসিন, চেঙ্গকৌ, তঙ-হোঙ্গ, ফ-লঙ্গ প্রভৃতি চীনা পণ্ডিত জীবজৈবে দীর্ঘকাল থাকিয়া স্থানীয় ভাষা কোএন-ফুয়েন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল বৌদ্ধগ্রন্থাদি সাগ্রেহ করিয়া উহা অধ্যয়ন করা এবং অমুবাদ করা। ইংসিজ বলিয়াছেন যে, চীনাতীর্থযাত্রী হুইনিঙ্গ ভারতবর্ষে যাত্রার পথে তিন বৎসরকাল হোলিঙ্গ (মণ্যজাভা) নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় পণ্ডিত জ্ঞানভয়ের সহযোগিতায় তিনি কয়েকখানি বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক অমুবাদ করিয়াছিলেন। (৯) হুইনিঙ্গ এবং জ্ঞানভয়ের এই সহযোগিতায় ফলে বুদ্ধদেবের নির্বাণসংক্রান্ত আগমের অমুবাদ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পালি ধর্মশাস্ত্রে যাহা নিকায় নামে পরিচিত, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রে তাহাই আগম নামে সুপরিচিত। সুতরাং বুদ্ধদেবের নির্বাণসংক্রান্ত গ্রন্থের অমুবাদে গভীর সংস্কৃত-জ্ঞান অপরিস্ফুট ছিল। ইংসিজ আরো বলিয়াছেন যে, এই দ্বীপাঞ্জে অমুবাদের সংস্কৃত ভাষার বিরচিত বুদ্ধচরিত ভারতবর্ষের মতই জনপ্রিয় ছিল। দ্বীপময় ভারতের এই বৌদ্ধধর্ম মুখ্যত ছিল হীনযানের মূল সর্বাঙ্গিপদশাখার। এই শাখার গ্রন্থাবলী প্রধানত সংস্কৃতে রচিত হওয়ার যবদ্বীপে এবং দ্বীপময় ভারতের অন্তর্গত পালি ভাষার রচিত গ্রন্থসংক্রান্ত গ্রন্থাদি হুলভ। জীবজৈব সান্নাজোর কল্যাণে স্মৃশাত্তার ৬৮৫-৬৮৯ খৃষ্টাব্দে যে গতিবেগ সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কারণ আমরা সূত্রবংশের ইতিবৃত্তে পড়িতেছি যে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চীনাভ্রমণ এই স্থল হইতে অনেক সংস্কৃত পুঁথি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে স্মৃশাত্তার যিনি নরপতি ছিলেন, তাঁহাকে সূত্র ইতিবৃত্তে ত্রিস-চেন্সো-বো-চপো-মি অর্থাৎ হজ্জি সুমুদ্রভূমি (স্মৃশাত্তার রাজ্য) অভিধানে ভূষিত করা হইয়াছে। (১০) ক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমান-স্বাধীন স্থাপিত হওয়ার এই সংস্কৃত-চর্চার ছেদ পড়িল। সেই স্মৃশাত্তার অবস্থিত অঞ্চলবর্ষের 'পুত্র কনকবেদিবীজ' (১১) আদিভাষ্যের (১৩৪৩ খৃঃ)

qui allerent chercher la loi dans les pays d'occident par l-tsing. Translated by E. Chavannes, Paris, 1894. (৭) A. Record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay Archipelago (671-695) by l-tsing. Translated by Takakusu (Oxford, 1896).

১। E. Chavannes, Religieux eminents, p. ১০.

১০। Grœneveldt, Notes, p. 65; Ferrand, J. As., 1922, pp 19-20; Krom, Geschiedenis, p. 249.

১১। Kern, VG VII p. 219.

B R Chatterji, Indian Cultural influence in Combodia, p, 110.

৭। Kern, VG VII, p 67 ff, Krom, Geschiedenis, p 5, Gonda, Sanskrit in Indonesia, p 32.

৮। (ক) Memoire compose a l' epoque de la grande dynastie T' ang sur les Religieux Eminents

বইয়েরওল, অমোঘপাশ শিলালিপি প্রভৃতি 'উক্ট সঙ্কৃত' রচিত হইয়াছে। (১২)

স্বমাত্রার সংস্কৃতচর্য ক্রমশ ভাটা পড়িলেও মধ্য যবদীপে ইহার শ্রোত দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। এই স্থলের সর্বপ্রাচীন অমূল্যল-লিপিগুলি যে কেবলমাত্র সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই নহে, ঐ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাব্যবহার জন্ম আবার অমূল্যলনী পুস্তক, ব্যাকরণ, হ্রস্বশাস্ত্র, অভিধান প্রভৃতি প্রাচীন যবদীপীয় ভাষায় অথবা মিশ্র সংস্কৃত—যবদীপীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন যবদীপীয় সংস্করণ ঐ সমস্ত কাব্যশ্রী বিভিন্ন কাক্যবিন গ্রন্থ, ধর্ম ও পুণ্য সাহিত্য, বয়োগ ও ঋণকথা এত অধিক সংখ্যায় রচিত হইয়াছিল যে, যবদীপে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন শাখার গভীর অমূল্যলন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর ছিল না। ডঃ হইকাশ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কবি যোগেশ্বরের যবদীপীয় রামায়ণ গ্রন্থাদি ভট্টিকাব্যের আংশিক অনুবাদ এবং আংশিক মূল্যমুসারী স্বকীয় সৃষ্টি। এই সমস্ত গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা বধ্যাসময়ে করিব।

যবদীপের আদিম ভাষা বিরূপ ছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার মত পর্যাপ্ত উপাদান বিজ্ঞান নাই। তবে বিভিন্ন দীপে প্রচলিত ইন্দোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বাক্যশৈলীর রূপ অনুধাবন করিলে ইহা মনে হইবে যে, প্রাচীন যবদীপীয় নরনারী সমস্ত ছোট ছোট বাক্যাবলি নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিত। বস্তুত কেবলমাত্র প্রাচীন যবদীপীয় ভাষার নহে, প্রাচীন মালয় ভাষারও আদিম রূপ এইরূপ সহজ, নিম্নভরণ এবং জটিলতাবঞ্চিত ছিল। এইরূপ, বচন, বিকল্পিত, ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পার্থক্য বিজ্ঞান ছিল। বলিলেই হয়; ইহার জটিলবাক্য সৃষ্টি করিবার সাধ্য একান্ত সীমিত ছিল। এই সীমিতসাধ্য যবদীপীয় ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রথম যুগলোক আসিয়া নিপতিত হইল। ইহার ফল হইল অসাধারণ; কারণ এই সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সহযোগিতার ফলে অমৃত উদ্ভিগাছিল তাহাই যবদীপ ও বলিদ্বীপের সাহিত্যে স্পষ্টরূপে পরিগ্রহণ করিয়াছে। যুগের বিবরণ, প্রথম যুগে সংস্কৃতের প্রাচীন যবদীপীয় ভাষার মধ্যে যে সহযোগিতা বা সংঘাত টিরাছিল তাহার স্বরূপ বুঝিবার কোনো সিংগার্মন নাই। তবু এই যুগের দুই ভাষার মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের ক্ষেত্র যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সন্মুখে আমরা বেবল অধ্যয়ন করিতে পারি, কিন্তু ইহার সন্মুখে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিবেশন করা সম্ভবপর নহে। পরোক্ষ প্রমাণ বাহা বিজ্ঞান তাহার মধ্যে প্রধান হইল : (১) প্রাচীনতম শিলালেখ—তাম্রশাসনে ব্যবহৃত যবদীপীয় ভাষা এবং উহাকে পরিবেশিত সংস্কৃত শব্দগুলির বানান ; (২) মধ্য যবদীপে রচিত গ্রন্থাবলী এবং আলোচ্যবিবরণ। প্রমাণের স্বরূপ দেখিয়া স্বভাবতই মনে হইবে যে, এইরূপ শিথিল ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন অচল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নহে। এই কথা অতীব সত্য ;

অতরাং এই বিষয়ে এস্থলে বাহা বলা হইবে তাহাকে অসঙ্গত অনুমানের বেশি মর্যাদা দেওয়া সম্ভবপর নহে।

আমরা একথা হয়তো সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, যবদীপে যে সমস্ত হিন্দু বৌদ্ধ ঔপনিবেশিক ব্যবসায়ী বা অভিযাত্রিক আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন না। তাঁহাদের ভাষা ছিল প্রাদেশিক ভাষা অর্থাৎ তাঁহারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চল হইতে গিয়াছিলেন সেই অঞ্চলের ভাষাতেই তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কথাপকথন বা ভাবের আদান-প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার জননী সংস্কৃত ; অতরাং এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার শব্দাবলী সংস্কৃতবচন হওয়ার জন্ম সম্ভবত তাঁহাদের ভাবের আদান-প্রদানে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হইত না। এই সমস্ত ভারতবাসীরা আবার যখন দ্বীপময় ভারতের অধিবাসিগণের সঙ্গে আলাপ করিতেন তখন তাঁহারা সংস্কৃত সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা ভাষা প্রাচীন মালয় বা প্রাচীন যবদীপীয় ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন।

এই সংস্কৃত শব্দগুলি সংস্কৃত ছিল প্রাদেশিক ভাষার কথা সংস্কৃত শব্দ। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত ভারতবাসী দ্বীপময় ভারতের নারীগণ বিবাহ করিয়া ঐ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া তাঁহাদের ভাষায় আংশিক ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন কতিপয় ভারতবাসীগণ অপভ্রংশ ঔপনিবেশিক বা ব্যবসায়িকগণকে ঐ ভাষায় দাক্ষিণ্য করিতেন। সম্ভবত অতি প্রাচীন যুগে ঐ ভাষা শব্দসংখ্যাও বিপুল ছিল না ; তাহা ক্রমে ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকাল লাগিবার কথা নহে।

এ কথা আমরা সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, দ্বীপময় ভারতের অগণিত নরনারী তাঁহাদের স্বদেশী ভাষাতেই কথাবার্তা বলিতেন। অতরাং বিদেশী লোকের পক্ষে নতুন দেশে আসিয়া তথাকার প্রচলিত ভাষায় কোন মৌলিক পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃত এবং দেশীভাষার সহযোগিতার ও সংঘাতে প্রাচীন যবদীপীয় ভাষার অবলুপ্ত ঘটিল না, ঘটিল উৎকর্ষসাধন। ইহারই স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে উচ্চস্তরের ভাবের জগতে। সেখানে সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য ছিল এবং এই সাহায্য গ্রহণ করিয়াই যবদীপীয় ভাষার জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণীত হইল। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন যবদীপীয় ভাষা সংস্কৃত এবং যবদীপীয় ভাষার মিশ্রণ নহে : ইহা হইল ইন্দোনেশীয় বাক্য এবং রচনাশৈলীর মধ্যে সংস্কৃত শব্দের অমুপ্রবেশ। এই অমুপ্রবেশ কোন কোন গ্রন্থে সীমিত ভাবে হইয়াছে, কোন কোন গ্রন্থে হইয়াছে বিপুলভাবে। বস্তুত যবদীপীয় গ্রন্থগুলিতে আমরা সংস্কৃতের যে দ্বিবিজয়ী রূপ দেখিতে পাই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে ডঃ যুইনবল কহু'ক সংকলিত এক যবদীপীয় ডঃ ভাষার অভিধান গ্রন্থে। ডঃ গণ্ডা বলিয়াছেন যে, ঐ অভিধান ৬৭১০টি সংস্কৃত শব্দ আছে এবং যবদীপীয় শব্দের সংখ্যা হইল ৬১২৫টি। মালয় অভিধানগুলিতেও সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা ৭৫০টির কম হইবে না। (১৩) ডঃ গণ্ডা যবদীপের ব্রহ্মপুত্রাণের কথা

১১। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Kern, VG VII pp. 163, 219 ; *ibid.*, 1921, pp. 199-200 ; Kern in OV 1912 pp. 51-2.

১৩। দ্রষ্টব্য Gonda, Sanskrit in Indonesia, pp. 115-6.

## বীণময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

আলোচনা করিতে গিয়া বলিগাছেন যে, উহার কোন কোন পৃষ্ঠায় সংস্কৃত ও দেশী শব্দের আত্মপাতিক সংখ্যা বথাক্রমে ৪ ও ১। প্রাচীন বব্বীপীর কাব্যগুলিতে এই অনুপাত ১ : ৪ বা ২ : ৭ (১৪) মধ্যযুগের কিছু অংশের রচনার সংস্কৃত ও দেশী শব্দের হার বথাক্রমে ১ : ৪ হইবে। (১৫)

বহুদিন পূর্বে ডঃ ব্র্যাণ্ডেল (১৬) বব্বীপীর ভাষায় বিরচিত প্রাচীনতম শিলালেখ তাম্রপত্রে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহাতে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং উহার বানানও শুদ্ধ নহে। পরবর্তী যুগের অনুশীলন লিপিশক্তিতে সংস্কৃত শব্দসংখ্যার যেমন বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি উহার বানানও প্রায় নিভুল। ইহা হইতে এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, (ক) সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ প্রথম যুগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুগে ব্যাপকতর হইয়াছিল; (খ) দ্বিতীয় পর্বে সংস্কৃত ভাষার গভীরতর অনুশীলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় যুগের সংস্কৃত শব্দ ক্রতিলিখন পর্যায়ের নহে; (গ) তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আমরা বব্বীপ এবং মুসলমান সংস্কৃত রচনার যে নির্দশন পাই, তাহাতে শব্দরূপ, বানান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ভুলভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়।

১৬. ডঃ ব্র্যাণ্ডেল মজপহিত যুগে যে অল্পসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ দৈনিক কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হইত, তাহা সম্ভবতঃ বব্বীপীর কথ্য রীতির সহিত বথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করিত। উদাহরণ হইতে (১৭) অর্থাৎ এই যুগের সংস্কৃত শব্দ বব্বীপের — ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কথ্যভাষার প্রভাবে এই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে।

২

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিন্দু-আদিপত্যের যুগে বব্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র প্রথমে পশ্চিম বব্বীপে ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত পূর্ববর্ণনের সংস্কৃত অনুশাসনলিপি এই রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচায়ক। তাহার রাজধানী ছিল তরুয় নগরে। এই তারুয় রাজ্যটি সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দীতেও বিজয়মান ছিল। কারণ, ত্যাগবংশের নতুন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তোলা-মো বা তারুয় হইতে ৬৬৬—৬৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন দেশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। (১৮) এই দুইশত বৎসর পশ্চিম বব্বীপের রাজদরবারে সংস্কৃতচর্চা আদৌ হইত না, ইহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা প্রমাণ করাও আবার অসম্ভব।

পশ্চিম বব্বীপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র অবশেষে মধ্য বব্বীপে চলিয়া গেল; ইহা সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর ঘটনা। যে তারুয়

রাজ্যটিকে আমরা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি বিশ্বয়চকিত নেত্রে দেখিয়াছিলাম তাহা সপ্তম শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে একবার দেখা দিয়া কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। এই সময়ই খটল হোলিঙ্গ বা মধ্য জাভার অভ্যুত্থান। পশ্চিম বব্বীপের নেপথ্যগমন এবং মধ্য জাভার উপানের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলে তাহার তাৎপর্য কি, তাহা বর্তমানে আর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এখানে শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তুক্রমাস শিলালিপি প্রাক্যাদর্শ, ডিয়েজ উপত্যকার স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য, ছইনিজ-জানভের শাভ্রালোচনা যে সংস্কৃতির স্বাক্ষর, তাহাতে মনে হয় যে মধ্য বব্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ লাভ করিবার পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল ছিল। এই স্থলে ইন্দোনেশীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার সংঘাতে একদিকে ভাষা ও সাহিত্য এবং অপরদিকে শিল্পের সৃষ্টি হইল। সামাজিক জীবনেও সম্ভবতঃ এই সময়ে এক বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়াছিল। এই আলোড়ন ছিল সুদূরপ্রসারী এবং ইহা প্রায় তিন শতাব্দীকাল জাপিয়া উচ্চতর সমাজ-জীবনে, চিন্তায় এবং আদর্শে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। সম্ভবতঃ ভাষা ও সাহিত্য-সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষা, ব্যাকরণ, অভিধান রচনা, সংস্কৃত শিখিয়ার অনুশীলনী পুস্তক মধ্য বব্বীপের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই যুগে কোন কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে বলিবার উপায় নাই। মধ্য জাভার প্রাথমিককালে যদি আমরা ৬৫০—১২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই যুগে সম্ভবতঃ তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়েও অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ বিজয়মান হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অমরমালা নামক কোষ গ্রন্থখানি অসম্ভব এবং ইহা রাজা জিতেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী রচিত হইয়াছিল বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা আমরা পরে করিব।

পূর্ব জাভার প্রাচীন স্থাপিত হয় দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে, কিন্তু এই সময় হইতে রাজা ধর্মবংশের শাসন কালের পূর্ব পর্যন্ত (১২৫—১১০ খৃষ্টাব্দ) আর কোন বব্বীপীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না তাহা আজ বলিবার উপায় নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মবংশের রাজত্বকাল হইতে বব্বীপীর সাহিত্যের উন্নতির যুগ আরম্ভ হইল। এই যুগ আনুমানিক ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এই যুগে কবিতা, সিন্ধুসরি এবং মজপহিত রাজগণের পুত্রপোষকতার প্রাচীন বব্বীপের সাহিত্য উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করে। এই সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ব বব্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন স্তরের লোক সহযোগিতা বিশিষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ গ্রন্থই তারিখবিহীন এবং ইহাদের রচনাস্থল কোথায় তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। এই অনিশ্চয়তার জন্য এই সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতির ইতিহাস লেখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ইহার সময়ও সম্ভবতঃ সমাগত হয় নাই। বাহাই হউক মজপহিত যুগের পরেও এই ভাষার আরো প্রায় দুইশত বৎসর কাল অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সাহিত্যের প্রাণ ছিল না। প্রাক্ মুসলিম যুগের এই সাহিত্যই

১৪। Ibid, pp 119, 120

১৫। Ibid, p. 121

১৬। TBG XXX11 (1889) p.112 ff, 129 ff, Krom, Geschiedenis, p. 94.

১৭। G. Pigeand, Java in the fourteenth century, Vol. IV. p. 181.

১৮। Pelliot, Deux itineraires, BEFEO, IV, p. 284





বাড়ীতেই সার্ফে কাচুন, দেখুন কত তফাৎ! সার্ফে সব কাপড় সবচেয়ে ধবধবে, সবচেয়ে পরিষ্কার আর সবচেয়ে সহজে কাচা হয়। সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি! বাড়ীর সব জামাকাপড়ই সার্ফে কাচুন ... ছেনেমেয়েদের জামাকাপড় সাঁট, শাড়ী, মনকিছুই।

**সার্ফে সবচেয়ে কবসা কাচা হয়**

BU. 44-140 BG

হিঙ্গুহান লিভারের তৈরী

—ঘটনাটা জানা নয়কার। বলেছিলেন বিজয়বাবু।

—ঘটনা তো সবাই জানে। তুমিও জান।

হ্যাঁ জানেন। অস্বীকার করতে পারেন না বিজয়। মানেজার এসে বলেছিল—মুগেনবাবুর স্ত্রীও নেই।

—নেই তাই কি! উনি হয় তো কোথাও গিয়েছেন।

কোথাও গিয়েছেন তো নিশ্চয়ই—কিন্তু কোথায় তা কেউ জানে না।

মানেজারবাবু ঘরে ঘরে বলতে থাকেন, লোকে বলছে—মানে মুগেনবাবুদের ওখানে ঠুং খুব যাতায়াত ছিল। মুগেনবাবুর স্ত্রীও খুব মশরু—কাল থেকে তিনিও অসুস্থিত এই সব মিলে—দুশ্চরিত্রের চর—

—না। আমি বিশ্বাস করি না। জোর দিয়ে বলেছিলেন বিজয়বাবু।

কিন্তু, দিনের পর দিন কেটে যায় মুগেনবাবুর স্ত্রী ফিরে আসেন না—মুগেনবাবুও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব তখন ঘরে ঘরে বিজয়বাবুর বিশ্বাসের জোর কাণ হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু, তবুও—

এখনও তিনি বিশ্বাস করেন না যে অসিত ভণ্ড, অসিত চরিত্রহীন। কিছু একটা ঘটেছে—কোন একটা বিশেষ ব্যাপার—যে জ্ঞান—

তাই তিনি দিনরাত ভাবতেন, কেন ও এমন করলো? কি চেয়েছিল ও! ভাবতেন আর বলতেন—বলতেন আর ভাবতেন—

শেষটার সরোজ একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিল, রাত্রিদিন তুমি ঐ লোকটার কথা বল কেন?

—‘ঐ লোকটা!’ চমকে উঠেছিলেন বিজয়বাবু, তোর বাবা—

—না। গভীরকণ্ঠে সরোজ বলে, যে স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব অস্বীকার করে, সে পতি নয়, পিতা নয়। এই সব দায়িত্বহীন, উদ্ধৃষ্ণ লোকদের শাস্তি দেবার জন্যই আমাদের এই সমাজকল্যাণ সমিতি।

—সে আমার কি?

—তুমি বুঝতে পারবে না? শুধু এটুকু জেনো, মানুষকে আর উদ্ধৃষ্ণ হতে দেব না আমরা। এই রকম শত, শত, লক্ষ, লক্ষ, সমিতি গড়ে উঠবে। অসামাজিক মানবকে সংশোধন করবে সামাজিক মানব।

যি-এ পাশ করবার পরে সরোজের বৈষম্য দিতে চেয়েছিল।

—বিরুদ্ধে-টির করা আমার পোষাবে না, টোট বৈকিরে বলেছিল সরোজ।

—ও কথা সবাই বলে। হাভা পরিহাসে বিজয় বলেছিলেন।

—আর, তোমার তা বিশ্বাস করে না। কঠিনকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সরোজ। অসিত রায়ের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছে?

একটু অবাক চোখে সরোজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিজয়বাবু। এই প্রথম সরোজ তাঁর সামনে পিতার নাম উল্লেখ করলো, কিন্তু, কি মিথিলায় বর্ণনা কুটে উঠেছে ওর কণ্ঠে। বিজয়বাবুর চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠে গেল।

সরোজের নিজের ইচ্ছাশক্তি ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে, বা ইচ্ছা পারিপার্শ্বিক—আমার মনে হয় তেমন কোন পারিপার্শ্বিক—

—তুমি একটা আশ্চর্য লোক, সরোজ অবাককণ্ঠে বলে, যে

তোমার এত ক্ষতি করেছে, তার পক্ষে ওকালতি করছ। কেন?

সেদিন বিজয় কিছু বলেন নি। পরে একদিন বলেছিলেন—তখন তিনি আরও বুড়িয়ে গেছেন—হাত ছুঁতে আপনা থেকেই ধরধরিয়ে নড়তে থাকে—কথাও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন হয়ে যায়—কিন্তু, অসিতের কথা উঠলে যেন নতুন মানুষ হয়ে যান—

বয়স যতই বাড়ছিল ততই অসিতের কথা আরও বেশি বলতেন। নিশ্চয়ও নয়, প্রশংসাও নয়, শুধু নাম ধরে বলে যাওয়া—যেন স্বগতোক্তি করছেন।

সেই সময় একদিন সরোজ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল, ওর সবক্ষে তুমি রাতদিন বক কেন?

—কেন? নিশ্চয় চোখে তাকিয়েছিলেন বিজয়, তারপরে হঠাৎ সরোজের মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, কেন জানিস? ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ? অবাক হয়েছিল সরোজ।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওর স্বভাব ঐ রকম ছিল বলে, ও ছেড়ে দিয়েছিল বলেই না আমি পেলাম তোকে। তোকে—তোকে—তোকে—...হুঁহুতে সরোজকে জড়িয়ে ধরেন বিজয়, নইলে আমার কিসের অধিকার। মাতামহ! কিন্তু, আমি তোকে শেয়েছি একান্তভাবে, সম্পূর্ণ নিঃস্বভাবে—এ যে কত বড় পাওয়া—আবরণে বিজয়ের শরীর কাঁপতে থাকে।

মেহের এই উগ্র উচ্চাসে সরোজের চোখে জল এসে যায়। কিন্তু, সামলে নিয়ে বলে, ছেলেবেলার সেই দুশুটা আমার মনে পড়ে। আমি ছিলাম উঠানের এককোণে, মা বসেছিল ঘরে তক্তাপোষের ওপরে, তুমি—তুমি সেদিন—আমাকে বকছিলে যে সে কেন অসিত রায়কে বিচার দেয় না। তুমি নিজেই যদি তাকে এত ভালোবাসো তবে কেন মার নীরবতার দুঃখিত হও?

—কেন? অনেককণ চূপ করে থাকেন বিজয়বাবু, আমিও একথা ভেবেছি। শেষটার মনে হয়েছে, আমি তো আমার প্রাণ্য প্রবোমাত্রায় পেয়েছি—বলতে গেলে প্রাণ্যের চেয়েও বেশি কিন্তু যেহেঁটা কি পেল? স্বামী নেই, সংসারের প্রতি কোন আসক্তি নেই, সম্ভাবনের প্রতি নেই ভালোবাসা। কে এর জন্য দায়ী? যে দায়ী কেন ও তার বিরুদ্ধে একটুও কথা বলবে না!

সেদিন সরোজ কোন কথা বলেন নি, কিন্তু অনেকদিন পরে রমার মৃত্যুর পরে, রমার চিঠিটা পড়ে ওর এই কথাই মনে হয়েছিল, কে দায়ী। রমার জীবন নষ্ট হওয়ার মূল কে!

বিজয়বাবু বুঝতে পেরেছিলেন সরোজকে দিয়ে ব্যবসার কোন কাজ হবে না। তাই তিনি আর বাড়াবার চেষ্টা না করে বা ছিল তাই রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন।

বিজয়বাবুর মৃত্যুর অন্তর দিন পরেই একরাতে সমাজকল্যাণ সমিতির কাজ সেরে ফিরে এসে সরোজ দেখলো, শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের প্রাইভেট সাইকেল-রিজা দাঁড়িয়ে আছে।

একটু অবাক হয়ে ক্রতপায়ে বাড়িতে ঢুকতে যেতেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন।

—কোথায় গিয়েছিলেন? জুঁচক প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু।



## এক কলঙ্কের চারটি মেয়ে

—এই একটু কাজে...।

—ওঃ। আপনার সেই সমাজকল্যাণ-ডাক্তার যেন স্পষ্টতই বিদ্রূপ করেন।

সরোজ একটা রুঢ় ঐড়াস্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তখনই ভেতর থেকে পুরোণ যি বাস্তব ভাঙ্গলার চাঁকান ও কান্না ভেসে আসে, দিদিমণি গো...ও দিদিমণি...

...হ্যাঁ। শেষ হয়ে গেল। সরোজের সপ্তম ব্যাকুলদৃষ্টির উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন। অমৃত ভাগ্য ভ্রমহিলার—পতি-পুত্র পরিত্যক্ত।

কয়েকদিন ডাক্তারবাবুর কথাটা মনের মধ্যে ঘুর বেড়িয়েছে সরোজের—পতি-পুত্র পরিত্যক্ত। সত্যই তো মায়ের প্রতি কোন কর্তব্যই সে করে নি, তাই অমৃতশুচিত মায়ের জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে এসে।

প্রত্যেকেই আমাকে সোয় দিচ্ছে, সমালোচনা করছে, বিশেষত বাবা। বাবা রীতিমতো গালাগালি দিচ্ছেন আমার। কিন্তু আমার সোয় কি!

আমার স্বামীকে আমি ভালবেসেছি, তা যদি অপরাধ না হয়ে থাকে তবে একে ভালবাসি তাতে কি অপরাধ। চপলচিত্ততার ভ্রম করা সম্ভব, কিন্তু এরা আমাকে গালি দেয় আমার অচপল-চিত্ততার জন্য—আমার অন্তরের ভাবের একনিষ্ঠতার জন্য।

লোকের কাছ থেকে এরকম বিপরীত ব্যবহার আমি আশা করি, বিশেষত বাবার কাছ থেকে।

মাতৃহীনগৃহে আমি বাবার হাতেই বড় হয়েছি। তিনি বার বার আমার মৃত মায়ের কথা সজ্ঞে উচ্চারণ করেছেন—তার আদর্শ আমাকে উদ্ভূত করেছেন।

মায়ের আদর্শবাহ অমৃত বা আমি বাবার মুখ থেকে পোহছি, তাতে পতিপ্রেম ছিল প্রধান কথা—একমাত্র বলা যেতে পারে।

বাবার বক্তব্যকে শ্রদ্ধা করে, মায়ের মৃত্যুকে পূজা করে আমার শৈশব কেটেছে। মর্যাদার প্রায়স্তর বাবা বিবেচনা করে বঁচ হাতে আমাকে সম্প্রদান করেছেন, তাকেই আমি পতি বলে গ্রহণ করেছি।

শুধু পতি নয়, প্রিয়।

তাকে আমি ভালবেসেছিলাম বাবার দেওয়া অজ্ঞাত স্নেহের দানের মতই তাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম উন্মুখ মনে, বিনত শ্রদ্ধায়। তারপর, ধীরে ধীরে তার চেহারা, তার ব্যবহার আমার মনের ভালবাসাকে গভীর থেকে গভীরতর করে তুলেছিল।

তাকে ভালবাসা যেমন আমার অপরাধ নয়, আমাকে না ভালবাসতে পারাটাও তার অপরাধ নয়। দোষ আমি তাকে দিই না। বরং তিনি যে অমৃত কয়েকটি দিন তাকে ভালবাসবার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ, হ্যাঁ, সত্য কথা। আমি শুধু প্রেমে মুগ্ধ নই, আমি কৃতজ্ঞা বিনীত।

তোমরা আমাকে গালি দাও—তোমরা অবাধ হয়ে ডাবো—এ মেয়েটি কি। যে স্বামী তাকে সম্মানসহ পরিত্যাগ করে গিয়েছে, তার সম্বন্ধে কোনদিন কোন অভিযোগ নেই—একটি কঠিন বাক্যও সে বলে নি কখনও। এর কি মন বলে কোন পদার্থ নেই।

এতদিন আমি কোন উত্তর দিই নি। তোমাদের মিথ্যা দোষারোপ কান পেতে শুনে গেছি, তোমাদের ভুল ধারণার মনে মনে হেসেছি। আজ আমি উত্তর দিচ্ছি।

আমার মন অত্যন্ত গভীর এবং প্রবল বলেই সেট মন জানে—ভালবাসার ব্যাপারে দু'পক্ষ কখনই পরস্পরকে সমানভাবে ভালবাসতে পারে না। একপক্ষ ভালবাসে—অপর ভালবাসতে দিয়ে দত্ত করে। আমি তাঁকে ভালবেসেছি—তিনি আমাকে সেই অধিকার দিয়ে দত্ত করেছেন—এই তো আমার জীবনের পরম লাভ।

অধিকার! শব্দটা মনে পড়তেই তোমাদের কতগুলি কথা মনে পড়লো, তোমরা বারবার বলা—তাকে আমার আটকে রাখা উচিত ছিল। কি অধিকারে—না জীবন অধিকারে।

জীবন অধিকার। তিনি কি সে অধিকার দিয়েছেন আমাকে। না। আমার াবা তাকে কিনে নিতে চেয়েছিলেন—রূপার জাল জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তাকে—আবার তিনিই আজ ক্রুদ্ধ হচ্ছেন যেহেতু রূপের মোহে বন্দী হয়েছেন আমার স্বামী।

আমি নিজে এই অভিযোগে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি—আমার স্বামী রূপ বা রূপ কিছুই মোহেতেই ভুলেছেন না। তিনি জীবন-শ্রী। জীবন উপভোগ করতেই নবপথে বাঁচা করেছেন।

অবশ্য, তোমরা বলবে, আমার স্বামীর পক্ষে কেন শুনে এই ভাবে বিয়ে করাটা কি অস্বাভাবিক নয়। তিনি তো জানতেনই যে পাত্রীর রূপ নেই। তিনি তো জানতেন যে তিনি পাত্রীর জন্ত নয়, পাত্রীর পিতার অর্থের জন্ত বিয়ে করেছেন। তবে। কেন এই মিথ্যাচারণ। আমার পিতার পক্ষে স্বামীকে কেনা এবং স্বামীর পক্ষে নিজেকে বিক্রি করা দুইই সমান অন্যায় ও হেয়। তবু কাউকে বিচার আমি করবো না।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ডাক্তার গড্ডা রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪  
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুগ্ধ টকডাউ, ঢেঁকুর ওষ্ঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগি, বুকজ্বালা, জ্বালা, অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশান্ত। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। মাত্র চিকিৎসা করে মারা যাতন হয়েছেন, তারও লাবণ্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করতেন। শিহরলে মূল্য ফেরত। ১৬৪ গ্রাম প্রতি কোটা ৩ টাকার, একট্রে ৩ কোটা ৮ ৫০ বাপ ডা. মা. ৩ পাইকারী মত মূল্য

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী সোড, কলি। (হেড অফিস- বঙ্গিশাল, পূর্ব পাণ্ডিত্য)

আমি জানি, তোমরা আমাকে বল আদর্শবাদী। আড়ালে বিজ্ঞপ করে আমাকে। তুলনা কর সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গে।

এই ব্যক্তিব্যক্তির যুগ, আধুনিক স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে যে একটি ভণ্ড ও চরিত্রহীন (তোমাদের মতে) স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে না—তাকে উপহাস করা ভিন্ন আর কি কোন পথ খোলা আছে।

কিন্তু, আমি আদর্শবাদী নই—আমি পরিপূর্ণ বাস্তববাদী। একটুকরো হীরে একতুণ্ড আমার পরসার চেয়ে অনেক দামী। আমি সেই হীরে খুঁজে পেয়েছি—আমার দুই বছরের দাম্পত্য ইতিহাস আমার সমস্ত জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ভালবেসে আমি স্থখী হয়েছি—আর কিছু আমি চাই না।

লেখাটা পড়ে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে বসে থাকে সরোজ। লেখা তো নয় যেন একটুকরো হীরে। ঘুরির-ফিরিয়ে তাকে যে ভাবেই রাখা না কেন নীতি ঠিকের পড়ে।

মায়ের সম্বন্ধে শব্দ ছিল না ওর। কোন সমালোচনাও ছিল না। কারণ, সে ভাবতো মা অজ্ঞানভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। মা যে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখ পাচ্ছে—উগ্রভাবে এ বোধ তার মনে ছিল—কিন্তু সে ভাবতো কেন দুঃখ পায়। ঐ রকম একটা বাজে লোকের ভক্ত হুগে পোতে লজ্জা হয় না। অপমান বোধ হয় না। মনের যে ভাবকে 'দূর' করে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত সেই ভাবকেই ডেকে এনে দূর বসায়। এ তো শুধু নির্লজ্জতা নয় এ যে অজ্ঞান—অসিত রায়ের পথ চেয়ে সে বসে থাকে তাকে আর বাই হোক সরোজ রায় কখনও ক্ষমা করতে পারবে না।

মায়ে মায়ে ও মাকে সম্বোধ করতো। ও ভাবতো ওর মা-ই বোধ হয় ওর বাবাকে সৃষ্টি দিয়েছে। ওর মায়েই কঠিন ওরাসীজ এবং একান্ত আত্মপশ্চাদ্ধাত্ম অসিত রায় কখনই নিজের স্থান করে নিতে পারেনি। হয়তো ওর মায়েই রক্ত গভীর বিসদৃশ ব্যবহারে হতবুদ্ধি হয়ে সেই দরিদ্র নিঃসহায় লোকটি বহু বছরবে অজানা অগতে চলে গেছে—

বসন্ত বাড়বার পরে মায়েই এই মনোভাবের জন্য অমূল্য বোধ করতো সে, প্রথম জীবনের ঘৃণা বিরক্তি রাগ শেষে পরিণত হয়েছিল একটু সজল অমূল্যতমের করণায়।

কিন্তু, সমস্ত অমূল্যতম, সমস্ত করুণা ছাপিয়ে মনে কি যেন এক বিবেচ, ঘৃণা, বিরক্তির প্রদোষ। মায়ে মাকে ওর মাকে বিজ্ঞপ করতে ইচ্ছে হতো—বদি বিজ্ঞপের আঘাতও তার সখিৎ ফেরে।

কিন্তু পারতো না। রমার শাস্ত স্মরণ মুখের দিকে তাকিয়ে তার গলার স্বর যেন নিজে থেকেই কন্ড হয়ে যেত—কালো মুখে বড় বড় চুটি নিবিড় কালো চোখ—মাথার ওপর অগোছালোভাবে উটে রাখা একগাঢ় কালো চুল—মায়েই প্রান্তে লুটিয়ে শাড়ির কালো পাড়—কালো সীমারেখা ঘেরা এই কালো মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে যেত সে—

অবাক হতো—ভয় জাগতো মনে—নামহীন এক অজ্ঞত ভাব—বুঝিয়ে বলতে সে পারেনি না—মনে হতো ও যেন এক কন্ড গুগার বাইরে পিড়িয়ে আছে—ভেতরে ঢোকা দূরের কথা, বাইরে পিড়িয়ে একটি কথা বলবার সাহসও তার নেই—

তখনই মনে হয়েছিল জীবনে আনন্দ কিসের আছে বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চল না, বুদ্ধি দিয়ে যার বিচার চলে না—প্রজ্ঞাপন্ন সুরভির উপরে—বল উপরেও একটা কিসের আছে।

রমাকে কোনদিন ভালোবাসে নি সরোজ। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে মনে বলে, মা, তোমাকে আমি চিনতে পারি নি। আমাকে ক্ষমা কর। চারিদিকে খুঁকান থাকে মায়েই যেটি ছবি।

কিন্তু কোথাও নেই। ছোট রমা, অবিবাহিতা রমা, বিবাহিতা রমা, স্বামী পরিত্যক্তা রমা—কখনো কোন মায়ে ছাপ নেই ঘরে। রমার মনের ছাপ যেমন কোন মনে ফোটে নি, যেমন তার মেহের ছাপও ফোটে নি ঘরে কোথাও।

শুধু পড়ে আছে চিরদিন—মুশ মানবীর মনের একটুকরো ছাপ আর ছবিটা—মুশ মানবীর স্বাধীন ছবি।

শাস্ত্র নিকরগে প্রশান্তিতে তাকিয়ে কন্ড ছবিটা। মিটি মিটি হাসছে—যেন বমার হুগে, রমার মুখ তার কাঁড়ে কিছুই নয়।

রাগে শরীর জলে ওঠে সরোজের। যে থেকে খাল নেয়—টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে ছবিটা—তারপর সেই টুকরোগুলিকে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেবে—সেই পোড়া ছাই জল দিয়ে ঘুমে পরিষ্কৃত করবে।

ছিঁড়তে গিয়ে হঠাৎ থামে যায়। সে মনে হয় রমা যেন সামনে এসে পিড়িয়েছে—‘হেমনি বোজ’ চোখের কালো পাতা, হেমনি মাথার ওপরে তোলা ঘন কালো পট্টনা চুল—

সরোজ ছ’ হাতের ছবিটাকে ছ’ টুকরো করতে উজ্জ্বল হঠাৎমাত্রই সে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে বলে—না—ওর চুল খালে ছড়িয়ে পড়ে—খুলে যায় চোখের পাতা—নিবিড় কালো তারা ছুটি চকল হয়ে ওঠে—

চিরমৌন, চিরশুদ্ধ নারী কানুল বিবশ তন্তস্বরে বলে—না। আমিই যে এই—

‘আমি-ই যে এই’—নিজের মনেই একবার বলে সরোজ—সত্যই তো এই ছবিতেই তো মিশে আছে তার মা। কত প্রসন্ন প্রভাতে, কত মনোরম বিপ্রহরে, কত গোখুরিগন্ধিত অপরাহ্নে, কত নিবিড় নীশীথে তার মা এই ছবিপানির নিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে।

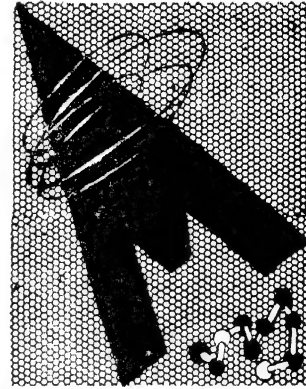
সরজা খুলে বারান্দায় বের হয় সরোজ। পূর্বদিকে আলোর আভাস। কি বলেছেন কবি? হৃদয়ের আগমনে উষা পালিয়ে যাচ্ছে। না, উষা স্থির হয়ে পিড়িয়ে আছে। কিন্তু স্বপ্ন যে সমস্ত প্রকার কর্তব্যের বিধি-নিয়েধে বাধা—উষার কাছে এগিয়ে যাবার সময় তার নেই।

সেই ভোরের আলো-ঘেরা বারান্দায় কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসে সরোজ।

সমাপ্ত

শুনেতে মোলোয়েম এবং রহস্যময় অনেক কিছুই ইগানীঃ ক্রমশ  
বিশ্বরক্ষক এবং 'সলিড' বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে।  
চাঁদের বুড়ির চরকা খেমে গেছে অনেককাল, শাস্ত, সৌম্য চাঁদের বুকে  
কবে কখনো হয় তো কড় উঠে থাকবে, বুড়ি নিজেও সেট বাড়ির  
শিকার হয়ে আজ বিশ্বস্তির প্রাসাদের নিজের নির্দিষ্ট বন্ধে স্থপানিডায়  
মগ্ন। এ নিদ্রা আর টুটবে না, কোনোদিনই না। অনেকটা এই  
রকমই, আমাদের এককালের নিকট প্রতিবেশী, নিকটতম সম্পর্ক  
ছিল বার সঙ্গে—সেও আজ আশ্রয় পাচ্ছে—তবে চাঁদের বুড়ির  
মতো অপরিমাপ্য দূরে নয়, মাত্র কুটনানেক দূরে। কিন্তু আমাদের  
ঐ প্রতিবেশীর আশ্রয়ের এই কুটনানেক দূর আমাদের জীবনের  
অনেক 'চাষ-ই' নষ্ট করে দিয়েছে।

দিয়েছে বৈ কি! ছন্দে যে আজ আর ছন্দ নেই। আমাদের  
কাবোই নেই। কথাটা সরলভাবে ভাব দেহলে মনে হয়—কবি-  
সাহিত্যিকের ভাষায় আমরা সকলেরই ছন্দহীন হয়ে গেছি—একবারই  
ছন্দহীন। যেন যুগের সঙ্গে টেকা দিতে গিয়েই এ যুগের 'ছন্দ'  
নিজেকে একটি বস্ত্রে পরিণত করেছে। এর আঁজকের নাম হৃৎপিণ্ড,  
কেউ কেউ খোলাগুলি ছন্দবস্ত্রও বলে থাকেন। এঁরা বলবেন, আর  
কাবোর পরশ লাগাবার প্রয়োজন কি? যন্ত্রক যন্ত্র বললে, সত্য  
কথা তো বলা হবেই, আর ভারত যে নতুন 'হাসিক-তা'বোধ সৃষ্টি  
হবে, আমাদের মনে তার ফলে ভবিষ্যতে কঠোরতব সত্যকেও  
আমরা সহজভাবে নিতে পাবো।



## দ্বিগুন বার্তা

বলতে হয়: একজন স্বাভাবিক পুরুষের ছন্দবস্ত্র চাপিশ ঘণ্টায় এক  
লক্ষ চার হাজারবার থেকে এক লক্ষ দশ হাজারবার নড়েচড়ে ওঠে।  
আর স্বাধ্ববর্তী নাবীরা ক্ষেত্রে (বোধ করি নাবীরাবোর চকলতার সঙ্গে  
সঙ্গতি রেখে) এ নড়াচড়ার সংখ্যাটা ঠাঁড়ায় সর্বক্ষেত্রে ঘণ্টায়

# ছন্দহীন হৃৎপিণ্ড

তীরন্দাজ

চাঁদের যেমন বুড়ি নেই, ছন্দবস্ত্রও তেমনি আর 'ছন্দ' নেই।  
চাঁদের বুড়ির নতুন ঠিকানা বিশ্বস্তির রাজা আর 'ছন্দবস্ত্র' প্রায়-  
মণ্ডলী। কিন্তু 'ছন্দহীন এই ছন্দবস্ত্রটির' ব্যাপার-তাপার কিন্তু একদা-  
বিশ্বরক্ষক। চাঁদের বুড়ির কার্যকলাপের চাইতেও বিশ্বরক্ষক।  
অতো বড়ো হিমালয়টা পড়ে আছে তো পড়েই আছে। নিজের  
অস্তিত্ব সপ্রমাণ করবার জন্তে তার যে আর কিছু করা প্রয়োজন  
অন্তত তার ভাবসার দেখে তা মনে হয় না। পড়ে আছে তো পড়েই  
আছে—বাক্য বলে একবারে নষ্ট নড়নচড়ন। আর আমাদের এই  
'ছন্দবস্ত্রটি' পাছে আমরা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসি, বোধ করি  
সেই জন্তেই দিনে লক্ষাধিকবার নড়েচড়ে ওঠে। লক্ষাধিকবার বলতে  
হয় তো সবাই আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝি না সেই জন্তেই

এক লক্ষ দশ হাজারবারের বেশি। এতো মেহনত করে কেউ নিজের  
অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে থাকে কি?

এই যে হৃৎপিণ্ড যা ঘণ্টায় লক্ষাধিকবার স্পন্দিত হচ্ছে, এর  
স্বচরিত্রকে নির্দিষ্ট ক্যান্ট কি? আমাদের? যে বাঁচিয়ে রাখে তা তো  
অবশ্যই সত্য, কিন্তু এই আশ্চর্যজনক ব্যাপারটার সঙ্গে এতো বেশি  
ঘনিষ্ঠ আমরা যে, বর্তমানে এই বৈধে থাকবার ব্যাপারে আশ্চর্য আমরা  
আর বড়ো একটা বোধ করি না। একজন প্রান্তিকবস্ত্রের শরীরে  
বিভিন্ন শির-উপশিরা দিয়ে সারাদিনে মানবদেহের রক্তপ্রবাহকে প্রায়  
১৬৮০,০০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। কিন্তু এর ফলেও তার শরীরে  
কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা যায় না, দেখা দিলে চলতে পারে না।  
কাবণ, পরদিনও ঐ পরিমাণ দ্রুত বেঁচেই-নিয়েই জীবিত হয়।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ছত্রপিত্তের স্পন্দন কমতে কমতে মিনিটে যতটি স্পন্দনে নেমে আসে—আবার বাড়তে বাড়তে দুশোটিতে পৌঁছয়।

গুণী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একটি অপরাধীর বেলায় দেখা গেছে দশমভক্তের পূর্বে তার হৃৎস্পন্দন ছিলো মিনিটে ৭২ কিন্তু ষষ্ঠাভুক্তিতে নিয়ে যাবার পরে কয়েক মিনিট পর্যন্ত দেখা গেছে তার হৃৎস্পন্দন মিনিটে ১৮০ পর্যন্ত উঠেছে।

প্রতি মিনিটে ছত্রপিত্তের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাঁ প্রকোষ্ঠে প্রায় তিন গ্যালন রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সাতদিনে ছত্রপিত্ত থেকে মোট প্রায় ৪৩২০ গ্যালন রক্ত পাম্প করে সারাদেহে প্রবাহিত করা হয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, একজন সুস্থ ব্যক্তির ছত্রপিত্ত সারাদিন কাজ করবার জন্যে (অর্থাৎ রক্তপ্রবাহকে চালু রাখবার জন্যে) যে শক্তি (এনার্জি) ব্যয় করে থাকে তা একত্র করলে এক টন ওজনের একটি ইস্পাতখণ্ডকে অন্যত্রাসে জমি থেকে ৮২ ফুট উঁচুতে তোলা সম্ভব হতে পারে।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, মানবদেহে ছত্রপিত্তই একমাত্র যন্ত্র যার কখনো কোনোরকম বিশ্রাম জোটে না। ধারণাটা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। একটি বেলগাড়ি যেমন স্টেশনে এসে থেমে যায় ছত্রপিত্ত সে রকম থামা অবস্থা মাত্র একবারই থাকে। বিস্তৃত তবু ছত্রপিত্ত তার কাজের কঁাকে বিশ্রাম প্রচুরই পায় বলতে হবে। কারণ, একটু থেমে থেমে এক মিনিটে ছত্রপিত্তের যে ৭২টি স্পন্দন হচ্ছে এটা যদি না থেমে থেমে ঘটতো! যায় তা' হলে দেখা যাবে যে একটি ছত্রপিত্তের ৭২টি স্পন্দনের জন্যে বাস্তবিকপক্ষে মাত্র আট কি নয় সেকেন্ড সময় লাগে। অর্থাৎ মোট সময়ের আট ভাগের একভাগ সময় মাত্র ছত্রপিত্তকে সচল রাখে, বাকিটা সময় চলে বিশ্রাম।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের হৃৎস্পন্দন গড়পড়তা মিনিটে আটবার বেশি হয়—এটা এমন কি মনুষ্যত্বের জীবের পক্ষেও সত্য। একটি হাঁড়ের হৃৎস্পন্দন যেখানে মিনিটে ছত্রপিত্ত বার হয়ে থাকে সেখানে দেখা যায় যে কোনো গাড়ীর হৃৎস্পন্দন হয় মিনিটে ছাপান্ন বার।

## দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদান :

### কনিয়া সংরক্ষণের নতুন উপায়

আইওরার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে কনিয়া বা অন্ধি-গোলকের স্বচ্ছ-আবরণ সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যাবে।

কোন দুর্ঘটনার ফলে অথবা চোখের রোগের দরুন বীদেব্র এই স্বচ্ছ-আবরণ নষ্ট হয়ে গেছে, বীরা দৃষ্টিহারী হয়েছেন—কোন মৃত-ব্যক্তির চোখের এই জিনিষটি সরিয়ে এনে এই সব রোগীর সাথে এটি জুড়ে দিলেই তাঁরা আবার দৃষ্টি ফিরে পেরে থাকেন। যে-সব হাসপাতালে এটি সাগ্রহ করে থাকে, বহু ব্যক্তি তাঁদেরই চোখের এই জিনিষটি মৃত্যুর পূর্বেই সেখানে দান করে যান।

কনিয়া সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে দাতার মৃত্যুর ৬২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এটিকে কাজে লাগাতে হতো, নইলে এটি নষ্ট হয়ে যেতো।

আইওরার চিকিৎসকেরা রিসারিদের মধ্যে এটিকে তিন পর্যন্ত রেখেছেন এবং ছত্রিশ ঘণ্টার পরেও অঙ্গ ব্যক্তির চোখে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন। তাঁদের অনিদিষ্টকাল পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কনিয়াটিকে অবিকৃত অবস্থা যাবে। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার না করলে এটির এখ নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই।

এইভাবে কনিয়া সংরক্ষণের সুবিধা অনেক। দুর্ঘটনার বীর হারান তাঁদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে এই কনিয়া-ভাণ্ডার সহায়ক হয়ে থাকে।

আইওরার আইথ্যাক বা কনিয়া-ভাণ্ডার গঠিত হয় ১৯৫৫ স এই ভাণ্ডার আমেরিকার অঙ্গার স্থানের আরও পর্যটনশীল আইথ্যাক সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জাতীয় সমিতি গড়ে তুলেছে। এ আরও উন্নতিসাধন, কাজকর্মের সম্প্রসারণ এবং নিদিষ্টমান রাখা ভাণ্ডারের বর্ধনশক্তি নিরূপণ প্রভৃতি কাজকর্মের উদ্দেশ্যেই সমিতি গঠন করা হয়েছে।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত কি না, তা নিরূপণ করার একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমেরিকার নে: বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বলেছেন, রক্তে তামার মাত্রা নিরূপণ করলে কে এই রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বহুপূর্বেই বলে দেওয়া পারে। অন্তত বীরা একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁ রক্ত এবং তাঁদেরই সময়সীমা সুস্থ ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা দেখে হৃদরোগে বীরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের রক্তের মধ্যে সুস্থ ব্যক্তি তুলনায় তামার পরিমাণ অনেক বেশি। রক্তবহানালীর মধ্যে পদার্থ জমলে এই সব নালী কঠিন হয়ে পড়ে। রক্তে তামার জমা এ ব্যাপারে সাহায্য করে, ফলে হৃদরোগে দেখা দেয়। আর এ মত—মৃত জল বা স্ফটিক গুটারের মধ্যে তামার পরিমাণ অনেক থাকে। হৃদরোগে মৃত্যুর হারের সঙ্গে এই মৃত জলপানের স আছে বলে তাঁরা বলেছেন। পথা বিচার এবং গুণপত্রাদির সাহ রক্তে এই তামার পরিমাণ হ্রাস করা এই রোগ থেকে অব্যাহা পাওয়ার অঙ্গতম পথ বলে তাঁদের বিশ্বাস।

### ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ

### নির্মূল করার অভিনব পদ্ধতি

ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার জগৎ মানি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তরের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা কতক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। ক্ষেত-খামার-বাগানে পরী করে দেখা গেছে যে পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর।

দৃষ্টি পদ্ধতিতে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে ক্রমে তাদের বিধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রে পর মিলিত হতে না পারে, তার এক বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে পরীক্ষাগারে গবেষণা করে মেথিল ইউজিনল নামে এক বৌ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়েছে। ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর একজাতীয় প বাছির কাছে এই পদার্থটির এক ছুনিবার আকর্ষণ আছে। গুয়া

## বিজ্ঞান বাতী

নিকট প্রশান্ত সাগরীর রোটা ঘীষে এই মাছির প্রবল উৎপাত। এখানে মেথিল ইউজিনল পরীক্ষা কবে দেখা হয়। মেথিল ইউজিনল সমস্ত পুরুষ-মাছিকে আকৃষ্ট করে ফলের বাগান থেকে নিয়ে গেল বহুদূরে অজ্ঞ এক অঞ্চলে, যেখানে কীটনাশক ওষুধ ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে সমস্ত পুরুষ-মাছি এখানে এসে মৃত্যুবরণ করল। পুরুষ-মাছি ধ্বংস হওয়ায় ঐ জাতীয় মাছির উৎপাত ও বংশবৃদ্ধি বন্ধ হল। ক্রমে ঐ দীপটি থেকে এই মাছি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এই ধরনের আকর্ষক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে স্ত্রী কীটপতঙ্গের দেহ থেকে নিষ্কাশিত আকর্ষকেরও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। বসন্তঝড়িতে যে সব স্ত্রী-মাছি দেখা যায় তাদের দেহে এবং বাঁধকপি ও পীচফলের দেহে এই পদার্থ পাওয়া গেছে। এদের দেহ থেকে এই আকর্ষক পদার্থ নিষ্কাশন করে নিয়ে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরে তা কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়।

দ্বিতীয় ওষুধটি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সমিশ্রণে প্রস্তুত বা পুরুষ-কীটের প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট করে। এইভাবে পুরুষের ব্যাপক নিবীজন সম্ভব করতে পারলে কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হবে এবং ক্রমে ঐ জাতীয় কীটপতঙ্গ সম্পূর্ণ নির্মূল হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে এই নিবীজন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রান্তীয় মাছি নির্মূল করা হয়েছে। বর্তমানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। ১৯৬৩ সালের হিসাবে দেখা

গেছে এই প্রক্রিয়ার মাছি গবাদিপশুর উৎপাদকদের প্রায় কোনই ক্ষতি করতে পারে নি। অথচ পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি ডলার পর্যন্ত হয়েছে।

ফসলের পক্ষে বিপজ্জনক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার আর একটি নতুন অস্ত্র হল ভাইরাস। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন এক-জাতীয় ভাইরাস আছে যা বাঁধকপি ও ভুট্টার পোকাকে আক্রমণ করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, সামান্য পরিমাণ এই কীটপতঙ্গ ভাইরাস অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অঞ্চলে ঐ জাতীয় কীট ধ্বংস করতে পারে।

আরও গবেষণায় দেখা গেছে, কোন কোন গাছপালার মধ্যে এমন পদার্থ আছে—যা নিষ্কাশিত করে রাসায়নিক পদার্থে সামিশ্রণে কীটের ওষুধ পরিণত হতে পারে।

তলা গাছ থেকে নিষ্কাশিত এই ধরনের এক পদার্থ মহাক্ষতিকারক তুলারীজের কীট ধ্বংস করতে পারে। পুরুষ-কীটের দেহ থেকে নিষ্কাশিত অকুট্রিন আকর্ষকের সাহায্যে এই কীট নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে।

কোন কোন ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক শত্রু আছে। নিউজগি অঙ্গরাজ্যে প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ এমন এক জাতীয় কীট ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা প্রধানত জিপসি মথের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকে। কতকগুলি ক্ষতিকারক গাছ-গাছড়া ধ্বংস করার কাজেও কীটপতঙ্গ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দু'জাতীয় কীট ছেড়ে দিয়ে একশ্রেণীর আগাছা ধ্বংস করা হয়েছে; ঐ কীট প্রধানত ঐ শ্রেণীর আগাছা খেয়ে বেঁচে থাকে। —অমৃসন্ধানী

## ঘুম—আয়—আয়

প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্নিড্রা বা ঘুমের ভূমিকা বড় কম নয়। ঘুম কেন হয় বা কেন হয় না এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাত্মক হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেন নি, শুধু এটুকুই জানা গেছে যে, সুস্থ জীবনযাপন করতে হলে স্নিড্রার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। বর্তমান যুগে নিদ্রাহীনতা ব্যাধি স্বরণ দেখা দিয়েছে, অনেকেরই বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষ ভাবেই এ রোগে ভোগেন, চিকিৎসকরাও নিদ্রাহীনতার নানাবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থাপনায় লিপ্ত হতে তৎপর, কিন্তু প্রশ্ন এই যে এইসব কৃত্রিম উপায়ে কি সত্যিকার স্নিড্রা হওয়া সম্ভব? ঘুমের বাড়ি সেবনে বা অজ্ঞ কোন উপায় অবলম্বনে যে নিদ্রাকে আমরা সাময়িকভাবে আবাহন করে আনতে সক্ষম হই সে নিদ্রাকে কি সত্যিই স্নিড্রা বলে অভিহিত করা চলে? এর উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক। কারণ জাগরণের মতই নিদ্রাও মানব শরীরের এক স্বভাবজ ধর্ম, কৃত্রিম উপায়ে তাকে আয়ত্ত করতে ছারি কোন সুফলের আশা করা কখনই সম্ভব নয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রাহীনতা শরীরের অপরাপার অঙ্গের চেয়েও মস্তিষ্কের পক্ষেই বেশি ক্ষতিকর, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এর জট্র মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত ঘটতেও দেখা গিয়েছে, বসন্ত মস্তিষ্ক বিশ্রাম পায় এই নিদ্রারই মাধ্যমে আর সেরেজট মাথার কাজ বৃদ্ধির করতে হয় বত বেশি স্নিড্রার প্রয়োজনও তাঁদের সম্বন্ধে। নিদ্রার মাধ্যমে মস্তিষ্কের উত্তেজিত শৈলীসমূহ শিথিল হয়ে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করে, বার ফলে আমাদের সমগ্র প্রানুসমুদীতে একটা শিথলতা সঞ্চারিত হয়ে যায়, ক্রান্ত মাছেরের ক্রান্তি দূর করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম তাই ঘুম। সচরাচর স্বাভাবিক নিরাময়ই ঘুম নেমে আসে আমাদের চোখে,

সাধারণ মানুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, তার ফলেই স্বাভাবিকভাবেই ঘুম নেমে আসে যথা সময়ে তার ছুটোখ ছুড়; এজন্যই দেখা যায় যে সচরাচর খেটে-খাওয়া মানুষরা নিদ্রাহীনতার শিকার হয় না, কায়িক শ্রম বৃদ্ধির একেবারেই করতে হয় না, ভোগবিলাসের আধিক্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বৃদ্ধির বানচাল হওয়ার উপক্রম, তথাকথিত ভাগ্যবানদেরই প্রধানত এর কবলে পড়েন; আর পড়েন আর একদল মানুষ অত্যধিক মস্তিষ্ক চালানা করাই বৃদ্ধির জীবিকা। নিদ্রাহীনতার অভিশাপ বড় ভয়ানক এমন কি এর থেকে মস্তিষ্কবিবৃতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই এ রোগটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন, আবহমানকাল থেকে ব্যবস্তুত ঘুমের বাড়ির ব্যবস্থা দেওয়া তো আছেই কিন্তু তার সঙ্গে আরও সহ উপায় অবলম্বন করে নিদ্রাহীনের চোখে ঘুম ডেকে আনার প্রচেষ্টার তৎপর তীরা। প্রিন্সটন এন জে তে এক ধরনের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বিত হচ্ছে নিদ্রাহীনতা দূর করার জন্য, যা সত্যিই অভিনব; সেখানে নানারকম ঔষধ মিশ্রিত সুগন্ধি জলে ভরা বাথটবে শুইয়ে নানা ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়, এই প্রণালীর আবিষ্কারকদের প্রধান জীক্যামেরনের মতে অতি ভয়ানক অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও এই প্রণালীতে দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। ঐ বাই হোক স্নিড্রার জট্র স্বাভাবিক মানুষের প্রয়োজন মোটামুটি সংবত জীবনযাপন, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম অভ্যাস ও সাদাসিধে খাদ্য গ্রহণ, এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকলে, নিদ্রাহীনতার অভিশাপ থেকে তাঁরা দূরে থাকতে পারবেন বলেই মনে হয়।

# উদ্ভিদ-অভিধান

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

## অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ

গুরুপত্রা—তিস্তিড়ী বৃক্ষ ॥ শঙ্করত্না ॥

গুরুবর্চোয়—পাতিলেবু।

গুরুশিংশপা—শিংশপ বিং।

গুদলশিম (দেশজ)—*Jolichus lablab*,

গুল—*euphorbia terucalli*.

গুলঝানার—এক প্রকার দাড়িমগাছ। পারস্যজাত।

গুলখীরা - [ ইং holly-hock ] *althoea rose*.

গুলগী—*nipa fruticans*.

গুলঞ্চ—[ ফা. গুল-আ-চীন, ইং Spanish jessamine ]

তগরাদিবর্গের পুষ্পত্রক বিং, *plemeria acuminata*.

গাছ আঁকা বাঁকা। ফুল সাদা, ভিত্তর দিকক হলদে রং,

বাহিরে লাল, সুগন্ধি। প্রকারভেদ—(১) সাদা

গুলঞ্চ—ফুল সাদা, *p. alba*. (২) লাল গুলঞ্চ—ফুল

লাল, *p. rubra*, শুভ্রচট্টাঙ্গ।

গুলঞ্চ কন্দ—কন্দ বিং, কুলী

গুবাক, গুয়া—পুণ্ড্র।

গুয়া বাবলা—*Acacia farnesiana* গুবাবুল ডং।

গুলদাউদি (পারস্য)—*Pyrethrum indicum*, *crysanthemum i*.

গুলনরগিশ (পারস্য)—*narcissus tazetta*.

গুলফিরিদি (পারস্য)—*Venca rosca*.

গুলবীশ—একপ্রকার বাঁশ।

গুলমখমল—*gonophrea globosa*

গুলমোদি—এক প্রকার ফুলগাছ, *impat'ens balsamina*,

গুলর (দেশজ)—এক প্রকার গাছ, *figus gooloore*,

গুলল (দেশজ)—বৃক্ষ বিং।

গুলী—সুহী বৃক্ষ, মিজ।

গুলাল তুলসী—ফুলাল তুলসী। তুলসী ডং।

গুলাস্থায়া (দেশজ)—*eranthemum pulchellum*.

গুলাসকর—(ইং Three Styled flax) একপ্রকার বাহারি  
লতা *linum trigynum*.

গুলদাউদি (দেশজ)—একপ্রকার ক্ষুদ্র বেগুন, *Solanum*

গুমা (দেশজ)—একপ্রকার বৃক্ষ।

গুম্বকেতু—অম্ববেতল, ঠেংখড় ॥ রাজনি ॥

গুম্বমূল—আদা।

গুম্ববল্লী—সোমনলতা।

গুম্বানী—লম্বলতা (?)। পর্যায়—বৌকং, উল্লুপ, বিকধা,  
অবকং।

গুম্বী—১ আমলকী, ২ এলাচী, ৩ গৃধ্রমৌবৃক্ষ, গুড়কাওনী  
॥ শব্দচ ॥

গুবাক—সুপারি, স্থান বিশেষে গুয়া, *areca catechu*.

পর্যায়—কোটা, পুণ্ড্র, ক্রম্বক, খপুস, গুবাক, পুণ্ড্রবৃক্ষ, দীর্ঘ

পাদিপ, বহুত্রক, দৃঢ়বর্ষ, চিকুণ, পুণ্ড্রী, স্বরঞ্জন, গোপদল,

বাজতাল, চটাকল। বাঙলায় চারি প্রকার সুপারি

আছে—দেশাল খড়ে, ২ ডেটেল, ৩ চিকি, ৪ রামপুণ্ড্র,

৫ হাজে সুপারী। সুপারী ডং।

গুহা—১ সিংহপুচ্ছলতা, ২ পূর্ণিমালাতা, চাকুলে।

গুহপুষ্প—অম্বল বৃক্ষ।

গুহবীজ—ভূত্বণ, গন্ধ খড়।

গুটপত্র—১ আঁকাট বৃক্ষ, ২ করীর বৃক্ষ।

গুট-পুষ্পক—বকুল বৃক্ষ।

গুট ফল—বদর বৃক্ষ।

গুট বাঁহক, গুট বয়ী—অফোঠ বৃক্ষ।

গুমা—[ গ' ফলেপুষ্পা ] ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিং। [ আরব—লক্ষ্য,  
পারস্য—গোবলু, অন্ধ-মূলদোবেং ]

গুজন, গুজস—১ মূল বিশেষ, চলিত কথায় শালগম বা

গাজর (?) *brassica sapa* পর্যায়—শিখিমূল, যবনেট,

বকুল, গ্রিষ্মমূল, শিখাকন্দ, কন্দ, ভিণ্ডুর-মোদক;

২ রমুন, ৩ লাল রমুন।

গুজনখী—১ কাকাদনী বৃক্ষ, কালিয়া কড়া, ২ ফুল গাছ  
॥ স্মৃতি ॥

গুপপত্রা—ধূমপত্রা বৃক্ষ।

গুগ্রান, গুগ্রানী—ধূমপত্রা বৃক্ষ।

গুপ্তি—বদর বৃক্ষ।

## উদ্ভিদ-অভিধান

গৃহকুলক—চিচিঙে শাক ।

গৃহজন্ম—১ মেচ, শৃঙ্গ বৃক্ষ, ২ শাক বৃক্ষ, শৈশব গাছ ।

গৃহাশয়া—পানের গাছ ।

গেঁটবিন (দেশজ)—বৃক্ষবিঃ ।

গেঁদা, গাঁদা—[ সং বন্দুক, হিং গেঁদা, গেণ্ডক, ওং গেণ্ডু পারসী—গোল্ডফার্ব, হিং French mary-gold, African mary-gold বা calendula ] সৌন্দর্য্যভিনয়ের পুষ্পতরু, tagetes patula, t. erecta. প্রকার ভেদ—(১) দেশী গাঁদা—গাছ লম্বা, ফুল তামাটে বর্ণের, (২) চীনে গাঁদা—latula, গাছ ছোট, ফুল হলদে রংয়ের লাল আমোজ, (৩) বড় গাঁদা—t. erecta, (৪) বিলাতী গাঁদা—calendula গাছ ছোট, ফুল বড় বড় হলদে রংয়ের ।

গেছি-শিম—এক প্রকার শিম, lablab macrocarpum.

গেছব—excoecaria agallocha

গৈর—লাঙ্গলী বৃক্ষ ।

গৈরিকাক—জলমধুক বৃক্ষ ।

গোআনিয়া—এক প্রকার ঘাস, andropogon punctapum.

গোআনিয়া লতা (দেশজ)—এক প্রকার লতা cissus vitiginea.

গোড়ালেব—লেবু ড্রঃ ।

গোকট, গোকটক—গোক্ষুর বৃক্ষ । গোক্ষুর ড্রঃ ।

গোকর্ণা—মুখালতা ।

গোক্ষুর—সং ত্রিকটক, হিং গোখুরা, ছোট গোখর, গোরখুল, ওং গোখর, তে. পালেক । ওং গোখরা, ফাং ভুরম্বোখার খর, আং বজ্রলখর, বকলতলখার খমুক গোখরি, গোখুর, গোখুর, গোখুরা, tribulus terrestris, t. lanuginosus. বর্ষায় শাকবিঃ, ঘাসের মাঝে জন্মে । প্রকার ভেদ—(১) ক্ষুদ্র গোক্ষুর—পাতা ছোলাপাতার মত, ফল পাঁচবর্ণ, ফলে ৬টি কাঁটা আছে, (২) বৃহৎ গোক্ষুর—পাতা খেতাব, ফল শাদা ও পীত, ফল পাঁচকোণা, ৪ কোণে ৬টি কাঁটা । পর্যায়—খদংষ্ট্রা, বন শৃঙ্গাট, বণ্টফল, ক্ষুরক, চণবজ্রম, ক্ষুর, গোক্ষুরক, স্বাজুকট, গোকট, ইক্ষুগাংক্ষা ।

গিখরি—গোক্ষুর ড্রঃ ।

গিচাগুলী (দেশজ)—বৃক্ষবিঃ ।

গিছাল—ভুদেহ, চাকুনিয়া ।

গিঞ্জা—গোলোমিকা বৃক্ষ ।

গিজারিক—কণ্টকার বৃক্ষ ।

গিজপর্ণা—দ্রুগ ফেনীবৃক্ষ ॥ রাজনিং ॥

গিজিয়া—লতাবিঃ ।

গিজিহা—গোজিয়ালতা, দারিয়া শাক, premna esculenta পর্যায়—বার্বিকা, দর্বিকা, দার্বিপত্রিকা, খরপত্রী, বাতোলা, আধামুখা, অক্ষুজিহা, অধঃপুশী, গোজিহা ।

গোজী—গোজিহালতা ।

গোটা—সুপারি ।

গোভূষ—শীর্গবৃন্ত তরমুজ ॥ যেদিনী ॥

গোত্রবৃক্ষ—ধমন বৃক্ষ ॥ তাবপ্রঃ ॥

গোথুবি (দেশজ)—একপ্রকার ঘাস [ ইং one headed cyper grass ] anosperum monocephalum.

ছোট গোথুবি—cyperus dubis.

গোতুধদা, গোতুধা—চণিকা তৃণ ॥ রাজনিং ॥

গোথাঞ্জি—গোয়ালে লতা ।

গোথাপদিকা—গোথাপদী লতা ।

গোথাপদী—গোয়ালিয়া লতা, গোয়ালে লতা ড্রঃ ।

গোথাবতী, গোথাবল্লী—গোথাপদী ।

গোথীশ—দোণপুষ্পী ।

গোথুয়া—গম ড্রঃ ।

গোপককটিকা—রাখাল শশা ।

গোপঘোন্টা—১ শেয়াকুল, ২ হস্তিকোলি, ৩ বৈচ ।

গোপদল—গুণাক বৃক্ষ ।

গোপন—তেজপাতা ।

গোপভদ্রা—কাশ্মরী বৃক্ষ ।

গোপভদ্রিকা—গম্ভারী বৃক্ষ ।

গোপবল্লী—১ মূর্বা, ২ শামালতা, ৩ অনন্তমূল ।

গোপা, গোপিনী—শামালতা ।

গোপাঙ্গনা—অনন্তমূল ।

গোপানবক্টি—রাখাল শশা ।

গোপানী—রাখাল শশা ।

গোপুটা—বড় এলাচী ।

গোপুরুক—কুম্ভক বৃক্ষ ।

গোমক—[ সং গোতুধা, গবাংকী, চিত্রা ] তরমুজের মত ফল বৃক্ষ, খরমুজ ড্রঃ ।

গোময়হ্রত, গোময়জ্জটিকা—কৌড়ক ছাতা । পর্যায়—দিলীর, শিলীরক, উচ্ছিন্নীধ ।

গোময়প্রায়—গন্ধ খড় ।

গোময়োদ্ভব—আরগব, গোঁদাল বৃক্ষ ।

গোমরী—রাম বেগুন ।

গোমুতী—arenga saccharifera.

গোমুত্রিকা—হৃণবিঃশেষ । পর্যায়—রক্ততৃণ, ক্ষেত্রজা, কৃষ্ণ ভূমিজা ।

গোয়ালে লতা—[ সং গোথাপদী, গোথাবতী, হংসপাদী, গুহালিক, ওং তিন আবুলিয়া ] লতা বিং, Vitis pedata, cissus P. এই লতার মূল কিংবা পত্রের সাদৃশ্য পক্ষে মতভেদ দেখা যায় । কেহ বলেন পাতা ত্রিভুজ বিশিষ্ট (হাঁসের মত) । কেহ বলেন পাতার মূল হাঁসের পায়ের মত লাল । পাতা হিসাবে তিন প্রকার—(১) বড় গোয়ালে । পাতা

রোমশ ও পাতা ৭টি পর্ণ, (২) ছোট গোয়ালে—এক বৃন্তে ৩টি দল ও প্রত্যেক দলের পাশে ক্ষুদ্র ছেদ দেখা যায় ও (৩) হয় আঙ্গুলে গোয়ালে। পর্যায়—সুবহা, গোদাঙ্জি, ত্রিঙ্গলা, ত্রিপদী, মধুসবা, হংসপাদিকা, হংসাজি, রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডিকা, বিশ্বগ্রাসি, কীটমারী, কণ্ঠাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাদী, সূতপাদিকা, সফারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা, ধাত্রীপদী, গোদাপদিকা, বলীদিদলা, হংসবতী।

গোরক্ষকর্কটী—চিহ্নিটা।

গোরক্ষ চাউলা—[সং গোরক্ষ তথুলা, নাগবলা] জবাদি বর্গের ক্ষুপ বি\*, sida spinosa. পাতায় ৩টি শিরা বোটার কাছে ৩টি আর থাকে। পাতার নীচের পিঠ পাঁশুটে। ফুল ছোট শাদা। ফল পঞ্চকোষ। বেড়োলা গাছের মত কিন্তু তাহাতে ১০টি কোষ আছে।

গোরক্ষ চাকুলা—Uraria lagopodioides.

গোরক্ষ জম্বু—১ গোখুম, ২ গোরক্ষ চাকুলে, ৩ ঘোঁচাবৃক্ষ।

গোরক্ষতথুলা—পর্যায়—গাঙ্গেরকী, নাগবলা বালা, ব্রহ্ম গবেধুকা, খরবল্লিকা, বিশ্বদেবা।

গোরক্ষদুন্দু—অমৃতসঞ্জীবনী বৃক্ষ।

গোরক্ষী—[সং স্নদণ্ডিকা, সর্পদন্তী] মালব দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুপ বি\*, solanum rubrum erythropyrenum.

গোরখা—বৃক্ষ বি\*।

গোরবা (দেশজ)—গরুখড়।

গোলকাঁকড়া—গোল কাঁকরোল momordica cochiro-chinensis.

গোলখয়রা—[ইং holly hock] গুলখারী—althoa rosea.

গোলমলঙ্গা—cyperus rox.

গোলপাতা—তালাদিবর্গের ক্ষুপ বি\* nipa fruticans. পাতায় স্নদর ছাতা হয় ও ছাউনি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্নদরবনে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গোলমরিচ—[সং মরিচ, উষণ, ধর্মপতন, হি\* কালীমরিচ, ম\* চোকামরিচ, আ\* জালুক, ক\* মেনসু, তে\* মরিয়া, তা\* মিল শুভলী, ফা\* কিল্কিল-ই-সিয়া, অ\* কিল্কিলি অস্বদ, ইং black pepper] তুলাদিবর্গের তুলুস্তিত লতাবি\* piper nigrum আসাম ও কোচবিহারে মরিচের লতা জন্মায় বটে, কিন্তু বাংলার মত ফলপ্রসূ নয়। ফলের নাম গোলমরিচ।

গোল মেথি—cyperus seminudes.

গোল মোহিনী (দেশজ)—একপ্রকার গাছ duringia celosioides.

গোলাপ, গোলাব—[ইং rose] পূর্বে বাংলাদেশে ছিল না। আজকাল প্রায় শতাধিক গোলাপ দৃষ্ট হয়। গোলাপ অত্যন্ত সুখী পুষ্পবৃক্ষ। সমস্তে পালন করিতে হয়। (১) বসরাই গোলাপ [ইং Bussorah rose] rosa centifolia. r. damascena. বসরাই গোলাপফুল বৎসরে একবার বসন্তকালে ফোটে। গাছ কণ্টকপূর্ণ। শাদা ও লাল দুই রকমের ফুল হয়। (২) দেশী গোলাপ—সৌরতি rosa moschata. ফুল শাদা রংয়ের—অল্প মৃগনাতির গন্ধ আছে।

গোলাব জাম—[ইং rose apple] জাম দ্র\*, cngenia jambosa.

গোলাস—শিলীয় (৭)।

গোলীচ—বটীপাকলি।

গোলোমিকা—গোলোমী, খেত দূর্বা। পশ্চিমে গোখুম।

পর্যায়—গোখুমী, গোজ, ক্রোষ্টকপুচ্ছিকা, গোসন্তবা, প্রস্তুরিণী।

গোবরা—anesomeles ovata.

গোবরা-নটি—amarantus lividus.

গোবরা ফিঙ্গাটা (দেশজ)—একজাতীয় বৃক্ষ, illiacea.

গোবরিয়া-চাঁপা—plumiera acuminata.

গোশীর্ষক—দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

গোরিল—খেতসর্গপ।

গোরী—১ খেত দূর্বা, ২ তুলসী, ৩ মল্লিকা, ৪ সুবর্ণ-কদলী, ৫ আকাল মাংসী।

গ্রাসি দূর্বা—বাঁটি দূর্বা।

গ্রাসিপর্ণ—(হি\* গস্তিবন) পার্শ্বিয়াল। কুর্শিমা জাতীয়, নেপালে হয়। পর্যায়—শুক, বহিপুষ্প, হোঁলেয়, কুকুরবহী, বহী, শুকবহী, কুশপুষ্প, গুলক, বিশাখা, গ্রাসিক স্বারামণ্ডক, শুকপুচ্ছ, শুকচ্ছদ, কাকপুষ্প।

গ্রাসিপর্ণা—জতুকালতা।

গ্রাসিফল—১ কপিথ, ২ মদনবৃক্ষ, ৩ শাকুরণ্ড বৃক্ষ।

গ্রাসিমংফল—লকুচবৃক্ষ, মান্দার।

গ্রাসিমূলা—মালা দূর্বা।

গ্রাসিফল—১ পিঙ্গনী মূল, ২ আদা, ৩ বইচ, ৪ করীর বৃক্ষ, ৫ তথুলীয় শপক।

গ্রাসিলা—১ ভদ্রমুত্তা, ২ মালা দূর্বা।

গ্রাহনায়ক—অর্ক বৃক্ষ।

গ্রাহনাশ, নাশক—শাক বৃক্ষ।

গ্রাহপতি—অর্ক বৃক্ষ।

গ্রাহক্ষয়—ভূতাক্ষ বৃক্ষ।

গ্রামীণা—১ নীলী বৃক্ষ। পর্যায়—নীলী, নীলিনী তুলী, কালদোনা, নীলিকা, রজনী, ত্রিঙ্গলী, তুচ্ছা, মধুপর্ণিকা, ক্রীতকা, কালকেলী, ২ পালঙ্কা শাক।

গ্রাম্যকন্দ—বন ওল।—কর্কটী—কুম্ভাণ্ড।—বল্লতা—পালঙ্কা-শাক।



## উদ্ভিদ-অভিধান

গ্রান-রোহক—অর্থগন্ধা বৃক্ষ ।

গ্রাহিন—কপিথ ।—৭—১ ক্ষুদ্র দ্রুলাভা, ২ ক্ষীরই ।

গ্রাহিফল—কপিথ বৃক্ষ ।

গ্রীষ্মজা—নবমালিকা ।—ধাতু—বোরোধান ।—পুষ্পী—করণ

পুষ্পবৃক্ষ ।—সুন্দর—গিমেশাক ।

ঘটালাব—গোললাউ ॥ রাজনিং ॥

ঘটিসেওড়া—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ ।

ঘটক—ক্ষুপবিশেষ ।

ঘটকর্ণ—ক্ষুপবিশেষ, ঘটকান ।

ঘটী—বৃক্ষবিশেষ, *bignonia snaveoleus*.—পাটিলি,—  
পারুল—অরণ্যবিশেষ [ হি° মোটা ] *bignonia snave-  
oleus*, *schrebra swieteniodes*. ফল ছলদে রংয়ের,  
থয়ের রংয়ের আমেজ আছে । ফল প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা,  
ঘটীর মত । পথায়—গোমীচ, বাটল, মোক্ষ, মুষ্কক,  
গোলিহ, ক্ষারদ্র, কালমুষ্কক, পাটিলি, ঘটাক, বাটি, ভীক্ষু,  
কাঠিপাটিলি, কালাস্থলী, কাচস্থলী ।—রবা, রবী—  
বনশন, স্থানবিশেষে বান্ধানিয়া, শগপুষ্পী ।—লিকা,—  
লী—কোষাতকী ।—বীজ—জয়পাল বৃক্ষ ।

ঘটিনীবীজ—জয়পাল বৃক্ষ ।

ঘন—মুথা, *cyperus rotundus*.—ক্ষুদ্র—শিশু ।—জধান—  
ঘনসোলা ॥ ত্রিকণ্ড ॥—অচ,—শিক্ষ ।—ক্ষয়—বিকটক  
বৃক্ষ ।—পত্র—১ পূর্ণবা, ২ শিক্ষ ।—পল্লব—সজনে ।  
—ফল—বিকটক বৃক্ষ ।—রস—মোরট বৃক্ষ ।—বিল্লিকা  
—অমৃতস্তবা লতা ।—বাস—কুম্বাণ্ড ।—সার বৃক্ষ  
বিশেষ ।—স্কল—কোশাঙ্গ বৃক্ষ ।—স্বন—তণ্ডুলীয় শাক ।

ঘন—মাষপর্ণী ।—ময়—খজুর বৃক্ষ ।—মল—বাস্তক শাক ।  
ঘৰ্ণণী—হরিদ্রা ॥ ত্রিকণ্ড ॥

ঘলঘসা—[ সঃ কলস, দ্রোণপুষ্পী, উঃ গাইত্র ] খলঘসিয়া,  
হলঘসা *lanceas linifolia*. তুলস্তাদিবর্গের আরণ্য ক্ষুপ  
বিশেষ । ফুলের আকার ডোণ্ডার মত, রং শাদা ।  
প্রকারভেদ—১ ছোট ঘলঘসা—*l. aspera*. ফুলের  
বহিরাবরণ মক্ষণ । বৎসরে দুইবার ফোটে । বর্ষাকালে  
ও শীতকালে । ২ বড় ঘলঘসা—*l. caphalops* ফুলের  
বহিরাবরণ রৌয়াযুক্ত ।

ঘটিক—ধুন্তর ।

ঘাস [ হিং grass ]—। চানৈ ঘাস—জাপান ও সিংহলের  
সমুদ্রজাত শৈবাল বিশেষ, *gelidium*, *gracilaria*,  
—কচু—*typhonium flagelli-frume*.

ঘিকুমারী—ঘতকুমারী দ্র° ।

ঘিতরই—একরকম ক্ষুদ্রবৃক্ষ ।

ঘিনটিনাটি—*amorantus tennifolius*.

ঘিনালিতা পাট ( দেশজ )—*corchorus capentaris*.

ঘিরপুরণী ( দেশজ )—একপ্রকার গাছ, *luffa pentanda*.

ঘূর্ণাপ্রিয়া—উদ্ভূত বৃক্ষ ।

ঘুলঞ্চ—ধানবিশেষ, গড়গড়ে ধান ।

ঘূর্ণাবাস—শেওড়া গাছ ।

ঘূর্ণাবাস—শম্মা ৩ ।

ঘৃতকরঞ্জ—ঘিয়াকরমচা । পর্যায়—প্রকীয় । ঘৃতপর্ণক,

স্নিগ্ধপত্র, তেজস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক, বিরোচন ।

ঘৃতকুমারিকা—ঘৃতকুমারী দ্র° ।

ঘৃতকুমারী—[ অজরা, গৃহকতা, কুমারী, স্ককটকা, হি°

ঘিউকুমারী, বনভস্করী, কুঠবেপাট, কো° ঘিস্তবক্ষন, ম°

কোরকড, কোরফাটী, শু° কুনার, ক° লোয়িমর, তে°

পিন্নগোবিন্দকটলবন্দ, ফা° দরখতেসিন, অ° মুসবর, ই°

Indian aloe ] রজনীগন্ধাদিবর্গের শাক বিশেষ, *aloe*

*indica*, *a. perfoliata*, *a. vern*, *a. chinensis*. পাতা

মোটা ছপাশে কাঁটা আছে ও মধ্যে পিচ্ছিল রসযুক্ত ।

ঘৃতকুমারীর রস হইতে 'মুসবর' হয় । মুসবর চারি

প্রকার—(১) সক্রোটিহিন, (২) আরবিক, (৩)

জাফিরাবাদ, (৪) মহীশূর ।—পর্ণক—পূর্ণক—ঘৃতকরঞ্জ

দ্র° । মণ্ডনিকা—হংসপদী বৃক্ষ ।—মণ্ডা—বায়সোলী

বৃক্ষ, নাকড়া হাতা ।

ঘূতাচীগর্তসমুবা—বড় এলাচী ।

ঘৃতি—চামর আলু ।

ঘৃটিলা—চাকুনিয়া ।

ঘেঁচু—[ সঃ ঘেঙ্কলিকা ] বচবাদিবর্গের শাক বিশেষ,  
*spathium chinense*, *typhonium trilobatum*.  
বনে কোপে ঘাসের মধ্যে জন্মায় ।

ঘেঁই—[ সঃ ঘটাকর্ণ ] ভাট দ্র° ।

ঘোটিকা—১ বৃক্ষ বিং, পথায়—ককটি, তুরদী, চতুঃদ্র, ২  
লোনী শাক ।

ঘোড়করণ—বড় গাছ, *ailanthus excelsa*.

ঘোড়ানিম—( দেশজ )—*melia azadirachia*—মুগ—  
*phaseolus sublobatus*.

ঘোন্টা—১ ঘোন্টাকুল । পর্যায়—বদর, গোপঘন্টা, শূগাল,  
কোলি, কপিকোলি, হস্তিকোলি, বদরীজ্জদ, কক্কঙ্ক,  
২ পূর্ণবৃক্ষ ।

ঘোরা—দেবতাড়ী লতা, ঘোবালতা ।

ঘোলমছনী—ঘোলমোনী গাছ ।

ঘোলমহনি—অপার্মাগাদিবর্গের ক্ষুপবিশেষ, *deeringia*  
*indica*, *deeringia celosioides*. গাছে জড়াইয় ওঠে ।  
ফুল ছোট, ফলও ছোট, শীংসযুক্ত, গোলাকার ।

ঘোলি, ঘোলিকা, ঘোলী—এক প্রকার পত্র শাক ।

ঘোষ—কোশাতকী দ্র° ।—কাক্টি—১ যেত কোষাতকী  
লতা, ২ মাকাল ।

ঘোষা—১ মোরী, ২ শত পুষ্পা, ৩ কোষাতকী, ৪ কাকড়া  
শূদ্রী (৫) । লতা (সং ঘোষক) কোষাতকী দ্র° । [ ক্রমশ ।

# বিশ্ব ও প্রাচীন

বসন্ত প্রবাসের দিন

কুম্ভা বসু

পূর্বকথা

দেখতে দেখতে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল, কিন্তু মনে হয় যেন এই সপ্তাহের কথা। বসন্ত-প্রবাসের দিনগুলির স্মৃতি মনের মধ্যে স্নান হয়ে যায় নি এতটুকুও। আটলান্টিকের ওপার বড়ো আশাওয়ার কাহিল হয়ে পড়তে আমাদের এরোপ্লেন গ্যাটার এয়ার-পোর্টে নামল। নয়ত লগুন থেকে যে ওভার-নাইট স্টাইটে আমরা নিউইয়র্ক যাচ্ছিলাম, পথে তার কোথাও থামবার কথা ছিল না। গ্যাটার এয়ারপোর্টে প্লেন যখন নামল আমাদের হাতঘড়িতে তখনো রাত গভীর, কিন্তু লোকাল টাইম অনুসারে ভোর হয়ে গেছে।

যাত্রীদের সামনে হেকফার্ট ট্রে বসিয়ে দিয়ে গেল এয়ার হোস্টেস। আমেরিকান লাইনের এরোপ্লেন, হেকফার্টের প্রাচুর্য প্রচুর। সামনে ট্রে নিয়ে বসে এরোপ্লেনের ছোট কাচের জানলা দিয়ে বাইরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে মনে হল আর যাত্রা করবে ষট। তারপরেই নিউইয়র্ক।

কিন্তু এ কি হল? মন থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না কেন? আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আর কয়েক ষটীর মধ্যে পৌঁছে বাব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এতে উৎসাহিত হওয়া দূরে থাক বেন শঙ্কিত হয়ে উঠেছি মনে মনে। কেবল মনে হচ্ছে দেশটা আমার সম্পূর্ণ অজানা। লোকগুলো কেমন, সে সবকিছু ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। আমি তো রাষ্ট্রনেতা বা সাংবাদিকদের মত কোর্ট-টু-কোর্ট ট্যার করতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি অন্তত কিছুদিনের মত ঘর বাঁধতে। অজানা দেশে, অপরিচিত পরিবেশে নিজেকে কলন করে উৎসাহিত হবার বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পেলাম না।

এই জন্ম গত কয়েকমাস ধরে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন, এত ছুটোছুটি কারণে এবং অকারণে। কতবার অধীর হয়ে উঠেছি থেকে থেকে। এক একবার যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসে অমনি উপস্থিত হয় কোন একটা বাধা। 'শ'-র পুরোন পাসপোর্ট বাতিল হয়ে গেছে দেখা গেল, রিনিউ করার কথা মনে ছিল না। নতুন পাসপোর্ট হয়ে হয়েও হতে চায় না। পোনো গেল প্রাক-স্বাধীনতা যুগে, অবাঞ্ছনীয় লোকের তালিকার নাম ছিল 'শ'-র, তারই জন্ম এত জর্জো স্বাধীনতাপ্রার্থিতার একযুগ পরেও। ওবু ভাগা ভাল ফরেন এক্সপ্রেজের হান্সাম ছিল না কোন।

সেদিন আমেরিকান এক্সপ্রেসের কলকাতা আপিসে যে ডায়ালোকের সঙ্গে দেখা হল তিনি আমাদের এ সৌভাগ্যের কথাটা না জানাতে

আজকাল তো নিয়ম হয়ে গেছে স্বামী যখন কাজে যাবেন বিদেশে স্ত্রীরা তখন ঘরেই থাকবেন। হঠাৎ রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। মনে হল বলি, আজকাল স্ত্রীরা বুকি ঘরে থাকেন কখনো? বরং স্বামীরাই থাকেন দরকার হলে, স্ত্রীরা বেরিয়ে পড়েন। সত্যিই তো, যুক্তরাষ্ট্রেই তো পরে দেখলাম কত ভারতীয় মহিলা—পাড়ছেন হয়ত হার্ডভাবে বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পাবলিক হেলথ। ছেলেমেয়ে রেখে এসেছেন দেশে। কার কাছে রেখে এলেন—জিজ্ঞেস করলে জবাব পাই, কেন উনি তো আছেন।

যাবার আয়োজন প্রস্তুত। বুক করা হয়ে গেছে এরোপ্লেন। শেষ মুহূর্তের জিনিসপত্র কেনাকাটা, প্যাক করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কদিন খুব। শরীর খারাপ লাগছিল মাঝে মাঝে কেমন যেন অস্বস্তিক। এটা-সেটা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলি নিজে নিজে টুকটাক। কাউকে কিছু আর জানিয়ে দরকার নেই, আবার বাধা পড়ে থাক আর কি। কিন্তু হায়। শেয়ারকা করা গেল না। আশ-পাশ কবা জিনিসপত্র ঠেলে রেখে শয্যা নিলাম একদিন। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে মনে হল শেষটা যুক্তরাষ্ট্রে ছেড়ে আরো কোন দুবদেশে পাড়ি নিতে হবে নাকি? দীর্ঘ একমাস কেটে গেল রোগশয্যায়।

নতুন করে আবার শুরু হল প্রস্তুতিপর্ব। বুক করা হল এরোপ্লেন। ফিরে প্যাক করলাম জিনিসপত্র। অবশেষে একদিন যাবার দিন এসে গেল। বিকেল তিনটে দশম থেকে ছাড়বার কথা। টেলিফোন এল এরোপ্লেনের আপিস থেকে। বড় হয়েছে শিউনিও না সিঙ্গাপুরে কোথায় যেন। প্লেন তাই লেট হবে অনেক, নির্দেশ এল প্রস্তুত হয়ে বসে থাকবার, বেই খবর আসবে বেরিয়ে পড়তে হবে।

বসে বসে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। বন্ধুজন বীরা সোজা দশমদ চলে গিয়েছিলেন ঠিকমত খোঁজ না নিয়ে তাঁরা কিছু ভুলেনা ভুলেনা। ফুল হাতে ঘুরে এলেন বাড়িতে রাগ করতে করতে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল, রাত্রি গভীর হয়ে চলল। এমন সময় নিশীথরাতে টেলিফোন বেজে উঠল বনবন করে। এল বহু প্রতীক্ষিত নির্দেশ। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভুল করে হর্ন বেজে উঠল কয়েকটা। কয়েকখানা মোটরগাড়ি উড্ডমান পার্কের গেট পার হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আমাদের যাত্রা শুরু হল।

দলে আমরা আড়াইজন। শ, আমি আর বু—পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যার হৃদয়েরও কম। চারদিকের ব্যাপার দেখে সে সবচাইতে বেশি উৎসাহিত। গান করতে করতে, ছড়া বলতে বলতে উঠে পড়ল এরোপ্লেন। ঘুরে একবার বলল সকলকে, তোমরা এবার ছাদে চলে যাও। ছাদের কাছাকাছি দিয়েই তো এরোপ্লেন উড়ে উড়ে যায়, সেখান থেকেই ভাল দেখা যাবে সব কিছু, এই তার বিশ্বাস।

রাত তখন তিনটে। এরোপ্লেনের ভেতরটা 'ছবি সুরু হয়ে যাওয়া' সিনেমা হাউসের মত অন্ধকার। ছোট, ছোট নাইট লাইট আলির যাত্রীরা ঘুম দিয়েছে। হঠাৎ গর্জন করে প্লেন টেক অফ, কয়েকই আমার বুকে মুখ লুকিয়ে বু বলে উঠল, মাঝমাঝি বাধ। তাড়াতাড়ি বলি, ঐ দেখো কেমন ভাল আলো। সামনে 'ফ্যাসেন সীট বোর্ড'—

## প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ

আলে, নীল আলোতে শান্ত করতে পারি না তাকে। কেঁদে বলে, আমি বাড়ি যাব।

সেদিন গ্যাস্তার এরারপোর্টে বসে প্রেনের কাচের জানলার বাইরে ভোররাত্রের আলো-আঁধারের দিকে তাকিয়ে আমারও বুক হুক-হুক করে উঠল অজানা ভবিষ্যৎ-এর শংকায়। মনে হল আমার যদি হত ওর বয়স, তবে কে জানে আমিও হয়ত কেঁদে বলতাম বাড়ি যাব।

কিন্তু সত্যি কি এত দিবার কিছু ছিল? আমেরিকা-যুরোপের শ্রমজীবনে যে সত্য সবচেয়ে বড় করে জানলাম তা হল সবদেশেই সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মূল সুরটি এক। জীবনের মৌলিক অমুভূতির ক্ষেত্রে ওরা এবং আমরা এবং নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তারা সকলেই সকলের নিত্য অন্তর্গত। সুখে-দুঃখে, হাসি কান্নার একইভাবে জীবন কাটাতে মানুষ দেশে দেশে। এই সামান্য, সহজ সত্য মান থাকলে আমরা কেউ কাউকে আঘাত করতে পারতাম না। পৃথিবীতে এত বৃদ্ধ-বিগ্ৰহ, মন বধাক্ষি চলতে পারত না।

আমার আমেরিকান সই হারিয়েটের চিঠি এসেছে দিনকতক আগে। লিখেছে, আমার প্রিয় কবি রবার্ট ফ্র্যাঙ্কলের কবিতা তোমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়' হয় নি কখনো। তুমি যখন এখানে ছিলে। আজ তোমাকে কলাইন লিখে পাঠালাম। আশা রইল, এ ক'টি কবিতার

লাইন তোমার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে যেমন পৌঁছেছে আমার হৃদয়ে অনেকবার—

It is a matter for joy almost a matter for rapture  
That here on this earth, between the two

freezing poles

Not altogether burned by the sun or drowned  
by the wind

In hunger and pain and sickness and fear of death  
Man lives, builds cities, grows wheat and goes  
to church

Do not be fooled, do not make any mistake—

We cannot afford to murder each other,

even with flags and bugles,

For it those of us of one blood and mind were

ever to destroy

Finally and irreparably, once and for all, for ever,

Those others whose differing blood or ideas

lash us to fury

How bare would earth seem, how lonely her hills  
and watercourses,

**উৎসর্বে**  
**বেনারসী রেশম বস্ত্র**

**সিল্ক সেন্টার**

**বহুবাজার মার্কেট**  
**কলিকাতা-১২**  
**ফোন: ৩৪-৪৮১০**

## প্রথম পরিচয়

আইভল ওরাইন্ড এয়ারপোর্টে যখন এসে নামলাম, তখন চারদিকে বন্ধ বন্ধ করছে সকালবেলাকার রোদ, সুন্দর নীল আকাশ। কিন্তু সেসব দিকে মন দেবার অবসর কোথায়? বিমান-বন্দরের বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন পালন করতে বাধ্য হয়ে পড়লাম। এ-সাতটা থেকে ও-কাউটারে বাচ্ছি, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছি এদিকে-ওদিকে। কোথাও পাসপোর্ট, কোথাও কার্ফমস্, কোথাও হেলথ্, নানা রকম চেকিং চলছে।

হেলথ্, কাউটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। 'শ'-র এক্স-রে ফিল্ম-এর ওপর খুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছেন একজন অফিসার। পাশের অন্য অফিসারটির দিকে মিস্টাট ঠেলে দিয়ে একসময় বলে উঠলেন, দেখো তোমার কি মনে হয়, হোয়াট ডু ইউ থিংক অ্যাবায়ট ইট? হু' নম্বর অফিসার চোখ বুজিয়ে নিল একবার তারপর বললে, আই থিংক আই উইল বাই ইট। যার সোজা বাংলায় মানে গাড়ার, জা আমি এটা কিনব।

আমেরিকান ভাষা বুঝতাম না তখনো ভাল। চোখ বড় করে চেয়ে রইলাম তাই। এক্স-রে ফিল্ম কিনবে? তার মানে! পরে বুঝেছিলাম বাই-আর সেলিং-এর উপমা না দিয়ে কথা বলতে পারে না আমেরিকানরা। ভাবের আদান-প্রদান নিয়ে কথা তা-ও কেনা-বেচাও চার্লস্-এ বলে। কেউ হয়ত নতুন কোন ভাবধারার প্রচার করতে চায়, সে বলবে সে আইডিয়াটা বেচতে চায়, কেউ হয়ত কিনবে সে আইডিয়—কেউ কিনবে না।

কিছুদিনের মধ্যে আমাদেরও রপ্ত হয়ে গেল ভাষা। অভ্যাসসারে মিজেরাও শুরু করে দিলাম বাই-আর সেলিং-এর ব্যবহার। হয়ত কোন নিয়ন্ত্রণে গিয়েছি কোন পাটিতে। হোস্টেসকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। জাপকিনের বোঝা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, দাও এগুলো বেচে দিই। অর্থাৎ কি না বিলিয়ে দিই অভ্যাগতদের মধ্যে। কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা।

আইভল-ওরাইন্ড থেকে নিউইয়র্ক গেতে উৎসুক চোখে দেখছিলাম দু'ধারে। কোথাও ছোট ছোট বাড়ি, তার কিনে পাউন্ডে কাপড় শুকাতো দিচ্ছে মেয়েরা। কোথাও হঠাৎ একটা বিরাট পার্কিং স্পেস জুড়ে পড়ে আছে এককোঁক গাড়ি। ঠিক যেন কাচের পাত্রে ঢেলে রাখা একরাশ ক্যান্ডি। ঢাকঢাক আর উজ্জল রঙের লগ্ন আমেরিকান মোটরগাড়িগুলোকে দেখার লাজলের মত। ক্যান্ডির মহাভক্ত সব আমেরিকানরা। যেকোন আমেরিকান লিভিং রুম অর্থাৎ বসবার ঘরে ফুলদানীতে যেমন থাকে ফুল, দেয়ালে ছবি, তেমনি টেবিলের একপাশে কাচের জারে ভরতি থাকে ক্যান্ডি। আমাদের পান-মশলায় মত অভ্যাগতদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় বর্ধন-তখন। একহুতা, দু'হুতা, তিনহুতা চকচকে মোটরগাড়িগুলোর দিকে তাকালেই জার-ভরতি লজ্জেলের কথা মনে পড়ে যায়।

একসময় অল্পমনস্কভাবে পার হয়ে গেলাম একটা কবরখানা। খাড়া খাড়া পাথরের স্মার বসানো আছে, তাতে নাম খোদাই করা আছে মৃতের। গাড়ির বহুদুর্ঘটতির সঙ্গে প্রায় যিমুনি এসে গিয়েছিল। এমন সময় একটা বাঁক ধুয়েই চোখের সামনে ভেসে উঠল—ওটা কি? আরো একটা কবরখানা না কি। প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড

খাড়া পাথরের স্মার উঠে গিয়েছে যেন আকাশ ভেদ করে। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে একটা চাকুলের স্থলি হল। সকলেই কাছে-দেঁতে নিচ্ছে ওভারকোট, হাতব্যাগ। এই তবে নিউইয়র্ক? আমি যেন আশা করেছিলাম রঙে ও রেখায় অপরূপ কবিত্বময় হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠবে ম্যানহাটানের স্বাইক্সপারশ্রণী ঠিক জন ম্যারিনের আঁকা ছবির মত। তার বললে নিউইয়র্কের ধূসর, ফুল স্বাইলাইন দেখে কেন মনে হল, এখনি পিছনে ফেলে-আসা কবরখানাই যেন একটি বড় সংস্কার?

অল্পক্ষণের মধ্যে গাড়ি হুকে পড়ল শহরে। দু'ধারে বিরাট অটালিকার চাপে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। মনে হল যেন পরে আছি গলার কাছে আঁট করে বাঁধা কোন জামা। দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে গেলাম নিউইয়র্কের কোন এক বড় হোটেলের অন্তর্গত তলার একটি তলার, হাজার ঘরের একটি ঘরে। বিশালকায় নিদ্রা পারিচারিকা ছুটোছুটি করে ত্রুটে বয়ে আনল খাদ্যসম্ভার, শয্যার পেতে দিল সজ্জা খোপ-ভাতা রঙিন চাদর দেয়ালের রঙের সঙ্গে তাল বজায় রেখে। এই মাকিন রঙের আসক্তি আমাদেরও পেয়ে বসেছে। তাই কলকাতার বেশিরভাগ বাড়িরই আজকাল দেয়ালে-জানলার, আসবাব-পর্দার, চাদরে-কুশনে রামধনুর মত রঙিন। শীতের দেশে যত ভাল লাগত এই রঙের ব্যবহার, আমাদের দেশে বিশেষত গ্রীষ্মকালে ঠিক তেমনটি লাগে কই?

একই দিনে সেই হোটেলের আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রেক্সিলের কোন এক কুটনীতিক। তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের নামের ছিল আশ্চর্য মিল, উচ্চারণগত নয় বানানগত। ফলে বেশ একটা কমেডি অঙ্ক এরন্ স্থলি হল। আমাদের লগ্ন আসা যত কিছু খবর সেই ব্রেক্সিলিয়ান ডিপ্লোমেটের ঘরে সরবরাহ করে দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ—আমেরিকান কর্নিপুণ্ডতার এই প্রাথমিক পরিচয়ের রাগ না হয়ে বেশ একটু আনন্দের বোধ হল। বাকু, এরও তা হলে আমাদের মত।

'শ'-কে তখনই ছুটতে হল কর্নহলে। এদিকে আমি চিন্তিত হয়ে ভাবছি নিউইয়র্কের সব বন্ধুরে হল কি? কার কোন খোঁজ নেই। নিজেই খোঁজ নেব মনে করে টোলফোন ডিরেক্টরি হাতে নিয়ে বললাম এসে সত্তপাতা রঙিন বিছানায়। অমন কলকাতা-নিউইয়র্ক দীর্ঘ পথভ্রমের যত ক্লান্তি একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল যেন। টেলিফোনের বই-এ মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল টেলিফোনের স্বনমন্যামতেই তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে নিউইয়র্কে।

পথে পা দিতেই আলো ঝলমল করে উঠল নিউইয়র্ক। রাত্রের নিউইয়র্কের মোহিনীরূপ আমার মন হরণ করল। সকালবেলার কর্ণগন্ত যে শহরকে মনে হয়েছিল নবাগত বিদেশীর প্রতি নিভান্ত শীতল—কেমন যেন একটা উপেক্ষার ভাব—রাত্রের মেজাজ দেখলার তার অন্তরকম। আলোকিত পথঘাট, সাজানো দোকান, রেস্তোরাঁ। পথচারীদের শাড়ি দেখে ক্রিয়ে-ফিরে তাকানো। সবকিছুতেই একটা শায়র বন্ধুতার আশ্বাস।

ততক্ষণ আমাদের সঙ্গী হয়েছেন নিউইয়র্কবাসিনী আমার এক আমেরিকান আত্মীয়। আশি বলেই উল্লেখ করা বাক তাঁকে। বন্ধুনের ঘরে ইনি, বাঁটি নিউইয়র্কের কালচারেল আবহাওয়ার

মাহু? তারপর একদিন তারতবর্ষকে ও বিশেষ একজন ভারতীয়কে ভালবেসে মৃত্যু বর্কন থেকে এসে ঘর বাঁধেন কলকাতায়। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। দীর্ঘ দশ বছর বসবাস করে ভারতবর্ষ যখন তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমিতে পরিণত হয়েছে তখন আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারালেন। অনেক দুঃখ-বেদনার মধ্যে নিজের দেশে ফিরে আসেন। এই পনেরো বছর এতটুকুও ভুলতে পারেন নি শোকের আঘাত। এই চিরবিরহিণী নারীকে দেখলেই মনে হয় একেমন আমেরিকার মেয়ে?

আণ্ডি বললেন, তোমরা আজ আমার অতিথি। চল আগে আমার বাড়িটা দেখবে তারপর কোন রেস্টোরাঁর বসে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। ওয়েস্ট উনপঞ্চাশ স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ফিফথ এভেনিউ পার হয়ে ইস্ট উনপঞ্চাশ স্ট্রীটে পড়লাম। সেপ্টেম্বরের রাত্রি ওদের এখন ফল অর্থাৎ শরৎকাল আবহাওয়া যাকে বলে মাইন্ড অর্থাৎ কি না শীতও নয়—গরম তো নয়ই নিতান্ত আরামপ্রদ। নিউইয়র্কের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে বড় ভাস লেগেছিল সে রাতে।

আণ্ডির ছোট এপার্টমেন্টে পা দিয়েই মনে হল কপাট ক্রকের কবিতা ষ্টং পাস্টে নিয়ে বলি,—

Here is a corner in some foreign land that is forever India.

বসবার ঘরের ফরাস-চামর-তাকিয়া থেকে পুরু করে দেওয়ালের ছবি, জানলার পর্দা সবই বিশিষ্টভাবে ভারতীয়। দার্জিলিং, ঢাকা, দিল্লী, কলকাতা নানান জায়গা থেকে আহরণ করা জিনিস। তবে সাজ-সজ্জার ভারতীয় হলেও জাতে খাঁটি আমেরিকান এপার্টমেন্ট। একথানা বড় ঘরই তিনটুকরো করা, শোবার ঘর, খাবার ঘর আর আঁতুপ্তি ক্রম মানে বসবার ঘর। একপাশে কিচেন, বাসন-খোওয়ার সিংক, রান্নার ওভেন, ফ্রিজ সবকিছু হাতের কাছাকাছি।

রেস্টোরাঁর বসে খেতে খেতে কাজের কথা হল। 'শ' খবর দিলে বর্কনে আমাদের কর্মস্থল নির্দিষ্ট হয়েছে। উপরওয়াল বলেছেন এখনি যেতে পারলে ভাল তবে আমরা নিশ্চয় ক্লান্ত, ক'দিন নিউইয়র্কে বিশ্রাম করেও যেতে পারি। আমার মনে হল নিউইয়র্ক আর যাই হোক বিশ্রাম করার জায়গা নয়। ওটা বর্কনে গিয়েই করা যাবে। নিউইয়র্কের সঙ্গে পরিচয় অসম্পূর্ণ রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বর্কনে চলে যাওয়াই স্থির হল।

### বর্কনের পথে

'ই বর্কন, ই বর্কন—ই হ্যাভ সাম্ ফান...' আমার শিশুপুত্রকে কোলে বসিয়ে পা নাচিয়ে-নাচিয়ে গান করতেন আণ্ডি! কোলাহল-বুধর, কর্মব্যস্ত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন পেছনে ফেলে ট্রেন যখন এগিয়ে চলল ট্রেনের চাকার চাকার বেন বাজতে লাগল সেই গানেরই প্রতিধ্বনি।

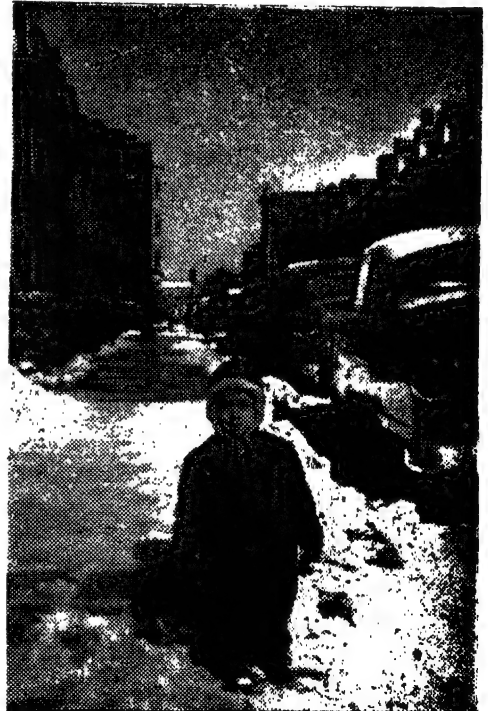
ট্রেনে বসে চোখ কান সজাগ করে মেলে রাখলাম ভেতরে-বাইরে। পাছে কিছু দেখতে-শুনতে বাদ পড়ে যায়। নতুন দেশ বা দেখি তাই ভাল লাগে। ট্রেনের হু'পাশে একটু বাদে বাদে নজরে পড়ে পুরোন মোটর গাড়ির লোহালকড়ের জুপ। মনে হয় এও বেশ; বছর বছর নতুন মোটরগাড়ি কেনে লোকে। পুরোন বাতিল-হয়ে-

যাওয়া পাড়িঙলোর গতি হবে কি? তাই অব্যাহিত লোহালকড়ের জুপ জমে ওঠে।

কামরার ভেতর ডাইনিংকার থেকে এটা-সেটা নিয়ে কিরি করতে আসে থেকে থেকে—ছাম স্যাণ্ডউইচ, চীজ স্যাণ্ডউইচ, হুখ, ককি, কোকোকোলা। ট্রেনে উঠলেই খিদে পায় বরাবর। মাঝে মাঝে ডাকি স্যাণ্ডউইচওয়ালাকে। গলা ভিজিয়ে নিতে মরকার হয় ককি কিং কোক।

কোচ ট্রেন। দীর্ঘ কামরা, দু'জনের বসবার সীট মুখোমুখি করে সাজানো। কামরার প্রান্তে একটুকরো জায়গা কাচের দেয়ালে খোদা, মোকিং লাউঞ্জ। 'শ' উপস্থাপন করলে খানিক তারপর অব্যাহত হল কাচের ওপাশে। আমেরিকাতে যেন ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই ধূমপান করে বেশি। মোকিং লাউঞ্জে মহিলাদেরই মনে হল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

দেখতে দেখতে এক বুন্ডা মহিলার সঙ্গে ভাব জমে উঠল 'শ'। ভারতবর্ষের প্রতি অশেষ চান। নাতনী বারবারা ছিল চারবছর ভারতবর্ষে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে। সে সময় তার পরিচিত সব ইণ্ডিয়ান হোম-এ তাকে ঠিক নিজের মেয়ের মত গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় আতিথেয়তা তাদের মুগ্ধ করেছে। বারবারা এখন আছে শেনে কিন্তু বারবারার মা অর্থাৎ বুন্ডার মেয়ে বর্কনেই থাকেন।



শীতের বর্কন

ইতিমধ্যে দেখতে পেলো তাড়া করে গিয়ে ডাব করেন। তাদের জন্ত কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। মনে করেন খণ শোধ করছেন কৃতজ্ঞতার। বারে বারে বলতে লাগলেন বড়ি, আমাদের ওখানে আসতে হবে কিছু, নিশ্চয় আসবে। আমার মেয়ে লরা কত খুশি হবে। কাঁপা-কাঁপা হাতে নোট বইয়ে লিখে দিলেন নাম-ঠিকানা।

পৃথিবীতে কোথার কার আপনজন ছড়িয়ে থাকে ভেবে পাই না। ওয়েলজ, পরিবারের সঙ্গে সেই যে আলাপের স্মরণপাত হল ট্রেনে, হীরে তা পরিণত হয়েছিল পরমাশ্রিত্য। কতবার এসেছি-গিয়েছি ওদের স্টেট লুই ট্রাউটের বাড়িতে। কত দরকারে ছুট এসেছেন মিসেস ওয়েলজ, তাঁর অভিশপ্তিচিহ্ন গাড়িখানা চড়ে। প্রথম দিনেই বলে রেখেছিলেন, যখন বা প্রয়োজন আমাকে বলতে যেন সাবোচ করো না, আমার গাড়িটা তো রয়েছেই, আই সিড ইন মাই কার। হৈ-টৈ করতে দল বেঁধে গিয়েছি বর্কনের বাইরে—সালো, রিভিয়ারের বীচ, নরও' স্টারব্রিক ভিলেজ।

ট্রেন এসে থামল এন্ড্রিডেল-এ। এরপর আসবে বর্কন। সাউথ কেশন হল বর্কনের বড় কেশন। কিন্তু তার আগে আছে একটা ছোট এক মিনিটের কেশন ব্যাক বে। ব্যাক বেতে ছড়বুড় করে নামতে ন'-নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল। কোনমতে নেমে পড়ে আমরা তখনো হীকাছি। মনে পড়ল মিহিভায় তখনো চিত্তব্রজ হর নি, সে সময় এরকম এক মিনিটের থামা ছিল কেশনে। উঃ, নামবার সময় কি ভাড়াছড়োটাই না লাগত। তারপর দেখা যেত নির্বাং কিছু না কিছু ফেলে আসা হয়েছে ট্রেনে। ছাতা, লাঠি, টুপি কোন একটা খোলানো রয়েছে হুকে, নরও' সাবানটা কেসপুড পড়ে আছে বাথরুমে।

আমাদের দেশের মকবুল কেশনের মতই ছোটখাট, নীরব, নির্জন কেশন ব্যাক বে। বিকেলবেলার নরম রোদেই ব্রিক চেহারা। পা দিয়েই মনটা খুশি হয়ে উঠল। নিউইয়র্কের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি আর হটপোলে ভরা পথচারীর পর বর্কনকে মনে হল অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। বর্কনের সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনে প্রেম। ব্যস্তসমস্ত নিউইয়র্কবাসীর পাশে বর্কনিয়ানদের মনে হল অনেক বেশি চিত্তোদালা, ছবি।

ঠেলাগাড়ি ট্রেনে নিয়ে এসে ঝাঁড়ালো একজন পোর্টার। আমাদের আমেরিকা প্রত্যাগত সব বন্ধুরা আসবার সময় বেজার ভর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মালপত্র সব কম নাও, হাত্য করে নাও। ওদেশে কুলি-টুপি পাবে না। সবই নিজেরের খাড়ে করে বইতে হবে। আমার তো বেশ ভর ধরে গিয়েছিল। কন্নরার স্পষ্ট দেখতে পেরেছিলাম, মস্ত বড় স্মার্টকেস মাথার নিয়ে ঘুরে বেড়াছি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেটে-ক্রেটে। এ অভিজ্ঞতা যে একেবারে না হয়েছিল তা নয়। তবে কার্ফক্রে দেখা গেল, অবস্থা অতটা ভীতিপ্রদ নয়। কুলি আছে, জুবে প্রয়োজনের চাইতে সংখ্যার কম। তাই অপ্রসিদ্ধার পড়তে হয় মাঝে মাঝে। মাথার করে মোট বয়ে নিয়ে যাওয়া নেই কোথাও। পুশবার্ট বা ঠেলাগাড়ি আছে সেজন্ত। লাগেজ-শিছু দক্ষিণা দিতে হয় বেশ।

বর্কনের লোকেরা যেন আগে থাকতে পণ করে বসেছিল

আমাদের প্রতি বন্ধুৎসল হবে। নবাগতের প্রতি সকলেই সৌজন্য প্রকাশ করতে চায়, সাহায্য করতে উৎসুক হয়ে ওঠে সকলেই। মালগুলো গুণে গুণে তুলে দিচ্ছি পোর্টারের গাড়িতে, পেছন থেকে একজন সহযাত্রী চাপাগলায় বললেন, করছ কি, এ ছোট ব্যাগগুলো নিজেরা নাও, এক একটা গরুগ্রন্থ স্টেট করে পড়বে যে। থানিকটা লজ্জিত হয়েই ছোট ব্যাগ দু'-একটা নামিয়ে নিলাম। ট্যান্ডিগোলা ছুটল সেও গরম সন্ধ্যাপাণী। বলে কলকাতা থেকে আসছ, বেশ বেশ। আমিও দেখেছি ক্যালকাটা, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় একবার কলকাতা হয়ে যেতে হয়েছিল—সে কৌদে বসল এক দীর্ঘ কাহিনী।

নিউইয়র্কের ট্যান্ডিগোলার কুট হ'ল অনেক সময়। ট্যান্ডির প্রাণ্য ভাড়া ছাড়াও 'টিপ' দিতে হয়। টিপের পরিমাণের কম-বেশির ওপর নির্ভর করে টালকোর মোজা। কিন্তু বর্কনে আমাদের ভাগ্যে যে কি করে সবসময় নেহাৎ একাডেমিক, ইনটেলেকুয়াল ক্যাম্পান জুটত ভেবে পাই না। পথ চলতে আলোচনা করতে হত প্রেটো, নরও টেগোরের গীতাঞ্জলি। নিউ ইংলণ্ডের হাওয়ার বোধ হয় ছড়িয়ে আছে কালচারের বীজ। একবার একজন ট্যান্ডি ডাইভার আলোচনা করেছিল গান্ধীজীর সত্যগ্রহ নিয়ে। দ্রুপ করে বলেছিল 'গ্যান্ডি'র মত 'গাই' তাকেও কি না মার্ভারড হতে হল, সত্যিই মানবজাতির আশা নেই কোন।

'শ' একদিন ফিরে এল বর্কন থেকে ট্যান্ডিতে চেপে। ট্রয়ং, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত চেহারা। বললাম, কি হল, কাজের চাপ পড়েছিল বৃষ্টি খুব। 'শ' বলল হ্যাঁ, খাটুনি গেছে বেশ, তার ওপর সারাটা পথ আলোচনা করতে হল অজস্তা-ইলোরার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিয়ে। অনেক বেশ যদিও খোঁরা হয়েছে, অজস্তা-ইলোরা দেখা হয়ে ওঠে নি 'শ'-র তখনো।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিরা।

যব হতে শুধু হুই পা ফেলিরা।...

এদিকে যে আমেরিকান ট্যান্ডি ডাইভার ঘুরে এসেছে অজস্তা ইলোরা। যুদ্ধের সময় বয়েতে ছিল কি না। কি বিপদ।

সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই বর্কনকে একবার দেখে নিতে চাই। কোনমতে মোটবারিগুলো ঘরে ফেলে রেখে পাখে বেরিয়ে পড়লাম। হাট্টিংটন এভিনিউর চওড়া পথের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ট্রাটকারের লাইন, হু'পালে যাক্কে-আসছে বাস-মোটরগাড়ি। আমি বড় হয়েছি কলকাতার, রাসবিহারী এভিনিউতে। ঠন ঠন করে এসে ঘটাং ঘটাং আগরাজ তুলে ট্রাম থামে বাড়ির সামনে। বিকট, বর্কণ আগরাজ করে হঠাৎ ত্রেক কয়ে নীল শোতলা বাসগুলো দোরগোড়ায়। হাট্টিংটন এভিনিউ আমার ভাল লেগে গেল। মনে হল এসে পড়েছি বাপের বাড়ির পাড়ায়।

রাস্তা পার হওয়ার আটটা শিখতে হল নতুন করে। চিরদিনের অভ্যাসমত কেবলই আগে ডানদিকে দেখে পরে বাঁদিকে দেখি পার হতে গিয়ে। এখানে দেখতে হয় আগে বাঁ-পরে পরে ডাইনে। ভুল হওয়াটা মোটেই বাহুনিয় নয়—বা দ্রুতবেগে গাড়ি চলে। কমন-ওয়েলথ এভিনিউর ওপর এই ভুল করে 'শ' একদিন থাকা খেলো মোটরগাড়ির। ভাগ্যক্রমে গাড়িটা ছিল ছোট কোকসওয়ারগন, সামান্য ছড়ে-বাওয়া আর গা-হাত-পা ব্যথার ওপর দিয়ে কেটে গেল কাঁড়া।

বটনাটা অবজ্ঞা বেমালুম গোপন করে গিরেছিল আমার কাছে শ' দীর্ঘকাল।

অনেককাল পরে কলকাতার বসে যেদিন প্রথম বটনাটা সুনসাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললাম, পড়ে গিয়ে কি করলে তুমি?

শ' তার স্বভাবমূলত নির্বিকার হাসি চেপে বললে, হাত-পা বেড়ে উঠে পড়ে বললাম, আমারই ভুল, আপনাদের নয়!

এতে চালক নিতান্ত অবাক হয়ে গেল, কারণ এ রকম স্পিরিট পথচারীর কাছে নাকি আশাই করা যায় না ওদেশে। চাপা পড়ে যদি মরতেই হয় এরা সাবধানে 'জেরাক্সিস'-এ চাপা পড়ে মরে। তা হলে খেসারত আদায় করা যায় চালকের কাছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন আমেরিকান নাগরিক। গাড়ি চাপা পড়ে চালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অভিনব। খুশি হয়ে শ'-কে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিলেন চালক।

কর্মক্ষেত্রে আমাদের বাসস্থান নির্বাচন করতে হল হাসপাতাল পাড়ায়। সামনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বাড়িঘর। পাবলিক হেলথ স্কুলবাড়ির গা বেয়ে একটা নাম-না-জানা লতা উঠেছে। ওপাশে পিটার্সেট ব্রিগহাম হাসপাতাল, টেমপ্ট স্ট্রীট আর হাউসিটনের মস্ত বড় মোড়টার নাম তাই পিটার ব্রেট-ব্রিগহাম সার্কেল। কর্মক্ষেত্রে, অমকালো ঢেংরা পিটার ব্রেট ব্রিগহাম সার্কেল। চারপাশ ঘিরে রেস্তোরাঁ, চুলকাটার দোকান, কাপড় কাচার দোকান, গোটা দুই সুপারমার্কেট আর ডাগ স্টোর্স। আমেরিকান সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ এই ডাগ স্টোর্স। ওয়ুথ-বিশ্ব ছাড়াও এখানে পাওয়া যায় খাত, পানীর, পাঠ্য, খেলনা, লিখবার সরঞ্জাম—কি নয়। পথ চরতে প্রতি হুমিনিট অন্তর চোখে পড়বে একটা করে ডাগ স্টোর্স।

বড় রাস্তা ছেড়ে হ'একটা ছোটখাটো রাস্তা এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ালাম খানিক। উইগলসওয়ার্থ স্ট্রীট, ওয়াসিটন স্ট্রীট। এক ধরনের দেখতে বাড়ি হ'পাশে। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ছোট একটুকরো বাগান, ফুল ফুটে আছে নানান রঙের। বু ফুল দেখে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সামনের বাড়ির সিঁড়িতে বসেছিল এক বৃদ্ধ। আর এক বৃদ্ধা বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের উচ্চাঙ্গে চমকে তাকালো হ'জনেই। কাঁচি হাতে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বৃদ্ধা বললে 'হা-ই'। সামান্য বিছু ফুল কেটে এগিয়ে দিল আমাদের দিকে। বটনের প্রথম অভ্যর্থনা প্রসঙ্গমনে গ্রহণ করলাম। [আগামী সংখ্যায় হানিমুনের পর।

মৌব বন্ধন

শ্রীমতী মীরা রায়

জানলা থেকে সরে এসে পাঁড়াল মাধবী। বাড়ির কাঁটাটা মাথারগ্রিহ হুঁটোর ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে। নিশ্চক নিশ্চিহ্ন পৃথিবীর অন্তরীণ নীরবতার মাঝে ডুব দিয়ে মাধবী মনের আনাচ-কানাচগুলো হাতড়াবার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। কিন্তু তার মনের প্রবৃত্তিগুলো অবিরাম অভিযোগের কোলাহল তুলে তাকে টেনে নিয়ে গেল তার মনোরাজ্যের অশান্ত অহুত্বের আবর্তের

মাঝে। বিগত সারাটা জীবনের সেনাপাওনার হিসাব খতিয়ান করে দেখতে গিয়ে মাধবীর অক্ষতারাঙ্ক দৃষ্টির সামনে পাওনার ঘরের বিরাট শূন্যতা যেন মুখ হাঁ করে গিলতে এল। কি পেয়েছে সে সারা জীবনে? আজীবন যাকে চেয়েছিল সমাজের নিষ্ঠুর বিধি তাকে সরিয়ে দিল তার জীবন থেকে। সে বন্ধনার জ্বালা ভুলতে যাকে বরণ করে নিল স্বামীরূপে তার শমনরূপটিই দিন দিন মাধবীর বিবাহোত্তর জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মনীষের সঙ্গে তার বিবাহের দিনটি পরিষ্কার মনে পড়ে। তার অন্তর্গামী আত্মনাদ সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল মৃত চাঁদপুকুরের কল্লিত আশীর্বাদ আহ্বানে, শিলা নারায়ণের সামনে উচ্চারিত সবচেয়ে বড় প্রবন্ধনাময় বিবাহের মন্ত্রধ্বনিতে। 'তোমার স্তন্য আমার হোক আমার স্তন্য তোমার হোক' উচ্চারণ করেছিল মনীষ, সেটা যে কত বড় প্রহসনের ব্যাপার হয়ে ঝাঁপবে তাদের পরবর্তী জীবনে তখন কি ঘৃণাকরেও কেউ জানতে পারছিল? সেদিনের সানাই-এর করুণ সুরটা আজ রাত্রির নীরবতার মাঝে বড় আতঙ্করে বাজতে লাগল মাধবীর কানে। বিয়ের পরে মা-পাওরা জীবনটাকে সে উপেক্ষাই করেছিল, সাধারণভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল একটি শান্তির সঙ্গার, এ গড়ে তোলার লক্ষ্যক করতে চেয়েছিল তার নারীজীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়।

কিন্তু তার জন্মের স্মৃতিকাণ্ডে ভাগ্যবিধাতার কলম দিয়ে যে ব্যর্থতার ছাপটাই তার লগাটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল তাকে এড়াবার কোন পথই সারাজীবনে মাধবী খুঁজে পায় নি।

বিয়ের প্রথম বছরটা তবু মন্দ কাটে নি। নতুনঘরে মোহে মনীষ কিছুদিন মশগুল ছিল, কিন্তু এর খোলাস খুলতে বেশি দরি লাগল না। মনীষের কাছে মাধবী অর্থ কৌশলের মাশকাঠিতে বহু নীচে ছিল, মনীষের স্বার্থপর লুক্ক মনটাকে পরিতৃপ্ত করতে গেলে মাধবীর বাপের বাড়ির বে'পরিমাণ অর্থও দেওয়া উচিত ছিল, তা তারা দিতে সক্ষম হয় নি—ওদিকে তার স্তিমিত রূপের করুণ আবেদন মনীষ রুদ্ধচিত্তে দিন দিন বিরক্তি ও রাগই সঞ্চার করেছিল। রূপের বিকিকিনির হাতে ওর সৌন্দর্যের পসরা বড় অল্প ছিল। মনীষের ক্রুব মনের মনপ্রকাশে ক্রমেই মাধবী ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু নিরুপায় সহনশীলতার সঙ্গেই মনে নিচ্ছিল মনীষের অবজ্ঞা অপাত্যার নিপীড়ন। মাধবীর জীবন প্রভাতের পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠা পাতাগুলো অকাল 'মধ্যাহ্নের খরতাপে ক্রমেই শুকিয়ে যাবে পড়েছিল, শুধু যার এদিকে নজর দেওয়ার কথা ছিল, সে ফিরেও তাকাল না বা জানলও না কোথা দিয়ে মাধবী ফুলের স্বপ্নাঙ্ক সৌ-ভটুকু বড় অনাচারে লোকচক্ষুর অন্তরালে মিলিয়ে গেল পৃথিবীর ধূলাবালির মাঝে। ইদানিং প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনীষের মাধবীকে লাঞ্ছনা ও অপমান করা স্বাভাবিক রীতিতে ঝাঁড়িয়েছিল। মাধবীক সে সরিয়ে দিয়েছিল তার জীবন থেকে অনেক দূরে। যদিও এখন মুখ বোরাতেই মাধবীর নজরে পড়ল ঘরের কোণে ভিন্ন খাটে গভীর নিদ্রার মগ্ন মনীষ। হ্যাঁ নজরের মধ্যেই তো স্বামী-স্ত্রীর নিঃসামুদ্রাঙ্গী একঘরে তারা শুচ্ছে, সমাজ, আত্মীয়স্বজন সকলেই তো জানছে মনীষ তার কত কাছে রয়েছে তবু এ মনগড়া হুঁত মাধবীর কেন? মনগড়াই বটে! হাসি পেল তার, যে ব্যবধানটা সমাজের নব-নারীর চোখে পড়ে না তার গভীরতটী যদি সমাজ বুঝত। মাধবীর বুক চিরে একটা

অলঙ্কার তপ্তনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, কাছেই আছে বটে মনীব। অভিনয়ের প্রবেশিকার মধ্যে যে সমাজের অস্তিত্ব তার কাছে এই বাস্তবিক স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের খোসস্টুকুর নিশ্চয় দাম আছে। অস্তরের সত্যকে বিচার করবার মত সত্যপ্রিয় দুই এ সংকীর্ণ সমাজের কোথায়? এ সমাজ শুধু মানুষকে বৈধেছে মিথ্যার, শঙ্কার, বন্ধনে, শাসনে। এখানে মুক্তির, সত্যের, বিচারের অবকাশ নেই, এটুকু মাধবী নিজের জীবন দিয়ে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে।

জানলা থেকে সরে এসে মাধবী নিজের খাটে এসে শুয়ে পড়ল, পাশেই ঘুমিয়ে আছে তার একমাত্র সম্ভান বাবলু। আট বছরের নিম্পাপ বাচ্চোর পবিত্রতার একটি ছোট্ট বিন্দু যেন ও। মায়ের মানিষর জীবনের কালো অন্ধরঙলার সঙ্গে এখানে ওর পরিচয় ঘটে নি। মাধবীর স্পর্শে পরম নিশ্চিন্তভাবে নিজেকে ঘুমন্ত সঁপে দিল মাধবীর কোলের মধ্যে। তাদের বৌধ-জীবনের একটি ক্ষণ সেতু যেন বাবলু। বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়েও মাধবীর অব্যাহত চোখ দুটো কিছুতেই বন্ধ হতে চাইল না। এ আঁজ নতুন নয়, বছরদিনই নিঃসঙ্গ রাত্রিতে নিজেকে একাটি শপে নিজের মুখোমুখি হতে শেরেছে তখনই তার বেদনার সমুদ্র উথাল-পাথাল হয়ে জেগে উঠেছে, সেহের সমস্ত দ্রাব্যত্বগুলো টান-টান হয়ে জেগে উঠে বিশ্রামের বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করেছে। সুপিয়ে ওঠা দাঁকু কোব বার বার জানিয়ে দিয়েছে জীবনের বার্ষিক্যকে, তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নি, নিঃস্রাম্য ধরিত্রীর অন্তঃপ্রবাহীর কাছে একমাত্র নিজের দুঃখকে অঙ্গুলের উপচারে নিবেদন করেছে, শুধু নিম্পুণ শিকারী মনীব ঘিরে দেখে নি তার অস্ত্রক্ষেপের পারদর্শিতা। কতদূর ক্রিয়ালীল হয়েছ তার শিকারের ওপর। আজও মনীব নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমোচ্ছে, শুধু মাধবীর বিনিমিত্ত প্রহরগুলো কাটতে লাগল আগামী ভোরের কটিন-বাঁধা জীবনযাত্রার কথা ভেবে।

সেই সকালে উঠতে হবে, মনীব উঠবে, চা খাবে, কাগজ পড়বে। তারপর একটু বেলা হলে স্নান সেরে অফিসে বেরিয়ে যাবে, মাধবীও গতাত্মগতিক কাজের ঢাকায় ঘুরবে। সন্ধ্যার মনীব বাড়ি ফিরে অফিসের অমার-কাপড় ছেড়ে চা-টা খেয়ে আবার বেরিয়ে যাবে। ক্লাব বন্ধ বাচ্চর আড্ডা ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা, তারপর বিছানার এসে বখন আশ্রয় নেবে তখন শ্রীমতী মাধবীর জীবনদর্শন অধ্যয়ন করবার মত অত্যাধ্বাণী প্রেম তার আর থাকবে না, ঘুমের ঘোরে কোথায় তলিয়ে যাবে। নিঃসঙ্গ নিঃশব্দের একঘেরেমি ঘোচাবার জন্য কয়েকবার মাধবী অব্যাহতিভাবেই এগিয়ে এসেছে মনীবের সান্নিধ্যে—পরিবর্তে পেরেছে বাস-বার প্রত্যাখ্যান। গত সকালেই তো মনীবের ভোজ্যতালিকার কিছু খাটতি পড়েছিল সব রাগটা তার গিরে পড়ল মাধবীর ওপর। মেয়েমানুষের রাগাবাঙ্গা বিষয়েও কি একটা সুরক্ষাবল্ল করবার মত গুণ নেই? রূপ ও রূপের অভাবের সঙ্গে কচিরও অভাব। এ-নিরে মনীব প্রথমে খাবার টেবলে হুড় তুলল, অতিষ্ঠ হয়ে শেষে মাধবীও বেশ হুঁটা-চারটে কড়া বুলি শুনিতেছিল। মোটা দড়িও টানতে টানতে ক্ষয়ে যায়, তার শেষ তত্ত্বটুকুও আর সংযোগরক্ষা করতে পারে না। মাধবীর সহনশীলতাও সেই পর্দায় এসে পৌঁছেছিল। মনীবের অসন্তোষের মুখে সেও মুখ খুলে তার 'অবৈধ' নারীসত্তার কিছুটা প্রকাশ

ঘটিয়েছিল, তদিক বাচ্চদের জুগেও লাভন পেয়েছিল। খাওয়া ফেলে মনীব রক্তমুক্তিতে ছুটে এসেছিল ওর দিকে।

ওর ঐ ভীষণ মূর্তি দেখে মাধবী হতচকিত হয়ে চমকে উঠেছিল। কি মারবে না কি? এতদিন তো গায় হাত তোল নি, এবার কি সেই অভাবটাও পূর্ণ করতে চাও?

মায়খুঁচো হয়ে উঠেছিল মনীব, সারা জীবন তো আলাচ্ছ, কিছু তো বাপের বাড়ি থেকে আনতে পার নি। না রূপ না রূপো; কিন্তু বাচ্চর ছলটুকু আমদানী করলে কোথা থেকে?

মাধবীও অসহ্য হয়ে বলেছিল, ভোঁতা অস্ত্র তোমার হাতে পড়েছিলাম, আজ যে শাপিত হয়ে উঠেছি এতো তোমারই কৃতিত্ব। দিনের পর দিন তোমার অবিচার অত্যাচার আমার ব্যাক্যতে ছল জুগিয়েছে, এ ছলের আলা থেকে তো তোমার নিষ্কৃতি হতেই পারে না।

আর কোন কথা সে বলতে পারে নি, উল্কাট লুকোবার জন্যই সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু মনীবের সবল হুঁটা বাছ তার কাঁধে প্রেবল বাঁকুনি দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে পিড় করিয়ে দিল।

সত্যি কথা আমার শোন মাধবী, তোমার মত একটা নিম্নল বোকা আমি আর বইতে পারছি না, তুমি সরে বাও আমার পথ থেকে, আমার মুক্তি দাও। কি আছে তোমার মধ্যে? রূপ? কি এনেছ তুমি পৈত্রিক সম্পদ? বা চেয়েছিলাম, বিয়ে করে তার কিছু পাই নি তোমার মধ্যে। তোমার মাঝে কোন আমার অমুহুর্তি পাই না, আমার জীবনে তোমার বন্ধন করলেও বর্ষভার সমস্ত মনটা জলে ওঠে। আমার খাওয়া-পাওয়া, চলা-ফেরা, জীবনযাত্রাপ্রণালীর কিছুতে তুমি কথা বলতে এসো না। তুমি কি ব্রহ্মতে পার না কতখানি অকিঞ্চিৎকর তুমি আমার জীবনে? কোন কথা তুমি আমার শোনাতে এসো না, সরে বাও আমার সামনে থেকে, আমার জীবন থেকে। বেখানে পার চলে বাও আমার মুক্তি দিয়ে, সমাজের বুক বসে আমি আর এ অভিনয় চালাতে পারব না।

বজ্রহাত তালগাছ যেমন তার মাথার সর্বথ খুঁয়ে শুধু একপাশে ভর দিয়ে পীড়িয়ে থাকে, মাধবীও বোধ হয় মনীবের জন্য আঁজও ঠিক সেইভাবেই সজ করেছিল। পীড়িয়ে সবই সে শুনল, তাকে সর্বস্বান্ত করে, রিক্ত করে মনীব যে তাকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে গেল, মনীবের এই উল্লস আক্রমণে সেইটাই বিশেষকরে প্রকাশ গেল।

এতদূর বাঁধন কেটে গেছে? মনীব তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনায়াসে বেখানে খুশি তাকে চলে যেতে বলছে? মিথ্যা এ স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়? সাতপাকের বাঁধন না কি জীবনেও খোলা যায় না? মাধবীর মনে হল বিয়ের মালার ফুলগুলো কবে ঝরে গেছে, শুধু সূতাটা এখন মোটা কাঁছ হয়ে তার কণ্টালীর বাসগোছ করে টিপে জড়িয়ে আছে, তার থেকে মুক্তি নেই। কেসলে মুক্তি নেই? মনীব তো সহজেই মুক্তি দিচ্ছে সেও কি মনীবকে বৈধজীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে না? সেও আর ঐ কাঁছির বন্ধন স্বীকার করবে না, বাবলুক নিয়ে আলাবা চলে যাবে, থাক মনীব তার এই সঙ্গার নিয়ে। ধর্মের নামে একি অদমতার প্রতিষ্ঠা জীবনে? সমাজের বিকৃত শব্দে সত্যের অঙ্গলাপ করে, এ কি বিভ্রম পটনক্রিয়া চলছে? এর পৃতিগড়ে কি সমস্ত সমাজ-জীবন বিধিরে উঠবে না? আর যে কেউ এটা মেনে নিক, মাধবী আর এটা মেনে নিতে পারবে না, সেও



## জীবন ও আশা

মনীষকে মুক্তি দিয়েই চলে যাবে। তার অভিমানাহত নারীও কিছুণ-বেগে ফুঁসিয়ে উঠল। জীবনের জুয়াখেলার মাথবীর চরম পরাজয় ঘটলে।

সাতপাকের বাঁধনের মধুরতা যখন বেড়ির কঠোরতার রূপ নেত সে নিরুপায় চূর্ণভোগের দাসত্ব বহু যুগ থেকে এসেশের মেয়েরা নীরবে মেনে নিয়ে এসেছে।

এযুগের মেয়ে হয়ে মাথবী কিছুতেই ঐ অবস্থাকে নীরবে মেনে দেবে না, নিজের বাঁচবার পথ নিজেই খুঁজে নেবে। বিড়ম্বিত জীবন থেকে তাগের দুঃভনেরই মুক্তি হোক। সন্ধ্যার মনীষ বাড়ি ফিরতেই সে তাই বিনা বিধার তার সামনে গিয়ে পাঁড়াল।

তুমি আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিলে না? আমিও তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই। আমাদের এ মিথ্যা অভিনয় শেষ হোক। আমার একটা আমার স্থানান বোগাড় করে নিতে দাও, তারপর তোমার চিরজীবনের মতই মুক্তি দিয়ে যাব। কোনদিনও মাথবীর অন্তিম তোমার ভীনে খুঁজে পাবে না।

এ স্মৃতিটা আরও আগে হলে খুশি হতাম মাথবী, প্রাণুগলায় মনীষ উত্তর দিল, কিন্তু দেখা চলে গিয়ে যেন আইন-আদালত করে আমার জন্মে ফেলবার চেষ্টা কোর না, কারণ তাতে উন্টে তোমারই মুখিল বেশি হবে। তুমি নিজে থেকেই সরে যাক, এতে আমি তোমার মাসিক আর্থিক সাহায্য দিতে বাধ্য নই। তোমার নিজের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি আমার পেছনে লাগতে আস, আইনের প্যাঁচে ফেলে তোমার বিপদে ফেলতে আমার বেশি বেগ পড়ে হবে না। বাক—আমি কিছু সময় তোমার বিলাম, এর মধ্যে তুমি তৈরি হয়ে নাও।

এরপর মাথবীর আর স্থানে পাঁড়ার প্রবৃত্তি হয় নি, মনীষেরও ক্রায়ে বাওগার তাড়াতা তখন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বে নাটকটার পালা শেষ হয়ে গেল, রাত্রি ২টা পর্যন্ত জেগে মাথবী সেইটারই পর্যালোচনা করছিল। মনীষ তার সঙ্গে দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দিচ্ছে এবার তার তাম্রতরঙ্গা গোটানোর পালা। মনীষ আইন-আদালত করতে সাবধান করছে, অর্থাৎ সে মনীষের অর্ধসাহায্যের জন্য আইনের খারহু হবে। আইনের শক্তিতে সে জোর করে মনীষের ঘরে বসবাস করতে পারে—মনীষের শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কিন্তু নাঃ মনের বন্ধনই যখন কেটে গিয়েছে তখন বাহ্যিক ও বন্ধনটা বোকা স্বরূপ সে বহন করতে পারবে না। আইনের শাসন বর করার, প্রেমের বাঁধন বর ভরার। সে মনীষের কাছ থেকে কোনরকম অঙ্গুগ্রহাভের জন্য আইনের সাহায্যক্রাথী হয়ে না। এইসব ভাবতে ভাবতে মনন তার চোখে ঘুমের প্রলেপ পড়ল তখন পৃথিবীর ঘুম সবচেয়ে ডাকছে।

সকালে উঠতে মাথবীর একটু দেহিই হয়েছিল। সে যখন চায়ের টেবলে এসে বসল মনীষের খাওয়ার-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, সে তখন অকস্মিত প্রবৃত্তি সাজ করছে। বাড়িতে নয়টার ঘরে বড় কাঁটাটা গিয়ে বে সমকোণ রচনা করেছে, মাথবীর দৃষ্টি সেইখানে কেন্দ্রীভূত হওয়ার রাজ্যের লক্ষ্য এসে জড় হল তার সর্বাক। পড়কলের ঘটনার পর থেকে মনীষ প্রীর সঙ্গে বাক্যব্যয়ে বড় হিসাবী হয়ে উঠেছে, মাথবীর এই বিলম্বের হেতু জানবার জন্য তার পক্ষে কোন উৎসাহই দেখা গেল

না। সে নিজে তৈরি হল, সেইসঙ্গে খোকার মাকে ডেকে বাবলুকে তৈরি করে দিতে ভুরুম দিল। এর একটু পরেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে বাবলুকে ভেতরে বসিয়ে নিয়ে মনীষ বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল মাথবীকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না। মাথবী কিছু কিছু এসে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল, কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না, মনীষের ছুড়ুমার। এই তাচ্ছিল্যটা হজম করতে তার বেশ একটু সময় লাগল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল নিঃশীম একাকিত্বের মাঝে।

এরপরই আগমন ঘটল খোকার মার, তার কাছে। খানিকটা চুপ করে থেকে বলল, বৌদি, আমার কাজ তো শেষ হল, এবার নতুন জারগার চাকরীর জন্য চেষ্টা করতে হবে তো?'

একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই মাথবী প্রশ্ন করল, কেন খোকার মা বাবলুর কাছে তুমি এতদিন কাজ করছ, তাকে এত বড় করে মাহুত করলে, সে তোমার কত ভালোবাসে, তুমি আজ ঠাৎ কাজ ছেড়ে দেবার কথা বলছ কেন?

ওমা তাও জান না বৌদি বৌদি, খোকনবাবুকে যে বাবু বোটিং-এ ভর্তি করে দেবার তরে আজ নিয়ে গেছেন, আজ সব দেখিয়ে শুনিতে নিয়ে আসবেক, তারপর তো ও মাসের পরলা থেকে গিয়ে খোকনবাবু থাকবেক। ওখানে না কি খোকনবাবু নেকাপড়া ভালো হবেক, বাড়িতে বড় দুট্টমী করে তাই বাবু বোটিং-এ রাখবেক। এরপর আমার আর এখানে থাকার কি দরকার বৌদি?

তুমি জানলে কি করে খোকার মা এত কথা?

ওমা, আমি যে শুনছ চা খেতে বসে খোকনবাবুর সঙ্গে বাবু এইসব কথা বলছিলেন। বলছিলেন, বাবলু তোমার বোটিং-এ রেখে আসব, ভালো করে নেকাপড়া করবে, সেখানে তোমার মত কত ছেলে আছে তাদের সঙ্গে খেলা করবে, আনন্দ করবে থাকবে, এখানে একলা থাক সেখানে কত বন্ধু পাবে, কত হৈ হৈ, কত মজা, যাবে সেখানে? আমাদের খোকনবাবু তো বন্ধুর কথা শুনে জারী খুশি। বলে, বাবা আমাকে এখুনি সেখানে নিয়ে চল আমি খুব খেলা করব নতুন বন্ধুদের সঙ্গে। আমি আড়াল থেকে শুনে ভয়ে মরি।

বৌদি, শুনেছি বোটিং-এ না কি ভরানক মারধোর করে? ঐটুকু বাচ্চা, কোথায় সেখানে একলা গিয়ে থাকবে বল তো? অবিজ্ঞি নেকাপড়া শিখে বড় হতে গেলে সব কষ্টই গেরাহ করতে হবে।

চাকিতে সমস্ত চালটাই মনীষের মাথবী বুঝতে পারল। তার কাছ থেকে বাবলুকে সরিয়ে দিতে চার মনীষ। তবুও বুঝে হাসি টেনে এসে বলল, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন খোকার মা? ছেলেকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে গেলে বোটিং-এ রাখাই ভালো, দেখছ তো বাড়িতে থাকলে কি রকম দুঃস্থ হয়ে যার, সমস্তকণ দেহবার জন্য তো বাড়িতে কেউ থাকে না, কিন্তু বোটিং-এ সমস্তকণ ছেলের পেছনে জোরকর ব্যবস্থা আছে। ওখানে ছেলের খুব বড় করেই রাখা হয়। কত বড় বড় লোকের ছেলেরা ওখানে গিয়ে থাকছে। আর বাবলু তো মাঝে মাঝে আসবে। তারজন্য তোমার চাকরী ছাড়ার কি প্রয়োজন? বাও বাও এখন নিজের কাজে বাও, কোথায় কি তার ঠিক নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

এ কথার খোকার মা আশঙ্ক হল কি না বোঝা গেল না, বাড়ি গিয়ে করতে করতে সে উঠে গেল।

মাধবীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর রঙটা যেন নিমেষে পাটে গেল। তাকে জর্মেতে না দিয়ে মনীয় এই জগৎই বাবলুকে নিয়ে বেরিয়েছে। মনীয়কে মাধবী সেদিন বলেছিল মুক্তি দিয়ে যাবে, তাই কি সে নিজে বিদায় নেবার আগেই ছেকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে? মনীয় নিশ্চয়ই তার চলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। মনীয়ের নিজের কাছ থেকে সে বহুদিনটুকু সরে গেছে, এবার মনীয়ের সংসার থেকে তার সরে যাবার পালা, মনীয় তার মাতৃহৃৎ থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে চায়।

নাঃ হিন্দুধর্মের খোলাসুটুকু এবার ভেঙে পড়ছে, একে ধরে রাখার চেষ্টা মানে বাতুলতা। স্ত্রীর অস্তিত্ব যেখানে বোঝাশব্দরূপ, বিয়ে যেখানে নিরুপায় বানিটানার স্বীকৃতি, মাতৃহৃৎ যেখানে অমীকৃত, সেখানে ঐ খোলাসের মিথ্যা মর্বাদটুকু বয়ে বেড়াবার মত মনোবল আর মাধবীর নেই। আপাতত এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তার দাদার বাসার গিয়ে উঠতে হয়, তারপর সেখানে থেকে একটা চাকরী-বাকরী দেখে সে নিজের ভার নিজেই নেবে। কান্নারই গলগ্রহ হয়ে থাকবে না সে। মনের বিচারে লজ্জার মাধবী আর সেদিন মনীয় ফিরলে পরে তার সামনে বার হল না। বাড়ি ফিরেই বাবলু দুপদাপ, শব্দ করে মাধবীর অঙ্ককার ঘরে এসে পাড়াল। মাধবী আলোটা জ্বলে দিতেই তার শিশুকণ্ঠ কলকলিয়ে উঠল।

মা, জান মা, আজ বাবা আমার কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? একটা বিরাট বাড়ি সেখানে কত ছেলে রয়েছে মা। বাবা বলল, আমি না কি ঐ বাড়িতে থাকব, ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে খেলা করব—কত আনন্দ করব, কি মজা হবে না মা? ও-বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করব আর ছুটি হলে তোমার কাছে এ-বাড়িতে আসব। মা তুমি কাদবে না তো? আমার ছেড়ে থাকতে?

মাধবী স্নেহে ওর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বলল, বাবলু সোনা তুমি বুঝি নতুন বাড়িতে পড়াশোনা করতে যাচ্ছ? বেশ তো খুব ভালো কথা, লেখাপড়া শিখে জ্ঞান হবে, কত বড় হবে। নতুন বাড়িতে কত নতুন বস্তু পাবে—কত খেলা করবে। আমি তোমার জন্ম কাদব কেন, আমার তো শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে, ছুটি হলে এ-বাড়িতে আসবে, আমি মাঝে মাঝে তোমার বড় বাড়িতে গিয়ে তোমার দেখে আসব কেন? একলা এ-বাড়িতে তুমি থাক তোমার কোন খেলার বস্তু নেই, ওখানে কত বস্তু পাবে, কত মজা হবে বল তো?

মাধবীর হাত ধরে টানতে টানতে বাবলু খাটে এনে বসিয়ে দিল, একটুখানি নিজেজকণ্ঠে বললে, এরকম একখাটে তোমার সঙ্গে শুতে তো পাব না মা, রাতে কার কাছে শোব বল তো?

জন্ম শোবার লোকের ডাবনা? কত ছেলে একসঙ্গে শুচ্ছে দেখবে, কত গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে, আমার কথা তখন তোমার মনেই থাকবে মা। তখন দেখবে আর আমার কাছে এসে শুতে চাইবে না।

ও-কথা বলো না মা, তোমার কাছে শুতে বেরকম ভালো লাগে, এরকম আর কিছুতেই লাগবে না, সারাদিন বহুদের সঙ্গে খেলা করতে

ভালো লাগবে, রাতে কিন্তু তোমার চাই—মাধবীকে জড়িয়ে ধরে বাবলু খাটে জোর করে শুয়ে পড়ল।

বাবলু ঘুমের পড়ার অনবচ্ছিন্ন পরে যখন মনীয় রাতে শোবার জঙ্ক ঘর ঢুকল, মাধবী কোনবকম ভগিতা না করেই বলল, বাবলুকে আমার কাছ থেকে এভাবে সরিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তোমার সেদিন বলেছিলাম না—তোমার আমি মুক্তি দিয়ে যাব। সেটা আমি তোমার মিথ্যা আশ্বাস দিই নি। সত্যিই আমি তোমার একেবারেই মুক্তি দিয়ে যাব। আগামী রবিবারই আমি দমদমে দাদার বাসার চলে যাব, তাৎপর্য ওখানে থেকে যা হয় একটা কাজকর্ম দেখে শুনে নেব, তোমার কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নিয়ে যাব না। শুধু বাবলু ছুটি হলে আমার কাছে গিয়ে থাকবে।

মনীয় পরম ঔদাসীন্যে শুধু উত্তর দিল, বেশ তো তোমার পথ তো খোলাই, উচ্ছে করলেই চলে যেতে পার, আমি তোমার একটুও বাধা দেব না। কিন্তু হাবার আগে তোমার কাছ থেকে আমার কিছু বুঝে নেবার আছে, আমার সে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিয়ে তবে তোমার সম্পূর্ণ মুক্তি।

মাধবী মনে মনে একটু হাসল, মনীয় বোধ হয় তার সংসারের জিনিসপত্র কিছু বুঝে দেখে নিতে চায়।

দুশকণ্ঠে সে বলল, নিজের তোমার সব জিনিস তোমার বুঝিয়ে তোমার হাতে দিয়ে যাব। তোমার বাড়ি থেকে একটা কোন জিনিসই আমি নিয়ে যাব না। যদি তোমাকেই ছাড়তে পারলাম তোমার সামান্য জিনিস আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—ছিঃ। এতটা হীনমনাযুক্তি আমার নেই।

মাধবী শুনেছিল, বাবলু সোমবার বোর্ডিং-এ চলে যাচ্ছে তাই সে স্থির করেছিল রবিবার দিন সে দমদমে চলে যাবে। তার অনভিপ্রেত সেই রবিবারটা আসতে মোটেই বিলম্ব করে নি। সকালে উঠেই যাবার জঙ্ক মাধবী প্রস্তুত হয়ে নিছিল, গুছিয়ে নিচ্ছেছিল তার জৈবিক দাবীপূরণের স্বল্পপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো। তার এতদিনের সাজানো সংসার, তাতে যতই কঁক থাকুক না, আজ তা ছেড়ে যেতে মনের কোন অজানা তন্ত্রীতে একটা নিবিড় বেদনার সুর না উঠে পারে নি। সংসারের বন্ধন যতই কঠিন হোক তবুও সেটা বেদনামধুর, তার গভী কাটাতে গেলে বস্ত্রিশনাড়ির টানে যেন আঘাত লাগে। খোকার মা দমদমে তার দাদার বাসা পর্যন্ত গিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, মাধবীর বিসর্জনের উপসংহারটুকু মনীয় এইভাবেই পালন করছে। এর ভেতরেও স্বামিদের দয়টুকু রয়েছে বৈ কি।

মাধবীর স্ট্রাকশনটা হাতে নিয়ে খোকার মা নিচে পাড়িয়ে আছে, মাধবী নেমে এসে একসঙ্গে গিয়ে পাড়িতে উঠবে। এ সংসারের মায়ী মাধবী কাটাতে চায়, চলেই যখন যাচ্ছে—বত শীত যেতে হয় ততই ভালো। বেলা বাড়ছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। মনীয় তার কাছ থেকে কি বুঝে নিতে চায় দেখবার জঙ্ক মাধবী বাতাপার্বের আরোজন শেষ কার মনীয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

গভীররবে বলল, আমার বাবার আগে তুমি আমার কাছে থেকে কি বুঝে নিতে চেয়েছিলে—এখন বুঝে নাও, আমার বাবার সময় হয়ে এল।

আনন্দের

দিনে

উপভোগ্য

# কোলে

বিস্কুট, লাজস ও টফি



২১/১২/৪৩



কোলে বিস্কুট কো.  
প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১.

বঙ্গবন্ধা : ১৯৫৪ '৭১'

২৬৫

মনীষ বোধ হয় আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল, একখানা কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, স্বামীর বন্ধন সবই ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তখন স্বামীর দেওয়া সবচেয়ে বড় জিনিসটাও তোমার বিনামূল্যে ছোড় দিতে হবে। এর ওপর তোমার আর কোনদিন কোন অধিকার থাকবে না, এই নাও এই অঙ্গীকার পত্রে সই কর।

মাধবী দ্রুতহস্তে কাগজটা টেনে নিল, তার বিমিতদৃষ্টি লেখাগুলোর ওপর দিয়ে এক মিনিটে ছুটে চলে গেল। কাগজটায় লেখা ছিল,—‘আমি আমার স্বামীর কৃত্রিম সম্পত্তির সহিত তাহার ও আমার পুত্র শ্রীমান বাবলু উপর সব অধিকার প্রকৃত পরিচ্যাপ্ত করিতেছি। ভবিষ্যতে উহার মালিকানা দাবী করিয়া কোনদিন আইনের বা আদালতের সাহায্য পাইব না। যেহেতু আমি তাহার উপযুক্ত শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম, সেইহেতু তাহার পিতার তত্ত্বাবধান হইতে তাহাকে কোনদিন সরাস্ত্রে চোরা করিব না।’ ইতি—এর পর সই-এর স্থানটা শূন্য আছে।

গুরুগম্ভীর স্বরে মনীষ বলল, আমার সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে গলে আমার ছেলেকেও তোমার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে চলে যেতে হবে, কোনদিনও তুমি আর শুকে না ছাড়াবে না, বাবলুকে এমনভাবে মানুষ করবে—সে জানবে না, মনিষ গাছ। এর জন্য আইন-আদালতের সাহায্য নিলে তোমার পুত্র বড় হতে হবে না। জেনে রেখো, বাবলুকে আমার কাছে রাখবার জন্য আমি আমার সর্বস্বত্তি নিয়োগ করব, তুমি কিছুতেই পাবে না তাকে।

মাধবীর কানে মনীষের সব কথাগুলো বোধ হয় ভালো করে ঢুকল না, সমস্ত পৃথিবীটা ওর চোখের সামনে চুলতে লাগল। বাবলুর হাঃসমাধা মুগ্ধগান সম্পন্ন হয়ে ওর চোখের সামনে জেদে উঠল, ক্রমে সেটা ধীরে, অনেক দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। নিফল চেষ্টায় মাধবী ওর হাত ধরে তুলে তাকে বেনে ধরতে গেল, পারল না ধপ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাবলু এমনি করে হারিয়ে যাবে। চিরদিনের মত ঐ রকম মিলিয়ে যাবে তার জীবন হতে? রেহ-মায়ে-মমতা সর্বাঙ্গ ছুঁতে গলে দিয়ে মনকে পাখর করে তুলতে হবে? জীবনের মরুভূমির মাঝখানে মনীষ তাকে পীড় করে দিতে চায়। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বনের কিছু নেই, যেদিকে ফিরে তাকাও নিঃসঙ্গ রুদ্ধতা, একাকিত্ব, সারা জীবনব্যাপী হতাশার বিরাট শূন্যতা, ভবিষ্যতের যেটুকু রেহের নীড় সে আশা করছিল, সেটুকুও সমূলে উৎপাটিত করে চলে যেতে হবে? না, না, না, ওগো আমি পারব না। তুমি আমার সব শাস্তি দাও, হানো আমার বুকে শক্তিশেল সব সইব, তবু পারব না নিঃসর্তে পুত্রের ওপর সব অধিকার ত্যাগ করতে। আমি যে মা। হুনিয়ার মার স্থান যে সকলের ওপরে, সে একাই একক মহিমময়ী। তার উচ্চারণে শুধু এক শব্দ ‘মা’, তার পাশে দ্বিতীয় শব্দ বসবার পর্বস্ত স্পর্ধা নেই, এ মহিমময়ী পদকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না আমার সমস্ত নারীসত্তা। আমার সর্বাভিমান পরাজিত হোক এর কাছে, আমি কোথাও যেতে পারব না—বাবলুকে নিঃসর্তে বিলিয়ে দিয়ে, আমার লালিত অপমানিত নারী মাভূতের তরুতার হয়ে আমার অনাগত জীবন-প্রভাতে অস্বপ্ন করক।

মনীষের এতদিনের বিরাগের হিমত্বায় মাধবীর মাতৃক্বেদ স্নেহের উত্তাপে গলতে শুরু করল? সে তাড়াতাড়ি তার পায়ে লুপ্তিত মাধবীর অবশ দেহটাকে তুলে ধরে পীড় করে দিতে গেল, কিন্তু তার সংজ্ঞাহীন দেহটা এতদিন পরে স্থান পেয়েছে মনীষের বুকের ওপর।

## ভাবনা থেকে—

### কৃষ্ণা ঘোষ

আর কখনো খেলাগর ব ধুলোবাগি উড়বে না,

ধোঁয়ার গন্ধে সকাল সন্ধ্যা গুমটি যবে রাখবে বা

অনিচ্ছাতেই। অনেক কষ্ট পোড়, শরীর পুড়বে না।

বাসি চাঁটারের জন্য থেকে ক্রান্ত বাতাস সপ্তাহে,

কুঁ দিয়ে ওই আশুনা ক আলিয়ে নিয়ে নিভিয়ে দিতে

অনিচ্ছাতেই—অনেক কাজে চোখের জলকে ছিটিয়ে দে।

অমি এখন ধূলা ঝেড়

হাত ছুঁটাকে যত্নে ধরে।

দিনরাত্রির ভাবনা থেকে

চোখ জুড়লে পড়বে শুয়ে।

### যাযাবর

### প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

বস্ত্র অশ্বের পিঠে

সংসার বয়ে নিয়ে চলেছে

কাশ্মীরী যাযাবরের দল।

হুনিয়ার ঘোবন আর উদ্দাম রক্ত

তাদের শিরায় শিরায়।

ওরা থাকে পাহাড়ের চূড়ায়

জঙ্গলে জঙ্গলে—

নগরে বাঁধ না কো ঘর

যুগ্য চোখে তাকিয়ে থাকে

সভ্যতার দিকে।

ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ক্ষীণকায় মানুষ

নীড় বাঁধে ইটের দেওয়াল

আর কুটিরের মাঝে।

ভয় পায় আকাশকে, ঝড়কে

আর উদ্ভ্রান্ত মৃত্তিকে।

ওরা যাযাবর।

ওরা চলেছে এক পাহাড় থেকে

আর এক পাহাড়ের দিকে।

ওই বেধা দুর্গম গিরিশৃঙ্গ

গোছে বিশেষ পাহাড় বন আর

নীল আকাশের মাঝে—

সেখানে লক্ষ্য ওদের।

অশ্বের খুরে উড়ছে ধূলি

চলেছে যাযাবরের দল।

তুসীর বোসের সঙ্গে বক্তব্য আমার খুব বেশি হলে বছর দশেকের হবে। প্রথম শ্রেণীর মার্জিত কচিবোধের মানুষ হলো যে রকম হয়, সুবীর ঠিক তাই। বিকম পাশ করে চার্টার্ড একাডেমির সুবিধে না পেয়ে সুবীর এসে কাজে ঢুকলো। জুজু গ্র্যাণ্ড মিলাস কমানিশাল করে। তাতেও ফাঁটিং মোটামুটি মন্দ পেলো না। থাকতো বোবাক্সের একটা বোর্ডিংয়ে। বললো: 'মেন বোর্ডিংয়ের রান্না খেয়ে খেয়ে কুমাকের বাগোটা খেজে গেল। ভালো একটা মেয়ে খুঁজে দে, বিয়ে করে ঘর বাঁধি।'

অত্যন্ত স্নান্য প্রস্তাব। তাই খানিকটা তৎপর হলাম। ভাগ্য ভালো যে, দু'এক ব্যয়গায় বোজখবর নিতেই একটা চাকুরিয়া মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। জিজ্ঞেস করলাম: 'চলবে কি না দেখ।'

সুবীর বললো: 'ভালই তো। যা দিন কাল, তাতে একটু ভালোভাবে থাকতে গেলে একার রোজগারে চালানো মুশ্বিল। চাকুরিয়া মেয়ে হলে এদিক থেকে আমার বরং আনকটা সুবিধেই হবে।'

অতএব সোজা গিয়ে এবারে মেয়ের সঙ্গেই কথা বলতে হলো। কারণ, এখানে তারও নিজের বলতে কেউ নেই। থাকে লেডিস হোস্টেলে। প্রায় সুবীরই অবস্থা। কিন্তু আলাপ করে দেখলাম—চলতি বাড়ালী যবর মেয়েদের মতো নিতান্তই ভাগ্যের পায়ের মাথা খুঁড়ে চলবার মতো মেয়ে নয় শেলী। এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে—যা অনেকের মধ্যেই বিরল। তেমনি স্মার্ট। কেউ চালিয়ে নেবে, তবে সে চলবে। এ তার স্বভাবের বাইরে। সংসারে সুস্থভাবে চলতে হলে এমনি মেয়েই তো দরকার।

সুবীরকে এসে বললাম: 'শেলী দস্তক একদিন চায়ের রেস্তোরাঁর ডাকি, তুই তার সঙ্গে আলাপ করে দেখ—ভালো লাগে কি না। শেখবপুস্ত কিছু ঘটলে আমাকে যে দায়ী করবি, তা চলবে না।'

প্রথমটা কি রকম ইতস্তত করলো সুবীর, তারপর রাজি হলো। রেস্তোরাঁর টেবলের দু'পাশের মুখোমুখি দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ওরা। আমি মাঝখানে। কথা শুরু হলো অফিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, তাৎপর্য সেক্সপীর থেকে গ্রেট গার্গো এবং গ্রেটব্রুটেন থেকে রেড চারনা পর্যন্ত এসে বন্ধন আলোচন। কিছু মুখর হলো, আমি ওদের ব্যক্তিগত কথাবার্তার সুযোগ করে দিতে উঠে পড়ে ব'ললাম: 'কিছু মনে করবেন না মিস দস্ত, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, ছুটি পরতালিশে ওয়াটগজে আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে। এখন না উঠলে গিয়ে অপ্রস্তুত হবে। আপনাবা ধীরে শুদ্ধ চা খান, আমি চলি; পরে আবার কোনোরূপে আপনাকে অফিসে বা বোর্ডিং-এ বিং করে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবো।'

কোনোরকম বিস্ময়িত না হ'য়ে 'ঠিক আছে' বলে আমাকে বিদায় বিল শেলী।

এর ঠিক দু'সপ্তাহ বাদে ওরা কোর্টে গিয়ে রেজিস্ট্রারের কাগজে গই করে এলো।

ব'ললাম: 'তবে আর কি, এবারে ঘর বাঁধো।'

হুজনে বোর্ডিং-এর বিল চুকিয়ে এবারে উঠে এলো চাক এভেন্যুর ছোট একটা স্ট্যাটে।

গিয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম: 'কি, হুজনে খুশি তো?'

সুবীর ব'ললো: 'তুই যেখানে বটক, সেখানে খুশি না হ'য়ে উপাধি আছে।'

## মি স শে লী দ স্ত



রঞ্জিতকুমার সেন

শেলী ব'ললো: 'বসুন, এ বেলা এখন থেকে খেয়ে তবে যাবেন।' আপত্তি করলাম না, দেখলাম—রান্নাভোগ চমৎকার হাত শেলীর। ব'ললাম: 'ভালো মুখ করিয়ে দিয়ে কিন্তু ভালো করলেন না মিসেস বোস, এরপর বন্ধন-তখন এসে নিজে থেকেই পিঁড়ি পেতে ব'লে পড়বো।'

—'সে তো আমার সৌভাগ্য।' বলে মুখে হাসি টেনে নিল শেলী।

সুবীর ব'ললো: 'আমার অন্তে তুই তো অনেক করলি, এবারে শেলীর অন্তে একটা থি দেখে দে। নইলে ঘরের কাজ সামলে চাকরী করা ওর পোষাবে না।'

ভিত্ত্বারের কঠোর এবারে শেলী বললো: 'নিজের হুঁটো জগন্নাথ হ'য়ে ব'সে থেকে রতন ঠাকুরপোকে আর কত খাটাতে বলা?'

সুবীর বললো: 'তাতে রতন কিছু মনে ক'রেবে না; কিছু মনে ক'রবার মতো ছেলেই নয় রতন।'

তখন হাসি পাচ্ছিল, কোনোরকমে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সেদিনের মতো উঠে এলাম সুবীরের ঘর থেকে। জানতাম—বৌয়ের মতো কি সংগ্রহ করাও তার নিজের দ্বারা সম্ভব হবে না। দেখে তখন দিন কয়েকের মধ্যে তাই কি-ও একটি সংগ্রহ ক'রে দিলাম।

সুবীর বললো: 'তুই না থাকলে আমি যে কি ক'রতাম, তাই জাবি।'

হেসে বললাম: 'বোড়ি-এ জীবন কাটিয়ে দিয়ে শেষ বয়সে কোনো মঠে-আশ্রমে গিয়ে নিতিস। তোকে নিয়ে হ'য়েছে মুন্ডিল। এবার থেকে একটু চটপটে না হ'লে গিন্নীর কাছে তুই উঠতে-বসতে বকুনি খেয়ে মরবি।'

হয়তো এবারে শেলীর চিরকালের গৌতো-স্বভাবটাকে গ্লিহবর্তন ক'রে নেবার জন্তে কিছুটা তৎপর হ'য়ে উঠতে চেষ্টা ক'রলো সুবীর।

এমনি ক'রেই কিছুকাল কেটে গেল।...

একদিন সন্তান এলো শেলীর কলে। সুবীরের বিবাহিত জীবনের প্রথম ফল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। ছেলেই চেয়েছিল সুবীর।

বললাম: 'এবারে ঘর তোর পূর্ণ হ'লো।'

—'হর তো হ'লো।' কিন্তু—'

—'আবার কিছ কি রে?'

সুবীর বললো: 'শেলীর ইচ্ছে ছিল না, একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে আমাদের সন্তান হয়।'

—'তবু হ'লো।' বললাম: 'তা—ছেলেকে কোলে পেয়ে এবারে তা খুশি তোর স্ত্রী?'

সুবীর বললো: 'খুশি হ'লে আমি নিশ্চিত হতাম, কিন্তু কেমন যেন সবসময় ছেলেকে ও এড়িয়ে চলতে চায়। আগে যদি এতটা বুঝতাম—'

—'তবে বাপ হতিন্স না, এই তো?'

—'কিন্তু সন্তান পেয়ে কোনো মেয়ে খুশি হয় না, এটা আমার ধারণা ছিল না।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'বিয়ের পর এ ব্যাপারে তোরা কোনো আণ্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এসেছিলি?'

—'মনে পড়ে না।' সুবীর বললো: 'তবে এটা বুঝেছিলাম—শেলী সবসময় ফ্রি থাকতে চায়। পারিবারিক মেয়েদের মতো এক জায়গায় স্থায়ী হ'য়ে থেমে থাকতে চায় না সে।'

বললাম: 'কিন্তু আমি যখন তাকে কনট্রোল ক'রেছিলাম, তখন তো এরকম কোনো মনোভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করি নি। সে-ও তো সংসারই চেয়েছিল।'

ভারীকণ্ঠে সুবীর বললো: 'হয় তো কোনো পুরুষের সাহচর্যে গৃহজীবন চেয়েছিল, কিন্তু সন্তান চায় নি।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'ছেলে কি তা' হলে বিয়ের কাছে থাকে, মায়ের বুকের দুধটুকু অবধি পায় না ছেলে?'

এবারে আমার মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল সুবীর।

বললাম—ব্যাপারটা কিছু জটিল। কিন্তু আমার নিজের উপরেও লজ্জা এলো বড় কম নয়। ঝেঁটো আমিট ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম;

শেষ পর্যন্ত সুবীর যদি সুখী না হয়, তবে—

বললাম: 'ও-সব কিছু না, দু'দিনেই ঠিক হ'য়ে যাবে। আমি বরং সামনের র'ববার তোর দ্বার সঙ্গে মিট, ক'রেবা।'

কিন্তু র'ববার অবধি কাটলো না। বুঝবার পর শুক্রবার সন্ধ্যার ছুটেতে ছুটেতে আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সুবীর।

জিজ্ঞেস ক'রলাম: 'কি ব্যাপার? ঘামে যে একেবারে নেয়ে উঠেছিস।'

কমকণ্ঠে সুবীর বললো: 'শেলী চলে গেছে।'

—'চলে গেছে মানে?'

সুবীর বললো: 'শেলীর তো ছুটাই চলছিল, আমি অফিস থেকে এসে ওর আর খোঁজ পেলাম না। কি বললো—মা সেই যে কখন বেরিয়েছেন, আর ফেরেন নি।—ব'লে একটা যুগবন্ধ-করা খাম আমার হাতের সামনে এগিয়ে ধরলো কি। খুলে পড়েই মাথাটা ঘুরে গেল। শেলী লিখে রেখে গেছে: আমি তোমার এখান থেকে চল বাচ্ছি। চাকরীতেও রেজিগনেশন দিলাম। মিছেমিছি আমার কোনো খোঁজ করতে চেষ্টা কোরো না। খোকন রইল, ও একান্তই তোমার, আমার নয়। পারো তো আমাকে তুমি ডাইভোল কোরো। তোমার উপর আমার কোনো দাবী থাকলো না।'

আকাশ থেকে পড়ে বললাম: 'বলিস কি? কখনও স্বগড়া করিস নি তো?'

সুবীর বললো: 'স্বগড়া ক'রতে চেয়েও আজ অবধি তার অবকাশ পেলাম কোথায়? আজ অবধি শেলীকে তো শুধু ভালই বাসলাম রে।'

—'সো আনস্বেরুনেট ইউ আর।' বললাম: 'কিন্তু তোর পক্ষে চূপ করে থাকা উচিত হবে না। অন্তত থানার এভাবে একটা ডায়রী ক'রে রাখা উচিত হবে যে, ছেলে হবার পর থেকে শেলীর মাখার কি রকম গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল, হঠাৎ সে এই চিঠি যেনে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা : ডাঃ কাণ্ডিকচন্দ্র বসু এম-বি

৪৫ নং আমহার্ট ষ্ট্রিট ● কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-১১১৭

আম-ক্যালঅপটিকো

## মিয় শেলী সত্ত

ভাই করলো 'সুবীর'। আমাকে ওর ছায়াসঙ্গী হ'য়ে ঘুরতে হ'লো।  
রেডিও-ওয়ানআউলমেন্ট আর মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়া থেকে শুরু  
করে থানার ডায়েরী কব্বা অবধি কোনো চেষ্টারই ফলটো রাখা হলো না।

কিন্তু দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল  
না শেলীর। সুবীরের ছেলের দায়িত্ব এবারে বাধা হ'য়ে কিছুটা আমার  
পরিবারে এসে প'ড়লো। এ ছাড়া সুবীরে ও দ্বিতীয় পথ ছিল না।

কিন্তু ভাইভোসই কি করতে পারলো সে শেলীকে? তার জন্তে  
শেলীর উপস্থিতি চাই, বোঝাপড়া চাই; কিন্তু কোথায় শেলী?

নেই। যে এন্ফোস'মেন্টের ভয়ে সারা দেশ কাপে, তারও  
কোনো হিন্দিস এনে দিতে পারলো না শেলীর।

এমনি ক'রেই অনেককাল কেটে  
গেল। সেই সঙ্গে হয়তো সুবীরের  
মন থেকে শেলীর অস্তিত্বও দূরে দূরে  
রান হয়ে এলো।...

সেদিন দুপুর না গড়াইই আমাকে  
এসে টেনে নিয়ে বেরলো সুবীর ঘর  
থেকে।

জিজ্ঞাস করলাম 'কোথায়  
যাবি?'

সুবীর বললো: 'চুপচাপ ঘরে  
পড়ে থাকতে ভালো লাগছিল না।  
ভাবলাম—চৌরঙ্গীপাড়ার কোনো  
হাউসে কিছু একটা লাইট হিন্দী ছবি  
দেখে কাটাই। মনটা হালকা হবে।  
হু'টো টিকিট কেটে নিয়ে এলাম তাই  
'ছনিয়াক' নাম পাছশালার'। চল,  
বেরিয়ে পড়ি।'

সাধারণত হিন্দী ছবি আমি  
দেখি না। ক্রটিতে বড় বাধে।  
তবু সুবীরের জন্তেই বেরোতে  
হলো।

পূর্বায় যে হু'টো প্রধান নাম  
পাওয়া গেল, তাদের একজন নবাগতা  
ললিতা আনন্দ, আর একজন দেবপ্রী  
পাথের।

ছবি শুরু হলো ললিতা আনন্দের  
ভূমিকা দিয়ে। পূর্বায় তার আবির্ভাবের  
সঙ্গে সঙ্গেই আমি আর সুবীর  
হু'জনেই চুপকে উঠলাম। বললাম:  
'এ কি, এ যে অবিকল শেলী!'

সুবীর বললো: 'অবিকল নয়,  
শেলী নিজেই। হয়তো এই তবে  
ওর ইচ্ছে ছিল। ছেলেকে ফেলে  
জেপে নাম ভাড়িয়ে তাই ও গিয়ে  
বোম্বের কিনে নেমেছে।'

জিজ্ঞাস করলাম: 'শেলী সম্পর্কে তুই তবে কোনো সন্দেহই আর  
রাখিস না?'

—ছবি দেখবার পর আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।  
থেকে সুবীর বললো: 'আমি অনাচায়ে ওর এগেনস্টে কোর্টে এখন  
কেস আনতে পারি।'

বললাম: 'তাতে যত না লোক হাসাবি, তার চাইতেও ছোট  
হবি তুই নিজেকে।'

সুনে অনেকক্ষণ কথাটা নিয়ে ভাবলো সুবীর তারপর হঠাৎ সিট  
ছেড়ে উঠে পড়ে বললো: 'ছবি দেখা আমার হয়ে গেছে, চল, বেরিয়ে  
পড়ি।'



এই লুকম ঘটনাই ঘটে.  
সময় লাগে তেল মাথায় রেখে চুল উঠে যায়...  
তাই আমরা প্রত্যেক নারীরাই চুলের যত্ন  
সময় জন্ম  
**ইলোরা** কুঁচ অয়েল  
ব্যবহার করেন

ইলোরা কেমিক্যাল • কলিকাতা-২





## মিস শেলী দত্ত

একটি নারীর পোর্ট্রেটকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল—কি জীবন্ত! ভেবেছিলাম—খোকনকে নিয়ে সুবী আমার পাশেই আছে। ছবির দিকে দৃষ্টি ফেলেই বললাম: ‘দেখ, তাকিয়ে দেখ—হাউ লিভি এ্যাণ্ড ওয়ান্টারফুল!’

পাশ থেকে অকস্মৎ একটি নারীকণ্ঠ এসে কানে বাজলো: ‘হাউ ওয়ান্টারফুল দিস ল্যাণ্ডস্কেপ!’

তাঁকাত্তে যেতেই হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো: ‘মিসেস বাস আপনি!’

ততক্ষণে সুবীর এসেও আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার হাতের মুঠোর খোকনের হাত। শেলীকে চিনতে তারও বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি। সঙ্গে তার খুব সম্ভব পাঞ্জাবী কি বোম্বেওয়ালা এক ভদ্রলোক।

হঠাৎ এবারে সুবীটানা চোখ দুটোকে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো শেলী। তারপর আদ্যো বাস আধো উর্ধ্ব মিশিয়ে বললো: ‘কাকে বলছেন? বোধ হয় ভুল করছেন আপনি!’

সুবীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—দু’সেকেন্ডের মধ্যেই ঘামে সে স্নান করে উঠেছে। কিছু বলতে চাচ্ছে না, অথবা বিহুভিন্নাসের মতো হঠাৎ ফেটে পড়তে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না।

এবারে খোকনের দিকে ইঙ্গিত করে শেলীকে বললাম: ‘আমি ভুল ক’রলেও আপনি বোধ করি খোকনকে ভুল করবেন না; ওর মুখে রয়েছে আপনার মুখের আদর্শ, ওর শরীরে রয়েছে আপনার দেহের রক্ত!’

—‘আপনার কি মাথা খারাপ? এসব কি বলছেন আপনি?’ বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার সঙ্গীটিকে বললো: ‘লেট আস গো নাউ আনন্দ, প্রিজ কুইক,’ বলেই সঙ্গে সঙ্গে দু’জনে বাইরের দাঁকা লদে গিয়ে একটা মোটরে চেপে বসলো।

খোকনকে কালো তুলে নিয়ে বললাম: ‘ঐ যে মা চলে যাচ্ছে, ডাক না?’

খোকন হাত বাড়িয়ে ডাকল: ‘মা’।

কিন্তু তবু শেলী কিয়লো না, গাড়ি নিয়ে লন ছেড়ে রাস্তার পিঠে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণ যে নারী পোর্ট্রেটটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল—লিভি এ্যাণ্ড ওয়ান্টারফুল, এবারে মনে হলো—সি ইজ নাথিং বাট ডেড এ্যাণ্ড আগলি।

# লেক্সিন

## সর্প দংশনের স্বাবিজ্যাত মহৌষধ

সর্পপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে। কাকড়াবিছা  
ও অন্যান্য বিষাক্ত দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

“Snake Bite” পুস্তক আবার পাওয়া যাইতেছে; দাম ৫/-

বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয়।

পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম

কলিকাতা অফিস:

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫

# অভিনয়ের নায়ক

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

পূর পর হিনটে 'টেক' নষ্ট হল। 'কাট' এই শব্দটা শেষের  
বারে অত্যন্ত বিকৃতভাবে উচ্চারণ করল দিবাকর। ফরেন  
এক্সপ্রেসের এট কন্ডাক্টর যুগে পাঁচ-শ' ফিটের মত 'র' যিচ্চা নষ্ট হওয়া  
মানাই গায়ের রক্ত ঝল ২-য়ে। প্রডিউসার দীপচাঁদ আগরওয়ালা  
সামনে ঝাঁড়িয়ে ৩টি দেখছিলেন। গোমড়া মুখ করে তিনিও ঝাঁড়িয়ে  
রইলেন।

পেইন্ট-বক্স নিয়ে মেক-আপ-ম্যান নিতাই দাস এগিয়ে এল।  
ঘেমে উঠেছে হিরেটিন রক্তা রায়। ফর্সা গাল চুঁরে চুঁরে ঘাম গড়িয়ে  
পড়ছে। হোটের লিপস্টিকের লাল রঙ চিবুকে গড়িয়ে একাকার।  
নিতাই দাস তাড়াতাড়ি পেইন্ট বক্স হাত দিল। হিরোইন রক্তা  
রায়ের মুখটাকে আবার মেরামত করে তুলতে হবে।

: হচ্ছে না। একদম হচ্ছে না। প্রজ্ঞোতকুমারের দিকে তাকিয়ে  
বলল দিবাকর। গেরুগা রঙের পাঞ্জাবী আর ধূতিপরা হিরো প্রজ্ঞোত-  
কুমার তখন একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। একটু অপেক্ষান্তের হাঙ্গি  
হাসল।

: অভিব্যক্তি 'শব্দটা কি আপনার অভিধান থেকে উঠে গেল না কি  
মশায়? ই-রাজ্যেত যাকে বলে এক্সপ্রেশন। দিবাকর বলতে  
লাগল। সিচুয়েশানটা কিছুতেই আপনাকে বোঝাতে পারলুম না।  
পন্ট, এদিকে এস তো  
একবার।

ফা ই ল হা তে  
পাংলুনপর' একটা বছর  
পচিশেক বয়সের ছেলে  
এল। জ্যা সি স্ক্যা ট  
ডাইরেক্টর পন্ট, সেন।  
সিনটা আর একবার  
পড়তো পন্ট।

পাঁচ মিনিটের একটা  
টেক। হিরো তার দ্বীকে  
নিয়ে বেড়াতে এসেছে  
এ ই সমুদ্র-নিবাসে।  
অবিখ্যাসিনী জ্ঞা' সঙ্গে  
প রি চয় হয়েছে এক  
জমজকারী ভঙ্গলোকের।  
দিনে দিনে তাদের  
য নি ঠ তা বেড়েছে।  
একদিন সমুদ্রের ধারে  
অবিখ্যাসিনী জ্ঞা আর  
আর সেই ভঙ্গলোক এসে  
বসেছে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।  
এ ম ন সময় সেখানে



আসবে খামী। দ্বীকে সেই অবস্থার দেখে ওর চোখ দু'টো নেকড়ের  
মত জ্বলে উঠবে। আর তখনই সে স্মৃগার্ট নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে  
পড়বে লোকটির ওপর।

কাইলটা বন্ধ করল পন্ট, সেন। দিবাকর বলল: এবার বুঝতে  
পারলেন, আপনার সমস্ত এক্সপ্রেশন ফুটিয়ে তুলতে হবে চোখে।  
ত্রিশ সেকেন্ড আপনার চোখের স্কোজ-আপ নেওয়া হবে। দরকার  
হলে আরও বেশি সময় আমি দিতে রাজি। কিন্তু মাইণ্ড জাট  
আপনার চোখ। বুঝতে পারলেন না, যাকে সবচেয়ে ভালবাসতেন,  
সে অবিখ্যাসিনী, পরপুরুষের কোলে মাথা রেখে বসে আছে। সে  
অবস্থার একজন পুরুষের এক্সপ্রেশন যা হওয়া উচিত।

কুমাল বার করে মুখ মুছল দিবাকর। কথা বলতে বলতে  
হাঁফিয়ে উঠেছে।

: এককাপ চা খেয়ে নেই দিবাকরবাবু। একটু সবুজ কক্কন।  
নিখিল সান্যাল। এ ছবির ভিলেন। হিরোইন রক্তা ভিলেন  
নিখিলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে।

চটপট করে নিন নিখিলবাবু। রোদ্‌দুইটু চলে গেলে আবার  
হা-পিতোশ করে বসে থাকতে হবে।

হিরোইন রক্তা রায়ের সঙ্গে চাকর আছে। রান্না থেকে চা ঢেলে  
চাকর এগিয়ে দিল চায়ের কাপ। রক্তা রায় বলল: আরও দুটো  
প্রজ্ঞোত খাবে. নিখিলবাবু পাবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রজ্ঞোতকে বলল রক্তা।

: আজ দেখছি কাজে তোমার মন নেই।

: কি করে বুঝলে? একটা সীন তিনবার টেক করতে হলে  
কার মেজাজ ঠিক থাকে। ডিরেক্টর যেন আমরা আর কোনদিন  
দেখি নি। ও নিজেকে মনে করে ফেলিলা বা আইজেনস্টাইন। এমন  
জানলে এ ছবির কাজ নিতুম না আমি।

: ও কথা. ভাল না প্রজ্ঞোত। এক বছর তুমি কাজ পাচ্ছিলে না।  
তুমি বলেছিলে বলেই না আমি দিবাকরবাবুকে ধরে ব্যবস্থা করিয়ে  
দিলাম। দিবাকরের ছবিতে হিরোর চাপ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

আবার মুখটাকে বিকৃত করল প্রজ্ঞোত। বত সব।

সমুদ্র এখন শান্ত। হাওয়া নেই। তাই ঝুটি হতে পারছে।  
আকাশের ভাষগতিক ভাল নয়। মেঘ করতে পারে। দিবাকর  
তাড়া লাগাল: ঝি-রেডি, ঝি-রেডি।

প্রডিউসার দীপচাঁদ বলল: দেখবেন দিবাকরবাবু। এবার  
যেন আর 'র' যিচ্চা নষ্ট না হয়।

দীপচাঁদের কথার উত্তর দিল না দিবাকর। এ কথার উত্তর  
হয় না। ওরা ওরকম বলে। শিল্পের ধার ধারে না। পুরোপুরি  
ব্যবসায়ী।

রেডি রেডি।

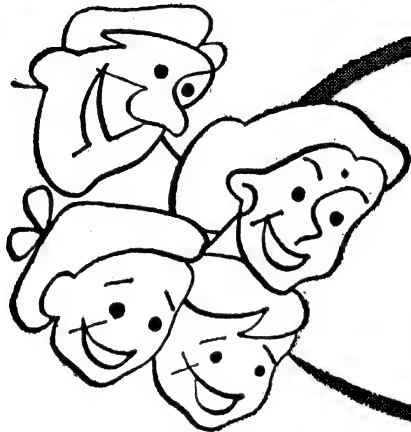
তাড়া লাগায় দিবাকর। আবার সিচুয়েশন আর সিকোয়েন্স  
বোঝাবার জজ্ঞে খাতা নিয়ে আসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পন্ট, সেন।

আগে রিহাঙ্গিগলটা হয়ে যাক। সমুদ্র-সৈকত। সামনে ঢেউ  
এসে আছে ডে পড়ছে। সৈকতে বসে আছে নিখিল। পরনে  
পাঞ্জামা, পাঞ্জাবী, চটি। তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে রক্তা।

নিখিল বলবে: তোমার চুলে আজ কি তেল মেখেছ সন্ধ্যা?

রক্তা বলবে: স্কোজ বে তেল মাখি।

# ফিলিপ্স



আমি

মিল্ক অফ  
ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের  
পক্ষেই আদর্শ

## বিবেচক-অম্লনাশক

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে!  
কেবলমাত্র একটিই খাটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া  
আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-  
নিরোধক কোষ্ঠ পরিকারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার  
করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও  
সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়ার  
চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।



প্রস্তুতকারক রেজিটার্ড ব্যবহারকারী: দে'ক'মেডিকেলস্টোন্স (ম্যানু) প্রা: লি:

IPB/MOM-L-1/64/8

নিখিল : কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তোমার চুলের বনে গন্ধরাজেরা মেলা বসিয়েছে।

রত্না : আচ্ছা কেন এমন হয় বলতে পার ?

নিখিল : কিসের কথা বলছ কি করে জানব ?

রত্না : এতদিনের তৈরি হিসেব সব কেন এমনি করে ভুল হয়ে যায়।

ঠিক এই সময় ঢুকবে প্রোডাক্ট।

: বাস, বাস। ঠিক হয়েছে প্রোডাক্টবাবু। এতেই চলবে। নিন এইবার শুরু করা যাক।

: সাউণ্ড ?

: রেডি।

: ক্যামেরা ?

: রেডি।

: স্টার্ট।

ক্ল্যাপশিট কটা বাড়ির দরল পন্ট সেন। মাইক এগিয়ে গেল ওদের মুখের কাছে। ক্যামেরার ঘর ঘর আওরাজ উঠল।

: কাট।

অর্ডারনা করে উঠল দিবাকর। ক্যামেরা খেমে গেল। সাউণ্ডভ্যান নিখর, নিমন্তক। নিখিলের কোল থেকে মাথা তুলে উঠে পীড়াল রত্না রায়।

আর সেই মুহূর্ত দীপটাদ আগরওয়ারায় মুখ দেখলে মনে হত তিনি বুঝি এখনই কঁদে ফেলবেন। কি ডিরেক্টরের পাল্লায়ই যে পড়েছেন দীপটাদ। 'বেলাভূমির গান' ছবির পাঁচ হাজার ফিট তোলা হয়েছে, তার মধ্যে দু'হাজার ফিট বরবাদ। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না দিবাকরের।

: আজ থাক। আজ আর হবে না আপনার।

বিব্রত প্রোডাক্ট সসকেচে উঠে পীড়িয়েছে। এবার বিরক্তি তার চোখে।

: আজ আর মর। আজকের মত স্টুটি শেষ। দিবাকর টেবিলে বলল।

ক্যামেরাম্যান তার ইউনিট নিয়ে প্যাকিং করছে। সাউণ্ডভ্যান স্টার্ট নিল।

গুপু পন্ট সেন কাছে এসে বলল : আর কিছু দরকার আছে দিবাকরনা।

: না। চারজন একট্রী জোগাড় করতে হবে কাল। চাওজন জেলে। সমুদ্রে মাছ ধরার এক সীল আছে। কাল দু'খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ।

: কাল রাতের ট্রেনে আমি চলিয়ে যাবে।

ফিরে তাকাল দিবাকর—দীপটাদ।

: কিলিম একই কম খরচ কজন দিবাকরবাবু। গডন'মেন্ট তো ফোটা করে দিয়েছে। এদিকে আমার আর চারখানা ছবি পাড়ে আছে। পরন্তু দিল্লি বার্ষিক। রেড্ডী সাহেবের সঙ্গে ব্যক্তিগত হবে।

দিবাকর উত্তর দিল না। গুপু সিগারেটের টিনট এগিয়ে দরল দীপটাদের সামনে।

: লেकिन রত্না দেবী, তুমি মনে করছেন না তো ? এই যে পাঁচ-

পাঁচটে টেক বরবাদ গেল। অবশ্য উনি খুব ভাল আদমি আছেন। বোম্বের জামলীর মত না। জামলীর বা মেজাজ মশায়! বললে বিশওরাস করবেন না। একদিন হল কি—

বক বক করছে দীপটাদ। দিবাকর এসব কথাই পাত্তা দেয় না। প্রডিউসারদের খুব পাত্তা দিতে নেই। তা হলে ডিরেক্টরের ভার চাকর মনে ভাবে। দিবাকর চাকর নয়—সে শিল্পী। ক্যান ফেস্টিভালে তার তোলা ছবি তিনবার প্রথম হয়েছে। একবার বেস্ট অ্যান্টি-হু'বার বেস্ট ডাইরেকশন। চারবার তার ছবি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

প্রোডাক্টমারকে চালটা দেওয়াই অসম্ভব হয়েছে। কিন্তু রত্না রায়ের জন্তে। প্রোডাক্টওরই সাজেসান। মরত প্রোডাক্ট যে ছবিটাকে ডোবাবে তা জানত দিবাকর।

এককালে ক'খানা ছবিতে ভালই নাম করেছিল প্রোডাক্টমার। শেষের কটা ছবি রূপ করল। প্রোডাক্টমারকে এখন আর কেউ ডাকে না।

প্রোডাক্ট এখন রত্নার অল্পগৃহীত। এককালে ওরা দু'জনে পর পর ক'খানা ছবিতে অভিনয় করেছিল। সেই থেকে প্রোডাক্টের ওপর রত্নার দুর্বলতা। কেউ কেউ মতিয়েছিল, রত্না আর প্রোডাক্টের বিয়ে হয়েছে গোপনে। কিন্তু না সে সব মিথ্যা কথা। তবে প্রোডাক্ট এখন রত্নার কাছেই থাকে। রত্নার আশ্রিতের মত।

মধ্যে পাড়ে নিখিলের অভিনয়টা হরত ভুটেবে না। বাট হাজার টাকার হিরোইন রত্নারও নয়। নিখিলেরও নাম আছে বাজারে। তার রেট পঁচিশ হাজার। নেহাৎ বরদটা বেশি বলে নারক সাজতে পারে না—কিন্তু উপন্যাস হিসেবে তাকে নিয়ে কাজাকাড়ি।

টিপ্ট থেকে চা ঢালতে ঢালতে হিরোইন রত্না জিজ্ঞাসা করল : আপনার ক'চামত ?

দীপটাদ বলল : হামি তো সুগার খাই না।

দিবাকর বলল : হুই।

নিখিল বলল : তিন।

: আপনি তো বড় বেশি মিষ্টি খান। হিরোইন রত্না বলল।

: তুমি হাতে করে দিলে অবশ্য মিষ্টি না দিলেও চলে। একটু হোসে বলল নিখিল।

দিবাকর লক্ষ্য করল হাসলে ভাল দেখার নিখিলকে। বেশ সুন্দর অ্যালেল আসে। এই অবস্থায় যদি একটা মিড শট নেওরা যায়।

বেলাভূমির গানে একমাত্র রত্না রায় ছাড়া আর কাউকে মিয়েই আগে কোন ছবি করার নি দিবাকর। প্রোডাক্ট নতুন, নিখিলও নতুন তার ছবিতে।

নিখিলের সঙ্গে রত্নার যে এত ঘনিষ্ঠতা আছে তা জানত না দিবাকর। কিন্তু রত্নার অনেক কিছুই জানা যায় না। কাছে থেকেও অনেক কিছু বোঝা যায় না।

হোটেলের এই চা-চাক্রে প্রোডাক্ট মেই। দিবাকরের রূপ এখন একটু পড়েছে। ভাল : যেচার—এককালের ডাকসাইটে হিরোর আজ কি অবস্থা। একদিন বোম্বাই থেকেও ডাক এসেছিল প্রোডাক্টমারের। প্রোডাক্ট যায় নি।

## বড়ি বয়েস নায়ক

লোকে বলত : রত্নাই যেতে দেয় নি।

সমস্ত বিনটা কোথা থেকে কেটে গেল দিবাকরের। এখনও চারদিন ইন্ট্রান্ট এখানে থাকবে। আর একসেট অভিনেতা-অভিনেত্রী এসে পৌঁছবে কালকের ট্রেনে। কয়েকটা সোলেশান ঠিক করতে হবে। ক্যামেরা, সাউণ্ডবক্স, রিক্রেক্টর, কুন্সিদের মজুরি। হিরোইন রত্না রাত্রে পাওয়া বি-এর লুটি আর কচি পাঠার মাংস খান—তার বন্দোবস্ত।

হাবে হাবে সিনেমাকে আট বলে মনে হয় না। ইণ্ডাস্ট্রি বলে মনে হয়। আর সে যেন সেই ইণ্ডাস্ট্রির ম্যানেজার। ঠক ঠক করে দরজার শব্দ হয়। কে নক করছে। সজা হয়ে এসেছে। টাকার হিসেব করছিল ঘরে বসে। দিবাকর বিরক্ত হয়ে দরজা খুলল—প্রভোতকুমার।

: কি ব্যাপার? সারাদিন কোথায় ছিলেন?

: জরোঁছলাম ঘরে। মাথা ধরেছিল খুব।

: এখন কেমন আছেন? কাল স্ট্রিক করতে পারবেন তো?

: করতেই হবে। আমি দুঃখিত দিবাকরবাবু। আপনার ডিরেকশন বুঝতে পারছি না। মানে আমি ঠিক—।

: মিন সিগারেট খান। শুধু সিগারেট কেন? ড্রয়ার থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করল দিবাকর। কাচের মাসে ঢেলে এগিরে দিল। ভাল জিনিষ মশায়। সেবার ক্যান থেকে এনেছিলুম। এইটুকু বাকি ছিল।

রাতের বরষা বাড়ে। সাতটা-আটটা।

: চলুন একটু ঘুরে আসি। সমুদ্রের ধারে এই জ্যোৎস্না রাত্রে—বুকেছেন না? প্রভোতকুমার করল প্রজোত।

সমর্থন করল দিবাকর : মন্দ না। হাতে কাজকর্ম নেই এখন।

: অভিব্যক্তিটা ঠিক আসছে না। বুঝতে পারছি আমি। তবে কি জানেন, কেমন যেন হুড় আসছে না। যেতে যেতে বলল প্রজোত।

সমুদ্রের এখন উত্তাল। চাঁদের আলো পড়েছে ঢেউয়ের ওপর। ক্রেশোর পাতের মত জল জল করছে। আবোল-তাবোল বকে বাচ্ছে প্রজোত। কিছু হল না বুঝলেন। কত আশা! ছিল। এমন করে যে কেন গৈকে গেলাম। পকাশ হাজারের কম ছবি করি নি। এখন পাঁচশ' টাকা পেলেও করি।

কারা বসে আছে সমুদ্রের ধারে। দূর থেকে ছাঁরার মত দেখার একজন পুরুষ। তার কোলে মাথা রেখে নারী একজন।

ঠিক সকালে এই দৃশ্যটাই স্ট্রিক-এ ছিল। কাছে এগিয়ে গেল ওরা। মূর্তি দু'টি নিখর নিশ্পাল। পুরুষের গলাটি দু'টি কোমল বাহ দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে নারী।

আরও কাছে এগিয়ে গেল ওরা। আরও কাছে। কি আশ্চর্য। বারাসে আছে, তাদের ক্রক্ষেপ নেই পিছনে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে ওরা।

এবার নিকটতম সান্নিধ্য থেকে ওদের দেখল দিবাকর। বাট হাজার টাকার হিরোইন রত্না বার। আর নিখর নিশ্পাল পুরুষ মূর্তিটা নিখিল।



সেই মুহূর্তে প্রজোতের মুখের দিকে চাইতে গিয়ে নির্বাক হয়ে গেল দিবাকর। প্রজোতের চোখ দু'টো নেকড়ের চোখের মত ধক ধক করে জ্বলে। আর সেই চোখ থেকে মূর্তী মূর্তী ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ছে বেলাহুসিতে। একটা জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে প্রজোতকে। এখনই যেন জানোয়ারটা লাকিয়ে পড়বে।

আর সমুদ্রের সেই জুক গর্জনের মাঝে চিংকার করে টেচিরে উঠতে ইচ্ছা করল দিবাকরের। কি ভয়ানক 'অনিপুণতাবই' না নেকড়ের মত চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছে প্রজোতের। পর পর চারটে টেক করেও যে অভিব্যক্তিটুকু ওর চোখে-মুখে ফুটে ওঠে নি—সেই অভিব্যক্তিটুকুই অত্যন্ত নিখুঁত হয়ে ওর মুখে এখন ফুটে উঠেছে।

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে আপনার ডিক্ল্যান

# মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত  
কোন বাড়তি খরচ নেই  
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো  
(প্রাঃ) লিঃ  
১১৭, কেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬  
ফোন : ৩৫-৩০৪৮  
দুইবার বাতীত প্রত্যহ সন্ধ্যা ১০টা  
ছইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

একটা বছর ঘুরে এল। লেট ঘুরে এসেছে আবার।

সিস্টারদের আত্মরুদ্ধতার সময় এটা। আর দেশীয়দের মধ্যে ভয় আঁব চাপা উত্তেজনার। প্রতি মুখে কংগো-গ্রীষ্মের নিদারুণ শ্রান্তির ছাপ পড়েছে। তবু ক'জন নাসিং সিস্টারের মত আর কারো মুখেই নয়। সংখ্যার তারা এখনও বড় কম।

সেজন্ম মাদার ম্যাথিল্ডার উদ্বেগের সীমা নেই। প্রচণ্ড গরমের এই ক'মাসে নিয়মিত গুদের এক একজনকে সফরের সংগিনী করেছেন, যাতে গুদের মনটা অস্ত্রত কিছুটা বিশ্রাম পেতে পারে। টিচি নানদের কাছে সব সময় আভাস দিয়ে রাখেন যে এবটা ক্লিনিক পরিদর্শনে যেতে হবে, অথবা টিকা দেবার পদ্ধতি শেখাবার ডাক এসেছে একটা স্কুল-মিশন থেকে। স্কুল-মিশনটার ওপর সাধারণ্যে টিকা দেবার ভার পড়েছে।

এই বছরের মধ্যে সিস্টার লুক দু'বার গিয়েছে তাঁর সংগে। গিয়ে দেখতে পেয়েছে তার স্বপ্নেদেখা আফ্রিকার রূপ। কুয়াশাহ্রম নদীপথ পেরিয়েছে বখন পিয়াওয়াতে চড়ে, দু'ধারের তীরে দেখেছে নিবিড় অরণ্য। কালা মাঝির দল লগি মেরে নৌকো ঝেরে নিয়ে যেতে যেতে একঘেয়ে স্বরে গান গায় একটানা। মাদার ম্যাথিল্ডা অনেক সময়ই সামনেটার এসে দাঁড়াতেন সমুখপানে মৃদুদৃষ্টি মেলে... যেন সবার আগে উপভোগ করতে চান... নদীর বাঁকে বাঁকে যে রমণীয় স্বর্গশোভা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে দাঁড়ের আঘাতে তার নিস্তকতা ভগ্ন হবারও আগে। গন্তব্যস্থানে নৌকো ভিড়লে ছোটছেলের মত ক্রুর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। যাত্রার এই সমাপ্তিটা তিনি সহিতে পারেন না কিছুতে—অন্তরঙ্গ স্বরে একবার বলেও ফেলেছিলেন কথাটা।

সিস্টার লুকের অন্তরে গোপন আশার ভাঙা-গড়া। ইয়োয়েপীয়াসনের এই হাসপাতালে দারিহকাল তার শেষ হয়ে গেলে নিশ্চয়ই শুধু দেশীয়দের সেবা-মিশনে বদলি হবে সে। আর বছর কয়েকের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে আপন। হতেই বদলি পাওনা হবে তার। যে নিয়ম কোন বিশেষ কমিউনিটি, কোন বিশেষ কাল, কোন বিশেষ

কারাগার প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তি রদ করে তারই বলে।... ক্ষতির মধ্যে এক মাদার ম্যাথিল্ডাকে হারাতে হবে। তবে ঐ নিয়মটা অপিরিয়রদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য, নির্দিষ্ট সময়ান্তে তাঁদেরও নতুন কমিউনিটির ভার নিতে হয়। কাজেই তাদের এই ক্রুর জনগণে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকেই।

এখন সে করার নান হয়েছে। এখানে আসার পর এই কমিউনিটির ক্যাণ্টাইনিস্ আর স্কুলের গানের টিচার সিফার মারভিয়েনস্ তার কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কিন্তু তার ডবল ডিউটির ভক্ত মাদার ম্যাথিল্ডা রাজী হন নি তাকে করার দলে যোগ দিতে দিতে। দেশের ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেই গাফিকা নানদের রীতিমত শক্তিকর হয়।

আর এখন সে প্রায় বছরখানেক ধরে করেছে গাইছে। ফাদার ভেরময়লেনের শেষ আগমনের সময় থেকে হিসেব করে তারিখটা সে বলে দিতে পারে।

...সেই শেষবার ফাদার ভেরময়লেনের আসা। টেক্টলসোর ফলাফল জানানোর দারিহটা দু'কটিন মনে হয়েছিল।

অস্ত্রবটা বখন অসহায়ভাবে সে দারিহ পালনের ভক্ত শক্তি সংগ্রহে লিপ্ত, তিনি নিজেই প্রসঙ্গে তুলে কথাটা সহজ করে দিলেন।

—কি হ'ল সিস্টার, এখনও নয়? মনে মনে আমি কুঠরোঙ্গী, দেহটাই বা না হবে কেন বল তো?

মাদার ম্যাথিল্ডাকে কথাটা বলতে গিয়ে বরষর করে কেঁদে ফেলেছিল। ঈশ্বরের হারবিচারের এই অযোগ্য প্রকাশে আত্মা করবার মত কিছু খুঁজে পায় নি, কোভটুকু অপ্রকাশিত থাকে নি।...এর অল্পদিন পরে করেছে স্থান পেল সে।

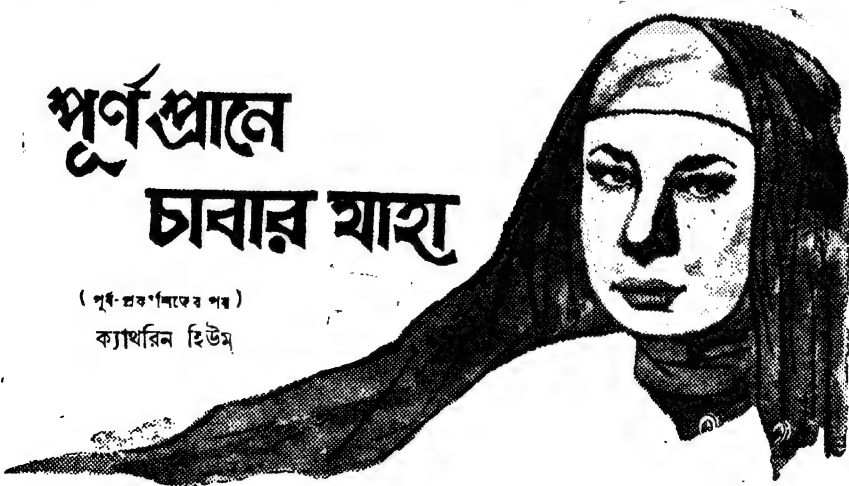
উত্তরকালে অনেক সময় নিজেই সবিষয়ে ভেবেছে দু'টোর মধ্যে যোগাযোগ কিছু ছিল কি না।

এবার প্রথম ইক্টারের অল্পষ্ঠানে সে গাইবে।

...আকাশের রঙটা লালচে, বখন-তখন হঠাৎ একপললা বৃষ্টি বরিয়ে দেয়।...

## পূর্ণপ্রাণে চাবার থাশ

(পূর্ণ-প্রবর্তিতের পর)  
ক্যাথরিন হিউম



## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

প্রত্যহ সকাল দশটা থেকে এগারোটো একপ্রহর আর বিকেলে তিনটে থেকে পাঁচটা একপ্রহর ওরা গানের সময় দম রাখা অভ্যাস করে।

করে বখন মাঝে-মাঝেই স্থবরাবেগের প্রাবল্যে সমস্ত অঙ্গর আচ্ছন্ন হয়ে আসতে চার কেনে বেনে... বেনে দেখে দেশীয় ছাত্রদের নিয়ে গান গাইছে জংলের মধ্যে বসে ১০০ পানি গাইতে গাইতে কণ্ঠে আরও বেশি আবেগ বোগ করে দেবার ভক্ত আকুল হয়ে ওঠে মন, ক্যাট-টাইসের প্রতি বিরক্ত সমালোচনার তীব্র হয়ে উঠতে চার ১০০ পরক্ষণেই সখিৎ ফেরে বখন, আপনাদের অধিকারের গণ্ডির ওপর চেষ্টনার আলো এসে পড়ে। এই প্রাচীন সংগীতের কহটুকু জানে ও যে মহামত ব্যক্ত করবে?

শুধু গান গাইবার সময় বলে নয়, বেশ অহুভব করতে পারে সামগ্রিক একটা পরিবর্তন আসছে তার মধ্যে। ছোটখাট ব্যাপারে অমুদ্রুতিগুলো দপ, করে এসে উঠতে চায়। কুলপায় বখন কোন সিঁটার অভিব্যক্ত করে আজকাল দেখে প্রত্যন্তর হাসতে আগের চেয়ে শক্ত লাগে, সে যে তার একটা অপূর্ণতা স্মরণ করিয়ে দিল সেজন্ত কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকাতো... রাতের স্বপ্নগুলো উদ্দাম, বিস্ময়কর। নাইট ভিউটির সিঁটারটি রাত্রিশেষে বিছানার চাদরে মুহু আকর্ষণ করে ডেকে দেয় বখন, বীণাশৃঙ্গের জয় হোক—চারটে বেজেছে সিঁটার লুক—প্রাচীন বিছানার ওপর অঁকেপড়া শিঙে যুথখানি চিনতে একটু দেরি হয়ে যায়, স্বপ্নের ঘোরটা কাটাতে সময় লাগে।

একবারও মনে আসত যদি তার লোহার-গড়া বাহ্যের কোনখানটা ভেঙে পড়তে পারে ছোট-বড় এইসব মানসিক পরিবর্তনগুলো আর দুর্ধোণ্য ঠেকত না চোখে। এরপর এগুলো মনে করে করে অসুস্থতার ক্রমিক বিবরণগুলো নিজের হাতে এত সহজে লিখে ফেসতে পেরেছিল যে নিজেরই অবাধ লেগেছিল একের পর এক এই সাবধান সংকেতগুলো কি করে নজর এড়িয়ে গেল তার। একটি ডেসি-বডের আকর্ষিক বীতংস মুত্থা পর্যন্ত সব সংকেত।

দুখটানাটা যেদিন ষটে ভোর থেকেই হাসপাতালে সবকিছুই বেহুতো চলছিল বেন। পাঁচটার অপবেশন টেবিলে ডাক্তারের হাতে প্রণ গেল একটি। প্রথম থেকে সব চক্ষুগুলো প্রতিফুল্লই ছিল। তবুও এটা পরাজয়ই—তার এবং ডাক্তার—উভয়েরই।

তারপরই এমিল খবর দিল, একজন বয় বেগেড মাস্তাল হয়ে এসেছে। কাজ করবে কি, দাঁড়াতে পারছে না।

তখনই ম'সিয়ে মারসেলকে কোন করল, বরষের নিয়ে তার সব সমস্তা থেকে তিনিই উদ্ধার করেন।

কিন্তু তিনি জানালেন, শহরের জেলখানার সব সেল ভর্তি।

—কোথাও একটা বেখে দিন না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কোথাও না জায়গা পান, এমিলকে বলুন বাপানে কোথাও একটা আনান্ড জায়গা খুঁজে বার করতে! একটা দিন ঘুমুই ওর নেশা ছুটে যাবে সিঁটার।

এমিলকে সেই আদেশই দিল।—এবার কে, এমিল।

## কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী



## ভুঙ্গল

সুগন্ধি মহাভুঙ্গরাজ  
কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি  
প্রচলিত হইয়াছে। বড়  
শিশিও গীত্ৰই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি: কলিকাতা-২২

—বানজা। নেশা কাটুক ওর, বেত মারবার হুকুম দেব আমি।

—কিন্তু শাস্তি ঠিক করার আগে কারণগুলো খোঁজ করতে হবে তোমার।

—ভয় কারণ কিছু নেই মামা লুক—ঐ সব মেয়েমানুষের ব্যাপার কেবল। গায়ের কার কাছে খবর পেরেছে ওর (বো) একটা শিকারীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কিন্তু বানজার আর একটা বো আছে—আরও কাঁচা বরেন, একঘর ছেলেশিলে তার। তবু—

এমিলও শিঙ্গল কিরল আর সেও বানজার কথা ভুলল, কাজের এক চাপ। মেটার্ননিউতে নতুন তিনটে কেস এসেছে আজ, বাখা উঠেছে। সে দাখিব শুধু নয়, তাদের উদ্বেগাকুল স্বামীদের সাধনা দেবার দায়িত্বও আছে। কনটেম্পোরারি হুঁটো টাইকরেড কেস। আর জেনারেল ওয়ার্ডে তো তিলধারণের স্থান নেই—এত স্থান প্রাক্টই তত সাপে কামড়ানো কেস। আর ম্যালেরিয়া কেস এত যে কাঁপনি শুরু হলে বোধ হয় দেওয়ালগুলোকে অবধি কাঁপিয়ে দিতে পারে।

আর গরমও তেমনি পড়েছে ১০০

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সিক্টার অরেলিকে আজকের পরিস্থিতির সুযোগ্য হতে হল না। মালার ম্যাথিভার সঙ্গে কিছুই পার্থক্য জকলে সফর গেছে সে। সেখানকার আবহাওয়ার শীতেরই আমেজ বহু।

বার হুঁরেক এমিল গিয়ে দেখে এসেছে বানজাকে। ফিরে এসে খবর দিয়েছে সে আখের নাক ডাকাছে জন্তর মত।

—ও যে দ্বাধু্য তা মনে করিয়ে দিতে অন্তত, বিশ বা চারুক দ্বারা দরকার।

কালো বুখানা নামে ভিজ চক্চক করছে—বানজার এই পলখলনে দৃষ্টতই বেননহাত। বানজা বেন বাট, ভাতটার প্রভিউ বিবাসজগৎ করেছে।

—সকাল পূর্ব অপেক্ষা কর এমিল।

পরদিন সকালে চ্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়েই দেখল এমিল অপেক্ষা করছে তার জন্ত ১০০ সারারাত বুট পড়েছে, আর এখন সাদা কুশাশ ঢেকে আছে চারপাশ। সেই কুশাশ ভেদ করে ভোরের প্রথম আলো দেখা দিচ্ছে, হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে আন্তে আন্তে।

এ বেন সেই প্রথম স্ট্রীর প্রত্যক্ষ...প্রাণনা সংগীতের সুরটা এখনও বাজছে কানে...এ বেন তারই বহিঃপ্রকাশ।

—বাও, খুলে আমার কাছে নিয়ে এস তাকে, তোমার সামনে আমি কথা বলব। শাস্তি ঠিক করার আগে ওর কথাগুলো শুনে নেওয়া দরকার।

তার ডেকের কাছে এমিল ফিরে এসে কাঁড়াল বখন, তাকে চেনা বাজে না—হাইরের মত ক্যাকশে বুখ, চোখ হুঁটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাঁকাছে ও।

—বামা, দেখবেন আনন্দ...আর বলতে পারল না, ঢোক গিলে খেয়ে গেল।

কথা না বাড়িয়ে দ্রুতপায়ে হাসপাতাল-বিজ্ঞানের বাইরে এল সে এমিলের সঙ্গে। বাগান পেরিয়ে যেতে যেতে অসুস্থমান করবার চেষ্টা করল কি খটে থাকতে পারে।

মামা দেখুন, মামা দেখুন...ভীতি-বিহ্বল সড় গলার এমিল বলছে।

ফরাসীতে বলেই আবারও কিস্তিগ্রাহিলিতে সেই একই কথা বলল, মামা দেখুন...

হাসপাতালদের পিছন দিকে একটা স্থান্যাল দেওয়া লোহার পেতে বাগানের মন্থপাতি থাকে। এমিল তার দরজাটা হুঁকাক করে খুলে ফেলেছে।

নাওয়া মেঝের ওপর একটা মন্থব্যাকৃতি হোয়াইট এ্যাটের শুণ, বানজাকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলেছে তারা। কংকালটি পড়ে আছে শুধু খুলিতে একগাছা চুলও অবশিষ্ট নেই।

আতকে শুক সিক্টার লুক। দ্রুতকার মাংসানী শিপড়গুলোর দিকে বিক্ষারিত চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে কাঁড়িয়ে আছে শুধু—কংকালটাকে জীবন্ত সাদা চাদরের মত ঢেকে রেখেছে ওরা।

কতটা সময় কেটেছে, কি করে ফিরে এসেছে হাসপাতালে নিজেও জানে না।

টেলিফোনে পুলিশ-টাকের বেশ একটু সময় লাগল বুঝতে কে কথা বলছে। বিপদটার একটু আভাস চাইলেন, সাহায্যের ধরণটা আন্দাজ করে নিতে পারেন যাতে।

সিক্টার লুক আশ্রাণ চেষ্টা করছে স্থির হতে, বিকৃত স্বরটাকে স্বাভাবিক করে নিতে।

কোনক্রমে বলল, কোনে আপনাকে বলতে পারব না মারসেল, একলা একবার আসেন যদি।—সনির্ভক অমুরোধের সুর, তাঁর মনে পড়ে যাতে কলোনির টেলিফোনগুলোর বেগ আছে সংবাদ-ক্রমের সঙ্গে, যে কোন গুরুতর খবর নেটিভ স্কাই-বোর্ড থেকে সোজা অরপে চল যায়।

তাতেও ওর মনের অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করেন নি পুলিশ-টাক। মিনিট দশেকের মধ্যে সপ্রতিভ হাসিমুখে ওর ডেকের সামনে এসে কাঁড়িয়েছিলেন, খুজু পেশাদারী ভঙ্গী। কিন্তু ওর মুখের চেহারা দেখে থমকে গেলেন।

এমিলকে ও ইসারা করেছে সেই পেড়ে তাঁকে নিয়ে যেতে। জয়ের ইতস্তত করতে দেখে অজুতকর্তে জানিয়েছে সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না।

বা করছে বা বলছে সবটাই কেমন বেন ভাবের ঘোরে, মুখের প্রশান্ত ভাবটাও চোঁকাকুত।

মারসেলের ফিরে আসার অপেক্ষার বসে চাটগুলো সেখবার চেষ্টা করছে বত, চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই বীভৎস দৃষ্টট।

...মন্থব্যাকর শুণ একটা...বীভৎস একটা সারীস্থপ গতি ১:০০ মিথ্যা শুকো নিজেইই তোলাতে চাইছে নিজে—অন্তর জুকে যে বিক্ষুব্ধ হাছাকার উঠছে, নিজের মনকে বোকাতে চাইছে বিবেকের কান্না সেটা নয়, বর্বা-শেষে পোকা-মাকড়গুলো বেরিয়ে এসেছে গর্ভ থেকে, তাদেরই একঘরে ডাক কানে বাজছে বুধি।

মারসেল ফিরলেন বখন, বুধ একটু কেরোসিনের গন্ধ ভেসে এল। বেশ একটুকু তিনি কথা বলার পূর্ব ওর মগজে ঢুকল, যে ভাষাটা শুনেছে সেটা চলিত ফ্রেমিস—সুপরিচিত, ঘরোয়া, আশ্চর্য সাধনার জয় জড়ানে।



জনসন আও জনসন-এর

সব চেয়ে মোলায়েম, সব চেয়ে মিহি বেবী পাউডার



শিশুর  
পক্ষে  
সেরা  
আপনার  
পক্ষেও  
সেরা



শিশুদের উপযোগী সেরা প্রসাধন ঠৈরিতে ৭৫ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞতা

জনসন-এর

শিশুদের উপযোগী যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রী পাবেন:  
বেবী সোপ—বেবী ক্রীম—বেবী অয়েল—বেবী লোশন

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কলকাতা



—এমিলকে বলে এলাম মশালের আগুন দিয়ে পিঁপড়গুলোকে তাড়াতে। আমার ডাইভারটাকে ফেরৎ পাঠিয়েছি শহরে একটা কফিন নিয়ে আসতে। শেড থেকে সেটাই সবাই বার করে আনতে দেখে—গ্রীশান কবরের নিয়মমারিক কফিন, দেশীয় লোকদের দেখাতে হবে তাই। বানজা তো একজন কনভার্ট ছিল, তাই না?

অকুটে সম্মতি জানাল সিঁকার লুক, ঠাঁ, আমারই কর।

—ডামের খবরে কি যে রটেবে কেউ জানে না, সার্টিফিকেট কিন্তু লিখতে হবে অজ্ঞাতকারণে মৃত্যু।

খামলেন একটু, ওর নির্বাক মৃতিটা দেখলেন। যেন সে আপত্তি করেছে এইভাবে যুক্তি দেখাতে লাগলেন তারপর।

—জ্যাক ওকে পিঁপড়তে খেয়ে ফেলেছে কি করে বলা যেতে পারে বলুন? আমরা ভাল করে জানি যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় সে বেহেড মাতাল ছিল। এই তো, গত সপ্তাহে একটা গাঁয়ে যেতে হয়েছিল এক বাটু পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে—সে লোকটাও এমনি অজানা কারণে মরেছে। অজানা মানে—তখনুম যখন সারা সন্ধ্যা লোকটা সিঁধা গিলেছিল, অজানা কারণ আর অজানা রইল না তখন। বোঝাই তো যাচ্ছে সিঁকার, বিধিক্রমার মৃত্যু। মদ ভাল বতন ঢোলাই না করার দরুন প্রাইই এমনিধারা অঘটন ঘটে যায়।

কথা বলার কঁকে ওকে নিরীক্ষণ করে দেখছেন মারসেল।—

—ক্যাসাভার শেকড় ছুরকমের হয়—মিঠে আর জেঁতো। জেঁতো বেগুলা সেগুলা খুব চড়া জাঁচে ভাল করে আল না দিলে হাইড্রোপসিয়ানিক এ্যাসিড থেকে মৃত্যু ঘটতে পারে অনারাসে।

বুইও পরে পেশাদারি ভাগিটা ফিরে এল গলার আবার, কনপূর্ণের অজ্ঞানগ স্বরটা যেন আর কারা।—খুব সম্ভবত আপনায় ঐ মৃতি বিবেই মারা গেছে সিঁকার, পিঁপড়গুলো ওর কাছে যাবার আগেই। সেই কথাই এমিলকেও বলছিলাম—সে তো কেবলই বুক চাপড়াচ্ছে আর নিজেকে শাপ-শাপান্ত করছে। কিন্তু আপনায় ঐ এমিল সিঁকার ...অনেকদিন জগল থেকে চলে এসেছে তাই তুলে গেছে অনেককিছু—না হলে এমন ঘটনা আকৃছার ঘটছে।

তনতে তনতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছে সিঁকার লুক। এমিলের মত তাকেও কি আত্মহানি মুক্ত করতেই কথাগুলো বলছেন না মারসেল? ঈশ্বর জানেন ঐ রক্ষ সাধাসিমে মৃতিটি সামনে ঝাড়িয়ে বিমুক্ত অন্তঃকটকে দেখতে না পাওয়ার ভাণ করছে কি না।

কোনক্রমে স্রীপ একটু হেসে হস্তবাদ জানাতে পারল অনেক চেষ্টার। প্রাকৃতিক সঙ্গতিভ একটা শ্রালুট করলেন মারসেল।

মাদার ম্যাথিন্ডা সক্র সেয়ে ফিরতেই সিঁকার লুক দেখা করল তাঁর সঙ্গে। ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শোবাটা সব নিজের ওপর নিল।

—সময় করে নিয়ে এমিলের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসা আমার উচিত ছিল মাই মাদার। বানজাকে মাটিতে ফেল না রাখার কথা ভাষা উচিত ছিল নিশ্চয়ই...

মাকশখে খেয়ে গিয়ে কাশল। কমাল দিয়ে খুঁটা ঢেকে ফেলল তারপর।

মাদার ম্যাথিন্ডা স্থিরচোখে দেখছেন তাকে।

পুলিশ-রিপোর্টটা তুলে নিয়েছেন হাতে, ওঁকে শোনাবার জন্য জোরেই পড়লেন, 'কারণ অজ্ঞাত'।...আমি এর সঙ্গে একমত। মারসেলের মত আমিও সিঁকার বিশ্ব মৃত্যু এত দেখছি যে এ রকম কিছু ঘটলে সব সময় এটাকেই সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করি আমিও। তোমাকেও তাই মনে করতে হবে সিঁকার। বুঝতে পারছি প্রথমে কতটাই আশাত পেরেছিলে তুমি মনে আর কিতাবে নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছ। শুধু তুমি কেন, আমাদের মধ্যে যে কেউই এই-ই করত।

একটু খেমে আবারও একটু নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাকে, মুখে মুহূহাসির আভাস।

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এবার কিন্তু এই আত্মহানি কাটিয়ে উঠতে হবে তোমাকে, নিজেকে দেখী ভাববে না আর। তুমি বখেষ্ট বুদ্ধিমতী, এ ধরণের আত্মকেন্দ্রিকতার প্রেরণ দিও না।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। সুপিরিয়র বলে দিয়েছেন আত্মকেন্দ্রিকতার প্রেরণ দিও না। সে নিজে কিন্তু কিছুতেই নিজের অপরাধবোধটা বেড়ে ফেলে দিতে পারছে না। পারছে না বলে নিজেরই বিশ্বাসের অবধি নেই তার। তার ঐ দুর্ভোগ মানসিক পরিবর্তনটাই কি দায়ী এর জন্ত?

এমন হ'ল অনবরত চোখে জল আসতে চার। পরের ক'টা সপ্তাহ শুধু প্রাণপণে উলাত কারা বোধ করে করে কাটল। ওর কাজের সুবিধার জন্য ডাক্তার হয় তো নিজের কাজের গুণ্ডার বাইরে কিছু করে দিলেন স্বৈচ্ছার, উত্তরে এমন একটা আবেগপ্রবণ মন সাড়া দিতে চায়, যে তার নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এই সময় একদিন ল্যাবোরেটোরিতে স্লাইড দেখছিল বসে। হঠাৎ কাশি আসতে মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখটা সরিয়েই দুর্মনীর ইচ্ছে হ'ল নিজের স্পুটামটা একবার টেক করতে।

মন বলছে কিছুদিন থেকেই দেখছি যত অকুট খেরাল আমার মাথায় চাপে—এটাও যেমন! বলছে বটে, হাত দুটো কিন্তু স্লাইড একটা তৈরি করে ফেলেছে ততক্ষণে। ইচ্ছে করে কেশে কাটের ওপর স্পুটাম ট্রান্সপল তুলে নিয়ে হাইপোওরার লেন্সের নীচে রাখল।

ফিস্তের ওপর লালচে বেগুনি রঙের নলাকার একটা বস্তুার বীজাণু কাঁপছে।

প্রথম প্রতিক্রিয়ার ভারি একটা স্বস্তিবাধ করল।...সবকিছুর পিছনে তা হলে এই।

.. তাই সব সময় ক্লান্ত আমি, ক্লান্ত আর ভাবপ্রবণ।

..সুই বানজার মৃত্যুটা কোনমতেই বেড়ে ফেলে দিতে পারছি না।

ক'টি হুহুর্কের আলোড়নে অস্ত কথা এসেছে মনে। সাধা চামড়ার কোন মাছুরের বন্ধ। হলে বধাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে—গ্লেনে হোক, জাহায়ে হোক। এখানে এই প্রথমগুণীর আবহাওয়া অসুখটার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ওর জায়গার যে নান কাজ করতেন এই অসুখ নিয়েই তিনি ফিরেছেন।...জাহায়ে সিঁকার অগসুটিন বলেছিলেন বন্ধ। হওয়ার অর্থ কংসো-সার্ভিসের সমাপ্তি।

..দেশে ফেরার টিকিট কাটা হ'ল আমার।

## পূর্ণপ্রাণে চাষীর বাহা

দম বন্ধ হইতে আসিতে চাইছে... এখনই যেন কনভেটের দেওয়াল-  
গুলো চোপে আসছে চারদিক থেকে।

ব্রোসেড লর্ড! এমন যেন না ঘটে।

কিন্তু ঘটেছে। কিন্তুের ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন নলাকার পদার্থ-  
গুলো ভাসমান... যুঁকে পড়ে হঠাৎ গুপ্তে শুরু করল আপনা হতেই।  
...মাইক্রোসকোপের তলা থেকে শ্লাইডটা টেনে নিয়ে ওয়েস্ট-ব্যাথে  
ফেলে দিল হঠাৎ।

সমস্ত ঘটনাটার ওপরই ছেদ টেনে দিতে চায়।

একদমটা একটানা নিজের কাজ করে গেল। মাইক্রোসকোপের  
কাজ শেষ করল, বৈকালিক রাউণ্ডের জগা ওষুধপত্রের ট্রে তৈরি করে  
রাখল, মাগার মাখিতাকে ক'ন করল ছাঁবার—ক'জন রোগীর  
রিপোর্ট জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

কলসতা কিছু নেই, কিছু ঘটে নি ভারতে খুব বঠিন লাগছে না।

অজ্ঞা একটা মন কাজের ভার নিয়েছে। সে মনটা অপরিচিত।

সেই অপরিচিত মনটা পঙ্কায়ম দিচ্ছে ও ভাষনাটা বেড়ে ফেলে  
দিতে।—এ রোগের ধরণ-ধারণ সবই তো জান, যা করবার নিজেই  
কর। কেউ টেরও পাবে না। বিকেলের দিক রক্তোচ্ছ্বাসে মুখ  
লাল হয়ে উঠলেও তোমার ঐ রোদে-পোড়া চামড়ার ধরা পড়বে না তা।  
রোগীদের তো প্রায়ই বল চেষ্টা করে কাশির বেগ দমন করতে, তুমি  
নিজেও করতে পার তাই। চেষ্টা করে ক্ষিপে বাড়তে পার—  
অতিরিক্ত ভিন্ন তোমার যতটা খাওয়া প্রয়োজন, এমিল এনে দিতে

পারে বাজার থেকে। আর কাজের কঁকে অবসরমত বিকেলের  
দিকে একটু ঘুমিয়ে নেবার অমুখিতা তো হাতেমগোই পেয়ে গেছে।...  
ঘুমিয়ে আর খেয়ে তোমার ক্ষমতাকে পূরণ করে নিতে পার তুমি, অহু  
হয়ে উঠতে পার।

ঘটনাধীনক পরে সিস্টার অরেলি এল একটা চার্ট নিয়ে,  
আলাচনা করতে চার।

—তোমার ডায়াগনিসিস করার ক্ষমতাটা অল্পত সিস্টার লুক...  
দেখ তো এটা তোমার গ্যাসট্রিক হেমাভেজ বলে মনে হয় না?

কালচে বাদামি রঙ, আকস্মিকতার মত কালো পায়খানা।

এন্টি-ক্লো পড়ে মাথা নাড়ল সিস্টার লুক। কথা বলাতে  
যাচ্ছিল, সিস্টার অরেলির রোদে-পোড়া বাদামি মুখখানা ঈষৎ  
বাগ্মতায় যুঁকে এসেছে কাছে... ঘটনাধীনক আগে দেখা শ্লাইডের সেই  
ছবিটাট আবার প্রকট হয়ে উঠল সামনে। কথা বলা হ'ল না,  
তড়িৎস্পর্শের মত পিঁছিয়ে সরে গেল।

মুণ ঘুরিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, বরনের বল কেবল  
ভাঙা বরফ দিতে। বেশ এবটু চেষ্টা করে বলতে পারল, গলাটা যেন  
কে চোপে ধরেছে।

হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সিস্টার অরেলি স্যাঁথে  
টোরি ঘরের দরজা খুলে।

সিস্টার লুক নিশ্চলক চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে—  
এইমাত্র যেখানটায় সিস্টার অরেলি এসে ঝাঁড়িয়েছিল বাগ্মতায়।

## প্রত্যেকটি মেরিট\* সেলাইকলের সঙ্গে আপনি কিনছেন সারাজীবন নির্ভাবনায় সেলাই সারাজীবন সিঙ্গারেন্ন\* সেবা

মেরিটের স্পর্শে আপনি আনন্দ পাবেন—  
কি অনায়াস গতি নিয়ন্ত্রণ... কি মঙ্গল নীরব  
কাজ... স্বস্তির টান কি নিখুঁতভাবে বাঁধা।  
এর মূলে রয়েছে মেরিটের অতি মজবুত  
গঠন অথচ স্বল্প ভারসাম্য।

এছাড়া মেরিট থাকলে আরও এক 'লাভ'  
...এর সঙ্গে যেকোন সিঙ্গারের দোকান কিম্বা  
বিক্রেতার কাছে সেই সিখ্যাত সিঙ্গার : ভিলের  
ওপর আপনি সর্বদা নির্ভর করতে পারেন।



সিঙ্গারের যেকোনক  
কিছবিনি বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা  
আপনার কাঁধেবাঁধি অসু-  
খোবিত সিঙ্গারের যিকোন  
কিছা যেকোন থেকে একটি  
মেরিট কিনুন।



সিঙ্গার  
আর্টসিট  
স্বয়ংচালিত হাতে বোনার কল



সিঙ্গার  
টেবিল ও সিঙ্গার ফ্যান



সিঙ্গার  
ইলেকট্রিক ইরি

\* সিঙ্গার কোম্পানীর একটি ট্রেডমার্ক

মনে হচ্ছে সেই একই জাতিগায় কামউনির সব সিস্টাররা এসে  
দাঁড়াচ্ছে একে একে—প্রথম নার্সরা, তারপর বয়স নানরা।  
ফিসফিস করে ওরা বলছে কি...এত সতর্ক যে কি বলছে ভুলতে হ'লে  
করবে কয়ফে ঠেকে যাওয়ার মত কাছাকাছি আসতে হবে।...

ল্যাবোরেটোরি থেকে মার্জারিতে প্রায় উড়ে এসে পৌঁছোল।  
ডাক্তার গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে মাইক্রোসকোপের ওপর  
খুঁকে আছেন।

—কি যে করব বুঝতে পারছি না উইর, সব সময় এত ক্লান্ত  
লাগে। আমার অস্ত্র ক'রে চ।

পিছনে ওর গল! শুনে ডক্টর লাইটটা বন্ধ করে ঘুরে  
চাইলেন ডাক্তার।—ক্লান্ত হলেই লোকে ভাবে অস্ত্র ক'রেছে।  
কি হল কি?

—আমার টি-বি হয়েছে।

ভীষণ চোখে তাকালেন ডাক্তার, এটা কি ঠাট্টার জিনিস নাকি?

—ঠাট্টা তো করি নি।

একটুক্ষণ বাস থেকে যেন সেটাই উপলব্ধি করতে চাইলেন।

উঠে এসে হুঁকান হাত রাখলেন তারপর। কি এক অনির্ভর্য  
চোখের প্রকাশে চোখের দৃষ্টিটা ওকে অবশ করে ফেলেছে প্রায়।

—কে বললে?

উত্তর না পেয়ে একটা ন্যাকানি দিয়ে গলা চড়ালেন, বললে কে?

—মাইড, মাইক্রোসকোপ—আমার নিজের স্পটায়।

ওর চোখকে অবিশ্বাস করেন না কোনদিন, আজও করলেন না।  
পলক হাতে তেমনিভাবে ধরে হইলেন তাকে পুরো একটা  
মিনিট, দৃষ্টি ভাবে মনে হবে যেন বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত  
করতে চান তাকে।

—দাবা কপোয় কেবল আপনার সংস্কারে কাজ করতে পারি  
আমি...আপনাকে না হ'লে আমার চলবে বলে তো মনে হয় না।

ডাক্তারের গলার অদ্বারহ সুরটা অস্বস্তিকর। মার্জারি চারিদিকে  
চেয়ে চেয়ে দেখছেন, অস্থানবন করতে চান যেন সে যখন থাকবে না  
কি বকব হবে ঘাংখানা।

কাঁধে ডেড়ে দিয়ে স্কেটসকোপটার ভজা হাত বাড়ালেন।

—স্মার্টি খুলুন—খুলে ফেলুন...লাল ছুঁটো দেখতে হবে।

অনেকগুলো জামা বোতাম খুলে আলগা করতে হবে—ব্যাপুলার,  
হুটি সেমিজ, জাঁট বডিগটা...আঙুলগুলো কাঁপাচ্ছে।

...ভুল হয়ে থাকতে পারে তার, ক্লান্ত চোখ ছুঁটো ভুল দেখেছে  
হয় তো!

টেবিলের ওপর বসল, খোয়াল নেই ভেলটা সরায় নি।

কাঁধের ওপর দিয়ে ডাক্তার সামনের দিকে সরিয়ে দিলেন।

কর্কশ কণ্ঠের হুকুম আসছে একের পর এক।

—ক্যান্ডন। লম্বা নিশ্বাস নিল। বলুন খাটি বি...

—কিছু একই আছে সত্যি, মনে হচ্ছে বা দিকের লোবে।  
সামনের দিক থেকে সুনবেন বলে ঘুরে সামনে এলেন। খুঁকে দাঁড়াতে  
স্থখটা পাশের দিকে সরিয়ে নিল সিস্টার লুক। ডাক্তার একাধি হয়ে  
ফলছেন আর ও প্রায় নিশ্বাস রোধ করে বসে আছে।

দেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সোজা হয়ে, উদ্বিগ্ন মুখে হাসি

ফুটেছে।—হয়েছে একেবারে ওপরে—সামিট লেপবে...বজিনসটা  
সামাজ্যই। এ তো সহজেই সেরে বাবে।

লোবের সামিট বা সর্বোচ্চ অংশ মানে যেখানে অক্সিজেন এসে  
প্রথম ঢোকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

পরক্ষণই খোয়াল হ'ল অনাবৃত বক্ষ বসে আছে। ওর বিস্তৃত  
চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালেন। হুঁজনেই জানেন  
আর একজন সিস্টারের উপস্থিতি ছাড়া কোন নানকে পরীক্ষা করা  
নিষিদ্ধ। মুহূর্তের উত্তেজনার কারোই সেকথা মনে ছিল না।

একে একে খোলা বোতামগুলো আটকে পোশাকটা ঠিক করে  
দিচ্ছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার কথা বলে চলেছেন।

—গোড়ি ট্রিটমেন্ট আপনার সহ্য হবে সিস্টার। কিউনির  
পক্ষে ওটা ক্ষতিকর বটে, কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল। আমি  
দায়িত্ব নেব—

কিন্তু ওকে তো মানার মাখিন্দাকে বলতে হবে। বলতে হবে  
তৃতীয় কারো অধুপস্থিতিতে এই পরীক্ষার কথা; বলতে হবে প্রথমই  
ও ডাক্তারের কাছে ছুটে এসেছিল।

—মাদার মাখিন্দাকে বলতে হবে আমার।

মুহু মস্তব্যটুকু শুনেই চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার, কেন?

উত্তরের জগা অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা একপলক।

পরক্ষণই ক্রুদ্ধকণ্ঠে সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শোনা গেল,  
কেন?

—বাধ্যতার নিয়ম। আমাকে বলতেই হবে—

—বললে ওরা দেশে পাঠিয়ে দেবে।

—জানি—হুঁকোটা তজ্রা কপোল বেগে গড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার ঘোঁক উল্লেন। হোগের কোন নতুন উপসর্গ দেখতে  
পেয়েছেন যেন হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত কোন উপসর্গ। মনস্তাত্ত্বিকের  
মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ওকে কিছুক্ষণ, কুণ্ডিত চোখ দুটো  
বিশ্লেষণরত। সিস্টার লুক কতকটা বদছে ওর চিন্তাস্রবের নীচে নীচে  
যে কোথা লুকোনো ঐ গভীর দৃষ্টি সেইখানে গিয়ে পৌঁছেছে।

কিছুক্ষণ পরে বেশ শাস্তভাবে বললেন, আপনি ভর পেয়েছেন  
সিস্টার। কিন্তু দেশে যদি পাঠিয়ে দেয় ওরা, কনভেন্টে আপনার  
সইবে না।

সিস্টার লুক নীরবে চলতে শুরু করল এবার।

ডাক্তারও আসছেন পিছন পিছন কথা বলতে বলতে। দীর,  
সময়, বৈজ্ঞানিকমূলক।

—আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে বাচ্ছি বা সন্তুষ্ট নিজেও  
আপনি জানেন না। তবে মানদেয় আমি ভালমত চিনি তা জানেন  
তো? ছুরি হাতে নেওয়ার দিন থেকে কোনদিন সাধারণ নার্স নিয়ে  
কাজ করি নি...কনভেন্টের ছাঁচে-ঢালা আপনি নন সিস্টার, হতেও  
পারবেন না কোনদিন। যাকে আগন্তিক নান বলে আপনি তাই—  
সাধারণ মানুষের পক্ষে আদর্শ, রোগীদের পক্ষে তো বাটেই, কিন্তু কনভেন্ট  
বা চায় তা নন।...একদিকে আপনার মানসিক গঠন, আর একদিকে  
আপনার কনভেন্ট আদর্শ—হুঁটোকে এক করবার জন্তে দিন-রাত লড়াই  
চলেছে আপনার মনে। আপনার অস্বস্তি। সেটাই সিস্টার—ট-বিটা,  
তার নেহাৎ গৌণকল।

খুবই সহজ !

# আপনি



# ৫ টাকায়

গ্যাসনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ-এ

একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

খুলতে পারেন



ব্যাঙ্ক চার্জ লাগেনা—  
বরং বছরে ৩% হিসাবে  
সুদ পাওয়া যায়

আজই আপনার নিকটবর্তী শাখায় দেখা করুন :

গ্যাসনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(মুদ্রারাজ্যে সমিতিবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত)

NGB/618 BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১৯, নেতাজী হুভাষ রোড ; ২৯, নেতাজী হুভাষ রোড, (লেগেডুস ব্রাঞ্চ) ; ৩১, চৌরঙ্গী রোড ; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লেগেডুস ব্রাঞ্চ) ; ৬, চার্চ লেন ; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড ; ১বি, কনভেন্ট রোড, ইটালী ; ১৭এস/এ, মলিনী রজন এভিনিউ, নিউ আলিপুর (সেফ ডিপোজিট লকার) ; ১৬৩, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ ; ১৩৯সি, বিধান সরণী, ক্রাশ্বালার ।

বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ '৭১

২৮৩

কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া বড় সামান্য নয়। ডাক্তারের লক্ষ্য এড়ায় নি যে প্রতিক্রিয়া ও চাকতে চেষ্টা করছে। অমুগ্ধজিত নীরবতার নিজেকে গোপন করে রাখার আশ্রয় প্রয়াসের পরিশ্রমে হঠাৎ কানশতে শুরু করল।

ডাক্তার দেখছেন শুধু। অপেক্ষা করে আছেন।

হঠাৎ সপ্রতিভভাবে বললেন, যাই হোক, চান যদি তো ঐ গোঁণ ব্যাপারটা আমি সারিয়ে দিতে পারি।

অজান্তেই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, আমি থাকতে চাই। এতক্ষণের সূর্যম নিঃশেষে ভেসে গেছে কোথায়, তবু তারই শেষ হেঁশটুকুর প্রভাবে বৃষ্টির অকারণ রুদ্ধতায় রুট শোনাল।

ডাক্তারের চোখ দুটো অসল উঠেছে তবু, কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা মিশেছে।

আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিন তা হলে। আমি প্রথম মাদার ম্যাথিন্ডাকে বলব—দেখবেন আমি বলার পর তিনি আর আপনার পাঠিয়ে দিতে পারবেন না। মাসের পর মাস আপনাকে এইভাবে কাজ করানোর জন্তে তিনি আর আমি দু'জনেই দারী—দীর্ঘা শুকনো আদর্শের বুলি আওড়ে কাজ হাসিল করা হয়েছে, আপনার স্বাস্থ্যের দিকটার কেট ফিরেও চাই নি। গোস্ত-ডাউট কিওরের জন্তে আপনাকে এখানে রাখলে অভিনব কিছু করা হবে না। আর একবারও নিরম ভেঙেছিলাম আমার—মাদার ম্যাথিন্ডা আর আমি। এই সব কলোনীর ব্যাপারের এক হঠাকর্তার বেলা—তিনি এমন কাজের লোক যে ছ' মাস ছুটি নিলেও নাকি স্ফটিক রসাতল যাবে। স্তব্ধতা—তাও সে অনেক বেশি এডভান্ট বেস। মাদার দেখেছিলেন তাঁকে টেনে-টেনে সারিয়ে তুলেছিলাম—না পারতাম যদি তো দু'জনেরই গর্ভান যেত আর কি।

ডাক্তারের মুখে বিকৃত একফালি হাসি। সার্জারিতে অনেক আলো। যন্ত্রপাতির ক্যাটালগের ওপর বিছুরিত হুঁহালোক তাঁকের ওপরের সারবন্দী বীকায়গুলোর গায়ে গিয়ে পড়েছে—চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে প্রায়... ডাক্তারের হলঘরে মুখের চামপাশে একটা অপাখিব লাল আলোর বৃত্ত। জ্যোতির মত বিছুরিত তা বল, এ আলোর জাত আলোদা।

—আবহাওয়ারা আমার খুব ভাল পাচ্ছি সিস্টার—করবারে, ঠাণ্ডা।

বন্দীদের প্যাভেলিয়ানটার থাকবেন আপনি। দেখেছেন তো জায়গাটা—একবারে যাক বলে গাছের মাথায় বৃষ্টিতে পারবেন। ডিম, সার্ডিন আর সালা মাসকাট মদ... ডায়েট লিখে দেব আমি। তিন মাসে—আরও কম লাগতে পারে—

—কাজ করতে পারব আমি?

—সকালে আমাকে গ্র্যাসিফ করবেন করল। কিন্তু সিস্টার, একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার কাছে—এমন করে শক্তিকর করা চলবে না। ঐ যা বলছিলাম—টি-বিটা নেহাৎ সৌণ ব্যাপার—আসল অসুখটা তো আমি সারাতে পারব না, নিজেকে সারাতে হবে আপনি।

অদ্ভুত এককুরা হাসিতে মুখখানা প্রায় প্রশান্তই দেখাচ্ছে। একই থেমে আবার বললেন, নিজেকে নিখুঁত নান করে তোলার জন্ত আপনার ঐ দিন-রাত্রির লড়াইটা ছাড়তেই হবে সিস্টার।... বিশ্রাম করুন, বিশ্রাম করা দরকার আপনার।

গাউনটা টেনে খুলে ফেলে জ্যাকেটটা পরে নিলেন। দরজার কাছ থেকে খুঁজে পাইডের ব্যাগভরে হাসলেন, যেমন অভ্যাস।

—আপনার অতি-সচেতন বিষয়কে ভাবমুক্ত করতে যেতারাও সিস্টার, মাদার ম্যাথিন্ডাকে বলতে বাচ্ছি আজ সকালে আমিই আবিষ্কার করেছি আপনার অসুখটা আর আপনার কোন অঙ্গাঙ্গিই দিই নি তাঁর কাছে আগে গিয়ে বলবার—আমার তো তিনি ভালই জানেন। আসার আগে নিজেকে হা-কিছু জেনেছিলেন ভুলে যান একেবারে—অবশ্য মাইক্রোসকপিষ্টের দস্ত যদি পথ আগলে না পাইডার আপনার।

পরবর্তী তিন মাস তার জীবনের বৃগমকে ক্ষুদ্র একটি নাটকের অভিনয় হয়ে গেল, মনে রাখবার মত নাটক একটা। উত্তরকালে যখনই এই সময়টার দিকে ফিরে তাকিয়েছে, মনে হয়েছে ধর্মজীবনের সাদা-কালোর মধ্যে এই তিন মাস একটা সোনার মোড়া পথ।

যে ছেলেবেলাটাকে কোনদিনও পায় নি, সেটাই যেন ধরা দিয়েছে এসে। শিশুর স্বপ্নের জীবনে আছে যেন... একেবারে গাছের ওপর বসবাস, সঙ্গী একটা ছোট স্তলর বাদর—যত্নবক সর্বজি 'মি' পোকগুলো ধরে ধরে খায় সে। মনটাও শিশুই মত শুদ্ধ-নিষ্পাপ, গানি নেই, ঘল নেই কোথাও। সবকিছু কাছে আসছে অদ্ভুততর মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর-চতনা পর্যন্ত। খেদের চালের ওপর দিকে টিকটিক আসা-যাওয়ার সর্বস্ব শব্দ... বুনো ফুলের স্বরাস... কোড়ে বাতাসে কলাগাছের পাতায় পাতায় মাতামাতি—সাবর মধ্যে তাঁই প্রকাশ... আর অন্ধকার নামে বখন, স্ফটিক আর ধ্বংসের গর্জন বনের অন্তস্তল পর্যন্ত আলোড়িত করে তোলে সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা মুখরতার সুরে আত্মিক-রাত্রির একতান শোনান তিনি। সেই বিচিত্র পরিবেশ ওস্ত টেক্সটোমের ভবিষ্যৎবাণীগুলোকে সত্যের রূপ দেয়।

সবকিছুই অবিশ্বাস্য কেন! ডাক্তারের মুখে খবরটা পেয়ে মাদার ম্যাথিন্ডা কোনক্রমে চোখের জল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—অভিজ্ঞতকর এই স্বাবাদটা অবধি মিলিয়ে সবকিছুই অবিশ্বাস্য। ডাক্তারের সংগে আলোচনাস্তে, একঘণ্টা চ্যাপেলে কাটিয়েছেন সুপিরিয়র।

তারপর ওর ডাক পড়েছে।

—ঈশ্বরের সহায়তার দ্বির করেছি তোমাকে এখানে রাখব—খুঁকিটা যে খুব বেশি তা তুমিও বুঝে, আমিও বুঝি—আশা করছি দেবে উঠবে তুমি, আর কার্যক্ষেত্রে হয় তো হারাতে হ'ল তোমার।

রক্তাভ দু'টি চোখ ভরা স্নেহ আর উবেগ। মুহূর্ত থেমে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে অবিচলিত দৃঢ়কণ্ঠ বলতে শুরু করেছেন আবার!

বিশেষ বিধান কেবল সকালের দিকটার কাজ করবার অল্পমতি দিচ্ছে তাঁকে—সার্জারিতে ডাক্তারকে গ্র্যাসিফ করবে আর নাসনের সারাদিনের ডিউটি-চার্ট তৈরি করে দেবে। সেই চার্ট অল্পসারে কাজ করিয়ে নেবে সিস্টার অফেলি। নিজের ঘরে একা থাকে এখন থেকে, খাবার ঘরের বাসনপত্র যাতে ছোঁরাছুঁরি না হয়। কমিউনিটি উপাসনার যোগ দেবে না, যদিও নিজের মনে প্রাতিটি উপাসনাই করবে নিরমিত। ম্যাসে বোগ দিতে পারে, তবে কন্ডারে আর গাইবে না। বন্দীদের প্যাভেলিয়ানের ওপরতলয় থাকবে।

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

—গাছের ডালে পাখির মত—মাদার ম্যাথিল্ডা এককণ্ঠে আবার নতুন করে হাসলেন।

উঠে পঁাড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার উদগ্র বাসনাটা দমন করতে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল শিক্টার লুক।

জাহাজে আসতে আসতে যে বুশ-স্টেশনের স্বপ্ন দেখত, বন্দীদের প্যাভেলিয়নে তারই প্রতিচ্ছবি। হাসপাতালের শেষপ্রান্তে দোতলা এই বাড়িটা পরে তৈরি হয়েছে। দেশীয় শৈলীতে তৈরি, জংল-মুখী বাড়িটা, মাথার খড়ের চাল। নীচেরতলার শহরের জেলের কয়েদীদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসার দরকার বাদে তাদের থাকবার ব্যবস্থা। আর থাকে হিন্দুরা, ধর্মগত আর খাওরা-নাওরার বাধাবিধির কারণে মূল হাসপাতালে রেখে বাদে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। খড়ের ঝালার নীচে গোল ঘরখানার দেওয়ালে খুব পাতলা জালের আবরণ। এত পাতলা যে ঘরে আলো ছালালে তবেই চোখে পড়ে। রাত্রে মথগুলো ডলভেটের মত বড় বড় বাদামি ডানা দিয়ে বাইরে থেকে থাকা দিয়ে যায় সেই পাতলা জালের ওপর।

সাধারণ দৈনন্দিন খাবারের ওপর টি-বি রোগীদের জন্য ডাঃ কম্বুজাটির অতিরিক্ত ডায়ারির ব্যবস্থা আছে, নিজে তিনি তার নাম দিয়েছেন 'প্রেরির ওপর অয়েস্টার'। সে ডায়ারির আগুতার তাকে ও পড়তে হচ্ছে। রান্নাঘরে সেইমত খাবার দেবার স্বকুম দিয়েছেন ডাক্তার। প্রথম দিন নিজে এলেন 'অয়েস্টার' কেমন করে খেতে হবে দেখিয়ে দিতে। মাদার ম্যাথিল্ডার কাছ থেকে

একজোড়া উৎকৃষ্ট ফটকের পানপাত্র চেয়ে এনেছেন, দু'টোতেই একটা করে কাঁচা ডিমের কুস্থম, কুঁচোনো পাসলে কিছু আর জেবুর রস। উচ্চপদস্থ কোন পরিদর্শক এলে এই পানপাত্র দিয়ে আপ্যায়ন করতেই অভ্যস্ত ছিল এতদিন।

একদৃষ্টে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুহু মুহু হাসছেন ডাক্তার।

—অস্থস্থ শিক্টারকে সবকিছুই উপহার দেওয়া চলে। দু'হাতে দু'টো গেলাস ধরে এগিয়ে এলেন কাছে:—খেয়ে ফেলুন দেখি কুস্থমগুলো—চোখ বুজে গিলে ফেলুন—ভাবুন অয়েস্টার খাচ্ছেন।

নিয়মিত খাওরা-নাওরা ছাড়া দিনে দু'বার এটা খেতে হবে, আর রাত দশটার সময় ঘুম থেকে তাকে ডেকে তুলে সাড়িনের স্যান্ডুইচ আর দু'গেলাস হোরাইট মাসকাট মদ খাওয়ানোর হুকুম হয়েছে।

ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন বিছানার গদি, চাদর, বালিশের ওয়াদ, বরফের বাস্কে রাখা বিয়ারের বোতলগুলো—যেমন যেমন হুকুম দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকমই হয়েছে সবকিছু।

—বেশ। যত পারেন খান-খান, ঘুমান। কোনরকম ভাবনা-চিন্তা নয়—যদি না এই গোল্ড, কিওর থেকে জখম কিউনি নিয়ে বেরুতে চান।

—মুখ খোয়ার বেসিনের স্ট্যাণ্ডটার নীচে মাইক্রোসকোপটা লুকিয়ে রাখা, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল। কোন কথা না বলে গভীরভাবে



সর্বত্র  
পাওয়া যায়

## এতীশা কবিরাজের মহাভুসরাজ

### তৈল

ইহাই একমাত্র কেশতৈল আয়ুর্বেদীয়  
ভেষজের গুণাগুণ ঠিক রাখিয়া —  
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য  
ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ  
কর্তৃক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।



আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

সেটা তুল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন গুনগুন করে গান গাইতে পাইতে। ওটা থাকলে যখন তখন নিজের স্পটাম টেস্ট করবে, সেই উদ্দেশ্যে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বুঝতে সময় লাগে নি।

তিনমাসব্যাপী আলস্যের জীবনের সেই সূচনা। পার্থিব জীবনের চরম প্রাচুর্যের মধ্যেও এমন অসুস্থতার বিলাসভুল নয় খুব। কমিউনিটির সদস্যর স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে রেখেছে চারপাশ থেকে, ইতোমধ্যেই তার নিরাপদ আরোগ্যের জন্য সিস্টাররা ম্যাস উৎসর্গ করেছে একটা। হয়তো কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগেছে সত্যি তার অসুখটা অতি পরিণামের দক্ষ কি না, নাকি কোন মানসিক ছন্দর ফল—যে ছন্দর নিরসন করতে পারে নি সে। কিন্তু ও জানে প্রার্থনায় তারা মনোনিবেশ করেছে যখন, মার্জিত মুখে সে ভাবনার লেশমাত্রও কোটে নি।

সিস্টার ইউচারিস্টিয়া প্রথম দেখতে এলেন তাকে, তারপর একে একে আর সবাই। বুঝা নানটি বাচ্চা একটা বাদর এনেছেন। ঘোড়ি খুলে একটি ছেলের বাস্কটবল সম্পত্তি, সিস্টার ইউচারিস্টিয়া কথা নিষেধিয়েছেন তাকে বাদরটার জন্য ভাল একটা থাকবার জায়গা খুঁজে দেবেন।

লম্বা লেজওয়ালা ছোট জীবটা ভর পেয়েছে বেজার।

সিস্টার লুক সাগ্রহে দু'হাতের মধ্যে তুলে নিল তাকে, মাদার ম্যাথিল্ডা কি অল্পমতি দেখেন আমার কাছে রাখতে?

সিস্টার ইউচারিস্টিয়া সহাস্র বললেন, তুমি যা চাও তাই পাবে, যা করতে চাও তাই করবে। বেলজিভা যে তাঁকে বলেছেন তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা নির্ভর করছে তার ওপর।

কোথাও বিধেয়ের স্পর্শ নেই এতটুকু, দৃষ্টান্তে পরম সন্তোষ। এমন আশ্চর্য, অজ্ঞতপূর্ব স্বাধীনতা তাঁদের মধ্যে একজনের ভাগ্যও বটেই অন্তত।

অসুস্থের খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ঠেকানো গেল না। কলোনির বেসব রোগীরা মনে রেখেছে তাদের জীবনের সঙ্কটকালে রাত্রির নিভৃতভাবে প্রার্থনারতা এই নানটিকে, তাদের কার্ড দেওয়া মদ, জাল্পিন মাদার ম্যাথিল্ডার অফিসে এসে পৌছাতে লাগল। ডেস-বরদর খোঁরা এনে দিচ্ছে ডিম, মুরগীর ছানা, মাঝে মাঝে এক-একটা শিকার-করা জন্তর মাংস। দেখতে বরসোসের মত, মাথাটা নেই, থাকলে বেড়াল বলে চিনতে পারা যেত। বাতীবাহী ড্রাম জানাবটা ভাগলে পৌঁছে দিয়েছে। ফল ফাদার জেরমরলোও সন্তোষে পেরেছেন। চিঠি দিয়েছেন একথানা—মনে করিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর তাই ঘটাবেন তার মংগলের জন্য যা বটা চাই। আর জানিয়েছেন তাঁর ছেলেরা হাতীর গাঁতে খোঁচাইয়ের কাজ করছে, বহাসময়ে সে উপহার রাখারের হাতে পৌছোবে তার কাছে।

বাদরটার নাম ফেলিস। ট্রি-হাইসে যখন মাসখানেক বেটেছে, ততদিনে তাকে সে নানের মত ঘ্রোঁদ দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। তার ডাইনিং টেবিলের একাধিক বসে সেই বাচা—পাশে বসে নিজের জাপকিনটা বাঁধে গলার, প্লেট থেকে ভরজাভে খাবার তুলে খায়। বিকেলের দিকে ও যখন ঘুমোর, খড়ের চালে ঝি-ঝি পোকের লড়াই খোলে। তারপর যখন বোম্ব উঠে পড়বার সময় হয়েছে

ওর, এখন উঠা অক্লিষ্ট পড়তে হবে, এসে ছোট ছোট কালো হাতে গায়ের চাবার ধরে টানে। ও যখন নতজান্ন হয়ে সান্নাধ্যার্থনা করে, উঁচু হসপিটাল-বেডবার বসে থাকে দু'হাত দিয়ে নিজের পা দুটো ধর। প্রার্থনা-সমাপ্তির অপেক্ষার বিচিত্র দু'টি ছোট ছোট সোনালী চোখে একদৃষ্ট তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, দেখে কতক্ষণে তৃপ্তিহীন করে। যেই তৃপ্তিহীন করা হয়ে যায় অমনি একলাকে কোলে এসে লম্বা লম্বা তারের মত হাত দুটো দিয়ে বহাসাধ্য জোরে গলাটা জড়িয়ে ধরে।

গ্র্যাণ্ড সাইসোলোব পর কখনও সিস্টার লুক কথা বলে না ফেলিসের সংগে। তবে তাকে কোলে নিয়ে যতর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় অনেক সময়—পর্দার গায়ে রাত্রি মথগুলো মালার মত কুলে থাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাই, হাসে ওর দিকে চেয়ে। আর আলোর সুইচটা একবার নিভিয়ে দিলে মুহূর্তে অরণ্যের প্রাণকেন্দ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওরা দু'জনেই—কৃত্রিম আলোটা সরে যাওয়ার সংগে সংগে বাইরের অকৃত্রিম জীবনটার সংগে ব্যবধান ঘুচে যায়—আরণ্যকের দল যেন নিকট সামিথে এসে পাঁড়ায়—তীক্ষ্ণবে, আর্তনাদে, গানে অরণ্যের জীবনটাকেই ওদের ঘরের মধ্যে টেনে আনে। পাতার কাঁক দিয়ে নিম্পলক চোখে তাকিয়ে চাঁদ হাসে। এমন পরিবেশে গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে ভেসে-আসা মাদলের সুরে ফ্রটলয়ের আমেজ লাগে।

দু'মাসে দশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। সবুজ বিবেচনার নিজের নাসি করে সে, ক্রটি ঘটতে দেয় না কোথাও। অসুখটার মানসিক প্রতিক্রিয়া সুতীত্র, আত্মকেন্দ্রিক, আবেগপূর্ণ ভালবাসার ভরিয়ে তুলেছে তাকে—অসুখ করার আগে কালে-ভয়ে প্রশংসা করেছে বার, আবেগের আতিশয্যে তার সংগে এখন শাস্তসংঘমে কথা বলা রীতিমত কষ্টকর। তবে এ অবস্থা যে আসবে অমুমানই করেছিল, তাই অবস্থাটাকে আরও আনাও সহজ হয়েছে অনেকটা। আশাবাদের সুরটাও খুব চড়ার বাঁধা এখন—নীরাগ হয়ে উঠবে বলেই নয়, সে বিষয়ে একেবারে স্থিরনিশ্চয় সে, ভবিষ্যৎ সবকিছু সম্বন্ধেই মনটা আপাতত সুখস্বপ্নের ঘোরে আছে। এও এ রোগেই লক্ষণ ভা জানে। তবু সব জানাকে ছাণিয়ে একটা অহুত্বিত্তি কোরালো হয়ে ওঠে মাঝে মাঝেই, সে অহুত্বিত্তি বলে অসুখ সেয়ে গেলেও এ সব উচ্চাশা মিলিয়ে বাবে না তার।

ডাক্তার তার মানসিক অসুস্থতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছিলেন—অধৌক্তিক মস্তিষ্কটা মন থেকে বেড়ে ফেলেছে। তাঁর আবেগময়তাই বিশ্রাম করছে, প্রতি দিনটাকে সেই দিনের সংগেই শেষ করে দিচ্ছে। ভাবনা-চিন্তাগুলো আপাতত প্রতিদিনের সুবোধন-সুবিজ্ঞের গণ্ডির মধ্যে সীমিত। তার এই নতুন জীবনের সাধনা তাকে নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতার দেখছে জীবন কত অনাড়ম্বর হতে পারে। দেখছে প্রতি দিনটিকে পরমেশ্বরের দান বলে নিলে কি অপরিমের সুখ পাওয়া যায়। দেখছে বত বিনয় বাড়ছে।

একদিন বিকেলে ঘুম থেকে উঠে পর্দা-সওয়া জানলার ধারে পাঁড়িয়ে আঁচল অব, লডস্ আত্মিত্তি করছিল। হঠাৎ খেরাল হল সমস্ত অন্তরটা তার অনাবল আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে—খি চিন্তাভ্রম ক্রম ড্যানিয়েলের অহুত্বিত্তি ওর বড় প্রিয়—আলো ও অহুত্বিত্তি



## পূর্ণপ্রাণে চাষার বাঁহা

আহ্বান জানাচ্ছে প্রভুকে আশীর্বাদ করতে, আহ্বান জানাচ্ছে গিরি-পর্বতকে, নদী সমুদ্রকে—ওদের জলের তপস্যার বা কিছু লীন সব কিছুকেই... আশীর্বাদ কর, হে পশুকুল, গাভীগণ, আশীর্বাদ কর প্রভুকে...

মন বলছে নানকে তো এমনই হতে হবে। হওয়া উচিত।  
ঈশ্বরের শিশু হওয়ার অর্থ এই-ই।

পূর্ণ অন্তরে বাইরের জামলতার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে অনেক সুখী নানের মুখ মনে পড়ছে, বুদ্ধি দিয়ে কোনদিন তাঁদের বুঝতে পারে নি। যা কিছুই ঘটনা হোক প্রাশান্তিতে গ্রহণ করেন তাঁরা—মাঝে মাঝে এটা নেহাৎ ছেলেমানুষি মনে হ'ত। আজ নিজের মনের সেই অবজ্ঞার হাসি নিজের গায়েই লাগছে ফিরে।

সুখী ঐ মুখগুলো ঠকে বলছে যেন, প্রতিদিন নতুন করে বাঁচার অর্থ এখন তুমি জেনেছ, জেনেছ দিন-শেষের সঙ্গে দিনটাকে শেষ করে দেবার মূল্য কতখানি।... বন্ধুর পাথে বাধা যত কিছু তাকে সরিয়ে দিয়ে পথ করে দেবার শক্তি প্রভু স্বয়ং যোগান।

বানরটাকে বলল, অসুখ না করলে এ কথা জানা হ'ত না আমার। আর দেখছিল। ফেলিন ওর স্বাটটা আঁকড়ে ধরে থলে আছে।

রোজ এই সময়টার অব ওঠে। আজ প্রথম খারমোমিটারটা নরমাল শো করছে। ১০০ খারমোমিটারটা বাড়তে বাড়তে ঘরটাও চারদিকে ঘুরছে, উত্তেজিত মনের পরশ লেগেছে লোর ছন্দে।

পরদিন অপরাহ্নের পর মাইক্রোসকোপের দীর্ঘে নিজের স্পটাম টেস্ট করছিল, ধরে ফেললেন ডাক্তার।

সঙ্গেহে হাসতে লাগলেন, তাড়াহুড়ো করে লাভ কি? তাড়াহুড়ো করলেই কি কমিউনিটিতে করা সহজ হয়ে যাবে? তা হবে না সিস্টার, বুঝা চেষ্টা।

আরও সন্তোষান্বিতের মধ্যে সব মাইডগুলো তার নেগেটিভ শো করল।

কমিউনিটিতে ফিরে মনে হ'ল অপরূপ স্মরণ এক নিস্তব্ধ নিজ'র দেশে বেড়িয়ে ঘরে ফিরল যেন। এই ছোট কমিউনিটিকে প্রতিদিন মনে হ'ত একেবারে শুষ্ক, নির্বাক। আজ মনে হ'ল তুল ফেনেছিল এতদিন—যথেষ্ট সাড়াশব্দ আছে কায়গাটার, প্রাণের সাড়া একটু কাল পাতলেই মেলে। ট্রি-হাউসের মত নিস্তব্ধ জনহীন নয়।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়



প্রেক্ষাবদ্ধ হয়ে কাজ করুন, প্রেক্ষাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুন

একাবদ্ধ হয়ে কাজ করা, একাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলা এবং নিয়মাবদ্ধতার ওপারেই একটা জাতির শক্তি নির্ভর করে। আমাদের স্বাধীনতা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, একমাত্র একতা ও সংহিত প্রাচটাই সেই বিপদ দূর করতে পারে। একাবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করুন।

ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করে তুলুন

# কবি কণ্ঠপুর-বিরচিত আনন্দ-রত্নাবন

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

একবিংশ স্তবক

রাস-বিলাস

১৬-১৬। সেই গান শুনতে শুনতে, সেই গানের স্রুতে, সেই গানের স্বরগ্রাম শ্রুতি জাতি ইত্যাদির অঙ্কুর কৌশলে, একান্ত সচেতন হয়ে উঠলেন কুসুমাসব। স্বরগর্বে ফুল উঠল তাঁর ছাতি। চীৎকার দিয়ে উঠলেন,—‘ললিতে উল্লিতে, প্রাণের স্যাঙাৎ আমার কি গানধানাই না গাইছেন—চরীতে! বয়সকালেও শুনি নি এমন স্রুতের ফুল ফোটানো গান! অসাধ্য, ইং, আশনাদের মত গরবিনীদের গলায় তোলা অসাধ্য।’

সঙ্গীতবিদ্যা হৃদয় দিয়ে উঠলেন,—‘একরসি চরী নেই, কেবল ক্যাচ-ক্যাচ। শাণিয়ে রেখেছেন বুদ্ধিকে। চরীর চেয়েও যদি মুরলী গান গাইতে আমাদের এই ললিতা, তা হলে যে মর্ত্তমান স্থলবুদ্ধি! আপনাকে হারাতে হবে মুরলী। আসুন বাজি ফেলুন।’

কুসুমাসব বললেন,—‘সঙ্গীতবিদ্যে, আপনি দেখছি বলতে চান—এই সঙ্গীতবিদ্যা আপনিই একলা বোঝেন,—এর ধ্যান-ধারণাও আমাদের পক্ষে দুঃসহ,—বাজি ফেলেই একে বুঝতে হয়। তা হলে কিন্তু আমাদেরও বলতে হয়, গান ভালো লাগা না-লাগাটা দৈবস্তরের ব্যাপার।’

সঙ্গীতবিদ্যা বললেন,—‘বিশ্রবটু, এটি বৈদগ্ধ্য নয় যে ব্রাহ্মণ বৈদগ্ধ্যদের প্রশস্তির প্রতীক। করতে হবে। বলি, এসব গানের বিচারে আপনি কে মহাশয়?’

১৭। ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণও হাসতে-হাসতে গাইতে-গাইতে এমন চোখে চাইলেন বরসুর দিকে যে, সে চোখ দেখে কুসুমাসবের আর বুঝতে বাকি রইল না তিনি কি চান। তাই পুনর্বার ছাড়লেন,—‘অরি গরবিনী ধনী—তা বেশ তা বেশ। ধরেই নিচ্ছি আমি কেউ নই; সঙ্গীতের যে আমি একমাত্র সমরদার একথা আপনি মানেন না। ভালো। কিন্তু আশা করি আপনি লক্ষ্য করেছেন, আমার বরসুর গান গেয়ে উঠতেই শুরু হয়ে গেল যমুনার জল, তরুলতা আনন্দে ঝড়লো, খগমুগ পঞ্চ শিউরে উঠল হর্ষে। আপনার গানে যদি তাই ঘটত তু হলে কথঞ্চিৎ সমতার একটা প্রান্ত উঠলেও উঠতে পারত। তবে সমীচীনতার তো নয়ই। অতএব আসুন, আমিও প্রস্তুত। লিঙ্গগান নিয়ে যদি পাশা পাড়তে চান, তা হলে একদিকে এই রইল আমার মুরলী-পাণ, আর অপরদিকে আপনারো থাকুক প্রিয়সখী-পাণ। করুন।’

১৮। চমকে উঠলেন ললিতা, বললেন,—‘কি কুবুদ্ধি গো কি কুবুদ্ধি। এই সব বুদ্ধিতেই তো পৃথিবী পুড়ে থাকে হয়ে যায়। পাশা খেলার পণ্যপণি আছে সবাই জানে; তা বলে এমনধারা পণ্য কাচ-কাঞ্চনের সমতা?’

কুসুমাসব।—‘কী যে বলছেন আপনি। আমার প্রিয় বরসুর মুরলী হল কাচ, আর আপনার সখী হলেন কাঞ্চন?’

ললিতা।—‘নিশ্চয়, এতে সন্দেহ কোথায়? যদি সাম্যই চান, তা হলে বিনিষ্কোভে পণ রাখুন আপনার বরসুটিকে।’

কুসুমাসব।—‘বেশ তবে গান ধরুন। হিতৈষীদের আমি শিরোমণি। আমি এই পণ ধরলেম আমার বরসুকে।’

১৯। ললিতা আরম্ভ করলেন গান।

প্রথমেই তিনি আলাপ করলেন—‘কেদার রাগ—অতিললিত, অতি-উদার। গন্ধর্ব-গর্ভ খর্ব করে, গরিমায় ও মাধুরীতে বিকশিত হয়ে উঠল তাঁর গান্ধার-প্রাণে সঙ্গীতবৃত্তি বজ্রকণ্ঠে গা রে মা ধা রে। ত্রিহীন স্পর্শ করে অনেকরকম গমকের ব্যবহার দেখিয়ে খেলতে লাগল আলাপ। এমন ভূক নাচিয়ে আলাপ জমালে, আর আলাপের মধ্যে এমন ত্রীড়ারসের ক্রীড়া দেখালো, প্রোহাদের যে সাহস ও উৎসাহে ভর্তী পাড়বে সে তো স্বতঃসিদ্ধ।

২০। কেদার রাগে আলাপ করেই লয়ের খেলা দেখিয়ে শৌরসেনী ভাষার গান ধরলেন ললিতা,—

‘সকল কল্যায় মণ্ডল ও,

বধিত-প্রেমক সমুদ্র ও,

পৃথিবী হরষণ পশ্চিম ও,

রাজ্যে শ্যামল-চন্দ্র ও।

অমর-মঞ্জরী শিরপর আলা,

ফাল্গুন রাজকি খেলন ও

বৃন্দাবন-প্রিয় কোকিল কাল,

অবলা জনে কাঁহে হেলন ও।’

২১। গান শুনেই সগর্বে চোঁটেরে উঠলেন কুসুমাসব,—

‘হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ—হেরে গেছেন, হোঃ হোঃ’

হোঃ হোঃ—হেরে গেছেন ললিতাদেবী।’

বলতে বলতে দুঃখ তুলে ভাবের ঘোরে সে কি তাঁর উদ্ধাম নৃত্য! জানতেই পারলেন না কুসুমাসব, বগল থেকে কখন খসে পড়ে গেছে তাঁর মুরলী, জানতেই পারলেন না কখন নিমেষের মধ্যে সকলের চোখে বেন ধুলো দিয়েই টুক করে মাটি থেকে মুরলীটুক সরিয়ে ফেলেছেন শ্রীমতী সঙ্গীতবিদ্যা। গোলেমালে গন্তগোলে একটি প্রাণীও জানতে পারল না, কি হল মুরলী। সঙ্গীতবিদ্যা এই বিবয়ে আর হুঁ ছ’ শব্দটি করলেন না। বরং উল্টো মুখ কামটা দিয়ে কুসুমাসবকেই বলে উঠলেন,—‘আচ্ছা তো; কোন কারণ? নেই, হঠাৎ এমন—আজ্ঞা দোষ মাতালের মত নেচে উঠছেন কেন? যিনি সত্যিই পারেন সেই আপনার বরসুটিই বিচার করে বলুন—কার জয়।’

২২-২৪। উত্তর দিলেন কুসুমাসব,—‘নিজেকে যোর পণ্ডিত বলে বিবেচনা করেন দেখছি। আমার তো মনে হয়, সরাসরি হার হয়ে গেছে আপনার। সোজা কথা—বাজি ফেলা হয়েছিল চরী গান নিয়ে, ইনি গাইলেন বিপদিকাঞ্চণ্ড। আবার হাসছেন যে। নিজেই বিচার করুন, হার হয়েছে কি না।’

শুনেনি হো: হো: করে হেসে উঠলেন সুন্দরীরা। তাঁরা ছড়া কাটতে লাগলেন কবিতায়। তারপরে একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন,—  
'বৈরসিক মহাশয়, চর্চা হোক, দ্বিপদী হোক জন্তুদী হোক, নামের বৈচিত্র্যে কি আসে যায়। গানে দেখতে হয় স্বরগ্রাম মূর্ছনার খেলা।

চোখ চেয়ে দেখুন ললিতাদেবীর গীত-মাধুর্যের মতিমাটি :—

এই পাখাণ্ডুলি-মণীন্দ্রদেহ নিয়ে বঁারা আলবাল রচনা করেন বুকের, তাঁরা মকুলেই দ্রব হয়ে গেছেন, উদগীরণ করছেন জল। ঐ দেখুন, সেই জলও আবার স্তম্ভিত হয়ে জমে গেছে, কঠিন হয়ে প্রত্যেক বুকের মূলে মূলে রচনা করেছে নিবিড় বেদী।

কালিন্দী দেবতাছা, বৃন্দাবনের তরুলতা জানময়, খগমুগ সকলেই চিময়। ধাপনার বয়স্কর গান শুনেন তাঁরা যে ভাসবেন কীদবেন, সোটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর গানের এইটেই বৈশিষ্ট্য যে, পাখাণ্ড গলল। তাই বলছি, জিতছে আমরাই। আপনি এখন দয়া করে নিজের বয়স্কটিকে নিজে হাত ধরে নিয়ে এসে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন।'

২৫। এবার সুবল এগিয়ে এলেন, বললেন,—'অগ্নি সঙ্গীত-বিজ্ঞে, অবিজ্ঞার মত আজ এ জড়ত কেন আপনার? আপনি তো আর তাঁর মত নন। তিনি কেমন করে কৃষ্ণক নিয়ে আসবেন? অধীন তার প্রভুকে টেনে নিয়ে আসবে, এমন কথা তো বেদেও নেই।'

কৃষ্ণ বললেন,—'কৃষ্ণমাসব, এখন তোমার মান বাচানো দায়। সিব-মদমত্তা এই বরবর্ণিনীরা এই বিজ্ঞ-গরবিনীরাই—জিতছেন। এদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তুমি পারবে না। যত চেষ্টা করবে আরো অনর্থকই ঘটবে, একশেষ হবে দুঃস্বপ্নার। অতএব দাও আমাকে আমার মুরঙ্গী। নইলে তোমার সঙ্গে মুরঙ্গীটিও যাবেন।'

বন্ধার দিয়ে উঠলেন কৃষ্ণমাসব,—

'কী যে বল কথা! জিততেছি, আমিই জিতছি।

আপনি এখন দয়া করে গা তুলুন, প্রচণ্ড হর্ষে

সমানয়ন করুন এঁদের প্রিয় সবীচিক।'

২৬-২৭। ললিতা কুণ্ঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—'ওরে নির্লজ্জ পত্নপুত্র, এতটুকুও ঘটে বৃদ্ধি নেই—গান নিয়ে হল পণ, আর নিজে কি না গগন ফাটাইছেন—আমার জয় আমার জয় বলে চেঁচিয়ে!'

কৃষ্ণমাসব কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'জানি না বাবা,

কিসের গোভ হয়েছে আপনার। নিজের সিদ্ধান্তই যেখানে সিদ্ধান্ত নয় সেখানে আর বলবার কীই বা থাকে! নিন আপনার মুরঙ্গী, আমি পালাই।'

এই বলে মুরঙ্গীটি দিতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, নেট, মুরঙ্গী নেই। কৃষ্ণ দিয়ে উঠলেন,—'ভো বহুত, পালিয়েছেন, প্রথমেই আমার বগলদা বা থেকে ভরে অস্থির হয়ে মুরঙ্গীদেবী পালিয়েছেন, বোধ হয় অক্ষত লতার উদ্ভানে—'তিনি পালিয়েছেন।' হাসির কথা, রসের কথা। - হো: হো: করে হেসে উঠলেন সকলে।

২৮। ঠিক এই সময়টিতে কৃষ্ণমণ্ডলের কিছুদূরেই আবারের নিবিড় রমণীয়তায় বহুমত্তা হয়ে বিলাস করছিলেন বলরামপক্ষীরা বরবর্ণিনীরা। হোলিখেলা চলছে, হঠাৎ সেখানে ঘটে গেল এক বীভৎস ব্যাপার। কোথা থেকে এলেন জানি না, কোথায় লুকিয়ে ছিলেন তাও জানি না, মৃত্যুর নিমন্ত্রণ পেয়েই যেন হঠাৎ তাঁদের মাথাখানে লাঞ্ছিত পড়লেন এক কুবোর অমূল্যজীবী—শঙ্খচূড় তাঁর নাম—বৃন্দাধম, জীবনধারীদের মধ্যে অধমেরও তিনি অধম। উদ্বেগজটিকিত তাঁর মহৎ—রাম-রামাদের মধ্যে যিনি রত্ন তাঁকে তিনি তরণ করে নিয়ে সটকাবেন। কি প্রচণ্ড লক্ষ দিয়েই না তিনি এলেন। উল্লফনই বটে।

ধরুন, কোনো স্থানে পড়ে রয়েছে একখান চিকণ কনকশিলা, চক্চক্ করছে মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের কিরণ-মরীচিকায়। সেটিকে যদি নিমল জলে ভেঁগ ভেবে, কোনো বোদে-পোড়া মূর্খ-পাছে মগডাল থেকে বাঁপ দেয় সবেগে !!—এই লক্ষণ সেই রকমের।

ধরুন কোথাও গনগনে আগুন জ্বলছে, লক্সক্ করছে শিখা; সেটিকে দিব্যোষধির কম্পিত কানন ভেবে, চুরির লোভ সামলাতে না পেরে, যদি কোনো পতঙ্গ তাতে লাক মারে !!—এই লক্ষণটিও সেই ধরণের।

ধরুন বনের মধ্যে কোথাও সোনার রঙের কেশর ফুলিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে সিংহ; সেটিকে পাকা ধানর আঁটি ভেবে হঠাৎ যদি লাক মারে বুড়ু—এক বজা মহিষ !!—এনার লক্ষণটিও সেই ধরণের।

গাখের মাথার মণি চুর করতে গেলে ব্যাঙের যা দূর্দশা হয়, এ-ও যে তাই হবে তাতে আর সন্দেহ কি।

২৯। তাঁকে দেখে, তাঁর অতিকরাল মাথায় আবার একখান জলজলে মাণিক জ্বলছে দেখে, তরঙ্গুর চোখের সামনে চমুসদের যে দশা



Super craftsmanship  
in  
JEWELLERY

ROY COUSIN & CO.  
JEWELLERS & WATCHMAKERS  
4, DALHOUSIE SQ. EAST. CAL. - I

হয় তাই হল বিলাসিনীদের। তাঁরা সিঁচিয়ে উঠলেন। সত্ৰাসে মুখ  
উঁচিয়ে চীংকার দিয়ে উঠলেন,—

‘কোথায় রাম, কোথায় কৃষ্ণ, রক্ষা কর আমাদের রক্ষা কর।’

৩০। নিজের আনন্দাবগে বলয়ম তখনও নাচছিলেন। কিন্তু  
অর্জুনের কানে পৌঁছেছে না পৌঁছেতেই লাফিয়ে উঠলেন শ্রীরক্ষা।  
মধ্যপথেই থেমে গেল তাঁর গান। তিনি ছুটলেন। ধরায় পা পড়ে  
পড়ে কি না। পড়ে--এত দ্রুত ছুটলেন, দুর্বলটাকে ধরতে পাছু পাছু  
ছুটেছে ছুটেছে এমন শ্রীবল্লভম-গনগন করছে (ক্রোধ, হৃদয়টাকে যেন  
কল্প বগে দিয়েছে পেশ্যাবাশের কেশা।

৩১। কৃষ্ণ বলরাম-দুই বোন-প্রতির প্রচেষ্টাগুলো ছুটি আগুনে  
 দেগে পামহাঁসের জ্ঞান হল। তবে কি এবার আগুয় উকট অবমাননা  
 শাল চড়কে হবে? মোর ফলেন না যে? ৭ প্রাণটি আগে বিচ্যানে।  
 দরকার। অতঃপর হর্মসি পামহাঁস চড়ে দিহে পামহাঁস পালানেন।  
 পামহাঁস বাল পালান।

৩২। একদিকে সিন্ধের মত ছুঁইয়েন পুরুষাবৃত্ত বৃক্ষ, অন্যদিকে বহু হস্তী বহু পলায়ন কলাহীন যক্ষাধম শ্রীচূড়। ক্রম দম ফুঁবেই গেল অসমর। একদিকে ফ্রেপ ওতুদিকে খেভি ; ভূমি বেগের সমাধিতে স্রিষ্ট শ্রীচূড় হায় পড়লেন পামর। তাঁর উপর কাঁপিয়া পড়লেন বৃক্ষ, কাকের মাথায় যেন তাম। বহুচূড় যেন সাপ হাব বেমানি আয়সীনি বক্রম বৃক্ষ তাঁর পশ্চাত্তর মুণ্ডি বম্বো পামবায় কশ জড়ায় নিয় মারলেন চান। উপাড় হল, বুড়ো বহুপের পিঠ বহু শকু সেই অসু-কল্যাণের মন্তক। তাঁরপরে শ্রীচূড় বহু মন্তক থেকে বৃক্ষ উপাটন করে ফেললেন সেই অসমলে প্রসিদ্ধ মণি।

ব্যাপার দেখে ব্রজহুনাশের তৌ চোখের পাতা আর  
পড়ে না। মলি তো নয় যেম তাঁদের বিবাত ঝান্ডের প্রতীমুতি।  
মানটিক হাত নিয়ে এ গায় এলেন। বহুতী। দাদা বরামকে উপহার  
দিবেন সেটি প্রমোদ-মুদাম দামোদর

৩৩ ৩৬। তারবারে তিনি ফিরে গেলেন তাঁর কসমশ্রু মজোব্বের  
আবোশের মাধ্য। রোরে বঙ্গলাক্রীড়ার বাঁবা তাঁর ধ্যানর ধন, সেট তাঁর  
নিকরু রমীমশুল বরিত ও তগনো স্ববক্রুতর মনোগারিতায় গেয়ে চল-  
ছিলেন গান যদিও তবানো আন্দল প্রকাশ করে চলছিলেন তাঁর সবারা,  
তবুও কৃষ্ণর মনে চল, কেনন যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে উৎসব।

তাই এসেছি, কোথায় যেন কিছুই ঘটে নি, তেমনই একটা ভাব দেখিয়ে, এমন হোলপাড় করে তুললেন উৎসব যমেনে তল--নিভস্ত নীল যেন জ্বলন্ত শ্বশুর সারথী যেন ভরল পাতল দালাল যেন চূর্ণকাম হরে গেল নতুন করে। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল--কোথায় মুন্সী কোথায় মুন্সী! আর--তুমি চোর, তুমি চোর, তুমি সবচেয়ে, তুমিই চোর--চৌরী চৌরী--বলতে বলতে কৃষ্ণ কাঁপিয়ে পড়লেন সেইখানে, প্রেমের আবেশে তল গিয়ে যখনে তাঁর নিতাম্বী সতচীনের সঙ্গে নিয়ে বাসভঞ্জন চন্দ্রাবমনে--ভবামনে। বাধার অবসর না দিয়েই, যখন তিনি উদ্দেশ্যে প্রবেশের বুকুর আঁচল সরিয়ে তাঁর খুঁজে লগলেন মুন্সী তখন প্রথমে বিপরীত দিক দিয়ে উল্লসিত হয়ে উল্লসিত হয়ে, তারপরে চট্ট তুলল জুড়ি, শব্দ কুটিল হল চক্ৰ। দেবতার মূর্তি তাঁর বললেন--

‘বলি ও কুশম্বাসবের সহচর, এ অবিচার তোমাকেই সাজে। তোমার হাত থেকে উড়াও হয়ে আমাদের গুড়নার মধ্যে ঢুকবে কেমন করে মুন্সী? তোমার ঐ মন মজানো। মুরলী যদি আমরায় চুরি করে থাকি, তাহলে দাও আমাদের সমুদ্র দণ্ড; আর তা যদি না হয়, তাহলে আমরা ছিনিয়ে নেব তোমার সেকৌলজ কণ্ঠহার। এই রইল আমাদের পণ।’

চন্দ্রাবলী বন্ধার দ্বিগুণে বঙ্গলেন,—

‘অবলা তলোও আমরা কারা গায়ের জোরে টলি না। আমরা মুবলী চুর কদতে পারি...এই বুঝে তো তোমার হাত থেকে কুশুমাসির ছিনিয়ে নিয়ে’ ছাফান মুবলী। সেটুকুও দেখছি স্বরণে নেই।’

कुशमासिब वः ज्ञेयः—

‘আমরা চুপ করতে পারি’... এই বাঁকটুকু থেকেই প্রশ্ন জন্মে,  
আপনার চুপ করেছেন মুন্সী। আমি যে ছিনিয়ে নিয়েছি মুন্সী,  
তার প্রশ্ন বটে ? বটে, দেখান।

ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ବଳଲେ,—

‘প্রমাণ আদায় কি, এ’রা সবচেই প্রমাণ।’

বৌক দাঁড়ালেন ত্রাফিনাট্ট, বললেন,—‘ওরা সকলেই আমার  
বিশ্বক্ষেত্র।’

চন্দ্রাবলী । 'আপনার রহস্যই আমার প্রমাণ ।'

বিস্ময়বহু। 'না, তা হতেই পারে না। তুমি যদি তবে, নির্দয় (যোদী), তবু কেন আপনাদের ওটনা হুজুগ করতে যাবেন?—আগা, তখন মুরলী, মেরের চেহা মুরলী—নিমেষ নহে আপনারাষ্ট আপত্তন করেনে; আপনাদের বাদ্যদ্বিত অতএব অলীক।'

৩৭। বুধমাসের উত্তরে অগ্রভিত্তা বা ভীতির কোনও গন্ধই ছিল না। নিকট সত্তা কি কখনো নিছক মিথ্যা হয়? বুধ বললেন,—‘দেখ বৎস, যেটিকে তো তোমার পদ্মহাতের সঙ্গী হয়ে থাকতেই আমি দেখছি। আমার মন বলছে, সঙ্গী হরিদ্রাই ওটিকে সগিছেছে, ঘরা নেন।’

ভূনাং সঙ্গীতিঃ-- অতিশয়গোব যিনি বনবিবেশে--নিজের  
সর্গাত নখানর সীমানায় কপ কবে ফুটিয়ে তুললেন ছলছলে একটা  
ছলনার ভাব এবং হৃদ্য। পারের যন্ত্রুর বাজয়ে লালিতার পাশ দিয়ে  
চলতে লেটে তাঁর হাতে টুক করে চালান করে দিলেন মুরদী।

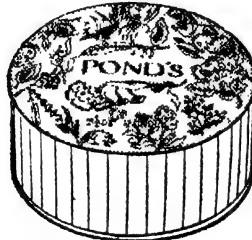
৩৮। তাঁর আকাংক্ষাব্যবহার যে একটু বিশেষ প্রকারের, — লক্ষ্য  
এড়ান না ত্র্যক্ষবস্তুর। বাড়ি ঘরেই তৎক্ষণাৎ তিনি কৃষকে বললেন,  
— বসন্ত, ধান করাল। মুরলী-তন্ত্ররা তিনি নিজেই অভিযুক্ত। হাঙ্গ  
পড়েছেন। সঙ্গাতের ধিনি আগমাদিষ্টাত্তা দেবা, তাঁকে উদ্দেশ্য কর  
ঐ সেট তখন কিঞ্চিৎ পরিহাস করেছিলেন কি না, তাই শুনে কি  
বলে — নাকের উপরেই ঐ তাঁর প্রমাণসিদ্ধ হয়ে গেছে আশঙ্কা, সঙ্ঘাতের  
এখন কল্যাণ করতে চুটেছেন। এ বাবা চোয়ের লক্ষণ।

লালিত্যের হাতে মুরসী চালান করে সদর্পে এগিয়ে এলেন সঙ্গীতাবধা। অম্লের বিম্বিত হাসির অগ্নিরেখা টেনে তিনি ঠুকলেন,—  
‘এসব কি বকছেন বাটমশায়? নিঃসন্দেহে আপনি একটি কাগজটার  
কুশ।’ ফাগ নিয়ে খেলতে খেলতে, কখন আনি আবার চুরি কাগজের  
মুশ? আর যার হাস্য দেও কঠিন, আমি প্রয়োজনেই বা লালগের  
তার মুশ?।’ হিষো বদনাম এসে দেখেই দেখেছি আপনার শতাব।



## পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেসপাউডারে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল... মনোরম মুখশ্রী

পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেসপাউডারে আপনার রং একেবারে অকৃত্রিম দেখাবে—মুখশ্রী হবে আশ্চর্য উজ্জ্বল। এই পাউডার মুখের ওপর আলতোভাবে লেগে থাকে... কখনও জেবড়ে যায় না বা দাগ পড়ে না; মুখের এতটুকু দোষত্রুটিও সহজে নিখুঁতভাবে ঢেকে রাখে। পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেসপাউডার হাল্কা ও বিহি—রকমারি রঙের পাবেন। একবার মাখলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার মুখশ্রী লাবণ্যে মনোমুগ্ধকর থাকবে।



## পণ্ডস

ড্রীমফ্লাওয়ার  
ফেসপাউডার

সীলন-পাণ্ড স ইনস্ট (সীমিত দ্বারে থাকিন যতরায়ে সংগঠিত)

JWT/P 2086

এমন করলে অদূর ভবিষ্যতে আপনি যে একটি কলঙ্কের পুণ্ড্রবক হয়ে ফুটেবন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা রাখি আর বেশি প্রশ্নের সেরেবন না নিজের নীতি বিগহিত বাচালতার। যাক, দয়াবশতঃই এবার শান্তি বিধান করা হল না আপনার।”

৩১। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে।

মুন্সীর অপভ্রংশ নিয়ে এই রণ, এই সাহস, এই হাসি, অবলাদের উপর এই বল প্রয়োগ, এবং প্রেমোৎসাহের চেয়েও অনেক বেশি উপভোগ্য এই অসম আমোদ ও সরস আহ্বাদ, এক মধুর ব্যাপার হয়ে ঝাঁড়াল বনমালীর কাছে; তবুও তিনি পারলেন না—কিছুতেই পারলেন না—মন টলাতে মান ভাঙাতে মানিনীদের, তাঁর মণ্ডলের ঐ সাধের সুলক্ষীদের। মনটা কেমন যেন নরম হয়েই গেল।

অতএব ক্রমশ তিনি একের পর এক উপস্থিত হতে লাগলেন তাঁর সখীদের কাছে। যেখানেই যান সেখানেই—প্রত্যাখ্যান! পাওরা যায় না মুরলী, সখীরা যান এড়িয়ে। এমন করে ঘরতে ঘরতে তিনি যখন ললিতার কাছে এসে পৌঁছলেন, এবং যখন ভ্রমর-রীতিতে স্পর্শ করতে গেলেন সেই পদ্মটিকে, তখন হাসির দমকে একটু অসাধবান হয়ে পড়া সন্তোষ, নবলব্ধ সৌভাগ্যের গবিত আনন্দে ললিতাদেবী—রসপাণ্ডিতা যিনি অতি ললিতা—তিনি নিঃসঙ্কোচে, যেন কৃষ্ণের স্পর্শ এড়াতে, পৌঁছে গেলেন বৃষভাম্বনিনীর বরাশয়ে, এবং অলক্ষিতে তাঁর হাতে মুরলীট সঁপে দিয়ে, কিংবা এসে নির্ভয়ে বলে উঠলেন,—

৪০-৪১। ভালবেসে বেসে অত আর হাসতে হবে না। ঠেলাটি বুঝতে পারবেন যদি আমাকে ছোন। দেমাকে আর পা পড়ে না। এই দেখুন আমার কাছে মুরলী নেই, মিথ্যুক নয় ললিতা।” বলতে বলতে তিনি নাড়াতে লাগলেন ওড়না; এবং হাসির ঝিলিকে জ্যোৎস্না হাসিয়ে পুনর্বার বলে উঠলেন,—

“ভালবাসার মানুষ কি সব ভুলে যায়? মনে করে দেখুন, কুবেরের অমুচরের পিছনে আপনি ছুটছিলেন—তখন মাটিতে পড়ে যায় নি তো আপনার ছোট বীশীটি? বুখা, বুখা, আপনার এই চোর বোঁজা এই পরমাসুন্দরীদের মধ্যে।”

কুসুমাসব ফিসফিস করে বললেন,—

‘বুঝেছেন বয়স্য, সুন্দরীদের পরমাটি তাহলে বেণুচোর।’

কৃষ্ণ বললেন,—

‘হতেও পারে। বয়স্য কী উদ্ভট কী সূক্ষ্ম তোমার বুদ্ধি! পারিশেষ্য প্রমাণ বলে ঐ ওতেই তো গিয়ে শেষ হচ্ছে তর্ক। চল বাই, বোঁজা যাক।’

এই বলে পীতাম্বর যেই মন্তপ-নাটো চোখ ঘোরাতে ঘোরাকে এগোবার উপক্রম করলেন রাধার দিকে, অমনি তিনি সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, যে মণিটি দাদাকে তিনি ভেঁটে দিয়েছিলেন, সেই মণি, অবিমাদি অষ্টদিকির সিদ্ধির চেয়েও সুখদ সেই মণি, উঃ কি সুখরঞ্জন কি অমূল্য তার জ্যোতিঃ—সেই মণিটিকে হাতে নিয়ে

বলরামপ্রিয়া জর্নেকা উৎসবরসিকা তাঁর রাধার সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন!

তারপরে কৃষ্ণ কানে শুনতে পেলেন, বলরাম-প্রিয়া তাঁর রাধাকে বলছেন,—

‘অরি গুণ-গরবিনী রাধিকে, দামোদরের অগ্রজ এই মণিখানি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করুন।’

৪২। তারপরে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন, বলরাম-প্রিয়ার নিবেদন শুনে ধূসীতে ভরে উঠল রাধার অন্তর, হাসির কিরণ লাগল দন্তে, এবং মণিটি গ্রহণ করবার আগ্রহে যেই তিনি সত্তর প্রসারিত করলেন দুখানি ফুলের পাণড়ির মত করযুগ, আর মরি মরি, স্তম্ভর শিথিল হল যেই সুন্দরীর উত্তরী, অমনি—ওমঃ—ওকি—মাটিতে পড়ে গেল যে তাঁরি মুরলী।

৪৩-৪৪। দেখেই, হাসতে গিয়ে দেখলেন, সিঁদুরের মত টকটকে লাল হয়ে গেছে কুসুমাসবের বদন; ঘাড় ঘুরিয়ে বগল বাঁধিয়ে সান্নিধ্য তৈরি নাচছেন; সহচরদের সঙ্গে মিলে হি-হি করে হাসছেন; করতালির করতাল বাঁধিয়ে হৈ হৈ করে গাইছেন। হাসতে হাসতে কৃষ্ণ তখন ললিতাকে পরিহাস করে বললেন,—‘বলি ও ললিতে, তখন আমার আপনি বলেছিলেন—কুবেরের অমুচরের পিছনে ছুটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে মুরলী। এখন দেখছি, যা বলেছিলেন, তা সত্য। তা না হলে কি এমন হয়? বাৎসল্য-কুতূহলী আমার চলধারী দাদা আদর করে উপহার পাঠালেন মণি, আর যেই সেটি গৃহীত হল, অমনি অবহেলায় ক্ষুণ্ণ হয়ে স্তম্ভরী নবরোষে জ্বলে উঠলেন মুরলীদেবী। তিনি মান করে যে ভুল-নিপত্তি হবেন—এতো হবারই কথা!’

কুসুমাসব বললেন,—‘আহো আহো, আশ্চর্যের নয় কিছুই। প্রিয়-বয়স্যের আমার ছিদ্রহীন শুভবুদ্ধিটি এতই গভীর, যে শত চেষ্টা করেও গুহ্যদের বৃহস্পতি নিজের বয়সকালে ডুব মেরে তুল ছুঁতে পারলেন না সে সাগরের। সেই বুদ্ধিটিকে যিনি চুরি করেন, নবীন তন্তর-বিজ্ঞান-স্বরূপিনী সেই বৃষভাম্বনিনী যে একটা ছেঁদো, অমজুল মুরলী চুরি করবেন, যা নিখিল জনমানসকে রসাতলে ডুবিয়ে মারবার একটি বস্ত্রবিশেষ, তাতে আর কপালে চোখ তোলায় আছে কি! ওহে আমার তমালবরণ বন্ধু, তুলে নিন আপনার মুরলী। ভেবেছিলেন, আমি নিয়েছি; কিন্তু ভুল বয়স্য, ভুল। নীতির তো আপনার বালাই নেই।’

৪৫। বীশীখানি কুড়িয়ে নিয়ে কুসুমাসব সঁপে দিলেন কুবের করকমলে। আদর করে দামোদর অধরে ধরলেন বীশরী। বীশী বাজলো। নির্বিড় উদ্ভাসে ছড়িয়ে পড়ল আমোদের ফুলকি।

বীশী বাজলো। প্রেমে নির্বাক হয়ে গেলেন আনন্দময়ীরা। ভাবের অক্ষুট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে, আকারে-ইঙ্গিতে বিকশিত হয়ে উঠল বাসন্তী বন-বাবণ্য।

মহোৎসবের হল অবসান।

[ক্রমশঃ]

ইতি মুরলীচৌর্ধবিলাসো নাম একবিশ্ব স্তবকঃ।

[মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]

অজিতকৃষ্ণ বসু

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

# বাস্তবী মজিল



[ ৬নটবর মিত্তের ডায়েরী থেকে ]

কি অন্ধকণের মধ্যেই বুঝলাম সে আমার আপন জন্মস্থানই  
খুঁজুকানি, কাহারও পদধ্বনি নহে। ভুল-ভঞ্জে মনটা  
খুঁশি হইল না, উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার মেহাদ বাড়িয়া গেল। বড়ই  
অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে নানারূপ চিন্তা আসিয়া  
মগজে হিড় করিল।

ভাবিতে লাগিলাম সত্যই কি আলোতে আমার বিশ্বাসের ব্যাঘাত  
ঘটিবে বলিয়া 'বিবিসাহেব'র হুকুমে তৃত্য এ ঘরের সমস্ত আলো  
নিবাইয়া দিয়া গেল? না কি ইহার পিছনে অন্ধ কোনো কারণ  
আছে? সে কারণটা কি আমার পক্ষে বিপজ্জনক বা উদ্বেগজনক?  
ব্যাপারটা একটু রহস্যময় মনে হইল। শ্রবণ করিলাম বোমভোলা  
পাঠকের উক্তি। তিনি খাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছেন:

‘আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।’

ঠিক করিলাম নিশ্চিন্তই থাকিব। চিন্তা করিয়া যখন কোনো  
স্বরাহা হইবে না, তখন নিশ্চিন্ত থাকিলে ক্ষতি কি? আরেকটা  
অজুত কথাও মনে পড়িল—বোমভোলা পাঠক আমার যুথের চেহারার  
সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ ৬মঙ্গল পাণ্ডের যুথের চেহারার  
মিল দেখিতে পাইয়াছেন! কিন্তু তাহার সহিত আমার এই বাধ্যতা-  
মলক আতিথ্যের সম্পর্ক কি?

ঘরের ভিতরটা যতখানি সম্ভব চোখ বুলাইয়া দেখিবার চেষ্টা  
করিলাম, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কারণ বাহিরে  
চাঁদের আলো দেখা গেলও সে আলো সোজাভাবে ঘরের ভিতরে

চুকিতেছিল না। ঘরের ভিতর অতি আবছা আলো, অথবা বাপুসা  
অন্ধকার।

আমি ধীরে ধীরে চোখ বুজিলাম। নির্ভাবনার, বেশ আরাম  
করিয়া চোখ বুজিলাম। বোমভোলা পাঠকের দেওয়া আশ্বাসের সুরে  
সুর মিলাইয়া ভাবিলাম এখন আর আমার ভাবনা আমার নহে, আমি  
যাহার অতিথি, তাহার। অর্থাৎ বাতাসী বিবি।

কতক্ষণ ঐভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলাম বলিতে পারি না।  
ঘুমাইয়া পড়ি নাই, এইটুকুই বলিতে পারি। হয় তো বা আরেকটু  
পরেই ঘুমাইয়া পড়িতাম, এমন সময় কেমন করিয়া জানি না, আমার  
শয্যার অনতিদূরে কাণের উপস্থিতি অনুভব করিলাম। সে যেন এক  
অতি রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। হয় তো আগন্তকের নিশাস-  
প্রশ্বাসের ধ্বনি আমার কানে গিয়া থাকিবে। আমি ধীরে ধীরে চক্ষু  
মেলিয়া প্রেরণ করিলাম: ‘কে?’

সুসজ্জিত বাক্যকণ্ঠে জবাব আসিল: ‘আপনার বান্দী, বাবুজি।’

এ ধরণের বিনয়-বিগলিত বুলি বহাদুর শুনি নাই। তাই বলিলাম,  
‘আমার বান্দী???’

জবাব শুনিলাম, ‘বান্দীর নাম বাতাসী বিবি।’

চমকাইয়া উঠিয়া বলিলাম, ‘বাতাসী বিবি!!!’

এতক্ষণ—কতক্ষণ জানি না—যাহার প্রতীক্ষার শুইয়া ছিলাম,  
সেই রহস্যময়ী আমার অনতিদূরে! তাহার মোহময়ী কণ্ঠস্বর স্পষ্ট  
শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সেই বম আলো বেশি অন্ধকারে তাহাকে ভাল  
করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, বাপুসা ছায়ামতির মত দেখিতে

পাইতেছিলাম মাত্র। এইবার বুঝিলাম অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে বলিয়াই বাতাসী বিবি ভৃত্যকে ছকুম করিয়াছিল এ ঘরের সবগুলি আলো নিবাইয়া দিয়া যাঁতে। ভাবিলাম সে কি কুরপা! বলিয়াই আলোতে আমার দৃষ্টিগোচর হইতে চাহে নাই? কিন্তু শুনিয়াছিলাম বাতাসী বিবি কোমলা সরলা অথবা না হইলেও তাহার রূপের অভাব নাই। তবে কি আমার চোখে সে রহস্যময়ী হইয়াই থাকিতে চার বলিয়া তাহার এই অন্ধকারের আড়ালে আশ্রয়?

অসাধারণ ক্ষমতাবতী এই রমণীর এমন বৈক্য বিনয়ই বা কেন? নিজেকে আমার বানী বলিয়া পরিচয় দিয়া সে কি আমাকে উপগম্য করিতেছে? অথবা অতিথির প্রীতি ইহা তাহার স্বাভাবিক সৌজন্য মাত্র।

অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, দেখিবার জন্ত দুই চোখ কৌতূহলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল এইক্ষেণ যদি একমুহূর্তের জন্তও বাহিরে বিদ্যুৎ চমকাইত তাহা হইলে বড় ভাল হইত, ঐ মুহূর্তের বৈদ্যুতিক আলোতেই ভয়ঙ্করী রহস্যময়ীকে দেখিয়া নিতাম। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকাইল না। ঘরের ভিতরে বাপসি আলো-অন্ধকার রহস্যময়ীকে বহস্যের বাপসি আড়ালেই রাখিয়া দিল।

‘বাবুজি এখন বেশ আরাম বোধ করিতেছেন তো?’

‘হাঁ, বিবিসাহেবা।’

‘বানীকে সাহেবা বলিবেন না, বাবুজি। নাম ধরিয়াই ডাকিবেন। আপনার মুখে সাহেবা শুনিলে আমার বড় অপরাধ হইবে।’

এই কথাটা ভাড়াচোরী বাংলার ভাড়া ভাড়া উচ্চারণে বলিল বাতাসী বিবি। ঐ বিকৃত উচ্চারণই কানে বড় মধুর লাগিল। মুখে কিছু বলিলাম না। বাতাসী বিবি বলিল : ‘আজ ভোরবেলা বড় ভয় পাইয়াছিলাম, বাবুজি। তারপর সাগরিন বড় ভয় ভয়ে কাটিয়াছে। বিকালবেলা হেকিম সাহেবের মুখে হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, মোক্ষম দাগুয়াই কাজ করিয়াছে, আর ভয় নাই। তিনি বলিলেন এইবার আপনাকে আপনার বাড়িতে পাঠানো যাইতে পারে। কিন্তু—’

‘কিন্তু কি, বাতাসী বিবি?’

নামটা উচ্চারণ করিব বলিয়া ভাবি নাই, আপনাই হইতেই কিভাবে উচ্চারণিত হইয়া গেল।

‘আমিই আপনাকে যাইতে নিলাম না, বাবুজি।’

‘কেন?’

‘ভাবিলাম ঘরে আপনার বিবি নাই, একটা রাত্রি আপনি এখানে বিশ্রাম করিয়া গেলে কোনো লোকসান হইবে না। আমিও প্রাণে শান্তি পাইব। আমার অপরাধ নব্বেন না, বাবুজি।’

বাতাসী বিবির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার ঘরের খবর তাহার অজানা নহে! বলিলাম, ‘না না, অপরাধ কিসের?’

বাতাসী বিবি বলিল, ‘এক হিসাবে আমিই আপনার এভাবে আহত হইবার জন্ত দায়ী। কারণ আমাকে আপনার কুস্তি দেখাইবার জুড়ই বাদশা পালোয়ান আপনাকে তাহার আখড়ায় নিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার নিজের গরজে নহে। আপনার কুস্তি আড়াল

হইতে চূড়ি করিয়া দেখিলাম, কারণ পালোয়ানজী বলিগাছিলেন, জেনানাকে দেখাইবার জন্ত আপনি কুস্তি লড়িতে গাঙ্গি নহেন। আচ্ছা বাবুজি, জেনানা জাতটাকে কি আপনি তুচ্ছজ্ঞান করেন, যুগ্ম করেন?’

‘ছি ছি, সে কি কথা? এই জেনানা জাতের একজনকেই তো বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম, স্ত্রীও করিতাম।’

বহুদিন বাদে মনোরমার কথা এই প্রথম মনে পড়িয়া বৃকের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘবাস বাহির হইয়া আসিল।

বাতাসী বিবি সেই দীর্ঘবাস লক্ষ্য করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। সে বলিল, ‘তবে জেনানার দৃষ্টিগোচরে কুস্তি লড়িতে আপনার আপত্তি কেন? তাহাতেই আপনার কুস্তির মধ্যাহ্নাহারী আশঙ্কা?’

বলিলাম, ‘মধ্যাহ্নাহারির প্রস্ন নহে। কুস্তি অত্যন্ত কক্ষ, কঠোর ব্যাপার। আর নারীজাতি স্বভাবত কোমল, কমনীয়—’

বাতাসী বিবির স্পষ্টই মূর হাসির আয়োজ্য আমার বাক্য-সমাপ্তিতে ধাবা গিল। বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, ‘বাবুজি, জেনানা মাঝেই নরম, দুর্বল, ভীক, আপনার মনে একপ্র ধারণা হইল কেন? এই জেনানার হাতটি দয়া করিয়া একবার পরখ করিয়া দেখিবেন কি?’

বাতাসী বিবি তাহার বসিবার আসনটিকে টানিয়া আমার শব্দ্যর আরো কাছে আগাইয়া আসিয়া আমার সামনে তাহার ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিল। লক্ষ্য করিলাম তাহার বসিবার আসনটি একটি আরাম-কোদার, অথবা সোফা। এই সোফাটি কখন নিশেঙ্গে এ ঘরে আসিয়া হাজির হইয়াছে টের পাই নাই। বাদশা পালোয়ান যে মোড়ার উপর বসিগাছিলেন, বিবিসাহেবার বসিবার উপযোগী আসন সেটি নজে বলিয়াই এই সোফা আসিয়াছে।

বাহিরের চাঁদের আলো ঘরের ভিতর আরেকটু বেশি চুকিয়াছিল কি? না আমার চোখ দুটি প্রায়াক্ষকার নামমাত্র আলোতে দেখিতে আরেকটু বেশি অভ্যস্ত হইয়াছিল? বাহাই হউক, সেই ক্ষণ আলোতেও নিকটবর্তিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পারিলাম কোনো গাঢ় রঙের (সম্ভবত বৃক্ষবর্ণ) দেহাবরণের তলার তাহার সম্পূর্ণ দেহ গোপন, বোরখা-জাতীয় আবরণে মুখ ঢাকা, শুধু চোখ এবং নাক খোলা রহিয়াছে, মুখের চেহারা বা দেহের গঠন সযত্নে কোনরূপ স্পষ্ট আন্দাজ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

আমার বৃকের কাছাকাছি বাতাসী বিবির বাড়ানো ডান হাতের পাতা, লগিত ভাবার বলিতে গেলে বলিতে হয় কয়-কমল। আমি অশ্রুতিবোধ করিতেছিলাম। পর-নারীর হস্ত-ধারণে আমি অভ্যস্ত নহি। বিশেষ করিয়া এই রহস্যময়ী অপরিচিতার হাত ধরিবার জন্ত আমার হাত উঠিতেছিল না।

বাতাসী বিবি আমার সন্কেচকে ভর বলিয়া ভুল করিল কি? তাহার হাসি শুনিয়া মনে সেট সন্দেহই হইল। বাতাসী বিবি বলিল, ‘জেনানার হাত ধরিতে ভয় করিতেছেন, বাবুজি?’

‘না না, ভয় করিব কেন?’ বলিয়া আমার ডান হাতে বাতাসী বিবির ডান হাতটি গ্রহণ করিলাম, বাড়ানো হাত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার অমর্ধালা করিতে মন সার দিল না। হাতে



সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা... 'আমার ত্বকের  
সৌন্দর্য্যসাধনে  
লাক্স আশ্চর্য্য  
কাঙ্ক্ষ করেছে'



রূপসী চিত্রতারকা সাধনা বলেন, 'আমার ত্বক-  
সৌন্দর্যের জন্য আমি লাক্স ব্যবহার করি। লাক্স যেমন বিশুদ্ধ  
তেমনইই মৌল্যবোধ। আর, কি মনমাতানো সুগন্ধ লাক্সের।  
আমার প্রসাধনের প্রথম কথাই তাই লাক্স।  
আপনিও লাক্স ব্যবহার করুন।



লাক্স টয়লেট সাবান • চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য্য সাবান

LIT. 178-180 BG

সাদা ও স্বাদুস্বস্তির চারটি রঙে  
হিন্দুস্থান লিকারের তৈরী

বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ '৭১

২২৫

হাত মিলাইয়া বিদ্রুত হইলাম। দম্মা-সদারী-মুগ্ধ কল্প-কঠিন হাত তো নয়, সে হাতে নারীহস্ত স্নেহ কোমলতা, মৃদুতা, কমলীয়তার কিছুমাত্র অভাব নাই। কিন্তু ইহার পরই যে বিষম অমুগ্ধ করিলাম, তাহা অগুরুপ। বাতাসী বিবি তাহার হাত শক্ত করিয়া আমার হাতের উপর যে চাপ দিল, তাহা হইতে আমার কুস্তি-কশরৎ-অভ্যন্ত কঠিন হাতেও বৃষ্টিতে পাবিলাম ঐ আপাত-নারী-মুগ্ধ হাত ইচ্ছামাত্রই কত কঠিন, কত শক্তিশালী হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম হাতের কল্পিতও অসাধারণ জোর বাতাসী বিবির।

‘জেনানাকে খুব দুর্বল বলিয়া মনে হইল কি, বাবুজি?’

বলিলাম, ‘না। বলিলাম জেনানা মাত্রই দুর্বল নহে।’

বাতাসী বিবির হাত বাতাসী বিবি ফিরাইয়া নিয়া গেল, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল আমার হাতে ঐ আশ্চর্য হাতের কোমল-কঠিন স্পর্শ যেন তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ভাবিলাম বাতাসী বিবিকে এ ভাবে আমার হাত ধরিতে দিয়া ভাল করি নাই, কারণ এ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা নানারকমের ওষ্মদগু তুচ্ছতাক জানে। কে জানে ঐভাবে একটা অজুহাতের চল করিয়া আমার হাত-খণ্ড কোনরূপ তুচ্ছতাকেরই অঙ্গ কি না? এরূপ সম্মেলনের কারণ এই যে, তাহার পর হইতেই বাতাসী বিবির প্রতি আগেকার বিরূপ ভাব আশ্চর্যরকম দূর হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, তাহার কণ্ঠস্বরেও কি এক আশ্চর্য যাদু ছিল—জানি না, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারীকে সাংঘাতিক স্ত্রীলোক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন মনে হইল। কিন্তু, পরেই আবার ভাবিলাম, শরতান প্রকৃতির লোকও যখন অতি অমায়িক হাসি হাসিয়া মন ভুলাইতে পারে, তখন ভীষণ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে মোহিনী-যাদু থাকিলে, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বরং ইহাও তাহার নানা অস্ত্রের অঙ্গতম অস্ত্র। বাহাই হউক, ঠিক করিলাম কণ্ঠস্বরের ছলনার না ভুলিলেই হইল, কণ্ঠস্বরের স্ননিতে বাধা কি? ভাবিলাম ইহাকে আরো কথা বলাইতে হইবে।

কিন্তু বাতাসী বিবিকে কিভাবে সোধেদন করিব? আপনি বলিব, না তুমি বলিব? বোমভোলা পাঠকের ‘আপনি’ সোধেদন করিয়াছি, তিনি ব্রাহ্মণ এবং আমি হইতে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু এই বাতাসী বিবি? উহার সঠিক বয়স জানা ছিল না, কণ্ঠস্বরের স্ননিয়া অনুমান করিলাম বয়স আমার অপেক্ষা বেশি নহে। আর মর্যাদা? একটা বিয়াট বে-আইনী দলের অজ্ঞাতচরিত্রা সদারীকে ‘আপনি’ বলিয়া সম্মান দিব আমি, বাংলার সেরা শহরের নামজাদা এ্যাটর্নি? কিন্তু আমি তাহাকে মর্যাদার যোগ্য মনে না করিলেও এমন হইতে পারে যে তাহার আত্মমর্যাদার দম্ভ অতি প্রবল, আমি আমার মর্যাদার দম্ভে তাহাকে যথোচিত মর্যাদা না দিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাহাকে ‘অসম্মান করিতেছি, এরূপ সম্মেহ করিলে সে ভরস্বরী হইয়া উঠিতে পারে। মনে পড়িয়া গেল বাতাসী-চরিত্রে অভিজ্ঞ বোমভোলা পাঠকের শিগরি; তিনি বলিয়াছিলেন বাতাসী বিবির মত অজুত নারী-চরিত্রের সহিত আমার পরিচয় নাই, আমি যেন আমার নিজের অজ্ঞানিতে ক্ষণিকের ভুলে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া না তুলি। মনে হইতে লাগিল আমার সমুখে যেন অজস্র বালু, তাহার মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে চোরাবালি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, প্রতিটি

পদক্ষেপ সাবধানে করিতে হইবে যেন চোরাবালিতে না পড়িয়া যাই। ভালর ভালর এখান হইতে বাহির হইতে না পারা পর্যন্ত খুবই সাবধান থাকিতে হইবে, বিবির আত্মমর্যাদাবোধে যেন যা না দিয়া বসি। তাই ভাবিলাম বাতাসী বিবির বয়স বা পদমর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ে আমার প্রয়োজন নাই, অপরিচিতা মহিলার প্রতি ভদ্রসমাজে যেরূপ সৌজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রচলিত আছে তাহাই করিব, বিবি সাহেবাকে ‘আপনি’ বলিয়াই সোধেদন করিব।

বাতাসী বিবি বলিল, ‘জেনানাটি এইরূপ জানিলে বোধ করি তাহাকে দেখাইবার জগ্ন কুস্তি লড়িতে আপত্তি করিতেন না?’

বলিলাম, ‘বোধ হয় করিতাম না।’

কি করিতাম না করিতাম বিবেচনা না করিয়া যে উত্তর শুনিবে বাতাসী বিবি খুশি হইবে মনে হইল তাহাই দিলাম। বুলিলাম উত্তরে যথার্থ কাজ হইয়াছে। বাতাসী বিবি খুশি হইয়াছে।

একটুকু চিন্তা করিয়া বাতাসী বিবি বলিল, ‘বাবুজি, আমার অনেক কথা বলিবার আছে। অনেক ভিন্কা চাচিবার আছে। প্রথম ভিন্কা, শ্রামসনকে আপনি তার বেইমানির জগ্ন দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।’

চিন্তা না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, ‘সেই করিয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু শ্রামসনের উপর আমি রাগ করি নাই, কারণ লড়াইতে জয় হইয়াই থাকে। আমারই বরং আরেকটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল।’

‘ঠিক বলিয়াছেন, বাবুজি। সেটী অপরাধের শাস্তি আপনি শ্রামসনের হাতে পাউয়াছেন এবং শ্রামসন আপনার উপর যে বেইমানি করিয়াছিল তাহার শাস্তি আমি তাহাকে দিয়াছি। কিন্তু আপনার ক্ষমা না পাইলে সে তাহার পাপ হইতে মুক্তি পাইত না। আপনার বড় মেহেরবানি, বাবুজি।’

আমি যে শ্রামসনকে ক্ষমা করিয়াছি সেজগ্ন যেন তাহার কৃতজ্ঞতার স্মৃতি নাই, এইভাবে বাতাসী বিবি আমার ডান হাতটি তুলিয়া লইয়া উদ্ভাসিত আবেগে তাহার হৃদ হাতে চাপিয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই যেন নিজের ছেঁচোমাখিতে লজ্জা পাওয়া সে আমার হাত আমারি বিছানার উপর ফিরাইয়া দিল। আমি নিঃসন্দেহে অমুগ্ধ করিলাম ইহা তাহার মিথ্যা অভিনয় নহে, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অকপট অভিব্যক্তি। তাহার এই ক্ষণিক উজ্জ্বলের আকর্ষক বিজলী চমকে যেন এই রহস্যময়ীর স্বয়ং-রহস্যের অনেকখানি এলাকা মুহূর্তকের জগ্ন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি স্পষ্ট বৃষ্টিতে পাবিলাম শ্রামসনের যাদুতে বাতাসী বিবির সারা স্বয়ং আচ্ছন্ন, তাহার বুক চিরিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে তাহার ভিতরে লেখা আছে শ্রামসনের নাম; বেইমানির অমার্জনীয় অপরাধে শ্রামসনকে নির্বাসন দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়া বাতাসী বিবির সারা অন্তর হাহাকাব করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, মনে হইল বাতাসী বিবির মনে একটা বন্ধন সংস্কার আছে—তাহাকে কুসংস্কার বলিব কি না জানি না—বাহার ফলে তাহার ধারণা আমার ক্ষমা না পাইলে শ্রামসন চির-অভিশপ্ত হইয়া থাকিলে, যে অবস্থাকে ইংরাজিতে বলে ইটর্ন্যাল ড্যামনেশন (eternal damnation)। অগ্নাবধনে ক্ষমা করিয়া শ্রামসনকে সেই ভয়াবহ ‘ইটর্ন্যাল ড্যামনেশন’ অর্থাৎ চির-অভিশপ্ত হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছি, এ কারণে আমার প্রতি বাতাসী বিবির কৃতজ্ঞতার স্মৃতি নাই।



মাসিক বন্ধুত্ব

জ্যৈষ্ঠ / '৭২

মুক্ত অঙ্গনে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা

—শম্ভু সাহা

আলোকচিত্র



হুমায়ূনের স্বপ্ন  
—শান্তিময় সাক্ষাৎ

ঐক্যমান  
—সবু দাস



শান্তিক বনফলী। কৈলাস / '১১



মাসিক বহুমতী । ১৫/১/৭১

ভূমিতা  
—এস এম হারলার

প্রাতরাশ  
—অরুণজ্যোতা রায়চৌধুরী



হাসিক বন্দন। ১৯৮৪/৮৫



বন্য দাঁতিত

(কলিমা)

—সিদ্ধি সিকার গান

## বাতাসী মজিল

বলিলাম, 'সামসনকে আমি ক্ষমা করিয়াছি, আপনিও শান্তি ফিরাইয়া নিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।'

বাতাসী বিবি বেন আহত হইয়া বলিল, 'বাকীকে 'আপনি' বলিয়া লজ্জা দিবেন না বাবুজি, মনে হইবে আমাকে উপহাস করিতেছেন।'

বলিলাম, 'ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। আমাকে মাফ কর। এ ভুল আর করিব না। কিন্তু সামসনকে যে শান্তি দিয়াছি, তাহা তুমি ফিরাইয়া লও।'

বাতাসী বিবি ব্যথিত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, 'তা হইবে না, বাবুজি। বাতাসী বিবি যে দণ্ড একবার দেয় তাহা আর ফিরাইয়া নেয় না। আপনি সামসনকে ক্ষমা করিয়া বড় ভাল করিয়াছেন, বাবুজি। নহিলে—'

—নহিলে কি হইত, বাতাসী বিবি তাহা বলিল না, আমি সে বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিতেও ভরসা পাইলাম না। কিন্তু অহুমান করিলাম তাহার নেক-জরের পাত্র সামসনকে আমি ক্ষমা না করিলে বাতাসী বিবি আমাকে ক্ষমা করিত না, দণ্ড বিধান করিত এবং সেই দণ্ড হইতে কিছুতেই আমাকে রেহাই দিত না। সামসনকে আমার যে ক্ষমা করিবার স্মৃতি হইয়াছিল সেজন্ত ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দিলাম। নহিলে এই ভয়ঙ্করী বিধানে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইত কে জানে? তারপরই আমার মনে প্রশ্ন জাগিল: তবে কি আমার মুখ হইতে সামসনের ক্ষমা আদায় করিয়া নিবার ভহই বাতাসী বিবি আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল? স্ত্রী-স্বাক্তির চরিত্রই রহস্যময়; এই

জাতীয়া প্রাণাঙ্কের চরিত্র তো আরো বেশি রহস্যময়, সে রহস্য ভেদ করা আমার মত পুরুষ এ্যাটর্নীর কর নচে।

সামসন-প্রসঙ্গ আবার তুলিতে বাইগেছিলাম, বাতাসী বিবি থামাইয়া দিল। বলিল, 'যে বাতিল হইয়া গিয়াছে সে বাতিলই হইয়া গিয়াছে, বাবুজি। উত্তার কথা আর নয়। বেইমানি করিয়া সে আপনার কাছে হারিয়া গিয়াছে।'

কুস্তির মাটির উপর সামসনের অথেনোয়াডোচিত নোংরামির জন্ত তাহার প্রতি ক্ষোভ এবং ঘৃণা জাগিয়াছিল। বাটে, তবু আমিই তাহার বড় ক্ষতির কারণ হইয়াছি জানিয়া আমার মনে দুঃখ বোধ করিল এবং যে কারণেই হোক আমার প্রতি এই ভয়ঙ্করী বর্মণীর এত মনোযোগ আমার মানসিক অস্থিরতাই কারণ হইল। কিন্তু অস্থির ভাবটা যথাসাধ্য গোপন রাখিলাম, পাছে অস্বস্তি বোধ করিতেছি জানিলে বাতাসী বিবি অপমান বোধ করিয়া অসন্তুষ্ট এবং কষ্ট হয়।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্ত বলিলাম, 'বাতাসী বিবি, এখন ব্যাক কত? মধ্যরাগি কি?'

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'চিপ্ত হইবেন না। মধ্যরাত্রির এখনো কিছু বাকি আছে।'

'আমি তোমার অস্থিরতার কারণ হইয়া বড় স্কাচ বোধ করিতেছি, বাতাসী বিবি। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইতেছি। ঘুমের সময় হইয়াছে, ঘুমাতে যাও।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'আমি কি এখানে থাকিরা আপনার



পরিবারের সকলেরই  
প্রিয় সাবান

# মার্গো সোপ

সুপ্রতি-শ্রিত মার্গো সোপের

প্রচুর নরম ফেনা নারী ও

শিশুর কোমল ত্বক সুস্থ রাখে।

নির্গন্ধকৃত নিম্ন তেল থেকে

তৈরী এই সুগন্ধি সাবান

দেহ লাভণ্য উজ্জ্বল ও

মৃদুপ রাখতে অস্বীকার।

দি ক্যালকটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিঃ কলিকাতা-২৯



বিরক্তির কারণ হইতেছি, বাবুজি ?' তাহার কঠিন স্বর—সেটা বাস্তব না অভিনীত বলিতে পারি না। যাহাই হউক, জ্ঞাতসারে কাহাকেও বাথা দেওয়া আমার স্বভাব বা পছন্দ নহে। বাতাসী বিবি—সে যতই ভয়ঙ্কর চরিত্রের নারীই হোক না কেন—মনে বাথা দিয়াছি তাহিরা মনে বাথা পাইলাম।

বলিলাম, 'না না। একা পড়িয়া থাকিতাম, একজন কাছ থাকিলে, কথা বলিলে তো এ অবস্থায় ভালই লাগে। কিন্তু তোমার তো ঘুম আছে, বাতাসী বিবি ?'

'বাতাসী বিবির রাত জাগা অভ্যাস আছে বাবুজি।' মনে হইল বাতাসী বিবি পরম কৌতুকের চাপা হাসি হাসিতেছে। অবশ্য তাহা আমার কল্পনাও হইতে পারে।

বলিলাম, 'কিন্তু আমার জ্ঞাত রাত জাগিয়া তুমি শরীর খারাপ করিবে কেন, বাতাসী বিবি ?'

বাতাসী বিবি এইবার সত্য সত্যই হাসিল; ইহা নিঃসন্দেহে আমার কল্পনা নহে। বলিল, 'বাবুজি আমার শরীর দেখেন নাই, তাই এমন কথা বলিতেছেন। এ শরীর সত্যে খারাপ হইবার নহে। তা ছাড়া আপনি আমার সম্মানিত অতিথি, না জানিয়া আমাকেই কুস্তি দেখাইতে আসিয়া বেইমানি আচরণ আরম্ভ হইয়াছেন, আপনার জ্ঞাত আমি রাত জাগি না তো কে জাগিবে, বাবুজি ?'

'কেন, তোমার তো দাস-দাসীরা নিশাইতে অসুবিধা নাই, বাতাসী বিবি ?'

'তানাই সত্য। কিন্তু কোনো দাস বা দাসীর হাতে সম্মানিত অতিথিকে সারারাত দেখাশোনার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিশিচুত হইয়া ঘুমাইবে, বাতাসী বিবিকে এমন বৈষম্য ভাবিতেছেন কেন, বাবুজি ?'

বলিয়া সামান্য কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়াই বাতাসী বিবি আবার বলিল, 'না না বাবুজি, আপনাকে অপর কাহাবো হাতে রাখিয়া গেলে আমার সারারাত ঘুম হইবে না।'

বাতাসী বিবির ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল সে এ ঘরেই সারা রাত কাটাইবে। তবে কি আমার বিপদ আশংকার মেয়াদ

কাটিয়া গিয়াছে, সে কথা সত্য নহে, আমাকে নিকটীর্ণ করিবার জন্য একটা ভাঁওতা মাত্র। তবে কি রাজে আমার অবস্থা হঠাৎ খারাপের দিকে বাইতে পারে, হেকিম সাহেব বাতাসী বিবিকে সেইরূপ কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, সেজন্তই বাতাসী বিবির এই উদ্বেগ ? সেইজন্তই সারারাত আমার শয্যা পাশে নিজে জাগিয়া আমার উপর নজর রাখিবে এবং প্রয়োজন বোধ হইলেই হেকিম সাহেবকে জাগাইয়া নিয়া আসিবে ? আসল ব্যাপারটা হু হুতো তাহাই, বাতাসী বিবি আমার কাছে গোপন করিতেছে।

ভইয়া থাকিতে যে ঘুম খারাপ লাগিতেছিল এমন নহে, তবু নিজের অবস্থাটা একবার পরখ করিয়া দেখিবার জন্তই উঠিয়া বসিবার চেষ্টার উত্তোষ করিলাম। উত্তোষেই আমার চেষ্টা বন্ধ করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি বলিল, 'উঠবেন না বাবুজি। সাবধানের মার নাই। চলিল ঘটার মেঘান পার হইতে দিন।'

চেষ্টা বন্ধ করিলাম। বাতাসী বিবির কথা রাখিলাম। তাহিলাম প্রবল প্রত্যাপাদিতা বৃদ্ধকণী যদি আমার তত্ত্বাবধানে থাকে, তাহা আমার পক্ষে ভালই, ঘুম পাইলে অপেক্ষাকৃত নিকরধণে ঘুমাইয়া পড়া যাইবে। কিন্তু আরামপ্রদ শয্যা আমি পরম আরামে নিরা উপভোগ করিব, আর আমার শয্যাপাশে সোফায় বসিয়া বসিয়া আমার আশ্রয়দাত্রী প্রত্যাশামণী সারারাত জাগিয়া কাটিইবে, একথা ভাবিয়াও বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আগন্তের এমন আশুর্ঘ্য মাতুরী বহুদিন উপভোগ করি নাই। তাহারই নরম হাতে নিজেকে পুরাপুরি মসিলা দিলাম। জন্ত নিশীথ রাত্রি ; গৃহের অন্ত্যস্ত সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই সন্দেহ হইতেছিল, নীরবতা এমনই গভীর। আকাশে চাঁদের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ঘরের ভিতর চাঁদের আলো ঢুকিয়া তাহার কিঞ্চিৎ অভ্যাস রহস্যবৃত্তা বাতাসী বিবির নাগাল পাইয়াছিল। ফলে বাহার কণ্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাতাকে চান্দ্রু দেখিবার কৌতুহল প্রবল হইয়া উঠিল। আমি বাতাসী বিবির বসনারত মুখের দিকে তাকাইলাম।

[ক্রমশঃ]

## ঐ প্রেম আজ নয়

দিলীপ দাশগুপ্ত

স্থিরদৃষ্টিপাতে দেখ, এই চোখে জলে কোন আলো;  
চাঁদ-কুল-হাসি-গান অকস্মাৎ কে যেন নিভালো !  
কে যেন অদৃশ্য হাতে মুখে দিয়ে মুখের প্রাণেপ  
বলিরেখাসম্বিত আমার 'মমি'-কে অনিবেগ  
দেখে নিয়ে স্থিরপ্রাণ। তাই যেন অশাস্তের ডাকে  
ফাগুনকে পায়ে দলে' রক্তবেশে প্রচণ্ড বৈশাখে  
গীর্ভবতী কুমারীস জীবনের ট্র্যাঙ্কডিকে নিয়ে  
অভ্যন্তর সোনারাঙা আশারীণু দিনকে উড়িয়ে  
হঠাৎ যে সিদ্ধকাম। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে  
আত্মত্যাগের মহোৎসবে সর্বার্থক ধন-গণ্য পণে

পেছেছি পরমধন—সেই ধন যদি পারো নিতে  
সবকিছু পার হয়ে এসো তুমি ঐ প্রেম নিতে।  
এতদিন মেরু-শৈত্য প্রেম যেন পলু করে ধরে।  
স্বর্গপ্রাণে মোহমুক্ত আজ তাই মহাসমাদরে  
পেতে চাই দেশপ্রাণে অভিজিতা অনন্তা সে নারী,  
মধুময়ী-আত্ম-জীবী-খাননন্না আমি হবো তার-ই  
একান্তসচিব-মিত্র আশানে ও প্রয়োজন-বাসরে।  
আত্মা তাই বারবার দেশপ্রাণে বহুবার মরে  
অমরত্ব চেয়ে চেয়ে। আমি তবু তলুতলু বসে  
দেখছি অপরাজিত স্বর্গ থেকে কারো পড়ে খসে।



ব্রাণ্ডন। আমেরিকার থিয়েটারের কোন  
ধর্মী সন্তোষ নেই। এর কি কোন  
যাখ্যা আছে।

মিলার। আমি জানি না—তবে আমেরিকান  
মনের ভেতলুয়ে সন্তোষের সূত্র থাকতে পারে। শুনাছি  
আমেরিকান লোকদের শতবরা নকস্‌ইজান গির্জায়  
যায় অথবা গির্জার সভা। ইতিহাসে আমরাই বোধ  
হয় সর্বাঙ্গীণ বেশি গির্জায় গমনেচ্ছু জাতি। কিন্তু  
গির্জায় যাওয়া এক কথা এবং সে ভাবে ভাবা অর্থাৎ  
সচেতনভাবে জীবনের গুঢ় অর্থ খোঁজা আর এক কথা—আর কোন  
বহুতাত্ত্বিক অর্থনৈতিক জীবনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই রকম  
বাস্তববাদী, দক্ষ জাত আর পাওয়া যাবে না।

সেই সত্যকে উপশম অথবা সমর্থন করবার কোন চেষ্টা নেই।  
এটা অর্থনৈতিক জীবনের দিকে বাবস্থায়িকভাবে আগসর হওয়া।

কিন্তু, রবিবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। কয়েকঘণ্টার  
জঙ্গ আমরা লাভ ও ক্ষতির কথা ভুলে গাই—এবং শুভ চিন্তা করি।  
এভাবে কটানো জীবনে ধর্মের আদর্শবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে  
ন—শুধুমাত্র সন্তোষে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়া।

এখন, স্বভাবতই আমাদের নাটক সেই জীবনযাত্রার রীতিই

## মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৫

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাণ্ডন

প্রতিফলিত করবে। আমেরিকার লোকদের থিওনী  
কল্পের ধর্ম নেই। এইমাত্র আমি যা বললাম—ধর্ম  
হচ্ছে রবিবারের, বাকি সপ্তাহ লোকে আর কিছু করে  
—তার মধ্যে গুরু কোন পরম্পরাবিরোধী ভাব দেখতে  
পায় না। ওদের মতে এতে কোন ভুল নেই।  
আমাদের রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে যখন  
ক্রমবর্ধমান এই উদ্ভট পরম্পরা বিরোধিতাকে নাটকের  
সুন্দারকারে সূত্র বা কিছু ভালো যা কিছু মন্দ দেখার  
স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নি। মন্দ প্রলাবণ্ডগুলি এতো  
বিস্তারিত ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের  
নায়কের শত্রুদের আমরা ধরে নিয়েছি—যেন ওর শত্রুর  
অনুগত। হতভাগ্য নায়ক হতভাগ্যরূপেই সামনে  
উপস্থিত হয়।

মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতার এমন যন্ত্র হয়ে  
উঠেছে যে, আমরা তার সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই জানতে  
পারি না। প্রায় প্রতিটি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পই  
হলো যে কি করে প্রধান চরিত্রগুলি তাদের দোষগুলি  
থেকে মুক্ত হলো। ওঁ'নাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত  
আমাদের প্রধান ধারা পূর্ণতার প্রসঙ্গ চারিদিকে ঘুরে  
বেড়ায়। শুধুমাত্র নীতিগত পূর্ণতা নয়—ব্যক্তির



পূর্ণতাও। সেই সমগ্রতা সাধনে যা বাধা দিচ্ছে সেই শক্তি খুঁজে  
বের করা কঠিন। আমাদের বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, তারা আছে  
এবং তাদের আচরণ উন্নোচন করা যায়। শুধুমাত্র অহুসন্ধানের  
সূত্র থাকাই সব নয়। তার একটা কারণ এই যে এটা খুব বিরক্তিকর  
হয়ে ওঠে। অন্ততপক্ষে পুরণো কথা কিরে বলা প্রয়োজন।

এই রকম মানসিক অবস্থায় আমি 'দি ফ্রিসবল' লিখেছিলাম।  
ঘটনাক্রমে ম্যাকাথিজমের সময়ে এটা ঘটেছিল যখন এক ধরনের  
ব্যক্তির বিচূর্ণন আবার আমাদের মধ্যে বিগাজিত ছিল। এতে  
আমি পুরাতন সৌন্দর্যময় এবং নাট্যোচিত শৃঙ্খলা পুনর্জীবিত করতে  
চেষ্টা করেছিলাম—বলতে চেয়েছিলাম যদি সে নিজে সাধারণ অপরাধে  
অপরাধী হয় তবুও কেউ হত-পা ওঠিয়ে বসে নিজের স্টেট জগতকে  
ধাস হতে দিতে পারে না। আমি একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে  
আহ্বান করতে চেয়েছিলাম, আমি বলতে চেয়েছিলাম অজ্ঞানেরও  
কতগুলি দিক আছে এবং আমাদের জগতের নিরবরতার কারণ এই  
যে আমরা ভয়ে এর স্মরণ রেখাগুলি খুলে ধরতে পারি না।



মনরো—বিভিন্ন ভঙ্গীতে

চল্লিশের নাটকগুলি বা ভগতে আত্মবিশ্লেষণ নিয়ে শুরু হয়েছিল।  
ক্রমে জগৎকেই বাদ দেবার কৌশল আশ্রয় করে। অর্থনীতি রাজনীতি



নর্তকী মনারা

এইসবই বিষয়বস্তু হয়। এইভাবেই আত্মকল্পনা ভাবপ্রবণতা ও  
যৌন-অমৃতভূক্তিবাদ শুরু হয়। এ হচ্ছে নাটকের মধ্যেই প্রাতি  
নাটক এবং এতে অনেক বড় বড় লোকের মতবাদের ছায়া  
আছে—বাঁধা অমৃতের করেন যে, জীবনের গতি বর্তমানে এইরকম।  
চরিত্রগুলি অভ্যাত্যচারিত কিন্তু অভ্যাত্যচারীর হৃদয় মিলছে না—  
হয় তো সে সেখানে নেইই। আমার মনে হয় যারা এই প্রকার  
বা হাস আমাদের মধ্যে ছড়ানো তাদের সঙ্গে বাঁজী ধরে আরও তুলার  
কাঠামো স্থাপি কর।

প্রাণ্ডন। আমেরিকার নাট্যসাহিত্য অগ্রগত অবস্থাতীন। আশানি  
এর পরিবাদ কি করে দেখলেন।

মিলার। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্বত আমাদের 'সাম্যক' করেছিল। দ্বিতীয়  
নাটক ছিল। তার মানে হচ্ছে যে, আমেরিকার স্বাধীনতা, আমেরিকার  
জীবন কোনরকমে রঙ্গমঞ্চে বেঁচে ছিল। জীবনের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে  
কোন সম্পর্ক ছিল না। নাটকগুলি দু'শকটি বাদে সবই অতি-  
নাটকীয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দেশে প্রবৃত্ত আধুনিক নাটক  
স্থাপি করবার চেষ্টা হলো—যে নাটকে সমকালীন জীবনের ছাঁপ পড়ে  
এবং আমার মতে ও'নীলকে এই প্রাণ্ডন সোতের একশালে মধ্যে  
দেওয়া উচিত। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য প্রায় আর সব লোকের মতো  
ঘটনার সাংবাদিক রিপোর্ট নয়।

প্রাণ্ডন। কাদের কথা বলতে চাইছেন!

মিলার। যেমন, 'হোয়াট প্রাইস মোরী', 'ব্রট শেজ' ষ্ট্রীট সীনের  
খুব প্রভাব ছিল। সেই প্রথম শ্রদ্ধাহীনতার সুর শুরু হলো বা  
বর্তমানে যুক্তরাজ্যে খুবই চলছে। ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের পুরাতন  
হুকুম বাতিল হয়ে গেল। সেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে যুদ্ধ পুরাতন নাটকের  
দৃষ্টিভঙ্গী—বা একে কোন না কোনভাবে গৌরবমণ্ডিত করে তুলতো—  
ছাড়া বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধকে খুব সহজ সাধারণ  
দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা আরম্ভ হলো—যেন একটা নোরা ব্যাশার। একটা  
নৃতন ভাষা—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সমসাময়িককে ব্যঙ্গ এবং উল্লাস সাহিত্যে  
প্রবেশ করলো।

আমার মনে হয় স্বভাববিদ বেলাঙ্কা প্রবল প্রভাব বিস্তার  
করেছিলেন—বাঁধা আমাদের পায়ের কড়ার মতো মনে হয়, কারণ  
তাঁর প্রচলিত রীতিমতো ভাতিপ্রদ-। তাঁর নাটকে অনেক দৃষ্ট আছে—  
নায়ককে কীসি দেওয়া হচ্ছে এমন সময়ে নায়িকা একটা আমেরিকার  
পতাকা হাতে নিয়ে ছুটে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো ও সেটা তার ওপরে  
ছুড়ে দিল এবং স্বভাবতই যুক্তপ্রদেশীয় সৈন্তরা পতাকার ওপর দিয়ে স্তম্ভী  
করতে পারলো না। এইভাবেই নাটকের উপসংহার হোল, বা হোক নাটক  
প্রযোজনা করতে তিনি প্রচুর স্বাভাবিক জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন।

তিনি রঙ্গমঞ্চে আয়েরগির করেছিলেন; জলপ্রপাত করেছিলেন;  
এবং তিনি শিশুদের বেস্ট্র-স্ট্রেট নামক একটা জিনিস করেছিলেন ডাডে  
'মিলসপাই'র ওপরে মাছিটিও ছিল। এখন এসব নিয়ে কথা বলা  
বোকাবো—কুণ্ডু এটুকু বলতে পারি যে, স্টানলভিট্জ এটা দেখেছিলেন  
এবং অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বেলাঙ্কাকে খুব  
বড় পরিচালক জ্ঞানতেন। তিনি সখা চেষ্টা করতেন গল্প ও  
চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকত্ব সত্ত্বেও স্বাভাবিকতার স্রুত—এবং তা  
তলানীন্তন উচ্চাঙ্গপ্রাণ, ভাবাতিকেরক্তরা অভিনয়ের একদম উপেট।

দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ অন্তরকম—তা তদানীন্তন জীবনযাত্রাটাই বারী।  
 ঠিক চরিত্রগুলি কিস্তি। ওরা অক্লিষ্টকর কিন্তু অশ্লিষ্টের বিষয়  
 তবু ওদের এমনভাবে পরিচালনা করেছেন যেন ওরা যুব স্ত্রী এবং  
 তবু ওদের দিয়ে সামাজিক চিকিৎসানী ও নীতিগত গল্প বলিয়েছেন।  
 ১১ হাক তিনি একটি মত নিজেছিলেন যা আমেরিকার বঙ্গবন্ধু ছিল—  
 হুভারবিন্দু অশ্লিষ্টতা যদিও তা তাঁর হাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে

বোঝেছিল। এর পাশে যা আছে তা হচ্ছে—যা দিন দিনই  
 দর্শকদের পরিচিত জগতের কাছাকাছি থাকিবে। রবীন্দ্র শেরউড,  
 ম্যাক্স এন্ডারসন, এস এন কামিন, ফিলিপ বারী, এন্ডার হাইন্স  
 জর্জ কেবলী, সিডনী হ্যাটফিল্ড প্রাচীনকালেই আরও বয়েছে অথবা তাদের  
 মূল বিশেষ শক্তিতে আছে। তারা যুগকে মেনে চলেছে।  
 ক্রমশঃ  
 অনুবাদিক—রাণু ভৌমিক

## প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

শ্রীমানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

বিশ্বনাথিতের দ্বারা ভারতীয় মনীষার অবিস্মরণীয় অনুদান  
 সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে। সাক্ষ্য দাঁড়িয়ে রঙ্গমঞ্চ আকর্ষণ পান  
 করে নিখিল বিশ্বের নিরবধিকালের বসিকময়্যাক আশ্রয় সম্ভূত।  
 বিখ্যাত বিশেষী মনীষী আচার্য গোবিন্দ হোমার উইলসনের সাক্ষ্য  
 সাহিত্য সম্বন্ধে উক্তিটি বিশেষ সরলীকৃত—

‘ন জানে বিত্ত্যে কি তনু মাধুয়মঃ সাক্ষ্যতঃ।

সর্বদেব সমুদ্রমুখা যেন বৈদেশিকা বঙ্গম্।।

যাং ভারতবর্ষ স্যাদ যাবৎ বিজ্ঞা-হিম্যাচলো।

যাবৎ গঙ্গা চ গোদা চ তাবৎবং হি সাক্ষ্যতঃ।।

সাক্ষ্যত আলংকারিকরা কাব্যকে দৃষ্ট এবং প্রত্যক্ষের মোটামুটি দুটি  
 ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দৃষ্টকাব্যকেই আমরা সাধারণত বাংলা  
 নাটক বলে চিহ্নিত করি। কাব্যতাত্ত্বিকদের ভাবায় দৃষ্টকাব্যকে বলা  
 হয় রূপক। নায়ক-নায়িকা, বিষয়বস্তু এবং রসের পার্থক্য অনুসারে  
 সাক্ষ্যত দশপ্রকারের রূপক রয়েছে, নাটক, প্রেক্ষণ, ভাণ, ব্যাযোগ,  
 সমনকার, প্রিয়হাস্য, অংক, বাধি এবং প্রহসন বার অষ্টম হচ্ছে  
 নাটক। অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনাকে রূপায়িত করে তোলার জন্মই  
 দৃষ্টকাব্যকে বলা হয় রূপক—‘রূপারোপাত, রূপক’—এই হোল  
 বিশ্বনাথের বিশ্লেষণ।

জীবনের জীবন্ত অনুকরণ বলেই নাটক প্রেক্ষাকাব্য। আমাদের  
 আলংকারিকরা বলেছেন—‘অবহাস্যকৃতিন টোম্’, বলেছেন—‘লোক-  
 বৃত্তান্তকরণম্’। নাটকের লক্ষ্য—চরিত্রের বিকাশ, যার আশ্রয়প্রকাশ  
 হল আচরণে। সমাজ ও মনসারে নিজেকে সাধ্যমত স্বেচ্ছা করে  
 রাখার চেষ্টা করে মানুষ। কিন্তু, সে স্বতন্ত্র হয়েও কোন্ এক অদৃষ্ট  
 দৈবশক্তির অধীন। স্বভাবের প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপূর  
 দ্বন্দ্ব আবেগ মানুষের সময়ের বাঁধকে বন্ধন ভূগের মতো ভাঙিয়ে নিয়ে  
 যায় এবং বাইরের বাধার প্রেক্ষতর হয়ে ওঠে, চরিত্র তখনই হয় নাটকীয়  
 বিকাশের উপযোগী। ঘটনাক্রমে মানুষ এমন বিষয় সমস্যার পতিত  
 হয় যে, তার একটিমাত্র পদক্ষেপে সমগ্র জীবনের গতি নির্ধারিত  
 হয়ে যায়। এই প্রথম পদক্ষেপেই নাটকের সূচনা। সমগ্র নাটকটি  
 সেই এক মুহূর্তের পরাবৃত্ত বিকাশ।

জীবনের কক্ষক্ষেত্রে কর্মফল অলঙ্ঘনীয়। এই জগতে কার্য এবং  
 কারণ দুইভেদে শৃঙ্খলে বাঁধা। বিনা উদ্দেশ্যে মানুষ কোনো কাজই  
 করে না এবং শুভাশুভ আচরণে সে আপনায় পরিণাম আপনাই ডেকে  
 আনে। নাট্যকার সংসারের এই চিত্রটাই অঙ্কিত করেন। জটিল  
 সমস্যার সংকল্প-বিকল্পে মনের হেলাবোলা, উত্তর সংকেত অনুভব,

জীবনের সঙ্কল্পকে যথার্থ নির্ধারিত, সংশয় নিশ্চয় নিরূপণ, বিধায় কর্মফল  
 বিযুক্ততা, অবস্থার এবং চরিত্রের এই রবমের দৃষ্ট-ফলটিই নাটকের মজাদার  
 গ্রাম। আশ্রয়নিরীশায়, ভয় ভয়সার, হৃদয়বিদর্পে, অপর ভাষালোক-  
 সম্মত, অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার যাত প্রতিঘাতে, পুরুষকারের  
 প্রচেষ্টায়, দৈবের নিষেধ, বিভিন্ন ভাবে নাটকীয় কাহিনীর বিকাশ।  
 ঘটনার অনুকূল ও প্রতিকূল আচরণে নাটকীয় গল্পের সৃষ্টি, অনুভবের  
 যাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় রসের সৃষ্টি। কবিজ্ঞ, ঘটনাবৈচিত্র্যে, চরিত্র-  
 চিত্রে বিপরীত ও বিসম্মতের সমাবেশ ঘটলে নাট্যকার দর্শকের কল্পনা,  
 কৌতুহল এবং সহানুভূতি করেন উত্তীর্ণ। তখন, রঙ্গমঞ্চে সর্গজন্মের



‘নিশাচর’-এর সহ নায়িকার ভূমিকায় মনীষা অধিকারী।

মতো নকল আসলের সঙ্গে সমজাতিপন্ন হ'য়ে ওঠে এবং সত্যের সংসারে যে নয়াচিত্র সাধারণত দর্শকের চিত্তকে আকর্ষণ করে না, কবিত্বের প্রভাবে, করুণার পরিচ্ছদে রংমঞ্চ তাই অস্বস্তিরূপে প্রতীয়মান হয়।

দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনীত হওয়ার মাধ্যমেই নাটকের সার্থকতা। এই অভিনয় প্রদর্শনের জন্য অপরিসীম হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ ও রংমঞ্চ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন ভারতীয় মনীষার অভূতকালীন অবদান প্রদান সংগে স্মরণীয়, তেমনি এই প্রেক্ষাগৃহ এবং দর্শকজন্যর ক্ষেত্রেও তাঁদের অগভীর চিন্তা এবং অভূতপূর্ব রসসৃষ্টি আজও বিশ্বের সকার করে। যদিও আমাদের আধুনিক রংমঞ্চ তৈরি হয়েছে উনবিংশ শতকে। দ্বিতীয়ার্ধে, তবুও ভারতীয় রংমঞ্চের ইতিহাস অক্ষ হলেই প্রায় অরণ্যতাত্ত্বিক থাকেই। কালের ক্রমালোচনায় এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদের উদ্ভাত তাণ্ডবে প্রাচীন ভারতের বহু অমূল্য নিদর্শন ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদ এবং দেবমন্দিরের সন্নিধানই তৎকালে সাধারণত রংমঞ্চ নির্মিত হ'ত। আর রাজপ্রাসাদ ধ্বংস এবং দেবমন্দির ধ্বংস করার মতোই এই বর্ষর আক্রমণকারীরা শোভা সর্বাধিক আনন্দ। ফলে, সভ্যতার এই শত্রুর নির্মম অভ্যাচারে প্রাচীন ভারতের কোনো সুগঠিত রংমঞ্চের অস্তিত্ব বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। মন্দির-মন্দিরে ভাঙন থাকতো সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। সেই সবও ভগ্নাভূত করে তাঁরা অস্তিত্ব করেছেন পৈশাচিক আনন্দ। ফলে, ভারতীয় সভ্যতা-

সংস্কৃতির অগণিত গ্রন্থগত এবং বাস্তব নিদর্শন আজ বিলুপ্ত। তবুও এই সব বিপর্যয়ের হাত এড়িয়ে পল্লীতে-পল্লীতে বৈভববিস্তৃত বিজ্ঞানবাসনী যে সংস্কৃতপণ্ডিতবর্গ প্রাচীন বিজ্ঞান ধারাকে নিজের জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাঁদের কাছে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থমালা আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাণনত সেগুলোই বোষণা করছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা।

নাট্যকলা নিয়ে বিখ্যাতোত্তর পুরাণ, শাস্ত্রতন্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ, নারদের সঙ্গীতমন্ত্রকল্প, ভোজের সমরগানসুত্রার, সরস্বতীকণ্ঠমণ, বাসবরাজের শিবতত্ত্বতাকর, ধনঞ্জয়ের দশকণক, বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণ, মন্ডলভট্টের কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রাণ্ড উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থমালায় মধ্যে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ হচ্ছে আচার্য ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। দৃশ্যকাব্য, শ্রব্যকাব্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যসম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণসমবিত এমন অতীত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অগণতে দুর্লভ। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হ'তে খ্রীষ্ট ৩য় শতকের মধ্যে এই গ্রন্থটি রচিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থপাঠেই জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সুপ্রসিদ্ধিত প্রেক্ষাগৃহ এবং সুসজ্জিত রংমঞ্চ অভিনয়কালে ব্যবহৃত হ'ত। নাট্যশাস্ত্রেই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার বহাবধ অমূল্য হ'ত, নাট্যাভিনয়ের সমুদ্রত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহ ও রংমঞ্চের গঠনকৌশলে সাহিত্য হয়েছিল যথেষ্ট উৎকর্ষ। সুতরাং অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বের সমুদ্রত ভারতীয় নাট্যকলার গৌরবময় উত্তরাধিকার আমরা বহুম করে চলেছি। এইজন্য আমরা বর্ষা গৌরব অনুভব করতে পারি। পরবর্তীকালে নাট্যকলার এই ধারা যথেষ্ট পত্তিগুটি লাভ করেছিল, অবশ্য ভারত বর্তমান স্বাধীন ছিল। নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে অসংখ্য অলংকার গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং তাঁদের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যকলার যথেষ্ট আলোচনা। সেই সব গ্রন্থে কোথাও কোথাও তত্ত্বগত দৃষ্টান্ত থাকলেও সবাই মোটামুটি আচার্য ভরতপ্রবর্তিত পন্থাই কিত অনুসরণ করেছেন।

তাই আচার্য ভরতপ্রবর্তিত রংমঞ্চের বিবরণই বর্তমান আলোচনা অনেকটা সীমিত। মঞ্চাভিনয় নাট্যকে ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট সম্মান দান করা হ'য়েছিল, দান করা হ'য়েছিল সর্বজনমাত্র বেদের মধ্য। আচার্য ভরতের মতামতসারে বহু স্ট্রিক্তা ব্রহ্মা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য চতুর্বেদের জ্ঞান হ'তে বঞ্চিত জনসাধারণকে চতুর্বেদ-নিহিত জ্ঞানে উদ্ধৃত করার জন্য ধর্মার্থবিশ্বকর, উপদেশসমবিত, সর্বাঙ্গার্থ সম্পন্ন এবং সর্বাঙ্গপ্রবর্তক 'নাট্যবেদ' নামক পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করেন।—

ধর্মার্থঃ যশস্তাঃ চ সোপদেশস্তাঃ সন্যগ্রহঃ।

ভবিষ্যন্তঃ লোকস্তাঃ সর্বকর্মামুদর্শকঃ॥

সর্বাঙ্গার্থসম্পন্নঃ সর্বাঙ্গপ্রবর্তকঃ।

নাট্যাখ্যঃ পঞ্চমবেদ সেতিহাসঃ করোমাহঃ।

এবং সঙ্কল্প ভগবান সর্ববেদানুসরণঃ।

নাট্যবেদঃ ততশচক্রে চতুর্বেদাংগসম্ভবঃ।

জগ্নাহ পাঠ্যম্ অথোপাং সামভ্যো গীতমেব চ।

যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাতর্কনাদপি।

বেদোপবেদৈঃ সযজ্ঞো নাট্যবেদো মহাজনাঃ।

এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মা সর্ববেদিনাঃ। (না-শ ১১৪-১৪)



## রূপশ্ৰী

এই পবিত্র নাট্যবিজ্ঞানকে তিনি তেরোটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। নাট্যবিজ্ঞান পায়দলী হ'তে হ'লে এই ত্রয়োদশবিধের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য।

‘রসাতাৰা অভিনয়ঃ ধৰ্মীভূতি প্রবৃত্তয়ঃ।

সিদ্ধিঃ স্বরাস্ত্রযাতোক্তং গানং রূপশ্ৰীং সারথঃ।

উপচারস্তথা বিশ্রাং মণ্ডপশ্ৰীং সৰ্বশঃ।

ত্রয়োদশবিধো জ্ঞেয়ঃ স্বাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।’

(১) রস, (২) ভাব, (৩) অভিনয়, (৪) ধৰ্মী, (৫) বৃত্তি, (৬) প্রবৃত্তি, (৭) সিদ্ধি, (৮) স্বর, (৯) আতোক্ত, (১০) গান, (১১) রূপ, (১২) উপচার, (১৩) মণ্ডপ—এই তেরোটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলে পূর্ণ হয় নাট্যবিজ্ঞান-শিক্ষা।

(১) রূপঃ—হাস, ক্রোধ, দীর্ঘ, রোদ, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত—এই আটটি হ'ল নাট্যরূপ। (২) রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিষম—এই আটটি হ'ল স্থায়ী ভাব। নির্বেদ, গানি, শংকা, অশ্রু, মদ, ভ্রম, আলস, দৈর্ঘ্য, চিন্তা, মোহ, পুত্তি, বৃত্তি, ক্রোধ, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ভ, বিদায়, উৎসাহ, নিদ্রা, অপমার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিলা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উদ্ভাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক প্রভৃতি ৩৬টি হ'ল ব্যভিচারী ভাব। আর জড়, হেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভাগ, বেগু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি হ'ল সাত্বিক ভাব—অর্থাৎ মোট ৪২টি হ'ল ভাব। (৩) আঙ্গিক, বাচিক, আচাৰ্য এবং সাত্বিক এই চার প্রকারের হ'ল অভিনয়। (৪) লোকধৰ্মী এবং নাট্যধৰ্মী এই দুই প্রকারের হ'ল ধৰ্মী। (৫) ভারতী, সাধুতী, কৈশিকী আরভাটী—এই চারটি হ'ল বৃত্তি। (৬) আবহা, দাক্ষিণ্য, গুহ, মাগধী, পাকালী এবং মধ্যমা এই পাঁচ প্রকারের হ'ল প্রবৃত্তি। (৭) সিদ্ধি হ'চ্ছে দৈবিকী এবং মাঘুরী এই দুই প্রকারের। (৮) যজ্ঞ, দ্বন্দ্ব, গান্ধার, মধ্যম, বৈবর্ত পঞ্চম এবং নিয়াদ এই সপ্তবিধ হ'ল স্বর। (৯) তত, অবনত, ঘন এবং সুধির—এই চার প্রকারের হ'ল আতোক্ত বা বাস্ত। (১০) প্রবেশ, আবেশ, নিশ্চয়, প্রাসাদিক এবং অন্তর—এই পাঁচ প্রকারের হ'ল গান। (১১) রূপ বিজ্ঞান (১২) বাহ ও অভ্যন্তর—এই দুই প্রকার হ'ল উপচার। (১৩) বিকৃষ্ট, চতুরঙ্গ এবং ত্রাশ—এই তিন প্রকারের হ'ল মণ্ডপগুণ। আরো নানা বিভাগসমূহ হ'চ্ছে এই অখিল নাট্যবিজ্ঞান।

এখন প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের বিশিষ্ট রূপটি জানতে হ'লে তার কতকগুলি অংশ রংগপীঠ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মন্তব্যবনী এবং প্রেক্ষামণ্ডপ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই পাঁচটি অংশ নিয়ে আচার্য ভরত যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার, সুবিখ্যাত রসভাষ্যকার আচার্য অভিনব গুপ্ত তাঁর ভাষ্য ‘অভিনবভারতীতে’ ভারতের উক্তির যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। দীর্ঘকালের ব্যবধান এবং সেই প্রাচীনবিজ্ঞান ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হবার জন্তে মহর্ষি ভরতের কোনো কোনো উক্তি এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাই সেই সব স্থলে মতভেদের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তবে মহাবির মূল উক্তি, আচার্য অভিনব গুপ্তের ভাষ্য এবং প্রাপ্ত নাট্যকাবলীর নাট্যকীর নির্দেশণী আলোচনা করে প্রাচীন ভারতীয় রংগমঞ্চের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায় নাট্যগৃহ নির্মাণের একটি পৌরাণিক ইতিহাস মেলে। মহেশ্বরবিষ্ণুরোংসবে দেবাসুর যুদ্ধে অশ্রুতিকে অধঃপতন করে যখন প্রথম নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল, তখন অশুরেরা বিয় উৎপাদন করে অভিনয় পণ্ড করে দেয়। এই বিষয়কারীরা রংগপীঠের ওপর আরোহণ করে সুরধার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রহার করে সংজ্ঞাহীন করে দিয়েছিল। তখন ইন্দ্র জর্জরদণ্ড দিয়ে বিষয়কারী অশুরদের বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ভরত ব্রহ্মার নিকট নাট্যরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের আবেদন জানালে ব্রহ্মা বিশ্বকর্ষাকে নাট্যবেশ্য কর্ণাক নাট্যগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। কলে নিকৃপহবে নাট্যাভিনয় চলতে লাগলো।



চিত্র সাংবাদিকদের বিচারে বছরের সেরা অভিনেত্রী-সুচিত্রা সেন

এই কাহিনী থেকে এই কথাই অনুমান করা যেতে পারে যে, একেবারে প্রথমে হয়তো বর্মমানের ব্যতীর মতো উগ্ৰুজ্জ্বল মুক্ত-অঙ্গনেই অভিনয় হ'য়ে থাকত। তখন রসবিমূগদের নানা উৎসাহে সময় সময় অভিনয় পড় হ'য়ে যেতো। ফলে, স্তব্ধকৃত আবৃত্তি হানে অভিনয়ের প্রয়োজন দেখা গেল এবং তাইই জন্মে নিখিত হ'ল নাট্যমণ্ডপ। নাট্যগৃহের আকৃতি এবং পরিমাণ সবকিছু নাট্যশাস্ত্রে লিখিত রয়েছে—

‘বিকৃষ্টচতুঃশত ত্র্যশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।

তৈবাহ ত্রিণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠাঃ মধ্যা তথাবরম্।



ললিতা চটোপাধ্যায়—হাতাছবি বাইবে

অষ্টাদিকং শতং জ্যেষ্ঠাঃ চতুঃশতম্ মধ্যমম্।

কর্ণাঙ্ক তথাবোহা বস্তাঃ দ্বাত্রিংশদিশতঃ।

দেবানাম তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠাঃ নৃপাণাম মধ্যমং ভবেৎ।

শেবাণাম প্রকৃতীনাম তু কণীষ সর্বিধায়তে।

শ্রেষ্ঠাগৃহাণাম সর্বেষাম ত্রিপ্রকারো বিধিঃ পুতঃ।

বিকৃষ্টচতুঃশত ত্র্যশ্চৈব প্রোক্তজুতিঃ।

কণীষে শতং ত্র্যশ্চ চতুঃশতং তু মধ্যমম্।

জ্যেষ্ঠাঃ বিকৃষ্টাঃ বিজ্ঞেয়ং নাট্যবেদপ্রোক্তজুতিঃ।

এই পরিব্রজনা অনুসারে নাট্যমণ্ডপ তিন প্রকারের—বিকৃষ্ট, চতুঃশত এবং ত্র্যশ্চ অথবা ভাষান্তরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠা, মধ্যম এবং অবর। জ্যেষ্ঠ হ'বে ১০৮ হাত দীর্ঘ, মধ্যম হ'বে ৬৪ হাত এবং অবর হ'বে ৩২ হাত। এই ত্রিবিধ নাট্যগৃহের মধ্যে দেবতাদের জন্য জ্যেষ্ঠা, রাজাদের জন্য মধ্যম এবং জনসাধারণের জন্য অবর গৃহকে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। অশ্রু শব্দের মানে হচ্ছে কোণ। ত্র্যশ্চ বলতে ত্রিকুজ্যুতি কেত্রকে বোঝানো হ'য়েছে। মহর্ষি ব'লছেন—

‘ত্রৈশ্ব ত্রিকোণং কর্তব্যং নাট্যবেদ্য প্রোক্তজুতিঃ।

মধ্যে ত্রিকোণমেবাত্ রংগলীটং তু কারয়েৎ।

বারং তেইনৈব কোণেন কর্তব্যং তন্ত্রং বেদনঃ।

বিতীর্ণট্টেব কর্তব্যং রংগলীটং পার্শ্বতঃ।’

ত্রিকোণাকৃতি এই নাট্যগৃহের মধ্যে ত্রিকোণ রংগলীট নির্মাণ করতে হবে। এতে দ্বার থাকবে দু'টি। একটি শ্রেষ্ঠাগৃহের কোণে আর একটি রংগলীটের পশ্চাতে।

তবে চতুঃশত অথবা মধ্যমটি মর্ত্যের মায়াদের বিশেষ অভিনয়োপযোগী। কারণ, তার যথোপযুক্ত গঠন সংস্থানের জন্য অভিনয়ের গান এবং সংলাপ অধিকতরভাবে সুখশ্রাব্য হয়। অতিরিক্ত বড় নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত এবং সংলাপ প্রয়োগ করতে হবে। ফলে, বেহুঁরো শোনাবে। আর, সকল প্রযুক্ত কর্ণট্ট প্রয়োগ করার জন্য ভাবের অভিযুক্তি চোখেছুখে স্থাপিত হয়ে প্রকাশিত হবে না। তাই, চতুঃশত শ্রেষ্ঠাগৃহই প্রশস্ত ব'লে তার পরিমাপ এবং কার্য নির্দেশ ক'রে ভরত ব'লছেন—

‘চতুঃশতকরান কুর্ধাদৌর্ধ্বেন তু মণ্ডপম্।

দ্বাত্রিংশতঞ্চ বিস্তারান মর্ত্যানাম ধো ভবেদিত্।

অন্ত উর্ধ্বং ন কর্তব্যঃ কতুর্ভিন্নানি মণ্ডপঃ।

বসাদবাস্তব্ভাবঃ তিষ্ঠত্ব নাট্যাঃ ব্রহ্মদীপিত্।

মন্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুচ্চারিতবরম্।

অনিম্রণধর্মহান বিশ্বরূপশ্চ ত্র্যজং ॥

বন্দ্যাপ্যামৃগতো ভাবো নানাদৃষ্ট সমবিতঃ।

স বেদনঃ প্রকৃষ্টহান ব্রহ্মদবাস্তবাত্তাপরাম্।

শ্রেষ্ঠাগৃহাণাম সর্বেষাম ত্র্যশাধাধামমিষাতে।

যাবৎ পাঠ্যব্যচ পেরচ তত্র অব্যতরং ভবেৎ।’

[ আগামী সংখ্যার সমাপ্য।

# মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে শ্রীসত্যজিৎ রায়

ধূলিকণার সঙ্গে বসুপাত !

আমাদের অনেক সাধের, শপের, সৌখীন কলকাতার বিকালের আকাশ দেখতে দেখতে কাকচক্ষু বসুমতি ধারণ করল। কলকাতার রাজপথের ধুলার ঝড় দেখে মনে পড়ে গেল রাজধানের মক্কাভূমির আঁধি। বাতাসের প্রবল বেগে বিচ্যস্ত পথের পথিককুল যে যে দিকে পারে ছুটেতে শুরু করেছে। একটা কোথাও আশ্রয় চাই নয় তো জানলার কপাট, দোকানের সাইনবোর্ড, ঢালাঘরের টিন উড়ে এসে আঘাত হানতে পারে অন্তর্কিতে। তবুও, কলকাতার বাসিন্দারা সেদিন এই প্রকৃতির তাগুবনীলাকে সাধের বরণ করেছে। কদিন ধরে অসহনীয় গ্রীষ্মের দাবলচে কলকাতার লোক উদ্যস্ত বললেই ঠিক বলা হয়। যার সঙ্গেই দেখা হয়, মুখে সেই এক কথা—উঃ! কি গরম, বুটের দেখা নেই। তাই সেদিন কলকাতাবাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সেই ঘনঘোর কালবৈশাখীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে। মেশিনগানের মত গুমগুম আওয়াজে মেঘ ডাকাডাকি শুরু করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অব্যুতসহস্রবারায় বারিবর্ষণ। সেদিন হরতো ছিল ১০৬ ডিগ্রী তাপমাত্রা। (নেপথ্যে জানিয়ে রাখি, আমাদের আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের ঘোষণায় জানানো তাপমাত্রা কলকাতা এবং তৎপার্ব্বর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা সমান নয়—এই কথাটি আমাদের জানিয়েছিলেন আলিপুৰ আবহাওয়া অফিসের বর্তমান কর্ণধার ডক্টর সেন।)

বসুমতী কার্যালয়ের ঘরে-ঘরে হলে-হলে তখন অসময়ে আলো জলে উঠছে। কেন না, বর্ষার ঘনঘটাৰ আঁধার ছড়িয়েছে দিকে দিকে। ১০৬ ডিগ্রী থেকে হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে গেছে ১০-এর কাছাকাছি। বুটের হিমসিক্ত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস চলেছে ঝড়ের



মাসিক বসুমতীর সম্পাদকীয় কক্ষে মাসিক বসুমতী পাঠ্যত  
শ্রীসত্যজিৎ রায়।

বেগে। কালবৈশাখীর কালো আকাশ দেখতে দেখতে লাউজে পাড়িয়ে আমাদেরই এক সাংবাদিক-সহকর্মী তাজা একটি সিগারেট ধরিয়ে ওন ওন সুরে কাব্য আওড়াতে শুরু করলেন—

‘তোমারে বারণ করি সাধা তো নাই,  
তুমি যাবেই যখন—  
দূর বাবলা গাছের কাঁকে বাঁকা টানটাই  
বুধা জাগায় স্বপন।  
হোথা আকাশ কুলিয়া যেন,  
পড়েছে মেঘে—  
জ্যাপা আশিনে ঝড় আসে—  
ঝড়ের বেগে।

ট্রেন ছুটেবে আঁধারে আমি স্তনব জেগে  
খালি তারি ঘন ঘন’

সাংবাদিক-এক সিগারেটে একটি সজ্জার টান দিয়ে বললেন—  
কার লেখা বলুন তা ?

—? ? ? তবেই তো চিন্তির চড়কগাছ! আমার আবার  
কবিতা-টবিতা আসে না। আমি চিরকাল ইকনমিস্ট-এই ছাত্র।  
এ লেখা কি আপনাদের এই বৃহদেব বহু কিম্বা সময় সেনের ?

—উঃ! না—

—বিজ্ঞ দেখা স্মরীন দত্তর ?

—উঃ!

অবির আগ্রহের প্রেরণ, ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে—তবে কার ?  
স্বাধীনতার ?

সাংবাদিক-বন্ধু এপাশে-ওপাশে মাথা দোলানেন।

—বলুন, আপনিই বলুন। আপনি সাংবাদিক। সাংবাদিক  
মানেই সবজান্တာ।

—না ভাই, আমি ঠিক তা নয়। আমি সব কুছকা কুছ কুছ  
জান্তা। তাই মানছি, এখন বলুন কব লেখা ?

—বাঙলা সাহিত্যের ডাইডেন, বাঙলা দেশের পোপ সক্রীকান্ত  
দাসের লেখা।

এ ছেন দুর্বোলে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে—চিত্র-শিল্পী,  
পরিচালক বাঙলার স্বসন্তান সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব। ঠিক বাঙলের  
মতট তাঁর আগমনের গতি। বর্তমান চিত্রে-ছবিয়ার প্রথম দাদশ জন  
বিশ্ববিখ্যাত ও স্বীকৃত পরিচালকদের মধ্যে অর্থাৎ আইজেনস্টাইন,  
বার্গমান, ডল্লিন, ফেলিসি, ডিসিকা, হিচকক, ডিল বেস্তিস  
প্রভৃতির সঙ্গে সমমর্যাদায় যিনি আর একটি আসন দখল করেছেন  
তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

বাঙলের মত গতি তাঁর। দ্রুতগমনে চলেছেন মাসিক বসুমতীর

সম্পাদকীয় বিভাগে। সুইডেনের সরিরে ঘরে ঢুকে একটি চেয়ার দখল  
করে বসে পড়ছেন খ্রীয়ার। এই আসা এবং আসন গ্রহণের মধ্যে  
যেটুকু সময় তার মধ্যে খ্রীয়ার একটি প্রস্তাব করলেন,—আপনাদের  
পত্রিকার সব কপিট কি exhausted ( নিঃশক্তি ) হয়ে যায় ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কোন কোন particular সংখ্যা হয় তো  
ছ'-এক কপি পেতে পারেন।

প্রশংসার সবিষয় চাহিনি খ্রীয়ারে ধ্যানভিত্তি স্তম্ভি চোখে।  
বসলেন,—বাঃ। ঋণিক থেমে আবার কথা ধরলেন,—আমার কিন্তু  
মাসিক বসুমতীর কয়েকটি পুরোনো কপি চাই। এবটু থেমে থেমেই  
কথা বলেন খ্রীয়ার। ঋণিক থেমে বসলেন—একজন তাঁর লেখা  
পড়ানোর জন্য আমাকে মাসিক বসুমতী দিয়েছিলেন কয়েকখানি।  
আমার রাশি রাশি বইয়ের স্তূপে কোথায় যে তা হারিয়ে গেছে তা  
আর খুঁজ পাচ্ছি না।

—কেন্ কোন্ সংখ্যা আপনার প্রয়োজন ?

মাসিক বসুমতীর সেই পুরাতন সংখ্যাগুলির অহুস্কানে লোক  
ছুটল।

পৃথিবী-বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায় অবশেষে সবার মাঝে-  
নিশেলে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে ( বর্তমানে বসুমতী প্রাইভেট



বি এফ জে-এর বার্ষিক উৎসবে সমাগত শিল্পিবৃন্দ। প্রথম সারিতে খ্রীসত্যজিৎ রায়কে দেখা যাচ্ছে



লিমিটেড) এসে থাকেন। বসুমতী থেকে প্রকাশিত অমূল্য গ্রন্থসমূহ কিনে নিয়ে যান।

—চা দিতে বলব ?—সম্পাদকের জ্ঞানক সহকর্মীর প্রশ্ন।

—খয়ের কাগজের অফিসের চা কি উনি খেতে পারবেন।

শ্রীয়া বললেন—হ্যাঁ, চা একটু আমাদের বেশিই খেতে হয়। ঠুঁড়িতে বথন কাজ করি তখন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই আমাদের চায়ের দরকার হয়।

—ঠুঁড়িতে কি ভাল চা পাওয়া যায় ?—সম্পাদকের প্রশ্ন।

শ্রীয়া—হ্যাঁ, এন, টির 'হু' নম্বর ঠুঁড়িতে আজকাল বেশ ভাল চা হচ্ছে, সেখানে ভাল চা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এমন সময় শ্রীয়ারের হাতে মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যা ধরিয়ে দেওয়া হল।

সম্পাদকের সহকর্মী বললেন, এই সংখ্যায় আপনার 'চাকলতা'র সমালোচনা আছে।

শ্রীয়া—ও, তাই না কি !—কথার শেষে পত্রিকার পাতা উল্টে তাঁর সাম্প্রতিক ছবির সমালোচনা পড়তে শুরু করলেন।

—আপনার 'চাকলতা' তো এখনও বেশ ভালই চলেছে। আমি জানি, মফস্বলের কয়েকটি হাউসে খুবই ভাল সেল পাচ্ছে। সম্পাদক বললেন।

শ্রীয়া—হ্যাঁ, আমার এই ছবিখানি স্ট্যাণ্ডার্ড সেল পাচ্ছে।

বেয়ারা চায়ের কাপ বসিয়ে দিয়ে গেল। পৃথক বেকাথিতে

হুঁখানি পোস্টেন পাক বিস্কুট। শ্রীয়া একটি বিস্কুট তুলে নিলেন, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, বাঙলা সাহিত্যের মান কি রকম বৃদ্ধি পেয়েছে ? আমার তো মনে হয় বাঙলা সাহিত্যের মান অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছে।

সম্পাদক বললেন—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আগের তুলনায় বাঙলা লেখার মান নীচে নেমে গেছে। মৌলিক সাহিত্য কিছুই তেমন হচ্ছে না আজকাল।

সহকর্মীর প্রশ্ন, আপনার 'মহাভারত' ছবির কাজ কি শুরু করেছেন ?

শ্রীয়া—না, মহাভারতের পরিকল্পনা বৃহৎ, কাজ শুরু হয় নি। বর্তমানে একটু rest নিচ্ছি।

এ কথা, সে কথার পর রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। শ্রীয়া বললেন, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র মিউজিয়মে এখনও বহু মূল্যবান লেখা আছে বা কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আমি নিজের গিয়ে দেখে এসেছি ঠাকুর-পরিবারের সেই বিখ্যাত 'পারিবারিক খাতা' যাতে বিজ্ঞাননাথ থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনেক মূল্যবান লেখা আছে। এমন কি, ঠাকুর-পরিবারের বড় বীরা (তারক পালিত, সোহেন পালিত, অক্ষয় চৌধুরী, কবি বিহারীলাল প্রভৃতি) তাঁদের অনেকেরই রচনা দেখতে পোলাম। এ সব লেখাই লেখকদের হস্তে লেখা। অনেকেরই হয় তো জানেন না এই পারিবারিক খাতায় লিখতে হলে লেখকদের



'কান্দীর কি কলীর' ছবিটি-এর অবসরে ভোজনেরত শামী কাপুর ও শমিলা ঠাকুর।

পাঁড়িয়ে লিখতে হোত। কারণ খাতাটি থাকত অনেক উঁচুতে। খানিক খেমে শ্রীয়ায় বললেন—আমার কাছে একটা টেপ রেকর্ড আছে যাতে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কণ্ঠ ধরা আছে। এই রেকর্ড তাঁর গাওয়া গান, বলা গল্প, ছড়া আর হাসি-তামাশা অনেক কিছুই আছে।

সচকর্মীর প্রশ্ন, আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন সালের? আপনার সহপাঠীদের মধ্যে নাম করতে পারেন এমন কে কে ছিলেন?

শ্রীয়ায়। ইং ১৯৪০। আমার সহপাঠীদের মধ্যে নাম করা যায় সিদ্ধার্থসুন্দর রায়, খেলোয়াড় নির্মল চট্টোপাধ্যায় (ক্রিকেট), প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী।

কথা বলতে বলতে শ্রীয়ায় টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিজের গৃহে সহধর্মিণীকে ফোনে ডাকতে চেষ্টা করলেন। টেলিফোন বেজে চলল, কারো কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। শ্রীয়ায় হাসতে হাসতে বললেন,—হয়তো বুটী নেমেছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুইজেরের তলার পাট পরিহিত দু'এক জনের দেখা-আদেখা, ভিতর থেকে লক্ষ্য করা যায়। হাওদায় হাওদায় বটে গেছে শ্রীয়ায় এসেছেন এখানে। ঘরে ঢুকব কি ঢুকব না, বস্তুতাব স্টাফ ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গীত প্রতীক্ষা।—আস্থন, ভিতরে আস্থন।

ক্যামেরা আর ফ্ল্যাশ লাইট হাতে আমাদের নিজস্ব ফোটোগ্রাফার প্রবেশ করলেন। তাঁর মুখে অমারিক হাসি, বস্তুতাবীতে শ্রীয়ায়কে

ছবির মাধ্যমে ধরে রাখতেই হবে। ঘরের কোথায় পাঁড়ালে ঠিকমত ছবি তোলা যায় ক্যামেরাধারী খানিক যথাযোগ্য দৃষ্টিকোণ খুঁজতে থাকেন। শ্রীয়ায় হাসতে হাসতে বললেন—আমার কিন্তু ভাই হাতে খুব বেশি টাইম নেই।

ততক্ষণে ক্যামেরাধারী এবাংখনি শূন্য চেয়ারে উঠে পাঁড়িয়েছেন। চোখে ক্যামেরা তুলে চিত্রশিল্পী বললেন—না, খুব বেশি দেরি হবে না। এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইটের বিদ্যুৎগতি সোনালী আলোর ঘর ভরে উঠল। ছ'বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীয়ায় গমনোন্মুখ হলেন।

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীদত্তাজিৎ রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত হৃদয়তা আমাদের আজকের নয়, অনেক দিনের—তবে, সেদিন ঐ ছ'ঘণ্টা সময়ে তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের আলোচনার নানা ধরণের গল্পে যে বজ্রিষ্ঠ চিন্তাধারা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী এবং আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল—তা আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেল।

দীর্ঘ দীর্ঘ বিদায় নিলেন সত্যজিৎ রায়। আমাদের চোখ পড়ল হঠাৎ তাঁর হাতের দিকে। দেখলাম সে-হাতে শোনা পাচ্ছে মাসিক বস্তুতাবীর ১৩৭১ সালের বৈশাখ সংখ্যা। যার প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকে চলেছেন।

[ বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বস্তুতাবীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী নৃপেন দত্ত, শান্তিময় সাগাল ও বীরেন দত্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ]



# হৃদয় পাথো



( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

সুলেখা দাশগুপ্ত

এক এক সময় যেমন ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়—তার স্পিডোমিটারের কাঁটাটা একলাফে গিয়ে শূন্যস্থান ছাড়িয়ে গতির চাপে থবথব করে কাঁপতে থাকে—চিন্তারও তেমনি এক একটা সময় এসে উপস্থিত হয় একটানে গতি বাড়িয়ে দেওয়ার। তখন সময় থাকে না সময় নিয়ে ভাবতে বসবার। অকস্মের এখন সেই অবস্থা। জাইভার রাস্তার গাড়ি বের করে এনে জানতে চাইছে, কোথায় যাবে।

শিবানী ওকে বলতে বলছে, বলুন কোথায় যাবে। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে অরুণ?

অরুণ কি আগরওয়ালার রডন ট্রীটের সুরমা স্ট্যাটে নিয়ে হাজির করতে পারে শিবানীকে!

নির্জন সাহেব পাড়ার নির্জনতম কোণে—চারিদিকের বিস্তৃত কম্পাউন্ডের মধ্যে নয়তলা বাড়ির সর্ব-উপরতলার সুসজ্জিত রম্য স্ট্যাটিটি মি: আগরওয়ালার। বসে বসে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে ভাড়া আর তিন শ' টাকা করে বেহারাদের মাইনে গোণে আগরওয়ালার। সজ্জিত বাড়ি খালি পড়ে থাকে। বেয়ারাগুলি বৃক্খকে শোফাশেটের উপর বারান্দা বুলার আর হাই হোলে ঘুমায়। কিন্তু আগরওয়ালাকে যারা চেনে, তারা জানে ব্যবসার মূল চাবি কাঠিই হলো আগরওয়ালার এই ঘর। লিম্বটের অটোমেটিক চাবি টিপে উঠে এসে এবার আপ্যায়িত হয়ে ফের লিম্বটের অটোমেটিক চাবি টিপে নেবে বান খারার ভাঁদের হাত দিয়েই অটোমেটিকভাবে মোটা অঙ্কের ব্যাক লোন এসে যায় আগরওয়ালার হাতে। এসে যায় মোটা অঙ্কের বন্টস্ট্রাক্ট। ইনকাম ট্যাক্সের লস্কের ঘরের নোটিশ, আদায়ের বেলা নেবে আসে লশ-পাঁচ হাজারে। আগরওয়ালার বলে এটা তার লক্ষ্মীর ঘর। তারপর মুচকি হাসি হেসে বলে, মালিক্সের রাখি কি না, তাই পুজাটা ভালই পাওয়া যায়। প্রায় যা চাওয়া যায় তাই মিলে যায়।

ইন্দ্রনাথের ব্যবসার একটা সোল এজেন্সি আগরওয়ালার চাই। সে চাওয়াটাও তাকে তাই ইন্দ্রনাথকে এ ঘরে এনেই চাইতে হবে। সেদিন মদের বাস্ক ভেট দিয়ে গোড়াপত্তন করে এসেছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করে আসছে ইন্দ্রনাথকে তার রডন ট্রীটের স্ট্যাটে আনার। কিন্তু ইন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করছিল তাকে। 'এ সব আর নয়' এ মনোভাব দিয়ে পুরো না হোক, একটা না, না, না—দিয়ে যে ইন্দ্রনাথের অন্তরটা ভরা ছিল অরুণ তা জানত। কারণ অরুণকেই ফোন করে আগরওয়ালাকে বলতে হয় ইন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ গ্রহণের অসমর্থতার কথা। কিন্তু আগরওয়ালার অত সহজে হার মানবার লোক নয়। যদি তাই হতো তাব তিন তিনবার ব্যবসার গণেশ উন্টিয়ে ফেলেও আবার এমন মাথা তুলে ঠাঁড়াতে পারত না।

শান্তা কাউল—বাস কান্দীরী মেয়ে। মেয়ে নয় বেন কান্দীরী উপত্যকার আপেল বলে মাটিতে পড়ে থাকে। আপেল একটা। আগরওয়ালার বখন এই শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের অফিস কামরার সেদিন চুকছিল তখনও বেন তার গোলাপী হু-এর গালে, গলার, শরীরে কান্দীরীর গ্রামের মাটি মাথা ছিল। আগরওয়ালার বেন স্নানটাও করতে দেয় নি শান্তাকে—পাছে মাটি ধুয়ে গিয়ে চেহারার বহুতা চলে যায়। সত্য মাটি থেকে তুলে আনার চিহ্ন নষ্ট হয়ে যায়। পোষাকও ছিল অপরিচ্ছন্ন। তার পরা সালোয়ার পাঞ্জাবী হুঁটোই ছিল ময়লা। গায়ের পাঞ্জাবীটা একেবারে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ছিল ঘামে ভিজ। বৃকের হুঁশাশে কুলছিল হুঁটো লম্বা লম্বা বেগী। সে হুঁটোও যেমন উসকে যেমন ধুলাবালি জঙ্গিত। বেন তিন চার দিনের ট্রেনের পথ লোর ধুলো আর কয়লার শুঁড়ো তার মাথার জমে আছে। একদিন বেগী খোলা হয় নি। চিকুণী পড়ে নি। পোষাক বদল হয় নি।

এয়ার কন্ডিশন কামরার দরজা টেলে আগরওয়ালার বখন এ হেন মাটিমাথা শান্তাকে নিয়ে ইন্দ্রনাথের তবতকে বৃক্খকে অফিস

কামরার প্রবেশ করল তখন বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। সে তখন সবেমাত্র এক লাঞ্চপাটি থেকে ফিরছে। বিদেশীদের সঙ্গে পাটি ছিল। তাই সাধারণত লাঞ্চ বসটা ড্রিক করে তার চাইতে কিছুটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল ড্রিক করাটা। ইন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে ঐযং লালের সঙ্গে একটা স্বপ্নানু বোর মিশেছিল। শাস্ত্রার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগরওয়ালাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করছিলো, কি ব্যাপার মিঃ আগরওয়ালার ?

মনে মনে একটু হাসল আগরওয়ালার। শাস্ত্রাকে নিয়ে আসবার সময়টা যে আগরওয়ালার লাঞ্চার পর বেছে নিয়েছিল তা কি এমনি এমনি। বিদেশীদের সঙ্গে পাটি থাকা আর ড্রিক করাটা বেশি হয়ে যাওয়া আগরওয়ালার ভাগ্য। কিন্তু লাঞ্চার পর কিছুটা যে নেশাধরা মাথা ইন্দ্রনাথের থাকবেই—এ তার হিসেবের মধ্যেই ছিল। আগরওয়ালার নমস্কার জানিয়ে ইন্দ্রনাথের অর্ধচন্দ্রাকৃত অফিস-টেবিলের উদ্দেশ্যে দিকে খুশিমনে আসন গ্রহণ করল। তারপর শাস্ত্রাকে দেখিয়ে বলল, মিঃ সেন সত্যকুলভাষি থেকে তুলে নিয়ে এসেছি একে—এইমাত্র ট্রেন থেকে নামল—বেটি নমস্কার জানাও বাবুকে।

শাস্ত্রা টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ কুঁচকে ছোট করে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল—দুঃহাত এক করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্তে জী।

অরুণ ইন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। সাহেবদের প্রাইভেট জীবনের—অর্থাৎ গোপন জীবনের ভার তো তাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীদের হাতেই থাকে। অরুণ বুকল ওর উপস্থিতি নিয়ে তাই আগরওয়ালার মাথা ঘামাচ্ছে না।

কিন্তু অরুণ উঠে গিয়েছিল।

আগরওয়ালার শাস্ত্রাকে নিয়ে চলে গেলে ডেকে পাঠিয়েছিল ইন্দ্রনাথ আর অরুণ গিয়ে দেখেছিল ইন্দ্রনাথ যেন কদিন আগের ইন্দ্রনাথ আর নেই কিন্তু সে কথা অল্প কথা। তা ভাববার সময় নেই এখন অরুণের। এখন ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকে কোথাও যাওয়ার নির্দেশ না मिलেই নয়। কিন্তু কোথায় যেতে বলবে সে তাকে। রডন স্ট্রীটের ভই স্ক্যাটে তো শিবানীকে নিয়ে যেতে পারে না সে। মাথার পীডোমিটারের কাঁটা শূন্যের ঘরে পড়েছিল। ভাবনা-চিন্তা না করেই একটানে কাঁটাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে অরুণ অবশিষ্ট ড্রাইভারকে বলল, আও উভার বাইরে লাগাঞ্জী, হাম চালায়েঙ্গে। কিন্তু এ পর্যন্তই। ড্রাইভার ওর হাতে স্কিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে নেবে গেল। অরুণ ফাস্ট গিয়ারে পা রেখে স্কিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি চালিয়েও দিল কিন্তু মাল্হুয়ের মাথাটা বন্ধ নয় যে, চিন্তার গতি একবার বাড়িয়ে দিলে সেই একই গতিতে চলতে থাকবে। ফের চিন্তার কাঁটা হাত-পা ছেড়ে অসহায়ভাবে যেন শূন্যের ঘরে খলে পড়ল অরুণের। ড্রাইভারের কাছে নয় মান বাচানোর পথ বের করা গেল কিন্তু এখন কোথায় ধাবে সে।

জরুজোঁট রোডের নিয়ন আলোসজ্জিত মন্থন পথ চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। এর কত দূর কত দিকে চলে গেছে। কোন দিকে ধাবে সে। যে দিকেই বাক না কেন ধাবে সেদিকে ? কোথায় গিয়ে থামবে। গাড়ি ট্যান্ডি আর পথ-চলতি মাল্হুকে একদিক-ওরদিক

পাশ কাটাতে-কাটাতে নিরুপায় হাতে ডিমলার গাড়ির বিশাল দেহটা শব্দগুস্তিতে চালিয়ে নিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল অরুণ।

আর গাড়ির ভেতরে বসে জয়ের অহংকার বোধ করতে লাগল শিবানী। ও জিতে গেছে। এই জিত, তিতি যদি ও অরুণের সঙ্গে না জিততে পারত তবে এককণ্ঠে ওর মর্দাদাকে কেড়ে তালার ঘাটে শ্রমশান যাত্রার পাঠিয়ে দিতে হতো। ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়েও ভালই করেছে লোকটি। শিবানী দেখেছে, বোম্বা-বাবু-ড্রাইভার এরা বতাই কসিলের মতো মুখ করে থাকে—সব বোঝে।

রাস্তার আলো কখনও এসে পড়ছে শিবানীর মুখের উপর, কখনো সরে যাচ্ছে। মনের ভেতরে যেন ওর যুদ্ধ চলছে। এদিকে অরুণের কাছে মর্দাদা প্রতিষ্ঠার দুরন্ত জেদ কাজ করছে, অত্য়দিকে নিদারুণ উত্তেজনা বোধ করছে ইন্দ্রনাথের কাছে যেতে। ইন্দ্রনাথকে কোথায় দেখবে কে জানে। কি অবস্থায় দেখবে তাই বা কে জানে। নানা সম্ভাব্য ছবি সে কল্পনার দেখতে লাগল আর ঘূর্ণার, বিতুলার চৌকি কামড়াতে লাগল বসে বসে।

আজ শিবানী বড় স্বস্তি করে সেজেছিল। তার আজকের সাক্ষ্য সাক্ষের ভেতর ঐশ্বর্যের উগ্রতা ছিল না, ছিল যুঁই ফুলের স্তম্ভতা। ইন্দ্রনাথ সাদা পোষাক একেবারেই পছন্দ করে না—এ খোরাল তার ছিল। কিন্তু আজকের গোমট গরম আষাঢ়াওয়ার রং বে একেবারেই অচল। এই সাদা দিয়েই আজ ইন্দ্রনাথকে সে মুগ্ধ করবে—এ ইচ্ছাই সে মনে রেখেছিল। সাদা পোষাকের ওপর সাদা মুক্তোর হার পরন্তে-পরন্তে শিবানী যেন ইন্দ্রনাথের কঠোর 'বাঃ' শব্দটাও স্তন্যে পেয়েছিল।

গাড়ি নিয়ে কি অরুণ নিরুদ্দেশ যাত্রার চলছে না ইন্দ্রনাথই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অনৈক্য হলো তো অরুণ চলছেই—কেবল চলছেই। কতবার লাল আলো জ্বলে উঠল দেখে গাড়ি থামল। নীল আলো জ্বললে গাড়ি চলল। কতবার কাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ির গতি বাড়ল, কতবার ট্রাম, বাস, মাল্হু, দিল্লির ভিড়ে খেমে খেমে এগুলো কিন্তু এমন কোন ঠিকানায় বাচ্ছে অরুণ যে এখনও ঠিকানা মিলল না।

অরুণও বুঝছিল কোন একটা জারগার এখন গাড়ি নিয়ে গাড়ি না করলেই আর চলছে না। এভাবে আর কত ঘুরবে। একবার বিরস্তির সঙ্গে অকুণ্ঠিত করে ভালবে দেখে নিয়ে ছেড়ে আগরওয়ালার স্ক্যাটেই শিবানীকে। তারপর যা ঘটে ঘটুক। ওর কি। চাকরী ওর চলছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওর ট্রেন ধরবার কথা ছিল। ইন্দ্রনাথের কাছে অহুগতের প্রদ্বন্দ্ব নেই। তবে সে ভূতের মতো ঘুরে ঘুরছে কেন ? তা হাড়া অনেক আগেই অরুণ তার কাজ চলে যাওয়ার কথা বলে শিবানীর হাত থেকেও তো বাঁচতে পারত। যে পথে বাচ্ছিল সে পথ থেকে হঠাৎ মোড় ঘুরে সোজা রডন স্ট্রীটের দিকে চলল অরুণ।

শিবানীকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে সে সোজা হাওড়া স্টেশনে পালাবে। এ আবহাওয়া ওর সইবে না।

রডন স্ট্রীটের অভিজাত সাহেবগাড়ার স্ক্যাটে-স্ক্যাটে তখন আলো জ্বলছে। শাস্ত্রা নির্জন স্তম্ভ পরিবেশ। মনে হয় যেমন জনশূন্য পথ সেতমনি বুঝি জন্তলুহা বাড়িগুলিও। কেবল বাড়িগুলির আলো বলাই, না মাল্হু আছে। আগরওয়ালার নবস্তা স্ক্যাটের সামনে দিয়ে একবার

কৃত্রিম-এর একটি বিশিষ্ট নমুনা

# আমরা ছিলাম নিজের জালে বন্দী

দেশমান্য তানসাদে জড়িয়ে গেলে  
কুমিল্লাজা মাঝে ম'লে উড়িয়ে  
দেওয়া সহজ



যখন বিয়ে করেছিলাম তখন জীবনটা এমন বিভ্রম হয়ে  
উঠবে ভাবিনি। কোথায় গেল হাস্যতা জীবনের সেই যশু যশু ?  
পদস্পরের অথহঃখের সান্নিধ্য হয়ে চলাই ছিল আমাদের আনন্দ, কিন্তু এখন  
কিছুদিন থেকে কোনো কাজেই উৎসাহ পাচ্ছি না—কেবল ক্লান্তি আর ক্লান্তি  
—একবারে অস্থির, অকেন্দ্র হয়ে পড়েছি। আমার স্ত্রীও দেখে দেখে  
বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। দিনে দিনে দুজনেই এসন নিঃশব্দ।



এই ক্লান্তির হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া  
যায়? গেলাম এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু  
বললেন, শরীরের শক্তি-সামর্থ্য কমে গেলে প্রায়ই  
এরকম উবেগ হয়, দুশ্চিন্তায় শেষে বসে। হুত  
খাদ্য, শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে তিনি আমায়  
রোজ হরলিক্স খেতে বললেন।



গোড়ায় একটু একটু করে অবসান কাটতে লাগল। তারপর  
২১৭ আমাদের ক্লান্তির কালো ছায়া হুতে গেল। জীবনে  
আবার রঙ ধরল, আমাদের দিনগুলো হয়ে উঠল প্রাণোচ্ছল।  
হরলিক্স-এর স্বাস্থ্যসুকারী জাহ্নমেরে আমরা মুক্তির নিঃশ্বাস  
ফেলে বাঁচলাম। হরলিক্স থাকতে আর কখনো ক্লান্তির  
আলে বন্দী হতে হবে না।



**হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!**

১৯৭৭/৭৮

পার হয়ে গেল অরুণ। এখানেই এখন ইন্দ্রনাথ আছে। কিন্তু ধামতে পারলে না। গাড়ি শিবানীকে বলতে পারলে না, সোজা লন পার হয়ে ভেতরে ঢুক ঘনি। নাম বলছেই দারোগান আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না, তা হয় না।

শিবানীকে যে জবাব দিয়েছিল, নিজেবেও সেই জবাব দিতে হলো অরুণের।

আপনি কি আমাকে পথে-পথে ঘোরাচ্ছেন নাকি? শিবানীর তীক্ষ্ণ-বর্ষণ কণ্ঠের আচমকা প্রশ্নে এবটু চমকেই গিয়েছিল অরুণ।

ক্ষিপ্ৰগতিতে অগ্রসৃতকণ্ঠে বলে উঠল, না—না। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি—

জবাবটা অরুণ কিছু একটা জবাব দেবার জন্তু আর এ ছাড়া কিছু বলবার নেই বলেই দিয়েছিল। কিন্তু জবাবটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে একেবারে বিম্বিত আনন্দিত করে দিয়ে একটা বাড়ি ভেসে উঠল ওর চোখের উপর। এতক্ষণ যে কেন শিবানীকে ওখানে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেবার কথা মনে হয় নি, বুকেই উঠতে পারলে না অরুণ। সে জায়গাটার কথাই তো তার সর্বপ্রথম মনে হওয়া উচিত ছিল। গাড়ি চালিয়ে দিল অরুণ।

শিবানী ওকে না চিনুক, না দেখুক, শিবানীকে অরুণ এই ছ'মাসের চাকরী জীবনে অনেক দেখেছে এবং অনেক দেখা দিয়ে একটা মানুষকে বতটুকু চেনা যায় তা চিনতে। আর সঙ্গে শিবানীর হৃদয়তা—কার বাড়ি যেতে, কার সঙ্গে গল্প করতে শিবানী বেশি ভালবাসে সে কথা সে জানে এবং জানে ললিতা তার ভেতর প্রধান। ললিতা এখন যে বাপের বাড়ি এ কথাও অরুণের অজানা নয়। কালকেই কালীনাথকে ওরা নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে। ১০-ইস্ বখন ওঁ শিবানীকে এখানে নিয়ে আসতে পারত।

গাড়ি যেখানে থামল স্তম্ভিত হয়ে শিবানী দেখল সেটা ললিতাদের বাড়ি। অসহ্য রাগে-অপমানে কি যে সে করবে বুঝে উঠবার আগেই ললিতা গাড়ি থামবার শব্দে বসবার ঘর থেকে মুখ বাড়ালো। শিবানীকে দেখে দৌড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

নামতে হলো শিবানীকে।

শিবানীর দুই হাত জড়িয়ে ধরে ললিতা বলল, কি সৌভাগ্য আমার। ভাবতেই পারছি নে তুমি নিজ নিজ চলে এসেছো।

চসতে চলতে শিবানী বলল, বাঃ তোমার কাছে আমার জন্মদিনের শাড়িটা বয়ে গেছে না? দিয়েছো সেটা আমাকে? আর পড়ে থাকলে ঠিক এক সময় লোভ সামলাতে পারবে না। পরে ফেলবে। তাই নিয়ে বেতে এলাম।

তুমি শাড়ি নিতে এসেছ? অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে ললিতা। অবশ্যই।

কিন্তু শিবানী এ কথা ললিতাকে বিশ্বাস করতে পারলে না। সে মাথা নেড়ে বলল, তা কখনও হয়। এমন রমণীয় সন্ধ্যায় এমন রমণীয় সাদা সাজে সঙ্গে মুক্তার মালা গলার পরে তুমি বেরিয়েছ— আমার কাছ থেকে শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্তু—

শুধু শাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্তু বেরব কেন। বেরিয়ে ছিলাম, এখন দিয়ে যাচ্ছিলাম—

ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল ছ'জনে। ললিতা হেসে বলল, এখন দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে তা আর জিজ্ঞাসা করব না। আরো কিছু আবেল-তাঁবেল বলে বসবে। অপ্রস্তুত অবস্থায় এমনি হয়। এমন কথা বেরিয়ে আসে যে তার জবাব দিতে গিয়ে আরো অপ্রস্তুতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। নইলে তো দিবা বলতে পারতে, সোজা-গুজো তোমার সঙ্গে গল্প করতে এল, ম ললিতা। এমন অবিশ্বাস্য মনে হতো না।

বসল ছ'জনে।

শিবানী সত্যি নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেলতে পারছিল না।

ললিতা শিবানীর দিকে তাকিয়ে সন্ধিগুহ্যকণ্ঠে বলল, কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে যেন তুমি আচমকা এসে পড়েছ—কেউ এনে তোমাকে হঠাৎ এখানে ছেড়ে দিয়েছে।

শিবানী ললিতার সে কথার জবাব দিল না, মাথার ওপর নুপুরের কমনবন্দ শব্দ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করল, নাচছে কে?

সখার।

নাটক তো হচ্ছে লক্ষীর পরীক্ষা। তাতে সখীদের নাচ কোথায়? ওরা ঢুকিয়েছে। কিরো যখন রাগী হলো তখন তার রাজসভার ওরা নাচ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তা রাগীর কাছে নাচ—এ সন্দেহের তবক-মোড়ানো সোনালী-রূপালী পাতে মতো। শোভা বাড়ি বৈ কমে না। তাই আপত্তি করি নি। শিবানী যখন তখন কথার চলে গেল, ললিতাও তখন আর ও কথার গেল না। বলল, বাস মাদের খবর দিয়ে আসি। ললিতা চল গেল।

শিবানীর ভেতরটা যেন অপমানের যন্ত্রণার জ্বলতে লাগল। ইন্দ্রনাথকে দিয়ে তাড়াবে লোকটাকে। কিন্তু অরুণ যখন এমন বিখন্ত অজুচর ইন্দ্রনাথের, তখন ইন্দ্রনাথ ওর কথা শুনে কেন। ইন্দ্রনাথের মতো চরিত্রহীন লোকদের সবারই অরুণদের মতো একজন করে অজুচর থাকে। তাদের উন্নতি আরো বাপে-খাপে বেড়ে চলে। ইন্দ্রনাথ কখনই তাড়াবে না ওকে। আরো হয় তো পুঙ্খনত করবে অরুণের মুখে ঘটনা শুনে। [কমণ।

এ মামলার প্রচলনপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি স্মরণীয় আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উৎসবে গুরুদেবের কলিকাতাস্থিত বাসভবনে ও নিজকক্ষে শিষ্য জওহরলাল নেহরু প্রদর্শ্য অর্পণ করছেন। আলোকচিত্র মনো চৌধুরী কর্তৃক গৃহীত

নিভাতই সে এক বিজলী আলোর মিলি।

কিন্তু তার ট্যারা অন্ধলের খুশি ঘরটি কোনো-  
দিনই আলোর মুখ দেখতে পার না।

চারদিকে আর আশেপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি মাথা  
তুলে দাঁড়িয়েছে। একটা দিকে একটা কারখানার লম্বা  
সেত। তার চিমনিগুলি সারাদিন আকাশের মুখে কালো  
ধোঁয়া মাখিয়ে দেয়।

পাড়টার এককোণে সবাইকার বিবড়ট্ট এড়িয়ে কোনো-  
মতে টিকে আছে একটা খেটে-খাওয়া মানুষের বস্তু।

এমনিতেই ত' আঁধারে মাথা গুঁজে থাকে। তার  
ওপর নিবারণ নিজের ওই ছোট খুশি ঘরখানিতে আলো  
ঝালবে না।

আশেপাশের সবাই ওকে ঠাট্টা করে বলে, আচ্ছা নিবারণ, সারা  
'পৃথিবী'য় তুমি আলো খেলে বেড়াও, আর নিজের ঘরে এককোঁটা  
আলো নেই? এ তোমার কি রকম ব্যাবস্থা বলা দেখি? ওই  
একরকমি মেয়েটা যে দিন-রাত আঁধারে পড়ে মরে—সেটা কি তুমি চোখ  
মেলে দেখতে পাও না?

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথা শুনে নিবারণ রাগ করে না,—মিটিমিটি  
হাসে শুধু।

মায়ে মায়ে জবাব দেয়, আরে ভাই, তোমরা বোঝ না! ওই  
বোনটার জন্মেই ত' আলো আলবার উপায় নেই। আমার আর তিন  
চুল কে আছে বলা? থাকবার মধ্যে ওই আট বছরের বোন টুনী।  
এত দশি মেয়ে—বুঝলে?—সব দিবে ওর কাজ। ও যে কখন কি  
অনর্থ করে বসে তার ঠিক কি? ঘরো, আমি থাকি সারাদিন বাইরে  
বাইরে। কখন জামার আগুন লাগিয়ে বসবে—পুড়ে একবারে ছাই  
হয়ে যাবে।

প্রতিবেশীরাও নাছোড়বন্দা। তারাও আপত্তি তুলে বলে,  
আহা, তুমি ঘরে আলগা খোলা আলো রাখবে কেন? তুমি নিজে  
ত' বিজলী আলোর মিলি,—তাই না হয় খাটিয়ে দাও ঘরে।

নিবারণ শিউরে উঠে উত্তর দেয়, ওরে বাবা, সে আরো বিপদের।  
কখন 'শক' খেয়ে পড়ে মরে থাকবে—কাক-পক্ষীতে জানতেও পারবে না।



এই আলো নিয়ে ভাই-বোনের সঙ্গেও নিত্যা বগড়া।

টুনী বলে, আচ্ছা দাদা, চিরটাকাল আমি আঁধারঘরে থাকবো?  
সারা রাজ্যে তুমি আলো খেলে বেড়াও, আর নিজে এত অন্ধকারে  
থাকতে ভালোবাস?

নিবারণ মিটিমিটি হাসে।

—ওরে দশি মেয়ে, আঁধারে থাকি কি আর সাথে? তুই যে  
একেবারে হাতে-পায়ে লম্বী! তুই আর একটু বড় হ'—তখন  
দেখবি—এই ঘরে একশ' পাওয়ারের আলো খেলে একেবারে  
রোশনাই করে দেবে।

টুনীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে এগিয়ে এসে অত বড় দাদাকে  
হুমকি দেয়। আমি কবে বড় হবো—তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা  
আছে? তার চাইতে তুমি আমাকে একটা বৌদি এনে দাও—সে  
ঘরে আলোও আলতে পারবে,—আর তোমাকেও খুব শাসনে রাখতে  
পারবে।

দাদা ছুটে গিয়ে টুনীর চুলের মুঠি ধরে হুম-ভুম করে কিল বসিয়ে  
দেয় পিঠে।

টুনী খিল খিল করে হেসে ওঠে।

ও জানে দাদা ওকে কতখানি ভালোবাসে।

পাছে আলোর দিকে কিছু অঘটন ঘটে—তাই কিছুতেই সে ঘরে  
আলো আলবার ব্যাবস্থা করবে না।





বসন্তে ওর বহরী মেয়েরা কত শিখির ছালায়, কেউ কেউ বিবি রাগা করতেন শিখে গেছে। কোমরে শাড়ি জড়িয়ে বাপ-ভাইদের রাগা করে কেমন খাইয়ে দেয়। নিবারণ কিন্তু ওকে আলোর কাছে যেতেই দেখে না।

কি যে ওর আঙনে ভর—বুঝতে পারে না টুনি। নিজে হাত পুড়িয়ে হুঁবেলা রাগা করবে,—কিন্তু টুনীকে কখনো উল্লুনের ঘরে যেতে দেখে না। এর জন্তে ওর সমবয়সী মেয়েরা ওকে 'পটের বিবি' বলে ঠাটা করে। ওর চোখ ছাঁট ছলছল করে ওঠে। শুধু দাদাকে কিছু বলতে পারে না।

টুনি ত' জানে দাদা ওকে কত ভালোবাসে।

যেদিন কাজ শেষ করে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়—সেদিন সে পাশের ঘরের পালুদের বৌদির কাছে গিয়ে বসে থাকে। অন্ধকার ঘরে ওর একটু-একটু ভুতের ভয় করে। কিন্তু দাদার কাছে বলতে সে লজ্জা পায়।

শিশু রাস্তার ঘরে গেলে নিবারণ একেবারে দোকান থেকে রুটি-মাংস কিনে ফিরে আসে। সেদিন আর উল্লুনে আঁচ পড়ে না। ভাই-বোন পাশাপাশি বসে খেয়ে নেয়।

নিবারণ জানে, টুনি রুটি-মাংস পেলে আর কিছু চায় না। কিন্তু সেই রুটি-মাংস ঘরে তৈরি করতে গেলে—অনেক সময় বাবে, অনেক পরদা বাড়তি খরচ হবে। তাই শিখের দোকান থেকে মাঝে-মাঝেই নিবারণ রুটি-মাংস কিনে এনে টুনীকে খুশি করে।

বসন্তে হোক—শিবারণ কিংবা না-আসা পর্যন্ত টুনীর কুশি ছালাবারও ইচ্ছা নেই। অন্ধকার ঘরে বসে-বসে আর কতকণ মশার কামড় খাওয়া যায়? তাই অসহ্য লাগলেই টুনি সোজা পালুদের ঘরে গিয়ে ওদের পড়াশোনা শোনে।

টুনীরও খুব ইচ্ছে,—সে পালুর মতো ইচ্ছুলে পড়ে,—নানা রঙের বই ব্যাগে পুরে বেগী হুলিয়ে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ইচ্ছুলে যায়।

কিন্তু লজ্জার সে সব মনের কথা তার দাদাকে বলতে পারে না। সারাদিনের মধ্যে দাদা যে-কোন সময় খেতে আসবে—তা সে নিজেও জানে না। বোনটিকে পাশে বসিয়ে না খেলে আবার নিবারণের পেট ভরে না।

তাই ইচ্ছে থাকলেও টুনি তার আকাঙ্ক্ষার কথা দাদার কাছে খুলে বলতে লজ্জা পায়।

হঠাৎ কলকাতার শহরে একটা সাড়া জাগল। বিদেশের এক প্রবাসিনী এই দেশ সফর করতে আসছেন। তাই চারদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

দেশের প্রবাসিনী থেকে স্তব্ব কণে জানী-গুণী সবাই নতুন নতুন পরিকল্পনার মতো উঠলেন।

কর্ণোৎপত্তির কাউন্সিলাররা একটি বিশেষ আলোচনা সভার মিলিত হয়ে স্থির করলেন,—সারা শহরকে আলোকমালায় অভিনবরূপে সজ্জিত করতে হবে।

বিরাট উৎসব-উদ্‌যাপনের মধ্যে প্রবাসী গৃহীত হল।

কর্ণোৎপত্তির বসন্ত বিজলীবাতির মিলিত ছিল—তারাত' সঙ্গে সঙ্গেই

কোমর বেঁধে কাজে লাগল। গোটা শহরের বড় বড় রাজপথগুলি আলোকমালায় ঝলমল করে তোলা ত' সহজ কথা নয়।

কাজেই বাইরের বিজলী-মিল্লিদেরও এই আলো আলানোর কাজে লাগানো হল।

নিবারণও অজ্ঞাত মিল্লিদের সঙ্গে এই কাজে লেগে গেল। দিন নেই, রাত নেই—ওরা শুধু বিজলী-তার নিয়ে কাজ করে চলেতে। খুব চড়া পাওয়ারের বায়ুগুলি ঝলবে এইসব রাজপথে।

একদিকে চলেছে তোরণ তৈরির কাঠের মিল্লির হাড়ভাঙা পরিশ্রম,—আর একদিকে এগিয়ে চলেছে বিজলী-তার আলানোর অবিরাম থামেলা।

নিবারণ যে দুপুরবেলা খেতে আসবে তারও ফুরসৎ পায় না। কাজের জায়গাতেই অজ্ঞাত মিল্লিদের সঙ্গে বরাদ্দ খাবার খেয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে। কিন্তু টুনীর রাগা করবার হুকুম নেই। তাই দাদাকে না জানিয়ে সে কোনোদিন তেলোভাঙা মুড়ি চিবিয়ে ফিড়ে মেটায়—আবার কোনোদিন বা পাড়' থেকে কচুরী আর তরকারী কিনে খায়। শিখের দোকান ওদের পাড়ার নেই,—কাজেই দাদা না হলে মাংস-রুটি কে কিনে আনবে?

নিবারণ দিন-রাত খাটছে। ওইখানেই মাঠের ঘারে ওদের কয়েকটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেইখানে তাদের যত্নপাতি থাকে। আর পালা করে মিল্লিরা কিছু কিছু সময় ঘুমিয়ে নেয়। বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবার ফুরসৎ মেলে না। বারা গোটা শহরে আলো জ্বালাবে—তারের ঘর দিন কয়েক অন্ধকার থাকুক না।

হঠাৎ একদিন সকালের দিকে নিবারণ বোনের খোঁজখবর নিতে এসেছে। হাতে কিছু ফল আর বান রুটি।

টুনি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার দাদা? তুমি কি খাও না—আর ঘুমোও না? ওরোজগারে তোমার দরকার নেই, আজই কাজ ছেড়ে দিয়ে এসো।

নিবারণ টুনীর মাথার-পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, শুধু আজকের দিনটারে টুনি। আজই আমাদের সব কাজ শেষ হবে। আজ আলো জ্বলবে—হাজার হাজার দামী আলো। দেখিস গোটা পথ দিন-বরাবর হয়ে বাবে। একটা ছুঁচ পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে নেওয়া বাবে। কাল ত' সেই বিদেশী জাতিখি আসবে—কাল রাস্তাঘাটে দারুণ ভিড়। আজই রাস্তার এতে তোকে রিক্সা করে নিয়ে যাবে। হাজার-হাজার আলো জ্বলে দেখে আসবি নিজের চোখে। তারপর আমরা করবো কি জানিস? শিখের দোকানে বসে গরম-গরম রুটি-মাংস খেয়ে আবার সেই রিক্সা চেপে ঘরে ফিরে আসবো। রাস্তার বেলা রিক্সা চাপতে কি আরাম দেখবি তখন। কেমন ফিরিয়ে হাওয়া দেয়—মন-প্রাণ একেবারে খাতির তোলো।

নিবারণের কথা শুনে টুনিও খুব মেতে ওঠে। কোনোদিন ত' আর ঘরের বাইরে যেতে পারে না। টুনি মনে-মনে স্বপ্ন রচনা করতে লাগলো। তার বন্ধু পালুর কাছে দাদার কোরামতির কথা কতভাবে গল্প করলে সারাদিন ঘরে। এমন'কি পালুকে নেমস্তন্নও করলে—আলোর মালা দেখবার জন্তে।

সেইদিন রাস্তায় আলো জ্বলবে। ঠিকাদার, স্থপারভাইজার সবাই



## ছোটদের আসর

এসে হাজির। মিস্ত্রীরা আজ তাদের আলোর মালার মোহময় স্বপ্ন রচনা করবে।

সব দিকে সবাই প্রস্তুত।

মিস্ত্রীরা বলছে, তাদের দিক থেকে সব কাজ শেষ হয়েছে— এখন বিজলী প্রবাহের সংযোগ হলোই আলো অগ্নি উঠবে।

কনট্রোলার, ঠিকাদার, সুপারভাইজার.....মিস্ত্রির দল সবাই উত্তেজিত।

তাদের এতদিনকার পরিশ্রম আজ সার্থক হবে। তাদের মুখগুলো আজ আলোর মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুপারভাইজারের আদেশ হল,—সুইচ, 'অন' করে যাও—

মিস্ত্রীরা সঙ্গে-সঙ্গে সেই বকম কাজ করলে। কিন্তু আলো তাতে জ্বলল না।

ঠিকাদার বললে, ও-হে নিবারণ, তুমি ত' সেরা মিস্ত্রী—সবাই সে-কথা বলে। তুমি একবার ওপরে উঠে দেখ না, কোথায় কি গড়বড় হয়েছে। তোমার ত' এক মিনিটের কাজ। যাবে,—টুক করে কাজটা হাঁসিল করবে,—আর তোমার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে উঠবে।

নিবারণ এগিয়ে এসে বললে, আমি ওপরে উঠতে পারি তার, কিন্তু ওই কাঠের লম্বা সিঁড়িটা বড্ড নড়বড়ে। যদি চারজন লোক নীচে শক্ত করে ধরে—তা হলেই আমি ওপরে উঠতে সাহস পাই।

ঠিকাদার বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ধরবে বৈ কি। তখন ঠিকাদার চারজন কুলিকে ডেকে এনে সেই উঁচু লম্বা কাঠের সিঁড়িটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে।

ব্যথারীতি ব্যাবস্থা হলে নিবারণ ভত্ব করে সেই সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু কাজটাকে সে বত সহজ মনে করেছিল তা নয়। ওটা সারাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।

নিবারণ ওপর থেকে হাঁক দিয়ে বললে, চট করে হবে না তার— বেশ খানিকটা সময় নেবে—

নীচে থেকে ঠিকাদার জবাব দিলে, আচ্ছা, তুমি কাজ চালিয়ে যাও—আমরা সবাই আছি—তোমার কোনো ভয় নেই।

কাজ চলছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল,—তবু নিবারণ সেটা সারিয়ে তুলতে পারল না।

ঠিকাদার অসহিষ্ণু হয়ে বললে, আর কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে! তারপর একটা কুলির দিকে তাকিয়ে বললে, চা নিয়ে আর ত' কয়েক কাপ। বাবি আর আসবি। অল্প তিনজন কুলি তাতে আপত্তি জানিয়েছিল। ঠিকাদার হুমকি দিয়ে বললে, তোরা তিনজন শক্ত করে ধরে থাক। হু'বেলা ভাল-কটি মারিস নে?

একটা লোক বেরিয়ে আসতে—ওরা টাল সামলাতে পারল না। ছড়মুড় করে অত উঁচু কাঠের সিঁড়ি কাৎ হয়ে ভেঙে পড়ল। আর নিবারণের দেহটা তড়িতাহত হয়ে অত উঁচুতে ঘোটা বিদ্যুতের তারে প্রাণহীন হয়ে খুসতে লাগল।

সেই সময় টুনি নতুন স্রব পয়ে ভাবছে,—কখন দাদা কিরে আসবে, আর কখন তাকে রিজা করে হাজার-হাজার আলোর মেলা সেখানে নিয়ে যাবে।

এক রাজা। রাজ্যের নাম বাসে-রাজার নাম ইতিহাসে পাই নি, তবে রাজা রাজাই,—তার নামধামের কি এমন প্রয়োজন। এ রাজার বয়স বেশি নয়। রাজার মন্ত্রী আছেন, সেনাপতি আছেন, পাত্রমিত্র অমাত্য আছেন—পুরোহিত, খাজাঞ্জি, রক্ষী—সব আছেন আর আছে বিরাট তোরাণা এবং অসংখ্য প্রজা।

তিন হাজার বছর পূর্বে সূর্যবংশের কোন রাজা এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এক কশাঘ্রুফমে এ রাজ্য এরাই চালিয়ে আসছেন। তিন হাজার বছর পূর্বে যে সব আদব-কায়দা, আইন-কানুন চলেছিল, আজ পর্যন্ত তা এ রাজ্যের রাজা-রাজড়ী পালন করে আসছেন। খেলে-ভুবার আহারে-বিহারে সেদিনের কসাবে বিধিনিষেধের আজ পর্যন্ত একতিল ব্যতিক্রম ঘটে নি। সকলে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে আসছেন। সেই সব বিধিনিষেধ মেনে রাজা ওঠেন, বসেন, খানপান, শাসন পালন করেন।

সকালে পাঁচটার নহবৎখানার ভোরে সানাই বাজে,—সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদকক্ষে বৈভালিকেরা বন্দনা গান শুরু করলে রাজা মন্ত্রী ভোগে ওঠেন। বিছানা থেকে উঠেই রাজা প্রান্তঃকৃত্য



একদিন যা হয়েছিল

\*

জৈবিক মোহন  
সুখানন্দিত্য

(স্বপ্নকাহ)

সারেন। তারপর নাপিত এসে দাড়ি কাটিয়ে দেয়, রাজা আসেন আনের ঘরে—সেখানে খেতপাখরের চৌবাচ্চার গন্ধকল—ভুতারা রাজাকে স্নান করিয়ে দেয়—তারপর রাজবেশ পরে রাজা এসে বসেন চা খেতে—চারের পর্ব শুরু হয়েছে বেড়েশো-বছর আগে থেকে। সে এক কাহিনী।

রাজ্যের সব বিষয়ে পরামর্শদাতা কুল —রা

ছিল—বশিষ্ঠের প্রতিপত্তি, এ রাজ্যে তেমনি কুলগুরু প্রতিপত্তি। একবার সেই মেঘশো বছর আগে কুলগুরু ভীষণ সদি হয়েছিল কিছুতে সে সদি সারে না—বৈবর্তের বড়ি-পাচন খাইয়ে সারাতে পারল না, অ্যালোপাথিকরা কোন মিক-চারে সারাতে পারলো না—শেষে এক সাধুবাৰ আসাম হিমালয় পর্বত থেকে নির্দেশ দেন কুলগুরুকে পাহাড়ী চারের পাতার কাং খেতে। তাতেই কুলগুরু সর্পি সারে। কুলগুরু তখন এই চারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে পুখির পাতার সে শ্লোক এঁটে দেন—শ্লোকটি হলো—

সুখদা কলিযুগে চা শুভর বুদ্ধিকারিকা—  
ত্রিসঙ্খ্যা বা পিবেৎ এই চা

সো দীর্ঘায়ুর্ভবেৎ এবম্।

সেই থেকে এ রাজ্যে চারের প্রচলন।

চা-পানের পর রাজা রাজসভার বসেন বেলা বায়েটা পর্বত, তারপর রাজা আপন অন্ধরে রাজসভার সামনে বসেন ভোজনে, ভোজনের পর বিশ্রাম—বিশ্রামের পর বিকালে অজ্ঞাগার পরিদর্শন, তারপর চা পানান্তে ঘোড়ার কিছা হাতীতে চড়ে বাঘ শীকার ভ্রমণ—কিরে এসে সাহ্য আসর, গীতবাহত, অভিনয় দর্শন এবং রাত্রি নটায় ভোজন, সাড়ে নটায় শয়ন। তিন হাজার বছর ধরে এতদিন পালন করে আসতেন রাজারা এ বিধি। তার ওলট-পালট নেই। রাজ্যপরিচালনার বেশ শৃঙ্খলা আছে—এ সবার অন্তরালে যে বিরাট পৃথিবী সে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে—এ রাজ্যের রাজা থেকে কি প্রজারা তার কোন খবর রাখে না।

কিন্তু একদিন ঘটলো এর ব্যতিক্রম—সেই কাহিনীটি বলছি। সেদিন চা-পান শেষ করে রাজা বিশ্রাম করছেন, মন্ত্রী এসে বললেন—মহারাজ!

রাজা বললেন—কি সংবাদ মন্ত্রী?

মন্ত্রী বললেন—মহারাজ! আবার তুলে পালের রাজ্যের রাজা আমাদের রাজ্য আক্রমণের উত্তোগ করছে।

রাজা অবাক! বললেন—হঠাৎ তার এমন স্পর্ধা!

মন্ত্রী বললেন—আমাদের একমল প্রজাদের পরিবর্তন—মাঝুলি আচার-বিধি তারা ভেঙ্গে দিতে চায়। তাই পালের রাজ্যের রাজার সাহায্য চেয়েছে।

রাজা বললেন—তোপ দাগে!—তোপের মুখে সব উড়িয়ে দাও।

মন্ত্রী বললেন—বখা আজ্ঞা মহারাজ।

সে আজ্ঞা বখারীতি পালিত হলো।

দু' মাস পরে মন্ত্রী এসে জানানলেন—প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছ, সকলে একজোট। তারা সনাতন বিধি-নিষেধের প্রচীর চূর্ণ করে দিতে চায়।

রাজা বললেন—বারবার তোপ দাগলে রাজ্য প্রজাপুত্ৰ হবে—তখন বাদের নিয়ে রাজ্য চালাবো?

মন্ত্রী বললেন—ঠিক কথা মহারাজ।

রাজা বললেন—তা হলে উপায় কি বলা।

মন্ত্রী বললেন—আপনার পাঠাগারে সেদিন আবদ্য উপভাস পড়ছিলুম মহারাজ—তাতে দেখা আছে—বোগদাদের খালিক হাফ

অল রসিদ চন্দ্রবেশে রাজ্যের আশেপাশে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। প্রজারা বা চাইতো তিনি তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করতেন—তারাই তাকে খুব মানতো।

আপনি যদি তাই করেন—

রাজা বললেন—চমৎকার প্রস্তাব। আমি তাই করবো—কিন্তু কথারটা গোপন রাখা চাই—শুধু তুমি জানবে, আর কেউ না।

মন্ত্রী বললেন—তাই হবে মহারাজ।

রাজা বললেন—কুলগুরুকে জানানো হবে না।

মন্ত্রী বললেন—না মহারাজ। রাজ্য রক্ষা করা হলে প্রজাদের রক্ষা করা চাই। কুলগুরু শুধু পুঁথি জানেন প্রজাদের জানেন না।

গভীর রাত্রে মন্ত্রীর হাতে রাজমুকুট দিয়ে দীনবেশে রাজা বেরলেন খিড়কী দিয়ে পুরী ত্যাগ করে রাজপথে। মন্ত্রী বললেন, কাল রাত্রে এই ঘর দিয়েই আপনি পুরী প্রবেশ করবেন।

রাজা বললেন বেশ।

রাজা সঙ্গে নিয়েছেন ছোট থলি ভরে একরাশ মোহর। কাল সারাদিন খেতে এবং থাকতে খরচ করতে হবে তো।

মন্ত্রী বললেন—একজন রক্ষী বাবে সঙ্গে—

রাজা বললেন—না না। তা হলে জানাজানি হতে পারে।

ঘাটে-ঘাটে-সরাইয়ে মানুষের কি জটলা—এদের মোলায়েমতার, হাসি-কলসেবে এতটুকু জটিলতা নেই,—অতি সরল-সহজ তাদের আচরণ।

নিবাস ফেলে বিদেশী ভাবলো চমৎকার আছে এরা! বাড়ির কাঁটা ঘরে বস-শীড়ানো বার।

প্রানাহারের পর-নিঃসঙ্কোচ আচরণ। নদীর জনহীন তীরে জীর্ণ একখানি ঘর। সকালে প্রান করতে এসে সকলে দেখে সে ঘরে দীনবেশ এক বিদেশী আশ্রয় নিয়েছে। নদীর জলে প্রান করে দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়ে বিদেশী পথে বেরিয়ে ভিড়ে মিশল।

সরাইয়ে লোকজনের কি অন্তরঙ্গতা, প্রাণখোলা আলাপ। কারো কথার এতটুকু জটিলতা নেই, কারো মনে চলার ইজিত নেই। যেমন খুশি গল্প, গান, হাসি, তামাসা—এ-বেশ আর এক পৃথিবী! গভীর মুখে নিশ্পন্দভাবে কেউ এখানে থাকে না! চমৎকার! এরই নাম বুদ্ধি জীবন?

নিবাস ফেলে বিদেশী ভাবলো, এদের পায়ে শিকল নেই, কাজেও কোনো বাধা নিয়ম নেই।

সরাই ছেড়ে বিদেশী বার হলো। সরাইওয়ালার চাকর বলল—আবার এসো ভাই।

কি দরদ। রাজা বললেন—আসবো বৈ-কি।

রাজা পথে বার হলেন। রাজপুত্রীর বাইরে আনন্দ যেন হাওয়ার মত মুক্ত লহরে বয়ে চলেছে। লোকজনের মুখে-চোখে সে আনন্দ কি দাঁতিই না কুটরে তুলেছে। ঐ তাঁর ক'জন অমাত্য পথে চলেছে। তারা বেশ হাসি-মুখে খোশ-গল্পে বশগত হয়ে চলেছে তো। কারো মুখে গাভীর্ষ নেই! তন্তুভাব নেই! এরাত হাসতে জানে, প্রাণথুলে গল্প করতে জানে। তাঁর সত্যর তবে অমন মুখ গোঁড়া করে এরা থাকে কেন?

## ছোটদের আসর

আনন্দ বা কিছু, তা তবে রাজপুরীর বাইরেই ১...

মাথার উপর নীল আকাশ, পাখির গান, ফুলের গন্ধ-ভরা বাতাসের মুক্ত অবাধ প্রবাহ -- সবই অপরূপ।

দৌড় পাড় আসছিল। মাঠ-বাটে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি, রাখালের বাঁশী, মাদলের সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে চায়ী মজুবদের নাচ-গানের লো ও ভিড়ে তিনিও যদি মিশতে পারতেন! ওদর ওই আনন্দে নিজের আনন্দ খেলাতে পারতেন।

ক্রমে সন্ধ্যা নামলো। মন্দিরে-মন্দিরে কীসর-খণ্টার রোল--

বিদেশীর বেশে রাজা চলেছেন। নগরের প্রান্তে বনের ধারে প্রজাদের কি একটা উৎসব চলেছে। রাজাকে দেখে তারা চীৎকার করে উঠলো--আয় রে। তাকে বিদেশী দেখছি। আজ আমাদের এ উৎসবে তোর মলিন মুখ দেখতে পারবো না। আর খাবি আর...

গভীর কার্চুরি--কাঠ বেচে ক'পরমা সে পার! সেই পরমায় অতিথিকে ডেকে এমন আদরে আসর মাতার এমন অসঙ্কোচ আনন্দে...

রাজা বললেন--কি দেবে, দাও।

বুড়া কার্চুরি লাড়ু, এনে দিলে; বড়ি বাতাসা দিলে; বুড়ার তেলে মুড়ি দিয়ে এলো; পাতায় ভরে মেয়ে নিয়ে এলো বর্ণার জল। রাজা তাদের সেবা-বন্দে শ্রান্তি দূর করলেন। আরো পুরীতে ফেরবার কথা। রাজা ফিরলেন।

হার খুলে মন্ত্রী বললেন, কে?

রাজা বললেন--এক বিদেশী আমি।

মন্ত্রী বললেন--হাসন মহারাজ। বৈতালিকেরা প্রস্তুত আপনায় বন্দনা-গানের জন্তু...

রাজা বললেন--আমাকে ছুটি দাও মন্ত্রী। আমি আজ বাইরে থাকতে চাই। এখানকার এই বিশি-নিয়ম, আদব-কায়দার বাধাবিধির কথা মনে হলে প্রাণ যেন হাঁড়িয়ে ওঠে।

মন্ত্রীর বিশ্বাসের সীমা নেই। মন্ত্রী বললেন--মহারাজ--

রাজা বললেন--আনন্দ বা কিছু, তা বাইরেই। সে-আনন্দ পাবার জন্ত আমি সিংহাসন ত্যাগ করতে পারি...

মন্ত্রী আবার বললেন--মহারাজ--

রাজা বললেন--জীবন ক'দিনের জন্ত মন্ত্রী? জীবনে আনন্দ যদি না মেলে, তবে কিসের জন্ত জীবন ১--কতকগুলো নিরমের বাঁধনে বন্দী হয়ে থাকার কোনো সুখ নেই। বন্ধনে আনন্দ নেই মন্ত্রী, তাই আমি স্থির করছি...

মন্ত্রী বললেন--কি স্থির করছেন মহারাজ?

রাজা বললেন--ঐ বিদ্রোহীদের ডাকবো। ওরা মুক্তি চায়। ওরা চায় দেওয়ার তুর্ভেদ অস্ত্রাঙ্গে যে-অন্ধকার জন্মে আছে, সে অন্ধকার দূর করতে। আমিও তাই চাই। তুর্ভেদ কারাগারটির ভেঙ্গে ওদের রাজা আজ মাঝের মতো ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তোমরা যদি তাতে রাজী না হও, তা হলে সিংহাসনের অঙ্গকূপে আর কোনো হতভাগ্যকে এনে বসাব, কারাগার-কাহনের বাঁধনে আটপুঠে বাঁধ থাকবে। আনন্দ কি তা আমি বুঝি। আদব-কায়দার বাঁধন আর মানব না--মানতে পারবো না।

মন্ত্রী বললেন--মানতে হবে না, মহারাজ। এ তুর্ভেদতা ভেঙ্গে

রাজপুরীকে আজ নগরের মুক্ত-প্রান্তরের অঙ্গভুক্ত করে দিন। তাকে কারো দুঃখ থাকবে না।...

রাজা বললেন--তাই হোক মন্ত্রী--তুমি সেই ব্যবস্থাই করো।

## ভালো আবৃত্তি করতে হ'লে

### শুশীল মণ্ডল

আবৃত্তি করতে কার না ভালো লাগে। কিন্তু সবার আবৃত্তি

যে স্তনতে ভালো লাগে তা বলতে পারি না। গান করা, ছবি আঁকা, বক্তৃতা করা, বাজনা বাজানো এ সমস্তই হ'চ্ছে অশুশীলনের ওপর নির্ভরশীল। ভালো অশুশীলন করলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন যে গান গায় সে বড় গায়ক হ'য়ে উঠবে। তেমনি আবৃত্তিও। আবৃত্তি যে করে সে যদি নিয়মিতভাবে বাড়িতে অশুশীলন না করে তা হ'লে কোনদিন-ই ভালো আবৃত্তিকার হ'য়ে উঠবে না।

মাকে মাকে এমন আবৃত্তি শুনেছি যে, মনে হচ্ছিলে সত্যি সত্যি আমি যেন কবিতার সঙ্গে একান্ত হয়ে গেছি। দুঃখের কবিতা শুনে চোখ দিয়ে জল পড়েছে। আবৃত্তি যদি অন্তরকে নাড়া দিতে না পারলো তবে আর আবৃত্তি কিসের। কিন্তু এমন আবৃত্তি কলাচিৎ শোনা যায়।

শুন্দর আবৃত্তি করার জন্য কতকগুলো বিশেষ বিশেষ জিনিসের ওপর জোর দিতে হয় বেশি। প্রথমত মুখস্থ। কবিতাটিকে জলের মত মুখস্থ করতে হবে। যেন মুখস্থের মধ্যে কোথাও এতটুকু খুঁং না থাকে। কারণ কবিতাটি যে স্তনবে সে যদি শোনার মাকে বাধাপ্রাপ্ত হয় তা হ'লে তার কবিতা শোনার 'ভাবটি' (mood) যায় নষ্ট হ'য়ে। সে অঙ্গমনক হ'য়ে পড়ে, কলে কবিতাটির বা উদ্দেশ্য তা হয় বার্থ। সেইজন্যই প্রথমে দরকার জলের মত মুখস্থ।

এরপর আসে উচ্চারণ। কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে এটির সবচেয়ে অত্যধিক সাবধানতা প্রয়োজন। কারণ উচ্চারণের দোষে কবিতা সম্পূর্ণ জলের মত মুখস্থ থাকলেও শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শ্রোতা বিরক্তিরোধ করে।

এ দেশের (পশ্চিমবঙ্গের) লোকেরা সাধারণত 'স'--উচ্চারণের ক্ষেত্রে ইংরাজী 'এস'-এর মত 'স'-কে উচ্চারণ করে। এটা কিন্তু দোষের। এ ছাড়া 'র'-কে 'ড়' বলে অনেক। এ উচ্চারণের দোষ আবার বেশি ক'রে দেখা যায় পূর্ববঙ্গীয় লোকদের মুখে। তা ছাড়া 'উ'-কার উচ্চারণের ক্ষেত্রেও অনেকে 'উ'-কার উচ্চারণ করে। যেমন, 'যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বাবে বায়ে'র ক্ষেত্রে যু-গে-যু-গে' টেনে টেনে উচ্চারণ করে।

তাই শুন্দরভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে হলে উচ্চারণের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বতদূর সম্ভব উচ্চারণকে স্পষ্ট এবং শুদ্ধ করার জন্ত আবৃত্তিকারকে সচেতন হ'তে হবে।

তৃতীয়ত আবৃত্তিকারকে সব সময়ে ভাবতে হবে যে সে আবৃত্তি করছে, অভিনয় করছে না। অনেকে আবৃত্তি করার সময় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভিনয় করে। এগুলি কিন্তু মারাত্মক দোষের।

ঘরের মধ্যে যদি জড়তা থাকে তবে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। জড়তা থাকলে কবিতা শুনতে খারাপ লাগে। বলার ভঙ্গিটাও হবে মাজিত।

অবশেষে এক কথাও ঠিক যে, শুদ্ধ রসবোধ না থাকলে কবিতা আবৃত্তি করা যায় না। কবিতাকে মন দিয়ে বুঝতে হবে সবার আগে।

# সাহিত্য পরিচয়

## বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কিশোর ম্যাটক, অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীর পাঠ ও অভিনয়যোগ্য নাটক। স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজীবনী অবলম্বনে রচিত নাটকটি অভিনয়যোগ্যী তো বটেই তা ছাড়া এর নিজস্ব একটা অবদানও আছে, তা হল এর সহজ ও স্বচ্ছ গতিশীলতা, কিশোর-কিশোরী তো বটেই, বয়স্ক পাঠকেরও মন আকর্ষণ করার মত 'সঙ্গতি' আছে এ রচনার। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রবোধ সরকার, প্রকাশনা—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্যামাচরণ সে ট্রাট, কলিকাতা-১২, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নম্বর পরমা।

## বিচিত্র বিবেকানন্দ

'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' উপলক্ষে যে 'সব রচনা আজ অবধি প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান রচনাও তার অন্তর্গত। উনবিংশ শতাব্দী বাঙালী জাতির পক্ষে চিরস্মরণীয়, কারণ এই শতাব্দীই বাংলাকে উপহার দিয়েছে এমন সব মানুষ যাদের জন্য বাঙালী আজও বিশ্বমভায় জাতি হিসাবে গণ্য; এবং বলা বাহুল্য মাত্র যে 'স্বামী বিবেকানন্দ' তাঁদের মধ্যে ও পূর্বোক্তাঙ্গী। বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি স্রুতিস্তিত প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক এত মত চরিত্র সম্বন্ধেই কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'স্বামী বিবেকানন্দের' চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ১। চিত্রকে বুঝতে আলোচ্য রচনা যথেষ্ট সহায়তা করবে আর সেটাই এ গ্রন্থের রচয়িতার মূল উদ্দেশ্য। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ শোভন, আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রকাশনা—বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১। দাম—হুঁ টাকা পঁচিশ নম্বর পরমা।

## বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতলঙ্গস্বামী

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীতলঙ্গস্বামীর জীবনী অবলম্বনে রচিত এই রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। হিন্দুমাত্রই এই অবিস্মরণীয় মানুষটির নামের সঙ্গে পরিচিত, সাধন জীবনে এমনই উচ্চমার্গের পথিক ছিলেন তিনি যে, তাঁকে 'সচল বিশ্বনাথ' বলেই অভিহিত করা হত। 'তলঙ্গস্বামী' সম্বন্ধে বহু অসৌক্য কাহিনী প্রচারিত আছে, বর্তমান গ্রন্থেও তার কয়েকটি সন্নিবেশিত করেছেন লেখক, বস্তুত এই মহাত্মার জীবন-কাহিনী প্রায় রূপকথার মতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অবিদ্বাং, অধ্যাত্মবানী ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাই যেন বিকশিত হয়েছিল এঁর মধ্যে; এই পুত জীবনকথা পাঠ করতে করতে পাঠক ভারতের মহিমময় অতীতকে যেন উপলব্ধি করতে পারেন, শত শত যোগী, জিতেন্দ্রিয় মহাত্মানব দ্বারা অধুষিত ভারতবর্ষকে যেন চিরন্তন মহিমায় স্বীয় পটভূমিতে আবিষ্কার করেন নতুন করে। বিশ্বাসী বৃদ্ধজনের কাছে এ গ্রন্থের অবশ্যই সমাদর হবে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

লেখক—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩, শ্যামাচরণ সে ট্রাট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

## আমাদের বিশ্বকাবি

রবীন্দ্রজীবন ও বাণী সম্বন্ধে লেখা এই রচনার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলার কিশোর-কিশোরীর মনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা। লেখক শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর সুপরিচিত কর্মী, বিশ্বকবি সান্নিধ্যলাভের সুযোগেও ধন্ত হয়েছিলেন তিনি একদা, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে যদিও তিনি রচনার মাঝে ছড়িয়ে দেন নি, তবু বলা যায় যে হয়ত বা সেজন্যই তাঁর রচনা এতটা প্রোজ্ঞল, এতটা আন্তরিক হয়ে উঠতে পেরেছে। লেখকের ভাবারীতি অত্যন্ত সুযম ও সাবলীল, সহজভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি রবীন্দ্র-জীবনের মূল তথ্যগুলিকে, বিশ্বকবির জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা সুসংহত ধারণা জন্মায় বইটি পড়লে; কিশোর-কিশোরীর জন্য লেখা হলেও অমূল্যবিশ্ব পাঠকমাত্রই এ রচনা পাঠে উৎসুক হবেন। আমরা এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক শোভন ও পরিচ্ছন্ন। লেখক—কিতীশ রায়। প্রকাশনা—ডিরেক্টর পাব্লিকেশনস্ ডিভিশন, মিনিষ্ট্র অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড প্রডাক্টিং, ওস্ত সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী-৬। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নম্বর পরমা।

## জনগণের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুবিধ রচনাও প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার মধ্যে যে ক'টি রচনা প্রকৃতভাবে প্রামাণ্য এই আখ্যায় অভিহিত হওয়ার দাবী করতে পারে আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্তর্গত। এ গ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয় জনগণ বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের সংযোগ। শুধু সাহিত্যই নয় জীবন ও কর্মের মাঝ দিয়েও রবীন্দ্রনাথ সাধারণের জন্য যা করে গেছেন তাও বিমোহিত হয়েছে এই রচনার মাধ্যমে। বহু স্রুতিস্তিত প্রবন্ধের উপস্থাপনা করে নিপুণভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করে তুলেছেন, বইটি আভ্যোপাত্ত পাঠ করলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বকবির যে আত্মিক বন্ধন ঘটেছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, অমূল্যবিশ্ব ও বোদ্ধ। এই উভয়বিধ পাঠকই যে বর্তমান গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। বাংলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রচনা এক মূল্যবান সংযোজন। লেখকের আন্তরিকতার তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্টতর হতে উঠেছে। প্রচ্ছদ অতি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চতর। লেখক—সুধীরচন্দ্র বর। প্রকাশনা—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্যামাচরণ সে ট্রাট, কলিকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

## বার্নার্ড শ'

বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী 'বার্নার্ড শ' সম্বন্ধে আজ অবধি যত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যে ক'টি বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা দাবী করতে পারি আলোচ্য গ্রন্থ তারই অন্যতম। বর্তমান রচনার শ'র ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা তাঁর জীবনদর্শনের দিকটাতাই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, শ'র সাহিত্যচেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির একটা নিখুঁত পরিচয় উজ্জ্বল এ রচনা সুদী পাঠককে খুশি করে তুলবে বলেই মনে হয়। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, আপন বক্তব্যকে বুদ্ধিদে অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন তিনি, বইটি পড়তে তাই ভাল লাগে, বিষয়বস্তুর গুরুত্বও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। জীবন ও জীবনীমূলক রচনার আসরে বর্তমান রচনা মূল্যবান এক সংযোজন বলেই বিবেচিত হবে। প্রচ্ছদ সংযত-সৌন্দর্যে মণ্ডিত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—স্বয়ং দাস। প্রকাশনার—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

## শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা

'রবীন্দ্রনাথ' তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তারই অন্তরঙ্গ এক পরিচয় উজ্জ্বল এ রচনা নানা কারণেই উল্লেখ্য। বর্তমান গ্রন্থে শাস্তিনিকেতন বা অধুনা প্রসিদ্ধ বিশ্বভারতীর পূর্ব ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, রচনাকার স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুদিনাবধি জড়িত, তাঁর শিক্ষা, লীলা ও কর্ম এখানেই—সুতরাং এ রচনাকে প্রামাণ্য বলটা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এতে সংকলিত হয়েছে, বহু ঘটনা ও বিবরণ বা বিদ্যুতপ্রায় তাও স্থান পেয়েছে এতে—সুতরাং অল্পসংখ্যক পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ যে মূল্যবান বলেই গণ্য হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। 'শাস্তিনিকেতন' যে গুরুদেবের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী তাও বোঝা যায় বর্তমান রচনাটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে, বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনেরই মূর্তপ্রতীক বেন এই শাস্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে শাস্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে চেনা দরকার, জানা দরকার, বর্তমান রচনার মাধ্যমে আমাদের সেই চেনা-জানার পথেই কিছুটা এগিয়ে গিয়েছেন লেখক। প্রচ্ছদ অতি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—স্বয়ং রচয়িতা। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

## সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ

### ভাষা-দীপিকা (২য় ভাগ)

আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ভাষার পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ এক ব্যাকরণ রচনার উত্তম ব্রতী হয়েছেন লেখক, বর্তমান খণ্ডটি তারই দ্বিতীয় কসল। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এ ধরনের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে, লেখকের যত্নে ব্যাকরণের মত কঠিন বিষয়ও বেশ সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে, শিক্ষার্থীর কাছে বর্তমান গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই মনে হয়। আদিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—

শ্রীবসন্তকুমার শাস্ত্রী। প্রকাশক—শ্রীবসন্তকুমার শাস্ত্রী, ৩১ বি, লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা—৩১। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়।

## শেক্সপীয়ারের গল্প

মহাকাব্য শেক্সপীয়ারের অমরকাব্য নাটকগুলির পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিম্নরোজন, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে তাঁর নাটকগুলির বিষয়বস্তু শুধু মহৎ সাহিত্যেরই রস প্রদান করে না তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কয়েকটি নিটোল কাহিনীও; বর্তমান গ্রন্থ সেইরকম ক'টি গল্পকেই পরিবেশন করা হয়েছে সহজবোধ্য শৈলীর মাধ্যমে। এই গল্পগুলি থেকে মহাকাব্যের অমর রচনাশৈলীর সাথে পরিচয় ঘটে পাঠকের, মূলত ছোটদের জন্য রচিত হলেও বয়স্ক পাঠকও যে এগুলি পাঠে তৃপ্ত হবেন এমন আশা করা অসঙ্গতি নয়। শিশু সাহিত্যের ভাঁড়ারে এ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য অবদান। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শিশিরকুমার নিমিষী, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা পঁচিশ নয়।

## মজুমুদ্র

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি কৌতুক নাটিকা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসিদ্ধার অপরিমেয় দক্ষতার ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে রচনাটি সত্যিই উপভোগ্য। প্রথমেই বলা ভাল যে, এই নাটকখানি লেখকের নবীন কোন রচনা নয়, বহু পূর্বেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এর, সে সময় পাঠকচিহ্নের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করার সৌভাগ্যও ঘটে এর কপালে, বস্তুত সেদিন রসজ্ঞজনমাত্রই এই নাটক পড়ে ও অভিনীত হাতে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, বহুদিন পরে নাটকটিকে তত্ত্বাবধে নবকলেবরে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে তাই এর প্রকাশক সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। নাটকের বিষয়বস্তু যে বৈচিত্র্যপূর্ণ একথা আগেই বলেছি, কারণ এর অন্যতম প্রধান চরিত্র একটি সারমের এবং তাকে কেন্দ্র করে যে হাস্যমধুর কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা, সহজেই মন কেড়ে নেয়। সরসোজ্জ্বলদীপ্ত সংলাপ এ রচনার আরেক ঐশ্বর্য! স্বামীকে মন্ত্রমুগে কুসুরে পরিণত করা হয়েছে ভেবে নারিক। শুভকরী কুসুরটিকে যেভাবে পরিচর্যা করতে থাকেন তার বর্ণনা পড়তে পড়তে সত্যিই হেসে লুটোপুটি খেতে হয়, শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হিসাবেই বীর অনন্তসাধারণ খ্যাতি সেই বনফুল যে নাট্যকার হিসাবেও নগণ্য নয়, এ রচনার তার স্বাক্ষর মেলে। একটি অতি মনোহর রসনাটিকা হিসাবেই উল্লেখ্য এ রচনা যে আজকের পাঠকচিহ্নকে জয় করে নেবে আগের মতই সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রচ্ছদ—বিষয়োচিত, অপরাপর আঙ্গিক ভাল। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা।

## জয়ন্তী

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আসরে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' এক চিহ্নিত নাম, ভাষার দীপ্তিতে ও ভাবের ব্যঙ্গানর তিনি সহজেই চমক জাগান পাঠক মননে, অতএব তাঁর রচনামাত্রই যে প্রত্যাশার

## পোষ ফাঞ্জনের পালা

সঞ্চীর করে তার পরিমাণও বড় কম নয়। আলোচ্য উপন্যাস সে প্রত্যাশা সফল করবে। প্রেমের এক বিচিত্র রূপ প্রকাশ করেছে এই গ্রন্থের কাহিনীর মাধ্যমে, নারিকা বাসন্তী একদা ভালবেসেছিল আশিসকে আত্মবিশ্বস্ত হয়েই কিন্তু আত্মতৃপ্তির সহজ পথটা ছেড়ে যে ত্যাগের পথটা সে বেছে নিল, তারই করুণ মধুর সুর এ রচনাকে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা, সত্যকার প্রেম যে কত নিঃস্বার্থ, কত মহীয়ান সে কথাটাই যেন নতুন করে ধরা পড়ে এই রচনার সঙ্গে পরিচিত হলে, জরতী এক নারীর জীবন-জিজ্ঞাসার আলোড়িত হয়ে ওঠে অন্তর, মথিত হয় মন। লেখকের দীপ্তোজ্জ্বল শৈলী বিষয়বস্তুকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে, রসজ্ঞ পাঠক বইটি পড়ে এক অনাবদিত আনন্দলাভ করে যন্ত্র হবেন। আঙ্গিক কুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১। দাম—তিন টাকা।

## শিশু পরিবেশ

আলোচ্য গ্রন্থটি শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক। লেখক যথেষ্ট সহজ ও সাবলীলভাবে শিশুর মনের নানা বৈচিত্র্য ও তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিশুর মনকে সাধারণত কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অকুরকে যথোচিত যত্নের দ্বারা লালন না করলে যেমন তার থেকে মহাকুহের উদ্ভব আশা করা যায় না, শিশুকেও যেমনই সত্যিকার সাবধানতার সঙ্গে পালন না করলে ভবিষ্যতে হুহু সবল মনঃশক্তি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মানুষকে লাভ করা যায় না, আর এরূপ শিশুর দেহ ও মন এই দুটি বস্তুকেই বন্ধ করা প্রয়োজন, না হলে তার ক্রমবিকাশও স্বাভাবিক পথে ঘটে না। শিশুর মনের প্রবণতা তার একান্ত সাবধানতার সঙ্গেই পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, আলোচ্য রচনা এ সম্বন্ধেই আলোকপাত করে। মনে হয় বহু উৎকর্ষ পিতামাতা এ লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তৃপ্তিলাভ করবেন ও উপকৃত হবেন। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—সাত টাকা।

## একটি বেগমের অশ্রু

সাম্প্রতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নিগূঢ়মল' এক পরিচিত নাম। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমান গ্রন্থে তিনি একটি নারীর জীবনের ঘটনা, বাস্তব-প্রতিঘাত, সুখ, দুঃখের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। আরা বেগম, আলিকুলি, বুলবুল বেগম, সফরজঙ্গ, সজ্জা, ইমাদ প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি লেখক অক্ষর ও মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। লেখনীর বাহুতে কাহিনীটি বাঁধার হয়ে উঠেছে। লেখক যে একজন সিদ্ধকথক তাঁর রচনা পাঠে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। উপন্যাসটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য, আনন্দদায়ক ও রসসমৃদ্ধ। উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে জড়তামূলক এবং কৃত্রিমতামূলক। ডাবা সহজ, সরল ও সাবলীল। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কাম্য। লেখক—নিগূঢ়মল। প্রকাশনায়—জ্ঞানদীপ, ১, কন'ওয়েলিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

সাম্প্রতিক বালা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা হচ্ছে কমই, সেজন্য সত্যকার ও সার্থক কোন উপন্যাসের আবির্ভাব হলে স্বতঃই সাহিত্যভ্রাঙ্গীর চিত্তে একটা চমক লাগে, বর্তমান উপন্যাসটি সম্বন্ধে এ কথা খাটে; বস্তুত এ রকম পূর্ণাঙ্গ ও মনোরম উপন্যাস পাঠের সুযোগ বর্তমান যুগের পাঠকের ভাগ্যে যে এক, তুই বিরল এ কথাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য গ্রন্থের পাত্র-পাত্রী বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন আগন্তুক নয়, এর আগে আরও দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক এদের উপস্থিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান রচনা এক এগিক উপন্যাসেরই শেষ ধাপ, কিন্তু সে সত্ত্বেও এর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বড় কম নয়, আগের দুটি উপন্যাস পড়া না থাকলেও এই রচনার রস গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। স্বয়ং সম্পূর্ণ এক মহৎ উপন্যাস পাঠের তৃপ্তিতেই আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে পাঠকের মন আর সেটাই এ গ্রন্থের চরিত্রতার সবচেয়ে বড় বৃত্তি। একাদশতম পরিবারের যে ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন লেখক তা আজকের দিনে প্রায় দৃষ্টিতে পর্যবসিত। আর হয়ত সেজন্যই তার আবেদন প্রায় রূপকথাই রত অবিচ্ছিন্নভাবে আকর্ষণীয়; কোন স্টাট নেই, বিভ্রান্তি বা চমক লাগাবার সামান্যতম কোন প্রচেষ্টাও নেই, শুধু ফেলো কাঁসা দিনের এফ অন্তরঙ্গ ও প্রামাণ্য পরিচয় মণ্ডিত হয়ে এ রচনা আত্মপ্রকাশ করেছে, যা পাঠ করতে করতে হারিয়ে ফেলতে হয় নিজেকে, গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ আনন্দ-সেদনার সঙ্গে কখন নিজেরও জ্ঞাত-অজ্ঞাত একাত্ম হয়ে উঠতে হয়। গ্রন্থকারের আত্মরিকতা ও দক্ষতার বাঙালীর পূর্বতন সমাজ ও সামাজিক জীবনের যে পরিচয় এই রচনার দ্বারা ছাত্র বিদ্যুত তাকে মূল্যবান এক দলিল বললেও বড় একটা অত্যুক্তি করা হয় না। আর সেজন্যই সাহিত্যের আসরে এ রচনার মূল্যায়ন করার নিরিখ শুধু সাহিত্যরসই নয় এর ঐতিহাসিকতাও, কারণ শুধু সাম্রাজ্যের উপান-পতনেই ইতিহাস রচিত হয় না, যে কোন জাতির যে কোন ব্যক্তির সমাজ জীবন ও অন্তরঙ্গ জীবনও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। লেখকের শৈলী আশ্চর্যভাবেই পরিণত ও সাবলীল। এমন অনাগাস কুশলতায় টেনে নিয়ে গিয়েছেন তিনি কাহিনীকে যে এতবড় দীর্ঘ রচনা পাঠ করতেও মুহূর্তের জগ্ন ক্লান্ত হয়ে ওঠে না মন, উৎস্রুত থাকে উদ্ভ্র, কৌতূহল অব্যাহত। এমন একটি লোভনীয় রচনা প্রকাশের জন্ত, প্রকাশকও নিঃসন্দেহেই পাঠকের প্রভূত ধন্যত্বের অধিকারী। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রকাশক—বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১, দাম—পনেরো টাকা।

## স্বাধিকার

আলোচ্য কুসুমারতন ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রটি, কতিপয় ছাত্র ও তরুণ সাহিত্য অমুরাগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। কয়েকটি গল্প ও কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে এর মাধ্যমে, লেখকরা সকলেই নবাগত হলেও তাঁদের কয়েকজনদের মধ্যে কিছুটা প্রতিজ্ঞাভিত্তি ইসারা পাওয়া যায়। পত্রিকাটির আঙ্গিক সম্বন্ধে উৎসাহী হওয়ার কোন কারণ নেই। সম্পাদনা—জিহাদ আলী। প্রকাশনা—জিহাদ আলী, বাউড়িয়া কেশন রোড, বুড়িখালী, হাওড়া।

## জুডফ্রি

মামুলী ধরণে লেখা মামুলী বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য না থাকলেও একটা সহজ সৌন্দর্য আছে। বুদ্ধির দীপ্তি বা চমকের চেয়ে বীর সোজাগুলি বলা সাধারণ কাহিনী পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে এ রচনা উপভোগ্য বলেই প্রতীয়মান হবে। লেখকের শৈলী পরিচ্ছন্ন ও আন্তরিক। প্রচ্ছদ—সাধারণ, ছাপা ও বঁধাই ভাল। লেখক—চিন্তাধ্বনি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—প্রভাত প্রকাশন, ৩০, বেনিয়ারটোলা লেন, কলিকাতা—১। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## বাসর লগ্ন

ছোট গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসাবে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ বাংলা সাহিত্যের আসরে সুবিদিত। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিম্নপ্রয়োজন। লেখকের সাংস্রতিক উপন্যাস বাসরলগ্ন সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বজনোপভোগ প্রদান পরিচায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাসর লগ্নের আপ্যায়নবস্তু এমন এক মরনী রসে আলিপ্ত যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে অভিভূত করে রাখে। বিশেষ রমণী চরিত্রটি অল্পদৈ লেখক তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় দিয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। জঘন্স, শান্তি, সতী এবং এদের বিরে আর যে অজ্ঞাত চরিত্র ভিড় করেছে উপন্যাসটিতে তাদের মধ্যে সব ক'টি প্রধান চরিত্রই বাস্তবের রেশার অঙ্কিত। চরিত্র চিত্রণে, কাহিনী বিকাশে, প্রকাশ ভঙ্গিমায তিনি অদ্বুতপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসটিতে লেখক এক বর্জিত জীবনধর্মের ভাষা রচনা করেছেন। কাহিনীটির গতি সাবলীল, লোকের স্বন্দ্র অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনের নানাকণ ধরা পড়েছে—সেই মনোময় জীবন চরিত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। প্রচ্ছদ সন্মর, ছাপা ও বঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশনার—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাই লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-১, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## আকর্ণিণ

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই সাহিত্যপত্রটি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। রামকৃষ্ণ মিশন আবাদিক বুদ্ধিদায়ী বিভাগের নবোদ্ভূত থেকে বর্তমান স্মারক পত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে, এতে প্রকাশিত রচনাটির অধিকাংশই ঐ বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রগণের; সুচিন্তিত ও সুসিদ্ধিত প্রবন্ধগুলি স্বামোজীর মহান নীতি ও কর্মের ব্যাখ্যাকল্প, তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি কথাও ছ'—একটি রচনার মাঝে সন্মরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইংরাজিতে যে সব প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে সেগুলিও ভাষা-ভাষার অনন্ত, করেকটি মূল্যবান আলোকচিত্রও প্রবন্ধে মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে, বস্তুত আলোকের পারিপাট্যে, রচনার উৎকর্ষে আলোচ্য স্মারক গ্রন্থটি যেন এক রূপে রসে ভরা পূর্ণ শব্দল। প্রকাশক—স্বামী সোকেসরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন আজম, নলেন্দ্রপুত্র, ২৪ পরগণা।

## পাতাঘরের পুনর্জন্ম

সাহিত্যজগতে যে কয়জন প্রথম সারির লেখক আছেন তাঁদের মধ্যে বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) অঙ্গতম। তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যকে যে আলোকখানি সমৃদ্ধ করেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। একজন কুপন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। পীতাঘর জীবনে টাকা ছাড়া অল্প কোন পার্থিববস্তু পৃথিবীতে যে থাকতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তিনি অতি সাধারণভাবেই অতিবাহিত করেছেন; কাউকেই তিনি কখনই সাহায্য করেন নি। মামুলীর জীবনে কখন কোন সময় এবং কিভাবে যে পরিবর্তন আসে তা বলা কঠিন? একদিন রাতে নিদ্রার অবচেতন অবস্থার আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং আত্মার নানা বাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের আসল পরিবর্তন ঘটায়। কাহিনীতে অবিদ্যাত ও অসৌক্যিক জগতের ছায়াপাত হওয়ায় সব পাঠক-পাঠিকারই কোঁতুল জাগ্রত হয়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোঁতুল অববাহিতও থাকে। চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে লেখকের স্বকীয় কল্পনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একটি অপর্যাপ্ত রচনা পড়ার অন্তিম পাঠকের মন ভরে ওঠে আর সেটাই লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রচ্ছদ সন্মর, ছাপা ও বঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—বনফুল, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাই লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## তাব কেমন হুত

আলোচ্য পুস্তকটি এক ক্ষুদ্রায়তন নাটক। নারী আশ্রমতে নারীর স্বাধীন সর্বব্যাপী পরিচালিত হলে কেমন রগড় জমে সেটাই দেখানো নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান নাট্যগণিককে প্রশংসা বলেই উল্লেখ করা উচিত। নাট্যকারের ভাষা স্ববাক্য, ভঙ্গী সহজ, হালকা হাসির ছোঁয়াচড়া নাটকটি পড়তে ভালই লাগে। ছাপা, বঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রকাশনার—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৪, রমনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—১। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

## পালে পটকা পুতুলের বিয়

শিশু ও কিশোরদের মনোমুগ্ধকারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রেও যে প্রতিভাধর কবিরা যথেষ্ট শক্তির স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন স্বামী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি কিশোর সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। মোট বারোটি কবিতা ও একটি শিশু-উপভোগ্য নাটক স্থান পেয়েছে এই কাব্য-গ্রন্থটিতে—যার প্রত্যেকটি উপভোগ্য ও সরস। প্রকৃতপক্ষে কবির মজাদার শৈলী পাঠক মনকে যেন চুষকের মতই আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি হাতে পড়লে প্রত্যেক ছেলেরাই যে খুশি হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ সন্মর, ছাপা ও বঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বামী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক—কীর্তী পাবলিশার্স। কলকাতা স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা—১২।



# লাভ গান স্বাভিন্য



## রাগসংগীত কোন্ পথে ?

মমুজ গুপ্ত

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে আমাদের সামাজিকজীবনে যে সঞ্জীবনী শক্তির প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল, নানা কারণে তা' হয়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, ভারতীয় রাগসংগীতের মাঝে এক ঘম-ভাংগা ভাব লক্ষ্য করা গেছে। গত কয়েক বছর। মনে হয়েছিল রাগসংগীতে ভারতের যে গভীর মননশীলতা আছে সেটা যেন প্রকাশ পাবে। কি জনচেতনায়, কি শিল্পচেতনায় উভয় দিকেই এমন এক উদ্দীপনা প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে আশা হয়েছিল রাগসংগীতের সংস্কৃতিগত নবীন জীবনের সূত্রপাত হোক এবং এ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু চুংখের সাথেই লগতে হবে যে, বর্তমান কয়েক বৎসরে সেটা উদ্দীপনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। মনে হচ্ছে যেন যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এর শুরু হয়েছিল তা' যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে—যেন পথ খুঁজে পাক্কা না কোন পথে গেলে প্রকাশ স্বাভাবিক হবে। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় রাগসংগীত যেন নূতন যুগের ধারায় মিল খুঁজে পাক্কা না এবং তার বক্তব্য তুলে ধরতে পারছে না।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নাম নিয়ে এখন পর্যন্ত রাগসংগীতের কিছু কিছু আবেদন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু তাও যেন কৃত্রিমতার ছাপ পরে দারসার। গোছের হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা কেন হোক? এর কারণ বৃত্তে হবে, খুঁজে বের করিতে হবে এর ভেতরের গলদকে। প্রত্যেক রাগসংগীত শিল্পীকে নূতন এই ধারাকে বৃত্তে চাব নিজেব আত্মসমালোচনার দ্বারা। এর মাঝের এই অবক্ষয়ের ধারাকে বন্ধ করতে চলে, নূতন কার প্রাণপ্রীতি করতে চলে কোনও প্রকার আত্মসমালোচনার বেড়া নিজ নিজেদের ঘিরে রাখলে চলবে না—তাতে এই শিল্পের চূড়ান্ত সমাধি রচনা করা হবে, সাথে নিজেদেরও। ফলস্বরূপ এই ঐতিহ্যময় শিল্পধারায় এমন কিছু আসবে, যাকে আর নিজের বলে দাবী করার উপায় থাকবে না—যার প্রভাব এখনই কিছু কিছু বৃত্তে পারা যায়। কোনরূপ বক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে একথা বলা হচ্ছে না। একথা বলার কারণ শিল্পের চরিত্রকে বক্ষা করার ক্ষেত্রে সেই ভাটের চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায়। শিল্পে উদারতা আছে, প্রগতি আছে কিন্তু চরিত্রকে নষ্ট করে কখনও নয়।

রাগসংগীতের এই অবক্ষরকে অনেকে আমাদের সামাজিক জীবনের অভিলক্ষ্য মাত্র বলতে পারেন। তাঁরা বলেন এর

কাণে অর্থনৈতিক। এ বিষয়ে বিতর্কের মাঝে না যেয়ে এবং একে মেনে নিয়েও এ কথাটি বলব যে, একদিনের এত ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প আজ হঠাৎ এমন কি অর্থনৈতিক বিপ্লবের মাঝে পড়ল যাতে চরিত্রের পরিবর্তনটা (যেটা সহনীয়) চরিত্রহীনতার পর্যায়সিত হওয়ার মত হোল। ইতিহাস কিন্তু এর থেকেও বড় বিপ্লবের সাক্ষ্য দেয় যেখানে রাগসংগীত তার চরিত্রকে হারায় নাই। তার উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন—পৃথিবী তখন এত বড় ছিল না। শিল্পের ক্ষেত্রে সেটা আপেক্ষিক মাত্র। আমাদের এর কারণ অনুসন্ধান করতে চলে আরো গভীরে যেতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা, নূতন সমাজ চেতনা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিকতা এসব কিছু মাঝেই রাগসংগীতের উপযোগিতা খুঁজে বের করতে হবে। কোনও বিষয়ে উদাসীনতা অথবা উপেক্ষা ইহার পক্ষে যেন ক্ষতিকর তেমনি অতি আগ্রহও সমান ফল দেখাতে পারে।

আজকাল রাগসংগীতের প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অভাব আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু তবুও জনচেতনায় সাদা পড়ছে না। আজ থেকে দশ বছর আগে যে উৎসাহ আমরা দেখেছি তা' হঠাৎ ভ্রমিত হয়ে গেল কেন? সংগীতের উপযোগিতা, পার্যায়তালিকার স্থান, সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সরকারী প্রচেষ্টার যা কিছু হওয়া উচিত তাতে বিশেষ কিছু অভাব বা উদাসীনতা আছে মনে হয় না। বেসরকারী প্রচেষ্টাগুলিও রাগসংগীতকে বাঁচাবার পক্ষে নগণ্য নয় তবুও রাগসংগীতের মর্যাদা খাচ্ছে না একথা মানতেই হবে। সেখানেই খুঁজে দেখতে হবে দোষ কারণ? সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগের নিকট আমরা সব সময় বিশেষজ্ঞের জ্ঞান দাবী করতে পারি না। তাঁরা যতটুকু করতে চান তাতে বেখে শিল্পী ও শ্রোতাদেরও কিছু করবার আছে, একথা ভাবতে শিখলেই মনে হয় এ অংশ থেকে স্বাক্ষি পাওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে রাগসংগীত শিল্পীদের মাঝে যে 'দোষগুলি প্রকট হয়ে শিল্পকে ক্রমশ এই অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলির বিরোধের প্রয়োজন আছে মনে করি। আজ থেকে পনের বছর আগে পর্যন্ত যে অবস্থা ও মন নিয়ে রাগসংগীত শিল্পী আসতেন সেটা মন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে (যুগের প্রভাবেই হয়ত) প্রত্যেক শিল্পী তাঁর মোক্ষলাভের পথিকান্নে যেটাকে প্রধান করে দেখেন তা' অর্থকরী। শিল্প সাধনার যে কোনও অবস্থাতেই যদি অর্থকরী



মনোভাবের প্রাধান্য থাকে তবে তা' যে কখনও সূক্ষ্ম শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না একথা সকলেই মানবেন। আজ শিল্পী হওয়ার পেছনে আছে এক ব্যাবসায়ী মন যা জনচেতনার অন্তরে প্রবেশ না করে হীন্স্র ও অপূর্ণাঙ্গ মনোরঞ্জক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই শিল্প যে সাময়িক এই বোধে যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ সূক্ষ্ম মননশীল শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয়। স্বাধীনতা লাভের পুণ্যযুগের শিল্পীরা নিষ্ঠা এবং বর্তমান শিল্পীর প্রয়াসে যে মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ সেই প্রভেদই শিল্পকে জনমানস থেকে দূরে সারিয়ে দিচ্ছে। আরো পারদ্বার করে বলতে গেলে বলতে হয় স্বাধীনতা লাভের পুণ্যবতী যুগের শিল্পীদের কাছে অর্থকরী লাভালাভের প্রেরণ ছিল গোণ বা বতমানে হয়ে গেছে মুখ্য। পুণ্যবতী শিল্পীদের কেউ বলতে পারেন না যে তারা বতমানে যে বশ ও অর্থ পেয়েছেন তারা ত' পূর্বেই ভাবতেন। এঁদের নিকট এই লাভ আকাম্ব্যক হলেও অকাম্য হইত নয়। যদিও তারা অনেকে এটাকে বতমানে একচেটিয়া করে নিতে চেয়ে নিজের প্রাপ্যের অংশ কোনও ভাগীদার দেখতে পছন্দ করেন না, নুতনের জগৎ স্থান ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত তবুও বতমানে শিল্পী হওয়ার প্রয়াসে পাওয়াটাই মুখ্য হওয়াতে নবীন শিল্পী যেন-তেন-প্রকারে জনমানসে চমক সৃষ্টি করে নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করতে চান তাতে কেউ কেউ কৃতকাব্য হলেও সেটা স্মরণীয় হচ্ছে এবং মননশীল শিল্পসৃষ্টি আর হচ্ছে না। প্রাতিষ্ঠিত শিল্পীরাও নিজের প্রাতিষ্ঠা বজায় রাখার জগৎ এমন কিছু করছেন যার ভেতর থেকে পুণ্যবতী নিষ্ঠা ও মননশীলতা কমে যাচ্ছে। তারাও শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের দোজা পথে নিজের প্রাতিষ্ঠা বজায় রাখার সংকল্পের পথ বুঝে মননশীলতা ত্যাগ করছেন। অথচ একটা কথা এঁদের পক্ষে থেকে বলার আছে। স্বজনশীলশিল্প মানুষের জীবনে খুব বেশি একটা হয় না, কিন্তু এই স্বজনশীলতার নিত্য নবীনতার মাপকাঠিতে যখন তাকে বাঁচতে হয় তখন তাদের উপর অধিচার করা হয়। তখন শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাচার তাগিদেই শিল্পকে মনোরঞ্জক শিল্পী হতে হয়। এইস্থানে শিল্পকে সমাজচেতন হতে হবে এবং একই সঙ্গে শ্রোতাকেও হতে হবে সংবেদনশীল। শিল্পের ক্ষেত্রে কাজ কুসুরিয়ে গেলেই সেটাকে আক্ষেপে বলে সরিয়ে দেওয়া ভাব্যত্বের স্বজনশীল, মননশীল শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর এ ধারণা রাখতে হবে। আর্টের গণ্ডি, কাল বা ব্যক্তিগতবোধের দ্বারা সীমারিত রাখা অজ্ঞান, কিন্তু তার চেয়ে বড় অজ্ঞান হয় যখন কোনও বিশেষ কালের মানসিকতাকে পুরনো বলে উপেক্ষা করি। ভাব্যত্বের শিল্পকে তার অতীত থেকে পাঠ নিতে হবে, জানতে হবে বর্তমানকে, তবেই সে মননশীল হবার দাবী করতে পারে।

বেদনকারী উত্তাপে বেশব সান্ধ্যতক অস্থান বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠছে তাদের প্রচেষ্টা যদিও শ্রোতা তাঁর পক্ষে কিছু সহায়ক হচ্ছে তবু তার মধ্যেও যে সকল ত্রুটি আছে সেগুলিকেও বুঝতে হবে। একই অস্থানে শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ক্রান্তির মানুষকে একই সঙ্গে আনন্দ দিতে যেরে তারা একটা বিষয়ে ভেবে দেখছেন না যে, আনন্দলাভের উপায় প্রত্যেক মানুষের এক নয় এবং প্রত্যেক মানুষই একই বিষয়ে একরূপ ভাবেন না। যদি সেটা জ্ঞানের বিষয় না হয়ে স্নানবৃত্তির বিষয় হয়। তাঁদের আয়োজিত অস্থানীয় সকল শ্রোতাই সকল সংগীত ভাণ্ডারগোস্তে পারেন না, একথা

তারা নিজেরাও মানবেন যদিও সকল সংগীতই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে শ্রেষ্ঠ কিছু বিভিন্ন মানসিকতার শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করতে যেরে প্রত্যেক বিশিষ্ট সংগীতই নিজের বৈশিষ্ট্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেতে বাধ্য। রাগসংগীত যদিও অজ্ঞাত সংগীতের মত মানুষের মনের একই উৎস থেকে উৎসারিত তবুও তাকে বোঝার জগৎ কঠিন ও গভীরতা বোধের প্রয়োজন আছে। লোকসংগীত ও রাগসংগীতকে একই আসনে বসাবার অর্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঁচালিকার ও কাব্যিক সমন্বয়াদি দেওয়ার অনুরূপ।

অবশ্য এ বক্তব্য কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এর উল্লেখের কারণ শুধু এইজন্য যে শিল্পের ক্ষেত্রে এই ধরণের সাম্যবাদ সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিপন্থী হয়ে পড়ছে। এখানে আরো উদাহরণ দেখান যায় এই অস্থানগুলি কিভাবে আবেগপ্রবীণ রাজনৈতিক চিন্তার বাহক হয়ে নিজের চরিত্রকে হারিয়ে ফেলেছে। সংগীতকে শিল্প হিসেবে না নিয়ে যদি তা থেকে আরো কিছু করিয়ে নেবার তাগিদে এই অস্থান হয় তা হলে ভর হয় তাতে উভয় দিকেই ক্ষতি হতে পারে। ইতিহাসে অবশ্য সংগীতের সামাজিক বিপ্লবের হাতের হওয়ার উদাহরণ অপ্রচুর নয় তবুও তার সাথে এর পার্থক্য এই যে, দেখানো শিল্পী ছিলেন সেই যুগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আর এ যুগে শিল্পীকে দিয়ে সেই অবস্থার সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। অবশ্য যত জরুরাই হোক না আর্টের ক্ষেত্রে আর্টের আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হবে সেই সৃষ্টির জগৎ। শিল্পকে মানুষ হিসেবে বোঝান চলে গেলে তাকে ফরমাইসী শিল্প সৃষ্টি করতে বললে শিল্পের স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শিগত হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন সেই শিল্প কোনও প্রয়োজনে না এসে অনেক গুরুতর বিপর্যয় হান্ডা করে দিয়ে সমস্ত ডম্বেলই ব্যর্থ করে দেবে। রাগসংগীতকেও কোনোরূপ ফরমাইসী অবস্থার মাঝে নিয়ে যাওয়া তার নিজস্বতাকে ক্ষুণ্ণ করে। বর্তমান শিল্পী এই ফরমাইসী শিল্পের তাগিদে নিজের ব্যক্তিককে নষ্ট করে রাগসংগীতকে এমন এক অবস্থার মধ্যে টেনে দিচ্ছেন যাতে ভাব্যত্বের শিল্পীদের কাছে কোনও উদাহরণই রাখতে পারছেন না। আবার জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে নিত্যনুতন চমক সৃষ্টির তাগিদে রাগসংগীত বর্তমান আধুনিক সংগীতের কাছে সমানে মার খেয়ে চলেছে। এই হেরে যাওয়া স্বাভাবিক। এখানে যে অসমরুচির লড়াই, তাতে রাগসংগীতকে হারতেই হবে। রাগসংগীত শিল্পী যদি নিজেকে মননশীলতা থেকে দূরে সরিয়ে এনে মনোরঞ্জকতার মাঝে স্থান করে নিতে চান তবে তাঁর বৃত্ততে হবে যে তার উপাদান অনেক কম, গণ্ডী নির্দিষ্ট তাই সেক্ষেত্রে তাকে এই ফরমাইসী চালে নিজেকে সাজাবার অর্থ তার নিজের ক্ষতিকে ডেকে আনা। অথচ কাজ-রোজগার এবং পারিপার্শ্বিকতার চাপে পড়ে শিল্পকে তাই করতে হচ্ছে। অস্থান উত্তাপকারী অর্থকরী অবস্থার দিকে তাকিয়ে ঐশ্বর্য তথাকথিত 'পশ্চাত্য' মানসিকতার প্রেরণ দিতে পারেন নী তখন তাঁদের সেই বৈচিত্র্য সঙ্কটকাল মনের আসল স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। শিল্পের গাভীশীলতাই শিল্পের প্রাণ। আমাদের রাগসংগীত যদি তার মধ্যযুগীয় ভাবধারার পরিবর্তন না করে, যুগসচেতন হ'ল হ'বে এখনও নানা কুসংস্কারের অন্ধকারে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখে,

তুমাত্র পুরান বস্তাপটা ভাষ-ভাষনাকে মূলধন করে বেঁচে থাকার আশা করে তা হলে সেটা হবে আর এক মারাত্মক তুস। শিক্ষিত মনের কাছে এই ভাবগুলির অনেকটাই কোনও জাবেদনই সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ এই শিক্ষিত জনমানসই শিল্পের মাঝে গতিশীলতা পরিমাপের কষ্টপাথর। তুমাত্রা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী না হলে রাগসংগীত বোঝা যাবে না। এই ভেবে যে শিল্পী শিল্পচর্চা করবেন তাঁর জানা উচিত কোনও ভাল সাহিত্য বোঝবার জন্য সাধারণ মানুষ বিশেষ কিছু সাহিত্য চর্চা করেন না। শিক্ষিত মনের স্বাভাবিক সৃষ্টিবোধেই তার স্থান হয়। রাগসংগীতও এইভাবেই নিজের স্বাভাবিক স্থান করে নিতে পারবে যদি তার মাঝে যুগের ক্লাসিক ভাবধারার প্রভাব আসে; তার জন্য প্রয়োজন সঙ্গীতের সাথে সাহিত্যের সমন্বয় এবং শিল্পীর যুগসচেতনতা।

বর্তমানে সংগীত বিষয়ে সামান্য কিছু সমালোচনা কিছু কিছু পত্র-পত্রিকাতে স্থান পাচ্ছে—যদিও তাতে সাধারণ মানুষের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। এই সমালোচনাগুলিতে সঙ্গীতের দর্শন এবং মননশীলতা সবচেয়ে প্রায় কিছুই থাকে না, পরিবর্তে দেখা যায় রাগের টেকনিক্যাল ক্রটি-বিচ্যুতির উল্লেখ বাস্তব সাধারণ মানুষ কোনও উৎসাহ পান না, বরঞ্চ একে জানতে গেলে এইসব টেকনিক্যাল অংশগুলি না জানলে চলবে না এই ভেবে এ বিষয়ে একেবারে উগাঙ্গীন হয়ে পড়েন।

## আমার কথা (১১১)

কল্যাণী রায়



কল্যাণী রায়

বিশ্বের দরবারে পূণ্য ভারতভূমির শাশ্বত ঐতিহ্য ও মহান সাংস্কৃতিক প্রচারণের পবিত্র কর্ম ভারতের বর্তমান যুগের যে সঙ্গীতশিল্পীর দল যথাযথিত দক্ষতা প্রদর্শন করে অভাবনীয় সুনাম ও প্রভুত সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী কল্যাণী রায় মিসেসকে এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারিণী। অরক্ষ সেতারশিল্পী হিসাবে আজ তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা শুধু বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, সাত-সমুদ্রের নদী পেরিয়ে সেই খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে বাঙলার গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

১৯৩১ সালের ২৯-এ এপ্রিল বাঙ্গলেশবুকের শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায়ের কন্যা কল্যাণী রায়ের জন্ম। মা শ্রীযুক্তা মণিকা দেবী শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদারের খুলনাত পুত্রী। তাঁর সঙ্গীতাত্মরসিকি উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছেন কন্যা কল্যাণী রায়। সঙ্গীতে মণিকা দেবীর প্রবল অমুরগা বে প্রভাব বিস্তার করল কল্যাণী দেবীর মধ্যে তাঁর জীবনে তা হয়ে উঠল অনতিক্রম্য। কালে সঙ্গীতই হয়ে ঝড়াল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, ত্রুত, আনন্দ এবং এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই তিনি উপনীত হলেন খ্যাতির অন্তহীন রাজ্যে।

সেখানে তিনি পাঠ নেন নুপেন গঙ্গোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রমোহন সেন এবং বিলিয়েন হোসেন বাঁ প্রমুখ কৃতবিদ্য শিল্পীদের কাছে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি ভূষিত হন 'স্বরজী' উপাধিতে। বক্তারের বি, মিউস পবীকার প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি এর অধিকারপত হয়। তের বছর বয়স থেকে ইনি নিরমিত স্বরশিল্পী হিসাবে আকাশবাণীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তখনাল প্রোগ্রামে মহিলা স্বরশিল্পীদের মধ্যে

ইনিই প্রথম অংশগ্রহণ করেন। জ্ঞানপ্রকাশ বোম্বের পরিচালনার রাধিকামোহন মৈত্রের সঙ্গে ইনি লন্ড প্রেসিং রেকর্ড-এ অংশ নেন। এ বিষয়েও মহিলাশিল্পীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। ই পি রেকর্ডেও এর ব্যক্তি। গৃহীত হয়েছে।

১৯৬৩ সালে ইনি সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন। এই ক্রমিয়া ভ্রমণ নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ—যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাংস্কৃতিক বিনিময় পন্থিকল্পনা অনুসারে রূপ সরকারের বিশেষ অতিথিরূপে তিনি রাশিয়া যান এবং সেখানে রসিকসমাজে বক্তৃতার দ্বারা ভারতীয় রাগপদ্ধতি প্রভুতি বিস্তার করেন। সেখানকার গুণিজ্ঞান তাঁর অনবদ্য ঐতিহ্য মুগ্ধ হন। তাঁর এই রাশিয়া সফরের প্রস্তুতির কয়েকজন রুশশিল্পী ভারতে আসেন এবং শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ ভারত-রুশ মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করল।

সেতারবাদিকা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি আজ অপরিসীম। রসিকসমাজে তিনি যে আলোড়ন এনেছেন তার তুলনা বিয়ল। যতসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি যে অভিনবধার আনয়ন এনে দিয়েছেন তার গুরুত্বও অসমূল্যের নয়, রসিকসমাজ জেনে আরও আনন্দ পাবেন যে, কল্যাণী রায় শুধু স্বরেরই সাধিকা নন তুলিরও পূজারিণী। চিত্রকনের ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধহস্ত। বর্ণের প্রয়োগেও রেখার ব্যক্তনায় তাঁর অঙ্কিত ছবিগুলি যেমনই অপূর্ব তেমনিই অনবদ্য।

# নভেনীল

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন অবিভ্রান্ত বর্ণের রাত্রির অন্ধকার আকাশে প্লেন উঠল যেন নিরুদ্দেশ শূন্যতার হাবিরে বাবার হতাশা নিয়ে।

মাটির স্পর্শ ছেড়ে প্লেনের শূন্য প্রথম উৎক্ষেপের মুহূর্তটা কেন জানি না আমাকে প্রত্যেকবারই কেমন বিহ্বল করে দেয়।

এবারের বিহ্বলতাটা একটু বৃষ্টি অশ্রুতমিশ্রিত।

উঠবার সময় বাক নেবার দরুণ উর্ধ্ব ও অধোলোকের কিছুটা যেন গুলট-পালট হয়ে গেছে। মেঘাবৃত আকাশে তারার চিহ্নমাত্র নেই। তার বনলে ফেল-জ্বালা বোম্বাই শহরের বিদ্যুত আলোক সমারোহই যেন আরেক আকাশ সৃষ্টি করছে। প্লেনের জানলার ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল অথচ বৃষ্টিধারার বেগড়ে যাওয়া সেই আলোর আলপনা দেখতে দেখতে জ্বন-কালের চেতনাও বৃষ্টি স্বাভাবিক থাকে না।

একনিম্ন ক্রান্তের যাত্রী। একধারে পাশাপাশি তিনটি ও অঙ্ক বায়ে দু'টি করে সীটের দীর্ঘ সারি।

ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি দু'টি সীটের সারিতেই জানলার ধারে জায়গা পোয়েছি।

প্লেন বেশ রাত করে ছেড়েছে। আমাদের যথাস্থানে বসিয়ে দেবার সময় এরর-হোর্কেস যে আলো আলিয়েছিল তাও এখন নেভানো। লম্বা কামরার ক্রীণ করেকটি বায়ের অত্যন্ত মৃদু আলো। সহযাত্রীরা নিজেনের সীট হেলিয়ে দিয়ে ঘুমের না পড়ুন, তারই আয়োজন করছেন।

আমার কিন্তু ঘুম আসবার কোন আশাই নেই। যেন কি প্লেনে উঠলে ছেলেবেলা থেকেই কিরকম একটা উদ্গ্রীব উত্তেজনা আমাকে অধীর করে রাখে। আশ্রয় অনিচ্ছার একটা বিশেষ কারণই রয়েছে।

বাক নেবার পর টাল সামলে উর্ধ্ব-অধোর বিভাগ স্বাভাবিক করে তুলে প্লেন আরব সমুদ্র পাড়ি দেবার রাস্তার মুখ ফিরিয়েছে। বোম্বাই শহর তার আলোর মালা নিয়ে অসীম নীরত্ব অন্ধকারে ক্রীণ অশ্রুট হ'তে হ'তে হাবিরে গেল একসময়ে।

প্লেন আরব সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে বলে অনুমান করে নিতে হয়, প্রধানত তার কম্পনে আর অবিরাম একঘেরে শব্দ নির্ঝরে। নইলে ভাবতে পারা যেত চারিদিকে গাঢ় কালো পর্বা টানা একটা

কামরার যেন বসে আছি। সে অনুভূতিকে নাড়া দেবার একটিমাত্র ব্যাপারই অবশ্য আছে। যেখানে আমার সীট তার একটু পেছন দিয়ে প্লেনের একটা ডানা সেই অন্ধকার পর্বা ভেদ করে কিছুদূর পর্বত ছড়ানো। টার্পো-প্রপ প্লেন। অল্পক্ষণ একটা নীলাভ বিহাং ফুলির তাই সে ডানার প্রপেলার আর জেট মুখের বস্ত্রে কিলিক দিয়ে বাচ্ছে। এ সব কিছু মিলিয়ে একটা অবাস্তবতার অনুভূতিই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু আমার অনিচ্ছার কারণ সে সব কিছু বললে ভুল বলা হবে। প্লেনে ওঠার পর থেকে একটি ডাবনাই আর সব অনুভূতি হাপিয়ে মনটা অধিকার করে আছে। তীব্র কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মেশানো ডাবনা। সে ডাবনা যে খেতাল মেয়েটির অবাচিত সাহায্য ছাড়া সেদিনের আকাশযাত্রা সম্ভব হত না তাকেই বেক্স করে।

মাত্র কিছুক্ষণের জানা এই বিদেশী মেয়েটি সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোঝ ছাড়া আর কিছু থাকবার কথা নয় অবশ্য। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সে যা করেছে তার তুলনা হয় না।

তুধু যে নিজের জন্তে আনিয়ে রাখা গাড়িতে আমাদের এরর-পোর্টে পৌঁছে দিয়েছে তা নয়, দেরিতে এসে পৌঁছোবার দরুণ, মাল ওজন চেক করা, পাশপোর্ট ইত্যাদি দেখানোর ব্যাপারে যে কামেলা হতে পারত তাও কাটাতে সাহায্য করেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

সাহায্য করেছে অবশ্য ধীর গাড়ি নিয়ে এরর-পোর্টে এসেছে তাঁর ঘায়াই। আত্মীয়স্ব বা প্রেমিক বাই তিনি হন, তাঁর ওপর মেয়েটির বেশ কিছু অধিকার আছে বোঝা গেছে। উল্লেখ্য তারতীর মন খেতাল। পদবী না জানলেও ডাক নাম যে বিলা, মেয়েটির মুখ থেকেই তা জেনেছি, সেইসঙ্গে এটাও বুঝেছি যে পেশা তাঁর বাই হোক বোম্বের বিদেশী বাসিন্দা হিসাবে বিদেশের ক্ষমতা প্রতিপত্তি খুব অল্প নয়।

বিলা খুব প্রেমময় মনে আমাদের মত দু'জন বিপার ওভারভার্সার সাহায্যে এগিয়ে যে আসেন নি এটা তাঁর ব্যবহারে খুব অশ্রুট থাকে নি। কিন্তু নীনার সে বিষয়ে জ্ঞানপূর্ণই ছিল না, আর আমাদেরও তখন মনোভাব বিলম্বণ করে সাহায্য গ্রহণ করব কি করব না স্থির করার অবস্থা নয়।

বিলের এয়ার-পোর্টে প্রচুর খাতির। মস্তবজাবে অভ্যস্ত ভাড়াভাড়াই তাই আমাদের সব কামেলা চুকে গেছে।

যে কাকের বেড়ার ওপার থেকে সাগর পারের আকাশবাত্তীদের তখনকার মত মাটির মাছুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে যেতে হয় সেখানে পাড়িয়ে নীনা 'বিল'-এর দিকে চেয়ে কেমন একটু নিষ্ঠুর কৌতুকের সঙ্গেই হেসে বলেছে—চললাম বিল। তোমাদের মুখে চুপকালি লাগবার ভয় আর রইল না।

চেহারার, চরিত্রের, চলনে-বলনে বিল যে পাক্সা সাহেব তা ইতিমধ্যেই বুঝেছি। মুখে কোনভাবে প্রকাশ হতে দিলে—বিশেষ হুঁজুন ভারতবর্ষের সামনে—তার জাত যায়। তবু তার চোখ দুটোর কেমন কোন একটু কাতরতার আভাস ফুট উঠেছে।

নীনা তারপরে বলেছে—দববাজ হরত আমার খোঁজ করতে তোমার কাছেও আসতে পারে। তাকে বোলো আমি আর ফিরব না। তা বলবার সময় বোধ হয় পাব না।—বিলের পাঁতে পাঁতে শিষ্ট হয়েই বুঝি কথাগুলো অশ্রুভাষে বেরিয়েছে।

কেন?—নীনার মুখে যেন সরল কৌতুহলের প্রশ্ন।

কারণ তার আগেই তাকে গুলি করব বলে—কথাটার একটু পরিহাসের সুর দেবার চেষ্টা থাকলেও চোরালের পেশীর কাঠিন্যটা তার সঙ্গে ধাঁপ খায় নি।

নীনা হেসে উঠেছে এবার। বেশ উঠেছে; আরই আশপাশের সকলকে চমকে দিয়েও বিলকে রীতিমত বিব্রত করে হেসে উঠেছে অকুণ্ঠিতভাবে। তারপর বলেছে—তাই কোরো। ভারতবর্ষ এসে একটা সত্যিকার নাটক লাগিয়ে দিয়ে গেছি বলে তা হলে গণ থাকবে।

এ কথা বলবার পর নীনা কিন্তু আর গাড়িনি। হঠাৎ পেছন ফিরে বিলকে আর কোন বিদায়-সম্বাধন না জানিয়েই এগিয়ে গেছে একলা।

আমরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গাড়ির থেকেছি কয়েকফুট, তারপর কর্তব্যবোধে বিলকে ধস্তাবাদ জানিয়েছি আমাদের জন্তু বা করেছেন তার জন্তু।

বিল সে কথা শুনেই বোধ হয় পান নি কিংবা নীনার খাতির বাদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন তেমনি হুঁজুম অবাধিত উপদ্রবের ধস্তাবাদ প্রোচের মধ্যে আনাও প্রয়োজন বোধ করেন নি।

অবস্থা বুঝে আমরাও প্লেনের দিকে পা বাড়িয়েছি এবার।

সব উৎসেগে দুর্ভাবনা পার হয়ে এসে আমার সহযাত্রী এখন নিশ্চিন্ত। যেতে যেতে একটু অবজ্ঞার সঙ্গেই বলেছেন,—যাই বলুন, স্নেহী কেমন একটু অভব্য। আদব-কলসনা জানে না। কিভাবে হাসল দেখলেন। বড়বরের ত'নয়ই খাস বুটিন কি না তাই সন্দেহ হয়।

বলতে পারতাম, আদব-কার্য্য জ্ঞান ও মানা খাস বুটিন বলতে তিনি বা বোঝেন, নীনা তাই হ'লে—এ প্লেনে চড়বার সৌভাগ্য ত'নয়ই তার স্নেহ পরিচয়সূচক হ'ত না যে।

সে জবাব না দিয়েই নীরবে প্লেনে এসে উঠেছি।

সেখানে নীনার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা গিয়েছেন অল্প কামরার তার আসন।

তার সঙ্গে আর দেখা হবার আশাও করি নি। তবু যখন থেকে

তার কথাটা মুছে কেসতে পারি নি কিছুতেই। ওই সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই তার জীবনের যে আভাসটুকু পেয়েছি তার রহস্য যেমন কৌতুহল জাগিয়েছে তেমন তার চরিত্রও।

সে চরিত্র যে সাধারণ ছকে পড়ে না, আমাদের উপযাচক হয়ে নিজের মোটের পৌছে দিতে চায়। থেকেই তা বোঝা গেছে।

গাড়িতে ওঠবার সময় তার প্রেমান পাণ্ডা গিয়েছিল আরো।

মালপত্রের লটবহর প্লেনে বস সাক্ষিত হ'র ততই ভালো।

আমার সহযাত্রী সংখ্যা না বাড়ালেও সঙ্গে এমন একটি চাউল পোটম্যাটো নিয়েছেন, আকাশপথে যা প্রায় অচল। হোটেলের পোটম্যাটো গাড়ি করানো বিল-এর গাড়ির পেছনে তা তুলতে গিয়ে সবাই হিমাসম। গাড়ি ছোট নয় কিন্তু পেছনের কেরিয়ারে তিন জনের অস্ত্র লাগেজের সঙ্গে সে সিন্দুকগোছের সুরেকশ ধরানো অসম্ভব।

সময় বয়ে যাচ্ছে। বিলের মুখের রং বদলানো দেখেই তাঁর মেজাজ কোন পদার তার আভাস মিলেছে। আমার সহযাত্রী অস্থির হয়ে ছোট্ট ছোট্ট করে হোটেলের পোটম্যাটোর কথাগুলো ধমকে কখনো মিনাত করে অনর্গল ভুল নির্দেশ দিয়ে দিশাহারা করছেন আর আমি সমস্ত ব্যাপারটা পরম কৌতুকনাট্য হিসেবে উপভোগ করব না লজ্জার ধরণী বিধা হ'ব বলে প্রার্থনা করব স্থির করতে পারছি না।

হঠাৎ নীনা বলে উঠল,—বিল। এটা ত' ভেতরে নিলেই হয়।

ভেতরে, বিলের গলার স্বরের চেয়ে এক চোখের ইংৎ কপালে তোলা ভুঙ্ক-ই বেশি বাধ্য হয়ে উঠল,—তা হলে মাছুষের বদলে মাল-ই নিয়ে যেতে হবে।

নীনা বিলের প্রোচের বিদ্রূপের তিক্ততাকে আমলই দিলে না। নিজের জেদ ধরেই, জোর দিয়ে বললে, মাল-মাছুষ সবই যাবে। তুমি সুরেকশটা ভেতরে তোলাও দেখি। তোমরা তিনজনে সামনে বোসো আমি না হয় পেছনে থাকব।

কি বা তা বলছ নীনা। তা কি হয়। বিলের গলার অকৈর্যের সঙ্গে অসহায়তা বেশানো।

খুব হয়। 'অটল, তা না হলে মাল বা মাছুষ' কোনটাই ফেলে যাওয়া চলবে না

নিরুপায় স্কেড ৬-শার সত্যিকার বিলাতী কাঁধ নাড়া এবার দেখলাম।

আমার সহযাত্রীরা সি প্রমাণ সুরেকশ পেছনের সিটে তোলা হ'ল। শুধু শেষ পর্যন্ত বা বাকী হল তাতে বিল ও নীনার সঙ্গে আমি সামনে ও আমার সহযাত্রী তাঁর লাগেজ নিয়ে পেছনে বসলেন।

নীনা ও বিল নাম দুটো এই মাল তোলার ককণ প্রহসনের সময়েই প্রথম জানতে পেরেছিলাম। নীনার জীবন যে গতানুগতিক ধারার নয় তার কিছু ইঙ্গিতও পেয়েছিলাম হোটেল থেকে এয়ার-পোর্টে যাবার পথে।

বুঝি তখনও সমানে পড়ছে। রাস্তাঘাট গাড়ির চেয়ে নৌকারই বেশি উপযোগী।

বিল অতি নিশুণ চালক, গাড়িও তাঁর উঁচুনের। তবু মার

## নভেনীল

মাঝে অতর্কিতভাবে গুপ্ত খোদিলে-খানার পড়ে আমাদের প্রাণান্ত ঝাঁকুনি দেওয়ার সঙ্গে গাড়ি বিকল হবার উপক্রম হচ্ছিল।

সাঁটাকুঁড়-এর রেল লাইন পার হবার পর এমনি এক জলের তলায় লুকোন গর্তে গাড়িটা পড়ায় ঝাঁকানির চেয়ে নীনার কথাতাই বেশি চমকে উঠেছিলাম।

কি যেন বলে আপনাদের; হাড়গোড় ভাঙা কি যেন হয়ে গেল; বলুন না মিঃ চৌধুরী।

সম্বোধনটা আমাকেই এবং উচ্চারণটাও বিকৃত কিন্তু ভাষাটা বাংলা। ঝাঁকানির দক্ষণ আর চমকিত বিমূর্ততার করে কহু হুতু কিছু বলতে পারি নি।

গাড়িটা জল খই-খই গর্ত থেকে কাংরে উঠে তখন আবার বেগ নিয়েছে।

নীনা-ই আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কই বললেন না।

এবার প্রশ্নটা ইংরাজিতেই।

বললাম, আপনি বোধ হয় হাড়গোড় ভাঙা দ বোঝাতে চাইছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, হাড়গোড় ভাঙা দ-ই বটে। আমরা ওই দ হয়েই এবার-পোর্টে পৌঁছোব মনে হচ্ছে।—বলে নীনা চেসে উঠল।

আপনি বাংলা শিখলেন কোথায়? এবার না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

কোথায় আবার? শিখেছি মানে শিখছিলাম বাংলা দেশে, না বাংলা দেশেও ঠিক নয় বাঙালীর কাছে বলাই উচিত! এবণর আর কৌতুহল প্রকাশ করা অশোভন। তবু হৃদয়ে কথার জের টানলাম,—বাংলার একেবারে থাকে বলে ইন্ডিয়ামও কিছু শিখেছেন দেখছি।

ইন্ডিয়াম না শিখলে আর শেখা কি? সে ত' প্রাণ বাদ দিয়ে খোলস। তাই প্রাণটা ধরবারই চেষ্টা করছিলাম।

অনেক প্রশ্নই এ সম্পর্কে মনে এসেছিল কিন্তু নিজেকে সামলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কথা জিজ্ঞাসা করলাম,—কিছু মনে করবেন না। আমার পদবীটা স্ট্রাকেশের ওপরকার লেবেল দেখেই জেনেছেন বোধ হয়!

নীনার হাসি শোনা গেল। বললে,—না লেবেল না পড়ে তার আগে জেনেছি। জেনেছি হোটেলের রিসেপশনিষ্ট মেয়েটির কাছে জিজ্ঞাসা করে।

আমি চুপ করেই রইলাম।

নীনা নিজেকে থেকেই আবার বললে, খুব অস্বাভাবিক হচ্ছন নিশ্চয়। তা হলে শুধুন, আপনাদের অস্থিরতা দেখেই মনে হচ্ছিল কোন বিপদে পড়ছেন। রিসেপশনিষ্টের কাছ জিজ্ঞাসা করে বিপদটা জেনে নিয়েছিলাম, সেইসঙ্গে আপনাদের নামটাও। কলকাতা থেকে আসছেন জেনে আর চেহারা দেখেই আপনাকে অবশ্য বাঙালী বলে বুঝেছিলাম।

চেহারা দেখেই বাঙালী বলে বুঝেছিলেন। আপনার দুটি ত' খুব তীক্ষ্ণ। সপ্রশংস বিষয়ে জানালাম,—সত্যি কথা বলছি বিদেশিনী হিসেবে এটা আপনার আশ্চর্য কমতা বলতে হবে।

আশ্চর্য এমন কিছু নয়। নীনা হাসল আবার,—এদেশে আসার পর থেকে ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালীকেই যে সবচেয়ে হাড়ে-হাড়ে চিনেছি।

কথার তার করে কৌতুক না আক্ষেপ প্রধান ঠিক বোঝা গেল না।

এতক্ষণের আলোচনা কখনো ইংরেজী কখনো বাংলায় মেশানো খিচুড়ি ভাষায় চলছিল। হঠাৎ একটা খোদিলে পড়ে চাকা থেকে ছিটকানো জল আমাদের গায়ে এসে পড়ায় নীনা! ইংরাজিতেই একটা মুহূর্তের গাল পেড়ে হেসে উঠে বললে,—আমাদের 'গিয়ারিশ' আর বুঝি সম্ব হচ্ছে না বিল! ইচ্ছে করে গাড়ি খানার ফেলছ আমাদের জন্ম করতে।

বিল কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে গাড়ি চালিয়ে গেছে। ড্যাশবোর্ডের আলোর তার মুখটা শুধু একটু যেন বেশি কঠিন মনে হয়েছে।

গন্তব্যস্থলে তখন প্রায় পৌঁছে গেছি। দূরে এবার-পোর্টের লাল লোনা বাজছে।

এবার-পোর্ট আর একবার মাত্র নীনার সঙ্গে বাক্য বিনিময় হয়েছিল। আমাদের লাগেজ পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যাপারে বিল তখন ব্যস্ত। আমার সহযাত্রী নিজের ওর্ডারবুকেই অকারণে তাঁর পাশে ঘুম ঘুপ করছেন।

নীনা আমার কাছে ঝাঁড়িয়ে একটু হেসে বলেছিল,—বিল মনে মনে আমার খা মুগুপাত করছে।

ভয়তর খাতির বলেছিলাম,—হ্যাঁ ঠিক খুব বর্ষ দেওয়া হ'ল।

কষ্ট ওর কিছু নয়, শুধু মান খোচাবার জালা। মনে মনে বিল এখনো রাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে পড়ে আছে। আমার মত হতচ্ছাড়া মেয়ের জন্মেই সেখান থেকে মাঝে মাঝে নাড়া খেয়ে বলে ওঠে কিন্তু কিছু করতেও পারে না।

সন্ত-পরিত্রিত সম্পূর্ণ অজানা একজন বিদেশীকে এ ধরনের কথা শোনানো একটু অপ্রত্যাশিত নিশ্চয়, কিন্তু নীনাকে এটুকুর মধ্যে যা জেনেছি তাতে তার পক্ষে কথাগুলো অস্বাভাবিক মনে হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে নীনা আবার নিজের মনেই বেন বলেছিল, তারি মজা লাগে বিল আর আমার কথা তুলনা করলে। বিল এদেশে রাজগারের খাতির থাকে অথচ তাকে চিনতে চায় না, আর প্রাণ দিয়ে চিনতে চেয়েও ঠিকত না পেরে আমার চলে যেতে হচ্ছে।

উত্তর রাত আশায় বলা কথা নয়। রাশি-রাশি প্রশ্ন মনের মধ্যে ঊর্ধ্বে উঠলেও তাই চুপ করে থাকতে হচ্ছে।

**ডাঃ বসু**

# অশোক কার্ডিয়ল

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তি

ও পৌরস্বয় বর্ধন করে

ডাঃ বসু ল্যাবরেটরী লিমিটেড

কলিকাতা-৯

সেই সব প্রসঙ্গই প্রেমের জ্বলন্ত ধারে বিনীত রাত কাটাতে কাটাতে মনের মধ্যে ঢেউ তুলছিল অল্পমান ও কল্পনার।

অন্ত দিগন্তের দিকেই প্রেম ছুটে চলেছে। রাত তাই অস্বাভাবিক-রকম দীর্ঘ। সে দীর্ঘ রাতের অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আর কিছুতেই এল না। নিচে বহুতর আরব সমুদ্র হলেছে, ওপরে মেঘাবরণ ছাড়িয়ে এসে তখন নক্ষত্রবচিৎ আকাশ।

নীনা সঙ্কল্পে একটা কথাই বারবার মনে জাগছে। নীনা বলছে,—সান্তালীনে হাড়ে-হাড়ে চিনেছে। 'হাড়ে-হাড়ে' কথাটা তার অল্পবিস্তার দরুণ 'ইডিয়মে'র অপপ্রয়োগ না তার পেছনে সত্যিকার মর্যাদাসিক কোন ইতিহাস আছে? সে ইতিহাস কি ততো পারে?

শেষবারে একটু বৃষ্টি ঝাঙ্কি ও জড়তায তন্দ্রা এসেছিল।

কারবার ওপরে প্রেম যখন নামবার জগ্রে ঘুরছে তখন জেগে উঠলাম।

সবে তখন বিলম্বিত সকাল হচ্ছে। ওপব থেকে নীলনদী প্রাণিত সুরেলা সুরেলা শ্রীর বদলে মিশরের সঙ্গে মরুপ্রান্তরের জাতিঘট যেন বেশি করে টের পেলাম। এয়ার-পোর্টের এলাকাটার অন্তত লালচে মলিন বালিতে বন্ধাতেরই আভাস।

ট্রানসিট প্যাসেঞ্জার হিসাবে প্রেম থেকে নেমে নির্দিষ্ট বিশ্রামাগারে সকালের ব্রেকফাস্ট খেতে গেলাম।

বাইরেটা দেখা যায় এমন একটা কোণের নির্জন একটা টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম। আমাদের চোখে অচুত ধরণের ঢিলে জোকা-পরা পরিচায়ক এসে ব্রেকফাস্টের ট্রে দিয়ে গেল।

মাথা নিচু করে কাপে কফি ঢালছি, এমন সময়ে অবাধ হয়ে দেখলাম দূর থেকে নীনা-ই আমার দিকে আসছে।

কাছে এসে স্তম্ভপ্রভাত জানিয়ে আমি কিছু বলবার আগেই নিজ থেকে অন্তরিকের একটা চেয়ার টেনে বসে বললে,—আপনার সহবাত্রীকে কোথায় কেসে এলেন! তিনি যেসকল ভীতু অস্থির পঞ্চানন মানুষ আপনাকে না পেয়ে অন্ধকার দেখছেন বোধ হয়।

না, তাঁর জগ্রে আর ভাবনার কিছু নেই। তিনি এটী কারোতোই সরকারী কক্ষে এসেছেন। এতক্ষণে উপযুক্ত জিম্মার বহুদেই শহরের দিকে রওনা হয়েছেন বোধ হয়।

রেষ্টোরাঁ-পরিচায়ক নীনার সামনেও একটা ট্রে রাখতে এসেছিল। ইচ্ছিতে তাকে নিবেদন করে শ্রীনা বললে,—আপনি 'ড' বোম তরই থাকছেন। আমি বাক্তি জুরিখ হয়ে। আর দেখা হবে না বলে বিদায় নিতে এলাম।

সত্যিকার কৃতজ্ঞতা নিয়েই বললাম,—আপনি যে উপকার করেছেন তাতে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে আমারই আপনার খোঁজ করা উচিত ছিল, কিন্তু আকাশগর্ভে বাওরা আসার অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত অল্প। কোথায় খুঁজব বুঝতে না পেরে সে চেষ্টা আর করি নি। সেক্ষেত্রে মাফ চাইছি।

থাক থাক ওতেই হবে!—নীনা হাসল,—করাসীদের মত আপনারা খুব মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন জানি।

আমরা মানে বাঙালীরা বলছেন বোধ হয়। ফরাসীরা কিয়কম মিষ্টি কথা বলে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার কথাটা শুধু যৌথিক মিষ্টতা বলে মনে করবেন না, ওটা আস্তুরিক। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার কাছে জীবনের একটা মনে রাখবার মত ঘটনা। যদিও অসংখ্য ভিজাসার চিহ্নেই দৃষ্টিতে তা বোঝা থাকবে।

যেমন?—জিজ্ঞাসা করে নীনা হাসল। হাসিটা কিন্তু স্নান।

যেমন, কবে কেনই বা আপনার মত মেয়ে এদেশে এসেছিল, কি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে এমন অনেক কিছু।

একপাশের বিশাল কাঁচের জানলা দিয়ে একটা বিশাল প্রেনকে আকাশে উঠতে দেখা যাচ্ছে। সেদিকে করেক্ষুদ্রত চেরে থেকে নীনা একটু ভারী গলাতেই বললে,—অভিজ্ঞতাটা তিক্ত বলেই ধরে নিচ্ছেন কেন।

ধরে নেওয়াটা ভুল হলেই খুশি হব। প্রসঙ্গগুলো তবু রয়েই গেল। একটু খেয়ে নীনার মুখের দিকে চেরে সাহস করেই জিজ্ঞাসা করলাম,—একটা কথা শুধু জানতে পারলে কিছুটা কৌতূহল মিটত।

বলুন কি কথা?

আপনি কাল বোয়ের এয়ার-পোর্টে কোন এক দেবরাজের নাম করেছিলেন। দেবরাজ নামটা খুব সাধারণ নয়। আমি একজন দেবরাজের কথা সামান্য জানি। নাম দেবরাজ সরকার, বিজ্ঞানে ইওরোপের সেবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দলভ উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে মস্ত বড় চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কেউ বলে মধ্যপ্রদেশের কোন জঙ্গলে সে নাকি খেচ্ছা-নির্বাসনে আছে, কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। আপনি তারই নাম করেছিলেন কি না জানতে ইচ্ছে হয়। এরকম আশাতীত ঘটনা-সম্প্রীত অবস্থা সাধারণত হবার নয়।

যা হবার নয় তাই হবারই আশাতীত ঘটনা-সম্প্রীত। নীনা একটু তেমে উঠে ঠাণ্ডিয়ে বললে,—বিস্ত্র আপনার কৌতূহল মোটাবার আর সময় নেই। ওই শুভুন আপনার রোমের প্রেন ছাড়বার বোধবা। নমস্কার।

বালাতেই নমস্কার জানিয়ে এয়ার-বাগ আর ফোলিওটা তুলে নিয়ে এয়ার বিগার নিতে হল! বাইরে বার হবার দরজার কাছ থেকে ফিরে চেরে দেখলাম নীনা ওপরের রেলিং-এর ধারে ঠাণ্ডিয়ে আছে। জীবনে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া এবং আমার অসংখ্য অনুস্মারিত প্রেমের জবাব পাওয়া অসম্ভব বলেই তখন মনে নিয়েছি।

সেই অসম্ভবই একদিন সম্ভব হবে কি করে জানব।

[কথন।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষার একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

# বার্ধক্য

## বারানসী

নালকণ্ঠ

সাতচল্লিশ

একটি আশ্চর্য অপরাহ্ন কখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে উত্তীর্ণ হলো টের পেলাম না, আশ্চর্যের একটি যুগলের রণীর সন্নিধ্যে। নামের প্রয়োজন নেই। ভারতজোড়া নাম আইনজ্ঞ হসবে। পাণ্ডিত্য প্রচুর, সাফল্যের প্রায় শিখরদেশে উপস্থিত একজন, মহাজন সুপরিচিতা সমাজসেবিকা। দু'জনেরই এই পরিচয়ের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় একটি ব্যক্তিত্বভূষিত সন্নিধ্যে সৌভে সেই দক্ষ্যর আচ্ছন্ন হয়েছি অনেক বেশি। প্রসঙ্গ করছি সেরিন কাশীর। আমার প্রিয় নয়, প্রের প্রসঙ্গ। মরলোকে ওই একটি পরিবেশ, কাশী, আলোচনারভূমিটাই অমরলোকে থেকে এসে পাড়ে একমুঠো আলো। কী আছে ওই ছুটি অক্ষরে, কাশী,—সবল যুগের সকল 'নেশন'-এর আত্মকল্লব সকল আত্মবর্ণের শেষ—আশ্রয় ওই কাশী। বিশ্বের ব্যতক অনাথের ব্যতকণ্ঠ না মুক্তি হচ্ছে ততক্ষণ জেগে আছে যেখানে স্বয়ং বিশ্বমাথ। দেহের দুখা দূর করবে যে কেবল সে নয় জীবের মুক্তিদাতা। Not by bread alone। সন্দেহের অতীত যে ওই সংগে বহুধার যত জীব তাকে সুরার ভরে দেবে, অন্ধরে দেবে অমৃতের আশ্রয়, মনে করিয়ে দেবে জীব যে, সেই শিব। খেলাতে এসেই সে ইচ্ছে করে ভুলেছে যে সেই শিব। কাশী ছাড়া আর কোথায় শিব খুঁজে বেড়াচ্ছেন জীবকে। বরণা আর অসি। বরণা আর রশ্মি, মুক্তি আর বন্ধনের সংগমক্ষেত্র আর কোথায়? শিব ও জীব আর কোথায় হরিহরাস্তা?

ব্যতকণ্ঠ কাশী না পৌঁছছে ততক্ষণ এ জীবনের তীর্থভ্রমণ অসমাপ্ত। ততক্ষণই কেবল হাহাকার:

হেথা নয়, হেথা নয়, অজ্ঞ কোথা, অজ্ঞ কোনখানে।

কাশীতে পৌঁছনমাত্র নাম আর প্রণাম:

প্রাণে যদি পেয়ে থাকে চরমের পরম নির্দেশ,

এবারের মতো করে শেষ।

কাশী যাবার আনন্দ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভারতবিখ্যাত সেই আইনজ্ঞ। একবার নয়। দু'বার। তারপর ভ্রমর এসে গুনগুনিতে গেল কানে। কাশীর গংগার ওপারে মাচার ওপর বাসা বেঁধে আছেন একজন দ্বন্দ্বক ভালোবাসার যিনি জীবন্ত বিগ্রহ। কী করে যান কাশী? মনে আপশোষের মেঘ জমতে না জমতেই আবার আনন্দ আসে কাশী থেকে। এবারে আর ভুল হয় না। হ্যাঁ, বাব, কাশী। ২৩শে ডিসেম্বর '৬৩। মেগালসরাইয়ের কাছেই থাকেন

এক বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়েই উঠবেন। একথানা গাড়ি আছে তাঁর। একটি ডাইভারের ব্যবস্থা করতে জানালেন বন্ধুকে।

২৩শে ডিসেম্বর সকালে বহারীতি মেগালসরাই থেকে সীতাল বন্ধুর গাড়িতে লশাখমেধ ঘাটে। সেখান থেকে নৌকার পঙ্গায় তপস্বী সেখানে সাধু বাসে আছেন একটা উঁচু মাটার ওপর। দু'কোণ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞ বসলেন মাটিতে। গরমে নোয় উঠলেন। সাধুর দিকে তাকালেই দুর্ব্বল আলো লাগে চোখে, তাকানো যায় না।

সাধু জিজ্ঞাস করলেন, কী বাচ্চা কই হচ্ছে? বলার একই বাদে ছুড়ে দিলেন কাগজের মোড়ক। তার মধ্যে খুব ছোটো ছোটো পাতা। বললেন: খেয়ে ফেল। আইনজ্ঞ ব্যক্তি বিধা করলেন দেখে বললেন: খেয়ে ফেল, ভর নেই।

খেয়ে ফেললেন ছোটো পাতাটি ভজলোক। সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে গেল সর্বাংগ। মনে হলো একটা চানর সঙ্গে থাকলে ভালো হতো।

কী করতে এসেছিল কাশীতে?—সাধু-জিজ্ঞাসা।

মিটি: করতে,—ভজ-উত্তর।

মিটি: গিয়েই অস্বাক হয়ে বাধি। এখন বা, কাল আসবি।

মিটি: গিয়ে হতস্বাক হয়ে যান আমার সঙ্গে সন্ত-পরিচিত সেই ভজলোক। কেমনে নিহত হবার ধবর পান সকলে কাগজ পড়তে না পাওয়া ভজলোক সেই প্রথম।

পরের দিন সাধু তাঁর এক অল্পগত ব্রহ্মচারীকে বসেন ভজলোককে কতগুলো ক্রিয়া দেখিয়ে দিতে। ভজলোক যে যে ক্রিয়া করতে পারত সে সেই ক্রিয়াই দেখান ব্রহ্মচারী। ভজলোককেও অবশেষে সাধুর কথার সেই উদ্ভুক্ত গংগাতীরে সেবাতে হয় একটি ক্রিয়া করে।

আগের দিনের গাছের পাতার অনেক বড় একটা মোড়ক ভজলোক দেন সাধু যাবার আগে। বলেন, তাঁর ব্যক্তির কোন অংশই হলো, এটা খাইয়ে দিলে সেয়ে বাবে।

প্রণাম করতে এগিয়ে আসেন ভজলোক সাধুকে। মাচার ধীরে গিয়ে পাড়াতোই নেমে আসে একটা পা। কিছু ভজলোকের হাঙ্গামেই অনেক বাইরে। হঠাৎ দেখেন পা নেড়ে বাচ্ছে একই একটু করে। ঠিক যখন বুঝে আসলে হাত ছোঁরাতে পারেন ভজলোক, তখনই যেন প্রিঃ-এর মতো পা আবার ফিরে যাব বহানে।

কাশীর গংগার তীরে এই সাধু চিন্তন ভারতের জ্ঞানক বিগ্রহ। এর নাম দেউড়িয়া বাবা। বতবার নাম নিই, প্রণাম করি ভজলোক

এঁকে। লোক বলে এঁর বয়স সেড়শো, বয়স আরও বেশি। কাশীতে থাকেন আবার অস্ত্রভ্রমণে চলে যান। এঁকে দেখলে পুণ্য হয়। এঁর নাম করলে শূভ ঘূর হয়; এঁকে প্রণাম করতে পারলে পূর্ণকে প্রণাম করা হয়।

এর মধ্যে আরও এক জারগার ঘুরে এসেছেন আমার সত্ত-পরিচিত এই ভ্রমলোক। বীর কাছে গেছিলেন তাঁর কাছে না গেলে কাশী যাবার কোনও মানে হয় না। কিন্তু এ ভ্রমলোকেরও নাম করা বাবে না, কারণ এঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ছাপার অক্ষরে এঁর নাম প্রকাশ করব না। হাই হোক, কলকাতার আইনজ্ঞর সংগে কাশীতে বর্তমানে বাস বীর সেই বোগী না ভোগী বলতে পারব না, বর্তমান কাশীতে সৰ্বচেয়ে বড় আৰ্ণাং যিনি আমার, পাঁচ বছর আগে কোনে বোম্বায়েগে হন, কিন্তু সাক্ষ্য এই প্রথম। প্রসঙ্গের বলি আইনজ্ঞ এই ব্যক্তির সংগে আমারও সাক্ষ্য হবার কথা পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তা সত্যি সত্যি হলো এই সর্বমাত্র।

কাশীর মহৎ মানুষটির কাছে পৌঁছবার জন্তে কলকাতার বিখ্যাত লোকটি কাছেই অবস্থিত এক পানের দোকানের বুথকে পৌঁছে দিতে বলেন। বুথ সেখানে পৌঁছে দিয়ে ছুটি চায়। কাশীর বাঙালী সাধু বল্লভীর পরিচয় তিনি তাকে কিছুতেই যেতে দেন না। কেন, তা কলকাতার লোকটি তখন বোঝেন না। একথা সেধবার পর কাশীবাসী বলেন; বাঙালীর অনেক সময় দেখা যায় একটা ফুল অথবা ফুলের মালা রয়েছে, সেগুলি মাড়ানো বা ছোঁয়া উচিত নয়। ওগুলি অনেক সময় কাকের ক্ষতি করবার জন্তে থাকে, যে কাকেরই ক্ষতি হতে পারে ছুঁলে।

বাস্তবসেটটার সেখান থেকে বড়ো পানওলাকে নিয়ে কলকাতাবাসী গাড়ির দিকে আসতে দেখেন, বাস্তার ফুলের মালা অবিকল যেমন বর্ণনা তেমনইভাবে রয়েছে। সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন দু'জন। বড়ো পানওলাকে একা ছেড়ে দিলে সে এটি ছুঁয়ে ফেলত। কাশীর মুখে সতর্কবাণী উচ্চারিত না হলে কলকাতার ভ্রমলোক এক লাখিতে একে উজ্জ্বল দিতে গিয়ে নিজে শুঁড়ে হতেন এখন বুঝলেন।

আমরা উড়িয়ে দিই বা কুসংস্কার বলে সব সময়ই তা কুসংস্কার নয় যে একথা আমরা বুঝি না, কারণ, গৌলন্দাড়ি পেকে গেলেও আমরা আঙ্গলে সবাই অপ্ৰাপ্তবয়স্ক। হুঁপাতা ইংরিজি পড়া অথবা বলা হুঁপাকি কি হুঁহু গত্ত কিংবা পত্ত লেখা, একটু জটিল আং একটু কষ্ট সময়ে করতে পারা, মানবদ্বীপনের পূর্ণ চরিতার্থতা এ নয়। এই বাস্তব। যদি চোখ খুলে রায় নৈবাৎ তবে দেখব আমরা, আমাদের হাজে কিছু নেই।

হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

তরী পার হতে গিয়ে ভরাডুবি হই আমরা, কাশণ আমরা ভাঙ্ক। ভাঙ্ককের কথাই আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু তাঁর একটা কথাও আঁরারি বিশ্বাস করি না। কালে জানতার, আমরা সবাই একদিন রক্তাক্ত থেকে বান্ধকি হব। সবাই খেতে পাবে, কেউ সকাল সকাল, কেউ বেলায়। পৃথিবী নামক বিশ্বনাথস্থিতে কেউ অভুক্ত রইবে না। যে কোনও জাত, যে কোনও ধর্ম, যে কোনও জন্ম হোক তার, মুক্তি তাকে পেতেই হবে কেন? কারণ জীবের মুক্তি না হলে শিবের মুক্তি কই।

শিবকে? না, যিনি জীবকে নিজের বুক থেকে ফেলে দিতে পারেন না। আর কাশী কি? না, কাশী হচ্ছে সেই জারগা, যেখানে পৌঁছলে জীব জানতে পারে যে সেই শিব। এ কাশীতে পৌঁছর কোটিকে গোটক। আমরা সবাই যাই বেনারস ক্যান্টনমেন্টে, তাই কন্টেনমেন্ট মেলে না কিছুতেই।

সেই শরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বসে আরও একটি অবিশ্রমণীয় অভিজ্ঞতা আমাকে শোনান। সে ঘটনা কাশীতে ঘটে নি; ঘটেছে কলকাতায়। তবু তা বার্ষিক্যে বারাগলীরই কথা, কারণ তা অপাখি কথা। ভারতীয় সাহিত্যের যা চিরন্তন কীর্তি তা সবই যেমন তার উৎস হয় রামায়ণ-মহাভারত, নয় উপনিষদের, তেমনই ভারতীয় যোগসাধনার আদিতো ও অন্তে রয়েছে অনাদি ও অনন্ত কাশী। আইনজ্ঞ, সাহিত্যপ্রিয়, প্রিয়দর্শন মানুষটি বলছিলেন গয়ায় এক সাধুর দেখা না পাবার পর কলকাতায় খবর পান যে সাধু এসেছেন। সাধুর সংগে কলকাতায় সাক্ষ্য করেন সন্তীক। সাধুকে বিরক্ত করেন বাচাই করবার উদ্দেশ্যে। বলেন: রাস্তার বৈজ্ঞানিকরা স্পটনিক বলে একটি বস্তু শূন্যে ছেড়েছে যার পরবর্তী পদক্ষেপে মানুষ পৌঁছে যাবে চাঁদে। সাধু কিছু বলেন না। মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার সাধুর আওতার নয়। আইনজ্ঞ ভ্রমলোক এঁর আগের বছর তাঁর আমেরিকার সফরের কথাও বলেন সাধুকে।

আমেরিকা কি তোমার মৃত্যুভয় দূর করতে সাহায্য করেছে?—  
আমচা প্রশ্ন সাধুর।

না—

তা হলে আমেরিকা কি করেছে?

কলকাতার সেই সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করলেন সফরের উদ্দেশ্যে। বলেন: সকল মানুষের প্রসপারিটি, প্রোগ্রেস ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

সাধুর ঘরে ইঙ্গলেন তাঁর এক জিজ্ঞাসা। অসুখ সারাবার মন্ত্রটি কি গেলে সেখানে?

সব অসুখ নয়, কোন কোনও অসুখ তার সাগাছে বটে—

না। আমি জানতে চাইছি সব অসুখ সারাতে পারে কি না, মৃত্যুভয় হবার মন্ত্র জানে তোমার আমেরিকা?

না—

তা হলে গত বছর গেছিল আমেরিকায়, হরত আসছে বছর ছুটিতে বাবে চাঁদে, সেখানে গিয়েই বা কি হবে, যদি প্রতিবার মৃত্যুর কাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচার রহস্ত না জানো—

ভ্রমলোককে জিজ্ঞেস করেন সাধু ভ্রমলোকের গুঁঠবার সময়ে: কোথায় থাকো?

বালিগঞ্জে—

কতদূরে জানতে চাইছি, এখানকার কোনও জারগাই চিনি না—

এখান থেকে পাঁচ-ছ মাইল হবে—

সাধুর কাছ থেকে বেরিয়ে যে লোকটি আমার সত্ত-পরিচিত সেই ভ্রমলোককে সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ইংৎ রাগ করেন: সাধু-মহাত্মাদের সংগে কি কেউ এত তর্ক করে। তাঁদের কাছে যাই শোনাবার আছে। শোনাবার জন্তে নয়; কলকাতার খ্যাতিনামা



## প্রেম

মাছুষটি ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধ কথা। সাধু হঠাৎ তাঁর বাড়ি কতদূর একথা জিজ্ঞাস করলেন কেন ?

এই 'কেন'-র উত্তর পেলেন কলকাতার বাড়ির নিস্তব্ধ শরণগৃহ নিশীথ রাত্রে। পথের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোর ঘূর্ণ ভেঙ্গে যাওয়ার ভঙ্গলোক দেখলেন, সাধু দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে। তখন একটি ম্যাগসেসিয়ান ছিলো সেই ভঙ্গলোকের। টিকটিকি নড়লে সে চোঁচাত। সেও নিঃশব্দ ঘুমোচ্ছে। ভঙ্গলোক তাঁর স্ত্রীকেও ধাক্কা দিয়ে তুললেন। সাধু শুধু বসলেন : ডেরা মাং। তারপর হঠাৎ নির্ধাপিত দীপগৃহ অন্ধকার। যেন ফিউস হয়ে গেছে। কোথাও সাধু নেই।

পরের দিন সাধুর ওখানে যেতে, কয়েকজনের সাঙ্গে কথোপকথনরত সাধু যেন ইচ্ছে করেই ভঙ্গলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ভঙ্গলোক বলেন : আজ উঠ। আমার একটা প্রশ্ন ছিলো—

কাল তোমার ঘরে রাতে আমার যাওয়ার ব্যাপারে প্রবন্ধের অবকাশ নেই। তোমার আমেরিকাকে বলো, যে যন্ত্রের চেহেড়া ভ্রত, যন্ত্রের চেহেড়া দিয়ে যেতে পারা যায়,—যদি কেবল এইটেকে বড়ো করতে পারো,—এই বকের ভেতরটা—

ভারতের সত্যস্রষ্টা করিব কথাও তাই :

‘তোমার অনীয়ে প্রাণমন লয়ে বতনূর আমি পাই,  
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ নাই—’

অন্ধকার থেকে আলোর, অসং থেকে সত্য, মৃত্যু থেকে অমৃত যাত্রাই চিরন্তন ভারতের স্বপ্ন, সাধনা ও সাগ্রাম। এরই আদি ও অন্তে রয়েছে অনাদি কালী। কালী কেবল তীর্থ নয়; ভারতীয়-স্বপ্ন-সাধনা ও সাগ্রামের সত্যতীর্থ; স্বয়ং বিশ্বনাথের ‘স্ব’-তীর্থ।

সাধু ওই বিখ্যাত সাকসেসফুল মাছুষটিকে বলেছিলেন বকের ভেতরটাকে বড় করতে। ‘তার মন’ সব,—এই মনুতর জপতে জপতেই তো জীবের শিব হওয়া। পৌঁছে যাওয়ার মনের অতীত এমন রাজ্যে যেখানে ‘কে তুমি’ তার উত্তর মেলে। যেখানে এসেই সে জানে ‘সে’-ই আমি; আমিই ‘সে’-ই।

ভোলেবাবার কথাও এই প্রবন্ধে হুগল আমাকে প্রথম বলেন। কালীতে বীর পরিচয় বাঙালী সাধু বলে, অষ্ট বীর সাধুদের অভিযান কদাচ প্রকাশিত, তাঁর বাড়িতে এক বুক ডাক্তারের বাতায়ন আছে। সেই ডাক্তার আবার এই আইনজ্ঞ খ্যাতনামা লোকটির বাড়িতেও আসেন বান। তিনি একবার ভোলেবাবার সাঙ্গে সন্ধ্যাসী হবেন বলে ট্রেনে উঠে পড়েন। ভোলেবাবা গর্জন করে ওঠেন : বা, বা, নেমে যা এখুনি। তাঁর বউ-ছলেমেয়ে আছে, তাদের দেখবে কে ? যদি না নামিস তো আমি ঠেলে ফেলে দেব তোকে—

দরজা খুলে ধরেন মেল ট্রেনের ভোলেবাবা। হাতে দেন একটা আপেল। খেতে বলে দেন সেটা। উপাভ্যাসের না দেখে দুর্ভাগ্যে ধাবমান মেল ট্রেন থেকে লাফ দেন ভঙ্গলোক। মাটিতে পড়েন ঘেম থাম-ট্রেন থেকে নামলেন। ততক্ষণে বাড়ি থেকে বিশ-পচিশ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে কেলোছে তাঁকে মেএল ট্রেন। কী করে বাড়ি ফেরেন। ভাবতে ভাবতে হাতের আপেলের দিকে চোখ পড়ে। মনে পড়ে ভোলেবাবার কথা। খেয়ে কেলতে বলেছিলেন। কামড় দিতেই ফলে, ভঙ্গলোক দেখেন নিজের বাড়ির দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে তিনি।

ভোলেবাবার বেশ একটা ; ছদ্মবেশ অনন্ত।

এই যুগুত মস্তক। এই—অভিজাততম রোস্তার আধুনিকতম পোষাকে বলডায়রত। পরিচিত একজন ওই অবস্থায় ভোলে বাবাকে দেখে অপ্রস্তুত। পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ভোলেবাবা বলেন : এত আশ্চর্য হবার কী আছে ?

এই পোষাকে ?—বিস্ত্রত প্রশ্ন ভোলেবাবাকে বিস্ত্রত করে না এতটুকু। বলেন পোষাকটা দেখিয়ে ভোলেবাবা : এই পোষাকটা কি আমি ?

চিরন্তন ভারত বলেছে তাই, দেহের ওপর ওই বসনটুকুই নয়, দেহও আসলে বসনমাত্র। মৃত্যু মানে জীর্ণবসন ত্যাগ ; জন্ম মানে,—নববস্ত্র পরিধান !

ভারতবর্ষ ছাড়া একথা কে বলেছে আর ? হিন্দুর একার ছাড়া এ কায় দর্শন আর। [ ক্রমশ।

## প্রেম

### সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায়

জীবনের অলস বেলায়

কে তুমি আসিলে হেথা

বৌবনের প্রস্তুতিত পদ্মবন ছাড়ি।

ছিঁড়িছে বীণার তার

বেড়েছে হৃদয় ভার

রঙিন স্বপ্ন মোরে গিয়েছে যে ছাড়ি।

নাই বাণী নাই ভাষা

হৃদয়ের আকুলতা

প্রেম রূপে কেন এলে হৃদয় গহীনে।

কী দিয়ে পুজিব আমি

ওগো মোর অন্তরামী

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে।

দেহ তরুণ কাণ্ড সার

পত্র গুপ্ত নাহি আর

রিক্ত মনে রইছ যে পড়ে।

আনন্দ বেদনা-যতো

দেহভরি অলঙ্কার মতো

অড়ারে রাখিরাছে মোরে।

তপসী রায়।

# আমার এক আশা

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

বাক্সের পথে সহাই একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে  
গেলেন।

সব ভাল বার শেষ ভাল।

না আঁচলে বিশ্বাস নেই, তাই কথাবার্তা পাকা করেও স্থিতি  
নেই।

ওকে গাড়িতে ফুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন  
চৌধুরী।

এই হিরোর রোলটা, আমার মনে হয় দি পার্ট কর ইট মি:  
বাক্সেরিয়া।

সলজ হাসি হাসলেন বাক্সেরিয়া।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোম সিগারেটটা ফেল পা দিয়ে মাড়িয়ে  
দিলেন।

বিয়েলি...-ইটস্ এ অব টু আওগস দিজ টাইপ অক পারসনস্।

মাথার থেকে ঘাম মুছে একটা নিশ্বাস ফেললেন বোম।

রবীন ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল অজ্ঞানমনস্কভাবে।

হঠাৎ সত্যজন্মের গলা শুনে পেল।

কোথায় রবীন? বাড়ি নেই?

আজ্ঞে আধঘণ্টা আগেও তো দেখেছি।

কোথায়?

জানতাম না বলে।

ঘরের ভেতর ঢুকে বাড়িলেন। ঠিক এই সময়ই রবীন সামনে এসে

বাঁড়াল।

এই যে রবি? কোথায় ছিলে? ওপরে?

হ্যাঁ—

তোমার এক বন্ধু তোমার খোঁজ করছিলেন, তোমাকে তো  
পেলাব না।

কোথায় তিনি?

কে?

বললেন, এক বন্ধু এসেছে।

ও হ্যাঁ, এসেছিলেন কিন্তু এখন নেই। তোমাকে দেখা করতে  
বলে গেছেন।

চলে গেছেন?

হ্যাঁ কি সাম সাহাল। ডিটেলস্ হরিপদর কাছে জেনে  
নিও।

ও তা হলে শক্তি সাক্ষাস এসেছিল।

কে সে?

আমার ক্লাস ফ্রেন্ড।

ক্লাস ফ্রেন্ড? কোথাকার?

বগুড়ার বখন পড়তাম তখনকার।

ওঃ, ওখানেই থাকে নাকি তারা?

না, এখন চলে এসেছে। ওর বাবা সেখানকার স্কুলের হেডমাস্টার  
ছিলেন।

ওঃ।

পরিচয়টা জেনে তাক্সিলাভের চলে যাছিলেন সত্যজন্ম। রবীনও  
ফিরে দাঁড়াল।

রবি শোন।

কি মনে হ'তে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

বলুন।

রবীন ফিরে এল।

তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে। আমায়  
শোবার ঘরে এসো।

এখনই কি দরকার?

হ্যাঁ এখনই।

আচ্ছা যাচ্ছি একটু বাদে।

সিঁড়িরতলার নিজের কুইন্টায় ঢুকে পকেট থেকে একটা দোমড়া:

## বার এক আকাশ

কাগজ বার করে একটা কোলার ভেতর রেখে দিল রবীন। তারপর কোলটা দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখল।

শোবার ঘরে ডেকেছেন কাকা। এই অসময়ে? কি বিশেষ দরকার? ভেবে পেল না সে। কি কথা থাকতে পারে তাও বুঝতে পারল না।

বাইরের ঘরে একবার এসে রবীন। ওর বন্ধু চলে গেছে। কি জ্ঞান এদিকলি কে জানে। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার বিশেষ দরকার ছিল রবীনের; সেই ব্যাপারটার কি ব্যবস্থা করল কে জানে।

হরিপদ।

হরিপদকে ডাকল সে আরও কিছু জন্মবার আশায়।

কি বলছেন।

রান্নাঘর থেকে জবাব এস।

সোজা রান্নাঘরে চলে এল রবীন। হরিপদ প্রচণ্ড শব্দে গরম কড়ার ওপর তরকারী নেড়ে চলেছে।

আমার বন্ধুকে বশালি না কেন?

বদালাম তো। তা বাবু...

কিছু বলে বার নি?

হ্যাঁ, একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

কৈ দেখি?

একটা ছেঁড়; পাতায় লেখা শক্তির চিঠিটা দিল হরিপদ।

পোদিলে তাড়াতাড়িতে লিখে রেখে গেছে শক্তি।

তোমার জ্ঞান অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তোমার কাকার কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পেলাম না।...তুমি যা বলেছিলে সে বিষয়ে একটা কিনারা হয়েছে। কাল বিকেল পাঁচটার দেখা কর আমার সঙ্গে আমাদের ইস্ত্র রায় রোডের বাড়িতে। তোমার...বাক্ষরীটিকেও এনে, তাঁকে আমার নিমন্ত্রণ জানিও।

শক্তি।

চিঠিটা কার হাতে দিয়েছিল। কাকা দেখেছেন চিঠিটা।

তিনিই তো আমাকে দিলেন। সে বাবুটি আমাকে দিতে বাড়িছেন তা বাবু শুধনি নিজে নিয়ে তারপর আমাকে গিলেন।

কাকা পাড়েছেন নাকি?

নাভাঁস লাগল বৃষ্টি রবীনের।

তা জানি না। মনে হ'ল পড়ছিলেন। তবে বাবুটি অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন তা বাবু বললেন, আপনার ফিরতে দেরি হবে। বাবু নাকি আপনাকে কোন কাজে পাঠিয়েছেন।...তাই বাবুটি আর বসলেন না।

ও...আচ্ছা—ঠিক আছে।

দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে একবার কি ভাবল রবীন।

বুঝতে পারে না তার কাকার এই ব্যবহার। শক্তিকে এভাবে তাড়ানোর অর্থ কি?

বেশ খারাপ হয়ে গেল মেজাজটা।

হাতের নখগুলো ভাল করে পালিশ করছিল সূচরিতা।

রবীন বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিল।

কে?

আমি রবি।

এসো।

রবীন ঘরে ঢুকল, তাকে একবার দেখে আবার নখ পালিশ করতে লাগল সূচরিতা।

কাকা কোথায়?

জান করতে গেছেন।

আমার আসতে বসলেন।

হ্যাঁ তোমার দেরি লেখে জান করতে গেলেন।

ও...তা হলে জান হয়ে গেলে ডেকে পাঠাবেন। আমি

বাইরের ঘরেই আছি।

ব'শ না এ ঘরেই। তাড়া কিসের?

না তাড়া নেই?

তবে?

কি তবে?

বসতে ক্ষতি কি।

ক্ষতি নেই, তবে অনাবশ্যক হ'তে পারে তো।

এই অলস হেসে কাকীমার কথা রবীনের মোটে ভাল লাগে না।

কিছুই নয়, তবু যেন কেমন সহজ মনে হয় না তার।

সূচরিতা আবার হাসল।

অনাবশ্যক তো বটেই, তবে কাকীমার কাছে অনাবশ্যকও বসে যায়।

অবাক হ'রে গেল রবীন। ঠাটা করছেন না কি কাকীমা?

এত অন্তরঙ্গভাবে কখনও কথা বলেছেন বলে তো রবীন মনে করতে পারে না। আজ আড়াই বছরের ওপর হোল সূচরিতার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু নিজেকে কাকীমা বলে পরিচয় দেবার কোন আগ্রহ বা ইচ্ছে তো দেখা যায় নি। আজ হঠাৎ?

বস, বস। আবার বলল সূচরিতা।

কথানা বাড়িয়ে বসে পড়ল রবীন সামনে রাখা বকি; চেয়ারটার। হঠাৎ দোল লাগতেই সোজা হ'রে বসার চেষ্টা করল। আবার দুলতে লাগল চেয়ারটা।

তুমি বরং এটাতে ব'স।

হেসে নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে সূচরিতা বকি; চেয়ারটার কল দোল খেতে লাগল। পালিশ-করা নখগুলো দেখতে লাগল সে।

আচ্ছা, কাকা হঠাৎ আমার ডেকেছেন কেন?

কিছু না উত্তর দিয়ে মিটিমিট হাসতে লাগল সূচরিতা।

আমি কি জানতে পারি? কেন?

দৈর্ঘ্য থাকছিল না রবীনের।

পার বৈ কি! তোমার আর ইলার ব্যাপারের একটা হাসিল শেষে চান আর কি?

মানে?

রবীন ক্র কুণ্ঠিত করল।

গতীরতর কোন মনের খোজ আমি অবজ রাখি না। কিন্তু কথাগুলো তোমার কাকাকে খবরটা একবার জানিয়েছিলাম, এইবার বলতে পারি।

কি এমন খবর যে আতঙ্কিত লাগতে পারে তাই নিয়ে?

একটু উদ্ভতভাবেই প্রশ্ন করল রবীন।  
 ওর উদ্ভতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবটু হাসল সুরচিতা।  
 তারপর হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে একান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল,  
 আচ্ছা আমার বল তো, ইলার সঙ্গে সত্যিই তোমার খুব ভাব না কি ?  
 এসব কথা নিতান্তই ব্যক্তিগত।  
 হোক না ব্যক্তিগত, তবু কাকীমাকে ব্যক্তিগত কথাও বলা যায়।  
 এমন অনেক কথা আছে যা মা-বাবাকে বলা যায় না। যার,  
 যদি তাঁরা বন্ধুভাষণ হন। এক্ষেত্রে -- পরিহাস করছেন ?  
 সোজা সুরচিতার মুখের দিকে তাকাল রবীন।  
 তোমার সঙ্গে আমার পরিহাসের সম্পর্ক আছে বলে তো আমার  
 মনে হয় না।  
 আবার নখ পাশিশের সেটটা টেনে নিল সুরচিতা।  
 আচ্ছা আমি যাই।  
 একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলল রবীন।  
 না।  
 দূততর সঙ্গে বলল সুরচিতা।  
 কেন ?  
 কেন না কথার উদ্ভর দিয়ে তবে বাবে।  
 বেশ, কি কথার উদ্ভর দিতে হবে।  
 সুরচিতার সামনে এসে দাঁড়াল রবীন।  
 বোস।  
 সুরচিতার গলায় আবেশের সুর।  
 রবীন আবার বসে পড়ল।  
 বলুন আপনার প্রশ্ন।  
 একটু খেমে রবীনের মুখের মধ্যে কি দেখে নিল সুরচিতা, তারপর  
 নখ পাশিশ করা বন্ধ করে খুব দীরে দীরে জিজ্ঞেস করল, আমাদের প্রশ্ন,  
 আমরা জানতে চাই, তুমি ইলার সঙ্গে এত বেশি মেশ কেন ?  
 যদি বলি আমার ভাল লাগে ?  
 অবাক হয়ে গেল সুরচিতা।  
 চিরকালের লাজুক স্বরবাক ছেলেটা এত তেজ পেল কোথায় ?  
 আস্তে আস্তে রকিম চেয়ারটা থেকে উঠে এসে খাটের ওপর বসল  
 সুরচিতা, একেবারে রবীনের সামনাসামনি।  
 তোমার যে ভাল লাগে, সে তো জানা কথাই-- ভাল না লাগলে  
 ওপরে যাওয়ার যে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, এটা তো সহজবোধ্য।  
 কিন্তু একটা বিষয়ও তো ভেবে দেখা দরকার।  
 কি বিষয়ে ?  
 এইসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে মন দিলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট  
 হবে না ?  
 ভবিষ্যৎ বলতে আপনি কি বোঝেন ?  
 তোমার ক্ষেত্র, নাম, সম্মান, শিল্পী হিসেবে যশ।  
 আপনার কি মনে হয় অনন্তমনা হয়ে ফিল্মের সিন আঁকলেই  
 আমার জীবনে এই সব আসবে ?  
 কেন নয় ?  
 কেন নয় ! এইভাবে ফিল্ম লাইনে আমার কি সাক্ষ্য  
 আসবে ?

ফিল্মও কি একটা শিল্প নয় ?  
 সব সময় না।  
 তার মানে কি বলতে চাও ?  
 কিছুই বলতে চাই না, তবে এটুকু জানবেন, রসোত্তীর্ণ না হলে  
 কিছুই শিল্পের পর্দায় যেতে পারে না।--তা ছাড়া এই যে বাস্তব  
 ছাড়া, বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরোন গলিত চিত্রশিল্প এর সঙ্গে  
 জড়িয়ে থাকলে এই মৃত-বর্তমান আমাকে কোন ভবিষ্যৎ-সাক্ষ্যের  
 পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। যাবে না। অন্তত শিল্পী  
 হিসেবে তো নয়ই।  
 এ যেন কল্প রবীন, মুখচোখ তার কিসের আবেগে জ্বলছে, সে  
 মুখের দিকে তাকিয়ে সুরচিতার মুখের সর্কোতুক হাসি মিলিয়ে গেল।  
 আস্তে আস্তে বলল সে।  
 জীবনের সাক্ষ্য তো অর্থের ওপর। তাই নয় কি ?  
 আমি যদিও তা মনে করি না, অর্থই সব নয়, তবু বলবো, সে  
 অর্থও তো আমি পাই না। শ্রমের কি মূল্য আমি পাই তা বলতে  
 পারেন ?  
 তোমার কাকাকে বল না কেন ?  
 না।  
 না কেন ? মনে মনে ক্ষোভ পোষার থেকে মুখে বলে ফেলা  
 ভাল নয় কি ?  
 মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখবার মত যথেষ্ট জায়গা আমার মনে  
 নেই।  
 ইলাকে ?  
 আমি যাই--  
 ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রবীন।  
 দারুণ রাগ হ'ল সুরচিতার নিজের ওপর। শেষের পরিহাসটুকু  
 না করলেই হাত। খামকা বেচে অপমান ষাড় পেতে নেওয়া হল।  
 কিন্তু কি সম্পর্ক ছেলেটার। সত্যতর ঠিকই বলেন। এরা  
 উপকার নেবে অথচ স্বীকার করবে না। আবার বড় বড় কথা,  
 বাস্তবছাড়া চিত্র, গলিত চিত্র, মৃত চিত্র--কত কি। অর্থহীন  
 কতগুলো বুকনি শিখেছে ছেলেটা। ফিল্মে আবার এসব কথার  
 স্থান আছে নাকি ? চিত্রশিল্পে সব থেকে বড় কথা অর্থ। এ তো  
 শুধু শিল্প নয়, ব্যবসায়, তা না হলে অত কোটিপতি সব এ লাইনে  
 আসবে কেন ? শিল্পকে পেটোনাইজ করতে ? দার পড়েছে তাদের।  
 যত সব।--  
 রাগে গা জ্বলতে লাগল সুরচিতার আরও বেশি এই জ্ঞাত যে,  
 রবীনের কথাগুলো সে যেন ঠিক উপেক্ষা করতেও পারল না, কাঁটার  
 মত খচখচ করতে লাগল।  
 সত্যিই রবীনের কথাগুলো তাকে নাড়া দিয়েছে বেশ। সে  
 নিজেও তো জানে শিল্পের নাম করে কত বৃণিত জিনিস স্থান পেয়েছে  
 এখানে। সে নিজেও তো একজন ভুক্তভোগী।  
 কিন্তু সত্যতর মত একজন বৃদ্ধিমান লোকও তো বলেন যে,  
 আসলে বলবার আনন্দে নায়ক-নায়িকার মুখে কতগুলো কথা দিতে হবে  
 ঠিকই, সমাজের ত্রুটিগুলোও লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে,  
 কিন্তু তার থেকেও বড় কথা--অর্থ।



নতুন ফরমুলার  
**সানলাইটে**

**আরও ঝলমলে কাচা হয় !**

নতুন ফরমুলার সানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী স্বন্দর নতুন গড়ন ! আর সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে করে কাচার কী আশ্চর্য নতুন শক্তি ! প্রতি ধোপ কাচার পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা... ...আরও ধবধবে, আরও ঝলমলে কাচা হয় !

হিন্দুস্থান লিডারের তৈরী

S. 56-140 BG

বকসী : ইলাস্ট্রেশন

৩৩৫

বুঝতে চায় না সুরচিত্র। জানে সে, চিত্রশিল্পকে সত্যিই বার্থ শিল্পে উত্তীর্ণ করার প্রয়োজন আছে। কয়েকজন পরিচালক তো ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পকে একটি বিশেষ পরিণতির স্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। অতীতের কাঁচা ধারণার মূলোচ্ছেদ করে আজ সত্যিই চিত্রশিল্পকে যে বার্থ শিল্পের স্তরে নিয়ে যাওয়া দরকার, সে সত্য আজ স্বীকৃত হয়েছে। হোক, বর্ধন হবে তখন।

তাই বলে রবীনের মত একটি ছেলে এত কথা তাকে শুনিবে বাবে? সম্ভব হয়?

তাই রবীনের ওপর রাগ তার যেতে চায় না। হঠাৎ মনে হল, ঠিকই করেছেন সত্যব্রত। রবীনকে আরক করেই রেখেছেন তিনি, মকে প্রবেশ করতে দেন নি। একটা তেজী বোড়াকে বশ মানাতে সত্যব্রতই পারেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রান সেয়ে ভিজে মাথা তোরালে দিয়ে মুছতে মুছতে সত্যব্রত ঘরে ঢুকলেন। সুরচিত্রা তখনও শুয়ে, চোখে হাত ঢাশা দিয়ে।

কি ব্যাপার? শুয়ে যে?

এমনি!

রবীন আসে নি?

এসেছিল।

তবে?

তবে আর কি? চলে গেল?

বসতে বললে না কেন?

বসেছিলাম, বসল না।

হ্যাঁ, আমার কথা আছে তার সঙ্গে বলেছিলে?

সবই বলেছি। আবার বেশ পরম পরম কথাও শুনলাম।

পরম পরম কথা? কে বললে?

কেন, তোমার রবি। কত কথা শুনিয়ে গেল।

রবীন কথা শুনিয়ে গেল তোমাকে?

অবশ্য আমারও প্রয়োজন কিছু ছিল।...

সুরচিত্রা উঠে বসল বিছানার ওপর। সত্যব্রতর কাছে এসিয়ে এল।

এই? নিজে পাউডার মাখছে কেন? আমি দেব না বুঝি?

গারে মাখার পাউডারটা নিয়ে সত্যব্রতকে মাথাতে লাগল সুরচিত্রা।

ওর কোমর জড়িয়ে ওকে কাছে টানলেন সত্যব্রত। নিজে বুঝি কোন কাজ করব না?

না—অন্তত আমি থাকতে নয়।

বেশ।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন সত্যব্রত। ওকে বতটা বোকা ভাব ভতটা বোকা ও নয়।

সত্যব্রতর গায়ে ভাল করে পাউডার মাখাতেমাখাতে বলল সুরচিত্রা।

কাকে?

হঠাৎ মনটা অজদিকে চলে গিয়েছিল সত্যব্রতর।

কাকে আবার? তোমার ভাইপো।

ও রবি?

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কে?

ওকে বোকা ভাবি কে বললে তোমার? দেখছ না। কালকাতার মত সহরে কেমন আস্তানা করে নিজেব কাজ গুছাচ্ছে।

সে না হয় তুমি ওর কাক। বলে।

এখনকার দিনে কোন আত্মীয় কার খোঁজ নেয়?

হঠাৎ সুরচিত্রার ভারি রাগ হল। রবীনের ওপর যদিও সে চটে ছিল, কিন্তু এ মন্তব্য সে অকপটে গ্রহণ করতে পারল না। তাই হুম করে পাউডারের কোঁটটা রেখে দিয়ে বলে বসল, উপকার পেলে নেয় বৈ কি।

ওর কাছে কি উপকার পাচ্ছি?

যথেষ্ট, সে তুমি ভালই জান।

কিसे?

অকৃষ্ণিত করে জিজ্ঞাস করলেন সত্যব্রত।

ও এ রকম গাধার মত না খাটলে এক আয়ামে তুমি এ কোম্পানী চালাতে পারতে?

আর এতে ওর লাভ বুঝি কম হচ্ছে?

কোথার?

কেন? ওর মত একজন শিল্পীর যে এতটা নাম হচ্ছে তাও তো দেখতে হবে।

ওঃ, ভারী।...

ঠোট ওপ্টাল সুরচিত্রা। সিনেমার পট একে নাম না করলেও হয়ত ওর চলাফাৎ। চলতো কেন বলব, হয়ত আরও ভাল হত।... ছেলোট সত্যিই প্রতিভাবান।

রবীনের প্রশস্তি গাওয়া আজ কোনমতেই সুরচিত্রার উদ্দেশ্য ছিল না। বরা ঠিক উদ্দেশ্য মনোভাব তার ছিল। কিন্তু কথার কথার সত্যব্রতর এই দম্ব আজকাল সে যেন কেমন সহ করতে পারে না। তা হলেও কথার পিঠে কথা দিয়ে সত্যব্রতকে সে যখন আঘাত করতে চাইল তখন শুধু সত্যব্রত নয় সে যেন নিজেরও অধিক না হয়ে পারল না।

কিন্তু সত্যিই সে বলে ফেলছে, না বলে পারছে না। কদিন থেকেই লক্ষ্য করছে সে সত্যব্রতর কোন কথার প্রতিবাদ করার একটা স্বভাবসিদ্ধি ন্হা তার মধ্যে জেগে উঠছে। একে যেন সে মোটে আটকাতে পারে না।

সুরচিত্রার এই আঘাতটুকু সত্যব্রত লক্ষ্য করে গভীর হয়ে বললেন, প্রতিভার দাম আমিও দি'।...কেন না হাতে গোণা করেকটি প্রতিভাবানদের মধ্যে আমিও একজন এবং প্রথম সারিতে।

তোয়ালেটা টেনে নিয়ে সুরচিত্রা দ্রানের জন্ত বেরিয়ে গেল।

এর জবাব সে দিতে পারত, কিন্তু আজ নয়।

ভ্রমকভাবে মার খেলেন সত্যব্রত। তার প্রয়োজিত ও পরিচালিত প্রথম বইটাই এমনভাবে রূপ করল যে মোটা রকমের আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে দিল।

খুব বেশি রকমের যেন নার্ভাস হয়ে পড়লেন সত্যব্রত। নিজের অর্থাৎ সুরচিত্রার দরুন পাওয়া টাকার প্রায় সবটাই তিনি ইনভেস্ট

## আর এক আকাশ

করেছিলেন বড় লাভের আশায়। এমন কি জমি কিনে একটি বাড়ি করবার আশাও তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল আর বার সন্তানবাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন এই লাভের টাকা থেকেই।

তাঁর একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল, একজন বনেদী চিত্র-ব্যবসায়ী হবেন। শুধু নিজস্ব চিত্র-প্রতিষ্ঠান নয়, নিজস্ব বাড়ি, প্রচুর টাকা আর সম্ভবমত পয়ের পর বই প্রয়োজনা। যাতে চিত্রজগতে শুধু পরিচালক নয়, রমেন সরকারের মত তাঁরও একটা নাম থেকে যায়।

কিন্তু বাজারে বা রিপোর্ট পেলেন, তাতে এটুকু বুঝতে তাঁর বাকি রইল না যে, এই টাকা ফিরে না এলে তাঁকে পথে বসতে হবে। শুধু ভরতের হিসেবে তিনিই বাতিল হবেন না, নিজের হাতে ভবিষ্যতও তিনি নষ্ট করবেন।

অথচ এদিকে চাল বাড়িয়ে ফেলছেন অনেকটা।

খাওয়া-পাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সবকিছু থেকেই তিনি মশাষিঙের গছটুকু পর্যন্ত ছোট্ট ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধু ধনী নয় অভিজাত হ'তে হবে। চলাফেরা, বেশবাস সবোত্তম ফুটে উঠবে অভিজাত্য এবং সেটা একমাত্র সম্ভব তাঁর মতে প্রচুর অর্থ ব্যয়গারে। তাই পারিশ্রমিক হিসেবে অল্প লোকের কাছে টাকা নেওয়ারকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি, নিজের কোম্পানী খুলে, প্রয়োজনার কুঁকিটুকুও তিনি সাগ্রহে নিয়েছিলেন শুধু অর্থপ্রাপ্তির আশায়।

কিন্তু অর্থের নিকটাই যেখানে বড় কথা সেখানে সেটুকুর আশা ত্যাগ করা তাঁর মত লোকের পক্ষে বঠিন।

এই বইটাতে অনেক আশা ছিল তাঁর।

বাছা বাছা কথা বসিয়েছিলেন তিনি নায়িকার মুখে, বড় বড় বুলি। কিন্তু একবারও বোধ হয় ভাবেন নি যে নায়ক প্রবেশ পাঠ শুনেও দর্শক বা শ্রোতার দলে দলে সিনেমায় যায় না। এর মূল্য আকাশে আনন্দ পাওয়া, স্বপ্ন বা দুঃখের ইতিবৃত্তের ভেতর দিয়ে। তা ছাড়া এমন একটা শিক্ষার মাধ্যমও যে শিক্ষার্থক না হ'লে শ্রোতাদের মন পেতে পারে না এ ধারণা বোধ হয় তাঁর ছিল না। তাঁর নিজের প্রতিভার অহঙ্কারে তিনি বৃষ্টি ভেবেছিলেন যে, তিনি যা দেবেন দর্শক তা মাথা পেতে নেবে।

কিন্তু দর্শক তা নিল না, আর ভয়ানকভাবেই হতাশ হলেন তিনি।

কিন্তু হতাশ হলেও হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। সিন চার রাত ঘুমোতে পারলেন না, স্ক্রিনিং তার অনেক ছেলেমাছবি উপেক্ষা করলেন তিনি, তার অনেক আবেগ প্রকাশ ব্যর্থ হোল, গভীর চিন্তার ফলে গেলেন সত্যতত্ত্ব।

একটা পথ করা দরকার। এভাবে নিজেকে ডুবতে দিলে চলবে না। আবার চেষ্টা করে টাকাটা না তোলা পথন্ত তাঁকে অবশ্যই ভেসে থাকতে হবে। একটা উপায় চাই।

উপায় স্থিরও করলেন সত্যতত্ত্ব। নিজেকে বঞ্চিত করে টাকার শোকে হা-হুস্তার না করে একটি সূচনীয় পছন্দ বেছে নিলেন তিনি। মুর্ত্তমান শোকে মত তাঁর বাইরের ঘরে বসে রইলেন সত্যতত্ত্ব।

সত্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটির ভার ছিল বীরেন দাসের ওপর

বীরেন দাস লোকটা এ লাইনে নতুন নয়, কিন্তু তার ছোট-খাট আয়োজনের মধ্যে দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে হয় তাকে। এ ক্ষেত্রে তার সুনাম হ'লেও অর্থ আসে নি। কারণ মাহুবাটা সতিই ভাল।

সত্যতত্ত্ব বেছে নিয়েছিলেন তাকে।

বই বিলিজ করবার দিন পনেরো বাড়ে বীরেন দাস এল তার বিলের দক্ষণ কিছু টাকা প্রাপ্তির আশায়।

আশার আতরিত্ত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা পেল সে। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তই বেজায় গভীর হয়ে গেলেন সত্যতত্ত্ব।

কথাটা যেন খঁড়াতেই পারছে না বীরেন দাস। ভাবগভীর হয়ে সত্যতত্ত্ব বলে চলেছেন কিভাবে দেশের গোটা সমাজ উৎসর্গে বাচ্ছে, লগবিয়ায় এখনকার ছাত্রসমাজ কিভাবে আনন্দ পাবার চেষ্টা করছে, গুণীর কদর না করার কিভাবে গুণীদের অকালমৃত্যু ঘটছে আর সব শেষে ঘুরে-ফিরে এক কথা ভাল জিনিস গ্রহণ করতে না পারার মত মুখতার কি পরিণতি হ'তে পারে। অবশ্যই আজ হয়ত সত্যতত্ত্বের মত গুণীয়েও এ জন্ত সাফার করতে হচ্ছে কিন্তু একমিল আসবে যখন...

অনেকক্ষণ শুনে বীরেন দাস।

ঘরে তার স্ত্রী অমলা আজ পাঁচ মাস ভুগছে আসবার সময় দেখে এসেছে বড় মেয়ে এক। হাতে কিভাবে প্রতিবেশীর কাছে থেকে চাওরা চাল এনে ভাতের ব্যবস্থা করে তার সস্তা মা আর ছোট ভাইকে সামলাচ্ছে। আজ ডাক্তার না ডাকলে নয়। চোট ছেলের অস্থখটা ক্রমশ বৈশ্যপথে বাচ্ছে। কিন্তু টাকা কোথায়? তাই টাকার একটা সম্ভাবনার আশার প্রায় আশাস দিয়েই চলে এসেছে সে এখানে, তার প্রাণ্য টাকার কিছুটা আজ শেলেও চলে যাবে। টাকার ভারি প্রয়োজন আজ তার তাই অবশেষে মরিয়া হ'য়ে বলে উঠল—

মিঃ সেন: একটা দরকারে এসেছিলাম আপনাদের কাছে। আজ কিছু পেমেট আশা করেছিলাম।

স্থিরদৃষ্টিতে বীরেন দাসের দিকে তাকালেন সত্যতত্ত্ব। কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি, তাঁর এই দুঃসময়ে পেমেট?

স্বভাবতই লাঞ্ছক বীরেন দাস।

তার প্রাণ্য টাকা চেয়ে সে বৃষ্টি অভয় করেছে, এমন একটা ভৎসনা সত্যতত্ত্বের চোখে দেখতে পেয়ে সে আত্মে আত্মে বলল, অন্তত শ'খানেক লাগবেই।

সত্যতত্ত্ব এখনও ঠগের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছেন পড়ি বুঝতে পারল সে। কিন্তু তবু না বললে নয় আবার স্তম্ভ ছেলের মুখটা মনে পড়ল তার, মনে পড়ল অমলার কথা, মনে পড়ল যেসবকি সে আসবার সময় আশাস দিয়ে এসেছে।

হাতের কাগজটা অনাবশ্যক পাকাতো পাকাতো বলল সে— বুঝলেন না? পাবলিসিটির ভূরু আমায় নিজেরও বেশ কিছু খরচ হয়েছে।

তা নতুন নতুন বিজিনেস করতে গেলে কিছু ইনভেস্ট যে করতেই হবে।

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন সত্যতত্ত্ব।

অবশ্য আমি এ ক্ষেত্রে নতুন নয়, তবু মেয়ে নিছি যে ইমডে

করতেই হয় সে কথা ঠিক ; কিন্তু রিটার্নের আশাও তো আপনার মত আমিও রাখি।

আমার সঙ্গে আপনার ফুলনা করবেন না বীরেনবাবু। আমার ইনডেক্সমেন্ট কত জানেন ?...খরচ কিছু না মনে করেন তো তা হলে আমি বলবো, বোধ করি আপনার সারাজীবনের আর।

তা জানি, কিন্তু আমার কাছে ঐ একশ' টাকাই যে লাখ টাকা মি: সেন।

হ'তে পারে, কিন্তু...

কিন্তু নয় মি: সেন, আমার মত গরীব লোকের পক্ষে...

বিনিময়ে তো গরীব-বড়লোক শোনে না।

গভীর হ'রে বললেন সত্যজ্ঞাত।

তা জানি, আমার তো সেটা বক্তব্যও নয়, কিন্তু আমি তো অল্প কিছু চাইছি না মি: সেন। এ তো দর না, এ টাকা তো আমার প্রাণ্য মি: সেন।

একটু বেশ জোর পেয়েছে বীরেন দাস।

হ্যাঁ, প্রাণ্য তা জানি।

গভীর হ'রে উত্তর দিকে তাকালেন সত্যজ্ঞাত। কিন্তু...সবকালে কি তার প্রাণ্য পায়? আমার প্রাণ্য বা সম্মান, অর্থ তা কি আমি পেয়েছি?

সে আমি...

বীরেন দাসের কথাটা শেষ করতে গিলেন না সত্যজ্ঞাত। হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে নিঃশব্দ বেরী থেকে একটু এগিয়ে এলেন।

তুমি মি: দাস! মানুষের স্বভাবই এই, পদ্মের কুঁড়ি তুলে এনে ফোটান হ'ল। লোকে ফুলটাই দেখল হাতটাকে তুলে গেল।...অবশ্য বলতে পারেন যে ফুল আপনিই ফুটত একদিন না একদিন। সে ক্ষেত্রে আমি বলব ফুটত কিন্তু তার সময়মত আর জলে থাকলে।

ব্রহ্মতে পারল না বীরেন দাস এ কথা এ প্রসঙ্গে আসছে কি ক'রে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে।

সত্যজ্ঞাত বক্তার আসনে যেন জোর পেয়েছেন, বলে চললেন—

বীরেনবাবু! এখানেই মজা। যে ফুল সময়মত ফুটত তাকে যে হাত সময় না নিয়ে হ্যাং শৈশব থেকে ঘোঁরনে উত্তীর্ণ করে দিল তাকে.....

মাথা ঘুরছে বীরেন দাসের। জানে কথার এই মারপ্যাট আজ আর শেষ হবে না। চলবে কথার মত কথার এমনি অর্থহীন বুনানি। কিন্তু তার পক্ষে বলে থাকা সম্ভব নয়। এখানে না হয় অল্প কোথাও চেষ্টা দেখতে হবে, টাকা আজ তার দরকারই। যে করে হোক টাকা তাকে পেতেই হবে।

আচ্ছা আজ উঠি। ভবে আশা করছি, নেকস্ট উইকে টাকাটা পাব নিশ্চয়ই। নমস্কার।

স্বাস্থ্য পাবে বেরিয়ে গেল বীরেন দাস।

কিন্তু অত সহজে ছাড়ল না অভিনেতা আর ছবির নায়ক নবেদু।

দু'-এক কথা বলবার পরই সত্যজ্ঞাত বুঝলেন, এ শব্দ জারগা। অত সহজে কেবল কথার বুনানিতে ভোলান যাবে না একে। কিন্তু লাইনে অভিজ্ঞ পোড়-খাওয়া ছেলে নবেদু। সত্যজ্ঞাত মত না হ'লেও

টাকা সেও চেনে। সুতরাং এক্ষেত্রে অল্প উপায় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

সোজা সূচরিতার কাছে চলে এলেন সত্যজ্ঞাত শোবার ঘরে।

গতরাতে সিনেমা থেকে ফিরেও বেশ অনেকক্ষণ জেগে ছিল তারা। বিশেষ করে কথা কাটাকাটি করে সত্যজ্ঞাত ঘুমিয়ে পড়লেও সূচরিতার ঘুম আসে নি অনেক রাত পর্যন্ত। অসম্ভব মাথা ঘরেছিল সূচরিতার, তাই বেলা অবধি বিছানার পড়েই এপাশ-ওপাশ করছিল।

খুব ব্যস্ত হ'য়েই ঘরে ঢুকলেন সত্যজ্ঞাত।

রীতা! এখনও ঘুমে? ব্যাপার কি?

হুঁ—

কি আজ উঠবে না না কি?

হেসে আবহাওয়া লঘু করতে চাইলেন তিনি। এখন রাগারাগির সময় নয়। তাই নিজেই শেষে বহুতা স্বীকার করার রকমের অল্প প্রস্তুত হ'লেন তিনি।

রীতা। ওঠ শব্দটি, নবেদুবাবু এসেছেন।

তা আমি কি করবো?

গভীর হয়ে বলল সূচরিতা।

ওর পাশে বসে বুকে পড়ে ওর কপালে চুমু খেলেন সত্যজ্ঞাত, কিন্তু সূচরিতার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

বাঃ! নবেদুবাবু এসেছেন দেখা করবে না?

নাঃ, আমার বড্ড মাথা ঘরেছে।

এ কিছু নয় উঠে পড়।

কিন্তু নয় বললে কি হবে? আমার মাথা ধরছে তো ছাড়া শরীরটাও ভাল লাগছেই না আমি এখন উঠে সাজ-পোশাক করতে পারব না।

ও কিছু নয়, একটু বোধ হয় হ্যাংডার হয়েছে। কাল অতটা ড্রিক না করলেও পারত।

ব্যাপারটা লঘু করতে চাইলেন সত্যজ্ঞাত?

সেজ্ঞা নয়, এমনিই শরীর খারাপ।

ওপাশ ফিরে শুয়ে প্রস্রাবটি উৎসর্গ করল সূচরিতা।

সত্যজ্ঞাত রীতিমত বিরক্ত হলেন। কতক্ষণ বসিরে রাখবেন নবেদুকে? সীমা আছে তো সব জিনিসের। একটা শব্দ কথা বুঝে গলে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বললেন—ও তোমার চোখ খুব খুঁচা খেলেই প্রানীকু কেটে যাবে? তুমি এসো কিন্তু তাড়াতাড়ি, আমি চললাম, উনি একা বসে আছে? এসো ঠিক।

বেরিয়ে গিয়ে আবার কি মনে করে ফিরে এলেন সত্যজ্ঞাত।

আচ্ছা! রবীন্দ্র কোথায়?

কি জানি। আমি তো বিছানা ছেড়ে উঠেই নি।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সূচরিতা বলল। রাত্রে একটু মনের কুয়াসা তার সত্যজ্ঞাতের আঁধারেই কেটে গেছে। ও ওঁরবার উপক্রম করল।

এবার ওঁঠ শব্দটি। আচ্ছা আমি দেখছি রবীন্দ্র কোথায়। ওর ঘর তো দেখলাম না ওকে, এই সন্ধ্যােই আবার ওপরে গেল না কি?

হুটকি হাসল সূচরিতা।



যত সামান্য কাটা-ই হোক, অবহেলা করবেন না —

# ব্যাণ্ড-এড\*

ফার্স্ট-এড ব্যাণ্ডেজ  
ব্যবহার করুন



একটু আধটু কেটে গেল বা ঘা হল, আপনি তেমন পরোয়া করুন না।  
সামান্যতক রক্তের ভাগতে হতে পারে। যদি তখনতখি  
তাহলে ধুয়েময়লা আর রোগজীবাণু হাত থেকে  
ভেতর জল চুকতে পারে না; অতিরিক্ত

\* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক

জনস

আপনি না—পরে কিন্তু তাই থেকে আপনাকে  
আপনি রক্ষা পাবেন। ব্যাণ্ড-এড, ফার্স্ট-এড, ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে নেন,  
—নাবধের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাণ্ডেজ আলাদা আলাদা মোড়কে থাকে।

এণ্ড জনসন  
সব ইন্ডিয়া লিমিটেড



তা হলে রবীনও সত্যি প্রেমে পড়ল ?

না না হাসি নয়।

ভেঙে থেকে সিগারেটের বিশেষ একটা টিন বার করে নিলেন সত্যব্রত।

সত্যি রবীন ভাবিয়ে তুললে। ১০০০য় অল্প কোন দিকে ইনটারেস্ট প্রো করলে কুন্ডিল। আমার খুবই কতি। অমন একটা হ্যাণ্ড আমি পাব কোথায় ?

কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে বলে ওর জীবনে কিছু হবে না না-কি ?

হওয়া উচিত নয়। ১০০০কিন্তু এখন থাক ১০০০হুমি তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসো কিন্ত, আমি যাচ্ছি।

উচিত নয়। আবার ক্র-কুখিত হল সুরচিতার।

সত্যব্রতর মতে সবকিছুই বিচার করতে হবে, প্রয়োজনের মানদণ্ডে।

আজ প্রায় তিন বছর তাদের বিয়ে হয়েছে এটুকু সে নিঃসংশয়ে জেনেছে যে, সত্যব্রতর কাছে প্রয়োজনের স্থান সব থেকে আগে। সেখানে কোন হৃদয়ধর্মের স্থান নেই। তখন তাঁর চুলচেরা বিচার। সেখানে তিনি বড় কঠিন, বড় নিষ্ঠুর।

প্রায় আধখণ্টা লাগল সুরচিতার সাজগোজ করতে।

অবশ্য সুরচিতার পক্ষে এটাকে যথেষ্টই কল্পসময় বলতে হবে। কেননা তার কাছে সাজ মানেই বিলাস, সাজ মানেই বিয়াট একটা কিছু। অল্প সাজতে সুরচিতা জানে না। তার বহু সময় যায় শাড়ি বাছতে, ছুখের এনামেল করতে আর অলঙ্কার নির্বাচনে। তা সে বাইরের ঘরেই বাওয়া হোক আর উৎসবেই হোক। প্রকৃতি বাইরের লোকের সামনে বেরোতে হলে তার চাই প্রচুর সাজপোষাকের আড়ম্বর।

ব্যালকাল থেকে সাজবার আকাঙ্ক্ষা তাকে দ্বন্দ্বন করতে হয়েছে দারিদ্র্যের জন্ত।

তারপর যৌবনে যখন সে খোকা মিত্তিরের আশ্রয় পেলে, তখন সে প্রাচুর্যে দিশাহারা হয়ে গেল। খোকা মিত্তিরের নিশ্চিত আশ্রয়ে অল্লাসালঙ্কার অর্থে সে নিজেকে শুধু ভাসিয়ে দিতেই শিখেছে। মাত্রা টানবার কথা তার একবারও মনে আসে নি।

শুধু সাজ বলে নয় ; কেনাকাটার ব্যাপারেও সে কখনও হ'বার ভাবে নি।

দোকানে গিয়ে শুধু একবার বলা, শাড়ির পর শাড়ির ছুঁপ বাজ্ঞ বন্দী হয়েছে শুধু তারই ইচ্ছেমত। গরনার পর গরনার তার গা ভরে উঠেছে, আর বেশি আরও বেশি, সীমাহীন প্রাচুর্যে খুশিতে আর আনন্দে ভরে উঠেছে সুরচিতা।

কতবার এমন হয়েছে শাড়িওয়ালার কাছে কোন শাড়ি পছন্দ করে নেবার জন্ত বাইরে থেকে শাড়িওয়াল। পাঠিয়েছেন খোকা মিত্তির। পুরো গাঁটই রেখে দিয়েছে সে, সম্বই তার যে পছন্দ, কি করবে সুরচিতা। আর হ' হাতে টাকা ঢেলে গেছে তার পারে খোকা মিত্তির।

কিন্তু শেষে তাতেও বৃষ্টি ক্লাস্তি এসেছে সুরচিতার। না হলে সব ছেড়ে সে বিবাহিত জীবনের গণ্ডীর জেতর এসে অখা হতে চাইবে কেন ?

তার কটির ওপর দুটির কোন ছাপ পড়ে নি। তবুও এই প্রাচুর্যের মধ্যেও তার প্রাণ বৃষ্টি মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠেছে, তার মনের অতি সংগোপনে সে বৃষ্টি লালন করেছে একটি ভীক আকাঙ্ক্ষার।

সে আকাঙ্ক্ষা স্ত্রী হবার, মা হবার। সেই ভীকমন তাই সজ্ঞেবে ভাল কেটেছে নিজের চেষ্টার, নিজের উদ্ধারের পথ ধরেছে, যে পথ সরল।

কিন্তু সেখানেও তার এতদিনের কটি, তার দৃষ্টভঙ্গী তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দাঁড়ায়। সহজ, সরল হ'তে গিয়েও যেন সে পাবে না। তার পৃথিবীটাই যেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। সেই পৃথিবীতেই সে ভাল করে বাঁচতে চায়।

তাই উৎসব, আনন্দ আর প্রচুর সাজগোজ করে খুশি থাকে সুরচিতা।

নবেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে সুরচিতাকে আহ্বান জানাল।

নমস্কার।

ছ'টি হাত জোড় করে বুক অবদি ঠেকিয়ে নিজস্ব এক বিশেষ কায়দার নমস্কার করল নবেন্দু।

প্রতি নমস্কার করে নীচু সোফাটাতে গেল সুরচিতা।

নীচু চেয়ারে বসারটাই সে পছন্দ করে। শাড়ির ভাঁজগুলি নাকি অন্যরাসে এতে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে পারে আর মেয়েদের বেশ কমন্সীয় দেশায়।

সত্যব্রতর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে তিনটে বইয়ে সুরচিতা আর নবেন্দু নায়ক-নায়িকার পার্ট করেছে। দর্শকদের মতে নাকি ওদের ছিল রাজ্যমণ্ডক।

অবশ্যই শুধু স্ক্র্যানেই নয়। ওদের মধ্যে অল্প একটু ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। একথাও বিশেষ অজানা থাকে নি কারও। কানাকানি হ'তে হতে খোকা মিত্তিরের কানও উঠেছিল কথাটা। তাঁর ব্যাকুলতাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সুরচিতা। যেমন নবেন্দু হেসে উড়িয়েছিল প্রস্তুতবাঁকেই।

স্বভাবতই কুড়িগুণে বেশ একটা। গজীর চাল নিয়ে থাকে নবেন্দু। তাই তাকে এ নিয়ে কোন কথা বলতে কারও সাহস হয় নি, আর সুরচিতা নিজে জানে যে সত্যি সত্যি নবেন্দুর কাছে এ প্রস্তুতবাঁটার কোন মূল্যই ছিল না।

সহজ নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে সুরচিতার ভীক মনও কোন অনিশ্চিত মারামুগের পেছনে ছুটেতে চায় নি। তাই সে পথ পরিভাগ করেছিল সুরচিতা সহজেই, খোকা মিত্তিরও নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

তা ছাড়া নবেন্দুর সঙ্গে ব্যাপারটা আরও কিছু এগোবার আর একটা বাধা ছিল সে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যত। চিত্রশিল্পে সে তখন নবাগত, তাকে আমল দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার মত হুঁজি সুরচিতার মনেও আসে নি।

তাই ঐ পর্বন্ত। কিন্তু একথা সুরচিতা আজও অস্বীকার করবে না যে তার নবেন্দুকে ভালই লেগেছিল আর নবেন্দুর--

সুরচিতার দিকে হুগুদুটিতে তাকাল নবেন্দু। সে দৃষ্টিকে লজ্জিত

## আর এক আকাশ

হ'ল সূচরিতা। আজ যেন নবেলু সূচরিতাকে আবার নতুন করে দেখল। আর সেকথা সে প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করল না।

আপনাকে এত নতুন লাগছে।

সূচরিতার চণ্ডা করে সিঁথি ভর্তি সিন্দূরের দিকে তাকিয়ে বলল নবেলু।

খুব বেশি ঘন করেই সিঁহুর পরে সূচরিতা। পাতিত্রয়ের জন্ত নয়। ওকে ভাল দেখার ব'লে। আপনার সঙ্গে বহুদিন বাড়ে দেখা, বিয়ের পর বোধ হয় এই প্রথম, না ?

হ্যাঁ তাই মনে হয়।

তাই আপনার নতুন লাগছে, না হলে আমার পরিবর্তন তো নতুন নয়।

তা ঠিক, কিন্তু বাই তোকে, আপনাকে ভারি স্মরণ দেখাচ্ছে এ বেশে... ভারি ভাল লাগছে।

কথাটা হৃৎকর বলল নবেলু সূচরিতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনদিনই দ্বিধা করে না নবেলু আর এখন তেঁা নই। বাংলার প্রথম সারির প্রথম নায়ক সে।

সত্যজ্ঞতর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল সূচরিতা। একজন মুগ্ধ যুবকের চোখে মুখে এই প্রশংসাতে বেশ খুশি হ'ল সে। কিন্তু সত্যজ্ঞত ? নবেলু এই উজ্জ্বল উনি ঠিকমত নেবেন তো ? এবটু নীচু গলার যেন অনেকক্ষণ পরে বলল, ধন্যবাদ।

কিন্তু সত্যজ্ঞত এ সব কিছুটা লক্ষ্য করলেন না। তিনি কথাটা পাড়বার অব্যয় খুঁজছিলেন, তাই প্রথম কথাটির পরই সমর নষ্ট না ক'রেই তিনি বললেন,—শোন! রীতা! নবেলুবাবু তো অত্যন্ত হাজারখানেক টাকা ইমিগ্রিয়েটলি চাইছেন, কি করি বল তো ?

রাতিমত ঘামতে লাগল সূচরিতা। রাগও তার হল প্রচুর। নবেলুর সামনে ঘরোয়া সংবাদন না করলেই কি চলছিল না ? তার ওপর সত্যজ্ঞতর এ খেলা নতুন।

পাণ্ডনারকে সামনে বসিয়ে একবারে সোজা হুজি তাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়ার এ পদ্ধতি সত্যজ্ঞতর নতুন চাল। অথচ ব্যবসার আর ব্যয় প্রকৃতপক্ষে সূচরিতা কিছুই জানে না।

কি টাকা পাবেন নবেলুবাবু। মাত্র হাজার টাকার জন্ত নিজে এসেছেন ? কেন টাকা কি তাঁকে দেওয়া হয় নি পুরো ? তবে ?

অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল সূচরিতার মনে। সে কি বলবে ? কি করতে পারে সে ? কিছুই তো জানে না সে। প্রেমজন ছাড়া তাকে তো কোন কথাই জানান না সত্যজ্ঞত। সেও মাথা ঘামতে চায় না। তবে ? আজ হঠাৎ নবেলুবাবুর সামনে তাকে এ প্রশ্ন করার অর্থ কি ?

ওকে নীরব দেখে সত্যজ্ঞত যেন ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। সূচরিতার চোখের বিষয় তার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তিনি নিজে থেকেই ভাড়াভাড়ি বললেন,—

মানে ঠর পাওনা পনের হাজারের সাত হাজার দেওয়া আছে, বাকিটা...অবশ্য আমি লজ্জিত। কিন্তু কি যে করি নবেলুবাবু... আমার যে সেকটু চলেছে তাতে...আমি সত্যিই লজ্জিত।

না না লজ্জা পাবার কি আছে ? লজ্জিত হবার কোন কারণই নেই।

একটা সিগারেট ধরাল নবেলু। তারপর বেশ গা ছড়িয়ে বসে ঘোঁয়ার সিঁ ছাড়তে লাগল।

আশাবিত হলেন সত্যজ্ঞত।

সে আমি জানি নবেলুবাবু। আপনি সত্যিই মহৎ ব্যক্তি।

না ঠিক ততটা নয় মিঃ সেন, বতটা আপনি ভাবছেন।

কি যে বলেন।

বিনয়ে গলে গেলেন সত্যজ্ঞত। আর ঠর প্রায় কাছেই ঘোঁরা ছেড়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নবেলু ঠর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির সামনে বলল : বুঝতে পারলেন না আমার কথাটা।

কি কথা ?

সত্যজ্ঞতর মত লোকও যেন বোকা হয়ে গেলেন।

একটু হেসে সামনের দিকে বুকু পড়ল নবেলু। তারপর একবার সূচরিতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে সোজা গলার বলল টাকা আমার আজ চাইই। তাই বদহিলাম অনর্থক নিজেকে লজ্জিত করবেন কেন ?

শীত দিয়ে চোট কামড়ালেন সত্যজ্ঞত। মাটি সত্যিই শক্ত। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কেন ? হাতের টাকা বেরিয়ে গেলে কয়েকটি রেখা ছাড়া আর হইল কি ?

তাই যাড়টা একটু বেকিয়ে সূচরিতাকেই যেন বললেন।

সত্যি রীতা, নবেলুবাবুর পরিচাসজ্ঞান বেশ সূক্ষ্ম। না!

সজোরে কথাটা বলে টান টান হয়ে বসলেন সত্যজ্ঞত।

পরিচাস আমি করছি না সত্যজ্ঞতবাবু। আমার সময় কম। চেকটা একটু ভাড়াভাড়ি দেবেন। ক্যাশ দিতে বোধ হয় অসুবিধে হবে।

নবেলুবাবু।

এইবার সত্যজ্ঞত প্রয়োজকের গাশীর্ষ মুখে এনে নিজের ব্যক্তিককে স্মরণ করলেন যেন।

আপনি জানেন এই বইটা আমার টাকা দিতে পারে নি। স্মরণে আমার এই হিউজ এশটাব্লিশমেট মিটিয়ে আপনার টাকা দিই কোথা থেকে ?

জাটসু নট মাই লুক্ আউট।

সজোরে বলল নবেলু।

আপনার টাকা বেশি আসলে কি আমার বেশি করে দিতেন ?

মুখ শক্ত করে বসে থাকলেন সত্যজ্ঞত। নবেলুই আমার বলল,—জানি নিতেন না...খা ছিল বই বিলিজ করলে বাকি টাকাটা পাব। যদিও চুক্তি অনুযায়ী আরও বহু আগে—কন লাক্স স্ট্রাটিং ডে আমার বাকি টাকা আমি ক্রেম করতে পারতাম। কিন্তু করি নি...কেন তা আপনি জানেন।

জানি কিন্তু.....

ধীরে ধীরে বললেন সত্যজ্ঞত।

জানেন তো বটেই, আপনারই ব্যক্তিগত জুরোধ, আর আপনার প্রথম প্রয়োজনা, তাই আমি কোন জোর করি নি, বোধ হয় আমার দিক থেকে কোন অভ্যুত্থাও প্রকাশ পায় নি। কিন্তু আজ তিন মাসের ওপর বই বিলিজ করেছে, আপনি কি টাকা দিয়েছেন ?...সেন নি।

কোন উত্তর না দিয়ে হাত দু'টো মুঠো করে হাতের দিকেই তাকিয়ে বসে রইলেন সত্যব্রত।

আমিও অবশ্য চাই নি, সেটা আমার ভয়ত। কিন্তু আর নয় সেন, ইটস হাই টাইম।

আমি তা জানি।

এতক্ষণ কথা বললেন সত্যব্রত। কিন্তু একটা কথা কি ভেবে দেখেছেন নবেন্দুবাবু?

কি কথা বলুন!

জানেন কি? আমার খুচরো খরচই দিন পাঁচশ' টাকা।

তাতে কিছু আসে যায় না। আমার লৈনমনি খরচ তার ইত্তর হ'তে পারে। তার জন্ত অল্প লোকে তার প্রাপ্য ছেড়ে দবে?

শ্রদ্ধা অস্বস্তিতে রীতিমত বামতে লাগল সূচরিতা।

ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সত্যব্রত আবার বললেন জীয়ে হয়ে।

শুধুন, নবেন্দুবাবু। সকলে কি তার প্রাপ্য পায়? আমি কি আমার প্রাপ্য স্বার্থ সম্মান বা অর্থ কিছু পেয়েছি? আমি--

বাধা দিল নবেন্দু।

সম্মান কি পেয়েছেন জানি না, কিন্তু অর্থ পেয়েছেন আপনার গোপালও অনেক বেশি।--অবশ্যই নানা খাতে।

সূচরিতার দিকে একবার তাকাল নবেন্দু। আমি যাই।

সূচরিতা উঠে গাড়াল।

তার ফর্সা মুখটা টুকটুক করছে, মুখটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।

উঠছেন নাকি?

নবেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে গাড়াল। সেও যে বেশ উত্তেজিত রয়েছে, তার টুকটুক মুখ দেখলে বেশ বোঝা যায়।

মাগ করবেন মিসেস সেন, আমি সত্যিই লজ্জিত। আপনার মনে কোনরকম ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করা আমার অভিজ্ঞত ছিল না।

আমি জানি।

শীত দিয়ে হোটটা শক্ত করে চেপে তার লোটান জ্বাচলটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সূচরিতা।

নবেন্দুও ঘাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে বলল, শুধুন সত্যব্রতবাবু! কেলেবেলা আমাও ডাইভারকে পাঠাব। চেকটা ওর হাতে কাইগুলি দেবে। হ্যাঁ ওর হাতেই রিসিট পাঠাব।--নমস্কার।

নবেন্দু গাড়ির কাঁটার শব্দ শোনা পর্বন্ত পাখরের মত গাড়িয়ে ইলেন সত্যব্রত।

তারপর হঠাৎ তাঁর মুঠি পাকান ডানহাতটা নিজের জজ্ঞাতেই মন আলগা হয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন সত্যব্রত।

ঘরের মুহূর্তী আলোতে দেখতে পেলেন সূচরিতা চোখের ওপর ত চাপা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কি হ'ল রীতা? ঘুমোও নি এখনও?

কোন উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুল সূচরিতা। ওর পাশে বলে জর্জ হাতটা নিয়ে তাতে আলগা চুষ খেলেন সত্যব্রত।

শোন, সারাদিন বাড়িতে ছিলাম না বলে রাগ করছে বুঝি?

রাগ কেন?

হাতটা টেনে নিয়ে অত্যন্ত নিম্পা হুগায় উত্তর দিল সূচরিতা।

তা হলে রাগ কর নি তো! আমার--

তোমার কাজ থাকতে পারে তো।

হ্যাঁ, কাজই ছিল রীতা। তাই খাওয়াটাও বাইরেই সেরে নিলাম খেয়ে এসেছি?

হ্যাঁ।

তা হলে ওদের ফল দিতে হবে। উঠে পড়ল সূচরিতা।

কাদের?

বাঃ, হরিপদরা এখনও বসে আছে তো?

কেন, তুমি খেয়ে নাও নি?

কোনদিন খাই?

তা খাও না! তবে আজ যখন এত রাত হল--

হাত ওপাতে তো জানি না, কি ক'রে জানব বল।

না রীতা, বসন্ত রাগ কর নি কিন্তু সত্যিই রাগ করেছে।

না!--

বেরিয়ে গেল সূচরিতা।

একটু পরেই সূচরিতার খাবার দিয়ে গেল হরিপদ। সূচরিতা হাত ধুয়ে এসে খেতে বসল আর এই সহজ, নিম্পা ভাব দেখে এবাক না হয়ে পারলেন না সত্যব্রত।

রীতা। বিরাট একটা স্বপ্নবর।

কি?

গোপাল বাস্কারিয়াকে এবার টানতে পেরেছি! আমার নেকশ্ট প্রডাকসানের অধিকার বেশি টাকা দেবে ও। আর সমস্তটাই ইন প্রোডাকশন।

বিশ্মিত হয়ে তাকাল সূচরিতা।

উৎসাহে আর আনন্দে সত্যব্রতের চোখ দু'টো জলজল করছে।

ভাব তো কি ক'রে এটা সম্ভব হল?

ঠিক পাবে টাকাটা?

একটু আশাবিহীন হ'ল সূচরিতা।

নিশ্চয়ই!

জোবের সঙ্গে বললেন সত্যব্রত। তা হলে তো ধারের টাকাগুলো সব শোধ করে দেওয়া যাবে।

ধার শোধ?

সত্যব্রত হেসে উঠলেন সত্যব্রত। সেই আশায় আছ নাকি তুমি?

কেন?

সত্যিই এবাক হ'ল সূচরিতা। তুমি কি ভাব কখনকালেও এদের ফুল পেমেন্ট করব নাকি আমি? পাগল?

তা হলে?

কি তা হলে? দিনের পর দিন এই সব অপমান সহ্য করবে?

কিদের অপমান?

বাঃ, অপমান নয়? আমি তো ভাবতেও পারি না।

খাওয়া বন্ধ করে বলল সূচরিতা।

খাও খাও। আরে তুমি বড় বেশি সেন্টিমেন্টাল।

কিসে?

# নিশ্চিন্ত বিগ্রাম

‘জাহ্নবীর দিনে মানুষের চিত্তের আর শেষ  
বেই। চিত্তা যখন নিত্য সঙ্গী তখন নিশ্চিন্ত  
বিগ্রামের স্বযোগে যে জনেই সঞ্চিত হয়ে  
উঠবে সে আর বেঁধী কথা কি ? নিত্য নূতন  
সমগ্যা মানুষের হৃদয় আর মস্তিষ্কে যখন  
বিকল করে আনন্দ তখন সেহে আর মনে আসে  
অপরিসীম হ্রাস্তি—বেশীর ভাগ পাইই তাই  
কাটে যিনিদ্রায় যা বিকল্প নিদ্রায়।

জাহ্নবীর তেল মাখা ঠাণ্ডা হাতে তাই নিশ্চিন্ত  
জাহ্নবীর তেল ব্যবহার করলে পানিকট  
নিশ্চিন্ত বিগ্রাম যে সুস্তর তা এ বাজারেও জোর  
করে বলা চলে।



তেল তৈরি

## জাহ্নবীর



সি. কে. সেন এন্ড কোং প্রাইভেট লি.  
জাহ্নবীর হাউস  
কলিকাতা-১২

১, টাকার্স' ভেনু, ব্রডওয়ে, মাদ্রাস-১

১০/১১/১২/১৩

ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের সেদিন হইতে সূত্রপাত। কনের পটভূমি সেদিন হইতে জগদ্বাসী। তাঁহার ঈশ্বরমত প্রতিভা সেদিন হইতে 'বিশ্বময় দিয়েছে তাহা ছড়ারে।' জওহরলালের মধ্যে নতুন ভারতের ঐতিহ্যবি সেদিন বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইল। নেহরুজীর আলোর স্বাধীন ভারতের স্বরূপ জগতবাসীর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিল। তাঁহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা ও চিন্তাধারার সজীবতা এবং দুর্ভিক্ষীয় বসিষ্ঠতা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ নবভারত গঠনে শক্তি ও উদ্দীপনা জোগাইয়াছে। এক পরিমীলিত মন ও মার্জিত চরিত্র এবং মাহুকের কল্যাণরতন মূল্যন করিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার দুর্বার জয়যাত্রার সূচনা যাহার পরিণতি যেমনই গৌরবোজ্বল তেমনই সার্থকতার ভরপুর। নেহরু উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, পারমাণবিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রী ছাড়া আন্তরিক পৃথিবীর স্বাধীনতা বিত্তীয় পথ নাই। সেই নীতিই তিনি অগ্রসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি সেই নীতি অঙ্গুসারে পরিকল্পিত।

মৃত্যুর পর জন্ম হয় কি হয় না বিষয়টি আজো বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু, জন্মের পর যে মৃত্যু হইবেই অনিত্য এই মামবজীবনে ইহা আপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। মৃত্যু জীবনের হিসাবনিকাশের চরম নিশ্চিন্তি, জীবনের প্রব পরিণতি, ইহাকে অস্বীকার করার কোন উপায়ই নাই। তথাপি মৃত্যু আমাদের মধ্যে বেদনার মূর্তিতেই কখনো কখনো দেখা দেয় যখন তাহার আগমন আমাদের নিকট হইতে কোন অতি অপরিস্রবকে চিরতরে বহুদূরে সরাইয়া লয়। যে সময় নেহরুজীর নেতৃত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা, মানব জাতির কল্যাণার্থে বিশেষ শাস্তিহাণ্ডার প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক, নিষ্ঠুর নিয়তি ঠিক

সেই সময়েই তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে সরাইয়া লইল। তাঁহার গৌরবে সমুজ্বল আদর্শ জীবনের ঘটনাবলি বিচিত্র নাট্যে বহুনিবন্ধপাত ঘটাইয়া একটি বৃগের অবসান ঘোষণা করিল। সমাপ্তি ঘটিল ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ে। নেহরুজী নাই, এ বেদনা হৃৎসহ কিন্তু শোক-কবলিত হইলে আমরা মহৎ কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা প্রদর্শন করিব।

মহাকালের দরবারে তজ্জনিত বিরাট অপরাধে আমাদের অপরাধী হইতে হইবে। নেহরুজী রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার আদর্শ, ভাবধারা, পরিকল্পনার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন নতুন পথের। শক্তি, সাহস ও প্রেরণা দেশবাসী তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছে অক্ষুণ্ণ। আর তাঁহার উত্তরাধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। সেই বিরাট শক্তিশূন্যের উত্তরাধিকারী চ্যুতলাশ কোটি নয়নারী, মাখার উপর বাহাদের হিমালয় দণ্ডায়মান, পদপ্রান্তে বাহাদের কঙ্কাকুমারিকা বিরাজিত। তাঁহার স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তোলা, তাঁহার আরক কাদকে সম্পূর্ণতার উপনীত করা, তাঁহার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানই আমাদের আজ এক শ্রম পবিত্র কর্তব্য এবং তাহাই লোকান্তরিত দেশনায়েকের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। ইহা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সংগঠক উদ্যোগ। উচ্চাসের বশীভূত হইয়া নিছক ভাবার সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে একই বখার পুনরাবৃত্তি করিয়া দিনের পর দিন আত্মজ্ঞান করা বখার নেহরুবন্দনা নয়। প্রকারান্তরে তাহা জাতীয় কর্তব্যে চরম অবহেলা হিসাবেই গণ্যনীয়। আমরা লক্ষ্য করিতেছি নেহরুপ্রায়ের বিশাজোড়া শোকের মিছিলে কোন কোন স্বাধাধেয়ী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কুন্তীরাঙ্গ বিসর্জন করিয়া তাঁহার বা তাঁহাদের নামের সাহিত নিজস্বের নাম জড়িত করিয়া অতি নিন্দনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন বা দিতেছেন। সম্মুখে এখন আমাদের বিরাট কর্তব্য, তাঁহার স্বপ্নের, সোনার, সাধনার ভারতভূমির যে বর্ষাদা তিনি বহুগুণ বিবধিত করিয়া গিয়াছেন তাহা অটুত রাখার দায়িত্ব সর্বাঙ্গে এবং বিশেষ নিষ্ঠার



সহিতই পালনীয়, তাঁহার পতাকা। সপোরে উজ্জয়মান রাখার কর্তব্য হইতে বিনম্রাঙ্গ বিচ্যুত হইলে চলবে না। তাঁহার বিরাট অপরাধের অঙ্গকানের মধ্যে আলো দেখাইবে, দেখাইবে পথ, সরবরাহ করিবে শক্তি, সাহস, প্রেরণা। আমরা মনে কৈরি, আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার মত বিরাট চরিত্রের মৃত্যু হয় না, কামাগতভাবে না হইলেও তাঁহার করণের মধ্যে, আদর্শের মধ্যে তিনি জীবিত। সেই আদর্শের মধ্যেই নিয়ত অনিত্য হইতেছে—‘আমার জীবনে লজিলা জীবন ভাগো রে সকল দেশ।’

‘নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি’ বলিয়া তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত, জীবনের উদ্দেশ্যে বন্দনা জানাইতেছি।

## স্বাগত লালবাহাদুর শাস্ত্রী :



শ্রীঅতুলকুমার

নেহরুর আর এক নাম ব্যক্তিত্ব, নেহরুর নামটি উল্লেখিত হওয়া মাত্রই এক ধরার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি নির্দেশিত হয়। একক নামকরণ যে কতখানি শক্তিশালী, তাহার প্রভাব যে অনতিক্রম্য জওহরলাল নেহরু তাহার এক জাফল্য দৃষ্টান্ত। ভারতের রাজনৈতিক গগনে এ যুগে জওহরলাল ছিলেন রশ্মিমান দিবাকর। তাঁহার পুস্তকহানে অস্ত্র কাহাকেও চিন্তা করা তাঁহার জীবদ্দশায় যেকোন ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব ব্যাপার। বিস্তৃত আমাদের পূর্ব কথাবই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, এ ভারতবর্ষ জওহরলালের, তাঁহার আকর্ষক প্রেরণার তিন ঘণ্টার মধ্যেই গভীর শোকের বেদনাহত মুহূর্তে



শ্রীঅশোককুমার সেন

১৯৬৪ সালের ১ই জুন সারা ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন। যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্যসম্বিত। ভারতের ভাবীকালের ইতিহাস পরম সমাদরে চিরকালের ভিত্তিতে এই দিনটিকে বঞ্চে ধারণ করিয়া রাখিবে।

আধুনিক ভারতের রূপকার, মহিমার জগদ্বৃদ্ধি এশিয়ার এই তীর্থক্ষেত্রে ভারতের প্রাণস্বরূপ মহানায়ক জওহরলাল নেহরুর আকর্ষক তিরোধানের পর সারা বিশ্বে কেবল একটি জিজ্ঞাসাই ধানিত প্রাতিধানিত হইতেছিল। বিশ্বের যত্নে-যত্নে, নগরে, প্রান্তরে, গ্রামে-গ্রামে, কোটিকোটি মানুষের মুখে সেই একই জিজ্ঞাসার প্রাতিধানি—নেহরুর পর কে? After Nehru Who? রূপান্তর রাষ্ট্রনায়ক হইতে সাধারণ মানুষ কেহই এ চিন্তা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন নাই।



শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

ভারতরাষ্ট্র তাহার অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিয়া লইল। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। এক সপ্তাহের মধ্যে নেহরুর ভারত বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিল যে এই বেদনায় কৃকণ্ডন মুহূর্তে গভীর শোকের ত্রিধাম রক্তনীতেও ভারতরাষ্ট্র তাহার নবনায়ক নির্বাচন করিয়া এক মহৎ রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পরম গৌরব সহকারে পালন করিয়া লোকান্তরিত আচার্য, গুরু, মেতার সম্মান ও মর্যাদা সদস্যদে রক্ষা করিল।

নূতন নায়কের ভূমিকার এবার ভারতরাষ্ট্রের বঙ্গমকে দেখা দিলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। নেহরুজীর মন্ত্রশিষ্য, দীর্ঘ দিনের সচিব,

পরম বিশ্বস্ত অগ্রগামী লালবাহাদুরকে সারা দেশের সহিত আমরাও স্বাগত জানাইতেছি। নেহরুজীর পুণ্য-মুখি বিজড়িত আসনে অভিযুক্ত শাস্ত্রীজীকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিমন্ত্রন নিবেদন করি।

ভারতের এ যুগে ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষেপে এক বিবর্তন মুহূর্তে লালবাহাদুরের আবির্ভাব। একদিকে চীন, পাকিস্তান অন্তর্দেশিক কান্দীর তাহা ছাড়া আন্তর্জাতিক সহস্র সমস্যা, এই সমস্যার কটকাকারিণ পথ অতিক্রম করার নেতৃত্বও লালবাহাদুরকেই লটতে হইবে, এই পথ অতিক্রম করিয়া সার্বকলতার, সকলতার, সর্বপ্রাণির জগতের সম্মান ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে তাঁহাকেই দিতে হইবে। বহিঃশক্তির অগ্রসরণের আশঙ্কার ভীত ভারতবাসীর প্রাণে সাহস শৌর্য বীজ জোগাইবার ভারও তাঁহার। ত্রুট, চকিত ভারতের নরনারীকে সাহসে, প্রাণীপু করিয়া তুলিবার পুণ্যব্রত আজ তাঁহারই, শত শত কুপার ভারতীয়ের মুখে কুণার অন্ন তুলিয়া দিতে তাঁহাকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুজী ভারতের যে গৌরব বিবর্তিত করিয়া গিয়াছেন বিশেষত বিশ্বরাজনীতির দরবারে ভারতকে পুণ্যভাগের একটি মুখ্য আসনে তিনি অধিষ্ঠিত।



শ্রীচম্পদন কবীর

কিরিয়া গিরিচ্চেন বাহার ফলে সারা জগতে ভারতচেনা আজ এত ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর এবং উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর। সেই বিশ্বব্যাপী ভারত চেননা বাহাতে বিশ্বমাত্র মান না হয় সেমিকে সলা সতর্ক দৃষ্টি রাখার গুরুদায়িত্ব শাস্ত্রীজীর।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজী নবগত নন। বাট বংসর বংস এই নূতন প্রধানমন্ত্রী কৈশোর চইতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত জড়িত। ভারতমাতার মুক্তকামনার যে গণনাভী ভারতসত্তান আপন মুখ, বাণ, নিশিত ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়া মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইরাছেন এবং বাঁহাদের আত্মত্যাগে ভারতের সোনার অঙ্গ বিদেশীর পালনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছিল শ্রীশাস্ত্রীও তাঁহাদের অঙ্গতম। দীর্ঘকাল ধাবৎ কংগ্রেসকে তিনি নানাভাবে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। উত্তর প্রদেশের পূর্ব-মন্ত্রিসভার এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অঙ্গতম সদস্যরূপে তিনি যে কৃতিত্ব, নিষ্ঠা, আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও অবিস্মিত নয়।

নেহরুর নারকেৎ কংগ্রেসের শেষ স্মরণীয় কীর্তি ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শপথ গ্রহণ। এই শপথকে কাঙ্ক্ষিত করার দায়িত্বও বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই। আমরা আশা করি, জনগণের চুপ-সুখী, অভাব-অভিযোগ মোচনে শাস্ত্রী-সরকার অধিকতর যত্নবান হইবেন, দেশের খাদ্যসমৃদ্ধতা, বৈদ্যক সমস্যা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করিবেন, ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং পররাষ্ট্রনীতি আরও বশিষ্ঠ এবং সুব্যবস্থ করিবেন। সর্বোপরি কান্দীর এবং চীন, পাকিস্তান, জাক্ষাট সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যোচিত সাহায্য প্রদর্শন করিবেন। নেহরুজী ভারতের সর্ববিধ উন্নয়নের জন্ত যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইগুলি শাস্ত্রীজীর দ্বারা বাস্তবে পরিণত হউক ইহাই আজিকার ভারতবাসীর নির্বিচল কামনা।

শাস্ত্রীজীর মন্ত্রিসভার যোগদান করিলেন জাতীয় কংগ্রেসের তান্ত্র

সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের রাজনৈতিক জগতের তিনি একটি উজ্জ্বল তারকা। উত্তরোত্তর তাঁহার কর্মকর্তব্য দেশের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এবং পিতার আশ্রয় অমুসরণ করিয়া তিনি একান্ত স্বকীয়তার পরিচয় দিন ইহা সারা দেশবাসীর কাম্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই নবগঠিত মন্ত্রিসভার—নেহরু মন্ত্রিসভার দুইজন বাঙালী সদস্য সদস্যমানে স্থপদে বহাল রহিলেন। এই দুইজন—আইন ও যোগাযোগ-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এবং পোটোলিরাম ও রসায়ন-মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্নকুমার দেও স্থপদে বহাল রহিলেন। মন্ত্রিসভার কিছু রদবদল হইলেও বাঙালী মন্ত্রীদের দপ্তরে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ইহা মূলতঃ আশীর্ষ ও আনন্দের বাতীর্ঘ। ইহাতে তাঁহাদের অসাধারণ স্বয়ংক্রিয়তা, দক্ষতা এবং কর্মব্যগ্রগুণ ব্যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে এবং বাঙালী মন্ত্রীরা যে কতখানি নির্ভরযোগ্য এবং অপরিহার্য তাহাও প্রমাণিত হইল। নেহরুজীর প্রয়াণের পর নবনায়কের নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব স্বচাঞ্চল্যে বাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যে পালন করিলেন বাঙালী জননায়ক অতুল্য ঘোষের নাম এ প্রসঙ্গে সর্বিশেষ উল্লেখনীয়। বিশ্ববরেণ্য দেশনায়কের আকস্মিক তিরোধানজনিত বিরাট শূন্যতা এবং সুগভীর বেদনার সঙ্কটে ভাসমান ভারতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নির্বাচনে শ্রীঘোষ যে অভাবনীয় দৃঢ়তা, বশিষ্ঠ মনোভাব, সুচিন্তিত বুদ্ধি, অপরিণীম দক্ষতা এবং বিশেষত সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন এই অল্পদিনে এত বড় একটি বিরাট সমস্তার এত সহজভাবে সমাধান করিয়া তাঁহা তাঁহাকে আজ সর্বভারতীয় সমাজের যে আস্থা এবং বিশ্বাস আমিরা দিল তাহা তুলনায়হিত বলিলেই চলে। তাঁহার কর্মকর্তব্য আজ শুধু বাঙালার মধ্যেই গভীর নয়। সমগ্র ভারতজোড়া পটভূমির উপর তাঁহার কর্মক্ষেত্র সংগৌরবে সুবিস্তৃত। এই সাফল্যের জন্ত আমরা তাঁহাকে ও আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। ২৭এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১

## ॥ শোক-সংবাদ ॥

### যোগেশনাথ গুপ্ত

ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিল্পসাহিত্যিক যোগেশনাথ গুপ্ত গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ৮২বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বিক্রমপুরের বিখ্যাত সন্তানদের ইনি অঙ্গতম। ছইয়ণ্ডে ব্রহ্মপুত্রের ইতিহাস রচনা করে, ইনি প্রবীণস্বাক্ষে সমাদর লাভ করেন। বঙ্গের মহিলা কবি, শাখ রামপ্রসাদ, ভারত মহিলা প্রমুখ কয়েকটি পাদিত্যপূর্ণ এবং তথ্যবহুল গ্রন্থ তাঁহাকে গবেষক জগতের একটি বিরাট আসনে সমাসীন করিয়াছে। দশখণ্ডে বিখ্যাত শিল্পবিষয়কোষ শিল্পভারতী তাঁর কৃতিত্বের আর একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দ্বিবিদ্য লেকচারার'-এর সম্মানে সম্মানিত করেন। বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদ, রবিবাসর প্রমুখ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

### হিমায়ন্ত রায়

খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ হিমায়ন্ত রায় গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। কার্ডিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ও সভাপতির আসনে ইনি দীর্ঘকাল সমাসীন ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) সভাপতির আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

[ বি বহুবলী আইনজীবী নিমিত্ত: কলিকাতা, ১৩৭১ বিপিবহিবাহী দাদুলী ট্রাট হইতে শ্রীকুমার ভববহুবাহী কত্ব কৃতিত্ব ও প্রকাশিত ]



# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকা-সমালোচনা

### লেখিকার জীবন

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, ১৩৭০ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রচ্ছদে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মৌলানা শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের লেখা 'কণ্ঠস্থ'তে ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যার প্রকাশিত 'সন্ন্যাসিনী সজ্জা দেবী' আখ্যায়িক শ্রুতিকথার ছুটি ভুল ঘটিয়াছেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকার ও অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাহিরে থাকতে এই চিঠিখানা প্রতিদিন আমার দুটিগোচর হয় নাই বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্রথম কথা—আমি শ্রদ্ধেয় সজ্জা দেবীর মূখে যাচা শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (১) শ্রীযুক্তা সজ্জা দেবীর সন্ন্যাসনামের নাম 'স্বরূপানন্দ পর্বত' সম্বন্ধে আমি নিজেরই কৌতূহলী হইয়া 'পর্বত' কথাটির অর্থ জানিতে চাওগার তিনি বলিয়াছিলেন, হুদাদী সম্প্রদায়ের 'গিরি' প্রকৃতি সজ্জা প্রকার সম্প্রদায় জ্ঞাপক পদবী থাকে, পর্বতও সেই প্রকার একটি পদবী। (২) আমি শ্রীযুক্তা সজ্জা দেবীর মূখে শুনি নানা সদৃশ্যে বিভূষিত ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মহর্ষিদের পুত্রস্বত্বে নিজের নিকটে রাখেন এবং পরে তাঁরই মনোনীত ঠাকুরবাড়ীর একটি কুটার সঙ্গে বিবাহ দেন এবং নিজের জমিদারী সেরস্তার কাজ দেন। শ্রদ্ধেয় মৌলানা মহাশয় লিখিয়াছেন—মহর্ষিদের উত্থাপক ধর্মপ্রচার করিতে ডাকেন,— তিনি কখনও জমিদারী সেরস্তার কাজ করেন নাই। এ বিষয় হঠকত তাঁহার কথাটিকে, কারণ তিনি তাঁহার পুত্র—মার আমার শোনা কথা। আমি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যদি তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষেত্রের সন্ধান করিয়া থাকি, তবে তাঁহার জন্ম নিতান্তই দুঃখিত। ইতি—বিনীত—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা—২১।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, 'চাংজন' শিরোনামের 'মাসিক বহুমতী'তে প্রকাশিত প্রবাস্ত ব্যক্তিদের জীবনী সত্যিই সুখপাঠ্য। এইসব কৃতিপুরুষ ও মহিলা সম্বন্ধে জানবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অল্প কোথাও সে সুযোগ মেলে না। একমাত্র আপনাদের পত্রিকা মাত্রই সে ইচ্ছাপূরণ হয়। আপনাদের এই সাধ প্রচেষ্টার জন্য অল্পশ্রমকর হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'কণ্ঠস্থ'র লেখিকা অমিয়া দেবীও আমাদের ধন্যবাদ। তাঁর লেখার মাধ্যমে অধুনাবিস্মৃত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের টুকটাকি ঘটনার কথা জানিতে পারি। কিন্তু কৌতূহলের বোধ হয় সীমা নেই। তাই আরো অনেক নাম মনের দরজায় এসে ভিড় করে। হয়তো আপনাদের তালিকার তাঁদের নাম আছে; কিংবা হয়তো নেই—এই মনে করেই আপাতত কয়েকজনের নাম নীচে জানালাম—

1. S. K. Banerjee, Chief of Protocol.

2. P. C. Bhattacharya, Governor, Reserve Bank of India.

3. G. C. Chatterjee, Chairman, All-India Secondary Education.

4. Ela Reid (বাঙালী মহিলা), Director of Publicity, ISCON.

5. Air Vice-Marshal Ranjan Dutt, I. A. F.

6. B. Banerjee, I. G. of police, Delhi.

7. R. N. Banerjee, I. C. S. (Ex-Chairman U. P. S. C.)

8. B. N. Chakravarti, I. C. S.

9. B. R. Sen, I. C. S.

10. Dr. U. Bhattacharya, Chief Metallurgist, T. I. S. C. O.

11. A. Banerjee, Administrative Director (?), Ashok Leyland Ltd, Bombay.

12. Soami Nath Banerjee, Well-known Industrialist, Delhi.

এঁরা সকলেই কৃতবিশিষ্ট, উচ্চপদস্থ এবং সর্বোপরি সুশ্রুতিশ্রুত প্রবাসী বাঙালী। আপনাদের সুযোগ এবং সুবিধামত এঁদের জীবনী প্রকাশ করলে বিশেষ বাহিত হবে। নমস্কার জানিয়ে।

### জনৈক পাঠক

মহাশয়, চৈত্র (১৩৭০) সংখ্যা মাসিক বহুমতীর সঙ্গে পাঠানো কার্ড পড়ে জানলাম যে, নতুন গ্রাহকেরা ১৮টি সংখ্যার জন্য ২০ টাকা দিবে। অর্থাৎ আমরা বারো পুরাতন গ্রাহক তাদের উক্ত ১৮টি সংখ্যার জন্য ২২১০ টাকা (বাৎসরিক ১৫ + বাৎসরিক ৭১০) দিতে হবে। অতএব এই ব্যবস্থাব্যবহারী পুরাতন গ্রাহকেরা নতুন গ্রাহকের তুলনায় আপনাদের বিশেষ কনসেশনের সুযোগ পাচ্ছে না। আশা করি, এমতাবস্থায় আমাদের মত পুরাতন গ্রাহকদেরও আপনারা কনসেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। কিয়ট কার্ড পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করে আপনাদের নিত্য পত্রপাঠ জানায়ে। আপনাদের উত্তরব্যবহারী আগামী বৎসরের মাসিক বহুমতীর জন্য ব্যবস্থা করব। ধন্যবাদান্তে—বিভা ভট্টাচার্য। গ্রাহিকা নং এম ৫৩০৭২। নিউ দিল্লী।

### বেচতে চাই

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপে,

নিম্নলিখিত মাসিক বহুমতীগুলি প্রতিবৎসরেই একত্রে কিনা দ্বারা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। কেতোগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় বোঝা করিতে পারেন।

১৩৬০ সন বৈশাখ থেকে চৈত্র (১২টি)

## পৃষ্ঠাপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১২। দার্শনিক জর্জ সান্তায়া	( প্রবন্ধ ) কমলাপতি দে ...	৩৬৫
১৩। অখণ্ড অমিয় শ্রীগোবিন্দ	( জীবনী-গণনা ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	৩৬৭
১৪। অনন্ত-সংহিতা	( কবিতা ) ককণাশংকর মজুমদার ...	৩৭২
১৫। মলিন সপ্তা	( কবিতা ) সুদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ...	ঐ
১৬। তৈত্তিরীয়াপনিষদ	... অন্তর্যাদিকা—চিহ্নিতা দেবী ...	৩৭৩
১৭। দু'টি কবিতা	... ওয়াল্ড লুইটম্যান : অন্তর্যাদিক—দেবী ভট্টাচার্য ...	৩৭৫
১৮। লোকাতীত	( শিকার-কাহিনী ) সাধন তপাদার ...	৩৭৬
১৯। নাগফলি	( ভ্রমণকাহিনী ) প্রভাত মুখোপাধ্যায় ...	৩৮০
২০। একটি সনেট	... অশান্তি ঘোষ ...	৩৮৪
২১। মৌনমন	( উপহাস ) অরোধকুমার চক্রবর্তী ...	৩৮৫
২২। প্রবন্ধ	( কবিতা ) তেজেন্দ্রলাল মজুমদার ...	৩৯২
২৩। আলোকচিত্র—	... ... ৩৯২ (ক), ৪৭২ (খ)	
২৪। পত্রগুচ্ছ—	... ... ৩৯৩	
২৫। চারজন—	( বাঙালী-পরিচিতি )	
( ক ) বিশ্বনাথ রায়	... ...	৩৯৬
( খ ) যাদুগোপাল বসু	... ...	ঐ

### পঁচিশ বছর পৃষ্ঠি উপলক্ষে

সমস্ত পাঠক, ক্রেতা ও সহযোগী বন্ধুদের  
গ্রাশনাল বুক এজেন্সি জানাচ্ছে তার আন্তরিক অভিনন্দন।

### ★ ন্যাশনালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ★

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	—	উত্তরকালের গল্প	—	দাম : ১০'০০
অমরেন্দ্র ঘোষ	—	চরকাশেষ	—	দাম : ৩'৭৫
নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি	—	ইম্পাত	—	দাম : ৬'৫০
ম্যাকসিম গর্কি	—	মা	—	দাম : ৪'০০
ইলিয়া এরেনবুর্গ	—	পারীর পতন	—	দাম : ৮'০০
Hiren Mukerjee	—	India's Struggle for Freedom	—	দাম : ৮'০০
Muzaffar Ahmad	—	The Communist Party And Its Formation Abroad	—	দাম : ৩'৫০

### গ্রাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ॥ নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪

## সূচাপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
(গ) স্মৃতিচারণ	...	৩১৭
(ঘ) রমণীমোহন রায়	...	৩১৮
২৬। প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষের বীরা সতীর্থ ছিলেন (সংগ্রহ)	...	৩১৯
২৭। আশুতোষ : বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে (সংগ্রহ)	...	৪০০
২৮। বিশ্বের প্রথম মহামুদ্র	(কাচিনী)	শচীন্দ্রনাথ বসু
২৯। আর এক আকাশ	(উপজাস)	তপতী রায়
৩০। হাউই	(গল্প)	মীরা বাসন্ত্যরমণিয়ন
৩১। বিজ্ঞান বাঁতা—	...	৪৩৭
৩২। তালপাতার পুঁথি	(উপজাস)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৩৩। সংলাপ	(কবিতা)	বুদ্ধদেব গুহ
৩৪। অনিকেত	(কবিতা)	দীপেন দেবনাথ
৩৫। এক কলেজের চারটি মেয়ে	(উপজাস)	রাসু ভৌমিক (দাস)
৩৬। অঙ্গন ও আঙ্গণ—		
(ক) বোগেন ভিলিয়াম	(গল্প)	আভা পাকড়ানী
(খ) বস্টন প্রবাসের দিন	(ভ্রমণ-কাহিনী)	কৃষ্ণা বসু
(গ) দক্ষিণের বারান্দা	(কবিতা)	নন্দা কর
(ঘ) প্রতিজ্ঞা	(গল্প)	স্মৃতি ঠাকুর

### “জীবনী-জিজ্ঞাসা” গ্রন্থসমূহ

॥ নগি বাগচি রচিত ॥

রামমোহন (২য় সং)	৫.০০
মাইকেল	৪.০০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৪.৫০
কেশবচন্দ্র	৪.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৪.৫০
রমেশচন্দ্র	৫.০০
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	৫.০০
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ	৬.০০

### জীবনী-জিজ্ঞাসা-২

“FREEDOM FIRST, FREEDOM SECOND, FREEDOM ALWAYS.”

একদা বীর কর্তৃক বঙ্গনির্ঘোষবৎ এই মহান বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, বাংলার সেই চিরনির্ভীক সন্তান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাতপুঙ্খ, অর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্থ্য।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনীকার

নগি বাগচি প্রণীত

শিক্ষায়তন

এমসিএস

॥ ভূমিকা : অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ॥

বাংলাভাষায় ইহাই আশুতোষের চরিত্র ও প্রতিভার পূর্ণ-পরিসর সম্বলিত এবং ইতিহাস-নির্ভর তথ্য সমৃদ্ধ প্রথম জীবনচরিত্র।

॥ দাম : পাঁচ টাকা ॥

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-২ এবং ১৩৩এ রাসবিহারী আর্জিনিউ। কলিকাতা-২৯

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩৭। পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা	( উপহাস ) ক্যাথরিন হিউম : অনুবাদিকা— প্রগতি মুখোপাধ্যায়	৪৬১
৩৮। হৃদয় পাতো	( উপহাস ) অংশু দাশগুপ্ত ...	৪৬৬
৩৯। আয় তোরা আয়	( গীতি-কবিতা ) শেখলীয়ার : অনুবাদক—মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৯
৪০। জগদ্বিন	( গল্প ) জুলফিকার ...	৪৭০
৪১। নেহরুর মহাপ্রাণে	( কবিতা ) চামেলীবালা মিত্র ...	৪৭৪
৪২। গন্ধরাজ	( কবিতা ) মায়া ঘোষ ...	ঐ
৪৩। আনন্দ-বৃন্দাবন	( সংস্কৃত-কাব্য ) কবি কর্ণপুর : অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	৪৭৫
<b>৪৪। ছোটদের অঙ্গির—</b>		
( ক ) বন্দুকের আর বন্দুকা	( গল্প ) কুমারেশ ঘোষ ...	৪৮০
( খ ) রেশম সূতার গোড়ার কথা	( প্রবন্ধ ) বক্রগচন্দ্র মল্লিক ...	৪৮১
( গ ) ভগিভাগি	( গল্প ) জসিমউদ্দিন ...	৪৮২
<b>৪৫। সাহিত্য পরিচয়—</b>		৪৮৪
৪৬। বাতাসী মজিল	( উপহাস ) অজিতকৃষ্ণ বসু ...	৪৮৯
<b>৪৭। রঙ্গপট—</b>		
( ক ) প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ	( প্রবন্ধ ) ধ্যানেশনাথায় চক্রবর্তী ...	৪৯৪
( খ ) মনুরা-মিলার মাধ্যাকার	..	৪৯৭

সবে  
বেকলো  
৩৩  
ফাঙ্কো  
৩৩

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের  
শ্রেষ্ঠ কবিতা উপহার  
অসীম কোতূহল নিয়ে আধুনিক কবিতাকে  
সহজ রূপ দিয়েছেন।  
পাঠক আধুনিক কবিতার  
নতুন স্বাদ পাবেন।  
লেখকের অপর বই শোভন সংস্করণ বেকলো :—  
অনেক শোনা পাখির গান  
ছ' টাকা  
পরিবেশনায় : সেকাল একাল  
৭ টেমার লেন, কলকাতা-৯

সোনার বাঙলার সোনার কাব্য  
কুতিবাসী রামায়ণ

আদি কবির মহাকাব্য সংস্কারে সংহার করিতে সাহসী  
হই নাই। মহাকবি কুতিবাসীর এই সর্বাঙ্গসুন্দর ছাড়াবাদ-  
হীন সুপরিপূর্ণ রাক্ষসিরাজ্য সংস্করণ সমগ্র সম্প্রদায় রামায়ণ  
প্রকাশিত। উপহারে গ্রন্থজননজন ৪০খানি চিত্রে  
চিত্রময়। মূল্য ৮২ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

বস্ত্রশিল্পে  
**মোহিনী**  
মিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্য, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল— ২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, নদীয়া। বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানুফ্যাক্চারিং এজেন্টস্—

**চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং**

রেজিঃ অফিস—

২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
<b>৪৮। নাচ-গান-বাজনা—</b>		
(ক) ভারতীয় যন্ত্রের প্রকরণ	(প্রবন্ধ) প্রভাকর সেন	৫০৩
(খ) রেকর্ড-পরিচয়	...	৫০৪
(গ) আবার কথা	(শিল্পী-পরিচিতি) রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫০৫
<b>৪৯। মানুষের মনে গন্ধের প্রভাব</b>	(সংগ্রহ) ইটো উলারিস	৫০৫
<b>৫০। শাশতী</b>	(উপস্থাপন) নমিতা চক্রবর্তী	৫০৬
<b>৫১। নভোদীপ</b>	(উপস্থাপন) প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫১২
<b>৫২। প্রচ্ছদ-পরিচিতি—</b>	...	৫২২
<b>৫৩। সম্পাদকীয়—</b>		
(ক) আশুতোষ স্মরণে	...	৫২৩
(খ) শোচনীয় খণ্ডপরিহৃতি	...	৫২৪
(গ) জয়ন্ত নারালিকার	...	৫২৫
<b>৫৪। শোক-সংবাদ—</b>		
(ক) বিনয়তোষ ভট্টাচার্য	...	৫২৬
(খ) যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	...	ঐ
(গ) সতীনাথ বাগচী	...	ঐ
(ঘ) অপরূপ ভট্টাচার্য	...	ঐ
(ঙ) গিরিজাকুমারী দেবী	...	ঐ
(চ) যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	ঐ
(ছ) লক্ষ্মীমণি দেবী	...	ঐ

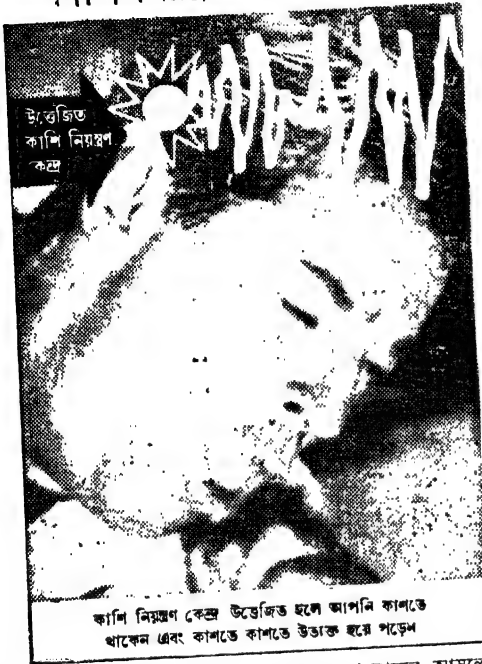
<p style="text-align: center;">মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত</p> <p style="text-align: center;"><b>বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭</b></p> <p style="text-align: center;">প্রাণতোষ ঘটকের নূতন উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>সুখের লাগিয়া ৪-৫০</b></p>	<p style="text-align: center;">গোপাল ভট্টাচার্যের নূতন উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>শেষ প্রদীপ শিখা</b></p> <p style="text-align: center;">চার টাকা পঞ্চাশ নং পঃ</p> <p style="text-align: center;">অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>জ্ববন বন্ধি ৬।।০</b></p>	<p style="text-align: center;">তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>ভুবনপুরের হাট</b></p> <p style="text-align: center;">= ছয় টাকা =</p> <p style="text-align: center;">জগদীশচন্দ্র ঘোষের নূতন উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>শহীদ ৫।। যাত্রিদল ৬।।</b></p>
<p style="text-align: center;">তপতী রায়ের উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>একটি সোনা মন ৬</b></p> <p style="text-align: center;"><b>কুয়াশার রঙ ৫</b></p> <p style="text-align: center;">নগেন্দ্রকুমার শুক্লারায়ের সত্ত্ব প্রকাশিত</p> <p style="text-align: center;"><b>মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫।।০</b></p> <p style="text-align: center;">সুখম ঘোষের সত্ত্ব প্রকাশিত উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>মেঘ ডাঙা রোদ ৫।।০</b></p> <p style="text-align: center;">অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ</p> <p style="text-align: center;"><b>সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫।।০</b></p> <p style="text-align: center;">চিত্তশঙ্করের</p> <p style="text-align: center;"><b>এরা অভিযুক্ত আসামী ৩।।০</b></p>	<p style="text-align: center;">অভিযাত্রীর উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>স্মৃতির মুকুর ৬-৫০</b></p> <p style="text-align: center;">অনির্বাক শিখা</p> <p style="text-align: center;">নট্টচন্দ্রের আলো</p> <p style="text-align: center;">প্রবোধ সাত্ত্বালের</p> <p style="text-align: center;">গল্প সংগ্রহ ৪</p> <p style="text-align: center;">এক বাঙালি কথা ৪</p> <p style="text-align: center;">প্রশান্ত চৌধুরীর উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;">লাল পাথর ৩</p> <p style="text-align: center;">সঙ্গম ভট্টাচার্য</p> <p style="text-align: center;">স্বপ্নশোধ ৩।।</p> <p style="text-align: center;">প্রমথনাথ বর্ণীর</p> <p style="text-align: center;">নীলবর্ণ শূণ্য ৪</p> <p style="text-align: center;">খা হলেও হতে পারতো ৩।।</p> <p style="text-align: center;">সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপন</p> <p style="text-align: center;"><b>সুন্দরী কথাসাগর ৫।।</b></p>	<p>তারাকঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থাপন</p> <p>আশুতোষ মুখো—জানালার ধারে ৪</p> <p>বনকল—উজ্জ্বলা ৩।।</p> <p>বিভূতি মুখো—আনন্দ নট ৩</p> <p>শক্তিগদ রাঙাঙ্ক—বনমাদেবী ৩।।</p> <p>আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩।।</p> <p>সত্যরত্ন মৈত্র—বনভূমিহিতা ২।।</p> <p>মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩</p> <p>নিরা মুখো—জটাজিবিভলার ঘাটে ৩।।</p> <p>ইন্দুমতী ভট্টাচার্য—আতঙ্ক কাকর ৩</p> <p>বেলা দেবী—জীবন ভীষণ ৩</p> <p>প্রভাবতী দেবী—উদয় অস্ত ২</p> <p>বিমল কর—দিবারাত্রি ৩</p> <p>মৌরীন্দ্র মুখো—লেকরোড ৩</p> <p>গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৩</p> <p>রাজকুমার মুখো—শয়তানের জলা ২</p> <p>তারাকঙ্কর চট্টো—কুমারী ধরম ৫</p> <p>কৃষ্ণানু বন্দ্যোপাধ্যায়—কালো চোখের তারা ৩।।</p>

**শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-২২৮৪**

ভিক্স এর কাশি নিবারণী নতুন আবিষ্কার

# প্রবল কাশি থামায়

কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে—যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে এর কাজ



কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উত্তেজিত হলে আপনি কাশতে থাকেন এবং কাশতে কাশতে উত্তাক হয়ে পড়েন



ভিক্স ফর্মুলা 44 আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রশমিত করে: কাশি থেমে যায় ও আপনি আরামে ঘুমাতে পারেন

কাশি ঠিক আপনার গলায় নয়। ডাক্তাররা জানেন আসলে কাশির সূত্রপাত হয় আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। গলার প্রদাহ এবং স্বাস্থ্যসীলীর রোগে আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উত্তেজিত করে ও আপনি কাশতে শুরু করেন ও কাশতে কাশতে উত্তাক হয়ে পড়েন।

ভিক্স ফর্মুলা 44 এর মধ্যে নতুন অনন্যসাধারণ “কাশি নিবারক” আপনার উত্তেজিত কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রশমিত করে এবং কাশি থেমে যায়। প্রবল ও যন্ত্রণাকর

কাশির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আপনি গাররাত শান্তিতে কাটাতে পারেন।

আর ঐ সময়ের মধ্যেই ভিক্স ফর্মুলা 44 এর বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রিত শক্তিশালী ঔষধগুলি দেহের প্রধান তিনটি অংশে কাজ করে যাতে আপনি প্রবল কাশির হাত থেকে সম্পূর্ণ আরাম পান।

**\* আপনার বুকের মধ্যে কাজ করে**  
ভিক্স ফর্মুলা 44 এর বিশেষ উপাদানগুলি শ্বাসনালীর গভীরে কাজ করে এবং বুকের ভেতর থেকে পরিষ্কার করে দেয়।

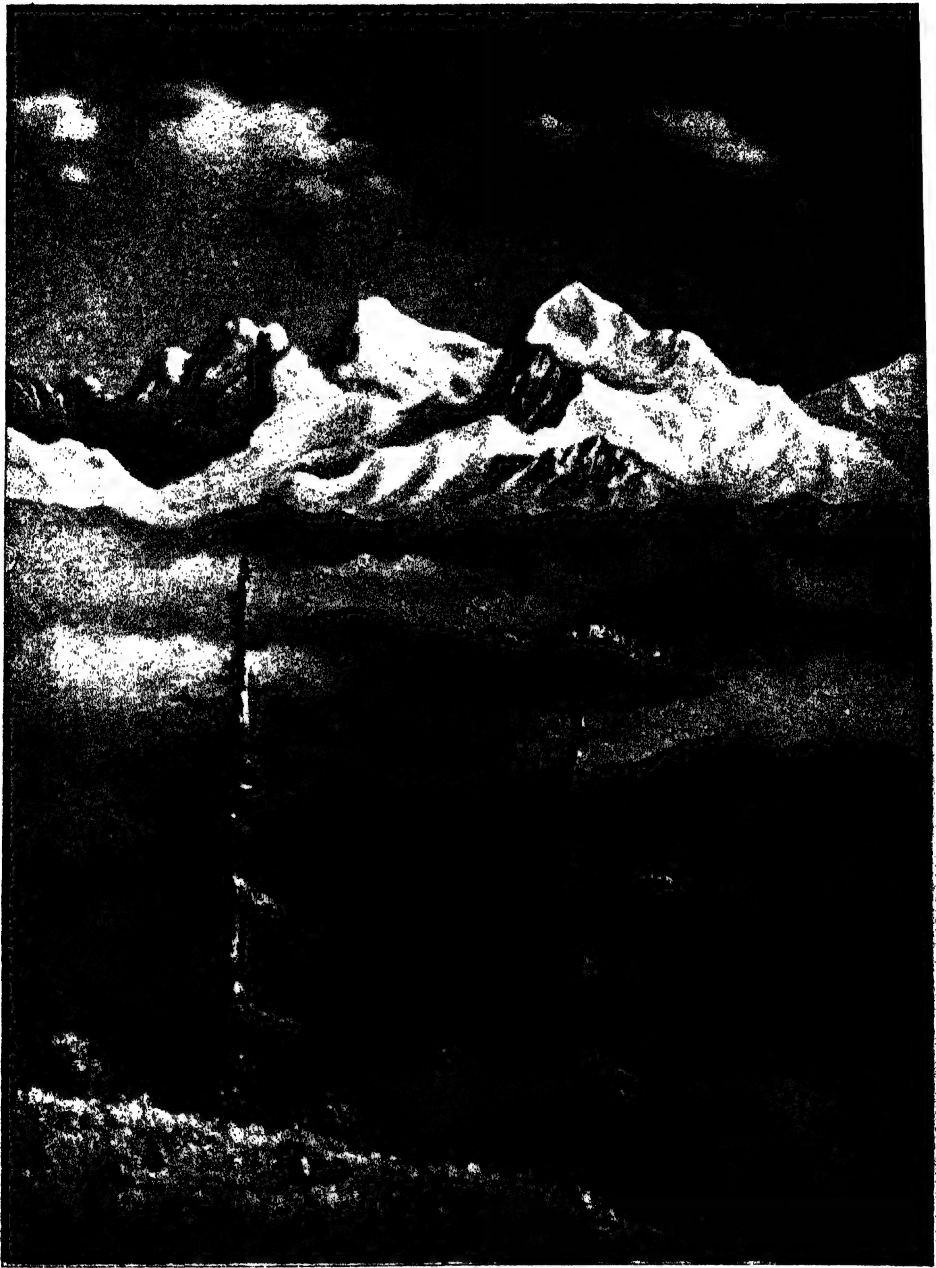
**\* আপনার গলার মধ্যে কাজ করে**  
ভিক্স ফর্মুলা 44 কাশিতে যথেষ্ট গলার ঝাঁক-গুলিতে দ্রুত আরাম আনে—গলার প্রদাহ অবিলম্বে বামায়।

**\* আপনার নাকের মধ্যে কাজ করে**  
ভিক্স ফর্মুলা 44 শরীরে এক নাক মুখে দেয় এবং আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস আবার সঠিক করে তোলে — সাধারণত ভালোভাবে ঘুমাবার গন্ধে আপনি বেশ আরাম বোধ করেন।

## ভিক্স ফর্মুলা 44

কাক মিকসচার যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে কাজ করে





মাসিক বসুমতী

II আশ্বিন, ১৩৭১ II

( তেলবট )

কাঞ্চনজঙ্ঘা

— শ্রী বলাইলাল মুখোপাধ্যায় —





৪৩শ বর্ষ

আষাঢ় ১৩৭১



প্রথম খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা

# মাসিক বঙ্গমজা

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

মুখ্যাদিত্ত কৰ্মকাণ্ডকে আশ্রয় কৰিয়া দেশ-কালপাত্ৰভেদে অধিকভাৱে সামাজিক কল্যাণকৰ কৰ্মে শিক্ষা দিয়াছেন। পুৰাণাদি তত্ত্ব, বেদান্তনিহিত তত্ত্ব উদ্ধার কৰিয়া অবতারাৱাদিৰ মহান চৰিত-বৰ্ণন-মুখে ঐ সকল তত্ত্বৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যান কৰিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্ৰভু ভগবানের কোন কোন ভাৱকে প্ৰধান কৰিয়া সেই সেই ভাৱৰ উপদেশ কৰিয়াছেন।

## কথামৃত

কিন্তু কালবশে সদাচাৰ্য্যজট বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচাৰ্য্যনিষ্ঠ ও কীৰ্ত্তিবুদ্ধি আৰ্হসম্ভাৱন, এই সকল ভাববিশেষৰ বিশেষ শিক্ষাৰ জন্ত আপাত-প্ৰতিযোগীৰ জায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবে জন্ত হুল ও বহুবিভূত ভাৱৰ হুলভাৱে বৈদ্যজ্ঞান পুৰাতত্ত্বৰ প্ৰচাৰকাৰী পুৰাণাদি তত্ত্বৰও কৰ্মগ্ৰাহ্য অসমৰ্থ হইয়া, অনন্তভাৱসমষ্টি অৰ্থও সনাতন ধৰ্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত কৰিয়া, সাম্প্ৰদায়িক ঈৰ্ষা ও ক্ৰোধ প্ৰজ্বলিত কৰিয়া তন্মধ্যে পৰস্পৰকে আহুতি দিবাৰ জন্ত সত্যত চেষ্টিত থাকিয়া, যখন এই ধৰ্মভূমি ভাৱতবৰ্ধকে প্ৰায় নৱকভূমিতে পৰিণত কৰিয়াছেন—

তখন আৰ্হসম্ভাৱন প্ৰকৃত ধৰ্ম কি এবং সত্যত বিবদমান, আপাত-প্ৰতীক্ৰমান-বহুধা-নিভক্ত, সৰ্বধা প্ৰতিযোগী আচাৰ্য্যসকল সাম্প্ৰদায়িক সমাজ, স্বদেশীৰ ভাষ্টিত্বান ও বিদেশীৰ ঘৃণাৰূপ হিন্দুধৰ্ম-নামক যুগ-যুগান্তৰব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ধৰ্মখণ্ডসমষ্টিৰ মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধৰ্মৰ সাৰ্বলৌকিক, সাৰ্বভৌমিক ও সাৰ্বদেশিক স্বৰূপ স্বীয় জীৱনে নিহিত কৰিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধৰ্মৰ জীৱন্ত উদাহৰণস্বৰূপ আপনাকে ধৰ্মবৰ্ণন কৰিতে লোকহিতৰ জন্ত শ্ৰীভগবান্ বাসবৰূপ অবতাৰ্হ হইয়াছেন।

অনাদি-বৰ্তমান স্থিতি, স্থিতি ও লক্ষ্যকাৰ সহযোগী শাস্ত্ৰ কি প্ৰকাৰ সংক্ষিপ্ত-সংস্কাৰ স্বাধীনমতে আবিৰ্ভূত হন, তাহা দেখাইবাৰ জন্ত ও এৰূপকাৰে শাস্ত্ৰ প্ৰমাণীকৃত হইলে, ধৰ্মৰ পুনৰুদ্ধাৰ, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্ৰচাৰ হইবে, এইজন্ত বেদমুৰ্তি ভগবান্ এই কলেবৰে বহিঃশিক্ষা প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে উপেক্ষা কৰিয়াছেন।

বেদ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ধৰ্মৰ এবং ব্ৰাহ্মণ্য অৰ্থাৎ ধৰ্মশিক্ষকৰে ৰক্ষাৰ জন্ত ভগবান্ বাৰংবাৰ শৰীৰ ধাৰণ করেন, ইহা স্মৃতিতে প্ৰসিদ্ধ আছে।

প্ৰপণ্ডিত নদীৰ জলরাশি সমধিক বেগবান্ হয়; পুনৰুৎপত্ত তৰঙ্গ সমধিক বিখাৰিত হয়। প্ৰত্যেক পতনৰ পৰ আৰ্হসমাজও শ্ৰীভগবানৰ কাৰুণিক নিয়ন্ত্ৰণে বিগতায় হইয়া, পূৰ্বপেক্ষা অধিকতৰ ৰক্ষণী ও বীৰবান্ হইতেছে—ইহা ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ।

প্ৰত্যেক পতনৰ পৰ পুনৰুৎপত্ত সমাজ, অন্তৰ্ভূত সনাতন পূৰ্ণত্বকে সমধিক প্ৰকাশিত কৰিতেছেন; এবং সৰ্বভূতান্তৰ্গামী প্ৰভুও প্ৰত্যেক অবতাৰে আত্মস্বৰূপ সমধিক অভিব্যক্ত কৰিতেছেন।

বাৰংবাৰ এই ভাৱভূমি মুচ্ছাপন্ন হইয়াছিলে এবং বাৰংবাৰ ভাৱতৰ ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তিৰ দ্বাৰা ইহাকে পুনৰুদ্ধাৰিত কৰিয়াছেন।

কিন্তু ঈশ্বৰাত্ম্যময় গুণপ্ৰায়া বৰ্তমান গভীৰ বিবাদ-বীজনীৰ জ্বাৰ কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাজৰূপে নাই। এ পতনৰ গভীৰতাৰ প্ৰাচীন পতন সমস্ত গোপালদেৱ তুল্য।

—স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণী হইতে

# গণিত জবাহরলাল নেহরু—পূর্ব স্মৃতি

ত্রিবেদীরনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিংশ

শতাব্দীর আশ্চর্য্যের মুখে, তখনকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের—পূর্ব প্রদেশ (আগ্রা ও আউধ) এবং বর্তমানে উত্তর প্রদেশ—কেন্দ্রীয় নগরী ছিল এলাহাবাদ। এখানেই ছিল এই প্রদেশের উচ্চতম ধর্মোপদেশ, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এখানেই ছিল এই প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং এখানেই ছিল প্রদেশের উচ্চতম পাদাধিকারী, অর্থাৎ প্রাদেশিক 'হোমিয়ার' নিবাস এবং এখানেই ছিল প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারকারীরা ও চিকিৎসকদিগের কর্মক্ষেত্র ও আবাস।

ব্যবহারকারীদের অধিকার ছিলেন গণিত মতিলাল নেহরু। এই নেহরু-পরিবারে ছিল, একাধারে, কাশ্মীরী লালবাহের বৈশিষ্ট্য ও মোঘল-দরবারের আভিজাত্য। উত্তর-ভারতের সামন্ত-রাজত্ববাদের অধীনেই তাঁহাদের বৃষ্টিশাক্তির সঠিক ও অল্প কেশীয় রাজত্ববাদের সঠিক মতন-সংক্রান্ত আদান-প্রদানের অনেক কিছুই ইঁহার হাতে দেওয়া ইঁহার প্রভুত আর-আমদানী ছিল। উপরন্তু ছিল হাইকোর্টের বিরাট পদার।

আম ও প্রতিপত্তি—হাইকোর্টের ব্যবহারকারী হিসাবে—অন্য কয়েকজনেরও ছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য-বিলাস-বাসনে ইঁহাদের ব্যাপক প্রকাশে ইঁহার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না তখনকার দিনে। এবং সেই ঐশ্বর্য-বিলাস-বাসনের সমারোহে ছিল এমন একটা ব্যাপক আভিজাত্যের প্রকাশ এবং আত্মমগ্নতার পরিচয়, যার দরুণ তখনকার দিনের বৃষ্টিশাক্তির গণিত অধিকারিবর্গও তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর 'স্টেটসম্যান' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিল যে, তিনি ছ'এক জন ছাড়া কোনও ল্যাট-বডলটিকে নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন না। কেশীয় রাজত্ববাদের মধ্যেও ইঁহার খ্যাতির ছিল গণিত বসিয়া, উচ্চতর আভিজাত্যের প্রতীক বসিয়া। রামপুরের নবাব ইঁহাকে অগ্রজের স্থান দিতেন।

এলাহাবাদে ল্যাটভবনে বিজলীর আলো-পাখা ইত্যাদি চলিবার পূর্বেই 'আনন্দভবনে' তাঁর প্রচলন হয়। তখন শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না, সে-কারণে ইচ্ছা বঁচাইবার জন্য ল্যাটভবনেও জেনারেটর বসাইয়া বিজলীর ব্যবস্থা হয়।

১১০০ সালে প্যারী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। গণিত মতিলাল সেই প্রদর্শনী দেখিতে যান সপরিবারে ও সঙ্গল। তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণগিরি গোলাম রোস্তম ও তাঁর ভাই কালুকে। এবং সেই সঙ্গে অবসরবিদ্যাদানের জন্য ছিলেন ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা বিখ্যাত কৌকল খাঁ (আসাতুল্লা খাঁ) ও তাঁহাদের সমস্তকারেরা। এই প্রদর্শনী দেখিতে আরো অনেক দলী ভারতীয় ও রাজা-রাজ্জী গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আভিজাত্য-জ্ঞান ছিল না, ছিল শুধু টাকা ও বিলাস-বাসন-ভূষণ।

তখনকার দিনে ডুকি মজা মাদরআলি ছিলেন অগ্রশ্রেষ্ঠ মর বসিয়া স্বীকৃত। এই প্রচণ্ড বগলাচী বিরাটকার তুর্কি ছাতি ছিল ৬০ ইঞ্চি, প্রদান ২২ ইঞ্চি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় গোলাম রোস্তম ইঁহাকে

চিৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ভারতীয় মল্লদের জগতে কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া গোলাম রোস্তম স্বীকৃতিলাভ করেন নাই। তবে এই প্রথম পরিচয়ের ফল পরে ভারতীয় মল্লরা বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জনের যোগ্য করিত হয়। গোলাম রোস্তমের অপরাধের সাহস ও অপর মল্লকৌশল পাশ্চাত্য মল্লক্রীড়াবিদদের মোহিত করে। এই মল্লক্রীড়ার ফলেই পরে করিম, কালী, গোলাম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ভারতীয় মল্লদের পাশ্চাত্য জগতে খ্যাতি অর্জনের পথ বাদ্যমুক্ত হয়।

২৪শ্রাবের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্য দেশেরও দেবার ও সারাদেব মোহময় কথাই শুনিতে প্রাপ্ত ছিল না। এদেশে তখনও যে সকল বিদেশী—বিশেষে ইরান—গুরু বিবাহ করিতেছিলেন তাঁহাদের না ছিল গণিত-সংকীর্ণ মনোভাব কোনও কল-বিবেচনা, না-ছিল মনোমত-বিষয়ে কোনও অস্বস্তি। শুধুতরাং কোনও প্রকৃত মল্লক্রীড়া পাশ্চাত্য সভ্যদের এদেশে আগ্রহিতেন না। এই সকল কারণে কেরামতউল্লা খাঁ ও কৌকল খাঁর যত্নসহীত পরিবেশন তখনকার পাশ্চাত্য-সভ্য-জগতে কোনও চিহ্ন রাখিতে পারে নাই। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে এদেশে যতদিন মেমুচিদের মত অগণিত-বিদ্যাপ্রসক্ত সভ্যতার নায়ক এদেশের যেতার ও সরোদ মল্লক্রীড়ার শুদ্ধ হইবার পর আলি-আকবর খাঁ ও বংশধর বিদেশে ভারতীয় যত্নসহীতের ইচ্ছালাভ ছড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

অজিকার দিনে, স্বাধীনতার সাততেরা বৎসর অতিবাহিত হইলে পরে আমরা এসব কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু সেই দাসত্বের কালে, জীনতার যুগে, কোনও ভারতীয়ের পক্ষে বিদেশী প্রতিযোগিতাব্য ও উদ্বাসিততার প্রবল বাধা উপস্থাপন করিয়া এজাতীয় ভারতীয়দের নিদর্শন প্যারী-আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়াব জন্য কতবড় আভিজাত্য-জ্ঞান ও কতখানি আত্মমগ্নতার বল প্রয়োজন ছিল তাতা সত্যকে বুঝান যায় না।

বিশ্বশালী লোক সে যুগেও অনেক ছিল এদেশে। অনেক রাজা মহারাজের প্রাসাদেও ভিনিসিয়ান ও বোহেমিয়ান কাঁচ এবং ফেডার, ডেসডেন ও রয়াল ক্রাউন ডাবি চীনাটিব বাদ্যনর ছড়াছড়ি ছিল; কিন্তু গণিত মতিলালের আভিজাত্য ছিল অতি উচ্চস্তরের—যেখানে শুধু টাকার জোরে বা পদমর্যাদার ভাবে আসন পাঠের সম্ভব ছিল না।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে গণিত জবাহরলালের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। তারপর এদেশে স্বল্প-শিক্ষা শেব হওয়ার মুখে, ১১০৫ সালে, তিনি বিলাতে পংখির স্থলে ভর্তি হইলেন, তারপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ওটনার টেম্পল—রম্পুর্ট হটল বিলাতী শিক্ষার পদ। সেই সঙ্গে হটল বিলাতী শিক্ষা-দীক্ষা, বেশ-ভূষণ আদান-প্রদান ও চিন্তাধারার প্রবর্তন। আমরা হারো যাত্রার পূর্বে যে জবাহরলালকে দেখিয়াছিলাম, বিজাত ভট্টে কিরিবার পর তাঁহার যে রূপান্তর দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম এটির আশ্রয়, মুখল ও ইরাজী আভিজাত্যের বি-ধারা নিষ্টিত হইয়াছে। কি উজ্জল মনো

## পণ্ডিত জবাবলাল নেহরু—পূর্বস্মৃতি

কান্দি, কি নিখুঁত বেশ-ভূষা ও জটিলহীন চাল-চলন, সে যেন মণি-কাকন যোগ হইয়াছে।

কিন্তু এসবল বহিরাবরণ একদিন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, যেদিন গান্ধীজীর পূণ্যময় স্পর্শে জবাবলালের মন-প্রাণ সকল বাহ্যিক আড়ম্বর, সকল বিলাস-বৈভবের বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। ১৯৪৭ সালে কনস্টিটিয়েন্ট এসেমব্লিতে, স্বাধীনতাপাভ সম্পর্কিত ভাষণে পণ্ডিত জবাবলাল বলিয়াছিলেন যে, 'দীর্ঘদিন পূর্বে আমরা ভাগ্যবান সঙ্গ বাজী ধরিয়াছিলাম এই স্বাধীনতা-লাভের জগৎ'। এ সেইদিনের কথা—যদিন গান্ধীজীর আহবানে সকল আসক্তি, সকল বন্ধন দূরে ফেলিয়া তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিবেদন করেন। আশ্চর্য এই পরিবর্তন, কিয়ৎ অপ্রত্যাশিত নয়। কেন না বাহার শৈশব ও কৈশোরের পরিবেশ বা পিতার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব, হীনতাভাব বা দৈবের বেশমায়া ছিল না, বাহার কৈশোরের শেষে ও যৌবনে উদ্বোধন হইয়াছিল বিলাতে 'পাব্লিক স্কুল' ও 'ভার্মিটিব' উচ্চশিক্ষিত স্বাধীনতার স্রোতের মধ্যে, সেজন্য যে প্রকৃত গুরুত্ব কাছে দীক্ষা পাইলে সকল মোহবন্ধন দূর করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঁপাইয়া পড়িবে তাহা অসম্ভব নয়। ব্যতীত পরিবর্তন বলা যায় বরং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ক্ষেত্রে। যৌবনের আরম্ভকাল হইতে পার্থক্যের সীমানার পার পুষ্প বাহার জীবন চলিয়াছিল। অপরিণীত ত্রৈমুখ্য বিলাস-বাসনের মধ্যে, সেজন্য যে কখনও কোনও প্রবল আকর্ষণে দরকিছ ছাড়িয়া, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভয় উপেক্ষা করিয়া এই অপরিণীত অবস্থায় হইতে পারেন, একথা বেহই ভাবিতে পারে নাই।

আমরা তখন দেখিতাম যে, যেখানে ও যে সকল অবস্থায় পণ্ডিতজী—অর্থাৎ পণ্ডিত মতিলাল নেহরু—অস্থায়ী বা দেশ অচুত করিতেন বা দৈব হারাইবার মত হইতেন, সেই পরিস্থিতিতে জবাবলালজীর মুখে বা ভাবভঙ্গীতে কোনও দৈহিক বা মানসিক বৈষম্য বা বিরক্তির চিহ্নও পাতোয়া যাইত না। অবশ্য পণ্ডিতজী তখন ঘটি বৎসরে পালপর্ণ করিয়াছেন এবং জবাবলাল মাত্র ত্রিশ পার করিয়াছেন। কিন্তু অত্যধিক দেখিতাম যে তর্কে অবাস্তব যুক্তি প্রয়োগে বা বেচাল ব্যবহারে পণ্ডিতজী উভয়ক হইয়া অতি স্পষ্ট—এমন কি ঋতু ভাষায়—প্রতিবাদ জানাইয়া বা ভংগনা করিয়া যেখানে দাঁত হইতেন,



পণ্ডিতজী

জবাবলাল সেখানে অসহিষ্ণুতার চরমে উঠিয়া প্রায় ফাটিয়া পড়িতেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে স্পোকাল কংগ্রেস অধিবেশন হইয়াছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার (কন্সিল) কংগ্রেসীয়দের প্রবেশ করার অনুমতি লাভের জন্ত। কন্সিল প্রবেশ ইচ্ছুক দলের নেতৃত্বে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু দাশ। হু'জনেরই দলবল বৃহৎ ছিল এবং তাঁহাদের ও সাধারণ ডেলিগেটদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল অতি জবজ। দাশ সাহেবের খাওয়ার ব্যবস্থার ভার পরে নিয়ন্ত্রিতেন তাঁর 'দাদি' উম্মিলা দেবী, যার রান্নার হাত ছিল অতি তন্দর। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। পণ্ডিতজীর সে সকল ব্যবস্থা যে রকম অপরিষ্কার পরিবেশে ও বাদ্য ঘেঁষা বিষাদ এবং জবজ ছিল তাহা আমাদেরই অসহ্য মনে হইত। বলা বাহুল্য পণ্ডিত মতিলাল

নেহরুর কাছে তাহা নরকযন্ত্রণার মতই ছিল। জবাহরলালজীকে কিংবা অবিচলিত দেখা যাইত।

দুই 'বড় কর্তা'ই ছিলেন ভোগ-বিলাসে অভ্যস্ত—পণ্ডিত মতিলালের তো ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ বিলাস-ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানীয় ছাড়া চলিতই না। একপ বিকট ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় দু'জনেরই মেজাজ সপ্তমে উঠিয়াছিল। আম'ম যাতে হইত দুই বৈঠকেই, যদিও আম'ম ছিলাম দাশ সাহেবের দলে। দেখিতাম কনেকেই অবস্থা বুঝিয়া ধীরে ধীরে রহিয়াছেন, বিরক্তি ও ক্রোধবর্ণণ থেকে নিজেকে বাচিয়ে। শুধু জবাহরলালজী ও রণজিৎ পণ্ডিত—জবাহরলালের ভগিনীপতি ও আমার প্রিয় বন্ধু—ঠিক আছেন, তবে রণজিৎ একটু বেশি চূপচাপ।

এরই মধ্যে একদিন নানা কথা প্রসঙ্গে জবাহরলালজী তাদের যৌকো পণ্ডিতজীর মতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করিলেন। পিতার ও যরোজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে ঐভাবে বিরূপ মন্তব্য করাটা যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ একথা তৎক্ষণাৎ অতি তীব্র ভাষায় শোনা গেল পণ্ডিতজীর মুখে। জবাহরলালজীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি আর একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না। সকলের হজ্ঞানিতে তিনি কখন বৈঠক থেকে উঠিয়া গেলেন। তারপর তিনি নিখোজ। পরদিন শোনা গেল যে তিনি নানা রাজ্যে শিখ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বোগ দেওয়ার এবং রাজ্য ছাড়ার সরকারী আদেশ অমান্য করার জন্য কারাকন্ড হইয়াছেন।

নানার শিখ রাজা বিপুদ্যমান সিং সেই সময় গবর্নর জেনারেলের আদেশে গণীচূত হইয়াছেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে শিখেরা বিক্ষোভ জানাইতেছিল তখন, 'ভঠা' বন্ধ হইয়া জুলুম চালাইয়া প্রকাশ সভায় বন্ধুতা ও গন করিয়া জবাহরলালজী সেদিনের বৈঠকে তিরস্কৃত হইয়া সোজা ট্রেনে চড়িয়া নানার যাইয়া সেই 'ভঠাকার'বিরোধ (প্রতিজ্ঞাবন্ধ মল) সঙ্গে মিলিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বন্ধুতা নিমাইছিলেন এবং গ্রেপ্তার

হওয়ার পর রাজ্য ছাড়ার আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

ওদিকে পণ্ডিতজীর আবাসস্থলে দু'তিন দিন দাফন অব্যবহার পর একদিন সকালের দিকে এক অভ্যস্ত জমকালো পোষাকপরা ভব্য ব্যক্তি আসিয়া 'বড়ে সরকারের' (পণ্ডিতজী) সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল। পণ্ডিতজীর সামনে হাজির হইয়া সে নিবেদন করে যে রামপুরের হজুর নগর সাহাব স্তনিয়াছেন যে 'বড়ে সরকারের' (অগ্রজপ্রতিম বয়োজ্যেষ্ঠের) থাকা-খাওয়ার বট হইতেছে। সেইজন্য তাহার আদেশে লঙ্গরখানার লোক-লগ্নর সাজ-সরঞ্জাম সমস্ত সে আসিয়াছে সেসবের ব্যবস্থা করিতে। তাহার প্রয়োজন তাঁর ফেলার জন্ত একটু জায়াগ।

সেইদিন থেকে খাওয়ার ব্যবস্থা তো 'উচ্চাসের' গাঁড়ালট, উপরন্ত সব-বিদ্যুৎ সাফসত্তরো হইল এবং পরিচরার কোনই ক্রটি রহিল না। শুধু যা জবাহরলালজী রহিলেন জেসে দিন দশকের মত। অজ্ঞায়ের প্রতিবাদ, অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে বিক্ষোভ ঘোষণা ও সেইসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এ তো তাহার মন-প্রাণের অঙ্গ ছিল এবং সে কাজের জন্ত নিজেকে কি দুঃখদুর্দশা বরণ করিতে হইবে সে চিন্তা তাহার একেবারেই ছিল না। হয় তো নানার ব্যাপারটা তাহার মনে প্রচ্ছন্নভাবে খেলিয়াছিল। পিতার তিরস্কারে মনের এককি দাবিয়ে রাখার ফলে অজ্ঞাদিকের দায়মুক্ত হইয়া সেই সকল প্রচ্ছন্ন চিন্তা প্রবল হয় এবং তারপর যেই চিন্তা সেই কাজ। এই তো ছিল তাহার প্রকৃতি শেখদিন পর্যন্ত।

বহুদিন পূর্বে যুবজনকে উপদেশচ্ছলে তিনি বলেছিলেন, 'Live dangerously', অর্থাৎ বিশপ-আপদ এড়াইয়া চলার পরিবর্তে জীবনযাত্রার অভিযান চালাও বিপদমঙ্গল পাখো। এই উপদেশ তাহার জীবনে নানা দুঃখ-দুর্দশা, নৈরাশ্য, বৈফল্যের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া ছিল। সেই-সবের পূর্ণমুদ্রাস্ত—স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরে—কোনও দিন সঠিকভাবে বিবৃত হইবে কি না জানি না।

## শিক্ষিতের দায়িত্ব

'যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সুসম্পন্ন হইতে হইবে। কেবল সামাজিক বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হয় না। ঐতিহাসিক কার্যের যেমন একটা তালিকা অন্তর্ভুক্ত মনে মনে থাকিলেও কার্যের স্থালা হয়,—সময়ের সম্ভাবহার হয়, তৎসঙ্গে জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়ত-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভাষা এমন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই হস্ত হইতেছে। অবকাশমত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া ছ' একটি কবিতা রচনা করিলেন বা চিন্তাপূর্ণ দু' একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যে প্রকৃত গঠন হইবে না। তৎপত্রার দ্বারা একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের জীবন্ত সাধন করিতে হইবে। মাছুভাষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য। কেন না তাঁহারা প্রাচীণ ভাষার পারদর্শী হইয়া সাধারণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পর্হণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলমঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উন্নয়মান জাতিরও খলন বা অধঃপতন হইতে পারে। 'যদু বদাচরিত শ্রেষ্ঠস্ত ও দেবতরো জনঃ।' তরুণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অথবা নিঃসজ্জনের আশঙ্কা বলবতী। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত মঙ্গল এবং বিশপ—এই দুই-এরই তেজু নিহিত রহিয়াছে। তাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ-বিশদ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্তব্য যে কত গুরুতর—তাঁহারা উল্লেখ নিঃসরাজন।'

—স্বাভ্যন্তরীণ মুখোপাধ্যায়

# ■ হৃদরোগ প্রতিরোধ করণ ■

বিশ বছর আগের একটি ঘটনা বলছি। এক ভ্রমলোক।

একজন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ার। মোটা বোজগার, তা' ছাড়া পৈতৃক অবস্থাও খুবই ভালো। ইম্মোরোপ-আমেরিকার বহুবার ঘুরে এসেছেন। দেশে ঘিরেও চেষ্টা করেন সাহেব-সুবেদের অনেক ভালো জিনিসকে নিজের মতো করে নিতে। বিদেশে থাকতে দেখেছেন, অনেক সুস্থ-সবল নীরোগ স্বাভাবিক লোক বছরে অন্তত একটিবার কোনও কারণ না থাকলেও 'ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের' কাছে আসেন নিজের শরীরের একটা 'চেক-আপ'-এর জন্তে।

দেশে ফিরে এই ভ্রমলোক এই জিনিসটি চালিয়ে যেতে লাগলেন। কোনো বছর এই 'চেক-আপ'-এর সময় কিছু লোকনো ব্যারাম ধরা পড়ে, কোনো বছর বা তা-ও পড়ে না! ডাক্তার লিখিত রিপোর্ট দেয়—চমৎকার আছেন।

এবারও ঠিক তাই হলো। ডাক্তারবাবুর কাছে থেকে ফেরবার দিন তিনেক বাদে লিখিত রিপোর্ট এবং চিঠি এলো : চমৎকার আছেন মশাই, আগামী বছর আবার ঠিক সময়ে 'চেক-আপ'-এর জন্তে অবজ্ঞাই আসবেন—তার আগে যে আপনাকে কোনো ডাক্তারের কাছে আসতে হবে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কিন্তু ঘটনাচক্রেই পরদিন সকাল নরটার সময়েই ভ্রমলোকের ড্রাইভার তাঁকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল—একটা সার্টিকিউরে জন্তে, মানে একটা ডেথ সার্টিকিউরে জন্তে। হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্য।

অকালে অশনিপাতের মতো আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল ব্যাপারটা। বধাসময়ে ফ্যান্টমের উদ্দেশে নিজের গাড়িতে চড়ে বসুন। হয়েছে

এঞ্জিনীয়ার। খানিকটা বাবার পরে পেছনের আসন থেকে একাঁ অক্ষুট আওরাজ কানে এলো ড্রাইভারের—ওঃ।

—কিছু বলছেন? ড্রাইভার বললো নিজের কানটা বাড়ী করে।

—নাঃ, তেমন কিছু নয়, এই বাড়ীর কাছটা যেন কেমন চিন-চি করছে।

একটু পরে বুণ করে একটা আওরাজ হাত ড্রাইভার বাড়ী ফিরে দেখলো একপলক—এঞ্জিনীয়ার খুব খুবড়ে পড়েছেন সীটের ওপর কিছুমাত্র কালক্ষেপ না করে ড্রাইভার গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে চলে এলো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের চেম্বারে। ডাক্তারবাবু ছুটে এসে পরীক্ষা করে দেখলেন—ডেথ সার্টিকিউরে লেখা ব্যতীত আর করবার কিছু নেই।

কি করে মারা গেলেন ভ্রমলোক? হার্ট ফেল করে। কোনো রকম আগে থেকে হৃদিস না দিয়ে হার্ট 'ফেল' করে কেন? কি করে করে? এর জবাবস্বরূপ ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বক্ত্র এর নাম—'ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাফ'। এ বক্ত্র সাহায্যে হার্টের প্রতিটি স্পন্দনে হার্টের যে-কোনো দুর্বলতার প্রকাশ থাকে তা সঠিকভাবে ধরা যায়। ইম্মোরোপ-আমেরিকার আজকের দিনে এ বক্ত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। ও সব দেশে আজ আর কেউ হার্টের ব্যারাম হবার পরে চিকিৎসার জন্তে অপেক্ষা করে না—হার্টের ব্যারাম কিন্তু অদূরভবিষ্যতে আসছে কি না ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে তা বুঝে নিয়ে হার্টের রোগ তার প্রতিরোধ করছে।

—নার্স মিল।

## একটি আশ্চর্য ওষুধ

একটা অতি আশ্চর্য ওষুধের কাহিনী শোনাবো আপনাদের।

আজকের পৃথিবীতে হাজার হাজার সরকারী বেসরকারী ল্যাবরেটরীতে যে ধরণের ওষুধ নিত্য তৈরি হচ্ছে, এ ওষুধটা ঠিক সে ধরণের নয় তা ঠিক—কিন্তু তবু এটা যে ওষুধ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ আপনাদের থাকবে না নিশ্চয়ই। এ ওষুধটার কথা অল্পবিস্তর হয়তো আপনিও আগে থেকেই জানেন, কিন্তু আমি এর যে আশ্চর্য কার্যকারিতার কথা বলছি তা হয়তো না-ও ভুলে থাকতে পারেন এর আগে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের কথা। আমেরিকা থেকে একটি লোক মনে করুন নাম তার পিটার স্বেচ্ছায় একটা কাজ বেছে নিয়েছিলেন—তার কাজটা হলো যন্ত্রণাকাতর রিট ওষুধখুঁজে হাসি ফোটানো। পিটার ইম্মোরোপ এসে বিভিন্ন হাসপাতালের সামনে গান-বাজনা, কখনো বা ম্যাজিক, কখনো বা হাফকৌতুকের আসর বসাতো।

বলা বাহুল্য, তার শ্রোতার শতকরা নড়াইজনই হতো বিভিন্ন রণক্ষেত্রের আহত—সৈনিকেরা—আর তা ছাড়া এক-আধজন সামরিক বিভাগের সক্ষম লোককেও কখনো দেখা যেতো। তবে হ'চারজন নার্স এবং ডাক্তারও সব সময়েই থাকতো এই সমস্ত আসরে যাতে হঠাৎ কেউ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে নজর দেওয়া যায় সেইজন্তে।

সব সময়েই পিটার করতো কি শ্রোতাদের (অর্থাৎ আহত সৈনিকদের) মধ্য থেকে এক-আধজনকে কাছে ডেকে নিয়ে তার 'শো' আরম্ভ করতো। এমনি একবার শো আরম্ভ করার আগে পিটার হাঁক দিলো—আমার বাড়ী ভাঙিনিমি, ভাঙিনিমিয়ার কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছেন? যদি থাকেন তো আমার কাছে চলে আসুন, কোনো লজ্জা নেই, চলে আসুন আমার একসঙ্গে গান গাইব।

হুঁতিন মিনিট চলে যায় অথচ কোনো সাড়াশব্দ নেই। অন্তঃপর দেখা গেলো শ্রোতাদের একেবারে শেষ লাইন থেকে হীরে হীরে একখানা হাত জাগলো—সেখেনই বাখা বাজিলো হাতখানা তুলতেও সে অক্ষম, কিন্তু তবু সে চেষ্টা করছিল। পিটারের অমুগ্ধোৎসাহে একজন মার্স তাকে মঞ্চের দিকে আসতে সাহায্য করার জন্তে এগিয়ে গেলো। কয়েকজন ডাক্তার বারণ করলেন নাসটিক—এ রোগীটিকে ঘেঁষে আসন থেকে না তোলা হয়। কিন্তু নাসটিক ডাক্তারবাবুদের বারণ ঠিক লক্ষ্য করে নি। মঞ্চের কাছাকাছি বসন এসে পড়েছে রোগীটি (নাসের কাঁধে ভর দিয়ে) তখন একজন ডাক্তার তাকে টেরিফাই বারণ করলেন ঐ রোগীকে মঞ্চের ওপর না তুলবার জন্তে; কিন্তু ততক্ষণে পিটার নিজের তাকে টানতে টানতে মঞ্চের ওপর এনে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। আর টেরিফে জিজ্ঞাসা করলো কীটিকে—ক'টা গান জানো তুমি।

আমাদের দেশী লোকটি কথা বলতে অক্ষম, তার শুধু ঠোট হুঁটিতে মুখ কাম্পন দেখা গেলো।

ডাক্তাররা জাঁতকে উঠলো। কিন্তু পিটার কোনোকিছু জ্ঞান না করে বলে উঠলো—আচ্ছা লাভুক ছোকরা তুমি, এতো লজ্জা নিয়ে স্টেনগান চালাও কি করে, হয়েছে ভয়েছে আর গৌ গৌ করতে হবে না—আমি গাইছি, আমাদের ডাক্তারিয়ার দেশী গান, মেঘপালকরা যে গান গেয়ে থাকে, পারো তো আমার সঙ্গে সঙ্গে একটু গাও—দেখবে অনেক কষ্ট দূর হবে।

গান ধরলো পিটার। প্রায় মিনিট হুড়ি গলার সমস্ত শৈল্পিক ফুলিয়ে সরবে গান গেয়ে চলেছে। হঠাৎ একসময় শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনের মুখচোখে একটা অস্বাভাবিক ভয়, আতঙ্ক এবং কৌতূহলের লক্ষণ চোখে পড়তে আকস্মিকভাবে পিটার গানটা থামিয়ে দিলো। কিন্তু তখন দেখা গেলো সেই রোগীটি সমানে গান গেয়ে চলেছে। ভাবাবেশে তার চোখ হুঁটি বন্ধ হয়ে গেছে—কিন্তু গানের প্রতিটি কথা স্পষ্ট সোচ্চারিত।

কয়েকজন ডাক্তার এসে কাঁপিয়ে পড়লো পিটারের গায়ের ওপর—ওঃ পিটার। তুমি একজন হাড়-ডাক্তার, ভগবান পাঠিয়েছেন তোমাকে আমাদের মাঝে।

এতো আনন্দের কারণ কি? পিটার জানতে পারলো একটু পরেই। ঐ রোগীটি বিগত চার মাস যাবৎ একেবারেই বাকশক্তি-রহিত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গনে গোলন্দাজ-বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল ও। ক্রমাগত শেলিং এবং তারপর শত্রুর একটি গোলা কামানের গোলার স্পর্শে মৃত্যু এসে পড়ার যে মারাত্মক বিফোরণ ঘটে তারই আওতাধীন এবং 'শক'-এর ফলে ওর স্নায়ুমণ্ডলী যায় ওলোট-পালোট হয়ে। এই চার মাস সমস্ত রকম ডাক্তারী চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়েছে—বাকশক্তি সে ফিরে পায় নি। আর সে কি না এখন উচ্চৈঃস্বরে গান গাইছে।

—ডঃ নাগ

## বেশী বয়সের প্রেম

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সেই বিকেল থেকেই, আর তারপর সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসবার মুখেই জরু হলো প্রচণ্ড বধণ। প্রায় অশব্দী একটানা চললো বৃষ্টিটা। বৃষ্টি পূর্বোপরি থামবার আগেই দেখলাম ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো, বাসের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। আমার চেম্বারের দোরগোড়ায় বর্তমানে রাস্তার জল প্রায় ছ' ফুট। মনে হলো এখন দুখোপে আর রোগীরা কেউ আসতে পারবেন না আজ। রাস্তার জলটা একটু কমলেই বাড়ি পালাবো, ততক্ষণে হাফকিলের মেডিক্যাল ক্যানাল ছ' একটা মাইজাড়া করাবার জন্তে টেনে নিলাম। একটা পত্রিকার কয়েক পাতা ওন্টাতেই একটি প্রবন্ধ নজরে পড়লো: 'রোগটা কোথায়? দেখে না মনে।' এ জাতীর রচনা অন্তান্তর মনে যে তাবেরই সৃষ্টি করুক না কেন আমাদের মতো পেশাদার ডাক্তারদের কাছে এ জাতীর রচনা বহন কোনো ডাক্তারের কতম থেকে পরিবেশিত হয়, তখন তার একটা বিশেষ অর্থ, কিছু কিছু বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। অল্প মেডিক্যাল জ্ঞানের রচনামাত্রেরই যে এ মর্যাদা প্রাপ্য, তা নয়। বিশেষ অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা চালান, তার ফলাফল যে সমস্ত রচনায় থাকে—সেই সংগ্রহই কেবল বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্য।

বর্তমান রচনাটির প্রথম কয়েক লাইন পড়েই জানা দাঁটা বন্ধ না

করে পারলাম না। কারণ, যে ডাক্তারবাবু রচনাটির লেখক, ইয়োরোপে তাঁর চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর প্রতিষ্ঠা আছে যদিও, কিন্তু তাঁর প্রতিপাত বিষয়টি ঠিক আমাদের কচিসঙ্গত নয় মনে হলো—পর্যাপ্ত বয়সের বৃদ্ধের কত ভয়মহিল। চারটি সন্তানের মা—স্বামী জীবিত এবং সক্ষম, আর্থিক অবস্থা ভালো—এইরকম একজন মহিলা নিরতিশয় দরিদ্রপাড়ার এক স্থূল মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ঘরসংসার ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন—এরই একটা চিকিৎসা হলো আলোচ্য রচনাটি।

ডাক্তারদের সাধারণত সময় থাকে কম, কাজেই পড়াশুনোর সুযোগ যেটুকু তাঁদের আছে, তাঁর প্রাণকটিনের পক্ষে সুবিধে হয় এই রকম রচনাই তাঁর পড়বার জন্তে আগ্রহ থাকে। আমি 'লালস' সম্পর্কেই সাধারণত চিকিৎসা করে থাকি—কাজেই 'রোগটা কোথায়?—দেখে না মনে?' আমি পড়বার জন্তে আগ্রহবোধ করলাম না। অল্প কিছু একটা পড়বার ভাবছি এখন সময় এলেন রথীনবাবু—বিশেষ অবস্থাপন্ন এবং মাতৃগণ্য একজন ভদ্রলোক—আমি এদের ক্যামিলি ফিজিসিয়ান। বৃষ্টি তখন বেশ পড়ছে—রথীনবাবু তারই মধ্যে কিছুটা ভিজেই এসেছেন।

যান্ত্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম: কি ব্যাপার? ছোটো থোকর অরটা বুদ্ধি আবার বেড়েছে? কাপালুলটা দিয়েছিলেন তো?

## বেশী বয়সের প্রশ্ন

—হ্যাঁ, নিরৈচ্ছিক ক্যাপসুল, ওর অর্থ খাড়ে নি, ভালোই আছে; আমি এসেছি অল্প ব্যাপারে।

—বয়স, বস্তু হবেন না।

রথীনবাবুর কথা বলবার বিশেষ ভঙ্গি দেখে একটু অস্বস্তি হয়ে গেলাম মনে মনে। পরিবারের কারবার একটু কিছু হলে উনি যে ভাবে আমার চেয়ারে এসে জমড়ি খেয়ে পড়েন, তাতে অনেকেই আশ্চর্যবোধ করেন। আর উনি কখনো এসে পড়লে সব কাজ ফেলে আগে ঠর কথা না শুনে উপায় থাকে না—যে জন্তে অজ্ঞান লোকজন এমন কি আমার কম্পাউন্টারও অনেক সময় বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। সেট রথীনবাবুর মুখ-চোখের ব্যস্ততার কোনট লক্ষণ দেখলাম না। উনি বেশ ছেঁকে বসলেন আমার সামনের চেয়ারটাতে, তাবপর আস্তে আস্তে আবস্ত করলেন—মাঝে একটু দৃষ্টিতে আপনাকে নিশ্চয়ই একটা পাকড়া দাবে মনে করবেই চলে গেলাম।

—বিশেষ করে বলুন কি ব্যাপার?

—দেখুন, এটা একটা ব্যাপার কি না ঠিক জানি না, হলেও হতে পারে। ব্যারাম হলে তো নিশ্চয়ই চিকিৎসা করবেন, আর তা না হলে অপারেশন আশা করবেন।

—নিশ্চয়ই, বাঃ!

—আগেই শপথ নিয়ে ফেললেন?

—নয় কেন?

—শুনলে আবার যেমনি নাক ঠেকাবেন না তো!—আমার ছেলেমেয়েরা যেমন করছে? স্ত্রী যেমন করছেন?

—একি কথা রথীনবাবু!

—ঠিকই বলছি।

কথাটা বলেই রথীনবাবু চট করে মুখ ফেরালেন বাঁয়ে, জানালার দিকে। বন্ধ জানালার খড়খড়ি নিয়ে বুটের জল চুইয়ে চুইয়ে কঁটায়ে কঁটায়ে করে পড়ছি—আমার মনে হতে লাগলো যেন রথীনবাবু কানদেন সাধারণত বয়স পুরুষমানুষেরা যেভাবে কৈদে থাকেন।

একটু অপ্রস্তুতবোধ করলাম। গভীর প্রকৃতি যেকোনো এই ব্রিটার্ড ম্যাঞ্জিষ্ট্রটকে হঠাৎ যে কি বলে সাধনা দেওয়া উচিত, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

আরো একটুকুণ বাদে রথীনবাবু নিজেই বলতে লাগলেন জানালার দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই: আমি আজ সকলের ঘুণার পাত্র ডাক্তারবাবু! স্ত্রী, ভাই, বোন, ভেলে, মেয়ে, ছেলের বোঁ, মেয়ের জামাই সকলেরই ঘুণার পাত্র। দোদটা তাদের কারো নয়, আমার নিজেরই। বলতে কি, আমি নিজেকে নিজেকে এ জন্তে কারো চাইতে কম ঘুণা করি না। সত্যি আমি ঘুণার বোণ্য: কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি অসহায়; নিজের ওপর আজ আর আমার কিছুমাত্র জোর নেই; একটু সাহায্য করবেন?

পরে রথীনবাবু আরো যা বললেন তার সাবমর্ষ অনেকটা এই রকম: ওঁদের দেশের একটি বালবিধবা, খুবই সাধারণ একজন মহিলা, শিক্ষানীকও নেই, অবস্থাপন্নও খুবই শোচনীয়, সামান্য কিছু জমিজমা আছে, আর তা ছাড়া অবস্থাপন্নরা নিয়মিত কিছু কিছু সাহায্য করেন তাতেই কোনো মতে চলে যায়—বর্তমানে বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ।

রথীনবাবুও বিগত বিশ বছর ধরে তাকে নিয়মিত সাহায্য করে আসছেন। কখনো একজন দুঃস্থকে সাহায্য করা হচ্ছে ভিন্ন আর কিছু মনে হয় নি—কিন্তু আজ বছরখানেক হতে চললো নিজে যাটের কোঠা পেরোবার পরে ঐ মহিলাটি সম্পর্কে মনে একটু দুর্বলতাবোধ করতে থাকেন। ক্রমশ নিশ্চয়ই নিজেকে বাবচারে ও নিজের অজ্ঞাতসারেই ওর সম্পর্কে মনের আসল ভাষট একটু একটু প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তারপরে অল্প মাস-খানেক হলো স্ত্রী একদিন খোলাখুলিই বললেন যে, ঐ মহিলাটির এ বাড়িতে আসা বন্ধ হওয়া দরকার। বরং রথীনবাবুই যেন তার বাড়িতে যান, ছেলের বিয়েথা হয়ে গেছে, একেবারে বাড়ির ওপর ঐ সব ব্যাপারটা দেখে থাকলে তাহলে মনোদায় বাধে। রথীনবাবু হতবাক। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হয়ে গেছে সে বিষয় আর ভিলমাত্র সন্দেহ নেই। রথীনবাবু বললেন যে তাঁর স্ত্রীর মুখখাশ দিয়ে সে অতো দুখা বয়সে পড়বে, তা উনি কখনো ভাবেন নি। আর নিজের কৃতদর্শি—সে-বিষয়েও ওর কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্ত ব্যাপারটার জন্তে দায়ী উনি নিজেই। কিন্তু উনি অসহায়। স্ত্রী-পিতার পরিচিত ঐ মহিলাটির আকর্ষণ ইনানী: উনি আর রোধ করতে পারছেন না।

রথীনবাবু প্রতিটি কথা খুব মন দিয়েই শুনলেন—ডাক্তার হিসেবে তো বটেই, বন্ধু হিসেবেও বটে। তারপর অতর দিলাম ঠেকে, বললাম দিন দিনেরক বাদে আসতে, এর মধ্যে ব্যাপারটা আমি একটু ভেবে নিতে চাই।

রথীনবাবু চলে যেতেই আবার ঐ মেডিকেল জার্নালখানা টেনে নিলাম, তারপর আর একখানা। এমনভাবেই চললো তিনটে দিন। ইয়োরোপ-আমেরিকা থেকে প্রকাশিত অল্পত দশ-পনেরো খানা হালফিলের পত্রিকা বাঁটা-বাঁটা করে এই সিঁড়িতে পৌঁছলাম যে বেশী বয়সে এই যে প্রেমের জন্তে মানুষের নতুন করে আকাজক্ষা জাগে মনে, তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই বরং এই ইচ্ছে জাগাটাই স্বাভাবিক। যৌবনের শুরুতে এই ইচ্ছে জাগা যেতোটা স্বাভাবিক—যৌবনের শেষে এই ইচ্ছেটা আবার নতুন করে জাগা তার চাইতে কোনো মতেই কম নয়। কারো এ বাসনা জাগে পরতার্লিশ থেকে পঞ্চাশ-এর মধ্যে, কারো বা পঞ্চাশ-এর পরে, কারো বা তারও পরে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, মেয়েদের বেলার এ বয়সটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বার পুরুষের বেলার পরতার্লিশ থেকে বাঁটা কি বাফটি। এই ইচ্ছে জাগাটা একটা একাডেমি জৈবিক নিদে শ। এর মধ্যে ডাক্তারীশাস্ত্র অনুযায়ী অস্বাভাবিক বা অজ্ঞানের কিছু নেই—অজ্ঞান বা সে সামাজিক দৃষ্টিতে। সবচাইতে আশার কথা, এ ব্যাপারে এই সামাজিক অজ্ঞানের দিকটা সম্পর্কে যিনি অজ্ঞাবস্তর সজাগ থাকেন—তার পক্ষে নিজেকে আবার নতুন করে বেশ আনা অনেকটা সহজ হয়।

রথীনবাবুকে তাঁর পাশ-বোধ থেকে কি করে উদ্ধার করবে মনে মনে সেইটে ঠিক করে নিয়ে অবৈধভাবে অপেক্ষা করতে লাগলার ঠর আবির্ভাবের জন্তে।

—স্মরণিক

# ফাঁসির কয়েদী কি হইবে?

**ফাঁসির কয়েদী** কি করে? কি তার পক্ষে করা সম্ভব? কথটা কখনো মনে হয়ছে কি? অনেক হয়তো বলবেন যে, ফাঁসির কয়েদীর মতো। একজন হতভাগ্য লোক কি করলো বা না করলো তা জেনেই বা লাভ কি! আবার অল্প কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, ফাঁসি ক্রমশ উঠেই যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, এ একটা হুমকীমূলক ব্যাপার—এতোই হুমকীমূলক যে, এ সম্পর্কে কিছু জানা না থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই।

আমাদের কিন্তু মনে হয় এর কোনোটাই সঙ্গত কথা নয়। কারণ, প্রথমত যে কোনো বিষয় সম্পর্কেই হোক না কেন, না-জানার চাইতে জানা যে সব সময়ই অধিকতর বাস্তবীয় জিনিস, একটু আবেগ সূচক করতে পারলেই আমরা তা বুঝতে পারি। আর দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে ফাঁসির সাজা বন্ধ হয়ে গেলেও গোটা পৃথিবী থেকে যে অদূরবিদ্যতে ফাঁসি উঠে যাচ্ছে, তা মনে করবার পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নীতিশাস্ত্রের যে গভীর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেশ-বিদেশের আইনজীবী, সমাজসেবী তথা অজ্ঞাত মানব-বন্দরীরা দীর্ঘকাল ধরে ফাঁসি বন্ধ করবার জন্তে কমবেশি আন্দোলন চালিয়ে ধীরে ধীরে জনমত তৈরি করবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ আজকের দিনে প্রেসিংগ্রাম, গোল্ডিংগ্রাম, কিংবা ভাতিয়গ্রামে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ে সমগ্রভাবে মানবজাতির জন্তে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করে নিজ নিজ শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জাতির স্বার্থের চিন্তার মশগুল হয়ে পড়ছেন। প্রত্যেক দেশের ভেতরকার সংগ্রাম মতো তীব্র হয়ে উঠছে নিজের গণ্ডীর বাইরের কথা ভাববার বা তার জন্তে কিছু করবার স্পৃহা মানুষের ততোই কমে আসছে। যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, ত্রিশ বছর আগের মানুষ মতোটা উদার ছিলো আজকের দিনে আর তা মোটেই নেই—রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও। বরং এক এক সময় মনে হয় যে, প্রতিটি গোষ্ঠী, দেশ বা জাতির মানুষকে রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব আজকের দিনে অত্যন্ত সচেতন দেখা যাচ্ছে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে—যতটা। বোধ হয় রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব হুটী হবার আগে ছিল না।

বাই হোক, পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে ফাঁসির রেওয়াজ কিন্তু অদূর-জবিষ্যতে উঠে যাচ্ছে না। কাজেই ভালো লাগুক আর না লাগুক, আমরা কেউ চাই আর নাই চাই ফাঁসির হুকুম আরো হাজার হাজার, ক'জানো, হয়তো বা লাখ লাখ মানুষকে নিজের কানে শুনতে হবে বিধাতো।

সত্যক পেশীগুলিতে যতদিন শক্তির প্রাচুর্য থাকে, ততদিন কাকুরই

মৃত্যুর কথা অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর কথা মনে হয় না—কখনো মনেও হয় না তার এ কথাটা। কিন্তু এ সময়েও তাকে মনে করিয়ে দিলেই সে স্বীকার করবে যে, সে চিরজীবী হয়ে আসে নি পৃথিবীতে। একদিন যে মরতে হবেই, ঠা, সে কথা সে জানে। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে এই যে জানা আর ফাঁসির হুকুম হওয়ার—এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সবাই বুঝতে পারে যে তার মৃত্যু অবধারিত—কিন্তু কেবল কখন যে আসছে সে মৃত্যু, তা নেহাত দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় বা কেউ জানেও না। কিন্তু ফাঁসির কয়েদী জানে যে তাকে অল্পক দিন অল্পক সময় মরতে হবে—মৃত্যুর দিনকণ্ঠ সম্বন্ধে এই যে একটা স্থিরনির্দিষ্ট পূর্বজ্ঞান—প্রধানত এর ফলেই তার অবস্থটাকে তর্কোপা করে দেয় যে কোনো সাধারণ মানুষের কাছে, অপরাধীমাত্রেরই আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্তে সবসময়ই প্রচুর কথা থাকে, যার সব কথাই হয়তো বা কেবলো অসার নাও হতে পারে। কাজেই অসাধারণ হ'ল একটা ক্ষেত্র ব্যতীত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে ফাঁসির হুকুম হলে কয়েদী মনে করে থাকে যে তার ওপর সুবিচার করা হলো না—তা খুই সহজবোধ্য। কাজেই আদালতে যাবার আগে বা যেতে আরম্ভ করবার পরে তার মনে যে পরিমাণ ক্ষোভ থাকে ফাঁসির হুকুম হবার পরে সেটা আরো অনেক বেড়েই যাবার কথা।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন আমাদের স্বদেশী যুগে দেখা গেছে একাদিক বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম হবার পরে রীতিমতো শহীদ ফিরতে আরম্ভ করেছিল। এগুলি নিশ্চয়ই অসাধারণ ঘটনা। এই বীর দেশসেবকগণ কাজে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের এমন সম্পূর্ণভাবে দেশহাত্কার পায়ে উৎসর্গ করে নিতেন যে, ফাঁসির হুকুমটা বাস্তবিকপক্ষে তাঁদের মানসিকতাকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারতো না। কাজেই এঁদের কথা আসা দাঁ।

অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রচনার ফাঁসির কয়েদীর চরিত্র আছে—সেগুলিও সাহিত্যের কল্পনা হবারই সমধিক সম্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক সত্য নয়।

ইদানিং দু'জন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণার ফল জানা গিয়েছে এ সম্বন্ধে। এঁরা দীর্ঘকাল ধরে ফাঁসির আসামীদের মানসিকতাকে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। এই মনোবিজ্ঞানীর ডাঃ হার্ভে ব্রস্টোন এবং ডাঃ কার্ল ম্যাকগাহী বর্তমানে নিউইয়র্কের সিং সিং বন্দিশালায় সঙ্গে যুক্ত আছেন। এঁরা দীর্ঘকাল ধরে কয়েক শত ফাঁসির কয়েদীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সাধারণত শা মনে করা হয়ে থাকে, ফাঁসি



## পাগলা কুকুর সাবধান

নিদারুণ হস্তাশা বা নিদারুণ আতঙ্ক—এর কোনোটাই কঁাসির কয়েদীর মধ্যে দেখা যায় না। অল্পশোচনার লক্ষণও কদাচিৎ দেখা যায়। জোরামতোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্তে আবেগের যে তীব্রতার প্রয়োজন হয় (যা সাধারণত যুক্তিবোধকে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে) তা দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে এবং আবেগের এই তীব্রতার ফলেই কয়েদী সাধারণত কঁাসি হওয়ার তাৎপর্যটাও সবসময় উপলব্ধি করতে পারে না। ডাঃ ব্রুস্টাস এবং ডাঃ ম্যাকগাহী বলেন যে, এটা যদি না হতো তা হলে খুব সস্তাব আসন্ন-মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে বেশিরভাগ কয়েদীই অল্পসস্তের মধ্যেই উদ্ভাস হয়ে যেতো। এই তো গেলো প্রথম অবস্থা—কঁাসির কয়েদীদের বেশিরভাগেরই যে অবস্থার মধ্যে কঁাসির পূর্ণাঙ্গ অবধি কাটে।

দ্বিতীয়ত হলো একটা ভাগ্যান্ধিতরীল অবস্থা। ভাগ্য বিশ্বাস করে এরকম ব্যক্তির দুঃস্বপ্ন বা মৃত্যু অনিবার্য এরকম রোগের কবলে পড়লে যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ কি আর করা যাবে, ভগবান যখন চাইছেন, মরতে হবেই। কঁাসির কয়েদীর পক্ষে এটা ঠাঁড়ায় অনেকটা এই রকম—ওরা আমাকে হত্যা করবেই। বেশ। করবে, করুক।

তৃতীয় দলে পড়ে সেই সমস্ত কঁাসির কয়েদীরা—যারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসই করে না যে তাদের বাস্তবিকই কঁাসি হবে। তারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, উচ্চতর আদালতে প্রাণভিক্ষার আবেদন নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে।

চতুর্থত দেখা যায় কঁাসির কয়েদীদের মানসিকতার একটা আকস্মিক পরিবর্তন। কেউ হঠাৎ নতুন কোনো ধর্মে দীক্ষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কারো মধ্যে বা দেখা দেয় সাহিত্য বা দর্শনশাস্ত্র

সম্বন্ধে একটা উদগ্র আগ্রহ—অর্থাৎ তার নিজের যে কঁাসি হতে চলছে এই একটা ব্যাপার ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত বিষয়েই এ আগ্রহহীন হয়ে ওঠে।

পঞ্চম বা শেষ দলে যারা পড়ে তাদের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রাথমিক লক্ষণগুলি নিঃসন্দেহভাবেই দেখা দেয়। এরা মনে করে যে, তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন স্বাভাসময়েই মঞ্জুর হয়ে গেছে, শুধু সেই খবরটা সরকারীভাবে জেলখানার এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। খবরটা এসে পৌঁছবে যে-কোনো মুহূর্তে। প্রাণদণ্ড মকুব হয়েছে যদিও (সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই) কিন্তু তার পরিবর্তে কি হলো? যাবজ্জীবন কারাবাস না কি পাঁচ বা দশ বছরের জেল? যে-কত্থর খাঙ্গারের স্তূপ হবার কি কোনো আশাই করা যায় না? এই শ্রেণীর কঁাসির কয়েদীদের কারো কারো মনোবিকৃতিটা আবার এমন একটা অবস্থার পৌছয় যে, আশেপাশের লোকজনকেই এরা শত্রু মনে করতে আরম্ভ করে। এরা প্রকাশ্যেই বলে থাকে যে, প্রাণদণ্ডের আবেদন মঞ্জুর না হয়ে থাকলেও হবে নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে আর কি হবে—জেলখানার লোকগুলি বা শয়তান, ওরা আমাকে হত্যা না করে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করে যে অর্ডার আসবে—সে কাগজখানা নিশ্চয়ই দেখি নি দেখি নি করে অল্প কাগজপত্রের তলার চেপে রেখে এই পাঞ্জি লোকগুলি কঁাসিত হুঁসিয়ে দেবে আমাকে—আর তারপর যখন সব জানাজানি হয়ে যাবে তখন এই বদমায়েসগুলি বলবে, অহা ভুল হয়ে গেছে। এ রকম কত ভুলই তো ওরা করে থাকে।

একবার ভাবুন, বাঁচবার জন্তে মানুষের কি সীমাহীন আকৃতি।

—তারদাভ

## পাগলা কুকুর, সাবধান

পাগলা কুকুর! পাগলা কুকুর! পালাও, পালাও।

এ রকম চাঁৎকার পাড়ার বা পরীতে আমাদের দেশের গ্রামে বা সহরে তো কটেই, পৃথিবীর অনেক দেশেই কমবেশি শোনা যায়। অসহ্য পথচারী বা ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের বীরা এভাবে সতর্ক করে দিবে থাকেন, তাঁরা পরম উপকারী করে থাকেন বলতে হবে, কারণ পাগলা কুকুর বা শেরালের কামড় অনেক সময় মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে ঠাঁড়ায়—আর সে মৃত্যুর যে ব্রহ্মা তা বীরা দেখেছেন কখনো, শুধু তাঁরাই জানেন কি ভয়ঙ্কর।

জলাতন রোগ যে শুধু পাগলা কুকুর বা শেরালে কামড়ালেই হয় তা নয়, জলাতনরোগগ্রস্ত গরু, নেকড়ে, কাঁবিড়ালী এমন কি সিংহের কামড়েও মানুষের বা অস্ত্র যে কোনো জীবজন্তুর মধ্যেও জলাতন রোগ সংক্রামিত হতে পারে। তবে গরুর জলাতন রোগ কদাচিৎ হতে দেখা যায়। হলেও মানুষকে কামড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের কন। কিন্তু শেরাল বা কুকুরের মধ্যে যখন জলাতন রোগ দেখা দেয়, তখন তার সময়ের মধ্যেই তা একটা ভয়ের কারণ হয়ে ঠাঁড়ায়। কারণ,

পাড়াগাঁয়ে রাস্তার আশেপাশের ঘোপ-কাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে অসতর্ক পথচারীকে কামড়ে বাওরা, শেরালের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ে। কুকুরের পক্ষেও ঠিক তেমনি। কুকুরের জলাতন রোগের সঙ্গে আমরা সবাই বেশি ছঁসিয়ার। কারণ, সহরে এবং পাড়াগাঁয়ে কুকুর সর্বত্রই অবাধে ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্তেই কুকুর সম্পর্কেই সতর্কতার প্রয়োজন সর্বাধিক।

জলাতন রোগের বিজ্ঞাণু যা খুব ক্ষতিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না—তা থাকে জলাতনরোগগ্রস্ত কুকুরের লালার সঙ্গে মিশে। সেই জন্তেই দেখা যায় কাপড় বা প্যাণ্টের ওপর দিয়ে যদি কখনো কোনো পাগলা কুকুর কামড়ে দেয় তা হলেও রোগটী খুব বেশি সংক্রামিত হতে পারে না—কখনো বা আদৌ সংক্রামিত হয় না। এমনতেই কুকুরের খড়ার সবকিছু কামড়ানো—জলাতন রোগ হলে ঐ প্রাণভক্তিটাই আরো বেড়ে যায়। এই রোগের কবলে পড়লে দেখা যায় মানুষেরও হৃৎকম্প প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। এক হলো পক্ষাঘাত—যেখানে কুকুর কামড় মিছেছে

সেইখান থেকে পক্ষাঘাতের সূচনা হয় এবং তারপর ক্রমশ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষাঘাতের লক্ষণ—এমন কি শ্বাসকেন্দ্র, ফুসফুস এবং হার্টেও। তখনই মৃত্যু ঘটে। আর দ্বিতীয় রকমের প্রতিক্রিয়া হলো হুখ থেকে ফেনা বেরোনো, অল্প ঘ্র, সবকিছু কামড়াবার একটা ভীত ইচ্ছা, মাঝে মাঝে শরীরে খিঁচুনি, অল্প কথাতাই একবারে কিণ্ড হয়ে ওঠা, অথচ তারই সঙ্গে একটা দারুণ হতাশার ভাব। ক্রমাগত গলা শুকিয়ে আসা অথচ জলস্পর্শ করবার অনিচ্ছা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, জলাতঙ্কগ্রস্ত মানুষের যদি দ্বিতীয় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে, তা হলে তাকে সাহায্যে তোলা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রথম ধরনের অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিলে তার রোগমুক্তি প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেইজন্টই পাগলা কুকুরে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া ভালো—আর সেই কুকুরটার দিকে নজর রাখা দরকার।

কারণ জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুর সাধারণত অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুর কামড়ালে মানুষের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে দশ দিন থেকে এক বৎসর পর্যন্ত সময় নিতে পারে—কিন্তু সেজন্ট অপেক্ষা না করাই ভালো।

ইরোপ-আমেরিকার অনেক দেশ এবং এশিয়ার জাপানেও আজকাল কুকুরকে জলাতঙ্কনিরোধক টিকা দেওয়া হয়—যার ফলে ঐ সমস্ত দেশ থেকে এ রোগ একবারেই নিমূল হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও যতদিন অল্পরূপ বন্দোবস্ত না হচ্ছে, ততদিন দেখতে হবে একটা কুকুর পাগল হয়ে যাবার জন্ট হয় তো শত শত নীরোগ এবং নিরীহ কুকুরকে মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশনের পালোয়ান কর্মচারীদের বিশাল মুদগরের ঘাঁতে খোলা রাজপথে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

—ময়দী

# একটু আড়াল

স্বামী-স্ত্রী, পৃথিবীর সামাজিক সংস্কার মাঝে যে সখকটি সখচরে গুরুত্বপূর্ণ তারই নাম, এ সখকে আবদ্ধ যুগলের মাঝে পারস্পরিক আচার-ব্যবহার কি ধরনের হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও বহুজনের বহুমত, তবে একটা বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, তাদের মধ্যে কোন আড়াল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

সাদা কথার স্বামী-স্ত্রীর কাছে কিছু গোপন করবে না, অপরপক্ষে স্ত্রীও নিজের ছন্দরখানি সর্বদাই বিশ্বস্তভাবে মেলে দরবে স্বামীর কাছে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে সেটা কি সত্যই খুব প্রফুল্লপ্রদ ?

নীতিবিদদের জ্ঞ-কুণ্ডন সঙ্গেও বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, দাম্পত্যকে সফল করে তুলতে হলে দাম্পত্যের মধ্যে কিছুটা আড়াল থাকা অত্যাৱশ্যক।

ধন্য কোন স্বামী একটু অধিকমাত্রায় কোপনস্বভাব সে ক্ষেত্রে সঙ্গারে শান্তি বজায় রাখতে হলে স্ত্রীর পক্ষে 'সদা সত্য কথা বলিবে' এ নীতিবাচ্যটি সর্বদা অম্লসরণ করতে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, এজন্ট মুদ্বিত, পত্নীমাত্রই এ ক্ষেত্রে 'অখপামা তত ইতি গজ' রূপ পন্থাটি অবলম্বন হয়ে থাকেন আর তাতে যথেষ্ট উপকৃত্যও হন।

কিন্তু ঘটনা বা কিছু তথ্য পরস্পরের কাছে লুকালে যদি সংসারের শান্তি অব্যাহত রাখা যায়, তবে সেটাই কর্তব্য নয় কি ?

ধন্য কোন স্ত্রী দাবা বা তাসের বাজি খেলাটিকে একবারেই পছন্দ করেন না অথচ স্বামী বেচারার যে সেদিকে শুণু আন্তরিক আকর্ষণই

আছে তা নয় সম্ভার সময় একবার ওই সখের আড্ডায় যেতে না পারলে মেজাজটাই যার খিঁচড়ে—সে ক্ষেত্রে নিজের প্রিয় নেশাটি ত্যাগ করে বাড়িতে বসে বিশ্বস্তর মৃতিধারণ করার চেয়ে একবাঞ্ছি খেলে এসে প্রেমমুখে গিল্লীকে আগিসের কাজের পর্বত প্রমাণ ফাইলের হিসাব দাখিল করলে সাপও মরে লাঠিও ভাঙ্গে না; গিল্লী খুশি হয়ে ভাবেন আহা 'আমার ণ্ডনার' মত কাজের লোক আর কে, কর্তাও নেশার থোরাক জোটাতে থাকেন প্রেমচিহ্নে; ফলে অবকাশকালীন অবসরটুকু দাম্পত্যের কাছে হয়ে ওঠে মধুময়। অবশ্য এই আড়ালেরও রকমফের আছে কোন গহিত অভ্যাস বা কর্মকে লুকোনোর পেছনে নেই কোন যুক্তিই।

আবার দাম্পত্য সখকে কোন আড়াল না থাকার আর একটা বিপজ্জনক দিকও আছে। হুঁজুন মানুষ ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাস করতে করতে কোন আড়াল না থাকার পরস্পর পরস্পরের কাছে আর ছুঁটো বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তা না হয়ে একটা সত্তায় পরিণত হয়। তাদের চিন্তা, সুখ, দুঃখ সবই একভাবে বইতে থাকে, আর এরই অবশ্যস্বামী ফলস্বরূপ পরস্পরের কাছে বোরিং বা একঘেয়ে হয়ে ওঠে, দাম্পত্য সখকে ফাটল ধরাতে এর বাড়ি বিপদ আর নেই। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে কিছুটা আড়াল অবশ্য প্রয়োজনীয় বটে, তবে আগেই তো বলা হয়েছে যে এ আড়াল যেন দূষিত না হয়, আর এ আড়ালের উদ্দেশ্য যেন শুভ হয়।

## একপশলা বৃষ্টির পর

স্বামীর অমতে পুত্র-কন্ডার উচ্চশিক্ষার্থে কোন স্ত্রী যদি লুকিয়ে বসন্ত জোগান তবে পরিণতিতে তা সুফলই এনে দেয়, আবার ঠিক তেমনি যদি তাদের উচ্চাঙ্গতার কড়ি গোপনে জোগান তাতে পরিণামে স্বর্ণনাশই ঘটে থাকে।

সন্দেহ বা অবিবাহিত দাম্পত্যের মন্ত বড় শত্রু, যে স্বামী স্ত্রীকে অবিরত সন্দেহ করেন বা যে স্ত্রী কর্মজাল স্বামী ঘরে পা দেওয়ারদ্রষ্ট তাঁকে শত-সত্যের জেরা করে বিধ্বস্ত করে দিতে প্রয়াসী হন, তাঁরা দু'জনেই অপরিণামদশী। এতে দু'জনেই মন ক্রমে পরস্পরের উপর বিধিরে ওঠে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক দাম্পত্যের ইতিহাস জানি, যাদের দাম্পত্য জীবনের বন্যায় পর্বস্ত ধ্বংস হয়ে গেছে পরস্পরের আড়াল ভাঙ্গার প্রচেষ্টায়।

অনেক সময় দাম্পত্যের মধ্যে কোন একজন অপরের সম্বন্ধে এমন কোন তথ্য জানতে পারেন বা তখনও পশ্চাদ্ধ সেই ব্যক্তির নিজেরই থাকে অজানা, অথচ বা জানতে পারলে তাঁর মানসিক স্বা ও শান্তির চিরতরে অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কর্তব্য কি?

নিয়ন্ত্রিত কাহিনী থেকে এর সহজতর পাওয়া অসম্ভব নয়। এক শিক্ষক স্বল্পবয়স্ক অত্যন্ত ভাবপ্রবণ বা যুঁকি স্বভাবের মানুষ ছিলেন, সেই সঙ্গে চুরারোগ্য ব্যাধির প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড ভয়, স্ত্রীকে তিনি বহুবার বলেছেন যে, ও ধরণের কোন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে জীবনাবসান ঘটাবেন; দুর্ভাগ্যবশত তাঁরই পেতে দেখা দিল একদিন কালার নামক ভয়াবহ ব্যাধির সূচনা; পারিবারিক চিকিৎসক বিবাদ-গস্তার মুখে স্ত্রীকে সংগোপনে জানালেন সে কথা।

ভয়বিহ্বল হয়ে পড়লেও অসংযত্ন ঈশ্বরের পরিচয় দিলেন ওই মহিলা সেদিন, তিনি জানতেন সে সময় স্বামী এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার ব্যাপ্ত আছেন, যাতে ব্যাধাত ঘটলে তাঁর নাম, বশ ও আর্থিক সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে চিরতরে, আর পত্নী এও জানতেন যে, কিছুতেই ওই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি নেই ঐ স্বামীর, চিকিৎসক নির্ধারিত সময়েই তাঁর মৃত্যু অবধারিত, সমস্ত বিবেচনা করে স্বামীকে অন্ধকারে রাখারই সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রী। জোগালেন আশ-উদ্দীপনা। স্বামীর অন্তরে, সমস্ত সেবার সাহচর্যে মগ্ন হয়ে গুললেন স্বামীর গোপা দিনগুলিকে।

বধ্যসময়ে গ্রন্থ সমাপ্ত হল, বশের মাথা দুলালো শিক্ষকের গলায়, মৃত্যুও অবশ্য এল প্রায় তার অব্যবহিত পরেই, কিন্তু পূর্ণ চিরের আনন্দ

স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন না তিনি, আর সেটুকুই বইল পতিপ্রাণা মহিলাটির সম্বল।

আড়াল যে সব সময় অনাকাঙ্ক্ষিত নয় পরন্তু অভিনন্দনবোণ্য, উপরের ঘটনাটি তাই প্রমাণ করে না কি?

বিয়ের পরে বা সব ঘটে তা ছাড়া আরও অনেক ঘটনা থাকতে পারে প্রাক-বিবাহিত জীবনের বা গোপন থাকলেই দাম্পত্যের কালটি হয় শান্তিপূর্ণ। এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে স্বামী বা স্ত্রীর অবিবাহিত গর্বায়ে বা বিবাহের পর পরস্পরকে না জানানোই মঙ্গলজনক। ধরুন একটু-আটটু রোমান বা হার্মা ধরণের প্রেমবন্ধনের ঘটনা তরুণ-তরুণী মাত্রেরই জীবনে এসে থাকে বা আসতে পারে, কিন্তু বিবাহের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সবের কোন অস্তিত্ব থাকে না, সে ক্ষেত্রে কেবল কি ঘটেছিল সেসব বিশদভাবে পরস্পরের কাছে বলে বলার সার্থকতা কি? লাভের মধ্যে মনে সন্দেহের বীজ বোপণ করা হয়ে যায় চিরতরে এবং মনোমালিঙ্গের সময় উভয়পক্ষই সেইসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে ঘারেল করার চেষ্টা করেন, ফলে সামান্য দাম্পত্যকলহও চিরকালীন প্রাণা অধুয়ারী লঘুক্লিয়ার পরিণত হা হয়ে কখনও কখনও চিরস্থায়ী বিদেহ ও যুগার সঞ্চার করে।

একটু আড়াল ভাল একথা সত্য এবং অনস্বীকার্য সত্য, তবে আগেই বলা হয়েছে যে তার রকমকমে আছে, প্রবন্ধনার সঙ্গে এই আড়ালকে কেউ যেন গুলিয়ে না ফেলেন, কারণ প্রবন্ধনা হীনতারই নামান্তরমাত্র এবং তার আশ্রয়ে কখনও কোন মানুষ সুখী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে বাহাদুর বনবার আশায় নিজের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বা উপার্জনকে অতিরঞ্জিত করে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন—তা হলে সুফলের বদলে কুফলই দেখা দেবার প্রভুত সম্ভাবনা।

একটা ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে স্ত্রী সেসব ক্ষেত্রে বেভাবে সংসার চালনা করেন তাতে পরিণামে সংসারের আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, কারণ আর অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে সংসার জীবনের ভিত্তিস্তম্ভ ধ্বংস হয়ে বাওয়ার সম্ভাবনা।

সুখী দাম্পত্য জীবন ভোগ করতে হলে তাই প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে বুঝে নিতে হবে কোন কোন বিষয়ে একটু আড়াল রাখা উচিত আর কোন কোন বিষয়ে সেটা একান্ত অনিষ্টকর।

বুকে চসতে পারলে একটু আড়াল দাম্পত্য জীবনকে সকল ও পূর্ণায়ত করে তুলবে নিঃসন্দেহে।

—জিমতী

## একপশলা বৃষ্টির পর

সলিল মিত্র

একপশলা বৃষ্টি হল—থমধমে আকাশটা উজ্জল  
সমস্ত দিনের পর; সমুদ্র হাওয়ার মিঠা স্বাদ;  
সমুদ্র এতোই কাছে, শুনে তার ঢেউয়ের কঙ্গোল  
খুশি-খুশি অল্পভূতি, মুছে ফেলি সব অবসাদ।

আর আজ—বৃষ্টি হলে আকাশ কি মেঘাচ্ছন্ন থাকে?

কাল স্বপ্নে এসেছিলে—আজ এলে বিকেলের ডাকে।

বসুমতী : আবার '৭১

৩৬৩

আস্তিনার এসে বসি, চোখ বৃষ্টি, বালার আলো

চোখের তারার কাঁপে, বিকেলের কুচুড়া লাল—

তারই এতো আলো না কি আমার হৃৎ চোখেতে ছড়লো?

আমার বুকের কাছে তুমি স্বপ্নে এসেছিলে কাল।

# দস্তয়েভস্কির জীবনে নারীর প্রভাব

কালীপদ মণ্ডল

বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক দস্তয়েভস্কির জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে আমরা নারী-চরিত্রের বিশেষ কোনদিক সঞ্চকে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। আমরা বলি বা আমাদের এমন একটা ধারণাও আছে যে, আমাদের দেশের মেয়েরা সতী-সাক্ষী ও স্বামীপুত-প্রাণী, কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের মেয়েদের সঞ্চকে আমাদের ধারণা অন্তরূপ। জীবনে বার বার নতুন স্বামী গ্রহণ ও বর্জন তাদের মধ্যে প্রায়শই ঘটে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার বিচারে তা নিন্দনীয় নছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ ঘটনাকে কেহ সহজে বরদাস্ত করবে না। অধুনা অবশিষ্ট কিছু পরিবর্তন হয়েছে, মাহুয়ের মন ও চরিত্র বদল হয়েছে, আইনের বন্ধনও শিথিল হয়েছে। দস্তয়েভস্কির জীবনেও এমনি করে পর পর তিনটি মেয়ে এসেছিল। মারিয়া, অ্যাপোলিনারিয়া ও অ্যানা। মারিয়া বিবাহিতা ও এক সন্তানের মা, তার স্বামী মদ খেয়ে অধিকাংশ সময় বদ মাতাল হয়ে থাকত। মারিয়ার জীবন হয়েছিল তাই বিষময়। স্বামীর মৃত্যুর পর দস্তয়েভস্কি মারিয়াকে বিয়ে করেন। তাঁদের এই মিলন সুখের হয় নি। দস্তয়েভস্কি দীর্ঘ আট বৎসর সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন, ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি রাত ও মৃগী রোগে আক্রান্ত হন। সংসারে খুব অভাব। মারিয়ার দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিল। কারো মনে শান্তি নেই। যখন অসুখ বাড়তে তখন তিনি মাসের পর মাস মারিয়ার সেবা করে যান। তখন তিনি স্বামী নন, লেখক নন— শুধু নার্স। এই সময় দস্তয়েভস্কির 'The Insulted and the Injured' উপন্যাসখানি তরুণসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। লেখক ছাত্রদের বৈঠকে প্রায়ই নিমন্ত্রিত হতেন।

এমনি এক বৈঠকে লেখকের সঙ্গে অ্যাপোলিনারিয়ার আলাপ হয়। অ্যাপোলিনারিয়া তখন বাইশ-তেরিশ বছরের ছাত্রী। সে দস্তয়েভস্কির সাহিত্য-প্রতিভার মুগ্ধ হয়েছিল এবং জীবনে প্রথম তাকেই আত্মনিবেদন করতে প্রস্তুত হলো। লেখকও মুগ্ধ হলেন অ্যাপোলিনারিয়ার রূপে। অ্যাপোলিনারিয়ার সংস্কারমুক্ত মন। সে স্বেচ্ছায় চার লেখককে জীবনে বরণ করে নিতে। স্বাদযের সমর্থনই তার সবচেয়ে বড় সমর্থন। সমাজের কোন সমর্থনকে সে পরোয়া করে না। ওদিকে দস্তয়েভস্কির ঘরে চিরজ্বর। জীর্ণ ও জ্বলন্ত প্রতিষ্ঠার জঙ্ক তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। অ্যাপোলিনারিয়ার আবির্ভাব লেখকের জীবনে নতুন আশার আলোকবর্তিকা তুলে ধরলো। অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে দস্তয়েভস্কি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি বহু দেশ ঘুরলেন। দুরাখেলার তাঁর দারুণ নেশা। অ্যাপোলিনারিয়া কতবার স্বামীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে দুরাখেলার জঙ্ক। ধীরে ধীরে তার মন ভেঙে পড়লো। সে চেয়েছিল লেখককে জীবনে একান্ত করে পেতে, কিন্তু তা পায় নি। দস্তয়েভস্কির অর্থেক মন পড়ছিল তাঁর রুগ্না নারী মারিয়ার প্রতি।

স্বচ্ছাকাশে আবার মেঘ দেখা দিল। অ্যাপোলিনারিয়া প্যারিসে একাকী এসে এক স্প্যানিশ যুবককে ভালবেসে বসলো। তার নাম সালভাদোর। সালভাদোর প্যারিসে এসেছিল ডাক্তারী পড়তে। প্যারিসে এসে দস্তয়েভস্কি যখন অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে এই কথা শুনলেন তখন তাঁর মনে হলো পায়ে তলা থেকে যেন পৃথিবীটাই সরে গেল। মধ্যস্থিত আঘাতে দস্তয়েভস্কি অ্যাপোলিনারিয়ার কাছ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিলেন। গোপনে অনেক ক্ষত্র বিসর্জন করলেন।

অ্যাপোলিনারিয়া সালভাদোরকে ছাড় দিল কিন্তু সালভাদোর তা দেয় নি। স্প্যানিশ তরুণটি তাকে নিয়ে কয়েকদিন শুধু আমোদ করতে চেয়েছিল। এই ঢালুকা ধরা গড়লে অ্যাপোলিনারিয়া জীবনে প্রচণ্ড আঘাত পায়। সে আবার দস্তয়েভস্কির কাছে ফিরে এলো বটে, কিন্তু লেখককে এবার সে কোন তৃপ্তি দিল না বরং তাঁর জ্বালা আরো বাড়িয়ে দিল। কাছে থেকেও দস্তয়েভস্কি তাকে পান না। যা পান তাতে তাঁর তৃপ্তি মেটে না। সালভাদোর যে অপমান করেছে পৃথিবীর সকল পুরুষের উপর অ্যাপোলিনারিয়া যেন তার শোধ নিতে চায় দস্তয়েভস্কিকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে।

দস্তয়েভস্কির জীবনে আবার পটপরিবর্তন দেখা দিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। একখানি উপন্যাস লিখতে হবে। সময় অল্প। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা প্রকাশককে দিতে না পারলে তাঁর হিন হাজার কংল ফেরত দিতে হবে প্রকাশককে। তাঁর এক বছর পরামর্শে তিনি এক তরুণী স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করলেন। বিশ বছরের ছন্দারী তরুণী অ্যানা। অ্যানা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দস্তয়েভস্কির অনেক বই সে পড়েছে। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। এবার তাঁর কাছে যাওয়ার সুযোগলাভে অ্যানা নিজেকে ধাক্কা মনে করলো। ১৮৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর অ্যানা খাতা-পেন্সিল নিয়ে উপস্থিত হলো দস্তয়েভস্কির বাড়ি। ২১শে অক্টোবর 'দি গ্যামলায়ের' নোট নেওরা শেষ হলো। ছাত্রিশ দিনে অ্যানা প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ টুক নিয়েছে। অ্যানা কয়েকদিন যাতায়াত করে বুরতে পারলো বড় অভাবের সংসার। প্রায় প্রতিদিন ঘরের বাসনপত্র বন্ধক দিতে হয়। মাঝে মাঝে দস্তয়েভস্কি অ্যানার কাছে অনেক ছুংখর গল্প করেন আর বলেন যে, জীবনটা একরকম ছুংখ-কষ্ট ও যোগ-দশ্যের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। শেষ জীবনেও শাস্তির কোন আশা নেই।

অ্যানা বহলে—আবার বিয়ে করেন না কেন?

—কে আমাকে বিয়ে করবে? তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

কথাটি বলেই তিনি মনে মনে লজ্জিত হলেন। তিনি ভাবলেন— অ্যানা হয় তো এখনই রোগে বাবে। তা ছাড়া তাঁর বয়সও পরিতাপনীয় পরিয়ে গেছে, দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কি আশ্চর্য, অ্যানার মুখে বিষন্নতার পরিবর্তে প্রেমমতাই ফুটে উঠলো। সে শান্তভাবে বললো—আমি রাজি আছি।

১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অ্যানার সঙ্গে দস্তয়েভস্কির বিয়ে

## দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা

হলে। মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে দস্তুরভঙ্গি বা পান নি, অ্যানার কাছে তা পেলেন। অ্যানা দেহ-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিল স্বামীকে। অ্যানা কোন যুবকের সংগে হেসে কথা বললে স্বামী ঈর্ষাবোধ করতেন। সে তারপর থেকে আর কারো সংগে সহজে মিশতো না। অ্যাপোলিনারিয়া হলে হয়তো স্বামীর ছোট মনের অভিযোগ তুলে ঝগড়া করতো। কিন্তু অ্যানার মুখে কোন অভিযোগ নেই, কোন দুঃখ নেই, সে স্বামীর সুরে সুখী, স্বামীর দুঃখে দুঃখী। সে স্বামীর ব্যক্তিকে সর্বদা বড় করে দেখতে চায়। স্বামীকে দারিদ্র্যের জুগ সে কখনো অল্লা দেয় নি, বরং তার অংশগ্রহণ করেছে; স্বামীর জুয়ার নেশা মেটাবার জুগ সে নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলে দিয়েছে। অজ্ঞান জেনেও কখনও স্বামীর সংগে কলহ করে নি, বরং স্বামীকে জীবন দিয়ে ভাল বেসেছে। স্বামীর জীবনসত্তার সংগে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে। এমন সতী-সাফী অ্যানা নারী সমাজে বড় বিরল। দেবদাসের চন্দ্রমুখীও অ্যানার কাছে দান বলে মনে হয়। দস্তুরভঙ্গি তাঁর Notes from the underworld—উপন্যাসের নারকের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: 'Love really consists of the right—freely given by the beloved—to tyrannize over her.'

ভালবাসা অত্যাচার করার অধিকার দেয়—দস্তুরভঙ্গি এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন অ্যানার উপর। মারিয়া বা অ্যাপোলিনারিয়া এমনভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। তাই ছিল তাঁর অন্তর্জালা!

শেষ জীবনে অ্যানা তাঁর সঙ্গিনী। তখন তাঁর ঘরে-বাইরে শান্তি। অ্যানা তাঁকে সন্তান উপহার দিল। তখন তিনি সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করলেন। তিনি যুগী রোগ থেকে নিরাময় হলেন। দুঃখ ও আঘাতই শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা যোগায়। দস্তুরভঙ্গির জীবনে তার দৃষ্টান্ত মেলে। তাঁর লিখিত Crime and Punishment, The Gambler, The Idiot প্রভৃতি উপন্যাসে মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়ার চরিত্র মেলে কিন্তু কোথাও অ্যানার চরিত্র পাওয়া যায় না। অ্যানা তাঁর জীবনসত্তার সংগে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল বলে তাঁর রচিত সাহিত্যে অ্যানার কোন স্থান নেই।

নারীর মন বিচিত্র। দস্তুরভঙ্গির জীবনে নারীর প্রভাব তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলে তিনি নিউশের মত নারীবিদ্বেষী নন। নারীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয় মেলে।

## দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা

অধ্যাপক কমলাপতি দে

‘প্রত্যেক জিনিসের একটা প্রাকৃতিক ভিত্তি আছে এবং প্রত্যেক প্রাকৃতিক জিনিসের আদর্শ পরিস্থিতি আছে’—কথাগুলো বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ সান্তায়ানা।

জর্জ সান্তায়ানা ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পেনের মাদ্রিদ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের জীবন তাঁর অতিবাহিত হয় আমেরিকায়, জার্মানিতে, ফ্রান্সে আর ইংলণ্ডে। শেষজীবন কাটে আমেরিকায় এবং মারা গেছেন ইতালীর রোমে কঠাশি বছর বয়সে।

দর্শনের অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা যদিও ছিল জর্জ সান্তায়ানার জীবনব্রত, তবু একথা বলা যায় যে, তিনি ছিলেন সাহিত্যিক; প্রায় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘দি লাস্ট পিউরিট্যান’ (১৯৩৫) তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছে বললে ভুল বলা হবে না। এমন কি জীবনের একেবারে শেষদিকে তিনি রাজনীতির চর্চাও করেছিলেন; তাঁর রাজনৈতিক গ্রন্থের নাম, ‘ডেমিনেশন এণ্ড প্যায়োরস’। প্রথম জীবনের কবিতা লেখার স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগে প্রকাশ করেন ‘দি লাইফ অব রিজন’; এই গ্রন্থ পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থই তাঁকে এনে দেয় খ্যাতি, এনে দেয় মর্যাদা, যে খ্যাতি আর যে মর্যাদা অশ্রুত সাহিত্যিক, অশ্রুত দার্শনিক। পাঠকজগৎ এই গ্রন্থই দেখতে পেলেন সান্তায়ানার দার্শনিক ও সাহিত্যিক স্বরূপ। কিন্তু সাহিত্যিক কলাকুশলতা যতই থাকুক, জর্জ সান্তায়ানা মূলত দার্শনিক।

দর্শনভাষ্যে সান্তায়ানার বস্তুব্য হলুদ দর্শনের ‘বিশ্বই ব্রহ্ম’-এর মতো কতকটা শোনাতেও কিছুটা নতুনত্ব আছে। তিনি বলেন, জগৎ

ছ’টো নয়, জগৎ একটা এবং আমরা যদি তা না ভাবতে পারি তা হলে আমরা ভুল করবো। তিনি বলেন...to double the world would be unspiritualise the spiritual sphere; to double the truth would make both truths halting and false...একটা মাত্র জগৎ, এই মর মর্ত্য আর অদ্বিতীয় সত্য, যেখানে a spiritual life possible in it, which looks not to another world but to the beauty and perfection that this world suggests, approaches and misses.

অংগ একথা তিনি স্বীকার করেন যে, আমাদের সকল কর্মপ্রেরণা আসে অজ্ঞ লোক থেকে, আমাদের নিজেদের হাতে-চুতে-পাওয়া সন্তান বাইরে থেকে, আর সেইটাই তো সকল বস্তুর উৎস-নিবৃত্তি। সান্তায়ানার এই কথায় আমরা পাই যে, তিনি জড়চেতনার সংগে অধ্যাত্মচেতনার একাগ্রীকরণ করছেন এবং কবি আর মিস্টিক যেন মিশে গেছে তাঁর মধ্যে। তাঁর ‘কবিতা ও ধর্মের ব্যাখ্যা’ নামক প্রবন্ধ সংকলনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কাছে কবিতা ও ধর্ম প্রায় সমার্থক, প্রভেদ যেটুকু আছে সেটুকু ব্যবহারিক কার্যকলাপের সংগে তাদের যোগ-বিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। জর্জ, তাঁর বস্তুব্য, কবিতা তখন ধর্ম হয়ে দেখা দেয় যখন জীবনের ক্ষেত্রে কবিতা প্রবেশ করে; আর ধর্ম যখন জীবনে অদ্বিতীয়ত্ব আনে তখন তা কবিতা ছাড়া আর কি-ই বা। ‘রিজন ইন্ রিজিডিয়ন’ গ্রন্থে ধর্ম সখক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন, ধর্ম তখনই নীতিবাক্য হয়ে দাঁড়ায় যখন ধর্ম

creases to represent or misrepresent material conditions and has learned to embody material goods.

নিজের সম্বন্ধে সান্ডার্সন একাধিক বক্তব্য রেখে গেছেন, তাঁর দার্শনিকত্ব আলোচনার সেগুলো কাজে লাগে। এক স্থানে তিনি বলেছেন, আমি যদি মানবীর ভাবে ভাবতে না পারি, তা হলে কিছুই ত' ভাবতে পারবো না। তাঁর 'দি রিলিগ' অব বীরি' পড়লে বোঝা যাবে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার ধারা কি রকমের ছিল। জড়বাদকে একেবারেই অবজ্ঞা করে যদি অল্প অধ্যাত্মবোধ প্রকাশ্য পায়, তা হলে গোড়াতেই যে ভগবদ্বিশ্বাসের মূলে কুঠারাবাত করি হতে পারে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও যোগ্যতা। বস্তুই তো ব্রহ্মের মূল এবং মূলই মাত্র, সেইটেই বা অস্বীকার করি কি করে। উপরি উক্ত গ্রন্থের অন্ততম খণ্ড 'দি রিলিগ অব স্পিরিট'-এ এই কথা বলেছেন। সান্ডার্সন তাঁর এই বক্তব্যকে বিজ্ঞানীদৃষ্টিভুলত বলে দাবী করেন নি, বরং বলেছেন, এ-ও একটা লোকধর্ম, এ-ও মন ও স্থলদ্বয়ের একটা শিক্ষণ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জার্মান কবি রিল্ফের কথা; তিনি ধর্ম বলতে বুঝছিলেন হার্ট-ওয়ার্ক। সে বা হোক, একটা জিনিস বিশেষভাবে বলা দরকার যে, সান্ডার্সনকে অসীম আর নিত্যতা খুব একটা পেয়ে বসে নি। আত্মা তাঁর কাছে শুধু আত্মা নয়, জীবাণু, জীব ও আত্মা। আত্মার অবস্থান সেই সমস্ত মানবদেহে যে, bodies breeding a thousand passions and diseases by which the spirit also is formented, so that it congenitally longs at first for happiness and at last for salvation.

সান্ডার্সন বলেতে চেয়েছেন যে, এই আত্মা মানবের নৈতিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে জন্মলাভ করে এবং জীবদেহকে সে অস্বীকার করতে পারে না, জীব ও জীবন বাদ দিয়ে আত্মা কল্পনাভীত। এই আত্মার নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই বলে তিনি মনে করেন। এ যেন 'চলিতে চালাতে নাহি জানে।' তবে এর জন্ম সম্ভব কি করে? তার উত্তরে সান্ডার্সন বক্তব্য হলো জৈনিক সমালোচকের ভাষায়, Is itself created or evolved by the psyche, which he (সান্ডার্সন) defines as the organic life of the body; এবং এই সত্তা বা আত্মার স্থপতি হলো সচিবানন্দ ও সর্বজ্ঞ হওয়ার, আর যদি সে স্বপ্ন সকল না হয় তা হলে সে-আত্মা সজীব থাকে না। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে বলতে পারি, সান্ডার্সন নৈতিক চরিত্রের দিকে প্রচণ্ড জোর দিয়েছেন, দার্শনিক দৃষ্টিভৌগটিকে মোটাটুটি অবহেলা করেছেন এবং আরও বলা যায়, নীতির কথা উঠছে বলে অ-নৈতিক আর দুর্নীতির কথাগুলো মনে না এসে পারছে না। আরও বলা চলে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি সং পথ-বিচ্যুত। জন ডিউই বলেছেন, আধেরিকার কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় দান হলো, নৈতিক দর্শন। তিনি নিজও তা বলেছেন।

সান্ডার্সন আরও বলেছেন 'রিজন ইন্ কমনসেন্স'র ভূমিকায় যে, এই নৈতিকদর্শন কখনই বিজ্ঞান নয়; এবং তা নয় বলেই তাঁর মতে,

দার্শনিকরা স্ব স্ব জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মুখপাত্র ছাড়া বেশি কিছু নয়। এইজন্মেই সম্ভবত দার্শনিক স্পিনোজাকে তাঁর আদর্শ মনে হয়েছে। কারণ, স্পিনোজা মানুষকে কিরিয়ে আনতে চেয়েছেন প্রকৃতির কাছে, স্বভাবের কাছে এবং তাকে সকল নৈতিক মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছেন। ব্যবহারী নীতিবাদীদের প্রতি তাঁর সমালোচনা পাই এই কারণে। আরও, তিনি বলেন, বাদ-বিসংবাদ কুটতর্কের যুগ গত হয়েছে, এখন হলো ব্যাখ্যানের যুগ এবং ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, গ্রীকরা পুরাকালে যে আদর্শের যে সংস্কৃতির গোষকতা করে গেছেন তাতে আজকের চে-ও জীবন ছিল সহজ, ব্যক্তিমানুষ ছিল মুক্ত, স্বাধীন। সান্ডার্সনের যুক্তি হয়ত দুট, কিন্তু আমরা সন্দিগ্ধচিত হয়ে পড়ি। এইরকম একটা নীতিবাদী-আদর্শ তাঁর মনে সব সময় ছিল বলে তাঁর দার্শনিক ইতিহাস 'দি লাইফ অব রিজন' হয়ে উঠেছে তাঁরই ভাষায়, Retrospective Politics.

জর্জ সান্ডার্সন শুধু হাওয়াই তর্কের দার্শনিকতা করেন নি, তাঁর যোগ ছিল বস্তুর সঙ্গে, যে-বস্তু বস্তুর নিজের জন্ত সত্য আর সত্য পারিপার্শ্বিক অবস্থানের দিক থেকে। সমাজের সঙ্গে সান্ডার্সনের যে যোগ ছিল সেটা বোঝা যায় রাজনীতি, শিল্প, যুদ্ধ, বন্ধু প্রভৃতি সাংসারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মত ও মন্তব্য প্রকাশে। দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আরও অনেক বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের মতো বিষয়কর। দেশপ্রেম বলতে তিনি বুঝেছেন, দেশপ্রেম জন্মের আকস্মিকভাবে, এবং দেশপ্রেম হলো কল্পনাপ্রবণ আবেগমাত্র।

সান্ডার্সনের কলা-শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তক 'দি রিজন ইন আর্ট' নীতিবাদী-দর্শনের আর এক প্রকাশ। মহাকবি দান্তে, গ্যেটে, সেক্সপীয়ার প্রমুখ বিশ্ববরণ্য কবি-নাট্যকারদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেমন মতুন তেমন জীবন্ত। নিজের সম্বন্ধে বিশেষত্বাঙ্গী এই প্রকৃতিবাদী-নীতিবাদী দার্শনিকটি যে-কথা বলে গেছেন সেই কথাগুলো দিয়েই তাঁর বর্ধাৎ মূল্যায়ন হবে। তিনি বলেছেন, আমার প্রকৃতিবাদ বা জড়বাদ পাঠ্যপুস্তকত্ব বিজ্ঞা নয়: উনিশ শতকের জড়বাদেরও অবশেষ নয়, বরং কি না সমস্ত দর্শনের অধ্যাপকরা ছিলেন ভাববাদী; এ প্রাত্যহিক বিশ্বাসে উদ্বারিত।-আমার অনুভূতি ও আবেগের ভিত্তিতে পাওয়া। আমার মনে হয় যারা বস্তুবাদী নয়, তারা নিজেদের ভালো করে চিনতে পারে না। জাবুক হিসেবে নিজেদের হয় ত' তারা জানে, কিন্তু নিজেরাই যে কাজ করে যায়, যে উপলব্ধি করে যায়, তা তারা লক্ষ্য করতে পারে না, কারণ, কাজ আর অনুভব বস্তুর আকস্মিক প্রক্ষেপ। (এ ফি হিস্ট্রি অব মাই ওপিনিয়ন) দার্শনিক তত্ত্ব সাধনার-সান্ডার্সনের এইটেই ছিল পূঁজি এবং এর ভিত্তিতে তাঁর যে যুক্তি, সে যুক্তি বুদ্ধি কল্পনার সম্মিশ্রণজাত হলেও ভাববাদী সান্ডার্সনের দার্শনিক ও সাহিত্যিক মতামত নিয়ে আলোচনা করার আছে, কারণ, তিনি বস্তুবাদী হতে চেয়েও বস্তুবাদী নয়, ভাববাদ আর যুক্তিসিদ্ধমতে তাঁর সমান অনীহা, নীতিবাদে গভীর আস্থা, অথচ তিনি বলেন—To love things as they are would be a mockery of things; a true lover must love them as they would wish to be.

০ মাসিক বসুমতী কিম্বদন্তী ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন।

# অচ্যুত অচ্যুত শ্রীমদ্রামায়ণ অচ্যুত অচ্যুত অচ্যুত

৭০

রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে গোপীনাথ সহস্রের ঘোর হুঃসংবাদ এসে পৌঁছল। রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাকে 'চাঙ্গে' চড়িয়েছে।

তার মানেই গোপীনাথকে রাজাদেশে হত্যা করা হবে।

'চাঙ্গে চড়ানো' মানে মঞ্চে তোলা। মঞ্চে নিচে ধারালো খড়্গ পাতা আছে, তার উপরে গোপীনাথকে যেনা হবে মঞ্চে থেকে। গোপীনাথ হু'-টুকরো হয়ে যাবে।

রায়-ভবানন্দের ছেলে আর রায়-রানানন্দের ভাই, গোপীনাথ কী অপরাধ করেছে ?

প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা গোপীনাথ। প্রজাদের কাছ থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করছে, কিন্তু রাজার প্রাপ্য কর বোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে হুঁলুক কাহনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হুকুম হলো বকেয়া বাকি শোধ করে দাও। কোথেকে দেবে ? গোপীনাথ বললে, নগদ নেই, যদি সময় পাই জিনিসপত্র বেচে দিয়ে দেখতে পারি। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, আপাতত তাই নিতে পারো।

তাই সই, কিন্তু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে ?

রাজপুত্র নিজে এল দাম কবতে। তার মুজাদ্দাওষ ছিল, কথা বলতে ঘাড় বাঁকায়। থেকে-থেকে মুখ উঁচু করে।

সে একটা অকথ্য দাম বললে।

'এত কম ?' দারুণ বিরক্ত হল গোপীনাথ। ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে, 'আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, উগ্র মুখেও থাকে না। তাই মাপ করুন, পারব না বেচতে।'

রাজপুত্র ভীষণ তুচ্ছ হল। রাজার কাছে গিয়ে লাগাল অনেকখানি করে।

'ছল করে টাকা দিচ্ছে না। রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ আশ্রসাৎ করেছে।' বললে রাজপুত্র, 'অনুমতি করুন ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই।'

রাজা বললে, 'প্রাপ্য আদায় করতে যা ভালো মনে করো তাই করো।'

আর কথা নেই, মঞ্চে তুলেছে গোপীনাথকে। মঞ্চে নিচে খড়্গ পাতা।

সবাই প্রভুকে ধরল, 'এখন আপনি যদি রক্ষা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।'

'রাজার শ্রায্য প্রাপ্য দেয় নি, রাজা যদি শাস্তি দেয় তা হলে তাকে মন্দ বলতে পারো না।' প্রণয়-রোধে বললেন প্রভু, 'রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্য-গীতে অপব্যয় করল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ ? একে তোমরা সমর্থন করো কী করে ?'

এমন সময় একটা শোক ছুটে-ছুটে এসে বললে, 'গুধু গোপীনাথকে নয়, তার ভাই বাণীনাথকেও চাঙ্গে তুলেছে।'

প্রভু উদাসীন রইলেন। বললেন, 'রাজা স্তম্ভিত তার নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিকিঞ্চন সন্ন্যাসী, তাতে আমার কী করবার আছে ?'

অরূপ দামোদর ও অশ্রাশ্র পার্শ্বদেবী কাকুতি করে

বললে, 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অমুগত। তাদের এই সঙ্কটে আপনার এ ঔদাস্য উচিত নয়।'

'তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে গোপীনাথের জন্ত দয়া ভিক্ষা করব।' ক্রুদ্ধ হলেন প্রভু, 'আঁচল পেতে কাহন মেপে নেব? আর রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী? পাঁচ পণ্ডার সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় চুল্লুক কাহন ছেড়ে দেবে?'

আরো একজন ছুটে এল।

'এফুনি—এফুনি গোপীনাথকে খজের উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান।'

প্রভু বললেন, 'আমি ভিক্ষুক, আমার থেকে কিছূ হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগন্নাথই ইচ্ছাময়, করণ-অকরণের নিয়ন্তা তিনি।'

'ঈশ্বর জগন্নাথ—বঁার হাতে সর্ব অর্থ।

কতৃ মকতৃ মন্তথা করিতে সমর্থ।'

তফুনি জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হরিনন্দন পাত্র এসে হাজির। সে নিজের থেকেই চলল রাজার কাছে। গিয়ে বললে, 'গোপীনাথ তোমার সেবক তার প্রাণদণ্ড নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। প্রাণ নিলে কি দেনা শোধ হয়ে যাবে? রাজকোষের ঘাটতি মিটেবে? বরং শ্রায্য দামে বোড়া কিনে নাও, দেখ কতটা উঠে এল। বাকিটা না হয় আস্তে আস্তে দিয়ে দেবে। প্রাণ নিলে সুরাহাটা কোথায়?'

'সত্যি প্রাণ নিয়ে কী হবে?' রাজাও যুক্তির পথে এল: 'আমার ধনের প্রয়োজন। বেশ তো যাতে প্রাপ্যটা পাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।'

হরিনন্দন ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। রাজার কথাটা বললে ব্যুঝিয়ে। বেশ তবে তাই হোক। যথার্থ মূল্যে বোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

এদিকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ বাগীনাথকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কী করল, কী বলল?'

যে দেখেছে সে বললে, 'বাগীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। দুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে, সহস্র পূর্ণ হলে দাগ কাটছে পায়ে।'

প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন, 'আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই রাজকর্ষ্য করে। কে কখন অশ্রায় করে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে, আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মুকুবের সুপারিশের জন্তে, সে অসহ। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে যাব। এখানে বিষয়ীদের বচসা শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।'

'তুমি এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন?' বললে কাশী মিশ্র, 'যে বিষয়ের জন্তে তোমার কাছে আসে সে মহামুর্থ। তোমার জন্তে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিখিরি হল। গোপীনাথও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্ছা করে নি, সে তোমার কাছে চায় নি প্রাণভিক্ষা। ভক্তরা নিজের প্রেরণাতেই এসেছে, তোমাকে এসে বলেছে। যে শুদ্ধ-ভক্ত সে তোমার জন্তেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ-দুঃখ যা আসে তাই মাথা পেতে নেয়। তুমি এখানেই থাকো। কেউ আর তোমাকে বিষয়কথা বলবে না।'

প্রতাপরুদ্র এল। যতদিন সে নীলাচলে থাকে ততদিন প্রতাপ্র এসে সে কাশী মিশ্রের পা টিপে দেয়। সেদিনও টিপছে, কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, 'প্রভু গোপীনাথের উপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছেন। বলছেন, রাজার থেকে মাইনে পায়, আবার কি না রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মসাৎ করে আমার কাছে কি না রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ী সঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো, প্রভুকে কী করে ঠেকাই?'

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, 'সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব, প্রভু শুধু নীলাচলে থাকুন।'

কাশী মিশ্র বললে, 'প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ায় প্রভুর সমর্থন নেই।'

'না, না, আমি প্রভুর দিকে তাকিয়ে ছাড়ব না, ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন সেই জ্ঞানেই ছাড়ব। তুমি প্রভুকে আটকাও।'

গোপীনাথকে ডাকাল রাজা। তাকে সন্ন্যাসের শিরোপা পরিয়ে দিল, বললে, তোমার সমস্ত ঋণ



মকুব করে দিলাম। মালজারী শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর রাজার ভাণ্ডার যাতে না লুণ্ঠিত হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম।

কোথায় মকে তুলে খেলে ফেলে প্রাণ নিচ্ছে, তা নয়, উন্টে সমস্ত প্রাণ্য ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয়, মাইনে দ্বিগুণ করল, পরিণে দিল সম্মানের শিরবস্ত্র।

কাশী মিশ্র এসে নিবেদন করতেই প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এ কী করলে? রাজার নিকট থেকে আমাকে দান গ্রহণ করলে?'

কাশী মিশ্র হকচকিয়ে গেল।

'গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে কৃপা না দেখালে আমি অসন্তুষ্ট হব, তারই জন্তে রাজার এই অনুগ্রহ। তা হলে এ প্রকারান্তরে আমাকেই দান করা হল।'

'তোমার মুখ চেয়ে গৌপীনাথকে কৃপা করে নি রাজা,' বললে কাশী মিশ্র, 'ভবানন্দের পুত্রেরা তারা প্রিয়পাত্র এই জ্ঞানেই সে বদান্ত হয়েছে। সুতরাং তোমাকে রাজদান গ্রহণ করতে হয় নি।'

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু আনন্দিত হলেন।

পঞ্চ পুত্র সহ ভবানন্দ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হল। বললে, 'আপনার কৃপাতেই গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়েছে। শুধু প্রাণরক্ষা নয়, পদোন্নতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাগীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিশয় হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।'

প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন, 'সবাই বৈরাগী হলে তোমার বহু কট্টরকে খাওয়াবে কে?' উপদেশ করলেন : 'রাজার প্রাপ্য ধনকে নিজের প্রাপ্য ধন বলে বিবেচনা কোরো না। আর অসহায় কদাচ নয়।'

বর্ষান্তরে গৌড়ীয় ভক্তের দল আবার আসে প্রভুকে দেখে যেতে। অদ্বৈত আচার্য, আচার্যরত্ন আচার্যনিধি ভো বটেই, নিত্যানন্দ পর্যন্ত, যাকে কি না বলা আছে, এসো না, গৌড়ে থেকেই প্রেমভক্তি প্রচার করো। কিন্তু অমুরাগ অমুরোধ মানে না, প্রাণের টানে সমস্ত বিধি-বন্ধন ছিঁড়ে যাই। কতদিন গৌরকে দেখি নি, কতদিন পাই নি তার সঙ্গসুখা, তাকে ভালোবেসেই তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি।

অমুরাগ কাকে বলে? যাকে সর্বদা অমুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় আগে আর কখনো অমুভব

করি নি, যাকে প্রতিমুহূর্তেই নবীন হতে নবীনতর মনে হয় তাই অমুরাগ।

'অমুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।

তার আজ্ঞা ভাঙ্গে তার সঙ্গের কারণে।'

যেমন গোপীরা করেছিল। রাস-রাত্রে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাগলের মত বেরিয়ে এলে কৃষ্ণ তাদের আদেশ করল ঘরে ফিরে গিয়ে পতিসেবা করতে। কৃষ্ণমুরাগে সে আদেশ তারা অগ্রাহ্য করলে। বললে, যা হবার হোক, আমরা তোমার সেবা-সঙ্গ ত্যাগ করব না।

কৃষ্ণের আদেশ যে তারা অমান্য করল তাতে কৃষ্ণ কি সুখী না বিরক্ত? সুখী, যেহেতু আজ্ঞাভঙ্গের পিছনে যে অধিকতর অমুরাগ। কৃষ্ণ যে অমুরাগের বশীভূত।

'আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতক পরিভোষ।

প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ।'

ভক্তদলের মধ্যে আছে রাঘব পণ্ডিত, সে আবার ঝালি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। তার বোন লময়ঙ্গী দিয়েছে ঝালি সাজিয়ে। আমসি, আচার, কানুন্দি, শুক্না কুল, রুখা-শুখা কত কী খাতদ্রব্য, চিড়ে মুড়ি খে থেকে শুরু করে নাড়ু, গজাজল, কপূর-এলাচ পর্যন্ত। ঝালির উপরে মোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া। প্রকাশু ভার, 'বোঝারি' বা মুটে তিনজন। মোসিন বা মুনসিব বা ঝালির রক্ষক মকরঞ্জ।

ভক্তরা নরেন্দ্রসরোবরে মিলিত হয়ে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি করল। আরেকদিন জগন্নাথের শয্যাখানের সময় বেড়াকীর্তন চালাল। সে কী হুঙ্কার-গজন-নর্তন-লক্ষণ।

'কীর্তন-আটোচপে ধরা করে টলমল'।

সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য হচ্ছে—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুত, শ্রীবাস, সত্যরাজ আর নরহরি এই সাতজনে সাত সম্প্রদায়। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করছেন অথচ প্রতি সম্প্রদায়ই ভাবছে প্রভু শুধু আমার দলেই আবদ্ধ আছেন।

'হে সর্বভক্তিবিমোহন জগন্নাথ, তোমার নির্মজ্জন যাই, তোমার চন্দ্রবদন দেখে মন প্রমত্ত হয়ছে।' ওড়িয়া পদকর্তার এই কথা কয়টি প্রভুর মনে পড়ল, স্বরূপকে বললেন তা গেয়ে শোনাতে।

আনন্দসাগর উঠলে উঠেছে। যারা দেখছে-শুনেছে,

ভুলে গেছে দেহ-গেহের কথা। বেলা তৃতীয় প্রহর হল  
তবু নৃত্যের শেষ নেই। ভক্তদল প্রাপ্ত হয়ে পড়ল।  
তখন ভক্তশ্রমের কথা শুনে প্রভু নিবৃত্ত হলেন।

জ্ঞানাহার শেষ করে প্রভু গষ্ঠীরার দ্বার জুড়ে  
গুয়ে রইলেন। প্রভু গুলে গোবিন্দ প্রভুর পদসেবা  
করে এই নিয়মই চলে আসছে। এখন দ্বারজোড়া  
হয়ে পড়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে? গোবিন্দ  
বললে, 'একপাশ হও, আমি ভিতরে যাই।'

প্রভু বললেন, 'আমার নড়বার শক্তি নেই।'

'তোমার পা টিপব যে।'

'তার আমি কী জানি।'

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর  
বিছিয়ে দিল, যেন তার গায়ের ধূলা না তাঁর গায়ে  
পড়ে। তারপর প্রভুকে লঙ্ঘন করে ঘরে ঢুকল। ঘরে  
টুকে প্রভুর কটি পিঠ টিপে দিতে লাগল। মধুর  
মর্দনে প্রাপ্তি প্রহর হল প্রভুর, নিম্নাকর্ষণ হল।

দশ দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ  
তখনো বসে আছে। জেদ হয়ে বললেন, 'এখনো  
বসে আছ কী। খেতে যাও নি?'

'কী করে যাই?' গোবিন্দ বললে কাতরমুখে,  
'দয়াকায় গুয়ে আছ, পথ কই?'

'ভেতরে এসেছিলে কী করে? সেই ভাবেই যেতে  
পারতে না?'

'যাব তো খাবার জেছ।' গোবিন্দ মনে-মনে  
বললে, 'তোমার সেবার জেছ শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন—অপরাধ  
করেছি, শাস্তি যদি কিছু থাকে সহ্য করব হাসিমুখে।  
কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্তু সে অপরাধ করব এ  
আমার ধারণার অতীত।'

বাইরে স্তব্ধ হয়ে রইল গোবিন্দ। ভগবৎসেবী  
ভক্তের মনের কথা প্রভু নিজেই বুঝবেন ঠিক-ঠিক।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রভু আবার গুণিচা-গৃহের  
কালন-মার্জন করলেন, বাগানে বহুভোজন করলেন,  
স্বর্ষের সামনে নৃত্য করলেন, দেখলেন কৃষ্ণজন্মখাতা।

ভক্তদের ইচ্ছে হল প্রভুকে খাওয়াই।

'গোবিন্দ, এ প্রসাদটুকু রাখো, প্রভুকে খেতে  
দিও।' কেউ পোঁড়া দিয়ে গেল, কেউ নাড়ু  
কেউ পিঠে।

'অমুকে এটা দিয়ে গেলেন।' প্রভুকে জানায়  
গোবিন্দ।

প্রভু বলেন, 'ধরে রাখো।'

কত আর ধরবে! ধরতে-ধরতে ঘরের কোণ ভরে  
গেল। প্রায় শতজনের ভক্ষ্য স্তুপীকৃত হয়ে উঠল।

'আমার প্রসাদ প্রভুকে খায়েছে তো?' ভক্তের  
দল আবার খোঁজ করতে আসে।

'আমার মণ্ডা? সরভাজা?'

এটা-ওটা অস্থ কথা বলে পাশ কাটায় গোবিন্দ।

'ভক্তদের আর কত বঞ্চনা করব?' গোবিন্দ  
একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জ্ঞানাল: 'খাচ্ছ না  
অথচ খাওয়া সক্ষম হয়ে আছে, এ-কথা গোপন করে  
রেখে আর কত আমার অপরাধের বোঝা ভারী করব?'

'তোমার আবার অপরাধ কী?' প্রভু হাসলেন:  
'তুমি তো আদিবন্ত, অনাদিকাল থেকে আমার  
বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে!  
নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।'

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে  
জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি-বিশ্বাদ মানলেন  
না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু একদণ্ডে খেয়ে ফেললেন।  
জড়বস্তুর পচে, চিন্নবস্তুর পচে না। মহাপ্রভুর  
প্রসাদ চিন্নবস্তুর।

'আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

গোবিন্দ বললে, 'রাঘবের বালি আছে।'

'আজ থাক। পরে একদিন দেখা যাবে।'

পরে একদিন খোলা হল রাঘবের বালি। সমস্ত  
জ্বোরই কিছু-কিছু প্রভু উপভোগ করলেন এবং  
তা প্রায়ই, এবেলা ওবেলা। ভক্তের প্রদ্বার জব্য  
উপভোগ না করে উপায় কী। তারপরে ঘরে রান্না  
করেও অন্নবাজন খাওয়াতে লাগল ভক্তেরা।

শিবানন্দ সেনও নিমন্ত্রণ করল।

বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে,  
প্রভুর কাছে আনতেই প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী  
নাম?'

'চৈতন্যদাস।' ছেলে উত্তর করল।

'এ আবার একটা কী নাম রেখেছ।'

'যে বোঝবার সে বুঝবে।'

গুরুভোজন করাল শিবানন্দ। গুরুভোজনে  
প্রভু বিশেষ প্রসন্ন হল না।

যে বোঝবার সে বুঝেছে। চৈতন্যদাস বুঝেছে।  
সে আরেকদিন নিমন্ত্রণ করল প্রভুকে। আর প্রভুর

কী কচিকর তা বুকে নিয়ে তেমনিধারা ব্যবস্থা করল।  
শাক শুকতো ফুলবড়া দধি নেবু।

প্রভুর পরিপূর্ণ সন্তোষ হল। ভুক্তাবশেষ  
চৈতন্যদাসকে দান করলেন।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পৌছিয়ে দেয়  
গোবিন্দ। একদিন গিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে-শুয়ে  
নাম করছে। বললে, 'এঠো, প্রসাদ এনেছি।'

হরিদাস বললে, 'আজ আমি উপবাস করব।'

'সে কি?'

'জানো আজ আমার সংখ্যাপূরণ হয় নি।  
সংখ্যাপূরণ না হলে কী করে ভোজন করি?'  
হরিদাস অস্থির হয়ে উঠল: 'এদিকে মহাপ্রসাদকেও  
বা কী করে প্রত্যাখ্যান করি?' মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ  
প্রণাম করে তার এককণা গ্রহণ করল হরিদাস।

এই ভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা ও মহাপ্রসাদ  
হুয়েরই মান রাখল।

পরদিন প্রভু নিজে এসে উপস্থিত হলেন।

'কেমন আছ হরিদাস? সুস্থ তো?'

'শরীর সুস্থ আছে, মন-বুদ্ধি অসুস্থ।' বললে  
হরিদাস।

'কেন কী ব্যাধি হল?'

'নামসংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে না প্রভু।'

প্রভু মমতামাখানো স্বরে বললেন, 'এখন বৃদ্ধ  
হয়েছ, নামসংখ্যা কমিয়ে দাও। তা ছাড়া তুমি  
সিদ্ধভক্ত, তোমার আর সাধনের প্রয়োজন কী!  
মায়াবদ্ধ জীবকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জ্ঞেই  
তোমার আসা, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগতে  
নামের মহিমা তুমি যথেষ্ট প্রচার করেছ। এখন  
বার্ষিকের দরুন নামসংখ্যা কমে গেলে কী আসে-  
যায়।'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, আমি সিদ্ধদেহ ভগবৎ-  
পরিকর নই। আমি সাধারণ জীব, হীন জাতিতে  
আমার জন্ম, আমার এ দেহও নিন্দনীয়। আমার  
দ্বারা কিসের লোক-নিস্তার কিসের নাম-প্রচার।  
রৌরব নরক থেকে তুমিই আমাকে বৈকুণ্ঠে তুললে।  
তুমিই স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর, তুমিই জগৎ নাচাচ্ছ। তাই  
তুমি আমাকেও নাচালে, যেন ছাড়া হয়ে ব্রাহ্মণের  
আধিপত্য খেলায়। আমার শুধু এক সাধ, যেন  
তোমার আগে আমার শরীর পড়ে। বুকে তোমার

পাদপদ্ম ধরব, ময়নে চাঁদমুখ দেখব আর জিহ্বায়  
কৃষ্ণচৈতন্যনাম উচ্চারণ করতে-করতে চলে যাব।  
তোমার কৃপা হলেই আমার এ বাঞ্ছাসিদ্ধি ঘটে।'

প্রভু বললেন, 'তোমার প্রার্থনা কি কৃষ্ণ অপূর্ণ  
রাখতে পারেন? কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার  
সমস্ত সুখ, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি তোমার  
উপযুক্ত হবে?'

'তুমি কী যে বলো! আমার মত একটা  
পিপীলিকা মরে গেলে এ পৃথিবীর কী ক্ষতি! তুমি  
ভক্তবৎসল। কিন্তু আমি কি ভক্ত? না, আমি  
ভক্তভাস। আমার বাহ্যিক আচরণ ভক্তের মত কিন্তু  
আমার অন্তরে কোথায় ভক্তি? তবু তুমি কৃপা করলে  
অধর্মের অধম ইচ্ছারও পূরণ হতে পারে। আজ যাও,  
বেলা অনেক হয়েছে, কাল প্রাতে জগন্নাথদর্শনের পর  
আবার এসো।'

হরিদাসকে আলিঙ্গন করে প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য করতে  
চলে গেলেন।

পরদিন ভোর হতেই ভক্তদের নিয়ে তাড়াতাড়ি  
হরিদাসের কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। শুধোলেন,  
'সংবাদ কী?'

হরিদাস বললে, 'এখন আপনার কৃপা।'

হরিদাসকে মাঝখানে রেখে মহাসম্মির্ভন  
আরম্ভ হল। প্রভু পঞ্চমুখে হরিদাসের গুণবর্ণনা  
করতে লাগলেন, সকলে গুণসৌরভে মোহিত  
হয়ে গেল।

তুমি আমার সামনে এসে বোস। তোমার বদন-  
পদ্মে আমার নেত্রভঙ্গ দু'টি স্থাপন করি। আর তুমি  
তোমার পা দু'খানি আমার হৃদয়ের উপর রাখো। আর  
বৈষ্ণবভক্তদের পদরেণু আমার শিরোভূষণ হোক।

অঙ্গন থেকে বৈষ্ণবচরণের ধূলি হরিদাস মাথায়  
তুলে নিল। 'বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর  
স্নানকেলি।' প্রভু চরণ বুকে ধরে বারে বারে বলতে  
লাগল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে-  
বলতেই পড়ল শেষনিশ্বাস।

এ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। মহাযোগেশ্বরের নির্যায়।  
মন-প্রাণ কৃষ্ণে নিবিষ্ট করে নিস্পালকচোখে কৃষ্ণকে  
দেখতে দেখতে ভীষ্ম যেমন মহাপ্রয়াণ করেছিল এ-ও  
সেই তিরোধান।

হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নিলেন প্রভু।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচতে লাগলেন অঙ্গনে। আর-আর ভক্তরাও নাচতে লাগল। নামকীর্তনের তুফান ছুটল।

রথে করে হরিদাসের দেহ নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রে। মান করিয়ে তাতে প্রসাদচন্দন মাখানো হল। ভক্তরা পাদোদক খেল।

প্রভু বললেন, 'সমুদ্র মহাতীর্থ হয়ে গেল।'

প্রসাদী বস্ত্রে ঢেকে হরিদাসের দেহকে সমুদ্রতীরে বালুকা-গর্ভে সমাধি দেওয়া হল। হরি বোল, হরি বোল বলে প্রভু ক্রীহস্তে বালি তুলে দিতে লাগলেন। সমাধির উপর বেদী বাঁধিয়ে দেওয়া হল। এবার হরিশ্বনি-কোলাহলে গগন-ভুবন পরিপূর্ণ করে দাও।

সিংহদ্বারে প্রভু নিজেকে এসে আঁচল পেতে দাঁড়ালেন। হরিদাস ঠাকুরের তিরোত্তাব-উৎসবের জন্তে প্রসাদ দাও পসারীরা।

অটল আসতে লাগল। যে দেখে সেই পাঠায়, যে শোনে সে-ও।

## অনন্ত-সংহিতা

করুণাশংকর মজুমদার

'In memory of some who are dead  
Some who live and some yet unborn.'

—Lushun.

একটি বহতা নদী, নিরুৎসাহ  
হঠাৎ জোয়ারে আনে  
একটি তরঙ্গী ইতস্তত।

জামরা সূর্যমুখী নিয়গা সমীপে  
আঁতরি আগুনে পুড়ে—আহার্য পেরুই  
(যেহেতু সস্তর কিছু)

যদিও রুজ্জাক গলার নির্ঘম তরঙ্গ আক্রোশ  
কারে: করতালি শ্রবণ ব্যথিত করে।

চট্ট আনোঁচটে ভাঙ্গে গড়ে যায়  
অনন্ত-সংহিতা

তার স্বাদ তরঙ্গের তার সুর তরঙ্গের  
তার গান আকাশময় বেহাগ-মুর্জনার  
কখনও শ্রবণ হয় অথবা মন্থর।

তীর বেবনা বুজ্জু জাণ্ডক জিহ্বাসা :  
এই সব আয়ুধ উদবাহু কিসের প্রত্যয়ে।

ভক্ত ভক্ত। তার জাতি-কুল নেই, গণ্ডি-বেড় নেই, তার দেহ পরমপাবন, তা সমস্ত স্থানকে তীর্থীকৃত করে। আর যা আগের থেকেই তীর্থ হয়ে আছে তাকে মহাতীর্থে পরিণত করে।

সবাই আকর্ষিত ভোজন করলে। প্রভু দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়ালেন। আর বললেন, নাম-মহিমার প্রকাশক ও প্রচারক হরিদাসের জয় দাও সকলে।

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।

ভক্তবাৎসল্য পূর্ণ কৈল জ্ঞানি শিরোমণি ॥

শেষকালে দিল তারে দর্শন-স্পর্শন।

তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্তন ॥

আপন ক্রীহস্তে তারে কৃপায় বালু দিল।

আপন প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥

মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।

এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান ॥

[ ক্রমশঃ ]

## মলিন সত্তা

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তমসাগহন নির্জনতার ব্যথিত মনের বাস ;  
অন্ধবহির পরিবেশ হতে আসে মৃত নিশ্বাস  
বহু বাসনার সমাধি রচনা করে চলি দিনরাত,  
চরম করের আলোখ্য আঁকে নিতুব নিপুণ হাত।

শিশুর নিটোল মুখে এঁকে চলি জ্ঞান মৃত্যুর রেখা,  
উজ্জ্বল তার স্বপ্নিল চোখে উদ্বেগ ব্যার দেখা।  
যৌবনময় তরুণচিত্তে আতঙ্ক ফেলে ছায়া ;  
পূর্ণ জীবনে পূর্ণচ্ছন্দ টানে মন নির্মায়া।

কলুর কঠোর বর্তমানের প্রেম পাঁকিল আমি—  
অন্ধকারের অতলাছেই দ্রুতপদে যাই নাহি।  
পুণ্য আলোকরাশির পরশে মলিন সত্তা কাঁপে,  
পৃথিবীকে তাই পূর্ণ করেছি নিকষকুপ পাশে।

ভুবু পরিবেশ অরণীয়ায় বাহিরে বিলীন হলে  
ভীকু চেতনার ভবিষ্যতের সত্য-সাধনা চলি—  
তখন কবরে সবুজ বাসের স্বপ্ন চক্রে আসে,  
মনের মলিন পর্বা সরাসরে কচি শিতহুহু হাসে।

## সপ্তমোহনুবাক:

অন্ন ন নিষদ্যং—তদব্রতং.....মহান কীর্ত্য।  
 (অন্ন ভুল,—তবু) অন্নের নিন্দা কোর না,—  
 এই তোমার ব্রত,  
 প্রাণই অন্ন, দেহের ভোগ,—দেহই প্রাণের প্রতিষ্ঠা।  
 আবার দেহই অন্ন,—প্রাণের ভোগ,—  
 প্রাণেই দেহের প্রতিষ্ঠা।  
 এই দেহপ্রাপকে, এই অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নকে,—  
 যিনি এমন করে জানেন,—মহান তাঁর প্রতিষ্ঠা।  
 তিনি পুত্রপুত্র ধনবান, অন্নবান ও অন্নভোক্তা।  
 ব্রহ্মভোক্তাদাঁও তিনি মহান;—  
 মহান তাঁর কীর্তি। ৩৭

## অষ্টমোহনুবাক:

অন্ন ন পরিচকীত, তদব্রতং.....মহান কীর্ত্য। ৩৮  
 অন্নকে উপেক্ষা কোর না,—  
 এই তোমার ব্রত।  
 জলই অন্ন,—আর জ্যোতি অন্নভোক্তা।  
 কারণ, জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত জলে।

(জলের মধ্যে জ্যোতি,—যেমন মেঘের মধ্যে বিহ্বল; আবার  
 তজ্জের মধ্যে জল,—সূর্যালোকে যেমন মেঘের প্রতিষ্ঠা।)

যে কেউ এই অর্থে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন,—  
 তিনি অন্নাদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।  
 তিনি অন্নবান, অন্নভোক্তা,—  
 সন্তান ও পুত্রবান,—  
 ব্রহ্মভোক্তা মহীয়ান, কীর্তিবান তিনি। ৩৮

## নবমোহনুবাক:

অন্নং বহুবুতং.....কীর্ত্য। ৩৯  
 অন্নকে তুমি অনেক অনেক বাড়াবে,—  
 এই তোমার ব্রত।  
 এই পৃথিবীই অন্ন,—আকাশের ভোগ।  
 আকাশে ধরার প্রতিষ্ঠা।  
 যিনি এই আকাশ পৃথিকে,—  
 এই অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন,  
 মহান তাঁর প্রতিষ্ঠা;  
 তিনি অন্নবান, অন্নভোক্তা,—  
 পুত্র পুত্রধনবান,—  
 ব্রহ্মভোক্তাদাঁও তিনি মহান,—  
 মহান তাঁর কীর্তি। ৩৯

## দশমোহনুবাক:

ন কখন বসন্তো.....অন্ততোহন্যা সন্ন্যাসাথ্যতে।  
 তোমার কুটারে বাসের জন্তে।  
 যে কোন অতিথি,—বখনি আহুক বারে,  
 কখনোই তাকে দিও না ফিরিয়ে,—  
 এই হোক তব ব্রত।

## কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

# তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(নিরলসে) তাই অন্ন যোগাড় কর,—  
 যেমন ক'িয়া পার!

ভাগ্য ও মাঝারি, কি স্ব অধ্যয়,  
 যে বৃত্তি নিতে পার।

তাই দিয়ে তব অন্ন যোগাড় কর।

(দানের জন্তে, অতিথির তরে, অন্ন যোগাড় কর)

(দানের জন্তে, যে বৃত্তি নেবে)

তাতেই তোমার অন্নবৃত্তি হবে।

(কখনোই তাই ছোড়া না কর,—  
 অলস বিলাস বশে।)

অন্ন ব্রাহ্ম। এই মন্ত্রগুলিতে যেভাবে অন্নের বিষয়ে বলা হয়েছে  
 তাতে বেশ বোঝা যায় যে—সে যুগেও ক্রীণে অন্নের প্রাধান্য অজ্ঞের  
 চেয়ে কিছু কম ছিল না। দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা তুচ্ছ করতেন না। তাঁরা  
 জানতেন, দেহমন্দিরেই ঘরে পরে, ঘর পেরিয়ে, একেবারে অন্তরের  
 সেই গর্ভ-গৃহে পৌঁছানো যায়, যেখানে চৈতন্যময়ের চিরন্তন আসন  
 পাতা আছে।

তাই দৈনন্দিন রক্ষা করতে হবে;—দেহ রক্ষার জন্তে চাই অন্ন।  
 অন্নকে তুচ্ছ কোর না। অন্নকে আহরণ কর, উপার্জন কর;—অন্নকে  
 অনেক অনেক বাড়াবে।

তাই তুমি নিশ্চেষ্ট থেকে না;—যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করে  
 উপার্জনের পথ করে নাও। সব সময়ে যদি শ্রেষ্ঠবৃত্তি না তোটে,—  
 উপার্জনের পক্ষে সব কাজই সমান।

যুগ যুগ আগের ভাষা এবং ভঙ্গী দিয়ে স্বর্ষ কবি এই অতি  
 আধুনিক ভাষাতেই কি বোঝাতে চেয়েছেন, যার নাম dignity  
 of labour? মনে হয়,—তখনো এ দেশে, আরামে এবং গর্বের,  
 আলস্যের রাজত্ব ছিল। এই অন্ন ও বৃত্তির উদ্দেশ্যে অলসতার  
 প্রতি দিকার এবং কর্মের প্রশংসা যুগেই হয়ে আছে।

অন্নের প্রয়োজন শুধু নিজের জন্তে নয়। সমাজের জন্তেও,  
 অতিথির জন্তেও। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল যেই তোমার অতিথি হয়ে  
 আহুক, কাউকেই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। সবাইকেই শ্রদ্ধা করে  
 আশ্রয় এবং খাদ্য দিতে হবে। তখনকার দিনে অতিথি সেবা গৃহস্থের  
 অবশ্য পালনীয় ছিল। না হলে প্রবাসী পথিকের অবস্থানিক হোত?।  
 তখন তো আর এত হোটেল ছিল না! গৃহস্থের গৃহই পথিকের  
 জন্তে আতিথ্যের ব্যবস্থা রাখতে হোত। কভেই 'গৃহ'র পক্ষে অন্ন  
 উপার্জন অবশ্য কর্তব্য ও অলসতা সর্বতোভাবে ত্যাগ ছিল।

য এবং বেদ কের ইতি বাচি.....বলমিতি বিদ্যতি ॥

এ সব তুমি যে জানে, সেজন  
সেই বস্তু ফল পায়।  
বাক্যে তিনিই কলাপকর।  
প্রাণে ও অপানে যোগক্ষেমরূপে জীবন-ধারণ তিনি।  
বাছতে তিনিই কর  
এং পরন্তলে তিনি গতি।  
দেহের ছন্দে এই নিয়মেই—  
ব্রহ্মের উপাসনা।

তারপরে শোন, বেনশক্তিহে তাঁরই স্বরূপের লীলা।

বুটতে তিনি তপ্তির স্বর,—  
বিদ্যুতে তিনি তেজঃ।

ব্রহ্ম শুধু সর্বভূতাস্ত্ররাজাই নন,—তিনি সর্বস্বরূপও বটে। তিনি ছাড়া কিছুই কোথাও নাই। তাই এ দেহও ব্রহ্মরূপ। দেহরূপ করতাই হবে। দেহবাহার বা নিয়ম তা পালনের দ্বারাই ব্রহ্মের উপাসনা হবে। শুধু হাতজোড় করে থাকলেই পূজা হবে না।—হাতের যা করণীয়, তা করার দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হবে। কাজেই তুমি এমন কথা বোল—বা শোভন এবং শুভকর। তোমার স্বাস্থ্যকিয়ার দ্বারা জীবনকে ক্ষেমস্থর করে তুলো। বসে বসে মন্ত্র পড়লেই হবে না। হাত দিয়ে যেমন করত হবে কর্ম—পা দিয়ে তেমনি হবে চলতে। তবেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা সার্থক হয়ে উঠবে,—

‘বহুতে তুমি মা শক্তি,  
ছন্দে তুমি মা ভক্তি’।

২। আমার দেহের মধ্যে যেমন পৌছি তোমার বিচিত্র প্রকাশ—  
তেমনি আকাশে আকাশে দখলি তোমার অনন্ত শক্তি, তানন্ত  
আনন্দ, অনন্ত অনন্ত, অনন্ত প্রেমের সঞ্চার। নিদাঘতাপে তপ্তদগার  
তোমার বৃষ্টি আলীনারের মত বার পড়ে। আমার দেহমন তৃপ্তি  
ও আনন্দে পূর্ণ করে দেয়। আমার নানা মাঠ জেগে ওঠে শক্ত।

আবার বধন মনে যে-য বনিয়ে আসে দুদিন—আকাশের বিদ্যুৎ-  
ঝলকে দেখি তোমারই তেজস্বী দীপ্তি। তোমার সৃষ্টিতেই তোমার  
পূর্ণ প্রকাশ, তাই বর্ষার তৃপ্তি ও বিদ্যুতের দীপ্তিতে তোমার  
প্রতীকোপাসনা;—

‘এই যে বাতাস দেহে করে, কুমুদস্বরূপ  
এই তা তোমার প্রেম, গুণা, ছন্দ করণ’।  
বর্ষ ইতি পশু জ্যোতির্বিহিত নক্ষত্রেষু;  
.....মানবান ভবতি।

জীবকূলে যশ তিনি,  
তারকার আলো তিনি,  
পুত্রের মায়ে তিনি অমৃতের দ্বারা  
কামনার ভোগে তিনি কামস্বরূপ।  
আকাশে আকাশে সর্বস্বরূপ তিনি।

সব প্রতিষ্ঠা তাঁহার মাঝারে,  
এ কথা যে জানে,—সই প্রতিষ্ঠাবান।  
(বৃষ্টির জ্যোতি) ‘মহঃরূপে তাঁর যে জানে,  
সেই তা অসীম মনবান।

সকলের সব ভালোর মধ্যে ব্রহ্মই প্রকাশ। জগতে প্রত্যেকেরই  
একটা শ্রেষ্ঠ স্থান আছে। সেই শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই ব্রহ্মের প্রকাশ  
স্বচরে সত্য। তাই তারার মধ্যে তিনি আলো,—সজ্ঞানের মধ্যে  
তিনিই চিরজীব। কামে তিনি প্রেম। আর বৃষ্টিতে তাঁরই  
জ্যোতির প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে গীতার বিদ্যুতিযোগ তুলনীয়;—

‘আদিত্যানামহং বিদ্যুজ্যোতির্বারিহিংগমান...’।

তত্ত্বমিত্যুপাসীত নমাস্তে...বশ্যাস্বাদিত্যে স একঃ।

‘নম’ বলে তাকে যদি কেউ করে ধ্যান,—

সকল কাম্য তার কাছে নত হবে।

প্রভুরূপে যদি কেহ তাঁর ডাকে।

শত্রুর শেষ হবে না।

যে রয়েছে এই মানবের দেহে,

আদিত্যে আছে যে,—দু’জনেই এক জেনো।

(বৈতথ্যের অন্তরে আছে এক)। ৩১০৪

স ব এবাবিদ অন্যান্ত্রোকাং

যিনি এরকম উপাসক আর জানা,

মৃত্যুর পরে এ লোক ছাড়িয়া তিনি,—

অন্যদের স্বরূপে মিশিয়া যান।—

তারপরে ধরে প্রাণময়রূপ,—

ভাসেন বাতাসময়।

সেখা হতে ফিরে মনোময় রূপে,

মননে প্রেরণা দেন।

পরে ধীরে ধীরে (প্রজ্ঞাস্বরূপে),

বিজ্ঞানময় আস্থার রূপ নেন।

প্রজ্ঞা হইতে আনন্দরূপে, বিধে সঞ্চার।

কামরূপ ধরে, এই সব লোক চিত্তবিহার করে,—

ব্রহ্ম এই সমস্তাধরূপ সামগান

গেয়ে যান।—

হাআআবু হাআআবু।

এই বিগট উপলব্ধিক গান ছাড়া আর কিভাবে প্রকাশ করা  
যায় ?—

আনন্দ রূপান্তরিত হচ্ছে সুরে,—দার বিশ্বের মর্দকোব হতে  
জ্যোতির সমুদ্রে ত কে তরঙ্গে ভেসে আসছে গান—হা আবু হা আবু।  
আহমমমমমমমমম। আহমমমমমমমমম.....

ব এবাব বেব ইত্যুপনিবৎ।

আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন।

আমি ভোক্তা, আমি ভোক্তা, আমি ভোক্তা।

আমি অন্ন ও ভোক্তার—(বিষয় ও বিষয়ী)

মিলনকার। আমি মিলনকার, আমি মিলনকার। ১

আমিই (সেই) প্রথমজ;—

এই রূপারূপ জগতের,

এক দেবতারেরও পূর্ব হতে চলেছে,—

আমারি সঞ্চার

আমারি মধ্যে অদ্বত প্রতিষ্ঠিত।

## দু'টি কবিতা

অন্নের রূপে, যে আমাকে দান করে,  
অন্নার্থীর কাছে,—  
সেইরূপ সে যে আমাকে রক্ষা করে —

যে করে না দান।—অন্নের রূপে  
আমি তাকে গ্রাস করি। ২  
আমি এ ভুবন ঈশ্বররূপে নিবত শাসন করি।  
সূর্যের মত প্রকাশ আমার।—

আমারো নিহা জ্যোতি।  
এই তো উপনিষৎ!  
যে জানে এ বাণী (পরম মুক্তি তার)।

১। আমি অন্ন, আমি অন্নাদ; আমি ভোগ,—আমিই ভোগী।  
আম্বাই বিষয় এবং বিষয়ী এবং এই উভয়ের মিলনকার। অন্ন ও  
অন্নাদ,—বিষয় ও বিষয়ীর মিলনের দ্বারা যে স্নোক্ত, যে ছন্দ রচিত

হয়েছে, যে চৈতন্যময় জীবদেহ সৃষ্টি হয়েছে, আম্বাই তার কারক।—  
রূপ, রূপবান ও রূপকার। আবার সেই আম্বার সার্বভৌমতার কথাই  
বলছেন ঋষি।

২। অন্নার্থীকে অন্ন দিলে আম্বাকেই রক্ষা করা হয়, যে আম্বা  
সর্বভূতে বিগঞ্জিত। আম্বার কোন প্রকাশকেই বিনষ্ট করার অধিকার  
কারো নেই। দানের দ্বারা এই অন্নকে সর্বাধিকারে রক্ষা করা যায়,  
সঞ্চয়ের দ্বারা নয়। ভোগকে বাড়িয়ে তুললে আম্বারই অপচয় ক্ষতি।  
যে আম্বা মুক্তিপ্রিয়ামী স্বার্থের বন্ধনে তাকে বঁধে, ততই সে  
অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, ভোগের তলায় তলিয়ে যাবে। স্বার্থ বন্দি  
উপেঁটা কথা বলে,—দান করতে না দেয়, তবে সেই জমিয়ে-তালো  
অন্নই একদিন তাকে গ্রাস করে;—তার আর মুক্তির উপায় থাকে না।  
দানর দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, স্বার্থ আপনাকে তার অন্তর্নিহিত  
মহৎ ঐক্য, তার মর্মগত আত্মস্বরূপের দিকে নিয়ত বয়ে নিয়ে যায়।

অম্ববাদিকা—চিহ্নিতা দেবী

## দু'টি কবিতা

ওয়ান্ট ছইটম্যান

হে আম্বা—অসমসাহসী

হে আম্বা অসমসাহসী  
আমার সাথে চল, ঐ অজানা দিগন্তে  
যেখানে মাটি নেই, মাটি নেই, পথ নেই কোন,—অধবায়  
নেই কোন চির দিগন্তের—প্রদর্শকও  
না কোন কণ্ঠস্বর, মানবিক স্পর্শও নয়  
কোটা কুল মুখ নেই, কোন চোখ, কোন চোঁট—  
নেই সেই দেশে।

আমি জানি হে আম্বা তা নয়  
তোমার আমার মধ্যে নিঃসীম শূন্যতা।  
অপেক্ষা করছে—অগোচর-স্বপ্নের দিগন্ত  
—সেই সব অজানা দেশে।

যখন সেই সব বন্ধন শিথিল হবে—  
সেই সব চিরন্তন বন্ধন ছাড়—দেশ ও কালের  
অন্ধকার নয়, পৃথিবীর আকর্ষণ, অমুভূতি—  
সেই সই বাধ্যতা যা বঁধবে না—আমাদের;  
তখন আমরা বিদীর্ণ হব, ভেসে যাব  
দেশ ও কালের মধ্য দিয়ে—হে আম্বা প্রভুত হও  
সমসাময়িক—সজ্জিত হও অবশেষে (হে আবেগ!  
হে অনন্ত!) পূর্ণতার পথে বাজা করো।

হে আম্বা—আম্বা আমার।

একদা এই জনারণ্য শহরের পথ বেয়ে চলে

গেছিলাম

একদা এই জনারণ্য শহরের পথ বেয়ে চলে গেছিলাম  
শ্মৃতিতে ছাপ রেখে ছিল—তার প্রদর্শনী, স্থাপত্য  
শুক এবং ঐতিহ্য।  
তবুও এখনও যেটুকু শ্মৃতি আজও আছে—সে এক নারী  
আকস্মিক যার দেখা, পথরোধ করেছিল  
—ভালবাসায়।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পাব হয়ে গেছে—  
আমরা ছিলাম একত্রে, সে ছাড়া আর সব গেছি ভুলে।  
আমার মনে পড়ে, শুধু তাকেই দেখেছিলাম  
সপ্রেম মৈত্রী সে আমার পাশে ছিল  
তবুও আমরা কখনো বিপথে বিভ্রান্ত হইনি—  
ভালোও বেসেছি,—সরেও এসেছি ফের  
আবার সে আমার হাত ধরেছে—আমি  
কোনদিন যাবো না আর সেই শহর—  
আজও আমি তাকে আমার পাশে সাক্ষর দেখি  
বিয়ল নিশেধ চোঁট দু'টি তার ব্যথার কাঁপছে।

অম্ববাদক—দেবী ভট্টাচার্য

# ভেঁড়াগাভী

সাধন তপাদার

বেঁজারি জঙ্গলের সন্ধানটা দিয়েছিলেন বুদ্ধির সাহেব—  
আমার শিকার-গুরু জিজ্ঞার বুদ্ধির।

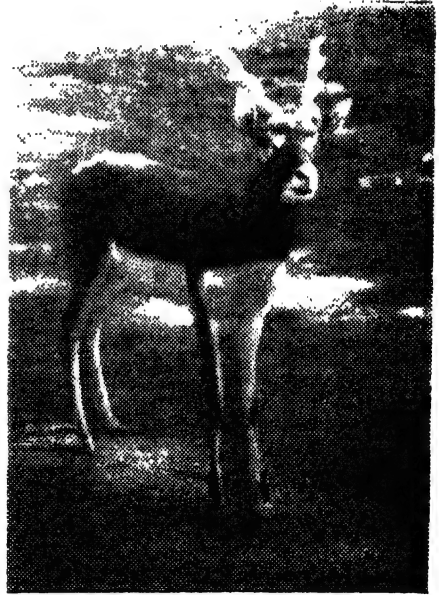
অনেকদিন আগেকার কথা সেটা। উনিশ শো' পঞ্চাশ সালের কথা। আমি তখন বিলাসপুরে। প্যাসেঞ্জার ডাইভার বুদ্ধির সাহেব তখন রিটারার করে বিলাসপুর রেল-কলোনির পাশে বাঁধোয়া তালারের পাড়ে বাড়ি কিনে ছায়িভাবে বসবাস করছেন—সে সময়ের কথা।

খাস ইংরেজ ছিলেন বুদ্ধির সাহেব। যেমন দুর্ধর্ষ শিকারী ছিলেন তেমন ছিল তাঁর লক্ষ্যভেদ। ঘণ্টার পঞ্চাশ মাইল বেগে যে কুকসার হরিণ দৌড়ায়—তিমশ' গজ দু'রে বাবমান সেই হরিণের পালের উপর রাইফেল থেকে গুলীবর্ষণ করে বেছে বেছে এক-একটি করে ধরাশায়ী করতেন তিনি। রিটারার করার আগের বছর পর্যন্ত আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিক্রিয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে শিকার করে বেড়িয়েছেন, আর সেই বুদ্ধির সাহেব রিটারার করেই বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। শুধু তাই না, ব্রাডপ্রসার, হাটের রোগ কত কি! তারপর ছুঁটা বছরও কাটল না, জিজ্ঞার বুদ্ধির ইহজগতের মায়া কাটালেন। বেঁচে থাকার কি আগ্রহ ছিল সাহেবের! আমাকে প্রায়ই বলতেন, ব্রাদার আমার পালসুটা দেখত। বলে হাতটা বাড়িয়ে দিতেন। বলতেন, আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খুব প্রখর। তিন-শ' গজ দু'রে টার্গেট হিট করতে পারি। তোমার সঙ্গে একদিন ব্ল্যাকবাক্ (কুকসার) স্কটিং এ যাব। দেখবে আমার খাট-খাটীর অগ্নিবর্ষণ। বলা বাছল্য তিনি আর যেতেন না। সক্ষম ছিলেন না।

সুযোগ পেলেই বুদ্ধির সাহেবের কাছে যেতাম। বড় ভালবাসতেন সাহেব আমাকে। আমাকে দেখলে কি খুশিই না হতেন বুড়ো। নিজের হাতে চা করে নিয়ে আসতেন। কখন প্যাটিস কখনও কেক খাওয়ারতেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন, তোমাকে বড় ভালবাসি ব্রাদার। আমার খাট খাট রাইফেলটা তোমাকেই দেব। দিয়েও ছিলেন। আমি জানতাম বুদ্ধির সাহেব অন্তর দিয়েই আমাকে ভালবাসতেন। আর বুদ্ধির সাহেবও কি জানতেন না যে কিসের টানে আমি বারবার তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। দৈহিক অক্ষমতার জন্তে যে শিকার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল—তার প্রকাশ বুঝি দেখতেন এক তিরিশ বছরের যুবকের মধ্যে। তাই আমাকে গেলে তিনি সব কাজ কলে শিকারের গল্পে মেতে উঠতেন। শিকারের অনেক অধিসিদ্ধি তিনি জানতেন। বিভিন্ন তাঁর অভিজ্ঞতা—বিভিন্ন সে-সব

গল্প। যুগে যুগে এমন চমৎকার শিকার বর্ণনা করতেন আমি উদ্গ্রীব-বিশয়ে স্তম্ভিত। শিকারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি উনি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন আমাকে। আর কি রসজ্ঞান ছিল সাহেবের। দু'বাক্যলিকে বলতেন 'সাগরার বাথ'। বলতেন, এল জি'র 'সাগরার বাথ' বড় টেরিবল থ্রিস ওর রেঞ্জের মধ্যে। চাক্সি টাইগারের মুখে বুনো গুহোরের পালের পিঠ। বঁধ আর হরিণের পালের মধ্যে মারতে এর জুড়ি আর নেই। বলতেন, গেম ইজ ইণ্ডস। প্রতিটি উপদেশ মূল্যবান, অক্ষর-অক্ষরে সত্যি। আমি বহুবার হাটাই করে নিজেছি।

সেবার ঐশ্যকালে কুকসার শিকার প্রসঙ্গে বললেন, গো টু বেঁজারি। বেঁজারি জঙ্গলে যাও। বেঁজারি জঙ্গলের মাঝাঝালাও আর সামান্তের চিতাওয়ারের বরণার এ সময়ে বিস্তর জানোয়ারের



কুকসার



## লোকাতীত

আনাগোনা হয়। দেগবে স্পটেড ডায়ারস এণ্ড ব্লাক বাকস—এক হাই এজ সাধারণ (সম্বন্ধ)। ইউ উইল সি ওয়াইল্ড বোরস হেফটি এজ বাক্কেলা। সন্ধ্যা হলেই মিছিল করে এসে এরা জল খেয়ে যায়। সন্ধ্যার আগেই তুমি মাঝাতালাওয়ের পাড়ে গর্ত খুঁড়ে বসে থাকবে। শুট ট্রিট অন দি ডেমুন থিংস। ডোর্ট হেজিটেট—গিৰ এ সাওরার বাথ। তারপরই বললেন, বাট বিওয়ার! চিতাওয়ারে কখনও রাতে যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন সাহেব?

বুদরি সাহেব বললেন, ট্রাটল এ ব্লাডি হাটেড প্রসূ।

মানে?

মানে বনদেও আছে, স্পিরিট আছে।

আমি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বুদরি সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষে বললাম, তা হলে তুমিও এসবে কান দাও সাহেব!

বুদরি সাহেব বললেন, শুধু কানই নিই না ভাদার, বিশ্বাস করি। ঐ বনদেও-ও বিশ্বাস করি, ভূত-প্রেতও বিশ্বাস করি। ঐ চিতাওয়ারেই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তা হলে বলি শোন।

বুদরি সাহেবের বাগানের একাধোণে চেয়ার-টেবিল পেতে মুখোমুখি বসে আমরা। অভ্যেসমতো আজও তিনি ভূইখির বোতল আর গেলাস নিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যা তখন উত্তরে গেছে। আকাশে তারাগুলো একে একে ভিড় জমাচ্ছে, সামনে বিশাল বাঁধোয়ার জলে তার আভাস পাকছি।

বুদরি সাহেব গেলাসে খানিকটা ভূইখি ঢেলে নিয়ে বললেন, সে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা। বিলাসপুর রেল-কলোনিটার তখন খানকয়েক কোয়ার্টার ছিল মাত্র। ঐযে আর টি এসু কলোনিটা দেখছি—ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলছে, আর পানদীর ওপারের শালের জঙ্গলটা ঐখানে গিয়ে শেষ হয়েছিল। আর তোমার কোয়ার্টারের পিছনে পলাশ জঙ্গলের যে ছোট ক্যুপটা আছে সেটার বিস্তার ছিল দু' মাইল দূরের হুইল গাঁ থেকে তোমার ঘরের সামনে লোকেশনটা পর্যন্ত। আজ না হয় জঙ্গলটা কাটাছুটো হয়ে আবাদ হচ্ছে, নয় ত' ঐ জঙ্গলেই আমি বিস্তর ব্ল্যাকবাক আর ওয়াইল্ড বোর মেয়েছি। চুসাইয়া পাড়ার দক্ষিণে নতুন বে ট্রান্সপোর্টেশন কলোনিটা হয়েছে ঠিক ঐখানেই আমি একবার পর পর দু'টো ওয়াইল্ড বোর মারি। সে এক দিনই গেছে। ওয়েন্ডন ডেইজ ওয়ার গোভেন, ভাদার। বাক সে কথা। বলে, বুদরি সাহেব গেলাসের তরল পদার্থটা গলাধঃকরণ করে নিয়ে বলতে লাগলেন—

সে সময় বেয়ারি এলাকায় একটা নরখাদক প্যাথার উপজব করে বেড়াচ্ছিল। গভর্নমেন্ট ও স্থানীয়

জমিদারের তরফ থেকে ঐ প্যাথারটিকে মারবার জঙ্গে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। হু'মাসের মধ্যে ঐ প্যাথারটা জনা পনেরোকে মেয়ে ফেলল—এণ্ড ভেরি ষ্ট্রঞ্জ—সবগুলোই মেয়েছেলে! ঐ চিতাওয়ারের বরণায় জল আনতে গিয়ে মরল কয়েকটা। উপায় ছিল না তাদের। ঐাখের শেষদিকে চিতাওয়ারের আশেপাশের গাছলোর সমস্ত জলাধার শুকিয়ে যায়। জল থাকে শুধু চিতাওয়ারে। কেসুদা, নওয়াগাঁ আর সিমুগাঁয়ের লোকেরা দু'-তিন মাইল পথ হেটে এসে চিতাওয়ার থেকে জল নিয়ে যায়। আজও তাই।

বেয়ারি, কেসুদা, সিমুগাঁ আর নওয়াগাঁয়ে একেবারে এক শিকারীরা এসে ভিড় করে। কেউ কেউ প্যাথার মারার অজুহাতে এসে হরিণ-শুয়ার মোরে সরে পড়ে। কেউ কেউ প্রকৃতই চেষ্টা করে। আমিও বার-কয়েক চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্যাথারটা আমাদের কাঁক দিয়ে তার মাছ-মারা অব্যাহত রাখল। বেয়ারি জঙ্গলের আশেপাশের গাঁয়ে বজ্রিতে বিভীষিকা বিরাজ করতে লাগল। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে যায় না, চিতাওয়ারের জল আহরণ মধ্যাহ্নে সমাপ্ত হয়। বেয়ারি চিতাওয়ারের অরণ্যপথ পরিত্যক্ত হয়ে সেখানে নতুন বাস গজাতে থাকে। এ পর্যন্ত বলে বুদরি সাহেব গেলাসে একটু ভূইখি ঢেলে আবার বলতে লাগলেন—

সে-বছর গরমটা একটু ভাড়াভাড়ি পড়েছিল। যেক্ষারার শেষোশি থেকেই কুরো-নালাস জলে টান ধরল। মার্চের প্রথম সপ্তাহে একদিন সকালে আমার শিকারী দুখীরাম এসে বলল, মাঝাতালাওয়ে বিস্তর শুয়ার পড়েছে, গেলে হয়। ঠিক ছাত্র, চলো, বলে, দুখীরামকে নিয়ে একটা মালগাড়িতে হাতবন্দ কৌশনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। বেয়ারি গিয়ে এসে বখন পৌঁছলাম তখন বেলা চারটে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোছগাছ করে দুখীরামের ঘর থেকে সব বাইরে পা দিয়েছি, গিয়ে একটা সোরগোল সুনলাম। সে সব জক্ষেপ না করে আর কয়েক পা এগুতেই জারগার জারগার লোকের জটলা দেখলাম, উত্তেজিত হয়ে কি সব আলোচনা করছে। হঠাৎ দূর থেকে আমাকে দেখেই একদল লোক হুলা সতে করতে ছুটে এল।



শিল্পে চিত্রিত হরিণ

হীপাতে হীপাতে একজন বলল, সাহাব, জলদি চিতাওরারে বাও ! এই কিছুক্ষণ আগে একটি মেয়েছেলেকে কেন্দ্রায় (চিতাবাব) মেরে দিয়েছে। আমি আর বাক্যব্যয় না করে দুখীরামকে নিয়ে চিতাওরারের দিকে রওনা হলাম। ছ' মাস রাস্তা—চিতাওরার পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গিয়ে দেখি লাঠি-সোঁটা, বাতি-মশাল নিয়ে বহুলোক সেখানে পৌছে গেছে। তারা মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে—বাঁশের খাটুলি তৈরি হচ্ছে। আমাকে দেখেই সসন্ধ্যে সব পথ ছেড়ে দিল। মৃতদেহটা বরপাব পাড়ে রক্তাক্ত শাড়িটায় ঢাকা ছিল। দুর্ঘটনার সাক্ষী কয়েকজন গ্রামবাসী বলল যে, তারা দুপুরবেলা বাণ্যায় রান সেরে যার যার পায়ে খাবার জল ধরে নিয়ে যখন দলবদ্ধ হয়ে ফিরছিল, তখনই ঘটনাটা ঘটে। মেয়েছেলেটি এমনিতেই বড় লাজুক ছিল, তাই সবার পিছনে সে জলের ঘড়া মাথায় নিয়ে আসছিল। হঠাৎ জলপূর্ণ ঘড়ার পতনশব্দে সকলে পিছন ফিরতেই দেখল—প্যাছারটা মেয়েছেলেটির ঘাড় কামড়ে ধরে মাটিতে পড়ল। তারা আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না, সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে হাঠ পেয়রে উর্ধ্বাশ্বাসে সিমগায়ের দিকে ছুটল। বাদার, নরম্যালি দিঙ্গ মেন্ন আর নট বাউয়ার্ডস—কিন্তু আমি দেখেছি ভৃত-প্রের্ত বা নরম্যালি কামের কথা শুনেলে এরা কেমন কুঁড়ে যায়—সাইক সেন্ট্রি পজ,স। তাই মেয়েছেলেটিকে ঐ অবস্থায় ফেলে সব পালান শুনে আমি বিম্বিত হলাম না। যা হোক, আমি মৃতদেহের কাপড়টা একটু সরিয়ে ঘাড়ের পিছন গভীর ছ'টো দস্তকাত দেখলাম। দেখলাম মেরনও থেকে ঘাড়টা স্থানচ্যুত হয়ে



ভৃত-প্রের্তের হাত থেকে গাঁকে রক্ষা করতে সিমগায়ের অবশেষপথে বিভীষণ মৃতি

গেছে। নিভুতে নিশ্চিন্তে বসে মৃতদেহটা খাওয়ার তেমন সুযোগ-সুবিধে নিশ্চয় ছিল না প্যাছারটার, সম্ভবত সিমগায়ের লোকদের হল্লা-চিংকার সর্বস্বণ তার কানে এসে থাকবে, তাই তাড়াতাড়ি করে পিঠ থেকে খানিকটা মাংস খুঁলে খেয়ে সে সরে পড়ে। বছর তিরিশেক বয়সে মেয়েছেলেটির।

স্বামী শিউচরণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, ছজুর, আমার একটা আরজি—এই কেন্দ্রাটাকে মারতেই হবে! আমি বললাম, ঠিক হায়—আর দেরি না করে ঐ গাছের ওপরে তোমরা একটা মাচান বেঁধে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও। বরপারটার এপার-ওপার জুড় সব বট, অশ্বখ আর ইমুলি গাছ জড়াজড়ি করে আছে। আজিকালের গাছ সেগুলো, যেমন উঁচু তেমনি মোটা। মৃতদেহটা থেকে আত্মমানিক গন্ধ-গণ্ডিশেক দূরে একটা বটগাছের উপর ওরা মাচান বাঁধল। দুখীরামকে সকলের সঙ্গে গাঁয়ে চলে যেতে বলে আমি মাচানে উঠতে বাছি, দেখি ব্যাটার মৃতদেহটা খাটুলিতে উঠিয়ে বাঁধাছাদা করছে। বললাম, হেই, হোমট আর ইউ ডুই ? ওটা নিয়ে যাছ কেন ?

শিউচরণ এসে বলল, ছজুর, মৃতদেহটা আজ রাতেই সংকার করতে হবে, নইলে ওর আত্মার সঙ্কতি হবে না—প্রের্ত হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাকে সমাজচ্যুতও হতে হবে।

রাগে আমার সমস্ত শরীর-রিরি করতে লাগল। বললাম, ছাঃ ইট! সমাজচ্যুত তুমি হবে না। কে করবে তোমাকে সমাজচ্যুত! উসিকো পিছুমে হাম তিন ফায়ার কতগো না। আর প্রের্ত হবার কথা বলছ—কাল একটা পুজো দিয়ে দিলেই হবে, সে খরচ তোমাকে আমিই দেব। তা ছাড়া এইটো বুঝতে পার না তোমরা মৃতদেহটা নিয়ে গেলে কেন্দ্রা নাও আসতে পারে। কিসের লোভে আসবে। এই সামান্ত কারণে এমন একটা সুযোগ হারাতে আছে। মৃতদেহটা রেখে যাও, আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের—কেন্দ্রাটাকে আজ আমি মারবই। কে শোনে কার কথা। লেকচার দিয়ে মৃতদেহটা আটকাতে পারলাম না। ওরা বাঁধাছাদা সম্পূর্ণ করে খাটুলি কাঁধে নিয়ে রওনা হল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ত্রাণার, ও-ব্যাটারদের ওপর ব্যাণ্ডাম গুলী চালিয়ে ম্যাগাজিন খালি করে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু তবু আমি মাচানে গিয়ে উঠলাম। এই ভেবে উঠলাম যে প্যাছারটা কি একবার জারগাটা দেখতেও আসবে না। দেখি একটা চাল নিয়ে। মাচানে উঠে ও-ব্যাটারদের বললাম, গেট আউট ক্রম হিয়ার, বাগো হি রাসে—ইউ ফুন্স অব দি ফার্ক ওগটার।

বেচারি এসে আমার সামনে আর এককাপ চা রেখে গেল। বুদ্রি সাহেব ছইস্বর গোলাসে একচুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন—মৃতদেহে অন্ধকার। চিতাওরার অন্ধকারে বিলীন। আমি যেন অন্ধকার সাগরে ভাসছি। চাঁদ উঠবে সেই রাত দশটার পরে। মাথাটা ধরেছিল, শরীরেও কেমন অস্বস্তি, আমি গাছের শুড়িতে মাথা ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। তলার শুকনো পাতার ওপর অনেকবারই জানোয়ারের চলাচল টের পেলাম। মোকলি ব্র্যাকবাক্স এও স্পটেড ডিয়ারস। কিন্তু আমি বাতি ছালালাম না। ছালালাম তখন, যখন ববললাম যে একটা বড় রকমের জানোয়ার এসে আমার

## লোকাতীত

মাচানের কাছে পাঁড়াল। দেখলাম একটা ওরাইল্ড বোর—এ ভেরি বিগ টাসকার। ব্রাদার, অতবড় ওরাইল্ড বোর সচরাচর চোখে পড়ে না। অল্প সময় হলে ঐ একটা ওরাইল্ড বোরের জন্তে আমি একশ' বুলেট খরচ করতেও কুণ্ঠিত হতাম না। যা হোক, আলো পড়তেই জানোয়ারটা বেঁচে কবে ঘুরে সোজা পালিয়ে গেল। ভাবলাম প্যাছারটা কাছে-পিঠে কোথাও নেই তাই অল্পসব জানোয়ারের গমনাগমন হচ্ছে। আমি ঐ একইভাবে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সজাগ হয়ে বসে রইলাম—যদি প্যাছারটার সাবধানী পরিক্ষেপ বা কোন আভাস পাই। কিন্তু মাথাটা আমার মাঝে-মাঝে চনকে উঠেছিল, চোখ চেয়ে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই মাঝে-মাঝে চোখবুজে থাকি আবার তাকাই। এমনি করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলম জানি না।

চোখ চাইলাম অনেক রাতে। অনেকক্ষণ চাদ উঠেছে। চাদ তখন আমার মাথার পিছনে। চিতাওয়ারের গাছের কঁকে-কঁকে বিচ্ছিন্নত জ্যোৎস্নারেখা, এখানে-ওখানে মাটিতে জলের ওপরে গিয়ে পড়েছে। মনে মনে আপশোষ হল প্যাছারটা বুঝি এসে ঘুরে গেল। কিন্তু একেবারে আশাও ছাড়লাম না। ভাবলাম নাও এসে থাকতে পারে, কিংবা একবার এসে থাকলে আবার ও ঘুরে আসতে পারে। আমি স্থির করলাম, বাকি রাতটুকু ঠায় জেগে বসে কাটিয়ে দেব। আমি বারবার বনের অন্ধকার আর আলোকিত স্থানগুলো দেখতে লাগলাম। দেখলাম যেখানে অন্ধকার ছিল সে জায়গা আলোকিত হল, যে জায়গা আলোকিত ছিল সে জায়গা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। জাষ্ট এ প্রে অব লাইট এণ্ড সেড। তারপরই রতকোনা প্রান্তর থেকে নেকড়ে'র ডাক ভেসে এল। যেন অনেকগুলো নেকড়ে চাদের দিকে মুখ তুলে কাঁদছে—উউউউউ। ভাবলাম একটা সিগারেট খেলে কেমন হয়, সন্ধ্যা থেকে খাই না।

ঠিক তখনই আমার বাদিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ থেকে কেউ যেন বেরিয়ে এসে মনে হল। ব্রাদার, আমি স্পষ্ট দেখলাম, ঐ অন্ধকার থেকে জ্যোৎস্নালোকে বেরিয়ে এসে এ উত্তম্যান—একটি মেয়েছেলে! বোমটা দেওয়া মাথার, ঘড়া নিয়ে জল নিতে আসছে। আই গুরুট কোল্ড। কি সর্বনাশ! এসময় কোথার জল নিতে এসেছে ও। ও কি জানে না আজকের তুর্ঘটনা। ভাবলাম হার ফেট ইজ, ডুমড। যতটা সম্ভব গলার খর চেপে ওকে ডেকে বললাম, হে বাই, বাগো হি'রাসে, ইহার শের ছায়। বলছি আর ভাবছি এখন প্যাছারটা কোন কোণ থেকে ওর ঘাড়ে ঝাঁপাবে। কিন্তু মেয়েছেলেটি আমার কথা শুনে বলল মনে হল না। এবারে আমি আর একটু জোরে বললাম, কাঁহেকো ইহার আয়া? অতি পানি লেনেকো টাইম ছায় কেয়া। বাগো হি'রাসে—শের ছায়। এবারে মনে হল মেয়েছেলেটি হর কাল, নয় আমার কথা গ্রাহ্য করছে না। আমার সন্দেহ হল মেয়েছেলেটি নিশ্চয় কোন বন-মতলেবে এসেছে। সাম ইক্লিসিট একেরার। চিতাওয়ারের সে বদনামও আছে। মেয়েছেলেটি বারবার আমার মাচানের দিকে এগিয়ে এসে। চাদের আলোর বতটুকু ওর মুখটা আমি দেখলাম তাতে আমার মনে হল ওকে আমি কোথাও দেখছি। বোধ হয় নভারগার্নি কি সিমগার্নেই দেখে

থাকবে। মেয়েছেলেটি আমার মাচানের খুব কাছে এসে পাঁড়াল। কোন কথা না বলে সে একটা হাত সোজা মাথার ওপর তুলে ধরল। ভাবলাম ডাকছে আমাকে।

আমি রেগে খুঁকে পড়ে একটা-কিছু বলতে গেলাম। দেখলাম আঙুলে ইসারা করে আমার মাথার ওপরে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি একটু ঘাড় ফিরিয়ে মাথার ওপরে তাকালাম। দি প্যাছার! ঠিক আমার পিছনে ফুট দশেক দূরে একটা বটগাছের ডালের ওপরে শুড়ি মেরে ঝাঁপাবার উপক্রম করছে। চাদের আলোর জলজল করছে চোখ দুটো। তুমুর্ন্ত রাইফেলটা ঘুরিয়ে আমি চোখ দুটোর মাঝখানে স্কসী করলাম—গাম্ববু! শব্দটা মিলিয়ে বাবার আগেই ধূপ করে নরখাদকটা নীচে গিয়ে পড়ল। টর্' জ্বালাবার অবসর পাই নি। এবারে টর্' জ্বালিয়ে প্যাছারের প্রাণহীন দেহটা অনেকক্ষণ দেখে নিয়ে মাচান থেকে নেমে এসাম।

আমার জীবনদাত্রী সেই মেয়েছেলেটির খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সে নেই! আশে-পাশে চারদিকে টর্'র আলো ফেলে দেখলাম, নেই! ডাকলাম, সাড়াও নেই! ভাবলাম ভয় নিশ্চয়ই পালিয়েছে। বুদরি সাহেব একমুহূর্ত খোঁজ আবার বলতে লাগলেন—ওপর দিকে গুলী ছোড়ায় আমার রাইফেলের শব্দ সিমগার্নের লোকেরা পরিকারই শুনেছিল, কেন না কিছুক্ষণ পরেই তথ্যরাম বহু লোকজন নিয়ে এসে পড়ল। আরে শিউচরণ ভাইয়া, সাহাব কেন্দ্রা মার দিচ্ছে—কেউ বলে উঠল। আনন্দের আবেগে জনতা উদ্ভল হয়ে উঠল। কেউ কেউ এসে আমার পা দুয়ে প্রণাম করেই ফেলল, কেউ কেউ গিয়ে মৃত প্যাছারটার ওপর বেগড়ক কিল-চড়-লাথি বরণ করতে লাগল। শেষে অতি কষ্টে সকলকে থামিয়ে বললাম, একটা মেয়েছেলে জল নিতে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে—দেখ কোথায় গেল।

মেয়েছেলে। প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল সব। মেয়েছেলে! এত রাতে আসবে কেন সাহাব। ইয়ে কভি নেহি হো সাক্তা।

আমি বললাম, আমি নিজের চোখে দেখলাম, আমার জীবন বাঁচাল ও আর তোমরা বলছ কভি নেহি হো সাক্তা! বলে ঘটনাটা খলে বললাম।

কেউ একজন বলল, আচ্ছ। সাহাব মেয়েছেলেটি দেখতে কেমন বল তো?

বললাম; সে 'ত' ভাল করে দেখতে পারি নি, তবে আঁখি-আলোর তার মুখটা বতটুকু দেখেছি তাতে চেনা চেনা ঠেকলো।

সে লোকটি বলল, জজুর, ইয়ে আত্মা ছায়।

বললাম, কেয়া, আত্মা ম্যান?

লোকটি বলল, ওহি যো আজ মরা উনকী আত্মা। শিউচরণের ডৌকীর আত্মা।

বন্ করে উল মাথাটা আমার। খবরখ করে সর্বসরীর কাঁপতে লাগল। শিউচরণের বোয়ের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই কাপড় সরিয়ে একবার দেখেছিলাম।

[ আগামী সংখ্যায় চলবে।

# নাগরিক

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

নেপোল মারে দৈ

কোন এক যুগে পৃথিবীটা গোল ছিল। আজ কেবলই গণ্ডগোল। আগে রাজ্য ছিল, প্রজা ছিল। এখন কেবল পাটি। আকাশে সূর্যের ছিল একচেটিয়া ব্যবসা। এখন সেখানে স্পুটনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আনাগোনা। কোন এক যুগে এ পৃথিবীতে বোধ হয় মানুষও ছিল। আজ তার চিহ্নও নেই। বা আছে তাকে বলা হয় 'মাস' (Mass)। আগে সাহিত্য ছিল, এখন শুধুই বিজ্ঞাপন। এই সেদিনও আমি পাঠক ছিলাম। আজ হ'তে চাইছি লেখক। গণ্ডগোলের এমন অকাত্য প্রমাণ আমার আর কিছু জানা নেই।

এই গণ্ডগোলের গোড়ার শুরু করি। ধরে দেয়ে আর কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে মহানন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অরের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে, বাইরের পৃথিবীটাকে জানবার স্পৃহাও ছিল না, তেমন সুযোগও ঘটে নি। পৃথিবী বলতে যেটুকু জ্ঞানতাম তার সীমানা ছিল সাত নম্বর বাস, সন্তোরা নম্বর বাড়ি (আমার মহাজনের) আর ছবি করার সাতশো বায়নাঙ্ক। বিপদ ঘটলো ভারত সরকারের আমন্ত্রণ; জোর তাগিদ এলো ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে বিদেশ যেতে হবে, অতএব দিল্লী এসো, আলোচনা আছে। এমন ভাবি বেশ ছিল তাঁতি তাঁত বনে, বিপদ হল গান শুনে।

এরদিন সরকারি দপ্তর বলতে জ্ঞানতাম ইনকাম ট্যাক্স অফিস। দিল্লী গিয়ে বোঝা গেল জ্ঞানার গোড়ার আমার প্রচণ্ড গলদ আছে। কলকাতার ইনকাম ট্যাক্স-এর যে মহারথীকে মনে হত রীতিমত বিভীষিকা, দিল্লীর দরবারি দরে তিনি নিস্তান্ত দীন, দয়ালু। ওখানকার আশি টাকার ফেরাণিও এক একটি বিরাশি শিকার বিভীষিকা। বেশি তো কম নয়।

সাক্ষাতের সময় ছিল দশটা। সেক্রেটারিয়েটের সিংহসদনে যখন দাঁড়িলাম তখন দশটা বাজতে পাঁচ। দেখা যখন ঘটল তখন পাঁচটা বাজতে দশ। মনের গোড়ার ধাক্কা লেগেছিল ঠিকই কিন্তু রণে ভল দিই নি। ভারতব্যাপী অজ্ঞাত বহুসংখ্যক নেপোদাদার মতন সরকারি দৈ মারবার এমন সুবর্ণ-সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার মূর্থতা আর বারই থাক, আমার নেই। হানটাকে পকেটে গুরে মনটাকে বুকিয়েছি এ সব ভুলগবানের সীলা।

সেক্রেটারিয়েটের প্রথম হার্ডল বন্ধুত্বধারী সেপাই। সে বিড়ি গেলেই খুশি। দ্বিতীয় পর্বত একজন কেরানী। সরকারি ভাষায় তার নাম রিসেশন অফিসার। তার কাজ গাদিতে বসে শীতকালে

হিটারে হাত-পা সঁকা আর গ্রীষ্মকালে ঝগসের তলায় বসে খুবদার পান খাওয়া। এখানে আর বিড়ি চলে না, চাই সিগারেট। দিতে হয় না, নিজেই চেয়ে নেন। আপনি করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা। একমুখে ঝগসা ছেড়ে যখন মোতান্ত মন ভরে তখন টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বারকয়েক নাড়াচাড়া করে বলেন 'এনগেজড'। ইংরেজি এই ছোট কথাটার আভিধানিক অর্থ যাই হোক, এখানকার ভাষায় এর মানে 'আর একটা সিগারেট'। দিলেন তো কুপার কার্পণ্য নেই, নইলে নির্ধাত ভিড়ের মধ্যে হারালেন।

তিন সিগারেট অপেক্ষা করার পর ভেতরে যাবার ছাড়পত্র যদি বা পাওয়া গেল তো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেয়াদা নেই! আরও আধ ঘণ্টা এবং পুরো দু'টা সিগারেট।

'লিকামিত' টানা অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে যখন সাহেবের (জুজি টাই পরিচিত) সদরে পৌঁছান গেল, তখন সাড়ে বারোটা; জানা গেল সাহেব মিটিং করছেন। আমার পথ-প্রদর্শক পেয়াদাটি তার লাল পাগড়ি খুলে বিড়ি বের করে বসে গেল সাহেবের আর্দালির সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায়। আর্দালি সাহেব মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকায় আর ফিসফিসিয়ে মেমসাহেবের মোটা মোটা খবর ছাড়ে। বোঝা গেল তার সাহেবের উল্লসিত আসন্ন-আর দু'দিন যদি মেমসাহেব ঐ—বাকি কথাটা আর শোনা গেল না। কানটা খাড়া ছিল, কিন্তু গলাটা বড্ড খাটো।

সাহেব এসেন একটায়। আপাদমস্তক দেখে আমার ব্যক্তিত্বের ব্যাসটা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন বলে মনে হল না। কোন কিছু না শুনেই ভুলকো (হ) বললেন, 'কাল আসবেন, আজ বড় ব্যস্ত।'।

রাগ হল, ফিরে যাবার উপক্রম করতই মন বললে, 'আরে মূর্থ, তুই না গেলে দৈটা অজ নেপোল মারবে!!'

বাধা হয়ে স্তব্ধ চড়িয়ে নামটা চাহর বরলাম। সাহেব মজা ব্যস্ত হ'য়ে মাটিতে প্রায় দুটিয়ে পড়েই সন্ধান জানালেন। ক্ষমা প্রার্থনার চেয়েই আমার খাবি খাওয়ার উপক্রম। ঘরে নিয়ে বসালেন। চা এল, পান এল, দু'দশটা ফাইলও এলো।

মন্ত্রীসঙ্কল যখন পৌঁছান গেল তখন বেলা চারটে। তার প্রাইভেট সেক্রেটারির পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টের বড়বাবুর স্টেনোগ্রাফার জানালেন ক্যাবিনেটের মিটিং হচ্ছে ডেট হ'বে না। ঘরে সাপাইপির তলায় হাত ঢুকিয়ে উকুন বাছার বহর দেখে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে লাগল। পালাবার জন্য কীদাছে কিন্তু আমার মধ্যকার নেপো থাকে বলে নাছোড়বন্দী।

দেবদর্শন ঘটল পাঁচটা বাজতে দশ মিনিটে। দরার সাগর মহা সন্মানে হাত বাড়িয়ে কর্মমর্দন করে বাণী দিলেন, 'আপনি যে যেতে রাজি হয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ছবি ভারতের শ্রমায় অক্ষর রাঁধবে!'

বাস। কথা শেষ। কাজও শেষ।

জনবহুল দিল্লীর রাজপথ।

জাজার হাজার সাইকেল আমার ত্রুণার দিকে ছুটে চলেছে। বাড়িমেথো গরুর গলার খটর মতন ওদের সাইকেলের খণ্টি বাজে। বুলো ওড়ে।

স্টাটপরা, চটি পায়ে কেরাণী। সালওয়ার পরা পাঞ্জাবী তরুণী। বাঙালী, মাস্তাজী, ভূটীয়া। সারা ভারতের সেরা ছেলেরা স্বৈচ্ছ্য তাদের স্বকীয়তা খুঁটিয়েছে এই কেবাণীবাঙ্কো। দেহে ওদের ক্লাস্তি, মনে পরম ঐশ্বর্য। পেছনে অল্পবাল্লুর নিশ্চয়তা। সারা ভবিষ্যৎ জুড়ে ভাবনা। কোথায় কাকা? কোথায় মেসো? কোথায় বোনাই? তারাই উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ, অনিশ্চিত সোপান।

কনট প্রেস।

সাল নীল আলোর বসন্তানি। ঝাঁড়িয়ে দেখি মহিলাদের কেনার মরুময়। মরুময়ী ফুলেরই ফৌলুয় ওদের ঘোঁরনে। কারো আছে, কারো গেছে। অধিকাংশেরই প্রবল প্রচেষ্টা ওটাকে বং দিয়ে আর চা দিয়ে ধাব রাখবার। সবকারি মহলের ঐতিহ্য ওদের পোঁকটো চোঙ্গি ব্রাউস, বদর নাইলন বাতাবে আর হাঁটখাওয়া চটিতে। ওদের যত দেখি তত সেই বড় পূর্বাপ গান মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে— 'জানি না কোথায় আছি, রাখিয়া কিছা রাঁচি।'

ওটাকে হাঁটতে চলেছি চকাকারে। সন্ধাবেলার দিল্লী সহর ঐ চককে কেন্দ্র করে চরকরাজি ধায়। প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রত্যেকটি মানুষ। যাদের একবার দেখি তাদের বার বার দেখি তবপরি সব এক হয়ে মিশে যায়। একই স্তোত্রের বাঁধা সব সরকারি স্থানবাসী। কেউ কাকার কাঁধের উচ্চাসন, কেউ খোসামোদের খাসমহলে। কেউ বোতল দিয়ে বারশাহ। কেউ বোঁ সামনে নিয়ে বড় সাহেব। বাকি সব কেরাণী। কেউ ফাট, কেউ ফালতু।

মেঘবস্ত্র পাঞ্জাবী নারীজাতির ভিড় ঢেলে ঢেলে ন'টা বাজল। দোকানের আলো নিভল' তো পাড়টাই অন্ধকার। তখন আর থানান মানুষ দেখা যায় না। কান পাতলে শোনা যায় সেই হারিয়ে যাওয়া ভারতের দূর ভাগবাব। বাক্সির স্তিমিত অন্ধকারে ঢোখ আর মনে এক করল দেখা যাবে ইন্দ্রপ্রস্থর ঐতিহ্য আর মুঘল-এ-খাজমের বাদশাহীজানা। কাগ্রেসী দিল্লী আর পাঞ্জাবী অফিসারদের বেয়াদবীর তলার নিশ্চয় হয়ে গেছে। পার্কের বেঞ্চে বসে বসে দেখলাম নিরুণ নয়া দিল্লী। কোন এক যুগে এখানে মানুষ ছিল। আজ আর মানুষ নেই। আছে কংগ্রেস, আছে কেরাণী। আর তাদের কতক।

সরকারি আমন্ত্রণ এসেছি, তাই আন্তানি হল অশোকায়। পুরোণ স্থাপত্যশিল্পের সঙ্গে, এট হোটেল জড়িয়ে আছে আধুনিক ক্রটি। এত বড় হোটেল শুনেছি এশিয়ার নেই। আরতনব কথা জানি না, অবাবস্থার এর তুলনা নেই সাগা পৃথিব্যে এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এখানকার মানদণ্ড হল গায়ের রং। চামড়া যত সাদা ওদের সেলাম ও সেবা তত সহজ ও স্পষ্ট। বাকি সব বকেয়া। ঘরের যত বাতলা, বরোয়া আবহাওয়ার তত অভাব।

ভট্টিনং-রুমে গিয়ে বসলাম সাড়ে ন'টার। ভেবেছিলাম ভিড়টা কাটিয়ে বসব। গিয়ে দেখি মতপানের মরুময় সব জমে উঠেছে। ওদিকে নৃত্য-প্রদর্শনী। আকর্ষক নর্তক হলেন ভারতীয় নৃত্যকলার অনন্ত কলাবিদ। মনে পড়ে গেল একদিন এরই নাচ দেখবার ভক্ত সারা পৃথিবী উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। একেই মধ্যমণি করে মাকিনী টাকা এসেছিল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার প্রচেষ্টায়।

নগাদিল্লীর নতুন সত্যতা ভারতীয় কৃষ্টির সেই বৈশিষ্ট্যকে নামিয়ে এনেছে মদের আসরে, কাঁটা, প্রেট, চামচের টুং-টাং-এর মধ্যে, বেচার। থানসামার আসা-যাওয়া আর দোড়ার বোতলের ফোসফোসানির সঙ্গে সমতলে।

কোন এক যুগে পরসাদি দেয় মুড়ি পাওয়া যেত। এ যুগে পরসাদি দেয় মানুষ ও মনুষ্যের দুই ই পাওয়া যায়। সহজেই। সে যুগে ছিল শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা, শিল্পীর প্রতি সম্মান। এ যুগে আছে শুধু লাভ আর লোকসান।

ভোরবেলা এয়ারপোর্ট। সাহেব এলেন সি-অফ করতে—সত্বীক। ভেবেছিলাম বৃষ্টি সম্মান, সময়মত কানো গেল স্বার্থ। মেমসাহেব আবেদন জানালেন ওঁর জগা যদি একটা ট্রানসিস্টার আনি তা হ'লে উনি বাধিত হবেন।—প্রীজ !!

দিল্লী সহরের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে দেখলাম প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট খাবা পেতে বসে আছে, সারা ভারতের মানুষগুলোকে মারবে বলে। মানুষ মরবে, আবার জন্মাবে, কিন্তু মহাব্যাহ? আমাদের ঐতিহ্য?

পেনে বসে ডায়েরির পাতায় হিসেব লিখতে বসলাম। হিসেব করে দেখা গেল ভারত সরকারের সাতশো টাকা খরচ করে মজীর বাণী দিয়েছেন সাতটা কথা। গড়পড়তা প্রত্যেকটি কথার দাম একশো টাকা।

হিসেব শুনে মিভা বললে, 'মস্ত পাগল!'

হুনিয়ার সব দোষ আমার মাথায় নির্বিবাদে চাপিয়ে দেওয়া প্রিয়স্থানীর নারীজাতির একটি প্রেম-ব্যাদি। মিভা বাই বলুক; আমি ঠিকই জানি গোলমালটা আমার মাথায় নয়, এই যুগে।

দিল্লী থেকে ফিরেই আমার দশম দশা। স্বাস্থ্যের ফুটো আর আত্মসম্মানের ফাল্গুনী ভরবার আগেই ভরে ভরে টেলিগ্রাম আসতে আরম্ভ করল। 'কবে যাচ্ছেন? পাসপোর্ট ঠিক হয়েছে কি না? ছবিটা কাটি ছাঁট হল কি না? জার্মানী ভাষার সাব-টাইটেল করার কি হল? কবে হবে? কে করবে? টেলিগ্রামের বহর আর ট্রান্সকলের বাহার দেখে আমার আতাহ নিভা মাথায় উঠল। হাতে সময় মাত্র সাতদিন। সারাদিন সরকারি ফরমারসের বদ' সারি আর সারারাত ল্যাবোরেটরিতে বসে বাবো হাজার ফুটের ছবিকে ছোট করি। তাতেও নিস্তার নেই। এখানেও আক্রমণ শুরু হল। ছবিটার কোন দৃশ্য বাদ যাবে, কোন কথা জোর হবে, তারও লম্বা লম্বা সিস্ট আসতে আরম্ভ হল। যত অসম্ভব নির্দেশ, অসম্ভব কল্পনা, অসম্ভবিক ভাবধারা।

এদিকে ছবির কাজে রাত যায় ওদিকে সরকারি কাজের অবসরে পাসপোর্টের জগা ছোটোছুট। ড্রাবোন' রোডের মোতালার ওপর ঐ যে দপ্তর, দেখতে ওটা ছোটোখাটো চিড়িয়াখানা। বড় বারান্দায় ছোট ছোট বুলবুলি। ওদিকে কেরাণীগুলোর ভুমকি, এদিকে বিভ্রান্ত পাসপোর্ট-প্রার্থীদের হাহাকার। একটা ফানের তলার একশোটা মানুষ গরমে হাঁসকাঁস করছে। ডানধারে দরজা। উঁকি মারলে দেখা যাবে আর একটা সফ লম্বা বারান্দা। তার দু'ধারে জাল দেওয়া আছে। জালের ওপারে আরও জলন্ত বিভীষিকা—অর্থাৎ আরো

কেরাণী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের টেরিলে কাঁইল, মুখে পানি, হাতে সিগারেট আর দুটিতে বিরক্তি।

সকাল ন'টার কিউতে পীড়ালে দু'টো আদ্যাজ নর্শন পাওয়া যায়। প্রথম দিন দরখাস্তের ওপর দুটি বুলেটের ধরাবতার বললেন, ছবির সঙ্গে চেহারা মিলছে না। বোঝাতে পারলাম না যে দোষটা আমার নয়। পরের খেয়ে ঘরের মোব তড়াবার সময় যে ছবি তোলা হয় তার সঙ্গে ঘরের খেয়ে সরকারি মোবের শুভো খাওয়া চেহারার প্রভূত পার্থক্য। ছবিটা তুলিয়েছিলাম মিতার মনোরঞ্জনকে জ্ঞাত। আর কিছু না থাক চাকচিক্য ছিল। সরকারি ফর্ম হাতে সারাদিন কিউতে পীড়িয়ে সে চাকচিক্য জুন মাসের খামে ধূসে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ধরাবতারের মন কিন্তু হিমালয়ের চাইতে ঠাণ্ডা, জমে পাথর হ'য়ে আছে। সেটাকে গলাতে পারে এমন জোর মানুষের নেই, টাকার আছে। আমার আবার ওটারই অভাব।

ছবি বললে পরদিন আবার কিউতে। আবার নর্শন মিললো দু'টোর। আজ যদি ছবি ঠিক হল তো ব্যাক গ্যারান্টিস সংখ্যা মনঃপূত হল না। হতাশ হ'য়ে মনটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, পেছন থেকে সমবেতকণ্ঠে তাগাদা এল, 'হল মশাই?' তাকিয়ে দেখি সবাই সাটের হাতা গুটোচ্ছে, তবু একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

প্রশ্ন করলাম—'কত টাকার গ্যারান্টি চাই?'

সহজ উত্তর এল, 'কবে যাবেন?'

'শনিবার।'

কেরাণীবাবু কুপা ক'রে বললেন, 'আজ তো বুধবার—তারপর যে ধরনের হাসি উনি হাসলেন তার সারার্থ হল আমি একটা পাগল। আর কোন প্রাঙ্গ নিমন্ত্রণোজন। তিন দিনের মধ্যে পাসপোর্ট চাওয়া ও পাওয়ার কল্পনা রাঁচি ছাড়া অন্য কোন ভাবগায় যে সম্ভব নয়, এটা ওর হাসিতেই স্পষ্ট। আর কিছু বলার আগেই দেখি পেছনের ধাক্কায় লাইনের বাইরে যেখানে গেছি।

ব্যাকের বাঁধা নিয়ম। সেখানে কীক নেই কিন্তু যুক্তি আছে। আমার কাতরোক্তি শুনে ম্যানেজারসাহেব নিয়মের ওপর দরদার দাগ টেনে নতুন গ্যারান্টিপত্র সই করে দিলেন। আবার ছুটলাম ব্রাবোন' রোড। কেরাণীবাবু দেখে শুনে বললেন, 'রেখে বান, সময়মত জানতে পারবেন।' আর কোন প্রশ্ন করা চলবে না। পাঁচটা বেজে এক মিনিট হ'য়ে গেছে।

পরের মোড়ে ট্যাক্সির জন্ত পীড়িয়ে আছি, পেছন থেকে ডাক এল, 'এই যে দাদা।'

কাউটারের কেরাণীবাবু।

'মানে আপনাদের সঙ্গে আসাপ করতে এলাম। কোথায় বাচ্ছেন?'

'ইচ্ছা হল বলি, জাহায়েমে যাবেন?'

ওর প্রশ্নের জবাব উনি মিছেই দিলেন আরও একটা প্রশ্ন তুলে।

'বাড়ি বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কবে হ'লে হবে?'

'কি?'

'আপনার পাসপোর্ট।'

এইবার ওর নয়ম স্তরের মধ্যে যে গরম ইন্সটিটুট ছিল সেটা স্পষ্ট হল। সোজা ভাবায় সহজ কথাটা বলে দেওয়া আমার মজাগত। ওতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। বললাম—

'টাকা চাই?'

ভক্তলোক এমনভাবে হাসলেন যে নিজেকে আমার মিতাঙ্গ নিল'জ্জ মনে হল। অবলীলাক্রমে উনি বললেন—

'সরকারের পরসার বাচ্ছেন, টিকিটের খরচ তো হাগবে না।

দু-চারটে পরসার আমার পাখো না স্তার?'

'কেন পাবেন?'

'চলিশ কোটি লোকের মধ্যে আপনিও তো সরকারি নজরটা পেয়েছেন। কেন পেলেন?'

যুক্তি অকটা। এ প্রশ্ন বহুবার আমারও মনে হয়েছে। তবু, হটবার বান্ধা নেই। বললাম—

'ছবিখানা করেছি বলে।'

'তেমনি আপনাদের পাসপোর্ট আমার হাতে পড়েছে বলে আমারও কিছু প্রোপ্যা। কত তো পাবেন। দু-চার টাকা গরীবকে দিলে শুণ গাইব।

'দেব' না।'

'তা হ'লে আপনাদের নেকুই ছবিতে একটা চাল দেবেন। ভিড়ের মধ্যে পীড়িয়ে যাবো।'

সত্যিই হাসি পেল। একই মানুষের কত রূপ। পথে পীড়ালে আর প্রেক্ট দারিত্র্য, দণ্ডের চেহারে বসলেই তার অন্য চেহারা। এরও বাইরে সে শিল্পী। মনে সৃষ্টির আকুল আগ্রহ।

'হাসছেন স্তার?'

'অভিনয় জানেন?'

'করিয়ে নেবেন। আপনি তো ডিরেক্টর।'

'কেন অভিনয় করতে চান?'

'এই মানে—বুঝলেন না?—অনেকদিনের সখ!'

রাজি হলাম। হোক ও সরকারি মহলের জবরদস্ত সেবেস্তাদার। বাড়িতে আমার হাহাকার ব'লেই দণ্ডের এত হুঙ্কার এতো অত্যন্ত সহজ কথা। পেছনে হাত দিয়ে পকেট কাটাটা ওদের মজাগত ব্যাধি নয়, সুবোধের সুবিধা নেভরা। জীবিকা অর্জনের তাড়না আছে, সেইটাই ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ক্ষিপ্ত আর অভাব সাধারণ জীবনে আদর্শের তোরাক্ষা রাখে না। এ সবের ওপর মানুষের যে সহজ মনটা তাকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। তাই রাজি হলাম।

পরের ছবিতে ভিড়ের মধ্যে পীড়াবে। কত লোক তো পীড়ার, তার মধ্যে একজন। সারা ছবিতে বিহ্বল ঝলকানির মতন এক পলক। কেউ চিনবে না, জানবে না, লক্ষ্যও করবে না। করবে কেবল ও নিজের আওর কাছের মানুষ তাও দু-চারজন। দেখাটা আনন্দ নয়, আসল আকর্ষণ অভিনয় করাটা। বাড়িতে ধবরটা পৌঁছোলে কেরাণীবাবু তার হাজার দিনের পুরোন দুষ্টির ওপর চোখ তুলে স্বামীকে একবার নতুন ক'রে দেখবে। সেই ওর আনন্দ। অকস্মে আফালন করে বলবে, 'কাল আসব' না, খুটি

আছে।' যতদিন না ছবি মুক্তিলাভ করবে ততদিন প্রতিমুহূর্তে চলবে নিজেকে নতুন করে দেখা, স্বতন্ত্র ক'রে দেখানো। দেখতে দেখতে মুক্তির দিন আসবে। মনটা সেদিন সরকারি গোলাবী ছাড়িয়ে ছুট দেবে নতুন ছন্দে। পাসপোর্ট, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি আর পাওনাশর পথের মোড়ে হারিয়ে যাবে। পাসটা হাতে আর পুরা সংসারটা পেছনে নিয়ে যখন প্রেক্ষাগৃহে ঈড়াবে তখন ঐ কেরাণী একেবারে অল্প জগতের অনন্ত জীব। ওর চারপাশের লোক শুধু দর্শক। ও দার্শনিক। পাশের লোকটাকে দেখবে নীচের মাছের মতন, নিয়ন্ত্রণের ছোট ছোট বিলু। মনে হবে ওরা অব্যবহৃত ভিড়। নিছক বায়লা।

ছবি আরম্ভ হবে। যে উত্তম তারকাকে দেখবার জন্য ও নিজেই দিনের পর দিন লাইন দিয়েছে আজ ওর তাকেই মনে হবে অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক; মন আবুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকবে সেই ভিড়টার জন্য, সেই ভিড়ের মধ্যে নিজের জন্য। সে মাছুষটা আগের তাহাকারলিষ্ট কেরাণী নয়, সে সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষার উদ্ভাসিত শিল্পী।

তারপর আসবে সেই মুহূর্তটি। ছন্দয়ের তরীতে তরীতে জাগবে নব ভ্রমুভূতি। তার স্তর স্বতন্ত্র, তার ছন্দ অদ্বৈতপূর্ণ। জীব হাতপানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরবে; একপলকের দুঃখিনিময়। চবির ঐ স্তর ও আবেশ আর মনের ঐ স্বাতন্ত্র্য হ'জনে ওরা ভাগ ক'রে নেবে হ'জনের নিবীড় নির্জনতার। পরদিন ভোরবেলার গরলা এসে যখন পরসার জন্য পাড়া মাথার করবে তখন হুম থেকে উঠে ওরা দেখবে ঐ একপলকের অদ্বৈত মাছুষ দু'টো আবার বুঝিয়ে পড়েছে। জেগে থাকবে শুধু পাসপোর্টের কেরাণী আর তার জীবন-জীর্ণ আটপোরে বৌ।

তাই রাজি হলাম। একমুঠো চাল না দিতে পারি, আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি কেন?

পাসপোর্ট পেলাম পরদিন বিকলে। গ্লেন ছাড়ল, তারপর দিন রাত নটায়।

### বিদায়ের বিতীষিকা

কেরাণীবাবুকে 'নেক্ট' ছবিতে চান্স দেবার দায় খাড়ে নিয়ে পাসপোর্ট পাওয়া গেল' কিন্তু ছবি পাঠাবার ছাড়পত্র পেতে থাকে বলে নাস্তানাবুদ। এই ছাড়পত্র দেবার মালিক হলেন খাকি উদিপরা আবগারি বিভাগ। কোকেন কারবারিদের কুপোকাৎ করার ঝাঁর অভ্যস্ত তাঁদের কাছে আমরা মশার চেরও নগণ্য। অস্ত্রাস্ত্র সরকারি দপ্তর জনসাধারণকে যে খ্যামটা নাচ নাচান তার বেশিটাই হয় বোমটার ওলার। আবগারি বিভাগে আক্রমণ বালাই নেই। সবটাই সহজ এবং স্পষ্ট। এখানে লাইন দিতে হয় না, সরাসরি বসতে হয় কারেমি হ'য়ে। সকাল থেকে সারাদিন, কখন কখন সারা সপ্তাহ, নির্বাচ হ'রে, নির্বিবাদে। কথা বলেছে' কি ব্যস, পড়লে ১১১৭ সনের ৩৭৩ ধারার ২১ (ঙ) নিয়মের 'শ' শাখার কবলে। সেটা কি? ওঁরা নিজেরাই জানেন না।

জবে ওঁদের ঝিক থেকে সহানুভূতি এবং সাহায্যের শেষ নেই। ব্যানার্জীসাহেবের (বাবু বলা চলেবে না, হাকপ্যাণ্ট পরার ঐটাই বিশেষণ) চেহারা যত চাকচিক্য, ব্যবহারে ততোধিক সৌজাত।

রেসের বোড়া যেমন দৌড়াবার জন্য ছুটকট করে, উনি তেমনি সাহায্য করার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। হ'লে কি হবে, ওঁদের নিজেদের আইনের বেড়াফালে ওঁরা নিজেরাই এমন বিস্তীর্ণভাবে জড়িয়ে আছেন যে, ইচ্ছে থাকলেও সহজে নিষ্কৃতি দেবার উপায় নেই। যত নিয়মের ধারা তত বিভিন্ন ধারণা। প্রতি লাইনের প্রতিটি অক্ষর নিয়ে অফিসার-অফিসার মতের হারামারি-আর সেই যুদ্ধ মরে আমার মতন উলু-খাগড়া।

ব্যানার্জীসাহেব নিজের ঘরে আমাদের বসিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলেন, কিম্বাটা কোন ধারার ধরবে? র' কিম্বা ওঁদের নিয়মের মধ্যে বাঁধা, কিন্তু যে ফিল্মে ছবি তেলো হয়েছে সেটা? একজন বললেন, 'ঐ একই জিনিস—অর্থাৎ পাঠ্য ও যা মাসের বোলও তাই। তৃতীয় হাকপ্যাণ্ট বললেন, 'আরে মশাই ভঁটা হল ছবি।' চতুর্থ হাকপ্যাণ্ট টেবিল চাপড়ে বলেন, 'কি ক'রে হয়?—এই আইনে যে ছবির কথা বলছে সেটা হল ছির ছবি, ফিল্মের ছবি তো নড়ে-চড়ে।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি হাকপ্যাণ্ট এসে কনকাবেলটি বেল জমিয়ে তুললেন। খট্টা তিনেক আলোচনার পর এ সমস্তার যদি বা সমাধান হল (কেমন ক'রে তা বলতে পারব না) প্রায় ঊঠল কিম্বাটা ফ্যাক্টরিজাত জিনিস না শিল্পবিশেষ। সরকারি নিয়মে ঈড়িত হল ফ্যাক্টরি, অথচ ফ্যাক্টরি আইন কুঁড়িও সন্তোস্ত ব্যাপারে প্রবোজ্ঞ নয়। কুঁড়িওর কমীরা বলেন, তাঁরা শিল্পী, সংঘ বলেন, তাঁরা 'মজদুর'। প্রবোজ্ঞকমহল নিজের স্বার্থের দিকে সর্বদৃষ্ট রেখে বলেন, 'আট খট্টা কাজ কর কাগণ তুমি কমী' আবার ওঁরা যখন কর্মীর সহজ সর্ভগুলাে দাবী করেন তখন সরকারি ট্রাইব্যুনাল বলেন, 'সে কি ক'রে হয়?'

আবগারি আইনের জঞ্জাল থেকে ধাঁধ করের অঙ্কট। যদি বা কোনমতে উদ্ধার করা গেল, তো বিশদ বাঁধলো ফর্ম নিয়ে। কোন ফর্ম টাকাটা নেওয়া হবে। আমার সহযাত্রী প্রবোজ্ঞক বন্ধু করবার নোটগুলো পকেটে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে রাস্তা হ'রে শেবকালে বেয়ারাদের বেক্ষিতেই সটায় শুয়ে পড়ল।

সারাদিন আলাপ-আলোচনার পর ফর্মের হদিস হল কিন্তু দেখা গেল সেই ফর্মের নিয়ম অল্পবারী ক্যাসটাকা নেওয়া চলবে না, ঐ মূল্যের ভ্রাশস্তাল সেজিস সার্টিফিকেট চাই। অতএব ছোটো ডাকঘর।

জি পিওর মাথার একখান লাল শালুর ওপর একমণ তুলো দিয়ে চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন টাঙানো আছে 'ভ্রাশস্তাল সেজিস সার্টিফিকেট কিহুন।' ভেতরে কখনো দেখবেন কম করে দশটা কাউন্টার আছে ও কুড়িটি কেরাণী। তিন খট্টা লাইন দিয়ে জানা গেল যে সার্টিফিকেট কিনতে গেলে চার বকম ফর্ম ফিল আপ করতে হয় এবং কম করে চারদিন কাউন্টারের ধারে ঘুরপাক খেতে হয়। নিয়মকে নাড়বার ক্ষমতা নাকি স্বাক্ষরবাবুরও নেই। তা হলে? কুপোপনবশ হয়ে কেরাণীবাবু মুখভর্তি প্যারোয়ারার গন্ধওরলা এক গাঁজাখোর বড়োকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্ক্রক বলুন।'

বললাম। তিনি তিন টাকা (এবং দু'টো সিগারেট ও একটা পান) নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে সার্টিফিকেট হাতে শক্তে দিলেন। আমাদের কার্যোদ্ধারে কেরাণীবাবুর হুখে যে অনাবিল হাসির ঝোঁগা ছুটল তাতে হুঁই হয়ে প্রবোজ্ঞক স্রবোষ তার পাতের ঝাঁকে কেরাণীবাবুকে

নিকটতম আত্মীয়তার মৃৎমালা বেঁধে ফেলল। অম্পট বহলে  
'অনুরক্ত ভাই।'

আবগাণি-বিভাগের বামেলা মিটিয়ে যখন গা-বাড়ি দিলাম তখন  
আমার হাত হল গলা ফাটির চিংকার ক'রে বলি 'গৃহীণ বড় ভাই।'  
পারলাম না কারণ তা হ'লে সারা সবকারী মলকটার সংস্কার সরাপরি  
সম্বন্ধ পাতাতে হয়।

এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালের জেট প্লেন, গালভরা নাম বোরিং  
সেভেন ও সেভেন। ছাড়বার সময় সাতটা। ভারতের বাইরে যাবার  
যাত্রীদের নানান বামেলা, অতএব এয়ারপোর্টে হাজিরা দিতে হয়  
ছ'ঘণ্টা আগে। ছুন মাসের পাঁচটা মান টাটার ফানসি। দশ  
মিনিট বসেছি কি বসি নি, লোকে লোকারণ্য। কারো হাতে মালা,  
কারো হাতে ফুলের তোড়া। আমাদের বিদায়-সম্বন্ধনার ব্যাপক ব্যবস্থা।  
ভিড় দেখে থানিকটা ভেড়কে গেলাম। ছোট্ট ছবির ছা পোষা পরিচালক,  
চলেছি ছ' সপ্তাহের মেয়াদে, তারজ্ঞা এত? সুবোধকে এককোণে  
টেনে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'  
ও ততোধিক খাটো গলায় বহলে, 'ট্যান্জি ডাড়া দিয়ে ম্যানজ  
করেছি, মানে পাশিসিটি।'

লোক যখন এসেছে, জীবিকতা ও নিবাব্ব। দর্শকত্ব মুখের ওপর  
কৃতজ্ঞতার লাইন টেনে মালা পরতে আশ্রয় করলাম। একগাল  
হেসে সবাই ফুল দেয় আর ছ' গাল হেসে আমরা নি। বাচ্ছি তো  
দেড় মাসের মেয়াদে, তারপর ফিরই তো আবার আমরা পরস্পরের  
যে দুইয় সেই কুটুমই তবু মনটা নরম হয়ে আসে। বিদায়ের  
সম্বন্ধনাটাও সজ সজ সেরে ফেলি।

কেউ আর বাড়ি যেয়ার নাম করে না। যতই বলি 'আচ্ছা  
তা হ'লো... কেন আর বঠ করবেন... মিছিমিছি...' ততই জ্বনি তাও  
কি হয়? প্লেনটা ছাড়ুক, তারপর যাবো।'

বিদায়ের পালা শেষ ক'রে যখন কাঁসটমস ঢেকে যাযো তখন জানা  
গেল যে যাত্রার সময় এবছটা পিছিয়েছে। প্লেনের কোথার গলদ  
দেখা দিয়েছে। ক্রমদ গুলাম। বিশার নেওড়া হয়েছে; ছবি  
তোলা হয়েছে, এমন কি বহরনও হ'য়েছে। এবার পুরো একটি  
ঘণ্টা কাটিবে কেন বরে? তবু কটিল। আবার হাসি,  
আবার বিদায়-সম্বন্ধনা, আবার কংমর্মন এবং আবার ঘোষণা—  
প্লেন ছাড়িতে আরও একঘণ্টা!!

## একটি সনেট

অশান্ত বোধ

ঝড়টি থেমে গেছে মাঝরাতে আশ্রয় সময়ে  
সাইয়েন, ব্রেনগান আজ যেন অকৃত নীরব  
পশপায়ে মুগ্ধ ছায়া; ছিন্নভিন্ন দৃশ্যবলী সব  
অন্ধকারে স্থির হয়ে বিধাবিহীন কৌতুক, বিশ্বমে  
ঢেরে আছে, পাহাড়ের অন্তরালে রান বৃক্ষগুলি  
ফিরে চাই, বৃষ্টি নেই—মাজ শুধু তোমার উজ্জল  
উজ্জ্বল বৈচিত্র্য, আকাশের শাণিত বিজলী  
কবে ঝলকাবে সেই হৃৎস্থ স্থিতি ছ'হাতে সখ্য।

দু'বার বিদায় নেওড়া হয়েছে, বাণী বিনিময়ও হ'য়ে গেছে, অতএব  
এখন কেবল হাসি দিয়ে ম্যানিজ করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের  
এই যাওয়ার ব্যাপারে বহুপ্রকার হাসি দেখেছি; কোনটা দয়ার, কোনটা  
কুপার, কোনটা দ্বিবার, কোনটা ককণার (কৃতজ্ঞতার হাসি নিজেই সব  
হেসেছি বলে দেখার সৌভাগ্য হয় নি।) কিন্তু হাসি যে হাসপাতালে  
পাঠাবার উপক্রম করতে পারে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নটায়  
যখন সত্যিই প্লেন ছাড়ল তখন চোয়াল দু'টো একেবারে আড়ষ্ট।

সারা প্লেনে যাত্রী আমরা পাঁচজন, যাত্রী তার চেয়েও বেশি। যাত্রী  
অর্ধে হোসটেস্। আসলে ওরা এক একটি ডানাকাটা পুরী। ফিকে নীল  
শাড়ি, কটকে লাল চোঁচি ছুর আর ভাঙা ভাঙা হিন্দি মেশানো বাঁকা  
বাঁকা ইংরেজিতে ওদের শোভা বোখাইয়া-হিরায়িনদেরও তার মানায়।  
নামে ভারতীয়া হ'লেও জেটের তরুর ওরা অভিন-দেশের অপরিচিতা।

আমাদের ভূঙ্গিসাহেবের কথা মনে পড়ছে। বৈকব বাবা মা  
অনেক আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন বাজেন। তিনমাস বিলেতের  
বাসাসে নামটা পালটে তিনি হলেন বারজেন, ইংরেজি বানান  
Bartzen। উনি একবার ব্রীজ খেলতে বসেছিলেন ক্যালকাতা  
ক্লাবে, মিসেস রয়কে পাটনার নিয়ে। ভাগ্যক্রমে ভূঙ্গিসাহেব একবার  
তাস পেলেন সোজাশুজি গ্রাণ্ড ক্লামের। মিসেস রয় স-উৎসাহে বললেন,  
'ইউ লাকি ডগ।'

ভূঙ্গিসাহেব তাকে তাকে রইলেন। তারপর ভূঙ্গিসাহেবের  
ভাগ্যক্রমে (এবং মিসেস রয়ের দুর্ভাগ্যক্রমে!) মেমসাহেব এক  
হাত চমৎকার তাস পেলেন। ভূঙ্গিসাহেব একেবারে অক্সোনিয়ান  
স্বরে চিংকার ক'রে উঠলেন—'ইউ লাকি বাট,।'

আমাদের যাত্রী দেবীরাও ওরই সম-গোত্রীয়। হিন্দি আমাদের  
জাতীয় ভাষা। ওদের বলার ধরণ মনে হয় ওটা বিজাতীয় বৈয়মানদের  
অবস্থা গালাগাল—যেটা বলা এবং বোঝা দুইই অপূরণ।

আর আমাদের সহযাত্রী ছিলেন মাথো মেলেকোর। কলকাতা  
থেকে চলেছেন লণ্ডনে, তিনমাসের ভ্রমিতে। আশা আছে যদি কোন  
রকমে ওখানে বিচোটা হয়ে যায়। দেখতে ঠিক হুন্দরী না হ'লেও  
লম্বাঘীর নিশ্চয়, কিন্তু আশ্চর্য, কককতা। এয়ারপোর্টে আমরা তাকে  
কেউ হক্কাই করি নি। বয়স সাতাশ কি আটশ। রয়েছে ইংরেজি  
রস্তার স্পষ্ট ইসারা। জাতে আয়লা ইণ্ডিয়ান, কাজে স্টেনো।  
ওকে লক্ষ্য করলাম বাহুতে, বুহল ম বকুট এয়ারপোর্টে। [ক্রমশ।

রক্তাশ্রিত মৃতদেহ, দর্পিত উল্লাসে ভরাহ  
নিভে গেছে একে একে আজন্মের আন্তরিক স্বাদ।  
অথচ অদূরে ঝলে শান্ত রোদ, এলে মেলা হবে  
সুখাতাস, চোরাবালি? ক্ষমাহীন পরিব্র বিবাহ  
ঘটে গেছে বিরাট যুদ্ধের শেষে; নশ্র অবসাদ  
কেন যেন কেটে গেছে মস্ততার আরকে, আসরে।



# মৌমর্ষ

( পূর্ণাহবতি )

শ্রীমুবোধকুমার চক্রবর্তী

উনত্রিশ

এ অঞ্চলে এখন প্রবল শীত পড়েছে। অরণ্যের শীত যেন বাতের ভয়ের মতো। সাধা শরীর একেবারে আড়ষ্ট করে দেয়। দময়ন্তী জানত না যে শীতে মাহুত এমন কাবু হতে পারে। তার বাবা যে অঞ্চলে থাকেন, সে এখান থেকে খানিকটা দূরে। সেখানে লোকালয় আছে, হাটবাজার আছে, রেল স্টেশনও আছে। জায়গাটা একটু খোলামেলা। একটু কাঁকা কাঁকা। সন্ধ্যা হবার আগেই দময়ন্তীরা বসবার ঘরে এসে বসত। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গল্প করত মায়ের সঙ্গে। মা কখনও উল বুনতেন, কখনও বই পড়তেন। এক-একদিন তার বাবাও এসে কাছে বসতেন।

দময়ন্তীর মনে হল, সে সব দিন আর ফিরে আসবে না। তার মা তো চলেই গেছেন, তার বাবাও তাকে গ্রহণ করবেন না। আর জগদীশ? জগদীশের লেপের উপরে দময়ন্তী একখানা কতল টেনে দিয়েছে। রাঁচি থেকে এই জিনিসগুলো সে নিয়ে এসেছিল। এগুলো জগদীশের জিনিস, দময়ন্তীর মনে হয় যে এই লেপ-কতলের ভিতর জগদীশের বেশ আরাম হয়। তার মুখ দেখেই এ কথা মনে হয়।

জগদীশের হাতে একখানা বই ছিল, কিন্তু তার মন ছিল না বই-এর পাতায়। দময়ন্তী বসে বসে একটা সোফোটার বুনছিল। আর মাঝে মাঝে জগদীশকে দেখছিল।

এক সময় জগদীশ বলল : আজ গোলমালটা কেন হল ?

জানি নে।

নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।

হয় তো ছিল।

তোমার কোন কোঁতুহল নেই ?

না।

সে কি।

অস্তের সম্বন্ধে কোন কোঁতুহল না থাকাই ভাল।

জগদীশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল : মিষ্টার চৌধুরী চট্ট ছিলেন লবাস্টার বো-এর ওপর, তাই না ?

দময়ন্তী সংক্ষেপে বলল : হ্যাঁ।

আমার কি মনে হয় জান ?

দময়ন্তী কিছু জানতে চাইল না।

যেহেঁতু আমাদের সম্বন্ধেই কিছু লাগিয়েছিল।

দময়ন্তী এবারে মুখ তুলে তাকাল।

জগদীশ বলল : দেখতে পাও না, আমাদের চারিদিকে কেমন ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। নিশ্চয়ই নজর রাখে আমাদের ওপর।

দময়ন্তী মুখ নামিয়ে বুনতে লাগল।

জগদীশ আবার তার হাতের বইখানায় মন দেবার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জিজ্ঞাসা করল : মিষ্টার চৌধুরী এখন কি করছেন ?

জানি নে।

সন্ধ্যাবেলায় কি করেন তিনি ?

জানি নে।

তুমি তো আগে তাঁর কাছে বসতে।

দময়ন্তী আবার মুখ তুলে তাকাল। বলল : তখন আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

কি গল্প করতেন ?

তোমার কথাই হত।

হঁ।

বলে জগদীশ চুপ করল।

আচ্ছা দময়ন্তী : এবটু পরেই জগদীশ আবার কথা কইল : আজকাল তুমি মিষ্টার চৌধুরীর কাছে কেন যাও না ?

ভাল লাগে না।

কেন ?

তোমার কাছেই থাকতে ইচ্ছা করে।

মিষ্টার চৌধুরী শুনেছি খুব মদ খান।

দময়ন্তী চমকে উঠল, বলল : কে বলল হোঁমাকে ?

জগদীশ একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল : দেখলে তো, শুয়ে শুয়েই আমি কত খবর রাখি।

একথা কে তোমাকে বলেছে ?

কেন, মিথ্যা কথা নাকি ?

দময়ন্তী বলতে পারল না যে, এ মিথ্যা কথা। অনেকদিন আগে সে একদিন তাকে আবর্ষ মদ খেতে দেখেছে। কিন্তু এবারে তারা এখানে আসবার পরে একদিনও তাকে মদ ছুঁতে দেখে নি। সে যে মদ খাচ্ছে না সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ এই কথা মনে পড়তেই দময়ন্তী আশ্চর্য বোধ করল। বলল : নিজেকে দেখলে বিশ্বাস করব।

বলুমতী : আবার '৭১

জগদীশ সহসা জিজ্ঞাসা করল : ঐ মেয়েটা কেমন ?

কেন্ন মেয়েটা ?

ঐ তোমাদের যেমসাহেব ।

ওর নাম সুরেন্দ্র ।

কি ?

পাড়ীদের দেওয়া ইংরেজী নাম, ফরাসীও বলতে পার ।

বেশ নাম তো ।

মেয়েটাও ভাল ।

জগদীশ একটু খেমে জিজ্ঞাসা করল : তবে নিকটার চৌধুরী আজ ওর ওপর এমন চটে উঠলেন কেন ?

তাকে জিজ্ঞাসা করি নি ।

জগদীশ এবারে বলে ফেলল : মাঝে মাঝে তাঁর কাছে তোমার বসা উচিত ।

এই কথা জানতে বলছে ?

না না, ও কথা কেন ? আমাদের জন্মে ভদ্রলোক এত করছেন, আমাদেরও তো কিছু করা দরকার ।

বেশ ।

দমহস্তী উঠে পড়ল । দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল । তার পরেই বিষয়ে অভিভূত হয়ে গেল ।

বারান্দার অপর প্রান্তের ডেক-চেয়ারে কাঠুরী চৌধুরী একাকী বসে আছে । হাতের চুরুটে ছাই জমেছে অনেকখানি । সেদিকে তার দৃষ্টি নেই । সে তাকিয়ে আছে সামনের অন্ধকারের দিকে । অরণ্যময় পৃথিবীও তারই মতো নিঃশব্দে প্রহর গণনা করছে । শীতে দমহস্তীর সারা শরীর সহসা কঁপে উঠল ।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই কাঠুরী চৌধুরীর ধ্যান ভাঙল । চমকে উঠে বলল : আরে, আশ্রন আশ্রন ।

হাত দিয়ে একখানা চেয়ার ঠেলে দিয়ে বলল : বহন ।

কাঠুরী চৌধুরীর গায়ে একটা থলুরের সার্ট, তার উপর একখানা গরম চাদর । তার একটা দিক খসে পড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে । সেই দিকে তাকিয়ে দমহস্তী বলল : আপনার শীত করছে না ?

শীত ! জঙ্গী মানুষের আবার শীত-ঈদ কি !

বলেই হেসে উঠল হা হা করে । সেই উদ্দাম উদ্ভাস হাসি, অরণ্যের বন্যপশুও এই হাসি শুনে ভয় পাবে । তখুনি সংবত হয়ে বলল : জগদীশবাবু ঘুমোন নি তো ?

না ।

বাঁচা গেল ।

কেন বলুন তো ।

আমার হাসিতে তাঁর ঘুম নিশ্চয়ই ভেঙে যেত ।

দমহস্তীর নিজের কথাই মনে পড়ল । সেই একদিন কাঠুরী চৌধুরীকে হাসতে বাধ্য করেছিল । তখন সে জগদীশ ঘুমিয়ে পড়লে তার কাঁছ আঁতোতা । দমহস্তীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ।

কাঠুরী চৌধুরী এই দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনেন নি । বলল : শীতে আপনাদের বেশ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে । ফায়ার প্রেসটা যে কেন ব্যবহার করেন না বুঝি না । কাঠ আছে, কয়লা আছে, বললেই লব্যাট খেলে দিয়ে যায় ।

দমহস্তী হেসে বলল : আমরা তো আপনার মতো বাইরে বাস থাকি না, আমাদের শীত হবে না ।

এও আমার একটা দোষ । ঘুমোবার আগে আমি কিছুতেই ঘরের ভিতর ঢুকতে পারি না । আমার বাইরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে । গরমে না হয় বাতাসের জলো বসি, আর বর্ষায় বৃষ্টি দেখতে, কিন্তু এই দ্রবন্ত শীতে কেন এমনি করে বসে থাকি যে, নিজেই জামি না । অনেকেই আমাকে পাগল ভাবে ।

তার কথা শুনে দমহস্তী হাসছিল ।

আপনি হাসছেন তো ! গে সাহেবও হাসত, এই শীতকালে বারান্দায় আমাকে দেখলেই পাগল বলত । মাথা গরম থাকলেই নাকি লোকে ভিম লাগতে চায় ।

দমহস্তী বলল : এও পাগলের কথা ।

কাঠুরী চৌধুরী তখন মেনে নিল, বলল : আপনি ঠিকই বলেছেন । বুড়ো সাহেব নিজেও পাগল ছিল । এক একদিন এমন এক একটা কাণ্ড করত যে, তা সামলাতে আমরাই প্রাণান্ত ।

এরই মধ্যে দমহস্তী ভেদে ফেলেছে যে এ সাহেবের গল্প করতে কাঠুরী চৌধুরী ভালবাসে । জগদীশকে সে অনেক গল্প শুনিয়েছে । অনেক পাগলামির গল্প । আজ বলল : বুড়ো মহাবীর সময়ও আমার সঙ্গে রসিকতা করে গেছে ।

কি রকম ?

ম্যাক্সিমগিজের একটা নার্সারি ফুল, বুড়ো তাহেই তার লাভের অংশ দিতে বলে গেছে । সেই দায় ঘাড় নিয়ে আমি এখনও হিমসিম খাচ্ছি ।

কেন ?

ও জায়গাটা ভরজমাক্ট ছিল দেশ স্বাধীন হবার আগে । এ মুলুকের বত সাহেব, ছিটায়ার করে সবাই সেখানে বাড়ি করে বাকি জীবন কাটাত । এখন তার অবস্থা দেখুন । না ছাত্র, না মাস্টার । ফুলের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে বুড়োর টাকা আমি জমা দিয়ে দিচ্ছি ।

দমহস্তীর তখুনি একটা কথা মনে এল । কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে বলতে পারল না । কাঠুরী চৌধুরী মাস্টারের অভাবের কথা বলেছে । সেখানে একটা কাজ কি পাওয়া বাবে না ? সে চেষ্টা করলেই হয় তো হয় । কিন্তু—

এর মধ্যেও একটি কিন্তু আছে । কাঠুরী চৌধুরীর দরাস্তেই সারাজীবন বাঁচতে হবে । জগদীশ কি এটা ভাল চোখে দেখবে ? তাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু বলা উচিত নয় । থাক আজ । আজ তাদের অজ্ঞা কথা হোক ।

দমহস্তীর হঠাৎ নজরে পড়ল, দরজার আড়াল থেকে সুরেন্দ্র উঁকি দিচ্ছে । কাঠুরী চৌধুরী বারান্দায় তার ছায়া দেখেই চিনতে পারল । বলে উঠল : কে রে যেমসাহেব নাকি ?

সলজ্জ হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত করে মেয়েটা বেরিয়ে এল । রঙিন শাড়ি পরেছে বকবকে ব্লাউজের উপর, মাথায় পরিপাটি সিঁধি । ফুল শুঁজেছে খোঁপায় । সামনে এসেই কাঠুরী চৌধুরীকে একটা প্রণাম করল ।

কি রে, এত ভক্তি কেন আজ ?

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল  
করে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস  
মিষ্টি ব্যবহারেই  
হা সম্ভব।



সতর্কীকরণ :-

কি নিয়ম মত  
চৈতন্যকর রসায়ন দ্বারা  
শিল্পকার প্রাক ক্যাপের  
উপর R.C.M. মনোগ্রাম  
ও প্রান্ত চকারক  
এম. এল. বসু এণ্ড কোং  
দেখিয়া লইবেন।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস - কলিকাতা - ৯

উঠে পাড়িয়ে স্তম্ভের তার গলার মালা দেখাল। রূপোর নতুন মালা।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : এইটি কিনলি বুঝি? দেখি দেখি, কেমন হয়েছে?

মেয়েটা অস্বস্তিতে এগিয়ে এসে ঝুঁকি পাড়াল।

কাঠুরে চৌধুরী নেড়ে চড়ে দেখল। তারপরে তার গাল টিপে দিয়ে বলল : খাদ্য হয়েছে।

লজ্জায় স্তম্ভের মুখ রাঙা হল। বলল : তিন টাকা ছ'আনা বেশি লাগল।

তা লাগুক। হতভাগা সাহেব গেল কোথায়?

ভয়ে ও লুকিয়ে আছে।

ভয় কিসের?

বলছে, সাহেবের মেজাজ আজ খারাপ। তার ওপর—

তার ওপর কি?

তিন টাকা ছ'আনা বেশি লাগল।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল। বলল : এই কথা।

বল আমার ব্যাগ থেকে আরও দশ টাকা বের করে নেবে।

স্তম্ভের দময়ন্তীকেও একটা প্রণাম করল। বলল : সাহেবের তো ছেলেমেয়ে নেই, আমরাই তাঁর ছেলেমেয়ে।

কাঠুরে চৌধুরী বলে উঠল : স্তম্ভের এদের কাণ্ড! আমার ছেলেমেয়ে নেই বলে এদের আমার ছেলেমেয়ে সাজবার সব। কেননা, আমার তো বউও নেই, আমার বউ হবার সব হয় না?

বলে কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল।

মস্ত বড় জিভ বার করে মেয়েটা পালিয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী চোঁচিয়ে উঠল : ও-রে লজ্জাবতী, ও মমসাহেব, তাঁর সাহেবকে একবার পাঠিয়ে দে।

লবটি পাড়িয়ে ছিল বসন্তের আঙুলেই। তখনই ঘেরিয়ে এল। কাঠুরে চৌধুরী বলল : বেশ গরম ছুঁলেমালা বাকি নিয়ে আর তো।

কাঠুরে চৌধুরীর কাণ্ড দেখে দময়ন্তী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এই রকমের কথাবার্তাও আচরণ তার কল্পনাতীত। এই অরপ্যে এসে তার নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

লবটি চলে যাচ্ছিল, কাঠুরে চৌধুরী বলল : ছুঁলেমালা নয়, তিন শেয়ালা।

দময়ন্তী বলল : ককি আমি ভালবাসি না।

তবে চা কর।

লবটি চলে যাবার পর দময়ন্তীর একটা পুরণো কথা মনে পড়ল। অনেক দিন আগে সে কাঠুরে চৌধুরীকে মন খেতে দেখেছিল। ষোড়শ বয়েসেই যে প্রতি সন্ধ্যায় সে মন খায়, আজও খায়। কিন্তু এবারে, এখানে আসবার পর সে একদিনও তাকে মন খেতে দেখে নি। কাঠুরে চৌধুরী কি মন খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে! একটুখানি ইতস্তত করে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল : আপনি আজকাল মন খান না?

না।

ছেড়ে দিয়েছেন?

না।

তবে?

আপনারা আছেন বলে সময় বেশ কেটে যায়। হাতে কাজ থাকত না বলেই তো মন খেঁতাম।

দময়ন্তীর মনে হল, এ কথা সত্য নয়। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না।

তিন-পেয়ালা চা আনতে লোকটি বেশিক্ষণ দেরি করল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : ইঞ্জিনীরার সাহেবকে খাইয়ে আয়।

জগদীশ আজকাল চা খাবার কারদা পেয়ে গেছে। ডাক্তারের নির্দেশমতো সে চৌকিতে শোয়। শক্ত বিছানার তার শোবার আদেশ। একটু সাহায্য পেলেই সে পাশ ফিরতে পারে। বিছানার পাশে পেয়ালাটা ধরলেই সে অনায়াসে চা খায়।

এবারে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কাঠুরে চৌধুরী বলল : আজ বিকেল বেলায় মেয়েটাকে বকে মনটা খারাপ হয়েছিল। দশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলাম।

কি দোষ করেছিল?

হতভাগা লবটিই ওর নামে নাশিশ করেছিল, ও নাশিক মেম সাহেব হয়েছে। দিনকয়েক পরে ওদের পরব, নিজেও যাবে না, লবটিকেও যেতে দেবে না। আপনিই বলুন, ওরা তো আর ইচ্ছে করে খুঁটান হয় নি, পাস্ত্রীরা ওদের বাপ-দাদাকে তুলিয়ে খুঁটান করেছে। কেন তারা খুঁটান হয়েছিল স্তম্ভের আশ্চর্য হবেন।

এমন সামান্য কারণে মানুষ এমন চটেতে পারে, এ ধারণাও দময়ন্তীর ছিল না। আশ্চর্য হয়ে বলল : কেন?

ভূতপ্রোতে এদের গভীর বিশ্বাস, ভয়ও অগাধ। কারও অসুখ করলে মোহ থেকে মুখগি পুঙ্খ বলিদেয়। গ্রামে বেশি অসুখ শুরু হলে সে গ্রাম ছেড়েই পালিয়ে যায়। পাস্ত্রীরা ওদের সাহস দিয়ে বলত, খুঁটান হলে আর ভূত ধরতে পারবে না। ওষুধ দিয়ে তারা রোগ সারাত। প্রায় একশো বছরের চেষ্টার ওরা প্রায় তিন লাখ ওরাক্তিকে খুঁটান করেছে। তা করুক। কিন্তু জীবনের চেয়ে কি ধর্ম ওদের বড় হবে। ধর্মের ওরা বোঝে কি।

কাঠুরে চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল : ধর্ম যদি ওরা বুঝেই তো যাত্রা ভগতের ভাকে ওরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যেত না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যাত্রা ভগৎ প্রচার করেছিল— উপদেষ্টার পূজা চলবে না, মদ-মাংস ছাড় আর বলি বন্ধ কর। বলল, বিদেশীরাই এদেশে ভূত-প্রোত এনেছে। দেখতে দেখতে আন্দোলন শুরু হল, তার নাম টানা ভগৎ আন্দোলন :

টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা

টানা বাবা টানা টান টোন টানা।

সবল জাত। যে বা বলে তাই ওরা বিশ্বাস করে। ঐ মেয়েটাও কার কাছে স্তম্ভে এসে বলছিল, পরবে যেও না। কেন বাবে না! পরবই তো ওদের জীবন। পরের কথায় জীবনটা ওরা নষ্ট করবে।

কাঠুরে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দময়ন্তী কোন কথা খুঁজে পেল না। বিচিত্র এই মানুষ। এমন মানুষের পরিচয় সে আগে কখনও পায় নি।

## ত্রিশ

শেষ পর্বন্ত দময়ন্তীরও পরবে যাওয়া স্থির হল। জগদীশ মত দিয়েছে।

সকালবেলায় ধাঙড় মহাতো এসেছিল কাঠুরে চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করতে। কাঠুরে চৌধুরী অভিমান করে বলেছিল : আমাকে তোরা ভুলে গেলি ?

হাত জোড় করে ধাঙড় মহাতো হেঁট হয়ে বলেছিল : ছিঃ ছিঃ সাহেব, এ কখনও হতে পারে ! তোমাকে না হলে কি আমাদের পরব জন্মে !

ও-সিকের ঘর থেকে দময়ন্তী এসেছিল বেরিয়ে। তাকে দেখতে পেয়ে বুড়ো জিহ্মেস করল : তোমার বোঁ না কি ?

দূর হতভাগা, বিয়ে করলে তোরা নেমস্তন্ন খেতিস না !

তা ঠিক, তা ঠিক !

ও আমাদের ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বোঁ, ওকে বলবি না ?

ধাঙড় মহাতো এবারে দময়ন্তীকে নমস্কার করল হেঁট হয়ে। তাদেরও পরবে যাবার নিমন্ত্রণ জানাল। কাঠুরে চৌধুরী একটা ভেঁটি কেটে বলল : দূর হতভাগা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যাবে কি করে ! সে তো কোমর ভেঙে বিছানায় পড়ে আছে।

ধাঙড় মহাতো খুবই লজ্জিত হল, চিন্তিতও হল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আর তোর নিমন্ত্রণে ইনিই বা যাবেন কেন ! ধাঙড় মহাতো কোথাব ?

তুমি একা মাথুব বলে তো আমরা জানি। তাই একাই এসছি।

তবে যা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে গিয়ে বল। ধাঙড়ী মহাতো এসে এঁকে নিয়ে যাবে। যাবেন তো আপনি ?

বলে দময়ন্তীর দিকে তাকাল।

দময়ন্তী কিছুই বুঝতে পারে নি। কাঠুরে চৌধুরী বলল : আজ ওদের পরব আছে। হাড়িরা খেয়ে ওদের মেয়ে-পুত্রব আজ নাচবে।

তারপরই বলল : সারাদিনই তো বাড়িতে বসে থাকেন, গেলে মল লাগত না।

আপনি যাবেন তো ?

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল, বলল : আমি না গেলে কি ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে ? দলভুত্ব এখানে চড়াও হয়ে আমাকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাবে।

দময়ন্তীও হাসল তার কথা শুনে।

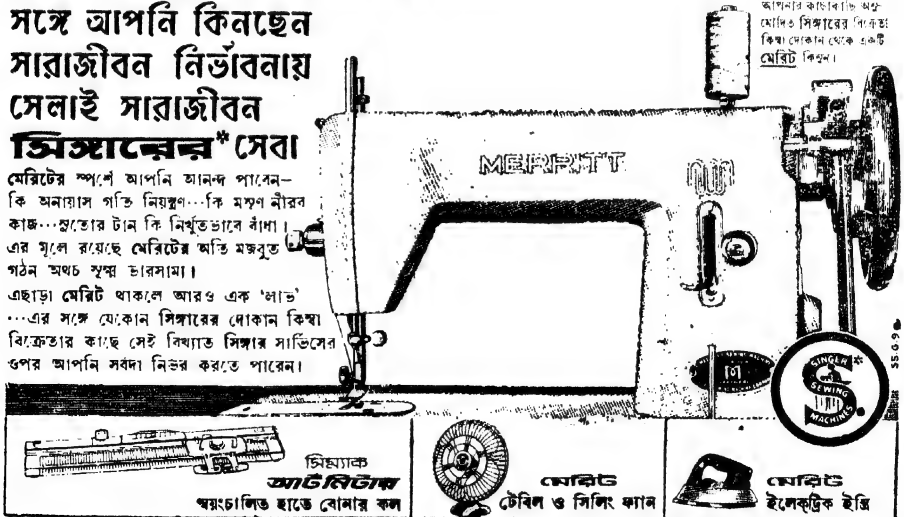
কাঠুরে চৌধুরী বলল : যা যা, ওঁর সঙ্গে যা, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে বল গিয়ে। বকুনি গেয়ে পাতিয়ে আসিস না, মত আদায় করে আসবি।

অনেক পুরনো লোক এই ধাঙড় মহাতো। মাথার সবক'টা চুল কবে সাদা হয়েছে তার হিসাব জানে না। কাঠুরে চৌধুরী এসে অবধি তার এই চেহারা ই দেখছে। দময়ন্তীকে অমুসরণ করে সে জগদীশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। বেকল অনেকক্ষণ পরে। হাসতে হাসতেই বেকল, বলল : ধাঙড়ী বিকেলে আসবে।

আমার জন্তে তুমি আসবি না ?

## প্রত্যেকটি মেরিট\* সেলাইকলের সঙ্গে আপনি কিনছেন সারাজীবন নির্ভাবনায় সেলাই সারাজীবন সিঙ্গারের\* সেবা

মেরিটের স্পর্শে আপনি আনন্দ পাবেন—  
কি অনাগাস গতি নিয়ন্ত্রণ—কি মৃদু বীরব  
কাজ...স্বস্তার টান কি নিখুঁতভাবে রাঁধা।  
এর সূলে রয়েছে মেরিটের অতি মজবুত  
গঠন অথচ মৃদু চারসাদা।  
এছাড়া মেরিট থাকলে আরও এক 'মাত্র'  
...এর সঙ্গে যেকোন সিঙ্গারের দোকান কিছা  
বিক্রয়তার কাছে সেই বিখ্যাত সিঙ্গার সার্ভিসের  
ওপর আপনি সর্বদা নির্ভর করতে পারেন।



\* সিঙ্গার কোম্পানীর একটি ট্রেডমার্ক

বুড়ো হেসে বলল : তা যদি বল তো এইখানেই থেকে যাই, তোমার সঙ্গেই যাব।

বেশ তো, ওরে লবাট। দু'টো মুরগি কাট আজ, খাঙড় মহাতো এখানে থাকে।

খাঙড় মহাতো রসিয়ে রসিয়ে হাসল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : এই বুদ্ধি না হলে সাহেব বলেছে কেন ? আমি না গেলে খাঙড় আসবে কোথা থেকে !

কাঠুরে চৌধুরী কপট রাগের ভাণ করে বলল : যা যা, তোকে আর আসতে হবে না।

খাঙড় মহাতো এসেছিল, এসেছিল আরও দু'জন মেয়ে। জগদীশের সঙ্গে দেখা করে তারাই দময়ন্তীকে টেনে বার করল। ওরা হইল জগদীশের কাছে।

পথে নেমে কাঠুরে চৌধুরী বলল : আপনি বেরুতে পারবেন বলে আমার ভরসা ছিল না।

কেন বলুন তো ?

আমার তাই মনে হয়েছে।

দময়ন্তী বলল : ঘরে বসে থাকলে কি আমার চিরদিন চলবে।

এ কোভের কথা। কাঠুরে চৌধুরী তাই অল্প কথা বলল : এতটা পথ কি আপনি হাঁটতে পারবেন ?

আপনারা পারবেন, আর আমি পারব না ?

আমরা অনেক কিছু পারি, যা আপনি পারবেন না। শহরের লোকের জন্তে তো পরিশ্রমের কাজ নয়, বসে বসে তারা বুদ্ধির কাজ করবে। নিজে না খেটে অস্ত্রের খাটুনির পরস্রাণ খাবে রাজভোগ।

দময়ন্তী স্ফীতাস্রা করল : লবাটরা কোথায় গেছে ?

তারা গেছে অল্প গ্রামে। সে আরও দূরের পথ। আজ রাতে ওরা ফিরতে পারবে না।

আমরা পারব তো ?

দময়ন্তী তাকাল কাঠুরে চৌধুরীর মুখের দিকে।

সে হেসে বলল : না ফিরলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে গুলী করে মেরে ফেলবেন।

দময়ন্তী শিউরে উঠল। এই মুহূর্তে তার মনে হল যে কাঠুরে চৌধুরীর সঙ্গে এমন করে বেরিয়ে আসা তার উচিত হয় নি। জগদীশ তাকে ভুল বুঝবে। সে বড় দুঃখের, বড় অসম্মানের। তার চেয়ে যত্নের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকাই ভাল ছিল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : রাগ করলেন না কি ?

না না, রাগ নয়। অসহ্য মানুষটাকে ফেলে এলাম, তাই ভাবছি—

থারাপ লাগারাই কথা।

খাঙড় মহাতো এদের কথা শুনছিল তারা টের পায় নি। সে বলল : পরিবেশ বিনে দোষ হয় না।

হিন্দী এঁরা বোঝে, বলতে পারে। নিজেদের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করে তাও চেষ্টা করলে বোঝা যায়। যারা এদের দক্ষিণ দেশের লোক বলে, তারা ঠিক বলে কি না সে বিষয়ে কাঠুরে চৌধুরী সন্দেহ আছে।

খাঙড় মহাতো একটু এগিয়ে এল, বলল : গ্রামে হালচাল সব বদলে যাচ্ছে সাহেব, নিজেদের বলতে আর কিছু থাকবে না।

কি রকম ?

ধুমকুড়িয়া আগলাবার জন্তে নাম হত খাঙড় মহাতো, আমি আগলাতাম মেয়েদের ঘর। আমাদের গায়ের ধুমকুড়িয়া দেখেছ তো ? ভেঙে পড়ছে।

দময়ন্তী কাঠুরে চৌধুরীর দিকে তাকাল। সে বলল : বড় ছেলে-মেয়েদের এরা খাঙড়-খাঙড়ী বলে। দিনের বেলায় যথেষ্ট মেলামেশা কর, কারও আপত্তি নেই। রাতে আলাদা শুতে হবে গ্রামের ধুমকুড়িয়ার। তার জন্তে ছেলে মেয়েদের বয়স অনুযায়ী তিনটি করে ভাগ। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এসব মানে না।

দময়ন্তী বলল : আমি তো এখানকারই মেয়ে, কিন্তু আমি এদের সম্বন্ধে কিছুই জানি নে।

জানতে চান নি বলেই জানেন না।

দময়ন্তী বলল : আমাদের কাছে তো কেউ আসত না।

ওরা শুধু পাড়ার লোককে ডাকে। পাড়া বোঝেন ? আমাদের মতো পাড়া নয়। ওদের পাড়া হল করকটা গ্রাম নিয়ে। আমি ওদের পাড়ারই লোক।

হেসে বলল : আশ্চর্যও বটে।

খাঙড়ী মহাতো সমর্থন করে বলল : তা তুমি বলতে পার।

তোমার সঙ্গে আমাদের আশ্চর্য্যেই হয়েছে।

তারপর দময়ন্তীর দিকে চেয়ে বলল : এই সাহেব আমাদের ধর্ম কর্ম সবই জানে। চাই কি, পাছানের কাজও করতে পারবে।

পাছান কি ?

পাছান বোঝ না বুঝি। কি বলে গো, পাছানকে তোমাদের বেশে কি বলে ?

কাঠুরে চৌধুরী বলল : পুরোহিত। তারপর বল, কি রকম করে তোমরা তিন বছর পর পর পাছান বদলাও। এবারে আমি সুপারীক শিখিয়ে দেব—ওর নোড়াবাধা কুসোটা বেন আমার বাড়ির দিকেই চলে। দাও না একবার আমাকে পাছান হতে।

সঙ্গী মেয়ে দু'টো খিল খিল করে হেসে উঠল।

খাঙড়ী মহাতো বলল : কি করবে তা হলে ?

ওদের সর্গার গিয়ে বলব, ধর্মশ্রম আমাকে স্বপ্ন দিয়েছে মহাদানিয়ার পূজা বন্ধ। শুধু চণ্ডীর পূজা আর মাসে মাসে সেন্দ্রা—দাও সেন্দ্রা বিত্ত সেন্দ্রা, লেখাপড়া শিখে তোদের খাঙড়গুলো এখন খাঙড়ীর মতো শুধু ঘরকন্না করছে।

মেয়ে দু'টো আরও জোর হেঁস উঠল। বলল : তুমি ঠিক বলেছ। এখনকার ছেলেগুলো বর্ষা লেবড়া চালাতেও ভুলে গেছে। ধুতি-কোর্ত পরে শহরে ছুটোছুটি করছে চাকরির জন্তে। আরে, চাকরি তোদের রাজ্য করবে !

একটু খেমে বলল : শুনলে তুমি ক্ষেপে যাবে সাহেব, সেদিন একটা সাক্ষীর ব্যাপার নিয়ে ওরা পক্ষে হল না, মহাতোকে কলা দেখিয়ে শহরে গেল মামলা করতে।

কে লোকটা ?

নাম শুনে তোমার কাজ নেই।

## যোন মন

কেন ?

প্রথমে তোমাকে বলবে ভেবেছিল, তারপর ঠিক করল, থাক। তোমার কানে উঠলে তার প্রাণটাই যাবে।

শহরে গিয়ে গিয়ে তোরাও দেখছি শহুরে হয়ে গেছিস। তোদের আর হইল কি ? পদ্ম গেল, মহাতো গেল, কোনদিন শুনব পরব গেছে, সরণ বুড়িয়াও গেছে।

না সাহেব, এমন করে বলা না। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে কোনদিন তোমার কথাই সত্যি হবে।

পথের দু'পারে, শুক কক্ষ মাঠ। ধানকাটা হয়ে গেছে, নুতন করে জমি চাষ হয় নি। পথ সংস্কার, গরুর গাড়ি চলে চলে দু'চাকার গর্ত হয়েছে গভীর। এ পথে জীপ চলে না, মাঝখানের উঁচু জমিতে আটকে যাবে। পশ্চিমের আকাশে স্থানান্তর আর দেখি নেই।

দমহস্তীর এ পথে চলতে ভয় করছিল। তারপর মনে পড়ছিল সেদিনের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা। সে পথেও ছিল এমন গরুর গাড়ির চাকার দাগ। এমন গভীর গর্ত যে মাঝে মাঝেই তার ভয় হচ্ছিল উল্টে যাবার। কিন্তু সে পথ এর চেয়ে প্রশস্ত ছিল বলেই তারা চলতে পারছিল। শেষ পর্যন্ত—

দমহস্তী শিউরে উঠল। কাঠুরে চৌধুরী তার এই শিহরণ দেখে বলল : আপনার কি শীত করছে ?

না।

ফেরার সময় শরীর জমে যাবে।

কিরতে কি আমাদের খুব বেশি দেরি হবে ?

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল : কি ধাজড়ী মহাতো, আমাদের ছাড়বি কখন ?

বুড়ি হাসল। ফেরার জন্তে তো তোমার কোনদিন তাড়া দেখি নি সাহেব।

তা দেখিস নি, বিস্ত্র আজ যে পাদের বোঁ সঙ্গে আছে। তাকে তো সময়মতো পৌঁছতে হবে।

তা হবে।

কাঠুরে চৌধুরী দমহস্তীকে বলল : আপনার ভাল না লাগলে আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

ভাল লাগলেও আসব।

সেই ভাল। শুনলি তো ধাজড়ী মহাতো, পিছনে ঘরের টান থাকলে এইরকম হয়। আমাদের বাপু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিস।

তোমাদের যেমন মজি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল বুড়ির নাক দিয়ে।

ধাজড়ী মহাতো খানিকটা পথ এগিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। মহাতোর সঙ্গে পাছানও ছিল। তারা প্রথমেই গিরে সর্গায় ঢুকল। পরিদায় একটি আমাদের কুঞ্জ, গাছে গাছে ছাওয়া এই অন্ধকার জাংগলি গ্রামের পবিত্রতম স্থান। কাঠুরে চৌধুরী প্রণাম করল, তাকে দেখে দমহস্তীও একটা প্রণাম করল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : বলা হে মহাতো, তোমাদের নাচ কখন শুরু হবে ?

## স্বাধীনতা বিপন্ন সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করুন

—জহরলাল নেহরু

একমাত্র সামরিক শক্তি দিয়েই প্রতিরক্ষা গড়ে ওঠে না। আর্থিক শক্তিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের তাড়াতাড়ি উন্নয়ন করে এই শক্তি বাড়তে হয়। কাজেই আপনার কাজও প্রতিরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিয়মিতভাবে থেকে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।



DASH/PS

## জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়োজন

তার তো দেরি আছে সাহেব।  
কিন্তু আজ আমরা দেরি করতে পারব না, বৃদ্ধল !  
খাঙড়ী মহাতো বলল : পরের বো সঙ্গে আছে, তাই তাড়াতাড়ি  
বেতে চাইছে।

কাঠুরে চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠল : দূর বোকা, ওর স্বামী যে কোমর  
জেঙ্গে শুয়ে আছে, তাকে দেখবে কে, আর মনই বা এখানে টিকবে কেন !  
সবাই মাথা নেড়ে বলল : ঠিক বটে।

দময়ন্তীর জন্মই আজ খাঙড়-খাঙড়ীদের তাড়াতাড়ি ডাকা হল।  
সবাই বলল, এট সন্ধ্যাবেলাতেই একটা নাচগান হোক। হাঁড়িয়া কই ?  
একটা ছেলেকে ডেকে কাঠুরে চৌধুরী বলল : কি রে মহাশিষের  
পো, তোর বিয়ে হল, না এখনও হালালি করে বেড়াচ্ছিস।

ছেলেটা লজ্জা পেল।

কেউ বিয়ে করছে না বুঝি ? খাঙড়ী মহাতো করছে কি ! এখন  
তো বেড়ার মাস। দে না একটা বিয়ে দিয়ে।

কে একজন জবাব দিল : ডেকে বিয়ে করবে কে। বেচারী সাক্ষার  
চেষ্টায় আছে।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠল।

কাচের গেলাসে করে মহাতো হাঁড়িয়া এনেছিল। একটা নয়,  
দুটো গেলাস। কাঠুরে চৌধুরী একটা গেলাস নিয়ে খুশি হয়ে উঠল,  
বলল : দে দে, ভাল করে ঠিকরি করেছিস তো, অনেকদিন তোদের  
হাঁড়িয়া খাই নি।

দময়ন্তী ভয়ে ভয়ে বলল : এ হো মদ।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : নিন নিন, একবারে খাটি জিনিস, কোন  
ভেজাল নেই এঁতে।

কয়েক চুমুকেই নিজের গেলাসটা শেষ করে দিল।

দময়ন্তী তার গেলাসটা হাতে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে মুখ দেবার  
সাহস পেল না।

খাঙড়-খাঙড়ীরা তখন হুঁদলে মুখেমুখি ঈড়িয়েছে। সাঁইখো  
তুলিলা খেচকা নাগেরা নিয়েও ঈড়িয়েছে খাঙড়েরা, একজনের হাতে  
মুরলী। ছকুম পেলেই তারা বাজনা শুরু করবে। তারপর নাচ।  
এগিয়ে এসে মহাতো বলল : এরা জানতে চাইছে কি গান ধরবে।

কাঠুরে চৌধুরী হেসে উঠল হা-হা করে। বলল : তোদের পরব,  
তোরা গাইবি। আমি কি বলব ?

মহাতো তবু নড়ল না। তাই দেখে কাঠুরে চৌধুরী বলল :  
তা হলে সেই গানটা ধর—

শুভ, পেলো, কালোটি কোর, টিকো ধোড়া  
বলা মাজই নাগেরা ডুমডুম করে উঠল। তার সঙ্গে অল্প বাস্তব  
খচখচানি। খাঙড়েরা গাইল :

শুভ, পেলো, কালোটি কোর, মমহার্য পাত্র।

অবাক হয়ে দময়ন্তী তাকাল কাঠুরে চৌধুরীর দিকে।

কাঠুরে চৌধুরী হেসে বলল : এটা বাস্তব গান। না বলে দিলে  
আপনি এর মানে বুঝবেন না। ছেলেরা বলছে, চল কক্কা, আমরা  
হুঁজনে টিকো নদীতে যাই, আমাদের প্রিয় বনে, সেই বনে গিয়ে  
আমরা হুঁজনে কক্কা, পাতা কুড়োব, আর টিকো নদীতে মাছ ধরব।

ময়েরা এগিয়ে এল কোমর তুলিয়ে তুলিয়ে।

একজন রসিক মেয়ে বলল : সাহেব যে বসে রইল।

আর একজন বলল : হাত ধরে তুলে তান না।

একবার দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী নিজেই উঠে  
পড়ল।

নাচ হল অনেকক্ষণ ধরে। দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে কাঠুরে চৌধুরীকে  
দেখছিল। লোকটা এই দলের সঙ্গে যেমালুম মিশে গেছে। শুধু  
পোখাক আর চেহারার ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। লম্বায় সে  
ওদের চেয়ে অনেক বড়, গলাতেও ওর জোর বেশি। দলের মধ্যে  
ওকেই সবচেয়ে দামাল দেখাচ্ছে।

ফিরে এসে যখন সে দময়ন্তীর পাশে বসল, তখন তার কপালে  
কিছু কিছু ঘাম। তার জগা আর এক গেলাস হাঁড়িয়া এল। গেলাসটা  
হাতে নিয়ে সে দময়ন্তীকে বলল : আপনি এখনও শেষ করেন নি ?

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে দেখল যে, কখন এক সময় সে খানিকটা  
হাঁড়িয়া খেয়ে ফেলাছে। মনে মনে লজ্জা পেল অপরিণীম, কিন্তু  
মুখে কিছুই বলল না। গেলাসটা নামিয়ে রেখে উঠে ঈড়াল।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : আপনি উঠে পড়লেন ?

চলুন, ফিরে যাই।

মহাতো এগিয়ে এল, এল খাঙড়ী মহাতোও। বলল : ভাল  
লাগল না ?

দময়ন্তী বলল : খুব ভাল লাগল। কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে।

কাঠুরে চৌধুরী তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করল না। পকেট  
থেকে খানিককয় নোট বার করে মহাতোর হাতে দিয়ে বলল : তবে  
চলি রে, আমার নাম করে তোরা আর একদিন হাঁড়িয়া খাস।

সবাই দুঃখিত হল। মহাতোরা এগিয়ে দিল তাদের।

[কমশ]

## প্রশ্ন

### তেজেন্দ্রলাল মজুমদার

ছন্দে ঘুমিয়ে থাকা একটি কামনা  
দুরাশায় বর্ম বসে কোনও এক সৈনিকের মত  
কেন আজ জেগে ওঠে, মানসী বলে না ?  
ঐশ্বের প্রাণ স্বর্ষ এখনও তো দিগন্ত বিস্তৃত।

এখনও তো মাঠে মাঠে সবুজেরা করে নি মিছিল,  
পাখিরাও ফিরে এসে বাঁধে নি যে নীড়,  
হাতছানি দেয় নি তো প্রাচুর্যের প্রভাত স্বপ্নীল,  
ফলভরে শীষগুলি এখনও তো নোয়াই নি শির।

তবু কেন ঘুম ভেঙ্গে একটি কামনা

আমাকে ব্যাকুল করে মানসী বলে না ?





পারাপার  
—প্রভাত কান্তি ঘোষ

মাসিক বস্তুমতী  
আষাঢ় / '৭১

# আলোকচিত্র

ভুল ভুলাইয়া  
—স্বর্ধনামণ দত্ত





—অমলেন্দু ঘোষ



—নির্মল রায়

। মাসিক বসুমতী । আশ্বিন / '৭১

খে  
লা  
র  
ছ  
লে



৩ জাপানী বৌদ্ধমন্দির ( সারনাথ )

—এস এম চাউদার

ভীর, তরী, তরু

—নবগোপাল সিংহ





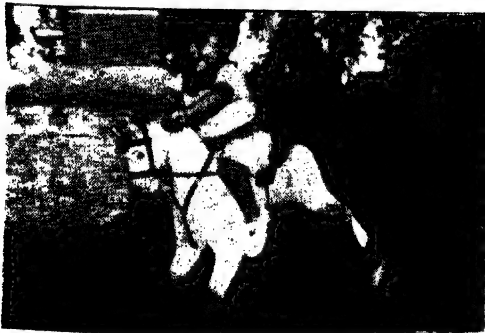
—মানসকুমার চৌধুরী  
জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা

—চিত্রাঙ্কণ ঘোষ

—বিশ্বনাথ ঘোষ

মাসিক বঙ্গমহতী  
আব ৮ / '৭১

—অসিত মিত্র





আমিও খেলবো

—শান্তিময় সান্তাল

জলহস্তীর হাঁস

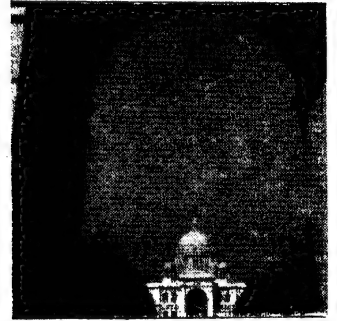
—পি জি দাস



কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প

—পারুল ভট্টাচার্য

। মাসিক বসুমতী । আগস্ট / '৭১

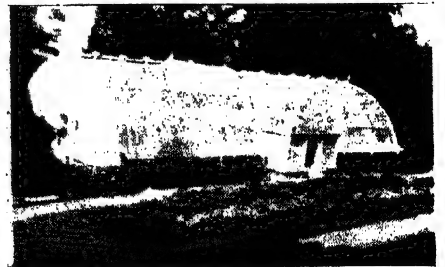


দৃষ্টিকোণ

—বলি রে

বোটানিক্স (দার্জিলিং)

—সমীর দত্ত





# প্রবন্ধ



[ বিগত বৃৎ যে-সকল শ্রমণীয় ঘটনা জাতীয় জীবনে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে, আন্তোত্য-লিটন মন্তব্দে সম্মোহিত অকৃতম। পদাধিকারবলে তনানীন্তন বাঙলার লাট লর্ড লিটন ছিলেন বিশ্ববিজ্ঞালয়ের আচার্য। এই অধিকারে তিনি আপন আভ্যাবত এবং ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির চরিতার্থকাররূপে দেখতে চেয়েছিলেন বাঙলার বাস আন্ততোষকে। কিন্তু তেজস্বিতা, বক্তিত্ব ও নিষ্ঠিকতার জিবেণীসঙ্গম বীর মধ্যে অবস্থিত, সেই আন্ততোষ ছিলেন অগ এক বিশেষ বাতুতে গঠিত। লিটন ঝাকে নিছক একজন 'বাক্তি' হেবেছিলেন আসলে তিনি নিজেই এক 'প্রথর সমুজ্জল ব্যক্তিত্ব'। লিটনের দর্পিত মনোভাব, প্রভুত্বপূত আচরণের সমুচিৎ প্রভুত্বের পাটিকেছিলেন সারা ভারতের গর্ষ ও গৌরব, বাঙলা দেশের শিক্ষাসেবীর ইতিহাসে অগতর আলোকপ্তত, পুঙ্খমসিত ত্রাণতরনর আকুতোষ মুখোপাধ্যায়। লাটসাহেবের গর্বোদ্ধত জুজুহিলেনে পোঁখ-মানাননা গেল না বাঙলার বাবকে। এই মূল্যবান পত্রে অকামিমুক্তি এবং বসিষ্টগুস্তিহের এক অনন্তসাধারণ সমধর লক্ষ্য করা যায়। আন্ততোষের ভ্রমণতবার্ষিকীর পুণ্যচুর্ভে ঐতিহাসিক পত্রটি আনন্দা পামানোর সন্দের পাঠক-পাঠিকার সমীপে সমপস্থাপিত করতে অনিলাখী। পরে আলোচিত শিকমদ্রার আসনে তখন অদ্বিষ্ট ছিলেন স্বর্গীয় আদ্র প্রভাসেন্দ্র মিত্র মহাশয়। —স]

## শ্রার আন্ততোষের পত্র : লর্ড লিটনকে লিখিত

সেনেট হাউস

কলিকাতা—২৮-এ মার্চ, ১৯২৪

প্রিয় লর্ড লিটন,

আপনার ২৮-এ মার্চ তারিখে লিখিত পত্রটির—গাঢ় গভ শ্রমিবার সক্ষার সমর্থন হইতে কিরিয় আমি পাইরাছি—প্রাপ্তিস্বীকার করি। আমার আচরণের প্রতি আপনি বেরূপ অগায় ও মূল্যতীন সিদ্ধান্ত আরোপ করিয়াছেন সে কারণে এই পত্রে আমি আমার বক্তব্য খোল-খুলিভাবে এবং বিধাতীনচিত্রিত প্রকাশ করিব।

উপাচার্য হিসাবে আমাকে পুননিরোগ করা সন্ধকে আপনার প্রস্তাব এবং তৎসম্পর্কিত আরোপিত সর্ভাদি সন্ধকে আমার মহামত ব্যক্ত করার পূর্বে প্রস্তাবিত পরিচরনা সন্ধকে আমার মনোভাব সন্ধকে আপনার মন্তব্য আলোচনার ইচ্ছা রাখি। এ সন্ধকে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইরাছে সেগুলির বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করা যদিচ সম্ভবপর নয় তথাপি ইচ্ছা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমার আচরণে সমালোচনা করার পূর্বে সেগুলির উপলব্ধি আপনি আপনার স্মৃতিপটে উদিত করিতে পারেন নাই। সম্ভবত আপনি বিম্বৃত হইতে পারেন নাই যে জীযুক্ত মিত্রের নিকট হইতে বিশ্ববিজ্ঞালর হিসেব একটি কপি পাওয়ায় পর বে ৪ঠা নভেম্বর ১৯২২ তারিখে আপনার লিখিত যে পত্রে ঐ বিলের বিষয়বস্ত এবং আদর্শ সন্ধকে আমি বিশ্বরণের অযোগ্য সর্ভে আমার তীব্র আপত্তি জানাইরাছিলাম। ঐ বিলটি আমার নিকট এক সীতিমত আন্দর্কের খোরাক জোগায়।

আপনার স্বরণ থাকিতে পারে যে, জীযুক্ত মিত্র আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আপনার ৮ই নভেম্বর ১৯২২ তারিখে লিখিত পত্রে আমাকে আপনি স্পষ্টভাবে জানাইরাছিলেন জীযুক্ত মিত্র আপনাকে জানাইরাছেন যে বিশ্ববিজ্ঞালয়ের সেনেটের অভিমত সরকারীভাবে লওয়া হইরাছে এবং আপনার ব্যক্তিগত অভিমত আমজিত হয় 'নাই'। ইহাট্রাসালে প্রকৃতঘটনার সম্পূর্ণ

বিপরীত। খসড়া বিল সম্পর্কে আমার মহামত আপনার সহিত কয়েকটি সাক্ষাৎকারে এবং পত্রবিনিময় প্রসঙ্গেই আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। শেষে ১১ই ডায়ুহারী ১৯২৩ তারিখে বিলটি সন্ধকে সেনেট-সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিবার অনুমতি আপনিই আমাকে দেন। প্রায় সেই সময়েই আপনার নিকট হইতে মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের একটি কপি আমি পাই। ইহার বিষয়বস্ত সন্ধকে যাবতীয় তথ্যাদি বরণবার অলুঙ্ক হওয়া সন্ধেও সরকার বিশ্ববিজ্ঞালয়ের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছেন। এই ভাবেই সেনেটে দুইটি বিল আসিল এবং সেনেট এই ব্যবস্থা সন্ধকে রিজার্ণ



শ্রার আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়

প্রবানের জন্ম একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। বিশ্ববিজ্ঞানক্ষেত্রে অভিমত নির্ধারিত হওয়ার এবং আপনাকে তাহা জানানোর পূর্বেই আমার সনির্বন্ধ প্রতিবাদ এবং সিনেটের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আপনি সমর্থনের অযোগ্য এক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে এই বিল (অথবা বিলগুলিকে) পরিচিত করার উদ্দেশ্যে আপনি উহা বা এগুলি অনুমোদনার্থে সরাসরি ভারত সরকার ক পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখিতে পাইবেন যে, আমি এবং আমার সিনেটের সহকর্মীরা আপনাকে বোঝাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি যে বিলটি (বা বিলগুলি) ঘোরতর আপত্তির সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনামুক্ত বলিয়াই সে সম্বন্ধে যথেষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য তদন্ত না করিয়া তাহা সরকারী সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হওয়া বিধেয় এবং যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের ব্যবহৃত প্রতিবাদ এবং আবেদন সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

আপনি এখন অসুযোগ করিয়াছেন যে আপনার সরকারের সিদ্ধান্তগুলির কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধাপ্রদানের সর্বপ্রকার কৌশল এবং উপায় আমি অবলম্বন করিয়াছি। আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি ভারত এবং আসাম সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। তবে আপনি জানিয়া আশ্চর্য হইবেন যে আমি বাহ্য করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণরূপে সবিধানসম্মত। আপনার ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখের পত্র আপনি আমাকে স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, সিনেটের সদস্যদের সহিত বিলটি সম্বন্ধে আলোচনা করার সম্বন্ধে আপন অভিক্রিতি অনুযায়ী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আমি সম্পূর্ণরূপে বাধ্যমুক্ত। আমার ১৫ই জানুয়ারী ১৯২৩ তারিখের জবাবে জানাইয়াছিলাম যে—উৎপাদিত প্রয়ের গুরুত্ব অনুসারে বিলগুলি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সিনেটের প্রতিটি সদস্যকে সে সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ দেওয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম। আপনার হয়তো জানা নাই যে, আসামের মহামাফা গভর্নর, শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বড়লাটের পরিবদ সদস্য, আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং আসামের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনও—এই সিনেটের অন্তর্ভুক্ত। কাগজগুলি 'একান্ত গোপনীয়, শিরোনামায় উপরোক্ত ভ্রমমহোদয়গণের প্রত্যেকের নিকটই প্রেরিত হইয়াছিল। কাগজগুলি যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে আমি দূরে সরাইয়া রাখিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে আইন-সমর্থিত অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিতেন। এখন ইহার ফলে তাঁহারা যদি আপনার সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন এবং এই প্রসঙ্গে উপযুক্ত ও যুক্তিসম্মত বিবেচনা করিয়া কোন ব্যবস্থা যদি তাঁহারা অবলম্বন করিয়া থাকেন তৎক্ষণাৎ আপনি দুঃখ পাইতে পারেন, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের ভিত্তি হিসাবে তাহা কোনমতেই গ্রাস্যসঙ্গতভাবে বিবেচিত হইতে পারে না।'

জ্ঞাপনি আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি শ্রার মাইকেল স্ট্রাডলারের নিকটও আবেদন জানাইয়াছি। আমার এবং সিনেটের সদস্যদের পরামর্শ সত্ত্বেও শ্রার মাইকেল স্ট্রাডলারের পৌরোহিত্যে গৃহীত কমিশনের সমস্ত সমর্থন আপনি অনাহুতানিকভাবে 'রাজিত' করিয়া দিয়াছেন। যে বিষয়টি আজ গত কয়েকসপ্তাহ বাবৎ

জন্মসাধারণের দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ করিয়া চলিতেছে, তাহা যদি মাইকেল স্ট্রাডলারকে আমি জানাইয়া থাকি তবে তাহা আমি বিশ্ববিজ্ঞান এবং সর্বসাধারণের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছি জানিবেন। অধিকন্তু সংবাদপত্রাদিতে আপনার সরকারকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধাদি রচনা আমিই উদ্ভাবনা জোগাইয়াছি—ইহা প্রতিপাদন করিতে আপনি বিন্দুমাত্র বিধাগ্রস্ত হন নাই। ইহা বিদেহপূর্ণ কুংসাশ্রয় এবং দাবী করি, এই কল্পিত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্ম প্রামাণ্য নথিপত্রাদি আপনি উপস্থাপিত করেন।

আপনার অভিযোগ, আমার সমালোচনা গঠনমূলক হওয়ার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক মতিতে দেখা দিয়াছে। ইয়া, বিলগুলির বন্দোবস্ত সম্পর্কে আমার সমালোচনা প্রতিকূল তাহার কারণ শুধু শিক্ষাগত দিক দিয়াই নয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াও উহা লিপিবদ্ধ করিতে বিধাবোধ করি নাই, যেহেতু আমি এবং আমার সিনেট সহকর্মীর দল ঐ বন্দোবস্তকে অত্যন্ত আপত্তিসন্মক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া আপনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আপনার সরকারেরই কল্যাণার্থে বিশ্ববিজ্ঞালয়কে কোন পরিবর্তন পোষণ করার আহ্বান জানানোর আপনি কোন প্রয়াসনই বোধ করেন নাই। সন্দেহ নাই, আপনার মনে পড়িবে যে একাধিক উপলক্ষে আমি আমার সহকর্মীদের এবং আপনার সরকারের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় একটি বিল প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু আমার সে প্রস্তাব আপনার নিকট হইতে কোন সাড়াই পায় নাই। আপনার অভিযোগ যে তত্ত্বাবধি আপনি আমার নিকট হইতে কোন সাহায্যই পান নাই। আমার এ প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, আপনাকে আমার সাহায্য ও পরামর্শ বারংবার দান করার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু—কারণটি অবশ্য একমাত্র আপনারই জানা—'আপনি কোনবারই তাহা গ্রহণ করেন নাই। বিলগুলির বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আপনাকে আমার খুঁটিনাটি মন্তব্যসহ পত্রের পর পত্র দিয়াছি এমন কি কয়েকটি বৈদ্যনিক যুক্তিতেও তাহার ছেদ পড়ে নাই—কিন্তু সেই সমস্ত মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে আপনার কোন উত্তর আপনি কোনবারই দেওয়ার প্রয়াসনই অনুভব করেন নাই। অথচ, যদিও আপনার ১১ই জানুয়ারী ১৯২৩ সালে লিখিত পত্রে দেখা যাইতেছে যে আপনি লিখিতেছেন—সংশোধনরত বিলে প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংশোধনগুলির সম্পাদন যে অসম্ভব এ বিষয়ে আপনি নিঃশঙ্কর। কয়েকদিন পরেই দেখিমা আশ্চর্য হইলাম যে, সেই বিলই ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনার্থে আপনি পাঠাইয়াছেন। আমাদের ধারণা সম্বন্ধে আপনার কোন মন্তব্যই আপনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। রিপোর্টটি সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনারও কোন সুযোগ আপনি আমাকে দেন নাই। তৎক্ষণিক ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩ তারিখে আমাকে লিখিত আপনার পত্রটিও আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। বাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বিষয়টির গুরুত্ব আপনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং আমাদের সমালোচনার প্রতি আপনার দৈর্ঘদীনতা প্রকাশ করিতেও আপনি বিন্দুমাত্র কুঠাপ্রকাশ করেন নাই। আমি দেখিতেছি, আমার বিরুদ্ধে আপনার সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্যাদির বিকৃত উপস্থাপনের অভিযোগ আপনি

আনিয়াছেন। এই কল্পিত অভিযোগ, আমি এখানে প্রেস্তাভায়ে অস্বীকার করিতেছি জানিবেন। অথচ অজ্ঞানকে আপনি যখন ব্যবস্থা-পরিষদে বলিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ এবং যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সম্মত সংগ্রহ করা সম্বন্ধ আপনাদের উদ্বিগ্নতাটী বিলম্বের কারণ—ভারত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তখনই কি আপনি জ্ঞাত ছিলেন? এই বিখ্যাত কেন্দ্র করিয়া আমাদের মধ্যে যে সমুদায় পরত্রাদির বিনিময় হইয়াছে এবং ঐ সংক্রান্ত বাণীয়া প্রামাণ্য দলিলাদি জগৎ সমক্ষে প্রকাশ করিবার যদি আপনার সাহস থাকে—তাঁহা হইলে সে সম্বন্ধে একজন নিরপেক্ষ জনসাধারণের বিচার আমি দৃষ্টান্তেই মানিয়া লইব।

আমাকে উপাচার্যপদে পুনর্নির্বাচন করা সম্বন্ধীয় আপনার প্রেস্তাবটির বিষয়ে আমি চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিব, ইহাতে অবশ্যই কয়েকটি বিশেষ সর্ত আরোপিত থাকিবে। ঐ শব্দের জন্য আমি যেন প্রার্থী এবং পুনর্নির্বাচনের আশা রাখি—এই মনোভাবটি আমি দেখিতেছি আপনার পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছে। আপনাকে বিশেষভাবে অবহিত করিা দিই, আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যদি সেই ধারণা হইয়া থাকে, তবে বলিব আপনারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণার বশীভূত। দশটি বৎসর যে বিরাট আসনের ভার আমি বহন করিয়াছি তাঁহার ঐতিহ্যের সহিত আপনার কোন পরিচয়ই নাই। সেই ধর্মভীরু সৈনিক—মিটোর পরলোকগত জর্জ আমাকে উপাচার্যের আসন গ্রহণ করিতে সর্বপ্রথম আহ্বান জানান। তিনি আমাকে কোনরূপ শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করেন নাই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ বাহাতে সর্বতোভাবে দৃষ্টি হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার বিচার এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে সেনেটের সহিত একত্রে কাজ করার আদেশ স্পষ্টভাবে দিয়াছিলেন। সেদিনও সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং ধারণা সম্পর্কে আমাদের প্রকাশ্য সম্মত ঘটয়াছে। গত ১২ই মার্চ ১৯১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে লর্ড মিটো আমার সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাঁহা জানিবার আগ্রহ আপনার হয় তো থাকিতে পারে—তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কার্যকাল শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ভারি আনন্দ পাইতেছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থা আপনার নির্ভীক বলিষ্ঠতা এবং অপরিমিত দক্ষতার দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইতে থাকিবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের আসনে সমাসীন ছিলেন সে সময়ে সরকারের সহিত বহুবার আমাদের তীব্র পার্থক্য ঘটিয়াছে এবং সরকারের যে সমস্ত ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া আমার সমুখ প্রতীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে উপাচার্য হিসাবে আমার অনুমোদন জানাইতে বিন্দুমাত্র বিধাযো্য কদাচ করি নাই। সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মনোভাবের সেই দৃঢ়তার প্রতি প্রতীতিই অভিনন্দন জানাইবার উদ্যোগ ও মহৎ লর্ড হার্ডিঞ্জের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যখন দুই বৎসর পূর্বে লর্ড চেমসফোর্ড এবং লর্ড রোনাডসের সনির্বন্ধ অনুমোদন উপাচার্যের আসন গ্রহণ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি সেই সময় লর্ড রোনাডসের সহিত আলোপ-আলোচনায় আমি বিরূপাছিলাম কেন সে সময়ে একজন পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন উপাচার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য তাঁহার মত আর কেহ অনুভব করেন নাই।

অবশ্য এই বিরাট ঐতিহ্য এবং মর্যাদার স্রষ্টা আমি নহি। উপাচার্যের পক্ষে আহৃত হওয়ার পূর্বে একাদিক্রমে সাতের বৎসর ধরিয়া আটজন উপাচার্যের সহিত সেনেট-সদস্যরূপে কাজ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের না হইলেও অনেকেই তাঁহাদের পূর্বসূরীর সময় হইতেই এই পদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন—বিখ্যাত পুরুষ ছিলেন। আমাদের প্রথম উপাচার্য স্যার কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস কোলভিলের সময় হইতে অনেক উপাচার্যই রাকমুকুটের নামে জ্ঞাত, নীতি ও বিচারের আনুগত্যের লগ্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যদি জানানো হইত যে উপাচার্য হিসাবে সরকারের মতবাদ এবং নীতির সহিত সর্বদাই তাঁহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া চলিতে হইবে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁহারা অবাক এবং আশ্চর্যগ্ধ হইতেন। আমার আসনের মর্যাদা আমি যথেষ্ট নিষ্ঠার সহিতই পালন করিয়া গিয়াছি এবং গত দুই বৎসরে বারেকের তরেও এ চিন্তা আমার মস্তিষ্কে উদ্ভিত হয় নাই যে, আপনার সরকারের নীতি ও মতবাদের সহিত আমি নির্বিচারে কণ্ঠ মিলাইব এইরূপ আশা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান সম্বন্ধে আপনার সরকার-অনুমত নীতি সম্বন্ধে আমার ধারণার সহিত গত কয়েক মাস যাবৎ আপনি অতি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত আছেন এবং উপাচার্য হিসাবে আমার কার্যকলাপ অযোগ্যতার পরিচায়ক এইরূপ মন্তব্য আমার কর্ণপাশের করিতে ইহার পূর্বে আপনি কখনও সাহসও পান নাই। আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করিয়াছি যে, যদিও আপনাকে এবং আপনার মন্ত্রীকে তুষ্ট করিবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস কখনও করি নাই কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয় এবং নিশ্চিন্ত করিতে বিন্দুমাত্র বিধাযো্য করি না যে, প্রচুর বাধা এবং অন্তর্বিধা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের অনুকূলেই বাণীয়া কার্য করিয়াছি। আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সম্বন্ধ করিতে পাবেন না ইহাতেও আমি কিছুমাত্র বিষমবোধ করি না। আপনার সমুখ এমন একজন আছে যে নিজের সিদ্ধান্ত এবং বিবেকের অনুশাসন অনুযায়ী নির্ভীকভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে এবং কথা বলে—বলা বাহুল্য, আপনি তাকে দেখিতে সেইজন্মই সম্মত নন। আপনার সরকারের ইচ্ছা এবং আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করার এবং সিনেটে গুপ্তচরবৃত্তি করার মত একজন উপাচার্য সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে হয় তো অসম্ভব হইবে না, তিনি আপনার আস্থা এবং বিশ্বাসভাজনও সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই হইবেন কিন্তু তিনি যে সিনেট এবং বাঙলার জনসাধারণের বিশ্বাস এবং আস্থা তিলমাত্র অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন না—এ কথা নিঃশংসে বলার ক্ষেত্রে কোম বাধা থাকে না। আমরা এই আসনের ‘নূতন ঐতিহ্যের স্রষ্টা’ এইধরণের এক উপাচার্যের কার্যবলীও আগ্রহের সহিতই লক্ষ্য করিতে থাকিব।

অতঃপরে, এক্ষেত্রে একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র যে উত্তর হইতে পারে—এবং যে উত্তর আপনি এবং আপনার উপদেষ্টারা প্রত্যাশা করেন—সেই উত্তরই আমি সর্ববিধা পন্থায় করিয়া আপনার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছি—যে অপমানজনক প্রস্তাব আপনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা আমি প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

আপনাদের  
ধা—আন্তরিক স্বাক্ষর।





## বিশ্বনাথ বায়

[ বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ভারতসেবক-সমাজের সভাপতি ]

বর্তমান ভারতের বৃহত্তম নগরী এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতার সেই আদিপার্শ্বের ইতিহাসে যে ক'টি নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে, মহারাজা সুরময় রায়—তাদেরই একটি। সৈনিকের কলকাতার জনজীবনে ব্যাপকভাবে বীরের প্রভাব পড়েছিল, মহারাজা সুরময় ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ভারতের ইতিহাস অনেক এগিয়ে গেছে, হয়ে উঠেছে আরও বিচিত্র আরও উজ্জ্বল, আরও বসিষ্ঠ—সময়ের অগ্রগমনে মহারাজা সুরময় আজ নিজের ইতিহাসে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু যে ঐতিহ্য তিনি রেখে গেছেন—তার গৌরব ও মর্যাদা তাঁর বংশধরদের দ্বারা উত্তরাধিকার আভ্যন্তরে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, জীবননাথ রায়ের জীবনকাহিনীর দিকে মৃষ্টিপাত করলে সে সংকেত আর কোন প্রকার সম্ভবই থাকতে পারে না।

মহারাজা সুরময়ের পুত্র রাজা বৈজ্ঞানিক। তাঁর পৌত্রের পৌত্র



বিশ্বনাথ বায়

হলেন স্বর্গীয় আশুতোষ রায়। আশুতোষ রায়ের পুত্র অজিতের দিনের বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনকল্যাণব্রতী সমাজসেবী জীবননাথ রায়ের জন্ম হয় ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কলকাতার টাউন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন ১৯২৭ সালে। ১৯৩০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হলেন আই এস সি পরীক্ষায়। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী জীবনবিজ্ঞানাল সিংহ ছিলেন তাঁর সহপাঠ্যের অন্যতম।

জনজীবনে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯২৩ সালে আধুনিক বাঙলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্বাচন উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে আগমন হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশসর্গোব সভাপতিদের। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যনীয় যে, সেই নির্বাচনে সৈনিক বিধানচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী টিফিন বর্মানার জননায়ক রাষ্ট্রদ্রোহ অরেন্দ্রনাথ। বিশ্বনাথের বয়েস তখন বারো। সেই অধিবেশন তাঁর বালকচিত্তে গভীরভাবে দাগ রেখে যায়, জনজীবনে যোগ দওয়ার প্রথম অনুপ্রেরণা বা অন্তর্নিদেহ পান সেই অধিবেশন থেকেই। স্মরণ্য পরবর্তীকালের বিশিষ্ট জনসেবী বিশ্বনাথ রায়ের জীবনে সেই অধিবেশনটির গুরুত্ব সমধিক।

১৯৩৩ সালে তিনি পৌরপ্রতিনিধির কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন। ১৯৩৬ সালে কালকটী ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্রাস্টের নির্বাচিত হলেন অন্যতম অছি। ১৯৪৫ এবং ১৯৫২ সালে কংগ্রেস দলভুক্ত হিসাবে যথাক্রমে স্বাক্ষর ব্যবস্থাপক পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সম্প্রতি ভারত সেবক-সমাজের সভাপতির আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বর্তমান যুগে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর নাম সবিশেষ অর্ন্তব্য। পাঁচটি হাই স্কুল তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'জনসেবা' পত্রিকাখানি সম্পাদনে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। জনসেবা ও বাঙলা নামক দুইখানি গ্রন্থ তাঁর দ্বারা রচিত।

ঔণ্ডু স্পেন্স, সম্পাদক হিসাবেই নয়, ত্রিভিঞ্জী, আলোকচিত্রকর, ডাকটিকিট অম্বাণী, জীববিদ হিসাবে তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ফুটবল, টেনিস এবং বিলিয়ার্ড তিনি প্রভূত সাফল্য এবং স্বীকৃতির অধিকারী। যে সকল জনহিতকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানাদির শীর্ষস্থান তিনি অধিকার করে আছেন, তাদের সাংগঠ্যও নগণ্য নয় বরং তার বিপরীতই।

## যাহ্নোগোপাল বসু

[ দক্ষ প্রচারবিদ ও ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি ব্যুরোর পরিচালক ]

প্রচারশিল্পের উন্নয়নে বীদের সমগ্র শক্তি এবং নিষ্ঠা উৎসর্গিত অথচ আত্মপ্রচার বীদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞত—বিশিষ্ট প্রচারবিশেষজ্ঞ ক্রীমুক্ট যাহ্নোগোপাল বসু তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিটি ব্যুরো বীর অরুণ্ড কর্মশক্তির এক অভিনন্দনীয় নিদর্শন।

১৩১৪ সালের মাঘ মাসে (১৯৮৭ঃ) এই কর্মী যাহ্নুঘটির জন্ম হয়। বশোতর জেলার অন্তর্গত পাজিয়া গ্রামে বসুদের আদি নিবাস। স্বর্গত দৈবচরণ বসুর দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ যাহ্নোগোপালের যগ্রামেই জন্ম হয়। পাজিয়ার জেলা হাইস্কুল শিক্ষা স্বক হয় তাঁর



ভারতবর্ষ তখন পরাধীন, বিদেশীশাসকগোষ্ঠীর লৌহনিগড়ে দেশজননীস পোনার অঙ্গ সেদিন শৃঙ্খলিত। দেশের মুক্তি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন ভারতের বিশেষত বাঙলা দেশের অগণিত সম্ভাবন। সারা দেশে সেদিন স্বাধীনতার দুর্বার সঙ্কল্প। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে বন্ধনযোচনের আত্মহান। সে আত্মহান তরুণ বাহুগোপাল সাহা না দিয়ে পারলেন না। দেশজোড়া এই বিরাট আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে দিলেন বাহুগোপাল। ১৯২৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সেই বছরের কংগ্রেস অধিবেশনের স্থতি বাঙালীর স্থতিতে অম্লান দীপ্তিতে বিরাজ করছে। সেই ঐতিহাসিক অধিবেশন অম্লতীত হয় কলকাতায়। পৌরোহিত্য করেন স্বর্গীয় মোতিলাল নেহরু ও সর্বাধিনায়কের দামিনীভার গ্রহণ করেন জনগণমন অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। ছত্রিশ বছর পূর্বে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে আজও তা অবিস্মিত। বলা বাঙাল্য, কংগ্রেসের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখার ক্ষেত্রে শুধু তাঁকেই নয় তাঁর পরিবারের অজ্ঞাত সদস্যদেরও প্রথমেই নির্ধারিত ও লক্ষ্যনা ভোগ করতে হয়েছে। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

১৯৩৩ সালে তাঁর জীবনের যাত্রাপথের মোড় ফিরল। সংবাদপত্রজগতে তাঁর প্রবেশ ঘটল। ফরওয়ার্ড লিবারি ও বঙ্গবাণী প্রমুখ তদানীন্তন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকের কাজ শুরু করেন। সাংবাদিকজগতের দিকপাল স্বর্গীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে বাহুগোপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মাধ্যমে পত্রিকাভগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপিত

—সময়ের অগ্রগমনে যে সম্বন্ধ আজ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এক বন্ধনে পরিণত হয়েছে।

১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং ব্যারোর প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৫২ সালে ঐ প্রতিষ্ঠান প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। প্রচার-প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই সংস্থা যে অভাবনীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে চলেছে তার তুলনা নেই। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তার এই ব্যাপক প্রসিদ্ধির মূলে আছে তার প্রাণবশরূপ বাহুগোপালের অক্লান্ত উত্তম, অশেষ কর্মনিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতা।

১৯৬৩ সালে ভারতের অ্যাডভার্টাইসিং এজেন্সি র‍্যাগোসিসেশনের কার্যকরী সমিতির সভাপদ অলঙ্কৃত করেন। এ ছাড়া অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ও সেগুলির উন্নয়নকর্মে যথেষ্ট যত্নবান।

আনুমানিক ১৯৪১ সালে শ্রীমতী বীণাবাণী বসুর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। আট পুত্র এবং তিন কন্যা তিনি জনক। 'বসুমতী'র সঙ্গে তাঁর স্মরণীয়কালের যোগ এবং এই সংযোগ যেমনই অবিস্মিত তেমনই ঘনিষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর তা ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বাঙালার তথা ভারতের বাণিজ্যজগতের পুরম গৌরব ও অক্লান্ত কর্মী স্বর্গীয় ভবতোষ ঘটক ককেশয়ের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর ও ঘনিষ্ঠ।

## সুবোধ ঘোষ

[ লরুকারী সাহিত্যকার ]

বাঙলা সাহিত্যের মানোন্নয়নে বীণার সাধনা সর্বজনস্বীকৃত

এবং বাঙলা দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের নব অধ্যায় রচনার বীণার অবদান অবিমরবীর—সুবোধ ঘোষ তাঁদেরই অক্লান্তম। বর্তমান বাঙলার কথাকারদের সমাজে একটি প্রথম সারির আসন বীণা জগ্রে সদস্যনে নির্ধারিত।

দীপ্তমান উজ্জ্বল আকৃতির অধিকার। এই স্বনামধন্য লেখকের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অপরূপতায় আজ অতিক্রান্ত। স্বর্গত সতীশচন্দ্র ঘোষের পুত্র সুবোধচন্দ্রের জন্ম হয় ১৯০১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাজারিবাগে। ঘোষদের আদি নিবাস বিক্রমপুর। সন্তীশচন্দ্রের পিতৃদেব হাজারিবাগে বসতি স্থাপন করেন, সেই থেকে হাজারিবাগেই তাঁর স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। হাজারিবাগেই সুবোধ ঘোষের বাচ্যকাল ও কৈশোর কাটে। যথাসময়ে শিক্ষা শুরু হল। প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হলেন। সেন্ট কলম্বাস কলেজে প্রবেশ করলেন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে। তারপরই পুথিগত অধ্যয়নের সমাপ্তি। সুবোধ ঘোষ রূপ-রসের পিপাসু, মনে তাঁর জীবনের সম্বন্ধে অমুসন্ধিষ্ম, মানসচ্ছন্দ তাঁর সন্ধানী। জীবনের সংস্র প্রাশ্নের জটিল জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যে মনে ক্রিয়ার পর চিন্তার তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, পৃথিবীর রূপ, রস, মানুষী সম্বন্ধে বীর শিল্পমত্তা পরিশূর্ণ সচেতন, জীবনের অপার রহস্যের সূত্র সন্ধানে যে তরুণচিত্ত তৎপর—বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম সাধারণত তাদের মনে লুপ্ত লেশ বেহত পারে না। এখানেও তাই ঘটল, আই এস সি-তে



বাহুগোপাল বসু

তার পঠিতব্য পদার্থ, রসায়ন ও গণিত। কয়েকদিন আগেই এক অপরাহ্নে সুবোধ ঘোষ নিজের কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মথার অভাবে যে আমি আই এস সি-তে ফেল করলাম তা নয়, আসলে পাঠ্যপুস্তক সঙ্গ ভাই খাপ খাওয়াতে পারলাম না। Physics, Chemistry বাও বা হল, Mathematics-এর সঙ্গে তো একেবারেই মনের মিল হল না। সেইটেই আমার fail করার একমাত্র কারণ। গণিতের সঙ্গে তাঁর মিশালি হল না—হয় তো তখনই তার চেয়ে ঢের বড় গণিত—জীবনের কল্প কথ। তাঁর শুরু হয়ে গেছে।

বরজীবন শুরু হল। চাকরিও নিয়েছেন, ব্যবসাও করেছেন। কাজের খাতিরে ভারতের বহুস্থান করেছেন পরিভ্রমণ। এশিয়ারও বহুদেশ করেছেন পর্যটন। এই সময়ে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সমাজকে, তাদের বাসিন্দাকে, জীবনযাত্রাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অতি নিকটে থেকে। জীবনের বিচিত্ররূপ এক এক করে পরিপূর্ণরূপে তাঁর সন্ধানী চোখে ধরা দিয়েছে। জীবনকে ও মানুষকে বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তিনি এইভাবে পান। তাঁর জীবনে এই সময়টিকে তাঁর ভাবীকালের সাহিত্যজীবনের প্রস্তুতির যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। পরবর্তীকালে সাহিত্যের পাতায় জীবনের যে বিচিত্ররূপ তিনি এঁকে গেলেন, এই ব্যাপক ভ্রমণ এবং দর্শন তাঁর সেই অনবদ্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল বলা চলে।

১৯৪০ সালে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় তাঁর রচনার প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফসিল। বাঙালির সাহিত্য-সমাজ অবাক-বিম্বরে প্রত্যক্ষ করল সাহিত্য-গগনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বহুবাহিত আবির্ভাব। সেদিনকার তরুণ-সমাজে বিশেষ করে এল এক অভাবনীয় আলোড়ন। সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে। তরুণ

কথাসিদ্ধার সাহিত্য-জননীর পায়ে প্রথম অর্ধেক জনসাধারণ আবৃত করে দিল বিপুল সমাদরে। ভারত প্রেমকথা, বিশ্বদস্তার দেশে, অমৃত পথের যাত্রী, ভারতের আদিবাসী, ভারতীয় যৌজের ইতিহাস, মঙ্গলী প্রমুখ তাঁর গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, শুধু গল্প-উপন্যাসই নয়, অস্ত্রাস্ত্র বিষয়ে তাঁর লেখনী বলিষ্ঠ এবং জ্ঞানধারণ। ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, পুরাণ, প্রাণিতত্ত্ব, চাক্ষুশিক, কাঞ্চনিক, অরণ্যতত্ত্ব, ফ্রেডেরিয় বোম মনোদর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর প্রিয় পঠিতব্য। তাঁর অস্ত্রাস্ত্র গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে ত্রিধামা, শতকীরী, শ্রেয়সী, তিলাঞ্জলি, কুসুমেন্দু, ভোলের মালতী, চিত্তচকোর, কাঞ্চিধারা, নাগলতা, বহুত মিনতি, স্তন বরনারী, একটি নমস্বারে, সূজাতা প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। ত্রিধামা, শ্রেয়সী, অজুনগড়, স্তন বরনারী, বর্ণালী, জতুগৃহ, অধ্যাত্মিক, শিউলবাড়ি, সূজাতা প্রভৃতি ছায়াচিত্রাদি তাঁরই কাহিনী অবলম্বনে রূপ নিয়েছে। তাঁর শ্রেয়সীর নাট্যরূপ দীর্ঘকাল ধরে পেশাদারী বঙ্গমঞ্চ থেকেই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে তিনি 'প্রবুদ্ধ স্থিতি পুংস্বার' লাভ করেন। বোম্বাইয়ের চিত্রজগৎ 'সূজাতা'র কাহিনীকার হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধাশ্রুতি অর্পণ করেন পাঁচ হাজার টাকা। বর্তমানে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকের পদে সমাসীন। ইরোরোপের বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

যই কেনা, বাগান করা, শিকার, ভ্রমণ—এই ক'টি তাঁর বিশেষ শখ। সাহিত্য-জগতে যেদিন তাঁর আবির্ভাব হয় সেদিন আমাদের মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান। আমি জিজ্ঞাসা করি—রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আপনি এসেছেন?

সুবোধ ঘোষ উত্তর দিলেন—একদিন মাত্র তাঁকে দেখেছি—দূর থেকে।

## রমণীমোহন রায়

[ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ]

আজকের দিনের বাঙালি দেশের শিক্ষাজগতে যে ক'টি নাম

বিশেষ উল্লেখের দাবীদার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধের শিক্ষাবিদ রমণীমোহন রায় সেই তালিকায় একটি উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ নাম। স্মিতহাস্য, বিনয়ে ভরপুর এই সদালাপী মানুষটির সান্নিধ্য বীরা লাভ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবেন যে, শিক্ষাদান এবং বিজ্ঞান-অনুশীলন ছাড়া আরও একটি বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা তাঁর করায়ত্ত—সেটি আত্মজ্ঞানমূলক আচরণে সম্পূর্ণ অপরিচিতকে অতি নিকটে আকর্ষণ করে আনার।

আদি নিবাস ঢাকার অন্তর্গত দেউলুর গ্রামে। পিতৃদেব স্বর্গীর রাইমোহন রায় প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করতেন। মাতৃদেবী স্বর্গীরা অনুশীলাসুন্দরী রায় সে-যুগে প্রাথমিক শিক্ষার স্বলারশিপ লাভ করেছিলেন। শিক্ষার প্রতি অম্লহাগ—দেখা বাচ্ছে জনক-জননী উজ্জের দিক থেকেই রমণীমোহন উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন।

১৯০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী স্বগ্রামেই রমণীমোহনের জন্ম। শৈশবে কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হলেন কটলি চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ১৯০৮ সালে। ১৯১৭ সালে উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার। প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে ছাত্র হিসাবে তিনি যুক্ত



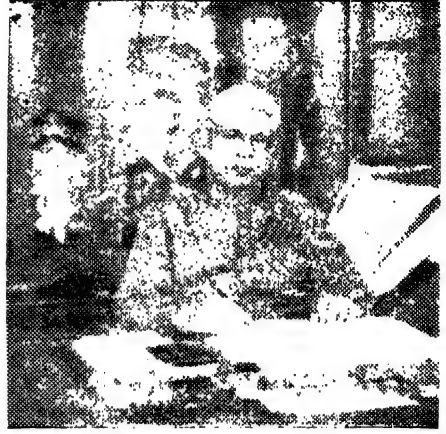
সুবোধ ঘোষ

ছিলেন ১৯১৭ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে থেকে তিনি ১৯২৩ এবং ১৯২৪ সালে এম-এস-সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষাজীবনের পর শুরু হল কর্মজীবন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বিভাগগার বলেজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি সন্নিহিত ছিলেন ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে। ১৯৩৫ সালে তিনি যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর কন্টিভেনশন অফ সায়েন্সের রেজিষ্টার নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৯ সালে পুনরায় যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ১৯৫০ সালে উন্নীত হলেন উপাধ্যকের আসনে। ১৯৫৫ সাল থেকে অধ্যক্ষের আসনে তিনি সমাসীন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এবং এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইন্স কমিশনের স্ট্যাণ্ডার্ড কমিটিরও সদস্যের পদ তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ এ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স এ্যাসোসিয়েশনের সচিব কর্মপরিষদের সদস্য এবং সভাপতির আসনে তাঁকে দেখা গেছে। এ ছাড়া আরও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত।

যে সকল অধ্যাপকের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, জীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়দর্শন রায়, আশুতোষ মৈত্র, জ্যোতিষ্মণ ভাট্টা প্রভৃতি নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যেও অনেকেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট যশ এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। স্কুলজীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পরিচালক ডাঃ রবীন্দ্র চৌধুরী, প্রবীণ চিত্রপরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ, স্কিফেনস নিরলেন্দু



রমণীমোহন রায়

ঘোষ প্রভৃতি। কলেজজীবনে সহপাঠীরূপে পেলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্ততম দিকপাল বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রচনাকার সর্বাঙ্গীসহায় গুহসরকারকে।

এই প্রসঙ্গে রমণীমোহনের আর একটি নামও মনে পড়ে যায়। বললেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র—তিনি কলার ছাত্র তবে গণিত ছিল আমাদের উভয়েরই পঠিতব্য। গণিতের ক্লাসে আমরা মিলিত হতাম। তাঁর নাম ডক্টর শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

## প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষের যাঁরা সতীর্থ ছিলেন

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল,

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

হেরশচন্দ্র মৈত্র

ব্যোমকেশ চৌধুরী

আশুতোষ চৌধুরী

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী

আবদার রহিম

শামসুল হুদা

বসুমতী : আষাঢ় '৭১

# আশুতোষ : বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে

বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে আশুতোষ বিদ্যার সারথি

তোমারে আপন নামে সম্মানিত করেছে ভারতী।

—রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার স্বকর্মতার উপর একটা প্রত্যয় ছিল যে তিনি বিজ্ঞানী হইবেন—ইহা জানিগাই তিনি কর্মের পরিবর্তন করিতেন, তাঁহার লক্ষ্যগুলি বৃত্তকার্যতার পথবিকল্প ছিল।

—রবীন্দ্রনাথ

এই কর্মবীরের ধানের মতই আমি সম্পূর্ণরূপে অম্লভব করছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষানিবন্ধেই দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞানসম্পদের ভিত্তিস্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ

আমার সৌভাগ্য যে, আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন। আমি বাংলায় বলব স্থির করেছি কেনে তিনি আমাকে বললেন, দেখ, লাইসাহেবের ইচ্ছে, নিম্নে প্রথম বক্তৃতাটা ইংরেজিতে হোক, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালাম—হবে না। তিনি আর কোন উত্তর দিলেন না। যথাসময়ে চেয়ার খোলা হল। বাংলা ভাষার লেকচারের পর তিনি আমায় কাছে ডেকে বললেন, তুমি বাংলায় বলে ভালই করছ, আমি চাই এখানেই সব ক'টা লেকচার বাংলায় হয়। তখন আমি বুললেম এমনি করে তিনি আমায় বাচিয়ে নিলেন। বাংলা ভাষার উপর কতখানি টান তাঁর মনে ছিল এই অন্তিমপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি অনুভব করলেম।

—অবনীন্দ্রনাথ

আমার মনে হয়, বাঙালী জাতির মধ্যে বিজ্ঞানগির মহাশয়ের মত পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই। কোন বাঙালীকে আশুতোষের মত সাধু চেষ্টা করাস্ত পুরিশ্রম ও অশ্ববসায় দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়কে যশোমুখী করিতে দেখা যায় নাই, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাপুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

—প্রবুদ্ধচন্দ্র

This long familiarity with the Calcutta University, his wide grasp of educational problems and his extraordinary capacity for dealing with them made Sir Asutosh the most commanding figure in the University. During the time he was Vice-Chancellor he ruled the University with a supreme sway, and it is but right to say that he enforced the regulations with a measure of discretion, a regard for all interests that partly allayed the suspicion and anxiety they had created in the minds of the educated community in Bengal. He was a unique figure in the educational world of Bengal.

—Sir Surendra Nath Banerjee

বাঁহারা আশুতোষের চরিত্রের অন্তঃপুর কখনো প্রবেশ করিবার অধিকার পান নাই, তাঁহারা তাঁহার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিত্র কর্মের ভালোমন্দের সত্য বিচার করিতে পারিবেন না। এই কারণে আশুতোষের অসামান্য প্রতিভা ও শক্তি স্বীকার করিয়াও বাহিরের লোকে অনেক সময় তাঁহার চরিত্রের মর্যাদা দিতে পারেন নাই।

—বিপিনচন্দ্র পাল

আশুতোষ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহার যোগিজানোচিত একাধ সাধনা নিয়োগ করিয়াছিলেন।—দীনেশচন্দ্র সেন  
আশুতোষ স্বয়ং পণ্ডিতাঙ্গণবা ছিলেন এবং সবল বিষয়েই তাঁহার কল্পবিস্তার তদিকার ছিল—গণিত, সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতের জ্ঞান তাঁহার যেকোন তদ্যাপকের যোগ্য ছিল। তাঁহার দৃষ্টি এবং বিবেচনায় এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বিষয়টি বিবেচনামূলক হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যৎ সজ্ঞাবনা ও তাহা পরিপূর্ণ করিয়া হোলার উপায় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তিনি কোন বিষয়ের স্বল্প স্বল্প তথ্যগুলির আলোচনাকালে অধ্যাপকদের তাৎপর্য্য ও তৎসম্বন্ধে দূরদৃষ্টি ও বর্তমান সমস্যাসমূহের সমাধান করিবার শক্তি অনেক বেশি দেখাইয়াছেন।

—দীনেশচন্দ্র সেন

In whatever sphere of life he moved he gave a new impetus and a fresh vigour to his cause. A straining fighter all his life, he left behind him far resentments.

—R. N. Mookerjee

মাকড়সার চর্চার দৃষ্ট আশুতোষ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা যতটা করিতে সমর্থ হয়েছেন আর কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান ততটা করতে পারেন নি। তাঁর যে কেবল দূরদৃষ্টি ছিল তা নয় দেশভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত কতকগুলি বিশ্বাসও তাঁর ছিল।

—অমীর্ষকুমার চট্টোপাধ্যায়

Like a Colossus he did bestride the world of our University with aparent ease he bore burdens under whose weight any ordinary man would have staggered, and his energy seemed tireless and inexhaustible.

—W. S. Urquhart

The daily out-turn of Sir Asutosh's work was a moral to others, to one and all.

—Justice Rankin

He could have ruled on Empire. But he gave the best of his powers to education.

—Sir Michael Sadler.

Sir Asutosh may justly be said to be one of the brightest ornaments of the Bench of the High Court of Calcutta.

—Sir Lawrence Jenkins

Sir Asutosh Mookerjee was the most striking and representative Bengali of his time. In the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, he represented the University so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh.

—Lord Lytton

# বিশ্ব প্রদর্শন মহাযুদ্ধ

শচীন্দ্রনাথ বসু

সার্ডিসের যুদ্ধের পর থেকেই পারস্য-রাজ দারেইওস আ্যাথেলের উপর রেগে ছিলেন, ম্যারাথনের বিপর্যয়ের খবর বখন তাঁর কাছে পৌঁছাল তখন তাঁর ক্রোধ আর বাধা মানিল না। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বন্ধপরিকর হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন রাজ্যে লোক পাঠালেন প্রজ্ঞতির ভর্তুকি দিয়ে—যুদ্ধজাহাজ, গাড়ি, ঘোড়া, খাদ্য সবকিছু অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে যত পারা যায়, সব অভিযানের চেয়ে বড় হবে এই অভিযান। বাছা বাছা লোক দিয়ে সেনাবাহিনী স্ফীত হল, সশরকম প্রজ্ঞতি চলল দিবারাত্রি, তিন বছর ধরে সমগ্র মহাদেশ রইল যেতে। পরের বছর মিশরে বিদ্রোহ দেখা দিল, ইতিপূর্বে কাঞ্চিসাস জয় করেছিলেন সে দেশ। এতে মিশর ও গ্রীস দুইয়েরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার সংকল্প দৃঢ়তর হল দারেইওসের মনে।

দুই অভিযানই বখন যাত্রা শুরু করতে প্রজ্ঞত তখন হঠাৎ রাজপুত্রদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হল এর পরে কে রাজা হবে তা নিয়ে। পারসীক আইন অনুসারে যুদ্ধে বাবার আগে রাজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। সিংহাসন পাবার আগে দারেইওসের প্রথম পত্নী গোত্রিয়াস তনয়ার গর্ভে তিনটি পুত্র হয়েছিল এবং তিনি রাজা হবার পরে সাইরাস-কন্ডা রাণী আতোসূসা চার পুত্র প্রসব করেন। প্রথম পক্ষের প্রথম পুত্র আর্তোবাজাক্তাস, দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ জের্সাস। দুই মায়ের দুই ছেলের এই বিবাদে আর্তোবাজাক্তাস বললে রাজার সব ছেলেরের মধ্যে সেই বড়, স্তত্রয়া সর্বজনীন নিয়ম অনুসারে সিংহাসন তারই প্রাপ্য। জের্সাস বললেন মহামায়া সাইরাস তাঁর মাতামহ, যিনি পারসীকদের স্বাধীনতা দান করেছেন।

দারেইওস তখনও নিজের মতামত জানান নি এমন সময়ে জামারাতোস সজ্ঞাতে এসে উপস্থিত হলেন। স্পাটার রাজা জামারাতোসের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সিংহাসনচ্যুত হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়েছিলেন। লোকে বলে যে, দারেইওস পুত্রদের বিবাদের কথা শুনে তিনি জের্সাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর যুক্তির সঙ্গে আরও এক যুক্তি যোগ করতে বললেন; তা হল এই যে তাঁর জন্মের সময়ে দারেইওস রাজত্ব পেয়েছিলেন, কিন্তু আর্তোবাজাক্তাসের জন্ম হয়েছে এই ঘটনার আগে, স্তত্রয়া রাজপুত্রের স্নাত্য তধিকারী জের্সাস ছাড়া আর কেউ নয়। স্পাটাতেও এই নিয়ম যে রাজা সিংহাসনে বসার আগে তাঁর যে সব ছেলে হয় তারা রাজত্ব পায় না।

জের্সাস এই বুদ্ধি গ্রহণ করলেন এবং দারেইওস তাঁর যুক্তি স্তত্রয়সঙ্গত মনে করে তাকেই উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। হেরোডোটাস এখানে তাঁর নিজের অভিসত জানাচ্ছেন যে, জামারাতোসের বুদ্ধি ছাড়াও জের্সাস রাজা হতেন, তার কারণ আতোসূসার প্রভাব ছিল অসামান্য।

এই ঘোষণার পর দারেইওস যুদ্ধের দিকে মন দিলেন, কিন্তু সবকিছু তৈরি হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। মিশরী বিদ্রোহ এবং পুত্রদের বিবাদের পরের বছর ছত্রিশ বছর রাজত্বের পর তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন; স্তত্রয়া বিদ্রোহী প্রজ্ঞাদের অথবা আ্যাথেনীয়দের শাস্তি দেওয়া আর হয়ে উঠল না।

শাসনভার হাতে নিয়েই জের্সাস মিশর অভিযানের স্তত্র সেনাবাহিনী গড়তে আরম্ভ করলেন। গ্রীস তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল না,

কিন্তু একটি সভাসদ ক্রমাগত তাঁর কানে গ্রীসের বিরুদ্ধে মন্ত্র দিত। সে তাঁরই পিসতুতো ভাই মার্দোনিরোস জের্সাসের উপরে তার মত প্রভাব দেখে আর আর কাণ্ড ছিল না। 'মহারাজ,' সে বলত, 'আ্যাথেন আমাদের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে এবং এই অপরাধের শাস্তি তাকে দিতেই হবে। অবশ্য যে কাজ হাতে নিয়েছেন সেটা শেষ করা দরকার, কিন্তু মিশরের উদ্ধৃত্য দমন করে আ্যাথেলের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করুন। তা হলে সারা স্পত্ত আপনাকে সম্মান করবে এবং ভবিষ্যতে আপনার দেশ আক্রমণ করার আগে সকলে দ্বিতীয়বার ভাববে।' প্রতীশোধের প্রয়োচনার সঙ্গে সঙ্গে সে লোভও দেখাত—ইরোপায় অস্ত্রস্ত্র শুল্কর জারগা, সব রকম উদ্ভান-তরু মেলে সেখানে, জমির যা বা গুণ দরকার তার সবই সেখানে আছে, একমাত্র পারস্যের অধিপতি ছাড়া আর কেউ যোগ্য নয় এমন জারগার।

মার্দোনিরোস বদ মতলবের মানুষ এবং অনিশ্চিত উদ্ভোগের দিকে তার ঝোঁক; তা ছাড়া গ্রীসের বিরুদ্ধে এত প্রয়োচনার পিছনে তার আশা ছিল যে সে নিজেই সেখানকার শাসনকর্তা হবে। বারে বারে বলে শেষ পর্যন্ত সে জের্সাসকে রাজী করাল—হয় তো সক্ষম হত না যদি অস্ত্রের থেকেও সাহায্য না আসত। প্রথমত খেসালীর রাজপরিবার থেকে জের্সাসের কাছে সনির্ভর অস্থায়ী এল গ্রীস আক্রমণ করতে। তা ছাড়া স্তত্রয়াই এক স্পত্তদার রাজার আশ্চর্য ক্ষমতার সুখ্যাতি করে এবং বিবিধ দৈববাণী থেকে আবৃত্তি করে তাঁকে বোঝাল যে এই যুদ্ধে তাঁর জয় অনিশ্চিত। এই কাজে তার একটি লোকের সাহায্য নিয়েছিল, তার কাজ দৈববাণী সংগ্রহ করা; এর মধ্যে যেগুলিতে পারস্যের ক্ষতির নির্দেশ আছে সেগুলিকে সযত্নে বাদ দিয়ে শুধু জয়নির্দেশক বাণী সে সাজিয়ে দিয়েছিল আবৃত্তির উপযুক্ত করে। জের্সাস শুনলেন এক পারসীক হেলেশ্পনটে সেছু বানাবে, তার সৈন্তবাহিনী এশিয়া থেকে গ্রীসের মধ্যে ঢুক পড়বে। এই সবকিছু মিলে জের্সাসের মনস্থির করে দিল।

কিন্তু আগে তিনি মিশরে এক বাহিনী পাঠালেন পিতাত মৃত্যুর পরের বছরই। বিদ্রোহীদের আগের চেয়েও হীনতর দাসস্ত্র পরিণত করে নিজের এক ভাইকে মিশরের শাসনভার দিলেন। কিছুদিন পরে এই রাজ্যপাল এক লিবিয়াবাসীর হাতে খুন হয়।

### জের্সালের সত্য যুদ্ধালোচনা

মিশর জয়ের পর অ্যাথেন্সের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত করে জের্সাস দেশের প্রধান ব্যক্তিদের এক সভা ডাকলেন, এই যুদ্ধ সফলকৈ নিজের ইচ্ছা জানাতে ও তাদের মতামত জানতে। সভার তিনি অভ্যাগতদের বললেন, 'পারসীক জীবনের যে নিজস্ব ধারা আমি শিশুপুরুষদের থেকে পেয়েছি তার ব্যাঘাত আমি করব না। জের্সাদের কাছে শুনেছি সেই যবে পার্সাস আন্তিরাগ্যাসকে সিংহাসনচ্যুত করে মিডীয়দের থেকে আমাদের স্বাধীনতা আদায় করেছিল, তখন থেকে আমরা কখনও নিষ্ক্রিয় থাকি নি। আমাদের জাতীয় ইতিহাস আপনাদের নতুন করে বলার দরকার নাই—সাইরাস, কাশিতাস, এবং আমার পিতা দারেইওসের প্রসিদ্ধ কার্ত্তির কথা আপনারা জানেন, কেমন করে তাঁরা সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন তাও জানেন। আমিও যেদিন সিংহাসনে বসেছি সেদিন থেকে ভাবছি কি করে এঁদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পারি। অবশেষে একটি পথ আমি দেখতে পাচ্ছি, তাতে শুধু যে পারস্যের গৌরব বাড়বে তা নয়, আমাদেরই মত বৃহৎ আমাদেরই মত সমৃদ্ধ—হয় তো আরও সমৃদ্ধ—একটি দেশ আমরা পেয়ে যাব, উপরন্তু লাভ করব প্রতিশোধের আনন্দ। এই পরিকল্পনা আপনাদের জানানোর জন্যই এই সভা ডেকেছি। হেলেন্পনটের উপর সেতু বানিয়ে ইরোরোপে ও গ্রীসে প্রবেশ করব, আমার পিতার ও আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অ্যাথেনীয়রা যে অপরাধ করেছে তার জন্য তাদের সমুচিত শাস্তি দেব। দারেইওস নিজেই এ কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁকে বাধা দিল; তাঁরই হয়ে এবং আমার প্রজাদের উপকারের জন্য আমি এই কাজ সম্পন্ন না করে নিশ্চিন্ত হব না। অ্যাথেন্স দখল করে আলিয়ে পুড়িয়ে তা ধূলিসাৎ করে দেব, বিনা কারণে তারা আমাদের যে ক্ষতি করেছে এইভাবে তার প্রতিশোধ হবে। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় আরিস্তাগোরাসের সঙ্গে সার্জিস এসে এরা মন্দির ও চতুর্দিকের উজ্জান পুড়িয়ে দিয়েছিল, ম্যারাথনে আমাদের সৈন্যদের কি করেছিল তাও জানেন।

এই সব কারণে আমি এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছি এবং ভেবে দেখছি যে এতে কতগুলি সুবিধার আশাও আছে। অ্যাথেন্স ও তার প্রতিবেশী স্পার্টাকে যদি আমরা দমন করতে পারি তো পারসীক সাম্রাজ্যের সীমা গিরে ঢেকে দেবের আকাশে। আপনাদের সাহায্যে আমি ইরোরোপের শেষ মাথা পর্যন্ত যাব, সবটাকে একত্র করে বানাব এক দেশ, তখন আমাদের আধিপত্যের বাইরে আর কোথাও হৃর্ষের আলা পড়বে না; কারণ, শুনছি অ্যাথেন্স ও স্পার্টা বাদ দিলে জগতে আর এমন শহর বা জাতি নেই যা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং দোষী ও নির্দোষ সকলকেই দাসত্বের দিকল পরতে হবে।

অতএব আপনারা যদি আমাকে খুশি করতে চান তো নির্ধারিত দিনে যেছায়া প্রস্তুত মনে সৈন্তসামন্ত নিয়ে আমার কাছে আসবেন—বাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনী দেবেন তাঁদের আমি সর্বোচ্চ সম্মান দেব। এই আমার আদেশ, কিন্তু তা বলে আমি যেছাচারী নই; বিশ্বটাই নিয়ে আলোচনা হোক, বাঁর ইচ্ছা তিনি নিজের মত জানাতে পারেন।

এর পরে প্রথমে মার্ফোনিরোস দাঁড়িয়ে বললে, 'মহারাজ।

পারস্যে এ পর্যন্ত বত লোক জন্মেছে ও ভবিষ্যতে জন্মেবে তাদের মধ্যে আপনি মহত্তম। আপনি বা বললেন তার প্রত্যেকটি কথা অতি উৎকৃষ্ট ও সত্য, ইরোরোপের ঐ দুর্বল আইরোনীয়রা আমাদের বোকা বানাবে তা আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। ইতিপূর্বে আমরা ভারতীয়, ইথিওপীয়, অ্যাসিরীয় ও আরও অনেক মহৎ জাতিকে বিনা দোষে দাস বানিয়েছি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের সীমা বাড়তে; গ্রীসীয়রা বিনা কারণে আমাদের ক্ষতি করেছে, তাদের যদি সাক্ষ্য না দিই তো বড় অজুত হবে। তাদের থেকে ভয় করার কি আছে আমাদের—তাদের সৈন্য তাদের অর্ধ? কিন্তু তারা কেমন যুদ্ধ করে, কত সামান্য তাদের রসদ তা আমাদের জানা আছে! ঐ জাতির বিভিন্ন শাখা এশিয়ায় ও ইরোরোপে ইতিমধ্যেই দাস বনেছে। আপনার বাবার আদেশে আমি নিজেই একবার তাদের দেশ আক্রমণ করে ম্যাসিডোনিয়া ও প্রায় অ্যাথেন্স পর্যন্ত গিয়েছিলাম—একটি সৈনিকও আমাদের বাধা দিতে সাহস পায় নি। তবে স্তন্যে পাই গ্রীসীয়রা হঠাৎ বিচার বিবেচনা না করে যুদ্ধ আরম্ভ করে। নিজেরদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন সমস্ত ভূমি বেছে নিয়ে তারা কাটাকাটি করে, তাতে দুই পক্ষেরই প্রভুত্ব ক্ষতি হয়। এটা খুবই অজুত ব্যাপার—তাদের সকলেরই যখন এক ভাষা তখন আলোচনা বা অস্ত্র কোনও উপায়ে নিশ্চয় ঝগড়া মেটানো যেতে পারে। আর যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তা হলেও নিশ্চয় রণকৌশল ব্যবহার করা উচিত যাতে ক্ষতি কম হয়। যুদ্ধ সফলকৈ ঐ তো এদের অজুত ধারণা!

সুতরাং মহারাজ, এশিয়ার লক্ষ লক্ষ বোদ্ধা ও সমগ্র পারসীক নৌসহর নিয়ে আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন তখন কে আপনাকে বাধা দেবে? বিশ্বাস করুন, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি সেখানে গ্রীসীয়রা পিছিয়ে যায়; কিন্তু আমার যদি ভুলও হয়, যদি অজ্ঞতা ও নিবুদ্ধিতাজনিত এক দুঃসাহসের বশে তারা লাড়াই করে, তা হলে তারা টের পাবে আমাদের মত বোদ্ধা দুনিয়ার আর নেই। তবু বলি, এই উত্তোগে আমাদের কোনও ক্রটি রাখা চলেবে না; সাক্ষ্য কখনও আপনাকে ধরা দেয় না—চেষ্টা বিনা কিছুই হয় না।

সম্রাটের প্রস্তাব এ ভাবে সমর্থন পাবার পর কিছুক্ষণ কেউ কিছু কিছু কথা বলতে সাহস পেল না। সভার ছিল জের্সাসদের পিতৃব্য আর্তাভানোস, এই সম্পর্কে জোর করে সে মুখ খুলল, বললে, 'আলোচনার দুই দিকেই মতামত প্রকাশ করা হয়, তা ব্যতীত প্রেরণা বেছে নেওয়া অসম্ভব। সোনার দাম চেহারে দেখে বোঝা যায় না, অস্ত্র সোনার সঙ্গে যাব জানতে হয় কোন্টো বেশি খাঁটি; তোমার পিতা ও আমার ভাই দারেইওসকে আমি নিষেধ করেছিলাম শহরশত্রু ব্যবহারের দেশ সিদিয়া আক্রমণ করতে; ক্ষমতার গর্বে তিনি আমার কথা শুনলেন না—বহু উৎকৃষ্ট সৈন্য হারিয়ে দেশে ফিরলেন। কিন্তু ভূমি যাদের আক্রমণ করার কথা ভাবছ তারা শকদের থেকে অনেক বড় জাতি, স্থল ও জলের যুদ্ধে তাদের খ্যাতি অতুল্য। এমন হতে পারে যে, জলে বা স্থলে অথবা দুই ক্ষেত্রেই আমাদের বিপর্যয় ঘটল—গ্রীসের লোক যুদ্ধ জানে, শুধু অ্যাথেনীয়রা একলা ম্যারাথনে যে আমাদের হৃর্ষ বাহিনী ধ্বংস করেছে তা থেকে তা বোঝা যায়। অথবা ধর শুধু লস্লেই আমাদের পরাজয় ঘটল, তখন হেলেন্পনটে পাড়ি দিয়ে তারা আমাদের সেতুটি

নষ্ট করবে এবং তুমি সত্যিই বিপদে পড়বে। খুব জ্ঞানী বলে আমি এট সন্দেহবানর কথা বলছি না। তোমার বাবা যখন সিঁদিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন প্রায় এই রকমই ব্যাপার ঘটিয়েছিল; তোমার মনে আছে নিশ্চয় শকরা তখন আইরেনারি রক্ষীদের আগ্রাণ প্ররোচিত করেছিল দানিয়াবর সেতু কেটে দিতে এবং তখন মাইলিটাস-অধিপতি তিস্তাইটোস যদি নিজের বুদ্ধিতে না চলে অস্ত্রাঙ্গ আইরেনারি শাসকদের কথা শুনতেন তা হলে পারস্যের সর্বনাশ হত। কোনও এক সম্রাটের ভাগ্য যে, একদা একটিমাত্র লোকের উপর নির্ভর করেছিল একথা শুনতেও ভয় হয়!

‘সুতরাং আমি বসি এটি পরিকল্পনা ত্যাগ কর, অনর্থক বিপদের সম্ভাবনাব্য মধ্য থেকে না। এই সভা ভঙ্গ করে নির্জনে বসে ভেবে দেখ, তারপর মনস্ত্রি কর। উপযুক্ত ব্যবস্থা করো যদি ভাগ্য কারও বিরুদ্ধে যার তবে তার সাহসনা থাকে যে, যা করার সে করেছে, পক্ষান্তরে কেউ যদি অগ্রপঞ্চাৎ বিবেচনা না করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভাগ্যক্রমে সফল হয়, তবু এই লজ্জা তার থেকে যার যে, সে প্রস্তুত ছিল না।

‘তুমি জান যে প্রাণীকুলে যারা গড় হয় তাদের গর্ব দেখে ঈর্ষাবশত ঈশ্বর তাদেরই বজ্রাঘাত করেন। যারা ক্ষুদ্র তাদের প্রতি তিনি বিরক্ত হন না। সর্বদা উঁচু বাড়ি বা গাছের উপরই বান্ধ পড়ে। এইভাবে ঈশ্বর উন্নতকে নত করেন, কারণ একমাত্র নিজের মধ্যে ছাড়া আর কারও অস্তিত্বের তিনি সন্মত করেন না। প্রায়ই বৃহৎ বনবাগিনী ক্ষুদ্র সেনাদলের হাতে ধ্বংস হয় যখন সাজা দেবার জন্য ঈশ্বর ভর চুকিয়ে দেন তাদের মনে। বিরক্ততার জ্ঞানী ওরা এবং বিরক্ততার ক্ষতি সর্বদা অত্যধিক; দেরি করলেই সুবিধা হয়, যদিও সে সুবিধা সর্বদা অবিলম্বে প্রত্যাক নাও হতে পারে।’

রাজাকে এই পরামর্শ দিয়ে মার্টিনিয়োসের দিকে চেয়ে আর্তাবানোস বললে, ‘গ্রীসীদের ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করতে যা তুমি বললে তা মোটেই তাদের প্রাণা নয়, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে বাজে কথা আর বোলা না; অবশ্য বৃথতে পারছি ঐ করে তুমি রাজাকে দিয়ে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ, কারণ তাই তোমার মতলব। কুংসা অতি হীন জিনিস, এতে সকলেই ক্ষতির ভাগী হয়; কুংসা যে করে সে নিশ্চিত ব্যক্তির আড়ালে কুংসা করার দোষে দোষী, যে তার কথা শোনে তার দোষ এই যে প্রকৃত সত্য সে জানতে চেষ্টা করে না এবং যার নিন্দা হয় সে এই দু’জনের থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

‘তবু শেষ পর্যন্ত গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান যদি অনিবার্য হয় তবে আমার একটি প্রস্তাব আছে। রাজা পারস্যে থাকুন, তুমি যত সৈন্ত-সামন্ত লোকজন চাও তা নিয়ে বেরিয়ে পড়। যদি সফল হও তবে আমি এবং আমার ছেলেরা প্রশ্র দেব, আর যদি ব্যর্থ হও তো তুমি এবং তোমার ছেলেরা প্রাণ দিতে হবে। হয় তো তুমি এই চুক্তিতে রাজী না হয়েই যুদ্ধে বাবে—তা হলে আমি সলজি এমন একদিন আসবে যেদিন দেশের লোকেরা বলবে মার্টিনিয়োস পারস্যের সর্বনাশ এনেছে, যেদিন তারা শুনবে যে অ্যাথেন্স বা স্পার্টার কোথাও—অথবা তারই রাজ্যের—তোমার দেহ কুকুরে-পাখিতে ছিঁড়ে থাকছে।’

আর্তাবানোসের কথাগুলি শুনে জের্কাসাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন, ‘আপনি আমার বাবার ভাই, নয় তো এই অসার অদ্ভুত

বক্তৃতার বোধ্য শাস্তি পেতেন। কিন্তু কাণ্ডকারখানার জন্য আপনাকে অপমানিত হতে হবে। আমার সঙ্গে আপনি গ্রীসে যেতে পারবেন না, এখানে দ্রুতলোকদের সঙ্গে থাকবেন। অ্যাথেন্সকে যদি শিক্ষা দিতে না পারি তবে আমার অবিম্বরণীয় পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারী আমি নই। আমি জানি আমার না এগোলে অ্যাথেনীয়রাই আমাদের দেশ আক্রমণ করবে—এর আগে তারাই এশিয়াতে চুক সার্ডিসে আলিয়ে দিয়েছিল। হু’ পক্ষেরই একটা বোঝাপড়ার সময় এসেছে, হয় আমাদের যা কিছু আছে তা ওরা নেবে, নয় তো ওদের সর্বস্ব আমাদের হাতে আসবে—এর মাঝামাঝি কোনও পথ নাই। সুতরাং এখনই আমাদের প্রতিক্রিয়া নেওয়া উচিত।’

এর পরে সভা ভঙ্গ হল। সেইদিনই সন্ধ্যায় আর্তাবানোসের কথাগুলি ভেবে ভেবে জের্কাসাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং রাতে ঘুমের আগে তাঁর মনে হল যে, গ্রীস আক্রমণ করাটা আসলে ভাল হবে না। পারসীকরা বলে যে, সেদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন দীর্ঘ সৌম্য এক মুহূর্ত তাঁর শয্যার পাশে ঠাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে বললে যে গ্রীস অভিযান সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে না, তিনি যেন আবার আগের সিদ্ধান্তে ফিরে যান। এই বলে ছারামূর্তি উড়ে চলে গেল। পরদিন সকালে মন থেকে এই স্বপ্ন দূর করে দিয়ে জের্কাসাস আবার সভা ডেকে বললেন, ‘আমি খুব শীঘ্র মত পরিবর্তন করেছি তা দেখে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার বুদ্ধি এখনও সম্পূর্ণ পাকে নি, তা ছাড়া যারা জোর করে আমাকে এই যুদ্ধে জড়তে চায় তারা একদ্রুত আমাকে শাস্তি দের না। আর্তাবানোসের কথাগুলি শুনে আমার যৌবনের হৃদয় ভেঙে উঠেছিল এবং আমি তাঁকে এমন কড়া কথা বলেছি যা জোরটো কারও বলা উচিত নয়। এখন বৃথতে পারছি তিনি ঠিকই বলেছেন, গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধ করব না আমরা।’

এই সিদ্ধান্তে পারসীকরা খুব খুশি হল। কিন্তু সেই রাতেই সম্রাটের স্বপ্নের সেই ছারামূর্তি আবার এসে বললে, ‘দারাইওস-পুত্র, আমার নির্দেশ সত্ত্বেও তুমি তা তুচ্ছ করে প্রকাশ্যে যুদ্ধ পরিহার করেছ। এই তোমাকে বলে যাইচ্ছ, এই যুদ্ধ না করলে যেমন হঠাৎ তুমি মহত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছ তেমনি একদ্রুতই আবার ধূলিসাৎ হবে।’

অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে জের্কাসাস বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ আর্তাবানোসকে ডেকে পাঠিয়ে সব কথা জানিয়ে বললেন, ‘যদি ঈশ্বরই এই স্বপ্ন পাঠিয়ে থাকেন তবে এই মুহূর্তে আপনাকেও দেখা দেবে এবং একই আদেশ জানাবো। আমার মনে হয় এমন ঘটনার সম্ভাবনা আরও বাড়বে যদি আপনি আমার পোষাক পরেন, আমার সিংহাসনে বসেন এবং আমার বিছানায় ঘুমান।’

রাজ-সিংহাসনে বসতে প্রথমে আপত্তি করে পরে আর্তাবানোস জের্কাসাসের উপরোষে রাজী হল, কিন্তু তার আগে বললে, ‘বৎস, যে সংপরাশ্রম শোনে সে আর বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায় সমকক্ষ। তোমার অবস্থা হুই গুণই আছে, কিন্তু কুসঙ্গ তোমাকে বিপদে নেয়। তুমি আমাকে যে কষ্টান্তি করেছ তাতে আমি ততটা দুখে পাই নি যতটা শেরেছি এই দেখে যে দু’টি পথের মধ্যে তুমি সেটি বেছে নিলে বা উচ্চতমত পরিপোষক, যা তোমাকে আর তোমার দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে

### জের্কস্তাসের গ্রীষ্ম অভিযান

যেতে পারে ; ত্যাগ করলে সে পথ যা আমাদের উদ্ধৃত্য দমন করতে শেখায় কেবলই আরও বেশি চাওয়ার দোষ দেখিয়ে দিয়ে। এখন তুমি ঠিক পথটি চিনেও স্বপ্ন দেখে আবার উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছ, ভাবছ কোনও দেবতা তা পারিয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন ঈশ্বরের থেকে আসে না ; আমি তোমার চেয়ে বয়স অনেক বড়, আমি বলছি ঘরের মধ্যে এই যে দুগ্ধগুলি আমাদের চোখের সামনে ভাসে প্রায় সর্বদাই তারা দিনের বেলায় যা আমরা ভাবি তার চারমাত্র ; তুমি 'সদিন এই অভিযানের বখ' ভেবেছিলে। অথবা এও সম্ভব যে তোমার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়, হয় তো এর মধ্যে ঐশ্বরিক কিছু আছে যেমন তুমি বলছ। চার্যমূর্তি তা হলে হয় তো আমাদেরও দেখা দেবে, কিন্তু তোমার পোষাক পরলে এবং তামা। বিছানার স্তলে সে যে সহজে আসবে তা আমার মনে হয় না। কারণ, নিশ্চয় সে এমন নির্বোধ নয় যে তোমার জামা পরে থাকলেই আমাদের তুমি বলে ভাববে। তবে আমার কাছে সে আশ্রক আর না আশ্রক, তোমাকে যদি আবার দেখা দেয় তবে আমিও স্বীকার করব যে ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। যাই হোক, তুমি যখন আজ্ঞা করছ তখন তোমার বিছানার নিশ্চয় আমি শোব।'

অর্জাবানাস রাজার পোষাক পরল, রাজ-সিঁড়াসনে বসল, তারপর রাজসভায় গিয়ে স্বপ্ন দেখল সেই মূর্তি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধ থেকে রাজাকে বিরক্ত করতে চেষ্টা করার জন্য সে তাকে তিরস্কার করে বললে, উনিতবার গতি পরিবর্তন করতে বাবার অপরাধে তাকে শাস্তি পেতে হবে। এই বলে চার্যমূর্তি উত্তম লৌচশলাক। দিয়ে অর্জাবানাসের চোখ পুড়িয়ে দিতে উদ্ভত হল, তখন চিংকার করে জেগে উঠে সে দৌড়ে গেল রাজার কাছে।

তার পাশে বসে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করে অর্জাবানাস বললে, 'আমি যে তোমাকে বাধা দিতে চেয়েছিলাম তার কারণ বহু ক্ষমতা-গর্ভিত রাজত্বকে দুর্বলের কাছে পরাস্ত হতে আমি দেখছি। অত্যা আকাজক্ষার বিপদ আছে—মাসুসাগেভাসাদের বিকল্পে সাইরাসের অভিযান অথবা কাম্বিসাসের ইথিওপিয়া আক্রমণ আমি ভুলতে পারি নি। আমি নিজেই কি দারেইওসের সঙ্গে সিদিয়ায় যাই নি ? এই সব বিপর্যয়ের থেকে এই বুঝেছিলাম যে, একমাত্র শাস্তির পথে চললেই তুমি জগতের চোখে স্মৃতি হবে। কিন্তু এখন দেখছি ঈশ্বর স্বয়ং এই ব্যাপারে আছেন, তিনি গ্রীষ্ম ধ্বংস করতে উদ্ভত হয়েছেন, স্তম্ভরা আমার ভুল স্বীকার করছি। পারসীকদের তোমার স্বপ্নের কথা বলে তাদের বৃদ্ধের জন্য প্রভুত কর।'

পরদিন প্রভুবে সম্রাট এই পরামর্শমত কাজ করলেন এবং অর্জাবানাস তাঁকে প্রেক্ষাগে সমর্পণ করল। এর পরে জের্কস্তাস আর একটা স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি জলপাইব মুকুট পরে আছেন, তার শাখা সমস্ত পৃথিবী ছেয়েছে ; পুরোহিতরা এর অর্থ করলে যে তিনি সারা জগতের অধিপতি হবেন।

চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল, প্রভুত শুরু হল, মিশর জয়ের পর চার বছর ধরে লোক ও রসদ সমগ্র হল রাজ্যের সর্বত্র। পঞ্চম বছরের শেষে এই প্রকাণ্ড বাহিনীর মুখে জের্কস্তাস যাত্রা আরম্ভ করলেন।

জের্কস্তাস যে বাহিনী নিয়ে গ্রীষ্মের দিকে যাত্রা করলেন, হেরোডোটাস বলেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সিদিয়ায় দারেইওস বত সৈন্য নিয়ে গিয়েছেন, ষ্ট্রয় ও অক্সাঙ্ক রণক্ষেত্রে যত ফৌজ ব্যবহার হয়েছে, তার সব একত্র করলেও এই বাহিনীর সমান হবে না। এশিয়ার প্রতি দেশ থেকে লোক এসেছিল হাতে, কেউ দিয়েছিল জাগজ, কেউ পদাতিক, কেউ অশ্বারোহী, কেউ বা অন্তকিছু। বড় বড় নদী ছাড়া আর সব জলাশয় নাকি শুকিয়ে গিয়েছিল এদের পিপাসা মেটাতে। হেরোডোটাস সবিস্তারে এই বাহিনীর ও তার নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

পথে এক জায়গায় পিথিয়োস নামক এক লিডিয়াবাসী জের্কস্তাসের জন্য অপেক্ষা করেছিল, তাঁকে এবং সেনাবাহিনীকে নানাভাবে অপ্যায়ন করে সে যুদ্ধের খরচ বাবদ তার সব টাকা দিয়ে দিতে চাইল। জের্কস্তাস খোঁজ নিয়ে জানলেন সে নাকি ইতিপূর্বে দারেইওসকে এক সোনার গাছ ও সোনার লতা উপহার দিয়েছিল এবং সম্রাটের পরেই জগতের অধিতার ধনী বলে তার খ্যাতি। পিথিয়োস সম্রাটকে ক্রিশ লক্ষেরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইল, কিন্তু তিনি তার কথাও ব্যবহারে এত খুশি হয়েছিলেন যে তার টাকা তো নিলেনই না, উপরন্তু নিজের তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে চল্লিশ লক্ষ পূর্ণ করে দিলেন।

সার্ডিসে পৌঁছে প্রথমেই জের্কস্তাস গ্রীষ্মের প্রত্যেক রাজ্যে দূত পাঠালেন বহুতার নিদর্শন চরে, এক অ্যাথেন্স ও স্পার্টা ছাড়া। ততক্ষণে অ্যাথিডস থেকে হেলেন্পনুটের উপর প্রায় এক মাইল লম্বা দু'টি দড়ির সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে কিন্তু পরে এক প্রচণ্ড ঝড়ে তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খবর শুনে জের্কস্তাস অত্যন্ত রেগে গেলেন, তাঁর হুকুমত ঐ জলপ্রাণীকে তিন শো চাবুক লাগানো হল এবং একজোড়া হাতকড়া জলে ছুড়ে ফেলা হল—শোনা বার গরম লোহার ছেঁকাও দেওয়া হয়েছিল। যারা চাবুক মেরেছিল তারা রাজার আদেশে জলকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম কটুক্তি করলে, হেরোডোটাস বলেছেন হেলেন্পনুটের প্রতি এই অতি উদ্ভত ব্যবহার বর্ষ জাতিরই উপযুক্ত। যারা সেতু বানিয়েছিল তাদের শিরশ্ছেদ করে নতুন ওস্তাদের হাতে কাজের ভার দেওয়া হল, তারা পাশাপাশি জাহাজ সাজিয়ে তার উপরে আবার সেতু বানালেন।

সার্ডিসে শীত কাটিয়ে বসন্তকালে জের্কস্তাস তাঁর বাহিনী নিয়ে অ্যাথিডসের দিকে যাত্রা শুরু করলেন, তখন হঠাৎ পরিষ্কার নির্দেশ আকাশ রাত্রির মত কালো হয়ে গেল ; রাজা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পুরোহিতদের এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন, তারা বললে চন্দ্র নির্দেশ ধের পারশ্বকে, সূর্য নির্দেশ দেয় গ্রীসকে—গ্রীসীয় শহরগুলির অন্ধকার বনিয়ে আসছে এই হল ঈশ্বরের নির্দেশ। জের্কস্যাস খুব খুশি হয়ে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু বেশিদূর যেতে না যেতে পিথিয়োস চিঙ্কিত হয়ে পড়ল। জের্কস্যাসের সঙ্গে তার সখা স্থাপিত হয়েছে সেই সাহসে সে তাঁকে গিয়ে বললে, 'মহারাজ, আমার পাঁচটি ছেলেই আপনার অভিযানে বোগ দিয়েছে, আমি বুড়ে হয়েছি, দয়া করে যদি আমার ও আমার



## বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধ

সম্পত্তির দেখাশোনা করতে একটিকে ফিরিয়ে দেন তবে বড় উপকৃত হব।

অত্যন্ত বেগে স্নেক্সাস বসলেন, 'আমি নিজেকে যখন আমার ছেলে, ভাই, আত্মীয়, বন্ধু নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি, তখন তুমি সামান্য এক দাস হয়ে এমন অহুরোহ করছ। ইতিপূর্বে তুমি আমাকে আতিথ্য দিয়েছ ও ঐদার্য দেখিয়েছ সেইজন্য তোমার শাস্তি কমিয়ে দিচ্ছি—তুমি নিজেকে ও তোমার চার ছেলে বৈতে গেলে, কিন্তু থাকে তুমি বাঁচাতে চাচ্ছ তার প্রাণ দিতে হবে।'

তার হুকুমে তৎক্ষণাৎ পিথিগোসের বড় ছেলেকে ছুঁঁকরো করে কেটে সেনাবাহিনীর পথের দু'পাশে রাখা হল।

আবিডোসে পৌঁছে স্নেক্সাস এক উঁচু জায়গায় শ্বেতপাথরের স্তম্ভসমূহে বসলেন, সেখান থেকে সমস্ত সেনা ও নৌবাহিনী চোখে পড়ল। পোন্তসমাকীর্ণ হেলেন্পনট প্রণালী ও স্নাকাকীর্ণ উপকূল দেখে পড়ল। পোন্তসমাকীর্ণ হেলেন্পনট প্রণালী ও স্নাকাকীর্ণ উপকূল দেখে পড়ল। পোন্তসমাকীর্ণ হেলেন্পনট প্রণালী ও স্নাকাকীর্ণ উপকূল দেখে পড়ল।

পিতৃব্য আর্জাবানোস জিজ্ঞাসা করলে এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনের কি কারণ।

স্নেক্সাস বললেন, 'হঠাৎ আমার মনে হল মানুষের জীবন কত সংক্ষিপ্ত—এই হাজার হাজার লোকের একজনও এক শো বছর পরে বেঁচে থাকবে না।'

আর্জাবানোস বললে, 'ঠিক কথা, কিন্তু এর চেয়েও দুঃখের জিনিস মানুষের জীবনে আছে। জীবন সংক্ষিপ্ত বটে, তবু কোথাও এমন সুখী লোক একটিও পাবে না যে একবার নয় বহুবার মরতে না চেয়েছে। জীবনে কতরকম দুর্ভোগ আসে, রোগে কষ্ট দেয়, তখন এই ক্ষুদ্র জীবনও মনে হয় অতিদীর্ঘ, দুঃখের ভারে সত্যুর আশ্রয়ই আমরা সকলে কামনা করি। এর থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের একটুখানি সুখের স্বাদ দিয়ে ঈশ্বর কৃপণের মত বঞ্চিত করেছেন।'

স্নেক্সাস বললেন, 'এ জগতে মানুষের ভাগ্য আপনি যেমন বললেন ঠিক তেমনই। তবে এ সব দুঃখিতা থাক; আচ্ছ! বলুন দেখি, স্বপ্নে সেই পুরুষটিকে যদি না দেখতেন তা হলে কি এখনও আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করতেন?'

আর্জাবানোস বললে, 'স্বপ্নের আশা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করি। কিন্তু সেই রাত্রি থেকে আমি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছি। ভয়ের অনেক কারণ, তার মধ্যে প্রধান হল যে, পৃথিবীর বৃহত্তম দুই শক্তি তোমার বিরুদ্ধে।'

এই কথায় আশ্চর্য হয়ে স্নেক্সাস নিজের স্থল ও জলবাহিনীর আকৃতি তাকে মনে করিয়ে দিলেন, তখন আর্জাবানোস বললে, 'যে শত্রুর কথা বলছি তোমার বাহিনী যত বাড়বে তার শক্তিও তত বাড়বে—এই শত্রু হল জল আর স্থল। আমাদের নৌবহরকে বাড়তে আশ্রয় দিতে পারে এমন একটি বন্দরও কোথাও নেই এবং পথে এমন কয়েকটি বন্দর তোমার দরকার। আর স্থল—কেউ যদি বাধা না দেয় তো তুমি কেবল এগিয়েই যাবে, কেবলই মনে হবে আরও চাই, বসন্তদিন না এই স্থলেরই দূরত্ব বাড়তে বাড়তে শেষে শত্রুকে অনাহারে মারবে। তার চেয়ে আমার মনে হয় সব রকম বিপদের দিকে চোখ রেখে যে সাবধানে চলে এবং সুযোগ বুঝে কাঁপিয়ে পাড়ে সেই বুদ্ধিমান।'

স্নেক্সাস বললেন, 'আপনার কথা ঠিক, তবে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবেন না বা বিপদের কথা ভাববেন না। যদি প্রতিটি প্রস্তাবের সব রকম সম্ভাবনা ওজন করে চলতে হয়, তা হলে কিছুই করা যায় না, বিপদের ভয়ে নিষ্ক্রিয় ও নিরাপদ হয়ে বসে থাকার চেয়ে আমি বরং বিপদের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে কাজে লাগতে চাই, তাতে ফল যাই হোক। তর্কে কিছুই প্রমাণ করা যায় না—যারা কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক তারাই লাভবান হয়, অতি সাবধানরা নয়। পারস্যের যে আজ এত গৌরব, এত প্রতিপত্তি তা কি করে হল? তার রাজারা আপনার মত ভাবেন নি বা আপনার মত লোকের পরামর্শ নেন নি বলেই তা হয়েছে। আমরাও পূর্বপুরুষদের পদ্ধতি অনুসরণ করে বসন্তকালে যুদ্ধে বেরিয়েছি, সমগ্র ইরোপ জয় করে নিখিঁয়ে দেশে ফিরব। এই বলে সম্রাট আর্জাবানোসকে সন্তোষিত ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

পরের দিন স্নেক্সাস সূর্য উপাসনা করে হেলেন্পনট অতিক্রম আরম্ভ করলেন, সকলের পার হতে সাত দিন সাত রাত্রি কেটে গেল। কথিত আছে সম্রাট যখন ইরোপে পা ফেললেন তখন স্থানীয় একটি লোক চিংকার করে উঠল, 'হা ঈশ্বর, গ্রীসকে ধ্বংস করতে তুমি এই পারসীকদের মূর্তি ঘরে ও এত লোক নিয়ে এসেছ কেন? তুমিতো আরও সহজেই তা করতে পারত।'

ইরোপে পৌঁছে আবার যখন যাত্রা আরম্ভ হয়েছে তখন হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—এক ঘোড়াকার গর্ভে জন্মাল এক খরগোস। স্নেক্সাস সে দিকে নজর দিলেন না বটে, কিন্তু এর সাংকেতিক অর্থ খুবই স্পষ্ট; ইঙ্গিতটা এই যে তিনি মহাসমারোহে সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবেন, তারপর প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসবেন ঘরে।

থ্রেসের উপকূলে এক জায়গায় পৌঁছে স্নেক্সাস তাঁর সৈন্য গণনা করলেন, নৌসেনা বাদ দিয়ে মোট সংখ্যা ষাটাল সতের লক্ষ। গণনার জন্ত প্রথমে দশ হাজার লোককে ঠাসাঠাসি করে ষাঁড় করিয়ে তাদের ঘিরে একবৃত্ত টানা হল, তারপর সেই জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘিরে পর পর এক এক দল করে সৈন্য তার মধ্যে গাদাগাদি করে ভরা হল; প্রত্যেক দলের সংখ্যা ধরা হল দশ হাজার।

এর পরে হেরোডোটাস বিভিন্ন জাতির যোদ্ধাদের পোষাক, অস্ত্র ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা নিয়েছেন। পারসীকদের সজ্জা ও উপকরণ ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ; প্রত্যেকের দেহ নাকি স্বক স্বক করছিল সোনায়—'অমূল্য পরিমাণ' সোনা ছিল সঙ্গে; তা ছাড়া ছিল গাড়ি ভর্তি সুসজ্জিত নারী ও দাস, বিশেষ বিশেষ খাদ্য ইত্যাদি। আরব, ইথিওপীয়, মিডীয়, লিডীয় ও অনেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে হেরোডোটাস ভারতীয়দেরও নাম করেছেন—তার। স্মৃতির পোশাক পরত, অস্ত্র ছিল বেস্তের তীর-ধনুক, তাঁরের মাথায় লোহা বসানো।

সংখ্যা গণনার পরে স্নেক্সাস তাঁর স্থলসেনা ও নৌবহর পরিদর্শন করলেন। পাটীর সিংহাসনচ্যুত রাজা ডামারাতোস এই অভিযানে ছিলেন, পরিদর্শনের পর তাঁর সঙ্গে আসর যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর আলপ হল। সম্রাট বললেন, 'আপনি গ্রীসের লোক তাও আবার এক ক্ষমতাপন্ন শহরের নাগরিক, বলুন তো গ্রীসেরা কি আমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস পাবে? আমার নিজের ধারণা গ্রীস ও অন্তর্ভুক্ত

পাশ্চাত্য দেশ একত্র হয়ে আমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যখন ঐক্য নেই।’

তামারাতোস বললেন, ‘মহারাজ, প্রিয় বলব না অপ্রিয় বলব?’

রাজা বললেন, ‘সত্য বলুন, তাতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না।’

তখন তামারাতোস জবাব দিলেন, ‘গ্রীসের লোক শৌর্ধের দ্বারা দারিদ্র্য ও অধীনতা ঘরে রেখেছে। ডোরীয় বংশজাত সব গ্রীসীদের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাবান, কিন্তু বিশেষ করে স্পার্টাবাসীদের কথা বলছি। গ্রীসকে দাস হতে হয় এমন সর্ব তারা কিছুতে গ্রহণ করবে না, বিতীয়ত, সমস্ত গ্রীস বস্ততা স্বীকার করলেও তারা লড়বে—সংখ্যার মাটে এক হাজার হলেও তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে।’

জের্কাসাস তাঁর কথা অবিশ্বাস করে হেসে বললেন, ‘তা যদি সত্য হয় তবে যেহেতু আপনি তাদের মধ্যে রাজা ছিলেন একাই আপনার আমাদের কুড়ি জনের সঙ্গে লড়াই করতে পারা উচিত। কিন্তু আপনি ও অস্ত্রাত্ত যে সব গ্রীসীর আমার সভার এসেছে তাদের দেখে এই দাবি কিছুটা আশ্চর্য্যবিতা মনে হয়। তা ছাড়া গ্রীসীরবাহিনী এক নেতার শাসনে আবদ্ধ নয়, এই অবস্থার সংখ্যার সমান হলেও তারা পায়সীকদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।’

তামারাতোস বললেন, ‘মহারাজ, আমি জানতাম সত্য কথাটা আপনার প্রিয় হবে না। আমার দেশের লোক আমার বংশগত ক্ষমতা ও সুখ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছে, আমাকে দেশান্তরী করেছে, তাদের প্রতি আমার খুব অমুগ্ধাঙ্গ নেই; পক্ষান্তরে আপনার বাবা আমাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তবু আপনি জানতে চেয়েছিলেন বলে স্পার্টাবাসীদের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য বলেছি। আমি নিজে যুদ্ধে দশজনের সমান এমন দাবি করি না—একজনের সঙ্গেও লড়াবার ইচ্ছা আমার নেই; তবে কোনও মহৎ আশ্রয় যদি ডাক দেয় তো আপনার ঐ সৈন্যদের একজনকে প্রতিরোধ করে আমি অস্ত্রাত্ত আনন্দ পাব, যদিও তারা বলে তারা একজন তিনজন গ্রীসীর সৈনিকের সমান। গ্রীসীররা স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ করে বাটে, তবু তাদের এক নেতা আছে, আপনাকে আপনার প্রজারা যেমন ভয় করে তাকেও তারা সেই রকম ডরায়—তার নাম নীতি। এই প্রভুর আদেশে তারা যুদ্ধে কখনও পিছিয়ে যায় না, শত্রু যতই বড় হোক, হয় জেতে নয় মরে। হয় তো আপনি ভাগ্যেই আমি রাজ্যে বসছি, তা’হলে আমি মুখ বন্ধ করেই থাকব, আপনি কথা বলতে বলেছেন বলেই বলেছি।’

জের্কাসাস হেসে তাকে বিদায় দিলেন।

নানা দেশ পাহাড় বন অতিক্রম করে পারসীকবাহিনী এগিয়ে চলল। এক জায়গায় এক নদীকে ধুশি করতে পুরোহিতরা কতগুলি সাদা বোড়া আহুতি দিল, অস্ত্রাত্ত তারা নয়টি বালক ও বালিকাকে জীবন্ত সমাধি দিল। হেরোডোটাস বলছেন এটা পারসীক রীতি; জের্কাসাসের দ্বী আমেগ্রিস নাকি বৃদ্ধ বয়সে চৌদ্দটি উচ্চবংশীয় পারসীক বালককে জীবন্ত সমাধি দিয়েছিলেন—তাঁর আশা ছিল যে, পাস্তালের রাজা তাঁর নিজের বদলে এই উপহার গ্রহণ করবেন। সর্বত্র রাজা ও তাঁর বাহিনীর খাবার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় লোকেরা প্রায় নিঃশ্ব হয়ে গেল, উপরন্তু খালা-বাটি পর্যন্ত তারা হারাল। অ্যাব্‌ডেরার কাছে

এক জায়গায় রাতে সিন্ধের দল এসে ভারবাহী উটগুলিকে আক্রমণ করল, অস্ত্রাত্ত পশু ও মানুষকে কিছু বললে না।

বে সব দূত ইতিপূর্বে গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছিল, সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হতে হতে তারা একে একে ফিরে এল, কেউ খালি হাতে, কেউ বস্ততার চিহ্নস্বরূপ মাটি ও জল নিয়ে।

প্রায় দশটি জাতির থেকে অধীনতার স্বীকৃতি পাওয়া গেল, যারা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বন্ধপরিকর তারা প্রতিজ্ঞা করলে যে, যুদ্ধ শেষ হলে এই সব রাজ্যগুলির সম্পত্তির এক-দশমাংশ কেড়ে নিয়ে দেল্‌ফাইব দেবতাকে উপহার দেওয়া হবে।

অ্যাথেন্স ও স্পার্টাতে যে জের্কাসাস দূত পাঠান নি তা ইতিপূর্বে দারেইওসের দূতের প্রতি তারা কেমন ব্যবহার করেছে সে কথা মনে করে অ্যাথেন্সেরা তাদের হীন অপরাধীর গর্ভে ফেলে দিয়েছিল, স্পার্টাবাসীরা কলেছিল কুঠাতে এবং বলেছিল যে মাটি ও জল তারা চায় তা ঐখানেই পাওয়া যাবে। এর ফলে অ্যাথেন্সের কি দুর্গতি হয়েছিল তা হেরোডোটাস জানানো না, তবে স্পার্টাবাসীরা বহুদিন ধরে মন্দিরে আহুতির পরিবর্তে কোনও শুভ লক্ষণ পেল না। এতে অস্ত্রাত্ত বিচলিত হয়ে তারা ঘন ঘন নাগরিকদের সভা ডেকে ভিত্তিমালা করতে লাগল দেশের জন্ত মরতে কে রাজী আছে। অবশেষে স্পের্কিয়াস ও বুলিস নামক সম্ভ্রান্ত ও ধনীবংশীয় দু’জন লোক এগিয়ে এল দারেইওস-দূতদের হত্যার অপরাধ মোচনের জন্ত জের্কাসাসের কাছে প্রাণ দিতে।

পারস্যের পথে এদের পরিচয় হল এশিয়াস সমগ্র উপকূলঞ্চলের শাসক হিন্দার্তাস নামক এক পারসীকের সঙ্গে। সে নিজের বাড়িতে এদের আতিথ্য করে খাবার সময়ে বললে, ‘আপনারা আমাদের রাজ্যের সঙ্গে সখ্য স্থাপন কর’ত রাজী নন কেন? আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন তিনি কুপের আদর জানানো। জের্কাসাস মনে করেন আপনারাও গুণীলোক, আপনারা দু’জনে যদি তাঁর অধীনতা মেনে নেন তো গ্রীসীর দেশগুলির কতক তিনি আপনারদের হাতে তুলে দেবেন।’

অতিথিরা জবাব দিলে, ‘আপনি সবটা না বুঝে এমন পরামর্শ দিচ্ছেন, বিশ্বটায় একদিক শুধু দেখতে পাচ্ছেন। দাসত্ব কি আপনি জানেন, কিন্তু অধীনতার স্বাদ কখনও পান নি, তা তিতো কি মিঠে তা জানেন না। যদি জানতেন তো দরকার হলে তার জন্ত কুড়াল হাতে নিয়েও যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিতেন।’

সুজাতে পৌঁছে যখন তারা রাষ্ট্রার সামনে উপস্থিত হল তখন প্রথমই রাজার দেহরক্ষীরা তাদের দিয়ে সাঠিঙ্গে প্রবিপাত করাতে চেষ্টা করল। তারা বললে, তাদের মাথা জোর করে ঠেলে মাটিতে ছুঁইয়ে দিলেও তারা কখনও তাতে রাজী হবে না—তাদেরই মত রক্ত-মাংসের কোনও মানুষকে পূজা করার রীতি স্পার্টাতে নেই। এর জন্ত তারা পারস্যে আসে নি, এসেছে পারস্য-রাজত্বের হত্যার জন্ত শাস্তি নিতে। শুনে জের্কাসাস পরম ঔদার্য্য সহকারে বললেন যে, স্পার্টাবাসীরা বিশ্বের রীতির বিরুদ্ধে বিদেশী রাজত্বত্বদের হত্যা করে যে অপরাধ করেছে, স্পার্টার বিরুদ্ধে সেই অপরাধই তিনি করবেন না, তা ছাড়া প্রতিশোধ নিয়ে স্পার্টাবাসীদের পাপমুক্তি দিতে তিনি চান না।

স্পের্কিয়াস ও বুলিস নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে গেল।

## গ্রীসের প্রস্তুতি

পারসীক অভিযানের নামমাত্র লক্ষ্য অ্যাথেন্স হলেও স্পের্তাসের আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র গ্রীস জয়। অভিযান আরম্ভ হবার পরে গ্রীসে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। যে সব জাতি আগেই বহনতা স্বীকার করল, ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হবে। এই আশার ভারা খৃশ্মিনে রইল; যারা স্বাধীনতা মানল না তারা শক্তিত হলে ভবে যে, সমগ্র গ্রীসে যথেষ্ট জাহাজ নেই এবং দ্বিতীয়ত গ্রীসের অধিকাংশ লোক যুদ্ধে বীতশ্রী, পারসীক শাসন মেনে নিতে রাজি।

হেরোডোটাস এইখানে অ্যাথেন্সের উচ্চ প্রশংসা করে আবেগের পরিচয় দিয়েছেন যা তিনি সাধারণত করেন না। তিনি বলছেন, 'এই প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিমত প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও জানি অধিকাংশ লোকে তা মানেন না। অ্যাথেন্সেরা বিপদ দেখে যদি নিজের রাষ্ট্র ছেড়ে পালিয়ে যত বা আত্মসমর্পণ করত তা হলে জলে পারসীকদের প্রতিরোধের কোনও চেষ্টাই হত না। আর গ্রীসীয় নৌবাহিনী না থাকলে স্থলযুদ্ধের কি পরিণতি হত তা সহজেই অনুমেয়। করিন্থীয় বোজকে স্পার্টা যতই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা স্বরূপ, পারসীক নৌশক্তির মুখে তা রক্ষা করা সম্ভব হত না; তখন স্পার্টাবাসীরা একা পড়ত—হয় খুব ধানিকটা শৌর্য-বীর্য দেখিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিত, নয় তো গ্রীসের বাকি আশের অবস্থা দেখে তাঁরাও আত্মসমর্পণ করত। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অ্যাথেন্সই গ্রীসকে বাঁচিয়েছে। গ্রীসের ভাগ্য ছিল তার হাতে, সে যেমতিকে যেত সেই গুরুত্ব ছিল। অ্যাথেন্সেরা স্থির করল গ্রীস বাঁচবে, তার স্বাধীনতা রক্ষা করবে, তখন যে সব রাজ্য বহনতা মানে নি তাদের তারা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করল। ঈশ্বরের সহায়ে অ্যাথেন্সীয়রা পারস্ত-রাজকে বিতাড়িত করেছে। দেলফাইর দৈববাণীতে যে ভরসার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল তাও তাদের স্ফূর্ত্যাকৃত করতে পারে নি। শত্রু বোধ করতে তারা বহুপরিচর থেকেছে।'

দৈববাণীর নির্দেশমত কাজ করবে ভেবেই তারা দেলফাইতে দূত পাঠিয়েছিল, সেখানে পুরোহিতানীর মুখে তারা শুনল আসন্ন ধ্বংসের কথা—শুনল যুদ্ধের রথের নীচে হাত, পা, মাথা, দেহ সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে, ছাতের উপর দিয়ে কাশো রক্ত বয়ে যাবে ইত্যাদি। 'এখনও বসে আছ কেন, পৃথিবীর শেষপ্রান্তে পালাও', বললে দৈববাণী।

দূতরা তা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু দলের একজনের পরামর্শ অনুসারে জলপাইর শাখা হাতে নিয়ে আবার মন্দিরে ঢুকল এবং অ্যাপোলো দেবের কাছে দেশের জন্ত আরও সদর ভাগ্য তিক্ষা করলে।

এবার যে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া গেল তাতেও নির্দেশ ছিল এশিয়ার পদাতিক ও অস্বারোহীরা জন্ত অপেক্ষা না করে পলায়ন করতে, এও বলা ছিল যে, 'ঐশ্বরিক স্পার্টামিসেস' দ্বীলোকের গর্ভজাত পুত্ররা মারা পড়বে; তবু এ বারের বাণী আগের মত অতটা নির্ধর মনে হল না। দূতরা তা লিখে নিয়ে অ্যাথেন্সে ফিরে এল, সেখানে বিশেষজ্ঞরা নানা রকম ব্যাখ্যা করলে, কখনও তার একটা আর একটাব সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকের মধ্যে একটি পক্ষি ছিল যে, 'কাঠের দেয়াল নষ্ট হবে না, তাই তোমাদের বাঁচবে'; জনকয়েক এর অর্থ করলে যে অ্যাক্রিপালিস ধ্বংস হবে না, কারণ এই গিরির চতুর্দিকে তখন

কাঁটা গাছের বেড়া ছিল। অস্ত্রা বললে কাঠের দেয়াল অর্থ জাহাজ সুতরাং অবিলম্বে নৌশক্তি বাড়ানো উচিত। অথচ এ দিকে স্পার্টামিসেস বিপর্যয়ের কথাও বলা হয়েছে—এই হেরালি নিয়ে বখন সবাই চিন্তিত তখন থেমিস্তোক্ল্যাস নামে একজন বললে যে, স্পার্টামিসেস নিশ্চয় শত্রুর সর্বনাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নয় তো 'ঐশ্বরিক স্পার্টামিসেস' না বলে 'যুব স্পার্টামিসেস' বলা হত।

পেশাদার ব্যাখ্যাকাররা শুধু জলযুদ্ধের বিস্মৃতি পরামর্শ দেয় নি, সব রকম প্রতিরোধেরই বিপক্ষে চলেছে, কিন্তু নাগরিকরা থেমিস্তোক্ল্যাসের ব্যাখ্যাই ভাল মনে করল। স্বাধীনতাকামী গ্রীসীয় রাজ্যগুলি এক সভার মিলিত হয়ে স্থির করলে যে, সর্বপ্রথমে তাদের গৃহবিবাদ বন্ধ করা দরকার। স্পের্তাস সার্ডিসে পৌঁছেছেন জেনে তারা এশিয়ার গুপ্তচর পাঠাতে মনস্থ করল। তা ছাড়া আর্গস, সিসিলি, কর্সাইরা (বর্তমানে কর্শু) ও ক্রীটে দূত গেল গ্রীসের জাতীয় সংকটে সাহায্য প্রার্থনা করে।

তিনটি গুপ্তচর সার্ডিসে এসে পারসীকবাহিনীর সব খবর সংগ্রহ করল, কিন্তু অবিলম্বে ধরা পড়ল। সেনাপতিরা বখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে উজ্জত তখন স্পের্তাস খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ শাস্তি রদ করে বলে পাঠালেন, গুপ্তচরদের যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই লোকগুলিকে প্রেরণ করে বখন তাদের আর্গমেনের কারণ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ রইল না, তখন রক্ষীদের হুকুম করলেন তাদের সঙ্গে করে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেনাবাহিনীর সব কিছু দেখাতে; যা যা তারা দেখতে চায় তার সব দেখে নেবার পর তারা নিরাপদে যে দেশে খুশি ফিরে যেতে পারে। তারপর স্পের্তাস তাঁর এই আদেশের কারণ প্রকাশ করে বললেন যে, এই তিনজনকে মেয়ে ফেললে গ্রীসের এমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু এরা যদি দেশে ফিরে পারস্যের প্রচণ্ড শক্তির কথা বলে তো তাঁর খুব উপকার হবে—গ্রীস বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে।

স্পের্তাস বখন অ্যাথেন্সে ছিলেন তখন কতগুলি শস্যবাহী জাহাজ হেলস্পন্ট অতিক্রম করে ইজিনা ও পেলপিনাসের দিকে যাচ্ছে দেখেও তিনি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাঁর বিশ্বাস ছিল ঐ শস্য তাঁরই হাতে পড়বে, সুতরাং আগে থেকে তা কেড়ে নিয়ে নিজের ভার বাড়ানো নিরর্থক।

তিন গুপ্তচর বখন ফিরে এল তখন গ্রীসীরা আর্গসে দূত পাঠাল সাহায্যের অমুরোধ জানিয়ে। আর্গসবাসীরা বলে যে, পারস্য বখন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে তখনই এই অবস্থার আশঙ্কা করে তারা দেলফাইতে লোক পাঠিয়েছিল নির্দেশের জন্ত। দৈববাণী স্পষ্ট বললে গ্রীসের হয়ে যুদ্ধ না করতে। স্পার্টার সঙ্গে তখন তাদের যুদ্ধ চলাছিল, অলদীন আগে তারা হুঁহাজার সেনা হারিয়েছে। দৈববাণী উপেক্ষা করে তারা সমগ্র গ্রীসের হয়ে যুদ্ধ করতে রাজী হল, যদি স্পার্টার সঙ্গে ত্রিশ বছরের যুদ্ধবিরতি হয় এবং সম্মিলিত বাহিনীর উপর স্পার্টার সঙ্গে আর্গসের সমান কড়ত্ব থাকে। প্রথম সর্জের এই উদ্দেশ্যে যে ত্রিশ বছরে তাদের আবার একতল বোঝা তৈরি হবে; পক্ষান্তরে এই সময়টা তারা যদি হাতে না পায় এবং উপরন্তু পারস্যের কাছে পরাজিত হয় তবে এত বিপর্যয়ের পর স্পার্টার কাছে তাদের দাসত্ব কার্যেই হয়ে যাবে; এই ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা দেলফাই

যায়। এ ছাড়া খাবারের সৈন্যদেরও তিনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন; খাবার মনে মনে শত্রুর পক্ষে ছিল, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তাই। তাঁর ডাকে সাড়া দেয় কি না; কিন্তু সাড়া দিলেও তাদের সহায়ত্বিত্তির পরিবর্তন হয় নি। লেওনিদাস ও তাঁর তিন শো সেনা প্রধান বাহিনীর আগে এগিয়ে গেলেন যাতে অজ্ঞাত মিত্রপক্ষীয় রাজ্যগুলিও যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়; স্পার্টাকে পিছিয়ে থাকতে দেখলে তারা অনার্যসে শত্রুর দিকে চলে যেতে পারত। তখন ওলিম্পিক উৎসব চলছে, সেই কারণে মিত্ররাজ্যগুলি বেশি লোক যুদ্ধ পাঠাতে পারে নি; সকলেরই ধারণা ছিল খার্মগিলির যুদ্ধ শেষ হতে সময় লাগবে।

পারসীকবাহিনী এখন এই গিরিসংকটের কাছে এসে পড়েছে তখন তাদের বোধ করা যাবে কি না সে সম্বন্ধে হঠাৎ গ্রীসীদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল। পশ্চাদপসরণের কথা বিবেচনা করতে এক সভা বসল, পেলপনিসীয়রা বললে তাদের উচিত পেলপনিসিয়ায় গিয়ে করিষ্টীয় যোদ্ধাটিকে রক্ষা করা; অজ্ঞাত এই প্রস্তাবে আপত্তি করল, তখন লেওনিদাস তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন যে তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে এবং বিভিন্ন রাজ্যের কাছে আরও সৈন্য চেয়ে পাঠাবে।

এই সভা এখন চলছে তখন স্পার্টাস এক অস্বাভাবিক প্যাঠালেন প্রতিপক্ষের ক্ষমতার অসুস্থ্য নিয়ে আসতে, সৈন্যেরা কি করছে তাও সে দেখে আসবে। এই লোকটি গ্রীসীর শিবিরের কাছাকাছি এসে যতটা দৃষ্টি যায় তার সবটা ভাল করে দেখল, যদিও এক দেয়ালের আড়ালে কিছু সৈন্য তার চোখে পড়ল না। যাদের দেখতে পেল তারা স্পার্টার সেনা, কেউ তখন নগ্নদেহে ব্যায়াম করছে, কেউ চুল ঝাঁড়োচ্ছে। পাগোস গুপ্তচর অবাক হয়ে তাদের দেখল, তারপর সন্ধ্যা ও আর যা যা জানার ছিল তা লক্ষ্য করে নিঃশব্দে ফিরে গেল। কেউ তাকে নব্বড় করল না, কেউ ধরতে চেষ্টা করল না।

তার মুখে সব শুনে স্পার্টাস হতভম্ব হয়ে গেলেন। স্পার্টার সেনারা যে হয় মারতে নয় মরতে প্রস্তুত এটা তাঁর কল্পনার বাইরে—ব্যাপারটা কেবল অদ্ভুতই হৈল তাঁর কাছে। দ্যামারাতোসকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি সব বললেন জানতে চাইলেন তাদের এই ব্যবহারের অর্থ কি।

দ্যামারাতোস বললেন, 'এই অভিযান আরম্ভের সময়ও এদের সম্বন্ধে আপনাকে বলেছিলাম, এই উদ্দেশ্যের ফল কি পাঁড়াবে তা আপনাকে বলতে আপনি হেসেছিলেন। এরা এসেছে আমাদের থেকে এই গিরিসংকট রক্ষা করতে এবং তাঁরই জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জীবন যখন বিপন্ন তখন বেশ পরিচর্যা করা স্পার্টার রীতি। এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, আপনি যদি এদের এবং দেশস্থ স্পার্টাবাসীদের হারাতে পারেন তবে জগতে আর এমন জাতি নেই যে আপনার বিরুদ্ধে হাত তুলতে সাহস করবে। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং শ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে আপনাকে এখন যুদ্ধ করতে হবে।'

স্পার্টাস তবু বিশ্বাস করতে পারলেন না—এত অল্প সৈন্য কি করে তাঁর প্রকাণ্ড বাহিনীর সঙ্গে লড়ায়ে তা তাঁর কল্পনার অতীত।

শত্রু অপসরণ করবে এই আশার সম্রাট চার দিন অপেক্ষা করলেন, তারপর তাদের নির্বোধ ও অজ্ঞতা দেখে অত্যন্ত বেগে কোষকে হুকুম

করলেন তাদের বন্দী করে তাঁর সামনে হাজির করতে! মিডীয় আক্রমণে অনেকে হতাহত হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অজ্ঞেয়া তাদের জায়গা দখল করল, প্রচণ্ড ক্ষতি সত্ত্বেও হার মানল না। তারা প্রমাণ করল যে, পারস্য-রাজের বাহিনীতে অনেক লোক, কিন্তু বোদ্ধা অল্প। সারাদিন ধরে যুদ্ধ চলল, প্রান্ত মিডীয় সৈন্যদের সরিয়ে অবশেষে হিদার্যাস তার বাছা বাছা পারসীক সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হল। তার বিশ্বাস ছিল যে এবার যুদ্ধ সহজে শেষ হবে, কিন্তু সেও কিছু সুবিধা করতে পারল না। সেই সংকীর্ণস্থানে পারসীক সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনও কাজে লাগল না।

স্পার্টার সেনারা যুদ্ধ বোধে তাদের শত্রু ছিল অনভিজ্ঞ। মাঝে মাঝে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়নের অভিনয় করত, জয় আসন্ন ভেবে শত্রু যেই সিংহনার করে এগিয়ে আসত তখন ঘুরে ফিরিয়ে তাদের প্রচুত ক্ষতি করত। স্পার্টার হতাহত খুব বেশি হয় নি। অবশেষে পারসীকরা নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ বিরতি দিয়ে ফিরে গেল। স্পার্টাস এক জায়গায় বসে সব দেখলেন, শোনা যায় নিজের বাহিনীর বিপদ দেখে তিনবার তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন।

পরদিন পারসীকরা আবার আক্রমণ করল, তারা আশা করেছিল যে, সংখ্যার আতঙ্কিত সেনা আর প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু এ বারও তারা সুবিধা করতে পারল না, হটে যেতে বাধ্য হল। এ অবস্থায় কি কর্তব্য তা ভেবে না পেয়ে স্পার্টাস এখন খুব ভাবিত হয়ে আছেন, তখন হঠাৎ স্থানীয় একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তাঁর নাম এফিফালতাস, মোটা পুরুদেহের লোভে সে সম্রাটকে জানাল খার্মগিলিতে পৌঁছাবার আর একটি অপরিচিত পার্শ্বা পথের খবর। এই বিশ্বাসঘাতকের পরে অশ্রুস্রূতা ঘটেছিল।

এফিফালতাসের খবরে খুশি হয়ে হিদার্যাস তৎক্ষণাৎ আসল গিলেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে যাবার। এখন তারা বাড়া স্তম্ভ করল তখন সম্রাট বাতি জালা হচ্ছে, সারারাত পার্শ্বা পথে চলে ভোরে তারা এক শিখরে পৌঁছাল; সেখানে এক হাজার মিত্র পক্ষীয় সেনা পাহারা দিচ্ছে, পারসীকরা একতরফ বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে, কেউ তাদের দেখতে পার নি। কিন্তু এখন তারা শিখরে পৌঁছাল তখন এতটুকু বাতাস ছিল না, বরা পাতার উপর তাদের পায়ের শব্দ পরিষ্কার শোনা গেল। মিত্রপক্ষীয় প্রহরীরা লাফিয়ে উঠে অল্প তুলে নিতে নিতে শত্রু তাদের উপর খাঁপিয়ে পড়ল। গ্রীসীরা যে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে, তাই পারসীকদের আশ্চর্য মনে হল—কোনও রকম বাধা তারা আশা করে নি। হিদার্যাসের সন্দেহ হ'ল হয় তো এরা স্পার্টার বোদ্ধা, কিন্তু এফিফালতাসের কাছে সঠিক পরিচয় জেনে যুদ্ধ চালিয়ে গেল সে। পারসীক বাণ আকাশ কাশে হঠাৎ সন্ধ্যা প্রতিকূল তখন পূর্বের উচ্চতম অংশে হটে গেল, যদি দরকার হয় সেখানে মরবে বলে। পারসীকরা তাদের প্রতি আর নজর দেয় না দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল নিজদের পথে।

খার্মগিলির গ্রীসীরা অবিলম্বে তাদের বিপদ উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ আলোচনা আরম্ভ হল। কেউ বললে এই বাটী ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, কেউ প্রকাশ করলে বিশ্রীত মত। ফলে সেনাবাহিনী দু'ভাগ হয়ে একদল ঘুরে ফিরে গেল, আর একদল থাকল

## বিবের প্রথম মহাবীর

লেওনিদাসের সঙ্গে। কেউ কেউ বলে তিনি নিজেই অনেককে বিদায় নিয়েছিলেন তবুও প্রাণ বাঁচাবার জন্য। স্পাটার থেকে তাঁর অধীনে ধারা এই সংকট রক্ষা করতে এসেছে, তাদের পক্ষে তা ত্যাগ করে যাওয়া অশোভন হবে যেহেতু তিনি তাদের নিয়ে থেকে গেলেন। হেরোডোটাসেরও ধারণা যে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি থেকেছিলেন—কলে মহান এক নাম অবিদ্যরহী হতে বইল ইতিহাস, স্পাটাকেও তার সযুষ্টি হারাতে হল না; কারণ যুদ্ধের প্রারম্ভেই দৈববাণীতে জানা গিয়েছিল যে হয় তাদের শহর বিদেশীরা ধূলিসাৎ করবে, নয় তো এক রাজ্য প্রাণ দেবে। হেরোডোটাসের বিশ্বাস এই বাণী লেওনিদাসকে প্রভাবান্বিত করেছিল, তা ছাড়া তিনি স্পাটার জন্য এমন প্রসিদ্ধি রেখে যেতে চেয়েছিলেন যার ভাগ অন্য কোনও শহর পাবে না। যারা ধার্মিকি থেকে চলে এসেছিল তিনিই তাদের যেতে বলেছেন—‘তারা পলায়ন করে নি বা মতবিরোধের ফলে আদেশ অমান্য করে নি।’

সকলবেদা সূর্য তর্পণ করে জের্জস্যাস তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। এর আগে গ্রীসীরা ধার্মিকি সংকটের সংকীর্ণ অংশে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রেখেছে, এবার শেষযুদ্ধ করছে জেনে তারা প্রশস্ততর ক্ষেত্রে সরে এল। অনেক শত্রু হতাহত হল, অনেকে সমুদ্রে পড়ে ডুব মরল, অনেক বহুসংখ্যক পায়ের চাপে প্রাণ হারাল। সেনাপতির ক্রমাগত চাবুক মেতে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল, লোক মরল অসংখ্য। শত্রু ভিন্নপথে পাহাড় ঘুরে আসছে জেনে গ্রীসীরা বেষরোয়া যুদ্ধ করে দেহের শেষ শক্তিটুকু ক্ষয় করলে ক্রমে তাদের সব বশী ভেঙে গেল, তখন তরবারি হাতে নিল তারা।

এই সংঘর্ষে লেওনিদাস প্রাণ দিলেন প্রকৃত বীরের মত; আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ স্পাটারবাসী মরল তাঁর সঙ্গে। তাদের এবং স্পাটার তিন শো বোদ্ধার প্রতিটি নাম হেরোডোটাস জেনে নিয়েছিলেন যাতে লোকে তাদের মনে রাখবে। পারসীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রাণ হারাল, তার মধ্যে ছিল জের্জস্যাসের দুই ভাই। লেওনিদাসের দেহ নিয়ে তিন সংঘর্ষে চলল, চারবার শত্রুকে বিতাড়িত করে শেষ পর্যন্ত গ্রীসীরা দেহটি টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। এইভাবে অনেকজন যুদ্ধ চলার পর পারসীকদের নতুন সৈন্য কাছাকাছি এসে পড়ছে দেখে গ্রীসীরা গিরিসংকটের সংকীর্ণ অংশে সরে গেল আরও ঘন হয়ে, তখন যুদ্ধের চেহারা বদলে গেল। সংকটের মুখে ছোট্ট এক পাহাড়ের উপর পাথরের এক সিংহমূর্তি গড়া হয়েছিল। পরে লেওনিদাসের স্মৃতিতে হেরোডোটাস তা দেখেছিলেন, এইখানে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে মরেছিল গ্রীসীরা—কারণ হাতে তলোয়ার, কাণ্ডে হাতিরার শুধুমাত্র হাত আর পীত—বস্ত্র না শত্রু দুইদিক থেকে এসে তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করলে।

বোদ্ধাদের মধ্যে সেদিন সবচেয়ে বেশি বীর দেখিয়েছিলেন স্পাটার দিয়োক্যাস। শোনা যায় যুদ্ধের আগে তাঁকে একজন বলেছিল যে, পারসীকরা যখন তাঁর ছুড়তে আরম্ভ করে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে।

তার উত্তরে দিয়োক্যাস শান্তভাবে শুধু মন্তব্য করলেন, ‘ভাল

খবর, আমাদের রোদে লজ্জাই করতে হবে না।’ এই ধরণের আরও অনেক উক্তি নাকি তাঁর আছে। স্পাটার বোদ্ধাদের পাশাপাশি থেম্পীর সৈন্যরাও বীরবিক্রমে লাঞ্জে।

যে বোদ্ধা মরেছিল তাকে সেখানেই কবর দেওয়া হল, গ্রীসীর বাহিনী দু’ভাগ হয়ে যাবার আগে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদেরও সমাধিস্থ করা হল। সমাধির উপরে লেখা হল; ‘পেলপুসের দেশ থেকে চার হাজার বোদ্ধা এখানে খ্রিশ লক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁড়িয়েছে।’ স্পাটারবাসীদের জন্য ছিল এক বিশেষ স্মারকলিপি; ‘হে পাঠক, স্পাটার গিয়ে বল, আমরা তাদের আদেশ মেনে এখানে মরেছি।’

স্পাটার তিন শো বোদ্ধার মধ্যে ছিল এউরিতোস ও আরিস্তোভ্যামোস, কঠিন চক্ষুরোগে ভুগছিল বলে লেওনিদাস যুদ্ধের আগে তাদের পাঠিয়ে দিলেন স্বস্থ হতে। পথে দু’জনের মধ্যে বিবাহ শুরু হল—স্পাটার ফিরে যাওয়া অথবা বহুদূর সঙ্গে ঝাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা এর কোনওটাতোই তারা একমত হতে পারল না। পারসীকরা পাহাড় ঘুরে চলে এসেছে শুনেই এউরিতোস তার ভৃত্যকে বললে, ‘কলঙ্ক যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে; সে প্রভুর আদেশ পালন করেছে পালাল, এউরিতোস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিল। আরিস্তোভ্যামোস অ্যাম্বিনিতে থেকে গেল, এউরিতোসকে অনুসরণ করতে তার সাহস হয় নি। তাকে কিরে আসতে দেখে স্পাটার লোক ভীষণ রেগে গেল; হেরোডোটাসের ধারণা আরিস্তোভ্যামোস একাই যদি অস্বস্থ হয়ে ধার্মিকি ছাড়ত, অথবা দু’জনেই যদি সেখানে ফিরে যেত তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হত না। অস্বস্থের দোহাই দু’জনেই দিতে পারত, কিন্তু একজন মরল আর একজন প্রাণ বাঁচল দেখেই দেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল।

আরিস্তোভ্যামোস কি করে স্পাটার ফিরল সে সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে। গ্রীসীর শিবির থেকে তাকে নাকি এক বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং যদিও তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল কিরে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার, সে ইচ্ছা করে পথের দেরি করে প্রাণ বাঁচাল। সঙ্গের লোকটি যথাকালে ফিরে গিয়ে যুদ্ধে মরল। সে যাই হোক, দেশে ফিরে তার ভাগ্যে জুটল তিরস্কার ও অপমান। ঘরে আগুন জ্বালতে কেউ তার কাছে দেশলাই ধরল না, কেউ কথা বললে না তার সঙ্গে, সবাই তার নাম দিল ‘কাপুনে’। কিন্তু পরে সে সব ক্ষতির পূরণ করেছিল প্র্যাটিয়ার যুদ্ধে। এমনও শোনা যায় যে ঐ তিন শো বোদ্ধার সবাই মরে নি, একজন বেঁচেছিল। তাকেও এক বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল যেসালীতে, কিন্তু স্পাটার ফিরে কুখ্যাতি সহিতে না পেরে সে গলায় দড়ি দিল।

বীরদের সৈন্যরা ধার্মিকিলিতে বাধ্য হয়ে কিছুটা যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু যেই তারা দেখল পারসীকরা জিতে যাচ্ছে তখন স্পাটার সৈন্যদের অপসারণের সুযোগ নিয়ে তারা দু’হাত বাড়িয়ে শত্রু কাছাকাছি গিয়ে আত্মসমর্পণ করল, চিৎকার করে বললে তারাই প্রথম পারসীকদের মাটি-জল পাঠিয়েছে, তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এসেছে। ইত্যাদি। কথাগুলি সবই সত্য এবং প্রায় সবাই তারা প্রাণে বাঁচল, কিন্তু জের্জস্যাসের আদেশে সেনাপতিত্ব করতের দেহ চিহ্নিত করে দেওয়া হল

# আর এক আক্রমণ

তপতী রায়।

॥ শ্বেতাংশ ॥

এবার ওর কথাই যেন অবিশ্বাস করতে পারল না ওরা। বিস্ত  
হরিপদ আর না বলে পারল না।

কিন্তু মা! আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমরা  
কাচাকাচা নিয়ে সংসার। দুটো টাকার জন্মই তো সব ছেড়েছুড়ে  
এতদূরে খাটতে আসি। মাইনে না পেলে চলে কি করে বলতে পারেন?

যেমন এসেছিল, তেমনি বেগে সেখান থেকে শোবার ঘরে চলে  
এল স্মৃতিরতা।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে অকালে পোক খাওয়া রগের কাছে  
চুলগুলোর কলপ লাগাছিলেন সত্যব্রত।

পদা সরিয়ে সরেগে স্মৃতিরতাকে চুকতে দেখে সহাত্তে জিজ্ঞেস  
করলেন সত্যব্রত।

কি ব্যাপার? শোবে না?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল  
স্মৃতিরতা।

শোন! আর তো সম্ভব হয় না।

কিসে অসম্ভব হ'ল?

ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন সত্যব্রত।

তুমি হরিপদকে মাইনে দাও না?

কেন হরিপদ বলছিল নাকি?

দিয়েছ কি না তাই বল না।

গছুর হয়ে স্মৃতিরতার দিকে ফিরে দাঁড়াগেল সত্যব্রত।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন স্মৃতিরতার দিকে। রীতিমত অবাক হয়ে  
গেছেন তিনি স্মৃতিরতার দৃগুভঙ্গী দেখে।

তোমাকে কি তার জন্ম কোন কৈফিয়ত দিও হবে নাকি?

আমাকে নয় হরিপদকে, সে তার মাইনে চায়। আর সেটা  
তার ছাড়া পাওনা।

জাতি।

আর কথার অপেক্ষা না করে পৌজা চলে গেলন রাগাঘরে।

হরিপদ আলো নিভিয়ে ঘর বন্ধ করছিল! অন্ধকারে সত্যব্রতকে  
দেখে অবাক হয়ে বাগাশার আলো জ্বালাল।

হরিপদ, মাকে কি বলেছিল?

হরিপদ চুপ করেই থাকল, বাবুকে সে সত্যিই ভয় করে।

মাইনে পাস নি ব'লে অমুযোগ করেছিল না?

হরিপদ তবুও চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মেখে খুঁটতে লাগল।

হ্যাঁ রে, তিন মাসের মাইনে পাস নি ব'লে বড়মুখ করে আমার  
কাছে বলছিল? আর আমার কাছে এই যে এক বছর ধরে কাজ  
করছিল, এত ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে জানছিল এটা কি কিছুই নয়?  
বল?

কি বলবে হরিপদ? এখানে কাজ করার কি বিশেষ মূল্য থাকতে  
পারে, ও তো ভাবতে পারে না। তাই চুপ করেই থাকল।

একবার ওর মুখটা দেখে নিলেন সত্যব্রত। ওসুধে কাজ ধরেছে,  
হরিপদ বোধ হয় লজ্জিত হয়েছে ওর এই অপরাধের জন্ম, তাই উৎসাহ  
পেয়ে এবার জোরের সঙ্গে বললেন— জানিস, তুই যে সত্যব্রত সেনের  
বাড়িতে কাজ করিস, সেটা তোরা একটা পরিচয়?

হ্যাঁ হয়ে গেল হরিপদ।

ওর হাত থেকে টাফটা ক্রায় পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে একটু  
দম নিয়ে দাঁড়াল। তারপর সোজা সত্যব্রতের ঘুঘুর দিকে তাকিয়ে  
বলল, তা হলে বাবু অজ্ঞা নোক দেখবেন। আমার দারা হবে না।  
আমার টাকা মিটিয়ে দেবেন, চলে যাব।

ভাবতে পারে না আর হরিপদ।

বাবু বলেন কি? পেটের দায়ে খাটতে এসেছে সে। পরিচয়—  
পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার?

দেশে তার চারটি কাচাকাচা নিয়ে কি কষ্টে যে সন্সার চালায়  
শতুর মা তা কি সে জানে না? পরন্তু শতুর মার কাছে থেকে যে  
চিঠি এসেছে, তারপর আর স্থির থাক। বার কি করে? শতুর মা  
স্পষ্টই জানিয়েছে—এবার টাকা না পাঠালে সে গলায় দড়ি দেবে।

বেশি মাইনের লোভে সে এখানে কাজ করছে, তা ছাড়া তার গত  
অসুখে গিন্নী যা খরচ করে চিকিৎসা-পত্র করিয়েছে সেকথা ভোলে নি  
সে, নেমকহাণাম নয় হরিপদ। তাই এ অবস্থায়ও বিচ্ছু বলে নি  
সে এতদিন। জানে গিন্নী তাকে টাকা পেতেই দিয়ে দেবে।

# একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলুন



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ

গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। মাত্র ৫০ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং আপনার জমা টাকার ওপর প্রতি বছর ৩% হিসেবে সুদ পাবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই আপনার কাছাকাছি স্থানীয় শাখায় দেখা করুন। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আপনার যেকোন সমস্যার সমাধানে স্ননিপুণ ও সৌজন্যপূর্ণ সেবার জন্য আমরা সবদাই প্রস্তুত।



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বৃত্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ • সমস্তদের দায়িত্ব শীমাবদ্ধ

NGB/598 BEN

কলিকাতা: ১২, নেতাজী সুভাষ রোড; ২২, নেতাজী সুভাষ রোড, (লেফটেন্যান্ট রোড); ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লেফটেন্যান্ট রোড); ৩, চার্চ লেন; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড; ১৮, কনভেন্ট রোড, ইন্টার্লী; ১৭এস/এ, বলিনী রজন এডমিনিস্ট্রিয়েট, নিউ আলিপুর (সেক ডিপোজিট লকার); ১৩৩, রাসবিহারী এডমিনিস্ট্রিয়েট, বালিগঞ্জ; ১৩৩সি, বিধান সরণী, স্থানীয় অফিস।

কিন্তু একে তো শত্ৰু মা'র চিঠি তার ওপর এটা কর্তারই কারসাজি দেখে মরিয়া হয়ে উঠল সে। তাই একেবারে জবাব দিয়েই বলল।

সত্যতঃ একটুও বিচলিত হলেন না তার এ উত্তর প্রকাশ। স্তব্ধতা। এসে দাঁড়িয়েছে, ওর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন,— তোরা অশিক্ষিত মুখ! তোদের আর কি দোষ দব বল।

তার গলায় খেদ ফুটে উঠল। হরিপদর নীচু মুখকে আরও লজ্জা দিয়ে বললেন,—তোদের তো কোন বুদ্ধি নেই, শিক্ষিত লোকেরাই বা কি? তাৎপত্যও দুঃখ হয়, তাদের কাছেও এই টাকটাই বড় সব থেকে।

হাসি শেল স্তব্ধতার। সত্যতঃ এমনভাবে বলছেন যেন তার কাছে টাকা মাটির মতই তুচ্ছ। তার নিজের কাছেও কি টাকটাই সব থেকে বড় নয়? তিনিও কি টাকাকেই সব থেকে বড় স্থান দেন না? হরিপদর সামনে এসে দাঁড়াল স্তব্ধতা। হরিপদ! কাল তোমার মাইনে পাবে।

একটা ভীষণদৃষ্টি ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন সত্যব্রত।

রবীনের আঁকা ছবিটা শেষ হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু এটুকু এড়াতে পারে নি, একমনে এঁকে গেছে সে আর তার তুলির রেখার রেখার ফুটে উঠছে যে মুখ, সে মুখে তার মনের সবটুকু ইচ্ছা যেন রূপ পেয়েছে, সে মুখ ইলার।

ছবি শেষ হওয়ার পর তৃপ্তিই বোধ করেছে সে।

এ ছবি তার নিজস্ব, একাঙ্কই নিজস্ব, তার মনের গহনকাণে যে ভীক বাসনাটুকু আশ্রয় নিয়েছে, তার প্রকাশ থাক তার এই ছবিতে, কেউ তা জানবে না কারও দেখবার দরকার নেই।

কিন্তু ছবিতো শেষটান দেবার সময়ই অসময়ে ঘরে ঢুকলেন সত্যব্রত।

ছবিটা দেখে চমকে গেলেন তিনি। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে পড়ীর হয়ে ছবিটা দেখতে লাগলেন, তার হাতছাটি পেছনে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে মাথাটা তেলিয়ে বহুক্ষণ ধরে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন ছবিটা।

শেষ টান দিয়ে তুলিটা রেখে একটু সরে এসে ছবিটার দিকে তাকাল রবীন, সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে সত্যব্রতকে দেখে বেশ অবাক না হয়ে পারল না। বানিকটা অপ্রস্তুতও।

ওষ ঘরে এমনিতে সত্যব্রত কখনও আসেন না, তাই নিজের এই নিষ্পত্ত ঘরটিকে সুরক্ষিত কর্তব্য মত মনে করেই নিজের মনে নির্ভয়ে কাজ করে যায় সে। কিন্তু আজ সত্যব্রতকে এঘরে দেখে একটা লজ্জা আর অদ্ভুত অসুস্থতা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণেই একটা আশ্চর্যস্বাদের তৃপ্তিতে যেন মন ভরে উঠল। সত্যব্রত তার ছবিটা মগ্ন হয়ে দেখছেন।

কাকাকে সে সত্যিই ভালবাসে আর প্রজ্ঞা করে।

কত দাম ফেলেছে ছবিটার?

রবীন্দ্রের দিকে না তাকিয়েই ওকে প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত।

এটা আমি বিক্রি করব না।

খুব নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল রবীন।

অদ্ভুত কণ্ঠ প্রাইস তো ওঠাতে হবে।

সেটা অল্প ছবিতো পুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।

মনে মনে হাসল রবীন। এর কণ্ঠ প্রাইস কত ভাবেন কাকা! জ্ঞানবের সৎকৃৎ ব্যাখ্যা-বেরনা নিয়ে সে একেছে যে ছবি, আবার সবটুকু মাধুর্য চোখেছে যে ছবিতো—তার কি মূল্য দিতে পারে একজন ক্রেতা! এমনভেই সে জানে শিল্পীর সৃষ্ট ছবি, তার সত্যব্রতের মত, সামান্য মূল্যে তাকে বেচাকেনার হাটে ছেড়ে দিতে হয়, হয়ত তা অস্বস্তিকারী না হলে শিল্পী বাঁচবে না, তার জীবিকার জন্য তা করতেও হবে, কিংবা তাই বলে এই ছবি? বিক্রি করার কথা কল্পনাও করতে পারে ন রবীন।

কিন্তু এটা বেশ ভাল ছবি, বাজারে দাম পাবে, অমনি ছেড়ো না! আবার বললেন সত্যব্রত। বেরিয়ে বাবার আগে।

এটা একজনকে দেব বলে প্রতিশ্রুতি আছি।

আবার ফিরলেন সত্যব্রত। বুঝতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন, এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রতিশ্রুতি আচ্ছ, একটা ছবি দেবার? বেশ তো অল্প একটা দাও। এটা—

মা এটাই দেব বলেছি।

জোরের সঙ্গে কথাটা বলে ছবিটার ওপর সারা পাতাল কাপড়ের ঢাকটা ফেলে দিল রবীন।

রগে গা জলে গেল সত্যব্রতর। দিন-দিন রবীন যেন আরও বাইরে চলে যাচ্ছে, এত সাহস এত তেজ পাচ্ছে কোথায়? থাকত তো আগে নেহাতই আশ্রিতের মত। কোনদিন তার অস্তিত্বও জ্ঞান যেত না, শুধু কাজের ভেতর দিয়েই সে বেঁচে থাকত। এমন কি তার শিরসস্তার কোন পরিচয় দিতেও সে আগ্রহী ছিল না নিজের সিঁড়িরতলার ঘরে নিভাভ মিথিরাখে থাকত সে, নেহাতই নীরব।

অথচ কিছুদিন হ'ল লক্ষ্য করছেন যে রবীন যেন বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সরব হ'য়ে উঠছে সে। স্তব্ধতার কাছেও শুনেছেন সে কথা। এত তেজ তো ভাল নয়। সত্যব্রতর কাছে থাকার তার পরিচয় বহন করবার গৌরবকে অস্বীকার করে এখানে থাকবার কথা কল্পনাও করেই নাকি রবীন? তা ছাড়া শুধু তাই নয়, সত্যব্রত তার অলসতা। স্ট্রীও কি রবীন ভুলে যায় নাকি?

রবীনের দিকে সোজা তাকালেন সত্যব্রত। তারপর দুঃখও বললেন, তোমার আঁকার প্রতিভাকে আরও স্বীকার করি। তোমার কাকীমাকে দেখিয়েছ ছবিটা?

‘আমরাও’ কথাটার ওপর বেশ জোর দিলেন। তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। নিখুঁত আভ্যন্তরীণ হলে সত্যব্রতর চোয়াল শক্ত হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। তবে ব্যাখ্যারে তিনি অসম্বন্দ প্রকাশ করেন কঠিন কথনো।

আজও করলেন না। শুধু রবীন হাসল, শুধু ইচ্ছে নয়, কাকার আমোলে ছবিটা তাকে দেখাতেই হবে কাকীমাকে, বার কাছে এ ছবি কোনই মূল্য নেই, শিল্পীর কোন মর্মানীই বার কাছে নেই, বাবে জীবনের মূল প্রয়োজন সর্বাংগে ফিরে রয়েছে।

ভাব দেখাতে হবে।

সত্যব্রত বেগিয়ে বাবার আঘাতটা পরে ছবিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল রবীন।



## আর এক আকাশ

বারান্দাতেই সূচরিতার সঙ্গে দেখা।

সূচরিতার স্মরণ মুখানাও যেন আজ কি রকম খারাপ লাগল রবীনের কাছে।

সূচরিতার সৌন্দর্য তাকে কোনদিনই টানে না, স্মরণী হ'লেও রবীনের দৃষ্টিতে সূচরিতা যেন বড় বেশি প্রকট। আজ আবার লক্ষ্য করে দেখল সে, কাল রাত্রে পেট কিছু কিছু উঠে গেছে, চুলগুলো এলোমেলো, চোঁটের রং তখনও হালকা হয় নি।

হঠাৎ ওর এই বড় বড় প্রসাধিত মুখের ভগ্নাবশেষ তার মধ্যে কেমন একটা বিড়কা জাগিয়ে তুলল। যেন সৌন্দর্যের উৎকট বিজ্ঞাপন। আর এরই পাশে আর একজনের সরল মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ল তার। সে যখন কত স্মরণ, সে চোখে কত গভীর অতলতা, কত সহজ শ্রী সে মুখে। সেই সরল চোখে এই প্রসাধিত মুখের জন্ত কত বিষয়, কত প্রশংসা, তবু কত সহজ, কত নিষ্পাপ সে মুখ।

ওকে দেখে হাসল সূচরিতা।

উত্তরে হাসবার একটা প্রয়াস করল মাত্র রবীন। নারীজাতি বিশেষ করে মাতৃসান্নিধ্যের প্রতি তার স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাষণ সর্বদা সে সজাগ, কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই সূচরিতা সযত্নে একটা শ্রদ্ধার ভাব সে চোঁটা করেও আনতে পারে নি। শুধু কাকীয়া বলে সহ্য করেছে মাত্র। অবশ্যই তার ব্যর্থতার কোনদিনও কিছু প্রকাশ পায় নি, যেটুকু পেরেছে তা ভরসা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু রবীন ভালভাবেই জানে সেখানে আশ্চর্যিকতার লেশমাত্রও ছিল না।

আজও সূচরিতাকে হাসি দিয়ে স্বর্থোদন করবে ভেবেও পারল না, কেবলমাত্র হাসির ব্যর্থ প্রয়াসে তার মুখানা কেমন অকুণ্ট হয়ে গেল।

কি ব্যাপার? হাতে কি?

একটা ছবি।

কিসের?

একটা পোর্ট্রেট, আজই শেষ করেছি... কাকী। আপনাকে দেখাতে বললেন।

ও না হলে বুঝি দেখাতে না?

পরিহাসের চোঁটা করল সূচরিতা।

উত্তরে কোন কথা না বলে ওপরের কাগজটা সরিয়ে ছবিটা সামনে রাখল রবীন।

ভাল করে দেখবার জন্ত কাছে এগিয়ে এল সূচরিতা।

অত কাছে এগোবেন না! নর থেকেই ভাল দেখাবে অয়েলপেন্টিং কি না।

জানি... তোমার নামসই দেখছি।

দমবার যেরে সূচরিতা নয়। কিন্তু আর দেখল না। ছবিটা আর না দেখেই পোবার ঘরে ঢুক গেল সূচরিতা।

কিছুক্ষণ চুপ করে ঝাঁড়িয়ে থাকল রবীন। তারপর ছবিটা আবার তুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল সে।

আরও খারাপ লাগল রবীনের, ভাসবে তবু মচকাবে না।

আসবার সময় সূচরিতার গলার উঁচু হাসি স্তনতে পেল। মনে হল বোধ হয় ইচ্ছে করেই তাকে স্তনিয়ে স্তনিয়ে হাসতে সূচরিতা। কান দুটো ঝাঁঝ করে উঠল রবীনের। অবশ্যই শিল্পী

মর্যাদা পাবার প্রত্যাশা এর কাছে সে করে না, কিন্তু নিজেরও তো একজন শিল্পী। তাহলে? কেবলমাত্র অর্থই কি তাকে টেনে এনেছে এখানে? নিজেকে তিনি শিল্পী বলেই তো প্রচার করেন, তাহলে? কতটুকু দাম তাঁর কাছে শিল্পের?

শুধু কাকার অমুরোথেই না সে এসেছিল আজ। তা না হলে সে ভালভাবেই জানে তার সাধনা নিজের, এদের নিন্দা প্রশংসার তার কিছু আসে যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দুটি বড় বড় সরল চোখের সপ্রশংস দৃষ্টি। এতেই সে ভুগল। মুহূর্ত্তা কিশোরীর চোখে সে আশার আলো দেখেছে সেখানেই সে পেরে গেছে তার সাধনার সার্থক পূর্বস্বার। আর কিছু সে চায় না।

নিজের ঘরে চলে এল রবীন।

সে শুধু একে যাবে নিজের খুশিতে। একমাত্র ঘর কাছে তার ছবি অমূল্য, সে শুধু তার স্মৃতিকেই ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না, সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিকেও, সে স্মরণ অর্টের সংজ্ঞা জানে না, বিশেষ মাত্রার ভুলনায় সে বিচীর করতে জানে না, কিন্তু সে জানে কতটা ভালবাসার সঙ্গে এই শিল্পী তার ছবি তঁাকে, কতটা যত্নে লালন করে সে তার শিল্পে আপন সন্তানের মত। সে তার ব্যক্তিগতক বাদ দিয়ে শুধু শিল্প খাচাই করে না। উপেক্ষিত রবীনের ক্ষমকে সে সযত্নে তুলে নিয়েছে, স্থান দিয়েছে নিজের ভীক বৃকে। রবীনের বিক্ষিপ্ত মন, অবহেলিত মন সেখানে স্থান পেয়েছে, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কৃতজ্ঞ হয়েছে রবীন। নতুন করে যেন রবীন অমূল্য করেছে, কেবল মিনগত পাপক্ষয় নয়, কেবল যখন বুকে আশ্রয় পালন নয়, কেবল ভীকতার সঙ্গে আপন স্মৃতি নিয়ে লুকিয়ে থাক। নয়, তারও মূল্য আছে, পৃথিবীতে তারও কিছু দেবার আছে, সে শিল্পী।

রবীনের নতুন জন্ম হয়েছে, সে স্রষ্টা, তাই অমূল্য করে ইলাকেও সে স্মৃতি করবে। ইলাকেও সে তার ভালবাসার রং-এ নতুন করে গড়ে তুলবে। মাটির প্রতিমার খড়ের কাঠামোটুকু সে পেরেছে, সে কাঠামোর মাটির প্রলেপ লাগিয়ে রং ধরাবার ভার বহি সে পায় তো নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে। সার্থক হবে তার জীবন।

বারবার ইলার খুঁটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। স্বিরদৃষ্টিতে সে ছবিটার দিকে তাকিয়ে বইল আর ভালবাসবার বন্ধন তার বৃকটা যেন ছমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল।

**ড্যা বস্তু**

# অশোক কার্ডিয়েল

বাণীর স্বাস্থ্য, শক্তি  
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

ড্রাগস্টার্স

ডাঃ বস্তু ল্যাবরেটরী লিঃ

কলিকাতা-৯

কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই তার। তমক ভাঙ্গন হরিণদর ডাকে।

দাদাবাবু! দাদাবাবু!

কে? ওঃ....কি বল।

চোখের বোনে আসি জগটা হাতের জামার উল্টো পিঠে মুছে নিল রবীন।

বাবু ডাকাচ্ছেন।

আমাকে?

হ্যাঁ..

আজ্ঞা যাচ্ছি।

মনের এ অবস্থায় ঠিক আবার কাকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুরটা কেটে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। কিন্তু যেতে তো চলেই ডেকেছেন বখন।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা দোমডান কাগজ বার করে একবার দেখল রবীন। আজ তিন-চারদিন ইলার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। এ চিরকুট্টুকু চারদিন আগের। রবীনের পকেটেই যুঝছে। আবার একবার পড়ল রবীন বোধহয় সহস্রবার পড়ার পরও....

‘সত্যি ভালবাস তো? আমি ভালবাসি..’

‘সত্যি সত্যি সত্যি, তিন সত্যি।’

কতবার একথা বলবে ইলা। রবীন কি তিন সত্যি অপেক্ষায় আছে? ইলার সমস্ত চোখে কি তার অতল ভালবাসার ছায়া থর থর করে কাঁপে না? আর রবীন? তার ভালবাসা বোঝাবার জগত কত সত্যি লাগবে? ভেবে পার না রবীন।

আর একবার দেখে নিয়ে পরম যত্নে সেই ছোট্ট দোমডান কাগজটা খোলার মধ্যে রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল রবীন।

কি একটা কথা নিয়ে তখনও হাসাহাসি করছিলেন ওরা, রবীনের ঘরে ঢুকতে দেখে দু’জনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সুচরিতা সামনের ছোট টেবিলটা থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে পাড়তে আরম্ভ করল।

বোস রবি, কথা আছে।

একটা মোড়ায় বলল রবীন।

তুমি যা করছ সে বিষয়ে কি ভেবে দেখেছ?

কোন ভূমিকা না করেই একেবারে সোজাশুজি প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত।

কি করছি?

রবীন প্রশ্নটা যেন বুঝতে পারল না।

বুঝতে পারছ না? আমি তো বেশ সোজা প্রশ্নই করেছি, আর কোন কথাই নির্ভূমিকা আমি ভালবাসি না।

কেন যেন একটু নার্ভাস লাগল রবীনের। ও বুঝতে পারছে কি কথা বলতে চাইছেন সত্যব্রত। কিন্তু এরকম সোজাশুজি এই ধরনের প্রশ্ন কাকার সঙ্গে আলোচনার সম্ভাব্যতা। সবচেয়ে তার ধারণাই ছিল না, তাই বেশ একটু নার্ভাসই মনে হোল তার।

কিন্তু মনে সাহস এনে সে বলল, ভূমিকার প্রয়োজন নেই জ্ঞানদার—প্রশ্ন যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি তা হলে তার উত্তরে বলব যে আমি ছেলেমানুষ্য নই, সবকিছু ভেবেই আমি..

কি ভেবে? কতটা ভেবে?

আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা কি জানতে চান?

হঠাৎ মনে যেন জোর পেল রবীন।

না জানতে চাইতাম না, যদি না তার সঙ্গে একটি ভ্রমপরিষদের সদস্যের, একটি সরল মেয়ের জীবনের স্তম্ভশাস্তির প্রশ্ন জড়ান না থাকত।

কিন্তু এনে ভাবনার কি আছে?

ভাবনার নেই তুমি বলতে চাও।

অস্বস্ত আমি হোঁ দোষি না।

দেখ না..

যেন গর্জে উঠলেন সত্যব্রত। দেখ না, কেন না এখন তোমার চোখ অন্ধ। প্রেম-ভালবাসা...কতটুকু মূল্য এর বাস্তবে? বখন.. আমার তো মনে হয় জীবনে তারই সব থেকে বড় মূল্য আছে।

বখন জীবন সঞ্চকে কিছুই জান না তখন তাই মনে হয় বটে...কিন্তু ইলার সুখের কথা ভেবে দেবেছ কি? যদি অথবা তার সুখ তোমার..

কথা শেষ হতে দিল না রবীন। ওর চোখ দু’টো জলজল করছে, বলল, হ্যাঁ ইলার সুখই আজ আমার কাছে সব থেকে বড়ই চিন্তা, আমি জানি ও সুখী হবে।

মুগ টিপে হাসল সুচরিতা, সেটুকু রবীনের দৃষ্টি এড়াল না। সে আরও কহল চোখ নিয়ে আরও ক্ষোভে বলল, তাকে আমি সুখী করবো, সে তা জানে।

ঈটুকু মেয়ে সুখের কি বোঝে এখন?

সুখ বোঝবার জন্ত বয়স লাগে না কাকা।

লাগে বৈ কি, বিশেষ করে যে সুখের ওপর সমস্ত জীবন নির্ভর করে সেটুকু বোঝবার জন্ত যথেষ্ট বয়স লাগে। জীবনে অভিজ্ঞতা না আসলে সুখ-দুঃখের তারতম্য বোঝা যায় না।

সেটা মাশের কথা, হিসেবের কথা।

রবীন সজোরে বলল।

কিন্তু তুমিই বা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? রবীন হয়ত ঠিকই বুঝেছে।

সুচরিতা এতক্ষণে মুখ খুলল।

ওর দিকে একবার তাকাল রবীন। সমবেদনা না উপহাস? কাকীমার মনোভাবটা ঠিক কি?

সত্যব্রতও সুচরিতার মুখের দিকে তাকালেন। কি বলতে চার সে? বোঝে না কি?..

ভুলই করছে রবীন!...অর্থের স্বাধীন সবচেয়ে ব্যাবহা না করেই এক মহাদারিত্ব নিতে যাচ্ছে, বা তার উচিত হচ্ছে না।

আমার মনে হয়, সুখ-বল পূর্ব আমি অর্থের ব্যাবহা নিশ্চয়ই করতে পারব।

দু’খানা হাত থাকলেই সব পূর্ব অর্থ রোজগার করতে পারে না রবি।

কিন্তু তুমি হাত কেন? তার সঙ্গে..

তোমার প্রতিভার কথা বলছ তো?

## আর এক আকাশ

রবীনের মুখের কথা কেড়ে নিলেন সত্যব্রত, সবাই তোমার কাক  
নয়।

উত্তরটা মুখে এসে গিয়েছিল রবীনের। কিন্তু সে উত্তর না দিয়ে  
অন্ত কথাই বলা সমীচীন মনে করল।

আমি তো আই-এ পাশ করেছি কাকা, তা দিয়ে কি একটা  
ফুলের...

হ্যাঁ ঐ পর্বত, ফুলের টিচারই হ'তে পারবে। তার বেশি নয়,  
তাতে লাভ?

তার বেশি হতেও চাই না।...সেই আমার যথেষ্ট লাভ, যদি  
পাই...আমি যাই কাকা আমার একটা কাজ আছে।

ওকে ছেড়ে দাও না! সত্যিই ওর তো কাজ থাকতে পারে!...  
তা ছাড়া ও তো ছেলোমামুষ নয়, ও যদি ভাল বোকে...

ওর ভাল বোকার ক্ষমতা কতটুকু।

গভীর হয়ে বললেন সত্যব্রত।

ওর ভালমন্দ আমি বুঝি, ও নয়।

নিজের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন সত্যব্রত। রবি যাও  
এখন, কিন্তু কথাটা মনে রেখ, কোনরকম অবিবেচনায় কাজ যেন  
না দেখি...বাও।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রবীন।

সে পারে, ইলার জন্ত সব পারে। কাকীমার পরিহাস, কাকার  
সাবধানবাণী সবই সে সহ্য করতে পারে শুধু ইলারই জন্ত।

একটু পরেই পাঞ্জাবীটা গলিয়ে নিয়ে ওপরে বাবার জন্ত প্রস্তুত  
হ'ল রবীন।

প্রস্তুতই হ'ল, অর্থাৎ ইলাকে দেবে বলে ছোট একটা কাগজে  
কি একটু লিখে সেটা হাতে করে নিয়ে নিল, ইলাকে দিতে হবে।

সামান-সামনি কথা বলার, বিশেষ কথা বলার স্তবগে বেশি  
পাওয়া যায় না তাই আগে থেকে লেখা চিরকুটই তার। মন দেওয়া-  
নেওয়া খেলা খেলে। আশা খেলা নয় তাদের কাছে, এ বুঝি তাদের  
জীবনের পথম সত্য।

ক'দিন ইলার সঙ্গে দেখা হয় নি।

ও নিজেও যেতে পারে নি বেশি তার  
ওপর গেলেও কোথায় যেন লুকিয়ে  
থাকে মেয়েটা। অথচ অনেক কথা  
বলবার আছে ইলাকে। সেই কিছু  
না জানা মেয়েটাকে শোঝাতে হবে  
অনেক কিছু, বোঝাতে হবে অনেক  
কথা। সে অবকাশ কোথায়?  
আবার শক্তিরই শরণাপন্ন হ'তে হবে।  
সেবারে যাওয়া হোল না, কাকাই  
আটকে দিলেন তাকে একটা কাজের  
আহ্বান। এবার শক্তি ছাড়া গতি  
নেই।

কিন্তু তার আগে একবার ইলার  
দেখা পাওয়া দরকার। আজই...

সোজা ওপরে উঠে এল রবীন।

এ কয় বছরে সে বেশ বনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওপরতলার সঙ্গে।

অবশ্যই অক্ষণার সঙ্গে বনিষ্ঠতাই তার বাহ্যত বেশি। ইলা তো  
প্রথম প্রথম আসত না, তারপরেও যখন এসেছে তখন সে ইলা যেন  
অন্ত মেয়ে। বৌদির সামনে বা পিসিমার সামনেই গল্প কবছে তারা,  
তর্ক করেছে, বৌদির ছোট ছেলোটাকে আদর করে রাগিয়েছে ইলা আর  
তাদের হৃৎকনের ছোট ছোট বগড়ায় সত্যিই আনন্দবোধ করেছে  
অক্ষণ।

তাদের বাড়ির গুমোট-ঘরা আবহাওয়ায় রবীনই যেন দক্ষিণের  
হাওয়া এনে দিয়েছে, তাই রবীনের আসাটা ঘরাবরই সদর অভ্যর্থনা  
পেয়েছে, আর উৎসাহ পেয়ে কখন চিরদিনের যুখচোরা লাখু ছেলে  
রবীন এ বাড়িরই যেন একজন হয়ে প্রগলভতার যুধর হয়ে উঠেছে,  
সেখান রবীন নিজেও ব্যস্ততা পাবে নি।

অক্ষণা সম্বন্ধে প্রশ্নের দিয়েছে রবীনকে। যে ইলা শিশুর মত  
উচ্চাসে ভরিয়ে রেখেছে বাড়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সেই ইলাই  
যখন ছোট ভাইপোকে কোলে নিয়ে সিঁড়িরতলার রবীনের ছোট  
ঘরখানার ছবি দেখতে আসে, তখন কখন যেন পরিবর্তন হয়ে যায়  
তার। তখন হৃৎকনের চোখে যে ভাবা ফুটে ওঠে তা শিশুর মত,  
দুঃখের নয়, সে দুঃখ যেন পরম্পরের দৃষ্টির অন্ধত্বল অবধি আলোড়িত  
করে, সে দুঃখ যেন দৃষ্টির অন্তর্য্যাক্ত ভাষা বলে।

সেই দারুণ অস্বস্তিকর অথচ মধুর সমন্বিত হতে ইলা প্রায়  
চূর্ণ করেই থাকে আর সহজ হবার চেষ্টার অনর্গল বকে বার বার বন্ধ-বন্ধ  
রবীন, কখনও ছবির আলোচনার, কখনও বা সঙ্গীতের।

তারপর বীরে বীরে কখন ছোট দ্রুত পরস্পরকে জেনে  
ফেলেছে আর খেমে গেছে তবল্যাক।

তবু বলা হয় নি, কোন কথা বলা হয় নি, সময় হয়ে এসেছে  
এখন গভীরভাবে চিন্তা করবার। ইলাকে বলতে হবে বিষয়টাকে  
বেশ ভেবে দেখবার জন্ত, শুধু হাসি নয়, অনেক আনন্দ, অনেক বেশনা  
নিরে গড়া হবে তাদের জীবন, সে জীবনের জন্ত প্রস্তুত হ'তে হবে  
তাকে।

কিন্তু দেখা হচ্ছে না ইলার সঙ্গে।

পেটের যন্ত্রণা কি মানাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন।  
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

# বাকলা

বহু গাছ গাছড়া  
দ্বারা বিশুদ্ধ  
মতে প্রস্তুত

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,  
মুখে টকভাব, চেন্নুর ওঠা, বামিডাব, বামি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যগ্নি, ব্রুকডায়া,  
জ্বাংহুরে অরগটি, ব্রুকপনিয়া ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশাম।  
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু ডিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তারাও  
স্বাস্থ্যকর সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। শিখরলে মূল্য ফোঁস ১।  
৩৮৫ গ্রাম প্রতি কোটা ৩ টাকার, একট্রে ৩ কোটা ৮'৫০ টাকার ডা. মা. ও দাইকলী দূর পৃথক

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭  
(হেড অফিস - বঙ্গশাখা, পূর্ব পাকিস্তান)

কাল দু'বার গেছে বৌদির কাছে। চা খাবার ভূতো করে। অহ-কাঙাল এই ছেলেটাকে সত্যিই ভালবাসে অরুণা। তাই যখন তখন উপস্থিতি সম্ভেছে প্রশ্নর পাথ, কিন্তু ইলার সঙ্গে একবার নিভূতে দেখা হওয়া দরকার। আজই বলবে ইলাকে শক্তির বাড়িতে দেখা করবার জ্ঞান।

ওপরে এসে আগেই দেখা হল অরুণার সঙ্গে।

খেরা বড় দালানে রাতের রাগ্নার জ্ঞান কুটনো কুটছে অরুণা।

পরিবারের নিজস্বের লোক অরুণা হলেও আশ্রিত-আশ্রিতা আর কর্মচারী মিলিয়ে এখনও প্রতিবেশার প্রায় পনের-যোলজন লোক খায়। তাই খাওয়ার আয়োজনটা প্রচুর্নই করতে হয়।

বাবা! বৌদি বাড়িতে উৎসব নাকি?

কুটনোর পরিমাণ দেখে রবীন প্রশ্ন করল।

কেন?

হেসে জিজ্ঞাসা করল অরুণা।

এত তরকারি?

বাঃ এ তো বোজাই লাগে, তবে আজ একটু বিশেষ ব্যবস্থা অবস্থা। করেকজন আসবেন।

ওঃ...আচ্ছা বৌদি! ইলা কোথায়? তাকে ক'দিন দেখছি না?

খুব সহজ সুরেই বলার চেষ্টা করল রবীন।

কোথা থেকে দেখবে?

কেন? ও কি এখানে নেই নাকি?

না থাকারই মতো। আর বল কেন? এমন পাগল মেয়ে,

আজ তিনদিন তো মেয়ে অরুণার প্রায় ত্যাগ করেছে।

কেন?

কেন আবার। খালি ক'দেখছে... ক'দেখছে ইলা?

দমটা প্রায় আটকে গেল রবীনের।

ইলা ক'দেখছে? আজ তিনদিন সমানে? কিছু খাচ্ছে না? অথচ...

কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করল রবীন, কেন বৌদি!

ভাই, কেমন পাগল মেয়ে দ্যাখ, ওর বিয়ের ঠিক হয়েছে, আজ ছেলে নিজে দেখতে আসবে সন্ধ্যার পর। তাই মেয়ের আপত্তি।

ইলার বিয়ে?

খুব আন্তে আন্তে যেন নিজের মনেই উচ্চারণ করল রবীন।

তা মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে হবে না? এ নিয়ে এমন কাণ্ড করে কষ্ট? আর কিছু তো বলতে পারবে না বাবাকে, তাই বা অল্প স্তার, কৈসে ভাবছে বাবা দেবে। কি পাগল মেয়ে বল তো?

রবীন নিজেই পাগল হয়ে বাবে। কিই-বা করতে পারে ইলা এ ছাড়া?

এ ছোট্ট সাল মেয়ে কিতাবে ঠেকাতে চেষ্টা করছে তার সর্পশক্তি দিয়ে। সত্যিই তো আর কিই-বা অল্প আছে তার কাছে, চোখের জল ছাড়া। অথচ রবীন নিজে? কিই-বা সাহায্য করছে তাকে?

মনে পড়ল আর একবার কেমন করে অস্থিরের অছিলায় সব ঠেকিয়ে ছিল ইলা। বিছানা ছেড়ে ওঠেই নি এবার। তাই বৃষ্টি এবার ওকে প্রায় না ভানিয়েই এ ব্যবস্থা এতদূর এগিয়ে গেছে।

সরল মেয়ে ইলা, তার বয়স যদিও প্রায় কুড়ি হয়েছে, কিন্তু মনের বয়স তার বৃষ্টি পনের পেরোয় নি। তবু কত চাতুরী করেছে সেই সরল সংসারানভিজ্ঞা মেয়েটি।

নিজের ওপর দ্বিধার এল রবীনের। একটু আগে একেই সে প্রেমের গভীর দিকটা বোঝাবার জ্ঞান প্রস্তুত হচ্ছিল।

ছটফট করতে লাগল রবীন।

অরুণা কুটনোগুলো জল থেকে তুলে বড় বড় বারকোশে সাজিয়ে রাখছে। কিছুক্ষণ সেদিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রবীন, তারপর মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করল অরুণাকে, বৌদি, কোথায় ইলা?

বাবার ঘরে শুয়ে।

কোন উপায় নেই, একটিবার দেখাও পাবে না তার। কত বড় খুঁকি ঘাড়ে নিয়ে প্রাণপণে বৃষ্টিছে, সেই ইলা। কিন্তু বারবার কি ইলাই ভার নেবে? ইলা? যে ঝেঁটে গেলে বুক পেতে দিতে পারে রবীন, তার এই কষ্ট দেখবে রবীন কেবলমাত্র দর্শকের মত?...

অসম্ভব...

কুটনোর থালা নিয়ে চাকর চলে যেতেই অরুণা রান্নাঘরে চলে গেল ঠাকুরকে রান্না বৃষ্টিয়ে দিতে।

কিছুক্ষণ ঈড়িয়ে থেকে নেমে আসবার জ্ঞান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল রবীন।

কর্তার ঘরের দরজা ধরে ঈড়িয়ে ইলা। রবীনের গলা পেয়েছে বোধ হয়, শীর্ণ কান্ড চেহারার, রবীনের বুকটা যেন ঝেঁটে যাবে বেদনায়। জলভরা তার বড় বড় চোখ তুলে একবার রবীনের দিকে তাকাল ইলা, তারপর পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

এটুকুই যথেষ্ট।

রবীনের বুকটা বৃষ্টি ভেঙ্গে খানখান হয়ে বাবে। এ দৃষ্টিতে তিরস্কার নেই, কেবল নীরব অভিশাপ। রবীনের মনে সে দৃষ্টি যেন কেটে কেটে বসতে লাগল।

অসম্ভব...কিছু করতেই হবে, আর দেরি নয়।

দরজার দিকে এগিয়ে এল।

পদা সরিয়ে ডাকল, ইলা! লক্ষ্মীটি একবার নীচে এস।

জানলার শিক ধরে ঈড়িয়েছিল ইলা। ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল।

না বললে হবে না ইলা!...আমি নীচে যাচ্ছি...বৌদি এখন এসে পড়বেন...এসো! লক্ষ্মীটি...তাড়াতাড়ি...আমি যাচ্ছি... প্রতাপারে নীচে নেমে গেল রবীন।

একটু বাধেই নীচে নামল ইলা। সিঁড়িরতলার ঘর অন্ধকার, তাই দিনের বেলায়ও রবীন আলো ছেলে কাল করে।

আজ ঘরটা অন্ধকার। আছে তো রবীন? তাকে আসতে বলল যে? বুকটা চিপ চিপ করছে ইলার। অসম্ভব নার্ভাস লাগছে ওর। কেউ কিছু ভাবছে না, অথচ ইলার মনে হচ্ছে সব লোক বৃষ্টি ওর গতিবিধির ওপরই নজর রেখে বসে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দেখা হরিপদর সঙ্গে। কি দিদিমণি! কাকে খুঁজছেন? মা আর বাবু তো বাইরে গেছেন। জানি।



নতুন খরিশুলায়  
**সানলাইটে**

**আরও ঝলমলে কাচা হয় !**

নতুন করমুলায় সানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী সুন্দর নতুন গড়ন! আর সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে করে কাচার কী আশ্চর্য্য নতুন শক্তি! প্রতি ঘোপ কাচবার পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা আরও ধবধবে, আরও ঝলমলে হয়ে উঠছে!

বিশ্বব্যাপি লিভারের ডেট্রী

৯-১২-১৪০ ৪০

ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়াল ইলা। এরপর ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে?

ভেতরে এসে।

রবীনের গভীর গলার গভীর স্বর।

হরিপদর কোঁতুল স্পষ্ট উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে গেল ইলা।

বৌদি বলেছে দুপুরটা ঘুমিয়ে নিতে। ইলাকে চোখের জল মুছে খেতে বসতে দেখে খুশিই হয়েছে অরুণ।

জানা কথাই। ক'দিন আর কীভাবে? প্রথমে ভয় পেরেছিল বোধ হয়। তাই খাবার সময় ওকে মনে করিয়ে দিল দুপুরে ঘুমিয়ে নেবার কথা, তাতে মুখটা বেশ টাটকা দেখাবে, এ ক'দিন কেঁদে বুকের বা অবস্থা করেছে, স্কন্দী বলে রক্ষা, তা হলেও মনে হচ্ছে ইলা যেন কত রোগ ভোগ করে উঠল।

তবু খুশি হয়েছে অরুণ।

শেষ পর্যন্ত ইলার মন ফিরেছে, যে কাণ্ড আরম্ভ করেছিল।

একসঙ্গে খেল তারা। অস্তমিনের মত গল্পটাও বাদ গেল না। বাক্য ক'দিন বাদে ইলা বেশ খুশি। তবু বেশি খেতে পারল না। কয়েকবার ধমক দিল অরুণ। তারপর এ সময়ে নিজেকে অবস্থা দ্রবণ করে অব্যাহতি দিল ইলাকে।

ছেলে নিজে দেখতে আসবে, এ রকম লাগবারই কথা। সহজ হবার চেষ্টা করলেও যে সহজ হওয়া যায় না, সে কথা অরুণ জানে।

বা হোক ওকে শুতে দেখে নিশ্চিত হ'য়ে থোকাকে নিয়ে ঘুমোতে গেল অরুণ।

বাক্সা ছেলের মা, রাতের ঘুমের যখন কোন নিশ্চয়তা নেই, তখন দুপুরের সুনিত্রাটুকু অবহেলা করা যে মুখ'তা সে কথা অরুণ স্বীকার করে।

জানলাগুলো বন্ধ করে শুয় পড়ল ইলা। বৌদি বলেছে বলে মন, রোজকার অভ্যাসমতই সেও শুয়েছিল একটু ঘুমিয়ে নেবে বলে।

কিন্তু পারল না।

সাড়ে তিনটে বেজে গেলে চলে যাবে না। ঘড়িতে টা-টা-ক'র ছ'টে বাজতেই সে উঠে পড়ল। মুখ-চোখে জল দিয়ে এসে পাখার স্পীটটা আরও একটু বাড়িয়ে দিল ইলা।

বেজার গরম পড়েছে, চারটের আগে আর বৌদি দরজা খুলবে না। আর অন্য কারও কথা তো ওঠেই না। গরমের দিন, রোদ না পড়লে পিসিরাও উঠবেন না জানা কথা। তা ছাড়া বাবার ঘরও বন্ধ থাকবে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। দাদা আশিস থেকে না কেতা পর্যন্ত।

আসলে দাদা না ফেরা পর্যন্ত বাড়িখানাকে প্রায় মৃত বলেই মনে হবে। আর ইলাকে দেখতে আসবে সন্ধ্যার পর। অত্যাগ সময় অনেক, কিন্তু ইলার হাতে নয়।

সাড়ে তিনটের মধ্যেই প্রস্তুত হ'তে হবে। বাড়ি নিখুঁত, যেন সবাই মরে আছে, সামরিক যুঁহা। দু'দিন বাদে এদের কাছে ইলারও যুঁহা ঘটবে। ভাবতেই বুকটা টিপটিপ করে ইলার।

একা বিশেষ কখনও বাড়ি থেকে যেবার নি সে, কাছাকাছি নয় বাড়ি ছাড়া। আজ কিন্তু তাকে একাই বেরিয়ে যেতে হবে।

সেখানেই অপেক্ষা করবে রবীন। তার বন্ধুর গাড়ি নিয়ে।

তারপর?

তারপর আর ভাবতে পারে না ইলা।

সেই সরল আত্মরে মেটে। কখন স্বাধীনতা ভাবনার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে; যত খুশিতে যাচ্ছে, ততই বেশ জট পাকিয়ে যাচ্ছে? আর ভাববে না সে।

রবীন তো তাকে বলেইছে সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিতে! আজ থেকে সব ভাবনা সব দায়িত্ব রবীনের। তাই দেবে সে। তাই দিচ্ছে, তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ভার সে রবীনকে দিয়ে দেবে, তার নিজেরও।

হঠাৎ কেমন লজ্জা হ'ল রবীনের কথা ভেবে। আজ প্রথম রবীন তাকে--

আরনার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকেই মুখটিপে হাসল ইলা। আবার মনে পড়ল রবীনের কথা। সারা গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করল।

আলমারীর পাল্লাটা টান করে খুলল ইলা।

থাকে থাকে তার শাড়ি সাজান। খুব ইচ্ছে করল ইলার সোনালী বুড়িয়ার লাল সিল্কের শাড়িখানা পরে। ওটা শরলে তাকে নাকি ভারি মানায়। তা ছাড়া আজকের দিন, হাজার হোক--প্রথম যাচ্ছে সে আজ রবীনের সঙ্গে, একটু সাজবে না?

আরনার সামনে দাঁড়িয়ে গালের ওপরে একবার শাড়িটা ফেলে দেখল ইলা।

খুট করে লক্ষ্য হতেই চমকে তাকাল পেছনের দিকে।

না, দরজা ঠিকই বন্ধ আছে। তা ছাড়া এ সময় কে আর আসবে।

কিন্তু না, আর সময় নষ্ট নয়।

গত বছরে তার উনিশ বছরের জন্মদিনে দাদা যে হান্সা গোলাপী রং-এর চন্দ্রেরী শাড়িটা দিয়েছিল, সেটা পরে নিল ইলা। এখানোও তার খুব প্রিয় শাড়ি।

চুলটা ভাল ক'রে আঁচড়ে মুখে অল্প একটু পাউডার দিল, তারপর কি মনে করে বড় একটা টিপ আঁকল তার সাদা কপালে। তারপর শুদ্ধি-রাখা একটা ব্যাগ নিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল।

বুকের গড়কড়ানি বেড়েই চলেছে। হঠাৎ চোখটা ভাল করে জল এসে গেল। চিরদিনের মত বিদায় নিচ্ছে সে।

বাবার ঘরের সামনে একবার মাথা ঠেকাল, তারপর দাদা, বৌদি আর ছোট পিসিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নীচে নেমে গেল।

গাড়ি-বারান্দার তলা দিয়ে ঘেরোতেই দেখা সামনের বাড়ির ত্রিভঙ্গাব্যুহ সজ্জা।

গরমকালের এই দুপুরবেলা, কিন্তু ওর চোখে ভয় নেই। সারা দুপুর বসে থাকবে জানলার শিক ঘরে।

না-দেখার ভাণ ক'রে চলে যাচ্ছিল ইলা। কিন্তু ত্রিভঙ্গ-পুঁহিণী বোধ হয় ত্রিপ্রাহরিক বিপ্রম ভাগ্য ক'রে বাইরের অগভীর আশ্বাসন নেবার জন্য বন্ধপারিকর। টেচির ডাকল, কি ইলু, এই দুপুরেও কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

## আর এক আকাশ

বন্ধুর বাড়ি।

কথা না এগোতে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল ইলা।

পাখের মাঝে দেখা পরিমল ঘোঘের ভাইপোর সঙ্গে। ওকে কথা বলবার অবকাশমাত্র না দিয়ে গভীর মুখে এগিয়ে গেল ইলা। বড় কাজে বাধা আছেই।

মোড়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল।

ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রবীন। আজ শুধু তার দৌলধর নিয়ে নয়, আপন অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে তার ইলা, সেই স্বীকৃতিটুকু যেন তাকে আরও স্নান কর তুলল রবীনের চোখে।

খুব কষ্ট হল তো?

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ওর দিকে সম্মুখভাষিতে তাকিয়ে বলল রবীন।

কিসের কষ্ট বা...?

সলজ্জ হাসিতে মুখ নামাল ইলা। রবীনের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে লজ্জা পেল ও। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল।

ওর পাশে বসে গাড়ির দরজা বন্ধ করে রবীন বলল, পরিচয় করিয়ে দি... ইলা... আর আমার বন্ধু শক্তি সান্তাল।

সমস্বার।

গাড়িতে তাড়াতাড়ি স্টার্ট দিল শক্তি। বেশিঙ্গ ঠাডান নিরাপদ নয়।

হাত তুলে নীরবে প্রতিশ্রুতিস্বার করে রবীনের দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি করে হাসল ইলা।

গাড়ি চলতে লাগল। একটু কাছে সরে এল রবীন।

এই।

প্রায় কানের কাছে কিসকিস করে বলল রবীন।

শক্তির দিকে একবার তাকিয়ে আবার হাসল ইলা।

ওর খামে-ভেজা ঠাণ্ডা কাঁপা হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতে শক্ত করে ধরল রবীন।

সুচরিতার আঙ্গ স্মৃতি ছিল।

শেষ পর্বন্ত সে রাজী হয়েছে কিংয়ে নামতে।

রাজী কেন, এ ক'দিনের আলোচনার পর যখন সিনারিও লেখা, স্মৃতি-এর তারিখ ঠিক করা সব পূর্বোদমেই হতে লাগল, তখন আন্তে

আন্তে কেমন যেন বেশ একটু ভালই লাগল সুচরিতার। ও যেন তার পরিচিত জগতেই ফিরে যাচ্ছে আবার।

যদিও আগে এক রাত্রে চূড়ান্ত স্বগভীর ভেতর দিয়েই সে রাজী হয়েছে।

সেদিন তারা বেড়িয়ে ফিরল যখন, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

একটু কফি খেলে হয়?

খাও।

সুচরিতা নিম্পূহ গলার উত্তর দিল।

খাও নয়, তুমিও খাবে।

না।

না কেন?

আমার ভাল লাগছে না।

আজকাল তোমার অনেক কিছুই ভাল লাগে না। বা আমার ভাল লাগে।

খুব স্বাভাবিক।

না স্বাভাবিক নয়, যেমন ফিয়ে নামায় তোমার আপত্তি।

হ্যাঁ তাতে কি?

কিছুই নয়, শুধু আমার অবাধ্যতা করবার জন্ত। ফিয়ে নামা তোমার পক্ষে এমন বিধায় আমিষ ভোজনের মত লাগছে কেন তা জানি না।

আমি তো বলেছি আমার ইচ্ছে নেই।

কিন্তু ইচ্ছে থাকা উচিত। জান তুমি টাকা-পয়সার অবস্থা সজিন। ভালমত টাকা না আসলে পরে মুন্ডিলে পড়তে হবে। তাই বাজারিয়ার টাকাটায় একটা কেরিলিটির আশা করছি।

তা হলে তোমার আকাজক্ষা মিটেবে?

একথা বলার মানে?

আর কি মানে। কারও আকাজক্ষা অল্প মেটে, কারও গীমাহীন অর্থেও নয়।

আশা করি নিজেকেও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ফেলছ।

না—

না—আলবৎ।

তা হলে তাই।

তর্কের শেষ কথাটুকুও যেন খুঁটে কেলে দিতে চাইল সুচরিতা।

*Super craftsmanship*  
in  
**JEWELLERY**

**ROY COUSIN & CO.**  
JEWELLERS & WATCHMAKERS  
4, DALHOUSIE SQ. EAST. CAL. - I

কিন্তু অত সহজে ছাড়লেন না সত্যব্রত। অনেক কথা শুনিগেছে আজ তাকে সূচরিতা, শুধু আজ নয়, প্রায়ই শোনাচ্ছে,—

শোন!

সময় নেই, রাত হয়েছে।

তোমারোটা নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সূচরিতা।

কোথায় যাচ্ছে? শোন তোমার সঙ্গ আমার কথা আছে। তুমি আজকাল বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ রীতি। এতটা ভাল নয়।

আমারও সেই একই প্রশ্ন। একটা সীমা তো আছে?

শোন তা হলে।

ওর হাত ধরে ওকে প্রায় জোর করে বসালেন সত্যব্রত।

তুমি কি মনে করছ যে আমি করে আমার ওপর নিজের ব্যক্তিগত জাহির করবে? আর তোমার অপূর্ণ পারসোনালিটি দেখে আমি ভয় পাব?

পাগল। তোমাকে আমি চিনি না? তোমার ব্যক্তিত্বের কাছে পাঁড়াব আমি?

ঠিক তাই।

রাগে হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ করলেন দৃঢ়ভাবে সত্যব্রত। তাঁর চোখাল দু'টো শক্ত হয়ে উঠল। শোন! তোমার জানাচ্ছি আমি, তোমার নামভেই হবে আমার নেকস্ট বই-এ। নায়ক ঠিক হয়ে গেছে নবেন্দুবাবু। মনে রেখ!... আর এ মাসেই স্মৃতি আরম্ভ হবে। টাকা আমার চাই-ই।

ভক্তিত হয়ে বদে রইল সূচরিতা। তার দু'টো চোখ ছালা করে উঠল। কিন্তু কান্না এল না।

অপমান-চূড়ান্ত অপমান করছেন সত্যব্রত তা সে জানে। এত বছরের সংসার করার পরও তার স্বামী তাকে ভাল একটা বিক্রির সম্পদ ছাড়া, কিছুই ভাবতে পারেন না।

যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলো সে ভোলে নি, কিন্তু আবার তার পুনরাবৃত্তি কি তাকে করতে হবে জীবনভোর?

সারারাত ঘুমোল না সূচরিতা। শেষে মনস্তির করে ফেলল। নারিত্যকে সে ভয় পায়, এই ভাল। সত্যব্রতের ইচ্ছামতই চলবে সে। এই তার জীবন! এ ছাড়া আর কি আছে? অর্থ প্রচুর অর্থ, আনন্দ উৎসব, সিনেমা পাটি আর অস্ত্র শাড়ি-জামা গয়না। এই তার ভাল। তা ছাড়াও যে খবর শু-ল, সেটাও....

রাজী হ'য়ে গেল সে।

শুধু রাজী নয়, ক্রমশ বোধ ভাল লাগতে লাগল তার বোজকার এই উত্তেজনা আর প্রস্তুতি। আর একটা আকাঙ্ক্ষাও তার মনে টকি দিতে লাগল।

আজ স্মৃতি-এর দশম দিন। অনেকটা এগিয়ে গেছে বই। রবীনের হাবার কথা ছিল, কিন্তু যায় নি ও! এতকাল বেশ বিরক্তই হয়েছেন সত্যব্রত!

শুধু তাই নয়, ঠুঁড়িওর আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তাতেও রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন সত্যব্রত।

সমস্যটি সূচরিতাকে শুধু একা নিয়ে নয়। নবেন্দু ঐ কাণ্ডের পর—আবার সত্যব্রতের বইতে নারিক হচ্ছে জেনে প্রথমটা বিশ্বাস

করতেই চায় নি সূচরিতা। নিজের দস্তকে বজায় রাখবার জন্য এমনই কিছু বলা সত্যব্রতের পক্ষে অসম্ভব নয়, সূচরিতা তা জানে। সর্বদাই তাঁর এই ভাব। চলতি ভাষায় বাক্য বলা যায়, 'কিল থেয়ে কিল চুরি।' হাজার অপমানের পরও তাঁর নির্বিকার ভাব, যেন তিনি কোথাও অপমানিত হন নি, হ'তে পারেন না। তাই নবেন্দুর অপমানও যে গায়ে মাখবেন না সত্যব্রত, তা সূচরিতা জানত।

কিন্তু সত্যিই কনট্রাস্ট সই করার পর সূচরিতা এখন স্পষ্ট নবেন্দুর সই দেখল তখন শুধু অস্বাভাবিক নয় খুশিই হল সূচরিতা।

সেদিনের সে অপমানটুকু, সত্যব্রত হরত ভাল-হন কিন্তু সূচরিতা ভোলে নি।

না হোক কতকগুলো টাকার জন্য তাকেই অপমান করেছে নবেন্দু পরোক্ষে। যদিও তার পরে চিঠি লিখেছে সে টাকাটা পাবার পর এবং তার এই অনিচ্ছাকৃত দুর্ভাগ্যেরের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তবুও সূচরিতা ক্ষমা করে নি।

ক্ষমা সত্যব্রতও করেন নি, তাঁর স্বামীর নয় এত সহজে ভুলে যাওয়া কিন্তু অসম্ভব। নিয়ে গড়া তাই তাঁর মনোভাব এত সহজে প্রকাশ পায় না। আবার নবেন্দুর ওপর কর্তৃত্ব দেখাবার একটা দুর্বল স্পর্শও তাকে পীড়ন করেছে, যার ফলে বেশ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে আর বেশ কয়েকবার ইন্টারিটার পর তাঁর বইয়ে নবেন্দুক পেয়েছেন তিনি। অবশ্যই শুধু অহংবোধ চরিতার্থ করা নয়, এর পেছনে ব্যবসায়িক বুদ্ধিই বেশি কাজ নিয়েছে একথা নিঃসন্দেহ। এ টাকা দ্বিগুণ হয়ে ফিবে, সত্যব্রত তা জানেন।

সূচরিতা অর্ন্ত খবর রাখে না। শুধু যে নবেন্দু তাদের অপমান করেছে আবার টাকার লাভেই যে তাকে তারই স্বামীর প্রোডাক্সানেই আসতে হ'ল এই ঠিকটুকু তাকে খুশি করল।

সেদিন ওদের স্মৃতি একটু আরম্ভ হবার পরই হঠাৎ সূচরিতা অজ্ঞান হয়ে গেল।

ধরাধরি করে ওকে দ্রুত থেকে এনে বড় ঘরের কোঁচে শোয়ান হল। অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেলেন সত্যব্রত। মনে করে দেখলেন কাল রাতে তো কিছু কথা কাটাকাটি হয় নি। মানসিক না শারীরিক কি কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রথমদিনের পর থেকেই স্মৃতি আর এই সব উত্তেজনা যে সূচরিতার বেশ ভাল লাগছে তা লক্ষ্য করেছেন তিনি। বেশ হাসিখুশিই তো আছে সূচরিতা। তবে? মনের কোন দুর্বল আবেগের বিচিত্র প্রকাশ নয়ত এটা? কে জানে!...

নবেন্দু ব্যস্ত হ'ল কম নয়। কিন্তু তার সামান্য ভয়ভাঙ্গুটুকু উৎকণ্ঠাও কেমন যেন খারাপ লাগল সত্যব্রতের।

সূচরিতা তাঁর দ্বী, তার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া ব্যস্ত হওয়া সব তাঁর কর্তব্য। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু এটা তাঁর বাড়ি নয় ঠুঁড়িও। একজন বিশেষ করে নারিক! অস্বস্থ হয়ে পড়তে কারও ব্যস্ততাকেই ঠেকাতে পারলেন না তিনি। রবীকে বার বার বত মনে পড়ল, বত তার প্রয়োজন অল্পতব করলেন তত রাগ হ'তে লাগল তার ওপর। আজ গিয়ে একটা বোঝাপড়া করবেন তিনি, দিন দিন বড় বাড়িরে তুলছে রবী।

কিছুক্ষণ বাতাই অস্থ হ'ল বটে সূচরিতা। কিন্তু আজ আর



## আর এক আকাশ

তার দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব নয়। ডাক্তার ডাকবার লোক গেছে, কোন করাও হয়েছে। তার মধ্যেই সূচরিতা অস্থির হ'ল।

ওকে ঘরে শুইয়ে রেখে সবাইকে ডেকে নিলেন সত্যব্রত। পার্শ্ব চরিত্রের অভিনেত্রী রমাকে অনুবোধ করলেন সূচরিতার কাছে থাকতে। উনি বাড়ি বাবার ব্যবস্থা করবেন দেখুনি।

কিন্তু শুধু সূচরিতার জন্ম আজকের দিনটা নষ্ট করা যায় না।

মনে মনে হিসেব করলেন সত্যব্রত। এই সেট, লোকজন, আজকের খরচ সব মিলিয়ে একটা দিন নষ্ট হ'লে টাকার ক্ষতি কম নয়। তা ছাড়া সূচরিতা তো অস্থির হয়েই আছে। স্বতঃস্ফূর্ত নবেন্দুর স্টাটা শেষ করে ফেলবার জন্ম ব্যগ্র হলেন তিনি। এতে অল্প সুবিধেও আছে। সূচরিতার কাছ থেকে নবেন্দু থাকবে অনেক দূরে, তাঁরই চোখের সামনে।

সাধারণত দু' একবার রিহাসার্স দিয়েই আর দু' একবার মনিটরেই নবেন্দুর অভিনয়ের ফাইনাল টেক নেওয়া সম্ভব হয়।

রিহাসার্স হয়েই গিয়েছিল, মনিটর করেই ফাইনাল নিলেন সত্যব্রত। কিন্তু কি যে হ'ল, নবেন্দু যেন অনমনস্ক। ছ'বার এন জি হোল।

সত্যব্রতের জ্ঞ কুণ্ঠিত হ'ল।

এবার রীতিমত বিরক্ত হলেন তিনি।

নবেন্দুবাণী। প্রিজ একটু যদি মন দেন।

দিক্খিতো!

হুঁ বুঝলেন না, না হলে বেশি রাত হয়ে যাবে, আজ আরও দু'টে স্ট টেক করতেই হবে। এ সিনটি আমি শেষ করতে চাই—কাল অল্প সেট।

সব তো বুঝলাম, কিন্তু কি যে হচ্ছে, মনে থাকছে না।

করেকজন মুখ টিপে হাসল। তারা যে সূচরিতার সঙ্গে নবেন্দুর ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছে তা নয় ওদের দু'জনকে নিয়ে জল্পনা করতেই তাদের ভাল লাগে। মাঝবয়সী সত্যব্রতের পাশে সূচরিতাকে মানানো যেন স্বাভাবিক নয়। তার ওপর আজকের নবেন্দুর ব্যগ্রতা তাদের এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে বেশ।

ওদের হাসিটুকু সত্যব্রতের চোখ এড়াল না। সমস্ত গা জলতে লাগল তাঁর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই সমস্ত তুচ্ছ ইঙ্গিত উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সত্যব্রত আবার তৈরি হলেন তিনি ফাইনাল টেকিং-এর জন্ম।

ক্যামেরা দিয়ে আর একবার দেখে নিলেন তারপর বললেন, স্টাট।

এগিয়ে এল সহকারী অনিল দাস।

সিন ফোর, টেক ফোর।

ক্রাপশটিক বন্ধ করে স্রুত সবে গেল সে।

ক্যামেরা এগিয়ে চল নবেন্দুর পেছন পেছন, যেখানে পথ দিয়ে নবেন্দু চলেছে উদ্‌দ্যস্তের মত।

# লেক্সিন

## সর্প দংশনের সুবিখ্যাত মহোষধ

সর্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে! কাকড়াবিছা

ও অন্যান্য বিষাক্ত দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

"Snake Bite" পুস্তক আবার পাওয়া বাইতেছে; দাম ৫/-

বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয়।

পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম

কলিকাতা অফিস :

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫

সত্যতর প্রাণমত আর হুঁটা স্ট না নেওরা হ'লেও মোটামুটি কাজটা এগোল।

প্রায় সারাদিনই তার ঘরে শুয়ে থাকল অচরিতা। ডাক্তার এসে দেখলেন অনেক পরে, আর যে কথা বললেন সত্যতরকে তার থেকে বিন্দুহীন কথা ভাবতেও পারেন না সত্যতর।

না না হ'তে পারে না, এ অসম্ভব-....

কেন অসম্ভব কেন? আপনি কি বুকে গিয়েছিলেন নাকি?

না তা নয়...তবে...আপনি ঠিক বলছেন?

মনে হয়। ডাক্তারি একটা সায়েন্স মিসে। এখানে অমুমানের স্থান নেই।

তা জানি...তা জানি...তবে...

এ-সব অসম্ভব, ভেতরের কোন দুর্বলতার জন্য অজ্ঞান হয় অনেকে।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় দেন সত্যতর।

কিছু এসে অচরিতাকে কিছু বললেন না, গভীর চিন্তায় তাঁর মুখের রেখাগুলো আরও প্রকট হ'য়ে স্থলে পড়েছে বেন মুখখানা। একবার সেদিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুলল অচরিতা।

বুঝতে পেরেছে সে।

আজকের দিনের আর্থিক কতি সত্যতরকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবুন তিনি। সে অল্প ভাবনা ভাববে। জীবনকে আবার মধুরতার ভরিয়ে তোলা। আবার সেই পুরোন খেলা। নবেন্দ্র চোখেও সে তার আভাস পেয়েছে। এমনভাবে খেলা করেই তার জীবন কাটুক। এমনি সম্বল লব্ধাবে। এই ভাল কথার।

কিন্তু সত্যতরকে শুধু আজকের কতিই ভাবিয়ে তোলে নি। বই-এর অনেকটা টেক করা হয়ে গেছে এই অবস্থায় অচরিতা তাঁকে এত বিপদে ফেলবে তা কে জানত?

কিন্তু কি করে সম্বল হ'ল? ভাবতেও পারছেন না তিনি।... অচরিতাকে বলা হবে না, একটা ভালমত সমাধানের পথ না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত।

এখন কেমন কাছ?

ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলেন সত্যতর।

ভাল।

চোখ বুজেই উত্তর দিল অচরিতা। বাড়ি বাবে?

হ্যাঁ যাব। তবে তুমি তোমার অ্যাক্টিভ শেষ করে নাও না।

না আজ আর হবে না।

কেন?

না বাড়িই চল, তুমি অসুস্থ।

বেশ আমার পাঠিরে দাও, তুমি টাকার কতি কমে...

তা হোক...

বেশ খুশিই হ'ল অচরিতা।

তার অসুস্থতাকে যে সত্যতর টাকারও ওপরে স্থান দিলেন এজন্য

বেশ গর্বিতই হ'ল সে।

এখন কেমন আছেন মিসেস সেন?

ভাল।

বোধ হয় বিশেষ নয়, আপনাকে এখনও খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ক্লান্ত হ'লে আর ক্লান্ত দেখাবে না?

মিষ্টি করুণ করে হাসল অচরিতা।

নবেন্দ্র খুব একটা ইচ্ছে হ'ল ওর কোলে-বাধা ক্লান্ত হাতটা

একবার ছোঁয়।

কয়েকদিন বিশ্রাম নিন...আপনার প্রচুর বিশ্রাম দরকার।

বিশ্রামেই তো থাকি।

হয়ত এটাও 'এনাক' নয়। আরও প্রয়োজন।...ও কি...আবার

বসে পড়লেন কেন? শরীরাটা কি বেশি খারাপ লাগছে?

উঠতে গিয়ে সত্যিই বসে পড়েছে অচরিতা, ওর মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি ওর হেসান মাথাটা ধরে ফেলল নবেন্দ্র।

মিসেস সেন?

ওর মুখের ওপরে বুকে একেবারে কাছে এসে গভীরভাবে ডাকল নবেন্দ্র।

ঘরে ঢুকলেন সত্যতর।

সব গোটাঘর জুড়ে দিয়ে অচরিতাকে নিয়ে খাবার ভক্ত এসেছেন তিনি।

কি ব্যাপার? আপনি এখানে?

সেটা প্রশ্ন নয় মিসেস সেন। মিসেস সেন বোধ হয় আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে আমি দেখছি।

অচরিতার পাশে বসে ওকে জড়িয়ে ওর মাথাটা বুকে টেনে নিলেন সত্যতর।

...আপনি দয়া ক'র কাউকে পাঠিয়ে দিন।

আমি ডাক্তার আনছি।...

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল নবেন্দ্র।

জান হারায় নি অচরিতা।

কিন্তু মাথাটা আবার টলে গিয়েছিল ঠিকই। ওকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুললেন সত্যতর।

অনেকে চলে গেলেও, তবু বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। সকলেই ব্যস্ত।

প্রোডাকসন ম্যানেজারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সত্যতর গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভারকে কাঁট করতে বললেন।

নবেন্দ্র আসার আগেই তাঁকে বেরিয়ে যেতে হবে কী ডিও থেকে।

সাধারণত কর্তার গলা কখনও শোনা যায় না।

কদাচিৎ গাড়ি বের করতে বলা বা মাঝে মাঝে জোর কার্ণি ছাড়া কর্তার অস্তিত্বই জানা যায় না সহজে।

কিন্তু আজ বেন সন্তোষে। শুধু চেঁচামিচি নয়, কানকে দেন গালাগালি দিচ্ছেন; বোকা-বাচ্চা না ভালভাবে, কিন্তু গলাটি যে বেশ চড়া তারে বাধা সে বিবরে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে অল্প শব্দও হচ্ছে। খালা বাট্টা ছুঁড়ছেন নাকি?

## বার এক আকাশ

ইলার দাদা অকস থেকে এসেই বেরিয়ে গেছে।

অরুণা অসহায়ভাবে প্রথম থেকেই নীচু গলায় বতগুলো কৈফিয়ৎ দিয়ে যাচ্ছে। যদিও যল হচ্ছে না তবুও উত্তর দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছে সে।

সত্যব্রতদের গাড়ি এসে থামল। অসহ্য অচরিতাকে সাবানে ধরে ধরেই নামালেন সত্যব্রত।

এসেই স্তন্যতে পেয়েছেন ওপরের চোঁচামিচি, অচরিতাকে শোবার ঘরে রেখে বেরিয়ে এলেন তিনি, নিজেও ভয়ঙ্কর ক্লান্ত।

ব্যাপার কি রে হরিপদ ?

কি জানি, বুকতে পারছি না।

অসম্ভব বিরক্ত বোধ করলেন সত্যব্রত। ন', নীচেরতলার ভাড়া নেওয়াই স্বক্কারি। ওপরের হুমদাম শব্দগুলো যেন ঠিক মাথার ওপরেই পড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

কথাটা বলবার সময় তিনি বোধ হয় ভুলে গেলেন এই প্রথম। নীচেরতলার কোন অসুবিধে অন্তত এ বাড়িতে তাঁকে সহ্য করতে হয় নি।

কিন্তু এ রকম তো কখনও হয় নি বাবু।

হরিপদ না ব'লে পারল না যেন।

তা বটে, কিন্তু আজই বা কেন ?...আচ্ছা! রবীন কোথায় ? আজ কুঁড়িওতেও যায় নি সে।

কি জানি ঘর তো বন্ধ। আমি বলি বুকি কুঁড়িওতে গেছেন।

বাড়িতে তো নেই।

যাক গে...

পরে মোকাবিলা করা যাযে ভেবে আবার নিজেদের ঘরে ঢুক এলেন সত্যব্রত।

কি যে কাণ্ড হচ্ছে আজ সকাল থেকে। সবস্তু পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়লে বুকি শান্তি পান তিনি। তার ওপর ডাক্তারের কথাটা তো তাঁকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

অচরিতা উঠে বসেছিল বিছানার ওপর।

উঠলে কেন ?

ঠিক আছি। ওপরে কি ব্যাপার বল তো ?

আমিও তো তাই ভাবছি। যেন কুককেক্স বেগেছে, বর্তা ক্ষেপেছেন মনে হচ্ছে।

অচরিতা উঠে পড়াল।

কিন্তু কেন ? কখনও তো এমন হয় না ? ভক্তলোক তো ভারি শাস্ত প্রকৃতির বলে মনে হয়।

রবীনও—

হ্যাঁ ওর কাছ থেকে তো সবই জানতে পারবে, ওর এত যাতায়াত ও বাড়িতে।

আবার মুখ টিপে হাসল অচরিতা।

## কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্যা হিমালী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্যের  
মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই  
এর পরিচর্যা করা উচিত। উপযুক্ত  
উপাদানে প্রস্তুত হিমালী  
গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য  
ও মসৃণতা বাড়ায়।



হিমালী  
প্রাইভেট লি:  
কলিকাতা-২



বসুমতী : আষাঢ় '৭১

৪২৫

তুমি ভাল আছ তো এখন ?  
উদ্ভিন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সত্যব্রত ।  
হ্যাঁ গো হ্যাঁ...  
হাদল সূচরিতা !  
দরজায় মুঠ ধাক্কা পড়ল ।  
কে ?  
সূচরিতা জিজ্ঞেস করল ।  
শোবার ঘরে রবীন ছাড়া আর কে ঢোকা দিয়ে ঢুকবে ।  
আমি ।  
মেয়েলি গলার উত্তর হল ।  
দেখ দেখ পোনের কেউ বোধ হয় ।  
সত্যব্রত পর্দা সরায়ে রীতিমত অবাক হলেন । তাড়াতাড়ি  
সরে গিয়ে পথ ক'রে দিলেন, আসুন ।  
ভেতরে ঢুকল অরুণা । শুকে দেখে চমকে গেল সূচরিতা । এর  
থেকে আশ্চর্য আর কি আছে ? আজ বিনয়নের ওপর ওরা এ  
বাড়িতে আছে কোন বিশেষ দিনে নিমন্ত্রণ করেও অরুণাকে নীচে  
আনতে পারে নি । ইলাই এসেছে বরাবর ।  
আজ হঠাৎ ?  
নিশ্চয়ই বিপদে পড়েই এসেছে, যাঁ টোমামিচি হচ্ছে ওপরে,  
না হলে অহঙ্কারের একটি আবরণ ঢেকে রাখা নিজেই কখনো !  
বেশ খুশি হ'ল সূচরিতা ।  
কি ব্যাপার বোদি ।  
ভরানক বিপদে পড়েছি ভাই ।  
বসুন ।  
না বসব না । আপনি যদি একবার ওপরে আসেন তো ভাল  
হয় । একটু কথা আছে ।  
বেশ তো এখানেই বসুন না ।  
হ্যাঁ আপনার তো এখনও কাপড়-চোপড় ছাড়াও হয় নি । আপনি  
না হয়...  
তার জ্ঞান নয়, আমি—একটু অসুস্থ আছি ।  
ও মাপ করবেন । আমি আবার এসময়ে...বিস্ত্র এত বিপদে  
পড়েছি ভাই...  
বেশ ভাল লাগছিল সূচরিতার । দান্তিক অরুণাকে হাতের মুঠোয়  
পেরেছে সে ।  
বলুন না ! আর তার জ্ঞান নিজে এলেন কেন ? ইলাকে  
দিয়েও তো বলাতে পারতেন ?  
সে কথাই তো বলতে এসেছি । ইলাকে পাওয়া যাচ্ছে না ।  
অরুণার গলার স্বরে স্পষ্ট হয় আর ভাবনা ।  
সে কি ?  
হ্যাঁ ভাই, কি যে হবে ভাবতেও পারছি না ।  
উত্তেজনার কাঁপছে অরুণার গলা ।  
কেমন যেন মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি অনুভব করল সূচরিতা ।  
সত্যব্রত অরুণা আসবার পরই বাথরুমে চলে গেছেন হাত মুখ  
ধোবার জন্ত ।  
বাথরুমে বন্ধ দরজার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে এল

সূচরিতা অরুণার সঙ্গে । উত্তেজনা তারও কম নয় । তার অসুস্থতা  
সে ভুলে গেল, এখন সে সব কিছু বোধই করছে না যেন ।  
রবীন কোথায় ?  
দরজা গলার জিজ্ঞেস করল অরুণা ।  
কেন ওর ঘর ?  
সিঁড়িরস্তার ঘরটার দিকে পা বাড়াল ওরা ।  
একটু ঠেলতেই বন্ধ দরজাটা খুল গেল । রবীনের অস্থকার ঘরে  
কিছু দেখা যাচ্ছে না । আনো জ্বালান ওরা আর সেই আলোকিত  
ঘরের যে অবস্থা দেখল তাতে বুকতে আর কিছু বাকি থাকল না ।  
সারা ঘরটা তখনই বন্ধ ।  
সামনের ইজেক্টার জায়গা শূণ্য । রবীনের বড় স্যাটিশেটার  
তালা খোলা । বোকা যায়, রবীনের প্রিয় আঁকার সংগ্রাম আর  
অতি প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ছাড়া সবকিছুই সে বাছল্য মনে করে  
ফেলে রেখে গেছে ।  
হরিপদ ।  
জোরে হাক দিল সূচরিতা ।  
দাদাবাবু কোথায় ?  
বাবুকে তো বলছি ।  
আমাকে বল না জিজ্ঞেস করছি আমি  
আজ্ঞে, দাদাবাবু তো তুপুরবেলা বেরিয়ে গেল একটা ব্যাগ আর  
ঐ বড় আঁকার জিঁদা সন্ধ্যা হাতে করে ।  
তুই দেখেছিলি ? কিছু বলেছিল ?  
না । কিছু বলে নি । শুধু বললে বেরোচ্ছি, তা আমি ভাবলাম  
বুঝি আপনাদের স্টুডিওতেই গেছে ।  
তাকে আর কিছু বলে নি ?  
কই না তো ?  
আচ্ছা তুই যা ।  
দাদা য় কেন্দ্র পড়ল অরুণা ।  
সূচরিতা শুকে শক্ত করে ধরল ।  
নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ততস্তর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে  
গেল অরুণা ।  
বাথরুমে বার বার ধাক্কা পড়তে রীতিমত বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে  
এলেন সত্যব্রত ।  
হাঃ ব্যাপার কি ? বাথরুমে দরজা ধাক্কাও কেন ?  
কি কাণ্ড হয়েছে জান ?  
উত্তেজনার কাঁপছে যেন সূচরিতা ।  
কি কাণ্ড ।  
রবীন পাগিয়েছে ।  
পাগিয়েছে ।  
হ্যাঁ শুধু একা নয়, ইলাকে নিয়ে ।  
ইলাকে নিয়ে ?  
তাই তো অত টোমামিচি, দেখলে না ওপরের বৌকে নীচে, আমার  
কাছে ?  
কেন কথা বললেন না সত্যব্রত । গুম হয়ে বসে রইলেন  
কিছুক্ষণ, হাত ছুঁতে ছুঁতাবে মুঠো করলেন, চোখাল ছুঁতে শক্ত হয়ে

## আর এক আকাশ

গছে তাঁর। কি এক দৃঢ়কল্প করছেন তিনি। আজ কিভাবে দিন আরম্ভ হয়ে, কিভাবে দিন শেষ হচ্ছে তাঁর।

ঠান্ডা খুব অস্থিরবেশ করতে লাগলেন তিনি। ঘরটা মনোহী পাগচারি শুরু করলেন।

কি করতে পার তুমি? এত ভেবে কি হবে?

অনেকক্ষণ পরে যেন স্তব্ধতা বসতে পারল।

ওর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন সত্যব্রত।

সত্যি রবীন যে এমন শক্ততা করবে।...

কথা শেষ হ'ল না ওর।

ওকে খামিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন সত্যব্রত, শক্ততা তুমিও ফম করছ না।

আমি?

এর থেকে অবাক হবার কি আছে—খাঁ, তুমিই...জান আজ তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়বার পদ...

কি হয়েছিল?

কিস কিস করে বললেন স্তব্ধতা।

নবনুর্গ অগ্রহ যে সত্যব্রতের ভাল লাগে নি, সেটুকু বুঝতে স্তব্ধতার দেবি হয় নি।

সত্যব্রত ওর দিকে এগিয়ে এলেন, দৃঢ় হাতে দু'কাঁধ ধরলেন স্তব্ধতার তারপর কেমন হুল-হুল চোখ করে বললেন, জান! তুমি না হ'তে চলেছ!

না—

বিরাট একটা টাকর করে দু'হাতে মুখ ঢাকল স্তব্ধতা।

এ হ'তে পারে না। তার জীবনে সন্তানের স্থান নেই। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তা সত্যব্রত। তাই সেও তার সন্তানের স্মরণে তার জীবন কাটাতে। সেই ভাল তার।

কিন্তু আজ এ কি কথা বললেন সত্যব্রত? বিষয়ে-আন্দে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল স্তব্ধতার। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কঁদেই চলে।

ওর দিকে না তাকার পাগচারিই করতে লাগলেন সত্যব্রত।

তাঁর এত হিসেব, এত গ্লান সব যেন কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সন্তান জন্মের সন্তানবান্দ আনন্দ, বাস্তব জ্ঞানের সংঘর্ষে মিশে যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে।

কি করতে পারেন তিনি?

ভেবেছিলেন হয়ত বা এই সময়ে সন্তান আদার সন্তানবান্দকে ঠেকান যায়, ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করবার কথাও তিনি ভেবেছিলেন, কিন্তু সব গ্লান, সব হিসেব রবীন যেন কেমন হেঙ্গে দিল।

বিশ্বাসের গুস্তগুস্তা একে একে যেন সরে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে মাটিতে গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে।

সেই রবীন!

আশ্রিত, মুক, তার সাহস হ'ল এতটা। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে, নির্দ্বিধা জীবন ছেড়ে অনিশ্চিত পথে ছুটে, তাঁর মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে?

কি ম্পর্দা।

কিছুতেই ক্ষমা করবেন না তিনি।

তিনি ভালভাবেই জানেন আজ হোক কাল হোক তাকে ফিরে আসতেই হবে। অস্বস্তি তার প্রাণ্য বহু টাকার কিছুটাও দাবী করার জন্ত এ ছুসময়ে। সেটুকু সে ছাড়তে পারবে না। তাই সে আসবেই, আজ হোক, কাল হোক।

কিন্তু ওরা এল না।

আজ কাল করে একমাস চলে গেল, ওরা এল না।


স্তব্ধতার বিষয় যেন সীমা ছাড়াল। নিজের মধ্যে শুধুমাত্র স্তব্ধতার সন্তানবান্দ নয়, ইলা আর রবানের কথা ভেবে।

তার এতদিনের চিন্তাধারায় একটা বিরাট প্রশ্ন যেন মাথা তুলে পিড়াল।

জগতে তবে দিকিওরটিই শেষ কথা নয়? অর্থের জোর?

ছাড়াও অন্য জোর আছে, যাতে পরম অনিশ্চিতকেই জীবনে আস্থান করা যায়?

সত্যিই অবাক হল স্তব্ধতা।



ডার্লি ও কার্লিও

# দুলালের

# তালমিছুরী

# সপরিবারে নিখরচায় শৈলাবাসে ঘুরে আসুন

জনসন অ্যাণ্ড জনসন-এর কাছ থেকে

বিজয়ী প্রতিযোগী পাবেন

কাশ্মীর, দার্জিলিং অথবা নিজের পছন্দমত যে কোনো শৈলাবাসে  
বেড়িয়ে আসার জন্যে বিমানপথে যাতায়াতের ২টি  
ফুলটিকিট ও ২টি হাফ-টিকিট, উপরন্তু ৫০০ টাকা হাত খরচ  
এবং আরও ১৫টি পুরস্কার...

৫টি  
দ্বিতীয়  
পুরস্কার

সুন্দর নক্সা-বক্স।  
বাচ্চাদের খাট

৫টি  
তৃতীয়  
পুরস্কার

মনোরম প্রশস্ত  
ফোল্ডিং প্র্যাম

৫টি  
সামান্য  
পুরস্কার

সেরা দরের  
ষ্টীম ইঞ্জী

যোগদানের শেষ তারিখ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৪

এই তারিখের মধ্যে আপনার প্রবেশপত্র  
আমাদের কাছে পৌঁছান দরকার।

আপনার বাড়িতে নিশ্চয় কচি ছেলেমেয়ে আছে? আপনার দরকার শুধু একটি ক্যামেরা আর এক রোল  
ফিল্ম—তাহলেই আপনি জনসন অ্যাণ্ড জনসন-এর নতুন শিশু-প্রতিযোগিতায় এই জমকালো প্রথম পুরস্কারটি  
পাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে পারেন। এখন আপনার বাচ্চার ছবি তুলতে শুরু করে দিন—যে ছবিটা সব  
চেয়ে মনোরম হবে, সেটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। প্রতিযোগিতায় সে ছবি প্রথম হতে পারে—  
আর তাহলে আপনার সপরিবারে বেড়াতে যাবার স্বপ্ন এতদিনে সফল হবে।

## প্রবেশপত্রের কুপন

আমি নিয়মাবলী মেনে চলতে এবং বিচারকদের সিদ্ধান্ত  
ছড়াব ব'লে গ্রহণ করতে সম্মত আছি।

বড় অক্ষরে পুরো নাম : শ্রী/শ্রীমতী.....

ঠিকানা.....

প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা :

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড

পোস্ট বক্স নং ৬৫৩১, বোম্বাই ২৬



## আপনার বাচ্চার ছবি পাঠান

যোগ দেবার আগে নীচের নিয়মগুলি পড়ে নিন :

১। একমাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের অধিদায়ীরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। জন্মন অ্যাণ্ড জন্সন এবং জে, ওয়াশটার টমসন কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্মচারীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না।

২। প্রত্যেক ফটোগ্রাফের সঙ্গে, জন্মশল বোবী পাউডারের একটি 'ইকনমি' বা বড় টিন অথবা ছুটি 'মাক্সার্নি' টিন খরিদ করার একটি ছাপানো ক্যাশমেমো পাঠাতে হবে।

৩। একজন প্রতিযোগী একাধিক ফটো পাঠাতে পারেন; কিন্তু প্রত্যেকটি ফটোর সঙ্গে একটি ক'রে ক্যাশ মেমো পাঠাতে হবে। প্রত্যেকটি ফটোর পিছনে যেন প্রতিযোগীর নামধাম স্পষ্ট করে লেখা থাকে।

৪। যাদের ফটো পাঠানো হবে, তাদের বয়স যেন ১৮ মাসের বেশী না হয়। ফটোগুলি হবে সাদা কালোয়; সাইজ কমপক্ষে ৩" x ৪"। প্রেরিত কোনো ফটোই ফেরত দেওয়া হবে না।

৫। একটি বিচারকমণ্ডলী প্রেরিত প্রত্যেকটি ফটোই সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। বিচারকদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং এ বিষয়ে কোনো রকম পত্রালাপ করা হবে না।

৬। আপনার এক বা একাধিক প্রবেশপত্রের সঙ্গে একটি ক'রে প্রবেশপত্রের কুপন (পাশে দেওয়া হল) পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হলে নিকটস্থ দোকানদারের কাছ থেকে অতিরিক্ত কুপন সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনার প্রবেশপত্র জন্সন অ্যাণ্ড জন্সন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৫৩১, বোম্বাই ২৬—এই ঠিকানায় পাঠাবেন। খামের ওপর 'শিশু-প্রতিযোগিতা' (Baby Contest) কথাটি লিখবেন।

• ট্রেডমার্ক

হুঁজনের ভালবাসার জোরে পৃথিবীকে উপেক্ষা করে সব-কিছুকেই জয় করবার বাসনা রাখা এরা।

একের হৃদয়ের উত্তাপ অস্ত্রের হৃদয়ে সংকারিত হয়ে কি এক গভীর মমতায় বৃষ্টি তাকে উত্তপ্ত করে তুলে। সে উত্তাপের আশ্বাস স্মৃতিতে শেল না কেন?

নির্ধাক দৃষ্টিতে স্মৃতির তাহীয়ে হীরে এগিয়ে এসে জানলার শিকে মুখটা রাখল। ক'দিন ধরে যে শরীর তাকে একটা অস্থিত দিচ্ছে তারই আবেগ কাটিয়ে উঠতে চায় সে।

অন্ধকার আকাশের শরীরে হাজার হাজার তারার আলোয় জীবনের এক নির্মম সত্যবোধ যেন তার মনে মনে এক নিবিড় অমুড়তিকে আবির্ভাব করল।

অর্থের নেশা নয়—জীবনের নেশার অর্থের প্রয়োজন। ঐ সরল মৌলিক জীবনবোধের এক দুগ্ধ যেন ঐ আলোকিত আকাশে ভাস্বর বিষমভাবে স্মৃতিরতার সামনে উপস্থিত হ'ল। বৃষ্টি বহুদিন আগে যে বজ্রা ঘোষের সূচ্য হচ্ছিল তার দিদির মৃত্যুপূর্ণ জীবননেশার অর্থ সে বুঝতে পারছে। হঠাৎ সবটা পারছেও না, কিন্তু বিবশ বিষয়ে স্মৃতিতে তার অব্যক্ত আর্তনাদে যেন শুনতে পেল, বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি-গয়না এই সবই যেন সমস্ত নয়, এক অনাচারিত উৎসাহের প্রবহমান উর্দাম অমুড়তিই বৃষ্টি জীবনের অঙ্গাদি পাথর।

যেন এই মুহূর্তে স্মৃতির তাহীয়ে বহুভব করল, বৃষ্টি সেই অপূর্ণ অমুড়তির প্রগাঢ় স্বাদের ভক্ত সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেই নীড়ান যায়।

না হলে কোথা থেকে জোর পেল বহীন ইলা? কোথা থেকে পরম ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয় তারা এই নিশ্চিত পরম আশ্রয়কে হুঁপিয়ে টেনে সেই অনিদিষ্ট জীবনকে বরণ করে নিল।

আজ যেন স্মৃতিতে ঐ সূর্য আকাশের মতই উদ্ভাসিত আবেগে জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির দেয়ালে ছায়া ফেলল।

অতীতের সেই বজ্রা ঘোষকে স্মৃতিরতার মনে পড়ল। আর মনে পড়ল দারিদ্র্যের প্রকট জীবনকে। সেই দারিদ্র্যের যাবতীয় অভিযোগকে উপেক্ষা করবার হুঁসোহস।

বজ্রা ঘোষের মার, দিদির আর সখতারও। জীবনের যাবতীয় অস্থির দুঃখ আর বহুবার আঘাতে অতীতের হুঁসোহসও কেবলমাত্র মানুষের অস্থি স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকবার—বাঁচবার মানসকে গ্রহণ করবার যে স্বপ্ন—স্মৃতিতে যেন তারও একটি বাসনা মনে মনে গ্রহণ করবার জন্ত তার প্রস্তুতগা মনকে মেলে ধরল।

তুধু এই তুচ্ছ বিলাসের আনন্দই নয়, জীবনে সহজভাবে বেঁচে থাকটাই বৃষ্টি আনন্দে। তাই বৃষ্টি এই সমস্ত অস্বাভাবিক জীবনবোধে তৃপ্ত অর্থেলোপ সত্যতত্ত্ব বা গোকা মিলিতই নয়, আছে

বৃষ্টি হাজার হাজার মনুষ্যত্বসম্পন্ন সং জীবনবোধে দীপ্ত প্রাণবান মানুষের মিছিল।

সে মিছিল কি স্মৃতিরতার ভক্ত নয়? সে সাধারণের মিছিলে কি স্মৃতিরতার স্থান নেই? মাথায় যেন অসহ্য বহুগা হচ্ছে তার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সত্যিই সে পারে না। সে সাধারণের কাছে ফিরে যেতে পারে না, কেন না সে সাধারণ নয়। ভাল করে যেন বুঝতেও পারে না স্মৃতিতে। অভ্যস্ত আরামের এই জীবন ছাড়া যে জীবনের আভাস তাকে এমনি করে গভীরভাবে নাড়া দিল মনে মনে সেই জীবনটুকুতেই যেন সে নিঃশ্বাস নিতে চায়। এই পরিচিত আকাশের মাথামানেই সে এক আকাশ খোঁজে। যে আকাশে সে প্রাণভরে খোলা হাতদ্বারা নিঃশ্বাস নিতে পারবে। হঠাৎ তার চোখ দিয়ে বড় বড় করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।\*\*\*

সে একা, সত্যিই সে বড় একা!...

সীমাহীন নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার ভক্ত তার আজ অস্ত্র কিছু প্রয়োজন। ইলেকট্রিক আলো নয়, ফ্লোরসিনেব উজ্জ্বলতা নয় বৃষ্টি ঐ অন্ধকার আকাশের সহস্র প্রদীপে জ্বালা প্রাণের আলোর উদ্ভাসিত হ'তে চায় সে।

সেই আকাশের দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল স্মৃতিরতা জানে না।

হঠাৎ দেখল, সামনের ল্যাম্পপোস্টটার কাছে ভিড় কমে গেছে।

তাকে চিনতে পেরেছে ওরা।

ওরাই তাকে ফিরিয়ে দেবে তার নিজের জগতে, তুধুই সে জগৎ তার প্রাণ্য।

ল্যাম্পপোস্টের আলোতেই বৃষ্টি জানলার ফ্রেমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল তার মুখ, তাই ভিড় হয়ে গেছে কৌতূহলী জনতার।

পদ'টা টেনে সরে আসতে যাবে স্মৃতিতে হঠাৎ একটা মনুষ্য শুনে তার পা যেন আটকে গেল। আর পারে না সে, এটুকুই মূল্য তার, আর বেশি নয়, এর বেশি সে আশা করতেও পারবে না।

হঠাৎ যেন তার চাঁৎকার করে উঠতে হচ্ছে হ'ল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সমস্ত সামনেটা যেন একবার হুঁলে উঠল? সামনে রাখা চেয়ারটা হুঁহাত দিয়ে ধরতে গেল স্মৃতিরতা, কিন্তু পারল না।

প্রচণ্ড শব্দ হল।...

কিছু বলতে পারল না স্মৃতিরতা, কিছু দেখতেও পারল না।...

অনেক, অনেকক্ষণ বাদে স্মৃতিরতা আন্তে আন্তে দেখতে পেল যার যেকোনো বিচ্ছিন্নে রাখা নীল কার্পেটের রোঁমাগুলো।

ক্রমশঃ বড় হতে হতে তারাই যেন একটা বিরাট আকাশ হয়ে গেল। স্মৃতিরতা চোখ বুজল।

## সমাপ্ত

[ বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন ]



‘নবদিগন্ত’ পত্রিকার কাজ করতাম তখন। জার্নালিস্টদের ডিগ্রীটা সবে পেরেছি—তার ওপর মোরদের মধ্যে আমাদের ব্যাচই প্রথম ডিগ্রী পেল। কাজেই অভিজ্ঞতার ঘাটতিটুকু উৎসাহের জোয়ারে পুরিয়ে নিতে চাইতাম। নিত্যানতুন পরিকল্পনা পেশ করতাম সম্পাদকের দরবারে। অবশ্য সেগুলি প্রায় সবই না-মঞ্জুর হতো। তবু ওরই মধ্যে মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা সিরিজ লেখার পরিকল্পনা সম্পাদকের ভালো লাগে গেল, সিরিজটা তো অমুমোদন করলেনই—উপরন্তু এর মালমশলা যোগাড় করা ও লেখার ভারও আমার ওপরই পড়ল।

এই সিরিজটার উপলক্ষেই উমাশশী দেবীর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য উমাশশী দেবীর নাম আজকের পাঠকেরা জানবেন না হয় তো। আমিও জানতাম না। তার ওপর যে সব মহিলা সাহিত্যিকের খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত তাঁদের নিয়েই সিরিজটা লেখা হবে এটাই স্থির ছিল। কাজেই উমাশশী দেবীর কথা আমার সিরিজে লিখব এটা কখনো ভাবি নি।

অবশ্য তার আগে বলতে হয় পাঠক হিসেবে উমাশশী দেবীর সংগে আমার পরিচয়ের কথা। ‘নবদিগন্ত’ পত্রিকার সংগে সংশ্লেষ থাকলেও পাড়ায় সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত ছিলাম না আমি। এই আধা-শহর আধা-পাড়া গাঁ শহরতলিতে এসেছি আমরা বছর দুয়েক। প্রত্নবেশীদের সংগে পরিচয় থাকলেও তাঁরা অনেকেই নবদিগন্ত পত্রিকার অস্তিত্বের কথা একেবারেই জানতেন না। আর ধারা জানতেন তাঁরাও হয় তো ধারাবাহিক গল্প উপভাস সিনেমার পাতা ছেড়ে প্রাঙ্গের পাতাগুলিতে নজর দেওয়ার উৎসাহ বেশ কমেতেন না। তাই নতুন সিরিজটা স্বাক্ষর আমার যে মনোভাবই থাক না কেন, পাড়ার কান্ডর চোখে সেটা পড়েছে এমন আশা করি নি। তাই যখন একদিন সকালে একটি কিশোরী মেয়ে এসে ভীষণ ভীষণ চোখে তাকিয়ে বললে—‘আপনিই তো ‘নবদিগন্ত’ পত্রিকার মহিলা সাহিত্যিকদের ওপর লিখছেন?’

তখন অবাক হয়ে গেলাম খুব। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে জবাব দিলাম—‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি?’

মেয়েটি এবার একটু সলজ্জ হেসে বললে—‘আমার নাম অঞ্জলি রায়, ওই পুঁথির নিকের মাটিটার ওপারে আমাদের বাড়ি। ‘নবদিগন্ত’ আমি প্রায়ই পড়ি। আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে।’

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি খেমে গেল। মনে হোল ও কিছু বলতে চায়—ভরসা পাচ্ছে না। মেয়েটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলাম। লম্বা একহারা গড়ন—স্নামলা রঙের মুখখানা ভাঁরি মিষ্টি। পরণে সাদাসিধে ডুরে একখানা। ভালো লাগলো মেয়েটিকে। ওকে সহজ হবার সুযোগ দেবার জন্ত বললাম—‘গাড়িরে কেন, বোসো।’ চা খাবে একটু?’

‘না না—আজ থাক। আরেকদিন আসবো’—তারপর একমুহূর্ত বিদ্যা কবিরে বললে—‘একটা কথা বলতে এসেছিলাম—’

‘বেশ তো, বলো—’

‘আপনি তো মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে লিখছেন, আমার কাকীমার কথা লিখুন না কেন?’

‘তোমার কাকীমা?’

‘আমার কাকীমার নাম উমাশশী দেবী।’ মেয়েটি ওর বিদ্যা

মীরা বানস্করমনিয়ন



অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে দেখলাম। ‘আপনি কি পড়েছেন ওর লেখা?’

উমাশশী দেবী? মনে করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। এটা সিরিজটা শুরু করার পর বাংলা-সাহিত্যের মহিলা সাহিত্যিকদের ওপর বেশ কিছু মালমশলা ঘাঁটতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু কট, উমাশশী দেবী বলে কাকুর নাম তো শুনি নি!

মেয়েটিকে সে কথা বলতে বাগলো, কিন্তু আমার দ্বিধা দেখে সে নিজেরী অনুমান কবে নিল উত্তরটা। বললে—‘পড়েন নি তো? অবশ্য পড়বেন কি করে—কাকীমা তো বেশ কয়েক বছরের মধ্যে লেখেন নি বিদ্যা। কিন্তু আমি এনেছি এই দুটো পুরোনো মাসিক পত্রিকা। কাকীমার লেখা গল্প আছে এতে। পড়বেন?’

শাড়ির আঁচলের নীচে লুকির বাথ দুটো বিবর্ণ মাসিক পত্রিকা বার করলো ও। নাম ‘দেখলাম—‘বাকী’। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। হয় তো এর পরেই ‘কাকীমার’ কঠোরিতত্তর বন্ধ হয়ে গেছে।

পত্রিকা দুটো আমার টেবিলে রেখে ও বললে—‘আপনাদের সময় হলে একটু পড়বেন, কেমন? আমি পরে এসে নিয়ে যাবো।’

বলতে দ্বিধা নেই গল্প দুটো। যে পড়তে শুরু করেছিলাম তার প্রথম কারণ নেহাৎ মেয়েলী কৌতূহল—দ্বিতীয় অঞ্জলির মিলি মুখখানা তা ছাড়া পাতা উল্টে পান্টে দেখেছিলাম গল্প দুটো বেশি বড়ো নয়।

ট্রামে এসপ্লানড পৌঁছুবার আগেই শেব করে ফেলা যাবে। তাই সেদিনই বেরুবার সময় কাকীরা সংখ্যা দু'টো আমার শান্তিনিকেতনী বোলাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

কিছুদূর পড়েই কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম। গল্প দুটার কাহিনীগত উৎকর্ষ হয় তো খুব একটা নেই—কিন্তু যা আছে তা হোল তাম্র ধোঁজির সঙ্গে গভীর অমৃত্যুর এক আশ্চর্য সমন্বয়। প্রকাশজগীর পারিপাট্য ততো নেই—কিন্তু বৃকতে পারলাম একটু ঘবলে মাজলেই পাওয়া যাবে এক নিখাদ হীরে। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকেরও বখন জীবনবোধ নিতান্ত ভাসাভাসা তখন জীবনের মূলে পৌঁছুবার এমন সন্ধানীদৃষ্টি আর অমৃত্যুতীল হৃদয় পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল কি করে।

অঞ্জলি এসো দিন দুয়েক পরে। উৎসাহভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো—‘পড়েছেন আপনি?’

বললাম—‘পড়েছি বই কি—’ কিন্তু তোমার কাকীমা এত চমৎকার লেখেন, তবে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন কেন?’

অঞ্জলির মুখটা এবার রান দেখালো একটু। ‘আমিও তো কতো বল কাকীমাকে। কিন্তু কিছুতেই বলম ধরতে পারি নি।’

বললাম—‘চলো তোমার কাকীমার সঙ্গে আলাপ করে আসি।’

‘বাবেন? চলুন না এমুণি—’ অঞ্জলিকে অসন্তুষ্ট খুঁশি দেখালো। ‘কাকীমা নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরেছেন—’

‘কাকীমা কি বাইরে কাজ করেন কোথাও?’—কৌতূহল দমন করতে পারি না আমি।

‘করেন বই কি—’ বেশ গর্বের হাসি হাসে অঞ্জলি। ‘এ পাড়ার বিনোদিনী মাইনর স্কুলের হেডমিস্ট্রেস উনি।’

এবার মনে পড়লো পাড়ার অনেকের মুখেই বিনোদিনী স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের প্রশংসা শুনেছি। অজুত নাকি তাঁর কর্মক্ষমতা। অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন স্কুলটার পেছনে। ফলে হয় তো শীগগিরই হাইস্কুল হবে এটা।

অঞ্জলিকে বললাম—‘তোমার কাকীমার প্রশংসা তো সবার মুখে শুধে।’

‘হবেই তো—’ অঞ্জলি হেসে বলে। ‘কি ভীষণ কাজের লোক কাকীমা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আর শুধু কি বাইরে? ঘরেও সব কাজ কাকীমা নিজে দেখানো করেন। কি চমৎকার যে রান্না করেন কাকীমা—’

সারাদি পথ অঞ্জলি ওর কাকীমার প্রশংসিত গেরে চললো। ওদের বাড়িটা দেখলাম বেশ সুন্দর। ছোট বাংলা প্যাটার্নের বাড়ি—সামনে একফালি জমি। তাতে গোটা কয়েক ফুল আর পাতাবাহারের গাছ। কিন্তু বাগানের কোথাও একটি পাতা পড়ে নেই। বৃকতে পারলাম অঞ্জলির কাকীমার এদিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে।

আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে অঞ্জলি ভেতরে গেল। ঘরটায় আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই—খানকয়েক বেতের চেয়ার ও একটা বেতের টেবিল। এম্ব্রয়ডারী করা টেবিলক্লেথের ওপর সবুজ রঙের ফুলদানীতে গোটা কয়েক রজনীগন্ধা। দেয়ালে ঝুলছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ছবি। দরজার কটকী পর্দা। সব মিলিয়ে এমন একটা

বাছসাহীন ছিমছাম ভাব যে ভাবি ভালো লাগলো।

একটু পরে ঘর চুকলো অঞ্জলি—হাতে চারের ট্রে। পেছনে এলেন উমাশশী দেবী। বলতে বিধা নেই উমাশশী দেবীকে দেখে আমি একটু হতাশ হলাম। গোলগা গা ভারিকী চেহারা, বিশেষ কোন প্রতিভার ছাপ নেই সেই মুখে। ঐ ধরনের আরো পাঁচজন গিন্নীবান্নার সঙ্গে খুব একটা তফাৎ খুঁজে পেলাম না আমি। নমন্যর করে একটা চেয়ার টেনে বসলেন উনি। টিপট থেকে চা ঢাললেন পোরালার। তারপর একটু হেসে বললেন—‘অঞ্জলির কাছে আপনার কথা শুনেছি। ও আপনার খুব ভক্ত। আমাকেও ঐ দলে ফেলাতে পারেন। ‘নবদিগন্ত’ আমিও পড়ি—আপনার প্রবন্ধ সবার আগে।’

সংকুচিত হয়ে বললাম—‘কিই বা লিখি তার জন্য বাহবা দিয়ে আমার অপ্ৰস্তুত করবেন না। আমি কিন্তু আজ আপনার কথা শুনেতে এসেছি।’

‘আমার কথা?’ বিস্মিত হলেন উনি।  
আমার হাতে ছিল ‘কাকীরা’ সংখ্যা দু'টো। বার করে দিয়ে বললাম—‘আপনার গল্প দু'টা পড়লাম। কি চমৎকার লেখার হাত আপনার। কিন্তু আজকাল লেখেন না কেন?’

পত্রিকা দু'টা দেখে তাঁর মুখটা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বললেন—‘কি আপনার কাছে দিলে এ পত্রিকা? অঞ্জলি বুঝি? অঞ্জলি—’

অঞ্জলি আগেই সরে পড়েছিল।

‘আপনি অঞ্জলির ওপর রাগ করবেন না—’ আমি বললাম। ও ভালোই করেছে। নয় তো কি করে জানতে পেতাম এতো ভালো লেখেন আপনি। আমার কথার জবাব দিন এবার। লেখেন না কেন আজকাল?’

এবার একটু হেসে উনি বললেন—‘কৈফিয়ৎ চাইছেন বুঝি?’

‘নিশ্চয়ই চাইছি। পাঠক হিসেবে।’

‘আচ্ছা বললো। কিন্তু চা’-টা খান আগে। জুড়িয়ে যাবে।’

চারের পোরালার চুমুক দিয়ে উনি আমার নিজের বিবরণ দু'চারটে প্রশ্ন করলেন—বাড়িতে কে কে আছে—কবে পাশ করেছি—ইত্যাদি। তারপর আমার অজান্তেই কখন আলাপটা ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। উনি বলতে শুরু করলেন তাঁর স্কুলের কথা—কিভাবে একটু একটু করে স্কুলটা গড়ে তুলেছেন। বললেন এ পাড়ার সভা-সমিতির কথা। এ পাড়ার প্রথম বায়ান্দাদের মধ্যে তাঁরও পড়েন। প্রথম বখন এলেন চারিকি খানান্ডাবায় ভর্তি ছিল। কত আবেদন-নিবেদন করে এদিকে বাসকট করাতে হয়েছে ইত্যাদি।

গল্প করতে করতে কখন রাত হয়ে গেছিল খোরাল করি নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলাম। আটটা বাজে। কালই যে আমার আগামী প্রবন্ধের প্রকৃতি দেখে দেবার কথা।

বললাম—‘উঠি এবার। আমার একটু কাজ আছে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে গল্প করলাম অথচ আপনার কথা কিছুই শোনা হোলো না।’

উমাশশী দেবী হাসলেন আবার। বললেন—‘বারে আমার কথা নয় তো কার কথা হোল এতক্ষণ? আমার স্কুল, কাজ, বাড়ি, ঘরদোর, পাড়া—এসবের মধ্যেই তো আমি রয়েছি। এগুলো বাদ দিলে আমার অস্তিত্ব কোথায়?’

তর্ক তুলতে পারতাম। কিন্তু হাতে সময় ছিল না। বললাম—

‘আজ বড়ো দেরি হয়ে গেছে—আপনার প্রার্থের জবাব আরেক দিন দেবো।’

উনি নমস্কার জানিয়ে বললেন—‘আসবেন কিন্তু আরেকদিন—’।  
রাত্ত্রে শুয়ে উমাশশী দেবীর কথাই ভাবছিলাম। উনি যে হচ্ছে  
করেই আমার প্রাণটা এড়িয়ে গেলেন তা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু  
কেন? একবার মনে হোল হয়তো লেখাটা ছিল উমাশশী দেবীর  
সাময়িক খোয়াল। কিংবা ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার প্রবল  
বাসনা চরিতার্থ করার উপায়মাত্র। অল্পদিন পরেই সে খোয়াল  
সে বাসনা মিলিয়ে গেছে। কিন্তু যতাই ঐ গল্প ছোট্টোকে নিয়ে  
মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, ততাই এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে  
উঠলো যে নেছা সাময়িক খোয়ালের বশে অমন লেখা সম্ভব নয়।  
কিন্তু তবে কেন উনি লেখা ছেড়ে দিলেন?

এক মেয়েলীমন, তার সাংবাদিকবৃত্তি। কাজেই কৌতূহলটা  
দমন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হোলো। তাই ঠিক করলাম আবার  
দেখা করবো। ঠর সন্দেহ। কিন্তু মনে কোলো হয়তো ঠর বাড়িতে গেলে  
নানা অজুহাতে আমার প্রার্থের জবাব দেবেন না উনি। শিষ্টাচার  
আতিথেয়তার ভূঁই আত্মগোপন করবেন। তা ছাড়া হয়তো আত্মীয়  
পরিজনদের উপস্থিতিতে নিজের অন্তরকে মেলে ধরতে সংকোচবোধ  
করেন উনি।

অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম ফুলেই ঠকে ধরতে হবে একদিন।  
অবশ্য একেবারে ফুলের মতোও ঠিক সুরিধা হবে না তা জানতাম।

তাই একদিন বিকেলে ছুটিব ঘটাব বিনামিনী ফুলের গেটে গাড়িয়ে  
অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ফুল ছুটি হয়ে বাওয়ারও আধ ঘণ্টাটুক পরে বেরিয়ে এলেন  
উমাশশী দেবী। আমাকে দেখে ছ’ চোখ কপালে তুলে বললেন—  
‘এ কি, আপনি এখানে? কাউকে নিতে এসেছেন বৃষ্টি? কিন্তু  
বাচ্চারা তো সব চলে গিয়েছে।’

বসলাম—‘না, কাউকে নিতে আসি নি, আপনার সংগে দেখা  
করতে এসেছি।’

‘আমার সংগে?’ আরো বিস্মিত শোনালো ঠর কর্তৃক। ‘জন্মরা  
কোন কথা আছে কি?’

‘হ্যাঁ, একরকম জন্মরীই বটে।’

‘বেশ তো, চলুন আমাদের বাড়ি—’

আমি বললাম—‘আপনি আসুন না আমার সংগে—’

‘আপনার সংগে? কোথায়?’

আমি একমুহূর্ত বিদ্বা করলাম। একটু এগিয়ে গেলেই পাড়ার  
বিজ্ঞান-কবিন—হয় তো পর্দা-ঢাকা খুপারীও মিলবে। কিন্তু  
বিনোদিনী ফুলের হেডমিস্ট্রসকে নিয়ে বিজ্ঞান-কবিনে ঢোকা অসম্ভব।  
যদিও ঐ রকম একটা পরিবেশই হয়তো উমাশশী দেবী ঠর মনের  
কথা বলতে পারতেন। একটু ভেবে বললাম—‘চলুন না—আজ  
আমাদের বাড়ি—’

খানিক ইতস্তত করে উনি বললেন—‘আচ্ছা, চলুন—’।

আনন্দ ঙ্গসবে

# ক, হোডের

প্রসারিত সামগ্রী








ক, হোড ২৩ কোং • কলিকাতা - ২৪

বাড়ি এসে ঠেকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। টেবিল আর বিছানার ওপর বই-খাতার স্তূপ দেখে উনি বললেন—‘পড়াশোনা করেন খুব দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বইগুলিকে গুছিয়ে রাখেন না কেন?’

লজ্জা পেয়ে বললাম—‘আমি ভীষণ অগোছালো—’

‘গাড়ান, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি’—বলে উনি বই গোছাতে লেগে গেলেন—।

বললাম—‘চা আনি আপনার জন্তে?’

‘তা আমুন। চা নইলে গল্প শুন্যে না—’।

চা নিয়ে এসে দেবি এর মতোই আমার ঘরের ভোল পাণ্টে ফেলছেন উমাশশী দেবী। বই-খাতা সব নিপুণভাবে গোছানো। জরুরী ফুলদানীটা দেয়ালের তাক হতে টেবিলে নেমে এসেছে। বিছানার চান্দরটা টানটান করে পাতা। আমার বললেন—‘ফুলদানীটা খালি দেখছি। আমার এখানে রজনীগন্ধা রয়েছে অনেক। অজলির হাতে পাঠিয়ে দিই যদি আপত্তি হবে না তো?’

ঠেকে এভাবে কাজ করতে দেখে আমার ভারী অপ্রস্তুত লাগছিল। মনে মনে স্বীকার করতে হোল যে আমার এবটুও দূরদৃষ্টি নেই। নয় তো ঠেকে আনতে খাবার আগে ঘরখানা একটু গুছিয়ে যেতে পারতাম। অল্প তখন ভাবি নি যে ঠেকে এখানে আনবো।

আমার সন্কেচটা ঝোপ হয় ঠের চোখে ধরা পড়েছিল। বললেন—‘আপনি লজ্জা পাচ্ছেন বুঝি? কিন্তু লজ্জা পাবার কি আছে। আপনার বয়েসে আমিও অগোছালো ছিলাম। আর এখন যেটা দেখছেন সেটা একটা বদাভাস মাত্র। কাজ ছাড়া থাকতে পারি নে আমি। যাক এসব কথা। চা জুড়িয়ে গেল। শুক করি আসুন।’

চায়ে চুম্বক নিয়ে বললেন—‘বেশ হয়েছে চা-টা। আপনি করেছেন বুঝি?’

আমি বুঝতে পারলাম যে এই প্রশংসাইটুকু নেহাৎ আমাকে সহজ করার প্রচেষ্টা মাত্র। ভজমহিলার বুদ্ধি আছে এবং রয়েছে সম্ভরতা।

একটু পরে জিজ্ঞাস করলেন—‘কই আপনার জরুরী কথা বললেন না?’

‘বলছি। কিন্তু তার আগে কথা দিন যে আপনি উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন না?’

‘বেশ তো জুলুম দেখছি’—হাসলেন উনি। ‘সব কথার কি উত্তর আছে?’

বললাম—‘নিশ্চয়ই আছে। কখনো প্রকাত্তে—কখনো বা অপ্রকাত্তে। বলুন এবার, দেখা ছাড়লেন কেন?’

একহুঁচক চুপ করে থেকে বললেন—‘কেন জানতে চান এ-কথা, বলুন তো?’

‘জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।’

‘তুমিই কোতুল? না নতুন কোন সিরিজের মালমশলা যোগাড় করছেন? তা যদি করেন—তা’হলে কিন্তু সিরিজটার নাম দিতে হবে—যে সূত্র না ফুটিতে—’

দেখলাম উমাশশী দেবীর চেহারাটা গোলগাল হলেও কথাগুলো বেশ ধারালো। বললাম—‘ঠাট্টা করে কথাকাটা এড়িয়ে যাবেন না।’

বলতে আপত্তি কিসের আপনার? এত ভালো লিখতেন—কেন বন্ধন করলেন পাঠকদের?’

এবার উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। চায়ের পেয়ালায় চামচটা নাড়তে নাড়তে বললেন—‘পাঠকদের কথা জানি না—কিন্তু নিজে বঞ্চিত হয়েছে এটা অস্বীকার করবো না—’

‘কিন্তু কেন?’

হাসলেন উনি। কিন্তু মুখখানা ককণ দেখালো। বললেন—‘আর লিখতে পারলাম না—তা’ই।’

‘তার মানে?’

‘মানে তো সোজা। কলমে আর লেখা এলো না—’

‘বাঃ, তাও কখনো হয় না কি?’

‘কখনো কখনো হয় টী কি?’

উমাশশী দেবীর উত্তরটা কিন্তু আমাকে হতাশ করলো। আমি ভেবেছিলাম হয় তো ঠের সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তির পেছনে লুকিয়ে আছে কোন বেদনাবিধুর ঘটনা। আর সেই বেদনাবিধুর ঘটনা থেকে ছোটখাট একটা ফিচার লিখতে পারবো এ বিশ্বাস আমার ছিল—যদিও কথটা ঠের কাছে স্বীকার করি নি। স্মরণ সাংবাদিক হিসেবে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস ছিল না বলা চলে। ভাবলাম এই প্রশংসার এখানেই দাঁড়ি টানবো। কিন্তু সেই মুহুর্তে হঠাৎ ঠের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অস্বাভাবিক হয়ে গেলাম। কি অপরিচীত বেদনার ছাপ সেই মুখে। কে বলবে এই মুখখানাকেই একটু আগে নিতান্ত সালামাটা বলে মনে হয়েছিল। তাঁর বেদনা কি আমাদের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ওপরে তুলে ধরে—হোক তা যতো ক্ষণিকের জন্ম।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর উনি নিজেই বললেন—‘কই, আর তো কিছু জিজ্ঞাস করলেন না?’

বললাম—‘কোন অধিকার এগুলো ভাবছি।’

আমার দিকে খানিকক্ষণ চের থেকে উনি বললেন—‘আপনি বয়েসে অনেক ছোট—আমি তো প্রায় গত যুগের লোক। তবু কি আশ্চর্য জানেন? আপনিই প্রথম জিজ্ঞাস করলেন কেন লিখি নে। আত্মীয়-পরিজনেরা অনেকেই অনেকবার লিখতে উপদেশ দিয়েছেন—কিন্তু কেন লিখলাম না সে কথা এমন করে জানতে চায় নি কেউ।’

কি মনে হোল, বললাম—‘জানতে কিন্তু পারি নি এখনো—’

নিখাস ফেললেন উমাশশী। তারপর বললেন—‘হ্যাঁ, বলবো আপনারকে। হয় তো বুঝতে পারবেন—হয় তো না। কিন্তু আমার মনের ভার কমবে খানিকটা।’

একটুখানি চুপ করে থেকে উনি বলতে শুরু করলেন—।

‘লেখার হাত আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু সে লেখা থেকে বাহবা যত না পেয়েছি, মনে মনে আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশি। আর আমার কলমে যতো না লেখা হোত তার চের চের বেশি লেখা হোত মনে মনে। নিজের মনে একটা কল্পনার রাজ্য গড়ে তুলেছিলাম আমি—সেখানে ভ্রম নিতো কত বিচিত্র চরিত্র, কত বিচিত্র তাদের স্বপ্ন-স্বপ্ন হাসি-কান্না। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগ থেকেও নেই, মনে মনে সে সব চরিত্রকে গড়তাম ভ্রান্ততাম আমি—তাদের জীবনের স্মৃতিগুলো নিশিয়ে—নানা—নানা তৈরি করতাম। এই—জগৎ ছিল

## হাউই

একান্ত আমার, নিজস্ব। কেউ জানতো না এর কথা। অনেকবার মনে হয়েছে, আমার কর্তন্যার রাজ্যটিকে কালির আঁড়ে ফুটিয়ে তুলবো, কখনো কখনো হয় তো চেষ্টাও করতাম, কিন্তু প্রতিবারই মনে হোত কালি-কলমে যা ফুটে উঠেছে তা আমার কর্তন্যার রাজ্যের ছায়ামাত্র, কার্য নয়।

তবু একথা স্বীকার করবো—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদিন না একদিন কালি-কলমের মাধ্যমে আমার কর্তন্যার রাজ্যের কার্যটিকেই ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

ম্যাগাজিনে ডু'একটা লেখার বেশ নাম হয়েছে এমন সময় আমার বিয়ে হোল। আর সেই সঙ্গে আমার পুরোনো জীবনেরও হোল ইতি। না, পড়াশোনা ছাড়লাম না। অবশ্য। বরঞ্চ আমার স্বামীর আগ্রহে প্রাইভেটে বি-এ দেবার জন্ত তৈরি হতে লাগলাম। দেখলাম আই-এ অবধি হেলাফেসা করে পাশ করে এসেছি। এবার একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। আমার স্বামীর ইচ্ছা ছিল যেন আমি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করি—কারণ আমার গড়া নিয়ে আত্মীয়-পরিজনরা অনেকের বেশ বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিলেন। হাজার হলেও সে যুগের কাল তো! শান্তিভি ভারতেন ঘরের কাজে ফাঁকি দেবার জন্ত আমি পড়ার বাতানা তুলেছি।

আমার স্বামী বললেন—‘মার ধারণা যে মিথ্যা এটা তুমি প্রমাণ করে দাও উমা—’

কাজেই পড়তে বসতাম রাত দশটার পর আর ভোর চারটেয় উঠে। বাকি সময়টা শান্তিভির অস্ত্রাণ গুরুত্বপূর্ণের মতোই ঘরকন্নার কাজে সেগে থাকতাম। অবশ্য এ কথা বলছি না যে এসব কাজ আমার খারাপ লাগতো। বরঞ্চ, নতুন নতুন সংসার করার আনন্দে অতিতুচ্ছ কাজেও আনন্দ পেতাম আমি। তা ছাড়া স্বামীর আদর-সোহাগে মনটা এতোই ভরে থাকতো যে, ওদের সংসারকে খুশি করার জন্তে প্রাণ-মন ঢেলে কাজ করতে ইচ্ছে হোত। ফলে প্রশংসাও জুটতে লাগলো বেশ। আত্মপ্রসাদে আমার বুক ভরে উঠলো। আরো খাটতে লাগলাম সংসারের জন্ত। কখন যেন সবার অলক্ষ্যে

সংসারের দায়-দায়িত্ব প্রায় সবটুকুই আমার ওপর এসে পড়লো। মনে হতে লাগলো এক একটা দিন চল্লিশ ঘণ্টার না হয়ে আটশ ঘণ্টার হোক না কেন।

বলাই বাহুল্য, এত ব্যস্ততার মধ্যে কলম নিয়ে প্রায় বসভেই পারতাম না। আমার মনের কর্তন্যার রাজ্য কিন্তু তখনো অটুট ছিল। বরঞ্চ যতোই জীবনের কাছাকাছি আসতে লাগলাম ততোই তার অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় হাসি-কারার টানা-পোড়েন দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমি। আমার কর্তন্যার জালে জেগে উঠলো নতুন নতুন নজ্জা। সেই নজ্জাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো মনের মধ্যে। খুশিমনে তাবল্যাম এইবার আমার মনের তাবনাগুলি কার্য নেবে। হয় তো কখনো

## — প্রত্যেক মানুষের জেনে রাখা উচিত —



চুল থাকলে অথবা  
মাথার চুল উঠ গেলে  
আপনার সৌন্দর্য্য  
চমক হয়ে যাবে...

## ইলোরা কুঁচ অয়েল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে

ইলোরা কেমিক্যাল . কলিকাতা-২ .

কখনো নিয়েও ছিল। আপনি যে গল্প হুঁটা পড়েছেন সে হুঁটা এ সময়কারই লেখা।

লিখতে সময় পেতাম না, একত্র কিন্তু আমার আকশোষ ছিল না। আমি ভাবতাম একদিন সময় করে কলম নিয়ে বসবেই বন্দী হবে আমার যুক্ত-বিহঙ্গম ভাবনাগুলো। কিন্তু ক্রমশ সেই একটুকু সময় পাওনাই কঠিন হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে সম্মানে বি-এ পাশ করেছিলাম আমি। পরীক্ষার ভাবনা চুকলে—ভাবলাম এবার কলম নিয়ে বসবো। কিন্তু জীবনের দাবী কি অত সহজে মেটায়? সে বছরই আমার প্রথম সন্তান কোলে এলো। প্রথম মা হওয়ার যে কি অপূর্ণ অমুভূতি তা হয়তো ঠিক আপনি বুঝতে পারবেন না। আমার দেহের অধিমজ্জা দিয়ে গড়ে উঠেছে এক নতুন জীবন—আর একটু এগুই করে আমারই শ্বেহচ্ছায়ার সে ভীম পরমিত হয়ে উঠেছে—এই অমুভূতি এই বোধ, হয়তো মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে বিষমকর অমুভূতি।

সেই অমুভূতির জোয়ারে যে আমার সবটুকু সময়টুকু ভেসে গেল তা নয়—ভেসে গেল আমার মনের একান্ত বরনার জগতটি। অথচ জানতেও পারলাম না আমি। কচি একটা অসহায় প্রাণের একান্ত নির্ভরতা শুধু আমার কাজকে নয় চিন্তাকেও পরিব্যাপ্ত করে তুলল। থোকা একটু বড় হতে না হতেই কোলে খুকু এলো, তারপর আবার থোকা। এমন করে ক'টা বছর আমি বিভোর হয়ে রইলাম।

আমার স্বামী কিন্তু মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক করতেন—‘উমা তুমি আজকাল একদম লিখতে বসছে না। মাঝে মাঝে লেখ না কেন? এমন একটা ক্ষমতাকে নষ্ট করছ।’

ছোট থোকাকে কোলে দোলাতে দোলাতে বলতাম—‘ভাবছ কেন, এরা বড়ো হলেই লিখবে।’

তখনও আমি ভাবতাম সময় পেলেই আমি লিখতে পারবো। বুঝতেও পারি নি আমার বরনার উৎসর্গ কখন শুকিয়ে গেছে। জীবনের জালে আটপূঠ বন্দী হয়ে গেছি আমি।

কিন্তু জীবনের জাল তো খোলেও একদিন। আমার থোকা-খুকুরা বড়ো হতে লাগলো আর একটু একটু করে নিজের জগৎ আবিষ্কার করতে লাগল ওরা। সে জগতের বৈজ্ঞানিক থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলাম আমি। এদিকে সংসারের অংকোও স্বচ্ছল হয়েছিল খানিকটা, ফলে ঘরের কাজের জগৎ ফিটাকর বহাল হোলো। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম আমার হাতে অনেক—অনেক সময়। এত সময় নিয়ে কি করি?

আমার স্বামী বললেন—‘এবার লেখা শুরু করো দিকি। অনেক তো খাটলে সংসারের পেছনে—’

অনেক—মনেকদিন বাদে ঘের কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। ছেলেমেয়েদের হোমট্যাক, মুদ্রা-পয়সার হিসেব, আত্মীয়-স্বজনের চিঠির উত্তর, সবগুলি ভাবনেন পেছনে ফেলে এসেছি—। মনটা হাক্সা মনে হচ্ছিল। কানামাটি খুলে দিতে এক দমকা হাওয়া বার চুকলো। খুশিমনে কলম পরলাম আমি।

কিন্তু কি লিখবো।

একমিনিট, দু’মিনিট, দশমিনিট কেটে গেল, মনের মধ্যে অজস্র ভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেল কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলাম না কি লিখবো।

স্বামী বললেন—‘এতদিনের কনভার্সার ফল এটা। দিন কয়েক আপন মনে ভাবো দিকি। দেখবে লেখার মাগলশলা পেয়ে গেছে। গাইয়েদেবও কিছুদিন না গাইলে অমনি হয়। দেখে দিন কয়েক বয়াজ করলেই এবার সব ঠিকঠাক। এও তেমনি আর বি—’

কিন্তু আমার স্বামী একটু ভুল করেছিলেন। রোগাক্রম্য করে বিকল স্বরদ্বয়কে চালু করা যার অবশ্য—কিন্তু দিনের পর দিন আকাশ-পাতাল ভাবলেই কি পাওয়া যায় বরনার সোনার কাঠি? বায় না। তাই নিজের মনের গহন অনেক খুঁজে বেড়িয়েও পেলাম না আমার পুরোনো দিনের বরনার হগতটুক। আমার অজান্তে তা কখন মিলিয়ে গেছে। নিজেকে ভীষণ রিক্ত, অসহায় মনে হতে লাগলো। মনে পড়লো কতদিন ভেবেছি ইচ্ছে করলেই সেই জগতের বিভিন্ন নজ্জাকে কালি-কলমে ফুটিয়ে তুলতে পারবো। ভেবেছিলাম মনের সিন্দুকে চিরকাল জমা হয়ে থাকবে তা। সেই অংকারের ফলেই কি মায়া হয়ে শূন্য মিলিয়ে গেল আমার বরনার রাজ্যের পাঁচ-শাঞ্জীরা?

স্বামী বললেন—‘কলমকে আশ্রয় করেই লিখতে হবে এমন কি কথা আছে? আজকাল তো বাস্তবকে নিয়েই লেখে সবাই। তুমিও লেখ না কেন, চারপাশে যা দেখছ?’

অগত্যা সে চেষ্টাই করতে লাগলাম। একটা গল্প লেখাও হোলো, খানিকটা স্বামী পড়ে বললেন—‘এই তো বেশ হয়েছে—’

কিন্তু গল্পটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল। কারণ? কারণ যে ঘটনাটিকে আশ্রয় করে লিখেছিলাম আমি—বাস্তবে তার লেখানোই ইতি। কিন্তু কাগজ-কলমে লিখে যতবারই পড়লাম—মনে একটা অভূতপূর্ব খোঁচা দিতে লাগলো। মনে হোলো এ গল্পের এখানে শেষ হতে পারে না—এ গল্পকে আরো একটু এগুতেই হবে।

কিন্তু কোন দিকে? কতটুকু? তার তদিশ পেলাম না আমি। অনেক—অনেক চেষ্টা করলেও না। যে সোনার কাঠির ছোঁয়ার বাস্তবজীবন সাহিত্যের জীবন হয়ে ওঠে, সে সোনার কাঠিই আমি হারিয়ে ফেলেছি।

একটু একটু করে এই নিদারুণ সত্যটা আমার কাছে ধরা পড়লো। ফুরিয়ে গেছি আমি। এবাবারই। হয়তো একদিন আমার মতো সম্ভাবনা ছিল, শক্তি ছিল। কিন্তু সে শক্তি আমার অগোচরেই কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা হাউই-এর মতো এবটুখানি জলে উঠেই একেবারে নিভে গেছি আমি। এবাবও কি আমার লিখতে বলবেন?

উমাশশী দেবী থামলেন। বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারের ঝরঝুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম—‘আলোটা জ্বালি?’

‘চাইলেই কি সব সময় আলো জ্বালানো যায়? বোধ হয় না। আচ্ছা, আসি এখন।’ কেমন?—অন্ধকারেই উঠে পড়তেই উমাশশী দেবী।

ভিটামিনের আবিষ্কার বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত শারীর-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শর্করা, স্নেহ এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে থাকলেই আদর্শ খাদ্য হয়। এর সঙ্গে অল্প পরিমাণ মর্ডো খাতব লবণ এবং জলও থাকে চাই, কিন্তু বখান পরীক্ষিত প্রাণীদের শুধু এই ধরনের রাসায়নিক ভাবে বিভূষিত খাদ্য দেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে তাঁরা শেষ পর্যন্ত মারা যাচ্ছে। এর থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে, প্রাকৃতিক খাদ্যে এমন কতগুলি বস্তু আছে, যা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই পদার্থগুলিকেই পরে ভিটামিন নামে অভিহিত করা হয়।

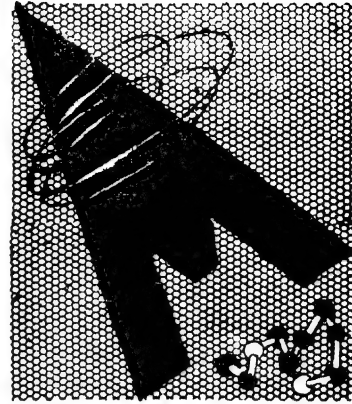
এরপর বিজ্ঞানীরা মানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যে, কোন ভিটামিনের অভাবে কি রোগ হচ্ছে। এই রকম ভাবে অল্পসন্ধান করে তাঁরা দেখলেন যে, লিভারে বা বকুতে এমন একটি ভিটামিন আছে যার ঘাটতি পড়লে প্রাণী দেহে পারনিসিয়াস এ্যানেমিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করে দেখলেন যে, এই বস্তুটির মধ্যে খনিজ পদার্থ কোবাল্ট আছে। এই জন্ত ভিটামিন বি ১২-কে 'কোবালামিন'ও বলা হয়।

আধুনিক জৈব-রসায়ন যে কতখানি উন্নত হয়েছে, এই কোবালামিনের রাসায়নিক গঠনের কথা ভাবলেই বোঝা যায়। এর ভিতরে একটি নিউক্লিওটাইড আছে এবং এর সঙ্গে লেগে আছে এমাইনো প্রোপানল। এই এমাইনো প্রোপানল আবার প্রেশিয়ানিক গ্রাসিডের সাথে যুক্ত আছে আর এটাও আবার যুক্ত আছে পরফাইরিন জাতীয় একটি পদার্থের সঙ্গে। এই পরফাইরিন জাতীয় গঠনের মধ্যস্থলে আছে খনিজ পদার্থ কোবাল্ট এবং এর সঙ্গে যুক্ত আছে এই পরফাইরিনের নাইট্রোজেন এবং নিউক্লিওটাইডের সায়ানাইড ও এজল (Azal) গ্রু। এই কোবালামিন অতি সহজেই প্রোটিনের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং এইভাবে প্রোটিনের শোষণ (absorption) সাহায্য করে।

আমাদের দেহের অন্তরে মধ্যে যে সব ব্যাকটেরিয়া আছে তারা এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে। কিন্তু এর শোষণ নির্ভর করে একটি অন্তর্নিহিত বস্তু (intrinsic factor) উপর এবং এটি আমাদের স্নায়ুহিতা এবং পাকস্থলীর রস থেকে। এর রাসায়নিক গঠন সঠিকভাবে জানা যায় নি, তবে এটুকু দেখা গেছে যে এটি সাইকো-প্রোটিন জাতীয়। পারনিসিয়াস এ্যানেমিয়া হলে এই অন্তর্নিহিত বস্তুটি স্নায়ুহিতা এবং পাকস্থলীর রস থেকে অন্তর্নিহিত হয়, আর তাইই ফল-স্বরূপ এই রোগ দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থার কোবালামিন মূত্রের সঙ্গে থাকে না। তবে বখান এটি সরাসরি শিরার মধ্যে ইন্ট্রিভ করে দেওয়া হয়, কেবল তখনই মূত্রে এটির উপস্থিতি দেখা যায়। মারেনদের দ্বারা কিন্তু সাধারণ অবস্থাতেই এটি পাওয়া যায়। বকুতে এই ভিটামিন বেশ খানিকটা সঞ্চিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে পুস্তর বকুতে, বুদ্ধে, দুধে, শুণ্ণিও এবং ডিম্বে এই ভিটামিন বস্তুটি পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে দেহে এই ভিটামিন পাওয়া যায় না।

শরীরে এর ঘাটতি পড়লে ওজন কমে যায়, শরীরের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। সব সমর দুর্বল মনে হয়, প্রজনন ক্রিয়া বাধা থাকে, মস্ত



## দ্বিগুন বার্তা

মেগাকেরিওসাইটের সংখ্যা কমে যায় এবং রক্তক্ষারতা দেখা যায়। এ ছাড়াও স্নায়ুজ্বর কয়েকটি বিশেষ অংশে ডিজেনারেশন হয়, দ্বিভে এবং মুখে প্রকাশিত হয়।

ভিটামিন বি-১২ শরীরে অনেক রকমের কাজ করে। তবে এদের সবচেয়ে বড় কাজ লোহিত-কণিকা গঠনে সাহায্য করা। এই সারানোকোবালামিন এবং কোলিক-গ্রাসিড একযোগে লোহিত-কণিকার নিউক্লিক গ্রাসিড তৈরি করতে অংশগ্রহণ করে এবং মেগালোব্লাস্ট-এর পদের স্তর থেকেই এই সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এদের অল্পস্থিতিতে হাড়ের মধ্যে মেগালোব্লাস্ট সেলগুলি একত্রিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর ফলে ম্যাক্রোসাইটিক এ্যানেমিয়া হয়।

যদিও বৃহদন্ত্রে এই ভিটামিন বেশ কিছু পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তবুও সেখান থেকে এর শোষণ খুব কমই হয়ে থাকে এবং এইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের সঙ্গে এই ভিটামিন বস্তুটি পরিমাণে নেওয়া উচিত।

—শক্তিপদ সেনগুপ্ত।

## মহাকাশ সম্পর্কিত তথ্যসন্ধান

(পৃথিবীর ৬-টি রাষ্ট্রের উল্লেখ)

আমেরিকার জাতীয় বিমানবিজ্ঞান ও মহাকাশ সন্থা বা গ্রাণ্ডাল আটোমিক এ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র কতটুকু বা লাভবান হয়েছে? তা ছাড়া ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র বা বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও উপগ্রহের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধান ব্রতী হন তবে তাতে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সন্থা তাদের সাহায্য করলে পারেন বলে প্রস্তাব করেছিলেন সেই প্রস্তাবই বা কার্যকরী কতটুকু প্রয়োগ করা হয়েছে।

তবে স্তব্ধ হেড়ে হুংগকে মানুষ কেনই বা বরণ করে নেয়, যরণ সময়ে কেন ঝাঁপ দেয়, চাঁদ ধরার প্রয়াসই বা পার কেন—কেন এই মহাকাশযাত্রার হুংখম প্রচেষ্টা এ সব প্রশ্নের উত্তর নোবেল পুরস্কার

বিকল্পী প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারল্ড উরে বলেছেন : 'মানব চিরজীবন মধ্যে মহাকাশ পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ নিহিত রয়েছে। মানুষ চিরদিনই অজানাকে জানতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, সমগ্র মানবতাহাসেই রয়েছে তার পরিচয়।

অজ মহাকাশ পরিকল্পনা রূপাংগে বিশ্বের বহু দেশ ত্রুত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ঐ সব রাষ্ট্রকে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা ১৯৫৯ সালের প্রস্তাবে ১৯৫৯ সালের তুলমায় সংস্থা আরও অমেকখানি এগিয়ে গেছে। প্রায় বাটটি রাষ্ট্র ব্যক্তিগত বা আকলিকভাবে এই তথ্যসন্ধানী সাময়িক উত্তোগে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

সংস্থা উর্ক আবহমণ্ডল এবং আরোহোক্ষিয়ার (পৃথিবী থেকে ২৫ মাইল ও তার উর্কান্তর) সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী পরীক্ষামূলক রকেট প্রেরণের পরিকল্পনাকে রূপদান করছে।

এই সংস্থার সাহায্যে দশটি রাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন এবং তাদের নিজেদের পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে রূপদান করছে। সংস্থার রকেটের সাহায্যে ঐ সব রাষ্ট্রের তথ্যসন্ধানী উপগ্রহসমূহ মহাকাশে প্রেরিত হচ্ছে। তাদের গবেষণার সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে।

এই পৃথিবীর সব মানুষ একই আলো-হাওয়া-জলে সঙ্গীত। আবহাওয়ার ঐ একটি সূত্রে বিশ্বের সব মানুষই বাঁধা। ১৯৬৪ সালে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাতটি 'টাইরাস' জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে। জাতীয় বিমান বিজ্ঞানী ও মহাকাশ সংস্থা ঐ সব উপগ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সরবরাহ করেছেন। বিভিন্ন দেশেরও আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ব্যবস্থা আছে। টাইরাস প্রেরিত তথ্যাদি পাওয়ার ফলে তাদের ব্যবস্থা উন্নততর হয়েছে। বিশ্বের চল্লিশটি রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার সাহায্য পাচ্ছেন এবং সংস্থার এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার সহযোগিতা করছেন।

আবহাওয়া সম্পর্কে ঐ তথ্যসন্ধানের ব্যাপারে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নেরও সহযোগিতা করছেন। এসম্পর্কে ঐ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এ বিষয়ে পর্যালোচনার ফলে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নিয়ন্ত্রিত তিনটি বিষয় মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১। উত্তর রাষ্ট্রেরই আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সহযোগিতা ও সংগৃহীত তথ্যের বিনিময়।

২। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ক্ষেত্র নিরূপণের জন্য উত্তর রাষ্ট্র কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও তথ্য বিনিময়।

৩। ইকো জাতীয় নির্দিষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহে মিলিত উত্তোগ।

বৃহৎ উত্তোগে মহাকাশে মানুষাবাহী এক আরোহী ছাড়া মহাকাশযান প্রেরণসহ অসংখ্য বহু বিষয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাগ্রহণ, গবেষণা ও ট্রেনিং ব্যাপারে সাহায্য করছে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থিতির সন্ধান ও তাদের সাহায্যে তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সংস্থা করেছেন। ১৯৬৩ সালে বাটটিরও বেশি রাষ্ট্রের বহু প্রাক্তক, অধ্যাপক ও ইঞ্জিনিয়ার এ নিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান-মহাকাশ সংস্থার সহযোগিতা সম্পর্কে সংস্থার দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ হোসার ইমেওয়েল বলেছেন যে, 'এতে কোন আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার নেই। আমরা এ ব্যাপারে কাউকে অর্থ-সাহায্য দেই না কোন অর্থও কারোর কাছ থেকে নেই না।'

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজস্ব ব্যবস্থা অনুসারে মহাকাশ পরিবহন কার্যকরী করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তাদের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিজ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য বহুতরু প্রত্যক্ষ সাহায্য করা যায় ততটুকু সাহায্য করা হচ্ছে। সংস্থার অনুদান কোন পরিকল্পনাকে ঐসব দেশে রূপান্তরিত করা হচ্ছে না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক বর্ষসূচীর আর একটি মোক্ষা কথা গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে, যে সব ফল পাওয়া যায় তার উপর অধিকার বর্তে সমগ্র মানবজাতির। ঐসব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয় পুস্তকে তা দ্বারা নিবিল মানব সমাজই উপকৃত হয়ে থাকে।

মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টা ও উত্তোগ একত্রিত হলে আরও এগিয়ে যাওয়া বাবে, মহাকাশ যাত্রা হবে সম্ভাবিত।

অনন্ত জ্ঞানের আধার ঈশ্বর এই ভ্রমণেও সৃষ্টি করেছেন। এখানে বিশ্ব রহস্যের সন্ধান মানুষের হীশক্তির বলে সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনই বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এই রহস্য উদ্ঘাটনই করতে গিয়ে মানুষ যে জ্ঞান সঞ্চয় করবে, মানুষের কল্যাণ কামনায় কার্যক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ হবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান ও চরম লক্ষ্য। সুতরাং মহাকাশ সংক্রান্ত কার্যসূচীর রূপায়ণে সম্মিলিত উত্তোগের প্রয়োজনীয়তা এখন বেরূপ অনুভূত হচ্ছে এ রকম আর হয় নি। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মানুষের কল্যাণ সাধিত হলেই এর সার্থকতা।

—অনুসন্ধানী

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥



# তলেপাতার সুখি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

এগার

। খ ।

দুর্গাদেবীর প্রার্থের কি জবাব দেবে শিবনাথ বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না কি পরিচয় সে দেবে মুন্সীর।

মুন্সীরও শুরু হয়ে একপাশে ঝাঁড়িয়েছিল।

অবিলম্বে আলো মুন্সীর চোখে মুখে পড়েছে। দুর্গাদেবী দেখেন অপূর্ণ রূপলাবণ্যময়ী মেয়েটি।

বয়েসে কৈশোর বৃষ্টি সবে উত্তীর্ণ হয়ে যৌবন ভুঁই চুঁই করছে।

ঘটনার আকস্মিক পরিস্থিতিটা শিবনাথ ততক্ষণে কতকটা সামলে নিয়েছে। বলে, ওর সব কথা আপনাকে আমি বলবো মা। ওকে আপনাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।

কিন্তু আশ্রয়ের কথা নয়, দুর্গাদেবী তখন সম্পূর্ণ অন্ধ কথা ভাবেন। অনিন্দ্যমুখী মুন্সীর মুখের দিকে তাকিয়ে তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ কথা ভাবছেন বৃষ্টি।

স্বামীর নজরে পড়েছে মেয়েটি।

স্বামীকে তিনি খুব ভালভাবেই চেনেন। নারী সম্পর্কে তাঁর মনোভূতিটা একটু বেন বেশি রকমই উদার এবং সে দৃষ্ণে ও লজ্জার ব্যাপারটা আর যার কাছেই হোক পুত্রের বন্ধুর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে বা পড়বার যেখানে ক্রীণতম সম্ভাবনাও আছে, সেখানে ঐ মেয়েটিকে তিনি আশ্রয় দেবেন কোন দ্বঃসাহসে, সেই কথাটা মনে হওয়াতেই বৃষ্টি অগ্রমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মুখের 'পরে ওদের সে কথাটা বলতেও বেন পারেন না।

তা ছাড়া মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় বেন মনটা কেমন হয়ে পড়ে।

বললেন, এসো—আমার সঙ্গে এসো—মা—

অন্ধরমহলে ওদের নিজের ঘরে নিয়ে এলেন দুর্গাদেবী। তারপর ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখানে বোস তোমরা—ঠাকুর-ঘরটা গুছিয়েই আমি আসছি—

ওদের ঘরে বসিয়ে দুর্গাদেবী ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

স্বামীর সঙ্গারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও ইদানীং ঐ ঠাকুর-ঘরটি মনে ছিল তাঁর একমাত্র সাথীনা ও শান্তির জায়গা—শুধু ক'ছ থেকে মন নেবার পর থেকে।

দিনমানে সংসারের নানা কাজের ভিড়ে পারেন না, কিন্তু রাতে সংসারের সব কাজ মিটে বাবার পর গিয়ে প্রবেশ করেন ঠাকুরঘরে।

অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে কেটে যায় এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরঘরেই রাত হরত শেষ হয়ে যায়। গৃহদেবতা কালো কট্টপাখরের বালাগোপাল—হামাগুড়ি দিয়ে হাত পেতেছেন নাড় র জুজ।

গোপালের সামনে চুপটি করে বসে থাকতেও বৃষ্টি ভাল লাগে।

সেদিনও রাতে চুপটি করে বসেছিলেন গোপালের সামনে, বাইরে ঐ সময় মোক্ষদা দাসীর গলা শোনা গেল।

কেন এত রাতে দাদাবাবুকে দিয়ে কি হবে।

ভূতা কৈলাস বলে, দাদাবাবু কে এক বন্ধু আর একটি মেয়ে এসেছে, দেউড়িতে ঝাঁড়িয়ে আছে দেখা করবে বলে।

বন্ধু আর একটি মেয়ে—এই এত রাতে দেখা করার সময় না কি— বলে সে গে—দাদাবাবু ঘুমাচ্ছে এখন দেখা হবে না। বত সব অনাস্ব্যস্তির কথা—রাত দুপুরে এসেছে দেখা করতে—

কিন্তু ততক্ষণে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও দুর্গাদেবী আসন ত্যাগ করে উঠে পড়েছেন।

দাদাবাবুর বন্ধু ও একটি মেয়ে কথাটা তাঁর কানে গিয়েছে। 'বাইরে এসে ঝাঁড়ান।

ভূতা কৈলাস কির'বাছিল তাকে ডাকেন, কৈলাস—

মা ?

কৈলাস ঘুরে ঝাঁড়াল।

কে এসেছে দাদাবাবুর কাছে বলছিল ?

সঙ্গে তার বন্ধু আর একটি মেয়ে—দ্বাররক্ষী বলছিল—

চল ত'দেখি কে !

কৈলাস বাইর'হলের দিকে এগিয়ে যায়, দুর্গাদেবী তার শিহনে শিহনে অগ্রসর হল।

ভুলে যান ঐ মুহূর্তে তিনি—বে অন্ধপুরের বাইরে অত রাতে গৃহস্থবধূর পা বাড়ান রীতি নয় এবং কথাটা বেন তাঁর মনে পড়ে অন্ধরমহল ও বাইর'হলের মধ্যবর্তী দ্বারপথ বরাবর পৌছে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে ঝাঁড়ান আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর কানে আসে স্বামীর জীবৎ জড়িত কণ্ঠস্বর। তোলা, দেখ ত' বাহাদার ঝাঁড়িয়ে কারা ?

খামী তা চলে ফিরে এসেছেন, ঠিক কি করবেন বুঝতে পারেন না। দুর্গাদেবী—মুহূর্তের জন্য বোধ করি ইতস্তত করেন, তারপরই শাস্ত্র-কণ্ঠে ভোলাকে নির্দেশ করেন, ভোলা ওদের ভিতরে পাঠিয়ে দে—

ঠাকুবুঝের কাজ কোনমতে সারতে সারতেই দুর্গাদেবী ডাৰছিলেন অতঃপর ঐ মেয়েটির কি ব্যবস্থা করবেন।

আশ্রয়ের জ্ঞাত মেয়েটি এসেছে তাঁর কাছে এবং নিঃসন্দেহে বিপদে পড়েছে নচেৎ এত রাত্রে এমন করে ছুটে আসত না এখানে।

মেয়েটির মুখের করুণ অসহায় দৃষ্টি বেন দুর্গাদেবীর চোখের উপর জ্বলন্ত থাকে। কোনমতে কাজ শেষ আবার ফিরে এলেন দুর্গাদেবী, যে খয়ের মধ্যে মুন্সারী আর শিবনাথকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেই বের। দেখলেন ক্লান্ত অবসর মুন্সারী মেঝেতে জাঁচল পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তার শিরের কাছে ক্লান্ত বসে আছে শিবনাথ, স্থির পাখরের মূর্তির মত।

মুন্সারীকে ঘুমাত্তে দেখে বললেন, আহা, ঘুমিয়ে পড়েছে—

হ্যাঁ মা—এতখানি পথ হাঁটা ত'ওর অভ্যাস নেই। তার ওপর অনেকদিন খরের মধ্যে বন্দিনী ছিল।

বন্দিনী ছিল। সে কি?

হ্যাঁ—সে এক বিশ্বাসের কান্ডিনী।

দুর্গাদেবী শব্দপ্রদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন শিবনাথের মুখের দিকে।

শিবনাথ বলে, হ্যাঁ মা, পতঙ্গীজ দস্যু ওকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে ওর মা-বাবার কাছ থেকে—

কি বলছ তুমি শিবনাথ! বিশ্বাসের বেন অবধি থাকে না দুর্গাদেবীর।

শিবনাথ সংক্ষেপে মুন্সারীর ইতিহাস বলে যায়।

জ্ঞত হয়ে শোনেন সে ইতিহাস দুর্গাদেবী।

শিবনাথ বলতে থাকে, আশ্র সেই দস্যুই নিজের আগুতার মধ্যে শেষে ওকে ঘাস করবার জ্ঞাত উত্তত হয়েছে।

কিন্তু লোকটা কে? সেখানে তুমি গেলে কি করব? ওর সঙ্গে পরিচয় হলোই বা কি করে তোমার?

আমিও যে সেই দস্যুর কাছেই ছিলাম এতদিন মা—

কি বলছো?

হ্যাঁ—মামুষটা এখন উপরচোতা যে কখনো কল্পনাতে ডাৰতেও পারি নি তার ভেতরে এমন একটা জঘন্য অত্যাচারী—সোভী দস্যু লুকিয়ে আছে। মুন্সারীর সব কথা না শুনে অশ্রুসাহেবের সত্যিকারের পরিচয়টা হয়ত কোনদিনই পেতাম না। তাই পরিচয়টা পাওয়ার পর আর সেখানে থাকতে সাহস হলো না। তাই কোথায় যাবে, কে আশ্রয় দেবে—হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো মা। মনে হলো পৃথিবীতে আর কোথায়ও আশ্রয় পাই বা না পাই আপনার কাছে পাবোই। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম ওর হাত ধরে—

বেশ করেছো।

কীপকণ্ঠে বললেন দুর্গাদেবী।

আমি জানতাম মা, তুমি আমি করি নি। আমি এখন নিশ্চিত—ওকে আপনার পায়ের তলায় পৌঁছে দিলাম।

দুর্গাদেবী বেন একটু ক্ষমমনস্ক। কি বেন ভাবছিলেন।

শিবনাথ বলে, আমি তা হলে এখন যাই মা?

যাবে?

হ্যাঁ—

রাত শেষ হয়ে এলো। তা ছাড়া এখন তুমি যাবেই বা কোথায়?

যেখানে এতদিন ছিল সেখানে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে না?

না।

তবে?

আমার এক বন্ধু—জীবনবন্ধু বৌবাজার অফলে থাকে—তার বাবা—ককুবল ট্রেল এণ্ড কোম্পানীর বেনিয়ান, তার ওখানে হয়ত কিছুদিনের মত আশ্রয় পেতে পারি। তারপর সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করে নেব।

সে কাল যা করার করো। বাকি রাতটুকু খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। খাজাঞ্চি বুড়ো মচেশবারু আছেন, বলে ডাকলেন, কৈলাস—

কৈলাস আশেপাশেই ছিল কচীর ডাকে এগিয়ে এলো মা— ডাকছিলেন?

হ্যাঁ—শোন, ওকে খাজাঞ্চিবাঘুর ঘরে নিয়ে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে দে—

চলেন বাবু—

শিবনাথ আর বিক্ষিপ্ত করে না। কৈলাসের পিছু পিছু ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যিই সে তখন অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছে। একটু ঘুমাবার প্রয়োজন।

শিবনাথ চলে গেলে আবার তাকালেন দুর্গাদেবী মেঝেতে শায়িত। ও নিশ্চিত। মুন্সারীর মুখের দিকে।

কমলকলির মত মুখখানি বেন। ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় ও দুর্ভাবনায় বেন স্তব্ধ গিয়েছে।

মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

স্থান দিতে হবে মেরোটিকে। স্থান নয় রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজের গৃহে তা সম্ভব নয়।

সহসা মনে পড়ে জ্যোত্স্নাতা অনাদিনাথ বস্তুর কথা।

ঠিক। দাদার কাছেই কাল পাঠিয়ে দেবেন ওকে দুর্গাদেবী। দাদার আশ্রয়েই ও নিশ্চিত হতে পারবে।

অনাদিনাথ ধনী ব্যক্তি—নিমকমহলের দেওয়ানী করে করেক বৎসরের মধ্যে প্রচুর সম্পদ উপার্জন করেছেন।

তা ছাড়া শোভাবাজারের রাজবাংশোদ্ধৃত গোপীমোহন দেবের পুত্র বর্তমান রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশেষ সহোভজন ও জ্বরপাত্র অনাদিনাথ। সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব দুই আছে অনাদিনাথের।

অনাদিনাথ কলকাতার সমাজের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এবং দুর্গাদেবী জ্যোত্স্নাতার মুখেই শুনেছিলেন কলকাতার সমাজ প্রধান দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে এতটুকু আন্দোলন চাঙ্গিরেছে বর্তমানে।

রাজা রামমোহন রায়ের দল ও রাজা রাধাকান্ত দেবের দল। বর্তমানে দুই দলের মধ্যে তিনটি প্রধান বিষয় নিয়ে।

## ভাগ্যপাতার পুঁথি

যেমন ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, সহমরণ প্রথাও উচ্ছেদ এবং ব্রাহ্মোপাসনা স্থাপন।

রাজা রামমোহন রায়ের দলের ঐ তিনটিই লক্ষ্য এবং ঐ তিনটি ব্যাপার নিয়েই আন্দোলন চালিয়েছেন আর অল্প দল রাধাকান্ত দেবের দল—তাদের মতে ঐ তিনটিই বর্জনীয়। নচেৎ সনাতন হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ নাকি অবশ্যস্বার্থী অদুরভবিষ্যতে। তাই তিনি হিন্দুধর্মের রক্ষক রূপে অগ্রণী হয়েছেন। সমাজের এই দুদিনে শক্ত্যুষ্টিতে হাল ধরেছেন।

আর সেই রাধাকান্ত দেবের দলেরই অঙ্গতম পাণ্ডা আজ অনাদিনাথ। অনাদিনাথ শোভাবাজারেই বসবাস করেন।

দুর্গাদেবী স্থির কবেন প্রভুযেই জ্যেষ্ঠের কাছে সংবাদ পাঠাবেন।

কিন্তু মেয়েটা যে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। মুন্সীর মুখের দিকে তাকালেন—অকাতরে ঘমাচ্ছে মুন্সী।

গারে চৈলা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন, মুন্সী—মুন্সী—ওঠ মা—হুতিনবার ডাকতেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে মুন্সী। চল, ঘর শুঁকি চল—

দুর্গাদেবীর কথাই আর দ্বিকল্পনা না করে মুন্সী উঠে বাসে বাসে তাঁকে অমুদরণ করে।

শিবনাথ ভূত্যের সঙ্গে এসে খাজাকী ঘরে প্রবেশ করল। ঘর-জোড়া তক্তাপায় পাতা—তার উপরে ফরাসি বিছান। এককোণে ছোটো সূর্যহং কাঠের আলমারী। তার পাশে লোহার সিন্দুক—হেলসিন্দূর চিত্র-বিচিত্র।

বুদ্ধ খাজাকী মহেশবাবু একধারে ফরাসের উপর শুয়ে প্রচণ্ড নাসিকাধ্বনি করে চলেছেন। কৈলাস শিবনাথকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই চলে যায়, শুয়ে পড়েন গো! একধারে—শুধু বাবার সময় সাবধান করে যায়, বুড়োকে জাগাবেন না—একপাশে শুয়ে থাকেন চূপচাপ, ঘরের কোণে একটি প্রাণী মিটি-মিটি অগচ্চে। তারই আলোয় ঘরের মধ্যে একটা মুহূর্ত আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শিবনাথ ফরাসের উপর শুয়ে পড়ল।

ঐ রাত্রে অন্তটা পথ হেঁটে এসে সে নিজেও কম ক্লান্ত হয় নি। পা হুঁটো যেন ভেঙ্গে আসছিল। কিন্তু শয্যাগ্রহণ করেও চোখে নিজের আসে না।

নানা ভাবনা মাথার মধ্যে একটার পর একটা এসে ভিড় করে। কাজটা কি ভাল হলো। নিজে এসেছিল—এসেছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে মুন্সীকেও নিয়ে আসাটা কি ভাল হয়েছে সঙ্গে করে।

প্রভুযে উঠে শুন্দরসাত্বে বখন জানতে পারবে মুন্সী আর সে দু'জনাট রাত্রে পলাতক হয়েছে—সহজে কি সে নিরস্ত হবে।

নিশ্চয়ই সে অমুদয়ন করবে তাদের এবং তার পক্ষে তাদের খুঁজে বের করতে হয়ত তেমন কঠিন হবে না। আর একবার খুঁজে বের করতে পারলে সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না শুন্দরসাত্বে।

হাজার হোক পত্নীগীত ভালদস্ত। দয়া-মায়-মমতা বলে কোন কিছু কি ওদের হৃদয়ে আছে না কি। না—কাজটা ভাল হয় নি।

সে নিজে চলে এসেছিল—এসেছিল—মুন্সীকে সঙ্গে করে আনতে গেল কেন! তার নিজেরই এই দুনিয়ার মাথা গোঁজবার কোন ইচ্ছা



সর্বত্র  
পাওয়া যায়



এতীশ কবিবাহুর

মহাভূক্ষরাজ

তৈল

ইহাই একমাত্র কেশতৈল আয়ুর্বেদীয়  
ভেষজের গুণাগুণ ঠিক রাখিয়া —

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

ডাঃ সত্যানন্দ চন্দ্র মোহন  
কর্তৃক পরীক্ষিত ও স্বাক্ষরিত।



আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

দেই—পরাজিত—সঙ্গে সে নিয়ে এলো আর একজনকে। কিন্তু কি করবে শিবনাথ। মন যে তার চাইল না।

মুম্বরীকে স্কন্দরসাহেবের কবল থেকে উদ্ধার করার এক বীরত্ব মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অতঃপর—অতঃপর কি!

নিয়ে ত' এলো উত্তেজনার মাথার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুম্বরীকে সঙ্গে করে—দুর্গাদেবী যদি শেষ পর্যন্ত এখানে ঠাই না দেন মুম্বরীকে, কোথায় যাবে সে মুম্বরীকে নিয়ে।

কেউ এখানে তার আর পরিচিত নেই।

তা ছাড়া পরিচিত হলেই কি হয় করে কেউ কাউকে গৃহে স্থান দেয়। স্কন্দরসাহেবের গৃহে স্থান পাওয়ার পূর্বে কিভাবে তার দিন কেটেছে মনে কি নেই তার।

আবার স্কন্দরসাহেবের কথা মনে পড়ে শিবনাথের। সামনে একদিন তার গৃহে সে তাকে স্থান দিয়েছিল!—শুধু স্থান নয়, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আর সে কি না সেই লোকটার সঙ্গেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এলো। বিশ্বাসঘাতকতা বৈ কি—ব্যাপারটাকে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা চলে।

শুনে থাকতে আর পারে না শিবনাথ, অন্ধকারেই শয্যার উপর উঠে বসে। অদূরে শয্যার শারিত ও নিরীত মহেশবাবুর মুখখান। সে অবিশিষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর নাসিকাদ্বিনি অন্ধকারে সমানে কানে প্রবেশ করছে।

কি করবে এখন শিবনাথ। কি তার কর্তব্য।

সামান্য বাকি রাতটুকু পোহালেই ত' বা করবার তাকে করতে হবে। সে ভাবে না তার বা হবার হোক, কিন্তু মুম্বরী।

মুম্বরীকে দুর্গাদেবী যদি আশ্রয় না দেন।

পা জড়িয়ে ধরবে শিবনাথ হুঁহাতে দুর্গাদেবীর—মা মেয়েটা সত্যিই দুর্ভাগিনী শুকে আপনি পায়ে ঠেলবেন না। দয়া করুন মা—

## সংলাপ

বুদ্ধদেব শুধু

হ্যালো—হ্যালো

বুট্ট নামলো।

সন্ধ্যার আজ আসছো কি?

মেথের হারেনে টাঙ্গ মেহ,মানু নর্তকী।

নতুন বোতলে পুরানো মদ্যিরা

সখ্যের মালা হলুক

অনেক দিনের খিল-জাঁটা-বুক

এবার না হয় থলুক।

হ্যালো, হ্যালো, মিস্ জানা।

আমার তো নেই কোনো অলীল মানা।

৭ ছুটুবা না হয় ইচ্ছে-হাওয়ার মুখে

বা জন্মের মতো রক্তের দাগ শুকে

দুয়ারে দিচ্ছি হানা;

নিশ্চিত জেনো আজ সন্ধ্যার তুলবই এই মূলক।

নিজের শয়নখরই মুম্বরীকে নিয়ে এসেছিলেন দুর্গাদেবী।

একটা খোয়া শাড়ি এনে বললেন, শাড়িটা বদলে নে বা—ও রাজ্যের শাড়িটা ছেড়ে কেল।

ঘরের এককোণে রীপাধারে রীপ জলছিল।

তাঁরই মুহু স্বজ্ঞালোকে কেমন যেন ঘুম-ঘুম চোখে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে মুম্বরী।

সত্ত ঘুম থেকে উঠে এসে ঘুম এখানে। তার চোখের পাতা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। হুঁচোখের পাতার তখনো যেন ঘুমের অঙ্গন লেগে রয়েছে—চোখের পাতা হুঁচো ভারী ভারী।

দুর্গাদেবীর নির্দেশে মুম্বরী পরিধের শাড়িটা ছেড়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে নিল। হাত-মুখ ও পাশের বারান্দার মাথা জলপাত্রে ধুয়ে এল।

তখাপি দুর্গাদেবী খানিকটা গল্পাঙ্গল মুম্বরীর সর্বাত্মে ছিটরে দিলেন। এবার এতকণে যেন নিশ্চিন্ত হলেন, সহজ হলেন দুর্গাদেবী।

চোখে-মুখে জল দিয়ে হাত-পা ধুয়ে তাঁর দেওয়া শাড়িটা পরে যখন এসে মুম্বরী দুর্গাদেবীর সামনে ঝাঁপাল—প্রদীপের আলোর মুম্বরীর সত্ত জলেভেজা মুখখানির দিকে তাকিয়ে দুর্গাদেবীর যেন চোখের পলক পড়ে না। রাতের শিশিরে-ভেজা যেন একটি পদ্মকলি।

তোর নাম যেন কি বলছিল শিবনাথ?

মুম্বরী—মুহু শাস্তকণ্ঠে জবাব দেয় মুম্বরী।

কিন্তু পেরেছে, কিছু খাবি?

না—

বাইরে ভোলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মা—

কি রে ভোলা?

কর্তাবাবু আসছেন—

কোথায়?

এই ঘরে—

[ক্রমশঃ]

## অনিকেত

ধীরেন দেবনাথ

বহুব্র প্রসারিত স্বপ্ননীল রাজপথ নয়,

নয় কোনো অনিপুণা কুমারীর অন্ধত হৃদয়।

হিসাবের ছককাটা জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়

খুঁজেছি অনেক কাল কত লব্ধ কত ক্রান্ত পায়।

হেঁটেছি পথের স্রোতে উজ্জলিত বেত্রবতী তাঁরে,

কখনও বা সংগীহীন কল্লনার উজ্জরিতা বিরে।

আবার নেমেছি পথে জীবিকার সত্য অবেশিতে,

প্রান্তিক আসাম হতে ওপারের পশ্চিমী দিল্লিতে

তবু তো যেতে নি ফুঁরা—হৃৎপ্রাণ আজও ঘুরে মরে,

খুঁজে ফেরে আদিগন্ত জ্যোতির্গর্ভ অবতারটিরে।

সারা দেহ উন্নতিরা প্রকম্পিত স্বর—আমি আশ্রয়;

দূর হতে দূরতরে অনেক ঘুরেছি—আজ রাস্তা।



# এক কলেজের চারটি মেয়ে

পরিশিষ্ট

রাণু ভৌমিক (দাস)

লালমাটির পথ এঁকে-বঁকে যেখানে শেব হয়েছে—সেখানে পৃথিবীর সৌম্যতা শুধু হয়ে পড়িয়ে গেছে—চারিদিকের খোলা শূন্য মাঠ ও অসমান মাটি—সেখানেই এই নিঃসঙ্গ কালো বাড়িটা। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত—শুধু মানব পরিত্যক্ত নয়—পৃথিবীরও যেন পরিত্যক্ত। দূর চকু-বাল রেখার আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে—সেখানে স্পর্শ নেই নীলিমার। চারিদিকে সঙ্গী, কৃষ্ণ, বিষম মৃত্যুর ধ্বংসতা।

বাড়িটার অনেকগুলি জানালা—সবক'টিই বন্ধ। কিন্তু লালমাটির পথ দিয়ে এসিবে যেতে যেতে যদি কখনও পথিক ধমকে পড়িয়ে পড়ে, তা' হলে হয় তো তার চোখে পড়বে শ্রীহীন কালো একটি হাত জানালার একটা পাট খুলে আবার দ্রুত বন্ধ করে দিল। কোঁতুহলী পথিক যদি দৈর্ঘ্য নিয়ে অপেক্ষা করে তা হ'লে সে হয় তো দেখবে...

কি দেখবে তা বলে না সেই ছোট চা-খানার লোকরা। শুধু মাথা নাড়ে। কি যে ইঙ্গিত করে তা বাখা যায় না, তবে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, এই বাড়ি সম্পর্কে ওদের একটা অদ্ভুত ভীতি আছে।

এই চা-খানার পরিচিত-অপরিচিতের ভোলাভেগ নেই—যে কোন অচেনা মুখকে ডেকে অগ্নির বলতে পারে, দাদা কেমন আছেন?

চমকেই উঠছিলেন বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন নবাপাত। যিনি একটু আগে নিঃশেষে চুক নির্বাক হয়ে এককোণে বসেছিলেন। আর চমকাবারই কথা। অচেনা জায়গার এক অপরিচিত লোক যদি এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করে, 'কি? কেমন আছেন?' তা হ'লে কি রকম লাগে।

আর, ঠাঁর মনে তো শুধু বিষম নয় একটু ভয়ও। অনেকদিন থেকেই এই ভয় হয়েছে তাঁর সঙ্গী। যৌবন ছাড়িয়ে তিনি যেদিন প্রৌঢ়ের গম্ভীর একলাফে পার হয়ে বাধক্যের এলাকার পড়লেন—যেদিন থেকে তাঁর মনে অজ্ঞানচাচো—সেদিনই যৌবন শেষ হলো—আর যৌবনের কৃতকর্মগুলি কালো ছায়ার মতো—দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে অমুসরণ করতে থাকে—এখনও তিনি চমকে উঠলেন, কোথা থেকে এল ও। কিন্তু, ততক্ষণে লোকটা গুলিকে সরে গেছে।

—ওঃ। তা হ'লে বিশেষভাবে আমাকে নয়। নিশ্চিত আমার

নিবাস কেলে ভাবেন ভ্রমলোক—আবার তখনই মনে হয়, ওকে জিজ্ঞেস করলে হোত—ও কি জানে...

এখানে আসবার আগে আমি হু'ল্টা পড়িয়েছিলাম একটা বাড়ির সামনে—লালমাটির পথে পড়িয়ে তাকিয়েছিলাম কালো বাড়ির দিকে...বারবার এই কথাটা মনে লাগতে থাকে ভ্রমলোকের—কিন্তু, তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না।

অচিন্ত্যও তখন ভাবছিল এই কালো বাড়িটার কথা। হাক-প্যাণ্ট পরা অচিন্ত্য একটা কেটলি নিয়ে পড়িয়েছিল চা নেবার জন্যে। সে ভাবছিল, এই কালো বাড়ির কালো মেয়েকে কেন সবাই 'মেমসাহাব' বলে। মেমসাহাব তো দেখেছে অচিন্ত্য—অদ্ভুত দেখতে—লাল টকটকে, পাতলা বাদামী চুল। আর, এতো কালো, রোগা বিকল দেখতে। প্রথমবার যখন 'মেমসাহাব'কে দেখেছিল সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে...খুব বয়সী হয়েছিল তার পেটে মনে হয়েছিল কি যেন পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে—আর হঠাৎ পৃথিবীটা কালো হয়ে গেল—

চোখ তাকিয়েই সে দেখেছিল...পরে জানতে পেরেছিল ওকে অজান হয়ে পড়ে যেতে দেখে ওর বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মা তো নাকি রীতিমতো কীদতে শুরু করেছিলেন। অচিন্ত্যের ভারি আপশোস হয় যে সে মায়ের কান্না দেখতে পেল না। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তো মায়ের কাছে শুধু বকুনি আর চড়চাপড়—মা কথা বলা মানেই বকুনি দেওয়া, শুধু তাকে নয়, বাড়ির সবাইকে বকেন মা। তাই মা'র কান্নার খবরটি তার নিকট অত্যন্ত অবিধাত মনে হয়েছিল—কিন্তু জোট বোন এমনভাবে 'মা কালীর' দিঘি দিয়ে বলে যে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

জ্ঞান হবার পরে তাকিয়েই সে ভয় পেরেছিল, কালো, শ্রীঙ্গীন একটি মুখ হু'চোখে রাস্তার বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তাঁর হুকড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু সে চোটা করবার আগেই কালো, দীর্ঘ হাত এসে ওকে চেপে ধরেছে। আর—

আর, অস্বাভাবিক হয়ে অচিন্ত্য অমুগ্ধ হয়ে, কি নয় কি মিট সেই

হাত। ঠিক যেন সোয়েলের শিব—ঠিক যেন একমুঠো শিউল ফুল, ঠিক যেন—অচিন্ত্য বৃক্ষে পাবে না, বোঝাতেও পাবে না—কিন্তু, এমন মনোভাব এসেছিল তার মনে অনেকদিন আগে—একদিন বাড়ির সবাইকে লুকিয়ে দুপুরের গরম রোদে সে অনেক অনেক দূরে চলে গিয়েছিল, তারপরে অবাধ হয়ে, আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে দেখলো সামনে একটা পুকুর—টলটল করছে জল, চারিদিকে সবুজ গাছ, ঝোপকাড়। তিনটে হাঁস খেলা করছে সেই জলে—

একটু সময় চুপ করে থাকিয়েছিল অচিন্ত্য। তারপরে প্যাঁচ খুলে নেমে পড়েছিল জলে—সেই মুহূর্তের অমুভূতি সে যে সেদিনের স্পর্শে নতনভাবে অনুভব করেছিল।

—কুমি আছে—বের করতে হবে—শুককণ্ঠ বলেছিলেন তিনি। আর, অচিন্ত্য অবাধ হয়ে ভেবেছিল, তার পেটে কোথায় কি আছে, তা কি করে উনি জানতে পারলেন?

তারপরে, সত্য সত্যই যখন ওর পেট থেকে বড় বড় কঁচোর মতো চুটো কুমি পড়ে—তখন মুহূর্তের জ্ঞান সে ওকে মহাভারতের ভীমের সঙ্গে তুলনা করেছিল। আর, এই আকর্ষণের প্রভাবেই বোধ হয় এক সন্ধ্যার চুপি চুপি উপস্থিত হয়েছিল ওর বাড়িতে—

চুকতে পারে নি ও। ঢোকবার মুখে সন্ধ্যা, বিধাবিকল-ক্ষণে স্তন্যে পেরেছিল বিভৎস এক চাঁৎকার সন্ধ্যার আবহা। অন্ধকারে—সেই চাঁৎকার অমামুখিক মনে হয়েছে—ভয়ে হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে—আর সেইভাবেই ছুটে পাগিয়ে আসে সে। আর কখনও ও দেখানো যায় নি—কিন্তু প্রায়ই তার মনে পড়তো সেই অদ্ভুত ছুটি চোখ—অমুখম স্পর্শ—আকুল চাঁৎকার...

—ওর সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়, আবক্ষ দীর্ঘ দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে ভাবেন হেমন্তাবাবু। ওর সব অপরাধ ক্ষমা করা যায়। ঈশ্বর যাকে ক্ষমা করেছেন, তাকে কি মানুষ ক্ষমা না করে পারে?

তারপরে পিটার তাঁর নিকটে এসে বলে, প্রভু, কতবার আমার জ্ঞাতা আমার বিরুদ্ধে অন্তর্য করবে ও আমি ক্ষমা করবো। সাতবার? প্রভু খীন্ত তাকে বললেন, আমি তোমাকে বলছি—সাতবার নয়—সত্তরগুণ সাতবার।

সাতবার নয়—সত্তর গুণ সাতবার অপরাধ ক্ষমা করো। কিন্তু, মানুষ তো তা করে না। বারবার বলে গেছেন মহামানব, মানুষকে বিচার করো না। কোন পারিপার্শ্বিক কে কোন কাজ করতে বাধ্য হয়, তা কেউ বলতে পারে না। মানবের মনের খোঁজ কেউ রাখে না। বিশেষত মানবী তো জন্ম-অপরাধী, প্রথমে সে সবকিছু হরণ করলো, সব মাটি এবং মানবের সব অধিকার কেড়ে নিল—সব সে আত্মসাৎ করে—প্রতিবাদীদের হত্যা করে—তারপরে সে হরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে। এই সব আইন তার আগে লেখা উচিত ছিল।

ঠিক এমনভাবে নারীকে নষ্ট করেছি আমরা। প্রথমে তার সমস্ত অধিকার, সব ক্ষমতা হরণ করেছি, তাকে করে তুলেছি পুরুষ-নির্ভর। আমরা তাকে প্রলুব্ধ করেছি, বাধ্য করেছি বহু ভঙ্গার। তারপরে, আমরা তাকে ব্যাভিচারিণী বলে বিচার করেছি, শাস্তি দিয়েছি। নারী নরকের দ্বার—আখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করেছি।

যে বার নিজের কাজ কর। একমাত্র ঈশ্বরই বিচারক। তিনি অসীম ক্ষমার আধার। নিজের নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, ঈশ্বর তোমার কত অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

‘স্বর্গাধিপতি ভূতাদের হিসেব পরীক্ষা করেন।

হিসাব পরীক্ষার পর তিনি দেখিলেন একটি ভূতা প্রভূত স্বাধী। কিন্তু সে লোকটি দেয় অর্থ দিতে অসমর্থ হওয়ার আদেশ দিলেন, সেই লোকটি, তার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বিক্রয় করিরা অর্থ আদায় করিতে হইবে। সেই ভূতাটি তখন নতজানু হইয়া বলে, প্রভু আমাকে সময় দিন—আমি স্বর্ণ পরিশোধ করিয়া দিব।

তখন প্রভুর মনে দয়া হইল—তিনি সেই ভূতাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু, সেই ভূতোর নিকটে তাহার এক সহস্রমু স্বাধী ছিল—সে গৃহে প্রত্যাঘর্জন করিয়া তাহার গলা টিপিয়া বলে, আমার প্রাণ্য মিটাইয়া দাও। সেই সহস্রমু নতজানু হইয়া বলে, আমাকে সময় দাও—আমি সব পরিশোধ করিয়া দিব। কিন্তু সে স্বাধীকে স্বর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। অপরাপর সহস্রমু এই ঘটনার বিবরণ প্রভু নিকটে নিবেদন করে। তখন প্রভু তাহাকে আহ্বান করিয়া বলেন, দুইমতি ভূতা তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে—তাই তোমাকে স্বর্ণমুক্ত করিয়াছি। তোমার প্রতি আমি যে অনুকম্পা দেখাইয়াছি তাহা কি তোমার সহস্রমুর প্রতি দেখানো উচিত ছিল না।

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না—কথাটা মনে হতেই চমকে ওঠেন হেমন্তাবাবু।

হঠাৎ যেন এক চরম ও রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। মানুষের উপান, বর্ধন ও পতনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ছবি যেন ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। না, মানুষ মানুষকে ভালোবাসে না—কেন? কেন পারে না মানুষ ক্ষমা করতে!

—ও যে ক্ষমারও অযোগ্য। শীতে শীত চেপে শশাঙ্ক বলে, ক্ষমারও অযোগ্য। মানবের তো নয়—ই এমন কি মানবেরও নয়। পিশাচও বোধ হয় ঐ রকম পিশাচীকে ক্ষমা করতে চুণাবোধ করবে। আশ্চর্য। কিভাবে ও একটা লোককে তিলে তিলে হত্যা করছে...

...চোখের সামনে আমি দেখছি...চোখের সামনে আমি দেখছি...হঠাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে শশাঙ্ক। সেই চাঁৎকার বেড়ার কাঁক দিয়ে অনেক অনেক দূরে চলে যায়।

উপস্থিত সবাই শশাঙ্কের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ কিরিয়ে নেন। ওরা জানে, শশাঙ্ক মাঝে মাঝে এমন চোঁচার—ওরা জানে—কেন?

কেন? কেন? জ্ঞ কুঁচকে বলে ওঠে শশাঙ্ক। কেন? আমি বা দেখছি তা যদি কেউ দেখতো—সে পাগল হয়ে যেতো। কিন্তু, আমি তা হই নি। শুধু আমার ইচ্ছে হয়েছে দু'হাতে ঐ শুকনো গলাটা ধরবার। কিন্তু, পারি নি। না, শাস্তির ভয় আমি করি না। পৃথিবীর কোন শাস্তি আছে বা আমাকে এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেবে। তবে, ভয় পেয়েছিলাম—ভয় পেয়েছিলাম এই জেবে যে, ঐ শুকনো গলা টিপে নিশ্বাস বন্ধ করতে আমি হয় তো পারব না—তার আগেই বিধ-আজ্ঞার হুকুম আমার শরীর পুড় বাবে।

আমাকে ও ডেকেছিল ওখানে কাজ করার জন্যে। গরী?

# শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব -এখন হৈলো, দেখাচ্ছ না ব্যস্ত আছি!

ছোট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অমরোধ করে কিন্তু  
মায়ের সময় হয় না কারণ সংসারের নানান খুঁটিনাটি আর পর্বতপ্রমাণ  
কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই  
মান হ'তে শুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের  
গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হয়ে ওঠে কিন্তু তার  
মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অযত্নে বঞ্চিত চুলের রুক্ষ প্রকাশে  
অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি  
ঘরেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ  
তাই তার যত্ন সর্বপ্রথমে নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের  
চুল দিনে অন্ততঃ দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা  
উচিত। স্নানের আগে কয়েক ফোঁটা জবাকুসুম বেশ করে  
চুলের গোড়াগুলিতে ঘষে দিন। জবাকুসুম চুলের খাও  
জুগিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।



কেশ তৈল

## জবাকুসুম

KALPANA JK 628

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

১. টাকাস' লেন, ব্রডওয়ে, মাদ্রাস - ১



হ্যাঁ, খুবই গরীব আর—নইলে কি আর—হঠাৎ চোখ দুটি ফুটক গুঁঠ শশাঙ্কের। পাশাপাশি লোকদের চোখে-চোখে ইঙ্গিত খেলো বার—তার। বেন একটু নড়ে প্রস্তুত হয়ে বসে।

...ভাবনাগুলো কি রকম জট পাকিয়ে বাচ্ছে, ভাবে শশাঙ্ক। চাকরীর জন্ত ওখানে গিয়েছিলাম—প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কেন ছেড়ে এলাম না? কেন রইলাম এ যন্ত্রণা ও নোংরামীর কাছে। কেন?

ঠক্ ঠক্ ঠক্। কে বেন ওর মাথার হাতুড়ী ঠুকছে। উঃ। জু হুঁটো হুঁহাতে চোপে ধরে শশাঙ্ক। নোংরামী। যন্ত্রণা। কষ্ট। পাশাপাশি বেসে-খাকা দুটি চোখ বেন এক হয়ে তীরের মতো এসে পায় লাগছে—

কিছুই তো নেই—শুধু চোখ। চোখ নয় চোখের চাউনি। নিজের মনেই মাথা নাড়ে শশাঙ্ক। ঐ রকম চাউনি সে আজ পর্যন্ত কোথাও দেখে নি—অনেক বেন টুকরো-টুকরো করে কেলে সেই ইম্পাতের চাউনি।

প্রথম দর্শনেই বুড় হয়ে গিয়েছিল শশাঙ্ক। বুড়। শশাঙ্কের শরীরটা যে বার দুয়েক ঠিকটা চান—কোণের বলিষ্ঠ যুবক এগিয়ে এসে ওর পাশে বসে।

বুড় নয় মোহিত—সম্মোহিত। ওর সেই সাপের মতো চোখে সম্মোহন ছিল। সাপ? ঠিক কথা। সাপই বটে। সাক্ষাৎ লতনান মানবীরূপ ধরেছে।

ঘরের সামনে বসে আছি—একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলে, আপনাকে মেমসাব ডাকছেন। অবাক হয়ে গেলাম, এখানে আবার মেমসাব এলো কোথা থেকে। আমাদের এই অজ-পাড়াগাঁয়ে মেমসাবের এলে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। ছেলেটাও অপরিচিত। তা এখানে—সাধারণ চেহারার একটি ছেলে হারিয়ে যেতে পারে—কিন্তু একটি আন্ত মেমসাব।

—কে মেমসাব? কোথায় থাকে? জু ফুটক আরও অনেক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু, তার আগেই ছেলেটা সামনের দিকে হীটতে শুরু করেছে।

যদি সেদিন না যেতাম—কি করে জানব? সাধারণ কৌতুহলেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। লালমাটির পথ পার হয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কালো একটা নেমগ্রেটে সোনালী অক্ষরে লেখা—ডাঃ প্রিমা চ্যাটার্জী—শেপার্শিক।

শেপার্শিক? বিশেষজ্ঞ? কিসে বিশেষজ্ঞ, তা কিছুই লেখা নেই—পরে অবশ্ত জানতে পেরেছিলাম—কিন্তু তা অনেক পরে—

সামনের ঘরেই বসেছিল। আমি বেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—রোগা, লম্বা, নাকটি খুব পাতলা ও তীক্ষ্ণ, চিবুকটা সুরু, কালো পাড় সাধা শাড়ি পরে ইঞ্জিনেরায়ে বসেছিল।

ঘরে ঢোকামাত্র আমার দিকে শুধু একবার তাকালো। সেই মুহূর্তে সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল আমার। কিন্তু, তখন বুকতে পারি নি।

—মামি এসেই আপনার কথা শুনলাম, গভীর কাটা-কাটা কণ্ঠে ও বলে, 'শুনলাম আপনি যেখান লেখাপড়া শিখেছেন অথচ কোথাও কোন কাজ পান নি। আমার একটি লোক দরকার—ব্যবসারে সাহায্য করতে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। কত টাকা আপনি চান?

বাসে সর্বদা বলে ওঠে। এভাবে ডেকে এনে অশ্রমান করবার মানে কি? গরীব হতে পারি, কিন্তু ওর কাছে তো সাহায্য চাই নি। অনেকগুলি কঠিন রুচ কথা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোনটাই বলতে পারি না।

—তা হ'লে ঐ কথা রইলো—কাল থেকে আসবেন।

গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই। সেজন্তই তো আজ এই অবস্থা। বন্ধুরা বতটা বলে ওতটা নয়—তবু সেই দুটটা যখন মনে পড়ে—সেই দুটটা—

নবাগত ভ্রমলোক তাঁর অন্তরমনস্ত চিন্তাধারা থেকে হঠাৎ চকিত হয়ে বলেন, ও কি? চা-খানার লোকরা কিন্তু বিশেষ বিচলিত হয় না। শুধু সেই বলিষ্ঠ যুবক এসে শশাঙ্ককে চোপে ধরে, বা জোরে হাত-পা ছুঁড়ছে। মুখের দু'পাশে কেনা গাড়ির পড়েছে—মনে হয় বেন বৃকের ওপর থেকে ভারী কিছু একটা ফেলে দিতে চাইছে—একঘণ্টা। যুবকটি হস্তান্তরে ভাবে, একঘণ্টার জন্তে আটকে গেলাম। আচ্ছা, প্রত্যেক বারই দেখছি এই প্রকোপ একঘণ্টা থাকে—খুব আকর্ষ তাই না!

হিসেব মেলাতে মেলাতে বিজয় ভাবে, চা-খানার এমন এক-একটা বিশেষ দিন আসে বটে। এমনিতে কিছুই নয়—সেই পরিচিত মুখগুলি আসছে, তাস খেলছে, আড্ডা দিচ্ছে—প্রায় একই প্রকার গল্প। কিন্তু মাঝে-মাঝে—যখন আচ্ছের সিনটা—কোথা থেকে এলেন এই আধপাগলা ভ্রমলোক—আবার আজ-ই কি না শশাঙ্ক ফিট হলো—

আচ্ছা—কি দেখেছিল শশাঙ্ক? কেন ও এ রকম হয়ে গেল। ওকে ভো ছেলেবেলা থেকেই চিনি। এ রকম তো আগে ছিল না? তবে একটু পাগলাটে ধরণের—জামরা বলতাম 'পাগলা শশে'। পড়াশুনোর ভালো ছিল—আর বই পড়তে যে কি ভালোবাসতো—

এই বইয়ের জন্ত-ই তো। সারাক্ষণ যে বই মুখে করে বসে থাকে তাকে পাড়াগাঁয়ে কে কাজ দেবে? কয়েকজনকে বলেছিলাম—তারা হাসতে হাসতে বলে, ও তো জেগে ঘুমায়। ও আবার কি কাজ করবে।

সত্য সত্যই শশাঙ্কের চোখ দুটো বেন সব সময়ই ঘুমিয়ে থাকতো। আধখানা খোলা, আধখানা বোজা। বেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখছে চোখ দুটো। কি স্বপ্নের চোখ ছিল। মাটিতে স্থির হয়ে পড়ে-খাকা শশাঙ্কের দেহটার দিকে একবার তাকায় বিজয়। কি শোচনীয় অবস্থা! বেন কোন ডাইনী রক্ত শুবে নিচ্ছে। ডাইনী? ডাইনী-ই বটে। অন্তত লোকে তো তাই বলে—বিশেষত তিমুর মারি—সে জোর গলায় বলে, অনেকদিন দেখেছি ডাইনীটাকে জানালা গলির বের হতে—আরও সুরু হয়ে গেছে, আরও কালো—কিন্তু ছোট ছোট চুল অনেক লম্বা হয়েছে, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে পাখার মতো দু'দিকে ছড়িয়ে আছে।

—রাতে উড় ডাইনী কোথায় গেল? পরিহাসের স্বরে, প্রশ্ন করতো বিজয়।

—তুমি ঠাট্টা করছ? বলে উঠতে তিমুর। দু'পাতা ইয়েলী পড়ে ভারী গুস্তাদ হয়ে গেছে না? এই তো সেদিনও কুত্তের গল্প শুনে এসে কোলে লুকোতে—

তিমুর রাগ দেখে বিজয় হাসতো। সত্যি—কথাটাই বলাকে



তিত্বকা—বুঝ ভর পেতো ও ছেলেবেলার—রাত্রি হলোই মনে হোত কি একটা কাটাখুঁ এগিয়ে আগছে হাঁ করে—সে সব দিনের কথা মনে হোলো হাসি পাঠ।

কানে বার তিহু মাঝি বলছে, ডাইনী যদি না হবে তো লোকটাকে ঐ রকম শুবে খায়? দেখেছিস ওর 'সোয়ামী'র অবস্থা।

কথাটা ঠিক। মেয়েটা শুধু ওর স্বামীকে নয়—শশাঙ্ককেও শুবে খেয়েছে। তেতরে কিছুই বেন অবশিষ্ট নেই—শশাঙ্কের। বড় নয়ম মন ছিল ওর। শশাঙ্কের দিকে কল্পদৃষ্টিতে তাকার বিজয়, সব শেষ হয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই।

—কিছুই থাকবে না আমার—সেবিস, একদম শেষ হয়ে বাব। শশাঙ্কই বলেছিল একদিন।

সেদিন বিজয় হেসেছিল। তুই তো চিরদিনই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস।

—স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন।

—ছেড়ে দে না। বলেছিল বিজয়, চাকরী ছাড়লেই দুঃস্বপ্ন ছাড়বে।

—তা হয় তো হবে। কিন্তু...

'কিন্তু'টা বিজয় বয়েছিল—চাকরী তো ছাড়তে পারবে না। প্রথম দিন-ই সে কথা বুঝে নিয়েছিল বিজয়। শশাঙ্ক বলেছিল, দাখ, ভয়মহিলা অদ্ভুত। আমার একটুও ভালো লাগে নি। ও বেন আমার নাজীন্দর সব জানে...

—ভালো না লাগলে চাকরী করিস না। উপদেশ দিয়েছিল বিজয়। তাকে তো আর কিনে নেয় নি।

—না। মাথা নেড়েছিল শশাঙ্ক। শেষটার বলেছিল, দেখি, যদি অন্তর্বিধে হয় তো ছেড়ে দেব।

বড় দেহিতে ছাড়লো শশাঙ্ক—নিজেকে একদম শেষ করে। কিংবা হয় তো এ ভাবে শেষ না হলে কোনদিনই ছাড়তে পারতো না।

—মেয়েটা অদ্ভুত। বিজয় ভাবে, শশাঙ্ক ঠিকই বলেছে। খারাপ, ভালোর প্রশ্ন এখানে অবাস্তব। মেয়েটা অদ্ভুত। ঐটুকু একটা বাড়ি—ছ'খানি মাত্র ঘর—সেখানে হাসপাতাল করেছে—হাসপাতাল বলেই সবাই জানতো—স্বতনিনা—

হ্যাঁ, মারে মারে এক রকম ঘটনা ঘটে। তার নিভরন চাখানার উত্তেজনার ঢেউ হয়ে যায়। যেমন আজ এই অপরিচিত তরলোকের আগমনে হলো...

সেদিনও হুঁচন লোক এসেছিলেন। সাধারণ পোষাক পরণে—সাধারণ লোক। তবুও অপরিচিত হুঁচ দেখে সবাই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল—কিন্তু, তাঁদের কোন প্রশ্ন করবার আগেই একটা কিসকিসানো কথা সারা চাখানার ছড়িয়ে পড়েছিল—দারোগা সাহেব... খানার দারোগা সাহেব...

ভয়ে বিজয়ের বুক কাঁপতে থাকে। দারোগা সাহেব কেন? কি অপরাধ তার? সে তো চা-বিদ্যুট বিক্রি করে, কোন গোপন অভ্যাস তো করে নি...তবে...

সকলের মুখে ভয় ও উৎসেগের ছাপ। বিজয়কে তো ভালবাসতো সবাই। কি বেন কি বিপদে পড়লো মেয়েটা—

খানার দারোগা বুঝতে পারেন। হাজার হোক, দারোগা তো—লোকের মন নিয়ে তাঁদের কারবার—তিনি একই হাসেন, অভয়ের হাসি, প্রশ্রয়ের হাসি।

—এখানে ডাঃ চ্যাটার্জী থাকেন?

উপস্থিত সবাই বোবা চোখে তাকায়।

—ডাক্তার? মেয়ে ডাক্তার?

ওঃ! এতক্ষণে সবাই সহজ হয়। তাই। হ্যাঁ, ওর জন্ম দারোগা আসতে পারেন ঘটে। ওর জন্ম যে কেউ আসতে পারে—এমন কি ভিন্ন গ্রাহ থেকে কেউ এলেও অবাক হবে না ওরা।

—কোথা থেকে এলো? আবার প্রশ্ন করেন দারোগা।

—ছড়র। এবারে তিহু মাঝি এগিয়ে এসে বলে, ছড়র, ও ডাইনী, আমি স্পষ্ট জানি, ও ডাইনী। রাত্রিবেলা...

—কি যে বল? ওর কথার বাধা দিয়ে হেসে ওঠেন দারোগা। ডাইনী নয়—তবে ডাইনীর চেয়েও সাংঘাতিক। হাতেমতে কিছুতেই ধরতে পারছি না—তাই তো এখানে এলাম—ধরবই একদিন না একদিন...



সেই সময়ই ক্যাটক্যাটে গলার টেঁচিয়ে উঠেছিল গোমালো বৃদ্ধি—

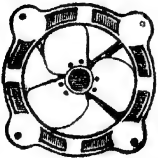

শুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

# মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত  
কোন ব্যড়তি খরচ নেই  
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো  
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রাট, কলিকাতা-৯  
ফোন : ৩৫-৩০৪৮  
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা  
হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

সে রোজ বিকেলে বিজয়কে চাকের দুধ ভোগান দেয়। এতক্ষণ এককোণে বসে সব ভুলছিল—এবার থাকতে না পেরে বলে, তোমরা কেন সবাই মিলে মেয়েটার পেছনে লেগেছ, বাছা। কি ক্ষতি করেছে সে তোমাদের। আর তিহু, তুই যে বলছিলি, ও না থাকলে তোর মেয়েকে কে বাচাতো শুনি? তোর একটু ধর্মভর নেই?

—সেইজন্তাই তো মনে হয় ডাইনী, দীঘু সোৎসাহে বলতে থাকে, শুভুন দারোগা সাতের, আমার মেয়ের অস্থখ করেছিল—সারানো শিবের বাবারও অসাধি। শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম—কেউ কিছু করতে পারলো না—আর, সেই অস্থখ কি না একটা খুচ ফুঁড়িয়ে সারিয়ে দিল..

—মেয়েটা শুনেছি খুব ভালো চিকিৎসক। দারোগা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, কলকাতার ওর খুব নাম ছিল।

—সারিয়ে খুব অস্থখ করেছ, না। গোয়ালা বৃড়ি নিজের মনেই টেচাতে থাকে, সারিয়েছে-ই তো। আবার এতদিনের বাস্তব ব্যথা—সোজা হয়ে ঝাঁড়তে পারতাম না—সারলো তো। এতদিন দেখেছি, মেয়েরাই মেয়েদের পেছনে লাগে, তা তোরা ব্যাটাছেলে চয়ে—তোদের লজ্জা করে না।

মুহূর্তের জন্তু সবাই শুক হয়ে যায়। ওরা যেন ছোট হয়ে যায়। একটু পরে দারোগা হাসেন। ওর সেই মার্কামারা হাসি, বলেন, তুমি যে বাছা কেন ওর পক্ষে বলছ তা জানি না কিন্তু কোন কোন মেয়ে কেন বলে তা জানি—আর সেই জানাটাই হাতেনাতে ধরতে হবে। আর কোন কথা না বলে দারোগাবাবু উঠে যান—পেছনে পেছনে একান্ত অল্পগত ছায়ার মতো কনকটবলটি চলে যায়।

গোয়ালা-বৃড়ি ঋণিকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে। ধীরে ধীরে সবাই প্রায় চলে যায়। বিজয় একা বসে থাকে। ওদিকে দুটো লল তাস খেলায় মগ্ন। এমন সময়ে শশাঙ্ক এলো।

—কি ভাবছিল অত পাঁচার মতো মুখ করে। শশাঙ্ক বলে।

—তোর মনিবানীর কথা। বিজয় উত্তর দিয়েছিল, ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। এমন কি থানার দারোগা পর্যন্ত উৎসুক। অথচ..

—অথচ কি? অল্পমনস্কভাবে জবাব দিয়েছিল শশাঙ্ক।

—অথচ আমার মনে হয় ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। এই ভদ্রমহিলা লেখাপড়া শিখেছেন—নিজের পায়ের নিজে ঝাঁড়িয়েছেন—ওঁর চেহারা ভালো নয় আর উনি স্বল্পবয়ী, এই তো ব্যাপার।

—না, শুধু এই ব্যাপার নয়। শশাঙ্ককে চিন্তাধ্বিত দেখাচ্ছিল। ব্যক্তি বিজয়, আরও অনেক ব্যাপার আছে, আমি ঠিক এখনই সব কথা বলতে পারছি না—কিন্তু..

—কি বল না! এত ভাবছিল কেন?

—জানিস অনেক মেয়ে আসে। চিন্তাধ্বিত কণ্ঠে শশাঙ্ক বলেছিল।

—কেন?

—কেন? বিবাহের শশাঙ্ক বলে, যে কারণটা মনে আসছে তা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হচ্ছে হচ্ছে।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরে একদিন শশাঙ্ক এলো। ওর মুখ রক্তশূন্য।

—কি হয়েছে? বিজয় প্রশ্ন করে।

ও কোন উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ও।

—আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। অনেকক্ষণ পরে ও বলে।

—তা তোর মুখ দেখে-ই বুঝেছি। কি?

—সকালে এই আটটা ন'টার সময়ে—প্রিয়া চ্যাটার্জী যখন বের হচ্ছে, তখন একজন ভদ্রলোক এলেন। বয়স বছর ত্রিশ, শীর্ণ, ক্লান্ত চেহারা। মুখখানার এমন মাঝা মাঝানো যে প্রথমেই চোখ টানে।

প্রিয়া চ্যাটার্জী একবার ওর দিকে তাকালো। সেই ক্লান্ত, কক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্যেভরাকণ্ঠে বলে, কেন তুমি এসেছ?

জলে ভরে ওঠে ছেলেটির চোখ। বলে তোমাকে দেখতে।

..সেই কণ্ঠ শুনে যে কোন লোকের চোখ জলে ভরে উঠবে—পাযানেরও হৃদয় বিদারিত হবে, কিন্তু প্রিয়া কক্ষতর কণ্ঠে বলে, দেখা হোল তো, এবারে চলে যাও।

আর কোন কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় প্রিয়া চ্যাটার্জী। সেই ছেলেটি সেখানেই ঝাঁড়িয়ে থাকে।

—বারান্দায় ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে সব-ই দেখি। শশাঙ্ক বলতে থাকে, আমার আশ্চর্য মনে হয়—অসম্ভব লাগে, সব ঘটনাটাই অবিবাহিত মনে হয়, কিন্তু না, স্থিরমুখের মতো ঝাঁড়িয়ে আছেন তিনি, যৌদ এসে পড়েছে মুখে, ঠিক যেন বৌদ্ধ জ্ঞাতকের কক্ষণায়ন মুখের ছবি।

—আপনি আহ্নন, ঘরে এসে বসুন, ওঁর সামনে গিঁধে বসি।

—ও আহ্নক, ভদ্রলোক উত্তর দিলেন।

—কে? ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী? ওঁর ফিরতে তো অনেক দেরি, ততক্ষণ আপনি এখানে ঝাঁড়িয়ে থাকবেন।

ভদ্রলোক একটু হাসেন, কোন কথা বলেন না।

আর, ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী ফিরে এসে ওর দিকে দৃকপাত না করে সোজা নিজের ঘর চুকে যায়।

বিষয়ে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। এও কি সম্ভব? একটা লোক ক্লান্ত, সুধার্ত একটা লোক তোমার জন্তু দুপুরের রৌদ্রে অপেক্ষা করছে আর তুমি কি না তার নিকটে একবার তাকালেও না! তুমি কি মেয়ে? তুমি কি মানুষ?

থাকতে পারলাম না, ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কোণের ইজিরেয়ারটায় চুপ করে বসে আছি। সেই মুখটার দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলতে পারলাম না। বলা যায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই নোচে কৌশল্যার মা চেঁচিয়ে ওঠে, অ-দিদিমণি, শীগগির নেবে এস। লোকটা যে মরে গেল।

বিহ্বালের মতো ডাঃ প্রিয়া চ্যাটার্জী নোচে নেমে যায়। আমিও পেছনে পেছনে নামি।

যেখানে ঝাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেখানেই পড়ে আছেন, দেখে মনে হয় প্রাণ নেই।

প্রিয়া বাঘিনীর মতো লাফিয়ে গিয়ে পড়ে। স্বল্প মুহূর্তে তেঁকবার জন্তুও বহুপরিচর। ও নিজেরই হুঁ হাতে তুলতে বাচ্ছিল আমি গিয়ে ধরলাম।

হুঁজনে মিলে ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম প্রিয়া চ্যাটার্জী এত জোরে ঠোট চেপে ধরেছে যে, পাতের পাশে রক্তেরখা ফুটে উঠেছে।

## এক কলেজের চারটি বেদে

দ্বারে দ্বারে ঘর থেকে বেধিয়ে এলাম।

এটুকু বলে শশাঙ্ক প্রশ্ন করেছিল, ওদের কি ব্যাপার বলতে পারিস।

—তু'জনে হু'জনকে ভালবাসে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে কেন এত নিষ্ঠুরতা! বোধ হয় ভদ্রলোক বিশেষ কোন অভ্যাস করেছে।

—তুই শুঁকে দেখিস নি—তাই বলছি। তুমি করবার মতো উনি নন।

কয়েকদিন পরে শশাঙ্ক এসে ঝাঁড়াতে না ঝাঁড়াতেই বিজয় হাসিমুখে প্রশ্ন করে, কি রে? তোদের গল্প কতটা এগুলো।

—গল্প?

—নয় তো কি? বরঞ্চ বলা উচিত গল্পের চেয়েও লোমহর্ষক, তা নাহকের কি হলো—চলে গেছে।

—না, না। অসম্ভব। শ্যামশাহী।

কয়েকদিন পরে বিজয় জানতে পেরেছিল ভদ্রলোকের নাম জ্যোতিষ্মদ রায়।

—বেশ বড়বরের ছেলে। বলেছিল শশাঙ্ক।

—কি করে জানিল?

—কথাবার্তার বোঝা যায়। তা ছাড়া, হাতে একটা আটা দেখলাম—খুব দামী, আর কি চমৎকার কবিতা বলেন। অত সূক্ষ্মর কণনও শুনি নি।

—তোকে কবিতা শোনান কি করে?

—বাঃ। ডাঃ চ্যাটার্জী কলে ঘেরিয়ে গেলে তো আমরা হু'জনে মিলে গল্প করি। দেশ-বিদেশের কত কথা বলেন। ঠর বাড়ির কথা বলেন।

—তুই? তুই... কথটা বলতে না পেরে নীরব হয়ে যায় বিজয়।

—হ্যাঁ, প্রশ্ন করেছিলাম শুঁকে, আপনি কেন এভাবে এখানে রয়েছেন, তার উত্তরে একটু হেসে বলেন, 'আমি যে শুঁকে ভালোবাসি।' বললাম, 'এত অপমান, লাঞ্ছনা আপনার অসহ্য লাগে না।' না—'এটাও যে ভালোবাসারই অঙ্গ।'

—এই রকম প্রেম-পাগলকে আর কে কি করবে বল। এ সেই রকম, 'মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।' বিজয় হেসে বলে।

কিন্তু এর কয়েকদিন পরে শশাঙ্ক এলো—যুথ শুকনো, গালছুঁটা কে যেন টিপে বসিয়ে দিয়েছে—চোখের কোণে গভীর কালি। দেখে চমকে উঠেছিল বিজয়। শশাঙ্ক এসে স্তব্ধের মতো বসেছিল—বিজয় ডাকলেও সাড়া দেয় নি। অনেকক্ষণ পরে, নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বলেছিল, মেরে ফেলবে—মেরে ফেলবে ও। পৃথিবীর সব কিছুকে ও হত্যা করবে।

[ আগামী সংখ্যার সমাপ্য।

## অলৌকিক দৈবশক্তিসময় জরুর সর্বশ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও জ্যোতিষ্মদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষাণ্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লন্ডন)



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও পণিত সভার সভাপতি এবং কান্টীয় ব্যাংকনী পণিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রকৃত এবং অকৃত ও হুই প্রভৃতির প্রতিকারকরণে শাস্তি-বস্ত্রাদি, তাত্ত্বিক ক্রিয়া ও প্রত্যক্ষ কলপ্রদ কচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিচয় কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনোবীক্ষণ দ্বারা অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে প্রমাণ করিয়াছেন। এশসোপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে বাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

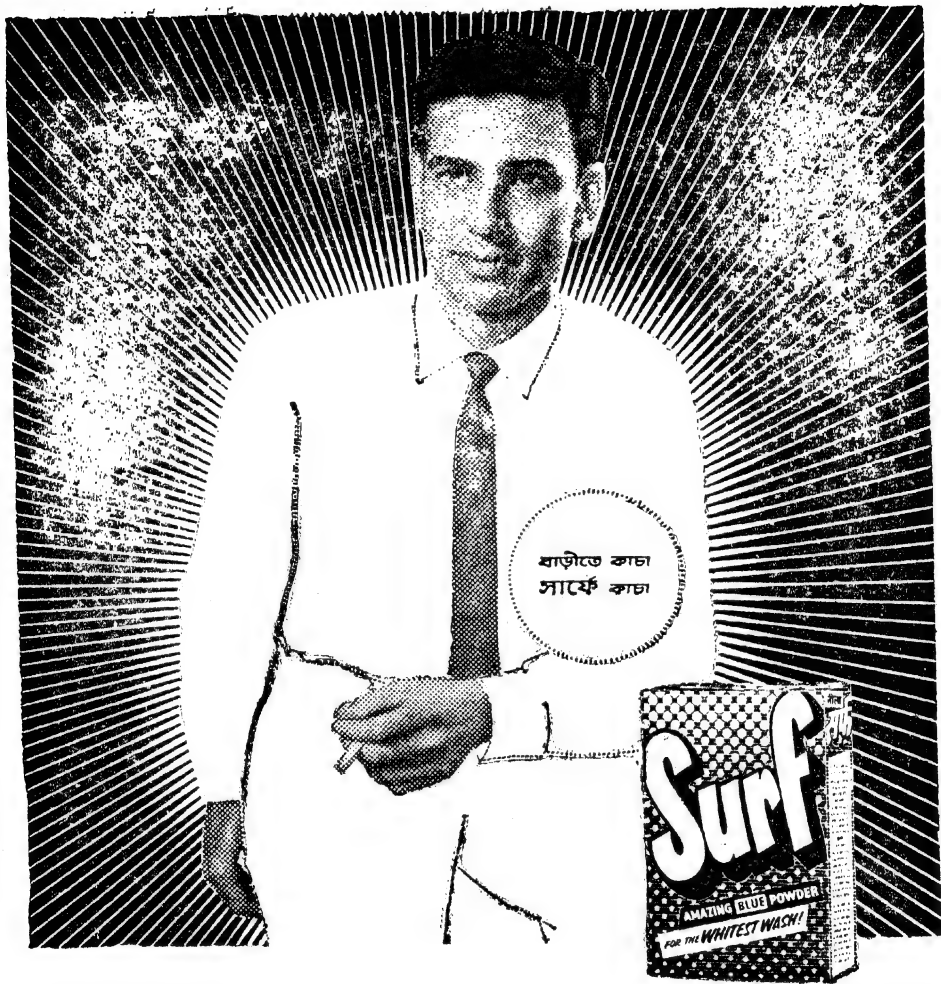
বিল, হাইদেন্স মহারাজা আটপড়া, হার হাইদেন্স মাননীয়া ঘটমাতা মহারানী জিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপণ্ডিত মাননীয় ভার মহম্মদাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সত্যাবের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ভার মহম্মদাথ রায় জৌহুরা কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপণ্ডিত মাননীয় বি. কে. রায়, বকীর গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়সহ, কেউনখড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব সিং এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল ভার কজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংসাই নগরীর সিং কে. নতপল

প্রত্যক্ষ কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

১ম কবচ—যারপে ধরাসে প্রকৃত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বোক্ত)। সাধারণ—১১৮/০, পঞ্জিকালা ১৮৭—২১১৮/০, মহাপঞ্জিকালা ও স্বর্গ কলসারক—১২১৮/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক পুত্র ও ব্যবসায়ীর অবশ্য প্রাপ্য কবচ)। ২য় কবচ—স্বর্ণপণ্ডিত বুদ্ধি ও পরীক্ষার ফল ২১৮/০, ১৮৭—৩০১৮/০। ৩য় কবচ—যারপে অভিলষিত ধনী ও পুত্র বসন্ত এবং চিরশ্রুতি ও মিত্র হয় ১১১৮/০, ১৮৭—৩০১৮/০। ৪য় কবচ—যারপে অভিলষিত কৰোহি, উপরিহ বনিকের সন্ততি ও সর্বপ্রকার সামান্য জরলাভ এবং প্রবল শক্তিশাল ২৮/০, ১৮৭—৩০১৮/০, মহাপঞ্জিকালা—১৮১৮/০ (আরামের এই কবচ ধারণে ভাঙমাল সন্ধানী জরী হইয়াছেন)।

(হাপিডা ১৯০৭ ধঃ) অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এণ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (যে), বনলাভা ট্রাট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ৮৮/২, ওয়েলসলী ট্রাট পেট) কলিকাতা—১০। ফোন ২৫—৪০৫৫। সদর—বৈকাল ৫১১ হইতে ৫১৮। ব্রাক অফিস ১০৫, প্রে ট্রাট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—২, ফোন ৫৫—৩০৫৫। সদর প্রান্তে ১৮১ হইতে ১৮৮।



বাড়িতেই সার্ফে কাচুন, দেখুন কত তৃষ্ণা! সার্ফে সব কাপড় সবচেয়ে ধবধবে, সবচেয়ে  
 পরিষ্কার আর সবচেয়ে সহজে কাচা হয়। সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি! বাড়ীর  
 সব জামাকাপড়ই সার্ফে কাচুন... সার্ট, শাড়ী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবকিছুই।

**সার্ফে কাচা সবচেয়ে ফরসা**

৩৫ ১১/১০ ১০

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরি

## বোগোব ভিলিয়া

### আভা পাকাডাশী

একরাশ সবুজ পাতার মধ্যে টুকটুক লাল ফুলগুলি ভাষি  
সুন্দর। শীতের দুপুর। গায়ে মিষ্টি রোদ লাগছে। বড়  
ক্ষিণে পোরে গেছে। অথচ তুমি বলে গেছ খাবার সময় ঠিক ফিরে  
আসবে। কেন না তুমি জান, আমি একা খেতে পারি না। সেই  
সকাল আটটার তুমি স্বান সেরে ব্রেবকাফ্ট করে বেরিয়ে গেছ।  
তখনো অন্ধকার, বাইরের কুয়াসা কাটে নি।

আমি ডাক-বাংলার সামনের কংক্রিটের রাস্তাটা দিয়ে একবার  
ওদিকে যাচ্ছি আবার ধীরে ধীরে এদিকে আসছি। দেখছি আদর্শলিটা  
ঝিমোচ্ছে। ওর গা থেকে রোদ্দুটা সরে গেছে। সেটাও ওর  
খোল নেই। সকালবেলাকার সেই তাজা শক্ত চোরাটা কেমন  
যেন মিহিয়ে গেছে। খানসামাও ঘরের ভারী মেকন রং-এর পর্দাটা  
সরিয়ে আমাকে একবার দেখে গেল। ওরও সব কাজ সারা হয়ে গেছে।  
এতদূর থেকে আমি টুংটাং আওয়াজ না পেয়েও বুঝতে পারছি, সেই  
সাদা টেবিলরূপ-পাতা বড় টেবিলের হুঁদিকের হুঁটো চোরাের সামনে  
হুঁটো রাইসপ্রেট উপুড় করা, কাঁটা-চামচে সাজান হয়ে গেছে। গ্রাপকিন  
হুঁটোও হুঁটো। গেলসে ফুলের মত সাজিয়ে দিয়েছে। জলের  
জাগের পুঁথি গাখা নেটের ঢাকাটা অল্প অল্প কাঁপছে। মাঝখানের  
ফুলদানিটা একপাশে সরান, সকালের তাজা গোলাপগুলোরও নিশ্চয়ই  
এখন ঐ আদর্শলিটার মত ঝিমোয় অবস্থা। একটু ঢিলে হয়ে  
গেছে। টমাটো, সসু আর স-ট পট্টা অন্ধদিকে রেখেছে। আমার  
গিয়ে বসলেই বাওলভের গরম চিকেন আইরিশ কু আনুন্টের কি শাক  
আর এক-একখানা করে গরম চাপাটি হাঙ্কির করবে খানসামা।  
আমবে ধোঁয়া-ওঁঠা স্বগন্ধি দেয়াহুনি চালের ভাত।

নাঃ। বড় খাবার কথা ভাবছি। এই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায়  
স্বানের পর বড় বেশি ক্ষিণে পোয়েছে। ঘরের ভেতর গিয়ে একটা  
আপেল নিয়ে এসে কামড়ে খেতে খেতে আবার পাঁচটারি করছি।  
রোদটা অনেক সরে গেছে। কি সবুজ চারদিকটা। কত নিমের  
গাছ। হাওয়া চলছে আঁব শনশন শব্দ উঠছে। দূরে ব্রীজের ওপর  
ট্রেন যাচ্ছে কি বকম একটা গভীর শব্দ উঠছে। আদর্শলিটাও  
চমকে উঠে বসল। ঠিক আমার মতই ওও ভুল করেছে, সাহেবের  
গাড়ি আসছে ভেবে। ঠিক স্টেশন ওয়ানটা অমনি শব্দ করে  
আসে। জমানারটা চলে গেল। তারও কাজ সারা হয়ে গেল।  
বাথরুমটা ধুয়ে-মুছে দিয়ে গেছে। ঘরের ভেতরটা কিরকম  
ঠাণ্ডা আর নিশেদ হয়ে আছে। ঠিক আমার মনটার  
মত। ওর গেঞ্জি-পাজামাগুলো শুকিয়ে গেছে, তুলে নিয়ে ঘরে  
এলাম একবার। মনে হচ্ছে কি শান্তি। কি সুন্দর পরিবেশ।  
ঠিক যেমনট আমি চেয়েছিলাম। এমন একটা নিরালা জায়গার  
এসে শুকে একান্ত করে পেতে চেয়েছিলাম। যেখানে ওরও কেউ  
ধাকবে না, আমারও কেউ ধাকবে না, শুধু ও আর আমি থাকবো।  
যতবার ও দিন পেছিয়েছে এখানে আসার, ততবার শুকে বকেছি।  
ট্রান্সকলর বিনমিনিট সময়ের মধ্যেও রাগ করেছি। অভিমান করে  
একটার পর একটা চিঠি লিখেছি। বলেছি, তুমি যে বলেছিলে  
আমাকে প্রথমেই তোমার বাড়িতে নিয়ে তুলবে না। বলেছিলে, এতদিন

# বিন্দু ও প্রাঙ্গণ

তোমাকে প্রাঙ্গণের পাই নি এবার এমন জায়গার নিয়ে বাবো  
যেখানে তুমি তোমার মত করে আমার পাবে। আর আমিও তবু  
তোমার নিয়ে সব ভুলে যাবো। আশ্বর্য্যক বসে তোমার বুকিয়ে  
দেবো, বুঝবে আমার ভালবাসা কি? বস কি?

মিথ্যে বলে নি। সত্যিই এ স্বাদ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।  
এমন করে কোন মানুষ যে আমার নিয়ে মেতে উঠতে পারে সে  
আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার প্রত্যেকটি কাজ, ওঁঠা-বসা,  
চলাফেরা, হাসি-কথা সবটাই যেন ওর কাছে বিময়। সবকিছুর  
মধ্যেই ও একটা না একটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায়। যেন বড়সড়  
একটি শিশু তার বড় বড় হুঁটো অমুসন্ধিৎসু চোখ মেলে অবাক-  
বিময়ে একটার পর একটা নতুনব নিরীক্ষণ করছে। নেড়েচেড়ে  
দেখছে, চেখে চেখে পরখ করছে; যদি ফুরিয়ে যায় এই যেন তার ভয়।  
ও যদি আমার জীবনে না আসত তা হলে আমার যে একটা মূল্য  
আছে বা এই বিশেষত্বগুলি আছে সে আমার ধারণার বাইরেই  
থেকে যেত। কোনদিন আর তা এমনি করে এত আলো নিয়ে  
আমার জীবনে উজ্জাসিত হত না। কিন্তু মাত্র তো চারটি দিন।  
তার হুঁটো দিন তো কেটেই গেল।

ইস! পারে কি একটা ফুটছে, সেই গোল গোল চোরকাটা। ঐবে  
হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মধ্যে গিরোছিলাম তখন কাপড়ে আটকে গেছে।  
'চোরকাটা' বেশ নামটি। আমার অবস্থাও তো এতদিন ঐ চোরকাটার  
মতই ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। সেই সব  
দিনগুলোতে উঃ কি উদ্দাননা, কি মাদকতা, কত লজ্জা, কত ভয়,  
কত সন্কোচ কিন্তু ধরা যখন পড়ে গেলাম তখন সংশয় ঘুলে। যে  
আমার তুলস সে কিন্তু আমার চোরকাটা নাম বদলে দিল, আমার  
স্বীকৃতি দিল। বস্তু করে আমার পরখ করল, নতুন করে আবিষ্কার  
করল আমায়। তার চেনায় আমিও নিজের নতুন পরিচয় পেলাম।  
যখন বলল চলে এসো আমার কাছে। পারলাম না ফিরিয়ে দিতে। এমন  
করে তো আমার কেউ ভাকে নি আগে। সেবা তো অনেকেরই  
করেছি, সেবাই তো আমার ব্রত। সেই কবে ঘর ছেড়েছি, কোন  
ছোটবেলার। তারপর কতবার কত হাসপাতালে গেলাম। নার্স,  
কাঁফনার তারপর পেট্রিন। দিনে দিনে বেড়েছে বয়স, বেড়েছে  
অভিজ্ঞতা।

উঃ। প্রথম দিন, যেদিন আমি ট্রেনিং এ যাবার পারমিশন পেলাম  
বাড়ি ছেড়ে, কার্কা-কার্কাটার পরিচিত আশ্রয় ছেড়ে খড়ানুরে যেতে হবে।  
হাসপাতাল সংলগ্ন হোস্টেল। কে জানে সে কেমন? এত উত্তেজনা  
হয়েছিল যে সারাটা রাত সেদিন ঘুমোতে পারি নি। কি ছেলোমামুই  
না ছিলাম। প্রথম প্রথম একমোটা টাকা করে দেবে। তার থেকে  
আবার খাওয়া খরচ আর ঘোণা খরচ কাটবে। কিছু জমা রাখবে যদি  
কিছু ভেঙ্গে ফেলি সেইজন্য, তবু তবুও আমার হাতে গোটা কুড়ি-পঁচিশ

টাকা বাঁচবে। তার থেকেই কাকুকে একটা সোমেরটার বনে দেব, আর কাকীমাকে কিনে দেব একটা রাউজ পিস। এই এতো খরচের মধ্যেও কাকু সব এনে দিচ্ছেন তার জন্ত। প্রথমে কাকীমার বিয়ের ঠাঁইটো বং হয়ে এলো। তারপর এলো একটা ছোট হোল্ডল। তার মধ্যে দু'টো সাদা চামর আর আনার স্বর বিছানা। এবার চাই তেলি গজ লাগু। নাসের গাউন হবে, মাথার কাপ হবে। পায়ের জন্ত সাদা মোজা আর সাদা জুতো এলো, আর সুন্দর ছোট একটা ঘড়ি। টান করে খোঁপা বাঁধতে হবে। বাঁধতেই জানি না খোঁপা। বেণী তুলিয়ে ফুলে যেতাম। সারাদিন ধরে চুলগুলো নিয়ে কসরত করতাম। ও, প্রথমদিন খোঁপা বেধে কি আনন্দ, সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছি। ঐ নাসের এপ্রন, মাথার কাপ আর সাদা উঁচু হিসের জুতো পরে কেমন দেখাবে আমাকে সেই চিন্তায় মশগুল থাকতাম। অনেক ভয় দেখাত, বলত, পারবি না তুই। কত অনেকা লোকের সেবা করতে হবে। সাংঘাতিক সব অশ্রু, ঘেরা করবে তোরা। মনে মনে বলতাম পারবে, নিশ্চয়ই পারব, পারতেই হবে যে আমাকে। এ ফুলমাকারী করা, দিদির মত সেই একঘেরেমি সইতে সইতে কুঁজো হয়ে যাওয়া, ও আমি পারব না। বুকি কষ্ট আছে এ কাজের কিন্তু তবু বৈচিত্র্যও তো আছে, কত রকম রঙ্গী তাদের কত রকম অশ্রু। তারা বাধে-আসবে, ডিউটিও বদল হবে। কিন্তু মাকারী,—ও বড় একঘেরে।

তারপর শুরু হল অজ্ঞ জীবন। প্রথম দিকে বিশেষ আটকায় নি। তারপর বনন এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে দিল। উঃ! কি বিভীষিকা। সেই সব আত্মহত্যা করতে যাওয়া রঙ্গী, তাদের কিছুটা পড়েছে, কিছুটা পোড়ে নি, কি বীভৎস দেখতে হয়েছে। কেউ পড়েছে, অনেকদিন আগে, এক তো পোড়ার যা তার ওপর হয়েছে বেড়সোর। গেজের পর গেজ ঢুকিয়েই চলছে এতবড় গর্ত হয়েছে কোমরে। কি উৎকট গন্ধ? পোকা ধরে গেছে কান্নর ঘার। কেউ চাপা পড়ে মৃত্যু এসেছে; কান্নর হাত নেই, কান্নর পা নেই। কাজকে কেউ বাটারি দিয়ে চুপিয়েছে ট্র্যাকটর রক্ত ভাসছে। দেখে দেখে আমার বুকের রক্ত হীম হয়ে যেত। কাজ করব কি? সেবা করব কি ওদের? নিজেরই অশ্রু হয়ে পড়তাম। ছুটে কোয়ার্টারে গিয়ে ধমি করতাম না হয় বিছানায় শুয়ে পড়তাম। শান্তি হত। ডবল ডিউটি পড়ত। বীভৎস বড়দি। মোটাসোটা গোলগাল হাসিখুশি মেয়ে বড়দি। সে সকলের বড়দি। অনেক কাণ্ড করে আমাকে জেনারেল ওয়ার্ডে চালান করল।

সেই ছোট ঘড়িটা আজও রয়েছে হাতে। ব্যাণ্ডটা নতুন। ও দিয়েছে। বলছে আজ একটা নতুন ঘড়ি আনবে আমার জন্ত দিল্লী থেকে। সেটাতে শুধু ওর জন্তই সময় দেবব আর কান্নর জন্ত নয়। সময় দেখে চমকে উঠলাম প্রায় আড়হুটে বাজে। রোসন-হানির মধ্যে গিয়ে রোদর আসছে ঘরে। হসদে ঘরে জানাল-দরজার কোন দর পূর্ণার রোদের আলো পড়ে, কেমন যেন একটা লাল আভা ছড়ায়। আর হাটতে পারছি না বাইরে গিয়ে। পা ব্যথা করছে। খাটেই বসে আছি সেই থেকে। এবার লেপটা পায়ের উপর টেনে নিলাম। বাইরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলাম ও এসে দেখবে আমি ওর জন্ত অপেক্ষা করছি। ওর গাড়িটা গेट দিয়ে ঢুকতে

দেখলেই একপাশে সরে দাঁড়াব। ও হাসতে হাসতে একলাফে নামবে, আর কোনদিকে না তাকিয়ে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেবে। আর্গালিটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে 'জমহিন'। ও শুধু তাকে একবার চোখের কোণ দিয়ে দেখবে। ঘরে ঢুকবে বলবে বাঃ সুন্দর করে রেখেছ তো ঘরটি। এই না হলে তুমি? হঠাৎ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলবে—জিতা! তুমি কিন্তু দু'দিনেই বড্ড বেশি সুন্দর হয়ে গেছ। কেমন যেন একটা নতুন আলো পড়েছে তোমার মুখে। আরও একটু সরে এসে কানে কানে বলবে,—বিয়ের জল। মুখের সেই আশখোলা হাসিটা ফুটে উঠবে, একটা ইচ্ছেই ইসারা জাগতেই আর্গালিসির দিকে চোখ পড়তে থমকে যাবে। সে তখন সাহেবের পোষাক ঠিক করতে ব্যস্ত। কাঁধের কাছের আশোষচক্রটি আর স্টার দু'টো বকবক করছে। সুন্দর পাশিশ করেছে কিন্তু আর্গালি। খানসামা এসে দরজার নক্ করবে, সাব খানা যোগাড়?

এককলি গান তখন তোমার মুখে গুনগুন করছে, হাতে সিগারেট। তুমি বলবে,—হ্যাঁ হ্যাঁ জলদি বরো।

আবার আমার দিকে তাকাবে আরনার মধ্যে দিয়ে দেখবে আমার, চুল আঁচড়াচ্ছ তখন তুমি।

ব্যস্ত হয়ে বলবে—খাও নি এখনো তুমি? এই তোমার দোষ। আমার দিকে লেগে থেকে বলবে—লেমন কলাফটা সুন্দর মানায় তো তোমাকে? চারদিকে একবার দেখে নেবে। আর্গালি বলে গেছে, আবার সন্ধ্যা ছটার আসবে। খানসামা হঠাৎ শব্দে খাবার যোগাচ্ছে ও-ঘরে। আমাকে জড়িয়ে ধরে,—আমার রাগিটি, আমার জিতাটি বলে বসে নেবে।

বাঃ থেকে খানসামা ডাকবে—দাব!

চমকে উঠে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলবে,—ইয়েস।

সেই মিষ্টি মিষ্টি হুট হাসিটা হাসতে হাসতে বলবে,—চল রাগী খাবে চল।

চিন্তায় ছের পড়ল, বেলা যে তিনটে বাজে? এমন তো কথা ছিল না। বলেছিল লাঞ্চটাইমে সে নিশ্চয়ই ফিরবে। তবে? দিবান্বপ দেখছিলাম কেমন জেগে জেগে? হঠাৎ এই কিম্বদন্তি ঘরেও কেমন সুন্দর একটা চাকলা এসেছিল। আশ্চর্য ও নেই তবু যেন ও রয়েছে। ঐ তো ডেসিং-টেবিলের ওপর ওর সেজি কেস, ব্রাস, চিক্রণী। ওয়ার্ড রোবের মধ্যে হ্যান্ডার স্মিট আর ইউনিফর্ম ঝুলছে। বড় হলদে তোমালেটা ওর গায়ের গন্ধ মেখে চোরারের পিঠে ঝুলছে। ব্রাউন স্মিট পাশিশ মেখে চকচক করছে স্কু-ফ্যাণ্ডে। পাশেই আমার চটিটা রয়েছে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'টো স্ট্রবেরশ। একটা ওর একটা আমার। ওপাশের ছোট টেবিলটার আমার সব টুকটাকি জিনিস। এমনি সাজান ঘর ও বড় ভালবাসে। ও নিজের ঘর, নিজের বাড়ি, নিজের বাগান সব সাজিয়েছিল, কিন্তু শান্তি পায় নি। আমি তার সাক্ষী। সেবা করতে গিয়েছিলাম তাকে ওর মিসেসকে। উঃ কি জঘন্য মেজাজ আর নোরা মন ছিল ভ্রমহিলার। আশ্চর্য! তারপর তিন বছর কেটে গেছে? এলাহাবাদ থেকে বদলি হয়ে গেল ও কলকাতায়। এলাহাবাদেই আমার সঙ্গে পরিচয়। সামান্য অশ্রু হয়ে এসেছিল কমলা নেহরু হস্পিটালে। আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই অসুখে আবার কেউ হাসপাতালে আসে নাকি? বলেছিল, কি করব বাড়িতে যে বলল ইন্সপেক্টর ভীষণ ছোঁয়াড়ে। আমাকে কে দেখবে, তাই ভয় আসতে হল। ওঁতো আর দেখবে না। এই সামান্য ব্যাপারে মিলিটারি হাসপাতালে যায় নি ও।

এ কদিনের আলোপে কি জানি ও কি পেলো আমার মধ্যে? কিন্তু আমাকে ও পেয়ে বসল। ওর অসহায় অবস্থা, মিষ্টি স্বভাব-চঞ্চল অভ্যাস, সব মিলে যেন একটা দুরন্ত শিশু। তারপর ডাঃ খান্না ওর দ্বার চিকিৎসার ভার নিতে বাধ্য হয়ে আমাকে দিনরাতের নার্স হয়ে ওর বাড়ি যেতে হল। বুঝলাম কি ব্যাপার। বাড়ি শুদ্ধ চাকর, বাবুটি, খানসামা, আদালি সবাই ভটস্থ মেজাজে। খুব সৌখিন ভ্রমহিলা। অসুখের মধ্যেও মেকআপ করবেন। এদিকে বর্তার জামা-কাপড় ছেঁড়া, ময়লা। বুঝলাম ইনি বিয়ে করেছেন ওর শ্রাদ্ধারিকে, স্টাটারসকে—ওকে নয়। আমাকে একা পোসেই বসতে—কিছু মনে কোর না ও ঐরকম। বুঝতাম অসম্ভব ভয় পায়। তাই এত বেড়ে গেছেন ভ্রমহিলা। কিন্তু এলাহাবাদ তাঁকে ছাড়ল না। ওও আমাকে ছাড়ল না। তবে বদলির পরওগানা এলো। ওঃ! সেদিন কি কান্না কঁদেছি। সমানে ট্রান্সকল করতো। খবর রাখত, বলত একটু শুদ্ধিয়ে নি। মাঝে এসে কি মনে করে বেঁধে গেল আমার। ওর ভয় পাচ্ছে হারিয়ে যাই। মাত্র সাতদিন ছুটি পেয়েছিল। কিন্তু আমার তখন পরীক্ষা, মোটেই কাছে পাই নি ওকে। তারপর কত কাণ্ড করে এখানে আসা হ'জনে। এবার ওর বাড়ির সবাইকে ও জানিয়েছে। আমার কথা বলেছে। এখান থেকে ফিরে এলাহাবাদের হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দেবে, তারপর হ'জনে একসঙ্গে কলকাতা যাব। ভালবাসব ওঁদের। ওঁরা তো ওরই বাবা, মা, দাদা, বৌদি! মিষ্টি একটা বৌ হয়ে যাব।

—মমসাব?

আদালিটা ডাকছে। বোধ হয় ছুটি চায়। আমার জবাব দেবার আগেই স্টেশন ওরাগনটা গেটের মধ্যে ঢুক পড়ল। তাড়াতাড়ি পায় চটিটা গলিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। আদালিটাও তটস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু এতো একজন সাহেব? আমাদের কর্নেল সাহেব কই? অজানা আশঙ্কার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন হিম হয়ে গেল।

—আর ইউ মিসেস সেন?

কাঁপা গলায় উত্তর দিলাম, ইয়েস।

আই অ্যাম ভেরি সারি, দিস ইস ইউর লেটার।

আমার বৃকটা ধরথর করে কাঁপছে, নিজেরই নিজের বুকের শব্দ শুনেতে পাচ্ছি। তবু পড়লাম চিঠিটা।

আমার স্নিহা,

আমি জানি তুমি ভীষণ শক পাও। আমাকে নেফা যেতে হচ্ছে। চরিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ছাড়তে হবে। তুমি জানো, আমি তোমার কাছ থেকে প্রায় সাতশ-আটশ মাইল দূরে দিল্লীতে বসে রয়েছি। আর দু'ঘণ্টা পরে প্লেন ছাড়বে। আমার ফেরা তাই সম্ভব হল না। এই অফিসারের সঙ্গে আমার লাগেজগুলো আদালির সাহায্যে প্যাক করে পাঠিয়ে দিও। আর তুমি বিলগুলো মিট আপ

করে ফিরে যাও। সন্ধ্যার গাড়ি পেয়ে যাবে। এই সাহেবই তোমার পৌছে দিয়ে সেই ট্রেন কলকাতা যাবে। টাকা আমার মানিব্যাগ থেকে নিও, নিশ্চয়ই নিও। তোমার টাকা খরচ কোর না। এখন তো আর তোমার সন্ধ্যা থাকা উচিত নয়।

তুমি বলেছিলে, বোগোন ভিল্লার গাছ লাগাবে বাড়িতে। কয়েকটা ভাল কেটে নিয়ে যেও। টুকরো টুকরো করে কেটে লাগিয়ে দিও। পাতা ঝরে যাবে, একেবারে শুকিয়ে যাবে, তবুও নিরাশ হয়ে যেও না। জল দিয়ে যেও, একদিন না একদিন ফুল ফুটবেই।

বেঁচে থাকি তো ফিরে এসে তোমার কাছে আগে যাব। আমার রাগিটি, আমার জিতাটি, ভেঙ্গে পড় না। আমি জানি, তুমি খুব শক্ত, মা হলে জীবনের এত বড়বন্ধা সহ্যে পারতে না। আমার আশর নাও।

আর্বি হেড কোয়ার্টার  
নিউদিল্লী

তোমার  
—সেনা

## বসন্ত প্রবাসের দিন

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

হানিমুনের পর

একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল—অপরিচয়ের বেড়

ডিজির বসন্তের সঙ্গে চেনাশনো করতে, আমেরিকান জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে। 'শ'রও মাসবানেক গেল কর্ণহুলে কাজের ধারা বুকে নিতে। তারপর একদিন বসু বললেন ডেকে, হানিমুনেইজ শুভাব, এবার কাজকর্মের ভার বুঝে নাও।

আমারও হানিমুনে ওভার হয়ে গেল চটপট। নতুন পরিচয়ের আনন্দ, কৌতূহলের ওপর প্রাত্যহিকতার ছাপ পড়ল। জড়িয়ে পড়লাম দৈনন্দিন কাজের জালে।

সকাল উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি করি ছুটে ছুটে। গৃহকর্তা কাজে বেরিয়ে যান আটটার মধ্যে। তারপর একটু চিলে দেওয়া চলে। চায়ের বাসন খুঁতে-খুঁতে ঘণ্টা বেজে ওঠে দরজায় দু'বার ক্রিং-ক্রিং, ক্রিং-ক্রিং। ওটা সাংকেতিক তার মানে চিঠি এনেছে পিওন। বুও বুকে ফেলেছে এ সংকেতের মর্ম। উৎসাহিত হয়ে চিঠির ওঠে মেলম্যান, মেলম্যান বলে। হরত চিঠি এল দেশের, নরত নিউইয়র্ক থেকে আর্টির। সিকের ওপর অর্থসমাপ্ত বাসনধোরা ফেলে রেখে পড়ি-মরি করে ছুটি চিঠি নিজে।

বাজার করা আছে এরপর। কাছেই সুপার মার্কেট। ছেলের হাত ধরে চলে যাই।

চেনাশনো হয়ে গেছে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে। পথ চলতে দেখা হয়ে যায়, আলো, হাউ আর ইউ দিস মনি? বলে সবাই। কোয়াইট ওয়েল, থ্যাংক ইউ। বলতে বলতে মনে মনে ভাবি এরা সব সময় দিস মনি জুড়ে দেয় কেন? বিশেষ করে আজ সকালে কেমন আছি জানতে চায়? না কি ওটা অমনি একটা রীতি?

ওই যে থ্যাংক ইউ বললে সবাই ফিরে বলে ইউ আর ওয়েলকাম এটা কিন্তু বরাবর স্মরণ মনে হত আমার। চলেবেলার যদিও ইংরেজি কেতামতে শিখেছিলাম থ্যাংক ইউ বললে ফিরে বলতে

হয় ডোট মেনশন নয়ত ইটজ্জ অল রাইট। কাজের বেলায় কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই ওগুলো ব্যবহার করা হয়। একটু হাসি, একটু চাহনি দৃষ্টিবাদের উত্তরে অনেক সময় তাই যথেষ্ট। যদি কিছু বলতেই হয় তবে ডোট মেনশন বা থাক থাক দৃষ্টিবাদের দরকার নেই। এর চাইতে ইউ আর ওয়েলকাম সহায়ণে ধন্যবাদ সর্বাঙ্গিকরণে গ্রহণ করার যে ভাবটি ফুটে ওঠে তা অনেক বেশি সুন্দর নয় কি ?

পাশের বাড়ির মিঃ ব্রাউন, বু ডাকে আংকল জো, এগিয়ে আসেন আমাদের দেখে, বুর দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন, হাই জো, কান্ শেক হাওস্। এটা একটা বাধা ঠাটা দু'জনের মধ্যে বিনিময় হয় বোজ সকালে। জো বলে ডাকলে বু খেপে উঠে বলে, আই গ্রাম নট জো, মাই নেন্ ইজ বু। ততক্ষণে চাচা জো দৌড়ে রান্নাঘর ঢুকছেন। একটা পাতলা কাগজের ক্রাপকিনে মুড়ে নিয়ে এসেছেন গরম 'কুকি'—মানে বিস্কিট, একদম বেকিং প্যান থেকে তুলে। কুকির দিকে একনজর চেয়ে আর হ্যাও শেক-এ আপত্তি করা চলে না, জো বলে ডাকলে ও না।

সুপার মার্কেটের কাচের দরজা—ট্র্যাকার্টে পা দিতে-না-দিতে আপনি খুলে যায়। বলমল করে ওঠে ভেতরে খেরখেরে সাজানো কত বিচিত্র সামগ্রী। ক্রেতার মাথা ঘুরে যায় অমনি। দরজার পাশ থেকে একখানা পুশকার্ট বা চৌলগাড়ি টেনে নিয়ে ঘুরে ঘুরে হরেকরকম পছন্দমত জিনিস বাছাই করছে আর গাড়ি বোঝাই করছে সবাই। দাম দেবার পালা আসবে সবার শেষে। হাতে আছে গিল্ট কি কি চাই, পণ করেছে মনে বাড়তি জিনিস একটুও কিনব না। ওমা! কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়। বাড়তির সংখ্যাই বেশি হয়ে যায় গিল্টের চাইতে।

ওপাশের শেলফে দেখছি প্র্যাক্টিকের টেবিল রথ এসেছে নতুন। একটা টেবিল রথ দরকার কিচেনের গোল টেবিলটার জুগ। কি করে যে চমকছিল এতদিন টেবিল রথ ছাড়া, ভেবেই পাই না। ঢক্-কাটা ঝাঙনের স্তম্ভ ওধারে টেবিলের ওপর। একটা ঝাঙনের অভাবে অসুবিধা হচ্ছিল ভারি ক'দিন থেকে। এদিকে খেলনার কর্নারের পাশে মাটিতে টাল করে রাখা আছে বেডরুম শ্লিপার। বেশ সুন্দর তো, একজোড়া নিলে মন্দ হয় না। ওপরে বড় বড় হয়গ্গ লেখা 'সেল।' নিচেই নেওয়া যাক সস্তায় দিচ্ছে বখন। এমনি করে তুপাকার হয়ে ওঠে পুশকার্টের ওপর জিনিসপত্র, খাচ্-খাচ্গা সব রকম।

তরিতরকারীর লাইনে সাজানো আছে সুন্দর করে আলু বেগুন, ফুলকপি, টমাটো। বুটনো কোটার হাল্গামাতে আর যেতে ইচ্ছে করছে না? ঠিক আছে। প্র্যাক্টিকের খালেতে জড়ানো আছে কাটা ফুলকপি টুকরো। নয়ত জ্বলেন ফুডের দিকে গেলে সবই পাওয়া যাবে। কাগজের ব্যাগে খোসা-ছাড়ানো কড়াইশুটি, টুকরো করে কাটা গাজর, নরত সবরকম পিচ মিশেই তরকারী। মাছ-মাংসের দিকে ভিড় করেছে সবাই; কাটা ঘোড়া ঢক্-ঢক্ স্বচ্ছ কাগজে মোড়া প্যাকেট সাজান রয়েছে নানান ওজনবের, নানান সাইজের। মুরগী কি চাই? আন্ত, অঁখানো, শুকু চ্যান্ দু'খানা—সবই আছে। তাও হয়ত মনোমত জিনিসটি খুঁজ পাচ্ছেন না কেউ। সামনেই buzzer আছে। বোতাম টিপে দরতই বেরিয়ে আসছে—কোন দোকান কর্মচারী। নিঃশব্দে দরকারের জিনিসটি এগিয়ে দিয়ে অদৃশ হল অদৃশালো।

সুপার মার্কেটের একটি প্রধান লক্ষণই হল দোকানীর অল্পপস্থিতি। কিছু দরকার হলে জিজ্ঞেস করে নিতে পার কিন্তু জিনিসপত্র বেনার জুগ কেউ মাথার দিবি দিচ্ছে না, দর কমা'কষি করারও কোন সুযোগ নেই। তবে আধুনিক জগতে প্রোপাগান্ডার এমনি গুণ, দোকান-সজ্জা বা ডিসপ্লের এমনি মহিমা যে, খন্দের যথারীতি ঝায়েল হয়ে যাচ্ছেন। দোকানী ঠাকডাক করছে না বাটে কিন্তু ব্যাক ভর্তি নয়ন-লোভন বিচিত্র স্রবাসস্তার কেবলি হাতছানি দিয়ে চলেছে ক্রেতাকে, যেন ডেকে ডেকে বলছে আমাকে কেনো, আমাকে কেনো।

সুপার মার্কেট প্রসঙ্গে আমার সবসময় মিরিয়মের কথা মনে পড়ে যায়। মিরিয়ম আমার বান্ধবী, আর্টের ইতিহাসের ছাত্রী। তার স্বামী ডার্গেলিস একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। ডার্গেলিসের চিত্রকলার আলোচনা করতে করতে দু'জন মহিলার আলপাচারিতে যেমন হয়েই থাকে ফস্ করে মিরিয়ম মোড় ঘুরিয়ে মার্কেট প্রসঙ্গে পৌছে গেল।

চোখ বড় করে বললে, আচ্ছা, তুমি হে-মার্কেটে বাজার করছে কখনো।

করি নি। যদিও হে-মার্কেট স্টেশন চোখে পড়েছে আমার আগার গ্রাউণ্ড স্ট্রীটকারে যেতে যেতে! বললাম, কেন হে-মার্কেট বিশেষ বাজার না কি।

চোখ আরো বড় করে হাত নেড়ে মহা উৎসাহে বলে উঠল মিরিয়ম, তবে আর বলছি কেন। জানো, সেখানে সব জিনিসপত্র তরিতরকারী নিয়ে ওপেন-এয়ারে বসে। আবার দরাদরিও করা যায় বেশ।

এতবড় একটা সাংঘাতিক খবর আমাদের একটুও বিচলিত হতে না দেখে মিরিয়ম হয়ত আশ্চর্য হল। কিন্তু আমি যে দেখে অভ্যস্ত গড়িয়াহাট, লেক্ মার্কেটের বাজার, এমন কি সাঁওতাল পরগণার মেঠো হাট। ওপেন-এয়ারে বাজার বসে আর দরাদরিও করা যায় বেশ, এতো আমার কাছে কোন অত্যশ্চর্য খবর নয়। আমার বন্ধ আশ্চর্য লাগে ওদের সুপার মার্কেট। বড় বড় কাগজের কার্টন ভর্তি দুধ আর রকমারি ফলের দস তুলে নিচ্ছে গৃহিণীরা কোয়ার্টার গ্যালন, আধ গ্যালন, যেমন সাইজ চাই। এক গ্যালন দুধ অবশ্য কার্টনে নয়, প্রকায় কাচের জারে আছে। গরুর সঙ্গে দুধের সম্পর্ক কি, বলতে পারবে না কোন আমেরিকান শিশু। কাগজের কার্টন আর কাচের জার থেকে দুধ বার হতে দেখছে সে আজন্ম।

সুপার মার্কেট থেকে বাইরে যাবার মুখে এপাশে রয়েছে আইসক্রীমের র্যাক। দেশে ফিরে গিয়ে আমেরিকার কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মিস করবেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল আমার এক ভারতীয় বন্ধুকে। তিনি হেসে বলেছিলেন, আইসক্রীম। সত্যি, আমেরিকার মত এত উৎকৃষ্ট এবং এত রকমারি আইসক্রীম আর কোথাও দেখি নি। আর কতরকমের ফ্লেভার—ভ্যানিলা, স্ট্র-বেরী সাধারণ সুগন্ধ থেকে সফ্র করে পিচ, পাইন-আপেলের ডেলিক্ট ফ্লেভার।

এই আইসক্রীম-রসিক ভারতীয়ের গল্পটা মিরিয়মকে বলতে বলতে আমি বলেছিলাম, আমাকে এই প্রশ্ন করলে আমি কিন্তু বলতাম, দেশে ফিরে আমেরিকান জীবনযাত্রার যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি মিস করব তা হল সুপার মার্কেট। এত আরামে বাজার করার কথা দেশে ভাবতেই পারব না। ঠাকডাক, টে-হটগোল, দরাদরি নোরা আবর্জনার



তুপ সব গিলে ওখানে বাজার করাটা একটা বিজয়িকা মনে হয় আমার।

মিরিয়ম আমার সঙ্গে কিন্তু একমত হতে পারল না। বললে, এখানকার হাটবাজারে হিউম্যান সাইডটা একেবারে অবহেলিত। তোমার বর্ণনা শুনে আমার মনে হচ্ছে, বলকাতায় বাজার করাটা একটা ট্রাট নিশ্চয়ই।

বাজার দেরে ফিরবার পথে দু'হাতে থাকে দু'টো বিরাট কাগজের টোভা। রাস্তা পার হতে গিয়ে বৃকে বলি, আঁচল ধরো। শক্ত হাতে মুঠো করে আঁচল ধরে পার হয়ে যায় রাস্তা আমার সঙ্গে। এই কারদাটা এখানে শিখেছি নতুন। ফেনওয়েতে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি মায়েরা আসে নানান বয়সী শিশুদের নিয়ে, রাস্তা পার হবার সময় তীক্ষ্ণ মেমসাহেবী গলায় কানে আসে হোল্ড অন, হোল্ড অন। ছোট ছোট বাচ্চা কেমন সুন্দর মায়েব কোট, স্বাচি চেপে ধর চলে যাচ্ছে।

অবশ্য এখানকার ট্রাফিক পুলিশ ও মোটরগাড়ির চালক দুই-ই শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। পথেবাটে শিশুদের রাইট অফ ওয়ে প্রায় অ্যাগুন্সদের মত। কোপলে স্কোয়ারে চারমাথার মোড়ে একবার বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম খুব। ঠিকমত ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করে না আসাতে দেখি ঠিক মোড়ের মধ্যে গাড়িয়ে আছি। আর প্রায় চারদিক থেকেই গাড়ি আসছে ছুটে। বুর হাত ধরে গাড়িয়ে

ভাবছি চোখটা বুজ্ঞে ফেলব কি না—এমন সময় ম্যাজিকের মত চারদিকের মোটরগাড়ির স্রোত থেমে গেল।

মোড়ের ট্রাফিক আইল্যান্ডের ওপর ঠাণ্ডা পুশিশ হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিয়েছে চারদিকের গাড়ি। আর প্রাণপণে হাত নেড়ে আমাকে ইঙ্গিত করছে পার হয়ে যেতে। সেদিন মনে বেশ গর্ভ হল। জানতাম না এটা এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়। হামেশাই এরকম হয়। হুতুমুড় করে আসতে আসতে হোক কয়ে গাড়ি থামায় চালক। কিছু না, বেবীকারেজে শিশু নিয়ে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছে কোন মা পার হবার জন্য। হাত নেড়ে তাকে আগে যেতে ইঙ্গিত করবে চালক।

সেদিন ভেবেছিলাম পুলিশটা হয়ত আমাকে ভেবেছে এন্ট্রেন্স অফ ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষের রাণী। আশ্চর্য নয়। নিউইয়র্কের হাল্‌ম অকলে একবার বুরে বেড়াছিলাম একা। যদিও আন্টির নিষেধ ছিল। বারবার বলেছিলেন, ওটা শেডি ক্যাথেড্রালের জায়গা। একটা লোক এগিয়ে এসে আলোপ জমালে অবাচিতভাবে। একথা-সেকথার পর ম্বিকেস করছে আচ্ছা, তোমার চুলের দিখিতে ঐ লাল লাইনটা কিসের? ওটা কি কিছুর সিহল? অবশ্য তোমার কপালে ঐ লাল স্পাটের মানে আমি জানি কিন্তু চুলের মধ্যে লাল লাইন আগে দেখি নি।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, লাল টিপের মানে তুমি জান? কি বলা তো?

## বেণারসের দল বেণারসী ?

বারাবরগীর কারবানা হইতে সিন্ড সেন্টারের বেণারসী কাপড় বাছাই হইয়া সরাসরি কলিকাতার বিক্রয় কেন্দ্রে আগার জন্ত মধ্য পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় সিন্ড সেন্টারের বেণারসীর দাম কম এবং ডিজাইনও নিত্য নূতন।

বিবাহের বেণারসী বা যে কোন রূপ রেশম বস্ত্র ক্রয়ের পূর্বে সিন্ড সেন্টারে পদার্পণ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

### সিন্ড সেন্টার

বেণারসী ও রেশম বস্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

বহুবাণীর মার্কেট (বহুবাজার কলেজ স্ট্রীট মোড়) কলিকাতা • ফোন ৩৪-৪৮১৩

বারাবরগী কেন্দ্র : ডি১৭/১০৬, দশাশুমেধ রোড।

সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, কেন ওটা তো রয়লটির চিহ্ন, তুমি নিশ্চয় কোন রয়ল ফ্যামিলির ময়ে।

তু'এক কথা বল আমি তখন সরে পড়তে পারলে বাঁচি। একটুও ইচ্ছে নয় যে তার ভুলটা ভাঙি। আবার মনে মনে ভয়ও ধরে গেল শেষটা সত্যি কোন রাজকন্যা ঠাউরে কিডনাপ করে নেবে না তো 'হোস্টেজ' করে রাখতে ?

চাবি ঘুরিয়ে বাড়িতে ঢুকে হাতের জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে রাখি। বু'কেমন সাহায্য করে, এগিয়ে দেয় হাতের কাছে এটা-ওটা, রেফ্রিজারেটরের নীচু তাকে নিজেই ঢুকিয়ে রাখে কড়াইগুটির প্যাকেট, চাকের টুংরো। কত অল্পদিনে এসব দেশে শিশুরা পর্যন্ত স্বাবলম্বী হয়ে যায় ভেবে আশ্চর্য হই। নয়ত ওর বা বয়স, হত যদি কলকাতা, মাটিতে কি পা পড়তে পেত ওর ? এর কোলে তার কোলে দিন কাটত।

অবশ্য শুধু শিশুর কথা কেন ? শিশুর মা (এবং বাবাও) অতি অল্পদিনে আমেরিকান ওয়ে অফ লাইফ লীড করে যেরকম দ্রুত সর্ব-কর্মপটুতায় পরিচয় দিতে শুরু ক'লাম, তাতে নিজেরাই চমৎকৃত। আমার হত বেশ দম্ভই হয়ে য়ে, যদি দর্পহারা মধুসূদনের মত আমার বাড়িওয়ালা খিওডোর বখন-তখন আমার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো মনে না করিয়ে দিত।

যে-কোন লোককে চট করে একটা উপযুক্ত নামকরণ করে দেওয়ার অভ্যাস আছে বু'। খিওডোরকে সে ডাকে খিটখিটে 'বুড়ো' আংল। নামটা যে নিতান্ত অপ্রাপ্ত প্রিয়তৈ হইছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাগ্যিস বুড়ো বাংলা জানে না। দুপূর্ববেলা হাতে হাতুড়ি-বাটালি আর দু'একটা যন্ত্রপাতি নিয়ে খিটখিটে বুড়ো আংলের আবির্ভাব আমার এপার্টমেন্টে। আমিই খবর দিয়েছিলাম বাথরুমের দ্বারিখ সিস্টেমটা ঠিকমত কাজ করছে না। দ্রুত ডাইভার দিয়ে বিভিন্ন অংশগুলো খুলতে খুলতে বুড়ো আমার সঙ্গে বকবক শুরু করে। তোমরা ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ভারি ভাল, চমৎকার স্বভাব, খুব শুভ মাদার—তবে কি জানো, তোমরা তেমন কাজের নও। গলগল করে ময়লা জল বেরিয়ে পড়ে সিস্টার্ন থেকে। দু'হাতে জঞ্জাল খেঁটে আবার সব জুড়তে জুড়তে বুড়ো বলে, এই দেখো না এই দ্বারিখ সিস্টেমটা কোন আমেরিকান গৃহিণী হলে নিজেই মেয়ামত করে নিতে পারত, আমাকে ডাকাডাকি করতে হত না। কিন্তু তুমি—ইত্যাদি।

### হাউসহোল্ড 'চোর'

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, আমার বর্কটন জীবনের প্রথম দিকে হাউসহোল্ড চোরের সঙ্গে খুন্স করে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম সহজেই। (চোর, 'চোর' chore) মনে পড়ে যেত বলকাতার বাড়ির হরিপার বা পাঁচুর মার কথা। অথচ এ দুর্বলতার খবর আমার বান্ধবী ও প্রতিবেশিনীদের কাছে গোপন করে চলা ছাড়া উপায় কি। নানারকম কলকল, গ্যাংগেট উদ্ভাবন করে সঙ্গারের কাজের ভার হালকা করবার চেষ্টা হয়েছে ওদেশে। তবুও কাজ বখেই আছে। আলোবিনের আশ্চর্য-প্রাণীপের মত চোখের নিম্নেবে কিছুই হয়ে যায় না।

জননী ও জামার ভূমিকা ছাড়াও আমেরিকান গৃহিণীকে একাধারে

ঠাকুর-চাকর-মালী-ডাইভার সবরকম ভূমিকায় নেমে পড়তে দেখেছি আমেরিকান গৃহিণীর কর্মশূন্যতা আমাকে চম্ভা দিয়েছে। আর মুগ্ধ হয়েছি এদের হেলার সবকিছু করে ফেলবার ক্ষমতার। এই তো সন্ধ্যাবেলার আমার প্রতিবেশিনী মিসেস কালিনেন্ নতুন কেনা লাল ককটেল ড্রেসটি পরে পাটিতে গেলেন। তখন তাঁকে দেখে একবারো কি কেউ বুঝবে মার একঘণ্টা আগে ইনি ফুটপাথে পার্ক করা গাড়িটি স্বহস্তে ধোয়া-মোছা করতে ব্যস্ত ছিলেন ?

হারিয়েট বললে, আই হাব, ডুরিং মাই ওন ওয়ার্ক, তুমি কি বলা ?

ঢোক গিলে বললাম, মানে আমাদের বেশ লাগে, তবে কি জানো আমার একটা ধারণা হয়েছে—তোমাদের দেশে যে মেয়ে বিয়ে করেছে বার ছোলমেয়ে আছে, সংসার আছে তার পক্ষে কোন গবেষণার কাজ করা, সিরিস পড়াশুনা করা, সাহিত্যো-বিজ্ঞানে কোন মহৎ প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেওয়া একটু শ্রম নয় কি ? এ ধরণের কাজের জন্য যেই অকল্যাণ বা লিভার দরকার সে বোধ হয় পায় না, তাই নয় ?

হারিয়েট আমার ধারনার সার্বকথা খুঁজে পেল না। বললে, অন্তত চারদিকে ত'লে আমাদের দেশের মেয়েরা সবধরণের কর্মক্ষেত্রে যেমন সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে দেখতে পাই, তাতে তো কোন অসুবিধার কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না।

হাউসহোল্ড 'চোর' সংক্রান্ত স্বরতে কাপড় কাচার জন্য আছে—ওয়াশিং মেশিন, বাসন মাজারও আছে ডিশ-ওয়াশার, ঘর বাঁচি দিতে আছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। গ্যাসের উত্তন ও রেফ্রিজারেটর প্রতি ঘরেই দেখতে পাওয়া যায়, সাধারণের নাগালের বাইরে নয় সে সব। সুপার মার্কেট বাজার করা করেছে সহজতর। ক্যাথ ফুড বা টিনের খাবার ও ফ্রাজেন ফুড অন্তত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি হচ্ছে ওদেশে। এর ওপর আছে 'গরম করে খাও' রেডিমেড খাবার। প্যাকেট ভর্তি মাংসের রোস্ট বা ভাজা মাছ, প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে heat n' serve-এর আবার আর একটা নামও আছে টি-ভি ডিনার। এসব না কি টি-ভি দেখতে দেখতে খাবার কথা—তাই এই অপূর্ণ নামকরণ।

এর থেকে কেউ যদি ধারণা করে যেন যে, ওরা বুঝি টিন খুলছে আর খাচ্ছে, রাঁধা-বাড়ার পাট তুলেই দিয়েছে একেবারে, তবে কিন্তু খুবই ভুল হবে। প্রায় প্রত্যেক আমেরিকান গৃহে দিনের একটা বড় খাওয়া বেঁধে-বেড়েই খাওয়া হয়। তবে বাড়িবাড়ি নেই কোন কিছুতেই। নেমস্তন্ন খাওয়াতে হলেও সাধারণত মাছ বা মাংস একটা পদ বখেই। আধুনিয়িক একটা তরকারি, কাঁচ হিসেবে আলু বা কুটি-মাখন। ডেভার্টের জন্য অনেকসমর আইসক্রীম। খুব বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাওয়া-নাওয়া হলে একটা মাছ ও একটা মাংস ছ'রকম পদ। দেশ থেকে চিটি এল আমার এক আত্মীয়র জামাইকে নেমস্তন্ন করে কি কি খাইয়েছেন, লিখেছেন। সেই খাওয়ার মেধু অনুবাদ করে শুনিরেছিলাম কোন কোন বন্ধুকে। শুনে তারা শুধু বলেছিল, হোয়াট !

মুদ্রাণে দেখেছি লাফটাই ওদের বড় খাওয়া, রাতের ডিনার হয় হাডা। আমেরিকাতে কিন্তু লাফটা একটা স্যান্ডউইচ দিয়ে সারা

হয় অথবা কান খুলে স্থপ ঢেলে নেওয়া হয় একপাত্র। কাজকর্মে বার। বাইরে থাকে কর্তৃকলেই খেয়ে নেয় তারা—নরত চলে যায় ডাগ টোপে—একটা হট ডগ কাগজের কাটনে এক কাটনে দুধ হয়ে গেল লাক। রাত্রে ডিনার এদের আসল খাওয়া। সন্ধ্যা ছুটা হল ডিনার টাইম। শীতকালে চারটে বাজতে আঁধার ঘনিরে আসে—গ্রীষ্মকালে নটা পর্যন্ত সূর্যাস্ত হতে চায় না। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন ছুটার সময় রাত্রে খাওয়া খেতে বসা চাই আমেরিকানদের। এ ব্যবস্থার সুবিধে আছে অবশ্যই। সাতটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, বগন-দোয়া, সবরকম ঘরকন্নার 'চোর' সমাপ্ত করে যে বার মতে বেরিয়ে পড়ে। হয় কাজে, নয় অসমর বিনোদনে। নরত নেহাৎ বাড়ি বসে বই পড়ে টেলিভিশন দেখে। দিনের কাজের শেষে আমরাও এক একদিন বেরিয়ে পড়তাম বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস্-এর দিকে। সারাদিনের ক্লাস্তি হরণ করে নিত মিউজিয়ামের দওদাল-জোড়া ছবি।

হালা লাক সেয়ে এক একদিন কাজ সেয়ে রাখি এক একটা। বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো চুকিয়ে চললাম আমায় কাপড়-কাটা বুড়ির কাছে। বালিশের ওয়াড়ের এই নবতম ব্যবহার এখানে শিখেছি ন'পাউণ্ড পর্যন্ত কাপড়-চোপড় বালিশের ওয়াড়ে পুবে দিয়ে দিলে বৈধ নয়। তার বেশি হলে খরচও বেশি। ওয়াসিটন স্ট্রীট ওপর মাঝারি দোকান, সারি সারি বসানো ওয়াশিং ও ডাইং মেশিন। দোকানের কব্জী-বুড়ির সঙ্গে আমার বেশ ভাব। গোটাটাকে বেড়াল পরিবৃত্ত হয়ে বসে আছে দোকানে। সব বুড়ি মেমসাহেবদের বেড়ালের প্রতি দুর্বলতা থাকে কেন কে জানে? একটু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করে বুড়ি বললে, আজ কিরকম চাই জই না ওয়েট? কাপড় কেটে ভেজা অবস্থাতেই দিয়ে দেবে, না শুকিয়ে তবে দেবে?

বল'ম, ওয়েটই দাও আজ। ভেজা দিলে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

বুড়ি যতক্ষণ কাপড় কাচে মোড়ের সেলনে বু'র চুলটা কেটে নেওয়া চলতে পারে। চুল কাটানোর খরচ ভারি বেড়ে যাচ্ছে আমেরিকাতে দিন দিন এই আলোচনা সব জায়গাতে চলছে তখন। আমাদের বন্ধু গ্রাটমারার স্ত্রী তো তাই বাড়ির ছেলেমেয়েদের এবং কর্তার চূর্ণকাটার ভার নিজেই নিয়েছেন হাতে আর অল্পদিনের মধ্যে বেশ নিপুণভাবে কাজ চাপাচ্ছেন। মোড়ের এই ইটালিয়ান নাপিত আমার কাছে আগেকার চাজই নেয়, খাতির করে বেশ। চুল কাটতে কাটতে আমাকে খবর দেয় পাড়ার সব স্ক্যাণালের।

ব্রাউসের চেনো? বুড়োবুড়ি? আহা, ঐ যে ওঁদিকের লালবাড়ির থাকে?

চিনি বৈকি! প্রথম যেদিন বস্টনে এলাম মিসেস ব্রাউন বাগান থেকে ফুল গিয়েছিলেন আমাদের। মিসেস তো বুড়োকে ফেলে পালিয়েছেন, খবর দিল নাপিতমশাই। এ্যা। আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। তবে শোন—বলে সে জুড়ে দিল এক লম্বা কাহিনী।

চল আসবার সময় হঠাৎ গলা নামিয়ে বললে, ম্যাডাম, বেশ সাবধানে থাকো তো বাড়িতে?

কেন কি আবার হল?

জানো না বুকি, 'প্রাউলার' দেখা গেছে পাড়ার। এরা চোরকে বলে প্রাউলার অর্থাৎ সেই ধরণের চোরকে বার। অন্ধকারে আনাচে-কানাচে প্রাউল করে অর্থাৎ ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। শুনে ভরে বাঁচি না।

এ-সব দিক থেকে ওদেশে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই থাকতাম। ক্রাইম বেড়ে চলেছে দিন দিন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছিঁচকে চুরি বা অল্প ছোটখাট ক্রাইমের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। যা আছে সবই উঁচুনের ভাবতাম, বিদেশী আগন্তকের গৃহে উঁচুনের ক্রিমিনাল হানা দেবে কিসের লোভে? স্থানীয় খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলোসেই নজরে পড়বে বড় বড় হেড লাইন—খুন-লুট-রাহাজানি আরো কত ঘৃণ্যতব অপরাধের খবর। আমরা ভারতীয়েরা খবরের কাগজপড়ার জাত আর আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকও কাগজ পড়ে প্রাণনত রাজনীতিক খবরের জ্ঞান—দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় প্রকার। ক্রাইম ও স্ক্যাণাল উপজীব্য কাগজে বিরক্তি ধরে যেত। বস্টনে যতদিন ছিলাম এক 'ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর' ছাড়া অল্প কিছুতে রুচি হত না।

যে কথা বলছিলাম, একদিকে এই খুন-লুট-রাহাজানির খবর অল্প দিকে সাধারণ ম'মুয়ের সততা—ছুঁটার মধ্যে সমন্বয় করা আমার পক্ষে শক্ত হত মনে মাঝে! দোকানে জিনিস জুড়ার দিয়ে এসেছি আমার অমুপস্থিতিতে ভেলিভারি দিয়ে চলে গেছে দোরগোড়ার, প্রায় সাইড ওয়াকের ওপর। কোনদিন কিছু খোঁজা বার নি। বেবীতঙ্ক ক্যারেক্স রাস্তার ওপর পার্ক করে রেখে মা চুকেছেন দোকানে বেবীর গায়ের সুদৃশ্য গরম কলশটাও কেউ তুলে নেয় নি। সেবার বস্টনের পার্ক স্ট্রীট স্টেশন থেকে হার্ডার্ড বাড়ি আয়ারগ্রাউণ্ড স্ট্রীটার অর্থাৎ ট্রাম চেপে, শবের ভাঁজকরা জাপানী ছাটাটি ফেলে নেমে পড়লাম ভুল। সারাদিন হার্ডার্ড কাটলাম। মনেই পড়ে নি ছাত্তার কথা। ফিরতি পথে হার্ডার্ড স্টেশনে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। স্টেশন কর্মচারী একজনকে বললাম, সে বললে কেমন দেখতে বর্ণনা করো।

বর্ণনা শুনে নিয়ে নিশাঙ্গে উঠে গেল এবং একটু পরেই ছাত্তা আমার হাতে সমর্পণ করল আবার।

তাঁই বলছিলাম বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ছিলাম আমার এপার্টমেন্টে। কত সময় একাই থেকেছি শিশুপুত্র নিয়ে। 'শ' কাজ করেছে নাইট ডিউটি, উইক-এণ্ড ডিউটিতে নরত কার্যোপলক্ষে চল গিয়েছে মন্ট্রিওল বা সাইরাকুজ। কিন্তু আমার নাপিতমশাই কিছুদিনের মত যা প্রাউলার ভাতি চুকিয়ে দিল আমার মনে, কি বলব! এমন কি 'শ'র অমুপস্থিতিতে টি-ভিতে হিচকক বা এলোরি কুইনের রহস্যনাটিকা দেখার সাতসণ্ড হত না আমার।

ভেজা-কাপড়ের ঝোলা বুড়ির দোকান থেকে সংগ্রহ করে বাড়ির পথ ধরলাম আবার। সাবানের গন্ধ আসছে আমার বালিশের ওয়াড়-কাম থলের ভেতর থেকে। ভালই কেটেছে কাপড়। প্রথম প্রথম আমার শাড়িগুলো বুড়ির মনে আভ্যেকের উল্লেক করত। বলত এরকম ড্রেস আমি কখনো কাচি নি, পারব না।

আমি বলতাম, ড্রেস-ট্রেস ভুলে যাও—যেমন করে বিছানার চাদর, পর্দা কাটোন্তেহনি করে কোচ দাও।

আজকাল আর ভয় পায় না শাড়ি দিলে।

বিকেল চারটের সময় টিক যেন আমার স্ত্রীদের জুতাই টেলিভিশনে  
সুস্থ হয় ডিক্‌লার্ক শো, মার্কিন কায়দার ব্যাং-ব্যাং করে নাচগান  
বাজনা চলতে থাকে। টেলিভিশনরূপীণী মেকানিক্যাল জার্নির হাতে  
পুত্রকে সমর্পণ করে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত মনে।  
কানে আসে গান হচ্ছে—

দিস্ ইজ আগার ফার্স্ট অ্যানিভার্সারি...

বাট ইট ওনট বি দি ল্যান্ড...

মাসের মধ্যে কারি-পাউডার ঢালতে ঢালতে নিজের মনেই বল  
লার্ক না হলেই তো বাঁচি।

একবারে নির্ঝিয়ে যে রান্নাপথ শেষ হয় তা নয়, মাঝে মাঝে বু  
এসে ডাকাডাকি করে, এসো না এই নাচটা একটু নাচি। উম্মনের  
আঁচ কমিয়ে দিয়ে যেতে হয় ওর হাত ধরে, দু'একবার ঘুরপাক খেয়ে  
আসতে হয়। সঙ্গীত চলতে থাকে,—

টু নো, নো, নো, হিম্ ইজ টু লং লভ হভ হিম।

কোন কোনদিন টেলিফোন বেজে ওঠে বন্বন্ব করে। রিসিভার  
ফুলতেই কানে আসে মহিলাকণ্ঠে পরিষ্কার বাল্যায়, আজ কি রান্না  
চাপালেন?

চ্যাটার্জি-গৃহিণীর টেলিফোন ব্রাইটন থেকে। আমাদের বস্টন  
জীবনের শুরুতেই 'শ' আর আমি বলাবলি করে নিয়েছিলাম  
'বস্ত্রিন রোমে থাকব রোমানদের মতই চলব।' অর্থাৎ আমেরিকান  
জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করার চেষ্টা করব। প্রাচীন  
হলেও কোথায় স্বদেশীরা! আছে নুঁজে বার করে একসঙ্গে মিলে  
খিচুড়ি খেয়ে প্রবাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগের অপব্যবহার করব  
না। মোটামুটি এ নিয়ম মেনে চললেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন কেউ  
কেউ। ব্রাইটনের চ্যাটার্জি পরিবার, সঙ্গীত কবি অমিয় চক্রবর্তী,  
রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অধিলাদন, কোহাস্টে আশ্রমের শ্রীমতী  
গায়ত্রী দেবী এমন আরো অনেকে।

প্রতিভাবান ভারতীয়রা দেশত্যাগী হয়ে বিদেশে যার বাস করেন এ  
সমস্যাটা আজকাল আমরা প্রায়ই স্তব্ধ থাকি। শ্রীচ্যাটার্জিকে মনে  
হত তারই একটি অলস নিদর্শন। দেশে থাকতে কলকাতার কোন  
একটি বৃহৎ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। স জীবনের  
দুঃসহতা আমাদের অনেকেরই জানা। এখানে পেয়েছেন পছন্দমত  
কাজের সুযোগ, পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার মত আর্থিক  
সম্পত্তি। দেশে আর কিরবেন না মনস্তির করে ফেলেছেন। দেশে  
কিরবার কথা উঠলেই বলেন, কিং গিয়ে কি করতে বলেন, আমার  
অনুক কলেজে মাস্টারি? ওর ছবিব মত সাজানো বাড়িটি, দরজায়  
কাঁড়ানো গাড়ি আর ছেলে দুটির উজ্জল মুখের দিকে তাকিয়ে  
দেশে কিরবার অন্তরোধ করতে ভরসা পাই বই?

কোন কোনদিন বাংলামতে বাড়ী পর্যটাল্লিশ মিনিট গল্প করে  
ফেলি, কোনদিন আবার টেলিফোন-আলাপ সুদীর্ঘ হয় না দু'পক্ষেই  
রান্না। মিশিয়ে এসেছি, বাকি পড়ে আছে তখনো বিস্তর হাউসহোল্ড  
'চোর'।

অবশেষে মিসেস চ্যাটার্জি বলেন, বাই আবার বামনিগিরি  
করি গিয়ে, এসেছে আর সবই ভাল এই এক যা থামেলা।

খেতে বসে সন্ধ্যার খবর শোনাটা বেশ নেশার ঝাঁড়িয়ে গিয়েছিল  
খাবার প্লেট হাতে কিচেন থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসার ভারি অনুবিধা।  
ইদানীং তাই ভাঁজকরা কার্ড টেবলটা লিভিংরুমের টেলিভিশনের  
সামনে পেতে নিতাম। খেতে খেতে খবর শোনা হত, দেখা যেত  
টুকরো-টুকরো নিউজরীল। হঠাৎ হয়ত এককলক দেশের খবরও  
ভেসে উঠল টেলিভিশনের পর্দায়। কলকাতা, বা কেরালা নয়ত  
নিউ দিল্লী। [অগামা সংখ্যায় আমেরিকার কলকাতা।

## দক্ষিণের বারান্দা

### শ্রীমদা কর

আমার এই দক্ষিণের বারান্দাটি

যেন একটুকরো আশ্রয়

রূপোণী রেখে আটকনো।

সেই আয়নাটিতে মুখ দেখবো বলে

আমি বারবারই ছুটে চলে আসি।

আজ সকাল উঠে দেখলাম

রানি বিহীন একখানি মুখ

সময় যার চোখের কোণে

দাগ টেনে গেছে—অনেক অনেক বার।

দুপুরে দেখলাম রাস্তা অপ্রসন্ন মুখটা

বিরজিত আর রাগে কালো হয়ে উঠেছে।

সে চেহারাকে দেখে আমি ভয়ে

পালিয়ে গিয়েছিলাম দুই হাতে চোখ চেপে ধরে।

সন্ধ্যাবেলা দেখি তারার নীল আলোয়

উজ্জল হয়ে সেই চোখ দুটি ফুল উঠেছে।

তোমারি প্রেমের প্রত্যাশায়

তারা গভীর অশ্রুধর

আর অন্তরঙ্গ মধুর।

## প্রতিজ্ঞা

### শ্রীমতী স্মৃতি ঠাকুর

সন্ধ্যা তখন গরমের ছুটির। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

কবিতা সংগ্রহিতের মতো সমুদ্রতীরে বসে চেয়েছিলাম সমুদ্রের  
দিকে। ডেউ-এর পরে ডেউ এসে আছড়ে পড়ছে ওর পায়ের কাছে—  
বালির বুক। সঙ্গে নিয়ে আসছে ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের  
অজস্র বিহুক—যাবার সময় সেগুলোকে ফুলের পাণ্ডির মতো ছড়িয়ে  
দিয়ে যাচ্ছে ভিজে বালির বুক, আবার পরস্পরকে সব ধুয়ে-ধুয়ে  
নিয়ে যাচ্ছে। বিরামহীন এই খেলা খেলে চলেছে সমুদ্র।

আকাশের সন্ধ্যার রক্তরাগে সাগরও রেঙে উঠেছে—বুঝি বা কবিতার  
মনেও সেই রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দূরে দিকচক্ৰবালে আকাশের  
লালে আর সাগরের লালে মেশামিশি হয়ে গেছে। নীড়ে-ফেরা  
হংস-বলাকারা আকাশের বুক কবিকের জন্তে যেন একটা ছবি এঁকে

## দেন ও প্রাপ্তি

য় বাচ্ছে। এমন অন্তরাগের রক্ত বাঁধানো আকাশে কালো কালো পাখির জাপানী ছবি ওর একথানা আছে। সেই ছবিখানার ধাই ওর বাই-বাইর মনে পড়ে যাচ্ছে।

ওর স্বামী নীতিশ বাগির ওপর পাচ্চারী করতে করতে দূরে গাথায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে কবিতা আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সমুদ্রের ককরোরের মধ্যেও আশপাশের লোকের খাবার্তার একটা সম্পূর্ণ গুঞ্জন এবটু-আটু কানে এসে বাজছে। র মনে হচ্ছে যেন অজ্ঞ কোনো জগৎ থেকে কথাগুলো ভেসে আসছে।

কে কবিতা! ওর ঠিক পেছনেই একটি পুরুদ-বর্ধন ওর ানভঙ্গ করে দেয়।

কে স্তমিত! চমকে উঠে যেন কবিতা পুরুদকঠের প্রতিধ্বনি হয়ে।

কবিতার বলার অপেক্ষা না রেখেই স্তমিত ওর পাশে বসে পড়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলে। চিনতে পেরেছে তা হ'লে?

তোমার কি ভোলা সমস্ত স্তমিত!

আমি ভাবছিলাম হয় তো তুলেই গেছ আমাকে। হয় তো তোমার আমাদের সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে নেই অথবা এতদিনে মনের পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কবিতা ওর দিকে কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষে তাকিয়ে বলে একটুও না, কেন এমন কথা বলছো? তোমার নিজের পরিবর্তন ঘটে গেছে বোধ হয়, তাই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো আমার ওপর।

বিশ্বাস করো কবিতা একটুও পরিবর্তন হয় নি। হ'বেও না কোনোদিন। তোমায় আমি চিরদিন আমার মনের মণিকোঠায় মণি-মণিকোর মত সমস্ত রেখে দেবো।

কবিতা বলে আর আমি বুঝি আমার মনের মণিকোঠায় জীবনের বিশেষ দিনগুলোর কথা জমা করে রাখতে অক্ষম হবো বলে তুমি মনে করো? সে দিনগুলো চিরদিন আমার মনে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

স্তমিত ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, সত্যি বলছো?

কবিতা বলে, একদম সত্যি। ওই সমুদ্রের সামনে বসে আমার মিথো বলতে ইচ্ছে করছে না।

স্তমিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে বসে থাকে তারপর জিজ্ঞাস করে, এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

পতিদেবতার সঙ্গে এসেছি।

কই কারুর সঙ্গে দেখছি না তো? বলতে বলতে স্তমিত এদিক ওদিক দেখে নেয় কবিতার স্বামীর উদ্দেশ্যে।

এদিকে গেছে যেভাবে যেভাবে।

কোথায় উঠেছ?

আমরা পুরী হোটেল এ দোতলার সামনের দিকের ঘরে উঠেছি। তুমি?

ঐ সী-ভিউ হোটেলটার।

একলা এসেছ?

হঁ, বৌ ছেলোদের নিয়ে ছুটিতে বাগের বাড়ি গেছে। তোমাদের বাড়ির আর সকলের খবর কি কবিতা?

ভাল। নমিতা গত বছর বি-এতে অনার্স পেয়েছে। তোমাদের বাড়ির কি খবর?

আমাদের বাড়ির আর সকলে একরকম ভালই আছে, তবে যা শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

কবিতা বলে, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো বল তো?

অনেকদিন পরে। আমি তোমায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি যে সত্যি তুমি কবিতা কি না, তারপর নিঃশেষ হয়ে তবে এসেছি তোমার কাছে, না হলে অজ্ঞ কোনও ভদ্রমহিলা হলে অচেনা লোককে এভাবে কথা কইতে দেখে চটে যেতে পারেন তো?

কি এতো ভাবছিলে বসে বসে কবিতা?

কিছুই জাবি নি বিশেষ, শুধু দেখছিলাম বসে বসে সীমাহীন এই সমুদ্রকে। ভারি আশ্চর্য আর অদ্ভুত লাগছে টেউগুলোকে—ওদের কি বিগাম নেই আছড়ে পড়ায়। দেখো! কি বিরাট শক্তি ওই সমুদ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে, নিজেকে ওর কাছে অতি দৃঢ় অসহায় যেন একটা কুটোর মত মনে হচ্ছে। নিমেষের মধ্যে টেউগুলো আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর কি অদ্ভুত সুন্দর দেখে আকাশের এই বস্তুর খেলা! কোনও শিল্পীর তুলিতে এমন প্রাণবন্ত ছবি আঁকা যাবে না।

কবিতা দেখছি তুমি শুধু কবিতা নও কবিও! তোমার এমন আত্মসমাহিত ভাবটাকে আমি অনাহুতভাবে এসে নষ্ট করে দিলাম বলে সত্যি দুঃখিত।

মোটও না, তুমি আমার সকল ভাবকে আরও প্রেরণা যোগাও তাই তোমাকে পাশে পেয়ে আমার ভাবগুলো ভাষা পেল। আমার কবি হওয়ার কৃতিত্বটা তোমায়ই। মনে পড়ে স্তমিত, রোজ সকালবেলা যখন তুমি বাবার কাছে পড়তে আসতে, তখন আমি আমাদের বাগান ফুল ফুলতাম আর যখন তুমি আমাকে দেবার জন্য একটু করে তোমাদের বাগানের গোলাপ ফুল নিয়ে আসতে? হ্যাঁ, মনে পড়ে। তার তার বরলে তুমি আমার দিতে সস্ত-ফোটা শিউড়ি ফুল প্রতিদিন সকালবেলা। কি যে ভাল লাগতো ফুলগুলো! হোমাকেও ওই শিউড়ি ফুলের মত নির্মল শুভ্র সুন্দর মনে হতো। সারাদিনটা আমার তুমি ওই শিউড়ি ফুলের মিষ্ট গন্ধ দিয়ে ভরে দিতে।

ততক্ষণে আকাশের লাল মুছে গিয়ে ধূসর ছায়া গাঢ় হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের কালো কালো টেউগুলো মাথায় কক্ষফাসের আলো জ্বালিয়ে সারা সমুদ্রে ছুটেছুটে করছে। বড় বড় টেউগুলো যেন দৈত্যের মত দাঁত বার করে ছুটে এসে তারের ওপর নিফল আক্রোশে বাপিয়ে পড়ছে। যেখানে টেউগুলো এসে ভেঙে পড়ছে অচক্যে সেখানে কক্ষফাসের চিকু-মিকিলি দেখে মনে হচ্ছে যেন অনেক হীরেব কুঁচি ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে টেউগুলো।

ওরা সেইদিকে চেয়ে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর একসময়ে স্তমিত বলে ওঠে কি মনে হচ্ছে জানো? আমার স্মৃতিত বৃদ্ধিকৃত হৃদয়ের সঙ্গে ওই সমুদ্রের হৃদয়ের কোথায় যেন খুঁ মিল! ওর হৃদয়খানিও যেন আমার হৃদয়ের মত কোনো প্রেরকে পাবার আশায় উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসছে আর বার বার ব্যর্থ হয়ে নিফল আক্রোশে ভেঙে পড়ে হাহাকাব করছে। পরমুহূর্তে আবার নতুন

উভয়ে ছুটে আসছে নতুন করে পাবার চেষ্টায়। কিন্তু ওর আশাও আমার আশার মতই কোনোদিন পূর্ণ হবে না।

কবিতা মনে পড়ে আমাদের কত ইচ্ছা ছিল যে বিয়ের পর পুরী বেড়াতে আসবো? পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারকের মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো আমরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে দেখব, সমুদ্রস্নান করবো, দু'জনে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের ঢেউ শুণবো আর গল্প করবো?

হ্যাঁ খুব মনে পড়ে, আশ্চর্য দেখ, আজ আমরা ঘটনাটকে দু'জনেই পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করছি!

যদিও আজ তুমি অপরের স্ত্রী কিন্তু আমারই তো হতে পারতে, যদি না বাবা মৃত্যুশয্যা়ার তাঁর মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করার জন্য আমার ওভাবে না অক্লান্তে করতেন! অসবর্ণ বিয়েতে তাঁর খুব আপত্তি ছিল। তাই তিনি তোমার সঙ্গে আমার কিছুতেই বিয়ে হতে দিলেন না। বাবা বেঁচে থাকলে আমি তাঁর অন্যতমই তোমার বিয়ে করতাম, হয় তো তোমার নিয়ে আলাদা থাকতাম, কিন্তু তাঁর শেষ সময়ের কথা আমি অম্ল করত পারলাম না। তারকজ্ঞ জীবনে যত অসুখী হই, কর্তব্য আমাকে করে যেতেই হচ্ছে। তাই বলছি আমার যেমন এ জীবনে তোমাকে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই তেমনি ঐ সমুদ্র পারবে না এই তারক পেতে—শুধু বুখাই ওর আফালন।

তোমার বিয়ের আগের দিনটার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে সুমিত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি আমাদের বাড়ি এসেছিলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বারান্দার কোণে যেখানে ফুলগাছের টব দিয়ে ঘেঁরা বসবার জায়গা ছিল সেখানে আমরা বসেছিলাম দু'জনে। আমার তুমি একটা মস্তবড় রক্তগোলাপ দিয়ে বলেছিলে আর যেই আশ্রক না কেন তোমার জীবনে আমাকে ছাড়া আর কারকেও তুমি ভালবাসবে না।

আর তার বিনিময়ে তুমিও সেদিন একটা মস্তবড় চন্দ্রমল্লিকা আমার দিকেছিলে, বলেছিলে তোমার পক্ষেও আর কারকেও জীবনে ভালবাসা সম্ভব নয়। ফিরে আসার সময় তোমার চোখের জল আমাকে বড় বিচলিত করেছিল কবিতা।

আমি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলাম তোমাকে আমার হৃদয়ের আসনে এখনকার মতই চিরদিন প্রতিষ্ঠা করে রাখবো।

তুমিও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে সেই কথা কবিতা। পরদিন বিয়ের সবকিছু উৎসব-আড়ম্বর আনন্দ-কোলাহল আমার কাছে বেশুরো, অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, এমন কি তারপরের আরও অল্প-দিনগুলোও। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কর্তব্যকর্মের মধ্যে ফিরে যেতে আমার বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

তারপর বছর দুয়েক বাদে আমরাও বিয়ে হয়ে গেল, আমিও আমার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য করে এসেছি নিখুঁতভাবে। কিন্তু তোমার জায়গার আমি কারকে বসাতে পারি নি সুমিত।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়।

কি চিন্তা করছিল ওরা কে জানে। সুমিত আবার বলে ওঠে, তোমার ক'টি ছেলেমেয়ে কবিতা?

একটি মাত্র মেয়ে।

আমার শুধু তিনটি ছেলে। কত বড় হোলো তোমার মেয়ে?

এই-বছর সাত-আট হোলো।

তোমার মেয়ে তোমার মত সুন্দরী হয়েছে কবিতা?

সকলে তো তাই বলে।

বড় দেখতে ইচ্ছে করছে তাকে, তোমার সঙ্গে এখানে এসেছে নাকি?

না। ব্যাঙ্গালোরে ওর পিসিমার বাড়ি বেড়াতে গেছে। আমার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না কিছুদিন থেকে, তাই দিন পনেরোর জন্য এখানে এসেছি চলে।

আমি কালকেই চলে যাছি এখান থেকে।

কোথায়?

আরও দু-এক জায়গায় ঘুরে শশুরবাড়ি পৌঁছবো, তারপর ফ্যামিলি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো।

তোমার সঙ্গে হয় তো আর কখনও দেখা হবে না সুমিত!

হয় তো নয় তবে-সুমিত চুপ করে কি ভাবতে থাকে।

আকাশে এর মধ্যে একফালি বাঁকা চাঁদের কখন আবির্ভাব হয়েছে তা ওরা খেয়াল করেনি। এই অবসরে কবিতার সমুদ্রের দিকে চোখ পড়তে দেখে চোঁটেগলো। এখন হীরের খেলা ফেলে চাঁদকে নিয়ে সোনার খেলা শুরু করেছে।

কবিতা—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বড়ছেলের বিয়ে দেবে? আমার জীবনে তো আর তোমাকে পেলাম না,—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমার সেই সাথকে পূর্ণ করতে দাও। বল দেবে?

এখন তো ওরা ছোট!

আহা, আমি বলছি বিয়ের কথা ঠিক করে রাখতে, বিয়ের বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দেবো ওদের, ততদিন দুই বাড়ির মধ্যে মেলামেশা চলবে। অবশ্য তোমার স্বামীর আপত্তি হবে কি না জানি না।

আমার কোনো মতামত নিয়ে উনি মাথা ঘামান না। এ ব্যাপারেও আমি যদি ভাল বুঝি আর জোর দিই, আমার পছন্দকরা ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য, তবে উনি আপত্তি করেন না।

তবে কথা দিলে তো?

দিলাম। তবে সবার উপর ভগবানের ইচ্ছা—তিনি যা করেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে, আজ তবে আসি কবিতা।

আজ্ঞা। দেখি উনি বোধ হয় আমাকে খুঁজে না পেয়ে হোটলে ফিরে গেছেন। আমিও চলি সুমিত।

ক্ষণিক পাওয়ার আনন্দ আর বিচ্ছেদ-বেদনার ভারাক্রান্ত একটা অদ্ভুত অসুস্থতি মনে নিয়ে ওরা পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়।

বছর পর্বত পার হতে হতে অধিত্যকার এসে পৌঁছে পথিক  
বিশ্রাম পার যেমন, সন্ধ্যাস-জীবনেও তেমন অধিত্যকা-কাল  
আসে মাঝে মাঝে। চলায় পথটা সহজ হয় তখন, বাধা আসে না,  
বিপদ সকেতের মুখে পড়তে হয় না। পরের দু'টা বছর সেই  
অধিত্যকা-কাল সিন্ধুর লুকের জীবনে। অন্ধর জুড়ে প্রগাঢ়  
প্রশান্তি, নিজের কর্মক্ষমতা দেখে নিজেরই বিশ্বাস লাগে। বিস্তীর্ণমান  
কংগোর মনে একটা স্বাদেশিকতার গর্ভ এনেছে। এমন কোন  
গর্ববোধ যে মনে ছিল তার, নিজেও জানত না। কিন্তু আজ  
আর সে গর্বে উগ্রতা কিছু নেই, শান্ত মনে মনে নিয়েছে শুধু।  
সব মানুষের মনেই কোন না কোন পূর্ণগাম্ভীর্য প্রবিষ্ট হয়ে থাকে,  
নানরাও একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে পারেন না তার—পূর্ণজীবন  
থেকে টেনে আনতে বাধ্য হন সন্ধ্যাস-জীবনেও। এই স্বাদেশিকতার  
গর্ববোধও তেমনই কোন পূর্ণগাম্ভীর্যের মত মিশে গেছে ওর স্বভাবে,  
তাকে বাধ দেওয়া যাবে না।

কংগোর সমুদ্র নিয়ে নানা কথা বলাবলি করে পুরুষ যোগীরা—  
কোষাপ্ট আর ইউরেনিয়াম-বুজোর কসলের বগুনি—১৯৩৮ সালে  
প্রায় ত্রিশ হাজার টনের কাছাকাছি পৌঁছোবে। রেলপথ ক্রমেই  
আরও অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে—কংগো নদীর প্রধান শাখানদীগুলো  
থেকে কাটা পরস্রোতা নালীগুলোর মতই।

—উপনিবেশিকতার অর্থ পরিবহন—উপনিবেশিকদের মুখে মুখে  
কথাটা প্রবাদে ঝাড়িয়েছে।

মাইলের মাপে নির্মিত পথের পরিমাপ নিয়ে জাঁক করেন তাঁরা।  
আর নানরা নীরবে বন্ডার্টদের সংখ্যা গোণেন।

ভাষার বহু নতুন নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে এসে—নানা প্রতিষ্ঠান,  
নানা গঠনমূলক সংস্থার গোশাকী নামের বদলে ছোটখাট ঘরোয়া নাম  
চলু হয়েছে মুখে মুখে। ওটাকো, ইউটেসলেও, ইনোয়াক। এ এম  
আই তেমনই এক প্রতিষ্ঠান—চিকিৎসাক্ষেত্রে নিরোদের কাজে  
লাগানোর পরিকল্পনা তার মূলে। ১৯৩৫ সালে সরকার গড়েছেন,

যে বছর সে জেসিং-বয়দের প্রথম দলটা গড়ে তার পরের বছরই  
ঠিক। এই সংগঠনটার সঙ্গে তাই মনে মনে মধুর একটা  
যোগাযোগের অমুদ্রিত আছে। যদিও সেই সঙ্গে নম্রভাবে নিজের  
মনেই একধাপে ভাবে ও ধরনের কোন ছককাটা মেডিক্যাল প্রোগ্রাম  
তার চোখের সামনে ছিল না। কালো ছেলগুলোর বড় বড় কালো  
চোখে আর কিছু শেষবার আকৃতি দেখত, সেই দেখা হতেই জেসিং-  
বয়দের দল গঠন পরিকল্পনার উৎপত্তি। তবু সেই পরিকল্পনাই  
মাধ্যমে এক সুপরিব্রাজনার ভিত্তির সঙ্গে তার বহু ও পরিপ্রায় মিশে  
একাত্ম হয়ে গেছে। বর্তমানের ব্যাপক পরিব্রাজনার রূপায়ণ দেখতে  
দেখতে তাই হঠাৎ এক এক সময় মনে পড়ে যায় প্রায় ছ'বছর আগে  
জাহাজের একটা প্রার্থনার কথা—এক সমুদ্র-ক্যাপ্টেনের চোখ দিয়ে  
যেদিন প্রথম মিশনারী সিন্ধুরদের দেখে সাগ্রহে আপন মনে প্রার্থনা  
করেছিল, যে প্রভু, আমি যেন ভাল কিছু করতে পারি।

ইরোরোপে ইতোমধ্যে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে। ওরা বিস্তারিত  
খবর রাখে না তার, কেবল শিরোনামগুলোই জানতে পারে, তা থেকে  
কোন কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। সবই দুর্বোধ্য লাগে। বিগত  
চার বছরে রিক্রেশনের আলোচনা প্রায়ই জাগতিক ব্যাপারের দিকে  
মোড় ফিরেছে, অল্প কোন কারণে নয়—অত্যাচারিত বিপন্ন আত্মার  
জ্ঞান প্রার্থনার প্রয়োজনে। নাৎসী-নির্ধাতিত ইহুদীদের আত্মার জ্ঞান  
গৃহস্থ-হত স্প্যানীয়দের আত্মার জ্ঞান। চারিদিকে ওলোট-পালোট  
হয়ে বাচ্ছে যেন সবকিছু—রাজ্য-রাজ্য সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে।  
যুগোশ্লাভিয়ার আলেকজান্ডার গুস্তাভে নিহত হয়েছেন, ইংল্যান্ডের  
এডওয়ার্ড সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করেছেন, জার্মানী গ্রাস করেছে  
কমিউনিস্টরা। আর এখন এই আটকালের সেপ্টেম্বরে হিটলার  
চেকোস্লাভাকিয়ার একাংশ জার্মানীর বলে দাবী করেছেন এবং মিউনিকে  
স্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত দলিল অনুসারে সত্যই তা তাঁর হাতে তুলে  
দেওয়া হয়েছে। দলিলটার নাম শান্তি-চুক্তি।

নানরা মাঝার ম্যাথিডাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি মনে হয়  
যদি গিয়ে ইরোরোপকে আর চিনতে পারবেন আপনি?

নতুন সুপিরিয়র নির্বাচন হয় ছ'বছর অন্তর। সেই উপলক্ষে



পূর্ণপ্রাণে

চাবার থায়া

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম

বেলজিয়ামে ফেরার ভোড়া জাড় করছেন মাদার ম্যাথিল্ডা। কিছুদিন ধরে একটা আত্মজাতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল—সিঁকারি ইটচেনিসুয়ারির মত প্রবীণদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল '১৪-১৮'র দিনগুলোর স্মৃতি। মিউনিক চুক্তির পর সে সব উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এসে। মাদার ম্যাথিল্ডাকে এখন অল্প এক যুদ্ধের জ্ঞতা উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছে—দেশের কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাসটার সংগে লড়াই হবে, তাঁর নিমন্ত্ৰ রক্তটা পেরে উঠবে কি না সেটাই ভাবনা।

নানরা নানাভাবে তাঁর যাত্রার আয়োজন করে দিচ্ছেন। টিচাররা তাঁর জ্ঞতা শাস আর দস্তানা বুনছেন, তাঁর পশমের গাউন আর ব্যাপুলার হাওয়ার দিয়ে ইন্ড্রি করে দিচ্ছেন। নার্সরা ওষুধপত্র গুছিয়ে দিলেন—প্রচুর ক্যাফাইন রইল, জাহাজ ষ্টাটলটিকের ঠাণ্ডা শ্রোতে দিয়ে পড়বে বখন, তখন রক্তটা গরম করে নিতে পারেন যাতে।

সিঁকারি লুক কৃতজ্ঞ য় মাদার ম্যাথিল্ডার সঙ্গিনী হতে ডাক পড়ে নি তাঁর। কংগো তার রক্তে এমন ওষুধপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, সে এমন দেশে গিয়ে ছাটনাট একটা ছুটি কাটিয়ে আসার কল্পনাও করতে পারে না। বেলজিয়ামকে এখন আর তার ক্রমালখানার চেয়ে বড় লাগবে না দেখতে!

অজ্ঞাত মিশনারি সিঁকারির কথা মনে হয়—ভারতবর্ষে, সিংহলে, চীনে, আফ্রিকার অল্প অল্প মিশনে—মাদার ম্যাথিল্ডার জ্ঞতা তাঁর বা করছে তারাও সবাই ঠিক তাই করছে তাদের সুপরিষদের জ্ঞতা। প্রত্যেক কমিউনিটি তার সর্বাঙ্গিক যত্ন ভালবাসার সুপরিষদেরকে বিবেচনা করে।

মাদার চাইদের পথে প্রাক্তা-প্রবীণদের মিছিল দেখতে পাচ্ছে কল্পনার। দেখা সম্ভব নয় বটে, কিন্তু মিসসম্প্রদে বলা চলে চুলগুলো একেবারে সাদা ঠান্ডে-চাঁদপাশ দিয়ে দূরগত স্থানের বিচিত্র আবাস। ট্রপিকের সুপরিষদের ব্রিড্জকার বানামি মুখোদের মত সুখগুলো দেখে ইলঙ তার ইচ্ছা-চাঁদপাশ সুপরিষদের চমকে যাবেন সম্ভবত—ভঁরের ফাকাশ সাদা পাতার সংগে এত বেশি তফাৎ তাঁর। নভিসরা এই জ্ঞানের সমাবেশে মাদার পড় আউলের ওপর ভর দিয়ে চলাফেরা করবে। অবল আকাক্ষ্য স্বপ্ন দেখবে মিশনের জ্ঞতা উপযুক্ত নির্গাচিত হওয়ার দিনটাকে, সে যেমন দেখতে। এগারো বছর আগে। নিজেরই আবার লাগে ভাবতে।

তিন মাস থাকবেন না মাদার ম্যাথিল্ডা। এই তিন মাসের জ্ঞতা খুব সন্তর্ভাবে নিজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন তিনি। এ্যাকটিং সুপরিষদের হিসেবে কাজ করবেন তাঁর সেক্রেটারি সিঁকারি মারির-রোজ। সিঁকারি মনিক স্থলগুলোর পূর্ণ দায়িত্ব থাকবেন। সিঁকারি ইটচেনিসুয়ারির ওপর নার্সারির সব ভার রইল, সিঁকারি লুকর ওপর হাসপাতালের।

যাবার আগে তাদের ততোয়কে ছালাদা ছালাদা ডেকে নির্জনে শেষবার উপদেশ দিলেন।

সিঁকারি লুককে বললেন, তোমাকে এইমাত্র আমার বলবার কথা সিঁকারি, মায়াজন হারিও না বখনও। মনে রেখ, টিবি হওয়ার পরও একদিন রেহাই পাও নি তুমি। কিন্তু পাবে, ফিরে আসি আমি। যুদ্ধ হলে ডেজের ওপর রাখা একখানা চিঠিতে চাপড় দিলেন ধীরে ধীরে, একজন কোয়ালিফায়ড নার্স সংগে নিয়ে আসক সার্জারির

ভার নিতে। এর মধ্যে ভগবান করুন বিশেষ কোন সমস্যার মুখে পড়তে না হয় তোমার। আর তা যদি পড় সিঁকারি, বা করবে তার আগে ঈশ্বরের নির্দেশ প্রার্থনা করার কথা যেন কখনও ভুলো না।

পূর্ণ বিশ্বস্ত চোখে সিঁকারি লুক তাৎকাল তাঁর দিকে। সামনে বসে ছোটখাট মাথুখটি, তাঁর অদৃশ্য। কংগোর তার প্রথম দিন-গুলোর তাকে যে কত পরীক্ষার মধ্যে দেখেছেন তাঁর ঠিক নেই।

—কোন সমস্যা দেখা দেবে না মাই মাদার, এ আমি বিশ্বাস করি। প্রতিকূল ঘটনা বা ঘটবার তা ঘটেই গেছে। ঈশ্বর সদয় আমার ওপর, মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণা বা কিছু সব একসঙ্গে প্রথম ক'টা বছরেই দিয়ে শেষ কর দিয়েছেন এখন আপন গতিতে বাধা পড়ে গেছে সবকিছু, চাকার তালে ঘুরে যাচ্ছে দিনগুলো। প্রশান্ত হাসল একটু। আপনি ফিরতে ফিরতে মাই মাদার, মেটরনিটি এক্সটেনসানটা আমরা শেষ করে ফেলতে চেষ্টা করব।

মাদার ম্যাথিল্ডা চলে যাবার পর সে আর সিঁকারি অরেলি পালা করে মেটরনিটির নতুন রকের কাজ দেখল। মাদার ম্যাথিল্ডার অনেকদিনের স্বপ্ন এটা এবং তাঁর অল্পবয়স্কিত্তিতে নিজেরা ওদারক করে এটা শেষ করে আনার তৃপ্তি কম নয়। ইয়োরোপীয় কলোনীতে জন্মের হার ক্রমশই বাড়ছে, মেটরনিটির পুরোধা প্যাভেলিয়নে আর কুলোর না। এই এক্সটেনসানের প্রানটা মাসের পর মাস ঘুরছে গভনমেন্ট, ভিকার এ্যাপাটোলিক আর মাদার ম্যাথিল্ডার অফিস থেকে এদিকে। তার মধ্যে একমাত্র মাদার ম্যাথিল্ডাই জানেন মেটরনিটির কোথায় কি থাকা দরকার না দরকার। স্মরণ্যে বার বার সফল ঠেং প্রান সংশোধন করেছেন তিনি।

সমস্তটা বোশের কার্যামের ওপর উঠল বাড়িটা। অজ্ঞাতর আর নভেজর—এই দু'মাসেই বেশ চোখে পড়ার মত কাজ এগিয়েছে। ইটাশিয়ান বনুটাইর জংগল থেকে মজুরের কাজ করতে দেশীয় ছেলোদের আনিয়েছেন, নিজের দক্ষ রাক্তিমিত্রী আর ছুতোর মিত্রীর দলকে যোগান দেবে বলে। ভললোকের চোখে মাদার ম্যাথিল্ডা একজন সেন্ট—তিনি ফিরে আসার আগেই কাঙটা শেষ করে ফেলার পরিকল্পনাটা তাঁরও মনে ধরেছে স্মরণ্যে কাজ চলছে পুরোদমে।

জঙ্গল-ছেলেগুলো ভারা বেয়ে বাদদের মত ছুটোছুটি করে, বত্কণ কাজ করে গান গায় অবিরাম। আর সপ্তাহে একবার তাদের বোরা কনস্ট্রাকসন সাইটে বখন স্বামীদের রোজগারের ইয়োরোপীয় খাবার আর ইয়ার্ডের মাল গুছিয়ে নিয়ে যেতে তখন যেন জংগলটাকেই সংগে করে আনে ওরা। ঢাক-ঢোল আসে, জঙ্গল-ছেলেগুলোর থাকবার ব্যবস্থা যেখানে দেখানে নাট-গান চলে।

সিঁকারি অরেলির মনে দুর্জর লোভ ওদের ধর্মের পথ দেখাবে, গ্রীচান করবে। সিঁকারি লুককে একা পেলেই পরম বিশ্বাসভরে সোংসাং নিজের মনের আশার কথা শোনার তাকে।

—একটু যদি বেশি সময় দেওয়া যেত ওদের পেছনে—গ্রীচান করবার কত যে স্বযোগ রয়েছে!

বিজ্ঞিরের কাজ দেখাশোনা করতে আসে বখন সব সময়



আনন্দের

দিনে

উপভোগ্য

# কোলে

বিস্কুট, লাজস ও টফি



৩০/১২/৫৬



কোলে বিস্কুট কোং  
প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১

একটা কাঁক'-এর ব্যাগ নিয়ে আসে। এটাই নাকি ওর বড়নির টোপ। মাঝে মাঝেই একটা জ্বলী-ছেলে কাছে এসে দাঁড়ায় সলজ্জ—কাটা আঙুলে ব্যাগের বেধে দিতে হবে। কিংবা চোখে চুন-বালির গুড়ো পড়ে ফুলে উঠেছে, পরিষ্কার করে দিতে হবে। সিস্টার অরেলি শুধরা করার কীকে কীকে হাসতে হাসতে ঘরোয়া কিসুওয়াহিলিতে আলাপ করে তার সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি, তার গোষ্ঠী কি, কোন গাঁয়ে তার বাড়ি, ক'টি বোঁ তার, বড় মালিক কতগুলি পুত্র-কন্যার খনে খনবান করেছেন তাকে!

শুনতে শুনতে স্মিতমুখে বলে, এই যে তোমাদের বড় মালিক, আমার ঈশ্বরও তিনিই—...হ্যাঁ, হ্যাঁ...একবারে এক।

সাগিনীর এই কনভার্ট করার আগ্রহের ভাগ সিস্টার লুকও নেয়। তবে ওর মতে সময় থাকলে শিক্ষার মাধ্যমে কনভার্ট করতে চেষ্টা করত ওদের; জ্বলী-ছেলেগুলোর দিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়ে ওদের গায়ের তাবিজ আর ডুকৃতাকগুলোর দিকে—হাড়ের টুকরো, পাখির নখ, বুনো জন্তুর লোমের গোছা...ঐগুলোই ওদের বন্দী করে রাখে জাহুর আর ওবার কাছে। ওরাই ওদের ওপর রাজত্ব করে সারাজীবন—আনুভূত।

সিস্টার অরেলিকে তাই বলে, ওদের একটাকে অন্তত শেখাও কোড়টা কাঁতে আর বুঝতে পুঁজ পুঁজই—অণ্ড উপসর্গতা নয়। তা হলে আর কিছু করার দরকার হবে না, অন্ধকার থেকে সে আপনি আলাতে বেরিয়ে আসতে পারবে।

অন্তত একটা জ্বলী-ছেলের গলা থেকে ঐ সব বীভৎস তাবিজ-টাবিজের কিছুটা নিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা তার, আর সিস্টার অরেলির ইচ্ছা সময়ের অপচয় না করে ঈশ্বর ওদের কনভার্ট করার—জানত যদি কি হস্তবুদ্ধির আকস্মিকতায় তাদের দু'জনের ইচ্ছাই চিরিতার্থ হবে তা হলে সেই ক্ষণেই জ্বলী-ছেলেগুলোর দিকে তাকালেই যে ইচ্ছা প্রবলিত হয়ে ওঠে মনে, সেই বিপত্তিকর ইচ্ছাটাকেই সিস্টার লুক ভাবনা থেকে টেনে উপড়ে ফেলে দিত।

উৎসাহটা পেয়ে বসেছে। সারা নভেম্বর মাসটা তারা দু'জনে জ্বলী-ছেলেগুলোকে মেজে-ঘসে একই ভদ্রত্ব করবার চেষ্টা করল। গোপনে মতলব আঁততে লাগল ক্রিসমাস ইভের অজুঠানে তাদের চ্যাপসে বাবার লোভ দেখাবে। পরে শুনেছিল সিস্টার লুক, সেই একই সময়—সারা মাস ধরে জগলের একটা জাহুর এই ছেলেগুলোর একটাকে বলাছে সে যদি একটি দ্রোণীকে খুন করতে পারে—শেতকারা হলেই ভাল হয় খুব, তা হলে যে বোঁটা মরে বাবার পর তার প্রেতিনী তাদা কবে বেড়ছে তাকে, তার হাত থেকে সে চিরদিনের জন্ত রেহাই পাবে।

বড়দিনের আগের পনেরো দিন সিস্টার অরেলির নাইট ডিউটি ছিল মেটারনিটিতে। জ্বলী-ছেলোটা সেই সময় একদিন এল। নিজেই নিজের বড়ো আঙুলটা কেটেছে, রক্তাক্ত আঙুলটা উঁচু করে ধরে বন্ধ বন্ধের দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারতে লাগল। সিস্টার অরেলি তখন সবে নবজাতকদের তাদের মায়েরের কাছে হুধ খাওয়ারে এনেছে।

আপনারা আমাদের এক মিনিট ক্ষমা করেন যদি আমাদের

এগিয়ে গিয়ে প্রেসন্নহাস্তে দরজাটা খুলে সে।

ছ'জন মহিলা দেখেছিলেন প্রথম দৃষ্টটি। দরজা খোলায়ই বসতি থাকা দিয়ে চুকে পড়ল ওয়ার্ডের মধ্যে, হাতে তার শিশু দিকে লুকোনো একটা কাঠের মুগুরের মত...শাপলের মত এদিক-ওদিক চাইল, যেন বেছে নিতে পারছে না কোন খেতাজিনীর প্রাপ্তি ওর চাই—যাও বেড়ে আছে তাদের কারো, না কি ঐ পরিচিতা দীর্ঘাজিনী মেয়েটির—যার মুখের শুভ-পরিভ্রতা তার পোষাকে অবধি ছড়ানো।

হঠাৎ মুগুরটা তুলে ধরে সিস্টার অরেলির বাথার প্রচণ্ড আঘাত হানল সে।

প্রথম আঘাতেই দু' কীক হয়ে গেল মাথাটা, তবু কেমন করে যেন তখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি মা হুধ খাওয়ারছিল বাচ্চাকে, এ ভয়ঙ্কর দুঃখের পরও চেতনা ছিল তার—সে দেখল দূর শান্ত পায়ে জ্বলীটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সিস্টার অরেলি, এক পা এক পা করে বার করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ওয়ার্ড থেকে।

করিডর অবধি চলে গেছে যখন, জ্বলীটা আরও দু'বার আঘাত করল তাকে। সিস্টার অরেলি পড়ে গেল মাটিতে, আর তাকে দেখা গেল না। এবার সেই মহিলাটি তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

এমিল এসে যখন বহু দস্তাধস্তি করে সেই উন্মত্ত জ্বলীটাকে আন্তে আনল, তখনও সেই মহিলাটি চীংকার ব্বাছে এক নাগাড়ে, সিস্টার লুক যখন করিডর দিয়ে দৌড়ে এল তখনও।

একজন রোগীর বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন—এ ছাড়া প্রথমটায় কিছুই ধারণা করতে পারে নি সিস্টার লুক—যদিও দুঃস্বপ্নের মত দেখতে পেয়েছে দু'টে। কালোমুঁতি লড়াই শেষে দন ফুরিয়ে ইয়াজে, চকিতে এও দেখেছে ওপরের মূর্তিটা এমিলের। আরও কিছু দেখেছে। সিস্টার অরেলির নিশ্চল সাদা দেহটা পেরিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেয়েছে তার হেড-ব্যাণ্ডে রক্ত।

চীংকার থামাতে প্রথমেই মহিলাটিকে সিডেটিভ দিল অকম্পিত হাতে...হিস্টেরিয়ার চীংকার ভূবে যাচ্ছে ক্রমশ...।

—উনি মারা গেছেন তখন সিস্টার, লোকটার দিকে হেঁটে গেলেন যখন...সত্যি মারা গেছেন...তবু হাসছিলেন...হেঁটে যাছিলেন...।

সিস্টার অরেলি মারা যার নি মাদাম—মারা যার নি—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন এখন, সে মারা যার নি—

ওয়ার্ড থেকে চলে আসবার আগে এ্যাকুটিং সুপিরিররকে কোন করে ফোর্স পাবলিককে ডেকে পাঠাতে অনুমোদন জানাল। তারপর কাদের দরজাটা খুলে শান্তভাবে করিডরে এসে দাঁড়াল।

ততক্ষণে এমিলের কাছে সমস্ত নাইট-ডিউটির বয়রা এসে জড়ো হয়েছে। পাগলটাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে তার ওপর বসে আছে তারা, ভীত বিম্বায়িত দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ছে সিস্টার অরেলির দেহের ওপর।

ধর্মজীবনে এই দ্বিতীয়বার ইটু গেড়ে বসে একটি সিস্টারের উক কজিতে হাত দিল সিস্টার লুক। প্রাণের স্পন্দন তখন স্তব্ধ তাতে।

মুহুর্তেই এমিলকে ডাকল, সিস্টার অরেলিকে তুলে নিয়ে বেতে সাহায্য করবে।

কিন্তু এমিল নড়বার আগে বা নড়তে পারার আগে...দাদার

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

মাখিভা আর তিনজন ডেপুটি এসে গেলেন। সিঁটার মারিয়া-রোজ, সিঁটার মনিক আর সিঁটার ইউচারিসুসিয়া। সিঁটার অরেলিকে ট্রিটমেন্ট-কমে বসে নিয়ে গেলেন চারজন, টেবিলে শোয়ালেন। আকুটি অপিরিয়রের দিকে চেয়ে মাথা নাদুল সিঁটার লুক, তিনি তখনই প্রিন্ট ডাকতে চলে গেলেন।

গ্যাণ্ড সাইলেস অক্ষুণ্ণ রেখেই তাঁরা ফিউনারালের প্রথম পর্ষদের কাজগুলোকে করলেন—যে যেটা সবচেয়ে ভাল পারেন। আট বিভাগের সিঁটার মনিক ফাট ঠিক করে দিলেন, বিমর্ষিত কমফটার চাপ দিয়ে শামুকের খোলস আকৃতি ফিরিয়ে আনলেন। নাসারির সিঁটার ইউচারিসুসিয়া তার দুই হাত মুড়ে শিশুসুলভ বিধানের ভাগিয়ার বক্ষস্থ ত্রুশের ওপর হস্ত কলসেন। একটিমাত্র সুরু বস্ত্রের বেধা নেমে এসেছে মুখে সিঁটার লুক ভিজে তুলে দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দিল। নাসা-সুলভ স্ট্রোফে লক্ষ্য করেছে শুধু হেড-বাণ্ডটা মাথাটাকে বধাস্থান ধরে রেখেছে!

উত্তরকালে কথাটা মনে পড়ে বিচলিত হয়েছে বলবার।

ফানার স্ট্রিফেন শেষ অমুল্যপনের তেল নিয়ে এলেন, আর সিঁটার মারিয়া-রোজ প্রতিজ্ঞাপত্রের ছোট কাগজখানা তার যত্নকরের কাঁকে দিয়ে দিলেন, আমৃত্যু ঈশ্বরের অধুগত্য স্বীকারের শপথ তাকে। কঠোর বন্ধ সবার, ভাব-ভাগিতে চিন্তাশূণ্য আবিষ্টতা, ঐতল গহবরের কিনারা এসে স্বপ্নচাীর মত ইতস্তত করছে যেন।

সিঁটার মারিয়া-রোজের সঙ্গে জেগে রইল সিঁটার লুক। নতজাহ্ন হয়ে বসে একত্র বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রশান্ত স্থখানার দিকে, অপারাতমুত্তাও কোন বিকৃতি আনে নি সে মুখে।

বহুক্ষণ পরে সিঁটার মারিয়া-রোজ নীরবতা ভাঙ করলেন, অপিরিয়র হিসেবে এ আঁকার একমাত্র তাঁরই।

মুহুর্তে জিজ্ঞাসা করলেন, একেমন করে ঘটল সিঁটার লুক?

—আমি ঠিক জানি না। তবে সুনলাম বররা একটা ভাতুকরের কথা কি বলাবলি করছে। এমিল বলতে পারবে সব ঘটনাটা। আমরা সব আগে সেই মহিলাটিকে দেখতে হচ্ছিল।

থেকে গেল, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

এও কি সম্ভব যে সে রোগিণীটির পরিচয় করেছিল সব আগে!

খবরাখবরের ঢাকে ক্ষণমাত্র না থেমে ঘটনাটা এতক্ষণে সবিস্তারে জগলে পৌঁছে গেছে।

—আমি শুধু এইটুকু জানি সিঁটার, ঐ প্রচণ্ড আঘাতের পরও সেই জংলী-ছেলেটাকে ও ওয়ার্ড থেকে বার করে দিয়েছিল—

এইটুকু বলেই থামল।

তারপর সিঁটার অরেলিকে নীরব ভাষার বলল, আমি শুধু এইটুকু জানি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শ্মিত হেঁদেছিলে তুমি, ভেবেছিলে একট কনভার্ট গের্বে তুলছ বঁড়শিতে!—ওদের গ্রীশ্চান করবার লোভ আমাদের ছোট বোনটি আমার! ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বঁড়শির টোপ গের্বেছিলে তুমি সিঁটার, আমি অন্ত্রোপচারের ছুরি দিয়ে! বেওয়ারিশ ঐ আত্মাগুলোর দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম আমরা, কৃপণ যেমন করে বিশাল পরিমাণ ধন-মৌলভের দিকে তাকায়—মনে পড়ে? আর বড়দিনের সময় আমাদের গ্রীশ্চান বয়সের সঙ্গে ওদের চ্যাঙ্গেল নিয়ে বাবার জন্তে কি রকম

মতলব করেছিলাম!—মুখে না বলি, মনে মনে আশা করেছিলাম এই ভাবেই জয় করব ওদের, চোখে সেই আশার আলো ফুটত আমাদের—

টোট দুটো সিঁটার অরেলির রক্তাভ এখনও, জীবনের রং এখনও মিলেই নি। লাজুক মিষ্টি হাসিটুকু এখনও লেগে আছে, তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হ'ল টোট দুটো নড়ছে বুঝি, যে কথাগুলো বলবে সেগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে যেন।

কি বলবে ওরা? বসবে ওর স্বপ্নের কথা, ওর আকাঙ্ক্ষার কথা!—ঐ জংলী-ছেলেগুলোকে গ্রীশ্চান করবে ও।

...আর কোনদিন তাকাবে না তুমি, কোনদিন না। তোমার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে—ঐ নৃশংস আঘাতে। আমরা বুঝি নি আমাদের ঐ ছোট ছোট বঁড়শির টোপ দেখে খুশি হন নি প্রভু, তিনি চাইছিলেন একবারে বড় জাল ফেলি...

বেদনা-বিহ্বল অন্তরটা অসাড় হয়ে আছে, কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না। না হলে দেখতে পেত একেবারে বড় জাল ফেলাই যদি সত্যিই অতিশ্রোত ছিল বিধাতার তো সে জাল ফেলার কাজ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে গেছে—সিঁটার অরেলির চির-মুদ্রিত দুটি নয়নের দিকে চেয়েই দেখতে পেত।

সে দৃষ্টি নেই আপাতত, এখন শুধু তিস্ত অন্তর চীৎকার করে উঠছে ঐ উদ্ভ্রান্ত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে।

অমুবাদিকা—প্রগতি মুখোপাধ্যায়



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত  
'শঙ্খ ও গদ্য'

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৯২৫

# হৃদয় পাথ



( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

সুলেখা দাশগুপ্ত

ইন্দ্রনাথের নতুন ম্যানেজারের বাঙালী পোষাক দেখে শিবানী বিস্ময়বোধ করেছিল তখনই। এখন সে বুঝতে পারলো কেন ইন্দ্রনাথের মিশনারী স্কুল-কলেজে পড়া, ইংরেজী নকলে গড়া স্মৃতি, টাই, স্মি পরা ম্যানেজারের জারজার এমন ধুতি-পাঞ্জাবী-চম্পল পামে দেওয়া ম্যানেজার রাখতেও মন উঠেছে! লোকটা চতুর—এ কথা ইন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছে বলেই পোষাকের এমন অকৌলীল্য মেনে নিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পূর্বেও জয়ের আনন্দ বোধ করেছিল শিবানী। ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে জানতে চাওয়ার যে লোক বলেছিল, 'তা হয় না'—সেই লোককে শুধু ইন্দ্রনাথ কোথায় আছে বলা নয়, সে যেখানে আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে শিবানী—মনে হয়েছিল লোকটাকে দিয়ে এটা না করাতে পারলে ওর সম্মানকে কেওড়াডালার শ্রদধানযাত্রায় পাঠাতে হতো। লোকটার ঐ জবাবের পর—ও যদি ঘরে গিয়ে ঢুকত তবে মর্মান্দার কি কিছু অবশিষ্ট থাকত—কি এর কাছে, কি বাড়ির লোকগুলির কাছে। এখন ইন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে কি হবে না হবে, কি ঘটবে না ঘটবে সে এখন বোঝা বাবে। ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে হয় সে বেরিয়ে যাবে ওকে দেখে, নয়ত ইন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবে ওকে নিয়ে। তারপর বোঝাপড়া ওদের মধ্যে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

কি বোঝাপড়া করত শিবানী ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ?

জানে না—শিবানী জানে না। শিবানী ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আগে অনেক কল্পনা করেছে। প্রথম প্রথম করেছি প্রেমের। তারপর রাগের, দুঃখের, কোভের, যগড়ার। কিন্তু এত কল্পনার ভেতরও এ কল্পনা তাঁর মনে কোনদিনও উৎসাহ হয় নি যে, ইন্দ্রনাথের শিছু তাড়া করে ছুটছে সে! ভাবতেও পারত না সে কথা। স্বপ্ন দেখলেও শিউবে উঠত যুগায়।

কিন্তু এমনিই হয়—

সবার না হোক, এমন জীবন আছে, যা সে কল্পনা করতে পারে না। ভারতে পারে না, স্বপ্নে দেখতেও যুগা বোধ করে, ঘটনা তাকে কেবল সে-সবের ভেতরই নিয়ে ফেলে। শিবানী জানে তার অদৃষ্টটা সেই রকম। নইলে যে কৃটিগহিত কাজ সে কল্পনা করতে পারে না তাই করছিল—তাও একা নয়। একজন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে জোর করে টেনে সঙ্গে নিয়ে। যেন এ লোকটার যে কৃটিবোধ আছে, ওর সেটুকুও নেই। যেন এই যে লোকটা বুঝছে এ ভাবে গিয়ে উপস্থিত হওয়াটা নিতান্ত কৃষ্টিচর পরিচয়—শিবানীর সে বোধটুকুও নেই। এমনি নিয় মানের মেয়ে ও।

কিন্তু শিবানী এও তো মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছিল। লোকটা তাও হতে দিল না।

নিজে উঁচুতে উঠল না, ওকে উঁচুতে তুলল লোকটা ওকে ইন্দ্রনাথের কাছে না নিয়ে গিয়ে।

না, এসব কিছু নয়। উঁচু-নীচু স্মৃতি-কৃষ্টি—কিছু নয়। এগুলি হলো এসব লোকের মোসাহেবি। চাটুভূতি আর চাকরি বজায় রাখা। হাঁটুর উপর তোলা আঁট হাত কাপড় পরা, ফতুয়া গায়ের সরকার হলে, হাত কচলে ইনিমের-বিনিমে কৈলেক-কিয়ে দয়া প্রার্থনা করে শিবানীর হাত থেকে অস্বাভাবিক লাভ করত। পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের ধুতি আর হাঁটু-কোলানো পাঞ্জাবী-পরা ম্যানেজার বলে সে কাজটাই চতুরতার সঙ্গে করলো।

একটু নড়েচড়ে বসল শিবানী, সোফায়।

যদিও ললিতা এইমাত্র শিবানীর সম্মুখটাকে রমণীয় বলতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাটাকেও রমণীয় বলেছে, কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা একেবারেই রম্য ছিল না। একটু হাওয়া নেই। গাছপালা এমন নিখর নিশ্চল যে, সেদিকে তাকালে আকাশটাকেও মনে হয় যেন জমাট বেঁধে আছে। পাখার তলায় বসেও শিবানীর কপালে বিন্দু বিন্দু বাষ্প জমে উঠছিল। অস্তমনস্ক হাতে ব্যাগ খুলল শিবানী

## হৃদয় পাঠো

কমালের জন্ম। কোলের উপর সোফার পাশে হাতড়ালো। না পেয়ে মনে পড়ল, সে বেকারের জন্ম নেমে আসে নি, নেমে এসেছিল ভেতরের অস্থিরে স্থির থাকতে না। পেয়ে। কোন বিষয়েই সে প্রস্তুত ছিল না। না লোকটার সঙ্গে এ ভাবে জড়িয়ে বাওয়ার জন্ম—না তার সঙ্গে বেকারের জন্ম।

কপালের ঘাম হাতে লাগায় কমালের কথা মনে হয়েছিল, না পেয়ে তুলে গেল শিবানী কমালের প্রয়োজনের কথা। মনে মনে যতই গাল দিক শিবানী লোকটাকে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পরা—সরকারের সঙ্গে এক করে, কিন্তু তাতে শাস্ত হতে পারল না। মনের গালিতে মনের আলো নিরসন হয় না।

আর হার হারই।

অপরকে তুলে বোঝান সহজ, কিন্তু নিজেকে তুলে বোঝান সহজ নয়।

সে পরাক্রান্ত হয়েছে লোকটার কাছে।

অহংকার দিয়ে সম্মান বাঁচাতে গিয়ে অসম্মানের অতল তলার তলিয়ে গেছে সে।

না, মাথা তোলাই আর উপায় নেই।

ও গিয়ে এখন গাড়িতে উঠবে। লোকটা গাড়ি চালাবে। বাড়ির সিঁড়ি-বারান্দায় নিয়ে গাড়ি দাঁড় করাবে। ও নেমে উপরে চলে যাবে?

সম্ভব?

অসম্ভব! ভেতরের অসহ্য ছটকটানিতে শিবানী উঠে দাঁড়াল। তারপরই আবার বসে পড়ল।

তবে কি করবে?

ও চাকর দিয়ে বলে পাঠাতে পারে অরুণকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে। তারপর ও যে করে হোক যাবে—হোক ট্যাক্সিতে। হোক ট্রামে-বাসে।

আরো হান্সকর। আরো পরাজয়। আউট হাউসের উপর-তলায় ইন্দ্রনাথের পি-এর ঘর। সেখান থেকে সমস্ত লন বাগান গাড়িব্যবস্থা দেখা যায়। অরুণ সেখান থেকে দেখবে, সে ট্যাক্সি থেকে নামছে? নতুন হেঁটে লন পার হচ্ছে? তার মানেটা কি দাঁড়াবে? রাগ করে ও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে! হ্যাঁ রাগ। চটে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিতে হলে চাকর দিয়ে বলে পাঠানো যায়। ওকে দিয়ে তুণ-কণ্ঠে বলতে হয়, চলে যান আপনি গাড়ি নিয়ে এখান থেকে। তাই আদেশ করবে গিয়ে সে অরুণকে। সোফার হাতের চাপ দিয়ে উঠতে গিয়েও উঠল না শিবানী।

না, বসে থাক।

কথায় বলে, একা রামে রক্ষা নেই স্ত্রীর দোসর। একা ইন্দ্রনাথেই রক্ষা ছিল না তাতে এমন অমুচর মিলেছে তার। আর ইন্দ্রনাথকে পায় কে।

ইন্দ্রনাথকে পাওয়ার চেষ্টা কি ও করত? করত না। অনেক দিন ধরে তার প্রতীক্ষা করা শিবানী ছেড়ে দিয়েছিল। ওর বিবাহিত জীবনের এই পাঁচ বছরের ভেতর প্রথম দু'বছর প্রতীক্ষা করেছে শিবানী প্রেমের সঙ্গে, আকুলতার সঙ্গে। তারপর কিছুদিন করেছে ঘৈণের সঙ্গে। তারপর এই তিন বছর ধরে আর করে না। এক

সময়ের মুহূর্ত গোপা দ্বী আজ আর খোঁজাও করত না কতদিন চলে যাচ্ছে বিনা সাক্ষাতে। কিন্তু আবার প্রতীক্ষা করতে আরম্ভ করেছিল শিবানী। যদিও সে ইন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, নির্ভরও হচ্ছিল না। তবু—তবু বড় গাঢ় এবং গভীর অনুরাগ ফের এসে গিয়েছিল শিবানীর সে প্রতীক্ষায়—। ইন্দ্রনাথের ভেতর একটা আকর্ষণী-শক্তি আছে বলেই না শিবানী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাকে ভালোবেসেছিল। বিয়ে করেছিল। যখন ইন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে যার তখন তার করবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন ইন্দ্রনাথ তাকে কাছে টানে তখন—

বন্ধু...

মেয়ের উপর একগোছা চাবি পড়ার শব্দে একটু চমকেই পায়ের কিউটেজ মাথা নাথার উপর থেকে চোখ তুলে শিবানী।

শিবানীকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতো দেখে মেয়ে থেকে চাবির গোছা তুলে নিয়ে অপরাধী মুখে ললিতা বলল, সিরি!

সরি কেন?

তোমাকে জাগিয়ে দিলাম।

আমি ঘুমোচ্ছিলাম।

ঘুম থেকে নয়। চিন্তা থেকে।

চাবির গোছা হাতে ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে এসে সোফার বসল ললিতা। বলল, এর ভেতর আরো তিনবার ঘুরে গেছি।

সত্যি! তবে সরি তুমি বলছ কেন, সরি বলব তো আমি।

ললিতা একটা ক্রমাল বাড়িয়ে ধরল।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, এটা কি?

ক্রমাল—

আচ্ছা! বলে তে, উঠে হাত বাড়িয়ে ক্রমাল নিল শিবানী। কপালের ঘাম ক্রমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, ক্রমাল যখন গিয়ে নিয়ে এসেছ, তখন বিনবার না হোক একবার যে অন্তত ঘুরে গেছ—আমি টের পাই নি তা সত্যি।

না, তিনবার। যদি দেখো। সাতটায় এসেছ। এখন প্রায় আটটা। তোমাকে বসিয়ে রেখে যাঁবে আর এক ঘণ্টার ভেতর বার তিনেক ঘুরে যাবে না! চা নিয়ে এসেছিল। তাও ফিরিয়ে দিয়েছি। এবার দিতে বলি। ললিতা উঠে গিয়ে চা দিতে বলে এলো।

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা বৌদিরা বাড়ি নেই বুঝি?

বৌদি বাড়ি নেই। মা আছে। কিন্তু পাশের বাড়ির গিন্নী এসেছেন। খুব জমিয়ে দু'জনে গল্প করছেন সেখানাম। তাই আর ডাকলাম না। ওদের জমটি গল্প নষ্ট হবে—আমাদেরও মাকে মাঝে নিয়ে গল্প জমবে! চলে এলাম।

চা-খাবার নিয়ে এলে ললিতা চাকরকে খাবার সময় বলে দিল, ডাইভারকে চা খাবার নিয়ে গাড়িতে দিয়ে আসিস মাধু।

শিবানী মুখ খুলতে গিয়েও মুখ শক্ত করে ফেলল। একটাবাদে বলল, চা-খাবার কেন জানলে—

যাবে না?

ইচ্ছে করছে না।

চা-টা?

তাও নাক?

তবে থাক।

আচ্ছা, কেবল চাটী দাও। সোফা থেকে শরীর তুলে হাত বাড়াল শিবানী।

ললিতা ওর হাতে কাপ তুলে দিয়ে বলল, যে'গাধোগের কুমুর একটা ছবিকে নবীন বলেছিল, এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে'দুর্লভ লগে ওর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই ভূত যোগটি উই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। আজ তোমাকে ঘরে ঘরে দেখে থাকিলাম আর আমার মনে হচ্ছিল, লক্ষ্মীর প্রসাদ নয় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। একটা বিদ্বান-খেলানো তলোয়ারের কপ তোমাব মুখের ওপর ঘোলাবে স্থির হয়ে আছে, এমন দৈবাৎ দেখা যায়। তুমি নাকি বাঁশরি নাটকে বাঁশরির পাট করেছিলে। আজ যদি তোমার সেই অভিনয়ের দিন হতো তবে তুমি অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করতে।

চায়ে চুমুক দিচ্ছে দিতে থুব মনোযোগ দিয়ে ললিতার কথা শুনছিল শিবানী। সে কথা শেষ করতেই হাতের কাপ টেবিল নামিয়ে রেখে বলল, অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের প্রতি আমার এতটুকু লোভ নেই ললিতা। অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কেউ পাচ্ছে শুনলে আমার হাসি পায়। আমার ধারণা এতবড় কাকির পুরস্কার আর দ্বিতীয় নেই।

কেন! বিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল ললিতা।

প্রতিটি মানুষ নিপুণ অভিনেতা। প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অনিপুণ অভিনয় করে চলেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নয় কে? তুমি, আমি, ও, এ সে সবাই—সবাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এর ভেতর কেউ যখন কার্বল ছবিতে বা থিয়েটারে অভিনয় করে পুরস্কার পায়, তখন আমার হাসি পায়।

তুমি কিন্তু আজ ভিনয়ে উত্তরোত্তে পারো নি।

আমি অভিনয় করি নি। তুমি না হয়ে যদি তোমার বাড়ির আর কেউ বেরিয়ে আসতেন, তবে আমি নিশ্চয়ই অভিনয় করতাম এবং সে অভিনয়ে তুলে ধরার সাধ্য তোমাদের রথ-মহারথী পরিচালকদেরও থাকত না। তারপর হঠাৎ ছাদের দিকে চোখ তুলে শিবানী হেসে বলল, নাচের বিহাসে এখনও হচ্ছে? অভিনেতৃবৃন্দ ব্রাহ্ম হচ্ছ না?

এর মধ্যে একবার বিশ্রাম আর অন্তর্বির্তী খাওয়া হয়ে গেছে।

মাধু চায়ের কাপ-ডিস নিতে এসে ক্রিকেট খাচ্ছিল খাওয়া হয় নি দেখে। ললিতা ডেকে বলল, সব তুলে নিয়ে যা। খাবেন না। ডাইভারকে চা-খাবার দিয়েছিল তো?

মাধু জানাল, দিয়েছিল সে, কিন্তু সে খায় নি কিছু।

আচ্ছা যা।

মাধু ডিস-কাপ তুলে নিয়ে চলে গেল।

জ্যোদীশ্বর চাটী যেন জানালার কাছাকাছি প্রায় এসে গাড়িয়েছিল। যদি ঘরে আলো না থাকত তবে ঘরটা জ্যোদীশ্বর ভরে যেত। বাইরে বোধ হয় হাওয়া ছেড়েছে। জানালার পর্দাটা আগের চাইতে অনেক বেশি উড়ছে। একদৃশ ঘরের বাতাসে এতটা উড়ছিল না। বাড়ি যেতে হলেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে—হাই বোধ হয় শিবানী উঠতে পারছিল না। নইলে তার এখন সত্যি কথা বলতে হচ্ছে কমছিল না। ললিতার সঙ্গেও না।

ললিতা বুঝতে পারছিল তাই সে চুপ করেই রইল।

একদৃশকণ বাদে শিবানী বললো, যা, এমন চুপ যে।

কেবল কথা বলতে হবে তার কি মনে আছে।

...তোমার খবর বল। সোফার পিঠে রেখে এবটু গা ছেড়ে বসল শিবানী।

আমার খবর—সহিত' একটু ভাল হল। তারপর চোঁটি উল্টে বললো, কিস্টু নেই।

একেবারেই কিছু নেই।

না একেবারেই নেই। এ মাসে একদিন হোলো'খাই নি। একটা ছবি দেখি নি। একখান নতুন গহনা গড়াই নি। একটা শাড়ি কিনি নি—

খবরের জগৎ তবে তো সত্যি শূণ্য দেখছি। বলে একটু হাসল শিবানী। কিন্তু তার মুখের হাসির সঙ্গে যে তার অন্তরের যোগ ঘটল না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ললিতা চাবিব গোছা কোমরে গুঁজে উঠে গাড়িয়ে বললো, অভিনয়ে কিন্তু উত্তরোত্তে পারলে না শিবানীদি। ওবার বলেছিলে, অভিনয় কর নি। এবার আর তা বলতে পারছ না! যত সহজ বলছ, তুচ্ছ বলছ, অভিনয় তত সহজ নয়।

অভিনয় সহজ তো আমি বলি নি। আমি বলেছি, প্রতিটি মানুষ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। আমরা প্রতিটি মানুষ দিনরাত যে অণুপুণ অভিনয় করে চলেছি তার কাছে সিনেমা নাটকের অভিনয়—তার আবার পুরস্কার। বক্তা পরিহাস করছে। তার পরিহাস তো মাঠে মারা যায় নি, আমার হাসি এটুকুই বলতে চেয়েছে তার চাইতে বেশি বলতে চায় নি। যদি চাইত তবে পারত। কিন্তু তুমি গাড়িয়ে?

চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

কেন, তুমি আমাকে পৌছে দিতে যাবে কেন? তুমি ভাবছ আমি মারামারি কাটাকাটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি?

না। কাটাকাটি করলে জামাকাপড় রক্ত থাকত। তা আমি পৌছে না দি না দিলাম। চলো গঙ্গার পাড়টা এবটু গাড়িতে চকর খাইয়ে তুমি আমার পৌছে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। অসচ্ছ লাগছে ঘরের মধ্য।

শিবানীকে তবু উঠতে না দেখে ললিতা ছেলেমাধুগি আদ্যে গলার বললো, কই উঠছ না শিবানীদি। ওঠ না। তারপর এগিয়ে এসে শিবানীর হাত ধরে টেনে বললো, এমনিতেই আজকাল শরীর নিয়ে হাঁসফাঁস করি। তাতে আজকের গরম যেন দমবন্ধ করে আমাকে। একটু বাইরের হাওয়ার ঘূর্ণিয়ে নিয়ে এসো না বাপু।

শিবানীকে উঠতে হলো।

আজ তার কপালে যেন কোন কাজ মন্থভাবে হবে না। ডাইভারের বদলে অক্ষয় তার গাড়ি চালাচ্ছে—এটা স্বাভাবিক নয়। অক্ষয় যখন ললিতাদের বাড়ি চেনে তখন ললিতাও হয়তো তাকে চেনে—কিংবা হয়তো চেনে না—এ কথাটা বড় নয়। সব চাইতে বড় কথা যেটা, সেটা হলো ললিতার বিশ্বাস লাগবে, ডাইভারকে চা খাবার গাড়িতে দিয়ে আসবার নির্দেশ তো সে ওর কাছে বসেই দিয়েছে। একে যে চা গাড়িতে এনে দেওয়া যায় না একথা কেন শিবানী ওকে বলে নি।

## আয় তোরা আয়

ললিতা তো বুঝবে না অবজ্ঞা উপেক্ষা দিয়ে মাথা উঁচু রাখা ছাড়া ওর আর মাথা উঁচু রাখার কোন উপায় নেই।

যাক্ গে—ওদিক থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে ফেলল শিবানী। ললিতা বৃদ্ধিমতী মেয়ে। সে কোন রকম অস্বস্তিজনক অবস্থায় ফেলবে না। ললিতার সঙ্গে চলতে চলতে বললো, এমনিতেই ঠাসকাঁস করে মানো?

শরীর ভালো নেই।

কি হয়েছে?

এই—কিছু নয়।

এই বললে শরীর ভালো নেই। আবার বলছ কিছ?—ললিতার দিকে তাকালো শিবানী, ব্যস্ত হবে?

খোঁজ করো কিছু?

আজ্ঞা! এত বড় খবর রয়েছে আর বলছিলে খবর নেই। তাই মার কাছে এতদিন ধরে রয়েছ।

ফের তাকালো সে ভালো করে ললিতার দিকে। বললো, বেশ তো বোকা যায়, আমারই বোকা উচিত ছিল।

তাকালে তো বুঝবে। তুমি কি তাকাতো আমাদের দিকে।

হাসল শিবানী। তাকাই নে বৃদ্ধি! তা ক'মাস হলো।

ছ'।

এতদিন! এ'পন্থ তুমি বল নি। কেউ বলে নি? কি অজ্ঞান!

কেন বলবো? কোন আগ্রহ আছে তোমাদের আমাদের সম্বন্ধে। আমি ছুটে ছুটে যাই বলে তবু আমার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক আছে—বলেই ঠোঁট ভাঙা করল ললিতা, বললো, তাও ভারি। জন্মদিনে নেমন্তন্ন করলাম এলে না পন্থ। সেদিন গিয়ে অফিস থেকে ধরে নিয়ে এলাম—বসল'না পন্থ।

আজ?

আজ তুমি এসেছ কি আর কেউ তোমাকে আচমকা ছেড়ে দিয়েছে আমাদের দরজায়, বুঝলে পারছি নে। তবে আমি যে তোমাকে অনেকটা সময় পেলাম—তা ঠিক।

গাড়ির গম্ভিতে পিঠ রেখে সিগারেটের পর সিগারেট টানছিল অরুণ আর গরমে ঘামছিল। ওদের দেখে সোজা হয়ে স্কিয়ারিং ধরে বসল।

গাড়ির দরজা খুলে ললিতাকে ওঠাল তারপর নিজে উঠে বসপাশে গাড়ির দরজা বন্ধ করে শিবানী কঠিন কণ্ঠে আদেশ করল, রেড রোড ধরে গঙ্গার ধারে বান।

পুরো কথাটায় বাংলায় বলার জ্ঞান তো বটেই শিবানীর গলার অহেতুক কাঠিন্দ্রও আশ্চর্য হয়ে ললিতা ড্রাইভারের আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির দিকে তাকাল। অরুণকে সে কালকেই প্রথম দেখেছে কালীনাথকে নামিয়ে দিতে এলে। যদিও অরুণ গাড়ি চালাচ্ছিল না। ড্রাইভারই গাড়ি চালাচ্ছিল। সে গাড়িতে ছিল। কালীনাথের কাছে কালই জেনেছি এই ছেলেকে ইন্দ্রনাথের নতুন পি-এ। আজকের পুরো ব্যাপারটাই ললিতার এতো বোধের বাইরে লাগছে যে, সে একেবারে চূপ করে গেল।

বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ভবানীপুর পড়ল তারপর চৌরঙ্গী পার হয়ে অরুণ শিবানীর নির্দেশ অনুসারে রেড রোডে পড়ল। রেড রোডে পড়ে বাড়ির বেগে গাড়ি ছেড়ে দিল অরুণ।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ বসে রইল ছ'জন। ললিতা মুখের উপর উদ্ভূত চুলগুলি হু'হাতে চেপে ধরে বসে রইল। শিবানী তা-ও করলো না। তার খোয়ালও নেই যে, মুখের উপর চুলগুলি অসহ্য নাটোনাটি করছে।

ললিতাকে পৌছে দিয়ে শিবানী যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। গাড়ি-বারান্দার গাড়ি থামতেই দরজা খুলে নেমে পড়ল শিবানী। আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন—তেমনি কঠিন স্বরে অরুণকে আদেশ করে বসবার ঘরে এসে চুকল সে। চুক ঘরের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল। ঘরটার চারদিকে না বলে বাড়ির আবহাওয়াটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আনল বললে ঠিক হয়। যেন নিশ্চল বাড়ি। গাছের পাতাগুলির মতো স্থির হয়ে আছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

[ক্রমশঃ]

## আয় তোরা আয়

(গান)

উইলিয়ম শেক্সপিয়ার-এর 'জ্যাক ইউ লাইক ইট' নাটকের 'Under the greenwood tree' গানটির অনুবাদ।]

গামল গাছের মধুর ছায়ায়  
আরামেতে শুয়ে থাকতে কে চায়  
আমার পাশে পরমাখ্যাসে  
বল না রে ভাই বল না আমার ॥  
হেথায় শুয়ে আজ দুপুরে  
মিলিয়ে গলা পাখির-সুরে  
গাইবি কে গান আর আয় আয় ॥  
ঝড় বাদল আর শীতটি ছাড়া  
অল্প অল্পের পারি নে সাড়া  
সবুজ ঘাসে আমার পাশে  
থাকবি শুয়ে আয় তোরা আয় ॥

চাও নাকো হতে-হোমরা-চোমরা  
তেমন মানুষ কে আছে তোমরা  
বাঁহা বাঁচার খোলা আলো-হাওয়ার ॥  
অতি সাদাসিংহ জীবনযাপন  
ছোটবড় সবে ভাবিয়া আপন  
বিচিতে কে চাস চিন্তাইনতার ॥  
ঝড় বাদল আর শীতটি ছাড়া  
কোন শত্রুর পারি নে সাড়া  
নরম ঘাসে পরমাখ্যাসে  
থাকবি শুয়ে আয় তোরা আয় ॥

অনুবাদক—মল্লিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# জন্মদিন



## জুল্ফিকার

### এক

১০ই পৌষ সোমবার—শীলার জন্মদিন। দীপঙ্করের পিসতুতো বোন শীলা। বছর পাঁচেক হল ওর বাবা শিলং থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছেন।

এই পাঁচবছর ধরে দীপঙ্কর শীলাকে তার জন্মদিনে উপহার দিয়ে আসছে। প্রতিবারই উপহার পেয়ে শীলা খুশি হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, টেক্সট আছে দীপুদার!

বিশেষ দামী হয়ত নয়, কিন্তু জিনিসগুলো বাস্তবিকই চমৎকার।

কোথা থেকে জোগাড় করে এগুলো দীপুদা,—ভেবেই পায় না শীলা। আরবছর পেয়েছিল ক্রামরঙের একটা ফাউন্টেন পেন। তার স্লিপটা ছাই-ছাই রঙের মিনে-করা সাপের আকারের—ঈষৎ এঁকো-বঁকে নেমে গেছে লেজটা, কণাটা কলমের মাথার দিকে। হু'পশে ছোট ছোটো লাল পাখরের চোখ, অঙ্গুল করে ওঠে আলো গলে।

দোকান দোকান ঘুরে জিনিস দেখে বেড়ানো দাপঙ্করের একটা নেশা। যত নতুন ও অদ্ভুত টায়ের জিনিস বাজারে বেরোয়—তাদের খোঁজ ওর মত কেউ রাখে না।...

শীলার জন্মদিনের উপহার কিনবার জন্যে দীপঙ্কর গোটা বিবিরটা ঘোরাঘুরি করে ফিরল। মাসের আজ ছাব্বিশে, তা' ছাড়া ছোট ভাইয়ের পরীক্ষার ফিস্ট দিতে হয়েছে এ মাসে। হাত কাঁকা বললেই হয়। বরো, তের, মেঝে-কেটে পনের,—তারই মধ্যে বা হোক করে সারতে হবে। সে রকম যদি কিছু নাই পাওয়া যায়, অগত্যা নীচের ভাল দেখে একটা ফুলের তোড়াই নিয়ে যাবে। হলদে গোলাপের গারে হু'-একটি চন্দ্রমল্লিকা, মাঝে মাঝে নীল এক-আধটা কন রাওগার,—মন্দ দেখাবে না কবিনেশনটা। ফুলের দোকানে বললে তারাই তোড়া বেঁধে দেয়।

ভাবতে ভাবতে দীপঙ্কর নিউমার্কেটের যে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার মালিক ওকে ভালভাবেই চেনে। অনেকবার তার দোকান থেকে টুকটাকি জিনিস কিনেছে। দীপঙ্করকে দেখে লোকটা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়।

‘আমুন স্তার, একটা নতুন জিনিস রেখেছি আপনার জন্যে।’

বঁ-হাতি ব্যাকটার পিছন দিক থেকে একটা কাগজের বাস্ক এনে খুলে বার করল একটা কাঠের কাষেট। ডালার উপর চমৎকার একটা ছবি, ল্যাকার ভানিশে আঁকা। ফিকে নীল, সবুজ, মড, কালো আর সাদা,—জায়গায় জায়গায় ঘোর লালের স্পর্শ।

আপাতদৃষ্টিতে এর সুন্দর কলাইনৈপুণ্য সবার চোখে ধরা পড়বার কথা নয়। একটু নিবন্ধভাবে দেখলে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! দীপঙ্কর মুগ্ধবিশ্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে। করেকজনা শিল্পী-বন্ধুর সঙ্গে জানাশোনা থাকার, জীবনে অনেক ভাল ছবি দেখবার সুযোগ হয়েছে তার।...-নিজের সে ছবি একে থাকে।...এটা সত্যিই একটা অনন্য সৃষ্টি। সম্ভবত কোন দক্ষিণী-শিল্পীর কাজ। অজ্ঞাত এই শিল্পীর উদ্দেশ্য মনে মনে প্রজ্ঞা জানার দীপঙ্কর।

একটা পৌরাণিক কাহিনীর আলেখ্য। বোধ হয় কচ ও দেবদানীর ছবি। বঙ্গ-পরা, পুঁথি-হাতে এক স্তম্ভমার বিস্তার্তা—মুখে-চোখে এক অপার্থিব কমলারতা। সমুখে দাঁড়িয়ে মুগ্ধকুন্তলা, আরতলোচনা, ক্ষীণ-মধ্যা এক তাপস-বালিকা।

বুকের কাছে হু'হাতে পরম স্নেহ ধরে আছে একটা মুগশিশু। মাথার উপর আনত শাখার ফুলছে পুঁপিত বনলতা। নীচে তুণের শামল আশ্রয়ণ। মেয়েটির ওষ্ঠ-লব্ধ হাসিটি ভারি হৃদয়ের ছুটিয়ে তোলা হয়েছে...

দোকানীর কথার দীপঙ্করের চমক ভাঙে।

‘নিরে বান স্তার, নাম খুব বেশি নয়, মাত্র সাতচল্লিশ টাকা।’

হাতে টাকা থাকলে দীপঙ্কর জিনিসটা নির্ধাত কিনত।



## জন্মদিন

ওকে চুপ থাকতে দেখে দোকানদার আশ্বাস দিয়ে বলে, 'টাকার জঙ্ক ভাববেন না। না হয় আসছে মাসে দেবেন। পছন্দ যখন হয়েছ নিজেই যান।'

ধায়ে জিনিস কেনা দীপঙ্করের স্বভাব-বিশুদ্ধ।

একটু মান হেসে উত্তর দেয়, 'কৌটোটা সত্যিই খুব ভাল লেগেছে আমার। রেখে দিতে পারবেন না কয়েকটা দিন? পরে নেব।'

'আপনি যখন বলছেন, না হয় আসতে আসি। পুরোই রেখে দেব।'  
—বলল দোকানদার।

দীপঙ্কর ভাবল—আসছে মাসে জিনিসটা কিনেই ফেলবে গোটা-পঞ্চাশেক টাকা ধার করে।

## দুই

মার্কেট থেকে বেরিয়ে থানিকদূর এগুতেই দেখে, ফুটপাথর কোল ঘেঁষে দামী একখানা লিমুজিন; তারই পাশে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ কলেজ-সহপাঠীরা শ্রোতাভ্যাস—সুশী মিতার একজন অবাঙালী স্যুট-পরা ভক্তলোকের সঙ্গে কথা বলছে।

বহুদিন বাদে দেখা।

কলেজ ছাড়ার পর মাত্র দু'বার ওর সাথে দেখা হয়েছে, দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে—একদিন সকালে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, আর একদিন লাইট-হাউস সিনেমার সামনে রাত সাড়ে আটটার সময়। শেষবার দেখা হবার পরও তিন বছর হতে চলল।

দীপঙ্করকে দেখতে পেয়ে সুশী এগিয়ে এসে, 'ইজ ত্রাট ইউ দীপ, ওল্ড বয়? ওয়েল, হাউ গোল্ড ড ওয়ান্ড' উইথ ইউ? উই মট আফটার এ্যানু এজ ১০-এসো, আলোপ করিয়ে দি।'

টানতে টানতে দীপঙ্করকে সেই স্যুট-পরা ভক্তলোকের কাছে নিয়ে যায়।

'হি ইজ এন্সি ডি—সুকদেব বাজাজ। বাজাজ এয়ার ওয়েজের নাম শুনেছ নিশ্চয়, আর রাজস্থান মেশিন টুলসের ১০-সেই বাজাজ বাড়ির ছেলে। ফিল্ম লাইনে আছেন, হলিউড-ফ্রেঞ্চ। ডিভেলপার হিসাবে বাজারে নামও করেছেন। ওঁর লেটেস্ট ফিল্ম 'দিমাগ' হাজ কজড এ সেনসেশান। আমাকে ওঁর নতুন ফিল্মে হিরোইন সাজতে বলছেন ১০-সিনেমার নামল অনেক আগেই নামতে পারতুম। আই হেট ইউ থিঙ্ক অব স্ট্যান্ডিং ইন এ স্ট্যাফি রুম ফর আওয়ার টুগেদার, আওয়ার দি ব্লাইণ্ড মেয়ার অব ল্যান্ডস্কাপ টু আটার সাম সিটি এ্যান্ড সপি ডায়ালগ ১০-এ্যান্ড মি: বাজাজ দিস ইজ মাই ওল্ড ফ্রেন্ড এ্যান্ড ক্লাশ মেট। দীপঙ্কর ঘোষ ডি. ফিল্ম,—এ মান অব ফাইন আর্টিস্টিক টেক্সট এ্যান্ড টেম্পোরারিমেট। চমৎকার বার্শ বাজান। ছবিও আঁকেন।'

বাজাজ 'ম্যাড টু মট ইউ উইল্ড বোয়,' বলে দীপঙ্করের হাত ধর'কি গিলেন। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—মাফ করবেন উত্তর বোয়, বড়ই দুঃখিত খুব গুরুত্বী কাজ রয়েছে। আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যে দুটা কথা বলব, তার উপায় নেই ১০-আই মার্ক বাজ অফ নাউ, আর নট ইউ কমিং মিস্ মিতার?'

শ্রোতাভ্যাস দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বলল, 'ভাল কথা, কাল আমার জন্মদিন, এসো বুকল। চায়ের নেমন্তন্ন রইল। আমি এখন

উড, ট্রাটে স্ল্যাট নিয়ে আছি। বাবা মারা যাবার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।'

সুশী হাণ্ড-ব্যাগ থেকে একখানা কার্ড বার করে দীপঙ্করের হাতে গুঁজে দেয়।

'এতেই রয়েছে ঠিকানা ১০-আচ্ছা, চলি এখন। যেও কিন্তু ১০-বিটউইন কোয়ার্টার টু সিল্ল এণ্ড সেভেন। সাড়ে পাঁচটার গ্যাস্টরা সব চলে যাবে, মিসেস বর্ধনের ওখানে মজলিস আছে। আমি ইচ্ছে করেই যাচ্ছি নে। আই কার্ট স্টাণ্ড হাব।

বাজাজের হিম্পানো স্মাইলিং ওদের দু'জনাকে নিয়ে গেল।

দীপঙ্করের সমস্ত প্লান ওলোট-পালোট হয়ে যায়। শীলার জন্মদিনের পাটিও কাল সন্ধ্যায়। সহপাঠী হিসাবে একবার সুশীর বার্ষিক পাটিতে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। কিন্তু ওদের বাড়ির ধনী ও উৎকট সাহেবী পরিবেশে সে নিতান্ত বিব্রত হয়ে উঠেছিল। দীপঙ্কর সুশীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে বাবে কি বাবে না—ঠিক করে উঠতে পারে না। পাশের চায়ের দোকানে বসে কাপ ট্রয়ের চা খেতে খেতে অনেক চিন্তার পর বাওয়াই স্থির করল।

তার তরুণ জীবনের অনেক অশ্রু-স্মৃতি ওর সঙ্গে বিজড়িত। সুশীর সাদর আমন্ত্রণ তাই সে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারল না। শীলাদের ওখানে তা হলে আর বাওয়া হবে না, যদিও পিসীমা আসার জঙ্ক বার বার করে বলেছেন, চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে,—জরুরী কাজে আটকা পড়ার হয়ে উঠতে পারল না। সাথে না হয় ভাল দেখে একটা ফলের তোড়াই পাঠিয়ে দেবে।

## তিন

প্রথম কলেজে, পরে ইউনিভারসিটিতে একসঙ্গে পড়েছে ওরা,—পুরো চার বছর। ভক্ত ও স্তাবকের অভাব ছিল না শ্রোতাভ্যাস—কলেজের ভিতরে এবং বাইরে। তবু কেন যেন দীপঙ্করের ওপর ওর একটু সদয় দৃষ্টি পড়েছিল। বোধ হয় ভাল ছেলে আর অসম্ভব লাজুক বলে। একটু কিছুতেই মেয়েদের মত মুখ রাজা হয়ে উঠত ওর। ছেলেরা তাই ঠাটা করে ওর নাম দিয়েছিল, 'মিস দীপা'।

সুশী সত্যিই অসাধারণ মেয়ে। স্ত্রীচাম, লাবণ্যময়ী, স্নেহ-নিপুণ। ছেলেবেলায় মেয়েদের স্কুলে দৌড়-ঝাঁপ, হার্ডলহেসে বরাবর ফর্ক প্রাইজ পেয়ে এসেছে। মোটর চালনার অনেক পাকা ড্রাইভারকেও হার মানার। রাইফেলের লক্ষ্যও অব্যর্থ। টেনিসে বাহবা পাবার মত হাত। গানও গায় চমৎকার। সচরাচর বাঙালীর ঘরে এত ফর্সা রঙ চোখে পড়ে না। তা ছাড়া বেশিরভাগ মেয়েরা যেমন প্রশংসায় অভিভূত হয় ও তাদের দলে পড়ে না, নিশাও ওকে বিচলিত করতে পারে না। ওর নিজের চারপাশে কৌতুক ও বিজ্ঞপের এমন একটা দুর্ভেদ প্রকার রচনা করে তুলেছিল, যে ওর জ্বরযন্ত্রণে করাঘাত করতে গিয়ে বার্ষিকাম হয়ে ফিরে এসেছে প্রশংসাকাতার দল।

শ্রোতাভ্যাস উল্লেখ্যলোকের তারা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে দীপঙ্করের তাকে পাবার স্বপ্ন আকাশ-বৃক্ষের মত। তবুও সেই অলভ্যার সান্নিধ্য মাঝে মাঝে

জুটেছে তার ভাগ্য। বোটানিকসের ছাত্র-নিবিড় গাছের নীচে কাটিয়েছে ছুটির দিনের কোন অলস মধ্যাহ্ন, পাশাপাশি বসে। শুনিচ্ছে ওকে তার বাঁশির করুণ মধুর সুর। চীনাপাড়ার হোটেল, প্রাণচাউয়ের প্লেট সামনে নিয়ে আলোচনা করেছে ডাইলান টমাসের কবিতা না হয় স্মালভেডের ডালীর ছবি।

ইউনিভারসিটি ছাড়বার পথ অশীর চাষপাশে গড়ে উঠল গুজনরত অ্যাডম্যারারদের একটা মধুচক্র। সেখানে দীপঙ্করের মত সামান্য লোকের স্থান নেই। কলভোজী, বেপারোয়া, পরসাতওয়াল পরিবারের ছেলেসবাই ওর ওখানে ভিড় জমাতো। আসত জী লাস জার্নালিস্ট উৎপাদক নন্দী,—যার বাবা বছরে ইনকাম ট্যাক্সই দেন বিরাল্লিগ হাজার টাকা। আসতেন ক্যাপ্টেন রবীর সিং চৌহান—অলফোর্ডের টেনিস ব্লু। বাগের কারবার বেচে দিলেও, শেরারের ডিভিডেট আর জমা টাকার সূদে তিনপুরুষের বসে বসে খাওয়া চলবে। দুর্গন্ধ শিয়ারী চন্দ্রকুমার মেহরা। মেহরাদের ইউরোপ জুড়ে কাম্বারী শাল আর জয়পুরী মিনাকরী জিনিসের কারবার চলছে। প্যারি, রোম, ভিয়েনা তিন জায়গায় দোকান—হেড অফিস লন্ডনে। চন্দ্রকুমার পাঁচবার কন্টিনেন্ট ঘুরে এসেছে—এই ত' সব সাতাশ বছর বয়স, এরই মধ্যে। মস্তে কালোর ফলেও খেলেছে, ইয়াটে চেপে ভূমধ্যসাগরের নীল জলে ঘুরে বেড়িয়েছে।...সুপরিয়ার্লিস্ট শিল্পী টুটল সেন,—জার্মান স্থার সি আর গুপ্তের ভাগ্যে ও একমাত্র ওয়ারিশ। বিলেতে তিন বছর থেকেও সিকের পাঞ্জামা, পাঞ্জাবী আর শাল ছাড়া কিছু গায় দেখে নি; বিড়ি ছাড়া ধূমপান করে নি। পুরো তিন বছরের খোরাক—ছ'হাজার বাণ্ডিল বিড়ি (দিনে কমপক্ষে পাঁচ বাণ্ডিল হিসাবে) স্পেশাল অর্ডার দিয়ে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল, চড়া কাফ্টমস ডিউটি দিয়ে।

তবে অশীর বন্ধুদের স্থায়িত্ব বেশিদিন টেকে না, বিশেষ বাদেব সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা নিবিড় হয়ে ওঠে। বন্ধুস্থানে ওর পরিবর্তন যোগ লেগেই আছে।...প্রথম দিকটার মিতালীটা বেশ জোর কদম চলে, তারপর আসে মন্থরতা। শেষে বন্ধুদের পালায় নামে বহনিকা। কিন্তু এই বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ বা বিতৃষ্ণা কিছুই রেখে যায় না ওর মনে। অবিশিষ্ট যারা ওর খুব কাছাকাছি না যৌসে, তাদের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্যের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না।

কতবার ভাল ভাল বিষের প্রস্তাব এসেছে ওর, কিন্তু অশী বাহবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাবী পতির অসঙ্গতি নিয়ে তীব্র বিক্রম করেছে। তার চলন, বদন, হাবভাবের নকল করে সবাইকে হাসিয়েছে।...

দাদারা ও অন্ত্যস্ত নিকট আত্মীয়েরা শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। ইচ্ছে করে যে মেয়ে নিজের ভাগ্যকে অবহেলা করে, তার হৃৎক কে খণ্ডবে?

ওদের বাড়ির বৈঠকখানায় হরেকরকম লোকের ভিড়, অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লায়ে দাদা-বৌদিদের কাছে নিত্যন্ত অসহনীয় হয়ে ওঠে। কোন কোন দিন অশী বাইরে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফেরে। বন্ধুস্বর্গ ও আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে বোনের নিষেধ শুনতে শুনতে দাদা হুঁজব অস্থির।...

যা করে করুক ঘুরে গিয়ে করুক।...পৃথকভাবে বাস করতে অশোভনার কিছুমাত্র অনিচ্ছা ছিল না। বাবা ওর নামে পৃথক যে টাকা রেখে গেছেন তাই আর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িখানা নিয়ে, দাদার আশ্রয় ছেড়ে চলে এল অশী। বাড়িভাড়া আর ব্যাঙ্কের সূদে একা মাহুঘের দিবা চলে যায়, তা ছাড়া বড়লোক বন্ধুদের কাছে দরকার মত যখন ইচ্ছে চাইলেই টাকা পাওয়া যায়।

আজ শিকার, কাল পিকনিক, পরশু প্রোজারটিপ, ককটোল পাটি, টেনিস টুর্নামেন্ট, আর্ট শো—এই সব নিয়েই যেতে রইল অশী মিটার। প্রজাপতির মত লব্ধি ডানা মেলে ভেসে বেড়ায় নির্ভাবনায়, চঞ্চল বাতাসের শ্রোতে।

## চার

অশীর চলে যেতেই দীপঙ্কর ফিরে গেল দোকানটাতে। ভাবল, কোঁটাটা পলে অশী নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। আর ওর মত লোক এর চেয়ে আর কি এমন ভাল প্রজেক্টই বা দিত পারে। অশীকে সাত বছর আগে যেমন দেগেছে, তাই দিয়ে ওকে বিচার করে। ওর বড়মামুষ বন্ধুরা অনেক দামী সৌখিন জিনিস দেবে ওকে। তার এই সাতচল্লিশ টাকার কার্টের ক্যাসেটটা হয়ত সেখানের পাশে নিত্যন্ত বে-মানান লাগবে। তবে দীপঙ্করের বিশ্বাস, অশীর কাছে কোঁটোর অমর্যাদা হবে না। ডালার ওপরের অমন স্পন্দন ছবিটা যে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না, সে বিষয়ে ও অনেকটা নিশ্চিন্দেহ।

দোকানী ক্যাসেটটা প্যাক করতে যাবে, এমন সময় একটা বৃদ্ধি খেলে যায় দীপঙ্করের মাথায়। কাঁকা কোঁটাটা না দিয়ে, কিছু চকোলেট ভর্তি করে দিলে হয় না। ও জানতো নারকেল শাঁসজা অ্যামেরিকান বাউন্টি চকোলেট এককালে অশীর খুবই প্রিয় ছিল। বাজার ঘুরে অনেক কষ্টে জোগাড় করল তারই পাতুগুথানেক। চকোলেটগুলো ক্যাসেটে পুরে, একটা অসুস্থ ম্যাজেট। রঙের ফুল পাতা আঁকা সিকের ফিতে দিয়ে বেঁধে, দোকানী প্যাকটোটা তুলে দেয় ওর হাতে।

ছোট একখানা কার্ডে হু' ছর কবিতা উদ্ভূত করে ক্যাসেটটা পরদিন অশোভনার উড স্ট্রীটের স্ট্যাটে পাঠিয়ে দিল কলেজের এক বেরারার মারফৎ।

সেই একই লোকের হাতে শীলাকেও চিঠি ও ফুল পাঠিয়ে দেয়—হলদে ও বেগুনী গোলাপের শুধক।...

দীপঙ্কর অশী মিটারের স্ট্যাটে একটু দেরিতেই পৌঁছল—সন্ধ্যা পেরিয়ে সওয়া ছ'টার।

তেতলায় ওর স্ট্যাট—সোজা উঠেই বঁ-হাতি। দরজা খোলাই ছিল। দীপঙ্কর নিঃশব্দে ডুইং-রুমে ঢুকল।

একটা নীল রঙের অলুজ্জল বাঘ লগছে ঘরটার।

মাঝখানে একটা বড় গোল টেবিল, নানা রকমের উপহারে ভর্তি ভ্যানিটি ব্যাগ, মূল্যবান ফাউন্টেন পেন, ছোট বড় ভেলভেটের বাসে হীরের আংটি, হুল, রিস্ট-ওরাক, ব্রোচ, নম্রাকাটা দামী কারের শিশিতে ফরাসী সেট, প্রসাধন সামগ্রী, স্বপুঙ্খ চীনামাটির ক্রোকারিস, ক্রপোর কফি-সেট, সিঙ্ক-হাইলান ও ডেকনের শাড়ি, ব্লাউস, নরম পশমিনার চাদর, স্বাক, একজন দিয়েছে ছোট একটা ফ্রিজ আর



খাজুরাহের যুগলমূর্তি

( মধ্যপ্রদেশ )

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

মাসিক

বহুবচী

জ্যৈষ্ঠ / '৭১

শ্রীলোকচন্দ্র

মাসিক  
বঙ্গবতী  
আষাঢ় / '৭১

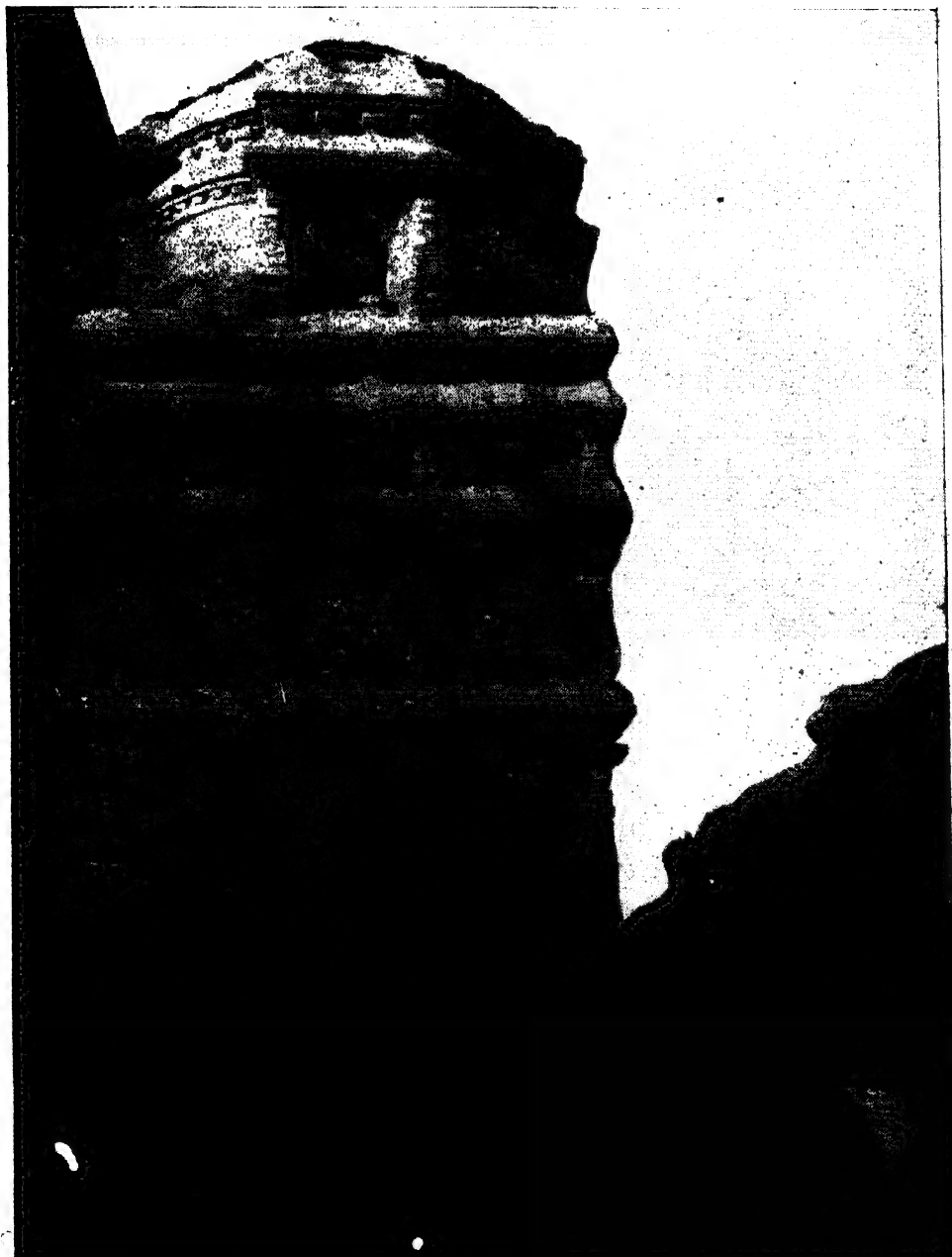
[ ছবি ফেরৎ লওয়ার জহা

উপযুক্ত ডাক-টিকিট

দিতে হয়। ]

বুদ্ধ-স্মৃতি

—পি সি ভট্টাচার্য





দিলবাহার

( আব্ পাহাড় )

—বিশ্বনাথ বিশ্বাস

দ্বাসিক

বহুমতী

আব্ ৮ / ৭১

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার  
নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন



বাসিন্দা বহুবলী । আষাঢ় / '৭১

ছায়াছবির যজ্ঞ

—দেবু দাস

• [ ছবির নেগেটিভ পাঠালে ছবি ছাপা হয় না।

একজন একটা চিন্তিলার ফার দেওয়া ক্লাক সম্ভবত বিদেশ থেকে আমদানী করা।

কোথাও কিন্তু তার কৌটোটার চিহ্ন নেই।

বয়রাটা ভুল করে অল্প কোন বাড়িতে কৌটোটা দিয়ে আসে নি ত'ই না, তাই বা কি করে হয়। লোকটা ফিরে এসে বাড়ির বা বর্ণনা দিল তা'ত লুপ্ত মিলে যাচ্ছে। ফটকের পাশে ছুঁটো ইউক্যালিপটাস গাছ, সিঁড়ির দু'ধারে ছুঁটো টবে ফুড়ে চানা বাঁশের ঝাড়। কান্ডেটো বার হাতে দিচ্ছেলি, সে স্বয়ং স্ত্রীশোভনা না হয়ে বার না—মেম সাহেবদের মত রঙ, ঝুং সোনালী চুল, চোখে পুরু চশমা, বাঁ গালে তিল।

পাশের ঘরে আলো জ্বলছে।

সুশী আর কে যেন রয়েছে ওখানে।

পূর্বের কঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়েছে এঘরে, চৌকাঠ পেরিয়ে ...

হঠাৎ স্তন্যতে পায় ঝুং স্তরাজড়িতবর্ধে সুশী বলছে, 'ইটস্ মার—মারভেলাস মিষ্টার বাজাজ, ইউ আর এ ডিয়ার।'

একটু সর এসে পূর্বের কঁক দিয়ে দেখে, একটা সোফায় এলারিতা সুশী ডান হাতের মণিবন্ধটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। উজ্জল নিরন আলোয় হাতের হীরের বন্ধনটা থেকে থেকে বলমল করে উঠছে। চে'খ-নাথানো নীল, সাদা সোনালী বর্ণছটা দ্রুত রঙ পাটোছে একটা থেকে অঙ্কটায়।

সুশীর সামনে একখানা আর্থ-চেয়ারে বসে কালকের সেই স্মিট-পরা মাড়োয়ারী ভল্লোকটি।

'হাউ মাচ?' সুশী জিজ্ঞাসা করে।

বাজাজ সাহেব একটু হেসে জবাব দেন, 'হোয়াই ডু ইউ ওয়ারী ফর দি প্রাইস... ইউ লাইক ডা ট্রিফেলট, ডাটস্ অল।'

সুশী বলে, 'স্টিল আই মার্ক নো হাউ মাচ ডাভ ইউ ওয়ার্থ।'

'নট মাচ... নিয়ার এ্যাবাউট টুয়েলভ, থাউজেন্ড।'

'ও দিস ইজ শিয়ার এক্স-এক্সট্রাভাগান্স!...এতগুলো টাকা মিছেমিছি খরচা নাই বা করতেন।'

'মিছেমিছি!...আ, হোয়াট ডু ইউ সে মিস্ মিটার। আপনার মুখের এই হাসির বিলিক...এরই দাম লাখ টাকা। আর তা ছাড়া কোথায় রাখবে টাকা বলুন তো? ব্যাক রাখলে মোটা ইনকাম ট্যাক্স কেটে নেবে। ঘরের সেফ লুকিয়ে আর কত মজুত করা যায়। চোর, ডাকাত, আগুনের ভয়ও তো আছে।'

## পাঁচ

দীপঙ্করের উপস্থিতি বাজাজই প্রথম লক্ষ্য করতেন, 'ওয়েল সমঝি ইজ লয়াটারিং ইন জা ডুইং স্কম।'

'কে, দীপু?'

পূর্বী সরিয়ে ব'র ঢোক দীপঙ্কর।

'দেখেছ কি স্কন্দর ব্রেসলেটটা।' সুশী ওর হাতখানা বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে। 'লুক! ইজ নট ইট ম্যাগ-ম্যাগনিফিসেন্ট?'

ঈর্ষায় ও যুগায় দীপঙ্করের মনটা বিধিয়ে ওঠে। একটু কাঁঠহানি হেসে বলে, 'খাসা।'

সুশীর দিকে চেয়ে দেখে দীপু। বাস্তবিক অপরাধ লাগছে ওকে।

## স্বাধীনতা বিপ্লব

সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জওহরলাল নেহরু



## বিপদ সত্যিই রয়েছে

সামান্যের অপর দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা এখনও রয়েছে।

সব সময়ে সতর্ক থাকুন। নিয়মানুবর্তী থেকে এবং সর্বশক্তি প্রাণাণ করে প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করে তুমি।

আপনার প্রচেষ্টাকেও প্রকৃত করে তুলুন।

পরিপুষ্ট দেহখানি হৃদয় পশমের আঁটা জামার নীচে আত্মপ্রকাশে উদ্ভূত। গায়ের দামী ব্যাগখানির বেশির ভাগই মাটিতে লুটোচ্ছে। চোখ দু'টো চুলু চুলু—হৃৎকুর। একটা কোমল অঙ্গ ভঙ্গিতে সোনার অঙ্গ এলিয়ে দিয়েছে সোফার। হাতলের ওপর রাখা একটা চাপা রঙের ডেলভেটের মুশানের ওপর মাথাটা হস্ত। হাল টুকটুকে মুখখানা ঘিরে সোনালী চুলের উচ্ছলতা—যেন সোনালী চেউ-এ ভাসছে একটা অক্ষুণ্ণ বক্তৃকমল, মনে হয় ও যেন কোন কল্পলোকের মাথাখিনী—কামনার সাথে বিষয়ও জাগিয়ে তোলে মনে।

‘তোমার চকোলেটগুলো সত্যিই সুন্দর ছিল। সব শেষ করে ফেলেছি, আমি আর চুল মেন—একটা বা হাতে ধরা লম্বা হোল্ডার আঁটা ইন্ডিপেন্ড্যান্স সিগারেট মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বহল, ‘সবাই কত দামী দামী উপহার দিল, কিন্তু আমি আশ্চর্য চকোলেটের কথাটা কেউ ভাবে নি। খ্যাসসু বর ইওর ডেলিশাস চকোলেটসু।’

দীপু ভাবে ও শুধু চকোলেট পেয়েই খুশি, কান্ধেটাকা কি ভাল করে দেখেও নি? কই একবারও ত’ তার উল্লেখ বরল না।

বাজাজ দীপঙ্করের দিকে একটা সর্ধাতুর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, ‘নাউ ইউ হ্যাভ ইওর ওল্ড প্যাল মিস মিটার টু টক অ্যাবাউট ওল্ড টাইমস। আই থিন্ক আই শুড, বোটার টেক মাই লীভ।’

‘ও নো, নো—মিস্টার বাজাজ!—ইউ মাস্ট স্টে এ্যাণ্ড হ্যাভ ইওর ডিনার হেয়ার। হোটলে খবর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে আপনার জন্তে।—দীপু ত’ ঘরের লোক।—ইউ ডোন্ট টেক ইট এ্যানিসু, দীপু। আই অ্যাম ফ্রাইটফুল্লী সারি—ফিলিং রাবার মিক। মাথাটা ঘুরছে। মেহরা কণ্ঠনেট থেকে কি মতুন মদ আমদানী করেছে। তার পাল্লায় পড়ে ক্যামেলের সঙ্গে হাসেরিয়ান টোকাই আর খানিক জিন

মেশান পাঞ্চ দুপুরের দিকে—এবটু বেশি মাত্রায় খেয়ে গেলেছি।— ক্যারাজড এ বিট টু মার্—ইট ওয়াজ এ হেভি পাঞ্চ।’

সুশী কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ সিগারেট টেনে চলে।

ওয়েল দীপ, মাই ওড ওল্ড বয়! কিছু মনে কোরো না। ও ঘরে টেবিলে খাবার আছে, নিয়ে পান। ইন্ডেকস্ট্রিক কেটলও আছে একটু কফি বানিয়ে নাও নিজে। ইচ্ছে করলে চাও তৈরি করতে পার। সবই মজুত আছে শেলফে—চা, চিনি, কণ্ডেনশড মিল্ক। মোড়টার বোনের অস্থখ, তাকে দেখবার জন্ত গোটা বিকেলটা ছুটি নিয়েছে, আটটার ফিরবে।—ডাউট মাইণ্ড প্লিজ।’

দীপঙ্করের মুহূর্তের জন্ত ওখানে থাকবার ইচ্ছে ছিল না, তবু কি ভেবে সে পাশের ঘরে গেল। একটা টেবিলের উপর কিছু কেক, পেপ্তি, ডালমুট, বিস্কুট রয়েছে, প্লোটে পড়ে ছ’ চারখানা কার্টলেটও রয়েছে।—হঠাৎ পাশের শেলফে নজর পড়তে দেখে তার সেই কাষেটটা, ডালা খোলাই পড়ে আছে। তার মধ্যে সিল্কের ফিল্টেটা গোল করে জড়ানো (কিটাই বোধ হয় ভড়িয়ে রেখেছে হটা নোবে বলে)।

থমকে ধাঁড়ায় দীপঙ্কর।

আশু তুলে নেয় কোঁটোটা। আলোয়ানের নীচে বগলদাৰ করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

‘আচ্ছা, আসি তা’হলে সুশী—ওডনাইট। ওডনাইট মি: বাজাজ।’

রাস্তায় নেমে হন হন করে এগিয়ে চলে দীপু বড় রাস্তার দিকে। কোনও একটা দোকান থেকে একুণি ফোন করতে হবে শীলাকে যে ও আসছে তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ বোগ দিতে।—মোটো সাতটা দশ, ট্যান্সি নিলে সাড়ে সাতটার আগেই গিয়ে পৌছে যাবে পিসিদের ওখানে।

## নেহরুর মহাপ্রয়াণে

### চামেলীবালা মিত্র

অজভেনী গিহিচুড়া হোল আজি চূর্ব  
রত্নের ভাগুর আজি হোল চিরশু  
ভারত জননী হোল ‘জহরং’ হারা  
গগনে নিভিল বৃষ্টি চির শুকভারা  
ভারতের শ্রেষ্ঠরত্ন কোথা গেলে চলি  
কোটি কোটি সন্তানের জন্মপণ্ড দলি  
স্নেহের ‘নন্দিনী’ তব লুণ্ঠিতা ধরায়  
আদরিণী ‘ইন্দু’ বলি কে ডাকিবে হার  
প্রাণের দৌহির ছই সম্রাট রাজীব  
বেদনার মুহূর্তমান নির্ধাক স্তম্ভিত  
কোথা চলি গেলে চির ভারত ‘সম্রাট’  
শূদ্ধ তব সিংহাসন শূদ্ধ রাজ্যপাট  
কারে দিয়ে গেলে ভার কে হবে সারথি?

## গন্ধরাজ

### শ্রীমতী মায়ী বোষ

তোমার দেওয়া গন্ধরাজের ঝাড়ে  
(শুকুনো) তবু দিনে দিনে প্রেমের সুবাস বাড়ে  
অনেক দিনের অনেক কথা  
গাঁধা এসের সাথে  
মনে তোমার পড়বে কি আর  
পাও যদি গো হাতে  
তোমার পথে অভিনয়ের  
রাতের রাণী আমি  
জানতে তুমি মনে মনে  
এরা তাই হয়েছে দামী  
এরা আমার জীবন-সাথী  
চিরদিনের তরে  
দেখবে এসের শুকুনো ধূলি  
চিত্তভঙ্গের ‘পরে—



১। এতপরে অনেক মধুরাত্রি এসেছে এ তিন ভুবনে। সে সব রাত্রি রাধারমণ-বিলাস যে এত মোহন ও এত আমোদ-মেদুর হতে পারে তা বলনাতেও আনতে পারেন নি দিব্যালাকের রমণীরা। সে বিলাসগুলি যেন আরাধনারও অতীত, ...এত মধুর, এত দুর্লভ, এত রসদ। তাদের মধ্যে একটি রজনীর বিলাসের ইতিহাস বিশেষভাবে বর্ণনার যোগ্য। রসের বাসনার হৃদয় বীণের ভরপুর, তাঁদের সেটি জ্ঞানের ক্ষম।

এই দোলোৎসব-লীলাশ্রেণী, বিপুল আনন্দের শালীনতার সম্পাদন করেছিলেন লীলাকিশোর শ্রীভগবান-... তাঁর লাবণ্যময়ী মহাভাবময়ীদের সাহচর্যে।

শ্রীকৃন্দাবনে এমন একটি বনস্থলী ছিল যেখানে সমারোহে উৎসব হত কুলনের, তিস্মোলার দোলনের। বনস্থলীর প্রান্তে প্রান্তে কল্পদ্রুমের এত ছিল শ্রেণী-সুন্দর অবস্থান, যে দেখলেই মনে হত কেউ যেন সেগুলিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পুঁতে রেখে গেছে। সরল দীর্ঘ স্তম্ভপুষ্টি-...আকাশের দিকে উঠে গেছে গুঁড়িগুলি। গাছের শাখার ডগার ডগার দেখবার মত সে এক বাস্তবন্ধনের দেখাচিত্র। ঢলেছে, একের পর এক গাছ, আর মাঝখানে দিয়ে চলেছে শূন্যাকাশ।

বিরচি পান্নার প্রোটারের মত কল্পদ্রুমগুলির মাঝখানে, ...আহা, গাছে গাছে বুলছে মুক্তার লহর, দুলছে চামর, কাঁপছে চীনাশুকের পতাকা, ডালে ডালে ফুটেছে রতন-কুল, ফলছে রতন-ফল, ডাকছে মণিবিহঙ্গ, ...বনস্থলী আলোকিত করে বিরাজ করছিল একটি চতুষ্কোণ প্রান্ত কাঞ্চনী বেলী।

বেদীর চার কোণে হরিচন্দনের চারটি গাছ। অসুত সুন্দর। চারদিক থেকে তারা তাদের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে বেদীর উপর এমনভাবে গড়ে তুলেছিল একটি তুঙ্গ মণিমণ্ডপ, যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল মণ্ডপের চতুর্দার চতুঃসুত। শিখরের চতুঃছদটিও যেন হীরাপান্নায় সজ্জিত।

সেইখানে হরিচন্দনের শাখাগ্র থেকে অনতিদূর স্বর্ণরজ্জ দিয়ে বাঁধা, বুলছিল এবং জরদোলন-জন্দে ধীরে ধীরে দুলছিল শ্রীহরির-... প্রোভোলাল-খট। খটটিও এরমি সাংস্থান যে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম যেকোনো বস্তুর না কেন জ্বলনে, দিগঙ্গনাদের বলতেই হবে,—

‘এ তো, আমার দিকেই তো মুখ করে দুলছে।’

২। রাধাকৃষ্ণের এই দোলমণ্ডপের চতুঃপ্রান্ত থেকে চতুর্দিকে যে ছড়িয়ে পড়েছিল উৎসব-মুষ্টি দেবতত্ত্বের অগণিত বীথি, সেগুলি কিও বিভক্ত ছিল সৌন্দর্যচতুর একেকটি চতুরঙ্গ। চতুরঙ্গের প্রত্যেকটিই যেন আবার পাণি-ডাক। আনন্দের ও শ্রামলতার স্বপ্ন। তাদের প্রত্যেক দু’টির মাঝখানে একটি একটি করে দোলস্থলী। প্রত্যেকটিতেই বেলী। বেলীমধ্যা যুগ্মধরীদের জন্মেই যেন সৃষ্টি।

এই দোলস্থলীতে, দু’টি-দু’টি করে দেবতত্ত্বের স্বয়ং থেকে বুলছিল, ... সমান রেখায়-...উঁচু নয় নিচু নয়-...সোনার শিকল দিয়ে দৃঢ় করে বাঁধা, চার চার সারি দোলন।

৩। মধ্য মণ্ডপটির চতুর্দিকে চিত্তামণি-কুচিকুরি চতুঃচতুরের কল্পনা। সমান তাঁদের পরিসর। সেখানে খেলে বেড়াচ্ছিল যৌবন-ময়মত অনিন্দ্যসুন্দর স্বয়ং-হরিশ-...পালে পালে। প্রত্যেকটি চতুরের মাথায় সোনার জাল। বড় বড় গাছের চূড়। থেকে এত উঁচুতে টানটান করে সেগুলি বাঁধা যে উপলোচনে দেখতে হয় তার সৌন্দর্য।

কবি কণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-কৃন্দাবন

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বাবিংশ-স্বতক

রাস-বিলাস

আর পাছগুলিও কি সুন্দর। চোখ ঠিকুরে যায় তাদের প্রবাল রঙের পাতার আঙনে। চাঁদনী রাত্রে পাতার কাঁক দিয়ে দিয়ে যখন ছিটছিট জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে মই চত্বরগুলিতে, তখন এক ভারি বগড়ের ব্যাপার ঘটে যায় সেখানে :-...আলো-আঁধারিতে তিস-তুঙ্গ ছিটরে রয়েছে ভেবে ভুল করে দুটে আসে হরিণবদুবা, আর ঠক ঠক ঠোঙের লেগে যায় মুখ-মুখে। তবু এত একরকমের দেখতে এই চত্বরগুলি যে দিক্‌ভেদজ্ঞান না থাকলে চিনতে কষ্ট হত দেবতাদেরও।— বনদেবীরাই এখানে বিরচন করে গিয়েছিলেন মুক্তার জাল দিয়ে গাঁথা চারটি অপূর্ব বিতান। কুলন উৎসবের শোভাবর্ণনের উদ্দেশ্যেই, তাঁরা যেন খুব তাড়াহাড়া এসে বসনা করে ফেলেছিলেন এগুলিকে।

বিতানগুলি এত সুন্দর যে অলঙ্কারসম্পন্ন ও মুগ্ধ হয়ে উঠতে চাইছেন তাদের প্রশংসার।

এগুলি তো বিতান নয়, এরা যেন কৃন্দাবনভূমির দিগঙ্গনাদের মুক্তাময়ী বিরাধ ককুলিকা-...প্রথমে না হলে অকম্পিত হস্তে বীদের ধরে রয়েছেন পবনদেব। অথবা এরা যেন দূর-আকাশের গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্রের নাদ-...অন্যদিকে পৌঁঁচানো ভুলে স্থান পরিভ্রমণ করে, চরণবন্দনার আশ্রয় হুলতে হুলতে নেমে এসেছে ধরণীতে।

৪। এই বিতানগুলি থেকে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যখন দোল খেতে থাকে খণ্ড খণ্ড চীনাশুকা, তখন মনে হয় কৃন্দাবনভূমির রেণু-লেহনের লালসায় বুঝি পেল হয়ে উঠেছে আকাশলক্ষ্মীদের রসজ্জ ভিহ্বা। মন্দ-সপক্ষী পবনে তখন ধীরে ধীরে হুলতে থাকে এগুলির দোলক, আর ঝুঁঝুঁ করে বাজতে থাকে মুক্তা-মণির প্রলম্ব।

আর এর প্রান্তে প্রান্তে যখন হুলতে থাকে চামর, তখন কি বাহারটাই না খুলে যায় বিতানগুলির, তখন মনে হয় বনদেবীরাই বুঝি সশ্রদ্ধ সস্তার করছেন এগুলির-...জ্যোৎস্না-সায়রের উড়ন্ত হংসগুলিকে বসিয়ে, অথবা আকাশজন্মা খেত শতদল ছলিয়ে, অথবা নানান ফুলের গাঁথা মালায় সাজিয়ে।

এই হেন দোলস্থলীটি সেদিন বিহ্বল হয়ে উঠেছিল সৌরভের আতিশয্যে। ভূর ভূর করে বাতাসে ভাসছিল অগুরুপূর্ণ মণ্ডপের, দিগঙ্গনাদের লোমের মত সেই ধূসলখায় উল্লাসে খেলে বেড়াচ্ছিল কপূরের এসেয়ে এবং কুম কুম করে চতুর্দিকে বয়ে পড়ছিল কল্পদ্রুমের বিন্দু বিন্দু মস্তুরঙ্গ।

আকাশ ছেয়ে অসংখ্য বিমানে সেখানে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন...বিচিত্র বাসিন্দাদি সঙ্গে নিয়ে...সিঙ্কেরা, বিভাগেরা, চারপেরা, কিন্নরেরা, দেবীরা এমন কি দেবেরাও। আগে থাকতেই তাঁরা এসে গিয়েছিলেন। উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না যদি উপস্থিত হওয়া যায় সময় হাতে রেখে।

৫। সারা বন থেকে বেঁচে এসে বনদেবীরা। তাঁদের সকলেরি এক খেয়াল, নানা নেই। নানান রকমের অতি সৌখীন উৎসব সামগ্রী হাতে নিয়ে তাঁরা পৌঁছে গেলেন। আনন্দবিশাল তাঁদের হৃদয়। বৃন্দাদেবীর সঙ্গে কি তাঁদের সভাব, কি তাঁদের সহচরী ভাবের ঘটা! অমন দেবীটি কি আর বৃন্দাবনে হয়? হৃদয়ের অমন প্রশান্তি সত্যিই অতুলনীয়। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা দোলামণি-তঙ্কর মণ্ডপগুলি থেকে থলে নিলেন বাছা বাছা ফুলের মালা এবং গড়তে বসে গেলেন ছোট ছোট জাহিরার ফুলের গয়না। কি সুন্দর গয়না, কল্লনাও গয়না।

৬। এবার চতুর্দিক থেকে উড়তে উড়তে এল পাখি। আঁকের পর আঁক। দোঙ্গল্লীর গাছে গাছে, ডালে ডালে, এমন কি পাতায় পাতায় সভা জমকিয়ে তারা বসে পড়ল। তাদের দেখেও আনন্দ। পাখিদের লক্ষ-হৃদয় তখন দোল খাচ্ছে আনন্দে, কুৎসুৎ দেখে, এ নবীন আমাদের কি তুলনা হয়। আনন্দে তারা ডাক ভুলে গেল, গুণতে বসে গেল কুৎসুৎ।

৭। নমনে পরম কৌতুক, হৃদয়ের পরম সুখ...

এ বন থেকে ও বন থেকে টুকটুক করে বেঁচিয়ে এল হরিণেরা। লতার-ছাওয়া প্রত্যেকটি কুঞ্জের শ্রামল অঙ্গনে অঙ্গনে তারা ছবিটির মত স্থির হয়ে বসে পড়ল।

তারপরে অকস্মাৎ...বেঁগুর কলধ্বনিতে আবৃত্তা হয়ে নয়, ঘরের কাজ ফেলে চলে আসাও নয়, গুরুজনদের নিষেধ লঙ্ঘন করে পলারনও নয়...না জানি কোথা থেকে কেমন করে সেখানে এসে সম্মিলিতা হলেন প্রজ্ঞার বত মৃগনয়না সুন্দরীর দল। লীলারহস্তের এই চিন্তামণিগুলি কি তবে বেঁচিয়ে এলেন দিগবন্ধদের বুক চিরে? না শ্রীমুখ ভেদ করে বল্লভদের? কে জানে।

তাঁদের প্রত্যেকের শ্রোণিদেশের উপর দিয়ে অর্ধেক জাহ্নু ঘিরে কুহুম-বর্ডিন মূহ-শন চণ্ডাতকের শোভা। তার উপরে বাহার দিয়ে কাঁপছিল বাতাসের মত ফুৎফুৎ আগুলফ-লম্বিত সূক্ষ্ম চান্নাতক। স্তনের উপর বকুলিকা ভ্রমরছন্দে বাঁধা। নাবিধে কল্লনা কাবী। সকলেরই সমান সাজ, সমান শ্রী।

তাঁদের মধ্যে কয়েকটি এলেন...ফুলের ধুকু কাঁধে গুলিয়ে। মেখলার মালায় ফুলের শর, হাতে আবারের গুলাল। শ্রীমদনের বীরবেশ পরে তাঁরা যেন বরণস্ব মাততে এলেন দোলমঞ্চে কৌতুকের।

আর কয়েকটি সুন্দরী অঞ্চলে কুহুম বেঁধে এবং কোমরের নীচে সোনার বঁখলার সোঁটকে জড়াতে জড়াতে লীলাভরে বহ্নিম হয়ে এসে দাঁড়ালেন; যেন তাঁরা এতদিনকার জমানো রত্নপাণ্ডিত্যের বিত্যাধনটিকে কাপড়ের গিরোর বেঁধে, কিনতে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণের মণিকথানি হৃদয়ের।

আর একদল এলেন, মহামণিময় ছোট ছোট থালা হাতে নিয়ে।

বাষ্প লেগে পাছে নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে লাক্ষার কৌটার ভয়ে তাঁরা থালায় বসিয়ে নিয়ে এলেন...মহাপ্রভি অঙ্কুর সিন্তসার, বস্ত্রীপক, বপুঁরগু আর চন্দনচূর্ণ।

আর একদল এলেন, বিভিন্ন গড়নের অতুলনীয় বাসুকার্য করা জলযন্ত্র বহন করে। সব কাঁচিই সোনার। কোনোটির ভিতর কুহুমবারি, কোনটিতে চন্দনজল, কোনোটিতে বস্ত্রীগোলা জল, কোনোটিতে পাতলা হুস পুস্পর। সাংমাহে সুন্দরীরা যেভাবে এলেন, তাতে মন হল, অন্তরাধিবা একদল ওজ্জ্বলী বৃষ্টি মন্থথযুছে নামলেন।

৮। অতঃসেনার সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হরণ করে স্ত্রীরক্তেরা চতুরঙ্গনে প্রবেশ করেই এক লহমায় যেন তাঁরা অভিভূত হয়ে গেলেন অন্ধকার এই মহোৎসব-রসের মাদকতায়। আরম্ভ হয়ে গেল মৃদন। কি খেলা— সে কি খেলা। এ বলে আমাদের দেখ, ও বলে আমাদের দেখ। আমি আগে সহী, আমি আগে। কোথায় ভেসে গেল পৌঁদ্যপঞ্জ্যন। কলকণ্ঠের সে কি পরিহাস-শিখিল মন্ত কলরব! যথা,—

‘আর কো দেখি।

এই তো এসেছি।

দেখবে তবে?

দেখাও দিক।

ঐ যা, খুঁসে গেল...

ওমা এই নাও, পরে ফেল

চড়া চড়া মারো মারো।

রঙে রঙে রাঙাও আরো।’...ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীরাধিকার কাঁধের উপর বাম বাহুর আদরখানি দেখে, বামকরে বাঁশরী, দক্ষিণ মণিবন্ধে বধুণ বাজছে কিনি-কিনি-কিনি, লীলাকমল গৌলাতে দোলাত, মণিতঙ্ক-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শোণ-কুহুম-বর্ণের অন্তর্ধ্বাস;

কিরীটটিতে বহু-বর্ষের গুফন;

বিলোল কর্ণে বপলে উড়ন্ত ভ্রামরের মধুগুণ;

মকর-কুণ্ডলধারী প্রবেশ করলেন মণ্ডপে।

সুস্মৃতিসুস্ম বকুকের চিত্রণ পেলবতার চুঁখিত তাঁর অঙ্গ।

বেগু-বন্ধনের মণীশ্রে মণীশ্রে নব্যচাক্রতার বিদূরণ।

কণ্ঠের উপকণ্ঠে কৌস্তভমণির কিরণ নৃত্য;

মদনমোহন প্রবেশ করলেন বোলমণ্ডপে।

কত বিলাস তাঁর নৃগুর-বর্ণিত চরণে।

লাস্ত্রছন্দে ললিতাদেবীও তাঁর ওষ্ঠাধরে তুলে ধরলেন তাগুণ, আর যিনি মদমত্তকবী-মুখি তিনি চলতে চলতেই গ্রহণ করলেন সেই তাগুণ। মণিময় মুক্তামাল্যের মত টলটলে হয়ে উঠল শ্রীজঙ্কের আভা। আর সে আভার রসিকতায়, দূরে হঠাৎ যেন সরে গেল বিদ্রোহিণী অঘরমণীদের ২মীড়-বাঁধি;...শ্রীভগবান প্রবেশ করলেন দোলমণ্ডপে।

জয় জয় জয় জয়ধনি তুলে গান গেয়ে উঠল মণিবিহঙ্গের।

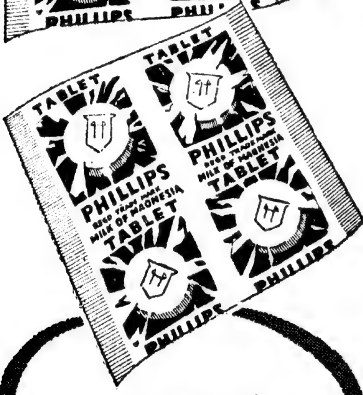
মুকুলের রোমাঞ্চ ফুটিয়ে অস্ত্রহর্ষের অভিনয় করে বসল ক্রমসমাজ।

ফুলের মধু বসিয়ে লতিকারা বর্ধমঙ্গল দেখাল আনন্দাক্রুর। আর

যেই শ্রীরাধাকে সঙ্গে নিয়ে দোলমঞ্চে আরোহণ করতে গেলেন শ্রীহরি,

অল্প অজীর্ণ, পেটের গোলমাল, বুক জ্বালা থেকে

এবং অস্বাস্থ্যের জন্য



৪ ট্যাবলেটের প্রতি  
প্যাকেটের মূল্য ২০ নয়া পয়সা

এখন

অধিকতর বিরাপতার জন্য  
এ্যালুমিনিয়াম ফরেল প্যাকে পাওয়া যায়।

# ফিলিপ্স

অফিস

মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া

## ট্যাবলেট

ফিলিপ্স ট্যাবলেটে আছে খাঁটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া যা পরিবারের সকলের পক্ষে সবচেয়ে দ্রুত কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য অগ্ননাশক।

যখনই অগ্নজ্বিত বদহজম আপনাকে গীড়া দেবে তখনই শুধু কয়েকটি ফিলিপ্স ট্যাবলেট চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার অস্বাস্থ্যকর বুক জ্বালা আর পেট ফাঁপা ভাব কমে যাবে, পাকস্থলী স্বস্থ হবে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে।

বাড়ীর সকলের জন্য সুবিধাজনক প্যাক ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী:

দে'জ মেডিকেল স্টোন্স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

অমনি ক্রমশঃ শিখরে শিখরে কোথায় যেন বসছিল মথুরেরা, অপর এক প্রেমের উদ্ভাসনার উত্তরা হয়েই যেন নেচে উঠল তারা। তারা যেন চোখের সামনে আবির্ভবন দেখতে পেয়েছে সত্যিই এক স্নিগ্ধ নীলমেঘের। কে—ও কে—ও—কেকাননি তুলে তারা যেন আকাশে বাতাসে প্রশ্ন ছড়িয়ে দিল—‘কোথায় কোথায় কে’।

১। নভোমণ্ডলের চারপাশে পৃথিবী-পৃথিবীর মত দল ললিতপদ-সকলের আনন্দে হুঁহাত ভরে ছুড়তে লাগলেন নক্ষত্রের মত অলঙ্কারে নন্দনকাননের ভ্রমর-বসা ফুল। সিন্ধবৃক্ষের সুকোমল হাতগুলি লজ্জার অস্তিত্ব তুলে গিয়ে মর্দন, পেথন ও চূর্ণনের দৈনুধ্য দেখিয়ে, বাজাতে লেগে গেল মর্দন পনব ও বর-লম্পট পটহাদি বাদিত। মন্যাকিনীর তরঙ্গভঙ্গের মত একটি কম্পিতসৌন্দর্য বিস্তার করে অমরবৃক্ষের হাতে হাতে তুলতে লাগল দিব্যচামেরের অক্ষততা। আর উর্বশীবলীভূতা অঙ্গবাদের তখন কি ভিড়ি কি ভিড়ি সারা গগনে। নতুনয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন—দোল-পার্বতিকা। তার উপর পাভা রয়েছে জ্যোৎস্নার ফেনার মত শুভ্র একখানি আন্তরণ। কী শুভ্র! রূপগ্রাহীনিয়ন যেমন নবীনরও মহিমা পবিত্র হয়ে ওঠে, তেমনি পবিত্রত্বের হয়ে উঠল সেই পার্বতিকা তাঁদের নয়নে। ময়ূরকলাপের কাককাজ করা দোলনা। এত সুন্দর কান্ন বে, সৌন্দর্যের উপরেও যেন রেখে গেছে তার শিল্পচিহ্ন।

গভীর উল্লাসে যেই দোলনার সমারোহণ করতে এগিয়ে গেলেন ব্রজতিলকনন্দন, অমনি বনদেবীদের কণ্ঠে সমধরে জেগে উঠল মধুর মঙ্গলগান। তাঁরাও এগিয়ে এলেন এবং মহামণিময় মঙ্গলদীপের তাপ দিয়ে আরাতি করলেন কৃষ্ণের।

শ্রীবিহারের সঙ্গে এবার রসিকশেখর মুকুন্দও অবাচ হয়ে দেখতে লাগলেন অদ্ভুত দোলাশিল্পী। তারপরে সকাতরে উঠে বসলেন মণীন্দ্রদোলন উৎসব প্রেংখালিকার। বামে বসলেন শ্রীরাধা—মুকুটমণি যিনি ব্রজধাম-সুলাচনাদের। শ্রীহরির হাতখানিকে লীলাভরে ধরে রইল রাধার হাত—অমুভব করতে লাগল রহস্য-সোমাকের মহোৎসব।

চতুর্দিকে ছড়িয়ে বসলেন সহচরী-সমাজ।

১০। এমন সময় একটি সহচরী চক্ষুগ্রানদের অতিবুদ্ধির মত যিনি সত্যই অপরূপ সুন্দরী, তিনি চোঁস দিয়ে ছলিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের সেই অনিন্দ্যপ্রসন্ন দোলাৎসব প্রেংখালিকা। দিতেই, দোলনা থেকে এমন ঝড়-ভাঙলো ছুটে বেরিয়ে এল এক লাংঘ্যামৃত-শ্রোতস্থিনী, যে তার মাধুগতঙ্গে ধূলোর মত কোথায় যেন ধুরে ভেসে গেল সকলের দৈর্ঘ্য-সংগীত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখেই, লীলু উৎকণ্ঠায় প্রায়-কণ্ঠাগত প্রশ্ন, সুরলোকের দেব-দেবীরা বাধ্য হলেন পুষ্পবরধ ফেলে রেখে নভোমণ্ডলের এমন সব প্রদেশে আশ্রয় নিতে, যেখান থেকে শ্রদ্ধার এবং নিরুদ্ভাটে তাঁরা তৃপ্ত করতে পারবেন তাঁদের দর্শন-বাসনা।

১১। ‘কি মহামাধুরী আজি বুলনে’—তান-লয়ে এই মঙ্গলগানের স্বরপরিমলদ্বিকে দিকে বিকিরণ করতে করতে, উল্লাসে অধীর হয়েই যেন যুগ-প্রলানার মুখ। যেতে লাগলেন আনন্দে। কুহুমগুলি কোমরে বেঁধে এবার তাঁরা অধিকার করে বসলেন নিজের নিজের দোলায়।

যুবারির পুরোভাগে বসলেন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি; পরিজনদের নিয়ে দক্ষিণে বসলেন ভদ্রাদি; নিজগণ নিয়ে বামে বসলেন শ্রীমাদি; এবং স-সহচরী পশ্চাতে বসলেন ধন্যাদি।

১২। ‘দে দোল দোল’—দোল খেলবার প্রবল প্রত্যাশার, যে যার দোলায় চরচর করে উঠে পড়লেন আতীরকতার। কৃষ্ণের দোলায় সমান সমান তাঁদেরও দোলাগুলি উঠে। অত কাণ্ড অত আনন্দ অত আলো—এসে যেন এক অদ্ভুত রসের বিহ্বল খেলতে লাগল সর্বত্র।

১৩। রসের সভার সকলেই আজ গরবিনী। সবক’টি আঙিনাই উথলে উঠল সুগনগানে। চতুর্দিকেই যেন বীণ বাজাতে লাগল মৃতিমতী কনকলতার বন। কানে যেন তর্পের শ্রাবণ-বর্ষণ করতে লাগল সেই বজ্রারের সীমাহীন মরতা। ডুব দেওয়াও কঠিন এই আমোদের সাগরে।

একহাতে দোলনার স্বর্ণদাম, তুলতে লাগলেন তাঁরা। লীলাধিত লাংঘা ছড়িয়ে, তুলসীজবর সঙ্গে সঙ্গে, দোল দোল দোলাতে লাগলেন নিজেরের তন্ত্রস্তিকা। তারপরে অগ্নি হাত দিয়ে অকলের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে ছুড়তে লাগলেন—আবীর—মুঠা মুঠা আবীর। আনন্দের সঙ্গ ভায়ায় অমৃত বজ্রার তুলল ব্রজবৃন্দের হাজার হাজার মণিষর।

আবারের রাতা ধূলোয় লাল হয়ে গেল আকাশ। বায়ুশ্রোতে ভাসতে লাগল ধূলি; জবাফুলের সৌন্দর্য-চোর ঐ আবীর। অঙ্কুর হয়ে গেল ঘোম। দৃষ্টিরোধ করে বিহবল করে তুলল দিব্যলোকের অধিবাসীদের। বাস্তব হয়ে তাঁরা মুহুমুহঃ বর্ষণ করতে লাগলেন ফুল। ফুলের মধুতে বীরে বীরে শাস্ত হতে লাগল কেঁদুিলির উদ্ভাস। দোলহুদীর সীমানায় ঝাঁড়িয়ে ছিলেন বৃন্দাদি শনদেবীরা, জয় দিয়ে দিয়ে তাঁরা দোল দোল ফুলদোল দোলাতে লাগলেন রাধাকৃষ্ণের দোলায়। লীলালোল রাধাকৃষ্ণও ছুড়তে লাগলেন ফাগুয়া। আবার মরি মরি, যুগতাদেরও হাত থেকে তাঁরা উড়ে যেতে লাগলেন ফাগুয়ার মায়।

চতুর্দিকে দোল, দোল দোল তুলতে লাগলেন শ্রেয়সীরা। তাঁদের একমাত্র বাসনা—হারিয়ে দিতেই হবে প্রিয়তমকে। বাতাস চিরে ছুটে লাগল ফাগুয়াগুলি। বাস্তব মুখ থেকে ফইফই করে বেরোতে লাগল গালায় কৌটায় ভরা চন্দনাদির পঙ্ক। সব যেন কামদেবের গুলিকা।

দোল দোল দোল।

১৪। রাধাকৃষ্ণ দোলনাটির চতুর্দিকে বিরাজ করছিলেন যে সব কলাবতীরা, এবার তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেল চতুর্দিকের দোলা-বিলাসিনীদের। দূরের বিলাসিনীরাও অতি চতুর। সন্ সন্ করে ছুটে আসতে লাগল তাঁদের বজ্রী আর চন্দনের গন্ধগুলি। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কুহুমলোচনাদের দল মায়’খেতে খেতে হাতে ধরে ফেলতে লাগলেন গুলি। সেগুলিকে আবার টিপ করে করে ছুড়ে মারতে লাগলেন তাঁদের নিকে উড়িটে।

১৫। এত ছোড়াছড়ির ধুম, কিন্তু আশ্চর্য, একটি গুলিও এসে লাগল না যুগল রসেশের সঙ্গে। শত চেষ্টাতেও লাগল না। রোখ চপে গেল সুন্দরীদের। তাঁদের মধ্যে তিন-চারজনের নিসঙ্গি কর্তে

লাগল হাত। ‘আমি আগে, আমি আগে’—বলতে বলতে তাঁরা প্রত্যেকেই উপযুপরি ছুড়তে লাগলেন গন্ধগুলাল...চার চারটে করে একসাথে।

বিপুলবেগে সর্বাঙ্গিক থেকে ছুটে আসতে লাগল কাফার নরম নরম কোঁটারভরা গন্ধগুলাল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেগুলি মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যেতে লাগল বিখণ্ডিত হয়ে। আর ডিম ফেটে বেরিয়ে আসা পাখির বাকার মত চৌদ্দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াতে লাগল অন্ধকার গোলা, কপ্তারী গোলা, চন্দনের গোলা আর আবীরগুলাল।

কতকগুলো গোলা আবার, সত্যিই, নিকটেই এসে ফেটে পড়ল ব্রজরাজনন্দনের। তুরু তুলে শিউরে উঠে সেগুলোকে সামলালেন...পাশেই গাঁরা ছিলেন, সেই হৃদয়ীর দল। ছ-একটা যদিই বা ছুটে লাগব-কাগব হল জড়-গাম্বলের শ্রীজঙ্গে, রাগা সামলে নিলেন সেগুলিকে...পদ্ম চোখে হাসি হেনে। ঘামে সিক্ত হয়ে গেল তাঁর অঞ্জলি।

১৬। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব স্বতন্ত্র হরিণনয়নাদের লোচনে লোচনে যে আহ্বাদ খেলে বেড়ায়...যেটি নেচে ওঠে চপল নয়নের দোলনে...যেটি তারা কাটে দু’নয়নের অভিমানে...যা চকোরীর রূপ নের অমৃকম্পা-ভিঙ্কার অতি রসিকতার...যা ফুলের কুঁড়ির মত ফুটে ওঠে লজ্জার, শ্রীকৃষ্ণ কেবল সেই আহ্বাদটিকেই ফুটিয়ে তোলা একমাত্র মাদন-ব্রত বলে জানতেন ভালবাসার। অস্ত্রাঘাত অলস হয়ে রইত তাঁর দীর লালিত্য।

তাই তিনি চতুর্দিকে ঘোরাতে লাগলেন তাঁর বিলাস চতুর মন্তনয়ন। দেখলেন, চতুরঙ্গনের সমস্ত লোচনের আহ্বাদ তাঁর পানেই চেয়ে আছে। তবুনি তাঁর ইচ্ছে হল...মুখ্য পক্ষটিকে বেছে নিতে। কিন্তু কোন পক্ষটি মুখ্য?

তিনি দক্ষিণ দিকে চাইলেন। দেখলেন...দক্ষিণীরা কলিকলায় অসাম্যতা। কী অসম্ভবই না তাঁরা হুসছেন! কী আবীরই না তাঁরা ছুড়ছেন! যেন ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছেন লালে লাল ধুলোমাখা হাতীগুলোকে, যেন উড়িয়ে দিচ্ছেন বিজয়-বৈজয়ন্তী বৈদধের।

উত্তর দিকে চাইলেন। দেখলেন, আহা উত্তর-বিলাসিনীরা, সত্যিই যেন তাঁরা বিলাসিনীর শ্রেণী...কী প্রগলভ আনন্দেই না তাঁরা ছুসছেন!

পশ্চিম দিকে এবার চাইলেন। দেখলেন, পশ্চিমাদের নীল-নয়নের নীলিমায় হার মেনে গেছে নীলপদ্মেরও নীলিমা। দোল দোল তাঁরাও ছুসছেন। রসের বিলাসে টলটল করছে যৌন।

আর পূর্বদিক...অপূর্ব তাঁদের দোলন। চালনার কোঁশল। প্রচণ্ড আমোদের খেয়ার যেন ভেসে চলেছেন এই বরবর্ণিনীদের দল।

দেখতে দেখতে, আর শ্রীরাধার সঙ্গে ছলতে ছলতে, করপদ্মের পদ্মবাগ-সম্মল আবীরধূলি কখন যে তিনি ছুড়লেন জানি না, কিন্তু দোলহুগীর সমস্ত আনন্দময়ীরাই হঠাৎ ব্যস্তে পারলেন, দেখতে

গেলেন...তাঁরা হেরে গেছেন! কি আশ্চর্য, মুরলীধর হাসছেন আর তাঁরাই রাঙা হয়ে গেছেন রাঙে রাঙে! হার হার...হেরে গেছেন।

১৭। আর রসের ও কৌতুকের বিক্রমের আবেশে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিক্‌চতুষ্টয় তুটী করবার উদ্দেশ্যেই যেন, সেই সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুরলীধর ছুসছেন! আশ্চর্য তাঁর দ্বিবিধ-ছন্দ দোলনের।

পূর্ব ও পশ্চিম...এই দু’টি দিকের সম্মুখীন হলেন যেই কৃষ্ণ, দোলনা অমনি চলতে লাগল সম্মুখ-ছন্দে। উত্তর ও দক্ষিণ...এই দু’টি দিকের সম্মুখীন হলেন যেই কৃষ্ণ, দোলনা অমনি চলতে লাগল পার্শ্বগ-ছন্দে। আর ঠিক সেই সময়ে মরি মরি, সম্মুখ ও পার্শ্বগ দোলনের কৌতুক-ছন্দে...ছলতে লাগল তাঁর শ্রীমৎ কুণ্ডল, গলার হার আর বনমালা। বলিহারি বাই এই অদ্ভুত অত্যদ্ভুত দোলোৎসবের।

১৮। ওরে জনব, রসানুধির এই নিত্যসিদ্ধ রহোবিলাস...তা তারা প্রকট হোক, আর অপ্রকটই হোক...নিত্যাবিকশিত হয়ে চলেছে পূর্ণপাদ্যের মত, একের পর এক। এ খেলা শাখতাচ্ছের।

কেউ হয় তো বলবেন,—‘কৃষ্ণ-প্রভুর এই হেন প্রকট-অপ্রকট-নিত্য-লীলাঙ্গানী হবার শক্তি নেই।

জটিলরূপা-মুনিরূপা ইত্যাদি নিত্যাসিদ্ধান্তে, কৃষ্ণপ্রসঙ্গী কমল-লোচনা ব্রজযুবতীদের অস্তিত্ব নেই।

লীলাময়ের লীলাঙ্গানে বৃন্দারব্যুদ্ভির অপ্রকটতা...সমীচীন নয়।

সেখানে হয় না কেন শ্রীহরির নিত্যবিধাস?

কিন্তু উত্তরে বলব,—‘তাঁর সে শক্তি আছে। তাঁর প্রেরণীরা আছেন। বৃন্দাধনের অপ্রকটতা সমীচীন নিত্যলীলা সেখানে হয়।

তা না হলে, যিনি এক তিনি কেমন করে নানা হয়? বোড়শ সহস্র জীবন্তের পাণিগ্রহণের পর কেমন করেই বা তিনি পৌরজনদের সঙ্গে নিকে...যুগপৎ প্রবেশ করেন প্রত্যেক জীবন্তের পৃথক পৃথক গৃহে এবং অব্যবহিত পরেই নিজের অবস্থানের মতই ব্যবস্থা করেন গুরুজনদের এমন কি সাধারণ মনুষ্যদেরও অবস্থান?

সর্বক্ষণ বৃন্দারগোষ্ঠে যিনি থেতু আর রাখালিরা নিয়ে খেলার মেতে থাকেন, তিনি কেমন করে মধুপুরী বান, নিত্যবিহার করেন প্রেরণীদের সঙ্গে, বিরচন করেন তাঁদের বিরহ-ব্যাধি?

অতএব, যিনি অতকৌতুখ, যিনি পুরু-মহিমা, যিনি শ্রীভগবান, যিনি ব্রজেশ্বরীর নন্দন...তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয় কোনো বিলাস।’

কবি স্বর্ণপুর রচনা করেছেন এই চম্পু। চৈতন্যকৃষ্ণের কল্পণায় উদ্ভিত হয়েছে তাঁর বাগবিভূতি।

চৈতন্যকৃষ্ণই একমাত্র বীর জীবনধন (শ্রীশিবানন্দ সেন) সেই ছেন জনকের তিনি পুর। শ্রীনাথের চরণ-কমল স্মরণ করে শুদ্ধ হয়েছে তাঁর বুদ্ধি।

ইতি দোলোৎসবো নাম দ্বাবিশঃ স্তবকঃ।

সমাপ্ত

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]



## বন্ধু আর বন্ধুরা

কুমারেশ ঘোষ

আমাদের পাড়ার পন্টুটা বড় ফাজিল। কেবল বড় বড় কথা।

আর বড় বেশি চাল। সাম্রাজ্যের ঘটঘটি খুব। পায়ে তুড়তোলা চাট, পরনে ঢোলা পায়জামা, গারে গরদের পাঞ্জাবী মাথায় ওপ্তানো টেরি। চোখে চশমাও পরে, পাওয়ার আছে কি না কে জানে! হাতে ঘড়িও পরে, কখনো সেটা ফার্স্ট যায়, কখনো স্লো। কিন্তু কারো কিছু বলার উপায় নেই! বললেই বলে: জানিস আমার ঘড়ি দেখেই বেলা একটার কোয়ার তোপ পড়তো।

নস্তুটা ঠোটকটা। হুঁচকে দেখতে পারে না পন্টুর চালবাজি। বলে, রেখে দে ওর গাঞ্জ, ওর ঘড়ির মতে যদি তোপ পড়তো, তবে কোনদিন বেলা দশটার পড়তো, কোনদিন পড়তো বেলা তিনটের। একটার আর কোনদিন পড়তো না। আসল কথা কি জানিস, তোসের পাঁচমিনিট আগে, গোলটাতে রড থেকে সরিয়ে, ঐ পন্টুক ওখানে বসিয়ে দেয়।

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। আসল কথা, ওরা দু'জন কেউ কাউকে সজ করতে পারে না। ঠিক যেন, সাপে নেউলে কিংবা আদার-কাঁকেলার, অথবা মোহনবাগনি-ইকঁবেল আর আমরা হচ্ছি দর্শক।

আমাদের দলে গোপলাটা একটু বুদ্ধিতে খাটো। বোধ হয় রাখার বি নেই, শ্রেক গোবর পোরা। কোথায় কি বলতে হবে জানে না। সেদিন স্কুলে টিকিনের সময় আলুকাবলি কিলে খাচি আর গল্পো করছি, এমন সময় গোপলা বললে: জানিস ভাই সেদিন খেলা দেখে ফেরার সময় ট্রামে এত ভিড় হয়েছিল যে উঠতেই পারলার না। কোনো ট্রাম আর কঁপেজে দাঁড়ায় না। পাঁচ-ছয়খানা ট্রামের পেছন পেছন ছুটে ধরবার চেষ্টা করতে করতে প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এসাম। শেষে খোঁজোঁরি বলে রাগ করে বাকিটা পথ হেটেই মেরেছিলাম। হাক্ বাবা কটা পরমা বেঁচে গেল।

চালবাজ পন্টু গভীর হয়ে বাড় বঁকিয়ে সব শুনছিলো। হুট করে হুট বঁকিয়ে বললে: ইস গোপলা তুই বড় ভুল করেছিস।

কেন? কেন? গোপলা জিগ্যাস করলে।

পন্টু হেসে বললে: তুই যদি ট্রামের পেছনে না ছুটে ট্যান্ডুলোর পেছনে ছুটতিস, তবে নির্ধাত তিন-চার টাকা বাঁচতে পারতিস।

আমরা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম বটে, কিন্তু গোপলার

মুখটা কালো হয়ে গেল, ঝুলে গেল। চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠলো। নস্তু তাড়াতাড়ি গোপলাকে বাঁচালে। ওর হাত ধরে দল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল: চলে আর ইদিকে। শুনিস না ওর কথা। ফাজিল একটা।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। পন্টুর চালও বেড়েছে, নস্তুর রাগও বেড়েছে, আর গোপলার বুদ্ধিও একটু বেড়েছে বোধ করি। কারণ আর সে বেশি কথা বলে না।

সেদিন এক বাগানে সবাই ফিস্ট করতে গিয়ে গল্প করছিলাম। রেমো বললে: আচ্ছা, এ সময় যদি একটা হরিণ আসতো কি করতিস তোরা?

প্রায় সবাই বলে উঠলাম: কেন? ধরে, কেটে, রান্না করে খেয়ে সাবাড় করে দিতাম?

—আর যদি একটা বাঘ আসে? বললে রেমো।

এবারে প্রায় সবাই বললাম: বাঘ? বাঘ এলে চোঁ চোঁ পালাবে, নইলে বাঘটাই যে আমাদের সবাইকে সাবাড় করে দেবে।

—দূর বোকা! পন্টু বললে: বাঘ কখনো সবাইকে একসঙ্গে মেরে আত্মক করে খেতে বসে? তারও প্রাণে ভয় নেই? আমাদের, যেকোন একটিকে মুখে তুলে নিয়ে পালাবে। তারপর হেসে বললে: হয়ত নস্তুটাকে নিয়েই পালাবে!

নস্তুর গা জ্বলে উঠলো বোধ হয়। বললে: আমাকে কেন? আর তোকে নয় কেন?

পন্টু বললে, আমাকে নিলে বাঘটাকে মারবে কে? আমার বাবার বন্ধু আছে, তাই নিয়ে তাকে গুলী করে মারবে।

অ!—নস্তু বললে: এতক্ষণে বুঝলাম। বাঘটা আমার মুখে করলেই, আমি জোড়হাতে বলবো, দাঁড়াও হে বাঘ্রমশায়, পন্টু বাড়ি গিয়ে তার বাবার বন্ধুটাই নিয়ে এসে আগে তোমাকে মেরে তার বীরত্ব প্রকাশ করবে, তারপর তুমি আমাকে খেয়ে।

সবাই হেসে উঠলাম। রেমো বললে, সে আবার কি করে সব হয়? বন্ধু ছুঁলে বাঘটা তো মরেই যাবে।

নস্তু বললে: তুই জানিস্ নে, পন্টু যখন বন্ধু ছুঁলে সামনে দিকে, হস করে গুলী বেরবে ঠিক পিছন দিকে। এমনি ওর টিপ। আর নয় তো বাড়ি থেকে লুং এসে বলবে: ভাই বন্ধুটাকে মার কাশবাজের মধ্যে অনেক খুঁজলাম, পেলাম না।

যানে? চটে গেল পন্টু।

বন্ধু তোসের আছে কি না তারই ঠিক নেই! চোখ উন্টে বলে নস্তু।

বটে। পন্টু বললে: জানিস তুটানের এখনকার রাজার ঠাকুরবা বন্ধুটা আমার ঠাকুরবার বাগকে প্রজেক্ট করেছিলেন। অবশ্য কারণ ছিল। তিনি নাকি এককোঁটা হোমিওপ্যাথি ঔষধে সেই রাজার রক্ত-আমোশা সারিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর জানিস ঐ বন্ধু ঠাকুরবার বাবা, ঠাকুরা আর আমার বাবা বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ মেরে বন প্রায় উজাড় করে ফেলেছিলেন। রীতিমত লামা বন্ধু। ডবল ব্যারেল। আর এমনি রাজা, একবার গুলী ছুঁলে হয়,

## ছোটদের আলস

গিরে জন্তুর কপালের মাঝখান ফুঁড়ে বেরিয়ে বাঘে পৌছনবার থেকে—এত জোর।

নস্ট্রে খামিয়ে দিল তাকে মাঝখান, বললে : বা বা বাজ্ঞে বকিস না।

কথাটা শুনেই পণ্টু কেমন খমকে গেল। বললে যেখানে আদি পারি—তবে—তবে—

তবে কি ?

মানে, খুব লুকিয়ে যেখানে হবে, বাবা। যখন অকিসে যাবেন, দুপুরে সেই সময়ে।

কেন ? নস্ট্রে প্রশ্ন করলে।

মানে, পণ্টু, বললে, বাবা। এখানে বসি হ'য়ে আসার পর থেকে আর বন্দুক ধরেন নি। কি করে ধরবেন। এই কলকাতায় বন্দুক ছুঁতে গেলোই তো। কারো রান্নাঘরের হাড়ির মধ্যে ঢুক যাবে। বা নিজস্ব সব বাড়ি। আর আমাকেও বাধণ করে দিয়েছেন বন্দুক ছুঁতে—বতদিন না মেজর হই।

গোপনা। আবার হঠাৎ বোকার মত বলে ফেললো : সে কি ? তুই মিলিটারিতে ঢুকবি বুঝি ? কিন্তু মেজর হবার আগেই তো তাকে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে হবে।

পণ্টু বললে : আরে বোকা, সে মেজর নয়। একশ বছর হ'লে সাবালক হবে। তারপরে বন্দুক ছোঁড়া শিখবে।

নস্ট্রে বললে : থাক গে। সে তুই যখন শিখবি, শিখবি। এখন তাদের বন্দুক দেখাবি কি না বল।

পণ্টু একই ভেবে বললে : আচ্ছা তোরা আসিস পরত বুধবার দুপুরে, দেড়টা নাগাদ। মা-ও তখন ঘুমবে।

বুধবার দেড়টার শুটি-শুটি আমরা তিন চারজন গেলাম পণ্টুদের বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি। বাইরের ঘরে পণ্টু আমাদের বসালো। দেখলাম, দেওয়ালে হরিণের শিং, মোঘের শিং, ফরাসে বাঘের ছাল পাতা।

পণ্টু বললে : সব ঐ বন্দুক মারা।

নস্ট্রে বললে : দেরি করিস নে, নিয়ে আর তাদের বন্দুক। দেখি একবার গতিরাগটাকে। বন্দুকটা কোথায় আছে, জানিস তো।

পণ্টু বললে : জানি, মা'র আলমারির তলার বন্দুকের বাজ্ঞে বন্ধ করা। বাসু তোরা, আনি।

পণ্টু চলে গেল। আমরা ভাবতে লাগলাম—সেই অদ্ভুত ভূটানী বন্দুকের কথা—বা ছুঁলেই গুলী গিরে লাগে জন্তুর ঠিক মাঝ-কপালে। শুধু তাই নয়, যার দাপটে কত না জীবজন্তুর ইহলীলা শেষ হয়েছে। কয়টি প্রমাণ তো আমাদের চোখের সামনেই।

একটু পরেই পণ্টু এলো, পা টিপে-টিপে। হাতে তার লম্বা একটা বাজ্ঞ। টেবিলের উপর রাখলো সেটা। আমরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার উপর।

পণ্টু মরচে-পড়া ছিটকিনি খুলে ডালাটা ওঠাতে ওঠাতেই আমরা তো অবাক। বন্দুক কোথায় ? কাঠের শুড়োর মধ্যে জংবা জোড়ানলটা পুঁড়ে আছে শুধু। আর বাজ্ঞটা উইয়ে ভর্তি।

নস্ট্রে ঠাটা করে বললে : বন্দুক কৈ রে ? এ তো দেখছি, এক জোড়ানল। লোহার বাঁধি বুঝি ? ক্লারিভেনট ?

পণ্টুও অবাক হয়ে গেছিলো। ছলছল চোখে বললে : উইগুলো বন্দুকের ব্যাটনটা—ইস্, একেবারে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। বাজ্ঞটা এতদিন খোলাই হয় নি তাই.....

গোপনা কবিতা বানিয়ে ফেললে :

উইগুলো। বড় পাঞ্জি : দেখ, ব্যবহার

ভূটানী বন্দুক খেয়ে করে ছারখার।

মনে হ'ল ঘরের হরিণ-মোষ-বাঘদের ছিন্ন অংশগুলো যেন হো-হো করে হেসে উঠলো। বন্দুককে যেন বললে—কি ভায়া ? আমাদের মেরে শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলো উইয়ের পেটে।

রেমো বললে : সত্যি, কার কপালে যে কি ঘটে, বলা যায় না।

পণ্টু বন্দুকের বাজ্ঞ বন্ধ করলে।



বাইল

শিল্পী—সীতেশ রায়

## রেশম সূতার গোড়ার কথা

শ্রীবরুণচন্দ্র মল্লিক

সিঁদুর ভাস্ম-কাপড় কার না প্রিয়বস্ত। উৎসবে, পূজাপার্বণে সিঁদুর ভাস্ম-কাপড় পরা বা কেনা যেন একটা অপরিহার্য অঙ্গ। তোমরাই বল এ সময়ে তোমাদের জন্ম সিঁদুর কিছু একটা না হলে মনটা কেমন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কি ভেবে দেখেছে, এই চিহ্ন হেন জিনিসটা কি ? আর কি করেই বা আমাদের প্রমোজনীর সামগ্রীর উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ সেই কথাই তোমাদের জন্ম লিখছি।

তোমরা জান কাপড় তৈরির কাঁচামাল সূতা। সূতার উৎপত্তির প্রকারভেদে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী দেখা যায়। যেমন (১) উদ্ভিজ বা প্রোটিন ফাইবার, (২) প্রাণিক বা এ্যানিম্যাল ফাইবার ও (৩) কৃত্রিম বা সিন্থেটিক ফাইবার। কার্পাস সূতা ও নাইলন যথাক্রমে প্রাচীন ও কৃত্রিম ফাইবার জৈবিক আর এ্যানিম্যাল ফাইবার বলতে পশু ও রেশমের কথাই বোঝায়।

মহুতের সৈন্যদল জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যে সব কাঁচ ব্যবহৃত হয় রেশম-কাঁচের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। খাতের

তারতম্যামুসারে রেশমকীটের মধ্যেও শ্রেণিগত পার্থক্য দেখা যায়, তবে সকল রেশমকীট জীবন-প্রণালী প্রায় এক।

রেশমমূত্ৰতা প্রস্তুতকারী কীটকে চলতি ভাষায় পলু বলে। প্রথম অবস্থায় এগুলি দেখতে ছোট সরিষাকৃতি এবং ডিম নামেই পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যে এসব ডিম থেকে ছোট ছোট তুঁতগাণ্ডকার মত পলু বার হয়, এ অবস্থায় এদের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তুঁতগাছের পাতা খাওয়ানো হয়। বীরে বীরে পলু তুঁতগাছের পাতা খেয়ে বাড়তে থাকে এবং বড় হলে বা পাকলে এদের গায়ের রং-এ পরিবর্তন আসে। এ অবস্থায় দেরি না করে পাতলা বাশের পাত দিয়ে তৈরি প্রেক্ষার মধ্যে এদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পলু নিজের স্বভাব-ধর্মামুযায়ী একটা কোণ বেছে নেয় এবং বীরে বীরে এক ধরনের মূত্ৰতা নির্গত করতে থাকে এবং এই মূত্ৰতার মধ্যেই সমস্ত দেহটাকে গোপন করে। এ অবস্থায় এদের লেহেও ক্রমিক পরিবর্তন হতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই এরা পুতলিকায় রূপান্তরিত হয় এবং এই পুতলিকা, পরে প্রজাপতি হয়ে গুটি কেটে বার হয়ে যায়। আবার চলে ডিম পাড়ার পালা। এভাবে চলে এদের বৈচিত্র্যময় জীবনচক্র।

পুতলিকা অবস্থায় গুটিগুলি বোদের তাশে বা গরম জলে দেখ করা হয় এবং এর ফলে পুতলিকা মরে যায় আর গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বার হতে পারে না। কাটা গুটিতে নিরবস্থির মূত্ৰতা পাওয়া সম্ভব হয় না বলেই পুতলিকাগুলিকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হবার আগেই মরে ফেলা হয়।

গুটির আকার ও শ্রেণিভেদে মূত্ৰতার নির্ভর করে। গুটি থেকে হাতে ও মেনিয়ে দু'রকমেই মূত্ৰতা কাটার প্রচলন আছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় মালদহ জেলায় মূত্ৰতা কাটাই-এর কারখানা আছে। কাঁচা রেশমমূত্ৰতার তার কত মোটা, তার মাথের একক ডেনিয়ার। চারশ' পঞ্চাশ মিটার কাঁচা রেশমমূত্ৰতার ওজন যদি পাঁচ সেন্টিগ্রাম হয় তবে তা এক ডেনিয়ার। কাজেই এক ডেনিয়ার ওজনের মূত্ৰতা খুবই মি'হ। সাধারণ কাপড় বুনতে দশ বা এগারো ডেনিয়ার থেকে শুরু করে আরও মোটা মূত্ৰতা ব্যবহৃত হয়।

তা হলে জানলে তো কিভাবে রেশমমূত্ৰতা তৈরি হয়। বড় হলে এ সম্বন্ধে আবও বিস্তৃত জ্ঞানতে পারবে।

## ভাগাভাগি

জসিমউদ্দিন

বাঁপ মরিয়া গিয়াছে। দুই ভাই পৃথক হইবে। বড় ভাই

ছোট ভাইকে বলিল,—দখ, আমাদের গাইটা আছে। কাটিয়া ত' আর দুই ভাগ করা যাইবে না। তুই ছোট ভাই। তোকেই গাই-এর বড় ভাগটা দেই। তুই গাই-এর মুখের দিকট, নে। আর আমি গাই-এর পেজের দিকট লই।

ছোট ভাই ভারি খুশি। বড় ভাই তাকে ভাল ভাগটা দিয়াছে, সেখান সে বড় ভাই-এর প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সে সারাদিন এখান হইতে ওখান হইতে বাস কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ার। বড় ভাই রোজ সকালে কাড়ি ভরিয়া দুধ দোয়ান। সেই দুধ দিয়া

ছানা বানায়, ছানা দিয়া রসগোল্লা বানায়, সন্দেশ বানায় আরও কত কি বানায়। বলত খোকা-খুকুরা, আর কি কি বানায়? বে আগে বলিবে তারই জিৎ।

বড় ভাই ভারি খুশি। বেশ আমার ছোট ভাই। এমনটিই ত' চাই। এবার বুকিতে পারিলাম, বাশের সম্পত্তি তুমি ঠিকই রক্ষা করিতে পারিবে। তোমার ভাগে যখন গরুর মুখের দিকটা পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তোমাকে ভালমত তাকে খাওয়াইতে হইবে।

বড় ভাই-এর তারিফ শুনিয়া ছোট ভাই আরও বেশি করিয়া গরুকে হাস দেয়, বড় ভাই আরও বেশি করিয়া গরুর দুধ দোয়ান, আর ছোট ভাইকে আরও বেশি করিয়া তারিফ করে।

একজন চালাক লোক একদিন ছোট ভাইকে বলিল—আরে বোকা! তুই গরুর মুখের দিকটা লইয়া দিনাতি গরুকে হাস খাওয়াইয়া মরিতেছিস আর ওদিকে তোর বড় ভাই মজা করিয়া দুধ দোয়াইয়া লইতেছে।

ছোট ভাই-এর তখন টনক নড়িল। তাই ত'। কিন্তু এখন ত' কিছুই করার উপায় নাই। আমি যে আগেই গরুর মাথার দিকটা লইয়া ফেলিয়াছি। হাস আমাকে খাওয়াইতেই হইবে।

চালাক লোকটি তখন ছোট ভাই-এর কানে কানে একটি বুদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সকাল। যেই বড় ভাই গরুর দুধ দোওয়াইতে আসিয়াছে অমনি ছোট ভাই গাই-এর মাথার একটি মুণ্ডর লইয়া মারিতে আরম্ভ করিল। মুণ্ডরের চোটে গাই এদিক নড়ে ওদিক নড়ে। গাই-দোয়ান অসম্ভব।

বড় ভাই তখন বলে—আরে করিস কি, করিস কি?

ছোট ভাই উত্তর দেয়—আজ আমি গরুকে হাস খাওয়াই আর দুধ দোওয়াইয়া লইয়া বাও তুমি। আমাকে একাকীটা দুধও দাও না। গরুর মাথার দিকটা যখন আমার, তার উপরে আমি মুণ্ডরই মারি আর কুড়ালই মারি, তুমি কোন কথা বলিতে পারিবে না।

বড় ভাই বুলিল, কোন চালাক লোক ছোট ভাইকে বুদ্ধি দিয়াছে। তখন ছোট ভাইকে বলিল—আহা, তুই গরুর মাথার মুণ্ডর মারিস না। এখন হইতে গরুর দুধের অর্ধেক তোকে দিব।

ছোট ভাই বলিল—তুমি অর্ধেক দুধ দিলেই চলিবে না, তোমাকে আজ হইতে গরুর খাইবার লজ্জা অর্ধেক হাসও কাটিতে হইবে। নইলে এই মারিলাম আমি গরুর মাথার মুণ্ডরের বা।

: আরে রাখ রাখ।—বড় ভাই নরম হইয়া বলে—আজ হইতে অর্ধেক হাসও আমি কাটিব।

বাড়িতে ছিল একটা খেজুর গাছ। শীতকালে খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করিতে হইবে। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে,—আমাদের একটামাত্র খেজুর গাছ। কাটিয়া ত' ভাগ করা যাইবে না। সেবার গরুর মাথার দিকটা লইয়া তুই ঠিকিয়াছিলি। এবার বল খেজুর গাছের কোন দিকটা নিবি? তুই-ই আগে ভাগ নে।

ছোট ভাই উত্তর করে—আমি খেজুর গাছের গোড়ার দিকটা লইব।

বড় ভাই খুশি হইয়া বলে—আচ্ছা, তোর কথাই থাক। তুই



## ছোটদের আসর

ছোট ভাই, ভাল ভাগটা চাহিলে আমি বড় ভাই হইয়া ত' না করিতে পারি না।

ছোট ভাই লইল খেজুর গাছের গোড়ার দিকটা। সে সেখানে রোজ জল ঢালে। বা'তে গাছ আরও তাজা হয়। বড় ভাই গাছের আগার হাড়ি বসাইয়া মনের আনন্দে রস পাড়িয়া আনে। শীতকালে খেজুরের রস খাইতে কি মজা! রস দিয়া গুড় তৈরি হয়—গুড় দিয়া চিনি তৈরি হয়। চিনি দিয়া কি কি তৈরি হয় খোকা-খুকুরা? বল, বল, যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিৎ।

এইভাবে কিছুদিন ব'র। বড় ভাই খেজুরের রস খাইয়া মোটা হইয়া উঠিয়াছে। আর ছোট ভাই গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে ঢালিতে মাঝায় ব্যাধা করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন সময় সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া দেখিল, বোকা ছোট ভাই কেমন ঠকিয়াছে। সে তখন ছোট ভাইকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিল।

ছোট ভাই বলিল—ত'ই ত' এবারও আমি ঠকিয়াছি। কিন্তু খেজুর গাছের গোড়ার দিকের ভাগ ত' আমি নিজেই চাহিয়া লইয়াছি। এর ত' আর কোন প্রতিকার হইবে না।

: দূর, বোকা কোথাকার। বৃদ্ধি থাকিলে প্রতিকার হবে না কেন? এই বলিয়া চালাক লোকটি ছোট ভাই-এর কানে কানে আর একটি বৃদ্ধি দিয়া গেল। বলত খোকা-খুকুরা কি বৃদ্ধি দিয়া গেল?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা যেই বড় ভাই খেজুর গাছে উঠিয়া সেখানে হাড়ি পাতিতে গাছের খানিকটা কাটিতেছে, অমনি ছোট ভাই একখানা কুড়াল লইয়া খেজুর গাছের গোড়া কাটিতে লাগিল—খপ, খপ, খপ, খপ।

বড় ভাই গাছের উপর হইতে শব্দ শুনিল—আরে, করিস কি? করিস কি?

ছোট ভাই গাছের গোড়ায় কুড়াল মারিতে মারিতে উত্তর করিল—তুমি গাছের মাথা লইয়াছ। রোজ গাছের মাথা হইতে রস পাড়িয়া খাও। আমাকে একটুও দাও না। আমার খনন গাছের গোড়াটা, সেখানে আমি কুড়াল মারি আর বাই করি, তুমি

কিছু বলিতে পারিবে না। এই বলিয়া ছোট ভাই আবার গাছের গোড়ায় কুড়ালের কোপ মারিতে আরম্ভ করিল, খপ-খপ-খপ, খপ।

: আরে, থাম থাম। বড় ভাই বলে—আজ হইতে খেজুরের রস তোকে অর্ধেক দিব।

দুইভাই বেশ আছে ভাল। গরুর দুধ আর খেজুরের রস দুইজনে ভাগ করিয়া লয়।

তাহাদের বাড়িতে ছিল একখানা মাত্র কাঁথা। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে—দেখ, কাঁথাখানাকে ত' ছিঁড়িয়া দুইটুকরা করা যায় না। তুই কাঁথাটা দিনের ভাগে তোর কাছে রাখ, আমাকে রাত হইলে দিস।

ছোট ভাই খুব খুশি। বড় ভাই তাহাকে আদর করিয়া দিনের বেলায় জন্ম কাঁথাখানা দিয়াছে। কিন্তু দিনের বেলা গরম। তখন ত' কাঁথা গায়ে দেওয়া যায় না। সে কাঁথাখানাকে সারাদিন এতাজ করিয়া ওভাঁজ করিয়া দেখে। রাত হইলে বড় ভাই কাঁথাখানা লইয়া যায়।

ছোট ভাই সারারাত শীতে ঠকঠক করিয়া কাঁপে।

বড় ভাই দিবি্য আরামে কাঁথা গায়ে দিয়া রাতে ঘুমায়।

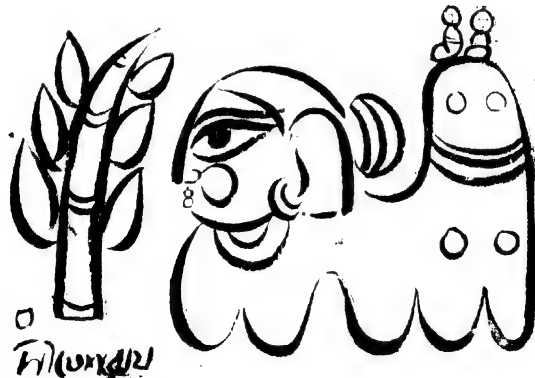
সেই চালাক লোকটি আবার আসিয়া ছোট ভাই-এর অ'খা দেখিল। দেখিয়া তার কানে কানে আর একটি বৃদ্ধি দিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই তার কাঁথাখানা জলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিল। বড় ভাই যখন শুইবার সময় ছোট ভাই-এর কাছে কাঁথা চাহিল, সে তাহাকে ভিজা কাঁথাখানা আনিয়া দিল।

বড় ভাই খুব রাগ করিয়া বলিল—আরে, করিয়াছিস কি? কাঁথাখানা ভিজাইয়া রাখিয়াছিস!

ছোট ভাই বলিল—কাঁথাখানা যখন দিনের ভাগে আমার, তখন সেটা দিয়া আমি দিনের ভাগে বাণী ইচ্ছা করিতে পারি। তোমা' ইহাতে কোন কথা বলিবার নাই।

বড় ভাই তখন বলিল—আচ্ছা, কাল হইতে আমরা দুইভাই একত্রে কাঁথার তলে শুইব।



খেলার

শ্রী—সীতেশ রা

# সাহিত্য পরিচয়

Mukta-Dhara

**আলোচ্য পুস্তকটি এক অমুবাদকর্ম।** রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকের সংস্কৃত অমুবাদ করেছেন লেখক, অমুবাদকর্মের বা প্রধান সম্পদ সেই সাবলীলতা। এতে পরিপূর্ণরূপেই বর্তমান এবং বিশেষ করে সেজন্তাই এই রচনাকে স্বচ্ছন্দে শিল্পোত্তীর্ণরূপে অভিহিত করা যায়। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্র-রচনার অন্তর্নিহিত ব্যক্তনাকে সঠিকভাবে ভাবান্তরিত করাটা বড় সহজসাধ্য নয়, কিন্তু বর্তমান অমুবাদক সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনাকে বর্তমানে নানা ভাষায় অনূদিত করা হচ্ছে কিন্তু সেসব ভাষার অধিকাংশই বিদেশী; স্বদেশের পুণাতন সস্তুতির প্রতীক সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্র-প্রতিভাকে মূর্ত করার প্রচেষ্টা যে একান্তরূপেই প্রশংসনীয় সে সন্দেহে সন্দেহমাত্র নেই। বর্তমান অমুবাদক সেজন্ত প্রভূত সাধুবাদের অধিকারী। এই অমুবাদকর্মটির আজিক ছাপা ও বাঁধাই স্বাধাযথ। লেখক—প্রোঃ ধ্যানেশনাথ্যর চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীমতী উষাদেবী চক্রবর্তী, এম-এ, বি-টি, ১৩২।৫। শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলি-৩১ (পশ্চিমবঙ্গ)। দাম—তিন টাকা।

## রাম্মার বই

রাম্ম—কথাতো শুনেই অংশ অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু এই ছোট শব্দটির তাৎপর্য বড় কম নয়, সুশাণিত খাতের আকর্ষণ প্রায় সর্বজনীন, মানুষের বস্তু ইন্ড্রির কাছে রসনা তার মধ্যে অন্ততম প্রধান। সুখাত এই রসনাকেই তৃপ্ত করে এবং বলা বাহুল্য এই পথে মনকেও ছুঁয়ে যায় স্বচ্ছন্দেই। আমাদের দেশে মেরো এ তথ্য খুব ভালভাবেই অঙ্গগত আছেন বলেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত রাম্মার নানারকম কেরামতি দেখানোতে ক্ষান্ত থাকেন নি কখনও, আর হরত বা সেজন্তই ছোট 'রাম্ম' শব্দটি আজ রক্তনশিল্পরূপেই পরিগণিত হচ্ছে, বর্তমান গ্রন্থটিও এ সংক্ষেপে বিশেষ আলোকপাত করে। লেখিকা অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে বহুবিধ নতুন ধরণের রাম্মার প্রকরণ সিপিং করেছেন, অভিজ্ঞা থেকে অনভিজ্ঞা সব বন্ধন ছুঁ মহিলাই যে এ রচনার ব্যাট উপকৃত। হবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই, অংশ রক্তনশিল্পে যা পুরুষের কোন অধিকার নেই সেটা বলা উচিত নয়, সেজন্ত বলা উচিত যে কোন রক্তন-বিলাসী ব্যক্তিই এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। সে বাই হোক গুরুত্বের দৈনন্দিন সহজ সাধারণ স্তরতা, ভাল, ভালনা থেকে ভোজের পর্যায়ভুক্ত হরেকরকমের উচ্চত্বের রক্তনপ্রাণীও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে এবং সেটা লেখিকার পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের বিষয় সেটা হল তাঁর শিক্ষা-প্রাণীর সহজগম্যতা, মনে হয় এ গ্রন্থ হাতে থাকলে বহু আনাড়ীও রাম্মার নামে কাম্মার বললে সোৎসাহে কোমর বাঁধবেন হাতা-বেড়ি-খুঁজি নিয়ে সমুখ-সমরে অবতীর্ণ হতে। এক কথায় রক্তনশিল্পের উপা এ ধরণের

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় কমই লেখা হয়েছে। বইটির আজিক, চাপা ও বাঁধাই জটিলীন। লেখিকা—সুলেখা সরকার, প্রকাশক—এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রোঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চট্টোজ্য স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নশা পরসা।

## পক্ষ পক্ষ

বর্তমান উপগ্রাসটি বিদ্যুতিভূষণের সাম্প্রতিক রচনা, স্বাধীনতার মূল্যবাক্য ভারত ভাগের পরিকল্পনা মেনে নিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যে ভ্রম করেছিলেন একদিন, তারই মূল্য দেশবাসী কিভাবে আজও দিয়ে চলেছে সেটাই দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ, বাস্তবহার্য বাদের একমাত্র পরিচয় কি অপরিমীম দুর্গতির মাঝে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে, এ গ্রন্থে রয়েছে তাদেরই ইতিহাস। দু'মুঠি ভর ও একখানি বস্ত্র; মানুষের এই সামান্ততম অধিকারটুকুতেও যারা বঞ্চিত সেই সর্বহারাদের জন্ত যে বেদনা লেখকের মনে সঞ্চিত হয়েছে কাহিনীর প্রতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে সেটাই। এবটা গোটা জাতির জীবনে অধঃপতনের এই সীমাহীন বিকার দেখে যেন শুষ্কিতপ্রায় তিনি, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে আছে একটু আশা এবং বিশ্বাস, পক্ষ পক্ষের মধ্য থেকেই কি ফুটে ওঠে না পক্ষ ? বিনোদ আর বিধু পক্ষ পক্ষের পক্ষের মতই যারা একদিন ফুটে উঠল, দেশের প্রত্যাশা তাদের মাঝেই মূর্ত; উদ্বাস্ত জীবন নিয়ে এবাং তে বহু রচনাই রচিত হয়েছে কিন্তু তা সব্বেও এ রচনা বৃষ্টি অনন্ত, দরদ ও আন্তরিকতার যে অদ্ভুতপূর্ণ পরিচয় উজ্জ্বল এ রচনা, তা সত্যই তুলনাহীন আর এখানেই লেখকের শিল্পিসত্তার ঘটেছে পূর্ণ বিকাশ। বর্তমান উপগ্রাসকে উদ্বাস্ত জীবনবেদ বললেও বোধ করি অত্যুক্তি করা হয় না। আমরা এ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাক্ষ্যকামী। প্রচ্ছদ-শিল্প শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—বিদ্যুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনার—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রোঃ লিঃ, ২, শ্রীমাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

## অষ্টক

রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থলেখকের এক বিশেষ আসন আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত আটটি রসমধুর গল্প সংগৃহীত হয়েছে এই সংক্ষিপ্তাকার গ্রন্থটিতে। কোন কাঁট বা চমকবর্তিত আধ্যাত্মিকগুণি যেন অনাবিল আনন্দেরই প্রতীকস্বরূপ, পড়তে পড়তে পাঠকের মনও যেন এক রসনির্ভরে অবগাহন করে ওঠে। একান্ত ঘরোয়া ছোটখাট ঘটনা-সমষ্টির মধ্য থেকেই অধিকাংশ কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু লেখকের বাহুকরা লেখনী কল্যাণে সামান্ত বিষয়বস্তুর এক অসামান্য মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে রসাতীর্ণ সাহিত্যে পরিণত। হাসতে ধীরে ভালবাসেন তাঁদের কাছে এ রচনা পরম উপভোগ্য বলেই প্রতীয়মান হবে। আজিক, ছাপা ও

## সাহিত্য পরিচয়

বাঁধাই ক্রটিহীন। লেখক—বিজ্ঞতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—রবীন্দ্র সাইন্সেস, ১৫২, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আড়াই টাকা।

## রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ (প্রথম খণ্ড)

রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে প্রামাণ্য রচনাদির অভাব নেই; তবু স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান গ্রন্থটিতে ঠিক যেনা যে কবিমানসকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা হয়েছে তা এতটুকু নতুন ধরণের। রবীন্দ্র-সাহিত্য চিন্তাশীল পাঠকমননে ঠিক কোন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আলোচ্য গ্রন্থ লেখক সেটাই দেখাতে চেষ্টাছেন। বর্তমান খণ্ডে কবির আত্মসত্তার, কৃতি, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণার একটা সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং এই সূত্রে তাঁর যেসব রচনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন, সেইসব রচনাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'বাজ কৌতুক' ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ রচনাকে অবলম্বন করে তাঁর কবিসত্তার যে ক্রমবিকশিত রূপটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা সত্যই আকর্ষণীয়। বিশ্ববস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিযোগবশত মালিনী, চিত্রাঙ্গদা, পঞ্চভূত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রচনা নিজেও পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, সাহিত্য পাঠের ভূমিকার যার মূল্য বাড় কম নয়। প্রাথমিক ও মননশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ যথেষ্ট মূল্যবান বলেই পরিগণিত হবে। চিন্তাশীল ও বোদ্ধা পাঠকসমূহই যে বর্তমান রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্দ। আঙ্গিক শিল্প কচিদ্রব্য, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—হরপ্রসাদ মিত্র, প্রকাশক—ডি এম সাইন্সেস, ৪২, বর্ন ওয়াশিং স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, দাম—নয় টাকা।

## সম্পূর্ণাঙ্ক

জরাসন্ধ ও তাঁর লৌহকপাট, বাংলা সাহিত্যের পরিসরে অতি সুপরিচিত দুই নাম, বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তু শোষণে নামটির উপরই নির্ভরশীল। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' যে শুধু বিষয়বস্তুর আন্তরিকতাই উল্লেখ্য তা নয়, তিনখণ্ডে বিভক্ত এই বৃহৎ গ্রন্থখানির আসল আকর্ষণ এর বৈচিত্র্য, মূল কাহিনীর উপর নির্ভর করে দেখা দিয়েছে কত প্রসিদ্ধ কাহিনী, কত আখ্যায়িকা এবং ঐক্যতপকে এরাই মূল গ্রন্থের মৌল আকর্ষণ। আলোচ্য গ্রন্থ এই ধরণের কয়েকটি আখ্যায়িকা একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে মূল গ্রন্থ থেকে চ্যিত হয়ে, বস্তুত তিনখণ্ডে বিভক্ত সবুজ গ্রন্থ 'লৌহকপাট' পড়বার সুযোগ-সুবিধা না ঘটলেও পাঠক এই গ্রন্থে তার রসাদান করতে পারবেন সহজেই। বর্তমান আখ্যায়িকাগুলি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে অবহীনায়গণে সমৃদ্ধ হলেও এর কোনটিই কল্পনাপ্রসূত নয়, লেখকের জীবনব্যাপী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফসল; দূরদর্শী স্ফূর্ত এক কার্যকর্মী কয়েকটা পোষাকের অন্তর্গত যে মনুষ্যকে দেখছেন, খুঁজছেন—আলোচ্য কাহিনীগুলি তাই মূল বস্তু। কি গভীর সহমুগ্ধতাই না প্রকাশ পেয়েছে এদের মাঝে; চমক বা মননশীলতার বৈকিঙ্গ সাজানো ক্ষমতারূপে বচনর কচকচিতে আধুনিক পাঠক বহন বিভ্রান্তপ্রায়, তখন এই ধরণের রচনা তাঁদের পক্ষে আহায ও ওষধ এ দুটিরই কাজ

করে; মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচর যে হৃদয়, সেই হৃদয়েরই হৃদয়কে ধন্য এ রচনা, মনকে অভিভূত করে এখানে দোলা দিয়ে যায়। মানবদরবী লেখকের উদ্দেশ্যে পাঠকের শ্রদ্ধাও তাই এখানে স্বতঃ-উৎসারিত। নামে 'সম্পূর্ণাঙ্ক' হলেও, মোট অষ্টটি আখ্যায়িকা ছাড়া শেষেই এই গ্রন্থে। প্রচ্ছদ-শিল্প সুবন্দ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জরাসন্ধ, প্রকাশক—রবীন্দ্র সাইন্সেস, ১৫২ শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা।

## নিজস্ব সৈকতে

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের বর্ণিত সাহিত্যকারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কাহিনী গড়ে উঠছে তীর্থযাত্রী কয়েকটি মানুষকে িরে, মানসিক বেদনার বিপরীত এক তরুণীকে সঙ্গে করে নীচালের পথে যাত্রা করেছেন চারজন নারী, পথে পরিচর ঘটল ভবনুর এক যুবকের সাথে, স্নেহে কৌতুকে বেদনার পথে সঙ্গীকে অপরিচয়ের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আপন করে নিতে বাংলা না এক লহমার ভারও, প্রবাসের দিনগুলোও যেন উড়ে গেল দ্রুত পক্ষ বিস্তার করে; মানুষে মানুষে মিলন যে কত সহজ কত সুন্দর তাই পরিচয়ে যেন হস্ত হয়ে উঠেছে এ রচনা। লেখকের রূপক শৈলীতে বিবৃত কাহিনী অতি সহজেই অধিকার করে পাঠকের হৃদয়; পড়তে পড়তে এক অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে মন, মনে পড়ে যায় বিখ্যাত পদবর্তার দুটি চরণ 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' এ যেন উপলব্ধির চক্রেবশ এক গল্প কবিতা, পড়া শেষ হয়ে গেলেও স্বার্থক বক্তার তোলে মনো। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। লেখক—কাশ্যুট, প্রকাশনায়—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইংট রিঃ, ২, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—সাত টাকা।

## অনল আয়ুর্জি

বর্তমানে পুরাতনী বাতাকে নিয়ে সাহিত্য রচনাও এতটা প্রাণবন্ত দেখা দিয়েছে, এতে উপকার বিবিধ, প্রাথমিক কথ-সাহিত্যে গতায়ুগতিকতার পরিবর্তে নতুন ধরণের রস আমদানী করাও দিহান্তে সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচর ঘটানো; আলোচ্য উপলব্ধি এ দুটিরই স্বাক্ষর বর্তমান। সত্যিই কথ-সাহিত্যের এক বহু অলোচিত কুপ্রথা। যদিও অধুনালুপ্ত তবু এবারি যে এ ভয়াবহ প্রথা দেশের মর্মসূত্রেই শিকড় গেঁথেছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই—বর্তমান রচনার প্রধান উপজীব্যও এটাই। সত্যিই কথ-সাহিত্যে বিতর্কে প্রচলিত ছিল এ রচনার তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে, সেইসঙ্গে বয়োজুগপ্তবর্তক রাজা রামমোহন বাবুর এক পরিচ্ছন্ন পরিচর, উনিবিশ শতকের এই বাসাকে অরুণ করতে হলে ষাঁকে বিদ্যুত তরবার উপর নেই কোনক্রমেই। অশ্রদ্ধ মুল্লানার সঙ্গে লেখক আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন অতীত বাংলার এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে। 'যে' ন বহু আলো তত অন্ধকার, কোঁকিল ও সত্যিই প্রাণের যুগকাঠি নিজে নিজে শত হুসর রমণীর আকুল ক্রন্দনকে ভুবিয়ে দিয়ে যেখানে পেশাচি জানালের জঘটক বেজে উঠত মহাসমারোহে—মৃত ধনীর প্রামোদ-সাগরে নিঃশ্রুত হয়ে যেত মানুষের মনুষ্য, নারীর সত্যি। তবু এই যদ-তদ্রিপ্রা ভেদ করেও স্মৃতি উঠেছে বারবার আলোর দিশা; জ্ঞানের দীপশিখা আলিয়ে

সমাজের পুঞ্জীভূত মানি অপসারণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন কয়েকজন মানুষ সে সময়, বীদের নাম বাংলা ভাষা বাঙালী এখনই তুলে নেন। আর সেই অবিস্মরণীয়দেরই পুরোধাস্বরূপ জলবে একটি নাম, সে নাম রাজা রামমোহন রায়। আলোচ্য রচনার গ্রন্থকার এই অপ্রতিপত্ত সত্যকে বড় আন্তরিকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কৌশলে কাল্পনিক কাহিনী যেন সত্য-ঘটনার মতই দৃঢ়বস্ত্র হয়ে উঠেছে। সেকালের শ্রাবণীয় কয়েকটি ঘটনা ও মানুষের নাম অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত হয়েছে, বাস্তব ও কল্পনার মেশামিশি কোথাও এতটুকু অতিরিক্ত ঠেকে না, আর সেটাই তাঁর সর্বোত্তম কৃতিত্ব। চরিত্র সৃষ্টিতেও নিপুণ তিনি, গ্র্যান্টনী কবিরাজ, নিরুপমা, রাধারাবী, হরশঙ্কর, কানাগিন্নী প্রভৃতি চরিত্রের, কয়েকটি ঐতিহাসিক, কয়েকটি কাল্পনিক, কিন্তু সব ব্যক্তিই সমান জীবন্ত, সমান কৌতুহলপ্রদ। বাংলা সাহিত্যে লেখক আজ এক চিহ্নিত স্থানের অধিকারী, মনে হয় ভবিষ্যতেও তাঁর লেখনী সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে, কিন্তু একথা বোধ হয় সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বর্তমান রচনাই তাঁর সাহিত্য কর্মের সর্বোত্তম পরিচয়রূপে কীর্তি হতে থাকবে। বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ এক চিরকালীন সংযোজন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—মুন্সীল রায়, প্রকাশক—এস. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট, লিঃ, ১-সি, কলেজ রো, কলিকাতা-১২, দাম—পনেরো টাকা।

### ছাত্রদের আশুতোষ

বাংলার 'ব' অ'স্তত্যের এই নতুন জীবনচিহ্নটি ছাত্রদের উপযোগী করে রচনা করেছেন লেখক। বর্তমান বৎসর এই মহাপুরুষের শতবার্ষিক উৎসবের বৎসর—এই উপলক্ষে তাঁর কর্মের বিবৃতি চরিত্র-কথা নতুন করে আলোচনার সুযোগ পেয়ে ছাত্রের সত্যই উপকৃত হবে। লেখক বহু জীবনীমূলক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন এ ধরন-এধা-এ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতাও অনস্বীকার্য। আলোচ্য রচনাতেও তাঁর ছাপ রয়েছে। আশুতোষ জীবন ও কর্মের এক সুস্পষ্ট পরিচয় উজ্জ্বল এ রচনা তাঁর বিশেষভাবেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—মণি বাগ্‌চি। প্রকাশনা—অক্ষয়কর্মে ইউনিভার্সিটি প্রেস, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা।

### শিক্ষাপুস্তক আশুতোষ

বাংলার বরণ্য-পুস্তক শ্রীর আশুতোষের নাম নানা কারণেই শ্রাবণীয় হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে বাংলা ও বাঙালী চিহ্নিন সন্তোষভাজনে মনে রাখবে; আলোচ্য জীবনী-গ্রন্থে লেখক বিশেষ করে এই দিকটিতেই আলোকপাত করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের শ্রী ও সমৃদ্ধি যে একান্তরূপেই 'আশুতোষের' জীবনব্যাপী সঞ্চার ফল এ রচনায় সে সত্য স্বপ্রকাশ। বাংলা ভাষার ও তাঁর দরদর, ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে তাঁর প্রচেষ্টা, প্রচেষ্টা অস্বীকার্যের সত্তা তাঁর বিপুল আয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করে তার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম হুঁড়ে শিক্ষাবিগণকে আরোহণ করানোর জন্য তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

এ সবেরই বিশদ পরিচয় বিবৃত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ। আজকের এই হতাশাগ্রস্ত, অশ্রুফের দিনে মহৎ লোকের মহান জীবনী রচনার প্রয়োজন সমধিক; এই কর্মযোগীর জীবনী রচনা বরং লেখক সেদিক থেকে এক বৃহৎ অভাব মিটিয়েছেন। লেখকের আন্তরিকতা ও সমগ্র শ্রমের ফলে এ গ্রন্থটি সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—মণি বাগ্‌চি, প্রকাশক—জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২১। ৩০, কলেজ রো, কলিকাতা-১, দাম—পাঁচ টাকা।

### ইতি তোমারই

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু মামুদী; হিন্দুনীরার পতি পরম শুকুমারী কাহিনীতে না আছে কোন বৈশিষ্ট্য না আছে কোন বৈচিত্র্য, তদুপরি বাংলায় এক স্বনামধন্য উপন্যাসিকের কোন বিখ্যাত রচনার ছাপ জায়গার জায়গায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। লেখকের আন্তরিকতা সন্দেহে অবশ্য অমুযোগ করার কিছু নেই—আর একমাত্র সেজন্যই রচনাটিকে পাঠযোগ্য বলা যায়। প্রচ্ছদ সাধারণ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশনা—অক্ষর লাইব্রেরী, ৪০, গরবাহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১, দাম—দু'টাকা।

### শেখরপীয়ারের সনেট পঞ্চাশ

মহাকবি শেখরপীয়ারের চতুর্থ-জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে এ সময় পৃথিবীর সর্বত্র, এই সন্ধিক্ষণে তাঁর অভুলনীর লিরিক কবিতাগুলিকে বাংলার অনুবাদ করে লেখক জগৎবরণে কবির প্রকৃত স্মৃতিতর্পণেই উদ্বৃত্ত হবেন। শেখরপীয়ারের সনেট বা লিরিক কবিতার সংখ্যা বড় কম নয়, আলোচ্য গ্রন্থ পঞ্চাশটি সনেট অনূদিত হয়ে একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে; অনুবাদক স্বয়ং কবি আর সেজন্যই অনুবাদকটিকে যথোচিতভাবে শ্রদ্ধাভীর্ণ করে নিতে সক্ষম হয়েছেন তিনি; মূল রচনার রস ও রূপ প্রায় অব্যাহত রয়েছে বলা যায়। অনূদিত সনেটগুলির ঠিক পাশেপাশেই মূল সনেটগুলি উদ্ভূত করে দেওয়ার পাঠকের পক্ষে মিলিয়ে নেওয়াটা সহজ হয় যায়। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই মূল রচনার সঙ্গে কাব্যানুবাদকে মিলিয়ে পাঠ করে মহাকবির স্বকীর বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় অনুভব করতে পারেন। কাব্য সাহিত্যের পরিসরে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল সংযোজন। আঙ্গিক কঠিন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদক—মণীন্দ্র রায়, প্রকাশনা—বান্ধ সাহিত্য, ৩০ কলেজ রো, কলিকাতা-১, দাম—চার টাকা।

### শৌলমারী আশ্রমের বহুশ

শৌলমারী আশ্রম ও তার সাধুকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা, তর্ক-বিতর্কের বড় বয়ে বাচ্ছে দেশে, বস্তুত এ বিষয়ে নানা মূর্খির নানা মত, শৌলমারীর সাধু বাস্তবিকই নেতাজী কি না সে সম্পর্কে সঠিক ধরন যদিও কেউই দিতে পারেন নি অত্যাধি তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, উক্ত সাধু যেরূপ হোন বা যাই হোন—তিনি অনন্ত-সাধারণ ব্যক্তির অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই বিষয়টিতেই তাঁর স্বকীর ধারণা অনুযায়ী আলোকপাত করতে চেয়েছেন। লেখকের

প্রাণ) সম্বন্ধে সম্বন্ধের অবকাশ থাকলেও একথা সন্দেহাতীতভাবেই দৃঢ় যে, তাঁর বিশ্বাস ও ধারণাকে পাঠকমনে সংকলিত করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর অধিকৃত। তেথাকের অল্পপমর্শেলী সমস্ত রচনাতিকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। উত্তরচাঁদ কথিত অশ্রু সন্নিবেশিত হওয়ার গ্রন্থের আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ বর্ষাযথ। লেখক—দীপেন্দ্রকুমার সান্দাল, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, দাম—সাত্টি টকা।

### রাজা বাদশার পথের ধারে

বর্তমানকালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের চাহিদা ও সমাদর বহুলাংশে বেড়ে গেছে, ঐতিহাসের উপাদানকে উপজীবা করে উপন্যাস রচনা করতে হ'লে সেই আদর্শের নিকট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনের নিকট লেখক সংকটদুষ্ট ও রেখেছেন। সাম্প্রতিক গ্রন্থের লেখক নিগুণানন্দ ইতিপূর্বেও কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাতে তিনি কৃতকার্যও হয়েছেন নিঃসন্দেহে। গ্রন্থটিতে মানবজীবন প্রবাহের চিত্রকে মূল্যায়নের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। মধ্যযুগ থেকে যে ঐতিহাস বর্তমান যুগ অবধি এগিয়ে এসেছে তার একপাশে রয়েছে চলমান সমাজ, আর একপাশে স্থির আদিম স্থায়। যুদ্ধ-বিগ্রহে ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থানে ও পতনে সেই মানব-মনের উপর যে প্রতিফলন ঘটেছে, তাকে লেখক সুন্দর ও মনোরমভাবে অঙ্কিত করেছেন গ্রন্থটিতে। গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসের মূল চরিত্রকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। আচার-ব্যবহার, ঐতিহাসিক, পোষাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, মানবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ক্রটিতে তুলতে সাধ্যমতো চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় গ্রন্থটিতে। বিগত যুগের চিত্র পরিবেশনে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি পাঠকসমাজ সমাদর লাভ করবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদ অপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, লেখক নিগুণানন্দ। প্রকাশনা—চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, ১১, থামাচরণ লে জ্বীট, কলিকাতা—১২। দাম—আট টাকা।

### দূর দুর্গম (ভ্রমণ-কাহিনী)

দূর দুর্গম পথ মানুষকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়ে পথে অজানাকে জানবার অদম্য কৌতুহল নিয়ে। একঘেরে সাংসারিক জীবনযাত্রা থেকে দুর্গম পথের টানে একাধিকবার বেরিয়ে পড়েছিলেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক গ্রন্থটি একটি ভ্রমণ-কাহিনী। চলার পথে লেখক কত বিচিত্র নরনারীর সংস্পর্শে এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই কাহিনীটি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন গ্রন্থটিতে। গোড়ারালের দুর্গম তীর্থ, শিখতীর্থ হেমকুণ্ড, জালামুখী, কাংড়ার গুহা, কোলাহাই হিমবাহ, অমরনাথের তুষারক্ষেত্র, নেপালতীর্থ, কোনারক প্রভৃতি তীর্থের কাহিনী মূল্যায়নের সঙ্গে ক্রটিতে তুলেছেন গ্রন্থটির প্রতি ছন্দে-ছন্দে। বর্তমান পৃথক রচনাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে যেসব সাবলীল সৌন্দর্য বিস্তারিত তার ছাপ পাঠকমনে গভীরভাবে একে দেয়। গ্রন্থটি পড়তে পড়তে পাঠক একান্ত হয়ে যায় লেখকের সঙ্গে, মনে হয় যেন বর্ণিত ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে তারও। চিত্রগুলি গ্রন্থটিকে সুশোভিত করেছে। লেখক—অজিতকুমার শ্রীমানি। প্রকাশনা—দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম, ২২/১, কন'ওয়ার্লিশ স্ট্রিট, কলিকাতা—৬। দাম—ছয় টাকা।

### প্রতীক্ষিত শব্দরা

বাংলা-সাহিত্য-আসরে বর্তমানে যে সব নবাগত লেখকের পদার্পণ ঘটেছে এবং বর্ধিত লেখনীর বলে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সাম্প্রতিক গ্রন্থের লেখক অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস। ভাণ্ডা-বিভূষিত সর্বহার্য উদ্বাস্তদের জীবন-কাহিনীকে উপজীবা করে এই মনোরম উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে লেখক যে সর্বহার্য মানুষের জীবন্ত-চিত্রের আবরণ তুলে ধরেছেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। একটুখানি মাথা গোঁজবার আশ্রয়না ও দু'মুঠি অয়ের ক্ষুদ্র অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন আজ দেশের প্রতিটি মানুষ। সেইরকম উদ্বাস্তরও জীবনের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে চলেছেন সুদিনের আশায়। তাঁদের সংগ্রাম একদিন সার্থক হবে বলে মনে করি। উপন্যাসটিতে লেখক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনীটুকু লিপিবদ্ধ করেছেন সুন্দরভাবে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কল্যাণ সেন, মনোরমা, সুনন্দা, পটল, স্বপ্না, অটল, তটিনী, ও কুমুদী প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মূল্যায়নের পরিচয় বহন করে। সুদীপুণ ব্যঙ্গনায় এবং অল্পভূতির স্নিগ্ধতা কাহিনীকে যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ করেছে। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং গভীর অল্পদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ জীবন-সচেতনতা উপন্যাসটিকে উজ্জ্বল করেছে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অচ্যুত গোস্বামী। প্রকাশক—দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম, ২২/১, কন'ওয়ার্লিশ স্ট্রিট, কলিকাতা—৬, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

### ইরানের ইতিকথা (পূর্বকাণ্ড)

ইতিহাস-অম্লরাগী বাঙালী পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থলেখক অপরিচিত নন, প্রাচ্যের বিগত গৌরব কাহিনীকে বিশ্বস্তির অঙ্কনকার থেকে আলোর আনার প্রাচ্যের তিনি ইতিমধ্যেই যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। বর্তমান গ্রন্থও সে বিশ্বস্তির স্বাক্ষরবাহী। ইরান বহু পুরাতন এক ঐশ্বর্যময় প্রদেশ, প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পায়ীঠ, এই রচনার মাধ্যমে গ্রন্থকার এই প্রদেশের এক প্রামাণ্য ও আকর্ষণীয় পরিচয় প্রদান করেছেন। ইরানের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানের প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ সমূহের সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় ঘটানো হয়েছে, ফলে প্রাবন্ধিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়েও এ রচনা কথ-সাহিত্যের প্রামাণ্যত্বে বঞ্চিত নয়। বাঙালী পাঠক যে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন, সে বিষয়ে আমার নিঃসন্দেহ। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ এক উজ্জ্বল অবদান বলেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা শোভন ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

## ধর্মের আলো

ধর্ম আমাদের প্রাণ। ধর্মকেই ভিত্তি করে আমাদের জীবন তার চলার পথের সন্ধান পায়। ধর্মকে বর্জন করে কোন জাতি কখনও জীবনের পূর্ণতার স্বাদ পেতে পারে না। সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি তাই আমাদের ঘরে ঘরে আবহমানকাল ধরে পুঞ্জিত হয়ে আসছে। গীতা বেদের গুরুত্ব বা বিরাট স্বর্বাধারণের পক্ষে সব সময়ে বোধগম্য হয়ে ওঠে না, তাদের দুঃস্থ তত্ত্বাদির গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, তাই সেইগুলির স্বর্বাধারণের উপযোগী সহজ সরল ও প্রাঞ্চল ব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিক গ্রন্থটির লেখক সকলের ধর্মবাদভাজন হবেন। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মূল বক্তব্য, সারমর্ম সংক্ষেপে অথচ কৃতিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ভাষাশৈলী, রচনাদক্ষতা প্রশংসনীয়। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখক—শ্রী হরেশচন্দ্র নাথমজুমদার। প্রকাশনায়—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১২৫১এ বর্ন ওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা।

## অকস্মাৎ (নাটক)

নাট্যকার হিসাবে অশীল মুখোপাধ্যায়ের নাম অপরিচিত। ইতোপূর্বে ব্যঙ্গসম্বন্ধ নাটক রচনায় শ্রীমুখোপাধ্যায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্যঙ্গসম্পূর্ণ এই নাটকটিতে নাট্যকার বর্তমান সমাজজীবনের একটি বিশেষ দিকের আবরণ তুলে ধরেছেন। নাটকটি অপরিচিন্তিত, অবিদ্যুত ও নাট্যকারের বলিষ্ঠ লেখনীর পরিচয় বহন করে। সাম্প্রতিক নাটকটির মধ্যে নাট্যকার তাঁর অল্পদৃষ্টি এবং সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। স্লাম্পে ভোজনে ও ঘটনার স্বাভাবিকতায় নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। মুগ্ধানার সঙ্গেই নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাসী ও মনোহর করে তুলেছেন। চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের পারদর্শিতা লক্ষ্যীয়, কয়েকটি চরিত্রে বিশেষ করে কুবের মল্লিক, যত্নোগোপাল, ভীমাধ্বন, গজানন, অলকানন্দা, জহন্তী ও রিণি সেন উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। লেখক—অশীল মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—এস সি সরকার এ্যান্ড সন্স (প্রাই) লিমিটেড, ১-সি কলেজ স্টোর কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নগা পরমা।

## হলুদ পাতার সবুজ শির

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কথা-সাহিত্যের আসরে নবাগত হলেও তাঁর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বাক্ষরকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে তঁ-তিনিটি নারীর ব্যথা, বেদনা ও আনন্দের ইতিহাসকে যথেষ্ট মূল্যমানার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। লেখকের শৈলীও বলিষ্ঠ, তবে জায়গায় জায়গায় কিছুটা অসংযম প্রকাশ পেয়েছে, মনে হয় তাঁর রচনারীতি আরও কিছু পরিণতির মুখোপাধী। চরিত্রচিত্রণেও নিপুণ লেখক দিব্যানন্দ, অঞ্জলি, নীলিমা প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে, পাঠক-মনে তারা সহজহৃদতির সঞ্চার করে। সহজেই আমরা বর্তমান রচনাটি, হাতে পেয়ে সুখী হয়েছি, তবে লেখকের পক্ষে যে আরও অস্বাভাবিক প্রয়োজনীয় একথাও স্বাক্ষর করি। প্রচলিত কল্পিতভাব, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—শ্রীঅনন্য মিত্র, প্রকাশনায়—বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নগা পরমা।

## সাতরঙ

স্বপনবড়ো নামটি আমাদের দেশের আঞ্চলিকবহনিতা প্রত্যেকের কাছেই সুবিদিত। ছোটদের জন্য গল্প লেখার যে তিনি সিদ্ধহস্ত তা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সত্ত-প্রকাশিত গ্রন্থের গল্পগুলি অনেকটা হিতোপদেশের কাহিনীর মত। লেখক কাহিনীর মাধ্যমে আসল যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করতে মোটেই অসুবিধা হয় না। গ্রন্থটিতে নাটিকা, গল্প ও কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর মধ্যে 'আপনি বাসা বাঁদো', 'হারিজং', 'পুকুরের পাড়ে', 'শিকারিঘর' ও 'বোধনে বিসর্জন' বিশেষ সুখপাঠ্য এবং শিশু ও কিশোরদের যথেষ্ট আনন্দদান করবে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ মনোহর, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। লেখক—স্বপনবড়ো। প্রকাশনায়—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, গ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ নগা পরমা।

## কালো হরিণ চোখ

বর্তমান বাঙালী সাহিত্যের ভগতে বীরা যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী প্রখ্যাত নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী (তত্ত্ব রায়) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কালো হরিণ চোখ' পূর্বপূর্ণরূপে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর অন্যতম প্রধান পরিচায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। স্বাভাবিক, প্রতিঘাত, হাসি-কান্নাভরা পরিপূর্ণ একটি নারী জীবনের নিটোল গল্প রচনায় তিনি অদ্বুতপূর্ণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। চরিত্র-চিত্রণে, কাহিনী-বিকাশে উপন্যাসটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য ও রসসমৃদ্ধ। কাহিনীর গতি কোথায়ও ব্যাহত হয় নি। তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর জীবনবোধ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। গ্রন্থটির প্রচার বাঞ্ছনীয়। লেখক—ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকাশক—বাক সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—দশ টাকা।

## শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী (রাসলীলা)

পরম পুণ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় জীবনে রাসপর্ব এক অস্বর্ণীয় অধ্যায়। সে কারণে ভক্তহৃদয়ের রাসলীলা এক অভিনব আবেদন জাগিয়ে তোলে। তাঁর মাধুর্য, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর দর্শন ভক্তের মনে এক অপূর্ণ অল্পভূতি এনে দেয়। স্বাধীন স্ব-ক সম্পূর্ণ বৃক্সবৈরাগ্যের শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ বর্ণিত এবং চিত্রিত। ঐ দশম স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়ের মধ্যে ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ—এই পাঁচটি অধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থটির উপজীব্য। এই গ্রন্থের রাসলীলা সম্বন্ধে অতি পুণ্যপুণ্যভাবে আলোচনা সমিহিত করে। এই সুবিস্তৃত আলোচনার ভক্ত পাঠক-সমাজ বহুলাংশে উপকৃত হবেন। রচনার প্রসঙ্গগুণে, ভাবার লালিত্যে এবং বর্ণনাতলীর প্রোঞ্জপতার এই মহামূল্য গ্রন্থটি সর্বাস্বস্তর হয়ে উঠেছে। লেখক—হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—তারকনাথ সমাজদার, সরস্বতী ৭৭ বাগুইয়াটি রোড, বাটগাছি, কলিকাতা—২৮। দাম—দুই টাকা।

অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

# বাস্তবী মজ্জিন



[৩নটবর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

মনে হইল আমার এই অবস্থা কোঁতুল বাতাসী বিবির তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। সারা দেশজোড়া বে-আইনী দলকে যে তাহার অঙ্গুলি হেলনে চালাইতেছে, এ দলের যে নাকি একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, এ দলে বাহার ভক্তদের উপর নাকি আর আপিল চলে না, সেই অসাধারণ নারীর দৃষ্টি এড়াইবে, আমার কোঁতুলের এমন সাধ্য কি?

কিন্তু শুধু সাধের প্রশ্ন নহে। আমার কোঁতুল তাহার দৃষ্টি এড়াইতে চাহে নাই, চেষ্টাও করে নাই। নারীজাতির মনস্তত্ত্বে আমার তেমন দখল না থাকিলেও এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই নারী আমার কোঁতুলে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং আশ্চর্যসাদাই অনুভব করিবে। কোনরূপ ভাণ না করিয়া মনের সত্য এবং স্বাভাবিক ভাবের প্রকাশে এই সাংঘাতিক এবং রহস্যময়ী দ্রোলোকটি—আমি এখন বাহার আওতার, অথবা 'হাতের খুঁটা'—বি আমার প্রতি সদয় বোধ করে, তাহাই তো আমার পক্ষে বাহুনার এবং নিরাপদ।

জোছনাও যেন আমারই মতো কোঁতুলী হইয়া ধীরে অতি ধীরে বাতাসী বিবির মুখের আশ্রয় স্পর্শ করিল। যেন যত্নসহে বলিল, 'ওগো রহস্যময়ী ভরস্করী, আশ্রয় তোলা, একবার তোমার রক্তাবী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া কোঁতুল মিটাই।'

কিন্তু কোঁতুল মিটাইল না বাতাসী বিবি। মনে হইল কোঁতুল মিটাইবার আগে সে যেন আমাকে বাচাই করিয়া নিতে চায়, আমাকে আরেকটু ভাল করিয়া বুঝিবার আগে সে আড়ালের বাহিরে

আসিয়া আমার দৃষ্টিতে ধরা দিতে চাহে না, রহস্যের আশ্রয়ে নিজেকে ঢাকিয়া রাখার মূল্য সে বোঝে।

বাতাসী বিবি বলিল: 'বাবুজি, আপনি আমার হাতে হাত মিলাইয়াছেন। ইহাতে আমাদের দোষ্টি হইল তো?'

আমি বলিলাম: 'সে কি কথা বিবি? দোষ্টি হয় সমানে সমানে। আমি কি তোমার সমান?'

'না, বাবুজি। আপনি বড়, আমি ছোট। কিন্তু বড়তে ছোটকে কি দোষ্টি হয় না?'

আমি লজ্জিত (এবং কিঞ্চিৎ শঙ্কিত) হইয়া বলিলাম: 'হি হি, বাতাসী বিবি। আমি বড়, এ কথা আমি বলি নাই।'

'আপনি বলিবেন কেন? আমি জানি। আপনি শহরের বড় আটর্নয়; তুমিরাছি অনেক টাকা আপনি কি মাহিনার আমদানী করেন?'

'কিন্তু তোমার চাইতে অনেক কম, বাতাসী বিবি।'

বাতাসী বিবি বলিল: 'তাহাও আমি জানি, বাবুজি। আপনি আইন মানান, আর আমার আইন ভাঙিবার পাইকারি কারবার। আমার বে-আইনী আমদানীর সঙ্গে পান্না দিয়া আপনার আইনসম্মত আমদানী পারিবে কেন? কিন্তু একথা আর আমি আপনাকে কি বলিব বাবুজি? আপনি পড়া-লিখা এলমদার আদমি। আর আমি একটা সামান্য মূর্খ দ্রোলোক মাত্র।'

বাতাসী বিবি 'পড়া-লিখা' বা 'এলমদার' কি না জানি না, কিন্তু একদম বঙ্কা যে বলিতে পারে, সেই দ্রোলোককে সামান্য বা মূর্খ বলিয়া

ডাঙ্গি পাবিলাম না। বরং বাতাসী বিবি সন্ধ্যা আমার উৎসাহ এবং কৌতূহল আরো যেন উগ্র হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম : ‘বাতাসী বিবি, যদি অভয় দাও তে একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।’

বাতাসী বিবি আমার কথা শুনিয়া যেন একটু কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, ‘আপনার ভয়ের বা ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নাই, বাবুজি। আমাদের এই কথোপকথন আমরা ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির কানে পৌঁছিতেছে না, পৌঁছিতেও না। একটা নচে, আপনি যত খুশি সওয়াল করুন। যেমন আপনার মজি। আমি যথাসাধ্য জবাব দিব। আমার সওয়াল করিবার কিছু নাই, আমি শুধু আর্জি পেশ করিব। বাবুজি, আপনার গহেলা সওয়াল বলুন। কথা বলিতে যদি আপনার নিজের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে হেকিম সাহেবের কোনো হুঁশিয়ারি বা মানা নাই।’

জানি না আমাকে কিসে পাইয়াছিল। ঐ অনভ্যন্ত পরিবেশে রহতময়ীর এমন নিকট সান্নিধ্যে, বোধ করি তাহার কষ্টবরের বাহুতেও, মোচাঙ্গর হইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা এমন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন—আমি বরাবর খুব হিঙ্গাব করিয়া, গুজন বৃথিয়া, কথা বলি—আমার মুখ হইতে ফস করিয়া বাহির হইয়া গেল কিরূপে? এমন দুঃসাহসের ভূত কি করিয়া হঠাৎ ঘাড়ে চাপিল?

আমি প্রশ্ন করিলাম : ‘বে-আইনী কারবারের রাস্তার তুমি নামিলে কেন, বাতাসী বিবি?’

আমার নিজের অজানিতেই কি করিয়া ‘তুমি’ শব্দটার উপর জোর পড়িয়া গেল। সম্ভবত সেইজন্যই প্রশ্নটা একটু আমেজা এবং উদ্ভত হইলেও বাতাসী বিবি অংশি হওয়ার বদলে যেন প্রীতিই লাভ করিল। জবাবটা যে সে একব্যাক্যে সংক্ষেপে শুভাইয়া বলিতে পারিল না তাহার অল্প কারণও ছিল, কিন্তু অল্পত একটা কারণ তাহার বাংলা ভাষার যথেষ্ট দখলের অভাব, অথচ সে তাহার বথাসাধ্য আমারই হাতভাবার আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। লিখিতে লিখিতে আমার মনে হইতেছে, বাতাসী বিবির সেই বহু প্রয়াসে, বহু আশ্রয়ে বলা ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষণ যেন আমার কানে আস্ত বাংলার চাইতে অনেক বেশি মধু খরাইতেছিল।

আমার প্রশ্নের জবাবে বাতাসী বিবি হাছা বলিল, তাহা সে এক কথায় বলিতে পারিত : ‘বে-আইনের পথ আমি বাছিয়া লই নাই বাবুজি, বে-আইনের পথই আমাকে বাছিয়া লইয়াছিল।’ কিন্তু অত সংক্ষেপে সে করিতে পারে নাই।

বাতাসী বিবির জ্ঞান মনের গভীরে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম কি? সম্ভবত করিতেছিলাম, তাই বলিলাম : ‘কিন্তু বে-আইনের পথ যে বিপথ, বাতাসী বিবি। আর সেই বিপথে পদে পদে বিপদের সজাবনা, অনেক ঝামেলা, অনেক ঝুঁকি—বিপথ তো সহজ দল নিরাপদ মোলায়েম নয় বাতাসী বিবি।’

বাতাসী বিবি বলিল, ‘সেই জন্তই তো বে-আইনী কারবারের এমন গান বাবুজি। নিরাপদ সহজ রাস্তা আমার বিলকুল না-পছন্দ।’

ছোট্ট একটুখানি কথা। কিন্তু ঐ কথাটুকু যে আশ্চর্য হইবে, দাঁড়জড়িতে বাতাসী বিবির মুখ হইতে বাহির হইল, তাহার আসেজ ভা ভাবার জানিতে পারিলাম না। প্রবল-প্রতাপাঙ্কিত স-কারের

বাঁধা আইন ভাঙিতে গেলে যে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া তাহার বিপুল ভার প্রতিমুহূর্তে বহিতে এবং সহিতে চর, তাহাতেই রোমাঙ্কের, রোমাণ্টিক আনন্দের খোরাক পায় বাতাসী বিবি। সেই খোরাকে পায় অমৃতের স্বাদ।

‘বাতাসী বিবি, আগুন নিয়া খেলিতে গেলে অনেক সময় হাত পোড়ে।’

শুনিয়া বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, ‘আমিও একটু নিজের হাত পোড়াইয়াছিলাম। এই মূলকে বপন বেশি পুরাতন হই নাই, তখন। তাহাও অবশ্য শখ করিয়া।’

‘শখ করিবার জ্ঞান কি কেহ হাত পুড়ায়, বাতাসী বিবি?’  
‘তামাসা উপভোগ করিবার জ্ঞান পুড়ায় বৈ কি, বিশেষ করিয়া যখন নিশ্চিত জানে হাতে ফোঁকা পড়িবে না।’

বিস্মিত হইয়া আমার বাতাসী বিবির মুখের দিকে আমার দুই চোখের ব্যর্থ কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। ভাবিলাম, আচ্ছা, আমার দৃষ্টি যদি আড়াল-ভেদী হইত, এক্স-রে (X-Ray) রশ্মির মতন। বিশ্বের কারণ : এমন জবাব ঐ জাতীয়া জীলোকের নিকট হইতে পাইবার আশা করি নাই। বাতাসী বিবি আমার দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করিল কি না জানি না, কিন্তু মনে হইল তাহার আবৃত মুখমণ্ডলে ছুটি অনাবৃত চোখের তার। যেন আকাশের ছুটি তারার মতই একবার ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বাতাসী বিবি যেন প্রথম আগ্রহাধিতা হইয়াই মৃতি-মগ্নন করি। বলিতে লাগিল : ‘হ্যা বাবুজি, শখ করিয়াই একবার গাচ পুড়াইয়াছিলাম। এই মূলকে ইয়াঙ্গ সরকারের আদালতের বিচারে কিছুকালের জ্ঞান মেহনতী করেণ ভোগ করিয়াছিলাম।’

মেহনতী করেণ। অর্থৎ সশ্রম কারাদণ্ড। এইবার মনে পড়িয়া গেল, কোথায় যেন এই আইন-বিরোধিনী রমণী সন্ধ্যা শুনিয়াছিলাম, সে চোরা-চালান সক্রান্ত দণ্ডবিধির কি একটা ধারার বহু-তিনেক জেল খাটিয়াছিল। এই খাটি সে না খাটিলে তাহার দলের আরেকজনকে (বোমভোলা পাঠককে কি?) খাটিতে হইত এবং সেই আরেকজন নাকি সেই দণ্ডদেশেরই প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার খালাসের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি দণ্ডটা নিজের মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল একাধিনী করেণবছর আগে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখার মত গুরুত্ব ইহাকে দিই নাই, কারণ বাতাসী বিবি নাম্নী এক ‘ক্রিমিনাল’ (criminal) জীলোক সন্ধ্যা মাথা ঘামাইবার আগ্রহ আমার হয় নাই। বিশেষ করিয়া দেওয়ানী আদালত নিইয়াই আমার কারবার ছিল, কৌজলারী আইন-আদালতের ওগতের সঙ্গে আমার দেহের বা মনের বেগ ছিল না বলিলেই চল। কিন্তু বাতাসী বিবির ডেয়ার নিভূতে নিম্নম রাতে তাহারই এক-কথা শুনিয়া সেই পুরাতন শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল।

বিলিাম : ‘শখ করিয়া কেহ সশ্রম কারাদণ্ডের কাঁস গলায় পরে, ইহা আমি কোনোরূপে ভাবিতে পারি নাই।’

বুঝিলাম বাতাসী বিবি যুহ যুহ হাসিতেছে। ভুল বুঝিলাম, না ঠিক বুঝিলাম, বলিতে পারি না।

কিন্তু বাতাসী বিবি বলিল, ‘কোনোদিন এমন করিয়া বাতাসী



অন্য কোনও মাথার তেলে এ  
আর কোনও দিন সম্ভব ছিল  
না এবং আজও সম্ভব নয় ।

একমাত্র দ্বিবিধ ফলদায়ক  
কেয়ো-কার্পিন তেলই আপনার  
চুলকে নরম ও চক্চকে করে  
এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে!

কেয়ো-কার্পিন আপনার চুলের  
শোভা বাড়ায় ও চুলের রেশমী-  
কোমল ভাব বজায় রাখে ।  
এ এক বিশ্বকর মাথার তেল  
—আজই কিনুন, রেজই  
ব্যবহার করুন ।

**কেয়ো-কার্পিন**

দ্বিবিধ ফলদায়ক কেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস্  
প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ  
গোহাটি • পটনা • কটক • জয়পুর



ভাষিত পারিলাম না। বরং বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহ এবং কৌতূহল আরো যেন উগ্র হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম : ‘বাতাসী বিবি, যদি অভয় দাও তো একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।’

বাতাসী বিবি আমার কথা শুনিয়া যেন একটু কৌতুক বোধ করিয়া বলিল, ‘আপনার ভয়ের বা ভাবনার কিছুমাত্র কারণ নাই, বাবুজি। আমাদের এই কথোপকথন আমরা ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তির কানে পৌছিতেছে না, পৌছিতেও না। একটা নচে, আপনি যত খুশি সওয়াল করুন। যেমন আপনার মজি। আমি যথাসাধ্য জবাব দিব। আমার সওয়াল করিবার কিছু নাই, আমি শুধু আর্জি পেশ করিব। বাবুজি, আপনার গাঢ়লা সওয়াল বলুন। কথা বলিতে যদি আপনার নিজের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে হেকিম সাহেবের কোনো হুঁশিয়ারি বা মানা নাই।’

জানি না আমাকে কিসে পাইয়াছিল। ঐ অনভ্যস্ত পরিবেশে বহুশ্রমের অমন নিকট সান্নিধ্যে, বোধ করি তাহার কণ্ঠস্বরের বাহুতেও, মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, নতুবা অমন অদ্ভুত একটা প্রশ্ন—আমি বরাবর খুব হিসাব করিয়া, গুজন বুঝিয়া, কথা বলি—আমার মুখ হইতে ফস করিয়া বাহির হইয়া গেল কিরূপে? অমন হুঃসাহসের ভূত কি করিয়া হঠাৎ খাড়ে ঢাপিল?

আমি প্রশ্ন করিলাম : ‘বে-আইনী কারবারের রাস্তার তুমি নামিলে কেন, বাতাসী বিবি?’

আমার নিজের অজানিতেই কি করিয়া ‘তুমি’ শব্দটার উপর জোর পড়িয়া গেল। সম্ভবত সেইজন্মই প্রশ্নটা। একটু আচমকা এবং উদ্ভট হইলেও বাতাসী বিবি অখুশি হওয়ার বদলে যেন প্রীতিই লাভ করিল। জবাবটা যে সে একবাক্যে সংক্ষেপে গুছাইয়া বলিতে পারিল না তাহার অল্প কারণও ছিল, কিন্তু অন্তত একটি কারণ তাহার বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখলের অভাব, অথচ সে তাহার যথাসাধ্য আমারই শ্রুতভাষার আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। লিখিতে লিখিতে আবার মনে হইতেছে, বাতাসী বিবির সেই বহু প্রয়াস, বহু আগ্রাসে বলা ভাঙা-ভাঙা বাংলা ভাষণ যেন আমার কানে আশ্রয় বাংলার চাইতে অনেক বেশি মধু বরাইতেছিল।

আমার প্রশ্নের ভবাবে বাতাসী বিবি বাহা বলিল, তাহা সে এক কথায় বলিতে পারিত : ‘বে-আইনের পথ আমি বাছিয়া লই নাই বাবুজি, বে-আইনের পথই আমাকে বাছিয়া লইয়াছিল।’ কিন্তু অত সংক্ষেপে সে করিতে পারে নাই।

বাতাসী বিবির জন্ত মনের গভীরে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম কি? সম্ভবত করিতেছিলাম, তাই বলিলাম : ‘কিন্তু বে-আইনের পথ যে বিপথ, বাতাসী বিবি! আর সেই বিপথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা, অনেক ঝামেলা, অনেক ককুমারি, অনেক খুঁকি—বিপথ তো সহজ সরল নিরাপদ মোলায়েম নয় বাতাসী বিবি।’

বাতাসী বিবি বলিল, ‘সেই জন্তই তো বে-আইনী কারবারের এমন টান বাবুজি! নিরাপদ সহজ রাস্তা আমার বিলকূল না-পছন্দ।’

হোই একটুখানি কথা। কিন্তু ঐ কথাটুকু যে আশ্চর্য স্বরে, আকর্ষণীয় ভাবে বাতাসী বিবির মুখ হইতে বাহির হইল, তাহার আমোজ তো ভাষা আনিতে পারিলাম না। প্রবল-প্রতাপাধিক্ত সরকারের

বাধা আইন ভাঙিতে গেলে যে প্রচণ্ড বিপদের খুঁকি মাথায় নিয়া তাহার বিপুল ভার প্রতিমূহর্তে বহিতে এবং সঠিতে হয়, তাহাতেই রোমাঞ্চার, রোমাণ্টিক আন্দলের খোরাক পায় বাতাসী বিবি। সেই খোরাকে পায় অমৃতের স্বাদ।

‘বাতাসী বিবি, আগুন নিয়া খেলিতে গেলে অনেক সময় হাত পোড়ে।’

শুনিয়া বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, ‘আমিও একটু নিজের হাত পোড়াইয়াছিলাম। এই মূল্যে যখন বেশি পুরাতন হই নাই, তখন। তাহাও অবশ্য শখ করিয়া।’

‘শখ করিবার জন্ত কি কেত হাত পুড়ায়, বাতাসী বিবি?’

‘তামাসা উপভোগ করিবার জন্ত পুড়ায় বৈ কি, বিশেষ করিয়া যখন নিশ্চিত জ্ঞানে হাতে ঘোস্তা পড়বে না।’

বিস্মিত হইয়া আবার বাতাসী বিবির মুখের দিকে আমার দুই চোখের বার্ষ্য কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। জাবিলাম, আহা, আমার দৃষ্টি যদি আড়াল-ভেদী হইত, এক্স-রে (X-Ray) রশ্মির মতন। বিপ্লবের কারণ : এমন ভবাব এই জাতীয় দ্রোলাকের নিকট হইতে পাইবার আশা করি নাই। বাতাসী বিবি আমার দৃষ্টির তীব্রতা অনুভব করিল কি না জানি না, কিন্তু মনে হইল তাহার আবৃত মুখমণ্ডলে দুটি অনাবৃত চোখের তার। যেন আকাশের দুটি তারার মতই একবার ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বাতাসী বিবি যেন পরম আগ্রহমিতা হইয়াই দৃষ্টি-মগ্নন করি। বলিতে লাগিল : ‘হ্যাঁ বাবুজি, শখ করিয়াই একবার চাচ পুড়াইয়াছিলাম। এই মূল্যে ইংরাজ সরকারের আদালতের বিচারে কিছুকালের জন্ত মেহনতী কয়েদ ভোগ করিয়াছিলাম।’

মেহনতী কয়েদ। অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ড। এইবার মনে পড়িয়া গেল, কোথায় যেন এই আইন-বিরোধিনী রমণী সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে চোর-চালান সক্রান্ত দণ্ডবিধির কি একটা ধারার বছর-তিনেক জেল খাটিয়াছিল। এই খাটা সে না খাটিলে তাহার দলের আরেকজনকে (বোমভোলা পাঠককে কি?) খাটিতে হইত এবং সেই আরেকজন নাকি সেই দণ্ডদেশেরই প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু তাহার খালাসের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বাতাসী বিবি দণ্ডটা নিজের মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল একাধিনী কয়েদবছর আগে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখার মত গুরুত্ব ইহাকে দিই নাই, কারণ বাতাসী বিবি নাক্সা এক ‘ক্রিমিনাল’ (criminal) দ্রোলাক সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার আগ্রহ আবার হয় নাই। বিশেষ করিয়া দেওয়ান আদালত নিইয়াই আমার কারবার ছিল, ফৌজদারী আইন-আদালতের এগতের সঙ্গে আমার দেহের বা মনের বোগ ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু বাতাসী বিবির ডেমার নিভূত-নিঃশব্দ রাস্তে তাহারই একথা শুনিয়া সেই পুরাতন শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল।

বলিলাম : ‘শখ করিয়া বেহ সশ্রম কারাদণ্ডের কাস গলায় পড়ে, ইহা আমি কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই।’

বুঝিলাম বাতাসী বিবি মুহু মুহু হাসিতেছে। ভুল বুঝিলাম, না ঠিক বুঝিলাম, বলিতে পারি না।

কিন্তু বাতাসী বিবি বলিল, ‘কোনোদিন এমন করিয়া বাতাসী

অন্য কোনও মাথার তেলে এ  
আর কোনও দিন সম্ভব ছিল  
না এবং আজও সম্ভব নয় ।  
একমাত্র দ্বিবিধ ফলদায়ক  
কেয়ো-কার্পিন তেলই আপনার  
চুলকে নরম ও চক্চকে করে  
এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে!

কেয়ো-কার্পিন আপনার চুলের  
শোভা বাড়ায় ও চুলের রেশমী-  
কোমল ভাব বজায় রাখে ।  
এ এক বিষয়কর মাথার তেল  
—আজই কিনুন, আজই  
ব্যবহার করুন ।

**কেয়ো-কার্পিন**

দ্বিবিধ ফলদায়ক কেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্  
প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ  
গোহাটি • পাটনা • কটক • জয়পুর



বিবির সাক্ষাৎ সম্পর্শে আসিবেন, ইহাই কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন, বাবুজি ?

বাস্তবিকই পারি নাই। তাহা মনে মনে এবং মুখে স্বীকার করিলাম। রহস্যটা আমাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করিয়াই বোধ করি বাতাসী বিবি বলিল : 'বাবুজি, আপনি যদি জানিতেন ইংরেজের জেলখানার আমি কি হালে ছিলাম, তাহা হইলে আমার গলা বাড়িয়া কাঁদাশব্দ বরণের শব্দের কথা শুনিয়া অবাক হইতেন না।'

'জ্যেলে কি হালে ছিল, বাতাসী বিবি ?'

'আপনার যাহাকে রাণীর হাল বসেন, বাবুজি। জুলতানার হালও বলিতে পারেন।'

কথাটা বাতাসী বিবি যেমন সহজস্বৰ্ণে উচ্চারণ করিল, তত সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু অবিবাস প্রকাশ না করিয়া শুধাইলাম : 'জ্যেলে ঢুকিয়া না হয় রাণীর হালেই থাকিবার সৌভাগ্য তোমার হইয়াছিল বাতাসী বিবি, কিন্তু সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী তুমি জ্যেলে গিয়া রাণীর হালে থাকিতে পারিবে, একথা তোমার নিশ্চয়ই আগে হইতে জানা ছিল না।'

বাতাসী বিবি বলিল : 'ছিল, বাবুজি। শারীরিক দুঃখ-কষ্ট-নির্ধাতন আর যেহেতু সহ্য করিবার সাহস আর ক্ষমতা দুই আমার প্রচুর আছে, কিন্তু মিছামিছি শখ করিয়া এগুলি সহ্য করিতে যাইব, এ-হেতু দুঃখ-বিলাসিনী বিকৃত-মস্তিষ্কা আমি নহি।'

অর্থাৎ অকারণে দুঃখ বরণ করিয়া বাহ্যদৃশি দেখাইবার মতো খামখেয়ালী পাগলামি তাহার মগজে নাই। বাতাসী বিবি তাহার জেল-জীবনের যে বর্ণনা দিল তাহা শুনিয়া বিম্মিত হইলাম।

বাতাসী বিবির তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডের জুকুম হইয়াছিল ; হাকিম সাহেব বুঝি একটু কড়া-কড়িভাবেই আইন মানিতেন তাই আসামী জীলোক হইলেও তাহার কারাদণ্ডকে সশ্রম করিতে দ্বিধা করেন নাই। সপ্তদশে 'তিন বৎসর' লেখা থাকিলেও কার্যত বাতাসী বিবিকে পূর্বা তিন বছর বন্দিগী থাকিতে হয় নাই ; আড়াই বছর মাত্র থাকিতে হইয়াছিল। 'বন্দিগী অবস্থার আদর্শ সন্তোষজনক আচরণ'-এর ফলে বছরে দুই মাস হিসাবে মোট ছয় মাস অর্থাৎ আধা বছর মকুব হইয়া গিয়াছিল—আইনে একপ্র মকুবের দণ্ডান আছে। -বাতাসী বিবির আদর্শ সন্তোষজনক আচরণের সার্টিফিকেট সরকারীভাবে দিয়াছিলেন স্বয়ং কারাধ্যক্ষ মহাশয়।

জেলের ভিতরে বাতাসী বিবির আচরণ-বিহারে, আমোদ-প্রমোদে এক বিবিধ বিলাসে কিছুমাত্র অনুরোধ ঘটে নাই এবং বাহিরের সহিত—বিশেষ করিয়া তাহার দলের সহিত—যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল। এমন কি কারাগারের চার-দেয়ালেক ভিতরে আসিয়া তাহার দলের প্রধান প্রধান কর্মীরা দলের আসন্ন এবং আগামী কার্যদৃষ্টি সম্বন্ধে বৈঠকী পরামর্শও বিনা বাধার সহিত গিয়াছে, দেওপ্রত্যাপ সরকার বৈয়াকরণের মাথা তাহাতে এইটুকুও ঘামিয়া উঠে নাই। কড়া হাকিমের দেওয়া তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের কুপায় বাতাসী বিবি আড়াই বছর মনোরম সরকারী আতিথ্য উপভোগের সুযোগ পাইয়াছিল, সৌখিন-সৌখিনারা যেমন অর্থে প্রাচু-

থাকিলে হাওদা বদলের জন্ত মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্ত শৈল-নিবাসে অর্থাৎ 'হিল-স্টেশনে' কাটাইয়া আসেন।

একদা এক পাগলকে পাথে পাথে চাঁৎকার করিয়া বেড়াইতে শুনিয়াছিলাম :

'সম্ভব অসম্ভব হবে।

অসম্ভব সম্ভব হবে।'

বাতাসী বিবির কথা শুনিয়া পাগলের সেই ভবিষ্যৎ ঘোষণার কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্ন করিলাম : 'বাতাসী বিবি, এ যে আবহা উপলব্ধির কাহিনীর মত শুনাইতেছে। অসম্ভবকে এভাবে সম্ভব করারছিলে কি করিয়া ?'

বাতাসী বিবি ডানহাতের যথাযোগ্য ডব্লিসহযোগে বলিল : 'জুতা মারিয়া।'

বলিতে বলিতে অতীতের সেই জুতা মারার দৃষ্টি মনে করিয়া বাতাসী বিবি পরম কৌতুকে বেন নবীনা কিশোরীর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি বিম্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম : 'জুতা মারিয়া ?'

'হা, বাবুজি। সে জুতা অবশ্য চামড়ার নহে, চামির এবং সোনার। এই দুয়ের কোনোটাইরই অভাব আপনার এই বাণীর নাই, বাবুজি।'

বাতাসী বিবির এই দুই রকমের বিনামা ছোট, মাঝারি ও বড় বাহাদুরের উপর প্রচুরভাবে বর্ষিত হইয়াছিল তাহাদের চামড়া শুধু কাগেই নহে, সাদাও ছিল। সে কথাও বাতাসী বিবির মুখেই শুনিলাম।

আপনার বাঁদী ! বাবুজির সেই বিনয়। অথবা প্রশ্রয় উপহাস ? উপহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরও প্রবৃত্তি হইল না, বিনয় বলিয়াই মনে করিয়া নিলাম।

ইংরাজ জাতির বর্ধশৃঙ্খলার, শাসন দক্ষতার, তাক্ষবুদ্ধিতে এবং দোঁড়প্রত্যাপে আমার আস্থা ছিল বিরাট, সেই আস্থার প্রচণ্ড আবাত দিল বাতাসী বিবির এই বিচিত্র কাব্যবাদের কাহিনী। বাতাসী বিবিকে জেল খাটিতে হইয়াছিল, সেই কাহিনীই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে খাটা যে এই ধরণের খাটা—তাহা শুনি নাই।

ইংরাজ সরকারের আইনকে এমনভাবে বুঝাশুষ্টি দেখানোও সম্ভব ইহা মানিয়া নেওয়ারকে যেম একটা আন্তর্জাতিক গেলার মতই কঠিন ব্যিয়া মনে হইল। যে ইংরাজের রাজত্বের পূর্বের অন্ত বাইবার ক্ষমতা নাই, ইংরাজের শাসনতন্ত্রকে এমন অবলীলায় কাঁকি দেওয়া কি সম্ভব ?

ঠিক কি কথা বলিয়াছিলাম অরণ করিতে পারিতেছি না ; কি একটা কথাই আমার মনের ঘটিকা বাতাসী বিবির কাছে ধরা পড়িয়া গেল। বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'বাবুজি ভাবিতেছেন ইংরেজের মূলকে এমন ব্যাপার সম্ভব নহে, আমি আপনাকে মগের মূলকের কিসুমা শুনাইতেছি ?' বলিয়া আমাকে সে ইংরাজ-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ শুনাইল, তাহাতে পূর্ণাপুরি সার দিতে না পারিলেও অপরাধ-জগতের এই কুখ্যাত নাগরিকের অন্তর্দৃষ্টিতে মনে চমক লাগিল। সে বলিল, 'বাবুজি, ইংরাজের জ্ঞানে আমি বা আমার দল এদেশে ইংরাজ-শাসনের দ্বন্দ্বন নহি, এদেশে হইতে ইংরাজ সরকারকে ছলে, বলে বা কৌশলে ভাড়াইয়া দিবার অথবা তাহাদের শাসনকে বিশ্ল করিবার কিছুমাত্র আগ্রহ আমাদের নাই। আমরা ইংরাজের তৈয়ারি আইন ভাঙি—যথাসাধ্য গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে, প্রকাশ্যে কখনোই

## বাঙালী বলিল

তাহাদের আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করি না। আমরা আইন ভাঙি বটে, কিন্তু এমন কোনো আইন ভাঙি না যাঁহা ভাঙার ফলে তাহাদের শাসন কিছুমাত্র বিঘ্ন হয়।’

অর্থাৎ ইংরাজ বাহাকে আসল ভয় করে তাহা ‘সিভিলন’ (sedition) বা রাজদ্রোহ, ক্রাইম (crime) বা অপরাধ নহে। অথবা যে ক্রাইমকে ইংরাজ এদেশে সত্যিকারের দুশমন বলিয়া গণ্য করে, তাহা পোলিটিক্যাল ক্রাইম (political crime), অর্থাৎ ‘রাজনৈতিক’ অপরাধ। বাঙালী বিবি বা তাহার দলের চরিত্রে বা ক্রিয়াকলাপে ক্রাইম আছে, কিন্তু রাজনীতির কণামাত্র নাই। সেই কারণেই ইংরাজ রাজশক্তি বা রাজপুরুষবৃন্দ বাঙালী বিবির দুশমন নহে; তাহার জেলখানায় আইনের মর্দাণা রক্ষিত হইল, ইংরাজরাজের ‘প্রেস্টিজ’ (prestige) বা সম্মান বজায় থাকিল, বাস, আর কি চাই? জেলে গিয়া চার দেয়ালের নেপথ্যে রাজনীতিসম্পর্কহীন এবং ইংরাজ-অবিদ্বেষী বাঙালী বিবি শাস্তি ভুগিল, না স্বস্তি ভোগ করিল, সাজা পাইল না মজা লুটিল, তাহা লইয়া ইহাদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই। আর্থিক দাঙ্গিয়া হুঁহাতে ছড়াইয়া বাঙালী বিবি আইনের সাজা এড়াইয়া বে-আইনী মন-প্রবিধা-বিলাস ভোগ করিলে ইহাদের আশপ্তি কিছুমাত্র নাই।

বাঙালী বিবি বলিল, ‘বাবুজি, কোনো ইংরাজ তার জাতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, (বেইমানি করে না), নিজের বড় স্বার্থসিদ্ধির সগুণ জাতির এতটুকু ক্ষতি হইতে দেয় না। তাই রাজনৈতিক অপরাধীদের তাহারা হাজার প্রলোভনেও ক্ষমা করে না, রেহাই দেয় না। কিন্তু—’

আর শোনা বাছল্য মনে হইল। বলিলাম, ‘বুঝিলাম, বাঙালী বিবি। তুমি ইংরাজ রাজশক্তির দুশমন নও বলিয়াই টাঙ্গি আর সোনার দৌলতে জেলে থাকিয়াও জেলের কিছুমাত্র দুঃখের ছোঁচ টের পাও নাই। কিন্তু তুমি রাজদ্রোহিনী হইলে নারী বলিয়া ইংরাজ তোমাকে রেহাই দিত না, দুশমন বলিয়া তোমার দুর্গণার চূড়ান্ত করিত।’

বাঙালী বিবি বলিল, ‘হাঁ বাবুজি, ইংরাজের সঙ্গে তো আমার কোনো বগড়া নাই, শত্রুতা নাই। এ জাতের অনেক গুণের আমি তারিফ করিতাম, এখনও করি। শুধু একটা ব্যাপারে কিছুদিন আগে ইংরাজের উপর আমার কিছু ঘৃণা হইয়াছে বাবুজি।’

‘কি ব্যাপারে, বাঙালী বিবি?’ প্রশ্ন করিলাম আমি, যখন মনের ভিতরে অনুভব করিলাম বাঙালী বিবির এই ঘৃণার ভাবটা শুধু মুখে কথা নহে, বাস্তবিকই আন্তরিক।

বাঙালী বিবি বলিল, ‘বাবুজি, আপনাদের আঠারো বছরের নও-জোয়ান—কুদিরাম। তাহারই ব্যাপারে।’

যের ভিতরে সহসা বজপাত হইলেও বোধ করি এমন চমকাইয়া উঠিতাম না, বাঙালী বিবির মুখে বালায় কিশোর শরীদ কুদিরামের নাম শুনিয়া যেমন চমকিত হইলাম। এক বছরও হয় নি মজঃফরপুর জেলে কুদিরামের কাঁসি হইয়াছে, তাহাকেই বেদনার সহিত মরণ করিয়া এবং মরণ করাইয়া পথে প্রান্তরে কত গায়ক ভিখারী বেদনা-কল্পণ কণ্ঠে গাহিয়া বেড়াইতেছে:

‘একবার বিলার দাও মা, ঘুরে আসি।’

কুদিরামের কাঁসির বাখা বাঙালী ভোলে নাই, বাঙালীর ভুলিবার

কথা নহে, বাঙালী কোনোদিন ভুলিবেও না। বাঙালীর এই মর্যাদিক বেদনার অংশগ্রহণ করিয়া ক্রিমিনাল দলের নেত্রী বাঙালী বিবি এক মুহূর্তে বেন আমার স্বর জয় করিয়া নিল। আমি বলিলাম, ‘কুদিরামের কাঁসির জন্য তোনার ইংরাজের প্রতি ঘৃণা হইয়াছে, বাঙালী বিবি?’

বাঙালী বিবি বলিল, ‘না বাবুজি, কাঁসির জন্য নহে। মাছুষ খুন করিলে কাঁসি বাইতে হয়, এমনই আইন আছে। কুদিরাম মাছুষ খুন করিয়াছিল, কাঁসি গিয়াছে। ইহাতে ইংরাজের কিছু কষ্ট হয় নাই।’

এই ক্ষমহীনতার কথা শুনিয়া মর্মান্ত হইলাম। মাত্র আঠারো বছরের এক কিশোর বিদেশী অত্যাচারীর বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়া কাঁসি গেল, ইহাতে এতটুকু বেদনা-বোধ নাই, এ কেমন জ্বালোক? বাঙালী বিবি কি মানবী, না দানবী?

‘তবে ইংরাজের উপর তোমার ঘৃণা কেন, রাগ কেন, বাঙালী বিবি?’

‘কাঁসির আগে কুদিরাম কি শেখ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, আপনি তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন, বাবুজি?’

‘মরিবার আগে কুদিরাম একবার তাহার জন্মভূমি মেদিনীপুর এবং তাহার মাতৃসমা দিগিকে শেখ দেখা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল।’

‘ইংরাজ তাহার সেই শেখ ইচ্ছা সহজেই পূরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই, বাছা দুশমনকে তাহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই তাহাকে কাঁসি লটুইয়াই হত্যা করিয়া নীচ আক্রোশ মিটাইয়াছিল। খুঃ!’

অশ্রুহীন ঘৃণা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙালী বিবি গুণ ফেলিবার আওতাও ভঙ্গির নকল করিল। তারপর বলিল ‘ইংরাজকে বড় তারিফ করিতাম বাবুজি, দরাজ-দিল মর্দানা লাভ বলিয়াই ভাবিতাম। ইংরাজের দিল এত ছোট হইতে পারে, তাহা কখনো স্থপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।’

বাঙালী বিবির কথা শুনিয়া মনে হইল অতি উচ্চ শিখর হইতে ইংরাজের পতন আরম্ভ হইয়াছে; বাঙালী বিবি বেন তাহা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করিতেছে। অতৃপ্ত কামনা লইয়া কুদিরামের আত্মা অনন্তশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ যদি বালকের শেখ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর আগে তাহাকে শেখ ছুঁটিটুকু দিত, তাহা হইলে ইংরাজের মহত্বই প্রকাশ পাইত, গৌরবই বৃদ্ধি হইত, ভারতে ইংরাজের শাসন তাহা ধারা বিন্দুমাত্র বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া ইংরাজ জাতি অন্তত একজনকে শ্রদ্ধা হারায়াইছে—সেই একজনের নাম বাঙালী বিবি।

‘কুদিরামের কাঁসির পর হইতেই বাঙালীকে আমি নতুন চোখে দেখিতে লাগিলাম, বাবুজি। বুঝিলাম বাঙালী যেমন জান নিতে জানে, সাজা মরদের মতো তেমনি বিলকুল বেপরোয়া ভাবে জান দিতেও জানে। কুদিরামের কাঁসি না হইলে আপনার সঙ্গে আমার মোলাকাত, অন্তত এইভাবে মোলাকাত, হয় তো কোনদিনই হইত না, বাবুজি।’

বাঙালী বিবির এই হেয়ালি-মার্কী কথা শুনিয়া আমার বিমিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ কি অদ্ভুত কথা বলিতেছে বাঙালী বিবি? কুদিরামের কাঁসির সঙ্গে বাঙালী বিবির সহিত আমার সাক্ষাতের কি সম্পর্ক?

[ক্রমশঃ।



## প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ

(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্রাষ্টব্যশ্রীনাথ চক্রবর্তী

দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত এবং বিস্তারে ৩২ হাত এই মর্ত্য মাহুঘোচিত

মণ্ডপে রংগশীর্ষ, রংগশীর্ষ, নেপথ্য, মন্তব্যারী এবং প্রেক্ষা-  
মণ্ডপের সংস্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শকাসনের দিক থেকে নেপথ্যগৃহপঙ্ক্ত যদি একটি রেখা টানা যায়, তা হলে সেইটি হবে দৈর্ঘ্য এবং অক্ষদিকে যে ৩২ হাত রয়েছে, তাকে বোঝাবে বিস্তার বলে। নাট্যশালা তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে রংগমঞ্চ ও অপরভাগে দর্শকসভা। ৩২ হাত পরিমিত ক্ষেত্রে দর্শকাসন স্থাপন করা হত। মনে হয়, তার সামনে ৩২ হাত রংগশীর্ষ, রংগশীর্ষের পশ্চাতে ৮ হাত রংগশীর্ষ এবং তার পশ্চাতে ১৬ হাত ছিল নেপথ্যগৃহ। এই অংশগুলোর পরিমাপ এবং অবস্থান সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকায় সঠিক গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এই সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্যের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রংগশীর্ষ কারো কারো মতে ত্রিভুজিক হতো। রংগশীর্ষের পৃষ্ঠে এক নেপথ্যগৃহের সম্মুখে নিমিত হ'ত রংগশীর্ষ। এই রংগশীর্ষ বিকৃত নাট্যগৃহে রংগশীর্ষ থেকে উন্নত এবং চতুরস্রে রংগশীর্ষের সম্মুখে সমস্ত ভূমিতে অবস্থিত হবে। আচ্ছাদিত, অর্থাৎ প্রভৃতি এখানেই বোধ হয় সম্পাদিত হ'তো। রংগশীর্ষের ঘটরাক্ষকে নেপথ্যগৃহের দুইটি প্রবেশদ্বার থাকবে। এই রংগশীর্ষে নানাবিধ দৃষ্টসজ্জা ও ক্রাদির বিস্তার করা হত। নাটকে যথাসম্ভব বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তাঁরা বর্তমানের মতো বহুবিধ সেট এবং নানাবিধ চিত্রাদি আঁকন করতেন। ভবত রংগশীর্ষের দারুণত্বসম্বন্ধে নিদেশ দিয়ে বলেছেন—

‘এবং রংগশীর্ষ: দৃশ্য দারুণত্বপ্রযোজ্যে।

উহ প্রতীকসংযুক্ত নানাবিধ-প্রযোজিতম্।

নানা সজ্জনোপেতং নানাবিধচিত্রবিদ্যম্।

নানাবিভাগসংযুক্তং স্বরঙ্গালগ্নবাক্যকম্।

সুশীলধারীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম্।

নানাবিধচিত্রবিদ্যে: স্তম্ভ-পুংগবো-হি তম্।’

এরপর মন্তব্যারী সম্বন্ধে ভরত বলেছেন—

‘রংগশীর্ষস্য পার্শ্বে তু বর্তম্য মন্তব্যারী।

চতুস্তম্ভসমায়ুক্তা রংগশীর্ষপ্রমাণতঃ।’

অর্থাৎ ইচ্ছাসংসেধেন কর্তব্য মন্তব্যারী।

উৎসেধেন তয়োস্তস্য কর্তব্যঃ রংগমণ্ডপম্॥’

এই মন্তব্যারীর সংস্থান সম্বন্ধে বহুপ্রকার জটিলতা রয়েছে নাট্যশাস্ত্রে এবং তার ভাষ্যে। ফলে এ সম্বন্ধে নানা মূর্খির নানা মত। তবে আচার্য সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহোদয় সঙ্কত নাটকের আভাস্তরীণ প্রমাণ সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন, তাই আপাতত যুক্তিসহ বলে মনে হয়। মন্তব্যারী হচ্ছে রংগশীর্ষের দুই পাশের স্তম্ভযুক্ত সোপানপরম্পরাবিশিষ্ট, গোলাকার উপাধামবেষ্টিত উচ্চ বেদিকা বা দ্বিতীয়ভূমি। সম্ভবত, এই স্থানটি অভিনয়কালে বিশ্রাম, প্রাসাদারোহণ, রাজোপবেশন, নাটকের ভেতরের নাটকীয় নৃত্যগীতাদি দর্শন প্রভৃতি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত।

বেশরচনাটির জন্য নেপথ্যগৃহের সংস্থান হ'ত রংগশীর্ষের পৃষ্ঠে এবং তার দুইটি দ্বার সম্মুখে এবং একটি দ্বার পার্শ্বে সন্নিবেশিত হ'ত। পাত্র-পাত্রীরা পাশের দ্বার দিয়ে বাইরে থেকে এসে নেপথ্যে প্রবেশ করতেন এবং সামনের দ্বার দুটি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতেন মঞ্চে।

প্রেক্ষামণ্ডপ ও দর্শকাসনের পরিকল্পনার ভরত বাস্তবিকায়ণ ও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। Acoustic সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তা করতেন। মর্হি বলছেন—

‘কার্য: শৈলগুহাকারো দ্বিভূমিনাট্যমণ্ডপ:।

মন্ডবাতারনোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্।

তন্মালিবাতঃ কর্তব্যঃ কতৃভিনাট্যমণ্ডপ:।

গভীরস্বরভা যেন কুতপসা ভবিষ্যতি।’

পর্বেত্রে গুহার মতো, দ্বিভূমি, স্বল্পবাতায়নযুক্ত, নির্বাক এবং গভীর স্বরবান হবে নাট্যমণ্ডপ। নির্বাত এবং গুহাকার হবার জন্মে গীতবাক্যধ্বনি সুগভীর হ'য়ে শ্রুত হবে। রংগগৃহের চতুর্দিকে আধুনিক ব্যালকনির মতো দ্বিতীয় তল নিমিত হবে। রংগশীর্ষের নিম্ন থেকে দ্বারদেশ পর্যন্ত ক্রমান্বিত সোপানাকৃতি অর্থাৎ গ্যালারির মতো আসনশ্রেণীর ব্যবস্থা থাকবে। ইষ্টকের দ্বারা সূক্ষ্ম ভিত্তি নির্মাণের পদ্ধতি ভূমিভাগকর্ম, ভিত্তিকর্ম, দারুণকর্ম, ভিত্তিলেপকর্ম, স্তম্ভকর্ম, চিত্রকর্মাদির দ্বারা নাট্যগৃহকে সুগঠিত এবং সূক্ষ্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন ভরত—

‘ভিত্তিকর্মবিদিত্ত্বা ভিত্তিলেপঃ প্রদাপয়েৎ।

স্তম্ভকর্মবিস্তৃত্য বিদ্যাতব্যং প্রযোজ্যতঃ।

ভিত্তিষথ বিলিঙ্গাসু পারিমুদ্রাসু সর্বতঃ।

সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজ্যেৎ।

চিত্রকর্মণি চালেখ্যা: পুঙ্খানুপুঙ্খমস্তথা।

লতাযদ্যশ্চ কর্তব্যশ্চরিতং চান্দ্রভোগজম্।’

ভিত্তির দ্বারা দেয়াল, ভিত্তিলেপের দ্বারা প্রাক্টারি, স্তম্ভকর্মের দ্বারা চূপকামকরা, চিত্রকর্মের দ্বারা বিলিঙ্গ ও পরিমার্জিত সমতল ভিত্তির ওপর স্তম্ভপুঙ্খ এবং প্রাকৃতির দৃশ্যাদির আঁকন করাই বোঝাচ্ছে।

## দৃশ্যপট

সোপানাকৃতি দর্শকাসন নির্মিত হইবে ইষ্টক এবং কাঠ দ্বিধে। প্রথম শ্রেণীটি হইবে ভূমিভাগ হ'তে এবং তাত উঁচু যাতে সঙ্গীত সহজে অবলোকন করা চলে। এই সম্বন্ধে শিনি বলাছেন—

'ভক্তানাং বাস্তবতাপি সোপানাকৃতিপীঠম্।

ইষ্টক-দারুভিঃ কার্ণিঃ প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্॥

হস্তপ্রমার্থকং সৈবৈভূমিভাগসমুৎখিতঃ।

রংগণীপারলোকাং তু কৃৎসাদাসনকং বিধিম্॥

নাট্যীয় মূলরসানুযায়ী বর্ণনামিষ্ট ছিদ্রবিহীন অথচ যুগ্ম বস্ত্রগুণ রংগভূমির পশ্চাত্তাগে শোভা পেতো। যাকে বলা হ'ত যবনিকা। আদিরসে জামবর্ণ, হাস্যে খেতবর্ণ, বক্রণে ধূম্রবর্ণ, বৌদ্ধ বস্ত্রবর্ণ, বীরে স্বর্ণবর্ণ, ভয়ানকে কৃষ্ণবর্ণ, বিভৎসে নীলবর্ণ, জুহুতে সীতবর্ণ এবং শান্তরসে ইন্দুকন্দধরবর্ণের যবনিকা ব্যবহৃত হ'ত। আবার কেউ কেউ সর্বরসেই অরুণবর্ণের যবনিকা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত প্রবেশের সময় যবনিকার সবেগ আন্দোলনকে বলা হ'ত অপটিক্সেপ।

নেপথ্য থেকেই নাট্যীয় নেপথ্যোক্তি এবং আবগুহস্থলে কোলাহলাদি করা হ'ত। আলংকারিকেরা অভিনেতৃবর্গের প্রবেশ ও প্রস্থানের হুটি ধারণপথের উল্লেখ করেছেন। নেপথ্য থেকে রংগমঞ্চে প্রবেশের সময় হুটি স্বন্দরী কুমারী উক্ত দ্বারসমুখস্থ যবনিকা সরিয়ে পথ করে দিতো। এই ধার হুটির মধ্যস্থলেই সম্ভবত হস্ত্যাদকদের বসার স্থান থাকতো।

এই সুগঠিত রংগমঞ্চে আগমিক, বাচিক, আহাৰ্হ এবং সাক্ষিক—

এই চতুর্বিধ উপায়ে অভিনয়ের পূর্ণতা সম্পাদনে তাঁরা নিরত হইতেন। অংগের দ্বারা নিম্পন্ন অভিনয় হচ্ছে আগমিক, বাক্যের দ্বারা বাচিক, বেশ রচনাদির দ্বারা বেশ আহাৰ্হ এবং শুভ-দুঃখাদি ফুটিয়ে তোলার দ্বারা সাক্ষিক অভিনয় সম্পাদিত হ'ত। এর মধ্যে অভিনয়ের সর্বাধিক সাক্ষ্য নির্ভর করে আহাৰ্হের ওপর— এই কথা বলছেন নাট্য-শাস্ত্রকার এবং তদীয় ভাব্যকার উভয়েই। নাটক দৃশ্যের ওপরই বেশি নির্ভর করে বলে মঞ্চকল্পনার গুরুত্ব সর্বাধিক মঞ্চের জগৎ—কলাকৌশলে রচিত বাস্তব জগৎ— অর্থাৎ বিধাতার সৃষ্ট বাস্তব জগতের illusion অর্থাৎ

মায়ামাত্র। এই মায়াসৃষ্টির ওপরেই অভিনয়ের সার্থকতা। আর এই মায়াসৃষ্টিতে সর্বাধিক সহায়তা করে আহাৰ্হ-অভিনয়। পুস্তকমূলক অর্থাৎ নানাধি সেট এবং মূর্তিনিৰ্মাণ, অঙ্কবর্ণন, অংগরচনা অথবা বর্তমানের painting এবং সজীব অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে মঞ্চে 'বীৰজ' ভাবারির সমাবেশ প্রভৃতি আহাৰ্হ-অভিনয়ের আওতায় পড়ে। হান্সা বস্তু দিয়ে পূর্ণত, বাদ্যনিৰ্মাণ করে বাস্তবের মায়াসৃষ্টির ক্ষেত্রে মঞ্চে সজীবত্ব করে অভিনয়কে যতদূর সম্ভব realistic করার নির্দেশ দিয়েছেন ভরত। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের জনৈক বিদগ্ধ সমালোচকের কথাগুলো বিশেষ প্রযোজ্য—

It however, must be assumed that as models of hills and palaces have been prescribed by Bharat to be used on the stage, and as these were actually used, there were certainly some means for the shifting of such puestas. In ancient Indian theatre, neither there was any painted scene nor even the possibility of producing any light effect. In creating dramatic illusion, actors in these days had to depend mainly on their voice and skill in recitation and partly on dance, music, make-up and costumes. Conditions of stage representation prevalent in a particular age are mainly responsible for the particular pattern of dramatic literature produced in that age. This is why we come across numerous descriptions of time and place in rhythmic prose and verse in any Sanskrit drama. Shakespeare used long soliloquies and descriptive



বি, এক, জে-এর বাধিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী সচিত্রা সেন

passages in his dramas mainly to overcome the handicap imposed upon by the want of painted scene and suitable light arrangement in Elizabethan stage. Indian seers and artists, however invented the use of suggestive sets with puestas to overcome this difficulty long before the Europeans could conceive of it. It is really interesting that centuries before the use of even painted hanging scenes by European theatres, not to speak of the most modern device of sets, ancient Indian theatre attained success in creating dramatic illusion with suggestive sets.'

(S. Chatterjee *Our heritage* IX, Part II. P. 81)

পুস্তকবাহকের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকের জন্যে ব্যঙ্গনা উজ্জ্বল করা। বর্তমানে যেমন কোথাও কোথাও শুধু বিদ্যুতের খেলা এবং নকলার যাত্রার দ্বারা দর্শকে মুগ্ধ করা হয়, তখন কিন্তু তা হ'ত না। দর্শকেও ভারতে হবে, তার স্থায়ের সপ্ত রসবোধকে জাগ্রত করতে হবে—এই ছিল নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে বলা চলে—

'The object of a dramatic presentation, according to the Indian ideal, is to evoke an aesthetic pleasure in the minds of the spectators and the propounders of theories in ancient India were



হিন্দী চিত্র 'বিজাপতির' নায়িকা—শ্রীমতী সি.

fully conscious about the limitation of realism in the matter. In fact, stark realism was never favoured in any form of Indian art. This shows that ancient Indian theatre was very cautious regarding the use of accessories and a harmonious blending of the realistic and suggestive practices—was the result.' (ত্রি)

নাটকে একদিকে রয়েছে রসশ্রুতি, আরেকদিকে রয়েছে রসভোক্তা—আর এদের মাঝখানে রয়েছে মঞ্চ ও অভিনেতা। রসভোক্তা তথা দর্শকের সঞ্চক্ষেও আমাদের এই অবিকারবাদের দেশে কিছুটা বাছ-বাচার ছিল। অপরিচিত, শব্দপাণি, অনাচারী, পীড়িত, পাগল এবং যারা অভিনয়ে অনভিজ্ঞ, নাট্যসভার তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অযোগ্য পাঠের রস পরিবেশনে তাঁরা ছিলেন নারাজ।

মধ্যস্থ, সাবধান, অচঞ্চল, স্থায়বানী, নিরহংকার, রসভাবাভিজ্ঞ, সানন্দচিত্ত এবং গুণলাসে নিরুপণে অভিজ্ঞ কলারসিকেরাই নাট্যসভার সদস্তপদ লাভে যোগ্য বিবেচিত হ'তেন। আমাদের আলাংকারিকের ভাষায় দুঃশ্রব্যসকল কাবোরাই আরেদন সদস্যের নিকট। আর সেই সঙ্গমস্থ প্রভুত জমুশীলন সাপেক্ষ। সঙ্গমের সংজ্ঞা বিস্তারিত আলাংকারিক বলছেন—

'যেহা বাবায়ুশীলনাতাসরশাদ বিশদীভূতে কাব্যমুকুতে বর্ণনীয়তম্যতীভবনযোগ্যতা কেহত্র সঙ্গরসংবাদভাভঃ সঙ্গদয়াঃ।'

'কাবোর নিয়ন্ত জমুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের মস্তিষ্ক চিত্তদর্পণ স্বরূপ হ'য়ে গেছে এবং ফলে যার শুদ্ধ সঙ্গরসংপূর্ণ কাব্যবর্ণিত বস্তুর বিশ্ব স্তম্ভরভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই প্রতিবিম্ব দর্শনে যিনি আনন্দে তন্ময় হ'য়ে যেতে পারেন, তিনিই সঙ্গদয়। তাঁরা ব্রহ্মাবাদ-সহোদর কাব্যরস পরিবেশন ক'রতেন এই সঙ্গদয় সতমর্মীদেরই জন্ত। আর, এই নাট্যবেদের গীর্বা প্রয়োগ ক'রবেন, তাঁদেরও হতে হবে মহাবি ভরতের ভাষায়—'কুশলা যে বিদগ্ধাশ্চ প্রগল্ভাশ্চ জিবজ্জমাঃ—সুনিপুণ, বিদ্বান, সাহসী এবং পরিশ্রমী।

মাধুর্যের উত্তর জীবন-মরুতে আনন্দের অভিধ্বনিই হ'ল নাটকের কাজ। যুগযুগান্ত ধ'রে মানবসমাজ এই আনন্দের সন্ধান ক'রেছে যাত্রা। নিখিল জ্ঞান, শিল্পকলা, যোগ এবং বিদ্যার আকরঃ ধর্ম, বশ এবং বুদ্ধির বিবর্ধকঃ লোকোপদেশজনক, সকল আর্জনের বিশ্রান্তিজনক এবং আনন্দদায়ক হ'ল এই সার্বক নাটক—

'দুঃখার্জান্য প্রমর্তান্য শোকার্জান্য তপস্বিনাম্।

বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ ভবিষ্যতি।

ধর্ম্য বশতম্ আয়ুয্য হিতঃ বুদ্ধিবিবর্ধনম্।

লোকোপদেশজননং নাট্যমেতদ ভবিষ্যতি।

ন তজজ্ঞানং ন তজ্জিহ্মং ন সা বিত্তা ন সা কলা।

নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যোহস্মিন বরং দৃশ্যতে।'

(নাশা-১১১৪-১৬)

আর, রসপিপাসুরা এই নাট্যরস আবাদন ক'রে 'আনন্দে বহুক পান সুখ নিরবধি।'

\* ৬ষ্ঠ বর্গে নাট্যসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বদূপা রংগমঞ্চে ৩০শে মার্চ, ইং ১৯৬৪ বিশেষ আমন্ত্রণ প্রদত্ত ভাষণ।



ব্রাণ্ডন। এখন তাদের কেমন লাগে ?

মিলার। বর্তমানে তাদের অনেক সৃষ্টি অত্যন্ত মৃদু, একটু অভিন্ন-সচেতন এবং নিরীহ মনে হয়—যদিও তারা পুণ্যাতন ভাবরীতির ধারা ও কৈশোর আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। তাদের অনেকগুলি খুব ভালো কাজের রীতি খুব ভালো—বোধ হয় আমাদের বর্তমান জগতের তুলনায় অতিরিক্ত ভালো। ও'নীলের অনেক লেখা এখন বর্ধার্কতর মনে হয়, বোধ হয় আমরা ঠিক স্নায়ুপীড়ার অংশীদার। তা ছাড়া ঠিক লেখা ত' আশ্চর্য। অপরায় তাদের নিরুদ্ভ-মনের ছবি রঙ্গক্ষেপে দেখতে চার নি। তাই তাদের অত্যন্ত শীতল মনে হয়। ও'নীল আমাদের মতো সাংখ্যলিখিত শ্রমীর। আর ওরা জনবক্তা সংখ্যগরিষ্ঠ এবং এভাবেই ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। আমরা এখন আশ্চর্যতভাবেই চাই কিন্তু ওরা গঠনশিল্প, রসপূর্ণ কথাব্যক্তি, লোকের হাবভাবের সম্বন্ধে মন্তব্য, প্রতিমাভঙ্গ এসব গছন্দ করতো। ও'নীলের লেখাও মাঝে মাঝে এই রকম ভাবে লিখে নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার অন্তর্জীবনের ছাপ দর্শনীয় ও তা মনকে নাড়া দেয়।

## মনরো-মিলার সাক্ষাৎকার-৬

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

হেনরি ব্রাণ্ডন

এই সব লেখকদের কতগুলি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ত্রিশশকে হয়েছিল কিন্তু সে যুগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুরে বিশেষ লাভ করেছিল—তার মধ্যে কিলফোর্ড অডেটস্‌ এবং লিলিয়ান হেলম্যান প্রধান। সামাজিক নাট্যকাররা তখনও গঠনশিল্পী—তারা জনগণের কথাই বলে, কিন্তু অডেটস্‌ ও হেলম্যানের অন্তরের নিরুদ্ভ ভাষাও রূপ পেয়েছিল—তার ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করেছিল ফ্যাসিস্টকালীন জনমনের যন্ত্রণা। ওজেন্ট একটা নতুন কাব্যময় ভাব—আর সেই গন্ত যেন জীবনের চেয়েও বড়। হেলম্যানের স্মরণভাবে সাক্ষাৎনাট্যে গতি ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। এই দু'জন লেখকেরই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন—তাদের কাজ থেকেই তা চেনা যায়—কিন্তু প্রতীকগুলি প্রায়ই এতটা ত্রিশশকবর্মী ছিল যে, যখন সেই সামান্য রাজনৈতিক বিকোভ যুদ্ধে পরিণত হলো তাদের পৃথিবী পুরোণ হয়ে গেল। আমাদের বিচার করে দেখা উচিত সত্য-ই তাই কি না? এই সব নাটকগুলি আমার স্মরণকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল এবং ভালোবাসার সঙ্গে আজও স্মরণ করি।

একথা মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র বামপন্থীরা সামাজিক নাটক লেখেন নি। ম্যাক্সওয়েল এন্ডারসন, শেরউড, রাইস, সিডনি হাওয়ার্ড এমন কি বায়মান ও ব্যারীও এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ফ্যাসিজম ও কন্যুনিজমের বিরোধ নিয়ে লিখেছেন। আমার মনে হয় অডেটস্‌ ও হেলম্যান এই বিষয়ক নিজেদের একক কল্পনার দেখেছিলেন। একজুই এটা তাঁদের যুগের মনে হয়েছে। আসলে এভাবে 'জিওরসনের' সময়ে সাবালক হয়ে ওঠে।

চল্লিশ শতকের পরিণতির সূত্রে আমরা দেখি নাট্যকারদের

আত্মপ্রচাবের অন্তরঙ্গতা দিন দিনই গভীরতর হয়েছে—এবং গঠনশৈলী ও রঙ্গমঞ্চের নীতির দিকে তাঁরা কম নজর দিচ্ছেন। এই হিসেবে ও'নীল-ই নায়ক—চিরস্থায়ী ভিত্তি। তাঁর সৃষ্টিও আমাদের মতো অজ্ঞী ক্রয়েজিরবাদ, নিখোঁ সমস্যা, সমাজতত্ত্ববাদের ভাণ, সামাজিক ক্রাংবিচার ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ এবং সেই রকমই অপ্রচলিত অশ্লীলতা, বিজ্ঞী কৌশল ও অতি নাটকীয়তার কলুষিত। কিন্তু তিনি নিজে দুহুর্ভের জ্ঞাত ও তলিয়ে যেতে পারেন নি—আমরা তাঁর অন্তরের কথা শুনেতে পাই—তাঁর নানা সুরে সাড়া দিই। তাঁর আত্মকরণ, তাঁর যন্ত্রণাময় জিজ্ঞাসা, তাঁর নির্মম সন্দেহ রঙ্গমঞ্চস্থত সমাধানকে ঢেকে দেয়। আর সব লেখকরাও তাঁদের নর্নটকে বন্দী হয়ে আছেন।

চল্লিশ এবং পঞ্চাশ কল্পব্যতিকার যুগ। এর জন্ম প্রধানত দাবী টেনেসী উইলিয়াম। আমার একটি পা'ও এই প্রোতে। এ হচ্ছে নিষ্ঠুর, রোমাণ্টিক স্নায়ুপীড়া, সমসাময়িক জীবনকে আত্মার মধ্যে যুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা। ব্যক্তিই জয়লাভ করেছে। সমস্ত সংঘাতই যৌন-সংঘাতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরিপ্রেক্ষি দিন দিনই বাস্তবায়ন হচ্ছ। কারণ হয় এতে সমাজের খুব বেশি স্থান নষ্ট নাহো সমাজকে একদম বাদ দণ্ডা হয়। এর গুণ স্পর্শপ্রবণতা বিস্তার ক্ষমতার—এখানে স্পর্শপ্রবণতা অর্থে আমি ভাবাহুড়তি বোঝছি।

এখন এটা চপলবিজ্ঞতার বিপজ্জনক আতিশয্যে চলে গেছে। এ যেন নীল-আকাশের নাটক বিশেষত কয়েকটি নতুন লেখকদের নিকট। যৌন-সংঘাত এতটাই পৌছতে পারে—আর বেশি নয়, এটা এখন ডাক্তারী শাস্ত্রের আওতার এসে বাচ্ছে। নাটককে নিজের অন্তর্জীবন পরিত্যাগ না করেও রৌদ্রালোকিত জগতে পথ করে নিতে হবে। প্রত্যেক আবিষ্কারই শেষে নিয়মবদ্ধতার পরিণত হয়। আমি বলতে চাইছি পূর্ণতার পথে যেতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি ও নিজে লেখতে করতে হয় বতরণ না বস্তত এটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনায়। প্রথম বারে অন্তর্ভেদী চাঁৎকার ঘীর ঘীর অভ্যাসগত ক্রন্দন কিংবা আত্মসচেতন কৌপানীতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময়ে মনে হয় এই রকম আত্মসচেতন ইচ্ছার জোরকরা কবি,



উত্তমকুমার প্রোবাজিত 'ছোটসে মূল্যাকাত' চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা।

নিয়তিব শিকার এবং কুজ্জ্বলিকার চেয়ে সেই আগের মতো একগাঙ্গা ছাদ দেখাই ভালো। কিভাবে যে এটা ঘটবে—আরও বেশি প্রতীকতার প্রকাশের পথে অথবা বাস্তবতার পূর্ণজন্মে (চিরচরিত ধারণামুখারী বলছে) তা জানি না—কিন্তু যেভাবেই হোক নাটককে ইন্দ্রিয়স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্যের জগতে নিজেকে পীড় করাতে হবে এবং ভাগ্যই হচ্ছে প্রতিপক্ষ।

ব্রাণ্ডন। আপনি যেন বলতে চাইছিলেন যে ও'নৌল এক পাশে...

মিলার। ও'নৌল একদিকে ছিলেন, কারণ বিশ-ত্রিশ দশকের মেজাজ ছিল অদ্যমিক। মূলত তাদের জগৎ বুদ্ধিগ্রাহ—তীর অতীন্দ্রিয়। একটি ব্যক্তি শু ভাগ্যের (এর চেয়ে ভালো শব্দ খুঁজে না পেয়ে এটাই ব্যবহার করছি) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তীর মতো আর কোন নাট্যকারের ছিল না—অন্তত আমার জানা নেই। সেটাই ছিল তীর চিন্তার প্রধান বিষয়—এবং তিনি সর্বদা তাই নিয়ে বাস্তব থেকেছেন। তিনি একহাতে আধুনিক সাহিত্যের চিরচরিত সমগ্রগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তিনি সর্বদা ঈশ্বরের কানের কাছে গুজবও ব্যবহার করেছেন। সেই পূরম অজানাকে মন থেকে মুছে দেওয়ার অন্ধমতের আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি ত্রায়ের বেকটের 'ওয়েটিং ফর দি গডট' দেখেছিলেন।

মিলার। আমি পড়েছি। কখনও দেখতে যাই নি। ঐ নাটকটার বৈপ্লবিক ভাবের জন্য আমার ওটা খুব ভালো লাগে। এটা খুব অন্তরঙ্গ বক্তব্য—রঙ্গমঞ্চে করা খুবই কঠিন এবং সেই সময়ের সারাংশ। এতে অমুড়তি আছে—বুদ্ধিও আছে। কিন্তু আমি এর সমাপ্তি কোথায় ভিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করছি—এই শিল্পকৌশল, এই আকার এবং অনেক অভিজ্ঞতা অমুখাদের সমাপ্তি কোথায়? অর্থাৎ ভবিষ্যতে এ কতটা টিকে থাকবে। আমি অমুখব করি যে পরিত্যক্ততা এর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। এতটা বঙ্গ-নিরপেক্ষত—তা যেভাবেই লেগে হোক না কেন শূন্যতা আসতে বাধ্য এবং এটা করাই ওদের মনোগত ইচ্ছা। এবং আমার মনে হয় না এটা অজ্ঞাত মনোভাব গ্রহণ করবার মতো নমনীয়। আমি সমালোচনা করছি না—শুধু বিবরণ দিচ্ছি। আমার মতে সমালোচনা সম্পূর্ণভাবে নিজের সাংস্কৃতিক স্তরে সীমায়িত থাকবে। এটাই যুক্তিসঙ্গত এবং উচিত। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমি এলিজাবেথীয় যুগে থাকতে চাই। রাস্তার ওপরের টিকানা মাত্র। শুধু সৌন্দর্যবর্ধন—প্রয়োজন নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন—হুই-ই টিক।

ব্রাণ্ডন। আমার মতে আপনি ও সার্জে বর্তমান যুগের দু'টি শক্তিশালী নাট্যকার। আপনার ও ওর মধ্যে তফাত এটাই যে, ওর লেখায় আদর্শের প্রাধিক।

মিলার। আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এক নম্বর,



সন্ধানী পরিচালিত 'অন্যনাস্ত' চিত্রে নারিকা অপ্রিয়া চৌধুরী ও নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমি এমন একটা সংস্কৃতির মধ্যে লিখছি—যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য নেই। এরা জানে না এরা কি করছে। একটা সাধারণ লোক কিংবা বিরাট প্রতিষ্ঠান দু'য়ের পক্ষেই এটা সত্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে আমি তা জানি।

ফরাসী দেশের লোকরা খুব ভালোভাবেই জানে যে, নিজেদের জাতি সঙ্ঘে সচেতন না হলেও তা সোজাভাবেই হোক বঙ্গগতভাবে চিত্রণ করা সম্ভব। মানে তারা ভেবে নেবে যে 'কেউ' জানে তারা কি করছে এবং বলতে গেলে এটা ঠিক নিয়মতান্ত্রিক কাজ। এখানে এটি বিলাস—কয়েকটা ছুজুগে লোক হয় তো এতে মাততে পারে, কিন্তু কোন ফল হবে না। তুমি জানলেই বা কি আসে যায়? আমরা এখানে প্রয়োজনে বিশ্বাস করি। আমরা প্রয়োজনের প্রভুত্ব ক্রীতদাস। প্রয়োজনকেই এখানে সত্যের সম্মান দেওয়া হয়। কিন্তু, কখনও কখনও লোককে অপরিহার্যতার সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

ব্রাণ্ডন। এটা কি কতকটা অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব নয়?

মিলার। এই দেশের বঙ্গবাদ সম্বন্ধে যে অভিযোগ আছে তার সম্বন্ধে আমি স্পষ্টভাবে মত জানাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি কয়েকজন ইংরেজ ও ইয়োয়োলীয়েস দাবণা বিসৃত জ্ঞান থেকে লঙ্ক।

আমি নিজে অনুভব করি যে, আপনারা ভাবতেই অবাক হয়ে যান যে এখানে বুদ্ধিজীবী জীবী নেই। কিন্তু এসত্যের কারণ হয় তো যে আমরা কোন ব্যাপারের নামাকরণ করতে চাই না—তাকে শ্রেণিবদ্ধ করতে চাই না।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি অজ্ঞাত দেশের লোকরা কি বুঝতে পারে যে বুদ্ধিজীবীরা কি করে? কিন্তু বাইরে অনেক লোক আছে যারা বুদ্ধিজীবীর নামেই মাথা নীচু করতে শিখেছে। আমার সেই নাপিতটার কথা মনে পড়ছে যার কাছে আমি যেতাম। সে বছরের পর বছর আমার চুল কেটেছে, কিন্তু কখনও 'কেমন আছেন', 'ধন্যবাদ' ছাড়া কোন কথা বলে নি যতদিন না আমার ছবি 'ডেইলি নিউজ' ছাপা হোল—সেবারে বোধ হয় আমি একটা পুরস্কার পেয়েছিলাম—এই রকম কিছু একটা হবে। ও ছিল ইটালিয়ান কোনরকমে ইংরাজী বলতো—তখন ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ডি এনানজিওর নাম শুনেছি কি না? আমি বললাম তার লেখা পড়েছি। তখন থেকেই ওর চোখ জলে ওঠে এবং তারপর যখনই আমি দোকানে এসে ওর চেয়ারে বসতাম ও আমার দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গ, মধুর হাসি হাসতো এবং মাথা নেড়ে বলতো, ডি এনানজিও। আমিও হাসতাম এবং ও আগের চেয়ে অনেক যত্নে চুল কেটে নিত। আসলে সে ডি এনানজিওর লেখা সম্বন্ধে কিছুই জানতো না—কিন্তু ঐ নামটাত্তই জাতীয় গর্ব ও পূর্ণতা অনুভব করতো। ডি এনানজিও তার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্রাণ্ডন। আপনি 'ডি এনানজিও'কে জানেন বলে ঐ নাপিতটার চোখে বুদ্ধিজীবী বলে প্রতিভাত হলেন।

মিলার। ইটালীর জনসাধারণের চোখে ডি এনানজিও নামটির যা অর্থ এখানকার লোকদের তেমন কিছু নেই। কিংবা কশীর এবং অনেক ফরাসী লোকদের মতো কোন লেখক নিজেকে জাতীয়তা অথবা ঐ ধরনের কোন ভাবে প্রকাশের মুখপাত্র ভাবে না। এক কথায়, আমাদের কোন সামাজিক স্থান নেই—শুধুমাত্র আমোদ-সুখীকারী কিংবা কখনও গভীর চিন্তাবিদ বা প্রচুর রোজগারে।

অর্থের দ্রোতনার দিক দিয়ে এটা অবশ্য অ-বুদ্ধিজীবী মনোভাব—কিন্তু তাই বলে দুগা বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। সত্য কথা এই যে, একমাত্র যুদ্ধের সময়ে সৈনিকবৃত্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তি জাতীয় শোভার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। তা ছাড়া, ফরাসী অথবা অপরাপর ইয়োয়োলীয়েস জাতির মতো আমাদের 'আমেরিকার সংস্কৃতি'র সম্বন্ধে সচেতনতা নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা নাটক, চলচ্চিত্র, ছবি, গানের কোন মূল্য দিই না। সহজ কথা এই যে, জাতীয়তাবাদের কোন ছাপ না লাগিয়েই তাদের উপভোগ করা হয়। আবার বলছি, আমরা নামাকরণ করি না—শুধু সেহুলি করি।

এর ভালো-খারাপ ছ'রকম ফলই আছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে এতে দেশকে ফেরিওয়ালার বাসা মনে হয়। জনগণের স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন কোন বুদ্ধিজীবী নিজেদের চারিদিকে অস্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং হীনমন্ত্রতা বোধ তাদের মনে একাকিন্দ, হতাশা ও দুর্বলতা সৃষ্টি করে। বোধ হয় এর সর্বাপেক্ষা খারাপ ফল দেখা গিয়েছিল মাক্সবারের সময়ে—যখন মানবের অন্তিমের মূল কথাগুলিই বলবার প্রয়োজন ছিল বুদ্ধিজীবীদের এমন



'ভোজপুজী' চিত্র 'কে তুমি'র নায়িকা—শ্রীমতী সুরেবা

এক স্তন্যদায়ক সামনে শাঁড়িতে হয়েছিল যারা উপদেশ স্তন্যদায়ক অভ্যস্ত নয়।

তবুও আমি নিজেকেই প্রশ্ন করি, বুদ্ধিজীবী পূজারী জার্মানোভাত নাজিবানের সামনে কি করতে পারলো কিংবা পাঁচ বৎসর আলজেরিয়া বুদ্ধিবদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সামনে ফরাসীরা কি করছে? রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে অনেকে অবাক হয়ে ভাববে যে হয় তো বুদ্ধিজীবীরা শাসনতন্ত্রের কোন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হলে, অপরিহার্যভাবে তাকে সরকারের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

এক কথায় আমাদের অবহেলাই করা হয়, ব্যতিব্যস্ত করা হয় না। কিন্তু সবাই তো অবহেলিত। আমার সন্দেহ হয় এদেশে কোন একটি বৃত্তি জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্য মজুরি অথবা স্বীকৃতি পায় কি না? এতে ব্যবসায়ীরা আছে যারা সর্বদা বৃত্তিগত হীনমন্ত্রতাবোধে, হিংসা ও ক্রোধে ভোগে—যে শিল্পীরা সর্বদা জনগণের কাছ থেকে সমাদর পাচ্ছে।

এতে যে উপকার হয় (যদি উপকার নাম দেওয়া যায়) তাও বখেট। ঐ এক ধরনের স্বীকৃতি না পাবার ফলে আমরা দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হতে পারি। অসহিষ্ণু সমালোচক যারা আকর্ষিত অথবা প্রতিরোধিত না হয়ে আমরা যেমনি খুঁশি লিখতে পারি। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই—অন্তত অধিকাংশ মনে নেই। তাই সাহিত্য জীবনকে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করে।

বাণেশ্বর এতে কি শিল্পমন নিরুৎসাহ হয়ে যায় না?

মিলার। হ্যাঁ। মুন্সিগ এই যে শিল্পীর পথে নিজেকে একথা বোঝানো কষ্টকর যে তার বৃত্তি একটা তুচ্ছ চাপল্য নয়। আমার মনে হয় যে আমেরিকার মনোবৃত্তির এটাই সর্বাপেক্ষা বড় অবকাশ। এ থেকে বাঁচবার জন্ত শিল্পীকে গীতে গীত চেপে আত্মসম্মান রক্ষা করতে হয়—কখনও হয় তো লাভ করবার মুহূর্তেই—কারণ খুব বাজে ব্যাপার ছাড়া সম্মান পাওয়া যায়—কিংবা হয় তো এই জয়ের পেছনে দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততা থাকে। কিন্তু জনগণ যদি বুদ্ধিজীবীদের একটা মৃতি তৈরি করে তাহলেই কি প্রমাণিত হবে যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক আছে? যদি উদাহরণস্বরূপ ইয়োরোপকে ধরা যায় তা হলে আমি সন্দেহ প্রকাশ করো। আমার সামগ্র্য অভিজ্ঞতার স্তরেই বুদ্ধিবাজের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা নোংরা লোকের কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদ।

এই দুটিভঙ্গীর একটিমাত্র প্রয়োজনীয় স্রবী যে, শিল্পীকে এই ভাব জয় করবার মতো জোর দেয়। যা সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে কাজ পছন্দ না করায় যখন তারা অন্তর্মমন্ত্র তখন তাদের আঘাত করতে হবে। এতমাকে এটা তাদের কাছে সত্য করে তুলবে হবে যে মনের রাজ্যের পার্শ্ব পথগুলি সত্য—তোমার লেখা সাহিত্য বকেই তাই গ্রহণ করবে না—তোমাকে তাদের মনে এখনও



আব ডি বনশল প্রমোদ ও 'মেরে মন মতুরা' থেকে কুমারী নাক্স, কল্লভা ওপ্তা ও রবি ঘোষ।

যেটুকু ভাগ্য ও ভিজ্ঞান আছে তার নিকট বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।  
এই প্রকার যুদ্ধাঙ্গনে কবিতার মতো অক্ষমার কলা নষ্ট করে দিতে  
পারে—কিন্তু নাটক ও উপজ্ঞাসকে পুরুষোচিত দৃঢ়তা দেয়। অবজ্ঞা  
এ তাদের পেশী দ্বা, মর্মবনানী, চাঁৎকারমুখর এবং স্পর্শপ্রবণ করেও

তুলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যা বলতে চাইছি তা হোল যে  
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর নাও হতে পারে।

প্রশ্ন। টায়োনস্কে ৫ বেকোটর মতে নির্ভেজাল বুদ্ধিবাদীদের  
সম্মুখে আপনার কি মত?



সম্মিতা স্তানাকী : ফটো-নূরেন দত্ত



বসুমতী : আবাচ

মিলার। আমার মতে ঠোঁট নাট্য-বিরাধী, ঠোঁট কি বলতে চান তা আমি জানি। সেই একই কথা—ইচ্ছাশক্তির শেষ—ধারণাস্থম মানবের গোদুলি। ঠোঁট সাহিত্য থেকে উচিত শকট বাদ দিয়েছেন। জীবন প্রকৃতপক্ষে অদ্ভুত এবং বখন কেউ সেই অদ্ভুতত্ব সবথেকে সচেতন থাকে তখনই সে সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়। মানব এবং তার অস্তিত্ব পরস্পর শত্রু এবং এর মধ্যে কোন আপোষের কথা ভাবা যায় না।

ব্রাণ্ডন। কিন্তু ইয়োনস্কো বলেন যে শিল্পের মূলে আদর্শবাদ থাকতে পারে না।

মিলার। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু এত চরম সূত্র কাজে লাগবে না। আমি বিশ্বাস করি না যে লেখকের জ্ঞানার পরিধি তাকে লেখায় অথবা তার সাহিত্যসৃষ্টি করে। কিন্তু আমি কেন মানবের অবচেতন জীবন—যা থেকে সাহিত্য খোঁসাক পায় এবং যা সাহিত্যসৃষ্টি করে—চিন্তাধারাকে অসম্ভব করে তুলবে? লেখকদের মধ্যে এইরকম বিশ্বাস আছে বলে মনে হয়। অমুভূত জ্ঞান বলে একটা জিনিষ আছে। আমি বুঝতে পারি না কেন কোন ধারণা বা আদর্শবাদ সৃষ্টিগর্ভী সাহিত্যের পথে বাধা হবে। বরঞ্চ একে যদি ব্যক্তিগত দর্শনের পরিবর্তে ব্যবহার না করা হয় তবে এটা সজীবনী হতে পারে। ইয়োনস্কোর আদর্শ চিন্তাবাদ আর এররকম আদর্শবাদ।

ব্রাণ্ডন। আপনার মতে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি।

মিলার। একটা কথা যে থিয়েটার আর বেশিদিন টিকবে না—অস্তুত আমাদের দেশে। আকাশশিলী নাটকেই ভবিষ্যতের সুর।



গৃহকোণে একা—শমিলা ঠাকুর

[বর্তমান সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বহুমতী ১ পক্ষ হইতে সর্বত্র জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনন্দ সাহা, বারেন দর ও নৃপেন দত্ত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।]

আমরা জানি কি আশা করতে হবে—নাটকে আমাদের শোচনীয় পরাজয়—এবং স্নেহচ্যুত একাকিত্বের দঙ্গল। চর্যাৎ দেখতে পাব তারা পুরণো টুপি হয়ে গেছে। হয় তো, আমিই শুধু এভাবে ভাবছি—এবং হয়তো জীবনধারণ করা আর দু'বৎসর আগের মতো অসম্ভব নয় এবং এটা যতটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য ততটা নাটকীয় সত্য। আমি বলতে চাইছি যে, এখন আশা করা যায় যে মানবজাতি রক্ষা পেয়ে যাবে। মনে হচ্ছে দুইটি প্রবল শক্তি মানবজাতিকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। একথা অবশ্য নিশ্চিত যে পৃথিবীময় সৌভ্রাতৃ সম্প্রদায় কর্তে হলে আরও অনেকদূরে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র এই সত্য যে গত পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও যুদ্ধ না ঘটা এবং কিছু পদক্ষেপ করা যাতে মনে হয় এই দুই দেশের মধ্যে পূর্বমৈত্রীস্থাপন হতে পারে এবং সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধশিল্পের প্রবর্তন হয় তো যুদ্ধকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। এই সবই দেশকে শোষণ করবে যতদিন না এটা ভাববেগপ্রবণ লোকের জীবনের অংশ হয়ে উঠবে—যারা কখনও খবরের কাগজ পড়ে না—এবং তারা জানবে না যে কেন কয়েক বৎসর আগের থেকে সব পৃথক মনে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে রান্নাঘর পর্যন্ত লাইন্সটা বন্ধ ও বন্ধ কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। সামরিক শিক্ষার মতন একটি সহজ জিনিসের কথা ধরুন। যখন প্রতিটি আঠারো বছরের ছেলেকে সেক্সুয়াল নির্বাচন করা হচ্ছে এবং দুতিন বৎসর তাদের শিক্ষার দ্রুতি হচ্ছে যা তাকে এ একটি মাহুয় তোলা তার মনে নানারকম নিকট বিরক্তি মিশ্রিত ঘৃণা জেগে ওঠে। ছেলেটার মনে হয়—দূর ছাঁই, কেন এরা আমার সময় নষ্ট করছে কারণ আঠারো বছরের একটা ছেলের কাছে তিন বৎসর সমস্ত জীবন, একটা বিরক্তির জুকুটি মনে জেগে ওঠে—সবই বুঝা মনে হয়। সামরিক শিক্ষা অনেক কমানো হয়েছে। হয় তো শেষ পর্যন্ত প্রায় বৎসর কয়েকজন মাত্র নিয়েই হয়ে যাবে। শুধুমাত্র এই ব্যাপারটাই মনস্তত্ত্বের ওপরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—শুধুমাত্র বালকটির নয় তার পিতামাতার শুধুমাত্র, পিতামাতার নয় চারিপাশের সকলের, আমি এরকম একটা বাজে উদাহরণ দিলাম। প্রতি মানসিকভায়ে পেছনেই প্রেক্ত কারণ আছে, এই সবগুলি খুবই প্রয়োজনীয়—বাস্তব জগতের অস্থির আশ—কিন্তু যারা ফলভোগ করে তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়—এবং এরকম অনেক লোক আছে। কিন্তু বঙ্গমত এখনও সে অবস্থায় পৌঁছায় নি—দূরদৃষ্টির সেই গভীরভায়ে—যখন শুধুমাত্র আমাদের আটকে রাখা যন্ত্রণার মাকড়সার জাল না দেখে তার চেহের বেশি কিছু দেখতে পাই।

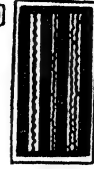
চারদিকে বহুবিধ ইঙ্গিত থেকে বোধ হয় জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমরা এখনও শেষ হয়ে যাচ্ছি নি। এবং যে মুহূর্তে প্রকৃতই তা ঘটবে তখন অনেক নাটকের ছুড়ে থাকা কালা হাতের অহুতি মনে হবে। ঘটনা কি রকম তা কেউ দেখবে না—শুধু দেখবে দীতি।

সমাপ্ত

অভিবাদিকা—রাণু ভৌমিক



# নাট্য গান স্বাভাঙ্গনা



## ভারতীয় যন্ত্রের প্রকরণ

শ্রীপ্রভাকর সেন

ভারতবর্ষ সঙ্গীতের তীর্থ। প্রাচীনকাল থেকে এই আজকের বিশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষ সঙ্গীতে বিশেষ অধ্যয়ন যোজন্য করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম সঙ্গীতক্ষেত্র যে ভারতবর্ষ তা বোধ করি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণীয়। যাঁরা হোক, ভারতের যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বহুজনের অবদান অসামান্য। এই যন্ত্রগুলির প্রকরণ সুবিশাল এবং অসংখ্য। সেই আদিকাল থেকে এই আজ পর্যন্ত বহুজনের বহু নতুন যন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। সেই যন্ত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অল্পদূরে যন্ত্রগুলির বিভক্তিকরণ হয়েছে। রাজসভার জঙ্ঘা, নটবংখানার জঙ্ঘা, বৃন্দব জঙ্ঘা, মঙ্গল অনুষ্ঠানের জঙ্ঘা বিভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। যন্ত্রের প্রধান শ্রেণীগুলির নাম—ঐকতান যন্ত্র, সভা যন্ত্র, মঙ্গল যন্ত্র, রণ যন্ত্র, ঘোষ যন্ত্র, গ্রামা যন্ত্র ও সওয়াহী যন্ত্র। আফগানিস্তান, কাবুল, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ থেকে কয়েকটি যন্ত্র ভারতবর্ষে এসেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা ভারতীয় যন্ত্র নামে অভিহিত হয়েছে।

ঐকতান যন্ত্রগুলি ঐকতান বাদনের জঙ্ঘা নিযুক্ত ছিল। ঐকতান বাদন 'নটবং' বা 'নটবং' নামে সমধিক পরিচিত। ভারতে ঐকতান বাদন একটি বিশিষ্ট বস্তু ছিল। সেকালে নটবং বা নটবং যন্ত্রে উৎসব ও সমার লভ্য করেছিল। সেকালে রাজা এবং সমস্ত দানীদের গৃহেই নটবংখানার ব্যবস্থা থাকত। উৎসবকালে এবং গোপালিগে নটবংখানায় নটবং বসত—এ ছাড়া ইচ্ছা ও ব্যবস্থানুযায়ী বা প্রয়োজনানুযায়ী অগাধ সময়ও বসত শোনা যায়। ভারতীয় নটবং-এর জঙ্ঘা নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত—১। সানাই ২। নাগড়া ৩। কাড়া ৪। টকাড়া ৫। রণশৃঙ্গ ৬। করতাল ৭। মুই বা নৈ অর্থাৎ আফগানি বাঁশি ৮। আলগোজ ৯। রসনটৌকি ১০। কলম ১১। বাঁশি ১২। ডম্ফ ১৩। তরাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের মধ্যে কতকগুলি বহির্দেশ থেকে এসেছে।—

সভা যন্ত্র বলা হত তাকেই বা সভা-সর্দা সভাতে ব্যবহৃত হত। রাজসভায়, দরবারে সভাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। সভাযন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—১। স্বরংসিদ্ধ ২। অনুগতমিচ্ছ। যে সমস্ত যন্ত্র গান বা জঙ্ঘা কোন বাজের সঙ্গে অনুগত হয়ে বাজে না, সেগুলিকেই স্বরংসিদ্ধ বলা হয়। আর যেগুলি গান বা জঙ্ঘা কোন যন্ত্রের অনুগত হয়ে বাজে সেগুলিকে অনুগত সিদ্ধ বলা হয়।

স্বরংসিদ্ধ যন্ত্রের তালিকায় পড়ে—১। রক্তবীণা ২। সরস্বতী বীণা, ৩। ত্রিতন্ত্রী বীণা, ৪। মহতী বীণা অথবা শারদীয়া

বীণা, ৫। কঙ্কণী বীণা, ৬। কিতরী বীণা, ৭। বজ্রনী বীণা, ৮। কাতায়ন বীণা, ৯। প্রসারণী বীণা, ১০। ময়ূর বীণা, ১১। পিনাকী বীণা, ১২। চিত্রা বীণা, ১৩। সপ্তস্বরী, ১৪। সুর সাগর, ১৫। সুরশৃঙ্গার, ১৬। সুরবীণ, ১৭। রবাব, ১৮। কাহনু, ১৯। বাঁশী ২০। এত্রোজ, ২১। তরব, ২২। দিলকবা ইত্যাদি।

অনুগত সিদ্ধবিভাগের মধ্যে পড়ে—১। তমুরা বা তানপুরা ২। মুদঙ্গ বা পাখোচাঙ্গ, ৩। তবলা-বাঁজা, ৪। ডম্ফ, ৫। মন্দিরা ও করতাল ৬। সারোজী ৭। মুচঙ্গ, ৮। খঞ্জরী ইত্যাদি।

উক্ত যন্ত্রগুলির মধ্যে রবাব, কাহনু, তরব আরব দেশ ও কাবুল দেশ থেকে এদেশে এসেছে।—

মঙ্গল যন্ত্র সাধারণত মঙ্গলযন্ত্রক অনুষ্ঠানে মঙ্গলচরণের জঙ্ঘা ব্যবহৃত হত। বিগা-উৎসব, পূজা-অর্চনা ইত্যাদির জঙ্ঘা সময় সময় মঙ্গলযন্ত্রের সৃষ্টি প্রয়োজন হত। যে যন্ত্রের ধ্বনি মঙ্গল-যন্ত্রক তাকেই বলা হয় মঙ্গল যন্ত্র। যেমন—শাখা, ঘণ্টা, কীসর, বাঁক, মুদঙ্গ, ঢোল, ভোর, শিখরা প্রভৃতি—

যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জঙ্ঘা যে সব যন্ত্রের ব্যবহার হত তাদেরকে রণ যন্ত্র বলে। জয়কো (জয়চাক), দগড়া, দুন্দুভি, রণ-শৃঙ্গ, দামামা, গোমুখ, মহাশঙ্খ, পনব, ডম্ফ, তরাই, কর্ণ প্রভৃতি এই পদ্যে পড়ে।—

রাজা-মহাগজাদের যুগে প্রায়শই বিভিন্ন বিষয় দেশময় ঘোষণা করার প্রয়োজন হত। ঘোষণা কয়েকটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত; এই সহায়ক যন্ত্রগুলির নাম ঘোষ যন্ত্র। ডেরা, দুন্দুভি, দামামা ইত্যাদি যন্ত্রই ঘোষযন্ত্র।—

চিবকালই উজ্জ্বল সঙ্গীতের সঙ্গে সমান তালে পা খেল চলবার চেষ্টা করেছে দেশী বা গ্রাম্য-সঙ্গীত। উজ্জ্বল সঙ্গীতের জঙ্ঘা যেমন কয়েকটি নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহার হয় তেমনি গ্রাম্য বা দেশী সঙ্গীতের জঙ্ঘাও কয়েকটি নির্দিষ্ট আছে। গ্রাম্য-সঙ্গীতের জঙ্ঘা যে সব যন্ত্র ব্যবহার হয় তাদেরকে গ্রাম্যযন্ত্র বলে। যেমন—মদল (মাদল), সুরমঙ্গল, একতারা, দোতারা, সারিন্দা, আনন্দলহরী বা বাঁশবগবগ, বাঁশি (বাঁশী নর), বেণু, বিভিন্ন প্রকারের বাঁশি, গোপীযন্ত্র, ধোল (শ্রীধোল), বিগুমী (খঞ্জরী), ডম্ফ (বানর ও ভালুক নাচের

সঙ্গে ব্যবহৃত হয়), তুর্ডি (সাপুড়িয়ার বাঁশ), জড়কা বা ছড়কা, রামগিটা, ঢোলক, ঢোল ইত্যাদি।—

রাজ-বাঁহাওরেরা যখন যুদ্ধভিন্ন অস্ত্র কোন কারণে সজ্জিত হয়ে বহির্গমন করতেন তখন তাঁদের মনস্তত্ত্বের জ্ঞাত রাজার হাতীর আগে চলমান উট বা অশ্বের পিঠে একটি ছোটখাট মজলিস বসত। রসনচৌকি, আলগোজা, কলম, ডঙ্কা, খোরদক প্রভৃতি যন্ত্র সেই চলমান মজলিসে ব্যবহৃত হত। পারস্য ভাষায় রাজার বহির্গমনকে সওগারী বলে। কাজেই সওগারীর জ্ঞাত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হত তাকে স্বাভাবিকভাবে সওগারীযন্ত্র বলা হত।

দেখা যাচ্ছে যে কিছু যন্ত্র একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যন্ত্রের নিজস্ব নাম অপরিবর্তিত থাকছে কিন্তু যখন যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের নামানুসারে যন্ত্রের ব্যবহারিক নামকরণ হয়েছে। যেমন দেখি ডম্ব যন্ত্র; যখন নহবৎ-এ ব্যবহৃত হয়েছে তখন তাকে 'নহবৎ-এ যন্ত্র' বলা হয়েছে, কিন্তু আবার যখন দেখি যে ওই ডম্ব যন্ত্রই রণ যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তখন তা 'রণ যন্ত্র' নামধারণ করেছে—ডম্ব, যা নিজস্ব নাম, তা কিন্তু পরিবর্তিত হয় নাই। এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তা সব অতীতের—আদি মধ্য যুগের! আধুনিক যুগে যন্ত্রের শ্রেণীকরণ আর অতীতের মত নই। বর্ত্তে বাঁহা নেই, ভারত আজ পশ্চিমী যন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত। প্রায় সব উদ্দেশ্যেই পশ্চিমী যন্ত্রের ব্যবহার হয়, এর ফলে আজ ভারতের যন্ত্র-ঐতিহ্য বিলীনমান।

সভায়ন্ত্রগুলির মধ্যে গীটার, সেতার, সরোদ, বাঁশী ও বাজুলিন অর্থাৎ বেহালা বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অবশিষ্টগুলি বর্ত্তমানে অপ্রচলিত।

ঐকতান বাদনে পুরাকালের যন্ত্রগুলি সব ব্যবহৃত হয় না। সানাই, বাঁশি ব্যতীত ব্যাগপাইপ; বিভিন্ন প্রকারের ডাম; ক্লারিনেট; বিভিন্ন ধরনের পাইপ; একর্ডিয়ন, পিয়ানো, অর্গ্যান, ইন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ, কঁাসর, ঘণ্টা, সানাই, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি গণনীয়।

রণ যন্ত্রের মধ্যে পশ্চিমের ব্যাগপাইপ, হর্ন, ডাম, মার্চডাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতের রণ যন্ত্রগুলিকে বর্ত্তমান যুদ্ধক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর করাই যায় না। এখন সনাদের ব্যবহার্য যে সব রণ যন্ত্র তা সবই পশ্চিমী—অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেও পরিবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক যুগে বোধ যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে রাজা-মহারাজা নামে কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না—সরকার বাহাদুরের ব্যবতীয় ঘোষণা নানাভাবে এবং অধিকতর স্তোত্ররূপে করা হয়, সঙ্গীতযন্ত্রের প্রয়োজন তাই হয় না।

গ্রাম্যসঙ্গীতে যন্ত্রগুলি প্রায় অপরিবর্তিত আছে। সওগারী যন্ত্র বর্ত্তমানে অচল। প্রয়োজন হলে পশ্চিমী ডাম পাইপ হর্ন ইত্যাদির সুর (নওয়া) হয়ে থাকে।

অর্থাৎ যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত, তা এক বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব জগতির তুলতে পারত। শুধু তাই নয়, এর এক বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল। বর্ত্তমানে পশ্চিমী যন্ত্র ব্যবহারে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব যে পরিস্ফুট হয়, একথা বোধ করি জোর করে বলা যায় না।

যাই হোক না কেন, নির্বিঘ্ন চিন্তায় মন হয় এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ভারতীয় যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করলে যে আবহাওয়া বা পরিবেশ অথবা ভাবের সৃষ্টি হবে, তা পশ্চিমীযন্ত্রের সম্পূর্ণ ব্যবহার কিংবা কিছু ভারতীয় ও কিছু পশ্চিমীযন্ত্রের ব্যবহারে সৃষ্ট আবহাওয়া থেকে পৃথক।

আমরা ভারতবাসীরা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকৃত্তে গৌরবোধ করতে কুণ্ঠিত বোধ কর'। অথচ পশ্চিম দেশগুলির ঐতিহ্য সম্পর্কে পশ্চিমীরা যথেষ্ট গর্ব করে থাকেন, তাঁদের থাকে না কেনিও কুণ্ঠা, বরং তা পাঁচজনকে জানাবার জন্যই তাঁরা সদা উদগ্রীব! কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা আপনাদের মস্তুর ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁদেরই ঐতিহ্য নিয়ে গৌরবোধ করি। আমাদের আপন ঐতিহ্য পুনঃস্মরণ করে তা পুনঃপ্রচলিত করা উচিত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতের প্রাচীন যন্ত্রের ঐতিহ্য অপর কোন দেশের যন্ত্রের ঐতিহ্যের তুলনায় কোন অংশেই অপরূপ নহ—বরং অনেক পরিমাণেই মংৎ এক উৎকৃষ্ট।

## রেকর্ড-পরিচয়

'এইচ-এম্‌টি' ও কলম্বিয়ার সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা রেকর্ডের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় :—

### হিজ মাস্টার্স ভয়েস

এন্ ৮৩০৮—দু'খানি নজরুল গীতি 'দূর দীপবাসিনী' ও 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেরে'—গেয়েছেন ফিরোজা বেগম।

এন্ ৮৩০৭—সত্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি নজরুল গীতি 'শাওন রাতে যদি' ও 'গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়'।

এন্ ৮৩০৬—ভোট প্রার্থীর 'নিবেদন'—দু'খণ্ডে সমাপ্ত কৌতুক নক্সা—শিল্পী হুমাল চক্রবর্তী ও জামাল দাস।

এন্ ৮৩০৫—'আমরা যদি হঠাৎ কোন ছলে' ও 'তোমরা সবাই অন্ধ কবে'—আধুনিক হু'টি গান—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এন্ ৮৩০৪—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (চৌধুরী) দু'খানি আধুনিক গান 'হার হারের বয়সের' এবং 'ওপথে যাবো না যাবো না'।

এন্ ৮৩০৩—দু'খানি আধুনিক গান 'মধুর সে মুখখানি' ও 'আমি স্বপনে তাহার' গেয়েছেন—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

### কলম্বিয়া

জিই ২৫১৮৩—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং নজরুলের দু'খানি ধর্মমূলক গান পরিবেশন করেছেন—'জগতের নাথ করো পার হে' ও 'যত নাহি পাই দেবতা'।

জিই ২৫১৮২—বহুলাল পণ্ডে গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন—'রাজা সাঁঝের লগনে' ও 'মানসী সেজেছি আমি'।

জিই ২৫১৮১ মিল্টা দাশগুপ্ত, যোগেশ দত্ত ও রবীন্দ্র অধিকারীর দু'খানি কৌতুকনক্সা 'মোহিনী' ও 'পালিবে পথ পাই না'।

জিই ২৫১৮০—'নয়নে বরষা ঝিম্‌ঝিম্‌' ও 'সে আসবে আজকে বলেছে'—আধুনিক দু'খানি গান—পরিবেশন করেছেন ইলা বসু।

জিই ২৫১৭—পদ্মালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে মাতৃপূজার সুর-নৈবেদ্য—'বসিলেন মা হেমবরগী' ও 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে'।



## আমার কথা (১১২)

### রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রতিভা এবং বিনয় যুগপৎ বঁদের মধ্যে সম্যকভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম তাঁদেরই সঙ্গে উল্লেখনীয়। সঙ্গীতের প্রতি উত্তরাধিকারসূত্রে অমুরাগবশত তাঁর অমূল্যলব্ধ তাঁর আত্মনিয়োগ যখন তাঁর উত্তরজীবনে এনে দিল অপরিণীত জনপ্রিয়তা এবং প্রভূত খ্যাতি তখনই তাঁর আত্ম-জনহীনতা আচরণ, শ্রীতিমধুর আচরণ এবং সবারাশ্রিত্য তাঁকে আন্তরিকতার অনেক কাছে টেনে নিয়ে যায়। বয়সের অধুনাতে অনেকের তুলনায় তিনি নবীন হলেও তাঁর জীবনের সঙ্গীতমুখালনের বিচিত্র বিবরণ আপন গুরুত্ব এবং বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা দেবীর পুত্র রামকুমারের জন্ম হয় ১১২১ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে। রেণুকা দেবী ছিলেন সঙ্গীতচর্চা রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। নিউ ইন্ডিয়ান স্কুলে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে থাকেন রামকুমার। প্রাথমিক পড়াশুনার উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হলেন বিজ্ঞানাগর কলেজে।

বিজ্ঞান জীবন থেকেই তবলা বাজানো তাঁর শুরু হয়। এ বিষয়ে প্রথম দীক্ষা পেলেন মাস্তামহ সঙ্গীতচর্চা রাজেন্দ্রনাথের কাছে। ছাত্রচিত্রে তখনও তারা কোটে নি, চলচ্চিত্রের সেই নির্বাক যুগেও তার সঙ্গে বালক রামকুমারের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল তবলাকে কেন্দ্র করে। সে যুগের নির্বাক চিত্রে রামকুমার তবলা বাজিয়ে থাকতেন। টিলা ইত্যাদি গানেও রাজেন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগী লৌহিত্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের পর তিনি বারাগণীরা সুপ্রসিদ্ধ তবলায় বৃন্দ মিশ্র, স্বর্গিকা ছোটেন হোসেন

বাণীনাথ বসু ঘরোয়ানার ভৃত্যবরবাণু মিশ্র ঘরোয়ানার জামবাণু প্রভৃতির কাছে তিনি তবলা শিক্ষা করেন। টিলা শেখার পর ক্রমশঃ শিক্ষাও তাঁর আরম্ভ হয়। জমিরদীন বাণী ও বাঙ্গল বাঁর কাছে শিখতে থাকেন বৈষ্ণব-ধূনি। রামপুরের মেহেদি হোসেনের কাছে শিক্ষা পনের বছরব্যাপী। ক্রমশঃ তাঁর গুরু লঙ্কপ্রতিষ্ঠ ক্রমশঃ প্রবীণ শিল্পী বৈষ্ণবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাগ-সঙ্গীতের জগতেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ নয়। হাড্ডা সঙ্গীতের শ্রোতাদেরও তিনি যথেষ্ট পরিচুতি দিতে সক্ষম। বেতাবে, চার্যচিত্রে এবং গ্রামোফোন জগতে তাঁর সাযোগ্য একে একে গড়ে উঠতে থাকে। সময়ের স্রোত সেই সাযোগ্যকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলছে।

প্রখ্যাত বেহালাবাদক পরিতোষ শীল তাঁকে এই জগতে (হাড্ডা গানের জগতে) নিয়ে আসেন। হাড্ডা গানের শিক্ষা নেন যশবী শিল্পী কমল দাশগুপ্তের কাছে। এ প্রসঙ্গে সুখ্যাত সুরকার দুর্গা সেনের নামও উল্লেখ্য।

কলকাতা বেকর্ড কোম্পানী দ্বারা তাঁর কয়েকটি চিত্র সঙ্গীতের ও একক সঙ্গীতের একই গৃহীত হয়েছে। বহু বিখ্যাত সংস্থার মধ্যে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য সাধুবাদে বিভূষিত হয়েছেন। কলকাতা ছাড়া প্রয়াগ, লাক্ষ্মী, দিল্লীতে অসংখ্য একাধিক সংস্থার মধ্যে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

স্বরণ সে সুন্দর দেশ হামারা, চন্দ্রশেখর, মেঘবৃত্ত, বিদেশিনী, জাঁদারে আলো প্রভৃতি ছবিগুলির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া কয়েকটি মাদ্রাজী ও তেলুগু ছবির সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন।

পূর্বাঞ্চল শিল্পবিশ্ব ছাড়া আরও বহু গুণিজনের শিষ্য নিয়ে নিজেকে যথেষ্ট লাভবান করে তুলেছেন। বর্তমানে বহু ছাত্র-ছাত্রী এর শিক্ষার নিজেদের পরিপূর্ণরূপে ভরিয়ে তুলছে।

## মাতৃষের মনে গন্ধের প্রভাব

ইটো উলরিয়

আজকের দিনে জিনিস বিকোর বিজ্ঞাপনের ছোরে এবং তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। বিজ্ঞাপন হয়ে পাড়িয়েছে একটা আর্ট না শিল্প। বিজ্ঞাপনে আজকাল নিতানতুন কৌশল ব্যবহার হয়। এই ব্যাপারে জার্মান বিজ্ঞাপনদাতারা এখন এক নতুন 'আশ্চর্য অস্ত্র' আবিষ্কার করেছে এবং সেই অস্ত্র হচ্ছে 'মাতৃষের অবচেতন মনে গন্ধের প্রভাব লক্ষ্য করে তারা বিজ্ঞাপনে গন্ধের কৌশল অবলম্বন করেছে। কিছুদিন আগে এক দোকানে দু'জাতের মোজা বিক্রি হয়েছিল। মোজাগুলি আসলে ছিল এক জাতের কিন্তু কিছু মোজার একরকম গন্ধ লাগানো ছিল। শতকরা আশিজন মহিলা কিনলেন সেই গন্ধ-লাগানো মোজা। বিজ্ঞাপনের দৌলতে শুধু যে গন্ধের কাটতি বেড়েছে তা নয়, অন্তর্গাস, মোজা, মনিব্যাগ, বেন্ট, জুতা, দস্তানা, স্মটেকেস, লেখার কাগজ, বই, জ্বালানি, আসবাবপত্র সবচেয়েই এখন বিক্রির ক্ষেত্রে গন্ধ ব্যবহার হচ্ছে। খাবার দাবারে

এখন গন্ধের অটেল ব্যবহার। গন্ধাবিশেষজ্ঞদের সীমাহীন কলনায় সঙ্গে এখন রাসায়নিকশিল্পকে তাল বজায় রেখে চলতে হচ্ছে। 'নিউকার' বলে একরকম গন্ধ তৈরি হচ্ছে যা পুরোনো গাড়িতে ছিটকে দিলে ভালো বিক্রি হবে এই আশায়। গন্ধের বাড়তে জিনিষপত্রের কাটতি বেড়েছে তো বটেই, মাতৃষের কর্মশক্তিও গন্ধের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। মনোবিজ্ঞানীরা তাই এখন কলকারখানার অফিসে সুগন্ধময় আবহাওয়া সৃষ্টি করার পরামর্শ দিচ্ছেন। চিকিৎসকরাও পিছিয়ে নেই। তারাও রুগীদের প্রস্তুত রাখার ক্ষেত্রে 'গন্ধ চিকিৎসার' আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে একটা কথা আমাদের নাক বড় সৌম্য। একই গন্ধ তা সে বত ভালোই হোক, বোজ বোজ আমাদের নাকের পছন্দ হয় না। তাই নাকের মারফৎ বিজ্ঞাপনের প্রতীক বিস্তার করতে গেলে তাকে নিতানতুন গন্ধের সন্ধান করতে হবে।

[ডি এ জি]

# শাস্ত্রী

নমিতা চক্রবর্তী

আজ তপতীর বার্ষিকে পাটি। কাল রাত হতে অস্থিত  
ভর আছে মন। পাটি জিনিসটা মন্দ নয়। বন্ধু  
সমাগম আলো নবম কেক, সোনালী চা। এখানে-ওখানে ফুল।  
কিন্তু নিজের জন্মদিনের জন্ম পাটি। সবার লক্ষ্যের কেন্দ্রীভূত  
হওয়া, টেবিল-ভরা উপহার—কি যে বিল্লী। আর জন্ম তো হয়েছে  
ভার করেই আজ গো পূর্ণ হবে তপতীর উদ্দেশ্য বছর। ইস!  
চুড়ি বছবে পড়ল তপতী। বুড়ি হতে বাকি কি আর।  
সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে—এই পাটিটা কেবল উদ্দেশ্য, তাকে ধরে  
একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে তপতীকে। গত তিন চারদিন ধরে  
তপতীর মাসি—তিনি বছর দশেক হোল তার মা হয়ে গেছেন,  
তাকে সেই রকমই বুঝতে দিচ্ছেন।

সকাতায় ফিরেছে ভাস্কর, ভাস্কর মিত্র। কলকাতা বিশ্ব-  
বিদ্যালয়ের পাঠ্য দায় করে সে গিয়েছিল ইয়োরোপে। পশ্চিমের  
বিশ্বজয়গুণী তার প্রশংসাপত্রের পাতাকে নিজেদের গানন্দ স্বাক্ষরে  
অলঙ্কৃত করে দিয়েছেন। মস্ত বড় চাকরী ছুটেবে অনায়াসে।  
কিন্তু না, চাকরীর দরকার নেই ভাস্করের। মস্ত ব্যবসারী হুমোইন  
মিত্রের একমাত্র ছেলে সে, চাকরী করবে কেন! নিজেদের  
ব্যবসায়ে লেগে যাবে। প্রস্তুত হবে ভবিষ্যতের মালিকানার  
জন্ম।

আবার কেবল টাকাই নয়, রূপও আছে তার। দিন সাতেক হোল  
ভাস্কর ফিরেছে কলকাতায়। এর মধ্যেই আর তর সইলো না মীনাক্ষীর,  
একেবারে পাটির হাল্লামা বাঁধিয়ে দিচ্ছেন। উঃ! তপতীর যদি  
জন্ম না হোত জুন মাসে—তা' হলে? তা' হলে মিশ্রের অকল্পিত  
ব্যবার জন্মদিন বানিয়ে পাটি দিনতেন মা আর ভাস্কর তাকেও হোত  
প্রধান অতিথি। অবশ্য বহুস্বদের জন্মদিনে বেশি বন্ধুকে ভাস্কর  
ভাবটা জানা যায় না। বড় সম্মুখের জন্মদিনে—অর্থাৎ কি না  
তিনি যে বড়ো হচ্ছেন সেটা মনে করিয়ে দেওয়া। আর উদ্দেশ্য  
বছরের জন্মদিন সে তো আনন্দের চিহ্ন। কিন্তু সেই খবরটি যদি  
চুপি চুপি তার কাছে চলে আসতো। ছোট বাঁটিতে পায়স,  
মাখাম মাখা-ভরা হাত বুলানো। যেমন চুপি চুপি সে বেড়ে  
উঠেছে, ছোট ছোট কোয়ারের চেউ পূর্ণ করে দিয়েছে তাকে, তেমনি  
নিজের নিরাশা ঘরমিতে বসে জানতে পোতো তপতী কুড়ি বছর  
তার দরজায়—কি ভালোই না লাগতে পারতো। তারপর এ তো  
জন্মদিনের পাটি নয়, একটা মস্ত পরীক্ষার আবার হচ্ছে তাকে

মীনাক্ষী। এত কম প্রশারশন নিয়ে এ পরীক্ষায় কি পাস  
করা যায়। রোগা-রোগা একটা শরীর, গঙ্গাজলের মত অশ্ব-গেহুয়া  
রং আর সজ্জা-কি-এ পরীক্ষা—ব্যব খবর বেরুতেও ঢের দেরি, এই  
নিম্নেরিক খাপখোলা নতুন তালারারের মত ভাস্করকে বুদ্ধ করা সম্ভব?  
অস্তুত আর পাঁচটা বাড়ালী মেয়ের পরিবেশে সে এবট ঘরোয়া  
হায় উল্লেও এত ভর লাগতো না তপতীর। অবশ্য তপতী ভালোই  
জানে এত কথা ভাববার সময় একটুও নেই মীনাক্ষীর।

অনবস্থভাবে বাড়ির অভিজ্ঞাতো ভাস্করকে বুদ্ধ করবার  
আয়োজনে ব্যস্ত সে অর্থাৎ দারে না কাটলেও ভাবে যেন  
অবনত হয় ভাস্কর। ভীতু ভীতু তপতীর প্রচুদপট রচনা  
করেছে যে শৈলেন রায়ের বাস্ক-বাস্ক আর হেমীকুল-শিরামণি  
মীনাক্ষী রায় এটা খুব স্পষ্টভাবে উহা থাকবে ইনটারভিউর  
সময়ে। তপতীর মা থাকলে কি এটা সস্তর হোত? হোত  
না। ভালোই জানে তপতী। মাকে বেশ মনে আছে তার।  
তিনি ভীতু আর কাঁপা মেয়েই ছিলেন। ছাকিস বছর বয়সে  
মায়া যান তপতীর মা। তিনি ছিলেন অবিকল তপতীর মত।  
সাদাগিধে, লাবণ্যের স্পর্শে যুক্তি মধুর। ছোটবেলা মীনাক্ষীর  
মত দীপ্তি তাঁর কোনদিন ছিল না। এই নিয়ে তপতীর  
ব্যবার একটা নীরব অভিযোগ ছিল। এমাক্ষী সব বুঝতেন,  
স্বামীপ অগোষ্ঠা সহ করতেন মেয়ে আর সেতার নিয়ে। তারপর  
একদিন হঠাৎ মাঝা গেলেন। যেমন চুপচাপ ছিলেন এমাক্ষী,  
তাতে তপতী ছাড় কেউ সসারের খালি জায়গাটুকু দেখে অভিভূত  
হোল না। অবশ্য দুখ পাবার বেশি লোকও ছিল না তাদের  
বাড়িতে, মাইনে করা লোক আর বাবা। সেই না'বছর বয়সেই তপতী  
বুঝতো বাবা'মার আড়ি। বাবা খুব বড়লোক মা বিস্ত গরীব—  
প্রায় তাদের দাদী বহুমণির মতই গরীব।

দিদি বেঁচে থাকলে বড়লোক ভগিনীপতিব দেওয়, পাটিভালিতে  
প্রধান অতিথির আসনটি বাঁধা ছিল মীনাক্ষীর। এবার স্থান  
বদল হোল, পাটি দেবার অধিকার বড়ালো তাঁর এবং প্রধান অতিথি  
হাত লাগলেন তাঁরই, ষাঁদের হাত করলে শৈলেন রায়ের ব্যবসায়ে  
শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। শ্রীবৃদ্ধি হোল আশাতীতরূপে সবাই একবাক্যে স্বীকার  
করলেন মীনাক্ষীর 'পাটম' আছে বটে। শৈলেন রায়কে সে আগাগোড়া  
চলে দেজেছে। বিশেষ করে কয়েকবছর আগে ইমোযোগ টার  
করে এসে তাঁর যে অনির্বচনীয় পরিবর্তন হয়েছে তা উপভোগ

করবার মত। ছিলেন দেশী বডলোকে প্যাড়। মস্তবড় বাড়ি দামী গাড়ি তাঁকে কোলাজার কোঠায় তুলেছিল। সত্য, তবু নিমন্ত্রণ খেতে দেশের মাটিতে—পাতা পাতা নিমন্ত্রণের মধ্য—কঁচা, খাস আর পাঞ্জাবীর দলে। মীনাঙ্কী তাঁকে ছেলে তুলেছেন নক্ষত্র লোকে। ডবল প্রবেশন হয়েছ—মিঃ ডে, র, মিত্রবের মধ্যে নয়, শ্রাব চৌধুরী, অনারবল ভাগ্যদেব অভিজাত গাঞ্জিতে। সবাই একবাক্যে বললেন এই উর্ধ্বলোকে একটুও বে-আনান লাগছে না মীনাঙ্কীকে, বরং এতদিনই দেশীদের মধ্যে তাঁকে কেমন যেন রাখা মান হাত। শৈলেন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা হালো না। পরস্বক দেখে দলের বিচার করা যায় না, অভিজাতেরও না টাই, স্ত্রী, জুতা, গাড়ি বোঝা একবাক্য। হাজার টাকা মাইনে পাওয়া চাকরের সঙ্গে হাজার টাকা মাইনে কেনেওহাল। মনবের তফাৎ করা শক্ত। ক্রটি দেয় নেন মহিলারা।

যাক গে সে সব কথা, এখন তপতী পড়েছে মুখিলে। এতদিন সে ছিল মাদি অর্থাৎ মা আর বাপ দু'য়েরই লক্ষ্যের বাইরে। কমলা ইনস্কিটিউন—চারপদ অত্যাশঙ্কিত কলেজ। বাইরে চিট, বাড়িতে খালি পা। বেগমবা যেকোনো কেরানী-ছত্‌তার উপযুক্ত। হঠাৎ একটা ব্যাপারে সে একেবারে মায়ের একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে বসলো। লজ্জুক মেয়েটিকে মীনাঙ্কী টেনে আনলো সভার মাঝখানে এবং সর্বদ্বন্দ্বীপ আয়োজন করলো তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে।

সেতার নামে একটা তবেব রাজনার জন্যই তপতীর জীবনে এলো এই বিপ্লব। সেতার ভালোবাসতেন এলাকী—তপতীর মা; নিজে নিজেই অমূলক বসে মতিলা রাজনীতি আয়ত্ত করেছিলেন ভালো। স্বামীও অনাদরের দিনে সেতার তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গভীর বাধা হতে। মেয়েকেও মা শেখাচ্ছিলেন বাচনা। ম' বছরে মা যখন মারা গেলেন, তপতীর তখন সেতারের হাতখড়ি শয। মায়ের জায়গায় রাতের বেলায় তপতীর পাশে ভয়ে থাকতো মায়ের সেতার, হাত লাগলে বেজে উঠতো অবিবল মায়ের গলার স্রোত।

সেতার ভালবাসলো তপতী। কান পাতলো বেড়িয়ে চারি ঘুরিয়ে। আন্তে আন্তে হয়ে উঠলো অনেকের চেয়ে ভালো বাজিয়ে। বন্ধুরা রাখতো তপতীর সব খবর। বেগম সেতার নয়, তার মিষ্টি গলার নরম গুনগুনও গুনগুনো তার অক্ষ পিরিয়ডে ডালমট সহযোগে। সেবার মস্তবড় জলসা বলেছে। বন্ধুদের ঠেকাতে পারলেও তপতী অমাজ করতে পারলো না ভরাটিগলা প্রিন্সিপালের অনুমোদন। সেতার বেগলে নিয়ে রমতে হল তাকে, আর একঘণ্টা পর যখন রাজনা খামলো, অন্যকেই ডাকলেন—শেখ হচ্ছে তাড়াহুড়া করে।

তপতীর সেতার বাজানোর প্রশংসা যথাকালে পিতৃপরিচয় সহ প্রকাশিত হল পত্রিকা। কেউই বোম নিভের মেয়ের ভগ্না খোঁজ চাইলেন তপতীর মাস্টারের। জীবনে প্রথম খতমত হয়ে গেল মীনাঙ্কী রায়। তপতীর সম্বন্ধ কিছু জানবার বা করবার আছে, সে যে কোনো কারণেই বন্ধীভূত হতে পারে এখান থেকে মনে হয় নি মীনাঙ্কী-এ হঠাৎ তাড়া হয়ে এ-বাবের চমকে গেল সে। কিছু একটা বলে ব্যাপারটা সামলে নিয়ে, বাড়ি ঘিরেই

তপতীকে ডেকে পাঠালো। তার তখন বি-এ পরীক্ষার টেক্সট চলেছে। বাড়ি কিবে খটে গড়াচ্ছে শ্রান্তিতে, ডাক শুনে অবাক। এমনটা তো কখনো হয় নি তাই অবাক হল, আর ডাকবার কারণ আদর্শ করবার চেষ্টা। কহতে করতে গিয়া পৌঁছাল মাঘের বসবার ঘরে।

মীনাঙ্কীর সমস্ত বাড়ি-কোরা মুখের লালোড় তখনো মিলায় নি। কালো সার্টিনের ব্লাউজের মধ্য দিয়ে বেবিয়ে আছে অটোরিশ বছরের স্মার্ডেল সোনালী বাহু, আর তার উপর মাথা বেখে চূণচূণ সোফায় হলে আছে মীনাঙ্কী। দাই পায়ে চিট পরিয়ে দিচ্ছিল, মেয়েকে দেখে সোজা হয়ে বসলো মা, পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি বুলাল মেয়ের উপর। রাতের বিমুদী বুলছে পিঠে, সামনেটার চিটনী চালিয়ে কলোজে গিয়েছিল তপতী, সেই ক্ষণিক শামন ভেঙ্গে কুচি কুচি চুল উড়ছে কপালে, পরনের সবুজ রং-এর শাড়িটা মোলায়েম অন্তরঙ্গতার প্রায় মিলিন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ব্লাউজে বোতাম নেই, এক চাউস সেপ্টিপিন সেই স্থান ঝলঝল করেছে। লজ্জা পেল মীনাঙ্কী। তার দাই বম্বনার পোষাকও এর চেয়ে ভালো। কচির অভাব আছে; কিন্তু দামে ভারী। মনে হলো কি অশুভভাবে এতদিন সে তপতীকে তুলে ছিল। কবে তপতী বড় হোল? কলোজে পড়লো? মেয়েকে পাশে বসিয়ে দীর্ঘ দশ বছর পর মীনাঙ্কী এই প্রথম জানতে চাইল তার পড়াশুনা আর সেতারের কথা।

এক সপ্তাহের মধ্যেই তপতীর সজ্জা অব ঘরের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। এল আয়না-বসানো ময়-কালমারী, বকমারী শাড়ি, জামা, জুতা আর নতুন সেতার। তপতীর টেলি ভরে গেল নানা প্রশংসন সস্তারে। স্বামীর রূপান্তর ঘটাবার ব্যাপারে এতটা হাতখল লাভ হয়েছিল যে, কতার বর্ণান্তর সাধনের সম্ভবত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ এল না মীনাঙ্কীর মনে। তপতীর নতুন সম্পদ কিন্তু অল্পদ্রুতি থেকে যেতে লাগলো। মীনাঙ্কী হাত লাগাতে এসেও শরীফার কথা ভেবে রূপ ফেরানোর কাজ স্থগিত রাখল। এদিকে পরীক্ষা এগিয়ে এল উর্ধ্বাধাস, আর হুজুর্জুড়ি করে শেখও হয়ে গেল। শেষের দিনটার রং বদলানও দেখতে পেল না তপতী। ইতিহাসের তৃতীয় পত্র—রাশি রাশি কাগজ, পেনের কালি ফুরাল—তার! আরাম! ঘণ্টা বাজবার দু'মিনিট আগেই শেষ হয়েছে লেখা। কি লিখেছিলাম? এ মা! কই আমি তে কিয়ি নি। উ। আর ইস্টের ব্যাপারগুলো কি জ রং—একঘণ্টা অবিভ্রান্ত বক বক, তারপর বাড়ি কিবে খাটভার মস্ত এক ঘুম দেবার যোগাড় করল তপতী।

সন্ধ্যা নামেছে, বিজ্ঞ আলো জ্বলে নি ঘরে। তপতীর মাথার ঘন চূরের মধ্যে শুভল জুঁবিয় মীনাঙ্কী ডাকলো—খুক! ঘুমি রুছিস?

চমকে তাকাল তপতী। খুক! কতদিন আগে তার নাম ছিল খুক? মা ডাকতেন—আমার খুকমণি। তারুণ্যে তো আর কেউ ডাকে নি ও নামে। কতদিন! বহুদিন পর আক-সেই ছোটবেলার নামটির সাক্ষাৎ বয়ে কিরে এলেন মা তার শৈশবকে হাতে নিয়ে। সেই আধো-অন্ধকার, মীনাঙ্কীকে হাঁ

বলে ভাবতে পারলো তপতী অক্লেশে। তার হাতটি জড়িয়ে, শান্ত হুঁচোখ ভরে বিম-খিমে ঘুম নেমে এসে তপতীর।

মীনাক্ষী যা বলতে এসেছিল—বলেত পারল না। বসে রইলো তপতীর পাশে। মনে পড়ল কতদিনের ভুলে-বাওয়া দিদিকে—এণাক্ষী, তপতীর মা।

এণাক্ষী প্রথম মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলো না পড়াই মন নেই, গান-বাঁজনার ষোঁক—আর ঘরের কাজ।

ঠাকুমা বললেন—দরকার নেই লেখাপড়ায় মেয়ের বিয়ে দাও এণাক্ষীর বাবাও ভাললেন—তাড়ি ভালো। যোলো বছরে এণাক্ষীর বিয়ে হয়ে গেল। যোলো বছর। রূপকথা আর স্বপ্নের যোলো বছরে এণাক্ষীর বয়স হল, সেই বয়সে চমকাল সবাই। যেমন রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য। ষি-এ পাশ করেছে, চাকরীতে মন নেই। নোমছে বাষ্মাতে। তাতেও টাকার দরকার। প্রচুর পণ দিলেন বাবা। ঢেকে গেল এণাক্ষীর কালো রং, পাশ না করার জট।

এক তেমন্তের গোপুলীতে বসে হয়ে বাইশ বছরের শৈলেন। শাঁখ, সনাই আর সারি সারি উৎসব।—সবার আগে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী পড়াশুনার ভালো ডায়েরি নর ছাত্রী। বাক-বাকি বং, কৌকড়া চুল, খাটো গোলাপী স্যাটিনের ফ্রাং একেবারে পড়ীটি। হৈ হৈ করে উঠলো বরষাত্রী দল—শৈলেন! এই! এই তেমনার সবচেয়ে স্নমধুর ছোট শ্যালিকা। শৈলেনের চোখ ভরে গেল খুশিতে, মনও। ভালল—একটু পর এই উত্তর ক্ষুদ্রণ মালা দেবে গলায়। বাবাসাতে নামলেও লোহার টুকরো গিলে ফেলে নি তাকে। সত্য কলেজ-ফেরা মনে তখনো লেগেছিল রোনাঘর বং। রাজত্ব ভালো লাগে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে কুঁচবরণ কস্তার মেঘবরণ চুল। মীনাক্ষী এগিয়ে এসে হতে দিল মুইয়ের মালা। মুক্কচোখে তাকাল হবুতরীপতির দিকে দুখে-গরদের পান্জাবী মিলিয়ে গেছে গায়ের রং-এ, হীরের মত ছলছলে চোখ হাসছে।

মুখ-চন্দ্রিকার সময় চমকে গেল শৈলেন। রোগা, কালো একটি মেয়ের ভীতু মুখ। সমস্ত মন কটু হয়ে গেল। ইচ্ছে করল বাবার সঙ্গে খগড়া করে, উঠে যায় বরাসন ছেড়ে। বাবাদের সব আমোদ বিমিয়ে এসেছিল বরের গম্বীর মুখ দেখে, কিন্তু মীমু এসে হাঁটু মুড়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরল—

আজি অমল ধল পালে

লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া,—

বসল এসে জামাইবাবুর গা বেঁগে, একটু একটু ভালো লাগা তখন শৈলেনের মুখে খুশির ঝলো ছালিল।

তারপর দিন গেল। বড় হল ছোট মীনাক্ষী, ইষ্টুল ছেড়ে কলেজ চুকল। বাবসা বাড়াল শৈলেন। মীনাক্ষীর প্রতি তার যে স্নেহ এতদিন সবাই সকাঁড়কে উপভোগ করছিল, তা চিন্তাব কারণ হয়ে ঝিড়াল ক্রমে। এণাক্ষী চিরদিন শান্ত মেয়ে—আরো শান্ত হয়ে গেল। চূপচাপ একেবারে। মেয়েটিকে নাড়াচাড়া করে, একা একা সোতার বাসায়। প্রথমে মা বুঝলেন ব্যাপারটা, স্বামীকে বললেন উবিয় হয়ে—

—মিহুর বিয়ে দাও।

—বিয়ে? মিহুর? এখুনি কি! পাশ করুক কি-এ। অমন স্তম্ভর মেয়ে। দেখো রাজপুত্র বর আনব।

—না, না। মা করিয়ে উঠলেন—দেখি কোর না বিয়ে দিতে।

মহীনবাবু বিব্রিত হয়ে চাইলেন দ্বীপ নিকে। সব কথা শুনলেন, বুঝতেও চেষ্টা করলেন। তার পরদিন হতেই লাগলেন মীনাক্ষীর পারের খোঁজে। সবকিছু স্থির হতে দেখি হালো না। আকাজিকত পাড়ে সব রকমে। হীরালাল ঠাকুরলালের জড়োর ক্যাটালগ বুললেন মা, বাড়িতে বং পড়বার তোড়জোড়। বাধা দিল মীনাক্ষী। রাগী লাল চোখ বাপের, মাশে কালা—কিছুতে বশ মানল না মেয়ে। সে পড়বে আরো, বিলেত বাবে।

বাপ-মাংহের মুখ কালো হয়ে গেল। বুঝলেন, যে সর্বনাশ ঘটছে এণাক্ষীর তাকে ক্রমতে পারবে না। ছেদীমামুং বাপ। বললেন—এক পরসা পাবে না মিহুর। উঠল করে এণাকে সব দেখেন।

—দাও, নির্ভেজাল সাহসী উত্তর দিল মীনাক্ষী। সে তখন ষি-এ পড়ছে, বরষার ইংবেজী ইষ্টুলে পাড়ে, দারুণ মার্ট। পড়া ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে খাবার উপক্রম করেছে, বাধা দিল এণাক্ষী। এণা মাকে বোঝালো, বাপের কাছে কীদল আর বোনের হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে।

শৈলেন জীবনে প্রথম খশি হোলো দ্বীপ প্রতি —বা? ? বেশ কবেছ। এ কি জলুম বাপ-মাম! বিয়ে করবে, মদর হলো, তার জগা অত্যাচার কেন।

দক্ষিণের থোলো ঘরে সবজ-সাদায় মিলিয়ে ডিসটেন্সার করা—

মীনাক্ষীকে দিদি মাজিয়ে দিল সেই ঘর। এণাক্ষীকে নুতন জড়োয় নেকশেং কিনে দিল শৈলেন বাব। তারপর হতেই কিছু কর্মবাস্ত সবসাদায় পাঁচটার পর কাজ কামে গেল, উৎসাহ দেখা গেল ডায়মণ্ড হারবার কিংবা ব্যারাকপুরের হাতা ধরে লম্বা দৌড় দিতে।

মীনাক্ষী বুঝেছিল—অজ্ঞায়, ভাষণ অজ্ঞায় হচ্ছে দিদির উপর কিছ অবু্য মন যে মানে না শাসন। বত নিজেকে বাঁধতে চাইত মীমু, তার চেয়ে বেশি জোর শৈলেনের। সে উড়িয়ে দিত সব বারণ। আত্মীয়-স্বজন যখন ‘ছি ছি’ রব তুলেছে,—হঠাৎ তিনদিনের করে মাঝা গেল এণাক্ষী।

মীনাক্ষী কীদল। দিদির মৃত্যুর জন্ত নিজেকে দায়ী করে কঠিন দিক্কার দিল, চলে গেল অপরাধী মুখে মাংহের কাছে। মজা হোল যে বছর না ঘুরতেই বাপ-মা জ্বরদন্তি লাগালেন শৈলেনকে বিয়ে করবার জগা। মীনাক্ষী মন শক্ত করেই ছিল, কিন্তু যখন শীর্ঘমুখ শৈলেন এসে কাছে গাঁড়ালো,—সব প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে গেল তার। একরত্তি বেলা হতে শৈলেনকে ভালবেসে এসেছে সে। দিদির পুতুল, শাড়ি, গরনার মতই দিদির বরও মীমুর একাধিপত্য। কোনো অভ্যয়ের প্রশ্ন সেখানে অবাঞ্ছন ছিল। তারপর দিনে দিনে কি হল, কি করে ঘোবনের অমুরাগে রূপান্তরিত হয়ে গেল কৈশোরের অনাবিল ভালবাসা,—বুঝতেই পারে নি মীনাক্ষী। রুপ বাস্তবের কঠিন থাকা খেয়ে যখন জাগল, তখন কিরবার পথ আর

নেই। শৈলেন আকর্ষণ ছুঁবে গেছে, আর মীনাঙ্কীর বন্ধ দরজায় মিথ্যেই আঘাত হানছে অকণকুমার, বক্শকুমার।

বিরে হয়ে গেল যেমন তেমন করে। রাজনা ব্যস্ত, আলো কিছু হোল না। উৎসব করতে বাধা দিল মীনাঙ্কী বাবা-মাকে। তাঁদের তেমন ইচ্ছেও ছিল না, মনে তখিল বড়ময়ের কার্নাভেজা যুগ।

শৈলেন কিন্তু আগোজান করল মস্ত প্রীতিভোজ্যে। রয়েছে বন্ধু, কর্মচারী, খাতির ব্যবহার কত শত লোক—ভোজ্য না দিলে ছাড়বে কেন তারা? ব্যতিক্রমে শৈলেন একবারে নতুন টা-এ বসলে দিল মীনাঙ্কী এসে প্রবেশ করার আগে, আর উৎসাহ-আনন্দে নিজেকে এমন করে বদলে গেল নিজের অজান্তে যে মীনাঙ্কীরও দাঁটা লেগে গল চোখে। দেখল এক নতুন শৈলেন রায় এসেছে দামী মেটির ঠিকিয়ে তাকে নিয়ে যেতে।

উৎসবের ক্রান্তি কবিত্তে গেল কর্দিন। স্বামী গেছে অকিসে। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হবে রাতের গাড়িতে তারা যাবে নৈনিতাল। সেই ক্রুদর দেশে কাটবে একটি মাস মধুগামিনী। মীনাঙ্কী জানে তাদের মধুবাত্রি শেষ হবে না কোনদিন তবু ক্রুরের নীল জলে তারা নতুন করে দেখাবে নিজদের মুখ। মীনাঙ্কী ব্যস্ত হোল গোজগাছ করতে। ছপুর বেলা। চাঁদ চোখে পড়ল—তপতী। নীরছবের মেয়ে বড় বড় চোখ মেলে দেখছে মাসির নবরূপ। চমকে গেল মীনাঙ্কী। মান চল তপতীর চোখ দিয়ে দেখছে দিদি। দেখছে তার সিঁথির সিঁথুর কেমন চিরির করে নিয়েছে মীনাঙ্কী—হাতে লোটা! বুন বলাহ—এই তো মনে ছিল।

বড় ভয় পেলো মীনাঙ্কী। একবকম পারি হয়ে গেল সে তপতীর কাছে হতে। তারপর হতে ইচ্ছে করেই তপতীর কাছে হতে দূরে দূরে থাকতো না। ক্রমে ভাল গেল তপতীকে তার দিদির থুকে। তপতী আছে—যে বুড়ি কি, যারমণি তাকে মানুষ করেছে, সেই বুকে করে আগলে রইল আটটা বছর। নিয়ম মত মাষ্টার এসেছে, ইঙ্কুল ছাড়িয়ে তপতী চুকেছে কলেজে। যে ঘরে তার মা থাকতো সেই ঘরে থেকে কৈশোর কাটিয়ে চলে এসেছে যৌবনে। আচ্ছ! অস্ত্র? অস্ত্র কি কখনো করে নি ওর? হয় তো করেছে, আর তাতেও দেখেছে যারমণি। সে মনে যাবার পর তপতী তা বড় সেয়ে। তখন নিজের ব্যবস্থা নিয়েই করেছে বুঝি। চোখে জল এলো মীনাঙ্কীর। উজ্জাস অবশ্য কেটে বহুদিন হোল জীবন চলছে স্বাভাবিক দ্বারায়। চাঁদ আজ আবার নতুন করে দিদির উপর ভালবাসার উত্তাল হয়ে উঠল মন, আর সেই ভালবাসার সম্মান হয়ে মীনাঙ্কীর কোলে নতুন জন্ম নিল তপতী। টুন আর মাহুর জগৎকে যে সমতায় লালন করেছে জঠরে, সেই সমতায় ভারী হোল মীনাঙ্কীর বুক। তপতীর কপালটিতে হাত রেখে অকণকুমার ঘরে নীরবে বসে বসে মীনাঙ্কী। আকাশ জগৎ তখন তারা উঠেছে।

পার্ট। বাংলা নিমন্ত্রণ কথার অর্থ আরো ব্যাপক। অনেক লোক, বহু ভোজ্য, আলো, বিশৃঙ্খলা—সব আছে নিমন্ত্রণে—

বিকেলের জলখাবারের নিমন্ত্রণ হলেও। ইরেজী পার্টি ছিমছাম। ছোট ছোট টবিশ ঘিবে চারটে, দুটো চেয়ার এখানে-ওখানে। ফর্সা পাঞ্জামা আর শাট ঘরে বেড়াচ্ছে অভিজাত চাকরের দল। শ্যুওউট, ফ্রাট, কেক—কুতুর ফল। কাছের ঘরে ম্যাগনোলিয়া কোম্পানীর লোক—সমসংগত যোগান দিচ্ছে অতিসজ্জীম। টু-টাং কাচের বাসনের শব্দে মিলছে হাসির ব্যস্তার। মেয়েদের স্বর কি নরম আর মুহু তবু শোনা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কার। বয়স ছেলেরের জড়ানো চিবানো কথা বোঝা শক্ত।

ঐতিপূর্ণও বাড়িতে হয়েছে অনেক পার্টি, তপতীর নিজের ঘরে খাবার প্লেটে মিলছে তার পরিচয়। এই প্রথম নাহিকার বোলে নেমে একবারে উদ্ভাস্ত হয়ে গেল তপতী। সবটাই তপতী, আবার অনেকখানিই তাব নয়, ঐক্যে সাজিয়ে, বাগানে যখন তাকে পার্টির মাঝখানে ছেড়ে দেয়া হোল, তখন তপতীর টম্পাবেটার পটানকুই ডিগ্রীতে নামে গেছে। সেই আদিকাল তেই মীনাঙ্কীর কাছে পার্টি টাট জলজাত তাই মেয়ের অবস্থা একটুও বুঝল না সে। হুঁ একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোজা তপতীকে বসিয়ে দিল ভাস্করের টেবিলে। তপতীর বুক ধকধক করতে লাগল চোখে অন্ধকার। যখন ভেদে যাচ্ছে বুক, পিঠ, গলা। কত আলো আর বং, সার্টিন আর সিকন-নাইলন। মীনা মণ্ডল, লিলি বোস আর দেবকী পালিতের প্রদ্যখনটারুয়ে একবারে মুগ্ধ তপতী। কি বুদ্ধি! হন বিষয়

## ‘স্বতপা’র উপগ্রাস

সম্পূর্ণ নতুন পটভূমিকায় এক বিশ্বয়কর সাহিত্য-সৃষ্টি

নামিতা চক্রবর্তী

# ইন্দ্রনীলা

আনন্দবাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, অমৃত, সাপ্তাহিক বসুমতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত এই মর্মস্পর্শী উপগ্রাস আজ বহু বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাকে বিম্বিত ও মুগ্ধ করেছে।  
দাম : দু' টাকা ॥ প্রথম মুদ্রণ : নিঃশেষিতগ্রাম ॥

প্রাপ্তিস্থান : শিক্ষা ভারতী

৯/৩ রমানাথ যজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

নেই বা নিয়ে ওরা কথা বলতে পারে না—আর বাজায় হাসির জলধরঙ্গ।

শুন্দর একটা কনসার্ট হচ্ছিল, অনেকের মত ভাস্করও শুনছিল তাই, তপতী একটু অবগর শেল নিজেকে সামলাবার। হঠাৎ শুনল ভাস্কর তাকে জিজ্ঞেস করছে সুবের কথা সর্ধনাশ! তপতী কি জানে আরোহী, অরোহী, সঙ্গারবীর বিশদ ব্যাখ্যা, না বোঝাতে পারবে পুরিয়া ধানেশী আর মিশ্রগাছারের তত্ত্ব! এ কোথায় তাকে নিয়ে এস মীনাঙ্কী। আবার চোখ তুলে চাইল তপতী। অচেনা রাজ্য। চোখে চোখে শ্রুতাজ খেলছে, বাকানো টোঁটের কোণে কি ধার!—মে ভাবল তার ঘবটির কথা—ছায়া আর শান্তি।

—আপনি একটা কথাও বলছেন না বিস্ত। নবীন মেঘের গুঃগুরু ভাস্করের গলায়। চমকে ভীতুচোখে তাকাল তপতী।

—তপতী? ও তো কথা বলবে সেতারের স্বন্ধারে। পাশের টেবিল হতে পাখির কুজনে বলল সেবকী।

—তাই ভাল সেতারের কথাই শুনব।

উঠে দাঁড়ল ভাস্কর। মীনাঙ্কী বাস্ত খাবলেও তার সমস্ত মনোযোগের বার আনা ছিল ভাস্করের প্রতি। তাকে দাঁড়াতে দেখে, হেসে কাছ চলে এল।

—ভাল লাগছে না বুঝি?

—খুব ভাল লাগছে। আরো কাগাতে চাই মিস রায়ের বাজনা শুন।

—বা, থুকে তো বাজায়েই। চল, চল, থুকে। ডায়ানে চল। তোমার সেতার আছে ওখানেই। তাকে নিয়ে এস তো ভাস্কর।

মীনাঙ্কী চলে গেল বাবস্থা করতে।

ওদিক হতে কথার বাণ ছুঁলো সীমা—বানানো কথা।

বসন্তলক্ষী যাও বিষয় অভিসারে।

সেতারে স্বন্ধার তোল বস্তুরাগেরে।

ভাস্করও যায় নিল—তাই ভাল। চলুন বাজাবেন বসন্তরাগ।

সমস্ত শরীর অনিচ্ছায় ভরে গেল তপতীর, তবু তাকে যেতে হোল। বেশীতে বসে কোলে তুলে নিল সেতার—নূতন দামী সেতার। এ তার মাঘের তার-বদলানো সেতার নয়, যকযকে নূতন। আজকের পাটিও মতই অচেনা। হাত কাঁপতে লাগল তপতীর। মেরজাপ জলে উঠল আঙুলে। চারিদিকে সাবির সাবির ক করা মুখ এতুনি বুঝি হেসে উঠবে বিদ্রুপ। নিজেকে সম্বৃত করল তপতী। আনন্দ করলো বিলম্বিত দ্রুতলরে দরবারী কানোড়া।

প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে বাজলো সেতার। প্রথম ভর পেয়েছিল তপতী। ক্রিড়ে তিক্তবাদ উঠেছিল। তারপর অলাপ শেষ হয়ে তান ধরবার আগেই সুবের গভীরে ডুবে গেল স, কোন অঙ্গদিত চোখে পড়ল না, মনে এসে না তার। বাজনা শেষ। শোনা যাচ্ছিল প্রশংসার মৃতগুঞ্জন।

—শুন্দর। খুব সুন্দর বাজিয়েছিল!—মেঘের কপালের ষাষ মুছে দিল মীনাঙ্কী। ভাস্করের চোখ হতেও এই প্রথম বৃদ্ধ অজলি বহিত হল। সুবের ঘুম-জড়ানো চোখে, মনে প্রথম পক্ষবকে দেখল তপতী। তারও ভাল লাগল। প্রায় ভালবাসার মতই ভাস্করকে এল লাগল তপতীর।

ভাস্কর তপতীর হাতে তুলে দিল আইসক্রীমের প্লেট। চেয়ে দেখলো ভাল করে। একজন তপতীর পটভূমিকা রচনা করেছিল শৈলেনে রায়ের টাকা, মীনাঙ্কী রায়ের আভিজাত্য। এবার সেতারের সুগটিকে পিছনে রেখে দাঁড়াল তপতী। শুন্দর মানিয়েছে। চিকণ জু উড়েছে স্নায়স লগাট ফদকে, তার তলার ছাঁট টলটলে চোখ—এ যেন কিছু মেয়ে কিছু সুর।

পাটি শেষ। শুভকামনা শেষে বিবায় নিল অতিথির দল। টেবিলে উপহারের স্তূপ। এধাবে-ওধারে ঘুরছে বয়। মীনাঙ্কী ছাড়ল না ভাস্করকে। রাত! দশটা আবার রাত!

—একুনি বাবে কি চস একটু বসবে। নূতন কেনা স্প্যানিয়েলটাকে দেখেছ? নকশা তোলা কাঁধা? নূতন কালেকশন।

ভাস্করের ইচ্ছা ছিল আর একটু দেখবে তপতীকে। বিনা আপত্তিতে চলে এল তাই বসবার ঘরে। কিন্তু মিথ্যা অপেক্ষা। একটি ঘটা কাটল স্প্যানিয়েলের লতানো কান, পেডিগ্রি আর নকশাতোলা কাঁধার সৌন্দর্যে বুদ্ধ হয়ে। তপতী এল না। রাত এগারোটায় আর একদফা কাটলেট খেয়ে বাড়ি ফিরল ভাস্কর। তপতীর রং-করা মুখের সঙ্গে চোখের চাওয়ার কতটা অমিল, সে কথা ভাবতে ভাবতে।

পাটি হতে পালিয়েছিল তপতী। কেবল সারাক্ষণ মাকে মনে পড়ছিল তার। মা! সেই ছলোছলো চোখ। কপালে লুটিরে থাকতো শাসনভাঙ্গা চুলের স্তূচি। ন'বছর বয়স পবন্ত মাই তো ভরে ছিল তপতীর ছোট জীবন। পুতুল খেলার সঙ্গীও মা। কাছে আসতে একটু দেীর হলে, তাঁট ফুলির ঘাছ স্তূজে বসে থাকত সৈ। যত্নমণির শাখাও ছিল না কিতের ভগাটি পর্যন্ত তাঁর।

কি যেন—কি যেন আদর করে বলতো মা? উৎকর্ষ হয়ে সেই কবেকার শোনা সুগটি মনে আনতে চাইল তপতী। একটুও মনে নেই মাঘের আদরের কথাগুলো। মাঝে—তার মাকে একেবারে ভুলে গেছে তপতী। ভুলে গেছে? মাঘের সেতার ধরে রেখেছে না মাকে?

ভূগবে শাখা কই তপতীর। বাবা, ছিলেন অল্প দেশের লোক। কি অবহেলা মাকে! তখনো মাঝে মাঝে পাটি হোত বাড়িতে—তুপুর হতে করা এসে সাজাত বাড়ি, টেবিল। আগতো রকমারী ধাবারের বাস আর মা—তখনো মা হতে দেীর ছিল তার। মীমুমাশি আসতো রাজকহার মত সেজে। হেসে হেসে মাঘের সঙ্গে কথা বলতো, তপতীর জন্ম নেমলস। তার কিস্ত একটুও ভাল লাগত না। আশা করে থাকত মা একুনি উঠে তিনতলার ছাদের ঘরে চলে যাবে,—সেখানে আছে তার সেতার। মিষ্ট শিশিরভজা চোখ আর সেতারের ত্রিনরিন স্নানতে স্নানতে তপতী চলে যাবে ঘরের দেশে। সে রাজ্যের ঘুম-পরাই সবাই মাঘের মত, কেবল বাবার গাড়ির শব্দ শুনেও তাঁদের চাশি মুছে যায় না এই তফাত।

তারপর একদিন মা চলে গেল। মরে যাওয়া কাকে বলে তখন জানতো তপতী, কিন্তু মরে যাওয়া তো ফুঁসিয়ে যাওয়া নয়। রাতের বেলা ছোটখাটের পাশের দক্ষিণের জানালা খুলেই চোখের সামনে

বিচ্ছিন্নে পড়ে নীল আকাশের মস্ত একটা টুকরো। সেই নীলের দোনে, রাজার তাবাব যিক্মিকির মধ্যে যিক্মিকি কবিত্ত ভার মা। ঘুমিয়ে থাকলে চুমা দিয়ে ঘাম কপালে, বাতাসে পাঠার হাতবুলানো— তাই তো শিটরে ওঠে তপতীর সব শরীর।

যাহুমণির শক্ত হাতের চিকুণী ঢক-ঢক—আপত্তি না-মানা দুধের পেগাস, কাঁটাশুক, মাছ—বড় হয়ে উঠতে লাগলো তপতী। মীমুমানি মা হয়ে গেল। বাড়িয়া হল অচেনা রাজা। অন্যদর? আদর করবারই কেউ নেই—তার আবার অন্যদর! সুন্দর একটা উদারীনতার পরিমণ্ডলী ঘিরে রইল তপতীকে। ফ্রক, শাড়ি, স্কুল কলেজ একটার পর আরেকটা এল জটিন করে। কোন অসুবিধা নেই। অনেক বই, মাসের মেতাব—আর যাহুমণি।

বড় হয়ে গেল তপতী। কষ্ট হয় নি কি মায়ের মৃত্যু? হয় নি? জীষণ কষ্ট! সেই নরম গণ্ডম বকে মুখ গুঁজে থেকে, হঠাৎ একদিন বড় হয়ে যাওয়া—আর নিজেকে নিজে দিন গুণে বড় হয়ে ওঠা, কি কষ্ট! যাহুমণি মরে গেল তপতীর সেকণ্ড ইয়ারের শেষের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গেল জ্বরের গরম কপালে বুলাবার হাত, পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল বদ-খাকা একটা কঁচকানো বুড়ো মুখ।

প্রিয়বালা এল যাহুমণির বদলে। সে যাহুমণি নয়—ভাল যি মীনাফীর বন্ধু এক মহিলা ছিলেন প্রিয়বালকে। সে জানে কালো মেয়েকে ফদা করার কোশল। চুল আর চেতরার কাঙ্ক্ষায় ওস্তাদ বলে সটিকিকেট আছে তার। তপতীর কাছে কিন্তু নিরাশ হল প্রিয়বালা। হাত লাগাতেই দিল না ঘোটে, বাতাসের দেয়া কি বর! নেহাৎ মেয়েটা ভাল আর মায়না বেশ, তাই টিক গেল প্রিয়বালা। না হলে প্রসাধিকা হতে সাদামাতি বিশ্বের কাজে কখনো সে পদারনতি ঘটাতো না নিজের।

আজকে কিন্তু তপতীর কোন আপত্তি চলেনি। মীনাফীর একশো টাকা মাইনের যমুনা তার প্রসাদন করে দিয়েছে। লম্বা চুল গুচ্ছগুচ্ছ হয়ে ঢুলছে ঘাড়ের উপর। জু আর চোখ এমনিতেই ভাল—তুলি ঢাল্যাবার দরকার নেই সেখানে, কিন্তু উদার হাতে রং ঢালেছে যমুনা তপতীর প্রায় সর্ব শরীরে। দিহুর উজ্জল শ্যামবর্ণা তপতী একবারে গৌরী আজ। ব্লাউজ কি মিতব্যয়িতা!—দেখা যাচ্ছে ফালি ফালি পিঠি আর কোমর। শাড়িটার আশ্রয়ের রং। ঠোঁটেও আশ্রন জলছে। আরনাম নিজেকে দেখে ভেবেছিল তপতী—এতো তার স্মৃতিদিনের সাজ নয়,—একজনকে মুক্ত করবার আয়োজন সব বিশ্বাস লেগেছিল। তারপর সেতাব—সব খাবাপ-লাগা সুরের আলোয় ভাল হয়ে গেল। ভাস্করকে দেখল তপতী। যত স্তম্ভেছিল, তেমন ভয়স্বর শুনল নয় সে। রং বাঙালীর মতই, লম্বা পশ্চিমেরা চান। চোখ, নিমগ্নতা জু অবিকল অবন্যাকারের বর্ণনা-মাতৃক নাক আর ঝাঁ দিকের কপালে হুঁটা চুলের ঘূর্ণি।

যদি এমন বানানো পাটি না হয়ে ভাস্করের সঙ্গে দেখা হত অজ্ঞ কোথাও? মায়ের তৈরি আলো ফুলের মেলায় নয়, ভগবানের নিজের দেওয়া দৈবের মধ্যে হঠাৎ যদি দেখা হত—পার্ক, ট্রাম লাইনে? তপতীর স্তম্ভনো চুল, উজ্জ্বল বারো টাকা দামের সজা শাড়ির আঁচল। সারাদিনের ঘামে পালিয়েছে পাউডারের

চিহ্নও। আর তিনদিনের পরা ঘরোয়া পোষাকে ভাস্কর! তা'হলে? যদি ঠেকে যেত হাতে হাত? তা'হলে? হয় তো তা'হলে সেতাব ছাড়াই বেজে উঠতে পারতো বসন্তরাগ।

তপতীর বাজনা ভাল হেগেছে ভাস্করের। মীরা ছাড়া আর কেউ এত খুশি হয়েছে কি তার বাজনা শুনে? অংশ কলেজে তার নাম আছে। সেবার প্রফেসর দরকার—কিশ্বীর বাচ্চা মাস্টার সজল দরকার বাজনা শুনে চেয়েছিলেন কি রকম মুগ্ধ-চোখে। তপতীরা ভাল চেনে না সায়েন্সের প্রফেসরদের। কমনসম্মে ছেলেমানুষ মাস্টার মশাইদের নিয়ে মেয়েদের ফিস্-ফিস্ উপভোগ করে আটদের ছাত্রীরা।

মীরা বলেছিল—দখিছিস সর্বকারের চাপ? ওর চোখ কি বসতে চাইছে জানিস?

—কি? হেসে জানতে চেয়েছিল তপতী।

—বলছে যদি পারতাম—

শচীর কণ্ঠে মালাখানি লয়ে

তামার গলায় দিতাম ঢলার

—এ! ভুল হল।

—হোক। ভুলই ওরজিসানিটি। হেসেছিল টুই বন্ধু আঠাবো বছরের চপল হাসি।

ভাস্করের চোখ কি বলছিল—মীরা থাকলে বলতে পারত সে কথা, কিন্তু ওকে তো আজ নিমন্ত্রণ করা হয় নি। না না, ভুল নয়। ইচ্ছে করে, ওকে বাতিল করা হয়েছে নিশ্চয় থেকে। মীরা থাকলে যে আজকের পার্টির অভিজ্ঞতাই কমে যেত।

প্রিয়বালকে বাইরে পাঠিয়ে দিল তপতী। একঘর অন্ধকার। উঁকি দিচ্ছে তার-ছিতানো আকাশ—সখানে বসে আছে তারা হয়ে তপতীর মা। রং দোয়া, পাতলা শাড়ি জড়ানো তপতী ঘুমোতে লাগল বাবিশ ডিডির ছোটটি হয়ে। স্বপ্ন-বুড়ো বনে দিলেন একটুকরো মিষ্টি স্বপ্ন খোঁবনের মৃগুককে ভরা। এক ছেলের চোপের আলোয় আলো হয়ে উঠেছে তপতী। হাতে তার কি?

ফুলের মাংস নয়, আইসক্রীমের প্লেট।

ভাস্কর অফিসে। মস্তবড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একপাশে ফোন। দুটি ফাইল-রাকে জমে আছে কাগজপত্র। একপাশে গাল আঘনা বসান লম্বা স্ট্যান্ড—খুঁজছে কোট। বাস্তব ভাস্কর জরুরী ডিকটেশন দিতে। মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ারিং কার্ড স্যুভান মিমের। দিনে দিনে বাড়ছে ব্যবসা। নিজে সব কাজ দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল, ইদানীং ভাস্কর এসে কিছু ভার নিয়েছে। নিবিষ্ট ছিল কাজে—আর্দালী এসে জানাল—মিস লিলি রোস। কলিজ উল্টে খড়ি দেখলো ভাস্কর,—চারটা। বসল টান হয়ে ইঞ্জিত পেয়ে স্টেনো গুহিয়ে নিল আজকের মত কাগজ। ভিজিটর এল ঘরে—লিলি রোস। এট নুতন নয়, অফিসে আরো এসেছে লিলি। লিলির ভাই প্রবীর ভাস্করের ছোটবেলার বন্ধু—লিলিও।

সারা জালহাসী ফোয়ার বোদ জলে যাচ্ছে তার তাপে টুকটুক লিলির মুখ। অফিসের সাবেক ঠাট এখনো বদলানি নি স্যোহন মিত্র, হয় নি এয়ার কণ্ডিশনড। ভাস্করের ঘরে খসখসের ডিজে

পর্দা মিষ্ট গন্ধ ছড়াচ্ছে। সারা দর অন্ধকার, আলো ঠিক টেবিলের উপর। ঘর যেন ঘুম-জড়ান। একটুও মনে হয় না মোটা মোটা হিশাবপত্রের ঘর বলে লিলির সতর্ক অবহেলায় উদ্ভাসিত তত্ত্বাধী আর বিশ্বকর্মাকে তার মানানো কারিকুরি নিয়ে বানানো মুখশ্রী আবশ্য জানে যুগমানো। ভাস্কর হয়তো বিহ্বল হোল।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার আবার কি। খেয়াল—চলে এলাম।

কন্দলন্ত দেখাল লিলি।

—তুমি নাকি তপতী রায়ের প্রেমে হাবুচুপু খাচ্ছে? বিয়ে করবে তাকে!

—এগুলি কি জিজ্ঞাসা না শুধুমান?

ফানিতে চাইল ভাস্কর।

—গুজব। বাজারের সব চেয়ে জোর খবর সরবরাহ করছি।

পি, টি, আই। দক্ষিণা দাও।

করপত্র প্রদান করলো লিলি।

—গুজবে কান দিতে বাধ্য আছে প্রাক্তননের স্বহস্ত অতিক্রম বল।

লিলির হাতটি নিজের হাতে তুলে নিল ভাস্কর। রক্তাক্ত কোমল হাত

—এত বড় নখ রেখেছে কেন? জান না চাঞ্চা পণ্ডিত নখীদের হতে শত হস্ত দূরে থাকতে উপদেশ দিয়ে গেছেন?

—ইস্!—খর্ব কেনে স্বাপট দিল লিলি।

—এখন তো এই লম্বা নখই শত হস্ত দূর হতে টেনে আনিচ্ছে তোমাদের।

—তা হবে। কিন্তু সত্যি লিলি। তোমাদের এই লম্বা নখ এবটুও ভাল লাগে না আমার।

—তোমার না লাগলেও লাগবে আর কারোর। তবে যদি নিশ্চিত করে দাও,—নখ কেটে, বেণী বেঁধে একেবারে সবল্য কিশোরী বনে যেতে রাজি আছি।

হাসলো দু'জনেই। একটু বা গভীর হল ভাস্কর।

—এ তোমার বড় বেশি শানানো কথা লিলি। কেবল পুরুষদের সজ্ঞ করত, অন্তত ভ্রমমেয়ো প্রদান করে,—একটুও ধারণা হয় না।

—এখানে তুমি বলতে চাও টাকার বংশে খাড়া বিকিয়ে দেয় নিজেকে, তারাই কেবল সাঙটা করে পুরুষের মনস্তত্ত্বের জগৎ?

—একবারে বুদ্ধ! তুমি ভাস্কর! তবের দখত,—একটা রাতের ভার নেবে বলে যারা যায়, তাদের খুঁশ করতে ওরা যদি অত সাজ করে, তবে সমস্ত জীবনের ভার নেবে খাড়া, যোগ্য হবে হরেক প্রথম প্রোচ-খুশির সরঞ্জাম দেবে সামাজিক সম্মান আর স্বাধিকারের ওখ—তাদের মন হরণ করবার জগৎ আমরা,—ভ্রমমেয়ো ধর না কেন মোহিনী বেশ?

হাসি চমকাল ভাস্করের চোখে, ছেড়ে দিল লিলির মুঠি। ভাল করে ইংরেজী শেখার এই এক দোষ—ইংরেজী সাহিত্যের কড়া কড়া কথাগুলি এমন আয়ত্তে এসে যায় যে, শ্রোতার চমক লাগে সে সব

শুন। মনে হয় বুঝি আলোচনাকারিণীর নিঃস্রবই আধুনিকতম চিন্তার প্রকাশ হচ্ছে।

লিলি বুঝলে কি না কে জানে ভাস্করের ভাবনা, কিন্তু প্রসঙ্গটা সে ছেড়ে দিল।

—দাদার কাণ্ড জান?

—অর্থাৎ নবতম কাণ্ড?—জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

লিলি হাসল।—হ্যাঁ নবতমই বটে, তবে আধুনিকতম নয়। ভালবাসা, বিয়ে, ছাড়াছাড়ি এ তো সেই আদিকালের ব্যাপার। সবদম ঘটত দাবেক দিনে—গল্প করেন ঠাকুমা। দাদাটা এমন হাবা,—ঠিক তাই করছে, আর আলিয়ে মারছে মাকে।

লিলির দাদা প্রবীর শুধু একবার বাকব্রাস করে নিলেই ফিটফাট। আমাদের দেশের কার্তিক লম্বা কোঁচা আর ময়ূর নিয়ে দেশী উদাহরণ সম্বার সজ্জাবনীমেরে রেখেছেন, দরকার পড়লে তাই ছুটেতে হয় ভিন দেশে। প্রবীর দেখতে যেন দেবাদিদেব জুপিটার—খাঁর ললাট ফলক হতে আথেনা দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। মেট লরেন্সে ছোট হতে পাড়ে চোখু ইংরেজী গানগুলো সে রপ্ত করেছিল আখালা-হেলগুনের দৌহতে শৈশবেই। যৌবনে বিলেতে গিয়ে রপ্ত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার তত্ত্বাভ্যাস জিনিস। যা পড়তে গিয়েছিল তা পাড়া হোল না বটে, কিন্তু তাঁবার স্ব্যাগোল, একবার বিয়ে আর ডাইভোর্স—। বহু টাকা বৈয়ের গেল প্রবীরের বাবা বিনাম বাসের মোটা পকেট হতে। ভ্রমলোক তত্ত্বদন্ত হয়ে বিলেতে গিয়ে ছেলেকে তত্ত্বগত করে ফেলেন, প্রথমে অবস্থা তাতে বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। বলেছিলেন—চুলোর থাক। কিন্তু প্রবীরের মায়ের মূলের দিকে চাইতে তা, আর চারদিকের গুঞ্জনেও বিব্রত হয়ে—দগত্যা—।

মাগ ছয়েক দাবৎ প্রবীর কিয়েছে দেশে এবং সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আবার নাকি প্রেমে পাড়েছে সে কোন এক পথে বেড়ানো মেয়ের। চাকরী নেবে বার্মিংহাম বা বার্ড কোম্পানীতে ছুশো টাকা মায়নায়, আর নকুলেশ্বর ডট্টাচার্য লেনে বাট টাকার স্ল্যাট। মা আবার ভির্নি খেতে আরম্ভ করেছেন। বিকেতে যা করত, তাতে তবু একটা আভিজাত্য ছিল তো। এ যে আট মূলের পাস বাইশ বছরের মাস্টারবী। বাবা বলছেন—গেট আউট। প্রবীর বলছে—ওকে। মাঝখানে লিলি পড়েছে মুন্ডিলে। তাত ডবোখী গুপ্ত—সরোজ গুপ্তর তিনবার ডাইভোর্স করা বোঁ, কিংবা পম্পা চকলাদার, তার আমিমুলকে ত্যাগ করে সম্প্রতি যে বেকার অবস্থার গ্রাণ্ড আছে—তবু কিছুটা মান বাঁচত। সবাই মানত খারিস্টোফ্রাট ক্যামিলির স্ব্যাগোল বল। এ যে একেবারে নিম্নমণ্ডলিও ঘরের পেটি কেলেস্টারী।

ভাস্কর দেখল লিলিকে। তাকিয়েছে সে সামনের দিকে, হাসিখুশি নেই। ধর্মতমে হয়েছে মুখ, বা দিকের জট একটু বেকে গেছে আর তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছোট তিল। ভাস্কর দেখেছে জয়ন্তীকে—প্রবীরের নব-মনোনীতা। আশ্চর্য! কি করে যে তাকে পছন্দ করেছে প্রবীর। না আছে তত্ত্ব-গরিমানা আত্মিক ঐশ্বর্য। আত্মিক ঐশ্বর্য। চমকাল ভাস্কর। সে কি জয়ন্তীর আত্মার মুখোমুখি হয়েছে? নারীদেহকেই সে ভাবছে বুঝি



নারী-মহিমা! মুন্সিল! বিলেত ঘুর এসেও সিগারেট খাচ্ছে না ভাস্কর। চিন্তা করবার সময় অশ্রুবিধা হয়

দু'দিন প্রবীরের সঙ্গে জয়ন্তী এসেছে ভাস্করের অফিসে। চকল মেয়ে। মাফারী ছাপ পড়তে অনেক দেরি এখনো। জয়ন্তীর ছবি দেখেছে ভাস্কর। হঠকো হাতে এক বুড়ো আর কোন একটা শালুক-গোটা পুকুরের একটা টুকরো। ভাস্কর দিয়েছিল তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কিছু কাজ। জয়ন্তীর আইসক্রীম খাওয়া লোভী লোভী মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা মায়ী হয়েছিল ভাস্করের—কিন্তু এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! সত্যি, পরিবারকে মুন্সিলে ফেলতে প্রবীর।

—এই কিলি। এবছর কি?

লিলি তাকাল, হাসল একটু—এ হাসি মানার না সংকরা চোঁটে। বললো—চলো, মা তোমার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

পাঁচটা বেজেছে তবু তখনো ওঠে নি কর্মচারীর দল। হলের মাঝ দিয়ে যাবার সময় নীচ নীচ মুখের চোরা দৃষ্টি পড়তে লাগল লিলি আর ভাস্করের উপর।

ছোঁড়ার। কীধর উপর মাত্র হাত ঠেকিয়েই অক্লেশে বসতে পারে লিলি। সোঁড়ার সাকুংহার রোডটা যদি পৃথিবীকে ছাড়িয়ে আরও দূরে ছড়ান থাকত—সদীমের রাজ্যে উগাও হত লিলি। আবার হাসল সে, এ হাসিও মানাল না বিভিন্ন চোঁটে।

তপতী চোখে দাঁধা দেখল নাকি? সে এসেছিল ডালহৌসী স্কোয়ারের টেলিফোনের কাছিতে মীরার খোঁজে। একমাস পান্ডা নেই তার। নূতন বাড়ি বদলেছে ওরা—সে ঠিকানাও অজানা—চলে এসেছে তাই মীরার অফিস। দেখা হল, কলকঠ হল দুই সখী। একই সময় নেই, মীরার ডিউটি শেষ হবে পাঁচটার। অগত্যা তপতী বসল একটা রোঁরো, হাতে ভুলে নিল অবসর-বিনোদনের একমাত্র সহচর সিনেমা পত্রিকা। বেলা শেষে বেরিয়েছে দু'জন। ইটিকে পুকুরের পাড়ার। হঠাৎ দেখা গেল সুটারে চলেছে ভাস্কর, তার কাঁধে হাত রেখে লিলি বোস। ইসবার চলে গেল ওরা। উড়ছে লিলির খাটো চুল, উড়ছে শাড়ির আঁচল—ওরাও উড়ে চলে গেল তপতীর সামনে দিয়ে। বন্ধুকে থমকতে দেখে মীরারও তার চোখ পাঠাল দ্রষ্টব্যের সম্মানে—

—কি দেখছিছ? ও! লিলি বোসকে? জানিস না তো কি মুন্সিলে যেলেছে আমাদের গর।

তপতী অবাক। লিলি বোসরা মুন্সিলে ফেলেছে! এত উঁচুতে অধিষ্ঠিত ওরা, যে সেখান হতে মীরাদের সাম্নিখে এসে মুন্সিলে ফেলা একটা দস্তরমত বিপ্লবাত্মক ঘটনা। বন্ধুর চোখে প্রশ্ন দেখে মীরার আবার বলল—চল বাড়িতে, শুনিবি সব। মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা'র, বাবা রেগে আছেন। টোকা বাজে না মোটে বাড়িতে।

তপতী একটু ভাবল।—আবার তোর বাড়ি মা'রা? দেখি হয়ে যাবে যে।

—তোর বেতে ইচ্ছে না হলে বাস না। আমার সাধ্য কি পটা গলিতে তোকে নিয়ে যাই।

অভিমানে অবুধ হল মীরার। বড় কমপ্লেক্স ওর। একটু কিছু হলেই অমনি তুলবে পারিবারিক প্রভেদের প্রশ্ন। অথচ ছোট থেকে দু'জনে এক ফুলে, একই কলেজে পড়ে বড় হয়েছে তারা। সেই অবহেলার স্বাধীনতার শিনশলিতে তপতীর প্রধান যাবার জায়গাই ছিল মীরার বাড়ি। তেল-মাখা মুড়ি, আমের বাগ-টক আচার,—সব কিছুতে ভাগ তপতীর। মীরার জোড়া তাঁতের শাড়ি পরে, বিজয়ার প্রথম প্রণয় করত তপতী মাদীমাকে। মীনাক্ষীর খবরদারীর আওতা এলে করেক মাস যাবৎ তপতীর গতিবিধি সংঘত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে মীরার সঙ্গে বন্ধুর মূল্য হবার কারণ ঘটে নি। তপতীদের পরিবার যেখান হতে শুরু, সেটা মীরাদেরই সমাজ ছিল। অবশ্য এখন শৈলেন রায় উঠেছেন বহু উর্ষে, কিন্তু তাই বলে কেরানী বা কবিরাজ আদ্যাদি দেখে জুঁটুকে যায় না মীনাক্ষীর। শৈলেন রায় তো তাদের পেলেই প্রাক-জীবনের আধু-কাচকলার গল্পে লেগে যান, চেষ্টা করেন অল্পবয়সী ছেলেরের চাকরী সেবার, ক্যাসেকটর সার্টিফিকেট বিতরণ করেন অকাতরে।

ডবল-ডেকারের জটগতি পচিশ মিনিটে এনে দিল মীরার বাড়ি—মনোহরপুর রোড। ঝাঁকুনি সামলে নামলো দুই বন্ধু। এ বাড়ি আগের চেয়ে ভাল। একটি ঘরের সংখ্যা বেড়েছে। জানালায় পর্দা, দুই বোনের তক্তাপোষ নূতন সূজীন।

—সুন্দর তো বাড়িটা। তপতী বললো।

উৎফুল্ল হল মীরার।—বেশ ভালো না? কিন্তু ভাড়া বড় বেশি। একশো টাকা; আর এ বাড়ি তো ছেড়েই দিতে হবে।

বিষয়তার ছায়া নামল মীরার মুখে।

যাবার এল—জা আর গবম সিডাড়া। বসলো দুই সখী মুখোমুখি।

—জানিস তপতী। দিদি বিয়ে করছে।

বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করার মধ্যে যে অর্ধগতি বিভ্রমতা রয়েছে তা বুঝতে পারল না তপতী। খুশির খবর হাসলো।

—ওমা, কবে? সেই হাম্রাহবাদের ডাক্তার বাকি?

—না রে, মেয়ে নিজেই সব ঠিক করেছে। প্রেমে পড়েছে! লিলি বোসের ভাই প্রবীর—সেই বে লাল গাড়ি আর ঘেঁরে নিয়ে যুবতো, মেমসাহেবের ঠেগানী বেয়ে কিং এসেছে দেশে—দিদি তারি সঙ্গে জুটেছে।

এত বড় হা করে ফেলল তপতী। দিদি! তার মানে জয়ন্তী? সেই ছাপা শাড়ি—ছিপিছিপি—টটার আর প্রবীর! ইয়োরোপ, লক্ষ টাকা, গাড়ির স্পীড নব্বই মাইল! বল কি মীরার!

মীরার মা এলে বসলো মেয়েদের কাছে। নয়ম চোখ নয়ম গলা।—তুনেছ জয়ার কাণ্ড?

নিজেকে সামলাল তপতী।—কাণ্ড আবার কি? ভালই তো। বিয়ে দিয়ে দিন।

—বিয়ে দেব? ও কি ঘর করবে আমার মেয়েকে নিয়ে হয় তো দু'দিন সখ হয়েছ, চাইছ বিয়ে করতে। খোয়ালো হুয়ালে ছুড়ে ফেলে দেবে মেয়েটাকে।

একটু থামলো মা।—আমাকে তো গ্রাহ্যই করে না। কি যে ভাবছে আজকাল! কেবল বলে—আমরা নাকি ওর টাকা চাই, স্ত্রু চাই না।

চোখের জল করলো শীর্ণ গাল বেয়ে। মায়ের হৃৎথে ভারী হল দুই মেয়ের বুক। সখীর কাছে চোখে চোখে বিদায় নিয়ে তপতী চলল বাড়ি, ভিড় ঠেলে উঠে দাঁড়াল ট্রামে।

—তাই, তাই—লিলি চলেছে ভাস্করের সঙ্গে। হয়তো যাচ্ছে লিলির বাড়িতে। ওদের বাড়িতেও উঠছে নিশ্চয় একটা প্রকাণ্ড বড়। মীরার মা ভাবছে মেয়ের আসন্ন দুঃখের কথা, আর লিলির দুঃখ—প্রবীর নেমে যাচ্ছে নৌচে, কেশবাণী মার্টারদের সমাজে যেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরিবারের প্রতিিনিধি হয়ে জইতার, অল্পে যাদের প্রবীরতাকে অগ্রাহ্য করে সময় বিশেষে ধমক লাগায় লিলির মা। বারা অপেক্ষা করে বারান্দায় বেতের চেয়ারে, অপ্যায়িত হয় বিজেস্টেড কানা-ভাঙা কাপে চা পেয়ে। লিলি বৃষ্টি ভাস্করকে ধরেছে প্রবীরকে বোঝাবার জন্য। দেশপ্রিয় পার্ক, সন্দের হাওয়া, দুলে দুলে চলছে ট্রাম। একটি সিট পেয়ে বসল তপতী। ভাগ্যিস তপতীর বাবার টাকা আছে,—তপতীকে বিয়ে করলে মিত্র পরিবারের নৌচে নামবার কথাই উঠবে না।

বাড়িতে পৌঁছে গেল তপতী। সিঁড়ি বেয়ে উঠল উপরে—নিজের ঘর। দেবির খবর নিল না কেউ। মীনাক্ষী গেছে চোরঙ্গীর ছবির একজিভিশনে। ছবি না বুকলেও হাওয়াটা ক্যান—না হলে নাম খারিজ হয়ে যাবে আধুনিকতার দলিল হতে।

আমনার কাছে দাঁড়াল তপতী। টাকা বাদ দিলে জয়ন্তীর সঙ্গে তার তফাত কতটা বৃদ্ধি চাইল। জয়ন্তী বি-এ পড়ে নি, কিন্তু মেডেল পেয়েছে আর্টস্কুল হতে। ইম্প্রেশনিস্ট নয় সে। ফুল, মেয়ে, আর শব্দন একাকার হয়ে যায় না তার ছবিতে। দেখতে? দেখতেই বা মন্দ কি জয়ন্তী? আধুনিক অন্তর্দ্বন্দ্ব কানবার টাকা থাকলে আর ম্যাক্সফার্টের ব্যবহার-শীল আয়ত্ত করতে পারলে ক্ষিগারে, ফ্যাদানে অনায়াসে হার মানাতো প্রবীরের বোনকেই।

জয়ন্তীর বাবা ছ'শো দশ টাকা মায়নার কোন অফিসের ক্যাশিয়ার। ভাইবোনে মিলে তারা দশ জন। বড় কষ্টে দিন চলে। বি-এ তো পড়তেই পারলে না মীরা। অবশ্য সম্প্রতি চাকরী করছে তারা দুইবোন। সত্যেরও তাই সীমাবদ্ধ ঘটেছে। মীরার মা ইন্সটলমেন্ট কিনেছে 'উবা' সেলাই কল—তার আজীবনের স্বপ্ন। কোথায় মস্ত বড়লোক, লক্ষপতি, সাতখানা বাড়ির মালিক বিমান বোস আর কোথায় বা জয়ন্তী—কোন এক ইঞ্জলের দেখুনা টাকার মায়নার আর্ট সেকশনের ইনচার! তবু তো প্রবীর চাইছে জয়ন্তীকে বিয়ে করতে। কেন চাইছে? প্রেম? না বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রাপ্ত পাখি-ডালে বসতে চায়? যে বর বাঁধতে না বাঁধতে জেঙ্গে দিয়েছে ইয়োরোপের মেয়ে তাকে আবার স্বপ্ন দিয়ে গড়বে? লিলি উড়ছে ভাস্করের স্কুটারে, প্রবীরের সাথ কেন পুড়ে-হাটা পথে চলতে?

—আপনার বাথসন্টের শিশিটা একটুও খরচ হয় নি বলে মেম-সাহেব আজ আমাকে খুব বকেছেন দিদি।

তপতীর চুলে চিকুণ দিতে দিতে বলল প্রিয়বালা।

—বাথসন্ট! ও মাকে বোলা আমার সাদাগুলি ভাল লাগে নান করতে।

—বাথসন্ট জলে ঢেলে নাওয়া কিন্তু ফাসন দিদি। দত্ত-সাহেবের বাড়ির মেয়েরা তো একদিনও অমনি জলে চান করবে না।

জুবিধা পেলেই পূর্বতন মনিব দত্তবাড়ির মেয়েদের সহজে তপতীকে জ্ঞান দিতে পারলে খুশি হয় প্রিয়বালা। তপতী সব সময় আমল দেয় না, আবার মাঝে মাঝে মজাও লাগে শুনতে।

—ওবা একবারে আহেলী বিলিতি মেমসাহেবের মত থাকে কি না।—খুব চলতে লাগলো প্রিয়বালা।

—সকাল নটার আগে বিছানাই ছাড়ে না কেউ। চুলে কাল—কাপড়, যুগে ক্রীম আর একটিলতে ঢলকে। সেমিড পরে শুতে যায়। শোবার আগে রোজ চুনা খায় বর আর মামকে—এ বাপ-মা আর কি। আমার মত আরো তিনটে আদ্য আছে ওদের। যুগে মাথবার রং, সিন্ধের জামা-কাপড় কত দিয়ে দেয় আমাদের।

নিখাস ফেলল প্রিয়বালা। পঞ্চাশটা টাকার লোভে সাহেব বাড়ি হতে নেমে এসেছে কোথায়। তা বা মেমসাহেব হল কথা ছিল,—তার বরণ-ধারণ কিছুটা সাহেবী। মেয়েটা একবারে বাঙালী। মান আর নেই প্রিয়বালার।

জয়ন্তী চোঁট কামড়ে বসেছিল। রাত একটা বেজ ঘোঁছে ওদিকের বিজ্ঞানায় মিচিমিট চাইতে চাইতে বৃষ্টি ঢাৎ বজছে মীরা। জয়ন্তীর ঘুম নেই। শুধু কি আজ! ঘুম গেছে তার ছ'নাল আগে হতে—যেদিন প্রথম দেখা হল প্রবীরের সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের পথে। বাস থাকা খেয়েছে গাছের ছাঁড়িতে। বাতীর দাঁড়িয়ে পথে,—সারি সারি সব উদ্ভিদ মুখ। রাত নটার মেয়ে-বাতী একা জয়ন্তী। প্রবীর আসছিল বড়ের মত কোন্ দুরন্তর হতে যেন। গাড়ি থামাল, শুনল সব। তুলে নিল সবার অমুরোধে জয়ন্তীকে তার টু-সিটরে। প্রবীর বোদ—বার নামে কত কুংসাংকলেক্সারী—তবু যার গাড়িতে দেখা যায় বড়ঘরের মেয়েদের।

আবার দেখা হল প্রবীরের সঙ্গে লেকের পাড়ে—রবীন্দ্র-সরোবরে জলের উপর মুখ দেখেছে প্রথম প্রভাত, ছবিতে সেই তুলভঙ্গণি ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল জয়ন্তী। প্রবীর এসেছিল চক্কর মারতে, কাছে এল। দেখল ছবির রেখা—তারপর? তারপর করে যে তাকে তুলে নিল নিজের টু-সিটারে, আর এমন আপন হয়ে গেল একটুও মনে পড়ছে না জয়ন্তীর।

বিয়ে! হ্যাঁ। প্রবীর তো তাকে বিয়েই করতে চায় কিন্তু মা যে কাঁদছে। বাবার রাগ—ভাইবোনদের নীরবতা, সব দেখছে জয়া। দৈনিক নিজের জ্ঞানে না এমন অসঙ্গত বিয়ে হতে নেই। বার বার প্রবীরকে বলেছে যে কথা, কিন্তু সব যুক্তি ভেঙ্গেছে প্রবীর।

জয়া ভাল করেই জানে ভালবাসা আর বিয়ে এক নয়। হাতে-হাত, একটু টোঁটের ছোঁয়া, হুঁটা ছোট কথা—কুট ওঠে প্রেমের

ফুল। বিয়েতে বাস্তবের দাবী। বাসর-শয্যা গ্রীষ্মরাত্রে স্বপ্ন-পরিদর্শন হয়ে ওঠে। বিয়েতে ইড়ি-কড়া, এমন কি মাছের লাল কানকো আর মাংসের পাঁজুটে রং-এর জ্ঞানও অপরিহার্য। প্রবীরের জানা পৃথিবী, আর জয়ন্তীর জানায় যে তাকাই অনেক। মাঝে মাঝে তারা যায় কাফেতে, প্রবীর দু'একবার চুমুক দেয় কাফেতে, খায় কি না খায় ভেঙ্গে একটু কার্টোনেট, আর কুমার নিম্নেরটা খেয়ে ইচ্ছা করে খেয়ে নিতে প্রবীরের থালায় পড়ে-খাকা খাবার, মনে হয় কুমালে জড়িয়ে তুলে নিয়ে আসবে টেবিলের সব খাবারগুলি কোল্ড-ড্রিঙ্ক চুমুক দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত শুধে নেয়, প্রবীরের খালি হয় না অর্ধেক গোলান। প্রবীরের যত নির্লিপ্ত দেখে, মনে হয় ঠাণ্ডার কথা। আশির উপর বয়স। সব ইচ্ছে চলে গেছে—কেবল আছে খাবার লোভ। খাবার দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হজমশক্তি নেই, ঠাতও নেই, আঙুল দিয়ে বেঁটে বেঁটে দেই খাত উপভোগের দৃশ্য দেখে কতদিন বমি এসে গেছে জ্বর। হুভিস্কের দেশের ভাইবোন, বাবার কথাবার্তা ভয়স্তার মীমা ছাড়িয়ে গেছে কবে, সেই সংসারের প্রথম মেয়ে জয়ন্তী। এখানে হাত বাড়িয়ে আছে সবাই—লাভী হাত। একটুকরো বিখুট, আখপানা মাছের জন্ম ঠেলঠেল করছে ভাইবোন। গত বছরেও নতুন বাড়ী হয়েছিল মাংসের, কিন্তু বাবা মেজাজ খারাপ হলেই দ্রুতকে বলেন—মাস্টিটা। জয়ন্তীর রোজগারের বেড়ানো টাক—অনেক টাকা। রোজ মাছ খাওয়া হত, ইচ্ছে কালে কেনা যায় আলোপ্যাথি ওষুধ। মীরারও চাকরী হয়েছিল। স্বচ্ছলতা উঁকি দিয়েছে সংসারে। বাবা-মা খুশি। ভাইবোনদের ওষুধ কাশার আলো—সব বোঝে অস্বস্তি। কিন্তু প্রবীরকে এত কথা বোঝানো যায় কি? কবে বলা যায়,—শোনায় বিশ্বাস করি না। অনেকবার ভালবেসেছে, ফাল ভেঙেছে সে ভালবাসা ভূমি। তাপ কখনো হয় উলসিনী, গরবিনী।

কিন্তু জয়ন্তীরও যে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। তার খেল বছর বয়স তো প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ নয়। তখন জারগার চল নেমেছিল সর্গক্ষে। শির-শির করে উঠে! সনস্ত মন বদীন্দ্রনাথ পড়ে। ককচূড়ার মত ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল সে। আপ আজ বাইশ বছর তার কথা উঠেছে, চোখ চুকেছে—কেউ কথা বললে, হাসলেও বাগ হতে আরম্ভ হয়েছিল প্রায়, এমন সময় প্রবীর এসে দেখল না তার হাড়-ওঠা গাল—সেলাই করা শাড়ির আঁচল। টু-সিটারে তুলে নিল জয়ন্তীকে, দৌড় দিল অনেক দূরে—বহু দূরে সংসারের মীমা ছাড়িয়ে।

কদিন হল চিঠি লিখেছে কিশোর। পিয়ারি দেওর—ছোটবেলার খেলার সাথী। কাজল-কালো ত্রিণ চোখ ছেলে। ইকনমিস্টের ছাত্র। জয়ন্তীকে ডাকত 'মেজদিন'। বলত বড় শব্দর ডাক—মেজদিন। সেই কিশোর সব স্তনে কঠিন কথা বলে চিঠি দিয়েছে। বলেছে জয়ন্তী স্বাধীন, নিষ্ঠুর। প্রবীর ধান্নাবান্ন। হয় তো সত্যি কথাই বলেছে কিশোর কিন্তু জয়ন্তীর মন যে জেগে উঠেছে—তার কি। চাদের পরিপূর্ণতার ছোঁয়া লেগে নদীর জল যেমন উত্তাল হয়ে উঠেছে তেমনি হয়েছে যে জয়ার বুক। সে ভালবাসতে শিখেছে, ভালবেসেছে।

—দিদি! এবার ফুমা। গুদিকের বিছানা হতে বলল মীরা।

চমকাল জয়া—তুই ফুমা? নি এখনো?

—ফুমোবা কি করে? তুই যে ঘুমুচ্ছিলি না।

—শোন মীরা। আয় আমার কাছে।

মীরা চলে এল দিদির বিছানায়—ভুলে। পায়ে-পায়ে জড়াজড়ি করে ছোটবেলার মত। বোনের গারে হাত রাখল জয়ন্তী। উনিশ বছরের মীরা ভরাট হয়ে, উঠেছে, কিন্তু জানে জয়া এ ঐশ্বর্য থাকবে না অনেক দিন। চাকরী করে আর সংসারের দাবী মিটিয়ে যাবে যাবে সেন-ও।

—প্রবীরকে বিয়ে করব বলে তুইও রাগ করে আছিলি মীরা?

বোনকে জিজ্ঞাস করল জয়া।

—প্রবীর তীব্রণ খারাপ দিদি। সবাই জানে বিলেতে বিয়ে করেছিল, আর—

—আমিও তো ভীষণ খারাপ ভাই।

—তুই? তুই খারাপ? ভয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছো কয়ে উঠে বসলো মীরা, কথা আটকাল তার।

—দূর পাগল! সে সব কিছু নয়। আমি বলছি অল্প অর্থে। শোন তুই, বুঝতে চেষ্টা কর। প্রবীরের টাকা আছে কিন্তু আমরা যাকে চিরন্তন বলে জানি, তা গুর নেই। আমার টাকা তো নেই-ই, ওরা যাকে চিরন্তন ভাবে তারও অভাব আমার মধ্যে।

—তোমার? তোমার চিরন্তন নেই? বলেছে প্রবীর এ কথা? ও কি জানে তোকে? বাংলা দেশে আছে এমন মেয়ে! কি প্লাগল! কত প্রাক্সিফাইস! ভীষণ রাগলো মীরা।

—শোন! বোনের হাত ধরে শুইয়ে দিল জয়া।

—প্রবীর মেয়েদের সখকে দুর্বল। মেয়েদের কাছ হতে দূরে থাকতে চায় না, দরকারও নেই ওর। কিন্তু সব সময় সত্যি কথা বলে, নিজের দোষও স্বীকার করে অব্যাহত। আমরা যাকে চিরন্তনহীনতা বলি, ওর অভিধানে তার নাম—স্পোর্টিং স্পিরিট। আমার কথা ভেবে দেখ। দরকারে তো বটেই, অদরকারেও অভ্যাসবশে মিথ্যাকাথা বলে ফেলি। সাহস নেই, তাই ছেলেদের সঙ্গে মিশি না, কিন্তু বন্ধুর বর দেখে চোখ টাটার। সবকিছুতে লোভ, অস্ত্রের ভাল দেখে কষ্ট—এর নাম কি দিদি বল তো?

মীরা শুনল, বুঝতে চেষ্টা করল জয়ন্তীর কথা।

—কিন্তু দিদি! তবু তুই প্রবীরকে বিয়ে করিস না। সবাই বলছে—ও তোকে ফেলে ঠিক পাঁচিয়ে যাবে।

—ওকে পালাতে দেব না মীরা। তেমন দেখলে ওকে ফেলে আগেই পালাব আমি।

—পালাবি? হতবাক মীরা—তবে বাবা-মাকে এত কষ্ট দিয়ে বিয়েটা কববার দরকার কি?

—দরকার? নিজের কানও যেন শোনা না যায় এমনি অশ্রুটে বলল জয়ন্তী।

—আমি এই সংসার হতে পালাতে চাই মীরা।

—এই সন্সার, বাবা-মা এতগুলো ভাইবোন—সব দায়িত্ব ফেলে তুই পালাতে চাস দিদি।

মীরা আর্তনাদ করে উঠল।

—পালাতে চাই। ফুরিয়ে যাওয়া গলায় বলল জয়া। সকাল হতে সন্ধ্যা বিষাক্ত হয়ে থাকে এখানে অভাবের বিশেষ। শ্রী নেই, শান্তি নেই—ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও নেই,—এমন করে আর থাকতে পারছি না। উমা দেখেছে বৃহৎ ট্রাক নাকি কালীঘাট পার্কে কার কাছে ভিলে চাইছিল। বড়খোকা তিনমাস ছুলের মামনা দেয় নি। হয় তো খেয়েছে সিগারেট, সিনেমা দেখেছে। হয় তো কোনদিন স্নানবি মেয়ে দেখে স্টিট দিচ্ছে, পকেট কেটে জেলে গেছে। বাচতে হলে এ সন্সার ছেড়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই।

—কেন? উৎসাহে বিছানার উঠে বসল মীরা। আমরা সবাইকে ভাল করব। বিশেষ না হলে কি হয়? আমরা ভাইদের মানুষ করব, নিজের বোনদেরও, কত খুশি হবে তখন মা। জানিস তো দিদি। কত অল্পে মা খুশি হয়, আর দেখেছিস একটু খুশিতে কেমন বলমল করে ওঠে মুখ? একটুও বড়ো লাগে না মাকে তখন। তাঁর শাড়িটা পরে মাকে কি স্নান দেয়া দিচ্ছিল, দেখিস নি?

দেখেছে। সব দেখেছে সে। মীরার কথার উত্তরে মনে মনে বলল জয়াস্তী। মায়ের সতেরো বছরের প্রথম সন্তান জয়া। তার চোখের ওপর দিয়ে কেটেছে মায়ের তরুণী-বয়স। কতদিন চুপি চুপি গলির মোড়ের দোকান হতে জয়া কিনে এনেছে পাউডার, ডেকছে 'বেল ফুল চাই'কে। রাত আটটার স্থান করতো মা সব কাজের শেষে। জল ঢেলে ঢেলে স্নান শরীর তাজা, মুখে হাফা পাউডার আর কপালে গোল টিপ। তখন কান পাতা থাকতো মায়ের পথের উপর। ন'টার বাড়ি ফিরতেন বাবা—টিউশনি সেরে। একটা কিছু নিশ্চয় হাতে থাকত। ঠাকুরার জর্জর, লাহুর জন্তু হয় তো কোনো কাগজের সাক্ষ্য-সংস্করণ, মায়ে মায়ে গলির টাইকা ইলিশ। পিসীরা এসে তো উৎসব। সব সময় হাসি-গল্প। অবাক হয়ে জয়া ভাবত—মায়ের খোঁপায় শুকনো বেলফুলের মালা আঁকিয়ার করে, এত আনন্দ কেন ছোট পিসীরা।

তাঁরপর এল ছুঁখের দিন। শেয়ারের বাজারে দাছ অনেক টাকা লোকসান দিলেন। ধারে ধারে অঙ্ককার হয়ে গেল সব আনন্দ। বাড়ির দরজার লাঠি হাতে কাবলী-কিস্তিওয়ালা। কুতু লেনের সেই বড় বড় ঘর ছেড়ে, মস্ত চৌবাচার টলটলে একপুকুর জল ফেল, বাড়ি বদলান হল স্যাংদেতে একটা একতলায়। ছুঁটো ছোটখাট, একমালি দরমা-বেগা রান্নার জাঙ্গা। কান্না পেত জয়াস্তীরা। ভাইবোনদের নিয়ে ঘরবন্দী থাকতে হত তাকে, পাড়ার নোংরা বাজাগুলোর চেয়ে অবজ ঘরই ভাল কিন্তু করপোরেশনের ইস্কুলে গড়তের পিঠেই বাড়ি-বাকাল জয়াস্তী, আরও সেই প্রথম মার খেল—শবর হাতে মার—যে বাবা তাকে দশটা চুমো দিয়ে ঘুম ভাঙাতেন।

মায়ের মুখের হাসিটি ঝড় তখনো ছিল। প্রাণপণে চেষ্টা করত মা সন্সারের শ্রী বজ্র বা শব্দে। দিনে দিনে সব অজরকম হয়ে গেল।

ঠাকুরা আর মাকে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতেন না। মাছ-ছড় না পেত দাছ করতেন বিক্রী পালাগালি। আর বাবা? বাবার জু কুঁচকেই থাকত। একটু হাসতেন না কখনো বাবা। কথা বলা মানাই ধমক। কত যে বিক্রী কাণ্ড হতে লাগল বাড়িতে। একবার তিন পিসীর আসা নিয়ে মহা হাস্যমা বাঁধল। খরচপাত্র ক্রপণতা নিয়ে কি যেন টিল্লনী কাটল বড়পিসী, আর বাবা চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বাশতা বললেন তাকে। পিসীরাও ছাড়ল না। সে কি বিরাট ঝগড়া। মা ছুটে এসেছিল শান্ত করতে, কিন্তু তাকেই সব অনিষ্টের মূল বলে ঘোষণা করে পিসীরা চলে গেল। সেদিনের মায়ের কান্না—সেই নিরুপায় মেয়ের প্রাণপণে গড়া ঘরের সব মাধুরী বখন দারিদ্র্য কঠিন হাতে মুছে দিল, সেদিনের মনান্তিক কান্নাও দেখেছে জয়াস্তী।

লোকের ওরিকে একটু অঙ্ককারে জলের ধার ঘেঁষে বসেছিল তপতী। ওখানে কি কোন অভিজাত তরুণী অমন করে বসে? ও তো কলেজে-পড়া, স্বদরবারেগে টলমল সস্তা মেয়ের নিভৃত নিরালা। গাড়িতে ভাস্কর ভিজ্জেন করেছিল—আজ কোথায়?

ঠাণ্ডা শান্ত তপতী হঠাৎ বলল, লোক বাবো? অনেকদিন যাই নি ওখানে।

তাই লোক এমছে দু'জনে, চুপচাপ বসেছে একটা কোণে। যদি জিনে-বাদাম কিনত তপতী, কোল পেতে বসত—বাদাম ভাঙ্গার মুটমুটে শব্দে ভাস্কর নীরবতা, হতে পারতো অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। মীরার সঙ্গে এলে তাই করত তপতী, কিন্তু এ-বে—ভাস্কর—বিজ্ঞান-বুদ্ধি আর চেহারা, কাছে এসেই যেন আড়ষ্ট লাগে একটু।

—বেজাপট কতখুঁ? নীরবতা ভেঙ্গে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল। অভিজ্ঞতায় বুঝে—পড়া আর স্নায়ের কথাতেই খুশি হয়ে সাড়া দেয় তপতী।

—সামনের ঘাসের প্রথম সপ্তাহে বেরবে শুনিছ।

—তারপর এম-এ বুঝি?

—না। মায়ের মত নেই। একটা ঘাসের শিষ ছিড়ল তপতী।

—তপতী শোন। ক'দিন হতে মীনাক্ষীর অসুযোগমত তপতীকে তুমি বলছে ভাস্কর।—আমি মত করে দিতে পারি মায়ে—মুহ মুহ বললো ভাস্কর।

হাসল তপতী। ভালই জানে সে,—ভাস্কর বা বলবে তাতেই রাজী মীনাক্ষী। অপেক্ষায় আছে, মস্তবড় একটা অসুযোগে রাজী হবার জন্য। ভাস্কর মীনাক্ষীকে জানাবে তপতীকে বিশেষ করবার কথা—খার তুচ্ছ খুশি হয়ে মা বলবে—হ্যাঁ-হ্যাঁ। যেন তার আর ভাস্করের মাঝখানে তপতী বলে কেউ নেই—দরকার নেই তার সম্মতি।

—আমিও আর পড়ব না ঠিক করেছি। অ্যাপ্লিকেশন করছি মীরাদের অফিসে চাকরীর জন্য।

—মীরার অফিস? মানে টেলিফোন? চাকরী করবে তুমি? অবাক হল ভাস্কর।

—চাকরী করব কেন? শুধু তো অ্যাপ্লিকেশন। চাকরী

হবে বুঝি আমার? আর মা করতে দেবেন চাকরী? কেঁটসময়ান দেখে দেখে দুপুরবেলা মেলা আয়গ্লিকেশন করছি আর ছাড়ছি। ইংরেজী অভ্যাস হচ্ছে আর কি।

প্রায় বোমানান হাসল ভাস্বর। এমন করেও কথা বলতে পারে নাকি তপতী? কালকটা রাগের বড়া আলোর, অভিজাত হোটলে, লম্বা জাইভে এতদিন দেখেছে ভাস্বর চুপচাপ তপতীকে। কথা বলেছে সে তার কথার উত্তরে, হেসেছে—হাসির কথায়। আজ প্রথম স্তনন নিজে হতে এত কথা, আর নৃপুরুবাজান হাসি। এই হাসি আর কথা আরো স্তননে চাইল ভাস্বর।

—আমার অফিসে আছে চাকরী। দেখ, করবে নাকি অ্যাপ্লিকেশন।

—কত নামনা? বোনাস কত মাসের? বৈময়িক জিজ্ঞাসা তপতীর আর হাসি। সত্যি আছে কাজ? মীরা একটা অল্প কাজের খোঁজ করছে। ওর আর ভাল লাগছে না দূরভাবিণী হয়ে থাকতে?

—মীরা? জয়ন্তী সোম ওর দিদি—না?

—ঠা। বাকি লিলির দানা—

থেকে গেল তপতী। সমস্ত সমগ্রটাই যেন এক মুহূর্তের জঙ্ঘা থেমে গিয়ে উৎসুক কান পাতল ওদের কথা স্তনবার জঙ্ঘা। ততক্ষণে চান উঠেছে একফালি আর নাচছে তার চামা একে বেকে লেবের জলে। খিরকিরে হাওয়া; তবু আর এখানে বসে থাকতে ভাল লাগল না তপতীর। জয়ন্তী—প্রবীর—তাদের ভালোবাসার কথা বলতে ইচ্ছাই করল না তার। কি হবে এখানে বসে থেকে কেবল বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে? যা তত্ত্বরভরে নিজে হতে জেগে ওঠে নি, সে কি জাগবে মুখের কথায়? প্রথম দিনটিতে কত ভাল লেগেছিল তপতীর ভাস্বরকে। কিন্তু তারপর হতে দাম্পত্য শাড়িতে নিজেকে মুড়ে, সন্ধ্যা কানিতে কাটাতে সে ভালোবাসা কোথায় যেন উড়ে গেছে। তপতী মনে মনে বলল,—নিয়ে দিতে পার দাঁও, কিন্তু আমার ভালোবাসব তারপরে বিয়ে হবে, তার অপেক্ষায় থাকলে তো মনে হচ্ছে যুগান্ত ধরে বসে থাকলেও আসবে না সে দুল ভবল।

ভালোবাসা যে জাগে নি মীনাক্ষীও বুঝেছিল সে সত্য। ভাস্বর নিত্য আসে, বেড়াতেও যায় কিন্তু চোখে আলো কই? তপতী তো আরো নীরব। স্তনবার আদিকালের প্রথমতই সে গিরে উপস্থিত হল খুড়কুতো বোনের দেওর সুমোহন মিত্রের বাড়ি। এককালে আধুনিকা শ্রেষ্ঠা ছিল মীনাক্ষী। সেদিন তার পায়ের তলায় অনায়াসে নিজেকে বিসর্জন দিতে উদ্বীর্ণ হয়ে থাকত বহু তরুণ। পূজকের দলে ছিল সুমোহনও সেদিন। মীনাক্ষী ইচ্ছা করলেই অনায়াসেই তার পদবী বদল হত মিত্রগোষ্ঠীতে। সুমোহন মিত্রের স্ত্রীও জানত সে কথা, কিন্তু তাকেও বিয়ে করেছে সুমোহন ভালোবেসেই, তাই মীহুর প্রতি কান বিষেয় ছিল না তার। সুকস্যাণীও বহু মীনাক্ষীর।

যথারীতি মিত্রদম্পতি রবিবারের সন্ধ্যা কাটাচ্ছিল বোনা আর মোটা বই ও চুকে। মাঝ অতিথির আগমনে বৈচিত্র্য

এল। ব্যস্ত হল স্বামী-স্ত্রী। দু'হাতে মীনাক্ষীকে ধরে আপ্যায়ন করল সুকস্যাণী।

—খবর কি? একজনের ওঠ আর একজনের চোখে জিজ্ঞাসা।

—খবর ছাড়া আসতে নই বুঝি?

—আরে না না। আসবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার কত কাজ, আর এদিকে ইদানীং আসছও না অনেক দিন, তাই—বলল সুকস্যাণী।

—আহা। আমি আসছি না। আর নিচ্ছে? সেই থুঁকুর জন্মদিনের পার্টি—তাও কত দিন হয়ে গেল। বন্ধুদের প্রীতিভরা অমুযোগে সুন্দর হয়ে উঠল দুসর সন্ধ্যা, এলো সোনালী চাঁ, বাড়ির বানানো কেক।

—ছেলের বিয়ের কতবুর কলিদি? কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করল মীনাক্ষী আর তক্ষুনি সব বুঝে ফেল হাসি চমকাল কস্যাণীর চোখে। তাই বল। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে দেবীর আগমনের উদ্দেশ্য। তা মন্দই বা কি। দেখতে পরীটি না হলেও তপতী মেয়ে বড় ভাল। একই কথা মনে হল সুমোহনেরও।

—কোথায় বিয়ে? দু' একটা কথা হচ্ছে বটে। ঠিক হয় নি কিছুই। তোমার থুঁকুরও তো বিয়ের কথা হচ্ছে না?

—গিরের চেষ্টা চাচ্ছে, কিন্তু ভাল ছেলে পাই কই।

—ভাল ছেলে? তা ভাস্বরকে কি তোমার ভাল ছেলে বলে মনে হয়?

হাসির কুল ফুল তিনটি মুখে।

—ভাল তো নিশ্চয়ই। থুঁকুর চেয়ে খুব বেশিরকম ভাল তোমার ছেলে। আর ভাস্বর কাউকে পছন্দ করে বসে নেই কি না ঠিক জানো তো?

মীনাক্ষী চাইল ছেলের মাথের দিকে।

—না না।—বলল বটে সুকস্যাণী, কিন্তু গলায় ঠিক নিঃসন্দেহের সুরটি বাজল না মাথের।

—খাড়া। আমি না হয় জিজ্ঞেস করব ওকে। কি বল? স্বামীর দিকে চাইল মিত্র-জয়া।

সুমোহন এতক্ষণ নীরব প্রোতা ছিলেন বান্ধবীদের তালপনের, জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিলেন—পছন্দ আর করব কাকে? অফিস নিয়মই তো আছে। তারপর সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই যাচ্ছ মীহুর ওখানে, পছন্দ করে থাকলে ও—করেছে তপতীকেই।

—কেন? লিলির সঙ্গে খুব ঘোরে তো। আর থুঁকী—একটু খামল নাক্ষী—আপ টু হিজ চয়েস না ও হতে পারে। বড় বেশি প্লেন ও।

—প্লেন? উত্তেজিত হলেন সুমোহন মিত্র।

—চমৎকার মেয়ে তপতী, সাবল্টাইম। হার আইজ আর সাইলেট তোমার অব প্রোথার। একদা প্রিয় কবির লাইন কোট করলেন তিনি।

হাসলো দুই বান্ধবী আর দুটি বিনিময় করলো সাইলেট আইজ আর এখন কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না। ঠিক হল ভাস্বরকে সুকস্যাণী বলবে তপতীর সন্ধ্যা। তাদের ব মঙ। অমন মেয়ে পাওয়া যাবে নাকি সহজে আজকাল

লিগল তো একটা উদ্ভট। আখা মেম, আখা বাগানী। ছেলে যদি পাগল না হয়, তবেই বিয়ের জন্ম অমন মেয়ে পছন্দ করবে। তবে যেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না। মেশে? প্রবীর ছোটবেলার বন্ধু যে—ওদের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশাও তাই। আর বোসেরা মাছুষ খাণা নয়।

—যাক! তা হলে মীনার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠাড়াবে কি রকম? হৌ হৌ হাসলেন সুমোহন। হাসল স্কুল্যাগী, মীনাঙ্কীও। যৌবনের ঝলমলে দিন, স্বপ্নেশ্বর করিডোর, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট উঁকি দিল ক্ষণিকের জন্ম।

ডুগ্লর নিখোশ ফেল বিদায় নিল মীনাঙ্কী। সেই অতীত দিনে বাম্বো নি কত দোষ করেছে মৌন-যুগ দিদিটির কাছে। দিদির শাড়ি-গয়না দখল করত যে জোরে। স্বামীও নিষেধিল সেই জোরেই। তারপর যখন পিছন ফিরে দেখাশু বুদ্ধি হল, তখন দেরি হয়ে গেছে—কত রাজি কেন্দে কাটিয়েছে মীনাঙ্কী। ভেবেছে মা কেন চুলের মুঠি ধরে প্রথমেই নিবৃত্ত করেন নি তাকে এই নিষ্ঠুর খেলা হতে। যদি তপতী সুখী হয়, হয় তো দিদি ক্ষমা করবে—সেই ছোটবেলার মত, যখন অনেক দোষের পর ছলছলে চোখে কাছে এসে ঠাঁড়াতে সে আর এশাঙ্কী ছেলে কাছে টেনে নিত তাকে।

অর্থনীতিতে বিলম্বী ছাপ থাকলেও ছাপিশ বছরের ভাস্কর কল্যাণীর একমাত্র সন্তান। এখনো বড় হতে পারে নি সে, স্বতন্ত্র হয় নি মায়ের বক্ষনীয় হতে। জমা টাকার অঙ্ক মোটা হলেও মিজ-পরিবার অতি আধুনিক নয় চলনে-বলনে। দ্বিতীয় মহাদুঃ ধেমন অনেককে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেলেছেও আবার অনেককে। সুমোহন মিত্রের টাকা যুদ্ধের দান। আর কল্যাণীর বাপের বাড়ি তো আজও মধ্যবিত্ত মাত্র। বিজ্ঞান খ্যাতি আছে কল্যাণীর ভাইদের, কিন্তু টাকার কথা বলে না কেউ। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী পরিবার গড়েছে কল্যাণী। দেয়ালে ক্রিশ্চামসক দেবের ছবি, বেগুড় মঠ, কালীবাড়ি। জালতা-সিঁদুর বর্ণিত নয় কল্যাণীর পরিবেশ হতে, আবার পাটি: সাহেব-বন্ধু এসবও আছে বাবদা এবং ভাললাগার খাতিরে।

পাটে টান টান ভাস্কর, কল্যাণী এসে বসলো কাছে, ছেলের কপালের চুল দরিয়ে, যুগে-চোখে আদর দিল মা।

—কি মতলব? হাসল ভাস্কর।

—বুঝিল ভাস্কর! একটা ভাির ভাল খবর আছে। ভণিষ্ঠা বার দিয়ে প্রথমই বিষয়বস্তুতে চলে গেল কল্যাণী।

—যখা? সবিস্তারে বল। মাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ছেলে।

—আজ মীনাঙ্কী এসেছিল। তপতীর সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চায়।

অম্বা গোল ভাস্কর। অতি আধুনিক মীনাঙ্কী রায়। কি বেন একটা সম্পর্কের সূতো বরে তাকে পিঙ্গীও বলতে পারে ভাস্কর, কিন্তু মহিলার এমন অম্বাদা করতে সাহস হয় নি তার। মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তো আধুনিক প্রণালিতে আদর করেছেন

মিসেস রায়—হঠাৎ আবার মায়ের কাছে প্রস্তাব করবার মত সেকলে হতে গেলেন তিনি।

—চুপ কেন? কথা বল? ভাস্করকে নাড়া দিল কল্যাণী। অনেক সন্ধ্যার জর্জটে হাইচিলে সুশোভিত মাকে দেখেছে ভাস্কর, কিন্তু ধনেখালি তাঁতের শাড়ি আর এলানো গোপার ঘোরা রূপটি ভাির ভাল লাগে তার। অবস্থা মি: শোভানের ডিনারে মাকে আঁচলে চাবি বাঁধা বেশে দেখলে ভীষণ চটে যাবে সে। ছোট-খাট মায়ের দিকে চেয়ে আনমনা হাসল ভাস্কর। গত দু'বাসের মধ্যে একদিনও কি এমনি সঙ্গে দেখেছে সে মীনাঙ্কী রায়কে?

—হাসলে হবে না। উত্তর সে। উনি বলেছেন তপতীকে ভাির পছন্দ ঠর।

আবার হাসল ভাস্কর। মনে পড়লো লিঙ্গির ভক্তি—মীনাঙ্কী রায়—ওস্ত স্নেহ অব ইয়োর ফাদার।

—লক্ষ্মী মা। এখন কিয়ের জুগুন লাগিয়ো না। ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ক্রোজ করবার আগে ইনকাম ট্যাক্সের বামেগা মেটাতে হবে। ব্যাবস্থা না করলে একটা লাগ টাকা দেলানী যাবে সরকারের ঘরে। আরো একটা বড় কাজের তালে আছি—পুর সুনো। স্বতরাং বিয়ের আলোচনা স্থগিত থাক সম্প্রতি।

—বড়ই কাজের মাছুষ হয়েছিস—না? কই উনি তো বলেন নি কোন ভাবনার কথা।

—মা, বাবা তো নিশ্চিত যোগ্য ছেলের উপর তার দিয়ে।

—তপতীকে পছন্দ নয়—তাই বদ আদত কথা।

—না মা, না। ভাস্কর উঠে বদন খাটের উপর।

—ছাড়বে না যদি, অবগান বর—পছন্দ করা কি এত গোজা আজকাল? জর্জটি, সিয়ান, নাইলন হরেকরকমে প্যাকেট মাড়া বস্ত্রগুলি কি বকমকের আলোয় দাঁধা লাগাচ্ছে না চোখে? কত বড় হাদি—চিত্ত হরণের অস্তিত্তি আকোশন। সাধা কি কাউকেই ডিসুওবলাইজ করি। পছন্দ আর বিয়ে দুটোই যে বড় শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে অনুনা মা!

—আহা! কি ছেলেব কথা। আমাদের সময়ে তো আর কেউ পছন্দ করে বিয়ে করে নি।

—সেই ক্রিশ বছর আগে? মাকাতার আমল সেটা মা। এখন যে বছরে যুগ পালটাচ্ছে। সাদাশিলে ছোটটি তোমাকে পছন্দ করেছিলেন বাবা আর তুমিও আপত্তি না করেই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিহীন সুমোহন মিত্রকে বিয়ে করেছিলে। আজ আর তা চলবে না মা। এখন আমরা চাই—প্রজেক্টেবল ওয়াইক, তারা চায় ব্যাক-বালেন্স, গাড়ি ও বাড়িতে স্টুটেল হাজবাও।

কল্যাণী হাসলো।—আর ক্লাস নে ভাস্কর! তা এখন মোট কথাটা কি? তপতী প্রজেক্টেবল ওয়াইক হবে না বলে ভাবছিস।

—এই নিয়ে অস্তুত বেশ কিছুদিন চিন্তা করা দরকার। তপতীর স্যামার কই মা? এখন পর্যন্ত সিপিএকেই রপ্ত হতে পারে নি। মায়ের চোখের আড়াল হলেই ফ্রমালে যবে তুলে ফেলে।

—তবে তাই বলব মাইকে—এ বিয়ে হবে না।

[কমদ]



(পূর্ণ-প্রকাশিতের পর)  
প্রমোদ মিত্র

বুধওয়ার হাটে গেছলাম।

সুদূর উত্তর বিহারের গভীর মফস্বলের একটা নেহাং নগর্যা হাট। প্রতি বুধবারে বসে বলে নাম বুধওয়ার।

হাটের জায়গা নির্বাচনের মধ্যে সুদূর অতীতে কি উদ্ভট কাজ হয়েছিল জানি না, এখনকার পাশ্চাত্য স্থানটি অনেকদিক দিয়েই বেশোটি।

যে সরকারী পাকা রাস্তাটা বর্তমানে হাটের দু'দিকের দু'টি মাঝারি গাছের গ্রামকে যুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে, তা থেকে দ্রুতত আশ মাইল পথ খানিকটা কাঁচা রাস্তা ও তারপর খানাতাম্ব-চরা বাঁকা ডাঙা জমির ওপর দিয়ে গিয়ে হাটে পৌঁছোতে হয়। ইজকাল বহুজনের যাতায়াতে একটা পায়-চঙ্গা পথের আঁকাবাঁকা পথ সেখানে দেখা যায় মাত্র। কোথাও কোথাও অস্পষ্ট বয়েল গাড়ির সকার দাগও আছে। তবে এ ছোট হাটে একটা ছুটির বেশি গরুর গাড়ি কদাচিৎ আসে। তাদের কোন বাঁধাবরা রাস্তাও নেই।

অসুবিধে অনেক হলেও বাপ শিতম'র আমলে যেমন হয়ে এসেছে সে ধার্মা বদল করবার কথা এ দেশের মানুষ সহজে ভাবে না। চিরকাল যা করে এসেছে তাই চোখ বুজে করে যায়। খানাতাম্ব ডিঙির মাঠ ভেঙে বুধবার এই হাটে আসে সওদা বেচতে আর কিনতে আবার প্রতি রবিবার এতোসারাম হাটে যায় আবে। মাইল ছয়েক দূরের দীবাওয়ারায়।

এ-সব নেহাং গাঁইয়া হাটের একটা আসলানি আকর্ষণ আছে। শহরে সভ্যতার ছোঁয়াট এখনো এ-সব সমাবেশকে তেমন বিকৃত করতে পারে নি। সস্তা খেলো মাথার তেলের শিশি, চিরুণী আয়না পুঁতি আর নকল পলার মালা জরির ফিতা বিক্রি হয় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সওদাই চিরন্তন।

প্রথমে হাটে ঢুকতেই দেখা যায়, দু'পাশে দেশী মুচিরা জুতোর সারি নিয়ে বসেছে। বেশির ভাগই শক্ত পুরু চামড়ার নাগরা। শহরে ফ্যাশনের অনুকরণে কিছু অঙ্গ ধরণের জুতোও আছে, কিন্তু তার খন্দের তেমন আছে বলে মনে হয় না। চামড়ার জুতোর সঙ্গে অপবিত্রতার একটা ধারণা মেশানো আছে বলে জুতোর সওদা হাটের একেবারে বাইরে সাজানো।

জুতোর পরেই মাছ বিক্রির জায়গা। মাছ-মাস এদেশে এখনো চুপার বস্তু। জাতের গর্ভ বাসের আছে তারা খায় না। মাছ নিয়ে আসেও ছুঁচার জন মাত্র জেলে। বেশির ভাগ হাটেরে সেখানে নাকে কম্পড় চাপা দিয়ে যায়।

জেলেদের সীমানা ছাড়ালেই সত্যিকার হাট আরম্ভ। কোথাও হাড়ি-কুড়ি সরা, কোথাও স্থানীয় কামারদের তৈরি হাতা, খস্কা, কড়াই থেকে কোদাল, কুড়ল, লাঙলের ফাল, কোথাও রাশিকৃত চাল, গম, জুনার আর তা ছাড়া বেশির ভাগই শাকসব্জী ফলমূলের পসারী। এরই মধ্যে কোথাও কেউ দেশী ধরণের পুরুষ মেয়েদের জামা নিয়ে বসেছে, কোথাও কাঠের বাগকোষ, উখলি বা গরুর গাড়ির চাকা বিক্রি হচ্ছে।

নৃত্যে উৎসাহী বন্ধু সুরীর নাগের পাঞ্জায় পড়ে সুদূর ছাপরা থেকে এখানে এসেছি। এ অঞ্চল বেলপথ থেকে অনেক দূর। নতুন একটা সরকারী রাস্তা সম্প্রতি তৈরি হওয়াতেই যাতায়াত একটু সুগম হয়েছে। সে রাস্তাতেও প্রায় পঞ্চাশ মাইল জোপে করে আসতে হয়েছে এই নগর্যা হাটে পৌঁছোতে।

সুরীর এসেছে তার নৃত্য সমীক্ষার কাজে। এখনও এ অঞ্চলটার জীবনযাত্রার যন্ত্রণের দেশী-বিদেশী পাঁচমিশেলী ভেজাল তেমন মেখে নি। নয়া সড়ক দিয়ে কিছু-কিছু লরী মোটর যেতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনো বয়েল গাড়ি চলে সেই সাবকো ছাঁদের চাকার গড়িয়ে। মেয়েরা মুলা বানার চিরচরিত রীতিতে, হাতের পায়ে রূপোর গয়নার সনাতন কারিগরী।

সুরীর সেই সব দেখতে এসেছে। এ-দেশে গরুর গাড়ির চাকার যে অব থাকে না, কয়েক টুকরো কাঠের পাটা দিয়ে যে তা তৈরি হয়, এই ধরণের চাকা যে সেই প্রাচীনকালের মহেঞ্জদাড়োর মাটির খেলনার দেখা যায়, এই সব সে আমার উৎসাহভরে বোঝার।

আমার কাছে বিষয়টা যে একেবারে নীরস তা না, কিন্তু শুধু তার নৃত্য সমীক্ষার সাধী হ'তে এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে আসি আসি নি।

শ্রমায় একটু শিকারের সখ এককালে ছিল। এ অঞ্চলে এক

বিস্তীর্ণ জলায় শীতের শেষেও অভ্রম পানী পাওয়া যায় খবর পেয়ে সুবীর নাগের সঙ্গে এ টহলে আসতে রাজী হয়েছিলাম।

বেরিয়েছি সেই পাটনা থেকে। পথে দু' জারগায় ডাক-বাংলোতে কাটিয়ে সর্বশেষ এই বৃণ্ডওয়ার হাটে এসে পৌঁছেছি। সুবীরের এখানকার কাজ সারা হলোই আনাড়ি শিকারীরও স্বর্গ সেই জলার উদ্দেশে রওনা হব এই কথা ছিল।

বৃণ্ডওয়ার হাট থেকে সে জলার সন্ধানে বাওয়া আর হ'ল না।

এক বছর আগে যে কাহিনীর খেই হারিয়ে গেছিল তা যে এ দকম একটা জারগায় অপ্রত্যাশিতভাবে আবার খুঁজে পাব, তা কি কখনো করনা করতে পেরেছি।

কোথার কারেয়ার এয়ার-টার্মিনাল আর কোথার অজ জংলা অঞ্চলের একটা নগণ্য চাষীর হাট।

ছেঁড়া গল্পের সূতো কিন্তু এইখানেই ছোঁড়া লাগল।

হাটের এক জারগায় জন দুই দেশী বাপারী কিছু পুরুষদের কামিজ আর মেয়েদের শুল্লা নিয়ে বসেছে। কামিজ ও শুল্লাগুলি সম্ভবত একালের কলে সেলাই করা, কিন্তু তার কাট-ছাঁটিনা চিরকালের। সুবীর সেইখানেই হঠাৎসেদের মধ্যে বসে সেই সব জামা খঁটিছিল। আমার উৎসাহে তখন ভাঁটা পড়েছে। একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে হাটের একিকে-ওদিকে চেয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ হাটের অপর প্রান্তে একটি মানুষকে দেখে বিম্বিত হলাম। এখানকার এই ধূলিমালিন জনতার মধ্যে মানুষটি একেবারে যেমানান।

এই হাটে আমরাও অবশ্য একদিক দিয়ে বিসদৃশ। সেটা প্রধানত পোষাকে। আমাদের দু'জনেরই পরনে চলাফেরার সুবিধার জুহা হাফ প্যাট সাটের সঙ্গে মজবুত জুতো মোজা। সরকারী আধা-সরকারী কর্মচারীদের কল্যাণে এ পোষাক গরমিলের হলেও এ সুদূর অঞ্চলেও অপরিচিত নয়। হাটের মাঝে এ পোষাক অতিরিক্ত কোঁতুল এখন আর জাগায় না।

এ মানুষটি কিন্তু শুধু পোষাকে নয় চেহারাতেও এ হাটের মধ্যে অনন্য। দূর থেকে মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু হাটের সাধারণ মানুষের মাথা ছাড়াই দীর্ঘ স্বজু সুগায় অসাম মূর্তিটিই বিম্বিত কোঁতুল জাগাবার মত। তার সঙ্গে গেকরা রঙে ছোপান পাঞ্জানা পাঞ্জাবী, মাথার আঁট টুপি আরো বিশিষ্ট করে তুলেছে।

আমার চোখে অদ্ভুত লাগলেও এখানকার মানুষের মধ্যে তেমন কোন সচকিত চাক্ষুশ্য না দেখে বুঝলাম মানুষটি এদের অপরিচিত নন। কোঁতুলী হয়ে পাশের একজনকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আমার অহম্মানের সমর্থনই পেলাম। কিছুকাল ধরে এই অদ্ভুত সাধুজিকে নাকি এ অঞ্চলে দেখা'যাচ্ছে। দীবাওয়ারার কাছে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় থাকেন। মাঝে মাঝে রাস্তায় ঘাটে বা এরকম হাটে তাঁকে দেখা যায়। সাধুজি একটি থলে হাতে সওয়া করতেই হাটে এসেছেন। দেখে একটু অবাক লাগছিল। তাঁর চেহারা পোষাকের সঙ্গে এ কাশটা মরায় না। সুবীর তার নৃত্য সন্ধান থেকে বিরত করে দৃষ্টটা দেখালাম।

সুবীর খানিকক্ষণ ভুল ক'টকে তাকিয়ে দেখে একটু চিন্তিতভাবে বললে,—আচ্ছা! কেমন চেনা চেনা লাগছে না?

চেনা!—অবাক হয়ে একটু মনোবাগ সহস্বরেই সে দিকে

চাইলাম। কিন্তু স্মৃতিতে কোথাও কোন আলাড়ন অমুভব করলাম না।

সুবীরই এখার আমার হাত ধরে টেনে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বললে,—এসো! ত'।

একটু বিমূঢ় ভাবেই তার শিছু পিছু গেলাম। তার নিজের গবেষণার বিষয়ে ছাড়া সুবীরের এরকম আগ্রহ ত' আর কিছুতে দেখা যায় না।

সাধুজির কাছ পর্যন্ত পৌঁছোতে হ'ল না। হাটের ভিড় কাটিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েই সুবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে উৎসাহভরে তাকিয়ে বললে,—চিনতে পেরেছ এবার?

তখন বেশ কাছাকাছিই এসে পড়েছি। ওদিকে সাক্ষী হাটের রাস্তার কিছু ভরিতরকারী কিনে সাধুজি নিচু হয়ে সেগুলো থলেতে ভরছেন।

ক্ষণ একটু স্মৃতির কল্পনা যে একেবারে অমুভব করলাম না তা নয়। কিন্তু পরচরটা মনে কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল না।

সুবীর এবার গর্ভবত আমার দিকে তাকিয়ে সোজাসে বললে,—আবে ও ত' দেবরাজ!

দেবরাজ!

বিমূঢ় হয়ে সুবীরের দিকেই ত কালাম।

হ্যাঁ দেবরাজ সরকার! তোমার মনে নেই? আমাদের বছরের সেরা ছেলে ছিল। কলেজে রাজনীতি করতে গিয়ে বর্তাদের চটিয়ে দেয়। কি যেন সাম্যজ্ঞান হায়েছিল মাগ চাটতে রাজী না হওয়ার। সব গোল মিটে যেত কদিন বাদেই। কিন্তু সবকিছু অতাক করে পড়া ছেড়ে দিয়ে দেবরাজ হঠাৎ নিক্কাশ হয়ে গেছিল। তারপর বছর কয়েক বাদে জামানী থেকে ওর খবর পাওয়া গেছিল। সেখানে ও নিজের বিখ্যে হুস্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছে—

সুবীর আরো কি সব বলে গেল। আমার তখন সেদিকে কান নেই। আমি সবিসয়ে একটু বিহ্বলভাবেই দেবরাজকে তখন দেখছি।

জলায় পাখা শিকারের কোড় ত্যাগ করে দেবরাজের আত্মনাত্তেই তারপর এসেছি।

বৃণ্ডওয়ার বহ হাটে তার সঙ্গে দেখা সেখান থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে দীবাওয়ার জঙ্গল শুরু হয়েছে। সেই জঙ্গলের সীমানার মধ্যে কিছুদূর গিয়েই দেবরাজের বর্তমান আবাস।

আবাসটি একটি টিনে ছাওয়া কাঠের দেওয়াল দেওয়া বারান্দাঘেরা কুটার গোছেব। আপাতত তার বেশ ভগ্নবশা। এ ধরণের ভাঙা-চোরা দু-একটি কুটার আশেপাশে আরো আছে। তার কোনটা টিনে কোনটা খড়ে ছাওয়া।

এগুলি দেবরাজের নিজের তৈরি নয়। বছর দু-এক আগে সরকারী এক ভূতাত্তিক দল কিছুকালের জন্যে এ অঞ্চলের খনিজসম্পদের হদিস নিতে এখানে আড্ডা গেড়েছিলেন। এ সব অস্থায়ী আবাসগুলি তাঁদেরই তৈরি। তাঁরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার পর যে কোন কারেবেই হোক কুটারগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা হয় নি। দেবরাজ যুগে যুগে এসে তাবৎ একটিকে একরকম বাসযোগ্য করে নিয়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

জঙ্গলের মাঝে পোড়ো বাড়িতে দেবরাজ কিন্তু ঠিক হাবের কোপনি সখল সন্ন্যাসীর মত থাকে না। সুখ না হোক মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যের



## নভেনীল

উপকরণ সেখানে বর্তমান। ফেরোসিনের স্টোভ আছে, চালিয়ে নেবার মত লোহা ও আয়ুর্নিয়নের কটা বাসন কোসন, কলাইকরা প্রোট কাপ ডিশও গোটা কয়েক। সেইসঙ্গে এলিক-ওলিক বাতায়নের একটি সাইকেলই সবচেয়ে বিখ্যাতকর।

বৃন্দাবনার হাট ছেড়ে আসবার সময় এই সাইকেলটি দেখেই বেশ কৌতুক ও বিস্ময় অনুভব করেছিলেন।

শ্রবীর বলেছিল—সে কি তা! তুমি সাইকেল ঢকে ঘোমাফেরা করো নাকি?

দেবরাজ গম্ভীরমুখে বলেছিল—একটা বাহন তা' চাই।

কিন্তু সন্ধ্যামীম সন্ধ্যাকাল কেমন গাঢ় দেখায় না?

এবার দেবরাজের মুখে কৌতুক ফুটে উঠেছিল। বলেছিল,—তা হুতত দেখায় কিন্তু বহুদিন না কলিমা দিচ্ছিল। তবে শুল্কবিচারটা রপ্ত করতে পারছি ততদিন এসব বাহন হাট সে গতি নেই।

একটু গভীর হয়ে তারপর বলেছিল—সন্ধ্যার ট্রেনেমাটিরে চাপতে পারে আর সাইকেল ঢকেই দেখে। তা ছাড়া গেরুয়া দেখলেই সন্ধ্যারী নাবো কেন? ওটা সোজা ও বাঁকা দুই অর্থেই মজা। কলিমাটির একটি দিকবিশিষ্ট।

তোমায় কি ভাবতে তাই তা' মনে পাবছি না!—ঠাট্টা করে বলেছিল শ্রবীর।

ভানসারী এখনই গেরুয়া চলতে চাইছে কেন? হু'দিন সবুর করো না!—দেবরাজও বলেছিল পরিহাসের সুরে।

দেবরাজ ও শ্রবীর এমনস্তর হাফা বহুসাল করতে করতেনই সারা রাতটা। গেরুয়া। আমার ও শ্রবীরের সঙ্গে একটি বছরের সহপাঠী। হু'লে দেবরাজের সঙ্গে শ্রবীরের পরিচয়টি ঘনিষ্ঠ। শ্রবীর আর দেবরাজ এরসঙ্গে একটি কলেজে পড়েছে, আমি ছাত্র ছিলাম অন্য কলেজের। বুড়ী ও উজ্জল ছাত্র হিসেবে দেবরাজের নাম তখন শুনেছিলুম। দেখেওছিলাম দু'একটি জায়গায়। তার বেশি পরিচয় দেবরাজের সঙ্গে হয় নি।

বৃন্দাবনার হাট অন্ধকারিত গেরুয়া পোষাকে তাই তাকে চিনতে না পারা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। চিনে ফেলবার পর শ্রবীর আমায় সঙ্গে নিয়ে দেবরাজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কি চে সাধু মহাবাহু! চিনতে পারো!

দেবরাজ প্রথমটা চমকে উঠেছিল, খুশি হয়েছিল তারপর। শ্রবীর আমায় পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনজনে আলাপ করতে করতে হাটের বাইরে যাবার সময়েই দেবরাজ তার আন্তানায় যাবার প্রস্তাব নিয়ে থেকে করেছিল। শ্রবীর আপত্তি বোধ হয় করতে না। কিন্তু দে কিছু বসবার আগেই আমি সাগ্রেই উদ্ভাসিত জানিয়েছিলাম।

সাইকেল নিয়ে হাস্য-পরিহাসের পর জীপের পেছনে সেটি বেঁধে তিন জনে দীবাওয়ার জঙ্গলের দিকে রওনা হয়েছিলাম। শ্রবীরই চালক। দেবরাজ তার সঙ্গে সামনে বসেছিল। আমি বসেছিলাম ভেতরে।

অনেকদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পাওয়া দুই বছর হাফা আলাপ আলোচনা সব আমার কানে যায় নি। যে কাহিনীর আভাস মাত্র আকস্মিকভাবে আকাশভ্রমণের পথে একবার দৃষ্টিকের জগ্রে পেয়েছিলাম তার রহস্য উন্মোচনের অযোগ্য সত্যিই পাব কি না সেই কথাই আমি তখন ভাবছি। নীনার কথার যার উল্লেখ ছিল

আর আমার যাকে জানি, এই দুই দেবরাজ এক ও অভিন্ন কি না সে বিষয়ে সশয় তখনও আমার যায় নি।

এ সময় দূর কবতে হলে দেবরাজের কাছে নীনার প্রেমস্র কোনোভাবে প্রবেশ হোলা সম্ভব। কি ভাবে সেটা তুলব আর তুললেও দেবরাজ কি ভাবে তা গ্রহণ করবে, কিছুই তখনো বুঝে উঠতে পারি নি।

জঙ্গলের মধ্যে দেবরাজের নির্জন আন্তানায় ক'দিন কাটিয়ে তার গত কয়েক বছরের বাইরের ইতিহাস মোটামুটি অবগত জানতে পারলাম। তার মতামত যে সব গুজব ছড়িয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ অস্বপ্নবিশেষ নয়। বেশির ভাগ শ্রবীরের প্রেমের উত্তরেই দেবরাজ তার জীবনের কিছু কিছু কথা আমাদের কাছে বলতে দ্বিধা করলে না। ইউরোপ থেকে বেশ শীঘ্রালা গোছের একটি চাকরী নিয়েই সে যে দেশে এসেছিল এ কথা সত্য, কিছুদিন বাদে হঠাৎ প্রকরিতে ইস্তফা দিয়ে গেছে প্রায় নিরুদ্ধ হয়ে যায় এ কাহিনীও অস্বপ্ন নয়।

কিন্তু এ পাগলামির মানে কি বলতে পারো?—গভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল শ্রবীর।

দেবরাজ একটু চেমে বলেছিল,—পাগলামিই যদি বলে তা হলে তা' মানের কথা আসে না।

হাসিতামাসার কথা নয় দেবরাজ—শ্রবীরের গলায় এবার উদ্ভিন্ন বিষমস্তর—তোমার মত মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলছে এ যে আমি ভাবতেই পারি না।

চাকরীর ধাপে-ধাপে একেবারে চূড়ায় উঠে অগাধ নাম-পরহা করতে পারলে, তাকে ছিনিমিনি খেলা নিশ্চয় বলতে না।

দেবরাজের স্বরে প্রেমস্র কৌতুক ছাড়া তিক্ততার আভাস ছিল না, তবু শ্রবীর বেশ একটু অর্ধদেহের সঙ্গে বলেছিল,—তোমার সঙ্গে কথার পাঁচ খেলতে বসি নি দেবরাজ। উত্তর দিতে না চাও তা' আমায় স্পষ্ট সে কথা বলতে পারো। ছিনিমিনি খেলা আমি কেন বলেছি তা তুমি ভালো করেই বোঝো। চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল তাকে বলবার কিছু নেই কিন্তু তোমার মত মানুষের সাধনতা কি এই জঙ্গলের অজ্ঞাতবাসে? তুমি সত্যিই আধ্যাত্মিক প্রেরণায় সন্ধ্যারী হয়েছ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি সন্ধ্যারী হয়েছি তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন?—দেবরাজের স্বরটা এবার যেন একটু গাঢ়—এই গেরুয়াটা যে শ্রবীরের পাতিরে ছোপানো ভা'ত আগেরও বলেছি। এই বেশবাস এই অজ্ঞাতবাস এও একটি অদম্য অজ্ঞাতবাসের অঙ্গ মনে করো না। তোমার নেশা যেমন নূরুজ, তুমি যেমন এ দেশের বাস্তব জীবন-প্রণালীর খুঁটিনাটি জানতে উৎসুক, আমি তেমনি এদেশের মানুষ তার গহন অন্তরের জীবন কি বুঝেছে কি পেয়েছে তাই বুঝতে চাই। ভুল হোক ঠিক হোক আমার ধারণা এই যে শহরের সভ্য-ভব্য একজন হয়ে কোনো ল্যাবরেটরিতে বসে এ সন্ধান গবেষণা চালানো যায় না। তাই এই ভবনুর জীবন তাই এই গেরুয়া পোষাক। মাঝে-মাঝে এই নির্জন বাস, একথাটা বিশ্বাস করতে পারো কি?

শ্রবীর দেবরাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নাড়বে চেয়ে থেকে কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেছে।

তারপর যে কদিন যোগান ছিল শ্রবীর নাগ এ ধরনের প্রাণ আর তোলে নি।

চাকরীর সাধিনাও শ্রবীর ভাবধার ভাষা নিয়ে ফিরে গেছে। আমি কিন্তু হাই নি। দেবরাজের কাছে আসে অন্তিমটি চেষ্টা।

এখানে আর কদিন যদি থাকি, আপনাদের অস্ববিধা হবে না ত'—কথাগুলো নিজের বাক্যেই বড় কষ্টে অনিচ্ছা।

দেবরাজ কিন্তু তা বোধ হয় লক্ষ্যে করে নি। সানন্দে জানিয়েছে,—অস্ববিধা কি বলছেন? অস্ববিধা ত' আপনার। এ রকম কৃচ্ছসাধনের অনেসে নিজস্ব নেই।

অনেসে নেই বলেই ত' সানন্দেই মজা পাচ্ছি।

দেবরাজ হেসে বলেছে—আপনাকে বুঝুর নিয়ে বিবাহ করাচ্ছি বলে আপনার আত্মীয়স্বজন আপনার বদনাম না দেয়!

না সে সন্ধ্যোগ তারা পাবে না।—পরিচাসের অহেই বলেছি,—বিবাহী হবার মূহুর্তে আমার নেই!

দেবরাজ একটু যেন পতীর হয়ে বলেছে,—কার ভেতরে কি যে থাকতে পারে কেউ জানে কি!

সেদিন প্রায়দুই ঘণ্টাখানেকই শেষ হয়েছে। যে দিকে চাই প্রায়দুই। সেদিনে বোরবার একটি অযোগ্য হস্ত দেবরাজের শেষ কথাটার ছিল। কিন্তু সে সন্ধ্যোগ পাবে ভালো করে পাবার জগ্গে অপেক্ষা করাট উচিত মনে করেছি।

শ্রবীর যাবার সময় আমার আলাদা করে ডেকে ক'টা কথা বলে গিয়েছিল। সে কথাগুলোও বোলবার নয়।

শ্রবীর বলেছিল,—তুমি ক'দিন এখানে থাকছ জেনে আমি খুশি। পারলে আমিও থাকতাম। দেবরাজের বাঁপাটা মনের একটা বড়ো অস্বস্তি হয়ে রইল। পাবো ত' বোরবার চেষ্টা কোরা। তবে আমার মত তর্ক করতে গিয়ে 'ভুল' কোবো না। নিজের চারিধারের দেওয়াল ও তা' হলে আরো উঁচু করে তুলবে।

শ্রবীর কথাগুলো মনে লেগেছিল। শ্রবীর তবু আমার অঙ্গ উদ্বেগ কিছু জানে না। যা এখনো অস্বস্তি ও সশয়ের বেশি কিছু নয়, তা তাকে বলা উচিত মনে হয় নি। আমার সশয় সত্য হোক বা না হোক, দেবরাজকে জানবার ও বোরবার অঙ্গ তুগিলও কম জোরালো নয়। তার মত মানুষের এই রূপান্তরের বহুশ্রম মনকে অভিভূত করে।

দেবরাজের সঙ্গে একান্ত সহজভাবেই মেশবার চেষ্টা করলাম। তার প্রকৃতিতে যা ব্যবহারে সেদিক দিয়ে কোনাে বাধা নেই।

এক হিসেবে সে নিজের সম্বন্ধে সত্য কথাই বলেছে। সন্ধ্যাসী বলতে যা খুশি বাইরের জীবনধারণ। তা সে ঠিক নয়। নির্জনে থাকা আর পেকরা পরা ছাড়া আর কোথাও কোন মিল নেই।

নিজের কুঁচুরে ধ্যানধারণা পুজোগোছের কিছু সে করে কি না

জানতে পারি নি। বাইরে সারাদিন সে কোন না কোন একটা কাজ নিয়মই থাকে।

এখানে আসবার পূর্ব আমার ও শ্রবীরের জগ্গে আলাদা একটা বুটফের বাতাস সে করে দিচ্ছেছিল। ভাঙাচোরা হলেও সেটা বাসযোগ্য। এ রকম প্রাণতানব ত'তে পারবে মনে করে আগে থাকতেই না কি সে বুটফের বগেজমানে বেখেছে।

এই বুটফেই তাকে সেদিন বললাম,—তোমার এখানে আমাদের মত অস্বি-অজ্ঞাগত তা হলে আসে! ক'দিনের সাধিনা আর এককালে সহপাঠী হওয়ার দরুণ আপনি থেকে তুমি-অন্তরঙ্গতার ইতিমধ্যেই পৌঁছেছি।

দেবরাজ কুড়ুল দিয়ে আলানি কাঠ কাটছিল আর আমি সেগুলো বয়ে রান্নার জায়গায় গিয়ে সাজিয়ে রাখছিলাম।

কাঠ কাটা খামিমে দেবরাজ কেমন একটু অস্বস্তিভাবে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলেছে,—আসবে আশা করতে দোষ কি?

কিন্তু তোমার ত' দু'দিনের ডেথা। আজ আছ কাল নেই। হঠাৎ আমাদের মত অদর্শনের দেখা না পেলে আসতে চাইলেও কেউ ঠিকানা পাবে কি করে।

ঠিকানা যদি কেউ সত্যি চায়, তা হলে ওরকম অদর্শন ঘটতে কতক্ষণ!

সে অদর্শন সত্যিই অত তাড়াতাড়ি যে ঘটবে ভাবতে পারি নি।

পরের দিন সকালে দেবরাজ আমায় কিছু না বলে আমার ঘুম থেকে ওঠার আগেই সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে গেছিল। ঘিরে এলো ছপুসবোলা। খলিতে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে দেখলাম। আর কয়েকটা থবরের কাগজ ও একটা বই।

জিজ্ঞাসা করলাম,—এসব আবার কোথা থেকে জোগাড় করলে? জোগাড় করি নি। আমার নামে আসে। ঘরের একটা গ্রামের পোস্ট অফিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে। সেখানে জমা থাকে। আমি ছুটার একদিন গিয়ে নিয়ে আসি।

হেসে বললাম, তা'হলে একেবারে নিরুদ্দেশ তুমি মও।

না, তা আর হলো কই!—দেবরাজ একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে বললে,—তোমার কিন্তু একটু কষ্ট দেব এবার!

কি কষ্ট!—অস্বা ক হয়ে তার দিকে তাকিলাম।

না, এমন কিছু নয়। পরন্তু থেকে তোমার থাকার ব্যবস্থা আমার সঙ্গেই করব। তোমার ও ডেরাটা আর একজনকে দিতে হবে। পরন্তুই সম্ভবত এসে পৌঁছেযাবে।

কে এই অভাগত! জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করলাম।

ক্রমশ

শ্রীমানব্রহ্মচারী

এই সাপ্তাহার মাসিক বহুসমতীর প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শ্রীমানব্রহ্মচারী

# স্বাধীনতা

## আন্তোম স্বপ্নে

বাঙালীর জাতীয় চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লবের শ্রেষ্ঠসারথি হিসাবে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতে, স্বয়ং সরস্বতী বাঁহাব নামের সহিত আপন নামটি সানন্দে যোগ করিয়া দিয়াছেন বাঙালীর বিপ্লবচর্চা সন্তান, স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দেশবরেণ্য অগ্রনৃত 'বাঙালীর বাম' আন্তোম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ চম্পকতাব্যবহার পুণ্যলগ্নে তাঁহার অবিদ্যাবাহী কবাবলী নতুন করিয়া স্রবণ করিবার সময় আজ দুয়ারে সমাগত।

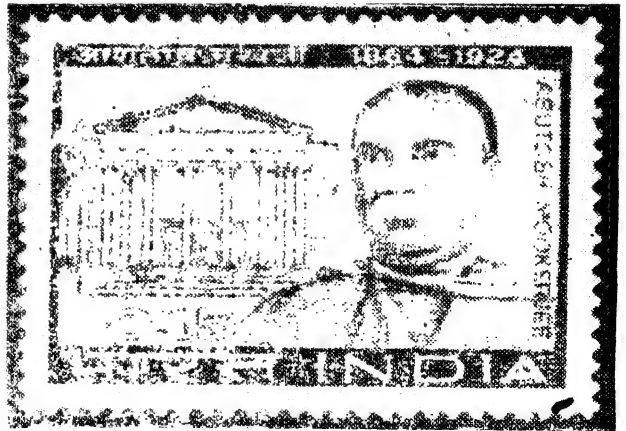
তাঁহার জন্মের সাত বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটিলেও তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা আন্তোম। আন্তোমের স্পর্শে 'তাতা' যে শুধু প্রাণ পাইল তাতা নয়, সর্গাশে কাণায় কাণায় ভরপুর হইয়া উঠিল এবং শুধু স্বদেশেই নয় জগতের শিক্ষাক্ষেত্র ও গণজিন-সমাজে শিক্ষাকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ লক্ষ্য ও স্বাকৃতির আসন লাভ করিল।

শিক্ষার বিপ্লুতি, প্রচার ও ব্যাপকতা ছাড়া জাতির উন্নতির আশা নাই এবং শিক্ষাই জীবন—এই বিশদ এবং শাশ্বত সত্যটি আন্তোমের দ্বারা মর্ম মর্ম অনুভূত হইয়াছিল—বিশ্বের স্রষ্টাজনসমাজেই শুধু নয় সাধারণ মানবসমাজেও স্বদেশের ভাববাবা ও অন্তরের বাণী প্রবাহের জগা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন সেদিনকার পরাদীন ভারতের ব্যাঘ্রের সহিত তুলনীয় নাগরিক আন্তোম মুখোপাধ্যায়। জগতের কল্যাণ দেশের তুলনায় বাঙলা দেশের শিক্ষার মান যে নগণ্য নয়—ইহাই প্রতিপাদন করা ছিল তাঁহার জীবনের সারস্বত। সেই স্বপ্ন সফল করিয়া তোলার সাধনাই তাঁহার গৌরবদৃষ্ট জীবনের অপরূপ ইতিহাস। বৃটিশ শাসিত হইলেও, রাজনীতির দিক দিয়া পরশ্যামের অধীন হইলেও শিক্ষা-নীতির দিক দিয়া বাঙালীর গুজ্জল্য সম্বন্ধে বিশ্বব্যাপী সচেতন করিয়া তোলার মধ্যে আন্তোমের যে গভীর দেশপ্রেম এবং স্বাভাবিক চিন্তা পরিস্ফুট হয় তাহার গুরুত্ব অনুল্লভ্য নয়।

বাঙলা দেশের শিক্ষানায়ক বলিতে তিনটি নাম প্রথমেই উল্লেখনীয়—পূণ্যলোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এবং শিক্ষাচর্চা আন্তোম। ধারা ও পথে পার্থক্য থাকিলেও লক্ষ্যে একই, সে বিষয়েও কোনপ্রকার মতদ্বৈততা অবকাশ নাই। শিক্ষা যে জাতির প্রাণ—এই পূণ্যমন্ত্রে সারা বাঙালী আন্তোমের নিকট যে নীক্ষালাভ করিল, তাহাই তাহার জীবনপ্রকাশের প্রোতোমুখ খুলিয়া দিল।

বস্তুত আন্তোমের নায়কত্বে দেশের শিক্ষাজগতে যে ব্যাপকভাবে আলোড়ন আসিল, তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিশ্বজ্ঞানীয় সর্বতোভাবে লাভ্যময়ী ও শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অভিনব কর্মশক্তি দ্বারা দেশের বাইরে দেশের যে অনুপম আলো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, সে সম্বন্ধে বাঙালীর অন্তরে আজ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া স্থান নাই।

আন্তোম ছিলেন এক জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। এক অক্ষুণ্ণ শক্তি আঁকর। সত্য, ধার ও নীতিতে প্রতিষ্ঠিত এক বিবেক পরিচালিত উজ্জল ব্যক্তিত্ব তিনি। অজ্ঞায়, দুর্নীতির সহিত তাঁহার বৈরিতা চিরদিনের, যেখানে তিনি সন্তোর অবমাননা, বিবেকের শৃঙ্খতা, নীতির ভাঙতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেইখানেই তদুত্তরে পন্থিত হইয়াছে সেই নিত্যবল্ল পুরুষের কণুকণের প্রতিবাদ। আদর্শমিষ্ট আন্তোমকে বারেকের তরেও স্বীয় আদর্শ হইতে কোন প্রতিবন্ধকতা কি কোন শক্তি বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আন্তোমের নিকট সর্গাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাদৃশ্য ছিল জনকল্যাণ। জনকল্যাণের হিসাবে যাত্রা কেবলপে প্রকটিত হইয়াছে তাঁহার বিবেচনায় তাহার রূপদানে তিনি কোনদিন পশ্চাৎপদ হন নাই। অমিতব্যয়ের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আন্তোম তাঁহার বিবেক এবং গায়নিষ্ঠার উপরে কাঠকেও স্থান দিতে বাজী নন। রাজশক্তি বাগধার তাঁহার শক্তি খণ্ড করার অপচেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রতিবাদই এই তেজোদৃশ্য ব্রাহ্মণ



এর আন্তোম জগদ্রথবাসিনী ডাকটিকিট। আন্তোমের প্রতিষ্ঠিত পাশে তাঁহার প্রদান কর্মক্ষেত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমানিত সিনেট হল।

সম্প্রদায়ের শক্তির তেজে নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ইংরাজ সরকার মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদের অভিক্রি অমুখায়া চলিবার লোক আন্তোতায় নন, বুঝিয়াছিলেন কি প্রলোভন, কি ভীতি-প্রদর্শন জনকস্যাণে উদ্ভূত আন্তোতায়কে তাঁহার পথ হইতে টলাইতে পারে না, বুঝিয়াছিলেন আন্তোতায় তাঁহাদের দ্বারা চিরদিনই অপরাধেয়।

শুধু শিক্ষাবিস্তার বলিলে সম্পূর্ণ হয় না—মাতৃভাষার মহৎ মর্যাদা দান, খ্যাতি ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে তাহার প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সুগভীর অমুখীলনের সূচনা ঘটানো তাঁহার জীবনের মুখ্যতম কীর্তি। শুধু শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ইতিহাসেই নয়, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তিনি এক অবিচ্ছেদ্য চরিত্র। তাঁহার জীবনতিহাস পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহার জীবনে কলা ও বিজ্ঞানের এক অদ্বৈত সমাবেশ ঘটিয়াছিল। বাঙালার প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্নয়নে এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে জ্ঞানবিস্তারে তাঁহার অবদানও সর্বশেষ অস্বীকার্য। দেশীয় বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিয়া আগ্রহ তাঁহার কম ছিল না। বিজ্ঞানের জটিল ও দুর্বহ তত্ত্বগুলিকে সাধারণের উপযোগী প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়া তোলার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী। সর্বোপরি বিজ্ঞানকে বসান্ধিত করিয়া তোলার দিকেও তাঁহার যত্নের অন্ত ছিল না। আবার তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে দেখা যায় প্রতি ছাত্র তাঁহার বিজ্ঞানীমন ছায়া ফেলিতেছে, আশান বজ্রাকারে নিছক উচ্ছ্বাসদ্বর্ষ করিয়া তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই এবং তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রীতিমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে।

আন্তোতায়ের জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক জীব্যব্যক্তিকে তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদাদান। পশ্চতীকালের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করিবে। তাঁহাদের জীবনীর মাধ্যমে জ্ঞান

যায় যে, তাঁহাদের জীবনের বোধনলব্ধ গুরুত্বানী আন্তোতায় তাঁহাদিগকে বিশ্ববিজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া সেই কৃতবিজ্ঞপুংগবের জীবনের প্রসিদ্ধি পথ করিয়া দিয়াছিলেন। মালাকর যেমন এক একটা ফুল একটি নিটোল মালা গাঁথেন, আন্তোতায়ও তেমনই এক একটা শক্তিমান তরুণকণা উজ্জ্বল মণি-মণিকোর সমন্বয়ে বিশ্ববিজ্ঞানের ঐশ্বর্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আজ জাতির যেকোনো ভাঙিয়া পড়িতেছে, তাহার কারণও অজানা নয়। জাতির চরিত্রের দৃঢ়তাও ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাউতেছে। জীবনের নিদিষ্ট লক্ষ্য আজ সর্ব ব্যক্তিগত স্বার্থদান। শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যাউতেছে—সবখানে অবযোগ্যতা এবং অক্ষমতার মিছিল চলিতেছে। দুর্নীতির বিদ্যাপাশে সেই আলোময় জীবন আজ তমসাক্ষর। তত্পরি সাবাদপত্রগুলিতেই তাহার মানের ক্রমাবনতি বিশেষ করিয়া দৃষ্ট আকষণ করিবে। পাঠ্য পুস্তকে পর্যন্ত প্রমাণ ভ্রান্তিও আমাদের দৃষ্ট এড়াইয়া যাউতে পারে না। আন্তোতায় যেসকল বিষয় দেশের গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া এক নূতন চেহারা সজ্জা করিয়াছেন, তাঁহার লোকান্তরে চলিশ বৎসর অশ্রদ্ধা হইতে না হইতেই সে সকল বিষয়ে বড় ভয়াবহ দুর্নীতি এবং বিপজ্জনক অবস্থা সভ্যবর্তী অন্তরে নির্দোষ বৈদ্যের কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসে। সেই জঘন্য পুস্তকমিত আন্তোতায় প্রমুখ দেশের প্রান্তঃসরীয় সম্ভ্রান্ত দর ভাববারা, আদর্শ অনুসরণ করা ছাড়া আজ এত জাতীয় ভ্রমোৎসর্গের হাত কটীত রক্ষা পাউবার ভিত্তি পথ নাই। আন্তোতায়ের আদর্শ, স্বপ্ন ও মুগ্ধের পথপ্রদর্শনীর সমাজকে, গুলকে পরিপূর্ণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার ভ্রমোৎসর্গ হইবার শক্তি দিক ও জাতিকে নতুন করিয়া পুনরায় সত্যক্ষেপে ভ্রমোৎসর্গ করিয়া তুলুন—তাঁহার ক্রমশঃতথ্যবিশিষ্ট ইংরেজ পুণ্ড্রব্রী উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাগুলি নিবেদন করিবে—এই কবনই জগৎবীর সাহসে বাক্য করি।

## শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি

সেই সর্বাংশা ভৃঙ্কর দিনগুলিরই ভয়াল পদধ্বনি কি আবার কর্ণসোচর হইতেছে? সর্বাংশা বাঙালী দেশের বুকে ছিটাকরের মস্তস্তরের পক্ষাশের ছলিকের কি আবার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে চলিয়াছে কলিকাতার বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতি বারবার এই প্রশ্নই আমাদের যুগপৎ শঙ্কিত ও ক্লিষ্ট। অন্তর্যক পরিপূর্ণ অবিকার করিয়া চলিতেছে।

প্রত্যাহের সাবাদপত্র রাত্রির অবসানে বিখর দিক দিগন্তের বাবতা যেমনই আমাদের গুণগুণকোণে বহন করিয়া আসে বর্তমানে তেমনই আনিতেছে নিত্য বাজ-ভ্রমোৎসর্গের হুমসাদ। বাজার এবং দোকানগুলি যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত, অগণিত ফুটন্ত আশ্রয় চৌকী এবং অর্থের বিনিময়ে স্তমিতেছে কেবল এক দুঃসং 'মিঠি, মাই' ক্ষানি। চাল মংস, তৈল এই অশু প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি যন কলকথার অপরূপবস্ত্রত পণ্ডিত, কিলস খাদ্যগুলি বাজার অমুপস্থিত হইলে জনসাধারণকে বুঝ একটা অপ্রবিনার পড়িতে হয় না, কিন্তু যে খজ ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব তাহার দুঃপ্রাপ্যতার হুঁচকি কল্পনাভীত, ভোগের পরিহাসে কলিকাতার অধিবাসীদের আজ সেই হুঁচকির মতোই কাল অতিক্রম করিতে হইতেছে।

কলিকাতার যতদূর জানা যায়, বেশন কার্ড চালু আউ হেয়ার্ট সঙ্ক তিরিশ হাজার, অথচ সরকারের ব্যবস্থা আছে আশি লক্ষ লোকের মত—অতএব অর্থের বেশি লোকদের অবস্থা অমুমেয়।

চালের দর নির্বাহিত, সেই মতো বিক্রয় করিলে যাত্রা বিক্রয় করেন তাঁহাদের পড়ন্তায় পোষায় না এই মর্মে তাঁহারাও অকুণোলা করিয়াছেন।

উড়িয়া হইতে চাল আমদানির ব্যবস্থা হইলেও তাহা সার্থকতার উপনীত হইতে পারে না। কারণ উড়িয়ার চাল ও কালের বাসিন্দাদের উপযোগী নয়, সেই কারণে এ চাল তাহার চাহিদা কমই থাকিবে।

অনেকেই মনে এসকেন্দে দেখা দিয়াছে যে, এই অলাব প্রক্রিয়া মুনাফাবোরেলা নিকোদের স্বার্থসিদ্ধি এবং পকেটপ্লির ভক্ত হইে অজার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতগুলি মতাব দর দৈনন্দিন বাজারে হইয়া যাত্রা ছিনিমিনি খেলিতে পারেন তাঁহাদের পিনাচ এবং পস্ত বলিলেও অস্বাস্থ্য হয় না। শত শত শিশুর মৃত্যুর আবুলা বন্দনে, শত শত নরনারীর একমুঠা অংগর জ্বল আকাশধাবা তাহাকারের মধ্যে হাঁহাদের স্বার্থসাধনের জুপ নিম্নম হাঙ্গি, দানবীর উল্লাস এবং ও অমার কোন মতিমন্ত বিগ্রহক্ষণও আদর্শচ্যুত করার অমতা রাখে।

আমাদের বর্তমানকালের জীবনধারণে জ্বালার অন্ত নাই। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পথচারিণি বিষয় শিখায় সাধারণতঃ জ্বাল। জ্বালার সেতু দিয়া জীবনচরী অতিক্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু ভ্রমের জ্বাল। যে সাধারণতঃ মনোভিত্তিক সে যথেষ্ট অধিক ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন। শত সংগ্রহ প্রাচীনক ডায়াল, রাজনৈতিক

বিপন্নর জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে তাহার উপর প্রত্যাহার দুইবেলায় 'দুখু'রী অন' হইতেও যদি আমাদের বঞ্চিত হইতে হয় তাহা হইলে জীবনধারণ যে একেবারেই অসম্ভব সে কথাটি যে কোন একটি বাসকের নিকটও জন্মের মতই বন্ধ ।

অতঃপর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখা যায় যে, এই বাঙলা দেশ শুধু তাহার সম্ভাবনাবেরই নয়, তাহাদের প্রয়োজন কড়ারগড়ায় মিটাইয়াও উৎপন্ন শস্য—প্রাক্তনের দ্বারা বাহিরের বহু নর-নারীর ক্ষুধার নিরসন ঘটাইয়াছে । বাঙলা দেশের ধাক্কা কত অব্যাহতীয় যে রসনা পবিত্র হইয়াছে তাহার তুলনা মেলে না । বাঙলা দেশের দিগন্তস্থিত সেনালী ধানের শোভা কত পথিককে যে আকর্ষণ করিত তাহাই বা তুলনা কোথায় ? বহিঃপ্রদেশের অমর লেখনীতে বাঙলা দেশ 'সুজলা', সুকলা, মলয়চ শতলা, শতজামলা', স্বীকৃতনাথের ধানদুগ্ধ ঘোষণায় 'চিরকলাগময়ী তুমি দয়্য, দেশ-বিশেষে বিতরিচ্ছ অন্ন' দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনবাগ্যে পুংসকরা' রাজস্বানের তথা ভারতের সামগ্রিক পরিভ্রমিতে প্রয়োগ করা হইলেও মূলত তাহা বাঙলা দেশের উদ্দেশ্যই লিখিত ইহা বৃদ্ধিতে দেশপ্রেমিকার করিতে হয় না । আর আজ ? দেখি বাঙলা দেশের একি ভয়াবহ অবস্থা ? তবু যদি এই দুঃখের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে বেদনা থাকিলেও অভিযোগ থাকিত না, অবস্থা যতই আশঙ্করূপ না হউক, তবু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে উৎপাদনের দিকে বাঙলা দেশ পূর্ব অনগ্রসর নয় তথ্য তাহার ঘরে ঘরে আজ উপবাসের হস্তাকার । সাময়িকভাবে এই দুঃখ পঙ্কতিতে পূর্বোক্ত নরপিশাচগণের স্বার্থসিদ্ধ হইলেও ইহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ সে সহজে ভাবিয়া কুসকিনারা পাওয়া যায় না । ইতিহাসের সহিত বাঁচাদের

কিছুটা পরিচয়ও আছে তাহারও স্বীকার করিলে যে, অন্নভাব যখনই কোন দেশে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়াছে তখনই সেখানে আবির্ভাব হইয়াছে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক বিপদগত । অন্নের অভাব শেষে পরিণত হইয়াছে শাস্তির অভাবে । ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ তাহার সর্বপ্রকার বুদ্ধি, বিচার হারাইয়া কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে । কোনপ্রকার মুক্তিহীন তাহাদের প্রভাবিত করিতে পারে না । প্রবাদকার অন্নচিন্তায় মহাকবি কালিদাসকেও বুদ্ধিহারা করিয়া ছাড়িয়াছেন—কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় তাহার ক্রিয়াকলাপ-গুলিও দেশ ও জাতির পক্ষে এক বিপজ্জনক মূর্তিতে দেখা দেয় । এক্ষুণ্ণে অন্নের প্রয়োজন অধিকাংশ মানুষকেই বহুতর অজ্ঞার কার্য করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে । অন্যতরুনা অনাবের তাড়না মানুষের মন হইতে তাহার বিবেক, নীতি, জায়সম্মত নির্বাসিত করিয়া দেয়—ফলত জাতীয়জীবন এক মর্মানশা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় । বিদেশী শত্রুতা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় থাকে বাণীর কলে দেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হয় ।

আশার কথা, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী হরলালজীলাল নন্দ ও খাজমন্ত্রী শ্রী সি সুরজলাগিরম এই বিপদে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে আশঙ্কিত এবং অভিনন্দনীয় । চোরাবাজারীদের বঠোর হস্তে দমন করার এবং তাহাদের শাস্তিবিধানের যে সমস্ত তাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সাফল্যলাভ করিয়া এই ভয়ঙ্কর অবস্থা অবসান ঘটাক সেই কামনাটী আমরা সর্বাঙ্গকরণে করিতেছি । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই ঘোর দুঃখের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন দেশবাসীর তাহা ভিজ্ঞাসা করিবাম অধিকার যে আছে আশা করি রাজা সরকার তাহা বিস্তৃত হইতে পারেন না ।

## জয়ন্তু নারলিকার

বাঁচাদের প্রাতিভার রশ্মি সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া দেশজনের গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে ভারতের সেই মুখোজ্জ্বলকারী সম্ভাবনাদের তালিকায আরও একটি নাম যুক্ত হইল । ছাপিশ বৎসর বয়সে মরণ বিজ্ঞানী জয়ন্তু বিষ্ণু নারলিকার সেই সমাদৃত নাম ।

কিছুদিন পূর্বেও এই নামটি ছিল সাধারণ সম্পূর্ণ অপরচিত আজ শ্রী নামটি শুধু পরিচিত নয় ভৌগোলিক ব্যবহারে বৃহৎ অস্বীকার করিয়া পৃথিবীর দিক হইতে দিগন্তের, দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত প্রসারিত হইয়া ভারত-জনমীর মহিমাবাক্তন করিতেছে ।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভগত সমাজে ভারতের ঐতিহ্য ও মহাদা আজ বীহার দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল । তৎকাল-বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তুর মাপকাঠিও আপেক্ষিকতায় বর্তমান জগতের অত্যন্তম বিজ্ঞানগুরু আইনস্টাইনকে তিনি চাঁ জ করিয়া বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন আনিয়াছেন ।

জীবনচক্র, সত্যসন্দর্ভ, মেঘনাদ, শিশিপুত্র, রামায়ণ, রামন, ভাবা প্রভৃতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাধনায় বিংশ শতক সমৃদ্ধ সেই বিশ্বব্যাপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানসাহকদের আলোকা নারলিকার বৃদ্ধি করিলেন । ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-মহাবীহীন ইতিহাস যেমনই বিচিত্র, তেমনই গৌরবোজ্জ্বল । পাটগণিত, বীজগণিত ভারতের স্বষ্টি । যে শুল্কবাদ ও

দশমিক বস্তুক ভিত্তি করিয়া বর্তমান গণিত রূপ লইয়াছে তাহারও তম ভারতই দিয়াছে । আগস্ট, ব্রহ্মসংস্কৃত, ভাষ্যগাচ্য প্রমুখ বিপন্ন যুগের গণিতাচার্যদের সাধনা আজও অক্ষয়বীর্য দীপিতে ইতিহাসে উজ্জ্বল ।

নারাদিক দিয়া ভারত আজ অজস্র দুর্দশা ও সমস্যার সম্মুখীন হইলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার তপত্তা যে অস্বাভাবিক অপ্রতিহত তাহার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে ইহা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার । শুধু তাহাই নয়, বাখা, বেদনা ও দুঃখে ভাষ্যজ্ঞান ভারতের নর-নারীর দ্বয়ে নারলিকারের এই বিজয়বাহী যে কতখানি উদীপনা ও শক্তি জোগাইবে তাহাও অল্পভব্যপক্ষে । দীপকাল পরে ভারতের এই নবলব্ধ জয়ে প্রত্যেকটি ভারতবাসীরই সমান আশা, জয়স্বামী তাহার বরমালা নারলিকারকে উপলব্ধ করিয়া সমগ্র ভারতের বর্গেই পরাইয়া দিয়াছেন তাই নারলিকারের জন্ম আমাদের গর্ব ও গৌরবের অন্তর্ভুক্ত নাই ।

ভারতের যে সকল অস্বাভাবিক স্তবাকাক্ষী রাষ্ট্রসম্মত পৃথিবীর দেশে দেশে ভারতের নাম অজস্র কুন্দা বাইয়া তুলিতে কল্ল, সে ক্ষেত্রে ভারতের এই বিজয়-বৈজয়ন্তী তাহাদের মনে অবশ্য ঐ প্রতিক্রমের সকার করিবে তাহা বুদ্ধিজীবী মহলে সহজেই অনুমেয় । ●

ভারতবর্ষে বর্তমানের শিল্পাভিমানের প্রাধান্যের কারণ হইতে মুখোন্মত্ত করিয়াছে। স্বাধীন ভারত ভাঙা জগতের একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত। বহির্গত, শিক্ষা-নৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের দৃষ্টিতে একটি প্রথমে শ্রেণীর দেশমণ্ডলী ভারতের অধিকাংশ মুক্ত চিনিমণ্ডলী ছিল, রাজনৈতিক অধীনতা সেই অঙ্গন হইতে হঠাৎকৈ কোন প্রকারে টলাইতে পারে নাহি। অসংখ্য প্রাচীনিক ও ঐতিহাসিক শত দুর্ভাগ্যে ভারতের জনন-বিজ্ঞানের চর্চা যে ক্রমশই উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া চলিয়াছে ন্যায়িক কারণে সাধনায় তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল, বর্তমানের স্বাধীন ভারতের অনেক পরিকল্পনা, দেশের স্বাধীন জীবনিক জগৎ বড় কবি এখনও তাহার আশ্রয়। সেই সকল পরিকল্পনা কথায়কথায় কল্প চাই অসংখ্য কর্মী, অনেক গুলী, অগণিত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। নারিকতার প্রথম বক্তা কীর্ত্তিমান ভারতবর্ষস্থান যে ভারতের বাহ্যিক পৃথিবীর নানাপ্রাণ

পৰিবেশে আমৰা শৈশৱকালৰকৈ সামাজিক আনন্দনয়ন কৰাৰ  
কৰিয়া উঠোৱা দোচাবান কমিনা কৰি। বিয়াৰ সাধনা কৰিছোঁ নাই  
ঐতিহ্য ও পোৱাৰ আৱৰণ বজহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ বিৰক্ষণৰ দ্বাৰা  
বিষয়বিশ্বাস। ইতিহাসৰ মাজিৰাৰ সাধনাৰ কাৰণে ইতিহাস কৰিছোঁ  
ৰাষ্ট্ৰক, আমাদেৱ এক জাতিৰকৈ। ইতিহাসৰ সাধনা কৰিছোঁ  
এই বিশ্বাস কমিনাৰ দ্বাৰা কৰিছোঁ আমাৰ কৰিছোঁ

বিনয়ভোষ ভট্টাচার্য

যশীন্দ্রবিনয় চৌধুরী

সম্পদ কল্যাণের প্রাণ্ডিন অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্ট সন্তুহৃত পণ্ডিত  
জীবী হস্তাক্ষিপমল চৌধুরী তাঁর ২৬তম জন্মদিন ৫৫ বছর বয়সে  
লোকান্তরিত হয়েছেন। সন্তুহৃত ভাষা ও সাহিত্যের কুশলীসহ  
যেটি জগদগণের মনো সন্তুহৃত ভাষার প্রসায়ে তাঁর সান্না  
বরণে উল্লাসের দাবীকার। লখনু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি কিছুকাল  
সন্তুহৃত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কলেজে  
সন্তুহৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের আসনও তাঁর দ্বারা কল্পিত। লেডী  
লোকোবর্গ কলেজের প্রিন্সিপাল (এ ডি) মাহেদী তাঁর প্রামাণ্য সচিবনি।

অধিকারত বা বাবিশ্বাদর ডাঃ সতীনাথ বাগচী গত ১৮ই আষাঢ়  
৫৬ বছর বয়সে শেখনিশাস লাগা করেছেন। আর জিক  
মেডিক্যাল কলেজে প্রতীবিজ্ঞা ও ক্রীড়াগে সফল অধ্যাপক  
পাঠ্যলেকের বদে ইহত জ্বরার নেওয়ার পূর্ব ঐ কলেজে তৎকাল  
এমারিতাস অধ্যাপকতাপে তিনি সফলিত হন। পাশ্চাত্যর সুর শ্রোক-  
গাতক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণাপ্রাচ্যমানর পরিশুদ্ধ উপাদেষ্টী ও  
কালিকালার মেডিকাল জার্নাল-এর সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁর দ্বারা  
সম্পূর্ণর পালিত হয়েছ।

শ্রদ্ধা বিদ্যুৎস্রোত কটোয়ালের গতি ২৫ই আগস্ট ৩০ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘোষণা করেন। কেশোর থেকে তাঁর কাব্যসংগ্রহ 'সুন্দা'। নন্দার মুদ্রণালয় পুস্তক তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রকাশনা করে। পুস্তকটি কবিতা ছাড়া উপকথা ও গল্পের মাধ্যমে তাঁর শাস্তির নির্দেশন প্রকাশ করেছে। কলকাতা হাইব্রিডের জার্নালিস্টিক রেকর্ডিং (জার্নালিস্ট সাইড) এর পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

দ্বিষাপতির স্বর্গত রাজা প্রমোদনাথ বায়ের ১৬৬মিণী রানী  
শিউজাকুমারী রায় গত ১০ই আগস্ট ৮৬ বছর বয়সে গতানু হয়েছেন।

কামার মণি বুড়িবিভাগের প্রাক্তন পরিচালক, রায়বাহাদুর  
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সাহিত্যিক, বৈষ্ণব চন্দ্র বসু বয়েসে উল্লেখ্য ত্যাগ  
করেছেন। জামাইরকা বোকা এম-এস-এ দ্বিগুণ তত্ত্ব করে এ  
দেশের বুড়িবিভাগে যোগদান করেন ও হলকালের মধ্যেই যথেষ্ট  
লম্বা সময় পরেই চিহ্নিত সমাধি দেন। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস  
কমিশনের টেকনিক্যাল গ্যাডভাইসার ও ব্রাহ্মকল্যাণাল গ্যাডভাইসারি  
পোর্টফোলিও সনস্করণেও তিনি প্রবৃত্তি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।  
শিল্পের দীর্ঘমুখী মিশন ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব  
কামার মণি সারা জীবন হতে।

বিশেষতঃ জাতিভেদে বর্ণভেদে। বাল্যশিক্ষারই মূলমন্ত্র। সশ্রমশক্তি  
সংগঠন। বড় বয়সেও শ্রম বর্ধক জোড়। বিদ্যোদান ঘটেছে। ইনি  
স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বের অজিত জ্যোতিঃ ছিলাম।

[ दि वसुधैव कुटुम्बकम् ]

# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকাসমালোচনা

সম্পাদক মহাশয়, পত্রিকাতেই বসেছি। আমার চাকরির প্রাপ্ত  
করুন। অনেকদিন পরে পত্রিকাতে বসেছি। আমার এই চিঠি।  
নতুন বছরের 'মাসিক বসন্তমতী' পত্রিকা আমার পিঠিতে। আমি  
এ পত্রিকা দেখে কাঁদতে উঠেছি। আমি তার প্রকাশের  
না করে থাকতে পারতাম না। অতীতের শীত ছাড়াও আমি  
করে নেবেন। এখন শুধু কথায় বাতালী সজ্জিত পারক।  
বাতক বলেই আমার প্রিয় পত্রিকা 'মাসিক বসন্তমতী'কেই  
সত্যিকথা বলতে কি—এই পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রারম্ভিক  
পত্রিকাহলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈশাখ মাসের (১৩৭১) মাসিক বসন্তমতীর  
প্রচ্ছদপটটি হয়েছে অদ্বী। বিশ্ববাস অমূল্য চিত্রখানি পরিবেশন  
করে আপন সত্যিই সমগ্র বাংলা দেশের দৃষ্টিমানসে হুঁয়েছেন।  
আপনার পত্রিকা মনোহর সুলভ। আমি আপনাকে বহুবার  
অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে অনুরোধগুলি বক্ষা করেছেন দেখে  
আপনাকে জানাচ্ছি আমার প্রাণের অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা  
সুভেচ্ছা। মাসিক বসন্তমতীর পাতায় নারায়ণাবাবুর জীবনী জানলাম,  
কিন্তু কৈ আপনার জীবনী তো পেলাম না? সত্যিই প্রাণত্যাগবশত,  
আপনার 'পদ্মাবতী' অপুর হয়েছেন। আপনি অতীতের চরিত্র এত  
সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন যেন মনে হয় চোখের সামনে দেখতে  
পাচ্ছি এক নির্দোষতা-প্রাপ্ত নারীক। এরনার জগৎ আপনাকে  
জানাচ্ছি আমার অভিনন্দন। আমি আপনার পত্রিকার অতি পুণ্য  
গ্রাহক। কবে যে গ্রাহক হয়েছিলাম—সেই স্বপ্নটুকু যেন আমার কাছে  
চির প্রচ্ছলিত হয়ে থাকবে। এখন মাসিক বসন্তমতীর সাথে এক হয়ে  
মিশে গেছি। মাসিক বসন্তমতীর উন্নতি আমার মনে কাগ্যে জানামের  
সম্পন্ন। সত্যিই সম্পাদক মহাশয় অদ্বী আপনার পরিচয়,  
বলিষ্ঠ আপনার সম্পাদনা, সার্থক আপনার ক্রম। সত্যিই সববিধ  
মিলিয়ে বলতে গেলে—কাঁবর কথা, 'ঠিক একটি গানের মত।' বাক  
এবার মাসিক বসন্তমতীর উন্নতিবাক্য ছাড়াও কিছু লিখছি। প্রথম  
করা না করা আপনার মত লিখকের হাতেই তুলে দিলাম।  
প্রথমত মাসিক বসন্তমতীর প্রাচুর্য ছড়িয়ে আছে সমগ্র বাংলা। তারা  
এই পত্রিকার মাধ্যমেই চিনতে পারে, জানতে পারে বাঙালীকে ও  
বাঙালী সম্প্রদায়কে। মাসিক বসন্তমতী সেই বর্তমানে নিজেকে নিয়োজিত  
করেছে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞ আমি একটি মন্তব্য দিচ্ছি। অতীত  
সম্পাদক মহাশয়, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালীর দমন কর্মী। আমার  
অনেকের নামই জানি বীরা অসামান্য বীর্য প্রকাশ করেছেন। এই  
স্বাধীনতা যুদ্ধে। বিজ্ঞ এমনও কেঁদেছে অতীতের বাবা  
সবার অলঙ্কারে এমনি-সেইভাবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের জীবনী কি  
আমাদের জানা উচিত নয়? আর তাঁদের বিয়ত জানতে হবে  
জানাতে হবে এই দরকার বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার মাধ্যমেই। পরোক্ষ

এ বাংলা আপনাদের মত সম্পাদকের দায়িত্ব বহু। আমার  
মা মৃত্যুর পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতার পরিত্য  
নির্ভরিতা, যা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। বসন্তমতীর পুষ্টি-  
সুখায়ত্ত্ব, যখন তিনি এই বিশ্বাস করতেন যে নেতাজী  
জানতেন এমন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দিন কিসাবে সমস্ত সোনার  
গহনা, রত্ন নিয়েছিলেন বা অতীতের মনে হয় যেন কপকপ শুনি।  
মরতমের তেঁ আর বসন্তমতী হয়েছেন। তাঁদের অসাদারণ বীরত্বের  
কাহিনী আমাদের অজানা হয়েছে। তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার  
জগৎ আপনাদের জন্য পাঠ্যে প্রস্তুত হ'ল। সব শেষ মাসিক বসন্তমতীর  
মহাদীর্ঘ উন্নতি। কামনা করছি। 'মাসিক বসন্তমতী' বিভাগটি সুলভ।  
পড়তে চান অতীতের পুষ্টি, আপনার জীবনী। সবশেষে  
ভাষাভাষা ব্যক্তিগত আর্থিক সমস্যা ছড়িয়ে পড়ুক 'মাসিক বসন্তমতী'  
সমগ্র বিশ্বে। পড়ুক বিশ্বের হয়ে যাবে দৃষ্টিভঙ্গি। বহুদূর থেকে  
আমার সমস্ত অভিবাদনা যুক্ত করে দিলাম আপনাদের শুভকামনার  
সাথে। 'ভক্ত বসন্তমতী'। ইতি—ভূমির বন্দোপাধ্যায়। মজলিস,  
টি, ই. পো—তহিয়া, ডারান, অসাম।

মহাশয়, আপনাদের গত কার্তিক মাসের (১৩৭০) মাসিক  
বসন্তমতীর ১০০ পৃষ্ঠায় 'নেতাজীবন' উল্লেখ করিয়া 'বিশ্বকোষ' নামে  
উপস্থাপনের মাধ্যমে অঙ্কিত বাঙালী বীর 'মা বাজীর নাম—  
নেতাজীবনের দেবদেব পরিবেশিত হওয়া'—একটি বিশেষরূপেই  
অঙ্কিত হয়ে মনে অব্যাহত প্রাপ্ত হইয়াছে। 'নেতাজীবন' সম্বন্ধে  
অনেক পুস্তক আছে এবং অনাবর্তী অনেক কিছু লিখা থাকেন।  
বিজ্ঞ যে মহাশক্তি আত্মবিশ্বাসমত আত্মশক্তি—দশমহাবিজ্ঞার  
প্রমাণবিজ্ঞা, যিনি বিশ্বমাতৃ সত্যকবিতা আবার মহাকালভয়হরণী,  
বসন্তমতী, হ'ল। মহাপাতাল ছাড়িয়াও যিনি বিভাজমান, কোন  
কসীম অধর বাহরকাণী কোন মৌল্যহরী তাঁকে আধরিত করিতে  
পারে না বসন্তমতী তাঁকে 'নিগধরী' নামে পরিচয়িত করা হইয়াছে।  
যিনি নিরাকার হইয়াও বহুদূর বহুদূর ভক্তসন্তানের তহুই সাকার  
ধারণ করিয়া সত্য হইয়া থাকেন—তাঁহার দীর্ঘ সাধক কমলাকান্ত,  
বামপ্রসাদ, রামদেব, বামপ্রসাদ, ও বৈষ্ণবস্বামী জীবনীতেই পাওয়া  
যায়।

ভূমি মহাশক্তি সমালোচক

সন্তান করে ভূমি মা সাকার।

বিশেষতঃ মাসিকের মতকালকাল গানিত আছে—

বিশ্ব মাত্রেয় দণ্ড দণ্ডন।

মা আমার তহি দিগবন্দ।

যিনি সীমা ও অসীমের বাহিরে যিনি 'দিগন্তানা বা দিগন্তানা'

বলিয়াই তাঁতাকে নগ্নতাবাদের দেবী বলিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে ইহা কিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক ? ইহা কোন অতি আধুনিক হিন্দুও স্বীকার করিতে পারেন না । বিজ্ঞ শাস্ত্র হিন্দুর অভীষ্ট দেবী 'মা কালীকে' লইয়া যজ্ঞভ্রমত 'নগ্নতাবাদের দেবী' বলিয়া কোনও উপক্রাসে সন্নিবেশিত করিতে পারেন না । ইহা অতি বিগর্হিত ও বলপূর্ণ মনের বদর্শ্য যৌন-আবেদনমূলক প্রকাশন চাড়া আর কিছুই নহে । আর বেশি কি লিখিব ? আশা করি আপনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন এবং ভজিত রামচৌধুরীকে তাঁহার লিখিত 'কিংবদন্তি রাণিণী' (১২) বসুমতীর বার্ষিক সংখ্যার ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত 'তুমুল বগড়া হবে' হইতে 'নগ্নতাই নারীর শ্রেষ্ঠ মৌলধ' পঙ্খিগুলি উক্ত উপক্রাস হইতে পুনঃবিলাস (delete) করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন । এই ঠিকানাগুলি দয়া করিয়া জানাইলে বড়ই উপকৃত হইব । (১) কানীর সন্ধ্যাসী বিন্দুভানন্দ ও গোপীনাথ কবিবাজুর ঠিকানা এবং (২) গত পৌষ সংখ্যার 'বার্ষিকো বাগধনী'তে প্রকাশিত 'সাপক জ্যোতিষী শ্রবীরবাবুর ঠিকানা' পোস্টবার্ড রহিল । আমি ১৯২০ সাল হতেই বসুমতী পাঠ করিয়া আসিতেছি, অল্পকাল মাকে মাকে বাদ গিয়েছে স্থানপরিবর্তন তেহুই ! বিনীত—কমলাকান্ত রায়চৌধুরী । ভট্টাচার্য্য, পূর্ণিমা বিহার ।

I like the magazine very much. So kindly send me the following issues which I have not received. Thanking you. S. L. Debi Rani Saheba of Kurupam, Kurupam House. 15 Gopalapuram 2nd. St. Madras—6.

### বেচেতে চাই

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে প্রক্তি কপি এক টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক । যদি কোন লোকের কিনিবার ইচ্ছা থাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন । উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর আখ্যাত সংখ্যার পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব । বিজ্ঞাপিত করিতে যদি খরচ লাগে, তাহা দিব ।

১৩৭০—শ্রাবণ হইতে চৈত্র

১৩৭১—বৈশাখ

শ্রবণকুমার নাথ, পোঃ—চিন্তবল্লভ, জিলা—বর্ধমান, কোরাটার নং ২১ডি, ষ্ট্রীট নং ৩২, আমলাদহ ।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী বীণা ঘোষ, অবধারক—শ্রীঅনিলকুমার দে, গ্রাম—আদর্শ পল্লী, ডাক—ঝড়ুল, জেলা—২৪ পরগণা, \*\*\* শ্রীমতী প্রীতি দেবী, এ ১১৬, রাজবাড়ী বারানসী, উত্তরপ্রদেশ \*\*\* শ্রীমতী রমা রায়, অবধারক—শ্রী এ এস রায়, টাটা হাউসিং কলোনী 'ইপ' ৪, বিজি নং ২, ম. রোড, বোম্বাই—৭৪ (এ এস) \*\*\* সচিব, ভারতী ক্লাব, গায়ক—ভারতী টেক্সটাইল এ্যান্ড ইন্টারেক্স লিঃ, ডাক—রিখড়া, জেলা—হুগলী \*\*\* শ্রীমতী ইলা পাল, ৪১০২, ওয়েস্ট প্যাটেল নগর, দিল্লী—১ \*\*\*

শ্রীমতী শীলাবতী সেন, অবধারক—শ্রীঃ আর সি সেনগুপ্ত, মহীদাস বাজার, কটক—২ \*\*\* ডাঃ পি জি চন্দ্র, সি-এ, ৬ (১) ডাক—নামসাই, কোহিত ফক্টরার ডিভিশন, নেফা, \*\*\* শ্রীমণিবচন্দ পাল, গ্রাম—শ্রীমঙ্গলপুর, ডাক—ঘাসবাঘ (ঘাটাল হয়ে) জেলা—মেদিনীপুর \*\*\* শ্রীবরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরসী দি কোবিদারী, ডাক—মুজদা, ধানবাদ, \*\*\* শ্রীমতী ব্রজা দাশগুপ্তা, অবধারক—রায়সাহেব রোড এন দাশগুপ্তা, বোস পার্ক, চার্চ রোড, ভাগলপুর—১, \*\*\* শ্রীকৃষ্ণবানন্দ বড়ু মাফেলী বাজার, ডাক—মাতেলী, জেলা—জলপাইগুড়ি \*\*\* শ্রীশ্রীকুমার মণ্ডল, গ্রাম—মোদীপুর, ডাক—বীরগঞ্জ (নলহাটা হয়ে) জেলা—বীরভূম \*\*\* সচিব, বিরজাম কিশোর মজা পাঠাগার, ডাক—বড়বলগোনা, জেলা—বর্ধমান \*\*\* শ্রীকল্যাণকুমার ভৌমিক, অর্থেতনিক সচিব, টি আর এল প্রক্লিংশন ক্লাব, ১২, হিজেট পার্ক, কলিকাতা \*\*\* এম্বাগারিক, গান্ধী সেবক সংগ্রহালয়, গুপ্তালয়, ১৪, রিভার সাইড রোড, ব্যারাবপুর, জেলা—২৪ পরগণা, \*\*\* শ্রীবরেন্দ্রকুমার সরকার, ডিপো ইনচার্জ (দিল্লী) বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, ১ দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী—৬। \*\*\* শ্রীঅজিতানন্দ সেনগুপ্ত : ৩৫, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা ১। \*\*\* অর্থেতনিক সচিব, স্টাফ ইনস্টিটিউট, সারস্বৎ সরণ, বিহার \*\*\* শ্রীমতী মারা ভট্ট চাফ, অবধারক—ভবানীচন্দ্র ভট্টাচার্য, এ্যাডভোকেট, বি ভট্টাচার্য রোড, ডাক—মীতাপুর উত্তরপ্রদেশ \*\*\* শ্রীমতী বীণাপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়, পোস্ট বক্স নং ৬৭, ধানবাদ ।

Sending herewith Rs. 15/- only as the yearly subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine every month. The Librarian, Dist. State Library, Dumka, (S. P.)

Herewith I am remitting the yearly subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati for the current year. Please send the magazine from the beginning of the current year. The Principal, St. John's Diocesan Girl's Higher Secondary School, 17, Sarat Bose Road, Cal-20.

I am sending Rs. 15/- towards the yearly subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Mrs. Pratima Chatterjee, 22, Queens Road, Allahabad.

Herewith I am remitting my subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly. Sm. Jharna Banerjee, C/o Shri P. Banerjee, Mikabari Tea Estate, Kurseong.

The subscription of the Monthly Basumati is sent herewith. Please send the magazine regularly. Mr. T. K. Mukherjee, C/o Expro International Ltd. P. O. Chanisword Dt. Poona-19 Maharashtra.

An annual subscription of Rs. 15/- only is sent herewith. Kindly acknowledge receipt and send the magazine every month. The Librarian, Utkal University Vanibihar. Bhubaneswar.



# • **সূচী** •

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। কথামৃত	( যুগবাণী ) ...	৫২৯
২। জিপদী, জিপদী	( প্রবন্ধ ) তীরন্দাজ ...	৫৩১
৩। প্যাভলফ	( প্রবন্ধ ) তীরন্দাজ ...	৫৩৩
৪। কৃত্রিম বৃষ্টি	( প্রবন্ধ ) সত্যবিজয় ...	৫৩৪
৫। কেশতত্ত্ব	( প্রবন্ধ ) শ্রুতসিক ..	৫৩৫
৬। সারমেয় প্রীতি	( প্রবন্ধ ) শিকারী ...	ঐ
৭। নেই তাই থাক	( রম্য-রচনা ) জীমতী ...	৫৩৬
৮। পশুপ্রীতি অন্তান্ত বিপজ্জনক হতে পারে	( সংগ্রহ ) ...	৫৩৭
৯। বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থী	( আলোচনা ) সঙ্কানী ...	৫৩৮
১০। একফালি চাঁদ	( কবিতা ) নিখিলবরুণ মাষ্টার ...	৫৩৯
১১। অনির্বেশ যাত্রা	( কবিতা ) সলিল চট্টোপাধ্যায় ...	ঐ

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

**এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড**

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেঙ্গলুরু - শ্রীলঙ্কা - গোহাটী

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১২। অখণ্ড অমির শ্রীসৌরঙ্গ (জীবনী-রচনা)	অচিন্ত্যাকুমার সেনগুপ্ত	৫৪০
১৩। 'আন্দোলন' বৈপ্লবিক সমিতির স্মৃতিকথা (প্রবন্ধ)	সত্যচন্দ্র দে	৫৪৫
১৪। মাহুঘের শত্রু 'ভর' (সংগ্রহ)	---	৫৪৯
১৫। একটি প্রসিদ্ধ শিশু-অপহরণ কাহিনী (রহস্য-গল্প)	কুন্তলা দত্ত	৫৫০
১৬। লোকাতীত (শিকার-কাহিনী)	সাধন তপাদার	৫৫৩
১৭। সিঁড়ির গান (কবিতা)	সঞ্জয়কুমার দে	৫৬০
১৮। মৌনমন (উপন্যাস)	সুবাণকুমার চক্রবর্তী	৫৬১
১৯। বিজ্ঞাপনে ববীন্দ্র-সাহিত্য (প্রবন্ধ)	নন্দিতা দত্ত	৫৬৭
২০। রেলগাড়ীতে উদ্ভুলতা (সংগ্রহ)	---	৫৬৮
২১। আলোকচিত্র—	---	৫৬৮ (ক), ৫৮০ (খ)
২২। পত্রগুচ্ছ—	---	৫৬৯
২৩। চারজন— (বাঙালী-পরিচিতি)		
(ক) তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	---	৫৭৩
(খ) ডাঃ মনোমোহন দাস	---	ঐ
(গ) বিষ্ণু দে	---	৫৭৪
(ঘ) বটরুক্ষ দত্ত	---	৫৭৫

কোটি কোটি বছর পার হয়ে আসা আমাদের এই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বা ভূত্বক চিরকাল একরকম থাকেনি, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজকের পৃথিবী রূপ-পরিগ্রহ করেছে। এ পরিবর্তনের পালা আজও শেষ হয়নি.....

লোক-বিজ্ঞানের নতুন তথ্যমূলক বই  
প্রকাশিত হলো।

## পৃথিবীর জঁঠরে

অনুবাদ : অরুণ রায়

দাম : ২.৩০

•  
: অত্যাশ্চর্য বই :

এফ. ডি. বুর্লেইনিকভ—এই পৃথিবী	---	দাম : ১.৫০
ডি. আই. গ্রমভ—অতীতের পৃথিবী	---	" ১.৬২
এম. ডি. বিয়েলিয়াকফ—বায়ুমণ্ডল	---	" ১.৭৫
লিয়াপুনভ—মহাবিশ্বের রহস্য	---	" ৩.০০
ইলিন ও সেগাল—মানুষ কি করে বড়ো হল	---	" ৩.৫০

গ্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ || নাচন রোড, বেনারচাঁত, দুর্গাপুর—৪

## সূচীপত্র

বিবরণ	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
২৪। এক ভারতসেবীর দেহাবসানে	( কবিতা ) সৈয়দ আলী আসাদ ...	৫৭৬
২৫। নিঃসম্পর্ক বাত্রে	( কবিতা ) শক্তি চট্টোপাধ্যায় ...	৫
২৬। বিশ্বের প্রথম মহামুহুর্ত	( পৌরাণিক-কাহিনী ) শচীন্দ্রনাথ বসু ...	৫৭৭
২৭। বিশ্বের বর্ষাদিনকে	( কবিতা ) চিন্তা চিন্তা ...	৫৮২
২৮। এক কলেজের চারটি ঘরে	( উপন্যাস ) রাণু ভৌমিক ( বাস ) ...	৫৮৩
২৯। বিজ্ঞান বার্তা—	...	৫৯০
৩০। রাত্রি অনেক	( কবিতা ) কাজী আবু জাকর সিদ্দিকী ...	৫৯২
৩১। ফড়ি	( গল্প ) আব্দুল শেখত, : অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র ...	৫৯৩
৩২। হৃদয় পাতো	( উপন্যাস ) সুলেখা দাশগুপ্ত ...	৬০৫
৩৩। অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞ—		
( ক ) মল্লিকার বাথ	( গল্প ) সবিতা দত্ত ...	৬০৬
( খ ) চাইবো না মা	( কবিতা ) বসুমতী চট্টোপাধ্যায় ...	৬১০
( গ ) বিগত নারিক	( কবিতা ) রমা মুখোপাধ্যায় ...	৬
( ঘ ) বসন্ত প্রবাসের দিন	( ভ্রমণ-কাহিনী ) কৃষ্ণা বসু ...	৬১১
( ঙ ) তুমি বিচি	( গল্প ) পূর্ববী চক্রবর্তী ...	৬১৪
( চ ) হু'টি হৃদয়	( কবিতা ) প্রতিমাদেবী বায় ...	৬১৭
( ছ ) আনো আশীর্বাদ	( কবিতা ) অরুণা ঘোষ ...	৬১৮
( জ ) তাই হোক আশীর্বাদ	( কবিতা ) রূপালী ঘোষ ...	৬

‘জীবনী-জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থসমূহ

॥ মনি বাগচি রচিত ॥

শিক্ষাগুরু আশুতোষ ৫.০০

রামমোহন ( ২য় সং ) ৪.০০

মাইকেল ৪.০০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০

কেশবচন্দ্র ৪.৫০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০

রমেশচন্দ্র ৫.০০

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫.০০

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ৬.০০

প্রকাশিত হ'ল :

ডাঃ বিমল রায় প্রণীত

## ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ

মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীত-নায়কদের জীবন-কথা ও সাধনা আলোচনায় তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ।

মূল্য : ৬.০০

আমাদের পরিবেশিত কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ :-

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ হিন্দু-সাধনা ৩.০০

উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন

ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন ১.০০

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ রবীন্দ্র সুভাষিত ১২.০০

হরিশচন্দ্র সাহাচার্য চৈতন্যোদয় ২.৫০

হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় THE HOUSE OF THE TAGORES 1.5

জিজ্ঞাসা ॥ ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯ এবং ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা	
৩৪। পূর্ণ প্রাণে চাবার বাহা	( উপভাস ) ক্যাথরিন হিউম : অম্ববাদিকা—প্রগতি মুখোপাধ্যায়	৬১১	
৩৫। বাতাসী মঞ্জিল	( উপভাস ) অভিজিতকৃষ্ণ বসু ...	৬২৫	
৩৬। নাগকণি	( জয়মকাহিনী ) প্রভাত মুখোপাধ্যায় ...	৬৩১	
৩৭। অন্ধ	( গল্প ) মানবেন্দ্র পাল ...	৬৩৮	
৩৮। ছোটদের আসর—			
( ক ) কর্কের ইতিকথা	( প্রবন্ধ ) ... অমরনাথ রায় ...	৬৪১	
( খ ) টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক	—জামুয়েল মোস ( জীবনী )	গোপাল সাতরা ...	ঐ
( গ ) মিঠে সানাইয়ের পুর শোনার	( কবিতা )	মৃণালকান্তি দাশ ...	৬৪৩
( ঘ ) বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প	...	দীপঙ্কর নন্দী ...	ঐ
( ঙ ) নেহেরু বিরোধে	( কবিতা )	সুচাসিনী দাস ...	৬৪৫
( চ ) গল্পীর কবি কুমুদরঞ্জন	( শ্মৃতিকথা )	প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	ঐ
( ছ ) বিশ্বকবির প্রীতি	( কবিতা )	তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৪৬
৩৯। সাহিত্য পরিচয়—		...	৬৪৭
৪০। নভোনৌল	( উপভাস )	প্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৬৫৩
৪১। দৈনিক বহুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে			
মাসিক বহুমতীর প্রজ্ঞাঞ্জলি	...	সার্ববাদিক ...	৬৫৭
৪২। বার্কো বারাগসী	( তীর্থদর্শন )	নীলকণ্ঠ ...	৬৬০
৪৩। বাঁহাদের সম্পর্কে এসেছি	...	জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ...	৬৬৪



### সোনার বাঙলার সোনার কাব্য কুণ্ডিবাসী রামায়ণ

আদি কবির মহাকাব্য সংস্কারে সংহার করিতে সাহসী  
হই নাই। মহাকবি কুণ্ডিবাসীর এই সর্বোৎকৃষ্ট ছাড়াবাদ-  
হীন সুপরিপূর্ণ রাজাধিরাজ সংস্করণ সমগ্র গুণকাণ্ড রামায়ণ  
প্রকাশিত। উপহারে প্রিয়জনরঞ্জন ৪০খানি চিত্রে  
চিত্রময়। মূল্য ৮ টাকা।

দি বহুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

## বস্ত্রশিল্পে মোহিনী দ্বিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন  
১ নং মিল— ২ নং মিল—  
কুষ্টিয়া, নদীয়া। বেলবরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রেজিঃ অফিস—

২২ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৪৪। <b>প্রচ্ছদ-পরিচিতি—</b>	...	৬৬৪
৪৫। <b>নাচ-গান-বাজনা—</b>		
(ক) কবিগাল লছোদর চক্রবর্তী ও কবিগান (প্রবন্ধ)	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	৬৬৫
(খ) তরুণ সঙ্গীত-সম্মেলনের সঙ্গীতামুঠান	...	৬৬৬
(গ) আমার কথা (শিল্পী-পরিচিতি)	হীরালাল সারথেল	৬৬৭
৪৬। অ্যাণ্টোনিডাকে (কবিতা)	মায়ী বসু	ঐ
৪৭। শিল্প র জীবনসঙ্গিনী (রম্যালোচনা)	চান্দনতা রায়চৌধুরী : অনুবাদক—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৬৮
৪৮। তম্বু ও মন (কবিতা)	প্রতিমা রায়	৬৭০
৪৯। <b>রঙ্গপট—</b>		
(ক) এক অবিদ্যগৌর শিল্পী	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৭১
(খ) স্মৃতির সন্ধরে মরিস শিলোলিয়র	বেবা দেবী	৬৭৪
(গ) চলচ্চিত্রে স্বভাব-জীবনী	...	৬৭৬
(ঘ) মিশরের চলিউড	...	৬৭৭
(ঙ) সাংবাদ-বিচিত্রা	...	ঐ
(চ) শৌখীন সমাচার	...	৬৭৯
৫০। শাশুতী (উপন্যাস)	নমিতা চক্রবর্তী	৬৮০
৫১। <b>সম্পাদকীয়—</b>	...	৬৯৮
৫২। <b>লোক-সংবাদ—</b>	...	৭০২

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত  
বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭  
প্রাণতোষ ঘটকের নতুন উপন্যাস  
সুখের লাগিয়া ৪-৫০  
তপতী রায়ের উপন্যাস  
একটি সোনা মন ৬  
কুয়াশার রঙ ৪  
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের সত্ত্ব প্রকাশিত  
মহাশোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫৥০  
সুখথ ঘোষের সত্ত্ব প্রকাশিত উপন্যাস  
মেঘ ডাঙা রোদ ৫৥০  
অনাথবন্ধু বেদান্ত  
সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫৥০  
চিত্তগুপ্তের  
এরা অভিব্যক্ত আসামী ৩৥০

গোপাল ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস  
শেষ প্রদীপ শিখা ৪-৫০  
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস  
জীবনবন্ধি ৬-৫০  
অভিযাত্রীর উপন্যাস  
স্মৃতির মুকুর ৬-৫০  
অনির্বাক শিক্ষা ৫  
নষ্টচন্দ্রের আলেণ ৬  
প্রবোধ মাঙ্গালয়  
গল্প সংকলন ৪  
বন্দীবিহঙ্গ ৩৥৥  
এক বাঙালি কথা ৪  
জনতা ৩  
প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস  
লাল পাথর ৩  
সমান্তরাল ৩৥৥  
সঞ্জয় ভট্টাচার্য  
অপলোম ৩৥৥  
স্মৃতি ৩  
অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস  
নীলবর্ণ শৃঙ্গাল ৪  
বাংলার কবি ৪  
যা হলেও হতে পারবে ৩৥৥  
মনং বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস  
সুন্দরী কথাসাগর ৫৥৥

তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস  
**ভুবনপুরের হাট**  
— ছয় টাকা —  
জগদীশচন্দ্র ঘোষের নতুন উপন্যাস  
শহীদ ৫৥০ যাত্রিদল ৬৥০  
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের  
সাহিত্যের স্বরূপ ২-৫০  
বাংলা সাহিত্যের একদিক ৪-৫০  
তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিবারের আসর ৩  
আন্তঃস্থ মতো—জানালার ধারে ৪  
বনকুল—উজ্জ্বলা ৩৥৥  
বিভূতি মুখো—আনন্দ নট ৩  
শক্তিপদ রায়গুরু—বনমাধবী ৩৥৥  
আশাপূর্ণা দেবী—অতিক্রান্ত ৩৥৥  
মানিক ভট্টাচার্য—স্মৃতির মূল্য ৩  
ইন্দ্রমতী ভট্টাচার্য—আতপ্ত কাঞ্চন ৩  
বিমল কর—দিবারাত্রি ৩  
গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪  
তারকদাস চট্টো—কুমারী ধরম ৫  
কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালো চোখের সারা ৩৥৥

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, বিধান সরণী ( কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ) : কলিকাতা—৬  
ফোন—৩৪-২২৮৪

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

শংকর সিকদারের

**আলোর তৃষ্ণা ৬.০০**

অমরেন্দ্র দাসের

**আলেয়া মঞ্জিল ৫.০০**

অবধূতের

**অনাহত আভিতি ৫.০০**

শক্তিপদ রাজগুরু

**পিয়াসা মন ৪.০০**

জীবন যুগয়া	দীনেন্দ্রকুমার রায়	৩.০০
মৃত্যু সীমান্ত	শক্তিপদ রাজগুরু	৩.০০
অগ্নিস্বাক্ষর	ঐ	২.৫০
রুহিণী বাড়ি	নিহাররঞ্জন গুপ্ত	৩.০০
পুষ্পধনু	ঐ	২.৫০
মনমমুরী	ঐ	২.৫০
মুখর রাত্রি	আশাপূর্ণা দেবী	৩.০০
অরসন্ধি	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২.০০
বিনিময়	বিশ্বনাথ রায়	২.৫০
উর্গনাভ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩.০০
বসন্ত	উত্তমপুত্র	২.৫০
রূপসী (প্রাপ্তবয়স্ক)	ঐ	২.০০
রামায়ণ (উপভাস)	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	২.০০

**আরতি প্রকাশনী**

১, কলেজ রো, কলকাতা - ৯

**ছোটদের জন্যে স্কুলের বই**

আমাত্রাসাদ সরকারের

**দোয়েল ফিঙে চন্দনা মূল্য ১.২৫**

শিবরাম চক্রবর্তীর

**কথায় কথায় ফ্যাসাদ মূল্য ১.০০**

দুর্গাদাস সরকারের অম্বাবাদ

**আইভ্যানহো মূল্য ১.০০**

এভারেস্ট বুক হাউস, এ-১২এ, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-১২

**জেনে রাখা ভাল..... ?**

সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভবও এখনও “পদ্মা ষ্টোলের” কাপড় এবং তৈয়ারী পোষাকের দাম বাড়ে নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়—

**“পদ্মা ষ্টোর্স”**

উত্তর কলিকাতায় আধুনিকতম বস্ত্র প্রতিষ্ঠান।

২৮নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, } ১৩৮/১ নং বিধান সরণী,  
শিয়ালদহ, কলিকাতা } কলিকাতা  
ফোন : ৩৫-৫৫২৮ } ফোন : ৫৫-৮৩৫০

পরমভাপবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

**শ্রীকৃষ্ণ**

ভক্তির মঙ্গলকিনী—প্রেমের অলকানন্দা—জ্ঞানের আকাশগঙ্গা।

—বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ দ্বিতীয় নাই—

॥ আনারায়ণে নিবেদিত এই ভক্তি-নৈবেদ্য স্বর্গপাত্রের সুসজ্জিত ॥

এরূপ চিত্র-সমৃদ্ধ—মুদ্রাভিন—সম্মোহন-সংস্করণ

এ পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত হয় নাই।

**মূল্য ১৫/- টাকা**

**দর্শনসমুচ্চয়ঃ**

**মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক**

ব্যাকরণ-কাব্য সাংখ্যভৌত বিরচিত

চাক্ষুরিক মত গুণন করিয়া, লেখক হিন্দুর মত-দর্শনের সমস্ত ও সূক্ষ্ম

প্রাণী করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সর্কশাস্ত্রের নিখাদ, বহুপ্রাণ হিন্দুর

নিকট অমূল্য সম্পদ। **মূল্য দুই টাকা**

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

## স্বাধীনতার ইতিহাস

বিদ্রোহী বাংলার শৃঙ্খলমোচন অভিযানের প্রারম্ভে তরুণদের উদ্বুদ্ধিত করিয়াছিল।

### পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থতালিকা

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোচ্চল প্রথম প্রামাণ্য বিবরণী

প্রতাপাদিত্য ২১

ভারতের স্বাধীনতার সহিত সম্পদ লুণ্ঠনের প্রথম জালিয়াৎ ও বাটপাড়ের কথা

জালিয়াৎ ক্লাইব ২১

মহারাজ নন্দকুমারের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্য

মহারাজ বন্দুকুমার ২১

রাজনৈতিক-গণনের দীপ্তসূচী—পাঞ্জাবকেশরী

লালা লাজপৎ রায়েব জীবনী

(ইংরাজিতে)

রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় মহাজীবনী। মূল্য ১০

কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র—প্রসিদ্ধ আইনবিদ

ক্রীসনকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

## হিন্দুধর্ম পরিচয়

দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা

বাংলার বিজ্ঞানসম্মত হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা যেদিন লুপ্ত হইল, সেইদিন হইতে হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি নষ্ট হইয়া গেল। তাহারই স্রবোগ লইয়া আমাদের গৃহ সমাজ ধ্বংস করিয়াছে যুনানী সভ্যতা। বাংলার অতীতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নায়ক বাংলার বালগোপালদের কচি করকমলে যে পরিচয় মনেস্তে তুলিয়া ধরিয়াজেন, তাহাতে জাতি কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতি বিজ্ঞানে এই গ্রন্থ অবজ্ঞাপাঠ্য হওয়া উচিত।

### কয়েকটি বিশিষ্ট অভিমত—

বিহারের প্রাক্তন প্রদেশপাল ক্রীমানব জীহরি এনি লিখিয়াছেন—

“...চমৎকার বই। স্বয়ং প্রচারিত হিন্দুধর্ম সংক্ষেপে স্পষ্ট ধারণা হবে বইখানি পড়লে। প্রত্যেক কিশোর ও কিশোরীদের হাতে এই বইয়ের একখানি করে বই শোভা পাক, এ আমার বড় ইচ্ছা।”

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘প্রবাসী’র অভিমত—

“স্বদেশের মূল ও সার কথার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় সম্ভাব্য সম্ভ্রুতিগণ ক্রমে বিভ্রান্ত ও আদর্শভ্রষ্ট হইয়া উঠে। ইহার ফল ইদানীং আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ সময় এত-একখানি পণ্ডকের প্রয়োজনীয়তা আছে।”

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২

## সদ্য প্রকাশিত নূতন নূতন উপন্যাস

উত্তরণ	আশাপূর্ণা দেবী	৫.০০
কাছের মানুষ	কণপ্রভা ভাটুড়ী	৪.০০
তমস্বিনী	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩.০০
পরজবসন্ত	অরবিন্দ পালিত	৩.০০
অপরাজিতের নদী	স্বপ্নারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	২.৫০
বিলাসিনী রাই (কাহিনী)	স্বপ্নারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩.০০
সন্তোষামি যুগে যুগে	বর্ণাবলয় চট্টোপাধ্যায় (ধর্মমূলক জীবনীচিত্র)	৩.০০
সিকুর স্বাদ (২য় সং)	প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত	৭.০০
রবীন্দ্র-চর্চা	হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত	৫.০০
অনেক দিনের অনেক কথা	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	৪.০০
নজরান	অমরেন্দ্র দাস	১০.০০
জেবুল্লিসা (৩য় সং)	অমরেন্দ্র দাস	৬.০০
তনুস্ম	আশাপূর্ণা দেবী	৪.০০
দূরের মালঞ্চ (২য় সং)	হরিনারায়ণ চট্টো	৫.০০
রেণীপার্ক	স্বপ্নারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৪.০০
মায়ামারিচ	”	৩.৫০
সাহসিক	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩.৫০
সরস্বতীয়া	বিনয় মিত্র	৩.০০
রায়মঞ্জল	শক্তিপদ রাজগুরু	৩.০০
রাতের চোঁ	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩.০০
বাহুবল	চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩.০০
তচেনা	শুদ্ধসত্ত বসু	২.৫০
বিজয় বসন্ত	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২.৫০
হেডমাস্টার (৩য় সং)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২.৫০
সোনালুপোর কাঠি	কবিতা সিংহ	২.০০
মাৎস্রমোহো	প্রতিভা বসু	৩.৫০
শুভক্ষণ (২য় সং)	নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩.৫০
মুলিধুসর	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩.০০
পত্রবিলাস	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩.০০
ছায়াসূর্য	আশাপূর্ণা দেবী	৩.০০
ছায়া হরিণ	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩.০০
পাহাড়ী চল	সমরেশ বসু	৩.০০
মরসুমী	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২.৫০
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি	দিব্যেন্দু পালিত	২.০০
সাম্প্রতিক স্মৃতিবাচিত কবিতা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩.০০
মোবনবাউল	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	৩.০০
অভিদূর আলোরেরখা	মঞ্জু রায়	২.০০
প্রথম নায়ক	নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১.৫০

সুরভি প্রকাশনী ১, কলকজ রো, কলিকাতা-৯

ভিক্স এর কাশি নিবারণী নতুন আবিষ্কার

# প্রবল কাশি থামায়

কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে—যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে এর কাজ



কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উত্তেজিত হলো আপনি কাশিতে থাকেন এবং কাশিতে কাশিতে উত্থিত হয়ে পড়েন



ভিক্স ফর্মুলা 44 আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রশমিত করে। কাশি থেমে যায় ও আপনি আরামে ঘুমাতে পারেন

কাশি ঠিক আপনার গলায় নয়। ডাক্তাররা জানেন আসলে কাশির সূত্রপাত হয় আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। গলার প্রদাহ এবং শ্বাসনালীর গ্লোয়া আপনার কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে উত্তেজিত করে ও আপনি কাশিতে শুরু করেন ও কাশিতে কাশিতে উত্থিত হয়ে পড়েন।

ভিক্স ফর্মুলা 44 এর মধ্যে নতুন অনন্যসাধারণ “কাশি নিবারক” আপনার উত্তেজিত কাশি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে প্রশমিত করে এবং কাশি থেমে যায়। প্রবল ও যন্ত্রণাকর

কাশির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আপনি সারারাত শান্তিতে কাটাতে পারেন।

আর ঐ সময়ের মধ্যেই ভিক্স ফর্মুলা 44 এর বিজ্ঞানসম্মত সংমিশ্রিত শক্তিশালী ঔষধগুলি দেহের প্রধান তিনটি অংশে কাজ করে যাতে আপনি প্রবল কাশির হাত থেকে সম্পূর্ণ আরাম পান।

<p>* আপনার বুকের মধ্যে কাজ করে</p> <p>ভিক্স ফর্মুলা 44 এর বিশেষ উপাদানগুলি শ্বাসনালীর পর্দার কাজ করে এবং বুকের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার করে দেয়।</p>	<p>* আপনার গলার মধ্যে কাজ করে</p> <p>ভিক্স ফর্মুলা 44 কাশিতে বস্তুসে গলার ঝাঁক তুলিতে সক্ষম হয়।</p>	<p>* আপনার নাকের মধ্যে কাজ করে</p> <p>ভিক্স ফর্মুলা 44 সর্দিতে বন্ধ নাক খুলে দেয় এবং আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস আরও সহজ করে তোলে।</p>
--	--	---



## ভিক্স ফর্মুলা 44

কাফ মিক্সচার যেখানে কাশির সূত্রপাত সেখানে কাজ করে



গদ্যিক বসুমতী । শ্রাবণ, ১৩৭১ ॥



( বেগমচিহ্ন )

বাস্তবহারা

—শ্রীমদেবী জগদীশ  
বাস্তবচৌধুরী আদিত্য



শ্রাবণ ১৩৭১



চতুর্থ সংখ্যা।

# মাসিক বঙ্গমণ্ডল

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[ স্বামীজী আমেরিকা ঘাইবার 'বচনপুর্বে ১২১৬  
সালে যখনলুপ্ত 'সাহিত্য-কলস' নামক মাসিকপত্রে  
Imitation Of Christ নামক ভগবদ্বিষ্যত  
পুস্তকের 'ঈশা জন্মসংগ' নাম দিয়া জন্মবাদ করিতে  
আরম্ভ করেন। উক্ত পত্রের প্রথম ভাগের প্রথম  
হটতে পঞ্চম সংখ্যা অবধি বর্ষ পরিচ্ছেদটি পর্যন্ত  
প্রকাশিত হইয়াছিল। আমবা সমুদয় জন্মবাদটাই  
করিলাম। স্বস্মৃতি স্বামীজীর মৌলিক রচনা।—স ]

## সূচনা

ঋষ্টির অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খৃষ্টজগতের অতি  
আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান ক্যাথলিক'  
সম্প্রদায় লিখি—লিখিত বহিলে ভুল হয়—ইহার প্রত্যেক  
অক্ষর উক্ত ইশা-প্রেমের স্বর্বাঙ্গী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুত  
মুদ্রিত। যে মহাপুস্তকের হলন্তজীবন্ত বাণী আজি চারিশত বৎসর  
কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় বদ্ধূত মোহনী শক্তিবেলে আবৃষ্ট  
করিয়া রাখিয়াছে—রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা  
এবং সাধনগলে কত শত সম্রাটেরও নমস্কার চটাইছেন, বাঁচার অস্পষ্ট  
পাথরতার নিকটে পরস্পরের সন্তত যুগমান অঙ্গণে সম্মুখদায়ে  
বিভক্ত খৃষ্ট-সমাজ চিরপৃষ্ঠ বৈষম্য পরিতাপ করিয়া মস্তক অবনত  
করিয়া রাখিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনাব নাম দেন নাই।  
ইহেবন বহা কেন?—যিনি সমস্ত পাবিব ভোগ বা বিলাসকে,  
ইহজগতের সমুদয় মান-সম্রাজকে ঐষ্ঠার কায় ভাগ্য করিয়াছিলেন—তিনি  
কি সামান্ত নামের ভিখারী হইতে পারেন? পরতী লোকেরা অনুমান  
করিয়া 'টামস আ কম্পিন্স' নামক একজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে

## କଥାସତ

গ্রন্থকার হিঁস করি যাচ্ছেন: কতদূর সত্য সঁখর জ্ঞানেন।  
 যিনিই শুউন, তিনি যে জগতের পুজা, তাহাতে আর  
 সন্দেহ নাই।

এখন আমরা খৃষ্টিয়ান রাজার প্রজ্ঞা। রাজ-  
অনুগ্রহে বহুবিধ নামধারী স্বদেশী-বিদেশী খৃষ্টিয়ান  
দেখিলাম। দেখিতেছি, যে মিশনারী মহাপুরুষেরা,

‘কৃত্রিম নাসা আছে খাও, কলসকার জন্ম ভাবিও না’ প্রচার কারয়া  
‘আমিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সংঘর বাস্তব—দেখিতেছি—  
‘দাঁশের মাথ রাখিবার স্থান নাই’, তাঁহার শিষ্যের’, তাঁহার  
প্রত্যেকের’ বিলাসে মগ্ন হইয়া বিবাহের বরটি সাজিয়া এক পয়সার  
মা-বাপ হইয়া—‘দাঁশার জগন্ত তাগ, জছুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে  
বাস্তবিক প্রকৃত খুঁজিয়া (দেখিতেছি না) এক জছুত গ্লানসী, অতি  
দাঙ্কিম, মতা অত্যন্তাচার, বেকস একা ক্রম চড়া প্রোটোট্যাক খুঁজিয়া  
সম্প্রদায় দেখিয়া খুঁজিয়া সম্বন্ধ আমাদের যে অতি কুৎসিত ধারণা  
হইয়াছে, এই পুস্তক পাঠ্য করিলে তাহা সমাকরণ দূরীভূত হইবে।

‘সর্বসম্মান কি একমত’ সকল ব্যাপ্য জ্ঞানীরাই একপ্রকার মত।  
পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পাড়িতে গীতার ভগবদ্ভক্ত ‘সর্বদান’ পরিত্যজ্য  
মামেক শরণ্যে ত্রু প্রকৃতি উপাদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে  
পাইবেন। দীনতা, জাতি এবং দাস্তর্ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের  
ছাএ ছরে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে অনন্ত বৈরাগ্য, অত্যন্ত  
আত্মসমর্পণ এবং নির্ভয়ের ভাবে হৃদয় উন্মোচিত হইবে। গীতার অর্থ  
গৌড়ামীর বশবর্তী হইয়া গুপ্তিয়ানের সেবা বলিয়া এ পুস্তক অশ্রদ্ধা  
করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনের একটি পুত্র বলিয়া  
আমরা কীত হইব,—

‘আপ্ত, পদেশবাক্য: শব্দ:’

সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এখানে টীকাবাক্য স্বয়ং জৈমিনি বলিতেছেন যে, এই আশুপুরুষ আর্থ এবং প্রত্য উভয়ই সম্ভব।

যদি ‘যন্যচাৰ্য’ প্রভৃতি গ্রীক জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ পুরাকালে আর্থদিগের নিকট এতাদৃশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তসিদ্ধের পুস্তক যে এদেশে আদর পাইবে না, তাহা বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক যে পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আমরা পাঠকগণের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিব। আশা করি, বাশি বাশি অসার নড়েল নাটক বঙ্গের সাধারণ পাঠক যে সময় নিয়োজিত করেন, তাহার শতাব্দের একাংশ ইহাতে প্রয়োগ করিবেন।

অনুবাদ যতদূর সম্ভব আঁকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকাৰ্য হইয়াছে বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য ‘বাইবেল’ সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।

কিমধিকমতি।

## প্রথম অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

‘পৃষ্ঠের অঙ্গুসংগ’ এবং ‘সসার ও যাবতীয় সামসারিক অন্তঃসায়স্ক  
পদার্থে দুবা

১। প্রভু বলিতেছেন, ‘যে বেহ আমার অঙ্গুগমন করে, সে অঙ্ককারে পদক্ষেপ করিবে না।’ (ক)

যজ্ঞপি আমরা যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হ্রদয়ের অঙ্ককার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি, তাহা হইলে পৃষ্ঠের এই কয়েকটি কথা আমাদের শ্রবণ করাইতেছে যে, তাহার জীবন ও চরিত্রের অঙ্গুগমন আত্মনির্দেশের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব ঈশ্বর জীবন মনন করা আমাদের প্রধান বর্তব্য। (খ)

২। তিনি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অঙ্গ সকল মহাত্মাপ্রদত্ত শিক্ষাকে অতিক্রম করে এবং যিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা

(ক) যোহন ৮:১২

He that followeth me &c.

দৈবী জ্যোতিঃপ্রদায়ী মম মায়া দূরত্যা।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতং ভ্রবন্তি তে।

—গীতা ১৭ অ-১৪ ॥

আমার সর্বদা ত্রিগুণময়ী মায়া নিত্যন্ত ভ্রুতিক্রম্য; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজন করে, তাহারাই কেবল এই অঙ্গুর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

(খ) To meditate &c.

ধ্যাত্বৈবোদ্ধানমগনিশ: কুনি:।

তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধন:—রামগীতা।

যদি এই প্রকারে অহনিশ পরমাত্মার ধ্যান করা সমস্ত সসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

পরিচালিত, তিনি ইহারই মধ্যে লুক্কায়িত ‘মার্গা’ (গ) প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু এ প্রকার অনেক সময়ে হয় যে, অনেকেই পৃষ্ঠের সন্মতায় বাতম্বর শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভের জন্য কিছুদূর অগ্রসর প্রকাশ করে না, কারণ, তাহার পৃষ্ঠ আত্মার দ্বারা অল্পপ্রাণিত নহে। অতএব যজ্ঞপি তুমি আনন্দময় এবং সম্পূর্ণভাবে পৃষ্ঠ-বাক্যাত্মক অল্পপ্রাণেশ করিতে চাও, তাহা হইলে তাহার জীবনের সহিত তোমার সম্পূর্ণ জীবনের সৌন্দর্য্য স্থাপনের জন্য সম্মতিক যত্নবীল হও। (ঘ)

৩। ‘ব্রহ্মবাদ’ (ঙ) সহজে গভীর গবেষণার হোমার কি লাভ হইবে, যদি সেই সমস্ত সময় হোমার নন্দতার অর্থাৎ সেই ঐশ্বরিক ত্রিভুকে অস্বস্তি করে?

নিশ্চয়ই অল্প বাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না; কিন্তু ধর্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে। (চ)

অনুতাপে হ্রদশস্য বরং ভোগ করিব—তাহার সর্বক্ষণ্যাক্রান্ত বর্ণনা জানিতে চাই না।

যদি সমগ্র বাইবেল এবং সমস্ত দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার বি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও। (ছ)

[তমশ।

—স্বামী বিবেকানন্দের কথা হইতে।

(গ) ইজ্যোত্সরা যখন মরুভূমিতে আচরণাভাবে বসে পাইয়াছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর তাহার নিকট এক প্রকার খাত্ত বর্ণন করেন—তাহার নাম ‘মার্গা’।

(ঘ) But it happens &c.

অহাণোমঃ বেদ ন চৈব কমিতঃ।

—গীতা।

অবশ্য করিয়াও অনেকে ইহাকে বুঝিতে পারে না।

ন গচ্ছতি বিনা পারা ব্যাধিরোদয়কতঃ।

বিনাতিপরাঙ্গুদভবাঃ প্রদর্শকর্ন মুদ্যতে।

—বিকটচূড়ামণি ৬৪।

‘দ্বিগদ’ বখাটিনেই ব্যাপি দূর হয় না, অপদোষাত্মক ব্যতিরেকে প্রকৃত হইতেই মুক্তি হইবে না।

প্রকৃতন কিং দৌ ন চ দর্ম্মচরঃ ॥

—মহাভারত।

যদি ধর্ম আচরণ না কর, বেদ পড়িয়া কি হইবে?

(ঙ) তুল্লিগান মতে জন কথর (পিতা) পবিত্র আত্মা এবং

তনয়েশ্বর (পুত্র)—ইনি একে বিন বিন এক।

(চ) Surely sublime language &c.

বাস্যৈবৈশ্বরী শব্দকণা শাস্ত্রব্যাক্যানকৌশলম্।

বৈভূত্যা বিভূত্যা ভবভূক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥

—বিবেকচূড়ামণি ৬০।

নানাবিধ ব্যাক্যবিভাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার কেবল শাস্ত্রব্যাক্য কৌশল মাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে।

(ছ) কোহিন্থিথান ১৩.২

# জিপসী, জিপসী

ইরোপে হেনরী ফিডি; এবং ভিটর ভাগা থেকে শুরু করে আমাদের তারাকুর পৃথক দেশ-বিশেষের ছোটো-বড়ো সমস্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে জিপসীদের কথা কিছু কিছু বসবার চেষ্টা করেছেন। শক্তমান সাহিত্যিকদের রচনা পড়ে জিপসীদের জীবনব্যাপার অনেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি তা ঠিক, তবে সাধারণভাবে জিপসীদের সম্বন্ধে আমাদের বোকাহুল বা দারুণ কোথা থেকেও স্তম্ভের নির্ভর করে গড়ে উঠে না।—ওদের সম্পর্কে আমাদের দারুণ, বিশেষ করে সহরাক্ষরে অবিবাসী যারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে ওঠে।

মনে করে দেখুন, ত্রাং একদিন কোনো একসময় মেয়ে-শুকন মিলে হুজুগ কি হয় হো পাচেন-সত্যন লোকটী আপনার গোঁড়ের কাছে এসে গান-বাকীনা চাই কি তথ্যতা বা নাচও শুরু করে নিয়েছে। কেউই তার বাড়ির সামান্য হস্তা পছন্দ করে না, আপনিও করেন না তা জানি, কিন্তু পেরেচেন কি সেই অন্যের গায়কতাকে তখনই তাড়িয়ে নিত? জানি, খাবান পাচেননি। কারণ, ওদের ত্রি গান, ওদের অস্বাভাবিক প্রাণ-চঞ্চলতা, অস্বাভাবিক বস্তুত্ব এই জন্মে যে, প্রকৃতির অস্বাভাবিক আশা ছিলো যে আমাদের মতো সৎস প্রাণবন্ততা মাতন মাতেরই থাকবার কথা—তা আজকের পৃথিবীর জমজমা মাতন আমরা সকলেই হাবিয়ে ফেলেছি—বিশেষ করে নগরবাসীদের ভেতর দখলি। তাই। আমরা তখন প্রসিদ্ধত্ব নিজেদের 'এডিট' করতে চেষ্টা করি। কথা বলি এডিট করে, চলি-বিচি 'এডিট' করে, গোখাক গরি এডিট করে, চেষ্টা-ভাবনা, স্তম্ভ-স্বাভাবিক প্রকাশ তাত্ত্বিক 'এডিট' করা। চাই কি সবটুকু সবার সমস্ত 'এডিট' করতে চুলি না। অথচ ভালোভাবে 'এডিট' করার কাজটা যে কতো দীর্ঘ তা সব-আজ্ঞান এডিটার অশেষাশে বোঝা কিছুকো কঠিনত্বের তাঁরা সকলেই জানেন। তাঁরা এডিটর বিস্তৃত আকর্ষণ মেলে না—এডিটর ত্রিবে আমাদের সকলেই যৎপরানন্তি খারাপই বলা চলে। বাজেই এখনই আমরা নিজেদের এডিট করতে বাট, তখনই অস্বাভাবিকতা এবং হাঙ্গর কুদ্রিমতা আমাদের চোখে পড়ে যায়। কিন্তু জিপসীরা, নিজেদের এডিট করে না। আমাদের সঙ্গে জিপসীদের এটিখানটাই আছে।

যে, জিপসী বা তাদের পূর্বপুরুষ ভারতীয় 'বেদেরাই' হচ্ছে আজকের অসত্য মত্বসেপ সঙ্গে ফেলে-মাসা দিনের অলৌকিকতায় বিশ্বাসী মানবসমাজের একমাত্র যোগসূত্র।

জিপসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের প্রচলন আছে। তবে বেশির ভাগে ঐতিহাসিকই মনে করেন যে ভারতের বেদেরাই আজকের সারা পৃথিবীর জিপসীদের পূর্বপুরুষ; আর এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে জিপসীদের আদিভূমি ছিল স্পেন দেশে। আবার কেউ কেউ মিশরের দক্ষিণ-কলকেও জিপসীদের উৎপত্তিস্থল বলে মনে করে থাকেন।

উৎপত্তিস্থল যেখানেই হোক-না-কেন বিভিন্ন নামে পৃথিবীর যেখানেই জিপসী দেখা যায়, অকস্মিকভাবে তাদের পোশাক-আশাকের



একজন প্রখ্যাত মূ-বিজ্ঞানী এক সময় বলেছিলেন

চিরমুক্তির গিরাদী—একটি জিপসী কথা

বিভিন্নতা থাকলেও জীবনধারণ শ্রমালী এবং স্বভাবচরিত্র প্রায় একই রকম দেখা যায়।

জিপসী সমাজের পুরুষেরা সাধারণত থাকে নাচ-গান-বাজনা নিয়েই, কখনো বা গাছ-গাছড়ার ওপর নিজেও নাড়াচাড়া করে তারা—এদের সমাজের প্রকৃত কর্তাব্যক্তি, অর্থাৎ সংসার চালাবার যে দায়িত্ব তা প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের হাতে। কখনো সাপের খেলা দেখিয়ে, কখনো দুরারোগ্য কোনো ব্যারাম সারাবার কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করে, কখনো দুগ্ধাপ্য মণি-মুক্তা ইত্যাদি পাথরের পসরা মিসিয়ে, কখনো ভেড়া-ছাগল বিক্রি করে, কখনো বা জ্যোতিষ-চর্চা করে যে উপার্জন এদের করতে হয় সংসার চলে তাই নিয়েই। এ উপার্জন সাধারণত খুব বেশি না হবারই কথা, অনিয়মিত তো বটেই—কিন্তু তারই ওপর নির্ভর করে গোটা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ জিপসী-পরিবার শতাব্দীর পর শতাব্দী চাপিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় অনেক ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়ক (যেমন জার্মানীর হিটলার) চেষ্টা করেছেন জিপসীদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে। পাকা বাড়িতে স্থায়ী ঠিকানার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন ওদের আকৃষ্ট করবার জন্তে—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। দীর্ঘকাল অনিশ্চিতভাবে পথে-পথে ঘুরতে ঘুরতে নিকরদেশের পথে ঘোরার নেশা ওদের মজ্জা-মজ্জায় মিশে গেছে।

জিপসীদের নিজেদের একটি ভাষা আছে—নিজেদের মধ্যে



জিপসীদের কাছে টাকা একমাত্র স্বর্ণ

সাধারণত এই ভাষাতেই কথা বলে থাকে ওরা। কিন্তু, নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে আরো বিভিন্ন ভাষা ওরা আয়ত্ত করে ফেলে দেখা যায়। একবার দেখা গিয়েছিল একটি বৃদ্ধ জিপসী পুরুষ পৃথিবীর প্রধান বাইশটি ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করতে সক্ষম। ইয়েরোপের একাধিক গভর্নমেন্ট তাকে নিজেদের সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। সে বলতো—এক জারগার স্থায়ীভাবে কোনো কিছু করলে তা প্রকৃতির বিরুদ্ধে জবজ্বল অশরাধের সমিল একটা কাজ হয়ে যায়। প্রকৃতি নিজে সদা-চঞ্চল, সদা-পরিবর্তনশীল, আমাদেরও (অর্থাৎ মানুষদেরও) ঠিক তেমনিই হওয়া দরকার। তোমাদের পাকা বাড়ির চাইতে আমাদের খোলা মাঠ, কিংবা পথের ধারের এই তাঁবু এ অনেক ভালো।

জিপসীরা পৃথিবীর কোনো দেশের সরকারকেই নিজেদের সরকার বলে মনে করে না—বাস্তবিকপক্ষে সরকারমাত্রই অপ্রয়োজনীয় একটা কিছু বলে এদের ধারণা। আর এই জন্তেই কোনো দেশে যখন জিপসীদের আবির্ভাব হতে থাকে, (বিশেষ করে রাজনৈতিক আবহাওয়ার যুদ্ধের রক্ত লেগে গেলে) তখন সেই সমস্ত দেশের পুলিশ বিভাগ সজাগ হয়ে ওঠে ওদের সম্পর্কে—যাতে না স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে সামরিক বা অসামরিক কোনো গুস্তবপূর্ণ খবর ওরা সংগ্রহ করতে পারে।

যে বিশেষ গুণের জন্তে এক এক সময় জবরদস্ত রাজনীতিবিদদের কুনজরে পড়া সবেও, আজও জিপসীরা প্রায় সর্বত্রই চলাক্ষর্য্য করতে পারে, তার একটি হলো টোটকা চিকিৎসা। নানা গাছ-গাছড়ার সাহায্যে অনেক সময় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি ওরা প্রকৃতই সারিয়েছে দেখা গেছে। বলাই বাহুল্য এই শুধুগুলি পুরুষাত্মকমে ওরা গোপন রেখেই চলে; এইটেই ওদের মূলধন হয় তো একটা গাছের শিকড়, তুরস্ক বা আকছার পাওয়া বাস, কেউ তার কোনো গুণ আছে বলেই মনে করে না, তেমনি একটা জিনিস দিয়ে হয় তো জিপসীরা ভেনেজুয়েলা কিংবা ইকোরাডোরের (যে অঞ্চলে 'এ গাছ আদে' মেলে না) কোনো মুস্তক্ল কগীকে সারিয়ে দিলে। আর দ্বিতীয় যে গুণ তার আবেদন সর্বজনীন বলসেই হয় অর্থাৎ গান-বাজনা এবং নাচ। বাঁশি এবং বেহালা যন্ত্রের মধ্যে এই দু'টি কঠিন জিনিস পুরুষাত্মকমে চর্চার কলে ওরা এমনভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছে যে, অনেক সঙ্গীত বিশারদকেই অনেক সময় দেখা গেছে যে, হয় তো চলতে চলতে হঠাৎ পথের মাঝে স্তব্ধ হয়ে পড়েছেন পথের ধারে কোনো জিপসীর বেহালা শুনে। কিন্তু য মুহূর্তে সে বুকতে পারবে যে, আপনি ওর বেহালাটা শিখে নেবার চেষ্টা করছেন, সেই মুহূর্তেই সে বন্ধ করবে—কারণ, সকলের মতো ওরাও ওদের মূলধন হাতছাড়া করতে নারাজ।

বাইরে থেকে মনে হয় যে জিপসীদের জীবনযাত্রার নৈতিক মান বেশি হয় খুব প্রশংসনীয় নয়—কারণ কোথাও গান-বাজনা শুদ্ধ করে দিয়ে ওদের মেরেরা হয় তো সহজেই আপনার হাত ধরে ফেলবে কিছু চাদার জন্তে, (চাই কি হাতখানা হয় তো বা আপনার পকেটেই ঢুকিয়ে দিলো) কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ওদের জীবনযাত্রার নৈতিক মান আমাদের চাইতে অনেক উঁচুতে। বিয়ের বাইরে কোনো প্রকার যৌনসংশ্লব ওরা কল্পনা করতে পারে না। —তীরন্দা

# প্যা ভ ল ফ



প্যাভলফ

মানুষই হোক বা মহাযোত্তর অজ্ঞাত জীবজন্তুরাই হোক—

এরা সবাই যে কোনও কিছু শিখতে পারে তা কি করে সম্ভব হয়? পাখি উড়তে শেখে, হরিণশিশু দৌড়তে শেখে, মাছ সাঁতার কাটতে শেখে—এ সমস্ত ব্যতীত পারা বা তা অপরকে বোঝানো বিশেষ কঠিন নয়। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থার এসবের কারণস্বরূপ যা বলা হতো অর্থাৎ সহজাতবৃত্তি, তাতে এ শিক্ষার যা প্রবৃত্ত কারণ তার বেশির ভাগটাই জানা হয়ে গিয়েছে। এসব আভ্যন্তরীণ দৈনন্দিনতা অজ্ঞাত বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু পাখি মানুষের ভাষা (তা একটি শব্দই হোক অথবা দু-শব্দই হোক) বলতে শেখে কি করে? হরিণশিশু বা কুকুর বা হাতী যে মানুষের পোষ মানেন তা কি করে সম্ভব হয়? কিংবা মানুষ যে জ্যামিতি শেখে বা দর্শনশাস্ত্র শেখে বা খেলায় গান শিখতে পারে—একটি বা কি করে সম্ভব হয়? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নানা দেশের বিজ্ঞানীদের শত শত পরীক্ষা-কার্যের ফল বহুতরল বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তা হলে সম্ভবভাবে মানুষ বা মহাযোত্তর জীব বা শেখে তার কারণগুলি। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের থিয়োরীগুলি মোটামুটি তিনটি ধারণার মধ্যে সীমিত করা যায়। প্রথমত ধারণার একত্রীকরণ (association of ideas), দ্বিতীয়ত ধারণা বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা (concepts) এবং তৃতীয়ত রূপকল্প (images)। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই নানা দেশের বিজ্ঞানীরা ব্যতীত পেরেছিলেন যে, সহজাতবৃত্তির গুণে শিক্ষা এবং সম্ভবভাবে শিক্ষার কারণস্বরূপ যে প্রাথমিক তিনটি সূত্র পাওয়া গেছে তার সাহায্যে সবকিছু সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ সহজাতবৃত্তির গণ্ডিতে পড়ে না এবং সম্ভবভাবে শেখা হচ্ছে না—এ রকম অবস্থাতে মানুষ বা মহাযোত্তর জীবেরা অনেক কিছুই শিখে থাকে। মানুষের মতো উচ্চস্তরের মস্তিষ্ক না থাকা সত্ত্বেও একটা বুনো হাতী পোষ মানেন কি করে? ওরা তো ধারণার একত্রীকরণ, বিচ্ছিন্ন চিন্তা বা রূপকল্পের সাহায্য নিতে পারে না। আর মানুষের কথাই যদি ধরা যায়, অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে যে, এ রকম অনেক অভ্যাস বা দোষ—কিছু গুণ আমাদের চরিত্রের মধ্যে ঢুক গেছে, যেগুলি শেখবার জন্তে আমরা কেউ নিশ্চয়ই কখনো সম্ভবভাবে চেষ্টা করি না। সাধারণ মানুষের কাছে এ সমস্ত প্রশ্ন কখনই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি—হবার কথাও নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক যুগ ধরে ঠিক এই জিনিসটা সঠিকভাবে বুঝার জন্তেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। নানা বিচিত্র গবেষণাও করে গেছেন।

শত শত বিজ্ঞানী যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন ঠিক সেই সাধনাতেই সাক্ষ্যলাভ করেছিলেন প্যাভলফ—আইভান পেট্রোভিচ প্যাভলফ।

জারশাসিত রাশিয়ার একজন দরিদ্র পাড়ার ছেলে প্যাভ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর। সেট পিটারসবার্গ (আজকের লেনিনগ্রাড) বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের কৃতিছাত্র প্যাভলফ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে একজন চিকিৎসক হিসেবেই জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্তে ছাত্র-অবস্থা থেকেই প্যাভলফ আগ্রহী ছিলেন। ডাক্তারী করে আর ল্যাবরেটরীতে এসে গবেষণা চালানো শরীর বা মনের দিক থেকে অসম্ভব না হলেও ফুৎসন্তের অভাবে অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা-তথির করে প্যাভলফ একটা অধ্যাপনার চাকুরী জোগাড় করলেন। তারপর শুরু হলো গবেষণা।

মনোবিজ্ঞানের নানা দিকে প্যাভলফের গবেষণার যে সাক্ষ্য দেখা গিয়েছিলো, তার পেছনে রয়েছে প্রাধান্যত দু'জন জার্মান গবেষক-অধ্যাপকের সম্মেলন শিক্ষা। পরিত্রাণ বছর বয়সে প্যাভলফ জার্মানিতে এসে দু'জন জার্মান গবেষক-অধ্যাপক কার্ল লুডভিগ এবং আর পি এইচ হাইডেনহাইন-এর শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। ওঁরা দু'জনেও জীবজগতে সম্ভবভাবে শিক্ষার কাজটা কিভাবে সম্ভব হয় তাই নিয়েই গবেষণা করছিলেন। প্যাভলফেরও আগ্রহ ছিল এই বিষয়েই একেবারে ছাত্রাবস্থা থেকেই।

জার্মানি থেকে ফিরে আসবার পরে একটানা প্রায় বিশ বছর নিজের ল্যাবরেটরীতে নানা পরীক্ষা-কার্যের পরে প্যাভলফ বা আবিষ্কার করলেন—মনোবিজ্ঞানে তা 'কণ্ডিসিং রিসপন্স' নামে খ্যাত।

প্যাভলফের আবিষ্কার মোটামুটিভাবে এইরকম: কোনও কুকুরকে যদি তার খাবার দেখানো বা শোঁকানো যায় তা হলেই তার তালিভারি গ্রাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে থাকে এবং পাকস্থলীর ভেতরেও গ্যাস্ট্রিক রস নির্গত হতে থাকে। এরপর যখন কুকুরটিকে খাবারটা খেতে দেওয়া হয়, তখন ঐ রসের আবিষ্কার বেশ বেড়ে যায়—ভুক্তবস্ত্র পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই এটা হতে আরম্ভ করে। প্যাভলফের এই আবিষ্কার কিন্তু প্রকরণান্তরে সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ব্যবহারী বিশ্বাসেই সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সে সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, খাদ্যবস্ত্র পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছবার পরে কোনও বাস্তবিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই গ্যাস্ট্রিক রস নির্গত হয়। প্যাভলফের আবিষ্কার প্রচলিত ধারণাকে আমূল পাণ্টে দিলো।

চিকিৎসাশাস্ত্রে প্যাভলফ প্রাধান্যত শারীরিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাজেই 'স্বাভাবিকভাবেই' মানসিক কোনও ক্রিয়াকলাপের জন্তেই প্রথমত শারীরিক কারণ খুঁজতেন। এ ক্ষেত্রে

দেখা গেলো, সে অভ্যাস প্যাভলফকে সত্যের সন্ধানই দিলো। প্যাভলফ আবিষ্কার করলেন যে ভোগাস (Vagus) ন্নায়ু শালিভারি গ্রাণ্ডু এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রাণ্ডু থেকে রস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। প্যাভলফ পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ঐ স্নায়ু বিভিন্ন কবে ফেলবার পরে ঐ সমস্ত গ্রাণ্ড থেকে রস নির্গত হওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

প্যাভলফের আবিষ্কারের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু যে 'কণ্ডিস্ড রিফ্লেক্স'-এর সঙ্গে প্যাভলফের নাম গুতপ্রতিভাবে জড়িত সে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা দরকার। 'বেল এক্সপেরিমেণ্ট' বা 'ঘণ্টার সাহায্যে পরীক্ষা-কাণ্ড' নামে সুপ্রসিদ্ধ এই পরীক্ষা-কাণ্ডের ফলে প্যাভলফ এই সত্যই প্রমাণিত করেছিলেন যে, জীবের যে প্রকৃতি বা স্বভাব তা নানা অভ্যাসের ফলে সীমিত এবং তার কারণগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক—দেহের বাইরের কোনো কিছুই তার নিয়ন্ত্রিত হয় না। বেল

এক্সপেরিমেণ্ট হয় এইভাবে : প্রথম একটা কুকুরকে কয়েকদিন ক্রমাগত খাবার দেবার সময় একটা বিশেষ ধরণের ঘণ্টার ধ্বনি করা হতে লাগলো। বলা বাস্তব্য, খাবারের কাছে এলেই কুকুরের শালিভারি গ্রাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে আরম্ভ করলো। এর ফলে দেখা গেলো যে কুকুরটির প্রকৃতি ঐ বিশেষ ধরণের ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, তারপর থেকে শুধু ঘণ্টার ধ্বনি শুনেই, খাবার না পেলেও তার শালিভারি গ্রাণ্ড থেকে রস নির্গত হতে আরম্ভ করেছে।

প্যাভলফ-প্রদর্শিত পথে কিজিভলজিক্যাল সাইকোলজি আজকের দিনে আরো অনেক এগিয়ে গেছে এবং মানুষের মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে দৈহিক কারণগুলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হতে পারে অনেকের ধারণা।

—তীরন্দাজ

# কুজিম-বুটি

মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির কাছ থেকে যখন যেটুকু পারলে নিঃসৃত নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রকৃতি যেটুকু স্বেচ্ছায় দেয় নি, সেটুকুই মানুষ জবরদস্তি করে আদায় করে নিচ্ছে। এটা মানুষের বিজ্ঞানের সাফল্যের কথা; মানুষের অধ্যবসায়ের সাফল্যের কথা।

প্রসঙ্গত একটা ব্যাপার আলোচনা করবো আমরা। সে হলো কৃত্রিম বৃষ্টির কথা। প্রকৃতি আমাদের বৃষ্টি দেয় এবং পরিমাণেও নেহাৎ কম দেয় না। কিন্তু প্রকৃতি দেয় তার পুশ্‌মতো, সব সময়ে ঠিক আমাদের প্রয়োজনের কথা শিবেচনা করে দেয় না। ফলে অনেক সময় আমরা বৃষ্টির অভাব বোধ করি। এই অভাব মোচন করার জন্যে বেশ কিছুকাল ধরেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে আসছেন যে, প্রকৃতি তার খেয়াল-পুশ্‌মতো যেটুকু বৃষ্টি নামাচ্ছে নামাক; কিন্তু আমাদের প্রয়োজনমতোও যাত আমরা প্রকৃতিকে বাধ্য করতে পারি বৃষ্টি নামাতে। এ সংক্ষেপে নানা ধারণা প্রচলিত আছে। অর্থাৎ এমন রচমারি প্রচারকাণ্ড চালানো হয়েছে বিভিন্নমতল থেকে যে, অনেকের ধারণা বিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করলেই যে-কোনও সময় অমনি বৃষ্টি নামাতে পারেন—যেমন অনেকটা শুটচ টিপ বিজ্ঞানীর আলো আলানো তর আর কি। আবার অনেক ব্যাপারটাকে একেবারেই বুজকি বলে মনে করেন। অর্থাৎ কি না বৈজ্ঞানিক ধরা বাধী।

কিন্তু এ ছাড়াও ধারণা কোনটাই পুরা সত্য নয়। ইচ্ছে করলেই বিজ্ঞানীরা বৃষ্টি নামাতে পারেন তা যেমন সত্য নয়, তেমনি বিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিচ্ছেন তাও সত্য নয়। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামাবার জন্যে দেশ-বিশ্বের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতই প্রচুর গবেষণা চাটিয়েছেন এবং এমন পর্যন্ত সে গবেষণা যথেষ্ট সফললাভ করে নি। এ সংক্ষেপে আমাদের দেশ বা অজান্তের আমাদের দেশের

সত্যই বিজ্ঞানচর্চা যে সমস্ত দেশে হয়ে থাকে সে সব দেশের কথা বাদ দিয়ে আশ্রয় বিজ্ঞানের দিক থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব শ্রেষ্ঠ অগ্রণী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করা যাক।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানোর সংক্ষেপে ইউ এস ওয়েদার ব্যুরো মার্কিন বিমানবহরের সহযোগিতায় সব চাইতে ব্যাপক পরীক্ষা-কাণ্ড চালিয়েছে। এই পরীক্ষা-কাণ্ডের জন্মে ১৬০ বর্গ মাইল জলাগার উদ্‌দীপক-এ চর্চা করা হয়েছে। নয়মাসব্যাপী এই পরীক্ষা-কাণ্ডের জন্মে পাঁচটি বিমান এবং পঞ্চাশটি আবহাওয়া অফিস প্রায় দুশ জন আবহাওয়াবিদ বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। লেড অক্সাইড, সিলভার আইওডাইড এবং ডাউ-আইস (বিশুদ্ধ বরফকণিকা) প্রয়োগ করা হয়েছে। নয়মাসে মোট উদ্‌দীপকবাহার বৃষ্টি নামাবার চেষ্টা করা হয় তার ফলে দেখা গেছে :

১। পনেরোটি ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বৃষ্টি নামানো গেছে যখন ক্রিশ মাইলের মধ্যে কোথাও না কোথাও স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটছিল এবং ২। এককোঁটা বৃষ্টিও নামানো সম্ভব হয় নি যখন ক্রিশ থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রাকৃতিক বৃষ্টি না হচ্ছিল।

এই অভিজ্ঞতার ফলেই মার্কিন দেশের বিজ্ঞানীরা আজকের দিনে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা থেকে কার্যত বিরত হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, যে পর্যন্ত না এমন কোনও গ্যাসীয় রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করা না যাচ্ছে যার ফলে বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় (অর্থাৎ বায়ুকে অন্তত কিছু সময় শুষ্ক করে রাখা যায়) সে পর্যন্ত উদ্‌দীপক দ্রব্য করে ততোই লেড অক্সাইড, সিলভার, আইয়োডাইড বা ডাউ-আইস বিচ্ছুরিত করা হোক না কেন—তার ফলে যে নির্দিষ্ট কোনো জায়গার বৃষ্টি নামানো বাবেই এমন কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

—দত্তবিজয়



# কেশভঙ্গ

চুল কাটলেই বাড়ে এবং যতো বেশি ঘন ঘন কাটা যায় ততো বেশি বাড়ে—এই রকম একটা ধারণা আমাদের সকলের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা এতই সাধারণ এবং সহজ-সরল মনে হয় যে, আমরা যেন 'কমনসেন্স' দ্বিষ্টেই ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পরে আজকের দিনে স্পষ্টই বলছেন যে, সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এ ধারণাটা সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ভায়গার চুলের বাড়বার একটা নির্দিষ্ট হার আছে এবং কাটা হোক আর না হোক, তাতে ঐ চুলের বৃদ্ধির হারে কোনও তারতম্য ঘটে না।

মানুষের শরীরে চুল জন্মের দিক থেকে বাড়ে না? (সচরাচর কিন্তু আমরা সেই রকমই মনে করে থাকি)—বাড়ে গোড়ার দিক থেকে। হাত-পায়ের নখের ক্ষেত্রেই আমাদের চুল নিখুঁত। প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের ওপর অল্পটুকু চুলের বৃদ্ধি নির্ভর করে। পনেরো বছরের একটি বিশোধের চুল যে হারে বাড়তে থাকে, পঁয়ষট্টি বছরের একজন ব্যক্তির—যা অল্পটুকু বেশি বায় যে ঐ কিশোরীটির বয়স বড়ো হবে তখন তার চুলের বৃদ্ধির হার অনেক কমে যাবে। কাজেই 'বাক্স' যাচ্ছে যে, জীবনীশাস্ত্র বলতে আমরা যা বৃদ্ধি চুলের বৃদ্ধি শেখছিছোঁ তাই তার ওপর নির্ভর করছে।

একটি চুলের আবু সাধারণত পাঁচ থেকে ছয় বৎসর। ছয় বৎসর হয়ে যাবার পরে গোড়ার শুকনো পাক্তার মতোই একটি চুল তার গোড়া থেকে সমস্ত আপনিই বয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় যে, একটি 'বুড়ো' চুল বয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ভেতর থেকে ঠিক সেই মতোই আবার নতুন চুলের আবির্ভাব ঘটে—এ ঘন জনবহুল ক্ষুদ্রবয়স্কের মতো আর কি।

একজন অধ্যাপক প্রথমে কয়েক মাস ধরে মাইক্রোমিটারের সাহায্যে তাঁর বাল্যদেশের চুলের বৃদ্ধির হার জেনে নিলেন। তারপর পুরো এক বছর ধরে বৃদ্ধির একটা পাশ কামিয়ে ফেলতে লাগলেন এবং অল্প পাক্তার চুলগুলিতে বাজাত-চলতি নানারকম তেল মাখাতে লাগলেন। সাপ্তাহিক পর পর তিনি কামাতে লাগলেন বৃদ্ধির একটা দিক। তারপর এক বছর পরে মাইক্রোমিটারে সাহায্যে বৃদ্ধির কামানো দিক এবং নাকামানো দিকের চুলের বৃদ্ধি হিসেব করে দেখলেন যে একেবারে সমান। যে দিকটা এক বছরে বাহ্যিক বার কামানো হয়েছে সে দিকের চুলের বৃদ্ধির হার অল্প দিকের তুলনায় একটু বেশি নয়।

ঘন ঘন চুল কাটলে বা দাড়ি কামালে স্বাভাবিকভাবেই চুলগুলির উৎসার সক্রিয় এবং মোলায়েম ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই জন্যে তাত বুলোলে 'খসখসে' ভাবটা একটু বাড়ে এবং তারই ফলে আমাদের মনে হয় যে চুল বা দাড়ি বৃদ্ধি এগার খুব ঘন হয়ে উঠেছে—বিশুদ্ধ বাস্তবিক তা হয় না। চুলের স্বাস্থ্য বীরা প্রকৃতই ক্ষেপাতে আগ্রহশীল, ঘন ঘন চুল কাটার চাইতেও তাঁদের যে কাজটি বেশি কল্লীর সে হলো ডাক্তারবাগানের সঙ্গে পরামর্শ করে খাতি-নির্বাচন করা। নানা জিনিসের অভাবে অনেক সময় চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি তথা মৌলিক বাতত হয়।

বেশি চুল কাটলে শরীরের কণ্ঠি হয় বলে সাধারণত একটা দশবার প্রচলিত আছে—সে ধারণাটাও কিন্তু সত্যি নয়। চুল, নখ প্রভৃতি আমাদের শরীরের উপাত্ত-পড়া অংশ বলতেই হয়—কাজেই তা নষ্ট করে ফেললে শরীরের কোনো ক্ষতি প্রকট উঠতে পারে না।

—সুরসিক

## সারসংক্ষেপ প্রীতি

যুগ যুগ ধরে সভ্য-অসভ্য নানা দেশের মানুষ কুকুরকে যে কতো রকমে সোমাস্তি দেবার চেষ্টা করে আসছে, তা ভাষালব্ধ অবাক লাগে। কুকুরের খাবার, কুকুরের পোষাক, কুকুরের বিছানা, কুকুরের প্রাণাধন চাই কি কুকুরের মনোবক্তারের জগৎ অনেক যে পরিমাণ অর্থ এবং সময় ব্যয় করে থাকেন তাও নেহাৎ কম নয়। এর মধ্যে বেশিরভাগই হয় তো ব্যক্তিবিশেষের বিলাসিতার অঙ্গ, স্বার্থো ক্ষেত্রে কুকুরের প্রতি অতিমাত্রায় বড়-আদর তার সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় বলে গণ্য করা হয়; কিন্তু আবার অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রয়োজন হিসেবেই দেখা দেয়—তার নিজে এবং তার পরিবারের জীবনরক্ষার প্রয়োজন। সম্প্রতি এক পণ্ডিতের বিবরণীতে এই শ্রেণীতে প্রয়োজনে কুকুর পোষার কাহিনী জানা গেছে, যা প্রকৃতই চমকপ্রদ।

ব্যাপারটা সত্যি এবং ঘট থেকে বটল প্রায়নার দক্ষিণাফল

অরণ্য-অধুগিত জেলাগুলিতে। এ অঞ্চলটি জনবহুলবিরল। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রাচীন পাঁচ বর্গ মাইল হয় তো মাত্র একজন মানুষের বাস। এখানকার অধিবাসীরা 'ইণ্ডিয়ানস' একটি গোষ্ঠী। এদের বলে 'ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ান'। এরা পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীদের অন্ততম। এরা এভাবে আসে না হলেও আমাদের মতো ধবধর সভ্য নয় (অর্থাৎ খাবার কাগজ পড়েনা, পাণ্ডা পালিত করেনা, খাবার এবং ওষুধ ভেজাল দেয় না, ঘৃণা নেয় না ইত্যাদি ইত্যাদি)।

এই প্রায়-অসভ্য 'ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ানস' তাদের কুকুরের যা যত্ন নেয় তা শুধু নিশ্চয়ই অবাক হতে হয়। এ অঞ্চলে গরম খুবই। গরমে কুকুরদের কোনও কষ্ট বাতত না হয় সেইজন্মে এরা এদের কুকুরদের দিনে অন্তত তিনবার স্নান করায়। স্নান করাত্তে

বাবার সময় কেন অবধা কষ্ট করবে বেচারী। আহা, পায়ে যদি কাটা-টা ফুটে যায়। সুতরাং এরা এদের কুকুরদের কোলে, কাঁখে বা পিঠে করে কাছাকাছি কোনও নদী বা জলাশয়ে নিয়ে যায়, আবার স্নান করিয়ে কোলে-পিঠে করেই বাড়ি ফিরিয়ে আনে। এরা নিজেরা বেশিরভাগই বাস করে পাতার ঘরে, আর বার অবস্থা খুঁই ভালো তাদের দেখা যায় সুরু সুরু গাছের ডাল পাশাপাশি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে পুঁতে বেড়া বানায়—কিন্তু ছাঁউনি এদেরও পাতার। ঘাস মাটি আর এদের ঘরের ময়ের উচ্চতায় কোনও পার্থক্য নেই। কুকুরদের এভাবে রাখা চলে না। কারণ সাপ আছে, নানা জংলী পোকামাকড় আছে, তা ছাড়া নীচ জাহাগতে হাওয়া খেলে না, কাজেই গরমটাও বেশি। তাই দেখা যায় কুকুরদের বাসের জঙ্কে এরা বেশ উঁচু মাচান তৈরি করে। বেউ কেউ আবার দোলা বানিয়েও দেয়।

বাসের জঙ্কে যে কুকুর তার প্রভুর কাছ থেকে এতটা সুরিধে পায়, তার খাবার যে কি রকম হতে পার ত। সহজেই অগ্রময়। বস্তুতপক্ষে এই কুকুররা তাদের প্রভুদের চাইতে অনেক বেশি ভালো খাবারই পেরে থাকে। যদি কখনো খাদ্যবস্তুতে টানাটানি পড়ে তা হলে এদের প্রভুরা বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিজেও এমন কি নিজের সম্ভাবনিক স্বাস্থ্য তরুণতার তার কুকুরগুলিকে খাবার জোগায়। উৎসব এবং পাল-পার্বণের সময় প্রভুরা যেমন নানা রঙে নিজেদের দেহ রঞ্জিত করে, কুকুরদেরও ঠিক তেমনিই করা হয়। কোনও কুকুরী যদি এসবের পরে মারা যায় তা'হলে নবজাতকেরা প্রভু-পত্নীর স্তব্ধের সুরাপানের সুযোগ লাভ করে থাকে। যে কুকুররা এতটা পায় তাদের প্রভুর কাছ থেকে, প্রতিদানে তারা কি দেয় প্রভুকে এবং তার পরিবারবর্গকে? এককথা বলতে গেলে এই কুকুরেরাই এ অঞ্চলের

অধিবাসীদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। অরণ্যস্কুল এই অঞ্চলে জনবসতি এতই কম যে সেখানের অধিবাসীদের রক্ষাবেক্ষণের উপযোগী সরকারের বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত করা কোনো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পক্ষেই লাভজনক (!) হয় না। কাজেই বুটশ সবকারণও তেমনি কিছু করে নি এদের সম্পর্কে। এখানকার অধিবাসীরা তাই নির্ভর করে এদের কুকুরগুলির ওপর।

কুকুরের জ্ঞানশক্তি কখা সর্জনবিদিত। কিন্তু এই ওয়াই ওয়াই ইণ্ডিয়ানদের কুকুরদের জ্ঞানশক্তির সঙ্গে বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলের কুকুরেরই তুলনা করা চলে না। অন্তত মাইগথানেকের মধ্যে নতুন কোনও জন্তু বা মানুষের পদক্ষেপ হলেই এরা ডাকতে আরম্ভ করে এদের প্রভু এবং তার পরিবারবর্গকে সতর্ক করে দেয়। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষের গন্ধে এরা ঘেঁষে মতাবে ডাকতে আরম্ভ করে জন্তু-জানোয়ারদের গন্ধে ঠিক সে ভাবে ডাক না। তার ফলে এদের প্রভুরা এবং তাদের পরিবারবর্গ সহজেই বুঝতে পারে বিপদটা কি ধরণের। বলাই বাহুল্য, এই আগন্তুকেরা, তা মানুষ হোক বা জন্তু-জানোয়ারই হোক, যাই প্রভুর আস্তানার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, এই কুকুরদের ডাকাডাকির তীব্রতাও ঠিক সেই হারে বেড়ে যেতে থাকে এবং তারপর সেই নবাগতকে গিয়ে আক্রমণ করা, সে তো প্রভুর ইঙ্গিত পেলেই শুরু হয়ে যায়।

এই কুকুরদের সঙ্গে বীরা জানেন তাঁরা সকলেই বলে থাকেন যে, এই কুকুরগুলি তাদের প্রভু বা প্রভুর পরিবারবর্গের কাছে মেয়শাবকের মতো হলেও প্রভুর শত্রুর কাছে এরা সাক্ষাৎ যমদূত।

—শিকারী

## নেই তাই খাচ্ছ

মৃগাক্ষি কালিগাশ বলেছিলেন একদা,—

‘নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?’

হার রহস্যচ্ছলে এ বাক্য উচ্চারণ করার সময় ভ্রমেও হস্ত ভাবেন নি তিনি যে ভবিষ্যৎ জাতির জন্তু কি মহান আশুবাচ্যই না রেখে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি শহর কলকাতার তাৎ জনসাধারণ উপর্যুক্ত বাক্যটির মহিমা স্তব্ধস্বর কণ্ঠে প্রতি শ্রুত্রে প্রতী পলে। বিশ্বাস না হয় চলে আশ্রয় বাজারে দেখবেন সর্বত্র, সর্বগ্রাসী এক নেই নেই রব, নেই—চালের দোকানে চাল, তেলের দোকানে তেল, মাছের দোকানে মাছ। আপনাব প্রাঙ্গণের উত্তরে দোকানী এক উচ্চস্বরে হাসি হাসবে, যেন ঐ সব বস্তু আছে কি না জানতে চাওয়াটাই আপনার মৃত্যু বা ধুঁকটা, তারপর বর্ষধর ঈশ্বর নাড়িয়ে বলবে আপনার হতাশা দর্শনে—‘আছে শ্রাব মাল, এক্ষেবারেই কি নেই তবে এক নম্বর মাল নিতে গেলে দামটা একটু বেশি লাগবে, দিতে পারবেন কি?’ বলা বাহুল্য, শোনা মাত্র উদ্বাহ হবেন আপনি, জানতে চাইবেন কত লাগবে?

এবার বৈকল্যোচিত বিনয় প্রকাশ পাবে লোকনরি মুখে, মরমিয়া

স্তরে যে কথা নিবেদন করবে, তা শুনে মূরে-পড়া রাজ্যবতী লতার মত আশ্বে আশ্বে স্থানত্যাগ করাই স্রো মনে করবেন আপনি, কারণ ডি-এ, টি-এ নিয়ে আপনার মাসিক আয় মাত্র আড়াইশো টাকা, এই টাকার চাব-পাটজেন লোকের সমস্ত সমস্ত সামান্য কয়েক সংসার চালাতে হয়, কাজেই সাড়ে চারটাকা কিলোর তেল বা চল্লিশ টাকা কিলোর চাল, আপনার পক্ষে চিত্রহারকা বৈজয়ন্তীমালার সামগ্র্য পাওয়ার মতই তুলত।

শুধু মনে, শুধু হাতে, বাড়ির দিকে চলবেন আপনি, প্রতীক্ষমণী গৃহিণী যেখানে তৈলাভাবে প্রায় ফুটন্ত লাভ্যস্ত্রোত্তের মতই টগবগ করছেন। এবার আশ্রয় অল্পত অর্থাৎ কাঁচা বাজারে, সল্যায় সরকার মাছের দাম হ্রদে দিয়েছেন আর পাচজনের মত এক-খবরটা আপনার কানে এসেছে স্তব্ধতা ভোরবেলা প্রাত্যহিক চারের পেয়ালাটা নিঃশেষ করে বেশ প্রসন্নমনেই বাজারের দিকে ধাবিত হলেন, গৃহিণী মাথার দিবি দিয়ে বলে দিয়েছেন মাছের মাথা জানতে যন তুল না হয় মুড়িকট হয় নি কতকাল; ছোট খোকা আবার চিড়ি মাছ বলতে পাগল, ছেলেটার আঙ্গ জন্মতিথি—কাজেই যদি পাওয়া যায় একটু চিড়িও যেন নেওয়া হয়, তা ছাড়া ঘর করতে কাটাপানো তো আছেই, আহা, কতদিন

## নেই তাই খাচ্ছ

যাহ পাতে পড়ে না, দুখপেট্টা সরকারের এতদিনে তবু হুঁস হল।

যাক, ফর্দ পকেটে বীরদর্পে তো এলেন মাছের বাছারে। গুড়ের হাঁড়ি ঘেঁষে মাছির জটিলার মতই এ-একটা জায়গায় কালো কালো মাথার জটল। দেখেই আশ্চর্য করে নিলেন, ওইসব জায়গাতেই আছে প্রাণিত ধন। অবশ্য মাছওয়ালা বা মাছ চাকুয় করতে একটু বেগ পেতে হল। দেড়শো জনের কলহইয়ের ঝুঁতো থেয়ে শরীরটা একটু অগ্রসর হলে পর দর্শন মিলে। গলাটা স্বাভাবিক চড়িয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রার্থনা করলেন। প্রায় মিনিট পনেরো কণ্ঠস্বর নাচ করার পর মেছো বা মেছুনীর দুটি পড়ল আপনার দিকে।

নির্ধিকার ক্লিরাঙ্গ দুটিতে আপনার শব্দিক বারেকের তরে চেয়ে দেখল, অল্পকম্পাতরা কণ্ঠে আদেশ প্রচারিত হল,—‘ঝুটুঝুটু চিলাচ্ছেন কেন বাবুশারী? লাইনে দাঁড়ান।’

—‘লাইন?’ সভয়ে হৃদয়স্বয় করলেন যে ওই দেড়শো জন ভাগ্যবানের হয়ে গেলে কবেই মন্ত্র-ভাগ্যবিধাতা আপনাকে কৃপা করবেন—হাতখড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন একবার, গৃহীণীর রক্তচক্ষু স্মরণ করলেন একবার, তারপর ছল্লের মত ব্রাহ্মণ করে ঈশ্বরের সাধনার ধনের কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করলেন একবার, কিন্তু হল না

কিছুই। বাঙালী যে এতটা ডিসপ্লিনের ভক্ত তাও তো জানা ছিল না। শতকণ্ঠে বিকৃত হলেন যে আইনী প্রাচীরের ভগ্ন নিপুণ গোলরক্ষকের মতই সামনের সারি আপনাকে আবার স্বত্বান্নে কথান্নে পিছনে পাঠিয়ে দিল। দুর্গা স্ত্রীর থেকে যতজনের নাম স্মরণ হল, অভিমানভরে তাঁদেরই স্মরণ করলেন মনে মনে। নাকের বদলে নকর্ণের মত মাছের বদলে কয়েকটি ডিম সংগ্রহ করে, তরকারীর বাজার অভিমুখে পা চালালেন। সেখানে অবশ্য ফোড়ের কোন কাপড় ঘটল না, সবই পায়ে। যাচ্ছ এবং ভেরলোকের কথার মত একদামে। দেখা গেল সেখানে ভাতা বলে কিছু নেই, উচ্ছে, পটল, আলু, ঝিঙে সব একদর; সাম্যবাদের এমন জগন্ত নির্দেশে বিমুগ্ধ হৃদয়ে যথাস্থিতি সংগ্রহ করলেন কিছু, তারপর ফিরে চললেন হোম—সুইটহোমে।

পথ চলতে চলতে কিছু দার্শনিক-চিন্তার উদয় হল আপনার মনে। বাজারে যা মেলে না, তা মেলে কালোবাজারে অর্থাৎ বর্ধিত দামে। তা হলে কালোবাজারী বা নেপথ্য ব্যবসায়ী বেঁচে আছে বা করে থাকে শুধু একটা নেতিবাচক অস্তিত্বের মাধ্যমে। আপন মনেই বলে উঠলেন এবার—

‘নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?’

কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।’ —শ্রীমতী

## পশুপ্রীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে

গত কয়েক দশকে চিকিৎসার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে বহু কাজ হয়েছে। চিকিৎসার এই শাখার নাম মামুয় ও পশুর রোগ। মামুয় ও তার গৃহপালিত পশু উভয়কে যে-সব রোগ আক্রমণ করে সে সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর একদল চিকিৎসক তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। বিশ্বব্যাপ্ত্যসংস্থার হিসাবে এতাবৎ এই রোগসমূহের সংখ্যা আশি। এর মধ্যে সাতচোরে পুরাতন প্রেগ। এক থেকে তত্ত্বজ্ঞানে এই রোগ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়ায়। পশু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। প্রেগের জবাগু মশার মাধ্যমে ছাঁড়র থেকে মামুয়ে সাক্রমিত হয়। মহামারী আকারে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগে দলে দলে ছাঁড়র মরে। আজও মাঝে মাঝে এশিয়ায় কোন কোন দেশে প্রেগ দেখা দেয়। কিন্তু ১৭২০—২১ সালে ফ্রান্সে মার্সাই শহরে প্রেগ মহামারীর পর যুরোপ আর কখনও প্রেগের আবির্ভাব হয় নি।

জলাতন আর একটি রোগ যেটি মামুয় ও পশু উভয়কেই আক্রমণ করে। এই রোগে আক্রান্ত মামুয় বা পশু শরীর খিল ধরে ও ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। সাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পশুর টিকা গ্রহণ করলে এক্ষণে জনের মধ্যে নিরানব্বই জন ঝুঁকতে পারে কিন্তু দেরি জল বাচানো মুশকিল। এই রোগ যে কেবল কুকুর, শিয়াল এবং খঁচস থেকেই ছড়ায় তা নয়, বাড়ুড় থেকেও হতে পারে। গত বছর পশ্চিম জার্মানিতে এই রোগে

প্রায় তিনশত জানোয়ার মারা পড়েছে। সেকালের অপর একটি বদরোগের নাম গ্রন্থিরোগ (গ্যাংগার)। রোগটি ছোঁচাচে এবং জোড়া-দুই পশুদের থেকে মামুয় ও বিড়ালের মধ্যে ছড়ায়। এর বীজগু মামুয়ের চোখ ও শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের যোগাযোগকারী কিল্লিতে আক্রমণ করে। এই রোগ যে ভীষণ ছোঁচাচে তার প্রমাণ এক লাংঘে টেরীতে এই রোগবীজগুভরা একটি শিশি ভেঙ্গ বাওরায় ল্যাবরেটরী; সব লোক মারা যায়। একজন ছাত্র এই রোগে অসুস্থ এক ঘোড়ার চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা পড়ে। সেই ছাত্রের শরীর-পরীক্ষারত চিকিৎসকও এই রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। আজকাল পশ্চিম জার্মানীর সব সীমান্ত জোড়ী-দুই পশুদের পরীক্ষা করা হয় এবং রোগের সামান্য আভাস ধরা পড়লেই সেই পশুকে মেরে ফেলা হয়।

আধুনিক এক গবেষণার ফল দেখা গেছে যে, বক্ষ্ম-রোগাক্রান্ত গরুর দুগ থেকে মামুয়ের মধ্যে বক্ষ্ম ছড়ায় না ছড়ায় সেই গরুর নিঃশ্বাস থেকে। এই থেকে মেনিনজাইটিস হয়। মামুয়ের অপেক্ষা কুকুর ও বিড়াল এইভাবে বক্ষ্মাক্রান্ত হয়। খুব ছোট ছেলেমেয়েও অবশ্য বক্ষ্মাক্রান্ত গরুর দুগ থেকে পোনের গোলমাল ভোগে।

এ ছাড়াও ছাগল, গরু-মহিষ এবং শূকর থেকে বস্তুরোগের রোগ হয় যেগুলির প্রাণ্ডুর্ভাব আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং আশ্চর্যের বিষয় সেইসব রোগ কখনও ৪৬ ডিগ্রি অক্ষরেখার দ্রুমী দলবার না। —ডি এ ডি।

# বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থী

অতীত ইতিহাসের পাতা ওপ্টালে দেখা যায় জ্ঞানভিক্ষু বিধ্বংসন মহান শিক্ষকদের নিকটে শিক্ষালাভের জগৎ দেশে-বিদেশে গিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, ভারত প্রভৃতি দেশে যে প্রজাতীর্থসমূহ গড়ে উঠেছিল, তাঁরা তাতে সমবেত হয়েছেন। তখন ভারতের তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী, কাপী, কাশী ছিল বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষার পীঠভূমি। তক্ষশীলায় ভৈরবজিজ্ঞান, উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং নালন্দায় বিক্রমশীলা, বল্লভী, কাপী, কাশী ও মথুরায় জায়ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র চর্চাব জগৎ মধ্য এশিয়া, সিংহল, ত্রয়াদেশ, চীন, ইন্দোচায়না, ইন্দোনেশিয়া এমন কি তদূর কোরিয়া থেকেও বিদেশী বিদ্যার্থীরা ভারতে আসতেন।

সে যুগ আর নেই। আজ যুগের প্রয়োজন অনুসারে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম দর্শনের তুলনায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিষয়ের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন ভারতের পুনর্গঠনের যে আয়োজন চলছে, তাতে নতুন নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ভারতে গড়ে উঠছে এবং দেশ-বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা বিনিময় চলছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষালাভের জগৎ বহু ভারতীয় বিদ্যার্থীও এই সব দেশে যাচ্ছেন এবং এই সব দেশ থেকে সাহিত্যাদি অল্পশীলনের উদ্দেশ্যে বিদেশী বিদ্যার্থীরাও এদেশে আসছেন।

১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত বিদেশে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল—চৌদ্দ হাজার দু'শো তেরো জন। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন আমেরিকায় এবং তিন হাজারের কিছু বেশি যুক্তরাজ্যে।

বিদেশী বিদ্যার্থীদের উচ্চতর শিক্ষালাভে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন ও একত্রে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হয়ে থাকে। এই কারণেই প্রতি বছর সেখানে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৬২-৬৩ শিক্ষা বছরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে ১৮০৫টি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে ১৫২টি বিদেশী রাষ্ট্রের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৪৭০০ জন। প্রতিবৎসী রাষ্ট্র কানাডার বিদ্যার্থীদের দলটি সব থেকে বড়। এই দেশের ৭০০৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এই সময়ে আমেরিকায় পড়াশুনা করত। কানাডার পরে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ছ' হাজার এক শত

বাহার জন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী তখন আমেরিকায় ছিলেন। ১৯৫০ সালের তুলনায় এদের সংখ্যা দ্বিগুণ।

এ সব ভারতীয় বিদ্যার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং ও ভৈরবজিজ্ঞানের ছাত্র। মাত্র কয়েক বছর আগে শিল্পকলা ও সাহিত্যাদি (হিউম্যানিটিজ) অল্পশীলনের জগৎ ভারতীয় বিদ্যার্থীরা আমেরিকায় যেতেন। কিন্তু নবভারত গঠনের জগৎ প্রয়োজন অধিকতর সংখ্যায় ইঞ্জিনীয়ার ও টেকনিশিয়ান। তাই শিক্ষাদি অল্পশীলনের উৎসাহ দেওয়া হয় নি। ফলে এই সব বিষয়ে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সেখানে কমে গেছে।

তবে আট হাজার মাইল দূরের এই দেশটিতে কেন এত বেশি সংখ্যায় ভারতীয় বিদ্যার্থীরা যায়? বিজ্ঞা অজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা তা অস্বাভাবিক দেখাতে পারে। এর উত্তর বলা যায় শিক্ষার সব ক্ষেত্রে অতি উচ্চমান সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ সাধারণত সর্বাধুনিক শিক্ষালানপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন এবং শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান অধ্যাপকগণকে নিয়োগ করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা যে অসংখ্য বৃত্তি, ভ্রমণ-বৃত্তি দিয়ে থাকেন, সে সকল বৃত্তি ছাড়া বিদ্যার্থীরা আমেরিকায় এসে অস্বাভাবিক দেশের তুলনায় অর্থোপার্জনের অধিকতর সুযোগ-সুবিধাও পেয়ে থাকেন, তৃতীয়ত আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশও তাদের মনোমতই হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে খাজ-খাবার কোনরকম সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। অধিকাংশ রেস্টোরাঁ ও ক্যাসেটেরিয়া নিরাপত্তা ও আমিষ দু'রকমেরই নানাপ্রকার খাদ্য পরিবেশন করে থাকে। ফলে পানভোজন সম্পর্কে অসুবিধাও খুঁজতে লোকেরও খাদ্যাদি ব্যাপারে কোন অসুবিধার পড়তে হয় না। আমেরিকায় আসবাবপত্র সমেত বাড়িভাড়াও সহজেই পাওয়া যায়, চতুর্থত বিদেশীদের প্রতি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমেরিকাবাসীদের মনোভাব, তাদের মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে আপন করে নেওয়ার জগৎ সেখানে বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান নানাভাবেই বিদ্যার্থীদের সাহায্য করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফরেন স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ফেডারেলড উইমেনস্ স্লাব, লীগ অব উইমেন ভোটার্স, এক্সপেরিয়েন্স ইন ইন্টারন্যাশনাল লিডিং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগে থেকেই এদের খবর দিয়ে রাখলে, বিদ্যার্থীরা যেদিন যেখানে এসে পদার্পণ করবে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সেইদিন ঐস্থানে গিয়ে নবাগত বিদ্যার্থীদের কাঙ্ক্ষিত বা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও অস্বাভাবিক বিষয়ে সাহায্য করে থাকেন, পরে আবার এদের জগৎ এই সকল স্বেচ্ছাসেবক পিকনিকের এবং আমেরিকার

## একফালি চাঁদ ও অনিদে'শ যাত্রী

বিভিন্নস্থান পরিদর্শনের জন্য সফরের ব্যবস্থা করে থাকেন, এঁরাই এদের মার্কিন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, মিলন বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। মিনেসোটার মত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কৃতি ও প্রবণতাসম্পন্ন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মার্কিন সাথ জুটিয়ে দেবার অভিনব পরিকল্পনা ব্যতীত আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা দপ্তর রয়েছে।

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আমেরিকা এই প্রকার শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখে যে, দেশের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা প্রতিবছরই হোয়াইট হাউসে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকেন। পর্যালোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সনে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে বলেছিলেন—

‘আমরা আপনাদের জন্য চাই স্বাধীনতা, চাই উন্নততর জীবন—আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে মিত্রতা—আপনারা আমাদের অতিথি—আপনাদের স্বারা আমরা উপকৃত—আপনারা যতদিন

এখানে থাকবেন, সেই সময়ে আপনারা যা শিখবেন তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের শেখাবেন।’

এই কয়টি কথার মধ্যেই বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে মার্কিন মনোভাবের পুরো চিত্রটি পাওয়া যায়। এ বছরেও ঐ ধরনের একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জনগণের অভিনন্দনবাণীতে আমেরিকার মূল আদর্শ অভিযুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

‘মার্ক্সের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কোন একটিমাত্র আইন, একটিমাত্র পদ্ধতি বা ধারণার মাধ্যমে অভিযুক্ত হতে পারে না। আমেরিকা থেকে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা কি নিয়ে আসেন, কি শিখে আসেন, তারা বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিজ্ঞান-কৌশল আশ্রয় করা ছাড়া, মানবিক মর্যাদা, স্বাধীনতা ও বিদেশীদের প্রতি আতিথেয়তা এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিয়ে আসেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দূর অতীতের মতই আজও শিক্ষার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান চলছে।

—সন্ধানী।

## একফালি চাঁদ

### ত্রিনিখিলরঞ্জন মাইতি

দিনের শেষে স্নান-আকাশে—

একফালি চাঁদ উঠল হেসে,

দীর্ঘির পাড়ে বাঁশের বনে—

লক্ষ তারার ঝিলিক হেনে।

চোরে ছিলাম আপন মনে

আধখোলা ঐ বাতায়নে,

ভাবতে ছিলাম মনের কথা

চাপা দিয়ে কথার গাথা।

খোলা চাঁদের পরশ লগে

মন-কমলে উঠল লগে,

গোপন প্রিয়র মিষ্টি হাসি

মনের সর্ব বাঁধন নাশি।

মুহু বায়ু দোল দিয়ে যায়—

ব্যাঙ্কল মনে গোপন-কোঠার,

তোমার স্মৃতি আঁকতে মনে

আধখোলা ঐ বাতায়নে।

চাইছি তোমার বায়ে বায়ে

পাই না তোমার ক্ষণের তরে,

জানাই তোমার অঙ্গনীরে—

শেষ কথাটি—‘ভালোবাসি প্রিয়ে।’

## অনিদে'শ যাত্রী

### সলিল চট্টোপাধ্যায়

আমার এ প্রাণে এসেছিল কত ভাষা

দিতে পারি নি কো'র সুর মেটে নি কো'র আশা।

সেদিন প্রভাতে, সারাদিনে, সাঁঝে

গেয়েছি কত যে গান।

স্বখে-দুখে মিলে গিয়েছে ভরিয়া

আমার পিপাসু প্রাণ।

মধুর নিশীথে চাঁদ তারা তলে

ব'লেছি কত যে কথা।

তারা সব আজ দিয়ে চলে শুধু

অসহ অশেষ ব্যথা

এ বেদনা হয়, না পারি ভুলিতে

না পারি বলিতে কারে।

তাই মন উড়ে গিয়ে সন্মুখেতে

বেন সে কাঁদিতে পারে।

# হেতু অসি শ্রীমদ্রামায় অসিহুতু হেতু

৭১

হরিদাসের তিরোধানের পর থেকেই প্রভুর চিত্ত বিষন্ন! কৃষ্ণবিনহুতিতেই এই বিষন্নতা। অহরহ প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জন্তে কাতরতা।

‘হাহাকৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন।’

মনে স্বস্তি নেই স্বাস্থ্য নেই, স্বরূপ আর রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলে রাত কাটান। সমস্ত রাত্রিই এখন কৃষ্ণরাত্রি

এদিকে গোড়ে ভক্তদের আয়োজন চলেছে আবার প্রভুদর্শনে নীলাচল যাত্রা করবে। নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যেন নবদ্বীপ না ছাড়ে, তবু আদেশ অমায়াক করে পে চলেছে। চার ভাই আর স্ত্রী মালিনীকে নিয়ে চলেছে শ্রীবাস। সস্ত্রীক শিবানন্দ, সঙ্গে তাদের তিন ছেলে। বাসুদেব মুরারি পুণ্ডরীক তো আছেই, বালি সাজিয়ে রঘুনাথ। আরো অনেকে। শচীমাতা সকলকে আশীর্বাদ করে দিলেন।

দলের নেতা শিবানন্দ, রাস্তাঘাট সযত্নে সেই পাকা লোক। ঘাটিয়ালকে পথকর দিয়ে ছাড় নিতে সেই ভালো পারবে।

একদিন ঘাটিয়াল সবলকে আটক করল। ঠিকঠাক কর দাও।

‘ওদের ছেড়ে দাও। সকলের হয়ে আমি দেব।’ শিবানন্দ হুমকে উঠল: ‘নাও, হিসেব করো।’

আর সকলে ছেড়ে দিল ঘাটিয়াল। তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পাছতলায় অপেক্ষা করতে লাগল। শিবানন্দ হিসেব চুকিয়ে ঘিরে এলে পর থাকবার জায়গা ঠিক হবে।

ঘাটি থেকে ফিরতে শিবানন্দের দেরি হচ্ছে।

খিদের আলায় নিত্যানন্দ অস্থির হয়ে উঠেছে। শিবানন্দই খাবার বন্দোবস্ত করবে অথচ তার এখনো ফেরবার নাম নেই। কী এত হিসেব যে এতক্ষণ দেরি হবে! তার জন্তে এতগুলি লোক না খেয়ে মরবে নাকি?

অসহ্য। নিত্যানন্দ শাপ দিয়ে বসল। বললে, ‘ও এখনো ফিরছে না? ওর তিন ছেলেই মারা যাবে।’ শিবানন্দের স্ত্রী কাঁদতে বসল। এ কী অকারণ। তখনই ফিরল শিবানন্দ।

স্ত্রী কেঁদে পড়ল। ‘কেন ফিরতে দেরি করলে? থাকবার খাবার জায়গা এখনো ঠিক হয় নি দেখে গোঁসাই শাপ দিয়েছে, তোমার তিন পুত্রই মারা যাক।’

‘তুমি তার জন্তে কাঁদছ কেন? মরুক, আমার তিন পুত্রই মরুক,’ শান্তমুখে বললে শিবানন্দ, ‘গোঁসাইয়ের সব বালাই নিয়ে তারা চলে যাক।’

শিবানন্দ নিত্যানন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তখনই নিত্যানন্দ তাকে লাথি মারল।

পদপ্রহার না আশীর্বাদ! আনন্দে বিহ্বল হল শিবানন্দ। গ্রামের মধ্যে গিয়ে তখনই বাসুদেব ঠিক করে এল। চলুন সকলে। অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়।

বাসায় সকলকে নিয়ে গিয়ে শিবানন্দ নিত্যানন্দকে বললে, ‘আমার মত অসুস্থ কার, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। শাস্তির ছলে করুণা করলেন আমাকে। আপনার চরণরেণুর স্পর্শে আমার অধম দেহ পবিত্র হল, মনে জাগল কৃষ্ণভক্তি। আমার জন্ম-কুল-কর্ম সার্থক হল।’

নিত্যানন্দ শিবানন্দকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করল।

সবাই ভাবলে এ কী বিচিত্র ব্যবহার। যার প্রতি দ্রুত হলেন তাকেই আবার কৃপা করলেন। লাথি দিয়ে পরে আলিঙ্গন।

শিবানন্দের ভাগনে শ্রীকান্তের সহ্য হল না। সে বলে ফেলল, ‘মহাপ্রভুর পার্শ্ব আমার মামা, তাকে লাথি মারা গৌঁসাইয়ের উচিত হয় নি। আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি নাশিশ করতে।’

সটান গিয়ে প্রভুর পায়ে দণ্ডবৎ করল শ্রীকান্ত।

গোবিন্দ বললে, ‘গায়ের জামা খোলো, খালিগায়ে দণ্ডবৎ করো। বজ্রাবৃত দেহে ভগবৎপ্রণাম অপরাধ।’  
‘আহা-হা, থাক, ওকে বাধা দিও না।’ প্রভু গোবিন্দকে বাধা দিলেন : ‘এ বালক মনে ছুঁতে নিয়ে এসেছে, ওর যেমন খুশি তেমনি করুক।’

প্রভু তাঁহলে সমস্তই জানতে পেরেছেন! বালক অবাক হল। তা হলে সবিস্তার নাশিশ করবার আর দরকার কী!

সবাই এসে পড়ল, দর্শন করল প্রভুকে। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত পলকে ঠিক হয়ে গেল, কারও কোনো অভিযোগ রইল না।

তিন ছেলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শিবানন্দ।

‘তোমার এই ছোট ছেলেটির নাম কী?’ জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

‘পরমানন্দ দাস।’ বললে শিবানন্দ।

‘ও! এই আমার পুরীদাস?’ প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

আগে কোনো এক বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে সঙ্গীক অবস্থান করছিল তখন প্রভু বলেছিলেন, তোমার এবার যে ছেলেটি হবে তার নাম পুরীদাস রেখো।

নীলাচলেই মাহুগর্ভে আবির্ভূত হয়েছিল বলেই তার নাম পুরীদাস। পোশাকী নাম পরমানন্দ দাস।

এই পুরীদাসই কবি-কর্ণপুর।

বালকের মুখে প্রভু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ চুকিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হোক।

গোবিন্দকে বললেন, ‘যতদিন পর্যন্ত শিবানন্দের প্রকৃতি আর পুত্র গ্রন্থানে থাকবেন আমার ভৃত্যবশেষ পাবেন।’

শ্রী-শব্দ উচ্চারণ করেন না প্রভু। বলেন, প্রকৃতি।

নবদ্বীপ থেকে পরমেশ্বর মোদক এসেছে। প্রভুর গৃহের কাছেই তার ঘর, কত মোয়া-নাড়ু খাইয়েছে প্রভুকে, বাল্যকাল থেকেই প্রভুর প্রতি অনির্বাক স্নেহ। এবার সেও চলে এসেছে। সেই নয়নমণিকে একবার দেখে আসি।

‘আমি পরমেশ্বর।’ মোদক দণ্ডবৎ করল।

‘তুমি—তুমি এসেছ?’ প্রভু প্রীত হলেন : ‘বা, এসে ভালো করেছে। সব কুশল তো?’

‘মুকুন্দের মা-ও এসেছে।’

পরমেশ্বর ভেবেছিল তার স্ত্রী, মুকুন্দের মাকে দেখেও প্রভু খুশি হবেন। ছেলেবেলায় প্রভু কত আদর আপ্যায়ন পেয়েছেন এই মুকুন্দের মার কাছে। সে কি আর ভালবার?

কিন্তু প্রভু সঙ্কুচিত হলেন। কোনোক্রমেই যে তাঁর কাছে স্ত্রীপ্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয় তা মোদক কী করে জানবে? সে সরল, চাতুর্যের ধার ধারে না। তারই জগে স্ত্রীপ্রসঙ্গে তার অপরাধ হলেও প্রভু তা উপেক্ষা করলেন। মুকুন্দের মা মালিনীর মতই দূর থেকেই প্রভুকে দেখে গেল।

প্রতিবারের মত এবারও যথারীতি গুণ্ডিচামার্জন হল, হল রথাগ্রনর্তন। সেই চাতুর্যাস্ত, সেই সব যাত্রা, উৎসবলীলা। প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন প্রভুকে ভিক্ষে দেওয়া। সর্বত্রই শুধু ভক্তি-প্রীতির ঢেউ।

‘প্রতি বৎসর কত কষ্ট করে তোমরা আস।’

প্রভু পৌড়-ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আসতে-যেতে কত রেশ। তবু তোমাদের বারণ করতে পারি না। তোমাদের সঙ্গলাভে যে আমার সুখ হয়। আর বারণ করলেও নিত্যানন্দ শুনেছে কই? অর্ধদৈতেরই বা আমার প্রতি কত কৃপা, কত দুর্গম পথ লঙ্ঘন করছেন প্রতিবার। স্ত্রী-পুত্র-গৃহস্থ সব ছেড়ে এমনি চলে আসা সহজ কথা নয়। আমার কোনো পরিশ্রম নেই, আমি তো নীলাচলেই বসে আছি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ্য, আমার কোনো ধন নেই, কী দিয়ে তোমাদের স্বাগত আমি শোধ করব? শুধু আছে আমার এই দেহ তাই তোমাদের সমর্পণ করে দিলাম। কে চায় বলা তাকেই আমি আমার দেহ বেচে দিতে পারি। আমার এ দেহ তোমাদেরই জিনিস, তোমাদেরই সম্পত্তি।

প্রভুর কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগল সকলে।

কেউ আর ছেড়ে যেতে চায় না। ফেরবার দিন পরিয়ে যাচ্ছে, তবু কারু বাড়ি যাবার নাম নেই। হুমি বিকোবে কী, তোমার গুণে সমস্ত জগৎ যে তোমাতেই বিকিয়ে আছে।

প্রবোধবাক্যে সবাইকে সুস্থ করলেন প্রভু। নেত্যানন্দকে বললেন, ‘তুমি বার বার এসো না, আমিই ওখানে তোমার সঙ্গ নেব। অনেক দিন হয়ে গেল, এবার সকলে ফিরে যাও।’

কেন ফিরিয়ে দিলেন কে বলবে। ঈশ্বরের আচরণ দ্বীপ কী করে বুঝবে? তাই সবাই শান্তমুখে ফিরে গেল।

‘ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝি না যায়।

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥’

প্রভুর কথামত জগদানন্দ নবদ্বীপে শচীমাতার সঙ্গে দেখা করল।

‘তোমাকে এসব প্রসাদী বস্ত্র মালা চন্দন আর হোপ্রসাদ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন প্রণাম আর বনয়স্তুতি।’ প্রভুর হয়ে জগদানন্দই দণ্ডবৎ করল।

শচীমাতার আনন্দ দেখে কে। ‘বলো আমার নেমাইয়ের কথা বলো।’

প্রভু যে এখানে খেতে আসেন, আর শচীমাতা য সেটাকে স্বপ্ন বলে ভাবে সেইসব কথা অনেক ললে জগদানন্দ। আরো আরো কত কথা। চৈতন্যের সুখকথা।

সেই কথাই বিলোতে লাগল ঘরে-ঘরে। ঘরে-ঘরে শুধু নয়, জনে-জনে বিলোতে লাগল চৈতন্য।

শেষ পর্যন্ত শিবানন্দের বাড়িতে এসে উঠল, প্রভুর হৃদয়ে বহু যন্ত্রে চন্দনাদি তেল তৈরি করল। এ তেলে পাখা ঠাণ্ডা হয়, পিন্তের দোষ কাটে। প্রভু কীর্তনে স্তম্ভ থাকেন, কৃষ্ণবিরহরঞ্জে রাত জাগেন, আহায়ে মসময় হয়ে যায়, জগদানন্দের খারণা হল এ তেলে ঠার উপকার হবে।

মনোহরণ পদ্ধতি মিশিয়ে সে তেল কলসীতে করে গীলাচলে নিয়ে চলল।

গোবিন্দকে বললে, ‘এ তেল প্রভুর সঙ্গে মাথিয়ে পাও।’

গোবিন্দ, প্রভুর সমীপস্থ হল। বললে, ‘জগদানন্দ চন্দনাদি তেল তৈরি করে এনেছে। তার ইচ্ছা সে তেল আপনি একটু মাথায় দেন। তাতে পিত্ত আর

বায়ু শান্ত হবে। এক কলস নিয়ে এসেছে। পদ্ধ কী সুন্দর!’

প্রভু বললেন, ‘তেলে সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। তারপরে সুপদ্ধ! সে অত্যন্ত লজ্জার কথা। এ তেল জগদানন্দকে দাও—সে তেলে তাঁর দীপ জ্বলবে আর তাইতে জগদানন্দেরও পরিশ্রম সার্থক হবে।’

জগদানন্দ জানতে গেল প্রভুর প্রত্যাখ্যানের কথা। অভিমানে মুখ ভার করে রইল।

জগদানন্দের দুঃখ গোবিন্দের মনে গিয়ে বাজল। দিন দশ বাদে আবার সে প্রভুর কাছে নিবেদন করল। ‘একটু তেল মাথলে পণ্ডিতের মনোবাক্স পূর্ণ হয়। তাই বলছিলাম—’

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন। ‘তা হলে মর্দন করতে একজন পালায়ান ডেকে নিয়ে এস। এই সুখের জন্মেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! এ তেল মাথায় মেখে আমি রাস্তায় বের হই আর সকলে বলাবলি করুক, আমি ব্রীলোকের মনোরঞ্জন করবার জন্মে পদ্ধ মেখেছি। আমার সর্বনাশ নিয়ে তোমরা পরিহাস করতে চাও?’

গোবিন্দ চুপ করে গেল।

পরদিন এল জগদানন্দ। প্রভু তাকে বুঝিয়ে বললেন, ‘আমি তো সন্ন্যাসী এ তুমি ভুলে গেলে? তবে তুমি এ পদ্ধতে গৌড় থেকে নিয়ে এলে কেন? আমাকে কি তা ব্যবহার করা সাজে? এ তেল জগদানন্দকে দাও, তাঁর প্রদীপে এ দন্ধ হোক।’

‘কে তোমাকে বললে যে এ তেল আমি গৌড় থেকে এনেছি? মিথ্যেকথা।’

জগদানন্দ অভিমানে রুখে উঠল: ‘এ আমি আনি নি। কখনো না।’ বলে ঘরের ভিতর থেকে তেলের কলসী নিয়ে এসে আঙিনায় প্রভুর সামনে আছাড় মারল। কলসী চৌচির, সমস্ত আঙিনা ভেসে গেল। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল নিজ ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে রইল।

পরদিন প্রভু এসে হাজির। অনেক ডাকাডাকিতেও উঠল না জগদানন্দ। খুলল না দরজা।

‘শোনো, আজ মধ্যাহ্নে আমি তোমার এখানে ভিক্ষা নেব।’ প্রভু বললেন বাইরে থেকে: ‘তুমি নিজের রান্না করে দেবে। আমি যাই স্নান-দর্শন করে আসি।’



তখন জগদানন্দ না উঠে করে কী। প্রিয়তমকে  
কি উপবাসী রাখা যায়।

মধ্যাহ্নকৃত্য সাঙ্গ করে প্রভু এসে দেখলেন বিচিত্র  
ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছে জগদানন্দ।

কিন্তু আহারে বসেও প্রভু হাত লাগাচ্ছেন না।

‘আরেক পাত্রে তোমার জন্তে অন্নব্যঞ্জন নাও।’  
বললেন প্রভু, ‘তুমি-আমি আজ একত্র ভোজন করব।’

তার খাবার জন্তে প্রভুর আগ্রহ দেখে জগদানন্দ  
প্রোমত্তিত হ’ল। তেলের জন্তে আর তিলমাত্রাও  
ছুখ রইল না। পাঁচশরে বললে, ‘তুমি আগে খেয়ে  
নাও, আমি পরে খাব।’ তুমি যখন বলছ তখন আমি  
কি আর না খেয়ে থাকতে পারি?’

‘বেশ, তবে তাই, পরে খেয়ো।’ প্রভু খেতে শুরু  
করলেন, বললেন, ‘রান্না কা অপূর্ব হয়েছে! ক্রোধাবেশে  
রান্না করেও ব্যঞ্জনে অমৃত ফলিয়েছ। এ কৃষ্ণের প্রসাদ  
ছাড়া আর কিছু নয়। কৃষ্ণ আজ তোমার হাতে খাবেন  
বলেই তোমাকে দিয়ে এত ভালো রান্নিয়েছেন।’

জগদানন্দ বললে, ‘যে খাবে সেই নিজেরেই খেয়েছে।  
আমি শুধু রান্নার জিনিস জোপাড় করে দিয়েছি।’

‘পণ্ডিত কহে, যে খাইবে সেই পাক কর্তা।’

‘আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহরণী।’

বেশি-বেশি করে পরিবেশন করছে পণ্ডিত। পাছে  
আবার অভিমান করে বসে তাই ভয়ে-ভয়ে সব খেলেন  
প্রভু, অস্থানির প্রায় দশগুণ। যে ভগবান প্রেমের  
বশীভূত সে ভক্তকে ভয় করবে না তো কী।

‘কিন্তু আর নয়, অনেক হয়েছে।’ প্রভু বলতে  
কান্ত হ’ল পণ্ডিত।

আচমন করে মুখশুদ্ধি নিয়ে বসলেন প্রভু।  
বললেন, ‘এবার তুমি খাও, আমি দেখি।’

জগদানন্দ বললে, ‘খাব’খন। আপনি বাড়ি গিয়ে  
বিশ্রাম করুন।’

‘তাই যাচ্ছি।’ প্রভু উঠলেন, গোবিন্দকে লক্ষ্য  
করে বললেন, ‘তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিতের ভোজন  
হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে।’

প্রভু চলে যেতেই জগদানন্দ গোবিন্দকে বললেন,  
‘তুমি যাও, গিয়ে প্রভুর পদসেবা করো। আর বলো,  
পণ্ডিত এই ভোজনে বসেছে। ভয় নেই তোমার জন্তে  
প্রভুর ভুক্তাবশেষ রেখে দেব। উনি ঘুমিয়ে পড়লে এস।’

গোবিন্দ প্রভুর কাছে এসে হাজির হল।

‘পণ্ডিত ভোজনে বসেছে।’

‘ভোজনে বসলে কী হয়? দেখে এস ভোজন শেষ  
হ’ল কিনা।’ প্রভু গোবিন্দকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন

আর সকলেরটা বেড়ে রেখে প্রভুর স্বস্থির জন্তে থাল  
নিয়ে বসে পড়ল পণ্ডিত। ভোজন শেষ করল। গোবিন্দ  
সেই সংবাদ পৌছে দেবার পর প্রভু স্বস্থিতে শুলেন।

প্রভুর শয়ন কী? কলার শরলা প্রভুর শয়ন।  
আন্ত কলাপাতার মধ্যের ডাঁটিটার নাম শরলা। সে  
শয়ন সুখকর নয়। প্রভুর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে  
গেছে, ও বস্তু শয়নে শুতে তাঁর হাড় বাধা লাগে।  
কৃষ্ণের বিরহ-আতিতেই তাঁর কুশলতা, তারপর ঐ শয্যা  
যদি মেঝের উপর বিছানো থাকে তা হলে দেহরেশের  
আর অবধি থাকে না। তবুও মাঝে মাঝে তাঁকে  
প্রফুল্ল দেখায়, হয় তো যখন রাধাভাবে তাঁর পূর্ব মিলন  
কথা মনে পড়ে।

আবার জগদানন্দের বৃকে বাজল সেই কলার  
শরলা। প্রতিকারের জন্তে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।  
সূক্ষ্মবস্ত্র নিয়ে এসে গৈরিকে রাঙাল, শিমূল তুলে  
ভরে দিবা তা দিয়ে তোশক আর বালিশ তৈরি করল।  
গোবিন্দকে বললে, ‘নিয়ে যাও। এতে প্রভুকে  
শুতে বসো।’

গোবিন্দ বৃকি একটু দ্বিধা করল নেয় কি না নেয়।

সামনে স্বরূপ দাঁড়িয়ে। ‘আপনি যান।’ জগদানন্দ  
স্বরূপকে ধরল: ‘আপনি গিয়ে প্রভুকে এ শয্যা  
শুইয়ে আসুন।’

তোশক-বালিশের শয্যা দেখে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট  
হলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘এ কে করালো?’

‘জগদানন্দ পণ্ডিত।’

জগদানন্দের নাম শুনে প্রভুর সঙ্কট হল যদি  
আবার রাগ করে অনাহারে পড়ে থাকে। তাই রুঢ়  
কথা বললেন না। তোশক-বালিশ সরিয়ে রেখে  
কলার শরলার উপরই যথাবিধি শয়ন করলেন।

স্বরূপ বললে, ‘এ শয্যা উপেক্ষা করলে পণ্ডিত  
ছুখ পাবে।’

‘তা হ’লে একটা খাট নিয়ে এস।’ প্রভু রোষ  
পরিহাস করলেন: ‘জগদানন্দ কি চায় আমি বিষয়-  
ভোগ করি? মাটিতে শোয়াই তো সন্ন্যাসীর কর্তব্য,  
সেই ক্ষেত্রে তোশক-বালিশের শয্যা ব্যবহার অর্থহীন  
আমার জাতিচ্যুতি।’

স্বরূপ জগদানন্দকে জানাল প্রভুর বিতুষণ কথ।  
জগদানন্দ প্রশ্ন করল : ‘এর তবে প্রতিকার কী ?’  
স্বরূপ উপায় বের করল। কিন্তু কলাপাতা  
সংগ্রহ করল। নখে চিরে চিরে রাশি-রাশি তন্তু বের  
করে প্রভুর ছ’খানি বহির্বাঁসের মধ্যে পুরল। বেশ  
একটা লেপের মত জিনিস হল। এই তবে তাঁর শয্যা  
হোক। তাঁর কৃশ দেহ কিছুটা আরাম পাক।

প্রভু এও স্বীকার করতে চান না।

স্বরূপ অনুন্নয় করতে লাগল। তোমার সেই  
কলাপাতাই তো আছে, আর তোমারই নিজের বহির্বাঁসে  
তোমার আপত্তি কী। তোমার কষ্ট দেখাটা যে  
ভক্তের পক্ষে কষ্টকর এটা তো তুমি মানবে।

শেষ পর্যন্ত এ শয্যা অঙ্গীকার করলেন প্রভু।

কিন্তু জগদানন্দ শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই।  
প্রভুর এত ক্লেশ স্বচক্ষে দেখা যায় না। এর চেয়ে  
বৃন্দাবন চলে যাই।

‘অনুমতি করুন আমি বৃন্দাবনে যাই।’ প্রভুর  
কাছে অনুমতি চাইল পণ্ডিত।

‘তার অর্থ আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছ।  
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তুমি ভিখারি হবে ?’

‘বা, তা কেন ? কতদিন থেকেই আমার বৃন্দাবন  
যাবার ইচ্ছে।’

‘তা হোক। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট  
হবে না ? আমার কষ্ট তো খুব বোঝো—এ কষ্টটা  
বোঝো না ?’ প্রভু অনুমতি দিলেন না।

তখন জগদানন্দ স্বরূপকে গিয়ে ধরল। দয়া করে  
প্রভুর মত করিয়ে দিন। আমার বিচ্ছেদে তাঁর  
আবার কী কষ্ট !

স্বরূপ প্রভুকে বোঝাতে বসল। পণ্ডিত গোড়ে  
তো যায় শচীমাতাকে দেখতে, তেমনি একবার বৃন্দাবন  
দেখে আসতে বাধা কিসের !

তবে যাক। প্রভু শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন।

পথের উপদেশ দিতে বসলেন। বললেন,  
‘বারাণসী পর্যন্ত কোনো ভয় নেই, স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।  
বারাণসীর পর থেকেই ভয়। তখন কখনো একা  
চলবে না, স্থানীয় ক্ষত্রিয়দের কার সঙ্গ নেবে। একলা  
বার্ভালি দেখলে বাটপাড়েরা অত্যাচার করবে, সব  
লুটপাট করে বেঁধে রাখবে, খেতে দেবে না। সঙ্গে  
ক্ষত্রিয় কাউকে দেখলে এগুতে সাহস পাবে না। আর

মথুরায় সনাতনের ওখানে উঠবে। মথুরায় যত স্থায়ী  
ভক্ত আছেন তাঁদের চরণবন্দনা করবে। দূর থেকেই  
তাঁদের ভক্তি করা ভালো। কদাচ তাঁদের সঙ্গে  
থাকবে না যেহেতু তাঁদের সহজ আচরণের মর্মগ্রহণ করা  
তোমার পক্ষে কঠিন হবে। সনাতনের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলের  
দ্বাদশ বন দেখবে, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতের উপর যে  
গোপাল আছে তাকে দেখতে পাহাড়ে উঠো না, কৃষ্ণ-  
কলেবরে পাঠে কালে অপরাধ হবে। দেখো, তাড়াতাড়ি  
ফিরে এসো। সেখানেই থেকে যেয়ো না। আর  
সনাতনকে বোলো, আমি শিগগিরই বৃন্দাবনে  
যাচ্ছি, আমার জন্মে যেন একটি জায়গা ঠিক  
করে রাখে।’

প্রকটলীলায় প্রভু তো আর যান নি বৃন্দাবন, কিন্তু  
বিগ্রহমূর্তিতে গিয়েছেন। দ্বাদশাদিত্য টিলার কাছে  
সনাতন প্রভুর ত্রিবিগ্রহ স্থাপন করেছে।

প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে জগদানন্দ রওনা হল।  
তার জন্মে প্রভুর কত স্নেহবাকুলতা ! প্রভু যদি  
আমার প্রতি মনোযোগী থাকেন তাহলেই তো আমি  
নিবিল্ল-নির্ভয়।

‘ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।

যাঁহা যৈছে যোগ্য তাঁহা করেন ব্যবহার ॥’

যে অমিতাহারী বা যে অনাহারী, যে অত্যন্ত  
নিদ্রাশীল বা যে অত্যন্ত জাগরণশীল তাদের কারুই  
যোগানুষ্ঠান হয় না। যার আহার বিহার কর্মচেষ্টা  
নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত তারই যোগসিদ্ধি সম্ভব।

ঐ কথা গীতায় অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ।  
আবার ভাগবতে বলেছেন উদ্ধবকে : আমার প্রতি  
উজ্জিতা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ বা  
সাংখ্য ধর্ম বা তপস্বী বা বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাস তেমন  
পারে না।

ভগবান শুধু শুদ্ধ ভক্তের অধীন। বলেছেন  
গোপিনীদের : ‘আমার প্রতি ভক্তিই প্রাণিগণের  
সংসারমোচনের উপায়। আমার প্রতি তোমাদের যে  
মদাকর্ষক স্নেহ জন্মেছে এ আমারই ভাগ্য।’

ভাগ্য তো বটেই। ভক্ত না থাকলে ভগবান যায়  
কোথায় ? বাঁচে কী করে ? ভক্ত সরস বলেই তো  
ভগবান স্নিগ্ধ হতে পাচ্ছেন।

আবার ভক্তই তো ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ।

[ ক্রমশ।

# ‘আন্দোলন’ বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা

সতীশচন্দ্র দে

ব্রাহ্মজ্ঞানের কাছে শুনেছি ‘আন্দোলন’ সমিতির উদ্ভব হয়েছিল মধ্য-কলিকাতার রাজা সর্বোদয় মল্লিক (প্রাক্তন ওয়েলিংটন) স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোণে থেপাচন্দ্র ইনস্টিটিউশন নামে যে এন্ট্রেন্স স্কুল ছিল সেট বিজ্ঞানের বাটিকে, কতিপয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা, বোধ করি ১৮৯৭ সনে। লর্ড কার্জনবাবু দ্বারা বঙ্গভঙ্গ তখনও হয় নি বা দেশবাণী স্বদেশী-আন্দোলন জাগে নি। শুনেছি, উক্তাঙ্করা ভেবেছিলেন স্কুলের শুধু পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন বা পরীক্ষায় পাশ করে জীবনযাপনের জন্য উপার্জন সম্ভব হতে পারে কিন্তু সর্বভাবে উন্নত মানুষ হওয়া যায় না, মানসিক উন্নতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই তাঁরা মধ্যে মধ্যে দেশী ও বিদেশী সদগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনাসভার আয়োজন করতেন। এট সমিতির নামকরণ হয়েছিল ‘আন্দোলন’ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রস্বার্থে নয় সমষ্টিগত সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের সর্বকর্মে উন্নত করা।

ক্রমে তাঁরা নিজের উন্নয়ন, শুধু মানসিক গঠনে সীমাবদ্ধ না রেখে শারীরচর্চা মন দেন। সকালে বৃষ্টি ও আলো ইণ্ডিয়ান ফিরিস্তিরা দেশীয়দের উপর পথে-ঘাটে অত্যাচার-অপমান করত। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা, ইন্ডেন উক্তান প্রভৃতি স্থানে নিরীহ পথচারীকে ছড়ি মারত, স-বুট পদাঘাত করত। তরুণ ছাত্রদের মনে এ সকল অপমানের জ্বালা অসহ্য বোধ হতে লাগল। সে সময়ে মর্শিয়ে লর্ড নামক স্থানীয় এক ফরাসী যুবকের সহিত সমিতির যুবকদের বন্ধুত্ব হয়। বোধ হয় ফরাসী বলে, মর্শিয়ে লর্ডের বৃষ্টি ও ফিরিস্তির উপর বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি নিজে ছিলেন মুষ্টিযুদ্ধের ভাল ওস্তাদ এবং তাঁরই প্রবৃত্তি উৎসাহ ও শিক্ষার সমিতির অনেক সভ্য বন্ধু লড়াই ও নানারূপ ব্যায়ামক্রিয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠছিল।

প্রথম বার সমিতির পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে বান্দেব নামক জনৈক পেরুচিলায় ও দ্বারগে আসে, তাঁরা হলেন ঐসতীশ মুখোপাধ্যায় (ডু সোসাইটির নন) ইনি পরে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন; ঐনিবারণ ভট্টাচার্য ইনি পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলেন; ৩তঃ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; লেগকের অগ্রজ ৬তিনকড়ি দে, ইনি পরে বঙ্গবাসী কলেজে বসন্তের অধ্যাপক হয়েছিলেন ও ৬তরুণ সিন্ধুর মহাশয়গণ। পরে ক্রমশ স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা ৬বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ৭প্রভাসচন্দ্র দে (পরে ইনি রাজসাহী কলেজের ও তদানীন্তন বিপন কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক হয়েছিলেন), জীহেন্দ্রনাথ নন্দা (ইনি মাণিকতলা বোমার মামলায় জীঅরবিন্দেব সহিত বিচারাবান আসামী ছিলেন), জীরণেন গাঙ্গুলী ইত্যাদি ও তদানীন্তন যুবকগণ সমিতিতে যোগদান করেন।

বিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস দেশের মানোগণনে তেমনভাবে জেগে ওঠে নি। রাজা রামমোহন, বিজ্ঞানগণ, স্বামী বিবেকানন্দ-আদি মহামানবদের বাণীতে অস্তরের পরাধীনতার লজ্জা কিছু অম্লভূত হোত। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে অক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধে

ভারত এক ছিল না, নানা কুসংস্কারের আবর্জনার স্তূপে দেশের বা কিছু মঠ, ভারতের বেদান্ত-উপনিষদ-চরিত্র-বীথ চাপা পড়েছিল। এ দেশকে জাগতে হবে। ‘কংগ্রেস’ বলে তখনকার দিনে যে প্রতিষ্ঠান ছিল মধ্যে মধ্যে তার সভার আয়োজন হোত। তাতে থাকত শুধু বৃটিশের দরবারে ক্রমশ, আবেদন-নিবেদনের পূর্বা, রাষ্ট্রচালনার ভারতীয়দের উপস্থিতি উপযুক্ত লোককে উচ্চস্থান দিতে অমুযোগ। কিন্তু একথা স্বীকার, তখনকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের মতৈক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা ছিল ও অনেকটা জাতীয় বা জাতিগত প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসের পিছনে সংগ্রামী বা দাবী শক্তি না থাকলেও সর্বভারতীয় সংহতি শক্তির কিছু উদ্যোগ হয়েছিল-বললে অত্যুক্তি হয় না।

‘আন্দোলন’ সমিতির বিত্তীয় অধার শুরু হল ১৯০৫ সালে। যখন বাংলা দেশ শক্তির করার প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পিতা ৬হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্বদেশী-আন্দোলনে দেশ ভেসে গেল। সে স্বদেশী বক্তার উল্লেখিত হয়ে উঠল আমাদের ‘আন্দোলন’ সমিতি। মানসিক ও শারীরিক অমূল্যলনের উপর আরও যা সমিতির প্রাণে জেগে উঠলো তা হোল স্বদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধ।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সারা বাংলা দেশে তথা ভারতে যে তীব্র স্বদেশী-আন্দোলন জেগেছিল তাতে কয়েকজন মুসলমান নেতা আন্তরিকভাবে যোগদান করলেও সাধারণ মুসলমানগণ প্রাণের সাড়া দেয় নি। হিন্দু বাঙালী স্বদেশী গ্রহণ করেছিল ও বিদেশী বিশেষত বৃটিশদের বর্জন করেছিল। তদানীন্তন বৃটিশ গভর্নমেন্ট কোন কোন স্থানে, যেমন যেমন সিং জেলার জামালপুর এলাকার মুসলমান গুণ্ডার দ্বারা হিন্দুদের আক্রমণ, দেবমন্দির লুণ্ঠন ও প্রতিমা ভাঙ করতে প্ররোচনা দিচ্ছিল। ‘আন্দোলন’ সমিতি থেকে কয়েকজন যুবককর্মী কলিকাতা হতে পূর্ববঙ্গের আক্রান্ত স্থানগুলিতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে বীরবোদ্ধার মত সেখানে আক্রান্তদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘আন্দোলন’ সমিতির পক্ষে এটি একটি অস্বাভাবিক গৌরবময় ঘটনা। বাংলা দেশ থেকে সারা ভারতে স্বদেশী-আন্দোলন জেগে উঠলো। শুধু বিদেশী বর্জনের ঘণাভাব থেকে দেশের প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি মমতাবোধ, দেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্ৰীতি জাগতে লাগল। ‘আন্দোলন’ের কর্মিগণ এই স্বদেশীভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে মন-প্রাণ দিয়ে দেশের কাজ করতে লাগল। যে কংগ্রেস সারা ভারতে নরমহুদী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গভর্নমেন্টের বৃপাভিকার জন্য আবেদন-নিবেদনে নিবদ্ধ ছিল, সেই কংগ্রেসে ক্রমশ দাবীকারী স্বরাজপন্থীদের আবির্ভাব হোল।

ইতিমধ্যে ‘আন্দোলন’ সমিতি ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বহুবাজার ভবনদ্বারের মাঠে, যেখানে থেপাচন্দ্রের শাখা-স্কুল ছিল, সেখানে স্থানান্তরিত হোল। এই নিবন্ধের লেখক সেই সময়ে ‘আন্দোলন’ সমিতিতে সক্রিয় কর্মীরূপে যোগদান করেন। রত্না কেসের মজার

বসুমতী : শ্রাবণ ১৩১০

## ‘আত্মোন্নতি’ বৈশ্বিক সমিতির ইতিকথা

শিল্প সংগ্রহ ব্যাপারে যে ভূত্বকভূষণ ধরের কারাদণ্ড হয়েছিল, সেই ভূত্বকদাও সেই সময়ে সমিতিতে যোগদান করেন। বৌবাজার মলঙ্গা লেনের পার্শ্ব অত্যন্ত ভালবাসার গলির রামলাসার ঠাকুরবাড়িতে সমিতির শাখা ছিল। সে শাখা পরিচালনা করতেন ৬৮তরুণ মুখার্জী, ৬জীবন মুখার্জী, ৬কালিদাস বসু, ৬গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীমন্তে ব্যানার্জী, ৬নরেন ব্যানার্জী প্রভৃতি কর্মীদের সাহায্যে। মজার পিঙ্গল সংগ্রহের জন্য রডা কোম্পানীতে যিনি জেটি সরকারের কাজ নিয়েছিলেন সেই ৬শ্রীশ মিত্র ওরফে ৬হাবু মিত্র ‘আত্মোন্নতি’র এই মলঙ্গা শাখার কর্মী, অতুলকলার শিষ্য। মধ্য-কলিকাতার বরানগরে ৬খগেন চ্যাটার্জী ৬পার্বী মুখার্জী, হাওড়ায় কোমগরে শ্রীনিবারণ মিত্র ‘আত্মোন্নতি’র শাখা-সমিতিগুলি পরিচালনা করতেন। ৬বিপিন গাঙ্গুলী এই শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন—তার বিশদ তথ্য লেখকের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

তখন সমিতির সভাপতিকে বড় ও ছোট লাঠিখেলা ও খুঁইযুক্ত, ছোরাখেলা, জাপানী যুগুৎসু, উচ্চলক্ষন, দীর্ঘলক্ষন, বুকে হাঁটা, লক্ষ্যে গোলা নিক্ষেপ করা, ডিল, কুচকাওয়াজ, কুস্তি ইত্যাদি সকল রকমের চর্চা করানো হত। প্রায় প্রতি রবিবারে গঙ্গার বাবুবাটে, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডে, ভালগলার ৬শিবকালী কুমারের পুকুরে, শিয়ালদার নিবটস্থ আপার সাফুলার রোডস্থিত ৬মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপ্রাঙ্গণের পুষ্করিণীতে সাতার শিক্ষা দেওয়া হত। সম্ভবপক্ষে শিক্ষার্থীদের খাত ছিল মুঠা মুঠো ভিজা ছোলা। মাঝে মাঝে কর্মীরা লাড়ি ও মাফি হয়ে নৌকা চালানোর শিক্ষালাভ করত ভবিষ্যতে স্বাধীনতার যুদ্ধে হাবুসৈনিকদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষারূপে। গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ঋষি বস্তুমন্ত্রের ‘আনন্দমঠ’, ‘দেবী চৌধুরাণী’, ‘রাজসাহ’ ৬কবি হেমচন্দ্রের কবিতা ‘বাজ রে শিঙা বাজ, এই রবে’—এই সকল সদগ্রন্থ সমিতির সভাদের পাঠ করানো হত। বিদেশীয়দের মধ্যে ইতালীয়দের দেশপ্রেমের জন্য স্বদেশী যুবকগণ নিজেদের বিশেষভাবে স্বাধী বাধ করত। সে দেশের ম্যাজিনি, গ্যারিবল্দি, কাডুর প্রভৃতি নব ইতালীর স্রষ্টাদের পুস্তকগুলি বিশেষ অগ্রদ্রষ্টব্য দান করত। ফরাসী বিপ্লবের পুস্তক, রাশিয়ার প্রিন্স ক্রোপটকিন লিখিত ‘নিহিলিস্টদের কাহিনী’, আইরিশ বিপ্লবের সিন্‌ফিন আন্দোলনের কথা, চীনের সান ইয়াং সেনের কাহিনী ও পৃথিবীর যেখানে যত দেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের ক্ষমতা বিপ্লব স্বয়ং পুস্তক পাওয়া যেত সেগুলি সংগ্রহ করে পাঠ করানো হত, বৈশ্বিকভাবে মানসিক অহুশীলনের জন্য। ততদিনে দেশের ও সমিতির সভাদের মন ও আত্মকোণ্ডু বিদেশীবর্জনে বা স্বদেশীতে সীমাবদ্ধ রইল না, অন্তরে জেগে উঠতে লাগলো ব্রিটিশ বিতাড়ন ও পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। কংগ্রেসের চরমপন্থিগণ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ পেলে সম্ভব হবেন বলে ভাবনা করেছিলেন। নরমপন্থিগণ ব্রিটিশের অগ্রদ্রষ্টব্য হলে আশিক স্বরাজে খুশি থাকবেন বলেছিলেন। সমিতির সভারা কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্বাধীনতা বিস্মার করতো না এবং সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা ব্রিটিশ বিতাড়ন করে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিরাট প্রস্তুতি স্বয়ং

কোনও সম্পূর্ণ ধারণা ছিল না। মনে হোত কর্মে অগ্রসর হতে হোতই পথ খুলে যাবে।

‘আত্মোন্নতি’ সমিতির পরিচালকগণ নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করতেন, দ্বিতীয় স্তরের বা কনিষ্ঠদের পুরা জানবার উপায় ছিল না। কর্মের জন্ত যখন যেটুকু প্রয়োজন ‘তার অতিরিক্ত কোনও কথা কনিষ্ঠদের বল হোত না। অতুলকলার ছিল অপরাধভুল্য। যখন যে কাজের ভার পড়তো কঠোর নিয়মানুবর্তির সহিত সেই কাজ করবার জন্য আদেশ দেওয়া হোত। সম্ভাব্য অধীকার পিঙ্গল, কাঁতুজ বা বোমা একস্থান হতে আর একস্থানে পৌঁছে দিতে হলে কে কাকে কি দিতো তা বধ্যাসক্ত গোপন থাকতো। চাদের অঙ্গ আবৃত করে কাজ করতে হোত—যার ফলে অনেকক্ষেত্রে পরিচিতির পরিচয় লাভ করা যেতো না। লেখক যখন বোমা প্রস্তুত করে সরবরাহ করতো তা গ্রহণ করতো একজনমাত্র কর্মী। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক কাজে আসতো না, পাছে জানাজানি হয়ে যায় ও পুলিশে টের পায়। বোধ করি এই কঠোর সাবধানতার জন্য ‘আত্মোন্নতি’র বহুকর্মী পুলিশের অন্ত্যাত থেকে ঘেঁষে সমর্থ হয়েছিল এবং ১৯১৫-১৬ সালে যখন ডিফেন্স-অ্যাক্ট প্রবল ধরপাকড় হোলো, তখন ‘আত্মোন্নতি’র বহুকর্মী কারাগারের বাইরে থাকতে পেরেছিল।

১৯০৯-১০ সালে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি স্থানান্তরিত হোল বহুবাজার স্ট্রীট বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, যেখানে বসন্তভীর আশিস এবং তখন ছিল গ্রাশনাল কলেজ সেই প্রাঙ্গণস্বরূপ বটীতে। এইখানেই আমরা শ্রীঅগ্নিবন্দ্যের প্রথম সাক্ষাৎলাভ করি। বরোদা হাক্কোর উচ্চ বেহনের দামানীর পদ পরিত্যাগ করে তিনি দেশের জন্ত মাত্র ৭৫°°° টাকা বেতনে জাতীয়শিক্ষার পরিচালনার্থে কাশনাল কলেজের ভারগ্রহণ করেন। তিনি বহুজ্ঞা দিতেন অন্তঃপ্রাঙ্গণী ভাবায়, তাঁর ভ্যাগের আদেশ ‘আত্মোন্নতি’র কর্মীদের অন্তর মুগ্ধ হোত। ঋষি বস্তুমন্ত্রের বল্লভায় বাক্যে আমরা ‘দেবী দুর্গা’ বলে পূজা করি—তিনিই আমাদের দেশজননী, জন্মভূমি, স্বাধীনতা সাংঘাতী জীবনের ধর্ম—শ্রীঅগ্নিবন্দ্যের কাছে সেই শিক্ষাই পেতাম। দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর দিনে তীক্ষ্ণ জোরের দ্বারা বৃক্কের দন্ত বাহির করে বিধপক্ষে স্পর্শ করে ‘আত্মোন্নতি’র সভারা মাতৃপূজায় অঙ্গাল দিতো। শৃণু গ্রহণ করতো—

‘তোমার তরে মা সঁপিছু এ দেশ,

তোমার তরে মা সঁপিছু প্রাণ।’

মধ্যে মধ্যে সমিতিতে ইতিহাসপ্রসঙ্গ দেশপ্রেমিক মহামানবদের শরণে উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। প্রতাপাদিত্য উৎসবে ৬সরলা দেবীচৌধুরাণী সভানেত্রী হলেন। আমাদের মনে হোত তিনি যেন বস্তুমন্ত্রের দেবীচৌধুরাণী স্বয়ং ২মুখা আবহূতা। রাজা সুরোধ মজুমদার ওগোষ্ঠিন স্কোরদেহ বাটার প্রাক্ষেপে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। বড় লাঠি, ছোট লাঠি, তরবারি খেলা, বস্ত্রি হুড়া, বীরদ্ব্যজ্ঞক নানা ক্রীড়ার মাধ্যমে সে উৎসব সম্পাদিত হোত। কিন্তু আমাদের ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি হিন্দুর পুনরুত্থান বলতে ঠিক বা বোঝার তা চায় নি। উদ্বেগ ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। হিন্দু মুসলমান, ক্রীষ্টান, শিখ, পারসিক, জৈন সকলকে নিয়ে এক মহাভাতির জন্ত। একমাত্র পথ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা বা ব্রিটিশ বিতাড়ন ব্যতীত অসম্ভব।

## ‘আত্মোন্নতি’ বৈপ্লবিক সমিতির ইতিহাস

সমিতির বিশেষ নেতা শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী বিখ্যাত মানিকতলা বোমা মামলার বিচারধীন আসামী ছিলেন। ইনি মিলিটারী ডাক্তার কনসেল নন্দীর পুত্র। এর বাড়ি ছিল মধ্য-কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর একখানি হাত উড়ে গিয়েছিল। তিনি পুলিশের নিকট বলেছিলেন যে, গোণার সিন্দুক সরাতে গিয়ে তাঁর হাত নষ্ট হয়ে যায়। পুলিশ ইন্দ্রনাথবাবুর জ্ঞাত ও সমিতির উপর নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করার প্রকল্প বিভাগ লুপ্ত হোল, বইলো গুপ্ত সমিতি বৈপ্লবিক-ভাবাপন্ন কর্মীদের নিয়ে। আমরা অনেকে সে সময়ে বৈপ্লবিককর্মে সঙ্গে জনসেবার কাজ করতাম। অর্ধদার আদি বিভিন্ন যোগে ও গ্রহণে পূণ্যার্থী ব্যক্তিদের সেবার্থে পঙ্গুঘাটে, রেল, স্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতাম। সে সকল সেবাকর্ম এমন স্বেচ্ছা ও নিষ্ঠার সচিৎ সঙ্গীভূত হোত যে, শুধু দেশের জনগণের নয় গভর্নমেন্টেরও কিছু প্রশংসা পাওয়া যেত। কিন্তু, পুলিশ সেইসঙ্গে আমাদের কর্মপ্রণতির বিকাশ এবং জনপ্রিয়তা দেখে যে কিছুমাত্রের ভীত হোত না এমন নয়। পরাধীন-জাতির আত্মশক্তির উন্মেষ, মনুষ্যের জাগরণ দেখলে বিদেশী শাসকদের খুশি না হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ মারা গেলে সমিতির সভার গামছা কাঁধে শবদাহ করতে যেতো। শ্রদ্ধাধিকারী ভিখারী ভোজনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজও করতে হোত। কেউ অসুস্থ হলে দিব্যরাত্রি ঘণ্টার পরিচর্যাও সভার কাজ হতো। ১৯১৩ সালে দামোদরের বন্ধার মোদিনীপুর, বর্ধমান, ভগলী কেশব বহুপন্নী জলপ্রাণিত হয়েছিল, কর্মীরা দলবদ্ধভাবে নৌকায় খাওয়াজানি বহন করে প্রাণিত অঞ্চলের দুঃখের সেবাকর্ম করেছিল। কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু এ সকল দেশের কাজে পড়াশোনার যে ক্ষতি হোত তার জ্ঞাত কেউ বিন্দুমাত্র দুঃখিত হোত না। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান ও পদস্থ হওয়া নয়; ধন নয়, মান নয়—কর্মীরা চাইতো জাতি কি করে জাগে, বিদেশী শাসক বিতাড়িত হয়ে দেশ বিভাবে স্বাধীন হয়। তাদের বিশ্বাস ছিল দেশ স্বাধীন না হলে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক—কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের কাজ করে সম্ভবমত লেখাপড়ার মান দিত। দেশসেবার মাধ্যমে ‘বিশেষ-ছেলেরা’ সম্ভারণের স্বেচ্ছাভাবাসা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

দেশের ধনী জমিদারদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবী সমিতিগুলিকে সহায়তা করতেন, এমন কি গভর্নমেন্টের বিঘনজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। গুপ্তভাবে তাঁরা অর্থ-সাহায্য করতেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতের গণতন্ত্রী সমাজবাদী ভারত সেই সকল ধনী, মহানুভব ব্যক্তিদের দান সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হবেন না। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে তখনও দেশপ্রেমের উন্মেষ হয় নি, অধিকাংশ দেশপ্রেমিক এসেছিল শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে।

কবি হুগলার ‘স্বাধীনতা হীনতার কে বাচিতে চায়বে’ কবিতাটি পাঠ করে মনে পরাধীনতার দিকার এনে দিত। সমিতির কর্মীরা ভাবতো দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত না হলে জগতের সমুখে আমাদের দেশ অতি দীন ও হের। কৃষক-জাপানের যুদ্ধে জাপানের জরলাতে কর্মীদের মনে প্রচুর ভরসা এসেছিল—ইরোরোশিমের পরাজিত করে এশিয়াবাসীর জরলাতে, সমিতির কর্মীদের মনে চুচ বিশ্বাস জাগলো যে, এদেশবাসীও প্রাণপণ চেষ্টা করলে একদিন বৃটিশ শাসককে

বিতাড়িত করতে পারবে এবং দেশ স্বাধীন হবে। কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার গান, তাঁর করুণ দেশপ্রেমের সঙ্গীত। ‘বাংলার মাটি বাংলায় জল’ ইত্যাদি, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ কর্মীদের মনে দেশের সংহতিভাব জাগিয়ে তুলতো, দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখাতো। তাঁর ‘বন্দীবিরে’ ‘জীবনমৃত্যু পায়ের তৃত্য, চিন্তা ভাবনাই’ মনে বীরবোধ জাগরিত করতো—মরণে আনতো নির্ভরতা। আরও কতকগুলি গান সমিতিতে গীত হোত যেমন, ‘আমার দে মা অসি, সন্তানে অক্ষয় জেনে বল মা আর সবে অধোবদনে শুধু নীরবে বসি।’ ‘ভর করবোনা ভর করবোনা’ কর্মীদের মনে দেশপ্রেম, সাহস, বীর্য ভরে দিত। ১৩শ্রবাব্দে উপাধ্যায়ের ‘সন্ধ্যা’, শ্রীধরবিশ্বের ‘বন্দোবস্ত’, দেশের কথা, ‘বর্তমান রণনীতি’, ‘মুক্তি কোন পথে’ ইত্যাদি পুস্তক কর্মীরা পাঠ করতো এবং দেশের স্বাধীনতা আনয়নের পন্থার কথা চিন্তা করত।

‘আত্মোন্নতি’ সমিতির নেতা ও কর্মীগণ, মধ্যবিত্তের পক্ষ বা সম্ভব তার অপেক্ষা সরাসর জীবনযাপন করতো; আধা-সন্ন্যাসীর মতো। অনেকেই আজীবন ব্রহ্মচারী থাকবার সংকল্প করতো। ভারতের মহানেতা বীর শিবাজীর কথা কর্মীরা ভাবতো। মহাত্মা গান্ধী করত তাঁর অর্পণ ত্যাগ, কৃষ্ণাধার, বীরত্বের কাহিনী কর্মীরা পাঠ করতো। রাজহত্যার ইতিহাসও পাঠ করানো হত। রাণা প্রতাপের অর্পণ যুদ্ধকাহিনী এবং কৃষ্ণাধারের কথা খরণ করে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির সভারও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, বর্তমান না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন পর্যন্ত স্ত্রীরাও ভোগবিলাস ত্যাগ করে কৃষ্ণাধারের দ্বারা নিজের উপযুক্ত যোদ্ধা করে গড়ে তুলবে। দেশের ও মনের সকল শক্তি, প্রাণের গভীর ভক্তি দেশের জন্ত নিয়োগ করবে।

বিশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ভারতে বিশেষত বাংলা দেশে বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতি চালিত ছিল, যেমন—‘অম্মশীলন’, ‘যুগান্তর’, ‘আত্মোন্নতি’ ইত্যাদি। সে সমিতিগুলি মোটের উপর পারম্পরিক সহযোগিতার দেশের স্বাধীনতা আনয়নের কাজ করতো। রিভলবার পিস্তলদি গোপনে সংগ্রহের জ্ঞাত মূল্য দিতে হোত উচিত মূল্যের অনেকগুণ বেশি। জাহাজের নাবিক, চীনা ও কোনও কোনও ফিরঞ্জির কাছ থেকে রিভলবার, কাঁতুজ পাওয়া যেত। বিপ্লবী কর্মীরা বিদেশীদ্রব্য ব্যবহার করতে ঘৃণা বোধ করতো। কিন্তু, বিদেশী পিস্তল, কাঁতুজ তাদের কাছে অতি প্রিয় ছিল, কেন না দেশের স্বাধীনতার জ্ঞাত শস্ত্র বিপ্লব বাতীত আর কোন উপায় তাদের জানা ছিল না। দেশের শত্রু নিপাত করতে, দেশী হোক, বিদেশী হোক, পিস্তল, কাঁতুজের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। সমিতির কর্মীদের নিজস্ব উপার্জন ছিল না বললেই হয়। তারা কিছু উপার্জন করতো তারা অধিকাংশই সমিতির কাজে ব্যয় করতো। দেশের কতিপয় লোকের কাছ থেকে একত্র প্রয়োজনীয় অর্থ বা পাওয়া যেত তাতে পিস্তল, কাঁতুজের মূল্যের কিছুই সংকুলান হোত না। তাই স্বদেশী ডাকতি করে অর্থসংগ্রহের পন্থা গৃহীত হয়েছিল। দেশের লোকের কাছ থেকে অর্থ লুণ্ঠন করা ছিল অব্যাহীন। সরকারের বা বিদেশী ধনিক ব্যবসায়ী অর্থ লুণ্ঠনই ছিল কামা, যেমন খিদিরপুরে বড়ো সম্প্রদায় অর্থ লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সহরে ও গ্রামে দেশের প্রজাতির টাকা ও গহনা কিনে কিছু লুণ্ঠিত হোত বারংবার ‘বন্দোস্ত’

জনসাধারণের নিকট কিছু অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বললে মিথ্যা বলা হয় না।

রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র ছিল বলে লেখককে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির পক্ষ থেকে চন্দননগরে বোমা-প্রস্তুতির শিক্ষালয় করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে ৬বিপিনদা বসুকে করেছিলেন। বোমার কাপের বিক্ষোভে লক্ষ্য হয়ে লেখককে প্রায় বার দিন যাবৎ অন্ধভাবে কাটাতে হয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে বোমা-প্রস্তুতির রাখবার ও বর্ষণকর্তা নির্ধারণ করবার ভার ছিল নেতাদের উপর। বোমা ‘আত্মোন্নতি’ পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত ৬বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ৬অম্বকুল মুখার্জী ও গিরীন্দ্রনাথ বানার্জী। এঁকে জানা ছিল, ৬যতীন্দ্র মুখার্জী (বাঘা মতীন) ছিলেন সকল দলের মিলিত প্রচেষ্টার সর্বাধিনায়ক।

১৯১৪ সালের অগাস্ট মাসে ইরোবোরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হোল। দেশের স্বাধীনতালাভের সুযোগ এসে গেল। জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে যে অস্ত্র সংগ্রহ করা হতো, প্রয়োজনের তুলনায় তার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সেই সময়ে এসে গেল ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির দ্বারা রডা কোম্পানীর মজার পিস্তল অপসারণের সুযোগ। পিস্তলগুলি ছিল অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয়। দশটি টোটা একসঙ্গে নিম্নোক্ত লাগান বেত, খাপটি পিছনে সংলগ্ন করে খেঁড় মাইল রেজের হাইফেলের কান্ন করার জন্ত পুরা ব্যবস্থা ছিল, সংখ্যায় ছিল পঞ্চাশটি পিস্তল ও পঞ্চাশ সহস্র রাউন্ড গ্রাউন্ডশিম বুলেট। ‘আত্মোন্নতি’র বৈপ্লবিক কর্মে এটি একটি গৌরবময় ঘটনা—যা শোনা ও যা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার কিছু এখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

বীর নাম আগেই করা হয়েছে, শ্রীহাবু বা শ্রীশ মিত্র ছিলেন মলঙ্গাপল্লীর যুবক ৬অম্বকুল মুখার্জী ও ৬কালিদাস বোসের স্বদেশী-শিষ্য। প্রধানত কালিদাসবাবুর পরামর্শক্রমে শ্রীশবাবু রডা কোম্পানীতে জেট সরকারের কর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে জার্মানীর প্রস্তুত কিছু মজার পিস্তল ও কাঁড়ের আমদানী হয়েছিল কান্দার বা তিস্ত গভর্নমেন্টের জন্ত। তার মধ্য থেকে কতকগুলি পিস্তল ও কাঁড়ের বাস্তব, বন্দর থেকে নিয়ে অসংখ্য পথে শ্রীশবাবু রডা কোম্পানীর গুদামে ডেলিভারী না দিয়ে মলঙ্গাপল্লীর পল্লীতে প্রেসিডেন্ট বাবসারী কান্দি মুখার্জীর লৌহ রাখবার প্রাক্ষেপে নিয়ে আসেন। পথে ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির কয়েকজন বিপ্লবী-কর্মী—বোমার সশস্ত্র হয়ে পাহারা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বোমার নামগুলি শোনা গিয়েছিল—তারা হলেন ৬কালিদাস বোস, দুর্গা পিতুরী সেনের ৬কালিচরণ দত্ত ও শ্রীহরিদাস দত্ত। পরে সেই সব মাল মলঙ্গাপল্লী থেকে বোমারজার হিদারাম বানার্জী সেনের সংলগ্ন জেলপাড়া সেনে আনা হয়। ৬বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে লেখক সার্পেন্টাইন সেনের শ্রীবাসন্ত দাস ও ডিজন সেনের শ্রীকান্ত গুপ্তকে নিয়ে কুলির ছদ্মবেশে সেই সব বাস্তব বহন করে ৬ভুক্তক ধরের বাড়িতে নিয়ে বান। রাত্রে বাস্তবগুলি ভেঙ্গে মাল বাহির করে নেতাদের নির্দেশমত ঠাঁয়েই প্রেরিত কতকগুলি কৌশলীকৃত ভর্তি করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। প্যাকিং শব্দগুলি, তেলো কাগজ ও প্যাকিং-এর উড়, উল ইত্যাদি পুড়িয়ে সাক্ষ করে লেখক গভীর রাত্রে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে। ‘আত্মোন্নতি’র বিশিষ্ট সভ্য ৬ভুক্তক ধর, ৬কালিদাস বোস, ৬নরেন্দ্র

বানার্জী ও শ্রীহরিদাস দত্তের কারাদণ্ড হয়। তৎকালের বাড়িও খানাতল্লাসী হয় ও বিছুকাল হাজতবাসের পর লেখক প্রমাণভাবে মুক্তি পায়। এই ঘটনার আত্মপূর্বক সমস্ত ঘটনা কান্দার জানা আছে কি না বলা যায় না, যিনি বহুতরু করেছিলেন তাঁর তত্ত্বকৃত জানা আছে। কিন্তু এই মজার পিস্তল সংগ্রহের দ্বারা বিপ্লবীদের মধ্যে অস্ত্রশক্তি বর্ধিত হয়। বড়বাজারে শিবাবু সেনে এক গুদাম থেকে পুলিশ কিছু কাঁড় জ হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছিল, নাচে প্রায় সমস্ত মাল সে সময় পুলিশ কর্তৃক অনাবিহৃত ছিল। কান্দার কাছ হতে কোনও স্বীকারোক্তি পুলিশ আদায় করতে পারে নি এবং এই কমিশন অস্ত্র কন্ট্রোল কমিটী দ্বারা পাড়েন নি। বাস্তবের মহাবিপ্লবী নামক ৬যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, ৬চিন্তাপ্রিয় ইত্যাদি বীরগণ যে পুলিশের বিরুদ্ধে বুড়িবালায় নদীর তীরে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তাতে এই মজার পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেক কাল পরে ৬স্বর্ষ সেনের বা মার্টিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও এই মজার পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল।

ইরোবোরের প্রথম মহাযুদ্ধ তখন পুরানমে চলেছে এবং জার্মানী জয়লাভ করছে। শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নয় ইরোবোর ও আমেরিকাতেও ভারতীয় বিপ্লবীরা গঠিত হয়েছিল। এমন দিনে বিপিনদাও কাছ গুপ্ত সংবাদ পেলাম যে, জার্মানী থেকে জাহাজ ভর্তি যুদ্ধস্ত্র আমদানী হচ্ছে এবং সে সব অস্ত্র বিপ্লবীরা গ্রহণ করে বৃটিশ উচ্ছেদের জন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করবে। ৬বিপিন গাঙ্গুলী লেখককে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন; অস্ত্র পাওয়া গেলে ভারতবাসী যে অভ্যুত্থান হবে, ঠিক হয়েছিল যে বিপিনবাবু ও সহযোগী শ্রীঅম্বকুল মুখার্জী বোমার নেতৃত্বে ‘আত্মোন্নতি’ ও ‘যুগান্তর’ কর্মীরা ফোর্ট উলিগ্রাম আক্রমণ করবে। মজার পিস্তল নিয়ে কর্মীরা নির্জন প্রান্তরে স্রুটিং অভ্যাস করত। সে সময়ে ফোর্ট বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প।

কিন্তু অল্পপূর্ণ জাহাজ ভারতে পৌঁছান না। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বারা দেশে বিপ্লব ও অভ্যুত্থান হলে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল, তারও কিছুই হল না। আশার স্বপন ভেঙ্গে গেল। ১৯১৫-১৬ সালে ‘আত্মোন্নতি’ ও অস্ত্র সমিতির বহু বিপ্লবী কর্মীর বাড়ি খানাতল্লাসী হল। ডিফেন্ড্যান্ট এ এবং ১৮১৮ সালে তিন নম্বর রেগুলেশনে ব্যাপকভাবে অনেকে কারাগারে ও অন্তরীণে আবদ্ধ হলেন। ৬বিপিন গাঙ্গুলী তখন কারাগারে। অন্তরীণ অবস্থায় লেখক যখন কুতুবদিয়া ঘোষে বন্দী ছিল সেখানে ‘আত্মোন্নতি’র অনেকগুলি বিপ্লবীকে রাখা হয়েছিল। কলিকাতার বোমারজার ৬কালি দত্ত, বরাহনগরের ৬খগেন চ্যাটার্জি, ৬পার্বতী মুখার্জি, বড়বাজারের মাড়োয়ারী যুবক শ্রীকান্দিহাইলাল ইত্যাদি ‘আত্মোন্নতি’র কর্মীরা অন্তরীণ ছিলেন। পরে যখন লেখক হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিল, তখন ‘আত্মোন্নতি’র নেতাদের মধ্যে সহবন্দী ছিলেন প্রফেসর ৬প্রভাস দত্ত, ৬হরিশ সিবদার প্রভৃতি। ‘যুগান্তর’ ও ‘অম্বকুল’ সমিতির অনেকে সেখানে বন্দী ছিলেন; যেমন সর্গী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অক্ষয় গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নলিনী গুহ, বোমেন দে-সরকার, সুবীন বোস, অম্বদা মজুমদার ইত্যাদি।

## ‘আত্মোন্নতি’ বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা

‘আত্মোন্নতি’ বর্ত্তক দেশের শত্রুনিপাত যা হয়েছিল তাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুলিশ অফিসার নন্দ বানার্জীর হত্যা, বৌবাজারের সম্ভ্রম মিত্র ছোয়ারের (তদানীন্তন সেন্ট জেমস্ ছোয়ার) দক্ষিণ-পশ্চিম পথের সংযোগস্থলে। নন্দ বানার্জী বাংলার তথা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের শত্রু প্রফুল্ল চাকীকে প্রেষণার করতে চেষ্টা করে, অত্যাশ্চর্য মনোবলে যার জঙ্ক নিজেকে দুইবার গুলী করে ও প্রফুল্ল চাকী মৃত্যুবরণ করেন। নন্দ বানার্জীকে হত্যা করেন ‘আত্মোন্নতি’র ওশীশ পাল ওরফে নারেন, লেখকের সংকর্ষ। তাঁর সহযোগী ছিলেন ব্যাটারানিবাসী শ্রীধরেন গাঙ্গুলী। দ্বিতীয় হত্যা যা অরণ্যে আসে তা হোল অগবপাড়াবাসী দেশদ্রোহী মুবার মিত্রের, যার জঙ্ক ওশীশ পাল গাঙ্গুলী দূর পড়েন। মঙ্গলা পল্লীতে ওগিরন্দ্র বানার্জীর বাড়িতে বসে লেখকের তৃপ্তিসিক্ত পরিব্রজ্ঞা কল্পিত হয় এবং নন্দ বানার্জীর হত্যাকাণ্ডী ওশীশ পাল একটি মুবার মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসে।

## মানুষের শত্রু ‘ভয়’

ভয় মানুষের চরম ও পরম শত্রু, ভয়েই অধমরা হয়ে রয়েছি’, একথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। আর প্রকৃতপক্ষে কাগজে বা অকার্যে প্রায় সর্বদাই কাশঙ্ক্যকে আমন্ত্রণ করে আনি মনে। ভয় মনকে অস্বাভাবিক কবল মানুষ বিচার কানন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, নৈতিক বা নিঃশেষ না হলে বৈচিত্র্য মনে থাকে মানুষ। একথা অস্বাভাবিক যে, বর্ত্তমান যুগে মানুষের চির শত্রুকুল ভয় ও তার সম্যক কারণ বর্ত্তমান দুঃখের যা হালচাল তাতে অসম্মান শ্রীতিত নবাবস বরার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে মানুষ; বাকনৈতিক ঝগড়া কড়াকড়ি, মারাত্মক পারমাণবিক আবিষ্কারমূল্য, স্বার্থের গুরুত্ব ইত্যাদির ঢাপে আমাদের প্রায়মুগ্ধলী প্রায় বিদগ্ধ বিস্তৃত তা সত্ত্বেও বিচারের জন্ম অভ্যাসের সাদন করা ছাড়া গতাস্ত্রের নেই। আমরা যদি নিজদের চিন্তাধারাকে একটু পরিবর্তিত করে নিতে পারি তা হলেই দেখব অনেক স্তরে, অনেক স্থপ্তিতে বাস করতে সক্ষম হই। মানুষের মত মরণশীল, আর মৃত্যুও একবারই আসে, এই মহা সত্যকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারলেই প্রাণমুহুর্তে মরার যন্ত্রণা থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে, ‘ভীক মৃত্যুর আগে শত্রুর মরে’, এই প্রবাদ বাক্যটি বর্ণ বর্ণ সত্য, বাস্তবিকই ভয়ের তাড়নাকে জীবনভয়ের যাবা ভোগ করে যায়, একটি মুহুর্তের জঙ্কও সত্যকার জীবনের স্বাদ কি তাবা পেতে পারে? আমরা এক পরিচিত ব্যক্তি একদিন প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করেই জ্ঞানালেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে মেরিন তাঁর কপালে কান অটন ঘণ্টা। নিশ্চিতপ্রায়, অত্বেতুক আশঙ্কার সৈন্য প্রতিমুহুর্তে যে বাতনা তিনি ভোগ করছেন তার তুলনা কোথায়, অস্বাভাবিক শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটল না শুধু তাঁর জীবনের মাথা দিনগুলি থেকে একটি সোনার-বাতা দিন সার্থকতার বলে ব্যর্থতার কালি মেখে চিরহরে অবলম্বন হয়ে গেল। আমেরিকার প্রাক্তন বিপ্লবী রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বলছেন, ‘আমাদের ভয়েকেই শুধু ভয় করা উচিত’, ‘অজ্ঞান, অচেনা, অদেখা বিপদকে ভয় করে করে আমরা যেন মনুষ্যের অবমাননা না করি’। মানুষ যে কতরকম আশঙ্ক্যকেই না লালন করে ব্যতিরেকে তুলছে নিরস্ত, যুদ্ধভীতি আজকের দিনে অস্বাভাবিক একটা সর্বজনীন আর একথাও অনস্বীকার্য যে এ ভয়ের পেছনে অন্তত কিছুটা বৃত্তি আছে। আমাদের মধ্যে

যুদ্ধ অবসানের পর ১৯১১ সালের শেষে আমরা যখন ক’রাগারের বাইরে আসি তখন দেশে মহাআত্মা গাঙ্গীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পরিচালনার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর আহ্বানে বিপ্লবী-কর্মীরা অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দেন। তখন বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে ‘আত্মোন্নতি’র পৃথক সত্তা আর কিছুই বইলো না। অজান্তে বিপ্লবী দলের দ্বারা ‘আত্মোন্নতি’র অনেক কর্মী মনে-প্রাণে অহিংস অসহযোগ মেনে নিলেন, আবার অনেকে ভাবলেন যে, সশস্ত্র ও অহিংস—সকল উপায়েই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করা যায়। কেউ কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের পথ একমাত্র পথ রূপে বেছে নিলেন। এর পর ‘আত্মোন্নতি’র পুরাতন কর্মীরা ধীরে ধীরে দেশের স্বাধীনতার জঙ্ক বর্ষ করতে লাগলেন, তা ঠিক ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির সদস্যরূপে নয়। ‘আত্মোন্নতি’ সমিতি তখন কংগ্রেসের দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের মধ্যে বিলীন হয়েছে।

অনেকেরই যুদ্ধের ভয়াবহতা সযত্নে কিছুটা ধারণা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভীতিকে এতটা প্রাশ্রয় দেওয়ারই বা কি আছে? এমনও তো হতে পারে যে মানুষের শুভবুদ্ধিই পরিণামে জরী হয়ে চিরন্তন মানব সমাজকে রাস্তমুক্ত করে আনবে। মানুষই যুদ্ধের আমশানী করেছে একদিন, আবার হয়ত একদিন এই মানুষই যুদ্ধ, কাটাকাটি, হানাহানির উপর সমান্তরী ঝাঁড়ি টেনে দেবে। অতএব অত্বেতুক ভয়ের চিত্তকে পীড়িত না করে বরং নিজের নিজের কর্তব্য অধিষ্ঠিতভাবে পালন করে যাওয়াই সমুচিত কাজ। কয়েক বছর আগে শত্রুদ্বারা অত্বেতুক কোন এক শহরে একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, বোমার আঘাতে বিধ্বস্তপ্রায় সেই গৃহের স্নানের ঘরটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, দেখলাম সেই অপরিসর কক্ষ খাওয়ার জঙ্ক একটি ছোট টেবিল পাঠা রয়েছে, ব্রহ্মপুত্র অববাহণ তার উপর, মাঝখানে স্কন্দর একটি ফুদানীতে অগ্নান পুষ্পগুচ্ছ অবধি শোভা পাচ্ছে; গৃহিণী বললেন, ‘জানি হয়ত আমরা এই মুহুর্তেই বোমার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, কিন্তু এখনও তো বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ বরাবর যেভাবে চলেছি সেইভাবেই চল’। আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক হুযোগ, সাংক্রামক ব্যাধি ইত্যাদি মারও কত রকমের আতঙ্কেই না বিচলিত হই আমরা কিন্তু এ ২০-২১ হাত থেকেই তো পরিত্রাণ আছে, সব অত্বেতুকই তো শেষ হয় কখনও না কখনও তবে বুঝা চিন্তা করে মনকে অবসন্ন করে লাভ কি? মনস্থির রাখতে পারলে যে কোন বিপদকেই অতিক্রম করা যায়, এজঙ্কই হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ ‘গীতার’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হরদৌর্যল্য পরিহার করতে বাহবার উপদেশ দিয়েছেন। আতঙ্ক একবার মনে শিকড় গাঢ়লে মানুষ আর কোন কাজেই সফল হতে পারে না, বিধাৎস্ত কৃষ্ণিত মন নিয়ে যে কাজেই অগ্রগণ্য হয় তাতেই ব্যর্থতা বরণ করে, আবার মন দৃঢ় থাকলে যে অসম্ভবও সম্ভব হয় তারও দৃষ্টান্ত আছে ভুরি ভুরি। অতএব বুঝা শক্তির জীবনের পথ চলা আমরা যেন বটকাকাণ্ড না করে তুলি। কবিত্তর ভাষায় যেন বলতে পারি,—

‘জীবন মৃত্যু, পারের ভূতা, চিত্ত ভাবনাইন।’

# একটি প্রসিদ্ধ শিশু-অপহরণ কাহিনী

কুসুলা দত্ত

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠে কর্নেল লিওবার্গ দেখলেন খ্যাতিরও বিড়ম্বনা আছে। দিনরাতই লোক আর লোক আর হৈ-চৈ। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বলে কিছুই আর তাঁর থাকছে না।

নিরিবিলিতে শান্তিতে বাস করবেন বলে লিওবার্গ অবশেষে নিউ জার্সীর হোপওয়েলের কাছে একটু জনবিরল জায়গায় একটা বাড়ি করলেন। ১৯৩২ সাল সেটা। কিন্তু শান্তি তাঁর কপালে ছিল না।

এলা মার্চ রাতে লিওবার্গ গৃহিণী যখন শুতে যাবার জোগাড় করছেন হঠাৎ নার্ন বেটি ছুটে এল—‘থোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না।’

থোকা হল লিওবার্গ-দম্পতীর একবছর আটমাস বয়েসের ছেলে।

নার্নের কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই ছুটে গেলেন থোকায় ঘরে।

শুধা শূঙ্খ! বালিশের ওপর শিশুর মাথা রাখার দরুণ অগভীর গর্ত দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, শিশু কিছুক্ষণ আগেও বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিল।

ব্যাপার বুঝতে চার্লস লিওবার্গের দেহি হল না। স্ত্রীর দিকে ফিরে ভগ্নকণ্ঠে তিনি বললেন—‘এ্যান, থোকাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।’

অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে চুরি করে নিয়ে গিয়ে মোটা মুক্তিপণ দাবী করার ঘটনা আমেরিকায় মোটেই বিরল নয়। লিওবার্গ তখন অগাধ আর্থের মালিক। তাঁর স্ত্রীও বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

কর্নেল লিওবার্গ তৎক্ষণাৎ স্থানীয় এবং রাজ্য পুলিশকে খবর দিলেন। তাঁর ব্যবহারজীবীকে খবর দিলেন। তারপর রাইফেল নিয়ে মোটরের হেডলাইটের আলোর বাড়ির চারদিকে বুখাই খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন।

পুলিশ এলো। ভাল করে অনুসন্ধান পরীক্ষা করে বাখা গেল কার্টের মই-এর সাহায্যে কেউ দোতলায় শিশুর ঘরের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুক ওকে চুরি করেছে। ভাড়া মইটাও পাওয়া গেল। লিওবার্গের মনে পড়ল যে শিশুর নির্বোধ হওয়ার কথা জানার কিছুক্ষণ আগে তিনি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনেছিলেন বেন কার্টের কিছু একটা ভাঙার শব্দের মত। কান পেতে আর কিছু শুনতে না পেয়ে শেষে তিনি ভেবেছিলেন ও কিছু নয়। জানাল/চাড় দিয়ে খোলার একটা যন্ত্রও পাওয়া গেল। একটা চিঠির খাম শিশুর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ না আসা পথস্থ লিওবার্গ সেটি কাউকে স্পর্শ করতে দেন নি। হয় তো অপরাধীর আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে এ থেকে। আঙুলের ছাপ কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন চিঠিটা খোলা হল। যা ভাষা গিয়েছিল তাই। চিঠিতে পঞ্চাশ হাজার ডলার দাবী করে জানানো হয়েছে যে শিশু নিরাপদেই আছে। পুলিশ বা সংবাদপত্রে যেন কিছু জানানো না হয়। হুঁচার দিন পর টাকার কোথায় দিতে হবে, সেটা জানানো হবে।

টাকার ভুল অর্থবিদ্যা ছিল না। লিওবার্গ স্থির করলেন যে, তিনি অপহরণের নির্দেশমতই চলবেন। পুলিশকে তিনি তখনকার মত নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খবরের কাগজগুলো তৎক্ষণে কাগজ ছেপে ফেলেছে। তাঁর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় হৈ-চৈ পড়ে গেল। হুঃসাহসী বীর বৈমানিক লিওবার্গে শিশুপুত্র

অপহৃত হয়েছে। এটা কম উত্তেজনার খবর নয়। লিওবার্গ পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু উত্তাল জনসমুদ্রের ভিড় ঠেকাতে তাঁকে পুলিশের সাহায্য নিতে হল। তবে তিনি যোষণা করলেন যে, অপহরণকদের অনুসন্ধানে তিনি পুলিশ লাগাবেন না।

৪ঠা মার্চ অপহরণকদের প্রতীক চিহ্নিত আরেকটি চিঠি এল। যেহেতু লিওবার্গ সব প্রকাশ করে হৈ-চৈ লাগিয়েছেন, সেহেতু সব শান্ত না হলে এবং পুলিশ না চলে গেলে তিনি ছেলে ফিরিয়ে পাবেন না। মুক্তিপণের টাকাও পঞ্চাশ হাজারের জায়গায় সত্তর হাজার দাবী করা হল চিঠিতে। চিঠি ইংরাজীতে লেখা হলেও তাতে কয়েকটি জার্মান শব্দ এবং তুল বানান দেখা গেল। অবশ্য এগুলো আত্ম-গোপনের ভুলও করা হতে পারে।

৮ই মার্চ সংবাদপত্রে একটি চিঠি বের হল। জন এক কণ্ডন বলে এক বৃদ্ধ শিক্ষক জানানলেন যে, একটি মা বাতে তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরে পান, সেজন্য তিনি তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় এক হাজার ডলার অপহরণকদের দিতে এবং অপহরণকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে প্রস্তুত।

পরদিনই জন কণ্ডন অপহরণকদের কাছ থেকে চিঠি পেলেন এবং লিওবার্গকে জানানলেন। লিওবার্গের সম্মতি নিয়ে তিনিই লিওবার্গ ও অপহরণকদের মধ্যস্থত্ব করে কাজ করতে লাগলেন। অপহরণকরা প্রয়োজনমত চিঠিতে এবং ফোনে তাঁকে নির্দেশ দিতে লাগল। তাদের নির্দেশামুযায়ী ডঃ কণ্ডন রাতে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে একটি লোকের দেখা পেলেন। সে জানাল তার নাম জন এবং সে দলের একজন লোকমাত্র। আরো পাঁচজন লোক দলে আছে। তারাই যে শিশুর অপহরণ সে বিষয়ে জন কিছু প্রমাণ দিল এবং শিশুর পরনে যে পোষাক ছিল সেটি ডাকে তাঁকে পাঠিয়ে দেবার প্রতিক্রিয়া দিল। জন সর্বদা যথাসাধ্য ঢেকে রেখেছিল বাতে তাকে ভাল করে দেখা না যায়। কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ভয় পেয়ে সে ছুট দিলে ডঃ কণ্ডনও তার পেছন পেছন ছুটে গিয়ে তাকে আশ্রয় করার সময় তাকে ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিশুর পোষাকটি অপহরণকরা পাঠিয়ে দিল। তখন লিওবার্গ অপহরণকদের প্রার্থিত অর্থ দিতে প্রস্তুত হলেন। এর মধ্যে কার্টিস বলে একটা লোক জানানল যে অপহরণকরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এতে লিওবার্গ কিছুটা বিভ্রান্ত হলেন এবং সময়ও নষ্ট হল। অবশেষে অপহরণকরা স্থান নির্দেশ করে ডঃ কণ্ডনকে চিঠি দিলে এবং তাকাতাড়ি করার দাবী জানানল।

লিওবার্গ টাকা আনতে গেলে কোবাগার কর্তৃপক্ষ মোটগুলোর নম্বর রাখতে চাইলে লিওবার্গ আপত্তি করলেন। এটা জানতে পারলে হয় তো অপহরণকরা ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুর অনিষ্ট করবে বা ভীত হয়ে শিশুকে ফিরিয়ে দেবার স্বীকৃতি নিতে অনিচ্ছুক হবে ভেবে তাঁর পিতৃহৃদয় উষ্ণ হয়ে উঠল। কোবাগার কর্তৃপক্ষ পীড়াদায়ী করার তিনি মত দিতে বাধ্য হলেন কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুবান্ধবরা টাকা দেবার সময় পুলিশ রাখার এবং অপহরণকদের ঘরে ফেলার যে পরামর্শ দিলেন তা তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। তা কিছুতেই হতে পারে না।



## একটি ঐতিহাসিক শিশু-অপহরণ কাহিনী

জন্মের নির্দেশমত একটি কবরখানার পাশে গিয়ে লিওবার্গকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে ডঃ কণ্ডন নেমে গেলেন। জন উপস্থিত ছিল। কণ্ডন বললেন যে—সন্তর হাজার জোগাড় করা যায় নি পঞ্চাশ হাজার জানা হয়েছে। তবে ছেলেকে কোথায় পাব সেটা আগে লিখে না জানালে টাকা হবে না। জন তাতেই রাজী হল। কণ্ডন লিওবার্গকে এসে জানালেন যে জন পঞ্চাশ হাজারেই রাজী হয়ে গেছে। লিওবার্গ ধন্যবাদ দিয়ে বিশ হাজার ডলারের বাবুটা রেখে পঞ্চাশ হাজার ডলারের বাবুটা কণ্ডনের হাতে তুলে দিলেন। সেটা পেয়ে জন একটা খাম দিল এবং বলল ছ' ঘণ্টার আগে যেন সেটা খোলা না হয়।

কিন্তু লিওবার্গের কাছে এসে ডঃ কণ্ডন বললেন যে লিওবার্গ তো কোনো কথা দেন নি, কথা দিয়েছেন তিনি স্ত্রুতরাং লিওবার্গ চিঠিটা খুলে ফেলুন। বলা যায় না, যদি জন কীকি দেয়, চিঠিতে যদি শিশুর কথা কিছু না থাকে তবে ছ' ঘণ্টা সময় শুধু শুধু নষ্ট হবে। স্ত্রুতরাং লিওবার্গ চিঠি খুলে ফেললেন। জন কীকি দেয় নি। স্থান নির্দেশ করে দেখা ছিল একটা নৌকোর শিশুকে পাওয়া যাবে।

ছ' ঘণ্টা পর বৈমানিক সি-প্লেন (যে প্লেন জলে ডাসে) ঐ স্থানে গেলেন। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও নৌকা বা শিশুর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে লিওবার্গ দেখলেন একমাস পর সেদিন তাঁর শিশুপুত্রের ঘরে আলো জ্বলেছে। মা অপহৃত-পুত্রকে কোলে নেবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। লিওবার্গ ত্রুকে আশ্বস্ত করে বললেন—দেরি হতে পারে তবে ছেলেকে ফিরে পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

কণ্ডন আবার অপহরকদের উদ্দেশ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যে ছেলে পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন লিওবার্গ যথাকর্তব্য করতে প্রস্তুত হলেন। প্রথমে একাধাগার থেকে লিওবার্গ কর্তৃক মুক্তিপণের টাকা হিসেবে জনকে প্রদত্ত গোল্ড-নোটগুলোর নম্বর যুগ্মসূত্র ও কানাডার প্রত্যেক ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লিওবার্গ তখনো ছেলে ফিরে পাবার আশা ছাড়েন নি, তাই তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর নামটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন পাছে অপহরকরা সন্দেহ করে যে তিনি পুলিশ লাগিয়েছেন। কিন্তু সেটা গোপন রাখা গেল না। তখন লিওবার্গ একটি বিবৃতিতে জানানলেন যে, তিনি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও অপহরকরা শিশুটিকে ফিরিয়ে দেয় নি। সেদিন ১ই এপ্রিল।

এর মধ্যে কাটিস বলে লোকটি জানালো যে অপহরকরা তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তার কথায় বিশ্বাস করে লিওবার্গ নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন কিন্তু কারো পাত্তা নেই। আবার কাটিস বলল অপহরকরা অস্ত্র জারগার সন্ধান করতে বলেছে। সে দিন আবার আবহাওয়া খারাপ। এভাবে ১২ই মে পর্যন্ত আশা নিরাশার খন্ডে হুলতে হুলতে হতভাগ্য শিশু পুত্রের সন্ধানে ইতস্তস্ত তোলপাড় করে বেড়ালেন।

অবশেষে উইলিয়াম এলেন বলে একটি লোক দৈবক্রমে পটাপাতা ও মাটিতে ঢাকা একটি শিশুর বিকৃত শব্দই দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দিলে। খবর পেয়ে লিওবার্গ এলেন। তাঁর মুখে এক্সেজ্ঞাস। ধৈর্য ও সংযম সহকারে দেহটি পরীক্ষা করে তিনি বললেন—‘এটি আমারই ছেলে।’

পরে প্রকাশ পেয়েছিল যে, অপহরক যখন শিশুকে চুরি করে মই

ঘরে নামছিল তখন মই ভেঙে পড়ে যাওয়ার শিশু যে আঘাত পায় তাতেই তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। অপহরক প্রথম থেকেই জানত সে লিওবার্গকে ধোঁকা দিচ্ছে। ছেলে সে ফিরিয়ে দেবে না।

মিসেস লিওবার্গ তখন অস্ত্রহস্তা!

নিউ জার্সী স্টেট পুলিশ উঠে-পড়ে লাগল অপরাধীকে ধরার জন্তে। এর মধ্যে জানতে পারা গেল যে কাটিস আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছে এবং এভাবে মূল্যবান ক’টি দিনের অপচয় ঘটিয়েছে হতভাগ্য শিশুকে মিথ্যা আশা দিয়ে।

অপহরণের দিন লিওবার্গ-পরিবারের মিসেস লিওবার্গের মায়ের কাছে গিয়ে থাকার কথা ছিল। শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ায় যাওয়া হয় নি। কিন্তু এ খবর অপহরকরা পেল কোথেকে? পুলিশ শিশুর মাতামহীর একটি পরিচায়ককে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে জেদা করতে থাকে। খবরটা কারো কাছে বলেছে বলেই তাকে বা অস্ত্র কারয়েই হোক, মেরেই ভয় পেয়ে গেল এবং বিব খেয়ে আত্মহত্যা করল।

সংবাদপত্রে তুলুল চৈ-চৈ শুরু হল। পুলিশকে প্রচুর গালাগাল দেওয়া হতে লাগল। তারা আসল কাস্তের বোলায় অষ্টরজা, অসহার তরুণীকে ভয় খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে ওস্তাদ—ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যি বলতে কি পুলিশ এই মামলার অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। আড়াই বৎসরের পরে অপরাধী ধরা পড়েছিল। কিন্তু ততদিন পুলিশ বসে থাকে নি। তাদের দু’টি প্রধান মন্ত্র ছিল মুক্তিপণরূপে প্রদত্ত গোল্ড-নোটগুলোর নম্বর এবং কাঠের ভান্ডা মইটি। এরই সাহায্যে তারা আটঘাট বাদছিল। নম্বরী নোটের অনুসরণ করে তারা অপরাধীর বাসস্থান সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল এবং সেইসব অঞ্চলে কড়া নজরটী শুধু রাখা যে নি সব পেন্টেল পাশ্চাত্য লিওবার্গপ্রদত্ত নোটের নম্বর জানিয়ে দিয়েছিল যাতে এই নম্বরী নোট পেলেই মালিকের গাড়ির নম্বর রাখা হয়।

কাঠের মইটি পুলিশ আর্থার কোয়েলার বলে একজন কাঠ-বিশারদকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে, কি ভাতের। কোথায় হয় এমন কি কোন দাকান থেকে কাঠ কেনা হয়েছিল তা পর্যন্ত বের করেছিল। অপরাধী ধরা পড়লে পর এই কাঠের মালিক হামুস অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, মইয়ের একটা ধাপের কাঠটি অপরাধীর ঘরের একটি কাঠের থেকে নেওয়া এবং অপরাধীর নিজের একটি যন্ত্রই কাঠটি কাটা হয়েছে। এভাবে পুলিশ এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছিল যাতে দীর্ঘদিন পরেও অভিযোগ প্রমাণ করতে অসম্ভাব্য হয় নি।

১৯৩৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর একটি পেন্টেল পাশ্চাত্য পেন্টেল কেনার পর ক্রেতা একটি দশ ডলারের গোল্ড-নোট দিলে ম্যানেজারের মনে পড়ল যে, লিওবার্গপ্রদত্ত নোটের নম্বরের যে তালিকা পুলিশ বিভাগ থেকে এসেছিল তাতে দশ ডলারের নোটের কথা আছে। ত্রুয়ের বিষয়, তালিকাটি মহলা হয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার স্টেট ফেল দেওয়া হয়েছে। ম্যানেজার চালককে ভাল করে লক্ষ্য করলেন এবং সে গাড়িতে উঠলে পর গাড়ির নম্বর টুকে রাখলেন।

নোটটাসহ সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে গেলে পর গেল নোটটি সেই লিওবার্গের মুক্তিপণের নোট। তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর গেল। ম্যানেজারের কাছে নোটের মালিকের চেহারার বর্ণনা শুনে

পুলিশের উৎসাহীকর্তা যিনি আর কানন্দ লুণ্ঠাতে পারলেন না। কণ্ঠশ্রমস্ত বর্ণনার সঙ্গে জ্বল মিলে যাচ্ছে। এতদিন বৈধ ধরে যে অল্পান্ত চেঁচা চালিয়েছেন অবশেষে তার ফল মিলল। স্টেট মটর ভেইকল বুঝতে যেন করে গাড়ির মালিকের নামঠিকানা শেষে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। মুক্তপাণের টাকার একটি মোটা অংশ তার বাড়িতে পাওয়া গেল এবং পাওয়া গেল একটি দূরবীণ যা দিয়ে খুব সম্ভব সে লিওবার্গের বাড়ির পাশের কোনো জঙ্গল থেকে বাড়ির কে কখন কোথায় থাকে এসব লক্ষ্য করত—যাতে শিশুকে নিষিয়ে চুরি করা সম্ভব হয়। ভাতিতে সে জার্মান। নাম তার জনো রিচার্ড হাউপটম্যান। জার্মানিতে পর পর কয়েকটি চুরির অভিযোগে জেল খেটেছে সে। জেল থেকে পালিয়েই সে আমেরিকায় আসে।

হাউপটম্যান অবশ্য বলল সে শিশু অপহরণ করে নি। কিন্তু মুক্তিপণের অর্থ তার কাছে এল কি করে—এরও কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারল না।

১৯৩৫-এর জানুয়ারী হাউপটম্যানের বিচার শুরু হল। নিউজার্সীর তরুণ এটর্নী-জেনারেল ডেভিড উইলস্কেজের এটিই ছিল প্রথম ক্ষোভদারী মামলা। এই প্রথম মামলাতেই তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

ডঃ কণ্ঠন সাক্ষ্য দিতে উঠে বিধাতার দৃষ্টিতে জানালেন যে, জন বলে যে লোকটি তাঁর সঙ্গে মুক্তিপণ সম্বন্ধে কথা বলতে আসত, সেই যে জনো রিচার্ড হাউপটম্যান এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। অশুদ্ধত শিশুর মৃতদেহ পাওয়া যাবার অব্যবহিত পরে কণ্ঠন পুলিশের কাছে জনের চেহারাের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন সেটি তাঁকে আবার বলবার অনুরোধ করলেন উইলস্কেজ। কণ্ঠন যখন সেই বর্ণনাকে আবৃত্তি করলেন আদালতের সবাই তারিফে দখলেন হাউপটম্যানের চেহারাের সঙ্গে সেটি জ্বল মিলে যাচ্ছে।

হাউপটম্যানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন দুর্ধর্ষ আইনব্যবসায়ী এডোয়ার্ড রিলী। রিলী বহু খুনি আসাম্যকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে মুক্ত করেছিলেন। এতেন হুদে আইনজীবীর নির্মম জেরার মুখে দাঁড়িয়েও ডঃ কণ্ঠন একটুও টললেন না।

সরকার পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য ছিলেন কাঠ-বিশারদ আর্থার কোয়েলার। সেই ভাঙ্গা কাঠের মইটি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে উঠে কোয়েলার বিভ্রান্ত তথ্য ও অকাট্য প্রমাণ দাখিল করে দেগালেন যে, মইটি হাউপটম্যানের বাড়িতে প্রাপ্ত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি এবং এ বাড়িরই একটি তক্তা থেকে কেটে একটি কাঠও মইয়ে লাগানো হয়েছে। রিলী প্রচণ্ড আক্রমণ করেও এই 'শাল'ক হোমসের' সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দিতে অক্ষম হলেন। হাউপটম্যানের পক্ষে ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে এ কথা বুঝতে কারো বাকি রইল না।

রিলী তাঁর সওয়ালে এই শিশু-অপহরণ ব্যাপারটি লিওবার্গ-পরিবারের পরিচারকবর্গের ওপর চাপাতে চাইলেন। বিশেষ করে শিশুর নাস 'বেটিকে তিনি প্রধান অপরাধী বলে নির্দেশ করলেন। কোয়েলারের সাক্ষ্য উড়িয়ে দেবার জন্য একজন কাঠবিশারদ আনা হয়েছিল। তিনি আদালতে নিজেকে হাতশাস্পর করে তুলেছিলেন।

উল্লেখ্যের জেরার উত্তরে হাউপটম্যান বলল সে নির্দোষ। কিন্তু সে যে একাধিকবার মিথ্যে বলেছে তা আদালতে উইলস্কেজের জেরায় প্রমাণিত হল। সব শেষে সরকার পক্ষের সাক্ষ্যগুলির অকাটাভা

আবার সবার সামনে তুলে ধরার পর হাউপটম্যান যে কতবড় মিথ্যাবাদী তার একটা জলন্ত প্রমাণ উপস্থিত করলেন আদালতে।

মুক্তিপণ দাবী করে লেখা চিঠিগুলিতে Signature শব্দটি Signature বলে লেখা ছিল। হাউপটম্যান দাবী পড়ার পর পুলিশ এই স' চিঠিতে যে সব বানান তুল লেখা ছিল সেগুলি এক এক করে তাকে দিয়ে লিখিয়েছিল। বলা বাহুল্য হাউপটম্যান সেগুলো ঠিক চিঠির মতই তুল লিখেছিল। আদালতে রিলীর প্রশ্নের উত্তরে হাউপটম্যান বলে যে, পুলিশ তাকে বাধ্য করেছিল Signature শব্দটি Singnature বলে লিখতে। এখন উইলস্কেজ সেই সমস্ত কাগজের টুকরোগুলি জুরী হাতে দিয়ে বললেন—'আপনারা দেখুন, এর মধ্যে অনেকগুলো শব্দই আছে কিন্তু Signature শব্দটি নেই, কোথাও নেই' কার হাউপটম্যান আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছে পুলিশ জোর করে তাকে Singnature লিখতে বাধ্য করেছে !!'

পুলিশ ইচ্ছা করেই Signature শব্দটি বাদ দিয়েছিল। কারণ কাগজে এটা নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে, হাউপটম্যান অবশ্যই তুলটা জানতে পেরে গেছে সুতরাং শুটা লেখানোর অর্থ হয় না। হাউপটম্যান সম্ভ্রান্ত তুল গিয়েছিল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী রায় বের হল। বিচারক ট্রিনচার্ড মামলাটি বুঝিয়ে দেবার পর সন্ধ্যা এগারো ঘটী সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার করে জুরী রায় দিলেন হাউপটম্যানের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মামলার সুনানী আসক্ত হবার আগে থেকেই বাইরে বহুলোক প্রেসমিটন ভিড় করেছিল। হোটেল মাত্র একটি ছিল। তাতে ৯০০ ঘরের জমা অনুরোধ এসেছিল, যাতে মামলার সময় ওখানে থাক। রায়। আদালতের বাইরে অপেক্ষমাণ বিরাট জনত কষ্টেই হয়ে চাঁৎকার করছিল, 'খুন করে ফেল, শেষ করে দাও হাউপটম্যানকে,' রায় বের হতে জনতা আনন্দে চাঁৎকার করে উঠল।

ট্রিনচার্ড মুহূর্তেই আদেশ দেবার সময়ও হাউপটম্যান স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরে সে ভেঙে পড়ল। কখনো কখনো লাগল কখনো যিসু যিসু করে বলতে লাগল 'হোট ছোট মাঝুয়, ছোট ছোট কাঠের টুকরো, ছোট ছোট কাগজের টুকরো—'

সম্ভবত শিশু, ভাঙ্গা মই এবং চিঠির কথা তার মনে গচ্ছিল। হাউপটম্যানের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় কেউ কেউ মনে করলেন, মুহূর্তেই দেওয়া উচিত হয় নি।

হাউপটম্যানের আইনজীবীরা টালবাহানা করে সময় নিলেন, আপীল করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। ১৯৩৬-এর ১লা এপ্রিল বৈজ্ঞানিক চেয়ারে হাউপটম্যানকে প্রাণ দিতে হল।

এবার লিওবার্গ-দম্পতী তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রের সম্বন্ধে শাসিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে লেখা কতকগুলো চিঠি পেলেন। যদিও চিঠিতে 'আমরা' বলে উল্লেখ ছিল, হাউপটম্যানের কোনো সঙ্গী এ পাপকাণ্ডে ছিল বলে কিন্তু জানা যায় নি। সুতরাং এ চিঠি তার দলের লোকের লেখা বলেও মনে করা যায় না। সম্ভবত শিশু-অপহরণক দুর্বৃত্তদের কেউ ঘটনার বিবরণ জেনে হাউপটম্যানের প্রতি সহানুভূতিবশত এ রকম করে থাকবে। তা ছাড়া অজ্ঞাত কারণেও লিওবার্গ-দম্পতী বেশ কিছুদিনের জন্য আমেরিকা ছেড়ে ইংলণ্ডে চলে আসেন শান্তিপূর্ণ ও নিরবিধি জীবনের আশায়।

# ভ্রাতৃত্ব

(শেষাংশ)

সাধন তপাদার

—মুনে পড়ল—হ্যাঁ, সেই মুখটাই তো! ভ্রাতার, তারপর কি হয়েছিল আমার মন নেই, কি করে সে রাতে সিমগাঁয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম তাও বলতে পারব না। এরপর বেশ কিছুদিন কাজকর্মে আমার মন বসে নি। সর্বদা চিতাওয়ারের ঘটনাটি আমার মাথার পাক খেয়ে বেড়াতে। তারপর একদিন কেঁটসম্যান-এ এক জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন যে, শিউচরণের বৌয়ের সংসারের সাধ-আশ্রাধ মেটে নি। তার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তার অকালে অপব্যাসমুতর প্রতিশোধ নিয়েছিল তোমারই সাহায্যে।

আমি বললাম, এ ত' খুব ভাল কথা, এতে ভয়ের কি আছে।

বুধরি সাহেব বললেন, ঠাঁড়াও ভ্রাতার, আরও আছে। সিনোবা গাঁয়ের মাঝে কুমিকে আমি জানতাম। ভাল শিকারী ছিল। সেই মাঝে কুমি বেলারিতে শিকার করতে গিয়ে আর ফিরল না। তিন দিন পর ওর গলিত মৃতদেহটা চিতাওয়ারে পাঠানো গেল। কেউ বলল সাপে কেটেছে, কেউ বলল ভরে মরেছে। বাতেই সে মরুক কিম্বা চিতাওয়ারে মরেছে এটা ঠিক। এসব অবশ্য পুরনো দিনের কথা। এই কিছুদিন আগে স্যামুয়েল আলফি আর আমার ভগিনীপতি ইরং চিতাওয়ার থেকে পালিয়ে এসেছে। ওরা গিয়েছিল ওয়াইল্ড বোর শিকারে। চিতাওয়ারের বরণার পাড়ে গর্তে বসে গভীর রাতে শুনল একটা গৌ.গৌ. আওয়াজ। একটা মাংসের খসখসে হতে থাকলে গলা দিয়ে যেমন শব্দ বোঝায় ঠিক ঐ রকম। কেউ যেন কাউকে টুটি টিপে মারছে। ইরং, আলফি বন্দুক বাগিয়ে টর্চ আলিয়ে তর তর করে খুঁজল কিম্বা কিছুই দেখল না। তারা বার বার শুধু শুনল ধূপধাপ করে কারা যেন এদিক-ওদিক দৌড়ায়। শেষে তারা পালিয়ে আসে।

ভ্রাতার, তুমি বেলারি, মওরা গাঁ, সিমগাঁয়ে গেলেই জানতে পারবে কখনো কতলোক কতভাবে

ঐ চিতাওয়ারে মরেছে। চিতাওয়ারে মৃত্যু লেগেই আছে। প্রতি বছর দু'টো-একটা লোক সেখানে মরছে। কানিতে খুল মরছে নয় তো খুন হচ্ছে। কখন ভরে মরছে কখন সর্পদংশনে মরছে। তা ছাড়া জন্তু-জানোয়ারে তো মারাচ্ছেই। একথা সত্যি—গ্রীষ্মকালে চিতাওয়ারের বরণার অসংখ্য জানোয়ার জল খেতে আসে। আর গ্রীষ্মের শেষে এক সময় যখন বেলারি মাথাতালার ওরে জল শুকিয়ে বার তখন বেলারি পার্শ্ববর্তী গুপ্তা ও সারোরা জলের মধ্যে বা আশেপাশে কোথাও জল থাকে না। জল থাকে শুধু বেলারি নীমাঙ্গে চিতাওয়ারের বরণায়। স্বাস্থ্য অসুস্থ সে জল। চিতাওয়ারে তখন জানোয়ারের জড়োহুড়ি পড়ে যায়। কিন্তু শিকারী পার না মারার সুযোগ। বন্দুক ছুড়বার অবসর আর তার হয় না। তার আগেই শিকারীকে নিজের জীবন নিয়ে তহ হর নয় তো প্রাণ দিতে হয়। প্রাণ দিয়েছে মাঝে কুমি, প্রাণ দিয়েছে আরও কতজনে। পালিয়ে এসেছে ইরং, আলফি—পালিয়ে এসেছে কত লোকে। তাই বলি ভ্রাতার, বেলারি আর সব জায়গার তুমি



মাথাতালার

যাও কিন্তু চিতাওয়ারে তুমি যেও না। মিহিমিহি হয়রান হবে, শিকার পাবে না। হয় পালাতে হবে নয় মরবে।

এ পূর্ণস্তু বলে বৃদ্ধি সাহেব একটু খেমে গেলাসের সমস্ত হুইস্টিউক নিঃশেষ্যপান করে শূন্য গেলাসটি হাতে নিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁধোয়া তালিওয়ার দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন। যেন নিজেকেই নিজে শোনাত লাগলেন—

উঃ, কি ভয়ংকর জাগরণ! চিতাওয়ার! দিনমানে যে চিতাওয়ার বিচিত্র ছত্রিশগুড়ী কলরব হাসিগানে মুখরিত হয়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে সেখানে নেমে আসে বিভীষিকা! পৃথিব্যে যখন বনের পিছনে হেলে পড়ে চিতাওয়ারের শেষ মনুষ্য-কলরবটা তখন স্রীণ হয়ে যায় সিমসারের পথে বিশাল অশ্বখ গাছটার পিছনে। আর ধীরে ধীরে চিতাওয়ার তার নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জাগতে থাকে। কটকটে ব্যাঙগুলো কটকট করে চিতাওয়ারের জাগরণ ঘোষণা করে। ঝিঁঝিঁরা একে একে জাগে, ঝিল্লিরবে ঐকতান শুরু করে। বরগার মাছেরা মনের আনন্দে আবার থেলা শুরু করে, টুপটাপ শব্দে জলে ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এখানে-ওখানে সরসর করে কত কি চলে যায়। রাত বাড়ি আর ঘন বৃষ্টির আড়ালে চিতাওয়ার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। শুধু নক্ষত্ররাজ্য বৃন্দশীরের কঁাকে কঁাকে চিতাওয়ারের দিকে তাকিয়ে অতন্ত্র পাহারা দেয়। বোজকায়মতো জন্মে প্যাঁটাটা থেকে থেকে ডাবে—জম-জম! তারপর একসময় রতকোনা প্রান্তর থেকে নেকড়ের ক্রন্দন ভেসে আসে—উঁউউঁউ! গাঁয়ের লোকেরা বলে অভিশপ্ত চিতাওয়ারের অশরীরীরা এ সময়ে জাগে।



রামসহায় ও দুই বনো-শুরোদের বাচ্চা

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। ঘুরে-ফিরে চিতাওয়ারের কথাই মনে পড়ছিল। গভীর রাতে খুপে দেখলাম চিতাওয়ারের অশরীরীরা আমাকে ঘিরে নাচ্ছে। আতঙ্কে বুম ভেঙ্গে উঠে দেখি ঘেমে নেমে উঠেছি।

বিশ শতাব্দীর যুবক, বিশেষ বিজ্ঞান-চর্চা না করেও যুগপ্রভাবে কিছুটা বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। দিনে দিনে বিজ্ঞান চরমে উঠছে। বিধবাসী এটম, হাইড্রোজেন বম মানুষের করাস্ত, দেবাদিশেষ মহাদেবের বাসস্থান কাঞ্চনজঙ্ঘা বেলকল করে তারা ভখন চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সর্বত্র মানুষের জয়-জয়কার। এসব দেখতেনে বৃদ্ধি সাহেবের কাহিনী বিশ্বাস করতে মন চায় না, অশরীরী বিশ্বাস করি না, কোন কালেই করি না। কিন্তু অশরীরী ভয় যে একেবারেই নেই তাও বলি না। তবে কয়েকদিন ধরে অমৃতব করছি বেজারি আমাকে টানছে, বিপুল বিরম্বে টানছে।

তাৎপর বৈশাখ শেষে একদিন দুপুরে বিলাসপুর-রাসপুর লাইনে হাতবন্দ স্টেশনে এসে নামলাম। স্টেশন পোটার রামসহায়কে সঙ্গে নিয়ে জনহীন রতকোনা প্রান্তর পেরিয়ে উত্তর-দক্ষিণ সমান্তরালে বেজারির ধূলিধূসর বনরেখা দেখলাম—বৌজালোকে ঘুমিয়ে আছে। বনমধ্যে কোথাও একটা দাবানল থেকে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদগিরণ হচ্ছে। রতকোনা প্রান্তরের প্রবহমান উত্তপ্ত উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ সে ধুমশিখাকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কি নিষ্করণ ভয়াল সে সৌন্দর্য! সে শুধু উপলব্ধিই করা যায় প্রকাশ করা যায় না।

এ জঙ্গল রামসহায়ের নখদর্পণে। সে আমাকে নিপুণ পদবিক্ষেপে পথ দেখিয়ে সন্ধ্যার আগেই বনের গভীরে মাঝাতালাওয়ে নিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে পাড়ের ওপর উঠে পাঁড়াতাই একপাল কুকসার হরিণের মুখোমুখি হয়ে পড়লাম। জলে মুখ দিয়েও তাদের জল ঝাওরা হল না, মুহূর্তে সব চারদিকে ছিটকে পালাল।

রামসহায় আপশোষে শিরে করাঘাত করে বলল, হায় ভগওয়ান, কিতনা বড়া বড়া কারসাইল (শিঙেল কুকসার)।

আমি ঢাল বেয়ে নেমে জলার চারপাড় ঘুরে দেখলাম। দেখলাম মাঝাতালাওয়ের জলও স্রুত শুকিয়ে বাচ্ছে। জলার পাড়ে পাড়ে কচি হাস গজাচ্ছে। বেজারির আর সর্বত্র জল শুকিয়ে গেছে, হাস পুড়ে বাচ্ছে—বুঝা আর সারোবার জললে হুড়িঙ্কের হাহাকার, শুধু মাঝাতালাও এই কচি হাস আর জল নিয়ে লজ্জাখানা খুলে বসেছে। শত শত হরিণ আর বুনো-শুরোদের ক্ষুরে মাঝাতালাওয়ের চারপাড় চিহ্নিত হয়ে আছে। কোথাও বুনো-শুরোর ভূমিকর্ষণ করেছে কোথাও কাদার গড়িয়েছে। পাড়ে পাড়ে ছড়িয়ে হরিণের বিষ্ঠা।

গর্ত খুঁড়তে হল না। জলার পশ্চিম পাড়ে একটা কড়ি গাছের নীচে গর্ত একটা বোড়াই ছিল সেটা দখল করলাম। চারিদিকে রক্তলাল শিশুল আর পলাশ ফুলের শোভা দেখে আর অপ্রান্ত বৃষ্ণ ডাক স্ননতে-স্ননতে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলাম। হঠাৎ টিউউ পান্থির তীব্র চিংকারে ধ্যান ভাঙতেই দেখি, বনভূমি অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আমাদের পিছনে কোথাও কতকগুলো চিরল হরিণ ডাকছে—টিউউ! টিউউ!

আমি শিহন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ও কি! পাছের কঁাকে কঁাকে লাল জাভা! লালে লাল পশ্চিম আকাশ! ভাবছি

## লোকাতীত

অনেকক্ষণ পূর্ব অন্ত হয়েচে আকাশ এত লাল কেন। রামসহায়কে দেখালাম।

সে দেখেই বলল, হার ভগওয়ান, সত্যনাথ হো গিয়া। সারোয়ার বাসবনে আশুন লেগেছে হজুর। দুনিয়াভরু বাস হলে বাচ্ছে হজুর। কি হবে।

বললাম, বাসবনে আশুন লেগেছে তো কি হয়েছে?

রামসহায় বলল, গাঁয়ের গরু-ভয়েষ খাবে কি হজুর। আবাদি জঙ্গলে কোন চরাগ নেই (গরু-মোষ চরবার জায়গা) এককাডা বাস নেই।

বললাম, কেন বেলারি ঘুঘুর নেই?

রামসহায় বলল, আছে। কিন্তু এসব তো সরকারী জঙ্গল, এখানে গরু-ভয়েষ চরতে দেয় না। উঃ, সারোয়ার কি বাস হজুর। শুধু বাসই বাস। আর কত হরিণ-শূরোর—বাসের বনে ভুবে নিশ্চিন্তে চরে বেড়ায়। শিকারী গুলী ঢালাবে কি হজুর—দেখতেই পায় না। শুধু শোনে সরস্ব-সরস্ব শব্দে সব চলে যায়। তারপর একটু থেমে বলল, আপনায় তক্দির বড় ভাল হজুর। সারোয়ার সমস্ত জানোয়ার আজ বেলারি ঘুঘুর চলে আসবে। আপনায় গুলী ফুরাবে তো জানোয়ার ফুরাবে না।

হঠাৎ জলার চারপাশে বিশ্রামরত ব্যাঙেরা একসঙ্গে জলে ঝাঁপাল—শব্দ হল চরুয়াং।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে কোকরে চোখ রাখলাম। অন্ধকারে চোখটা একটু সরে এলে দেখলাম একপাল হরিণ পুন্ডিকের ঢাল বেয়ে জল খেতে নামছে।

রামসহায় কিস-কিস করে বলল, ডবল ফায়ার করিয়ে হজুর, শে-চায়টো গিরা নিজিয়ে।

ওর কথায় কান না দিয়ে আমি পাঁচসেলের টর্চটা আলালাম। দেখলাম জলার অর্ধেকটা ছুড়ে তুফার্ত হরিণেরা নিশেধে জলপান করছে। কুন্ডসার, চিত্রল দুই-ই এসেছে। বাতি নিভিয়ে দিলাম। কিছু সন্দেহ করল না ওরা। যেমন নিশেধে এসেছিল জল খেয়ে তেমনি নিশেধে চলে গেল।

রামসহায় বড় ক্ষেপে গেল। বৃষ্টি আর সমীহ করতে চায় না। হাত-পা ছুঁড়ে বলল, কেহা বাবুলী, আপ গোলা নেহি ঢালাতে হে! ইত, না হরণ—বাগরে বাপ। কেইসান শিকারী আপন হজুর।

ধমক দিয়ে বললাম, চুপ থাক জংলী কোথাকার! সারাদিনের পর শিপাসার্ত হরিণেরা জল খেতে এসেছে, ওদের মেরে বাতাহুরী না করলেও চলেবে! হরিণ বখন মারবার আমি ঠিকই মারব।

রামসহায় বলল, তা হলে হজুর আর এখানে বসে থেকে কি হবে? বললাম, কেন, শূরোর মারব।

সঙ্গে সঙ্গে সে জবাখ দিল, ওরাও তো জল খেতে আসবে।

বললাম, তা হলেও মারব। ওরা হিংস্র শত্রু। ওরা আমাদের অশেষ ক্রুতি করে। কসলের সময়ে একটা হরিণ যত ফসল খায় তার বিশগুণ খায় একটা শূরোরে। আবার একটা হরিণ বছরে যখন একটা বাচ্চা দেয়, একটা শূরোরে দেয় দশ থেকে বোলাটো। নিরীহ-নির্জীব হরিণগুলোকে মেরে মেরে সাবড়ে দিল লোকে, আর ওরিকে হৃৎ হৃৎ বুনো-শূরোরগুলো পরম নিশ্চিন্তে কলবৃদ্ধি করে চলেছে।

যে হারে শূরোর বাড়ছে, বৃষ্টি, এরপরে জঙ্গলের আশে পাশের গাঁয়ে ঐ শূরোর নিরেই মাছুষকে ঘর করতে হবে। টেপ পাবি যখন শূরোরের সঙ্গে এক হয়ে মাটি খাবি—ফসল তো আর পাবি না।

কথাগুলোর মর্মার্থ রামসহায় হয় ত কিছুটা বুঝল। সে বলল, সে ত সহিবাত হজুর। ঐই শূরোরে শ্রীতি বছর আমাদের ক্ষেতের ফসল—

রামসহায়ের কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। অনেকগুলো হরিণ আবার একসঙ্গে ডেকে উঠতেই হুজনে পিছন ঘিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম।

উঃ, কি বিধবালী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে সারোয়ার! পশ্চিমের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত আশুন বিস্তারলাভ করছে। রক্ত আলোর বন্যায় ঘুঘুরা-বেলারি উড্ডাসিত। রক্তাভ আকাশে পাভাশুক শীর্ণ গাছগুলো উলঙ্গ প্রেতিনীর মতো ঠাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে শুকনো গাছের মাথায় মাথায় প্রেতিনীর তন্দন। দেখলাম লাল আকাশে পাখিরা উপর-বাসে উড়ে চলেছে দিকে দিকে, উড়ে আসছে ঘুঘুরা-বেলারি দিকে সেই সর্বগ্রাণা অগ্ন্যাদগার আর ধুমশিখার উপর দিয়ে একে-বেকে দিবিদিক জানিশুক হয়ে। আকাশে কালো কালো বিন্দুর মতো সে পাখিদের কলধনি বছরে এই মাঝাতালাওয়ার পাড়ে বসে আমি শুনলাম। শুনা—সাবীতার' নন্দানগারা সব অসহায় হরিণের ডাক। চিত্রল ডাকছে, কুন্ডসার ডাকছে, টিউউ! টিউউ! টা-আক! টা-আক!

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমরা শুনতে পেলাম ঢালের ও পিঠে কঁাক। জায়গাটা যেন জানোয়ারের চলাচল হচ্ছে। রামসহায়কে রেখে আমি বুকে হেঁটে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঢালের ওপরে মাথা রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

সারোয়ার বনের আশুন আলোকিত হয়ে উঠে কঁাক জায়গাটা। সে আলোর স্পর্শেই অনেকগুলো বন্যজন্তু দেখলাম বৃষ্টি সারোয়ার থেকে পালিয়ে এগে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। কঁাক জায়গাটার যতটুকু দেখতে পেলাম—দেখলাম এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দলে-দলে হরিণ আর বুনো-শূরোর। অসংখ্য চিত্রল, কুন্ডসার আর বুনো-শূরোরের



বিজয়

সমাবেশ দেখলাম। পাশে পাশে শূ্যোর ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে, মায় বাতাসগুলো পথন্ত হুঁ শব্দটি করছে না।

এরই মধ্যে তিনটে চিত্রল হরিণ বৃহতে বৃহতে ঢালের নীচে এসে দাঁড়াল। বিরাট শিশুগুটি বাতাসে বারকয়েক নাক টেনে-টেনে তুলল। প্রতিকূল বস্তুতে কিছু বোধগম্য না হওয়াতে নিশ্চিন্ত মনে হরিণী দু'টোকে নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল—আর উঠতে লাগল আমার নাক বরাবর।

মহা সমস্তায় পড়ে গেলাম আমি। না পারছি পথ ছেড়ে দিতে না পারছি ঐভাবে পড়ে থাকতে। আর হুঁপা এগুলোই আমাকে দেখে ফেলবে। আমার কেমন লজ্জা হতে লাগল, আমি চোখ বুজে ফেললাম।

পরমুহুর্তেই শিশুগুটির তীর চাংকার কানে এল, ট্যাও-ও-ও! সঙ্গে সঙ্গে খটাসু-খট-খটাপট, খটাপট, শব্দে শত শত বহুজন্তুর শব্দ—চারদিকে পালাতে লাগল। যখন চোখ চাইলাম দেখি সব কীকা। মুহূর্তেই শত শত জানোয়ারের উপস্থিতি যেন বিশ্বাস করতেও মন চায় না। একটা সুখস্বপ্ন বলে মনে হয়।

আমি আবার গর্তে এসে বসলাম। সারোয়ার আগুন ঐ একই ভাবে জ্বলতে লাগল। নিশেষে সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি গর্তের গারে হেলান দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রামসহায়ের গৌচা খেয়ে গোখ চাইলাম। কানের কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে বলল, দু'টা শূ্যোর এসেছে দেখুন হুড়ুর।



বুনো-শূ্যোরটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম হ্যা শূ্যোরই বটে। জলের কিনারে কিনারে নাক ঘষে ঘষে এগুচ্ছে—তবে তেমন বড় নয়।

আমি বনুকটা উঠিয়ে নিলাম এই ভেবে যদি এর পর আর না আসে। কেন-না ভরসা হচ্ছিল না যে রকম চমকে পালিয়েছে সব আর নাও আসতে পারে।

আমি বনুকের উপর হুঁকে অন্ধকারে নিশানা ঠিক করতে গেলাম এমন সময় কানে এল আমার বাঁদিকে উত্তরে বড় পাহাড়ীর দিক থেকে সোঁ সোঁ শব্দে যেন ঝড় আসছে। লক্ষ্য করলাম শূ্যোর দু'টোও সেদিকে মুখ তুলে তাকিয়ে উদ্গ্রাহ হয়ে আছে।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোটি-কোটি নক্ষত্র অলঙ্কৃত আকাশ, কোথাও একবিদ্যুৎ মেঘ নেই। তা' হলে ঐ শব্দ কিসের। একটা অজানা আশ্রয় আমার মন ছেয়ে গেল। আমি বনুকটা একটু নামিয়ে সেদিকে কান পেতে উদ্গ্রাহ হয়ে বসে রইলাম।

শব্দটা আরও এগিয়ে এলে বুঝলাম গতিটা ঝড়ের কিন্তু শব্দটা নয়। সরল-সরল শব্দে বহুপদবিক্ষেপে কারা যেন ঝরাপাতা মাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। ক্রমশ শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। অবশেষে দেখলাম ছটাপট, ছটাপট করে বন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল কালো কালো জুপের মতো অসংখ্য বুনো-শূ্যোর। খুবখুবখুব করে সেই বিশাল বরাহবাহিনী জলার চারপাড়ি ঘিরে ফেলল। প্রথমোক্ত সেই শূ্যোর দু'টা ভিড়ের মধ্যে যে কোথায় হারিয়ে গেল আর পাত্তাই পেলাম না। কিন্তু এই সব নয়। ক্রমাগত বাহিনীর পর বাহিনী দুর্বারগতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল। মাঝাতালাগরের জল আর দেখা যায় না।

শূ্যোরগুলো সরবে নানা কাজে মেতে গেল। কেউ কাদার গড়াচ্ছে, কেউ মাটি খুঁড়ছে, কেউ জল খাচ্ছে, আবার কেউ কেউ প্রেমাস্পন্দ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বারকয়েকই স্থগতে গিয়ে অবততার্থ হলাম, এদিক-ওদিক সরে গিয়ে গোল বাধার। তবে অনুমান করলাম প্রায় দু'শো বুনো-শূ্যোর। এই দু'শো শূ্যোরে মাঝাতালাগরে একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিল। বরাহ-নির্মান আর বোঁহোঁতানিতে কানে তাল লাগাবার যোগাড়। ওদিকে জলার ব্যাঙগুলো বৃষ্টি চিড়েচন্টে হয়ে গেল।

নিশানা না করলেও চলত, চোখ বুজে ট্রিগার টানলেই হত, তবু বেছে নিলাম কতকগুলোকে। গ্রা-আম্! গ্রা-আম্!

পর পর দু' ব্যায়েল খালি করে দিয়ে মাঝাতালাগরের বিপ্লব চরমে পৌঁছে দিলাম। কে মরল কে বাঁচল, কিছু দেখলাম না। কদিক দেখলাম শূ্যোরগুলো নারকীয় চিংকারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ল আর তারই একটা দল ভীমবিক্রমে আমাদের গর্তের দিকে ছুটে আসছে—আমার মন হার হার করে উঠল। আমি রামসহায়কে ইসারা করেই গর্তের মুখে শিঁট পেতে চোখ বুজে মাথা শুজে পড়ে রইলাম।

ভয়-ভাবনার আর শারীরিক ব্যগ্রার সেই সেকেন্ডগুলো যেন ঘটা বলে অহুমিত হচ্ছিল। মহুয়া সেতুর উপর দিয়ে ডজনখানেক শূ্যোর আমাদের গর্তটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। যে পালল না সে একটা বাচ্চা। টের পেলাম বাচ্চাটা আমার আর রামসহায়ের পেছের কীকর

## লোকাতীত

মধ্যে পড়ে গিয়ে বারবার আমার গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। ওকে ধরে কেললাম।

রামসহায়কে ডাকলাম, সাড়া দিল না। ঠেলে দিয়ে ডাকলাম রামসহায়।

চূপ। ঐ একইভাবে উপুড় হয়ে সে মাথা গুঁজে পড়ে রইল। ভয়ে ভাবনার আমার সর্ব শরীর শির-শির করে উঠল।

শূর্যের বাচ্চাটাকে কীটবাগের মধ্যে পুবে দিয়ে ফাসনাটো এঁটে দিলাম। টর্চ আলোতেই দেখি রামসহায়ের পিঠ বেয়ে অব্যাহত রক্ত বরছে আর সে অচৈতন্য। ওকে পাজাকোলে করে উঠিয়ে গর্তের বাইরে এনে শুইয়ে দিলাম।

জল আনতে গিয়ে দেখি গুলীর আঘাতে দু'টো শূর্যের পাড়েছে। একটা মরে পড়ে আছে, আর একটা তখনও পা ছুঁড়ছে।

আমি জল এনে রামসহায়ের চোখ-মুখে বারকয়েক ঝাঁপটি দিতেই সে একটা অস্টুট কাতবোক্তি করে চাইল, পরক্ষণেই আবার চোখ বুজল। ওর জ্ঞান ফিরে আসছে বুঝতে পেরে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওর পাশে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই উত্তরের বন থেকে একটা জাস্তব গোঙানি ভেসে এল আঁ-আঁ-আঁ।

প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপরে আবার শুনলাম। শুনে মনে হল একটা শূর্যের বহুধা-কাতর শব্দ সেটা। সম্ভবত এলজির হুজুর আহত হয়ে শূর্যেরটা বনের মধ্যে পড়ে আছে।

রামসহায় উঠে বসতে গেল। ওকে বাধা দিয়ে বললাম, উঠিস না, শুতে থাক।

রামসহায় বলল, আমার কি হয়েছে? আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

খানিকটা বলতেই ওর সব মনে পড়ল। বলল, হ্যাঁ হুজুর এবারে মনে পড়েছে।

আপনি গুলী ছুঁতেই শূর্যেরগুলো তেড়ে এসেছিল।

আমি বললাম, তেড়ে আসে নি, চমকে পালাচ্ছিল। ওরা আমাদের দেখতেই পায় নি। বলে, ওকে বাচ্চাটা দেখালাম, মৃত শূর্যের হুঁটার কথাও বললাম।

শুন ভারী খুশি সে। হেসে বলল, হুজুর, আপনে আজ কামাল কর্ দিয়া। বলে শূর্যের দু'টো দেখবার জন্তে জোর করেই উঠে বসল। বসেই বলল, উঃ, পিঠে বড় ব্যথা!

রামসহায়ের পিঠটা জায়গার-জায়গার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কেন না গর্তের মুখ থেকে অনেকটা নীচে সে পিঠ পেতেছিল। ফলে, শূর্যেরগুলো পূর্ণ ওজনে ওর পিঠে পড়ে আবার উঠে যায়। তা ছাড়া বেশির ভাগ শূর্যেরই ওর পিঠ মাড়িয়ে য়। আমার পিঠেও কয়েক জায়গায় ছুঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু গুরুতর নয়। আত্ম গায়ে না থাকলে হয়ত আমার পিঠে আঁচড়ও লাগত না। আমি রামসহায়ের পিঠের ক্ষতগুলোতে ভালো করে টিকার-আয়োডিন ঘষে দিলাম। সে দিল আমার পিঠে।

আঁ-আঁ-আঁ। সে গোঙানিটা আবার ভেসে এল।

রামসহায় বলল, ও কিসের ডাক হুজুর।

বললাম, মনে হচ্ছে একটা শূর্যের গুলীতে আহত হয়ে ঐ বনে

কোথাও গিয়ে পড়েছে। তুই গর্তে গিয়ে বস আমি আর এক গুলীতে শূর্যেরটাকে শেষ করে দিয়ে আসি। ভয় নেই, এখনি আসব।

আমি হুঁসেলের টর্চটা বন্দুক ক্ল্যাম্প করে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে চুকলাম। কি অন্ধকার! সেই একটুকরো চাঁদ উঠেছিল, কোথায় যেন আছে, দেখলাম না। জন্তটার অবস্থান আন্দাজ করতে সেই গোঙানিটা শুনবার অপেক্ষায় আমি সেই অন্ধকারে চূপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

শব্দটা আবার হল। আমার ডানদিকে আনুমানিক পঞ্চাশ গজ দূর থেকে শব্দটা ভেসে এল। এখানে নিঃসন্দেহ হলাম যে, শব্দটা একটা আহত শূর্যেরেরই যক্ষা-কাতর ক্রন্দন। আমি টর্চ জ্বালে শূর্যেরটাকে খুঁজতে সাহস পেলাম না। অন্ধকারে তীব্র আলোর ঝাঁপায় বুনা-শূর্যের বড় কেপে যায়। হয় চমকে পালায় নয় আলো লক্ষ্য করে তেড়ে আসে। তা ছাড়া হিংস্রতায় দলছাড়া বুনা-শূর্যের আর আহত বাঘ হুই ভয়ংকর। একেত্রে শূর্যেরটা দলছাড়া ত' বটেই—আহতও।

অগত্যা আমি বরাপাতার উপর খুব সতর্কপণে পা ফেল ফেলে এগুতে লাগলাম। আমার চলার পথে ঝিঝিঙালা একে একে শুক হয়, এগিয়ে গেলে আবার ঝিল্লিরব শুরু করে। পায়ের কাছে সরীসৃপ খরগোসের চকিত পলায়নে এক একবার চমকে ঝাঁড়ই আবার চলি। প্রায় অর্ধেকটা পথ যেতেই শূর্যেরটা ককিয়ে উঠল। আমি এবারে সাবধান হলাম যে, অসতর্ক হুহুত শূর্যেরটার



বেল্লারি জঙ্গলে লেখক

সামনে না পড়ে বাই। আমি সমস্ত ইঞ্জিনের অল্পভূতি কেন্দ্রীভূত করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগলাম।

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও শূরোরটা টের পেল। সুনলাম আমার সামনে থেকে ঘোঁষা করে উঠে পড়ে একটা অক্ষুট শব্দে অসহায় যন্ত্রণায় কাতরভাবে কাতরভাবে সে ছুটে চলল। আমাদের পরস্পরের ব্যবধানটা কমাতে এক্ষণে আমিও তার পিছু পিছু দ্রুত ছুটে চললাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না। অন্ধকারে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। আর সেই শব্দে শূরোরটা চমকে গিয়ে আরও দ্রুত ছুটে লাগল। তবে আশার কথা শূরোরটা এক নাগাড়ে বেশিদূর ছুটে পারল না। আমি হাত-পা বেড়ে উঠে ঈর্ষাভরে সুনলাম সেই কর্কশ অসুনারিক যন্ত্রণাকাতর ধনিটা আরও তীব্র হয়ে ভেসে এল প্রায় এক শ' গজ দূর থেকে। আমি অনুমান করলাম শূরোরটার কুসফুসে গুলী সেগেছে তাই ঐ অসহ যন্ত্রণা, বেশি ছুটেতে পারে না—পালাতে গিয়েও ঈর্ষাভরে পড়ে।

আমি আবার বীরে বীরে এগুতে লাগলাম। কিন্তু পারের তলায় শুকনো পাতার চর্মরন্ধনি এড়াতে পারলাম না, ফলে খানিকটা যেতেই সুনলাম শূরোরটা আবার পালাচ্ছে। আমি এবারে মরিয়া হয়ে সামনে টের আলো ফেলে শূরোরটার উদ্দেশ্যে ছুটেতে লাগলাম। কিছুদূর দৌড়েই হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

দেখলাম সেখান থেকে একটা বড় ঢাল নেমে গেছে। ঢালটার ছড়িয়ে ছোটা বড় অনেক পাথর। ঢালের শেষে শুরু হয়েছে এক বিস্তীর্ণ ঘাসবন। বেসিক তাকান যায় শুধু ঘাস আর ঘাস। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে সে ঘাস। সেই ঘাসবন আবার চেঁচি খেসে উঠে গেছে বহুদূরে একটা টিলার উপরে। নক্ষত্র-আলোয় দেখলাম যতদূর হাওয়ায় ঘাসের ডগাগুলো হেলছে-তুলছে-কাঁপছে। যতদূর স্তনেছিলাম মনে হল এটাই বড় পাথরটির ঘাসবন।

হঠাৎ শূরোরটা আমার বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে গন্ত-তিরিশেক দূরে যন্ত্রণায় কঁদে উঠল। আমি চমকে বনুকটা তুলেই ঘুরে ঈর্ষাভর। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাঁওর করতে পারলাম না। ঐ শূরোরেরই মতো অসহ্য কালা-কালো পাথর ঢালটার ছড়িয়ে আছে, কোনটা শূরোর কোনটা পাথর আমি বুঝলাম না। আমি বিমূঢ় হয়ে ঈর্ষাভরে রইলাম।

তারপরই সুনলাম খটখট শব্দে শূরোরটা সেই প্রস্তরাকীর্ণ ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। আমি একটা উঁচু পাথরের উপর উঠে দেখতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পাথরের শব্দে একাকার হয়ে মিশে গিয়ে সে নেমে যাচ্ছে। আমি পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে শব্দটা অনুসরণ করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে শূরোরটাও দ্রুত নেমে চলল, আর চলার তালে-তালে একটা অগ্নি কাতরধ্বনি করতে লাগল, উঁ-উঁ-উঁ-উঁ!

আমি আর একটু দ্রুত এগুতেই শূরোরটাকে দেখে ফেললাম, ঢাল থেকে নেমেই একফালি কাঁকা জায়গা পেরিয়ে সে ঘাসবনের দিকে ছুটছে। সর্বনাশ! আমি বনুকটা তুলে গুলী ছুড়তে গেলাম আর অমনি ঢাল সামলাতে না পেরে পাথর থেকে মুখ খুঁড়ে পড় গেলাম। ঘোঁষা করে শূরোরটা তীব্রবেগে ঘাসবনে ঢুক গেল।

নিম্নেই উঠেই আমি শূরোরটার অনুসরণে উন্নতির মতো সেই ঘাস-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সরসর শব্দে শূরোরটা ঘাসবন দিয়ে ছুটছে আর দিশেহারার মতো আমি তাকে অনুসরণ করছি। ঘাসের ডাঁটার, পাতার আমার আঁচল গা ঘেঁষে গিয়ে কত-বিকত হতে লাগল, অজস্র ঘাসের বীজ মাথার-চোখে-মুখে ঝরে পড়ছে, বারবার ঘাসে গা আটকে পড়ে বাছি আবার উঠছি যেন শূরোরটাকে না হারাই। কিন্তু এত করেও শূরোরটাকে যেন শেষ পর্যন্ত হারালাম। এক সময় সেই সরসর শব্দটা আর সুনলাম না। কোনদিকে যে গেল শূরোরটা তার হৃদিসই করতে পারলাম না।

শূরোরটাকে যে কখন হারালাম, কোথায় হারালাম কিছুই বুঝলাম না। আর আমি যে কোথায় এসেছি, কতদূরে এসেছি তাও জানি না। ভেবে দেখলাম শূরোরটাকে এখন খুঁজতে গেলে এই ঘাসবনের গোলকধাংরা নির্বোধের মতো ঘুরে মরতে হবে। তা ছাড়া বিপদের সম্ভাবনাও বেশি। এই ঘন ঘাসবনে শূরোরের অতর্কিত আক্রমণ এড়ানো যাবে না। কোন অবস্থাতেই তখন আর এগিয়ে যাওয়া মুক্তিযুক্ত মনে হল না—আমি দুঃখে-হতাশায় সেখানেই বসে পড়লাম। রাত তখন কতটা জানি না।

একটা সিগারেট মুখে দিয়ে দেশলাইয়ে কাঠি জ্বালিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেললাম। সর্বনাশ, কি করছি। একটা ফুলকিতে থাণ্ডবদাহন হয়ে যাবে যে। হয়ত নিজেও পুড়ে মরব। সিগারেট দেশলাই পকেটে পুরে ঘাসের গদিত্তে হাত-পা টান করে শুয়ে পড়লাম। ভাবলাম ভোর হলেই রক্তের দাগ দেখে দেখে শূরোরটাকে খোঁজ করব। ঘাসের ডগার কাঁকে তারমর আকাশের দিকে চেয়ে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। রামসহায়টা না জানি কি করছে—না জানি ও কেমন আছে! ভোর হলে কত বাকি!

ডুইট-ডিডু ডুইট, টি-টি-টি!

একটা টিটিভ পাখির ডাকে বনভূমির নির্জনতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল ঘাসবনটা কাছাকাছি কোথাও শেষ হয়েছে। ঐ টিটিভটাই তার প্রমাণ। এই ঘন ঘাসবনে টিটিভ থাকে না, থাকতে পারে না। বনের কাঁকে কাঁকে, মাঠে জলাভূমিতে গাছতলায় ডিম পেড়ে বা বাচ্চা রেখে আশেপাশে থেকে সে পাহারা দেয়। জীবজন্তু দেখলেই সন্ধিহান হয়ে ডাকতে থাকে, কখন ঠুকবে দেয়। গুরা শিকারীর 'ইনফরমার'। শিকারীকে জীবজন্তু চলার পথের দেয়। কিন্তু টিটিভটা কি দেখল! শূরোরটাকে নয়ত!

আমি লাকিয়ে উঠে ঈর্ষাভর। কুছ টিটিভটার একটানা টি-টি ডাক সুনতে সুনতে আমি ঘাসের বন ভেদ করে সেদিকে ছুটেতে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, কিছুটা গিয়েই একচিল ময়দানে এসে পড়লাম। গুপার এক নিবিড় মসীর বন। গগনচুম্বী সব ষট-অখণ্ড আর তেঁতুল গাছ শাখা-প্রাশাখা জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে আছে। টিটিভটা তখনও ময়দানের উপরে ডেকে ডেকে চক্কোর মেরে ঘুরছে। আমাকে দেখেই তীব্রতর চিংকারে উড়ে এসে আমার মাথার উপর ডেকে ডেকে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। আমার মনে হল শূরোরটা এদিক দিয়েই কোথাও বনের



মধ্যে চুকছে। টিটিভটকে এড়াতে আমি দ্রুত সেই খোলা জায়গাটা পেরিয়ে বনের মধ্যে চুকই একটা গাছের নীচে গা ঢাকা দিয়ে ঠাঁড়লাম।

ভেতরটা যেমন অন্ধকার তেমনি ঠাণ্ডা। হুঁহাত দূরে আমার দৃষ্টি যায় না। ভাবলাম ভাল করি নি এসে—একটা অমুমানের উপর নির্ভর করে। টিটিভটা হয়ত অজ্ঞা কোন জানোয়ার দেখে ভেঁকে থাকবে। একবার ভাবলাম ফিরে গিয়ে ঐ ঘাসের বনেই শুয়ে থাকি, আবার ভাবলাম থাক আর একটু দেখি। আর সেই মুহূর্তে শূরোটা কঁদে উঠল, আঁ-আঁ-আঁ! দূরে নয়, কাছেই।

আমি সেই অন্ধকারে আঙলে ভর করে গাছের পিছন থেকে পিছনে এগুতে লাগলাম। থানিকটা গিয়েই অন্ধকারে জলের চকমক দেখলাম। আর শুনলাম শূরোটা ঐখানেই বোখাও খুব কীশখরে কাতরাচ্ছে, উঁ-উঁ-উঁ-উঁ।

আর একটা গাছের পিছনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রশস্ত নালা, আর তারই পাড়ে জলের দিকে মুখ করে ঠাঁড়িয়ে আহত শূরোটা কাতরাচ্ছে। পাড় থেকে জলের অবস্থান থানিকটা নীচে—অন্ধকারে চোখটা একটু সরে এলে দেখলাম শূরোটা। বার বার চেঁচা করে ও জলে মুখ দিতে পারছে না। আমি ধীরে ধীরে বনুকাটা তুলে অন্ধকারেই নিশানা ঠিক করে ওর পান্ডর ঘেঁষে গুলী করলাম। একটা ভরকর চিংকার করে শূরোটা একপাক ঘুরেই পাড়ে গেল।

টর্চ জ্বলে ট্রিগারে হাত রেখে আমি শূরোটার কাছে গিয়ে ঠাঁড়লাম। মৃত্যুবরণকার শূরোটা হাঁ করে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছটফট করছিল। অনেকক্ষণ ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে দেখলাম ওর প্রাণ আর বেঁচেই না।

শব্দ শৈশবে ছোট একটা ঘটনা মনে দাগ কেটেছিল, আজ আবার মনে পড়ল। তখনও স্কুল পাঠশালায় পড়ি না। আমাদের বাড়ির দরজার কদমের একটা কুচর মরছিল। আমি দেখে দৌড়ে গিয়ে মাকে ডেকে আনলাম। কুচরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মা বললেন, বা তো এক গেলাস জল নিয়ে আয়। আমি দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে আসতেই মা বললেন, দে, ওর মুখে একটু একটু করে জল দে। তা দিলাম। দিচ্ছেই ভিজিয়ে কবলাম, কেন মা জল দিলে কি হয়? মা বললেন, এ সময়ে জল দিলে পুণ্য হয়। স্তোরও পুণ্য হবে।

সেদিন মৃত্যুশয্যাগ্রস্ত কুচরটার কষ্ট দেখে আমার মন কঁদে উঠেছিল, আজও শূরোটার কষ্ট দেখে আমার মন কঁদে উঠল। আমি ভাড়াভাড়া পকেট থেকে ক্রমালটা বের করে জলে ভিজিয়ে আনলাম। তারপর ক্রমালটা নিংড়ে শূরোটার মুখে জল দিলাম। সেদিনও পুণ্য অর্জন করেছিলাম কি ন জানি না, আর শূরোটা আমার দক্ষ বধি পাণ হয়ে থাকে সেটা লায়ব হয়েছিল কি না তাও জানি না, কিন্তু জল দিতেই শূরোটা বারকয়েক মুখটাকে দ্রুত নাড়ল, তারপরই শেখবারে মতো চোখ বুজে নিখর হয়ে গেল।

এরপরই শোরোলো কোথাও প্রহর ঘোষণা করল। কোন প্রহর ঘোষিত হল বুঝলাম। আমি অবসাদ আর স্তম্ভভাৱে ভোরের অপেক্ষার সোখানেই ঠাঁড়তে মাথা শুঁজে বসে বইলাম ও থানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ব্রা-দা-র!

অকস্মৎ বৃষ্টি সাহেবের ডাকে আমি চমকে জেগে মাথা তুললাম। মনে হল বহুদূর থেকে বৃষ্টি সাহেব যেন আমাকে ডাকলেন। ও ডাক আমার পরিচিত। তাঁর সঙ্গে শিকারে গিয়ে বনের মধ্যে যখনই ছাঁড়াছাঁড়ি হয়েছে ও-ডাকেই তিনি আমার খোঁজ করতেন।

আমি ভাবলাম তা হলে কি শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি সাহেবও শিকারে এলেন! কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব, সাহেব তো এত ইটতে পারবেন না! একেই বাস্তবের রোগী, তার উপর হাটের রোগ—না সম্ভব নয়। ভাবলাম এ আমার অববেচন মনের ক্রিয়া।

আবার মাথা গোঁজবার আগে আমি চারদিকটা একবার দেখে নিতে গেলাম। ডানদিকে শূরোটার উপর দিয়ে আমার দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে বাঁদিকে এসে বাধা পেল। একটা শুকনো লম্বা ডাল পাড়ে আছে। এমন একটা গাছের ডাল আমার পাশে ছিল বলে মনে হল না। আমি তো জায়গাটা বসবার সময় পরিষ্কার করেই বসছি। আমি ডাল সরাতে হাত দিতে গিয়েই চমকে হাত টেনে নিলাম।

একটা সাপ। বিরাট একটা সাপ আমার পিছন থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত পাড়ে আছে! সম্ভবত একটা মরাল সাপ জল খাচ্ছে। হোক নির্বিষ, আমি আলগোছে বনুকাটা তুলে নিয়ে একলাফে ডানপাশে সরে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তীব্র একটা হিস্-স্ শব্দে টর্চটা জ্বলেই বনুকা তুলে ঘুরে ঠাঁড়লাম। দেখি মরাল নয়—ভরকর বিহবর একটা শখচুড়! আমার বুক-সমান উঁচু ফণা তুলে বাতির আলোর দুলছে। ব্যবধান কিছুই না, ছোবল মারলেই হয়।

গ্রা-অ-ম্!

গুলী খেয়েই লুটেরে পড়ল সাপটা। উটে-পাটে আছড়ে-পাছড়ে গিয়ে পড়ল জলে। তারপর থানিকক্ষণ জলটাকে তোলপাড় করে স্থির হয়ে গেল।

আমি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলাম। গলগল করে ঘামতে লাগলাম। আমার পা ছুঁতে শরীরের ভার আর সইতে পারছিল না। আমি আবার মাথা শুঁজে বসে পড়লাম। ভাবলাম আর ঘুম্ব না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল মাথা শুঁজে থেকেই শুনলাম বহু পাখির কাকলিতে বনজুঁমি মুখর। মাথা উঠিয়ে দেখি তপোবনের মতো এক অপরূপ হুল্লর জায়গায় আমি বসে আছি। সামনে অর্ধচন্দ্রাকার একটা জলাশয়, ফটকের মতো সে জল। চারদিক ঘিরে আলিসনাবন্ধ সব ক্রম-মহাক্রম, কীকে কীকে সুর্যরশ্মির বিকিরণ। আমার মনে হল এরকম একটা দৃশ্য আমি যেন আর কোথাও দেখেছি।

কিন্তু, এ আমি কোথায় এলাম! কোনপথে মাঝাঝালায় কিংব তাও জানি না। রাসমহাংয়ের জন্তুও উৎকণ্ঠিত হলাম। এদিকে শূরোঙলোরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

আমি বনুকাটা তুলে নিয়ে জলার পাড়ে, পাড়ে হেঁটে গিয়ে একটা টিলার উপরে উঠতেই বুঝলাম এটা বনপ্রান্ত। টিলার ওপারে ধুধু কয়েক শূকর খানেকত। খানেকত শেষে একটা গা। গাঁয়ের পাশ দিয়ে ধূলা উড়িয়ে একটা গরুর গাড়ি বাচ্ছে।

ঢিবি থেকে নেমে মাঠ দিয়ে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে আমি হাত তুলে চিৎকার করে গাড়িওয়ালাকে ডাকলাম।

লোকটা সেখানেই গাড়ি রেখে দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এল। বলল, কোন্ সাহাব?

বললাম, দেখ আমার কয়েকজন চাকর দরকার। তিনটে শূরের মেরেছি আমি, বেঞ্জারি বা গায়ে নিয়ে যতে চাই, মাংস, মজুরি যা চার দেব।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, কোথা মরেছেন সাহাব?

বললাম, দু'টো মাঝাতালাও আর একটা—

মাঝাতালাওয়ে! সে ত' অনেকদূরে!

জিজ্ঞেস করলাম, কতদূর?

তা প্রায় তিন কোশ হবে। আর একটা কোথার মেরেছেন সাহাব?

বললাম, ঐ জঙ্গলে নাগার পারে।

ঐ জঙ্গলে, কখন মেরেছেন?

বললাম, কাল রাতে।

লোকটা অনেকক্ষণ অপলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বারংবার আমার আপাদমস্তকে চোখ বুজিয়ে বলল, সাহাব ঐ জঙ্গলে কখনও রাতে যাবেন না।

কেন?

বলল, ওটা চিতাওয়ার। শুধানে বনদেবী আছে, প্রেতাঙ্ক আছে।

চিতাওয়ার! ধুক করে উঠল বুকেটা আমার! তা হলে এই সে চিতাওয়ার! বুদরি সাহেবের বর্ণনা গভীর দাগ কেটেছিল আমার অবচেতন মনে—তাই জারগাটা চেনা-চেনা ঠেকছিল। মনে পড়ল সাহেবের সাবধানবাণী বিওয়্যার, চিতাওয়ারে কখনও রাতে যাবে না! জাটস এ ব্লাডি হাউড প্রেস। বনদেও আছে, স্পিরিট আছে। তা' স্পিরিট-ফিরটের কথা সত্যি না হলেও চিতাওয়ার যে ধারাপ জারগা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাপ-খোশের ভয় আছে। উঃ! কি ভয়ংকর সাপ! কিন্তু বুদরি সাহেবের সেই ডাকটা,—

সেটা কি!

যা হোক গাড়িওয়ালার সাহায্যে লোকজন সংগ্রহ করে ঘটাস্থলের মধ্যেই শূরোটাকে নিয়ে মাঝাতালাওয়ে এলাম। গর্তে অপেক্ষারত রামসহায়কে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। সৌভাগ্যের কথা শূরেরগুলো বেঞ্জারি গায়ে নিয়ে ফেলেই বিক্রি হয়ে গেল। বুদরি সাহেবের জন্তে একটা ঠ্যাং কেটে রেখে বাকি সব যে দাম পেলাম তাতেই রাজী হয়ে গেলাম। তারপরেই রামসহায়কে নিয়ে সোজা চলে এলাম হাতিবন্দ কেঁশনে। তাকে কিছু টাকা বকশিস দিয়ে একটা মালগাড়ির জেকে উঠে দুপুরের আগেই বিলাসপুর এসে পৌঁছলাম।

কেঁশনে পা দিয়েই শুনি বুদরি সাহেব নেই! গতরাতে হাট স্ট্রোকে মারা গেছেন। সংবাদদাতার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি শুদ্ধিত হয়ে পড়িয়ে রইলাম। আমার কানে শুধু বাজতে লাগল বহুদূর থেকে ভেসে-আসা বুদরি সাহেবের সেই ডাকটা, আদার।

শেষ

## সিঁড়ির গান

সন্তোষকুমার দে

সিঁড়ি • সিঁড়ি • সিঁড়ি

সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, গেছে নেমে

সিঁড়ি চলে গেছে ডাইনে ও বামে,

কোথাও থাকে নি থেমে।

চলার পথের সঙ্গী, তবু তা

মাড়িয়েছি দুই পায়ে

দাঁড়ির থাকি নি, উঠি নামি ঘুরি ফিরি

সঙ্গে চলেছে চিরসঙ্গী সে সিঁড়ি।

সিঁড়ি, ঐ সিঁড়ি ধাপে ধাপে আছে

সদরে অন্তঃপুরে

সিঁড়ি আছে বুকি সবার জীবনে

পাকে পাকে ঘুরে ঘুরে।

কঠিন কাটানো কঠোর বাঁধন

ইটে আর কংক্রিটে

কাঠ লোহার ধাপে ধাপে করে

জীবনের ঘাম পিঠে।

ছোট বড় ধাপ আছে আছে আছে আছে

যত দূর বাই, উপরে নীচে কি কাছে।

কোথা এর শেষ? লিফটম্যান কবে এসে

কাঁড়াবে দুয়ার বঁসে?

হর উঠে যাবে স্বর্গের পানে

নয় নামে রসাতলে—

বাজে বেল কিরি কিরি,

জীবন বাহিরা ওঠে নামে বুকি

৫

চলমান কোন্ সিঁড়ি।

# মৌলমণি

( পূর্ণাঙ্গবৃত্তি )

শ্রীমুবোধকুমার চক্রবর্তী

একত্রিশ

বন্ধুর নল পরিষ্কার করতে করতে কাঠুরে চৌধুরী ঐ সভাস্থানের কথা ভাবছিল। তার মনে হয়েছিল যে সন্ধ্যা একটা মুখোশ। এই মুখোশ পরে বনের পশুও মানুষ নামে সমাজে ঢলাফের করতে পারে। তার কোন ভয় নেই। ঐ মুখোশ যতক্ষণ খুলে না পড়বে ততক্ষণ সে নিবির মানুষের সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে পারে। বনে বাস করে কাঠুরে চৌধুরী এই মুখোশের খবরটা পার নি, আজ তাই সে সভা-সমাজের কাছে মানুষের সম্মান পেয়ে না।

আর দিনকয়েক পরে দমরস্তার রাঁচী ফিরে যাচ্ছে। ডাক্তার সেন অ্যাপুলেন্সের ব্যবস্থা করেছেন। অ্যাপুলেন্স রাঁচী থেকে আসবে? এই ব্যবস্থায় কাঠুরে চৌধুরীর দুখে পাবার কিছু নেই, বরং তার কাঁধ থেকে এত বড় একটা দায়িত্ব নেমে যাচ্ছে বলে তার খুশি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী খুশি হতে পারে নি মানুষের মধ্যে মানুষদের অভাব দেখে। পৃথিবীতে যে মানুষের এত অভাব, একথা তার জানা ছিল না।

দমরস্তা কখন এসে তার পাশে ঠাঁড়িয়েছিল, সে খেয়াল করে নি। কথা শুনে চমক ভাঙল।—কি করছেন?

কাঠুরে চৌধুরী ক্লান্তভাবে বলল : বন্ধুটায় মরচে পড়ে গেছে। পড়বেই তো। কতদিন ফেল রেখেছেন বলুন! আমরা চলে গেলে আপনার কাজে লাগবে।

কাঠুরে চৌধুরী এবারে মুখ তুলে তাকাল। গভীরভাবে লেবল দমরস্তাকে। তারপর নিঃশব্দে আবার কাজে মন দিল।

চোরারটা টেনে নিয়ে দমরস্তা তার মুখোমুখি বলল।

এবারে সে কি মাথালি কৃতজ্ঞতার কথা বলবে? কিছু বিচিত্র নয়। তার স্বামী তাকে সন্দেহ করেছে, কত কদর কুংসিত ঘটনা খেঁচে গত কয়েক দিনে। কাঠুরে চৌধুরী বাথো যে এ ছাড়া দমরস্তার আর কোন উপায় ছিল না। বাঁচতে হলে এ স্থান তাকে ত্যাগ করতেই হবে, কিন্তু অজ্ঞত গিরেও সে কি বাঁচতে পারবে? যতদূর সে জানতে পেরেছে তাতে তাদের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না। জগদীশের কোন সঙ্কল্প নেই। সরকারী টাকার মোটা কিনেছিল, মাসে মাসে তার জন্তে মোটা টাকা কেটে নিচ্ছে। পাওনা ছুটি ফুরিয়ে গেলে মাইনেও সে পাবে না। তারপর বধন তাকে পরীক্ষা করে জানবে যে সে কোনদিনই আর কার্যকর হবে না, তখন নিশ্চয়ই তাকে জবাব দিয়ে দেবে, বলবে সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে

দিতে। তখন তারা কোথায় গিয়ে ঠাঁড়াবে! জগদীশ না ভাবুক, দমরস্তা একথা কেন ভাবছে না! তার কি এমন অবস্থা হলে চলে।

দমরস্তা জিজ্ঞাসা করল : আজ আপনি কাজে বেরলেন না?

এই তো কাজ করছি।

বন্ধুর কাছ নয়, আপনার কাঠের কাছ।

আজ ছুটি নিয়েছি।

বলেন কি, আপনি ছুটি নিয়েছেন! আপনাকে তো ছুটি নিতে কোনদিন দেখি নি।

সব মানুষেরই ছুটি নেওয়া উচিত। গ্রে সাহেব ঠিকই বলতেন, হস্তার একদিন ছুটি না নিলে দেহের ক্লান্তি কখনও দূর হয় না। তারপর একদিন কঠিন অনুশ্রম করে।

দমরস্তা উৎফুল্ল হল, বলল : আপনার কি আজ শরীর ভাল নেই? আজ ভাস আছি।

তবে কি কাল রাতে কোন কষ্ট হয়েছিল?

হয়েছিল। কিন্তু কাঠুরে চৌধুরী সে কথা স্বীকার করল না। দমরস্তাকে সে কথা বলার দর না, অ্যাপুলেন্সের ব্যবস্থা করে ডাক্তার সেন সে কথা বলতে এসেছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এ কথা বধন বলছিলেন, কাঠুরে চৌধুরী চটে উঠেছিল : কে বলেছে আপনাকে এ সব ব্যবস্থা করতে?

ডাক্তার সেন একটু স্বতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন : কিছুদিন থেকেই তো মিসেস মেহতা আমাকে বলছেন। রাঁচী কেবলার জন্তে মিস্টার মেহতা খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

তবে আমাকে কেন, তাঁদেরই এ সংবাদ দিন।

ডাক্তার সেন ধানিকন্ড চূপ করে রইলেন, তারপরে বললেন : আপনি অস্বাভাবিক আমার ওপর রাগ করছেন। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

কাঠুরে চৌধুরী কোন কথা কইল না।

ডাক্তার বললেন : প্রাক্টার খুলে ছবি নিয়ে বা দেখলাম তাতে কোনই ভরসা পাচ্ছি নে। তিন মাস পরেও হাড়ের ভাঙা টুকরোগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ক্যালস ফর্ম করছে বটে, কিন্তু ও জোড়া শক্ত হবে না। ভয়লোক সারাজীবন বোঁড়াবেন।

একটু খেমে বললেন : ওদের ভাব আপনি আর কতদিন বইবেন।

কাঠুরে চৌধুরী জিজ্ঞাসা করতে পারল না যে তবে কে তার বইবে ওদের! এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তো অশোভন হত, এর কদর

করতেও এরা ঝিগা করত না। তাই বলেছিল : খবরটা ওদের দিয়ে আনুন।

কাঠুর চৌধুরী যে খুশি হয় নি, ডাক্তার সেন তা বুঝতে পেরেছিলেন : বল সন : আর মাস তিনেক থেকে গেলেই ভাল চত। প্রাস্টার খুশি হতে পারতেন। আদুসেলসরও দরকার তত না। কিন্তু মিষ্টার মেহতার শক্তই মিসেস মেহতা ভাড়াভেড়া করছেন। মিষ্টার মেহতা বলছেন, রাঁচিতে পৌছতে পারলে তাঁর আর কোন দুঃখ থাকবে না। তাঁর বাড়ি আছে, প্রতিভেট ফাগুও টাকা শুয়েই অনেক। তার ওপর তাঁর দেশের বিরাট ব্যবসা। বড়ভাইকে বলে রাঁচিতেই একটা ব্রাঞ্চ খুলবেন। লোকজন ব্যবসা করবে, সিলেক্ট চাষিটি দেখেন মিসেস মেহতার কাছে।

কাঠুর চৌধুরী তার মুখ বঁকিয়ে বলল : খুব ভাল ব্যবস্থা।

ডাক্তার সেন কি বুঝলেন তিনিই জানেন। উঠে পঁড়িয়ে বললেন : বাই, খবরটা ওদের দিয়ে আসি।

কাঠুর চৌধুরী হাসেন বললেন নি, ডাক্তারও আর ফিরে আসেন নি। দময়ন্তীকে স্তম্ভবস্থ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন।

তারপরে দময়ন্তী এসেছিল প্রদরমুখে। বলেছিল : শুনেছেন ? ই্যা শুনেছি।

এই ভাল হল, কি বলেন ?

আপনাদের ভালমন্দে আমি কি বুঝি বলুন।

উত্তর শুনেই দময়ন্তী বুঝেছিল যে কাঠুর চৌধুরী মোটেই খুশি হয় নি। তবু বলেছিল : আশা করি নিজস্বের একটা চলনসই ব্যবস্থা করে নিতে পারব। কয়েকমাসের মাইনে তো উঠি পাবেন, তা ফুরাবার আগেই একটা মাস্টার জোড়াড় করে নেব।

কাঠুর চৌধুরী শুণ্ড বলেছিল : হুঁ।

তারপর দময়ন্তী বলেছিল তার বেবনার কথা : আপনি তো সবই জানেন।

এই কঠোর শুনে কাঠুর চৌধুরী চমকে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল, দময়ন্তীর অন্তর আজ কাঁদছে। মুখ তুলে তাকিয়েছিল তার চোখের দিকে।

সন্ধ্যার বাতাসে তখন বেশী শীত ছিল না, অন্ধকারে কুয়াশা মিশে নিশাই শুণ্ড ঘন হয়েছিল। দময়ন্তীর মন হয়েছিল ভারী। বলেছিল : আমার জীবন তো আর আমার ইচ্ছায় চলবে না। যার ইচ্ছায় চলবে সে বড় অবুঝ। সে কিছু বুঝে না। বুঝবেও না কোনদিন। আপনার আশ্রয়ে থেকে সে বড় নীচ ইতর হয়ে যাচ্ছে। তাকে আমি টেনে তুলতে চাই। আপনি বাধা দেবেন না।

কাঠুর চৌধুরী কোন উত্তর দেন নি।

দময়ন্তী বলেছিল : অনেক অসম্মানের কথা আমাকে শুনেতে হয়। সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। নিজের অসম্মান আমি গায়ে মাখি না, কিন্তু আপনাদের অসম্মান যে কিছুতেই সহ্যে পারি নে। প্রতিবাদ করলে কল উল্টা হবে, তাই চুপ করে থাকি। আমরা চলে গেলে লবাটের বোঁকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে অনেক খবর দেবে। সব শুনেলে আপনি অন্যায়সেই আমাকে কমা করতে পারবেন।

কাঠুর চৌধুরীর বিশ্বাস হচ্ছে না দময়ন্তীর এইসব কথা। লবাটের বোঁ সব জানে, আর তাকে কিছুই বলে নি। তার ইচ্ছা হল, মেয়েটাকে এলুপি ডেকে সব কথা জেনে নেয়। কিন্তু দময়ন্তীর জন্তেই পারল না। দময়ন্তী বলল : দোঁচটি আপনার, আমরা না বাঁচলাম। পথত্ব এসব কথা কাতিকে মিত্র সা করবেন না।

তারপর নিজেই কিছু কিছু বলল : আপনার বাধ হয় মনে আছে, সেদিন ওরা ওদের গ্রামে আমি থাকি কটা মদ খেয়ে ফেলেছিলাম। এর আগে আমি কোনদিন মদ খাবার কথা বল্লনাও করতে পারতাম না। কেন খেয়েছিলাম তা জানি না। বোধ হয় নাচ দেখতে দেখতেই অস্বমনস্ক হয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তারপর আমারও ইচ্ছা হয়েছিল ওদের মতো এগিয়ে পিছিয়ে খানিকক্ষণ নাচতে। সে ঐ বাজনা শুনে আর আপনাদের দেখে। আমার খুব ভাল লেগেছিল।

তবে আপনি তখন কিরলেন কেন ?

সে ভয়। আমার মনে ছিল যে ঐ পরিবেশে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে কদ অন্তরমনস্ক হয়ে মদ খায়।

খাড়া-খাড়া তো সবাই খেয়েছিল।

ওরা থাক, তাই বটে—হিঃ হিঃ—

আমিও তো খেয়েছিলাম।

আপনি পুঙ্খবাহুদ, আপনার আলাদা কথা।

তারপরেই দময়ন্তী স্বাকার করল : ওদের সঙ্গে নাচতে আমার একটুও লজ্জা হত না।

এ যে কত বড় সহ্য কাঠুর চৌধুরী তা জানে। তার এই বাংলোর কেউ গাও নাচতে বললে লজ্জায় সে মরে যাবে। অথচ সেখানে সে প্রাণের আবেগে নাচে। তাদের নাগেরাও বাজনা শুনেই তার মন নেচে ওঠে, আর দেখে পুঙ্খ জাগে হাঁড়িয়া খেয়ে। দময়ন্তীরও যে নাচতে ইচ্ছে করেছিল, তাত অশ্চব্ হবার কিছু নেই।

তারপরেই দময়ন্তী বলল : আমার নিষাতনের কথা আপনি জানেন না।

না তো।

ফেরার পরে আমার মুগে ও মদের পক্ষ পেয়েছিল। কি বলেছিল জানেন ? না, সে কথা আপনাকে বলব না। আত্মহত্যা করে আমার মরতে ইচ্ছা হয়েছিল। কি নাচ, কি ইতর কথা। সেদিন ওকে আমার ভদ্রলোক বলে মনে হয় নি। এখনও ও আমাকে সন্দেহ করে। লবাটের বোঁকে যা জিজ্ঞেস করে, পরে আপনি সব জেনে নেবেন। নোদন তো আমরা কাছে থাকব না, কাতিক আপনাদের খুন করার দরকার হবে না।

খুন।

কাঠুর চৌধুরী যেন আত্নানাদ করে উঠেছিল।

শাস্ত্রভাবে দময়ন্তী বলেছিল : আমাদের জীবন নিয়ে কেউ যদি গল্প লেখে, তা হলে একটা খুনের দরকার। তা না হলে এ গল্প শেষ হবে না। ও যদি সোজা হয়ে পঁড়াতে পারত, বলতে পারত, তা হলে সে আমাকে খুন করত, নয় তো আপনাকে। আর তার সন্দেহের কথা জানলে আপনিও চুপ করে বসে থাকতেন না।

কাঠুর চৌধুরী সবই বুঝেছিল। কিন্তু বাপ করে নি, অভিমান করে নি। শুণ্ড শুদ্ধ হয়ে বসেছিল।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল করে তুলুন  
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস  
মিষ্টি ব্যবহারেই  
তা সম্ভব।



সত্যকীরণ :-

কি নিবার সময়  
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্তি  
পিলফার প্রফ ক্যাপের  
উপর R.C.M. মনোগ্রাম  
ও প্রস্তুতকারক  
এম, এল, বসু এণ্ড কোং  
দেখিয়া লইবেন।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস - কলিকাতা - ৯

নিজের ঘরে ফিরে বাবার আগে দময়ন্তী বলেছিল : আমার বৃকের ভিতরটা ঝলছে মিস্টার চৌধুরী, এই জ্বালায় হাত থেকে বাঁচবার জন্তেই আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

দময়ন্তী বলল : আজকে আপনার শরীর ভাল নেই।

না-না, বেশ ভাল আছি।

আমি মানব কেন। আপনার হাতও চলছে না, আমার কথার উত্তরও দিচ্ছেন না।

কাঠুরে চৌধুরী জেগে উঠে আবার বলুক পরিভাষে মন দিল।

দময়ন্তী হেসে বলল : আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাল রাতের কথা ভাবছিলেন।

শুধু কাল রাতের কথা নয়, আরও অনেক দিনের কথা। ভাবছি, এই পৃথিবীটাকে আজও চিনতে পারলাম না।

পৃথিবীটা চিনেছি, কারও এ গর্ব থাকে উচিত নয়। আমাকে কি আপনি চিনতে পেরেছিলেন, না আমি চিনেছিলাম আপনাকে!

আপনাকে বোধ হয় আজও আমি চিনতে পারি নি। তবু একটা নিবেদন জানিয়ে রাখি। সূর্যের দিনে না হোক, ছুঁষের দিনে আমাকে স্মরণ করবেন।

দময়ন্তীর হৃৎস্পন্দ হঠাৎ ছল ছল করে উঠল। বলল : আমার জীবনে তো সূর্যের দিন আর আসবে না।

বলেই পালিয়ে গেল তার সামনে থেকে। কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

লবটা এসে খবর দিল : একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে।

কাঠুরে চৌধুরী চটে উঠল : দেখা হবে না বলে দে।

বলেছি।

তবে আমাকে কেন বলতে এসেছিস?

দেখা না করে সে যাবে না বলছে।

জবে পাঠিয়ে দে আমার কাছে।

লোকটা যখন সামনে এল, কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল তাকে সে কোথায় দেখেছে। বলল : কে হে তুমি?

লোকটা হাতজোড় করে বলল : আমি একজন মালী। কাজের জন্তে এসেছি।

কোথার তোমাকে দেখেছি বল তো?

খেমলানিবাবুর বাড়িতে।

কাঠুরে চৌধুরী একমুহূর্ত কি ভাবল, তারপর বলল : তা সেখান থেকে চলে আসতে চাইছ কেন?

সে বাড়ি তো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

কি বললে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কে কী হে?

বোধ হয় নীলাম হবে।

তা এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?

ভাল ফুল দেখে আপনার বড় ভেজ খাবার কথা মনে হয়েছিল, তাই ভাবলাম আপনি নিশ্চয়ই সৌখীন লোক।

বটে। দু'দিন পরে এস।

কাঠুরে চৌধুরী আর অপেক্ষা করল না। জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

## বক্তৃতা

কাঠুরে চৌধুরী দিন কয়েক এলামেলো ভাবে ঘুরে বেড়াল। স্থান করে নি, খেতেও আসে নি এক একদিন। দময়ন্তী খবর নিয়েছে, জেনেছে যে সে তার কারখানাতোও বার নি। কোথায় গেছে, কি করেছে, তা লুপ্ত সেই জানে।

এই মাহুঘটার জন্ত দময়ন্তীর আজ দুঃখ চল। রাতারাতি সে যেন বদলে গেছে। দুর্ঘটনার পর তারা যখন এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন লোকটা অস্ত্ররক্ষা ছিল। এমন দুঃসময়েও তার মাথা ঠাণ্ডা ছিল। নিজেই শুধু নিয়ম পালন করে নি, দময়ন্তীকে নিয়ম মানতে বাধ্য করেছিল। বলত, নিয়ম মানা না-মানা একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসের সঙ্গে বিপদ-আপদের সম্বন্ধ নেই।

সেই কাঠুরে চৌধুরী এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে তাকে পাওরাই যাচ্ছে না। কেন এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাও জেনে নেবার উপায় নেই।

দু'দিন থেকেই সেই মালীটা ঘোরাঘুরি করছে। কাঠুরে চৌধুরীর দেখা পায় নি, দেখা পেয়েছে দময়ন্তীর। তাকে দেখে লোকটার বিষয়ের সীমা ছিল না। বলেছিল : তুমি এখানে দিনিমণি?

দময়ন্তীও জিজ্ঞাসা করেছিল। তুমি এখানে?

মালী বলেছিল : চাকরির চেষ্টায় যুগি।

দময়ন্তী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল : কেন, আমাদের বাড়ির চাকরি বৃদ্ধি নেই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালী বলেছিল : বাবুই নেই তো আমার চাকরি।

বাবা নেই!

ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল দময়ন্তী।

তাড়াতাড়ি মালী বলেছিল : বাড়িতে নেই, কোথায় আছেন তা কেউ জানে না।

তারপর দময়ন্তীকে তাদের বাড়ি বিক্রি হবার খবর দিয়েছিল। বলল : শুনে পাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে একটা ইঁদুল বসবে।

বাবার কি হয়েছিল?

কিছু একটা অসুখ ছিল, কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা করান নি।

রাত্তি ঘুম হত না বলে বারান্দার পায়েচাঁকি করতেন, এক একদিন—

এক একদিন কি?

ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠতেন।

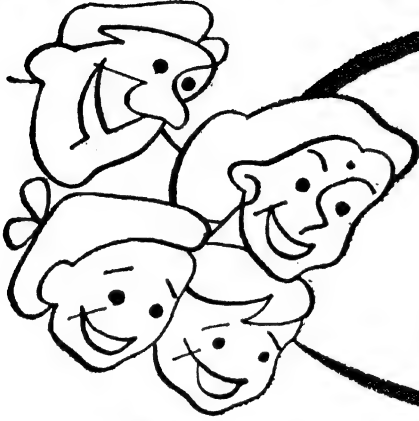
কিসের ভয়?

তা তো জানি না দিদিমণি। আমরা কোনদিন জয়ের কিছু দেখি নি।

তবে?

তবে লোকে নানান কথা বলত।

# ফিলিপ্স



আমি

মিল্ক অফ  
ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের  
পক্ষেই আদর্শ

## বিরেচক-অম্লনাশক

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে !  
কেবলমাত্র একটিই খাটি ফিলিপ্স মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া  
আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-  
নিরোধক কোষ্ঠ পরিকারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার  
করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও  
সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া  
কেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।



প্রস্তুতকারক রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: ডে'জ মেডিকেল সোসাইটি (ইন্ডিয়া) প্রাই. লি.

PHARMALAB

বসুমতী : শ্রাবণ ১৭১

৫৬৫

দময়ন্তী উৎসুকভাবে তাকাল মালীর মুখের দিকে। কিন্তু মালী আর কোন কথা বলল না।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল : কারা ইচ্ছুক খুন্সুছ ?

শুনছি, এক বুড়ো মহাজন। বাবুর দেনার দ্বারে বাড়িটি নীলাম হয়ে বাড়িল। সেই বুড়ো গিনে নিচ্ছে।

ইচ্ছুক খুন্সুছে কেন ?

বোধ হয় নামের জন্তে। বুড়ো-বরসে সবারই ইচ্ছা। নাম কিনবার।

দময়ন্তী বলল : তুমি একটু বসো মালী, আমি এখনি আস।

দময়ন্তী জগদীশের কাছে এসে ঘটনাটি বলল। তার হাত দুটো চেপে ধরে বলল : তুমি যদি অল্পমতি কর, তা হলে এই খুন্সুই একটা চাকরি চেষ্টা দেখি।

মাথা নেড়ে জগদীশ বলল : নানা এখানে নয়, চল আমরা বাঁটাতে ফিরে যাই।

কি করব সেখানে ?

দরকার হলে ভিক্ষা করব, কিন্তু এট জঙ্গলে আর নয়।

দময়ন্তী স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : সেই ভাল।

তার চোখের দিকে জগদীশ তাকানুত্বিত চোরেছিল। দেখল, তার মুখের প্রসন্নতা কল্লুত্বিত হল, দৃষ্টি হল বেমনার্ত।

জগদীশ বলি এই রকমই কিছু আশা করেছিল, বলল : মিস্টার চৌধুরীকে কয়েক দিন, দখতে পাচ্ছি না।

দময়ন্তী সাক্ষেপে বলল : হ্যাঁ।

তিনি কি কোথাও বাইরে গেছেন ?

জানি নে।

রাত্তি বাড়ি ফেরেন না ?

শোধ হয় ফেরেন।

দেখা হয় না তোমার সঙ্গে ?

না।

তবে এই ইচ্ছুকের খবর কে দিল ?

এতক্ষণে দময়ন্তী তাতা বিরাগের কারণ বুঝল। বলল : আমাদের পুরনো মালি। বাবাব কথা তো তার কাছেই শুনলাম। অপমানের ভয়ে বোধ হয় পালিয়ে গেছেন।

জগদীশ এবারে চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দময়ন্তী বলল : নিউ না একটা দরখাস্ত করে। মালীকে বসিয়ে বেখে এসেছি, তা ই চাতে দিয়ে দেব।

জগদীশ কোন উত্তর দিল না।

দময়ন্তী বলল : নিউ না গো !

এবার জগদীশ উত্তর দিল, বলল : দরখাস্ত পাঠালেই কি চাকরি হয়।

হবে। ডাক্তার সেনকে ধরব, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

জগদীশ সম্মতি দিল না, আপত্তিও করল না। দময়ন্তী আর দেরি না করে দরখাস্ত লিখে ফেলল। তারপর বাইরে গিয়ে মালীর হাতে দিয়ে বলল : সেই বুড়ো মহাজনের হাতে এটা পৌঁছে দাও। কোন উত্তর দিলে আমাকে জানিও।

বিকেল বেলায় ডাক্তার সেন এসেছিলেন জগদীশকে দেখতে। বললেন : টেলিকোনে কথা হয়েছে। মালীর কথায় অ্যাথুলসে আসবে।

জগদীশ বলল : দময়ন্তী এমিকে কি করেছে জিজ্ঞাসা করুন।

দময়ন্তী সবই খুলে বলল, সেই সঙ্গেই অল্পবোধ জানিল তাকে সাহায্যের জন্তে।

আশ্চর্য হয়ে ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন : কারা ইচ্ছুক ?

দময়ন্তী লজ্জিতভাবে বলল : তা তো জানি নে। মালী বলছিল এ বুড়ো মহাজন।

ডাক্তার সেন বললেন : মুন্সিদের কথা।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন : মিস্টার চৌধুরী কোথায় ?

জানি নে।

ডাক্তার সেনের জন্ত চা নিয়ে লবট ঘরে এসেছিল। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : কি রে, তোর প্রভু কোথায় ?

সাহেব ? সাহেব হাজারীবাগে গেছেন।

জগদীশও আশ্চর্য হল। বলল : কবে ?

লবট বলল : কিছুক্ষণ আগে ওয়া এসে জিনিসপত্র নিয়ে গেল।

ফিরতে নাকি দেরি হবে।

বিম্বরে দময়ন্তী অভিভূত হল।

ডাক্তার সেন বললেন : মাথুখটা এই রকমই।

জগদীশ প্রশ্ন করল : কি রকম ?

সাধারণ সৌজন্মবোধের অভাব আছে। জালী লোকদের সঙ্গে কাজকর্ম করে এত অবস্থা হয়েছে।

জগদীশ বোধ হয় খুশি হল। তাই দেখে ডাক্তার সেন বললেন : আপনারা যে চলে যাচ্ছেন উনি জানেন। দিনকয়েক পরে গেলে কি চলত না ?

হ্যাঁ, দময়ন্তীর দিকে চোখ পড়তেই ডাক্তার সেন থেমে গেলেন।

জগদীশ বলল : উনি কিরে না এলেও তাঁর জন্তে আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। অ্যাথুলসে এসে আমাদের মেতেই হবে।

দময়ন্তী বলল : কিন্তু এর মধ্যে আমার চাকরিটা যদি হয়ে যায়—

জগদীশ বলল : তা হলেও আমরা এ বাড়িতে আর থাকব না।

ভদ্রলোকের উপর আমরা অনেক অত্যাচার করেছি।

ডাক্তার বললেন : তা সত্যি।

দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করল : এ অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না ? বাড়ি ভাড়া।

চাকরিটা যদি আমাদের হয়, তা হলে তো একটা আশানা আমাদের চাই।

তা ঠিক।

বাবার সময় ডাক্তার সেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে, এ বিষয়ে তিনি তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। বুড়ো মহাজন যদি এ অঞ্চলের লোক হন, তা হলে তাঁর কথা কিছুতেই ফেলতে পারবেন না। দময়ন্তী নিশ্চিত থাকতে পারে।

[ আগামীবারে সমাপ্ত ]



# বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্র-সাহিত্য

নন্দিতা দত্ত

মা'র চোখের অন্ত নেই। প্রয়োজনের তাগিদে মা'র চোখের যে জিনিসের চাহিদা থাকে তার যোগান দেওয়া ব্যবসায়ীদের কাজ। যুগ যুগ ধরে ব্যবসায়ীরা মা'র চোখের চাহিদা বুঝে—জিনিস উৎপাদন করেছেন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। তার জন্য ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপন দেন। নানা উপায়ে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাস্তব-জীবনে এই বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। ব্যবসায়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকার, রূপালী পর্দার, চৌমাথার মোড়ে সর্বত্র বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন আরও আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে যখন শিল্পীর তুলিতে, বৈজ্ঞানিক আলোর চমৎকারিতে, লেখকের লেখনীতে এবং কবির কবিতার ছন্দের বাহুশীর্ষে—বিজ্ঞাপন—স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

তাই আজকাল দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্র শতবর্ষোত্তর যুগে কবিতার কবিতার মধ্যে দিয়ে, কাব্যের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি শুরু হয়েছে। এমনও দেখা যায় কোন কোন জায়গায় কবির কবিতা টাঙিয়ে এক বিশেষ দ্রব্যের সম্বন্ধে তার মনের প্রশংসাবাদ লিখে দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সাহিত্য ভাণ্ডারকে এমনভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন যাতে সাহিত্য-পিপাসুর দল ঈশ্বর সন্ত চাইতে এসে ফিরে না যান। তাঁর সাহিত্যের রসপান করা ছাড়াও রয়েছে তাঁর ভাস্কর্য্য বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, নৃত্যবিজ্ঞান, রাসায়নিক বিজ্ঞান এবং আরও কত কি তাও বা আমরা যখন অস্বাভাবিক বিশ্বের তাঁর আকাশচুম্বী প্রত্যেক কথা চিন্তা করি তখন দেখি রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিজ্ঞাপনের মধ্যেও টেনে আনা হয়েছে। যবনের কাগজের এক কোণায় যখন দেখি একটি অক্ষরী তক্তার কেশরশির পাশে ছোট একটি সুগন্ধি তেলের ছবি আর বাক্য হাতের লেখার ছাপের অক্ষরে লেখা রয়েছে—

‘যোমটা মাখায় ছিল না তার মোটেই,

মুক্তবী পিঠের পেরে লোটো।’

তখন বিজ্ঞাপনদাতার কাছে হয় মানতেই হয়। আবার যখন দেখি—

‘মুক্তকেশে পুষ্পমধে লুকায় অশনি’

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় দেবতার বর চিত্রাঙ্গদা যে রূপ অঙ্গ ধারণ করেছিলেন রূপালংঘ্য-বালিসিনীরা সেইরূপ ইচ্ছা করলেই ধারণ করতে পারেন কোন এক বিশেষ তৈল ব্যবহার করে।

রবীন্দ্রশতবর্ষোত্তর যুগে বিজ্ঞাপনদাতারা রবীন্দ্রকাব্যের অংশবিশেষ এমনভাবে তাঁদের বিজ্ঞাপনে বসিয়ে দিলেন যেন মনে হয় কবিতার তাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই তাঁর জীবিতকালে লিখে রেখে দিয়েছিলেন। আর যেসব ভাগ্যবান বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কবিতার কাছ থেকে মতামত লিখিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের তো এ যুগে আনন্দ আর ধরে না।

উদাহরণস্বরূপ এক বেকর্ড কোং তাঁদের বিজ্ঞাপন কবির উদ্ভৃতি তুলে ধরেছেন—‘স্বরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের

নিরে যায়। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না। সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।’

শেয়ালাদা স্টেশনের সম্মুখভাগে ছবি একে ওপরে বেলপথ বিভাগ কাপসন দিলেন ‘শেয়ালাদা হয়ে শিলাইদহ।’ তার পাশে লেখা রয়েছে ‘শান্তিনিকেতনের বন্ধুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের প্রমত্ত। পদ্মা অনেক দূর। উমিল লাল কাকরের নিস্তক ভোলপাড় থেকে শান্ত রূপালীর মত প্রসারিত তবু পদ্মার উচ্চ তটতল।’ কবিমনের এই ক্রমপরিবর্তনের বিচিত্র পথ হয় তো শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ পথন্ত প্রসারিত। বারংবার কবির এই পথ-পরিভ্রমণের সূত্র স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিলাইদহ। এতরকম বিজ্ঞাপন পড়ে কার না মন পাড়ি ভ্রমতে চায় শিলাইদহের প্রমত্ত। পদ্মার শান্ত ও শ্রদ্ধ পরিবেশের বুকে কাঁপিয়ে পড়তে! আর একরকম বেলপথের বিজ্ঞাপনে দেখছি বেলগাড়ির সম্মুখভাগের ছবি দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে—বেল লাইনের ধারে বিরাট বটবৃক্ষাভি শাখা-শাখা বিস্তার করে রয়েছে—নীচে লেখা রয়েছে—

‘দিনবাত গড় গড় ঘড় ঘড়

গা ডব্বা মা'র চোখে কড়

ঘন ঘন গাড়ি তার ঘুরবে

কড় পশ্চিম কড় পূর্ব’

রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় নিয়ে লেখেছেন। মা'র চোখের কথাই তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের স্বপ্ন-দৃশ্য নিয়ে লিখেছেনও প্রচুর। বিশেষ করে পল্লী-একলের হোগজীর্ণ শীর্ণকার লোকদের দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি কোন এক জায়গায় তাদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

‘দেখছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোন বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়। তারা কাজে কীকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই কারণেই প্রাণের দায়ে দুঃস্থ হয়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় দেখেছি বাছ কারণকে। কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজার মধ্যে বাস করে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উত্তম ফটিয়ে দিয়ে পাথে-পথে যে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছয়।’ এক নামকরা ওদুঃস্থ বিজেতা প্রতিষ্ঠান, কবিতার এই আশীর্ষক তাঁদের ওদুঃস্থের বিজ্ঞাপনের কাছে লাগালেন।

আর এক বেকারিজ প্রাইভেট কোম্পানী কবিতার জনপ্রিয় কবিতা ‘এবার ফিরাও মোরে’ থেকে আশীর্ষক তুলে ধরলেন ‘অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই স্বাস্থ্য উজ্জল আনন্দ, উজ্জল পথমায়া’। কবিতার এই কবিতার গুরুত্ব এবং গাভী কতখানি—তা রবীন্দ্র পাঠক-পাঠিকার জানা আছে—বস্ত্র শুধু এই বিশেষ আশীর্ষক পড়ে মনে হয় যেন এই বিশেষ পাটুকটী বিজেতার জুই বাঁধে হয় তিনি লিখেছিলেন।

এক বর্গাভি বিজেতার বিজ্ঞাপনের নমুনা কিরকম ভাবে দিলেন তাই দেখা যাক। মাঠে রাখাল বালক গরুর পাশে নিয়ে গাড়িয়ে

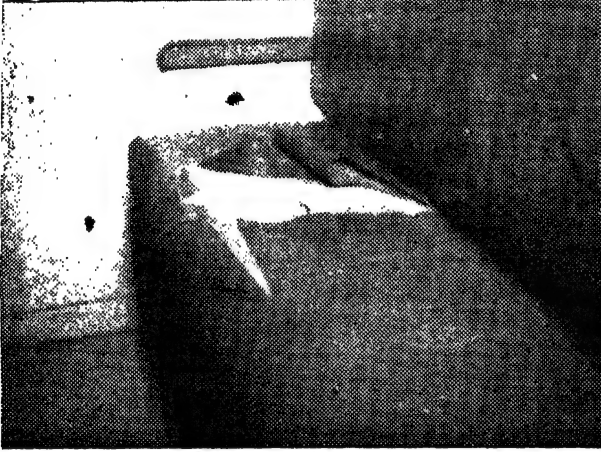
## রেলগাড়ীতে উচ্ছৃঙ্খলতা

ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে মে ১৯৬৪ পর্যন্ত এই ছ' মাস সময়সীমার মধ্যেই পূর্ব-রেলপথের হাওড়া এবং শিয়ালদহ এই দু'টি বিভাগকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার আর যথাক্রমে ২১১,১৮৬ এবং ৪৩৭,৩১৩ টাকা। ট্রেনগুলির কামরা, ওয়াগন এমন কি বৈদ্যুতিক ট্রেন থেকেও ট্রেনের আসবাবপত্রগুলির উন্নতির মত ধ্বংসসাধন ও তা'র ব্যয়িক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলি ও যন্ত্রগুলির অপহরণই এই বিপুল ক্ষতির প্রধান কারণ। শুধু মে মাসেই এই বাবদ ক্ষতির অঙ্ক ৬১,৮১২ টাকা (হাওড়া) এবং ৬৬,১১৬ টাকা (শিয়ালদহ)।

২৫ KV. AC. বৈদ্যুতিক ট্রেনগুলি—২রা ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে যেগুলি প্রেরিত হয়েছে—দেখা যাচ্ছে এই উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক সীলক্ষেত্রে আজ পরিণত। এপ্রিল মাসে দেখা গেছে বৈদ্যুতিক ও বায়বিক যন্ত্রগুলির অপহরণ বাবদ শিয়ালদহ স্টেশনকে ৬০,০০০ টাকার

বেল-কামারার ছিটভিন্ন আসন

ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।



পৃথিবীর যে কোন দেশের রেলপথের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্যীয় এই সকল যন্ত্রের ও যন্ত্রকোচগুলি যেভাবে এই সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলদের শিকারে পরিণত হয়েছে তা ভাবলে আর বেদনার খন্ত থাকে না। এই ধ্বংসকর্মে তারা সম্পূর্ণরূপে ভড়াংবিহীন। রবারের আসন, রেজিন কাপড় এবং পাটের ক্যানভাস ও ব্যাবহুল বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও যন্ত্রগুলি পরিপূর্ণরূপে আজ ছিন্নভিন্ন ও নষ্ট।

এই উচ্ছৃঙ্খলতার অপকীর্তির কলে সাধারণ যাত্রীদের অনেকেই তাঁদের প্রাণ্য এবং তাঁদের কাজা নিশ্চিৎ সুযোগ ও বন্দা সু থেকে বঞ্চিত হ'য় চলেছেন। তাই, এদের সমনে রেল কর্তৃপক্ষ সাধারণ যাত্রীদেরও সাহুকুল সহযোগিতা এটী অবস্থায় বিশেষভাবে কামনা করেন—এই মর্মে সাধারণ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদন জানিয়েছেন।

ঝাড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে; মেঘের ঘনটায় সমস্ত আকাশ কালো হয়ে রয়েছে। এ আর একটি স্ত্রী বৃষ্টির ঘনকালো কেশরাজি বাতাসে উড়ছে। এই বৃষ্টি ছবি ছেপে পাশে লিখে দিলেন—

‘এ যে ঝড়ের মেঘের কাল

বৃষ্টি আসে মুকুতেশ

জাঁচলখানি দোল।

এই বকম আরও কত বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এটা সত্যি যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজ হয়ে আসে। আর বিজ্ঞাপনদ্বারা সব সময় দাবী করেন—তাদের আপন আপন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনজাত দ্রব্য উৎকৃষ্ট—এই বিশ্বাস হয় তো ক্রেতার মনে সন্মতে সফল হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় কবিত্বের উপযুক্ত অংশবিশেষের উদ্ভূতি দ্বারা আপন আপন ক্রিয়াদের গুণাগুণ ব্যক্ত করার প্রয়াস আনন্দ ও উৎসাহজনক।

কোন কোন সময় মনে প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিককে বোঝার মত বা নিবিড়ভাবে আপন করে নেওয়ার মত আমাদের সাধারণস্তর লোকদের সুযোগ আসবে কি না। হয় তো বা—উচ্চস্তরের পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমিত থাকবে। আমাদের কাছে তিনি হয়ে থাকবেন অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না, নানাতাবে তাঁকে আমরা কাছে রাখার মাছুষ করে

নিতে পেরেছি। তাঁর সান্নিধ্য গান, কবিতার, বিজ্ঞাপনে, সর্বাঙ্গ দিয়ে আমরা তাঁকে আমাদের কাছে একান্তভাবে আপন করে পাচ্ছি।

মনের অন্তস্তলে যে আশঙ্কা মাঝে-মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে এমন একদিন আসবে যেদিন রবীন্দ্রনাথ স্বত্ব গবেষণার উপাদান ফুরিয়ে যাবে—কিন্তু এখন দেখছি তেমন ছুঁনি আর আসবে না। নতুন অনেক সম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট কর্মময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজ আমাদের কাছে সাহিত্যের মূল্য আছে এবং তা নিয়ে বহুরকম ভাবে আলোচিত হচ্ছে। চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, হস্তরসিক রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথ এরকম ধরণের অনেক প্রবন্ধই আজকাল খবরের কাগজে বা সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশ পাচ্ছে। স্তরায় মাউঃ—রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে দূরের মানুষ নন; তিনি চিরদিন আমাদের মাঝেই চির-অমর হয়ে থাকবেন। তিনি হলেন কালজয়ী মহাপুরুষ।

বার বার তাঁকে শ্রবণ করতে গিয়ে একথাই মনে ধনিত হয়—

তুমি আমাদের ভাষা,

তুমি আমাদের গান,

তুমি আমাদের চিন্তা,

তুমি আমাদের ধ্যান

তোমাকে সম্বার।



শাসিক বসন্তী । প্রাণ / ১২

গোলকচন্দ্র

মৌন প্রহরী

—পি, সাহান্না

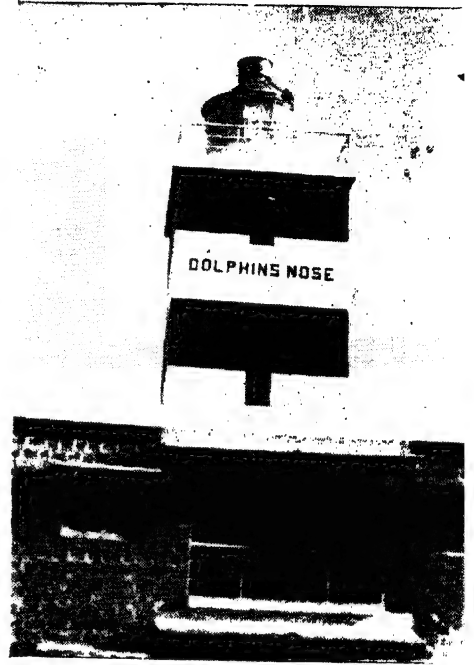
বাতিঘর (বিলাখাপজন্য)

—প্রতিমা মুখোপাধ্যায়

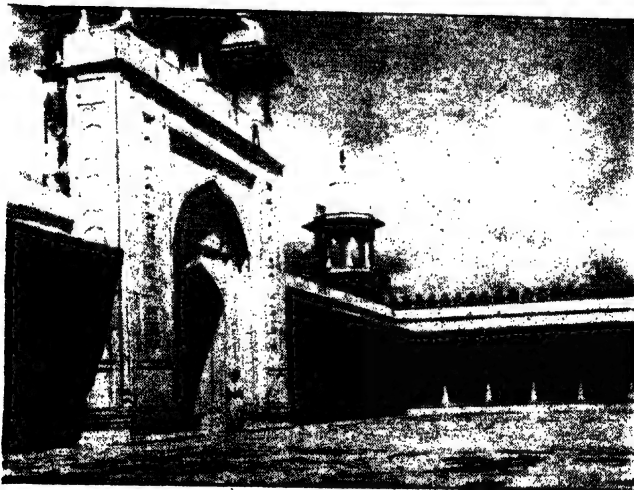


ভারতীয় বিমানবন্দরে চেস্টার বোলস

—ইউ এস আই এস



মাসিক বসুমতী / শ্রাবণ '৭১



আগ্রা দুর্গ

—অমিত সরকার



অপেকা

—জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়



এ্যাক্সিডেন্ট

—শান্তিময় সান্ডাল



খাত্ত চাই।

—এস. ধর



সোহাগী

—প্রভাত বাগচী



কাজেই প্রভাষ  
—বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড

বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড / অর্থাৎ '৭২



## কয়েকটি দৃশ্যাপ্য ঐতিহাসিক পত্র

ডঃ বাস্টিডকে লিখিত লর্ড কার্জনের পত্র

ছাফউড, ব্যাংকোফ্টাফ

এপ্রিল ১৬, ১৯০৮

প্রিয় ডক্টর বাস্টিড,

আপনার সুবিখ্যাত, 'ইকোস ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা'র একটি বৃহত্তর সংস্করণ প্রকাশের প্রহর শুণিতেছে জানিয়া আমি আনন্দপ্রসূত হইয়াছি। যে সংস্করণটি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল তাহাতে আমি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, উহার প্রতিটি ছত্রে আপনার অকুরন্ত জ্ঞান এবং অকুরন্ত উদ্ভাবনের চিহ্ন সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারত হইতে আসিবার পথে যখন আমি প্রথম আপনার গ্রন্থ পড়িত তখন হইতেই লক্ষ্য করিতেছি যে, সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে এমন কোন পৃষ্ঠা নাই যাহার মধ্যে অসুস্থতা এবং অসুস্থতার চিহ্ন অসুস্থপস্থিত। অসুস্থতা বলি এই কারণে যে, বঙ্গদেশে বৃটিশ-শাসনের হস্তপাত হইতেই প্রখ্যাতনামা নরনারীদের ভাগ্য একটি সূত্রে সংযুক্ত হইয়া যায় যাহা তাহাদের জীবনের এবং প্রতিভার এক বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসুস্থতার বলি এই কারণে যে, আপনার সজীব বর্ণনাত্মক নিশ্চয়ই অগণিত পাঠক-পাঠিকার অন্তর অভিভূত করিয়াছে। অবলুপ্ত অথচ অতীতের ঐচ্ছাসমুদ্র বিবরণসমূহ উদ্ধার করিয়া তাহাদের যে অভিনব রূপদান আপনি করিয়াছেন তাহা আবিষ্কার করিয়া আমারও চিত্ত বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছে।

কলিকাতা—ব্যবহারিক জীবনের সচরাচর দৃষ্টান্তে একটি সাধারণ স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দখা যাইবে যে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। জনকানেক ইউরোপীয়ের মধ্যে বাহারা সেখানে সমাবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বাহারা সেখানে অজ্ঞকালের জন্ম বাসা বাঁধিয়াছিলেন তাহাদের পদচিহ্ন আজ যে আবৃত সে সখ্যে অবশ্যই কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু, আপনি যৌবন ও আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণলগ্নে বাহারা এশীয়ার মধ্যে পদক্ষেপ করিয়া বহু পরবর্তীকালে অবসর লইয়াছিলেন হয় তো বিশেষ খ্যাতিলাভের জন্ম কিম্বা অজ্ঞ জ্ঞান ও বিরাট পরিসরের মধ্যে নিজেকে সংযোজিত করার জন্ম—কলিকাতার এই আকর্ষণের মূলে তাহাদের অবদান অবিস্মরণীয় নয়। যে সময়টি আপনার লেখনীর মধ্যে দিয়া চিত্রিত হইয়াছে সে দিকে নরনপাত করিলে দেখিতে পাই যে, কুড়ি বছরের সময় সীমার মধ্যে কত আলোকোজ্জ্বল চরিত্রের অভাবনীয় সম্মেলন কলিকাতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল—বহু বিচিত্র পথগামী এই এক-একটি চরিত্রগুলির মধ্যে ওরানে হের্ফিংস, স্যার ফিলিপ ক্রাফ্টিস, স্যার ইলাইজা ইল্ফ, স্যোস এমলার, শিল্পী জোফানি, ভবিষ্যৎ যুবরাজী

টালোরান্দ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে। এই সব কারণেই যুগ এবং স্থান উভয়ই বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

যুগের প্রচার এবং আচার-আচরণের পরিবর্তন যত ঘটিতেছে, অতীতের পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অপেক্ষাও ব্যক্তিচরিত্র এবং ব্যক্তিগত ঘটনাদি ততই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হয়। অতীতের বহু এই জাতীয় চরিত্র এবং ঘটনা বিশ্বস্তি ব সমুদ্র হইতে পুনরুৎপত্ত হইয়া নবরূপে নবকলেবরে আপনার গ্রন্থে যে চিত্রিত হইয়া উঠিয়া বর্তমানের পাঠক-পাঠিকার সমুদ্রে প্রতিভাত হইয়াছে—ইহাও আপনার গ্রন্থের কম আকর্ষণ নয়। আপনার সান্নিধ্যে আমরা আজ আবার ব্র্যাক হোলের মরণ বরণ, ওয়াশেন টের্টিসের নন্দ, শাস্ত্র, গাউ অমুরাগ এবং সত্যিভা, জুনিয়রের হিংসা ও শত্রুতা, ইয়োরোপের কুটনৈতিকের সঙ্গে যার বিবাহ হইল—কোরোমণ্ডল উপকূলে জাহা সেই পরমানুস্মরী চমোহসিকার জীবনালেখ্য যেন আমরা স্পষ্টভাবে আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্যবহার এবং শাসনকার্য সমর বস্তই অধিকার করুক তথাপি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকারে অবকাশ মুহূর্ত্তিকুণ্ড নিয়োজিত করিতে ভারতের এ যুগের মানুষকে আপনার গ্রন্থটি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তত্ত্বপরি যে অতীত অবচেতনভাবে আমাদের বর্তমান সামাজ্যশাস্ত্রের বীজ বপনের কাল বলিয়া গণ্য তাহার প্রতি একটি পথিক কর্তব্যও আমার মতে এই মানুষদের আছে।

আপনার গ্রন্থের নবসংস্করণ উৎকর্ষের বিচারে পূর্ববর্তীগুলিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া যাক এই কামনা স্বাভাবিকরূপে করিতেছি জানিবেন।

আপনার অত্যন্ত বিশ্বস্ত  
ডাঃ কার্ল অফ কেডলফর্ন

কোম্পানীর পরিচালকদের উদ্দেশ্যে লর্ড ক্রাইল্ড এবং

তাহার কর্মপরিষদের সদস্যদের পত্র

ফোর্ট উইলিয়াম

২৩এ ডিসেম্বর, ১৯০৯

আপনাদের পত্রের ভাষা ও রচনারীতি আপনাদের এবং আমাদের উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ইহা বলিবার অনুমতি দান করুন। কি প্রভু-ভৃত্য, কি ভুল্লোকে-জহলোকে—যে কোন দিক দিয়া বিচার করিলেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামান্য খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি এবং কোন কোন অনায়াসে উপেক্ষণীয় অনিচ্ছাকৃত অনবধানতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করা হইয়াছে এবং উহার যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে। হর্নামের ও কলকাতার প্রেসের যদি বহু বৎসরের কর্মজীবনের

সকল পৌরব এক ঘণ্টার কুংকারে  
তাহা হইলে সামান্য ও অপ্রমাণ উদ্দেশ্যগণিতে আস্থা রাখাই সমীচীন।

স্বাঃ ক্লাইভ

মানিংহাম

ফ্রান্সল্যাণ্ড,

ম্যাকেট

কুক

বেচার

গ্রেডেল

### উপরোক্ত পত্রের উত্তর

কোম্পানীর কর্মে এখনও বারী নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে  
বাহারী গত ২১এ ডিসেম্বরের পত্রে বাফর করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে  
আমরা বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেছি যে এই পত্র পাঠ্য মাত্র তাঁহাদের  
যেন অবিলম্বে কর্ম হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁহারা যেন কোন  
প্রকারে ভারতবর্ষে আর অবস্থান করিতে না পারেন সে দিকেও  
আপনাকে প্রথর দৃষ্টি দান করিতে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে  
এবং এই পত্র আপনাদের হাতে পৌছানোর পর যে প্রথম জাহাজ  
স্থানীয় বন্দর ত্যাগ করিবে—তাহাতে যেন অবশ্যই তাঁহাদের তুলিয়া  
দেওয়া হয়। এই নির্দেশগুলি যেন কোনপ্রকারে অ করা না হয়।

### গভর্নর ভ্যালিটার্টকে লিখিত

#### হলওয়েলের পত্র

বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর নিকট হইতে হাল আমলে আমি যে সকল  
অজ্ঞায়, বিচারবিহীন ও ক্রোধোদ্ভাবক মন্তব্যসমূহ লাত করিতেছি তাহা  
আর অধিকদিন এই কর্মভার বহন করিবার ক্রেশ হইতে আমাকে মুক্তি  
দিতেছে। কোম্পানীর অঙ্গুলে এবং স্বার্থে আমার নিঃস্বার্থ সেবা  
ও উদ্ভম এই সময়ের মধ্যে কিছু সম্মানজনক এবং পক্ষপাতবিহীন  
প্রতিদান আশা করিতে পারিত।

### ক্লাইভকে লিখিত ফিলিপ ফ্রান্সিসের পত্র

নিজের জাহাজের ভাণ্ডার প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দিন। অজ্ঞ  
কাহাকেও কখনও বাহা বলি নাই, আপনাকে তাহা বলিতে আমি  
বিন্দুমাত্র বিধাবোধ করিতেছি না যদি এমন কোন ব্যবস্থা হয় বাহার  
সহিত আমি নিজেকে মিলাইতে পারিব না বা বাহার সহিত আমার  
সংযোগ কোনপ্রকার ফলপ্রসূ হইবে না তাহা হইলে আপনি সেক্ষেত্রে  
বরাবরের জন্ত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে পারেন।

### শেরিফকে লিখিত বিচারপতিদ্বয়ের পত্র

কলিকাতার শ্রীযুক্ত শেরিফ মহোদয় এবং কলিকাতা

মহামহিম রাজনের কারাগারক মহোদয়

বিষয়ঃ মহারাজা নন্দকুমার

মোহনপ্রসাদ, কামালউদ্দীন খাঁ এবং অজ্ঞাতের শপথানুসারে—  
অভিযুক্ত মহারাজা নন্দকুমারকে আপনার হোজাজতে রাখিা লউন।

পরলোকগত বৃন্দাকী দাসের এক্সিকিউটরবর্গকে প্রত্যাহিত করার  
উদ্দেশ্যে জাল জানিয়াও ইচ্ছাপূর্বক এবং উদ্দেশ্যমুখকভাবে আসল বলিয়া  
একটি জাল উইলকে প্রতিলিপ করার চেষ্টার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত।  
আইনের স্বাভাবিক বিধান অনুযায়ী ইনি যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ইঁহাকে  
নিরাপদে আপনার হোজাজতে রাখিবেন।

স্বাঃ এস সি লিমেন্সে

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ

জন হাটভ

পত্রটি ঐতিহাসিক হ'লেও তার বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের  
যথেষ্ট কারণ বিজ্ঞমান। ভারতবর্ষে একটি সময় এসেছিল, যে  
সময় শাসকগোষ্ঠীর খৃশ্মাফিক ইতিহাস লিখিত হয়েছিল।  
একাধিক কারণবশত সত্যকে চাপা দিয়ে কাল্পনিক কাহিনীকে  
ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দেওয়া হয়েছিল। তখনই বিষয়,  
এ যুগের শক্তিময় গবেষকদের সাধনায় বহু অবলুপ্ত সত্যের  
পুনরুদ্ধার হয়ে ইতিহাসের নতুন ভাষ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। দেশপু  
মহারাজা নন্দকুমারের মাথানত করতে পারেন নি ব্রিটিশ সরকার।  
ইংরেজের ধীতির পাতকের তালিকার সেই জগ্রে এই স্ববীয় নেতার  
নাম অনুপস্থিত। স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চিত্ত, তেজস্বী এই ব্রাহ্মণকে  
মিথ্যা অভিযোগে বে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আজকের  
দিনের নব-নারীর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

### ফ্যারারকে লিখিত ব্রিক্সের পত্র

প্রিয় মহাশয়,

গুরুতর উদ্বেগের সহিত এই পত্রে আমি আপনাকে বাহা  
জানাইতেছি আমার অজ্ঞমান যে, মেসার্স জ্যারেট এ্যাণ্ড ফল্লকন্ট তাহা  
আপনাকে পূর্বেই অবহিত করিয়াছেন যে রাজাই শুধু দোষী সাব্যস্ত  
হন নাই, আদালতের সময়ে মিথ্যা শপথগ্রহণ করার অভিযোগে  
মীর আশাদ আলী, শেখ ইয়ার মহম্মদ এবং কৃষ্ণজীবন দাসকেও  
অভিযুক্ত করার দায়িত্ব পাবলিক প্রসিকিউটর গ্রহণ করিয়াছেন।  
কি হুভাগ্য রাজার! কেন যে তিনি জীবন দাসের শেষ সাক্ষ্য কামনা  
করিলেন—যে সাক্ষ্য পূর্ববর্তী সমস্ত বিবৃতিগুলিকে একেবারে উল্টাইয়া  
দিল এবং তাহাদের গুরুত্বসমূহ একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। রাজা  
নিজেই নিজের হুভাগ্যকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পূর্ববর্তী  
সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যগুলি পূর্ববক্ষণ করিয়া ও সৃষ্টিজিতভাবে বিচার-  
বিবেচনা করিয়া শ্রার ইলাইজা হয় তো জুরিবর্গকে রাজাকে “নির্দোষ”  
বলিয়া ঘোষণা করার নির্দেশ দিলেও দিতে পারিতেন। আপনি এবং  
আমি শ্রার ইলাইজাকে যে নোট দিরাছিলাম—তাহার সদ্যবহার  
তিনি যথেষ্টই করিয়াছেন—সেগুলি আমি এতৎসহ পাঠাইতেছি।  
যেহেতু গতকল্য রাতি তিনটার পর আর নিশ্রা না আসায় আমি  
বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতেছি সে কারণে কিছু বিশ্রাম  
গ্রহণ করিয়া আপনার জন্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষিত থাকিব। আপনার  
সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ বিষয় কাঁকর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা  
যায় তাহা যথেষ্ট সন্তর্ভতা এবং বিচার বিবেচনা বিশ্লেষণ সহকারে  
আলোচনা করিতে হইবে। আমার সাথের মধ্যে যতদূর সম্ভব এ



ক্ষেত্রে তাহার পূর্ণ সম্ভাবনার করিয়া আপনার সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব জানিবেন। বাস্তবিক, হতভাগা বুজের জন্ম বাড়ট বেরনা হয়।

প্রিয় মহাশয়, আপনার

অত্যন্ত বিশ্বস্ত

স্ব: সি.এক.ব্রিঞ্জ

জন্ম ১, প্রান্ত:কাল

### উইলারকে লিখিত ফ্র্যাঙ্গিসের পত্র

প্রি: মি: উইলার,

মি: হেষ্টিংস ও আমার মধ্যে যে কাগজপত্রের বিনিময় হইয়াছে, তাহার একটি নকল মি: টিলঘম্যান আপনাকে দিবেন। এইগুলি অল্পখানেক করিলে দেখিবেন যে, কি পরিমাণে অপমানিত ও আহত হইয়া (যাহার ক্ষতিপূরণ অসম্ভব এবং কোন ভরলোকের মধ্যে যাহা সমর্থনের ও কল্পনার অতীত) আমি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছি।

আমার পশ্চাতে যে সেমণা রাখিয়া যাইতেছি তাহা সত্য বলিয়া গণ্য করিবেন। মি: হেষ্টিংস আমাকে সম্ভবত ভুল বুঝিতেন না এমনত অবস্থায় তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না, কারণ তাহার প্রতি কোন অভিচার করা ইচ্ছাবিরুদ্ধ বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বাহা জানেন তাহা ভালই জানেন। আমি কোন নীতিকে ভিত্তি করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছি জ্ঞা যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি সে বিষয়ে অধিক জানেন। এই দেশকে তাহার ভাগ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া দত্ত শীঘ্র পারেন—ভাগ্য করুন। প্রিয় বন্ধু বিদায়, চিরকালের জ্ঞা বিদায়।

এখনও জীবিত থাকাকালীন

আপনারই

স্ব: সি.এক.ব্রিঞ্জ

### বন্ধুকে লেখা স্মার ইলাইজা ইম্পের পত্র

জ্ঞা প্রভাতে মি: হেষ্টিংস এবং মি: ফ্র্যাঙ্গিস পিলুলের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একই সময়ে উভয়ে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া গুলী করেন। মি: ফ্র্যাঙ্গিসের গোলা লক্ষ্যাত হইয়া কিন্তু মি: হেষ্টিংসের গোলা মি: ফ্র্যাঙ্গিসের দক্ষিণ দিকে বিদ্ধ হয় তবে পঞ্জরাধি দ্বারা উঠা প্রতিহত হওয়ায় বন্ধুস্থলে পৌছাইতে পারে না। উঠা মেরুদণ্ডকে আহত না করিয়াই তাহা অতিক্রম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায় উঠার এক ইঞ্চি পরিমাণ বাম দিক হইতে নির্গত হয়। ক্ষত সহজে গুরুতর কোন আশঙ্কা নাই এবং তিনি নিজেও বিপদুক্ত।

### জ্যাক লেখা হেষ্টিংসের চারখানি পত্র

সোমবার

১২ই অগাস্ট

আমি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করি নাই এবং কিছুই আমার লবণগোচরে হয় নাই তবে মাস্ত্রাজ হইতে আমি একখানি পত্র পাইয়াছি, যাহাতে কোম্পানীর জাহাজগুলির আগমনবাস্তবিক

জানানো হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের মধ্যে একমাত্র বাহা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল যে, নিশিতরূপে ধার্য হইয়াছে যে যতদিন আমার অভ্যর্থন ততদিন আমি এখানে থাকিতে পারিব, তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে সেই একই সহচরদের সঙ্গে।

কলিকাতা

বৃহস্পতিবার

প্রান্ত:কাল

আমার পরম প্রিয়তমা ম্যারিয়ান,

আজই সকালে মি: ফ্র্যাঙ্গিসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং আঘাত তিনি পাইয়াছেন তবে সে আঘাতটিও ভীতিকর নয় তোমাকে এই সংবাদটি স্মার জন ডে'র দিন এইরূপ ইচ্ছা আমার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবেও অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ লইব এবং অবশ্যই তোমাকে জানাইব। তিনি আছেন এখন বেলভেডিয়ায়। ডা: ক্যাম্পবেল ও ডা: ফ্র্যাঙ্গিস এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতেছেন। আমি বিন্দুমাত্র আহত হই নাই তা ছাড়া আছিও বেশ ভালই। আমার নিকট হইতে কুশলবার্তা শুনিয়া তোমাকে আশ্বস্ত হইতে হইবে। তবে, আমাকে দেখিতে কিন্তু এখন কোন প্রকারেই পাইবে না। মি: ফ্র্যাঙ্গিস যতক্ষণ না পরিপূর্ণরূপে বিপদুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইতেছেন ততক্ষণ আমার পক্ষে কলিকাতা ভাগ্য কিছুতেই হইতে পারে না। তবে, আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি এখন চু'চুড়িতেই থাকিয়া যাও। তোমার সহিত সেখানে মিলিত হইবার সেই পরমানন্দময় ক্ষণটি এখনও কিছুদূরে আছে তবে বেশি দূরে নাই। আশা করি, কয়েকদিনের মধ্যেই সেই মুহূর্ত সমাগত হইবে। মি: রসকে আমার প্রীতি ও শুভকামনা জানাইও কিন্তু, এই সকল ঘটনা করাত তাহার কর্ণগোচর করিও না। আমার ম্যারিয়ান, গত দুইদিন ধরিয়া আমার সকল চিন্তা, সকল কর্ম এমন কি স্বপ্নে তুমি যে পুত্রপ্ৰাপ্তভাৱে মিলিত হইয়া আছ আমার মন-প্রাণ তুমি ভরপুর করিয়া আছ, তুমি যে আমার সৈরাটি হার জুড়িয়া আছ।

আমার প্রাণেখরী, আমি তোমারই

স্ব: ডব্লিউ এইচ

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা

আমার প্রেমসী ম্যারিয়ান,

আজ সকাল সাতটার সময়ে তোমাকে একটি পত্র আমি লিখিয়াছি, সেই পাত্রেই স্মার জন ডে'র লিখিয়াছি, তাঁহাকে আমি নির্দেশ দিয়াছি যে, পত্রটি তোমার হস্তে সমর্পণ করিবার পূর্বেই বিষয়বস্তুটি যেন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, কারণ, ফ্র্যাঙ্গিসে এবং আমাতে আজ বাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন ভিত্তিহীন অতিরিক্ত সংবাদ পাছে তোমাকে ভীতি, চকিতা ও শঙ্কিতা করিয়া তোলে সেইজন্যই আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম, আশা করি আহারের পূর্বেই পত্র পাইয়াছ এবং চিঠি মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে আমি দেখি না। তদুপরি, ডাকবাহকদের ব্যবস্থা হইতেও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া আছে। তবে, এক চিন্তা যে স্মার জন যদি চু'চুড়ায় সেই সময়ে না থাকেন তাহা হইলে... এখন অতীব আনন্দে সহিত তোমাকে জানাইতেছি যে, মি: ফ্র্যাঙ্গিস সম্বন্ধে চিন্তায় কোন

কারণ নাই, আঘাতও তাঁহার সেরকম গুরুতর নয়, গোলা তাঁহার দেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই। তুমি বলিয়াছ না যে 'কি যে হয় তাহা কে বলিতে পারে, কালের দিকে কেই বা তাকাইতে পারে' ইত্যাদি।

হতভাগ্য নেলারকে আমি চাল ইত্যাদি দিয়াছি কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের এখন বা অবস্থা তাহাতে খাতিগ্রহণ তাহার পক্ষে সম্ভব কি না বুঝিতে পারিতেছি না এবং বর্তমানে খাতিগ্রহণ তাহার কোন উপকারেও আসিবে কি না বলিতে পারি না। মিঃ মোট তোমাকে তোমার চাবির গোছা ফিরাইয়া দিবে। তোমার যে একশত সোনার মোহর আমার কাছে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে তাহার ভারও তাঁহার হস্তেই দিয়াছি। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার এ আশ্বাস তোমাকে দিতেছি। মিঃ ফ্র্যান্সিস সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কলিকাতার আমাকে থাকিতেই হইবে, কারণ এ অবস্থায় আমি কলিকাতা ত্যাগ করিলে পলাতক ঘনাম আমার প্রতি আরোপিত হইবে, অতএব এক সপ্তাহের পূর্বে আমি তোমার নিকট যাইতে পারিব না, কিন্তু তোমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তুমি কলিকাতা আসিও না।

আমি ভাল আছি। কিন্তু তুমি তো পত্রে লেগ নাই যে তুমি কেমন আছ—তোমার কুশলবার্তাটুকু তোমার পত্রে অন্তর্ভুক্ত! স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বপ্রকার যত্ন অবশ্যই গ্রহণ করিও। বিদায় প্রেয়সী—

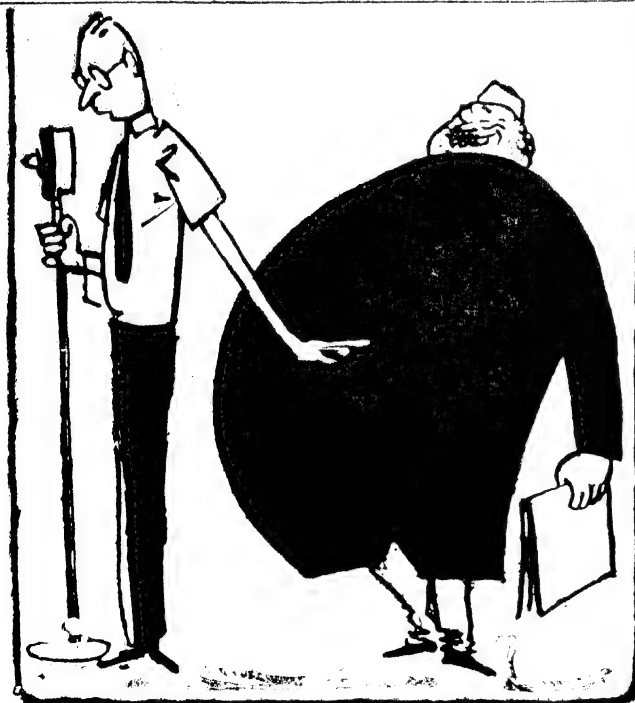
তোমার একান্ত অনুরক্ত—যাঃ ওয়ানেন হেষ্টিংস

আমার আদরের ম্যারিয়ান,

তোমার পত্রটি আমি পাইয়াছি তুমি কিন্তু রাগ করিতে পারিবে না। হয় তো বাহা ঘটয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে—খরীদা নেওয়া উচিত কারণ ইহার মধ্যে উজ্জল ভবিষ্যতের বীজ নিহিত থাকতে পারে, ইহার ফলে বাহা আসিতেছে তাহা হয় তো সুন্দর ও সার্থকতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াই উদ্ভিত হইবে।

এখন তুমি আমাকে অনস্বস্ততা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগতা প্রত্যেকটির হস্ত হইতে মুক্ত জানিবে। যেখানে তুমি আছ সেইখানেই আরও অধিককাল থাকিলে যদি তুমি আনন্দ পাব, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য জানিবে। মিঃ ফ্র্যান্সিস ভালো দিকে যাইতেছেন এবং তাঁহার পরিপূর্ণ আরোগ্য সম্বন্ধে এখন আমি সুনিশ্চিত বলিতে পারি। বেচারী নেলার আর জীবিত নাই। শ্রাব জে ডেকে তুমি কি কষ্ট করিয়া একটু জানাইয়া দিবে যে এখন এখানে আমার তাঁহার আত্ম কোন প্রয়োজন নাই।

আমি নিজের তাঁহাকে লিখিতেছি। লেডী ডে অনস্বস্ত জানিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম। তাঁহাকে, বিবি মোটকে এবং মিঃ রসকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাইও। তোমারই—যাঃ ডব্লিউ এইচ



এবারে দেশের খাতাবাণ্ডার তার কারণ  
সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবেন খাতাবাণ্ডারের  
উপমন্ত্রী.....

শিল্পী—রতন

## তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

[ বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও ঐতিহাসিক গবেষক ]

সাহিত্যক্ষেত্রে যে গবেষকের দল শুধু ইতিহাসচেষ্টা ও

ঐতিহাসিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেন নি—সেইসঙ্গে সমান দক্ষতার সঙ্গে বারী অর্পণ ভাষালিঙ্গিত্য ও সরস বর্ণনাত্মকতার পরিচয় দিয়েছেন, বার ফলে ইতিহাস শুধু তথ্য ও বিবরণে পরিপূর্ণ না হয়ে এক রসসম্পন্ন আকারে বাদের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাঠক সাধারণের অন্তরঙ্গপূর্ণ সঙ্গম হয়েছে—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় সেই তালিকার এক বিশিষ্ট নাম। যে অধিবৃন্দ ইতিহাস এবং সাহিত্যের সমন্বয় সাধন করেছেন তপনমোহনের নাম সেই তালিকায় যথোচিত স্বীকৃতিসহ সবিশেষ উল্লেখ্য। ইতিহাসের বহু তথ্যের, বহু ঘটনার সঙ্গে নব-আলোকে এ যুগের পাঠক-পাঠিকার পরিচয় ঘটানোর তাঁর কৃতিত্ব এবং গুরুত্ব বিশেষভাবে মর্তব্য।

বাঙালার এক বিদগ্ধ-পরিবারের সন্তান তপনমোহন। বলা বাহুল্য, তাঁর দ্বারা বংশের সন্মান ও ঐতিহ্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজর্ষি রামমোহনের পৌত্রী-পৌত্র স্নানমথ্য স্ত্রীধর স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। মা স্বর্গীয়া সরোজা দেবী ছিলেন পুণ্যপ্রোক্ত মহাবিদ্যোৎসাহের অগ্রতম পৌত্রী এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য মনীষী বিজ্ঞানপ্রাণের জ্যেষ্ঠা বক্তা—রবীন্দ্রনাথের ভাতৃপুত্রী।

১৮৯৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী উত্তর-কলকাতার রায়বাগান ঝুঞ্জে তপনমোহনের জন্ম। ১১ নং ডাফ স্ট্রাটে অবস্থিত মিস ওয়াইটের বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ। দশ বছর বয়সে তিনি শাস্তিনিকেতনে ভর্তি হন। শাস্তিনিকেতনের তখন আদিপর্ব। কলেজ-জীবন তাঁর অতিবাহিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৯১৮ সালে এম-এ পরীক্ষায় হন সম্মানে উত্তীর্ণ। পরীক্ষার সাফল্যলাভ করে তপনমোহন বিলাত যাত্রা করেন। কেম্ব্রিজ পিটার হাউসে তিনি অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। লিঙ্কনস ইন থেকে ১৯২২ সালে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সিদ্ধমোক্ষ হন।

ব্যারিস্টার হয়ে তপনমোহন ফিরে এলেন কলকাতায়—তাঁর স্বদেশে, জননী-জন্মভূমির মহিমায় অন্ধে। স্নক করলেন আইনব্যবসায়। যোগ দিলেন কলকাতার হাইকোর্টে। প্রথমে কিছুকাল ইনি শ্রাব টোবিক আমীর আলীর অধীনে শিক্ষানবিশী করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের নবরঞ্জন স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ইচ্ছামুত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্র্যান্ডমিনিষ্ট্রিয়ার-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। এই পদে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সংযোগ। ১৯৪১ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিশ্বভারতী সোসাইটি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর-পরিষদের তিনি অগ্রতম সদস্য ছিলেন।

তপনমোহনের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয় ইংল্যান্ডে। রবীন্দ্রনাথের দেশবাসী তত্ত্বপরি তাঁর তৎপর-দৌহিত্র তপনমোহনের লেখনী ফসল ফলাতে স্নক করে শেখরীয়ারের দেশের মাটিতে। যখন ভাষাও তখন শেখরীয়ারের দেশের অর্থাৎ প্রথম জীবনে ইংরাজী ভাষার প্রতিম লিখতেন, ফরাসী ভাষাতে তাঁর দখল অসাধারণ। কিছু



বাঙলা রূপকথার তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন, ইংরাজী ভাষাতেও সেগুলির পরে রূপান্তর ঘটে।

'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থটি তাঁর সাধারণতঃ এক বিপুল আলোড়ন আনল। আমাদের জাতীয়-জীবনে পলাশীর গুরুত্ব যে কতখানি সে সম্বন্ধে আজ নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। ভারতের ইতিহাসের সেই যুগসন্ধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অভিনব দক্ষতা সহকারে লিপিবদ্ধ করে পাঠক-সমাজের বিপুল সাধুবাদ তপনমোহন লাভ করলেন। ঐতিহাসিক রচনার ইতিহাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি নতুন ধারার ও একটি নব অধ্যায়ের স্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিস্ম, বাঙলা লিরিকের গোড়ার কথা, হিন্দু আইনে বিবাহ, পলাশীর পর বঙ্গের প্রভূতি গ্রন্থগুলি তাঁর রচনাশক্তির এক-একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

আজকের দিনে স্মৃতিস্মাজের একটি প্রথম সারির আসন তপনমোহনের অধিকারগত। বাঙলা সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যবর্ধনের সাধনার তাঁর জীবন অতিবাহিত। বাঙলা দেশের রসিকসমাজেরও তাঁর কাছে তাই প্রত্যাশার অন্ত নেই।

## ডাঃ মোনামোহন দাস

[ ভারতের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ]

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বাঙলা দেশের অসংখ্য গ্রামের অগ্রতম গ্রাম। সে গ্রামের এক সাধারণ কৃষিজীবী-পরিবারে ১৯১১ সালের মার্চ মাসের একটি দিনে যে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হল, কেউ জামল না সকলের অলক্ষ্যে বিধাতাপুঙ্ক তার ললাটে কি লিখে গেছেন—সেদিন হয় তো পরিবারের কেউই ভাবতে পারে নি যে এই শিশুর জীবন অল্প ধারায় প্রবাহিত হবে—স্বল্পপরিমিত গুণী অতিক্রম করে এই শিশুর কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হবে বিরাট পরিসর পটভূমির উপর—এক মর্দনারতীর ক্ষেত্রে সে লাভ করবে বিপুল জনপ্রিয়তা ও অপরিমিত খ্যাতি—আপন দক্ষতার ও আন্তরিকতার সে আসবে অনেকেরই প্রবোভাগে। আজকের দিনে সেই শিশুই—ভারতের অগ্রতম উপমন্ত্রীরূপে সাধারণতঃ সুপরিচিত। ডাঃ মোনামোহন দাস তাঁর নাম।

শিশুদেবের নাম স্বর্গত পূর্ণিমা দাস। মোনামোহনের বন্ধন

বাল্যকাল সেই সময় পূর্ণাঙ্গের ভাগিনেয় স্বর্গীয় মদনমোহন দাস তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। সেদিন সেই বালকের মধ্যে হয় তো ভবিষ্যতের কোন বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিল মদনমোহনের সন্ধানী চোখ—কৃষক পরিবারের সন্তান মনোমোহনের জীবনের বোনসঙ্গের সে এক স্মরণীয় অধ্যায়। মদনমোহন তাঁকে নিয়ে না এলে হয় তো তাঁর জীবনের ধারা গতানুগতিক প্রোতেই মূর্ত্ত, বৃহত্তর জগতের সিংহদ্বার হয় তো উন্মুক্ত হোত না তাঁর সামনে। মদনমোহনও পরিবারের মধ্যে প্রথমজন, যিনি গ্রামের বাইরে আসেন। আনন্দের কথা মাতুলপুত্র সঙ্কে মদনমোহনের আশা পরিপূর্ণ-সফলতার রূপ নিয়ে পরবর্তীকালে প্রতিভাত হল।

মদনমোহনের বাড়িতে বাস করতে থাকলেন মনোমোহন। দশ টাকার ফলারশিপ নিয়ে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৮ সালে। সিটি কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হলেন আই-এস-সি পরীক্ষায়। যোগ দিলেন মেডিকেল কলেজে। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩৬ সালে।

স্বভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়ে আপন রাজনৈতিক-জীবন আরম্ভ করলেন মনোমোহন। স্বভাষচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে পৌরকর্তৃপক্ষ তাঁকে কর্মে নিয়োগ করলেন, পরে স্যানিটারী অফিসারের পদে তিনি উন্নীত হলেন, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সেই আসনে তিনি সমাসীন ছিলেন। মদনমোহনের অমুজ বিধানসভার সদস্য রাখানাত দাস ছিলেন গান্ধীবাদী আর মনোমোহন স্বভাববাদী একই বাড়িতে বসবাস করতেন কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দুই ভায়ের মধ্যে যুদ্ধের জলো মনের মিল নষ্ট করতে পারে নি। এই সময়েই শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমুখচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মনোমোহনের যোগাযোগ গড়ে উঠল।



ডাঃ মনোমোহন দাস

১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউটিংয়েট গ্র্যাসেমুন্ডির অঙ্গতম সদস্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে তাঁর শৃঙ্খ আসনে সমাসীন হলেন মনোমোহন। ১৯৫১ সালে গঠিত অস্থায়ী লোকসভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৫২ সালে ভারতে অদ্বিতীয় প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন মনোমোহন দাস, কিছুদিন পরে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী দেশবাবা মনোমোহন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। আরও কিছুদিন পরে উপমহা নিযুক্ত হলেন শিক্ষাবিভাগে। শিক্ষা-মন্ত্রণালয় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—(১) শিক্ষা ও (২) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর। দ্বিতীয় ভাগের উপমহা হিসাবে গৃহীত হলেন মনোমোহন। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ চাগলা আবাব বিভাগ দুটিকে এক করলেন, তখনও মনোমোহনকে সেই বিভাগেই উপমহা হিসাবে দেখা গেছে। আচার্য নেহরুর লোকসভার পর ভারতের শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তাঁর বহুকালের দপ্তর পরিবর্তন হল—র্তমানে তিনি পুনর্গঠন বিভাগের উপমহা।

সেদিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মৌলানা আজাদের উদ্দেশে। মৌলানা আজাদের বিশেষ স্নেহ তিনি লাভ করেছিলেন। বর্তমানে জিন্নামূল উদ্বাসনের কল্যাণ-সাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র প্রত বলে তিনি মনে করেন—তাঁর সমগ্র শক্তি এক্ষেত্রে তিনি উৎসর্গ করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এই জীবনালেখ্য অপর্যবেক যাবে। রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের সঙ্গে তিনি মোটেই সম্পর্কশূন্য নন। এই প্রসঙ্গে আমাদের পাঠক-পাঠিকাকে জানিয়ে রাখার সুযোগটুকু গ্রহণ করি যে, 'বজ্রানন্দী' রচনায় এবং ছোটদের উপযোগী কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

## বিষ্ণু দে

[ দিকপাল কবি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ]

এ যুগের কাব্যকলার উৎকর্ষসাধন এবং বিকাশের ইতিহাসে যে ক'টি নাম চিরকালের দাবীতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—বিষ্ণু দে তাদেরই অঙ্গতম। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের গরিমা ও গুরুত্ব সর্বক্ষেত্রিকসমাজে আজকের দিনে নতুন কিছু বসায় নেই। মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে যাদের প্রগাঢ় পরিচয় বিস্তারিত, প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে তাঁদের স্বরসেও এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসনের অধিকারী।

বিষ্ণু দে'র প্রাপ্ততামহ যখন বঙ্গকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধলেন, ইতিহাসের পাতা ওঁটালে দেখা যায়, এ দেশে ইংরেজ শাসনের তখন সবে সূত্রপাত হয়েছে। স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র দে'র মধ্যম পুত্র বাল্যের লব্ধপ্রাপ্তি কবি ও শক্তিমান প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে'র জন্ম হয়, এই মহানগরীতেই ১৯০৯ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে। বিদ্যালয়-জীবন অতিবাহিত হয় মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন) এবং সংস্কৃত কলেজিয়েটে স্কুলে। ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাশ করলেন আই-এ। সেন্ট পথস কলেজের ছাত্র হিসাবে

ইংরাজিতে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ইংরাজিতে এম-এ পরীক্ষায়ও সসম্মান সফলকাম হলেন ১৯৩৪ সালে।

কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র-জীবন সমাপ্ত হল। শুরু হল গৌরবময় অধ্যাপক-জীবন। অধ্যাপক-জীবনের অর্ধাং শিক্ষাদানের মহৎ কর্মের সূচনা হয় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ১৯৩৫ সালে। ন' বছর পর ১৯৩৪ সালে তিনি যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন তিন বছর। ১৯৪৭ সালে তিনি যুক্ত হলেন মোলানা আজাদ কলেজে। আজও শব্দের অধ্যাপক হিসাবে সেখানে স্বমতিয়ার বিরাজমান। বিষ্ণু দে যখন কলেজে পাঠ নিচ্ছেন সেই সময় যে শ্রদ্ধাভক্তি শিক্ষাবিদদের শিক্ষাগুরু হিসাবে লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রফুল্ল বোষ, রবি বোষ, কিরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রতম।

সাহিত্যের গগনে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাহিত্যের আলোতেই সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র। লেখা আরম্ভ হয় বিদ্যালয়-জীবন থেকে। লেখা প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৯২৬-২৭ সালে। বাঙালী সাময়িকপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়—দিকপাল সাহিত্যিক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়—‘বিচিত্রা’ এবং বৃন্দাবন বস্তুর ‘প্রগতি’, ‘কল্লোল’ প্রমুখ পত্রিকাকুলিতে বিষ্ণু দে’র রচনাদি প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়, পরবর্তীকালের ইতিহাস কালের অজানা নয়। ১৯৩৩ সালে (আনুমানিক) তাঁর কাব্যগ্রন্থ উর্দু ও আটমিশ প্রকাশিত হয়। তাঁর অজানা কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—চোরাবালি, পূর্বলেখ, সাত ভাই চম্পা, সন্দীপের চর, অঘিষ্ট, তুমি শুধু পচিশে বৈশাখ, আলোখা, নাম রেখেছি কোমল গাছার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ প্রভৃতি। সম্প্রতি, কিছুকাল আগে তাঁর সম্পাদনায় একটি এ-যুগের কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। যে বিদেশী ফুল এবং এলিয়টের কবিতা তাঁর ছ’বানি অনুবাদগ্রন্থ। কৃতি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো জীবন ও শিরসাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ হিসাবে বিশেষ উল্লেখনীয়।

তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে তাঁর অমর্যাদা বন্ধুসহল এক মহতী সন্ধ্যা’র দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করলেন।

তাঁর সহধর্মিণী স্রীমতী প্রগতি দে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যশস্বিনী মহিলা। বর্তমানে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা হিসাবে নিযুক্তা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছেন কবি বিষ্ণু দে। সাহিত্যরথী স্বর্গীয় মহিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বিষ্ণু দে পরিচিত হন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে। দে-যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক-আজ্ঞা ভারতী বৈঠকেও তিনি যাত্রারত করেছেন—অবস্থা, বয়েসে তখন তিনি বালকমাত্র। এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখি, একদিন তাঁর গৃহে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনরত অবস্থায় তাঁর কাছে তাঁর একটি আলোকচিত্র চেয়েছিলাম।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—‘কোথাও ছবি ছাপাতে আমার আপত্তি, তোলাতেও’—

এই কথাগুলির মধ্যে তাঁর আত্মপ্রচারবিষয়ী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে।

## বটকৃষ্ণ দত্ত

[ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ]

এ দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ইতিহাসে ১৯৫০ একটি স্বর্ণযুগীয় বছর। সুপ্রসিদ্ধ চারটি ব্যাঙ্ক এই সময়ে একত্রে সংযুক্ত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নাম গ্রহণ করে ভারতের ব্যাঙ্ক ইতিহাসের এক বলিষ্ঠ নবযুগের সূচনা করে। এই বিরাট বিশাল প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধারের আসনে সেদিন যিনি অধিষ্ঠিত হলেন সেদিন বয়সে তিনি ছিলেন তুলনামূলক বিচ্যে নিতান্তই কনিষ্ঠ। চল্লিশ তখনও তাঁর অতিক্রান্ত হয় নি, বলা বাহুল্য, আজও সেই আসনে সমাধীন থেকে ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতিসাধন করে আপন দক্ষতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। আজ শুধু বাঙালী নয়—সারা ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর নাম বটকৃষ্ণ দত্ত।

এই দক্ষতা ও প্রতিভা তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রেই লভ্য। এ দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্যীয় পুরুষ স্বর্গত নরেন্দ্রেন্দ্র দত্তের ইনি স্রবোৎসব এবং স্নানামধু পুত্র। কুমিল্লায় ১৯১০ সালের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম। বিদ্যালয়-জীবন কুমিল্লাতেই অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা থেকে আই-এস-সি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-কম পরীক্ষায় তিনি সফলকাম হলেন ১৯৩০ সালে।

বি-কম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বল্পকালের স্রুতি তিনি পিছু-প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ব্যাঙ্ক করপোরেশনে যোগ দেন। তখন থেকেই বটকৃষ্ণ আশা, উজ্জীর্ণা ও স্বপ্নের এক মূর্তিমস্ত প্রতীক। নব নব সম্ভাবনা সে সময় থেকেই তাঁর মন-প্রাণ-চিন্তা আচ্ছন্ন করে আছে। নিজে ব্যাক গঠন করে সেটি পরিচালনার বাসনা তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠল। পিতৃদেবের অনুমতি এবং সহধর্মে তিনি সৃষ্টি করলেন নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড। অধিষ্ঠিত হলেন তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের আসনে। ১৯৩৮ সালে এই ব্যাঙ্কটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় সিডিউলে



বটকৃষ্ণ দত্ত

অন্তর্জাতিক হর এবং অল্পকালের মধ্যেই কালকটো স্কয়ারি: হাউসের পুরে পুরি সমগ্র হতে সমর্থ হয়। ১৯৪৬ সালে এই ব্যাক কুমিল্লা ব্যাকিং করপোরেশানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। বটকু ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। পরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পদে তিনি বধন উন্নীত হন নরেন্দ্রচন্দ্র তখন চেয়ারম্যানের আসনে সমাসীন। ১৯৫০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর কুমিল্লা ব্যাকিং করপোরেশান, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাক, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাক এবং হুগলী ব্যাক একত্রে সংযুক্ত হয় এবং চক্লিশ বছর বয়স্ক বটকুই যে তার প্রধান কর্ণধারের আসন লাভ করলেন এই রচনার প্রারম্ভেই তা বিবৃত হয়েছে। গ্রাম্য এবং মফস্বল অঞ্চলে ব্যাকিং ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা, বুদ্ধি ও প্রসার সম্বন্ধে বেঙ্গল স্ট্রাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে তিনি একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫০ সালের ফরাল ব্যাকিং এক্সোয়ারি কমিটির নিকট এই পরিকল্পনাটি উক্ত চেম্বার প্রেবণ করেন।

অক্ষ কমিটি, বোর্ড অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট গ্রাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া, এগ্রিকালচারাল রিকাইট্রাল করপোরেশান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রূপায়িত ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাডভাইসারি কাউন্সিল ফর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ

ব্যাকার্সের বর্মপরিষদের, বেঙ্গল স্ট্রাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের করপরিষদের, ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের গ্রাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি কর্ণকরী সমিতি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশাল ওয়েলফয়ার গ্রাণ্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের পরিচালক সমিতির তিনি অগ্রগতম সদস্য।

এল আই সির পূর্ণাঙ্কলের অক্ষ উপদেষ্টা পরিষদের ও টি বোর্ডের সভাপদ তিনি অক্ষত্বত করেছেন।

ইণ্ডিয়ান ব্যাকস এ্যাসোসিয়েশানের তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড অফ ইণ্ডাস্ট্রিজের তিনি চেয়ারম্যান। আসাম ও উড়িষ্যার স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশানের তিনি পরিচালক।

ইনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করেছেন। সেই সব স্থানের ব্যাকিং পরিচালন ব্যবস্থাসমূহ বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

১৯৬০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে বিনয়কুমার সরকার মেমোরিয়াল লেকচারারের সম্মান প্রদান করেন।

প্রথম জীবনে ইনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। শিকারেও ছিল তাঁর যথেষ্ট শখ। বর্তমান ফাইন্যান্সিয়াল প্রেসেরও তিনি একজন নিয়মিত লেখক।

## এক ভারতসেবীর দেহাবসানে

মৈয়দ আলী আসাদ

দিল্লার রাজপথ শোকাতুর। নীরব নিখর  
রূপ নিয়ে সমাসীন। সবায়ের মাঝে  
বিরাট জিজ্ঞাসা, অসংখ্য কৌতুহলী  
জোড়া জোড়া চোখ ফটকের কাছে।

এ মন প্রসারিত স্তূরের প্রান্তে  
বেদনাবিধুর আলা অন্তরের কোণে,  
যে ছিল বৌশনি তাঁধারের মাঝে  
আজ তাব নিঃশেষ আলো, স্বর্গের পানে।

অশাস্ত পৃথিবী, উত্তলা বাতাস বাহ  
মন্সাকিনীর কিনারে কিনারে।  
বেদনাবিহবল শত হৃদয়ের হাতাকার  
কেবলি ক্ষনিত আজ দেবতার ধারে।

তে মহাপুরুষ! তোমার জীবনই বাণী  
পথতার। মানবের আলোর দিশারী তুমি  
মর্ত্যলোকে শেষ যাত্রাপথে প্রবাসি তোমার  
অমৃত আশীষ তব চিরদিন আসে স্নেহ নামি।

## নিঃসম্পর্ক যাত্রা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তখন আবিল দিন, বধায় শতর গেছে ভিজে,  
কেউ কেউ বর হতে বের করে গিয়েছে কোথায়,  
আমি হেমন্তের কোলে মুখ পেতে শুধিরেছি নিজে,  
জেনেছে। স্বর্গীর সেবা, গাঁথো বসে অভিপ্রায়মালা

নীরবে ঘরের কোণে, দিন বাহ, নধ্যাহ লুকায়;  
অপমানে পোড়া রূপ ঘুরে ঘুরে একা ঘুরে ঘুরে  
নদী বখা ধরে কোথা? সাগরের বহন্তে যে আলা  
হে দীপ, নরানে মৃত্যু, কোথা তুমি নিশ্চিত আমার?

চাই চাই তোমাকেই ঘরে শুকে হেমন্তের কোলে।  
শৈশবে বরাও মুখে সব হুং, পাতার সন্ধ্যাস-..  
অচেনা নৈমিষে, ভায়ে, মরে বাধা বৃক্কের ভিতর,  
স্বহীন, বিষণ্ণতা, ঢেকে দাও প্রিয়ের মতন  
গভীর আড়ালে, ঘরে, এসো বর্ষা দূরে পরবাসে  
যা আমার নয় তারে নিরানন্দ স্নেহে চলে বাধা?

## জামারাতোসের রহস্য

যুদ্ধের অবশ্যানে জামারাতোসকে ভেঙে স্নেহের হাসি বললেন, 'আপনি যা যা বলেছিলেন সবই সত্য বলেছে, আপনি ভাল লোক, এখন বলুন দেখি আর কত লাসেডিম্যানীর বাকি আছে? তাদের মধ্যে এদের মত উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ক'জন?'

জামারাতোস বললেন, 'মহারাজ, লাসেডিমানে (১) অনেক লোক, অনেক শহর। সে দেশে স্পার্টা বলে যে শহরটি আছে তার লোকসংখ্যা প্রায় আট লাখ। এখানে যারা যুদ্ধ করেছে তারা প্রত্যেকেই তাদের সমকক্ষ, স্পার্টার বাইরে যারা আছে তারা তাদের সমান না হলেও ভাল যোদ্ধা।'।

স্নেহের হাসি বললেন, 'এবার বলুন সবচেয়ে সহজে কি উপায়ে এদের জয় করা যায়। আপনি একদা এদের রাজা ছিলেন, ভিতরের খবর জানেন।'।

জামারাতোস পরামর্শ দিলেন, 'আপনার নৌ-বহর থেকে তিন শো জাহাজ লাসেডিমানে উপকূল কিথিরা দীপে পাঠান। আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন একদা বলেছিলেন যে, এই দীপ যদি সমুদ্রগর্ভে যায় তবেই স্পার্টার মঙ্গল ব্যর্থ আমি যে বুদ্ধি আপনাকে দিছি সেই অভিসন্ধি একদা দেশের কোনও শত্রুর মাথায় আসবে তা তিনি অনুমান করেছিলেন। আমি প্রস্তাব করি আপনার জাহাজগুলি কিথিরার ঘাঁটি বানিয়ে সমগ্র লাসেডিমানে আতঙ্ক ছড়াক। নিতের পরেই যুদ্ধ ফেলে তারা অস্ত্র গ্রাসীদের সাহায্যে যাবে না। আপনি অনার্যাসে তখন গ্রাসের বাকি অংশ ভয় করবেন, লাসেডিমানে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। কিন্তু এটি প্রস্তাব যদি গ্রহণ না করেন তবে আরও বিপদ আশঙ্ক্য করতে পারেন। পেলপনিসাসের প্রান্তে সমুদ্র উপর এক সাংকীর্ণ যোজক আছে, সেখানে মিত্রপক্ষীয় গ্রাসের সব সেনা আপনার বিধ্বংস মোতায়েন দেখতে পাবেন, এখানে বা যুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে আপনাকে। আমার বুদ্ধি নিলে ঐ যোজক ও পেলপনিসাসের শহরগুলি বিনা যুদ্ধে আপনার হাতে আসবে।'।

এই সময়ে সম্রাটের ভাই নৌ-বহরের কমান্ডার আখাইমেদাস বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মহারাজ, এই বিশ্বাসঘাতক গ্রাসীদের কথায় কান দেবেন না, আপনার সাক্ষ্যে ঐ ঘোষণা করে সে দুর্বুদ্ধি দিচ্ছে। আমাদের চার শো জাহাজ এরই মধ্যে নষ্ট হয়েছে, তিন শো যদি পেলপনিসাসে পাঠাই তা শত্রু আমাদের সমকক্ষ হয়ে পড়বে। নৌশক্তি ভাগ না করলে তারা যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। তা ছাড়া স্থল ও জলবাহিনীর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে একত্র অগ্রসর হওয়া উচিত, তাদের পৃথক করলে নৌ-বাহিনী আপনার কোনও কাজে লাগবে না।'।

স্নেহের হাসি বললেন, 'আখাইমেদাস, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি তোমার বুদ্ধিই নেন। কিন্তু জামারাতোস যা আমার ভাল মনে করেছেন তাই বলেছেন, তিনি মনে মনে আমার বিস্ময়বানী এমন কথা আমি মানব না, তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ ইতিপূর্বে আমি পেয়েছি। তা ছাড়া সবাই জানে যে লোকে প্রায়ই প্রতিবন্ধীকে ঠেঁকা করে, ঘৃণা করে, তাকে এমন বুদ্ধি দেয় না যাতে তার ভাল হবে—অবশ্য অতি মহৎ লোকদের কথা আল্লাহ কিন্তু হেমন আর ক'জন! পক্ষান্তরে

১। পেলপনিসাসের বক্ষি-পূর্বাপ।

# বিক্রির প্রথম মহাযুদ্ধ

শচীন্দ্রনাথ বসু

ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক একই শহরের নাগরিকদের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; বিদেশী বন্ধুর সৌভাগ্যে লোকে সহানুভূতি বোধ করে, তাকে সর্বদা ভাল বৃদ্ধি দেয়। জামারাতোস বিদেশী এবং আমার অতিথি; ভবিষ্যতে কেউ যদি তাঁর কুখ্যাতি না করে তো আমি সুখী হব।'।

এই আলোচনার পর স্নেহের হাসি যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন মৃতদেহ দেখতে। লেওনিদাস স্পার্টার রাজা ও সেনাপতি ছিলেন শুনে তাঁর মাথাটি কেটে শূণ্য চড়তে শুরু দিলেন। এতে বোকা যায়, হেরোডোটাস বলেছেন, লেওনিদাসের প্রতি সম্রাটের অতি তীব্র ক্রোধ ছিল, নতুবা তাঁর দেহ নিয়ে তিনি এমন বীভৎস কাণ্ড করতেন না, কারণ সাধারণত অস্ত্র সব জাতির তুলনায় পারসীকরা বীর শত্রুকে বেশি সম্মান দেখাত।

স্পার্টা ও পারস্যের প্রতি জামারাতোসের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল তা স্পষ্ট না হলেও এই প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি কাহিনী আছে। স্পার্টা'ই সবচেয়ে আগে জানতে পারে যে স্নেহের হাসি গ্রীস অভিযানে উদ্রক্ত হয়েছেন, তখন দেলফাইর থেকে তারা কি দৈববাণী পেয়েছিল তা ও আগে বলা হয়েছে। আসন্ন আক্রমণের খবর তারা পেয়েছিল অতি আশ্চর্যভাবে। জামারাতোস তখন পারস্যে নির্বাসন নিয়েছেন এবং স্পার্টাবাসীদের প্রতি তাঁর যে খুব খ্রীতি ছিল না এমন সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। যাই হোক, স্তম্ভায় বসে তিনি স্থির করলেন স্নেহের হাসির মতলবটা গোপনে স্পার্টাকে জানাতে হবে। দু'টি ভাঁজ-করা কাঠফলকের উপর তিনি স্নেহের হাসির অভিযানের কথা লিখলেন, তারপর মোম দিয়ে ঢেকে ফলকগুলি স্পার্টাতে পাঠালেন। সেখানে প্রথমে কেউ ফলকগুলির রহস্য ধরতে পারল না, কিন্তু লেওনিদাসের স্ত্রী গোর্গো (স্নেহের হাসির মেয়ে) ভেদ করলে রহস্য। তার কথায় মোম ঢেকে ফেলে বার্তা উদ্ধার হল এবং তা গ্রাসের অস্ত্র পাঠানো হল। প্রথম এই যে জামারাতোস এই কাণ্ডটি করেছিলেন কি স্পার্টার প্রতি সন্তানের থেকে; না কি তিনি এক ক্রুর আনন্দ পেয়েছিলেন আসন্ন বিপদের খবর জানিয়ে।

## পারস্যের অগ্রগতি ও গ্রাসের সম্ভাব

স্থলে গ্রাসের পরাজয়ের পর হেরোডোটাস এই দুই শক্তির মধ্যে জলযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রাসীরা নৌ-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক,

ছিল স্পার্টার এউরিবিয়াস্তাস—মিত্রপক্ষীয় রাজ্যের কেউ অ্যাথেনীয় সেনাপতির অধীনে কাজ করতে রাজী হয় নি, ল্যাসেডিমোনের লোক চেষ্টাচ্ছে। এ নিয়ে ঝগড়া করলে সমগ্র গ্রীসের সর্বনাশ হবে জেনে অ্যাথেন্স তা মেনে নিয়েছে; কারণ শান্তির চেয়ে যুদ্ধ বতটা হান বলছেন হেরোডোটাস, যুদ্ধের তুলনায় ততটা মন্দ অন্তর্দর্শে খণ্ডিত দেশ।

আর্টিমিসিয়ামে এসে গ্রীসীরা দেখল অদূরে সেনা-সজ্জিত প্রকাণ্ড পারসীক নৌ-বহর। এতটা তারা আশঙ্ক্য করে নি, ভয়ে গ্রীসের ভিতরের দিকে পলায়নের কথা চিন্তা করতে লাগল। তা হলে ইউবিয়া অন্তরীপকে তৎক্ষণাৎ শত্রু গ্রাস করবে, সেখানকার যোদ্ধারা এউরিবিয়াস্তাসের মত পরিবর্তন করতে অসমর্থ হয়ে ঘৃণ দিয়ে কাজ সমাধা করলে; তারা সেনাপতি থেমিস্তোক্ল্যাসকে প্রায় তিরানব্দুই হাজার টাকা দিল, সে এই টাকার অংশ এউরিবিয়াস্তাস ও আর এক জনকে দিয়ে ব্যবস্থা করলে যে আর্টিমিসিয়াম ত্যাগ করা হবে না। এরা দু'জন জানতে পারল না টাকা কোথা থেকে এসেছে, তাবলে অ্যাথেন্স পাঠিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা শত্রুর শক্তি ও বর্ণাশীল পরীক্ষা করতে গ্রীসীরা পারসীক-বাহিনী আক্রমণ করলে। এই অল্প কয়েকটি জাহাজকে এগিয়ে আসতে দেখে পারসীকরা ভেবেছিল অতি সহজেই জয়লাভ করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীসীরা তাদের ত্রিশটি জাহাজ বন্দী করল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যুদ্ধ বন্ধ করে যে-বার বাঁটিতে ফিরে গেল। তখন ভরা গ্রীষ্ম, সেদিন সারারাত প্রচুর বজ্রপাত সহ বড় বৃষ্টি চলল। যুদ্ধবন্দ ও ভাঙা জাহাজের খণ্ডগুলি ভাসতে-ভাসতে এসে পারসীক নৌ-বাহিনীর চতুর্দিকে, তার মধ্যে ক্রমাগত বড় ও বজ্রের শব্দ—সৈন্যরা ভাবতে লাগল তাদের শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে। এর আগেও তাদের উপর দিয়ে কম হুর্ভোগ বায় নি—আর একবার বড়ো অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হয়েছে, তা সামলাতে সামলাতে আবার এসে ভীষণ জলযুদ্ধ। পারসীক নৌ-বাহিনীর এক অংশ ইউবিয়া প্রদক্ষিণ করতে এগিয়ে গিয়েছিল, এই বড়ো এর সব জাহাজগুলি পাথরে ঠেকে মরল। গ্রীসের তুলনায় পারসীক বাহিনীর সংখ্যাধিক্য কমিয়ে দেবার জগা ঈশ্বর যেন বধাসাধ্য করছিলেন। তা ছাড়া অ্যাথেন্স থেকে আরও তিনশতটি জাহাজ আসতে গ্রীসীদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল। আগের দিনের মত আবার বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর কিছু ক্ষতি করে ফিরে এল তারা।

ক্ষত্রের কাছে এত অপমান সহ করে পারসীক সেনাপতিরা পরের দিন দুপুরে নিজস্বাই আক্রমণ করলে। জাল এই সংঘর্ষগুলি যখন চলছিল তখনই স্থলে খাখশিলির যুদ্ধ চলেছে, গ্রীসের পক্ষে দুইয়েরই উদ্দেশ্য এক—দেশের অন্তর্দর্শে পৌছাবার শখ বন্ধ করা। এই তৃতীয় দিনের যুদ্ধে পারসীকদের জাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকার রেখায় গোল হয়ে এগিয়ে এল, তখন গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী গিয়ে তাদের আক্রমণ করলে। দুই পক্ষেই শক্তি প্রায় সমান—পারসীকদের সংখ্যা বেশি হলেও স্টোই তাদের বাধা হয়ে ঠাঁড়াল কারণ জাহাজগুলি কেবলই একে অন্নের পথে পড়ছিল। এ যুদ্ধেও চরম নিশাঙ্গি কিছু হল না, আবার যে-বার ঘুরে ফিরে গেল।

এর পরে আর্টিমিসিয়ামে খাখশিলির বিপর্যয়ের খবর পৌছাল

এবং গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করলে। তা জানতে পেরে পারসীকরা আর্টিমিসিয়াম দখল করল এবং আগ্রহে আগ্রহ হতে থাকল। এই সময়ে স্পের্ত্রাস নিজের নৌ-সেনাদের মনোবল বাড়ানোর জগা তাদের খাখশিলি বর্ণনাক্রমে দেখতে পাঠালে, কিন্তু তার আগে ব্যবস্থা করলেন সেখানে তাঁর যে বিশ হাজার সৈন্য মরেছে তাদের হাজারখানেক বাদ দিয়ে আর সকলের যুদ্ধবন্দ খাদে ফেলে তার উপর যেন মাটি পাতা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। হেরোডোটাস বলছেন, কিন্তু নিজের ক্ষতি গোপন করার তাঁর এই অদ্ভুত চেষ্টার কেউ ভোলে নি।

একটা দিন বেড়িয়ে সৈন্যরা আবার জাহাজে ফিরে এল, স্থল-বাহিনীর সঙ্গে স্পের্ত্রাসও এগিয়ে চললেন। এই সময়ে আর্কিডিরার থেকে কয়েকজন লোক চাকরী খোঁজে তাদের কাছে এসেছিল; স্পের্ত্রাস তাদের প্রশ্ন করলেন, গ্রীসীরা কি করেছে, উত্তরে তারা বললে, তারা ওলিম্পিক উৎসব পালন করেছে, নানারকম ক্রীড়া ও রথের দৌড় দেখছে। পুরস্কার কি জিজ্ঞাসা করে জানা গেল জলপাইপাতার মালা।

আর্জানানাসের ছেলে তা শুনে বলে উঠল, 'এ কি শত্রুর সঙ্গে অ'মরা যুদ্ধ করতে এসেছি বরা পরস্পরের প্রতিবিশ্বাস করে টাকার লোভে নয়, শুধু গোঁবের খাতিরে!'

এই স্থলর উক্তি শুনে স্পের্ত্রাস তাকে বললেন কানুক্ষ।

অগ্রসরের পথে পারসীক স্থল-সেনা কোথাও কোথাও জালিয়ে-পুড়িয়ে সবকিছু ধ্বংস করল। এক ভাগ্যবান এসে শতিনীকে দ্বিত্ত করে বড় দলটি নিয়ে বিগলিত প্রবেশ করে স্পের্ত্রাস অগ্রসর হলে অ্যাথেন্স লক্ষ্য করে। বিগলিতবাসীরা তখন শত্রুর পক্ষে চলে গিয়েছে, ম্যাসিডোনিয়ার থেকে আলেকজান্ডার শহরে শহরে সৈন্য মোতায়েন রেখেছেন স্পের্ত্রাসকে বোঝাতে যে, বিগলিতা তাঁর বন্ধু। পারসীকদের অল্প দলটি চলল দেলফাইর মন্দিরের দিকে, তাদের উপর লুকুম, মন্দির লুণ্ঠ করে তার সম্পদ সম্রাটের সামনে উপস্থিত করতে হবে; এ সম্বন্ধে তিনি এত কথা শুনছিলেন যে, শোনা যায় যে দেশে নিজের ধনরত্নের চেয়েও এখানকার কোনও কোনও সামগ্রী তাঁর কাছে বেশি পরিচিত ছিল। আক্রমণ আসন্ন দেখে দেলফাইবাসীরা প্রথমে তাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদের অজ্ঞাত পাঠিয়ে দিল, তারপর নিজেরা পানাস্তাস গিরিতে গিয়ে আশ্রয় নিল, শহরে থাকল শুধু বাউজন ও মন্দিরের পুরোহিত। পারসীক সৈন্য যখন অ্যাথিনীর মন্দিরে পৌঁছেছে তখন নাকি ঠঠাৎ দারুণ বজ্রপাত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে পানাস্তাসের দুই শিখর ভেঙে প্রচণ্ড গর্জনে ভেঙে এসে পড়ল তাদের উপর, বহু লোক মরল সেখানে। তা ছাড়া মন্দিরের ভিতর থেকে এক ভীষণ চাঁৎকার শোনা গেল। নিদাক্ষণ ভয়ে পারসীকরা পালাতে আরম্ভ করলে, তখন স্থানীয় অধিবাসীরা পাহাড় থেকে বেরিয়ে তাদের আক্রমণ করে আরও ক্ষতি করল।

অ্যাথেনীয়রা ভেবেছিল যে, পেলপনিসীয়রা বিগলিতাতে শত্রুকে আটকাতো চেষ্টা করবে, দেখা গেল তা না করে শুধু নিজ দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে তারা করিয়ার যোদ্ধকটু প্রতিরক্ষা করতে ব্যস্ত। অ্যাথেনীয়দের অহুত্বার্থে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনী আর্টিমিসিয়াম থেকে সরে ত্রালমিসে আশ্রয় নিল, সেখান থেকে অ্যাথেনীয়রা দেশে



## শিবের প্রথম বহাবু

কিরে তাদের ত্রীলোক ও শিশুদের অ্যাটিকার বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে। দৈববাণী শ্রবণ করে তারা বুঝল যে, অ্যাথেন্স বিপন্ন, কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কারণ ছিল; অ্যাথেন্সীদের বিশ্বাস যে প্রকাণ্ড এক সাপ অ্যাক্রিপোলিসের মন্দিরে বাস করে এবং পাঠাউটি পাহারা দেয়; সাপের জন্তু প্রতি মাসে তারা মধুমাখা পিঠি রেখে আসত, প্রতিবারই তা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তখন দেখা গেল পিঠি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। সুতরাং তাদের মনে হল দেবী নিজেই অ্যাক্রিপোলিস ত্যাগ করেছেন।

শ্রালামিসে নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন অধিনায়কদের এক আলোচনা সভা বসল, এটরিবিয়াতাস প্রত্যেককে অভিমত জিজ্ঞাসা করলে কোথায় শত্রুকে বাধা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে। অধিকাংশ বললে, শ্রালামিসে হেরে গেলে তারা সেখানেই আশ্রয় নিয়ে পড়বে, কিন্তু করিন্থীয় বাজকে হারলে অন্তত নিজদের লোকের মধ্যে আশ্রয় পাওয়া যাবে। সুতরাং সেখানেই যুদ্ধ করা উচিত; পেলপনিসীয়রা অবশ্য সর্বান্তঃকরণে সম্মত হল এ প্রস্তাব। আলোচনা তখনও চলছে এমন সময়ে অ্যাথেন্স থেকে এক দূত এসে জানাল যে পারসীক হুল-সৈন্য অ্যাটিকায় পৌঁছে সারা দেশ জালিয়ে দিয়েছে।

হেলেনপট অতিক্রম করার পর অ্যাটিকা পর্যন্ত আসতে তাদের তিন মাস লেগেছিল। তারা বহন অ্যাথেন্সে এল তখন শত্রুর পরিত্যক্ত, শুধু অ্যাথেন্সের মন্দিরে জনকয়েক ছাড়া—কিছু মন্দিরের স্তম্ভটো, কিছু গরীব লোক; পরসার অভাবে তারা দের সন্ধে পালাতে পারে নি, তা ছাড়া তাদের ধারণা ছিল যে, দৈববাণীতে যে বলেছে ‘কাঠের দেয়াল’ অ্যাথেন্সকে রক্ষা করবে, তার প্রকৃত অর্থ তারা মরতে পেরেছে; দেয়ালের ইঙ্গিত জাহাজের প্রতি নয় ভেবে তারা তখন অ্যাক্রিপোলিস ঘিরে সেখানে বসে রইল। পারসীকরা কাছের আর একটি পাঠাউ দখল করে তাদের প্রতি অগ্নিবাহী বাণ বর্ষণ করতে থাকল, কাঠের দেয়াল তাদের বাঁচাতে পারল না দেখেও তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে চলল। শত্রু বহন এগুতে চেষ্টা করল তখন প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে ফেলল তাদের উপর, তা দেখে স্বেক্সাসও খতমত খেয়ে গেলেন। শেষকালে পারসীকরা বাঁধা পথটি ছেড়ে অন্তরিক দিগে শিখরে উঠল, সেদিকটা এতই খাড়া যে সেখানে কোনও প্রহরী ছিল না। তাদের দেখে অ্যাথেন্সের কেউ কেউ নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরল, অন্তরী মন্দিরের অন্তঃপুরে আশ্রয় নিল। মন্দির খুলে পারসীকরা প্রত্যেককে মারল, তারপর মন্দিরের সব সম্পদ নিয়ে সমস্ত অ্যাক্রিপোলিস আগুন ছোলে ধ্বংস করল। অ্যাথেন্স-বিজয়ী স্বেক্সাস স্বজাতি পিতৃব্য আর্জাবাসেসের কাছে চিঠি পাঠালেন শ্রবণ জানিয়ে। পরদিন তাঁর সঙ্গে অ্যাথেন্সের লোক যারা ছিল তাদের আদেশ করলেন অ্যাক্রিপোলিসে গিয়ে অ্যাথেন্সের রীতি অনুসারে আহুতি দিতে; হয় তো যখন এই রকম নির্দেশ পেয়েছিলেন, অথবা মন্দির পুড়িয়ে বিবেকের দশনে জগছিলেন।

এদিকে স্যালামিসে এই সব খবর অত্যন্ত চাকল্যের সৃষ্টি করল। কয়েকজন নৌ-সেনাপতি কোনও আদেশের অপেক্ষা না করেই নিজের নিজের জাহাজ নিয়ে পলায়ন করল। যারা থাকল তাদের আলোচনার ঠিক হল যোজ্ঞকে গিয়ে যুদ্ধ করা হবে। সভার

পর রাতে বহন সবাই যে-বার জাহাজে ফিরে এসেছে তখন স্যালামিসে নামক এক গ্রাথেনীয় থেমিস্তোক্ল্যাসের জাহাজে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জেনে সে বললে, ‘না না, একবার যদি আমরা স্যালামিস ত্যাগ করি তা হলে একতা বলে কিছু থাকবে না, যে-বার বাড়ি চলে যাবে, আমাদের সব শক্তি ক্ষয় হবে। আমার কথা শুধুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন ঐ সিদ্ধান্ত রদ করতে, হয় তো আপনি পারবেন এটরিবিয়াতাসের মন বদলাতে।’

কথাটা থেমিস্তোক্ল্যাসের ভাল লাগল, কিন্তু না বলে সে তখনই প্রধান সেনাপতির জাহাজে গিয়ে জানালে যে একটা জরুরী কথা আছে। এটরিবিয়াতাস তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসল। তখন থেমিস্তোক্ল্যাস একটু আগে যে সব যুক্তি শুনেছে তার সঙ্গে নিজের যুক্তি মিশিয়ে এমন গুরুতর আবেদন জানাল যে, ফলে ঠিক হল সেনাপতিদের আবার এক সভার ডাকা হবে। সভার আলোচ্যবিষয় সম্বন্ধে এটরিবিয়াতাস কিছু বলার আগেই থেমিস্তোক্ল্যাস দীর্ঘ আবেগপূর্ণ এক বক্তৃতা আরম্ভ করল।

অবশেষে কারোই সেনাপতি তাকে বাধা দিয়ে বললে, ‘থেমিস্তোক্ল্যাস, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যে লোক সংকেত না পেয়েই ছোটে তাকে চাবুক মারা হয়।’

থেমিস্তোক্ল্যাস সঙ্গে সঙ্গে বললে, ‘হ্যাঁ কিন্তু ছোট্টা আরম্ভ করতে যারা দেরি করে তারা কোনও পুরস্কার পায় না।’

তারপর এটরিবিয়াতাসকে বললে, ‘এদের কথা না শুনে গ্রীসকে বাঁচাতে আপনিই পারেন। আমাদের সামনে দুটি পথ আছে, বিবেচনা করে দেখুন কোনটা ভাল। যোজ্ঞকে গেলে খোলা সাগরে যুদ্ধ করতে হবে, তা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না, কারণ আমাদের জাহাজ শত্রুর চেয়ে সাংখ্যিক অল্প ও যুগ্মগতি। তা ছাড়া যুদ্ধ আমাদের পক্ষে গেলেও শ্রালামিস, ইজিনা ইত্যাদি তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তৃতীয়ত শত্রুর নৌ-বহর দক্ষিণে এলে হুল-সেনাও পেলপনিসীয়র দিকে অগ্রসর হবে, সমগ্র গ্রীসকে বিপদে ফেলা হবে। কিন্তু আমাদের পরামর্শমত এইখানে যুদ্ধ করলে খোলা জলে আমরা পড়ব না, দ্বিতীয়ত শ্রালামিসে আমাদের পরিবার আশ্রয় নিয়েছে তারা বাঁচবে এবং তৃতীয়ত এখানে লড়েও আমরা পেলপনিসিয়াকে রক্ষা করতে পারি সেখানে শত্রুর হুল-সেনাকে না ডেকে।’

বক্তৃতার শেষে থেমিস্তোক্ল্যাস ভর দেখাল যে, তার কথা না শুনে অ্যাথেন্সের জাহাজে তাদের পরিবার তুলে নিয়ে ইটালিতে চলে যাবে।

এই কথার কাজ হল, শ্রালামিসে থাকাই স্থির করল এটরিবিয়াতাস। তর্কযুদ্ধ শেষ করে কংযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল জাহাজে জাহাজে।

### শ্রালামিস

এ দিকে পারস্যের নৌ-বহর ফ্যালেক্সে এসে পৌঁছাল, তখন স্বেক্সাস গেলেন তা পরিদর্শন করতে। সেখানে বিভিন্ন সেনাপতিদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন আপন অভিধান সম্বন্ধে, সবাই একবাক্যে বললে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত, শুধু নারী-বোঝা আর্জেমিসিরা বললে, ‘মহারাজ গ্রীসীয়দের সঙ্গে জলযুদ্ধ করবেন’

নৌ-কৌশলে তারা আমাদের চেয়ে বহুগুণ শ্রেয়, যেমন পুরুষ শক্তিশালী নারীর তুল্য। তা ছাড়া তার প্রয়োজনই বা কি? আপনার প্রধান লক্ষ্য অ্যাথেন্স আপনি দখল করেছেন, গ্রীসের বাকিটা অনারসে আপনার হাতে আসবে। বরং জলে হেরে গেলে আপনার স্থল-সেনাও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার : উৎকৃষ্ট প্রভুস কপালে সাধারণত নিকৃষ্ট সেবক জোটে, আর নিকৃষ্ট প্রভু পায় উৎকৃষ্ট সেবক। আপনার মত প্রভু আর জগতে ছুটি নেই, তাই আপনার এই তথাকথিত সহযোগীরা এত অপদার্থ—এই যারা মিশর, সাইপ্রাস, দিলিশিয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে এসেছে।

এই সব কথা শুনে সভাস্থ সকলে ভাবল নৌ-যুদ্ধে বিরত হতে বলছে বলে রেক্সাস তাকে ভীষণ শাস্তি দেবেন; তার বন্ধুরা দুঃখিত হল, যারা রাজদরবারে তার প্রতিষ্ঠার প্রতীক ঈর্ষণারূপে তারা আনন্দ পেল। আসলে রাজা খুব খুশি হলেন, তার প্রতি তাঁর প্রদ্বা আরও বাড়ল। তবু অধিকাংশের মতামতসারে তিনি যুদ্ধের আদেশ দিলেন। জাহাজগুলি ত্রালামিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে, আলো নেই; পরের দিন আক্রমণের জঙ্গ তারা তৈরি হতে লাগল।

গ্রীসীরা তখন ভয়ে জর্জরিত, বিশেষত পেলপনিসীরা। তারা ত্রালামিসে রয়েছে অ্যাথেন্সের সাহায্যে যুদ্ধ করবে বলে, হারলে এই ঘোপেট আবদ্ধ হয়ে পড়বে, দেশরক্ষার সাহায্য করতে পারবে না। সেই রাত্রেই পারস্তের স্থল-সেনা পেলপনিসিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। অবশ্য কবিছৌহ-বাজকে শত্রুকে আটকাবার জঙ্গ বর্ণণে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, থার্মপিলির পতনের পর পেলপনিসিয়ার সব শহর থেকে সৈন্য গিয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রস্তুতির খবর ত্রালামিসে সবাইকে আরও সচেতন করে তুলেছে পেলপনিসিয়ার বিপদ সংকট, এউরিবিয়াডাসের সিদ্ধান্তের প্রতীক বিরুদ্ধতা আবার জেগে উঠেছে। নতুন করে সভা ডেকে আবার অনেকে বললে ত্রালামিস ত্যাগ করে পেলপনিসিয়ার গিয়ে যুদ্ধ করতে, যদিও অ্যাথেন্স, ইজিনা ও মেগারা আপত্তি করলে।

এই সময়ে আলোচনায় নিজের পরাজয় আসন্ন দেখে থেমিস্তোক্লাস নিঃশব্দে সভা থেকে উঠে এল। তারপর তার কথামত এক ছুত্থা রাজির অঙ্ককারে নৌকা করে পারসীক নৌ-শিবিরে গেল, সেখানে পৌঁছে বলল, 'অ্যাথেনীয় সেনাপতির থেকে আমি এক গোপনবার্তা এনেছি, তিনি আপনারদের রাজার মঙ্গল কামনা করেন, তাঁর জয় হোক এই চান। গ্রীসীরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে, দ্রুত পলায়ন করে গা বাঁচাবার মতলব করছে। আপনারদের হাতের মুঠোর থেকে তারা যেন বেরিয়ে না যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করলে অসামান্য সাফল্যলাভ করবেন। তারা এখন পরস্পরের গলা কাটতে উত্তত, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না, উপরন্তু তারা মনে মনে পারস্তের পক্ষে তারা আপনারদের হয়ে যুদ্ধ করবে।'

খবর পৌঁছে দিয়ে দূত ভাড়াভাড়ি ফিরে গেল। পারসীকরা তার কথা বিশ্বাস করে ত্রালামিস ও উপকূলের মধ্যে এক ছোট ঘোপে বহু সৈন্য নমাবার ব্যবস্থা করলে। তারপর মধ্যরাত্রে সেই সর্কারী জলপ্রণালীর আশেপাশে তাদের জাহাজগুলি এমনভাবে সাজাল

বাতে গ্রীসীরা সেখান থেকে আর বার হতে না পারে। সারারাত তারা কেউ ঘুমাল না, নিঃশব্দে চলল এই কাজ, প্রতিপক্ষ জানতেও পারল না।

গ্রীসীয় সেনাপতিদের মধ্যে তখনও বাক্যযুদ্ধ চলছে, তারা জানল না যে শত্রু তাদের দু'দিকে পথ আটকে কাঁড়িয়ে আছে। সবাই যখন খুব গরম হয়ে উঠেছে তখন ইজিনা খাঁপ থেকে নৌকা করে আরিস্তিডাস নামক এক অ্যাথেনীয় ত্রালামিসে এল এবং সভার বাইরে কাঁড়িয়ে থেমিস্তোক্লাসকে ডেকে পাঠাল। এই দু'জনের মধ্যে তখন গভীর শত্রুতা ছিল, কিন্তু আরিস্তিডাস তা তুলে গিয়েছিল গ্রীসের এই সংকটে। থেমিস্তোক্লাস বাইরে আসা মাত্র সে তাকে বললে, 'এই সময়ে কে দেশের বেশি উপকার করতে পারে তাই নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত। পেলপনিসীরা বর্তমানে ত্রালামিস ছেড়ে যাবার কথা বলুক এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না। নিজের চোখে দেখে এলাম, এখন আর কাবও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই, আমাদের নৌ-বহর সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সভার ফিরে গিয়ে খবরটা শাও।'

'অর্থবর এবং অপরাধমণ,' বললে থেমিস্তোক্লাস, 'বা আমি সবচেয়ে বেশি চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে, শত্রুর এই উদ্ভোগের জন্য আমিই দায়ী। আমাদের লোকেরা যখন বেজায় যুদ্ধ করতে চাইল না তখন তাদের বাধ্য করতে হল। কিন্তু খবরটা তুমিই গিয়ে বল, আমি বললে ভাববে ঝানানো কথা। তোমার বিশ্বাস করে ভাল, না করলেই বা কি—পালাবার পথ তো বন্ধ।'

আরিস্তিডাসের কথাও সেনানায়করা বিশ্বাস করল না, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তখন শত্রুর পক্ষ ত্যাগ করে একটি জাহাজ এসে হাজির হল, তারায় একই খবর দিল। এই জাহাজটি নিয়ে গ্রীসীয় নৌ-বাহিনীর সংখ্যা কাঁড়াল তিনশো আশি।

বাধ্য হয়ে গ্রীসীরা এবার যুদ্ধের জঙ্গ প্রস্তুত হল, ভোরবেলা যোদ্ধাদের একত্র করে থেমিস্তোক্লাস এক বক্তৃতা দিল, মনুষ্য চরিত্রের মহৎ ও হীন অংশের তুলনা করে আসন্ন সংকটে মহত্বের পথ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলে। তারপর সব জাহাজ শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল, পারসীকরাও দেখতে দেখতে তাদের উপর এসে পড়ল, আরম্ভ হল ভীষণ যুদ্ধ। পারসীক নৌ-বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি হল যুদ্ধে, তার কারণ তারা নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী নয়, জাহাজগুলি ঠিকভাবে না সাজিয়ে এলোমেলো আক্রমণ করছিল তারা, আর গ্রীসীরা কাজ করছিল দলবদ্ধভাবে। তবু রেক্সাসের চোখ তাদের উপর আছে জেনে তারা সেদিন ভাঙই যুদ্ধ করেছিল।

আর্টেমিসিয়ার আবেগ বিশেষ কর সম্রাটের প্রশংসা কর্তন করেছিল। যখন পারসীক নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভল তখন তার জাহাজকে ত্যাগ করল এক গ্রীসীয় রণপোতা। সামনে তখন কতগুলি পারসীক জাহাজ, পলায়নের পথ বন্ধ, পিছনে শত্রু, এই অবস্থায় দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আর্টেমিসিয়া নিজেদেরই এক জাহাজ বাঁধা ঘেরে ডুবিয়ে দিল। তা দেখে যে অ্যাথেনীয় জাহাজটি তাকে ত্যাগ করেছিল তার কর্তার আর্টেমিসিয়ার জাহাজটিকে খপকীর বলে তুল করল এবং পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করে অস্ত্র দিকে চলে গেল। তারা যদি জানত যে এই জাহাজ আর্টেমিসিয়ার তা হলে প্রাণপণ চেষ্টা করত তাকে ধরতে; এক গ্রীসীক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে এটা

## বিশ্বের প্রথম মহাকাব্য

অ্যাথেনীয়দের অসহ্য মনে হয়েছিল এবং জাহাজের কর্তাদের বিশেষ আদেশ ছিল তাকে বন্দী করার জন্ত—পুণ্ডরাক প্রায় তির্যাক হাজার টাকা।

যাই হোক, আর্টেমিসিয়া বখন নিজের এক ভ্রাতাজ ভূষির দিল তখন তা স্নেকস্যাঙ্গের চোখে পড়ল, তিনি এক জায়গা থেকে যুদ্ধ দেখছিলেন। পার্শ্ববর্তী একটি লোক তাঁকে বললে, ‘মহাভাজ, দেখেছেন আর্টেমিসিয়া কি অস্বস্তি যুদ্ধ করছে? একটি শত্রু ভ্রাতাজ ভূষিরে গিয়েছে সে।’

সম্রাট নাকি তখন বলেছিলেন, ‘আমার পুত্রবরা দ্রৌলোক বনে গিয়েছে, আর দ্রৌলোকরা হয়েছে পুরুষ।’

আভাজটী যে শত্রুর নয় তা জানবার উপায় ছিল না, কারণ সবাই ভূষে মরেছিল। পারসীকরা সীতার জানত না, তাদের বন্ধু জাহাজের সঙ্গে তারাও জলের নিচে গেল। ক্রমে তাদের বাতিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও ভ্রতরূপ হয়ে পড়ল। যুদ্ধ করে তো সুবিধা করতে পারলই না, সংকীর্ণ জলপথে পালাবারও পথ পেল না। কেউ অ্যাথেনীয়দের হাতে কেউ ইজিনীয়দের হাতে ডুবেল।

### পারস্তের সন্ধি প্রস্তাব

শ্রালামিসের বিপর্যয়ের কয়েকদিন পর পারসীক স্থল-বাহিনী পশ্চাদশরণ আরম্ভ করল, খেসালিতে মার্দোনিয়োসের অধীনে বাছা বাছা কিছু সৈন্য রেখে স্নেকস্যাঙ্গ দেশে ফিরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যারা গেল তারা কেউ মা। পড়ল, কেউ থেকে গেল পথে, বাস-পাতা-বাকল গেয়ে চলতে হল অনেক দিন। নৌ-বহরের বা বেঁচেছিল তাও এশিয়ায় ফিরে গেল।

খেসালির থেকে মার্দোনিয়োস মাসিডোনিয়ার রাজা অ্যালেকজান্ডারকে দিয়ে অ্যাথেন্সকে এক বার্তা পাঠালেন। সেখানে গিয়ে তিনি অ্যাথেন্সকে বললেন, ‘পারস্যরাজ মার্দোনিয়োসকে জানিয়েছেন যে অ্যাথেন্স তার বা ক্ষতি করেছে তা তিনি ভুলে যেতে রাজী আছেন। স্নেকস্যাঙ্গ তাকে আদেশ করেছেন অ্যাথেন্সের ভূমি তাকে ফিরিয়ে দিতে, তা ছাড়া আরও যা ভূমি সে চায়, তা সে পেতে পারে, উপরন্তু স্বাধীনতা অসুস্থ থাকবে তার। অ্যাথেন্স তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলে দক্ষ-মন্দির আবার গড়ে দেওয়া হবে।’

মার্দোনিয়োস জিজ্ঞাসা করছে, ‘তোমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও কেন পাগলের মত? তোমরা কোনও দিন তাঁকে হারতে পারবে না, একদিন তাঁর কাছেই হারবে। গ্রীস আমার হাতে কত বড় বাহিনী আছে তা তো দেখেই পাচ্ছ, সংকীর্ণ হলে এর চেয়ে বহু গুণ বেশি সৈন্য আসবে। সন্ধি কর, করে স্বাধীনতা বাঁচাও।’

মার্দোনিয়োসের উক্তি শেব করে অ্যালেকজান্ডার নিজের হয়েও একই স্তর গাইলেন—স্নেকস্যাঙ্গ অপরাহের, তিনি যে বিশেষ করে তাদেরই এমন উদার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং বন্ধু হতে চান এমন তা অ্যাথেন্সের পক্ষে পরম ভাগ্য। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাদের বেশে চিরদিন যুদ্ধ লেগে থাকবে, ইত্যাদি।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অ্যালেকজান্ডার অ্যাথেন্সে গিয়েছেন জনে স্পার্টা। ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে দূত পাঠাল। অ্যালেকজান্ডারের ভাবণ শেব হলে তারা বললে, ‘আপনার

পারস্তের এই অপমানকর প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না, আপনারা পক্ষে তা অত্যন্ত অজ্ঞায় হবে, কারণ আপনারাই এই যুদ্ধ শুরু করেছেন, তখন আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করেন না। এখন সেই যুদ্ধে সমস্ত গ্রীস জড়িয়ে পড়েছে।’

মার্দোনিয়োসের প্রস্তাব অ্যালেকজান্ডার খুব মিষ্টি করে বলেছেন, ‘তারা দু’জন একই দলের লোক। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে বিদেশীর মধ্যে সত্য বা আশ্বাসমান পাওয়া যায় না।’

অ্যাথেনীয়রা অ্যালেকজান্ডারকে বললে, ‘পারস্তের বল যে আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি তা আমরা জানি, সেটা আপনার অন্ত করে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা আমাদের এতই প্রিয় যে, যে করে হোক তা আমরা রক্ষা করব। পারস্তের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করতে বলা বুঝা, তাতে আমরা কোনওদিন রাজী হব না। মার্দোনিয়োসকে গিয়ে বলুন যে যতদিন আকাশে সূর্য আছে আমরা স্নেকস্যাঙ্গের সঙ্গে সন্ধি করবই না, অবিরত যুদ্ধ করে যাব—যে সব দেবতা এবং বীরের মন্দির ও মূর্তি তিনি আগুনে পুড়িয়েছেন তাইই আমাদের সহায়। আর কখনও আমাদের উপকার করছেন ভেবে এমন প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না।’

তারপর স্পার্টার দূতদের তারা বললে, ‘আমরা সন্ধি করব এমন আশঙ্কা করা অ্যাসেডিমোনিয়াদের পক্ষে হয় তো স্বাভাবিক, কিন্তু এতে আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। পৃথিবীর সব সোনা, সবচেয়ে মনোরম ও সমৃদ্ধ দেশও যদি আমাদের হেঁরা হয় তবু আমরা সৈন্যদের শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়ে গ্রীসকে শূন্যলিত করব না। এমন ইচ্ছা থাকলেও তা আমরা করতে পারি না, তার প্রধান কারণ তারা আমাদের মন্দির, মূর্তি পুড়িয়েছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে। তা ছাড়া আমরা ভাবতে শিখেছি সমগ্র গ্রীসীয় জাতির কথা—এক রক্ত, এক ভাষা, মন্দির, বনামূর্তি, জীবনধারণের সূত্রে বাঁধা যে জাতি। সুতরাং বর্তদিন একজন অ্যাথেনীয়ও বেঁচে আছে ততদিন আমরা স্নেকস্যাঙ্গের সঙ্গে সন্ধি করব না।’

অ্যাথেন্সের হয়ে আব্রগণ্য কথ্য হেরোডোটাস এর আসেও বলেছেন, এই ইতিহাসে তা দেখা গিয়েছে।

অ্যাথেনীয়দের জবাব পেয়ে মার্দোনিয়োস অ্যাথেন্স আক্রমণ করল এবং দ্বিতীয়বার ধ্বংস হল এই শহর। কিন্তু পরে প্র্যাটিয়ার যুদ্ধে পারসীক বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল এবং মার্দোনিয়োস নিজে মারা পড়ল। সেই দিনই এশিয়ার পশ্চিম উপকূলে মিকালে নামক জায়গায় আর এক যুদ্ধে গ্রীসীরা শত্রু-বাহিনীকে হারাল এবং যে ক’টি জাহাজ তাদের ছিল তাও পুড়িয়ে দিল।

### স্নেকস্যাঙ্গের প্রণয়

শ্রালামিসে পরাজয়ের পর হাজার কোটির পথে স্নেকস্যাঙ্গ কিছুদিন সাড়িসে ছিলেন, তখন তিনি নিজের ভাই মাসিস্তাসের দ্বার প্রেমে পড়লেন! তাকে নানারকম বার্তা পাঠিয়ে কোনও ফল হল না, ভাইয়ের প্রতি প্রত্যাশিত স্নেকস্যাঙ্গ জোরজবাব দিলেন না। বলপ্রয়োগে তিনি সাহস পাবেন না কেনেই মহিলাটিও তাঁকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করার মত জোর পেয়েছিল। স্নেকস্যাঙ্গ তখন এ সব পথ ত্যাগ করে মাসিস্তাসের মেয়ে আর্জাইস্তার সঙ্গে নিজের ছেলে দারাইোসের বিয়ে

ঠিক করলেন, তাঁর ধারণা ছিল যে এর ফলে আকাঙ্ক্ষিতাকে সহজে পাওয়া যাবে। এর পরে তিনি স্তম্ভভাৱে ফিরে গেলেন।

সেখানে পুত্রস্বপ্ন বধন তাঁর প্রাণে এল তখন মাকে ভুলে তিনি মেরের প্রতি অমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। এইবার তাঁর প্রেম সফল হল, কিন্তু কালক্রমে এই গোপন প্রণয় প্রকাশ হয়ে পড়ল এইভাবে। রাণী আর্মেন্ডিস নিজের হাতে বুনো স্বামীকে নানা রঙের সূন্দর এক লম্বা জামা উপহার দিয়েছিলেন। খুব খুশি হয়ে সেটি পরে স্নেক্সাস আর্ভাইন্ডার কাছে গেলেন, কিন্তু যেহেতু সেও তাঁর খুশির আর একটি কারণ সেহেতু তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে সে বা চাইবে তাই পাবে। আর্ভাইন্ডা ও তার পরিবারের কপালে নিশ্চয় সর্বনাশ লেখা ছিল, তাই সে জামাটি চেয়ে বসল। রাণীর ভয়ে স্নেক্সাস প্রাণপণ চেষ্টা করলেন—জামা না দিয়ে কোনও গতিকে দায়মুক্ত হতে; আর্মেন্ডিস ইতিমধ্যেই সন্দেহ করেছেন, জামা মিলে আশ সন্দেহ থাকবে না। তিনি আর্ভাইন্ডাকে অসুস্থ সোনা, নানা সূন্দর শতর মিতে চাইলেন, বললেন, ইচ্ছা করলে সমগ্র এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হতে পারে সে। আর্ভাইন্ডা কোনও কথা শুনলো না, জামাটি আদায় করে মহানন্দে তা পরতে লাগল।

রাণী অবশ্য অবিলম্বে সব জানলেন, কিন্তু তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল আর্ভাইন্ডার মেরের উপর। সেই তাঁর সব বর্ণনার কারণ মনে করে তিনি তার সর্বনাশের কথা ভাবতে লাগলেন।

রাজার জন্মদিন-উৎসবে প্রতি বছর তিনি অক্লান্ত ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজা নিজের মাথা ধুয়ে পানসীকদের উপহার বিতরণ করেন, যে বা চায় তাকে তাই দেওয়া তাঁর অমুগ্ধ কর্তব্য। খাবার সময় বধন এল তখন রাণী উপহার চাইলেন মাসিন্ড্যাস-পত্নীকে। এই দাবীর স্বর্ধ বৃত্তে পেরে স্নেক্সাস সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে পড়লেন, ডাইয়ের দ্বীপে এভাবে দান করার চিন্তা তাঁর কাছে খুব খারাপ লাগল, বিশেষ করে তিনি বধন জানতেন সে নির্দোষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হল।

তখন তিনি মাসিন্ড্যাসকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি আমার

সহোদর তা ছাড়া লোক ভাল। আমি বলি তুমি দ্বীপে ত্যাগ কর, আমি চাই না তুমি তার সঙ্গে বাস কর। পরিবর্তে আমার মেরেকে দিচ্ছি, তাকে বিয়ে কর।'

মাসিন্ড্যাস অবাক হয়ে বললে, 'এ অতি আশ্চর্য প্রস্তাব। বাক্যে ত্যাগ করতে বলছেন তার ছেলেকে—তা ছাড়া এমন দ্বীপ কারও হয় না। এখন হঠাৎ একে ত্যাগ করে আপনার মেরেকে বিয়ে করব। না মহারাজ, আমাকে রাজকন্ডার যোগ্য মনে করেছেন বলে আমি অতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু এমন কাজ আমি করতে পারব না। নিজের দ্বীপে সঙ্গে আমাকে শাস্তিতে বস করতে দিন। রাজকন্ডার ভক্ত আমার তুল্য লোক আপনি আরও পাবেন।'

স্নেক্সাস রেগে বললেন, 'বেশ, আমি তোমার হাতে রাজকন্ডাকে দেব না—তবে দ্বীপে সঙ্গে তুমি আর একদিনও থাকবে না। উপহার প্রস্তাৱাধানের উচিত শিক্ষা তুমি পাবে।'

'মহারাজ, আমার প্রাণটা এখনও আছে, তা আপনি এ পর্যন্ত নেন নি', এই বলে মাসিন্ড্যাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই দু'জনের মধ্যে বধন কথা হচ্ছে তখন এমিকে আর্মেন্ডিস প্রহরী পাঠিয়ে মাসিন্ড্যাসের দ্বীপে ধরে আনলেন। তাঁর আদেশে প্রথমে তার স্তন, নাক, কান ও হাঁট কেটে কুকুরদের দেওয়া হল, তারপর জিভ ছিঁড়ে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাকে ঘর পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্নেক্সাসের সঙ্গে কথার পর বিত্তী আশঙ্কা নিয়ে মাসিন্ড্যাস তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরল; দ্বীপে সাংঘাতিক চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ তার ছেলেকে সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল যে তারা এবং আরও কয়েকজন বন্ধু মিলে বাকুট্রায় যাবে, সেখানে বিস্ত্রোহ-ঝালিয়ে তুলে রাজার বিশেষ ক্ষতি করবে। মাসিন্ড্যাস ছিল সেই প্রদেশের রাজ্যপাল, সেখানে সবাই তাকে খুব ভালবাসত; এই উদ্দেশ্যে নিশ্চয় সে সফল হত, কিন্তু স্নেক্সাস তার মতলব জানতে পেরে পিছনে ফৌজ পাঠালেন, তারা রাজ্যের তাদের ঘরে ফেলে প্রত্যেককে হত্যা করল।

সমাপ্ত

## বিশেষ বর্ষাদিনকে

চিন্তা চিন্তা

গোটা দিনটাই সেদিন

মাঠে মারা গেলো,

সে শুধু তোমার জন্তে—তোমার জন্তে।

সকালের সগে সগে সেই যে

বরষার বরষার বরষতে থাকলো

তোমার পাগলা-বোরা,

দিনভোর আর তার বিন্দুর বিবর্তি

ঝেঁঝেতে পারলো না।

কি জানি কি সাধ সেদিন জেগেছিলো,

তার মনে—তার প্রাণে।

এদিকে এ্যাক্সা যে গো-বেচারা গোছের

প্রাণ প্রত্যেকের রকমফের

হয়রানির অন্ত থাকলো না,

সে যেন জেনেও জানে না।

এ' কিন্তু তার উচিত হয় নি,

সে তুমি বাই বলো না।



# এক কলেজের চারটি মেয়ে

(পরিচিষ্টের শেখাংশ)

রাণু ভোমিক (দাস)

—আজ আমি ওকে হত্যা করেছি, ঠিক সেই সময়ে অন্ধকার বাড়ির কাণের একটি ঘরে অনুজ্ঞাস আলো খোলে প্রিয়া চ্যাটার্জী লিখছিলেন—আজ আমি ওকে হত্যা করতে পেরেছি। এতদিন চেষ্টার ফলে ও আজ শাস্ত হয়েচে—আমার পাশেই ও পড়ে আছে—আমার প্রেম।

কেন ও এলো আমার জীবনে। আহবান তো কখনও জানাই নি—বারবার প্রতিবেশ করেছি—তবু ও এলো। তাড়িয়ে দিলাম—চলে গেল না—পালিয়ে এলাম—ও গলো পেছনে পেছনে। কেন ও বুঝতে পারে না ভালোবাসা আমার জন্ত নয়। স্ত্র ও অস্ত্র হ'ল মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিল—কিন্তু ঐশ্বর্যের, সৌন্দর্যের, কল্যাণের অমৃতের ভাগ কস্তুর পায় নি। আমি সেই অস্ত্রের দলের। আমার জন্ত এ পৃথিবীর কিছুই নেই।

বারবার বলেছি, প্রেম আমার জন্ত নয়। ও শুনলো না। ভগীরথের তপস্যা ওর। আমাকে প্রেম-মন্ডাকিনীতে সিক্ত করবেই করবে।

বললাম, প্রেম ঘৃণা করি। ও বিশ্বাস করে না। ও ভাবতেই পারে না কেউ প্রেম ঘৃণা করতে পারে। পারিজাত কি চেনে পাঁক?

আলোর দেশের লোক ও। সেখানে অন্ধকারের ছায়া নেই। বাবা, মা, ভাই, বোন সুখী পরিবার। বাড়ির আদরের বড় ছেলে। অনেকগুলি ছোট ভোঁটে ভাইবোনের ভালোবাসার দাদা। মি ডি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিড়লে পড়ে গেল, সামান্য আঘাত—কিন্তু সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন—হাসপাতালে নিয়ে এসেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল বাইরে থেকে যতটা সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ নয়। পায়ের হাড় সরে গেছে।

—বেশ কিছুদিন চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। এই হলো হাসপাতালের নির্দেশ।

ওর বাবা বললেন, তা'হলে এখানেই থাক।

জ্বর চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। দীর্ঘকাল,

প্রশস্ত বুক, রু তামাটে—হাসিমুখি—সদানন্দময়। সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ঠর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হাসতে হাসতে উনি বলেন, জ্যোতি এখানেই থাক। বা চমৎকার ব্যবস্থা! আমার নিজেরই মনে হচ্ছে পা ভেঙ্গে শুয়ে পড়ি।

ওর মা সঙ্গে এসেছিলেন। মাতৃহর স্নিগ্ধতার ভরা দেহ—যেখানে সৌন্দর্যের প্রাণ অবাস্তব। আশঙ্কার মুখখানি একটু স্নান। ঠকে দেখে আমার মনে হয়েছিল—আর একটা দূষিত দুর্গন্ধ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

—কি যে বল। স্বামীকে মৃত্ত্ব ধমক দেন উনি।

বিছনীতে লাল ফুল-বাধা কিশোরী ছোট বোনটি দাদার গা বেঁসে বসে কি যেন বলে কিসকিসিয়ে আর মিটিমিটি হাসতে থাকে।

সব মিলিয়ে একটা ছবি। স্বর্গের ছবি। সে ছবি দেখার অধিকারও আমার নেই। আমি পালিয়ে বাই।

ধবধবে সাবা বিছানার সাদা, পাতলা পাঞ্জাবী পরে শুয়ে থাকতো জ্যোতির্ধর রায়। হাসপাতালের অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন পরিজন প্রীতিতে ঘেরা এই ঘরটির চেতনাই যেন বদলে গেল। জমাদার থেকে শুরু করে সিভিল-সার্জন সবাই হাসিমুখে ঘরে ঢোকে, প্রীতমুখে ঘর ছাড়ে। আর নার্সদের তো কথাই নেই। রীতিমতো রেবারেবি।

শুধু একমাত্র আমি পরিত্যক্ত। আমি জানি অসুস্থের অধিকার আমার নেই—তাই সেদিকে তাকাই না আমি। এটুকু আত্মসম্মান বোধ ছিল আমার।

ওখানে আমি চাকরি করি। আমার ডিউটি আছে। রোজ একবার ঢুকি।

সেদিন টেবিলে রাখা চাটটা দেখছিলাম। হঠাৎ ও ডাকলো, ডাঃ চ্যাটার্জী।

ভাষা ইংরাজী—স্বর বাংলা। আমি সেই স্বর সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলাম। গভীর পেশাগতকণ্ঠে বললাম, ইডেন্স!

ও বোধ হয় একটু থমকে গেল—চমকে গেল। জানি না।

তাকাই নি ওর দিকে। এমন কি, কেন ডেকেছিল—সে প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি নি।

ও চলে গেল ভালো হয়ে। শুনেছিলাম হাসপাতালের সবাই নাকি ওকে বিশ্রাম-সুতির ফুল দিচ্ছে। শুধু আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। সেদিন ডিউটি ছিল না আমার।

কয়েকদিন পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখতে পেলাম উষ্টোদিকের রাস্তার ও দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। কিন্তু ঠিক তখনই একটা বাস পেয়ে উঠে পড়লাম। বাস থেকে দেখতে পেলাম রাস্তার যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে অবাধ হয়ে আপনভোলা মতো ও তাকিয়ে আছে। ছুঁ চোখে অপার বেদনা ও বিষম।

পরদিন বেরিয়ে বাসফুপে যেতেই ও এগিয়ে এলো। আজ এদিকের রাস্তাতেই ছিল। হাসিমুখে বলে, নমস্কার।

—নমস্কার! অল্পদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিই।

—আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। একটু সময় হবে।

—না।

—কেন? হাসিমুখে ও প্রশ্ন করে।

জু চুচক ওর দিকে তাকিয়ে বলতে বাঙ্কিলাম, সে কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হবে। তাকালাম—ট্রাম, বাস, গাড়ির শব্দ, ভিড়, নোয়ারামির পরিপ্রেক্ষিতে ওর সেই অমুগ্ধ মুখের দিকে একবার তাকালাম—ব্যস। সব শেষ।

হাসপাতাল থেকে ইউনে গার্ডেনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ। কিন্তু কত শতবার গিয়েছি আমার। অনেক ‘অন-কন’র পৃথিবীর শেষ প্রান্ত।

সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। এ কি? কোথায় বাঙ্কি আমি। চাদের দিকে তাকিয়ে আছি বলেই বোধ হয় ও বলে, ঐ চাদ তো কিছুই নয় পৃথিবীর একটা টুকরো অংশ—ওখানে মরা নদী আর মরা পাহাড়। তবু আমরা ওকে কত স্মরণ ভেবে নিরেছি।

—তাতে কোন লাভ হয় নি—তার নয়—আমাদেরও নয়।

—সেই কল্পনার পৃথিবী স্মরণের হয়েছিল।

হঠাৎ রাগ হয়ে যায়। বোধ হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি বলেই রাগ হয়। গীতে গীত চেপে বলি, চাদের দিকে তাকিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ কারো অপরাধ ক্ষমা করেছে!

উঠে এলাম। প্রচণ্ড রাগ হলো ওর ওপরে। এ কি ছাফা পৃথিবীর সঙ্গে ও আমার পরিচয় করাতে চাইছে। থাকুক ও ওর অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে। যখন রুচ আঘাতে স্বপ্ন ভাঙবে তখন ও জাগবে। কিন্তু আমি জেগেছি। জেগে ঘুমোবার কোন মানে হয় না।

শুধু নেকামীভরা নয়—মিথ্যা একটা পৃথিবী। ও কি কখনও আমাকে ভালোবাসতে পারে? পৃথিবীর সংবৃদ্ধ মিথ্যা।

—কেন তুমি আমাকে ভালোবাস! বলেছিলাম একদিন, মাছুষ মাছুষকে যেমন ভালোবাসে তার কিছুই নেই আমার। রূপ নেই, গুণ নেই, অর্থ নেই।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—আমাকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ শব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল।

বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আমি জারজা: আমি পৃথিবীর একটু অবাস্তব সৃষ্টি যে মুহূর্ত ডালি থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

—একটা জানা গল্প শুকে বললাম, বামন এসেছিল রাজসভায়। যেমনি কুংসিত রূপ ততোধিক কুংসিত অঙ্গভঙ্গী। ফুলের মতো সুন্দরী রাজকুমারী হেসে গাড়িয়ে পড়ে—আর বামন ভাবে রাজকুমারী ওর প্রেমে পড়েছে। সে আরও নানাবকম ভঙ্গী করতে থাকে। সভা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বামনের মনে শাস্তি নেই—সে রাজকুমারীকে খুঁজছে। হঠাৎ সামনের আরনার একটা ছায়া—কি এ কুংসিত বামন? কেন ও এলো এই সৌন্দর্যের প্রাসাদে। কোবে আশ্চর্য্য হয়ে বামন ওকে হত্যা করতে যায়—কখনই সে নিজেকে চিনতে পারে—আর বুঝতে পারে রাজকুমারী তাকে—

—গল্পটা আমি পড়েছি, ও হাসিমুখে বলে, এগারসনের লেখা। অপূর্ণ গল্পটি।

—বামন অনেক দেরিতে নিজের মুখ দেখেছিল, কিন্তু আমি আমার মুখ অনেক আগেই দেখেছি, আমি বলি।

সেদিনই আমি কলকাতা ছাড়লাম। ওর সঙ্গে দেখা হোক তা আমি চাই না। কি উদ্দেশ্যে ও আমাকে একটি আবিষ্কার ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাইছে তা জানি না—কিন্তু কথাটা যে আবিষ্কার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাঝের বীভৎস মুহূর্তদুটো কি আমি কখনও ভুলতে পারি? সেই সাদা শাড়ি, সাদা ব্রাউজ পরনে—আমার স্তাচাস্তা মা। কে তাকে টেনে নামালো রাজ্যের পঙ্কিলতায়। তারপর বীরে বীরে রাজ্য টেকে ফেলে দিনকে—গোপন জীবনের পাশ প্রকান্তে সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে শেষ করে দেয়।

ছোট গ্রামের ছোট সেই মেয়েটি। ছোট ছোট চুল দুগিয়ে সে ঘুরে বেড়াতো—হাসের খেলা দেখতো জলে পা ডুবিয়ে বসে। আরও পাঁচটি গরীব মেয়ের মতো পরিশ্রম করে কালো-কালো রং আর দুর্ভিক্ষ স্বাস্থ্য নিয়ে সে একদিন ঘোঁরনে পা দিল।

বয়ের বয়স হলো—বয়েসও হয়ে গেল। রোগজীর্ণ, প্রায় বৃদ্ধ একটি লোকের সঙ্গে বিয়ে হলো তার। ভাগ্য থাকলে পাকা চলে সিঁহুর পড়বে! আশীর্বাদ করতেন বয়সসীরা, কিন্তু নিশ্চিত বৃত্ত্যপশ-যাত্রীকে মুহূর্ত দুহার থেকে ফিরিয়ে আনবার মতো ভাগ্য তার ছিল না—কাজেই কুড়ি বৎসর বয়সে সে বিধবা হোল।

তারপরে সে একজনকে ভালোবাসা পেল—একজনকে ভালোবাসলো।

আমি সেই মেয়েটিকে দোষ দিই না। পাপের শাস্ত, স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়া ফিরাফাসিয়ে বলে, আমি সেই মেয়েটিকে দোষ দিই না। আশুনে-পোড়া মন না হলে কেউ প্রেমকে প্রতিক্রিয়া করতে পারে না।

সেই ছোট মেয়েটি—গ্রাম্য মেয়েটি—অশিক্ষিতা মেয়েটির মন তো কাঁচা মাটি। সে সত্য সত্যই ভালোবেসেছিল সেই লোকটিকে আর নাম আমি জানি না।

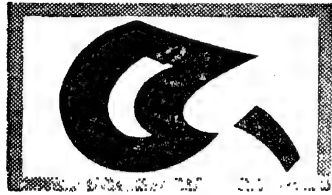
মেয়েটি সত্য সত্যই ভালোবেসেছিল ছেলেটিকে—দেহের প্রতি শিরাস-উপাধার—ফুলের মতো নিবেদিত করেছিল নিজেকে—

নইলে—

খুবই সহজ !

# আপনার

# মার



# টাকায়

গ্যাসনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ-এ  
একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট  
খুলতে পারেন



ব্যাঙ্ক চার্জ লাগেনা—  
বরং বছরে ৩% হিসেবে  
সুদ পাওয়া যায়

আজই আপনার নিকটবর্তী শাখায় দেখা করুন :

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(যুক্তরাজ্যে সীমিতবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত)

NGB/618 BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১২, নেতাজী রুডার রোড ; ২২, নেতাজী রুডার রোড, (লেয়েডস ব্রাঞ্চ) ; ৩১, চৌরঙ্গী রোড ; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লেয়েডস ব্রাঞ্চ) ; ৬, চার্চ লেন ; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড ; ১বি, কনভেন্ট রোড, ইকালী ; ১৭এস/এ, নলিনী রঞ্জন এডিনিউ, নিউ আলিপুর (সেক ডিপোজিট লক্কার) ; ১৬৩, রাসবিহারী এডিনিউ, বালিগঞ্জ ; ১৩৯সি, বিধান সরণী, ডামবাঙ্গার।

কাগজে অনেককণ মুখ চেপে পড়ে থাকে প্রিয়া। তারপরে লেখে, নইলে সে সেই পরিণতিকে ভালোবাসতে পারতো না।

জানতে ইচ্ছে হয় যখন সেই মেয়েটি উপলব্ধি করলো, প্রেমের ফুল ফল হয়ে উঠেছে তখন সে কি ভেবেছিল? সে কি আশা, আশঙ্কা-ভরা দুঃ-দুঃ-বন্ধে ছুটে গিয়েছিল প্রেমিকের কাছে। সে কি কিংরে এসেছিল অপমানিতা হয়ে?

সভ্যতার প্রথম স্তরের নারী সন্তান বহন করেছে, সে পেয়েছে স্বর্গাদপি গরীমসীর সম্মান—সে হয়েছে জননা আর আজ সেই সন্তান বহনের অপরূপে তাকে পতিত বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করতে হয়। একবার ভেবে দেখ, একটি গ্রাম্য, নির্বোধ, বিধবা মেয়ের দেহপোজীবিনী হওয়ার পেছনে কত যন্ত্রাণ, কত লাঞ্ছনা, কত অপমানের ইতিহাস গুপ্ত আছে।

তবুও সেই মেয়েটি দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভাগ্য সন্তানকে ভালোবাসতো। সংসারের সমস্ত বিষ নিজে নিয়ে সন্তানের জন্ম সঞ্চিত রেখেছিল অমৃত। ভালোবেসেছিল বলেই ভালোবাসার এই সন্তানকে প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, সমাজের অত্যাচার সম্বন্ধে ভালোবাসার বৃত্তবরা তাকে ঘিরে রেখেছিল। রাজির যন্ত্রাণ যখন এসে তার দিনকে ঢেকে দিয়েছিল তখনও সে দীপ্তে দীপ্ত চেপে সহ্য করেছে—

না, মাকে আমি দোষ দিই না। তার মতো স্নেহপ্রাণ, তরুণ মনের পক্ষে ভালোবাসা অপরাধ নয়। না, তাঁকে আমি দোষ দিই না। আর তাঁকে দোষ দিই বলেই যাদের জন্তে তাঁকে সেই কুংসিত মৃত্যুধারণ করতে হলো—তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

আমাকে মা 'মামুয়' করতে চেয়েছিলেন, মামুয়ই আমি হয়েছিলাম—মেয়েমামুয় হই নি। মার মৃত্যুসময়ে আমি কলেজের ছাত্রী। ওর মৃত্যুর পরে কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠলো। এক বিশী দুর্গন্ধ, যন্ত্রাণ আর চাঁৎকার স্তন্যেতে পেতাম।

—বিনুদি', চল এখানে থেকে চলে যাই।

—তাই চল। বিনুদি' চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে।

কিন্তু পরক্ষণেই চংকে উঠে বলে, তোর নেক পড়?

—ছেড়ে দব।

—না, না। আঁতকে গুঠে বিনু। তোর মা...

অনেককণ চুপ করে থাকি। যে নারী আমাকে রক্তবসে গড়ে তুলেছে—বকের স্নেহ পানন করেছে—তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। অসম্ভব ইচ্ছা হচ্ছিল জানবার—তবু চুপ করে থাকি।

কিন্তু, বিনুদি' নিজের মনেই বলতে থাকে, ওকে তো আমি এইটুকু বরদা থেকে জানি—পিতামির নোক বলতো। হাঁদা—আমাল কথা এই যে, এখানকার নোকগুলোই খারাপ—কেউ যদি ভালোমামুয় হলো, আমরা তাকে বলব—হাঁদা।

বিনুদি'র মতো এরকম খাঁটি কথা কেউ বলতে পারে নি। বিনুদি' আরও বলেছিল, বিধবা হয়ে গেলো, কত নিঃশব্দ করত, পূজা—টুকু মেয়ে—আমরা তাকজব বান যাই। ও মা, কিসের মধ্যে কি—এক রাজিরে আমার কাছে এসে—আমাকে তুই হুকিয়ে কলকাতা নিয়ে যেতে পারিস।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, বোঝাকার কি ঠিক নেই শুধু শুধু কলকাতায় যেতে চায় কেন?

—দরকার আছে।

মান 'সলো' হোল। দোর বন্ধ করে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, কলকাতায় কে থাকে?

ও উত্তর দেয় না। এতক্ষণে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। হাঁ, ঠিকই।

—সকোনামশট বাধিয়ে বসেছি—যাক, সেজ্ঞা তোকে কলকাতায় যেতে হবে না। আমিই পারব।

—না। না।

ওকে তো বড় ভালবাসতুম তাই আবার বললাম, তাক, তোর কাছে তো লুকোন নেই—আমি এই করি। তোদের ডাক্তার-মাক্তারের চেয়ে অনেক ভালো ডয়ু আছে আমার।

তা ও বলে, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি তোমাকে কে বললে?

—অবে কোথায় যাচ্চিস? তাকজব বনে গিয়ে বলি, এই কাঁটাটা বয়ে নিয়ে কি তুই বেড়াতে যাচ্চিস।

—না। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। কালোমুখ আর দেখাবো না—তাই যাচ্ছি। বিনুদি', তুমি যা ভাবছ তা আমি করব না। সেটা মহাপাপ। বিধবা হয়ে ভালোবেসে এক পাশ করছি আবার নতুন করে পাশ টানব না।

প্রিয়া কাগজে বুক পেড়ে দ্রুত লিখতে থাকে, বিনুদি'র কথা থেকে এক নতুন আলোকপাত হলো আমার জীবনে। তা'হলে, আমার অস্তিত্বের মূলে স্নেহ নয়—ভয়ময়।

এই ভালো। এই ভালো। মোহের অন্ধকার ভাঙতে হবে। কোন মোহ? আমার প্রয়োজন নেই—রূপের মোহ, ধনের মোহ, স্নেহের মোহ, ভালোবাসার মোহ।

সেই মোহযুক্ত মন নিয়ে গিয়েছিলাম রামরাজপুর। জীবনের সোনালী কটা দিন—মুহুর্ত, প্রাণিমা, পাপড়ি। পাপড়িকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। এই পৃথিবীর বৃকে ঠাঁড়িয়ে কি করে কোন মেয়ে অমরভাবে হাসতে পারে? ভাবতে গেলে অবিশ্রান্ত কিন্তু সেই প্রাণবন্ত হাসির দিকে তাকিয়ে বেউ আশ্বাস করতে পারবে না। ঘটবে কিছু একটা ঘটবে—যাতে ওর হাসি মুছে যাবে।

কদিন পরেই ঘটনাটা ঘটলো। বিচিত্র এই পৃথিবী—বিচিত্র তার ব্যবস্থা। সহশিক্ষা কলেজ—ঘখচ মেয়েদের সামনে কাঁটার মতো একটা বেড়া। পাপড়ির হাসি নষ্ট করবার জন্ত ওকে টেনে নিয়ে ওড়িকে বসলাম—যার ফলে আমাকে কলেজ ছাড়তে হোল।

মুড় হাসলাম। এই তো ঠিক। কলকাতায় ফির এসে কলেজে ভর্তি হলাম। আমাকে 'মামুয়' হতে হবে 'মেয়েমামুয়' নয়—অনেক মামুয়কে শাস্তি দিতে হবে। বিনুদি'র মৃত্যুর পরে হোস্টেলে চলে গেলাম।

বেশ ছিলাম। ডাক্তারীতে নাম ছিল। হয়তো এভাবে জীবন কেটে যেতো। কিন্তু...

ঠাণ্ডা উঠে ঠাঁড়ায় প্রিয়া। ঠাণ্ডা দেহটি ছ'হাতে স্পর্শ করে বলে, আজ আমি স্বীকার করছি—তোমাকে ভালোবেসেছিলাম—সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। তাই তুমি অত অসহ্য হয়ে উঠেছিলে। তোমার জন্মই আমি কলকাতা ছেড়ে পাগিয়ে এলাম। এখানে এসে পেলাম শশাঙ্ককে। এই একটি অদ্ভুত ছেলে। আরও একটু কল্পনা বা



## এক কলোজের চারটি মেয়ে

স্বজনীপ্রতিভা থাকলে ও বোধ হয় লেখক হতে পারতেন—কিন্তু তা না থাকায় হয়েছে একটি সেটিমেটাল ফুল।

প্রথম দিনই কি রকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। অংশ ওয়া পাড়ার লোক। শহর মেয়ে—বিশেষত শহুরে ডাক্তার মেয়ে—এবং আমার মতো এই রকম বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্ট চেহারা দেখবার অভ্যাস নেই।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, দিন দিন ওর 'হাঁ' বড় হতে থাকবে কিন্তু ও কখনও কোন কথা প্রকাশ করবে না। এরা হচ্ছে 'সেটিমেটাল ফুল'।

তাই নিশ্চিত মনে সেদিন বললাম, আজ একটা মেয়ে আসবে বলেছে, এলে ওপরে পাঠিয়ে দিও।

প্রথমবারে ও কিছু বলে না—কিন্তু দ্বিতীয় কেসটায় মেয়েটাকে না পাঠিয়ে নিজেই উঠে আসে।

—কি, প্রশ্ন করি।

—মেয়েটা এসেছে।

—বেশ তো, ওপরে পাঠিয়ে দাও।

—কেন ?

এবারে আমি ওর দিকে তাকাই। আমার চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয়। সেটিমেটাল ফুল। খুব আন্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলি, ওপরে পাঠিয়ে দাও।

তৃতীয়বারে শশাক্ষ আবার ওপরে এলো। ওর মুখটা বক্তৃতা। ঠাঁতে ঠাঁত চেপে আছে—এসব কি হচ্ছে ? দমবন্ধ গলায় ও বলে।

আমি ওর চাখের দিকে তাকাই। ও চোখ নামিয়ে নেয়—সরে যায় না। ওর সমস্ত শরীরটাই যেন সাপা হয়ে গেছে। কতটা মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হলে তবে মানুষ এতটা মরিয়া হতে পারে—

মনে মনে বলি, শশাক্ষ, অজানার যন্ত্রণায় তুমি উৎপীড়িত হচ্ছে কিন্তু জানতে পারলেই কি তুমি সুখী হবে ?

প্রকাশ্যে বলি, কি বিষয়ে তুমি জানতে চাইছ ?

চুপ করে থাকে।

—জানতে চাইছ, সেই বিষয়ে যে বিষয়ে তুমি জান।

—যা জানি তা কি সত্য ! ও এমনভাবে কথা বলে যেন ও মরে গেছে। ওর প্রোত্সাহ্য কথা বলছে।

—হ্যাঁ, সত্য।

তবুও ও ঠাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তপূর্ণ কণ্ঠে বলি, ঠাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যা জানবার তা তো জানা হয়ে গেছে। তখনো বুঝতে পারি নি যে ওর সরে যাবার শক্তি নেই। তাকিয়ে বুঝতে পেরে ওকে একটা ইঞ্জেকশন দিই। কিছুক্ষণের জন্ত ওর মন অসাড় হয়ে গেল—যে মন দেহের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল।

ও চলে যাচ্ছিল। আমিই ওকে ফেরালাম—সকোচের আবরণ মুক্ত করতে হবে।

—একবার যখন উঁকি দিয়েছ তখন সবটাই দেখ, আমি বলি।

ও অবাক চোখে তাকায়। সেটিমেটাল ফুল। নগ্নজগতকে জানতে ওদের এত ভয়, অথচ কৌতূহলেরও সীমা নেই।

—এখানে বস। কোণের একটি চেয়ারে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলি।

—চুপ করে বসে দেখ, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ইতিহাস—তোমাদের স্বর্গ, মর্ত্য, নরকের ছবি।

মেয়েটি ওপরে এল।

—তোমার কি নাম ?

—সন্ধ্যা।

—কি করো ?

—বাড়িতে থাকি চুপচাপ। স্থল ফাইন্ডাল দিয়েছিলাম তিনবার, পাশ করতে পারি নি।

—বাড়িতে কে আছে।

—সবাই।


—তা হলে কি করে এমন হলো।

মেয়েটি মুখ নীচু করে। ওর ফর্সা মুখটা লাল টকটকে। লজ্জায় ওর 'সব' বক্তৃকাবিকা যেন চামড়া ভেদ করে বের হতে চায়।

কিন্তু, আমি নির্মম। আমি প্যাষণ। আমি নিবিকার।

—বল।

—এই আর কি...



ডার্ম ও কাক্সিও

# দুলালের

# তালমিছুরী

—কি ?

—পানের মাস্টারমশাই...

—বুঝি :

হাটখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাঁও গো আমার হাতে ।

ধরব তাকে, ভরব তাকে রাখব তাকে সাথে ।

একলা পথের বাত্মা আমার করবে। রুমবীর ।

তা কি হলো ? স্পর্শপথের চাপে একলা পথের বাত্মা যে ভারী বোঝা হয়ে উঠলো ।

মেয়েটি নীরব । কিই-বা বলবে । আমার কাছে ও অমুগ্ধ-প্রার্থী । এমন একটা অমুগ্ধ বা আইনের চোখে অপরাধ—যে আইন তাকে বাঁচাবার বা ভবিষ্যৎ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না ।

—তুমি কি বিপদে পড়েছ ? কোর্ট সওয়ালের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করি ।

ও অবাক চোখে তাকায় । জানি, ব্যাপারটা হাত্তর । কিন্তু, ‘কনফেশন’ আমার চাই । তাই আবার বলি, তুমি কি বিপদে পড়েছ ?

—হ্যাঁ ।

—তোমাকে আমি মুক্ত করবো—কিন্তু বিনিময়ে তোমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে ।

—কি ?

—তুমি লিখে দেবে যে জীবনে আর কখনও প্রেমে পড়বে না ।

মেয়েটি একটুমানি তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বলে, আচ্ছা ।

সেই সেন্টমেন্টাল ফুল এতক্ষণ সব দেখছিল, শুনছিল আর মাঝে মাঝে কৌপে উঠছিল । তা কাঁপুক । ওকে অনেকবার কাঁপতে হবে ।

সেদিন বিকেলে দৃঢ় স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখে নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, এটা মহাপাপ ।

—কি ? প্রশ্ন করি । জানি ও কখনও ‘লবহতা’ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারবে না ।

—মহাপাপ করলে কি হয় ? হাসিমুখে প্রশ্ন করি । নরকে যাব এই তো । ওর রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, তোমাদের এই ঈশ্বর ভরলোক কোথায় থাকেন বলতে পারো ?

শশাক যেন শিউরে ওঠে । পাড়ারগির ছেলে । ওর রক্তের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের সংস্কার । এতটুকু বয়স থেকে মা-বোনদের ত্রুত, নিয়ম, পূজা, উপাসা, মানসিক করতে দেখেছে । কোন মেয়ে যে ঈশ্বরকে নিয়ে এভাবে বিজ্ঞপ করতে পারে তা ও ভাবতেই পারে না । বিহ্বলকণ্ঠে বলে, আ...আপনি ঈশ্বর মানেন না ।

—না । পরিচয় হয় নি । তুমি পারো পরিচয় করিয়ে দিতে ?

শশাক মুহূর্তে জল্প আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, ঈশ্বরকে মনে মনে উপলব্ধি করতে হয় ।

—খুব ভালো কথা । কিন্তু আমার মন যে ‘ঈশ্বরকে’ দেখতে পাচ্ছে তার পসস্থান নরক ।

—বু...তুমি একটা শিশুটি । ও কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় ।

তা পড়ুক । কিন্তু তবু ওকে জানতে হবে । সেন্টমেন্টাল ফুল । এই শব্দ খেরাপি’ চিকিৎসার ভেঙ্গে যাবে ওর চারিদিকের

নির্বৃত্তির জগৎ । আঘাত—আঘাত হানো । প্রচণ্ড আঘাত হানো ; নিরাবরণ করে দেখাও নগ্নতাকে ।

প্রতিটি কেসে আমি ওকে ডাক্তারাম । সব কথা জাহুক । এখানে কোথায় ওর ঈশ্বর । কি উল্লাসে নিজের সম্মানকে হত্যা করেছে জননী ।

একদিন বলেছিলাম—আমি ঈশ্বরের চেয়ে বড় । এভাবে যদি ঈশ্বরের সব সৃষ্টি ধ্বংস করতে পারতাম ।

ও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতো—আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কেন ।

তারপরে, জানতে পারলাম । আশ্চর্য । আমারই জীবনে ? ভেবে আশ্চর্য হয়ে খাই যে, কি করে লোক আমাকে ভালোবাসতে পারে ? কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও বার বার এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে—যা আমার মনকে তিস্তব্ব করে তুলেছে ।

ইদানীং ও বোগা হয়ে গিয়েছিল । আমাকেই দেখে মারা হোত । সেদিন একটা বিকী ছরছড়া মুখ নিয়ে এসে পাড়ালো । আর, আমি তাকেই ভীত, চকিত মুখে বলে, থানার দারোগা সন্দেহ করছে ।

—কি ।

—এই সব ব্যাপার ।

ওর ভয় দেখে বুঝলাম ও আমাকে ভালোবাসে—আমি বা চাইব না তাই কি আমাকে পেতে হবে সারাজীবন । রাগে শরীর জ্বলে যায় । কক্ষকণ্ঠে বলি, দারোগাকে কি কেনা যায় না ?

—এ লোকটি সে রকম নয় । ও যেন আমাকে চ্যালেঞ্জ করে ।

—সব লোককে কেনা যায়, কাউকে ছুটাকা, কাউকে দু’হাজার, কাউকে দু’লাখ, কাউকে দু’কোটি । কাউকে কাপাস—কাউকে রূপে । জ্যোতির্ময় আসবার কয়েক দিন পরে আবার এলো ও । কেন আমি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে অমুগ্ধবিক ব্যবহার করছি ।

বলতে যাচ্ছিলাম, তাতে তোমার কি ? কিন্তু বললাম না, ওর শাস্ত, সহজ, সরল মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ । অনেকগুলি যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে সেখানে ।

—ওকে চলে যেতে বল । মুখ ফিরিয়ে বললাম ।

—উনি আপনাকে ভালোবাসেন—তাই এভাবে পড়ে আছেন ।

—ভালোবাসা একটা ব্যাধি । তা থেকে ওকে মুক্ত করতে হবে । আমি ডাক্তার, এটা আমার কর্তব্য ।

যখন জ্যোতির্ময়কে ইজেকশন দিতাম আর ও যন্ত্রণার ছটকট করতো—তখন প্রথম দিন, হ্যাঁ প্রথম দিন শশাক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল । তারপরে ও শুধু বিড়লিড করতো আর তখনই ওর মাথাটা খারাপ হতে আরম্ভ হয় । সেন্টমেন্টাল ফুল—এদের এই রকম অবস্থা হয় ।

জ্যোতির্ময়কে—আমার প্রেমকে আমি হত্যা করেছি । কিন্তু শশাকের জল্প আমি দায়ী নই । এরা সেন্টমেন্টাল ফুল—এরা মানসিক অসুস্থ—এরা পৃথিবীকে পেলব করতে চায়—যা অসম্ভব ।

জ্যোতির্ময়, তোমার মৃতদেহের পাশে বলে, তোমার ঠাণ্ডা দেহ স্পর্শ করে কাজ আমি শপথ করে বলছি, তোমাকে প্রথম দিনই ভালোবেসেছিলাম—তুমি যে ভালোবাসাই জিনিস । কে তোমাকে না ভালোবেসে থাকতে পারে ? কিন্তু তুমি কেন কিছুতেই বুঝলে না

## এক কল্লোজের চারটি মেয়ে

যে এই পৃথিবীতে ভালোবাসা টিকতে পারে না। পৃথিবী পচা পাক পূর্ণ। এখানে প্রেম পদ্ম হয়ে ফোটে না—আগা বেড় হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এখানে প্রেমকে নির্মম মূল্য দিতে হয়। সরল, সত্যকে হতে হয় পতিতা—কি করে ভুলব আমি আমার জন্মের চারিদিকের এই তীব্রগন্ধা! কি করে ভুলব দেহপোজীবিনী মাংসের মতু আত্মনাদ? কি করে ভুলব প্রেম কোন নরক সৃষ্টি করেছিল?

তুমি তো জান না কি যখন আমি ভোগ করেছি! যতবার আমাকে ভালোবাসার কথা বলেছে ততবার আমার চোখের সামনে ছায়াছবি মতো আবর্তিত হয়েছে আমার জারজ-জীবনের পূর্ণ ইতিহাস। সেই যখনকার আলস্য, (কমা কথা) তোমাকে যখন দিয়েছি।

জ্যোতির্ময়, তোমাদের বাইবেলে বলে, নরের শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে নারী সৃষ্ট হয়েছে—She is bone of my bone & flesh of my flesh—অস্থি, আমার মজ্জা, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি পুরুষ-ই যদি স্রষ্টা তা হলে কি সে হত্যাকারী নয়? কিন্তু শান্তি পাবে সেই নারী—যে কষ্টে দারণ করবে—পালন করবে—তার জন্ম রয়েছে দারিদ্র্য, কলঙ্ক, অত্যাচার, ব্যাধি, এই পৃথিবীতে এসে কেন তুমি আমাকে প্রেমের কথা শোনাতে চেয়েছিলে জ্যোতির্ময়।

আমার যদি শক্তি থাকতো তা হলে পৃথিবীটা ভেঙ্গেচুরে নতুন করে সৃষ্টি করতাম। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই। তাই শুধু

কতগুলি ভাবী প্রিয়া চাটাজীকে নিঃশেষ করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি কি বলতে পার, কতগুলি প্রিয়া চাটাজীর ধ্বংসস্থলের ওপরে পৃথিবী নতুনভাবে গড়ে উঠবে।

দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ শোনা যায়। 'ওরা এসেছে'—প্রিয়া ভাবে। ঘরের কোণ থেকে সিঁহিল ভাবে ওয়ুধ নিয়ে আসে। বলে, জ্যোতির্ময়, তুমি আমার সব উষ্টে দিয়েছ। জানতাম, একদিন না একদিন ওরা আসবে। সে দিনটুকু ভর পাই নি—সেই দিনটির আশায় তাকিয়ে ছিলাম—যেদিন কোর্টে উত্তর পৃথিবীর সামনে বিচারকে বলে পাব, আপনি ক'টি জারজ-সন্তানের পিতা। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, তোমার মৃত্যুখের দিকে তাকিয়ে সবই মিথ্যা মনে হচ্ছে। আজ পাপড়ির হাসির অর্থ বুঝতে পারছি—তোমাকে যে বিব দিয়েছি জ্যোতির্ময় তা আমি একসঙ্গে নিলাম, মৃত্যুর পরে যেন তোমাকে পাই।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে ওরা যখন শেষপর্যন্ত ঘরে ঢুকলো তখন হৃৎজনের দেহ-ই সমান ঠাণ্ডা। দারোগা একটু হতাশা, একটু বেঁচে-যাওয়া কঠে বলেন, বড় দেরি করে ফেলেছি। আর, সেই কথাই ভান্নাকঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, বড় দেরি করে ফেলেছি। ও জেনে গেল না যে মাহুয় অজায় করে, অহুতাপ করে, প্রারম্ভিত করে—তাই পৃথিবী আজও সবুজ।

সমাপ্ত



সর্বত্র  
পাওয়া যায়

## এতীশ কবিরাজের মহাভূক্ষরাজ

সৈল

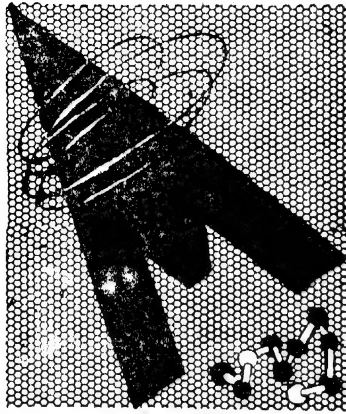
ইহাই একমাত্র কেশভেল আয়র্সেনীয়  
ভেষজের ওগাওণ ঠিক রাখিয়া —

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিজ্ঞানালের প্রাক্তন উপাচার্য  
ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র মোহন  
কর্তৃক গমীকৃত ও স্বাক্ষরিত।



আর্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

বহুমুখী : শ্রাবণ '৭১



## দ্বিগুন বার্তা

শরীর অস্থি রাখতে হলে খাণ্ড, জল ও বাতাসের মত বিশ্রামও যে আবশ্যিক, তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব বেশি হয় নি। রোগ চিকিৎসায় নানা ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবহার দ্রুতগতিতে চলেছে, একই রোগে বিভিন্ন ঔষধ ও উদ্ভাবিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামের পরিণতে ব্যবহার করা যায় এমন কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর যে পরিমাণ অঙ্গ-সঞ্চালন অপরিহার্য, তা বজায় রাখার জন্য শক্তি খাতবস্তুর জটিল উপাদানগুলিকে সরলবস্তুতে বিশ্লেষ্ট করেই পাওয়া যায়। এইভাবে

# বিশ্রাম

ব্যবহৃত শক্তিকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবার কতকগুলি সঞ্চেয়নূলক কার্যও সঙ্গে সঙ্গে চলার দরকার। শ্রমের সময় যেমন প্রথম প্রক্রিয়া চলে (বিলেপন), বিশ্রামের সময় তেমনি দ্বিতীয়টি (সংশ্লেষ) চলে। এইজন্য রোগীকে উপযুক্ত বিশ্রাম দেওয়া চিকিৎসার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

বিশ্রামের মাত্রা ঠিকভাবে মাপাঙ্ক করা কান্না ব্যাপার। কোন রোগী বিছানায় শুয়ে থাকলেও তার শরীরের অংশাংশে বা সর্বদাশেই কিছু কিছু নড়াচড়ার কাজ চলতে পারে। ডাক্তার বা নাস হাত দেখেন যে, রোগী বার বার পাশ ফিরছে, হাতপায়ের কোন অংশ বার-বার নাড়ছে, অথবা তার শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত নাহে হচ্ছে না। কিংবা তার মুখের ভাবভঙ্গি ক্রমাগত বদল হচ্ছে, কপালের চামড়া কৌচকাচ্ছে, দৃষ্টিতে রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, বা চোখের পাতার গতি নিয়মিত মূহুর্তে ঘটেছে না। এই সব দেখেই বোঝা

যায় যে, রোগীর বিশ্রাম উপযুক্তভাবে হচ্ছে না। অন্তর্পক্ষে রোগীর মানসিক চাকল্য থাকলে তা চোখে দেখা না গেলেও উপযুক্ত যন্ত্রে ধরা যায়।

মাংসপেশীর সংকোচের সময় তাদের দৈর্ঘ্য কমে ও প্রসারণের সময় তা বাড়ে। মাংসপেশীর এই সংকোচপ্রসারের উপরেই শরীরের ব্যবহারী নড়াচড়া নির্ভর করে। এই ঘটনা প্রকৃষ্টভাবেই দেখা যায়। আবার কোন কোনটি গোপনে বা চোখের আড়ালে ঘটে; যেমন হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুসের, পাকস্থলীর অন্ত্রনালীর ও মূত্রাশয়ের নিয়মিত বা অনিয়মিত গতি। আবার মনের ভাবের তারতম্যের সময় মুখের বা হাত-পায়ের ভঙ্গীর পরিবর্তন অনেক সময় এমন সূক্ষ্মভাবে ঘটে যে, ভাল করে নজর না করলে তা বোঝা যায় না। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে এই গোপন সংকোচপ্রসার লক্ষ্য করা ও মাপা যায়। সংকোচন মুহূর্তে অর্ধচন্দ্রাকৃতির হলে তাকে স্থায়ী-সংকোচ hypertension বলে। কোন কোন রোগে এই স্থায়ী সংকোচ অবস্থা একই ভাবে বহুকাল চলতে পারে। অল্প কোন কোন রোগে মাঝে মাঝে আসতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি (essential hypertension) রোগে বা থাইরয়েড গ্রন্থিবৃদ্ধি রোগে এই রকম দেখা যায়। কোন কোন অর্জন রোগে এবং স্নায়ুর অস্থিরতা রোগেও (nervousness) এই রকম লক্ষণ দেখা যায়।

বৃহদন্ত্রের আক্ষেপ-প্রবণতা, বৃহদন্ত্রের আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কোন কোন ধরণের উদরাময়ে এই অতি সংকোচপ্রবণতা অন্ত্রনালীর পেশীতন্ত্র সার্বাধীনই থাকে। আবার খাণ্ডনালী, পাকস্থলী এবং বৃহদন্ত্রের অবসাদেও এই রকম দেখা যায়।

Essential hypertension নামক রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে ধমনীর ক্ষুদ্রতর শাখাগুলির পেশীতে এত অতি সংকোচ অবস্থা হীরে ছম্বে ও বাড়ে। রোগের প্রথম অবস্থায় দৈনিক মাংসপেশীর skeletal muscle tonicity সংকোচের ফলেই অস্থায়ী চাপবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। মানসিক শান্ত অবস্থায় রোগীর রক্তচাপ স্বাভাবিকই থাকে।

মাংসপেশীর পূর্ণ প্রসারণ বা বিশ্রাম অবস্থা তখনই হয় যখন পেশীর কোন সংকোচই থাকে না। এই অবস্থা কান্নর কান্নর পক্ষে বিশ্রামের সময় স্বাভাবিকভাবেই আসে। কান্নর আবার অভ্যাসের ফলে বা চেষ্টার ফলে এই অবস্থা আনতে হয়। আবার শরীরের শিলামকে মনের বিশ্রাম থেকে তফাৎ করা যায় না, কারণ সজ্ঞান অবস্থার সকল কাজই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জ্ঞাতসারে হয় এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যাকে আমরা মানসিক শ্রম বলি, তাতেও শরীরের কাজ একেবারে বন্ধ হয় না। আমাদের দুঃখমান প্রতিটি আচরণের সময় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ও বহুসংখ্যক মাংসপেশীর কাজ পরস্পর-সাপেক্ষভাবে ও সহযোগে ঘটে।

এই জন্য মাংসপেশীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হলে মনের বা মস্তিষ্কের বিশ্রামও আবশ্যিক। বজ্রনা বা গভীর চিন্তা, আবেগ বা অজস্রকল মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সূক্ষ্ম শারীরিক ক্রিয়া সর্বদাই জড়িত থাকে। শরীরের কোন অংশে মাংসপেশীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম সম্ভব হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশের নিয়ামক মস্তিষ্কের অংশগুলিও বিশ্রাম পায়। অর্থাৎ

পেশীর বিশ্রামে মনেরও বিশ্রাম ঘটে। শারীরিক এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় এই জ্ঞানটি কাজে লাগালে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

Weir Mitchell বিশ্রাম চিকিৎসা নাম দিয়ে যে ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন তাতে খাতের উপরেই বেশি ঝাঁক দেওয়া হ'ত। রোগীকে, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি প্রচুর খেতে দিয়ে তাকে অধিকাংশ সময় শুয়ে থাকতে বলা হ'ত। বলা বাহুল্য, যাদের শরীরের ওজন কোন কারণে কম, এই ব্যবস্থার তাদের সহজেই ওজনবৃদ্ধি হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মবোধও কিছু বাড়ত। মিসেল কিন্তু ঠিক উপলব্ধি করেন নি যে, যে রোগীর মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতাই প্রধান লক্ষণ, মাংসপেশীর হাইপারটোনিয়াই তার শীর্ণতার কারণ, কিছুদিন ভাল খেলেও শুয়ে থাকলে এদের ওজন কিছু বাড়লেও, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তি ওজন কমে যায়। অপরক্ষে এসব রোগীকে প্রকৃত বিশ্রামের কৌশল শিখিয়ে দিলে শুধু মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে না, খাতের পরিমাণ না বাড়ালেও ওজন বেড়ে যায়। এর জন্য কিন্তু সারাদিন শুয়ে থাকার দরকার হয় না, রোগী সাধারণ কাজবর্ম চালায়ে যেতে পারে।

ওজন বাড়তে হ'লে শরন বা নিদ্রার সময় মাংসপেশী ও মনের পূর্ণ বিশ্রামের দিকে নজর দেওয়া দরকার। এটি অবস্থা তখনই পূর্ণভাবে ঘটে, যখন (১) metabolic rate বা খাতবস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার কম থাকে; (২) যখন knee jerk বা অজ্ঞাত শারীরিক reflex গুলির তীব্রতা কমে যায়; (৩) যখন রোগী বিভিন্ন অঙ্গের দিক থেকে এবং সর্বত্রের দিক থেকে শান্ততার অবস্থায় থাকে; যখন (৪) মনের বিভিন্ন কাজগুলির (চিন্তা, বস্তুনা, বিচার ইত্যাদি) তীব্রতা বা উগ্রতা অনেকটা কমে যায়।

সর্বশরীরের এই পূর্ণ বিশ্রামের সময় খাতের চাহিদা কিছু পরিমাণে কম হয়। কিন্তু শুধু সে জন্যই যে উপকার বেশি হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, বিছানায় শুয়ে থাকলেও যদি অনিদ্রার রাত কাটে, তা হ'লে সকালে স্বাভাবিক ঘুমের পর যে স্বাচ্ছন্দ্য, ক্লান্তি ও প্রাণীহীনতা বোধ হওয়া উচিত, তা মোটেই হয় না। বরং রোগী সকালে নিজেকে ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করে। অপরপক্ষে একঘণ্টা মাত্র উপযুক্তভাবে মাংসপেশীকে বিশ্রাম দিতে পারলে রোগী মনে করে যে, তার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। যদিও সে একটুও ঘুমায় নি। সুতরাং ঘুমের যে কোনও নিজস্ব অজুত গুণ আছে তা মনে হয় না। মনের অশান্তি বা অস্থিরতার ভাব রোগী চিকিৎসকের সহযোগিতায় যে পরিমাণে সংযত করতে পারে, তার শরীর মনের বিশ্রাম এবং স্বচ্ছন্দ্যতা সেই পরিমাণে বাড়ে। কিছুকালের জন্যও সম্পূর্ণভাবে সংযত করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ডায়ালিসিসের রক্তচাপ কমে যায় এবং পাকস্থলী, অন্ত্রনালী ও অন্ত্র আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলির নড়াচড়া ততই স্বাভাবিক ও নিয়মিতভাবে চলতে থাকে। চোখের এবং স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন পেশীগুলির গতি মনের বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা (যেমন চিন্তা, আবেগ, উদ্বেগ ইত্যাদি) বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মনের

পূর্ণ বিশ্রামে এদের বিশ্রামও পূর্ণমাত্রায় ঘটে এবং এই কারণে এই বিশ্রামের উপকারিতাও বেশি।

মাংসপেশীর উপযুক্ত বিশ্রামের জন্য নানা কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। আবার উপযুক্ত পথ্য, শাস্ত্রকর ভেজ এবং মানসিক চিকিৎসার দ্বারা মনকে শান্ত করার উপায়ও এখন জানা গেছে। তবে ঔষধ ইত্যাদির উপর নির্ভর না করে রোগী যদি নিজের শরীর ও মনকে সংযত করার কৌশলগুলি শিখে নেন, তা হলেই সবচেয়ে ভাল ফল হয়।

স্থানীয় বিশ্রাম :—শরীরের কোন অংশে আঘাত ঘটলে সেই অংশকে বিশ্রাম দেওয়ার বিশেষ দরকার হয়। শিশু-পক্ষাঘাত এবং কোন কোন বাতরোগে এর আবশ্যিকতা সবচেয়ে বেশি হয়। আবার পাড় গিয়ে হাতের কব্জির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে যে 'colles' fracture প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, তাতে কাঠের 'বাড়' ও প্রাক্টার দিয়ে অংশটির নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করাই চিকিৎসার গোড়ার কথা। যক্ষ্মারোগে ফুসফুসে ছিদ্র হয়ে গেলেও বৃকে প্রাক্টার করা অত্যাবশ্যক হয়। চোখের কোন কোন রোগে চোখের নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়। আবার কোনকেন প্রয়োগ করেও চোখকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব। কাঠের নানারকম ফ্রেম 'বাড়' নানারকম ক্র, বা পেরেক এবং কপিকলে ধোলান ওজনের সাহায্যেও শরীরের আহত অংশকে অচল করে রাখা যায়।

এই স্থানীয় বিশ্রামের ব্যবস্থার আর একটি কারণ হচ্ছে বেদনা কমান। পক্ষাঘাতের কোনভাবে জখম হ'লে বিশ্রামের দ্বারা শরীরকে সুস্থ করে। কোন কোন পাখির ডানার চোট পেলে ঠোঁটের সাহায্যে পালকগুলি সময়ে ডানটাকে মলে দিয়ে জলের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করে। শিপাসা ঘুর কতার জন্য গলা বাড়িয়ে জল খাওয়া ছাড়া অন্য কোন নড়াচড়া করে না।

সাধারণ ব্যবস্থার আহতস্থানের নড়াচড়া একেবারে বন্ধ করা যায় না। অজ্ঞাতের নড়াচড়ার সময় আহত অঙ্গের পেশীগুলিরও সাঙ্ঘাত চলতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বেদনাবোধই সেই কাজ থেকে বিরত হতে বাধ্য করে। পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হ'লে আহত অঙ্গের প্রভাবক স্নায়ুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা দরকার। এটি কাজ উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে বা অবসাদক ঔষধের সাহায্যে ঘটান যায়।

শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গের নড়াচড়া দুই দল বিপাকীত্বময় মাংসপেশীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারণত একাঙ্গের ক্রিয়া কিছু বেশি জোয়ার হয়। আঘাতের পর এই জোয়ার পেশীদলের দ্বারা সঙ্কেতে অঙ্গটি একদিকে অচল হয়ে পড়ে। তাতে বেদনা কম বোধ হয়। তবে এই স্থায়ী সঙ্কেত অবস্থা অস্বাভাবিক। সুতরাং 'বাড়' বা প্রাক্টারের বা প্রাক্টিকের সাহায্য নেওয়া খুবই দরকার। এই ব্যবস্থা করলে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর ভয়, উদ্বেগ ও বেদনা অনেকটা কম পড়ে। তবে এটি কতটুকু এমন স্ফটিকভাবে হওয়া চাই, যেন আহত অঙ্গের পেশীদলকে কোন অস্বাভাবিক অবস্থানে থাকতে না হয়। তুলা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করেই অনেক ছোটখাট আঘাতে অঙ্গটিকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। এতে যথেষ্ট না হলে মোটা কাপড় দিয়ে বারবার জড়িয়ে দেওয়ার পর শান্ত করে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। গ্রন্থির আঘাতে এই উপায়েই কাজ হয়। হাড় ভাঙলে বা বাতরোগে বালিশে

মত নরম পুরু জিনিসের উপরে অঙ্গটি রাখলে আরাম হতে পারে। পাতলা ভাবে প্রস্টার করেও এই কাজ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার স্নায়ুতন্ত্রকে ঔষধের সাহায্যে অবশ্য করলে ফল বেশি পাওয়া যায়। হাড় ভাঙলে ভাঙার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রস্টার করা দরকার। হাঁটু ভাঙলে প্রায় সমস্ত পা-টা এত ঝকঝক করতে হয়। প্রস্টারের আগে ভাঙা হাড়ের দুই অংশ বাতে ঠিকভাবে এক লাইনে 'বন্ডে' তা দেখা বিশেষ দরকার। তা হলে একটি আর একটির উপরে বা নীচে পড়ে না এবং দুই অংশ সহজে জোড়া লাগে। আঘাতটিস বাতের তরুণ অবস্থার বেদনায়ুক্ত ও ফুলা অংশকে বিশ্রাম দেওয়া খুবই দরকার। না হলে অনেক সময় পেশীগুলির অনিয়মিত স্থায়ী সংকোচে অঙ্গটি বেঁকে যায় ও কিছুদিন পরে এই বঁকা ভাব যোজক তন্ত্রের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে স্থায়ী হয়ে ওঠে। পরে আর সংশোধন করা যায় না। এজন্যে প্রস্টারের সাহায্যে অঙ্গটির নড়াচড়া কিছুদিনের জন্যে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হাঁটুর রোগেই এই সাবধানের আবশ্যক সবচেয়ে বেশি এবং পায়ে গুল্ক থেকে কুচকির কাছ পর্যন্ত অংশের নড়াচড়া বন্ধ করা দরকার হতে পারে। প্রস্টারের ফলে স্থায়ী কঠিন হ'তে দেখা যায় না। তবে দুই দিনের পরে প্রস্টার থুলে অঙ্গটি নড়াচড়া করতে দেওয়া হয়। হাতের আঙুলের বাতের জন্য দীর্ঘকাল প্রস্টারের সাহায্যে বিশ্রাম দেওয়া দরকার।

আহত বা আক্রান্ত অঙ্গের উপযুক্ত বিশ্রাম হ'লে মাংসপেশী, অস্থি বা গ্রন্থি তত্ত্বগুলি আপন-আপনি ও ধীরে ধীরে স্বস্থ হয়ে ওঠে। তবে এই সব ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিশ্রামের আবশ্যকতাও কম নয়। ক্রোধ, উত্তেজনা, বিরক্তি ইত্যাদি থাকলে এই সব ব্যবস্থার পূর্ণ বিশ্রাম ঘটে না এবং রোগ নিরাময়ে বিলম্ব ঘটে। চিকিৎসকের সহযোগিতায় রোগীর মানসিক ক্লেশ, উদ্বেগ এবং মানি অনেকাংশে দূর হতে পারে।

## অকালে জাত-শিশুদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা

### এঞ্জেলিকা ডিক

যে সব শিশু অকালে জন্মায়, আগেকার কালে যাদের বেশির ভাগ মারা যেত, আজকাল তাদের অনেকে বেঁচে যায় শ্রেফ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কৃপায়। মিউনিখে এই রকম অকালে জাত-

শিশুদের জন্য শোয়াবিড হাসপাতালে একটি কেন্দ্র আছে। এখানে শিশুদের কাচের বাস্কের মত ইনকিউবেটরে সমান তাপে রেখে দেখা হয়। ঐ ইনকিউবেটরের কাচের বাস্ক দু'টি প্রায় বায়ুকন্ট্রোল থাকে যার মধ্যে দিয়ে অকালে জাত-শিশুদের অনবরত ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয় যতদিন না সে নিজে খেতে শেখে। এইরকম ইনকিউবেটর সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত। চিকিৎসকরা যখন মনে করেন যে শিশু যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন করেছে, একমাত্র তখনই তাকে ইনকিউবেটর থেকে বার করে আনা হয়

কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসকের মতে অকালে জাত-শিশুদের বত শীত কেন্দ্রে পাঠানো হবে, ততই তাদের বাঁচার আশা বেশি। এর জন্য বেশিরে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স আছে যাতে পোর্টবল ইনকিউবেটর ও অস্থিত চিকিৎসক থাকে। খবর দিইই অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে শিশুদের কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

মিউনিখের হাসপাতালে অকালে জাত-শিশুদের জন্য কুড়িটি ঘরে চল্লিশটি শিশু রাখার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের তদারক করার জন্য বহু নার্স আছে। এইসব নার্সরা যখন ডিউটিতে যায় তখন তাদের প্রত্যেককে নিরাবরণ হয়ে গা-লাত-পা ধুতে হয় এবং অতি বেগুনী রঙের সাহায্যে তাদের জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর তারা জীবাণুমুক্ত পোষাক গায়ে নিয়ে মুখে মুখোশ পরে ওয়ার্ডে প্রবেশ করে। ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি ঘর সম্পূর্ণ শীতাপ-নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি ঘরের টেবিলে অক্সিজেন ও অতিরিক্ত তাপ সনরাহের ব্যবস্থা আছে। ঐ টেবিলের ওপর শিশুদের পোষাক বদলান হয়। প্রত্যেকটি ঘরে এমন বাস্তবিক ব্যবস্থা আছে যার ফলে কোন রোগ-জীবাণু দখলুলিতে প্রবেশ করতে পারে না। মলমূত্র ত্যাগ করলে শিশুর কাপড় ইত্যাদি ইনকিউবেটরের একটি বিশেষ পথ দিয়ে এসে কাচার জন্য একটি খলিতে জমা হয়।

প্রত্যেক দিন মা-বাবারা তাদের অকালে জাত-শিশুদের দেখবার জন্য হাসপাতালে ভিড় করেন। একটি জানালার সামনে এনে দু'ফুট দূর থেকে শিশুদের তাঁদেরকে দেখানো হয়।

—ডি এ'ডি।

## রাত্রি অনেক

### কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

এখন রাত্রি অনেক, মালবিকা, বাইরে যেও না তুমি;  
বাইরের অন্ধকার—বনকালো অন্ধকার স্তব,  
তার চেয়ে কাছে বস দুই চোখে চোখ দু'টি রেখে  
হাতে হাত দু'য়ে থাকো;—রাত্রি শোনাতে কাহিনী।

মনে পড়ে সেইদিন ক্লাস্ত পায়ে পথে যেতে যেতে  
প্রথম আলপ হ'ল তোমাতো-আমাতো  
তারপর কতদিন চলে গেছে ভেবে,

আজকে যখন এলে সলাজ চরণে  
তখনো বুঝি নি আমি,—বুঝি নি তখনো  
ঘাসের ফুলের স্রাণে,—শাড়ির আঁচলে,  
নিরন্তর আমার পাশে কখন পঁড়ালে।



## আত্মন শেখভ

অলগা আইভানোভার আজ বিয়ে। পরিচিত বন্ধু ও বান্ধবীরা সকলেই এসেছে ওর বিয়েতে।

স্বামীকে দেখিয়ে বান্ধবীদের লক্ষ্য করে অলগা বলে, 'দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ, কি সন্দেহ দেখাচ্ছে ওনাকে।'

চমক লাগার মতো এমন কিছু নেই ভদ্রলোকের চোখের মধ্যে। তবুও অলগা কথাগুলো বলে, বোঝাতে চায় কেন ও একজন সাধারণ লোককে বিয়ে করলে রাজী হয়েছে।

অলগার স্বামীর নাম স্টেপানোভিচ ডিম্ভ। ডিম্ভ নামেই কাউন্সিলার, আসলে সে একজন ডাক্তার। ছোটো হাসপাতালে গুকে যেতে হয়, একটোতে অস্থায়িভাবে কাজ করে।

সকালে নটা থেকে দুপুর পর্যন্ত তার ওয়ার্ডে এবং বাইরের যে-সব কগী আসে তাদের দেখাশোনা করতে হয়। বিকেলে ট্রামে করে অল্প হাসপাতালে যেতে হয়।

সারা বহরের আর খুবই জ্বল। এইটুকু বললেই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সবই বলা হয়—বেশি কিছু বলার বাকি থাকে না।

এদিকে অলগা এবং তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা ডিম্ভের মতো অতো সাধারণ নয়, প্রত্যেকেরই একটা না-একটা বিষয়ে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। একেবারেই অখ্যাত কেউ নয়। পুরোপুরি নাম করতে না পারলেও কিছুটা নাম কিনতে আরম্ভ করেছে, ভবিষ্যতে হয় তো আরো নাম করতে পারবে।

ওদের মধ্যে একজন অভিনেতা। এরই মধ্যে অভিনয়ে বেশ কিছুটা নাম করেছে। স্কলর, সুপুরুষ, চালাক-চতুর, লোকটা আকর্ষণীয় করতেও জানে। কি ভাবে বহুত্ব দিতে হয় অলগাকে তাই দেখায়।

একজন গায়ক। মোটা আমুলে লোকটা প্রায়ই দুঃখ করে বলে—অলগা নিজেকে নষ্ট করছে। অলগা যদি বুড়ে না হতো,

অলগা যদি এবটু মন দিয়ে খাটতো, একদিন না একদিন সে নামকরা গায়িকা হতে পারতো। এ চাড়া বহুকজন শিল্পীও ছিল ওদের দলে। তাদের মধ্যে রিগাবল্ডী নাম করা।

পঁচিশ বছরের অপরূপ স্রম্বক যুবক রিগাবল্ডীর ছবি প্রদর্শনাতে তৈ-টে পড়ে গেছে—শয় ছবির সে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেয়েছে। অলগার আঁকা ছবিগুলোতে তুলির টান দিতে দিতে ও বলে, 'চিজলিলে অলগা নতুন কিছু দিতে পারবে।'

অপরজন বেংলা বাজার। বেহালার সুরে কান্না ঝরে পড়ে! সে স্পষ্টই বলে—'সে সব মহিলাদের আমি জানি, তাদের মধ্যে একমাত্র অলগাই তার সমকক্ষ।'

একজন লেখকও আছে দলের মধ্যে। ছোট ছোট উপজ্ঞাস, গল্প ও নটক লিখে ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা নাম করেছে। আর বাকি রইলো কে? ওহো, ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিভিচের কথা বলাই হয় নি। ভদ্রলোক ভূমিদার, বিনা পরসায় বই-এর মলাটে ছবি এঁকে দেন। দেশীয় কৃষ্টি ও পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রাণ্ড তাঁর স্বাভাবিক টান। অসুখ না পড়লে এই সব শিল্পী, উদারনৈতিক ভাগ্যবান ধনী ভদ্রলোকদের ডাক্তারদের কথা মনেই পড়ে না।

ডিম্ভকে এরা সাধারণ লোক মনে করে—যেমন মনে করে আর পাচরনবে—বেনিয়ানের মতো এবং গাল দাড়ি, গায় একটা যেমানান কোট, ডিম্ভকে ওদের প্রয়োজনই হয় না। অবশ্য ডিম্ভ যদি লেখক হতো বিবাহ হতে পারতো একজন শিল্পী, তা হলে সকলে বলতো, 'ডিম্ভকে ঠিক জোয়ার মতো দেখতে।'

অভিনেতা অলগাকে বলে, 'এই বিয়ের সাজে তোমাকে ঠিক সাধা ফুল ঢাকা একটা লাল গাছ মনে হচ্ছে।'

অভিনেতার হাতটা ধরে অলগা বলে, 'না, না, শোন। ঘটনাটা কি ভাবে ঘটলো তাই যদি—বাবা আর ডিম্ভ, এবটু হাসপাতালে'

ডাক্তার। বাবা অস্ত্রের পড়লে ডিমভ, নিঃস্বার্থভাবে দিন-রাত তাঁর সেবা করতো। রিয়ারবন্ডা শোন, ওহে তোমরাও সকলে শোন। ও কি হচ্ছে, আরো কাছে এগিয়ে এসো। রাতে আমার ঘুম হ'তো না, বাবার পাশে চুপ করে বসে থাকতাম। একদিন বুঝতে পারলাম যে ডিমভ আমাকে ভালোবাসে, আমি ডিমভের মন জয় করতে পেরেছি। কি অদ্ভুত ভাগ্যের খেলা! তাই না?

বাবা মাথা গেলেন। ডিমভ কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসতো। কখনো কখনো বাইরেও আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলতো। একদিন সে আমাকে সব কথা বলে। সারারাত কেঁদে কাটালাম, বুঝতে পারলাম আমিও ডিমভকে ভালোবাসি। আজ আমার বিয়ে হ'লো।

পাশ ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে ডিমভ। মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে মুখ ফেরালে অলগা বলে, 'তোমারই কথা হচ্ছে। কাছে সর এসো। রিয়ারবন্ডাকে দেখিয়ে বলে এর হাতে হাত মেলাও—বাঁক, বাঁক, হচ্ছে।' আজ থেকে তোমরা দু'জনে বন্ধু হলে, কেমন?

মুচকি হেসে ডিমভ বলে, 'খুব খুশি হলাম। রিয়ারবন্ডা নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে পড়তেন। বোধ করি তিনি আপনার কোন আত্মীয় নন।'

২

অলগার বরস বাইশ, ডিমভের একত্রিশ।

বিয়ের পর তের দিনগুলো অথেন্ডি কাটে। বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে অলগা বাঁধানো ছবি ও ফটোগুলো বসবার ঘরে সাজায়। বড়ো পিন্নানো ও ঘরের আসবাবপত্রগুলোর চারপাশে ছোট ছোট চীনা ছাতা ও রঙিন টুকরো কাপড় দিয়ে সাজায়। রান্নাঘরের দেয়ালে টাঙান সজ্জারের আঁকা ছবি। ঘরের কোণে জড়ো করে রাখে বিড়ি ও কাস্তেগুলো। সিঁচি: এক দেয়ালে কালো কাপড় দিয়ে ঢাকে, ঘরটাকে করে তোলে একটা গুহাশিখর। বিছানার ওপর কোলানো 'ভেনিগারান' আলো, দরজার সামনে ঝাঁড় করানো মূর্তির হাতে টাঙি। যে-ই দেখে সেই বলে—খাসা বাসা তৈরি করেছে ওরা।

রোজ এগারোটার সময় অলগা ঘুম থেকে ওঠে। কিছু পরেই পিন্নানো বাজাতে বসে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছবি আঁকে। বারোটার কিছু পরে মেয়েদজির কাছে যায়।

স্বামী ও স্ত্রীর আর খুবই কম। বেবলমাত্র দরকারী জিনিসটুকু কেনা চলে। অলগার নতুন পোষাক দরকার হলে দজি ও অলগাকে নানাপ্রকার ফন্দি-ফিকির করতে হয়। আর তার জন্তে বারবার অত্যাচার ঘটনা ঘটে। পুরনো রঙিন জুকাটাই নানা রঙ-এর টুকরো টুকরো জরি ও ঘিটে গিটে সেলাই করে দেয়, ফলে সেটা জামা না হ'য়ে কিন্তুতকিমকার একটা বস্ত্রবিশেষ হ'য়ে ঝাঁড়ায়।

দজির কাজ থেকে যায় এক বান্ধবী অভিনেত্রীর কাছে। প্রথম রজনীর কিংবা কোন 'চ্যারিটি' শোয়ের টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করে। ওখানকার কাজ সেরে হ'র স্টুডিওতে যায়, নয় তো কোন সিনেমা হলে ঢোকে। পরে কোন এক নামদার বন্ধুকে নিজের বাড়িতে আসবার জন্তে নিমন্ত্রণ করে আসে।

সকলেই অলগাকে পছন্দ করে, ওর সুখ্যাতি করে। সকলেই

বলে অলগা ভালো, অলগা সুন্দরী, অলগা অসাধারণ...। নামকরা বারী তারা সকলেই অলগাকে নিজদের সমকক্ষ বলে মনে করে এবং সকলেই এবাচোকা স্বীকার করে যে, যদি অলগা নিজেকে এভাবে নষ্ট না করে, তা হ'লে একসময় সেও নাম করতে পারবে।

অলগা গান করে, পিন্নানো বাজায়, ছবি আঁকে, মাটির মূর্তি গড়ে, সবের দলে অভিনয় করে। যাকিছু সে বরফ না কেন সব কিছুই সে নিখুঁতভাবে করে। নামকরা বন্ধুদের এবং পরিচিত লোকদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার মধ্যে তার বেরকম দক্ষতা ফুটে বেরোর অল্প কোন কিছুতেই তমন ফোটে না। কোন লোকের মধ্যে নতুন কিছু দেখলেই অলগা তার সঙ্গে পরিচয় করে বন্ধু পাওয়া এবং নিজের বাড়িতে আসবার জন্তে অতুরোধ করে।

যেদিন কোন নতুন লোকের সঙ্গে অলগার পরিচয় হয়, সেদিনটা ওর কাছে সত্যিই মধুর বলে মনে হয়। নামকরা লোকদের ও শ্রদ্ধা করে, তাদের নিয়ে ও গর্ব করে, রাতে তাদের স্বপ্ন দেখে। নামকরা লোকদের সঙ্গে পরিচিত হতে বাধ্য, সে ব্যগ্রতা অলগা মন থেকে দূর করতে পারে না।

পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায়, নতুন বন্ধুদের নিয়ে উঠে-পড়ে লাগে। কিছুদিন পর তাদেরও ভালো লাগে না। তাদের সঙ্গে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। নতুন বন্ধুদের জন্তে সে ঘরে বেড়ায়, তাদের দেখা মিললে অল্পদের খোঁজ করে। কেন, অলগা এরকম করে কেন?

চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে সে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বসে। ডিমভের সহজ-সরল রসিকতার আনন্দে চোখের ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে অলগা।

অলগা স্বামীকে বলে, 'দেখ, তুমি সবই জান, সবই বোঝ। কিন্তু তোমার মস্তবড়ো দোষ যে 'আটের' দিকে তোমার কোন উৎসাহ দেখি না! ছবি আঁকা বা গান-বাজনা নিয়ে তো মাথাই ঘামাও না, কেন বল তো?'

ডিমভ বলে, 'ও-সব আমার মাথায় ঢাকে না। জীবনভোর শুধু বই আর গুণপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। ও-সব ব্যাপারে মন দেবার ফুরসোই হ'লো কই?'

'আমাদের আলোচনায় যোগ না দেওয়াটা খুব খারাপ দেখায়।'

'কেন? তোমার বন্ধুত্ব তো বই বা গুণপত্র নিয়ে কোন আলোচনা করে না। কই, তুমি তো তাদের দোষ ধরো না? যে যার নিজেরটা নিয়েই আছে। তা ছাড়া ছবি ও সিনেমার বিষয় আমি কিছু জানি না বা বুঝি না। একদল লোক জীবনভোর এই নিয়ে মেতে থাকে আর অল্প একদল লোক এ সবের পেছনে অজস্ত্র টাকা খরচ করে—দু'দফেই ঠোঁট মাজে। সত্যি কথা, আমি ও-সব বুঝতে পারি। তাই বলে আমি ও-গুলোকে হেজ্ঞান করি না।'

খাওয়া সেরে অলগা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরোয়। পরে থিয়েটার বা অর্কেস্ট্রা পাটিতে যায়। কোনদিনই রাত ত্রুপরের আগে ফেরে না।

বুধবার অলগা কোথাও বেরোয় না। কেন না বুধবার সন্ধ্যার সময় সকলে ওর বাড়িতে আসে। নিজদের মধ্যে 'আটের' আলোচনা চলে।



নামকরা অভিনেতা আবৃত্তি করে, গাইয়ে গান গায়, কেউ বা অলগার 'আলবামে' ছবি এঁকে দেয়। বীণাবাদক বীণা বাজায়। অলগা গান করে, নাট দেখিয়ে ওদের আনন্দদান করে। আবৃত্তি, অভিনয় ও গানের মধ্যে বিবাহের সমন্বয় চলে সাহিত্য, অভিনয় বা শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা।

বাঁকবী কঠিকে দেখা যায় না। কারণ, অভিনেত্রী আর ঐ মেয়েদেখি ছাড়া সমস্ত মেয়ে-জাতটাকেই অলগা ভুজ্ঞ ও হেরজ্ঞান করে। প্রত্যেক বুধবারে একজন না একজন নতুন ব্যতিথি আসে।

ওদের এই আসরে ডিমভকে দেখা যায় না। কেউ ওর জন্তো ভাবেও না। ঠিক সাড়ে এগারোটার পর রান্নাঘরের দরজা খুলে যায়, দরজার কাছে ঠাঁড়িয়ে ডিমভ অভ্যর্থনা করে—খাবার দিয়েছে, আপনারা আসুন। ডিমভের মুখে হাসি লেগে আছে।

সকলে খাবারঘরে চলে আসে। ডিসে করে খাবার দেওয়া হয়েছে—সেই একই রকমের খাবার চিরকাল চলে আসছে।

খেতে খেতে ওরা ডিমভের দিকে তাকিয়ে দেখে। ঐ পরিস্থিতি, পরকণ্ঠেই আর তার কথা মনে থাকে না। আলোচনার মধ্যে সকলে ভুবে যায়।

বিয়ের পর প্রথম দু'টা সপ্তাহ ওদের বেশ ভালোভাবে কাটে। তৃতীয় সপ্তাহে কিন্তু ভালোভাবে কাটে না। চর্মরোগে আক্রান্ত হ'য়ে ডিমভকে দু'দিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়।

অল্পর কালো চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। অলগা

স্বামীর পাশে বসে কাঁদে। একই ভালো হ'লে ডিমভের মাথার একটা সাদা ক্রমাল বেঁধে দেয়, মাথাবনের মতো স্বামীকে সাজায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আনন্দবোধ করে। তিনদিন পর ডিমভ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু নতুন করে আবার বিপদ দেখা দেয়।

একদিন খাবার সময় ডিমভ বলে, 'আমার সময়টা এখন ভালো যাচ্ছে না। আজ চারটে মড়া চেঁচাই করেছে! বাড়ি এসে দেখি দু'টা আঙুল কেটে গেছে।'

অলগা ভয়ে শিউরে ওঠে। ডিমভ হেসে বলে, 'ও কিছু না, মড়া কাটতে গিয়ে ওরকম কতবার কেটেছে।'

কখন স্বামীর রক্ত ঝিঝুটু হয়ে ওঠে এই চিন্তায় অলগা ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। ভালোয়-ভালোয় যাতে বিপদ কেটে যায় তার জন্তো রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

দিনকয়েক কেটে গেল, ডাক্তারের কোন ক্ষতি হলো না। ফিরে এলো সুখ ও স্বস্তিতে ভরা দিনগুলো। বর্তমান দিনগুলো হ'য়ে উঠলো আনন্দে ভরপুর। শীঘ্রই আসবে বসন্ত আনন্দের দ্বালি দাজিয়ে, তাদের জীবন যথেষ্ট চিরস্থায়ের মধ্যে দিয়ে। এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের জন্তো রয়েছে গাঁয়ের ছোট বাড়ি—সেখানে চলবে পায়ে হেঁটে বেড়ানো, চলবে ছবি তীকা, চলবে মাছ ধরা আর চলবে পাখির মিষ্টি গান শোনা। জুলাই থেকে শরৎকাল পর্যন্ত চলবে শিল্পীদের ভঙ্গা অভিনয়।

এটির কেশবিজ্ঞান

## কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য



উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অল্পম ভারতীয় ভারতীয় নারীর অপরূপ কেশবিন্যাসের চূড়ান্ত বর্তমান। একপ কেশবিন্যাসের জন্ত প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই করে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যাল-কেমিকোর ক্যান্থারল চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।



## ক্যান্থারল

সুদৃভসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশটেল

অলগা শিল্পীগোষ্ঠীর একজন স্থায়ী সদস্য। তাই ঐ অভিবানে সে-ও অংশগ্রহণ করবে। এরই মধ্যে অলগা একজোড়া ভ্রমণের পোষাক তৈরি করিচ্ছে—ভ্রমণের জুতা সে কিনেছে রঙ, তুলি, ত্রাশ, ক্যানভাস ও নতুন একটা রঙগনি।

রিয়াবদ্বী প্রায়ই অলগার কাছে আসে দেখে যায় অলগার কি রকম ছবি আঁকা চলেছে। অলগা নিজের আঁকা ছবিগুলো দেখায়। রিয়াবদ্বী ছবিগুলো দেখে বলে ‘বাঃ!...মেঘগুলো যেন গর্জন করছে, সমুদ্রবোলা আলোটা ভালো ফুটে ওঠে নি...সামনের জমিটা অগাধিচুড়ি হ’য়েছে, ছবিটার মধ্যে কিসের যেন...আমি যা বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?...ছবিটা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে নি। কুঁড়েঘরটা মগুপের মতো হ’য়ে উঠেছে...ঐ কোণটা আরো কালো হওয়া দরকার সব মিলিয়ে মন্দ হয় নি ছবিটা...সত্যি খুশি হ’য়েছি।’

৩

একদিন বিকেলে কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে ডিমড, শহরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। পনেরো দিন হ’লো স্ত্রী বেড়াতে গেছে, তাই স্ত্রীকে দেখতে যাচ্ছে। স্টেশন থেকে নেমে ভক্তলের মধ্যে দ্রাবিড় বাড়িটা খুঁজে বেড়ায়।

স্বর্ষ তখন ডুবু ডুবু। এমন সময় ডিমড ছোট বাড়িটা দেখতে পায়। চাকর জানায় অলগা বাড়ি নেই, এখনি ফিরবে।

সাদাসিধে ছোট বাড়ি, গর বেশি উঁচু নয়। দেয়ালের ওপর টুকরো টুকরো চিঠির কাগজ আঁটা, গর্তভর্তি এঁকে-খেঁড়ে মেয়ে। বাড়ির মধ্যে মাত্র তিনটে ঘর। একটার মধ্যে বিছানা পাতি। পরেরটার ক্যানভাস, আঁকবার তুলি, ময়লা কাগজ, চেয়ার ও জানলার ওপর পুস্তকদের কোট ও টুপি। তৃতীয়টার মধ্যে তিনজন অচেনা লোক বসে আছে। ভদের মধ্যে দু’জনের গায়ের রঙ কালো, মুখে একগাল দাড়ি। অপরজনের দাড়ি কামানো, দোহারা শূণ্য, খুব সম্ভব একজন অভিনেতা। টেবিলের ওপর কেটলিতে জল ফুটেছে।

ডিমডের দিকে চেয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করে, ‘কাকে চান? অলগাকে? ওরই সঙ্গে দেখা করতে চান? একটু বসুন, এখনি সে এসে পড়বে।’

ডিমড অলগার ফিরে আসার প্রতীক্ষার বসে থাকে। একজন দাড়িওয়ালা লোক ঘুম-ঘুম চোখে ডিমডের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাপে চা ঢেলে লোকটা জিজ্ঞেস করে, ‘এককাপ হবে নাকি?’

কিনে ও তেষ্ঠা থাকা সঙ্গেও ডিমড বলে, ‘না, আমি চা খাই না।’

একটু পরেই হাতির ও পায়ে শব্দ পাওয়া যায়। দরজার জোরে ধাক্কা দিয়ে অলগা ঘর ঢোকে, হাতে একটা স্ট্রিকেশ। পেছনে ঢোকে রিয়াবদ্বী—হাতে বড় ছাতা ও মোড়া টুস একটা।

আনন্দে আঁতরাণা হ’য়ে অলগা চাৎকার করে ওঠে, ‘ডিমড! ডিমড, তুমি!’ ডিমডের বকের ওপর মাথা ও হাত ছুঁতো রেখে অলগা থেমে থেমে বলে, ‘ডিমড...আমার ডিমড, এতোদিন কেন আস নি?’

‘কি করে আমি বসো? আমি সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত।’

এদিকে বখন আমার অবসর মেলে, ওদিকে তখন আসবার গাড়ি জোটে না।’

‘তোমাকে দেখে কি যে আনন্দ হ’চ্ছে, কেনন করে বলি সে-কথা। রাতের পর রাত তোমার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে ভেবেছি হয়তো তোমার অন্তর্য করেছি। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি! ভাগিস! তুমি এসে পড়েছো তা না হ’লে যে কি হ’তো, ভাবতেই পারছি না। এ বিপদের হাত থেকে তুমিই পারবে আনাকে বাঁচাতে।’

‘কাল এখানে একটা বিয়ে আছে। স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটরের বিয়ে। ছেলোটো দেখতে সুনতে ভালো, চালাক-চতুরও বাটে। আমরা কথা দিয়েছি যে সকলেই আমরা ওর বিয়েতে যাব। সে গরীব, তার বিয়েতে না-যাওয়াটা খুব খারাপ দেখাবে।’

‘আমরা সোজা কনের বাড়িতে যাব। সেখানে আছে লতাঝিথিকা, পাখির কাকলি, ঘাসের ওপর হোদের ঝিলমিলি আর থাকব আমরা রঙ-বেরঙের পোষাক পরে প্রকৃতির শ্রামল কোল ছুঁতে।’

মুখ শুকনো করে অলগা বলে, ‘কিন্তু ডিমড, কি পরে আমি বিয়েতে যাব, আমার যে একটাও জামাকাপড় নেই। তুমি আমাকে বাঁচাও, এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। কপাল ভালো যে তুমি এসে পড়েছো, এ যাত্রা তুমি আমাকে বাঁচাও। এই নাও চাষিটা নাও, শীগগির বাড়ি চলে যাও। আমার বেগুনি বস্ত্রের জামাটা নিও, ওটা সামনেই ঝুলছে দেখতে পাবে। যে ঘরে আমরা গান বাজনা করি, সেই ঘরের মোকাবেতে ছুঁতো পিচবোর্ডের বাস্ক দেখতে পাবে। ওপরের বাস্কটা গুললে টুকরো টুকরো জরি ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না, তাহাই তলার ফুলের তোড়া আছে। সবগুলোই নিয়ে এসো। দেখো, নই করো না যেন! ওরই ভেতর থেকে কয়েকটা বেছে নেব।’

‘ঠিক আছে, কাল গিয়েই ওগুলো পাঠিয়ে দেব।’

ভর-ভর চোখে তাকিয়ে অলগা বলে, ‘কাল! কাল হয়তো তুমি ঠিকসময় গাড়ি ধরতে পারবে না। সকাল ন’টায় প্রথম গাড়ি ছাড়ে, এখানে এগারেটার বিয়ে। হজীটি, আজই যাও। কাল যদি নিজে আসতে না পার, লোক দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিও। নাও ওঠো, দেরি হ’য়ে যাচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার সময় হ’য়ে এলো।’

‘আচ্ছা যাই।’

অলগার চোখ ভলে ভরে ওঠে। অলগা বলে, ‘তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। কি করি বলে, এখন বুঝতে পারছি ভক্তলোককে কথা দিয়ে কি বোকাশিটাই না করেছি।’

একগ্লাস চা গোথ্রাসে গিলে, কিছুটা হাতে করে তুলে নিয়ে ডিমড হাসতে হাসতে চলে যায়। কালো লোক ছুঁতো ও অভিনেতা বাকি খাবারগুলো শেষ করে।

8

জুলাই-এর নিখুম চাঁদটা রাত। ভল্গার ওপর জাহাজের ডেকে ঝাঁড়িয়ে অলগা—একবার জলের দিকে আর একবার তীরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। পাশে ঝাঁড়িয়ে রিয়াবদ্বী বলে চলে, ‘জলের ওপর ঐ যে কালো কালো ছায়া, ওটা সত্যি ছায়া নয়—ওটা একটা স্বপ্ন। সব

কিছুই ভুলে যাওয়া ভালো। মরে গিয়ে মানুষের স্মৃতিতে ভেগে থাকা ভালো। চারপাশে এই কুহেলিকাভরা চক্কেল জল, ঐ অসীম আকাশ, শেঁকা কুল বিহীন এই নদীতীর সবকিছুই আমাদের জন্মসার-শুভ জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় এমন কিছু যা মহৎ, বা অনন্ত, বা বহুগীর। অতীত নগণ্য, অত্মহাগবিহীন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার—এমন কি এই সুন্দর চাঁদনীরাতে—যা আর কখনও ফিরে আসবে না, এখনি শেষ হবে, অনন্তের মাঝে হবে চীন। কেন? তবে কেন এই জীবন?’

নিজের চিন্তায় বিভোর অলগা মনে মনে ভাবে—আমি অমর, আমি কখনো মরবো না। জলের ওপর আলোর বিলিফিলি, ঐ আকাশ, এই নদীতীর, ঐ কালো ছায়া অশার আনন্দে ওর মন ভরিয়ে তোলে। প্রাণে জাগায় আশা। সুদূর জ্যোৎস্নালোকের পর পা রে, অনন্ত-অসীম শূন্য ছাড়িয়ে যে জগৎ, সেখানে আছে যশ, আছে খ্যাতি আর আছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা। দূরের পানে তাকিয়ে অলগার মনে হয় যেন ভিড় বেগেছে ওখানে, আলো হয়ে উঠছে জায়গাটা, গান-বাজনার আর আনন্দে মেতে উঠছে সকলে।

গারে ওর সাদা পোষাক। চারিদিক থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে ওর ওপর। গরাদের ওপর হেলান দিয়ে পাশে ঝাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা, অলগার মনে হয় সত্যি ও মহৎ ও প্রতিভাশালী। ভবিষ্যতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠবে। দিনের অবসানে প্রকৃতির বুক ফুটে ওঠে যে আনন্দময় বর্ণচ্ছটা ওর তুলিতে তা মৃত হয়ে উঠবে অনবজ ব্যঞ্জনায়, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আর রাতের ছায়-কুহেলিকা সম্ভাব হয়ে উঠবে ওর তুলির রেখায়।

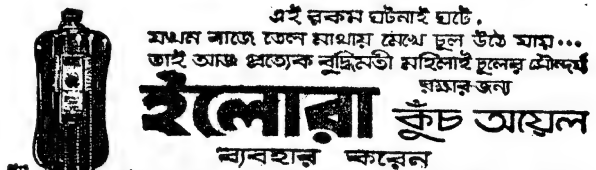
রিয়াবত্কী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অলগার দিকে—ভরাল সে চাউনি; ওর চোখে চোখ রাখতে পারে না অলগা।

কানের কাছে মুখ রেখে রিয়াবত্কী অলগাকে বলে, ‘আমি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠছি। একটবার মাত্র বল—তুমি আমার ভালোবাস। তোমার জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি।’

চোখ বন্ধ করে অলগা বলে, ‘ওভাবে বলো না বিত্তী শোনার। ডিমভের কি হবে?’

‘ডিমভের এত কি আসে যায়? ডিমভের কথাই বা উঠছে কেন? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? ওর কথা আজ নয়—আজ শুধু প্রেম, আনন্দ, শুধু তুমি আর আমি। আমি কিছু জানি না, তাকাব না আমি কিছুমানে, আমি চাই ক্ষণিক একটি মূর্ত্ত।’

অলগার বুকটা দক্কেল করতে থাকে। অতীতের সব ঘটনা—বিয়ের কথা, ডিমভের কথা আজ অস্পষ্ট বলে মনে হয়—মনে হয় যেন অনেক দূরে সরে গেছে তারা। সত্যি তো ডিমভের কথা আজ কেন? ওর জন্য কি করতে পারে সে?



ইলোরা কেমিক্যাল • কলিকাতা-২

হাত দু'টো দিয়ে মুখটা ঢেকে অলগা আপন মনে বলে চলে, 'বতরু কু আনন্দ দিয়েছি ডিমভকে একজন সাধারণ পুকুরের পক্ষে তাই যথেষ্ট। যা মন চায় তাই করুক তারা।' বিক তারা আমার অভিলাষ। নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়ে দেখাব যে আমি ওদের কত ঘৃণা করি... একবার অন্তত চেষ্টা করতে দোব কি? হার ভগবান, কি ভয়ঙ্কর অঘটন কি হৃদয়।'

রিয়াবভদ্রী ওকে জড়িয়ে ধরতে এলে অলগা দু'হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে দেয়। রিয়াবভদ্রী মিকে তাকিয়ে দেখে। জলের ধারা বইছে রিয়াবভদ্রীর চোখ দিয়ে। অলগা ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

ডেকের ওপর বিক থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'এক মিনিটের মধ্যে আমরা 'কিসেনমার' পৌঁছবো।' খাবারঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়।

হাসতে গিয়ে অলগা কঁদে ফেলে।

উত্তেজনার রিয়াবভদ্রী ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, বেকির ওপর বসে পড়ে ও। মাথাটা গরাদের ওপর রেখে অলগার মিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি শান্ত, আমি দ্বন্দ্ব আমি অবসর।'

৫

সেপ্টেম্বর মাস। কুয়াসার ঘেরা দিন। ভোরের দিকে পাতলা কুয়াসা ভাগ্যকে ঘিরে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। ন'টার পর শু'ড়ি শু'ড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়। পরিষ্কার দিনের কোনই আশা থাকে না। সকালে খাবার সময় রিয়াবভদ্রী বলে, 'শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর হচ্ছে ছবি আঁকা। আমি শিল্পী নই, বোকার ছাড়া অন্য কেউ আমার প্রতিভার কথা বিশ্বাস করবে না।'

হঠাৎ কাউকে বুঝতে না গিয়ে সে ছবিটা নিয়ে সবচেয়ে ভালো ছবিটা কাসিয়ে দেয়। খাওয়া শেষ হলে জানলার কাছে বসে বাইরের দিকে চোরে থাকে।

ভল্গা অশ্রু হতে উঠেছে। সে চাকচিক্য আর নেই। প্রকৃতির সবখানেই বিষম ছায়া, শরতের নিরানন্দের আগমন।। তাঁরে-বিছানো কার্পেটের মতো ঘন সবুজ ঘাস, হীরের মতো চকচকে সূর্যরশ্মির বিকিরণ, স্বচ্ছ নীল আকাশ, প্রকৃতির হৃদয় বুজ সবকিছুই যেন ভল্গার ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বসন্তের আগে ও-সব আর ফিরে পাওয়া বাবে না।

মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে কাকগুলো বিকট চীংকার জুড়ে দিয়েছে, রিয়াবভদ্রী বসে বসে ওদের ডাক শোনে। কাকগুলো যেন চীংকার করে উঠলো, 'সব কুছ, বুটা ছার, সব কুছ, বুটা ছার।'

রিয়াবভদ্রী মনে মনে ভাবে, 'আমি নিজেই সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি, আমার সমস্ত প্রতিভা আজ নিঃশেষিত। দেখছি এই পৃথিবীতে সবকিছু গতানুগতিক, সবকিছুই আশেপাশে, সবকিছুই অর্থহীন। ঐ মহিলাটির সঙ্গে মেলামেশা করা আদৌ সঙ্গত হয় নি।'

এক কথার বলতে গেলে রিয়াবভদ্রীর জীবনে এসেছে নৈরাশ্র আর অবসাদ।

'পার্টিসানের' অন্তিমিকে বিছানার ওপর বসে অলগা ঘন চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ঢালায়। মনে হয় যেন নিজের ঘরে বসে আছে। থিয়েটারের কথা, দর্শির কথা, বন্ধুদের কথা, মনে পড়ে। এখন কি

করছে তারা? তারা কি আমার কথা মনে রেখেছে? ডিমভ! আমার ডিমভ! বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে চিঠির মধ্যে কি কাকুতি-মিনতি বেচারী ডিমভের।

ডিমভ, মাসে মাসে অলগাকে টাকা পাঠায়। রিয়াবভদ্রীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছে জানালে আরো একশো টাকা পাঠিয়ে দেয়। কত ভালো, কত দয়ালু ডিমভ!

ভ্রমণে এসেছে ক্লাস্তি। এই চাবাভুযোদের সংস্পর্শ থেকে অলগা পাগিয়ে বাচতে চায়, বেড়ে ফেলাতে চায় দেহ-মনের সমস্ত মানি। চাবাদের সঙ্গে বাস করলে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে মনের এই মানি কোনদিনই দূর হবে না। রিয়াবভদ্রী ওদের সঙ্গে আরো দিনকতক থাকার কথা না দিলে, ওরা সকলে আজই চলে যেতে পারতো।

রিয়াবভদ্রী বিরক্তির সুরে বলে, 'তা ভগবান, কখন আবার সূর্য উঠবে? সূর্য না থাকলে আমি যে সৃষ্টালোকিত ভূভাগ দৃশ্য আঁকতে পারি না।'

'পার্টিসানের' ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে অলগা বলে, 'মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছবিটা তো পড়ে রয়েছে, মনে নেই?—ডান দিকে ঘন বন, বাঁ দিকে গরুর পাল ও রাজহাঁসের ঝাঁক। ঐ ছবিটা তো শেষ করতে পার।'

রিয়াবভদ্রী মুগ্ধ হয়ে বলে, 'শেষ কর। তুমি কি সত্যিই আমাকে এতো বোকা মনে কর যে, আমার কখন কি করা উচিত তা আমি জানি না। তোমার কাছ থেকে কি আমার জানতে হবে?'

'তুমি একেবারেই বদলে গেছ।'

'ভালোই হয়েছে।'

অলগা উল্লুনের পাশে দাঁড়িয়ে কানতে আরম্ভ করে।

'আবার কান্না হচ্ছে! কান্নাটাই যদি না শেষ হ'তো। চুপ কর বলছি। কান্দবার হাজার বকম কারণ আমারও আছে, কিন্তু আমি কান্দিনি।'

কোঁপাতে কোঁপাতে অলগা বলে, 'কারণ আছে! সবচেয়ে বড়ো কারণ বোধ হয় আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না। সত্যি বলতে কি আমাদের এই মেলামেশার জন্যে তুমি লজ্জিত, তুমি ভয় পাও পাছে সকলে জেনে ফেলে। তুমি হয় তো জানো না যে, অনেকদিন আগে থেকেই সকলে আমাদের লক্ষ্য করছে, গোপন কিছুই নেই।'

রিয়াবভদ্রী জোড়হাত করে বলে, 'অলগা, তোমার কাছ থেকে একটামাত্র জিনিস চাই, মাত্র একটি—তুমি আমাকে একা থাকতে দাও, তোমার কাছ থেকে এই আমার সব চাওয়া।'

'কিন্তু শপথ করে বল, আজো তুমি আমার ভালোবাস।'

রিয়াবভদ্রী দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'কি যন্ত্রণা! তুমি কি চাও যে, আমি ঐ জলে ঝাঁপ দিয়ে একজীবনটা শেষ করে দিই? আমাকে একা থাকতে দাও। তা না হ'লে আমি যে পাগল হয়ে যাব। দোহাই তোমার, একটু একা থাকতে দাও।'

'মারো, আরো মারো, মেরে ফেল আমাকে।'

কান্দতে কান্দতে অলগা পার্টিসানের পেছনে চলে যায়।

মাথাটা দু' হাতে চেপে ধরে রিয়াবভদ্রী ঘরের মধ্যে পাগড়ারি করতে আরম্ভ করে। খড়ের গাদার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনে।

যাচ্ছে। হঠাৎ মাথার টুপিটা চাপিয়ে, বনুকটা কাঁধে ফেলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ও বেরিয়ে গেলে অলগা বিছানার পড়ে কাঁদে। বিষ থেকে মরতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ে বাড়ির কথা, ডিমভের কথা। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্তে মন কেমন করে।

একজন মেয়েহলে ঘর ঢেকে। বাবার তৈরি করবার জন্তে উম্মেনে আন্তে আন্তে বাতাস করে। দিকি দিকি পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসে, ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় নীল হয়ে ওঠে।

একে একে ওরা ফিরতে আরম্ভ করে। কাদামাথা পারের ছুতো, বৃষ্টির জলে ভেজা মুখ।

দেহাল-টান্ধানো ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ এবং মূর্তিটার পাশের কোণ থেকে মাছির ভন্ ভন্ আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশির তলার মাছির গাদার মধ্যে তেলাপোকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্বয়ং অন্ত গেল। রিয়াবত্বী ঘিরে এলো। টুপিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ময়লা ছুতো পরেই বেশিটার ওপর চোখ বুজ শুয়ে থাকে।

‘আমি ক্লান্ত, আমি শ্রান্ত, আমি অবসন্ন।’

উৎকণ্ঠিতা অলগা ওর কাছে এগিয়ে যায়। তাকে দেখাতে চায় যে, ওর ওপর অলগা রাগ করে নি। ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। চিকণী দিয়ে ওর চুলের গোছা ঠিক করে দেয়।

রিয়াবত্বীর মনে হয় চটচটে কি যেন ওর গায়ে লাগছে। চোখ খুলে চেয়ে দেখে। বলে, ‘এ আবার কি হচ্ছে? আমাকে কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও।’

অলগাকে ঠেলা দিয়ে ও সেখানে থেকে চলে আসে। অলগা লক্ষ্য করে, ওর মুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার ছাপ।

টিক ঐ সময় মেয়েলোকটা থালায় করে খাবার নিয়ে এসে রিয়াবত্বীর সামনে দাঁড়ায়। ঐ কুংসিত মেয়েটা, এই ঘর, এই জীবনযাত্রা আর এই পরিবেশ ওর কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

অলগা নিজেকে অপমানিত বোধ করে। সে আন্তে আন্তে বলে, ‘এখন আমার ঘুরে থাকা ভালো। তু না হলে হয়তো রাগের মাথায় খগড়া করে বসবো। এদব আর আনার ভালো লাগছে না। আমি নিজেই চলে যাব।’

‘কেমন করে, উড়ে?’

‘আজ সাড়ে নটার সময় জাহাজ ভিড়বে।’

‘তাই না কি? বেশ তাই যাও।’

তোমার দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে রিয়াবত্বী নরম স্বরে বলে—‘এখানে তোমার ভালো না লাগবাবই কথা। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে, তোমাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা এসো, বিশ তারিখের পর আবার আমাদের দেখা হবে।’

অলগা জামা-কাপড় গোছায়। মনে মনে ধীরে, ‘সত্যিই তা হলে চললাম। আবার কি নিজের ঘরে গিয়ে বসতে পারবো? ছবি আঁকতে পারবো? বিছানার স্তরে ঘুমতে পারবো? খিরাট একটা বোকা ওর মন থেকে নেমে যাবে। রিয়াবত্বীর ওপর অলগার আর কোন রাগ নেই।

অলগা বলে, ‘হেবুসা, আমার রং ও তুলিগুলো রেখে যাচ্ছি। কিছু যদি পড়ে থাকে খাবার সময় সাজ করে নিয়ে যেরং...। শোন, আমি ন’ থাকতে তুমি যেন কুড়মি করে বসে থেক না, মন দিয়ে কাজ করো।’

রিয়াবত্বী জানতো যে, অ গা এখানে আসবেই। পাছে ডেকের ওপর সকলের সামনে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে হয়, তাই ঠিক ন’টার সময় সেখানে এসে অলগার কাছে বিদায় নেয়। অলগা সিঁড়ি দিয়ে নেমে জাহাজে উঠলো। জাহাজটা ধীরে ধীরে চোখের বাইরে চলে গেল।

আড়াই দিন পরে অলগা বাড়িতে ফিরে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বৈঠকখানার ঢোকে, সেখানে থেকে চলে আসে খাবারঘরে। টেবিলের সামনে বসে ডিমত ছুরিতে শাগ মিচ্ছে। গায়ে একটা সাট, গুয়েক্ট কোর্টের বোতামগুলো ঝোলা, সামনে ডিসের ওপর খাবার রয়েছে।

প্রথমে অলগা স্থির করে যে, ডিমভের কাছে সব কথা চেপে যাবে। কিন্তু ডিমভের ঐ প্রাণখোলা হাসি দেখে অলগার মনে হয় এই সরল আপন-ভোলা মানুষটাকে ঠকানো তার পক্ষে অসম্ভব। হাত ছুঁটোর মধ্যে বুখটা লুকিয়ে ডিমভের সামনে হাঁটু ঝড়ে বসে পড়ে।

# আর্গিকল

## আর্গিকল হেয়ার অয়েল



আর্গিকল, ভূমরাজ, পাইলোকরপাশ  
শ্রুতি ভেদ্য সহযোগে প্রস্তুত। ইহা  
অকালশয়তা ও পতন নিবারক এবং  
কেশবর্দ্ধক ও মস্তিষ্ক শীতলকারক

মহেশ লেবোরেটরীজ  
প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১১

এজেন্টস  
এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
৭৩, মেডানী স্ট্রাভ রোড, কলিকাতা-১  
ফোন : ২২-২৫৩৬

‘একি করছো?’

অলগা ঘাড় তোলো, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। লজ্জা ও ভয়ে কোন কথা বলতে পারে না।

‘না, না, কিছু হয় নি...আমি ঠিকই আছি...’

ডিমভ অলগাকে তুলে ধরে টেবিলের কাছে এসে বলে, ‘নাও—থেকে বসো।’

অলগা নিজেকে হালকা মনে করে। ডিমভ ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে।

৬

শীতের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিমভের সন্দেহ হয়—সন্দেহ হয় যে, বোধ হয় অলগা তাকে প্রতারণা করেছে। সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতো পারে না, যেন সে নিজের দোষী, স্ত্রীকে দেখে সে আর আনন্দে হাসে না। বসন্তা পারে স্ত্রীকে এড়িয়ে বাবার চেষ্টা করে। তাই বন্ধু কোরোস্টেলেভকে প্রায়ই খেতে আসতে বলে। কুৎসিত, বেঁটে, মাথাভর্তি ঝাড়া ঝাড়া চুল কোরোস্টেলেভের। অলগার সঙ্গে কথা কইবার সময় অকারণে জামার বোতামগুলো একবার খোলে, আবার একটু পরেই লাগিয়ে দেয়। ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকে গোঁফ পাকাতো থাকে।

বাবার সময় দু’জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়—‘ডায়াক্রাম্ যখন খুব ওপর দিকে উঠে যায়, প্রায়ই দেখা যায় বুক ধড়ফড় করে, পরে নানাপ্রকার উপসর্গ দেখা যায়।’ ডিমভ বলে, ‘কাল সন্ধ্যার সময় মরা চেরাই করবার সময় সে দেখতে পায় যে, কুগুটা প্যানক্রিয়াস’ ক্যানসারে মারা গেছে, যদিও মৃত্যুর কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিলো রক্তহীনতা।’

মনে হয়, তারা এই চিকিৎসা-সাক্ষাত আলোপ-আলোচনা চালিয়ে যায়—যাতে না অলগা কোন কথা বলার সুযোগ পায়। কেন না, অলগা তো কেবল একরাশ মিথ্যে কথাই বলে বাবে। বাওয়ার শেষে কোরোস্টেলেভ পিরানো নিয়ে বসে। ডিমভ ঠাট্টা করে বলে, ‘আর দেরি করছো কেন? আরম্ভ কর।’

কোরোস্টেলেভ, সোজা হয়ে বসে চড়া সুরে গান ধরে। ডিমভ হাত দু’টোর ওপর মাথা রেখে গভীর চিন্তায় তলিয়ে যায়।

আজকাল অলগা প্রায়ই অন্তমনস্ক হয়ে পড়ে। বাসে বাসে আনমনা মাথামুণ্ডু ভেবে মরে। অলগা ভাবে—‘আমি রিয়াবভ্‌স্কীকে ভালোবাসি না। আমাদের মধ্যে সবসম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। পরমাণেই ভাবে—না, না, রিয়াবভ্‌স্কী আমাকে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ ডিমভ বা রিয়াবভ্‌স্কী দু’জনের একজনও ওর পাশে নেই।’

যারাই রিয়াবভ্‌স্কীর স্টুডিওতে এসেছে তারাই একবারো ওর ছবির প্রশংসা করেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ ছবির সৃষ্টির মূল রয়েছে অলগারই প্রেরণা। যদি অলগার কাছ থেকে ও প্রেরণা না পেতো, তা হ’লে আজ কোথায় তলিয়ে যেতো রিয়াবভ্‌স্কী। আরো মনে পড়ে, শেষবার যখন ও অলগার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ওর গায়ে ছিঁলো সাদা ডোরাকাটা ছাই রঙের একটা কোট, গলার ছিলো একটা নতুন টাই। বৌকড়ানো কালো চুল, নীল চোখ আর ঐ বেশভূষার অলগার ওকে হৃদয় বলেই মনে হ’য়েছিলো।

রিয়াবভ্‌স্কীর কথা চিন্তা করতে করতে অলগা বেশভূষা পাশে স্টুডিওর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। রিয়াবভ্‌স্কী বেশ সহজভাবেই নিজের ছবির সংকে আলোচনা করে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ রিয়াবভ্‌স্কী ঠাট্টার ছলে বেথাদা প্রশ্ন করে বসে। ছবিগুলো দেখে অলগার হিসে হয়—সত্যিই ছবিগুলো ভালো। তবুও মুখ বুজে এসব সহ্য করতে হয়।

এরপর চলে অলগার অমরোথ, উপরোথ, চলে কাতর প্রার্থনা।

স্টুডিও থেকে সে যায় মেজেন্দ্রির কাছে কিংবা থিরাটারের টিকিটের জগ্রে কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করে।

যেদিন রিয়াবভ্‌স্কীকে স্টুডিওর মধ্যে দেখতে না পায়, সেদিন অলগার বাড়িতে আসবার জগ্রে চিঠি লিখে আসে। চিঠিতে লেখে যদি রিয়াবভ্‌স্কী অলগার বাড়িতে না যায় তা হ’লে অলগা বিষ খেয়ে মরবে।

আশ্চর্য! রিয়াবভ্‌স্কী অলগার বাড়িতে আসে, অলগার সঙ্গে দেখাও করে, এমন কি অলগাকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসে। ডিমভের সামনে কোনপ্রকার লজ্জা না করেই ও অলগার সংকে যত্না বলে। দু’জনেই বেশ বুঝতে পারে যে ওরা যে-যার নিজের পাথেই চলেছে। ওদের খেয়াল থাকে না যে, ওদের চালচলন কতখানি দুষ্টিবৃত্তি হয়ে উঠছে আর পাঁচজনের চোখে। এমন কি কোরোস্টেলেভও সব বুঝতে পারে।

‘কোথায় যাচ্ছো?’ অলগা জিজ্ঞেস করে।

লুকুটি করে রিয়াবভ্‌স্কী এমন একজনের নাম করে, যাকে ওরা দু’জনেই চেনে। ওর বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—একটু তামাসা করা, অলগাকে কিছুটা চট্টিয়ে তোলা।

অলগা শোবার ঘরে চলে আসে। বিছানার গুয়ে কাদতে আরম্ভ করে। লজ্জায়, অপमानে, রাগে অলগা বালিশটা কামড়ায়। ডিমভ, কোরোস্টেলেভকে দুই-ক্রমে বাসয়ে রেখে শোবার ঘরে চলে আসে। হতবুদ্ধি, লাজুক ডিমভ, অলগাকে সাহায্য দিয়ে বলে, ‘কৈদো, না, চুপ করো। বেঁধে লাভটা কি? এসব ব্যাপার চোখে বাওমাই ভালো, অন্য কেউ যেন জানতে না পারে...। তুমি তো বোঝ, যা ঘটলো তা আর ফিরিয়ে নেওয়া বাবে না।’

রাগে অলগা কাঁপতে থাকে। মনে মনে ভাবে—সাংঘাতিক এমন কিছু হয় নি, সবই আবার স্বাভাবিক অবস্থার ফিরে আসতে পারে।

অলগা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। চোখে-মুখে জল দেয়। মুখে প্যাউডার মাখে। রিয়াবভ্‌স্কী এইমাত্র যার নাম করলো, সেই বান্ধবীর কাছে ছোটো। সেখানে ওকে দেখতে না পেয়ে আর একজনের কাছে যায়। সেখানেও না পেয়ে ছোটো আর একজনের কাছে।

প্রথম প্রথম এতে অলগার লজ্জা হ’তো। ক্রমে ক্রমে সবই সরে যায়। এখন এসব অভ্যাসে ঝাঁড়িয়ে গেছে। কোন কোন দিন চেনাশোনা যত বান্ধবী আছে, ওর খোঁজে প্রত্যেকেরই বাড়ি টহল দিয়ে বেড়ায়। বান্ধবীরা অলগার এই বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারে।

একদিন স্বামীকে দেখিয়ে রিয়াবভ্‌স্কীকে বলে, ‘ঐ লোকটার

# চুলের সৌন্দর্য তেলের অপচয় নয়

— ২৬ —

তেল চুলের প্রধান  
খাদ্য তাই অন্ততঃ দশ মিনিট  
চুলের গোড়াগুলিতে তেল বেশ ভাল  
করে মালিশ করা উচিত। সামান্য  
একটু যত্নে চুলের সৌন্দর্য যে  
ক্ষণে বর্জিত হতে পারে তা কিছুদিন  
যত্ন নিয়ে অবাস্তব তেল ব্যবহার  
করলেই বুঝতে পারবেন।



## জুবাকসুম



ব্রহ্ম তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১, কলিকাতা-১৬

১, টাকাসাঁলেন, ব্রডওয়ে মার্গ - ১৬

ভালোমানুষী আর আমি সহ করতে পারি না। রিহাবত্বী ও অলগার হেলামেশার খবর যারা ভানে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই অলগা আমীর সম্বন্ধে ঐ কথাগুলো বলে নিজেকে সুখী মনে করে।

পত বছরের মতো এ বছরের নিশ্চলতাও বাঁধার নিয়ম কট।

বৃথকার সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসার বসে। অজিনতা আবৃত্তি করে, শিল্পী ছবি আঁকে, পিরানোবাদক পিরানো বাজায়, গাইয়ে গান করে। ঠিক সাড়ে এগারোটায় সময় খাবার ঘরের দরজা খুলে যায়, ডিমভ, দরজার কাছে ঝাঁড়িয়ে বলে, 'খাবার তৈরি, আপনারা আশ্রয়।'

অলগা নামকরা লোকদের ডেকে ডেকে তোলে, তাদের তদারক করে। পরে অল্প লোকজনদের কাছে যায়।

অলগা রোজ রাত করে বাড়ি ফেরে। দেখে ডিমভ তখনও নিজের ঘরে বসে কাজ করছে। তিনটে বাজলে তবে ডিমভ শুতে যায়, পরের দিন আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যায় থিয়েটার যাবার আগে অলগা যখন আয়নার সামনে ঝাঁড়িয়ে চেহারাটা শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে, সেই সময় ডিমভ শোবার ঘরে ঢোকে—গায়ে পোষাকী কোট, গলার সাফা রংয়ের টাই।

অলগার দিকে চেরে ডিমভ, হাসে—ঠিক আগে যে রকম হাসতো।

বিছানার ওপর বসে ঢিলে পাঁজাঘাটা সোজা করতে করতে ডিমভ বলে, 'আমার প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'উত্তরোত্তর তো।'

'দেখা যাক না।'

আমীর দিকে পোছন ফিরে অলগা মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিম্বিলো। ডিমভ, গলাটা বাড়িয়ে আয়নার মধ্যে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'দেখাই যাক না। খুব সম্ভব 'প্যাথোলজিতে' আমাকে 'ডক্টরেট' উপাধি দেবে।'

অলগা যদি ডিমভের এই সাফল্যের বিছুটা আশীদার হ'তে পারতো, হয় তো ডিমভ তাকে ক্ষমা করতে পারতো। পারতো অতীত ও বর্তমানের সব ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলতে। কিন্তু অলগা না উপাধি, না প্যাথোলজি, কোনটাই বোঝে না। কিছুই বলে না অলগা, থিয়েটার যাবার জন্তে ব্যস্ত সে।

কিছুক্ষণ বসে ডিমভ, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

৭

মাথায় যন্ত্রণার ভুগছে ডিমভ, সকালে সে কিছুই খায় নি; হাসপাতালেও যায় নি। পড়ার ঘর সারাদিন ভরে আছে। রোজ বেঘন বেঘোর সেদিনও বেরিয়ে যায় অলগা।

ওর আঁকা ছবিটা রিহাবত্বীকে দেখাবে, জিজ্ঞাস করবে পবিত্রদিন রিহাবত্বী ওর বাড়ি যান নি কেন? অলগা মনে মনে জানে ছবিটা মোটেই ভালো হয় নি, রিহাবত্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্তে ছল করে একেছে ছবিটা।

বেল না বাজিয়েই অলগা ডেতরে ঢোকে। হসখরের মধ্যে ঝাঁড়িয়ে পুঁথেকে জুতো খোলবার সময়ে, স্টুডিওর মধ্যে বৃহৎ পারের শব্দ ও আমার খসখস আগুয়ান শুনে পায়। ভেতর দিকে তাকাতাই

খয়ের রংয়ের জাঁট চোখে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে চমক লাগিয়ে কালো কাপড়ে-মোড়া ক্যানভাসের পেছনে কে যেন চলে গেল। একটা ঘরে যে ক্যানভাসের পেছনে লুকিয়ে পড়লো, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অলগাকেও যে কতবার ওই পেছু লুকাতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অলগাকে দেখে রিহাবত্বী আশ্চর্য হয়ে বলে, 'খবর কি?'

অলগার চোখ জলে ভরে ওঠে। বেচারী অলগা নিজেকে অপমানিত মনে করে। মেয়েটা লুকিয়ে আছে, সব শুনেতে পাবে। ও থাকতে মরে গেলেও অলগা একটা কথাও বলতে পারবে না। ক্যানভাসের পেছনে ঝাঁড়িয়ে মেয়েটা নিশ্বর হাসছে।

'আমার আঁকা ছবিটা দেখাতে এনেছি'—ভয়ে ভয়ে অলগা বলে।

'ছবি-?'

ছবিটা দেখতে দেখতে রিহাবত্বী অজমমক হয়ে পড়ে, পরে পাশের ঘরে চলে যায়।

অলগাও ওর পেছনে পেছনে চলে আসে।

স্টুডিওর ভেতর থেকে পারের শব্দ হলো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে মেয়েটা চলে গেল। অলগা কঁদে ফলে, ত্যাগত্যাগি ছুটে চলে আসে ওখান থেকে। ছবির কথা ভুলে যায়। নিজেকে বড়ো খেলো বলে মনে হয়।

রিহাবত্বী বিরক্তির স্বরে বলে, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আজ একটা, কাল একটা, পবিত্র একটা...।' আচ্ছা, ছবি আঁকতে তোমার এখনো ভালো লাগে? বিতুকা হয় না তোমার? তোমার মতো অবস্থার পড়লে আমি ছবি আঁকা ছেড়ে গান-বাজনা কিংবা অজকিছু একটা নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতাম। অবজ ছবিটা মন্দ হয় নি। কিন্তু মনে রেখো তুমি একজন গায়িকা, শিল্পী নও।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রিহাবত্বী। অলগা শুনেতে পায় চাকরকে কি যেন বলছে সে। বিদায় নেওয়ার হাত থেকে এড়িয়ে যাবার জন্ত, তার চেহেরে কান্নার হাত থেকে বাঁচবার জন্ত অলগা রিহাবত্বী আসার আগেই ওখান থেকে হুলস্থলে পালিয়ে আসে। কোনরকমে জুতো দুটো পারের গলিবে রাস্তার বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

প্রথমে সে মেয়েজির কাছে যায়। সেখান থেকে যায় 'বারনাই'-এর কাছে, কিছুদিন আগে সে ফিরে আসছে। 'বারনাই'-এর কাছ থেকে যায় বাজনার দোকানে। রিহাবত্বীকে চিঠি লিখে জানাতে ইচ্ছে হয় যে অলগা আজো তার ইচ্ছা হারায় নি। চিঠিতে লিখবে যে আসছে বসন্তকালে কিংবা আপামী ঐশ্বক্যকালে সে ডিমভকে নিয়ে 'ক্রিমিয়ার' বেড়াতে যাবে। অতীতের সবকিছু ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করবে।

অনেক রাত করে অলগা বাড়ি ফেরে। নিজের ঘরে ঢুকে বেশভূষা না-খুলেই চিঠি লেখবার জন্তে বৈঠকখানার চলে আসে। রিহাবত্বী বলেছে যে অলগা আসলে শিল্পী নয়। অলগাও জানাবে যে সেও খুব বড়ো নামকরা শিল্পী নয়। বছরের পর বছর সে একই ধরণের ছবি এঁকে এসেছে—দিনের পর দিন একই কথা বলে এসেছে। যতটুকু সে সুখ্যাতি পেয়েছে ততটুকুই সব—এর বেশি সে কিছু আশা করতে পারে না। অলগার লিখে জানাতে ইচ্ছে করে যে, অলগার সাহচর্য রিহাবত্বীকে যথেষ্ট প্রভাববিত্ত করেছে, অলগার কাছে সে অধী।



আজ সে অলগার প্রতি বিমূৰ্খ, কেন না পাঁচজন তাক বোকা বানিয়েছে—পাঁচজনের মধ্যে ঐ মেয়েটা একজন, যে-মেয়েটা আজ ছবিং পেছনে লুকিয়ে ছিলো।

‘এগিকে এসো একবার’—সরজা না খুলেই পড়ার ঘর থেকে ডিমভ ডাকে।

‘কেন, কি দরকার?’

‘দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাক। আমার কাছে এসো না। দু’দিন হ’লো আমি ডিপথিরিয়া রোগে ভুগছি—। এখন খুব খারাপ লাগছে। কোরোস্টেলেভের কাছ লোক পাঠাও। ওকে ডেকে আমুক। আমি ভালো বোধ করছি না।’ অলগা বেশ ব্যস্তে পাবে যে ডিমভ, পাবে পাবে এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপর শুয়ে পড়লো।

‘ওর কাছে লোক পাঠাও’ দশা গলা ডিমভের।

অলগা মনে মনে বলে, ‘সত্যিই ডিপথিরিয়া নাকি? মহা বিপদ তো!’

অলগা ভেবে ঠিক করতে পাবে না কেনই বা সে শোবার ঘরে এসো, কেনই বা সে বাতি জ্বালালে। কিছুই বুঝতে পাবে না সে। এখন কি করা উচিত।

আরনার ভিতর নিজেব চোখাটার ওপর নজর পড়ে। ফ্যাকাশে হ’ উঠেছে মুখ, চোখে-মুখে ভয় ছাপ। হাতগুলো জামা, সা ন হললে রয়ের আলর, ডোবাকাটা স্বাট’, সবকিছু মিলে এ টা কিছুতকিসাকার জরবিশেষ করে তুলেছে। ডিমভের জন্ত মাঠ’র অলগাব। অলগার প্রতি ৬৩ কি গভীর ভালোবাসা। ওর নিঃসঙ্গ ভাবন, বিশেষ করে ওর ঐ মিষ্ট হাসি—সব মনে পড়ে। চোখে কঁধে ফেলে অলগা। শেষে কোরোস্টেলেভকে জাসবার জন্তা অনুমোদন করে চিঠি লেখে। তখন রাত বারোটো।

৮

অনিয়ন্ত্রিত ক্লান্ত দেহ, অবিকল্পিত চুলব গোছা, মুখে অপরাধের ছাপ। সাতটার কিছু পরেই অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গায়ে সাদাসিধে বেশভূষা।

একটা লোক অলগার পাশ দিয়ে চলবার চলে যায়। মুখে একগাল দাড়ি, বোধ হয় কোন ডাক্তার হবে। ওষুধের গন্ধ ভেসে আসছে। পড়ার ঘর দরজার দাঁড়িয়ে কোরোস্টেলেভ, ডান হাত নিয়ে বাঁদিকের গাঁফে চাড়া দিচ্ছে।

অলগাকে দেখে বলে, ‘মাপ করবেন, আপনাকে ডিমভের কাছে যেতে দিত পারি না। আপনারও ছোঁয়াচ লাগতে পারে, এখান থেকেই দেখুন।’ তা’ ছাড়া ওর কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই। ডিমভ এখন তুল বকছে।

অলগা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, ‘সত্যি ওর ডিপথিরিয়া হয়েছে?’ কোরোস্টেলেভ বলে, ‘আবার যদি ক্ষমতা থাকতো, তা’ হলে এইভাবে বারো নিজেদের মরখকে ডেকে আনে, তাদের প্রত্যেককেই আমি জেলে পুরতাম। জানেন কি, কেমন করে ও ঐ রোগ ডেকে এনেছে? একটা ছোট ছেলের গলা থেকে মুখ দিয়ে পুঁজ টেনে বার করতে গিয়ে—ছেলোটা ডিপথিরিয়া রোগে ভুগছিলো। কি জন্তে ও এ কাজ করলো? জাহা বোকামী, কদিক মানসিক দুর্বলতামাত্র।’

‘খুব কি ভয়ের কারণ আছে?’

‘হ্যাঁ, ডাক্তাররা তো তাই বলেন।’

একজন বঁটে লোক ঘরে ঢোকে। সাধারণ কটা চুল, লম্বা নাক, কথার ইছবি ভাষার টান। ওর পেছনে ঢোকে একজন লম্বা লোক। সারা গা লোমে ভর্তি, মাথা ও কাঁধ সামনের দিকে নোয়ানো। কথাকার চেহারা লোকটার। সব শেষে ঢোকে একজন যুবক—লাল মুখ, দোহারা চেহারা, চোখে চশমা। ওদের সকলেই ডাক্তার, বন্ধুর অস্থানে এসেছে নাসিং করবার জন্তে।

পাঠার দণ্ডায় শেষ হলেও কোরোস্টেলেভ বাড়ি না গিয়ে ভুতের মতো ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ঝি ডাক্তারদের জন্তে চা তৈরি করে আর অনবরত ওজুধের দোকানে ছোটোছুটি করে। তাই অল্প ঘরগুলো কাঁকা কাঁকা মনে হয়।

শোবার ঘরে বিছানার ওপর বসে অলগা আপন মনে ভেবে চলে—স্বামীকে প্রতারণা করার শাস্তি ভগবান আজ দিলেন। শাস্তিশিষ্ট স্বামী আবার কোটের ওপর শুয়ে নীরবে বঠ সয়ে বাচ্ছে আর আমি নিশ্চিতমনে এ ঘর বসে আছি। যদি ডিমভ অভিযোগ করতো, এমন কি বেথোরেও যদি প্রসঙ্গ বকতো তা হ’লে ডাক্তাররাও বুঝতে পারতেন যে, ডিপথিরিয়া একমাত্র কারণ নয় রোগের অন্য কারণও আছে। কোরোস্টেলেভ সব জানে। ডাক্তাররা তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন। কোরোস্টেলেভ জানে যে, বন্ধু-পত্নীই ওর বন্ধুর মৃত্যুর কারণ, ডিপথিরিয়া উপলক্ষ্যমাত্র।

ভলগার ওপর টাননী রাতের কথা তুলে যায় অলগা। তুলে যায় প্রেমের স্বীকৃতির কথা, তুলে যায় চাবার কুঁড়েঘরে হুলোমর জীবন। যে শাপের পাকে সে আপাদমস্তক জুবেছে, সে পাক থেকে অলগা পোনরিনটী নিজেকে মলিনমুক্ত করতে পারবে না—তুচ্ছ মোহের বলে এসবই তার খামখেয়ালী।

রিগারভস্কী ও অলগার মধ্যে যে গভীর প্রেম, সে প্রেমের কথা মনে পড়তেই অলগা আপন মনে বকে—কি মিথ্যাক আমি! এ-প্রেম যেন একটা মজা অভিশাপ।

চারটার সময় অলগা কোরোস্টেলেভকে সঙ্গে নিয়ে বেতে বসে। কোরোস্টেলেভ কিছুই খবর না। অলগাও কিছু খেতে পাবে না। নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, শপথ করে—ডিমভ ভালো হয়ে উঠলে সে স্বামীকে ভালোবাসবে, স্বামীর অব্যাহ আর হবে না।

কোরোস্টেলেভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে—এই প্রকার মুখোশ-পরা বদমেজাজী লোকের বঁটে থাকটাই এক বিড়ম্বনা।

অলগার মনে হয় ভগবানের নির্ভর আশ্বাসের হাত থেকে তার আর কোন পরিত্রাণ নেই। সত্যিই কি স্বামীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলবার জন্তেই সে একটবারও পড়ার ঘরে ঢোকে নি? অলগার মনে হয়—জীবনটা শুধুই দুঃখময়, জীবনের সবকিছু আজ নষ্ট হ’য়ে গেছে। কিছুতেই আর তা ফিরে পাওয়া বাবে না।

খাওয়া শেষ হয়। সন্ধ্যাও হ’য়ে আসে। উইকমে এসে অলগা দেখে—চকচকে সুতোয় কাঁধ-করা সিল্কের বালিশের ওপর লম্বা রেখে কোরোস্টেলেভ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ডাক্তাররা ডিমভের বিছানার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

এসব ব্যাপার তার কিছুই জানে না। উইল্কেম অপরিচিত লোকটার নাক ডাকা, দেয়াল টাঙ্গানো ছবি, অজুত অজুত আদিবাসিত, গৃহকর্তার অবিদ্যুত চুলের গোছা, এলোমেলো বেশভূষা—এসবের মন আকৃষ্ট হয় না।

উইল্কেম ঘিরে এসে অলগা দেখে কোরোস্টেলেড ঘুম থেকে উঠে বসে চুপচুপ টানছে।

চাপা গলায় কোরোস্টেলেড বলে, 'ডিপথিরিয়া বোগের রাজ্যে তার নাকে সক্রামিত হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কপীর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কপীর অবস্থা খুব খারাপ।'

'শ্রেককে ডেকে পাঠান নি কেন?'

'তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, ডিপথিরিয়া নাকে সক্রামিত হয়েছে। তা ছাড়া শ্রেক কে? সত্যি কথা বলতে কি শ্রেক ডাক্তারই নন, আমিও যেমন শ্রেকও যেমন।'

উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কায় মধ্য দিয়ে সময় কাটে।

তদ্রার ঘোরে বিছানার ওপর পাড়ে থাকে অলগা। অলগার মনে হয়—সমস্ত স্রাটিটা, মেঝে থেকে ওপরের সিলিং পর্যন্ত, যেন একটা লোহার চাই। যদি এই লোহার চাইটা কোনরকমে সরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সবকিছুই আবার আনন্দে নেচে উঠবে। হঠাৎ অলগার চমক লাগে, মনে হয় ওটা লোহার নয়। ডিমডের রোগ ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়।

তদ্রার ঘোরে অলগা বলে, 'বন্ধুরা, আজ তোমরা কোথায়? তোমরা কি জানো না যে, আমরা বিপদে পড়েছি? হে ভগবান, আমাদের বাঁচাও, দয়া করো আমাদের।'

নাচের তলার ঘড়টা ঘড়ির ঘড়ির বেজে চলেছে, বাজার যেন শেষ নেই। যখন-তখন বাইরের বেলটা ঘন-ঘন বেজে ওঠে। ডাক্তাররা ডিমডকে দেখতে আসছে। কি ঘরে আসে, হাতে ট্রে, ট্রে ওপর একটা খালি গেলসা।

যি জিজ্ঞেস করে, 'মা, আপনার বিছানা পেতে দেব কি?'

উত্তর না পেয়ে কি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নাচের ঘড়িতে ঘটা বাজার শব্দ হয়। অলগা স্বপ্ন দেখে যেন ডিমডের ওপর বৃষ্টি হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে কে যেন ঢুকলো। কোরোস্টেলেডকে দেখে অলগা বিছানার ওপর উঠে বসে।

অলগা জিজ্ঞেস করে, 'ক'টা বাজে?'

'প্রায় তিনটে।'

'উনি কেমন আছেন?'

'কেমন আছেন। উনি মরতে বসেছেন, সেই কথাটাই বলতে এসেছি।' কান্না চেপে যায় কোরোস্টেলেড। বিছানার ওপর অলগার পাশে বসে জামার আন্তিন দিয়ে চোখের জল মোছে। প্রথমটার অলগা কথাটা দর্শকের মতোই জানে না। কিন্তু পরবর্তীতেই হতাশায় মুগ্ধ পড়ে।

কোরোস্টেলেড, কীদতে কীদন্ত বলে, 'ডিমড' মরছে, নিজেকে উৎসর্গ করে ডিমড মরতে চলেছে। বিজ্ঞানসাহস্রের কি ক্ষাটাই না হলো। আমাদের তুলনায় সে কত বড়ো, সে কত মহৎ! কত বড়ো

ওগো সে, কতখানি 'আশাই' না সে জাগিয়ে তুলেছিলো আমাদের সকলের মনো।'

হাতের মধ্যে হাত রেখে ও বলে চলে, 'হার, হার, কত বড়ো বৈজ্ঞানিক সে হতে পারতো। ডিমড, এ কি করলে তুমি? হা ভগবান!' দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ভেঙে পড়ে কোরোস্টেলেড।

কথা বলার ধরণ দেখে মনে হয় যেন কোরোস্টেলেড, কারোর ওপর চটে কথাগুলো বলছে, 'কি অজুত। এতটুকু মালিঙ্গ নেই ডিমডের ভীষন। বিজ্ঞানের সাধক বিজ্ঞান সাধনার আত্মাহুতি দিতে চলেছে। ব্যক্তিগত উপার্জনের জন্তে তাকে দিনরাত গাধার মতো খাটিতে হতে—সারারাত ধরে করতে হতো অম্মবাদ। কিন্তু কাদের জন্তে? কেউ তাকে রেহাই দেয় নি। আজকের এই শিক্ষিত তরুণ হতে পারতো আগামীকালের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক।'

কোরোস্টেলেড, অলগার দিকে ঘিরে তাকায়। চোখে-মুখে ঘৃণার ছাপ। বিছানার চাদরটা দু'হাতে ধরে রাগে ছিঁড়ে ফেলে, যেন সব লোব এঁ চাদরটার। কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'নিজের দিকে ডিমড, চেয়ে দেখে নি, অপবিত্র তাকে রেহাই দেয় নি। কিন্তু এসব বলে লাভটা কি?'

নিজের ভীষনের অতীত ঘটনাগুলো এক এক করে মনে পড়ে অলগার—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন অলগা বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে যে বাঁদের ও চেনে, বাঁদের ও জানে তাদের তুলনায় ওর স্বামী ছিলো অম্মবাস, সত্যিই মহৎ। সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতি ও সহকর্মীদের প্রতি ডিমডের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে—সকলেই আশা করতো যে ভবিষ্যতে ডিমড নাম করতে পারবে। দেয়াল, সিলিং, আলো এবং মেয়ের কাপটি—সবই যেন ওর দিকে চেয়ে আছে।

কীদতে কীদতে অলগা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় ছুটে চলে আসে বৈকুণ্ঠানার সেই অজুত লোকটার কাছে।

স্বানীকে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কোচের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে ডিমড। কোমর পর্যন্ত কবলে ঢাকা। মুখটা শুকিয়ে উঠেছে। মুখের ঐ মেটে হলদে রঙ এর আগে দেখে নি অলগা। কপাল, জা, মুখের ঐ শ্রিতহাসি দেখে ডিমডকে চিনতে পারা যাচ্ছে।

অলগা স্বামীর বুক ও কপাল হাত দিয়ে দেখে। বুকটা তখনও গরম আছে। কিন্তু কপাল ও হাত দু'টা বরফের মতো ঠাণ্ডা। আধ-ভাবে চোখ বুলে তখনও চেয়ে আছে ডিমড।

অলগা বলে, 'ভুল, সব ভুল। এখনো সবকিছু শেষ হ'য়ে যায় নি, জীবন এখনও সন্দ্র ও মধুর হতে পারে। মনে মনে লশণ করে—জীবনভোর তোমায় পুজা করবো, ভক্তি করবো, শ্রদ্ধা করবো।'

স্বামীর কাঁধ দু'টা ধরে কাকুনি দিয়ে অলগা বলে, 'ডিমড, কথা কও, চেয়ে দেখ। আমি এসেছি, আমি, .. আমি তোমার অলগা।'

অলগা বিশ্বাস করতে চান না যে ডিমড, আর জাগবে না।

ঠিক তখনই বৈকুণ্ঠানার মধ্যে কোরোস্টেলেড যিকে বলছে—'জিজ্ঞেস করার কি বা আছে? দূরতে ঘুরতে গির্জার দিকে বাও, খোঁজ করো ভিখারীরা কোথায় থাকে। তারাই শব্দেই ধূম-মুছে সবকিছু ঠিক করে দেবে।'

অম্মবাদক—ত্রীকৃষ্ণচন্দ্র

• মাসিক বহুমুখী কিশুন • মাসিক বহুমুখী পড়ুন • অপরকে কিনতে আর পড়তে বসুন।



( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

মূলধা দাশগুপ্ত

বাড়িটা যেন নৈশদের রাজ্য।

শিবানীর মনে হলো ও অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে এ বাড়ির লোকগুলি তাবপন আর নড়ে নি চড়ে নি : হাঁটে নি চলে নি। যে যেখানে ছিল সেখানেই প্রস্তবীভূত হয়ে গেছে।

শিবানীকেও যেন বাড়িটা প্রানাব্যুত করে ফেলল।

সে-ও বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গেল। সামনের সোফাটার মাথার হাত বেখে দাঁড়িয়ে হটল নিশ্চল হয়ে। অবশ্য শিবানী এখন আর মোটেই এখানে ঠাঁড়ত না। সোজা তার নিজের ঘরে চলে যেত, যদি না—অরুণকে আদেশ করে আসত দেখা করে যেতে। অরুণের চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে সে তার অপমানের উত্তর দিয়ে যাবে।

ওদিকে শিবানীর দেখা করে যাবার আদেশ শুনে স্কিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে কিছুটা শুক হয়ে বসেছিল অরুণও।

কিথের সে দম্বরমতো দুর্বলবোধ করছিল। সকালবেলার চায়ের পর তার অল্পট্ট আজ এখন পূর্বস্থি থাওয়া জোটে নি। ইন্দ্রনাথ তার ইংরেজ সহযোগীদের সঙ্গে লাঞ্চ বেরিয়ে গিয়েছিল লাঞ্চ টাইমের অনেক আগে। ওর হাতে চাপিয়ে দিয়েছিল অনেক বাজ। ইন্দ্রনাথ ফিরে এলে—তারপর অফিসের ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে নেবে—এই ছিল অরুণের ইচ্ছে। কিন্তু লাঞ্চ থেকে ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবার প্রার সঙ্গে সঙ্গেই আগরওয়ালা এসে মেচেটাকে সঙ্গে নিয়ে। যদিও সে আগরওয়ালার কথার মাঝখানেই উঠে এসেছিল তবু খেতে যেতে পারে নি। আগরওয়ালার উপস্থিতিতেই যদি ইন্দ্রনাথের ডকে প্রয়োজন হয়, যদি ডাক পাড়ে তাই অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। ডাক পড়েছিলও। আগরওয়ালা চলে যেতেই ওর ডাক পড়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথের ডাকের জন্য প্রস্তুত থাকলও, ডেকে যে কথা তাকে ইন্দ্রনাথ বললে সে কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না অরুণ। দিল্লিবিং চেম্বারটার ঈষৎ এদিক-ওদিক করতে করতে ইন্দ্রনাথ বললে,

মিঃ চক্রবর্তী আমি আপনার নামে একটা স্ল্যাট নিচ্ছি। আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।

কথামূলের কোন উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না ইন্দ্রনাথের দিকে। সে তার কথা বললে বিভলবিং চেম্বারের এদিক-ওদিক করা থামিয়ে সোজা হয়ে বসে চেক বই-এর উপর কলম নিয়ে উপুড় হয়েছিল।

কিন্তু অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে বললে, আমার নামে স্ল্যাট! সে বুঝতেই পারলে না কিছু।

ইন্দ্রনাথ মুখটা কিছুটা বিস্মৃত করে বললে, হ্যাঁ। আমার নামে মেবার একটু অম্ববিধে আছে তাই আপনার নামেই নিচ্ছি—কি বলেন।

বাস্। এর চাইতে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করলে না ইন্দ্রনাথ। বা এক কথা তাকে যে দু'বার বলতে হলো সেটাই বেশি ঠেকল কি না তার কাছে কে জানে, থদথস করে একটা বড় অঙ্কের চেক লিখে পাটাতা বই থেকে থমিয়ে অরুণের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, এই চেকটা নিয়ে আপনি চৌরঙ্গী ম্যানসনে চলে যান—এসুণি। আমার গাড়ি নিয়ে যাবেন।

ইন্দ্রনাথ চেক বাড়িয়ে ধরেছে—চেকটা নিতে হলো অরুণকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, মিঃ শিথের হাতে চেকটা দেবেন। তার সঙ্গে যা কথাবার্তা হবার—তা আমার হয়ে গেছে। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি শুধু চেক দিয়ে বাড়ি বাড়ির রসিদটা আপনার নামে ঠিকমত কাটিয়ে নিয়ে আসবেন। দেবি করবেন না। এসুণি চলে যান।

কিন্তু এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ চলে যেতে পারে নি। আর তাকে যেতে না দেখে স্পষ্টই বোকা গেল ইন্দ্রনাথ দারুণ বিস্মিত হয়েছে। ওর নামে স্ল্যাট নেবার আগে এই যে ওর চিত্ত চাওয়া এ তো আর কিছু নয়—ব্যাপারটা ঠিক আমাদের কারু ঘরে ঢোকবার আগে 'আমিছ' কিন্তু' বলে ও-পক্ষের সাগ্রহ আহ্বান সবচেয়ে নিশ্চয়

থাকার এবং নিশ্চয় থেকে অমুমতির অপেক্ষা না করে চুকে পড়ার মতো। অর্থাৎ শুধু একটু জ্ঞানই নিয়ে নেওয়া। তার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে অরুণ আদেশ পালন করতে চলে গেছে এ ছাড়া আর কিছু সম্ভবত ইন্দ্রনাথের মনেও আসে নি। তার কাজে লাগার মূল্য যে কি তা বুঝে না, বৃক্ষে বিগলিত হবে না অরুণ—এত বড় অর্বাচীন ভাবে নি ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের মাথায় তখনও মদের নেশা এবং সে বিষয়ে সে সচেতনও আছে। নিজেকে সংযত রেখে অরুণের দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললে, ‘আপনার কিছু বলবার আছে?’

অরুণও ইন্দ্রনাথের মতই ধীরকণ্ঠে বললে, ‘জ্যাট কে থাকবে?’

যেন ‘থ’ হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ অরুণের কথা শুনে। এমন একটা প্রশ্ন যে অরুণ তাকে করে বসতে পারে, তার দাবী আর অতীত। অরুণের গুটিতায় রাগে, অপমান কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে না ইন্দ্রনাথ। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্র একটা মস্ত প্রশংসনীয় জিনিস আছে, সে সহজে ব্যবহারের ভারসাম্য হারায় না। নেশার মাথার ও বৃত্তকণ বুদ্ধি উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে ঠিক রাখে। নেশার মাথাটা বখন মাতাল কণ্ঠে ‘ইউ গট আউট, ইউ গট আউট’ বলে অরুণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল স্বভাবের তেজ দিকটা তখন তাকে ছোঁর করে চোমারে বসিয়ে রাখল। একটু সময় পরে হাত দিয়ে টেবিল জায়গায় শুণ্ড বসালে চেকটা রাখল।

অরুণ চেকটা নামিয়ে রাখল। এ ছাড়া সে করতেই বা পারে কি। প্রথম থাকার ঘনিষ্ঠ সে ঘরে উঠতে পারে নি, তার নামে জ্যাট নেবার মানেটা কি। বিস্তৃত তারপর বৃত্তে সময় লাগে নি। আজকাল বস্ত্র নোংরাগিরি অস্বস্তিকৃত তো এই নানা নামে-বেনামে ভাড়া নেওয়া জ্যাটবাড়িগুলিই। ইন্দ্রনাথকে অরুণ মগ্ন খেতে দেখেছে। মাতাল হতে দেখেছে। দেশী-বিলাসিতা যে মেয়ে যখন চোখে ধরছে সুবোণ-সুবিধা এবং সমৃদ্ধি মিললে কোয়ার বেটন করে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দেখেছে। কিন্তু জ্যাট ভাড়া করে তাতে মেয়ে নিয়ে তোলা। ইন্দ্রনাথ কি আরো নাচে নামছে। যে লোক দু’দিন আগেও আগরওয়ারা জ্যাটে যাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছে, সে আজ নিজে জ্যাট নিচ্ছে। আগরওয়ারা এই যে আকর্ষণবিশ্বস্ত হাসি দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার এটা তবে এই জয়ের হাসি। ইন্দ্রনাথ বখন ওর হাতে চেক দিয়ে মিঃ স্মিথের কাছে গিয়ে কি করতে হবে, না হবে বসছিল তখন অরুণ এ কথাগুলিই ভাবছিল। শিবানীকে সে খুবই কম দেখেছে। তবু তার চোখের উপর হঠাৎ কিছুদিন যাবৎ শিবানীর শাড়ির উজ্জ্বল আঁচল আসতে-যেতে যে খুশি ছড়িয়ে বাড়ছিল তা ভেদে উঠল। ইন্দ্রনাথের আজ বাড়ি কিয়তের দেরি হবার সংবাদটা যে লে নিজে গিয়ে দেখে নি তার কারণও কিছুটা এই। শিবানীকে সংবাদটা দিতে খারাপ লাগছিল তার। বেদনাবোধ করছিল সে।

চেক ফিরিয়ে দেওয়ার ফলাফল কি হবে অরুণ জানত না। তবে ভাল কিছু যে হবে না, সে তো নিশ্চয়ই। অরুণ দেখল ইন্দ্রনাথ বলম ভুলে নিল। আর একটা চেক লিখল তেমনি একটানে। তারপর চেকটা ফুঁ করে একটানে ছিঁড়ে নিয়ে অরুণের হাতে বি বসলে, আজ মাসের দশদিন। কিন্তু পুরোমাসের মাইনেই আমি আপনাকে দিলাম। মিঃ রায়কে আপাতত আপনার হাতের ক্ষত্র বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন—আচ্ছা।

নিজের কামরায় এসে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল সে। চাকরীটা যাওয়ার খারাপ ভালো কিছুই লাগছিল না তার। চাকরী এটা গেছে আর একটা হবে। আমাদের দেশের চাকরীর বাজারটাকে কি এতই স্থলভ ভাবছিল অরুণ? না, তা ভাবছিল না। বরং চুলভ যে কত, সে কথা সে জানে। কিন্তু ওর সবার সইবে। বিয়ে করে নি। মা, ভাইবোনের বৃহৎ পরিবারের বোঝা বাড়ি চাপিয়ে বাবা চোখ বোজেন নি। বরং বোন কটার ভালো বিয়ে দিয়ে, মার বোড়শ শ্রাদ্ধ নিজ হাতে করে এবং নিজের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থার সঙ্গে উপরন্ত ওর জন্ত গোট দুই বাড়ি রেখে চোখ বুজেছেন। বড় রকমের কিছু নয় কিন্তু এখন পর্যন্ত একার পক্ষে যথেষ্টই বেশি সংস্থান রয়েছে ওর। তাই চাকরী যাওয়া নিয়ে সে কিছু ভাবছিল না। ববু সে কিছু ভাবছিল। মিঃ রায়কে ডেকে কাজ বুঝিয়ে বোবার আগে সে যে কেন এতক্ষণ চুপ করে বসে রইল তা অরুণের কাছেও স্পষ্ট নয় কিন্তু সে যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল তা সত্য। দীর্ঘদিন বাদে অবস্থা ওর এখনকার এই ভাবনাটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে ওকে ভীষণ অবাক করে দিয়েছিল কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা—অনেকদিন পরে হবে। এখন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে তারপর মিঃ রায়কে ডেকে সে তার হাতের কাজ বুঝিয়ে দিল। মিঃ রায় অনেক দিনের লোক। পাকা লোক। কেবল বললেন, আপনার একজ বো বেশিদিন টিকবে না আমি জানতাম। একটা ভালো এম-এ ডিগ্রী রয়েছে—কোথায় প্রফেসরি নিয়ে, বইপত্র নিয়ে থাকুন গিয়ে। মনের স্রব্ধ থাকতে পারবেন মশাই। যার যে কাজ।

মিঃ রায়কে কাজ আর কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতেই পাঁচটা বেজে গেল। এর ভেতর আর তার খাওয়ার কথা, দ্বিধার কথা মনেও পড়ে নি। এখন বখন পড়ল তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। সবাই চলে গেছে। ক্যাফিন প্রার বন্ধ হবার মুখে। আর ক্যাফিনে গিয়ে বসে খাবার ইচ্ছেও তার ছিল না। অরুণ বখন অফিসের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে—ইন্দ্রনাথ তখন নিজের গাড়ি বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে আগরওয়ারা গাড়িতে উঠেছে। অরুণকে দেখে ইন্দ্রনাথ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। যাকে কঙ্গুলী ভেলনে এটমাত্র ভাড়িয়ে দিয়েছে, তাকে দেখে অপ্রস্তুত—ইন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাড়ি যাচ্ছেন? শে, তত—মিসেস সেনকে গিয়ে বলবেন, আমার ফিরতে আজ একটু দেরি হতে পারে।

এই সংবাদটা শিবানীকে দেবার ইন্দ্রনাথের কোন প্রয়োজন ছিল না; ইচ্ছেও ছিল না। কিংবা তার চাইতে বলা ভালো—সাহসই ছিল না। কিন্তু ওই যে সাহস ছিল না তাই সাহস দেখাল সে অরুণের কাছে। অরুণের কাছে কেন দেখাল? কারণ ওরই কাছে যে অপ্রস্তুত বোধ করছিল সে।

অরুণ মনে মনে হেসেছিল। মানুষের অহমিকাটা কি অদ্ভুত চিত্ত। বাড়ি এসে স্ট্রটকেনে ভিনিসপজ শুভিয়ে একটা কার্ট-বোলানো ব্যাগে টুকিটাকি ভরে রেখে সে গিয়েছিল শিবানীকে খবরটা দিতে এবং কিছু খেয়ে নিতে। খেয়ে নিয়েই সে বেরিয়ে পড়বে পুরী গাড়ির উদ্দেশ্যে। ঠিক কটার গাড়িও জানে না। তবে সন্ধ্যার পর আটটা-টাটটার গাড়িটা ছাড়ে এটা সে জানে। তার ঢের সময় আছে। এখন তার সব আগে দরকার কিছু খেয়ে নেওয়া।

## হৃদয় পাতে

কিন্তু ওকে খেতে দিল না শিবানী। মুখের গ্রাস নমিয়ে, সামনের খাবার ক্লেসে ওকে উঠে যেতে হলো শিবানীর সঙ্গে। তারপর চা-খাবার আর একবারও এসেছিল তার ভাগ্যে। ললিতা পাঠিয়ে দিয়েছিল গাড়িতে। সে তখন অসহ্য গরমে গাড়িতে টিকতে না পেরে রাস্তার মেঝে পায়েচাষি করছিল আর ক্ষুব্ধ তড়ানার বিশেষ খাতবস্ত্র চোখের উপর প্রত্যক্ষ করছিল। এমন অবস্থায় হাতের কাছে খাবার—কে ডাইভার ভেবে গাড়িতে খাবার পাঠাল, আর গাড়িতে বসে খেতে দেখে কারা ওকে ডাইভার ভাবল এ নিয়ে মাথা ঘামাত না অরুণ। সে ঠিক খেয়ে নিত। কিন্তু মুশকিল হলো, এই যে আরো ক'টা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তার ডাইভাররা নেমে এখানে-ওখানে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—তারা কেউ ওকে ডাইভার ভাবছে না। এইমাত্র একজন এসে ওকে সাঁ'ব সম্বোধন করে একটা ইংরেজী টিকানা পড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ অবস্থায় সাঁ'ব তো বাইরে গাড়িতে বসে খাবার খেতে পারে না।

সমস্ত দিন অনাহারে দুর্বলবোধ করছিল অরুণ। এ-বাড়ির ব্রেকফাস্টটা অত্যন্ত ভালো তাই বিকেল পর্যন্ত একরকম চলছিল কিন্তু এখন আর চলছে না। শিবানী ওকে তার সঙ্গেই দেখা করবার আদেশ করে গেলে অরুণের মনে হলো বাবে না। গাড়ি থেকে নেমে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকবে। স্ট্রাকেশ আর ব্যাগ তুলে নিয়ে চলে বাবে সোজা হাওড়া। তারপর এ-পরিবারের সাথে বিশ্ভারবার সাক্ষাত ঘটবার কোন কারণ নেই। অত্যাচারের একটা সীমা আছে। হ্যাঁ, ও পালাবে। পুরী এক্সপ্রেস চলে গেছে—তা চল যাক। পুরী প্যাসেঞ্জার তো রয়েছে। ওটাতাই উঠে পড়বে সে।

গাড়ি থেকে নেমে সে তার আউট-হাউসের দোতলার নিজের ঘরটার দিকেই তাকাল। কিন্তু স্ট্রাকেশ হাতে নিয়ে সে পালিয়ে যাচ্ছে—দৃষ্টান্ত বজ্রনা। করতেই তার ভারি হাসি পোয়ে গেল। যদি শিবানী দেখতে পোয়ে, এই দারোহান উস্কে পাকড়ো পাকড়ো বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে ফেসল অরুণ।

দুটিটা ঘরের ভেতর ছড়িয়ে দিয়ে অরুণ গিয়ে দাঁড়ালো শিবানীর সামনে।

শিবানী নিজের দাঁড়িয়েছিল।

অরুণকেও বসতে বললে না। চাখ-মুখ বিজ্ঞপে ছাপিয়ে তুলে বললে, আপনার মতো বিশ্বস্ত অমুচর মি: সেনের আর ক'জন আছেন বলতে পারেন?

শিবানীর কথা শুনে অরুণের চোখের দৃষ্টিটা ঘেঁষকম হয়ে উঠতে চাইছিল এবং যেভাবে গিয়ে সে দৃষ্টি শিবানীর মুখের উপর পড়তে চাইছিল তা সংবরণ করল অরুণ। যেমন ছড়ানো ছিল দৃষ্টিটা তেমনই ছড়ানো রেখেই বললে, আমি নতুন এসেছি তাই বলতে পারছি নে।

তবে পুরোনো হোন। জাহ্নন। কেনে আমাকে বলবেন। আমি সবাইকে পূরিত্ত করব। আর তার প্রথম পূরিত্তারটা হবে আপনার প্রাণ্য।

বিশ্বস্ততার প্রথম পূরিত্তার আমি থাকতে আর কক্ষির পাবার উপারও নেই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে পূরিত্তার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না।

এমন অভিযুক্তিহীন মুখে এবং কঠে অরুণ কথাগুলি বললে যে, সে পরিহাস করলে, না সত্য সত্য বললে বোঝাই গেল না। অরুণের অবস্থা আরো একটু ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল বলে, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার হাত থেকে সে পূরিত্তার নেবার সৌভাগ্য আমার হলো না। কিন্তু 'আপনার হাত থেকে' কথাটা সামলে নিল। শিবানীর শাপান বিজ্ঞপের উত্তরে যে বিজ্ঞপ করবার তীব্র বাসনা তার জেগেছিল, সে বাসনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে ওঠা সংবরণ করার মতোই, সংবরণ করলে।

অরুণের কথা শুনে তখন কিন্তু শিবানীর জিহ্নভরা চোখের কোণে বিষম দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে বিষমটাকে সে স্পষ্ট হতে দিলে না। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, কেন হবে না?

মি: সেন আমাকে জবাব দিয়েছেন। আমি চলে যাচ্ছি।

এবার শিবানীর দু'চোখের একুণ-ওকুণ হুসু ছাপিয়ে বড়টা বিষম হলে উঠতে চাইল ভড়টা। বিষম ফুটতে দিলে না সে। বিষমের পাশে বিষমের বোধে বোধে গভীরকণ্ঠে বললে, আপনাকে, জবাব দিয়েছেন মি: সেন?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি যদি আপনার কাজ করতাম হুসে ডেকে কথা না বলে একুণ আমাকে তাড়াতেন।

তার নির্দেশ শোনেন নি আপনি?

আমার পক্ষে 'শান' স্তম্ভ ছিল না।

শিবানীকে নীরব দেখে অরুণ বললে, কাজ দিয়ে আপনাকেও সন্তুষ্ট করতে পারলাম না, মি: সেনকেও না; সেজ্ঞা আমি সন্তি হু:খিত।

মি: সেনকে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট কেন যে আপনি করতে পারলেন

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগিরীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারেন একমাত্র

**বাক্সা**

বহু গাছ গাছফুল দ্বারা শিশুকে মতে প্রস্তুত

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আত্মগোপ্য লাভ করেছেন

তারক গাছ রোজি নং ১৬৮৩৪৪

অসুস্থল, শিশুসুস্থল, অসুস্থপিত্ত, লিভারের ব্যাধা, মুখে টকভার্ক, চেহুরে ওঠা, নমিডাশ, বাসি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাশি, বুকজ্বালা, জ্বাছায়ে অরুণি, বসন্তশিখা ইত্যাদি রোগ হাত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তারাও আশ্চর্যজনক সেরা করে সবজীবাশ লাভ করবেন। শিশুকে মূল্য ফেরৎ। ৩৮৪ গ্রাম প্রতি কৌটা ৩০ টাল, এককো ৩ কৌটা ৮০০ নং ডা. মা. ও পাইলটের পুথক

**দি বাক্সা ঔষধালয়। ১৪২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।**

(হেড অফিস - অসুস্থপিত্ত, পুথক পাঠিকালয়)

না সেটাই তো আমার আশ্চর্য ঠেকছে। এতক্ষণ তো তাঁর খুশি হওয়ার মতো অনেক কান্না করছেন আপনি আমি দেখতে পেলাম। কি নিঃশব্দে মিং সেনের বিফলচরণ করেছিলেন আপনি ?

অরুণ চুপ।

শিবানী বুঝলে এঞ্জিয়ার্সার জবাব মিলবে না। যেমন মেলেনি ইন্দ্রনাথ কোথায়, সে জিজ্ঞাসাবাদ জবাব। অপমানটা আবার আবার করলো। আবার দু'চোখে বিদ্রোহ ঘনিষে এলো। কঠিনকণ্ঠে বললে শিবানী, আপনি প্রথমেই বলেন নি কেন আপনার চাকরী চলে যাবার কথা ?

আজ মাসের দশ তারিখ। মিং সেন মাইনে দিয়েছেন পুরো মাসের। আমি এখনও আপনারদের কর্মচারী। যতক্ষণ আছি যা আদেশ করবেন অবশ্যই আমি পালন করতে হবে।

না, এ লোকটার সঙ্গে সে পারলো না। ভেতরটা হতাশায় ঘন হাত পা ভেঙে পড়ল শিবানীর। এর সঙ্গে আজ তার পুরো হার রয় গেল। কিন্তু মুখে সে রক্তকণ্ঠেই বললে, আচ্ছ, যেতে পারেন আপনি।

অরুণ চলে গেল।

শিবানী দগল বারান্দার বেগিয়েই অরুণ হাতের কজি উঠে ঘড়ি দেখে নিল।

নিজের ঘরে এসে বসে ভাবলে শিবানী অরুণ এমন কি কাজে আদিষ্ট হয়েছিল যে সে আদেশ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ?

ইন্দ্রনাথ কি চুকুম করেছিল তাকে ?

কি কাজ করতে চেয়েছিল সে তাকে দিয়ে ?

ও জানে না। অরুণ গুকে বলে নি।

কিন্তু তবু সে কথা জানে শিবানী। ঘটনার ইতিবৃত্তি না জানলেও বোঝা যা যা় তা জানার চাইতে এতটুকু কম হয় না। একটি ভদ্র ডিসেন্ট ছাত্রের পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব নয় এমনি কিছু করতে বলেছিল নিশ্চয়ই ইন্দ্রনাথ অরুণকে।

স্বামীর লজ্জায়, নিজের লজ্জায় কেমন যেন ছোট লাগতে লাগল শিবানীর নিজেকে অরুণের কাছে। ওরা দু'জনই যেন ভীষণ নীচ প্রমাণিত হয়ে গেছে তার কাছে। অল্পচেষ্টা আর নিবিচার অজ্ঞাপালন অরুণের দ্বারা সম্ভব হয় নি বলেই যে তার পক্ষে সম্ভব লো না ইন্দ্রনাথের চাকরী বজায় রাখা, এ বুঝতে আর শক্তটা কি।

হার ভগবান! বিখ্যাত অরুণের সহচর বলে গালাগাল করে, বিদ্রোহ করে এই লোকটাকে অপমানিত করতে গিয়েছিল সে।

এতক্ষণ শিবানী ভাবছিল তাকে নাজেহাল করেছে অরুণ। এখন ভাবলে অরুণকে নাজেহাল করেছে সে। লোকটার চাকরী গিয়েছে। কে জানে বেচারার বাড়ির অবস্থা কেমন। হয়ত মনে উদ্বেগের অস্ত নেই। কাচি বলেছিল, ম্যানেজারবাবুর সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি। নিশ্চয়ই মনের অবস্থা এমন যে লোকটা খেতে পারে নি। তারপর সমস্ত দিন শেষে এসে খেতে চেয়েছিল—খাবার প্লেট সামনে টেনে মুখে খাবার তুলেছিল মাত্র। ও তাকে প্লেট থেকে টেনে তুলে 'গেছে। লগিতাদের বাড়িতে গাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিতে

গোলে নি। সে খাবার ফেরৎ আসতে দেখেও নীরব থেকেছে। জেনেসন্তে জুখার্ত লোকটাকে নিষ্ঠুরের মতো উপোস রেখেছে—আজ সে নীচতার শেষ সীমায় চলে গিয়েছিল যেন। লোকটা আজ সমস্ত দিন উপোসী—ভেতরটা ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানীর। কাচিকে ডাকল সে। কাচি এলে বিরক্তভরা কণ্ঠে বললে, তোরা সব কোথায় রয়েছিস ? দেখাই নেই ? রাত দশটা বাজে—খাওয়া-দাওয়া হবে না ?

তোমাকে খেতে দিতে বল ?

হ্যাঁ বলবি—ম্যানেজারবাবু কোথায় থায় ?

তাঁর ঘরে।

তাঁর খাবার দেওয়া হয়েছে ?

দেখে আসছি।

একটু বাদে ফিরে এসে কাচি জানাল, ম্যানেজারবাবু চলে গেছেন।

চলে গেছেন !

হ্যাঁ। প্র্যাকটিক্যাল ব্যাগ কিছু নেই।

খেয়ে গেছেন ?

না। বাবুটি বলল সে খাবার নিয়ে গিয়ে দেখে ম্যানেজারবাবু নেই।

শিবানীর মনে হলো, বিশ্বের জনারথ্যা যেন একটি খাঁটি লোক কাছে পেয়েও আবার হাবিয়ে ফেলল। আর একে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[ক্রমশঃ]

 *Super craftsmanship*  
in  
**JEWELLERY**

**ROY COUSIN & CO.**  
JEWELLERS & WATCHMAKERS  
4, DALHOUSIE SQ. EAST, CAL. - I

নিজের অদৃষ্টকে বারে বার ধিকার জানায় তিনি। সংসারের সকাল থেকে রাত্রি অবধি একটানা পরিশ্রমে মন তার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অধিক স্বচ্ছলতা যদিও বা থাকতো, তবুও মনে শান্তি থাকতো। তাও নয়। সংসারের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। তা থেকে একটু ব্যতিক্রম ঘটলেই মুশ্কেল পড়তে হয় তিনিমাকেই। নিত্যদিন এ আর ভালো লাগে না। স্বরণন তো এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। মাসের প্রথমে নিয়মমত মাইনেটি এনে তিনিমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত, আবার বলে কি না, 'এ বোঝা আমার নচে, তোমার'। এবার যত দায়-দায়িত্ব তিনিমা বুঝবে। কোনটাই তো বাদ দেওয়া চলে না, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেই তো চলে যায় স্বরণনের আরও এক-চতুর্থাংশ তারপর সবই বাকি, দশ তারিখ অবধি শুধু টাকা দেবার পালা চলে। নিজস্ব সংসার সব কিছু বিসর্জন দিতে বসেছে তিনিমা। আজ আর কিছুটা ভালো লাগছে না। মনটা তিক্ত অবসাদে ডুবে গিয়েছে। স্বরণনের ওপর রাগ তত বেশি হচ্ছে। আজ একটা বোঝাপড়া সে করবেই।

নিশ্চয় ছুপুরে প্রান্ত মন নিয়ে একটা খোলাই হাতে বসেছিল তিনিমা। হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে মরজা খুলে সামনে মল্লিকাকে দেখে বিম্বের হতবাক হয়ে যায় তিনিমা। দশ বছর পর দেখা, কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি মল্লিকার। পুরান খি হুট-এর মুর্শিদাবাদ শাড়ি, কালো ব্লাউস, চোখে চশমা, হাতে বালা আর ঘড়ি। ছিপছিপে দেহ, সন্দর মুখ। হঠাৎ দেখলে তরুণী বলে ভ্রম হয়। মল্লিকা যে তিনিমারই সমবয়সী, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না তখনো।

—কি রে চিনতে পারছিস না নাকি? তিনিমার চমক ভাঙায় মল্লিকা।

—মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে আসে তিনিমা।

—আমি কখনও বলনা কি নি মলি, তুই আসবি গরীবের কুড়োঘরে। খুশির আতিশয্যে তিনিমা বলে।

—থাক থাক আর ভুলতা করতে হবে না। বাধা দেয় মল্লিকা।

কক প্রসঙ্গ একসাথে মনে জাগে তিনিমার। একটু বলেছে পড়তে। দুজনে একটু চিন্তামাত্রা ছিল তুই তরুণী-মনের, আর আজ? কত প্রভেদ দুটি নারীর জীবনধারায়। তুই বছর বলেছে পাড়বার পরই তিনিমার বিয়ে হয়ে যায় তারপর মাঝে দু'একবার দেখা হয়েছিল মল্লিকার সাথে, কিন্তু এবারের দেখা দীর্ঘদিন পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে মল্লিকা একটি মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছিল। স্বাধীনভাবে জীবনধারণ করবার বাসনা পোষণ করতো মল্লিকা, প্রতদূর খবরটী জানা ছিল তিনিমার। তারপর এতদিনের বিচ্ছেদে সে সবটী ভুলতে বসেছিল। তিনিমার ছোট ছেলে বাণী ঘুম থেকে উঠে এসে অপরিচিতাকে দেখে মাক জড়িয়ে ধরে।

মল্লিকা বাণীকে আদর করে বলে—কটি ছেলেমেয়ে?

তিনিমা মুহূর্তে জবাব দেয়—তিনটি, দুটি ছেলে একটি মেয়ে, বড় দুটি ছেলে গেছে।

মল্লিকা তিনিমার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। সমস্ত বাড়িটিতে যেন লক্ষ্মীপ্রীতি বিরাজ করছে। তিনিমার কলাগন্ধের স্পর্শ চারিদিকে স্পষ্ট। সোফা-কৌচ, রেডিরোগাম আলমারীতে ঘর ভরা নেই, চোখ বলগানো বস্ত্রও কিছু ঘরে নেই, কিন্তু চোখ ছুড়ায় মন ভরে যায়। যেখানে বা আবশ্যক তাই দিয়ে যেন সাজানো সংসারটি। বাড়ির সামনে ছোট একটি ফুল বাগান, নানাবর্ণে ঝরে সুরভিত হয়ে আছে। সবুজ কটি ডালপালাগুলো সজীব জীবন্ত হয়ে হাওয়ায় দুলছে। এই শ্রদ্ধা মনোহর পরিবেশের স্পর্শে মল্লিকার বিজ্ঞ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, হাহাকার করে ওঠে মন। নিজের অধ্যাপনার দৃঢ়ত্ব যেন শিথিল মনে হয়। তিনিমা আগের চেয়ে রোগী হয়ে গেছে কিন্তু মাতৃহৃদয়ের কমনীয় লাবণ্য ওর সারা অস্থি জড়ানো, অতি সাধারণ আটপোরে পোষাকেও তিনিমাকে অপূর্ণ লাগে মল্লিকার গোঁথে। নিজের দ্রুত স্থান যেন ছাড়া হয়ে।

এটা তারও জীবনে বদান্তর আবির্ভাব হয়েছিল বৈ কি, তবে সে বড় স্বপ্নদর্শনের জগ্রে। অকণাভুক্ত সে বিশ্বাস করেছিল, বিদেশ যাত্রার দিনে বিদায়ের ক্ষণে মল্লিকার হাতটি গভীরভাবে ধরে ধরা গলার বলেছিল নবীন ব্যারিষ্টার অরুণাভ মিত্র—আমার পাশে তুমি না ঠাঁড়ালে ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার জীবন, কথা দাঁড় মলি—কর্ত্তে কি গভীর ব্যাকুলতা ছিল, দৃষ্টিতে ছিল আশ্বাস।

সেদিন মল্লিকার চোখের পাতা ভারী হয়ে গিয়েছিল, ছলছল চোখে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু তার সবটী ভুল। সবই ব্যর্থ। উচ্চশিক্ষার জগ্রে বিদেশ গেল অরুণাভ, সে শিক্ষা নিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধলো বিদেশিনীকে জীবনসঙ্গিনী করে। মুছে গেল তারই মুখোপেক্ষিনী প্রেমশ্রী মল্লিকাকে। ভুলে গেল আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত সমাজকে, অল্প মাত্র সেখানেই সে রয়ে গেল। এ খবর পাবার পর মল্লিকা একেবারে মুহূর্তে পড়েছিল, সমস্ত পুঙ্খ জাতটার ওপরই যুগায় বিধেয় মন ভরে গিয়েছিল। না না, তার সে ওপথে যাবে না, নিজে স্বাধীন স্বাবলম্বীভাবে জীবন কাটাতে, কারোও সম্পর্কে নিজেই সে জড়াবে না। তার মনের এই গোপন ক্ষতটি কিছুতেই শুকাতো পাবে না, বসে ছালা, বসে বাখা কাকে বোঝাবে সে। গলাটা শুকিয়ে আসে মল্লিকার, তিনিমার কথায় তথ্যবস্তু লাগে।

—কি রে, কি অত ভাবছিস? কত সহজ প্রশ্ন তিনিমার।

—কই, কিছু না তো। বোকে দেখে বড় ভালো লাগছে রে তহু। ছেলেটাও ভারি সুন্দর।

তিনিমা অমুযোগ করে—তার খবর কি বল? বিয়ে যে করিস নি বুঝতেই পারছিস, সারা জীবন কি এইভাবে কাটাবি?

মল্লিকা বসিকতা করে বলে—কি আর করি বল, মনে মনেই পোলায় কই? অন্তরের বেদনা গোপন করে।

—এখনও সময় আছে, তোর মত কি?

—বড়ো বয়েসে আর ও-প্রশ্ন কেন? নিজে স্বাদীনভাবে জীবন কাটাৰ ব'লে বিয়েতে অমত ছিল, এখন সে সময় পেরিয়ে গেছে—যাক জীবন এমনি করেই কাটিয়ে দেব। এখন ছুটিতে ছাছি, এখানে চেঞ্জ এসেছি। কোলকাতার তোর দাদার সংগে দেখা হয়েছিল সেখানেই তোর ঠিকানা পেলাম, একটু থেমে আবার বলে মল্লিকা—মা বাবা মারা যাওয়ার পর নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ লাগে, দাদারা বিদেশে, দিদি স্বস্তুর বাড়িতে, এত সম্পত্তি নিজেই বা আমি কি করব, এট দেখ না, টাইফয়েড হয়েছিল, বাড়িতে কেউ নেই, নাসিং হোমে যেতে হয়েছিল।

নাসিং হোমে? চমকে ওঠে তনিমা। সামান্য ক্রম্বে নাসিং হোমে যেতে হয় মল্লিকাকে, ওখানের ডাক্তার নাসিংদের কোনও মায়া-মমতা থাকে নাকি? শুধু কর্তব্য ছাড়া ওরা কিছু জানে না। গতবছর তনিমার অস্থখে কি অস্বস্তি সেবা শুকনাই না করেছিল স্বরঞ্জন। মারের পরে একমাত্র এই মামুখটিই এত পরিচর্যা করেছিল তনিমার। এমন দরদ দিয়ে তার কেউ সেবা করতে পারে বলে তো মনে হয় না।

স্বল্পকালের মধ্যেই মল্লিকার মানোবেদনার অনেক কথ জেনে ফেলে তনিমা। রূপ, বশ, অর্থ প্রতিপত্তি কোনও কিছুইই অল্লাব নেই মল্লিকার জীবনে, অল্লাব শুধু মনোব। সেখানে শাস্তি নেই, শাস্তি নেই সহ্যবৃত্তি জ্ঞানাবার কোনও মামুখ নেই। অকপাভ মিত্রের নাম উল্লেখ করে না মল্লিকা। বহু—বাইয়ের পিচাবে আমি সর্বস্বী, কিন্তু অস্বব আমার বিস্ত, শূন্য। তুই ভাই মনের মত সঙ্গী পেরেছিস, তোর 'মনোব খবরের জগ্রে একজন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে, সকলের ভাগ্যে তো সব স্নহ নয় না কি বলিস?

শেখের কথাগুলো তনিমার কানে বায় না, মনে পড়ে স্বরঞ্জন কতবার বলেছে—তোমার চোখের মধ্যে আমি তোমার মন দেখতে পাই। ছিঃ! ছিঃ! এত সৌভাগ্যকে সে উপেক্ষা করতে চাইছিল সামান্য একটু আর্থিক টানাটিনিতে, চৈতন্য জাগে তনিমার।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর মল্লিকা উঠে পড়ে। তনিমা রাগ করে।

—বারে এতদিন পর দেখা, একটু মিষ্টি মুখ না করেই যাবি? কণ্ঠে অভিমানে।

—না রে এখন একটু নিঃশব্দে ছাছি কি না সেজ্ঞা। অজ্ঞান এসে তোর রান্না খেয়ে যাব।

তনিমা সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়, নিজের হাতে তৈরি করা মিষ্টি-খাবার এনে দেয়—বলে এ খাবার তৈরি এতে কসুখ হবে না।

পরম তৃপ্তিতে মল্লিকা সবই গ্রহণ করে।—চমৎকার হয়েছে ভাই, আমার একক জীবনে এসব স্বশাস্ত্র খাবার স্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত। চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মল্লিকার কণ্ঠ থেকে।

আবার একদিন আসার প্রতিশ্রুতি জ্ঞানিয়ে বিদায় নেয় মল্লিকা। অপরাহ্নের বেলা পড়ে আসে। তনিমা নতুন উৎসাহ নিয়ে সংসারের কাজকর্ম শুরু করে দেয়। ছেলোমের স্কুল থেকে ফিরবে, স্বরঞ্জন অফিস থেকে। ঝি উনানে আশ্বিন ধরিয়েছে, সারা ঘর শোঁচায় ভরে গিয়েছে তব এখন একটুও বিরক্ত হয় না তনিমা। মল্লিকার ব্যথা তনিমা অনুভব করে। ধনী বক্তা কপসী বিধবা মল্লিকার মন কি না বিস্ত। তার তুলনায় নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হয়। রাত্রে শোবার স্বরে গিয়ে তনিমা নিদ্রামগ্ন সন্তানদের মুখগুলি শ্রোণ ভরে অতৃপ্ত নয়নে বারে বারে দেখে।

স্বরঞ্জন বই পড়ছিল, তনিমার সাড়া পেয়ে রসিকতা করে বলে—  
কি গো রাণী কাজকর্ম সারা হল?

অজ্ঞান দিন হলে তনিমা রাগ করতো, ছ'—একটি কথা বলতে ছাড়তো না কিন্তু আজ নতুন করে তার মনে পরিপূর্ণতা এসেছে দারিদ্র্যের জগ্রে যেটুকু ক্ষোভ ছিল, তাও মুছে গেছে মল্লিকার আশার পর। সারা মন আজ ভরে গেছে পরম শাস্তিতে স্বরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে মনে মাথা নীচু করলো তনিমা।

## চাইবো বা মা

### শ্রীমতী বসুমতী চট্টোপাধ্যায়

সেদিন যখন তোর কাছে 'মা'

চাইলাম গো চিনি

তুই বললি; ভাত খেয়ে নাও,

ভাত খেয়ে নাও মিষ্টি বিনি

কতদিন যে পাই নিকোঁ মাছ।

আজ কেন গো দিস নিকোঁ আঁড়?

আজকে আমার বড় পিড়ে

খেতে দেগোঁ ভাত।

ও কি! চোখে কেন দিস চাপা—

তোব ঐ নিরাভরণ হাত?

কঁদলি এমন অকোঁর করে।

ছেলে বুঝি তোর গোছেই মরে।

চূপ কর মা আর কখন—

চাইবো নাকোঁ ভাত

চোখের ওপর দিস নে চাপা

তোব ঐ নিরাভরণ হাত।

## বিগত বাহিকা

### শ্রীমতী রমা মুখোপাধ্যায়

ঠাঁৎ তুপের বৃষ্টি অঝোর অঝোর,

ঘরবন্ধ পরে বসে আছি মনস্থির;

আজ আর কোথাও না শুধু রব ঘরে,

অবিরাম বৃষ্টি বয়ে শেওলায় পরে;

হারায় অঝোর মন চিন্তার রথ,

মনে পড়ে বহুদূরে ফেলে-আসা পথ;

কোথায় ঝড়ির গুহা জ্যোৎস্নার ঘট,

বিশ্বস্তির লুপ্ত পাট আঁকা দৃশ্যপট;

ক্রমে ক্রমে লুপ্তপ্রায় অজস্রা ইলোরা,

আধুনিক সভ্যতার পাশ্চাত্য ইসারা

অর্বাচীন বলে সবে বুদ্ধিবাহে ক্ষমা,

গ্রামাণ ছ' চোখে ভাসে পল্লীর প্রতিমা।



## বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

### আমেরিকার কলকাতা

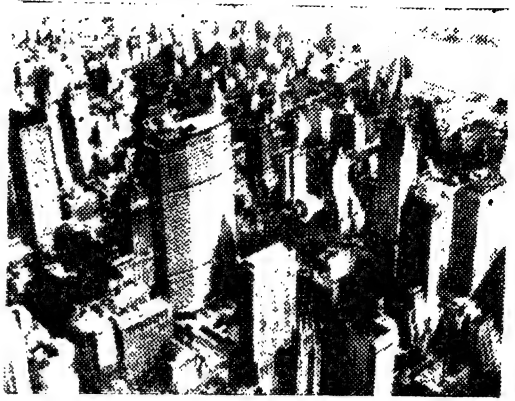
বস্টন অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বেশ আপনায় হয়ে পড়ল। এর কারণ কি ভাগ্যে গিয়ে অনেক সময় মনে হয়েছে বস্টন আর কলকাতা এই দুই শহরের জীবনধারায় কোথায় বেশ রয়েছে এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য। তাই কোন বস্টনিয়ান কলকাতায় এলে সহজেই 'আর্ট হোম' বোধ করেন। একই অমূল্য হ্রস্ব কলকাতাবাসীর বস্টনে।

বেশ কিছুকাল আগে আমাদের একজন বস্টনিয়ান বন্ধু কলকাতায় এসেছিলেন। হার্ভার্ডের অধ্যাপক। বস্টনের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হবার সম্ভাবনাও ঘটে নি। এই অধ্যাপক বন্ধু কলকাতা ঘুরে-ফিরে দেখালেন। বিস্তৃত শুষ্ক বাইরের চেহারা দেখে সন্তোষ না থেকে ইনি কলকাতার জীবনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতার প্রকৃত বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করতে ইনি উৎসুক হলেন, সাধারণত ট্যুরিস্টরা তাদের চারপাশে সমাজের যে জীবনের দেখেন তারা নয়। বাংলা সিনেমা দেখলেন, দেখলেন বাংলা থিয়েটার। মুগ্ধ হলেন। কলকাতা তথা বাংলা দেশের প্রাণে এঁতে যে একটা শিক্ষাদীক্ষা সত্যিকার ফলপ্রসূরী হয়ে চলেছে সেটা তাঁর নজর এড়ায় নি।

ফিরে যাবার সময় তিনি বললেন, তোমাদের কলকাতা ঠিক যেন আমাদের বস্টন। সেদিন একথাটার মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নি। কিন্তু বস্টনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর তাঁর বক্তব্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাস্তবিক আমারও প্রিয়বেশকে ইচ্ছে হত—বস্টন যেন আমেরিকার কলকাতা।

এই মিল যে ঠিক কোনখানে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এ তো বাইরেরকার সাদৃশ্য নয়, এ হল ভাবের মিল, স্পিরিট মিল। কলকাতার মতই বস্টনের একটা নিজস্ব স্পিরিট আছে। ওপর থেকে চট করে সেটা ধরতে পারা যায় না। রাজধানী ওয়াশিংটনে একটা সাইট-সিফিং ট্যুর করে এলে শহরটা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়। তেমনি নিউইয়র্কের ধন-জন-সমৃদ্ধি যে কোন নবায়নকেও চোখে পড়বে। কিন্তু বস্টনে কিছুদিন বসবাস না করলে তার স্পিরিটটা ঠিক ধরা যায় না। তাই বোধ হয় ওরা বলে Boston grows on you. একটা হেক্টর ট্যুরের মাঝখানে কোনমতে চকিশ ঘণ্টা কলকাতায় কাটিয়ে যে সব বিদেশী ট্যুরিস্ট কলকাতার বিচার করতে বলেন—ভাড়াও বলেন মারাত্মক ভুল। কারণ বস্টনের মতই কলকাতাও grows on you.

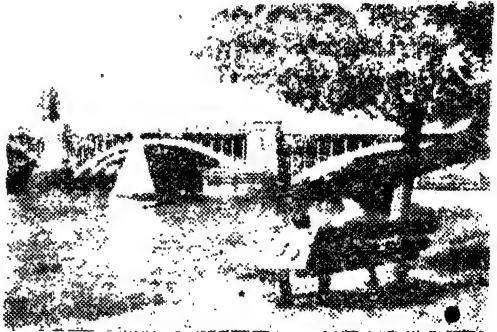
বাইরেরকার চেহারায় বস্টন নিতান্ত সাধারণ পুরোনো শহর। আর পাঁচটা আমেরিকান শহরের মত বোর আধুনিক নয়। অথবা বস্টন-প্রবাসী কোন কোন নিউইয়র্কার আমাদের কাছে দুঃখ করতেন বস্টন যথেষ্ট ফাস্ট (fast) নয় বলে। এই তো আমি কিছুদিন।



নিউইয়র্ক শহর প্রথম দৃশ্য

চারতলার এপার্টমেন্টে রটলাম সেখানে এলিভেটর ছিল না। সিঁড়ি ভেঙে ওঠানো করতে প্রাণান্ত। যে দেশে এলিভেটর, এস্কেলেটর, ছাড়া ছাড়া সে দেশে এক দুর্ভোগ! ময়লা খুঁড়ি হাতে নিয়ে পাঁচতলা ভেঙে বোজ নামি বেসুয়েট ময়লা ফেলতে। আর নিউইয়র্কের বাড়িতে সিঁড়ির পাশে ছিল দরজা, খুলে একটা পাইপের ডালা তুলে ময়লা ফেল দিতাম টুক করে—দার বাঁ করে চলে যেত জানি না ঠিক কোথায়—মোটের ওপর স্বাধীনতা।

বহর্য পড়ত যেদিন খুব বেশি বস্টনের পথঘাট, গাছপালা, গাড়ি, বাড়ি সবই যেত সাদা হয়ে—সেদিন দেখতে বড় সুন্দর হত। কিন্তু এরূপ ক্ষণস্থায়ী। একদিন বড় জোর দুদিন। তৃতীয় দিনে অন্ধ হল বরফ-গলা রাস্তায় এখানে-ওখানে বরফ-গলা জা, অর্ধেক গলে-বাওয়া বরফ, পিছল কতিন বরফের চাই। সাবধানে পথ চলতে চলতে হঠাৎ ভুল হয়ে যেত বর্ণবিক্ষিপ্ত কলকাতার পথে হাঁটছি বৃষ্টি-বা। যে শহরের লোক যত বেশি বুদ্ধিমান সে শহরের মিউনিসিপালিটি তত বেশি অপদার্থ—সেবার কলকাতায় তদানীন্তন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি



চার্লস নদীর তীর : এপারে বস্টন ওপারে হার্ভার্ড

গ্যালব্রথ যখন এই গ্যালব্রথস ল' ঘোষণা করলেন তখন আমাদের নতুন কর্মে মনে পড়ে গেল বস্টনের সেই খৃস্টীয় খণ্ডটি।

বস্টনিয়ানদের হাবভাব চাল-চলনের সঙ্গে বাংলাও কাছাকাছি আমাদের মিল আছে যথেষ্ট। অন্তত তাদের নাম যে নিম্না চলিত আছে তার অনেকগুলো আমাদের ওপরও প্রয়োগ করা হয় কখনো কখনো। বস্টনের পোষকরা নাকি বেজার অফারারী—ফ্র্যাঞ্চেইজ অফারার পোষকদের এই এক অভিযোগ সবই তাদের ভাষায় এই তাদের অত্যাচার্য। এ নিয়ে অনেক রাসিকাল গাউস বাজে। তারই একটা হল ওয়ানকার আমবেয়ালী ওয়েদার সম্পর্কে।

বস্টনের আবহাওয়া লোকদের সর্দক্ষণ একটা অনিশ্চয়ের মধ্যে ফেলে রাখে। এই গরম তো এই ঠাণ্ডা। কখন কি জামা-কাপড় পরে বাইরে যাব এই এক চিন্তা। শুভারকেটটা কি নেব না উলের জ্যাকেটটাই চলবে? মাথার বাঁধার রমালটা দেবার আজ আর বোধ হয় দরকার নেই, তেমন তো কনকান ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে না। তারপর হঠাৎ একরাশ জামা-কাপড়ের বোঝা অকারণে বয়ে বেড়াতে হল। নয় তো কীতে ফিরে আসতে হল মাঝরাঙা খেঁকেই। খবরের কাগজ হাতে আসতে লোকে তাই প্রথমেই চোখ বুলিয়ে নেয় ওয়েদার-রিপোর্টের ওপর।



প্রতিবেশী নারী অবকাশে পুলক-নাটক মেয়েরা বেরী-সিটারের কাজ করে অর্থোপার্জন করে

বস্টন গ্রোব না বস্টন হেরাল্ড—বাণী বাগজ যেন দিন দুই ওয়েদার রিপোর্ট দিচ্ছিল 'সানি টু-ডে গ্রাণ্ড টু-মরো' অর্থাৎ আজ যৌত্রকরোজ্জল দিন গেল এবং কালও তাই থাকছে। এর মধ্যে তৃতীয় দিন খবরের কাগজ খুলে সহায়ের চক্ষুদ্বির—হ্যাঁ! হয়ে গেছে, 'সানি টু-ডে গ্রাণ্ড টু-নাইট'—অর্থাৎ আজ ত্রৈত্রকরোজ্জল রাত্রি। নিশ্চকেরা বললে, জানি বস্টনে সহই সম্ভব তাই বলে রাত্রিরে হোদুদু?

বস্টনবাসীরা সাধারণত চাপাস্বাভাব। তারা সহজে লোকের সঙ্গে মিশতে চায় না। মিশবার যোগ্য লোক তাদের চোখে পড়ে না। বস্টনের উদ্দেশ্যে টোন্ট প্রপোজ করতে গিয়ে একদা ডিনার টেবিলে জন কলিনস্ বসিডি যে চার লাইন বহিরা রচনা করেছিলেন, তা আজও অমর হয়ে আছে—

And here is so good old Boston  
The home of the bean and the cod  
Where the Lowells speak only to Cabots  
And the Cabots speak only to God.

উদাসিনতার এই অপবাদ সত্য কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন খাঁটি বস্টনিয়ানকে। সে বললে, লোকে আমাদের ভুল বোঝে, কারণ ইমেশনের বহিঃপ্রকাশ আমাদের কম। আমেরিকার অগ্রাগ্রা অঞ্চলে বিশেষ করে ওয়েস্ট কোস্ট লোকেরা নিতান্ত অল্প পরিচয়ে হ—ই বলে পিঠ চাপড়ে দেবে, টেলিফোনে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে হট করে এসে উপস্থিত হবে বাড়িতে, এসে বেল বাজাবে না গাউগড় করে চুকে পড়বে কিচেনে। একজন খাঁটি বস্টনিয়ান এগুলোর কোনটাই করবে না। কিন্তু চাপাস্বাভাব বস্টনিয়ান যখন একবার একজনের বন্ধু মেনে নেবে তখন তা নেবে অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে। কিন্তু পিঠ-চাপড়ানো, লোকন্দখানো বন্ধুতার গভীরতায় আছে সশয়ের অবকাশ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন টাফট একবার এক আগন্তুক হাভার্ড পলেন লাওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে। লাওয়েল তখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট। বিশেষ কাজে লাওয়েল সে সময় গেছেন ওয়াশিংটনে টাফটের সঙ্গে ছিল জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট। আগন্তুক অন্তশত ভানেন না—ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খোঁজ করতে জবাব পলেন—The President is in Washington seeing Mr. Taft!

এই সব নিছক গল্পের অন্তরালে রয়েছে বড় একটা সত্য। তা হল এই নগরের ঐতিহ্যে নাগরিকদের একান্ত বিশ্বাস। সকলেরই মনের ভাব I am a citizen of no man's city. আর সত্যিই তো তারা যে-স শহরের অধিবাসী নয়। সকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র, পরবর্তীকালে সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পবলয় আপন বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ অভিজাত রচিত শহর এই বস্টন। বস্টনিয়ানদের হাবভাব নিয়ে বতই কেন না হাসাহাসি কক্ষ আবার তাদের আভিজাত্যের ভাগটুকুও চাড়ে না কোন আমেরিকান। আমি বস্টনে জন্মেছি, বন ইন্ বস্টন বলতে পারা এখনো মস্ত বনোদীমানার পরিচয়।

যদি বলি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের সূত্র এই বস্টনে তবে বোধ হয় ভুল হয় না। কারণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্বে বস্টনের

ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। 'বস্টন মাসাকার' আর 'বস্টন টি পার্টি' দুটি কথা আমেরিকান স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুপরিচিত। তাদের মাঝে ইটপাটকেল ছোড়া হয়েছিল। এই অজুহাতে একদল বৃটিশ সৈন্য বস্টনের পাথ গুলী করে মেরে ফেলল পাঁচজনকে, আহত হল আরো অনেকে। এই বস্টন মাসাকারের পথ চিহ্নে ছড়িয়ে পড়ল অস্ত্র সব কলোনিতে আর সেইসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল জোন্সের আগুন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে বস্টনের বন্দরে বাদা বৃটিশ জাহাজে রেড ইন্ডিয়ানদের বেশ পরে প্রায় একশ' লোক তানা দিল একরাত্রে। নতুন অটিনমতে চা বেচাবে বলে বাজার বোকাট চা ছিল জাগাজে। সব চায়ের বাজার স্থপথ্য জলে ফলে দিল বিক্ষোভকারীরা তাদের স্লোগান ছিল 'বস্টন হার্বার, এটি পট টু-নাইট'। বস্টন টি-পার্টির ব্যয়মাত্র যে বাড়িতে বসে কথা হয়েছিল—সেই ওল্ড সাউথ মিটিং হাউস আজও সবাই দেখতে যায় বস্টনে।

বস্টনের কাছেই লেক্সিংটনে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম গুলী ছোড়া হয়েছিল। এ গুলী ছুড়েছিল কে তা অজানাই রয়ে গেছে। বৃটিশরা বলে আমেরিকানদের কেউ আর ওরা বলে না বৃটিশ সেনাদের কেউ। সে যাই হোক, এ রক্তক্ষয় গুলীর আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল চারদিকে। আর সেখান থেকেই শুরু হয়ে গেল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। বস্টনের অনতিদূর দাঁড়িয়ে আছে বাকার হিল দৃষ্টিস্তত্ব তাইই অরণ্যে।

পল রিভিয়ার বস্টনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগের রোমাণ্টিক হিরো। নর্থ হেয়ারের তাঁর বাড়িটি ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত আছে। লেক্সিংটনের যুদ্ধের আগের রাত্রে এই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে গোপনে বেড়িয়ে ছোড়া ছুটিয়ে চলে যান তিনি। বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে আমেরিকান সেনাদের সতর্ক করে দেওয়ার ভার ছিল তাঁর। এই নৈশযাত্রা এখন প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

Listen my children and you shall hear  
Of the midnight ride of Paul Revere.

পল রিভিয়ার বাড়ির মত ওল্ড নর্থ চার্চটিও রক্ষিত হয়েছে। এই চার্চের চূড়া থাকে আলোর সংকেত পাঠানো হয়েছিল বৃটিশ সেনাদের গতিবিধি সম্পর্কে—কোনপথে আসছে তারা কলপথে না স্থলপথে?

One it by land, two it by sea এই নাকি ছিল সংকেত।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিক্ষোভ শান্ত হয়ে বাবার পর অনেকদিন ধরে বস্টন ছিল নিউ ইংল্যান্ডের তথা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রাজধানী। শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা সবকিছুর নেতৃত্ব বস্টনে।

ম্যাসাচুসেট্‌স, নিউ হাম্পশায়ার, মেইন, ভেরমন্ট, বোড আইল্যান্ড এই নিয়ে চল নিউ ইংল্যান্ড। প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে নিজেকে স্বতন্ত্রে বিশিষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা নিউ ইংল্যান্ডে ছেগেছিল নবজাগরণের ঢেউ—নিউ ইংল্যান্ড রেনেশাঁস নামে তা

## বেণারসের দরে বেণারসী ?

বারাণসীর কারখানা হইতে সিক সেণ্টারের বেণারসী কাপড় বাছাই হইয়া সরাসরি কলিকাতার বিক্রয় কেন্দ্রে আগার জন্ত মধ্য পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ায় সিক সেণ্টারের বেণারসীর দাম কম এবং ডিজাইনও নিত্য নূতন।

বিবাহের বেণারসী বা যে কোন রূপ রেশম কল্ল ক্রয়ের পূর্বে সিক সেণ্টারে পদার্পণ করিলে সমুদয় হইবে।

### সিক সেণ্টার

বেণারসী ও রেশম বস্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

বহুবাজার মার্কেট (বহুবাজার কলেজ স্ট্রীট মোড়) কলিকাতা • ফোন ৩৫-৪৮১০  
বারাণসী কেন্দ্র : ডি১৭/১০৬, দশাশ্বমেধ রোড।



ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। আর বস্টন হল এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু দি হার্ব অফ নিউ ইংলণ্ড। কেমব্রিজ আর কনবর্ডকে যদি বৃহত্তর বস্টনের মধ্যে ধরে নওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। ইতিহাস, রাজনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্য-শিল্পকলা সবকিছুতে দেখা দিল এক বলিষ্ঠ, উদার স্ফূর্তিধারা।

নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল চারদিকে—সাইক্লিষ্ট, আর্ট মিউজিয়াম, সিনেমা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশিত হল বস্টনে—নিউজ উইক ১৭২০ খৃষ্টাব্দে। প্রথম ম্যাগাজিন তাঁও বার হল বস্টন থেকে—প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল প্রতিবেশী হার্ভার্ডে। বিশ্বের মনীষা-রাজ্যে বস্টন তার স্থান করে নিল। আর জাতীয় জীবনে? বস্টন আজ বা ভাবে সারা আমেরিকা কাল তা ভাবে অবস্থা দাঁড়ালে সৌহারদ্য।

[ আগামাবারে শীতের হাওয়ায়।

## তুমি বিচিত্র

### পূর্ববী চক্রবর্তী

রাস্তার ধার ঘেঁষিয়ে গাড়িটাকে পার্ক করলাম। নামতে যাব

—আর তখনই চমকে উঠলাম আমি। সামনের ওই

অতিকার হলো—সবজ বাই-কালারের 'লেক্ট হ্যাণ্ড ড্রাইভ'-মার্ক। এতক্ষণ অন্য ড্রাইভের এঞ্জিন মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল, আর লাকিংয়ে কিছুটা পিছনে সরে এসে যেন অতীর্কিত আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিতে চাইল এত সাধের এই ক্ষুদ্রকার ফিয়ার্টিটিকে। আমার সব সাধ আর সাধ্যকে যেন ধ্বংস করতে চাইল বৃহত্তর দম্ভে। স্বাভাবিক প্রেরণাতে আবার হাতের চাবি যথাস্থানে সন্ধিবিষ্ট হল। কিন্তু স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে গিয়ে সামনে নেবার আগেই সবান্ন আমাকে অক্ষত রেখে তীব্রবেগে সে উধাও হয়ে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। হাঁ, অজ্ঞ গাড়ির বাগাই ছিল সমুখে। আর বড় রাস্তায় পাড় টান' নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটের রক্তিম লগদপানিও যখন শেষ হয়ে গেল—তখনই বৃষ্টি আশ্বস্ত হলাম আমি। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র। এতকিছু ঘটে গেল এই কয়েক মুহূর্তের অবকাশে। ঘটনার আকস্মিকতার বত বিমিত্ত বিচলতা—সব যেন একক্ষণ স্থির হয়ে ছিল আমার দুই অবাকচোখের তারায় তারায়। ছাড়া পেয়ে এবার বাঁধভাঙ্গা বস্তুর মত উছলে উঠল আর ভাসিয়ে দিল আমাকে ভাবনার ঝঞ্ঝে প্রোভে।

ওই নিউ মডেলের কার-টি আমার অচেনা সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনা ক্ষমকতিতে এমন ঝাপিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে আমার জামায় শুধু একজনই পারে। আর অগ্ন সেনের চেনাতেও তো সেই একজনই আছে—মোটর ড্রাইভ: যার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। জীবন নিয়ে—সে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক—খেলা করতেই যে ভালবাসে।

মোটর কোণের হাসিটুকু চপে নিলাম। হয়তো বা স্কোভের হাসি আপনাই মিলিয়ে যাব। গাড়িতে লক্ করে, কেঁথোসকোপ আর ব্যাগট্ হাতে ঝুলিয়ে দরজার পাখে অগ্রসর হলাম। প্ল্যাট সিস্টেমের বাড়ি। তাই সর্বদাই মুক্তধার। গিড়ি বেয়ে যেখানে হাজির হলাম, তাকে কোনমতেই প্ল্যাট বলে ভুল করা চলে না।

নীচু-ছাধের মেজানিন। প্রাণ আশ্রয়ের সময় বাড়ির মালিক নিশ্চয় কর্পোরেশনের কাছে ঘরটির শরনকক্ষ ভিন্ন অল্প কোন সাজসজ্জাই নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু বেশি উপায়ের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। অল্পবিস্তর লোকের কাছে স্বল্প ভাড়ার এই ঘরটিই যথেষ্ট। এখন তাই তার ঘে রূপ—তাকে উইকম কাম ডাইনিংরুম বা বেডরুম কাম কিচেন—যে কোনও নামেই অভিহিত করা যায়। স্যানিটোরির ব্যবস্থা নীচে দরওয়ান-চাকরদের সঙ্গে একত্রে। অত্যল্প আয়ের ভদ্র-শিক্ষিত পরিবারে বিলম্ব-প্র্যাক্ট—দুর্বাশ। ঘরে সকল কিছুই সাজান আছে হয়তো স্বপ্নেরভাবে। একজন বেডরিডনের পক্ষে অপরিহার্য সবই আছে সেখানে। তবু এই বিচিত্র সম্ভারের সমাবেশ নিঃসন্দেহে অনভ্যস্ত চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু আমি ডাক্তার। কতরকম পরিবেশই না আমাকে যেতে হয়। আর এ তো নিত্যন্ত চেনামহল। তাই অভ্যাসের চোখেই আমি দেখে নিলাম—ঘনায়মান সন্ধ্যায় প্রায়ছকার একলা ঘরে বিচ্ছিন্নতার একান্তে ভুগে আছে আমার বয়সী।

বালিশে মুখ ঝুঁকিয়ে রয়েছে সে। থেকে থেকে কি যেন এক অবচবদনার ক্রোড়ে উঠছে তার বিকীর্ণ দুর্বল দেহ। ক্রেপসোলের জুতো পায়ে না খাবলেও বৃষ্টি আমা: উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারত না ওই কাহত, আপনমনঃ মন। না, মা নেই ঘরে। এতক্ষণও তিনি ফিরে এলেন না। জানি, রোগ ছেলেকে এমন অক্ষকারে একা ঘরে রেখে যেতে শক্তি পানেন না। সন্দেহ এবার দৃঢ়তর হল শুধু। সেই এসেছিল। এতক্ষণ ছিল এই ঘরে। তারই হাতে সাময়িকভাবে ছেলের দায়িত্ব সর্পণ করে নিশ্চিন্তচিত্তে মা পেরিয়েছেন। এখনও যে তার দেহের স্তবাসে মদ্রির হয়ে আছে এই ঘরের বাতাস। আর তারই অভ্যাস পাচ্ছি ওই ভারাক্রান্ত হৃদয়, বক্রণ জীবনের কাতরতায়। আঘাত হেনে সে চলে গেছে নির্ভয়ের মত—সব বিশ্বাসের ভারকে অবসীল্য ঠেলে ফেলে দিয়ে। আর আমি শুধু রয়েছি এই বিরোগান্ত দৃষ্টির নীরব সাক্ষী হয়ে। এমন হবে আমি জানতাম। এই বক্রণ দৃষ্টির অবতারণার অপেক্ষাতেই যে ছিলাম এতদিন। কিন্তু এই কি আমি চেয়েছিলাম!

তের বছর আগে। সত্ত ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়েছি—কৃতিত্বের সঙ্গে। হাউস-সার্জন হিসাবে কাজ করছি আমারই কলেজের এক শুভাবী শিক্ষকের অধীনে। অভিভাবকদের মনে কত আনন্দময় উজ্জ্বল কল্পনা আমাকে ঘিরে। অল্পদিন পরেই দেশান্তরে যাব উচ্চতর শিক্ষার কারণে—ডবল এক—মাস-সি-এস—এর দুর্বীর আকর্ষণে। ইচ্ছা সকলের,—করেনে যাবার আগেই আমি বিবাহিত হই আর সম্ভব হলে বধূকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাই সেই প্রলোভনের অচেনা ভূমিতে। ঘটকের আনোগোনা চলছে, আত্মীয়-বন্ধুরা বহু সুপ্রতীকী খবর আনছেন, আশ দিনেরাতে বলিং-বেল বাজাচ্ছেন কত কল্পাদারগ্রস্তের দল। অত্যন্ত বিবী লাগত আমার। যেন নীলামে চড়ান হচ্ছে আমাকে। মেয়েদের তরফ থেকে তাঁদের রূপ-কোমলালিকেশন ও যৌতুকের ধার-ভার লেখিয়ে বাবার মনটি জয় করে নিয়ে, তাঁর এই লোভনীয় সম্ভানটিকে কে টোপার পরিয়ে

বর সাজতে পারেন তারই এক অদ্ভুত কাড়াকাড়ি চলেছে। স্পষ্টতই অনিচ্ছা। প্রকাশ করলাম আমি। এত ত্যাগত্যাগি বাঁধা পড়বার ইচ্ছা ছিল না। তা' ছাড়া উপার্জনশীল না হয়ে সংসারী হতে এ যুগে কেন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই পারে না। যা হোক, বিয়ে একটা লেগেই গেল বাড়িতে। আমার যুদ্ধে বাঁধা আসা-বাঁধা করতেন, তাঁদেরই একজনের মনে ধরে গেল অদ্ভুত স্মৃতিকোকে। সামনের বিদেশী ডিগ্রীধারী প্রতিষ্ঠিত এঞ্জিনয়ার একমাত্র পুত্রের বধু করে নিলেন তাকে। এবার দুই কুটুম্ব বরতে অনাগ্রহ থাকার রেহাই পেলাম আপাতত। দৌভাগ্যবশত ঠর মেয়েটি আগেই সুপাত্র হই গেল।

রীতির বিধের বাসরেই ওর সম্পর্কিতা ননদিনী ধিক্রুর সঙ্গে প্রথম দেখা। ঐশ্বর্যশীল তরুণীর দেহে বসন্তের সমারোহ। আমার যৌবনের মন সেদিন সমস্ত সংযমের দস্ত ভুলে আকুল হয়ে উঠেছিল। কুহুমিত কবরী, নীরন্ত সীমন্তে মুক্তার সাগর গাথা সিঁথিমৌর, দুর্বারঙ, বেনারসী আর সর্পাঙ্গ হীরক-মহাকুশের দ্ব্যতি। হাসিতে, গানে, স্তম্ভঙ্গ কথার আচারে তার সৌন্দর্য ও সপ্রতিভ ব্যক্তিব্য বেন ফুটে উঠেছিল। ফলশ্রুতি সন্ধ্যার মৃতিমতী বাসন্তিকা হয়ে, সমস্ত্রীর মহিমায় সকলকে সে একাই আকর্ষণ করেছিল, মাতিয়ে রেখেছিল। বর-কন্ডা নিশ্চয় হইছিল ওর পাশে। হয় তো সাক্ষাতের বিশেষ রঙ্গ, নয় তো বিবাহের পারিপার্শ্বিকতা, জানি না কি আমার চিন্তের বিচলতার জন্ম দাড়া। কিন্তু এটা ঠিক যে, তখন থেকেই তাকে আমি অন্তরঙ্গতার আসনটি দিয়ে ফেলেছি, আমার ব্যাকুল বাসনা তার অভিধান্যেই অগ্রহ মগ্ন হয়ে গেছে।

সে রাত্রেই জানা হয়ে গিয়েছিল, বিস্তর অর্থবান এক ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান সে। মাতৃহীনা আনন্দের তুলসী। চোখাপড়া ও অজ্ঞাত বিস্তার কুশলী। বি-এ পড়ছে। গুণ আছে বহুতর। অতশত জেনে পায়ের কি কাজ। নাপালের বাইরে হাত না দিতে বাওরাই তো ভাল। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত হার এটেলো মানে মানে সেরে আপাই সুবুদ্ধির পরিচয়। তবু স্বপ্নের ক ছে যে সব বিচার-বিবেচনা হার মানে। ধিক্রুর সঙ্গে আমার নাম যুক্ত করে স্বজনবন্ধুদের সরস আলোচনা ও মন্তব্য এরপরও কতবার শুনেছি আর কিছুটা আশাশ্রিতও হয়ে উঠছি। এতই কোন ক্ষুদ্র আমি? উপযুক্ত হয়ে তো পেতেও পারি গুণে পাশে। আমার ভালবাসার সাধনা হয় তো সার্থকই হবে একদিন।

পরিচয় ক্রমে সুনিবিড় হল। রীতি এখানে থাকলে মাঝে মাঝেই ও চলে আসত। দু' জনে সম্প্রীতি ছিল গভীর। আমাদের সবার সঙ্গেই সে সহজ অন্তরঙ্গতার মেলামেশা বরত। মার স্নেহে স্বর্গতা জননীকে খুঁজে পেতে, এটাও ছিল বড় কারণ। আপনজনই হয়ে উঠল অবাধে। আমরা ততোধিক তাকে ঘিরে মধুর বসন্ত করতাম। দৃঢ়তার বাঁধনে এই সংসারে অটকাকতে চেয়েছিলাম। মনের ভাব শেষ পর্যন্ত মুখের কথার নিষেধের মধ্যে বলাবলিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিহাসে, আলাপনে, কোনও অবস্থাতেই তার অতলাস্ত স্বদরহস্ত কারও বিশ্লবত আমার ব্যগ্র অসুস্থিসংসার ধরা পড়ে নি।

শেষ পর্যন্ত স্মৃতিতে দেখা করে তাকে সরাসরি এ সম্পর্কে প্রশ্ন ও প্রস্তাব করেছিল। ঐকান্তিক বিশ্বাসের বত আনন্দিতে অভিশ্রব চূর্ণ-

বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেহি হয় নি। সামান্য স্তব্ধ থেকে হেসে বলেছিল ধিক্রু, বড় ভুল করে ফেলেছ তোমরা। আমার জীবনের সঙ্গী হতে পারে এমন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ আজও হয় নি। চার তো অনেকটাই, কিন্তু আমাকে পায় না তো কেউ। অতিপ্রিয় অগ্রহের প্রতি এই অনাগ্রহ অবহেলাকে সহ্য সহ্য করতে পার নি আমার ভগ্নী। সাক্ষাত অপমানে পুঞ্জীভূত ভুল রচনাবে বিদ্যে বরত গিয়েছিল তার সঙ্গে। পরিবর্তে নির্বাক হাসির বক্ষিমা ছাড়া আর কিছুই মেলে নি। স্বপ্নব্যাধি থেকে এ সংসার ফোনে মাকে জানিয়েছিল সে। স্বপ্নদের সঙ্গে আমারও অজানা থাকে নি। বিবাহ আর নিকুপার বিষয় ঘনিষ্ঠ এসেছিল সকলের মধ্যে। অসুস্থচিত্তে আমি পালিয়ে কিংকিলাম গুদের চোখের আড়ালে।

সেই সন্ধ্যার অবসরভাবে অন্ধকার ঘরের শূন্যতার আমি বসেছিলাম। স্মৃতি ও তার স্বামী এসেছে—বৃথতে পেরেছিলাম। পিঠাশিটি ভাই-বান আমার। সব থেকে আমাকেই ও ভালবাসে। পাশ মার ঘর থেকে তার ক্ষুদ্র আলোচনার সাদা পাজিলাম। ধানিক পরে খুঁজতে খুঁজতে আমার ঘরে এল। আলো জ্বলতে তখনই চমকে উঠলাম। তারপরই দু'হাতে মুখ ঢাকলাম, নিভিয়ে দ স্মৃতি, চোখে লাগছে। অধীরের মধ্যেই পাশে এসে দাঁড়াল। স্বাভাবিকভাবে বলতে চাইলেও বিপুল হতাশার স্রোত দেহ ও বর্ষহরে বৃষ্টি প্রকাশ পেয়েই গিয়েছিল। ওর মমতার স্পর্শে বিচলিত হয়েছিলাম। নির্বাক দীর্ঘবাস ফেলেছিলাম। চকল হয়ে তাকি যুগান্তা গলার অঙ্গুষ্ঠ, তাকে তুই মন থেকে মুছে ফেল দাদাভাই,—ওর নিজেই যোগ্যতা নেই, তাই মিথো অস্বস্তির এমন করে বিমুগ্ন করল তোকে। ভগবান থাকে তোমার জন্ম নির্দিষ্ট করেছেন, তাকেই পেয়ে সুখী হবি। এ হয় তো একরকম ভালই হল। কিন্তু ওই স্মৃতিছাড়া গরবিনীর কপালে অশেষ দুঃখ আছে, নিশ্চয় বলছি আমি, দেখে নিস। এমন করে অপরকে বাধা দিয়ে অনেককে তুচ্ছ করে সর্বনাশী কখনও জীবনে শাস্তি, স্থিতি পাবে না, পেতে পারে না।

শেষের দিকের কথাগুলি জড়িয়ে গিয়েছিল আবেগে। তীব্র আতঁতার তাকে স্তব্ধ করেছিলাম, 'রীতি'। উঠে খোলা জানালার গ্রীল ধরে সামলে নিলাম। দীর মুহু বিস্ময়তার বললাম, অকারণে তার অসাক্ষাতে মন্দ কথা নাই বা বললি বোনটি। নিজের বিষয়ে বিচারের স্বাধীনতা তো প্রতিজ্ঞানেরই আছে। ও যেমন বুঝেছে—বিবেচনাশক্তি তার কম নয় জানিস। সত্যিই হয় তো বিবাহতার অভিক্রোত নয় এ মিলন। সেক্ষেত্রে তাকে দোষী করিস না। একই রীতিতে বিশ্বের সব মানুষ চলে না। কিছু বিশেষ, কিছু অন্তরকম হ'লই বা সে।

একান্ত প্রিয়জনের কাহনা সইতে পারি নি আর। স্মৃতি তা অমুভব করেছিল। নীরব সহ্যভূতিতে বতকণ বসে থেকে থেকে একদময়ে চলে গিয়েছিল।

তারপর বেশের বাইরে গেলাম। আরও কাজ শেষ করে ফিরেও এলাম। আর তখনই একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। চোখের সান্নিধ্যে-পুঞ্জির বসতে হবে। কিন্তু অনেক টাকার দরকার যে। বাবা স্পষ্ট ভাষায় তার অসামর্থ্য জানাতেন। প্রজিডেন্ট কাণ্ডের মোটা টাকার সবটাই প্রায় বাড়ি করতে ব্যয় হয়েছিল।

তাঁও জমি কত আগে ফেলাদামে কেনা ছিল। ভাইবোনেরদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, জীবনযাত্রার উচ্চমান বজায় রাখতে সক্ষম তেমন করতে পারেন নি। মানী বৈষয়িকের সঙ্গে তাল মেলাতে, দাবী-দাওয়া না থাকলেও স্ত্রীর বিয়েতে যথেষ্ট ব্যয় চায়ছে। এখনও ছোটবোন বাকি। ছোটভাই-এর ভবিষ্যৎ গড়তে হবে; দাদারাও সংসারী হয়েছেন, বাড়তি সাহায্য করা তাঁদের পক্ষে বাস্তবিক অসম্ভব। একটি উপায়ই শুধু আছে—যা তিনি নির্দেশ করলেন। আর তাই-ই হল। উচ্চ কস্তা-পণের বিনিময়ে অল্পপায় আমি আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য হলাম।

সহাস্যে স্তম্ভজিতা ধরিত্রী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এল। আগুন রঙের টিঙ্গর আবরণে আর রঞ্জনপল্লখচিত স্বর্ণভরণে তাকে অগ্রিশিখার মত লাগছিল। আগের মতই, সাময়িক সব অসুস্থতাই যেন ভুলে গিয়ে হর্ষে মোচার হয়েছিল সে, বৃষ্টি ভুলিয়েও দিতে পেরেছিল। নববধূকে ছাড়িয়ে সেই এ উৎসবের উজ্জলতমা নাইকি! হয়ে উঠেছিল। অজ্ঞদের সঙ্গে আমার স্ত্রীও সঙ্গশঃস বিষয়ে তার প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়েছিল। শুধু আমি অসহ্য প্রদাহে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম ভিতরে।

ঘীরে ঘীরে বিভিন্ন স্ত্রে ধরিত্রী ও আমার সম্পর্কে সব তথ্যই অর্ধজ্ঞানের জানা হয়ে গেল। বিব্রিত নারীমণ্ড! সজ্জাত উর্গার প্রাণতা তাকে হৃৎভঙ্গ, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহিতা করেছিল, ধরিত্রীর উপর তার ক্রমবর্ধিত রাগের কারণে একটি আশ্রয় হেতু ছিল। ওর অসামান্য দপিত অবস্থার স্পর্শকে কোনমতেই লম্বা করতে পারে নি সে। বহুবার আগেও কথার তা প্রকাশমান হয়েছিল।

স্বভাবগত বৃত্তির প্রধনতায় রজনী আমাকে পরাভূত বশবদ করতে চেয়েছিল। স্বস্তির আশায় অবশেষে তাকে আমি মেনে নিয়েছিলাম, মানিয়ে নিতেও চেয়েছিলাম। যান পড়ছে কনিষ্ঠা স্মৃতির বিয়েতে ধরিত্রী এসেছিল স্তনীর সজ্জার প্রাণান্তি আর মুস্তার সজ্জারে অপকণা হয়ে। আমার ছোট বৃন্দা ইটগোলে ভয় পেয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে কঁদে কঁদে উদ্ভ্রান্ত করছিল। কোল তুলে তাকে নিপুণভাবে ভুলিয়ে দিয়েছিল তখন। আমি কাছেই বেনি কাছে বাস্তু ছিলাম। স্পষ্টত আমার স্তনীর রজনী আকস্মিক এক অমার্জিত কুটিল বজ্রোক্তি করল, এখনও স্বয়ংবদ্য হতে পারল না ধরিত্রী, তোমার সমযোগ্য পুত্র বোধ হয় এ পৃথিবীতেই নেই।

পার্শ্ববর্তী স্ত্রীত্ব উপস্থিত অনেকের কৃষ্ণিত জ্ঞাতে বিগত গোপন থাকে নি। আমি শঙ্কায় শুক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি স্বন্দরভাবে ধরিত্রী তার শিল্প কীরিয়ে দিল। ছেলেকে আদর করে নামিয়ে দিয়ে মধুর হাসির উদ্ভাসনায় বলল, তাইই রজনী। অজ্ঞ সব মেয়েরা যাদের গলায় সাগ্রেতে বংমাল্য দিয়ে নিজেদের বজ্র জ্ঞান করে, আমার কাছে তারা নিত্যন্ত সাধারণ বোধ হয়। বরষীর তো দেখলাম না এদের মধ্যে একজনও।

রজনীর স্ত্রীরা মুখ মুহূর্তে কালা ভার হয়ে উঠেছিল। আর অপেক্ষা না করে, নিকল ক্রোধ ও সন্তোষের অধীরতায় সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম। বাড়িতে ডেকে এনে আমারই স্ত্রী ওকে যে অসম্মান করল, বর্ষণ হয়ে আমাকে তা আঘাত করেছিল। ধরিত্রীর উপর রাগ করতে আমি কিছুতেই পারি না কোনদিন।

দিনে দিনে রজনীর আদিপত্য বিস্তারের প্রকলতা আমাকে অতিক্রম করে গৃহের সব কিছুকেই অধিগত করতে চেয়েছিল। আমার পশার ইতিমধ্যে বেশ বেড়েছে,—পরিবারের মধ্যে সর্বাধিক উপার্জন করে ও যথায় প্রতিপালক হয়ে—বয়োজ্যেষ্ঠ না হলেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছি। পতি-গর্বে অংশভাগিনীরূপে তার ব্যবহারে তাই ক্ষমতার দামট ক্রমশই মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছিল। নিত্য অশান্তিতে চরমপথ বেছে নিলাম। এমন কি মা-বাবার সম্পর্কেও ওর প্রত্যক্ষ অবহেলা ও তুচ্ছতা প্রদর্শনে ঐর্ষ্যচূত হলাম। অথচ বিবাহিতা পত্নীর প্রতি স্তম্ভ বর্তব্যের নির্মম বন্ধন আছে। যখন কোনমতেই একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখা গেল না, এবটুকুও নয় হল না ও—তখন অস্ত্রজ্ঞান্যটি নিয়ে নিকল সঙ্গার রচনা বরলাম। বাড়ির সঙ্গে শুধু অর্থ নয়, স্বস্তির আর সাক্ষাতের যোগও বইল, অবশ্য যথাসম্ভব রজনীর অজ্ঞাতে। না হলে, ওর বটুভাষণের ঝড়ে বিধ্বস্ত হতে সারাদিনের শ্রমসম্মত আমি পারতাম না, আপনাব জন্মের উদ্দেশ্যে বারবার রুচ বাক্যবাণ বর্ষণ আমাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিত। আমার চেয়ে অর্থই ওর কাছে প্রিয়তর। সম্মতি নেই এটুকু। সন্তান দাস-দাসী—ভাইভার, অজ্ঞ বিলাস-উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে ঘরে অগ্রতিত প্রভাবে সে গৃহীত্ব কণ চলে—তার বাইরে আমি চেয়ার, হসপিটাল ও সেবাদার নিজেকে সর্বথা বিনিয়োগ করে গৃহস্থের বন্দনাকে বিস্তৃত হবার ভূসাদা চেয়ে বাপুত হলাম। জীবনের সন্তল প্রাণ ধরিত্রীর উদ্ভ্রান্তে যেদিন প্রথম দামটী পেয়েছিল, সেদিন থেকেই বৃদ্ধ হতে পেরেছিলাম শান্তিপ্রথের সাধনা আমার জন্ম নয়।

এরপরও ধরিত্রীর সঙ্গে বজ্রবার এখানে-সেখানে দেখা হয়েছিল। সন্তজভাবে সে আমার সঙ্গে মিশেছে, আমিও তাই করতে চেয়েছি। অসঙ্গ মনের তমসার ও যেন আলোক-বিশারী। সে যদি বাঞ্ছিত জন্মের সঙ্গে মিলিত হত, তবে সব থেকে তুণ্ড ততম আমি। কিন্তু তা হল না। ওদিকে কোন আগ্রহই ছিল না তার। স্নেহময় পিতা যেমনই ভেবে থাকুক, এ নিয়ে বীড়ানিধি করেন নি তাকে। কোন আশ্রয় ক্ষমতার (যে উদ্ভব-তিরিশে লাগণ) ও প্রাণোজ্ঞলতাকে সে ধরে রেখেছিল—এ নিয়ে গবেষণার অস্ত ছিল না আর। প্রসাধনে বা কুজিমতার নয়,—এই ছিল তার যথার্থ রূপ।

আনন্দের মধুচক্রে মগ্নরাগী ছিল ধরিত্রী। মৌ-পিয়াসীরা তাকে ঘিরে থাকতে চাইত অবিহাম। বন্ধুর দক্ষিণে অকান্ত ছিল সে। পৃষ্ঠ ছিল জ্ঞান-অজ্ঞত নানাবিধ দানের ক্ষেত্রেও। শুধু ক্লাব পাটি পিকনিকের উচ্চ-হলেই আনাগোনার আন্তি ছিল না,—চারিটি শো'র মধ্যমণি। বস্ত্র, প্রতিভা, আত্মপ্রাণের জগৎ তার কল্যাণহস্ত সদা ওসারিত থাকত। হস্ত বহুজনের কাছে প্রভাবিত হত মাতৃমুর্তিতে। কিন্তু সবকিছুই নিরঙ্কশ নয়, এও একটা বিপরীত দিকও ছিল। যেখানে অপমণ্য আর ঈর্ষা যুগ্মায় আক্রোশের অসংখ্য আক্রমণ। একটি বিষয়ে প্রথম ব্যক্তিকে সদাসতর্ক থাকত ধরিত্রী : নিত্য-সহচর পুরুষ! সখ্যতার সীমা লঙ্ঘন করতে গেলে, তাকে জয় করবার স্পর্শিত অভিল্য পোষণ করলেই, নির্ধিকার নির্মমতার তারের দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করত না। এই অনারী-প্রনোচিত আচরণ একদার বিমুগ্ধ অস্ত্রাঙ্গীরা এবং-এক প্রলভতম শত্রু হয়ে ঈড়াত। আর মেয়েদের বিরাগের কারণ ছিল বাস্তবম্বে

তার অরক্ষিত স্বভাবের প্রভাব। এই হীন প্রচারকার্যকে সত্যদ্বিল্যে অগ্রাহ্য করত ও স্বকীয় মহিমায়। আমি অসংশয়ে জানতাম—কলঙ্ক তার চরিত্রকে স্পর্শও করতে পারে না। তাই মিথ্যা ঘটনার দোষ হয়ে যেতাম অক্ষম বয়সে। এ আমাদের সমাজের এক কুৎসিত অভিশাপ।

নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে অল্পবিশ্ব কাজে আমি রাতের দিকে বহুক্ষণ চেয়ারে অতিবাহিত করতাম। বহুক্ষণ ঘরের বাইরে থাকা যায়। এমনই এক নিরালা অবকাশে ধরিত্রী এসেছিল আমার কাছে। বিষম বোধ করলেও অভাবনার ক্রটি হয় নি। ওর নবতম আবিষ্কার অনতিথ্যাত নবীন ঝর্ণশিল্পী অর্পণ সেনের নাম সেই প্রথম শুনেছিলাম। অভিজ্ঞাতরা, যে কোন কারণে ও ভাবেই হোক—আজও গুণের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন একথা অনস্বীকার্য। এক আত্মীয়ের বাড়িতে যোগে আসলে বাঙলা রাগসঙ্গীতে অর্পণের অসামান্য নৈপুণ্য ও কঠোরপূর্ণে মুগ্ধ হয়েছিল ধরিত্রী। কৌতুহল হইছিল অসুস্থ মনেসে গায়কের প্রতি। মৌখিক আলাপ পর্বেসিত হয়েছিল অন্তরঙ্গতার। তার দরিত্র আবাসে ছুটে গিয়েছিল প্রাঙ্গণচাঙ্গিণী। মাড়ীনা নূতন মায়ের ঘরেই ধ্বংস হয়েছিল। চেষ্টাছিল গুণের স্বাচ্ছন্দ্যে উপনীত করতে, অর্পণকে স্বনামে বিখ্যাত করতে। কিন্তু তার আগে ওর নিত্যযোগের উপশম প্রয়োজন। তাই আমার কাছে আসা। ধরিত্রীর অমুরোধ আমার পক্ষে অনতিক্রম্য। তখনই সঙ্গে নিয়ে এসে গাড়িয়েছিলাম এ ঘরে। সত্ত্ব হাকে হারিয়েছিলাম। অর্পণের মা'র সুকোমল বাৎসল্যের মাধুরী হৃদয়প্রান্তে তাঁর পায়ের তলায় আমার মাথা লুটিয়ে দিয়ে সব দুঃখ দূর করে গিয়েছিল। অমুরোধের বোধ হয়েছিল ওর সন্তানকে? সবচেয়ে পরীক্ষা করলাম তাকে—তখন স শব্দা নিতে বাধ্য হয়েছি। প্রচুর পরিশ্রম অথচ ম্যালনিউট্রিশন-এর যা প্রত্যক্ষ ফল,—উপযুক্ত জীবনীশক্তির অভাব ও গুরুতর ধরনের আনিমিয়া। এরপর তিলে-তিলে ক্ষয়িত হয়ে যেতে আর বাধা কি। হয়তো এটা টীক আমার কাজ নয়, তবু যথাসক্তি তার নিরাময়ে আমি একান্তভাবে নিযুক্ত হলাম। পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাস থেকে ধরিত্রীকে অশাসনে বিরত করেছিলাম। এই সর্বপ্রথম কঠিন হয়েছিলাম ওর প্রতি। আমার আত্মরিক্ততা হৃদয়ঙ্গম করে এবং কিরে যাব এই ভয়ে ও অপ্রতিবাদ কঠোর নিবৃত্ত হয়েছিল।

ওদের মা'হেলেকে দিয়ে আমার জীবন এক অপরূপে আন্দোলিত হল। একান্ত ধরিত্রীর কাছে অপরিণীত ক্ষুভত। এখানে যে ওর বসিষ্ট সঙ্গ পাই মাঝে মাঝে, তার মূল্যেরও কি পরিমাপ আছে। বেশ ব্যস্ততার পারি, এই অকূল অবস্থায় এদের প্রাত্যহিক দাবীগুলি কার সাহায্যের হাত মিটিয়ে থাকে—দামী ঔষধপথ্য থেকে সবকিছুই কেমন করে আসছে। শুধু এরা নয়, আমিও এই অবাচিত কষ্টগায় প্রদ্বাষিত হয়েছিলাম। যথোচিত সেবাচিৎসার রোগ এখন মুকিরই পথে। কিন্তু সম্প্রতি অর্পণের অমৃত্যুর ভাব-বৈলক্ষ্য আমার অভিজ্ঞ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গিয়েছিল, অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়েছিলাম—কারণ ধরিত্রীকে আমার চেনা আছে। যদিও ওর অবিকারের নির্দোষ থেকে, কিছু বুঝেছি কি না জাতিসম্মান পাবার উপায় নেই। আর

মা'র অগাধ সরলতার এত যুগ্মদৃষ্টি আশা করাই অসম্ভব। ছাত্রবিশেষ অপরিশ্রমদর্শী যৌবন, প্রাচুর্যবতী নারীর খেলালী আত্মকুল্যের সম্পর্কে এসে—অবস্থার সামর্থ্য বয়সের সমস্ত পার্থক্য ভুলে নিবিড় প্রণয়ে আত্মহারা হয়েছি। ওকে কি করে কেবাব ভেবে শোলাম না। যতদিন না মুখেরতার ব্যক্ত হয় দরিত্রতার কাছে—ততদিনই রক্ষা। ক্ষমাহীন কাঠিকে বিদার নেবার কালে একটিবারও আর পিছনে তাকাতে না ধরিত্রী,—বিভ্রান্তির প্রতি কোনও অমুরোধের দারিত্র্যই তার অবশিষ্ট থাকে না।

সন্দেহ নেই, আজ বিচ্ছেদের পর্ব চুক গেছে। নিরালা ঘরে অর্পণের রক্ত আবেগ নিশ্চিত অবাধ হয়ে ছিল প্রিয়ার উদ্দেশে। এই তার পরিণাম। বেদনার অবগাহনের প্রান্তিতে এখন শুভ হয়েছে ও—জানি নি আমার আগমন।

আমি ভাবছিলাম, কত অভিনবরূপেই যে ধরিত্রীর বিকাশ। স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, কণ্ঠা, সহ্যদ্রুতি প্রভৃতি শুকুমার চিত্তবৃত্তি পর্বাণ্ড আছে তার মধ্যে,—ঔশাসীক, উদ্ভূত, নির্ধরতারও তেমন পরিমিতি নেই। একই বস্তুকরা কোথাও বা শস্ত্রশালা, কোথাও উত্তর মরুভূমি, নর তো তুষারের রাজ্য! যে ধরিত্রীর বুকের বসিন্তে সমুদ্রের অন্তলে সম্পদের দাক্ষিণ্য—তারই মধ্যে জীবনহরণের দাক্ষিণ্য। ভূমিকম্প, প্লাবন, ইত্যাকার প্রাকৃতিক বিপদের কোনও নিয়ম নিরাপত্তা নেই। পৃথিবীকে আমার। দুয়ারী জননীজগৎই যেনেছি—প্রাণহীনীর রূপে দেখি নি। নিখিল বিশ্বের মাঝখানে থেকেও সে একক। ধরিত্রীতে এই বিচিত্র প্রকৃতি বৃষ্টি সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

মা ফিরে এসে সমস্ত হয়ে আলো আললেন। পুত্রের সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা, কোন দেবতার পূজা দিয়ে আশীর্বাদ এনেছেন। সচকিত অর্পণ ফুলে-ওঁ! আরন্তুচোখ থেকে উপাধানে মুখ মুছে ফেলবার ভাণ করল। তাঁর দ্বিগুণের উত্তর বললাম, ধরিত্রী চলে গেল মা, আমি এসেছি। ওঁ! কেউই এর নিগূঢ় অর্থ বোঝেন নি। এরপর কতক্ষণ অর্পণের উজ্জল ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা করে হৃৎকেন্দ্রের মুখেই হাসি ফুটিয়ে আমি ফিরলাম।

চৌরঙ্গী থেকে ময়দান, সেখান থেকে ষ্ট্রাণ্ড, এলামেলো ডাইভ করে উদার হাওদার মনের সবটুকু দুর্ভলতা প্রানি উড়িয়ে দিলাম। 'ধরিত্রী, তোমার বিরুদ্ধে কোনও নালিশ আমার নেই, রাখতেও দেখ না অর্পণকে। আর কিছু তো পাই নি, যে কর্তব্যের দুর্ভলতা দিয়েছি আমার—সব প্রতিবন্ধক পেরিয়ে সে তার আমি সানন্দে বহন করে চলব। তুমি সূচনা করেছ, আমি শেষ করব। অর্পণকে সারিয়ে তুলব, বাঁচিয়ে রাখব সচ্ছল্য সম্মানের জীবনে। ওর প্রতিষ্ঠা আর ব্যাতির ব্যাপ্তিতে চরিতার্থ হব নিজে। এই আমার শপথ।'

দু'টি হৃদয়

প্রতিমা দেবী রায়

বিষয় স্নাতক সিনেটা কেটে গেল,

দিনান্তের পারে নামলো রক্ত সন্ধ্যা

মলিন-খুসর বসন টেনে।

বাজলো না আবির্ভাবের আনন্দ।

আবার, তার মৃত্যুতে আসবে নতুন দিন,  
তার আত্মকার হিসাব থাকবে না কোথাও ।

দিন আসছে, বাছে—  
কে তার হিসাব রাখছে ?

কত অগণিতের প্রোত,—  
কত ভাল লাগা, কত বেদনা,  
কত স্মৃতি, কত হৃদয়  
সব বিলীন ।

সত্যতার উদয়-বিলয়  
রাজ-রাজাদের কথা  
অমর সে ব্যথা  
আজ ইতিহাসের পাতা মাত্র  
সন তারিখ চিহ্নিত ।

কিছু আমরা ?  
গড়লিকল্প প্রোত ?  
আমাদের চিন্তা, ভাবনা, উপলব্ধি  
পাবে না কোন ঠাই কালের পাতায়  
রিক্ত দিনের মত ক্ষয়ে যাওয়া জীবনটাই  
হবে ক্ষয়, মরণ সন্ধ্যার ।

জাতকিত প্রশ্ন কেঁদে মরে  
শান্তি, সত্য, শিব, পরমহ্রস্বর,—তুমি কোথায় ?  
হৃদয়-বিদারি নামে অক্ষয় ।  
জীবন-স্তন-মান, সব বাপসা হয়ে যায় ।  
বিবর্ণ রক্ত দিনের কদ্রালোকে  
দিগন্তের পারে চোখে পাড়ে 'ও কে ?'

ও কি সেই পরম হ্রস্বর  
পার্বতী পরমেশ্বর ?...

ও মরণবিজয়ী প্রেম ।  
মৃত্যু-তরঙ্গোপরি ঝাঁপিয়ে ছুঁটি নরনারী  
চিরকালীন আশা  
পরম বিশ্বাসে ।  
কংস আবর্ত ওঠে জেগে স্মৃতি মাঝারে  
সমস্ত বিলয় ;  
চারদিকে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের অপচয়—  
তার মাঝে সত্য জেগে রয় ।

আবার পূর্বদিগন্তে দেখা দেয় অকণিকা  
জীবনের স্তর সাহানা ওঠে বেজে  
দেখা দেয় নতুন আলোকে  
যুগান্তরের পারে ছুঁটি মায়া  
ছুঁটি স্বপ্ন ।

## আবো আশীর্বাদ

### শ্রীমতী অরুণা ঘোষ

অন্তাচলগামী বর্ষ নিয়ে গেল  
ব্যথাভরা রক্তমাখা দিন,  
কি নিয়ে আসিছ তুমি অভিশাপ ?  
না আশীর্বাদ বলা হে নবীন ।  
আকাশ যে আজো লাল  
ছলিছে যে চারিদিকে হিংসার আগুন,  
মায়ুষের মন হোতে চলে গেছে চিরন্তরে  
সুখময়, স্বপ্নভরা মধুর ফাগুন ।  
নাশদণ্ড বজ্রবালা কি দিয়ে করিবে বলা  
তোমারে বরণ আজ প্রাণের ঘাটে,  
শুধু যে বিলাপধনি মলয় বহিরা আনে  
রক্ত লেগে আছে তার গাম পত্রপুটে ।  
আকাশের আলো আজ গোখুরির রক্তিম লগনে  
রক্তে রক্তে রক্তা হয়ে আছে,  
বুড়ুক্ষার বহি জলে বাঙালীর মরতলে  
সর্বহারা আশাপাথ তবু চেয়ে আছে ।  
তোমার বরণডালার ছিলো যে প্রাণীপ জ্বালা  
নিভে গেছে বেদনার ঘাসে,  
ফুটেছিলো বত ফুল শুকায় সে ঝরে গেল  
অকালে গো মরণের পায়ে ।  
তাই তো বাঙালী আজ রিক্ত হ্রদে বসে  
'স্বাগত' জানাবে বলা কি বা দিয়ে আর,  
আনো, আনো আশীর্বাদ পুড়ে বাচ্ অভিশাপ  
আশান বঙ্গ হোক নন্দন আবার ।

## তা-ই হোক আশীর্বাদ

### রূপশ্রী ঘোষ

ছন্দোবদ্ধ বেদনার গান আমি গাই—  
সে গান হ্রস্বর কোথা কখনও হয়েছে অহ্রস্বর  
তবুও খামি নি কভু, বিলাপের নাহি অবসর ।  
সে গানের প্রোত তুমি হে দেবতা—জীবনদেবতা  
হুঃখ শেয়েছি হবে কেঁবেছি অজস্র বেদনার,  
তব চক্রে দেখিছি বরাভর আশিস ঘনায় ।  
তাই ত' বুঝি হুঃখ ক্রমের প্রসাদ—  
অবশ্য তা' গ্রহণীয় জীবনের পথে,  
আনন্দের অত্মীয় তাহারই শপথে ।  
হে কষ্ট, জয় হোক, হোক তব জয়  
তোমার দক্ষিণ মুখ সিন্ধু হস্তময়,  
তাই হোক আশীর্বাদ—সিন্ধু বরাভর



ম্যাসার হাউসের লব্ধ রিপোর্ট সেই লিখেছে। লেখাটার মধ্যে আলাংকারিক শব্দ ঢুকে গেল কটা। ঘটনাটা আত্মপুর্বিক নিজে চোখে দেখতে পেত যদি, তাহলে ঐ শব্দগুলো দিয়ে জারগা ভরাট করার বদলে লেখার মত বাস্তব সত্য কিছু পেত। রিপোর্টটা কনভেন্ট ম্যাপাঙ্কিনে বেরাবে। এই ধরণের রিপোর্ট সে একবারই মাত্র পাড়েছিল মনে পাড়ে। আরজটা তার এই রকম: 'আমার কলমটা আজ ডুবিয়েছি ছোট একটি শহীদদের হস্তে...' প্রত্যেক ধাপটা লক্ষ্য কর, তথ্য সংকলন কর। তথ্য লিপিবদ্ধ করলে আর নিজেকে মোচড়াতে হবে না...

পরদিন ভোরে এ্যাকটিং সুপিরির ডরমিটোরির বাইরে দেখা করলেন নানদের সংগে, জানালেন আজকের ম্যাস সিক্টার অরেলির রেকুরেম—তার আত্মার লব্ধ প্রার্থনা করতে হবে, গতকাল রাতে আকস্মিকভাবে নিহত হয়েছে সে। ম্যাসের পর খাবার ঘরে হাবার আগে তিনি বিস্তারিত জানাবেন ঘটনাটা, বাইরে কেউ প্রাঙ্গণ করলে যাতে উত্তর দিতে পারে তারা। মধ্যাহ্নের আগেই সমাপ্তি হবে।

...ট্রিশিক সবকিছুই জাড়াতিড়ি করতে হয়।

...কিন্তু এ কথাও তো আর লেখা যায় না।

...এ কথাও লিখতে পারি না যে সিক্টার অরেলির জারগার আমিও হ'তে পারতাম—যদি আমি কেবল নাইট রাউণ্ডে করেক মিনিট আগে যেতাম, সার্জারি ওয়ার্ডে দেরি না করতাম যদি।

...নিজেকেই নিজে বলছে, না এ কথাও লিখতে পার না তুমি। এ রিপোর্ট বার পড়বে তারা সবাই জানে তা হতে পারত না কখনও, ঈশ্বর বাকে মনোনীত করেছেন সে ছাড়া আর কেউ হতে পারত না। তাঁর পরিকল্পনায় অনিশ্চিত বলে কিছু নেই।

নানরা পরে বলবে, স্বর্গের দিন শুরু হবার সময় হয়ে গিয়েছিল তার।...পরিচিত বাক্যবিজ্ঞানে এই অকারণ মৃত্যুর পাশবিক তার দিকটা ঢাকা পড়ে যাবে।

খাবার ঘরের বাইরে এ্যাকটিং সুপিরির নানদের ছোট

দলটিকে ধাক্কা দেন। যে মৃত্যুকে এখনও বোঝে নি, তারই রেকুরেমে এইমাত্র গান গেয়ে এসেছে তারা।

শান্তভাবে বললেন, সিক্টার অরেলি পরার্থে মৃত্যুবরণ করেছে। একটি উদ্যম দেশীয় লোক কাল রাতে মেটাবিনিটিতে ঢুকে এমন আঘাত করেছে তার মাথার যে সে মারা গেছে। লোকটিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি মৃত্যুর আগে সে কমা করেছে তাকে, ভগবানের কাছে তার শেষ প্রার্থনা ছিল, এ অপরাধকে পাপ বলে গণ্য কোর না তুমি, কমা কোর ওকে।

প্রচণ্ড ধাক্কা নানরা নিশ্চল হয়ে গেল একেবারে।

প্রথম অস্বচ্ছন্দ দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল এমিকে-ওমিকে, আগের রাতে ট্রিটমেন্ট-রুম যে হতচেন নীরবতা নেমেছিল সেই নীরবতা নামল তারপর চারমিক ব্যাপ্ত করে।

সিক্টার মারিয়া-বাল্ম খামলেন না শুধু।

—আমরা জানি আমাদের প্রিয় সিক্টার প্রতিহিংসার ভাব দিয়ে যায় নি আমাদের ওপর—চিন্তাতেও না। সে আর নেই বটে, তার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব রয়ে গেছে আমাদের ওপর—প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদের, সেই কাজই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার। ডিউটিতে গিয়ে এখনই তোমাদের বয়সের সংগে দেখা হবে। এত বড় একটা দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া কি হয় আমাদের মধ্যে, সেক্স সশক্তিত হয়ে আছে তারা, ভাবছে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব। তোমরা তাদের বোঝাও ব্রিটানরা প্রতিশোধ নেয় না, যাক আমাদের শিখিয়েছেন শত্রুকেও ভালবাসতে। এই আদর্শবাদই শহীদ সিক্টার রেখে গেছে আমাদের জন্য, আমরা তাকে বাস্তব রূপ দেব।

...পরার্থে মৃত্যুবরণ...এটা আমি লিখতে পারি।

...কিন্তু নিজে বিশ্বাস করতে পারব কি? সিক্টার লুক হতাশ মনে জিজ্ঞাসা করছে নিজেকে।

সামনে মস্ত কাপড়—দেশীয় মানুষগুলোর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে আবার। ভবিষ্যৎ কর্পসবার এই নীতির ওপর ভিত্তি করে



পূর্ণপ্রাণে

চাবার খাখা

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)  
ক্যাথরিন হিউম

বহুমতী : প্রাণ '৬

অনিরুদ্ধ মিশনের যে কাহিনী স্মৃতি হল কল্পনায়, সিন্ধার লুকর রিপোর্টটাকেও ছোঁয়া লাগল তার—হতাশ মনে যে ভাবছিল রিপোর্টটি লিখে উঠতে পারবে না, বিশ্বাসের আলাক ফুটল তাতে।

লক্ষ্য করেছে কয়েকজন সিন্ধার ফিউনারাল-শেযে নিজের নিজের হারিয়ে ফিরে যাবার সময় ভর পেয়েছে—বয়সের সংগে মুখামুখি দেখা হবে এবার। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে গিয়েই সহজস্বরে তাদের সংগে কথা বলতে হবে, খুঁটখুঁতের আদর্শের কথা রাখতে হবে মাথায়। বাস্তব অন্তরে কিন্তু বিপরীত সুর বেজে উঠতে চাইছে। ক'জনের মধ্যে বিদ্রোহী ভাবটা এমনই মাথা তুলে ঝাঁড়তে চাইছে যে, দমনের ঐকান্তিক প্রয়াসে বাহুতই অস্থস্থ দেখাচ্ছে তাদের। যে কোন বিভাগেই বয়রা সিন্ধারদের তলনায় জনপ্রতি কুড়িজন অনুপাতে বেশি।

কালো মুখগুলো হঠাৎ দারুণ লজ্জায় কুংসিত দেখাচ্ছে, কি এক অশরিরের ছাপ পড়েছে এইটুকু সময়ের মাধ্য, যেন সেই চেনা মানুষগুলোই নয়। ওদের দিকে তাকিয়ে সব সিন্ধারদেরই মনে পড়ছে কংগার তাদের প্রথম দিনগুলোর কথা—সেই সেদিনের মতই আবারও আজ নতুন করে বৃষ্টির মুখের অগাধ, অভেদ, অজ্ঞের সম্মুখে এসে পড়েছে যেন। বায়ু-তাড়িত একদল মানুষ—গায়ের রঙটা অতিরিক্ত সাধা, বড় বেশি চোখে পড়ার মত।

তার নিজের বোকাপড়া এমিলের সংগে। তা দিয়েই বোঝা হয়ে গেল প্রথম এক ঘটনা কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছে অন্তরা। তবু তো এমিল একজন কনভার্ট, আর শ্রেষ্ঠকায় মানুষগুলোর সংগে তার পরিচয়ও আজকের নয়।

কিন্তু হাসপাতালে ঢুকল যখন, এমিল চোখ তুলে তাবাল না। তারপর সে ডেকের কাছে এগিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে করিডর দিয়ে চলতে শুরু করল। সামনের দিকে হুঁকে কুঁজো হয়ে চলছে কেমন, পিঠের ওপর সপাং করে এক ঘা চাবুক পড়েছে যেন।

পিছন থেকে এবার তাকে ডাক দিল সিন্ধার লুক।

—এখন কি তুমি কন্টেজিয়াসে যাচ্ছ নাকি এমিল? এই কাসলগুলো সিন্ধার মার্গারিটার কাছে পৌঁছে দেবে?

ক্যাশে হুঁকিত মুখে এমিল ফিরে তাবাল, মিত্রতার শরট্টা ক্ষয়গম হচ্ছে না। ওর মিত্রমুখের দিকে তাকিয়ে কাছে এসে ঝাঁড়াল তবু।

কি যে কাজের কথা বলছিল মামা লুক, কানে ঢুকেছে কি না সন্দেহ। অন্তর জুড়ে যে কথাটা বেদনা হয়ে বাজছে, সেই কথাটাই সব আগে এল জিহ্বাগে।

—সিন্ধাররা রাগ করেন নি আমাদের ওপর? ফরাসীতে নয়, কিসুওয়াহিসিতে জিজ্ঞাসা করল। নিহতের ভাষার কথা বলার অধিকারই হারিয়ে ফেলেছে যেন।

—তুমি তো আমাদেরই মত খ্রীশ্চান এমিল, তুমি তো জান আমাদের মনে হিংসার স্থান নেই। না এমিল, না, রাগ আমরা করি নি।

মামা লুকের শাস্তবর দিবার ফেলেছে, মনের সহজ হিসাবটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন।

—কিন্তু ঐ লোকটার ওপর তাহলে, মামা লুক...ঐ যে লোকটার জন্মে লজ্জা রাখবার জায়গা নেই আমাদের? কাল রাত্তিরে বাক ম'সিয়ে মারসেলের হাতে তুলে দেওয়া হল?

—তার ওপরও নয়, এমিল।

—আমি যে বুঝতে পারছি না। যে দুর্বোধ্য সমস্যার মুখে পড়ে সবটা বিধাশ্রুত, তারই আভাস ফুটল এমিলের মুখে-চোখে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে হইল একটু, চিন্তার ভারে ক্র হু'ট কুঁকিত। মাথাটা সঞ্চালিত হল দু'বার ওপর-নীচে। ধীরে ধীরে চোখের ভীতদৃষ্টিটা মিলিয়ে গিয়ে বিস্ময় ফুটেছে, সেই সংগে কাঠিন্তের আভাসও একটু। এই কঠোরতাটুকু পরিচিত।

—আমাদের কেউ যদি এভাবে খুন হ'ত মামা লুক, খুনেটাকে একেবারে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বাঁধতাম আমরা, আর জেলেরা সবাই তার গায়ের এক এক টুকরো মাংস খুবেল নিয়ে মাছ ধরার টোপ তৈরি করত—কংকালটা না বেরিয়ে পড়া অবধি।

সিন্ধার লুক ততক্ষণে ওর গলার ফিতে দিয়ে বোলানো ছোট সোনার ক্রুশটা স্পর্শ করেছে।

—হয় তো করতে এমিল, যদি...আমি বলব যদি না তাঁর এই চিহ্নটা থাকত তোমার গলার—তিনি আমাদের ক্ষমা করতে শিখিয়েছেন।

এমিলের কালো মুখে ক্ষুভিত একটুকরো হাসি ফুটল এবার। ল্যাবোরেরটার কোন জানা কাজে তুল করে ফেলে মামা লুক ধরে ফেলেন যখন, তখন যেমন ফোটে।

—এটাই তোমাকে বয়সের বুঝিয়ে দিতে হবে এমিল। মনে রেখ, তুমি ওদের ক্যাশিটা, আমার ডেপুটি।

কাগজপত্রগুলো হাত বাড়িয়ে নিল এমিল, নিয়ে অভিযান করল। বৈটে গীটাগোটা বাস্টু চেহার, মাথা উঁচু করেই এবার বৈটে যাচ্ছিল, কি ভেবে হলের মাঝখান থেকে ফিরে এল আবার। শটসের পকেট থেকে খুতোয় একসঙ্গে আঁকানো একগোছা পালক আর নখ বাধ করে ডেকের ওপর রাখল।

—কাল রাত্তিরে সেই বজ্রাতটার গলা থেকে একজন বয় এটা ছিনিয়ে নিয়েছে, জেলখানায় বাতে ভূত-প্রেতের হাত থেকে তার বাঁচবার কোন উপায় না থাকে।

সিন্ধার লুক পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল। লগ, বৃক্কের ওপর পড়ে আছে 'ফেটিশটা। সিন্ধার অবলম্বিত করবারে ছাপা অক্ষরের মত হাতের লেখার বানিকটা ঢেকে।

স্বাপিণ্ডটা এত দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে যে একবৃহত্তর কথা বলতেই পারল না।

—কে, এমিল?

—ইলুগা, মামা লুক।

ইলুগা! বয়সের মধ্যে একমাত্র এই-ই খ্রীশ্চান নয়।

এত জোরে তাবিজটা চেপে ধরেছে যে খুতোয় গাঁথা নখগুলো ফুটছে হাতে। একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হাতের নীচে অন্তর ছোট ছোট নিভুল লেখাগুলো ছাপসা হয়ে এল।

...ইলুগা সিন্ধার, তোমার সেই মাটিতে লুটের পড়ে আছে দেখে যে বেদনা সে পেয়েছে তাই তাকে এই মরুপড়া জিনিসটা স্পর্শ করবার

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

সাহস ছুগিয়েছে। একজনকে অন্তত তুমি গোঁথেছ তোমার বঁড়িশিতে, ছোট বোনটি আমার, একজনকে তুমি গোঁথেছ...

মুঠো খিঁচিল করে ফেটিশটা বাড়িয়ে দিল এমিলের দিকে।

—এটা তোমার সেই ছেলোটর কাছে জেলে ফেবং পাঠাতে হবে এমিল—এটার ওপর তার মস্ত নির্ভরতা, আমরা তাকে অসহায় করে দেব কেন। বিচারের সময় নিজেকে বাঁচাতে এটা তার কাছে থাকা চাই।

চমকে ফেটিশটা থেকে চোখ তুলে তার দিকে চাইল এমিল, কিন্তু এটা তাকে বাঁচাতে পারবে না মামা লুক।

—সেটা ওকে নিজেই বুঝতে দেওয়া বরকার এমিল।

কোমলকণ্ঠে কথাটা বলে এমিলের দিকে চেয়ে একটু হাসল। বড়বয়সটার মধ্যে তাকেও টেনে এনেছে।

সেই হাসিটুকু এমিলের মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে দিল। ডাকহুকরার মত ছুটে চলে গেল সে, খুলিভর্তি খবর তার বহদের দেবে।

এরপর অনেকদিন রিক্রিয়েশনে নানরা প্রায়ই সিস্টার আরেলির কথা বলাবলি করল। তাদের মুহূর্ত গভীর কঠিন কখনও বেদনার আভাস পাওয়া যায় না কিন্তু। বরং একটু ঈর্ষার আভাস থাকে।... যদি আমি মনোনিীতা হতাম...

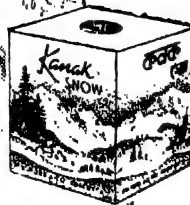
সে ঈর্ষার হুণ্ডী সিস্টার লুক নিজের অন্তরেও অচূড়ন করতে পারে। সেদিন রাজে সিস্টার মনিক অমিত্রাকর ছন্দে পরমেশ্বরের অপার কল্পনার কথা শোনালেন—সেই কল্পনা করে পড়েছে সিস্টার আরেলির ওপর...সেই কল্পনার বলে তাঁর নামে প্রাণ দেবার গৌরবে গৌরবান্বিতা হয়েছে সে...সুতরাং স্তন্যে সেদিন ঐ ঈর্ষার দাহ নিজের অন্তরেও অচূড়ন করেছিল।

অথচ ভাবতে গেলে একসময় ছিল যখন শিশুর নামে মৃত্যুবরণ করার এইরকম আকাঙ্ক্ষা বাড়াবাড়ি মনে হ'ত, কিংবা বলা চলে একেবারে পাগলামি মনে হ'ত। এখন আর তা মনে হয় না।...ট্রি হাউসে থাকতে উপলব্ধি করেছিল প্রকৃত নান হওয়ার অর্থ কি...সেই থেকে এই ছ'বছরে কি পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে মাঝে মাঝে বিশ্লেষণ করে দেখে। দেখে যত, মনে হয় তার নিজের ধারণাও প্রকৃত নান হওয়ার দিকেই এগোচ্ছে সেই অবধি। প্রকৃত নান শেষ শক্তিবিন্দুটি পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেয় কাজ আর প্রার্থনায়, চিরকাল আশা পোষণ করে কোন না কোন আত্মহত্যার মূল্যে প্রভু স্বর্গে স্থান দেবেন তাকে। সেই আত্মহত্যার তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীতে, সিস্টার আরেলির আত্মহত্যার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেমন।...

আরও তিনজন সিস্টারের কাছে বয়রা নিজেদের ফেটিশ খুলে দিয়ে গেছে। নিজে হ'তে, চাইতে হয় নি। ঠিক তারই মত তাঁরা সবাই ফেবং দিয়ে দিয়েছেন সেগুলো তাদের, যাতে ওরা নিজেরাই



আনন্দ ঈশ্বরে  
ক.হোডের  
সমর্পণ সামগ্রী



ক.হোড ২৩ কাক • কলিকাতা-১০

পরীক্ষা করে বোঝে কোন ক্ষমতা ওস্তাদের নেই—যদিও সে কিন্তু কোনদিন বলে নি এমিলকে দলে টেনে কি বড়বয়সে করেছে।

রিক্রেশন-বৃত্তের চারদিকে চেয়ে সবার মুখগুলো দেখে সিঁটার লুক। শেষে সিঁটার অরেলির কথা বলতে বলতে বেদনার চিহ্ন মুখে ওদের মুখে গৌরবের আভাস ফুটেছে। যে কৃষ্ণবর্ণ মাছঘটা হত্যা করেছে তাকে তারই সমগ্র জাতটার ওপর সিঁটার অরেলির রক্তস্বরা সার্থক আজ!...আলোচনাটা মধুর শোনার না, ছেলেমাছবিও নয়। সব কিছুর মধ্যে যে কথাটা মনে লাগে তা হ'ল তাবিজগুলো হাতে এসে পড়তে সবাই তারা একইভাবে উত্তর দিয়েছে। মনে হবে যেন একটা একক বুদ্ধিবৃত্তি তাদের ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্কগুলোকে অল্পপ্রাণিত করেছে।

একটা ব্যতিক্রমের কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

—প্রথম থাকার আমার খালি মনে হয়েছিল ওটা একটা উন্মাদ খুনে...সমস্ত অন্তর চাঁৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল বিধাতাকে, কেন এই অবিচার!

এ্যাকটিং স্পিরিটের বললেন, আমার ধারণা আমরা সবাই তাই করেছি সিঁটার লুক। এর জন্যে অমুশোচনার কোন কারণ নেই। পরমেশ্বরের প্রতি রহস্যময় পদক্ষেপটি আমরা তখনই দেখতে পেতাম যদি আর বৃত্তে পারতাম, এই লৌকিক জগতে আর থাকতে হ'ত না আমাদের। হ'ত কি!

কথাটা সবারই উদ্দেশ্যে, সবাই-ই তাই তার মর্ম উপলব্ধি করে রাখা নাড়ল।

সিঁটার লুক ভাবছে। সিঁটার অরেলির দেহের অব্যবহিত সমাধি-মিছিলের সংগে যেতে যেতে প্রাণবীনাট বড় বেশি ব্যস্তিক হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল নিজের কানেই...অন্তর্যাত্মা বাবো-বাবো কেনে উঠছিল কেন? কেন?...পরে সেই বেদনাগায়ক সময়টা অমুতাপের কারণ হয়েছে। আজ সিঁটার মরিয়া-রোজ সেই অমুতাপের শেষ ছায়াটুকুও সরিয়ে দিলেন—তার ওপর থেকেও যেমন, ওদের সকলের ওপর থেকেও তেমন।

শামিয়ানার তলার ক্ষুদ্র আলোক-বৃত্তের চারপাশে রাতের একঘেয়ে সুর আবাহত হানে। ডিসেবারের মধ্য-গ্রীষ্মের উত্তাপে শ্বাস-রোধ হয়ে আসে। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবী সারাদিনে যে পরিমাণ প্রখলিত উত্তাপ টেনে নিয়েছে, সূর্যাস্তের পর তা উদ্গিরণ করে দেয়। এই দুঃসহ গরমে বোধ হয় 'ঝিঁঝিঁ' পোকা আর বাতুড়গুলোরই কেবল ইচ্ছে থাকে ঘুরে বেড়ানোর।

...আর নানদের!

তাদের হাতের বোনার কাঁটার কাঁটার ঠোকাঠুকির শব্দ কানে আসে, ওরা সেলাই করছে বসে।

বাতুড় উড়ছে। নানা পোকা-মাকড়।

কিচ্,কিচ্, শব্দ। তীক্ষ্ণ স্বর।

সে শব্দসংগে বোনার কাঁটার ঠোকাঠুকির শব্দ কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

...কনভেন্টে কোন বীরও নেই!...

মঠের চলিত উক্তিটা মনে করে নিজের মনেই একটু হাসল সিঁটার লুক।

কংগোর ক্রিসমাস ইভের মধ্যরাত্রির মাস সব সময়ই মর্মপার্শী হয় খুব। পাঁচবার সিঁটার লুক গান গেয়েছে এই মাসে, এ বছর হাসপাতালে ডিউটিতে আটকে ছিল, গানের দলে যোগ দিতে পারে নি। ম্যাসের সময় এসে অজ্ঞাত দর্শকদের মত পিঁজিতে বসেছে তাদের সংগে। তাদেরই মত একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল নানদের তৈরি বাঁশ আর কান'গাছের পাতার ছোট আন্তাগুলটার দিকে। বসে দেখতে দেখতে চারপাশের আসনগুলোর অল্পভূতির আভাস পাচ্ছে। সংগীহীন জোয়ান শ্বাবসারীদের মনে পড়ছে জীবনের সব বড়দিনগুলো—সেই কান্ ছেলেবেলার অসীম কৌতুহলে জারনার পায়ে শিশু যীশুর মূর্তিটিকে শোয়াতে দেখেছিল। আবঠ রাম পান করে যে সব উপনিবেশিকরা সংগী-সাথী ছেড়ে কনভেন্ট চ্যাপেলে এসেছেন, স্বদেশের কথা ভেবে চোখ ছলছল করছে তাদের। কনভেন্টের কৃষ্ণাল বয়সের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক উত্তেজনার প্রবাহ বইছে, সেই প্রবাহটাই সবচেয়ে বেশি আসছে অমুতাবে। একধারে সবাই বসে পির চোখে তাদের নতুন ধর্মের এই মর্মগ্রাহী দিকটা দেখছে। তাদের মধ্যে জন্মের বুনা ছেলেগুলোও বসে...ওদেরই সটম্ আর সার্ট ধার করে পরেছে। বররা ওদের নিয়ে এসেছে অমুঠান দেহতে।

কি ভাবছে ঐ বুনা ছেলেগুলো কর্তন করা সম্ভব নয়, তবু টের পাচ্ছে মধ্যরাত্রির সুরেলা ঘণ্টাধ্বনিতে যে আবুলতা ও প্রত্যাশা ফুটেছে ওদের তীক্ষ্ণ চেতনার তখনই ধরা পড়ল তা। পরমুহূর্তে সে ঘণ্টাধ্বনি ধামামাত্র বে নীরবতা নামল, তার মধ্যে ওদের বেসটেলের টু-টাং শব্দ শোনা গেল...হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা অভিব্যক্তি-ভাইদের হাত ধরতে।

ধ্বংসে সাধা ক্যার ক্যাপ মাথায়...সিঁটারদের অসম্ভবত শোভাযাত্রা বেহিয়ে এল মঠের তোরণ দিয়ে। অরগ্যানের প্রথম সুর কব্জত হ'ল, তারই সংগে অবিমিশ্র মাধুর্যে সুর মিলিয়ে গলা তুলল তারা। এক একজন করে আসছে সুরার পদক্ষেপে...সারি-বন্ধ...মিছিলটা দীর্ঘারিত হচ্ছে ক্রমেই...অবশেষে এ্যাকটিং স্পিরিটরকে দেখা গেল, ছু'হাতের পাতার শোয়ানো শিশু যীশুর মূর্তি।

নানরা অলটার ঘিরে গাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলো এসে পড়ছে মুখে...পোশাকের লম্বা আন্তিন ডানার মত কুলে আছে দু'পাশে...মুস্তকর তারই মধ্যে লীন, বাইরে থেকে দেখা যায় না!...একদল দেহবৃত্ত বেন, এগিয়ে চলেছে ম্যান্ডারটার দিকে—জাব দেবার সেই পাতটা। চ্যাপেলের ঘণ্টাটা বাজছে...গানের মধ্যে বাজছে, গানের বিরতিতে বাজছে। স্পিরিটর বখন খড়ের বিছানার ওপর পোপালিনের মূর্তিটা শুইয়ে দিলেন, অরগ্যানের সংগে ক্যারার দলের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে চড়ল...

...ক্রাইস্ট আবার জন্ম নিলেন...ক্রাইস্ট আবার জন্ম নিলেন...

...সিঁটাররা গাইছেন...

...খড়ের ওপর শোয়ানো মূর্তিটার হাঁটুতে টোল, বাকানো কজ্জ,

—পুতুলের মত দেখাচ্ছে...

ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে অনেক উঁচু থেকে।

...ওরা ঠিক ছোট ছোট আবলুশ কাঠের মূর্তির মত বসে আছে এখানে, সিঁটার অরেলি। পালক আর নখের গোছা এখনও গলায়

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাই

কোলানো ওদের :--তা'হলেও--ওরা এখানে এসেছে। ছোট বেনিট আমার, এসেছে ওরা। আমাদের মোহন-বিভা দেখছে বসে। কারো একটি নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না--নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না।

তিনটি ম্যাসের পর প্রায় সব নানরাই বাৎসরিক ভোজে যোগ দিতে গেল খাবার ঘরে--ইচ্ছামত খাওয়া-দাওয়া করতে পারে তারা আজ, কোন বাধা-বন্ধ নেই। ফল আর এক গেলাস মদ, আর আর ক'জন যারা এ দিনও মদ খেতে চায় না, তাদের জন্য ঠাণ্ডা করা কোকো। গ্র্যাণ্ড সাইকেল অফুইই রাখতে হবে, তবে তারা চোখে-চোখে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে--আর ঐ মদ--বছরে কেবল চারবার দেখা দেয় বড় বড় ভোজগুলো--ইস্টার, গ্র্যাসাম্পসান, অল্ সেন্টস্ আর ক্রিসমাসে--তাও হ'গবলিটের বেশি কেউ নয়--ঐ মদ তাদের মুখের চোখে দীপ্তি এনে দিয়েছে।

—সিফ্টার অরেলি নিশ্চর চ্যাপোলে ঐ জলী-ছেলেগুলোকে দেখছিল।\*\*\*হৃদিও যে সম্ভাবনাটা মনে আসছে তার উল্লেখ করাটা হঠকারিতা হবে, কিন্তু আমরা তো অমরোও করি নি তাদের, তা সত্ত্বেও তারা যে এল এতে আশ্চর্য হবেই সবাই।

—শোভাযাত্রার তাকে আমার বড্ড মনে পড়ছিল--খারাপ লাগছিল ভারি--সে সবসময় সামনে থাকত আমার। মাঝে মাঝে চড়ায় আমার গলা উঠত না যখন, তার কণ্ঠের সুরে আমার ক্রটি ঢাকা পড়ে যেত।

—মাদার ম্যাথিল্ডা আজ রাতে আমাদের কথা ভাবছেন

নিশ্চর--মাদার হাউসে বড়দিনের উৎসব--কি সন্দের হয়, মনে আছে ?

যারা ঠাণ্ডা কোকো বেছে নিয়েছে, মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তাদের দিকে তাকাত গিয়ে গোপনে গোপনে কেমন একটা কল্পনা অমুভব করছে সিফ্টার লুক। পানীহটা ঠাণ্ডা করে দিয়েছে মনটাকে--আজ রাতে সারা বিশ্বে যে আনন্দ পরিবাস্তু তারই আভাস লেগেছে ওদের ছোট বকিত দলটাতোও।--মাদার হাউসের উৎসব অবশ্যই আরও জমকাল হবে। সে কিন্তু একমুহূর্তের জন্তও তার নিজের এই ছোট কমিউনিটির উৎসবের বিনিময়ে সেখানকারটা পেতে চায় না। পঞ্চাৎ পটুড়মিতে ঢাকের শব্দ, ঝিঝির ডাক, উত্তাপের আধিক্য লাল মুখগুলো--তবুও না।

মিতমুখে চুমুক দিচ্ছে পানিপাত্রে। মনে হচ্ছে মাদার হাউসে আট হাজার কিলোমিটারের চেরও অনেক বেশি দূর। কংগোর এই খাবার ঘরে--যেখানে হাসিখুশি সিফ্টারদের একটা ছোট কমিউনিটি তাদের মাদৃ সেওয়া বিবের ওপর তোরালে আটকে মধ্যরাত্রির পর আম খাচ্ছে, যারা নিজের দু'হাতের রেখাগুলোর মতই অস্বরণভাবে জানে পরস্পরকে--এখানে থেকে মাদার হাউসের মধ্যে বেন বছ ষৎসরের ব্যবধান।

সিফ্টার অরেলি তাদের জ্বালাতন করতে যে ভাবে জোর করে আম খাওয়াত--ছুদী-কাটা ছাড়াই--বসন্ত, শুকনো ব্যবহার করা মাসে ভগবানের এই অপূর্ণ মানকে অপরিত্র কর--সেখল তারা অধিকাংশই সেই পদ্ধতিতে আম খাচ্ছে। টেনে টেনে খোসা ছাড়িয়ে

মন মাতানো

পক্ষে

ভরা বালেই

সবার পছন্দ

# হিমালী

নতি পাউডার

উন্নত কৃষ্টি

পরিচালক

হিমালী প্রাইভেট লিম

তনিকাহা

ফেলে সোজা সোনালি শাঁসের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছে চ্যাপ্টা আঁঠিটা ধরতে।

সিক্টার মনিককে আগে কখনও হাতে করে কল খেতে দেখা যায় নি, আজ দেখা যাচ্ছে তিনিও হাত লাগিয়েছেন আম খেতে। দাঁতে করে তুলে নিয়েছেন অনেকখানি শাঁস, আর সেই খালি জারগাটার আঁশ ধরে ডিম্বাকৃতি আঁঠিটাকে তুলে ধরেছেন। কলারসিকের চোখ তাঁর, ওটার আকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখছেন হয় তো তাই উদ্ভিদ্ধ উৎপত্তি নির্ধারণ করছেন। 'ম্যানগিকেরা ইন্ডিকা'—মনে হয় প্রায় ছ'হাজার বছর ধরে চাষ হচ্ছে—বলমাকৃতি চিকণ পাতা, ছোট ছোট লালচে ফুল—আঁঠিওরালা শাঁসালো ফলে রূপান্তর ঘটে তার—

সত্যি তা বলে এমন কথা ভাবছেন না সিক্টার মনিক। সিক্টার লুক জানে যে একটি অদৃশ উপস্থিতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে তাদের সবার মনের সংগে, তাইই উদ্দেশ্যে কথা বলছেন তিনি।

বোধ হয় বলছেন, তুমিই নির্ভুল সিক্টার, ছোট বোনটি আমার আম খাওয়ার এটাই একমাত্র উপায় বটে।

সিক্টার লুকের সংগে চোখোচোখি হয়ে গেল, আঁশ-ভরা আঁঠিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে শিত হাসলেন।

১১৩১ সাল। কে জানত বছরটা কি অমংগলের ছায়া নিয়ে এল। নববর্ষের পনেরো দিন পরে মাদার ম্যাথিল্ডা ফিরে এলেন। প্লেনে এসে পৌঁছোতে প্রায় সন্ধ্যা হল। এ্যাকটিং সুপিরিরদের সংগে কোন্ কোন্ নান বিমানবাঁচিতে যাবে তা নিয়ে কিছু গবেষণা হ'ল যেমন হয়ে থাকে এবং চিরায়তির নিয়মে সবচেয়ে নিরহংকার ছুটি নান মনোনীত হ'ল—রায়াধর আর লন্ডির তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ওপর।

রাউণ্ড দিতে দিতে সিক্টার লুক গুনতে পেল প্লেনটা হাসপাতালের ওপর দিগে চলে গেল। শুনে নিজের মনেই প্রাণনা করল একটু, মাটিতে নামবার মুহূর্তটির জঙ্ক।

এই ভাবে দেশ থেকে কেউ ফিরলে সেদিন সাক্ষ্যভোজনের সময় খাবারের সংগে মদ দেবার বিশেষ বিধান আছে। সেদিন চ্যাপেলে স্ত্রালভের ঠিক আগেটোতে মনে মনে মাটিন আর লড বলে নিলেই চলে। তাতে মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে প্রথম রিক্রিশেনটার সময় খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া গেল। নানদের অনেক কথা বলবার থাকবে তাঁর—মাদার হাউসের বড় বড় ক্রিগাকলাপের কথা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৌখিক-ভাটে বেতোয়েও মাদার ইমাম্বারেলের পুননির্বাচনের কথা—এটা তিনি ইতোমধ্যে লিখেছিলেনও স্যাক্সেপে, সুপিরিরের জেনারেল কি খবর পাঠিয়েছেন তার কথা, ওদের আত্মীয়-বন্ধু বারো দেখা করেছেন তাঁরা কি বলে দিয়েছেন সে কথা।

পরদিন সকালে একক সাক্ষাৎকার হবে মাদার ম্যাথিল্ডার সংগে, চিন্তার সেখানে গিয়ে পড়েছে একেবারে। নিজের ধর্মীয় জীবনের কথা বলবার জঙ্ক ব্যর্থ হয়ে আছে। সুপিরিরের সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করবেন সর্বপ্রথম। আর বা কিছু সব পরে আসবে—মেটারনিটির এক্সটেনশান-ব্লকটা শেব হয়ে বাওরার খবর, রোগীদের সেখানে রাখা শুরু হয়ে গেছে, তার নাসিং নানদের

বাহ্যের খবর—সিক্টার আরেলি মাদার বাবার পর তারাই সব কিছুয় দারিদ্র কাঁধে তুলে নিয়ে এই বিলী আবহাওয়ায় খিণ্ড অতিরিক্ত কাজ করে তার কাজগুলো করে যাচ্ছে—

বলবে, আমার আধ্যাত্মিকতার, মাই মাদার, এতদিনে বেন একটা এক্স এসেছে। এ দুঃখের ঘটনাটা অনেক কিছু শেখালো আমার—আমি ভক্ত ছিলাম অনেক বিষয়। অনিশ্চয়তা আর নেই, ছোটখাট ভুল-ত্রুটিতে দুঃখ পেয়ে আত্ম-নিপীড়নের অসারতা এখন বুঝছি। এ আত্ম-নিপীড়ন এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে ঠিকই—হ্যাঁ, অনেক সময়ই ঘটে। তাহলেও আমার দক্ষতার চেয়ে ঈশ্বর বেশি করুণা করেন আমার। নিজেকে আজকাল শক্তিময়ী মনে হয়—আভ্যন্তরীণ শক্তি—

—আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে জানান? ক্যানারী পাখা গিলে ফেললে বেড়ালকে যেমন দেখায় তেমন।

ডাক্তার কখন এসে তার ডেকের সামনে দাঁড়িয়ে দক্ষ্য করছেন সে নিজের সংগে কথা বলছে।

বিকৃত হাতে হাত বাড়ালেন, এংগেবাটের চাটটা পেতে পারি কি? মাদার ম্যাথিল্ডাকে শুভেচ্ছা জানানো যাচ্ছি—সেই সংগে কাজের কথাও যোগ করে দিতে হবে—সাইকিয়াট্রিক কেনটার কথা বলতে হবে তাঁকে।

সিক্টার লুক ফাইলটা দিতে সেটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে হাওরা খেলেন একটু, কাল রাত্তিরেও তার সংগে জেগেছিলেন দেখছি। এবার কি? আত্মহত্যার ভয় কি?

—বিচ্ছু না উষ্টর, সত্যি ভাবি একলা লাগছিল, তাই। না হলে দেখালোনা যেটুকু করবার, সেজন্তে নাইট-বাই তো যথেষ্ট। এক মুহূর্ত খেমে হাসল একটু। আমি শুধু একটু কথা বলেছিলাম তাঁর সংগে আর কিছুই করি নি। তখনই তো একেবারে শান্ত নিরীহ হয়ে গেলেন।

—বিনয়ের আড়ালে নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করবেন না। একমাত্র আপনিই ওকে চালাতে পারেন এবং পারেন যে তা নিজের জানান বশ। আমার অবশ্য কুতূহল হওয়া উচিত, কিন্তু আপনার দিকে চাইলে আর তা হওয়া হয় না আমার।—মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি সিক্টার, কখন আপনি একটু ঘুমোন—আমার তো মনে হয় আদর্শই ঘুমোন না আপনি।

মুহূর্তকরক বিশ্লেষণ করে দেখলেন তাকে, গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন তারপর। টোসকার স্বর ভাঁজতে ভাঁজতেই মনে মনে মতলব একটা ঠিক করে ফেলছেন, ছোট ছোট চোখ দুটো জলে উঠল।—উত্তরকালে রতবার তার মনে পড়েছে এ দৃশ্য—কি সরল বিষাসই ছিল অপরের মন-বিশ্লেষণের ক্ষমতার ওপর। জেবেছিল ডাক্তারের চোখের উজ্জ্বল্যকেও তা দিয়ে বুঝে ফেলেছে।

—এখন থেকে ম'সিয়ে এংগেবার্টকে অল্প-খর ঘুমের ওষুধ দেবার জুজুম আসবে, আমি বাতে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি।

শুশুণিরে গান গেয়ে চলে যাচ্ছেন ডাক্তার হাতের ফাইলটা হাত-পাখার মত নেড়ে হাওরা খেতে খেতে।

গিছন হতে সিক্টার লুক দেখছে তাকিয়ে।

[ক্রমশ]

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

অজিতকৃষ্ণ বসু

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ]

# বাসমী মজিল



[ ৩নটম্বর মিত্রের ডায়েরি থেকে ]

কুদিরামের কীসির পর চইতে বাতাসী বিবি বাঙালীকে নতন দৃষ্টিতে দেখিতেছে, একথা বাতাসী বিবির নিজের মুখে শুনিয়া ভাবিলাম, তবে কি সে ইতার পূর্বে বাঙালী-জাতিকে ভীকু, দুর্বল, কাপুরুষ ভাবিয়া ঘৃণা কবিত এবং বাঙালার নিভীক কিশোর কুদিরাম শহীদ হওয়ার পর বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে সে তাহার আগেকার ধারণা পরিবর্তন করিয়াছে? ইহাতে 'ক্রিমিনাল' (criminal) বাতাসী বিবি সম্বন্ধে আমারও ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিল। সে বতই হীনচরিত্রা, অপরাধপ্রবণা সমাজ ও আটন-বিবোধিনা পাশিষ্ঠা হোক না কেন, আমাদের শহীদকে সে শহীদ বলিয়া চিনিরাছে, মনে মনে মর্ধাদার আসনে বসাইরাছে এবং কুদিরামের স্বজাতি বলিয়া বাঙালীকে সে সম্মানের চোখে দেখিতেছে, ইহা ভাবিয়া আমি মনে মনে তাহার সাতধুন মাক করিয়া দিলাম।

শুধু তাহাই নহে, মনে হইল আমি যেন বাতাসী বিবির কাছে ছোট হইয়া গিয়াছি। বাতাসী বিবি বাঙালী নহে, বাঙলার কিশোর কুদিরাম তাহার কেহ নহে; কিন্তু আমি বাঙালী এবং কিশোর কুদিরাম বাঙালী, আমার স্বজাতি। তবু এই বাতাসী বিবি কুদিরামকে যে মর্ধাদা দিল, আমি তাহা দিতে পারি নাই। বাঙলার যে 'রাস্তনৈতিক' বা 'স্বদেশী' আলোড়ন চলিতেছে আমি সে বিষয়ে কখনো বড় একটা মাথা ঘামাই নাই, আপন মনে আটনীগিরি করিয়া পরমা কামাটীরাছি আর আপন খেলালে চামুড়া'র কুস্তির আখড়ায় কুস্তি লড়িরাছি। মতঃকরপুর জেলে বাঙলার কিশোর কুদিরামের

কীসির সংবাদে ভূখবোধ করি নাই তাহা নহে। কিন্তু এ একটু সাময়িক 'আহা!' একটু অমুৎসাহ। একটু সহানুভূতি। বেচারী, থামখেলালী ডানপিটেশনা করিতে গিয়া অকালে বেহোতে প্রাণ হারাইল। ইংরাজ যদি কুদিরামকে কীসি না দিত তাহা চইলে থপি চইতাম—হয় তো বঙ্গ বঙ্গও করিতাম। ইংরাজ তাহাকে কীসি দেওয়ার ভূখিত হইয়াছি, কিন্তু বাতাসী বিবির মত ইংরাজকে অমন করিয়া ঘৃণা করিতে তো 'পারি' নাই।

বাতাসী বিবি আমাকে মর্ধাদা দিতেছে শহীদ কুদিরামের স্বজাতি বলিয়া, ইহাই যেন আমাকে কুদিরামের শহীদত্ব প্রথম অনুভব করাইল। বাঙলার কুদিরামকে যেন প্রথম শহীদ বলিয়া মনে করিলাম বাতাসী বিবির ডেয়ার। বিধাতার এ কি অদ্ভুত থামখেলালী!

ভাবিলাম যে কুদিরাম অবাঙালী বাতাসী বিবির চোখে বাঙালীকে প্রজ্ঞার আসনে বসাইরাছে, তাহার সম্বন্ধে—আমি বাঙালী—আমার কিছু মন্তব্য করা আবশ্যক। বলিলাম, 'আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কুদিরামই সর্বপ্রথম কীসির শহীদ।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'আজ হইতে পঞ্চাশ সাল আগের কথা ভুলিযেন না, বাবুজি, যখন ব্যারাকপুরে সেপাই ছাউনির মরদানে সেপাই মঙ্গল পাণ্ডের কীসি হইয়াছিল। আমি পাঠকস্তির মুখে তাহার কথা শুনিরাছি। পাঠকস্তি তাহার কথা আজও ভুলিতে পারেন নাই। মঙ্গল পাণ্ডের কীসি পাঠকস্তি নিষ্কর চোখে দেখিয়াছিলেন।'

বসুমতী : শ্রাবণ '৭১

৬২৫

বলিলাম, সে কথা আমি পাঠকজির মুখে শুনিয়াছি বাতাসী বিবি।’

ইহা শুনিয়া বাতাসী বিবি যেন কিঞ্চিৎ বিম্বিত বোধ করিয় বলিল, ‘ও, তিনি আপনাকে শুনাইয়াছেন? তিনি কি ক্ষুদ্রায়ম সখ্যেও আপনাকে কিছু বলিয়াছেন?’

‘না, বাতাসী বিবি।’

‘আমাকে বলিয়াছেন।’ বলিয়া বাতাসী বিবি যেন আমার উপর তাহার এই কথার ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমার কোঁতুল হইল। প্রশ্ন করিলাম, ‘কি বলিয়াছেন?’

‘মজঃফরপুর জেলে যখন ক্ষুদ্রায়মের কঁাসি হইতেছিল, তখন সেই কঁাসি—’

আবার নীরবতা। বাতাসী বিবি যেন বিশেষ কোনো কারণে কথটা বলিতে ইতস্তত করিতেছে। আমি প্রশ্ন করিলাম: ‘তখন সেই কঁাসি...?’

আমার কোঁতুল আর অকুপ্ত রাখা উচিত হইবে না মনে করিয়াই বোধ করি বাতাসী বিবি বলিল, ‘সামনে ঠাড়াইয়া নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন পাঠকজি।’

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকিয়া উঠিলাম। মুখ হইতে আপনা হইতেই বাহির হইয়া গেল, ‘অসম্ভব!’

কথটা উন্মুক্ত হইয়া নিজের কানেই বড় কটু শুনাইল। আমার কথা যেন ইঙ্গিত করিতেছে বাতাসী বিবি মিথ্যা বলিতেছে, অথবা বোমভোলা পাঠক তাতাকে মিথ্যাকথা শুনাইয়াছেন। ভয় হইল এইরূপ ইঙ্গিতে বাতাসী বিবি অপমানিত বোধ করবে। ক্রুদ্ধ হইবে এবং ক্রুদ্ধা কণিণীর দংশনের অভ্যুত্থান আমাকে সঙ্কট হইবে। এই রহস্যময় রমণী কি ভগ্নদরী কল্যাণী রূপ ধারণ করিবে কে জানে?

কিন্তু না। বাতাসী বিবি চটিল না। চটিয়াও না-চটিবার ভাণ করিতেছে এরূপ সন্দেহ বাহ্য হইতে পারিত, তাহা তাহার কণ্ঠের সুরে এবং বাচনভঙ্গিতে দূর হইয়া গেল। বাতাসী বিবি যেন একটু কোঁতুকবোধ করিয়াই বলিল, ‘অসম্ভব ভাবিতেছেন কেন, বাবুজি?’

ভরসা এবং সুযোগ পাওয়া বলিলাম, ভারতে এখন প্রবল প্রতাপ ইংরাজ রাজত্ব করিতেছে, ভারত মগের মূলুক নহে, শুভরাজ ইংরাজ যখন জেলের ভিতর কড়া পাহারায় এক যুগিত ইংরাজ-হস্তকে কঁাসি দিতেছে, তখন সেখানে একটি বে-আইনী দলের পাণ্ডা বোমভোলা পাঠক সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া সেই কঁাসি দেখিবেন, এ কথাটা সহজে বিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং এই কারণেই ‘অসম্ভব’ শব্দটি আমার মুখ হইতে একবাক্য অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া গিয়াছিল।

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, মগের মূলুকেই হউক বা ইংরাজের মূলুকেই হউক, বাতাসী বিবি, পাঠকজি অথবা হকিম সাহেবের পক্ষে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করা অনায়াসসাধ্য। বাতাসী বিবির মুখই সন্নিহনে শুনিলাম, বোমভোলা পাঠক ক্ষুদ্রায়মের কঁাসি-অন্তর্যানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্রায়মকে যে কঁাসি দিয়াছিল, সেই সরকারী-জহাঙ্গীরের সহকারীকে!

শুনিয়া আবার চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল এ যেন কোনও রোমাঞ্চকর উপজ্ঞানের একটি অংশকানিনী শুনিতেছি। অবশ্য কথটা এবার আর তেমন অবিখ্যাত ঠেকিল না।

বাতাসী বিবির মুখে শুনিলাম, হত্যার দ্বারা ক্ষুদ্রায়মের যখন কঁাসির তরুণ হইয়া গেল তখন হইতেই বোমভোলা পাঠক ক্ষুদ্রায়মের জন্ত চক্ষু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

‘তারপর?’

‘ক্ষুদ্রায়মের কঁাসির তারিখের কাছাকাছি তিনি মজঃফরপুরে চলিয়া গেলেন। আমাচর দলের সৈন্যদলেও একটা মস্ত বাঁটি আছে, বাবুজি, যেমন আছে তামাম হিন্দুজনে নানান শহরে, নানান গাঁয়ে, নানান বন্দরে। জেলখানার সবকারী-জহাঙ্গীরের সঙ্গে আমাদের দলের লোকদের জান-পচচান ছিল। লোকটাও শুধু মন নয়, আরো কয়েক রকমের নেশা ছিল এবং সেই নেশার খোরাক সংগ্রহের জন্ত সে হামেশাই আমাদের আড্ডার আসিত। কঁাসি দিবার সময় তাহার সঙ্গে সবদিক্ত একজন সহকারী থাকিত, সে জবসর নিলে বা মারা গেল ঐ সহকারীই জহাঙ্গীর-পদে তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। ক্ষুদ্রায়মের কঁাসির বেলায় ঐ সহকারীকে তাহার পুরা পাণ্ডনাটা আগাম দিয়া তাহার দলভিত্তিক হইয়া বোমভোলা পাঠক গেলেন মজঃফরপুর জেলে ঐ জহাঙ্গীরের সহকারী হইয়া।’

‘তারপর?’

বাতাসী বিবি বলিল, ‘পাঠকজি লুকাইয়া একরকম বিধ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, উচ্চা ছিল ক্ষুদ্রায়মকে মওকা মওকা গোপনে সবার অলক্ষ্যে সেই বিধ খাওয়াইয়া দিবেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীর শিথিল হইয়া আসিবে এবং জ্ঞান লোপ পাইবে। পাঠকজি ভাবিয়াছিলেন যে শরীরকে মৃত্যু হাতে বন্ধা করিতে পারিবেন না, বিবের সহায়্যে তাহার মৃত্যুলালী বস্ত্রার অন্তত কিছুটা লাঘব করিবেন।’

‘লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন কি?’

‘না, বাবুজি, পারেন নাই। ক্ষুদ্রায়মই পাঠকজিকে সেই সুযোগ দেয় নাই।’

বোমভোলা পাঠকের মুখে বাতাসী বিবি যাচা শুনিয়াছিল, বাতাসী বিবির মুখে তাচাটা শুনিয়া আমি বিম্বিত, স্তম্ভিত চমকিত হইলাম। তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

কঁাসির মধ্যে যখন ক্ষুদ্রায়মকে আনা হইল তখন সে অনায়াস পূর্ণরূপে অঙ্গন হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল, যেন কোনো একটি মজাদার খেলা খেলিতে অথবা নেখিতে আসিতেছে। ভয়, উদ্বেগ, বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন তাহার মুখে, চোখে বা চলনভঙ্গিতে নাই। সে যে প্রকৃত লোকের একান্ত মনোযোগের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এই মজাতেই সে মগ্ন। যে সাহেব-লোকেরা ভাবিয়া রাখিয়াছিল— এই নৈতিত ছোকা ভয় পাইয়া, কাল্পনিক করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইবে, তখন তাহাকে জোর করিয়া কঁাসিতে বুলাইয়া দিয়া বেশ মজা উপভোগ করা বাইবে, তাহাদের সে গুণ্ডা বালি পড়িল।

সরকারী জহাঙ্গীর বিষম বিম্বিত। কঁাসির এমন আসামী সে আর কখনো দেখে নাই। এ যেন কঁাসির দড়ি গলার পরিবার জন্ত অকুল! সাহেব-লোক যাহারা ছিল, ক্ষুদ্রায়ম তাহাদের দিকে হাসিমুখে এমন দৃষ্টিত তাকাইল যে, তাহারা সেই দৃষ্টির তীব্র তাকিয়া —তর তো বা কিঞ্চিৎ বিক্লপও—সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষণেকের জন্ত চোখ নামাইয়া নিল।



এটি নরম  
গরম  
ও প্রশংসী...



## এটি ঋব নিটিং উল!

বোনার উলের মধ্যে ঋব উলের ধারেকাছে কিছু লাগেনা...  
১০০% খাঁটি উল...নরম, মোলায়েম, অকৃত্রিম নমনীয়...  
খেপে যায়না, ঝুলেও পড়েনা... বাছাইকরা ফ্যাশনমাসিক  
রুম্মারি রঙে পাওয়া যায়। ঋব উলে বোনা পোশাক-  
পরিচ্ছদ বারবার কাচলেও তার জোলুখ ঠিক বজায় থাকে।  
সর্বোৎকৃষ্ট বেগনারা ছুলে ঋব



ঋব উলেন মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বর্ষে ১৩

যাযতীর ব্যবসা-সংক্রান্ত খোঁজখবর এখানে করবেন: জে. এণ্ড পি. কোটস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড  
বর্ষে: ৮১ পল্টন রোড, দিল্লী: গারস্টিন ব্যাস্টিন রোড, মাদ্রাজ: ১৯ ভানিয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা:  
৪০ বি. প্রিন্সিপ স্ট্রীট, কোরাট্টি: কেয়লা স্টেট. গৌহাটি: এ. টি. রোড, ঢাকোবাড়ি, আসাম.

DWM. G. 15

বোমভোলা পাঠক আসন্নমৃত্যু কুদিরামের মুখের দিকে তাকাইয়া চমকটাইয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন মঙ্গল পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন তিনি। এ কি আশ্চর্য সাদৃশ্য দুই মুখে! তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার 'ভাইয়া' মঙ্গল পাণ্ডে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া আবার কীসিমধ্যে আত্মবিসর্জন করিতেছে। না, আর সন্দেহ নাই, এ যে সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি; কেবল বাড়লার সরস মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখের কাঠিন্য কিঞ্চিৎ কমিরাছে, এই বা। বোমভোলা পাঠকের মুখ তটীতে অক্ষুণ্ট উচ্চারণ করিয়া গেল : 'ভাইয়া।'

এই খেপারোয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বিবের সাহায্য দিবার কথা বিস্তরের থাকার পাঠকজির মনেই রহিল না। পঞ্চাশ বছর আগে মঙ্গল ভাইয়ার কীসি দেখিয়াছিলেন কিছুটা দূর হইতে, তাহার পঞ্চাশ বছর পরে আজ আবার তাহার কীসি দেখিতেছেন একেবারে সমুখে পাড়িয়াই।

সব কিছু ব্যাপার যেন মন্ত্রবলে বড় তাড়াতাড়ি হইয়া গেল, বোমভোলা পাঠক লিখাহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ার ঠাণ্ডা মাখায় চিন্তা করিতে পারিলেন না, বাহা করিবেন ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাও কিছুই করা হইল না।

বাহারা কীসি দেখিতেছিল, হাসিমুখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া কুদিরাম বলিল কীসিতে মৃত্যুর পর প্রথম সুবোধে সে এই দেশেই আবার জন্মগ্রহণ করিবে, গলায় এই কীসির দড়ির চিহ্ন দেখিয়াই তাহাকে চেনা বাইবে।

পঞ্চাশ বছর আগে বাড়লার বারাকপুর সেনা ছাউনির মাঠে অবভাগী মঙ্গল পাণ্ডে কীসিতে বুলিয়া পড়িবার আগে অন্তিম-মুহূর্তে তাহার মুখে ছিল স্ত্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি। তাহার পঞ্চাশ বছর পরে বাড়লার বাহিরে মন্ত্রফরপুর জেলে সে আবার কীসি গেল বাঙালী কিশোর কুদিরাম রূপে, এবার কীসিতে বুলিয়া পড়িবার আগে তাহার মুখে অন্তিমধ্বনি :

'বন্দে মাতরম!'

বাতাসী বিবির মুখে বোমভোলা পাঠক কথিত এই কাতিনী স্ত্রীয়া আমার বৃকের ভিতর হইতে একটা অক্ষুণ্ট আত্মনাদ বাহির হইয়া আসিল। সেই আত্মনাদে আন্তরিক অনুতাপ আর লজ্জা যেশানো। বাড়লার শহীদ কুদিরামের কথা যেমন করিয়া ভাবা আমার উচিত ছিল তেমন করিয়া ভাবি নাই, ভাবিতে পারি নাই, লজ্জা আর অনুতাপ সেই জন্ম।

মনের উত্তেজনা একটু সামলাইয়া লইতেই মনে হইল বোমভোলা পাঠকের মস্তিষ্কে কিছুটা ব্যতিক্রম প্রভাব বহিয়াছে। অথবা ব্যতিক্রম না বলিয়া বলিতে পারা যায়, কীসির মধ্যে মৃত্যু-প্রতীক্ষমাশ মঙ্গল পাণ্ডুর স্মৃতি তাঁতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই কুদিরামকেও তিনি পুনর্জাত মঙ্গল পাণ্ডে বলিয়া ভাবিয়াছেন। কুদিরামের চেহারা মঙ্গল পাণ্ডুর মুখবির আভাস দেখিয়াছেন। তা তিনি দেখুন, কিন্তু আমার চেহারা সঙ্গে তিনি মঙ্গল পাণ্ডুর চেহারা সাদৃশ্য করনা করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্য কি? ইহা বোমভোলা পাঠকের প্রায় উন্নততার লক্ষণ নহে কি?

আর মনোভাবটা বাতাসী বিবিকে আভাসে জানাইলাম। বলিলাম : 'বাতাসী বিবি, পাঠকজি আমার মুখের চেহারাতেও মঙ্গল পাণ্ডুর মুখের চেহারা ছাপ দেখিতে পাইয়াছেন।'

আমাকে গম্ভীর করিয়া বাতাসী বিবি বলিল, 'জানি।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত নহে কি?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'না, বাবুজি। পাঠকজি কিছুই আমার কাছে আর অদ্ভুত নহে।'

বাতাসী বিবির কণ্ঠে বোমভোলা পাঠকের উপর অসীম বিশ্বাসের সুর। সেই সুরের জের টানিয়া বাতাসী বিবি আরো বলিল, 'সেইজন্যই পাঠকজি আপনার অসাধারণ ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং পাঠকজি সহজে কাহারও ভক্ত হইয়া উঠিবার মানুষ নহেন।'

মনে প্রশ্ন জাগিল, বাতাসী বিবি আমাকে যে এতখানি গুরুত্ব দিতেছে, আমার জন্য এতটা মাথা ও সময় খাটাইতেছে, আমার প্রায় ভক্ত হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহা কি আমার প্রতি পাঠকজির এই অদ্ভুত, বহুশ্রমের ভক্তিরই প্রতিক্রিয়া? কিন্তু মনের এই প্রশ্ন মনের ভিতরেই গোপন রাখিলাম। মুখে উচ্চারণ করিলাম না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। আমি নির্ভর মৃত্যুবরণকারী কুদিরামের কথা ভাবিতে লাগিলাম। বাতাসী বিবি কি ভাবিল বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, 'বাবুজি আমাকে যেন ভুল বুঝিবেন না।'

'তাহার অর্থ?'

'কুদিরাম জুলুমের বদল নিবার জন্ত নিজের জ্ঞান কবুল করিয়া জালিমের জ্ঞান নিতে গিয়াছিল এবং সাতটা মরদের মত, বাগানের মত, বৃক কুশটীয়া কীসিকাঠে জ্ঞান দিয়াছিল, তাহার সেই মর্দানা চিন্মতের জন্ত আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। বাঙালী কাপুরুষের জ্ঞাত নহে, বাঙালী দরকার হইলে অন্যায়ের জ্ঞান নিতে আর জ্ঞান দিতে পারে, কুদিরামই তাহা আমাকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু বাবুজি—'

'কিন্তু কি, বাতাসী বিবি?'

'কুদিরাম যদি আমার দলের লোক হইত, আর বিচারে কোনো কীকে ছাড়া পাঠিয়া, বা কোনো সুযোগে পলাইয়া দলে ফিরাই আসিত, তাহাকে আমি, বাতাসী বিবি, কি করিতাম বলিতে পারেন?'

বলিলাম, 'সমাদরে অভ্যর্থনা করিতে, সম্মান করিতে।'

বাতাসী বিবি বলিল, 'কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিতাম না। দলের লোকদের সামনে বিচার করিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড দিতাম এবং নিজের হাতে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলী করিয়া মরিয়া কবর দেওয়াইতাম।'

স্ত্রীয়া শিহরিয়া উঠিল। বাতাসী বিবিকে ঠিক যে শ্রদ্ধা করিতে গুরু করিয়াছিলাম এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার প্রতি আগেকার বিতৃষ্ণা ও অশ্রদ্ধার ভাব যে অনেকখানি কমিয়া আসিতেছিল ইহা সত্য। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা বলিয়া বলিল বাতাসী বিবি?

বলিলাম, 'কেন?'

'অমার্জনীর অপরাধে। কিংসকার্ড সাহেবকে মারিতে গিয়া সে ভুল করিয়া মারিয়া বলিল দু'জন কেনেডি মেম-সাহেবকে, বাহাদের কোন অপরাধ নাই। গাড়িতে তাহার লক্ষ্য শিকার আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হইয়া গাড়িতে বোমা ছোঁড়া তাহার উচিত হয় নাই—অমন কাঁচা কাজ করার অর্থ লক্ষ্য কাজটিকে সন্ধাননা হইতে

## বাতাসী বলিল

আরো দু'বে পিছাইয়া দেওয়া, উদ্বেগ সাধনের পথে বাধার সৃষ্টি করা তারপর—

‘তারপর—?’

‘তারপর যেভাবে সে ধরা পড়িয়াছিল, সেই ধরা পড়াটাও এক অমার্জনীয় অপরাধ।’

আমি বলিলাম, ‘কি আশ্চর্য। ধরা পড়িলে কীসি বাইতে হইবে জানিয়াও সে কি শখ করিয়া ধরা দিতে গিয়াছিল? দুর্ভাগ্যবশত ধরা পড়িয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে নিশ্চয়ই দোষ দেওয়া যায় না।’

‘কিন্তু ধরা সে দুর্ভাগ্যের দোষে পড়ে নাই, বাবুজি। ধরা পড়িয়াছিল নিজের বুদ্ধিহীন অসাবধানতার দোষে। খবর পাইয়াছি, বোমা ফাটিবার পয়দিনই রেল-কেন্দ্রনে সে খাবার খাইতেছিল, তখন তাহার পাতলা জামার দুই পকেটে দুইটি রিভলভার ছিলোতেছে। এই অবস্থার সে ধরা পড়িল। দুই মেম-সাহেবকে বোমা মারিয়া আততায়ী পলাইয়াছে, সে খবর চারিদিকে লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে, এমন গরম আবহাওয়ার মধ্যে রেল-কেন্দ্রনের মত প্রকাশ্য জায়গার পাতলা জামার দুই পকেটে দুই রিভলভার খুলাইয়া সন্দেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একরকম আত্মহত্যার সামিল নহে কি, বাবুজি?’

বলিলাম, ‘পলাইয়া ফিরিতেছে, নাওয়া-খাওয়া হয় নাই, এ অবস্থার মাথার ঠিক ছিল না; তাই অতটা খেয়াল রাখিতে পারে নাই।’

বাতাসী বিবি বলিল, ‘কিন্তু বাবুজি, এমন কাজে যে নামিবে তাহাকে অমন পেয়ালহীন হইলে চলিবে কেন? না বাবুজি, ইহার কোন ক্ষমা নাই।’

বুড়িলাম, ক্ষুদ্রিমারের মৃত্যুভরহীন অসাধারণ সাহসকে বাতাসী বিবি অসাধারণ শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু তাহার দুটি ভুল সে ক্ষমা করিতে পারে নাই এবং ক্ষুদ্রিমা তাহার দলের কর্মী হইলে বাতাসী বিবি তাহাকে শাস্তি দিবার সুযোগ পাইলে নিজের হাতে গুলী করিয়া হত্যা করিত। ‘ক্রিমিনাল’ দলের হয় তো এইরূপই ‘ডিসিপ্লিন’ (discipline) বা নিয়ম-শৃঙ্খলা, বে-আইনী দলের হয় তো ইহাই

আইন, কিন্তু তবু বাতাসী বিবি এই কথার তাহার প্রতি আমার মন একটু বিরূপ হইয়া উঠিল। মনে চইল এই অল্পতরমণীর মনের ভিতরে যেন পরস্পর-বিরোধী ভাব কাজ করিতেছে, বাহাদের একের সহিত অপরের তেমন সামঞ্জস্য নাই। বাহার জন্ত বাতাসীকে সে নূতন চোখে, শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাকেই সে নিজের আওতার পাইলে নিজের হাতে গুলী করিয়া মারিত। অদ্ভুত, অদ্ভুত এই বাতাসী বিবি।

বাতাসী বিবিকে আমার বিতৃষ্ণার ভাবটা বুঝিতে দিলাম না। বাঘিনীর গুহার বাধ্যতামূলক অবস্থানকালে বাঘিনীর প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করা নিরাপদ নহে।

কিছুক্ষণবাদে বাতাসী বিবি হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিল, ‘বাবুজি, আপনি কি জন্মান্তর বিশ্বাস করেন?’

‘এ প্রশ্ন কেন বাতাসী বিবি?’

‘পাঠকজি বিশ্বাস করেন, সেইজন্য। পাঠকজি আমাকে বলিয়াছেন মঙ্গল পাণ্ডেই আবার ক্ষুদ্রিমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মঙ্গল পাণ্ডে বাঙালীমূলক শেষ নিশ্বাস নিয়াছিল, তাই নবজন্মে এই বাঙালী-মূলকেই আবার প্রথম নিশ্বাস নিয়াছিল। ইহা কি সত্য, বাবুজি?’

এই শেষ প্রশ্নে যেন বালিকাশুলভ কৌতুহল এবং আমার উপর তাহার বালিকাশুলভ আস্থা। যেন ইহা সত্য কি অসত্য, তাহা আমি দিব্য উপলব্ধি দ্বারা জানিয়া বলিয়া আছি।

বলিলাম, ‘বাতাসী বিবি ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। পাঠকজি যদি এরূপ বিশ্বাস করেন, তবে ইহা তাহার কাছে সত্য।’

‘কিন্তু আপনার কাছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন বাবুজি?’

এ প্রশ্নের উত্তর কি দিব ভাবিতেছিলাম; বাতাসী বিবি আমার উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া বলিল, ‘বাবুজি, এই জীবনটাই একমাত্র জীবন; এ জীবন গেলে আর জীবন কখনো মিলিবে না, আমার তো ইহাই মনে হয়।’

বিস্মিত হইলাম। বাতাসী বিবি এইরূপ মনে করে বলিয়া নছে, জীবন সম্বন্ধে চিন্তা এই বে-আইনী দলের কুখ্যাতা সর্গদ্বীপের মগজে কিরূপে স্থান পাইল, ইহাই ভাবিলাম। [ক্রমশ:]

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিউক্স



# মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত  
কোন বাড়তি খরচ নেই  
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পোরেশন

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রিট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা  
হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বোলা থাকে



বসুমতী : শ্রাবণ '৭১



নতুন খাঁরধুলার

# সানলাইটে

**আরও কলধালে কাচা হয়।**

নতুন করমলার সানলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী সুন্দর নতুন গন্ধন! আর সেইসঙ্গে আরও কলধালে করে কাচার কী আশ্চর্য্য নতুন শক্তি! প্রতি-যোগ কাচবার পরে দেখবেন আপনার কাপড়সমূহ... **আরও ধীরে, আরও কলধালে হয়ে উঠবে!**

সুন্দর লিভারের তৈরী

১. ১১-১১১

নিবিদ্ধ জিনিসের প্রতি লোভ আদম ও ইভের সময় থেকে চলে আসছে। ওঁরা দু'জন নিবিদ্ধ ফলের প্রতি লোভ করেছিলেন বলেই প্রসিদ্ধ মহাব্যাজারির জন্ম। মানুষের সেই আদিম ও অকৃত্রিম দুর্বলতা বৃদ্ধের ছায়াচিত্র ভগতে তার কার্যে আসন বসিয়েছে। তাই, ঝাঁঝ রাত একটার সময় বয়ে এয়ারপোর্টে আমাদের সর্বাধীন জানাতে এলেন তাঁরা অল্প-বিস্তর প্রায় সকলেই মদোদগ্ধ। এইখানে সরকারীভাবে আমাদের ডেলিগেটনে যোগ দিলেন শ্রীমতী পাকওয়ারা (ইনি কিম্বা দেখেন, এশ্বরণের একটা কিংবদন্তী শোনা যায়।) এবং বেসরকারীভাবে যোগ দিলেন বড় ব্যবসাদার। তাঁরা কেউই ছবি করেন না, প্রবোধকদের জবাব করেন। লোক হিসেবে কেউ যে খুব সোভানীয়, তা আমার মনে হল না—এক আমাদের দলের ওঁদেরও বোধ হয় মনে হয় নি। হবার কথাও নয়। ছবি হচ্ছে মাত্র একটা, তাও আবার বাংলা দেশে আসামী ভাষার তোলা। নাচ, গান এবং পর্ষায় আকাশে একশো পাওয়ারের চাঁদ নেই বলে ঝাঁঝ বাংলা ছবিকে ছবির পর্ষায় ফেলেন না। তাঁরা যে সেই ছবির নিষাভাদের নিষয়ভাবে বর্জনীয় মনে করবেন তাতে আশ্চর্য কি? আমাদেরও আবার ঘরে নেই ভাত, লুখা কাঁচা। ছবি করি আদ-পরমার, নাকটা কিন্তু উঁচু। শিল্পী হিসেবে ওদের আমরা মনে করি নীচু দরের, চিন্তাধারার পটভূমিকার একেবারে স্বেচ্ছ। ছবি তোলাবার জন্ত যখন সকলকে ঝাঁড় করান হল, তখনই দেখি ভাগ্যলিঙ্গটা হঠাৎ বদল আছে। একধারে দিগ্বারের দল, অন্ধকারে কোকাকোলা আর মাঝখানে জর্মান প্রতিনিধি কেল সাহেব।

ছবির জগা ধাঁড়িয়েছি এক লাইন। কেউই কাউকে বিশেষ চিনি না, তবুও আশঙ্কে, আভাসে ও ইঙ্গিতে ওদের প্রায় সকলকেই বুঝছি কেবল একজন বাদে। মহিলাটি গলার মালা পরে চমৎকার আসর জমিয়েছেন। চেহারাটা সুন্দর না হ'লেও বরষের গুণ যাবে কোথায়? বিহারের ঝুল-পরা পুরুষ-চোখগুলো ঘুরে-ফিরেই সেই বরষের পায়ে গিয়ে হাঁট খায়। সুবোধকে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কে হে মেয়েটি? আন্দোলো-ইণ্ডিয়ান মনে হচ্ছে।' সুবোধ বললে, 'দেখি'।

দেখতে গিয়ে একেবারে দেখিয়ে দিলে।

প্লেন ছাড়ল রাত দু'টায়। ঠাসা ভর্তি। আমরা টুরিস্ট শ্রেণী। সামনে লাক্সারি ক্লাস অর্থাৎ মাদোয়ারী শ্রেণী। জানা গেল বত্রিশ কেদারার কেবিনে পুরো একটা পরিবার। বাপ, দাদা, পরদাদা মায় কি-চাকর পর্যন্ত। করেন একচেজে নামে একটা মস্ত কাঁস আছে। ভারতের বাইরে যেতে হ'লে ওটা একটা মস্ত দায়। বিদেশে পড়াশুনা বন্ধ, এমন কি প্রয়োজনীয় ওষুধও আছে না—কিন্তু ব্যবসাদাররা বেড়াতে কি করে যাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই।

আমার এক মাদোয়ারী বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে বললে—

# নাগরানি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

'দাদা মে কি বলে রে কাকো গোবে না? আমাদের রূপেরা দিয়ে কোংগ্রেস বিলাইতকো তাদালে।' আমাদের দোরকার রূপীয়া না দিলে হামলোগ কোংগ্রেসকে তাদািব।'

ঠিক কথা এক দেশ-নেতার। সেটা মর্ষে মর্ষে ভানেন সেইজন্তই দান বাবদ যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটা ইনকাম ট্যাক্স আওতাব বাইরে। এ নিয়ে এই দেশিও লাকসভার তরুর বড় ব'য়ে গেছে। কিন্তু কর্তার হটবার পাত্ত নয়। কামুনটা কায়ম থেকে গেছে।

আদার বাণারী আমরা, আইনসভার তরুর বড় সাধাবণ্ড কাগজের ডেড়িয়েই দেখে থাকি, কিন্তু তাব উপসর্গগুলো তো পথে-ঘাটে। আপাতত প্লেনে, আমাদের চোখের সামনে। অগত্যা চোখ বুজি।

বেকট হল বারোয়ারী এয়ারপোর্ট এখানে প্লেনে তেল নেওয়া হবে অতএব আমাদের ভাগে এবি একপ্রজ্ঞ কাগাকাল রাত তিনটে, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে কোকাকোলাবারী মহিলাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে পাশের চেয়ারের দিকে আড়ালের ইসারা করে বলি, 'ভেঁকে দিন।'

উনি হলেন গ্রুপকটোর সেই মহাবতিনী আন্দোলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী অর্ধ-মুস্ত্র অবস্থায় একবার আমার দিকে চায় নিবিবাদে গোলামটি নিয়ে মিলেন। আর সবাই আমাদের মতন তন্দ্রাচ্ছন্ন কোকাকালার স্পৃহা কাকুরই নেই। মিনিট দুয়েক পর প্লেটভতি শ্র্যাণ্ডউইচ এলো আর্ম আবার ঘুমের ঘোবেই পাশের দিকে ইসারা করি। এবার বোধ হয় মহিলাটি আপত্তি জানালেন।

ইন্টারিয়ান 'হার্কেসু ভাভ' ভাভ ইশবজিত্তে বললেন—'ইসু মাঙ্গ নো? ইউও হাসবান্স আগু'।

আড়গোখে চাইলাম। কে কার বামী? দেখি ইন্টারিয়ান মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে মুগ্ধ মুগ্ধ হাসছে। আমরা চোখ চাইতে দেখে সে তেমনি মিলি ভাষায় প্রশ্ন করলে—ইয়াস! ইয়ু বি আগু? ও হরি আমার ইঙ্গিতকে ও ভুল করে ভেবে বসে আছে স্বামিদের সঙ্কট। গুণো (ডাক নাম পার্জি!) ঘুমের নি চোখ বন্ধ শুয়েছিল। পেডোমো করে বললে, 'নিউ ব্রাইড ইট কেক!'

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বললে, ও ল ম।—নিউ ব্রাইড।

সেন ইয়ু মাস্ত।—নো? প্লেটো তখন আবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, সেন ইয়ু ইত।

স্বল্পশী যুবতী, কোন কারণেই 'না' বলা আমার নিয়ম বিকল্প, 'বেলাম।' প্লেট সন্নিবেশে রেখে টেবিলের ওপর পা খুলিয়ে মেয়েটি জমিয়ে বসল।

'কবে বিয়ে হয়েছ আপনাদের?'

ও কোশ থেকে পাঞ্জি বলে, 'কাল। বিলেত যাচ্ছে হানিমুন করতে।'

মেয়েটি আরও চোখ পাকায়, হানিমুনটা যেন ওরই। বলে, 'ও মা সত্যি।'

আমাদের সহযাত্রীণীর রসবোধ আছে। অস্পষ্ট বললে, 'হাঁ।'

সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়। দলের প্রায় সকলেই মুচকি মুচকি হাসছেন। তাইতেই বোধ হয় হোকেস্টার সন্দেহ হল, বললে, 'সত্যি বিয়ে হয়েছ?'

এবার উঠে বসতে হল। পূর্ণা যখন উঠেছে নাটকটা জমাতেই হবে। বলিল, 'কেন পাত্র হিসেবে আমি কি নিতান্তই অধিষ্ঠা।'

ও বোধ হয় দ্বাবার বিবাস মানল। আমাকে আপদমস্তক নিরীক্ষণ করে সহযাত্রীণীকে বললে, 'আপনার ভাগ্য আছে।'

'আমি চুটি করে উত্তর দি', 'তোমারও হতে পারে।'

'কমল করে?'

'আমায় নিয়ে করে।'

তলে হোকেস্ট গাড়িতে পড়ে যায় আর কি! হাত ছুঁটার ওপর শরীরের ওজন চাপিয়ে মাথাটা হেলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাং তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে!'

'আবার হতে পারে। জাতে আমি মুসলমান, চারবার হ'তেও আশঙ্কিত নেই।'

'তোমার বো তোমার মারবে!'

'তাহলে ভালুক দিয়ে দর!'

মেয়েটি আবার খিলখিলিয়ে হাসে ওঠে; সহযাত্রীণীকে বলে, 'সাধন তোমার স্বামী লোক ভালো নয় ভরানক রিফি!'

'জানি।' সহযাত্রীণী আমার একপলক দেখে, বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে—'জীবনটাই তো রিফি!'

আমায় বলে, 'না ডালিং?'

'সেইজগেই তো তোমার ভালোবাসি। আমাদের তো বিয়ে নয়, একেবারে কমবেডিশিপ।'

হাসির ঝড় বয় চারিদিক থেকে। এমন সময় বাওরার ডাক পড়ে সহযাত্রীণী আমার হাতের মধ্যে হাত চুকিয়ে বলে, 'চলো ডালিং!'

হোকেস্ট চলল সঙ্গে সঙ্গে। প্রেনের সিঁড়ির তলায় বলে, 'বাই! বাই!'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম হাত ধরাধরি করেই। পেছন ফিরে দেখি মেয়েটি তখনও হাত নাড়ছে। নাটকটার এইটাই শেষ দৃশ্য।

শে'ডায়লগ' বললে সহযাত্রীণী—'হ'লে আমি খুশিই হতাম।'

জানলার ধারেই আমার সাইট। পূর্ণাটা সামান্য সন্নিবেশে বসলাম।

ভোরের আকাশে তারা চিক্চিক করছে। ওপরে উঠলাম। নীচে যুগ্ম শহর, পাশে জাগ্রত আকাশ। নীচে শহরের আলোগুলোও আন্তে আন্তে নিশ্চেষ্ট হ'লে আসছে।

ছেড়ে এলাম বেকট। ফেলে এলাম একটি মাত্র দর্শকের জন্ত অভিনীত দু'টি চরিত্রের ছোট একাক্ষ নাটক।

সকালবেলাকার প্রথম সূর্য যুগ্ম থেকে তুলে দিল আলস্-এর ধারে, সুইজারল্যান্ডের ওপরে। বেকট ছেড়েছি ব্যস্ত জীবনের একটা ছোট অথচ সুন্দর বৈচিত্র্য নিয়ে। জুরীকে নামলাম একেবারে জীর্ণ। শরীরে ক্লান্তি; শীতে কাঁপনী। মনে গভীর অবসাদ। দেশ থেকে বহুদূরে; কাজের মধ্যে কম করে দু'ঘণ্টার কাক পড়বে, তার ওপর মেয়ের জন্তো মনের কোথায় যেন একটা করুণ মায়া মুছমুছ আমার মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়। প্রেন এখানে আবার তেল নেবে। আমাদের ভাগ্যে বোধ হয় কোকাকোলা।

বিবর্তাকার দৈত্যের মতন দানবীয় মেসিন নিয়ে চলেছে এয়ারপোর্টটাকে নতুন করে গড়ার কাজ। তারই মধ্যে দিয়ে চলেছি খেলাঘরের ট্রেনের মতন ডিজেন্সটান। গাড়িতে। পাশে এসে বসেছে সহযাত্রীণী। ও যে আসবে, পাশে বসবে এমন আশঙ্কা আমার অবশ্যই ছিল।

'ইয়ু আর এ ব্যাড হাসবেণ্ড।'

পাশে বসে ছলমছলবের মতন হাসতে থাকে। ওর চাহনিতে বেশ বুদ্ধিতে পানি রাতের মাধুর্ষ এখনও ওর মনে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। গাড়ি চলতে থাকে, খানিকটা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়েই। হাতখানা ও আমার মুঠোর মধ্যে মেলে ধরে। হাতের ভাষা ওর চোখের দৃষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—দূরে, বহুদূরে—আলস্ পাহাড়ের ওপর ভাসা-ভাসা মেঘেরও ওপারে। দূরে দেখি পাইনগাছগুলো আকাশের দিকে ইসারা করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাসের আসা বাওরার একটানা শব্দ ঐ দানবীয় মেসিনগুলোর লজ্জার চাপিয়ে উঠেছে। ঠিক সহযাত্রীণীটির মতন। আমার এই বিস্তৃত পৃথিবীতে এত ব্যস্ততা, বাঁচবার সংগ্রাম, পাঁচজনের মধ্যে নিজেকে প্রচার করার প্রবল প্রচেষ্টা, স্বার্থের হানাহানি; পেছনে ফেলে-আসা দিনের দারুণ দৈহিক, অনাগত ভবিষ্যতের কাছে প্রচণ্ড দাবী। বিস্তৃত তারই মধ্যে ওর হাতের ছোঁয়াটুকু আপন স্বাভাব্য ও স্নেহভর্যার বিস্তীর্ণ। আমাদের সখিদের মোহাদ আর বড় জোর ছ'ঘণ্টা তারপর যে যার পথে চলে যাব আপন আপন স্বার্থ ক্ষান, জীবনে আর কোনদিন হয়ত দেখাও হবে না। তাহ'লে? ভাবলাম হাতটা ধীরে নি, কিন্তু পারলাম না। নেইই ছবিতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ার যে আকুল মিনতি ছিল কেরানীগবুর, আজ তার মনেটা আরও একটু স্পষ্ট হল। সহযাত্রীণীর হাত ধরাটাও ঠিক তাই। পুরো ছবিবর একটি কোণে সামান্য কেরানীগবুর ছায়া। 'তার বেশি নয়।

মেয়েটি বললে, 'আমার নাম, মার্শ।'

আমার নামটা বোললাম না। কারো স্মৃতির বোঝা না হওয়াই ভালো।

জুরীক টার্মিনালটা সত্যিই সুন্দর। এখানে বেকটের

বিরাট নেই, কলকাতার বিশৃঙ্খলতা নেই, বস্ত্রের বরিশনেশ নেই। শিশুদের ঘরবাড়ির মতন সহজ-সরল পরিবেশ। এলোমেলো সাজানো আরামকোণার, মাঝখানে কাউটার। কোণে কফির প্রকাণ্ড পারকুলেটার। বাঁচা গেল। কোকাকোলাস দোরাওয়া আর সইতে হবে না।

হাঁক ছেড়ে ঘুরন্তই দেখি মাদোরারীদর ঠাকুরী। ওঁরা সদলবলে জুরীকেই নামবেন। বুড়ো বলছে—‘বাবুজি, কিধার বাচ্ছেন?’

‘বালিন।’

‘আরে ও শালা তো হিটলারকা রাজ। রহিয়ে ইধার। শরীল তি আছে পৈসা তি আছে।’

‘পরসা?’

ঠাকুরী তেমে বলেন—‘বাঙালীর বিজনেস হোবে না! আরে বাবুজি, ইধারকা ঘড়ি সাবা হুনিয়া যে মত্তর আছে। আমেরা তিশজন তিন ডবল ঘড়ি লেবে। একঠো ঘড়িমে শ’ রুপীয়া লাভ, তো নব্বয়ে কিতনা?’

‘কাষ্টমস ধরবে না?’

‘কাহেকো? চাইকার ক’রে ওঠেন ঠাকুরী—‘একঠো ঘড়ি তো দেশ সে আনবার পরমিশন আছে—আর দোঠো লিয়ে যাবার। আমেরা কোই ঘড়ি আনে নি। সে হল তাহলে তিনঠো। বাস্ ঘড়ি লেকর হামারা আনা বানা অসুল।’

বুড়োর কবল থেকে উদ্ধার করল মাঝী। কফি এনেছে ক্রীম দেওয়া। গরম বোঁওয়া উঠছে।

কোণের ছোট টেবিলে বসি আমি আর মাঝী, মুখোমুখি।

‘ছালো নিউটল ওয়েডস্, কি হচ্ছে?’

ঘুরে দেখি শকুন্তলা সারঙ্গল, সজ পাঞ্জি। আমাদের ট্রাভেলিং এজেন্টের ও একজন ছিঁর আকর্ষণ। দেশে টিকিটের ব্যাপারে প্রায়ই ওর শরণাপন্ন হইত হুম। ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়ে মাঝে মাঝে যে ওর নৈনন্দিন কর্ম-জীবনে পিনা টিকিটের যাত্রীও হই না তা বলব না। শুধু আমি নয় অল্প অনেকেই।

‘কে বলুন?’

বোঝা গেল পাঞ্জি ওকে গরুটা বেশ শুড়িয়ে বলেছে। আমার পাশের চেয়ারে ব’সে বলে মাঝীকে—‘খুব সাধারণ।’ এরা ফিল্মের লোক, মিথোষাটকেও সত্যি বানিয়ে চোখের জল ফেলার।

মাঝী একপলক চপ করে থেকে ছোট উত্তর দেয়—‘জানি।’

ওদের দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে একটা বিচিত্র সুর। সেটাকে কটিয়ে নেব বলে শকুন্তলাকে প্রেম করি—‘তুমি কোথেকে?’

ওর ম্যান-কিলার হাসি ছড়িয়ে বসে—‘হুট নিয়ে ছোটোছুটি। পল্লভ এসেছি এখানে, কাল কোথায় থাকব ভাবি নি।’

‘আপাতত?’

‘বালিন।’ বলেই তাকাল মাঝীর দিকে। অবার ওদের দৃষ্টিবিনিময়। হুতটা যে সহজ নয় সেটা বুঝলেও, কারণটা আমার ঠিক বোধ্যম্য হল না।

সাদে চপটার ক্র্যাঙ্কফুট। জরানীর মাটিতে পা দিয়েই আমার

ওদের অতিথি। বাকি বলে একেবারে জামাই অভ্যর্থনা। ফুল, ফল, চকলেট, ফটোগ্রাফ, অটোগ্রাফ, প্রেস, ওদের কোনরকমে পাশ কাটিয়ে যখন মাঝার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম তখন ট্রানজিট যাত্রীরা চলে গেছে। দূরে প্লেনটা ধাঁড়িয়ে পাখা বাড়ি দিচ্ছে।

মাঝী না বলে যখন গেছে তখন রাগ করেই গেছে, বিজ্ঞ অপরাধটা বুঝশাম না। বেকটের শুন্দর ছোট নাটকের ববিনকা পড়ল, গ্রামের বারোয়ারির থিয়েটারে ড্রপশিন পড়বার মতন একেবারে বিনা নোটিশে। জানলার কাছে ধাঁড়িয়ে শেষবারের মতন মাঝীর মুখখানা বঙ্গনা করতে গিয়ে দেখি, সেটাও ব্যাপসা হয়ে গেছে। কেমন দেখতে ছিঁব মাঝী? আর জানবার উপায় নেই। ও জীবনের ভিড়ে নিশ্চল হ’য়ে হারিয়ে গেছে। মনে আছে বেকটে প্লেন ছাড়বার ঠিক আগে শিঁড়ির ওপর ওর শেষ ডায়লগ, ‘হলে খুশি হতাম’—আর মনের মধ্যে মিশে আছে ওর হাতের ছোঁওয়াটুকু।

কেলগাতের টেনে নিয়ে গেলেন দোতলায়। কিছু খেয়ে আগর এক ঘটা প্লেন। শকুন্তলাকেও টেনে নিয়ে গেলাম। কফি খেয়েই ও উঠে ধাঁড়াল।

‘এ কি? থাকোনা?’

‘উঁহ! আমার প্লেনের সময় হ’য়ে গেছে।’

‘তুমি যে বললে বালিন মাঝে।’

‘বলেছিলাম।’

‘তাহলে?’

‘ওটা বলেছিলাম তোমার বেকটের কনকে হিগসেতে কানা করব’ বলে—করেওছি।’

শকুন্তলা চলে গেল। চেয়ার সিরিয়ে বেতে আমার বকটুকু দেখি হ’য়েছে তারই মতো ও একেবারে নিরুদ্দেশ। প্রকাণ্ড এয়ারপোর্ট ভর্তি লোক। ঐ বিরাট জনতার মধ্যেও আমার মনে হল—আমি একেবারে একলা। পৃথিবীর কাউকে চিনি না। বিশেষ করে মোরদের তে নাই।

## ৥ বার্লিন ৥

বালিনের মাটিতে পা দিচ্ছেই যে মাত্রঘটার কথা প্রথম মনে ভর— তাঁর নাম হিটলার। কম করে এক মাইল বৃত্তের ওপর আদভাভা চাঁদের মতন চমৎকার এয়ারপোর্টটা—তীরই কীভি। এখানে দিনে-রাত্রে যে কোন সময় একসঙ্গে ছ’খানা প্লেন উঠতে নামতে পারে। প্লেন এসে থামে একেবারে বারান্দার তলার, প্রাটেকর্ম ট্রেন ধাঁড়ানোর মতন। দলে দলে ডেলিগেট আসছে দেশ দেশান্তর থেকে, তাই দিকে দিকে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা। সারবন্দী রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার আর উঃসহ প্রতিনিধিদের ভিড় ঠেসে বতই এগিয়ে চলি, ততই কানে বাজে এয়ার রেড সাইবেন আর চোখে ভাসে নাকের তলার একগোছা বাটারফ্লাই গেক। মনে পড়ে, পনের দিকে তোলা ডান হাত আর তায় ওপর স্বস্তিকা। অজুতু মামুষটা একদিনই ছিল এত বড়। পৃথিবীর আতঙ্ক। ‘হেল হিটলার।’

পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলার একমুখ অবিস্মরণীয়। হিটলার আগলে যাই হোক, জর্মান শুধু কাগজ, বাকি বলে ‘ডোমিসাইক’।





## নাগফাঁণ

ফেরার কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ কৃষীয় মেজাজ-মস্তিষ্ক ওপর বেশ খানিকটা নির্ভর করতে হয়। তাঁরা যখন ইচ্ছে পথ বন্ধ করে দেন, যখন ইচ্ছে পাশপোটে ঢেক করেন। পাশপোটে সঙ্গে থাকলে বিপদ কারণ সব কিছু খাঁজ খবর নিয়ে তবে ছাড়বেন; না থাকলে আরও বিপদ, ছাড়বেনই না।

কোথায় যে ত্রিশশক্তি এলাকার শেষ আর কৃষীয় প্রভুত্বের আরম্ভ বলা বড় কঠিন। পশ্চিম-বাল্লিনের বাসে উঠে যেখানে ইচ্ছে যাওয়ার উপায় নেই, আবার পূর্ব-বাল্লিনের ট্রামে উঠে পশ্চিম-বাল্লিনে বেড়ানোর বাধা নেই। রাশিয়ার যুদ্ধ-স্থিতিসৌধ আমেরিকান এলাকায়। সেখানে কৃষীর প্রচুরী অর্থ মার্কিনী ভ্রমকাঠী। রাশিয়ার পরিচালিত পূর্ব-বাল্লিনের বেতারকেন্দ্র পশ্চিম-বাল্লিনে, কিন্তু পশ্চিম বাল্লিনে পরিচালিত বেতার কুন্তলান পূর্বে শোনা নিয়ন্ত্র। সারা বাল্লিনের আগুবাগাউণ্ড ট্রেন (যাকে ট্রা বলে) যুবাজ। পূর্ব-বাল্লিনের সম্পত্তি কিন্তু তাতে বৈজ্ঞানিক শক্তি যোগান দেন পশ্চিমোংশ। একটা রাস্তাব এগার রাশিয়ার, মপা হারে কশভীতি; পাশের পাঠাটা আমেরিকার, কিন্তু তার দাবের বাড়িগুলো কশ এলাকায়। একটা বাড়ি আছে, যার সদর দরজা কশ এলাকার, ঘরগুলো করাসি এলাকায় এবং পেছনের উঠান আমেরিকান এলাকায়। দেখানো থাকেন একজন ভারতীয় ডাক্তার। তিনি পাবার কেনেন কশ এলাকায়, কারণ সুখা; বিয়ে করেছেন করাসি মহিলা, কারণ তিনি সুন্দরী; বেড়ানো হান আমেরিকান এলাকায়, কারণ পথঘাট সুন্দর, শোভনীয়। কথায় কথায় তিনি বললেন—‘আছি তো মহানন্দে, কিন্তু মরলে না বিশ্বদুঃখ বেঁধে ওঠে।’

‘কেন?’

‘মরলে ডেথ-ডিউটি দাবি করবে তিন রাজ্য আর তাই নিয়ে বেঁধে যাবে খণ্ডযুদ্ধ।’

কথটা ভুললোক ঠাট্টা করে বললও, অবস্থানটা কিন্তু অনেকটা তাই। কৃষীয় পূর্ব-বাল্লিনে আমাদের একটাকার মূল্য এক মার্ক, পশ্চিম-বাল্লিনেও প্রায় তাই, কিন্তু কৃষীয় পূর্ব বাল্লিনের মার্ক পশ্চিম-বাল্লিনে চাব আনায় পাওয়া যায়। আবার পশ্চিম-বাল্লিনের মার্ক পূর্ব-বাল্লিনে সরকারীভাবে অচল ত’লেও বেসরকারীভাবে সোনার দামে বিক্রায়।

বললোক আছে যারা থাকে কশ এলাকায় কিন্তু কাজ করে পশ্চিম-বাল্লিনে। তারা যা মাইনে পায় সেটার মূল্য কশ এলাকায় টাণ্ডণ্ড বেড়ে যায়। আবার এমনও বললোক আছে যারা থাকে পশ্চিম-বাল্লিনে আর কাজ করে কশ এলাকায়; তাদের মাইনের টাকা আবার পশ্চিম মূল্যাবে হয়ে দাঁড়ায় চার ভাগের একভাগ! এই রকম নানান গোঁজামিল, গরমিল আর গণ্ডগোল বাল্লিনকে বানিয়েছে এক মস্ত প্রহসন।

হলেও, বাল্লিনের আকর্ষণ যুরোপীয় যে কোন শহরের চাইতে অনেক বেশি কুকারক্টাণ্ডামের এমোড থোক ওমোড পশ্চিম চোখ বলানো চাকচিক্য। প্রকাণ্ড মার্ভিনীমার্ক বাড়ির মাঝে-মাঝে ধসসুপের নীচের ওলায় দোকান, ওপরে ইটকাঠের স্তূপ। এখানকার দোকানে জিনিসের প্রচুর শাজানোর দৌলৎ আর

দামের ঊর্ধ্বা মুবোপের যে কোন শহরকে সহজেই হার মানায়। এখানকার তুলনায় লণ্ডনের শিকড়েল মনে হয় কিছু গরমার গলি। এই অর্ধ-ধ্বংস, পূর্ণপ্রাণ শহরটার শুদ্ধ একটা ঘোরা আছে বেটা সহজেই মানুষকে কাছে টানে।

এখানকার মানুষগুলো রাশিয়ার কাছাকাছি আছে বলে আশা-আকাঙ্ক্ষার উল্লেখ উঠেছে। ওরা আজ আছে বলেই ভালও যে থাকবে তার কোন স্থিতিহা নেই, তাই ওদের আন্তরিক বাঁচাটাই আনন্দ, কালকের আশাটা অলীক। ওরা বেপারোয়া আনন্দে ব্যাপ্ত। যাদের বয়স হয়েছে—অর্থাৎ যারা হিটলার-যুগের নিশ্চিত মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে এসেছে তারা সেই আনন্দে ভরপুর; যারা এখনও তার হিটলার-যুগের পরে জন্মেছে বলে আনন্দিত, ওরা সবাই আনন্দ দিয়ে জীবনকে জয় করেছে।

এই মনোভাবের পেছনে আরও একটা বড় কারণ আছে। জুনের ওপর জর্মানরা যেমন বর্ষ অত্যাচার করেছিল, রাশিয়ার শ্রমিক করেছিল জর্মানীর ওপর। জুঁরা জর্মানদের ভয় পায়; জর্মান রাশিয়াকে ভয়ও পায় যুগাও করে। ঠিক পেছনে সেই রাশিয়ার ও পেছনে বাস আছে এটা ওরা জানে এক এও জানে যে, রাশিয়ার কোন মুহুর্তে ওদের গ্রাস করতে পারে। এই ভয়ে ওরা ভর করেছে বেপারোয়া জীবনের মরিয়া দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ওদের অনিশ্চিত স্বাধীনতার মোহাশ ওরা আনন্দের মধ্যে বেঁধে নিয়েছে।

এটা স্বার্থের বস্তুত্ব; আমাদের নয় প্রদর্শনীর দো-ভাষী। প্রয়োজন মত চাইলেই সাহায্য পাওয়া যায়। প্রথম সন্ধ্যার পথে বেরিয়ে পাছে হারিয়ে যাই সেই ভরে পাঞ্জি ওকে একরকম জোর করেই সঙ্গে নিয়েছিল। তারপর থেকে ও আমাদের নিত্য সহচরী।

আমার আগে সরকারি টানা-হেঁচড়ার ঘুম হয় নি টানা সাতদিন। সাত শো সাত বোম্ব উড়ে জাহাজের স্ক স্ক কোলার পিষ্টের শিরদাঁড়া একেবারে শুকনো কার্টের মতন সোজা। অতএব হোট্টেলে পৌছেই এক ঘুমে সাতটা।

রাত আটটার পথে বেরিয়ে সোজা প্রদর্শনীর-দপ্তর। আটটার সঙ্গে ‘রাত’ কথাটা অভ্যেসদোয়েই বললাম ওখানে আটটা ‘রাত’ তো নয়ই সন্ধ্যাও নয় ভরা বিকেল। দপ্তরে আমি ছবির খোঁজ-খবর নিলাম। টিকিটের ব্যবস্থা করলাম, স্টল সাজাবার আয়োজন করলাম। সহযোগিত্বী কাকোতি মেনসাহেব (ছবির নাট্যিক) এবং আমাদের ডেলিগেশনের অঙ্কতম মহিলা-সদস্য / অরাম-কোদারার বস মুখে পাউডারের প্রলেপ দিলেন আর সুবোধ আবিষ্কার কল কথকে। কাজ শেষে পথে নামতেই জ্ঞানদা বললে, ‘ট্যাক্সি’।

খানিকটা অর্ধক হলাম। আমার সময় সাগাপ জ্ঞানদা পায়ে হাঁটার উপকারিতা ছাড়া আর কিছুই ভালোনে করে নি। হঠাৎ হল কি? আড়চোখে সুবোধের দিকে চাইলাম। ওর জ্ঞানপও নেই, মহানন্দে ও এখন কৃষ্ণক ভারত সরকারের মেডেল দেখাচ্ছে। জ্ঞানদা নাছোড়বন্টা, অতএব বাধ্য হ’য়ে ট্যাক্সি নিতেই হল। ট্যাক্সিতে উঠেই জ্ঞানদা বললে,—‘দাদা কিসে পেয়েছে।’

কৃথ মিয়ে গেল সন্দের ছিমছিম রস্তোরায়। আমার ইচ্ছে ছিল খাঁটি জর্মান খাবার খাব। পাক্কির ইচ্ছে ছিল কৃথের সঙ্গে জর্মানীর রাজনীতি আলোচনা করব।

জাননা বললে, 'ভাত খাবে।'

'অজ্ঞ আচরণ' অজ্ঞহাত, 'কাল ভাত খাওয়া যাবে' প্রতিক্রিয়া, এন পি 'স্পেশাল জর্মান খাবার' অজ্ঞত একবার খেয়ে দেখার সবিনয়, 'হোথ কোনকিছুই কাকোতি মেমসাহেবের ভেতামিকে টলাতে পারল না। ভাত সে খাবেই এবং আজই খাবে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। ওকে নিয়ে বিপদ আছে।

গেলাম চীনা রেস্টোর।। জর্মানীতে চীনা খাবার আর চীনে জর্মান খাবারের মধ্যে তারতম্য খুব একটা বে নেই এটা আমার অজ্ঞান তবে ভাতটা একেবারে বিস্তৃত পেশোয়ারী চালের চেয়ে ভালো। জাননা কাঁটা-চামচ সরিয়ে রেখে বা হাতে ভাত খাওয়ার বা স্পিড দিল তাতে জর্মানীর দানবীর ডিজেল ইঞ্জিনের গতিও কিছু নয়। পরিমাণের কথা বলব না সেটা নিত্যন্ত অভদ্রতা, তবে কৃথ যে এমন খাওয়া জীবনে দখে নি তা ওর কথাতাই বোঝা গেল। হু-চামচ ভাত মুখে দিয়ে কৃথ বললে—'ভাত বুঝি আপনার খুঁ ভালো লাগে?'

জাননা আরও এক প্লেট ভাত আনবার অর্ডার দিয়ে বললে—'লাগলে হবে কি।' কিশা করতে আরম্ভ করার পর থেকে খাওয়া তো প্রায় ছাড়তেই হয়েছে।'

কৃথ থাকতে পারল না। বললে, 'আরও বেশি খেতেন?'

কথা বলেই বুঝল বলা উচিত হয় নি। লজ্জার রাজা হ'য়ে বললে, 'মানে, বাগ করবেন না...'

জাননা সন্দের একটা ঢেঁকুর তুলে বললে, 'না, নেভার!'

ইতিমধ্যে বিল এলো। খুবই কম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ভাতের দামটা ধরে নি। ওরোটর হসে বললে—'ওটা ফ্রি।'

জাননা পীত খুঁটিছিল, কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসে বললে—'তাহলে আর এক প্লেট খাই?'

কৃথ বাঁচালো উঠে পিঁড়িয়ে। জাননা আর ওঠে না। নতুন জুতো খুলে সরিয়ে রেখে খাচ্ছিল, খাওয়ার পর জুতো আর পায়ে ঢোকে না। পাক্কির পেজোমো আছে, বললে—'বা ভাত খেয়েছে, পেটে কুলোর নি সোজা গিরে পায়ে নেমেছে।'

বেশা গেল জাননার পায়ে নতুন জুতোর জাঁরেল ফোঁস টকটকে লাল হ'য়ে ফুলে উঠছে। মোতালার ওপর রেস্টোর। সেখানে ট্যান্ডি আনার উপায় নেই, অগত্যা জুতোটা হাতে করেই জাননাকে নামতে হল। সারা প্রেমশুনীর সম্ভরথানা ছবিতে এমন নির্ভল্য হাসির দৃশ্য একটাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

পাক্কি ছবির প্রবেশক আর জাননা হিমোইন। অতএব পাক্কি আবার ট্যান্ডি নিল।

কুসারক্যাণ্ডাম। সংক্ষেপে ওরা বলে কু-ডাম।

মাহুঘের মরশুম। আলোর ভরা প্রথম রাত্রে অসদপায়ে পথ চলা।

কায়ো কোথাও বাওয়ার বাস্তবতা নেই, পাঁড়াবার ইচ্ছে নেই, বসবার বিধায় নেই। পথের ধারে রেস্টোর।গুলো সব ভর্তি। চেতর

থেকে উপছে পড়েছে পথের ওপর। একটা করে বিয়ার নিয়ে বসে আছে, কেউ একলা, কেউ একদল।

কৃথ আর আমি পথ চলেছি। অচেনা-অজানা দুই মাহুঘ পৃথিবীর চাঁ প্রান্ত থেকে এসে এক পক্ষকালের জন্ত পাশাপাশি পিঁড়িয়েছি। দুই পক্ষরই প্রবল বাসনা পরস্পরকে জানার; অথচ কথা নেই। শুধুই এলোমেলা ইটি। কোথাও একপলক পিঁড়ির আলোকিত জানলার মধ্যে দামের টিকিটখোঁটা জিনিস দেখা, সাজানোর অপরিমীম দৌন্দর্ঘের প্রশংসা করা। টি ছোট ছাড়াছাড়া কথা।

'আপনার ছবি কবে?'

'পরল।'

'কোথায়?'

'প্লাউজ-এ।'

'ও।'

আবার পথ ইটা। ভাবছিলাম মিতার কথা। কোথায় কে জানে? কেমন আছে তাও জানি না। দেশে এখন কটা? ঘুমোছে? ভালো আছে তো?

'পূরেকণ মানে কি?'

বাণি'নে ফিরে এলাম।

'পূর্বাক্ষণ—কথাই কৃথ ওঁর আগের ব্রহ্মর্ভ।'

কৃথ সোনালী চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'জর্মান নামটা অত সন্দের নয় মর্গেন ফট—'মানে প্রভাত-সূর্য।'

আমি বলি, 'আমার নামের কাছাকাছি।'

কৃথ হাসে। মিতা জানলে খুশি হত। কৃথের কথা নয়, ছবির জর্মান নামটার কথা। হয়ত কখনও দেখা হবে। তখন জানাব।

'বিয়ার খাবে?'

'না।'

'সমসে? জর্মানীর স্পেশাল?'

হেসে বলি, 'খাব।'

চুকলাম ছোট উল্লেরিতে। এখানে কেবল বিয়ার পাওয়া যায়, সঙ্গে তাজা গরম সমসে। হু'জন হু'প্লেট নিয়ে খেতে আরম্ভ করি। লক্ষ্য করেছি সারা সন্ধ্যা কৃথ ছিল বর্তব্যার কড়া আইনে বাঁধা কর্মী অর্থাৎ মাপ করা কথা, ওজন করা কাপড়। সরল, কিন্তু সহজ নয়। এখনকার কৃথ অজ্ঞ মাহুঘ। কথা হারিয়ে নির্বাক। কাপড় শিথিল করে সাধারণ। তবে ছাড়াছাড়া কথার জানা বার ও কলেজে পড়ে—এখানকার ফ্রি স্ট্রিনিভারসিটিতে অর্ধ বিজ্ঞান। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ তাই কাজ করছে অর্থোপার্জনের জন্ত। ওর বাবা পূর্ব বালিনি থাকেন। সেখানে অধ্যাপক। ও তাঁর একমাত্র সম্ভান।

বাড়ির কথায় ও হারানো কথার সুর খুঁজে পেল। বললে, 'আমিও ছিলাম সেখানে, সেই যুদ্ধের পর থেকে। তখন ছোট ছিলাম বাবা মার আদর ছাড়া অজ্ঞ কিছু জানতাম না। বরষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম রাশিয়ার-প্রবর্তিত শিক্সা-পদ্ধতিতে মাহুঘ নিজের মর্মান্দা হারায়। ওখানকার কড়া আইনে কাপড় নেই,

নিম্নের মধ্যে তার নেই। পূর্ব বার্লিনে তখন তাই হারিয়েছে, কুল হারিয়েছে। বাচার আনন্দ তা হারিয়েছে। ওখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিধি-ব্যবস্থার মানুষ হয়ে ওঠে যেদিন; মন হয় বিকল। তবু দিন কাটছিল, এমন সময় ভাত্রে বিদ্রোহ হল চার্টাডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনই ঠিক করলাম চলে আসব এখানে।

‘ওখানে থেকে এখানে পড়ার ব্যবস্থা কি ছিল?’

‘অসম্ভব। নিয়ম নেই। লুকিয়ে পড়া যায় কিন্তু জানাজানি হলে বুড়া বয়সে বাবার চাকরি যেত। জেলও অবধারিত।’

‘তারপর?’

‘বেড়াবার ভাণ করে মাঝে মাঝে এখানে আসতাম, সঙ্গে আনতাম কোনদিন দু’টে, ১. কোনদিন জামা—একটি একটি করে ছ’মাস গেল, এমন করে এমন জিনিস আনতে, এখানে থাকা আর পড়ার ব্যবস্থা করতে। তারপর একদিন সন্ধ্যার বাবার সঙ্গে বগদাদর ভাণ করে তুমুল চীৎকারে পাড়া মাথার করলাম। রাস্তায় যখন বেশ লোক জড় হয়ে গেছে তখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুট লিন্দার কান্ডে কান্ডে। জ্যাটের সবাই বুঝল আমি বাড়ি থেকে পালায়েছি। রাত কাটলাম বন্ধুর বাড়িতে—পর্বদিন এখানে।’

‘আমি চলে আসার পর বাবা পুলিশে এছাত্রা দিলেন যে আমার সঙ্গে উদ্দেশ্যে কার কোন সম্পর্ক নেই, কারণ আমি স্ট্রিটের নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে মহামার প্রকাশ করে বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করেছি।’

এক মিনিট খেমে যায় কথ। দীর্ঘ প্রশংসিত করে পূর্ব-দিগন্তে, ‘ক্রিডম ক্রাই’ লেখা নিওন আলোর পেছনে, যেখানে গভীর অন্ধকার। বুথটা সারিয়ে চোখটাকে ও আড়াল করল, নীচে নিশ্চয় দেখতাম চোখের পাতা ওর ডিঙে উঠেছে। ছোট দীর্ঘনিশ্বাসটাও গোপন করে রুখ বসে—‘এ ছাড়া বাবার বিচার পথ ছিল না।’ তিন বছর হয়ে গেল।

‘বাবা-মা’র সঙ্গে দেখা হয়েছে তারপর?’

‘মা’র সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় মা আসেন। বাবার সঙ্গে দেখা করতে বাই বছরে একবার, ক্রিস্টমাসে দিন। রাত্রে বাই পূর্ব-বার্লিনে, গভীর রাত্রে বাড়িতে। বখনও দু’টো বখনও তিনটির সময়, বখন ফ্রাটের সবাই সমারোহ শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ে। অন্ধকারে বাবার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি। কথা হয় না পাছে কেউ শুনে ফলে। ভোর হবার আগেই আবার বেরিয়ে পড়ি।’

‘বরা পড়লে?’

‘সাইবেরিয়া।’ তাগে রুখ।

আবার পথ। রাত প্রায় দু’টো। ইতস্তত লোক ছড়িয়ে আছে। নির্বাক পথ চলছি পারে হাঁট।

নাইট ক্লাব। ব্যাণ্ড বাজছে। নাইট ক্লাবের শতকরা নব্বইজন কর্মী বুনিতাগিরি ছাত্র-ছাত্রী। তারা সারারাত কাজ করে আর সাধারণ জ্ঞানের আরাধনা করে

চারিদিকে চোখ মেলে চাই। বিজ্ঞাপনের কালায় রাস্তাটা কলকল করছে। ওপরে তার কালো আকাশ নীচে পূর্ব-

বার্লিন থেকে একদল রিফ্রাজ এসেছে, তারা চলেছে। কেউ ঘর ছেড়েছে, কেউ দলার। এমনিথারা রিফ্রাজ আসে সাত-আশো প্রতিদিন নিশ্চপে পথ চলছি

হঠাৎ চীৎকার মর্ষভেরী আর্নাদ তারপরেই একটা কালো গাড়ি উল্লসে ছুটে বেরিয়ে গেল, পেছনের আলোটা নিভিয়ে। কথ থমকে দাঁড়াল।

‘কি হল?’

‘পূর্ব-বার্লিনে কেউ একজন চালান গল প্রায়ই যায়।’ খেমে আবার বলে হয় ত’ কোন বিশেষ লোক; হয় ত’ ওখানকারই কোন কর্মী। স্বাধীনতার আশায় এসেছিল, এক যুগের অন্তর্কর্তার বাকি জীবনের মহাদ হারালো। বাবে সাইবেরিয়া না হয় রাষ্ট্রকলের মুখে।’

প্রকাণ্ড হোটেল বার্লিন।

এয়ার কন্ডিশন করা ঘরের দরজা খুলে সামনের চিলতি বাবান্দার এসে দাঁড়লাম। পাচতলার ওপর থেকে দেখি সামনে ছড়ানো আছে পশ্চিম-বার্লিন। বিজ্ঞাপনের কালায় আকাশে অরুণ-ম্রাতা। হয় ত’ এখনি ভোর হবে, নতুন দিনে পুরোন সূর্য আবার নতুন করে উঠবে। ছাত্রা সব নাইট ক্লাব থেকে ক্লাসে গিয়ে ঢুকবে। সেখানে চলবে জ্ঞানের সাধনা, বিজ্ঞানের আরাধনা, সত্যতার অগ্রগতি। কথ তার কাজের আবার দিনে বাবার ব্যথা ভুলবে।

দেখা এখন ক’টা? সকাল হয়েছে। বাড়িতে মুহুগুজন।

মেয়ে বাগজ উঠে দেখছে, কে তার, ইন্টেলেন্স না মোতনবাগান। কে জিতলো? কৃপণ ন’ ফজার? আমি তাজার তাজার মাইল দূরে দাঁড়িয়ে ওর কথা ভাবছি। ওকে যে আমি আবার দেখতে পাবো এমন কথা কে জোর করে বলতে পারে? ওর আর আমার মাঝখানে অনন্ত দরজা। এই বয়সে কখন কি ঘটবে, এখন কি ঘটছে আমি তার কতটুকু জানি? মনের কোথায় যেন একটা অশঙ্কার ফাটল দেখা দেয়—ভাগ্যের বিভীষিকা তার পাখা মেলে। ভয় পেয়ে সর সরে আমি অশ্রয় খুঁজি মিতার স্থিতির মধ্যে। তাও যেন কেমন ছাড়া-ছাড়া। এলোমেলো।

বিত্ত আমার মনের মানুষ। কোন একদিন ছিল; কোন একদিন থাকবে। আজ এস নেই। আছে। জানি না। মনের হাত বাড়ালে তার হাড়ের নাগাল পাই। ভয় পেলে সে ভাঙনা ঘোচায়, দুখ পেলে সে বাধা দর করে। আমার সব চিন্তকে সে তাব আপন ভাগ্যবাসন অসীম উদার দিয়ে ঢেকেছে, আমার সব কাজের মধ্যে সে তার অপরিদ্রা সৌন্দর্য-সাধনার আসন পোতেছে। আমি তার মধ্যে নিঃস্তুভাবে বিলুপ্ত; বিলীন। দৈনন্দিন-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন বিব্রত হই তখন মিতাব ভাগ্যবাসার ভিত্তিতে আমি ভগবানের দিকে হাত বাড়াই। ও তখন পেছনে দাঁড়িয়ে অশ্রু শুষ্ক বলতে থাকে—‘সত্যম্ শিবম্ গুরুম্।’

ক্রমশঃ



## তথ্য মানব্র শাল

হাঁওড়া থেকে কাটোয়া পর্যন্ত এই প্রায় আশী মাইল রেল-পথের মধ্যে বৈচিত্র্য বড় কম নেই।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা নয়—এ বৈচিত্র্য ট্রেনের কামরার মধ্যে হকার আর ভিথরীদের। দানের লেশন থেকে আরম্ভ করে চিকণী সেক্টিপিন সব-কিছুই এ লাইনে মেলে। মুচির ছেসেটা পর্যন্ত—স্বাভে মূঢ়ি কিনা তাই বা ক জানে, পেটের দায়ে যে জাতেরই হোক না কেন—একটা বৃক্ষ আর এককোটা কালি, খানিকটা জাকড়া একটা কাঠের বাসুর নিয়ে ব্রতায় পাড়েছ। ‘পলিশ’—বেশ এক রকম দ্রুতগুরে উচ্চারণ করে একবার সকলের জুতার ওপর নজর বুলিয়ে চলে যায়।

—এই পলিশ এদিকে আর।

জুতা-পলিশ কাছে এসে দণ, করে ধুলার ওপর বসে পড়ে জুতাটা পা থেকে ধুলে নেয়।

—দশ পরমা লাগে গা বাবু।

—দশ পরমা! যাও আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ, বাবু, দশ নরা পরমা।

—কাহে?

—সু হার!

‘সু’ হার। অর্থাৎ কিনা একমাত্র শ্লিপার ছাড়া এদের কাছে আর সবই ‘সু’। ‘সু’য়ের জগা লাগে দশ নয়, আর শ্লিপার হলে অবশ্যই কনশেশন আছে—ছ’নয়।

এমনি বুনো আয়োজন। যাত্রীদের বাতে কোনো দিক দিয়ে কোনো-কিছুর অভাব না ঘটে—এগা যেন শে’দকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু এ লাইনের মতো টিনের বড় ডেকচিটে করে মিটি

আর তার সঙ্গে জলের ব্যবস্থা বোধ করি এখনো পর্যন্ত অস্ত্র কোনো লাইনে নেই। হাঁওড়া-কাটোয়া লাইন এ দিক দিয়ে পাইওনিয়র।

এছাড়া আনার ছ’টা লজেল থেকে আনার পচিশখানি বিকুটও এখানে মেলে। এইসব বিকুট যেসব স্নেহাঙ্ক বাপ-মা শিশুদের জন্ত কিনে দেন, পরের দিন ভোরে সেসব শিশুদের কি অবস্থা হয়, সুখের বিষয়—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না।

তারপর আছে ভিথরীর দল। সেও বড় কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। খোঁড়া, পা কাটা—মুলা, অন্ধ থেকে আরম্ভ করে একতারাধারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব পর্যন্ত। এদের কেউ সোজাছকি ভিক্ষে চায়—ছ’টা নয়া পরমা ছান বাবু—ছ’টা নয়া পরমা। ভগবান আপনাদের মজল করবেন। আবার কেউ গান গেয়ে। অধিকাংশ গানই নদের নিমাইকে নিয়ে—কৃষ্ণ দেহতত্ত্বের। একবার এক ফুলপাট সার্ট-পর অন্ধ ভক্তকে ভিক্ষুক এলেন। তিনি নাকি ম্যাট্রিক পাশ। মোটা গলার হাতে তালি বাজিয়ে বেশ ছ’পরমা ভোক্তার করে চলে গেলেন। এরা যে সব হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে কোথায় অবস্থায় বিধীন হয়ে যায় তার ঠিকানা কেউ জানে না। এমন কত জন এর—কত জন গেল। তেমন রসিক কোনো ডেলিপ্যাসেঞ্জার থাকলে এদের একটা তালিকা রাখতে পারতেন।

শনিবার। বেলা আড়াইটের সময় একখানা ট্রেন আছে শনিবারের ঘরমুখো বাবুদের জন্ত।

ব্যাগুেল থেকে ইঞ্জিন খল করে গাড়ি ছেড়েছে। ভাত্র মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মেন-লাইন ছুড়ে লুপ-লাইনের দিকে বাক ফিরল গাড়িখানা। দূরে বাঁশবেড়িয়ার ডিসট্যান্ট সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে।

একজন বললেন—এবার বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার তো হে, ব্যাগুেলের এই মাঠটাতেও চাষ হয়েছে। প্রতিবারই তো এটা খাঁ খাঁ করে।

দ্বিতীয়জন বললেন—হ্যাঁ। দেখছি। এমনি আর একটা মাঠ আছে—সোমড়ার লাইনের ধারে। কোনোবার একগাছা বাস জন্মাতে দেখি নি, এবার দেখা দিক।

তৃতীয়জন বললেন—তাতে আর আমাদের কি! ওদিকে কালনা, বাগনাপাড়, ধাত্রীগ্রামের মাঠগুলো যে পূড়ে গেল! এতটুকু বৃষ্টি নেই।

দ্বিতীয়জন বললেন—নাঃ, আগেরের মেঘটা ঢালবে বেশ। তার আগে বাড়ি পৌছতে পারলে হয়।

তৃতীয়জন বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনার মশাই কেবল ভিক্ষে ঘাবার ভয়! হোক বৃষ্টি—না তবু ভিজই যাব তবু ধানগুলা তো হবে। নইলে দেশের অবস্থাখানা কি হবে বলনা বন্ধোছন?

ওপাশে আর একজন চুলহিলেন, দেশের দুর্বৃত্তার কথা শুনে নড়েচড়ে বসে বলে উঠলেন—কল্পনা আবার কত পচ্ছ না! খুব পারছ। ওদিকে চীন—এদিকে পাবিস্তান—তার ওপর অনাবৃষ্টি! আচ্ছা মশাই, এই যে একদাঁক বাহু মস্ত্রী! দেশের এই দুর্দিনে পদত্যাগ করলেন তার কারণটা কিছু ভেবেছেন?

ট্রেন এসে ঠাঁড়ালো বাঁশবেড়িতে। আর্মি-মিটও নয়, গাড়ি ছেড়ে দিল।

—ভালো দানাদার আছে নেনে। রাজভোগ—মাত্র ছ’আনা—

—এই রাজভোগ। মস্ত্রীর পদত্যাগ সমস্তা ছেড়ে দিল ভক্তলোক রাজভোগ আশ্বাদনে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

অক্ষ

—কই দেখি কিরকম তোমার রাজভোগ।

মিষ্টিওলা বস থেকে সম্ভরণে একটি রাজভোগ তুলে দেখালে।

—এর নাম রাজভোগ! এ তো বসগোলা হে! হুঁ আনা জোড়া  
য়ে তো গোটা চাবেক দাও।

মিষ্টিওলা গম্ভীরভাবে বললে—যান, হাত ধুয়ে আসুন। বলেই  
দ্বার মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে তখনই ডেকটি মাথার তুলে নিয়ে  
দক্ষদিকে এগিয়ে গেল।

ভক্তলোক নিবিকারচিন্তে আবার ঠসান দিয়ে চোখ বুজলেন।  
হুঁ চোখ নিম্নলিখিত করবার আগে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য করলেন  
—যত সব জোড়ারের দল। ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এ্যাক্টে এগুলোকে  
ধরে না।

ট্রেন চলেছে। কোথায় বৃষ্টি হয়েছে। বেশ শিরশিরে বাতাস  
এসে গায়ে লাগছে। হঠাৎ এই কম্পার্টমেন্টে একটি মিষ্টি বেহালায়  
শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দে সকলেই যেন একটু উচকিত হয়ে উঠল।

প্রথমজন বললেন—এ এসেছেন!

দ্বিতীয়জন বললেন—হুঁ। বলে একটু সামনের দিকে খুঁকে  
দেখবার চেষ্টা করলেন।

প্রথমজন হেসে বললেন—অত ব্যস্ত কেন, এদিকেও আসবে।

ওপাশে চতুর্থন তরুণ ছিলেন। তাঁরাও একবার চকস হয়ে  
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তুফু নাচিয়ে কি ইশারা করলেন।

হাঁ, বেহালার স্বর ক্রমশই এগিয়ে আসছে। ঐ যে—সকলের  
দৃষ্টি ওই দিকে।

একটি দীর্ঘঙ্গ গৌরবর্ণ অক্ষ। দেখলেই ভক্তবংশের বলে মনে  
হয়। গলার কঠী। গায়ে গেরিমাটিতে ছোপানো হাতা-কাটা  
পাঞ্জাবি, পরনে আধমঙ্গলা ধুতি। অদ্ভুত মিষ্টিমুখে বেহালা বাজিয়ে  
এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি সেদিকে নেই। তাদের  
দৃষ্টি রয়েছে আর একজনের প্রতি। ঐ যে কি যত্নে কি সোহাগে  
অক্ষ ম'হুখটিকে আগলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ফর্সা রঙ,  
বড় বড় কাজলটানা চোখ, সিঁথের ওপর দপ, দপ, করে ফুলছে  
সিঁদুর। তার ওপর ঝঁঝ ঘোমটা। কঁকে কঁকে দেখা যাচ্ছে  
গলার কঠী। নিরাতরণ হাত হুঁখানিতে শুধু একজোড়া শাঁখা।  
হুঁজনের কেউ কোনো কথা বলছে না। একজন বাজিয়ে চলেছে।  
আর একজন দুই করুণ চোখ মেলে প্রত্যকের কাছে হাত পেতে  
যাচ্ছে। শ্রুতি করছে না কেউই।

এদের অতিক্রম করে ওরা চলে গেল।

এক নম্বর হুঁ নম্বরকে নীচু গলায় বললেন—জিনিসখানি ভালো।

দ্বিতীয়জন বললেন—হুঁ, টিকলে হয়।

প্রথমজন বললেন—তা এতদিন যখন টিকেছে—ছেলেপুলেও  
হয়েছে বোধ হয়।

দ্বিতীয়জন বললেন—কি করে জ্ঞানলেন?

# লেক্সিন

সর্প দংশনের সুবিধ্যাত মহোষধ

সর্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে। কাকড়াবিছা

ও অগ্ন্যাণ্ড বিষাক্ত দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

“Snake Bite” পুস্তক আব'র পাওয়া যাইতেছে; দাম ৫/-

বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয়।

পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম

কলিকাতা অফিস:

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫

প্রথমজন একটু দুলে-দুলে হাসলেন। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তবে একটু কি দু'টি। তা হোক, তবু শরীরের যত জানে।

দ্বিতীয়জন বললেন—কিন্তু অমন চেহারা আর তারই ভাগ্যে ঐ অঙ্ক ভিক্ষুক।

প্রথমজন বললেন—হয়তো বিয়ের পর অঙ্ক হয়েছে। কে জানে হয় তো আগে আমাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ ছিল, চাকরি করত, নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার করত। তারপর চক্ষুও গেল, কপালও ভাঙল। এখন ঐ ভিক্ষাপাত্র সার।

—তবে জাতি ভালো পেরেছে। বয়স অল্প, সুন্দরী তো বটেই কিন্তু সতীর তেজ আছে যুগে। দেখেছেন?

প্রথমজন মাথা নেড়ে বললেন—হু!

দ্বিতীয়জন বললেন—আজ আমরা অঙ্ক হয়ে গেলে আমাদের জী অমন হাত ধরে নিয়ে যাবো—পথে পথে নয়, এঘর থেকে ওঘর?

—ছাউ। যেই ডান হাত বন্ধ হবার উপক্রম বুঝবে, অমনি—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রথমজন চুপ করে গেলেন।

—বেহালা শুনেতে পাচ্ছি না তো? নেমে গেল না কি?

—হ্যাঁ, অঙ্ক গাড়িতে গেছে।

—বেশ আছে ছাউতে। অমন সঙ্গিনী পেলে আমরাও ভিক্ষে করে বেড়াতে পারতাম কি বলেন?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে জড়িয়ে ধরে নিয়ে বাচ্ছিল একপা-একপা করে, দেখেছিলেন?

—দেখি নি আবার।

আবার দীর্ঘশ্বাস। গাড়ি চলছে।

নবদীপের একটা অখ্যাত গলি। কোলকাতা চাপা ছোট একটা ঘর।

—মামি এখন বাচ্ছি।

অঙ্ক দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গিনীর দু'হাত চেপে ধরে বললে—এখনি বাবে!

—হ্যাঁ, মাথাটা বড় ধরেছে। ছাড়ো।

—কাল আসছে তো?

—তোমার গায়ে তো জ্বর লেগেই রয়েছে, একটা দিন নাই বেরলে।

অঙ্ক কম্পিত-স্বরে বললে—না না, ও ঠিক আছে। তুমি নিশ্চয় কাল আসবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা আসব। আঃ বেহালাটা অমন টেনে রেখেছে কেন? এখনি যে পা লেগে ভাঙবে। বেহালা তো জাভেবে না—কপালও ভাঙবে!

এমনি সময় বাইরে থেকে অর্ধঘণ্টা গলার কে ডাকল—সুখী!

সুখী চমকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি বাই। ডাকতে এসেছে।

এই বলে আর হুহুর্ভকালমাত্র বিলম্ব না করে সুখী বেরিয়ে গেল।

অঙ্ককার গলিতে একজন পুরুষ অপেক্ষা করছিল। ঝটখরে বললে—এত দেরি আজ?

সুখী বললে—ট্রেন লেট ছিল।

—‘ট্রেন লেট ছিল’ পুরুষটি ভাঙলে। এমিকে—সে, কি পেয়েছিল।

সুখী আঁচলের গিঁট খুলে একরাশ রেজকি লোকটার হাতে ঢেলে দিল। লোকটার দুই চোখ অন্ধকারেও জ্বলতে লাগল।

—ওর কাছে কিছু নেই তো?

—না।

—লুকিয়ে রেখে দেয় নি তো? অঙ্কগুলো কিন্তু ভারি সেরানো হয়।

সুখী এবার খেঁজে উঠল।—চুপ করে। যা জান না তা বোলা না। ও একটা পরস্রাও নিজের কাছে রাখে না। আমি নিজে যা ওর হাতে তুলে দিই, তাই ও নেয়।

পুরুষ সে কথাই বিশেষ কান না দিয়ে ধমক দিয়ে বললে—নে নে চ, এমিকে ছোট। গোসাই অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন।

সুখীর পা চলছিল না। সারাদিনের শ্রান্তি। তার ওপর হঠাৎ এই নতুন আমন্ত্রণ। বিরক্ত হয়ে বললে—না না, আজ আর আমি পারব না। আমার শরীরটা কি শরীর নয়? ঘেরে কেলেবে?

পুরুষটি কুংসিত একটা হাসি হেসে সুখীর খুঁজি ধরে নেড়ে বললে—এ কি আজ নতুন? তবে যে আজ বড় নতুন লাগছে সই।

অঙ্ককার গলিপথের নিস্তব্ধতা ছিল কঁদে অন্ধকার আখার বেহালায় দৃশ্য শোনা গেল। হ্যাঁ, অঙ্কই বাজাচ্ছে। কিন্তু এই ঘরে ট্রেনে বাজাতে কেউ কোনো দিন শোনে নি। এ তার একলা রাতের গান।



# বিখ্যাত 'শঙ্খ ও মদন'

মার্কি গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

## ডি, এন, বসু

হোসেন্সারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

## হোসেন্সারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২২২৫

দাঁড়িয়ে বসন্তী | শ্রাবণ / ৭২



কাজের শেষে

—ডাঃ সৌম্যেন গুপ্ত

আলোকচিত্র



কাঠবিড়ালীর প্রাতরাশ

—রামকিঙ্কর সিংহ

মাসিক বসুমতী



মাসিক বসুমতী

শ্রাবণ / '৭১

খাসিয়া যুবতী

—চঞ্চল মিত্র





ফুলের হাসি

—কুমারী রেবা

সেনগুপ্ত

মাসিক বসুমতী । শ্রাবণ / '৭১

কটাক

—কুদিরাম মাইতি



# কর্কের ইতিকথা

অমরনাথ রায়

ডাক্তারখানা থেকে বে ওষুধ-ভরা শিশিটা নিয়ে এলে—ওর মুখের ছিপিটা কি জিনিস বলতে পার? হ্যাঁ, ওরই নাম কর্ক—একরকম গাছের ছাল। গাছের নাম ‘কর্ক-ওক’—দেখা যায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তু গাল, স্পেন ও আরও কয়েকটি দেশে।

আমাদের দেশের বট, অখণ্ড প্রভৃতি গাছের মত কর্ক-ওক গাছও বেশ বড় হয়। গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের ভেতরকার কোষগুলিও সংখ্যায় বাড়তে থাকে। শেষে এই কোষবৃদ্ধির ফলেই পূর্ণবয়স্ক কর্ক-ওক গাছের ছাল যায় ফেটে। এই ফাটা ছালের নীচেকার অংশে কোষের যে পুরু স্তর থাকে—প্রকৃত-পক্ষে তাই হচ্ছে কর্ক।

কর্ক-ওক গাছের বয়স বিশ বছর পূর্ণ হলে প্রথম ছাল কাটা আরম্ভ হয়। তাতে যে কর্ক পাওয়া যায় তা মসৃণ নয় এবং সেইজন্যে নিকুট ধরণের। আর নিকুট বলে বাজারে তার দামও কম।

প্রথমবার ছাল কাটার পর আট-দশ বছর গাছের গায়ে আর আঁচড়টিও কাটা হয় না। ঐতিমধ্যে গাছে আবার নতুন ছাল গজায়, আর সেই ছালের নীচে আঁচ থেকে আড়াই ইঞ্চি পুরু কর্কের আন্তরণ সৃষ্টি হয়। তখন ছাল কেটে আবার কর্ক সংগ্রহ করা হয়। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বারের এই কর্ক অনেক ভাল। তবে খুব ভাল কর্ক পাওয়া যায়—গাছের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে।

সাধারণত প্রতি দশ বছর অন্তর কর্ক সংগ্রহ করাটাই প্রচলিত রীতি। জুলাই অথবা আগস্ট মাসে এ কাজ করা হয়। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয় একটি ধারালো ছুরি। ছুরির ফলা দিয়ে প্রথমে কাণ্ডের নাচে বেড় বরাবর ছাল একটু গভীর-ভাবে চিরে দেওয়া হয়। অমনি আর একটি চিরে দেওয়া হয় কাণ্ডের সেই অংশে—যার ওপর থেকে শাখা-প্রশাখা শুরু হয়েছে। এর পর এই দুই কাটা অংশের মাঝখানের ছাল লম্বালম্বিভাবে কেটে নেওয়া হয়। কাণ্ডের চেয়ে শাখা-প্রশাখা থেকেই ভালজাতের কর্ক পাওয়া যায়। আর প্রতিবারে একটি গাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড কর্ক সংগ্রহ করা হয়।

কাটার পর ছাল কয়েকদিন বাতাসে ফেলে রাখা হয়। তারপর তা জল দিয়ে সে척 করে নেওয়া হয়। ছালের বাইরের আবরণটা খুবই শক্ত আর এজো-থেকো। সেচ্চ করার ফলে সেটি নমনীয় হয় এবং তখন তা টেচে বাঁধ দেওয়া হয়। ছাল টেচে কেলার পর ভেতরের অংশটুকু চাপ দিয়ে সমান করে—পরে তকিরে দেওয়া হয়। ঐ শুকনো কর্ককে তারপর যন্ত্রের সাহায্যে তকিরে দেওয়া হয়। এ শুকনো কর্ককে তৈরি হয়—তৈরি হয় টেলি ও ক্রয়ের মেবে ঢাকবার ম্যাট ও আরও অনেক শিল্পদ্রব্য।

মোটামুটিভাবে এই হলো কর্কের ইতিকথা।



# হোটেল আমস

টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক—

স্যামুয়েল মোস

পোপাল সঁতার

‘ভগবানের কি বিচিত্র সৃষ্টি।’

যুক্তরাষ্ট্রের টেলিগ্রাফ তারে পরীক্ষামূলকভাবে সংবাদ প্রেরণের সময় বাইবেলের এই বাকটি সর্বপ্রথম সরকারী বাণী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারী স্যামুয়েল মোস ১৮৪৪ সালের ২৪শে মে তারিখ বার্নটমোর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ক্যাপিটল ভবনে অবস্থিত স্ট্রীম কোর্টের গ্রন্থাগারে উপরি উক্ত বাণীটি পাঠিয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালের ৩রা মার্চ তারিখে পরীক্ষামূলক-ভাবে টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের শুভ কাংগ্রেস ৩০ হাজার ডলার ব্যয়ের প্রস্তাব মঞ্জুর করে একটি বিল পাশ করেন। ঐ তারিখটি ছিল কাংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিন এবং অধিবেশন মূলতঃই হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বিলটি পাশ হয়। মোসের টেলিগ্রাফ তার স্থাপনের ব্যয় মঞ্জুরের জন্ম বিল পাশ করার কাহিনীটি উপকৃত্যসের দ্বারা চাকলাকর। ব্যয় মঞ্জুরের জন্ম আইনসভায় বধনি ভোট নেওয়া হচ্ছিল, তখন পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা প্রায় সমান থাকায় উভয়পক্ষই অস্থিতবোধ করছিলেন। কাংগ্রেসের অনেক সদস্য এরূপ একটি কাছের জন্ম ৩০ হাজার ডলার ব্যয় করাকে বরদাস্তার অর্থের অপচয় বলে মনে করছিলেন। আর আবিষ্কারক মোস দিনের পর দিন ক্রুদ্ধনিঃশ্বাসে আপেক্ষা করছিলেন। সেনেটের অধিবেশনের শেষ দিনে মোস গ্যালারিতে বসে অপেক্ষা করছিলেন। যে সব সেনেটরদের সঙ্গে তাঁর দ্বীতির সম্পর্ক ছিল, তাঁরা এসে জানিয়ে গেলেন যে, বিলটি পাশ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাশ হয়ে আপন গৃহে ফিরে এলেন। মোস এক জায়গায় লিখেছেন,—‘বিপদের সময় সাহায্য অবস্থাই আসবে, এই অভিজ্ঞতা আমার ছিল, তাই আমি সমস্ত ভাবনা-চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে অনতিবিলম্বেই শিশুর দ্বার নিশিচেষ্টে হুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে প্রাতঃরাশে শুভ নাচে নেমে আসতেই তাঁর বয়স এক বছার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

মোস তাকে প্রায় করলেন, ‘এত সকালে যে? ব্যাপার কি?’ ‘আমি আপনাকে’ অভিনন্দন জানাতে এসেছি’ মেয়েটি উত্তর করলো।

‘ও তাই নাকি, কিন্তু কেন?’

‘আপনার বিলটি পাশ হয়েছে।’

‘না বাছা, তুমি ভুল বলছা।’

‘আপনিই ভুল বলছেন, গতকাল গভীর রাত্তিতে অধিবেশন শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে বিলটি পাশ হয়েছে।’

সংবাদটি এতই অভাবনীয় যে, কিছুক্ষণের জুগ্ম মোস’ একেবারে নির্বাক হয়ে বইলেন। শেষে বললেন,—‘এই সংবাদটি তুমিই প্রথম দিলে, বাণ্টিমোর ও ওয়াশিংটনের মধ্যে টেলিগ্রাফ তার স্থাপন সম্পূর্ণ হলে সকলের আগে তোমার বাণীই প্রেরণ করবে।’

এ মেয়েটি বাইবেলের উপরোক্ত বাক্যটি নির্বাচিত করে।

মোস’র মনে অতীতের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠল। তখন তিনি ছিলেন এক তরুণ শিল্পী। শিল্পকলা বিষয়ে তিন বছর গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনার পর তিনি ল.-হার্ভার থেকে নিউইয়র্কে তাঁর আপন গৃহে ফিরে আসছিলেন জাহাজে। জাহাজখানির নাম ‘হুলি’। ঐ জাহাজে চালস টি জ্যাকসন নামে বস্টনের একজন চিকিৎসকও ছিলেন। জ্যাকসন বাত্মন্যের চিত্তবিনোদনের জন্ত একটি খেলনা দেখান।

ঐ খেলনার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলে পর উহা জাহাজের মেঝে থেকে লোহার পেরেক তুলে নিল। মোস’ নিজেরও ঐ পরীক্ষা দেখছিলেন। তিনি সেখানেই বিশেষ জোর দিয়ে বললেন,—‘বিদ্যুৎ চলাচলের পথের কোন অংশে যদি বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখানো যায়, তা হলে মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করা কেন সম্ভব হবে না, আমি তার কারণ দেখি না।’

জাহাজের অস্ত্রাস্ত্র বাত্মন্য তাঁর কথায় হেসে উঠলেন।

কিন্তু আহায়ে ও নিজায় সর্বদার জুগ্মই মোস’ এই চিন্তা করতে লাগলেন যে, কি ভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। একখানি নোটবই কোলের উপর রেখে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকাতো নানা রকমের নক্সা আঁকতে লাগলেন। দিনের পর দিন জাহাজে বসেই নিউইয়র্কের নিকটবর্তী হতে লাগল, মোস’র ততই মনে হতে লাগল যে, তাঁর অস্পষ্ট ধারণাগুলি সুস্পষ্টরূপে নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাঁর ঐ নক্সাগুলি বর্তমানে ওয়াশিংটন জাতীয় বায়ুযন্ত্রে সুরক্ষিত আছে।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি যেসব চিত্র অঙ্কিত করেছেন এবং যৌক্তিক পরম ব্যক্তি বলে মনে করতেন সে-সবের তুলনায় তাঁর এই নক্সাগুলি যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। বস্টন শহরের অনতিদূরে বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিনের জন্মস্থানে ১৯১১ সালের ২৭শে এপ্রিল ডায়মন্ড মোস’র জন্ম হয়। ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে মোস’র নাম সত্যচর উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মোস’র জন্ম হয় ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে। সে সময়কার ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলেন।

১৮১০ সালে তিনি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত করেন এবং ইউরোপে যাত্রা করেন। শিল্পী হিসাবেও তিনি কম শ্রমসাধ্য কাজ করেন নি। দুই বছর কাল অধ্যয়ন ও হাতে-কলমে শিক্ষালাভের পর তিনি সর্বপ্রথম যে বৃহৎ চিত্রখানি অঙ্কিত করেন তা আজও ইয়েলের আর্ট স্কুলে সুরক্ষিত আছে। চিত্রখানির নাম

‘হারকিউলিসের মৃত্যু’ লণ্ডনের রয়াল একাডেমিতে প্রদর্শিত দুই হাজার চিত্রের মধ্যে এই চিত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় মোস’ স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২২ বছর বয়সে এক তরুণ শিল্পীর পক্ষে এরূপ অসাধারণ সম্মানলাভ অত্যন্ত দ্বন্দ্বাধার বিষয়। জাহাজে মোস’ যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার ফলে দেশে ফিরে এসে তিনি অল্প মানুষ হয়ে যান। তিনি ভাবতে লাগলেন, মানুষের সেবার জন্ত বাম্পীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং যন্ত্রের সাহায্যে সকল প্রকার পণ্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে হয়, তা’ হলে উন্নত ধরনের দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এসব চিন্তা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে, তিনি তাঁর শিল্পচর্চার পেশা ছেড়ে দিলেন।

শিল্পচর্চা ছেড়ে দেওয়ার ফলে তাঁর অর্থাবস্থা দেখা দিল। বস্তুত তিনি যখন নিঃস্ব অর্থহীন এসে পৌঁছলেন—ঐ সময় সৌভাগ্যবশত তাঁর বন্ধুরা সাহায্যের জন্ত এগিয়ে এলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় মোস’ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্সি-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতরূপে অর্থ উপার্জনের ফলে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন। দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি নিজের হাতে একটি-একটি করে প্রত্যেকটি যন্ত্র নির্মাণ করেন।

শোষক-পরিচ্ছদে ও খাওয়ার জন্ত অর্থব্যয় করা বন্ধ করে দিয়ে তিনি সেই অর্থের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি টেলিগ্রাফের একটি নিখুঁত মডেল তৈরি করলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার খাটানো হলো এবং সেই তারে সংবাদ প্রেরিত হলো। সংবাদটি ছিল এইরূপ—‘টেলিগ্রাফ পাঠাবার পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে, ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ সাল।’

এইভাবে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবার সময় দূরবর্তী দুইটি স্থানের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরীক্ষার জন্ত তিনি কংগ্রেসের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ঐ সময় কংগ্রেস সদস্যরা সিমাকোর পদ্ধতিতে সাক্ষ্য প্রেরণ সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই আবিষ্কারের গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করেন নি। মোস’ তাঁর আবিষ্কারকে পেটেন্ট করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। হতাশায় ভেঙে না পড়ে তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন। লণ্ডন তাকে তাঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট অধিকার দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু তবুও এমন কতগুলি সার্ভে পেটেন্ট অধিকার দিল যে, তিনি তা চালাতে পারলেন না। সে বাই হোক, এই সফরের দক্ষণ তিনি ইউরোপে বিদ্যাব্যবস্থার আধুনিকতম বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পান এবং তারই ফলে তিনি হাক্সলি ধরনের একটি যন্ত্র তৈরি করেন—যার মধ্যে জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম। আর একবার তিনি অর্থের জন্ত কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা লাভও করলেন।

এখন সাংগোমের মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাফকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা দেখা দিল। মোস’ এবং তাঁর অংশীদার ডেইল তখনই কাজে লেগে গেলেন। মোস’র বাধাবির তখনও দূর হয় নি। মাটির তলার নল বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে টেলিগ্রাফের তার নেবার পরীক্ষা শুরু করলেন।

## ছোটদের আসর

এক বছর কাল বুধাই তিনি পরিভ্রম করলেন এবং তার সঙ্গে তেইশ হাজার ডলার ব্যয় করলেন। তিনি প্রায় হতাশার ভেঙে পড়লেন। এ-সময় একরা কর্নেল একজন ভ্রাম্যমাণ সেলসম্যানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কর্নেল, মোসকে ডাক্তার উপর ইনসুরেন্সের বসিয়ে তার সঙ্গে তার টেনে নেবার পরামর্শ দিলেন। মোসও রাজী হলেন। বার্নিটমোর ও হাড়ে রেলপথ ধরে টেলিগ্রাফ তার খাটানো হলো এবং বিরাট পরীক্ষাটি অস্বস্তিত হলো বার্নিটমোর পক্ষেই। অনতিবিলম্বেই বরাবরাগত হিসাবে টেলিগ্রাফ সাক্ষালাভ করে এবং দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র চালু হয়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যে মোস' অন্ততম। তিনি একাধারে শিল্পী, আবিষ্কারক, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিক ছিলেন। এই চারটি ক্ষেত্রেই তাকে কঠোর পরিশ্রম, দুর্ভাগ্য এবং মতামতের সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হলেও তিনি এ ক্ষেত্রেই তিনি সফল হন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি পৃথিবীর সকল জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

১৮৭২ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে মোস' নিউইয়র্কে লোকান্তরিত হন।

## মিঠে সানাইয়ের সুর শোনায

### শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

সুন্দর সব পরীরা

নতুন ফুলের বেশে,

মিঠে সানাইয়ের সুর শোনাতে

এলো মোদের দেশে।

দিকে দিকে আজ উঠছে

ওই সুরেরই ঝড়,

এমন দিনে কেউ থাকে না

দূরে আপন পর।

নীল আকাশে উড়েছে তাই

পাখিরা সকালবেলা,

মাঠ-বাটে বসেছে সব

রঙিন ফুলের মেলা।

শিশুর টোটে ওরাই আজ

ভুসছে হাসির ঢেউ,

জ্যোৎস্নাঘাটে এই কথাটি

জানলো না ভাই কেউ।

এমনি করে বছর বছর

ওই পরীরা এসে,

মিঠে সানাইয়ের সুর শোনায

আমাদের এই দেশে।

## বক্সিমচন্দ্রের গল্প

### শ্রীদীপকর নন্দী

গভীর অরধ্য। সেই অরধ্যের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে সন্ধ্যা মোটা পথ। পায়ে-চলার পথ।

পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেই মোটা পথ বেয়ে চলেছে দু'টি পাকী। একটি আগে আগে—অপরটি তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদের আলোর সারা জঙ্গল ঝলমল করছে। বোধ হয় পূর্বদিক তিথি। চারিদিক নিশ্চল। শুধু শোনা বাজে গাছপালার থসুথসু শব্দ। আর পাকী-বাহকদের স্তম্ভুর রব একটানা হাইও। হাইও!!

যোলজন বাহক দু'টি পাকী কাঁধে নিয়ে চলেছে। পাকীর আগে আগে চলেছে একজন লোক। তার এক হাতে লঠন—অন্য হাতে লাঠি। সেই পথপ্রদর্শক—পথের নিশানা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

পাকীতে চলেছেন হাকিম সাহেব। এ জেলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। চলেছেন সরকারী কাজে। ভোর হওয়ার আগেই সাহেবকে শহরে পৌছিয়ে দিতে হবে। যথাসময়ে পৌছিয়ে দিলে ভালরকম বকশিস মিলবে। সেই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওরা ছুটে চলেছে।

এই মাথ মাসের কনকনে শীতে ওরা গলদখর হয়ে উঠছে। ওদের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

হঠাৎ পাকী-বাহকেরা থমকে দাঁড়াল। অদূরে দেখতে পেলো কতকগুলি লোক। লোকগুলি ইতস্ততভাবে লুকিয়ে রয়েছে, ঝোপঝাপের আড়ালে-আড়ালে। টুকি-ঝুকি মারছে। ইসারা করছে পরস্পরের মধ্যে নানা রকম সাক্ষাতিক আওরাজ করে।

এই নিশীথরায়ে নির্জন-নিরালা জঙ্গলে এতগুলি লোককে দেখে পাকী-বাহকদের ভয় হলো। তারা নিরাপদ বোধ করল না। তাদের গা ছন্দুন্দু করতে লাগল।

লোকগুলি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এগিয়ে এসে লুকোচ্ছে ঝোপের আড়ালে। একঝোপ থেকে আর একঝোপের আড়ালে।

ওরা প্রায় পাকীর কাছে এগিয়ে এসেছে। বাহকদের বুঝতে বাকি রইল না এরা কারা। কিসের লোভে এই গভীর নিশীথে এসেছে এই জঙ্গলে।

ওরা খবর পেয়েছে রাত্রিতে সাহেব বাচ্ছেন। সঙ্গে বাচ্ছেন তাঁর জানাই, নতুন জামাইয়ের কাছে নিশ্চয় কিছু টাকাকড়ি আছে। নিদেনপক্ষে গারে সোনাদানা তো কিছু আছেই। সেই গন্ধে ওরা এসেছে। এসেছে দল বেঁধে। ভয় দেখিয়ে না হয় তো খুন-অখুন করে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে চম্পট দেবে। এই নিরালা-নির্জন নিশীথে কেউ টেরটি পাবে না। কেউ জানতে পারবে না কাদের এ কাজ। এমন সুযোগ কি কেউ কখনও ছাড়বে।

জম-ভাবনার বাহকদের গতি মন্থর হয়ে এলো। হঠাৎ এক সময় বিশ-ত্রিশ জন লোক হৈ-হৈ করে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। নিমেষের মধ্যে পাকী দু'টিকে ঘিরে ফেললে। মার মার বলে চিৎকার করতে লাগল।

বাহকেরা ভয়ে পাক্কা নামিয়ে রেখে পালাল, যে যে দিকে পারলে দৌড়াল। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে উল্কাধাসে দৌড়াল। ভয়ে পিছন ফিরে কেউ একবার তাকিয়ে দেখতে সাহস করলে না।

পাক্কার মধ্যে বিনি ছিলেন, সব তখন তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছিল। পাক্কা মাটি স্পর্শ করার তাঁর তন্দ্রার খেঁচ কেটে গেল। বাপার কি? কিসের এত চিংকার—এত কলরব।

পাক্কার ভিতর থেকে তিনি একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির। তাঁর পাক্কা ঘিরে রয়েছে বিশ-ত্রিশ জন সপ্তমার্কী লোক। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি দীর্ঘকায়। ওদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি আর সড়কি। কিসের নেশার চোখ ছুঁটি রক্তরাঙা। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। আর কি ভয়ঙ্কর—বিকট ছকার।

আশ্চর্য। পাক্কার ভিতরে বিনি ছিলেন তিনি কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন পাক্কা ভিতর থেকে। পায়ের কাছে দেখলেন একটা লাঠি। বোধ হয়, লঠিনধারী বোয়ারা ফেলে পালিয়েছে। তিনি ক্ষিপ্ৰগতিতে লাঠিটি কুড়িয়ে নিলেন। বজ্রযুগ্মে তা লাঠিটি উঁচিয়ে ধরে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ছকার দিয়ে উঠলেন—কে তোরা? কি চান?

সেই বজ্রগম্ভীর সারা অবগ্য রোঁপে উঠলো। ডাকাতদস্যরা চমকে উঠল। ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

হাকিম সাহেবের সে কি ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ। রাগে তাঁর শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠছে। বিখ্যারিত নয়নযুগল রক্ত-রাঙা। ঠিকরে বেরচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আবার ছকার দিলেন হাকিম সাহেব।—আর একপা যদি কেউ এগিয়ে আসিস তো তোদের কাক্কে আন্ত রাখব না। প্রাণে যদি বাঁচতে চাস তো এখন এখান থেকে পালিয়ে যা—

হাকিম সাহেবের সেই রুদ্রমূর্তিতে কি ছিল জ্ঞানি না। মম্বলের মত ডাকাতদস্যরা একে একে সব পালিয়ে গেল। যে অরণ্য এতক্ষণ ভীষণ কসরবে আর বীভৎস চিংকারে আতঙ্কিত হয়ে ছিল এখন তা নিস্তক। বাতাসের সন্মুখ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। বাতাসে গাছেব পাতাগুলি খসুখসু শব্দে নড়ছে আর নীচে মাটিতে শব্দ করে নড়ে উঠছে ফেলে-যাওয়া ডাকাতদস্যদের হাতের লাঠি আর সড়কি।

হাকিম সাহেব সেই গভীর নিশীথে নিস্তক-নির্জন অরণ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে আর ভাবতে লাগলেন, কিছুক্ষণ আগে যাটে যাওয়া ঘটনাটি।

কিন্তু কে এই অসমসাহসী হাকিম? হাকিম সাহেব আর কেউ নন—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন রূপ দিয়েছেন, তাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছেন। তাঁর অল্পময় রচনাবলী যুগে যুগে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে জ্বলন্ত প্রাণিত করেছে—নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। তিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট নন—মাতৃমন্ত্রের উপকাতা—জাতির জনক।

কিন্তু কে জানতো বঙ্কিমচন্দ্র এত বড় বীর—যোদ্ধা। যেমন নির্ভীক তেমনি তেজস্বী। যেমন মানসিক দৃঢ়তা তেমনি প্রত্নতত্ত্বপন্থমতিব। যে অরণ্য দিনের আলোয় কেউ প্রবেশ করতে সাহস করে না সেই বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করলেন অবলীলাক্রমে।

যাত্রা করলেন গভীর নিশীথে সেই অরণ্যপথে। জনমানব নিস্তক অরণ্যে একা এগিয়ে গেলেন মৃত্যুদূতের সঙ্গে পাশা লড়তে। কিন্তু মাঝবের বুদ্ধিবৃত্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর ব্যক্তিত্বের কাছে শারীরিক-শক্তি—পশুশক্তি চিরকালই পরাভূত হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। পরাজিত হয়ে ডাকাতদস্যরা পালিয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ভয়মুক্ত হলেন।

আর একবার বঙ্কিমচন্দ্র অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি নবীন যুবক—জগলী কলেজের ছাত্র।

সিপাই-বিভ্রোহের আগুন তখন দেশের চারদিকে জ্বলছে। চুঁচুড়ার সামরিক আইন জারি হয়েছে—রাত্রি নটার পর যে কেউ রাস্তায় বেরব তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হবে। এই হলো সেই সামরিক আইন। তাই সন্ধ্যার পর থেকে চুঁচুড়ার পথঘাট জনমানবশূন্য—নিস্তক। শুধু রাইফেল উঁচিয়ে আনাসোনা করছে অবলম্ব প্রহরী গোরা-সৈনিকের দল।

সেই সময়ের কথা বলছি। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চুঁচুড়ায় গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ বক্ষার্থে। থিয়েটার দেখার নিমন্ত্রণ। প্রথম যৌবনে থিয়েটার বঙ্কিমচন্দ্রের বড় প্রিয়বস্ত ছিল। এমনি পরিবেশেও তাই তিনি থিয়েটার দেখার লোভ সঞ্চার করতে পারেন নি।

সেদিন থিয়েটার ভাঙতে অনেক দেরি হয়ে গেল। থিয়েটার দেখতে দেখতে এমনিই তমস্র উদ্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন যে, সামরিক আইনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যখন থিয়েটার ভাঙলো তখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করে আজ কাঁঠালপাড়া যাবেন। গঙ্গার ওপারে কাঁঠালপাড়া। এখান থেকে গঙ্গার ঘাটও বেশ কিছুদূর। কি আর করবেন। ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিতে শুরু করলেন গঙ্গার ঘাটের দিকে। ইতিতে ইতিতে আরো কয়েকজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তাঁদেরই মতন কয়েকজন থিয়েটারদর্শক—ওপারের যাত্রী।

সকলে চলেছেন দল বেঁধে। থিয়েটারের গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় অঘটন ঘটল। কোথা থেকে একজন গোরা-সৈনিক এসে একজন যাত্রীর বৃকে বনুক উঁচিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। সেই লোকটির অবস্থা তো সঙ্গীন; থু থু করে কাঁপতে কাঁপতে মুছলি যায় আর কি।

বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ এই ভয়ই করছিলেন। তিনি দেখলেন, আইনামুসারে সৈনিক এখন শুধু ঐ লোকটিকেই নয়, প্রত্যেকটি পথচারীকেই গুলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে, এমন লোক নেই। এই অবস্থায় কি যে করবেন তিনি তা ঠিক করতে পারছিলেন না। অথচ কিছু একটা না করলে এখনি এতগুলি লোককে প্রাণে মারা পড়তে হয়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তিনি ছুঁ হাত তুলে সাহস করে গোরা-সৈনিকের সামনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে দাঁড়ালেন। নির্ভয়ে দৃষ্টান্ত ভাষার শাস্তকণ্ঠে তাকে বৃষ্টিয়ে বললেন। বললেন যে, তাঁরা সবাই গঙ্গার ওপার থেকে এসেছেন থিয়েটার দেখতে। থিয়েটার ভাঙতে দেরি হওয়ায় তাঁদের ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তাঁদের অজ্ঞ কোন দুর্বিসঙ্গি নেই।

## ছোটদের আলস

গোরা-সৈনিকটি তখন পাণ্টা প্রেরণ করলো—কি করে জানব তোমরা খিয়েটার দেখতে এসেছ, না আইন ভাঙতে এসেছ।

—তুমি ইচ্ছা করলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই খিয়েটাবে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নাম করলেন। সৈনিকটি কিন্তু উল্টো বৃক্কলো; সে ভাবলো, বার সঙ্গে সে কথা বলছে সেই বৃক্কি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সে তৎক্ষণাৎ 'স্ট্রাইট' করে সদস্যমানে পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর দলের লোককে নির্ভরে গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। কিন্তু গোরা-সৈনিকের ভয় কি এত সহজে যায়। তার প্রাণের ভয়ে দিশেহার হয়ে ছুটলো।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সহবাত্রী খিয়েটারদর্শকের দল সে যাত্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। রক্ষা পেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অসমসাহসিকতা আর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জঙ্ক।

## নেহেরু বিয়োগে

শ্রীমুহাম্মাদ দাস

নেহেরু তোমার তিরোধানে আজ

বজ্র পড়েছে শিরে

বজ্রাহত আজ শুকু ভারত

ভাসিছে নরন নীরে।

জনগণমন অধিনায়ক তুমি,

তুমি হে প্রাণমনস্রী,

সমগ্র ভারতে যে সুর বাজিছে

তুমি হে তাহার বরী।

সুগঠন তুমি পুরুষসিংহ

শৌর্যবস্ত্র ধীর,

উল্লার স্বর প্রতিভা দীপ্ত

সাহসী করবীর।

সুবক্তা কৌশলী রাজনীতিবিদ

তোমার সমান নাই,

ভাতৃসম তুমি ভারতবাসীকে

স্বদয়েতে দিলে ঠাই।

বারে বারে তুমি বসেছিলে কারা

স্বাধীনতালাভ তরে,

বিশ্বশান্তি চেয়েছিলে তুমি

প্রাণপণ চেষ্টা কোরে।

মৈত্রীবন্ধনে বাঁধিরা বিশ্ব

করিলে সবারে জয়,

বিপদে বিশ্বাল ভারত

করিলে গৌরবময়।

নদী-বন্ধনে জমির সেচনে

ফসল ফলিবে কত,

প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদে সবে

আরাম লভিবে শত।

তব, সপ্তদশের পরিকল্পনা

পরিপূর্ণ রূপ পাবে,

বিজ্ঞানের দানে সমগ্র ভারত

সমৃদ্ধিতে ছেয়ে যাবে।

নারী, শিশু আর সব সাধারণ

অশেষ কল্যাণ তরে,

সমিতি, সম্মত, নানা প্রতিষ্ঠান

তুলিয়াছ তুমি গড়ে'।

তুমি নাই, তব ভাবের বশায়

জগৎ প্রাণিত হবে,

তোমার আদর্শে সমগ্র ভারত

সবার উৎসর্গ হবে।

আনন্দলোকেতে অক্ষয় হও,

জগৎহরলাল তুমি,

শোকাহত মোরা মাগি' শুভাশীষ—

তোমার চরণে নমি।

## পল্লীর কবি কুমুদরঞ্জন

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু সাহিত্য পরিষদ ১৩৭০ সালের 'ভূবেন্দ্রী পদক' দিয়ে

সম্মানিত করেছেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে।

বল্লভ গ্রাম বাঙলার জীবন্ত-প্রতীক কুমুদরঞ্জনকে সম্মানিত করার পরিবর্তেই সম্মান বেড়েছে। কারণ এতে বাঙলা দেশের একটি সাহিত্য-সংস্থা একজন বাঁচা বাঙালিকে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ পেলেন।

রবীন্দ্রানুসারী কবিকুলের মধ্যে এই বয়োজ্যেষ্ঠ কবির যে অকৃত্রিম প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়েছে এমনটি আর সচরাচর দেখা যায় না।

কুমুদরঞ্জন পল্লীর কবি। বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বাত, বাঙলার ফল, বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট, বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ, বাঙলার পশুপাখি, গাছপালা সবই তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শে জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুট উঠেছে।

প্রকৃতির ছালাল কুমুদরঞ্জন। বস্তুরা যেমন বনে স্তম্ভ, ঠিক তেমনি বাঙলার প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেশের মধ্যেই কুমুদরঞ্জনের কবি-প্রতিভার পরিপূর্ণ ফুরণ ঘটেছে।

বাঙলার শ্রামল প্রকৃতি কবিকে মুগ্ধ করেছে, তিনি তাকে ভালবেসেছেন। কবি বলছেন:

আমি থাকি সূদূ গ্রামে বনরাজির মাঝ

শোভন লোভন শ্রামল কোমল নিয়েই

আমার কাজ।

কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে কোথাও কোন কৃত্রিমতা নেই। একটা সহজ সারল্যের অকপট প্রাণখোলা প্রকাশ তাঁর কবিতার ছন্দে-ছন্দে। কবি নিজেই বলেছেন, তাঁর এই প্রকৃতিপ্রীতি, প্রকৃতির প্রতি এই অম্লমুগ্ধ তাঁর বুকের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে।

গ্রাম-বাড়িয়ার প্রকৃতি কবি কুমুদরঞ্জনকে সর্বদাই আকৃষ্ট করে।  
বাড়িয়ার প্রকৃতির মধ্যে কবির প্রাণ আনন্দে নেড়ে ওঠে। জনরের  
সমস্ত রত্নখনি কবি খুঁজে পেয়েছেন বাড়িয়ার প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর  
কাছে বাড়িয়ার দেশের 'লেবুর কুঞ্জ' ও 'কাশীরে কলম কাননে'র চেয়ে  
অধিক মনোহর।

বাড়িয়ার ধূলিকণাটি পৃথক কবির আত্মার আত্মার হয়ে উঠেছে।  
তাই কবি গেয়েছেন :

মোর কাছে তব পথের এ ধূলি  
রাজের গরিমা পায়।

শহর জীবন কবির মনকে পীড়িত করে। তিনি পল্লীর কবি।  
পল্লীবাড়িয়ার প্রাণচঞ্চল শহরে স্তব্ধ। শহরের ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে  
কবি-প্রাণের সহজ প্রকাশের অল্পস্ব অব্যবহৃত দেখতে পান না।  
সেখানে মানুষের জীবন ক্ষুদ্রগতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেন নিখাস  
ভেলারও জারগা নেই। তাই শহরের কৃত্রিম আবহাওয়ার কবি  
ব্যথিত হন, কবি-প্রাণ সংকুচিত হয়।

এখানে তো নাই বনমর্মর বনবিহগের সাড়াটি  
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি ক্ষাণবল জলধারাটি।  
কোথা আমগাছ, যোপাঝর, কোথা বটগাছে ঝুলব ?  
কোথা অজরের সেই শ্রামকূট বেথা বুনা ফুল তুলব ?

অজরের কোল জন্ম, অজরের কোলেই মানুষ। তাই অজরের  
ফুল কবির কাছে প্রাণধিক প্রিয়। অজরের দুর্বল বিপদসী রূপও  
কবির মনকে বিরূপ করে তোলে না।

কুমুদরঞ্জনের কাব্য-প্রাণের সহজ, স্বচ্ছ আবহগের প্রকাশ। তাঁর  
কাব্যে কোথাও সচেতন চেষ্টার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। অকৃত্রিম  
প্রাণের স্পর্শটি কুমুদরঞ্জনের কাব্যের প্রধান গুণ। তাই কিঙে, কচু,  
পুঁই পৃথক সবকিছুই তাঁর কবিতার স্থান পেয়েছে। মোহিতলালের  
ভাবার, কুমুদরঞ্জন বাড়িয়ার খাটি কবি।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যসাধনার একটা বড় অংশ পল্লীবাড়িয়ার প্রকৃতিকে  
ঘিরে রূপলাভ করলেও ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিও  
অন্তরের প্রজ্জ্বল নিবেদনের সুযোগ তিনি খুঁজে নিয়েছেন তাঁর কবিতার  
মধ্যে। এখানে পল্লীর কবি তাঁর ছোট গতিটি ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন  
ভারতীয় জাতির চেয়ে প্রসারিত অঙ্গনে।

বসন্ত জন্মভূমির প্রতি তাঁর অকপট ভালবাসাই ভারতীয় সংস্কৃতির  
প্রতি তাঁর ভালবাসা জাগিয়েছে।

কবি কলিদাস রায় বলেছেন : 'কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির' মূলে  
আছে জন্মভূমির প্রতি, বাড়িয়ার প্রতি, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি  
গভীর প্রেম।'

ভারতীয় ঐতিহ্য, তার অতীত গৌরব কবির মনকে নাড়া  
দিয়েছে। ভারতের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যে তিনি গৌরবাবহিত।  
সৌরাষ্ট্রের দেবকেউল 'সোমনাথ' সম্পর্কে কবি অনেকগুলি কবিতা  
রচনা করেছেন। এই সব কবিতার তাঁর সেই গৌরববোধের স্বাক্ষর  
রয়েছে। লুবির মধ্যে যে একটি ভারতীয় বাস করছে তার প্রকাশ  
সোমনাথ সম্পর্কিত কবিতাবলীর মধ্যে। কবির জাতীয়তাবোধের  
স্বাধীন প্রকাশ এই সব কবিতা।

এই সেই সোমনাথ—জ্যোতির্লিঙ্গ বারে কয় লোকে,

উদগীত মহিমা বীর পূর্বাণের শত পুণ্যলোকে।

এ তীর্থ বোজ্ঞনব্যাপী সুপ্রাচীন অশ্বপের মতো,

ভারতের সব রস শাস্ত্ররসে করে পরিণত।

এর দরশনই পুণ্য ; এ শুধু মন্দির মঠ নয়,

হেথায় প্রস্তরীভূত জাতির আকালিকা জেগে রয়।

কুমুদরঞ্জনের দেশপ্রেমও লক্ষ্য করবার মত। 'পতু' গীত  
কবিতায় তিনি লিখেছেন :

ক' বিষত জমি আছে ? মরিতেছে  
তাহারি লাগিয়া দম কেটে ?  
কত শতাব্দী চলে গেল তবু  
র'য়ে গেলে সেই বাঘেটে ?  
গোয় ? সে দ্বিতীয় গর্য কি ?  
সাজ করিতে শেষ লীলা ?  
উহাই হবে কি পতু'গালের  
পিণ্ডদানের প্রেত শিলা ?

কিন্তু এ সমস্তের মধ্যে যেন কুমুদরঞ্জনের কবি-প্রাণের সেই সহজ  
স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা না। তার খোঁজ পেতে হলে চলে যেতে হবে  
বাড়িয়ার মায়ের প্রকৃতির কোলে, যেখানে কুমুদরঞ্জন স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে বৈচিত্র্য নেই সত্য, কিন্তু আপনি ক্ষুদ্র  
পরিসরের মধ্যে তিনি যেহে অস্বাভাবিক শান্তির নীড় এই পল্লী-মায়ের শান্ত  
কোমল, স্তম্ভিত রূপটিকে অন্তরের সমস্ত দরদ ও ভালবাসা নিভে  
প্রকাশ করেছেন।

প্রাচ্যের কথাসাহিত্যিক তারাস্বরের কথা দিয়েই প্রবন্ধ শেষ  
করছি :

'মাটির মধ্যেই কুমুদরঞ্জন মাতৃদেবতার সন্ধান পেয়েছেন, এই-ই  
তাঁর জীবনসাধনা।'

## বিশ্বকবির প্রতি

### শ্রীভূষার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিলে যবে গো রবি,

শতদিশি উদ্ভাসিত, দিগন্তের লক্ষ চহুছবি,

মাতালে সবার প্রাণ,

তাই তুমি জ্যোতির্মান।

ভালবেসেছিল তুমি,—পেয়েছিলেও প্রাণভরা,  
উঠেছিল নিত্য তব কবিতার স্বপ্নার ছন্দমতারে।

ফুটালে যে কাব্যদল,

হে চির প্রাণচঞ্চল।

তব দৃঢ়বাহী সঞ্চালিত নবছন্দ স্বাবরের প্রাণে,

বিহঙ্গের কলকণ্ঠে, মহাদাগরের জরগানে,

মানব প্রাণের গীতিকা তুমি

রচনা করেছ আপন মনে

মানবের শতব্যথা, জীবনের অনন্ত অভাস

তাই তুমি প্রথম মানব জাতির, হে রবীন্দ্র

লহ নমস্কার।



# সাহিত্য পরিচয়

## স্মরণীয় শতবর্ষ (আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স)

স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ করে রচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। কয়েকটি চিত্রশীল প্রবন্ধের মাধ্যমে স্বামীজীর সামগ্রিক সত্তাকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ের স্বাধীনতার পটভূমিতে এ জাতীয় রচনার মূল্য সমধিক। জীবনযাত্রার একনিষ্ঠ সাধক, চিরসংগ্রামী বিশ্বপথিক স্বামীজীর কর্ম ও চিন্তাধারার এক স্তূপ, পরিচয়ে এ রচনা প্রোজ্জ্বল। বোদ্ধা পাঠকের কাছে এ রচনা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। ছাপা, বাঁধাই ও আঙ্গিক পরিচ্ছন্ন। লেখক—নিখিলরঞ্জন রায়, প্রকাশক—আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুশুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা ১২, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## যুগ ভগিনী নিবেদিতা (প্রতিমা পুস্তক)

ভগিনী নিবেদিতার নাম বাঙালী তথা ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রিনী। এই মহীয়সী মতিসার জীবন ও কর্মধারার কাহিনীভ্রমরই এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে, আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপে সেই মহৎ প্রয়োজনই সাধিত হয়েছে। আইরিশ তরুণী মিস মার্গারেট নোবল কিভাবে ভগিনী নিবেদিতার রূপান্তরিত হলেন, আর তাঁর পূর্বজীবনের পটভূমিই বা কিরূপ ছিল এ সমস্তই মনোজ্ঞসঙ্গীত বিবৃত করেছেন লেখক এ গ্রন্থে। লোকমাতা নিবেদিতার ভারতের কল্যাণকর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন সম্ভব হয়েছিল যে প্রস্তুতির মাধ্যমে তা ঘটেছিল বহুপূর্বে; স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মনপ্রাণ সাঁপে দিয়েছিলেন বলেই যে এই মহীয়সী ভারতের পরাবীণতার বেদনাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই, আর সে জন্মই শুধু ভারতের অধ্যাত্মজীবনেই নয় ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অকুণ্ঠ পদসঞ্চারণ ঘটেছিল তাঁর। আলোচ্য রচনায় ভগিনী নিবেদিতার এই যুগ কর্মধারাই পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন লেখক এবং সেজন্মই তাঁর রচনাও প্রামাণ্য হয়ে উঠে গেছে। বস্তুত স্বল্পপরিচয়ের মধ্যে এই মনোবিনীর যে পরিচয় আঁকতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, তা অকুণ্ঠ অভিনন্দনেই উপযুক্ত। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রমথ সেন, প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—২ টাকা।

## মনোবী আশুতোষ (বিভাভারতী)

বাঙালির অন্ততম যুগপুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাম বাঙালী মাঝেই সুপরিচিত। আজ জন্মশতবার্ষিকীর পূণ্যলগ্নে তাঁকে বিশেষ করেই স্মরণ করা প্রয়োজন, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই কর্তব্যই অগ্রসর হয়েছেন। বাঙালির কিশোর-কিশোরীর বোধগম্য ভাষায়

আশুতোষের জীবন ও কর্মের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় দিয়েছেন লেখক, লেখকের সাবলীল শৈলী এ গ্রন্থে এক বিশেষ সম্পদ। গল্প বলার মতই আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এই মহাপুরুষের জীবনকথা বিবৃত হওয়ার স্বভাবতই পাঠকের মন আকর্ষিত হয়। আশুতোষের জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা একাধারে আকর্ষণীয় ও কৌতুহলপ্রদ। বাঙালী ছেলেমেয়েরা এ গ্রন্থকে সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—অমরনাথ রায়, প্রকাশনায়—বিভাভারতী, ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-১, দাম—দুই টাকা।

## বাঙালার বৈষ্ণব-দর্শন (শ্রীগুরু লাইব্রেরী)

বাঙালার বৈষ্ণব ধর্মমত একদিন গভীর শিকড় গেড়েছিল। বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক এসম্বন্ধে আজীবন সাধনা করে গেছেন, বস্তুত শক্তিমন্ত্রের উপাসক বাঙালীর চিত্ত যে বহুদিনাবধি বৈষ্ণব ভাবধারায় অল্পপ্রাণিত একথা সন্দেহে অবশিষ্ট নেই। পরম্পর-বিরোধী মনে হলেও সত্য। আলোচ্য-গ্রন্থে লেখক প্রগতি পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর রসাহুভূতিও ছিল প্রবল। বাঙালার বৈষ্ণব-দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে গবেষণা তিনি করে গেছেন বর্তমান রচনা তারই ফসল। এই গ্রন্থে যে-সব প্রবন্ধাদি সংকলিত তার প্রায় সব কয়টিই 'মাসিক বসুমতী'তে পর্যায়ক্রমে আঙ্গ-প্রকাশ করেছে। গ্রন্থাকারে এই মূল্যবান রচনাগুলিকে একত্র গ্রথিত করে প্রকাশক চিত্রাশীল পাঠকমন্ডিরই কুজ্জতাভাজন হলেন। বৈষ্ণবধর্মের অন্তর্নিহিত ভাববৈশিষ্ট্য বড় উজ্জ্বল হয়েছে ফুটে উঠেছে প্রবন্ধগুলির মাঝে, গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাধারার পরিচয়ে এরা ধন্য। প্রবন্ধগুলিতে যে-সব প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, সেগুলিকে গভীরভাবে প্রাণধান করেছেন লেখক; বহু দিক থেকে তাদের বিচার করা হয়েছে এবং এক-একটি বিষয়ে বিড়িলভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এ জন্মই গ্রন্থটিকে সামগ্রিকভাবে তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য বলে অভিহিত করা যায় নির্বিঘ্ন। গ্রন্থকারের শৈলী অত্যন্ত সাবলীল, আর সেজন্মই গ্রন্থাকৃত কঠিন দার্শনিকতত্ত্বও বুঝতে অল্পবিধা হয় না পাঠকের। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল সংযোজন। আঙ্গিক বিঘ্নহীন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা—৩। দাম—সাত টাকা।

## জঙ্গলগড় (গ্রন্থপ্রকাশ)

সাহিত্যের মধ্যে কোন বিশেষ অঞ্চলকে ফুটিয়ে ওঠালায় দক্ষতার জন্ম ধীরে ব্যাপ্ত সমধিক, তারাক্ষর তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। বর্তমান উপভাস্যটিও সে বিষয়ে সাক্ষ্যবাহী। উড়িয়া ৭

বাঙলার সীমান্তবর্তী এক ভূখণ্ডের বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনধারাই এ কাহিনীর বিষয়বস্তু। অনাথ ও আর্থ রক্তের সমিশ্রণে উদ্ভূত এক বিচিত্র সম্প্রদায়, ছত্রিশ জাতিরা তাদের নাম, জঙ্গলগড় তাদের রাজত্ব। অর্জুন সিং এই জঙ্গলগড়ের কুমার বা সর্গার, মূলত এই চরিত্রটিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনী। প্রেম, হিসেব, মিলন-বিরহের যে ছবি এঁকেছেন লেখক, তা যেমন স্পষ্ট তেমনিই স্ববিস্ময়াই; বর্ণনা-কৌশলে পরিবেশ জমে উঠেছে, কৌতুহল ঘনীভূত হয়েছে। বস্তুত এক আরণ্যাজীবন যেন মস্তবলে মুখব হয়ে অতীতকে টেনে নিয়ে এসেছে বর্তমানে। নারিকী, মুগধুম, কশিরা, দলু সর্গার, অর্জুন সিং প্রভৃতি চরিত্র যেন স্পষ্ট আকৃতি নিয়ে ঝাঁড়ায় চোখের সামনে। প্রেম যে সবার উপরে সেই অনাদি সত্যেরই প্রকাশে মধুর সমাপ্তি ঘটেছে কাহিনীর; পাঠ শেষে এক অস্বপ্ন পূর্ততার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে পাঠকের মন। লেখকের অনবদ্য শৈলী এ রচনার অন্ততম সম্পদ। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—তারাপঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশনা—গ্রন্থপ্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—১, দাম—চার টাকা।

### বত্মা (গ্রন্থলোক)

সাম্প্রতিক সাহিত্যের আসরে যে নামটি পাঠকমণ্ডিরই চিত্তে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে, বীর নতুন রচনামাত্রই সাদরে গৃহীত হয়, আলোচ্য গ্রন্থেরও লেখক সেই স্বনামধন্য কথাসিদ্ধী জরাসন্ধ। অত্যন্ত রচনার মত এ গ্রন্থে লেখক তাঁর কর্মজীবনের ছাপ ফেলেন নি, বস্তুত কাব্যজীবনের প্রভাবমুক্ত এ রচনার লেখক যেন এক নতুন ভূমিকার অবতীর্ণ। আদর্শনিষ্ঠ এক শিক্ষাবিদেব জীবন ও জীবন-বরণ; বড় নিপুণ তুলিতেই এঁকেছেন লেখক, সেই সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে বয়ে গিয়েছে মন দেওয়ার-দেওয়ার এক করুণ আখ্যান। সমাজের স্বাক্ষর দেওয়ার সুযোগ হল না যে প্রেমের তাড়ই সক্রপণ পরিণতি, সংবেদনশীল লেখকের কলমে এক অস্বপ্ন রূপ ধরেছে; নিষ্ঠা ও সত্যতার প্রতিমূর্তি জগদীশের মাধ্যমে লেখক যেন এক দুঃস্থ প্রাণেরই উত্তর দিয়েছেন। সত্যকার প্রেম যে অকৃত্রিম স্বীকৃতিরই উপযুক্ত, আত্মজের ওপর সজ্ঞাত বে-আইনী সন্তানকে গ্রহণ করে নিষ্ঠাবান ভ্রাতৃপুত্র জগদীশ তা প্রমাণ করেছেন। চরিত্রগুলি গভীর দরদ ও মানবিকতাবোধের উজ্জল নিদর্শন। বিশেষ করে জগদীশ, নীসা, পশুতমশাই ইত্যাদি চরিত্র যেন এক অনন্ত মহিমার আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙলার এক স্মরণীয় পুস্তককে অকৌশলে কাহিনীর মধ্যে টেনে আনাতে কাহিনীর আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। মানবদরদী সাহিত্যিকারের এ রচনা পাঠক সমাজের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। আঙ্গিক মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জরাসন্ধ। প্রকাশক—গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### বাহু নদী (গ্রন্থপ্রকাশ)

আলোচ্য গ্রন্থটি এক গল্প-সংকলন। লেখক সাম্প্রতিক বাঙলা কথাসাহিত্যের এক লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকার, বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রেই তিনি অনন্ত, আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলিতেও তাঁর

স্বকীর বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট পরিমাণেই পড়ছে। নিখুঁত আঙ্গিকে রচিত গল্পগুলি যেন এক একটি মূল্যবান রত্নবিশেষ—আলো চিকরোচ্ছে বার গা দিয়ে। মননশীলতা ও মানবিক আবেদনই এদের প্রধান সম্পদ, বর্তমান সমাজের যুগধরা আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি উজ্জলভাবেই ফুটে উঠেছে এদের মাঝে। মোট দশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এ গ্রন্থে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়করূপেই সার্থক। এ প্রসঙ্গে, 'সে আমার প্রেম', 'সাদা যে কোন', 'ভেবেছিলাম' প্রভৃতি বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। বর্তমান যুগের ক্ষমিষ্ণু মানস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে, 'সে আমার প্রেম' ও 'ভেবেছিলাম' গল্প দুটির মাঝে; অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার তরুণ জনদের প্রথম প্রেম, সত্য-বোনের অক্ষুণ্ণ পাবিত্রতা এসবই যে মরে যায়, মরে যাচ্ছে, নিপুণভাবে সেই সত্যকেই পাঠকের মননে উপস্থাপিত করেছেন লেখক। লেখকের বলিষ্ঠ ও মার্জিত শৈলী, তাঁর বস্তুবাক্য মুখর ও প্রাণবন্ত করে তুলতে সহায়ক। প্রচ্ছদকটি শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা।

### স্বপ্নের লাগিয়া (শ্রীগুরু লাইব্রেরী)

স্বনামধন্য সাহিত্যিকারের সাম্প্রতিক এই উপন্যাস এক বিচিত্র স্বাদ বহন করে এনেছে। অপরিণত বয়সী ছেলেমেয়ের পরিণাম-জ্ঞানহীন প্রেম যে তাদের জীবনে কি ধরণের বিপদের টেনে আনতে পারে, সেটা দেখানোই যেন লেখকের মৌল উদ্দেশ্য। নারীকল্যাণ আশ্রমের পটভূমিতে বিবৃত কাহিনী, মূলত দুটি তরুণ-তরুনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে; পার্থপ্রতিম ও সুলতা ভালবেসেছিল একে অপরকে, কিন্তু সার্থক হতে পেল না সে প্রেম, বোনের উন্নত জ্বালার অধীর হয়ে যে ভুল তারা করল, তাইই মাসুল জোগাতে ধ্বংস হয়ে গেল তাদের মুকুলিত জীবন, দুটি স্টুনোমুখ কমলকলি ফোটার আগাই বয়ে পড়ল। কাহিনী বরেন অবিখ্যাত মুসলিমনার পশ্চিম দিয়েছেন লেখক, সাম্প্রতিক সমাজের একটা দিক যেন নিপুণ তুলিতে আঁকা উজ্জল ছবির মত ভেসে ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। পার্থপ্রতিম ও সুলতা যেন পৃথক পৃথক কোন ব্যক্তিসত্তা নয়, পরিণামজ্ঞানহীন উজ্জ্বল বোনের মূর্তপ্রতীক। মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষিত কাহিনীও আছে দু-একটি, নারী-কল্যাণ আশ্রমের অপর দু-একজন বাসিন্দার জীবন-ইতিহাস, মাছুয়ের আদিতমত রিপূর বীভৎস অথচ অক্ষপাৎ প্রকাশ ঘটেছে তাদের মাধ্যমে, সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি মহৎ সত্য, পুরুষের পঙ্কজের বেদোতে চিরস্তনী নারীর আত্মবলিদান লেখক যে সম্পূর্ণরূপেই সমাজ-সচেতন এ কথার স্বাক্ষর মেলে তাঁর রচনার প্রতি ছুঁতে-ছুঁতে। বর্ণাঢ্য শৈলী এ রচনার প্রধানতম সম্পদ—পরিবেশকে রেখার আঁচড়ে যেভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন লেখক, তাতে তাঁকে ডাবার বাহুকর বলাই সঙ্গত। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—প্রাণতোষ ঘটক, প্রকাশনা—শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৩, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## এই হৃদয় নিায় (গ্রন্থপ্রকাশ)

মানবস্থির এক আশ্চর্য বহুস্তর আধার, ব্যাথ-বেদনায় সেই হৃদয় বিকশিত হয় কখনও, আর কখনও বা বিদ্রোহ করে সমস্ত জীবনটাই ভিত্তি টলিয়ে দিতে চায়, হৃদয়ের এই অপার বহুস্তর আলোচ্য রচনার মূল উপজীব্য। কাহিনীর নায়ক বীরেন বাস করে আত্ম-অহমিকার এক দুর্ভেজ দুর্গ, স্ত্রী উৎপলা ভাঙতে পারে না সে দুর্গ, আত্মরক্ষার্থেই অবশেষে ঘর ছাড়ে সে বীরেনেরই ঘনিষ্ঠতম স্ত্রীভাষ্যের সঙ্গে; অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল ধরা পড়ে ওদের কাছে; উৎপলাকে বীরেনের কাছে ফিরিয়ে দিবে আত্মহত্যা করে শুভাশীষ। এতেও উপানীতের দুর্গ ফাটল ধরল না বীরেনের, নির্বাক উপল্লাকে মহাস্তব মুখোশ পরিয়ে আবার ওঠে ঠকাতে চাইল উৎপলাকে এবং নিজেকেও। পরিণামে দেখা যায় বীরেন সহজ মানুষের মতই আত্ম মানুষের সঙ্গ, সাহচর্য ও মমতার ভিখারী। এই বীরেনকে দেখে স্বভাবতই মমতার বিধুর হয়ে ওঠে উৎপলার মন, আর এইবারই প্রকৃত মিলন সম্পাদিত হয় ওদের। লেখকের আন্তরিকতার কাহিনী হয়ে উঠেছে এক অপরূপ স্নিগ্ধতার মণ্ডিত, মানবমনের পৃথক ভাবাবেগও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় পাঠক মনে। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনার—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## ভালোবাসার হাতেখড়ি (আর্ট এণ্ড লেটার্স)

বাঙলা দেশের সাহিত্যজগতে শিবরাম চক্রবর্তী একটি বিশেষ নাম। যুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের আলোয় এই নামটি যথেষ্ট পরিমাণে উজ্জ্বল। শিবরাম চক্রবর্তীর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'ভালোবাসার হাতেখড়ি' তাঁর বৈশিষ্ট্য অঙ্গুর বেখেছে। কয়েকটি ছোট গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি রূপলাভ করেছে। গল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুখপাঠ্য এবং রসসমৃদ্ধ। প্রতিটি গল্প পাঠকের মনকে বিশেষভাবে ধরে রাখে এবং পরিণতিতে মনকে এক বিশেষ পরিতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। তাঁর শব্দচয়ন, বচনবিজ্ঞাস, বর্ণনাপদ্ধতি স্বভাবতই অমূল্য সাধুদের দাবীদার। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অজিত গুপ্ত। প্রকাশক আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাবুস্তম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

## অজিত দত্তের কবিতা সংগ্রহ (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস)

বীরের সাধনা এবং শক্তিমান্ত্র এ যুগের বাঙলা কাব্যজগতকে নানাদিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে—প্রথিতযশা কবি অজিত দত্ত তাঁদেরই অন্যতম। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অবিরামগতিতে তাঁর লেখনী কাব্যক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ফল ফলিয়ে আসছে। সম্প্রতি তাঁর একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সংকলন গ্রন্থটির মধ্যে শক্তিমান কবির বিভিন্ন কালের দুটিভঙ্গী ও চিন্তাধারার এক স্পষ্ট আলোচ্য প্রকৃতি হতে ওঠে। তাঁর ভাবাদর্শ অমূল্যত্বের প্রগাঢ়তা, রসপিপাস কবিমনের ছায়াপাত ঘটেছে, কবিতাগুলির ছন্দে ছন্দে। কবিতাগুলির বিভাসরীতি, প্রকাশভঙ্গিমা, কল্পনাবৈচিত্র্য

পাঠকসাধারণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। রসিকসমাজে এই বিশেষ সুপাঠ্য কাব্যসংকলনটির ব্যাপক ও বহুল প্রসার আমরা বিশেষভাবে কামনা করি। প্রকাশক—গুপ্ত ফ্রেণ্ডস এ্যাণ্ড কোং, ৩১ অক্টোবর দস্ত হেন, কলকাতা-১২ দাম—সাত টাকা।

## সপ্তসিন্ধু (চক্রবর্তী স্যাণ্ড কোং)

হিন্দী-সাহিত্যজগতের প্রথম সারির যে কয়েকজন স্বনামধন্য কথাসিঙ্গী আছেন, তাঁদের মধ্যে মহাপণ্ডিত রাহুল সানুজ্যোতায় অন্যতম। সাপ্তাহিক গ্রন্থটি একটি উপজ্ঞাস। ধর্মোদিক কালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উপজ্ঞাসটি। ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য মহাপণ্ডিত রাহুলজীর কল্পনার রূপ নিয়ে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত হয়েছে। উপজ্ঞাসটি কেবলমাত্র হিন্দী-সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি নিজস্ব রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে অতুলনীয় বলা চলে। বৈদিকযুগ সৃষ্টি এই ধরনের গ্রন্থ বিরল। গ্রন্থটি হিন্দী দিবোদাস কাহিনীর বঙ্গানুবাদ বর্ন। গ্রন্থটির প্রতি ছন্দে ছন্দে লেখকের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদক উপজ্ঞাসটির মন স্থানিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটন করেছে। ভাষার সাবলীলতা এবং গতির সহজাত অমূল্যবোধ নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। অনুবাদক জীভগীরথ। প্রকাশনার—চক্রবর্তী স্যাণ্ড কোম্পানী, ১২, শ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## অচেনা শহর কলকাতা (গ্রন্থপ্রকাশ)

কলকাতার বাসিন্দারা কলকাতাকে চেনা বলেই জানে বাইরের মানুষ কলকাতার এসে সব কিছুতে উৎসাহ আর কৌতূহল প্রকাশ করে যখন কলকাতাবাসীরা একটু কষ্টের চক্ষেই দেখে তখন তাদের। 'অচেনা শহর কলকাতার' লেখক অমিত্যভ চৌধুরী এই চেনা শহরের অচেনা কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। এই চেনা শহরটার বুকে এদিকে-ওদিকে, কাছে-দূরে কত যে অচেনা, আধ-চেনা, যোজ দেখা তবু অচেনা স্থান-বস্তু-অধিবাসী আছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা শুধু তাদের জানি না এবং চিনি না নয়, জানি না এবং চিনি না যে তা নিজেরাও খোঁজা করি না। অমিত্যভ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন এবং চিনিয়েছেন তাদের। শুধু অচেনা কেন, চেনা জিনিসগুলোকেই কি খোঁজা করি আমরা কিংবা মনের পাঠার ধরে রাখি চিত্তন করে। সাংবাদিক-সাহিত্যিক অমিত্যভ চৌধুরীর কলম চেতন বহু-উপেক্ষিককে সাহিত্যিক অমরতা দিয়েছেন 'অচেনা শহর কলকাতার'। তাঁর কলকাতার টেক্সট-ক্রিকেট থেকে বৃষ্টি প্লাবনে লোক-ভরা জনড্র ট্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটির উপস্থাপনা অনবদ্য। ঘাট-পাড়া, প্রবাসী, জুজু, কৃপাশংকর, রামনিবাস মাহাতো, তিনচাকী আড্ডার, আফগান ব্যাক, লালদীঘির সোফার পাড়া, টাকার গাছ, দুই আসর প্রভৃতি অল্প রসোত্তীর্ণ লেখার অচেনা শহর কলকাতা বিশেষ সমৃদ্ধ। বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার তাকে উজ্জ্বল স্থান দেবে। এই খণ্ড রচনাগুলি সবই 'চারণী' ইন্দ্রনাথ ও বনামে সংবাদপত্র-পৃষ্ঠার পূর্বে প্রকাশিত। আজকাল সাহিত্যের নামে

নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র থেকেও সাহিত্য-রস-গুণধীন বাক্যসুপ সৃষ্টি হচ্ছে যেমন, সাংবাদিকতা এমন ক্রমশ বহু স্বদেশ কলম পেয়ে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করছে। 'অন্যো নগর কলকাতা'র রচনা সমষ্টি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বইখানির প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—অমিতাভ চৌধুরী। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—তিন টাকা।

### জন্ম-অবোধ (রবীন্দ্র লাইব্রেরী)

এক শুভ্র উপজাতির মাধ্যমে লেখক একটি আদর্শকে সূচিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কাহিনীর নায়ক রামকুমার প্রাচীন ভাষাধারী লালিত-পালিত, ব্রহ্মায পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে সে ভোগবাদী আধুনিক সভ্যতাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না বরি কিছুটাই, আর তখনই দেখা দেয় সমস্যা, ব্যক্তিগত জীবন ধ্বংস হয়ে যায় আদর্শ ও বাস্তবের সন্মিলনে, তবু হার মানে না সে। রামকুমার চরিত্র সত্যিই মহাভারতের আত্মার প্রতীক স্বরূপ, যুগ-যুগের নিপীড়িত এক বিখ্যাত মনুষ্যকেই যেন মূর্ত করে তুলেছেন লেখক এই চরিত্রটির মাধ্যমে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে মায়িকা গৌরী, শৈলী, পশুপতি, নটিকতা সবই বেশ উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত, শেষের বেদনা ও ক্ষমাকে বহন করে গৌরীর জীবন পরিচয়। সজ্জৈ পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম। নীলপুণ্ডিত আর এক উল্লেখ্য চরিত্র। নিরোপিত, সত্যনিষ্ঠ যে লোক একদিন হিন্দুসমাজের শাশ্বদেবে মুকুটধারী মত বিরাজ করত—নীলপুণ্ডিত যেন তাদেরই ছায়া, সত্যকার ব্রাহ্মণ বলতে যা বোঝায় এই চরিত্রের মাঝে পাওয়া যায় তারই আভাস। লেখকের আন্তরিকতায় সমগ্র কাহিনীটি দ্রুত হয়ে উঠেছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের, এই আবিল যুগে লেখক যে এখনও তাঁর মনে আশার প্রদীপটি জালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন, আলোচ্য রচনা তারই স্বাক্ষরবাসী। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—শক্তিধর রায়গুপ্ত। প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫২ ভানুচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—দশ টাকা।

### মট-বটীদের বিচিত্র কাহিনী (গ্রন্থপ্রকাশ)

বাঙালী মঞ্চগাগল জাত, ছায়ছবির মায়ার বতাই আত্মবিশ্বস্ত হোক না কেন, রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণকে উপেক্ষা করার সাধ বা সাধ্য তার নেই; আলোচ্য গ্রন্থে সেই রঙ্গমঞ্চেরই কয়েকটি অন্তরঙ্গ খবর পরিবেশন করেছেন লেখক। বহুদিনাবধি রঙ্গমঞ্চের দ্বিষ্ট সম্পর্কে বাস করে তিনি যা যা দেখেছেন ও শুনেছেন বর্তমান রচনা তারই আংশিক স্মৃতিচারণ। রচনাটি কয়েকটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, সরসতা ও কৌতুকের যেন এক একটি অংকুর নিব্বর্ত, লেখকের কৌশলে অঙ্গসময়ের মধ্যেই পাঠকের মন আকৃষ্ট হয়ে ওঠে, লেখার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে বাধে না একটুকু। অভিনয় রমণীর রচনা পাঠের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক যেন এক অজানা জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। আলোচ্য গ্রন্থকে তাই একাধারে উপভোগ্য ও প্রামাণ্য বলতে পারা যায় স্বজ্ঞে। আমরা বইটি পড়ে সত্যিই আনন্দ পেয়েছি। প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১, দাম—তিন টাকা।

### বৈমানিকের ডায়েরী (গ্রন্থপ্রকাশ)

নাট্যটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। 'ডায়েরী' বলতে আমরা যে জাতীয় রচনা আশা করি, 'বৈমানিকের ডায়েরী' একেবারেই সে জাতের লেখা নয়। এটি একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস। যদিও পটভূমিকার মূল ভিত্তি লেখক-নায়কের বৈমানিক জীবনের গোটা কয়েক পাতা, তাহলেও বইখানিতে ঔপন্যাসিক উপাদান সবই আছে। কতকগুলি বাছাই করা চরিত্র আছে, প্রত্যেকটি চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, লেখকের নিপুণ কলমের টানে তারা প্রত্যেক আপনাপন রূপ পেয়েছে, আর পেয়েছে প্রাণ। নাট্যকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, রসবিদ লেখক মনের স্পর্শে আর সৃষ্টি, স্বাভাবিক পরিণতিতে উপন্যাসখানি সমৃদ্ধ। অনাড়ম্বর ও সংকীর্ণ এই পরিবেশিত উপন্যাসটিকে 'গ্রন্থপ্রকাশ'ও করেছে। অথচ এই পরিণতি নিয়ে সামান্য আড়ম্বর বা উচ্চসমগ্র রচনাটির সার্থকতার ওপর চরম আঘাত হনতে পারত। লেখকের মাত্রাজ্ঞান ও কচিবোধ সেকারণে সর্বশেষ প্রশংসনীয়। চরিত্রসৃষ্টি কিংবা পরিণতির প্রান্ত লেখকের সবার মনোযোগ, তবু বইখানির নামকরণকে ব্যর্থ করে দেয় নি—বাঙালী বৈমানিকের দৈনন্দিন জীবন উপন্যাসখানির আকর্ষণীয় সূত্র হয়ে অজ্ঞাত বিবিধ উপকরণের ফুলগুলিকে মনোহর মালায় গেঁথেছে। প্রচ্ছদ-শিল্পী অঙ্কিত গুপ্ত উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখেন। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখক—দীপকর। প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### নীল ক্রৌঞ্চের ডানা (স্তানতীর্থ)

বর্তমান বাঙালী সাহিত্যের দরবারে ছদ্মনামের অন্তরালে যে কয়জন নবাগত লেখক বলিষ্ঠ লেখনীর বলে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'অগ্নিমিত্র' অঙ্গতম। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের নবমত উপন্যাস 'নীল ক্রৌঞ্চের ডানা' পূর্ণরূপে লেখকের স্বজনসম্মতার পরিচায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাভরা একটি পরিপূর্ণ রমণী-জীবনের কাহিনী রচনার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীবিভাগে, চরিত্রসৃষ্টিতে উপন্যাসটি রসসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। ভাবার প্রাঞ্জলতা ও স্বল্প অন্তর্দৃষ্টি এবং সমাজ-সচেতনতা গ্রন্থটিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। প্রচ্ছদ, ছাপা, বাঁধাই সুন্দর। লেখক—অগ্নিমিত্র। প্রকাশনায়—স্তানতীর্থ, ১, বনওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দশ টাকা।

### কলা-বিভাগ, ভারতীয় সংগ্রহ শালা, কলিকাতা, সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা (গাইড বুক)

ভারতীয় সংগ্রহ-শালায় কলা-বিভাগের এই নির্দেশিকা বা গাইডবুকটি রঙ্গ-ব্যক্তিমাত্রই কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। চিত্রকলা ও অপর্যাপ্ত হস্তশিল্প-এস'টি বিভাগেরই বিশদ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক স্বয়ং কীর্তমান শিল্পী, কাজেই তাঁর বর্ণনায় অনভিজ্ঞজনের পক্ষেও কলা-বিভাগের ঐশ্বর্য সবেক অবহিত হওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, বস্তুত এত

সংক্ষেপে এত বিভিন্ন ধরনের শিল্পকৃতি সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারাটা সত্যই বিস্ময়কর। এ নির্দেশিকা হাতে থাকলে অতি সাধারণ মানুষও কলা-বিভাগের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন। কয়েকটি মূল্যায়ন চিত্রের প্রতিক্রিয়া মুদ্রিত হওয়ায় এ গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে শিল্প-জগতে আমন্ত্রণ করাই মুখপত্ররূপে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে প্রণেতা 'চিন্তামণিকর' শিল্পজগতের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। প্রণেতা—চিন্তামণি কর ও তিনকড়ি মুখার্জী। অনুবাদক—অমল সরকার। ভারতীয় সংগ্রহ-শালার ট্রাস্ট দ্বারা প্রকাশিত।

## আমেরিকাকে জাম্বুন ( ইউ, এস, আই, এস )

আলোচ্য কৃত্রিমতন পুস্তিকাটিতে, ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা সংক্ষেপে ক্রান্তব্য মোটামুটি সকল তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। আমেরিকা আজ পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ শক্তি, সুতরাং সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সংক্ষেপে অগ্রতম দেশের মত আমাদের কৌতুহলও কম নয়, এ পুস্তিকা পাঠে সে কৌতুহল কতকালে মিটেবে এবং সেজন্যই মূলত প্রচারধর্মী হলেও পুস্তিকাটি মূল্যবান। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। প্রকাশক—ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

## মধ্যদিন ( গ্রন্থপ্রকাশ )

আলোচ্য উপন্যাসের বিষয়বস্তু দুটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ইন্দু ও প্রমীলা, দুই বান্ধবী, দু'জনেই বিবাহিতা ও দু'জনেরই দাম্পত্যজীবন ব্যর্থতার পথবসিত। প্রমীলা মাতাল স্বামীর কঠোরিকার ও নীচতা সহ করতে না পারে সরে এসেছে; ইন্দু সইতে পারে নি স্বামীর পরনারীর প্রতি আসক্তি। এই দুটি মেয়ের বহিঃরূপ এক ধরনের হলেও, মানসিকতার রয়েছে প্রচুর বৈষম্য। প্রমীলা শক্তিমতী, ইন্দু দুর্বল, বিবাহবন্ধনকে চূর্ণ করে প্রমীলা। সে চার স্বাবলবন, চার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা; ওদিকে বহু যা খাওয়ার পরেও নীড় বচনার মোহে স্তম্ভয় থাকে ইন্দু। ভাগ্যের চক্রান্তে দু'জনের জীবনে দেখা দেয় একই পুরুষ; ক্ষয়বৃত্তিকে সবলে নিরোধ করে প্রমীলা ফিরিয়ে দেয় পুরুষের আস্থান, আর আত্মদান করে ইন্দু সে আস্থানের কাছে নির্দিধায়। ইন্দু-মণীন্দ্রের মিলন সম্পাদিত হয় আর সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ হয় প্রমীলার আত্মসমীক্ষণ, সত্য উপলব্ধি করে সে প্রেমই নারীজীবনের চরম সত্য—সাক্ষ্য, অর্থ, যশ এ সবকিছু অতিক্রম করে চিরন্তন নারীসত্তা ভাই সর্দারই আবুল হয়ে ওঠে মনোমত্ত নীড় বচনার। লেখকের ব্যক্তিগত শৈলী এ উপন্যাসের প্রাণসত্তাকে প্রোঞ্চল করে তুলেছে, ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন সঙ্গায় সমগ্র পারবেশকে ফুটিয়েছে বিস্ময়করভাবে। আত্মবিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে, চরিত্র হিসাবে প্রমীলা এক অখণ্ড বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। লেখক—বিমল কর, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা।

## অনুব্রাগ রাঙা ( সাহিত্য কেন্দ্র )

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কয়েকটি গ্রাম্য নরনারীর প্রেম, আশা, আনন্দ বেদনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও কিছুটা প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন, তবে তাঁর রচনা এখনও অপরিণত, অমূল্যবোধের মুখোপেক্ষী। এ রচনার একটা সাবলীল সৌন্দর্যের অভাব মেলে এবং এটুকুই এর সপক্ষে বলার মত থাকিছু। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—ভগদীশপ্রসাদ দাশ, প্রকাশক—সাহিত্য কেন্দ্র, ৫-১৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পরমা।

## শ্রীশ্রীংসভগবান ও তাঁহার উপদেশাবলী

( জে এন বসু )

স্বামী ধনরায় দাসজী কাঠিয়ারাবা সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীংসভগবান ও তাঁহার উপদেশাবলী' গ্রন্থখানি ধর্মশাস্ত্রের এক মহামূল্য তথ্য ও উপদেশসমৃদ্ধ। যজুর্দর্শনের অগ্রতম বেদান্তদর্শন, উপনিষদেই সার সঙ্কলন। ভগবান বেদব্যাস এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই বেদান্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেছেন ধর্মচর্চাধর্ম, নিজ নিজ মতামুসারে। সেইরূপ নির্ধারিত সম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীনিধারী ভগবান, বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করেছিলেন—তার নাম 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ'। শ্রীশ্রীংসভগবান, চতুঃসেন ও দেবধি নারদ বর্জক উপদিষ্ট মূল সিদ্ধান্তই তিনি তাঁহার ভাষ্যে প্রাতি, শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রমাণ সাহায্যে স্থাপন করেছেন। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, আজুর্ভোকেট। ১৩১এ, যোগীপাড়া মেইন রোড, কলিকাতা-৬। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পরমা।

## প্রাগতিহাসের মানুষ ( ফার্মা কে, এল, এম )

অতি আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে লেখা মানুষের এ ইতিহাস, বাংলা প্রামাণ্য গ্রন্থ ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। কি করে মানুষ সৃষ্ট হল এ জগতে, তার আদি থেকে আলোচনা করেছেন লেখক, প্রসঙ্গত বিশ্বের উৎপত্তি সংক্ষেপে সংক্ষেপে কিছুটা বলেছেন; কিন্তু প্রধানত তাঁর আলোচ্যবিষয় বিশ্বের উৎপত্তি ও তার বিকাশ। এই গ্রন্থে মানুষের যে ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে তা তার মতে আবির্ভাবের সময় থেকে ঐতিহাসিককাল অবধিই বিবর্তন। প্রাগজগতের যে বিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব, তারও এক প্রামাণ্য পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এ গ্রন্থ প্রাগতিহাসের এক প্রামাণ্য দলিল। জগদ্বিশ্বাত্মক মনোবী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিতের দল যেসব ভিত্তিতে মানুষের পুরাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন সম্পর্ক গবেষণা করে এসেছেন; এ রচনার কাঠামো তারই উপর নির্ভরশীল, সুতরাং একে প্রামাণ্য বলে অত্যাশঙ্কিত করা হয় না। বহু পরিশ্রম করে লেখক গ্রীষ্ম ও তথ্যাদি থেকে বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের শৈলীও অত্যন্ত সাবলীল। মানুষের পৃথিবীর বৃক আগমন, তার কর্মবিকাশ সম্বন্ধী তথ্যাদি এত কৌতুহলোদ্দীপকভাবে বর্ণিত হয়েছে যে অত্যন্ত সাধারণ পাঠকও এ রচনা পাঠে উপকৃত

ইবেন। মামুঘের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মনে যে উৎস্রক্য জন্মিত সেই বর্তমান, এ গ্রন্থ পাঠে তারই সম্যক নিবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা। প্রজ্ঞদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই কৃতিত্ব। লেখক—শরীফুল্লাহ বকর, প্রকাশক—কার্য্য কে এস মুখোপাধ্যায়, ৬-১ এ, বাস্তারাম অফিস লেন, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা।

### শাস্ত্র ভাষ্য—খবির কথা (এ, মুখার্জী)

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য সঙ্কলিত ইত্যাদির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যে সব পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে আলোচ্য গ্রন্থে তারই কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। দেবতার দেশ ভারতে দেবতার পরই যারা উল্লেখ্য ছিলেন, তাঁরা মহাতেজা তপস্বী বা ঋষি; কাজেই পৌরাণিক ভারতে এদেরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পৌরাণিক কাহিনী বা গাথা ইত্যাদিও এসেই জগতের মুখ। বর্তমান রচনার এসেই বিশদ পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের শৈলী আধুনিক ও সাবলীল, গল্প বলার ভঙ্গিতে কাহিনী বনেছেন তিনি, যে জগৎ পাঠকের কৌতূহল আগাগোড়াই অব্যাহত থাকে। পৌরাণিক ভারত যেন এক রূপময় আকৃতিতে ফুট ওঠে পাঠকের চোখের সামনে। আঙ্গিক সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার। লেখক—শ্রীউষোভকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক—এ মুখার্জী অ্যান্ড কোঃ প্রোঃ লিঃ ২, বাল্লম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা—১২, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### জননায়ক জওহরলাল (সুতপা)

জওহরলাল নেহরু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা একটি নাম, ভারতের ইতিহাসে তা বটেই সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই নাম। বর্তমান গ্রন্থে এই মহান নায়কেরই সুষ্ঠু রূপায়ণ ক'য়েছেন লেখক। লেখক প্রখ্যাত জীবনীকার, জীবনহরকর্মের আদর্শপুত্র জীবন ও কর্মগাথার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। বিলাস ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের পটভূমিতে যে জীবন একদিন বিকশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তাই সুপরিণতি লাভ করল ত্যাগ ও তুষ্ণবরণে। দীনর ফুলাল জওহরলাল রূপান্তরিত হলেন জনগণের পণ্ডিত নেহরুতে, প্রেম থেকে প্রেরণ পথে উত্তরণ ঘল এক মানবাত্মার। মামুঘের নিষ্কল দাঁপবর্তিকা হাতে যে পথিক একদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু সে প্রাণী শিবির আলো আজও অনিবাণ; পণ্ডিত নেহরুর জীবন ও বাণীও সেই অনল নিখা, বর্তমান রচনা তারই স্বাক্ষরবাহী। জীবনহরকর্ম বৃদ্ধিতে হলে, জীবন হলে এ ধরণের গ্রন্থ রচিত হওয়ার প্রয়োজনও তাই সমধিক। আমরা এ রচনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রজ্ঞদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—মণি বাগচী, প্রকাশক—সুতপা প্রকাশনী, ৮ দি, রজব আলি লেন, কলিকাতা—২৩, দাম—চার টাকা।

### শ্রীশ্রীরামচাঁকুর প্রসঙ্গ (প্রতিমা পুস্তক)

অধ্যাত্মজীবন প্রশঙ্গ যারা আগ্রহী, তাঁদের কাছে এ রচনা সমাদৃত হবে বলেই আশা করা যায়। শ্রীশ্রীরামচাঁকুর বালাব সাধন ক্ষেত্রে এক অনঙ্গ নাম। এই মহাপুরুষের জীবন ও কর্মগাথা তথ্য ধর্মসাধনার এক প্রামাণ্য পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। লেখক শ্রীশ্রীচাঁকুরের একজন ভক্তশিষ্য এই সাধক সম্বন্ধ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু ছিল, কারণ অঙ্গদনের জন্ম হলেও শ্রীশ্রীচাঁকুরের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমরা সুযোগলাভ করেছিলেন তিনি এবং সে জন্মই এ গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামচাঁকুরের সম্পর্কে বহু ব্যক্তিগত তথ্য ও প্রমাণাদি সমাবেশিত হতে পেরেছে। লেখকের আন্তরিকতায় এ রচনা উপলব্ধি ও আকর্ষণীয়। ভক্তজনরা এ রচনার মাধ্যমে অনায়াসেই এই সাধকের দিব্যজীবনের এক পূর্ণাঙ্গ অভ্যাস লাভ করে তৃপ্ত হবেন। গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—রবীন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—২, দাম—পাঁচ টাকা।

### খাতু সংহার (সুপ্রকাশ)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও আলোচ্য উপজ্ঞাসে লেখক যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছেন, তাতে সাহিত্য রসিকমাত্রেই আগ্রহী হয়ে উঠবেন। নারী-জীবনের এক প্রয়োজনীয় ও প্রধান দেহ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে কাহিনীর জাল বনেছেন লেখক। কিশোরী সুনীলা যেদিন প্রথম নারীত্ব লাভ করল, সেইদিনটি থেকে যেদিন অবলুপ্তি ঘটল সেই নারীত্বের, সেদিন পর্যন্ত তার জীবনায়ন করেছেন লেখক। কত ঘাত-প্রতিঘাত কত ব্যথা-বেদনাকে অতিক্রম করে যখন জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছল সুনীলা, ঠিক তখনই সুধাপাত্র হস্তচ্যুত হল তার, কালের অমোঘ নিয়মে মামুঘের অধিকার থেকে বঞ্চিতা হল সে। মনে হয় সুনীলার জীবনের অসম্পূর্ণ উপসংহারের মাধ্যমে লেখক এ যুগের যথিত ও অসমাপ্ত সত্তারই কপাশ করতে চেয়েছেন। পরিপূর্ণ সার্থকতা বা শাস্তি যে এ যুগের মামুঘের কাছে আকাশ-কুমুদে মতই দূরত্ব বস্তু—এই মহা সত্যকেই যেন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। লেখকের শৈলী সাবলীল ও বলিষ্ঠ। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অমুযোগ করার কিছু নেই। লেখক—নারায়ণ দাসশর্মা। প্রকাশনায়—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, রায়বাগান ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

### আকাশ গঙ্গা (মডার্ন পাবলিশিং)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতকে সরাসরি একই উৎস্রকোর সঙ্গেই লক্ষ্য করা হয় এবং বস্তুটা সম্ভব উৎসাহও তিনি পেয়ে থাকেন, কিন্তু হরত বা সে জন্মই অব্যাহত নারী-জীবনের পূর্ণাঙ্গ ঘটায় সম্ভাবনাও এখানে সমধিক। আলোচ্য উপজ্ঞাসটি পাঠ করলে এ কথা যথার্থ কোন দ্বিধাই অবকাশ থাকে না। অত্যন্ত স্নাত্তিকর একটি কাহিনীকে কঁচা হাতে বরন করা হয়েছে, শুধু তাই নয় বিখ্যাত কোন সাহিত্যিকারের সুপ্রসিদ্ধ একটি রচনার অক্ষম অমুকরণ করার প্রচেষ্টা, স্থানে স্থানে বেশ চমুপীড়াদায়ক। লেখকের শৈলীতে যদি অপরের স্বাক্ষর এত বেশি মাত্রায় না পড়ত, তাহলে কাল অন্তত এ-যুগে কিছুটা প্রত্যাশার ইঙ্গিত ছিল। লেখক ভবিষ্যতে আরও সাবধান হলে সবিবেচনার কাজ করবেন। প্রজ্ঞদ, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—বিশ্বেশ্বর নন্দী। প্রাপ্তিস্থান—দি মডার্ন পাবলিশিং কোম্পানী, ৩০, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

### মৌলুমী মন (সাহিত্য প্রকাশনী)

আলোচ্য ছোটগল্পের বইটি পড়ে আনন্দ পাওয়া গেল। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও তাঁর মধ্যে কিছুটা প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত আছে। মোট এগারোটি গল্প আছে বইটিতে, বিশেষ কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়বস্তু অবগত না করে, মামুঘের মনের সহজ-সরল কয়েকটি বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই লেখক বনে গেছেন তাঁর গল্পের জাল। লেখকের কলম এখনও সম্যক পরিণতিলাভ করে নি বটে, কিন্তু ছোটগল্প লেখার ক্ষেত্রে যে তাঁর কাছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিষ্কার। লেখক—মাখনলাল সরকার, প্রকাশক—সাহিত্য প্রকাশনী কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-১২। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

# বঙালী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)  
প্রোমজ্জ মিত্র

মুনের মধ্যে কেন যে অতি ক্ষীণ হলো অলৌকিক যুক্তিহীন একটা আশা হয়েছিল তা বলতে পারি না।

ভাগ্য অমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেবরাজের সঙ্গে যখন পাইয়ে রয়েছে তখন হারানো গল্পের খেঁও সেই নিজে থেকে ছুড়ে দেবে এমন একটা বিশ্বাস অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে বোধ হয় কাজ করেছে। সে আশা অবশ্য সফল হয় নি।

দেবরাজের নতুন অতিথি যে এসেছিল এক হিসেবে সে অবশ্য কৌতূহল জাগাবার মত বিশেষ একজন।

বছর ত্রিশ বয়সের একজন ইণ্ডিয়ান। নামটা শুনে পোল বলে মনে হয় তবে জার্মানিতেই বাড়ি। দেবরাজের সঙ্গে সেখানেই আলাপ হয়েছিল পড়াশুনা করার সময়। তারপর বহুদিন বাদে দেবরাজের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দেবরাজের সঙ্গে তার চিঠিপত্র বেঁধে বরাবরই ছিল। থাকবার কারণ টেন্ডার ভারতবর্ষ সবচেয়ে গভীর তীর্থ আগ্রহ।

এ আগ্রহ তার ছাত্রাবস্থাতেই ছিল। দেবরাজকে ভারতীয় জেনে সে নিজে থেকে এসে তার সঙ্গে তখন আলাপ করেছে আর দেবরাজের কাছে পরে যা শুনেছি তাতে অসংখ্য ব্যাকুল প্রশ্নে বিভ্রত করে তুলেছে।

আসল নাম তার অবশ্য বাংলার প্রায় অমুকারবীর ট্যাঙ্কুজ, কারোইদাক গোছের কি। সুবিধার খাতিরে তাই টেড করে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম যেদিন দেবরাজ বরুণের স্টেশন শহর থেকে টেডকে নিয়ে এসে সেদিন তাকে দেখে একটু কৌতুক মেশানো তাক্সিলাই অনুভব করেছিলাম।

এক ধরণের ভারত-প্রেমিকদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা কি কৌতূহল নেই। এদের আমি যেন চিনি।

গারের চামড়া শাদা হওয়ার দরুণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহ দেখিয়ে এরা যেন আমাদের কৃতার্থ করতে চায়।

এই গম্ভীর ভারত-ভক্তদের চেয়ে নাকি স্টেটকানো দান্ডিকরাও এক হিসেবে বোধ হয় ভালো। তারা অন্তত তাদের অবস্থা যুগের

যা আমাদের নিজস্বের ফ্রাট প্রাণির নিকট আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। আর এরা আমাদের মিথ্যা অহমিকাকে ধের স্তাবকতার মুড়মুড়ি।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দুঃখ অমগ্রসরতা সব এদের কাছে আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এরা আসে দীক্ষা নেবার বোগী সাধু সন্ন্যাসী খুঁজতে, মঠ মন্দির দেখে আত্মহারা হ'তে আর দেশে ফিরে গিয়ে ধোঁগটে আধ্যাত্মিকতার মোটামোটা বই লিখতে।

টেডকে আমি এই দলেই ফেলেছিলাম।

ফেলেছিলাম প্রথমেই তার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে বিরূপ হয়ে।

গেক্সা পরে সে আসে নি। কিন্তু বেচশ ঢোলা পাঞ্জাবী আর তার সঙ্গে কাবলী ধরণের পাঞ্জামার তাকে যেন অত্যন্ত বেমানান লেগেছে। ভারতীয় সাজার এই চোঁটেই আমার কাছে আপত্তিকর স্টেশন-শহর প্রায় মাইল কুড়ি দূরে। এতখানি পথের অর্ধেকটা মাত্র সরকারী বাসে এসে বাব্বিটা একটা দেহাটা একা ভাড়া করেই তারা এসেছে।

দেবরাজ একা থেকে নেমেই টেডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। দূর থেকে তাদের একার শব্দ পেয়ে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে পাড়িয়েছিলাম।

ভাড়া নিয়ে একা চলে যাবার পর তিনজনে মিলে আমাদের কুটারের দিকে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম।

টেড বেরকম মুক্ত চোখে চারিদিকে তাকাচ্ছিল তাতেই খানিকটা অকারণে তাকে আশ্বাত দেবার ঝোক হয়েছিল।

ওরটারপ্রকৃৎ খানিক ক্যান্সারের একটিমাত্র বড় খলে টেড সঙ্গে এনেছে। সেটা পিঠে বুলিয়ে সে ঘরে নিয়ে বাচ্ছিল।

সেটার দিকে আঙুল বোঝিয়ে বলেছিলাম,—ও খলের মধ্যে ক্যান্সার-ট্যামেরো কিছু আছে নিশ্চয়। এ সব মনোহর দৃশ্য নইলে তুলে নিয়ে যাবেন কিসে?

আমার গলার স্বরে খিঙ্কণটা একটু বৃষ্টি স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল।

দেবরাজ সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

কিন্তু টেড লক্ষ্যই করে নি মনে হয়। একটু সলজভাবে ক্রো

ধারে ধারে বলেছিল—না, ক্যামেরা আমার নেই। আমি ছবিটাই তুলি না।

একটু উচ্চারণের জড়তা থাকলেও টেড ইংরাজি ভালোই বলে।

উদ্ভাৱে তাকে বলার আর কিছু না থাকলেও মনে মনে কেমন একটু স্কন্ধ কেন যে বোধ করেছিলাম জানি না।

তার ভারত-ভক্তিতে খোঁচা দেবার জন্তে জিভটা অহেতুকভাবে উৎখান করছিল।

সুযোগ পেলাম খেতে বসবার সময়।

ইতিমধ্যে আমাদের ওপর ওপর পরিচর ভালোভাবেই সারা হয়েছে। টেড যে দেবরাজের মতই বিজ্ঞানের ছাত্র, হামবুর্গের একটি শিক্ষারতনে সে যে অধ্যাপক ও এখনো অকৃতদার, দীর্ঘ ছুটি নিয়ে সে যে এই প্রথম ভারতবর্ষ এসেছে এসব কথাই জেনেছিলাম।

টেবিলে টেডের জন্তে কাঁটা-চামচের ব্যবস্থা করা যায় নি। তার বদলে একটা চামচ আর ছুরির সাহায্যেই তাকে কাশ চালাতে হয়েছে। তাতে তার একটু অসুবিধেই হচ্ছিল।

সে যে আমাদের মত হাত দিয়ে খাবার চেষ্টা করে নি, তাতেও খুশি না হয়ে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তিটা লমন করতে পারলাম না।

বললাম,—হাত দিয়ে খাবার চেষ্টা করলে পারতেন! অন্ন হচ্ছে প্রাণ। সেই প্রাণ শরীরে গ্রহণ করবার সময় বাইরের কোন কৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নিলে অন্নকে অপবিত্র করা হয়।

টেড খাওয়া খামিয়ে সোজা হয়ে বসে কেমন একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসল। তারপর বললে,—আপনি পরিহাসই করছেন নিশ্চয়। কিন্তু এ ধরনের পরিহাসেও বিশ্বাস করবার লোকের ভারতবর্ষে অভাব নেই বলেই আমার সম্ভ্রমশ্রম বাড়ছে।

কথাগুলো মধুরভাবে বলা হলেও কোথায় যেন একটু চাবুক গেয়ে চূপ করলাম।

টেড সম্বন্ধে ধারণা তখন থেকেই পান্টান উচিত ছিল। কিন্তু তা ঠিক পারি নি। মনের মধ্যে কোথায় একটা বিরূপতার জড় তখনও ছিল।

হয়ত মনে মনে অস্পষ্টভাবে বা আশা করেছিলাম তা কল হওয়াই এ বিরূপতার কারণ।

টেডের সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ হয়েছিল শিকারে বার হবার পর।

জলায় পাখি শিকারের লোভেই এ অঞ্চলে গোড়ায় এসেছিলাম। দেবরাজের দেখা পাবার পর সে হচ্ছে ত্যাগ করলেও বন্দুকটা সঙ্গেই ছিল।

টেড আসবার দু'দিন বাদে একদিন সকালে উঠে সেটা পরিষ্কার করতে বসলাম।

দেবরাজের সেটা ডাকের জন্তে ঘুরে গ্রামের পোস্টাফিসে যাবার দিন। সকালে বেরিয়ে যাবার আগে আমার বন্দুক পরিষ্কার করা লক্ষ্য করলেও কোন মন্তব্য সে করল না। সাইকেলে চড়ে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল যে, তার এ বেলা ফেরা নাও হতে পারে সুতরাং আমি ও টেড যেন তার জন্তে অপেক্ষা না করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিই।

দেবরাজ বন্দুক বার করতে দেখেও কোন মন্তব্য না করায় নিশ্চিত হওয়ার বদলে একটু যেন হতাশই হয়েছিলাম।

মনে মনে একটা অস্পষ্ট বিক্ষোভই যেন ক'দিন ধরে জমা হচ্ছিল। নিজের অজান্তে একটা তর্কের ছুতোই বুঝি খুঁজছিলাম।

সত্যি সত্যি শিকারে যাবার কোন বাসনা আমার সেদিন ছিল না। কিন্তু দেবরাজ বন্দুক সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে সেইরকম ইচ্ছার কথাই না জানিয়ে বোধ হয় পারতাম না। এ জঙ্গলে পাখি শিকারের বিক্ষোভ কিছু বললে কি জবাব দেব, তাও বুঝি মনে মনে সাজিয়ে ফেলেছিলাম।

সে সব যুক্তিতর্ক-মারো-মারো হাওয়ারতেই একটা অব্যব তোখ চেপে গিয়েছিল কি না কে জানে।

বন্দুকটা পরিষ্কার করে তুলে রাগতে গিয়ে আর রাখলাম না।

সেটা হাতে করে টেডের কুঁড়েতে গিয়েই হাজির হলাম।

টেড তখন একটা কাঁটা নিয়ে অনভ্যন্ত হাতে মেরেটা কাঁটা দেবার চেষ্টা করছে।

আমায় দেখে কাঁটা খামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বললে,—এ দেশ আর আমাদের দেশের জীবন-দর্শনের তফাৎটার মূল কোথায় আমি বার করে ফেলেছি।

কাঁটা দিতে গিয়ে পেলে নাকি!—ঠাট্টা করলাম।

সত্যিই তাই! বলে টেড হাসল,—কাঁটা দিতে গিয়েই বুকলাম এখানকার মানুষ তোমরা জীবনটাকে বসে বসে দেখ আর চালাতে চাও, আর আমরা দাঁড়িয়ে।

সেটা বাধ্য হয়ে। আপনাদের এই বরফের দেশের ঠাণ্ডা মেয়েতে বসার উপায় নেই তাই!

ঠিকই বলেছেন। আমিও তা স্বীকার করছি না। টেড সরলভাবে হেসে বললে,—কিন্তু কারণ গাই হোক ওই বসার আর দাঁড়ানর মধ্যে অনেক কিছুর মানে লুকিয়ে আছে।

ভারত-দর্শনের চাবি কাঠি ত' তাহলে পেয়ে গেছেন। এবার একটা মোটা থিসিস লিখে ফেলুন।

আমার গলার কাঁজ যেকু ছিল টেড তা লক্ষ্য করে নি বোধ হয়। কিংবা লক্ষ্য করেও গায়ে না মেখে সে হেসে উঠে বললে,—জার্মানদের যেখানে কড়া সেইখানেই কিন্তু মাড়িয়ে দিয়েছেন? এককালে ত' সারা ইউরোপে আমাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির সঙ্গে এই বদনামও ছিল যে, তিল পেলেই আমরা তাল করে ফেলি। খাঁটিদের কথা ছেড়ে দিন কিন্তু পণ্ডিত্যজ্ঞতার কেতাব কত মোটা করে কত ফুটনোট নিতে পারে তারই নাকি পাণ্ডা দেখ।

হাসিমুখে কথা বলতে বলতে চট্টাং টেড গভীর হয়ে গেল। গভীর হল আমার হাতের বন্দুকটার কথাই খেয়াল করে বোধ হয়।

একটু চূপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে,—বন্দুক আপনার? আপনি শিকার করেন?

শিকার ঠিক নয়। হত্যা বলাই উচিত। নিরাক পাখিদের হত্যা করি। নিজেকে নিন্দা করার ছলেই গলাটা বেশ কাঁকালো করে বললাম—আজ এখন বার ছাছি। আসবেন নাকি সঙ্গে?

কয়েক মুহূর্ত চূপ করে থেকে টেড বললে, চলুন।

শিকারে গিয়ে সেদিন কিন্তু কোন পাখি মারি নি। মারবার চেষ্টাও পর্যন্ত করি নি। বন্দুক তোলবার মত পাখি ছ'চারটে দেখি নি এমন



ায়। দেবরাজ দেখেছিলেন ছাঁটো, হলদে ময়না জাতের পীলক-এর ছাঁট একটা খাঁক, একজোড়া জিহ্বাও।

টেডকে সেগুলো দেখিয়ে সামাজ্য বা জানি পরিচয় দিয়েছিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর এক জায়গায় বিশ্রাম করবার চেষ্টা করার পর টেড জিজ্ঞাসা করেছিল, কই বন্দুক ত' আপনি ছুড়লেন না? কি করে আর ছুড়ব! এবার তেঁসে বলেছিলেন, গুলী আনতেই ভুলে গেছি।

শিকারীর এমন ভুল কি হয়?—টেড গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে সত্যি কথাটা স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন,—আমি শিকার করব বলে সত্যি বোঝার নি! আপনি শিকারের কথায় কি বলেন শোনবার কৌতূহলে আপনাকে সঙ্গে আসতে ডেকেছিলেন।

কি ভেবেছিলেন? শিকারের কথায় আমি শিউরে উঠব।

তাঁই ভাষাই স্বাভাবিক নয় কি! আপনি জড়িলের ভারতবর্ষে দীক্ষা নিতে এসেছেন, সর্বজীব বোঝানে সমঝান দেই অহিংসার ভারতবর্ষ।

টেড উত্তর না দিয়ে এবার খানিক চুপ করেছিল, তারপর নিজেই প্রশ্ন করেছিল,—আপনার বন্ধু দেবরাজ কি শিকারের বিরুদ্ধে?

জানি না। আজ বন্দুকটা বার করে আমার পরিদর্শন করতে দেখে গেছে। কিছুই তবু বলে নি।

বলবে আপনি আশা করেছিলেন? টেড বেশ একটু তাকদূরীতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমি উত্তর দেবার আগেই আবার নিজেকে থেকে বলেছিল,—আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আপনার বন্ধুকেও আপনি চেনেন না।

নিজেকে এবার কেমন একটু অপরাধী মনে করেছিল। আশ্চর্যগালনের চেষ্টায় বলেছিলেন, আপনার কথা হয়ত সত্য। তবে একটা ধারণার আপনার সংশোধন করছি। দেবরাজ ঠিক আমার বন্ধু নয়। ভিন্ন কক্ষে পড়লেও আমরা একই বছরের ছাত্র ও পরীক্ষার্থী ছিলাম। তখন আলাপ ছিল না বললেই হয়। সহ্যকথা বলতে গেলে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই ক'দিন হল মাত্র হয়েছে। আমার চেয়ে আপনি সে হিসেবে ওর অনেক বেশি অস্থির। আমার চেয়ে নিশ্চয়ই ওকে বেশি চেনেন।

এত কথা বলার মধ্যে যত অদ্ভুতই হোক কৈফিয়ৎ দেবার তাগিদ ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায় একেবারে ছিল না এমন নয়।

যেদিক দিয়ে আশা করেছিলেন আগের মোড় কিন্তু ঠিক সেদিকে ফেরে নি।

টেড একটু যেন অগম্যনয় হয়ে বলেছিল,—আ দেবরাজকে আমি অনেকদিন আগে থাকতেই চিনি। চিনি ভালোভাবেই। ঠিক শক্রতা না হোক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু। সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি নিয়ে তা বোঝ হয় বুঝতেই পারছেন। আমাদের একটি সহপাঠীকে নিয়ে।



যেন ভোরের  
তাজা ফুল

**কোলে**  
থিন এরারুট  
বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোং  
প্রাইভেট লি.,  
কলিকাতা-১০

—1775/187-8/64-888

টেড চূপ করেছিল যেন দ্বিতীয় পাভাগুলো ভালো করে মেলে ধরতে।

আমি নীরবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলাম টেডের দ্বিতীয়মুনের মেজাজটা বজায় থাকার প্রার্থনা নিয়ে।

শীত শেষের দমকা হাওয়ায় জঙ্গলের মধ্যে তখন থেকে থেকে মর্মর উঠছে। একটা কাঠোঁকরা আমাদের কাছেই একটা গাছের গায়ে বসে ক'বার ঠোঁক দিয়ে বোধ হয় কিছু না পেয়ে আমাদেরই যেন ভৎসনা করে উড়ে গেল।

আশ্চর্যের কথা তার মুখটা পর্যন্ত এখন ভালো করে মনে করতে পারি না।—টেড আবার বলতে শুরু করেছিল। আমেরিকার মত না হোক আমাদের মধ্যেও তখন ডেংটি ছিল। আমি তাকে ডাকতাম নাচের আসরে, খিচোরে গান-বাজনার কনসার্টে। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় উৎসাহ ভরে বাজী হলেও ক্রমশ সে কেমন যেন আমার সখ্যকে উদাসীন হয়ে উঠছিল। নানা ছুতো-নাতার আমার নিমন্ত্রণ সে তখন প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে। সন্দেহ হয়ে উঠল। ভালোবাসায় সন্দেহের আলো অসহ্য। গোপনে একদিন তাকে তদুপস্থ করে দেখলাম আমারই এক সহপাঠীর সঙ্গে একটা রাস্তার মোড়ে সে দেখা করলে। সে সহপাঠী ভারতীয় ছ'জনে তারপর গিয়ে বসল দূরের একটা নির্জন পার্কের একটা বেঞ্চে। দূর থেকে ত্রি-সদৃশিতে তাদের লক্ষ্য করলাম। চোখে পড়বার মত এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা তাদের না দেখে বিষয়ের সঙ্গে সন্দেহ আরো বাড়ল। শ্রেমিকের মত বেস্টাভেঁসি করে তারা বসে নি। বেঙ্কের প্রায় দু'ধারেই ছ'জনে বসেছে। পরস্পরের হাত ধরবার কোন চেষ্টা পর্যন্ত তাদের নেই। শুধু মুখের আলাপই তাদের সঙ্গে চলে মনে হ'ল। সে আলাপের কি এমন আকর্ষণ হাতে নাচের আসরের উত্তেজনা সঙ্গীতের মাদকতা পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে। বিদেশী বলেই দেবরাজের উপর বিদ্বেষটা সেদিন থেকে আরো তীব্র হয়ে উঠল। তখন আমাদের দেশকে ধ্বংস করে নাৎসীবাদ নিজের আলোনে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছ'একটা আগুনের টুকরো তবু এখানে-ওখানে

ছাই চাপা হয়ে নেই এমন নয়। জাতের বড়ই রোগের বিজ্ঞের মত সহজে মরে না, রক্তে চাপা থাকে। দেহরাজকে ত'দেখছি। ঠিক বর্ণবিদ্বেষ ওর বিরুদ্ধে তেমন সহজ জাগাবার নয়। শুধন ঠাণ্ডার দেশের জল-হাওয়ায় ওর রং আরো অনেক উজ্জ্বল। জার্মান না হোক স্প্যানিশ পোর্টুগীজ বলে সকলেই ভুল হতে পারে। ওর বিরুদ্ধে এসিমাটিক হিসেবে সহপাঠীদের মধ্যে বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা করলাম। সফলও একেবারে হলো না তা নয়। সেই মেয়েটিকেই একদিন ক্লাসের ছুটির পর অনেকের মাঝখানে বান্ধ করলাম,—তুমি নাকি বোরখা পরে ওদানসীন হতে যাচ্ছ? ভারতবর্ষ সখ্যকে জান তখনও নিতান্ত বাপসা। মেরুদের এদেশে স্থানান্তর নেই, তারা ক্রীতদাসীর সামিল এইসব উড়ো খবরের সঙ্গে তারা সবাই বোরখা পরে এইরকম ধারণাই মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

মেয়েটির মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তবু ফলে উঠে এ আঘাতের পাণ্টা জবাব সে দিলে না। যেন সহজ রসিকতাই হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে এইভাবে হেসে কৌতুকের স্বরে বললে—বোরখা পরার সখ্য সবাই এক এক সময় হয়। মানুষের চোখের বিষে তাহলে নজর লাগে না।

আরো একটা কড়া আঘাতের কথা ভাবছি এমন সময় সে নিজে থেকেই হঠাৎ জিজ্ঞাস করলে,—আজ সন্ধ্যাতে কি করছ?

তাতে তোমার কিছু দরকার আছে!

অনেকের সামনে বলে ঠাট্টার সুরটা দেবার চেষ্টা করলেও গলার তিক্ততাটা চাপা পড়ে নি।

মেয়েটি হেসে বললে,—দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করছি। তেমন কিছু না থাকে আজ আমার নিমন্ত্রণ নাও না?

কিসের নিমন্ত্রণ?—আমার স্বরে সন্দেহ ও বিষয় মেশানো।

নিমন্ত্রণ নিতে হ'লে কি আগে থাকতে মেহু কার্ড জানতে হয়! বলে মেয়েটি হাসল তারপর আবার বললে, আজ সন্ধ্যায় কলেজের গেটেই আমার সঙ্গে অপেক্ষা করো।

তাই করেছিলাম, মনের মধ্যে সন্দেহ আক্রোশ কৌতুহল সব কিছুই মেশানো আলোড়ন নিয়ে।

মেয়েটি যখন সময়েই এসে আমার একটা বেঞ্চারে নিয়ে গেছিল।

সেখানে গিয়ে দেবরাজ আগে থাকতেই বসে আছে দেখেছিলাম।

টেড বরক মুহূর্তের জন্যে একটু খামতেই তার কাহিনীতে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—এ মেয়েটির মুখ ত'প্রায় ভুলে গেছেন বলেছেন। নামটা আশা করি ভোলেন নি। কি ছিল নাম?

নাম?—টেড একটু হেসেছিল।

আমি তখন উদ্গ্রীষ উৎকর্ষ হয়ে আছি।

কিন্তু এবারও আমার নিরাশ হবার পাল।

নাম অবশ্য এ গল্পে অবাস্তব।—টেড বলেছিল,—তবে নামটা খুব সাধারণ নয় বলেই ভুলি নি। নাম ছিল ব্রিট।

[ক্রমশ।

**ডাঃ বসু**

**অশোক কার্ডিয়াল**

কার্ডিও থ্র্যাট, ফাউন্ট

ও পোর্টার্স বর্ডার কন্ট্রোল

কম্পিউটার

ডাঃ বসু ল্যাবরেটরী লিমিটেড

কলিকাতা-১

# দৈনিক বহুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে

## মাসিক বহুমতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রগতির এই দুর্বার অগ্রগতির দিনে জাতীয়ভাবে সাংবাদিকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাংবাদিকের ব্যাপক প্রভাব সর্বক্ষেত্রে আজকের দিনে নতুন করে বলার কিছুই নেই। বিপুল এই ধরিত্রীর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, নগরে, জনপদে, গ্রামে, অরণ্যে, সাগরে, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে সমস্ত অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে অসংখ্য ঘটনার স্রোত নিত্য বয়ে চলেছে—পৃথিবীর নর-নারী তাদের ছায়া দেখতে পায় সাংবাদিকের দর্পণ। তাই সাংবাদিক ছাড়া আজকের দুনিয়ার আমাদের জীবনবাগ্য অচল। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাংবাদিকের প্রভাব তাই অনতিক্রম্য।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দেশের সুনাম ও প্রসিদ্ধি সর্বজন-বিস্তৃত। সাংবাদিকতার জগতে বাংলাদেশ দেশের বিরাট ঐতিহ্য ও গৌরব সর্বক্ষেত্রে উই অনবহিত নন। এই অপ্রতিত জয়ন্তীর সূচনা আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে—কিন্তু আজও তা দুর্দমনীয়।

ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অসংখ্য বাণী ও উক্তির মধ্যে একটি বিশেষ উক্তি—‘উপেন ছাপাখানার কাজ করবে।’ গৃহীণিষ্য বহুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথের চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে খুল গেল জীবন প্রকাশের পথ। রামকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পিত উপেন্দ্রনাথ মাথার তুলে নিলেন গুরু আশীষবাণী। প্রতিষ্ঠা করলেন বহুমতী সাহিত্য মন্দির। উত্তরকালে ঠাকুরের ও স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদে উপেন্দ্রনাথের, তাঁর একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রের এবং আরও অনেকের সাধনায় রূপ পায় এক বিরাট-বিশাল সাহিত্য-সাংবাদশালা। বাংলাদেশ দেশের সাংবাদিকতার

গর্ভ ও গৌরববর্ধনের মূলে বৃন্দের অবগান অতুলনীয়—বহুমতীর নাম সেই তালিকার শ্রবণ সঙ্গতে আজ উল্লিখিত।

দেশ ও জাতির সেবার বহুমতী নানাভাবে অংশ নিচ্ছে। গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ইংরাজী পত্রিকাগুলির দ্বারা সে যে পরিমাণে জনগণের সেবা করে এসেছে বা আসছে, তার মূল্য মিত্রপত্রের সমর আজ এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রচারের ও প্রসারের ইতিহাসে বহুমতীর দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। হুলতে হুলমূলে বাংলার গ্রামে-গ্রামে বহুমতীর গ্রন্থাবলীগুলি পৌঁছে যাওয়ার ফলে জনসাধারণে সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে যে ব্যাপক সচেতনতা দেখা গেল তাও বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। এ দিক দিয়ে বহুমতীর এই ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য। এ কথা কাল্পনিক নয় যে, দু' শহরে ও গ্রামে দৈনন্দিন কর্মকর্তা ভাবনায় অবসান অবকাশখন মুহূর্তে বিতাহীন দরিদ্র ব্যক্তিও সক্ষম হয়েছে বহুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির রসাস্বাদনে। এই দুঃপাণ্যতার দিনেও চতুর্দিকে প্রতিটি জিনিস যখন দুর্দশা বহুমতী তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র শিঙতে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাকে—‘নমো নারায়ণ’ মন্ত্রে করেছিলেন দীক্ষিত, তাই জননাশাযবর সেবার বহুমতী কখনও কোনদিন কোন ছলনা, কপটি বা কুরিমতার আশ্রয় নেয় নি।

দৈনিক বহুমতীর জনপ্রিয়তা যে কতখানি সে সর্বক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বলি বাঙালি মাত্র। সব বাঙালির ঘর ঘরে তার সমাদর ও সম্মান নিঃসন্দেহে উদ্যোগ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তার সমান আদর। সব কিছুর উপর সে স্থান দিয়েছে জনস্বার্থ, মানুষের কল্যাণের চেয়ে তার কাছে বড় আর কিছুই নেই। জনস্বার্থ-বিরোধী কোথাও কিছু ঘটেই তার বিগ্ৰহ কঠ থেকে তৎক্ষণাৎ ধানিত হয়েছে বহুবার প্রতিবাদ। জন্মালয় থেকেই সে যেমনই নিভীক, তেমনই সত্যপ্রিয়। তার বিগ্ৰহ বক্তব্যকে প্রতীত করতে পারেন নি সরকারপক্ষ। রাজসোবে পতিত হয়েছে দৈনিক বহুমতী, লাভ করেছে দুর্ভোগ, তথাপি রাজদ্রোহাসন সে মেনে নেয় নি। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় রচনা তাই লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়।

সাপ্তাহিক বহুমতী এবং গ্রন্থাবলী-গুলির মাধ্যমে উপেন্দ্রনাথ যখন সাক্ষ্যের সপ্তবর্ণে সেই সময়ে আর থেকে পকাশ বছর আগে দৈনিক



উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বহুমতী : শ্রাবণ '৭১

৫৭

বসুমতীর শুভ প্রতিষ্ঠা। তারপর এই পঞ্চাশ বছর তার কাটল অবিচল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই সংগ্রাম অজ্ঞানের সঙ্গে, দুর্নীতির সঙ্গে, বিকল্পতন্ত্রের সঙ্গে। তবু, ঠাকুরের অসীম কৃপায় শক্তি তার এখনও অক্ষুণ্ণ, সাহস তার এখনও সীমাহীন, উত্তম তার জড়হীন। গতানুগতিকতার সঙ্গে তার চিরবিবোধ। জনকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অভিনব নৃষ্টি সম্বন্ধে সে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশভঙ্গি, সংবাদবিভাগ, পরিধি, সংস্থাপন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব তুলনাহীন। শুধু দেশের নয়, বিদেশেরও বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে বসুমতীর কৃতিত্বের অন্ত মিলে না।

বসুমতীর জন্মলগ্ন থেকে একাদিক দিকপাল সাংবাদিক তাকে সম্বন্ধ করে গেছেন তাঁদের অসামান্য প্রতিভায়। দৈনিক বসুমতীর

বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার নিয়মিত বিভাগগুলির অবদানও কম নয়। শিশুদের জন্য ছোটদের পাতা, পেশাদারী মঞ্চ ও চিত্রজগৎ সম্বন্ধীয় নাট্যলোক ও চিত্রকথা, মহিলাদের জন্য বৌদ্ধিকবাহীর হাট, অপেশাদারী নাট্যশ্রমশ্রমগুলির জন্য রূপরশ্মি আন্তর্জাতিক জগৎ, অর্থনৈতিক জিনিষ, খেলাধুলা প্রভৃতি তার উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করেছে। সর্বশ্রী বিত্ত মুখোপাধ্যায়, রমেন চৌধুরী, পাকুল সেনগুপ্ত কৃষ্ণ কুণ্ডু, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাহন্দু মুন্সুঙ্গি, বীরেন ভৌমিক, শিববাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভাগগুলির যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত। এ ছাড়া দৈনিক বসুমতীর আর একটি প্রধান আকর্ষণ রবিবাসরীর সাহিত্যসভা। এই বিভাগটিতে মূল্যবান তথ্যসম্পন্ন সচিত্র প্রবন্ধ, অপর্যায় মনোময় ছোট গল্প, শক্তিবান শিল্পীদের অঙ্কিত বেথচিত্র, জ্যোতিষ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রস্তোতন, বাঙালি গ্রন্থাদির



বসুমতী ভবন

ইতিহাসে যে সব অবিস্মরণীয় নামগুলি জড়িয়ে আছে, সেগুলির গুরুত্ব অসামান্য। স্বর্গত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, স্বরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ মুস্তফী, ভল্লভ সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বীণেন্দ্রকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি দেশবরেণ্য সম্ভানরা যেভাবে বসুমতীর সমৃদ্ধি ও বিকাশের পথ প্রশস্ত করে গেছেন তা বিরল দৃষ্টান্ত বললেই চলে। এই যুগের সাংবাদিকদের অগুণ্ড এবং অভাবনীয় সমর্থন ঘটার ফলে বসুমতীর ইতিহাস এত উজ্জ্বল, এত বর্ণিমা।

এ যুগের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক স্মৃতি জীবন্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দৈনিক বসুমতীর বর্তমান সম্পাদক। এই পত্রিকা

সমালোচনা এবং সমকালীন ঘটনাদিকে কেন্দ্র করে হস্তঃস্বপ্ন চর্চক মন্তব্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে অগণিত পাঠক-পাঠিকার দরবারে বিতরণ করে চলেছে বর্ণনাত্ত আনন্দ। এই বিভাগটির সম্পাদনার গৌরব লঙ্কপ্রতিষ্ঠিত কথামোহী এবং বিদগ্ধ চিত্রকর জীবন্ত প্রাণতোষ ঘটকের। কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকরূপে বিভাগটির সঙ্গে জড়িত। দক্ষ সাংবাদিকর বাহুরে বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেন্দ্রকুমার গোখানী আজ দৈনিক বসুমতীর যথাক্রমে বার্তা সম্পাদক ও প্রধান সংবাদদাতা। সর্বশ্রী সুনীল ঘোষ, মণি বসু, শেলী দত্ত, ঘোষ, হুম্মিল মৌলিক, অনিল দেব, সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

## দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে মাসিক বসুমতীর প্রজ্ঞাঞ্জলি

সুশান্ত দে, দীরেন দত্ত, নীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপ্রসন্ন চক্রবর্তী, অধার বসু, ভবেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাংবাদিকগণ বসুমতীর বার্তা বিভাগের সঙ্গে এবং দিগ্বিজয় সেন, অসিত গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদ দাশগুপ্ত, বহি রায়, অনন্ত জানা, সুনীল দাস গ্রাম মল্লিক প্রভৃতি সাংবাদিকগণ দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে জড়িত। দৈনিক বসুমতীর সংকলিত সম্পাদকরূপে বীর যুক্ত আছেন তাঁদের নাম গবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা মুখোপাধ্যায়, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দু হুংসুন্দ। মুদ্রণ সম্পাদনা-বিভাগে নিযুক্ত আছেন সুনীলকেশ হালদায়, বৃকেন্দ্র ঘোষ, চিত্তবজ্র চক্রবর্তী, বসন্তকুমার রায়, দুর্গাপার ভাওরী, ত্রিমানু গুপ্ত, শুকুমার ভট্টাচার্য, মনুস্কন্দ চক্রবর্তী, লক্ষ্য দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর রায়, মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীরেন্দ্র সরকার।

পাঠক-পাঠিকাদের আজ আমরা সানন্দে ঘোষণা করছি যে বর্তমান দৈনিক বসুমতীর গৌরবময় জীবনের অধঃশতাব্দী পূর্ণ হল। এ উপলক্ষে একটি স্মরণীয় সংকলিত প্রকাশিত হয়েছে। সংকলিত গ্রন্থটিতে দৈনিক বসুমতীর বিস্তারিত ইতিহাস, বিশেষ গায় ঘটে গমন, অসংখ্য আলোকচিত্রাদি এবং বসুমতীর বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের অনবদ্য স্মৃতিসচিত্র এবং সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ পরিপাটি এবং রচনাসজ্জার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ ছাড়াও এই গ্রন্থ দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক বসুমতীর এবং বসুমতী প্রকাশনবিভাগের শুধুমাত্র কর্মী এবং বিভাগীয় বর্ষকর্তাদের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রকাশিত দৈনিক বসুমতী সংকলিত রচনাসমূহের মধ্যে কুমুদ রজন মল্লিকের কবিতা, কালিদাস রায়ের কবিতা, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বসুমতীর ইতিহাস, অরুণেন্দ্র সমাজপতি—বসুমতীর প্রবর্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান সেনগুপ্ত—ভারতে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, দিলীপ সেনগুপ্তের—Seven gates of wisdom, শঙ্করী প্রসাদ বসু—রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে, প্রোগ্রামে ঘটকের—জ্যেষ্ঠ দৈনিক বসুমতী, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর—সাংবাদিকের জিজ্ঞাসার ভূমিকা, সনৎকুমার গুপ্তের—বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদকদের জীবনী, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের—স্বলভ সাহিত্য প্রচারে বসুমতীর বিদ্যাকর অবদান, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের—বসুমতী ভবনে ইতিবৃত্ত, মহীতোষ রায়চৌধুরী—অভিনন্দন, দীরেন্দ্রনাথ রায়ের—বসুমতী সাংবাদ ও সাহিত্য সংগ্রহ, রজন চক্রবর্তীর—মহেন্তী মাহুসের বন্ধু বসুমতী, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বসুমতীতে সাংবাদিক, রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামীর—বসুমতীকে যেমন দেখেছি, সুনীল ঘোষের—গ্রেট ক্যালকট্টা কিলিং ও বসুমতী, মণি বসু—নব ভারতে সাংবাদিকের ভূমিকা, শান্তিপদ সিংহরায়ের—ঐতিহাসিক তারকেশ্বর সত্যগ্রহ ও বসুমতীর নাম উল্লেখযোগ্য। সাপ্তাহিক বসুমতী সপ্তাহ জয়ন্তী সেনের তথ্যবহুল রচনাটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

দৈনিক বসুমতীর জীবনের এই শুভমুহুর্তে তার উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেছেন দেশের বহু বরেণ্য এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রম। এই তালিকায়—রামকৃষ্ণ ঠাণ্ডা মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী

মাদবানন্দ, ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ, উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন, কর্ণমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কুমারগাতি, খাজমন্ত্রী শ্রী সি. স্ত্রবক্ষণ, আইনমন্ত্রী শ্রী অশোক সেন, তেলমন্ত্রী ডঃ ভদ্রনাথ কবির, রেলমন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাঠিক, শ্রমমন্ত্রী শ্রী সঞ্জীবনাথ, শ্রী অজিত, বোম্ব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লকান্ত সেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বলবন্তরায় মেটা, অমৃতভাণ্ডার পরিচালক সম্পাদক শ্রী তৃণাংকান্ত ঘোষ, আনন্দভাণ্ডার পরিচালক সম্পাদক শ্রী অশোককুমার সরকার, প্রবাসী সম্পাদক শ্রী কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়, জনসেবক সম্পাদক শ্রী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ায় ম্যানেজার শ্রী নৃপেন ঘোষ, বিজ্ঞানচর্চা সংসদ্রনাথ বসু, জ্যোতিষ বাসন্তী দেবী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী হৃদয়নাথ মল্লিক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুনীলনাথ দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হরিহর শেঠ, কলিকাতার মেম্বর শ্রী চিত্তবজ্র চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কাংগ্রেসের সভাপতি শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, সাহিত্যিক বনমল, শ্রীমোহন বসু, ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বেডে প্রতীম মিত্র, শ্রীমতী হরিহর, মুম্বাইবাসীর নবাব-বাসুদেব হাজারীজী ওমরায়, বর্ধমানের মতরাভাষিকার শ্রী হরিহর মনোহর বাহাদুর, মতরাভাষী প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হাটবাজার বঙ্গল কনোয়াল শ্রী হরীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এল সালভেন্ডোব বঙ্গাল শ্রী ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোমিনিয়ান গণতন্ত্র বঙ্গাল শ্রী ব্রজেননাথ রায় এবং অজস্র কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নাম বিশেষভাবে প্রণীতব্যে।

দৈনিক বসুমতীর এই আনন্দোজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী মুহুর্তে মাসিক বসুমতী তার উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ শুভেচ্ছা জানানো এবং তার উত্তরাধিকার গৌরব এবং প্রভেদিত চর্চায় কামনা করছে। এই উপলক্ষে বীদের কল্যাণ সহযোগিতা ও আন্তরিকতা বিশেষ স্বীকৃতির অধিকারী—তদাধী বর্ষা সুনীল কুমুদ শুকুমার কুমার, পঙ্কজ চৌধুরী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী ভট্টাচার্য, লজ্জ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ভট্টাচার্য সুবীর বেরা, জ্যোতিষ দে, সুশান্ত রায় মলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত জানা, ডোলা রায়চৌধুরী, বিজ্ঞান চক্রবর্তী, অশোক রায়চৌধুরী, বিজ্ঞানচর্চা ঘোষ, শুভাঙ্ক ভট্টাচার্য, অসিত মিত্র, মণীন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী দেবী রুদ্র এবং দৈনিক বসুমতীর রিপোর্টারগণের নাম উল্লেখ্য। এই বর্ষার দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কর্মীসমূহের নাম উল্লেখ করলে আমরা যেহেতু পরিমাণে আনন্দ পেতাম কিন্তু স্থানভাববশত সে সমস্ত আমাদের পরিচয় করতে হল—এ জগৎ আমরা বেরনাগোষ করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করি দৈনিক বসুমতীর সভাপতি মাসিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তির দিন বেশি দূরে নয়। বর্তমানে মাসিক বসুমতীর বয়স বিয়াল্লিশ। আর আট বছর অতিক্রান্ত হলেই মাসিক বসুমতী তার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনের আশা পোষণ করে।

—সাংবাদিক

# বার্থকে

## বারানসী

নীলকণ্ঠ

কাশীতে একটি অপরূপ সূর্যাস্ত হয়ে গেলো নীরবে ক'দিন আগে, এ জগতে ক'জন তার খবর পেল জানি না। প্রায় আড়াই-তিনশো বছরের এই মরদেহ নন্দনের সৌরভ এনেছিল বহন করে। দণ্ডে দণ্ডে পালে পালে নিজেকে দহন করে করে নিঃশেষ হলো একটি জীবন্ত ধূপ। নিভে গেলো একটি দীপের কাণ্ডি। তার আলো কোনও কোনও ভাগ্যবানের অন্ধকার করে গেল দূর। কোনও উৎসবযাত্রা হলো না শবকে ঘিরে। খবরকাগজে ছাপা হলো না ছবি। শোকপক্ষ হলো না পালন করা। ছাই নিয়ে বা ঠাণ্ডে তাই করার সুযোগ গেলো না পাওয়া। বজ্রতা দেওয়া সম্প্রদায় লেখা কিংবা ছুটি ঘোষণা কোনটাই দরকার পড়লো না। কারণ মরদেহে অমর্যবতী রচনা করেছিলেন বিনি বহু শতাব্দী ধরে তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতাদের বাণীই হচ্ছে জীবন। এখানে বীর কথা বলা হচ্ছে তাঁর জীবনই ছিলো তাঁর বাণী। ম্যাসানাম তাঁর—বীতরাগানন্দ। কাশীর অসংখ্য সাধারণ নর-নারীর কাছে তিনি ছিলেন কুন্তাবাবা। বহু প্রভুভক্ত ভাবের মধ্যে হৃগতের বিনি প্রভু তাঁর এক ভক্ত জীবনের শেষ অশেষ ক'টা বছর কাটিয়ে গেলেন কাশীর বানপুত্রিয়ার। কেউ কেউ জায়গটার সঠিক উচ্চারণ করেন,—বনপুত্রাওরা বলে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কিছুদূর এই অঞ্চল,—ফার ক্রম ছ ম্যাডিং ক্রাউড। নিরুপম নিশ্চরিত্য হাটসান পাতা। সমস্ত শব্দ উৎস বেথানে, সেখানেও বুঝি এমনই পঃমাশর্চ নিঃশব্দতা; নিশ্চরিত্য।

জরুরে ১৮৬৭তে বীতরাগানন্দের জন্ম। এ কথা বীতরাগানন্দের মুখই শুনে একজন লিখেছেন, কথটা তবুও ঠিক নয়। তাঁর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশি। বীতরাগানন্দ এ কথাও বলেছেন আত্মপ্রশংসা এবং বয়স গোপন করার কোনও অম্মার হয় না। তা ছাড়াও মহৎ মানুষের চেয়ে বীরা কিছু অতিরিক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে কালের বিচার হান্তকর। তৈলঙ্গ স্বামী একালের আর শংকরাচার্য সেকালের,—এ যারা বলে তারা জানেই না যে তাঁরা সবাই সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত, সেখান থেকে উৎসারিত, সেখান থেকে অনাদিকাল ধরে—

‘অনন্দধারা বহিছে ভুবনে।’

এঁরা জানিই না যে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বাস্কীক, বিশ্বামিত্র, চার্বাক, শুকদেব, ব্যাস, এঁরা আজও মানবদেহ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে

আসেন ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ বিচ্ছেদখান খুঁজে। তাঁদের তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখে চিনতে ভুল হয় না। নবনকে দেখে ঠাকুর বিশ্বাস্ত হয় নি বহুতে; এত দরি করতে হয়? আমি যে তোরাই জন্মে বসে আছি।

বীতরাগানন্দ তো তাঁরই দূত, কিংবা স্বয়ং তিনি, যুগে যিনি নিকৃষ্ট, সুখে যিনি বিগতম্পূহ, বীতরাগভ্যঞ্জে। না হলে কেন কাশীতে গেলেই বীর কাছে যাই, তিনি বলবেন, যাও বানপুত্রাওয়ার যাও, দেখে এসো, বীতরাগাবাবাকে। ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সতীর্থ মানুষের চেয়ে মহত্তর তীর্থ নেই। তাই কাশী মানেই কেবল দশাশমেধ-মণিকর্ণিকা-হরিশ্চন্দ্রের ঘাট নয়, বিশ্বনাথের গলি কিংবা গংগাস্নান নয়, নয় শুধু তিলেভাওয়ের কিংবা সৎকটমোচন দর্শন। কাশীর পরিচয় কাশীতে বসে আছেন বীরা তাঁদের কালাতীত অবস্থান দিয়ে বলবার জন্মে যে,—

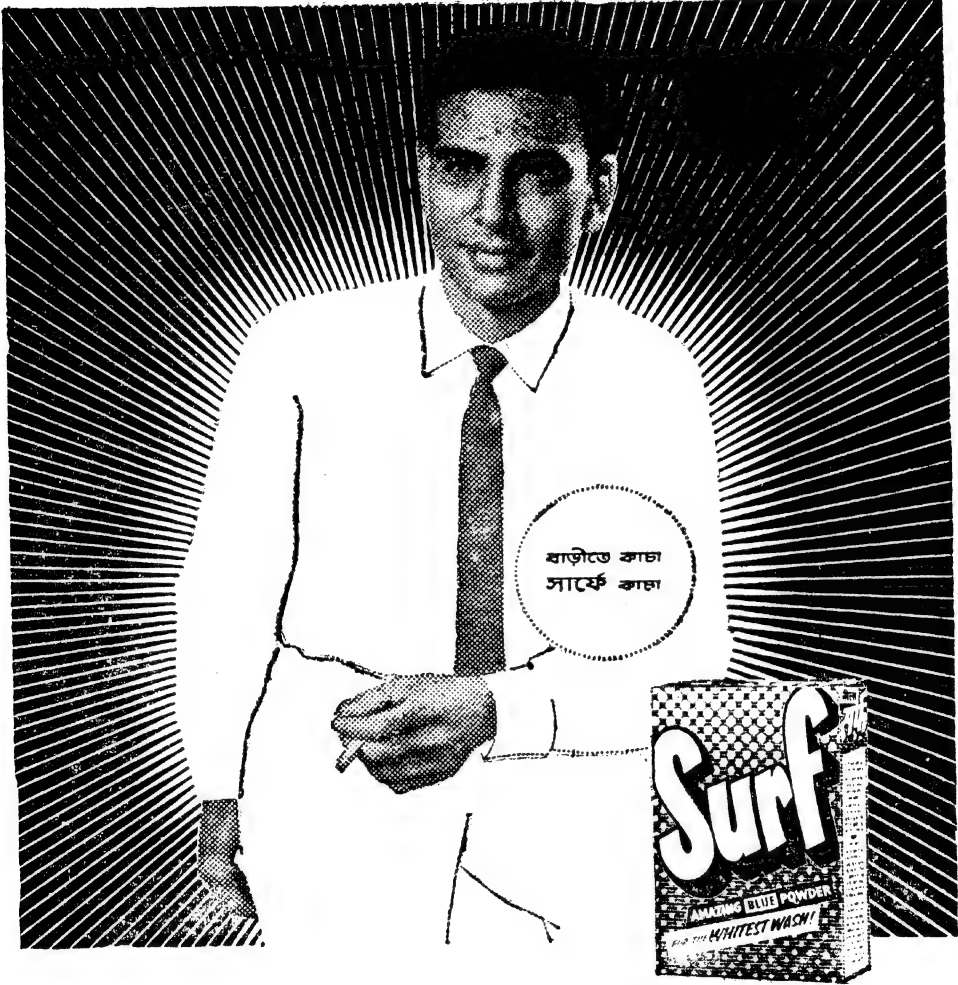
‘ওরে ভীক তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,

হালের কাছে ম'ঝি আছে করবে তত্তা পার।’

বিত্তদানন্দ, ভাষ্করানন্দ, বীতরাগানন্দ এঁরা সবাই সেই এক ‘অনন্দ’। একজনের নাম করলেই প্রণাম করা হয়ে যায় আরেকজনকে। গতকালকার, আজকের, আগামীকালের সূর্য বলবার, সূর্যকে সান’ কিংবা Soleil ক'খাটি বলবার মানে হয় অথবা হয় না কারণ একই সূর্যদাতা আমরা সবাই। সাধকের ক্ষেত্রেও এই এক সত্য। সব সাধকের সব সাধনার ধারা, শবসাধনার অঙ্কুশাও, যেখানে বীর মিলিত হয়েছে তিনি এবং আর সব এক ও অভিন্ন। কারণ এক ও অভিন্ন সাধনাই এঁদের সবলের সাধন। এঁদের আর কোনও সাধ নাই।

কেবল কাশীতে আছেন এঁরা? না। কোথায় নেই? কলকাতাতে এমন লোক আছেন, এমন ‘আলোক’ যুগান্তের অন্ধকারে বীরা আলিয়ে,গেয়েছেন বিশ্বসের আলোকবর্ষিক। এঁরা নীরবে নিভুতে, ‘মানুষের ভালো হোক,’ এই মন্ত্র অবিরত উচ্চারণে নিরত। বহু শতাব্দীর ওপর প্রাচীন এঁদের দেহ। লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যান। লোক এঁদের জানে না কারণ এঁরা ভারতবর্ষ। তবু এঁরাই ভারতের সেই রক্ত যা হাতে পেলে বিভা-বুদ্ধি-অর্থ অর্থহীন মনে হয়।

যে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তির কথা এর আগে বলেছি, তিনি আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার অনিশেষ ক'পি উদ্ধৃত করার কালে শাস্তিনিকেতনের অদূরে ছিন্নকঙ্কার শায়িত এক রমণীর মুখে এমন কথা



বাড়ীতেই সার্ফে কাচুন, দেখুন কত তফাৎ! সার্ফে সব কাপড় সবচেয়ে ধবধবে, সবচেয়ে পরিষ্কার আর সবচেয়ে সহজে কাচা হয়। সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি! বাড়ীর সব জামাকাপড়ই সার্ফে কাচুন... সার্ট, শাড়ী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবকিছুই।

**সার্ফে কাচা সবচেয়ে ফরসা**

BU. 43-140 BC

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

শুনেছেন বা আজকের জগৎ-অশান্তিনিকেতনকে মুহূর্তে পূর্ণ্য করে, পূর্ণ করে, পরিবর্তন করে যথার্থ 'শান্তি'-নিকেতন করে চোখের পলক পড়বার মুহূর্তে পরিণত পতিপূর্ণ ববে সে; সম্পূর্ণ করে। মাটির সংগে মিশে যাওয়া সেই এককালী শরীর সাধিকার। আইনজ্ঞ বিনয় করে নয়, সত্য কঠোর বলেছেন যে, তাঁর মতো সামান্য মানুষকে সেই অসামান্য সাধিকা যেন কিছু উপদেশ দেন দয়া করে। মরণ করে জ্বলে উঠেছে দু'টো চোখ অন্ধকার কোটরে। সাধিকা, আইনজ্ঞের পকেটের দিকে অঙুলি সংকেতে জিজ্ঞেস করেছেন : ওটা কি ? দেশলাই ?

ভয় পেয়েছেন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। এই বৃকি ধূমপানের কুকল সম্পর্কে আরম্ভ হয় অনর্গল বক্তৃতা। না। চিনতে পারেন নি তখন মাটির সংগে মিশে-যাওয়া শরীর সেই 'মা'টিকে।

সাধিকা বলেছেন সংগে-সংগে : ওই বস্তুটি কি যে জানে না সে শুকে বলবে সামান্য। যে জানে সে বলবে একটু অসহ্যক হলে আমার এই কুণ্ডে থেকে শুরু করে ওই অঞ্চল, এমন কি বহুদূর পর্যন্ত ভয়ানক করণীয় অসুস্থ শক্তি ওই সামান্য দেশলায়ের আছে।

কে বলবে, কে সামান্য আর কে অসামান্য। সাধিকা তারপর আবৃত্তি করতে থাকেন মাণ্ডুক্যোপনিষদ থেকে। মাটির দুক বিলীর্ণ করে 'মা'টির মুখে উচ্ছ্বসিত হয় করুণার ধারা।

আইনজ্ঞ ব্যক্তির শুধু মনে হয় অনাদিকালের এই ভারতবর্ষ যেন তাঁর কঠোর কথা বলছে সেই মুহূর্তে। অথচ কে খবর বাখে, ধ্বংসকাজে নাম না-ভাপা এটি সাধিকার। শান্তিনিকেতনে আসে না এমন বিঘ্ননাগরিক আজ কে আছে। তবু তারা কে জানে শান্তিনিকেতনের অপুরে আছে এক এমন বিঘ্ন নাগরিক।

কলকাতায় এখনও লোকহিত নিরত এক ফকিরের কথা আমি শুনেছি অসম্ভবকে সম্ভব করা, সম্ভবকে অসম্ভব করার খেলায় যিনি শিশুর মতো অসম্ম পান কখনও কখনও। পাপকে দিয়ে গিরিলাঘন করানো, বাচালকে মুক করা—এ দুয়েতেই তাঁর ইচ্ছা প্রধান কার্যকরী। এর একজন অমুগত এক সময়ে ফকিরকে ফিকিরি মনে ক্যানতেন। ফকির একে দিয়েই এর অবজ্ঞান লোকের হুঁয়োগ্য যন্ত্রণার উপশম করান। কান্তর ব্যক্তির বাড়ির লোক ছুটে আসে অবিখ্যাসী ব্যক্তির কাছে, বলে, বাবাকে আপনি একবার ছুঁয়ে দিলেই তিনি ভালো হয়ে যাবেন। এ অতুলন প্রথমে উপেক্ষা

করলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হয় একদা অবিখ্যাসীকে। অবশেষ ঘটবার পর তিনি বোঝেন সবাই ফিকিরি করে না; কেউ কেউ ফিকিরিই করে। বিশ্বের সকল আবরণের অধীশ্বর যেমন বৈজ্ঞানিক দিগ্বির, তেমনি সকল বাস্তবের মাতিক নিজের গোহাট্টেই যে ফকির,—এ খোরাল ততদিনে একদা অবিখ্যাসী ব্যক্তির আয়ত্ত হয়েচে।

সাধু এবং ফকিরের বেলার হিন্দু না মুসলমান,—এ প্রশ্ন নিঃস্বার্থক। বরসের বেলান্তেও যেমন, জন্মের ক্ষেত্রেও তেমনি। বতক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর অতীত অজানা তত্ত্বকেই নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে জানা কিংবা জানানো। সেই সাধনার অনন্দমহীকে জানা সেই ভুল ভাংগা। আমবা সবাই সেই এক-এরই যে অনন্ত চেতনা মনে পড়া সেই। মান আর চ'স, মানুষের ধর্ম হচ্ছে এই, কাহণ মান আর চ'স,—এই দুটিকে দিয়ে দাবণ করেই মানুষ,—মানুষ। কিন্তু মান আর চ'সের চেয়েও মানুষ বড়। কোনও কোনও মানুষ। তাঁরা কাউকে ধারণ করেন না। ধর্ম স্বয়ং তাঁদের ধরে আছে। দেশ-কাল-ধর্মের চেয়েও তাঁরা বড় এবং পরমাধর্ম্য গেলা সেই একমাত্র 'গোলোরাড়'-এর হচ্ছে এই যে এই সব মহাত্মাদেরও পতন হয়।

পতন-অভ্যুদয়ে তাই বজ্র বড় পথ, যে পথে দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে বক্ষের দরজার এসে দাঁড়ায় 'বজ্র'র রথ।

তবু এখনও গেল না জাঁধার। এখনও রহিল বাধা। এখনও সংশয়। এখনও সন্দেহ। এখনও জিজ্ঞাসা। একবার মনে হয় আছে, আরেকবার মনে হয় নেই। একবার মনে হয়, মৃত্যুতে সব শেষ। আরেকবার মনে হয় জীবন অশেষ। একবার মনে হয় ভয়ানক দেহ যে আর 'পুনরাগমন' করে না, একথা নিঃসন্দেহ। আরেকবার মনে হয় বর্ষাশয় মানে নববর্ষান্ত; মৃত্যু মানে নবজন্মের সূচনা। একবার চার্বাককে মানি, ঋণ-বৃত্তা ঘূর্ত পিবেৎ। আরেকবার মনে পড়ে চির-বাক : গুণেখু নিরুপায়মনা, অশেষ চ বিগতপূহ, বীতরাগভরক্রোধ।

অবিখ্যাসী দেওয়ালে লেখে : God is nowhere! বিশ্বাসী বালক পড়ে সেই একই লেখা আরেক চোখে : God is now here!

সন্দেহ থেকে নিঃসন্দেহে, অন্ধকার থেকে আলোর, মৃত্যু থেকে অমৃত পৌছনই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মৃত্যু রাখাল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নব নব সৃষ্টির প্রাণগণে। বলাচ্ছে, চৈতন্যে, চৈতন্যে। চলা, চলা, বলাচ্ছে না শুধু; বলাচ্ছে, জ্বালা, জ্বালা। সেই পূণ্যপাথর স্পর্শ করুক বার ছোঁয়ার জাঁধারের গায়ে ফুটে ওঠে নব নব তত্তা। বতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জানা ফুরাচ্ছে না তত্ত্বকে মুক্তি নেই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে। কর্মচক্রান্তে এ চক্র আমাদেরই তৈরি। এর থেকে মুক্তি সেও আমাদেরই অনায়াস।

এককে নিয়ে শ্রীহরি বেরিয়েছেন জলবিহারে। পাহাড়ের গায় এসে ঠেকেছে নৌকো। ওটা কি পাহাড়? প্রশ্ন করেছে শ্রীহরিপ্রাণ বালক। এরবন্ধ শ্রীহরি বলেছেন : পাহাড় নয়, ও তোমারই অসংখ্য বিগতজন্মের দেহের হাড়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার সামান্য একটু বাধা-ছিঁচো অংক মিলতে, হরির সংগে তাঁর অংক মিলতে, সেটুকুর জন্মেই এবার ভাসা। তাই এর শেষ জন্মে, জন্মেই নাম করে শ্রীহরির, প্রণাম করে শ্রীহরিকে। লোক



ক্যালকাটা অপটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ  
প্রতিষ্ঠাতা : ডাঃ কাণ্ডিকচন্দ্র বসু এম-বি  
৪৫ নং আমহার্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯  
ফোন : ৩৫-১৭১৭ গ্রাম-ক্যালঅপটিকো



## বার্ষিক্যে বারগণী

অবাক হয়। ধন্য ধন্য করে ভক্ত প্রবকে। সে জানে না তাই এমন করে। এব যে শ্রীহরির নাম নেয় জাম্বাই, সে নাম না নিয়ে পাবে না বলেই নেয়। যেমন পাবে না প্রজাপতি পাখা না সঞ্চালন করে। সংখ্যাতীত জন্ম থাকে খুঁজে পায় নি এব, শেষ জন্মে সেই নিখোজ নিজে এসে দেখা দিয়েছে ভক্তকে।

এক আমরা সবাই, তুমি-আমি যে যেখানে আছি সে সেখানে থাকব না, সবাই পৌছব তাঁর পার। কারণ আমরা না পৌছন পর্যন্ত, কেবল ভক্ত নয়, স্বয়ং ভগবানও নিকৃপায়। এই কথাই ঠাকুরের মুখেও শুনি, ঈশ্বরের দূত দক্ষিণেখবের ঠাকুরের মুখেও শুনি, যখন তিনি বলেন : সবাই খেতে পাবে, কেউ সকাল-সকাল কেউ বেলায়।

বিধ্বনাশের বিধে সবাই খেতে পাবে, বিধের যত অনাথ। সকলের অন্ন না জোটা পর্যন্ত অন্নপূর্ণা নাম সম্পূর্ণ হবে কেমন করে? সকলের বস্ত্র অঙ্গে না ওঠা পর্যন্ত তিনি দিগম্বর হন কি করে? মৃত্যুঞ্জয় না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত, স্বশ্রম শ্রমের ওপর দিগম্বরী নৃত্য কালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিয়ার আমি মাটির প্রাণীপ তাহলে কি করে বলি, 'ছালাও আমার পিখা'?

এই আমি কে?—মাটি। এই আমি কে—মাটি! এই মাটি আর ওই 'মা'-টি এক না হওয়া পর্যন্ত, একাকার না হলে এ মাটির যুক্তি নেই; ও 'মা'-টিরও বন্ধন অব্যাহত।

এই কেবল এক সত্য। আর সবই অন্ধব। হয় অজৌকিক, নয় অজৌক।

তবে? যদি সবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকে, শেষ পর্যন্ত উৎসব তব আমরা যারা রাজ্য শব্দ আছি সবাই তব উৎসব-এর

আলো তব কেন সাধনা করা, তবে কেন পাপ-পুণ্য ভেঁজিলে। তবে কেন বলা : এই কর, ওই কর। আর কিছুইই জন্তে নয়, কিছুক্ষণের খেলা জমাবার জন্তে শুধু। নিজেরই সাংগে নিজের খেলা। খেলা করবার জন্তেই, টান্ড করেই ভোলা যে আমিই জগৎস্বামী; আমিই স্বয়ং ভোলানাথ। খেলতে নেমে ভোলা না গেলে যে আমিই রাজা। তাহলে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা জমে কি করে। ভুলতে ভুলতে কর্মকে কড়ির পাওরা পাখে, তারপর জড়তে জড়তে, খুলতে খুলতে বর্ষক্রে ভিথিরি আবার রাজা হওয়া। রাজার ভিথিরি তখন আবার ভিথিরি রাজা।

[ আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ]

হাসিকান্ধার হীরা পান্না আমায়ই চেতনার রং। এখন অচেতন হয়ে আছি, না চিনবার খুশিটুকু পাব বলে। আবার খুশি হলোই চিনব, স্থিতি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তমো-রজো-সত্ত্ব, এ সবই 'আমি'।

তবু বিশ্বাস হয় না কারণ এখন আমার চেতনার চেহারা অবিশ্বাস। এখন সেই আমি ধরাং এসেই বলছি, শ্রদ্ধা করার কোনও অর্থ হয় না, কারণ মৃত্যুর সংগে সংগেই যে দেহ ভয়ীভূত তাকে জল দেবার অর্থ হয় না। যুক্তি দিচ্ছি, বেঁচে থাকতে তাহলে একতলার ঘরে খেতে দিলে তিনতলার বসে কেউ স্বত্বলোকে তা খেতে পারত, যদি মর্ত্যলোকে খেতে দিলে অমর্ত্যলোকে তা কেউ গ্রহণ করতে পারে।

তখন আমার যুক্তি খণ্ডন করার জন্তে আমিই অঘটন ঘটাই। যেমন ঘটছেই অসংখ্যবার। এই সেদিনও তো কালকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সেই অঘটন ঘটলাম আবার। [ ক্রমশঃ ]

সাধীনতা বিপন্ন  
সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করব  
—জওহরলাল নেহরু



নির্ভর প্রয়োজন হলে কিবু

যদি না কিনেও চলে তাহলে একবারই কিনাবেন না এত করে যে টাকা বাঁচার তা সরকারের প্রতিরক্ষা সক্ষম পত্রগুলি লগ্নী করুন। এত যে আপন গুণ জন্মায়ের উদ্ভবতি রোধ করতে সাহায্য করবেন তাই নয়, প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে অনেক জিনিস পেতেও সাহায্য করবেন

আপনার সক্ষম প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিবতে সাহায্য করে

বসুমতী : শ্রাবণ '৭১

৬৬৩

# যাহাদের সংস্পর্শে এসেছি

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

রাজা নরেন্দ্রলাল বাঁ। বাংলার পুনরুত্থান যুগের ইতিহাস বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬০ পর্যন্ত একশো বৎসরের মধ্যে সাহিত্যে রাজনীতিতে, শিক্ষায়, ধর্মে সমাজ-সংস্কারে সর্ববিধে এক মনীষীর আবির্ভাব দেখা যায় না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিগত ৬০ বৎসরে আমি যে সকল মনীষীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের কথা এখনও মনে ভাসিতেছে। তত্ব সে সব কথা বিস্তৃতির সুভল জলে ভাসিয়া যাউন। সেই সাঁ বিচিত্র ঘটনা, তথ্য দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে না পারিলে আমার অপরাধ হইবে।

বালা অস্বাস্থ্য রাজনৈতিক চেতনা আমার কোমল মনে অকুরিত হয় রাজা নরেন্দ্রলাল বাঁয়ের সংস্পর্শে আসিয়া। রাজা নরেন্দ্রলাল, এক বীর আদিবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ ছিল মেদিনীপুরের নিকটে নাড়াঙ্গোলা পল্লীর সুরক্ষিত গড়ের মধ্যে। তাঁহার শিক্ষা-সংস্কৃতি অতি উচ্চ আদর্শমণ্ডিত এবং উদারভাবাপন্ন ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় মেদিনীপুর ঐতিহ্যপূর্ণ এবং সদা-উৎসবময়। মেদিনীপুরের খ্রীষ্টীয়গণ্যদেবের দেউল, রথযাত্রা উৎসব, জন্মোৎসব মল্লিক বংশের বাস ও দোল-উৎসব, গঙ্গানারায়ণ দস্তের দুর্গোৎসব, হিন্দু মুসলমানের মতবৈষম্যের বীর উৎসব ও তাজিয়া ভাসান জাঁকজমক মেদিনীপুর শহরকে বারমাস মুগ্ধিত করিয়া রাখিত।

সে সময় রাজা নরেন্দ্রলালের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা মেদিনীপুর-বাসীর উপর সমাক-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও নেতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গাপূজার সময় জইমা-অস্ত্রে নবমীর প্রারম্ভের সঙ্ক্ষিপ্ত বসন্তুজার ব'লক্ষণ নির্ধারিত হইতে নাড়াঙ্গোলের গড় হইতে কামানের ধ্বনি করিয়া। মনে পড়ে, এক শারদর্শিনীর স্বচ্ছ নীচাকাশের অগগত অস্তিত্বে—যুক্তকরে সকলে জগন্মাতার স্মরণে নিমগ্ন হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া নাড়াঙ্গোলের গড় হইতে কামান গগিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'মা মা মা।' রব আকাশ-বাতাসকে আকুলিত করিল।

জগন্মাতার রথের প্রথম টান ভীমকর সৌম্যসুন্দর রাজা নরেন্দ্রলাল টানিতেন। মুসলমান ও খৃস্টিয়ানদের আগুন লইয়া খেলিতে খেলিতে অগ্নির হইবার ও বিবাদ ও মারামারির মধ্যে রাজা নরেন্দ্রলালের ইঙ্গিতে স্থপরিচালিত হইত।

রাজা নরেন্দ্রলাল দক্ষ অশ্বারোহী, খেঁচের অশ্ব (Australian bred) চালক, হস্তী আরও রাজা নরেন্দ্রলালকে দেখিলে পুরাক লের কুরুরাজার বীজ্ঞ অরণ করাইয়া দিত। মেদিনীপুর—মহাভারতে লিখিত বিরাট রাজার গোপগৃহের অধিকারী ছিল।

আমার পিতা স্বর্গীয় গোপাচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কসাই নদীর Annicut বা Dam-এর বক্ষণাবেক্ষণের এঞ্জিনিয়ার এবং মেদিনীপুর ক্যানাল বিভাগের কারখানার কর্তা ছিলেন। এই কারখানা হইতে ডায়ের মুখ পর্যন্ত নদীর তীর প্রান্তরে বাধান ছিল এবং এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ করিবার সুন্দর Promenade ছিল। রাজা নরেন্দ্রলাল প্রায়ই শেত-অশ্বের ছুঁড়িগাড়ি হাঁকিয়া এখানে পদচারণা করিতে আসিতেন এবং আমার পিতার সহিত সলাপ করিতেন। ক্রমে রাজার সহিত এই পৃথিবীর গাঢ় সৌহার্দ্য জন্মায়। আমিও রাজার অমুগ্ধ লাভ করিয়া লজ্জ হইয়াছিলাম। আমার বয়স তখন নবদশ বৎসর মাত্র, কিন্তু রাজার দেশপ্রীতি স্বাধীনাকাজ্জ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার উগ্র ছবি আমার কিশোর মনের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ৭৭ বৎসর বয়সেও মনে-প্রাণে জাগরিত হইয়া আছে। নরেন্দ্রলালের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব ও স্বাধীনতালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র ছিল, তাহার ছ'একটি উদাহরণ এখনো মনে আছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন বয়স যুগ চলিতেছিল লর্ড কিচেনার প্রভুতি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অপদম্বতা ও ভারের কথা এবং বীর জেনারেল জুবেরাট প্রভুতি সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি দিনের পর দিন ঘোষিত হইত, তখন রাজা নরেন্দ্রলালের কি আনন্দ। ইন্ডি ইন্ডি পাঙ্কজা বিহরণের ধুম। আমাকে জইমা লোফালুকির পালা চলিত। স্বাধীনতার রস আস্থাদ করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধি ছিল না, তবে ইংরাজ-বিরোধিতার রস প্রাণে জাগিয়াছিল।

রাজা নরেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি পরে ইংরাজ রাজপুরুষদের ঘোষের কারণ হইয়া ওঠে। তিনি টেগারিট মুভমেন্টের পিছনে উৎসাহ এবং অর্থ জোগাইতেন। ইহার জন্য তাঁহাকে নির্বাসিত ও নিপীড়িত হইতেও হইয়াছিল। তবে ইহাও সত্য, তাঁহারই প্রেরণায় ও উৎসাহে মেদিনীপুরবাসীরা প্রবল প্রতাপাধিত বৃটিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করিতে নিষিদ্ধাছিল এবং স্বরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিয়াছিল।

এ নামের প্রচ্ছদমণ্ড

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্রটি খ্রীস্টোমেন গুপ্ত বর্ষক গৃহীত হইয়াছে।



# নাদ গান ব্যাঙনো



## কবিরাজ লক্ষ্মীদেব চক্রবর্তী ও কবিগান

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে প্রায় অবলুপ্ত লোক-সংগীত পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে একটি বিশেষ দৃষ্টিক দেখা দিয়েছে। সত্যিকার মন নিয়ে কাজ তারা লোক-সংগীতের প্রচার-বিপ্লবণ করে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের বহুধা-বৈচিত্র্যের মধ্যে লোক-সংগীত একটি উপধারা হয়ে মিশেছে। তাই আজ প্রাচীন ঐসব ছাড়াও শহরের বা নগরের কোন সামাজিক বা ধর্মীয় আয়োজনী অর্হুষ্ঠানে যে অর্হুষ্ঠান-সূচী থাকে—তার মাঝে কখনও কখনও কবিগান, বাউল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও নাগরিক জীবনের আভিরাভ্যের সাথে এই জাতীয়-সংগীত-অর্হুষ্ঠানের কতখানি অন্তরের যোগ আছে বা আনন্দে কোন যোগ ঘটেছে কি না, তা' বিচারসাধ্য। তবুও অর্হুষ্ঠান-সূচীতে এদের প্রবেশ আনন্দের লক্ষণ—এতে সন্দেহ নেই।

বাংলা দেশের বিভিন্ন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কবিগানের প্রথা আজও প্রচলিত। প্রজ্ঞাতাদের পক্ষ হতে যে কয়েকজন কবিরাজের ডাক আসে তা দ্বার মধ্যে কবিরাজ লক্ষ্মীদেব চক্রবর্তী ও শেখ গোমামী দেওয়ান অত্যন্ত।

সাহেবগঞ্জ লুপ রেল লাইনে তারপার্ট রেল স্টেশন থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে লক্ষ্মীদেব চক্রবর্তীর বাস। গ্রামের নাম গুণ। কথার বড়ো—

‘গুণ নরুণ চাকপাড়  
মধ্যেখান মা তার।’

বহির্গু গ্রাম। বাড়ির বৈঠকখানার দেওয়ালে দেওয়ালে একজন দক্ষশিল্পীর হাতের ছাপ। পরে জেনেছি লক্ষ্মীদেববাবু শুধু কবিগান নন—চিত্রশিল্পীও। গৃহকাণে পুঁথি, পুরাণ আর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের শুপ। তাঁর পুরুষোচিত চোখেরা, চোখ বৃদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। গৌরব, চুল এমন কি চোখের ভুরু পর্যন্ত পেকে সাধা হয়ে গেছে। গলার স্বরে বার্ষিকের আর গাছীঘের বেশ। প্রতিপক্ষ গোমামী বলেন—

‘লক্ষ্মী উদর যার  
লক্ষ্মীদেব নাম তার।’

কথাটি ব্যঙ্গোক্তি হলেও মিথ্যা নয়।

বীহুদ্রের গোয়াল গ্রামে মাতামহ শ্রীলমোহন চক্রবর্তীর কাছে তাঁর শৈশবজীবনের স্মৃতি। মাতামহ অত্যন্ত শিষ্টাচার ও গৌড়া

হিন্দু ছিলেন। কবিগানের আসরে যাওয়া তাই নিষিদ্ধ ছিল। তবু মাতামহের অজ্ঞাতে চুপিসারে কবিগান শুনতে যেতেন শৈশবকালেই। চোন্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আঠারো বছরে তিনি পাঠশালার পণ্ডিতমশায়। গ্রামের জগন্নাথ মণ্ডল, সুরেন্দ্র ডোম ইত্যাদি কবিগানগণ চার-পাঁচটি কবিরাজের সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকলকেই কবিগান লিখে দেন। এইভাবেই তাঁর কবিরাজ-জীবনের সূত্র।

সম্বন্ধী শ্রীসত্যকিশোর চক্রবর্তীর কবিগান গাওয়ার সখ হয়েছিল। শিতা উদ্দেশ্য চক্রবর্তীর কাছে গান লিখে নেন। সম্বন্ধীর সাথে লক্ষ্মীদেব চক্রবর্তীও গান শুনতে যান। কিন্তু শুধু নির্ধাক শ্রোতা হয়ে তিনি সেদিন বলে থাকতে পারেন নি। মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। তখন বয়স একশ বৎসর। তারপর কবিরাজের সংস্পর্শ এলেন এতদ্ভাঙা। সম্বন্ধী গান করেন—তিনি পালায় বিদ্যবস্ত্র কথার ব্যাখ্যা করে দেন। প্রজ্ঞাতাদের দাবী—গান শুনবো না—কথাই শুনবো। সম্বন্ধী তখন কিছু কিছু করে প্রণামী দান শুরু করলেন। আর্থিক অসংগতির জন্য মাতামহের নিবেদিত উঠে গেল।

জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হল। বহু গোবর্ধন কুলিগিরি করে পাকুড় রেল স্টেশনে। সেখানেই কাকি সাহেবের কাছে চাকরী নিলেন চক্রবর্তীমশায়। বাংলা আর ইংরাজী নানা হরফে লিখতে পারতেন—সেই সুবাদেই চাকরী। কিন্তু এখানেও বেশিদিন স্থিতি হল না। কারণ মাতামহ আর মাতামহী মারা গেলেন। স্বাক্ষর প্রজ্ঞার পরিবার। তাই বঙ্গমহাদেবের স্মৃতি ফিরে আসতে হল গ্রামে।

সম্বন্ধী বললেন : গান করো—আমি দোহারী থাকব। তাই শুরু করলেন। উপার্জন আধা-আধি ভাগ হত।

কিন্তু মামা সংসারজ্ঞানী। তিনি বললেন—একা দলের সৃষ্টি করো।

ফলে সম্বন্ধীর দল ভেঙ্গে গেল। সম্বন্ধী হলেন ভ্রূপতি দলের পালাদোহারী। রতনসুন্দরী আর ব্যক্তিগত নিয়ে প্রথম কবিগান গাইলেন। ভ্রূপতী ও সুভদ্রা। গোপালকান্ত লেট নিলেন সুভদ্রা আর চক্রবর্তী মশায় নিলেন ভ্রূপতীর ভূমিকা। কবিগান হল গোয়ালাজেই।

তারপর ভূদেব মজুমদার ‘রাম’ ও তিনি ‘তারার’ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এইভাবেই শুরু হল কবিগানকে অমৌল্যতাবরণ করে সমাজস্থ করার চেষ্টা। ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবেশে কচিসম্ভ

গান। এই চেষ্টায় বেগ দিলেন নবীন মণ্ডল, জানকী ভাট, পুন্নি চক্রাভী।

আবার জীবনের পথ বাক নেয়। কবিবাল চক্রবর্তীমশায় হন চালের আড়ম্বর। কিন্তু খানচালের আড়তেই প্রতিভা চাপা থাকে না। ডাক এল বীরভূমগৌরব জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'রতনে রতন চেনে'। রামপুরহাটে প্রদর্শনী মেলা। কবিগান হল—তপশীলের ভূমিকা নিলেন তিনি। গোমামী হ'লেন 'বর্ণহিন্দু'। পালাগানের উদ্দেশ্য অস্পষ্টতা বর্জন। রক্তসের মাঝে স্বাদেশিকতার প্রসার সূত্র হয়ে গেল। জিতেন্দ্রবাবুর নির্দেশ এবং প্রেরণায় চক্রবর্তী মশায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। অ্যুযোগ ঘটি গেল মুকুন্দরামবাবুর স্বদেশীবাঁজা শেনার। আরও প্রেরণা পেলেন তিনি। বাঁজাদল খুললেন তিনি গ্রামাঞ্চলে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে—গ্রামবাসীদের স্বাদেশিকতার উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। কবিগান আর বাঁজাগানের মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল। মোহন ভগবানদাস চক্রবর্তীমশায়কে স্তম্ভ করার জ্ঞা মাঝখণ্ডের মাহালেব কিছু জমি দান করলেন। অভাবে তিনি দমিত হলেও দেশ দমিত হল না।

এরপর দেশে এল হুর্ভিক্ষ। কবিগান বন্ধ। মানুষ হুঁমুটে খেতে পার না—উৎসবের স্বাব তাই বন্ধ। দারিদ্র্য অঙ্গভূষণ হয় তাঁর। তখন গোমামীর খুব চাহিদা। গোমামী সাহেবের সাথেই চুক্তি হল। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে গোমামীর সাথে গান করতে করতে উনি পেশাদার হয়ে গেলেন। তারপর বাংলা দেশের বহু অধীশসম্মেলন, উৎসব হতে তাঁর ডাক এসেছে—আজও আসছে। পরিচিত হয়েছেন তারাশঙ্কর, গোপাল হালদার, প্রভাবতী দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাথে।

বৌবনের শুরু হতে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে তিনটি যন্ত্রণা—এক, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা; দুই, জমিদারের অত্যাচার জুলুম; তিন, বাস্তব অহমিকাবোধ। শ্রেষ্ঠ কবি হতে নিয়ন্ত্রণ পথস্ত্র প্রতীবাদের যে একতান—তিনি তাঁর সামাজ্য এক বাঁশ। কাবণ তাঁর বাণী অশিক্ষিত সমাজেই মুখ্যত প্রচারিত হয়েছে।

কবিগানের ঐতিহাসিক উৎস অনেকের মতে রাজপুতানার চারণকবি। কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের মতে—চারণকবি একদেশদশী—আর কবিবাল উভদেশদশী। তাঁর মতে তর্ক ক'রে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা বাঙালী জীবনের আদিম প্রবৃত্তি। পরম্পর পরম্পরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে—প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে বিকৃতরসের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই মানুষের শুভবুদ্ধি আর স্তম্ভিত হতে কবিগানের জন্ম হয় নি। সমাজের পঙ্কিলগর্ভে এর জন্ম। বিকৃতমনের খোরাক জোগাতে গিয়ে তাই আদিরসের প্রাচুর্য্য। কবিগানের প্রচলন হ'ল—পরের কুৎসা শোনার আগ্রহ হতে। পালা গৌণ—বিষয় অংশ নিয়ে একপক্ষ অপেক্ষাকৃত অসীল আক্রমণ করে। জ্ঞোতার স্তম্ভ আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়।

সিদ্ধার্থের জন্মের হাজার বছর আগে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের মানতে চাইতো না। বিশ্বাসিক, জনক ইত্যাদি ক্ষত্রিয়গণ যোগবজ করে জ্ঞানমার্গের চর্চা করতেন। তারপর বৌদ্ধধর্মের প্রাচুর্য্যে ব্রাহ্মণধর্ম আঁও হয়ে প্রতিপত্তি হল। চারুবার নিজে উপবাসী হয়ে চারুবার

নিরীশ্বরবাদের প্রচার করলেন। বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্য ব্রাহ্মণরা বিতাড়িত হলেন। বাঁজা থাকলেন—তাঁরা বৌদ্ধধর্মের আহুগত্য স্বীকার করলেন, সৃষ্টি হল সমাজপতির। শুরু হল গ্রাম্য আলোচনা আর মতবৈধতার; মান হ'ল—তখন হতেই কবিবালের সৃষ্টি। রাজা শশাঙ্কের কালে ব্রাহ্মণধর্ম আবার প্রতিষ্ঠা পে'ল—শুরু হল বৌদ্ধ বিতাড়ন। দেশে ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহে ত্রাত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ল সমাজে। তারপর ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আবার হিন্দুধর্মের প্রভাব হল ক্ষুণ্ণ। রামাধন-মহাভারত মূলকাব্যের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন হয়ে বিকৃতরসে পুষ্ট হয়ে উঠলো। সমাজের প্রতিটি স্তরের মত বিবিগানও তখন এর প্রভাবমুখ্য হতে পারে নি।

বর্তমানে কবিগানের পালার বিষয়বস্তু প্রধানত—ঐশ্বর্য ও অধর্ম (সামাজিক), অদৃষ্ট ও পুরুষকার (ঐশ্বরিক), শিক্ষিত ও বৃদ্ধক (অর্থনৈতিক), ক্রীড়ক ও বৃদ্ধাধন, রাম ও রাবণ (ঐতিহাসিক), কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট (রাজনৈতিক)।

সরকার পক্ষের নিকট তাঁর আবেদন—সরকারের সমাজ সংগঠনের নতুন ভূমিকার লোকসংগীত একটি অগ্রতম মাধ্যম হোক। দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে দেশের মানুষের মনকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিক লোকসঙ্গ।

কবিবালের কথা দিয়েই প্রাশঙ্কের উপসংহার করা যাক। আমার মতে দেশের শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যতদিন কবিবালের জন্ম না হয় ততদিন কবিগানের উন্নতি অসম্ভব। শিক্ষিত ও দরদী যুবক এলেই সঠিক তত্ত্ব আর তথ্য প্রচার হবে—লোকধর্মের প্রসার হবে।

## তরুণ সঙ্গীত-সম্মেলনের সঙ্গীতাসুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গীত-জগতে আজ 'তরুণ সঙ্গীত-সম্মেলন'

একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান।

গত দেড়শাব্দী মাদে বৈজয়ন্তীমালা ও লতা মুঙ্গেশকর সহ বহু প্রায় প্রত্যেকটি কণ্ঠশিল্পীর সমাবেশে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ আধুনিক ও মার্গ-সঙ্গীতের একটি সফল সম্মেলন পরিচালনার পর এই সম্প্রদায় আগামী ২ই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর সিংহীপার্ক কেবলমাত্র আধুনিক সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি সঙ্গীতাসুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ আশা ভোঁসলে ও হেলেন। এঁরা মঞ্চে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। এঁদের সঙ্গে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করছেন মুকেশ, হেমন্তকুমার, মহেন্দ্র কাপুর, গীতা দত্ত, সুরীন্দ্র সেন, চিত্তর চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা, সত্যনাথ, মানবেন্দ্র, নির্মলেন্দু, ইলা, নির্মলা, সনৎ, আরতী, জ্যোতী, বরণা, তন্জা এবং উবা খান্না (প্রথম মহিলা সঙ্গীত-পরিচালক)। নৃত্যে অংশগ্রহণ করছেন গোপীকৃষ্ণ, পন্না, সঙ্গীতা, বন্দনা, মাহক, বল্লব ও মীনা। হস্তকৌতুক পরিবেশন করবেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। গীটার বাজাবেন কাজী অনিরুদ্ধ ও মুকুল দাস। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ নেবেন বিতালরের ছাত্র-ছাত্রীসকল। পরিচালনা করবেন শ্রীগোপাল রায়। আমরা আশা করি এই সম্মেলনের সম্পাদকসহ প্রতিটি সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে প্রধান প্রচারসচিব শ্রীসনাতন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমোহন অধিকারী এই প্রচেষ্টাকে সফল করে

## আমার কথা (১১৩)

### হীরালাল সারখেল

সাগরীয় আন্তরিকতা থাকলে পারিপার্শ্বিক মহন প্রতিবন্ধকতা ও চলার পথের শতক বাধাবিপত্তি জীবনের সফলতার পথরোধ করতে পারে না—তরুণ ও শর্দিমান সঙ্গীতশিল্পী হীরালাল সারখেলের জীবনালেখ্য সেই শাখত সত্যেরই জরগান গাইছে।

আশ্চর্যের দিনের রসিকসমাজে হীরালাল সারখেল নামটি অপরিচিত নয় বরং শ্রোতৃমহলে গুণী শিল্পীর জন্ম ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ আসন সমাদরের সঙ্গে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাঁর গান সাধারণ্যে পরিবেশন করেছে যথেষ্ট পরিভ্রুতি, তাঁকে ক্রমশই উপনীত করেছে জনপ্রিয়তার স্বর্গরাজ্যে। কিন্তু এই তরুণ শিল্পীর জীবনের পথ প্রথম থেকেই দুঃসমাপ্তি নয়, কষ্টকাকীর্ণ। অনেক প্রতিবন্ধকতার বাঁটা পেঁয়রে তবে সাফল্যের গোলাপের স্বপ্নে ভরপুর তত্তে পেরেছেন তিনি।

১৯৩৪ সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাকী গ্রামে তাঁর জন্ম। স্বর্গত কিশোরীলাল সারখেলের সাত পুত্রের মধ্যে তিনি পঞ্চম।

সঙ্গীতের প্রতি বাস্যকাল থেকে তাঁর আসক্তি। সঙ্গীত সর্বভাবে বাস্যকাল থেকেই তাঁর মন-প্রাণ অধিকার করে আছে। যে কোন সঙ্গীতের আবেশন তাঁকে হাতছানি দিত, অন্তরে অন্তরে অনুভব করতেন সঙ্গীতের এক অমোঘ আকর্ষণ।

প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় বনজয় ভট্টাচার্য এবং সলিল

চৌধুরীকে তিনি লাভ করলেন তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষাগুরুরূপে—এঁরা ছাড়া জহর মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর মজুমদারের অনুপ্রেরণা তাঁকে প্রথম জীবনে যথেষ্ট লাভবান করে তুলেছে। ১৯৫৪ সালে অর্থাৎ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হীরালাল রেকর্ড জগতে আসেন। কলকাতা রেকর্ড কোম্পানী থেকে সলিল চৌধুরী ও অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া দু'খানা গানের রেকর্ড তাঁর প্রকাশিত হয় ('বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' এবং 'শাওন গগনে')। ১৯৫৭ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। এখানে তিনি প্রথম রেকর্ড করলেন 'ভগবান, তুমি এখন' এবং 'সোলাম হুনিয়া সোলাম'—গান দুটির যুগপৎ কথাকার এবং সুরকার জহর মুখোপাধ্যায়। ১৯৫৮ সালে তিনি প্রথম গ্রামা-সঙ্গীতের রেকর্ড করলেন। গান দুটির প্রথম

হীরালাল সারখেল



ক'টি কথা—'গুরির দে মা মনের গতি' এবং 'নিবিড় আঁধারে মা তোরা'—গান দুটিতে সুরযোজনা করেন প্রবীর মজুমদার।

এ ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীত, রাগপ্রধান, ভজন, কীর্তন, আধুনিক, পল্লীগীতির গায়ক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার অধিকার।

বেতায় এবং চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। বাঁশের বেজা, রিক্সাওয়ালা, মহিলামহল, রাতভোর, শ্রীধর-চিন্তা, হরিশ্চন্দ্র, নতুন প্রভাত, শ্রম, পশারিণী এবং সত্যীবেহুলা (অসমীয়া) চিত্রসমূহে ইনি কণ্ঠদান করেছেন। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর পূণ্যমুহুর্তে দুইখানি বিবেকানন্দ সঙ্গীত রেকর্ড করেন।

সঙ্গীতজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হোক এ প্রসঙ্গে এই কামনাই করি।

## অ্যাণ্ড্রোমিডাকে

### মায়া বসু

ডেক না আমারে ডেক না অ্যাণ্ড্রোমিডা

আমি ইকরাস উড়ে চলে যাই স্বপ্নের সন্ধানী,

রক্তে রক্তে কি যে আকুলতা মুক্তি উন্মাদনা

আরোও উর্ধ্ব প্রলুব্ধ করে অ্যাপোলোর হাতছানি।

শুধুলে বাঁধা পাতাঘ পাগড়ে রূপসী অ্যাণ্ড্রোমিডা

তব কটিতটে স্তন্যগ্রন্থ সোনালী আশ্রয় ভলে;

উন্মাদ আমি হে অভুলানীয়া গেরি তব যৌবন

তবু কাছে যেতে ভয় পাই পাছে এ মোমের ডানা গলে।

নির্জন দীপ। নারিকেল শাখে সবুজ ইসারা কাঁপে,

একটু পরেই অঁধার নামবে সখিমোপিরার 'পর

লালসামন্ত সাগর দানব ছ' বাহু বাড়ায়ও বদি

হে রাজকন্যা। জেনো সে তো নয় মৃত্যুর ঈশ্বর।

অশ্রুমাণ্ডে আবিল দৃষ্টি সিফিউস ক্যাসিওপি

ঐ বৃষ্টি আসে সেই অভিশাপ, করে বৃষ্টি সহ্যার

ভীক্ষদণ্ডী নখরের ভর কর না অ্যাণ্ড্রোমিডা

লেশ বলসায় পান্ডিউসের সাক্ষারি তরোবার।

আমি যে বন্দি। উড়ে যেতে চাই পলাতক ডানা মলে

জ্যোতির্বিদ্যিত মহাশূন্যের সীমান্ত প্রাঙ্গণে

গতিরোধ করে জ্বল অ্যাপোলো নির্ধর কোঁচুকে

তবু প্রাণপণে পাখা ঝাপটাই নীলগিরি নির্জনে।

অতল জলের উত্তাল ঢেউয়ে মৃত্যুর আহ্বান;

মাথার উপরে শাণিত তাত্র পূর্বের শিখা জ্বল—

মোমের শ্যলক খর উত্তাপে গলে গলে করে বার

দিগন্ত রেখা মুছে যায় ছুঁই অন্ধ চোখের জল।

তবুও আমারে ডেক' না—আমারে ডেক না অ্যাণ্ড্রোমিডা

ক্লাস্ত রিক্ত মৃত্যু তুহিনে আমি চির নির্বাক—

এ আছন্ন চেতনায় আব স্তিমিত এ আত্মস্বয়,

উড়ন্ত গতি সিদ্ধপাথির স্মৃতিটুকু জেগে থাক।

# শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

চরুলতা রায়চৌধুরী

সে এক মেঘমেঘুর দিনের কাহিনী। আকাশভরা মেঘপুঞ্জকে মনে হচ্ছে যেন আমাদের মাথার উপর এক ঘন আচ্ছাদন। কাজের শেষে আশ্রয়দানের সঙ্গে দিন কাটাতে সপ্তাহান্ত বাড়ি ফিরে দেখি, মা কাজে ভয়ানক ব্যস্ত। বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসার কথা। তাঁদের আপ্যায়নের জন্তে মা নিজেকে নিয়োগ করেছেন মিষ্টান্ন তৈরির কাজে। মায়ের সাহায্যার্থে নিজেকে মিলিয়ে দিলাম। বিকেলের দিকে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে। অল্পসময়ের মধ্যেই বাড়িটির সামনে একটু-একটু করে বেশ জল ঝাঁড়িয়ে গেল। বাড়ির সম্মুখভাগ পরিপ্লাবিত হয়ে গেল বর্ষার ধারায়—সেই দুর্ধোগে কেউ ছাতা মাথার বেরিয়েছেন, কেউ জল এড়াবার জন্তে পরিষেয়কে হাঁটুর উপর তুলেছেন, কেউ নগ্নপদে পথ চলেছেন—সে এক বর্ণনযোগ্য দৃশ্য। একান্ত বাধ্য না হলে ঘরের এক পা বাইরে কেউই আসছেন না, আসবেনই বা কেন—এই ঘন দুর্ধোগে, বজ্রার সাগরে শব্দ করে কেউ পাড়ি জমায়?

এ অবস্থার স্বাভাবিক বুদ্ধির নির্দেশই অতিথি আগমনের প্রত্যাশা জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু ভ্রমরতার খাতিরে নির্ধারিত সময়টুকু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত থালা সাজিয়ে অপেক্ষা আমাদের করতেই হয়।

কঁটোর-কঁটার যখন পাঁচটা বাজল, দুর্গন্ধ জলজোতকে যেন চ্যালেঞ্জ করে এক লৌহবানের ভেরী ভেসে এল আমাদের কর্ণকুহরে—যা আমাদের মন ভরিয়ে তুলল রাশি রাশি বিষয়ে। একটি ট্যান্ডি তার গতি থামাল আমাদের দ্বারপ্রান্তে। তখন বিশ্বস্তের সত্যিই সীমা খুঁজে পাচ্ছি না আমাদের অন্তরে। কি আশ্চর্য ঘটনা! বৃষ্টি বধিও তখন বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু পথ-ঘাট সমস্ত জল-জলময়। সেই জল ঠেঙিয়ে পাড়কা হাতে নিয়ে তিনটি ভ্রমরলোক এসে ঢুকলেন আমাদের বাড়িতে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া তাঁদের যেন সব দিক দিয়ে উৎফুল্ল এবং আরও প্রাণবান করে তুলেছে।

উদার হাসি হেসে একজন বললেন—জানি আমাদেরই আপনারা প্রত্যাশা করছিলেন। তারপর বললেন—সেইজন্তেই আপনাদের নিরাশ কর! আমাদের ইচ্ছার বাইরে।

তাঁদের আমার সেই প্রথম দর্শন। ইতঃপূর্বে তাঁদের কখনো দেখি নি। সুনাম তিনজনদের মধ্যে ছুঁল শিল্পী। বুটের পৃথিবলণ করতে লাগলাম। তাঁদের একজনকে সাধারণ দর্শনে শিল্পী ছাড়া অজ্ঞ কিছু মনে হয় একমাত্র বেশরাস ছাড়া। (যা তিনি পরেছিলেন খুব শিরসস্বতভাবে) তাঁর মধ্যে এমন কোন উপকরণ পাওয়া যায় না যাতে অপরিচিতের মধ্যে তিনি প্রতিভাত হতে পারেন একজন শিল্পী বলে—অস্তুত শিল্পের পরিমণ্ডল থেকে যেন অনেক যোজন দূরে তাঁর গতিবিধি এই কথাই প্রথম দর্শনে মনে আসে। তাঁর দীর্ঘ, সুগঠিত শৌখিন দেহ দেখে শিল্পীর পরিবর্তে ঠাকুর ব্যারামবীর বলে ভাবাটাই স্বাভাবিক। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে, একজন পেশাদার কুস্তিগীরের কাছে তিনি যথারীতি কুস্তিশিক্ষা করেছিলেন। মাথার তাঁর নরম চিহ্ন

বেশগুচ্ছ। ক্ষুদ্রাকার চোখে এক গভীর দৃষ্টি—আপনাদের দিকে নেত্রপাত করলে মনে হবে যেন আপনার অন্তরের অলিখিত ভাবের পার্যাক্ষর করছে সেই চোখ দুটি। এক কুঠাবিহীন জয়ের হাসি তাঁর মুখে লেগে আছে। সেই মাছুষটির নাম সুনাম। শুধু তাঁকে চোখেই দেখলাম না, জানলাম তাঁর পরিচয়ও। তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রথিতযশা তরুণ শিল্পী, শক্তিমান প্রখ্যাত ভাস্কর।

শিল্পের প্রতি আমার অমুহুর্তি চিরদিনের, কিন্তু শিল্পী কোনদিনই আমার মনে দাগ রেখে যেতে পারেন নি। এর আগে শিল্পী বলতে আমার যা ধারণা ছিল তা হল শিল্পী মানেই এক আবছা প্রকাশভঙ্গীসম্পন্ন এলোমেলো ছন্দহীন মাছুষ। কিন্তু এই শিল্পী আমার এতাবৎ সঞ্চিত ধারণা নিমেষের মধ্যে নশ্ত করে দিলেন। শিল্পী সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কল্পনা মুহূর্তের মধ্যে যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল এবং এর মূল যে এই এক বিশেষ শিল্পী—তা ভোঁ বলাই বাহুল্য। তাই, আমার সমস্ত ধারণা বীর ধারা তাসের ঘরের মত ধুলিসাং হয়ে গেল তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে আরও কিছু জানার এক দুর্বার কৌতুহল আমাকে অধিকার করে বসল। আমি তাঁকে তখন আরও ঘনিষ্ঠ কোণ থেকে জানার দুর্দাম ইচ্ছার কবলে। ইচ্ছাপূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীনও হতে হল না। যে মাছুষটিকে কেন্দ্র করে এই ইচ্ছা তিনিও আমাদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত হতে থাকলেন। আকাজক অতীতেই আমাদের বাড়িতে তাঁর আগমনও ঘটতে থাকে। শিচ্ছেন কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ভেবে দেখি নি, নিজেকে কোন কিছু গুণ্ডার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলাখুলিভাবেই মিশতে শুরু করলাম সেই ক্ষুদ্রত মাছুষটির সঙ্গে। এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশা একদিন পৌছোল যথানির্ধারিত এক নির্দিষ্ট পরিণতিতে। একটি সন্ধ্যায় তিনি প্রাঙ্গলভাবে প্রকাশ করলেন তাঁর অভিভাব। তাতে কোন ভুড়তা নেই, বিধা নেই, অস্পষ্টতা নেই। স্নগ্ধকালের সহচরীকে রূপান্তরিত করতে চাইলেন নিত্যকালের সহচরীতে, আলাপ-সঙ্গিনীকে দিতে চাইলেন জীবন-সঙ্গিনীর মর্যাদা। সোজাছজি প্রস্তাব এল তাঁর দিক থেকে—সোজাছজি তো নিশ্চয়ই বরং একটু আদিমভাবেই। এ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে নিমুখে তাঁর সঙ্গে আমিও খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে ভবিষ্যতকে আরও প্রাঞ্জল করে নিলাম।

এই বাগদান যখন আর গোপন থাকল না, শিল্পীর উদ্দেশ্যে তখন বর্ধিত হতে থাকল অফুরন্ত অভিনন্দন। কিন্তু, আমার প্রতি যেন সকলের একটা কল্পণাই লক্ষিত হল যেন আমি একটা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতার বোধমূলে উৎসর্গিত হয়েছি। কিন্তু সকলের এই মনোভাব আমাকে বিস্ময়াজ বিভ্রান্ত করতে পারে নি। শিল্পী-মনোভাব বলতে যা বোকার সেই জাতের কোন মাছুষের সঙ্গে এর পূর্বে আমার মেশার সুযোগ হয় নি। শিল্পীরা যে অস্ত্র মাছুষদের তুলনায় দৈনন্দিন জীবনে কোন অংশে পৃথক তা সেদিন আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নি। তবে সত্যের যেদিন উদঘাটন হল তখন সমস্ত অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

বিয়ের পর কিছুদিন দেবীপ্রসাদ স্বাভাবিকতার মুখোশ পরেছিলেন কিন্তু যেদিন অল্পভব করলেন যে, আইনের বিধানে নয়

## শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

সন্দের বিদানে এই সখ্য দূত থেকে দূতর হয়ে উঠেছে, এই বন্ধন লাভ করেছে অবিনাশ—সেইদিনই তাঁর কৃত্রিমতার অবসান ঘটল, আসল দেবীপ্রসাদ অর্থাৎ শিল্পী দেবীপ্রসাদ—সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে সব জারগায় তাঁদের তফাৎ—সেইগুলির মধ্যে করলেন আত্মপ্রকাশ। অল্পদিনের মধ্যেই সেই শিল্পসম্মত বেশবাস উধাও হ'ল—তাদের স্থানপূর্ণ করল ঢিলে ইজের আর ঢিলে জামা—কাজের পক্ষে তারা না কি খুব উপযোগী। একজন বন্ধু তাঁর ইজেরকে অতিথিত করেছিলেন 'সেফট লুজি' বলে। সাধারণ ঐ পোষাকে আবৃত থেকে প্রাক্টরে, কানায় মিশে থাকতেন তিনি। এর ফলও হত একদিকে যেমন হাস্যকর, অত্যাধিক তেমনই বেদনাদায়কও। দর্শনাখীর্ষ দল যখন 'দেখাতেন' একটি ঢিলে বেশবাস পরিহিত, বর্ণাচ্ছন্ন লোক নিজেকে—'ডি পি রায়চৌধুরী' বলে ঘোষণা করছে—তাঁরা তো রেগেই আতন—দেবীপ্রসাদকে তাঁরা ভয় দেখাতেন যে, মালাজের সরকারী চাকর ও কারু-বিভাগের অধ্যক্ষ ডি পি রায়চৌধুরীকে তাঁরা জানাবেন যে, এক ব্যক্তি নিজেকে তিনি বলে এভাবে প্রচারিত করছে। আমি অস্বীকার করছি না যে কাজের চাপে তাঁকে এভাবে সম্মিত থাকতে হয় কিন্তু কাজের অবকাশেও তাঁর বেশবাস হিন্দুমাড় পরিবর্তিত দেখা যেত না। কদচি কখনো হয় তো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেত।

আমরা যখন পরিণয়বন্ধনে মিলিত হই তখন তিনি ছিলেন রীতিমত সংযমী কিন্তু এখন তাঁর নিজের ভাবায় তিনি drinks to be sober পান তাঁর কাছে বিলাসিতা নয়, কর্মক্ষেত্রে তাঁকে প্রাণবন্ত রাখার ক্ষমতা, সৃষ্টির জগতে, চিন্তার জগতে নিজেকে সজীব রাখার ক্ষমতা আসলে এটা তাঁর প্রয়োজন। মজা তিনি নিছক আনন্দের জন্তে পান করেন না, করেন প্রয়োজনের খাতিরে। শুধু তাই নয়, তাঁর চিকিৎসকরাও বিধান দিয়েছেন যে, পান ত্যাগ করলেই তাঁর স্বাস্থ্যহানি অবশ্যই ঘটেবে।

জীবনের প্রান্ত তাঁর মানোভাব ঠিক এক দুর্গাঙ্ক দুর্ঘন ঢপল বালকের মত। তাঁর যেটা চাই—সেটা তাঁর চাই—ই—সে যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক আর যে মূল্য দিয়েই হোক। কখনো তিনি স্নেহের সপ্তসর্গে, কখনও তিনি দুঃখের তিমিরান্ধকারে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলে তখনই তিনি রুদ্রভৈরব আবার পরহুহুতেই একাকী অবস্থায় তিনি শাস্তশিবি।

তাঁর একাধিক অল্পতরুর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—লোককে বন্ধুদের বন্ধনে বাঁধবার ক্ষমতা। সাধারণত এই বন্ধুত্ব শুরু হয়ে থাকে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে মিছেই, তাঁর প্রতিপক্ষ যদি তাঁর বিশেষত্বগুলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাঁর অন্তরের স্পন্দনকে শৌছতে পারেন তা হ'লে হৃদয়তার বিজ বপন হতে কোন বাধাই থাকে না।

ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন রীতিমত দুঃখী। তাঁকে নিয়ে তাঁর বাবা-মার উৎসর্গের তো অল্প ছিল না। এ আমি শুনেছি স্বয়ং তাঁর পিতৃদেহ—আমার খণ্ডরমাশয়ের কাছে। যে কোন শিহরণপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাজ চিরকালই হাতছানি দিয়েছে তাঁকে—এক আমাঘ আকর্ষণ অল্পতরু করেছেন। সার্কাস দলে চুকে সাইকেলের খেলা দেখিয়েছেন, দুঃখ মানুষকে বাঁচাবার জন্তে নিজের জীবন করেছেন বিপন্ন, অবস্থা সংযমহীন খোড়ায়

চড়ে অস্ত্রের। যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—আবার গাছের তলায় বসে বাঁশ বাড়িয়ে সিগারেটের পরমা সাগর করেছেন। এ সব ঘটছে অবশ্যই তাঁর বাবা-মার অগোচরে। 'তাই ছেলে বতর্কণ বাড়ি না ফিরতেন, তাঁর পিতা ততর্কণ নিশ্চিত হতে পারতেন না। এরকম আরও কত ঘটনা যে ঘটে গেছে তার মীমাংসা নেই।

শিল্পের পর—আমি স্বামীর আসক্তি—সঙ্গীত ও শিকারে। সময় পেলেন তো ভুললে ছুটলেন। শুধু শিকারই নয়, সামগ্রিকভাবে অরণ্যও তাঁর মনে এক অবিদ্যব জাবের সৃষ্টি করত। কথার রাজ্যে তিনি তো রীতিমত মোহা। শিল্প এবং বৌদ-মনস্তত্ত্বই তাঁর প্রধান আগ্রহ। নিজের কথার প্রতি তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয় এবং আলোচনায় তিনি যথেষ্ট যুক্তিবাদী, তাঁর যুক্তির বাইরে কোন মতামত গ্রহণ করতে তিনি সক্ষম নন সে মতামত তাঁর জীবনই হোক, ছেলেরই হোক বা সম্পূর্ণ অপরিচিতেরই হোক। পানরত অবস্থায় তাঁর যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণময় মনের প্রকাশ বেন আরও প্রকট হয়।

হিন্দু-দর্শনের তিনি অমুগাণী হলেও তাঁকে তথাকথিত অধ্যাত্মবাদী বলা চলে না। যে কোন গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের দৃষ্ট তাঁর বিরোধ চিরকাল।

স্বামী হিসাবে 'জেলান' তাঁকে আমি বলতে পারি তথ্যে সেই 'জেলান' গীমা অতিক্রম করে না। এক কোমল ও হেঁচল মন তাঁর অধিকারগত, তা ছাড়া তাঁকে স্পর্শকাতর বললেও অতুক্তি হয় না। আপনি তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিন তিনি আপনায় কোন ব্যাপারেই মাথা গুণাবেন না কিন্তু তা না হলেই বন্ধনবিহীন সিন্ধের মতই তিনি আপনার মধ্যে এসে পড়বেন। এক কথায় এক প্রথর ব্যক্তিত্বের তিনি অস্বীকার।

প্রায় দু'বুগ এক শিল্পীর সঙ্গে ঘর করার অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনা করতাম। এই পরিবারে আর একজন শিল্পীরও আবির্ভাব ঘটেছে—আমার ছেলে—নৃত্যের মধ্যে সে জীবনের প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। আমার সৌভাগ্যের জন্তে আপনি ঈর্ষান্বিতও হতে পারেন, আবার দুর্ভাগ্যের জন্তে দুঃখপ্রকাশও করতে পারেন। মোটের উপর মানুষ দেবীপ্রসাদকে আমি যা দেখেছি, তাই চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি।

বহুদিন ধরে বারাকোন শিল্পীর সঙ্গে বসবাস করেন নি তাঁরা বুঝবেন না যে, একজন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে এক শিল্পীর জীবনের পার্থক্য কোথায় বা কতখানি। সে একা, আর কোন সময়ই তাঁর নিজস্ব বলতে থাকে না। শুধু গৃহিণীর বর্ণপালন করেই তাঁর কাজ শেষ হয় না। কতীর কর্তব্য তাকেই পালন করতে হয়। শিল্পী তাঁর ভাব ও সৃষ্টির জগতেই বিচরণ করে থাকেন, তাঁর বাইরের জগতের খুঁটিনাটি কি ঘটেছে না ঘটেছে সেদিকে দৃকপাত করার সময় তাঁর নেই। তাঁর সন্তানের পিতা তিনি—তাদের স্নেহও তিনি করেন, তাদের মুখে 'মম' ভুল দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করেন—কিন্তু বাস, এখানেই তাঁর কর্তব্যের ইতি। তাদের চোখে চোখে রাখা, বৃহত্তর পৃথিবীর প্রকৃত নরনারীকণ্ঠে তাদের গড়ে তোলা—এ কর্তব্য এখানে শিল্পী-পত্নীর।

স্বভাবতই একজন শিল্পী বিশ্বরঞ্জন—এর জন্ম দোষারোপ তাঁকে কোনক্রমেই করা চলে না। নিত্য নবনব মহৎ সৃষ্টির সাধনার তাঁর সমস্ত চিন্তা নিমগ্ন। তিনি যেনি থাকবেন না—সে সৃষ্টি সেদিনও এই নক্ষর পৃথিবীর বুকে চিরন্তন পরমাণু নিয়ে বেঁচ থাকবে। জগতকে তাঁর বৃহত্তর দানে সমৃদ্ধ করে তোলার সাধনাতেই তিনি মগ্নচিত্ত। তাই খুঁটিনাটি জাগতিক ঘটনা তাঁর মনে বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব নিতে পারে না। তিনি অতিথিবৃক্ষকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে বসলেন—ভুলেও গোড়েন পরমুহুর্তে, অতিথিদের আগমনে তখন শিল্পী-জায়গার মনের অবস্থা বদলন—তিনি সেই প্রথম জানলেন যে এঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁর কোথায় যেন একটা দেখা করার কথা আছে—কিন্তু সেটা হবে, কোথায় এবং কার সঙ্গে সেটা কিছুতেই মনে আনতে পারছেন না। অতএব, সেটা তখন তাঁর জীর্নই কর্তব্য—সে সব বিষয়ে থেঁচ রাখা।

তাঁর পোষাক তো রঙেরাঙ এক বিচিত্র, হঠাৎ দেখে মনে হয় সার্কাস ক্লাউন। এখন এ দোষ কার? কেউ কেন তাঁকে মনে করিয়ে দেয় নি যে কাপড়টি বদলানো উচিত।

তিনি ক্ষুধার্ত। সেজন্মে অবশিষ্ট তলুভর করছেন, কিন্তু ঐ অবধিই—কারণ তাঁর অভজানা, খাবার যখন দেওয়া হ'ল তখন একমুখ পরিভূষিত হাসি তেঁসে বললেন—‘ও অমার স্মিমে পোয়েছিল?’

কাজের জন্মে তাঁর কিছু সিদ্ধর টুকরো প্রয়োজন—গৃহিণী তাঁর পুরানো বা নতুন কোন শাড়ি থেকে শিল্পীর এই অভাবটুকু মিটিয়ে দিতে পারেন না? বোন নিমন্ত্রণে যাবার জন্মে সুসজ্জিত হয়ে শিল্পী-পত্নী শিল্পীর সামনে দাঁড়িয়ে। শাড়ির রঙটি হয় তো তাঁকে

মানিচ্ছে না, বাস তারপর—তারপর সেই মূল্যবান শাড়ি রূপ নিল পর্দায়।

শিল্পীর ঘর তাকে তো একটা ‘ওয়ার্কশপ’ বললেই চলে। কাগজ, রঙ, তুলি, ব্রাশে ছত্রাকার। ইতস্তত, বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়ানো। একজনকে তো ঢুকতে হবে খুব সতর্কতার সঙ্গে পাছে কোনকিছু নষ্ট হয়ে যায়। ঘর যদিও বা পরিষ্কার হল, দেখা গেল অনেক জিনিসই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, সঙ্গে-সঙ্গেই এও দেখা গেল প্রতিটি জিনিস তাঁর চোখের সামনেই রয়েছে।

দর্শনার্থী এসেছেন। শিল্পী তাঁর সাধনার মগ্ন, দেখা করার সময় কোথা তাঁর—এদিকে দ্বী-ও তো সাংসারিক কাজে ব্যস্ত—কিন্তু সে ব্যস্ততার কোন মূল্য নেই।

এই সব সমস্তাগুলির মধ্যই শিল্পী-পত্নীদের দিন কাটাতে হয়। শুধু দিন কাটানো নয়, সমস্তাগুলির সমাধানও করতে হয়। সমস্তাগুলির সমাধান মোটেই সহজসাধ্য (যে নয় তা পাঠক-পাঠিকার কাছে অজ্ঞাত নয়। জটিল গণিতের সঙ্গে এই সমস্তা তুলনীয়—তবে তার সমাধানও পাওয়া যায় কিন্তু এর? কোন দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের সমাধান করে বৈজ্ঞানিক অর্জন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি। কিন্তু সাংসারিক জীবনের এই দুইই সমস্তাগুলির সমাধানে সাফল্য দেখিয়ে শিল্পী-পত্নীরা কি পান—স্বীকৃতিবিহীন অবস্থাতেই তো উপেক্ষিতভাবে তাঁদের নিতে হয় পৃথিবী থেকে বিদায়।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদক : কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

## তলু ও মন

প্রতিমা রায়

তলু। নিশীথের স্রুপ্তি মাঝে থাকি  
তলুহীন নিশেধ একাকী,  
হে মোর হেচ্ছাচারী মন,  
কোথা তুমি বর বিচরণ?  
আছে কোথা এমন নগরী  
যেথা কভু নামে না শব্দরী  
‘চিরন্তন স্মৃষ্করণ ধরি’  
সেথা শুধু চলে বাওরা-আদা  
মুগুরিত অন্তহীন ভাষা।  
স্রুপ্তি শেষে তাই প্রশ্ন জাগে  
ছাড় দেহ কার অনুরাগে?  
নিত্য কোন্ অলঙ্কারে সাথে  
প্রেমের দেয়ালী কর বাতে?  
হেথা শুক রহি অচেতন,  
অনিত্যের অবাঞ্ছিত ক্ষণ  
কেটে যায় বুঝা অকারণ।  
লুগ্ধাচারী, বায়ুভরে চলি  
জড়তার যাও মোরে ছলি।

দিবসের ব্যর্থতার ভায়ে  
যাও চিত্ত কার অভিসারে?  
মন। অকপল ক্লাস্তি রয়ে জাগি  
রচি অর্থা নিশীথের লাগি,  
অরূপের নিভৃত দেউলে,  
অনান্যত পারিজাত ফুলে  
জগেরে রহে সর্বব্যাপ্তি ভুলে  
আগতির অনবদ্য রেশ  
সেথা লভি শাস্তির আবেশ।  
চিত্ত আমি তুমি মোর কাগ্না  
আমি নিত্য সেথা তুমি মারা,  
তোমারি আধারে এসে আমি  
ঘরার ধুলির ‘পরে নামি।  
অরূপের রূপধান করি  
তুমি মোরে রেখেছ বে ধরি  
তাই প্রিয়া তোমারে বিশ্বরি  
পারি না রহিতে দূরে দূরে  
ফিরে আসি চেতনার সুরে।



## এক অবিষ্মরণীয় শিল্পী

হার্ভার্ট বীরস ট্রী, পরবর্তীকালে আর হার্ভার্ট ট্রী, ইংলণ্ডের মঞ্চজগতে (১৮৫৩-১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭, ২৩ জুলাই) এক মস্ত বড় নাম।

বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসামান্য অভিনয়শৈলী, নিত্য নব নব উদ্বেগশালীন প্রতিভার পরিচয়, অথচ যেমন অগম্যমস্ত তেমনি অল্পস্থিতি ছিলেন তিনি। খোলাসেও অস্ত্র ছিল না তাঁর। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে নিয়ে বিজ্ঞিট ঘটত কম নয়।

বার্নার্ড শ'র পিগমেলিয়ন নাটকের ডেস-রিহার্সাল হচ্ছে। ডেস-রিহার্সাল ঘানে পুরোপুরি অভিনয়। দর্শকের আসনে বসে বন্ধুবান্ধব, গুণগ্রামী আর সমালোচক উপস্থিত। স্বয়ং নাট্যকার সামনের সারিতে।

মহলা চলছে। ট্রী সজেছেন অধ্যাপক হিগিন্স। নারিকার ভূমিকায় প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল। একটি দৃশ্য আছে, অধ্যাপক হিগিন্স-এর ত্বনিতুলক কথা আর কুপ্রস্তাব শুনে রেগে গিয়ে নারিকা তাঁর পায়ের স্লিপার খুলে অধ্যাপককে ছুড়ে মারবেন—এমনভাবে চিটি চিটি ছুড়বেন যাতে সেটি সোজা অধ্যাপকের মুখের উপর গিয়ে পড়ে। চিটি আগাগোড়াই মহমলের তৈরি, কাজেই লাগবার ভয় নেই।

যথাকালে সেই দৃশ্যটি এলো এবং যথারীতি ও যথাসময়ে নারিকার চিটি ট্রীর মুখের উপর গিয়ে পড়ল।

কথাগুলো ঠিকঠাক মনে আছে, কিন্তু চটির ঝাড়া তড়ানার ব্যাপারটি ট্রী বোঝা ভুলে গেছেন। তাই যখন তাঁর কথার উত্তরে রেগে কীপতে কীপতে শ্রীমতী ক্যাম্পবেল পা থেকে স্লিপার খুলে ট্রীর মুখের উপর ছুড়ে দিলেন তখন ভীষণ চমকে উঠলেন ট্রী, হতবুদ্ধি হলেন, যেন অপ্রত্যাশিত দারুণ আঘাত পেয়েছেন এইভাবে একটা অশ্রুটি বিষ্ময়জনক সহকারে ধপাস করে স্টেজের উপর বসে পড়লেন, তাঁর মুখে বিষম ক্রোধ, অপমান, বিষম ও বিস্মৃতির ছায়া ফুটে উঠল। কোন সাহসে অভিনেত্রী তাঁকে জ্ব্বো মারে? এ যে অবিদ্বান্ধ ব্যাপার। হাঁ করে বসে রইলেন। না গুঠেন, না কোন কথা বলেন।

আরক ভিতর থেকে তাঁর পাটী হাঁকছে, কিন্তু কেশোনে তার কথা, গর্জে উঠলেন ট্রী—‘কন্ সাহসে তুমি আমার এ ভাবে অপমান কর। আশ্পর্ষ্য!’

ট্রীর রকম-সকম দেখে আর কথা শুনে অভিনেত্রী রীতিমত ঘাড়ে গেছেন, ট্রী এ কি সব বসছেন, এ সব কথা তো বলার কথা নয়, আর অমনধারা বিচলিতই বা হয়েছেন কেন? নাটকে তো রয়েছে যে তিনি জ্ব্বো খেয়ে মাপ চাইবেন।

শেষ পর্যন্ত ট্রীকে বোঝাতে হল যে অভিনেত্রীর কোন দোষ নেই, নাটকের মধ্যেই এই ব্যাপার আছে, আর তা তো তিনি জানেনই।

ঘাড় নাড়লেন ট্রী। বললেন, ব্যাপারটা তাঁকে আগে ভাল করে বোঝানো হয় নি, মহম্মার সময় শ্রীমতী ক্যাম্পবেল তো কোনদিন তাঁকে জ্ব্বো ছুড়ে মারেন নি।

তাঁর এই যুক্তি শুনে সবাই হাসতে লাগল। বার্নার্ড শ' বললেন, ‘অভিনয়ের সময় যদি ঠিক এমনি ভুলে গিয়ে ওইভাবে বোকার মত



স্টেজের উপর বসে হাঁ করে চেয়ে থাকতে পারেন, তা হলে আমার নাটকের চেয়ে ধল হবে আপনার অভিনয়।’

তখুই এমনি বিস্মরণ নয়, তার সঙ্গে অদ্বুত সব খেয়ালেরও সংযোগ ঘটত মাঝে মাঝে। একটি নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী। সজেগুজে উইংস-এর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রবেশ। পাশে দ্বী দাঁড়িয়। হঠাৎ চকল হয়ে উঠলেন ত্রীকে বললেন, ‘জলদি! আমার এই কোর্টের বোতামধরে একটা নীল ফিতা চাই। শীগ গির নিয়ে এসো।’

দ্বী গেলেন মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে। ছুটি এলো মঞ্চাধ্যক্ষ। নীল ফিতে? কিন্তু সে রকম কোন ইঙ্গিত তো নাটকে নেই! না থাক, না থাক! ব্যাকুল হলেন দ্বী কিন্তু এখন এই হুতুর্বে একটা নীল ফিতা তাঁর চাই-ই চাই।

এদিকে আর দেরি করবার উপায় নেই, তাঁর স্টেজে ঢোকবার সময় এসে পড়েছে। কাতর হয়ে পড়লেন ট্রী। নীল ফিতা না হ’লে অভিনয় কিছুতেই ভাল করে করতে পারবেন না। সব বড়ি পণ্ড হয়।



শমিলা ঠাকুর—ছায়াছবির বাইরে

এমন সময় সেট সাক্ষরিত্বের তাঁর দ্বী বিশ্বকর উপস্থিতবুধির পরিচয় দিলেন। তাঁর পরনে ছিল সাধা গাউন। তারই একাংশ ছিঁড়ে নিয়ে সুরু একফালি ফিতা তৈরি করে সাজগারে গিয়ে সেটিকে নীল রঙে ডুবিয়ে এনে পরিবে দিলেন স্বামীর কোটের বোতামখারে। আনন্দে উদ্দাপনার উদ্বেল হয়ে ট্রী মঞ্চে প্রবেশ করলেন, প্রেরণাদীপ্ত অভিনয় নিমেষে অভিজ্ঞ করে দিলেন দর্শকদের।

হার্ভার্ট ট্রীর কাছে অভিনয় ছিল নিত্য নতুন পরীক্ষা। চরিত্রের মূল কাঠামোকে বজায় রেখে নিত্য নতুন করে তাকে সৃষ্টি করতেন। একজন প্রাজ্ঞ সমালোচক তাঁর অভিনয় সবক্ষে লিখেছিলেন যে, তিনি একই নাটকে ট্রী'কে বহু রাত্রি দেখেছেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, প্রতি রাত্রিই ট্রী কিছু না কিছু নতুন অভিব্যক্তি ও নতুনতর আঙ্গিক সংযোজনা করে চরিত্রটিকে নিত্য নতুন করে রূপলান করেছেন।

এই ক্ষণস্থায়ী অভিনেতার চরিত্র ছিল বড় বিচিত্র। অভিনয়ে এমন বিরাট দাপট, অথচ যেমন অস্বাভাবিক-প্রকৃতি তেমনই আপনভোলা ছিলেন তিনি। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সমালোচক হরত সাজগারে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, বাস, তাঁর সঙ্গে আলাপে যত্ন হলেন, একটু পরেই যে তাঁকে স্টেজে যেতে হবে তা যেমালুম জ্বলে বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত হরত এক রকম টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে স্টেজে ঠেলে দিতে হল।

দৃতিশক্তিও প্রখর ছিল না তাঁর। প্রায়ই সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে নিজের অভিনয়ের পারস্পর্য ভুলে যেতেন, সহ-অভিনেতা বা বলছে তা যেন সেই প্রথম শুনছেন, হাঁ করে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন, তারপর তার প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে নিজের পাঁট ভুলে গিয়ে হরত একটা মনগড়া উত্তর দিলেন। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল নিজের ভূমিকার সংলাপ। 'তখন এমন কথার বাঁধুনি আর অভিব্যক্তির গাঁথুনি দিয়ে নিজের খলনটুকু মানিয়ে নিলেন যে, সেই খলনাংশটুকুই হরত সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে অপূর্বতম হয়ে উঠল।

মাইনেকরা অভিনেতা থেকে যখন নিজে থিয়েটারের মালিক হলেন তখন দারিদ্র্য বাড়ল অনেক কিন্তু খেয়াল কমল না। একটা নাটকের অভিনয় বেশিদিন চালাতেন না। কিছুদিন পরেই মঞ্চাধ্যক্ষকে ডেকে হাই ভুলে বলতেন, 'বড্ড একঘেয়ে লাগছে ম্যানেজার, আজ কোন নাটক খোলবার তোড়জোড় কর।'

মঞ্চাধ্যক্ষ হরত বললেন যে, যে-নাটক চলছে তাতে পরগা আসছে প্রচুর, প্রতি রাতেই হাউস ফুল, এখন এ-নাটক বন্ধ করার কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু কে শোনে তার কথা। খোল শেজপীর। লাগাও প্রাচীর পত্র।

তিনশো রাত্রি চলবার পরেও যে-নাটকে প্রতি অভিনয়ে প্রেক্ষাগার



পূর্ণ হচ্ছে সে-নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। মঞ্চস্থ কবলেন জুলিয়াস সীজর, নতুনভাবে নতুন ঢং-এ।

কিন্তু শেক্সপীরের নাটকবলীর প্রযোজনায় তাঁকে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, দুগুণটির বাজলোর দ্বারা তিনি অভিনয়ের স্বচ্ছন্দগতিকে ব্যাহত করেছেন, নাট্যকারের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করে দুগুণের মধ্যে ও

অভিনয়ের ভিতরে বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলবার অতি-ব্যগ্রতায় সময় সময় তিনি অত্যন্ত খুলতায় পরিচয় দিয়েছেন।

কঠোর সমালোচনা নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু টী কখনো শেক্সপীরের অসম্মান ঘটান নি। তাঁর জুলিয়াস সীজরের অভিনয় দেখে লর্ড রোজবেরি বলেছিলেন, 'কৃত্রিমের রোমীয় ঐতিহ্যকে যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, একজন সত্যিকারের রোমানকে যদি দেখতে



জনপ্রিয় নায়ক—অনিল চট্টোপাধ্যায়

বহুবলী : আবেদী'৭১

ইচ্ছা কর তা হলে হার্বার্ট ট্রীর জুলিয়াস সীজরের অভিনয় দেখে এসো।'

তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মন্তব্য করেছিলেন যে, হার্বার্ট ট্রী বর্তক শেক্সপীরের নাটকের প্রযোজনায় সেই সেই অংশই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠত, যে সব অংশ নাট্যকারের রচনা নয়, হার্বার্ট ট্রীর বলনাগ্রহৃত। একথা আংশিক সত্য। অভিনয়ের মধ্যে ট্রী অনেক সময় নটিক-বহির্ভূত এমন সব ছোট ছোট 'ঘটনার' সৃষ্টি করতেন যেগুলি অসামান্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত।

'দ্বিতীয় রিচার্ড' নাটকের অভিনয়কালে তিনি একটি কুকুরকে স্টেজে নামালেন। নাটকে অবশ্য কুকুরের কোন উল্লেখ নেই। দেখানো হল, কুকুরটি রাজার বড় প্রিয় এবং রাজার বিশেষ অমুগামী। তারপর দেখানো হল, রাজার সঙ্গে মহীর বিরোধ যখন চরম সীমায় উঠেছে এবং মহীই জয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখন কুকুরটি রাজাকে পরিত্যাগ করে মহীর কাছে গিয়ে তার পা চাটতে লাগল, মহীর মুখে ফুটে উঠল সামলোর কুটিল হাসি, আর রাজা সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বারেক কুকুরটির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘাশ রোধ করতে করতে মগ্ন থেকে প্রস্থান করলেন। নাটক-বহির্ভূত এই দৃশ্যের অবতারণা দর্শক ও সমালোচকদের বিস্ময়ভিভূত করেছিল।

সময়ের সময়ে একটামাত্র চাহনির দ্বারা হার্বার্ট ট্রী একটি চরিত্রের সমগ্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। ঐ নাটকেই শেক্সপীরের



উত্তমকুমার—একটি বিশেষ ভঙ্গিমা

বর্ণনায় আছে, জনগণের বিজ্ঞপ্তি আর বহুস্তির ভিত্তর দিয়ে রাজা যোড়ায় চড়ে ওয়েস্ট মিনিষ্টার হল অভিমুখে চলেছেন। দুগুটি একজনের জবানিতে বলা হয়েছে। ট্রী স্থির করলেন বর্ণনাটি অভিনয় করে দেখাতে হবে। যোড়ায় বার করলেন স্টেজে। মঞ্চে উপর যোড়ায় চড়ে বেরলেন নেহাৎ সহজ ব্যাপার না। তার উপর চারিদিকে বহু লোকের চীৎকার, ঠেং-ঠেং।

কিন্তু যোড়ায়টিকে শিথিয়েছিলেন ট্রী আশ্চর্য দক্ষতার। চারিদিকে লোকজন গলা ফাটিয়ে রাজাকে গালাগালি দিচ্ছে আর তারই ভিতর দিয়ে অথপূর্বে চলেছেন রাজা হেটমুখে! বিপদে যোড়ায়ের মাথাও ঝুলে পড়েছে, অতি ঘরে ঘরে পা ফেলে প্রভুকে নিয়ে চলেছে সে, জনতার চীৎকারে এতটুকুও ঘাবড়াবে না। একটু দূরে গিয়ে প্রস্থানের পূর্বে রাজা একবার মুখ তুলে দর্শকদের দিকে চাইলেন, মাত্র একটিবার, আর তাঁর সেই একবারের মর্মস্পর্শী দৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সমগ্র জীবনের গভীর হতাশা আর বরুণ-বেদনা। বাক্যহীন সেই নীরব অভিযুক্তি যেন সহস্র কাতর কথার গুঞ্জন তুলে সারা প্রেক্ষাগাংকে অভিভূত করল। —অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

## স্মৃতির সঞ্চে মরিস শিভোলিয়র

মনে আছে যেদিন প্রথম তাঁর মুখোমুখি হই, সোভিয়েত জিজ্ঞাসিতছিলেন তিনি আমার দিকে, উজ্জ্বল নীল একজোড়া চোখ, অপরোচের সেই সর্বজনপরিচিত বিশেষ ভঙ্গিমা, ফরাসী ধরণের বাচনভঙ্গী—সবই পূর্ণপরিচিতি, কিন্তু যে কথাগুলি তিনি শোনালেন আমাকে তা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। 'আমার জীবনে' বললেন তিনি, 'দেহকাননার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রেম ও স্নেহবোধ এবং আমি মনে করি প্রণয় ব্যাপারে সেটাই সঙ্গত।

'অবশ্য এখনও যে আমি কোন স্ত্রীমণী নারীকে দেখে মুগ্ধ হই না তা নয়, তবে সেটা নিছক সৌন্দর্যমুগ্ধতির জগুই, ঠিক যেমনভাবে আমরা কোন শিল্পকর্ম দেখে তারিফ করি, রমণীর রূপও আজ আমার চোখে সেই পর্যায়েই।

'আমার বয়সে পৌঁছলে জানতে পারবেন যে, সৌন্দর্য দেখে শাস্ত মনে উপভোগ করতে পারাতেও কত বড় আনন্দ নিহিত থাকতে পারে।'

তবু এই বর্ষাবান পুরুষ, বীর সব চুল সাদা হয়ে গেছে, বয়সের ভারে চামড়া গীর লোল, সৌন্দর্যের ও পৌরুষের শেষ রশ্মিতে বীর দেহ এক বিধর্ম মাথুর্থে পূর্ণ হয়ে আছে, আজও সহস্র সহস্র নারীর চোখে ফরাসী পৌরুষের প্রতীক বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন, তাঁর কথা শুনে শুনেই ভেবেছিলাম আমি।

তিনিই সেই শাশ্বত প্রেমিক বীর স্বপ্ন আজও দেখে মেরেরা, কালে তাঁর মোহ হরণ করতে পারে নি। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে 'শিভোলিয়র' এই নামটিকেই উদ্দাম প্রেমের প্রতীক স্বরূপ তারা পূজা করে আসছে।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'এখন লোকে আমাকে নারীসক্তান্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন করলে সত্যই বিব্রত বোধ করি, এ বয়সে ও সব সত্যই অর্থহীন বলে মনে হয় আমার।'

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমার তো বিশ্বাস হল না।

## রূপট

এখনও এ ধরনে যে কোনও মেয়েকে তিনি নৈশ-আনন্দের জগৎ আমন্ত্রণ করলে, সে হয়ত আনন্দের সঙ্গেই সম্মত হ'বে, তা তার বয়স সতেরোই হোক বা সত্তরই হোক, আর সেটা সম্ভব এজ্ঞাই যে, তিনি শুধু বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতাই ছিলেন না, আজও তিনি এক আকর্ষণীয় পুরুষ।

১৯৩০ সালের এক শ্রাবণীয় দিনের কথা মনে পড়ে গেল আমার; যেদিন লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে মরিস শিভোলিয়ের বন্দী হয়ে পড়েছিলেন দশতাজার উংসাহী নারীর এক বিরাট বেঁটীর মধ্যে, পুলিশের কর্ডন ভেঙে তারা ধেয়ে এসেছিল তাঁর দিকে, আরকচিছু হিসাবে শত শত টুকরোর পরিণত হয়েছিল তাঁর পরিধেয়।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সারা বছরের আয়ের চেয়েও অধিক ছিল শিভোলিয়ের সাপ্তাহিক উপার্জন, ক্লাব সেবল বা ক্যারী গ্রাটের চেয়েও জনপ্রিয় ছিলেন তিনি।

'সমস্তটাই বেনে অবাস্তব, বেনে মেক', সত্যি বলছি এ ধরনের জীবনকে সত্যকার জীবন বলেই মনে হয় নি কোনদিন', তিনি বলে উঠলেন আমার উদ্দেশ্যে।

সে সময়ে নাকি তাঁর ধারণা ছিল যে, ছাত্রাচিত্রের মাধ্যমে যে জনপ্রিয়তা তিনি অর্জন করেছেন তার আগু হ'বছর বা বড়জোর তিন বছর; আর নিজের ফরাসী উচ্চারণকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য নিয়মিত ফরাসী শেখানোর ক্লাসে যোগ দিতেন। কিন্তু সে ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীদ্বিগ্রন্থ বছর কেটে গেল তারপর,



মৌমিত্র টোপাখ্যার—ছাত্রাচিত্রের বাইরে



অপ্রিয়া চৌধুরী—ছাত্রাচিত্রের বাইরে

জনপ্রিয়তার মুকুট তাঁর মাথার সপরি শোভা পেল এই দীর্ঘকাল ধরে। আর সেই সঙ্গে তিনি খ্যাত হলেন পৃথিবীর পরলো নথ্যের প্রেমিকদের একজন বলে।

তাঁর নামমাত্র উচ্চারণ করার জগৎ বহু রমণী তাদের পতিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হল। কাউকে শহুবে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হল না পর্যন্ত।

এক নিবন্ধে তাঁর নাম ব্যবহার করে জয়যুক্তা হলেন এক নারী এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি তা স্বীকার করলেন।

শিভোলিয়ের জীবনে বিবাহ একবার মাত্রই করেন কিন্তু অসংখ্য রমণীর সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মালিন ডিমেরিট্রি থেকে মেরিলিন মনরোও উপস্থিত।

এই সব কারণে তিনি অত্যধিক মাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠেন। একসময় তিনি বলেছিলেন যে, 'আমার প্রাতিভে অসংযম ও সতর্কতা এ দুটোই সমানভাবে বর্তমান; তবে আমি মনে করি যে, সতর্কতাই বেশি প্রয়োজনীয়, আর সেজন্যই অসংযম বা ইন্দ্রিয়পরতার সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধিকে সদাই সংযত রাখা করে চলি; কখন দাড়ি টানতে হবে, এ হিসেবে আজও ভুল করি নি কোনদিন।

'বহু নারীর আবির্ভাব ঘটছে আমার জীবনে; কিন্তু কখনই সম্যক-

ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলি নি, আর হরিত বা সেজ্জাই আজও আমার আকর্ষণ রয়েছে ভূট্ট।' অসম্ভবতই জানালেন শিল্পিলয়র।

তার বিবাহিত জীবনেও এই সন্তর্কতার পরিচয় বহন করে। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আমার দাম্পত্যজীবন সফল হয়নি, অন্তত আমি বা আশা করেছিলাম তদমূহুরূপ হয় নি এবং সেজ্জাই আমি নতুন করে আর জড়তে চাই নি, হয় তো তাতে অবস্থাটার পুনরাবৃত্তি ঘটত মাত্র।'

তার দাম্পত্যজীবনে অসুখী হওয়ার একটা জোরবান্ধু কারণ অবস্থা ছিল। নৃত্যসঙ্গিনী যে নারীকে একদা তিনি 'জীবনসঙ্গিনী' হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন সে নারী ছিলেন অত্যধিক মাত্রায় সান্দ্রহৃদয়।

এক সময় বলেছিলেন শিল্পিলয়র, 'পরিমিত পানাহার ও পরিমিত প্রেম-জীবনই মানুষের সাফল্যের মূল মন্ত্র, একজন খাটি ফরাসী হিসাবে আজীবন আমি এই রীতিতে চলতে চেষ্টা করেছি।'

কিছুদূর মৌন রয়েলেন তিনি, সাফল্যময় দীপ্তজীবনের শেষ প্রান্তে আসা এক পথিক-মাত্রা যেন জীবনব্যাপী পদচারণার শেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিল।

আবার মুখর হয়ে উঠল তার কণ্ঠ, 'এখন আর নাবীর পেছনে ছুটতে ভাল লাগে না, আমার সে বার্ক্য এসেছে এতে আমি আনন্দিত; প্রেমে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু আলাও বড় কম নেই—সে আশা থেকে বোধ হয় এতদিনে নিবৃত্তি পেলাম।'

কিন্তু এতদিনের নিপুণ শিক্ষার কি সত্যই মৃগয়া ভুলে গেছেন? কোন এক রেস্টোরার গৃহ-প্রেমিকা মার্লিন ডিভেইটকে দেখতে পেয়ে

সানন্দে চুপন করে বাগত জানিয়েছিলেন কেন তবে? সে আদর, সে উচ্ছ্বাস কি জীবন সম্বন্ধে বাতিল্পহ এক বংশ পুরুষের?

মেয়েদের কাছে আজও কেন তিনি রোমাণ্টিক প্রেমের রাজা বলে পরিগণিত হন? কি রহস্য আছে তার? কোন বাহ্যমুখে আজও তিনি আকর্ষণীয়?

বিশ বছর আগে একবার মন্তব্য করেছিলেন শিল্পিলয়র, 'আমি যে মেয়েদের খুব বেশি বৃষ্টি তা নয়, তবে যেটুকু বৃষ্টি তাতে মনে হয় তারা নিছক পশুর পছন্দ করে না।'

এ বিষয়ে আরও প্রশ্ন করলাম আমি, প্রথমটা কিছু ইতস্তত করে শেষে খোলামেনেই জবাব দিলেন তিনি, 'বোধ হয় মেয়েদের সম্বন্ধে এই দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতায় এতটুকু আমি জেনেছি যে, তারা প্রেমকেই সবচেয়ে বড় আসন দেয়, প্রেমহীন দেহভোগে তাদের কুচিই যে শুধু নেই তা নয়, অসুকারিত প্রেমকেও উপলব্ধি করতে তাদের হুল হয় না বগনও।'

—রেবা দেবী

## চলচ্চিত্রে সুভাষ-জীবনী

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সংকীর্ণ দৈনিক দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের ত্যাগভাষ্য, মহিমা-প্রদীপ্ত ও গৌরবালোকিত জীবনকাহিনী চলচ্চিত্রের রূপ নিতে চলেছে বোম্বাই থেকে এই সুবাদ প্রচারিত হয়েছে। ছবিটি হিন্দী ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই গৃহীত হবে। তেলুগু ভাষাতেও গৃহীত হবার কথা আছে। পণ্ডিতানভার নিয়েছেন হিরায় সেন। ক্ষুদ্ররাম, বাঘা যতীন প্রমুখ ভারতের মুক্তি-কামী



সদ্যা রায়—ছায়াছবি বাইরে

বহুমতী : শ্রাবণ '৭১

মহান সন্তানদের জীবনীচিত্র পরিচালনার ইতিপূর্বে ইনি যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের বালা ও বৌদনকালের ঘটনাবলী, রাজনৈতিক জীবন, কংগ্রেসের সহিত মতভেদ, ঐতিহাসিক অন্তর্ধান, আহত সৈনিকদের মিটার বিতরণ, ভারতীয় বোম্বারদের মনোরঞ্জন, জঙ্গ নাট্যোপহার, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধোৎসাহ, সাংঘর্ষিক জার্মানী থেকে মাদাগাস্কার যাত্রা, দেশের বাইরে থেকে বিদেশীর সঙ্গে দুর্বীর সংগ্রাম প্রভৃতি এই চিত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, মোতিলাল নেহরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, রাসবিহারী বসু, তাজো, অকিনলেক প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির এই চিত্রে এক আকর্ষণীয় সমাবেশ ঘটবে। এই চরিত্রগুলি রূপায়ণের ভার পড়বে বিভিন্ন শিল্পীর প্রতি। আফগানিস্তান, জার্মানী, জাপান, ইটালি, দূরপ্রাচ্যে প্রভৃতি দেশগুলি চিত্রগ্রহণের স্থান হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেতা প্রেমনাথ নামভূমিকার আত্মপ্রকাশ করবেন। ছবিটিতে জাতীয়তা উদ্দীপক এবং সুভাসচন্দ্রের প্রিয় গানগুলি গীত হবে। সঙ্গীতায়নের ভার গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমরা এই প্রচেষ্টাটির সাফল্য সর্বতোভাবে কামনা করি এবং এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার কোন অবকাশ নেই যে, এই সংবাদটি ঘোষিত হওয়ার পরবর্ত্ত থেকে সারা বাঙলা অনন্ত আগ্রহ নিয়ে ছবিটির প্রেরণ করবে।

### মিশরের হলিউড

আজকের জাগ্রত আফ্রিকার প্রাণকেন্দ্র মিশর। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অন্ততম লীলাভূমি হিসাবেও মিশর সারা বিশ্বের বিশুল প্রদ্বার 'অধিকারী'। সংবাদ এসেছে যে, অদূরভবিষ্যতে হলিউডের মত মিশরে একটি চিত্রনগরী গড়ে উঠবে। নীলনদের তীরে এই বিতীর্ণ হলিউড সৃষ্ট হবে। এ জঙ্গ ব্যয় হবে নয় লক্ষ পাউণ্ড। চিত্রনগরীটিকে বখাসাধ্য ভ্রমকালো করে তুলে বিলাস-নগরীতে পরিণত করা হবে। বাগান, বর্ণা, ভোজনাগার, 'সুইমিং পুল' ছাড়া বিদেশী তারকাদের জন্য বিশেষ করে একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল নির্মিত হবে। নীলের তীরে বর্তমানে আঠারটি আধুনিক কুড়িও নির্মিত হচ্ছে। এর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হতে পাঁচ বছর সময় লাগবে। তবে ১৯৬৬ সাল থেকেই এই চিত্রনগরী কার্যোপযোগী হয়ে উঠবে। বছরে দেড়শ'খানি ছবি নির্মাণের ক্ষমতাসম্পন্ন এই চিত্রনগরীতে চারটি পরিচ্ছিন্নাগারও গড়ে উঠছে। বর্তমানে মিশরে অবস্থিত কুড়িওর সংখ্যা—নয়। গঠনকার্য সমাপ্ত হ'লে এই চিত্রপুত্রী মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম চিত্রনির্মাণ কেন্দ্র বল পাইগণিত হবে।

### সংবাদ বিচিত্রা

আজকের ভারতবর্ষের প্রণয় রূপকার পূর্ণাঙ্গাঙ্ক রাজর্ষি রামমোহনের বিশ্বরকর জীবনী অবলম্বনে একটি চিত্রনির্মাণের পরিবর্তন গ্রহণ করেছেন সুবিখ্যাত অরোরা চিত্র প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্ত্তী নিবেদন 'ভগিনী নিবেদিত'। ছবিটি দর্শকসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জনে এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়েছে। রামমোহনের জীবনীচিত্রটিও পরিচালনভার অর্পিত হয়েছে বিজয় বসুর প্রতি। নামভূমিকার অপরীর্ণ জন শক্তিমান নট বসন্ত চৌধুরী।



অপরীর্ণাশঙ্কর—ছাত্রাছবির বাইরে



রবীন্দ্রনাথের মতে কাশী ভারতের প্রদেশ নয়, কাশী ভারতের আত্মা। ভারতের বিশ্ববন্দিত সত্যতা ও ঐতিহ্যের মূলে এই সপ্ৰাচীন নগরীর অবদান যেমনই বিরাট তেমনই ব্যাপক। কাশীর বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা যায় না। যুগ যুগ ধরে কাশী ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস গঠনে এবং তার বৈশিষ্ট্য আরোপে যে বতখানি সহায়তা করে আসছে তার তুলনা নেই। এই পুণ্যভূমি সঙ্কীর্ণ একটি প্রামাণ্য চিত্রনির্মাণের কাজ শেষ করেছেন অমূল্য রায় প্রোডাকশন্স। এই অভিনন্দনীয় চিত্রটি পরিচালনাও করেছেন অমূল্য রায়। এই চিত্রটিই কাশী সঙ্ক্ষে প্রথম প্রামাণ্য চিত্র দলিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঁদের বীরত্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছে বি কুনওয়ার সি তাঁদের অগ্রতম। এই বিপ্লবনায়কের মাতৃভাষা ভোজপুরীতে তাঁর একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী। তাঁর জন্মগ্রামে ময়ূরং অশুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে ছবিটি মুক্তি পাবে বলে অনুমান করা যায়।

পুণায় অবস্থিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সঙ্গীত ও ভারতের বিশিষ্ট



ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়—হায়াছবির বাইরে

সন্তান স্বর্গত ডঃ মুকুন্দরাম জয়াকরের বাঙালোটি যিৎ ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া অধিকার করেছেন। ছাত্রীদের হোস্টেল হিসাবে ঐ বাঙালোটি অতঃপর ব্যবহৃত হবে বলে জানা গেছে।

ডেক্ট রামণ নামে বাইশ বছরের একটি যুবক সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তারের কারণস্বরূপ জানা গেছে যে, নিজেকে একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত করে তিনি দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রীদের আলোকচিত্র গ্রহণ করতেন। পরে, এই মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে ও তিনি গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনার দেখা যাচ্ছে যে, মিথ্যাবাদ ও প্রতারণা কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না বা গোপন থাকে না। এই যুবকটি দেখা যাচ্ছে নির্ভয় নন—একটি বিশেষ গুণের অধিকারী। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করলে আলোকচিত্রী হিসাবে ইনি হয়তো কালে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু জীবনের প্রথম পর্বই তাঁর কালিমামণ্ডিত হয়ে গেল—এই ধরণের যুবক দেশে-বিদেশে অসংখ্য আছেন, এই ঘটনা থেকে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ভারতীয় চিত্রজগতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার অধিকারিণী ত্রিবাঙ্কুরের নতকী ভগিনীত্রয়ের সর্বকনিষ্ঠ রাগিণী সম্প্রতি শ্রী ভি মাধবন থাম্পির সঙ্গে বিবাহযুক্ত আবদ্ধ হয়েছেন।

সম্প্রতি জাকার্গায় দশ দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত তৃতীয় এ্যাক্সো-এশীয় চলচ্চিত্র-সম্মেলনে দক্ষিণ-ভারতীয় অভিনেতা রঙ্গ রাও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে বিভূষিত হয়েছেন। তেলেগু চিত্র 'নারথানশালা' তাঁকে এই সম্মান একে দিয়েছে। পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন রাষ্ট্রনায়ক সূর্য্য।

সম্রাট সন্তুম এডোয়ার্ডের একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের সুবাদ ইতঃপূর্বে পাঠকসমাজে প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে জানা গেল যে, তাঁর প্রপৌত্রী ইংল্যান্ডের বর্তমান অধিরাজী রাণী এলিজাবেথ এই প্রচেষ্টা কাঁধকর হলে দুঃখিত হবেন জানিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে এই পরিকল্পনার তিনি বিরোধী। এই পরিকল্পনাটি বজ্রিত হলেই তিনি আনন্দিত হবেন যথেষ্ট পরিমাণে।

লণ্ডন থেকে প্রচারিত হচ্ছে যে, ইতালীয় সরকার তাঁদের দেশের ছায়াছবি সেলস ব্যবস্থার আওতা থেকে মুক্তি দেবেন। তাঁরা মনে করেন সেলস ব্যবস্থা বলবৎ থাকলে তা চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর হয়ে পড়ায়, তার প্রকাশভঙ্গি ব্যাহত হয়, তদুপরি সেলস ব্যবস্থা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতালীয় ছবিকে আইনের শিকার হতে হয়েছে, এই সব কারণে সেলস ব্যবস্থা তুলে দেওয়াই এরা সমীচীন বলে মনে করেছেন।

দক্ষ চিত্রাভিনেত্রী শার্লো ম্যাকলেন (৩৪) তাঁর বর্তমান ছবির কাজ শেষ হলেই একা ভারতভ্রমণে আসবেন বলে জানা গেল। হলিউডের অভিনেত্রীদের মধ্যে বিশ্বভ্রমণকারিণী হিসাবে এর স্থান সর্বোচ্চে।



# শোখীন সমাচার

খাসদখল

রসরাজ অমৃতলালের খাসদখল নাটকটি একদা দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তার শিখরদেশে আরোহণে সমর্থ হয়েছিল। এই নাটকে হাশ্বাস এবং বিক্রমের মাধ্যমে রসরাজ সে যুগের সমাজের এক বিশেষ দিকের যে স্পষ্ট আলোকিত করে গেছেন—ইতিহাসের দাবীতে তা এক বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। স্বদীর্ঘকাল পর বিখ্যাত অভিনেতা হরিন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বৈকী গোষ্ঠী' এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে অভিনবদের পরিচয় দিলেন। বিভিন্ন চরিত্রে আশ্রয়ণ করেন জগজ্জুয়ার ঠাকুর, তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপ সেন, দীপেন মুখোপাধ্যায়, কেদার বাহ, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবব বসু, উপেন মল্লিক, সুরজিতকুমার ঠাকুর, আমদাস সাহা, সুনীত মল্লিক, অসীম ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, সাগর সেন, চিত্রা ঠাকুর, রেখা গুপ্ত, প্রমতি গঙ্গোপাধ্যায়, ডলি গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কারাগার

প্রবীণ নাট্যকার মম্বথ রায়ের 'কারাগার' নাটকটি একদা যে বিরাট আলোড়ন এনেছিল—যা দর্শকমহলে তা শেষ অবধি বৃষ্টিপ সবারকরে পুষ্পিত করে তুলেছিল। একথা অজানা নয় যে, পৌরাণিক পটভূমিকে অবলম্বন করে নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে

'রাবাক' চিত্রের একটি দৃশ্যে সজ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকী দত্ত ও রেখা বাহ

জনচিত্রে এক বিরাট ও ব্যাপক জাতীয়-মুক্তির চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। সেদিক দিয়ে এর মূল্য অনস্বীকার্য। ইউনিট থিয়েটারের উদ্যোগে এই নাটকটি সম্প্রতি দর্শকসমক্ষে নিবেদিত হল। কংসের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন স্বনামধন্য শিল্পী মোহন ঘোষাল। অস্ত্রাঙ্ক চরিত্রগুলির রূপ দেন গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য, অলোক চট্টোপাধ্যায় (পরিচালক), মলয় মিত্র, ত্রিশান্ত মুখোপাধ্যায়, অম্বপপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অমর পাল, তপন বসু, রবি পাল, প্রজিত দে, রথীন দত্ত, সুরেশ দত্ত, গীতা নাগ, লতা দত্ত, রাণু রায়, জহ্নবী বর।

আদর্শ সংসার

স্বর্গের সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'কপ ও চন্দ' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় অভিনীত হল 'আদর্শ সংসার'। পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোঁ এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পরিজনদের কেন্দ্র করে স্বথ, দুঃখ, আঘাত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হানি, কান্দা সমন্বিত সাধারণ বাস্তবী গৃহস্থ-পরিবারের জীবনযাত্রার একটি পরম উপভোগ্য ও মধুর চিত্র এই নাটকের উপজীব্য। চরিত্রগুলির রূপদান করেন দীমান বসু, দেবী চক্রবর্তী, মোহনলাল ভট্টাচার্য, দিলীপ মিত্র, অজিত দত্ত, অসিত মিত্র, অরুণ বসু, সুনীল কুণ্ডু, অজিত দত্ত, রাসবিহারী দাস (পরিচালক), গীতা নাগ, দীপিকা দাস, শিখা ভট্টাচার্য, সোহাগা বিশ্বাস, গীতা সেন, স্বপ্না বিশ্বাস প্রভৃতি।



বর্তমান সংখ্যার বঙ্গপট বিলম্বে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি মাসিক বঙ্গমতী শঙ্কর হইতে সংগ্ৰহীত।  
বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় সান্যাল ও সত্যরঞ্জন ঘোষ কল্ কল্ গৃহীত হইয়াছে।

# শাশ্বত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নিমিত্ত চক্রবর্তী

—আহা হা! ব্যস্ত হয়ে বিয়েটা ভেস্তে দিয়ে না।

হাস্য কথা আরও ছেঁতের বিয়ে দিতে চাও, কেমন। তুমি? এখন সোনিমিণি হয়ে ঘুমোও গা বাও। তারপর বিধামত বাবার সঙ্গে বসে, একটা সম্মিলিত অধিবাসনে কথ্য নির্ণয় হবে। কেমন?

আর কথা এগুলো না। কল্যাণী শুতে চলে গেল, আলো নিভল ঘরে ঘরে। ঘুমোবার আগে একটু ভাল ভাল। তপতী মন্দ কি! কিন্তু সে যেন কেবল সন্ধ্যার ছায়া, বিশ্রামের নীড়। কালের পর দিনের শেষে সে আর তার সেতার একত্রে হয়ে যে মাধুর্য রচনা করে, তারও প্রয়োজন আছে পূর্বস্বপ্নের জীবনে। কিন্তু যে গতিতে আজ চলেছে মানুষ—তার বেগে কই তপতীতে? বোঝাই যাচ্ছে না ওকে। মনে পড়ল ভাস্করের লিলি বোসের কথা। কি উদ্দাম। স্কুটারের স্পীডে ভয় নেই, শাস্তা নেই রাত জেগে নাচে। বাস্তবক্ষেপে ধরা পড়েও অবজ্ঞা হয় না, মৌনতা ঘনায় না অধরপটে। ভালোবাসার কথাতে ওড়ার হাসির ফুলঝুরি।

ভালোবাসা! প্রেম! কথাগুলো এখন অধিধান হতে বাদ দিলেই হয়। ভাল ভাল। কেউ কি ভালোবাসছে আজকাল? কোন মেয়ে, কোন ছেলে? লিলি? তপতী? জয়ন্তী? প্রবীর? সে নিজে? কেউ না। ক্যাস্টাম আর অসম্পূর্ণতা লাগে জানে ভালোবাসার। তাই তো ধৈর্য নেই, ক্ষমা নেই। একটু জটিলেই সব চুরমার হয়ে যায়। ও দেশেও দেখে এল ভাস্কর—কোন মূল্য নেই ভালোবাসার। সামান্য জাঁচে ফলে যাচ্ছে সব মাথা। তখন তার নয়টা দেখে বিস্মিত হয়েছি সে। ফিরে এসে দেখল এ দেশেও উঠছে সেই হাওয়া—প্রেমের চেয়ে বড় আত্মসম্মান, ঘরের চেয়ে বড় স্বাধীনতা।

মাঝে মাঝে ভাবে ভাস্কর—সেদিন ছিল ভাল, বখান আদম নরনারী কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে মনের প্রথম ভূষণ রূপ না ঢেকে, মিলিত হত অবহেলায়। বিচ্ছিন্ন হত আকর্ষণ। আজ মানুষের রক্ত ভরে একটা ঝড় জেগেছে তাই শাস্তি নেই, তৃপ্তিও নেই। চলার বেগ ধামলেই ব্রহ্মহত্যার অবকাশে নিজের রূপ দেখে বুঝি চমকে যাবে সবাই, তাই জাজ, আর রক এ্যাণ্ড রোল নেচে নেচেই নিশ্চেষ্ট হতে চাওয়া এই বর্তমান।

লিলিও ভাবছিল একটা ভাবনা। এগারোটা বাজিয়ে বাড়ি ফিরেছে সে। বিল্লী কেটেছে সমগ্র। তেতো হয়ে গেছে জিত সিগারেটের স্বাদে। লিলি জানে ভাস্কর গেছে তপতীর কাছে—প্রায়ই যায়। তপতীর সিন্দুরাবৃত্তিকে প্রশংসার চোখে দেখে সে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে নি বলেই অসামান্য হয়ে উঠেছে তপতী। ভাস্কর কি জানে লিলিও এক নিমিষে সব, সব বদলে দিতে পারে। লেতে পারে, মনোহা, অমিতা—সাধারণীদের মত খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়িয়ে টানে, বাসে—শুধু একবার যদি ভাস্কর বলে!

কতদিন তারা উমাও হয়ে গেছে কত দিকে। একবার গিয়েছিল কাকদ্বীপ বেড়াতে, ভাস্করের সখ। কালঠেঁশাখী এল পথে! গাছপালার তাণ্ডব, বিদ্রোহ চিরে চিরে দিচ্ছে আকাশের গা। বাজ পড়ল কাছে কোথায়। ভাস্করকে জড়িয়ে ধরবার করে বৈশিষ্ট্য লিলি—কিছু ভয়ে, কিছু সম্ভাবনার প্রত্যাশায়, বুঝি এবার ভাঙবে বাধ। কোথায়! শাস্ত হতে গরম কফি তার মুখে তুলে দিয়েছিল ভাস্কর। চোখে জল এল লিলির। রিবিদি বলেছিল—কখনো ভালোবাসিদে নে লিলি। রিবিদি—জার্কিস সেনের মেয়ে। রূপের আর গুণের সীমা নেই তার। ভালোবেসেছিল জল্পবয়সী প্রফেসরকে—রাউনিং পড়তে তার জুড়ি নেই, রবীন্দ্রনাথের ঐশীম অনুবক্ত। ভালোবাসার স্বর্ণ রচনা করে দিয়েছিল রিপি। চুপিচুপি বিয়ে করল তারা। সবার অমত? কি এসে যায় তাতে! একটি ঘর, দু'টি হৃদয়—কত স্বপ্ন। তারপর স্বামীকে বিলেত পাঠাল রিপি—স্বামীর, তার প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করবে পরিবারের মর্যাদা দিয়ে। কটল কতদিন। কত পাস! নাম, খ্যাতি। আর ফিরল না প্রফেসর। ওদেশে রিবির বন্ধুবা দেখেছে, ঘর বেঁধেছে প্রফেসর অন্ত নারীর সঙ্গে। সব সঙ্ক করেছি রিপি। মার্কটারী করে, বেঁচে আছে সে মার্কটারী হয়ে। একটুও আর চেনা যায় না সেই অধিত্যায় রিপি সেনকে—যাকে একদা ভেনাস বলে ডাকত জানাতো তরুণসমাজ।

রিবির কথা শুনে না লিলি। কিন্তু গাধান হয় তো ছিলই সে। নিজেকে তীক্ষ্ণ আর তীব্র করে হয়েছিল রহস্তময়ী—অপ্রাপ্যীয়া। এল ভাস্কর। তার গভীর চোখের তারায় সব ফুল হল, হারিয়ে ফেলল লিলি নিজেকে। জামবনাস্তে বে মেয়ের গুরু-গুরু ডমক বাজে, তারই মত কঠি ভাস্করের; কখন অজান্তে মেলেছে ডানা লিলির মন-ময়ুর টের পায় নি সে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হত

সাহেব-পাড়ার নির্জন ঘরে রাজির প্রাসাদন করতে করতে

বকী হালদার, মীমা পালিত—হার মানবর কথাই ছিল না।  
 দি মেয়ে সবার উপর দিয়ে লিলি নিজের জয়মালা কেড়ে নিত।  
 সে তপতী। কালো, ক্ষীণহস্ত, ভীতু, সেতার-বাঁজানো মেয়ে।  
 হার সত্য লিলি অসামান্য, কিন্তু প্রাণীপ-আলানো ঘরের কোণে  
 বসবে কোথায়? তপতীকে ঘণে-মেজে, বং-এ চ-এ নকল লিলি  
 নানো যায় হয় তো বা, কিন্তু লিলি যদি তপতী হতে চায়—সবাই  
 ঈর্ষাকর দেখে। ভাববে নূতন পাটেও অনবদ্য লিলি বোস, বেশ  
 ধনিয়র করেছে। টোপ্ট অফার হবে তার সম্মানে।

লাগবে নাকি তপতীর সাজ বদলাতে? ভাবল লিলি।  
 যানবে তাকে একটা দো-আঁশলা মেয়ে, যুটিয়ে দেবে ভাস্করের সব  
 মোহ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকাল নিজের ভাবনার রূপ দেখে।  
 ছি! ছি! এত নীচে নামতে পারবে না সে। তার চেয়ে বরং  
 এই নিরালো রাতে একটু চোখের জল মুছে দিক গালের রং।  
 নির্জন ঘরে দেখাক তাকে তপতীর মত—নকল তপতী নয়।

শ্রুত্যাগী জানিয়ে দিল—ভাস্করের মন বোঝা যাচ্ছে না।  
 এটু অবহিত হোক মীনাকী। মেলামেসার স্বযোগ দিক।  
 নিজেই এগিয়ে এসে, হয় তো কথা বলবে পাত্র।

মীনাকী ভেবে পেল না আর কি করবে। প্রায় আসছে  
 ভাস্কর, বাজনাও শুনছে কিন্তু ভাবান্তর কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো।  
 দু'পক্ষকেই চূপচাপ দেখে এগিয়ে এল নিজেকে। লাইট হাউসে  
 ভাল বই, আইন প্রিভিট, পিকনিক বোটানিক্স-এ। সব  
 প্রস্তাবেই আগ্রহ ভাস্করের, যাচ্ছেও। কিন্তু আলো অলছে কই!  
 ভালোবাসার সেই অপূর্ণ আলো! তবে কি ভাস্কর তপতীকে  
 চায় না? কাকে? কাকে চায় সে? সন্ধানীদৃষ্টি ছাড়ল মীনাকী  
 চারদিকে। মীমা? বেণু? লিলি? ঠিক। লিলি  
 বোস। গোমেদের সঙ্গে ভাস্করের খুব বন্ধুত্ব। শোনা গেছে লিলি  
 নাকি ধোয়া করে ভাস্করের অফিস শরিফ। দারুণ খ্যাতি।  
 নাচতে জানে ইরেজী নাচ। আর কথা? কি তাঁক্ষ তাঁত্র  
 কথার প্রক্ষেপণ। মুগ্ধ না হয়ে ভাস্করের উপায় আছে নাকি।  
 থুঁটটা বোকা। দিদির মত, ভাল কিন্তু জ্যোতি নেই।

ঠিক এই কথাই বাজু হল লিলির মস্তব্যে—‘তপতী ভাল  
 হতে পারে, কিন্তু আমার কই তার?’  
 ভাস্কর হাসলো। তার হাসিতে আর দিঠিতে যা উচ্চারিত,  
 তাতে উত্তপ্ত হল লিলি।

—‘আমার দিকে তাকিও না! অমন করে। তপতীকে খাট  
 করে নিজের কেস প্রীড করছি যদি ভাষা ভুল করবে।’

এবার আর হাসল না ভাস্কর, কিন্তু নিশ্চলও রইলো না।  
 —‘তোমারও কিন্তু ভুল হচ্ছে লিলি। এত সহজ আর  
 হালকা কথা মানাচ্ছে না তোমার মুখে। প্রায় ঈর্ষার মত  
 শোনাচ্ছে যে।’

লিলি আরক্ত হতে পারত। প্রসাধন আগেই লাল ছড়িয়ে  
 রেখেছে মুখে, স্বযোগ নেই কিছু প্রকাশ পাবার। ভাস্করের  
 বাবার টাকা আছে। সে নিজেকে এসেছে বিবেত ঘুরে—মস্ত  
 ব্যবসার মালিক, কিন্তু লিলিদের মত জাতি-আরিস্টোক্রাট  
 নয় তারা। ওর পক্ষে তপতীর মত ঘরোয়া মেয়েই ভাল—মনে

মনে ভাবল লিলি। অনায়াসে সহ হোস না কিন্তু চিন্তাটা।  
 অশুভ ভালোবাসা আর বিয়ে এক নয়। ভালোবাসার জন্ত বিয়ে  
 চলত কোকালে—যখন মেয়েরা কপালে কুসুম লাগিয়ে আন্তরিক  
 কলেজে পড়ত আর ছেলেরা রবিঠাকুরের হস্ত নকল করে  
 সাহিত্য করত। আজ বিয়ে হচ্ছে সামাজিক আর অর্থনৈতিক  
 গোত্র বজার রেখে—ভালোবাসার একটা ভাব-ভাণ্ড থাকে অশুভ।

চূপচাপ লিলিকে আবার বললো ভাস্কর—‘তপতীর খবর তো  
 তোমরাই ভাল জান লিলি। বন্ধু সে তোমাদের।’

—‘কখনো নয়।’ সরগে অস্বীকার করল লিলি। ‘ওকে  
 দেখছি মাঝে মাঝে। চেনা তো সেদিনের মাত্র। মীনাকী রায়  
 স্বীকারই করত না ওকে। সমাজে বেকবের কি করে?  
 তুমি কি জান ওদের খবর। তপতী তো মীনাকী রায়ের  
 স্বামীর মেয়ে; নিজের নয়।’

—‘মিসেস রায় বলেন, আমার মেয়ে তপতী।’

—‘আমার মেয়ে।’ ওকথা বললে তিনবার মুছা যাবে  
 মীনাকী রায়। অতবড় মেয়ে হলে ওর আর হইল কি।  
 ও তো তপতীকে ধাঁড় করিয়েছে নিজের প্রচ্ছন্নপটে। তুমি  
 মুগ্ধ হয়ে গেছ মীনাকী রায়ের বলমূল দেখে।’

—‘আরে। মীনাকী রায় যে সম্পর্কে আমার পিসী হন।’

—‘পিসী? কুঃ! মা বলেছেন—পিসি ইজ ইয়োর ফাদার’  
 ওউ মেম।’

উত্তেজিত লিলিকে শাস্ত করতে চাইল ভাস্কর।

—‘লিলি! চল ইটনিভারসিটি ইনস্টিটিউট। ববীন্দ্রনাথের  
 চিত্রাঙ্গনা—অপূর্ণ।’

শাস্ত হল লিলি। দৃক্‘হল পরিমিতবোধ হাটিয়েছে বলে।

—‘প্রবীরের খবর কি?’ প্রশ্ন বললে দিল ভাস্কর।

—‘কি জানি! আমার সঙ্গে তো দেখা নেই কতদিন।  
 সামতে আমরা একসঙ্গে খাই, তাও তো দাদা আজকাল প্রতি  
 সপ্তাহেই আবারসেট। মা ভরানক নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। বাবা  
 বলেছেন একদিন ওপেন ডিসকাশন করে, সোজা দরজা দেখিয়ে  
 দেবেন। নট এ ফার্সি। তবে মুন্সিল কি জান—ঠাকুমা ওকে  
 হাজার কুড়ি টাকা দিয়ে গেছেন। ইনট্যাক্ট রয়ে গেছে ষাচ্ছে,  
 স্রুদেও জমেছে কিছু। টাকার জন্ত ভর পাবে না বেশি। মুন্সিল।’  
 জ্ব বাঁকাল লিলি।

—‘আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে?’ সোজাত্বজ জয়ন্তীকে  
 জিজ্ঞাসা করল প্রবীর।

—‘তোমার চাকরী, আর বাড়ি ঠিক হলে।’ সরল উত্তর  
 জয়ন্তীর। —‘চাকরী? বাড়ি? পরে হবে—পরে হবে। এখন  
 চল বিয়েটা সেরে ফেলি। স্টাটু‘নিয়মে থাকবে হোটেল কণ্টিনেন্টালে।  
 নেপা মিস্তির আছে। বন্দোবস্ত ভাল।’

—‘না, না।’ বাধা দিল জয়ন্তী। —‘ফ্রাট দেখ। আর  
 তার আগে দেখ বিয়েটা করা ঠিক হবে কি না।’

—‘ভাবব ত’ কেবল তোমাকে। ওসব বাজে ভাবনা বন্ধ কি  
 লাভ।’

সুন্দর কথা বলে প্রবীর, কিন্তু বাক-চাতুর্ঘ্যে ভুলবার মেয়ে নয় জয়ন্তী। বললে—‘বাবা-মা, বোন সবার অমত।’ গোত্রচ্যুত হতে চাইছে তুমি আমাকে বিয়ে করে। পরে আবার অমৃত্যুতে পড়বে, ফোয়ার মত উইন্ডোম করবে না তো? সে আবার এক হাল্কা কথা। মাষ্টারীও চলে যাবে তা হলে।’

‘উঃ যেহেটা কি বাচাল। প্রায় আত্মনাদ করে উঠল প্রবীর।—‘প্রীজ জয়ন্তী। এসব কথা এখন ভেবে না। বরং জানিযুনে কোথায় যাবে, তাই ঠিক করে ফেল।’

—‘জানিযুনে? মঞ্চলিমা? ও তো বিয়ের তৃতীয় রাতেই পতন।’ ভুলে গেছে বৃষ্টি আগের কথা?

—‘তুমিও জানি বৃষ্টি ও সব? ক’বারের অভিজ্ঞতা?’ ভয়ে ভয়ে ভিজ্জাসা করল প্রবীর। শ্লিগার ছুড়ে না মারে। যে বস্তু প্রকৃতির মেয়ে জয়ন্তী। আর তাই ত’ মুগ্ধ করেছে প্রবীরকে। বানিয়ে কথা বলতে জানে না। রাগ, ভালোবাসা, লোভ—সব কিছুই অনাবৃত প্রকাশ। সেক্সটারায় গিয়ে সব খাবে, মার্কেটে কিনবে সস্তা জিনিস। আগ্নেয়ে লতিয়ে যায়, আর রাগলে পবন রুক্ষ।

না। এবার কিন্তু রাগে নি জয়ন্তী; বরং হাসল।—‘প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাক—পর্যক্ষ আছে তো কিছু, জানি ফুলশয্যার রাতেই সব মধু শেষ। তারপর আকাশ কালো। ধূলা টানের মুখ ঢেকে দয়। জীবনভরা তখন কেবল ঝড়—বৈতে থাকার মুহূর্ত, কোথাও বা ভালোবাসার প্রহসন।’

মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল প্রবীর। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে জয়ন্তী। কপালের চুল ঘামে-ভেজা মুখে কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের প্রমাণ আর তাতেই চোখ দুটি হীরের মত অল অল করছে। চলনা নেই, চাতুরী নেই।

—‘চল নীরায়।’ প্রবীর প্রস্তাব করল।

—‘না, না।’ বেশি বড় হোটেল পছন্দ করে না জয়া। প্রবীরের ঘানিবাগে কড়া নজর রাখে।

—‘মানসী কেবিন। আজ খেয়ে হাই নি। রুটি-মাংস খাবে। তুমিও খেয়ে দেখ, কি চমৎকার বানায় ওরা—সুন্দর। খালি কাল।’

চৌরঙ্গীর বিকলের জনারণা ঠেলে ঢুকে পড়ল জয়ন্তী হোটলে, প্রবীরকেও টেনে নিল। স্বিধা নেই, কৃত্রিমতাও নেই।

‘তোমার ফোয়ার সঙ্গে ত’ কত খেয়েছ এমনি।’ রুটির ঝোল মাথা টুকরো মুখে ফেলল জয়ন্তী।

ফোরা! মি ওয়াজ এ উইচ! জলে উঠল প্রবীরের চোখ। তরুণ বয়সের উজ্জ্বলতা তাকে পেয়ে বসেছিল, কিন্তু ফোরাতে প্রবীর ভালোবেসেছিল সত্যি সত্যি। কটিনেটের মেয়ে—হাউস মেড। বলত পড়াশুনা করতে চায়, তাই এসেছে লণ্ডন। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার জন্ত টাকা জমাচ্ছে। কত কথা, কত প্রেম, কত মধু বিদেশিনীর তহুতে। প্রথম বিয়ে করতে রাজী হয় নি প্রবীর। বলছিল—অন্তত পরীক্ষাটা শেষ হোক। ফোরা! জানাল, বিপদ হবে তা হলে। তার মধ্যে সঞ্চার হয়েছে দৈত্যের প্রাণের। বাধ্য হ’ল প্রবীর বিয়ে করতে। বিয়ের

পর ফোরা! জানাল বুঝতে ভুল হয়েছে তার। ক্রমে বরুণ প্রকাশ পেল। প্রচুর মদ। কত জালে জড়াল প্রবীরকে। প্রায় জেলের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। ভাগিস ভাস্কর তখন শিকারে ছিল। সব শুনে ছুটে এসে পড়ল সে, দেশে খবর পাঠাল। মোটা টাকা খোরাক দিয়ে মুক্তি পেল প্রবীর, কিন্তু কলহের কাহিনী পৌঁছে গেল সর্বত্র। গ্রাহ্য করে নি সে। মুক্তি পেয়েছে তাই বথেই। ভেবেছিল কখনো, কোনদিনও আর মেয়েদের ছাড়াও স্পর্শ করবে না। কিন্তু জয়ন্তী কি মেয়ে? সে তো আফ্রিকার একটুকরো বস্তু প্রকৃতি। তেমনি দুর্বলনীচ তেমনি আকর্ষণীয়!

রাত ন’টায় ভাল লাগল প্রবীরের চল-ওড়া, বাগ হাতে, পথে দাঁড়ান মেয়েটিকে। ভালোবাসল প্রবীর সকালবেলার শিল্পী শ্রামলীকে। আর জয়ন্তী? জয়ন্তী গলে গেল না, বরং তার সব সন্দেহ অনাবৃত করে প্রবীরের ভালোবাসার অবিবাহিত জানাল। তারপর একদিন উপস্থিত করল নিজ পরিবারের পরিচয়। কোন ঐতিহ্য নেই, নেই ছিটে-ফোটা আভিজাত্য, মর্যাদাও নেই। আছে কেবল এক রাস্কুনীর মত অভাব—দারিদ্র্য। বলল—তারা ঋগড়া করে কটুকঠে। তারা লোভী, তারা জোখী তারা মিথোবাদী। সব বলল জয়ন্তী আর তারই মাঝে মাঝে প্রবীর দেখল জয়ন্তীর আগুন-জ্বালা চোখে জল এসেছে, দেখাচ্ছে ওকে ঝড়-ঝাওয়া স্বাভিজাতের মত। বাহুপাশে জয়ন্তীকে টেনে নিয়েছিল প্রবীর। তেজী মেয়ে বাধা দেয় নি। কেঁদেছিল প্রবীরের বৃকে মুখ রেখে। এক অসুস্থ অমুহূর্তে ভরে গিয়েছিল প্রবীরের সমস্ত হৃদয়। মমতা—এক কোমল মমতার সে প্রথম অনুভব করেছিল, সে পুরুষ—যে পুরুষ ঘর বাঁধে, ছায়া আনে নারীর জন্ত।

—‘জান। মীরার বন্ধু সেই তপতী রায়, তার সঙ্গে ভাস্কর মিত্রের বিয়ে ঠিক ঠাক; অথচ তারই সঙ্গে বুরছে তোমার বোন লিলি।’

মাংসের হাড় হতে রস টেনে নিল জয়া। ভাবনা ছেড়ে জেগে উঠল প্রবীর। ছোট চুমুক দিল কোন্ড ডিঙ্কে।

—‘তাই বৃষ্টি? ভাবনার পড়েছে তপতী? বোনের বন্ধুকে ভয় পেতে বাধ্য করে দিচ্ছে। লিলির আত্মসম্মান বোধ আছে। ভাস্কর আমাদের বন্ধু। বেড়ানো তার নিদর্শন—আর কিছু নয়।’

—‘তা হবে।’ উদাসীন উত্তর জয়ন্তীর।—‘তা বলে তুমি কিন্তু ওরকম বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাতে কাজক তোমার টি-সীটারে তুলো না। আমার আবার অগ্ন্যশ্রুমানটা কিছু কম তো। টেচিয়ে মেচিয়ে একশা করব হস্ত।’

বিল চুকিয়ে হুঁজনে দাঁড়াল বাইরে এসে। দিনের আলো প্রায় শেষ। মাঠে গাছের তলার হাকা অন্ধকার।

—‘চল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। চিত্রাঙ্গদা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের।’

—‘চিত্রাঙ্গদা? ইতস্তত করল প্রবীর।—‘তার চেয়ে চল বরং লাইট হাউসে, সত্য অব সত্য।’

—‘যাঃ! শুলে সবাই দেখে ফেলেছে চিত্রাঙ্গদা। কেবল আমিই বাকি। খুব সুন্দর—চল চল।’



# চুল কখনো চট্‌চটে হয়না, কখনো শুকনো বা রুক্ষ দেখায় না

আঠালো তেল ব্যবহার ক'রে কি চুল আপ-  
নার চট্‌চটে হয়েছে? না কি মাথার তেল  
দিলেই শুকিয়ে যায়, রুক্ষ দেখায়? আপনি  
কেয়ো-কাপিন ব্যবহার ক'রে দেখুন—এই  
ভেদে মাথার তেলে আশ্চর্য কাজ হয়।  
প্রতিদিন কেয়ো-কাপিন ব্যবহার করলে চুল

আপনার চট্‌চটে হবে না, জট পাকাবে না  
কিংবা রুক্ষ ও শুকনো দেখাবে না। কেয়ো-  
কাপিনে চুল দিনে দিনে চক্‌চকে হয়ে  
উঠবে আর এমন কমনীয় আভা ফুটবে  
যা আগে কখনো দেখেন নি। আজই এক  
শিশি কিনুন।

## কেয়ো-কাপিন

দ্বিবিধ ২০লদ্যাক্রকেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল ট্রোরস্‌ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গৌহাটি • কটক • জয়পুর



৪০০০১৩

বাসের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল জয়ন্তী আর ট্যাগ্নি নিতেই হল প্রবীরকে—ভিড় এড়াবার জন্য।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট। জানা 'ছিল গান-ফান কি সব লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা দেখে মুগ্ধ প্রবীর। উন্মোচিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে ধীরে ধীরে নারী মহিমার একটি কুমারী-মন। অপূর্ব! অভিজাত মহলের ক্যাসন রবীন্দ্রনাথ দেখা গেল প্রবীরের বহু চেনা মুখ। জয়ন্তীকে দেখে বয়ে গেল একটু তরঙ্গ, কিন্তু অতি ভদ্রমাত্র তাই উঠল না কোন কিস-ফাস। মাথা হেলিয়ে, একটু হেসে আনকেই চিনল প্রবীরকে, জয়ন্তী রইল উদাসীনতার অস্বীকৃতিতে অলম্ব্য।

বোরয়েই মুখোমুখি দখা—ভাস্কর, সঙ্গে লিলি।

—‘আরে! সাহেব বে! এ কি সৌভাগ্য কবিশঙ্কর। ও!

আপনি? বুঝেছি। আপনিই ধরে এনেছেন প্রবীরকে।’

জয়ন্তীর দিকে চেয়ে হাসল ভাস্কর।—‘সুন্দর হয়েছে, না?’ উত্তর কিন্তু দেবার অবকাশ পেল না জয়ন্তী। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি, তাকে অনুসরণ করতে হল ভাস্করকে।

—‘তোমার বোন পালাল আমার দেখে।’ বলল জয়ন্তী।

ঠিক এই প্রশ্নটাই করল ভাস্কর লিলিকে—‘পালালে কেন লিলি? জয়ন্তীর সঙ্গে আলাপ করবার ভয়ে?’

—‘মোট কি খুব অভয়ের কথা না কি?’ পাঠী প্রশ্ন লিলির।

—‘এ তোমার অভয় কথা। আলাপ হলে দেখতে ভাল মেয়ে জয়ন্তী।’

—‘এককিউজ মি ভাস্কর। আমি অত উদার নই। ভাল হলেও বি-ক্লাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারব না।’

উত্তপ্ত হল লিলি।

আজ অনেকটা সময় ভাস্করের কেটেছে লিলির সঙ্গে। ভালই লেগেছে। এখন হঠাৎ বেনে স্তর কেটে গেল। মনে পড়ল তপসীকে। সে ডাকে জয়ন্তীকে—জয়দি।’ বলে—চমৎকার মেয়ে জয়দি।’ বলে—কি সুন্দর ছবি আঁকে, আর এত মজার কথা বলতে পারে! তপসী হলে এখন ছুটে গিয়ে জয়ন্তীর হাতটি ধরতো, মুছে দিত সম্পদের ব্যবধান দ্বিদি ডেকে। চিত্রাঙ্গদা দেবার পরের রমণীয় লগ্জি আরো মধুর হয়ে উঠতে পারত।

চটল ভাস্কর লিলির দিকে। লাল শাড়ি চোঁটের লাল রং-এ তাকে দেখাচ্ছে লাল আগুন—শান্তি নেই, বিশ্রামও নেই। মনে মনে চোখ বুজল ভাস্কর।

জয়ন্তী শক্ত করে মনকে ঝোঁকাছিল—আমি ভালবাসব না, কখনো বাসব না। কেবল বাঁচবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে ভাবব—আমি প্রবীরকে ভালোবাসছি। যদি সত্যি সত্যি ভালোবাসি, তবেই মরব। একদিন যখন ছেড়ে যাব—তুথের খেঁষ থাকবে না, পড়ব ভাঙনাখোলা হাতে তপ্ত খোলায়। বাপের খবর দুঃস্ব দারিদ্র্য সবে বাড়ি, কিন্তু স্বামীর তাচ্ছিল্যে ভেঙে যাবে বুক। এতসব কথা বার বার বুদ্ধি নিয়ে ভাল জয়ন্তী আর নিজেকে বোঝাল। কিন্তু সাধ্য কি তার ভালো না বোলে পারে! সুন্দর, রোমান্টিক প্রবীর কাছে এলেই সে রূপকথাই বাস্তবতা বনে যায়। তখন আর জয়ন্তী অনাদি সোমের চকিশ বছরের কণ্ঠ-ঠোঁ—বশজন

সন্তানের প্রথমা থাকে না, একেবারে হোয়ে যায় পরমরমণীয় রমণী। কি লখা পলকখোরা চোখ প্রবীরের! সকালবেলা চানুড়ির প্রাণ্ডাশ্রমে বসে, মনের অতলে ডুবে গিয়েছিল জয়ন্তী।

—‘দেখ চুঁ! বড়দার মুখটা কি সুন্দর লাল লাল!’

চমক ভাঙলো রুপের কথায়। বাবা যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে, ভেঙেচি কেটে বললেন—‘লাল-লাল আর হবে না। বাপ-মা-ভাইবোনদের অনন্ত দুর্গতি দিয়ে, চপ-কাটলেট সাঁটা হচ্ছে যে নিত্য। বুকলে—ধাক ছাড়লো অনাদি সোম জ্বর উদ্দেশ্যে—আমাদের অফিসের সেনাব্যব কাল বলল—পরশদিন দেখে হোটেল হতে খোর, সেই হতচ্ছাড়াটার সঙ্গে ট্যাগ্নি চড়ছে তোমার মেয়ে। চড়বে না! মায়না পেয়েছে যে—।’

—‘মায়না? নানা। সব টাকাই তো আমাকে দিয়ে দিয়েছে জয়া কালকে।’ জয়ন্তীর মা বলল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

—‘দিয়ে দিয়েছে? কই? আমায় বল নি ত!’ অগ্নিমূর্তি হোল অনাদি সোম—‘আমি শালা চোখে অন্ধকার দেখছি আর তুই মেয়ের টাকায় পুটলী বেঁধে বদে আছিস!’

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল জ্বরী—‘পঞ্চাশ টাকা যে রেগুর মায়ের কাছ হতে আনা হয়েছিল সেটা শোধ দিয়েছি—আর সব তো অমনি আছে। তুমি কাল রাত বয়ে বাড়ি এসে, তাই—’

—‘তাই! তাই কি শুনি? রাত করে আমোদ-আহ্লাদ করছিলাম, না? কেন এমাসে টাকা শোধ দিতে গেলে আমার জিজ্ঞেস না করে?’

—‘সে কি! টাকা তো পরদিনই দেবার কথা ছিল। কুড়ি দিন হয়ে গেল—’

—‘তাই আমার শ্রদ্ধ করতে গেলে কোঁপ-দালানী করে?’ বাঁভ্রম মুখে জ্বরী দিকে এগুলো অনাদি সোম। ছেলেমেয়েগুলির মুখ বিবর্ণ। একটা তুলুল কাণ্ডের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত বাড়ি। বাইরে হাতে কে ডাকল অনাদিকে, খেমে গেল ব্যাপারটা।

ব্লিষ্ট মুখে, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে গেল জয়ন্তী। পড়ে-থাকা চানুড়ির উপর কাঁপিয়ে পড়ল তিনটি ভাইবোন। মেয়ের দিকে চেয়ে বাখা বাজল মায়ের বুক। সত্যি! দিনে দিনে কি যে হয়ে যাচ্ছেন উনি! এমন কি ছিলেন সেই পিচিশ বছর আগের ফ্যান্ট সফ্যার! টগবগে ভাতের ইড়ির সামান্য বসে দিবাস্বপ্ন দেখল সুরমা—অনাদি সোমের দশটি সন্তানের মা।

আঠাশ বছরের জোয়ান তেজী জামাই। সাতশো টাকা শপ দিতে হয়েছিল—কিন্তু সবাই বলেছিল সার্থক জামাই করেছ সুরমা মা। সমবয়সীদের চোখে প্রশংসা। ‘কি ভাল ছিলেন স্বামী, আর কত বহুত! অগুরু ঢেলে দিতেন শাড়ির আঁচলে, তাই নিয়ে নন্দ-জামের কি ঠাট্টা। তখন বাসা ছিল ভবানীপুরের কুতু সেনে। শনিবার অফিস হাতে এসেই স্বামী বলতেন—মাথা ধরছে। শাড়ি ড়ি ভার দিতেন মাথা টিপে দেবার। ঘরে ঢুকলেই সুরমার মুখে অনাদি পুরে দিতেন ভীম নাগের তালশাসি সন্দেশ। কি লজ্জা! একদিন বড় নন্দ দেখে ফেলেছিলেন আর কি।’

মনে পড়ল একবার বন্ধুর বৌয়ের অসুখ দেখতে যাবার নাম করে থিয়েটার দেখা।—সীতা। কৈদে ফুললো চাখ। বাড়ির সবাই ভাবল—নরম মন, অসুখ দেখে কৈদেছে। সেই জয়া হবার সময় চুপি চুপি আপেল গ্রন দিতেন। গুড়ো মশলা অনন্তেন বাজার হতে। শাওড়ি বাগলে বলতেন—জুই দোকান, সস্তা।’

—‘চা দেবে নাকি?’ চৌকাঠ এসে বসল অনাদি। চমকাল সুরমা। ধমকাত পিয়েও থেমে গেল স্বামী। জল! টুইব মাতের চাখে জল। কেমন যেন দেখাচ্ছে মুখটা উন্ননের আঁচে। কেমন বাপুনা হয়ে এল যেন চোখ! না। একেবারে জগন্নাথ হয়ে যাচ্ছে মেজাজ দিনকে দিন। দোষ নাই স্ত্রীর। ওপরের ভাড়াটে বেটু মা ক’দিন হতেই কথা শোনানো—আগেই উচিত ছিল টাকাকটা দিয়ে দেওয়া।

চারের কেটলীতে আঁচল জড়িয়ে গরম জল ঢালছিল সুরমা—শিরাতোলা কাঁপা কাঁপা হাতে হাত রাখল অনাদি—‘তুমিও নাও চা।’

সুরমা মুখ তুলে চাইলো। চোখের জল নেমে এসেছে হাড়-ওঠা ভাঙ্গা গালে। অনাদির ইচ্ছা হোল হাত বুলিয়ে দেয় একচল্লিশ বছরের লালিত কপালটিতে। বাপ রে! সাতটা বাজছে দোতলার ঘড়িতে ঢং-ঢং। একুশি বাজার না গেলে নিবান্ধ লেট অফিসে। চায়ের শেব ঢোক, খালি হাত—বারান্দা পার নিম্নেবে। সুরমা চেয়ে বসল স্বামীর পাথর দিকে। বারান্দার কোলের ছেলেকটা মুড়ি

মুখে পুরছে। ঘরে ছেলেমেয়েদের হল। নাইট ডিউটির পর মীরা ফেরে নি এখনো। এককপ চা হাতে মা এসে চুকল সামনের খোপটিতে। পাটিশন করে জয়া তাদের জগ্না একটি ঘর বের করেছে।

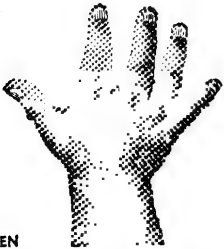
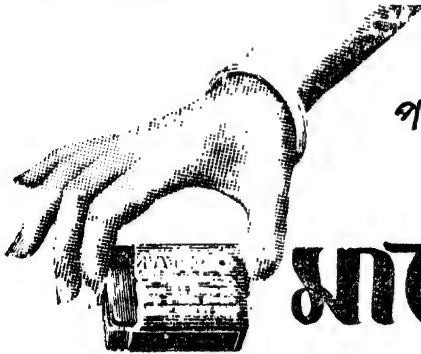
জহস্তী চুপচাপ বসে আছে নিজের বিহানার। পাশে মীরার চৌকী। দলা হয়ে পড়ে আছে ছেড়ে-বাওরা আধমরলা শাড়ি-ব্লাউজ। চায়ের কাপ মেয়ের হাতে দিল সুরমা। ছাড়া শাড়ি শুছিয়ে রাখলো, টান করলো ক’তকান সজ্জিনিটা, তারপর বেগীর উগার কাঁদটা টেনে জহস্তীর চুল থলতে লাগল মা।

—‘রাগ করিস না জয়া! ছুখে-কষ্টে তোর বাবা অমন হয়ে গেছেন।—নয় ত’ মনে নেই কত ভালোবাসতেন তাকে?’

মনে নেই? সব মনে আছে। কত টফি, লজ্জল বিবন, নাগরদোলা। বুক বাখা করে উঠল জহস্তীর। কক শুক চোখ বেয়ে ধারা নামল। বাবা অফিস হতে এসে ডাকতেন—মা, মা মণি! সেই যে বকের মধ্যে চুক পড়ত সে, আর ঘুমে নেতিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত ছাড়ত না বাবাকে।

সুরমা রান্নাঘরে বদিক তাকাল। করলা গুড়ছে। পুড়ুক। একটু অপব্যয়ে প্রশ্রয় দিল সুরমা। মেয়ের পাশে বসল মা, চুলে একটু বিলি কাটল।

—‘তোব একটা ছবিব খুব প্রশংসা হয়েছে? তপতী বলছিল! সেই ছবিটা? সেই পুঙ্ক আর শাপলা ফুল? ভারি সুন্দর!—থোকা



CHC-17 BEN

পরিবারের সকলেরই  
প্রিয় সাবান

**মার্গো সোপ**

সুরভি-স্নিগ্ধ মার্গো সোপের

প্রচুর নরম ফেনা নারী ও

শিশুর কোমল ত্বক স্নহ রাখে।

নির্গন্ধিত্ব নিম্ন তেল থেকে

ভৈরী এই স্নগন্ধি সাবান

দেহ লাবণ্য উজ্জ্বল ও

মস্তক রাখতে অমিতীয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লি: কলিকাতা-২৯

খোকা লাল ফুল ছেঁয় গেছে পুকুর। ঠিক মনে হচ্ছিল ছোটবেলার বেলতলিতে চলে গেছি। বুঝিল জর! অমনি ফুল ফুটাই সেখানে পূজার মাসের সকালবেলাগুলো আলা হয়ে থাকত।

মঞ্চচাথে মায়ের দিকে চাইল জয়ন্তী। চেয়েই রইল। কোথা হতে একটা আলো এসে পড়েছে মায়ের রক্ত-করণ মুখের উপর—সেই সকালবেলায় আলোটি বৃষ্টি! মনে পড়ে গেল দু'দিন আগে ঘটন—জল নিয়ে গোলমাল। কলকাতার ভাড়াটে বাড়িতে জল ঘটায় বন্ধু-বিশ্বেদ। পাশাপাশি বাস। দলনে দু'টা চচ্চড়ি, দিলীপ জর্জর আদান-প্রদান চলে হামেশা, বিজ্ঞ জলের প্রস্র এলেই কোথায় চলে যায় সব উদারতা। প্রায় পাগলের মত ক্ষেপে উঠে, কে কত রকমে জল-বঞ্চিত হচ্ছে তার হিসাব দিতে বসে। কার কটা বালতি, তার আয়তন কি, সে সম্বন্ধেও তীব্র বাণ-প্রতিবাণ আরম্ভ হয়ে যায়।

দোতলার বেণুর অল্পা ভাল। বেশ-বাগে, চাল চলনে পাওয়া যায় তার প্রমাণ অহরহ। বেণুর মা এমনিতে মাহুয মন্দ নয়। সুরমাকে ডাকে—দিদি। দুপুরের ঘুমের পর আলসেমি তাড়াবার জন্য রোজ চলে আসে একতলার। সুরমাদি'র সাজা পানের স্বাদ জ্বালা। কি সুন্দর খোঁপা বাঁধতে জানে সুরমাদি! কেবল প্রশংসা নয়, মাকে মাঝে তাতে করে আনে মাসের বাটি। অলক সুবীরকে গুনতে দেয় ইস্টবেঙ্গল-মোটরবাগানের রিলে। মাসের শেষে হাত পাতলে ধারও দেয় মাঝে মাঝে। গত রবিবার সেই বেণুর মায়ের সঙ্গে জল নিয়ে ঘটল মনান্তর। দুপুরবেলা। সুরমা বসেছিল একরাশ কাপড় নিয়ে কাচতে। রাগে গর গর করতে করতে দোতলাবাসিনী এসে কাঁড়াল সিঁড়ির মুখে। বলতে লাগল, শাখিত বচন। ঘরে অনাদি সোম হিসাব করছিল, আর কোন কোন বিষয়ে খরচ কমান চলে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল ঘর হতে।

—‘কি? কি হয়েছে?’

বাবাকে দেখেই অস্তরূপ হোল বেণুর মায়ের। মিটি মুখে তেলে বললো—‘আপনি উঠে এসেন কেন? বাস্তব হবার মত কিছু নয়। আজকে আমি সিনেমায় যাচ্ছি তো। দুপুরের জলটা দরকার। গাটা ধুতে হবে তাড়াতাড়ি। সুরমাদি’ এমন অবস্থা! এই বেলা তিনটেয় বসেছে কাপড় কাচতে। জল নিচ্ছে কল খলে। আর এমন সময় কি কাপড় কাচে গৃহস্থঘরে! এটা লক্ষ্মী-বলা তো।’

—‘সত্যি তো!’

দ্বার দিকে অগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁত বড়মড় করল অনাদি।

—‘যত অলক্ষ্যার কাঃবার। দুপুরবেলা কাপড়কাচা। শীগগির বন্ধ কর কল।’

হেসে হেসে উপরে উঠে গেল বেণুর মা। প্রায় ফর্সা স্বাস্থ্যবতী নারী। শান্তিপূর্ণ শাড়ি এখানে-ওখানে সোনার চিক্‌চিক শরীরে—ভাগ্যেই লগছে দেখতে।

—‘যেমন রূপ, তেমন গুণ! হাঁ:’

নাদি সোম চুকল ঘরে। মায়ের দিকে চেয়ে চোখে জল

এসেছিল জয়ন্তীর। বেলা তিনটার অল্প শীর্ণ ক্রান্ত মুখ। এক কড়া গোড়ায় ভিজানো বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাবর। ডান হাতের শাঁখাটা ভেঙ্গে গেছে মাস দুই, একটা লাল কড়। মা, তার মা অলক্ষ্যী!

সুরমা কিন্তু ঝগড়া থাকতে নয় নি। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধে দিয়ে, সিনেমায় যাবার আগেই ভাব করে ফেলিছিল বেণুর মার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখেছিল মায়ের গলা জড়িয়ে বেণুর মায়ের মন ধারাপ করা,—জল নিয়ে কুসিহু হুয়েছিল বলে মন ধারাপ।

জয়ন্তীদের দীনতা দেখে সবাই। তাদের করুণা করে, কটাক্ষ করে আত্মীয়-স্বজন। বাবার মেজাজ, দাঙ্গার বাগ, ভাইবোনদের ব্যর্থ যাওয়া দেখে তারা। সেখেনা নাকি জয়ার মাকে? ছেঁড়া কাপড়, মলিন কোণে গড়ে থাকা হীরটির হুতি চোখে পড় না কারোয়? মাকে শুধে নিচ্ছে সংসার আর তারা দশটা ভাই বোন মিলে। জয়ন্তীর কিন্তু মনে হয় তবু আছে আরো অনেক জায়গা আর শাস্তি আছে মায়ের ছেঁড়া আঁচলটির তলায়। এই তো সকালের ব্যাপারের কথা। সেই কুৎসিত বাঁহংসতার উপর মা একটু যেন কি ছড়িয়ে দিয়েছেন—জয়ন্তীর নিজের চোখ ভিজছে, বাবার মুখের সেই নিদাক্ষণ নিষ্ঠুর ভাব আর নেই। এমনি, এমনি হয় ব্যর্থ ব্যর্থ। বাড়িতে বড় উঠে। স্বার্থপরতার হিসাব-নিকাশের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মনে হয় ব্যক্তি আর কেউ কারোর দিকে জীবনেও তাকাতো পারবে না। চরম মুহূর্তটিতে বেরিয়ে আসেন মা। হলুদমাথা রোগী হাতখানি বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন করেন,—আবার সব সত্যের মধ্যে চলে আসে। ঠাকুমা ছোট ভাইটাকে গোপাল বলে চুমা খান, ঠাকুরা খোঁজ নেন বাবার অর ছাড়ল কি না। অনাদি সোমও এসে মেয়েদের ঘরে দাঁড়ায়।

—‘কি রে। মুখ ভার কেন? বকেছি বুঝি? যা, যা, রাগ করে না। আর আমাঝো হয়েছে এমন মেজাজ।’

—‘তোমার বিষের কথা হচ্ছে নাকি তপতী?’ মীরার জিজ্ঞাসা। মা সন্ততিসহ গেছেন মামাত ভাইপোর অল্পপ্রাপনের নিয়ন্ত্রণে, অফ ডিউটির দুপুর গুলতানি জমাবার জন্য তপতীকে ধরে এনেছে মীরা।

—‘বিষের, কই? মোটে ভালোবাসার কথা হচ্ছে।’ জানালা দিয়ে ফটপাথে ঘূর্ণীফুলের হলদে বৃটি তোলা দেখতে দেখতে বলল তপতী।

—‘তার মানে?’ হতভম্ব হল মীরা।

—‘মানে আবার কি? বিবাহ, ধন আর চরিত্রের কুটী মিলিয়ে মা ধরে এনেছেন ভাস্কর মিত্রকে। সপ্তাহে তিন দিন তিন রকম পোষাক পরে তিন রকম মেকআপে অ্যাপিয়ার হচ্ছি তার সামনে। এখন গৌরচন্দ্রিকা চলে। ভাস্কর মুগ্ধ হলেই শুধু হবে কীর্তন।’

ভাষণ হাসলো মীরা, তপতীও।—‘উঃ। তপতী। তুই কি যে সিনিক হয়ে উঠিছিস দিন দিন। আগে তো এমন ছিল না।’

—‘তার মানে—মাগে নাথালিকা ছিলাম।’

—‘কিন্তু ভেবে দেখ তো—তোমার মা বা করছেন, সে তো তোমারই ভালর জন্য।’



—‘স্বীকার করছি। তবে কি মানিস—ভাল কথা আর ভালোবাসানো এক নয়।’

—‘ভালো তো খুব যোগ্য পাত্র তপতী।’

—‘আরে বোকা! আদত গণ্ডগোল তো ওখানেই। পারের যোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিমত কঠ। পাত্রীও মুখিয়ে রয়েছে। হুপফের হাবা-মা গোথুলীলগ্নে লাগিয়ে দিলেই পারতেন। মিটে যেত গণ্ডগোল। মা ভাবলেন সেই আদিত যুগে বিয়ের পর ভালোবাসা হোত। এই যুগের দাবী, প্রথম পরিণয়ে পরিণতি পাবে। সুতরাং ডাকো চাকের নিমন্ত্রণ, বেড়াতে পাঠাও সব রোমাঞ্চকর জায়গার। তোড়জোড় হোক প্রেমে পড়াবার—তাই চগাছে।’

—‘তা বেশ তো! ভালোবেসেই ফেল না ভাবুক।’

—‘আগ! অত সোজা কি না? প্রথমেই ভুল হয়েছিল মায়ের। সম্বন্ধ করে বিয়ে দিতে গেল, যৌতুকের ভারে হলেও হতে পারতাম অধিকারী। স্বয়ংস্বরে মেলা প্রতিদ্বন্দী। সর্বপ্রধান লিঙ্গ বোম। ছুটারের পিছনে বসে উঠাও ছুটছে, নাচছে রাতভরে আর ইংরেজী-ফরাসী মিশিয়ে এমন সব বুলি দিচ্ছে, যে ভাবকের চোখ বিফারিত। ভালোবেসে কি শেষে হতাশ প্রেমিকা হব বলতে চান?’

পারের ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে হাসসা হুই বন্ধ।

—‘হঃ! কি যে হাসতে পারে মেয়ে হুইটা।’ ঘরে এসে ঢুকল জয়ন্তী। রোদে জলা মুখ।

—‘কি হলো এত হাসির?’

—‘হাসি নয়, স্বীকৃতিমত করছেন, কিন্তু লিঙ্গের জ্ঞান ও হালে পানি পাচ্ছে না। হোর প্রবীরের যোন—লিঙ্গ, দিদি।’

—‘হঃ! অসভ্য! বিয়ের আগে হোর-টোর বলতে নেই। আমার লজ্জা করে না?’ জিজ্ঞাসা করল জয়ন্তী। তিনটি মেয়ের হাসির জলন্তরঙ্গ মুখের হল জলস হুপু।

—‘প্রবীর তোমাকে খুব ভালোবাসে—না জয়ন্তী?’ তপতী জানতে চাইল ভালোবাসার রং-এর খবর যা একটু-কণ্ঠে তার মনেও, আর তাকে রেখেছে অতি সঙ্গোপনে সবার চোখের আড়ালে।

—‘বাসবে না? ও যে মদ খায়।’ বলল জয়ন্তী।

—‘ও মা!’

চৈতন্য উঠল তই উৎকণ্ঠে অল্পবয়সী মেয়ে।

—‘বেশি! ভিন্নি যাস নে। মদ না খেলে ও আমার ভালোবাসবে কি করে? হাড়বেরকরা চকিল বছরের মাত্রাবনী! ওর সেই মদ খাওয়া চোখের রাঙাই তো রঙিন হয়েছি আমি।’

মুহ হয়ে এল জয়ন্তীর গলা। দড়ফড় করে উঠে বসল তপতী। —‘ও তো চিরকাল থাকে না জয়ন্তী! তখন?’

—‘থাকে। থাকে। এ যে নেশার রঙ, বড় পাকা রঙ। একবার ধরলে আর ছাড়ানো যায় না। মদে এমন ওর চোখ জল, জলে যায় গলা—তবুও ভাল লাগে, তেমনি আমিও যে ভাল লাগি প্রবীরকে আমায় লোভ দিয়ে, দৈত্য নিয়ে, নীচতা দিয়ে। জলুনির

স্বাধীনতা বিপ্লব

সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জওহরলাল নেহরু



প্রতিরক্ষা সম্পর্কে আগনারও দায়িত্ব রয়েছে

আমাদের স্বাধীনতা নিরাপদ রাখার জ্ঞান, সম্পূর্ণতম প্রচেষ্টা, নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করে উৎপাদন বাড়িয়ে আপনি দেশের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন।

আগনার নিয়মানুবর্তিতা দেশকে শক্তিশালী করে

বসন্ত : শ্রাবণ '৭১

সাত্তাই ও কখনো ছাড়তে পারবে না আমাকে ।’ বুজ্জ গেল রয়স্তীর স্বব ।—

—‘দিদি দিদি ।’ জড়িয়ে ধরল বোনকে মীরা । ‘এমন করে বলিস না ভাই আমবা কি এতই খারাপ নাকি বে তপতী ?’ বন্ধুকে সাক্ষী মানল মীরা ।

তপতী চমকে গিয়েছিল । ভাস্করকে জড়িয়ে সেও ঠাট্টা করে নিজে, কিন্তু মনে মনে জানে বাঁধা বাঁজতে শুরু করেছে মূলতানে । এখানে দেখা দেয় নি তরুণ তপন কিন্তু আজোর সোনার রেখা ধরা পড়েছে পূব-দিগন্তে । বুকের মধ্যে দুক দুক—ভালোলাগার ভর । সে ভর বেদিন কাটবে সেদিন তারই হবে জয় । লিলি পারবে না, পারবে না তাকে হারাতে । লিলি তো রঙিন ডিক্টারে দানবী মদ । ভাস্কর মদ খায় না ।—বতই ছুটুক আর নাচুক লিলি, আশাবরীর যে স্রব, আছে তপতীর বীণায় তাই বাজছে ভাস্করের বুকো । কিন্তু ভালোবাসার এ কোন্‌ ছালা, বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে জয়স্তীর কথায় ?

—‘থেকে থেকে অনমনা হয়ে যাওয়া তোমার রোগ ণাড়িয়েছে বাগ ।’ বন্ধুকে ঠেলে দিল মীরা ।—‘কথা বলছিস না কেন ? আমরা খুব খারাপ ?’

সচেতন হল তপতী ।—‘নানা রকমে জয়দি’র মন খারাপ হয়েছে, এর কথা ধবংস কেন ।’ বন্ধুকে উত্তর দিল তপতী । তাকাল জয়স্তীর দিকে ।

—‘তুমি প্রবীরের উপর কিন্তু অজ্ঞার কবজ জয়দি’ । ওর এমনিতেই স্নেহশীল স্বভাব—আর তোমার মত মেয়েকে কে না ভালোবাসবে ? যে চেনে, জানে—সেই তো ভালোবাসে তোমার ।’

হাসল জয়স্তী ।—‘দবাই বাসে ? তোমার ভাস্করও তাহলে ভালোবাসে বল । সে তো চেনে আমাকে ।’

—‘খুব ভাল বলে ।’ একই বৃষ্টি লাল হ’ল তপতী ।

—‘চল না দিদি একদিন আমাকে নিয়ে সেড়াতে । তোমার তো কত জায়গার বাস । আর প্রবীরের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ভাবি ইচ্ছে হয় ।’ মা ও বলেছেন ।

—‘মা বলেছেন ?’ আশ্চর্য তোল জয়স্তী ।

—‘হ্যাঁ । মা বলেছেন—তার বিয়েতে বাধা দেবেন না, চেষ্টা করবেন বাবার মত করাতে । কেমন গুণ ধরণ-ধারণ ! মা তো তোকেও বলেছেন, না তপতী ?’

—‘হ্যাঁ ।’ মাথা হেলাল তপতী । ‘ভাস্করকে বলব মীরার সঙ্গে প্রবীরের আলাপ করার বাবস্থা করতে ।’

—‘কোথায় ? কোথায় বাবস্থা করবি ? তোমার যেসব জায়গার বাস, সেখানে চুকতে তিনবার হেঁট খাবে মীরা । আসো আর বাজনার এমন সময়ে যাবে ও, যে প্রবীরের সঙ্গে কথা বলতেই ভুলে যাবে । তার চেয়ে বরং চল ডায়মণ্ড হারবারে—চা আর বিস্কুট—যা গলার বাথবে না মীরার ।’

হাক হাসল জয়স্তী ।

—‘আচ্ছা দিদি । প্রবীর নয় তো বড়লোক আছেই । অনেক টাকা, গাড়ি, বাড়ি । কিন্তু তুই কি তার কাছে ভিক্ষে চাইছিস, যে নিজেকে সর্বদা এমন ছোট করে তুলিস ? তারপর

তোমার স্বপ্ন মনেই হচ্ছে—তোদের মধ্যে এত তফাৎ, তখন বিয়ে করারই দরকারটা কি ?’

বন্ধুকণী মীরার । সমর্থনের জন্ত চাইলো সে বন্ধুর দিকে । সার দিল তপতীও ।

—‘সত্যি জয়দি’ ! আমিও ভেবে পাই না—যেখানে তোমার মন আসে যাচ্ছে সেখানে ভালোবাসা গড়ে উঠছে কি করে ? তুমি কি এমন মন নিয়ে বিয়ে করে সুখী হবে ?’

—‘সুখ ?’ সুখের জন্ত প্রবীরকে বিয়ে করতে যাচ্ছি এ ধারণা জন্মাল কি করে তোদের ? সুখ তো ছিল সেই ছোটবেলায়—যখন মায়ের আঁচল কেড়ে গিয়ে জড়িরছি, ভাইবোনদের সঙ্গে একবাটি হোতে মুড়ি খেয়েছি ভাগ করে । তারপর হোতে আর সুখ কই ? সেই বৃষ্টির দিনে জল-জাগা বিছানায় নিটোল গভীর ঘুম ? এখন তো কেবল বড় হব, অনেক বড় । গাড়ি-বাড়ির গোড়ে অভিজাত হয়ে উঠবো—তার ভাবনা ।’

—‘তুই বড়লোক হবি কি করে ? প্রবীরকে তো শুনিছ ওর বাবা কিছু দেবে না । ও নাকি চাকরী করবে বাবা শেল-এ আড়াইশো টাকা মাহানর ?’

মীরা প্রশ্ন ছুড়ল ।

—‘পাগল হয়েছিস ?’ চাকরী করতে দিচ্ছে কে ওকে ? ও চাকরী করলে বিমান বোসের জাত বাবে না ?’

—‘জাত বাবে ?’

চোখ বিক্ষারিত দুই সখার ।

—‘চাকরী করলে, জাত যায় না—কি ? এ মা । বিমান বোস ত’ চাকরীই করে ।’

—‘সে চাকরা সেক্রেটারিয়েটের উপর ত্যায়, সাতাশ শো পঞ্চাশ । বাবা শেল-এ ছেলে চাকরী করলে, কেবাধার মেয়ে বিয়ে করলে, ওদের জাত যায় । বিমান বোস কক্ষণী জাত দেবে না । ছেলেকে মোটা টাকা, গাড়ি-বাড়ি সব দিয়ে ঠিকই স্বস্থানে রেখে দেবে । আমাকে বাদ দেবে পরিবারের তালিকা ততে, কিন্তু দেখবি দু’বছরের মধ্যেই আমি এমন ভাল বদলে ফেলবো যে লিলি বোসের সঙ্গে আমাকে একটুও তফাৎ করা যাবে না—কেবল পিতৃপরিচয় ছাড়া ।’ জয়স্তী থামল ।

—‘দরকার নেই বাবা এমন বড়লোক হয়ে । বাবা-মা সবার মনে ব’ল দিবে, ভাইবোনদের বঞ্চিত করে গাড়ি, টাকা না হলেই ভাল । আমি বলি, বুঝি তুই প্রবীর বোসকে ভালোবেসে বিয়ে করছিস—তা না টাকা ! পুর দিদি । দরকার নেই এমন বিয়েতে ।’

না দরকার নেই বই কি । আজন্ম মাঠারী করে করে বৃড়িয়ে যাবে তবু সেই জীবন নিয়ে ধুকতে ধুকতে কোনমতে বেঁচে থাকতে হবে । পারবে না, পারবে না জয়স্তী । তারও বৃষ্টি ব’ল হয় না মা-বাবা, বণু, ইমুর জন্ত ? ভিক্ষে যার না চোখের পাতা ? কিন্তু তবু অসহ্য এই দারিদ্র্য । আর ভালোবাসা ? তাকে ফেরাবে কি করে । রাশি রাশি কথার শলক—তার তলার চূপ, চাপ, কসে আছে যে সে ।

বাসের জন্ত মীরার ভাবনা, জয়স্তীর ভাবনা তারও, অন্তত

তাদের মধ্যে একজন, তাইছিল নিজেদের কথা। সেই ভাবনার প্রমাণ পাওয়া গেল মাসের ঠিক শেষ দিনটিতে।

রাত দশটা। সব কাজ শেষ। শোবার আগে এসময়টা বাইরের একফালি বারান্দাটুকুতে একটু বসে থাকে সুরমা। বন্ধ গলি, পাশে সাকারদের বাড়ির দেয়াল বেয়ে উঠেছে ঘুঁই লতা—তার একটা গুচ্ছ এদিকে ফুঁকে পড়েছে অকারণ দক্ষিণে। বড় থোকা, সুরমার আঁটারো বছরের ছেলে অলক এসে বলল মায়ের পাশে—একটু বেশি করে পাশ বঁয়ে। অলক বয়ে-বাওয়া ছেলে। ইচ্ছুর মায়েরা দেয় নি যেন কত মাসের, খবর দিয়েছেন মাস্টার মশাই। তার নাম কাটা গেছে। মায়েরা টাকা খরচ করেছে অলক অস্ত্রাবে। নিশ্চয় বিড়ি, সিগারেট, সিনেমার উড়িয়েছে টাকা। বাবা বার বার কড়া ভূম দিয়েছে বাড়ি হতে বেরিয়ে যেতে। জহরতীরও সেই মত, কেবল মায়ের মুখে দিকে চেয়ে বলে না কিছু স্পষ্ট করে।

পুড়ে পুড়ে সুরমারও মনের মার্ব্ব ক্ষয়ে গেছে। মনে হয় দেয় শান্তির কথা মত ভাতের বদলে ছাই বেড়ে। তফুশি বৃকের মধ্যে ছায়ে করে ওঠে। তার অলক। সেই একডাল গন্ধরাজের মত গোল গোল নদর ধবধবে থোকা সোনা। অবুঝ মায়ের বুক ব্যথায় গোলপাড় করে ওঠে। ছেলের চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় এ তো চুরি করবার, দোষ করবার চোখ নয়। ভুল, মস্ত ভুল বুঝে সবাই। তার অলকের মুখে যে এখনো দুধের গন্ধ লেগে আছে, ও সিগারেট খাবে কি।

—‘মা’। আন্তে আন্তে মায়ের পিঠে মুখ গুঁজল অলক।

—‘কি রে? ঘুম পার নি? বড় গরম না? এখানে শুবি একটু? দেখ হাওয়া আসছে, মাদুর পেতে দেব?’

—‘না, মা! না!’ অলক মায়ের পিঠের মধ্যে যেন মিলিয়ে যেতে চাইল।—‘কাল তুমি পাঁচটার মধ্যে আমায় খাবার দিতে পারবে?’

—‘পারব না কেন? কিন্তু অত সকালে ঘাবি কোথায়? এখন তো নীতকাল নয়।’

ক্রিকেট খেলার সময় দু’একবার এ রকম ভোরবেলা খাবার চেরেছে অলক কিন্তু এখন কি খেল—!

অলক বুঝল মা কি ভাবছেন।—‘খেল। নয় মা। আমি একটা কাজ পেয়েছি। ভোর সাতটার নিশ্চয় পৌঁছতে হবে সেখানে—বেলঘাটা।’

—‘কাজ? তুই—?’

অবাক হয়ে গেল সুরমা।

অবাক হল বাড়ির সবাই। ইচ্ছুর নায়েরা টাকা দিয়ে সিগারেট খায় নি, কিছু করে নি অলক। বেলঘাটার কারখানায় টাকা-ছাড়। কাজ শিখেছে এতদিন। মায়েরা না দিয়ে সেই টাকা খরচ করেছে যাতায়াতে। আটমাস পর এই মাস হতে ‘পইড হাণ্ড’ হয়েছে সে। নব্বই টাকা, ওভারটাইম বাটলে আরো, আর কাজ শিখলে অনেক উন্নতি। অনাদি সোম উদ্ভাস্তের মত চেয়ে রইল ছেলের দিকে। অলক গোলায় বায় নি? চেষ্টা করেছে তার পাশে ঝাঁড়তে—হাত লাগিয়েছে কিন্তু ওরালার খার শোনে?

দুটি পড়ল রাগাঘরের দরবার ঝাঁড়ান দ্বীর প্রতি। কতদিন, কত

যুগের দুভিক প’র হয়ে, আবার বৃষ্টি সুরমার কাছে পৌঁছতে পারবে সে। বাবার খাব করা গর্ত বোজাতে হয়েছে নতুন নতুন গভীর গর্ত, নিজের সংসারের জন্তও গর্ত, তার গ্রাসে গেছে জীবনের সুখ আশা সব। আর কিস্ত ভর নেই। এবার আর অনাদির বুড়ো ধরধরে হাত নয়, এবার সর্ষ যৌবনের হাত—জমা, মীরা, অলকের হাত লেগেছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ফিরে আসবে সেই সুন্দর হারিয়ে যাওয়া জীবন।

বিবাস, ভালোবাসা—তাদের পায়ের শব্দ শুনেতে পাচ্ছে অনাদি। ও কে এসে পায়ের ধুলা নিচ্ছে? অলক? কোথায় চলেছে সে? ও চুরি করেছে? জেল হবে? পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে? পালিয়ে যাবে? না, না। অলক যে চাকরী করতে যাবে। ভাল কাজ। ভবিষ্যতের আশা আছে হাতের কাজে, কাজ শিখলে ওঠা যায় অনেক উপরে, সেই আশার আলো ছেলের চোখে, সবার চোখে, জমা, মীরা—বাচ্চাগুলোর চোখেও। তবে আর কি? তবে?

এবার রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এসে উত্তপ্ত খিটখিটে অনাদি সোমকে বিশ্রাম দিতে। বারান্দাটা কি নরম। চাঁদকার—কান্নার শব্দ। আরে না, কিছু না। কিছু হয় নি তার—একটু ঘুম। একটু আরাম—সব শরীর ছেয়ে গিয়েছে আরামে।

—‘মীরা আলাপ করতে চায় প্রবীরের সঙ্গে।’

—‘কি মতলব? ভাঙতি দেবে না আশ্রয়্য করবে?’

ভাস্করের কথায় হাসল তপতী।—‘দু’য়ের একটাও নয়। ওর মা চাইছেন, মীরা প্রবীরের সঙ্গে আলাপ করুক।’

—‘অর্থাৎ পাত্রের রূপ, গুণ, দোষ সবকিছু ওরাকিহাল হতে চান মহিলা। কিন্তু ভদ্রে! তোমার মীরা কি এমন গুণভার বহনে কৃতকার্য হতে পারবে? অবস্থা পাত্রের রূপ একেবারে প্রকান্ত ব্যাপার। নেপথ্যের কিছুমাত্র কারিকুরি নেই তাতে, আর গুণ তো দেখছি—দর্শন এবং স্পর্শন মাত্রই মেয়েরা অভিজুত। বাকি রইল দোষ। এ জিনিস মানুষ এমন সবধে আবৃত করে রাখে যে ধরা শক্ত। তবে যদি সাক্ষ্যকে বিশ্বাস কর—বলবো, বোসেরা খারাপ মানুষ নন, আর তাদের মধ্যে প্রবীর সর্বোত্তম। টাকা আছে কিন্তু সে টাকার ওর চিরদিন বিরাট তাক্সিয়া। কোন্ড আভিজাত্যের প্রতীক।’

—‘লিলি বোসও তো খুব ভাল মেয়ে।’

হাসিতে চিক চিক করে উঠল ভাস্করের চোখ।—‘হ্যাঁ। খুব ভাল। তবে বর্তমানের আলোচ্য প্রবীর। লিলি নয়। লিলির প্রেমঙ্গ চালাতে চাও—মাগপ্তি নেই, কিন্তু সিকটিং গ্রাউণ্ড দোষ এসে যাবে।’

তপতী অপ্রস্তুত হল।—‘মীরার বাবা-মা কিছুতেই বুঝছেন না প্রবীর কেন জমাদিকে বিয়ে করতে চায়। এইমত জমাদি তেমন সুন্দরী নয়, মাস্টারী করে—মায় ওদের বাড়ির অবস্থা তো প্রবীরদের তুলনায়—’

—‘ও সব মাইও করে না প্রবীর। বিলাতে আমি ওকে টাকারী চালাতে দেখছি। জরতীকে ভাল লেগেছে ওর—অন্তরায় আর সব প্রেম অবাস্তর।’

—‘প্রবীর বোসের তো ঝালাঁষার অব্যাস আছে। মেয়ে দেখলেই ভাল লাগতে দেয়ি করে না, ভাষণর পালায়।’ বলল তপতী।

এতক্ষণ হাসিমুখ কথা বলছিল ভাস্কর, এবার গম্ভীর হল। —‘তপতী! ময় সম্বন্ধে প্রবীরের সুনাম নেই তার কারণ ওর সরল সোকা ভাবপ্রবণ স্বভাব। বাক্য নিয়ে খেলা করা উচিত, তাকেও একটুও কঁকি পের না প্রবীর, ফল কঁকি পড়ে নিজে। মেয়ে খেলা ভেঙ্গে চলে যায়, ওর কাঁধে চাপে কলঙ্ক, আর পুরুষ বলে সেটা বহন করে বিনা প্রতিবাদে।’

—‘মেয়েরা বুঝি কেবল খেলা করে? কখনো নয়।’ উত্তেজিত হল তপতী।

সব্বন্ধে তপতীর দিকে চাইলো ভাস্কর। কথা হচ্ছিল তপতীদের বাড়িতে বসে। বাইরে বৃষ্টি, বেরবার প্রস্তাব তাই বাতিল করে বাজনা শুনে চাইলো ভাস্কর। মীনাক্ষী ভারি খুশি।

—‘তাই ভাল। আর বেরিয়ে কাজ নেই। আমাকে অবশ্য যেতেই হবে। মিটিং আছে জরুরী আমাদের মহিলা-সমিতির। একটা ক্যান্টিন খুলবার কথা হচ্ছে। তোমরা গল্প কর। বাজনা হোক, মানবাধিকারী ভেঙ্গে দেবে।’

আরক্ত হরছিল তপতীর মুখ। বাজনা বাজাতে যে আর একটুও ভালো লাগবে না সে কথা বুঝেই ভাস্কর বাজাবার কথা তোলে নি এবং তাতেই এত খুশি হয়েছিল তপতী যে, হাসিমুখে নিজে হতে নানা কথা তে বলছিলই, মীণাদের প্রসঙ্গও এনে ফেলল।

তপতী বড় আড়ষ্ট আর নিজেকে এত বেশি ঢেকে রাখতে চায় সে, যে মাঝে মাঝে বোঝা লাগত ভাস্করের বিস্তৃত প্রথম হোটেই তখন যেন একটু নরম ভাব জন্মেছিল তার প্রতি। তারপর পরিচয় ঘন হবার সঙ্গে একটা আবিষ্কার ভাস্করকে আনন্দ দিচ্ছিল—এই তপতী-মীরার মত মেয়ে, এরা বোকা নয়। প্রচুর পড়াশুনা করে পাস করেছে, এখনো পড়ছে। আলোচনার নামালে দেখা যায়, কথা বলে আরাম আছে এদের সঙ্গে। যে কোন প্রসঙ্গে ‘হাউ ট্রেন্স’ বলে এক নকল বিষয়ে ঘাড় বাঁকাব না। মুহূর্তেই বাহ না নীতিবিরুদ্ধ কোন ব্যাপারের কাহিনী শুনে—যার নায়িকা হয় তো তাদের মত কোন মেয়ে। এরা জেদ করে, তর্ক করে, আবার কিশোরী কৌতুহল নিয়ে বা তাদের জানা নেই সে সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যাটা ভাল কাটবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই জন্মই প্রায় তপতীর সঙ্গে নিত ভাস্কর। ক্রমেই সে দেখছিল নিজস্ব একটা মতামত আছে তপতীর এবং সে মত যুক্তিবাদী, যুক্তিগ্রাহ্য। এজরা পাউণ্ডের কবিতা সম্বন্ধে নিজের কথা শুনার আশা করে নি ভাস্কর একটি সত্ত্ব বি-এ পাস করা মেয়ের মুখে। আবার এই রীমতী মেয়ের মধ্যে বসে আছে একটি লাজুক, অনভিজ্ঞ তরুণমন—যার ঘুম এখনো ভাঙে নি, কাটে নি শৈশব-স্বপ্ন।

ভাস্কর মনে মনে বুঝেছিল এমেরি দলের মেয়ে জরাজীর্ণ। যুক্তিতে উজ্জল, যুক্তিতে কঠিন, আবার ভালোবাসার গলে যায়, চোট কোঁচের আদর না পেলে। মধুর, মনোহর। প্রবীরের কাছে তাই বাস্তব অস্ত্র সব দিক তুচ্ছ হয়ে গেছে। ভাস্কর

তপতীর রাগ দেখল। মাথা নীচু। কিছুকাল কানে হুঁ ফোটা লাল চুঁচী। লাল হবার প্রতীকারে সস্ত্র সিন্ধি আর কালো চুলে আলো পড়েছে। শাড়ির পাড়টা আঙুলে খুলছে আর জড়াবে। একটু দেখল ভাস্কর ছবিটি। বলল—‘সবাই কি খেলা করে? অস্ত্র তোমার জরাদি’ যে করছে না একথা প্রবীর ভালই বুঝেছে। কিন্তু খেলা করবার মত মেয়েও আছে তপতী। খেলতে খেলতে তাদের নেশা ধরে যায়। বোঝে না খেলতে বসে এরা ভাস্করকে মানুষকেও। কি রাগ গেল? বুঝলে আমার কথা?’

—‘কিন্তু ছেলেরাও তো ও রকম খেলার কত মেরেকে কষ্ট দিচ্ছে।’ বাধা বাণী গলা শোনা গেল তপতীর।

—‘দিচ্ছে।’ উত্তর দিল ভাস্কর। ‘প্রবীর তাদের মত নয়, আর—’ তপতীর চোখের মধ্যে তাকাল ভাস্কর—‘আমাকেও বাদ দিতে পার সেই খেলোয়াড়দের দল হতে।’

তপতীর চোখের সাধ পূর্ণ হল লাল হয়ে গেল। আবার পূর্ণবেশে মন দিল শাড়ির পাড়।

ভাস্কর বুঝল আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল তপতী। মনে পড়ল তার লিলি। এমন কথা লিলি কৌতুকে, রহস্তে উজ্জল হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়, প্রগলভ হয়। আর হয় তো কোন কথাই বলবে না তপতী। বিস্মী হয়ে বাবে সন্ধ্যাটা।

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ, শোনা গেল বৃষ্টি পড়বার, মেঘ ডাকবার শব্দ। সমস্ত পরিবেশের প্রতি বিদ্রুদ্ধ হয়ে উঠল তপতীর মন। ভাবতে লাগলো সে—ভাস্কর জানে—ভাল করেই জানে, তপতীর সঙ্গে মিশবার অর্থ তপতীকে বিয়ে করবার পাথে অগ্রসর হওয়া। কি কুংসিত! সে মনে মনে মীনাক্ষীর নিরাবহন উপস্থিতি উপলব্ধি করল। দু’জনকে একা রেখে সে যেন হচ্ছে মত বানিয়েছে একটা বাদলার সন্ধ্যা। আর পিছনে ঠাঁড়িয়ে অনবরত দু’জনকে ঠেলাছে প্রেমে পড়বার ভঙ্গ। কি বিস্মী! ভাস্কর নিশ্চয় ভাবে তপতীর সব বিচুর পিছনে রয়েছে বিয়ে করবার মোটিভ। কড়া বাঙালার জরাদি’ বাক্য বলে—কীদে ফেলবার মতলব। সব দিক দিয়ে যেন ভাস্করকে আটকাবার একটা আয়োজন চলছে সেতারের বাজনা হোটে শুরু করে বর্ষা পকৌড়ী সব সেই জন্ম। ভাস্কর বুঝে ফেলেছে সে কথা। আর এখন বা ‘বলল তার মান কি এই ঠাঁড়ার না—’ চালির যাও তোমার সব কদা-কৌশল। যদি জিততে পার, কখনো কষ্ট দেব না।

তা দেবে না। কাঁইকেই কি কষ্ট দিতে পারে ভাস্কর? তা হলে আর সন্ধ্যাবেলার রাণী লিলির সঙ্গে ছেড়ে তপতীকে খুশি করাত আসে! ভাস্করও অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল সচকিত হয়ে তপতীর নতরুখ মলিন—যেন বিপথগত। মনে পড়ল তার পকেটে রয়েছে তপতীকে খুশি করবার ধার।

—‘তপতী শোন! মা তো রাজী। এখন ঠিক করে ফেল কি করবে, এম-এ পড়া না চাকরী।’

খুশি হয়ে মুখ তুলল তপতী।

—‘ও ভাবী খুশি। এই নাও ফরুখ। কালকেই কিন্তু লাকী ডেট রেডি হয়ে থেকে। আমি ঠিক দশটার আসব।’

—‘ও মা! একবারে ফরুখ নিয়ে এসেছেন। কি নোবো বলুন তো?’

## শাখতী

—‘চিঠি তো নিশ্চয়ই।’

—‘হ্যাঁ হ্যাঁ। চিঠি। কিন্তু মডার্ন না এনসিফট?’

—‘তোমার তো ভাল লাগে এনসিফটে চিঠি।’

—‘আরে।’ খুব খুশি তপতী।—‘কি আশ্চর্য। কি করে জানলেন আপনি?’

—‘খট চিঠি।’

—‘হান। ঠিক। এনসিফটে চিঠিই পড়ার সঙ্গে রিজিট্রাস চিঠি। কেমন হবে।’

—‘কেন শিখ, মাঝারী? সেও তো ভালোবাস। শিখাজী?’

—‘এমা। কে বলেছে ভালোবাসি? শিখাজী বুলি চলে এনসিফটে চিঠির সঙ্গে?’

—‘চলে না বুলি? জেহ ডানট পাড়া।’

—‘না, না। এনসিফটেই ভালো—মহন জে দারে, আশাক।’  
প্রাচীন যুগের ছাত্র পড়লে তপতীর মনে।

—‘তাঁই ভাল। এনসিফটে চিঠি। তবে এখন একটা ইমেন হোক, কেমন?’

—‘বেশ তো, বেশ তো।’

আসন-পিড়ি হয়ে সঙ্গ তপতী কাগজের উপর।

—‘জুহন। ইমেন নন, মালকোয়। যদিও এটা মালকোয়ের সময় নয়, কিন্তু স্বপ্নের বাজা মালকোয়।’

কিন্তু-কিন্তু। ভাবের আলোকে চেয়ে গেল ঘর। ভর গেল মন স্বপ্নের কাঁচা ছুঁলে বশটার প্রহ।

—‘তুমি নাকি তপতী বাককে নিয়ে গিয়েছিলে ইউনিভার্সিটিতে জরি করতে?’

—‘সঙ্গে গিয়েছিলাম। ভর্তিও নিজেই হয়েছে।’

—‘বেশ! বেশ! বরীন্দনাথের অমিত বার লেগেছিল কেঁটির বর্ণিতর ঘোঁচাতে। তুমি বুলি তপতীর বর্ণসংগ্রহ করবে? প্রামোশন দেওয়ার মনোবৃত্তি তব আধুনিকের আনন্দিতো?’

—‘তপতী পড়ছে এনসিফটে চিঠি। শুভরায় বসতে পার আমার চেঁচী নিশ্চয় হয়েছে।’ তাসল ভাস্কর।

—‘এনসিফটে চিঠি। ইংরেজী নয়, পলিটেকাল সায়েন্স নয়।’

—‘যমন ক’ট আয় সাংখ্য।’

লিলির শুম্বর ন’কটিং পাশে কুকন ভাগল।

—‘সত্যি।’ স্বীকার করল ভাস্কর।—‘তপতীর কুটিটা ঠিক প্রি-একটিশ শতাব্দীর নয়। সাধারণ খুব আর কই?’ ইংরেজীর নথর শুনলাম কেবল নাকি পারার কোয়ার। তুমি তো সিনিয়র কেবল জে ইংরেজীতে সেকেন্ড ইয়েছিল, না? আরো পড়লে পারতে কিন্তু।’

—‘দরকার? ম’ষ্টংগী হবে।’

টোয়েন্টিয়েথ েকুবি বসে কথা তুলিল। লিলি চাকরী করবে? কি অবিবাহিতারকম হাঙ্গর ইংলিশ। এর মণিবাক্যের একরকম বড়িটার দামটো আটশো পাঁচশো। গলার কানের পাঁচরঙলার দামও আড়িম্বারের দিক হতে একবারে প্রথম শ্রেণীর

না হলেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচে নয় নিশ্চয়। কিন্তু একটু ভাল ভাস্কর। পড়া কি কেবল চাকরীর জন্য? তপতীর কি দরকার আছে চাকরীর? করবে কোনদিন? কিন্তু পড়া হবে না দেখে কি জুখ, আর এখন কত খুশি হয়েছে।

—‘কি ভাবছ? তপতীর কথা?’ ভাস্করের হাতে টোকা দিল লিলি।

—‘তোমার কি তপতীতে পেরেছে? আর কোন কথা নয়, কেবল তপতী আর তপতী।’

—‘আমার পাবে কেন? পেরেছে তোমাকে। আমি বহু হিসাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইছি।’

—‘ব্যবস্থাটা কি শুনি?’

—‘কেল দৃষ্ট নিবে থাকবে বসবো চলে নিজাম-প্যাংসে—কানি ভাল। পেতী ভাগিয়ে দিয়ে দে। আলো আর হাসির বস্তার। নিশেয়ে অদিকার করে থাকলে অংক অর্ডার দেব সানাই,—না, না। সেটা তো পাত্রী নিজেই বাজাবে। অর্ডার দেব—টোশর, ফুলের মালা আর রাশি রাশি চপ-কটিলেটের।’

—‘ভাগ্যস মাল-টোপার বার দাও নি।’

তুঁজনেই হাসল খুব-মানের খুশির হাসি।

—‘না। অবস্থা চিকিৎসার বাইরে বার নি। দরকার চলে জানাব তোমার।’ বলল ভাস্কর।

—‘জানি না, যদি অবস্থা থাকে তখন জানাব মতন।’

—‘শোন লিলি। প্রবীরের সঙ্গে জরুরীর বিরোধে এত আগন্তু করছো কেন?’ প্রদক্ষ বনলাস ভাস্কর।

—‘কন বগতি তা বলি নি না কি?’

—‘ইঙ্গিত করেছে, স্পষ্ট বল নি কিছু।’

—‘বলেছি, বলেছি। তুমি বুঝে চাও নি তাই বোঝ নি।’

—‘জান্নী কিন্তু যেরে ভালই।’

—‘হতে পারে। কিন্তু ভাল যেরে আর যোগ্য পাত্রীতে, অনেক তফাৎ ভাস্কর। জরুরীর মধ্যে অভাব সেই যোগ্যতার।’

—‘অযোগ্যতাটা কি? গরীব?’

—‘একজাতিল।’

—‘তা হলে শিক’, সৌন্দর্য আর নানাগুণ,—তর কোন মূল্যই নেই বল?’

—‘যেরে নিলাম আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে জরুরীর ওগুলো কিছুমাত্র নেই।’

—‘নই?’

—‘না। প্রথম ধর শিক। কোনখানে ফু-ফাইজল পাস। তাৎপর্য করছে ম’ষ্টার। রূপ? সেটা অবজ্ঞা করছি। ওর শকুনের মত দৃষ্টিতে দাদা নাকি দেখেছে একটা বজ্র-শোভা। আর হাড় বের করা স্বীনে—কি যেন সব ভাল ভাল বাংলা উপমা শিখেছে দাদা আজকাল, তাই আছে। গুণের মধ্যে একগুণ—একটাকে গুণের বস্ত্র ছাড়িয়ে উঠে এসেছে প্রায় স্বর্গে। উইট! একশো বছর আগে হলে পুড়িয়ে মারা হত শুক উইট ক্রাফট আপগাই করবার জন্য।’

উঃ! কি কথা! জের লিলি। প্রায় সবই যেনে নিল ভাস্কর।

অন্তত তাই মনে হল লিলির। আবার বলল সে—‘যাক। ছাড় গুলব আনক্যানি ডিসকাশন। বাতনা বাজছে শুনছ?’

—‘শুনছি। কিন্তু আজ আমি নয়। রোজ আমাকে পাটনার করলে, ক্লাবে বরকট করবে সবাই।’

—‘কে বলল? দেবকী না রমলা?’

ভাস্করের ইঙ্গিত চাপিয়ে দিল তারই উপর লিলি।

—‘এ দেখ—চাওলা আসছে। কালকেই আমাকে গুয়ানিঃ দিয়েছে আজো। তোমার অধিকার করলে দেখা করবে বলিঃ গ্রাউণ্ডে।’

হাসলো লিলি পরিচাসে, কিন্তু গর্বিত হয়ে উঠলো না। আর যে কোন মেয়ে হতে পারতো ড্যানিটিব্যাগ, লিলির মত আকর্ষণীয় হলে। চাওলার বাস্তবসিদ্ধি হয়ে ‘লিলি চলে গেল ফ্লোরে।’

ভাস্কর মনোযোগী হোল ফ্লোর দেবকীর প্রতি।

—‘তুমি নাকি রোজ রক্তকে হারাচ্ছ দেবকী? সত্যি। তোমার মত মেয়ে উরোরোগেও চলে না।’

গলে গেল দেবকী। ‘হাউ নাইস অব ইউ। থ্যাঙ্কস! না আর ঠান্ডা খাব না। মশাম জ্বরের পর আমার গান। কে বলল রোজ হারাচ্ছি রক্তকে? মোটে ছ’দিন।’ চম্পকাস্থলিতে ছ’দিন দেখাল দেবকী।

—‘তোমার আঙুলে চুনি তো ভারি মানিয়েছে। দেখি, দেখি কোন আঙুল! ওঃ! না। এমনগজমেন্ট রি’ নয়। যা ভয় ধরিয়েছিলে। এখনো প্যালপিটেশন হচ্ছে।’

—‘ন’টি।’ ভাস্করকে তাড়না করল দেবকী। মনে মনে কুতজ্ব হল মেকন কালারের উপরে। এটাই হয় তো প্রিয় রং ভাস্করের। আর কালচে লালের উপর আলোর শেড—তাকে দেখাচ্ছেও অপূর্ণ। মনে মনে আয়নায়ে দেখা আজকের নিজের চেহারা ভাবল দেবকী। রাগ বাড়ল লিলির উপর। একেবারে শেমলস তীচার একটুও ছাড়বে না ভাস্করের সঙ্গে।

নাচের পর চলে এল লিলি। দেবকীর গান আরম্ভ হল—

‘Oh me! what eyes.

Hath love put in my head.’

—‘চল, চল বাইরে যাই। ভীষণ গরম লাগছে। আর দেবকী হাসপাতালের চি-চি শুনেতে হবে না।’

—‘আমাকে যে বসে থাকতে বলে গিয়েছে।’ করুণ মুখে বলল ভাস্কর। হেসে ফেলল লিলি। বাইরে বাগানে এসে বসল দু’জন। আরো আছে জোড়া জোড়া।

অজ্ঞায়। ভারি অজ্ঞায় হচ্ছে। মনে মনে ভাবল ভাস্কর। লিলির উপর অজ্ঞায়—আগুনিয়ে উপর? হ্যাঁ নিজেই উপরও বৈ কি! এই মানসিক বিধা আর দ্বন্দ্ব তাকে কাজ করতে দিচ্ছে না। শাস্তি পাচ্ছে না সে মনে, আর বাব-মা-ও বিরক্ত। মুগ্ধিল। মনে মনে উচ্চারণ করল ভাস্কর। লিলি যদি হোত দেবকাদের মত, কিবা তপতী হত ভৌতা হাংলা! ময়ে—এক মুহূর্ত লাগত না মন ঠিক করতে ভাস্করের। এ যে দুই-ই অনবদ্য। তপতী শতমুখ বাড়ের মোমবাতি, মাধুর্ঘ্যে ভরে দেয় মন। লিলি উৎসবের প্রোজেক্টল নিয়নস্টিক। তবে লিলি তাকে চায়, তপতী ব্যস্ত ঠেলে দিতে, কিন্তু ঠেলেই যে আবার আকর্ষণ করে নেয় হরের দূত পাঠিয়ে, নিমন্ত্রণ চিঠি

লেখে দু’টি চোখের আলো দিয়ে। মনে পড়ল তপতীর শাস্ত কপাটটি আজো ক্রা-বিলাস শেখে নি। বেশ ছিল সেক’লে। বড় বোঁ, মেজ বোঁ। হেসে ফেলল ভাস্কর।

—‘হাসাহেনার গন্ধ নিচ্ছিল লিলি—‘হাসছ যে?’

—‘হুঁটো বোঁ কি রকম?’ ভাস্কর জিজ্ঞাসা করল।

—‘রক্তখ থাকলে মন্দ কি? চীরে মহল, মতি মহল। দুই

রাণী হাসলে একজনের মাণিক করে, অজ্ঞের কান্নার মুক্তো। রাজকোষে টাকার অভাব হবে না কখনো, আর হিংসে করে করে দুই রাণীরই পুরানো রাজাকে রোজ রোজ নূতন নূতন লাগবে। কে দুই বোঁ হবে? তপতী, দেবকী? স্ত্রীরোগী, দুঃস্বপ্নী?

—‘দুই স্বামী কেমন? চাওলা আর অক্লান্ত?’

—‘ভাল, খুব ভাল। একজন সোনার বাট গড়িয়ে দেবে, আরেকজন চাদে নিয়ে যাবে। চল তিকত যাই। দেখানে সাত ভাইয়ের বড় দাৰা হবে তুমি। তোমার বোঁ—সবার বোঁ, তুমি কিন্তু একপত্নী ব্রতধারী।’

খুব হাসল ভাস্কর। এফুণ, এই মুহূর্তে অগলভাকে বেঁধে ফেললে কেমন হয়?

হয়ত আজই শেষ হত ভাস্করের সব বিধা, ব্যস্ত পায়ে দু’জনের মাঝে এসে ঠাঁড়াল দেবকী—‘কেমন হল গান?’

—‘উঃ! সাবলাইম, ইউনিক!’

সম্বাদের বললো ভাস্কর আর লিলি।

তপতীর ঘরে আড্ডা জমচ্ছিল তপতী আর মীরা। চার আনার চিনেবাদাম, যে কোন তারিখের একটা বাঙলা কাগজ—একটা দিন কাটাতে পারে তারা মহানন্দে।

—‘জানিস মীরা! লিলি বলেছে আন্তত্যা কলেজ নাকি ভাল নয়।’ বন্ধুকে খবর দিল তপতী।

—‘ভালো নয়?’ পৃথিবীর অশ্চর্যতম কথায় চোখ কপালে তুলল মীরা।—‘অমন কলেজ আর আছে নাকি কলকাতায়?’ শব্দ হল চিনাবাদাম ভাঙবার।

—‘বাংলা দেশেই নেই বল।’ মীরাকে সাংশোধন করল তপতী।

—‘অমন সুন্দর কলেজ! ক্লাশে বসে শোনা যায় ট্রাম-বাসের শব্দ। একটু ভাবলেই মনে হয় ট্রামে ঠাঁড়িয়ে ছলে ছলে আমরাও চলে বাচ্চি কলকাতায়, না রে?’

—‘আর হাক্সরা পার্ক? নরম ঘাসে পা ছুঁয়ে হাঁটা?’ মীরা কলেজের আরো গুণগণনা হোগ করল সানন্দে।

—‘তাই ত’ বলেছি আমি ভাস্করকে। এঃ! বাগামটা তেঁতো। আন্তত্যা কলেজে পড়ে গেছে কত মেয়ে—বাংলা দেশের সেরা সেরা মেয়ে সব—বাণী রায়, অমলাশঙ্কর, নন্দিতা কুপালনী। পড়েছে অমন কেউ লিলির লয়েটোতে? বছর বছর কি রেজাণ্ট আন্তত্যাঘর।’

অজ্ঞানের মধ্যে স্থির হয়ে গেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কলেজ আন্তত্যাঘর। তপতী গভীর সন্তোষের বাসিঁকাগজ মুখের সামনে মেলে শুয়ে পড়ল দুই সখী।

—‘ইউনিভারসিটি খুব অশ্চর্য, না রে?’

মীরার জিজ্ঞাসার উত্তর দিত খমকাল তপতী। বেচারী! পড়া চল না গুর। জানল না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার রোমাঞ্চ, ডবল-ডেকারের উর-খাসে ছুট, লাইব্রেরিতে পুথান বইয়ের গন্ধ। মুখে কিন্তু প্রকাশ পেল অল্প কথা—

—‘এমন কিছু বিশেষ নয়। আমাদের কলেজেই মত অনেকটা। ছেলেরা পড়ছে একসঙ্গে এই যা তফাত।’

—‘ছেলেগুলো কেমন রে? ছালামি করে?’ অন্তরঙ্গ প্রশ্ন মীরার।

একটু বিমনা হয়ে গেল তপতী।

‘ছালামি?’ ছেলেরা? কই ন’তো। বেশ ভাল তো সবাই, তবে দেওয়ালের গায়ে বিশ্রী কথা লেখা খাংক—ভারী বিশ্রী!

—‘চুপ করে আছিস কেন?’ তপতাকে টেনে দিল মীরা। পত্রিকা দেখান তপতী।

—‘দেখ, দেখ মীরা! একটা। আলু কেমন মাছেরে বাচ্চর মত দেখতে। কি মজা না?’ সাংসাতে দুই সখা গুঁকে পড়ল ছবিবিউপার।

—‘কলকর বেশ ভাল কাজ হয়েছে, না মীরা?’

—‘অ্যাপ্রেন্টিস। সবাই বলছে ফিটচার আছে।’

—‘বকলি মীরা! অতীত আর বর্তমানের কথা কেউ ভাবে না সবাই খোঁজে ভবিষ্যৎ। বুঝেই পারি না আমরা, ভবিষ্যতটাকে বানিয়ে দিচ্ছে বর্তমান।’

—‘উঃ, তপতী! চিট্রি কেন? ফিলজফি পড়ল পারতিস তুই। এমন জ্ঞানবানদের মত কথা বলিস মাঝেমাঝে। এত যদি জানিস তবে আবার পড়তে বসে, তোর ফিটচার ভবাই করলি কেন?’

—‘খামি? আমার ফিটচার? কি বলছিস তুই?’ বন্ধুর কথার অর্থ জানতে চাইল তপতী।

—‘আচ্চা! তোমার ফিটচার তো ভাস্কর মিত্র। তাকে লিলির পাল্লার ফেলে, এম-এ নিয়ে বসলে কেন?’

—‘ওঃ এই কথা?’ হাসল তপতী। দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল প্রিয়বালা। কি অপরিহার্য ঘণ্টা করেচে মেয়েটা। শাড়ি ঝলছে, দলামোটা ব্লাউজ ঠিক ঘরের মাঝখানে। চিনাখাদ্যের খোসা। কোনো সাহেববাড়ির মেয়ে বখানো খাবে কাগজের চৌদ্দ’র কেনা খোসাসহ বাদাম ভাজা? তারা প্রায় খায় না কিছু। না পেরেই তো পাতলা ছিপছিপে পুতুল পুতুল শরীরখানি বানিয়ে বাখে, হয় তো ণীতে কাটার বড়জোব এগুটা ছুটো কাঁজুবাদাম। চামচে দিয়ে তুলে নেবে ছোট ছোট গ্রাসের খাবার।

মীরার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল প্রিয়বালা। এই মেয়েটাই সব নঠের মূল। ছিরি-ছাঁদ দিয়েই ধরা যায় কেমন ঘরের মতো। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই তপতী ভুলেছে নিজের মান-মর্যাদার কথা। মেমসাহেবও বেন কি! একটু বাধা দেবে না যেকোন মীরার সঙ্গে মিশতে। অবজ্ঞা দেয় না যে কেন তাও স্তন্যে প্রিয়বালা সেকালের চাকর বুড়ী হরিশের বাড়ে। মেমসাহেব তো মেম হয়েছ মাত্র কয়েক বছর আগে। তার আগগ বাঙালীই ছিল। মাটিতে ভাত দেত ঠাকুর রীতিখোঁ লুকখোঁ, মোচাঘন্ট। সাহেবের তো এখনো লগে খাবার পর একটি পান।

মেমসাহেবের বাপ-মা একেবারেই বাঙালী। টাকা আছে। এখানে এলেই প্রিয়বালাকে দিদিমা দেন দশ-বিশ টাকা বকশিস। মা-মরা মেয়েকে দেশাশোনা করে তো সে। ঘর গুছাতে-গুছাতে প্রশ্ন করল প্রিয়বালা—‘দিদিমা শীগগির আসবেন, না দিদি?’

—‘দিদিমা? এখন? এখন তো আসতে পারবেন না। তাঁর গুরুদেব এসেছেন যে, ব্যস্ত আছেন তাঁকে নিয়ে। আমরা তো বাব রবিবার।’

—‘তোর দিদিমার গুরুদেবকে দেখেছিস?’ জিজ্ঞাসা করল মীরা।

—‘হ্যাঁ, দেখব না কেন? সব সময় তো ড-বাড়ি বাই তিনি এলে।’

—‘কেমন রে? গাঁজা-টাঁজা খায়?’

—‘হ্যাঁ! কি সুন্দর! সুন্দর স্তব পড়েন সকালবেলা।

আমার কপালে চন্দন বুলিয়ে দেন। প্রসাদী চন্দন! ঠাণ্ডা!’

তপতী ভুল করে শৈলেন রায়ের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মনে মনে ভাবল মীরা। ওর কথা, ভাবনা—সব মীরার মায়ের মত। হেমনি ঠাণ্ডা আর নরম। জহন্তী মীনাকী রায়ের মেয়ে হলেই মানাত ভাল। মেমসাহেবী কড়া মেজাজ। সবচেয়ে শাস্তির কথা ছিল—প্রবীরের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গোলমাল উঠে না তা হলে মোটেও। বদলে তপতী হয়ে যেত মীরার মায়ের বড় মেয়ে—এম-এ পড়া শাস্ত্র-গ্রন্থ মেটেই।

—‘এই কি ভাবছিস?’ চিমটি কাটল তপতী।

—‘ভাবছি?’ আনমনা হাসল মীরা—‘ভাবছি তুই আমার বো হলে বেশ হত।’

—‘হ্যাঁ! বোন তো আছিই। হবো আবার কি? কি টুটুন?’

—‘দিদি। আমাকে দিলে না বাদাম?’ নাকিস্বর বেব করল টুটুন।

—‘দূর বোক! তোকে না দিয়ে বাকি খেতে পারি? এই দেখ না বাকিশের নীচে।’

চোখ বিক্ষারিত প্রিয়বালা। দেশের বাতর লাগানো বাকিশ, তার তলায় শুয় আছে এতগুলো চিনেবাদাম। একেবারে বাজে মেয়েটা! মেমসাহেবের মেয়েকেও নষ্ট করছে।

—‘বাবা! সানডের কাগজে টেণ্ডার নোটিশটা দেখেছ?’

ইতিহাসের হাতল হতে পা না মালেন সুমোহন মিত্র, চুকট সরালেন মুখ হতে। ছেলের একটা কথাতেই বুকেছেন মিত্রসাহেব কি বলতে চাইছে সে। গত সপ্তাহে ভারত সরকারের একটা টেণ্ডার নোটিশ বেরিয়েছে কাগজে কাগজে—আউটডোর ট্রান্সফার সাব স্টেশন নির্মাণ এবং টেরিটরি লাইটিং—যার জাহাজমালিক খরচ ধরা হয়েছে নব্বই লক্ষ টাকা। বায়নার টাকা টেণ্ডারে উল্লিখিত মূল্যের টু’পার্সেন্ট এবং কাজ সম্পূর্ণ করার সময় পাঁচ মাস। টেণ্ডার ফেরবার বড় আগে হতেই ব্যবসারীমতল চেণ্টা-চরিত্র আরম্ভ করে দিয়েছে, ভাস্করও এ নিয়ে কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু আল একেবারে উত্তপ্ত।

—‘বাস!’ ছলকে চেঁচাল দেখালেন সুমোহন।

ভাস্কর বসলো। হাতে গোল করে পাকানো কাগজটা হরতে।  
বুঝিবারের স্টেশনম্যানেরই প্রথম পাত।

ছেলের দিকে এসে চোখে দেখলেন বাবা—ছাফিশ বছরের  
একটি সম্ভ্রুত ভবিষ্যতের প্রতীকশক্তি।

—‘করপোরেশনের কাজটা তো পেগেছি আমরা।’ ছেলের  
কথার উত্তর না দিয়ে প্রেসক্সব্রের আনলেন স্যুমোহন। বোধ হয় কিছু  
সামান্য দেবার ইচ্ছার।

—‘ও তো যে কেউ শেতে পারতো।’

—‘পারতো?’ পূর্বগর্বে হাসলেন পিতা। পাল্পের কাজটা  
‘পাটকা প্রায় অমৃত-হরণের মত হৃদয় হয়ে উঠেছিল, ভাস্করের চোঁটোতেই  
পাটকা গেছে।

—‘চল্লিশ টাকা পাঠিয়েছি জোনাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে, টেণ্ডার-  
কর্ম আনবার জন্য।’

নড়েচড়ে চেয়ারে বসলেন মিত্রসাহেব। পারের উপর হতে  
পা নামিয়ে সোজা হলেন। ব্যাপারটা বিগট। প্রথমত কাজ  
পাওয়ার সম্ভাবনা সূদূর। যদিও বা পাওয়া যায়, মাত্র পাঁচ মাসে  
শেষ করা যাবে না। ওদিকে মিত্র কোম্পানীর দিনিয়ার  
ইঞ্জিনিয়ার বস গেছে তিন মাসের ছুটিতে নাইনটিশাল—মাত্র তিনদিন  
হল। প্রচুর অসুবিধা আছে অজান্তে।

—‘শোন ভাস্কর। এ কাজ আমরা পাব না। মাধেয়াম  
আছে। এ জি জি কোম্পানী, আর সবায় উপর কাঙ্ক্ষিত।  
জানিস তো কাঙ্ক্ষিতদের ব্যাপার—ও এমন বেট দেবে যে কেউ  
পারবে না ওর সঙ্গে।’

—‘আমরা কাঙ্ক্ষিতদের চেয়ে কম বেট দেব।’

—‘পারবি না। যত কম রটই আমার দিই না কেন, ও  
অন্যায় সে খবর বের করে নিয়ে, তার চেয়ে অল্পত দু’পাসেন্ট কম  
ধরে টেন্ডার সাবমিট করবে।’

—‘আমরাও ওর খবর বের করে নেব।’

—‘কি করে?’

—‘যে ভাবে ও বের করে।’

—‘মাধেয়াম, এ ভি জি কিছু নয়, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত। তা ছাড়া  
রসও রয়েছে ছুটিতে।’

—‘রসের ছুটি ক্যাঙ্গেল করে দাও।’

—‘সে কি?’

—‘কেন তুমি তো আগুয়ান্টাণ্ডি’ দিচ্ছে ওকে পার্টনার করে  
নেবে। কাজের দায়িত্ব নেবার সময় ছুটি কি? এ সময় এ যদি  
না আসে, মিত্র আণ্ড কোং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর্ম তার  
পুরানো নামেই থেকে যাবে। মিত্র আণ্ড রস আর হবে না।’

চুপ করে রইলেন স্যুমোহন। আর কে রস আয়ালো ইণ্ডিয়ান,  
মিত্রের স্থলের বন্ধু। ব্যবসার প্রায় গোড়াপত্তন হাতট আঁছে।  
সম্প্রতি তাকে পার্টনার করে নেবার কথা হচ্ছে।

—‘কি ব্যাপার? পিতা-পুত্র নীরব কেন?’ ঘরে ঢুক জিজ্ঞেস  
করলেন পুরুষের একজন—বিশ্ববন্ধু সরকার। সুবিশালী ভদ্রপতি।  
কাজ কর্তন তের-তলার মাথায়।

স্যুমোহন হাসলেন।—‘ভাস্করের পাগলামি।’

—‘রসকে নিতে চাইছে না?’

—‘রস তো ওরই সাজেশন। এখন আবার মাথায় ঘুরছে—  
প্রাইভেট লিমিটেড। তোমার সঙ্গে নাকি কথাবার্ত বসেছে? এখন  
ব্যাপার কি ভান। ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্টের হেড ইঞ্জিনিয়ারিং করপো-  
রেশনের টেন্ডার নোটিশ বেরিয়েছে—আউটডোর ট্রান্সফর্মার সাব  
স্টেশন আর টেবিলারী লাইটিং। মাথা খারাপ হয়ে গেছে জীমানের।  
কাজটা করবে।’

—‘বেশ! বেশ! তা মাথা খারাপ বলছ কেন? এত বড়  
কাজ ত’ কর নি আর। লাভ, খ্যাতি দুই-ই বাড়বে কোম্পানীর।’  
বললেন বিশ্ববন্ধু।

—‘দুর্গাপুরে রয়েছে একটি পঞ্চাশ লাখ টাকার কাজ। তবে  
এটা আরো বড়। অনেক টাকার দরকার, সময়ও কম। তারপর ও  
কাজ কি পাওয়া যাবে? কাঙ্ক্ষিত রয়েছে না?—আর  
করপোরেশনের কাজটার কি ব্যবস্থা হবে? অন্তরিক্তে তো মন  
দেওয়া যাবে না।

শেষের প্রশ্নটা ছেলেকে করলেন স্যুমোহন।

—‘হ্যাঁ, তারি একলক্ষ টাকার কাজ। সাব-কনট্রাক্ট দিয়ে দেব  
এ ভি জি’কে।’ উত্তর দিল ভাস্কর।

একটু বিরক্ত হোলেন বিশ্ব মিত্র। এ ভি জি নেবে কেন  
সাব-কনট্রাক্ট? ওকি আমাদের চেয়ে ছোট ফর্ম?’

—‘নেবে। আমার কথা হয়েছে গান্ধী’র সঙ্গে। হেডী  
করপোরেশনে ওরা টেন্ডার দিচ্ছে কিন্তু পাবার আশা ত্যাগ করেছে  
তোমার মতই। কল্যাণীর কাজ ছাড়া ওদের হাতে তেমন কোন  
কাজও নেই, শুতবাং নেবে সাব-কনট্রাক্ট। কথাটা বাজারে চালু না  
হলেই হল।’

আশ্চর্য স্যুমোহন ছেলের তর্কিতগতিতে। বিশ্ববন্ধু বৃশি।

—‘বাঃ বাতাহুব ছেলে! তা কাজটা পারি তো?’  
মেসামশাইয়ের জিজ্ঞাসা।

—‘পারি কি না জানি না কিন্তু পাত হবে।’ এতক্ষণ হাসলো  
ভাস্কর—‘চৌধুরী তো তোমার বন্ধু?’

ইঙ্গিতটা ধরলেন বিশ্ববন্ধু। হাসি চাকাল চোখে।

—‘বন্ধু। কত পারি খরচ করতে?’

—‘দশ।’ তুই হাতের আঙুল দেখাল ভাস্কর।

—‘দেখ ভাস্কর।’ বগী গলা বাবার। ‘এসব কি বলছিস তুই?  
কখনো টাকা দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করিস না। এসব আমি  
পছন্দ করি না।’

—‘আজ্ঞা বাবা। কাঙ্ক্ষিত তোমার খবর এখন বের করে নেয়,  
কি কর? তোমার অফিসেই কেউ নিশ্চয় টাকা পেয়ে খবর দেয়।  
তুমি সন্দেহ কর, কিন্তু চাকরী তো ওজ পর্যন্ত কারো যায় নি।  
টাকা দেওয়া পছন্দ কর না, আর নেওয়াটা সহ্য কর—এটা কি রকম  
ব্যাপার? তবে আমি জ্ঞানভাবে কিছু করব না, সে বিষয়ে নিশ্চিত  
থাকতে পার তুমি।’ ভাস্কর উঠে বাইরে চলে গেল।

—‘সুনল ভাস্করের কথা?’ বললেন স্যুমোহন।

—‘কথাটা কিন্তু বলেছে ঠিক।’ সিগারেটের ধোঁয়া উৎসর্গে নিষ্কেপ  
করলেন বিশ্ববন্ধু।



—‘তুমিও একথা বলছ? ঘৃণ নিয়ে ও কান্ডিদের খবর বের করবে।’

—‘অল্প ব্যাপারে অল্প ভাঙ্গুর টাকা খরচ করতে চাইছে, কিন্তু বুঝেই বা তুমি অত শক্ত হচ্ছ কেন? চাপকা পণ্ডিত তো ঐ যে শর্তে শাস্তি-টাকায় নাকি বলে গেছেন অনেক দিন আগে। দেখে হামোহন! বাঙালীরা সবসময়ে ছেয়ে যায় কেন জান? বিল্ডেনস ট্যাক্টিস নেই বলে।’

—‘এক তুমি ট্যাক্টিস বল? এ তো চোরগলি। সবাই এ পথ ধরলে—অনেকটু ইচ্ছা দি বেস্ট পলিসি কথাটাই গুচে যাবে। ব্যবসায় সাক্ষ্যসমূহ হবার এটাই তো জানি মূলমন্ত্র।’

হাসলেন বিশ্বব্রু।

—‘পঞ্চাশোত্তর কি সমস্যাগে পৌঁছে গেছ নাকি? তোমার এক্সিয়েলসি না থাকলে অনেক একটা কোন কাজেই লাগবে না।’

—‘এক্সিয়েলসিও অর্ধ ঘণ্টা দেওয়া?’

—‘না। যে ভাবে গোক নিজের কাজ সফল করা। টাকা ভাঙ্গুর না দিক, মাথোরাম দেবে, কান্ডিদাস দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকার উপরে ঠাণ্ডার সিঁড়ি বানাবে।’

—‘বানাক।’ পুট উত্তর দিলেন হামোহন মিত্র। যুদ্ধ করে অনেক নীচে হতে আজ এখানে পৌঁছেছেন তিনি। কখনো কোন অজ্ঞাত পথ চলেন নি, ভাঙ্গুরও চলবে না।

এই কথাই ছেলে শুনলো মাথের মুখে।—‘ভাঙ্গুর! তোর বাবাকে তো জানিস? অজ্ঞাত কিছু কোরতে চেষ্টাও করিস না কখনো।’

এবার বিরক্ত হল ভাঙ্গুর।—‘ভাবছি কি তোমারা বল ত’ মা? ইচ্ছা করলেই ঘৃণ দিত পারবে। আর ক’জটা পেয়ে যাব সঙ্গে সঙ্গে? অল্প গোজা এসব ব্যাপার? এক ক’জটা দেবার কর্তা বাঙালী। তাঁরও ইচ্ছা বাঙালী কনসার্ন ক’জটা পাক। খবচপত্র হবে অল্পভাবে। জেনারেল অফিসের টেণ্ডার আক্সেপট্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেড হাচ্ছেন চৌধুরী, মেগেশমশাইয়ের বন্ধু। আমি টেণ্ডার দেবার শেষ তারিখে রাত আটটার সময় আমার টেণ্ডার সাবমিট করব। বাবাকে বলো এটা কোন অসম্ভবতা নয়।’

—‘ঠিক আছে।’ ছেলেকে কাছে ডাকলেন মিত্র। বিরক্তির ধোঁয়া উড়ে গেছে। আরম্ভ হল আলোপ-আলোচনা। রসও টেলিগ্রাম পেয়ে এসে পৌঁছাল,—‘ওয়েল। কাজটা গুণগুরুত্বপূর্ণ। তবে পাওয়া যাবে কি?’

—‘আমি কাজ বেগাড় করব। বাবা টাকা দেবেন আর কাজ তুলবার ভার আপনাদের।’

—‘ভেরি গুড।’

অফিসে ব্যস্ত হলেন মিসেসাহেব, রস আর জেনারেল ম্যানজার শশাঙ্ক ডকত। শশাঙ্ক বাঙালী নয়। তিনপুরুষের বাস কলকাতায়। চলন-বলনে একেবারে এদেশের মানুষ। টেণ্ডার তৈরি হচ্ছে। চলছে তিনটে টাইপ রাইটার।

ভাঙ্গুরও খাটছে। নিজের ঘর বন্ধ। সমানে শোনা যাচ্ছে মেমিস্টনের খটাখট। ক্লাব, সাংস্কৃতিক অস্থান, নানা জায়গায় নিমন্ত্রণ—সময় নেই, সময় নেই। অফিসেও অল্পস্থিতি ভাঙ্গুর।

জেনারেল ম্যানজার বিশেষ পছন্দ করে না ছুনিয়ার মিত্রকে। বড় বড় ভাষালস চোখ, কিন্তু যখন তীক্ষ্ণ করে তাকায়—পড়ে ফেলে যেন মনের কথা সব পৃষ্ঠাটি পর্যন্ত। স্তব্ধতা ভাঙ্গুর না আসাতে একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। রাগ হচ্ছিল হেড-ক্লার্ক অল্পদা সরকারের। বুঝছিল সে নিশ্চয় এবারও কান্ডিদাসের কাছে হারবে মিত্র কোম্পানী। মিথো সব খাটা-খাটুনি। তবু ভাঙ্গুর থাকলে কিছুটা ভরসার কথা ছিল। তার আবার অমুখ হোল এ সময়ে। ভাঙ্গুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে ওলদা চলে গেল সাহেবের বাড়ি।

—‘দেখা হবে না? দরকারী কথা ছিল যে একটী।’

—‘হবে না দেখা।’ শব্দী জানাল। ‘চন্দ্র-সুর্ধের মুখ দেখছে না? দাদাবাবু, হেড-ক্লার্কবাবু তো দূরত্বান।’

ক্ষুণ্ণ মনে বাইরে বেরুতেই দেখা ভক্ত সাহেবের সঙ্গে। জুঁকুঁকে হেড-ক্লার্কের হুঁপের দিকে চাইলো জেনারেল ম্যানজার—কি ব্যাপার! এ বাড়িতে ঘেন! পরদিন অল্পদাকে ডেকে পাঠাল ডকত। জানতে চাইল, অফিস-ডিউটি ফেলে কি দরকার ছিল কর্তার বাড়িতে।

দরকার আবার কি! ডকতকে ভর পায় না অল্পদা। দশ টাকা মাসনার উনিশ শো ছত্রিশ সালে ঢুকছে সে মিত্র কোম্পানিতে, রস তখন কুড়ি। সেদিন কোথার ছিল এত বড় অফিস আর তার জেনারেল ম্যানজার! মিত্র সাহেব নিজে করেছেন বাড়ি, বাড়ির ওয়েরিং। সে কি হুঁসমর দেশের! এম-এ পাশ ছেলেরও ভান্ড নেই। কত ভূষেছে লোকের জলে। টিউশনি, পাঁচ টাকার তিনটে ছেলে! অনেক দুঃখে কাতার প্রদূর রায় বসেছিলেন ল’ কলেজ ভেঙে ফেলতে। ঘর ঘরে বি-এ পাশ ছেলে—সব বেকার। মনে আছে মিসেসাহা নিজের হাতে কাগল মুড়ির মতো নিয়ে আসতেন, খেতেন সবর সঙ্গে ভাগ করে। পাশের বেকারের গ্লাসে করে আনত। চা—তুমেন গাওয়া আর কি হবে! সন্নিহিত লোক আর কে আছে? অল্পদা সরকার আর দারায়ান তিস্ক সিং। রস? রস তো এসেছে চল্লিশ সালে। তখন হুঁটা ওয়েলডিং মেশিন কেনা হয়ে গেছে। চালাঘরের টিনের তাপে গলতে গলতে কাজ করত রস।

মিত্র সাহেবের ছোটবেলার বন্ধু হবার ক্যামেরন রস। ইঞ্জিনিয়ার ভাল কাজ করত। মস্ত মাইনে, বেরাট প্রতিপত্তি। সব গেল মেয়ের পাঠায় পড়ে। লুইসা দ্রাবেরীর হেল্পলনাট আঁখিতারা আর অপরাধ চুল্লের সোনালী টেট বিপরীত করে দিল রসকে। কানালি দ্রাবেরী বন্ধু রসের। বন্ধুপত্নীকে নিয়ে বাড়িবাড়ি। দামী প্রজেক্ট, অমুবাগ, অদর্শন চার্টার্ডক অঙ্ককার।

প্রেমিক-যুগল ভাবত স্বামী বুঝে না কিছু। দ্রাবেরী বুঝছিল ভাল করেই। ওং পেতে ছিল হাত-নাতে ধরবার ভঙ্গ। ধরা পড়লো রস আর লুইসা শিমলার হোটেলে। মেয়ে অব্যাহতি পেল। পুরুষ মোটা টাকা খোঁসার দিতে বাধ্য হোল স্বামীকে। প্রায় সর্বস্বান্ত হল রস। চাকরী নিয়েও টানাটানি। মান রাখতে চাকরীতে রিজাইন দিল রস, আর সেই ছুঁচুনি দেখা হল মিঃর সঙ্গে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন জাগন মাত্র তার নিশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করছে। তারপর ছড়িয়ে পড়ল আগুন সর্বত্র। টাকা! টাকা! ছাপানো কাগজে টাকার ছড়াছড়ি। উপছে পড়ছে

টাকা; আবার তারি মধ্যে না খেতে পেয়ে পথে মুখ গুঁজে মরছে মানুষ। একটু ফ্যানের জগা কান্না; একটুকরো ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের জগা কান্না। একটোটা খাবারের বদলে মেয়েগুলোকে টেনে নিল শূনের পাথর ব্যাফেল ওয়ালের অন্ধকারে। নীচে থাকা, পড়ে যাওয়া মানুষগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রথ। মানুষের রমিট ছুস খেয় শরীরের হিম্মোবিন বাড়ালো মানুষ। মিত্র কোম্পানীও চড় চড় করে বড় হয়ে গেল। নতুন বাড়ি, সুইজারল্যান্ডের মেশিন। সুমোহনবাবু বড়সাহেব হয়ে গেলেন। কত জারগা হতে ডাক এল রসের। ভাল কাজ, প্রচুর বেতন আর সম্মান—ভেলুর প্রজেক্ট, বরাকর করপোরেশন। সব প্রত্যাখ্যান করল রস। তার অধীনে এখন চার জন ইঞ্জিনিয়ার খাটছে।

কয়েক বছর পর এস জেমারেল ম্যানেজার নতুন পোস্টে—টাই সুটে নির্খুঁত স্কিফট শশাঙ্ক ভক্ত। বড় বেশি চকচকে চোখে তাকায়, প্রকাশ করে নিজের পাওয়ার। রসকে ডাবে এগরী। একটু বৃষ্টি মন টলল রসের। স্টেটসম্যানের ওয়ার্টেড কলমে বৃষ্টি চোখে বোলাল সে। এমন সময়ে ইলগু হতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে ফিরল ভাস্কর। তুখোড় ছেলে। ইসারায় বুঝে নিল চিড় ধরেছে রসের মনে,—আর তার মানেই ব্যবসাতে চিড় ধরা। নতুন প্রান দিল ভাস্কর বাপকে। কথা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড হয়ে যাবে মিত্র কোম্পানী। রস? রস পার্টনার হবে।

ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে—রস গেছে নাইনিতাল—শরীরটা ভাল করে কেড়ে নিতে হবে নতুন উত্তম কাজ আরম্ভ করবার আগে। এমন সময়ে এই টেওয়ার। এর আগেও টেওয়ার দিয়েছে মিত্র কোম্পানীর দু-হু বার, কিন্তু হেলার তাদের হারিয়েছে কান্ডারাস। এবার? এবারও হারাবে। ওতো জেনে বস আছে মিত্র কোম্পানীর, সব কোম্পানীর টেওয়ার। দু-পাসেট, তিন-পাসেট কম ধরে নিজের টেওয়ার সাবমিট করবে—কাজ গুর। তা'ছাড়া এবার যেন ইচ্ছে করেই মিত্র কোম্পানী তার গেট বেশি বেশি ধরছে।

মন খারাপ অন্নদার। না, না। তার কিছু তো নয়ই। তবে এতদিনের অন্ন-জলের যোগানদার মিত্র, তার ভাল তো চাওয়া ধর্ম; আর কোম্পানীর ভালতে যে সরকারের ভাল নয়—কে বলবে? কোন কোম্পানীর হেডক্বার্টার মাইনে পায় পাঁচশো টাকা। এখন যদিও দু'হু কিছুটা বেড়েছে অফিসে,—বাড়িতে ঠিক আগের ব্যবহার। ভাস্কর তো অফিসেও ডাকে 'সরকারকাহু'। স্তব্ধ ভক্তের কৈফিয়ৎ নেবার মত জিজ্ঞাসার জু কোচকাল অন্নদা সরকার, জানাৎ—হাট সাহেব অফিসে অনুপস্থিত দু'সপ্তাহ ধরে। তাঁর শারীরিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাড়ি গিয়েছিল সে।

ছেটসাহেবের স্বাস্থ্যের সংবাদে অন্নদা সরকারের কোন দরকার আছে কি না জানতে চাইল জেনারেল ম্যানেজার ঠাণ্ডাগলায়।

এবার শক্ত হল সরকার। ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে জানাল—টেওয়ারের অতিরিক্ত কপিটা পাওয়া যাচ্ছে না। এসব সিক্রেট শিরষ বাইরে বাওয়া ঠিক নয়। বড়সাহেবকে না পেলে ছেটসাহেবকেই খবরটা জানাবার ইচ্ছা ছিল সরকারের।

দীতে দীতে চাপস ভক্ত। ইম্পাটিনেল।—যেদবী! দরজার দিকে আঙুল দেখাল। একটু চেয়ে দেখলে ভক্তের স্টেনো-টাইপিষ্ট—মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে হেডক্বার্টার। ভয় নেই ম্যানেজারকে? নতুন চাকরী পাওয়া ছেলটির বুক ধক করে উঠল অন্নদার জগা। এ-বয়সে এমন চাকরী গেলে যে মুখিল হবে বেচারীর।

যার জগা এত ভাবনা সেই অন্নদার গ্রাহ্য নেই একতিল। টেবিলে বসে দিবি মুখে পুত্র বাড়ির বানানো একখিল পান।

ঠিক চোদ্দদিন পর বিকেল তিনটার সময় খুশি ভাস্কর জড়িয়ে ধরলো মাকে—'মা। ভীষণ ক্ষিধে। ডিমের কচুরী ফরমাস দাও, আর গরম হসগোল্লা।'

ছেলের বাড়াকাকের মূর্তি দেখে স্তম্ভিত মা।—'কি করছিস দিন রাত ঘরে বস? আয়নার দেখগে মুখ।'

ছেলের বাপের উপরও অসহ্যাবী নিল এফ হাত।—'খরচ কমাচ্ছ নাকি অফিসের, যে ছেলেকে টাইপ করতে হচ্ছে?'

সুমোহন হাসলেন স্ত্রীর কথায়।

ব্যবসায়ের প্রশস্ত দীর্ঘ টেওয়ার। প্রত্যেকবার সাবমিট করতে যায় জেনারেল ম্যানেজার, এবার যাচ্ছে ছোট মিত্র নিজে। কাপড়-টাপড় বেশি নিচ্ছে ব্যাগে—সিগারেট একদৌড়ে ঘুরে আসবে। একটু অশ্লীল হল, একটু অশ্লীল ভোগ করল ভক্তসাহেব। তার প্রতি অবিশ্বাস নাকি? না, না। এই ত' কাগজপত্র রেডি করবার সময় অত্যাশঙ্কক ছিল সে। ছোকরা ছেলে ভাস্কর মিত্র! সখ নিজে কত বনবায়, আর ভবিষ্যৎ বর্তা তো নেই।

—'আপনি যখন যাচ্ছেন, এ কাজটা আমরা নিশ্চয়ই পাব।' ভাস্করকে স্তম্ভ খোসামোদ করল শশাঙ্ক ভক্ত।

নিরবিধি ঘরে এস অন্নদা সরকার।—'মিথো সব পরিশ্রম। তবু ক'দিন আগে অফিসে এলে কিছুটা সন্তোষনা ছিল।'

চোখ তুলে চাইল ভাস্কর সরকারের মুখের দিকে। হাসি চমকাল চোখে, একটু বেকলে সেকেণ্ড আকট টোটে।

—'বোসো কাকু! অফিসে না এলেও কাকি দিই নি। কাজ করেছি বাড়িতে বসে। দেখ না কি হয়। কাজটা পেলে কিন্তু খাওয়াবে পিসিমার তৈরি সরভাড়া।'

চোখে জল এসে গেল ভীষণ রাগী মানুষ অন্নদা সরকারের। ভাস্করের শিশুকালের বন্ধ দৌরাষ্ট্রা গেছে তার পিঠের উপর দিয়ে। ছোট এতটুকুন ভাস্কর! বউটাকরণকে সেই তো নিয়ে এল শিশুদল হাসপাতাল হোটে ট্যান্ডি করে। ইষ্টুলে কে ভর্তি করেছে ভাস্করকে, কে এনেছে পাসের খবর? সব, সব এই অন্নদা সরকার। বিস্মিত ঘুরে এলে কি হবে—সই ছোট ভাস্কর, সরভাড়া-লোভী ভাস্করই আছে সে এখনো। বত দেখে ছেলটাকে, অবাক হয় অন্নদা। হৈ হৈ। ক্লাব। মেয়ে নিয়ে নাচছে, খাচ্ছে সাহেবী কোর্টেলে, আবার কাজে বসল তো ধ্যানমগ্ন মহাতপসী। তখন ভাস্করের নিকটতম বন্ধুও চিনাব না ওকে।

কেটি পরতে ভাস্করকে সাহায্য করল অন্নদা।—'কবে ফিরবে দিল্লী হতে? জান তো কান্ডাদারের ছেলেও আছে!'

—‘বাচ্চা? তা বাব। ওর জন্ম ভেব না তুমি।’  
 —‘ওরা অনেক টাকা খরচ করবে।’  
 —‘আমিও করব কিছু, তবে অনেক নয়। তোমার বড়সাহেবের হুকুম মূখ্য চলেবে না। আর কি জান, এবার দিল্লীতে টাকার খেলা সুবিধে করতে পারবে না। আমি চাইছি—ওরা টাকা দেখাক, সেটাই বাবে ওদের বিপক্ষে তা হলে।’  
 —‘ওরা আমাদের চেয়ে কম রেট দেবে।’  
 —‘কি করে জানবে আমাদের রেট?’  
 —‘জেনেছে। প্রত্যেকবার জানে।’  
 একটা শুকনু হুঁত।  
 —‘বাবাকে বল নি কেন?’  
 —‘প্রমাণ কই? ওর অতিরিক্ত বিশ্বাস ম্যানেজারের উপর। সেট সাহসেই তো বসের কাজের উপরও কলম চালাতে যায় সে। অবশ্য যোগ্যতাও আছে। এক কান্ট্রীলাস ছাড়া সব জায়গাতেই কোম্পানীর স্বার্থ দেখে প্রাণ দিয়ে।’  
 —‘ভক্ত। আমি ভেবেছিলাম বিপিন গুপ্ত।’  
 —‘ঠিকই ভেবেছ। বিপিন গুপ্তই ওর হাতিয়ার।’  
 —‘কতদিন কাজ করছে বিপিন গুপ্ত?’  
 —‘দু’বছর। ভক্তই এনেছে তাকে। তার আগে তো রেকর্ড থাকত অনিমেষের কাছে।’  
 —‘হুঁ। জান কাফু, সামনের বছর কোম্পানীর অনেক অদল-বদল হবে।’ প্রাঞ্জলী ছেড়ে দিল ভাস্কর।  
 —‘পার্টনার হবে রস?’ অনুরা জিজ্ঞেস করল।  
 —‘কেবল রস নয়। মামা, মোসামশাই, তোমার বৌঠাকরুন।’  
 বাবা বলেছেন তুমিও একজন ডিরেক্টর হয়ে যাবে।’  
 —‘পাগল! বলে কি ভাস্কর। কার্ক হবে ডিরেক্টর।’  
 পাণ্ডুর এল ঘর ছেড়ে অরুণ। সিঁড়িতে শোনা গেল জুতোয় শব্দ।  
 —‘কি ব্যাপার? মাড়োয়ারী বনবার মতলব না কি? কেবল ব্যবসা।’  
 —‘দেখছ তো, নিম্নে করতে চেয়েও মাড়োয়ারীর প্রশংসাই করে ফেলেছে তুমি। সত্যি, কাজে ওদের নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য।’  
 কথা হচ্ছিল অরুণাণ্ড আর ভাস্করের মধ্যে। পাশে জানালার উপর পা ভুলে ঝাঁড়িয়েছিল প্রবীর। চারমাস ক্লাবে আসে নি ভাস্কর। হিজি-দিল্লী করেছে ব্যবসার কাজে। এই বসের চারটা। কত আনন্দ যে মিসু করল ভাস্কর। দিল্লীলালও প্রায় তল মাস অমুপস্থিত? ও তো দিল্লীতেই ছিল, দেখা হয় নি ভাস্করের সঙ্গে? জানতে চাইল প্রবীর।  
 —‘কতবার। এক ধাক্কা ঘুরে, একই ‘ক্লব’ে ‘ছোলে’ খেয়ে বাড়িয়েছি তো আমার। উঃ! বা গরম দিল্লীতে।’  
 —‘কি মরকার ছিল তোমার নিজের ব্যবসার? বাছ লোক রয়েছে ভক্ত। এই গরমে দিল্লী। হরিবল,।’—বলল জার্কিস যোবের ছলে অরুণাণ্ড যোব—বন অ্যাণ্ড বসের চোদ্দ শো টাকা মাইনে পাওয়া সেক্রেটারী।  
 —‘সত্যি। এত ব্যবসা ব্যবসা করলে ক’দিন পরই একময় মর্নিং হয়ে যাবে তুমি।’ প্রবীরের উক্তি।

ভাস্কর হাসল।—‘বাঙালী ব্যবসার হেরে বাচ্ছে, হটে বাচ্ছে ঠিক এই কারণেই। কাজ আর আনন্দের সামঞ্জস্য রাখতে পারছি না আমরা। একটু উঠতে না-উঠতেই কাজ ছেড়ে দিই কর্মচারীর হাতে, আনন্দের ভার আমাদের।’ ক’দিন পরই ব্যবসা কাঁপতে থাকে, তখন ছুটি মাড়োয়ারী সিঁদ্ধির দরজার—বাদের হরদম গাল দিচ্ছি কালচার নেই বলে। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যবসা হাত বদলে ওদের কাছে চলে যায়, আর আমরা মাথা কুটে মরি, বলি বাংলা দেশটা কিনে নিল অবাঙালী। ভক্তকে পাঠ্যবার কথা বলছিল অরুণ? ওর চেয়ে অনেক বেশি এক্সিসিটে ক’রচারী আছে কান্ট্রীলাসের, তবে টেণ্ডারের তথিরে যায় কেন দিল্লীলাল?’

একটু সময় কাটল চুপচাপ।

—‘তোমাকে অত্যন্ত মিস করছি আমরা সিমল গার্ডেন পার্টিতে। অসুস্থ হয়েছিল। সিসি, লিসির ভাল। বাজনার মালাধারী। লাফ দিরাণে। জিলিরা আবার ফ্যানী ড্রস-বল আর ফেরার অ্যারেঞ্জ করেছিল। এককোণ চা দশ টাকা। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব ছাড়া পারবে না কেউ এমন ব্যাপার করতে। ফিগটিন খাজেন্ড নীট খরচা।’ অরুণ ক্লাবের মরশুমী আনন্দের খবর দিল উৎসাহের সঙ্গে।

—‘আরে এই অভিজাততম ক্লাবের মেম্বার থাকবার মত চান! যোগাড়ের সামর্থ্য সফরেই তো দৌড়েছিলাম দিল্লী।’

—‘উঃ! বোগাস! কেন এত পরিভ্রম? মিডসায়েব কি ডিস্ট্রিনেব্রিট করছেন তোমাকে?’ বলল প্রবীর।

—‘ব্যবার টাকা আছে, অ্যাণ্ড ই হাজ্ঞ আরও ভাট মানি অ্যাট দি সোয়েট অব হিজ ভাউ। বহু পরিভ্রমে তিনি ঝাঁড় করিয়েছেন ব্যবসা, কিন্তু তাতে আমার কি? আমি নিজেকে একট্রিশ করব আমার কর্মক্ষমতা দিয়ে। বাবার অফিস চুকেছি, যদি কাজ না দেখাতে পারি, বুঝব ব্যবসা আমার জন্ত নয়। চাকরী নেব যে কোন জায়গায় যে কোন কোম্পানীতে।’

ভাস্করের কথায় বিদ্রূণ খেলে গেল প্রবীরের চিন্তায়। সত্যি। সত্যি কথা বলেছে ভাস্কর। নিজেই দিকার দিল মনে মনে। বাবার অজস্র টাকা নষ্ট করেছে সে, ইয়োরোপে অনেক বন্ধু তার, এখানেও সবাই গণ্যমান্য। আর সে নিজে? তার পরিচয় বিমান বোসের ছেলে। নিজে? নিজে কিছু না। পারবে জুতোটি হাতে যে দামী গাড়ীর স্টিয়ারিং ছইল ধরে আশি মাইল স্পিড দেয়—সব বাবার। প্রবীরের সমবয়সী ভাস্কর—এরি মধ্যে ব্যবসারী-মহলে নাচ হয়েছে জুনবার মিত্রের ফিউচার বিজনেস ম্যাগনেট বলে।

—‘ডোর্ট মাইও ভাস্কর। ছোটবেলার বন্ধু আমরা। পার্সোনা কথাবার্তাও সব সময় বলি খোলাখুলি। এতই যদি ম্যাটার অ ফ্যান্ট তুমি—অনেক সন্ধ্যা কাটাও কেন তবে তপতী রায়ের বাজ শুনে? তাকে নিয়ে যাও লাইব্রেরীতে, ইউনিভারসিটিতে এ তো গণেন ফ্যান্ট, যে তাকে ভাল লাগছে তোমার। তপতী যা ভাল মেয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই আনপ্র্যাকটিকাল, অ্যা এক্সিউজ মি, একটু ব্যাক ডেউডও বটে। অথচ এদের এক প্রক্যা তুচ্ছ করেই তুমি ছুটিছ তার কাছে। তোমার কথার সুন্দর কি তোমার ইচ্ছার মিল দেখছি না।’

[কম্প।]

# সম্মাদ কী য়

## অন্যভাবে হাফকার

‘বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কাঁঠর সন্সার,  
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার,  
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলা চাই, চাই মুক্ত বায়ু—  
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু।’

একদা ধনবাঞ্ছা পরিপূর্ণা অশেষ সোভাগ্যশালিনী বর্তমানে সহস্র দুর্ভাগ্য প্রাপ্তিভিত্তি, লাহুনার জর্জরিতা বাউলা দেশের সাম্প্রতিক খাজ-পরিহৃতির সমস্তাসংকুল পরিবেশে—‘এবার ফিরাও মোরে’ নামক রবীন্দ্রনাথের অবিষ্মবদীয় কবিতাটির উপরিউক্ত বিখ্যাত কয়েকটি পংক্তি দ্বয়ের আবার যেন নূতন করিয়া রেখাপাত করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ‘ছিন্নাত্তরের মনস্তর’ সম্বন্ধীয় রচনাংশগুলি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে।

মাসিক বসন্তমতীর গত সংখ্যায় এই বিভাগে বিয়টি লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈনিক যে ভাবে খাজাবস্থার অবনতি ঘটিতেছে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া যে কি শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে বেদনা ও উদ্বেগের আর অন্ত থাকে না।

অভাব, অনটনের সঙ্গে সঙ্গেই বোবার উপর শাকের আঁটির দ্বারা ভেজালের ক্রমবিস্তার আজ যথেষ্ট চিন্তার কারণ হইয়া পড়াইয়াছে। এক চতুর্দিকে ‘নাই নাই’ রবের মধ্যে যেটুকু কচিং কখনো ‘আছে’ শোনা যায় তাহাও আবার নিরাপদ নয়। ভেজাল বস্তুটি যে সাম্প্রতিক অভাব-অনটনের স্রবোগ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নয়, ভেজাল পূর্বেও ছিল, ভেজাল লইয়া আলাপ-আলোচনাও ইতোমধ্যে অসংখ্যবার হইয়াছে, ভেজাল বন্ধের আন্দোলনও বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু ভেজালের প্রাচুর্য্যের যে ভাবে ঘটিয়াছে তাহা কল্পনারও অতীত। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, একটি শিল্পকে সম্ব্রকীত হরলিঙ্গ খাওয়াইবার পর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাহার জীবনান্ত হয়, পরীক্ষায় দেখা গেল যে হরলিঙ্গে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত ছিল। ইহা ছাড়া তৈলের মধ্যে সায়নাইড এবং তামাকবীচি হইতে নির্গাসিত তৈল, রক্তনের গুঁড়া মশলায় অশ্ববিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োগের ভয়ঙ্কর সংবাদসমূহ আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

দেশের অধিবাসীদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায় (১) বিস্তারিত ধনিক সম্প্রদায়, (২) মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ, (৩) গৃহহীন শ্রমজীবী শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীর কথা বাদে দিতেছি শেখোক্ত শ্রেণীর বিষয়ও খুব গুরুতর চিন্তার কিছু নাই, ‘ব্যয়ের অমুপাতে তাহাদের আর বাড়িয়াছে এতদূর তাহাদের জীবনযাত্রা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু বিপজ্জনক

সর্বপ্রকার সামাজিক রীতি, নীতি, অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। সাধারণত একটি পরিবারে দেখা যায় হয়তো একটি প্রাণীর উপার্জনে আটটি-দশটি প্রাণীর অন্নসংস্থান হয়, তাহার উপর রোগ, শোক, সামাজিকতা তো নিত্যসহচর, আয়ের একটি বিরাট অংশ যায় বাড়িভাড়া। তারপর পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা। অল্পে সংকয়ের উদ্ভট স্বপ্ন অনেক উদ্ভাদের মাথায় আসিতে পারে, কিন্তু বীরবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই অমুভব করিবেন যে, অল্পে প্রয়োজনীয় ব্যয় যেখানে আয়ের অমুপাতে নির্বাহ হয় না—সেখানে অল্প সংকর।

এখন কথা হইতেছে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এই নিত্য মূল্যবৃদ্ধি, যাঁহে ঐযথ ভেজালের ভয়ঙ্কর প্রয়োগ, খাজবস্তুর ক্রমঃস্থাপত্য মামুদের সমগ্র চিন্তা বিশেষভাবে অধিকার করিয়া আছে। ইহা লইয়া যথেষ্ট উদ্বেগ, যথেষ্ট চিন্তা, যথেষ্ট বাদপ্রতিবাদ কিন্তু তথ্য এই সর্বনাশগুলির মূলোচ্ছেদ এখনও হইতেছে না কেন? কোন শক্তির সাহায্যে ইহার এখনও বর্তমান? সহস্র বাদাভুদার সত্ত্বেও কোন বলে ইহার এখনও কার্যক্ষম? আসল কথা বাদাভুদার কেবল শক্তি ও সময়েরই অপচয় করে, প্রকৃত কার্য তাহাতে কিছুই হয় না। উদ্বেগ, চিন্তা, ভাবনার মধ্যে সমাজ সচেতন জনকল্যাণকামী মনের পরিচর অবশুই পাওয়া যায় কিন্তু তাহার দ্বারা কখনও কোন প্রকার সমস্যার সমাধান হয় না—হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব।

এই দুর্যোগগুলির কবল হইতে দেশকে মুক্ত করার বহুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। শুধু যেগুলি অবলম্বন করিলে দুর্যোগগুলির অবসান ঘটিত সেই ব্যবস্থাগুলিই অবলম্বিত হয় নাই। সরকারপক্ষ যদি ভেজাল বা দুর্নীতি বন্ধ করার চেষ্টা তো দূরের কথা, সামাজ্য ইচ্ছাটুকুও অন্তরের একটি নিভৃত কোণে গোপন করিতেন তাহা হইলে তাসের ঘরের মত সর্বপ্রকার দুর্নীতি মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হইত। এই ঘোরতর অপরাধগুলি করিবার মত সাহস কোথা হইতে পায় খাজ ও ঐযথ বিবাক্ত ভেজাল মিশ্রণকারী জঘন্য নরপিশাচের দল? এত সাহস কেমন করিয়া তাহাদের অধিকারগত হয়? সহস্র আন্দোলন, বাদ-প্রতিবাদ, মিছিল, জনসভা, রচনাদি ক্রমাগত তাহার। যে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে কি দুর্ভেদ্য রহস্য তাহার পিছনে নিহিত?

আসলে সরকারপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি ক্রমার অযোগ্য উপেক্ষাই দুর্নীতি প্রসারের একমাত্র কারণ। অগণিত জনগণের স্বপ্নঃস্বপ্নের ভার বঁহাদের উপর স্তম্ভ তাহার। কয়েকটি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়া সর্বসাধারণকে এই সর্বনাশা অবলুপ্তির মহাসাগরে তলাইয়া যাইতে দেন তাহা হইলে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসের বজ্রার উন্নত উর্মি কি তাহাদেরও নিস্তার দিবে? এই কথাটিই আজিকার মোহামুদ্র, কাণ্ডজ্ঞানহীন সরকারকে বারবার

## এশীয় আকাশে ঘোর দুর্যোগ

এশিয়ার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। যুগপৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্যোগে তাহার আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কোটি কোটি এশীয়বাসীর মনে আজ শান্তির সেশমাত্র নাই, বিন্দুমাত্র আনন্দও আজ স্মৃতিতে পূর্ণবসিত, হাসি, গান, কাব্য তাহাদের জীবন হইতে আজ অন্তর্হিত। কয়েকটি মামুষের রাজনৈতিক খেলায় এবং ক্ষমতার লোলুপতায় কোটি কোটি নিরীহ মামুষের জীবনবাত্রা আজ বিঘ্নিত, প্রাণ বিপন্ন, ভাগ্য বঞ্চনার প্রলেপযুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণকে আমাদের এই ধারণার একটি উজ্জ্বল সাম্প্রতিক উপমাধরূপ অনার্যাসে গণ্য করা হইতে পারে। কাহার দোষ, কাহার গুণ সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র—পরে আমরা সে আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। যে কোন আক্রমণ সর্ব্বাঙ্গই যে কথাটি মনে করাইয়া দেয়, তাহা হইল রাজনৈতিক দ্যুতক্রীড়ার হতভাগ্য শিকার কোটি কোটি নিরীহ প্রাণ আবার এক সর্ব্বনাশা অবস্থার সম্মুখীন হইল। এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশ আক্রমণের মধ্যে দোষ একপক্ষের হইলেও বা পরাভব একপক্ষ বরণ করিলেও লোকস্বর, শক্তিস্বর ও অর্থস্বরের দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়—ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে দুই পক্ষই। সেই কারণেই সাধারণ বিচারের মানদণ্ডে সমাজের পক্ষে যুদ্ধ এত ক্ষতিকর এবং মানবকল্যাণের ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ বর্জনীয়।

এশিয়া যে আজ বিপন্ন সে বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা নাই, আর ইহাও মিথ্যা নয় যে, এশিয়ারই অন্তর্গত কয়েকটি রাষ্ট্র এই বিপদের জন্ত অনেকখানি দায়ী। তাহাদের পররাজ্যলোলুপতা, কাণ্ডজানহীন আচরণ, নীতিবিসর্জিত কাঙ্ক্ষালাপ সমগ্র এশিয়াকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেভাবে ধীরে ধীরে কমিউনিজমের প্রসার ঘটিতেছে, তাহা অতীব ভয়াবহ। তাহার পরিণতি যে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তথাকথিত কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা কালেই হইলে যে অবস্থায় আমরা উপনীত হইব, তাহাও বর্তমানকালে সংশয়ের তালিকাভুক্ত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই কমিউনিজমের প্রসারে যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছিল। পৃথিবীর অস্ত্রাঙ্গ দেশেরও এ সবক্ষে চিন্তার অন্ত ছিল না।

কমিউনিজমের অধিকতম প্রসার ঘটিতে না দেওয়ারই আমেরিকার উদ্দেশ্য। আমেরিকা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল এই অনভিপ্রের প্রসারকে আদমিত করিয়া রাখিতে। কিন্তু অবস্থা ভিন্নতর রূপ লইল।

ভিয়েতনাম আজ উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত। উত্তর ভিয়েতনাম উত্তর-দক্ষিণ সীমান্তের ভিয়েত কং বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে লাগিল। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—চীনের সহিত ইহার পথসংযোগ বিজ্ঞমান।

উত্তর অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে উত্তর-দক্ষিণের সীমান্তের বাহিনীকে আবার উত্তরে ভিয়েতনামের সহিত পথসংযোগ (হয়তো অন্তর সংযোগও) আছে চীনের—ইহার পরবর্তী অব্যাহত কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমের। ঐ অস্ত্রাদির সাহায্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামই যে আক্রান্ত

হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? তদুপরি মাও-সে-তুংয়ের সম্প্রদায়বদ্ধ এইভাবে উত্তর ভিয়েতনামের সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামেও ছড়াইয়া পড়িবে এ সিদ্ধান্তে আমরা অনার্যাসে উপনীত হইতে পারি।

মাত্র এক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্থিতি কার্যকলাপ পৃথিবীর সংবাদপত্রের বিরাট অংশ দিনের পর দিন ধরিয়া অধিকার করিয়াছিল। জনগন স্বেচ্ছা মাদাম ন্যা দেশকে যেভাবে সর্ব্বনাশের হারদেশে উপনীত করিয়াছিলেন তাহার বিষময় প্রভাব হইতে দেশ আজ মুক্ত। সেখানে আজ শান্তি, শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে আবার নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। শ্রমিকদের মধ্যে আবার প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে বৃহৎ শক্তির প্রতিজ্ঞাপূর্ণ নতুন প্রাণের। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিজ্ঞমান। এমতাবস্থায়,



প্রেসিডেন্ট জনসন

দক্ষিণ ভিয়েতনাম আক্রান্ত ও ভিন্নভাবে পুনরায় বিপদগ্রস্ত হইলে আমেরিকার ক্ষতিই সর্বাধিক। সে ক্ষেত্রে তাহার আক্রমণাশঙ্কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বাভাবিকতার পর্দায়েই পড়ে তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে তাহার গতাস্ত্রই বা কি ছিল?

আরও একটি দিক আছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের ভাগ্যচক্র। ফেব্রুয়ারি মাসের পর টুন্সান যখন রাষ্ট্রপতিতে উন্নীত হন তাহার তিন বৎসর পর নবনির্বাচন অস্থিতি হইয়াছিল—অতএব নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং নিজের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করিতে টুন্সান সময় পাইয়াছিলেন তিনটি বৎসর। এখানে জনসনের মেরাদ মাত্র এক বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি মাসও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর কয়েকটি মাস মাত্র অবশিষ্ট। তাহার পরই তাহাকে দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইবে—কি মূলধন লইয়া তিনি সেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, কি তাহার শক্তি, কি তাহার রসদ? কেনেডির মর্যাদিক মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে সক্রিয়ভাবে জনসনের এই প্রথম চরম ব্যবস্থা অবলম্বন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট কবলিত হইলে আমেরিকার যে ক্ষতি, তাহা সহজেই

জন্মের। বিরোধিত্বের এবং দেশবাসীর নিকট জনসনের চরম অযোগ্যতা সেক্ষেত্রে প্রমাণিত হইবে—জনসন যে দুর্বল নন, এই আক্রমণের দ্বারা ই তিনি তাহা দেখাইলেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠার পথ এই স্বল্পশরির সময়সীমায় অনেকখানি প্রশস্ত করিলেন।

তবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই আক্রমণ যে অসমীচীন ও অযৌক্তিক এই সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই অবলম্বন করা চলে

## আয়ুব খাঁর ব্যাকুলতা

পাকিস্তানের আয়ুব খাঁর আজ আর ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

বোধ করি আহারনিজ্ঞাও তাঁহার ঘটিয়াছে। মনে তাঁহার আজ আর তিলমাত্র সোয়াস্তি নাই। ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর সহিত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ না হইলে যে কি ঘটিবে তাহা বোধ করি একমাত্র তাঁহার 'খোদা' ছাড়া আর কাহারও জ্ঞাত নহ।



লাসবাহাদুর শাস্ত্রী

চীনের পরম মিত্র আয়ুব খাঁ কাজের লোক। তাঁহার অতি বড় শত্রুও বোধ করি তাঁহাকে নিছক বলিতে পারিবে না। সারা পৃথিবীর ঘরে-ঘরে, দেশে-দেশে, বন্দরে-বন্দরে ভারতের কুৎসা প্রচার এবং ভারতের বিরুদ্ধে উসকানো তাঁহার বিশেষ এবং মুখ্য কার্য। তাহার পর হিন্দুনিখাতন সঙ্কেতও তাঁহার মূল্যবান সময়ের অনেকখানি ব্যয় করিতে হয়, গতানুগতিকতার সহিত এই মাহুঘটিত কিন্তু কোনদিনই মিল হইল না, এক ধরনের অত্যাচার চালানোর সেই কারণেই তিনি দক্ষপাতী নন। তাঁহার নব নব উদ্বেগশালিনী প্রতিভা নূতন

না এবং ইহার দ্বারা যে কমিউনিজমের প্রসার বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইল তাহাও অনস্বীকার্য। বিশেষত কমিউনিজম বোধকরে আমেরিকার এই আক্রমণ আমরা সমর্থন করি তবে সেই সঙ্গে ঈশ্বরের চরণে এই ঐকান্তিক প্রার্থনাও জানাই যে—ঈশ্বার তাগ্যাকাশকে মঙ্গলময় পরিপূর্ণরূপে মেঘমুক্ত করিয়া প্রসার সূর্যের জ্ঞান রশ্মিতে উজ্জ্বল করিয়া দিন।

নূতন ধরনের অত্যাচারের, মৃণালস্তর, ও বিভৎসতার জন্ম দিয়া চলিতেছে, হিন্দুদের উপর তাহাদের প্রায়োগও ঘটিতেছে অতীব দক্ষতা (।) সহকারেই। হিন্দুনিগ্রহের নব নব কৌশল তাঁহার অভাবনীয় উদ্ভাবনীশক্তির বিশেষ পরিচায়ক। এ হেন শাস্ত্রীমান ও কর্মপুঙ্ক একবার যদি শাস্ত্রীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পান তাহা হইলে হয় তো বা 'সব বুটা ছায়' মনোভাব লইয়া মনের দুখে বনেও চলিয়া যাইতে পারেন (এমন দিল কি.....?)।

কাজের কথায় আসা বাক, যা সত্যেব এত ব্যগ্র কেন? এই চার চক্ষের মিলন না ঘটিলে কি দেশ রসাতলে যাইবে? তাঁহার অতি আগ্রহই আমাদের মনে সন্দেহের বীজ স্বাভাবিকভাবেই বপন করে, এই অতি আগ্রহই তাঁহার কপটতার মুখোশ খুলিয়া দিল—যে কপটতা তিনি আবৃত করিতে গিয়াছিলেন এটি অতি আগ্রহ দেখাইয়া।

অল্পদিন আগেও যিনি বলিয়াছেন নেহরুর মৃত্যুর সুযোগে ভারত আক্রমণ করিতে পারিতাম—এই কথার মধ্যেই তাঁহার মনোবাসনা ছায়া ফেলিয়াছে। বাহ্যিক দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মনে মনে পরিপূর্ণভাবে ভারত আক্রমণের তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, শুধু সুযোগ এবং অছিলায় অপেক্ষ।

শোনা যাইতেছে, কাশ্মীর সমস্যাতে কেন্দ্র করিয়াই তিনি এখানে আসিতে চান কিন্তু আমাদের বিচারবুদ্ধি ঐ কথাটি মানিয়া লইতে আমাদের নিবেদন করিতেছে। আসল তিনি আসিতেছেন পাকিস্তানী উচ্ছেদ বন্ধ করিতে—ইহাই আস্ত কথা। তা ছাড়া, এখন যে পরিস্থিতি তাহাতে কাশ্মীর সমস্যা আর আলোচনার কি আছে, গত জামুয়া মাসে পূর্ণ-পাকিস্তানে যে অমাহুবিৎক বর্ণোচিত হিন্দুনিধাতন স্কট্টা গেল তাহার নারক সর্ব্ব যা তো ইতোমধ্যে ঢাকায় কাশ্মীর আক্রমণের দাবী তুলিয়া খুব লাফালাফি, দাপাদপ্পি আবর্ত করিয়া দিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে আয়ুব দিল্লী আসিয়া কাশ্মীর সমস্যা আর নূতন কি আলোচনা করিবেন? পাকিস্তান হইতে সঙ্কট বাস্তবচ্যুতদের আগমন এককিন্তু এখনও কয়েক নাই, পূর্ণ-পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলিতেই কচিৎ কোন হিন্দু সংবাদ প্রকাশিত

হইয়া থাকে—ইহাও স্বাধীন সেখানকার অবশিষ্ট হিন্দুদের অবস্থা এবং হিন্দু সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব আঁচ করিতে তিলমাত্র রেশ অনুভব করিতে হয় না। কান্দীর সীমান্তও তো পাকিস্তানী উপলব্ধির অস্ত্র নাই।

ভারত সরকারের স্পর্ধিতাব্য এই সকল বিষয়ে পাকিস্তানের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা উচিত। এখনও নিত্য প্রয়োজনীয় জব্যের ব্যাপারেও পাকিস্তানকে ভারতের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের এই ঔদ্বৃত্ত ও প্রগল্ভতার প্রেক্ষণ দেওয়া কোনমতেই ভারতীয় সরকারের উচিত নয়—তাহার সর্বাগ্রে দাবী তুচ্ছন যে, আগে হিন্দু মিথ্যাতন বন্ধ হউক; তাহার পর আমাদের স্বরাষ্ট্র অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানকার হিন্দুদের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন তাহার পর আদ্যুধ খাঁর মনস্বামনা পূর্ণ করা

চলে কি চলে না ভারত সরকার ভাবিয়া দেখিবেন বিস্তৃততার পূর্ণে কদাচ নয়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আজ যে সকল সমস্তা বিদ্যাজমান সেগুলি ঠিক রাজনৈতিক সমস্তাও নয়, আঙ্গল সেগুলি সাম্প্রদায়িক সমস্তা। সেই অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সমস্তার সমাধানও চিরকালের মত অদৃষ্টই থাকিবা বাইবে।

পাকিস্তান এখনও অভিযোগ করিয়া চলিতেছে যে, ভারত পাগলামি করিতেছে, এই প্রসঙ্গ আমাদের বক্তব্য যে পাগলামি করা হইতেছে, ঠিকই, তবে পাগলামি ভারত করিতেছে না, করিতেছে পাকিস্তান, শুধু তাহাই নয় অর্থাৎ পাগলামিই নয় সমগ্র সভ্যতার ইতিহাসে পাকিস্তান কলঙ্কলেপন করিতেছে যাহার সহিত সে আজ একীভূত হইয়া গিয়াছে।

## বর্তমান শিক্ষাসমস্যার প্রসঙ্গে

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপণ্ডের মধ্যে বিতাদের সততা, আন্তরিকতা এবং বক্রিতা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা তাহাদের অন্ততম। শ্রীচাগলার মন্ত্রী-পূর্ব জীবনও গৌরবের ও কৃতিত্বের আলোর উজ্জ্বল। কর্মক্ষেত্রে তিনি যে অকুণ্ঠিত ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জনগণের অভিনন্দনে জগৎপূর। অল্পকাল পূর্বে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জুটোর অন্তঃসারশূন্য এবং উদ্বেগপ্রণোদিত ভারত-বিষয়েমূলক ভাষণ যে স্মৃতিগত যুক্তি ও অকণ্টা বক্তব্যের দ্বারা শ্রীচাগলায় গান করিয়া দিয়াছিলেন ভারতীয় জনগণের স্মৃতিতে তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শিক্ষা একটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। জমজীবনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান দিকের সমৃদ্ধিসাধনের দৃষ্টিতে এই দপ্তরের। জুথের বিষয়, শ্রীচাগলার জায় বিচক্ষণ এবং সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির এই দপ্তরের সঠিত সংযোগ নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয়।

শ্রীচাগলার শিক্ষামন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণের পূর্বে এই দপ্তরটি বহুবিধ অযোগ্যতার প্রমাণ দিতেছিল। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্র নানাপ্রকার অবিলম্বে তরিতা উঠিতেছিল, শিক্ষাজীবন এক অভাবনীয় সমস্তার সম্মুখীন হইতেছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার এবং বহুবিধ গণদের সংবাদ কাহারও অজানা নয়। স্কুল-কলেজে স্থান সঙ্কলন যে কি রেশকর তাহা ভাবিলে বিশ্বস্তের অবশি থাকে না, যদি বা কোলকমে স্কুল-কলেজের দুয়ারগুলি অর্গলমুক্ত হয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করা তখন আর এক গভীর সমস্তার বস্তুরে পরিণত হয়; দেখা গিয়াছে পরীক্ষা যথল প্রায় নিকটবর্তী তখনই পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হইল। অথচ, তাহাঙ্গ আশামূরুপ প্রতিকার প্রত্যাব বসিবার মত কিছুই হয় নাই।

দেশের স্বাক্ষর আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ, জীবনের বোধনলগ্নে যদি তাহাদের এই দুর্ভাগ ও যন্ত্রণার জ্বালায় জলিতে হয় তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ তাহার পরবর্তীজীবনে যে কি বিষময় হইবে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্মরণের অবকাশ থাকে না। বাল্যকালে যে দুর্ভোগ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহাঙ্গ স্মৃতি জাহার মন হইতে

মুছিয়া যাওয়ার নয়। ছাত্রজীবনেই এই ঘটনার ফলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এক ভীতিকর মৃতিতে তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইবে। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইলে দেশের যে সমৃদ্ধ সর্বনাশ ঘনাইয়া আনে তাহার তুলনা মেলা ভার।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে দেশমুখ মহাশয়



এম সি চাগলা

শিক্ষা-সংস্কারের নামে যে শিক্ষাসংস্কার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহার সাশোখনের দিকে বর্তমানে শ্রীচাগলা মনোনিবেশ করিয়াছেন। হতাশার জর্জর দেশবাসীর প্রাণে এই সংবাদটি যে আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ—স্বা বাস্তব, থাকিতে পারে না। প্রয়োজনের অনুপাতে বিভাগীয় মহাবিদ্যালয় না বাড়াইয়া ছাত্রসংখ্যা কমাইলে সমস্তা কমা তো দূরের কথা আরও ব্যাপকভাবে খণ্ডিতলাভ করিবে। শিক্ষা জাতির প্রাণ, শিক্ষা ছাড়া বিচিত্রার কোন উপায় নাই, শিক্ষা হইতে ভবিষ্যতের মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তাহা হইলে কারিকভাবে সে বিচিরা

থাকিলেও সমাজে মান যে কাখার নামিবে তাহা ভাবিলে কলিকতার পাওয়া যায় না। তখন চাষিত্তিক অংশতনের যে ভয়ঙ্করী বজা আসিবে তাহাকে কোন শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করা যাইবে তাহা চিন্তা করিলে দিশাহারা হইতে হয়—তাহুপরি পূর্বোক্ত ব্যবস্থার প্রচলন থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্বাক্ষরমার্কেটে দেখা দিবে এবং উক্ত ব্যবস্থা যে কতখানি ক্ষতিকর স্রীচাগলা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। দিল্লীর প্রতিটি শিক্ষার্থী বাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তজ্জগৎ তাঁবু খাটাইয়া শিক্ষাদানের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বোম্বাইয়ে সকাল-সন্ধ্যা রাশ খুলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে, এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জগৎ যে

আশ্চর্যবিত' ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

এখন বাঙলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও তো নৈরাশ্রজনক। দিল্লী ও বোম্বাইতে যেভাবে সমস্তার সমাধান হইতেছে, কলিকাতার দিকেও সেইরূপ কোন যত্নলব্ধক পথ অবলম্বন করিলে বাঙলার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী লাভবান ও উপকৃত হইবে। স্রীচাগলার সক্রিয় চেষ্টা সর্বতোভাবে আশা ও আনন্দের বার্তাবাহ, আমাদের মনে তাঁহার অবলম্বিত ব্যবস্থার যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। তজ্জগৎ, বাঙলা দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দোষ-ত্রুটি, অনুবিধানগুলির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

## ॥ শোক-সংবাদ ॥

### শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাঙলা দেশের শিক্ষাজগতের অগ্রতম প্রধান স্তম্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ও রামতল্লাহ লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত গত ৫ই শ্রাবণ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বি-এ-তে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ইনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। ১৯০৮ সালে পি আর স্বলারশিপ পান ও ১৯১০ সালে ডক্টরেট লাভ করেন। শিক্ষাবিদ ছাড়া সাহিত্যিকার ও সমালোচক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ রচনাদি দেশের সাংস্কৃতিক জগতের পরম গর্বের বস্তু। আন্তর্জাতিক স্তরীসমাজে ইনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এযুগে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে তাঁর অবদান অবিমরবীর। স্রীরাধার জন্মবিকাশ, বাঙলা সাহিত্যের একদিক, বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও আধুনিক কবিতার প্রথম পর্যায়, উপমা কালিদাসস্ত এবং আরও অসংখ্য মূল্যবান বিদগ্ধজন-সমাদৃত গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাস্ত্র-সাহিত্য গ্রন্থটি তাঁকে এ্যাকাডেমী পুরস্কার এনে দেয়। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান অমরবীর। তাঁর মৃত্যু বাঙলা দেশের পণ্ডিতসমাজে এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট শূণ্যতার স্রষ্টা করল।

### নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী

রোটারি ইন্টারন্যাশনালের প্রথম এলীর সভাপতি ও কলকাতা পিকচার্স ও এম জি এমের কলিকাতাস্থ পরিচালক ডঃ নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী গত ৫ই শ্রাবণ ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি এম এ পরীক্ষার এবং আইন পরীক্ষার সম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে রোটারি আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। ১৯৪৪-৪৫ এবং ১৯৬২-৬৩ সালে তিনি যথাক্রমে কলিকাতার এবং আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। বাঙলা দেশের তিনি প্রামাণিক চিত্রের অগ্রতম পথপ্রদর্শক। বেদান্ত এবং উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য যুগ্মদ্বারা প্রচুর আলোড়ন এনেছিল। ক্রাণ, চিলি ও আরবরাষ্ট্র

তাকে 'অর্ডার অফ মেরিট-এ এবং কালিফোর্নিয়া কলেজ অফ মেডিসিন' ও টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' প্রদানে সম্মানিত করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত করেন।

### মহারাজী সুরজা দেবী

দেশপূজ্য মহারাজা শ্রীর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্রবধু ও মহারাজা শ্রীর প্রজ্ঞোতকুমার ঠাকুরের সহধর্মিণী মহারাজী দেবী সুরজা ঠাকুর গত ১২ই শ্রাবণ ৮৪ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। দানশীলতা, পরোপকারিতা এবং বদাঙ্গতা প্রমুখ মহৎ বৃত্তিগুলির তাঁর মধ্যে এক পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সমগ্র পরিবারের মধ্যে তাঁকে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র মহারাজা প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, পুত্রবধু মহারাজী সুরীতি ঠাকুর বর্তমান। তাঁর মৃত্যু বিগত যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের একটি অমরীয় যোগসূত্র ছিল করে দিল।

### সরসীবালা দেবী

শ্রীর আন্ততঃ কৌমুরী, বীরবল প্রমুখ চৌধুরী প্রমুখ স্বনামধন্য দিকপাল চৌধুরী জাতবংশের অগ্রতম বিখ্যাত ক্যালকাটা উইকলি নোটসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত ব্যারিক্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী এবং রাষ্ট্রদ্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথের কন্যা সরসীবালা দেবী গত ৩রা শ্রাবণ তাঁর ৭১তম জন্মদিনে লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রখ্যাত ব্যারিক্টার বণদেব চৌধুরী এবং প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁর পুত্র ও জামাতা। ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর অধ্যক্ষ জয়ন্তনাথ চৌধুরী ও চিত্রতারকা দেবিকারায়ী তাঁর দেবপুত্র ও দেবপুত্রী।

### দ্বারি দত্ত

বেদান্তব্রত মনোবী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রবধু ও কবিমনসী সুরীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ছবি দত্ত গত ২ই শ্রাবণ মাত্র ৫০ বছর বয়সে পরলোকগতা হয়েছেন। ইনি উত্তর কলিকাতার সুবিখ্যাত ভোস (বসু) পরিবারের স্বর্গীয় সরোজেন্দ্রনাথ ভোসের কন্যা ও স্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভোসের জ্যেষ্ঠপুত্রী ছিলেন।

### সম্পাদক—স্রীপ্রাণভোষ ঘটক

[ দি বঙ্গবী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকতা, ১০০নং বিপিনবিহারী পল্লী স্ট্রিট হইতে স্রীহরার গহমজুমদার কনক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ]



# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকা-সমালোচনা

শ্রদ্ধাংশদেয়, আমি মাসিক বহুমতীর একজন অমুখ্য পাঠক। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত নতুন প্রবন্ধ বা ধারাবাহিক উপন্যাস সম্পর্কে আমার কেঁতুলের সীমা নেই। গত জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আপনার সম্পাদনায় মাসিক বহুমতী এক নবরূপ নিয়েছে—এ জ্ঞান আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় কয়েকটি ধারাবাহিক রচনার সমাপ্তি ঘটেছে। আবার সংখ্যা হাতে নিয়ে দেখলাম যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের বদলে দু'একজন নতুন লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে একজন নবাগতা মহিলা উপন্যাসিকের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস এ-সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। অজ্ঞাত সমস্ত লেখা পড়ার শেষে নমিতা চক্রবর্তীর 'শাখতী' ধারাবাহিক উপন্যাসটি পড়তে শুরু করি। থানিকটা পড়ার পর কিন্তু চমকে উঠলাম। এত সুন্দর কাহিনীর লেখা ইদানীংকালে পাড়ছি বলে মনে হয় না। সম্পূর্ণ অংশ পড়ে আরও ভাল লাগল। অত্যন্ত বুদ্ধিশীল লেখা, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিও এত স্নায়বিক হ'লে বুঝে না হ'লে উপায় নেই। বিভ্রাটের মাধ্যমে জানলাম যে, উক্ত লেখিকার 'ইন্দ্রনীলা' নামে আর একটি ছোট উপন্যাস আছে। বইটি নিশ্চয়ই পড়তে হবে। এক কথার পুনরাবৃত্তি করা, মনের সামান্য reflection কে তুলে ধরার জ্ঞান দশ পৃষ্ঠা ধরে স্নায়বিক বর্ণনা দেওয়া বর্তমানে যখন অধিকাংশ লেখক-লেখিকার অভ্যাসে ঝাঁপিয়ে গেছে, সেই ১০০০১২০০ পৃষ্ঠার বস্তাপট্টা উপন্যাস রচনার যুগে এ জাতীয় শিল্পকলাচি লেখা সত্যিই দুর্লভ। 'শাখতী' উপন্যাসের পরবর্তী অংশগুলি কেমন হবে জানি না, তবে যেটুকু পড়লাম তাতে মনে হ'ল যে, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অজুত শক্তিশালী লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃত জঙ্ঘাই জ্বর চেনে। প্রাণতোষাবাবু, সত্যিই আপনি পাকা জঙ্ঘাই—তাই এমন একজন লেখিকাকে বহুমতীর মাধ্যমে আপনি অগণিত পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরছেন। আপনার সম্পাদনায় মাসিক বহুমতী তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলুক। ইতি—সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

মহাশয়, আপনার পত্রিকার আলোকচিত্রে বিভাগটি বহুমতীর শোভাবর্ধন করে নিঃসন্দেহে কিন্তু ছবির নামকরণে তুলে দেখা যাইলে বড়ই দৃষ্টান্ত লাগে। বর্তমান সংখ্যা অর্থাৎ 'চৈত্র-১৩৭০'-এ এইরূপ একটি তুল আছে। ১০১৬ পৃষ্ঠার সংলগ্ন পাতায় জনৈক এস দর কর্তৃক গৃহীত 'গির্জা' (কলিকাতা) নামক একখানি ছবি ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ওই ছবিটি তো আসল কলিকাতা হাইকোর্টের ছবি—সম্ভবত ইডেন উত্তানের দক্ষিণ দিক হইতে তোলা। হাইকোর্টকে গির্জা বানিয়ে ফেলা—এটা কি আপনারদের ছাপার তুল না এস ধরের তুল, নাকি ধর মহাশয় হাইকোর্টকেই একটি গির্জা বলে ধরে নিয়েছেন? ধন্যবাদান্তে—সুনন্দা বসু, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা-২৬।

মহাশয়, নিবেদন এই আপনারদের বহুমতীর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের নিরমিত (fixed) গ্রাহক আমি। কার্তিক ১৩৭০, মাসিক সংখ্যাতে সম্পূর্ণ উপন্যাস সত্যীকান্তবাবুর লেখা পাঠ করিয়া এত আনন্দ পাইলাম যে, তাহা বর্ণনাহীন। কৃপাপূর্বক যদি শ্রীযুক্ত সত্যীকান্ত গুহ মহাশয়ের ঠিকানাটি আমাকে Boring Post-এ লিখিয়া জানাইতেন আমি নিজেই গৌরবান্বিত বোধ করিতাম। রমেশ লেখা বাহ্য মনে করি। নমস্কার, ইতি—শরচ্চন্দ্র চাকী, সম্পাদক, 'পাঠিক' মাসিক পত্রিকা। চকমকলিশপুর, কালিগ্রাম, প. বনাজপুর।

মহাশয়, মাসিক বহুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠালাম। বহুমতীর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বহুমতীর বহুলপ্রচার কামনা করি। বাড়ির সকলেই এমন কি, আমাদের ছোট ছেলে-মেয়েরাও বহুমতী পড়িয়া আনন্দ পায়। নমস্কার! ইতি—মারা দাশগুপ্ত। অবধারক—এস দাশগুপ্ত, এ্যাডভোকেট, মঙ্গলদাই, আসাম।

মহাশয়, আপনারদের কার্তিক ১৩৭০ সংখ্যার পিছনে যে বাম্মাসিক খুঁটাটি সংযোজিত করেছেন, সেটি বিশেষ উপযোগী হয়েছে, সেজন্য আপনারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এ প্রসঙ্গে অমুখ্য জানাচ্ছি, এই খুঁটাটি যখন বৈশাখ থেকে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকাগুলির জন্য, তখন উক্ত খুঁটাটি আশ্বিন সংখ্যার শেষে সংযোজিত হলে বাঁধাই-এর সুবিধা হয়। পরবর্তী বৎসরগুলিতে যদি অমুখ্য করিয়া আশ্বিন সংখ্যার ঐ খুঁটাটি দেন, তবে ভাল হয়। আশা করি, ইহাতে আপনারদের খুব অসুবিধা হবে না। নমস্কার—আন্তোতোষ বান্যাজী। ৮৭, ফিডার রোড, পোঃ—বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

মহাশয়, আমি দীর্ঘকাল আপনারদের পত্রিকার এজেন্ট মারক্‌স গ্রাহক। বাস্তবিকই এমন সর্বজনস্বন্দয় মাসিক পত্রিকা আর আছে কি না জানি না। যে কোন বয়সের লোকদের হাতে দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দচিত্তে। 'বার্ষিক্যে' বারাদেশীর লেখক নীলকণ্ঠ প্রকৃত নাম ও ঠিকানা জানিতে ইচ্ছুক। আমার বিশেষ দরকার আছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার। আশা করি আপনারদের সহযোগিতা পাব। অধিক আর কি? উত্তরের জন্য কোড়া পোকাকড়ি বিলায়। দ্বায় উত্তর দেবেন। ইতি—বিনীত শ্রীভোলানাথ সাহা। পাইকপাড়া, পোঃ—রাণাঘাট, জিলা—নদিয়া।

মহাশয়, আমি মাসিক বহুমতীর বহুদিনের পাঠক এবং অমুখ্য। সর্বপ্রথম আমি আপনার মাসিক বহুমতীর সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, আপনার পরিচালনার প্রত্যেকটি বিভাগকে প্রশংসা না করিয়া পারি না, ভক্তি দেবীর 'রক্তের স্বাক্ষর' এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'তালপাতার শৃংখি' উপন্যাসগুলি সত্যি ভাল লাগছে। 'চায়লুন'

বিভাগে আপনি বহু খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালীর জীবনী প্রকাশ করেছেন, আশা করি আপনি নিম্নোক্ত দুইজনকে জীবনীও এই 'চারণন' বিভাগে প্রকাশ করবেন। এরা দু'জনেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আদর্শস্থানীয়, আমার মনে হয় এদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এই 'চারণন' বিভাগে প্রকাশযোগ্য, আমি এই দুইজন ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানালাম,—(1) H. B. Ghosh. Dy. Chief Inspector of Mines Government of India. P. O. Sitarampur. Dt—Burdwan. (2) S. N. Adhikary. P. O. Sitarampur. Dt—Burdwan, ইতি—স্বস্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল।

### বেচিতে চাই

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি কোনও সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল লাইব্রেরীকে দান করিতে চাই। গ্রহণকারীকে এই ঠিকানা হইতে নিজ দায়িত্বে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৩৬০ সাল হইতে ১৩৬১ সাল বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত বই আছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনার পত্রিকার এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিলে বাধিত হইব।—শ্রীডালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮, বার্ড এভিনিউ, কুর্টি, ইস্টার্ন বেলেগে।

মহাশয়, আমি নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি একত্রে প্রতিক্রমি একটাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন লোকের কিনিবার ইচ্ছা থাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারেন। উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যার পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞাপিত করিলে বাধিত থাকিব। ১৩৬১, শ্রাবণ হইতে চৈত্র, ১৩৭১ সালের অগাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত। জিনিয়রেন মুখোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ—সোনাখুন্সী, জেলা—বাকুড়া।

### গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী শোভা দত্ত, এম এ, অবধারক—ডাঃ এস সি দত্ত, এম-বি, ডি-টি-এম, চাষালা কোলিয়ারী, ডাক—পাথরদি, জেলা—ধানবাদ \*\*\* শ্রী এস কে ঘোষ, তরায় টি এক্টেট, ডাক—বেলগাতি, (দার্জিলিং) \*\*\* শ্রীমুখেন্দু মুখোপাধ্যায়, সহকারী বর্মাধ্যক্ষ, ডি জে রাজ মুন্ডথারকি কোলিয়ারী, ডাক—মুন্ডথারকি, জেলা—ধানবাদ \*\*\* শ্রী বি কে মিথ, গার্ড, অবধারক—স্টেশন মাস্টার দিতলেশ্বর জংসন, পশ্চিম কলকাতা, গুজরাট \*\*\* শ্রীবসন্তকুমার দে, ৫৩, সিকদার পাড়া ট্রাট, কলিকাতা \*\*\* শ্রীবিখনাথ মণ্ডল, হোসেনাবাদ টি এক্টেট, ডাক—বীরপাড়া জেলা—কলপাইগুড়ি \*\*\* শ্রীমতী বীণাকী মুখোপাধ্যায়, বালো নং ২৭, (টাইপ—VI) ডাক—শিলালানি, ডুপাল (মধ্যপ্রদেশ) \*\*\* শ্রী এন হালদার, 'এলবিস হাউস' এন ফাটক রোড, মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) \*\*\* শ্রীনীতীশ রায়চৌধুরী, সচিব গান্ধী স্বয়ং, গ্রাম—মকাই সেটায়, ডাক—জলতানপুর, জেলা—বর্ধমান \*\*\* শ্রী এস পি রায়, ব্রক নং ৩১ ও ৩২, বেল-ডিউ ৮৫, ওয়ার্ডেন রোড, বোম্বাই—২৬ \*\*\* শ্রীমতী রেবা মিত্র, অবধারক—শ্রী ডি কে মিত্র, রাজকৌরী গার্ডেন, নিউ দিল্লী—৬ \*\*\* শ্রীমতী রুমা লাহেড়ী, বি এস সি, Under Graduate Wing Womens Hostel, অর্ধ মেডিক্যাল

কলেজ। পূর্ণা—১ \*\*\* কুমারী বিজয়া নাগ, অবধারক—শ্রী শি সি নাগ, এ্যাডভোকেট, মানি লজ, জেল রোড, শিলং, আসাম \*\*\* শ্রী এন সি গুপ্ত, ১১৩, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্ট্রাট রোড, ডাক—রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা—৪০ \*\*\* শ্রীসিদ্ধিকান্ত পাহাড়ী, গ্রাম—বুসকারী, ডাক—বাসন্তিহাট, জেলা—মদিনীপুর \*\*\* সচিব, টিচার্স কাউন্সিল কাসতামারী এইচ এস স্কুল, ডাক—কাসতামারী, জেলা—মুর্শিদাবাদ \*\*\* ডাঃ এস গঙ্গোপাধ্যায়, মেডিক্যাল অফিসার, জি এন এল এফ, ডাক—চিলকালী পল্লী, (বেরিলি হয়ে) জেলা—শ্রীকৃষ্ণ (এ পি) \*\*\* শ্রীমতী প্রীতি দেবী, ১১৬, রাজবাটি বাগানী \*\*\* শ্রীমতী অপরূপা ব্রা, অবধারক—Lc. Col, এস এস ঝা, ডি সি এস ও এইচ কিউ পি স্টাণ্ড এইচ পি এবিয়ান, আংখালা ক্যাট, পূর্ব পাঞ্জাব, \*\*\* সচিব, রবীন্দ্র পাঠক, চন্দনপুর, ডাক—চিকিদি, চন্দনপুর, জেলা—পুর্নুলিয়া \*\*\* সচিব, তাতাউর সন্দ্রীরাম গ্রন্থাগার, ডাক—ভুতন, জেলা—পুর্নুলিয়া \*\*\* সচিব, গোবিন্দপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, গাম ও ডাক—গোবিন্দপুর, জেলা—পুর্নুলিয়া, \*\*\* শ্রীমতী উমারাবী জুব্বারী, অবধারক—শ্রী বি চন্দ্রবর্তী, পোস্ট বক্স নং ১৬, জগজলপুর (মধ্যপ্রদেশ), গ্রন্থাগারিক, লালগোলা এম এন একাডেমী (পাবলিক) গ্রন্থাগার, ডাক—লালগোলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম ১৮টি সংখ্যার জন্য। বৈশাখ সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী মারা ভট্টাচার্য। অবধারক—ভবানীচরণ ভট্টাচার্য, সীতাপুর, উড়িষ্যা।

চণ্ডিৎ বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫ পাঠাইলাম। নিম্নলিখিত প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন।—স্বজাতা মুখার্জী, পরাশিরা, মধ্যপ্রদেশ।

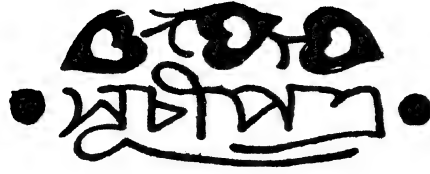
১৩৭১ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত ৩ ১৩৭০ সালের আদ্বিন সংখ্যাটির জন্য ১৬-২৫ পরদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—ডি পি বসু। পোঃ—কালিকাপুর, জেলা—বর্ধমান।

The sum of Rs. 15/- in payment of our renewal subscription is sent. Please acknowledge receipt.—S. Chatterjee, Asst. Bursar, St. Paul's School, Darjeeling.

আপনার পত্রাহারী মনিজ্ঞারযোগে বার্ষিকমূল্য পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেম।—ডি সি সেনগুপ্ত। সেকেন্দ্রাবাদ, এ পি।

এক বৎসরের চাঁদা ১৫ পাঠাইলাম। আশা করি প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠাইবেন।—শ্রীমতী মমতা বক্সী। অবধারক—ডাঃ বি কে বক্সী, পোঃ—নিউ কেরেন্ট, দেহাঘর।

১৩৭১ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী রমাবতী মিত্র, অবধারক—জে এন মিত্র। দিল্লী—৬।



ବିଷୟ	ଲେଖକ-ଲେଖିକା	ପୃଷ୍ଠା
୧। କଥାସୂତ	( ଯୁଗବାଣୀ ) ...	୧୦୫
୨। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ନିର୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ...	୧୦୭
୩। ଶାହିନାମ୍ ଏକଟି ନାକେର ରୋଗ	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଡାଃ ନାଗ ...	୧୧୦
୪। ମାହୁବ ବଢ଼େ ଅସହାର	( ଯମ୍ୟ-ରଚନା ) ତୀରନ୍ଦାଜ ...	୧୧୧
୫। ବନ୍ଧେର ସାହାଯ୍ୟ ଚିଠି ବାଛାହି	( ସଂଗ୍ରହ ) ...	୧୧୨
୬। ମହାପ୍ରାକ୍ତର କଥା	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ...	୧୧୩
୭। ଆପଣାର ଓଜନ ପରୀକ୍ଷା କରନ	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ନାର୍ସ ମିତ୍ର ...	୧୧୫
୮। ନିଜେର ଯତୋ ଚଳୁନ	( ଆଲୋଚନା ) ଜ୍ଞାନସିକ ...	୧୧୬
୯। ଧୂସର କି ?	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଜ୍ଞାନୀ ...	୧୧୭
୧୦। ଏକ୍ଷନ ନୃତି	( ଗୀତ ) ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତାପାସ୍ୟାୟ ...	୧୧୮
୧୧। କୋନ ଅକାଳସୁତାକେ	( କବିତା ) ଚିନ୍ତବରନ ଦାସ ...	୧୧୯

ଦେଶ ସେବାୟ ନିଯୋଜିତ,

ଏଆଲବାଟ୍ ଡେଭିଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍

କଲିକାତା—୧୦

ନୀତି ଓ ବିଜ୍ଞାନାଭ୍ୟାସୀ ଓଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣେର ଅଗ୍ରଣୀ

—ବ୍ରାହ୍ମ ସମୂହ—

ବୋଷ୍ଟେ - ମାନ୍ଦ୍ରାଜ - ଦିଲ୍ଲୀ - ନାଗପୁର

ବେଙ୍ଗାଳୁରୀ - ଜ୍ଞାନଗର - ଗୋହାଟୀ

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১২। ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি (প্রবন্ধ)	সুরেশচন্দ্র নন্দী	৭১৮
১৩। অথগুণ অমির শ্রীচৌরাজ (জীবনী-স্মৃতি)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭২২
১৪। দাহ (কবিতা)	সমরেন্দ্র ঘোষাল	৭২৬
১৫। পুনশ্চরণ (কবিতা)	অনিকঙ্ক কর	ঐ
১৬। রোম নগরীর স্মৃতি (ঐতিহাসিক-আলোচনা)	সোমেন্দ্রলাল রায়	৭২৭
১৭। নাগকণি (ভ্রমণ-কাহিনী)	প্রভাত মুখোপাধ্যায়	৭২৯
১৮। সনেট (কবিতা)	মাইকেল ডেটন : অনুবাদিকা—জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩৬
১৯। কেউ কি দেখে নি তাকে (কবিতা)	সুকুমার ভট্টাচার্য	ঐ
২০। আত্মহত্যা ও প্রেম (প্রবন্ধ)	সুধাংশু চৌধুরী	৭৩৭
২১। সাগর বেলার বিহু কুড়াই (গল্প)	শোণার সত্ত্বত দত্ত	৭৪৩
২২। আলোকচিত্র—	...	৭৪৪ (ক), ৮২৪ (খ)
২৩। ক্ষণস্থিতি (মৃত্তিকথা)	অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৫
২৪। বিজ্ঞান বার্তা—	...	৭৫৭
২৫। মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায় (কবিতা)	সুধাংশু দে	৭৫৯
২৬। দীপালী দিন (কবিতা)	মানসময়ী বিশ্বাস	ঐ



### সোনার বাঙলার সোনার কাব্য কুন্তিবাসী রামায়ণ

আদি কবির মহাকাব্য সংস্কারে সংহার করিতে সাহসী  
হই নাই। মহাকাব্য কুন্তিবাসীর এই সর্বদাসুন্দর ছাড়াবাদ-  
হীন সুপরিপূর্ণ রাজাধিরাজ সংস্করণ-সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ  
প্রকাশিত। উপহারে প্রিয়জনরঞ্জন ৪০খানি চিত্রে  
চিত্রময়। মূল্য ৮ টাকা।

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২

## বস্ত্রশিল্পে মোহিনী মিলের

অবদান অতুলনীয়।

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন

১ নং মিল—

২ নং মিল—

কুষ্টিয়া, নদীয়া। বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যানেজিং এজেন্টস্—

## চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

রোড: অফিস—

২২ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
২৭। ভারতের স্বাধীনতার সংকট	(প্রবন্ধ) বিভূতিভূষণ রায়	১৬০
২৮। স্বপ্ন	(কবিতা) সাবিত্রী দত্ত	১৬২
২৯। স্বপ্নের ভিত্তি : একটি অনিচ্ছা	(কবিতা) বাসুদেব দেব	ঐ
৩০। মৌনমন	(উপন্যাস) সুবোধকুমার চক্রবর্তী	১৬৩
৩১। অজ্ঞান ও প্রাজ্ঞ—		
(ক) প্রেম ও বিবাহ	(প্রবন্ধ) মদিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬১
(খ) বর্কট প্রবাসের দিন	(ভ্রমণকাহিনী) কৃষ্ণা বসু	১১০
(গ) অচেনা মেয়ে	(গল্প) অনীতা সেন	১১৩
(ঘ) পিতৃগৃহের স্মৃতি	(কবিতা) জয়লী গুপ্ত (চৌধুরী)	১১৬
(ঙ) হাউট	(গল্প) চিত্রা সেনগুপ্ত	ঐ
(চ) বিজয়িনী	(কবিতা) হাসি গঙ্গোপাধ্যায়	১৮০
(ছ) আরণ্যক	(গল্প) ডলি চট্টোপাধ্যায়	ঐ
৩২। পূর্ণ প্রাণে চাবার যাত্রা	(উপন্যাস) ক্যাথরিন হিউম : অম্বুবাড়িকা— প্রগতি মুখোপাধ্যায়	১৮৩
৩৩। পরীক্ষার্থিনী	(গল্প) গুণময় মাস্তা	১১৩
৩৪। পত্রপুঙ্খ—	...	৮০২

### ডঃ বিমল রায় প্রণীত ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ

॥ মধ্যযুগের ভারতীয় সাঙ্গীতিক ইতিহাস ॥  
মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীত-নায়কদের জীবন-কথা ও  
সাধনার তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ আলোচনা। মূল্য : ৬.০০

### মণি বাগচী প্রণীত জীবনী জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালা শিক্ষাগুরু আশুতোষ ৫.০০

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫.০০ রামমোহন ৪.০০  
রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ ৬.০০ রামেশচন্দ্র ৫.০০  
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০ কেশবচন্দ্র ৪.৫০  
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০ মাইকেল ৪.০০

### আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

দিলীপ মুখোপাধ্যায় : সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্লতরু ৬.০০ ॥ প্রভাত  
মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪.০০ ॥ সুনীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০.০০ ॥ ভবতোষ  
দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৬.০০ ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর  
পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০ ; পঁচাত্তর বৎসরের পদাবলী ৬.০০/৭.৫০ ॥

ডঃ রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু-সাধনা ৩.০০

ডঃ জাকীর হুসেন : ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন ১.০০

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাডিনিউ। কলিকাতা - ২৯  
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা - ৯

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩৫। চারজন— (বাঙালী-পরিচিতি)		
(ক) হেমলতা দেবী	...	৮১৩
(খ) সুবোধচন্দ্র সরকার	...	৮১৪
(গ) দীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৮১৫
(ঘ) বিনয়জীবন ঘোষ	...	৮১৬
৩৬। এস মা জননী (কবিতা)	শান্তি বসু	৮১৭
৩৭। বাতাসী মঞ্জিল (উপন্যাস)	অজিতকৃষ্ণ বসু	৮১৯
৩৮। ছোটদের আসর—		
(ক) পিঁপড়ের লড়াই (প্রবন্ধ)	রাণী মজুমদার	৮২৩
(খ) ম্যাজিক দেশলাই (যাতৃকথা)	কার্তিক ঘোষ	৮২৪
(গ) শালকি পাখি (কবিতা)	সর্বাঙ্গীসহায় গুহসরকার	৮২৫
(ঘ) কুরুক্ষেত্রের কথা (কাহিনী)	সাধনা কর	৮২৬
(ঙ) বহুশ্রমের বাতুরের মহম্মদ চেল (যাতৃকাহিনী)	বি দাস	৮২৭
(চ) বিদ্যুৎ জোনোয়ার (কবিতা)	সুলেখা হাওে	৮২৮
৩৯। নতুনোল (উপন্যাস)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮২৯
৪০। সাহিত্য পরিচয়—	...	৮৩৩
৪১। প্রচ্ছদ-পরিচিতি—	...	৮৩৭
৪২। বারকো বারাগসী (তীর্থ-দর্শন)	নীলকণ্ঠ	৮৩৮

বাঙলার নির্ধাতিত, বাঙলার জমর কবি  
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠতম কীৰ্ত্তি

## কবিকঙ্কণ চণ্ডী

... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ...  
মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার মহত্তম সৃষ্টি চণ্ডীর কাহিনী—বাঙলার জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। রোমাঞ্চিক সাহিত্য-সাধনার অগ্রদূত এবং বেদনারিষ্ট বাঙলার প্রতিনিধি কবি মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁহার কাব্যে সর্বজনের দুঃখে রূপান্তরিত।

— বর্তমান প্রবেশ আছে —

১। মূল কাব্য, ২। কবির জীবনী, ৩। কাব্য-পরিচিতি, ৪। কবিকঙ্কণে যুগের বঙ্গভাষা (বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৫। কাব্য সমালোচনা, ৬। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ, ৭। বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুযায়ী অধ্যাপক ডক্টর বিজিতকুমার দত্ত লিখিত সুবহু ভূমিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০৮। বোর্ড বাঁধাই। সূর্য রায় অঙ্কিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট।

মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অগ্নীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত

## মহাভারত

প্রথম খণ্ড— [ আদি, সভা ও বনপর্ব ]

মূল্য ৮ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড— [ বিরাট, উত্তোষ ও ভীষ্মপর্ব ]

মূল্য ৮ টাকা

তৃতীয় খণ্ড— [ দ্রোণ ও কর্ণপর্ব সহ ]

মূল্য ৮ টাকা

॥ ভাকমান্ডল স্বতন্ত্র ॥

দি বমুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
<b>৪৩। নাচ-গান-বাজনা—</b>		
(ক) কুসুমবীণা	(প্রবন্ধ) প্রভাকর সেন	৮৪১
(খ) সঙ্গীতে উদীরমান শিশুশিল্পী	...	৮৪২
(গ) বনে 'রবীন্দ্র শ্রুতিসৌধ'	...	ঐ
(ঘ) আমার কথা	(শিল্পী-পরিচিতি) সজ্জা চট্টোপাধ্যায়	৮৪৩
৪৪। যেহেতু	(কবিতা) গোবিন্দপ্রসাদ বসু	ঐ
৪৫। শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী	(স্থিতিচিহ্ন) চাকলতা রায়চৌধুরী : অনুবাদক—কল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৪৪
৪৬। উত্তরণ	(কবিতা) রূপজী ঘোষ	৮৪৬
<b>৪৭। রঙ্গপট—</b>		
(ক) বৈঠকখানা থিয়েটার	(প্রবন্ধ) অমল মিত্র	৮৪৭
(খ) ভয়াল যুহুরের জনক অ্যালেক্সেড হিচকক্	...	৮৪৯
(গ) আরোহী	...	৮৫১
(ঘ) সাধক কবি	...	ঐ
(ঙ) মহিলাদের নাট্যপ্রেরণা : পথের দাবী	...	ঐ
(চ) সংগম বিচিত্রা	...	ঐ
(ছ) রঙ্গপট প্রসঙ্গে	...	৮৫৪
৪৮। শাশ্বতী	(উপন্যাস) নমিতা চক্রবর্তী	৮৫৫
৪৯। সম্পাদকীয়—	...	৮৭৪
৫০। শোক-সংবাদ—	...	৮৭৮

## ন্যাশনালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

### ● উপন্যাস ও গল্প ●

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ দাম ১০.০০

অমরেন্দ্র ঘোষ

চরকাশয় (তৃতীয় সংস্করণ) " ৩.৭৫

অরুণ চৌধুরী

সীমানা " ১.৭৫

মিখাইল শলোখভ

কুমারী মার্টির ঘুম ভাঙলো

(Virgin Soil Uptured)

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

### ● প্রবন্ধ ও ইতিহাস ●

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন দাম ৯.০০

রেনবতী বর্মণ

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ " ৩.৫০

মুজাফ্ ফর আহমদ

প্রবাসে ভারতের

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন " ২.৫০

: জীয়েই প্রকাশিত হবে :

সৌরী ঘটক

কমরেড

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২. বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ || নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর—৪

## ● সুপ্রকাশের সুসাহিত্য ●

### ● সাহিত্য বিষয়ক

সাহিত্য জিজ্ঞাসা শুকুদাস ভট্টাচার্য ৪৫০

বিজ্ঞানজ্ঞান : কবি ও নাট্যকার রথীন্দ্রনাথ রায় ১৩৫০

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন বিমলকৃষ্ণ সরকার ২০০০

সাহিত্যের কথা শুকুদাস ভট্টাচার্য ৫০০০

কবিতার কথা বিমলকৃষ্ণ সরকার ৫০০০

নাটকের কথা অজিতকুমার ঘোষ ৫০০০

উপন্যাসের কথা দেবীপদ ভট্টাচার্য ৬০০০

ছোটগল্পের কথা রথীন্দ্রনাথ রায় ৫০০০

সমালোচনার কথা অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০০

শিল্পতত্ত্বের কথা সাধনকুমার ভট্টাচার্য ৬০০০

অলঙ্কার জিজ্ঞাসা শুকুদাস বসু ৫০০০

গল্পশিল্পী রথীন্দ্রনাথ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫০০০

### ● উপন্যাস

মাটি ও মানবী (মত) প্রবোধ সরকার ৫০০০

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ প্রশংসিত নতুন সংস্করণ

কল্যাণী লোকাল (মত) চতুমুখ ৫০০০

আভাস চতুমুখ ৪৫০

আইসোলা বেলা নীলকণ্ঠ ৬৫০

নীলকণ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গব্যধুনিক উপন্যাস

নব বুদ্ধাবন (২য় সং) নীলকণ্ঠ ৫০০০

আসামী কারা নীলকণ্ঠ ৩৫০

জুভাষচন্দ্র নীলকণ্ঠ ১৫০

বাহাদুর শাহ সমাধি বারীন্দ্রনাথ দাস ৫০০০

আড়াল শুকুদাস বসু ২৫০

পুষ্পলাবী শুকুদাস বসু ৪০০

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা সুতো ঠাকুর ৪৫০

ব্রাহ্ম্য নারায়ণ সান্যাল ৩০০

ব্যাপ্ত্যাপ্ত্যারের মা জ্যোতির্ময়ী দেবী ৩৫০

অতুসংহার নারায়ণদাস শর্মা ৫০০

এক নারীর কৈশোর-যৌবনে কতো মানুষের

আনাগোনার আশ্রয় দুঃসাহসিক কাহিনী ॥

প্রকাশ আসন্ন :

বাংলা চরিত্র সাহিত্য দেবীপদ ভট্টাচার্য ১০০০

সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ : ৯ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিঃ-৬

## এবার পুজোয় ছোটদের বই

গল্পের রাজা ক্রিলাডের গল্প ২১

ক্রিলাডের কালজয়ী গল্পের বই। অনিলেন্দু চক্রবর্তী

বাল সাগরের নিচে ২১

কিশোর উপন্যাস। চন্দ্রহাস

পুরাণের সেরা গল্প ২১

পৌরাণিক সরস গল্প। কৃষ্ণধন দে

অ্যাড্‌ভেঞ্চার অব লে ডেরী ২১

দুঃসাহসিক অভিযান উপন্যাস। বিপুল মুখোপাধ্যায়

ওয়ার্‌থ গ্যাং পাস ২১

লিও তলসুয়। ছোটদের গল্প। অশোক গুহ

পিক উইক পেপার ২১

চার্লস ডিকেন্স। ছোটদের জন্ম। অশোক গুহ



এ, কে, সরকার গ্যাং কোং

৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২ ॥

ফোন : ৩৪-৪৩১০

সহস্রাব্দী শিশুপাঠকের অভিনন্দনধন্য

দোয়েল ফিঙে চন্দ্রনা

আমাপ্রসাদ সরকার মূল্য ১২৫

কথায় কথায় ফ্যাসাদ

শিবরাম চক্রবর্তী মূল্য ১০০

আইভ্যানহো

দুর্গাদাস সরকার মূল্য ১০০

এডারেল্ট বুক হাউস। এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পরমভাগবত দেবেশ্রনাথ বসু বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণ

ভক্তির মঙ্গলকানী—প্রেমের অলকানন্দা—জ্ঞানের আকাশস্রোত ॥

—বঙ্গ-সাহিত্যে একদা মহাপ্রবীণ দ্বিতীয় নাই—

॥ জীনারায়ণে নিবেদিত এই ভক্তি-নৈবেদ্য বর্ণপাত্রের সুসজ্জিত ॥

একদা চিত্র-সমৃদ্ধ—সুপ্রভা—সুপ্রভা—সুপ্রভা—সুপ্রভা

এ পঞ্চম ভাগে প্রকাশিত হয় নাই।

মূল্য ১৫ টাকা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা - ১২



নৌলকঠের দীপ্তেশ্বরজীয়ার সাজালের  
**বিশ্বসাহিত্যের সুচীপত্র** ৮.০০ **শোলমারী আশ্রমের রহস্য** (৪র্থ সং) ৩.৫০  
 বিমল করের নতুন উপন্যাস প্রভাত দেবসরকারের নতুন উপন্যাস অশ্রুতি মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস  
**সারাবেল্লা** ৩.২৫ **ওড়া কাজ করে** ৭.৫০ **তুচ্ছ মম** ৫.০০  
 গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস ধনঞ্জয় বৈরাগীর  
**পৌষ ফাগুনের পালা** (২য় সং) ১৫.০০ **কালো হরিণ চোখ** (১ম সং নিরূপিতপ্রায়) ১০.০০

শংকর-এর  
**চৌরঙ্গী** (১২ম সং) ১০.০০ **যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ** (১০ম সং) ৪.৫০  
 তাম্রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরাসঙ্কর  
**নিশিপত্ত** (৫ম সং) ৪.০০ **মসিরেখা** (৪র্থ সং) ৯.০০ **আশ্রয়** (৫ম সং) ৩.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের আততোষ মুখোপাধ্যায়ের শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের  
**পরায়সী গৌরী** (২য় সং) ৪.৫০ **অগ্নিমিতা** (৩য় সং) ৫.০০ **হুসন্তী** (২য় সং) ৪.৫০  
 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বনকুলের সৈয়দ মুজতবা আলীর  
**অমাত্যের জয়যাত্রা** (২য় সং) ৪.০০ **দূরবীণ** (২য় সং) ৪.০০ **শ্রেষ্ঠ গল্প** (৮র্থ সং) ৫.০০  
 প্রেমেন্দ্র মিত্রের শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের  
**কুয়াশা** ৩.০০ **দ্বিতীয় অন্তর** ৯.৫০ **চন্দন কুঙ্কুম** (২য় সং) ৩.০০  
 সমরেশ বসুর ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের প্রাণতোষ ঘটকের  
**জোয়ার ভাটা** (২য় সং) ৩.৫০ **পকেটমার** (২য় সং) ৫.০০ **রোজালিগের প্রেম** ৩.০০

**বাক-সাহিত্য** ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ **ফোন :** ৩৪-৭৪৩৫

নৌহাররঞ্জন গুপ্তের সর্বাধুনিক গ্রন্থ আশ্চর্য লেখক সিদ্ধুবাদের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক  
**রহস্যভেদী কীরটি** ১০.০০ **নায়ক নারী নিয়তি** ৪.০০ **মিষ্টি মধুর উপন্যাস** সুন্দর প্রচ্ছদ  
 মেঘ কালো ৪.০০ **কনক-প্রদীপ** ৫.০০ **রুদ্ধবাসে পড়ার মত বই**। **গুরু**  
 চিংগীব সেনের করে শেষ না করে ওঠা যায় না  
**গুপ্তচর** (২য় সং) ৪.০০ **কেউ নায়ক কেউ নায়িকা**  
 বৈমানিকের ডায়েরী দীপঙ্কর ৪.৫০ **বিমল মিত্র অভিনব প্রচ্ছদ** ৪.০০  
 ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য **সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**  
**বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস** **তারার আলো** ৩.৫০  
 ১ম খণ্ড ১০.০০ **মনোজ বসু**  
 তাম্রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় **নিশিকুটুম্ব** (১ম পর্ব) ৭.৫০  
**কাল্লা** (২য় সং) ৬.৫০ " (২য় পর্ব) ৮.০০  
**জংলগড়** ৪.০০ **সুপ্রহর** প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫.০০  
**তিন কাহিনী** বনকুল ৬.০০ **নীলকণ্ঠী গজেন্দ্রকুমার মিত্র** ৭.৫০  
**শেষ দরবার** সমরেশ বসু ৪.০০ **স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়**  
 হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় **এই হৃদয় নিয়ে** ৪.০০  
**সন্ধ্যাতারা** ৪.০০ **সীমান্ত শিবির** ৮.০০

**গ্রন্থপ্রকাশ :** ৫-১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (ফোন-৩৪-১২৬৬)



১৪ কারেট সোনার নিবযুক্ত : ২১'০০  
সোনার পালিশওয়ালা নিবযুক্ত : ১৬'৫০

# পাইলট সুপার সেট

## কেটি ফোর্বস উপহার

এ রুটি জুড়ি হিসেবে এক কথায় অপূর্ব : পাইলট সুপারে সোনার পালিশওয়ালা নিব অথবা চৌদ্ধ কারেট সোনার নিব পেতে পারেন। এতে খসখসে কাগজের ওপরও মোলায়েমভাবে লেখা যায়। আর কলমের সঙ্গে থাকে প্রপেনিং পেন্সিল যার শিখটি চট করে বেরোয়। কেমিগোল্ড ক্যাল লীগানো হন্সর হন্সর রঙের পাবেন। অল্প খরচে এক অভিনব উপহারের সেট। চৌদ্ধ কারেট সোনার নিবের কলম শুধু সেট হিসেবেই পাওয়া যায়।



পাইলট কলমে লেখার জন্য  
পাইলট কালিই সেরা

দ্বি পাইলট পেন কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড  
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস : 'ক্যাথলিক সেন্টার' আরমেনিয়ান স্ট্রাট, মাদ্রাজ-১

# • বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার •

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্যোপন্যাস লেখিকা

আ গা ঝা ঞি সি টি র

নতুন বই বেরুলো।

**বড়ের কল্লোল**

৫০০

অন্যায় বই

দশ পুতুল : ৩৫০ || পঞ্চমাক : ৪৫০

রাতে গাড়ি : ৪০০ || চতুরঙ্গ : ৪৫০

ছন্দ ঘাতি মিল ধনঞ্জয় বৈরাগী ৬'৫০	গ্রীষ্ম বাসর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২'৭৫	নিত্য পথের পথী প্রবোধকুমার সান্যাল ৪'৫০	
কলিতীর্থ কালিঘাট ৪'০০ ক্রীম ৪'৫০ অবধূত	তীরভূমি ৪'৫০ নীলাঞ্জন ছায়া ৩'০০ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত মিতন ৩'০০ বধুবরণ ৩'০০ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
তৃষ্ণা ৩'০০ দুরন্ত চড়াই ৫'০০ সমরেশ বসু	জল পাড়ে পাতা নাড়ে ৮'০০ মন মান না ৩'৭৫ গৌরকিশোর ঘোষ	শুক্ল সন্ধ্যা ৫'০০ রমণীর মন ৩'০০ সরোজকুমার রায়চৌধুরী	
নতুন হাওয়া ৪'৫০ নির্বাসন ২'৭৫ বিমল কর	সাহিত্য চর্চা ৩'৭৫ হৃদয়ের জাগরণ ৩'২০ বুদ্ধদেব বসু	শ্রীপাহুর কলকাতা ৭'০০ সাত রাণী আট বেগম ৫'০০ শ্রীপাশ	
মাটি আর নাই ৪'৫০ প্রফুল্ল রায়	সাতটি রাত্রি ২'৭৫ বাণী রায়	এলেম নতুন দেশে জ্যোতির্ময় রায় ২'০০	রঙীন লগুন ৩'০০ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
একান্ত আপন ৪'০০ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	আকাশলিপি ৪'০০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র	আমার কাঁসী হল ৩'৫০ মনোজ বসু	
দ্বন্দ্ব মধুর ৩'৫০ সৈয়দ মুজতবা আলী ও রঞ্জন	জলপায়রা ৪'০০ প্রেমেন্দ্র মিত্র	দময়ন্তী ৩'০০ সুখীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

# স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থটিথ

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মৃতন বই প্রকাশিত হয়

৭ই আষাঢ়ের বই

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

## শ তা কী র স স্ত্রী ত



অভিজাত রুচির ছাপা ও বাঁধাইয়ে উপহার উপযোগী

### শরৎচন্দ্রের উপন্যাস :

স্বামী	শুভদা	বাঁমুনের মেয়ে	শেষ প্রশ্ন
শ্রীকান্ত ১ম	শ্রীকান্ত ২য়	শ্রীকান্ত ৩য়	শ্রীকান্ত ৪র্থ
পরিণীতা	বৈকুণ্ঠের উইল	বড়দিদি	চন্দ্রনাথ
চরিত্রহীন	দেবদাস	গৃহদাহ	

### শরৎচন্দ্রের নাটক

বিপ্রদাস	রাজলক্ষ্মী	বিজয়া	গৃহদাহ
পথের দাবী	ষোড়শী	রমা	দেবদাস
			পাঁচুভমশাই

### শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বই

হুমায়ূন কবীরের	শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব	১'৫০
শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের	শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন	২'৫০
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের	শরৎচন্দ্রের সঙ্গে	২'৫০
কাজী আবদুল ওহুদের	শরৎচন্দ্র ও তাঁরপর	৪'০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

গ্রাম : কালচার

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৬৪১



মাসিক বসুমতী  
 ৥ ভাদ্র, ১৩৭১ ৥

আলাপচারী  
 (দুঃখপা বাতপুত্র চিত্র)  
 —শিল্পী অজ্ঞাত



● স্বর্গত সত্যশচন্দ্র যুধোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

৪৩শ বর্ষ

ভাদ্র ১৩৭১



প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা

# মাসিক বসুমতী

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

‘অসার হইতেও অসার, সকলই অসার। সার  
একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র

তাঁহার সেবা।’ (ক)

তখনই সর্বোচ্চ জ্ঞান তোমার হইবে যখন তুমি  
স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য সংসারকে ত্যাগ করিবে।

৪। অসারতা—অন্তর্যব দমন আশ্রয় করা এবং  
সেই নম্বর পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

অসারতা—অন্তর্যব মান আশ্রয় করা ও উচ্চপদ লাভের চেষ্টা  
করা।

অসারতা—অন্তর্যব শারীরিক বাসনার অনুবর্তী হওয়া এবং যাহা  
অসন্তোষিত দণ্ড ভোগ করাইবে, তাহার জন্য ব্যাকুল হওয়া।

অসারতা—অন্তর্যব জীবনের সম্ভাব্যতারের চেষ্টা না করিয়া দীর্ঘ-  
জীবন লাভের ইচ্ছা করা।

অসারতা—অন্তর্যব পরকালের সম্ভবের চেষ্টা না করিয়া কেবল  
ইহ জীবনের বিষয় চিন্তা করা।

অসারতা—অন্তর্যব, যথার অধিনাশী জ্ঞানব্দ বিরাজমান,

(ক) ইক্লিজিয়াক্টিক ১১২—Vanity of vanities all is  
vanity &c.

কে সন্তোষিত হইলবিতরাগা:

অপান্তমোহা: শিবতব্ধিষ্ঠা: •

—শঙ্করাচার্য (মণিরত্নমালা)।

বাহ্যেরা তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশাশূন্য হইয়া একমাত্র শিবতত্ত্বে  
নিষ্ঠাধান, তাঁহারা ই সাধু।

## কথামৃত

### ● দীপা অনুসরণ ●

পরিদুলমান পার্থিব পদার্থ হইতে মনের অনুসরণকে  
উপরত করিয়া ঈশ্বর রাজ্যে হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করিতে  
বিশেষ চেষ্টা কর, যেহেতুক ইন্দ্রিয় সকলের অনুগমন করিলে তোমার  
বুদ্ধিবৃত্তি কলঙ্কিত হইবে এবং তুমি ঈশ্বরের কৃপা হারাষ্টবে। (গ)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আপনার জ্ঞানসম্বন্ধে হীনতা

১। সকলেই স্বভাবত জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বরের  
ভয় না থাকিলে, সে জ্ঞান লাভ কি?

আপনার আত্মার কল্যাণচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, যিনি নক্ষত্র-  
মণ্ডলীর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে বাস্তব, সেই গণিত পণ্ডিত

(খ) ইক্লিজিয়াক্টিক ১৮

(গ) Strive therefore &c.

ন জাতু কাম: কামানামুপভোগেন শাম্যতি

হবিষা কৃষ্ণবর্ণে ব ভূম এবাতিবর্ণতে।

—মহা।

কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু  
অগ্নিতে যুত প্রদানের দ্বারা অত্যন্ত বর্ধিত হয়।

অপেক্ষা কি যে দীন কৃষক বিনীতভাবে ঈশ্বরের সেবা করে, সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ নহে ?

যিনি আপনাকে উত্তমরূপে জ্ঞানিয়েছেন, তিনিই আপনার ঢক্ষে আপনি অতি হীন এবং তিনি সমুদ্রের প্রশাসনে অশ্রদ্ধাও অনিশ্চিত হইতে পারেন না। যদি আমি জগতের সমস্ত বিষয়ই জানি, কিন্তু আমার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে যে ঈশ্বর আমার কর্মমুগ্ধারে আমার বিচার করিবেন, তাহার সমক্ষে আমার জ্ঞান কোন উপকারে আসিবে ?

২। অত্যন্ত জ্ঞান-লালসাকে পরিত্যাগ কর ; কারণ, তাহা হইলে অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ এবং ভ্রম আগমন করে।

পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞা প্রকাশ করিতে এবং প্রতিভাশালী বলিয়া কথিত হইতে বাসনা হয়।

এ প্রকার অনেক বিষয় আছে, যদ্বিষয়ক জ্ঞান আধ্যাত্মিক কোন উপকারে আইসে না এবং তিনি অতি মূর্খ, যিনি—যে সকল বিষয় তাহার পরিত্রাণের সাহায্য করিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া—এই সকল বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন।

বহু বাক্যে আত্মা তৃপ্ত হয় না, পরন্তু, সাধুজীবন অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করে এবং পবিত্র বুদ্ধি ঈশ্বরের সমীক নির্ভর স্থাপিত করে।

৩। তোমার জ্ঞান এবং ধারণা, যি যে পরিমাণে অধিক, তোমার তত কঠিন বিচার হইবে; যদি সমীক জ্ঞানের ফলস্বরূপ জীবনও সমীক পবিত্র না হয়।

অতএব তোমার দক্ষতা এবং বিজ্ঞার ভগ্না বহু প্রশংসিত হইতে ইচ্ছা করিও না; বরং যে জ্ঞান তোমাকে প্রসন্ন হইয়াছে, তাহাকে জয়ের কারণ বলিয়া জ্ঞান।

যদি এ প্রকার চিন্তা আইসে যে, তুমি বহু বিষয় জান এবং বিলক্ষণ বুদ্ধ, স্মরণ রাখিও যে, যে সকল বিষয় তুমি জান না, তাহার সাংখ্যায় অনেক অধিক।

জ্ঞানগর্বে দগ্ধ হইও না; বরং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার কর। তোমা অপেক্ষা কত পণ্ডিত রহিয়াছে, ঈশ্বরান্বিত শাস্ত্রজ্ঞানে তোমা অপেক্ষা কত অভিজ্ঞ লোক রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াও কেন তুমি অপরের পূর্বদান অধিকার করিতে চাও ?

যদি নিম্ন কল্যাণপ্রদ কোন বিষয় জানিতে এবং শিখিতে চাও, জগতের নিকট অপরিচিত এবং অকিঞ্চিৎকর থাকিতে ভালবাস।

৪। আপনাকে আপনি যথার্থরূপে জানা, অর্থাৎ আপনাকে অতি হীন মনে করা সর্বাঙ্গেক। স্মরণ এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা। আপনাকে নীচ মনে করা এবং অপরকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাহার মঙ্গল কামনা করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং সম্পূর্ণতার চিহ্ন।

যদি দেখ, কেহ প্রকাক্ষরূপে পাপ করিতেছে, অথবা কেহ কোন অপরাধ করিতেছে, তথাপি, আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিও না।

আমাদের সকলেরই পতন হইতে পারে; তথাপি, তোমার দৃঢ় ধারণা থাকা উচিত যে, তোমা অপেক্ষা অধিক দুর্বল কেহই নাই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যের শিক্ষা

১। স্মরণ সেই মহুয়া, সাক্ষ্যেও চিহ্ন এবং নব্বয় শব্দ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সাক্ষ্য লক্ষ্য দেয়।

আমাদিগের মত এবং ইঞ্জির সকল ভূষণ আমাদিগকে প্রচারিত করে; কারণ বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টির গতি অতি অল্প।

৩। এবং গুঢ় বিষয় সকল ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া লাভ কি ? তাহা না জানার ভগ্না শেষ বিচার দিনে (ঘ) আমবা নিশ্চিত হইব না।

উপকারক এবং আবশ্যক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, স্বইচ্ছায়—যাহা কেবল কৌতুহল উদ্দীপিত করে এবং অপকারক—এ প্রকার বিষয়ে অনুসন্ধান করা অতি নির্দোষের কার্য; চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখিতেছি না।

২। ঈশ্বরশাস্ত্রীয় পদার্থ-বিচারে আমরা কেন ব্যাপৃত থাকি ? তিনিই বহু সন্দেহপূর্ণ তর্ক হইতে মুক্ত করেন, সনাতন (ঙ) বাণী যাহাকে উপদেশ করেন।

সেই অধিত্যয় বাণী হইতে সকল পদার্থ বিনিস্পষ্ট হইয়াছে, সবল পদার্থ কাঁচাভাবেই নির্দেশ করিতেছে, তিনিই আদি, তিনি আমাদিগকে উপদেশ করেন।

আমাকে ছাড়িয়া কেহ কিছু বুঝিতে পারে না; অথবা, কোন বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে পারে না।

তিনিই অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত—তিনি ঈশ্বরের সংস্থিত বাহার উদ্দেশ্য একমাত্র, যিনি সকল পদার্থ এক অধিত্যয় কারণে নির্দেশ করেন এবং যিনি এক জ্যোতিতে সমস্ত পদার্থ দর্শন করেন।

হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া তও।

বহু বিষয় পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা, তোমাতেই নিহিত।

আচার্য সকল নির্বাচন ইউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তম্ভ ইউক; প্রভো, কেবল তুমি বল।

৩। মানুষের মন যতই সংযত এবং অন্তঃপ্রবেশ হইতে সর্বল হয়, ততই সে গভীর বিষয়সকলে অতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে; কারণ, তাহার মন আলোক পায়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের ভগ্না সবল কার্য করে, আপনার সমক্ষে কার্যহীন থাকে এবং সকল প্রকার স্বার্থশূন্য হয়, সেই প্রকার পবিত্র, সর্বল এবং অটল ব্যক্তি বহু কার্য করিতে হইলেও আকুল হইয়া পড়ে না। হৃদয়ের অনুমূলিত আসক্তি অপেক্ষা কোন পদার্থ তোমার অধিকতর বিরক্ত করে বা বাধা দেয় ?

ঈশ্বরানুগামী সাধুব্যক্তি অগ্রে আপনার মনে যে সকল বাহিরের কর্তব্য করিতে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লন, সেই সকল কার্য করিতে তিনি কখনও বিরক্ত আসক্তিজনিত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হন না; পরন্তু, সম্যক বিচার দ্বারা আপনার কার্য সকলকে নিয়মিত করেন।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

(ঘ) খৃষ্টীয় মতে মহাপ্রলয়ের দিন ঈশ্বর সকলের বিচার করিবেন এবং পাপ অথবা পুণ্যমুগ্ধারে নরক অথবা স্বর্গ প্রদান করিবেন।

(ঙ) এই বাণী অনেকটা বৈদান্তিকদিগের 'মায়ার' ভূ ইনিহুঈশ্বররূপে অবতারণা হন।



# প্রাচীন ভারতের বাস্তুশাস্ত্র

ত্রিনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলে বর্তমানকালে বাংলায় তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মাটির তলা হইতে প্রাচীন অট্টালিকাদির নিবর্ণন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতেছে। খৃষ্টীয় সমুদ্র শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনদেশের পরিব্রাজক ওয়ান-চোয়াং বাংলা দেশে বহুসংখ্যক অট্টালিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পর, পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানে একটি দীর্ঘকালব্যাপী স্থাপত্য-যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ‘কুল ভূধর কঙ্কতুলা’ অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে শিলালিপিতে সমসাময়িক গ্রন্থ ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী মুসলমান শাসনকালে ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছিল। এখন কোন কোন অট্টালিকা ধ্বংসাবশিষ্টে ইষ্টক-প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

যে শাস্ত্রে এই সকল পূর্বতন অট্টালিকার স্থাপত্যরীতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার নাম বাস্তুশাস্ত্র। নানা কারণে অমুশীলনের অভাবে তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লোপ পাইয়া গিয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে এই সকল ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে না। এই সকল কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন বাস্তবত্ব এখনও যথাব্যোগে সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পুরাতত্ত্ব বাস্তব-গ্রন্থকরণ এখনও অনেকের নিকট ‘উদ্ভাদ’ (!) বলিয়া উপহাস লাভ করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞতাজনিত উপহাসসম্প্রদায় বিজ্ঞতার আবরণে আবৃত থাকিয়া এখনও আমাদের সাহিত্যে শুধুমাত্র রস-সাহিত্যেরই প্রোদগ্ধ দিগ্ধ আদিগাছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যে উদ্ভাদনাপূর্ণ মানবপ্রাণের অনির্বচনীয় আনন্দের স্পন্দন অন্বেষিত হইতে পারে, তাহা অনেকের কাছেই অবিজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত।

আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্যে ধর্মশাস্ত্র লেখক ও প্রয়োজকগণের নাম বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু বাস্তুশাস্ত্রোদ্দেশকগণের নাম অপরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে তাঁহাদের নামও সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। ‘মৎসুপুত্রাণের’ ২৫৩ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

‘ভূগুপ্তির্গণিষ্ঠকং বিখ্যাতাঃ যন্তথা।

নারদো নগরকট্টের বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥

তস্মাৎ কুমারো নশীলঃ শৌনকে! গর্গ এব চ।

বাস্তুদেবোহনিরুদ্ধকং তথা শুক্ল বৃহস্পতিঃ।

অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতাঃ বাস্তুশাস্ত্রোদ্দেশকঃ।’

কোন কোন শাস্ত্রে এই সকল বাস্তুশাস্ত্রোদ্দেশকগণের মধ্যে একটাই মূল উপদেশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাহার কোনও গ্রন্থের সম্ভান লাভ করা যায় না। তস্মাৎ হইতে মুনিপরাশরাক্রমঃ বাস্তুজ্ঞান আগত হইয়াছিল বলিয়া, একটি জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। বৃহৎসাহিত্যের ৫২ অধ্যায়ে বরাহ-মিহির তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

‘বাস্তুজ্ঞান যথাতঃ কমলভবা মুনিপরাশরাতাম্।’

বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে ‘মৎসুপুত্রাণ্ড’ অষ্টাদশ বাস্তুশাস্ত্রোদ্দেশক-

দিগের মধ্যে গর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। গর্গ বাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে (‘সমাসাৎ’) সংকলিত হইয়াছিল। এই সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার ভট্টোৎপল বশিষ্ঠ-মহাশয়জিতের নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পূর্বতম আচাৰ্য। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তুশাস্ত্রের আলোচনা অবলুপ্ত হয় নাই। রামরাজকৃত হিন্দু স্থাপত্যবিজ্ঞানের সুলিখিত নিবন্ধে আরও অনেক বাস্তু-বিদ্যাগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মানসার, কন্তপ, বৈখানস, সৎলাধিকার, সনৎকুমার, সারস্বতা ও পঞ্চরাত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার কোনও কোন গ্রন্থের লুপ্তাবশিষ্ট পাতুলিপি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ-সম্বাদিতো বাস্তুবিজ্ঞানের অনেক বিবরণ উল্লিখিত আছে।

বাস্তুশাস্ত্রোদ্দেশক বিখ্যাতার নাম জনশ্রুতিতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পূজা এখনও সমারোহসহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা যে কোনরূপ শিল্পকর্মে জীবিকার্জন করিয়া থাকে তাহার সকলেই প্রত্যহ তাহার নাম স্মরণ করিয়া থাকে—বৎসরান্তে তাহার পূজা করে। পুণ্যাদি প্রতিষ্ঠাকার্যে শিল্পীকে এখনও সাক্ষাৎ বিখ্যাতা বলিয়া সম্বোধন করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রামরাজ ‘বিখ্যাতার’ নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু ‘বিখ্যাত-প্রকাশ’ নামক আর একখানি গ্রন্থ একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। বিখ্যাতা কিরূপে বাস্তুজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছে—

‘প্রকক্ষ্যামি মুনিক্রেষ্ঠ শৃংখলকগ্রন্থমসঃ।

যন্তুং শত্ৰুনা পূর্ণং বাস্তুশাস্ত্রং পুরাতনম্ ॥

পরিশেষে প্রোহ বৃহৎসংখ্যং বৃহৎসং প্রোহ চ বিখ্যাতং।

স বিখ্যাতা জগতং হিত্যর প্রোবাচ শাস্ত্রঃ বহুভেদযুক্তম্ ॥’

এই বর্ণনায় জানিতে পারা যায়, বিখ্যাতা বা বাস্তুশাস্ত্রের উদ্ভাবনিতা ছিলেন না। বাস্তুজ্ঞান প্রথমে শত্ৰু কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে পরাশর বৃহৎসংখ্যক এবং বৃহৎসংখ্যক বিখ্যাতাকে বাস্তুজ্ঞান দান করেন। বিখ্যাতা জগতের মঙ্গল কামনার বহুভেদযুক্ত বাস্তুশাস্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। পুরাতন স্থাপত্যকীর্তির প্রকৃত পরিচয়লাভ করিতে হইলে, বাস্তুশাস্ত্রের সাহায্যে ইষ্টক-প্রস্তরের পরিচয় উদ্ভাবিত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহুসংখ্যক পাথরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভ প্রাধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে;—যেগুলি অট্টালিকার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং যেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত। যেগুলি অট্টালিকার অঙ্গীভূত, তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—কতকগুলি ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কতকগুলি ভিত্তির অঙ্গীভূত।

অট্টালিকার সহিত সম্পর্কযুক্ত পাথরস্তম্ভ একটিমাত্রই একস্থানে স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপনার জন্ম নিমিত্ত হইত। তাহার উপর অট্টালিকার কোনও অংশের ভার স্থাপ্ত হইত না। অশোকস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ, অরুণস্তম্ভ

প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের পারিভাষিক নাম স্তম্ভ নহে—‘ধ্বজ’। হয়শীর্ষ-পঞ্চমাংগে ‘একস্তম্ভো ধ্বজো জ্যেষ্ঠঃ’ বলিয়া তাত্কা উল্লিখিত আছে। এই সকল স্তম্ভ যতই বৃহৎ হউক, বৎস ও স্তম্ভখণ্ডে নির্মিত হইত। গঠন-ব্যবস্থার মান সামঞ্জস্যে এই শ্রেণীর স্তম্ভ শিল্প-শ্রম্যমার আধার বলিয়াই স্থপরিচিত। ইহাতে সাজ সজ্জার আঁৎসর অধিক না থাকিলেও, ইহার গাভীঘট ইহাকে সৌন্দর্যদান করিত। স্তম্ভীল দিগ্বসরবিস্তৃত প্রশান্ত প্রচ্ছদপটের সমুখভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এই শ্রেণীর সমুদ্রত স্তম্ভগুলি সেখানব গোঃ বস্তুস্করণেই প্রভিভাত হইত।

সেকালের দেবালয়ের যে প্রকাণ্ডে শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইত, তাহার পারিভাষিক নাম ‘গর্ভ’। তাহার গঠন-ব্যবস্থা ভিত্তিমূলক ছিল; স্তম্ভমূলক ছিল না। তাহার সমুখে একটি ‘মুখমণ্ডপ’ থাকিত। তাহার পরে একটি ‘মণ্ডপ’ বা ‘মহামণ্ডপ’ বা ‘নাট্যমন্দির’ গঠিত হইত। ইহাই পূর্ণাঙ্গ দেবালয়ের গঠন-ব্যবস্থা বলিয়া স্থপরিচিত ছিল। এই কার্যে বস্তুগুলি স্তম্ভ ব্যবহৃত হইত, তাহার সংখ্যামুসারেই ‘মণ্ডপগুলি’ নানা নামে কথিত হইত। ‘মংশসূরাণে’ ইহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

মূলমন্দিরের উচ্চতা অপেক্ষা ‘মণ্ডপের’ উচ্চতা অল্প থাকিত বলিয়া এবং ‘মুখ-মণ্ডপের’ উচ্চতা আরও অল্প থাকিত বলিয়া, স্তম্ভগুলির উচ্চতা অধিক হইত না। উড়িষ্যার প্রচলিত ভাষায় ‘মুখমণ্ডপের’ নাম ‘জগমোহন’, ‘মণ্ডপের’ নাম ‘নাট্যমন্দির’। কেহ কেহ উড়িষ্যার প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির নিদর্শন বলিয়াই ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বিচারসহ সিদ্ধান্ত নহে। উড়িষ্যার দ্বায় বাংলাব পুৰাতন মন্দিরেও ‘জগমোহন’ ছিল,—‘নাট্যমন্দির’ও ছিল। উড়িষ্যার সকল মন্দিরে এই দুইটি অতিরিক্ত অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয়ত বাংলার সকল মন্দিরেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। এরূপ পূর্ণাঙ্গ মন্দির অধিক ব্যয়সাধ্য,—অধিক সমৃদ্ধিসূচক—অধিক শিল্প-শ্রম্যমণ্ডিত।

যে সকল স্তম্ভ ভিত্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহা বাস্তবশাস্ত্রে ‘মহাস্তম্ভ’ নামে উল্লিখিত। ‘মহাস্তম্ভ’ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। মংশসূরাণের ২৫৫ অধ্যায়ে ‘পঞ্চ মহাস্তম্ভের’ পরিচয়সূচক বর্ণনা দেহিতে পাওয়া যায়—

‘কচকচচূঃ স্তাত্ অষ্টাশ্রো বজ উচ্যতে।

দ্বিবজঃ ষোড়শাস্তম্ভ ঝাজিঃশতঃ প্রথীনকঃ।

মধ্যপ্রদেশে যঃ স্তম্ভো বৃহো বৃহ ইতি স্মৃতঃ।’

যে স্তম্ভ চতুষ্কোণঃ তাহার নাম কচক—যে স্তম্ভ অষ্টকোণ সমন্বিত, তাহার নাম ‘বজ’,—যে স্তম্ভ ষোড়শ কোণ সমন্বিত, তাহার নাম ‘দ্বিবজ’,—যে স্তম্ভ ঝাজিঃশং কোণ বিশিষ্ট তাহার নাম ‘প্রথীনক’ এবং যে স্তম্ভ বর্তূল, তাহার নাম ‘বৃহ’। ইহাই আধাবর্ষে প্রচলিত ‘বাস্তবশাস্ত্রোক্ত’ পঞ্চ-মহাস্তম্ভের শ্রেণী-বিভাগ-সূচক পুৰাতন কারিকা। অজবিশ সংজ্ঞারও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে ‘কচকের’ নাম ‘কচকাণ্ড’,—‘বজের’ নাম ‘বিষ্ণুকাণ্ড’—‘দ্বিবজের’ নাম ‘কচকাণ্ড’।

স্তম্ভের অবস্থান কেন্দ্রে ‘পীঠিকা’ নামে ও স্তম্ভোপরি সংস্থাপিত

মধ্যবর্তী অঙ্গটির নামই ‘স্তম্ভ’। ‘বাধিকা’ স্তম্ভশীর্ষের সহিত লৌহকীলক যোগে সম্বন্ধ থাকিত ‘পীঠিকা’র মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে স্তম্ভমূল প্রোথিত থাকিত।

মন্দির দ্বার বস্তুস্করণে নির্মিত হইত না। তাহা বাস্তবশাস্ত্র পরিমাণ অনুসারেই নির্মিত হইত। দ্বারের বিস্তারের সহিত উচ্চতার অনুপাত স্থনির্দিষ্ট ছিল। তাহার সহিত মন্দিরের উচ্চতার অনুপাতও স্থনির্দিষ্ট ছিল। মংশসূরাণের ২৫৪ অধ্যায়ে দ্বারের সাধারণ ‘মান’ সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। যথা—

‘গর্ভমানেন মানব তু সর্ববাস্তুযু শযাতে।’

সকল বাস্তবশাস্ত্রেই ‘গর্ভের’ পরিমাণ অনুসারে দ্বারের পরিমাণ স্থির করা হইত। ‘বিস্তারার্থঃ ভবেদধঃ’ এই সূত্র জানিতে পারা যায়—বাস্তবশাস্ত্রের যাত্রা বিস্তার, তাহার অর্থেই ‘গর্ভের’ পরিমাণ ছিল।

‘গর্ভপাদেশ বিস্তারঃ দ্বারঃ দ্বিগুণমায়তম্।’

এই সূত্র জানিতে পারা যায়—‘গর্ভের’ চতুর্থাংশের সমান করিয়াই দ্বার বিস্তার স্থির করিয়া হওয়া হইত। এই বিস্তারের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল। এইরূপ অনুপাত-সম্পদ দ্বারগুলি মন্দিরের আয়তনের সঙ্গে চকন-সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত।

চারিখানি কর্ণসংযোগে কর্ণময় দ্বার নির্মিত হয় বলিয়া তাহা ‘চৌকাঠ’ নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রস্তরময় দ্বারও এইরূপ চারিখানি প্রস্তরেই নির্মিত হইত। যে দুইখানি প্রস্তর প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহার সাধারণ নাম ‘দ্বারশাখা’ বা ‘শাখা’;—যে দুইখানি প্রস্তর উপর ও নিম্নে বিস্তৃত হইত, তাহার সাধারণ নাম ‘উদ্বহর’ বা ‘উদ্বহর’। এই চারিখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে উদ্বহরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা শাখাখণ্ডের দৈর্ঘ্য অধিক হইলেও, সকল খণ্ডেই বিস্তার ও বাহুল্য (‘বেদ’) সমান ছিল। শাখার চতুর্থাংশ বিস্তারের ও উদ্বহরের চতুর্থাংশ ‘বাহুল্যের’ পরিমাণ নির্দেশ করিত। স্মৃত্যঃ পায়ণচতুষ্টিয়ের আশ্রমাত্র পাওয়া গেলেও, তাহার বিস্তারের ও বাহুল্যের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বারের আয়তনেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহার সাহায্যে মন্দিরের আয়তনেরও পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে,—দ্বারের উচ্চতার সহিত মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্তির উচ্চতাও একটি স্থনির্দিষ্ট অনুপাত প্রচলিত ছিল। সেস্তু শ্রীমূর্তির আয়তন হইতে মন্দিরের এবং দ্বারের আয়তন হইতে শ্রীমূর্তির শাঙ্গনির্দিষ্ট আয়তন আবিষ্কৃত হইতে পারে।

দ্বারশাখা কখনও কখনও একটি মাত্র শাখারূপে নির্মিত হইত। কিন্তু তাত্কা সচরাচর তিন শাখা হইতে নবশাখা পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখার সমষ্টিরূপেই নির্মিত হইত। এই সকল শাখার কাঙ্ক্ষার্থ ও বিস্তার মন্দির-দ্বারকে সৌন্দর্যের সঙ্গে গাভীর্য়দান করিত। উপরোক্ত সংস্থাপিত উদ্বহরের মধ্যস্থলে শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। হয়শীর্ষ পঞ্চমাংগে বিষ্ণুমন্দির দ্বারের উপরোক্ত উদ্বহরের মধ্যস্থলে দিগ্বজসমুদ্র স্রাপ্যমানা লক্ষ্মীর শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

‘তস্য মধ্যে স্থিতা দেবী সাক্ষাৎস্মী অরুণধরী।

বর্তব্য দিগ্বজৈঃ সা তু স্রাপ্যমানা ঘটনে তু।’

বিষ্ণুমন্দিরের দ্বার বৌদ্ধমন্দিরেও উদ্বহর মধ্যে শ্রীমূর্তি ক্ষোদিত করাইবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল।

## প্রাচীন ভারতের বাস্তবায়ন

ইষ্টকর্মিত দেবমন্দিরেও পাষাণনির্মিত দ্বার বা স্তম্ভ ব্যবহৃত হইতে পাতিত। প্রস্তরনির্মিত ভিত্তি ও শিখর বেঙ্গল প্রস্তর-নির্মিত দেবালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবমন্দিরের ভিত্তির উপরিভাগে অবস্থিত অঙ্গের নাম—শিখর, বা বিমান। শিখরের উচ্চতা ভিত্তির উচ্চতার দ্বিগুণ বলিয়া বাস্তবায়নে উল্লিখিত আছে। স্তম্ভাংশ মন্দিরের শিখর বা বিমান বহুদিকার প্রস্তরখণ্ডে গঠিত হইত। তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইত। শিখর রচনারীতির পার্থক্যে মন্দিরগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। যথা,—

‘মেরু-মন্মথ-কৈলাস-বিমানজঙ্গল-নন্দনাঃ।

সমুখাঃ-পদ্ম-গজকু-মন্দি-বদন-কুঙ্করঃ।

গুহরাজে বৃহৎসংসং সর্বতো ভক্তো গাঘটঃ।

সিংহো বৃহৎচতুর্দ্বারঃ যোড়শাষ্টাংশঃ শুভা।

ইত্যেতে বিংশতিপ্রোক্তাঃ প্রসাদাঃ সঙ্করায়মাঃ।

যথোক্তাঃসকলমণৈঃ লক্ষণানি বলাম্যতঃ।’

বরাহ-মন্দির এইরূপ মেরুমন্দির কৈলাসাদি বিশিষ্ট। শ্রেণীর নাম সিংহবদ্ধ করিয়া তাহাদের লক্ষণাদিরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—মেরুশ্রেণীর মন্দির সটকোণবিশিষ্ট, চতুর্দ্বারসম্মিত, বিচিত্র-কুহরযুক্ত বাদশভূমি-সম্পন্ন হইত। যথা—

‘তত্র বৃহৎপ্র-মেরু বাদশভোমো বিচিত্র কুহরশ্চ।

দ্বারৈঃ বৃহৎচতুর্ভির্দ্বারৈঃসকলমণৈঃ।’

টাকাকার ‘বিচিত্র’ শব্দে অর্থ ‘নানা প্রকার’ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ‘কুহর’ শব্দে অর্থ ‘বাতায়ন। মন্দির-শিখর ভিন্ন ভিন্ন ‘রথক’ বিভক্ত হইত; প্রত্যেক ‘রথক’ অনেকগুলি ‘ভূমিতে’ বিভক্ত হইত। এই সকল পারিভাসিক শব্দ এখন অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিচয় প্রকাশের জন্য বিষ্ণু কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থাপত্য-ব্যবহার উল্লেখ করিয়া কান্তপ একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি ভাটায়ংল তাঁহার রচনার উদ্ভূত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

‘ভূমিকা স্তম্ভ কর্তব্য বিচিত্র-কুহরবিধাঃ।

বাদশোপধু পরিগা বহু নট্যৈঃ সমাযুতাঃ।’

ইহাতে বর্ণিত পাওয়া যায়,—‘কুহরগুলির সহিত ভূমিকার সম্পর্ক ছিল এবং ‘বাদশভূমির উপরুপরি বিভক্ত, বাদশস্তরে বিভক্ত, বর্তলাভাসযুক্ত অণুকার প্রস্তর নির্মিত হইত। মন্দির-শ্রেণীর মন্দিরে দশটি ভূমি, কৈলাস ও বিমান শ্রেণীর মন্দিরে আটটি ভূমি, নন্দন শ্রেণীর মন্দিরে ছয়টি ভূমি থাকিত। ভূমি-বিভাগসূচক বর্তলাভাসযুক্ত পাষাণখণ্ডসমূহ শিখরের নানা অংশে সন্নিবিষ্ট হইত। শিখরের নানা স্থানের অলঙ্করণকার্যে ‘কতিমুখ’ ব্যবহৃত হইত। শিখরশীর্ষে ‘আলমক-শিলা’ স্থাপিত হইয়া মন্দিরের শোভা বর্ধন করিত।

সেকালের দেবমন্দিরের গর্ভমন্দির ভিত্তিগায়ে কার্ণাকার্যের আভির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ গর্ভমন্দির মন্থন ভিত্তিগায়েই নির্মিত হইত; কেবলমাত্র দুই-চারটি অভিব্যবসায় দেবমন্দিরের ভিত্তিগায়ে কিছু কার্ণাকার্য সংযুক্ত হইত। কিন্তু অধিকাংশ দেবালয়ের বহির্ভাগ আভ্যন্তর কার্ণাকার্যের করিয়া নির্মিত হইত।

মন্দিরমধ্যস্থ শ্রীমূর্তির সমুদীন হইবার পূর্বে, মন্দির-প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সে ব্যবস্থা এখনও একেবারে পরিচ্যুত হয় নাই। প্রাঙ্গণকালে বহির্ভাগের বিচিত্র কার্ণাকার্য উপাসকের আগ্রহপূর্ণ সরলচিত্র অলৌকিক ভক্তিমাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাকে দেবদর্শনের অধিকারী করিয়া তুলিত; ভক্ত-উপাসকের দৃষ্টিতে দেবমন্দির দেবতারূপেই প্রতিভাত হইত। যে কারণেই তটুক, দেবমন্দিরকে ‘দেবমূর্তিভূত’ বলিয়া দর্শন করিবার উপদেশ এখনও দেওয়া হইয়া থাকে। এ বিষয়ে চরশীর্ষ পঞ্চরাত্রের উপদেশটি উল্লেখযোগ্য। যথা—

‘শুকনাসা শূচনাসা বাহুভঙ্গকণ্ঠে শূচ্যে।

শিরস্তম্ভঃ নিগবিত্তঃ কলসঃ মুখঃ শূচ্যঃ।

কণ্ঠঃ কণ্ঠমণ্ডিতঃ জেহঃ স্বকঃ বেনী নিগজতে।

পাদুপক্ষে প্রণালে তু বৃহৎ শূচ্যঃ পরিবীকীর্ণিতা।

মুখঃ দ্বারঃ ভবদস্য প্রতিমা জীব উচ্যতে।

তচ্ছক্তিঃ পিণ্ডিকাঃ বিধি প্রকৃতিঞ্চ তদাকৃত্যম্।

নিশ্চলং তু গর্ভোহস্য অধিষ্ঠাতা কেশবঃ।

এবমেব হরিঃ সাক্ষাৎ প্রাসাদেহেন সংস্থিতঃ।

শ্রীহরি প্রাসাদ-রূপে বর্তমান। প্রাসাদ শিখরের ‘শুকনাসা’ নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার নাসা,—‘ভঙ্গক’ নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার বাহুপুঞ্জ—‘কণ্ঠ’ নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার মস্তক,—প্রাসাদশীর্ষাবস্থিত ‘কলস’ তাঁহার কেশপাশ—‘কণ্ঠ’ নামক প্রত্যঙ্গ তাঁহার কণ্ঠ,—‘বেনী’ তাঁহার স্বকদেশ—‘প্রণাল’ তাঁহার পাদুপুঞ্জ—‘শূচ্য’ (চূণ) তাঁহার তটুক,—‘দ্বার’ তাঁহার মুখ,—গর্ভমন্দির ‘প্রতিমা’ তাঁহার জীব,—প্রতিমার ‘পিণ্ডিকা’ জীব-শক্তি; পিণ্ডিকার ‘আকৃতি’ তাঁহার প্রকৃতি,—‘গর্ভ’ এই দেবদেহরূপী দেবমূর্তির নিশ্চল বিজ্ঞাপক,—তাঁহার ‘অধিষ্ঠাতা’ স্বয়ং কেশব। এইরূপে বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে স্বয়ং শ্রীহরিই মন্দিররূপে বিদ্যমান করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত এই বর্ণনা কবিজনমূলক বর্ণনামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে না। শাস্ত্রতত্ত্বেও দেবমন্দির ‘দেবমূর্তিভূত’ বলিয়া সমাদৃত, দ্বারপূজাপদ্ধতিতে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে দেবমন্দির দ্বারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তদ্বিহীন বিবিধ দ্বারদেবতার পূজা করিবার ব্যবস্থা বিবর্তিত আছে। ইহার মধ্যে কোনরূপ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে কি না জানা যায় নাই। বৌদ্ধ চৈতন্যপূজার সঙ্গে মূর্তিপূজা মিলিত হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল পাষাণখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই উপরে বর্ণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমতুল্য। কতকগুলি বিদ্বদ্বিহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা তাহাদের অংশমাত্র দেখিয়া সম্পূর্ণ-মন্দিরের রচনাসৌন্দর্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল পাষাণখণ্ড দেখিয়াও সেকালের বাস্তবায়নের সম্পূর্ণ পরিচয়লাভ করা অসম্ভব। তথাপি ধননকার্য ইতিহাসের ‘জীর্ণোদ্ধার’ নামে কথিত হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে ‘জীর্ণোদ্ধার’ের দ্বিগুণ ফল বলিয়া উল্লিখিত আছে—

‘পণ্ডিতঃ পতমানঃ তু তথা’ধ’ কুটিতঃ নরঃ।

সমুদ্র ত্য হরেৎসি দ্বিগুণং ফলমাশ্বতঃ।’

বাংলার অনেক ধ্বংসাবশেষ ‘রাজবাড়ী’ নামে পরিচিত হইয়া

আসিতেছে—অনেক ‘রাজবাড়ির’ প্রকার পরিখাবেষ্টিত রাজদুর্গের সীমান্টি দেখিতে পাওয়া যায়—অনেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে আজিও দৃশ্যমান হইয়া আছে। খনন করাইতে পারিলে ইহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে এখনও পুরাকীর্তির অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা করা যাইতে পারে। খননকার্যে অগ্রসর না হইলে অতীতের বাস্তবশাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারসাধন সম্ভব নহে। এই ‘জীর্ণোদ্ধার’ কার্যে একমাত্র গভর্নমেন্টকেই অগ্রসর হইলে চলিবে না। অংশ গভর্নমেন্টের সহায়তা ভিন্ন দেশের সাধারণ লোকের চেষ্টায় খননকার্যে সম্পূর্ণ সফলকাম হইবার পক্ষে অসম্ভবের অভাব নাই। তবুও নীচাপতিরার শরৎকুমারের রচনার উদ্ভূতি দিয়াই বলিতে হয় :—  
‘এই সমস্ত প্রাচীন নগরের যথাযোগ্য প্রত্নসম্পদ উদ্ধার করিতে

হইলে, খননকার্যের আয়োজন করিতে হইবে। প্রত্নসম্পদের উদ্ধার হইলেই ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। নচেৎ যে উপাদান এ পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্বারা প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারেনা। তাহা লইয়া সম্ভট থাকিলে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার কোনকালেই সম্পন্ন হইবে না। বাঙালীকেই বাঙালার ইতিহাস উদ্ধার সাধন করিতে হইবে এবং তাহাকেই বুদ্ধাভিসংস্কৃত ভূগর্ভে অবতরণ করিতে হইবে।’

শরৎকুমার আজ আর নাই ; কিন্তু তাঁহার প্রেমে কি বাঙালার বুঝ-সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করিবে না ? \*

• শর্গার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের রচনা অবলম্বনে।

## সাইনাস একটি নাকের রোগ

সাইনাস হলো সংক্ষিপ্ত নাম—পুরো কথাটা হলো সাইনুসাইটিস। নাকের এ রোগ আমাদের অনেকেরই অনেক সময় হয়ে থাকে। রোগের আক্রমণটা যদি পরিমাণে কম হয় বা রোগীর যদি শরীর-স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকে, তা হলে ডাক্তারবাবুদের সাহায্য না নিয়েও এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু, তা যদি না হয়—অর্থাৎ আক্রমণটা যদি খুব বেশি পরিমাণে হয় বা রোগীর শরীর-স্বাস্থ্য তেমন ভালো না হয়—তা’ হলে রীতিমতো চিকিৎসা ব্যতীত সাইনাস সাধে না।

অনেকেরই সাইনাসকে এক ধরনের সর্দি মনে করে থাকেন এবং সেই জেজেই সাইনাসের উপসর্গগুলিকে, যথা মাথাধরা; নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়া, কপাল বা ঘুঘের ওপরের অংশে (বিশেষ করে নাকের আশেপাশে) ব্যথা—সাধারণ সর্দির উপসর্গ মনে করে কেউ বলেন ফুটবাস নিতে, কেউ বলেন কাঁচা পেঁয়াজ খান মশাই, ঠিক হয়ে যাবে, কতো সেখেছি ও রকম। কেউ বা মাথাধরার একটা সাধারণ ওষুধের নাম আপনাকে বলে দেবেন—যে ওষুধ বিজ্ঞান মায়ফং তার চাইতে আপনায়ও কম জানা নেই। কিন্তু ডাক্তারমাত্রেই জানেন সাইনাস ঠিক সর্দি নয়—তবে সর্দিরাতী। আমাদের নাকের ছিদ্রপথ ছ’টি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছ, সেখানকার কয়েকটি ছিদ্র-প্রান্তকে সাইনাস বলে। সক্রমণের ফলে সেই ছিদ্র-প্রান্তে যে প্রদাহ সৃষ্টি হয়—যার ফলে প্রচুর ‘সর্দি’ বেরুতে থাকে, তাকে বলে সাইনুসাইটিস।

সাইনুসাইটিস বা সাইনাস ব্যারামে সাধারণত মানুষকে মরতে দেখা যায় না এবং এ ব্যারামটা মারক নয় বলেই অনেকে একে বেশ কিছুটা অবজার সঙ্গে দেখে থাকেন। এবং আমাদের শরীর নিজের ‘জীবনীশক্তির’ জোরে বহুটুকু সাহ্যতে পারে—সেইটুকু কমলেই প্রদাহ মনে এমন যে, দ্রাঘত সর্দিটা (প্রকৃতকি কিন্তু তা নয়) কমেছে,

যাকিটুকু ঠিকমতো স্নান-টান করলেই সেয়ে যাবে। কিন্তু, বাস্তবিকই তা নয়।

প্রবল সর্দি ওষুধ ছাড়াও একেবারে নিমূলভাবে সাধারণত সেয়ে যায় সত্যি—কিন্তু প্রকৃত সাইনাস যদি হয়, তা হলে ওষুধ ছাড়া তা কদাচিৎ সাধে—হয় তো খানিবটা কমে যেতে পারে এবং মাথাধরা ইত্যাদি উপসর্গগুলিও খানিকটা কমে যার মাথাধরার ওষুধ খেয়ে, কাজেই আমাদের কাজকর্মের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না দেখেই আমরা ধরে নেই যে রোগটা সেয়ে গেছে। কিন্তু—বাস্তবিক তা নয়। সাইনাস ঠিকই ভেতরে রয়ে গেছে জানবেন—ছ’ এক মাস বাদে যখন আবার একটু বাড়বে, আপনি তখন মনে করবেন হয় তো আবার নতুন করে একবার সর্দি হলো—কিন্তু, তা নয়।

আজকাল শিল্পাঞ্চলে সৃষ্টি হয় ধূলোর রাজত্ব। এই ধূলা এবং ঘোঁরা গুল অবস্থায় সাধারণত সর্দির সৃষ্টি করে—কিন্তু যেখানে বা যে সময়ে বাতাসে প্রচুর জলকণা থাকে, তখন ঐ একই ধূলা সাইনাস বা অস্ত্রান্ত্র শ্বাসনালীর ব্যারাম সৃষ্টি করে থাকে।

একটু অমূল্যমান করলেই দেখতে পাবেন যেখানে বা যে ঋতুতে আকাশটা যতো বেশি ধূলি-মলিন থাকে, সেখানে বা সেই ঋতুতে সাইনাস বা শ্বাসনালীর অস্ত্রান্ত্র ব্যারামও ঠিক ঐ পরিমাণেই বেড়ে থাকে। সাইনাস বার বার ঘুরে-কিরে হওয়া ভালো নয়। তাই প্রথমেই যখন কারো হয়’ তিনি যদি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইনাস নিমূলভাবে সেয়ে যায় দেখা গেছে।

অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক মনে করেন যে, মাঝে মাঝে শিল্প-এলাকায় বাইরের অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে ঘুরে এসেও প্রচুর বিস্তৃত বায়ুর সম্পর্কে আমাদের নাকের ছিদ্রপথের ‘সেল’-গুলি সজেজ হয়ে ওঠে—যার ফলে সাইনাসকে প্রেরিত্রোণ করা সম্ভব হয় ওঠে।

# মানুষ বড়ো অসহায়

একটি সত্য ঘটনা বলছি।

কিছুদিন আগে একটা রেলওয়ে প্রাটিকর্মের বেশকিছু বসে ট্রেন-এর জন্তো অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশে আর এক ভ্রমলোকও বসেছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো—বৃষ্ণতেই পারছেন আমাদের দেশের কথা বলছি; কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে 'বেশ কিছুক্ষণ' তারপরে আরো খানিকক্ষণ কেটে গেলো। ট্রেনের তবু টিকিটিংও পাঁতা নেই। বসে আছি তো বসেই আছি। কখনো ভালো করে পড়া খবরের কাগজটা আবার পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেজাল খেয়ে খেয়ে পেটের ব্যারোটা বেজে গছে এবং ভেজাল ভেবে ভেবে শ্রীমুণ্ডলীর তেরোটা বেজে গছে—এহেন অসহায় এবং তন্দ্রাগ্রস্ত সাব-এডিটরদের লেখার আর 'বিউটন দি লাইনস' পড়বার মতো কিছুই থাকে না আজকাল। বা থাকে, তা বেশি পড়লে মনের অবস্থা ভালোর চাইতে খারাপই হয় বেশি, আলো উবে গিয়ে শব্দকার ঘনিয়ে আসে।

যা বলছিলাম। খবরের কাগজটা কুঁচকে ভুমেড়ে গেলো। বসে বসে ছাড়মাড়া ভাঙ্গলাম বেশ কয়েকবার; জোর করে চোপ বুড়ে বসে বইলাম একটুকু; আবার চোব মেললাম; এদিক-ওদিক দেখে একটু অগ্রমনক হবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হবার নয়। না আমার মনটা স্থির হলো—না ট্রেনের ধূঁয়া দেখা গেলো। অবশেষে পারেন, ট্রেনের দেবির জন্তো এমন কি মহাভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো—যে দেশে বিগত দেড় শৃঙ্গে শতকরা নিরানব্বইখানা ট্রেনই দেরিতে আসে, সে দেশে আবার একটা ট্রেনের দেবির জন্তো এতো বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কেন? কিন্তু বাস্তবিকই আমার ব্যস্ততার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো। আমি হলাম গিরে বাক বলে একজন প্রায় সাহিত্যিক—পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, হোটেল-রেস্তোরায় এবং কোথায় না—বিস্তর নিজের ঢাক পেটাবার পরে এই সংবোধিত সাহিত্যসভার বক্তৃতা করবার জন্তো আমন্ত্রণ পেতে আরম্ভ করেছি। কয়েকদিন আগেও অবশ্য এর বকম ছিলো যে, সভার নির্দিষ্ট জায়গার শ্রোতা তো দূরের কথা, উল্লোক্যারাও কেউ এসে পৌছবার আগেই বন্ধ। আমি গিয়ে ছাছির হতাম—কিন্তু বারকয়েক এমনিধারা হয়ে যাবার পরে একটু সন্তুর্ হয়ে গেছি—আজকাল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ের গিরে থাকি। আজ নির্দিষ্ট সময়ের গিরে পৌছবার জন্তেই এই নির্দিষ্ট ট্রেনের জন্তো স্টেশনে গিরে অপেক্ষা করছিলাম। পকেটে সাতপৃষ্ঠা আমার সভাপতির অভিভাষণটা মাঝে মাঝেই খচমচ করে উঠছিলো। সত্যি একটা জোরালো বক্তৃতা লিখে ফেলছি। কাগজের যদি পা থাকতো তা হলে ও বক্তৃতাটা আমার পকেট ছিড়ে-কুঁড়ে প্রাটিকর্মে বেরিয়ে পড়লে কি না হতে পারতো।

এবার নিশ্চয়ই বৃষ্ণতে পারছেন ট্রেনের দেবির জন্তো আমার অস্থিরতাটা কি পরিমাণ শ্রাব্য। নিজেকেই নিজে সামলে উঠতে পারছি না, তার ওপর একটু নড়েচড়ে বসলেই বক্তৃতাটা যে রকম খচমচ করে উঠে পাত পিঁচাতে লাগলো। তাত আমি বাক বলে একেবারে গলদখর হয়ে পড়লাম আর কি। এমনিধারা সময়েই একটা অসতর্ক মুহূর্তে আমার মুখ থেকে বারিয়ে গেলো—ওঃ! কি অসহায় অবস্থা!

—হা-হা-হা-হা!

হকচকিয়ে পাশের ভ্রমলোকের দিকে তাকিয়ে দেখি ছুঁড়ি নাটিয়ে হিজপডরে আমার দিকে তাকিয়ে একটা বিকট ঠা করে হাসছেন। ঠাঁর হাসির আকর্ষিতা এবং তার বেগের মুখে নিজেকে যেন ঠিক রাখতে পারছিলাম না। ঢাক-ঢাক করে কিছু লুকোতে গিয়ে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয়, আমারও কিছুক্ষণের জন্তে অনেকটা তেমনিই হলো। তবে কি আমার উৎকট অস্থিরতার কারণটা ভ্রমলোক বৃষ্ণতে পেরে গেছেন? একেবারে অসম্ভব নয়—কারণ, মনে পড়লো খানিকক্ষণ আগে একবার আমার অভিভাষণটি পকেট থেকে বের কর গোটা দুই শব্দ এ্যাড করে দিয়েছিলাম। তার নাট ফল হয়েছিলো 'হা'টি। প্রথমত বক্তৃতাটা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে আর দ্বিতীয়ত পকেটের বাইরে প্রাটিকর্মের খোলা হাওয়ার ওর গরম ভাষাটাও খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছিল।

বিস্ত অ'র একটা লোকসানও হয়ে গেছে বলে আমার মনে হতে লাগলো এখন। আমার বিভিনের কাঁকে ভ্রমলোক নিশ্চয়ই আমার অভিভাষণটি পড়ে ফেলেছেন। তার মানে পাঁড়ায় এই যে, আমার বক্তৃতাটির এখন যা কিছু মূল্য তা কীসে হয়ে-বাওয়া বাজেরের বৃত্তান্তের মতো খানিকটা, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবার কিন্তু পকেটে হাত দিয়েও মনে হচ্ছিলো যেন আমার অভিভাষণটি অযোগ্য রক্ষকের হাতে পড়ে কোনো দুল্লী তরুণীর প্রাণতাহানি ঘটে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়—যেন অনেকটা তেমনি হয়ে গেছে; মুখ খুঁড়ে হুটির পড়েছে পকেটের ভেতর। আমার অভিভাষণটির নামকরণ করেছিলাম 'সাহিত্য ও মহুয্য'—সাহিত্য, যে সাহিত্যের আসরে একখানা পাত পাথার আশায় কতদিন আহার ভুলে বাই, বৃষ্ণতে অস্বীকার কবি, যার প্রতি কিঞ্চিৎ ঝোঁকের জন্তো অফিসে প্রোহই লেট এং হাঙ্গরক রকমের সমস্ত ভুল বা করে ফেলি, তা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়—সেই সাহিত্য যে মহুয্যের চাইতে কতো তুচ্ছ, মহুয্য যে কি বিরাট, চুলভ এই মানবজীবন আমাদের বারা একেবারেই বিনা। আত্মসে পেরে গেছি তারা যে সবাই এক একজন জ্যান্ত অবতার—এ সমস্তই আমার বক্তৃতায় আমি স্বার্থহীন ভাষার সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণ করেছি। এতো বড়ো একটা থিরোরী যদি পথ-ঘাটে কীস হয়ে যায় তা হলে কার না ক্ষোভ হয়।

শুধু ক্ষোভ তবু সামলানো যায়, কিন্তু ভ্রমলোক যখন মুখ খুললেন তখন আমার বা হলো ক্ষোভ তার কাছে হুড়ুপোষা শিশু, শোকও বোধ হয় বালক-টালক কিছু হবে—গোটা উত্তর গ্রীনল্যান্ডের হিমপ্রবাহ যেন আমি আমার ছত্রিশ ইঞ্চি খাঁচার মধ্যে অনুভব করলাম।

—মাগ করবেন, ভ্রমলোক হাসির রাশ টেনে বললেন, একটা বড়ো অস্ত্রায় করে ফেলছি, একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। বৃষ্ণতেই পারছেন এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আপনি যেমন গত ষটাত্তিনেক ধরে কি করবেন ঠিক করতে না পেরে অনেক কিছুই করে ফেলেছেন। আমার অবস্থাও অনেকটা সেইরকম। তাই চোখের কাঁচাকাছি যখন আপনায়

‘সাহিত্য ও মাছুষ’ এসে পড়লো আপনার অমূল্যমূল্য ব্যক্তিরকেই দেখলাম চোখ দুটো নিজেদের বুলিয়ে নিলে আপনার কাগজগুলির ওপর থেকে। অনেকটা বিদেশী কোম্পানীর দেশী বড়বাবুদের মতো আর কি, কতকো খুশি করবার জন্যে অবাচিতভাবেই সর্বদা সমস্ত রকম নীচ কাজ করতে তৎপর—যে নীচতা অনেক সময় এমন কি বৌদ্ধ কতকোও অবাক করে দেয়। যাই হোক মশাই আপনার লেখাটা আমার পড়া হয়ে গেছে। ভ্রমভার খাতির আপনার অভিমতকে সমর্থন জানানোটাই হয় তো ভালো কাজ হতো।

কিন্তু মশাই, মাপ কাবেন, মিথ্যে আমার ধাতে সম না। সাহিত্য, মানে সম্পাদকমশাই আর প্রকাশক মহাজনের অর্ডার সাপ্লাই করতে গিয়ে যে পণ্যসামগ্রী মাথার হটবাগ চাপিয়ে আপনারদের উৎপাদন করতে হয়, তার বিষয়ে যতো নিশ্চয় থাক। যার ততোই যে ভালো সে কথাটা সাহিত্যিক হিসেবে না হোক অন্তত ভ্রমলোক হিসেবে আপনিও স্বীকার করবেন আশা করি। তবে মাছুষ বা মাছুষের কথা সব-সময়েই অগ্রবিস্তার বলা চল। আমি কিন্তু মশাই আপনার ঠিক বিপরীত মতে বিশ্বাসী। আপনি মনে করেন মাছুষজীবন দুর্ভাগ্য, মাছুষ একটা বিরটি কিছু, মাছুষেরা বড়ো ভাগ্যবান ইত্যাদি ইত্যাদি; আর আমি মনে করি মাছুষজীবন স্থলভব বস্তু, এছাড়া ভেবে দেখুন তো কিছুমাত্র চেষ্টা ব্যতিরেকেই আমরা সবাই কেমন এক-একটি আশু জীবন পেয়ে গেছি। আর ভাগ্যের কথা বলেন তো বলবো, মাছুষের চাইতে অসহায় জীব পৃথিবীতে আর কেউই নেই—হতে পারে না।

ভ্রমলোক একবারটি মম ফিরিয়ে নিয়ে তারপর আবার আরম্ভ করলেন: মাছুষের এই অসহায়তার প্রমাণ চাই? শুধু তা হলে কয়েকটা কথা বলি, এতেই ঝাব হয় আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারবেন।

প্রথমত দেখুন, মাছুষকে পৃথিবীতে আনা হয় তার মতামতের অপেক্ষা না করে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময়ও যেতে হয় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

তৃতীয়ত দেখুন, যে খুব গরীব সবাই তাকে বলবে উচ্ছৃঙ্খল, বাজে খরচ করে তাই অভাব হয়।

চতুর্থত, যে মাছুষ বড়লোক সবাই তাকে বলবে—নিশ্চয়ই কিছু একটা অসুস্থপারে টাকা-পয়সা করেছে।

পঞ্চমত, আপনার যখন টাকা ধারের দরকার হয়, দেখবেন সবাই কেমন আপনাকে এড়িয়ে চলতে চাইবে; আর যদি আপনি সচ্ছল হন তো দেখবেন সবাই আপনার উপকার করবার জন্যে কতটা উদগ্রীব হয়ে আছে এবং সে অবস্থাটা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই বিরক্তকর হবে।

ষষ্ঠত, যদি কেউ রাজনীতি করে তো সবাই বলবে, লোকটা কিছু একটা দাও দারবার তালে আছে, আর যদি রাজনীতি না করে তবে তাকে অসামাজিক এবং স্বার্থপর আখ্যা পেতে হবে।

সপ্তমত যদি কেউ খুব দানখর্য্য করতে সবাই বলে লোকটা নিশ্চয়ই এককালে খুব পাণ্ডা-পাণ্ডা করেছে এখন তাই খণ্ডাবার চেষ্টা করেছে; আর যদি দান না করে তো সে যে কণ্ডু এ-বিষয়ে সকলেই একমত হবে। যদি আপনি প্রকৃতই ধার্মিক প্রকৃতির হন তা হলেও সবাই বলবে ভণ্ড—দার আদর্শ হল তো পায়ণ্ড বলবেই।

অষ্টমত শুধুন, যদি আপনি কোমল প্রকৃতির হন তো সবাই বলবে লোকটা মেরেলি স্বভাবের—দার কোমল প্রকৃতির না হলে বলবে নিষ্ঠুর।

যে অল্পবয়সে মারা গেছে তার সম্বন্ধে সকলেই একমত যে, সে বেঁচে থাকলে কি না হতে পারতো—দার যে বড়ো বয়স অবধি বেঁচে আছে তার সম্বন্ধে সকলেই একমত—দারদার! যমেরও অক্ষতি....

ও আমার ট্রেন এসে গেছে, আমি আপ-এ যাবো, আপনি তো ডাউন-এ যাবেন, তাই না? বসুন তা হলে আরো কিছুক্ষণ। আচ্ছা চলি, কিছু মনে করবেন না, নমস্কার।

মনে হলো এবার ডাউন-এ গিয়ে, মনে আরো ডাউন-এ গিয়ে সাহিত্যসভার না গিয়ে বরং আপ-এ বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার অভিভাবগটি চোস্ত করে রিভাইজ করতে আদৃত্ত করি অল্প কোনো সাহিত্যের আসরের মধ্যে। তাই এবার বাড়ি ফেরবার ট্রেনের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

—তীরন্দাজ

## যন্ত্রের সাহায্যে চিঠি বাছাই

আমাদের প্রধান পোস্টফিস বাজেনারেল পোস্টফিসকে যেমন বড় ডাকঘর বলে, তেমনি পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় পোস্টফিসকে বলে বুণ্ডেসপোস্ট। এই বুণ্ডেসপোস্ট থেকে প্রতিদিন পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্র ৩০ মিলিয়ন চিঠি যায়। পশ্চিম জার্মানীর অত্যন্ত অনেক ডাকঘর থেকেই দিনে তিনলাখ চিঠি যায়। পোস্টফিসে যথেষ্ট কর্মচারী রাখলেও এই পাহাড়-পর্বত চিঠি যথাস্থানে পাঠানো সহজ কর্ম নয়। তাই অনেকদিন ধরেই পোস্টফিসের কর্মচারী মাথা ঘামাচ্ছিলেন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে যেটা ঠিকমত চিঠি বাছাই করতে পারবে। গত বছরে এইরকম একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানীর ডার্মস্টাট পোস্টফিস সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এটা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নয়। পশ্চিম জার্মানীর সব পোস্টাল শহরগুলির প্রত্যেকের একটা সাংকেতিক চিহ্ন আছে। চিঠির গায়ে বিশেষ টাইপরাইটার দিয়ে চিঠির গন্তব্য-শহরের সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হয়। তারপর যন্ত্রের মধ্যে চিঠিগুলি ধরে প্রত্যেক শহরের আলোড়ি আলোড়ি বোঝে

চিঠিগুলি জমা হয়; তারপর চিঠিগুলি সেই শহরের যায়। সেখানে আবার কর্মচারীরা সাংকেতিক চিহ্নগুলি দেখে চিঠিগুলি বরাবর যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। এবার কিন্তু সুপরিচিত জার্মান প্রতিষ্ঠান দিমেল এমন একটা স্বয়ংক্রিয় চিঠি বাছাই যন্ত্র তৈরি করেছে, যাতে বাস্তবিক কোনই তদারকের দরকার হয় না। এই যন্ত্রে যন্ত্রের তিরিশ খেকে ছত্রিশ হাজার চিঠি ঠিকমত বাছাই হয়। এতে হাতে কিবা টাইপরাইটার দিয়ে চিঠির গায়ে কোন সাংকেতিক চিহ্নও দিতে হয় না। কারণ যন্ত্রটি বিনা বাধার পোস্টফিসের সংখ্যা পড়তে পারে। এতে সেকেন্ডে দশটা চিঠি বাছাই হয়ে ঠিকমত বোঝে গিয়ে জমা হয়। সেখান থেকে চিঠিগুলো আবার আর একটা চিঠিবিধি যন্ত্র গিয়ে জমা হয় যার নাম ‘রৌটু’—কারণ সেটা অনবরত ঘোরে। এই যন্ত্রের প্রাণ হচ্ছে একটা টেলিভিশন চোখ ও তার সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিম জার্মানীর সব বড় বড় পোস্টফিস এই যন্ত্র বসানো হবে।

—ডি এ ডি।

# ❀ মরুপ্রান্তরের কথা ❀

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সৃষ্টি আদিমকাল হইতেই মরুপ্রান্তর মানুষের পথম বিস্তার  
বন্দ। সমুদ্রে নিগন্ত-বিস্তৃত ধূ-ধূ বালুকারাশি, বিচিত্র  
কৃষ্টির গাছপালা, বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির বালুকাস্তূপ  
এর সূর্যমুখী বালুকার উপর বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ মানুষের  
দৃষ্টি ও কৌতূহলের উদ্বেক করে। মরুপ্রান্তরে গাড়াইরা  
ন হয় আমরা সত্যি প্রকৃতির বড় কাজাকাছি আসিয়া  
গিয়াছি। বিপরীতধর্মী এই প্রান্তরে দিনের বেলায় যেমন  
চও উদ্ভাপ, নিশীথ রাত্রিতে আবার তেমন ঠাণ্ড। আবারও  
দারবত শুক ও কৃষ্ণ; কিন্তু সময় সময় প্রচণ্ড বর্ষণও অস্বাভাবিক  
হয়।

নৈসর্গিক কতকগুলি কারণে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই  
ব কারণ কিছু কিছু যে আমাদের আশেপাশেও নাই এমন নয়।  
পৃথিবীর একই দূরত্বে যে ক্যাকটাস-শ্রেণীর গাছটি দেখি, সেটি হয় তো  
মরুপ্রান্তরের একেবারে আদি গাছ। কি করিয়া এই জাতীয় ক্যাকটাস  
মাসিয়া পড়িল তাহা উপলব্ধি করিতে হইল মরুস্থলির কারণগুলি  
মোলাচনা প্রয়োজন।

মরুভূমি বা মরুপ্রান্তর কাকে বলে এবং কেনই বা মরুপ্রান্তরের  
সৃষ্টি হয়? এ প্রশ্ন একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে যদিও  
মরুপ্রান্তরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য অপরিমিত তাপ, তবু উহাই একমাত্র  
কারণ নয় মরুস্থলির। কারণ ভূবারাণ্ড উত্তরমেরু অঞ্চলেও  
মরুপ্রান্তর আছে—সেখানে কিন্তু তাপ নাই। আবার দক্ষিণ  
আমেরিকার মরুপ্রান্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত শীতল। ভূমি মরুময়  
করিয়া তোলার বাণীয়ে সবচেয়ে বড় সহায়ক শুষ্ক আবহাওয়া ও শুষ্ক  
মাটি—যার কারণ আবার বৃষ্টির অভাব। মরুপ্রান্তরে সময় বৎসরে বৃষ্টি-  
পাতের গড়পরিমাণ শূন্য ইঞ্চি হইতে আট ইঞ্চির বেশি নয়। কিন্তু  
যেটুকু বৃষ্টি হয় তাহাও আবার সমগ্র বৎসরের প্রায়োজনমত নয়।  
যে কোন প্রান্তরেই ৮—১০ ইঞ্চি বৃষ্টি যদি বৎসরের নানা সময়ে  
প্রায়োজনমত হয় তবে মরুস্থলি হয় না। অনেক গাছপালা ও  
শ্রাবী সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু মরুপ্রান্তরে হয় তো বৎসরে ২ মাসেই ৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত দেখা  
গেল, আর বাকী সময়ে একবিন্দু বৃষ্টিও নাই। কাজেই ইহাই  
প্রতীয়মান হয় যে সমগ্রমত ম্যান পরিমাণ বৃষ্টি পাইলে মাটির এই  
ভয়াবহ পরিণতি হয় না। আমাদের পরিচিত গাছপালা শুষ্ক ভয়ে  
অভাবেই সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আর যেখানে  
গাছপালা বাঁচে না, সেখানে সাধারণ শ্রাবীর বাস অসম্ভব।

পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই জমবিরল—কারণ  
এ সকল স্থানে মরুভূমীর অবস্থা বিদ্যমান। মহাদেশগুলির মধ্যে  
একমাত্র ইউরোপই ব্যতিক্রম। এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় মহাদেশের  
বিষাট অংশই মরুপ্রান্তর; এশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত মালখণ্ডে  
গোবী মরুভূমি পৃথিবীখ্যাত। উত্তর আমেরিকার বড় মরুপ্রান্তরগুলির  
অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর। ব্রজিল,

আরজেন্টিনা, বলিভিয়া ও চিলিতে অনেক মরুপ্রান্তরের অবস্থান  
দেখা যায়। আফ্রিকার বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি ছাড়াও ইথিওপিয়া,  
মালি, কেনিয়া ও টাঙ্গানিকা ও বেলুয়ানাল্যাণ্ডে বিস্তৃত মরুভূমি  
আছে। এই বিভিন্ন মহাদেশগুলিতে মরুস্থলির কারণ অনুধাবন  
করিলে দেখা যায় বার্ষিক গড় বৃষ্টি এবং ভূবারণপাতের অসামঞ্জস্য  
ছাড়াও কতকগুলি স্থানীয় পারিপার্শ্বিকও বিদ্যমান। বৃষ্টিপাতের  
অন্যতর ভগ্না অনেক স্থানে একেবারে মরুময় না হইয়াও হয় তো  
প্রায় মরুময়; এরূপ স্থানে ২০ বা ৫০ বৎসর পরে পর পর ২০  
বৎসর যদি একবিন্দুও বৃষ্টিপাত না হয় তবে সম্পূর্ণরূপে মরুময় হইয়া  
গাড়ায়। পূর্ব গাছপালা বা জীবজন্তু যদিবা কোনওরকমে বাঁচিয়া  
থাকিতে পারিত, পরে তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া গাড়ায়।  
পৃথিবীর অধিকাংশ মরুপ্রান্তরের স্থলির ইহাই ইতিহাস।

মরু কথাটি মনে হইলেই আমাদের চোখের সমুখে ভাসিয়া উঠে  
বালুকারাশির চিত্র—নিগন্ত-বিস্তৃত ধূ-ধূ বালুকারাশি—মাঝে মাঝে  
বালিয়াড়ি—চাঁওয়ার প্রভাবে উঁচুনিচু টেউরের মত চলিয়া গিয়াছে।  
এই বালিয়াড়ি স্থলিও পূর্ণ ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে  
প্রথমে এ স্থানে ছিল আলগা বালুকারাশির স্তূপ—কোন গাছপালা  
এ আলগা ভূমিতে শিকড় গাড়িতে সক্ষম হয় নাই। তারপর  
কালের স্রোতে কোনও একসময়ে প্রকৃতির কোন বিপর্যয়ে বাত্যান্ধিক  
হইয়া টেউরের মত উঁচুনিচু বালুগাড়ির সৃষ্টি হইয়াছে। গাছপালা  
কোন কিছু যদিবা শিকড় গাড়িয়া কোনক্রমে প্রাণধারণ করিয়াছিল;  
তাহা বালুকারাশির চাপে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠে সর্বদময়ই বায়ুর দ্বারা ক্ষয় সাধন হয়। বায়ুর প্রবাহকালে  
নয়ম বা আলগা ভূপৃষ্ঠ হইতে মাটির কণাগুলি একস্থান হইতে  
অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। এভাবেই মরুপ্রান্তরে বালিয়াড়ি বা  
বালুকান্টেউয়ের সৃষ্টি হয়। আশেপাশে ঘন বৃক্ষাদি থাকিলে এভাবে  
বালুকা বা মাটির কণা একস্থান হইতে অপরস্থানে পরিবাহিত  
হইতে পারে না—বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মরুপ্রান্তর কোন বাধা নাই  
—কাজেই বালুকারাশি সর্বদাই বায়ুলাঞ্ছিত হয়। ঘুলির বড় বা  
বালুকার ঝড়ও এই কারণে মরুপ্রান্তরে লাগিয়াই আছে। এই  
ঝড় যে কত ভংকর, কি ভীষণ প্রকৃতি তাহা মরু-পথটেককারীদের  
বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়।

মরুপ্রান্তরে আবার সময় সময় প্রবলবেগে জলস্রোতও নামিয়া  
আসে। খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি? কিন্তু তবু অতিবর্ণনের ফলে  
বন্ধা হয়। কারণ মোটামুটি এই—মরু অঞ্চলে যখন বৃষ্টি একাজুই  
হয় তখন সে বৃষ্টির পরিমাণ হয় অস্বাভাবিকরূপে প্রবল। যে  
কোন একটি স্থানে অতি কম সময় অনেক বেশি বর্ষণ হইলে  
সেই স্থানের বালুকারাশি অতটা জল শুষিয়া লইতে সক্ষম হয় না;  
তখন এই অতিরিক্ত জল বস্তার আকারে এখিক ওখিক ছড়াইয়া  
পড়ে। মরুভূমিতে বস্তার রূপ ভংকর; অত্যন্ত দ্রুত তারল্যভি—  
পথটেকগণ বলেন যে মরুর বস্তার গতি দ্রুত বায়মান মনুষ্যের

গতির চেয়েও দ্রুততর। অরী বজার সে জল হাজার হাজার টন বালুক, বৃন্দাকার পাথর ইত্যাদি সব ঠেলিয়া লইয়া সমুদ্রের দিকে প্রবলবেগে অগ্রসর হয়।

মরুপ্রান্তরে সাধারণত বালুকা-ঝড় ক্ষান্ত হওয়ার সাথে সাথেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। এজন্য অতি মরু-পরিষ্করণ কখনও নীচুতানে তাঁবু ফেলেন না, কারণ পচিশ-তেরিশ মাইল দূরে বাগুকা-ঝড় হইলেও সেখানকার বজার জল অতি অল্পসময়ে ছুটিয়া আসিয়া সবকিছু ভাসাইয়া লইয়া বাইতে পারে।

মরুপ্রান্তরে যে সকল গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার বা কীটপতংগের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহারা কিন্তু আমাদের অতি পরিচিত গাছপালা বা জীবজন্তুর মতো নয়। ইহাদের আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন এবং পরিবেশও ভিন্ন। প্রথম উঠিতে পারে মরুর এই শুষ্ক আবহাওয়া ও জলশূন্য অবস্থার মধ্যে ইহারা বাঁচিয়া থাকে কিরূপে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই সে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মরুপ্রান্তরের গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার ও কীটপতংগদের অসংখ্য পারিশাখিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা বহিরাছে।

অধিকাংশ গাছপালাই ঘন কাঁটার আবৃত—কাঁটাগুলির উপর আবার পুরু লোমের আবরণ দেখা যায়। বেশির ভাগ গাছই ক্যাকটাস শ্রেণীর। ইহার মধ্যে Organ Pipe Cactus, Saguaro, Jumping Cholla Cactus, Teddy Bear Cactus, Prickly Pear Cactus, Beaver Tail Cactus, Disappearing Leaves Cactus সমধিক প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত কতকগুলি শ্রেণীর ক্যাকটাস আমাদের অনেকের বাড়িতেই টবে শোভাবর্ধন করে। মরুপ্রান্তরের উদ্ভিজ্জ বলিয়া এই সব ক্যাকটাসের জলের প্রয়োজন খুবই কম।

মরুপ্রান্তরের অপর বৈশিষ্ট্য খেজুর বা পাম জাতীয় গাছ দেখা গেলো সেখানে অথবা তাহার কাছাকাছি মরুতান বা ওয়েসিসু আছে ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে। খেজুর গাছ মরুপরিষ্করণের শুষ্ক জলেরই সন্ধান দেয় না, পরন্তু তাহাদের খাত ও আশ্রয়েরও উন্নয়ন।

মরুপ্রান্তরের আর একটি বিচিত্র গাছ জশুয়া গাছ (Joshua Tree)। ইহা যেন মরুর নিশানা—লোকালয়ে ইহার সন্ধান মিলে না। গাছের গোড়া হইতে উপর পর্যন্ত বর্ষাকালের মত ছুঁচালো পাতা অল্প হুড়াইয়া পড়ে। এই গাছের গুড়িও বেশ বৃহৎ। অসংখ্য পাখির নীড় ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল। মরুপ্রান্তরের অজস্র উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ Yucca অথবা Spanish Bayonet, Century Plant, Magucys, Ocotillo, Palo Verde ইত্যাদি।

ফুলের বৈচিত্র্যও দেখা যায়। বসন্তকালে যদি উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তবে চারিদিক বিচিত্রবর্ণের ফুলে ভরিয়া উঠে। এই সব ফুলের মধ্যে Sand Verbena, Yellow Encelias ইত্যাদি অধিক প্রসিদ্ধ।

মরুপ্রান্তরে এখনে-ওখানে ও গাছপালার আশেপাশে সহস্রশ্রেণীর জীবজন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি বিভিন্ন—কতকগুলি প্রচণ্ড তাপ ও শুষ্ক আবহাওয়ার হাত হইতে

আত্মরক্ষা করিবার জন্য বালুকার গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে—কেহ বেহু ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় আবার কিছুপাখ্যক ঘোপের ভিতরে অথবা বড় বড় বৃক্ষের গুড়িতে কেটেই বাস করে। এইসব জীবজন্তুর খাত উদ্ভিজ্জ অথবা ছোট ছোট প্রাণী।

এই জীবজন্তুগণি পারিশাখিক অবস্থার দরুণ স্বভাবতই আমাদের পরিচিত জীবজন্তুর চেয়ে আলাদা প্রকারের। ইহাদের শারীরিক গঠন মরুর ক্রম আবহাওয়ার উপযোগী এবং খাদ্যসংগ্রহ প্রণালীও অভিনব। বিখ্যাত চিত্র নির্মাতা Walt Disney'র Living Desert চিত্রখানি যাহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারাষ্ট মরুপ্রান্তরের জীবজন্তুগণের বিচিত্রতার পরিচয় পাইয়াছে।

স্তুতশামী জন্তুগুলির মধ্যে Desert Mule Deer, Peccaria, Jack Rabbit, Trade Rat, Kangaroo Rat, Prairie Dog, Antelope Squirrel, Ground Squirrel, American Badger, Spotted Skunk, Ring tailed Cat, Bob Cat, Mountain Lion ও Coyote অধিক প্রসিদ্ধ। Mountain Lion জাগুয়ার শ্রেণীর জন্তু আর Coyote মেকড়ে জাতীয়। সমুদ্রের বাহা পড়ে তাহাই Coyote-দের খাত। Skunkগুলি কাঠবিড়াল শ্রেণীর—ইহাদের লোমশ চর্মে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ।

মরুপ্রান্তরের নানাপ্রকার পাখির মধ্যে বাজপাখি অধিক প্রসিদ্ধ। নানা বিচিত্র আকৃতির পেঁচা, Chapparral Cock নামক একপ্রকার মোরগ (ইহার ঘটায় ১৫-১৭ মাইল পর্যন্ত দৌড়ায়), নানা প্রকারের কাঁচাকাঁচ, হিতির জাতীয় পাখি, Wren নামক গায়ক পাখি ও Desert Phainopepla নামক পাখি দেখা যায়। কয়েক প্রকারের বহুশেষ সন্ধানও মিলে—ইহারায় গুঁড়ি খুঁড়িয়া উত্তপ্ত বালুকার তাপ হইতে মিজেনের বাঁচাইয়া বাস করে—খাত—উদ্ভিজ্জ।

মরুভূমির সাপ অনেক প্রকারের এবং ভয়ংকর তাহাদের আকৃতি। অত্যন্ত বিবাক্ত এই সাপগুলির খাত সাধারণত ছোট ছোট পোকামাকড়। Rattle Snake-এর নাম অনেকই শুনিয়াছেন। ইহাদের সমস্ত শরীর বিচিত্রবর্ণের ষোড়শ আকৃতি চর্মে আবৃত। বোতামগুলিতে আবার ছোট ছোট শিং-এর মত বৈচিত্র্য দেখা যায়। আর একটি অদ্ভুত সাপ Sidewinder। ইহার যখন বালুকার উপর দিয়া চলে তখন পাশে দাগ রাখিয়া যায়। Sidewinder গুলি নিশাচর জীব—রাত্রিতে যে সব ছোট ছোট প্রাণী ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা এই সাপের খাত। অজস্র অনেক সাপের মধ্যে Racers ও Furrowing Snake উল্লেখযোগ্য।

সরীসৃপ নানাপ্রকার ও বিভিন্ন বর্ণের। Gila Monster, Horned Toad (শিংওয়ালা ব্যাং), Skinks, Nocturnal Gecko, Chuckwalla, Collared Lizard (গলবন্ধনওয়ালা গিরগিটি), Spade Foot Toad, Giant Desert Toad ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ।

পতঙ্গ ও পোকামাকড়ের সংখ্যাও অনেক। আকৃতিতে ছোট হইলেও ভয়াল ইহাদের প্রকৃতি। পদাঙ্গুদের সঙ্গে ইহাদের হিংস ও রক্তাক্ত লড়াই দেখিবার ভিনিস। ইহারায় এত বিবাক্ত যে বড় বড়



## আপনার ওজন পরীক্ষা করুন

জ্ঞ, এমন কি সাপ পর্বত ইহাদের ত্রিগুণানার বৈশিষ্ট্য ন। মফ-  
প্রান্তরের পিণ্ডেও উল্লখযোগ্য।

একথা বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না যে, মানব সভ্যতার উৎস  
সাথে মফপ্রান্তরের অবদান অনেক। মিশর তথা সাহারা  
ভূমি—এশিয়ার গোবী মরুভূমি, মানবসভ্যতার বিকাশের  
মাগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে-হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে  
সহজ মানুষের বাস করিবার স্থান ও শস্য উৎপাদনের চাহিদাও  
অসংশয় প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। স্বভাবতই আজ মানুষের  
মরুপ্রান্তরগুলির উপর বাইরা পড়িতেছে। আজ ইহা

পরিষ্কার বোঝা বাইতেছে যে, স্তম্ভ বৃষ্টিপাতের অভাব অর্থাৎ  
পর্যাপ্ত জলের অভাবেই মরুস্থলি হয়। স্তম্ভ বা মেচ-ব্যবস্থা  
করিয়া মানুষ মরুভূমির বিস্তৃত বালুকারাশির বতটা সম্ভব উর্বর  
করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। মরু মেচ-ব্যবস্থার কাজ  
আজকাল সাহায্য পূর্ণাঙ্গমে চলিতেছে—আর চলিতেছে  
আমেরিকার মরুভূমিগুলিতে। ইতিমধ্যেই এইসব স্থানের  
অনেকটা শস্যখামল করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। মরুতে  
ভূমি সাধারণত অজৈব লবণে সমৃদ্ধ—কাজেই শুধু পর্যাপ্ত  
পরিমাণ জল সরবরাহ করিতে পারিলেই ঐ ভূমি অনায়াসে উর্বর  
হইতে পারে।

# ✱ আপনার ওজন পরীক্ষা করুন ✱

হয় তো মনে করতে পারেন আমি একটা নির্ভর বিজ্ঞপ  
করতে যাচ্ছি ওজন পরীক্ষা করবার কথা বলে। কিন্তু  
না, তা নয়, যে ভয় আপনি পাচ্ছেন অর্থাৎ মারাত্মক  
কমের 'আগারওয়েট' হয়ে যাশন—তা নাও হতে পারে।  
বিশেষ করে যদি আপনার বয়স চল্লিশের ওপর হয় তা হলে  
অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হোক অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা  
যাবে যে আপনি 'আগারওয়েট' তো ননই বরং হয় তো  
মারাত্মক রকম ওভারওয়েট।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই যখন উপযুক্ত খাদ্য পান  
না—যা তাঁর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এবং যা তাঁরা খেতে  
ভালাবাসেন—সে দেশে আবার মানুষ ওভারওয়েট হয় কি করে—  
এ প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রশ্নকে বলা দরকার  
যে, এক ছটাক চর্বিজাতীয় জিনিস, তা বি কিবা মাখন হোক কিবা  
দুগ্ধ বা বনশ্পতি বা ইলিশ কিবা টায়া। জাতীয় মাছই হোক—কার  
পক্ষে যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বা করতে পারে, তার  
কোন সাধারণ নিয়ম নেই। মেদবহুল কোনো লোকের পক্ষে  
এ খাদ্য একেবারেই অপয়োজনীয়, কারণ তার সবটুকুই তার শরীরে  
ক্ষম্য হয়ে তার শরীরের ক্ষতিকর অবস্থাটাকে আরো বিপন্ন করে  
উঠানে নিশ্চয়ই। আবার বার শরীরে মেদ খুবই কম, যেটুকু অবশ্যই  
থাকা উচিত ছিল সেটুকুও নেই। তার পক্ষে ঐ এক ছটাক চর্বি  
জাতীয় জিনিস যে মোটেই ক্ষতি করবে না (অবশ্য যদি সে হৃদয়  
করতে পারে) তা তো খুবই সহজবোধ্য কথা।

এ বিষয়ে সব দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণই একমত যে খুব বেশি  
পরিমাণ ওভারওয়েট হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি অল্প একটু  
ওভারওয়েট হওয়ার চাইতেও অল্প একটু আগারওয়েট হওয়া ভালো—  
বিশদস্ত ব্যক্তির বয়স যদি চল্লিশের বেশি হয়।

আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার জোরেই বলছি একবার ওজন  
পরীক্ষা করে দেখুন, দেখবেন হয় তো আপনিও 'ওভারওয়েট।'

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই দেখা যায় ৩৫ কি ৪০-এর পরে  
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের চাইতে মেয়েরা সাধারণ বেশি  
'ওভারওয়েট' হয়ে পড়েন। বলাই বাহুল্য এর একমাত্র কারণই

হলো 'বেঠিক' রকমের ব্যক্তিগত। অর্থাৎ কি না ২০০০ থেকে  
২৫০০ 'ক্যালোরী' এনার্জি হাটির জন্তে যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন  
হয় তার চাইতে বেশি পরিমাণ খেয়ে ফেলা। তার ফল পাঁড়ায়  
এই যে ঐ ২০০০—২৫০০ ক্যালোরী অতিরিক্ত এনার্জি আমাদের  
শারীরিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মজুত হয়ে যায়—এইভাবে  
একটু একটু করে করে কয়েক মাস বা কয়েক বছর মজুত হতে  
থাকলে যে কোন মানুষই ওভারওয়েট হয়ে পড়তে পারেন।

ওজন কমতে হলে বা ওজন বাতেন বাড়তে না পারে সেমিকে  
যদি লক্ষ্য রাখতে চান তা হলে সবার আগে আপনার বসনা  
সম্বন্ধ করতে হবে—যেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব সহজ  
কাজ নয়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে ওভারওয়েট হলে এমন ক্ষতি  
কি হয়। তার উত্তর হলো যে, ওভারওয়েট ব্যক্তি নিজেই নিজের  
মারাত্মক ক্ষতি করে থাকেন প্রতিনিয়ত। এ ক্ষতিটা হয় অনেক  
রকমে। তবে সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয় আমাদের হার্টের। একবার  
ভেবে দেখুন না ৫ কিলোর একটা থলি যদি আপনাকে ১০০ গজ  
বয়ে নিয়ে যেতে হয় তা হলে যেটুকু পরিশ্রম আপনার হবে, খসিট।  
যদি ৭ কিলোর হয় তা হলে পরিশ্রমটা আর একটু বেশি হবে—নয়  
কি? এও অনেকটা সেই রকমই বলা চলে। আপনার ওজন ১২৫  
পাউণ্ড হলে আপনার হার্টের যেটুকু পরিশ্রম প্রত্যাহ করতে হবে—  
১৪০ পাউণ্ড হলে তার চাইতে তের বেশি অবশ্যই করতে হবে। ফলে  
ক্রমশ আপনার হার্টের পরিশ্রমের ক্ষমতা কমে আসতে থাকবে।

কাজেই, আবার বলছি—আপনার ওজন পরীক্ষা করুন, ওভার-  
ওয়েট হলে বসনা সম্বন্ধ করে, খাওয়া-কমিয়ে ওজন কমান, আর  
ওজন ঠিক থাকলে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন খাদ্য  
নির্বাচন করে নিন, যাতে ওজন বাড়তে না পারে।

কিন্তু বাঁদের ওজন কম? তাঁরা কি করবেন? বাঁদের ওজন খুবই  
কম তাঁরা তো অবশ্যই ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু বয়স  
এবং উচ্চতা বিচারে ওজনটা যদি খুব সামান্য কিছু কম থাকে (বিশেষ  
করে চল্লিশের পরে) তা হলে কিছুই করার দরকার নেই—অর্থাৎ  
কি না ওজন বাড়ানোর দরকার নেই।

—নাস' মিত্র।

# নিজের মতো চলুন

যাদের বয়স খুব কম তাদের কথা আলাদা। খাওয়া, পরা, চলা, কথা বলা, কথার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ ভাষা প্রয়োগ করা এবং ভাবের আভিগম্য ঘটানো—ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কেই ছোটরা বড়দের কাছ থেকে শিখে থাকে। এই যে শেখা এটাকে শিক্ষা-মানোবিদগণ বলে থাকেন অমূল্য করা। তাঁদের কাছে শিক্ষা মানেই অমূল্য করা, কিন্তু দেখবেন ছোটরা যখন বড়দের অমূল্যকরণের চেষ্টা করে কোনো বিষয়ে তখন খুব খারাপ লাগে না। তার কারণ প্রথমত অমূল্যকরণ তারা খুব সূচন্যভাবে করতে পারে না, তার মধ্যে থেকে যার কিছু কিছু ক্রটি যার ফলে একদিকে যেমন আমরা হাসির খোঁজ পাই তদ্ব্যতিকিৎ বাস্তবিকই একটা নতুন ধরণের সৃষ্টি কাজ চলতে থাকে—অর্থাৎ কি না অপটু অমূল্যকরণের ফলে নতুন একটা সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমরা বড়রা যখন কিছু অমূল্যকরণ করার চেষ্টা করি তখন কি হয়? হাসির বদলে এবার প্রথমত আমাদের মনে দেখা দেয় বিরক্তি আর দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি করলো সব চাইতে বেশি—একটা সৃষ্টির চুঁটি টিপে মারলো। সোজা কথা বলতে গেলে এই দাঁড়ায়—

রামবাবু যদি রবীন্দ্রনাথকে অমূল্যকরণ করে কবিতা লিখতে চেষ্টা করেন, তা হলে কিছু প্রতিভা থাকলেও আমরা বড়জোর একজন তৃতীয় শ্রেণীর রবীন্দ্রনাথ পেতে পারি—কিন্তু রামবাবু যদি তাঁর নিজস্ব পায়ার কাবাচটা করে চলেন তা হলে তাঁর প্রতিভার ছিটোকাটা না থাকলেও আমরা বা পাও। তা রামবাবুর নিজস্ব সৃষ্টি তাঁর প্রতিচ্ছন্দে রামবাবুর প্রকৃতিই উৎকৃষ্ট কি মারবে—কাব্য হিসেবে ব্যর্থ হলেও তার মধ্যে এমন কিছু অবশ্যই থাকবে যার ফলে রামবাবুকে আমরা শ্রবণ করবো।

কাবাচটার রেলার যে রকম জীবনের অজ্ঞা যে কোনো প্রসঙ্গে টিক সেই রকমই। প্রত্যেকে যদি আমরা নিজের মতো চলি

নিজের স্বাভাবিকতা বজায় রাখবার চেষ্টা করি (অর্থাৎ সমাজে অপরকে অমূল্যকরণ করার চেষ্টা না করি) তা হলে আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সমস্ত দিকেই নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করতে পারি।

প্রসঙ্গত একটা গল্প মনে পড়ে গেলো—

একবার এক জঙ্গলায় এক থিয়েটারের মালিক উপস্থিত ছিলেন। একটি সুন্দরী তরুণী গান সুরু করলো। অপূর্ণ তার চেহারা, চমৎকার গলা। কিন্তু তবু একটা জিনিস প্রতিমুহূর্তেই বাদ সাধতে লাগলো। তার ওপরের পাটির কয়েকটি দাঁত ছিল একটু উঁচু। ফলে গান গাইবার সময় মাঝে মাঝে তার ঐ দাঁত লোকে যদি দেখে ফেলে এই আশঙ্কার কখনো বেহুয়োভাবে তার গলা কাঁপছিল, কখনো বা সে ঘামতে সুরু করছিল, কখনো বা তার স্বর একেবারেই তরু হয়ে যাচ্ছিল। তার ফগটা কি হয়েছিল সহজেই অনুমান করতে পারবেন। টিটকারি থেকে ঢিল, ঢিল থেকে পাটকেল, পাটকেল থেকে জু..... যাক গে সে সব অব্যাহত কথা।

তারপর কি হলো বলি শুনুন। থিয়েটারের মালিক ভদ্রলোক দেখা করলেন মেয়েটির সঙ্গে, সে তখন নাকের জলে চোখের জলে। নিজের অজিজ্ঞতা এবং যুক্তি দিয়ে বোঝালেন তোমার যে দাঁত আছে সে কথাটা একেবারেই ভুল গিয়ে গান গাইতে চেষ্টা করো।

শুনলে আশ্চর্য হবেন। সেই একই জাংগার ঠিক এক বছর পরে অল্পকৃষ্টিত এক জলসায় সেই একই মেয়ে হাজার হাজার শ্রোতার সপ্রশংস হাততালি পেয়েছে। বুঝতে পারছেন—প্রথমবার যখন সে দাঁত লুকিয়ে গান গাইবার চেষ্টা করেছিলো তখন শ্রোতার গান কেউই শোনে নি সবাই দাঁত দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এবার যখন সে নিঃসঙ্কোচে দাঁত দেখাতে আরম্ভ করলো তখন আর দাঁত কেউ দেখে নি—শুধু গানই শুনছিলো।

—শ্রীরসিক

## প্ৰশ্নসিস্ কি ?

বর্তমানে ভেবজের মধ্যে যেগুলি অত্যাধিক বলে বিবেচিত হয়, আন্টিকোগালনাট নামীয় গুণটি তারই অঙ্গতম।

এই গুণ রক্তসঞ্চালনের কাজে সহায়তা করে থাকে, সকলেই জানেন যে শরীরে রক্তসঞ্চালনের কাজ ব্যাহত হলেই 'প্ৰশ্নসিস্' নামক ব্যাধির আক্রমণ ঘটে থাকে এবং তার পরিণামও সময় সময় অতি ভয়াবহ।

আলোচ্য ভেবজটি প্রয়োগ করে চিকিৎসকগণ অনেক সময়ই এ-সব কেস-এ সফল লাভ করেছেন

এই গুণের প্রভাবে রক্তবাহী শিরাসগুলি কার্যকরী অবস্থায় থাকে, চলাচল করার সময় রক্তকণিকাগুলি দানা বাঁধতে পারে না যার

ফলে দেহমধ্যস্থিত এক গুরুতর প্রয়োজনীয় অংশ হার্ট বা হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালন হয় স্বাভাবিক রীতিতে—যার ব্যত্যয়ে হৃৎপিণ্ডের কিংবা বহু হয়ে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটানোর আশঙ্কা থাকে।

হৃৎপিণ্ডের মতই ত্রেন ও শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যেকোন অংশেই প্ৰশ্নসিসের আক্রমণ ঘটতে দেখা বাচ্ছে ক্রমেই বর্ণিত মাত্রায় এবং সেজন্যই এই ধরণের ভেবজের গুরুত্ব ও চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু এই সব গুণ ব্যবহারেরও যথাযথ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ তা না হলে নানা জটিল উপসর্গের আবির্ভাব হর রোগীর দেখে।

আন্টিকোগালনাট জাতীয় কোন ভেবজ ব্যবহার করার সময়

## এখন স্মৃতি ও কোনো অকালমৃতাকে

রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার বাত-বাত, যাতে ওই ওষুধের প্রতিক্রিয়া দেখে ঠিকমত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায়।

এ ধরনের ওষুধের অতিপ্রাণে রোগীর দেহে রক্তসঞ্চালনের বেগ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে এবং তা থেকে হিমোফিলিয়া জাতীয় ব্যাধিতেও আক্রান্ত হতে পারে রোগী।

হিমোফিলিয়া-আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের কোন জায়গায় সামান্য আঘাত লাগলেও রক্তপাত ঘটে থাকে প্রবল মাত্রায়, আর তা বন্ধ করাও নিরতিশয় কঠিন।

অবশ্য বর্তমানে চিকিৎসকগণ এক বিশেষ ধরনের ওষুধ ইনজেক্ট করে হিমোফিলিয়ার রোগীর রক্তপাতও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, কিন্তু অ্যাটিকোগালনাট জাতীয় ভেজাজে ব্যবহারকারী রোগীর ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়ার আবির্ভাব ঘটলে সে বাসস্তাও অচল।

অবশ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে একমত নন, কারুর কারুর মতে হিমোফিলিয়া রোগে কোন অবস্থাতেই অ্যাটিকোগালনাট জাতীয় কোন ওষুধের প্রয়োগ অসম্ভব, আবার কেউ কেউ বলেন, ক্ষেত্রে বিশেষে তা একেবারে অসম্ভব নয়।

শৈশবোক্ত মতের পরিপোষকে বলা যায় যে, কিছু কিছু অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও রোগীকে এই জাতীয় ভেজাজ ব্যবহার করানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাচ্ছে সম্প্রতি এবং তাতে কোন কুফলও দেখা দেয় নি।

বর্তমানে অত্যধিক রক্তপাত বন্ধ করার নানা উপায় আয়ত্ত্বাধীন থাকার জন্যই অবশ্য আধুনিক শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের পরীক্ষা করে দেখতে সাহসী হয়েছেন চিকিৎসকবৃন্দ, ন্যাংএ এতে আশঙ্কা তো কম ছিল না।

সে যাই হোক হিমোফিলিয়ার রোগীকে অ্যাটিকোগালনাট

জাতীয় ভেজাজ দেওয়ায় বিপদের ঝুঁকি থাকে সব সময়ই, তবে তার মাত্রা কখনও বেশি কখনও কম এবং সেজন্যই থ্রম্বসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করার সময় চিবিংসকরা রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকেন।

অ্যাটিকোগালনাট ব্যবহারকারী রোগীর পক্ষে বহু ওষুধই কুফল প্রদায়ক; অ্যাস্‌পিরিন যা নাকি শিরশ্চিড়ার পক্ষে সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য এক অতি সাধারণ ওষুধ, তাও ব্যবহার করা নিরাপদ নয়, অ্যাটিকোগালনাট জাতীয় ভেজাজ ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তির পক্ষে, চিবিংসা বিজ্ঞানের মতে এই দুটি ভেজাজ নাকি পরস্পর বিরোধী।

থ্রম্বসিস রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ক্রমশই গভীর উল্লেগের সৃষ্টি করছে, চিকিৎসকদের মতে গ্রামের চেয়ে শহর অঞ্চলেই এ রোগের প্রাচুর্য বেশি, অ্যাটিকোগালনাট জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিমিত পানাহার ও নিশ্চিত পরিমাণ ব্যায়ামও নাকি এ রোগ নিরাময়ের পক্ষে কম সুফলদায়ক নয়, বস্তুত চিকিৎসকরা তো শেষের দুটি অভ্যাসের ওপরই বিশেষভাবেই জোর দিচ্ছেন আজকাল, তাঁরা বলেন, পরিমিত পানাহার ও নিরমিত ব্যায়ামের ফলে স্বভাবতই মানুষের শরীরে রক্ত চলালে থাকে অব্যাহত, যার ফলে রক্তকণিকাগুলি রুট বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। বলাইই হয় এবং থ্রম্বসিসের আক্রমণ-আশঙ্কাও দূর হয়ে যায় বহুলাংশে।

থ্রম্বসিস রোগীর পক্ষে তাই অ্যাটিকোগালনাট জাতীয় ভেজাজ যতটা প্রয়োজনীয়, নিরমিত ব্যায়াম, পরিমিত পানাহার, শাশ্বিপূর্ণ পরিবেশ ওর্বাং এরকথায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে ভাবনাব্যাপন করার পদ্ধতিও ততটাই অত্যাবশ্যিক।

—শ্রীমতী

## এখন স্মৃতি

শক্তি মুখোপাধ্যায়

অনেক বিশ্বাস নিয়ে পায় পায় এগিয়ে যেতেই মনের বিমূঢ়তা জলে-পুড়ে ছাই হবে জ্বেনে  
স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে  
শাস্ত হয়েচে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে  
অধিতীয় সভ্যতার উপকরণগুলি  
যেন সে সংগ্রহ করেছে অগ্নোর সাহায্য ব্যতিরেকে।  
এবং সে বায়-নখ দিয়ে  
রক্তাক্ত করেছে তার বিপক্ষের শক্তিশালী বাঁটি।

স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে  
শাস্ত হয়েচে। তাই সাদা চোখ নিয়ে  
কোন-কিছু দেখবে না; দেখলেও মুখোশে ঢেকে  
জননের বৃত্তিগুলি মুস্থ রেখেছে।  
যেন মনের পিছনে একটা বেতিসেরী কাজ  
অজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওপরে...

স্মৃতি এখন কপট অভিনয়ের গুণে  
শাস্ত হয়েচে।

## কোনো অকালমৃতাকে

শ্রীচিহ্নরঞ্জন দাস

আজকে আমার মনে পড়ে সেই হাবানো স্পন  
আকাশ-বাতাসে খুঁজে ফেরে তাই আমার মন।  
শুধুমুখের রক্তিম তুমি কি ঢকল  
ছেড়ে গেলে তবু পৃথিবীর এই মেহাকল।  
তুমি নেই তবু রয়েছে তোমার স্বপ্ন-সাধ  
শান্তিকপোত বয়ে আনে কত স্নস্বাদ।  
ডানায় ডানায় ফেটে পড়ে তার কি উদ্ভাস  
আজকে আমার (নেই কো) মনের হতাশাস।

বোঝাকল্পে এই দেশে কত সজাগ-চোখ  
কৈশে ওঠে দেখো শত্রুর ঐ দল্ল-নখ।  
যদিও এখনও উড়ছে আকাশে শকুন-চিল  
তবু উজ্জত প্রতিরোধে কত জঙ্গী দিল।

এবনও মিছিলে খুঁজে ফিরি আমি তোমার মুখ  
তোমাকে না পাই তোমাব মস্তই দীপ্ত বুক।  
যৌবন রাগে উজ্জল আজ কি উদ্দাম  
ভরে ওঠে মন পূর্ণ হবেই মনস্বাম।

# ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি

শুরেশচন্দ্র নন্দী

রাজসভায় যজ্ঞসভায় চৌর্যাজ শিশুপাল সমবেত রাজকুমারের সম্মুখে পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তীব্র কটুক্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শিশুপালের ঘৃণা বটুক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া মহামতি ভীষ্মেব যে প্রচ্যুতের প্রদান করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পরম প্রীতি—পূজা বৃদ্ধি—ঈশ্বর জ্ঞানের পরিচায়ক।

যজ্ঞসভায় সমবেত রাজকুমারের সম্মুখে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বংশ-মর্যাদা, অতুলনীয় ব্যবহার, বিজ্ঞাবুদ্ধি, শৌর্ধের প্রভূত প্রশংসা করিয়া সর্বশেষে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই নিখিঃ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। তিনি অব্যয়, সনাতন কর্তা এবং সর্বভূতের ঈশ্বর। শিশুপাল বালক, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা, গুণ, স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়া বালকোচিত উক্তিই করিয়াছেন।—

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরূপি চ অব্যয়।

কৃষ্ণত্ব হি কৃত বিশ্বমিদং ভূতঃ চরাচরম্।

অঘস্তা পুরুষো বাসঃ শিশুপাল ন বুধতে।

সর্বত্র সর্বত্র কৃষ্ণঃ স্তম্যাসেব প্রভবতি।

—মহাভারত—সভাপূর্ব।

মহাপ্রাজ্ঞ প্রীতিমান ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণে পূজাবুদ্ধি—ভগবদাকারা মনোবৃত্তি ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান ও অব্যয় বলিয়া হৃদয়ে প্রীতি-ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে তাহার রতি ছিল বলিয়াই নিজ উপলব্ধিগত জ্ঞানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। আরও বুঝিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই অখিল দেহীর আত্মার প্রিয় আত্মা। জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে দেহীর জ্ঞান অবতীর্ণ।

গোখানীপ্রবর স্তুত বলিয়াছেন, যে পূজাবুদ্ধি হইতে অখণ্ডজ্ঞান প্রেরণে অষ্টৈক্যতা ও অপ্রতিহতা প্রীতি জন্মে তাহাই মানবের পরম ধর্ম। এই প্রীতি-ভক্তির দ্বারাই মানবচিত্ত প্রশান্ত ও সুখী হয়।

স বৈ পুংসং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে

অষ্টৈক্যক্য প্রতিহতা যমাস্তা নুপ্রসাদতি।

—ভাগবত ১১২ ও

ধর্মরাজ ধর্ম বলিয়াছেন, পবিত্র কল্মষকরণে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনই প্রাধিকারিত পরম ধর্ম। মানবের শ্রেষ্ঠধর্ম ভক্তিধর্মের কথা স্তুত গোখানী এবং ধর্মরাজ শাস্ত্রবিহিত যে ধর্মের কথা বলিয়াছেন, উভয়ই তুল্যগুণাক্ষর। উভয় ভক্তির সার কথা—শ্রীভগবানের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রীতি-ভক্তি অর্পণই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম। মতিমান ভীষ্মসেবের শাস্ত্রবিহিত ভক্তি ধর্ম যে তাঁহার মতি ছিল—তিনি এই ধর্ম পালন করিতেন, তাহা তাঁহার ভক্তিব্রত ও প্রীতি রসসিক্ত হৃদয় সমুৎপন্ন স্তম্ভেই সুপ্রকাশ। এই স্তম্ভই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অব্যয়, সনাতন কর্তা সকল ভূতের ঈশ্বর বলিয়া প্রীতি-ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

যস্মিন্ বিধানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশস্তি।

গুণভূতানি ভূদেশে সৃজে দ্বিবিগণা ইব ॥

যস্মিন্মতোততে তন্তো দ্যুত্স্রগিব তিষ্ঠতি।

সন্ সন্ প্রথিতঃ বিশ্বঃ বিশ্বাজে বিশ্বকর্মণি ॥

হবিঃ সহস্রশিরসং সহস্রচরশঙ্কণম্।

সহস্র বাহু মুকুটঃ সহস্র বানোচ্ছলম্ ॥

অতিবাণীস্ত্র করানমতি সূর্যতিলেজসম।

অতি বুদ্ধাঙ্গিরাস্থানং তং প্রপাতে প্রজাপতিম্ ॥

পুরাণে পুরুষঃ প্রোক্তঃ ব্রহ্ম প্রোক্তঃ যুগদিম্।

কসে সর্বধং প্রোক্তঃ তমুপাত্তমুপাত্তম্ ॥

যস্মিন্ সর্বঃ যতঃ সর্বঃ যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।

যশ্চ সর্বমহো নিত্যং তথৈব সর্বস্থানে নমঃ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যেবায় গোত্রাঙ্গল্য হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

—মহাভারত

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়াই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে বটুক্তি করিয়াছেন। ইহা লীলাময়ের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের অব্যয়ত্ব, ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

লীলাময়ের বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করিয়া ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, হে ভগবান! তোমার বর্ম, তোমার লীলা কি বিচিত্র। যদিও তুমি আত্মরূপে সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। সকলেরই প্রতি তোমার সমদৃষ্টি—স্নেহ, মমতা আছে। তথাপি তুমি একদেশদর্শী কেন না তুমি এমনই চতুর যে, তোমার যোগমায়ার দ্বারা সমস্ত জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ। তুমি একমাত্র তোমার ভক্তের প্রতি এমনই স্নেহশীল যে, তুমি বাহ্যকল্পতরুরূপে তাহাদের কামনা, বাসনা ও প্রার্থনা পূর্ণ কর।

—ভাগবত ৭।২৭।৮

প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে ভূমন! হে ভগবান! হে পরাশ্রয়! হে যোগেশ্বর! আপনি ত্রিলোক মধ্যে কোন স্থানে কি ভাবে, কত লীলা প্রকাশ করেন, তাহাকে তাহা কে বলিতে পারে? আপনি যোগমায়ার দ্বারা নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছেন।

কো যেন্তিভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রয়

যোগেশ্বরোত্তীর্ভবত ত্রিলোক্যাম্।

কাহো কথং বাক্তি বা কলতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।

—ভাগবত ১০।১৪।২০

প্রহ্লাদের উক্তি ইহাই বুঝাইতেছে, যে সকল ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে প্রীতি-ভক্তি অর্পণ করে, শ্রীভগবান তাহাদের অনঙ্গা ভক্তিতে প্রীত হইয়া কল্পতরুরূপে সেই সকল ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন।

## ভাষ্যের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতি

সুতরাং শ্রীতি-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের অমুগ্রহণাত্মক একমাত্র উপায়। হস্তভাগ্য শিশুপাল শ্রীভগবানের অমুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, সেই কারণেই মোহাচ্ছ হইয়া শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কষ্টকি করিয়াছেন।

মহাব্রজ পরীক্ষিত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত শ্রীভগবানের পবিত্র লীলামহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, শ্রীহরি স্বয়ং অনতিবিলম্বে সেই মানবের—ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতা।

নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।

—ভাগবত ২:৮:৩

শিশুপাল অজ্ঞান মোহাচ্ছ বলিয়া শ্রীভগবানে তাঁহার শ্রীতি-ভক্তি ছিল না। এই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কষ্টকি করিয়াছেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যখন মানব কাষ্টের মধ্যে সদা-অবস্থিত অগ্নিব জায় জীবজন্তু সর্বভূতে আমি—ভগবৎসত্তা বিস্তারিত উপলব্ধি করে তখনই সেই মানব পাণ্ডবী ও মোহমুক্ত হয়।

সদা তু সর্বভূতেষু দাক্ষিণ্যমিব স্থিতম্।

প্রতিচক্ষীত মাং লোক জহ্যাত্তোহবা কখালম্।

—ভাগবত ৩:১৩:১

শ্রীতি-ভক্তি দ্বারা দিবাকান লাভ না হইলে ভগবদাকারা মনোবৃত্তি সর্বভূতে ঈশ্বরবৃত্তিব উদয় হয় না, এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না শিশুপাল মোহপ্রভাবেই সর্বভূতেষু শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই। সেই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে, বলিয়াই মনে করি। শ্রীভগবানের এই মোহাচ্ছিকা লীলার কথা শ্রবণ করিয়াই মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব মন ও ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের অতীত মোহপ্রদানকারী শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য বদ্বিরাছেন—

যো মোহরতি ভূতানি য়েহপাশাশ্রমবন্ধনৈঃ।

সর্গস্ত রক্ষণার্থায় তথৈব মোহাশ্রমে নমঃ ॥

—মহাভারত

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেবের শ্রীভগবান শ্রীতি, ভক্তি ও রতি ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে তাঁহার স্তব করিয়াছেন।

ভক্তবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, যে সমস্ত মানবের অন্তঃকরণ জাগতিক অনিত্য সূত্রে পূর্ণ, তাহাদের অন্তঃকরণ কখনও শ্রীবিষ্ণুর চরণে অবনমিত হয় না। অস্ত্রের ইচ্ছা, উপদেশ তাহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর চরণযুগ্মী করিতে পারে না। এই সঙ্গীত দুর্ভাগাই নরকায়িতে প্রবলিত হয়। কারণ অনিত্য সূত্রভোগে মজিয়া তাহারা ঈশ্বরবিমুখ, গোবিন্দর মত তাহারা গতাভাগতিকভাবে বোম্বধন করিয়া দিনযাপন করে। তাহারা জানে না শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র গতি—পরম কল্যাণবস্ত। তাহাদের অন্তঃকরণ কুচিন্তা, কুসংস্কর্ষ পূর্ণ থাকে। জাগতিক কর্মকেই তাহারা শ্রেষ্ঠকর্ম বলিয়াই জ্ঞান করে। অন্ধের মত তাহারা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অমুসরণ—অহুষ্ঠান করে।

—ভাগবত ৭:৫:৩০—৩১

প্রহ্লাদ বর্ণিত ঈশ্বরবিমুখ মানবের অবস্থা শিশুপালের ছিল, এই জন্তই তিনি নিত্যবস্ত বিবৃত হইয়া অনিত্যে মজিয়া ছিলেন।

শ্রীভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত ও মোহাচ্ছ ছিলেন বলিয়া শ্রীভগবানকে কষ্টকি সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—ত্রিকালেই আমি আছি; সকল জীবের অবস্থার কথাও পরিজ্ঞাত আছি। আমি মাগার আশ্রয়। আমি মায়াভীত বলিয়া মায়া আমাকে ল্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু আমার মাগার দ্বারা ভাবসকল এরূপ আচ্ছন্ন যে, তাহারা আমার স্বরূপ বৃত্তিতে পারে না। এইজন্যই আমার শ্রবণ করে না, আমার ভজনা করে না। আমাকে দেখে বলিয়া জ্ঞান বা উপলব্ধি করিতে পারে না।

বেদাং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যানি চ ভূতানি যাং তু বেদ ন কশ্চন ॥

—গীতা ৭:২৬

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, আমি অস্তিত্ব প্রজ্ঞাবিলাস যুক্তি স্বরূপ অর্ঘটন ঘটনা পটীয়া মায়াসমাবৃত্ত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নাই। মোহমুক্ত মানব আমাকে আজ্ঞা ও অবার বলিয়া অবগত হইতে পারে না। আর হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালস্থিত স্থাবর উদ্ভব ভূতসকল জানি, কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।

—গীতা ৭:২৫—২৬

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী অলৌকিকী আমার মায়া নিশ্চয়ই হস্তরা তথাপি যাহারা অলৌকিকী ভক্তিতে আমাকেই ভজনা করে তাহারা এই মায়াতে কৃতজ্ঞম করে।

দৈবী হোবা গুণময়ী মম মায়া দুরতারা।

মামেব যে গুণগোস্ত্রা মায়ামেতাং তদ্রাজ্যতে ॥

—গীতা ৭:১৪

ভক্ত ও সখা অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া নিখিল জীবের হিতার্থে শ্রীভগবান এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তিনি লীলাময়, রূপাময়। নিখিল বিশ্বের জীবকে রূপা কারবার ভক্তই দেহধারণ করিয়া সাধারণ দেহীয় মত মর্ত্যধামে অবতীর্ণ। তিনি এই বলিয়াই বলিয়াছেন, আমি সং, চিত্ত, আনন্দস্বরূপ। আমি জ্ঞ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থে মায়াবদ্ধিত দেহ ধারণ করিয়া বেদবিহিত ধর্মের মর্ধ্যদা রক্ষা করে। আমার ভদ্র, বশ ও মরণ সমস্তই অলৌকিক।

ভক্তোহপি সর্বব্যাসায়া ভূতানামিষ্যোহপি সন্।

প্রতিং স্বামিষ্ঠিষ্ঠা স্তবাম্যাস্তামরায়া। —গীতা ৪:৬

জয় কর্ম চ মে দিব্যমেব যো বৈশ্বতন্তব্যতঃ। —গীতা ৪:৩

ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা। সকল হুমুয়াই শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সর্বদাসার মুক্ত হইয়া দিবাকান লাভ করিয়া তাহার শ্রীতিকামনার অনন্তচিত্ত তাহাতে মনে শ্রীতি-ভক্তি অর্পণ করে, তাহা হইলেই তিনি প্রীত হইবেন। সত্যাত্ম্যপন্থ মানব তাঁহার অমুগ্রহই অর্হেতুকী শ্রীতিলাভ করিয়া শ্রীতিবদ্ধ হউক।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হরুমান আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞান দ্বারা লীলাময়ের লীলায়ত্ত অমুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, তুমি দেব কিংবা দৈত্যই হও অথবা মানব বা মানবের হও অনন্তচিত্তে শ্রীভগবানে রামচন্দ্রে ভজনা কর। তিনিই শ্রীহরি—দেহীরূপে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ। তিনি সেই শ্রীহরি—বিনি আত্মাধ্যাত্মিক যুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

—ভাগবত ৫:১৩:৮

ভীষ্মরাজ প্রস্থান বলিয়াছেন, দান, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্মাস্ত্রাণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রীত হন না। তিনি একমাত্র অনন্ধ্যা প্রীতি-ভক্তি দ্বারা প্রীত হন। পরম প্রীতিময়ী ভক্তি ব্যতীত সমস্তই বৃথা।

—ভাগবত ৭.৭।৫২।

পুনশ্চ তিনিই বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বিজ্ঞা, শক্তি, মান, বশ, যোগানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শক্তি দ্বারা শ্রীচরিত্র প্রীত হন না। গজেন্দ্রের মত একমাত্র অনন্ধ্যাভক্তি দ্বারা প্রীত হন।

আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী তিনিই গুণ ও দোষ, নীতি-অনীতি অর্থাৎ পরা-অপরা তাবদ্বিষয়ে জ্ঞানী, তিনিই সকল প্রকার ভোগাবস্থাতে নিম্পৃহ, তিনিই মুক্তিকাম ও অদ্বৈতবাদী সহকারে কর্তব্যকর অর্থাৎ শাস্ত্রবাহিত দমনালন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রবিশুদ্ধ দোষজ্ঞো ভোগ্যমাত্রো বিনম্পৃহঃ।

নিত্যানিত্য পদার্থ জ্ঞা মুক্তিকামো দুঃখহতঃ।

—সর্ববোধান্ত শিদ্ধান্ত সাব সংগ্রহ

তুর্ভাগা শিশুপাল শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-ভক্তিশূন্য ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ঘৃণা কটুজি সস্তব হইয়াছে।

নৈয়মিকচাৰ্য গোতম বলিয়াছেন—

আরাধ্যে জনান ভক্তিঃ।

আরাধ্যকৃষ্ণ জ্ঞানের নাম ভক্তি। অর্থাৎ কাহারও প্রতি গোঁরব প্রীতিসূচক ক্রিয়া বিশেষের নামই আরাধনা অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা বলিয়া জ্ঞান করার নামই ভক্তি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যাহারা সর্বদা আমাকে পূজ্যোত্তম জ্ঞান করিয়া আমাতে নিত্যযুক্ত, এবং আমার প্রতিই ভক্তিমান, সেই সকল জ্ঞানী-ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর যেমন প্রিয়—জ্ঞানীও তেমনি আমার প্রিয়। এক্ষণে মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার প্রিয়—

তেষাং জ্ঞানি নিত্যযুক্ত একভক্তির্দিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্তমঃ স চ মম প্রিয়ঃ।

—গীতা ৭.১৭

একাদশমো মৎপরমো ভক্ত্যন্তঃপ্রীতি যো প্রিয়ঃ

—গীতা ১২।২০

প্রীতিরসপূর্ণাভিপ্রিয় শ্রীনাথ ভক্তের নিকট প্রীতি-ভক্তিই কামনা করেন। যে সকল ভক্ত প্রীতির সহিত তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রিয়। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা উদ্ধৃৎক বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্রোক্ত ধ্যান ধারণা সমাধি চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, সাধ্যাযোগ বজ্রাদি শাস্ত্র-বিহিত মানা সংকর্ষাস্ত্রাণ দ্বারা কর্মযোগ। মহর্ষি কপিল নিজ জ্ঞানী দেবহুতিকে বলিয়াছেন, অয়ি জননী। সাধুভক্তগণ আমার প্রেম বদন ও প্রেমপূর্ণ নয়নসমবিত্ত নয়নাভিরাব বরপ্রদ দিব্য কলেবর দর্শন করিয়া আমার সহিত তাহাদের অন্তরের কথা বলিয়া পরমাপ্রীতি লাভ করিয়া থাকে—

পঞ্চস্থিতে ম রুচির্যাব সন্তঃ

প্রেমবজ্রকরণলোচনানি।

রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি

সাকং বাচং স্পৃহণীয়ং বদন্তি।

—ভাগবত ৬.২৫ ও ৬

পূজনীয় জ্ঞান করিয়া অবাধ্যের প্রীতি কামনার যে প্রীতি অর্পিত হয় উচ্চাভি ভক্তি। এই প্রীতিই পরম প্রীতি—ভগবদ-প্রীতি উচ্চাভি নামান্তর ভক্তি। এই প্রীতি ভক্তির অঙ্গসারিণী। পদ্মপূরণ বলেন, পূজাবক্তি বা আরাধ্যাব্যক্তিকা বৃদ্ধি ভক্তি। উচ্চা প্রীতিরসপূর্ণ।

পরমাপ্রীতি—ভগবদ-প্রীতির উদয় হইলে ভক্ত-হৃদয় দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে যথাক্রমে উদারের নাম—

১। সঙ্গীয়া বিবেশ।

২। অভিমান বিবেশ।

প্রথমটি ভক্তহৃদয় সর্ব সঙ্কারণমুক্ত করিয়া ভক্তকে উচ্চতর ভক্তিবাদনে শিক্ত করে। ভক্তিসাধন সিদ্ধ হইলেই ভক্ত নির্বল, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূত প্রীতিমান হয়।

কবি বলিয়াছেন, যাহারা অচ্যুতের পদ শান বরে, মিত্রা তাঁহাকে শ্রবণ করে, তাহারাও ভক্তিবৈরাগ্যে এক দিব্যজ্ঞান লাভ করে। এই ভাবেই তাহারা পরমা শান্তি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকে।

—ভাগবত ১১।২।৪৩

গোদামীপ্রবর স্তম্ভও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন, শ্রীভগবান বাসুদেব প্রারোক্ত ভক্তিবৈরাগ্যে—

বিবর-বৈরাগ্যে অষ্টৈবতু দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন করে।

—ভাগবত ১।২.৭

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব সর্ববিষয় সাক্ষারমুক্ত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত ছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার শ্রীভগবান প্রীতি ছিল। সেই কারণেই তিনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শিশুপাল পরাজনভক্তি-ভক্তিশূন্য ছিলেন বলিয়া অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভীষ্মদেবের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই।—এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ভক্ত যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তেমনি উহার দ্বারা ভক্তিলাভ করেন।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ভক্তিলাভ করিয়া মানব ঈশ্বরসিদ্ধিলাভ করে। অমৃত ও তৃপ্তিলাভ করে। শুধু ইহাই নহে, ভক্তিলাভ করিলে মানুষ অনিত্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষাবাহিত, শোকতাপশূন্য, অহিংস, অনিত্যবস্তুর যেমন অমৃতরস, তেমনি তদ্বিষয়ে অমৃতসাহী হয়। ভক্তি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলে মামব উন্নত, শুদ্ধ, আপনাকে আপনি মাতিয়া পরমানন্দে বিভোর হয়।

ও বঙ্গবন্ধা পুমান, সিদ্ধো ভবতামৃতো ভবতি তুণ্ডো ভবতি।

—ভক্তিসূত্রং ১ম অঙ্ক, ৪ শ্লোক।

ও যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ বজ্জতি, ন শোচতি ন বেদতি, ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

—ঐ ১ম অঙ্ক, ৫ শ্লোক।

ও বজ্জজ্ঞাবা মত্তো ভবতি স্তম্বো ভবত্যম্বা রামো ভবতি।

—ঐ ১ম অঙ্ক, ৬ শ্লোক।

পরমভাগবত ভাষ্যকার আচার্য স্বামী শ্রীধর বলেন, পরমা প্রীতি-ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়।

কৃষ্ণভক্তের বস্ত্রন ব্রহ্মজ্ঞানই রূপান্তে।

—গীতাভাষ্য

কারণ প্রীতি-ভক্তি স্পর্শমণি, উহা বাহ্য স্পর্শ করে তাহাকেই রূপান্তরিত করে—দুর্বল করে।

## ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রিয়সখা উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব ! প্রেমালিত অগ্নি যেমন স্পর্শমাত্র কাষ্ঠসমূহ দগ্ধ করিয়া ভস্ম করে, তদ্রূপ আঘাতে অন্যত্রা একপ্রাণী ভক্তি সঞ্চারিত হইলেই মানবের পূরণশীল নিঃশেষ করে।

যথাগ্নিঃ স্পৃশমুহুর্ভক্তিঃ কবোতাগ্ন্যাসি ভস্মদশং ।

তথামধিযয়া ভক্তিঃ কুরু বৈনাঃসি কৃৎসনশঃ ।

—ভাগবত ১১।১৪।১৮

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে ভক্তের এই অবস্থার কথা প্রিয়সখা উদ্ধবকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার মর্মকথা এইরূপ, যিনি ঐশ্বর্যবান হইয়াও সমস্ত ভূতজগৎকে আপন অন্তরে সত্তার মধ্যে বিরাট করিয়াছেন সেই পরমপুরুষ একমাত্র ভক্তি দ্বারাই চড়া—  
—কিছুতেই নচে । ১২

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মানব যখন ব্রহ্মরূপ হয়, তখন দেহাভিন্নমন-  
—হইয়া প্রসন্নচিত্ত হয়। যিনি ঐ বস্তুর জ্ঞান আর শোকগ্রস্ত হয় না।  
—তার পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে স্থান দেয় না। তখন ভাব  
—নির্মলগ্ধ এবং সর্বভূত সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত  
—ইলেই মনুষ্য আমার প্রীতি-কামনার আমাকে প্রীতি-ভক্তি নিবেদন  
—করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৫৪

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনুজ্ঞা ।

যত্নাত্ত্বঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্মহিমান ততম্ ॥

—গীতা ৮।১২

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নঃস্থান শোচতি কঙ্কসতি ।

সমঃ সর্ববু ভূতবু মন্তস্তি লভতে পরাম ॥

—গীতা ১৮।৫৪

পূরণ শব্দেও ভক্তের এই অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। সন্ত-  
—গামী বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের এমন দয়াকর যে, সমস্ত মন আত্মারাম,  
—হাদিগের অবিভাগ হইয়া হইয়াছে—আত্মমুক্ত হইয়াছে তাহারাই  
—শ্রীভগবানে অর্হেতুকী ভক্তি করে, —

আত্মারামান্দ মুনয়ো নির্গ্রস্তা পুণ্যকরমে ।

কুর্বন্ত্যর্হেতুকীঃ ভক্তির্মপুত্ৰগণো হরিঃ ।

—ভাগবত ১।৭।১০

ভক্ত নানক শিখভক্তিগ্রন্থে ভক্তের এই মানসিক অবস্থার যে  
—বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

স্থির—স্থির—চিন্তা স্থির হইল।

যন এবং গৃহ সমান হইয়া গিয়াছে।

আমার অন্তরে সেই প্রিয় বিরাজমান।

বাহিরেও আমি তাঁহাকেই অনেক আঁকড়েই দেখিতেছি।

আমি রাজ-যোগ অবলম্বন করিয়াছি।

নানক বলিতেছেন, হে সখী, আমি সংসারে

আছি, কিন্তু সংসারে নহি।

খির খির, চিত খির হী।

যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ তাহা উৎসর্গ করিয়া পরিত্যক্ত করিয়া, যাহা সুন্দর,  
—নির্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সত্তার পূজ্যের করিতে হইবে; এবং সেই  
—সত্তার কুহুমে আমাদের জননী ব্রহ্মবী ক অলঙ্কৃত করিতে হইবে।

বন গৃহ সমসরি হী।

অন্তর এক শিব হী।

বাহর অনেক ধরি হী।

কহ নানক লোগ অলোগিরি সখী।

‘সুখমনি—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত। পৃষ্ঠ ১০

স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পরম ভাগবত গোপীমহাপ্রবর স্তুত  
—এবং ভক্ত নানক ভক্তিগানের পর ভক্তের যে অবস্থার কথা বলিয়াছেন,  
—মহাজ্ঞানী ভীষ্মের সর্বসংস্কারমুক্ত হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া  
—ছিলেন বলিয়াই, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নতি জানাইয়া প্রণাম  
—করিয়াছেন। —

নমো ব্রহ্মণ দেবায় গোত্রাকংগিতায় চ ।

ভগবিতায় কৃকার গোবিন্দায় নমোনমঃ ।

শিশুপাল সংস্কার, অবিভাগ গ্রন্থমুক্ত ছিলেন না, সেই কারণেই  
—শ্রীভগবানের অমুগ্রহ-ভক্তিতে বঞ্চিত ছিলেন। এই কারণেই  
—তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কটুভাষ্য তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

ভক্তিতে হইয়া প্রভাপতি ব্রহ্মা আদিপুরুষ গোবিন্দের স্তবে  
—বলিয়াছেন—আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজন্য করি। যে সমস্ত  
—ভক্ত আদিপুরুষ গোবিন্দকে কোথাপি যে কোন ভাব অবলম্বন-  
—পূর্বক চিন্তা করিয়াছেন, তাহার তাঁহার তাদৃশ তহুই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ  
—ভক্তগণ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোণভাব, কামভাব, সখ্যভাব, ভীতিভাব,  
—বাৎসল্যভাব, মোহভাব, গুরুভবের প্রাতি গৌরবভাব এবং সেবা-  
—ভাব—যে কোন ভাবে চিন্তা করেন, ভক্তাদীন ভগবান সেই সমস্ত  
—ভক্তকে তাহাদিগের ভাবানুসারে স্বীয় ভাবময় সেই প্রদান করিয়া  
—কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

যং ক্রোধকাম সহ প্রণয়াদি ভীতি

বাৎসল্য মোহ গুরু গৌরব সেবাভাৱৈঃ ।

সংকল্পা তস্ত সদ্দীনী তত্ত্বমাপুরেতে

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।

—ব্রহ্ম সাহিত্য

শিশুপাল প্রীতি-ভক্তি শুল্ক হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোধভাবে কটুক্তি  
—করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীভগবান শিশুপালকে দুর্ভাব পদদান  
—করিতে কৃপণতা করেন নাই। তিনি শত্রু শিশুপালেরও মোহন  
—দর্শন দিয়া মুক্তিদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখ বলিয়াছেন,  
—আমি সকল প্রাণীতেই একরূপ কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই।  
—অজ্ঞান মোহাজন শিশুপাল বিরূপে ভীষ্মমুক্ত হইয়া শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের  
—শ্রীচরণাশ্রিত হয়। শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ বৈরবশত  
—ভোজন এবং উপবেশনকালে গতিবিলাস ও বিলাকনাদি যোগে  
—তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তলীর গতি প্রাপ্ত হন, তখন  
—তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ তাহাতে নিঃস্তর অধুস্তর হয়—এই ভাব  
—দ্বারা শিশুপালাদি শ্রীভগবানের অমুগ্রহ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সমদৃষ্টি—  
—সম্পন্ন শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক নিজচরণে আশ্রয় দেন।

# অচ্যুত অমিয় শ্রীমদ্রামায়ণ অচ্যুত অমিয়

৭২

বন পথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জগদানন্দ বারাগসী এল। মিলল তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। তাদের কাছে বললে সব নীলাচলের কথা।

সেখান থেকে চলে এল মথুরায়। মিলল সনাতনের সঙ্গে। এ বলে, আমার কী সুখ, তোমাকে পেলাম। ও বলে, আমার কী সুখ, তুমি এলে।

সনাতনের গোফাতেই জগদানন্দ আশ্রয় পেল। সনাতন মাধুকরী করে তাই গোফায় রান্নার ব্যবস্থা নেই। জগদানন্দ রান্নার ব্যবস্থা করল। একদিন সনাতনকেই নিমন্ত্রণ করল ভিক্ষে নিতে।

রান্না করছে জগদানন্দ, দোরগোড়ায় সনাতন এসে বসল। মাথায় পেরুয়া বস্ত্র বাঁধা।

ঐ পেরুয়া বুঝি মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র! জগদানন্দের প্রেমাবেশ হল। তবু জিজ্ঞেস করল, ‘এ বসন তুমি কোথায় পেলে?’

‘মুকুন্দ সন্ন্যাসী নামে এখানে যে সন্ন্যাসী আছে সে দিয়েছে।’

সহসা স্থান-কাল-পাত্রের ভুল হয়ে গেল, জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি নিয়ে তেড়ে এল সনাতনকে: ‘তুমি আরেক সন্ন্যাসীর কাপড় মাথায় বেঁধেছ?’

লজ্জায় স্নান হয়ে গেল সনাতন—বুখাই সে জগদানন্দের প্রভুপ্রীতি পরীক্ষা করতে এসেছে। অতিথি-আতিথ্য সে পলকে বিস্মৃত হল, যাকে নিমন্ত্রণ করেছে তারই প্রতি মারমুখো!

‘মহাপ্রভুর প্রধান পার্শ্ব হয়ে অথ সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি শিরোধার্য করেছ?’ জগদানন্দ উত্তত হাঁড়ি

আবার উত্তরের উপরই নামিয়ে রাখল: ‘এ দেখে কে সহ্য করবে?’

সনাতন বললে, ‘ধন্য তুমি। তোমার চৈতন্যনিষ্ঠাই প্রবলতম। পণ্ডিত, তুমিই মহাপ্রভুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছ। এই ভালবাসা প্রত্যক্ষ করবার জায়গাই পর-বস্ত্র মাথায় বেঁধেছিলাম। যে বৈষ্ণব আশ্রমাতীত নিক্কিঞ্চন বেশ ধারণ করবে তার গৈরিকে কী প্রয়োজন। এবস্ত্র আমি কোনো পরদেশীকে দিয়ে দেব।’

রন্ধনশেষে অন্ন চৈতন্যকে সমর্পণ করল। দুই ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে চৈতন্যকথায় নিমগ্ন হল। শেষে চৈতন্যবিরহছুখে কাঁদতে বসল ছুঁজনে।

দুই মাস বৃন্দাবনে থেকে জগদানন্দ ফিরে চলল। বললে, ‘প্রভু বলেছেন শিগগির আসছেন তিনি, তুমি তাঁর জন্মে অপেক্ষা কোরো।’

প্রভুর জন্মে কিছু জিনিস দিয়ে দিল সনাতন। রাসস্থলার বালি, গোবর্ধনের পাথর, পাকা গুকনো পিলুফল আর গুজামালা। দাদশাদিত্য টিলায় পুরানো একটা মঠ পেল তাই প্রভুর জন্মে সংস্কার করে রাখল। মঠের সামনে নতাপাতা দিয়ে ছোট একটা ছাউনি বেঁধে তাতেই বাস করতে লাগল।

জগদানন্দ প্রভুর চরণবন্দনা করে দাঁড়াল। সনাতনের কুশল জানাল, বললে, ‘আপনাকে এই সব দিয়েছেন।’

প্রভু সব রাখলেন, শুধু পিলুফল সকলকে বিতরণ করে দিলেন। এ ফল আঁটিগুঁক গিলে খেতে হয়। যারা তা না জেনে চিবিয়ে খেতে গেল তাদেরই মুখের ছাল গেল। বাঙালিরা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাই পিলু খেতে তাদেরই বেশি দুর্ভোগ।



একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, প্রভু দূর হতে।  
গোবিন্দের গান শুনেতে পেলেন। গুজরীরাগে  
ধুরকঠে একে গায়? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু  
জ্ঞান করবারও অবকাশ মিলল না তখনই হয়ে  
টলেন গানের উদ্দেশে। নিজের কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ  
খিরাক্ত হল তবু প্রভুর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের  
দান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু।

গোবিন্দ প্রভুকে ধরে ফেলল। বললে, 'প্রভু  
এ স্ত্রীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।'  
দেবদাসী! প্রভু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।  
তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

'গোবিন্দ, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচালে।  
স্ত্রীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।'

'আমি বাঁচাবার কে? তোমাকে জগন্নাথ  
বাঁচিয়েছেন।' বললে গোবিন্দ।

'শোনো সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে।'  
প্রভু বললেন, 'আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।'

'সপ্তাহ জীবিতাবধি।' পরমাত্মার আর সাত দিন  
মাত্র বাকি আছে, অন্তত এই সামান্য সাত দিন  
হরিকথার শ্রবণে-মননে কখনে-কোঁতনে অতিবাহিত  
করো। সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি বিরাট পুরুষের  
উপাসনা করো, অতঃপর আসক্তিতেই আত্মপাত,  
অধঃপাত।

যদি এক মুহূর্তও বাকি থেকে থাকে তা'হলে তাও  
অনেক।

তখন মিশ্রের ছেলে রঘুনাথ ভট্টাচার্য প্রভুদর্শনে  
যাত্রা করল কাশী থেকে। সঙ্গে সেবক রামদাস  
বিশ্বাস। রামদাস শাস্ত্রপ্রবীণ, রঘুনাথ রামচন্দ্রের  
উপাসক। অষ্টপ্রহর রামনাম জপ করছে। তার  
উপর আবার কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক।

অথচ রঘুনাথের কালি মাথায় বহন করে চলেছে।  
শুধু তাই নয় বিশ্বাসের সময় রঘুনাথের পা টিপে দিচ্ছে।  
'দেখ তুমি ধনী, পণ্ডিত, মহাভাগবত, তুমি কেন  
আমার সেবা করছ?' রঘুনাথ আপত্তি করল: 'তুমি  
আমার সাথি, সুখে আমার সঙ্গে চলো।'

রামদাস বললে, 'কী যে বলো তার ঠিক নেই।  
সেবা করাই আমার স্বধর্ম। তুমি সন্ধ্যা কোরো না,  
আমাকে যদি আনন্দিত দেখতে চাও তো আমাকে সেবা  
করতে দাও।'

রঘুনাথকে চিনতে পারলেন প্রভু। কাশীতে  
তখন মিশ্রের ধরে যখন আহার করতেন তখন তাঁকে  
কত সেবা করেছে রঘুনাথ।

গোবিন্দকে দিয়ে আলাদা বাসা পাইয়ে দিলেন।  
মিলিয়ে দিলেন ভক্তদের সঙ্গে। শুনিয়ে রান্না করতে  
পারে রঘুনাথ, প্রভুকে প্রায়ই খাওয়াতে লাগল। আর  
তার রান্না অমৃতময়। রঘুনাথ জানে সে অমৃতময়তা  
শুধু প্রভু খাবেন বলে।

কিন্তু রামদাসের প্রতি প্রভু বদান্ত নন কেন?  
যেহেতু রামদাস ভক্তিকামী নয়, মুক্তিকামী।  
তা'ছাড়া তার মনে বিচারভার অহঙ্কার। সর্বচিত্তজ্ঞাতা  
প্রভুর আর জানতে কিছু বাকি নেই।

কী আর করবে সে? সে গোপীনাথ পট্টনায়কের  
ছেলেদের কাব্যপ্রকাশ পড়াতে লাগল।

রঘুনাথ আট মাস থাকল নীলাচলে। বিদায়  
নেবার সময় প্রভু বললেন, 'শোনো, বিয়ে কোরো না।  
বৃদ্ধ মা-বাপের সেবা করো আর কোন বৈষ্ণবের  
কাছে ভাগবতের পাঠ নাও। বৈষ্ণব ছাড়া আর কে  
বোঝাবে ভাগবতের মর্ম? আর—আর একবার  
নীলাচলে এসো।'

নিজের কণ্ঠমালা প্রভু রঘুনাথকে পরিয়ে দিলেন।  
প্রেমগদগদনেত্রে কাদতে লাগল রঘুনাথ।

গৃহে চার বছর থেকে পিতা-মাতার সেবা করল  
রঘুনাথ। বৈষ্ণব-পণ্ডিতের কাছে ভাগবত পড়ল।  
তারপর পিতা-মাতার দেহান্ত হলে উদাসীন হয়ে আবার  
নীলাচলে ফিরে এল প্রভুর কাছে।

'আমি মায়ের একমাত্র পুত্র ছিলাম।' নারদ  
বলছে ব্যাসকে, 'আমার মা অতঃগৃহে দাসীবৃত্তি  
করতেন। তিনি ছাড়া আমার আর গতি নেই দেখে  
আমাকে তিনি প্রাণপণে স্নেহ করতেন, কিন্তু অশক্ত  
ও পরাধীন বলে আমার মঙ্গলহেতু কিছুই করতে  
পারতেন না। আমার বয়েস তখন পাঁচ, দিক-দেশ-  
কাল কোনো কিছুতেই আমার জ্ঞান বৃদ্ধি ছিল না।  
কেবল ভাবতাম কবে এই নিখিল মাতৃস্নেহ থেকে  
পরিত্রাণ পাব?'

পো-দোহন করতে মা বাড়ির বাইরে গিয়েছেন,  
দৈবক্রমে পথিমধ্যে এক সাপের গায়ে পদক্ষেপ করে  
বসলেন। কালপ্রেরিত সর্প তখনই মাকে দংশন করল।  
মা প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু, বলব কী, তাতে আমার,

অণুমাত্র হুখ হল না। বরং মনে হল ভক্তের শুভাকাজক্ষী ভগবান এই ছলে আমার প্রতি বোধ হয় কৃপা প্রকাশ করলেন।

আমি ঘর ছেড়ে উত্তরে যাত্রা করলাম। অনেক জনপদ নগর গ্রাম গোষ্ঠ পার হলাম। অনেক গিরি নদী উপত্যকা। শেষে এক বিস্তারিত অটবীতে প্রবেশ করলাম। শ্রান্ত ও অবসন্ন, ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর, বসলাম বৃক্ষমূলে। ঋষিদের মুখে শুনেছিলাম পরমাত্মা হৃদয়ে বাস করেন, এখন এই নিস্তর্র অবসরে তাঁকে চিন্তা করতে লাগলাম। ভক্তিবিশ্বলচিন্তে চিন্তা করতে-করতে উৎকণ্ঠা জাগল আর উৎকণ্ঠায় জল এল চোখে। কল্পিত নারায়ণ আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হলেন। হৃবিষহ প্রেমে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল, কিন্তু কই, সেই একান্তবাহিত ভগবৎরূপ আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আবার মনঃসংযোগ করলাম। প্রাণপণ যত্নে সন্ধান করতে লাগলাম সেই অনির্বচনীয়কে। আর তার দেখা পেলাম না। তখন বাস্তবের অগোচর গভীর স্নিগ্ধবাক্যে আমাকে সাস্থনা দেবার জন্তে বললেন, ইহজন্মে তোমাকে আর দেখা দেব না। যাদের কাম দক্ষ হয় নি তারা আমার দর্শন পায় না। তবে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অমুরক্ত বলে তোমাকে একবার দেখা দিয়েছি। দীর্ঘকাল সাধুদের সেবা করে তোমার বুদ্ধি আমাতেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কর, তা'হলেই এই নিরানন্দ লোক পরিত্যাগ করে আমার পার্শ্বচর হতে পারবে। বুদ্ধি একবার আমাতে বদ্ধ হলে তার আর বিচ্ছেদ হবে না। যে আমাকে স্মরণ করে আমার অমুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই বলে বেদপ্রসিদ্ধ অশরীরী হরি স্তব্ধ হলেন।

সেই থেকে সমস্ত লজ্জা পরিহার করে অনন্ত-পুরুষের ছর্বাধ নাম গান ও চরিত্র স্মরণ করে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম। নিলিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে কৃষ্ণচিন্তার কালাতিপাত করছি, আমার মৃত্যুকাল তড়িদ্ভালার মত সহসা আবির্ভূত হল। ভৌতিক দেহের অবসানে ভগবানের পার্শ্বচরযোগ্য দেহ পেলাম। পরে কল্লাবসানে শ্রীহরি বিশ্বসংহার করে সমুদ্রজলে শয়ন করলে আমি নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলাম। তারপর সহস্র যুগ অতীত হল।

ভগবান সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে নিরোখিত হলেন, মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আমিও উৎপন্ন হলাম।

তদবধি অথও ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করে আমি মহা-বিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকের অন্তর ও বাহ্য সর্বস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দূর-নিকট কোথাও যেতে আমার বাধা নেই, স্বরূপ ব্রহ্মে বিভূষিত এই দেবদত্ত বীণায় মূর্ছনা তুলে হরিগুণগান করে আমি সর্বত্র বিচরণ করি। সেই গান শুনে হরি আহুতের মত চলে এসে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। বিষয়ভোগেচ্ছায় নিপীড়িত অশক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হরিকথাকীর্তনই ভবসিদ্ধিপারের তরলীষরূপ। যে ব্যক্তি কামে-লোভে আসক্ত যোগপথ অবলম্বন করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না, কিন্তু হরিসেবা করলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। আমার আর কী কাজ! বীণাস্বরে হরিগুণগান করে নিজে আনন্দিত হয়ে মোহপীড়িত ত্রিলোককে আনন্দিত করছি।

গৃহহারা রঘুনাথ প্রভুর সঙ্গে আবার আট মাস কাটাল। প্রভু বললেন, 'আদেশ করছি, বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গে থাকো, ভাগবত পড়ো আর অমুরক্ষণ কৃষ্ণনাম নাও।' রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন, জগন্নাথের প্রসাদী চোদহাত লম্বা যে তুলসীর মালা পেয়েছিলেন আর যে পানের খিলি, তা তাকে উপহার দিলেন। ইষ্ট-ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে রইল রঘুনাথ।

বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথ রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবত। প্রেমে অষ্ট সাত্বিকের উদয় হচ্ছে, অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন ও কণ্ঠ অধরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, পড়ে উঠতে পাচ্ছে না। তারপর যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আসছে, তখন কী যে দেখছে কী যে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বোঝবার দরকারই বা কী! গোবিন্দচরণে আত্ম-সমর্পণই একমাত্র বস্তু।

এক ধনী-শিষ্যকে বলে রঘুনাথ ভট্ট গোবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে কুণ্ডলে বংশীতে। গ্রাম্যবাতী বা বৈষ্ণবিক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না, কৃষ্ণকথা পূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কোনো বৈষ্ণবের নিন্দাও তার কানে আসেনা। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কণ্ঠে ধরে থাকে।

হে কেশব! হে নাথ! ত্রীকৃষ্ণকে বলছে উদ্ধব, আমি কৃষ্ণের জন্তেও তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করতে সাহস করি না, আমাকেও তোমার স্বধামে নিয়ে চলে। তোমার লীলাচরিত্রের রস-আশ্বাদন মানুষের পক্ষে পরমমঙ্গল, তার কর্ণপীযুষ, আর এর রস পেলে মানুষের আর অগ্র কামনা থাকে না। আর আমরা যারা তোমার ভক্ত, শয়নে আসনে অশনে স্নানে গানে তোমার সেবা করেছি প্রিয়তা করেছি, আমরা তোমাকে কি করে ত্যাগ করে থাকব?

এদিকে প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিশ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীদের যে দশা হয়েছিল সেই দশা। উদ্ধবকে দেখে রাধা যেমন বিলাপ করেছিল তেমনি দিব্যান্ধাদ প্রলাপ করছেন।

হে ধূর্তের বন্ধু মধুকর, আমাদের চরণস্পর্শ করো না। তোমার মুখে সপত্নীর কূচমণ্ডলে বিলুপ্ত মালার কুহুম রয়েছে, মধুপতি সেই সব মানিনীরই প্রসাদ বহন করুন। আমাদের প্রশ্ন করে কী হবে? ছি-ছি, এ কি বলবার কথা? তোমার মত হুমেধা যেমন ভুক্ত পুষ্প ত্যাগ করে তেমনি। তিনি একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধরমুখা পান করিয়ে আমাদের ত্যাগ করেছেন। পদ্মা কেন তাঁর পাদপদ্ম সেবা করছে? নিশ্চয়ই সেই উত্তমল্লোকের মিথ্যা কথায় তাঁর চিত্ত অপহৃত হয়েছে। তাঁর গান আমাদের আর শুনিয়ে লাভ কী? আমরা তাঁর দারা নই। যাত্রী সম্প্রতি তাঁর সখী তাদের কাছে গিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ গান করো, তারাই তাঁর প্রিয়া, তাঁকে আলিঙ্গন করেই তাদের কুচতাপ শান্ত হয়েছে, তারাই তোমাকে অভীষ্ট পাইয়ে দেবে। যিনি দ্বৈতের প্রতি অহুঙ্কার প্রকাশ করেন, উত্তমল্লোক আত্মা তাকেই দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর মত কপটচরী আর কে আছে? তুমি তো তাঁরই দূত, তাঁরই মতো চাটুকার। তোমার গুণগুঞ্জনে আমরা আর আকৃষ্ট নই।

এমনিতরো বিলাপ প্রেমবিবশ ব্যাকুলতা।

একদিন প্রভু স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ রাসলীলা করছেন। মণ্ডলাকারে গোপীরা নৃত্য করছে আর মণ্ডলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত।

এখানে এই স্বপ্নে প্রভু না-কৃষ্ণ না-রাধা, তিনি এখানে দর্শক। তিনি এখানে রাধার স্বয়ংরূপে নেই

তিনি এখানে রাধার সখীরূপে আবিষ্টি। তাই তিনি দর্শক, রাসলীলার নায়ক-নায়িকা নন।

প্রভুর ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে দেখে গোবিন্দ জাগিয়ে দিল।

নিদ্রায় মনে হয়েছিল রাসলীলাতে উপস্থিত হয়ে বাস্তব রাসলীলা দেখছেন আর এখন জেগে উঠে জ্ঞান হল স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ। স্বপ্ন কেন সত্য হল না। তার জন্তে বিষণ্ণ হয়ে রইলেন।

অভ্যাসের বশে নিত্যকৃত্য সমাপন করলেন, গেলেন জগন্নাথদর্শনে।

আজ কেন কে জানে মন্দিরে প্রাণ ভিড়।

প্রভু যথারীতি গুরুভৃত্তান্তের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর দর্শন করেন জগন্নাথ। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া জ্বালোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক উকি মারছে কিন্তু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উঁচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগন্নাথের নাগাল পাচ্ছে না। অন্তোপায় জ্বালোক ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভুর কাঁধে পায়ের তর রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহ্যচেনা নেই তাঁর কাঁধে এ কি গুরুভার। গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই জ্বালোককে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, 'না, ওকে নিষেধ করো না। ও যত খুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তহু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্টি। এত আবিষ্টি যে কারু কাঁধে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।'

সেই জ্বালোকটি তখুনি নেমে পড়ল। প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

'আহা ওর কী আতি কী আনন্দতন্ময়তা! আমার যদি এমন থাকত। ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমন আতি জ্ঞান, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই!'

আগের রাত্রের স্বপ্নের আবেশে প্রভু সর্বত্র সেই মুরলীবদনকেই দেখছিলেন, এখন বাহ্যজ্ঞান ঘিরে আসার পর দেখলেন জগন্নাথের সঙ্গে সুভদ্রা বলরামও বিরাজ করছেন।

হঠাৎ আবার মনে হল আমি তো বৃন্দাবনে ছিলাম,

কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে! আমার সেই বৃন্দাবন গেল কোথায়? আমার প্রাপ্ত রত্ন আবার হারিয়ে গেল? বৃন্দাবন ছেড়ে আমি এই কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে? এ কুরুক্ষেত্রই বা কোথা থেকে উদয় হল?

বিষম মনে বাসায় ফিরে এলেন প্রভু। মাটির উপর বসে নখ দিয়ে রেখা টানতে লাগলেন। ছুঁ-চোখ দিয়ে অজস্রধারে অশ্রু বরতে লাগল।

বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আবার হারলাম কী করে? কে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কৃষ্ণ ছাড়া আমি এ কোথায় এসে পড়লাম? এ তো কুরুক্ষেত্রও নয়, এ জায়গার নাম কী? এ জায়গাটাই বা কোথায়, এখানে আমাকে কে নিয়ে এল?

দেহের স্বভাবে খান-ভোজন করছেন বটে, কিন্তু মন উন্মত্ত হয়ে রয়েছে।

স্বরূপ আর রামানন্দ এলে প্রভু তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

আমার অচ্যুতবিন্দু প্রাপ্ত হয়েছেও প্রনষ্ট হল। আমার বিষম মন দেহ-পেহ ছেড়ে ভিখিরির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ধৈর্য চলে গিয়েছে, আমি কি করব, যার লোভে বেদধর্ম লোকধর্ম অর্থপথ সমস্ত ছেড়েছি, ছেড়ে বৈরাগী

হয়েছি, সেই কৃষ্ণমাধুরী কোথায় লুকোল? সেই বৈরাগী কৃষ্ণসীলাকথার শঙ্খকুণ্ডল কানে পরেছে, কৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদনের তৃষাই তার একমাত্র জলপাত্র, আর কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশাই তার কাঁধে ঝুলি হয়ে শোভা পাচ্ছে। চিন্তা-কাঁথাই তার পায়ে চাদর, ধূলিমলিন-তাই তার বিভূতি। আর মুখে কৃষ্ণপ্রলাপ। উদ্বেগ ও উৎকর্ষাই তার দণ্ড। আর লোভই তার শিরোবস্ত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে মহাবাউল নাম ধরে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে বৃন্দাবনে। স্থাবর প্রজার গৃহে ভিক্ষে করছে, বৃক্ষলতা-কুঞ্জ কুটিরের কাছে। নিচ্ছে ফলমূল। আর জঙ্গমপ্রজা পোপসুন্দরীরা, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে করছে কৃষ্ণের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। তমালশ্যামল রূপ, অধর রস, গাত্র গন্ধ, অঙ্গ স্পর্শ আর বাক্যলহর ও বংশীধ্বনি। গোপীদের ভুক্তাবশেষ পেলেও সে পরিতৃপ্ত।

তারপর সে কৃষ্ণখ্যানরূপ যোগাভ্যাস করছে। রাত জাগছে। দেহে অভিনিবেশ নেই, সে তখন ব্যাধি, মোহ আর মুচ্ছার কবলে।

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর দশ দশা উপস্থিত হল। চিন্তা জাগরণ উদ্বেগ কুশতা অঙ্গমালিঙ্গ প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মোহ আর মৃতি। [ ক্রমশ

## দাহ

### সমরেন্দ্র ঘোষাল

আচ্ছন্ন শব্দরোল স্তিমিত অপরাহ্ন বেসা  
চতুর্দিক নৈশবন্ধ সমাহিত ছায়াচ্ছন্নতায়  
নদীগুলি নিদ্রা গেছে। নিঃসঙ্গ বালুভূমি একেলা  
বিধবার সিঁথি সম শব্দশূন্য গ্রাম নিঃস্বতায়।  
সমুখের মর্ত্যোপথে প্রসারিত শ্মশানের পথ  
কাবা খেন শব্দবাতায় চলেছে। এখানে আমি  
শ্মৃতির শবেদে লয়ে ধাবমান। গত মন্দ গ্লান  
সময়ের শ্মশানের দিকে। কার ডাকে খামি  
সহসা ফিরাই মুখ। চোখে বেঁধে আগুনের কণা।  
তার রূপ শ্মশানের চিতা। তার প্রেম পিছু ডাকে।  
শ্মৃতির শবেদে লয়ে ধাবমান আমি অগ্ন্যমণি  
গতিভ্রষ্ট হয়ে তার শরীরে মিলাই। আকাজকা থাকে।  
তার রূপ শ্মশানেতে আমার আকাজকা পুড়ে।  
ধীরে ধীরে ছাই হয়, উড়ে চলে দূর হতে দূরে।

## পুরুষচরণ

### অনিরুদ্ধ কর

স্পর্শের আগুন যদি ঝলে ওঠে শাস্ত্র বিভাবরী  
শোণিত শ্রোতের মধ্যে সাড়া দেবে বিপুল বিজ্ঞান  
শুভ্র ছুঁই করতল ভরে দিয়ে ছাখের কিংকরী  
নীরব বিদায় নেবে, গোয়ালির শেষ অগ্রস্রুত  
রশ্মির লাগণ্যবোধ ছুঁয়ে থাকবে নিদাঘ-রজনী।

বিসাদী জ্যোৎস্নার শিখা নেবে আসে চক্ষুর কজ্জলে  
সপত্র নিষ্পান বৃক্ষ পান করে নয়নের ধ্বনি  
স্পর্শের আগুন এসে ছুঁয়ে থাকে সব কোঁতুলে  
আগুনের পালে এসে শুয়ে থাকে আহত শরীর

ভ্রমরধার মেঘখামি শুয়ে নেবে রহস্ত-করী  
প্রথম পাণের মত রোমকূপ মুখের অধীর  
যদি আরেকবার... যদি ঝলে ওঠে শাস্ত্র বিভাবরী।

প্রবাদ বলে যে, 'Rome was not built in a day'—

অর্থাৎ রোম নগরী একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। প্রকৃতই তাই—রোম নগরী এবং রোমান সাম্রাজ্য অতি দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীসমূহের অঙ্গতম এই রোম। ইহা দীর্ঘদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহা ছিল এক মহান সভ্যতার ধারক ও বাহক।

রোম পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরীসমূহের অঙ্গতমও বটে। বস্তুতপক্ষে এখানকে বার দিলে রোমই পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রাচীনতম নগরী। পাশ্চাত্য জগতের অধিকাংশ স্থানই যখন অজ্ঞতার তিমির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—তখন রোমের প্রসিদ্ধি হয় এবং এই অজ্ঞান তিমিরের হাত হইতে পাশ্চাত্য দুনিয়াকে উদ্ধার করিতে রোমের যথেষ্ট অবদান আছে।

রোম পৃথিবীর অঙ্গতম প্রাচীন নগরী হইলেও, ইহার প্রতিষ্ঠার সময় এবং ইহার সৃষ্টি সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। এটি সব বিবরণী হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৭৫৩ সালে রোম নগরীর পত্তন হয়।

ঐ বৎসরই রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ত্রামুলাস—ইহার নামাযুগের এই শব্দের নাম হয় রোম—তাহার পিতামহ রাজা লুমিটারের নিকট হইতে টাইবার নদীর তীরে একটি নগর গঠনের অমুমতি গ্রহণ করেন। পিতামহের অমুমতি লাভের পর প্রথমেই তিনি ভাবী শহরের চারিদিকের প্রাচীরের সীমা চিহ্নিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লাউল টানিয়া জমিতে দাগ দিতে থাকেন। প্রাচীরের যেখানে যেখানে দরজা হইবে, সেখানে তিনি জমি হইতে লাউল তুলিয়া মাটিতে দাগ দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। এইভাবে রোমুলাস প্যালাটাইন পর্বত এবং তাহার পাদদেশে সামান্য জমি লইয়া এক বর্গাকৃতি চতুর্ভুজ সীমা স্ফুট করেন। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডেই রোম নগরীর গোড়াপত্তন হয়। মেঘপালকদের দেবী পেলসের উৎসবের দিন অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল এইভাবে মহানগরী রোমের সৃষ্টির স্মৃতি হয়।

শহর পত্তনের পর রোমুলাস দেখিলেন নবগঠিত নগরের জনসংখ্যা অতি নগণ্য। এই জনসংখ্যক অধিবাসীর সাহায্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রোম নগরীকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তাই রোমুলাস রোমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি নতুন শহরের একাংশ আশ্রয়স্থল হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এখানে যেকোন পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইতে পারিবে এবং পলাতককে রক্ষা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিলেন।

এই ঘোষণার ফলে রোমে বহু আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম ঘটিল এবং শহরের জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এইবার নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। যেসমস্ত পলাতক আশ্রয়প্রার্থী শহরে আশ্রয় নিরাছিল—তাহারা প্রায় সবাই ছিল পুরুষ। রোমে তখন যথেষ্ট সংখ্যক বিবাহযোগ্য বক্সা ছিল না। আশে-পাশে যেসমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করিত, তাহারা রোমুলাসের অমুচরদের দম্ভ্য বা দুষ্টতাকারী বলিয়া মনে করিত এবং তাহারা রোমবাসীদের সহিত তাহাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না।

## রোম নগরীর সৃষ্টি

ক্রিসোমেন্দ্রলাল রায়

এই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া রোমুলাস মোটেই দমিলেন না। তিনি ইহার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন এবং অবশেষে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রোমুলাস ঘোষণা করিলেন যে, দেবতা কনসাসের উৎসব পালনার্থে রোমে বিবিধ ক্রীড়া অনুষ্ঠান হইবে এবং ইহা দেখবার জন্য তিনি আশে-পাশের সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাইলেন। নির্দিষ্ট দিনে খেলা দেখিবার জন্য অসংখ্য রাজ্যসমূহের বহু অধিবাসী তাহাদের পরিবার-পরিজনবর্গ সহ রোমে সমবেত হইল।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হইল। সবাই একমনে খেলা দেখিতেছে। এমন সময় রোমুলাসের পূর্ণনির্দিষ্ট সঙ্কেত পাঠিয়া রোমের যুবকবৃন্দ দর্শকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অবিবাহিতা কুমারীদের তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। দর্শকবৃন্দ এই আকস্মিক বিপদে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা ভলোমত বাধাও দিতে পারিল না এবং রোমুলাস রোমীয় যুবকদের জন্যে এইরূপে একদিনে ছয় শতাধিক কন্যা সংগ্রহ করিলেন।

এই ঘটনার প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্য বিমূঢ় হইল এবং তাহারা রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তবে রোমের সৌভাগ্যবশত তাহারা একসাথে মিলিত হইয়া রোম আক্রমণ করে নাই। তাহারা একে একে রোম আক্রমণ করে এবং রোমের নিকট তাহাদের প্রত্যেককেই পরাজয় বরণ করিতে হয়। এইভাবে এক একে ক্যানিনি, এটেন্নিয়া, ক্রাস্টমেরিয়াম নগরকে রোমের শত্রুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। রোমুলাস বিজিত নগরসমূহের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া দখল করিয়া লইলেন এবং ঐ সমস্ত নগরের যে সমস্ত অধিবাসী রোমে বসবাস করিতে স্বীকৃত হইল, রোমের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের সাদরে রোমে আশ্রয় দিলেন।

ইতিমধ্যে সেবাইনরা তাহাদের বক্সা হরণের অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত রাজা টিটাস টেটিয়াসের নেতৃত্বে বিশাল এক সৈন্যদল গঠন করিল। রোমানরা এই শক্তিশালী সৈন্যদলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় লইল। ইহার পূর্বে তাহারা নিরাপত্তার জন্য তাহাদের সমস্ত গবাদি পশু ক্যাপিটোলিন পর্বতে প্রেরণ করে। কারণ প্রাকৃতিক রক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও ক্যাপিটোলিন পর্বত দুর্গপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেবাইন-সৈন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ দুর্গ দখল করিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্গপ্রাকারের কক্সা টারপীয়া সেবাইন সৈন্যবাহিনীর বাহুস্থিত সুবর্ণ ব্রেসলেট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে রাজা টেটিয়াসের নিকট প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাহাকে যদি ঐ সুবর্ণ ব্রেসলেটসমূহ দেওয়া হয়, তবে সে গোপনে দুর্গের দরজা খুলিয়া দিতে পারে। টেটিয়াস তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন। রাজা টারপীয়া গোপনে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া

দিল। সেবাইন-সৈন্যদল যুদ্ধ দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্যাপিটোলিন পর্বতের দুর্গ দখল করিয়া গেল।

দুর্গ দখলের পর টারশীয়া প্রতিজ্ঞাতি অমুখ্যারী তাহার পুরস্কার দাবি করিল, প্রতিজ্ঞাতি রক্ষা করিতে রাজা টেটিয়াস এবং সৈন্যরা তাহাদের সূর্য্য ব্রেসলেট এবং ঢালগুলি টারশীয়ার দিকে ছুড়িয়া মারিতে থাকে। নিক্সিগু ব্রেসলেট এবং ঢালের আঘাতে বিশ্বাসঘাতিনী টারশীয়ার মৃত্যু হইল।

এই পরাজয়ে তুচ্ছ হইয়া রোমুলাস রোমান-বাহিনীসহ সেবাইনদের আক্রমণ করিলেন। তুচ্ছ যুদ্ধ শুরু হইল। কয়েকদিন অবিরাম যুদ্ধের পরও যখন জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, তখন একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

রোমানরা যে সব সেবাইন-হস্তিতাক হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা একদিন চাৎকার করিতে করিতে যুগমান ছুট বাহিনীর মধ্যে আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের বিলাপ ও কাতরক্রন্দন শ্রবণ করিয়া ছুট বাহিনীর মধ্যে কতগুলি উদ্বেগ হইল এবং তাহারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সরিয়া গিয়াছিল।

সেবাইন-রমণীগণ সেবাইন-বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমরা তোমাদের নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে তোমরা এখন আমাদের একপাশ শাস্তি দিতে আসিয়াছ, আমাদের অজ্ঞায়ভাবে বলপূর্ব্বক হরণ করা হইয়াছিল। হরণের পর আমাদের পিতা-ভ্রাতা ও আত্মীয়পরিজন এতদিন আমাদের উদ্ধারের কোন চেষ্টা করে নাই। আমরা এখন রোমানদের সহিত নিবট বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, যখন যুদ্ধ তাহাদের পতন হইলে আমরা বিলাপ করিতেছি তখন তোমরা আসিয়াছ। আমরা যখন কুমারী ছিলাম, তখন তোমরা আমাদের উদ্ধার কর নাই। আর এখন তোমরা দ্রুত স্বামীর নিকট হইতে, জনীকে পুত্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছ। তোমরা এখন রোমানদের শত্রু এবং মাতামহ হইয়াছ। এখন আর তোমাদের তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয়—তোমরা যদি আমাদের ফিরাইয়া লইয়া যাউতে চাও, তবে তোমাদের জামাতা ও দৌহিত্রদেবও সাথে করিয়া লইয়া চল।'

সেবাইন-সৈন্যরা তাহাদের বক্তা এবং ভগিনীদের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। উত্তরপক্ষের ভিতর সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত অমুখ্যারী স্থির হইল যে, যে সমস্ত সেবাইন-রমণী পত্নীরূপে রোমানদের গৃহে থাকিতে সম্মত হইবে—রোমানরা একমাত্র পশম বোনা ব্যতীত তাহাদের দিয়া আর কোন কাজ করাইতে পারিবে না এবং আরও ঠিক হইল, এখন হইতে সেবাইনরা এবং রোমানরা একই নগরে বাস করবে এবং এই নগরীর নাম পূর্ব্ব-নামানুসারে রোমই থাকিবে, এই চুক্তি অনুসারে সেবাইনরা প্যালাটাইন পর্ব্বতের

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ কুইরীনাল এবং ক্যাপিটোলিন পর্ব্বতে তাহাদের বাসের নিমিত্ত নতুন নগরী গড়িতে শুরু করিল।

এইভাবে এই দুইটি গোষ্ঠী পরস্পরের সহিত মিলিত হইলেও প্রথম দিকে ইহাদের প্রোতাক্ষের নিজেদের আলাদা রাজ্য এবং সেনেট ছিল। অবশ্য অল্প কিছুদিন বাদে সেবাইনদের রাজ্য টেটিয়াস নিহত হইবার পর রোমুলাসই রোমের একমাত্র শাসকরূপে রাজত্ব করিতে থাকেন।

রোমুলাস কর্তৃক রোম নগরী পত্তনের সময় রোমের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ল্যাটিন বংশোদ্ভব; তারপর সেবাইনরা ল্যাটিনদের সহিত মিলিত হইয়া সেবাইনদের সহিত এই মিলনের ফলে রোমের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

ইহার পর এট্রুসকানরাও রোমে সেবাইন ও ল্যাটিনদের সহিত মিলিত হয়, তাহারা স্থাপত্যবিজ্ঞান বিশেষ পটু ছিল। এট্রুসকান রাজ্যের দীর্ঘদিন রোমে রাজত্ব করেন এবং তাহাদের রাজত্বকালে রোম নগরী সুন্দররূপে গঠিত হয়।

রোমের প্রথম নরপতি টারকুইনিয়াস সুপার্বাসের সময় রোমে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ-মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হয়। প্রবাদ আছে যে, জুপিটার, জুনো এবং মিনার্ডার স্তম্ভ তিনি যখন এক বিশাল মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন, তখন মন্দিরের ভিত খুঁড়িবার সময় একটি মীথুয়ের মাথার তাজা খুলি পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎজ্ঞার জ্ঞান, ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে রোম একদিন সারা পৃথিবীর রাজধানী বা প্রধান শহর রূপে বিখ্যাত হইবে। ইহাদের ভবিষ্যৎবাণী অস্বত আশীষরূপেও সফল হইয়াছিল বলা চল বৈ কি, কারণ রোম সারা বিশ্বের না হইলেও সার পাশ্চাত্য জগতের, বাহ্যকে তৎকালীন পাশ্চাত্যের লোকেরা গোটা পৃথিবী বলিয়া মান্য করিত, রাজধানী এবং প্রধান নগরী হিসাবে দীর্ঘদিন সম্মান লাভ করিয়াছে।

টারকুইনিয়াস সুপার্বাসের পরেই রোমে রাজত্বের পতন হয় এবং প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়, আবার প্রজাতন্ত্রের পতন এবং রাজত্বের গঠন এবং রাজত্বের পতন ও প্রজাতন্ত্রের উত্থানরূপ নানা পরিবর্তন এবং গল প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভাগ্য-বিপদগণ মধ্য দিয়া রোমকে বাইতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসময়েও রোম দীর্ঘকাল বাবৎ তাহার প্রাচীণ অক্ষুণ্ণ রাখে।

পরবর্তীকালেও গোপনের আবাসস্থল হিসাবে রোম সমস্ত খৃষ্টান দুনিয়ার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। প্রায় আটশত শত বৎসর পূর্ব্ব রোমের প্রথম সৃষ্টি হইলেও নগরী হিসাবে রোমের আকর্ষণ আভ্যন্তরীণ বজার আছে, রোম অতি প্রাচীন নগরী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও রোম নগরী চির-নবীন।

কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত দেশ-সিগণ আচার্য-ব্যবহারে, কথার-বার্তার, চাল-চলনে প্রকৃত বাঙালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের বাঁহারা মুখপাত্ররূপে, সমাজের বাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাহাদের আরাধ্য-দেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙালী আর এখন বাঙলা ভাষার সর্বসমক্ষে কথা বলিতে বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষার বহুত্ব করিতে সঙ্কোচবোধ করেন না বা বঙ্গভাষা নিজেকে বঙ্গভাষার সেরকরূপে পরিচর দিতে কুণ্ঠিত হন না।

পূর্ববালিনের অন্ধকার মেলে বসে ঐ লোকটা হরত ভাবছে—  
কি হারালাম? দেশের স্বাধীনতা, না নিজের জীবন।

মাগু-মাগুয়ে ধপ ঢলছে দিনে-রাত্রে, সকাল-সন্ধ্যায়। শাসনতন্ত্রের  
চুলচেরা বিচার হচ্ছে কনফারেন্স আর সানিট। নীচে নিম্নো  
বাণ্ড বাজছে, সাউথ-আফ্রিকায় সে আত্মদ বরছে, আমেরিকায়  
সে লিখিত শুছে। বিশ্বব্যাপী এই মহামারীর যড়যন্ত্রের মধ্যে  
এনেছি আমার ছোট অসমীয়া ছবি বার একমাত্র বলার কথা।  
হ'ল, পৃথিবীতে একটি শিশু তার নাম সবশিশু। পৃথিবীতে  
একটি মানুষ, তার নাম সবমানুষ। মানুষ এক ও অনন্ত।  
ভারতবর্ষের একটি ছোট কেবের একটি ছাটী কথার রেশ কোন  
পঞ্চত বাবে?

যাবে কি আজকের স্বাধীন মানুষের মনে?

জানি না।

কালকের নতুন মানুষের মনে?

তাও জানি না।

কগনও? শুধু ভবিষ্যতে?

তাও জানি না।

কেউ জানে না।

## প্রদর্শনী

দেখতে দেখতেই দু'দিন কেটে গেল। প্রদর্শনী আজ কাগজ।  
সন্ধ্যা সাতটা: কংগ্রেস হল-এ। আমাদের চারজনের ছোট ডেলিগেশন,  
নাথার ওপর সিডার হলেন বালিন ভারতীয় বাজুত। তিনি  
হাসপাতালে, অস্ত্রস্থ! তাঁর প্রতিনিধিত্ব করত এলেন বন (Bonn)  
থেকে উপ-রাজকৃত। সন্ত্রাসক। অস্ত্রতম ডেলিগেট পাকোয়াস মেমসাংহেব  
সঙ্গে এসেছিলেন ফ্র্যাঙ্কফুট পর্যন্ত, তারপর থেকে আর তাঁর দর্শন  
মেলে নি। সারা ভাংতে এত লোক থাকতে তাঁর প্রতি সরকারের  
স্বনজ্বর যে কি ক'রে পড়ল বোঝা উচিত। ছবি তো করেনই না,  
দেখেনও কম। সমালোচক হ'লে বৃত্ততাম, সমরদার হ'লেও না হয়  
চলত; অল্পবয়স্ক সুন্দরী হলেও না হয় সরকারকে সর্বাঙ্গকরণে ফমাও  
করা যেত। কিন্তু মহিলা শুন্দরী নন, সমালোচক হবার সাধ্য নেই।  
সমরদার কোনদিন হবেন এমন আশা করাও অস্বাভাবিক। পরে  
কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল উনি মাস্টারবী ছিলেন এবং আপাতত মেয়েদের  
ব্যয়াম করানোর ব্যায়ামে বিশেষ ক'রে ভুগছেন। উনি সারা বালিন  
মেয়েদের স্কুল দেখে বেড়িয়েছেন আর তাইই ফাঁকে ফাঁকে বধনই সময়  
পেয়েছেন মদের আসরের শোভা বাড়িয়েছেন। নিজেকে 'নেপো' বলে  
জানতাম। উনি নেপো:লারান!

আমাদের ডেলিগেশনের সরকারি অগ্রজ বন (Bonn) আগত  
উপ-রাজকৃত এবং তাঁর স্ত্রীকে প্রদর্শনীর পানোরো দিনে খুব বেশি  
হ'লে পাঁচদিন দেখেছি কি না সন্দেহ। মদের আসরে পাঁজি ওঁদের  
দেখেছে প্রায় প্রত্যেকদিনি এবং বাজারে জ্ঞানদা ক্রীমতা উপ-রাজকৃতকে  
দেখেছে দিনে-তিনবার। ভারত সরকারের চেহেড়া, ওড়ানো প্রকাণ্ড  
মারসিডিজখানা তিনি নিজের ব্যক্তিগত এবং একচেটিয়া সম্পত্তি  
ক'রে ফেললেন। হিসেব করলে অস্বস্তি দেখা যাবে বনীয়-দম্পতিকে  
আনা, থাকা আর গাড়ির পেট্রোল খরচায় ভারত সরকার বেশ মোটা  
টাকা ব্যয় করেছেন—যার মোটা অংশ ওঁরা উত্তল করেছেন মদের  
আসরে। ককন, ভালো কথা কিন্তু করেন এক্সচেঞ্জ? থাক গে ও

# নাগরিক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

## প্রভাত মুখোপাধ্যায়

প্রদঙ্গ। লিখতে বসেছি বালিনের কথা ভারত সরকারের ভুল  
কাহিনী বলতে গেলে ইতিহাস হ'রে যাবে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'ল কংগ্রেস হল-এ। বহু মহিল বিভূত  
কাননের এককোণে রাশিয়ান যুদ্ধ-অভিদৌধের প্রায় উল্টো দিকে  
এই হলটা আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের অক্ষয়কীর্তি এবং মার্শাল  
এডের অমর দান। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের এবং অপূর্ব পরিপূর্ণতা  
পৃথিবীর আর কোথাও দেখি নি। শোনা যায় এটা তৈরি করতে  
লেগেছে তিন বছর আর তিন কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, ছোট্টই  
সার্থক।

হল-প্রাঙ্গণে পৌছানো গেল ঠিক সাতটায়। সঙ্গে অসমীয়া  
মুগার লুঙ্গি, চাদর-পরা কাকাতি মেমসাংহেব, মধ্য-ব্রহ্ম অগ্রবর্তী পাঁজি  
আর ক্ষীণাক্ষী কথ। আজ ওর পোষাকের বাহারে এবং মনের  
প্রদর্শনার সৌন্দর্যের বড়া নেবেছে। আজ ও ঠিক দো-ভাবী নয়,  
একাগ্রভাবে অন্ত্রাসুন্দরী নারী।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে ফোয়ার। আকাশ-ছোঁওয়া জলধারার ওপর  
রামধনুর রং, তাইই পাশ দিয়ে ক্যান্টিলিভার সিঁড়ি। ওপরে  
আবার প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। তাইই মাঝখানে পুরো বসি কাচের মাজা  
হল, গোল হয়ে ওপরে উঠছিল, কে যেন ঝাঁক খাবড়া মেয়ে ওপরে  
ওঠা খামিয়ে দিয়েছে মাঝপথে। ফলে, ছাদটা অস্বস্ত এক  
এল্যামেসো ছন্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভেতরটা তিনভাগে  
বিভক্ত। একধার অল্প নীচু খাবারের জায়গা, মাঝখানে সিঁড়ি  
উঠে শ্লোপ নেবে হল, আর ওদারে, দোতালার মাঝামাঝি মজপানের  
আসর আর ব্যাণ্ডের রোশন-টোঁকি। হল-এ অতি আধুনিক বসবার  
কেদারা, প্রত্যেকটির সঙ্গে কানে-আঁটা ইয়ার প্রাগ। ছবি যে  
দেশেই হোক আর বৃত্ততা যে-কোন ভাষায়, ঐ ইয়ার প্রাগের সাহায্যে  
জার্মান, ইংরেজি আর ফরাসী ভাষার তার অনর্গল অনুবাদ শোনা  
যায়। হল-এ লোক ধরে হাজার, দুয়েক, ওদারে থানা খেতে  
পারে হাজারখানেক আর মজপান আসরে লোক ধরে তাও  
হাজার। ছাদটা ঠিক কাচের নয়, কিন্তু তা হ'লেও আকাশ দেখা  
যায়, হাত বাঙালে হরত বা তাত্ত্বগুলা ছোঁওয়াও যায়। আলোর  
ব্যবস্থা অল্পও নয়, অতিরিক্তও নয়।

প্রথমে শিল্পী-পরিচিতি। কাকাতি মেমসাংহেব নাচতে নাচতে  
গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মঞ্চে উঠলেন। ওর আগে আছেন ক্যারি  
গ্রাফ্ট, আনা সাইয়ানি। পেছনে হ্যারল্ড লয়েড, মেল ফেরার।  
মাঝখানে মেমসাংহেব একবারে চিড়ে চ্যাপটা। পারে প্রকাণ্ড

ফোকা, চোরাগার পর্দাশু নাড়ানেশ। কথার ভাষা জোগালো না, ইংরেজি তো নয়ই, অসমীয়াও আটকে গেল। কোন গতিকে হাতটা কপালে ছুঁয়ে দে দৌড়। মধ্য থেকে নাথতে গেল যে তিনটে সিঁড়ি পড়ে সে খোলসও নেই। ফলে, উটে একবারে ক্যারি গাটের কোলে। পাকির ধারণা পড়টা ইচ্ছাকৃত। আমার মনে হয় না।

পরিশেষে বার্গো মাস্টারের বক্তৃতা। বার্গো মাস্টার মানে লর্ড মেয়র। জার্মান শাসন-ব্যবস্থার উনিই হলেন বার্লিনের অধিপতি— অর্থাৎ পদ্মভূষণবিধান একীভূত। আজকের ছবি ফ্রান্সের সৃষ্টি, নাম 'লে জুর্জী লামোর' বাংলায় মোদা মানে ঈড়ার 'ভালোবাসা'। প্রদর্শনী-সমিতির মতে (ছবির নয়) এইটাই বছরের সেরা ছবি। ছবির শিল্পিতার্থ যেমনই হোক নৈতিক অর্থ ঈড়ার বাংলা প্রকাশকের, নতুন লেখকের লেখা প্রথম উপজ্ঞাসের মতন। মানে, আগে বই বাজারে ঘের হোক, লোকে পড়ুক তারপর পরসা। ছবির নায়িকার চর্য্য একদিন মনে হল বিয়ে না কবলে নারীজন্মই বুখা। অথচ মনের মতন উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছেন না। অগত্যা তিনি ঠিক করলেন, আগে বিয়ে করবেন না, পরীক্ষামূলকভাবে ঘর করবেন, যা হবেন, তারপর বে ছেলটিকে মনে হবে তাঁর স্বামী এবং তাঁর সন্তানের পিতা হবার উপযুক্ত তাকে বিয়ে করবেন। তাঁর সন্তানের পিতা কে সেটা বড় কথা নয়।

ছবির শেষে প্রচণ্ড হাততালি। শ্রীমতী পাকোয়াসার মতে এমন ছবি জীবনে দেখেন নি!

খাবার প্রাঞ্জল বৃক্ষের ব্যবস্থা। দেড় হাজার লোক সাইন দিয়েছে দশহাত টেবিলের ধারে। প্লেট হাতে ঈড়িয়ে রইলম প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। আমার পেছনে কথ। এগুলাম এক পা। আরও তিন কোয়ার্টার আরও এক পা। আধঘণ্টা আবার স্থির। কথের সর্কাইনী এসে সংবাদ দিল ওধারে কাজাকাড়ি পড়েছে।

কথ হেসে বললে, 'খাবার চাও তো সাইন ছাড়।'

সাদা চামড়া কায়দায় অগোছাল হ'লে লোকে বলে 'বোহেমিয়ান আর্টিস্ট'। কালো চামড়া অরুণ করলে লোকে বলে 'আনকালচার্ড নেটিভ'। ইতস্তত করছি ইতিমধ্যেই দেখি দূরে খাবারের টেবিলে বেরাল্লিছ ছতিকের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমাদের হাতের প্লেট হাতেই রইল।

পাকি আর কাকোতির খোঁজ নেই। কথকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে গিয়ে দেখি জাপানী দলের সঙ্গে ওরা জমিয়ে বসেছে। প্রশ্ন করি— 'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'কি?'

পাকি হাসে আর জ্ঞানদা মিট-মিট ক'রে আলতোভাবে নির্বাক চেয়ে থাকে। বোকা গেল ব্যাপারটা। আমরা নীচ ছতিকের দলে পড়েছি আর ওরা ওপরে বসায় ভেসেছে। জাপানী-নায়িকার ধার বেঁধে বসলাম। লাল রঙের কিমোনোতে হলদে রঙের বড় বড় ফুল। হাত দুটো চওড়া আঙুলের মধ্যে লুকোনো। আমি মাথা নীচু ক'রে অভিভাবদ জানাতেই মহিলা অধাবদন হলেন।

নাগকনি। নাকটা অতখানি বোঁচা না হ'লে বসতাম

পরমাশ্রয়ী। চোখ দুটো ওপরে উঠে ইনফিনিটিতে মিলিয়ে গেছে। খানিকটা ভগবানের হাত, বাকিটা ঈর্ষ নিজেই। আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল চোরাগার; চালে ও চলনে চাকচিক্যের অভাব। ঝং ধবধবে ফর্সা, ফ্যাকাসে নয়। পাশাপাশি বসলেও মনে হয় মাছুব নয়। মোমের পুতুল।

নারী-পুরুষের কথোপকথনের বহুবির ভাষা। প্রথম কথা বলে চোখ। চেয়ে দেখি মেয়েটি হাসছে। আমিও হাসলাম। কথ ইতিমধ্যে কোথা থেকে একপ্লেট কেক আর আইসক্রিম এনে হাজির করল। প্লেটটা নিতে গিয়ে আঙুলে-আঙুলে জল ছোঁওয়া লাগে। ওটা দ্বিতীয় ভাষা। স্পষ্ট অথচ নির্বাক। চোখ তুলে দেখি কথ নিশ্চলক তাকিয়ে আছে।

জ্ঞানদা বললে, 'চলুন হোটেল ফিরি।'

পরদিন সকালে স্টল উদ্বাটন। সেও এক পর্ব। দেশে যখন আমার জগ্ন তোড়জোড় করছি ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে খবর এস ওখানে আমাদের একটা স্টল দেওয়া হয়েছে। আরও জানা গেল দৈর্ঘ্যে সেটা বারো ফুট, প্রস্থ আট। জাতি মার্কিনী আর ফরাসী চাকচিক্যে আমরা পাভা পাভা না তাই স্টল সাজানোর জগ্গে এনেছিলাম আমাদের প্রামাণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সঙ্গে ছিল ধানের নীম, কুলো, শাঁখ। আসামের মাতঙ্গা, সাঁওতালদের কুনকো, বাঁকুড়ার ঘোড়া, জয়পুরের হাতী, কৃষ্ণগরের মাটির পুতুল। সাজাতে গিয়ে দেখি ভারত সরকার যেটাকে স্টল বলেছেন, আসলে সেটা চট্টের দেওয়াল। মনে পড়ে গেল বৃহৎসালন ছোট কাহিনী।

সেনাধ্যক্ষ লর্ড ওয়াভেল মধ্যপ্রাচ্যে গেছেন সেখানে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে। ঘটনাক্রমে দেখাশোনার পর সাহেব মগধুশি। এক শিশু সর্বারকে প্রশ্ন করলেন— 'সব ঠিক?'

প্রকাণ্ড শ্রাবুট মেয়ে সে উত্তর দিল— 'জি!'

সাহেব সদর হ'য়ে প্রশ্ন করলেন— 'কুছ মাংতা?'

'জি হ্যাঁ। ঈতন।'

সাহেব বললেন— 'ঠিক হায়। মিলেগা।'

দেশে ফিরে ওয়াভেল সাহেব জুকুম দিলেন মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সৈনিকদের জগ্গ ড্যান্টন পাঠাও কম করে একলক্ষ। পাঠাও তিন দিনের মধ্যে। সারা সরকারিমহলে সাড়া পড়ে গেল। ড্যান্টন কি? পুরো আর্মিগুপ্তর জুড়ে বৈঠক বসল। বার্টো কাইল, আনো যুদ্ধবিদ জিক্সেস কর পেপ্গালিস্টদের, তার পাঠাও মধ্যপ্রাচ্যে। ড্যান্টন কি জিনিস? তিনদিনের জায়গায় তিন সপ্তাহ কাটল তবু ড্যান্টন বহুশ্রম আর উদ্ভাটিত হয় না। কলকাতার এক বাঙালী ব্যবসায়ীর তাক বুঝে দর হাঁকল! বললে— 'আমি দেব ড্যান্টন। দাম, প্রত্যেকটা চোদ আনা।'

সাপ্রাই দপ্তর মহাযুশি।

একলক্ষ ড্যান্টনের জগ্গ লাগল দুটো নিম গাছ।

ভারত সরকার হাত বলছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধির বহর বদলায় নি। ঘোষার কাছেই থাকুক আর সার্কাসেই থাকুক—গাধা গাধাই



থাকবে। কোথায় ঈল আর কোথায় চাটের দেওয়াল। তবু সাজানো হল, একেবারে খাটী গ্রামীণ পন্থায়। বাঁটা থেকে আরম্ভ করে ঘট, কলাপাতা, ডাব পর্যন্ত। এই ঘর সাজানোর সামগ্রী আর পদ্ধতির ওপর টেলিভিসন অল্পটান হল তিনটে। বালিন থেকে, ইতালী থেকে আর লণ্ডন থেকে।

আমাদের ছবি দেখানো হল ১লা জুলাই রাত দুটায়, প্রদর্শনীর প্রধান প্রেক্ষাগৃহে।

হল জিলাধারের ভায়া নেই। তিন ভায়া অম্বাদ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি। ভাড়া ক্যামেরায়, অল্প অল্পে ছোট ছবি। আমাদের পুরা ছবির বা খরচ, যে-কোন যুগোপীয় দেশে এই টাকার একজন শিল্পীও মেলে না। আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রী সবই আনেকোরা নতুন। লেখকের পেশা ডাক্তারি, নায়কের পেশা গো-পালন।

দাম পেলাম আশ্বশের। প্রেক্ষাগৃহ কেঁপে উঠল হাততালিতে। আমাদের হাত কাঁপল অটোগ্রাফের তাগিদে। লিখলাম তিনটি কথা—‘সত্যম শিবম সুন্দরম’।

আমাদের ছবির বক্তব্যও যে তাই।

সত্যম, শিবম সুন্দরম।

যেদিন প্রথম ঈশ্বরধ্বনি উঠেছিল মানুষের কণ্ঠ থেকে সেই সত্যযুগের প্রথমারম্ভ থেকে আজও পশ্চিম মানুষ সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব ভাষায় এই একই কথা বলতে চেষ্টা করেছে তার সাহিত্যে, কবিতায়, তার ধারার আনন্দে।

সত্যম শিবম সুন্দরম।

শুধু এইটুকুই ছিল আমাদের কলার কথা। ছোট ছবির ছোট গল্প আরও ছোট পরিধির মধ্যে—পৃথিবীর সব মানুষ এক। সব মানুষ সমান। পৃথিবীতে একটাই শিল্প। তার নাম সর্ব-শিল্প। পৃথিবীতে একটাই মানুষ তার নাম মানুষ। পৃথিবীর একটামাত্র আদর্শ।

সত্যম শিবম সুন্দরম।

আনন্দের আতিশয্যে পাঞ্জি সকলকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল চীনা রেস্তোরাঁয়। খাওয়ার। সবাই খেল। শ্রীমতা কাকোতি গিলিলেন গোগ্রাসে। কথ আমাদের সঙ্গ নিল। আজ ওকে বলতে হল না, ডাকতে হল না, নিজেরই বললে আসবে। সে দু-একদিন আমাদের সঙ্গেও চীনা রেস্তোরাঁয় গেছে, ডাক্তার প্রেট সামনে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, খুব একটা খায় নি কখন। আজ ও একবারে অল্প মানুষ। সরকারি কারদা নেই, দৃষ্টি ওপর পরম ভাবসীতার মোটা। পূর্ণাও নেই। আজ ও আমাদেরই একজন। আন্তরিকতার ও অন্তরঙ্গতার একেবারে ভরপুর। শ্রীমতীর কাছে হাতে খাওয়ার লীক্ষা নিয়ে, পরিমাণে পাল্লা দিল। এতক্ষণ হলের স্বপ্ননার স্পষ্ট রেশ ছিল আমার কানে। কথের আমূল পরিবর্তন সেটা ছাপিয়ে উঠল। হঠাৎ এক সময় দেখি কথ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হাসলাম।

কথ আবার মন দিল খাবারে।

চারজনে পথ চলছি। আজ আর শ্রীমতী নারিকী ট্যানির ভক্ত আকার ধরল না। মনটা গুরু বোধ খানিকটা মাতাল হয়ে আছে ছবির অভ্যর্থনায়। নির্জন রাত্রি। সামান্য কুয়াসার একটা আন্তরণ পড়েছে মাথার ওপর। তারই মধ্যে দিয়ে চাঁদটা দেখাচ্ছে যেন মধ্যপ্রাচ্যের যুবতী নারীর বোরখা-ঢাকা চোখ।

সারা সন্ধ্যাটা মনের মধ্যে গুনগুন করছে। সকলের পেছনে আছি সবকিছুর উপরে। খাবার টেবিলের মুখরতা পথে নেবই হারিয়ে বসেছি। সকলেই। যত ছবি কথ ভাবছি কথের চোখ দুটো ততই তারমাথে উঁকিঝুঁকি মারছে। হঠাৎ দেখি কথ আমার পাশে। একমাথা সোনালী চুল একঝাঁকে ডানদিক থেকে বাঁদিকে নিয়ে ও আমার দিকে চাইল। বললে, কেমন লাগল তোমার ছবি জানতে চাইলে না?

বল। স্তনি।

কিছু বলে না কথ। ইটতে থাকে।

কৈ বললে না?

রাগ করবে। হাসল।

না। বল।

উদগ্রীয আগ্রহে অপেক্ষা করি। গুরু হরত খালাপ লেগেছে। আরও অনেকদূর খালাপ লেগেছে, ও এমন কিছু অন্তর নয়। তবু মনে আমার অর্ধ প্রতীক্ষা। ও নীরব; হরত ভাবছে কি বলবে। আবার বলি—লেটস হিয়ার ইট!

কথ আমার দিকে চাইল। বললে আদর্শের আড়ালে সত্যকে গোপন করা যায় না।

কি সত্য? মানে কোন সত্য?

মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব করার যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সেই সত্য।

অর্থাৎ?

মানুষ সমান নয়। প্রভুত্বটাই সহজ সত্য। যুগে যুগে সভ্যতার ইতিহাস মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বেরই ইতিহাস। শিক্ষিত চায় অশিক্ষিতের ওপর প্রভুত্ব। পুরুষ চায় নারীর ওপর প্রভুত্ব, মনী চায় দরিদ্রের ওপর প্রভুত্ব। প্রভুত্বের অনন্ত সংগ্রাম চলেছে বিশ্ব জুড়ে। সেইটাই আসল সত্য। তুমি যেটা বলতে চেষ্টা কর, সেটা সত্য নয়, আদর্শ। মানে?

তর্কের খাতির নেই হর মানলাম।

আদর্শের দোহাই দিয়ে সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাও কেন?

জানি না।

আমি বলি?

বল।

জীবনকে তুমি ভয় পাও; তাই।

ওটা ছবির সমালোচনা নয়, আমার চরিত্র-বিশ্লেষণ।

কথ হাসে। বলে, ঠিক তাই। ছবি তো বছরে বছরে আসে। দেখি। বাহবা পায় তারপর বিমূর্তির অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মানুষের বেলায় তা তো হয় না। কোন কোন মানুষের বেলায় একেবারেই নয়।

আমি কোন দলে ?

শেখের দলে ।

কেন ?

কথ হাদে । এমন ছোরে যে পাঞ্জিও পেছন ফিরে তাকায় আর ছোট করে বাংলায় বলে, জমেছে !

আবার প্রশ্ন করি কথকে, বললে না ?

কারণ তুমি শিল্পসাধনার আড়ালে নিজেকে গোপন করে রাখতে চাও, তাই । তোমার খুঁটি তোমার চেয়ে বড় হয়ে উঠে তোমার হাত ধরেছে । হওয়া উচিত ঠিক তার উল্টে । তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ।

ওটা সৃষ্টির মহিমা নয়, আদর্শের উচ্চাশা ।

কথ একপলক কি ভাবল, তারপর বললে, আদর্শ তখনই সার্থক হয়, সত্যের ওপর যখন তার ভিত্তি ।

আমি যা বলতে চেয়েছি, সেটার ভিত্তি কি মিথ্যার ওপর ?

মিথ্যে নয়, ভুলের ওপর ।

থেকে আবার বলে, সার্থক শিল্পখুঁটি হচ্ছে সত্যের সাধনা, আদর্শের নয় ।

চূপ করে ভাবতে থাকি । হলের আনন্দধ্বনি কেনমনে মিলে যাচ্ছে ।

কথ আবার বলে, তোমার আদর্শ এমন সহজভাবে সাজিয়েছ এবং সরলভাবে বলেছ যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখেছে । যখন পরে ভাবতে বসবে তখন দেখবে যে মোহিত হয়েছে ঠিক, মুগ্ধ হয় নি ।

প্রশ্ন করি, প্রভেদ কোথায় ?

একটা অসুভূতিক নাড়া দেয় । অগুটা মনকে জয় করে ।

হোটেলের মুক্ত-প্রাঙ্গণ । রাত বোধ হয় দুইটে । কয়েকটা ট্যান্ডি অন্ধকারে মিলিটনি করছে । বেল-বয় সজাগ আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমার ঘরের চাবিটা নিয়ে । ওদের 'সকসকে' কুঠের মধ্যে হাতীর দাঁতের এতটুকু হাতী মুক্তহস্তে দান করেছি বলে, আমার 'দেখাশোনার দায়িত্বের ভজ্ঞে ওদের মধ্যে হাতাগতি লেগেই আছে ।

কাচের দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো কথ । ওর নীলাভ চোখের ভাষা নীরব কিন্তু অস্পষ্ট নয় । বললে—ঘর আমার ।

হেসে বলি, দরলাম ।

তুমি কি ভাব তুমি আমার আমি সমান ।

হ্যাঁ ।

নৌ । নেভার ।

থেকে আবার বলে, এখন যদি আমি উঠে বাইরে ওপরে, তোমার ঘর, তুমি ঠিক চাইবে আমার ওপর তোমার প্রভুত্ব ।

হেসে বললাম—এসো ।

পাঞ্জি শুনছিল । বললে—মার কৈলাশ !

বিনা বিধায় কথ উঠে এল ওপরে । পাঁচতলার । চাবিটা ওর হাতে নিয়ে বললাম—চাবিটা এনেছি আমি । খোলাটা তোমার ভার । ও আবার দিকে চাইল । চাবিটা নিল । আমি দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ওকে দেখলাম । সুন্দরী, তাতে সন্দেহ নেই ।

ভেতরে বিছানিটা পরিপাটি করে সাজানো । সাদা ধবধবে চাদরটা

আরামের আমন্ত্রণ । সটা শুয়ে পড়ল কথ একদম ছেলেমানুষের মতন লাফিয়ে । জুতোটা না খুঁজেই ।

প্রশ্ন করলাম—বাবে কিছু ?

একটা সিগারেট ।

ধরিয়ে দিলাম । আলোটা ওর চোখে লাগছিল । নিবিয়ে দিলাম । বারান্দার মোটা পর্দাটা টেনে সরতেই টাদের একতিল আলোয় অন্ধকারটা ব্যাপসা হয়ে উঠল । বেড-সাইড টেবিলের ওপর ছোট চকোলেট ছিল । ওকে দিলাম । বললাম—আরাম করে শোও ।

জুতোটা ও পরে পা দিয়ে খুলে ফেলল । সোফায় বসে আমি মাঝে মাঝে শুন চকোলেটে কামড় দেওয়ার শব্দ আর সিগারেটের বিন্দু আলোয় দেখি ওর সাদা ধবধবে মুখখানা বাগিশের সঙ্গে এক হতে মিশে গেছে । চুলের লাইন টেনে চেহারার খুঁজতে হয় । হাতঘড়ির টিক্-টিক শব্দও কানে আসে ।

কথ বলে, দূরে থেকে দায় এড়াচ্ছ ?

আমি বলি, কাছে গেলে ঘেঁষাঘেঁষি হবে ।

কথ ছুটুমির সুর টেনে বলে—আঙনের ওপর পা ফেলে হাঁটে অথচ পা পোড়ে না এমন মানুষ নাকি তোমার দেশে আছে ? সত্যি ?

ওর পাশে শুতে শুতে বলি—আছে । সত্যি ।

তিনটে বাজল ।

চারটে বাজল ।

দূর থেকে উঠে দেখি আটটা বেজেছে । কথ নেই পাশে । চলে গেছে । বাগিশের ওপর ওরই মাথার কাঁটা দিয়ে গৌজা একটা চিটি । ছোট ।

'আটটায় ডিউটি । চললাম । আদর্শ ভালো কিন্তু তার দম্ভ ভালো নয় ।' এরজগ্গ হয়ত একদিন জীবনের সবকিছুই তুমি হারিয়ে বসবে ।

—কথ

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে সেদিন যদি কথের কথা শুনতাম তা হলে জীবনের অনেক কিছুই হয়ত হারাতে হোত না । সন্তানদের তো নয়ই । কথের সঙ্গে আর কখন আমার দেখা হবে না, হলে ওকে জানাতে পারতাম যে ওর কথা না শুনে জীবনের অনেক কিছু হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সে হাদানোর ভজ্ঞে আমার কোনই বেদনারোধ নেই । যা হারিয়েছি সেটা আদর্শের মুগ্ধতার নয় বিশ্বাসের মুগ্ধতার ।

## সোনার পাথর বাটি

ইংরেজ যখন কিছু চায় তখন কনবারেন্স ডাকে আর বৈঠক বসায় । ফরাসীরা যখন কিছু চায় তখন তর্ক করে, আমেরিকা যখন কিছু চায় তখন 'ডলার ছড়ান' আর জার্মান যখন কিছু চায় তখন করে যুদ্ধ । গত পঞ্চাশ বছরে এইটাই ইতিহাসের মূল কথা । প্রথম মহাযুদ্ধের কথা জানি না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস বাটলে দেখা যাবে, ইলাণ্ড চাইল শান্তি অতএব ডাকল কনবারেন্স এবং রায়মশে ম্যাকডোনাল্ডকে ছাতা বগলে পাঠালো বৈঠকে আলোচনা

রতে। ফ্রান্স চাইল যুদ্ধ থেকে মানে মানে সরে পড়বে এবং রকে জিতে ওরা পারিসকে করল মুক্ত শহর। জার্মানী চাইল বংশাধারী রাজত্ব—মস্ত এম্ব বঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। শেষ পর্যায়ে এসে দখা বাবে আমেরিকা যুদ্ধরত করছে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে আর গাতি এনেছে মার্শাল এডের ডলার ছড়িয়ে।

প্রথমে ধরা যাক জার্মানীর কথা।

সবাই জানেন সুদূরটা হচ্ছে শক্তির পদাঙ্গ। তারা উচিত দুর্গলের। কিন্তু পর পর দু'টো যুদ্ধে দেখা গেল জয়লাভ করেছে বানিয়া আর ডলার। এটা ব্যাপারটা জার্মানী ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়েছে ওরা যুদ্ধের কথা বাদ দিয়ে এখন বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। ওরা ঠিক করেছে বুদ্ধি দিয়ে বড় হবে এবং সরকার হলে রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে লাড়বে।

এই বুদ্ধি দিয়ে বড় হবার প্রথম ও প্রধান সোপান হচ্ছে আমেরিকার মার্শাল এডের পূর্ণ সুযোগ নেওয়া এবং বলা নিতান্তই বাচ্চা যে ওরা সেটা নিচ্ছে শুধু নিচ্ছে না, ছ' হাতে নিচ্ছে। লুট্টে নিচ্ছে। কিভাবে যে নিচ্ছে সেটা সঠিক বুঝতে গেলে যুদ্ধের ঠিক পরে বালিনের অবস্থাটা যে কি হয়েছিল সেটা আগে বোঝা সরকার। সেটা বোঝা সহজ হবে একটা ছোটগল্প থেকে। এটা ওখানকার অনেকের মুখেই শুনেছি।

গত মহাযুদ্ধে এক অন্ধকার রাত্রে ব্রিটিশ প্লেন বোমা ফেলেতে এলা বালিনে। তার আগে এত বোমা ওরা ফেলে গেছে যে, আর বোমা ফেলে ভাঙবার বালিনে কিছু বাকি নেই। এক বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলল—‘বচারা ইংরেজ :...এবার বোমা ফেলে যদি বাড়ি ভাঙতে হয় তো বোমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও ওদের আনতে হবে।’

সেতেন বালিনকে আজ দেখলে আর চেনা যায় না। শহরের বাইরে মাঠের পর মাঠ পড়ে আছে, কিন্তু ঘাসসুপ নেই। যেখানে বাড়ি ছিল সেখানে আজ ইমারত উঠেছে। যেখানে ইমারত এখনও ওঠে নি সেখানে ঐ ভাঙা-বাড়িই এমন চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় ঐ ভাবেই বুঝি বাড়িটা তৈরি।

বালিনের কুডামে (বুকারক্যাণ্ডামে) এই সবেরই অদ্ভুত সমন্বয়। প্রকাণ্ড চওড়া পথের দু'ধারে প্রাসাদ-প্রমাণ নতুন নতুন বাড়ি। যেখানে বাড়ি হয় নি সেখানে হয় সাজানো বাগান আর না হয় সাজানো ভগ্নস্থল। ওপর তলার খুঁজলে পাথরের তলার এখনও ছ' একটা মুহুদহ হস্ত বা পাওতা যেতে পারে, কিন্তু নীচের তলার, পথের ধারে দোকান সাজানোর উৎকৃষ্ট আর আলোর অন্ধকারানি দেখলে মরা মানুষও উঠে দাঁড়াবে। দোকানে এমন ভিনিস বহু আছে যা যুরোপের বহু শহরে দেখি নি। যেস্তোরায় অপগাণ্ড খাবার, মানুষের অবাধ যাওয়া-আসা। ব্যাশনের কোন বালাই নেই (ইংল্যান্ডে এখনও গাড়ি ব্যাশন, ডেম ব্যাশন, চিনি ব্যাশন।) কিউ'র কোন প্রয়োজন নেই, কানের কোন অভাব নেই।

রক্ত দিয়ে অতরহ প্রকাণ্ড মার্কিনী গাড়ি ছুঁতে জার্মান নব্বর যুদ্ধে এটে। দু'হাতে অস্ত্র মার্কিনী টারিস্ট বৃদ্ধে কাঁধে ক্যামেরা তুলিয়ে দু'হাতে তলার ছড়াতে ছড়াতে। এককথায় বলা যেতে পারে সুখ-সুবিধার আর ভ্রমণ আকর্ষণে বালিন' এবং পণ্যের

শ্রেষ্ঠতার কুডাম সারা যুরোপে একক ও অনন্য। বলা নিশ্চয়রাজন এ সবই এত সহজে, সঠিকভাবে এবং তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে মার্শাল এডের মাহাত্ম্য আর জার্মান জাতির কর্মতৎপরতার।

সব দেখে শুনে পাঞ্জি বললে, দাদা, আমাদের দেশে এসব হয় না?

শ্রীমতী নারিকার বুদ্ধি ব্রোডের চেয়ে ধারালো; বললে, খুব হয়। সহজ রাস্তাও আছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করি। হারবো তো জানা কথা। বাসু তা হলে ওরাও আমাদের এইভাবে পুনর্গঠনে সাহায্য করবে।

পাঞ্জি প্রশংসা লাগে, বলে, ঠিক।

কথ কথ বললে। আস্তে বলল—আর যদি আমেরিকাকে আপনারা হারিয়ে দেন? আসলে শ্রীমতী নারিকার (অত্যন্ত সব ব্যাপারের মতন) এটা ভুল ধারণা। শুধু মার্শাল এডের জগা এটা সম্ভব হয় নি। হয়েছে জার্মানদের জগা। এইটাই ঐ জাতটার বৈশিষ্ট্য। বা করে তার শেষ রাখে না। যুদ্ধ করল তো দেশের শেষ রাখল না। জু মারল তো বাট লাখ, এখন মার্কিনী ডলার নিচ্ছে তো বালিনকে বানাচ্ছে নিউইয়র্কেরও বাড়ি। আর শেষ রাখে নি হিটলারের এবং নাজীদের।

বালিন ঘাবার আগে আমার অত্যন্ত জানবার কৌতূহল ছিল হিটলার সবকিছু আধুনিক জার্মানীর মতামত কি। কথাপ্রসঙ্গে কথকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে আমার দিকে ও এমনভাবে তাকালে, মনে হল যেন হিটলারনামীর কোন ব্যক্তি, কোনকালে কোথাও যে ছিল তার খবরই ও রাখে না। প্রশ্নটা ক'রেই মনে হয়েছিল হস্ত ও পানিকটা অপ্রস্তুত হবে। ওর ভাগ্যতিক দেখে অথাক হলাম আমি। তখনই মনে মনে ঠিক করলাম আর নয়। আর কাউকে এ প্রশ্ন করা হবে না। যদি সম্ভব হয় হিটলারের অন্তিম নিজেই খুঁজে বের করব।

পারি নি। জার্মানীর বড় বড় শহর ব্রুসেল, হামবুর্গ, স্টুটগার্ট, ম্যানিস্ট, ডসেলডর্ফ, ডেসডেন। ছোট শহরে গেছি, ফ্রাইবুর্গ, ব্যাডেন-ব্যাডেন, বন, হেস; গ্রামাঞ্চলে ঘুরছি, টিটিজ, জ্যাসডেনকেল কিন্তু কোথাও হিটলারের ছবি কো পূরের কথা নামোজ্ঞও শুনি নি। কথাপ্রসঙ্গে আমি যদিও বা নামটা বলছি, অপরূপ গা-ঝাড়া দিয়ে সেটা এড়িয়ে গেছেন।

শুধু হিটলারকেই জার্মানী ভোলে নি। তাঁর কুকার্টি প্রতীকধানে অস্ত্র যে সব দেশ ওদের বিরুদ্ধে হাজারো কুকার্টি করেছে সেগুলোও ওরা ভুলেছে। সারা পৃথিবী একজোটে হ'য়ে ওদের দেশ ধ্বংস করেছে; যুদ্ধ অপরাধের জগা শাস্তি দেবার অজুহাতে ছোটবড় বহু দেশকেই কারাবদ্ধ করা হয়েছে; রাশিরা, ব্রুটন, ফ্রান্স এবং আমেরিকা ওদের বৃকের ওপর ব'সে আজও অবাধে প্রকৃষ্ণ করছে এবং আজ কেনেডি এবং ক্রুশেভ ওদের নিয়ে ক্ষমতার জুয়াখেলা খেলছেন—এসবই ওরা বোমালুম ভুলে গেছে। শুধু ভুলেছে বললে ভুল বলা হবে। এমনভাবে ভুলেছে এবং অস্ত্র সবাইকে তুলিয়েছে যে, আমেরিকা থেকে হাতুধাস পর্যন্ত প্রায় সব দেশই ধ'রে নিয়েছে গত মহাযুদ্ধের মূল কারণ জার্মানী ছাড়া অন্য সবাই। অর্থাৎ ওদের ওঁদাদের অসীমতার অপরাধের বোকা উঠেছে অস্ত্র সকলের কাঁধে।

হিটলার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে গিয়ে আরও একটা মস্তবড় ঐতিহাসিক সত্য ঐ সাতদিনেই আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। নাজী নামে কোন রাজনীতিক-সম্প্রদায় কোনদিনই জার্মানীতে ছিল না!

কোন জার্মানের কাছে এ বিষয় কোন আলোচনা যদি ভুলেও উপস্থাপন করা যায়, ওরা হাসে, কাঁধঝাড়া দেয় আর সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এমন ভাব দেখায় যেন সমস্ত ব্যাপারটা নিতান্তই বিরক্তজনক এবং পুরোপুরি অবাস্তব। আমি ডাবতাম বুকি এ বিষয়ে ওদের একটা অপরাধী মনোভাব আছে। ও হরি! একেবারে উল্টো। নাজী-প্রসঙ্গ তুললেই ওরা এমনভাবে তাকায় যে নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়। ওদের মধ্যে ব্যাটা নিতান্তই বুদ্ধিমান তাঁরা লজ্জা দেন না—ক্ষমাশূলভ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বুকিয়ে দেন যে তরত কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে ও ধরণের কেউ বা কিছু একটা ছিল এ রকম কিম্বদন্তি কখন কখন শোনা যায়!

ওঁরা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ঘটিয়েছিলেন, লাখ লাখ লোক সেই যুদ্ধে মরেছে (তার মধ্যে বেশিরভাগই জার্মান!); সেই যুদ্ধে আদ্যেক পৃথিবী ধ্বংস হয়েছে (জার্মানী প্রায় পুরোটাই!), জু মেরে নির্বংশ করতে গিয়ে নতুন জাতের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল 'ওঁরা' কারা? ওঁরা বলতে জার্মানীর যত্ন-মধু জাম নিশ্চয় নয়! যত্ন বা মধু হয়ে যুদ্ধ করেছে, প্রয়োজনমত আদেশ পালন করেছে আর বিপদে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে। মধুরা কটকাওরাজ করেছে, হাত তুলে হেইল হিটলার বলেছে, বড়জোর হু-চারটে জু-র বাড়ি লুণ্ঠরাজ করেছে। আর জাম? তারা তরত আইকম্যানের আওতায় পড়ে বেলসেনের গ্যাস-চেম্বারে স্ট্রাইটপেছে। তা হলে 'ওঁরা' কারা?—এ প্রশ্নের উত্তর ওঁরাই জানেন না! আমি তো কোঁছার!

হিটলার এবং নাজীতত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পেরে খানিকটা হতাশমনেই দেশ দেখায় মন দিলাম।

কৃথ বললে, চল, কাল সকালে পূর্ব-বাল্টিন পরিভ্রমণ করা যাক।

দেখার কিছু আছে?

হুম্! দুর্দশা!

দেশে রাজনীতিক ও অ-রাজনীতিক বহু ব্যাপারে কৃশী-বাশির সুরে সুরে নানান রকম সাপের নাচ অবশ্যই দেখেছি এবং একবার ছোবল যে খাই নি তাও নয়, কিন্তু সচক্ষে কৃশ শাসনের নমুনা দেখার এমন সুবর্ণমুহুরোগ যে এত সহজ পাওয়া যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। ঠিক হল—পরদিন সকাল দশটার আমরা যাবো।

কৃথ বললে, 'পাসপোর্ট সঙ্গে রেখ'। মাঝে মাঝেই ও এলাকায় পাসপোর্ট চেক হয় এবং সঙ্গে না থাকলে সরাসরি চালামি দেওয়া হয়।

শ্রীমতী নারিকা দেখে শুনে বললেন, দরকার নেই আমার গিয়ে।

আমরা গেলাম। সব মিলে জনা-কুড়ি। নানান দেশের ডেলিগেট। কৃথ আমাদের রথের ভাঙতীর ডেলিগেশনের সভ্যদের মধ্যে আমি আর পাঞ্জি। আরও সঙ্গে ছিলেন 'হিন্দু'র প্রতিনিধি কৃষ্ণমূর্তি। রংয়ে কৃষ্ণ হলেও ঐ মূর্তিটিকে একেবারে চাণক্য। ভাগ্যদোষে

বলে রাজশাসন করতে পারত, সে বিষয় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ওকে দেখলেই আমার ব্যাকরণ মনে পড়ে। চাণক্য আর চাণিকের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কৃষ্ণমূর্তি। অথচ ঐ চালে ভুল করে বল বৃকে ব্র্যাগুনবার্গি গেটের ছোট প্রতীকটা পেন দিয়ে এঁটে। আমরা কেউই লক্ষ্য করি নি। ধরা পড়ল 'পটিন্ডামের প্ল্যাটজ' পেরিয়ে কৃশী এলাকায় প্রবেশ করেই।

কৃশী আদব-কায়দায় প্রচণ্ড হস্তার দিয়ে জার্মান ভাষায় বন্দুকধারী সেপাই বললে, ফেরৎ যাও!

কৃথ অবাক মানলো। নাটকে দল নিয়ে এ অভিজ্ঞতা ওর একেবারে আনিকোরা নতুন। ও অনেক বোঝালো, আমরা অনেক আবেদন জানালাম, কিন্তু কাকশ পরিবেদনা। কেউ কথাই বলে না। আমরা হতাশমনে মুখ চাওরা-চাওরি করছি—এমন সুবর্ণমুহুরোগ বুকি বা বরাতের দোহেই বরবাদ হয়ে গেল।

কৃথ বললে, বুঝেছি।

সোজা গিয়ে কৃথ কৃষ্ণমূর্তির কোটের কলার থেকে গেটের প্রতীকটা খুলে বললে, এবার যেতে পারি?

দেখি!

প্রতীকটা কৃথের হাত থেকে নিয়ে মাটিতে ফেলে তার ওপর পা দিতে, যাবে, এমন সময় মূর্তিভাড়া হা হা করে উঠল। সৈনিকটি কৃষ্ণভাষার দিকে নিম্পলক তাকিয়ে অস্পষ্ট ভাষায় যা বলল, তার মর্মার্থ হল—আর একটি কথা বললে তোমাকেও এই-ই বরষ।

মাস্তাজীর বাচ্চা দমবার পাত্ত নয়। বাস থেকে নেমে পড়ল। আমরা দম বন্ধ করে বসে আছি। কি একটা অঘটন বুকি ঘটে যায়। ও গিয়ে কাঁড়ালো সৈনিকের মুখোমুখি। কৃথ আনার দিকে চাইল। কৃষ্ণভাষা কি বললে শুনি নি, হঠাৎ দেখি নিজেই পা দিয়ে মাড়িয়ে ওটাকে ভেঙে দিল। সৈনিকবর স-উৎসাহে ওর কর্মদর্শন করে বললে, শুট!

লজ্জায় সারাটা পথ আমি আর কৃথের দিকে চাইতেই পারি নি। ওটা হল কৃশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্ত জার্মানীর প্রতীকবাদের প্রতীক।

পটিন্ডামের প্ল্যাটজ-এ তিনটি এলাকা এসে মিশেছে। বৃটিশ, আমেরিকান ও রাশীয়ান। হোয়ারটা কিন্তু পশ্চিম-বাল্টিনে। থামথেরাল জায়গা, ভেঙে লাগে, হাসিও পায়। এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোর্ড লাগানো আছে। বৃটিশ এলাকায় ইংরেজিতে লেখা আছে—'আপনি এবার বৃটিশ এলাকা ছাড়ছেন।' কৃশীয় এলাকায় জার্মান ভাষায় লেখা আছে—'আপনি এবার ডেমোক্রেটিক এলাকায় চুকছেন।' ডেমোক্রেটিক এলাকা মানে কৃশীয় এলাকা, বোধ হয় কৃশীয়রা ডেমোক্রেটিক বলে। স্পষ্টই বোঝা যায় ইংরেজ জনসাধারণকে সাবধান করে দিচ্ছে আর রাশিয়া নিজেদের প্রচার করছে জার্মানদের কাছে। এখানে যে কোন সময় এলেই দেখা যায় বৃটিশ এবং বিশেষ করে মার্কিনী ট্রায়িক্টরা আসেন, বাস থেকে নাবেন, বোর্ডের সামনে কাঁড়িয়ে সবলে ছবি তোলেন এবং কেউ কেউ দূরবীণ এঁটে পূর্ব-বাল্টিনকে ভালো করে দেখে নেন। এরপর তাঁরা দেশে ফিরে 'রাশিয়ার কবলে বাল্টিন' নামে বই যে লিখবেনই, তা বলাই বাহুল্য।

আরও জুদের আরও উজ্জ্বল করে তুলুন  
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস  
মিষ্টি ব্যবহারেই  
তা সম্ভব।



সতর্কীকরণ :-

কিনিবার সময়  
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মুক্তি  
পিলফার প্রফ ক্যাপের  
উপর R.C.M. মনোগ্রাম  
ও প্রস্তুতকারক  
এম, এল, বসু এণ্ড কোং  
দেখিয়া লইবেন।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস - কলিকাতা - ৯

বাস চলল' রানীমান এলাকার মধ্যে দিয়ে।

এখানকার প্রধান রাজপথের নাম স্ট্যালিন আলি। শোনা যায়—হিটলারের আমলে এইটাই ছিল বার্লিনের চোরসি—এবং সারা যুরোপের ঊর্ধ্ব। এখন এর দু'ধারে ব্যারাক বাড়ি আর নীচে লোকান। লোকানে কোন নাম নেই। ব্যবস্যাটা কেঁটের দারিড, অতএব প্রতিযোগিতার বালাই নেই। আলোর দরকার নেই কারণ দুই আকর্ষণের প্রয়োজন নেই। নেবে দেখা গেল গ্লাস-কেসে কিছু কিছু তিনিস অথবা আছে, কিন্তু সাজানোর শোভা নেই আর নামের মা-বাপ নেই। সবচেয়ে অস্বাভাবিক লাগল এই প্রধান রাজপথের দু'মাইল পথে গোপাণ্ডগতি ন'জনের বেশি লোক দেখি নি। ছেলেবেলার ঠাকুরমার মূলিতে পড়েছিলাম পাতালপুরীর দৈত্য এসে রাজকুমারীর চোখে চুঁচ ফুটিয়ে রাজ্যের সবাইকে ঘূমে অচেতন করে দিয়েছিল। ছেলেবেলার সেই কাহিনী রানিয়ার হাতে কাষা পেয়েছে!

পুরে দু'ঘণ্টা গৃহেছি শুখানকার পথে-পথে। দেখেছি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোড়োবাড়ি (পড়ানো হয়); কেঁট অপেরা হাউসের পুড়ে-বাওরা সামনের বারান্দা আর পুড়ে-বাওরা খিলান (অপেরা কিন্তু নিরমিত হয়)। জার্মান রাজাদের প্রাসাদ সেখানে ছিল সেখানে রাজপ্রাসাদ নিশ্চিহ্ন করে বহুতর ১৫; হিটলারের প্রাসাদ সেখানে ছিল সেখানে সবুজ ঘাসের ঢিবি, গোয়েবলস, গোয়েরিং-এর ভাড়া বাড়ির দেওয়ালে বুলেটের বসন্ত দাগ; সারা এলাকার অসংখ্য ভগ্নস্থূপ আর তাদের ওপর আগাছার ভঙ্গল; দেখেছি বহু দোকান, নিত্যস্থান মানুষি ধরনের ও প্যাটানের নতুন খাঁচাবাড়ি, জানলায় ছেঁড়া পর্দা, অধনশ্রু শিশু, গোপাণ্ডগতি তেইশজন মানুষ; অসংখ্য রাজনীতিক শোকার বেশিরভাগই রানীয়ার বদান্ততার জয়গান—করশক্তি বাড়িও, কমুনে যোগ দাও, দিনে তিন ঘণ্টা খেছার ভগ্নস্থূপ

## সনেট

(মাইকেল ডেটন)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়

আর কোনো পথ নেই, তবে নিই চুপে বিদায়।  
আহা, রিক্ত আমি আজ, আর কিছু পারবো না দিতে :  
অথচ খুশি তবু—খুশির উজান এ হিচায়  
এতদিনে অবসর! আহা, পূর্ব খুশি আমি মিতে।  
শেষবার হাতে হাত রাখো, ওগো সব প্রতিজ্ঞাই  
ভুলে যাও। ফিরে যদি হয় পুনঃ আমাদের দেখা  
জেনো কারো কপালের লিখন সে বিধি অভিজ্ঞতাই—  
অথবা উত্তর-প্রেম-প্রণয়ের ফলশ্রুতি রেখা।  
এখন প্রেমের এই গঙ্গাজলী বালির শয্যা  
দেখোই ইচ্ছার বেগ; নাভিস্থান উপস্থিত হলো  
মরণের মুখোমুখি—তবু ইচ্ছা—বিকল—সজ্জার  
প্রার্থনার নিষ্ঠা ব্যর্থ; কি সারল্যে পারো যদি বলে  
এখনো অতীত যদি। জাখো, কোনো আশা নেই, জানি।  
তুমি পারো না কি মিতে শোনাতে সে জীবনের বাণী?

পরিকার কর (না করলে জেলে যাবে আর করলে সরকারি নতুন ফ্ল্যাটের জগা লটারীর টিকিট পাবে একশো ঘণ্টা কাজের পুর।) আর দেখেছি পথের মোড়ে-মোড়ে সঙ্গীরা তোলা সৈনিক।

একটাও গাড়ি দেখি নি; বাস দেখি নি, বেশিরভাগ পথেই একটাও লোক দেখি নি; একটাও রেস্টুরাণ্ট খোলা দেখি নি। যে করেকজন লোক দেখেছি তাদের প্রায় কাউকেই কথা বলতে শুনি নি। বাদের কথা বলতে শুনেছি তাদের হাসতে দেখি নি। মরা মানুষ আগ দেখেছি কিন্তু বেঁচে থেকেও যে মানুষ মরে তা এই প্রথম দেখলাম।

দু'ঘণ্টার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। রুথকে বলি, এবার ফেরা যাক। সবলেই অস্থির, শুধু রুথ ছাড়া। রাস্তার অন্ধকারে যে মানুষটা বছরে একবার আসে এবং দিনের আলোয় যে মানুষটা চার বছর দেখে নি, তার পক্ষে চট করে ঘিরে বাওয়া চারটিখানি কথা নয়। বাস এসে থামল একমুহূর্তের ভাঙা এক জনহীন পথে—প্রকাণ্ড ভাঙা ফ্ল্যাট-বাড়ির তলায়। দোতালার ওর বাবা-মা থাকেন। পথের ধারেই যে ঘর সেইটাই ওর বাবার। জানলাটাও খোলা; তবু রুথের সাহস হল না বাস থেকে নাগে, বাবা বলে ডাক দেয়। বাসের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাড়িটা একবার দেখে নিয়ে রুথ বললে—চল।

ওর ছোট দীর্ঘনিশ্বাসের টানা শব্দটাও মনে হল যেন অন্তহীন আর্তনাম।

আমার মেয়ে কি করছে? আজ রবিবার, দেশে এখন বেলা পাঁচটা। বোধ হয় গানের রাস আরম্ভ হল। সংসার আমার ফটিল ধরেছে এ খবর তো আমার জানা। সে আবার ওর ভবিষ্যৎ হারায়ে এইটাই আমার ভয়। ভবিষ্যতের ভাবনায় নিজেকে খানিকটা হারিয়ে ফেলি।

রুথ তখন রুমালে চোখ মুছেছে।

[ক্রমশ]

## কেউ কি দেখে নি তাকে

সুকুনাব-ভট্টাচার্য

কেউ কি দেখে নি তাকে যখন একান্তে রক্ত বরে,

মাঠ বন সমুদ্রের অন্তিম স্রবয়ে নীল পাখি

ডেকে যায়। হিজুল পলাশ তার অন্তিমের বিজন একাকী—

যখন বরষা ফুল তোল নোওয়া ধূসর প্রান্তরে।

কেউ কি দেখে নি তাকে...ওলো সখি সন্ধ্যা হয়ে এলো—

এই বলে মিলিয়ে যায় নক্ষত্রের মতো নিরুপমা

সন্ধ্যার শরীরে। যেন অবগাহনের দৃষ্টি ছাড়া নির্জন রক্তস্রব—

পশ্চিম পাড়ায়। প্রত্যহ ভোরের শ্রুতি সন্ধ্যার শরীর

ছুঁয়ে আসে, ওলো সখি কান্নিতে পারি না আমি আর..

ফিরে চল...এই বলে কাতিকের ভোরের মতন শান্ত ধীর

দু'হাতে কঙ্কণ নেড়ে চলে যায় প্রসন্ন সংসার।

আমি তো দেখেছি তাকে চোখ তার কান্নার শিশিরে

ভেজা। আমাদের রৌদ্র শীত ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনন্ত শরতে

চলো ফিরে—এই বলে বিহ্বল রাগে কখনো অস্থিরে

নুপুর বাজিয়ে গেল...গেল রৌদ্রে, মিছিলে পূর্বতে।

## আজকাল সংবাদপত্রে তত্ত্ববিদের আত্মহত্যার খবর প্রায়ই

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই আত্মহত্যার মূলে যে কারণটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছে—সেটা হলো প্রণয়। প্রণয় আজ নর-নারীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রেম-জীবনে নানা অভিজ্ঞতার দরুন আত্মহত্যার হিড়িক পাড়েছে এবং সেই আত্মহত্যার দিকে পুরুষের চাইতে মেয়েরাই অগ্রণী। পুরুষের চাইতে মেয়েরা কেন অগ্রণী? মধুমিলনের বার্তা যেখানে যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষকে ‘প্রেম ও প্রীতির মধুনিখার’র আনন্দময় করেছে, আজ সেখানে জীবন বিসর্জনের পালা কেন?

সাধারণ দৃষ্টিতে এই আত্মহত্যার কতগুলো কারণ পাওয়া যায়। সে কারণগুলোর পশ্চাতে রয়েছে আত্মহত্যার পটভূমি। নিয়ে সে ধর্মের কতগুলো কারণ উল্লেখ করলাম :

এক : প্রেম-জীবনে স্থূল বোঝাবুঝির জন্তু সংসার-জীবনে বা সংসার গড়ার পূর্বই একটা বিতৃষ্ণা আসতে পারে। তার ফলে নারিকার মনের সমস্ত আশা বা স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন সে প্রেমতিলক পৃথিবীতে বেঁচে থাকটাকে অর্থহীন মনে করে। পৃথিবীর মুহূর্তগুলো তার কাছে তিস্ত আর বিষবাত্প ভরা বলে মনে হয়। সে বার্ষতার ছালা নিয়ে বেঁচে থাকটাকে এখন তার কাছে ভ্রাসং হয়ে উঠে, তখন পৃথিবীর বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। সরিয়ে নেয়।

দুই : অনেক সময় প্রেমটা হয় এক পক্ষের। প্রেমিক প্রেমিককে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে, নায়ক ভালোবাসে নি বা ভালোবাসতে পারে নি, একটা দৈহিক আকর্ষণে শুধু ফালতু প্রেমের অভিনয় করেছে দিনের পর দিন, আর এখনই সেটা প্রকট হয়ে বস পড়েছে প্রেমিকার চোখে, আশা প্রবলিত হয়েছে, তখন প্রেমিকা দিন-রাত্রির অন্তরঙ্গের মধ্যে বেঁচে না থেকে মৃত্যুকেই প্রের বলে জেনেছে—জানে।

তিন : উভয়ের নিবিড় অন্তরঃসংসর্গের ফলে প্রেমিকা অন্তঃসেবা করেছে। প্রেমিককে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড় করতে শুরু করে। তা ছাড়া উপায় কি? নায়ক সামাজিক মর্যাদার ভয়ে বা আর্থিক সংকটের দরুন বা প্রেমিকার কাছে এতদিন ধরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রাসাদচুখী যে লোকচর দিয়েছে, তার আসল রূপ প্রকাশ হবার ভয়ে অলক্ষ্য সরে পড়ে। প্রেমিকার কথা ভুলে যায়। সে অবস্থার নায়িকা কি করতে পারে? তার যদি পারিবারিক মর্যাদা থাকে, পারিবারিক সংস্কার থাকে তবে পরিবারের মর্যাদা ও সংস্কারকে রক্ষার জন্তু, নিজের ব্যর্থ-প্রেমের জ্বালাকে জুড়োবার জন্তু মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। যারা কচিশীলা তারা কোনদিন অপারেশন বা অসামাজিক জীবনযাত্রাকে বেছে নিতে পারে না। তাই মৃত্যুকে তারা সবচেয়ে বড়ো আপনজন বলে মনে করে।

চার : আর্থিক সংকট প্রেম-জীবনে আত্মহত্যার আরো একটি মুখ্য কারণ।

পাঁচ : একদিকে অসবর্ণ প্রণয় অন্যদিকে পারিবারিক গোড়ামি প্রেম-জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

ছয় : বিবাহিতজীবনে আত্মহত্যার কারণ ঘটে পরস্পরকে জানাশানিতে ভুল কথা বলা দরুন। ভালোবাসার গোড়াপত্তনের পর থেকে নারী-পুরুষে উভয়ে উভয়ের গুণগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

## আত্মহত্যা ও প্রেম

সুখান্ত চৌধুরী

ব্যক্তিগতজীবনে কারো কোন দোষ বা অপরাধমূলক কিছু থাকলে তা চাপা পড়ে থাকে ভালোবাসার পেপার-ওয়ারের নিচে। বিয়ের পর নানা পরিস্থিতির মধ্যে বা সাংসারিক-জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সে দোষগুলো প্রকটিত হয়ে উঠে। ভালোবাসার জীবনে উভয়ে উভয়ের রূপ-রস-গন্ধ-গানে বসন্তকু আকৃষ্ট হয়েছিল, বিয়ের পর প্রকটিত হওয়া দোষগুলোর প্রতি নিকৃষ্ট ধারণা নিয়ে ততখানি আকৃষ্ট হয় এবং সেটা সংক্রামক ব্যাধির মতো মনকে ঘিরে থাকে। তারপর তর্ক-বিতর্ক বগড়া-ঝাঁট সংসার-জীবনকে বিধিরে তোলে। নারী বলে—এমন জানলে, এমন ছোট মনের পরিচয় পেলে কখনো তোমার বিয়ে করতাম না। তুমি একটা জঘন্য। পুরুষ বলে—তুমি এমন নীচ মনোবৃত্তির মধ্যে থাক জানলে কখনো তোমার ছায়া মড়াভাতম না ইত্যাদি। তার ফলে ঘটে ডাইভোস, আত্মহত্যা। আত্মহত্যাটা অনেকক্ষেত্রে না ঘটলেও মনের দিক থেকে অবশ্যই ঘটে।

সাত : অনেক নায়ক-নারিকা পরস্পরের প্রেমে পড়ে, অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনের শত বাধা-বিপত্তিকে অমান্য করে বিবাহ-বন্ধনে বন্দী হয়। নতুন সংসার গড়ে তোলে। কালক্রমে একঘেয়ে জীবন, আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদের অশুশোচনা, স্বামীর আসক্তিশীল ব্যবহার মনটাকে ধীরে ধীরে আনন্দহীন করে তোলে। তখন সংসারে আর সার থাকে না, সঙটাই থাকে। অসারতা এসে সংসারকে আছন্ন করে ফেলে। আত্মদানির দহনজ্বালায় জ্বলতে-জ্বলতে জীবনে বেঁচে থাকটা এখন অসম্ভব হয়ে উঠে, তখন চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

আট : কলেজ-জীবনে প্রণয়ের কালে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নায়কের স্বপ্ন থাকে, আজ বাবার বা অভিভাবকের অধীনে থাকলেও ডিগ্রী নিয়ে ভালো চাকরী পাবে। দু’টি জীবন এক হয়ে সোনার সংসার রচনা করবে। কিন্তু পাশ করার পর বাস্তবক্ষেত্রে এখন ফিরে আসে, চাকরীর উন্মোচনী করতে করতে জীবনটা তিস্ততার, নৈরাশ্র্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, আর্থিক সংকট জীবনযাত্রাকে দিশাহারা করে তোলে, ঘরের বাইরের নানা কষ্ট মস্তব্য জীবনকে জর্জরিত করে তোলে, তখন এতো আত্মদানি নিয়ে বেঁচে থাকটাকে দুর্বিষহ হয়ে উঠে—নান্দ্যত্মজীবনের সমস্ত স্বপ্নটা ‘মেশাকার’ হয়ে যায়—মৃত্যুর হাতছানি তখন পরম পাওয়া বলে মনে হয়। ফুল করে যায় পৃথিবীর ধূলা-কাদায়।

নয় : টিউটর আর ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় জন্মে আরো একটি অঘটন ঘটেতে পারে। টিউটর আর ছাত্রী পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে-থাকতে বা আসা-যাওয়া করতে করতে স্বাভাবিক নিয়মে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মে। টিউটর বেকার। চাকরীর দাখল ঘুরতে ঘুরতে দিন কাটায়। টিউশনির পরসটা দিয়ে কোনরকম পেটের ভাতটি জোগায়। কিন্তু প্রেম এখন আসে, সে বেকারত্বের কথা মনে থাকে না। প্রেমের দুর্বার আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তার ফলে, দৈহিক সংযোগও ঘটে। চারী অন্তঃসত্ত্বা হয়। মাকীর চিত্তভরা প্রেম নিয়ে বিতর্কিত

জীবনের প্রানিকে সঙ্গে নিয়ে গা-ঢাকা দেয়। ছাত্রী নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যাকে প্রেম মনে করে, নয়তো গার্ভেনের চাপে গর্ভপাত করতে বাধ্য হয়।

দশ : অতিমাত্রায় সেক্টিমেটালের দরুন মেয়েরা বোঁকের মাথার আত্মহত্যা করে বসে।

এগারো : মেরেকে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দেওয়ার ফলে বা এক বর দেখিয়ে অস্ত্র বরকে বিয়ে দেবার ফলেও আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এমন নজীর বিরল নয়।

বারো : অনেক ক্ষেত্রে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা আত্মীয়ের সঙ্গে নিবিড় প্রেম, আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। একান্ত নৈকট্যের মধ্যে থেকে প্রেম জন্মেছে বা দৈহিক ক্ষুধার কাছে নিজেদের সংবরণ করতে পারে নি, সে ক্ষেত্রে ধরা পড়ার ভয়ে বা ধরা পড়ে, বিয়ে হবার কোন উপায় না দেখে মৃত্যুর গলেই বরমালা দেয়।

তের : আবার অনেক ক্ষেত্রে কামনালিপ্সু কতগুলো মানুষ (?) নারীকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। সে ক্ষেত্রেটা বিবাহিত বা অবিবাহিত দুই প্রকার নারীর ক্ষেত্রেই আসতে পারে বা ঘটতে পারে। পুরুষ নিজের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য অথবা লোভনীর ব্যবসা ফাঁদবার জন্য নানা প্রলোভনে বা জোরপূর্বক বিবাহিত-অবিবাহিত নারীকে সমাজ থেকে অসামাজিক জগতে টেনে আনে। তার উপর নির্বিবাদে অত্যাচার চালায়। সে ক্ষেত্রে ছাড়া পেলেও নারীর আর সংসারে ফিরে যাবার পথ থাকে না, আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের কলংকিত-দখলিতজীবন ও যৌবনকে শেষ করে দেয়। আর যদি বাঁচার তাগিদ থাকে তবে অঙ্গগুলির গুটোটা বাতাসের সংগে হাস্য-লাস্যে রূপোপজীবিনীর ডুমিকা নেয়।

চৌদ্দ : অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকটাও আত্মহত্যার একটি মুখ্য কারণ। সৃষ্টির অনন্ত-বৌন-সম্ভারে একটি নারী পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার যৌবন অনাব্রত রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, চিরন্তন কামনার হোমানল থেকে অনেক মেয়েই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কামনা তাকে পঞ্চাৎ-পর ভুলিয়ে দেয়, প্রেমে-অপ্রেমে তার যৌবনকে পুরুষ-নিপীড়নের হাতে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। কামনার হোমায়িতে নিজেকে আহুতি দেয়।

এ সব ছাড়া আরো নানা কারণে আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান আত্মহত্যার কারণ উল্লেখ করলাম শুধু, বা নিরুভই দেখছি—সুন্দরি। উল্লেখিত কারণগুলো কতদূর সত্য বা তাৎপর্যপূর্ণ তার বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকা। ভুক্তভোগীরা। আমি মনস্তাত্ত্বিক নই, বৌনবিদ নই, দেখাটাকেই লেখার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছি। তার ভেতর অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, সেজন্য সহানুভূতিশীল পাঠক-পাঠিকা মাঝেই ক্ষমার চক্ষু দেখবেন—এটা আশা করি।

প্রেম-জীবনে বার্ষতার হিড়িক পড়েছে অজ্ঞকাল। আমাদের দেশে দিনের পর দিন শিক্ষা-প্রসারের সংগে সংগে আত্মহত্যার ক্ষেত্রটাও প্রসারিত হচ্ছে। বোল থেকে পশ্চিমের মধ্যে যাদের বয়স তাদের মধ্যে এই হিড়িকটা বেশি। পাশ্চাত্যে আত্মহত্যার এত হিড়িক নেই—বিশেষ করে প্রেম-জীবনে। তারও অবশ্য কতগুলো কারণ আছে।

প্রথমত তারা সে নায়ক হোক বা নায়িকা হোক, নিজের উপর দারিদ্র্যশীল, আত্মশীল। একটি প্রেমের বার্ষতার দমে যাবার পাঁজ-পাঁজী ওরা নয়। মানসিক দিক দিয়ে তারা খুব সখশ। তা ছাড়া আমাদের দেশের মতো সংস্কারের পরিপন্থীও তারা নয়। মৃত্যুও বার্ষতার তারা সহজে কাবু হয় না। এক বার্ষতাকে ঢেকে নতুন ভাবে সংসার গড়বার স্বপ্ন দেখে তারা—সংসার গড়ে। এই ভাঙাগড়া তাদের জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। বিচ্ছেদ ওদের কাছে সচরাচর চিরস্থায়ী বন্ধন হয়ে উঠে না। মন মজলো—ঘর বাঁধলো, মনের ঢাকা বিকল হলো—আবার ভেঙে দিল, আবার নতুন ঢাকা জুড়লো। কিন্তু আমাদের দেশের রুচি, কৃষ্টি, সমাজ জ্বালাল। আমাদের দেশের নর-নারীদের প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে ‘রুচি’ বা মূল বলে একটা বস্তু আছে, যা অন্তরের প্রত্যন্তে গিয়ে পৌঁছয়। সে মূল যদি ষণ্ণ ধরে তবে নতুনভাবে বাঁচতে বা সংসার গড়তে তাদের রুচিতে, সমাজে ও সংসারে বাধে। মনের দিক দিয়ে তা সাড়া দেয় না। তারা এককের প্রতি রুচিশীল—শুদ্ধাভ্যাস, বহুলের প্রতি নয়। তাই আমাদের জীবনে এতো বিপর্যয়।

দ্বিতীয়ত পশ্চিমী দেশের ছেলেমেয়েরা যে অবাধ মেলামেশার মধ্যে মাহুয হয়, সে মেলামেশার মধ্যে বড় হতে হতে স্বাভাবিক জীবনের রোমাঞ্চটুকু অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে কমে না কারণ, এতদূর মেলামেশার ব্যবহার আমাদের দেশে নেই—গার্ভেনের দেন না। তার ফলে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি একটা অনাস্বাদি রোমাঞ্চ নিয়ে বড়ো হয়। আর বখনি কোন পুরুষ বা নারী ছল-ছুতা অথবা নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে পরিচিত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। সে আকর্ষণ কালক্রমে জানাজানিতে—তারপর মন নিয়ে টানটানিতে আর বেশি সম-লাগে না। সকল যুক্তিকে অগ্রাহ করে সামান্য একটু মুক্ত আনন্দে জন্ত উভয়ে লাগারিত হয়ে উঠে—বা পশ্চিমী দেশে সহজে হয় না।

তৃতীয়ত ও দেশের নর-নারীর মধ্যে প্রেম-জীবনে বিরাট নৈরাশ ও বার্ষতা এলেও কর্ণ-জীবনে ওরা অটুট থাকে। আমাদের দেশে মতো এতো ভেঙে পড়ে না। কিন্তু আমরা ভেঙে পড়ি। প্রেমে আঘাতকে আমরা চরম আঘাত বলে মনে করি। আঘাতটা আমাদের কাছে চরমই। কারণ, একটি পুরুষের জীবনে অনেকগুলো মেয়েকে পাওয়া যেমন আমাদের সংসার-ধর্মের কাম্য বস্তু নয়, তেমনি একা নারীর জীবনে অনেক পুরুষকে চাওয়াও কামনার বস্তু নয়। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের রুচি ও আদর্শ একটা পবিত্র ভাবধার নিয়ে থাকে।

সে বাক, ওদেশের কথা আমরা আলোচ্য বিষয় নয়। ধানিকট মনোবলের বৃষ্টিস্ত হিসেবেই উল্লেখ করলাম। তা ছাড়া ও দেশে মতো আমাদের দেশে যোগ্যতা থাকলেই চাকরী সহজলভ্য নয়। আলোচনা হচ্ছে প্রেম ও আত্মহত্যাকে নিয়ে।

সাধারণ তরুণ-তরুণীর মধ্যে যে আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটছে তার কারণগুলোর মধ্যে ‘প্রণয়টাই’ অঙ্গতম কারণ। প্রেম-জীবনে মিলনের চেয়ে বার্ষতাই আসছে বেশি। অনেক বার্ষতার সংবাদ আমরা পাই—অনেক অনেক বার্ষতার সংবাদ আমরা পাই না। তরুণ-তরুণীর জীবনের এ জাতীয় নানা সমস্যা নিয়ে ‘মাসিক বসন্তমতী



আর 'নরনারীতে' করে কটা প্রবন্ধে আলোচনা করেছি পূর্বে। রচনাগুলো পাঠক-পাঠিকার ভালো লেগেছে জেনে, এই প্রবন্ধটিও তাঁদের সামনে তুলে ধরিছি।

একটা কথা সর্বাধিক স্বীকার করতে হবে যে, প্রেমের মধ্যে কোন অপরাধ নেই। এটা বয়েসের ধর্ম। যুক্তিতর্কে এর মীমাংসা নেই। একজন আর একজনকে অন্তর দিয়ে চাওয়াটাই হলো প্রেম। যে প্রেম দ্বন্দ্বের গভীরে গিয়ে মূল বিস্তার করে। অন্তর-জগতে ফুল ফোটার। জীবনকে সুরভিত করে তোলে। প্রেমের 'ডিক্লিনেশন' দিতে গিয়ে ডোনাভি পোটার গডভেজ বলেছেন,—Love is an emphemison. It means practically anything and all that one wants it to mean. It is a polite word for sexual intercourse. It is a word for the feeling a mother has toward a child. It is the word that is used for the feeling God has toward his children. It is the way we feel toward chocolate ice-cream, it we particularly like ocolate ice-cream. It expresses our willingness or eagerness to go to the mollies with some ore. It is the word that is used to express patriotism. It is the word that is used in connection with the affection human beings have for other human beings—the love of mankind অর্থাৎ অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যে সাযোগ, সে সাযোগটাই হলো প্রেম। ভক্তিক-প্রীতি স্বর্গ। সবই এ প্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত। যে প্রেমটা আজ বিকৃত হতে চলেছে, বার্থ হতে চলেছে, সেটা হলো নরনারীর প্রেম।

প্রেম-জীবনে বার্থতা আসার সাধারণ কতগুলো কারণ আছে। সে কারণগুলোর দিকে আমরা যদি নজর দিই খানিকটা তবে প্রেম-জীবনের বার্থতার সংখ্যা কিছুটা কমবে বলে মনে হয়। সে কারণগুলো উল্লেখ করে সাধামতো তার বিশ্লেষণ করলাম নীচে—

এক : আর্থিক সংকট—আর্থিক সংকট প্রেম-জীবনের সব চেয়ে বড়ো শত্রু। আর্থিক সংকট মানুষকে অমাহুয করে তোলে। বিবেকবুদ্ধিকে বেশপু পরিচালিত করে। মানুষের অন্তরের রসকে নিগুড়ে নেয়। হাসি-আনন্দকে কেড়ে নেয়। প্রেম-জীবনকে বার্থ করে দেয়। আর্থিক কাছ প্রেমের মূল অকালে শুকিয়ে যায়। সুতরাং সর্বপ্রথম আর্থিক সংকট দূর করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। সুখা যেখানে—সুখা সেখানে নেই। প্রেম সেখানে পাশব-প্রবৃত্তিকে জাগায়। প্রবঞ্চনাকে জাগায়। অর্থহীনের কাছে প্রেম স্বর্গীয় কিছু হয়ে আসে না, হান্সাপদ বস্তু হয়ে আসে। স্বর্গ সেখানে নরক। অতএব আর্থিক সংকটকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে আগেই।

দুই : সামাজিক বা পারিবারিক গোড়ামি—সামাজিক বা পারিবারিক গোড়ামি প্রেম-জীবনকে বার্থ করে দেয়। স্ববর্ণ বা অসবর্ণে যেখানেই একটা প্রণয় গড়ে উঠেছে পিতা-মাতা-অভিভাবক সেখানে বাধার প্রাচীর তুলে ঠাঁড়িয়েছেন। আমরা

এটা বিশ্বাস করি যে, কোন পিতা-মাতাই তাঁর ছেলে বা মেয়ের খারাপ কিছু চান না, কিন্তু যুগটাকে কিছুতেই তাঁরা স্বীকার করবেন না। তার ফলে প্রেম বার্থতার দৃষ্টিকে বৃক নিয়ে বৃকে বৃকে মরছে। হাজারো বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে যে মিলন হয়, সে মিলন সুরের হয় না। কারণ, শত বাধা-বিপত্তির ঠেলায় মন বস্তটা একেবারে শুঁড়িয়ে যায়। মন এমন একটা জিনিস, যে অতি সহজে ভেঙে পড়ে না, আবার সামান্য কারণেই ভেঙে পড়তে পারে। দুর্বিষহ যন্ত্রণাকে টেনে আনতে পারে। মা-বাপ হয় তো আর পাঁচ কি দশ বছর বাঁচবেন, কিন্তু বারা আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে, সংসারে বারা সুখ-দুঃখের ভেতর একটা অনাধিল আনন্দের প্রস্রবণ আনতে চাইছে, বাধা বা গোড়ামির ফলে তাদের আগামী জীবনটাকে তছনছ করে দেন। সুতরাং মা-বাপ-অভিভাবকে একটু যুগধর্মের দিকে তাকাতে অনুরোধ করছি, আর অনুরোধ করছি, যেখানে একটা পবিত্র প্রেম গড়ে উঠেছে বা উঠছে সেখানে একটা কেছা কেলেকারার সৃষ্টি না করে, হুঁটি জীবনকে নষ্ট করে না দিয়ে, নবজীবনের পদযাত্রীদের আশীর্বাদ করতে।

গোড়ামি কোনদিন মানুষের হিত করতে পারে না—বতদূর করে অহিত। ফালতু গোড়ামির আশ্রয় না দিয়ে, একটা অন্ধসংসার বা গোঁয়ারতুমি মনোভাব নিয়ে না থেকে যেখানে মিলনের বাঁধি বেজে উঠেছে সেখানে সুরটা সুরেলা হোক। পূরবী বিদায় নিক। তবে প্রেম-জীবনের আর একটি সমস্যার সমাধান হবে।

তিন : ভালোবাসার প্রবঞ্চনা—ভালোবাসার মধ্যে প্রবঞ্চনা প্রেম-জীবনে বার্থতার আরো কটি কারণ। সে প্রবঞ্চনা নারী বা পুরুষ কোন দিক থেকে হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ দৈহিক সুখের তাড়নার বা মেয়েপক্ষের আর্থিক প্রাচুর্য দেখে একটি মেয়েকে সহজে ভালোবাসতে ফলে। সে প্রবঞ্চনা অজ্ঞান সত্য নিয়েও হতে পারে। কিন্তু জীবনের নানা পর্বে সে প্রবঞ্চিত প্রেমের খুঁশ খুলে যায়, বার ফলে ভালোবাসার মধ্যে ভালো কিছু আর বাসা বেঁধে থাকে না, থাকে বিষ। আশুন।

প্রবঞ্চিত ভালোবাসার মধ্যে নারীরাই বিপন্ন হয় বেশি। ভালোবাসা তাদের কোমল প্রাণে এমন এক অনাস্বাদিত উপলব্ধি এনে দেয়, যে উপলব্ধি প্রেমিককে অন্তর দিয়ে বাচাই করতে তুলে যায়। আপনি গন্ধে আপনিই উত্তলা হয়ে উঠে। বার ফলে ঠকতে হল তাদের, সুতরাং এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যখন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, তখন প্রেম-জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য নারক বা নারিকার অলঙ্ক্যে নারক বা নারিক। ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু, অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করতে হবে।

চার : প্রেম-জীবনে আন্তরিকতা—ভালোবাসা যেখানে মহৎ মর্যাদার অধিকারী, আন্তরিকতা সেখানে একেবারে একান্তক। অন্তর দিয়ে আর একটি অন্তরকে উপলব্ধি করার নাম ভালোবাসা। হুঁটি অন্তরের গভীর উপলব্ধি যেখানে, প্রেম সেখানে মহৎ। প্রেমের নামে ঠীকা বুলির তুবড়ি ফাটলে খোলও সেখানে কেটে যায়। অর্থাৎ আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসো—প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এ প্রশ্ন অবাস্তব। অন্তর যেখানে প্রকাশমান সেখানে প্রেম ও পরিণয়

শাশ্বত। হুঁটি ফুলের গুণের বিকাশ তাদের পাণ্ডুরি মধ্যে নয়, সৌরভের মধ্যে। গভীর প্রেমের দিকে নর-নারী বধন এগিয়ে যায় সেখানে সুখ হয় মুক—অন্তর হয় মুখর। অন্তরের মুখরতা সেখানে নেই। প্রেম সেখানে পদ্মপত্র জলবৎ। সুতরাং কথা ও নীরবতার মধ্যে আসল-নকলের কিছু হদিস অবশ্যই পাওয়া যায়।

পাঁচ : সেন্টিমেন্টাল বা ভাবপ্রণবতা—অনেক যেরে অভিযাত্রার সেন্টিমেন্টাল। প্রেম-জীবনে সামান্য একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঢেউ আনতে পারে তারা। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে অনেক সময় নিজেরের মনোমালিঙ্গটুকুকে গুঁছে ফেলতে পারে না, ফলে প্রেম-জীবনে অশান্তির প্রবাহ এসে ঢোকে। নিজের নিজের দোষগুলোকে ঢেকে অন্তরের দোষগুলোকে বড়ো করে দেখতে চায়, বা দেখতে অভ্যস্ত। এটা অবশ্য সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, কেউ পৃথিবীতে দোষমুক্ত নয়। নানা পরিবেশের মধ্যে মানুষের দোষগুলো প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যেই পাপ আছে, দোষ আছে, মানুষই সেগুলো প্রকাশের সহায়তা করে। সেট মার্ক বলেছেন, All these evil things come from within and defile the man. সুতরাং মানুষ যদি মানুষের গুণগুলো দেখে তবে তার গুণেরই প্রকাশ পায়। দোষগুলোকে সহ্যভূতির সঙ্গে বিচার করে গুণের প্রতি আকৃষ্ট হলে, মানুষ মল থেকে ভালো হয়। এটা জীবন ও জীবিকার সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ছয় : পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা রাখা—পরস্পরের উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখা প্রেম-জীবনে কি দাম্পত্য-জীবনে সুখী হওয়ার আরো একটি মৌলিক সত্য। বিশ্বাসের অভাব হলেই আসে অভিযোগ। সে অভিযোগ থেকেই আসে অভিযাত। তারপর অব্যাহিত বৃত্তি-তর্কের কীসে আটকা পড়ে প্রেম-জীবন তিক্ততার ভরে ওঠে। সংসার-জীবনে নামে ট্রাজেডি। ভালোবাসা যেখানে মধুর—সেখানে সামান্য কারণে অবিশ্বাসের প্রস্র উঠলে ভালোবাসাটা হয়ে উঠে অর্ধহীন। একট পুরুষ বা নারী বিবাহিত-জীবনে কোন বন্ধু, আলাপী বা সহকর্মীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার হুঁটি কথা বললে, তাকে যদি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তবে ধরে নিতে হবে—প্রেম-জীবনে বার্ষিকতার ওটা প্রথম পদক্ষেপ। নানা কারণে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। সমাজে একক স্বামী-স্ত্রী রূপে কাল কাটানো কোনদিন সম্ভব নয়। তাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এদেরকে বাদ দেয়া যায় না।

আপনি পুরুষ। আপনি যদি একটি মেয়ের সঙ্গে সহজভাবে একটু কথা বলেন, তা যদি আপনার স্ত্রীর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, অথবা আপনি নারী, একজন পুরুষের সঙ্গে হাসি-মসকরা করে যদি হুঁটি কথা বলেন, তা যদি আপনার স্বামীর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠে, তবে বুঝবেন, আপনাদের ভাঙনের দিন আর বেশি দূরে নেই। এটাই ভাঙনের সিঁথে রাস্তা। কিন্তু এমন হীনকো মনোবৃত্তি নিয়ে সংসার করা চলে না। আপনি স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীকে চোখে চোখে রাখতে চান বা আপনি পুরুষ হয়ে যদি স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চান, তবে আপনাদের ভালোবাসার সার্বিকতা কোথায়? আর সত্যিকারের যে বাধার তাকে কোনদিন কোনভাবেই ঠেকানো

যাবে না। বার না। আপনি পুরুষ হয়ে যদি মনে করে থাকেন যে, একজনের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মন দেওয়া-দেওয়া ইংগিত থাকতে পারে, তবে ভুল করবেন। সে ভুলের ভিত্তি নিজেই নিজের সর্বনাশ থেকে আনবেন এবং আর একজনার সর্বনাশ করবেন। কারণ, জীবনটা অতো সস্তা জিনিস নয় যে, ভিজ়ে মাটি দেখলেই পা পিছুলাবে। মেয়েরা যাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে, আর পুরুষের কাছ থেকে যদি সে ভালোবাসার উপযুক্ত মর্যাদা পায়, তা হলে কোনদিন পা পিছুলায় না। পিছুলাতে পারে না। পুরুষ বতটা বহিমুখী মেয়েরা তহটা নয়। বিয়ের পর যদি পিছুলায়, সেটা পুরুষের পৌরুষহীনতার ভিত্তি, যুগ্ম মনোবৃত্তির ভিত্তি। সুতরাং প্রেম-জীবনে সুখী হতে হলে পদস্পরের উপর বিশ্বাস রাখাটা সব সত্যের একটি বড়ো সত্য। বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মায়।

সাত : অত্যধিক মেলামেশা—অত্যধিক মেলামেশা প্রেম-জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। ভালোবাসা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশার দরুন বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই মনে হয়, জীবনের বা কিছু আনন্দ সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। কথাবার্তার একটা নিশ্চয়্য তাই স্বভাবতই পরিমলিত হয়। জীবনটা একঘেয়েমীতে ভরে উঠে। তার ফলে সংসার-জীবনে অশান্তি আসতে পারে বা আসা অব্যাহত নয়। অনুরূপ ধরনি ডাঃ কিংয়ের মধ্যেও স্তন্যতে পাই। ডাঃ কিং বলেছেন, Many males are disappointed after marriage to find that their wives are not responding regularly and are not as interested in having as frequent sexual contact as they, the males, would like to have; and a great many of the married females may be disappointed and seriously disturbed when they find that they are not responding in their coitus, and not enjoying sexual relations as they had anticipated they would not a few of the divorces which occur within the first year or two of marriage are the product of these discrepancies between the sexual background of the average females and average males.

দেহটা পার্থিব, প্রেম অপার্থিব। উগ্র দৈহিক লালসার প্রেমের পরিভ্রাতা নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়, যেখানে নর-নারী সবারই সুবুদ্ধি সম্পন্ন। আমি অবশ্য এটা বলছি না, একজনের কোলকাতা একজন সিমলা থেকে প্রেমটাকে গুয়ারলোসের মতো কিছু কড়ন। প্রেমের সঙ্গে দৈনিক কামনাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওটা প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। দেহা-নৈরা জীবনের ধর। মানবিকতার স্বাভাবিক নীতি। তবে কথাটা বলছি এইজন্যই যে, একটি সন্দেশ যদি খাওয়া হয়, তবে তার সুস্বাদু টেক্ট, আর একবার খাওয়ার আগ্রহ জাগায়। আগ্রহকে জ্বিঁয়ে রাখে। কিন্তু একসঙ্গে একসের কি আশের খেলে, টেক্ট বন্ধটা নষ্ট হয়ে যায়, গা বমি-বমি করে। পুনরায় খাওয়ার আগ্রহকে কমিয়ে দেয়, যতটুকু বাড়ায় তা, বিতুল। তা নয় কি?

আট : মানসিক দুর্বলতা বা ভীকতা—মানসিক দুর্বলতা ঘটে

পূর্ণবয়স্কের। একটি মেয়েকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন অনেক পুরুষই দেখে, কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করতে গিয়ে তারা পেছিয়ে আসে। কারণ ভালোবাসার সময় যে সময়সীমা কথাসমূহের চিত্রা করে নি, এখন সেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে মনের জোর হারিয়ে ফেলে। বিয়ে হয় না। এটা ভালোবাসার অজুহাতে একটি মেয়েকে গলা টিপে মারারই সমিল।

প্রেম-জীবনে মানসিক দুর্বলতা পুরুষকে পৌরুষহীন করে তোলে। সেটা অস্বাভাবিক জ্ঞান। ভালোবাসার সঙ্গে নারিকাকে গ্রহণ করার একটা বলিষ্ঠ ভাবধারা অনেক নারিকের থাকে না। ফলে ব্যর্থতা আসে। স্ত্রীরাও ভালোবাসার সঙ্গে-সঙ্গেই মনের জোরও বাড়তে হবে, তীক্ষ্ণতাকে প্রকাশ দিলে চলবে না। প্রয়োজন হলে, সমস্যা সমাধানের জন্য হ'লনকেই অগ্রসর হতে হবে। সে অগ্রগতির মধ্যে প্রেম-জীবনের স্বাদ বাড়বে বৈ কমবে না।

নয় : ধনবৈষম্যতা—ধনবৈষম্য প্রেম-জীবনে ব্যর্থতার আরও একটি মুখ্য কারণ। একটি দরিদ্র পরিবারের ছেলের প্রেমে যদি পড়ে কোন ধনীকন্যা, তবে সে প্রেমকে নস্যতে উড়িয়ে দেন কস্তার 'গার্জনে'। গরীবের ছেলের ভালোবাসাটা তাঁদের কাছে হাস্যাম্পদ ব্যাপার। সে ভালোবাসাকে মেয়ের ধৌন-উন্নাদনা ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। সেরান-সেরানে কোলাকুলি না হলে সে প্রেম স্বীকৃতি পায় না। ফলে-মেয়ের কথা একটু চিন্তা না করে মেয়েকে আরন্তে আনার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ মেয়ের বাপ হয়ে পরোক্ষভাবে মেয়েকে হত্যা করেন। প্রেম-জীবনে এতো আত্মহত্যা দেখেও তাঁদের বিশ্বাস্তান লাভ হয় না। তাঁরা ব্যামশংকরের দল। তাঁরা যদি তাঁদের মেয়ের সুখই কামনা করতেন, তবে প্রেমটাকে অস্বই স্বীকার করতেন। মেয়েকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতেন না। সেরানে-সেরানে কোলাকুলি দিতে গিয়ে তাঁরা যে প্রচুর অর্থব্যয় করেন, সে অর্থ যদি গরীব ছেলের জন্য ব্যয় করতেন, তবে ছেলের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং তাঁদের মেয়েও সুখী হতো। কিন্তু তাঁদের অভিজাত্য তাঁদের অমন সুবুদ্ধি দেয় না, যা দেয় তা সিনেমা-থিয়েটারে।

ধনবৈষম্য সংসার-জীবনেও ব্যর্থতা আনতে পারে। কোন গড়োলাকের মেয়ে যদি কোন গরীব ছেলেকে ভালোবেসে, প্রেমিকের রমস্ত দরিত্রতাকে মাথা পেতে নিয়ে অর্থ-হুঃখে ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই দৈন্যিক দরিত্রতার চাপে ফেলে-জাসা দিনগুলোর কথা ভাবতে থাকে। মনে মনে হুঁটি সংসারের তুলনা করে। কোন ব্যক্তবীর নৈর্ধর্ষ দেখে মনে মনে ঈর্ষা জন্মে। সে ঈর্ষা থেকেই জাগে মনুশোচনা। একদিন যে বিস্তকে পরিহার করে চিত্তের টানে এ সংসার গড়ে তুলেছিল, আবার বিস্তের অভ্যাপার মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। প্রতিশ্রুতির কথা মনে থাকে না। যার ফলে ধার্মীর হৃৎখেয় সংসারটা একটু হয়ে দেখা দেয়। সংসার অসার হয়ে উঠে। স্বামীর সমস্ত হৃৎখ আর দৈন্যকে নিজের অংশভাগ হিসেবে গ্রহণ করে সুখী দাম্পত্যজীবন উপভোগ করতে খুব কম

মেয়েই পারে। কিন্তু প্রেম বেখানে শাস্ত সেখানে হৃৎখ আর দৈন্যকে বুক পেতে নিয়ে সংসার গড়তে হবে, না হলে হুঁটি জীবনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যার।

বা হোক, মোটামুটি যে ভালোচনাটা একরূপ করলাম, তার ভেতর দিয়ে আমাদের চিরন্তন সমস্যাটার কতখানি আলোকপাত করতে পেরেছি জানি নে এবং এই রচনার ভেতর থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার কতটুকু উপকার হবে, কতটুকু গ্রহণীয় আছে, বা আদৌ আছে কি না জানি নে, তার বিচার করবেন পাঠক-পাঠিকা। দিনের পর দিন প্রস্তুতি জীবন যেভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর পৃথিবীতে এসে তিস্ত মর্যাতনা নিয়ে বার চিরবিদায় নিচ্ছে তাদের নিয়েই এই ভালোচনা। তাদের নিয়েই এ ভালোচনা, যারা প্রেমে পড়েছে, পড়েছে, পড়বে। অতীতের তিস্ত অভিজ্ঞতার ভেতর প্রথিত-ভবিষ্যৎ স্মৃতি হোক, এটাই আমার প্রধান বক্তব্য। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে মধুর সে প্রেম মধুরেণ হোক—এটাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। পৃথিবীতে সবই প্রসূমো-কিলার নয়। তারা বৌনকে ভালোবাসে, আমাদের ভালোবাসতে হবে জীবনকে। জীবনের ভেতর দিয়েই বৌবনের মধুর ও নিবিড় সান্নিধ্য। প্রেমের পরিণতি আত্মহত্যার নয়—মিলনে। নিজেরা যদি পরস্পরকে ভালো করে জেনে নিই তবে দাম্পত্যজীবন সুখেরই হবে আশা করি। কারণ বিবাহ জিনিসটি সামান্য কিছু নয়, Ludovic Halevy-র কথা দিয়েই বলছি, Marriage is not a trifling thing. If a mistake is made it is for life. So it's well to know what one is doing when one takes the plunge.

১৩ই জুন নিউ সেক্রেটারিয়েটের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে প্রেমের মর্যাতনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে একুশটি বসন্তের স্বপ্ন-সান্নিধ্য পাওয়া স্নানন্দা মজুমদার। সংসার তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু স্নানন্দা জানে না, তার সাতাশ বৎসরের প্রেমিক অল্পসেই দিনে ঠিক চারদিন পরে বিধবানে স্নানন্দার অঙ্গুগমন করেছে।

হুঁটি ফুল অকালে যাবে গেল পৃথিবীর স্বপ্নোজ্ঞান থেকে। তাদের নির্মম মৃত্যুই আমাকে এ প্রবন্ধ রচনার উৎস্ক করেছে। অনেক মর্যাতনা নিয়ে এ প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। তবু লিখেছি, আর যাতে নষ্ট না হয়। স্নানন্দা-অল্পককে দেবার মতো আমাদের কিছু নেই। যে নির্মম পৃথিবী তাদের প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় নি, মৃত্যুর মহামিলনে তাদের প্রেম অমরত্ব লাভ করুক—তাদের পবিত্র আত্মার প্রতি আমাদের এই সহামৃত্তিঙ্গীল কামনা।

আর, আমরা যারা নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা, আমাদের যাত্রাপথ হোক মধুর—

মধুবাতা স্বভাবতে মধুরবস্তি সিদ্ধবঃ।

মাধ্বীন : সজীবনী :।

মধুনস্তুম্যতোবাসো মধুমং পার্থিবঃ রজঃ।

মধুজোরস্ত নঃ পিতা।

মধুমাত্রো বনস্পতিমধুমস্ত সুখঃ।

মাধ্বীগর্বো ভবন্ত নঃ।

ও মধু ও মধু ও মধু।

মাসিক বহুমতী কিছুন ● মাসিক বহুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন।



বাড়ীতেই সার্ফে কাচুন, দেখুন কত তফাৎ! সার্ফে সব কাপড় সবচেয়ে ধবধবে, সবচেয়ে  
 পরিষ্কার আর সবচেয়ে সহজে কাচা হয়। সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি! বাড়ীর  
 সব জামাকাপড়ই সার্ফে কাচুন... সার্ট, শাড়ী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবকিছুই।

# সার্ফে কাচা সবচেয়ে ফরসা

BU. 63-146 30

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

তার বছরের এই দিন—আর এই বছরের এই দিন—

কত তফাৎ হেলেনের জীবনে! গত বছরের জুলাই মাস ছিল আউসধানের মতো। তাজা—অমাবস্তার নির্দেশ ব্যতিরিক্ত মত গাঢ়—এখন এসেছে গংগাজানের পর শশানবন্ধনের নীরবতার ভার। পৃথিবী একবার মাত্র সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এসেছে—আর সেই ঘূর্ণনে আলাদা হয়ে গেল ওরা দু'জন। গত বছরের জুলাই—ওর একার ছিল না। ছিল ওদের দু'জনের। এ বছরের জুলাই—ওর একারই। তবু পরিপূর্ণভাবে নয়—আরেকজনেরও বৃষ্টি ভাগ আছে সেখানে। সে অশোভন নয়—তবু অশোভন। ওরা দু'জন কি একই পৃথিবীতে থাকতে পারতো না? পৃথিবী তো কত ছোট? এই ছোট পৃথিবীর পৃথ তো ওরা দু'জনেই দেখেছিল—মারো ছোট—মারো ছোট করতে চেয়েছিল। কেন সে পৃথিবীর দু'দুই আরো বড় হল?

বার্মিংহামে অশোভনের তখন তিন বছর থাকা হয়ে গেছে—যখন ওর হেলেনের সংগে প্রথম আলোপ। বার্মিংহামে তিন বছর—আর এই দেশে সাড়ে-তিন। আমিই বং ওর তুলনার ছিলাম নতুন। আদব-কায়দা আমাকে ওর কাছে শিখতে হলেও—একটা ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক পেছিয়ে ছিল—সেটা হল বান্ধবী বোগাড় করা। আমার কলা-কুশলতার ধার-কাছ অবধি ও যেসতে পারতো না—আমার আটের সাক্ষরদী করার সামান্য একটু ইচ্ছে অবধি ওর ছিল না। তাই ওর অবস্থা হয়ে থাকলো—ন বান্ধী ন তক্তো ভাবের মত।

অশোভনের বয়স কিন্তু নেতাজ্ঞ ছিল না—সাতাশ চলছিল তখন। আমারই সমান। আমরা একই বাড়িতে থাকতাম তখন—বেশ কিছুদিন ধরে। ওর স্বভাব ছিল—চিরকালই চাপা; তাই বেশি কিছু জানতামও না ওর সম্পর্কে। আর আমার সময়ও ছিল না বিশেষ। থাকতাম নিজের ধান্দার, পবের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার না ছিল সময়—না ছিল প্রবৃত্তি। তবু মাথা ঘামাতে হল—ওর ব্যাপারে।

সেটা উইক-এণ্ড নয়। কি যেন একটা বার। সন্ধ্যাবেলার দরজার কার টোকা শুনে—দরজা খুলে দেখি অশোভন দাঁড়িয়ে। অভাবনীয়।

‘আব ঘরের মধ্যে, ওকে বললাম, ‘কি ব্যাপার তোর—এই সময়ে হঠাৎ?’

‘দীপকর, একটু ইয়েতে পড়েছি’ অশোভন বললে, ‘তোর কাছে পরামর্শ চাই।’

‘অশোভনের ঘুঘের দিকে তাকালাম। ঠিক ঠাইর করে উঠতে পারলাম না ব্যাপারটা কি হতে পারে। গ্যাসরিং-এ দু'জনের কফির জল চড়িয়ে দিয়ে—ওকে বললাম, তোর আবার ‘ইয়ে’ কি হতে পারে? হয় Drawing-এর Designটা ঠিক হ'চ্ছে না—নয় Office-এর Canteen-এ আর খাওয়া পোষাচ্ছে না। এ ছাড়া তোর আর কি হতে পারে?’

‘দেশের একটা চিঠি এসেছে—বড় ভাবনার পড়েছি তাই নিয়ে। আমি নিজে কিছুতেই এর মাথা-মুণ্ড খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তোর পরামর্শ নিতে এলাম।’—গভীর হয়ে ও বললে।

অশোভনের গল্পের প্রথম অধ্যায় শুনলাম তখন। ওর মত হেলেনের পক্ষে সেটা খুব মামুলী নয়। চূপচাপ অশোভন—কিন্তু একেবারে নিরামিষ নয়। অশোভনের অনেকদিন ধরে দেশের একটি মেয়ের সংগে



স্পেন্সার স্মৃত্ত দত্ত

ভালবাসা আছে। তার নাম চিত্রা। চিত্রাদের বাড়ির সংগে ওদের কুটুম্বিতা আছে—কারণ, চিত্রা হল ওর মামীয়ার ভাইষি। বিলেত আসবার আগে অশোভনের বাল্যখ্যা-প্রেম নিশ্চয় সাবালকী একটা কিছু করার সাহস পায়—(ব্যাপারটা ও খুলে বলল না—যদিও ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, বোধ হয় চুখুচুখু খাবার সময় কেউ দেখে ফেলেছিল)—বার ফলে ঘটনাটা আর পাঁচজনের নজরে আসে। আপত্তি তুলেছিল সবচেয়ে বেশি অশোভনের মামীমা। তাঁর যে কি এতে মাথাব্যথা অশোভন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে নি। আপত্তির কোনও যুক্তি ছিল না—তাই মেয়ের মা-বাবা খুব ইচ্ছেও দেখান নি, অনিচ্ছেও দেখান নি। মামীমা কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকে দিলেন ঘুলিয়ে, বার জন্তে অশোভন আর চিত্রাকে বন্ধুদের মাহকত চিঠি লেখালেখি আরম্ভ করতে হল। সম্প্রতি দেশ থেকে চিঠি এসেছে যে চিত্রার বিয়ের চেষ্টা চলছে—হয় তো কোথাও ঠিকও হয়ে যেতে পারে। আর সেটাই হল অশোভনের সমস্যা।

‘তোর ভালবাসা এখন কোন stage-এ এসেছে?’ ওর গল্প শুনে ওকে জিগ্যেস করলাম।

‘ভালবাসার stage সেটা কি জিনিস?—আমি তো তা জানি না’—অশোভন বললে।

‘মানে—তোর ভালবাসা matured তো? চিত্রা কি তোকে ভালবাসে? তোকে বিয়ে করতে চায়?’

‘হ্যাঁ ভালবাসে নিশ্চয়ই। তবে বিয়ে করতে চায় কি না জানি নে। কি করে জানবো? বলা, আমি তো জিগ্যেসও করি নি এখনও।’

‘ওর বিয়ের চেষ্টা চলছে খবর শেলি’ কোথা থেকে—চিত্রার কাছ থেকে?’—

‘হ্যাঁ বলে অশোভন একটা খাতার হিজিবিজি কাটতে শুরু করে দিল। আমার চিঠি লেখার নতুন প্যাড সেটা।

‘হিজিবিজি কাটিনে না অশোভন—ওগুলো তোর এলোমেলো চিন্তার প্রতিচ্ছবি—তা বৃষ্টি তো? এখন বল কি করবি?’

‘কি করবি? তুই তো আমাকে বলবি আমি কি করবো বার জন্তে তোর কাছে এলাম পরামর্শ চাইতে, আর তুই উন্টে আমাকে জিগ্যেস করছিস—আমি কি করবো। তুই বল না—কি করবো?’—

‘হু’—তা তো বটে, বললাম—তারপর একটু চুপ করে থাকার পর বললাম—তোমার মামীমার ভাই, মানে চিত্রার বাবাকে একটা চিঠিতে খোলাখুলি লিখে দে যে আমি চিত্রাকে ভালবাসি আর চিত্রাও আমাকে ভালবাসে, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।’

‘চিঠিতে ঐ বরষ ভুললোককে এসব ভালবাসাবাসির কথা লিখবে?’ শ্রুশোভন ভুল কুঁচকাল।

‘ভুললোকটি তো বরষ হয়েছেন—তুমি কি হামা দিচ্ছ এখনও যে এসব কথা লিখতেও সকেচ? তোমার লজ্জা করে না বুড়া বাড়ী।’

শ্রুশোভনের আত্মমর্দাদার বোধ হয় একটু লাগলো। তাই আমার কই কথাগুলো পকেটস্থ করলে।

‘আচ্ছা দীপংকর, ওরা যদি বলে আমার দেশে যেতে আর কত দিন লাগবে—পরীক্ষা কবে শেষ হবে—তো কি বলব?’

‘ওসব ঝোপ বুঝে কোপ মারার ব্যাপার। হয় সত্যি বলি—নয় ধান্না দিবি, তোর পরীক্ষা শেষের তো দেরি নেই—ওরা কি মেয়েকে সুলিয়ে রাখতে পারে না? আর কেমন লোক বা ওরা যে, এমন বিলতে-ফেরত সুপাত্তর একটা—তার—জন্তে মেয়ে বসিয়ে রাখতে পারে না?’ তারপর মিটিমিট করে তাকিয়ে বললাম, ‘তোমার চিত্রাকে দেখতে কেমন রে? ডান-কাটা? প্রেম করছিস—অথচ, তোর ম্যাট্রলপীসে একটা ছবিও রাখিস নি? বলিহারি।’

‘চিত্রার ছবি দেখিবি—আমি আমার সাগে আমার ঘরে,’ শ্রুশোভন বললে।

‘আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে এলাম শ্রুশোভনের ঘরে। স্টুটেকেশ খুলে ও একগোছা চিঠির মধ্যে থেকে দু’টো-তিনটে ছবি দেখে তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিল—তারপরে আমার হাতে দিল এগিয়ে, ভাল করে আমি ছবিটা দেখলাম। ঝুঁড়িতে তোলা ছবি, একটা মানুষ-প্রমাণ উঁচু ছোট টেবলের মাথায়—পেতলের টবে ছোট পাম গাছ বসান—তার পাশে একটি মেয়ে ঝাঁড়িয়ে। দেখতে সাধারণই। আমি মন দিয়ে ছবিটা দেখছি, হঠাৎ শ্রুশোভন আমাকে আবার প্রশ্ন করলো, ‘আচ্ছা দীপংকর, ওরা যদি না বলে তো কি হবে?’

‘ওরা না বললে ভাববার কি আছে। তুই চিত্রাকে লিখে দিবি তখন ও যেন অস্ত্র কোথায় বিয়েতে রাজী না হয়। তারপর দু’এক বছর পরে তুই দেশে গিয়ে ওকে বিয়ে করবি। ভাল কথা—ওর বরষ কত?’

‘কুড়ি চলছে’—শ্রুশোভন বললে।

‘বাঙালী মেয়ের বরষ জানতে চাইলে—হাতে চার বছর রেখে দেয়। তুই সেই বরষ বলি না আসল বলি।’

‘সঠিক বরষ বললাম।’ শ্রুশোভন আহতভাবে বললো।

‘তুই চিত্রাকে জানিস না তাই এমন কথা বলি। জানলে কিছুতেই বলতিস না।’

‘চটে বাচ্চিস কেন শুধু-শুধু, সব দেশের মেয়েরা—বরষ কমিয়ে বলে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু আমি ভাবছি—তোমার চিঠি আসে কোথায়? চিঠি মানে চিত্রার চিঠি।’

‘কেন এ বাড়িতেই। আবার কোথায় আসবে?’

‘এ বাড়িতে আসে অথচ কেউই জানে না। এটা কেমন করে

হয়?’ ওকে বললাম, তারপর একটু ভাবার পর বললাম—‘C. Ghoshal বলে যে চিঠি আসে—সেটা নাকি?’

শ্রুশোভন হাসলো এবার, বললে—‘হ্যাঁ সেই হল চিত্রার চিঠি—আর তোর সব মস্ত হাঁস।’

‘তুই খুব একটা বুদ্ধিহীন নোস। ওকে বললাম।

শ্রুশোভন কিছু না বলে আবার হঠাৎ গোমড়া হয়ে গিয়ে বললো, —‘দীপংকর—কি হবে বল তো?’

‘ঘাবড়াস নে তুই। আমি বললাম। ‘চিঠি লিখে তো দে—তারপর দেখা বাবে।’

দু-সপ্তাহ কেটে গেল, দু-সপ্তাহের আগে চিঠি আসার সম্ভাবনা খুবই কম। আসে অবশ্য—তবে হয় সেগুলো মায়ের চিঠি নয়ত প্রেমিকার, প্রথমে আসে নিয়ম করে, তারপরে আসে শিথিলতা—কখনও এ পারে, কখনও বা ঐ পারে। শ্রুশোভনের ঘর থেকে আসার পর ব্যাপারটা অস্বাভাবিক করছিলাম। চিত্রার বাবা নিশ্চয়ই একটা কেউকেটা করেন। পাত্র হিসেবে শ্রুশোভন এমন কিছু খারাপ নয়—দরও জানা, সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। মেয়েকে দেখতেও সাধারণ। তা হ’লে? ‘সাধারণ’ দেখতে মেয়েদের বাপের টাকার জোর না থাকলে বিয়ের বাজারে কাটতি কম এই ধরনের একটা কথা—একদিন আমার এককালীন বাকবী ইটালীয়ান মেয়ে কালাকে বোঝাতে গিয়েছিলাম। সে তো পুরো ব্যাপার শুনে গালে হাত দিয়ে বলে পড়লো। সামঞ্জস্য করে এসে মেয়েদের পাঁচজনের সামনে বসতে হবে—দর্শনঘাটাই-এর জন্তে। কি ইতর বর্বর-টব্বর গোছেয় উজ্জ্বল হয়েছিল কালার। ওর গালে গাল দিয়ে আমরা যে স্তম্ভ হুই প্রমাণ করতে হয়েছিল সেদিন। তবে কালার গাল থেকে হাত এলো আমার মুঠোর। চিত্রার কথা বখন ভাবছিলাম তখন মনে হল—চিত্রার বাবার জোর কোথায়? নিশ্চয়ই কোন জোর আছে। নয় তো শ্রুশোভনের ভাবনার সিঁড়ি ভাঙার শেষ নেই কেন?

ভাবনা শ্রুশোভনের নয়—এবার ভাবনা হল আমার, শ্রুশোভনকে শুক্রবার রাতে Shakespeare-এ দেখে। Shakespeare আমাদের রাস্তার ওপরেই একটা পাবের নাম। অতি সাধারণ পাব। আমার যখন সময় কাটতে চার না বা বাচ্চবী থাকে না তখন এখানে এসে হয় ‘ডাট’ খেলি, নয় তো বীরার খাই দু’এক পাইট, শ্রুশোভনকে এখানে দেখে ভাবনাও হল—অবাকও হলাম।

‘তুই এখানে কি করছিস এই মন্দ ছেলোদের এলাকায়?’ ওকে বললাম।

‘বীরার খাচ্ছি—দেখতে পারছিস না, তোর চোখ নেই?’ শ্রুশোভন বললে।

‘তা তো দেখছি—কিন্তু একবারেই ডাকট হয়েছিস। ভাল লাগছে তোর? লাইট বা পেল দিয়ে আরম্ভ করতে পারতিস।’

‘বেশ লাগছে ডাকট—মন্দ কি?’ বলে শ্রুশোভন টাবলার ধরে বড় একচুমুক দিল। তারপরে শিথিল হয়ে বলল—‘দে সিগারেট দে একটা। জমবে ভাল।’

অম্মমানে বুঝলাম—একটা কিছু অর্থটন ঘটেছে। কোনবকম



আলোচনা

মাসিক  
বসুমতী  
ভাদ্র / '৭১

ঢোলকবাদিনী  
—মাসিক মিত্র



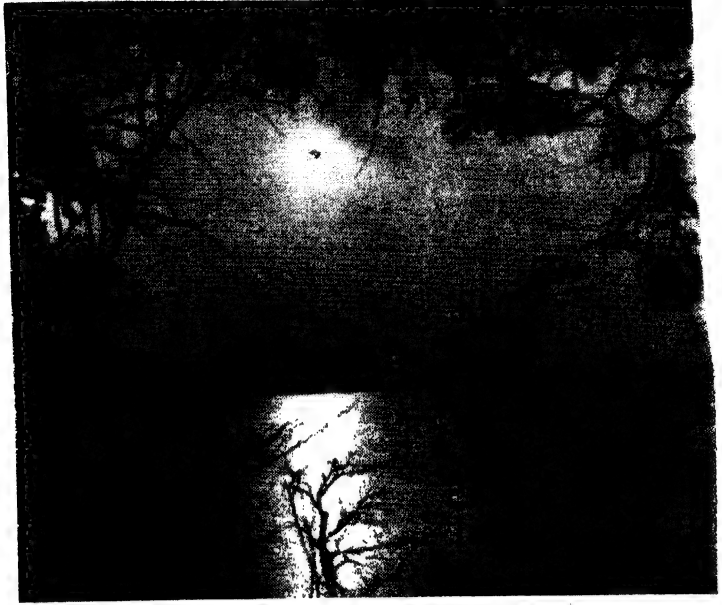
স্নানার্থী  
—শ্রীমতী ডাল ঘোষ

মাসিক  
বসুমতী  
ভাদ্র / '৭১

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে আপনার  
নাম, ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন



মাসিক  
বসুমতী  
ভাদ্র / '৭১



তোপটাঁচী লেক  
—বিশ্বকান্তি সাহা



রফের নদী (বঙ্গোপসাগর)  
—নীহাররঞ্জন শেঠ

ফুলকুমারী  
—ইন্দ্রজ্যোতিষ ঘটক





চাঁদে যেতে চাই  
— শুভেলু রায়

মাসিক  
বহুমতী



মায়ের আদর  
— অজানা

ভাদ্র / '৭১

সাধী  
— গদাধর শীল

উকচাচা না করে—ওকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপরে বললাম—‘তুই তো ডাট খেলা জানিস না। আর তোকে শিখিয়ে দি।’

ডাট খেলে যখন বাড়িতে ফিরলাম আমার। তখন রাত বেশ ভারী। আমি অস্বস্তিক হয়েছিলাম সব দিক দিয়েই। প্রথমত অশোভন আমাদের আর পাঁচজনের মত নয়। ও ‘নাচে’ যায় না—বীয়ার সাধারণত খায় না ওর মেয়েবন্ধুও নেই। পড়াশুনায় যে ও একটা কিছু তাও নয়—কিন্তু design-এর কাজ ও ভালরকম জানে, আর একজো অফিসেও ওর খাতির আছে। ঘর-মুখো ওর মন। দেশে যাবার ইচ্ছে প্রচুর। ‘পাবে’ একলা বসে বীয়ার খাওয়া ওর পক্ষে বিচিত্রই। সেদিন রাতে আমি আর চিত্রার কথা ওকে জিজ্ঞেস করি নি। দু-একদিন পরে ওকে বললাম—‘তোর কি ও তরফ থেকে চিঠি এসেছে?’

ও বললে, ‘হ্যাঁ’।

‘আমাকে বলিস নে কেন?’ আমি বললাম। ‘তোকে নিয়ে আর পায়া যায় না।’

‘কি বলার আছে আর। ওর তো ঘুরিয়ে ‘না’ বলে দিয়েছে। তোকে সেই খবর দেওয়াও যা—না দেওয়াও তা।’

‘ও! তাই বন্ধি তুই Shakespeare-এ গিয়ে নেবনাস হচ্ছিলি’ আমি ব্যাকুলিলাম যে এমন একটা কিছু ঘটেছে। ‘নয় তো অশোভন-চন্দর একলা পাবে যায় বীয়ার খেতে? আয় দেখি তোর চিঠি।’ আমি বললাম।

অশোভনের চিঠি পড়লাম। চিত্রার বাবায় লেখা খুব যুঁতপূর্ণ চিঠি। অশোভন যদি এক বছরের মধ্যে পরীক্ষার পাস করে দেশে যায় তো চিত্রার সঙ্গে বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি চিত্রাকে আর এক বছর বসিয়ে রাখতে পারেন। তবে এর মধ্যে, অশোভনকে তার লেখাপড়া সবকিছু বিশদ-বিবরণ দিয়ে চিঠি দিতে হবে।

‘আম্পারী দেখেছিস?’ অশোভন বললে। ‘আমাকে আমার progress report পাঠাতে বলেছেন।’ আর পরীক্ষার পাস না করলে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না লিখেছেন। কেন মেয়ের কি মন বলে কোন বস্তু নেই?’

‘একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মনে হয়’ বললাম। ‘একটা জিনিস অস্বস্ত জলের মত সোজা। তোদের ছদ্মের কোনও দামই দেওয়া হয় নি। বিয়েটা আমরা যেমন বেচা-কেনার পথ দিয়ে ফেলে দর করি—এ তার চেয়ে খুব বেশি দূরে নেই। তুই এক কাজ করতে পারিস। চিত্রাকে খোলাখুলি লিখে দে যে, যদি তুই ছুটি নিয়ে দেশে যাস ও তোকে তিন-আইনে বিয়ে করবে কি না। তোর রোজগারে তুই ওকে খুঁই সহজে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারিস। ও যদি রাজী হয় তো কাজ ফতে। আর যদি বলে না তো বলবো—She is not the only pebble on the beach; তারপর বাকি অংশটা ছেড়ে দে আমার হাতে।

নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল অশোভনের জীবনে এইবার। চিত্রা ঢকে-বাঁধা মেয়ে। সনাতনী। মা-বাপের অজান্তে তিন-আইনে বিয়ে করার সাহস তার নেই—সে দিল জানিয়ে। অপমানে-লজ্জায়

অশোভনের পৃথিবী কালো হয়ে গেল। আমি বললাম, ‘তুই অপমানিত মনে হচ্ছেস কেন? এতে আর নতুন কি আছে? এই হল আমাদের দেশের মেয়ের প্রেম—মেরুদণ্ড নেই। বাবা যদি বলেন তো রাজী হই,’ মরে যাই। কেন এর আগে যে ভালবাসার কথা বলে দিতে-দিতে চিঠি লেখা হয়েছিল সেটা কি বাবা বলেছিলেন?—তারপরে আমার বললাম, ‘তাহা ওকে খুব বেশি একটা দোষ দিতে পারি না। মেয়ের স্বাধীনতা নেই, মেয়ে স্বাধীন নয়। ওর পক্ষে ও যা বলেছে—সেটা বলাই স্বাভাবিক, এই পরিবেশে ওকে খুব দোষারোপ করা অস্বাভাবিক।’

অশোভন তার ম্যাটলপিসের মাঝখানে চিত্রার ছবি রেখেছিল গত কয়েক সপ্তাহ। আবার বোধ হয় তা ফেরৎ গেল স্বস্থানে। স্ট্র্যাকেশের অন্তরালে। অশোভনবাঁবু প্রায় প্রতিদিন আবার বাতায়ত শুরু করলেন Shakespeare-এ। এসব না-বালকী কারবায়ের নারব দর্শক হয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। হাজার হোক ছেলেটা দেশের ছেলে। তাই একদিন ওকে বললাম—‘তুই নাচের class-এ চল না আমার সংগে—নাচ শিখবি, একটা নতুন জিনিস শেখা হবে, দু-পাঁচজনের সংগে আলাপও হবে, তখন আর জীবনকে এত একঘোরে লাগবে না, আসবি?’ অশোভন রাজী হয়ে গেল, তখন ও এল আমার সংগে হেলেনের স্কুলে।

হেলেন কিপস, তুমি এই কোবর নারিকা, বিদগ্ধ—না। তুমি বিদগ্ধ নয়। খণ্ডিত—হয় তো খণ্ডিত। বহুবলভ—মা বহুবলভ নয় সে, হেনরী কিপসের ঘরগী হেলেন। হেলেনের বয়স তখন ত্রিশকে বড়ি-ছোঁওয়ার মত সবে ছুঁয়েছে—ছুঁয়েই লুকিয়ে গেছে বিশ শতকের ঘেরাটোপে। হেলেনের নিজস্ব কোন স্কুল ছিল না—হাই স্কীটের একটা স্কুলে সে নাচ শিখেছে। সপ্তাহে দু’দিন, আর একদিন তার নিজের বাড়িতে। আমি তখন কিন্তু জানতাম না যে, হেলেন একদিন নিজের বাড়িতে প্রাইভেট লেসন দেয়। অশোভনকে নিয়ে এলাম—হাই স্কীটের স্কুলে, শিখে নে মোটামুটি নাচটা—বেশি কিছু নয়, ওয়ালটজটা শিখলেই হবে। তারপর তুই বলবি—

‘হায়র আজি মোর কেমনে গেছে খুলি  
জগৎ আসি দেখা করিছে কোলাহুলি’—

অশোভন-চন্দর, কিসের কি ওখুঁ আমি জানি।  
বাগড়াও ম্যাং ইয়ার, দিয়ে দিলাম বাগী।

অশোভনকে তো ‘বাগড়াও ম্যাং’ বলে ছেড়ে এলাম। বীভ-কালী-কালী। বাবড়ালেম এবারে আমি। ওর সব চাল দেখছি আমাকে বানচাল করছে! কয়েক সপ্তাহ পরে দেখি অশোভন আমাদের ক্লাবের স্লোরে নেমেছে। আমি নিয়ম করে ক্লাবে কখনই যেতাম না। যেতাম—মধ্যে-মিশেলে। ক্লাবটা বিশেষ কিছুই নয়—যায়! ইংরেজ নয় অরবিই এদের সমস্ত সাধারণত—এতে ভিড় বেশি কন্টিনেন্টালদের আর কালোদের, আবার—জ্যামাইকান, নাইজেরিয়ান, ভারতীয়, পাকিস্তানী আর সিহংলী, বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রী—যুবক-যুবতীর মতের বিনিময়। মনোবণ্ড বিনিময়। সপ্তাহ শেষে সাধারণত রেকর্ড বাজিয়ে নাচ হত ক্লাবে। অশোভন একলা নয় সংগে একটা

মেয়ে। দেখতে মন্দ নয়। পায়ে দিকে নজর গেল আমার, গোদা পা দেখে মনে হল বোধ হয় জার্মান।

একটা নাচের পর সুশোভন এসে বসলো আমার কাছে। ওর পাটনার তখন আর একজনের সংগে নাচছে। ‘কেমন নাচতে শিখেছি?’ ও আমাকে প্রশ্ন করলো।

‘দারুণ,’ আমি বললাম—‘কিন্তু তোর ব্যাপার কি? আমার সংগে দেখাসাফাৎ করিস না। এখানকার হালচাল, দেশের হালচাল—কিছুই বলিস না। তার ওপরে দেখলাম নাচের নতুন পাটনার, কে রে মেয়েটা—নতুন দেখছি। not too bad-ch?’

‘ও অলগার কথা বলছিস। এখানেই আলাপ হয়েছে—ব্যাডেরিয়ার মাল, সব এসেছে।’

‘আর নাচবি না ওর সংগে? আমার সংগে অন্তত আলাপ করিয়ে দে,—’

‘না আর নাচবে না’ ও বললে, ‘তোর সংগে আলাপ পরে করিয়ে দেব’খন, চল একটু বেরোই।’

‘কোথায় বাবি এখন? এখানেই বল না কি বলবি? মেয়েটার সংগে ভাব করব না?’

‘হবে রে ভাব হবে, তোর কি মেয়েদের সংগে ভাব করার শেষ নেই? তোকে আমার কতগুলো কথা বলার আছে দীপংকর—তার জন্তে আমি তোর দু-একবার খোঁজও করেছি। কিন্তু বুঝিস তো—সব কথা বাড়িতে বলা চলে না। হয় তোর ঘরে কেউ এসে পড়বে—নয় তো আমার ক্রম-মেট কান খাড়া করে সবকিছু শুনবে, আর একটা নিরিবিলা পাবে যাই।’—

পাৰ আবার যেতে হবে? তুই কি আজকাল খুব বেশি ব্যারার খাচ্ছিস?’

‘ব্যার? খুব বেশি খাচ্ছি?’ হা-হা করে সুশোভন হেসে উঠলো। ‘আমাকে কি তুই নাবালক ঠাউরেছিস?’

সুশোভনের মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম, তারপর বললাম—‘চল যাই পাবে।’

দু’টো পাইট হাতে নিয়ে পাবের একটা কোণে সুশোভন বসলো। তারপর কোন কিছুই ভাবনা না করে মোটামুটি বলল—‘জানিস দীপংকর আমি চিত্রকে ভালবাসি না, আর চিত্রও আমাকে ভালবাসে বলে মনে হয় না, এটা আমার নতুন উপলব্ধি।’

‘কি করে তোর মনের কথা জানবো বল, এই সেদিন অবধি তুই তোর ভালবাসার কথা চেপে রেখেছিলি, হঠাৎ জানালি—তুই চিত্রকে ভালবাসিস—এমন কি আমি তাই ভেবে তোকে বিয়ে করার পরামর্শ অবধি দিলাম। আজ বলছিস তুই চিত্রকে ভালবাসিস না। তা হলে তোদের এই এতদিনের ব্যাপার ঠাড়িয়েছিল কার ওপর?’

মাথার চুলের মধ্যে সুশোভন তার আঙুল চাঙ্গিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে টাংলারে চুমুক দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—‘আমিও তাই ভাবি দীপংকর।’

‘কি ভাবিস তুই?’ নীরাস হয়ে বললাম।

‘আমি ভাবি যে, একটা দিক আমি এতদিন দেখি নি। যেটাকে

তোরা আর পাঁচজন মিলে বদলি bese—অর্থাৎ দেহ। দেহকে অস্বীকার করে ভালবাসা হয় না। আমাদের তরফে তার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি ছিল—তাই বোধ হয়—’

‘দেহ—bese তোর রাতারাতি এত জ্ঞান হয়েছে ভালবাসার হয় যাই—’ বাধা দিয়ে বললাম, ‘এদেশে এসেছিস তিন বছরের ওপর, এতদিন তো এসব তোর কাছে শুনি নি—এই তিন হস্তার এত জ্ঞান হল তোর কোথা থেকে?’—

সুশোভন সহসা উত্তর দিলে না। সিগারেটকে খুব জোরে টেনে রিং করার বুখা চোঁকা করে বললো—‘হলেন বসেছে,—’

‘হেলেন বসেছে?’—আমি আকাশ থেকে পড়লাম, ‘তোর হেলেনের সংগে এত আলাচনা হল কখন?’

‘দীপংকর, তোকে আশংকা অবাক করাবো।’ সুশোভন বললো।

‘জানিস, আমার মনে হয়, আমি হেলেনকে ভালবাসি, আর হেলেনও আমাকে—’

‘না মাইরি, এ যে অবাকের চেয়ে বেশি।’ আমি বললাম—‘তুই আর বামেলা বাড়াস নে সুশোভন, হেলেনের স্বামী আছে, সম্ভান আছে, ক্লাবে অলগা—উটা, যে কোনও স্প্যানিস জার্মান মেয়ের সংগে দু-এক বছর নেচে-কুঁড়ে ঘরের ছেলে ঘর ঘের, এসব করতে গেলে বামেলায় পড়বি—পরসার ভাদ হবে,—’

‘দীপংকর তোর ভাতের ছেলে প্রেম বোকে না। তুই তো কখনও প্রেমে পড়িস নি—এসব বুঝবি কি করে? আমার মনে হয় আমার আর চিত্রার ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার আমাদের দু’জনেরই ভাল, আমার ভাললাগা ওর ভাললাগার কোনও মিল নেই, আমি গান ভালবাসি, সুর ভালবাসি—চিত্রা তো একেবারেই—অ-সুর। ও আমার থেকে অনেক দূরে।’

‘বেশ কথা, সে না হয় হল। কিন্তু হেলেন? হেলেনকে ভালবাসার যুক্তি কি? দেহ? না তার চেয়ে বেশি। আর মনে রাখিস যে তুই একটা সঙ্গার ভাচ্ছিস। সবচেয়ে বড় কথা হল—তোরা এখন মোহ চলছে। ভালবাসা নয়। আর কিছুদিন যাক—তখন তুই নিজের বিচার করবি—এটা ভালবাসা—না মোহ, সেদিন তুই রায় দিস।’

পাব থেকে ফিরলাম দু’জনে। প্রচুর আবার হয়েছিলাম আমি, প্রথম সুশোভনের আচরণে—দ্বিতীয় হেলেনের, সুশোভনকে হেলেনের ওখানে আমিই নিয়ে যাই। স্বামী-সুত্রপথবৃত্তা হেলেনকে দেখে আমার এই দিককার কথা একেবারেই মনে আসে নি। ওর স্বামীকে অবজ্ঞা দেখি নি কখনও—যদিও ওদের বাড়িতে দু-একবার গেছি—নাচের ব্যাপারে, হেলেন প্রাইভেট লেসন গীতো সপ্তাহে একদিন যা আমি পরে জেনেছিলাম। ওদের পাড়াটাও—মধ্যবিত্ত পাড়া, সুন্দর।

এ পৃথক সুশোভনের সমস্তা ছিল চিত্রা। এবারে ও অনেক সমস্তা সৃষ্টি করছে দেখলাম। আমাদের জীবনে বৈজ্ঞানিকতা আমরা পছন্দ করি না—তাই বোধ হয় ইচ্ছা করে জীবনগ্রহিণী জটিল করি। জট বাঁধতে ভালবাসি—নিজদের ইচ্ছার-অনিচ্ছার মনের গোচরে-অগোচরে জট বাঁধি, দুঃখ পাই, বেদনা পাই—দুঃখ বিহী। তবু বাঁধি—বাঁধাই। আনন্দও পাই। সুশোভনের পৃথিবী জটিল হ’চ্ছে—

# একটি

# সেভিংস ব্যাঙ্ক

# অ্যাকাউন্ট খুলুন



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ

গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা খুবই সহজ। মাত্র ৫০ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন এবং আপনার জমা টাকার ওপর প্রতি বছর ৩% হিসেবে হ্রদ পাবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই আপনার কাছাকাছি স্থানীয় শাখায় দেখা করুন। ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে আপনার যেকোন সমস্যার সমাধানে স্ননিপুণ ও সৌজন্যপূর্ণ সেবার জন্য আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।



## গ্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা সীমিতবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

NGB/59B BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহঃ ১৯, নেতাজী স্ট্রাফ রোড; ২৯, নেতাজী স্ট্রাফ রোড, (লেগেডস ব্রাঞ্চ); ৩১, চৌরঙ্গী রোড; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লেগেডস ব্রাঞ্চ); ৬, চার্চ লেন; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড; ১৮, কন্ডেট রোড, ইটালী; ১৭এস/এ, মলিনী রজন এডিনিউ, নিউ আলিপুর (সেফ ডিপোজিট লকার); ১৬৩, রাসবিহারী এডিনিউ, বালিগঞ্জ; ১৩৯সি, বিধান সরণী, জামবাঙ্গার।

দেখলাম। কিন্তু আমার কি তাতে? ওর পৃথিবী ও—ওর আনন্দ ও—ওর দুঃখ ও ওর।

হেলেনের সঙ্গে অশোভনের ভালবাসা হল কি করে? স্বাধীনতা কই ওদের? তাই ভাবছিলাম, হেলেনের নিজস্ব—সম্প্রতিভা দু'টো দিন নাশের সুস্থল, আর একটা দিন প্রাইভেট পেন্সন দেবার সময়! দৌঁটো কি যথেষ্ট? অল্প সময়ের ওর স্বামী তাকে—পাঁচ বছরের ছেলে জন আছে। হেলেন মোটামুটি সুন্দরীও। সে অশোভনের প্রেমে পড়বে কেন? একেবারে পাঁচ পাঁচ মামুলি অশোভন। অল্প ভারতীয় ছেলের সঙ্গে ওর তফাৎ বোখাও নেই। তফাৎ শুধু পে-প্যাকেটে। Air-craft design-এ ওর হাত খুব ভাল। হেলেন কি তবে ওর পে-প্যাকেটের প্রেমে পড়েছে? তাই বা হবে কেন? ওদের বাড়ি-ঘর-দোর দেখে তো মনে হয়—হেলেনের স্বামীর অবস্থা বেশ খুচ্ছল। মাত্র তিন-চার সপ্তাহের আলাপ—এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-প্রেম, মন দেওয়া-নেওয়া সব। অশোভন করিবকর্ম কি জানি না—তবে ছবিবকর্ম নিশ্চয়ই।

হেলেনের সঙ্গে আমার একদিন দেখা হল ওডিন সিনেমা, কণ্টিনেন্টাল ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ওকে দেখলাম অশোভনের সঙ্গে। আমিও এলা ছিলাম না। অশোভন মারকত এর মধ্যে সেই জার্মান-মোটর সঙ্গে ভাব হয়েছিল। অলুগা ছিল আমার সঙ্গে। ছবির শেষে বাইরে বেরোবার সময় দেখা।

‘হ্যালো দীপংকর’ বলে হাসিমুখে হেলেন এগিয়ে এলো। আমি এর সঙ্গে অলুগার আলাপ করিয়ে দিলাম। অশোভনের হাতে বোধ হয় কিছু সময় ছিল। আমাকে বললে, ‘আর ন্যামহল রেস্টোরাঁয় হেলেনকে ভারতীয় খাবার খাওয়াব।’

খাবার টেবলে দেখলাম হেলেন সমানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে। কোলকাতা শহর কেমন? বাম্বিহামের চেয়ে বড় না ছোট—সেখানে ওপবতলার লোকের আদব-কায়দা কেমন, তাদের মধ্যে কারা কীটা-চামচ দিয়ে খায় আর কারা হাত দিয়ে—এইসব। অশোভন তার কিছু জবাব দিচ্ছে, কিছু ছেড়ে দিচ্ছে আমার ওপর, অলুগা একটু এটু বুঝে—আবার কিছু বুঝে নাও। ওর ইংরেজি তখন বিশেষ বস্তু হয় নি। তা ছাড়া খাবার নিয়েও সে বাস্তব। কণ্টিনেন্টাল মেয়েগুলো আর যাই হোক, ভারতীয় খাবারের মখানো দেয় বেশ। খাওয়া শেষ করে আমরা বেরালাম। বিদায় নিয়ে দু’দিকের পথ দু’জনে ধরলাম। অলুগা তখন আমাকে বললো, ‘হেলেন মেয়েটা বেশ ভালই, কিন্তু বড় বোকা’।

আমি বললাম—‘বোকা কেন বলছো?’

‘তুমি বুঝতে পার নি যে ও অশোভনের প্রেমে পড়েছে?’

অলুগা বলল, ‘মেয়েদের চোখ এড়ান বড় কঠিন।’

‘আর অশোভন?’ আমি ওকে জিগোস করলাম।

‘অশোভন একটু চেয়ে দেখতে চায়’ হি-হি করে অলুগা হেসে উঠলো। ‘ওসব ছেলে-আমরা খুব বুঝি—’

‘ছাই বোর পোড়ামুখী’—আমি বালায় বললাম।

‘পোড়ামুখী’ কি বলল তুমি তোমাদের ভাষায়? অলুগা ভুরু

‘তোমার সত্যি বুদ্ধি আছে—আমার ভাষায় বললাম ‘খুউ-ব বুদ্ধি’—জবাব দিলাম।

অলুগা খুশিতে উপছে পড়লো। একটু দূরে এসে ওকে তুলে দিলাম বাসে।

কয়েকমাস কেটে গেছে। অশোভন আমাদের বাড়ি ছেড়ে অল্প বাড়িতে উঠে গেল। এ বাড়িতেও অনেকদিনই ছিল। হঠাৎ বাড়ি বদলের কারণ আমি জানতাম। অশোভনের এ বাড়িতে নিজস্ব কোন ঘর ছিল না ও একটা ডাবল ঘর দেয়ার করছিল, তা ছাড়া অশোভন আর হেলেনের ব্যাপার নিয়ে এ বাড়ির অল্প ভারতীয় যে সরস-মালোচনা করত তা ওর ভাল লাগার কথা নয়। বাড়ি বদল করে অশোভন এলো—পার্ক ক্রেসেণ্টে। সিংগল ঘর—ভাড়া বেশি—স্বাধীনতাও। মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আমি আসতাম। পরোণো বন্ধুদের মধ্যে আমি নিরপেক্ষ ছিলাম বলে অশোভনের সঙ্গে আমার যাতায়াত বজায় ছিল। হেলেনকেও দেখেছি দু-একদিন অশোভনের নতুন বাড়িতে। দেখলাম হেলেনও বদলেছে।

আমি আজও বুঝি না হেলেনের কেন এই পরিবর্তন এসেছিল সেদিন। হেলেনের প্রথম প্রেম নয় অথচ প্রথম প্রেমের তত্ত্বনিমা মখান-ওর মুখে। ওর যৌবন ফুরোবার আগে—শেষ উদ্বেগও নয়—প্রদীপ নিভে যাবার আগে শেষবার প্রাণপণে জ্বলে ওঠার মত, কারণ হেলেনের তখন প্রায় তিরিশ বছর বয়স—তার ইংরেজির যৌবনকে বেঁধে রাখতে জানে। কিসের ছোঁওয়া পরেছিল সে? ওর জীবনে মন দেওয়া নেওয়া খেলা—অনেক খেলা হয়েছে। এত উদ্বেগ বা কিসের? একদিন ওকে দেখলাম সীনিওর পোড়ার দোকান থেকে বেরোচ্ছে, সীনিওর পেডোকে আমার পাকিস্তানী ব’লে সন্দেহ হয়। কেন যে নাম ভাড়িয়ে স্প্যাশি নাম নিয়েছে বুঝি না। ইনি হস্তরেখাবিদ আবার এর নতুন অভিনব পদ্ধতি হল—শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে মেসেজ পাঠান। এই শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে মনের তরঙ্গের যোগ হলে অলৌকিক কিছু বলা যায়। সীনিওরের দোকানে হেলেন কত পরসার চোট খেল জানি না। আমি সীনিওরের দোকানের সামনের কাফেতে চা খাচ্ছিলাম। হেলেনকে বেরোতে দেখে বিরিয়ে এলাম।

‘তুমি পোড়ার ওখানে গিয়েছিল দেখলাম।’ কৌনরকম ভণিতা না করেই বললাম, হেলেন আমাকে দেখবে আশা করে নি। একটু চমকে গেল।

‘হ্যাঁ পোড়াকে হাত দেখালাম। আচ্ছা দীপংকর তুমি হাত দেখতে পারো? সব ভারতীয়রাই তো পারে।’

‘হ্যাঁ তা পারে বটে! শুধু হাত দেখতে না—শুষ্কমার্গে দড়ি ফেলে ভোজবাজির খেলা দেখাতেও পারে।’

‘উন্টা-পান্টা কথা বোল না দীপংকর। বল না—তুমি আমার হাত দেখবে কি না?’

‘নিশ্চয়ই দেখব—নিশ্চয়ই দেখব। নরম হাত—চাঁদের আলোয় আমি খুব ভাল দেখি—’

‘Please দীপংকর। Please আমি পেডো বা বলছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো—আমার ভারতবর্ষে যাওয়া হবে কি না—আমার

হেলেনের হাত আমি দেখি নি। দেখতে জানি না—আমি, হাত দেখে কি বলব? একবার ইচ্ছে হল বলি, ‘তুমি কিসের নেশার স্বামী পুত্র আর স্বদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে আসার স্বপ্ন দেখছো? হোমার ভারতবর্ষ কি সুশোভন অনেক রঙে রাঙিয়েছে? সে রঙ মিথ্যা ছলনার—না সুশোভনের ছবির রক্তরাগে রাতান? হেলেন কিপস যে ভারতবর্ষকে তুমি ভালবাসতে চাইছো, মাকুদের বুল যে তার কাছে অনেক বড়? হোমার রক্ত-মাংসে তৈরি ছোট জনকে তুমি ভুলতে বাসছ—মাজ এ ভালোকে আর যে কেউ ক্ষমা করলেও ভারতবর্ষ কখনও করবে না।’ কিন্তু আমার মনের কথা মনেই রয়ে গেল। দু’জনে হাঁটতে হাঁটতে যে-যার বাড়ির পথে রওনা হলাম।

অলপার নতুন ছেলেবন্ধু হয়েছে—ইংরেজ। আমারও আমার নতুন বান্ধবী হল—এরিকা। বিড়ালাকী! আইরিশ মেয়ে। আমার আগাপ খুব বেশি হয় নি এরিকার সংগে তখনও, মানে আমি খুব হিসেব করে বড়ের চাল দিচ্ছিলাম। গজ-লোকো আর ঘোড়া সব হাতে রেখেছি। একটু বেশি হিসেব করেই চলছিলাম, কারণ এরিকা সুশোভনের সংগে এক বাড়িতেই থাকতো। আর সুশোভন আমাকে টিপ দিরজিল আগে থেকে খুব সাবধানে বড়ের চাল দিতে। The Goat—এ আমাদের নাচতে যাবার কথা ছিল। এরিকা এসে বললো—আজ নাচ বন্ধ থাক। তুমি সুশোভনকে দেখে এসো। ও অস্বস্থ। উটক-এগুটা এমন করে মাটি করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। কিন্তু এরিকার অনিচ্ছে দেখে তা মাটি করতেই হল।

‘কি হয়েছে সুশোভনের?’ আমি জিগোস করলাম।

‘জর-টর হবে বোধ হয়, বেগতে বড় খারাপ লাগলো। তোমার কথাও জিগোস করছিল।’

‘কথা জিগোস করছিল তো কি হয়েছে? যেতে বলেছে কি?’

‘দীপক আমার মনে হল ও বলতে গিয়ে বলল না। বোধ হয় আমাদের কথা ভেবেই বলে নি। আমার সেটা খুব ভাল লাগলো না। থাক না আজকের মত নাচ। আমি আমার বোনের বাড়িও যেতে পারি।’

‘ভাল। যা তোমার ইচ্ছে।’ বলে সুশোভনকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে পার্ক ক্রেসেটে এলাম।

সুশোভন নিজের দরজা খুলে দিলো। একমুখ দাড়ি—দৃষ্টও উদাস।

‘কি হয়েছে তোর এমন নোরা হয়ে বসে আছিস? জর-টর হয়েছে?’

‘না জর হয় নি। মনটা বড় খারাপ হয়েছে। কত কি যে ভাবছি।’

‘কি ভাবচিস তুই? আমাকে বলা চলে?’ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলাম।

‘আচ্ছা দীপক? (ওর আচ্ছা দিয়ে যে কথাগুলো আরম্ভ হয়, সেগুলো একটু গোলমালে) এ্যাক্সিয়ার উইচকোফট আছ—আমাদের দেশে মারগ-উটটান আছে—এই দেশে ফেখ-কিওর আছে—তা হলে নিশচয়ই ফেখ-কিওর আছে তাই না? আমেরিকাতে তো ডু ছু আছে।’

‘তাই বিলেতে বসে মারগ-উটটান করছিস? মতিচ্ছন্ন না হ’লে লোকে এমন কথা বলে না। কিন্তু মারবি তুই কাকে—কে তোর কাঁচা আসে পা দিয়েছে?’

‘হেনরীকে মারবে। হেনরী কিপসকে। ভগবানকে রোজ বলছি—‘হে ভগবান রোজ দুখটনার তো কত লোক মরে। হেনরী কেন মরে না। হেনরী কেন মরে না?’

‘হেনরী মরলে তোর লাভ কি? বেঁচে থেকেও তো তোর খুব লোকসান হচ্ছে না।’

‘আমার লাভ কি তা তুই কি করে বুঝবি? এত লুকোচুরি হাত থেকে তা হলে মুক্তি পাই রে দীপকর। সাতাশ বছর বয়স হয়েছে আমার। আর লুকোচুরি করে ভালবাসতে পারি না। প্রতিদিন আমার ভয়, প্রতিদ্বন্দ্ব হেলেনের ভয় এই বুঝি জানাজানি হল। এই বুঝি কোন প্রতিবেশি হেনরীর কানে কথা তুলে দিল। তুই তো জানিস আমাদের কত সাবধানে বাইরে যেতে হয়। অথচ আমি হেলেনকে ভালবাসি—আর হেলেনও আমাকে ভালবাসে। ওকে বেশি করে পাষ বলে তোর বাড়ি ছেড়ে এলাম এই বাড়িতে। কিন্তু কোথার ওর স্বাধীনতা? কোথার আমার সুযোগ?’

‘ছেড়ে দে তা হ’লে হেলেনকে। এত কামেলা করে, মন খারাপ করে, শরীর খারাপ করে, নাই বা প্রেম করলি? আর তাকে তো কেউ প্রেম করায় জন্মে মাখার দিবা দেয় নি। দেখ না আমাকে—ইসের মত জলে সাতার দিচ্ছি—অথচ পালকে জল লাগছে না। আমার মত হতে পারিস নে?’

‘পারি না দীপকর তোর মতো হ’তে, ওর মুখের দিকে চাইলে সব ভুলে যাই। জানিস আমার সংগে ও কত আলোচনা করেছে আমাদের দেশের সঙ্গার সখকে? মা-বাবা কেমন লোক? জনীর কথা ও যদি চেপে যায় তা হ’লে তো তাঁরা কিছুই ভাববে না—কারণ জনকে ও এ দেশেই রাখতে চায় শিকার জন্মে।’

‘তোরা এতদূর এগিয়েছিস? ভারতবর্ষে যাবার কথা ভাবছিস? কিন্তু তোর তো আসল সমস্যাই রয়ে গেছে। হেনরী কিপস যদি ওকে ডিভোর্স না করে তো তুই কি করবি? আর যদি ডিভোর্স আনে তো তুই কি কো-রেসপন্ডেন্ট হবি? জানিস তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর co-respondent হ’লে আটত্রিশ তাকে খোসার মতো দিতে হবে। তোর ঘটি-বাটি চাটি হবে। বাতালীর ছেলে বা ছ’পয়সা জমিয়েছিস—তা আর থাকবে না। তা এত কামেলা করে, যদি তোর বিয়ে করা পোষার তো কর বিয়ে। নগর সময় থাকতে চুকিয়ে দে, এসব মারগ-উটটানের কোনও কাজ হবে না।’

‘co-respondent হবার দিকটাও আমি ভেবেছি,’ সুশোভন বলল। ‘হেলেনকে বলে দিয়েছি যে আমার পক্ষে তা হওয়া সম্ভব নয়। ওর সংগে হেনরীর সংগে এখন বনাবনিও নেই। সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে হয়রানি বাগড়া হচ্ছে, ওকে mental cruelty-র অজুহাত দিয়ে ডিভোর্স আনাতে বলব ভাবছি। যদি হেলেন কোনরকমে ডিভোর্স পায় তো ও আমার হবে। পতিপুত্রভাবে আমার। তখন আর কোন লুকোচুরি থাকবে না। আমাদের ভালবাসা আর আমার দু’জনেই স্বাধীন হবে।’

‘কিন্তু যদি mental cruelty-র অজুহাত যথেষ্ট না হয় যদি হেনরী ওকে ডিভোর্স না দেয় তখন?’

‘তখন? জানি না তো তখন কি হবে। তুই দেখবি দীপংকর ভগবান আমার সহায় হবে। এতবড় ভালবাসার কি কোনও দামই নেই? তুই কি করে জানবি যে, হেলেন আমার কাছে কতখানি ওকে ছাড়া আমার জীবন হবে প্রেমহীন জীবন। যে জীবনে সব থাকবে আহার, নিদ্রা, সন্তানের ভগ্না দেওয়া—তবু কিছু থাকবে না। যে জীবন হবে দৈনন্দিন যত্নাত্মক দৈনন্দিন চলা। এ জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ভালবাসা দেখকে আশ্রয় করেই উঠেছে কিন্তু আজ তা দেখতে আবদ্ধ নেই। এর পরিধি অনেক বড়—তবু এর বিকাশ নেই, আমাদের স্বাধীনতা নেই বলে। তাই অহরহ ঈশ্বরকে বসছি—হে ঈশ্বর, হেনরী কিপসের একটা কিছু হোক—একটা কিছু হোক, কেন হেনরী থাকবে আমাদের দু’জনের মধ্যে? হেলেন আমার—হেনরীর নয়, হেলেন আমার।’—

শ্রুশোভন এতগুলো কথা বলে হাঁফিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম ওর চোখে জ্বালা, মন অশান্ত বিমুক্ত সমুদ্রের মত। কথাবার্তা ওর সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। ও যদি হেলেনকে ভালবেসেই থাকে তো সোজাভক্তি ডিভোর্স আনার চেষ্টা করলেই তো হয়? সেটা ওর পছন্দ নয়—অথচ হেলেনকে ওর চাই। কি আর বলব আমি, চোর না শোনে ধর্মের কথা। তারও পরে আবার মার্শ উচাটন শুরু হয়েছে, ইচ্ছে হোল নামাশলী শোনাই। মুখে বললাম, ‘তোরা একই পরিবর্তন দরকার। যা না’ দিন ছুটি নিয়ে বামিহাম ছেড়ে অন্ধ কোথায়। London-এ যা না? আর এখন ছেলোমাত্রী রেখে দাড়ি কামা। আমার সংগে রেন্ডোর’র চ’ প্রেম-কারী খাওয়াব।’

শ্রুশোভন যে ভেস্ত ভেস্ত লগুন চাকরীর চেষ্টা করছিল তা জানতাম না, লগুনে আমার কথামত ও হ’ সন্তোহ হসিডে করে এসেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের লগুন রোডের বাড়িতে ও এসে হাজির।

‘লগুন চললাম দীপংকর, চাকরী পেয়েছি, মাইনেও ভাল।’

‘লগুনে হঠাৎ চাকরী নিলি কেন? লুকোচুরি আর সইছে না বলে?’

‘না ওসব লুকোচুরি দেখা-চুরির ক্ষেত্র আমার কেটে গেছে। Ambition, বুঝলি Ambition, মানুষের Ambition থাকা চাই। ছোটর চেয়ে একটু বড়, তারপর আরো একটু। এটা আমার প্রথম ধাপ।’

‘হেলেনের সংগে তা হ’লে চুকিয়েই দিলি। ভালই করেছিল।’ আমি বললাম।

‘চুকিয়ে দিয়েছি কে বললে? ভালবাসা কি খোলামকুচি যে চুকিয়ে দিলুম ফেসে দিলুম? তুই তো ভালবাসার ভণ্ড বুঝিস না। এরকম বুদ্ধি আর কে দেবে।’

‘তা হ’লে? তা হ’লে ব্যাপারটা কেমন ঠাড়াচ্ছে?’

‘ব্যাপারটা এই ঠাড়াচ্ছে যে, আমি আগে লগুনে গিয়ে শুছিলাম বসব। তারপর হেলেন আগবে—চাকরী-বাকরী নিয়ে। তারপর

‘দু’তিন বছর? তুই থাকবি বসে এই দু’তিন বছর। তোরা পাঠা তোরা যা ইচ্ছে করবি। ল্যাক্স-মুন্ডা সবই তোরা।’

‘হ্যাঁ আমার পাঠা আমি ল্যাক্সের দিকে কাটাবো না—এটা জোর গলায় বলছি। দু’তিন বছর! দু’তিন বছর আর কি এমন সময়? ও তো দেখতে দেখতে কেটে যায়। এদেশে কত লোক তো কতো বছর এনগেজও হয়ে বসে থাকে।’

শ্রুশোভন এই অবধি বলে থামল। তারপর দু’টো আঙুল দিয়ে নিজের দাড়িটা চেপে ধরে আন্তে আন্তে বললো—‘দীপংকর, মাঝে মাঝে তোরা এখানে এসে যদি হেলেনের সংগে দেখা করি তো—মানে ইয়ে—’

‘তা তুই যদি লগুন উজিরে আসিস তো আমি তোরা চলে রাত হবো না—’

‘সাবাস। তুই আমার তাই-এর চেয়ে বেশি, গদগদ হয়ে শ্রুশোভন বললে। যাবার আগে একটা পাটি দেবার ব্যবস্থা করছি। তোরা পুরো Co-operation-এ আমার জরপাত হয়েই।’

শ্রুশোভনের পাটিতে হেলেনকে দেখলাম। নীরব-নতমুখী-শান্ত, ইয়েজ মেরেকে এমন চূপচাপ পাটিতে সচরাচর দেখা যায় না। যেন ভূমিকম্প হবার আগে থমথমে পৃথিবী। শ্রুশোভন এর কয়েকদিন পরেই লগুনে চলে গেল। কিন্তু এতটি স্তব্ধতার হাজিরা দিতো—বারিখামে। ওর ভালবাসার আঙনের তাপ যে কমে আসছিল তা আমি বুঝেছিলাম। আর একটা ঘটনায়—সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে ঠাড়াগেলো। হেলেন অনেকদিন থেকে একটা ভাল শাড়ি চেয়েছিল ওর কাছে। শ্রুশোভনের তা খোলাসে থাকতো না। শেষ উইক-এও হেলেন সেটা আবার মনে করিয়ে দিয়েছিল আমার সামনে। এবারে যখন শ্রুশোভন এলো হাতে ওর একটা প্যাকেট দেখে আশ্চর্য হলাম। ছেলেটা তা হ’লে ভুলে যায় নি। যদিও ওর সংগে হেলেনের এতটা মাখামাখি আমি কোদিনও চাই নি—তবু মেয়েটা ভাল দেখে আমার মন ভিজেছিল।

‘আমার শাড়ি আছে বুদ্ধি প্যাকেটে?’ হেলেন খুব উৎসাহের সংগে ওকে জিগ্যাস করেছিল।

‘ঐ বা ভারি! আবার ভুল হয়ে গেছে—প্যাকেটে আমার একটা পুরোনো সোয়েটার আছে—এর হাতটা ছিঁড়ে বাচ্ছে বলে তোমাকে দিয়ে সেলাই করতে এনেছি—পরের বার ঠিক শাড়ি আনবো—’ শ্রুশোভন বললে।

হেলেনের মুখ দেখলাম—কালো হয়ে গেল লজ্জার অপমানে দুখে। কি-ই বা একটা শাড়ির দাম। সে তো দাম বাচাই করতে যায় নি। বাক্যে ভালবাসে তার কাছে কাউলের মতো হাত পেতেছিল। আজ শূণ্য হাত তার সমস্ত কিছু যেন শূণ্য করে দিল। আমি নম্র করলাম শ্রুশোভনের দিকে।

হঠাৎ আমার মনে হল শ্রুশোভনের জাত আর আমার জাত একই। ত্রৌক ও নয়—ও আমারই মতন পাতাইস। ডুব সাঁতারের খেলা খেলছে জলে নেমে কিন্তু পাখায় ওর জল লাগছে না, পিছলিয়ে যাচ্ছে। শ্রুশোভন বোধ হয় আমার চেয়েও ভাল সাঁতারু।



## সাগর বেলায় কিছুকুড়াই

কারণ আমার আর ভাল লাগছিল না। প্রত্যেকটা উইক-এও সময় করে ঘর ছেড়ে যাওয়া কি আর ভাল লাগে? তার ওপর সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কারণ হেলেন যে কোন সময় ছাড়া পাবে—জানা নেই, আমার রুম-মট ও ঘটনাকে গুব ভাল করে নেয় নি। শুধু সুবিধে ছিল যে, সে শনিবার দিন সাধারণত থাকতো না, তার দাবার ওখানে যেত। তবু সব ব্যাপারটা যেন কেমন খোলান—আমার মনে হতো। সুশোভন মুখে বলছে ‘ভালবাসি-ভালবাসি’। আর একদিন আমাকে ছদ্ম, আত্ম-টান্ডা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, অথচ ডিভার্স কো-রেসপন্ডেন্ট হবে না। একটা আন্ত মাকুড়া। তবু এই আস-বাওয়া কমে আসতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। কারণ হেলেনের সংসার আছে—স্বামী-পুত্র আছে, আমি কোনদিনই চার নি সে-সংসার ভেঙে যাক, ওদের ভালবাসার তাপ যদি নিতে যার তো ওরা আবার সহজ জীবনে যাবে—এই ছিল আমার বিশ্বাস। হেলেন কিন্তু তখনও লগুন চাকরী নেবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভাগ্যে জোটে নি।

তিন মাস কেটে গেছে। একটা রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় সুশোভন হঠাৎ এসে হাজির বার্নিহামে। রবিবার সন্ধ্যাবেলায় আমার সতরচর বাড়িতে থাকতাম না, সুশোভনের তা জানা ছিল। সুশোভন এর আগের তিনটে উইক-এও আসে নি। কোনরকম চিঠিও দেয় নি যে কেন এসাম না। হেলেনের সর্গেও আমার দেখাদাকাং হয় নি—বেশ কিছুদিন। ওদের ঘটনা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

‘আ রে সুশোভন, তুই?’ অবাক হয়ে বললাম, ‘রবিবার সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ—এসেছিলি বুঝি বার্নিহামে? আচ্চিস কোথার—টোটেল-টোটেলে? তিন সপ্তাহ তো ডুব দিয়েছিস।’

‘দীপংকর কামেলার পড়েছি। (হরি! হরি! আবার কামেলা। তোর এক কামেলার তো আমি নাজেহাল।) এখন আসছি লগুন থেকে। তোর সঙ্গে পরামর্শ করব। নিরিবিলি কথা চলে এখন? তোর রুম মেট চন্দর তো তার দাদার বাড়ি থেকে রাত এগারোটার আগে আসবে না, এখন সন্ধ্যা ছ’টা।’

‘না চন্দর এগারোটার আগে আসবে না। তবে কামেলা আবার কি, না মাইরি।’

সুশোভনের কামেলার কথা শুনলাম। একটু খাবাড়ি যাবার কথা। পরকীয়া প্রেমের পথ, সোজা প্রেমের পথের চেয়ে অনেক কুটিল। প্রেম সহজ পথে চলে না, পরকীয়া প্রেমের পথে অনেক চোরকাটা—অনেক চোরাবালি, সুশোভন সেই কাঁটা দেওয়া পথে হাঁটছিল কাঁটা বাঁচিয়ে। এখন তার কাঁটা ওর পায়ে বঁধেছে। হেনরীর সন্দেহের জালে ও পড়েছে—আর সে জাল ভীষণ জাল। আতাই সকালে লগুনে ওর বাড়ির দরজার রিং স্তম্ভে ও এসে দরজা খুলে দেখে এক ইংরেজ-সম্পত্তী ঝাড়িয়ে, তারা সাজাশুভি বলে যে, তারা সুশোভন রায়েব যুগ দেখা করতে চায়। সম্ভব হবে কি না। সুশোভন এর আগে কখনও এসে দেখে নি তাই আশ্চর্য হয়ে যার—তারপর তাদের পরিচয় হিজ্জাসা কথাকত, ঘেঁটে বলে

## প্রত্যেকটি মেরিট\* সেলাইকলের সঙ্গে আপনি কিনছেন সারাজীবন নির্ভাবনায় সেলাই সারাজীবন সিস্টার্নের\* সেবা

মেরিটের স্পর্শে আপনি মানন্দ পাবেন—  
কি অন্যায়স গঠিত নিয়ন্ত্রণ-এর মঙ্গল নীরব  
কাজ-সংসার চান কি নিগুণ ভাবে বঁধা।  
এর মূলে রয়েছে মেরিটের অতি মজবুত  
গঠন অথচ সুষম ভারসাম্য।  
এছাড়া মেরিট থাকলে আরও এক ‘লাভ’  
—এর সঙ্গে যেকোন সিস্টার্নের দোকান কিংবা  
বিক্রেতার কাছে সেই সিখাত সিস্টার্ন মাতিসের  
ওপর আপনি সবদা নির্ভর করতে পারেন।



\* সিখাত বোধানীর একটি ক্রয়কার

যে, সে হেলেনের বাছুরী—হেলেনের কথা অল্পাধা দেখা করতে এসেছে সুশোভনের সংগে। এই ঘটনার আগের তিন সপ্তাহ সুশোভন বারিহায়ে আসে নি। হেলেনেরও কোনও খবর পায় নি। তাই খুশি হয়ে তাদের নিজের বারের ঘরে নিয়ে আসে। ওর তখনও মনে কোন সন্দেহের বেশও ছিল না। কফি-সিগারেট দিয়ে যখন সুশোভন তাদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত তখন ভ্রমলোকটি সহসা গুকে এই প্রশ্ন করেন।

‘আচ্ছা, আপনি কি হেলেনকে বিয়ে করতে চান?’

‘এ অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা, আমি অল্প পরিচয়ের লোকের সংগে একথা আলোচনা করতে চাই না’—

‘আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি—যদি আপনি আপনার স্বীকৃতি দেন।’

‘স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি?’ সুশোভন তখন ঘামতে থাকে।

‘আমরা প্রাইভেট ইন্ভেস্টিগেটর। হেনরী কিপসের। হেনরী কিপস হেলেনকে ডিভোর্স করতে বাজি আছে—আপনি যদি এই জবানবন্দীতে সই করেন।’ ভ্রমলোকটি সুশোভনের সামনে এক লিখিত জবানবন্দী ফেলে দেন। জবানবন্দীর সারাংশ এই যে, হেলেন অন্তঃস্বা। আর সন্তান সুশোভনের।

সুশোভন জবানবন্দী সই না করে পরপাশে তাদের বিদায় দেয়।

‘হেলেনের বাচ্চা হবে, তুই এ ঘনৈনা জানিস?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘হ্যাঁ’ সুশোভন জবাব দিলে।

‘বাজা কার—তা জানিস ঠিক করে? তোর না হেনরীর?’

‘আমার’—সুশোভন বললে। গত চার মাস হেনরীর সংগে হেলেনের কোন সঞ্চর্ষ নেই। এখন আমাকে London-এর বাড়ি পাঠাতে হবে। আমার নতুন Office-এর ঠিকানা ওরা কেউ জানে না। তাদের থেকে যেন কেউ না জানে। এই জন্তে আমি আজই লণ্ডন থেকে দৌড়ে এলাম।

‘কিছু হেলেন? হেলেন তো তোর Office-এর ঠিকানা জানে। তাকে তো তোর contact করে চলতে হবে? সেদিক দিয়ে যদি খবর বেরায়?’

‘না আমি এখন হেলেনের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারবো না। আমার শেষ চিঠির উত্তর আজ তিন সপ্তাহ দেয় নি। কি আমার এমন গরজ? আর হেলেন আমার নতুন Office-এর নামও জানে না—তা ঠিকানা।’

‘হয় তো হেলেনের অসুখ-বিম্বক হয়েছে, আমিও তো তিন হপ্তা তাকে দেখি নি। তুই এ নিয়ে এত উত্তলা হচ্ছিস কেন? এ তো ভালই হল। তোর তো সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। হেনরী নিশ্চয়ই হেলেন আর তার কালো-ছেলেকে নিয়ে ঘর করবে না। তুই তো এখন গুকে বিয়ে করতে পারিস।’

‘বিয়ে? এমন করে বিয়ে? এমন করে কে বিয়ে করবে? এমন করে বিয়ে করতে কি আমি কোনদিন চেয়েছিলাম! দুঃদুর ওসবে ক’মি নেই। কো-রেসপন্ডেন্ট হবার অনেক খরচ।’

হেলেনকে এত করে চেয়েছি, তোর ভালবাসার মধুচক্র ওকে ঘিরে উঠেছে, তুই হেনরীর মুঠার জন্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা অবদি করেছিস—যাতে তুই হেলেনকে সম্পূর্ণভাবে পাস। আর আজ যখন তার কাছে আসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে—তুই হু’হাত তাকে ঠেলে দিচ্ছিস—এই কি তোর ভালবাসা? এই কি তোর এতদিনের মন জানাজানি।’

‘দীপংকর তুই বুঝছিস না, কি বেলেঙ্কারী হবে এতে। আর আমার যথার্থবর্ষ যদি খোসার দিতে যাত্রা তো বিয়ের পরে আমার থাকবে কি? বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়।’

‘থাকবে তোদের প্রেম, তোদের দু’জনের সন্তান, তোর রক্ত আর হেলেনের দেহ-কোষের প্রতিটি বিন্দুর যৌথস্রষ্ট, তোদের দু’জনের স্বাক্ষর, তুই কি তাকে ফেলে দিতে চাস?’—

‘আমার মনে হয় হেলেন আমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে না। যদি বাসতো—তা হ’লে আমাকে না জানিয়ে ও হেনরীর সংগে এটি ধরণের কখনও আলোচনা করতো না। হেলেনের সংগে আমার হাজারবার কথা হয় গেছে যে আমি কখনও কো-রেসপন্ডেন্ট হবো না, হবো না। আর সেট আমাকে কো-রেসপন্ডেন্ট করতে চায়?’

‘কিন্তু হেনরীরও তো সমাজ আছে। হেলেনকে ও যদি আজও ভালবাসে—তবু ওর পক্ষে হেলেনের কালো রা-এর ছেলেকে—সুশোভন নামের ছেলেকে ও কি করে গ্রহণ করবে? তুই ওদের দিকটাও দেখ। এমন স্বার্থপরের মত কাজ করিস নে। তুই একবার হেলেনের সংগে দেখা করে কথা বল। কিভাবে হেনরী খবর ভেজেনছে তা তো তুই জানিস না, কেন মিথ্যে শোয়াবোপ করছিস হেলেনকে?’

‘না হেলেনের সংগে আমি এখন কোনমতেই দেখা করতে পারবো না। কে জানে আশেপাশে কোথায় হেনরীর চব-চামুড়ার ঘেঁরাঘরি করছে। আর তা ছাড়া—ওর তো এখন উত্তর দেবার পালা। আমার শেষ চিঠির উত্তর তিন সপ্তাহ হয়ে গেল দিচ্ছে না। ও আগে জানাক সব খোলাখুলি, তারপর দেখা যাবে। তুই আশা করি আমার বন্ধুত্ব খাতিরে এই অত্যাচারটা রাখবি—যে Office-এর ঠিকানা কাউকে দিবি না। আমি কালই বাসা বদল করবো,—একটু থামার পর দীপংকর উঠে গাঁড়াল, টাইটা বাঁধতে বাঁধতে বলল। দীপংকর আমি তাকে ভেবেছিলাম, ‘তুই অজ্ঞ জাতের, তুইও যে এমন সেকিটেকোল হবি জানতাম না। আজ চল—আমার ট্রেনের সময় নেই।’

‘গীতে গীত চেপে বললাম—‘সুশোভন, তুই একটা স্বাউণ্ড না।’

বেলগে সাইডিং-এর ধারে যে রাস্তাটা অনেকদূর কবরখানার দিকে চলে গেছে সেই পথে একদিন আমার সংগে হেলেনের দেখা হল। পথটা নির্জন—বারিহায়ের উপযুক্ত নয়—কালাহল নেই এখানে। সুশোভনের ব্যাপারের পরে আমারও যেন ক্লান্তি এসেছিল। নিজের দিকে তাকাই নি কখনও, প্রতিটি দিনের দিকে তাকাইতাম। সোমবার—black monday. মংগল, বুধ, বৈশ্যপতি খোড় বড়ি খাড়া, শুক্রবার pay day—শনি লাগাম ছাড়ার দিন, এই ছিল আমার ভাবনা। বিভিন্ন দিনের গতি ছিল বিভিন্ন, কিন্তু এ ক্লান্তিকে এক

## গার্গর বেনায় কিংকু কুড়াই

দেখ না! সময় হাতের মুঠো দিয়ে গলে যায়? আমার ছোট্টার গতি ক'ম গেল। তাই এরিকা গেল ইংরেজ ছেলের সংগে। মাঝে মাঝে একলা তখন ইটতাম এই পথে। দেখতাম ঘাসের ওপরে শিশির ঢেঁচক করছে—কার্ণবেড়ালী ছুটে বেড়াচ্ছে, ভাবতাম এর দাম নেই—কিন্তু এর দাম অনেক। এই পথেই আমার দেখা হল হেলেনের সংগে।

সুশোভনের গত চার মাস কোনও খবর জানতাম না। জানার প্রবৃত্তিও ছিল না। বার্ষিক হামে ও সেই আসার পর আর আসে নি। কারণ এল কোথা না কোথা থেকে নিশ্চরই খবর আসতো। হেলেনকে তঠাৎ দেখলে চিনতে পারা যায় না। গুঁর বাচ্চা হবার সময় এগিরে আসছে। ডিলে পোখাক পরা, পাণ্ডুর মুখ, চুলগুলোও অবিকৃত। 'গুড ইভনিং' বলে ওকে আমি সন্তোষ করলাম।

'গুড ইভনিং' বলে হেলেন হাসলো। ভোরের আকাশের তারার মত তায়ান।

'তোমাকে অনেকদিন দেখি নি হেলেন—কেমন আছ?' প্রশ্ন করলাম।

'ভাল আছি—দীপকর, হেগেন বললে, আবার প্রশ্ন করলো, 'তুমি কেমন আ? এদিকে?'

'এই পথটা আমার বেশ ভাল লাগে। এত নিরাল—নিজের মনের সংগে যেন মুখোমুখি পঁড়াই এখানে।'

'আমারও ভাল লাগে। তবে মনে হয় এ পথটা যেন বরাপাতার পথ। জান তো এ সড়ক কোথায় গেছে?'

'আমি এই পথে হাটি, দেখি প্রত্যেক বছর গাছ তার পাতা খসিয়ে দেয়, তার সময় হয়েছে—যেন কেউ মনে করিয়ে দেয়। যৌবনের সাজ খসাবার সময়! কখনও কখনও দেখি কাড়ে গাছের সব পাতাকে খসিয়ে দিয়েছে, শুধু আগার একটা পাতাকে পারে নি। সে হেলে-তুলে নাটছে—বেশ লাগে তাও দেখতে।'

'তোমরা ভারতীয়রা সাধারণ জিনিসের মাঝে, এমন অসাধারণ দেখতে জান—আর সেই দেখাটা আমাদের কাছে পরম বিশ্বাস হয়ে ওঠে দীপকর। সুশোভনও আমার কাছে প্রথমে এই বিশ্বাস ছিল। মনে হত সে কত ছেলেমানুষ? হেলেন বললে।

'আজ কি ভাব তাকে হেলেন?' প্রশ্ন করলাম।

'খাক সে কথা।' ও বললে, 'কিন্তু তুমি তো নিশ্চয় তার খবর পাও, জান সে কেমন আছে?'

'ভালই আছে,' মিথোকাথা বললাম।

'জান দীপকর আমি আর কয়েকদিন পরে ইক্সকিউজিবে চলে যাবছি। ফিরবো চার মাস পরে। যাবার আগে তোমার সংগে আমার এত দেখা করার ইচ্ছে ছিল যে বলার নয়। কপাল শুণে দেখাও হল। কেন দেখার ইচ্ছে ছিল জান? কারণ আমার জীবনের এই কালো অধ্যায়ের প্রথম শব্দ তুমিই লিখিয়েছ।'

'আমি এত জগে দুঃখিত ছেলেন। কে জানতো যে তার এই পরিণাম হবে। এসো আমরা ঐ বেঞ্চিটার একটু বসি। তোমার সংগেও দুঃখটা কথা বলা যাবে।' এবটু এগিরে একটা পার্কের বেঞ্চে ছুঁতনে বসলাম।



## ..রূপ হবে রূচনীয়

রূক্ষ আবহাওয়ার কোমল ভকের লাভা ও মন্থতা অটুট রাখতে যুগ যুগ ধরে হিমালী স্নো ঘরে ঘরে সমাদৃত। ভারতে তৈরী প্রথম স্নো হিসাবে এর ঐতিহ্য সর্বজন স্বীকৃত। সত্যি কথা বলতে ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি - প্রলেপে হিমালীর ছড়ি নেই। প্রসাধন সামগ্রীতে হিমালী শুধু মাত্র একটা নাম নয়, যুগান্তরের প্রমাণিত উৎকর্ষতার এটি একটা জাতীয় ঐতিহ্য।

## ..প্রসাধনে জহতিয়ু ঐতিহ্য

# হিমালী স্নো

তিনটি আকারে পাকড়া ময়



হিমালী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১

‘তুমি হঠাৎ বামিহাম ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন—যদি কিছু মনে না কর তো জিগ্যেস করি’—বললাম।

‘দীপংকর আমার বাচ্চা হবে ইলফাঙ্করের এক ক্যাথলিক হোমে’, হেলেন একটু চুপ করে থাকার পর বলল—‘সেখানে আমি শুভদিন থাকবো যতদিন না আমার ছেলেকে কেউ দত্তক নেয়। তারপর আবার ফিরবো এখানে। তুমি তো জান—বাড়িটা আমাদের নিজস্ব। হঠাৎ বিক্রি করে যাওয়া চলে—কিন্তু তাতে অনেক লোকসান। তবু হয় তো একদিন বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে হবে। তাই বলছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল’—

‘আচ্ছা হেলেন, লগুনে স্মশোভনের বাড়িতে যে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর গিয়েছিল তা কি তুমি জানতে? আর সে যে অবানবন্দী নিয়ে গিয়েছিল—সে তো স্মশোভন কোন দিনও চাই তো না। এমন জবানবন্দী—

‘প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? তুমি কি বলছ দীপংকর, আমি এর তো কিছুই জানি না। তবে হেনরী আমার অসাবধানে স্মশোভনের একটা টাইপ করা চিঠি পায়। তাই নিয়ে আমাদের ঝগড়া-মনোমালিন্য শুরু হয়। আমি শেষে সব স্বীকার করি। কারণ স্মশোভনের মোহ আমাকে এত আচ্ছন্ন করেছিল যে বসার নয়।’

‘ভাল কথা, যদি স্মশোভনের মোহই তোমাকে এত আচ্ছন্ন করেছিল তো তাকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করলে কেন? স্মশোভন তো আমাকে বলেছে যে তুমি তার চিঠির জবাব দাও নি’—

‘হয় তো আমার কিছুটা দোষ। হয় তো আমার অভিমান। দীপংকর তোমাকে ছোটখাট ঘটনা বলতে চাই না। তবু আমাদের ধা সম্বন্ধ ছিল সেটা যেন ক্রমশ একপেশে হয়ে আসছিল। স্মশোভন আমার ছোটখাট কত অমুরোখ যে ভুলে যেত তার শেষ নেই। আমার চিঠি দেবার পালা ছিল সেটা সত্যি। কিন্তু তার চেয়ে তো বড় সত্যি যে স্মশোভনের সন্তান আমার গর্ভে, আর তা স্মশোভনের জানি। আমি যদি একবার চিঠি না দি, তো সে কি পর পর আমাকে দু’টো চিঠি দিতে পারতো না? সে সন্তাই আমার এত শরীর খারাপ ছিল যে, আমার পক্ষে চিঠি বাইরে ফেলে আসা সম্ভব ছিল না। আমি তো হেনরীকে দিয়ে চিঠি ফেলাতে পারি না। তার পরের বুধবার যখন অলগা এলো তাকে প্রশ্ন করলাম—‘আমার কোন চিঠি আছে কি না। কারণ ইশানী আমার চিঠি আসতো ওর ঠিকানায়। অলগা যখন না বললো তখন লজ্জার, অপমানের, দুখে আমার চোখ ফেটে জল এলো। এই আমার ভারতীয় প্রেমিক? এই তার ভালবাসা? আমার গর্ভে তার সন্তান, আমার দেহের পুষ্টিতে তার পুষ্ট—আমার ভারতীয় প্রেমিক এত অকরণ? এক সন্তাই চিঠি না দিলে সে আমাকে পর পর দু’টো চিঠি দিতে পারে না? হে ঈশ্বর, আমার স্বামী হেনরী তো এত অকরণ নয়? কেন তাকে বঞ্চনা করেছি?’

‘কেন তাকে বঞ্চনা করেছ হেলেন?’ প্রশ্ন করলাম।

‘জানি না দীপংকর, আজও জানি না। আমার মনকে আজও জানি না। জানি হেনরী আজও আমাকে ভালবাসে—স্মশোভন যে আমাকে ভালবাসে না হেনরী বাব বার আমাকে বলেছে।

পাঠিয়েছিল শুধু স্মশোভনকে জানতে—আজ আমার মনে হচ্ছে। ও নিজে জেনেছে যে স্মশোভন আমাকে ভালবাসে না। আর সেই জন্যও ওর একার, আমাকে আজও বল নি।’

‘হেনরী তোমাকে এত ভালবাসে জেনেও—তুমি ঘর ভাঙার স্বপ্ন দেখতে।’

‘দেখতাম দীপংকর। আজ তা মনে করে হাসি। তবে জানি আমি প্রথমেই স্মশোভনের প্রেমে পড়ি নি। সে যখন আমার কাছে এসেছিল—তখন মস্ত ষা খেয়ে এসেছিল। আমি শুকে একটু সহানুভূতি দেখাতে চেয়েছিলাম। ইদানীং হেনরীর ভালবাসা অন্তিমোহা হয়ে এসেছিল—তাই স্মশোভনের ভালবাসার আশ্রয় আবার হললাম। আবার হললাম সে আশ্রয়ের শিখর—কিন্তু গৌরব নয়, অগৌরব। পুড়ে মরলাম দীপংকর—আমার ভালবাসার দাহন জ্বলে গেলাম আমি।’ হেলেন চুপ করে রইলো এর পরে।

আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঘেলে বললাম—‘হেলেন, তুমি একদিন ভারতবর্ষকে ভালবাসতে চেয়েছিলে। স্মশোভনের মনে দিয়ে। এখন তোমার ভারতবর্ষের ওপর ঘৃণা যেন স্মশোভনের মধ্যে দিয়ে না আসে। আমার দেশ অনেক বড়—আবার ছোটও। অনেক বিচিত্র রঙে রাঙান। তুমি আমার দেশের ওপর অবিরত ক’রো না অন্তর।’

‘না দীপংকর, তা কখনো করবো না। এ তো আমারই ভুল। হেলেন বললো। তারপর চলে গেল দান হেসে। বাবার আগে দু’টো হাত দিয়ে আমার হাত ধরে বললো—‘হয় তো আবার কখনও দেখা হবে আমাদের।’

আবার ফিরে আসছিলাম একলা নির্জন পথে। ঘুরে বেড়াই বাগানে বোধ হয় কারা শুকনো পাতা জ্বালাচ্ছে। গন্ধ আসছিল নাকে। একটু এগিয়ে রেলওয়ে সাইডিং। তারপর আগে এগিয়ে আমাদের দ্রাঘ। সুনামি রেকর্ড প্রেসারের রামরা বাজছে। কত সাদা, কত কালো আগছ। পরস্পরের কাছে এই সন্ধ্যায়? কত মতের বিনিময়—কত মনের বিনিময়। হ্যাঁ মনের বিনিময়ও। তবু আবার মনে এলো, আজ সকালের ডাকে—নতুন দিগন্ত থেকে আসা চিঠি। রতিন খাম আইভরি পেপারের ওপর জাঁকা সিলিং-মোর, টোপার আর গোড়ের মালা। ভেতরে লেখা—সবিনয় পুরস্কার নিবেদন। চিত্রার সঙ্গে স্মশোভনের বিয়ের চিঠি। স্মশোভন পরীক্ষার পাস করেছে বলে চিত্রার বাবা কস্তাস্প্রদানে রাজী হয়েছেন। আমার হঠাৎ মনে হল—ওর প্যাসেজবানী নিশ্চয়ই বরণ হিসেবে ভজলোক দিচ্ছেন। স্মশোভন কি তেমন কাঁচা ছেলে যে ঘরের পরমা খরচ ক’রে বিয়ে ক’রতে যাবে? আর চিত্রার? সে হয় তো বলবে—তোমার জন্মেই ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি আমারই। তুমি বতসুয়েই থাক, আমার প্রেমের টানে তোমাকে আসতেই হবে আমার কাছে।’

থাক ওসব চিন্তা। পায়ে পায়ে অনেক পথ হাঁটা হয়েছে—বড় তেঙী পেয়েছে, সামনের পাঁচটার ঢুকলাম। কাউন্টারের ধামে এসে

## অগ্নিযুগের কল্যাণী

প্রেসিডেন্সি কারাগার। বৃটিশ-বর্ষ ভারতের যথাগণনে।

কারাগারে কুশম-কলির দ্বারা অর্ধ-ফুট করেকটি ভক্ত-তরুণী লাইন দিয়ে কাঁড়িয়েছে অজ্ঞাত কারোদের সঙ্গে। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী লাইন অতিক্রম করে দ্রুতপায়ে চলেছেন এগিয়ে,— কারোদীর্ঘ তাঁকে দেখামাত্র নিয়মমাত্তিক কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠেছে,—সেলাম সরকার!

একটি তরুণীর পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘেরোটির হাত অনড়, বদন বাকচারা! থমকে কাঁড়ান কর্মচারী; কে এই উদ্ধত বালিকা? 'স্পার্টা'ত' কম নয়। ইংরেজ সরকারের জেলে বন্দিনী হয়েও তার তেজ কমে নি! কোন সাহসে সে অমাত্ত করে জেলের অমুশাসন?

ও! ঐ বৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মন প্রাণ-সমর্পিতা তরুণী কল্যাণীর একজন! কৈশোরের লালিত্য এখনও মুখ থেকে অপসারিত হয় নি। তা হোক,—কঠিন স্তব্র সরকারী কর্মচারীর ওতে মর্মান্বিত হয়ে চলে গেলে ইংরেজ-নপুং পদোন্নতির আশার জলাঞ্জলি। তৎক্ষণাৎ হুকুম হয় তাকে 'সেলে' বন্ধ করার। তার পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়,—কেন সে জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করে,—কেন 'সরকার সেগাম' বলে অভিবাদন জানায় না?

গর্বোন্নত শিরে তরুণী জবাব দেয়,—যে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম,—যার জন্য আজ জঘন্য জেল-জীবন, তাকেই আবার সেলাম? এও কি সম্ভব? আমরা কি মাছুষ নই? সেলে বন্দিনী হবার ভয়েও তার মুখে একবিন্দু ভীতির রেখা ফুটে ওঠে নি।

সেলের ভয়াবহতা শুনে আঁতকে উঠে। ছোট ও নীচ এমন একখানা কুঠুরী, যাতে সোজা হয়ে কাঁড়ানো যায় না। অথবা পা মেলে শোওয়া চলে না। জানালা-দরজার বালাই নেই, সামনের দিকে দরজার বিকলে করেকথান মোটা লোহার শিক, যা সব সময়ই মোটা একটি তালা দিয়ে বন্ধ থাকে। তার দেখালে কালো রং,—ভেতরে রাত-দিনের তফাৎ বোঝা যায়। এর মধ্যে অসীম মানসিক-শক্তিসম্পন্ন পুরুষমাছুষও বেশদিন থাকলে পাগল হয়ে যায়।

সেদিনের রাজনীতিক সংগ্রামে দেশকে দুশো বৎসরের পরাধীনতার মানি থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে যে সব শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের তরুণ-তরুণী মৃত্যুপণ করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েছিল, তাদের অনেককেই এই সব সেলে বন্দি থাকতে হয় মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেয়ে। ভগবান যেন এক অদ্ভুত ধাতুতে তৈরি করেছিলেন এই নির্ভীক, আত্মত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু বাংলার ছেলেমেয়েগুলিকে। আমাদের আজকের স্বাধীনতার ভিত্তি তাদেরই নিবাতন ও আত্ম-বলিদানের উপর গঠিত,—আজ কি আমাদের সে কথা ভুললে চলে?

এই কঠিন ইন্দ্রাণ্ডে গড়া মেয়েদের মধ্যে একজনকে দেখে হই বিম্বিত-রোমাক্ষিত। নাম তাঁর কল্যাণী দাস,—অথবা কল্যাণী ডাউচার্চ। বয়স ৫৫, বর্তমানে ভগ্নবাহু। বলেন,—শরীরের উপর দিয়ে এত বড় বয়ে যাবার পরেও এখনও পর্যন্ত যে বঁচে আছি তাই আশ্চর্য। বৎসরের পর বৎসর জেলের কাঁক-ভরা ভাত খেয়ে স্বাস্থ্য আর থাকে কি করে?

অতি মৃদুভাবী, স্নেহীলা মহিলাটির জীবন সম্বন্ধে আরও কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করায়,—যুৎসে তিনি বলেন,—সেদিনের



## ফ ণ স্মৃতি

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই গুটিকত আত্মত্যাগী মেয়ের কথা আজ কেঁইবা স্মরণে চায়? এখন যেন তাঁদের সকলেই ভুলে গিয়েছেন! কিন্তু যে সময়ে তাঁরা দেশের মুক্তিসংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন,—সে সময়ের সে কাজের দুর্ভাগ্য, আজকের মানুষের বল্লনা করাও কঠিন। বেশির ভাগ অভিভাবক, পরিবার-পরিজন, জনসাধারণ, সকলেই ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে কম্পমান,—সবাই তাঁদের বিরুদ্ধে। কোন সহযোগিতা কি উৎসাহের বদলে নিছক নিরুৎসাহ ও তির্যাক পেরেও তাঁরা তাঁদের কর্মপন্থা এগিয়ে চলেন যেন ভেতরেরই একটা আবেগের তাড়নায়।

কল্যাণীদের পিতৃদেব ৮৬বছরীয়াব দাস ছিলেন কটক কলেজিট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেকালের আদর্শ-চরিত্র দেশ-হিতৈষী কর্মব্যপারায় মুষ্টিমের শিক্ষকের অকৃতম। তাঁরই হাতে গড়া, তাঁরই শিক্ষার অনুপ্রাণিত, সেদিনের স্বদেশী বস্ত্রের ছোতা—অগ্নিস্থলিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর লেখার, নিজের জীবনে এই আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব ব্রানভাবে প্রকাশ করেছেন।

মাতা ৮৯বছরীয়াব আজীবন সমাজ-সেবার কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়-হৃদয়; আশেপাশের দুখী মেয়েদের দেখে তাঁর প্রাণ এতই কাঁপা হত যে, যখন যেখানে থেকেছেন, সর্বদাই নিজের বাড়িতে একপা দুখী মেয়েদের নানা প্রকার শিক্ষা ও হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের দুখ নিবারণের চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি আজ 'সরলা পুণ্যাশ্রম' নামে শতাধিক দুখী মেয়ে নিয়ে কলকাতার সহরতলী কসবার সুপ্রতিষ্ঠিত।

কল্যাণীদেরই সংগঠন শক্তিতে এবং তাঁর ভগ্না ও জাতজ্ঞার সহযোগিতায় ‘সরলা পূণ্যশ্রম’ এখন বিস্তৃতিলাভ ও নিজের পায়ে ঠাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণে সক্ষম।

এমন পিতামাতার গৃহেই এমন অসাধারণ স্বস্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর ছোটবোন বিণা দাসের নাম কে না জানে? ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় তদানীন্তন চ্যান্সেলার ও গভর্নর, শ্রাব স্ট্যানলি জ্যাকসনকে উপাধি বিতরণ সময়ে যে উপাধি-গ্রহীত্রে মেয়েটি অত বড় জনসভার প্রকাশ্য দিবালোকে অকুতোভয়ে শিস্তলের গুলী ছুড়ে মেরেছিল,—স্বদেশকে পবাবীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রেরণায়,—সেই অসীম সাহসী বীরান্না বিণা দাস (অধুনা ভৌমিক) কল্যাণীদেরই সহোদরা।

ছ’টি বোনই স্বদেশপ্রেমে আত্মহারা,—জীবনদানে ও মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে বন্ধপরিকর। তাঁরা বেধুন কলেজে পাঠ্য্যবস্থায়ই কাঁপিয়ে পড়েন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে। তখনও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি তেমন প্রবলভাবে প্রচারিত হয় নি,—বাংলার কিছুনাথক দুর্গচিহ্ন তরুণ-তরুণী মৃত্যুপণ করে বৃটিশ শাসকের উচ্ছেদ সংকল্প নিয়ে শ্রীঅরবিন্দর প্রদর্শিত পথে পা বাড়িয়েছেন। এ পথে নেই বিপদের সীমা-পরিমীমা—সমস্ত কাজ করা চাই অতি সাগোপনে। ইংরেজের চর সর্বথা পিছনে ঘুরছে, ঘৃণাক্ষরে সন্দেহ হলেমাত্র দলে দলে বিনা বিচারে জেলে পুরছে। আবার দলের অহদের খবরাখবর জানার জন্ত, ধৃতদের উপর চালাচ্ছে বর্ষা অত্যাচার! বিস্ত্র চাবুকের আঘাতে শয্যাশায়ী অথবা অজ্ঞান করে ফেলেলেও ওদের মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে না পেরে হার মানছে! এঁদেরই একজন কল্যাণীদের।

আদি নিবাস চট্টগ্রাম হলেও জন্ম কটকে এবং শিক্ষা কলকাতায় বেধুন স্কুল ও কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসের ছাত্রী অবস্থায় কল্যাণীদের ছাত্রী-সংঘের সম্পাদিকাৰূপে বাজেনৈতিক কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। সে বৎসর কলকাতা-কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন এমতিলাল নেহরু এবং জি ও সি—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কল্যাণীদের নেতৃত্বে ১০০টি ছাত্রী সেখানে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ সম্পন্ন করেন স্তম্ভভাবে। তারপর থেকে তিনি দেশের কাজেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে কলকাতা-শিক্ষায় ঠাঁড়ি টেনে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশমুক্তির কাজে। কতবার জেলে যান, কিন্তু দারুণ হুসহ জেল-জীবনের অবসানেই আবার গিষ্ঠ হন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। জেলের ভিতরে থেকেই তিনি ফিলজফিতে এম-এ পাশ করেন। মেয়ে-জেলের ভিতরেও কল্যাণীদেরই করেন কত জীর্ণসংস্কার। তাঁর নিকট শুনি,—জেলের ভিতরে তখন মেয়েদের যে একটি খোলার মত পোশাক দিত, তাতে সম্পূর্ণরূপে লজ্জা নিবারণ হওয়া ছিল দুঃস্বপ্ন। কল্যাণীদেরই এবং তাঁর কয়েকটি সহকর্মিণী ও

জেল-সঙ্গিনীর বহুপক্ষের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ ও বিরুদ্ধতার পর, জেলে মেয়ে-কয়েদীদের মোটা শাড়ি দেবার প্রথা প্রচলিত হয়।

আজকের স্বাধীন ভারতে ইংরেজ-প্রবর্তিত জেলের ভিতরের কুপ্রথাগুলির সংস্কারসাধনে আমাদের নেতারা আগ্রহশীল, কল্যাণীদের মত ভুক্তভোগিনীরাই পারবেন মেয়ে-জেলের অমানুষিক বর্ষা প্রথাগুলি দূর করতে। আজ এঁদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে দেশ হবে অনেক লাভবান ও শক্তিশালী।

কল্যাণী দাস বেশ কিছুকাল কারাগার বাসের পরও অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন অনেকদিন। তারপর এলো বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-আকাঙ্ক্ষিত, যুগান্তকারী স্বাধীনতা। এবার মুক্ত হয়ে কল্যাণীদেরই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন সমাজসেবা ও সংগঠনমূলক কাজে। তাঁর সময় ও মেধা, এখন বহুলাংশে নিয়োজিত হয়েছে তাঁর প্রচেষ্টা মাতৃদেবীর নামে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ‘সরলা পূণ্যশ্রম’ নামক প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে। কল্যাণীদেরই সুযোগ্য পরিচালনায় আজ এটি এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক অগ্রদূতান অধিকার করে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে, দুঃখা মেয়েদের প্রভূত কল্যাণসাধনে রত। বালীগঞ্জের মুন্সীদার গালস্ কলেজ স্থাপনেও তাঁর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয়। আদিত্যে, তাঁর কল্যাণহস্তের স্পর্শ বিনা এই কলেজ আজ এত বৃহৎ রূপ ধারণ করতে সমর্থ হত কি না সন্দেহ।

কল্যাণীদেরই সাহিত্য্য প্রতিভারও সুবর্ণ দোহাতে পাই তাঁর রচিত জেলের তথ্যবহুল ‘জীবন-অধ্যয়ন’ গ্রন্থ। কল্যাণীদেরই সাম্প্রতিক কাজ—দিল্লীর ‘রামমোহন রায় মেমোরিয়াল হল’ নির্মাণ। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—‘স্বামীর কর্ম-উপলক্ষে সম্প্রতি দিল্লী বাসের সুযোগ ঘটে। সেখানে মনে হয়, এই রাজধানীতে যদি রামমোহন রায়ের একটি স্থায়ী স্মৃতিমান্দীর গড়া যায়, তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। স্বর্গীয় মনীষীর নিকট আমরা কতভাবে ধনী, বিশেষ মেয়েদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁর অস্বহীন অবদান! আজ যে আমরা লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে বিচরণ ও কর্মক্ষমতা পেয়েছি সেও তাঁরই কৃপায়। এ কল্পনা মনের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করার পর কোমর বেঁধে কাজে অগ্রসর হই।’

আজ তাঁর সে স্বপ্ন সফল, সে আকাঙ্ক্ষা পূর্তিগুণ! দিল্লীর সরকারী মহলের নানা শাখা-প্রশাখায় ঘোরাঘুরি ও নিজ পরিকল্পনা জানানোর পর, কেন্দ্রীয় সরকার কল্যাণীদেরকে এই কাজের জন্ত দান করেন,—নুতন দিল্লীর রাউন্স অ্যাভিনিউতে তিন বিঘা জমি ও পঞ্চাশ হাজার টাকা। আরও লক্ষাধিক টাকা চাচা তুলে, বৎসর দুইয়ের ভিতরে বিরাট একটি হলঘর, পুস্তকাগার, মাতৃমঙ্গল বিভাগ, —সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় একটি মেয়ের পক্ষে গড়ে তোলা কি কম কৃতিত্ব? অথচ তাঁর সৌভাগ্যক্রমে পারিবারিক-জীবনে তিনি তাঁর দেশহিতৈষণা ও সমাজসেবী কাজে সর্বক্ষণই পেয়েছেন আত্মজনের সন্তোষ সহযোগিতা। বাৎসরিক তথা বাংলার মুখোজ্জলকারিণী এই অসাধারণ শক্তিশালিনী মহিলাকে জানাই প্রদানতি।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥

## বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-চিন্তা

মৃণাল ঘোষ

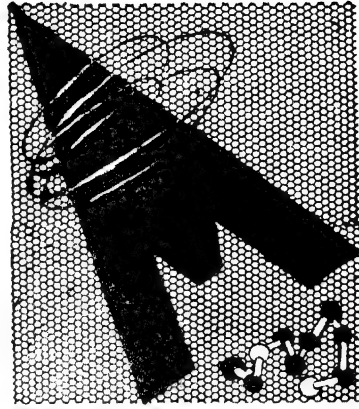
**শুধু** বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক নহে, সর্বকালে সর্বদেশে চিন্তাশীল মনুষ্যগণের মধ্যেও বিশ্বস্তপিত উপলব্ধি করবার, সৃষ্টি রহস্যের মর্মেদ্বাটন করবার একটা ঐকান্তিক প্রাণেচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিক-এবং মনোবৈজ্ঞানিক দুইটি বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাঁদের অঙ্গভূম।

বৈজ্ঞানিককে আমরা উপকাস-সম্মত। অতুলনীয় মর্যাদা দিয়েছি, কিন্তু এ কথা বললে একটুও অত্যাশ্রিত হবে না যে, এই রসজ্ঞতার জীবনব্যাপী বিজ্ঞান-চেতনা কিংবা সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর মনোবিজ্ঞানের বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত আমরা আশাহীনভাবে আলোচনা করি নি।

বিজ্ঞান-চর্চার ভিত্তিভূমি গণিত। সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে এক বিশ্বব্যবস্থার সৃষ্টি করল আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি। কিন্তু এই আপেক্ষিকতায় কি? মাত্র কয়েকটি ফলস্বরূপ কাগজের উপর একটি গণিতের সিদ্ধান্ত। ছাত্রাবস্থা হইতেই বহুশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিকের ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। কনিষ্ঠভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের অধ্যয়নকালে কলেজের কোন গণিতাধ্যাপক রাসে জ্যামিতির কোন এক 'প্রতিজ্ঞা' পূরণে ব্যর্থ হয়ে ফেলের সঙ্গে বসেছিলেন, 'চায় বৈজ্ঞানিক থাকিলে 'প্রতিজ্ঞা'র নিশ্চয়েই সমাধান হইত।'।

বৈজ্ঞানিক মতবাদ কিংবা সিদ্ধান্ত চিরপরিবর্তনশীল। নিউটনের যুগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির কপাস্তর গটল আইনস্টাইনের কালে, আবার হয়েল-নাইলিকার আজ বিজ্ঞান রাজ্যের কোন নব দিগন্তের দিশারী? আজ মহাশূন্য-বিজয়ী মানুষের বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রার যুগের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের যুগের তুলনা করা বাতুলতা। বাঙালী তথা ভারতবাসী তখন সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্কে আসিতে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় বৈজ্ঞানিক তখনই সমসাময়িককালের প্রচলিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করছিলেন। তার পটভূমি রয়েছে ১২৭৯-৮০ সালে লিখিত বৈজ্ঞানিকের কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। ১৮৭৭ সালে ঐ প্রবন্ধগুলি 'বিজ্ঞান রহস্য' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয়। অনেক পরে ১৯০৮ সালে বৈজ্ঞানিক শতাব্দিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক যে বাবোথানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, তার অঙ্গভূম 'বিজ্ঞান রহস্য'। এখানে শ্রবণ করা বর্তব্য যে, কোন বিষয়ে গভীর অধ্যুসী না থাকিলে প্রকাশভঙ্গী সহজ হয় না। কি অসম্ভব সহজ অথচ মূল্যবান ভাষায় বৈজ্ঞানিকের বিবরণ করলেন সৃষ্টি-রহস্য।

তবে এককালে জগতের যে এ রূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে এই পৃথিবী এইরূপ তুণ শূন্য, বৃক্ষময়ী সাগর পর্বতাদি পরিপূর্ণ, জীবমণ্ডল, জীববাস্যাপ্যমণ্ডিনী ছিল না; গগন এককালে একরূপ স্থগত নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট। না। একদিন তখন দিন হয় নাই, এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না... বায়ু ছিল না। কিন্তু বাহাতে এই চন্দ্র, সূর্য, তারা হইয়াছে, বাহাতে জল, বায়ু, ভূমি হইয়াছে... বাহাতে নদ, নদী, সিন্ধু... বনবিটপী, বৃক্ষ... তুণ, লতা, পুষ্প... পক্ষী, মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটয়াছে—ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে।



## জিওন বার্তা

বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans সূর্যের প্রাণের ইংরাজী ভাষায় Mysterious Universe এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর বহুপূর্ব উপন্যাসিক বৈজ্ঞানিক অপর এক সাহিত্যধর্মী প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে নিজ মাতৃভাষা বাঙালীর মাধ্যমে সৃষ্টি-রহস্যের কথা তাঁর স্বজাতিকে ভূমিয়ে গেছেন যখন বাঙালীর বৈজ্ঞানিক শব্দের কোন পরিভাষা সৃষ্টি হয় নি।

কি অপরূপ বৈজ্ঞানিকের জ্যোতিষতত্ত্বের নিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ! 'আলোক ইথর' নামে প্রথমে বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পরমাণুর আন্দোলনের ফলস্বরূপ। সূর্যকালক হস্তস্বর্গের সমন্বয়, সেই সন্তুর্গ ইন্দ্রধনু অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেরিত আলোকে সজ্জিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের বর্ণের সকল গুণক পৃথক; তাহাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ফলে সৌরজগৎ। এই সকল জ্যোতিষতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জগতের বর্ণ বৈজ্ঞানিকের কাব্য।

স্বনামধন্য প্রথম চৌধুরী (বীরবল) বলেছিলেন, ওমর খৈয়ামের হাতে জ্যামিতির রেখা রসায়নের গোলপের মত ফুটে উঠেছিল। নীরস বিজ্ঞানতত্ত্ব বিশেষণে বৈজ্ঞানিকের কুহিন্দও টিক সেই রকম। গতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকের নিবেদন:—

'গতিতত্ত্ব জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মেরাধের ফলস্বরূপ। জগৎ সর্বদা সর্বত্র গোল। সেই চাক্ষুষ বিশেষী করিয়া বৃত্তিতে গেলে, জতি বিশ্বব্যবস্থার বোধ হয়। জীবনাবধি শোণিতদ্বির চাক্ষুষই জীবন। স্থাপিত বা স্থানান্তর চাক্ষুষ রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও নৈতিক পরমাণু মাধ্যমে রাসায়নিক চাক্ষুষ সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়।'

Heat অর্থাৎ তাপ কি, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের বর্ণনা:—

'যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরমাণুর দ্বারা আতৃপ্ত এবং সম্বাদিত হইলে, তাহা তৎসম্বন্ধে আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই জিহাই তাপ।'

Light অর্থাৎ আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কি সূক্ষ্ম প্রাণের বর্ণনা:—

‘পৃথিবীতলে আলোক সর্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাতে, পৃথিবীতল একেবারে আলোকবিশূণ্য নহে। অতএব সর্বত্রই সর্বত্র আলোকীয় আলোকানের গতি বর্তমান।’

ছাত্রাবস্থা থেকেই Astronomy-র প্রতি বহুমুখের অধ্যয়ন ছিল অগভীর। নক্ষত্রলোকের রহস্যের কথা প্রসঙ্গে—‘আকাশে কত তারা আছে’ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি প্রথমেই উপস্থাপন করেছেন জ্যোতির্বেত্তাদের সেই চিরন্তন প্রশ্ন:—

‘ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু ফলিত আছে—ওগুলি কি?’

অগভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে তিনি আমাদের সেই শাখাত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন:—

‘তারা সব সূর্য, সব সূর্য!...এই আলোকবিন্দুগুলি সকলেই সৌর-প্রকৃতি। কেবল আভ্যন্তরিক দূরতাবশত আলোকবিন্দুস্ব দেখায়।’

তারালোকের, নক্ষত্রপুঞ্জের রহস্য বর্ণনায় স্বয়ং বহিমের কি অনুরাগী ভাষা:—

‘অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অসংখ্য নাক্ত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূরদৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র নাক্ত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বাসি, বনে যেমন পাতা, মালা রশ্মিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমন অসংখ্য এবং ঘনবিশিষ্ট।’

যখন ইংল্যান্ডে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানচর্চা হয় নি, তখন সেখানে নিউটনের পরমাত্মবাক্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের কথা স্বপ্ন করে বসেবসে নক্ষত্রের আবর্তনশীলতা প্রসঙ্গে লিখেছেন:—

‘গিচিট এই যে নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিক উপলক্ষ করিয়া যে সকল আধ্যাত্মিক গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দ্রাবতী এবং সৌরজগতের বিহীন এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাদীন।’

বহুমুখের বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বব্যবহার। তাঁর দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়েছিল সর্বস্বত্বাধীণী অসুস্থ প্রাণের লীলা। তাঁর জৈবনিক নামক প্রবন্ধে রয়েছে তার মর্মপর্যটন:—

‘জলজান, অগ্নিজান, অগ্নাজান এবং বস্কাজান এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক...এখন লক্ষ এক জৈবনিক সর্বভাব নিমিত্ত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি শাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী। য কুশুম ভ্রাণ মাত্র লইয়া লোকমোহিনী সন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সন্দরীও বাহা, কুশুমও তাই। কীটও বাহা, সন্মটিও তাই...সকলই জৈবনিক।’

এ ধেন বিজ্ঞান-জগতে বহুমুখের এক নূতন pantheism প্রচার।

শুধু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নয়, সত্যতঃই স্বয়ং স্বয়ং তিনি অবলোকন করেছিলেন, সৃষ্টির মধ্যে এক সর্বব্যাপী জৈবনিক চাক্ষুষ। জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ঐক্য আপন দৃষ্টির গভীর অনুভূতি দিয়া উপলব্ধি করে বললেন:—

‘জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন সেইখানেই জৈবনিক

তাহার পূর্বগামী। ‘অন্তথা সিদ্ধিশূন্য নিয়তা পূর্বসিদ্ধতা বাক্য’—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে এবং জৈবনিক জীবনের নিজ পূর্বসূরী বাটে। অতএব আমাদের এই চেষ্টা, সুখদুঃখবহুল, বহু প্রয়াসের জীবন কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, বাসায়নিক সংযোগসমূহের জড়পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, ক্যালিডাসের কবিতা, হোমার বা শ্যাকসপীয়ার পাণ্ডিত্য—সকলই জড়পদার্থের ক্রিয়া, শাখা সিত্তর স্বপ্নজান, আকবরের শৌখ, কোমতের মর্শবিনো—সকলই জড়ের গতি...সকলই জড়পদার্থের আকৃষ্টন সম্প্রসারণ মাত্র...এই সত্যতা জৈবনিক অজ্ঞান, অজ্ঞানজান এবং বস্কাজানের রহস্যময় সমষ্টি।’

## রাঙের অনুভূতি কি করে জাগে

### অনুসন্ধানী

মাঝের মধ্যে রাঙের অনুভূতি কি করে জাগে, এই প্রশ্নের

উত্তর বহুকাল আগে ১৮০২ সালে টমাস ইয়ং নামে

জর্নৈক পদার্থবিজ্ঞানী দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাঙের অক্ষিপট বা রেটিনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মোটাজুড়ি শব্দ। এইসব শব্দ অক্ষি-গোলকের স্বচ্ছ আবরণ বা অক্ষিপটের উপর যে বিভিন্ন রঙ প্রতিফলিত হয় তা আত্মসাৎ করে এবং তাদের পাঠিয়ে দেয় স্নায়ুশুলীতে। তাহেই রাঙের চেতনার ও অনুভূতি জাগে। পরে আবার বিজ্ঞানী বললেন, প্রতিটি কোষের বা শব্দর মধ্যে রয়েছে তিনটি রঙকের বা পিগমেন্টের বসতি। দেড় শতাব্দী ধরে এ নিয়ে গবেষণার পর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেকে এই ধারণাই আজ পোষণ করেন।

এই ঘটনার ১৬২ বছর পরে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবপদার্থ বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিচ্ছেদেই পবিবল্লনা অনুসন্ধান নির্বর্ত অতি সুস্থ ইচ্ছাকৃতিক বস্তুপাতির সাহায্যে মাঝের অক্ষিপটের বা রেটিনার মধ্যে রঙ সম্পর্কে অতি সচেতন তিন প্রকার কোষ বা শব্দর সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের এই উদ্ভাবনে টমাস ইয়ং-এর সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে।

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবপদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ এডওয়ার্ড এক ম্যাকানকলের (জুনিয়ার) সঙ্গে ডাঃ উইলিয়াম মাক্স এবং উইলিয়াম ডোবেল নামে জর্নৈক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করছেন। নীল রঙ, গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা নীল রঙের গ্রাহক বা রিসেপ্টার যে মাঝের চোখে রয়েছে এই গবেষণার ফলে তা প্রথম আবিষ্কৃত হল। পূর্ব রেটিনা বা অক্ষিপটের কোষ বা শব্দ সম্পর্কে পর্যালোচনার ফলে বিজ্ঞানীরা দুটিমাত্র আলোক-সচেতন রঙকের বা পিগমেন্টের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু অসংখ্য কোষের বা শব্দর মধ্যে তা কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার কোন হদিশ তাঁরা মেনে নি। অক্ষিপটের বা রেটিনার কোষের ও রাঙের স্তরটিই হচ্ছে চোখের আলোক-সচেতন অংশ। মাঝের একটি চোখের প্রায় দশ লক্ষ মোটার মত শব্দর বা কোষের এবং এক কোটি রঙ বা বস্তু রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে আলোকে রঙ চোখে পড়ে কেবলমাত্র সেই আলোকেই কোষসমূহ চালু থাকে। অক্ষিপটের



## মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায় ও দীপালী দিন

৮ ডেটনার ঐ সব কোষ বা শব্দর প্রত্যেকটির দ্বারা এক ইকিও-প্রিন্সিপাল ভাগের দুই ভাগ। হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি জড়িত মাইক্রোস্কোপে ফটোমিটারের সাহায্যে ঐ সব কোষের মধ্যে আলোকপ্রতি প্রতিবেশ করিয়ে এ বিষয়ে তথ্যসম্ভারের কাজ করেছেন। ঐ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিভিন্ন কোষের বর্ণালীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভাগ করে নিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করে দেখলেন যে এসব প্রক্রিয়া তিনটি। দুটি লাল ও সবুজ রং সম্পর্কিত। এই দুটি প্রক্রিয়ার কথা পূর্বেই জানা ছিল। তবে তৃতীয় প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে বহুকাল থেকেই পাওয়া যায় নি। ঐ প্রক্রিয়ায় সৌর আলো থেকেই পেলেন, ঐ নীল রঙ সম্পর্কিত। ঐ পর্যালোচনাও ইহা-এর মতবাদটিকে সমর্থিত করেছে। ঐ কতিপয় মাইক্রোস্কোপে ফটোমিটারটি তৈরি করেছেন ডাঃ ম্যাকনিকল এবং ডাঃ মার্শ। ঐ যন্ত্রের পরিকল্পনা এবং নকশাও ঐ তৈরি করেছেন।

এ ছাড়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ওয়ালডের অধীনে মিক্সাল কে ব্রাউনও একই সময়ে এ বিষয়ে পৃথকভাবে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেন।

ডাঃ ম্যাকনিকল তাঁর ঐ যন্ত্র সম্পর্কে বলেন যে, স্পেকট্রো-ফটোমিটার আলোর তীব্রতা বা মাত্রা নিরূপণের একটি যন্ত্র। ঐ যন্ত্রে কোন গবেষণাগারেই ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত উন্নত হওয়ার ফলে তাঁর ঐ অতিনব

মাইক্রোস্কোপে ফটোমিটার নামে যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে এবং রেটিনার বা অক্ষিপটের কোষের মত অতি ক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কেও ঐ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। 'যদি যন্ত্রপাতির অভাবেই নীল রং সম্পর্কিত ঐ রং-এর গ্রাহক বা রিসেপ্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে পাওয়া এতদিন সম্ভব হয় নি।'

ডাঃ ম্যাকনিকল এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে মনে হয় লাল রং-এর গ্রাহক কোন একটি কোষের বা শব্দের মধ্যেই লাল ও সবুজ উভয়প্রকার রঙের পদার্থই একই সঙ্গে থাকতে পারে। এ বিষয়ে আরও তথ্য অন্বেষণের সঠিক বর্ণালী গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

ডাঃ ম্যাকনিকল অল্পমুগ্ধসী বা নার্ভ সিস্টেম নিয়েই গবেষণা করেছেন। নেত্রস্থান বা অক্ষিপট নার্ভের মাধ্যমে শব্দ কিভাবে পরিবাহিত হয়ে থাকে তা নির্ধারণের চেষ্টা তিনি করেছেন। অক্ষিপট বা রেটিনা উদ্ভাবিত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ স্নায়ু বা নার্ভ তাতে কিভাবে শব্দ দেয় তা জানবার চেষ্টাও তিনি করেছেন। রং সম্পর্কে সচেতনতা সম্পর্কে যেসব তথ্য বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে তা এ ব্যাপারে সহায়ক হবে।

বর্ণ সম্পর্কে অনেক অল্প তথ্য বর্ণ সম্পর্কে দুটিও অনেকেরই ক্ষতিপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের দ্বারা কোন একটি কোষের বা শব্দের মধ্যে রঙের পরিমাণ জানবার প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়া এ বিষয়ে আলোকপাত করবে।

## মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়

সুখানু দে

আকাশ সমাধি  
মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়  
আমাদের এখানে এখন  
মহরার নেশায়  
কানামাছি গেলা;

রকেটেও পাড়ি ভমাই  
আকাশের কেনারা সন্ধান;

আমাদের সূর্য-প্রদক্ষিণ  
যবনিকাপাতের  
প্রাসাদে উন্মুখ;

সমুদ্রের হাওয়ার তখন  
নীল-নীল নেশা  
মহাকাশের জগৎগস্তীর আমন্ত্রণ;

মৃত্যু-নীল সাগরের নেশায়  
আকাশ নীল।  
গভীর সাধনার ময়  
জীবন-অনন্ত-বিবর্তন।

## দীপালী দিন

মাননয়া বিশ্বাস

ভুলি নিক সেই হাসির ঝলক দীপালী দিন।  
অনৌ আকাশে শিশু সহস্র কিসের স্বপ্ন  
অসীম আবেগে চলার লগ্ন  
বিরামহীন।

উন্নত তার উজ্জ্বল দেহে  
পূর্ণিমা স্মৃতি চন্দন স্নেহে  
আলাল পূর্ণ ভবন প্রদীপ মৃত্যুহীন  
নন্দন বনে সোনালী স্বপ্ন কালিহীন।  
রবিকর হতে গেয়েছে শক্তি অপরিমিত;  
দিগন্ত থেকে দিগন্ত-ভরা মরণহিম  
গলেছে,—গলেছে চরণে তার,  
স্পর্শ পেয়েছে অচ্ছকার,  
মুহূর্ত মাঝে অপরাধ সাজে চমক লাগাল ঘন বর্ষিন।  
আঁধার জীবনে উদ্ভূত তারা দীপালী দিন।  
ভুলি নিক সেই হাসির ঝলক দীপালী দিন,  
দুর্বার বেগে জোয়ার এনেছে বিভাসহীন  
জীবননদীতে—কুসুম ফুটেছে, অশ্রুমাহার  
ধবলীকে চরণচিহ্ন মনোলাভার।  
এ কি সন্ধান মুখ জীবনে মৃত্যুহীন  
হারানো প্রাণের স্বপ্নস্বপ্ন—দীপালী দিন।

# ভারতের বস্ত্রশিল্পের সংকট

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

আপেক্ষাকীন অবস্থারও দেশের দীর্ঘদিনের সমাজ-কণ্টকিত বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের সম্মুখে বিশেষ কোন সুশ্রবিকল্পনা নেই বরং এ বিষয়ে শৈথিল্য বা অবহেলা আমাদের এ শিল্পের অগ্রগতিককে রুদ্ধ করে রেখেছে। এজ্ঞা মালিকদের যুগোপযোগী নীতির প্রতি অসহযোগিতা এবং সরকারের শৈথিল্য বহুলাংশে দায়ী। এ বিষয়ে বিশেষ সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট পথে শিল্পকে পরিচালিত করার বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্য আজকের নয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব থেকে ভারতের এ শিল্প পৃথিবীর বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২০০০ সালেও দেখা যায় দিশরীষ মমীকে আবৃত করা হত ভারতীয় শৃঙ্গা মসলিনে। একটি শিল্পকর্মের বিরাট-বিখ্যার ছাড়াও আজ বস্ত্রশিল্পকে ভারতের বৃহত্তম শিল্প বলা যায়। কারণ ভারতের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগই উৎপাদন হয় কাপড় মিলদ্বারা। বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত বর্তমানে শ্রমিকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। তাদের উপার্জন একশত কোটি টাকার অধিক। ভারতবাসীর দাবি মোটা ভাত, মোটা কাপড়। কোনোটিই আশাহতকণ্ঠাবে মোটাই এতদ্বার্য পরিকল্পনার মধ্যেও।

আজও 'করিম শেখ' কোম্পানি গরে হল চাখ করে, অম্ব-উলসিনী 'পরাণের স্ত্রী' ভিক্টোরের সাথে নিজের লজ্জা নিবারণের জ্ঞান, কর্ণবস্ত্রের জ্ঞান দ্বারে দ্বারে ঘোরে—এ আমাদের জাতীয় চিত্র।

অপর দিকে নাইলন, টেরিলিন, ডেকন-এর প্রাচুর্য। 'আচ্ছে'র (Haves) দলবৃদ্ধ হচ্ছে। 'না আচ্ছে'র (Have not) দলের নিঃস্বতা কমছে না। (আমাদের দেশে প্রায় ৬ কোটি লোক প্রায় অন্যভাবে দিন যাপন করে, তত্বপরি আচ্ছে হুক লক্ষ ভিথিরী)। এই অসমতা (Disparity) সমাজতাত্ত্বিক দাঁতে গঠিত রাষ্ট্রের অগ্রগতির একদিককার নয়গতি। আমাদের মাথাপিছু কাপড়ের প্রয়োজন ১৮.৫ গজ। সরকারী মতে পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু কাপড়ের প্রয়োজন ২৫গজ। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মাথাপিছু ১৬গজ। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয় মাথাপিছু প্রায় ৩শত গজ)। ভারত সরকার কাঁচুনগোর রিপোর্টারের পর ১৯৫৪ সালে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের বর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাতে হস্তচালিত তাঁতকে বিদ্যুৎশক্তি চালিত তাঁতে রূপান্তরের নির্দেশ দেন। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদনে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, দেশবাসীই বা কতদূর সাক্ষাৎ হয়েছেন তার স্বয়ং জ্ঞানালোচনার মধ্যে না গিয়ে একটি দৃষ্টান্তবৎ উল্লেখ করলেই বোধ হয় বিষয়টি সহজে বোধগম্য হবে। ভারতের তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ।

১৯৫৭ সনে ১৬৭৮ কোটি গজ। ১৯৫৮ সনে ১৮২.২ কোটি গজ, ১৯৫৯ সনে ১৯১.০ কোটি গজ ও ১৯৬০ সনে ১৮৬.০ কোটি গজ। এর অর্থ স্থিতির পরিকল্পনার শেষে সমস্ত মুহূর্ত পরিকল্পনাসম্বন্ধে তাঁতবস্ত্রের অগ্রগতি অন্তান্ত নৈরাশ্রজনক। চাঁদ্রাড়া আমাদের বস্ত্রের অন্তরিক্ত প্রয়োজন ১৭০ কোটি গজ

তো রয়েই গেল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পের ভগ্ন-বাংলার বাইরে থেকে আমাদের দৃষ্টিতে হয় (বিশেষত দক্ষিণ-ভারতীয় অঞ্চল থেকে) ২১ মিলিয়ন পাউণ্ড। নানা হাত ঘুরে খাচ্ছে, মুনাফার সে স্রোতের যে দাম পড়ে, তাতে বস্ত্রমূল্য জনসাধারণের সাধ্যাতীতই থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তাঁতবস্ত্রের চিত্র ও উপরি-উক্তরূপ নৈরাশ্রজনক। একটি গজ হিসেবে ১৯৫৭ সনে ১৬.০৮, ১৯৫৮ সনে ১৮.৩৭, ১৯৫৯ সনে ১৮.৭০, ১৯৬০ সনে ১৮.৬৫। ১৯৬১ সনে অবশ্য অনুমান করা হয়েছে ১৯ কোটি গজের কাছাকাছি। পরিকল্পিত প্রচুর অর্থব্যয় হচ্ছে, কিন্তু কাশাহুরূপ উৎপাদন বা ফল কোথায়? এ বিষয়ে অপর একটি দিকের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। হস্তচালিত তত্ত্বশিল্পকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে নতুন কোন মিলেও তাঁত বসাতে দেওয়া হয় নি। যন্ত্রযুগে এ ব্যবস্থার কোন শুভ ফল হয় নি। বস্ত্রশিল্পে সংকট বয়েই গেছে। এতে মিল-মালিকদের কৃত্রিম বাজার সৃষ্টি এবং বস্ত্র দুস্ত্রাপাতার স্বযোগ এনে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মিল-মালিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

আবার অপর দিকে মাস্জাতার আমাদের দীর্ঘতম জম্মুয়ারী একজন তত্ত্ববায় সমস্ত দিনে ৮ গজের বেশি বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে না। এর দক্ষণ ভ্রমীর পরিকল্পনার স্তরভেদে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের তার ১৮ গজের উপর ওঠে নি। যুদ্ধ-পূর্বকালেও অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বেও আমাদের এ অবস্থাই ছিল, অর্থাৎ বলা যায় চরম 'স্থিতাবস্থা'। এখন যুগে—মিলের বহন শিল্পকে অংশই উৎসাহ দিতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, অবশ্য তা সরকারী নিয়ন্ত্রণবাহিনী। কারণ—টেক্সেলের দ্বারা বস্ত্রশিল্পে বহু মিল-মালিকের নীতি দেশের আদর্শের পরিপন্থী সন্দেহ নেই। আমরা সমস্ত বস্ত্রশিল্পকে সংস্কারী নিয়ন্ত্রণবাহিনী আনার পক্ষপাতী। তা যদি সম্ভব না হয়, কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সেই মিলের তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন বাড়তে হবে।

এ যুগে বস্ত্রশিল্পকে অস্বীকার করা যায় না। এখন মিলমালিকদের সঙ্গে পেয়ে না উঠে সরকার হস্তচালিত তাঁতকে আসরে এনে ঐতিহ্যবাহী নেমেছেন। এখানে অস্বয় চরকার ব্যর্থতা এবং মোটা কোটি টাকা ব্যয় উল্লেখযোগ্য। হস্তচালিত তাঁতশিল্পকেও অবশ্যই-যন্ত্রচালিত বা স্বয়ংক্রিয় তাঁতে রূপান্তরিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। যুগধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

তাপানে একটি মহিলা তাঁতী স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালার গড়ে প্রায় ৭০ খানা। অবশ্য এতে অত্যাধুনিক বস্ত্রপাতি ও শ্রম সাধ্যের প্রায় জড়িত। আমাদের সংকটমোচনে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে নচেৎ বস্ত্রশিল্পের অবস্থা গুরুতরই হবে। প্রসঙ্গত বলা অসমীচীন হবে না যে, দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে ছিল ১১টি কটন মিল, বর্তমানে মিল সংখ্যা বোধ হয় ১৪০টি এ শুধু পাকিস্তানের প্রয়োজনই মিটেছে না, ঐ দেশ বস্ত্র রপ্তানীতে অগ্রসর হচ্ছে; বিদেশী

দ্রব্যে অর্জন করছে। অথচ পাকিস্তানের কোন ব্যং পরিকল্পনা নেই—এরা শুধু চার অভাব মোটেতে, দেশকে বাঁচাতে।

আমাদের দেশেও বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পরিকল্পনা আছে। দেশী মুদ্রার কাঙালি আমরা। এই মুদ্রা অর্জনকরে আমাদের বস্ত্র স্থানীয় তথ্যও নৈরাগজনক। মিলিয়ন গজ হিসেবে ১৯৫০ সনে রপ্তানী হয়েছে ১০০০, ১৯৬০ সনে ৬২৭, ১৯৬১ সনে রপ্তানী হয়েছে ৫৭৭, ১৯৬২ সনে কিছু বৃদ্ধি হয়েছে বাল্য পুষ্টি গর্ব করা জে, কিন্তু আমরা বেদনার সঙ্গে ভাবছি—সে আর কতটুকু? তার মধ্যে বিনম্র গর্ব করার নেই। বস্ত্রের হুমুলা ও চুপ্পাপাতা ৬০ দিন রপ্তানীর ক্ষয় আমরা বস্ত্র রপ্তানীর বিরোধী নই। কিন্তু এ সংগ্রে বস্ত্রানী-বাণিজ্যে এ দৈর্ঘ্যের কারণ কি? বস্ত্রের অত্যন্ত লম্বা ও নিয়মানবের সত্ত্ব এই টাংকব পরিস্থিতির অস্বস্তম কারণ। যে আমাদের বৈরাগ্য বিদেশ—কৃষ্ণগতি বা কোন পথে? যুগ যুগে এসেছে। বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে জাপানী কুটিরশিল্পের যোগেতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই কম-বেশি ওচাৎকণ্ঠ, যুগের অযোগ্যে আমাদের তত্ত্ববাহনের ডমিকা কি? সেই টুকটুক-টুকটুক ক্রীতাব আমলে গতি যাতে দৈনিক ৮ গজ কাপড়ের বেশি কজন তাঁতী উৎপাদন করতে পারে না। কৃষকের মত তাঁতীও পোষা থাকে—শিল্পমুখ হচ্চে না—অন্তর্গামী হাসছেন। আমাদের স্বর্গীয় পদানমুখী বেলভিলেন, আমরা বাইসাইকেলের যুগে পড়ে—এদিক দৃষ্টি নিলে মনে হয় আমাদের ঘোড়ার গাড়ির যুগের উত্তরণ হয় নি—সমবায়িত্বের কাবশনা চালাওনা, তাঁত-একে উৎসাহ দান, সূতা বটন এবং কিছু কিছু রপ দানের পরিকল্পনা সবকানের রয়েছে এবং সে সম্বন্ধে কাজও শুরু হয়েছে। পরিকল্পিত সমবায়িত্বের কর্মচালনায় আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।

কিন্তু বটন নীতি-নীতি বা বিলিবাস্তব অংকট সর্ভ, পরিকল্পনা টি। অসাধু-বাসারীমহল তো সবট বানচাল করে দিচ্ছে। যক্ষ্মে তো তাই হচ্ছে অথচ ক্রীতকার বিদ্রুত হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমরা পশ্চিমের সঙ্গে কিছু লিখছি। তত্ত্ববাহগে যাতে কাব্যমূল্যে তো পার তারই ব্যবস্থাকল্পে সংকট সমবায়ভিত্তিতে সূতো বিলিব বস্থা করছেন, উদ্বেগ সাধু কিন্তু কাজ স্থল হচ্ছে কি? আমাদের অলিপি অনুরূপ। তত্ত্ববাহদের অর্থ কোথায় যে তারা সূতো ত্রয় ব্যব? স্তমভাং তাদের সেই মুনাফা-খরদের হাতেই পড়তে হয়। গার, বাবসারী, মহাজন, মার্কাব, উইভার বজ্ঞনের হাত ঘরে যে তো আসে তত্ত্ববাহদের হাতে, তার যে মূল্য পড়ে তাতে তাঁতীদের পিয়া আর কিছু থাকে না। পূর্ণগন্ত তাঁতীদের মহাজনের স্তমভে হয়। তারপর আরেকদল বাবসারী তাঁতীদের মধ্যে সূতো লি করেন। তাদের সামান্য মজুরীর বিনিময়ে বস্তাদি নিয়ে নেন তাঁতের অংশ দেওয়া তো দূরের কথা। এ বিষয়ে আমাদের দেশে বাগানী বাবসারীদের অসাধু প্রচেষ্টা অপারিকল্পিত; তাই আমাদের ত্তী-জোলাদের কৌশল জোটে না—অভাব চিরস্থায়, প্রতিকারহীন। ণীপের তলাটাই বোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁতীদের ঋণ দিতে হবে সরকার থেকে। এদের হুজুদেহে প্রাণ দিতে হইবে। ঘরে ঘরে তাঁতীদের পৌছে দিতে হবে মিলের দরের সূতো। মধ্যবর্তী কোন

ব্যবস্থা চলবে না। অর্থের অভাব নেই। শুধু চাটী একটু দর, দেশের প্রতি একটু মমত্ববোধ, একটু আশা-আশ্বাস। পরিকল্পনার কাগজপত্র থেকে একদলকে নেমে এসে জনসমাজের মধ্যে পরিকল্পনা রূপময় করে তুলতে হবে। কুটিরশিল্পকে বাঁচাতে হবে, ভারতের তত্ত্ববাহদের ক্রীতাব রক্ষা করতে হবে, কিন্তু তা আধুনিকতার মাধ্যমে। সাইকেলের যুগকে অস্ত্রত মোটরের যুগে উন্নীত করতে হবে। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে তুলানি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ বিষয়ে আলোচনা না করলে নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে।

রপ্তানী-বাণিজ্যে আমাদের তুলানি শিল্পের বিশিষ্ট ডমিকা আছে। আমাদের দেশজাত তুলা উৎকৃষ্ট ধরণের নয়। লম্বা আদ্যযুক্ত তুলা আমাদের আমদানী করতে হয়। তবে আমাদের রপ্তানী-যোগ্য তুলাতে বিদেশী মুদ্রার একটি বিশেষ সাধুর হয়। কিন্তু তুলা উৎপাদনও আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন হয় ৫৪ লক্ষ গাট কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ষাঁড়িয়েছে ৪৮ লক্ষ গাট। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ৭০ লক্ষ গাট উৎপাদনের উচ্চাশা কি করে কার্যকরী হবে—বলী কষ্টকর। আমেরিকার রপ্তানী গলপ্রের-এর কথা, বর্তমান মনস্তম্ভে ভাষ্যের রপ্তানী-যোগ্য তুলা নেই বা অতি সামান্যই আছে। সংবাদটি ব্যবসায়ীমহলে চিন্তার উত্তেক করেছে, আমাদের করেছে বিদ্রুত। উৎপাদনকারিগণ উপযুক্ত মূল্য পায় না, তুলার চেয়ে অল্প কৃষিজাত স্রোয় উৎপাদন লাভজনক—এটাই হল উৎপাদনকারীদের বস্তব্য। এর প্রতিকারার্থে সরকার কি করেছেন বা করছেন, আমাদের জানা নেই।

আমাদের প্রাধান্ত তুলা আমদানী করতে হয় মিশর বা আমেরিকা থেকে, মিশর থেকে উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা আসে কিন্তু আমেরিকা থেকে যে তুলা আসে তার মান সর্বত্র ঠিক থাকে না, ফলে বস্ত্র-উৎপাদনের মানও ঠিক থাকে না। এটাও একটি বিবেচ্য বিষয়। আপৎকালীন অবস্থার মিশরীয় তুলা আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অনিরমিতভাবে তুলা আসার দরুণ বস্ত্র-মিলগুলো মাঝে মাঝে সংকটে পড়ছে বলে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এ সংকট-মাত্রের উপায় নির্ধারণে বিশেষ তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি?

নানি কারণেই ভারতের বস্ত্রসংকট-এর একটা সুরাহা হবার আপাতত কোন বলিষ্ঠ নীতি নেই বলেই আমাদের ধারণা। এ-প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বস্ত্রজগতের একটি বিম্বর 'রায়ী' (পাট জাতীয় গাছ এবং এ বিষয়ে প্রথম বাংলায় লেখা আমার একটি প্রবন্ধ পত্রাঙ্কে প্রকাশিত হয়েছে) একটি বিশেষ সম্ভাবনার যুগ সৃষ্টি করছে।

এর থেকে কাপড়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি টেকসই বা শক্ত সূতো তৈরি হয়। তুলো বা উলের সঙ্গে এ মেশানো যায়। রায়ী বিদেশেও রপ্তানী চলে। আমাদের দেশে এ প্রচুর জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে একটি রায়ীর মিল প্রতিষ্ঠার কথাও আমরা শুনেছি কিন্তু সরকারী গবেষণাগার থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা আর শুনা যাচ্ছে না। আমাদের অদৃষ্টকে বিচার দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। অথচ রায়ী (Ramie) আমাদের বস্ত্রসংকট

বহুলাংশে লাঘব করতে পারে। এ বিষয়ে বিলম্বের সময় নেই ; কারণ জনসাংখ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বস্ত্রসংকট বেড়েই যাবে। সর্বশেষ সংবাদ—ভারত সরকার বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত-শিল্পের উপর কর আদায়ের আইন করেছেন। ৫০টি বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত থাকলেই তাকে মিল বলে ধরা হবে। এর ভয়াবহ পরিণতি পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে। তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শত শত অর্ধাচারী তাঁতী বেকার হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্প-পরিচালকগণ বাইরে থেকে সূতো ত্রুব করেন—এর দাম অনেক বেশি পড়ে এর কারণ পূর্বে বলা হয়েছে ; সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই

অভিনব পরিকল্পনা বস্ত্রসংকট দূর করা দূর স্বপ্ন, বরং দেশে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সরকার কি চান বাৎসরিক ১০০ কোটি পরিবহনব্যয় বর্তমান নীতি অনুযায়ী বস্ত্রসংকট মোচনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তদুপরি আমরা যেন নানা জুনির নানা মত সম্বলিত জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্তন ঘুরে ঘরি, ভারতের বস্ত্রসংকটের এও অন্যতম কারণ। তৃতীয় পরিকল্পনার এ দুর্দৈব সত্যই নৈরাগ্যকর ও বেদনাদায়ক। এ বিষয়ে সচ, পরিচালনার সময় আসে নি কি ? কারণ আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

## রথ

### শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত

জগন্নাথের রথ ছুটে চলে রঙ্ঘু আকর্ষণে,  
সমুখে যা পড়ে দলিত মথিত ঢাক বিধ্বনি।  
হস্ত বিহীন যেই শালগ্রাম,  
হটুক দেবতা কহটুক দাম,  
সম্মুখে কাঁপে বলীর প্রতাপে আতুরে করিবে কিবা !  
নিশ্চেষ্টনায় বিগত শুধু বাড়ার রথের শোভা।  
বিশ শতকের আকাঙ্ক্ষা যবে কাঁদে রে আঘাত হানে,  
পুষ্পক আর পাল্পক আসি নর-বহনাতা মানে,  
যখন মানব বীরবিজয়ে করিতেছে চিৎকার,  
জ্ঞান-গরিমার শ্রেষ্ঠ সোপান করিয়াছি অধিকার।  
তারই পাদদেশে তখনও মানব প্রেতের আকৃতি লয়ে  
জার আলার খুঁজিছে জীবিকা রক্তের যিনিময়ে,  
যে শোণিতে জাগে প্রাণস্পন্দন জীবকল্প আনে সাড়া,  
এই দুনিয়ার বিলাইয়ে তার বাঁচিবারে চায় তারা।  
ঐশ্বর্যের টানে সমরাসনে নাহে এ রক্তদান,  
দিবে না কেহই যোদ্ধার সেই স্তমহান সম্মান,  
রবে না স্মরণে কেবা ছিল এরা,  
কিবা ইহাদের জীবনের ধার,  
শরীরস্তম্ভ রচিরা এদের লিখিবে না কেহ নাম,  
শুধু ছুটুছুটি অল্পের লাগি যাতাদের সাগরাম।  
চুক্তি সেখায় কুটি ও কুটির ক্রোড় শু বিক্রোড়ায়,  
সেখায়ও লোলুপ কর প্রসারিত আকর্ষণ পিপাসায়।  
অপ্রত্যক্ষ বর্ষকায় সেই আদিকাল উঁকি দিয়ে যার—  
যখন আছিল মানব মানব, কুদিব পিগাসী নর,  
আজিও বিরাজে বিমূর্তরূপে তাদেই বশধর।  
সেই আদিমের নর-খাদকের নবীন সংস্করণ—  
আদিগন্ত প্রসারিত কর করিতেছে বিকিরণ,  
ধর্ম, বিবেক, দলি পদতলে,  
জগন্নাথের রথ ছুটে চলে,  
বিশ শতকের শীর্ষ শিখরে মোরা স্তম্ভ জাতি,  
জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছুটিয়া চলছি চাঁদে যে করিতে সাক্ষী।

## স্নদৃশ্যের ভিড়ে : একটি অনিচ্ছা

### বাহুদেব দেব

কোথায় যে ঠিকানা লেখা ছিল,  
দেখা হয়েছিল এক দুপুরের লোকাল ট্রেন।  
হাওয়ার পাতা উড়ছে। ফিজে পাখ টেলিগ্রাফে তারে,  
দুপুরটা থমকেছে ঠিক মাঠের পরে হঠাৎ চেন টেনে।  
(জলে চিলটা ডুবলো, ঝুপের ছবি ভাঙলো : একটি স্মৃতি)  
নীলে চিলটা ডুবলো—নীলচে ঘোঁরা, চমকার কাচে  
চোখের পাতা আছড়ায়, ঠিকানা ভুল পেছি নামটা  
হাওয়ার ভাসছে ধরতে পারছি না, কি যেন নাম ? সময়ের আঁচে  
পুতুলটা গলে গেছে, গালের কাছে হিনটা মাত্র চিহ্ন, আঃ  
বিশ্রুতির বরে স্মৃতির বাগান ঘেরা বাংলোর ভিতর ঘরে নরম ছায়া  
এখনো একটা সূর্যবুঝি সতেজ উজ্জল। পৃথিবীর কোথাও।  
রেণু রেণু বয়সের গণ্ড শুধু রয়ে পড়ছে দেহের মায়ায়।  
কিন্তু তাকে না, তাকে না, তাকে না, শুধু তার সৌরভ এখন  
মধুর বাতাসের অনন্ত ঐশ্বর্য ; এক মায়াবী মর্পণ নিয়ে সে  
টিপ আঁকছে, চুল বাঁধছে, কাফির-কাটা জানালায় ফ্রেমে।  
সে এক উজ্জল ছবি ; তিলোত্তমা যদিও দিয়েছে  
যুগ্মমান বর্তমান-ভবিষ্যৎ অশ্ল-উপসন্দকে জকের শরীর।  
হলুদ এ-মাঠ ভেঙ্গে ট্রেন তাকে নিয়ে যাবে নিরাপন্ন হুগের গভীরে।  
ঠিকানা সঠিক নয় কখনও, তাকে আমি দৃষ্টির কুহকে  
রাখবো না ঝেঁপে আর, চাইবো না তাকে আর স্নদৃশ্যের ভিড়ে।

# মৌলমনি

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি)

শ্রীমদ্বোধকুমার চক্রবর্তী

ভেজিশ

হাজারিবাগ থেকে ফিরে এসে কাঠুরে চৌধুরী সব স্তব্ধ।  
বৃষবার দুপুরবেলায় দময়ন্তীরা চলে গেছে। রাঁচী থেকে  
মাগুগলগাড়ি এসেছিল। কিন্তু তারা রাঁচী যায় নি। এইখানেই  
একটা নতুন স্কুলে ঢাকরি পেরেছে।

লবাট বলল : বাবার সময় মেমসাহেব কেঁদেছিল।

কিছু বলেছিল ?

না।

কিছুই বলে নি।

সাহেব ফিরে এলে কিছু বলতে হবে কি না আমি জিজ্ঞেস  
করেছিলাম।

কি উত্তর দিলে ?

অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে লবাট বলল : বলল, বলার কিছু নেই।  
মাঠের সবই জানেন।

আর কিছু ?

বলেছিলাম, বেশিপুরে তো বাসেন না। মাঝে-মাঝে আসবেন  
তো।

এ কথায় উত্তর নিশ্চয়ই দেয় নি।

বলেছে, ভগবান জানেন।

কাঠুরে চৌধুরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : ঠিকই বলেছে,  
বোতল বার কর।

শীত ফুরিয়ে এসেছে বলেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাত্তে দেয়ি হচ্ছে।  
বেলা শেষ হবার আগেই কাঠুরে চৌধুরী ফিরে এসেছিল। স্নান  
সেরে বাইরের বায়ান্দার এসে বসেছে। কাঁকা লাগছে সব-কিছু।  
শুধু ঘর আর বায়ান্দা নয়, পৃথিবীটাই তার কাছে কাঁকা মনে হচ্ছে।

অনেক দিন পরে লবাট আবার মদের বোতল আর গেলাস  
বার করল। বানিকটা গেলাসে ঢেলে কাঠুরে চৌধুরী কিছু আশ্বাস  
শেল। এইমদ তার পথ বন্ধ ছিল, তার নিঃসঙ্গ জীবনটাকে ভরে  
থাকত। অত্যন্ত হতাশার দিনেও পৃথিবীটাকে তার কাঁকা মনে  
হয় নি। এই নির্জন বন আর গভীর অন্ধকারও সে রক্তিন যন্ত্রের  
কোন অভাব দেখে নি।

কাঠুরে চৌধুরী একচুমুক মদ খেয়েই মুখটা বিকৃত করল। বড়  
তেতো লাগছে। চাঁৎকার করে লবাটকে ডাকল। বলল : এ  
কি দিয়েছিস ?

প্রশ্নটা লবাট বুঝল না।

কাঠুরে চৌধুরী বলল : এ তো খারাপ হয়ে গেছে। অল্প কিছু  
বার কর।

বোতলটা লবাট বদলে দিল, গেলাসটাও। কিন্তু কাঠুরে  
চৌধুরীর পছন্দ হল না। বলল : এও তেতো।

তবে বিলিতি বোতল দিই ?

যা তেতো নয় তাই দে।

কোন মদ তেতো নয়, লবাট জানে না। যা বার করে  
আনল, তাও মনিবের পছন্দ হল না। বিরক্ত হয়ে বলল : কি  
যা তা সব বার করছিস ?

লবাটের হঠাৎ হাড়িরার কথা মনে পড়ল। তার বো ভাল  
হাড়িরা তৈরি করে। বলল : হাড়িরা দেব জুজ ?

কাঠুরে চৌধুরী চাঁৎকার করে উঠল : স্বধরদার ওসব ছোটলোকের  
জিনিস আমাকে আর কখনও দিবি না।

ভরে লবাট পালিয়ে গেল।

কাঠুরে চৌধুরী একটা চুকটখরাল। সেই চুকটও আজ তার  
তেতো লাগছে। কিন্তু কেন তেতো লাগছে, কেন বিষাদ লাগছে  
সবকিছু! দময়ন্তীরা চলে গেল বলে ? ছি ছি, তা কেন হবে!  
দময়ন্তীরা তো তার কাছে থাকবার জন্তে আসে নি। তাদের বিপদের  
সময় সে তাদের তুলে এনেছিল। চিকিৎসার জন্তেই নিজের কাছে  
রেখেছিল। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই তারা চলে গেছে।  
তার জন্তে দুঃখ কিসের, অভিমানই বা কিসের!

যাবার সময় বলে গেল না! তার জন্তে সেই তো দারী! সে  
নিজেই তো পালিয়ে গিয়েছিল। এখানে থাকলে কি আর না বলে  
তারা চলে যেত। দময়ন্তীই তো এর জন্তে অভিমান করতে পারে।  
সে তো তা করে নি।

তবে কেন এই ঘটনাকে সে তুলতে পারছে না ?

কাঠুরে চৌধুরীর আঙুলের ফাঁকে চুকটটা পুড়ছে, আর সে ভাবছে  
গত কয়েক মাসের ঘটনা। দময়ন্তীরা এসে কিছুদিন থেকে গেল।  
এই তো স্বাভাবিক ঘটনা। সে তো কোন গোপন প্রত্যাশার তাদের  
উপকার করে নি। তার মনে কি কোন সোত ছিল, কোন পাপ।  
না কিছুতেই না। কাঠুরে চৌধুরী বুঝে লোক হতে পারে, প্রকৃতিতেও  
সে বজ্র। লোভ সে লুকিয়ে রাখে না। পাপ সে গোপনে করে না।  
তার মনে কোন রোদ নেই, সেখানে কিলবিল করে না পাপের জ্বালা।

কাঠুরে চৌধুরী চারিদিক থেকে তার মনটাকে দেখতে লাগল।

নিজের মনই তো মনের অগ্রীকণ যয়। নির্বিকার মন নিয়েই নিজের বিচার করা যায়। খুব সত্যি কথা যে, দময়ন্তীকে তার ভাল সেগেছিল, ভালবেসেছিল তাকে। কিন্তু তার বেশি তো কিছু নয়। তাকে পাবার ইচ্ছা হলে তো সে অনেক কিছু করতে পারত। কিন্তু তা তো সে চায় মি। সে যা চেয়েছিল সে একবারে অচ্ছা হিনিস। দময়ন্তীকে সে স্বথী দেখতে চেয়েছিল। এ কি অজ্ঞান, না পাগ!

সহসা তার দময়ন্তীর কথা মনে পড়ল। সে বলেছিল : আমরা চলে গেলে লবাটের বোঁকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনাকে অনেক খবর দেবে।

বলেছিল : সব শুনে আপনি অনায়াসেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

কথাটা মনে পড়তেই কাঠুরে চৌধুরী চেঁচিয়ে ডাকল : মেম-সাহেব।

তারপরেই দিকার দিল নিজেকে—ছি ছি, এদের সঙ্গে সে এমন করে কেন কথা বলে! দময়ন্তীরা তাকে কি ভাবত!

ভয়ে ভয়ে লবাটের বোঁ দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কি না কাঠুরে চৌধুরী খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর দময়ন্তীর কথাই আবার মনে পড়ল। সেই তাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। নিঃশব্দ মেয়েটা অপেক্ষা করছিল। তার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করল : ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তোর কাছে কি জানতে চাইত?

মেয়েটা এবারে ভয়ে মলিন হল।

কাঠুরে চৌধুরী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল : তোর ভয় নেই আমি তোকে কিছু বলব না।

ভয়ে ভয়েই সে বলল : মেমসাহেব গ্রানে গেলেই আমাকে ডাকত, অনেক কথা জিজ্ঞেস করত।

কি কথা, তাই তো জানতে চাইছি।

জিজ্ঞেস করত, মেমসাহেব আগে কতবার এ বাড়িতে এসেছে।

তুই কি বললি?

বললাম, আমরা একবার তাকে এঁই বাড়িতে দেখেছি। কতক্ষণ ছিল, কি করত সব জানতে চাইল। বললাম, বেশিক্ষণ ছিল না। সব খেতে খেতে সাহেব তার হাত ধরে টেনেছিল বলে রাগ করে চলে গেল।

আর কি বললি?

বললাম, সাহেব আমাদের সকলেরই হাত ধরে টানেন। তাতে রাগ করবার কি আছে!

তারপর?

এক-একদিন এক-এক কথা জিজ্ঞেস করত। বলত, কাল রাতে মেমসাহেব কতক্ষণ বাইরে বসেছিল, তোমার ঘরে গিয়েছিল কি না, কি কথা হচ্ছিল। বলতাম, আমরা সে সব জানি নে।

জানি নে কেন বলতিস?

মেমসাহেব বাবণ করেছিল।

৮।

লবাটের বোঁ কথা না বলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর সরে গেল। কাঠুরে চৌধুরী হাতের চুকট তখন নিতে গেছে।

পরের দিন খবর দিয়ে কাঠুরে চৌধুরী নরোত্তম খেমলানির মাঠকে ডেকে আনল। জিজ্ঞাসা করল : কি হে তুমি আর এলে না?

এসেছিলাম হুজুর, কিন্তু আমার আর কাজের দরকার নেই।

কেন?

ইচ্ছাতেই চাকরি পেয়ে গেলাম। পুরনো বাড়িতেই কাজ করব।

কিন্তু ফুল ফোটাতে পারবে তো আগের মতো?

কেন পারব না?

ভাল বীজ আছে?

আগের বছরের বীজ তুলে রেখেছি।

সেকি আর ভাল আছে?

কাঠুরে চৌধুরী লবাটকে ডেকে তার নতুন বীজের বাগ্ন আনতে বলল। সেইটে মালির হাতে দিয়ে বলল : নিজের বাড়িতে লাগাব বলে হাজারিবাগ থেকে এনেছিলাম, তা তুমি যখন কাজ করবে না তখন আমি রেখে আর কি করব, এটা তুমিই নিয়ে যাও।

মালি ইতস্তত করছিল।

কাঠুরে চৌধুরী দমক দিল : নিয়ে যাও না তে, কড়িক না হয় নাই বললে।

বলে বাগ্নটা তার সামনে রেখে দিল।

সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মালি চলে যাচ্ছিল। কাঠুরে চৌধুরী বলল : ফুল ফুটলে একদিন দেখতে যাব। যদি তেমন ফুল দেখাতে পার তো বকশিশ পাবে।

তা পারব হুজুর।

বলে মালি চলে গেল।

সন্ধ্যার দিকে এলেন ডাক্তার সেন। বললেন : আপনি এসেছেন খবর শেয়েই এসাম।

কাঠুরে চৌধুরী তাঁকে বাতির করে বলল : বসুন।

ডাক্তার সেন বললেন : মিস্টার মেহতাদের খবর পেয়েছেন তো!

শুনলাম, এইখানেই কোন স্থলে কাজ পেয়েছেন।

ঠিকই শুনেছেন। রথরাজ সিংকে তো চেনেন। স্টেশনের পাশে যার কাঠের গুদাম?

চিনি বৈ কি।

মিস্টার খেমলানির বাড়িখানা কিনে নিয়ে তিনিই স্থলটা খুলেছেন। বাইরে থেকে একজন মেমসাহেব এসেছে। আর মিসেস মেহতা। এই দু'জনই এখন স্থলটা চালাবেন। বুড়োক ধরে বাড়ির একটা আশে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

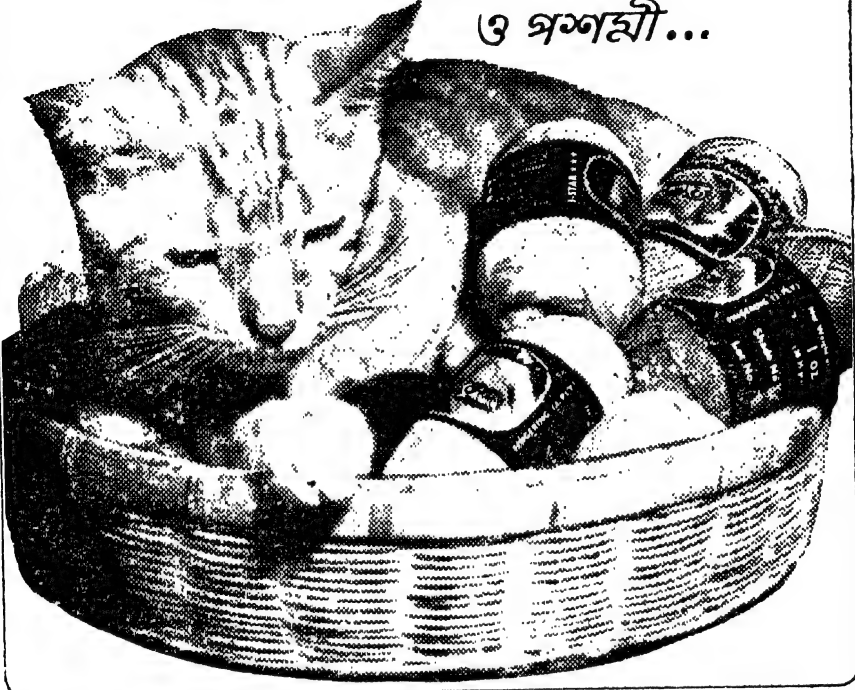
গভীরভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল : ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে।

ডাক্তার সেন এ কথায় অসুপ্রসাদ পেলেন। বললেন : এ অঞ্চলে আজ অনেকদিন ডাক্তারী করছি তো, কোন অসুযোগ করলে লোকে রাখে।

তা রাখবে বৈ কি।

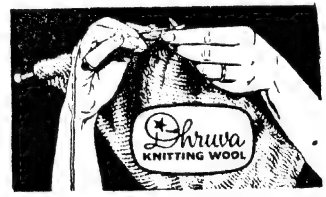
উঠবার আগে ডাক্তার সেন একটা কথা বললেন, অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গেই বললেন : মিসেস মেহতা আপনাকে একটা কথা বলতে বলেছেন। প্রথমটার লিখবেন বলেছিলেন, পরে বললেন,

এটি নরম  
গরম  
ও প্রশংসী...



## এটি ঐশ্বর্য নিটিং উল!

লোনার উলের মধ্যে ঐশ্বর্য উলের ধারেকাছে কিছু লাগেনা...  
১০০% ঐশ্বর্য উল...নরম, মোলায়েম, অকৃত্রিম নমনীয়...  
খেপে যায়না, ঝুলেও পড়েনা... বাছাইকরা ফ্যাশনমার্কিন  
রকমারি সঙ্গে পাওয়া যায়। ঐশ্বর্য উলে লোনা পোশাক  
পরিচ্ছন্ন বারবার কাচলেও তার জোলুখ ঠিক বজায় থাকে।  
অর্বোৎসাহে বৈশাল্য ঘূলে ঐশ্বর্য



ঐশ্বর্য উলেন মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে ১৩.

DWM ১৩

যাৰতীয় ষাৰসা-সংগ্ৰাহ গৌৰৱৰ এখন ৰৱৰেনঃ জে. এণ্ড পি. কোটস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড  
বম্বেঃ ৮১ গণ্টন ৰোড, দিল্লীঃ গাৰ্ভিন ব্যাংকিং ৰোড, মাদ্ৰাজঃ ১৯ ভানিয়াৰ ষ্ট্ৰীট, কলিকতাঃ  
৪০ বি. এলফো ষ্ট্ৰীট, কোৰাটঃ কোৰালা ষ্টেট, পোহাটিঃ ৩. টি. ৰোড, চৌকোবাড়ি, আমাম.

আপনিই বলবেন কথাটা। আপনারা তো অনেক দিনের বন্ধু কিছু যেন মনে না করেন এমনভাবেই বলবেন।

বলুন না আপনি।

বলেছেন, তাঁর অসুস্থ স্বামী পক্ষে করেন না, তা না হলে—

কাঠুরে চৌধুরী কঠিন হয়ে বলেছিল : বুঝছি, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

মিসেস মেহতাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি তাঁর অবস্থার কথা বলতে পারি। আপনার মতো উপকারী বন্ধুকে একথা বলে পারাণ্ডে তিনি নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছেন, কিন্তু এই অবস্থার তিনি আর কি-বা করতে পারেন। আপনিই বলুন।

আমি বুনো হতে পারি, কিন্তু ডেকেমাছুষ তো নই ডাক্তার সেন যে, সকলের কাছ থেকেই আমাকে উপদেশ নিতে হবে।

না না, আমি আপনাকে ঠিক বলতে পারলাম না। এ ঠিক উপদেশ নয়—

যা বোঝবার তা আমি ঠিকই বুঝছি ডাক্তারসাহেব? মিসেস মেহতাকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন, আমি তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে ঘাব না।

ডাক্তার সেন তাড়াতাড়ি বললেন : আজ আমি উঠি মিস্টার চৌধুরী, আবার দেখা হবে।

আপনার বিলটা আমার কাছেই পাঠাবেন।

না না, বিল আবার কিসের! আপনি তো আমাকে অনেক টাকা দিয়েছেন।

বলতে বলতেই ডাক্তার সেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

কাঠুরে চৌধুরী হা-হা করে তসে উঠল। আদমি মাহুদের মতো বন্ধ হাসি, চারিদিকের অরণ্যের ভিতর সেই হাসি কঁপে কঁপে মিলিয়ে গেল।

### চৌত্রিশ

কাঠুরে চৌধুরী ভেবেছিলেন, তার জীবনের গল্প এইখানেই শেষ হয়ে গেছে। স্রোতের মাঝখানে একটা ঢিল পড়েছিল, পানিকটা জল উঠেছিল ছিটকে, তারপর সব মিলিয়ে গেল। জীবনের স্রোত আবার ঠিক আগেরই মতো বইছে।

শুধু একটা বেদনা আছে বৃকের মধ্যে বীধে, তারই থেকে মাঝে-মাঝে রক্তক্ষরণ হয়। মাহুদের উপর বিশ্বাস তার হারিয়ে গেছে। নিজেকেও আর বিশ্বাস হয় না। এই বিশ্বাস যে কত গভীর ছিল, তা সে নিজেরই জানত না। আনাশের স্বর্গের মতো সে ত সত্য ভেবেছিল। আজ কাহুসের মতো সেই বিশ্বাস তার চূপসে গেছে। মাহুদকে মাহুদ ভুল বুঝতে পারে, এক কথা সে কোনদিন ভাবতে পারে নি। আজ নিজেকে তার বিচার দিতে ইচ্ছা করছে।

আজকের কাগজে সে একটা খবর দেখেছিল। কোডারমায় নরোত্তম খেমলানি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ ছিল। সাক্ষ্যেও খবর পড়ে সব কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে পড়ল যে অল্পদিন আগে এই ভদ্রলোক একদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন, নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁকে, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন। দময়ন্তীর কলেজে তখন ছুটি ছিল বলে তার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল।

সেই দময়ন্তী একদিন তার কাছে এসেছিল। কি জেগে এসেছিল তা বলে নি, বলবার সুযোগ হয় তো পার নি। কাঠুরে চৌধুরীর ভাল লেগেছিল তাকে, ইচ্ছা হয়েছিল তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখা, গল্প করে। কাঠুরে চৌধুরী শপথ করে বলতে পারে, আর কোন ইচ্ছা তার হয় নি। কিন্তু দময়ন্তী নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝেছিল। লবটির বৌয়ের কথা তার মনে পড়েছে যে সেদিন সে দময়ন্তীর হাত ধরে টেনেছিল। লবটির বৌয়ের যখন চোখে লেগেছে, তখন কাজটা নিশ্চয়ই তার ভাল হয় নি। কিন্তু হাত ধরায় যে দোষ হতে পারে এ তো তার জানা ছিল না। জানা থাকলে কেন সে এ কাজ করবে!

লবটির বৌয়ের সঙ্গে তো সে এই রকম গামেশাট করে, করে গ্রামের খাজড়িদের সঙ্গেও। নাচতে নাচতে তাদের জড়িয়েও ধরেছে কখন। কিন্তু কেউ আপত্তি করে নি, বাধাও দেয় নি কেউ। কেউ অসম্মান বোধ করলে কি মহাত্মা! তাকে বলত না? লবটিও তো কোনদিন কিছু বলে নি? কথাটা মনে হতেই সে ডাকল : লবটি।

লবটির বদলে তার বো এস।

লবটি কোথায়?

মেয়েটা মাথা তুলিয়ে হাসল, বলল : আমাকে বল না।

কাঠুরে চৌধুরীর মনে হল, এ মেয়েটাও তাকে হয় তো ভয় পায়।

বলল : আমার সামনে তুই আর আসবি নে।

মেয়েটার সাহসী-বশি, বলল : আমি কি দোষ করেছি?

কাঠুরে চৌধুরী কটমট করে তার দিকে তাকাল। এমন করে সে কোনদিন তাকায় না। ভয় পেয়ে মেয়েটা পালিয়ে গেল।

দময়ন্তীদের খবর কাঠুরে চৌধুরী মাঝে-মাঝেই পায়। তার ভাল আছে, সুখে আছে। স্থূলও কোনরকমে চলছে। এ বছর ছাত্র-ছাত্রী কম। আশা করা যায় সামনের বছর থেকে উন্নতি হবে।

একটা কথা ভেবে কাঠুরে চৌধুরী সন্তোষ পায়। দময়ন্তী আর তাকে তার স্বামীর প্রাণহানির চেষ্টার জন্ত দায়ী করবে না। আন্তরিকভাবে সে তার সম্মত দূর করার চেষ্টা করেছে। বোধ হয় সে সফলও হয়েছে, দময়ন্তী চিন্তে পেরেছে তাকে।

ডাক্তার সেন আসেন মাঝে-মাঝে। একদিন এসে দুখে প্রকাশ করলেন : হল না।

কি হল না?

মিস্টার মেহতা উঠে পাঁড়াতে পারলেন না।

কাঠুরে চৌধুরী সোজা হয়ে বসল : আপনি কি তার ব্যাঙেজ খুলে দিলেন?

কাল খুলেছি।

কুঁবে?

কোনরকমে জোড়া গেগেছে, কিন্তু টুকরো হাড়গুলো মজবুত হয় নি।

উদ্ব্যভাবে কাঠুরে চৌধুরী বলল : কি হবে তা হলে?

ডাক্তার সেন বললেন : পাঁড়ার চেষ্টা করে কাল বেদনা খুব বেড়ে গিয়েছিল। যুগ্মেও ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়েছে। আজও পাঁড়ার চেষ্টা করে কষ্ট পেয়েছেন।



## মৌন যন

কাঠুরে চৌধুরী আরও কিছু শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল।  
ডাক্তার সেন বললেন : বেশি কি করতে পারি।  
ডাক্তার কি করতে পারেন, কাঠুরে চৌধুরী জানে না। কিন্তু  
তিনি চলে যাবার পরেও সে এই কথাই ভাবতে লাগল।

এর কয়েক দিন পরে কাঠুরে চৌধুরী সেই দুঃস্বাদ পেল।  
জগলীশ মেহতাব আত্মহত্যার সবার। ঘুমের ওষুধ খেয়ে সে  
আত্মহত্যা করেছে। সকাল বেলাতেই তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া  
গেছে। ডাক্তার সেন এসে ডেথসার্টিফিকেট দিয়েছেন, পুলিশ এসে  
তদন্ত করেছে। আশান্নে তাকে দাফ করে সবাই ফিরে এসেছে।

দম্যন্তী কি করছে ?

নরোত্তম খেমলানির মালি এসেছিল পবন দিতে। সে বলল :  
বারান্দায় ঝাঁড়িয়ে আছে।

কাছে কেউ নেই ?

এতক্ষণ খুলের বড় মেমসাহেব ছিলেন, এইমাত্র চলে গেলেন।

কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। লবাট আর তার বৌ  
ঝাড়িয়েছিল দরজার পাশে। চারিধার অগোচর স্থির হয়ে আছে।  
আস্তে আস্তে মালি বলল : দিমিষণ এক। কি করে রাত  
বাটাবেন, সেই ভাবনা হচ্ছে। রাতে ঐ বাড়িতে আমাদেরই ভর  
করে।

তোমার বৌকে শুতে বলো।

উত্তর মালি একটু হাসল। কান্নার মতো করণ হাসি।

কাঠুরে চৌধুরী কি বুঝল সেই জানে, ডাকল : লবাট।

লবাট এগিয়ে এল।

তোমার বৌকে নিয়ে চলে যা। রাতে তোরা ঐ বাড়িতে থাকবি।

ওরাকে গাড়ি বের করতে বল।

মালি এই ব্যবস্থার বোধ হয় খুশি হল। একটা নমস্কার করে  
নেমে গেল।

কিন্তু লবাটের বৌ একটুও খুশি হল না। দরজার পাশে সে স্থির  
হয়ে ঝাড়িয়ে রইল। তার দিকে চোখ পড়তেই কাঠুরে চৌধুরী আশ্চর্য



যৌবনের স্মরণায়  
মুখমণ্ডল  
সমুষ্কৃত করে

পরিমাণের সমস্ত ব্যবহার  
রেখে উন্নত পদ্ধতি প্রমা-  
নীতে তৈরি। হৃদয় ও  
হাস্য প্রতিফলিত আবারে  
পাওয়া যাচ্ছে।



**লাবা**

ভ্যানিশিং ও কোল্ড ক্রীম

লাবা ভ্যানিশিং ক্রীম শুধু যে ত্বকের রক্ততা দূর করে তাই  
নয়, ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখতে সাহায্য করে। দিনে  
লাবা ভ্যানিশিং ক্রীমের ব্যবহারে ত্বকের লোমকূপগুলি  
পরিষ্কার হয়ে ত্বককে সজীব ও স্বন্দর করে তোলে। তাছাড়া  
মুখে পাউডার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

রাত্রে লাবা কোল্ড ক্রীমের ব্যবহারে মুখমণ্ডলে মসৃণ স্মৃতি  
এনে দেয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

হল, মেয়েটা কাঁদছে। কাঠুরে চৌধুরী চেঁচিয়ে উঠল : যা যা, সরে যা আমার সামনে থেকে।

অন্ধাশ্রম পরেই বাড়ির সব মানুষকেটা জীপে করে বেরিয়ে গেল। কাঠুরে চৌধুরী একা বসে বইল তার পুরনো বারান্দায়। এ কি হল! জগদীশ কি তার উপর এমন করে প্রতিশোধ নিল। হারিয়ে দিল তাকে জীবনের খেলায়।

সামনের স্বাক্ষরকার অরণ্যের দিকে তাকিয়ে কাঠুরে চৌধুরী কোন আশ্বাস পেল না। আকাশে ঢাউ নেই, তারার আলো আকাশেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর লোকের জন্য আজ বৃষ্টি কোন আলো নেই।

কোন শব্দ নেই, চারিদিকের গভীর অরণ্য স্তব্ধ হয়ে আছে। বৃষ্টি তারা কাঠুরে চৌধুরীকেই দেখছে, আর আশ্রয় চায়। গ্রামের একটা চেনা লোক মরে গেলে যে মানুষটা ছুটে দেখতে যায়, এত বড় দুঃসংবাদ পেয়েও সে কি না এমন করে বসে বইল! কি হয়েছে তার! কেন এমন পাথর হয়ে গেছে। কে তাকে পাথর করেছে।

সামনের সেতুন গাছটার পাঠা খস-খস করে উঠল। এটা গাছটা গ্রে সাহেব নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন, বলেছিলেন, একশো বছর পরে এটা টেবিল হবে। গ্রে সাহেবের ডায়েরিতে এর বয়স আছে, বয়স আছে আরও অনেক গাছে। এরা সকলেই কাঠুরে চৌধুরীর চেয়ে বড়। এরা অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। আজ এরা কাঠুরে চৌধুরীকে দেখছে চোখ মেলে।

এরা কথা বলতে পারে না কেন। এটা যে খস-খস করে শব্দ হচ্ছে, এ কি ওদের দীর্ঘশ্বাস। এতদিন তো ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নি। তবে আজ কেন ফেলেছে!

ও কিদের শব্দ। ওর জীপটা কি ফিরে আসছে। ওরাকে ছো ফিরে আসতে সে বল নি। তাই তো তার জীপটাই তো ফিরে এস। গাড়িতে এত মানুষ কেন। তবে কি লম্বাটরাও ফিরে এস। তাড়িয়ে দিল দময়ন্তী।

উজ্জ্বলনায় কাঠুরে চৌধুরী উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল সিঁড়ির নিচে।

এ কি! কাঠুরে চৌধুরী কি স্বপ্ন দেখছে। ওরার পাশ থেকে যে দময়ন্তী নামছে। কাঠুরে চৌধুরী যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল : আপনি।

দময়ন্তীও শুকনো চোখ বেদনার খম-খম করছে। কোন উত্তর দিল না।

পিছন থেকে লম্বাটের বোঁ বলল : আমরাই নিয়ে এসাম।

তার কাজের তারিফ করতে গিয়ে কাঠুরে চৌধুরী থেমে গেল। বলল : আপনি।

হৃৎস্রবের কেউই দেখতে পেল না যে অতীত মানুষগুলো কত খুশি হল।

বারান্দায় উঠে দময়ন্তী উজ্জ্বলনায় ভেঙে পড়ল। আর তার পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বইল কাঠুরে চৌধুরী। মাস ছয়েক আগেও কথা তার মনে পড়ল। দময়ন্তী ঠিক এমন করে এইখানে দাঁড়িয়ে ড'হাত মুখ ঢেকে বসেছিল। বলেছিল, আপনি আমার বামীক হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আজও কি দময়ন্তী সেই অভিযোগ করে।

নিজেকে শাস্ত করতে দময়ন্তীর সমস্ত লগল। অনেকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে তাকাল।

কেন এমন হল?

কেন!

বলে বুকের মতো থেকে একগুঁড়ি কাগজ দময়ন্তী বার করল। এগিয়ে নিল কাঠুরে চৌধুরীর হাতে। সে কেবলি, এ চিঠি জগদীশের লেখা। কিন্তু নারায়ণ খেমলানির নাম দেবে আশ্চর্য হল। জগদীশকে সে লিখেছে—

ছি ছি, বাপ হয়ে মোয়ের সম্বন্ধে এ কথা লিখতে পারল! শরতান পায়ণ্ড জ্ঞানোয়ার! এটা মুহুর্তে তাকে সামনে পেলে কাঠুরে চৌধুরী তাকে কৃষ্ণের মতো গুলি করে মারত। জগদান তাকে মারবে, নরকের কাঁট হবে নারায়ণ খেমলানি।

জগদীশকে লিখেছে : বিশ্বাস না হয় বদ্বারাজ সিনকে জিজ্ঞেস কর—কার টাকার সে আমার বাড়ি কিনেছে, আর কার কথার সে ত্রীপুল খুলেছে। সে যখন এ অঞ্চলে আসে ত্রীপুল খুলেছে তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, এবারও তাকে ত্রীপুল খুলে দেবে। বিশ্বাস না হয়—

কাঠুরে চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে গেছে। অত বড় মানুষটাও ছোট্ট শব্দ হাতে আজ থরথর করে কাঁপছে। ছোট্টখের দৃষ্টি গেছে কাঁপা হয়ে। সমস্ত চিন্তাখানা কাঠুরে চৌধুরী পড়তে পারল না। ফিরিয়ে দিল দময়ন্তীর হাতে। তারপর কেঁদে উঠল ছেলেরা মৃত্যুর মতো।

একটা পুরুষমানুষ যে এমন করে কাঁদতে পারে, দময়ন্তী জানত না। কি করবে, কি বলবে, কিছুই ভেবে পেল না।

অনেকক্ষণ পরে কাঠুরে চৌধুরী বলল : আমি সত্যিই আপনার স্বামীকে হত্যা করলাম। সেদিন আপনি ঠিকই বলেছিলেন।

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বলল : ঠিক বলি নি। ভুল করে আমি আপনার দোষ দিয়েছিলাম, আর কখনও ভুল করব না।

কাঠুরে চৌধুরী দময়ন্তীর মুখের দিকে তাকাল। বেদনার, বিষণ্ণ মুখ, গালের উপর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। একফালি আলোয় সেই জল চিক-চিক করছে।

এই আলো কোথা থেকে এসেছে। এতক্ষণ তো আকাশে আলো ছিল না।

॥ সমাপ্ত ॥

[ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য ]

## প্রেম ও বিবাহ

### শ্রীমণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবাহ বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান। নর-নারীর জীবনে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। যে সব নর-নারী আজীবন অবিবাহিতভাবে কাটান, তাঁদেরই বয়স বৃদ্ধি চলে অস্বাভাবিক। খোঁজ করলে জানা যায় নেপথ্যে কোন কারণ থাকার জন্য তাঁরা এই জীবনকে যেন নিতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এমনও দিন ছিল যখন বিবাহ বলে কোন সামাজিক প্রথার সৃষ্টি হয় নি। সেদিনের গৃহাধারী মানব পশুর মতই যৌন আকাজক্ষার নিবৃত্তি ঘটাতো। কোন লজ্জা, বাধা বা আইন ছিল না যা তাদের এই পাশবিক মনোবৃত্তিকে দমন করতে পারতো। কালক্রমে যখন সেই ছদ্মছাড়া মানব সন্তান একত্রে দলবদ্ধভাবে বাস করতে শিখলো—তখন তাদের মধ্যে ভাগ্য হ'লো বৃদ্ধি, বিবেচনা এবং সৃষ্টি করার আকাজক্ষা। মানুষে মানুষে এতদিন যে বিবাদ চলছিল তার নিবৃত্তি ঘটান মানুষ প্রথম উপলব্ধি করলে ভালবাসার স্বাদ। যা ও পুরুষের উভয়ের ভালবাসা এবং আকাজক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হ'ল বিবাহ প্রথার এতদিন মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধভাবে বাস করতো। একদল অপর দলের নিকট পরাজিত হলে বিজিত দলের মেয়েরা বিজিতাদের ভোগ্য হিসাবে গণ্য হতেন। কিন্তু ক্রমশ সমাজে শান্তি ও আইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মানুষ একে অঙ্গকে ভালবাসতে শিখলো। এই ভালবাসা থেকেই হ'লো বিবাহ প্রথার উৎপত্তি। নর-নারী একে অঙ্গকে ভালবেসে একান্ত আপনার করে কাছে পাওয়ার আশায় বিবাহ করতো। অর্থাৎ সেই যুগে প্রেমকে ভিত্তি করেই বিবাহ সংগঠিত হ'তো।

কিন্তু যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ প্রথাও পরিবর্তন দেখা দিল। ধর্ম বিবাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে শত বাধা-নিষেধের গাণ্ডিতে তাকে সীমাবদ্ধ করে তুললো। বৈদিক যুগে নর-নারীর মেলোমেশা ও স্বৈচ্ছার বিবাহ করার যে স্বাধীনতা ছিল, পরবর্তী ব্রাহ্মণ যুগে তা থাকলো না। এইভাবে বিবাহ প্রথার অনেক পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক বিবাহ ব্যতীত রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব ইত্যাদি প্রথার বিবাহ প্রচলিত ছিল। রাক্ষস বিবাহে আইন বা নিয়মের কোন বালাই ছিল না। কতটুকু বলপূর্বক হরণ করে বিবাহ করা হতো। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রেমের ভিত্তিতে লুকিয়ে যে বিবাহ হ'তো তার নাম ছিল গান্ধর্ব। অর্থাৎ অনেকটা আমাদের রেজিস্ট্রারি ম্যারেজের মত আর কি।

অতএব দেখা যাচ্ছে বিবাহ প্রথা সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকেই এ নিয়ে সমস্যা চলে আসছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীও সে সমস্যার হাত থেকে রেহাই পায় নি। উপস্থিত সমাজে দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে। একটি নেগোসিয়েটেড—সামাজিক বিবাহ এবং অপরটি লভ ম্যারেজ বা প্রেমঘটিত বিবাহ। একাধিক নিয়ম প্রচলিত থাকলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কোন পদ্ধতিটি শ্রেয়।

প্রাচীনপদ্ধিগণ বলবেন, পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকগণ যে বিবাহ দেন সেটাই আদর্শ।

আর নব্যপদ্ধিগণ বলবেন, বিবাহের প্রধান নারক-নারিক নিজেরা দেখেছেন যে বিবাহ করান সেটাই শ্রেয়।

# বৈদ্য ও প্রাচীন

দ প্রাচীনপদ্ধিগণ বলেন : আমাদের কালে এমন চলাচলির বিয় ছিল না। গুরুজনে যা দেখে দিরেছেন তাই হয়েছে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ প্রেমঘটিত বিবাহ যে প্রাচীনকালেও ছিল তার প্রমাণ গান্ধর্ব বিবাহ প্রথা। প্রেম মা যের স্বপ্নের এবং চিরন্তন স্নেহের বৃত্তি। প্রেম-ভালবাসা যদি প্রাচীনকালে থাকিত তবে শকুন্তলা-দুর্য়োধন ; কচ-দেবযানী ; প্রতাপ-শিবলিনী ; কৃষ্ণ-নরেন্দ্র ; অর্জুন-চিদ্ভাসনা ইত্যাদি বিভিন্ন যুগের প্রেমিক-যুগলের সাক্ষ্য আমরা পেলাম কিভাবে? একথা শো অনস্বীকার্য যে সাহিত্যিকগণ সেই যুগের বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি নিজেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে বসান করে থাকেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রেম সব যুগেই ছিল।

অন্য প্রেমঘটিত বিবাহের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কারণ এখনকার মত নারী-পুরুষের অস্বাভাবিক মেলোমেশা ; সহশিক্ষা প্রভৃতির এত প্রচলন ছিল না। তাই ক্ষেত্র বিশেষে প্রেম ও বিবাহ দেখা গেলেও সামাজিক বিবাহই প্রধান স্থান দখল করেছিল। এ বিবাহে পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মতামতের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। তখন বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকার তাদের মতামতের প্রশ্নও দেখা দিত না। কিন্তু বর্তমান যুগে যখন আমরা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হই তখন পাত্র-পাত্রী উভয়েই নাবালকদের সীমা পার হয়ে যায়। তাদের নিজস্ব বৃত্তি-বিবেচনা পাকা হয়। ছেলেরা উপার্জনক্ষম এবং মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষিতা না হয়ে বিবাহে আবদ্ধ হতে রাজী হয় না। এই পরিবেশে কোন ছেলে বা মেয়ে যদি কাউকে ভালবেসে বিয় করতে চায়, সেখানে যুক্তির দিক দিয়ে দেখলে আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না। এমতাবস্থায় অভিভাবক তাঁর অভিভাবকত্ব বজায় রাখতে জোর করে অঙ্গত বিবাহ দিলে সে বিবাহে দম্পতি স্থখী না হলে তার বিয়ম কল যে কতদূর গড়াতে পারে সে বিয়য়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

'Love is the happiness of the world... Love is a comming together... In love, all things unite in a oneness of joy and pain.'

এটাই হ'ল ইংরাজী সাহিত্যে প্রেমের একত্ব সংজ্ঞা।

বয়স্ককালে পুরুষ স্বতই আদ্যমণ্ডে নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। নারীও এই সময় থেকে তার মন, প্রাণ, চেতনা সব কিছু দিয়ে কামনা করে পুরুষকে। যুগ যুগ ধরে নারী কামনা করে স্বামীর মতোই পাবে সে তাঁর প্রেমিককে। দু'টি নর-নারী যখন সর্বনাশা ভালবাসার মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে একে অঙ্গকে জীবনের সাথী হিসাবে পেতে চায়, তখন মিথ্যা ধর্মের গোঁড়ামী অথবা অর্থ-কৌলিগের অসামঞ্জস্যের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের গাণ্ডী না টানাই মনে হয় ভালো। তবে একথা সত্য যে অভিভাবককে দেখতে হবে তাঁর পুত্র বা কন্যার স্বনির্বাচিত সে সঙ্গী যোগ্য ঠিক না।

তবে যোগ্যতার বিচারে রূপ, অর্থ অথবা ধর্মকে মাপকাঠি করলে চলবে না।

একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, বর্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে গেলে পুরানো যুগের কিছু গোঁড়ামী আর সংস্কার ত্যাগ করতেই হবে। নচেৎ পদে পদে সজর্ব অনিবার্য।

সামাজিক অথবা প্রেমঘটিত কোন বিবাহ পদ্ধতিই নিষ্কার নয়। পাত্র-পাত্রী যদি অভিভাবকের নির্বাচন স্বৈচ্ছায় মেলে নেন সেক্ষেত্রে সামাজিক বিবাহ শুধু আনন্দদায়কই নয়—কাম্যও। কিন্তু তাদের অমতে কেবলমাত্র লোকনিন্দা অথবা বংশধর্মদার জগ্ন শাসনের বেত্র উত্তোলন করা আর বাই হোক মানবিকতার পরিচায়ক নয়। সে চেষ্টায় সংসারে অশান্তির আধন জলে উঠতে বাধ্য। তাই মনে হয় যুগোপযুগী আবহাওয়ারকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

## বসন্ত প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

### শীতের হাওয়ায়

আমরা বধন যন্ত্রপাতির মাটিতে প্রথম পা দিলাম তখন ছিল শরৎকাল। উইক-এণ্ড হলেই সবাই দেখি গাড়ি নিয়ে ছুটেছে শহরের বাইরে। কোথায়? না বাচ্ছে ট্যানিং অফ, দি লিভসু দেখতে। গাছের পাতার রঙ ধরেছে আর সেই রঙের ছোঁচ লাগেছে মায়ূবের মনে। শীতকালে দার্বিনিয় রিক্স হয়ে থাকে গাছপালা। তাই যেন ঝরে যাওয়ার আগে একবার অপূর্ব ত্রী নিয়ে দেখা দেয় বনানী। মায়ূব নয়ন ভরে দেখে নেয় সেই রূপ। কৃপণের মত সঞ্চয় করে রাখে মনের মধ্যে সারা শীতকালের



হাউসহোল্ড 'চোর' সাক্ষিপ্ত করেছে আধুনিক রান্নাঘর

খোঁরাক। নভেম্বর মাসের মধ্যে ঝরে যায় সব পাতা। বসন্ত আসবে আবার সেই এপ্রিলে, তার আগে প্রকৃতির এই দৈন্ত ঘূর্তবে না।

শরৎকালের এই পাতার বাহার সর্বত্রই চোখে পড়বে। কি নিউইংল্যান্ডের 'ফল্'-এর ব্যাতি এখানকার আর সব-কিছুর মা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বীরে বীরে সোনালী হয়ে ওঠে গাছের পাতা তারপর হলদে আর ঝাউনের, সে যে কত বকমের হাকী, গা মাঝারি শেডের তকাত। সন্ধ্যাতে যেমন এক স্বর থেকে আর এ স্বরে যেতে মাঝে আছে জ্ঞতি—সন্ধ্যাতরঙ্গিকেরা তার মর্ম বোঝে তেমনি প্রথম হলুদ ছোঁপ ধরা থেকে শুরু করে বিবর্ণ, ধূসর হয়ে যে যাওয়া পর্যন্ত রঙের কত সূক্ষ্ম কালক্রম—তার মর্ম বোঝেন প্রকৃতি প্রেমিকেরা। শহর থেকে দূরে যেখানে পড়তে পারলে ভালই, নয় বসন্তে বসেও উপভোগ করা যায় নিউইংল্যান্ড 'ফল্'-এর সৌন্দর্য বেশি দূর নয় ফেনওয়ে অঞ্চলে, নয়ত বসন্ত কমন-এ কিছা চেক্টনা হিলের পাথে চোখে পড়বে সোনালী পাতার ছাওয়া বসন্ত তরঙ্গশ্রী।

শীতকালটা বধন পুরোপুরি এসে পড়ে তখন মনে হয় ভালই কিন্তু শীতের আগমনী মনকে নিত্যন্ত বিবর্ণ করে তোলে। সারা নভেম্বর মাস আকাশ মুখ কালো করে রইল আর বৃষ্টি পড়ল যখন তখন প্যাচ প্যাচ করে। হঠাৎ একদিন চমকে গিয়ে খেয়াল করি একটিও পাতা অবশিষ্ট নেই কোন গাছে। শূন্য শুকনো ডালপা মেলে দিয়ে কেমন যেন হাহাকার করছে গাছগুলো। বিকেল হব আর্দ্রে অন্ধকার নেমে আসে।

আমাদের লিভিং-রুমের কাচের শার্সি দিয়ে চেয়ে বাইরে দেখে যায় ট্রেমট কী-টের ওপরে মস্তবড় ক্যাথলিক গির্জার সুউচ্চ চূড়া গির্জার ঘটাগুলো করুণস্বরে বাজে। কালো আকাশের গা কালো ধ্বংসে গির্জার চূড়ার দিকে চেয়ে চূপ করে পাড়িয়েছিল জানলার কাছে।

শ' বলল, ডবল প্রেমোশন পেয়ে আমার মাথাটা ঘুরে গেছে স্পারেন্ড হয়ে গিয়েছি একদম। কিছুকাল আগেও বিশেষবাজার সুরে বধন আসত, লোকে প্রথম যেত ইংলণ্ড, তারপর হরত কচিনে একটু ঘোরাঘুরি, তারপর ভাগ্য প্রসঙ্গ হলে পাড়ি জমাত স্থা আমেরিকায়। আজকাল হচ্ছে অন্তরকম। ডবল প্রেমোশন পাও ছাত্রের মত প্রাথমিক এসে পড়েছি আমেরিকায়। হত যদি ইংল অতিথিবৎসল আমেরিকানদের মত এত আদর-আপ্যারনের ঘটা হ না, সেটাল 'হিটি'-এর এমন সুবন্দোবস্তও নেই সেখানে অ আবহাওয়ার কথা বলাই বাহুল্য। বসন্তের নভেম্বরের আকাশ দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। লণ্ডন হলে কি হত? সেখানে তো নভেম্বর, তা এপ্রিল, তা জুন-জুলাই আকাশের সেই একই ছিঁচকী ছেঁহা।

বসন্তের আকাশের এই করুণ, বিবর্ণ চেহারা সত্যিই দৃষ্টিভঙ্গির শীত তীব্রতর হল আর অজগিক আকাশ আবার বসন্তকে নীল হ গেল, সোনালী রোদ বসন্ত করে উঠল, যদিও সে রোদে তাপ ছিল এককোঁটাও। যেদিন বসন্ত সূর্য, পরিষ্কার আকাশ, সেদিন শীতে কাঁপুনি তত বেশি।

টেম্পারেচার নেমে গেল ছ-ছ করে।—১৮°—১৬°—১১° ফারেনহাইট। টেম্পারেচারের তারুণ্য নিয়ে সকলে আলোচনা কর

## বদল ও ঐশ্বর্য

বন্ধনে বাঁধি সেখানেই। Temperature is in the teens—এই একটা কথা শিখলাম ঐ সময়ে। আর এই টিন-এজার হাবহাওয়ার মেজাজ-মজি অনেকটা ওদের চকসমতি টিন-এজের ছুলেমেয়েদেরই মত।

মেমসাহেবরা শীত-গ্রীষ্ম দুইয়েতেই বেজার কাতর হয়ে পড়ে। দামরা যে গরম দেশের লোক তাও নীরবে মেনে নিয়েছি অসহ শীত, হুটফুট করে লাভ কি আছে? অথচ শার্শি, ক্লেয়ার, ক্যারল বার দ্বেই দেখা হচ্ছে সব হিশ-হি করছে শীতে আর কেবলি বলছে, “ও, আই এ্যাম ফ্রিজি।”

প্রথমে ভেবেছিলাম এরা দেখছি শীতে কাবু হয় সহজেই। কিন্তু গ্রীষ্মকাল আসতেই দেখলাম তখনো একই অবস্থা। গ্রীষ্মকাল যে এসেছে তা প্রধানত ছুটো জিনিসে বোঝা গেল। এক ধার্মোমিটারের দিকে চেয়ে সেখানে পারার অংক উঁচুতে চড়তে লাগল। আর এক মেমসাহেবদের বসনের দিকে চেয়ে, বসন-ভূষণ ক্রমশই সংশ্লিষ্ট হতে লাগল। ছেলেরা দেখলাম পুরো প্যাট ও পুরো হাফা জামা চালিয়ে যাচ্ছে এমন কি ছোট ছোট ছেলেরাও। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা কিন্তু তাদের মায়ের মতই স্ট পরতে শুরু করে দিল সামারের গোড়াত্তেই। বত দিন বার, ব্রহ্ম আয়তনের স্ট ও হাতকাটা ব্লাউজ পরে শার্শি, ক্লেয়ার, ক্যারল বামতে লাগল। বলতে লাগল, “ও আই এ্যাম মেটিং।”

গরমকালের কথা এখন থাক। নভেম্বরের শেষে থ্যাংস-গিভিং-এর ঠিক আগেই দিন বুপবুপ করে অল্প একটু বরফ পড়ে গেল। অল্প এ কিছুই নয় আসল পারফরমেন্স শুরু হবার আগে রিহাঙ্গেল। কোথা থেকে যে এত তীব্র কককন ঠাণ্ডা হাওয়া উপস্থিত হল, কিছুই জানি না। সেদিন পথে দেখি এক মেমসাহেব উন্টো দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ই্যা, সত্যিই পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হেঁটে। খানিকক্ষণ বোকার মত চেয়ে থাকার পর বুঝতে পারলাম মুখোমুখি হাওয়ার দিকে যুঝে ওঠা অসম্ভব। পিছন ফিরে হাওয়ার সংগে তাল রেখে থাটলে তবে এগোন যায়।

ডিসেম্বরের ন’ তারিখে ঘুম থেকে উঠে জানলার বাইরে চোখ পড়তে চোখ আর কেরাতে পারলাম না। কি এক অশাণ্ডি সৌন্দর্য নিয়ে বস্টন দেখা দিল সেদিন। এ যেন আমার নিত্যকার দেখা বস্টন নয়। সামনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বাড়ি বরফ ঢেকে গিয়ে রূপকথার রাজপ্রাসাদের মত চেহারা নিয়েছে। হাণ্টিংটন এডমিন্ডের চণ্ডা পথ বরফে ঢেকে গেছে আগাগোড়া, স্ট্রীটকারের লাইন চাপা পড়েছে বরফের তলায়। রাস্তার দু’পাশে সারবন্দী পার্ক করে রাখা মোটর গাড়িগুলো বৌদ্ধভূপের মত চেহারা নিয়ে বেশ একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি করেছে। গাছগুলোর পাতা না-থাকার লজ্জা বুড়েছে এতদিনে, বরফে সর্বাঙ্গ ঢেকে প্যাড়িয়ে আছে।

মনে পড়ে গেল, কলেজ-জীবনে পড়া রবার্ট ব্রিজের ‘লণ্ডন মো।’ পরীক্ষার ভাতি, সাবস্টেল লেখার আশংক সব ছাপিয়েও কেমন করে যেন কবিতাটি মোহ বিস্তার করতে পেরেছিল মনে। আগের দিন সারারাত ঘরে নিঃশব্দে বরফ পড়েছে।

When men were all asleep  
the snow came flying

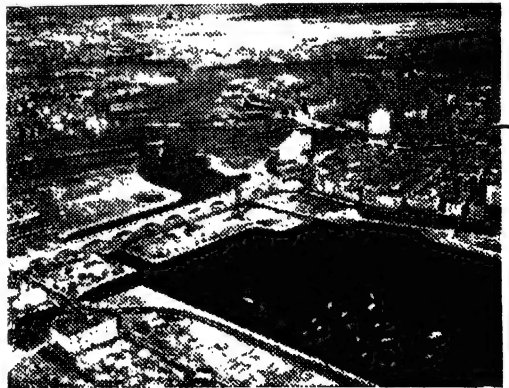
শহরের চেহারা পালটে গেছে কবির অজান্তে। সকালে উঠে সেই অসীম সাদার দিকে চেয়ে চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল—

The eye marvelled,  
marvelled at the dazzling whiteness.

শীতকে অবশ্য আমেরিকানরা কাবু করে ফেলেছে সেন্টিমাল হিটিং-এর গুণে। বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, ট্রাম-বাস, মোটরগাড়ি সবই গরম করা আছে—নাইস এণ্ড ওয়ার্ম। যদি কেউ শ্ব শ্ব করে রাস্তার ঘুরে না বেড়ায়, তবে শীতে কাঁপবার সুযোগ বিশেষ পাবে না। তাই কঠোর শীতের মধ্যেও আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত তো হলই না। হৈ-চৈ করে ঘুরে বেড়ানো সবই পুরোমাত্রায় চলতে লাগল। সামান্য একটু রকমফের হরত হল। ফল-এর সময় নেমস্তন্ন থাকত শিকনিক সাপারের শীতকালে বেশির ভাগ রাতে ডিনারের পর ‘গেট-টুগেদার’।

অনেক সময় এই ইনফর্মাল গেট-টুগেদার বা বন্ধু-সম্মেলন বেশ উপভোগ্য মনে হত আমার। অনেকে একসঙ্গে হয়ে শীতের রাতে জমিয়ে বসে গল্প করার পক্ষে আদর্শ। ডিনারের পর আটটা নাগাদ সকলে একজনের বাড়ি জড়ো হওয়া গেল। গৃহস্থামিনী নানারকম টুকিটাকি খাবার যোগাড় রাখবেন আর কিছু ডিংকস্, নানারকম ফলের রস একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পাঞ্চ হতে পারে। টুকিটাকির মধ্যে ‘ডিপস্’ অর্থাৎ—ডিপ, করে—ডুবিয়ে খাবার জিনিসের প্রাধান্য। টীজ দিয়ে তৈরি পাতলা ক্রীমের মত রয়েছে পাত্রে, তাতে টুক করে ক্র্যাকার বা আলু ভাজা ডুবিয়ে কুটিল করে কামড় দিচ্ছে সবাই। খোশগল্প চলাছে সঙ্গে। বেশ অনাড়ম্বর, অন্তরঙ্গ পরিবেশ। ঠিক বাবোটা বাজছেই এক রাউণ্ড কফি খেয়ে আসার ভঙ্গ করে উঠে পড়বে সবাই।

এরই মধ্যে ছুটো বড় বড় উৎসব এসে গেল আমেরিকানদের, থ্যাংস-গিভিং ও বডদিন। নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার থ্যাংস গিভিং বা ধন্যবাদ দিবস আজকাল জাতীয় উৎসব হিসেবে প্রতিপালিত হয় দেশ জুড়ে। তবু আগে কিন্তু এর বিশেষভাবে নিউ ইংলণ্ড



বস্টন শহরের একটি দিক

কেউভাল হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাই নিউ ইংল্যান্ডের আধা-গ্রাম আধা-শহর ফ্রেমিংহামে হ্যারিয়েটদের সঙ্গে খ্যাতি-গতি কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে মনটা খুশিতে নেচে উঠল। ফ্রেমিংহামে সেই আমাদের প্রথম বাড়ি। কিন্তু তাবপব থেকে ফিরে ফিরে বন্ধাব গিয়েছিল। এই ক্ষণকাল আমাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। টার্কি রোস্ট, ভুট্টা, সেন্ড, ক্রানবাবি সস, গিরে ডিনার হল। ডিনাবের পূর্ব বসবার ঘরে লগফায়ার ছোলে আরাম করে বসে গল্পগজব হল। সবচাইতে ভাল কায়গাটা অধিকার করে ফায়ারপ্লেসের ধান ঘেঁষে শুয়ে রইল ওদের প্রকাণ্ড কালো কুকুর বেঞ্জ। খ্যাতি-গতি থেকেই নারী প্রকৃতিপক্ষে শীশের সুখ ও কথাটা শুনছিলাম সকলের মুখে এবার বুঝতেও পারলাম বেশ। রাতে ফিববার সময় হ্যারিয়েটের গুডনাইট গান করতেন হল।

বড়দিন কাটাতে গেলাম আমবা ওয়েস্টন বলে বস্টনের উপকণ্ঠে আর এক ছোট শহরে। সেখানে থাকেন ডাক্তার ও মিসেস এলিস্টোন। বড়দিনের ডিনেব সাধারণত পারিবারিক উৎসব। ওদের পারিবারিক মিসেসের সঙ্গে যোগ দিতে এলিস্টোন-দম্পতি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সুসজ্জিত ক্রিসমাস ট্রির নীচে রয়েছে বর জুড়ি সুদৃশ্য কাগজে মোড়। ক্রিসমাসের উপহার। এলিস্টোন কজা পেনী ব্র হাতে তুলে দিল উপহার। মোড়ক খুলে দেখা গেল তার সবচাইতে প্রিয় খেলনা মোটরগাড়ি।

ইতিমধ্যে আরো নানান মরণের কাককর্ম করিয়ে পড়লাম আমি আর তারাই সূত্র ধরে বস্টনের সঙ্গে পরিচয় হতে-লাগল গভীরতর। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপক মেসেবের স্ত্রী মেরী টলর একদিন পরে নিয়ে গেল Y. W. C. A. এর সভাও কাপ নিল। কোপলে স্কোয়ারের ওপর Y. W. C. A. বাড়ি। কাপলে স্কোয়ারে আমার সবচাইতে বড় আকর্ষণ ছিল বস্টনের পাবলিক লাইব্রেরী। এবার আগে একটা যাবার কারণ হল।

প্রতি মঙ্গলবার Y. W. C. A. তে ছিল 'ওয়াশিং ডে' অর্থাৎ মহিলামহল। সারা সপ্তাহের সাপ্তাহিক বস্তু থেকে একটা দিন আলাদা করে রাখে গৃহবীরা। সেদিন এখানে এসে গল্পগজব, আলোচনা সভা থেকে শুরু করে সন্টার কাটা টেনিস খেলা নানা কাজে দিন কাটায় তাবা। প্রতি মঙ্গলবারের এই আসরে অনেক বস্টনিয়ান মহিলায় সঙ্গে আসাপ হল। সকাল দশটার 'কফি আওয়ার' দিয়ে দিনের শুরু। আমেরিকানদের কফি প্রীতি বিশেষ করে সকালবেলা কাজের মধ্যে এই কফির ছুটি একটাই অব্যাহত জিনিস। সকাল আটটার পূর্ণ-পাড়ার ব্যবসায়িক কাজের শুরু, বেলা দশটার অন্তত পনেরো মিনিটের লজা হলেও দেশজুড়ে কাককর্ম থেমে গেল, থমকে পড়লো সবাই, কি না কফি-ব্রক। আমাদের চা-প্রীতিকর ওয়া ইংলিশ অভোস বলে ঠাট্টা করত।

যা হোক, 'Y-wives day' শুরু হত কফি দিয়ে মণ্ডির মধ্যে বস্টনের বিভিন্ন ক্ষণ থেকে মায়াবা এসে জড়ো হতেন। ওপরতলার প্রশান্ত নাসারি। মাহেদের সঙ্গে যে-সব বাচ্চবা এসেছে তারা নাসারিতে ঢুকে পড়ল সারাদিনের মত। মাহেব: কফির আড্ডা শেষ করার বিভিন্ন ক্লাসে চলে যেতেন। কেউ সিদেশী ভাষা শিখতেন, কেউ শিগগেন জাপানী কারদার ফুল সাজানো,

কাক বা আছে হোর্কেসিং-এর ক্লাস অর্থাৎ কি করে আদর্শ হোর্কেস্ হতে হয় তার শিক্ষানবিশী।

আমাব ছিল কিছুদিন আট অফ কন্ভার্সেশন ক্লাস। কঠোরের ওঠানো-নামানো শেখানো হচ্ছিল একদিন। স্বর টেপ-রেকর্ড করে আবার ফিরে বাড়িয়ে শোনাইলেন আমাদের শিক্ষয়িত্রী। কে যেন বললে, তোমাদের দেশের গান একটা শোনাও না। কি মনে করে 'ধন ধাত্তে পুষ্প ভরা' প্রথম দু'টি ছত্র গাইলাম। ঠিক ও গানটাই কেন মনে পড়ল জানি না। বিদেশেই বোধ হয় নিজের দেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করে সচেতন হয় মানুষ। বেকিডি শুনেচে-শুনেচে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলাম ভাবছিলাম মন্দ হয় নি খুব।

এমন সময় আমার পাশের মহিলাটি বললেন, কি চমৎকার স্বর, এটা বুঝি একটা ভারতীয় লালাবাদী—ঘুমপাড়ানো গান?

শুনে আমি খতমত খেয়ে গেলাম একটু।

মধ্যাহ্নভোজনের বিরতির পর আবার শুরু হল বিভিন্ন আলোচনা সভা আর ক্লাস নবত খেলাধুলার আসর। তিনটির সময় ছুটি। কর্তারা বাড়ি ফিরলেন, ইঞ্চুল থেকে ফিরবে ছেলেমেয়েরা তার আগে বাড়ি পৌছে ঠিকঠাক করতে হবে সব। তাই বাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে ঘরের পথে চললেন Y-wivesরা।

আমেরিকান মেয়েরা ক্লাব লাইফ পছন্দ করে খুব। মেয়েদের নিজস্ব ক্লাব ছাড়াও যে কোন অপিসে, যে কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জীরা মিলে চুঁ করে একটা ওয়াইফস্ ক্লাব গড়ে ফেলবে। শর কর্তৃক ওয়াইফস্ ক্লাবের মেম্বার হয়ে যেতে হল শীগগিরই। সেখানে আমাদের দু'টা গুণ ছিল। আমাদের ছানির দলের চাইতে সিনিয়র দলের বয়সীরা অবশ্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ ছিলেন। নানান ধরণের চ্যারিটির আয়োজন, উৎসব অনুষ্ঠান, ডিনার বলনাচের ভার নেওয়া সব কিছুতে তাঁরা অগ্রণী।

আমার বন্ধু গ্লাডিং চিক্সম ছিল ডি এ আর (D. A. R.) নামে আমেরিকার একটি বিখ্যাত মহিলা-সংস্থার সভা। ডি এ আর বা ডিটারজ, অফ আমেরিকান রেভোলিউশন-এর সভা তারাই বাদে পিতৃ-পিতামহ কেউ কোন না-কোন মতে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত। গ্লাডিং ছিল আবার ওদের স্থানীয় ডেডহাম ক্লাবের একজন পাণ্ডা।

সে আমাকে একদিন ডেডহাম-এ ধরে নিয়ে গেল। বস্টন থেকে মাত্র মাইল-পনেরোর মধ্যে কি সুন্দর শহর। সেদিন বরফ পড়ছিল সারাদিন। বস্টন থেকে ডেডহাম পথটি এমনিতে সুন্দর, বরফ-ঢাকা গাছ-পালায় সেদিন আরো সুন্দর মনে হচ্ছিল। পথে হানকক ভিলেজে লাক সেরে ডেডহাম পৌছলাম। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট কটেজ, মাঝারি দোতলা বাড়ি—সবই বরফ গা ঢেকে শীড়িয়ে আছে। সামনেই চোখে পড়ল আগাগোড়া তুষারাবৃত তালু, সু উচ্চ চূড়াওয়ালা এক গির্জা। আমাদের গাড়ি গির্জার সামনে পড়লো।

এই গির্জার প্রশস্ত হলে বসে ডেডহাম উইমেনস্ ক্লাবের মাসিক অধিবেশন। ডেডহামের এই মহিলা সমিতি বয়সে সুপ্রাচীন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। আমাকে ওরা সেদিন ওদের অনারারি সভা নির্বাচন করল। এবার থেকে ডেডহাম বাড়ার পঁড়ালো বাধাবা নিষয়। সকালে বস্টন থেকে ঘুরিয়ে পথে কোন হোটলে গাড়ি পৌঁড় করিয়ে লাখ

সেই নিয়ে ডেডহাম ক্লাবে। গির্জার নীচে তলায় একেবারে মাটির নীচে আগুয় গ্রাউণ্ড হল—এ সুন্দর নার্সারির ব্যবস্থা। ক্লাবসভাদের ছেলেমেয়েরা সারাদিন কাটার সেখানে। এ ব্যবস্থা ছাড়া ও-দেশে মহিলারা আসেন।

রবিবার সকালে গির্জার উপাসনায় যোগ দিতে যায় সবই সপরিবারে, সেখানেও গির্জার সঙ্গে লাগাও নার্সারির ব্যবস্থা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জায় গিয়েছি টেলর-পরিবারের সঙ্গে বুথেকেছে নার্সারিতে। একবার একটু বড় ধর্মমতাসভার আয়োজন হয়েছিল হার্ভার্ডের কোন একটি গির্জায়। সব ধর্মের লোকেরা যোগ দিয়েছিলেন তাতে। বুকে নার্সারিতে খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখে নীচে আসতে একটু দেবী হল। তলে চুচ্চি, অথাক হয়ে শুনি গান হচ্ছে মায়ার ভজন। পরে আলোপ হস গায়িকা বাঙালী মহিলা।

জানুয়ারীতে একবার কোঙ্গাসেট ঘরে এলাম। সেখানে বেদান্ত আশ্রমে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল। জন্মোৎসবের উৎসবমুহূর্তীন সব ছাপিয়ে শীতের কথাই মনে পড়ত। সেদিন ছিল বছরের তীব্রতম শীত। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীর প্রচণ্ড শব্দনো কনকনে শীতের পর ফেব্রুয়ারীতে মাস ছুড় শুধু তুষারপাত হয়ে চলে।

একটা বড়বকমের তুষারঝড়ও হয়ে গেল একদিন সাঁ। সকাল সাঁ-সাঁ করে হাওয়া এলোমেলো বইছে। আমাদের উদ্ভ্রান্ত কালবৈশাখীরই স্মৃতিরূপ। ধূলো জার বুষ্টির বদলে শেঁজা তুলার মত বরফ। বরফগুলো এলোমেলো। ঘুরপাক খেতে খেতে ভিটিয়ে টিটিয়ে পড়ে চারদিকে। টেলিভিশনে ওয়ানিং সিগন্যাল দিচ্ছিল সারাদিন। পথচারী ও বিশেষ করে মোটরগাড়ির চালকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছিল—একটা ফার্ক মাগনিটিউডের তুষারঝড় বয়ে যাচ্ছে নিউ-জর্সির ওপর দিয়ে, নিত্যন্ত প্রয়োজন না হলে কেউ বাড়ির বাইরে যাব হবে না।

কয়েকজন আমেরিকান বন্ধুবান্ধব নিয়ে সেদিন 'পথেব পাঁচালী' দেখাবার কথা আমাদের। অগত্যা কানসেন করতে হল। মিসেস ওয়েলজ-এর ড্রাইভ করে নিয়ে যাবার কথা। টেলিফোন করলেন, 'পথেব পাঁচালী' দেখাবার নিত্যন্ত শখ আমার, কিন্তু তাই-বলে তো আর মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোর ঝুঁকি-মওচা চলে না।

[আগামীবারে ওয়াশিংটনে ছুটি।

## অচেনা মেয়ে

অনীতা সেন

স্টেশনে ঢোকবার আগেই ট্রেনটা চাঁৎ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। অনেকেই নেমে পড়লো ট্রেন থেকে কি হয়েছে দেখবার জন্যে। কেউ কেউ জানলা দিয়ে খুঁকে পড়লো।

সুতপাও মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। ইঞ্জিনের কাছে বেশ একটা ভিড জমে গেছে। চৈ-চৈ শব্দ ভেসে আসছে। আর কিছুট বোকা যাচ্ছে না।

বিস্ত্রিত্তে সুতপার মন ভরে গেল। অফিসের কাজ-সেই মনোবেলা বেরিয়েছিল। সমাজ-সবার কাজ। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে বড় ক্লান্ত লাগছে। আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

অনীতা সেন : ভাঙ্গা ১১

## চক্কা নিনাদ নাই!



সিন্ধু সেন্টারের কথা  
বলিতে ঢাক বাজাইবার  
প্রয়োজন হয় না।

সর্ব ভারতীয় কেন্দ্র সমূহ হইতে  
আধুনিকতম বস্ত্র শক্তির সমৃদ্ধ  
সিন্ধু সেন্টারের প্রদর্শনী গৃহ  
আপনার

পুজয়ার বাড়য়ার  
সার্থক করিয়া তুলিবে

সিন্ধু, আটসিক ও  
ক্যান্সী শাড়ীর বিপুল সম্ভাবন

সিন্ধু সেন্টার

বহুবাজার মার্কেট, মধ্য-বলিকাতা  
ফোন: ৩৪-৪৮১০

ভাবছিল কতক্ষণ গিরে দান সেয়ে শুয়ে পড়বে, কিন্তু বাড়ির কাছে এসে আবার কি বামেলা বাঁধলো। নিশ্চয় ধরঁট! কলকাতা শহরে তো নিভা লেগেই আছে। বাসিগল্প কৌশন থেকে ওর বাড়িটা বেশি দূরে নয়। ভাবতে লাগল এখানে নেমে হেঁটেই রওনা দেবে কি না।

কিছু কিছু লোক আলোচনা করতে করতে এইদিকেই ফিরে আসছিল। টুকরো-টুকরো কথা এবং অনেকের মন্তব্য শোনা বাড়িল। কেউ বললে, 'ওদের মরাই ভাল'।

কেউ বললে, 'আহা বেচার! একেবারে দু'আখানা!'

একজন স্ত্রতপানের কামরার উঠতেই অন্তরা জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে মশাই?'

লোকটা অবজ্ঞাভরে বললে, 'ও একটা বোবা পাগলী ভিখারী মেয়ে চাশা পড়েছে।'

কথাটা শুনেই স্ত্রতপা চমকে উঠলো একটি পুরোনো স্মৃতি ওকে চাবুক মেয়ে উঠিয়ে দিলে। তাড়াতাড়ি সন্দের ঝোলাটা কাঁধে ফেলে নেমে পড়লো। একরকম প্রার-দৌড়েই ভিড়ের কাছে এগিয়ে গেল। ভিড় ঢেলে চুকতেই একজন মন্তব্য করলে— 'মেয়েছেলে আবার এখানে কেন?'

স্ত্রতপা কান দিল না। সামনের দিকে হুক পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ঠিক বা জেবেছিল তাই রক্তের প্রাবনের মধ্যে পড়ে আছে ওদেরই পাড়ার সেই বোবা ভিখারিণীর দেহ—পরনে ওরই দেওরা শাড়ি। হুগুট কিছুদূরে ছিটকে গেছে।

স্ত্রতপা আর দাঁড়াতে পারলো না। সমস্ত দেহমন যেন অবশ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে লাগলো। টলতে টলতে ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। রেল-লাইনের ধার দিয়ে দিয়ে বস্ত্রচালিতের মত উঠে এল প্লাটফর্মে। মনকে যতই বোঝার একটা ভিখারিণী 'মেয়ের জন্ম এত দুখ কেন, ততই যেন গলা বুজে যায়— চোখে জল ভরে আসে। সামান্য করেকদিনের জন্ম হলেও ওর জীবনের সঙ্গে যে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিল স্ত্রতপা। সে কথা ভুলবে কেমন করে? সে-সব দুখ যে এখনও মনের মধ্যে জল-জল করছে।

সেই কথাই ভাবতে ভাবতে অজ্ঞানত্বের মত স্ত্রতপা বাড়ির পথ ধরলো।

সেই প্রথম যখন বাসিগঞ্জের নতুন বাড়িটাতে উঠে এসেছিল স্ত্রতপা, সেদিন নতুন পরিবেশে অনেক রাত পূর্ণন্ত ওর ঘুম হয় নি। অনেকক্ষণ ধরে এ-পাশ ও-পাশের শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা গোড়ানি আর করণ কান্নার স্বরে ওর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খোলার আগেই একটা অজানা ভরে বুকটা টিব-টিব করতে লাগলো। চাইতেই জানলা দিয়ে নজর পড়লো ও-পাশের ফুটপাথে।

ঐ যে বাগান-ঘেরা বড় বাড়িটা তারই পাঁচিলের ধারে একটা আর্মগাজতলার বসে কাঁদছে এক আখবরসী ভিখারিণী। সবে তখন কাঁচা হলুদ রোদ্দটা এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথার ওপরে তোলা রক্ত জট-বাঁধা চুল। পরনে শতছিন্ন গিঁট বাঁধা মরলা শাড়ি কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতেই স্ত্রতপা বুঝতে

পারলে ও কাঁদছে না। হাত-মুখ নেড়ে পথচারীদের কাছে কি সব বলছে। কিন্তু মুখ দিয়ে গোড়ানির মত অব্যক্ত শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বেরোচ্ছে না। বারা আশপাশে রয়েছে তারা কেউই ওকে গ্রাহ্য করছে না। পথচারীরাও অবজ্ঞাভরে চলে যাচ্ছে।

ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্তে স্ত্রতপা-বারন্দার বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কতগুলি ছোট ছোট ছেলের ভিড় হয়ে গেল মেয়েটির সামনে। ওদের মধ্যে মেয়েটি যেন আরও ক্ষেপে গেল। ওরা হাততালি দিয়ে কি বলছে আর মেয়েটি তাকাত্য করছে। ওরা কিছুদূরে পালিয়ে গিয়ে হাসছে। আবার ফিরে আসছে। কেউ আবার ঢিল কুড়িয়ে ছুড়ছে। মেয়েটি রেগে পথচারীদের কাছে নাগিশ করতে লাগলো গাঁ-গাঁ করে। কেউ তাদের ধমক দিল, কেউ চেয়েও দেখল না। পাশের বটগাছটার ছায়ার ছাতুর পশরা খুলে বসেছিল এক ছাত্তুরালা। সে হেসে কি মন্তব্য করলো। ইটের ওপর বসে যে লোকটি দাড়ি কামাচ্ছিল সেও সেই হাসিতে যোগ দিল।

পাশের বাড়ির দরওয়ানটাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্ত্রতপা জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটি কে?'

সে বলল, 'ও একজন পাগলী, বোবা; ওকে নিয়ে সবাই মজা করে।'

সত্যি সত্যি দেখা গেল সবাই ওকে নানাভাবে রাগাধার চেষ্টা করছে। ও কখনো চোঁচাচ্ছে, কখনও কাঁদছে, কখনও হাত-মুখ নেড়ে দৌড়ে যাচ্ছে।

স্ত্রতপার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় ছিল না। একে নতুন বাড়ি তার ওপর অফিসের তাড়া। তাই কাজ সারবার জন্ত বাড়ির ভেতর চুক গেল। কিন্তু সব কাজের কাঁকেও সেই একটানা একঘোরে স্বর শুনতে লাগলো।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে আর মেয়েটিকে দেখতে পেল না।

এরপর মেয়েটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু দিন পনেরো পরে আবার সেই গোড়ানি স্ত্রতপা হোল। সেদিন কিন্তু খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল স্ত্রতপা। বাড়িটা ওর বেশ ভালই লেগেছিল। বেশ ছোট দু'তলা বাড়ি। সামনে একটুখানি বাগান। ভেবেছিল বেশ নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ আবার কি বিপত্তি অথচ আশ্চর্য, এ পাড়ার সবাই এরকম বিশ্লী একটানা শব্দ সস্থ করে কি করে? মেয়েটিকে কোন আশ্রয়-প্রাপ্তিষ্টানে ভর্তি করে দিতে পারে তো? আচ্ছা একটু সময় পেলে নিজেই চেষ্টা করে দেখবে।

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে স্ত্রতপার একেই দেরি হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে দেখে ও তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চুক পড়লো। তারি ভাল লাগছিল ওর বৃষ্টি আসার রূপ দেখতে। বারান্দার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো দূরের তাল-নারকেল গাছগুলো হলতে আরম্ভ করেছে। দু-একটা শুকনো পাতা, সাধা কাগজ উড়তে-উড়তে কিছুদূর গিয়ে পড়লো। রাস্তার বাঁওগালা এক এক করে জলে উঠলো।

ও পাশের ফুটপাথে দৃষ্টি পড়তেই দেখলো সেই পাগলী মেয়েটা আশ পাশ থেকে পরসা কুড়িয়ে আসলে বাঁধে। বাক তা' হলে ও



রাজ কিছু পায়। মেয়েটা এবার পাশের হোটেল থেকে কিছু খাবার চরে নিয়ে আঁচলে বাঁধলো। তারপর এগিয়ে গেল রাস্তার বাতিঘার ঠিকে। ওখানে একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে পড়েছিল, বোধ হয় কছুতে ওর একটা পা চাপা দিয়ে গেছে। তখনও যন্ত্রণার মাঝে মাঝে কেঁউ-কেঁউ করছিল। মেয়েটা তাকে তুলতে গেল। কুকুরটা গায়ের ওপর ভর দিয়ে ঝাঁড়াতে পারলো না। তখনও কুকুরটাকে কালে তুলে নিল। রাস্তার চাপা কল থেকে একটু জল নিয়ে ওর গায়ে দিল। তারপর আঁচল থেকে ভাত নিয়ে খাওয়াল। ইতিমধ্যে গড়ে বড় কৌটা পড়তে আরম্ভ করেছে। সেইদিকে চেয়ে ও কুকুরটাকে কালে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে চলে গেল।

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল স্ত্রুতপা; কুকুরটা এতক্ষণ রাস্তার জঙ্গলের মত পড়েছিল, কেউ ফিরেও তাকায় নি কিন্তু এই আলো-ছাঁধারের সন্ধিক্ষণে মেয়েটির যে দরদরী মনের পরিচয় পেল, সেটাও কি ওর পাগলামী?

এর পর কয়েকমাস আর মেয়েটি আসে নি।

শীতকালের এক ছুটির দিনে স্ত্রুতপা বসে বসে সামনের বাগানটার রংস্বার করছিল। এমন সময় একটা হৈ-টৈ শুনে রাস্তার দিকে চরে দেখলো। সেই বোবা মেয়েটাকে ঘিরে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে, আর মেয়েটা হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

প্রায় সকলেই মেয়েটাকে মালাগাল দিচ্ছে। মেয়েটা কখনো কখনো সকলের পা ধরবার চেষ্টা করছে আবার কখনো কি বলবার চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে একটা কিছুতকিমাকার শব্দ বেরোচ্ছে ওর গলা দিয়ে। টানাটানিতে ওর জীর্ণ কাপড়ের ধানিকটা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত চুলগুলো মুখের সামনে ঝুলে পড়েছে। একটা ছেলে হঠাৎ মজা পেয়ে ছাত্তুওয়ালার জলের কলসীটা দিল মেয়েটার মাথার ওপর উপড় করে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা, কাপড়, গা ভিজ্ঞে একাকার।

একজন মস্তব্য করলো, 'এবার পাগলামী সারবে।'

আর একজন বলল, 'পাগলামী—না বদমাশী।'

মেয়েটা আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে কোন রকমে ভিড় ভেলে এ পাশের ফুটপাথে দৌড়ে এল। ভিড়টাও ওকে তাড়া করলো। বাড়ির সামনে আসতেই স্ত্রুতপা হাত ধরে মেয়েটাকে টেনে নিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো—'ওকে প্রথম দাবেন না। এখনই পকেট মারবার জন্যে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে টানাটানি করছিল।'

'সে আমি বুঝবো,' বলে গेट বন্ধ করে দিল স্ত্রুতপা।

মেয়েটা ততক্ষণে একপাশে বসে পড়ে কাঁপছে। স্ত্রুতপা তক্ষুণি ওর একটা পুরনো কাপড় এনে দিয়ে ভিজ্ঞে কাপড়টা বসলে কেলতে বলল। কাপড়টা হাতে নিয়ে কেমন একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেয়েটা, সে দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, বেদনা সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো ওর।

স্ত্রুতপা ভাত এনে ওকে খেতে দিলে। ভাত বেখে ওর চোখ হাটো উজ্জল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি করে ভাতগুলো কাপড়ে বাঁধতে লাগলো। স্ত্রুতপা মনে করলো নিশ্চয় সে কুকুরটাকে খাওয়াবে। তাই বলল—'কোথায় নিয়ে বাচ্চিস? এখানে বসে খা।'

মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেল। তারপর হঠাৎ কি হোল, আঁচলটা চেষ্টা ধরে ছুট দিল। পাগলী আর সাথে বলে?

কিন্তু এ পাগলামীর কি শেষ নেই? কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার একটা গণ্ডগোল বাঁধল মেয়েটা। স্ত্রুতপা বাস থেকে নামতেই দেখলো ও পাশের ডিসপেন্সারীর সামনে ওকে ঘিরে বেশ ভিড় জমেছে। ও ঠিক সেইভাবেই কাঁদছে, আর সকলের পা জড়িয়ে ধরছে। মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। এবার ওর জন্যে কিছু না করলেই নয়। স্ত্রুতপা ভাবতে ভাবতে যেই গेट খুলে বাড়িতে ঢুকতে বাবে—তারের মত ছুটতে ছুটতে মেয়েটা এসে ওর পাশের ওপর আছড়ে পড়লো। ইচ্ছাকৃত গিরেছিল প্রথমটা স্ত্রুতপা। মেয়েটা হয় তো মনে করেছে এটাই ওর একমাত্র আশ্রয়। পিছু পিছু করেকলনকে ছুটে আসতে দেখে সখিৎ কিরে এল ওর। একেবারে ঝরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাইরে চৌচাকমে শুনতে পেল, 'ওকে ছেড়ে দিন—আমরা পুলিশে দেব।'—'ওঃ! ভারি দয়া দেখাচ্ছে।' ইত্যাদি।

মেয়েটা তখনও হাঁপাচ্ছে। মার খেয়েই হোক আর দরজার লেগেই হোক কপালটা কেটে দর দর করে রক্ত পড়ছে।

স্ত্রুতপার চাকর পক্ষু ছুটতে ছুটতে সেই সময় এসে বলল—'দিদিমণি ওকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দিন। ও পাগলামীর ভাগ করে চুরি করে। ডিসপেন্সারীর কম্পাউণ্ডারের হাত ধরে টানছিল; ধমক খেয়ে একটা দামী ওবু তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

মেয়েটা কি বললো কে জানে? চোখ হাটো ওর জলে উঠলো, তারপরেই নিতেজ হয়ে মুখ নীচু করে বসে পড়লো।

স্ত্রুতপা জিজ্ঞেস করলো, 'বারে বারে কেন এমন হুইম্মী করিস?'

মেয়েটা এবার চোখ তুলে তাকাল। চোখ হাটো জলে ভরে গেছে। ভারি ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখখানা। দূরের দিকে আঁতুল দেখিয়ে গৌ-গৌ করে কি বললে। স্ত্রুতপা কিছুই বুঝতে পারলো না। এবার ওর হাত ধরে টেনে টেনে দূরের দিকে দেখাতে লাগল। ইসারা করে বোঝাতে লাগলো ওর সঙ্গে কোথাও যাবার জন্যে। স্ত্রুতপার কেমন জিন্দ চেষ্টা গেল এ ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত করবে ও। অন্তত বাইরের লোকদের ব্যবহারের এটাই হবে নিঃশব্দ প্রতিবাদ। তাই একটা গরম কাপড় জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চল কোথায় যেতে হবে।'

পক্ষু খুব ছেলেবেলা থেকে স্ত্রুতপাদের সংসারে কাজ করছে; দিদিমণির কাণ্ড দেখে অবাক!

বললে—'পাগল হলেন না? হুইম্মী?'

স্ত্রুতপা হাসতে হাসতে বললে, 'তুমিও চ-না।'

বুড়ো বয়স পর্যন্ত স্ত্রুতপাকে দেখে আসছে পক্ষু; জানে যেটা জিন্দ ধরেছে করে ছাড়বে। তাই আর কিছু বললো না।

তখন অন্ধকার নেমে এসেছিল। বাড়ির সামনে হিড়টাও আর ছিল না, হুই করে উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, রক্তচুল শুছিয়ে নিল মেয়েটা। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে কিরে দেখতে লাগলো, স্ত্রুতপা ঠিক আসছে কি না।

কিছুদূরেই একটা পরিত্যক্ত মাঠ পড়েছিল। মাঠটা পেরিয়ে ও একটা বস্তির পিছন দিকে স্ত্রুতপাকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা ভেসে-পড়া পোড়ো ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গেছন একিকটা

জঙ্গলে ভরে গেছে। কিন্তু সামনেটা বেশ পরিষ্কার করে নিকোনে। সেদিনকার সেই কুকুরটা একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। গ্যাসের মিটমিটে আলো-অন্ধকারে কঙ্কত দেখাচ্ছিল জায়গাটা।

মেয়েটি ইসারায় ওদের দাঁড়াতে বলে ভেতরে ঢুক গেল। কুকুরটা মুখ তুলে হ'বার ভেবে ভুল করে মেয়েটিকে দেখে আবার মুখ শুঁজে শুয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল 'কে, বিনো এলি?'

তারপর হাঁপানীর সঙ্গে কাশির শব্দ হতে লাগলো। স্তূতপার গাটা কেমন ছুঁ-ছুঁ করতে লাগলো। পঙ্ক গঙ্, গঙ্, করতে লাগলো।

মেয়েটা সেই সময় একটা মোমবাতি জ্বালে ওদের ভেতরে ডাকলো। ভেতরে বাত্রে কি, বাত্রে না ভাবতে ভাবতে ভেতরে উঁকি দিল স্তূতপা। দেখলে মেয়েতে শুয়ে শুয়ে ধুকচুকে এক মুড়াপথবাঈ রুগ লোক। অস্বস্তি দেখলেই বোঝা যায় শেষ ডাক এসে গেছে। মেয়েটি খুব যত্ন করে লোকটির মাথাটা ওর কোলের ওপর তুলে নিল। লোকটি চোখ বুজতেই চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটি সেইরকম যত্ন করেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে ওকে ঠেলে স্তূতপার দিকে আন্তর দিয়ে দেখালে।

লোকটির ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মুখে একটা করুণ হাসি ফুটলো। হু হাত কপালে ঠেকিয়ে অতি ক্ষীণস্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'মজলময় ভগবান আপনাকে ঠিক সময় পাঠিয়েছেন।' তারপরই কাশতে লাগলো। বললে, 'বডু কঠ হচ্ছে।'

কিছুক্ষণ থেমে থেমে, কাশতে কাশতে, হাঁফাতে হাঁফাতে যা বললে তা থেকে স্তূতপা 'জানতে পারলো' যে, বিনোর স্বামী এই লোকটি। আগে অস্বস্তি ভাল ছিল—কারখানার কাজ করতো। কিন্তু ট্রাম চাপা পরে ওর একটা হাত কাটা যায়। চাকরিটা চলে যাওয়ার পরেই তীব্র কঠিন রোগ হয়ে গলার স্বর বিবৃত হয়ে গেছে। সে সময় যেকু পুঁজি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে। তারপর কোনরকমে ভিক্ষা করে দিন চলছিল। কিন্তু অভাব-অনটনের জ্বালায় ও এক বছর হলো এই দারুণ রোগে জুগছে।

বিনো কোথা থেকে হুঁমুঠো ভাত জোগাড় করে আনে, কোন ভাল জায়গায় ওর কাজ পাবার উপায় নেই—ওকে সবাই পাগলী মনে করে। আজ আশা দিয়ে গিয়েছিল ওখুঁ দিয়ে ভাল করবে, কিন্তু ও তো জানে না আজই হয়তো সব ওখুঁয়ের বাইরে চলে যাবে তার স্বামী। বিনো তার কেউ নিলে তবু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারে সে।

এবার সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল স্তূতপার। ও যেন কেমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। পাথরের মত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। লোকটি ছটকট করে উঠতেই ওর সবিৎ ফিরে এল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে লোকটির মাথা একপাশে ঢলে পড়লো।

একটা কিছু হয়েছে বুঝতে পেরেছে মেয়েটি। দৌড়ে এসে স্তূতপার পা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! একটা ডাক্তার ডাকবার জন্তে একই ওখুঁ দেবার জন্তে ইসারা করে বোকাতে লাগলো। সে কি আকুল-নিরুপল। স্তূতপার চোখ ঝেঁটে জল এল। বুঝতে পারলো

সব শেষ হয়ে গেছে। তবু মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে বেরিয়ে এল। পঙ্ককে বললে, মৃতদেহ না নিয়ে বাওরা পর্যন্ত যেন ওখানো বসে থাকে। তারপর মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসে।

স্তূতপা এরপর সোজা চলে এল ওর সহকর্মী বন্ধু রজনীর কাছে। তার ওপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা এবং সংকারের ব্যবস্থা করার ভার দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। কিছু খেতে ইচ্ছে করলো না। উৎকর্ণ হয়ে রইল কখন মেয়েটাকে নিয়ে পঙ্ক ফিরে আসে।

গভীর রাত্রে পঙ্ক একাই ফিরে এল। বললে—'গোলমালের মধ্যে মেয়েটা কোথায় চলে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এই ঘটনার সাতদিনের মধ্যে ওকে এভাবে দেখবে, স্তূতপা আশাই করে নি। বেশ বোঝা যাচ্ছে ও আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? যে স্বামীর মুখ চেয়ে সে এতদিন এত অপমান, এত প্রাণি সহ্য করেছিল, তার অবর্তমান সবই কি শূন্য হয়ে গেল?

## পিতৃগৃহের স্মৃতি

জয়প্রী গুপ্ত (চৌধুরী)

শ্রীতের রোদধূর বেকে জানানার শাসিতে দেয়ালে আন্ননা গিয়েছে একে। ফেরিওলা দূরে হৈকে যায় মেঝেতে সেলাই কল, স্তূতো টানা অর্ধেক সেলাই, মা গেছেন ব্যস্ত পায়, ছবি ভাসে চোখের উপরে।

শঙ্কর, হুঁহাতে কালা খেলাঘরে দোকান সাজায় এতদূরে আমি তবু স্পষ্ট দেখি দুই চোখ ভরে ছায়া রোদধূরের ছবি। ওঠে নামে ছবির টেউয়ের। ছবির মিছিল যায়। আসে আর কেবল হারায়।

ট্রেনের গভীর ধ্বনি। স্মৃতি আনে গানের মতন ফুল থেকে ছুটে ফেরে দীপস্বর, দ্রুতপায় ঢোকে জানালার অলিন্দে ডাকে, কালো সাদা পায়দার জোড়া ফুলের বাগানে ছাদে, করে পড়ে ক্রিসানথিমায়।

ছবির ফুলেরা ঝড়ে, ঝরে, ঝরে ছবির ফুলেরা।

## হাউই

চিত্রা সেনগুপ্ত

একটা অসন্ত হাউই অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে আকাশের এককোণ থেকে পাড়ি দিতে দিতে আরেক কোণে মিলিয়ে গেল একনিমেষে। সেটা মিলতে না মিলতেই আরেকটা হাউই নিঃসীম অন্ধকার আকাশের দিকে ছুটে চললো। তারপর আরেকটা। আরো কয়েকটা অসন্ত হাউই মাথা ঠেলে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কখনো বা স্বাক্ষর-স্বাক্ষর আকাশের বুক আলো করে ছুটে চলেছে প্রহলিত হাউই-এর বিসর্গল বহির্শিখা।

কলকাতার স্তম্ভপ্রান্ত আকাশের গারে কারা যেন দেওয়ালির আলোর স্থালা মুলিয়ে দিচ্ছে একে-একে। সঁ...সঁ...হাঙ্কা একটা

আগরাজ তুলে হাওরা টেলে উঠে যাচ্ছে হাউইগুলো। তীর অথচ সিন্ধু আলোর রোশনাই সমস্ত অন্ধকারকে ভেঙ্গে চুরে সোনাগলা গুলিস্ত ছড়িয়েছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশময়।

ছাদের একাংশে শুয়ে মুগ্ধবিশ্ময় সেদিকে তাকিয়েছিল মাধবী। বেশ লাগে অবসর চোখ দুটো দিয়ে এ দুগ্ন উপভোগ করতে। পাশ ফিরে অশোকের দিকে একবার তাকিয়ে নিল মাধবী। ঠিক... যা ভেবেছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে অশোক। অশোকের এই ঘুমকাতুরে স্বভাবের কথা ভাবলে হাসি পায় মাধবীর। এত ঘুমতেও পারে অশোক। অথচ একবার জিজ্ঞাসা কর সাত রাজার কৈফিয়ৎ দিতে বসে যাবে এখন।

...উঁহ কি রাজ্য বক। তুমি তো আমাকে কেবল ঘুমতেই দেখ। যাও বিরক্ত কর না। একটু কেবল গড়িয়ে নিচ্ছি, তাও তোমার সহ্য হচ্ছে না—এই তো?

কৈফিয়ৎ দেবার সময় অশোকের অসহায় মুখটার স্বা অবস্থা ঠাড়া... দেখে না হেসে পায় না মাধবী।

আজকের কথাটা অবগত আলাম। পূজোর দিন বলে একটু নতুনত্বের নেশা পেয়ে বসেছিল মাধবীকে। অনেক সাধ্য-সাধনা করে অশোকের মত করিয়ে হুঁজুনে সিনেমা দেখে বাত করেই বাড়ি ফিরেছে। তারপর খাওয়ার-নাওয়ার সেবে একটু বিশ্রাম নিতে চান এসেছিল ওবা। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্তেও কথাটা ভোলে নি অশোক। ঐ আর এক রক্ত ছেলেমাছুষি। খোয়ালটা একবার উঠলেই চল। তখন ওকে সামলান দায় হয়ে ঠাড়ায় মাধবীর। যেন কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না অশোককে। নানান কথা দিয়ে অস্ত্রঘনন করে তোলবার চেষ্টা করে মাধবী। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ভালও লাগে মাধবীর। অগ্নিক বিশ্বয়ে অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে মাধবী। যে মাহুঘটাকে পড়ার ঘর থেকে এক মিনিটের জন্তেও হুঁস করিয়ে টেলে তুলতে পারে না মাধবী... সেই মাহুঘ যেন কত বদলে যায় এই সময়টা। চেনাই যায় না অশোককে। নতুন একটা উপায়ে হাত দিচ্ছে অশোক। সুপ্রতিষ্ঠিত লোক হিসেবে নামও করেছে প্রচুর। তবু নিজের সাধনার ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় ওর প্রথম প্রচেষ্টার মত আজও তন্নয়ন করে রাখে অশোককে। রাশি-রাশি বইয়ের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে থাকে অশোক। পরখ করে দেখেছে মাধবী... অশোককে তখন নিজের কাছেই কেমন আশ্চর্য অচেনা বলে মনে হয়।

সেই অশোকই ছোট লোভাতুর ছেলের মত ঐ সময়টা নিজের চাহিদায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে মাধবীকে। অশোককে নিজের আয়ত্তে এমন করে ধরা দিতে দেখলে ভাল না লাগে পারে না মাধবীর। হয়তো ওর চোখেও মাদকতার প্রলম্বিত ছাড়া ঘনিয়ে আসে দীর্ঘ দীর্ঘ। প্রখলিত কামনার তীব্র মুহূর্তন আশুন ধরিয়ে দেয় দেহ-মনের প্রতি তরিতে। নিজেকে সামলে নেবের চেষ্টা করে মাধবী। অন্তত সে চেষ্টার ক্রটি রাখে না ও। তবু সহজে নিষ্কৃতি দিতে চায় না অশোক।

ঠিক সেই সময় অশোকের ঐ অবাধ্য ঘুমটা যেন মনোবধের মত কাজ করে। কখন যেন একটু একটু করে নিজেকে হারাতে শুরু করে একসময় হঠাৎ কতদূর তলিয়ে যায় অশোক। অরাক লাগে মাধবীর।

কত সহজে পার পাওয়ার একটা অভাবিত স্বপ্নি পার মনে মনে। তবু কেন কে জানে, অতৃপ্তির আলতো একটা ছোঁয়াচ শুক বিষন্নতার ঘন ছায়া চুপিসারে ছড়িয়ে পড়ে মাধবীর মনের কোণে-কোণে।

হাউইয়ের খেসা তখনো ছুটে চলেছে আকাশ-বাতাসে। দেওয়ালির রাত্রি আজ যেন আশুনের অলঙ্কারে নিজের সর্গজ সাজিয়ে-গুছিয়ে সচকিত পায়ের দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আকাশময়। দিকচক্রবালের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত মুহূর্তেই সর্পিল বেথাগুলো ছড়িয়ে পড়েছে দিগভ্রান্তের মত।

আনন্দে দিশাহারার মত হাততালি দিয়ে ওঠে মাধবী—ভাখ-ভাখ... কত দুঃ... উঃ... কি সুন্দর।

অশোক তবু চেয়ে থাকে মাধবীর দিকে।

কিন্তু তখনো অক্ষপাতীনভাবে নিজের উজ্জ্বলের জের টেনে চলে মাধবী। ঐ... ঐ পড়ল, পড়ল একটা... উঃ ফুলগুলো কি সুন্দর সাদা হয়ে যাচ্ছে তাক... খাখি না।

অশোকের নির্ভিকার চোখ দুটো তখনো কেবল আশ্চর্য স্থির হয়ে রয়েছে মাধবীর চোখের ওপর। মাধবীর ঐ কৌশল যে কখনো কখনো বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারে অশোকের মন-প্রাণকে... এ কথাটা বা ভাবতে বাকি রাখে কি করে মাধবী ভেবে বিশ্বাস দুটো ওঠে অশোকের চোখে।

শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হল মাধবীকে।—আমার মুখের দিকে কি এত হাঁ করে দেখছ বল ত?'

প্রত্যুত্তরে পাশ ফিরে শোয় অশোক।

আবার অল্প পথ ধরে মাধবী। অশোকের মত কাছে আসার অদম্য নেশাটা যেন মাধবীকেও পেয়ে বসে দীরে দীরে। তাই আতঙ্ক আর ভয়ের মধ্যেই থুঁজে পেতে চায় অশোককে। বলে—এখানেই শুদ্ধ যে বড়। যদি একটা অল্পস্ত হাউই এসে পড়ে গায়ে। বলা তো যায় না... তখন কি হবে-ভেবে দেখছ?

থাক... তুমি আর আমার জগতে ভাবতেই হবে না। মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দেয় অশোক।

অশোকের মনের অভিমানটা যেন মাধবীর মনের আয়নার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলে এবার।

চূপ করে যায় মাধবী। কেবল একটা শুকনো ঢোক গিলে সামলে নেয় নিজেকে। দাড়া যেন একা মাধবীরই। একটা কিছু অজুহাত পেলেই হল অশোকের... সুর দোষ মাধবীর যাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই... নিশ্চিত।

অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে আবার প্রাণ করে মাধবী। কথাটা কানে নিচ্ছ না যে বড়। চল... নীচে চল। একটা অল্পস্ত হাউই এসে পড়তেও তো পারে।

পড়ে পড়ক... পড়েই মরব। অশোকের কণ্ঠস্বরে অভিমানের সেই সুর আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—তবু সে অনেক ভাল...

এবার হো-হো করে হেসে ওঠে মাধবী। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলেও নিল নিজেকে। বউদ অবুঝ। বউদ অভিমান অশোকের। যদি একটু বোঝবার ক্ষমতা থাকে... অভিমান কি মাধবীর থাকতে নেই। অবুঝ তো ও নিজেও হতে পারত। হলেই বোধ হয় ভাল হত। তবু আবার করার অজুহাত থাকতো।

নিজেকে যেন একটু-একটু করে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে মাধবী। অনেকক্ষণ চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। যখন অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় যেন আগুনের মেলা বসে গেছে ততক্ষণে। একটার পর একটা হাউই উঠছে আকাশে। আবার নামছে কোনটা। ডাইনে...সাঁই-সাঁই আর নামার নিবন্ধন খেলায় যেন মাতাল হয়ে উঠেছে আকাশটা।

এবার মাধবী কণা বলল।—চল নীচে যা।

প্রথম। স্তব্ধ দেয় নি মাধবী। তাই আবার বলে উঠল অশোক—কৈ তুমি? না নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল।

না। আমি তুমি নই। কণার কাঠি আনার চেষ্টা করে মাধবী।—কি এমন অন্ধার কথা বলেছিলাম? একটা আগুনের টুকরো এসে যদি পড়ে। বলা তো যায় না।

যত পাগলের প্রলাপ। অবচলিত প্রজ্ঞার-হাসি হেসে মাধবীর আতঙ্কে উড়িয়ে দিতে চাইল অশোক। সব যদিও উত্তর দেওয়া যায় না।

এবার মুখ খুলল মাধবী—হাসছ যে বড়? কি এমন হাসির কথা হল এটা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—পড়তেও তো পারে। না... এই রকম হেসেই উড়িয়ে দিতে পারবে বিপদকে?

এবার মাধবীর দিকে ফিরল অশোক। কিছুক্ষণ ওর মুগের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—ইস...এত ভয়। সঙ্কীর্ণ পরিহাসের মধ্যেই মাধবীর মুখিকে উড়িয়ে দিতে চাইল অশোক। তারপর কি ভেবে ছুঁতাত ভকে নিষিদ্ধ করে কাছে টেনে নিতে গাত বাড়াল।—অত যদি ভয়...সব এস আমার কাছে।

—থাক। কপট অভিমানে অশোকের ঝগড়া হাতটা সরিয়ে দিল মাধবী।—আমার জন্মেও ভাবতে হবে না।

আরও হয়তো কিছু বলত মাধবী। কিন্তু হঠাৎ বড় চমকে উঠেছিল মাধবী। ছাদের একেবারে ধার ঘেঁসে একটা জলজন্তু হাউই সাঁ-সাঁ শব্দে বেরিয়ে গেল আকাশের দিকে। সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। সত্তর অশোকের আরো একটু কাছে সরে এসেছিল মাধবী। সাঁই-সাঁই শব্দটা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গিয়ে আলোর বরন। ফুটে উঠল আকাশময়। কি তীব্র অথচ মিষ্টি আলো! দুলছে আলোর ফুলকিগুলো। একরাশ ইষৎ হলুদ কণের গুচ্ছ যেন হাওয়ার দুলছে ঘিরে বীরে। কি বিপুল সম্ভাবনার ভরে...সেঁচে আকাশটা। আর বীর হচ্ছে শুভ্রমুগের যত কানোবোঁ টুকরোগুলো যেন একে-একে নিজেকে গৌণে নিচ্ছে মালার আকারে। নৈক্যখন অন্ধকার আকাশের পটভূমিকার আলোর অঙ্গা যেন ঘূর্ণের নেশা ধরিয়ে দিল মাধবীর চোখে। চোখ বুজল মাধবী।

যে ভয়টা করেছিল মাধবী সেই আতঙ্কই সত্যি হয়ে ঝাঁড়াল শেখ পর্বত। সমস্ত আকাশ-বাতাসকে হঠাৎ সচকিত সমস্ত করে একটা জলজন্তু হাউই কোথা থেকে উড়ে এসে ঠিক ওদের মাথার ওপর স্থির অচঞ্চল ডানা মেলে থমকে ঝাঁড়াল। মাধবী অশ্লকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ভীষণ একটা উজ্জ্বল আলোর পিণ্ড অচঞ্চল হাউইয়ের ঠিক মুখোঁয় যেন জলছে অনিবার্য শিখার মত। হঠাৎ জ্বলিত নক্ষত্রের মত ঠোটা সোজা নেবে আসবে না তো ওদের ওপর। বিহবলের মত

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল মাধবী। যদি ঠিক ওদের মধ্যেই এসে পড়ে হাউইটা! নিদারুণ একটা অগ্নি-পাত্রে জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে সব শেষ করে দেবে তা হলে। সত্তর কেঁপে উঠল মাধবীর দেহটা।

হঠাৎ একটা স্মৃদ্ধ ক্ষীণ আলোর রেখা জলন্ত পিণ্ডটা থেকে সোপা বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে ঝাঁড়াল মাধবীর চোখের সামনে। যমের হাওয়াই অমৃতের করার চেষ্টা করে মাধবী, স্বপ্ন নয় তো। না : আত্যাগ উত্তাপটা বেশ বুঝতে পারছে মাধবী। স্বপ্ন কি করে হবে। আটো টিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও।

কিন্তু 'ক' শব্দটি। বিভীধিকার এতটুকু ছায়া পড়ে নি আলোটার কোন অঙ্গে। শুভ্রমুগ মোহময় একটা আশ্রয়ণে মোড়া আলোর বস্মিকাল ভাল লাগল মাধবীর। শিশুর অবোধ অসহায় ছুঁতো শুষ্ক ডাগর চোখের মত মিটি মিটি জ্বলছে আলোটা। মুখটা বড় চেনা ঠেকে মাধবীর চোখে। কোথায় যেন দেখেছে মুখটা। কোথায়...কোথায়... আলোর গতির মত দ্রুত ভেবে চলে মাধবী। কেমন যেন সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর। হাঁ, ঠিক। খুঁজে বার করেছে এতক্ষণে। সেই শিশুটাই। সত্তর দেখা সিনেমার একটা দৃশ্যে এই শিশুটার আসন্ন একটা জুয়োর সম্ভাবনার বুক কেঁপে উঠেছিল মাধবীর।

এবার বীরে বীরে মনে পড়ে যাচ্ছে সবকিছু। একদল ভীষণ দুর্বৃত্তের ভয়ে জনপদ ফাঁকা করে পালাচ্ছে ভয়াবহ নরনারী। ভেলে-বুড়ে, হান-পুকা, পুঙ্খ, অথর্ব...কউ বাদ নেই পালাতে। পাহাড়ের চূর্ণ একটা দাক্ষিণ্য ধরে উল্লসাসে পালাচ্ছে সকলে। এই কটি শিশুটি ছিল ওর অসহায় মার বুক। আর কারো দিকে নজর দেয় না মাধবীর। কেবল অশ্লকদৃষ্টিতে চেয়েছিল এই দিকে। আটো...শেচারা। ও জানে না যেকোন যুগুর্ভব কত বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে ওর জীবনে। প্রাণভয়ে ছুটছে ওর মা। আর মার বুকুর মতই কেঁপে কেঁপে উঠছে শিশুর নিশ্বাস কৃত্রম-কোমল দেহটা।

হঠাৎ সেই সংকীর্ণ পথটুকুও দুর্বৃত্তেরা বিক্ষোভ দিয়ে উড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড কণবিন্দবক আর্তনাদের মত সে প্রাণঘাতী শব্দটা পাহাড়ের প্রতিটি গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে আবার মিলিয়েও গেল একসময়। ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার হয়ে গেল ভীতজন্তু মাছুষগুলো। শিশুটা যে মার তোল থেকে ছিটকে কোথায় মিলিয়ে গেল খুঁজে পায় নি মাধবী। হয় তো বা অনেকের মতই ওর দেহটা রক্তাক্ত বিকৃত হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল শুষ্ক প্রান্তরের বুক।

আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল মাধবী। ওর খেয়ালই ছিল না নিজের বাহ্যিক অবস্থাটার কথা। হুঁস ফিরে এল অশোকের আতঙ্ক-জ্ঞান কণবীরে।—মাধবী? মাধবী...। কথার মধ্যেই মাধবীর হিমশীতল হাতটা অন্ধকারের মধ্যে চেপে ধরল অশোক।—কি হল তোমার? শরীর খারাপ করছে না তো?

নিজের অপ্রস্তুত অবস্থাটা বোধ হয় নিজের কাছেই এতক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বীরে বীরে। ভুলেই গিয়েছিল মাধবী ও সিনেমা দেখছে বসে বসে। কিন্তু অশোকের কথার উত্তরে একটাও কথা বলতে পারে নি মাধবী। গলাটা তখনো শুকনো হয়েই ছিল। একটা জুয়োয় যন্ত্রণার টনটন করছিল ওর হৃদয়টা। তাতে সাহসের প্রাণপ দিতে চেরেছিল অশোক। তবু মন সাড়া দিতে ছায় নি কিছুতেই।

সেই আতঙ্কটা যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না মাধবী।

এক একে সব মনে পড়ে যাচ্ছে মাধবীর। কি গভীর আতঙ্কই না নিজের চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছিল ও। এতক্ষণে খোলা আকাশের গায়ে আবার ভরে ভরে চোখ ফেরান মাধবী। কিন্তু সেই স্নিগ্ধ আলোটা? আর বেটা রক্তকঙ্কু ঝগলের আতঙ্ক নিয়ে উপাকাশে ভর দেখাতে চেয়েছিল ওকে? চোখের তুল হল না তো মাধবীর? গভীর অস্থিস্থিতে পাশ ফিরতেই শিউরে উঠল মাধবী। সেই আলোটা কত নীচে নেমে এসেছে? ঠিক অশোকের গায়ের ওপর মনে হচ্ছে। হ্যাঁ-ঠিকই। আলোটার উত্তাপে একটু একটু করে ঝলছে অশোক। একগুচ্ছ শুকনো কাশের দামে আগুন লাগার মত পুট পুট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে চলেছে অশোকের দেহটা। একটা অজ্ঞানিত ভয়ের আতঙ্কে ঘুমের মধ্যেই চৈলী দিল অশোকের গায়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য হয়ে শুয়ে রয়েছে অশোক। কোন বাস্তবতা নেই-কোন আতঙ্ক নেই, শাস্ত বিকারের এতটুকু চিহ্ন নেই ওর দেহে। কিন্তু মাধবীর চোখ এড়াতে পারে নি অশোকের বিকৃত মুখটা। আগুনে অশোকের শব্দর এড়াতে পারে নি অশোকের বিকৃত মুখটা। নিশ্চয়ই অশোকের সবদেহ মুখটা পুড়ে পুড়ে কদাকার হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই অশোকের সবদেহ আগুনের আলার অলছে। তবু কেন মাধবীর কাছে নিজেকে গোপন করতে চেষ্টা করছে অশোক।

গভীর বিরক্তি নিয়েই মাধবীর ডাকে সাড়া দিল অশোক। সেই পুরানো কথাটা এখনো যে স্বপ্নের মত বলে যেতে পারে অশোক, নেই, ভাবতে পারে নি মাধবী। অশোক বলল—থাক। আমার জন্তো তোমার ভাবতে হবে না। বলেছি তো—এত চেয়ে পুড়ে মরা অনেক ভাল। কথা শেষ করে আবার ও-পাশ ফিরে গেলো অশোক।

এবার প্রাণখোলা কৌতুকের হাসিতে ফেটে পড়তে চাইল মাধবী। বাবা—এত অভিমান অশোকের। হাসির দমকে ফুৎ ফুৎ উঠল মাধবীর দেহটা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজেকে সম্মলে নিল মাধবী। অশোকের কথাটা যেন প্রতিধ্বনিত হতে হতে এসেছে। সজ্ঞারে এসে থাকা খেল মাধবীর বুকে। কানে জ্বলল দিল মাধবী। হিঃ, এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম অভিমান অশোকের। বেশ। আমার জন্তো তোমার ভাবতে হবে না। গভীর অভিমানে মাধবী সারিয়ে নিল চোখটা।

তবু আতঙ্কটা কিছুতেই মন থেকে সরতে পারল না মাধবী। প্রতিটি দণ্ড-পল-মুহূর্ত এক একটি গভীর দুঃস্বপ্নের মত আঁধার বরে তুলল ওকে। আবার তাকাল মাধবী। কাঁপা আলোটা হঠাৎ বড় হতে হতে সৌরজগতের এতটুকু বিক্ষোভের মত ফেটে চোঁচব হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বর্ণবিদ্যার ও একটি প্রাণাত্মক শব্দ মিস্ট্রফোনাল মুখরিত করে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল মাধবীর প্রতিটি তন্ত্রীতে।

কিন্তু এবার চোখ বন্ধ করার মতো সাহসটুকুও বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছিল মাধবী। নিম্নেই দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই রইল অশোকের দিকে। অশোকের হাত-পা-মুখ অলং অলং নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আগুনের ভায়ে। কেবল একটা মাসের পিণ্ড তখনো অলছে মাধবীর চোখের সামনে। আগুনের উজ্জ্বলতা এতক্ষণে, স্পষ্ট হয়ে নিজের গায়েও অজুতব করল মাধবী। সরে বাবে কিনা তাও ভাবল

কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু সে শক্তিদুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। দৃষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে একবিন্দু নড়াতে পারল না মাধবী। একটা আশ্চর্যিক শক্তি যেন আঠেপিঠ ধরে রেখেছে ওকে।

ঠিক তাই। যা ভেবেছে? ভাল করে একবার তাকাল মাধবী। অশোকের প্রাণলিত দেহটা থেকে দুটো শব্দর ডাগর চোখের সেই শিউটা এখনো তাকিয়ে রয়েছে মাধবীর দিকে। কি মিট মধুর হাসি হাসছে শিউটা। মুহূর্তে দেহের সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে শিউটাকে কোলে তুলে নিতে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল মাধবী। কিন্তু কোথায় যেন হঠাৎ চোখের পেল মাধবীর হাত দুটো। চমকে উঠে সপ্রশ্ন-দৃষ্টি মেলে দিল মাধবী। বললে যাচ্ছে শিউটা ঘরে ঘরে, চোখের সামনে বললে যাচ্ছে অনিন্দ্যশব্দর শিউর আকৃতিটা। তার ভারগায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা বিস্তৃতদর্শন মুখ। আগুন পোড়া মুখটা চেনা যাচ্ছে না একটুও। প্রকাশ একটা মাথার নীচে ঝলছে হিংস্র দুটো চোখ বড় হয়ে উঠেছে ঘরে ঘরে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে শিউটা। হাত-পা বিহীন শিউটা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। সভয়ে নিজের হাত দুটো একটু গুটিয়ে নিল মাধবী। এবার পালাতেই হবে ওকে। যেমন করেই হোক শেষ প্রচেষ্টার জন্তো ওকে যে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। নিজের জিতটা বোলাচ্ছে টোটার ওপর। বেড়াচির মত দেহের পেছনের অংশটা চালনা করে এগিয়ে আসার কৌশলটা এর মধ্যেই আয়ত্ত করেছে বিস্তৃতদর্শন শিউটা। গা ঘিন-ঘিন করে ওঠ মাধবীর। ওর অন্তঃস্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে।

একটা প্রচণ্ড কৌতুকিন্তে মাধবীর তল্লাহ্‌য় দেহটা এতক্ষণে নিজের অন্তর অন্তর থেকে ভেসে উঠল ঘরে ঘরে। অশোকের উৎকর্ষিত কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল।—মাধবী!—মাধবী!—

চোখ খুলল মাধবী। অশোকের উদ্বিগ্ন চোখ দুটো সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে স্থির হয়ে রয়েছে ওর আতঙ্কজড়িত চোখ দুটোর ওপর। আকাশ-বাতাস এতক্ষণে আশ্চর্য শাস্ত হয়ে গেছে। অলস্ত হাউইয়ের আকাশময় সচকিত দাপাদাপি কখন শেষ হয়ে গেছে তাই বা কে জানে! শ্রান্ত ক্লান্ত আকাশটা কেবল বিঘ্নহর কালিমা মেখে মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে অজগতের মত। কেবল একটা উজ্জ্বল তারা এখনো স্পষ্ট অলঙ্কার করেছে মাথার ওপর। অশোকের মুখের পাশ দিয়েই মাধবী দেখতে পাচ্ছে তারারটাকে। যেন নিজের স্নিগ্ধ আলোর ছায়া বুলিয়ে মাধবীর দেহমন জুড়িয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু তারটা যদি হঠাৎ অলিত হুলিলের মত নশ্বর গতিতে আবার ভেঙ্গে পড়ে ওদের মধ্যে। কে জানে স্বপ্নের বাস্তবটাকে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তাই অশোকের বুকে মুখ তুলিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর হতে চাইল মাধবী। গভীর মাথপে মাধবীকে নিজের আরো কাছে টেনে নিল অশোক। আর কেউ ওকে ছুঁতে পারবে না, কিছুতেই নয়। সেই বিকৃত শিউটার অন্তঃস্পর্শ ওকে আর কোনদিন ভর দেবারে পারবে না।

এতক্ষণে হাসি পায় মাধবীর। প্রথম দাঁহাসর ভোরের একটু একটু করে ছেয়ে ফেলেছে ওর দেহ-মনে। উজ্জ্বল তারটা নিশ্চয়ই

## আত্মব্যাখ্যা

## ডলি চট্টোপাধ্যায়

এখনো তার স্নিগ্ধ আলোর মধ্যেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।  
অদম্য কৌতূহলে অশোকের বুক থেকে মাথা তুলে মুখ বাড়িয়ে  
তাকিয়ে দেখল মাধবী। ঠিক-তাই। যেন ওরই দিক তাকিয়ে  
এখনো অদম্য কৌতূহল-হাসিতে ভেসে পড়ছে তারটি। মিটি-  
মিটি চোখ দুটোর আলোর ইনারার ভাষা বুঝতে আর ভুল  
হবে না মাধবীর। নিজের মনেই চেসে ফেলে আবার। লজ্জার  
আরক্তিম মুখটা অশোকের বুকুর মধ্যেই লুকিয়ে ফেলে মাধবী।

## বিজয়িনী

## শ্রীমতী হাসি গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রামল বনানী খুঁজে মরি যবে

পাই শুধু মরোচিকা,

সরসতা যবে বুজি মাটি মাঝে

মিলে আগুনোরি শিখা।

পরশ খুলিয়া যারে ভালবাসি

দেয় সে ঠেলিয়া দূরে,

কুহজ্জতা জানায়েছি যারে

ব্যঙ্গ করেছো সুরে।

লক্ষ্মীর আসনে বসিয়েছি যারে

করেছে লক্ষ্মীছাড়া,

গুণনির্ণয় করি যাহার

সে করিল গৃহহার।

পঙ্ক হইতে তুলিহু যাহারে

দিল সে পঙ্কে ফেলে,

দুঃখীর দুঃখে ব্যথা জানাইলে

গিয়াছে সে অবহেলে।

যারে সাজাইতে সুন্দর ফুল

এনেছি আঁচল ভরে,

বক্স হাঙ্গির বসেছে, ছুঁয়ে না,

যাও গো হোখায় সরে।

দেবতারে যবে বলছি তুলিতে

সে ফেলিয়া দিল নীচে,

বর্ণেছে আমারে, এ ছিল না তব,

এ ভক্তি তব মিছে।

লাহিতা মোরে, দিল লাহিনী

সুরলোক ইহলোক,

তাই তো প্রমোদে নাহি অহুভুতি,

দুঃখেও নাহি শোক।

কঠোর আক্তিকে যদি কেহ থাক

এস গো আমার কাছে,

দেখ আজ মাপি, কঠোরতা বেশি

তোমা হ'তে মোর আছে।

ঘাটের সিঁড়িটা দিয়ে তার তব ক'রে নেমে এলো পাতা, পুকুরের  
শেষ ধাপটার। যেটা জলে ডুবে সবুজ শ্রাণ্ডলায় পেড়ল  
হ'য়ে রয়েছে। পা টিপে টিপে নামতে হয়। পা টিপে টিপেই নামল  
পাতা। কাঁথের বুকুরকে মাস্তা পেতলের কলসীটা আর গামছাবানা  
ওপরের সিঁড়ির ওপর রাখল।

একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিলে কেউ কোথাও আছে কি না।  
না কেউ কোথাও নেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শুধু পুকুরের সিঁড়ির ওপরের চাতালের  
পাশে বড় টগরগাছটার সাদা ফুলের চারপাশে দুটো প্রজাপতি ঘুর  
ঘুর করছে। এবার পাতা সামনের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

দূরে পুকুরের ওপরের ঘাটটা পুকুরের। সেখানে সাতাশ-আটাশ  
বছরের একটি দোহারী বসিষ্ট চেহারার ছেলে একমাথা কালো  
কোঁকড়া চুলের নীচে মিস্ট একখানা মুখ নিয়ে বসে মাছ ধ'রছিল।

সে একক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে ফাৎনাটার দিকেই চেয়েছিল। এখন  
ফাৎনাটা ডুবে গিয়েছে, হুইলের স্ততোয় টান পড়ছে, সেদিকে ওর খেয়াল  
নেই। পাতা আসতে কি ক'রে বুঝতে পেরেছে জানি না।—ও  
পাতাকেই দেখেছে।

পাতার বয়স বছর বাইশ। শ্রামল চিকণ দেহটি থেকে যৌবন  
উপছে পড়ছে। চেউবেলান কালো চুলের মস্ত একটা খোঁপা।  
ভাগর চোখে দুই মিমিমাংকা চকল চাউনি।

পাতা জলে নেমেছে। পাতাকে ঘিরে ছোট ছোট চেউগুলো  
বুতাকারে বড় হ'য়ে হ'য়ে আবার জলের বুকই মিলিয়ে যাচ্ছে। সবুজ  
কাচের চুড়িপর নিটোল দু'খানি হাতে পাতা জল সরিয়ে সরিয়ে খেলা  
করলো। জলের ওপর একটা জল-কড়ি লাফাচ্ছিলো, সেটাকে জল  
ছিটিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

পুকুরের ঠাঁও কালো জলে মুখখানাকে একবার ডোবালো।  
গা ডুবিয়ে মাথার কাপড়টা খুলে জলে ভিজিয়ে নিলে। তারপর  
কলসীটা টেনে নিয়ে বুক চোপে আস্তে আস্তে সঁতার কেটে ছেলেটির  
দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

তখন গোখুরির লাল আভা নারকেল-বাথির বিলম্বিলে সবুজ  
পাতা থেকে ছায়া ছায়া সন্ধ্যার বুক মিশে যাচ্ছে।

সঁতারকাটা পাতার নরম শরীরের চাপে পুকুরের বুক ছোট  
ছোট চেউ উঠে তীরের ওপর ভেসে ভেসে পড়ছে। তারই ওপর  
নারকেল গাছের কালো কালো ছায়াগুলো খর-খর ক'রে কাঁপছে।

সব শান্ত। সব স্তব্ধ।

কেবল পাখিরা একটি ছুটি ক'রে নীড়ে ঘিরে আসছে—তারের  
কুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

ছেকেটির কাছাকাছি এগিয়ে এলো পাতা। দু'জনের চোখের  
ভাষায় ক'টি নীরব মুহূর্ত কি যেন কথা কইলো।

একটু পরে ছেলেটি বললে—বাড়ি যাও পাতা, সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

পাতা ছেলেটির শূন্য যেতের খাফইটার দিকে চেয়ে তার স্তম্ভ  
কীতের হামিটাকে চোপ রাখতে পারল না। খিল খিল করে হেসে  
বসলে—তোমার চারে আজ একটা মাছও পড়ে নি!

ছেলেটি হেসে বললে—খুব বড় একটা পড়েছে। তুমি দেখতে পাহ্ছ না।

ভেতরের অর্ধটা বৃত্তে গেলে পাতার মুখটা লালচে হ'য়ে উঠল। মুখখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওর দিকে আড়চোখে একটা ফিলিক দিয়ে বললে—ছাই পড়েছে। তারপর বললে—আমি বাই। তুমি এসো, যেমন? ছেলেটি বললে আসব।

আশাশহর—গ্রামটার নাম রাজীবনগর।

ওখানেই থাকে বুড়ো মহিম দাস, শীর্ণ হাঁপানি রুগী। গলায় ফণি। তারই বাইশ বছরের বোঁ পাতা।

এ অঘটনটা যে কি ক'রে ঘটল তা কেউ জানে না।

লোক কানাকানি করে; বোঁ-বোঁ নয় হে সেবাদাসী।

আবার কেউ কেউ বলে—মহিম দাস ওকে নাকি অনেক গণ্ডা টাকার কিনেছে।

পাতাকে জিজ্ঞাসা করলে হাসে, উত্তর দেয় না।

ওরা অল্প গ্রাম থেকে এ গ্রামে এসে বাসা বেঁধেছিল।

কথাগুলো পাতারও কানে যায়। এক একদিন ও স্নান করে উঠে ছোট করে নাকে রসকলি কাটে। সন্ধ্যা হুঁটার মাঝখানে ছোট করে একটা চন্দনের টিপ দেয়। ঘর থেকে হাত-আরনাখানা ধার ক'রে এনে মুখখানাকে ঘুরিয়ে দেখে আর টিপে টিপে হাসে। তারপর আয়না রেখে কাজে যায়।

পাতারা ছোট জাত। তাই কারো ঘরে-লোবে ঢুকতে পায় না...

পাতা পাঁচবাড়ির কাজ বাইরে বাইরেই করে—স্নান মাজে, উঠান নিকায়... তাতে মাইনে বেশি নেই। একবাড়ি হ'বেলা হুঁটি খেতে দেয়। পাতা খায় না, সেই ভাত ক'টি সে বাড়ি আনে। আর তারই অর্ধেক বুড়ো মহিম দাসকে খাইয়ে নিজে বাকিটুকু খায়।

স্টেশনের দিকে আমবাগানের মধ্যে ছোট নিকোন কুঁড়েটুকু পাতার। নিকোন ছোট উঠান। তারই একপাশে একটা লাউমাচা। মাচার তলার লক্কাগাছ, পাতার নিজের হাতে পোতা। আর একপাশে একটা শিউলিফুলের গাছ। কে জানে কে কবে শূতেছিল। অজস্র শিউলিফুলে তলাটা সাদা হয়ে থাকে। মিলিগন্ধ হাওয়া... ..

হাঁপানি রুগী মহিম দাস পাতার সাজা তামাক হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে টানে। তারপর পাতার হাত ধরে গিয়ে ছোট একটা তক্তাপোষে পাতার তৈরি কাঁখাটার ওপর চুপ করে শুয়ে য়িমোয়।

পাঁচবাড়ির কাজ শেষে একদিন সন্ধ্যার একটু আগেই বোসেদের পুকুরে গা ধুতে এসেছিল পাতা। বর্ষার আকাশে তখন পুজ পুজ মেঘের অভিসার—এলামেলো বাতাসে বৃষ্টির বণা।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই রজনী আপন মনে মাছ ধরছিল। আপন মনেই ফাংনাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর কখন আপনা হ'তেই ওর চোখ হুঁটে গিয়ে মেঘের ঘাটের দিকে পড়েছিল। সন্দিন আর তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিতে পারে নি রজনী। ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির আবহা ছায়ায়, আসন্ন সন্ধ্যার নিবিড় স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে উজ্জল-বোঁঝা পাতা তখন ভিজে-কপড়ে জল থেকে উঠে তরা-কলসীটা কাঁখে নিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে বাচ্ছে।

কি মনে করে পাতাও আর একবার পেছন ফিরে চাইল। হুঁটি যুগুদৃষ্টি দেখল আর হুঁটি কালো চোখের যুগুদৃষ্টি।

ও অমূল্য দাসের ভাই রজনী। রজনী কাপড়ের দোকানে কাজ করে। মাছধরা রজনীর দেশ। আগে ও হালদার পুকুরেই মাছ ধরতো, পুকুরটা ছোট। ভাল মাছ পড়ে না। তাই এখন রজনী বোসেদের বড় পুকুরেই মাছ ধরে।

প্রতিদিন রজনীর মাছ ধর'—আর সেই সময়ে পাতার গা ধোয়ার ছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসে রাতে তখন লোক থাকে না। যদি কেউ কদাচিৎ থাকে তো এপারে পাতা বোমটা টেনে, ধীর মধুর পায়ে জল-ভরা কলসী নিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

ওপারে রজনী তার সমস্ত মনটা ফাংনাটার ওপর ঢেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। যেন কেউ কাউকে চেনে না।

দোকানের কাজ শেষে রজনী সেদিন বাড়ি এসে দেখলো অমূল্য খেরে-দেয়ে তখনও ঘুমোয় নি। দাওয়ার পিঠি রেখে বসে বসে বিড়ি টানছে। অমূল্যর কালো যগুমার্কি চেহারা। নেশাভাগ না ক'রলেও চোখ হুঁটে। সব সময় লালচে। গলার আওরাজটা রক্ত। অমূল্য আড়তে কাজ করে, খাটাখাটুনি বেশি। তাই ও অন্তরদিন একটু তাড়াতাড়িই খেয়ে শুতে পড়ে।

পাশের চালাটার রান্না হয়। রজনী হাতবুখ ধুয়ে খেতে বসলো। অমূল্যর বোঁ দেওয়ার ভাত ঢেকে রেখে ঘুমায়।

বৌটার রোগাটে কালো চেহারা। ছেলেমেয়ের হয় নি, সেইজন্মেই বোধ হয় মনটা রক্ত, মেজাজী। রাগ হলে অমূল্যকে গাল দিয়ে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ে। পাড়ার দুধ জোগান দেয়।

অমূল্য আর রজনী মারামারি করলো কি গলা ধরাধরি করলো কিছু আসে যায় না ওর।

রজনী খেয়ে এলে অমূল্য ডাকলে, রেজো।

রজনী বললে,—কি?

কড়া গলায় অমূল্য বললে,—রাজ রাতে তুই কোথায় বাস? চুরি করতে না ডাকতি করতে?

রজনী বললো,—কে দেখেছে?

চাপা গর্জনে অমূল্য বললো,—আমি দেখেছি। বল কোথায় বাস?

রজনী রেগে উঠে বললে,—যেখানেই বাই না সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

ধুক করে অমূল্যর চোখ হুঁটে জলে উঠল। বললে, আলবৎ দরকার আছে। তুই মহিম দাসের ঘরে বাস।

ক্রুদ্ধ রজনী বললে, বেশ করি, বাই তো বাঁই তাতে তোমার কি? একটা গোপন ঈর্ষার অমূল্যর চোখ হুঁটে। হিংস্র শাপনের মতো জ্বলতে লাগলো। বললে, আমার কি? আচ্ছ! দেখিয়ে দেব আমার কি?

রজনী তাকিল্যের ভঙ্গীতে বললে,—যাও যাও টের দেখেছি।

রজনীর অপস্বপ্নময় দেহের দিকে চেয়ে ণীতে ণীত ঘসে অমূল্য একটা অশ্রুট লক করলে।

অমূল্যদের আড়তের সামনে দিয়েই পাতাকে রোজ বাক্স বেতে হয়। অমূল্য ওৎ পেতে থাকে। পাতা অমূল্যর সামনে পড়ে যায়।

পাতার সমস্ত দৈর্ঘ্য অমূল্য একটা ক্ষুধিতৃষ্ণ দিয়ে যেন লেহন করে মুখের দিকে চেয়েচেয়ে নেকড়ের মতো হাসে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাতার কালা চকল চোখের তারায় যে চুপা ও অবজ্ঞা ফুটে ওঠে, অমূল্যর মনে হয় তার আঘাত বৃষ্টি চাবুকের চেয়েও বেশি।

পাতা যেন একটা ক্ষুধার্ত পশুর সামনে থেকে ক্রতপদে ছায়াঘন পল্লীপথে পালিয়ে যায়।

আর লালচে চোখ দু'টো অমূল্যর আরও লাল হয়ে ওঠে। নিঃফল আক্রোশে অমূল্য ফুলে ফুলে ওঠে।

পাতা জানে রাতের কোন ট্রেনটার শব্দ মিলিয়ে যাবার কতক্ষণ পরে রজনী আসবে।

ঘরে ঘরে প্রদীপ নিভে যায়। সারা পাড়া নিশুতি। পাতা পথ চেয়ে দাঁড়ায় বসে থাকে তারা-ছিটোন রাতের নবম অন্ধকারে।

রজনী এলে ওরা শব্দীদের কান বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাসে গল্প করে। বুড়ো মহিম দাস ঘুমায়।

পাতার হাতটা সজোরে চোপ ধরে রজনী বলে, চলো পাতা আমরা এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে যাই। যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না।

হাতটা ছাড়িয়ে নেয় না পাতা। সস্ত্র স্ত্র দু'টো একটু বৈকিয়ে বলে, বাঃ পালারো কেন? তারপর ওর চোখের চকল তারা দু'টো কেমন মমতার মন্থর হয়ে আসে, একটু হেসে বলে, আমার বুড়োকে ঝাণ্ডাবাবু কে?

পাতাকে কাছে টেনে নিয়ে রজনী বলে, কিন্তু দাদা জানে আমি এখানে চুপি চুপি আসি। রাত করে বাড়ি ফিরি। দাদা রোজ গালাগালি করে। বলে মেয়ে খুন করে ফেলবো তোদের। কীসি যেতে হয় সেও ভি আচ্ছা।

পাতা আরও কাছে সরে এসে হেসে বলে, দিক না গালাগালি। আমার জন্তে একটু গালাগালি সহ্যেতে পারবে না তুমি?

রজনী বলে, কিন্তু আমার ভয় করে পাতা। দাদা বা গোঁয়ার, একদিন না কিছু কাণ্ড করে বসে।

পাতা বলে, ধেং ও তোমার মিথ্যা ভয়। কি করবে কি? ঘন গাছের পাতার পাতার হাওয়া লেগে শির-শির শব্দ ওঠে।

বুড়ো মহিম দানের নাক ডাকার শব্দ আসে।

পাতা হেসে রজনীর কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে—বা বাঃ।

পাতার নিবিড় স্পর্শে রজনীরও বৃষ্টি মুছে যায় রাতের ভয়।

মুছে যায় দিনের গোপনতা। পাতার পিঠে হাত বুলিয়ে রজনী বলে, তুমি বড়ই চুপ পাতা।

কিন্তু মিথ্যা ভয় করে নি রজনী।

রজনীর দাদা অমূল্য দাস সত্যিই একদিন একটা কাণ্ড করে বসলো।

ঘরে-ঘরে প্রদীপ নিভে গিয়ে পাড়াটা যখন নিশুতি হয়ে গিয়েছিল।

পাতা আর রজনী যখন ভুলে গিয়েছিল দুনিয়ার একটুকরো জায়গা ওদের জন্তে কোথাও নেই। ওদের গল্প যখন আবশ-ছড়ানো চাপা গলার মুখর হয়ে উঠেছিল। দু'টি হাসি-মাথা অথবের কোমল স্পর্শে রজনীর যখন ভুলে গিয়েছিল রাত হ'য়ে যাচ্ছে। আর পাতা ওর হাত দু'খানা ধরে মিঠি হুরের কথার কথার রাতের নিভুতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে' হেসে উঠেছিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই আমগাছের আড়ালে আড়ালে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একটা হিংস্রমূর্তি আন্তে আন্তে এগিয়ে আসছিল।

দু'টি হারিয়ে-যাওয়া মন বৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করে নি।

আচম্ভা হঠাৎ একটা পেতলের ভারি ঘটি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পাতার মাথার সজোরে এসে আছড়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অক্ষুট আতঁনাদ করে পাতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

আর কিংকর্তব্যবিমূর্ত রজনী চিৎকার করে উঠলো,—মেয়ে ফেললে, মেয়ে ফেললে।

মুহূর্তে রাতের অন্ধকার বানু বানু হ'য়ে গেল।

নিশুতি পাড়ার ঘুম ছুটে গেল।

দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগল।

কি সর্বনাশ, কি ক'রে হ'ল?

কে মারলো?

পালারো কোথায় লোকটা?

মারলো কেন? মেয়েটা মরে গেছে নাকি?

একটা গোলমাল, একটা হৈ-চৈ।

ছি-ছি রাত দুপুরে পাড়ার মধ্যে একি ভয়ানক কাণ্ড?

ভিড়টা যেন ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে লাগলো।

স্পষ্ট কিছু না বুঝলেও এর মধ্যে গণ্ডগোল একটা আছে লোকে আন্দাজ করে। বক্রোক্তি, সমালোচনা, 'হৈ-চৈ' আর চৌচৌচৌর মধ্যে কখন বুড়ো মহিম দাস কাঁপতে-কাঁপতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখলো না।

ছোকরার দল এগিয়ে এসে পাতার অচৈতন্য দেহটা ওখানকারই একজন বড় নামকরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলো।

অমূল্য দাস তখন ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছে।

অনেক চেষ্টা করলেন ডাক্তার মুখার্জি।

ওপাড়া থেকে এপাড়ায় আনতে আনতে পাতার শাড়িটা রক্তে ভিজিয়ে লাস হ'য়ে গিয়েছে।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, অত্যন্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে, ততো ছাড়া মাথার দাক্ষণ চোট লেগেছে, যদি বেঁচেও যায় ততো মৃত্যুশক্তি হারিয়ে কেলবে হয়তো।

কিন্তু বাঁচলো না পাতা। হয়তো মৃত্যুশক্তি হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই বলতে।

সমস্ত ঘরটার একটা বদনহাত নীরবতা নিখর-নিশ্চয়।

কতক্ষণ পরে পাতার মৃতদেহের দিকে চেয়ে ডাক্তারের মৃদুগভীর বিহ্বল কণ্ঠ শোনা গেল—পুরো গাল—

পাতার বেড়ের পাশেই রজনী স্তব্ধ পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ডাক্তারের গলার শব্দই যেন সাহস পেয়ে একবার আন্তে আন্তে পাতার মৃত পাণ্ডুর মুখখানাতে হাত বোলাল। ছোট কপালটার পাশে রক্তের সঙ্গে একখোকা চূর্ণ-কুস্তল জড়িয়ে আছে।

রজনীর মনে হ'ল, কানের কাছে কে যেন কিস্ কিস্ ক'রে বলছে, 'ও তোমার মিথ্যা ভয়।

তারপর কখন এক সময় রজনীর বলিষ্ঠ দেহটা ধীরে ধীরে তত্ত্বাহত রাজিব নিকম্ব অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।



মাদার ম্যাথিল্ডার ডেজের একপাশে ফাইলটা রয়েছে। হাসপাতালের রিপোর্ট, রোগী ভর্তি আর ছাড়ার রিসিখানি—সব কাগজ-পত্রের জুপের ওপরে—অর্থাৎ অদরকারী বকখাই পরে হবে।

আশীষ জানিয়ে আলিঙ্গন করলেন তাকে।

তারপর কাঁধ দুটো ধরে বললেন, তোমার কথা যে কি বকম নে হত মাই চাইল্ড, বিশেষত সেট কেবলটা পাবার পর। কত স্তব্ধ ছিলে তুমি সিস্টার অরেলির, আমি তো জানি। তাই অমৃতব্রতে পেরেছিলাম কত কষ্ট তোমার হয়েছে ভগবানের এমন বিধান মনে নিতে।

কাঁধ চেড়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফির গিয়ে বসলেন।

—তারপর ফিরে এসে তোমাকে দেখেও বুকলাম তা। অনেক গগা হয়ে গেছে—খাবার ঘর প্রথম দেখে সত্যি বলতে কি চিনাতাই আমি নি আমি, এমন কষ্টের ছাপ পড়েছে তোমার চেহারায়।

সুপিরির থামলেন, উৎসব-বাকুল দৃষ্টি ত্যাগ করে দিকে।

—আমি চলে যাবার পর আর তোমার স্পটাম টেস্ট করেছি কি না ল তো আমার সিস্টার।

—না মাই মাদার। এত কাজ ছিল, সময় পাই নি। আর হাসল কথা কিছু দরকারও মনে করি নি। শ্রুতি হেসে আশ্বাস দিল। —নিজেকে আমার এত শক্তিশালী মনে হয় মাই মাদার—আপনি আমার জানালেন একজন সতকাঠী আসছে জাহাজে এখন বেন আমার কাছে সে প্রয়োজনটাও তুচ্ছ হয়ে গেছে।

কণ্ঠে দুতরার স্বর বাজল। তার আঙুর উদ্বিগ্ন প্রহরীকে তাঁরই টিটিটা শ্রবণ করিয়ে দিচ্ছে বেন—সিস্টারার সহজ পাথে চলার প্ররণা বোঝাতে যে নীতিবাণী। প্রার বাবহার করেন তিনি। বাস্তবান আঙুর আবাসস্থলরূপে বাস্তবান দেহ প্রয়োজন।

মাদার ম্যাথিল্ডা মাথাটা নাড়লেন এবটু, অর্থাৎ সে বলে যেতে পারে।

মহড়া দেওয়ারই ছিল, কথা খুঁজতে হ'ল না। বরং কথাগুলো দল সাগ্রহে বেরিয়ে এসে ভিতর থেকে, একবকম কোন বাধা না মেনেই।

অর্ধেক বক্তব্য পেশ করার আগেই জানতে পেরেছে সুপিরিরের মুখে যে উৎসব সজ্জ করতে পারে না সে, সেই উৎসবের ছ'রাটা এবার সবে বাজে। মাদার ম্যাথিল্ডার চোঁটের কোণে এবটুরেও হাসি খেলা করছে, সানন্দ বিম্বরের স্বাভাবিক প্রকাশ। জু দুটো টান-টান। নিজের গলার চড়া সুবচা কানে যাচ্ছে, তবু তাকে খাদে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে নি। যা বজছে তার মধ্যে আত্ম-প্রবন্ধনা নেই, অতিভাষণ নেই, নিজের সম্বন্ধে বিকৃত কোন উচ্চদারণাও নেই। অঙ্কুর যে শক্তি দ্বিতীয় একটা আত্মমজ্জর কাঠামোর মত বাস্তব হয়ে আছে, তার মধ্যে এ শুধু তাকেই বাইরে তুলে ধরামাত্র।

—একবার কিছু হটে এলে আবার এসেবার সময় যে শক্তি পাওয়া যায় সেইবকম একটা কিছু মাই মাদার—আপনাকে বলবার জন্যে এত ব্যগ্র হয়েছিলাম আমি।

কথা শেষ হয়ে গেছে, মাদার ম্যাথিল্ডার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটুকু লেগে আছে তবু। বেলজিগামের ঠাণ্ডা তাঁর মুখের মত হাতের শুভ্রতাও ফিরিয়ে দিয়েছে—জুশফিক্সের ওপর শুভ্রতার দেখাচ্ছে ডান হাতখানি। জুশফিক্সের কালা কাঠে হাতটা বোলগছেন ধীরে ধীরে, দৃঢ়তা ও অতীষ্টসাধনের অভিব্যক্তি তাকে।

—যা বললে আমার সিস্টার, বিশ্বয়ে অভিভূত আমি। অমুচ্চ বর্জস্বর ঈষৎ উত্তেজনার কাঁপছে মাদার ম্যাথিল্ডার।—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তোমার যে কথা বলতে যাচ্ছি প্রাত্ন নিজেই সেজ্ঞে প্রস্তুত করে রেখেছেন তোমার। তাঁর চরণে ফিরে দিতে অঙ্কুরভাবে সমস্তাঙ্গলার সমাধান হয়ে যায়।

এ্যাংগেবাইটের ফাইলটা তুলে নিলেন।

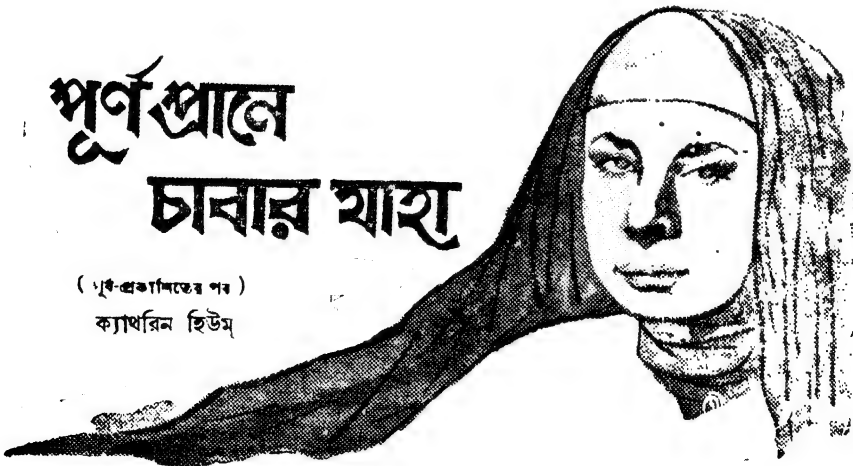
—ফেরার পাথে গুলেন সারাকণ এই কেসটার কথা ভেবেছি আমি। ম'সিয়ে এ্যাংগেবাইটের আত্মীয়তা কয়েকবারই মাদার হাটেনে এসেছিলেন—ওঁকে সশে করে পাঠানোর বাস্কা করার ভক্তে সনির্বন্ধ অভ্যর্থনা করছিলেন সবাই। তারপর গতকাল ডক্টরও সেই একই অভ্যর্থনা করলেন, আত্মীয়দের চেয়েও জরুরী ভাগির তাঁর। শ্রুতি হেসে হুঁকে বসলেন সামনে।—কাল সারা সন্ধ্যা আমি ভেবেছি সিস্টার কি করে তোমার বলব এই কেসটার সঙ্গে তোমাকে বেলজিগামে ফেরে

পূর্ণপ্রাণে

চাবার খাখা

(পূর্ণপ্রাণিতের পব)

ক্যাথরিন হিউম



পাঠাতেই হবে আমার। মিশনে তোমার আগন্তুক যে কতখানি আমি জানি, দিক্ত সাইকিয়াট্রি-তে ব্যংগের একা তুমিই আছ—

বেলজিয়ামে ফেরৎ পাঠাতেই হবে তাহে...সিস্টার লুক দুটিটা আর সরার নি মাদার মাথাভিত্তার মুখের ওপর থেকে। শক্তিমানে এক একাগ্রদৃষ্টি তার দ্বন্দ্ব-গভীরে প্রবেশ করে দেখছে আর এগিকে স্বাভাবিক নাস'স্থলভ অমুক্তকণ্ঠে কথা বলে চলেছে। সমস্তাটাও সেবাসাক্ষ্য।

—আর এক তোমার ওপরই এ দাঙ্গি দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি আমি। কলোনিতে এই একটা মানুষের গুরুত্ব তোমার অজানা নয়, তাঁর মানসিক অস্থিরতা আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা করা কতটা জরুরী তুমি তা ভালই জান। লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে যত তাড়াতাড়ি কোন স্ত্রীনাটোরিয়ামে নিতে পারা যায় ততই মজল, চিকিৎসার সময় পেরিয়ে গেলে কিছুই কোন মূল্য থাকবে না।

সুপিরিয়র খামলেন।

এবার তার কথা বলার পালা। দেখাতে হবে যে মনটাকে তিনি অপলকনেত্রে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন, সেটাও তার দেহের মতই অচঞ্চল আছে।

ছিন্নাসা করল, আর উঠল? প্রপ্লের বাকি অংশটুকু উইই রইল,—তিনি কি করবেন?

—তোমার নাম প্রস্তাব করে ডাঃ ফরচানারিট, কাজটা আমার পক্ষে সহজ করে দিচ্ছেন সিস্টার। তুমি চলে যাবার পর ঠিক অনেক দিনের পাওনা ছুটিটা নিয়ে নেবেন বলছেন। ঠিক অ্যাসিস্টেন্ট ডাঃ পিটারসকে দেবেন তাঁর বদলিতে জরুরী সার্জারি কেসগুলোয় কাজ করতে। আর বড় বড় সার্জারি কেসগুলো সব থনির ডাক্তারদের দিয়ে করাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

মাদার মাথাভিত্তা একটু খেমে হাতা সুরে আবার বললেন, আমি তো ভাবছি ভালই হল। প্রথম থেকে ঐ কাজ-পাগল প্রেতিভাবানটির সামনে সবসময় ত'স্থ হয়ে থাকতে না হলে তোমার পর যে আসবে আরও সহজে সব কাজ নিয়ে নিতে পারবে সে।

...তোমার পর...তোমার উত্তরাধিকারিণী।

...উত্তরাধিকারিণী...একজনের পর তার জায়গায় আর একজন নেয় যখন তাকে বলে—

—মাই মাদার...সিস্টার লুক কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থামল।

—বল সিস্টার? সুপিরিয়রের মিতহাসিত বরাভর:

—আমি কি...ওঁরা কি...এখানে কিরিয়ে দেবেন আমার! আপনাদের কি মনে হয়?

মাদার মাথাভিত্তার কলো চোখে সমবেদনার ছাতি কিলিক দিয়ে উঠল।

কঠোর আভাস নেই তার, গভীর দৃঢ়তার বললেন, আমি নিশ্চিত জানি যতদূর সম্ভব মাদার হাউস ফিরিয়ে দেবে তোমায়। আমি উরগ্রীব হয়ে থাকব তোমার ফেরার জন্তে। অবশ্য তোমার ফেরা নির্ভর করবে যেভাবেও মাদার ইময়ুয়েল তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য কেমন দেখেন, আর ডাক্তার তোমার দৈহিক স্বাস্থ্য কেমন দেখেন তার ওপর। তবে কোনটার রায় নিয়েই আমার চিন্তা নেই—

সোজাশুজি হাসলেন কোন আবেগ না রেখে। সত্যিই তুমি যা বললে আমার তারপর আর কোনটার জন্তেই উদ্বেগ নেই আমার।

কংগো-প্রত্যাগমনের আশ্বাসে যে স্বস্তিটুকু আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে সিস্টার লুক বুঝতে পারছে সেটুকু একেবারে স্পষ্টই ধরা পড়ে গেছে। মাদার মাথাভিত্তা খামলেন, বৃষ্টি ওর খাস-প্রাধাসের স্বচ্ছন্দ গতিটা স্তন্যস্তেই, তারপর বলতে লাগলেন আবার।

—জলহাওয়া পরিবর্তনের ছুটির অভ্যুত্থানেও দেশে আটকে থাকবে না তুমি। সে সময় এখনও হয় নি। চোখ নামিয়ে এ্যাংগেবার্টের ফাইলটার দিকে তাকালেন। ষাট হোক সিস্টার, এ দাঙ্গি যেটুকু পরিবর্তন আনবে তোমার মধ্যে উপকাঠই হবে তাতে। সেই অস্ত্রভেদী দৃষ্টিটা কেটে গিয়ে চোখ দুটো জলজল করছে এখন। যত অল্প সময়ই হোক তুমি একটা স্তব্ধতা পাবে মাদার হাউসের প্রশান্ত পরিবেশে তোমার আত্মিক জীবনটাকে পুনরুদ্ধার করে নেবার। আঃ নীরবতার সেই মরুভূমি, সন্ন্যাস-জীবনের পবিত্র আবহাওয়ার স্পর্শ পাবে তুমি। নিজের শ্রুতধর্মিত রোমন্থন করে মাথাটা নাড়লেন।

উজ্জল চোখে চেয়ে বললেন, আমার বেলা যেমন দিয়েছিলে নিজের জন্তেও তেমনি তোমার মেডিক্যাল ব্যাগে ক্যাফাইন নিও নিশ্চয়ই। ক্যাফাইন খেয়েও বেলজিয়ামে সারাক্ষণ আমি থাবুথ করে কাঁপতাম।

আলোচনার ষাটটুকু নেহাৎ সক্ষিপ্ত। সিস্টার লুক জানল নতুন সিস্টারকে নিয়ে যে জাহাজ আসছে সেই ভাড়াভেই তাকে যেতে হবে, প্লেন হাওয়া তার বোগীর পক্ষে অবধা উত্তেজক হতে পারে। সরকারী থরচে তাকে হাতে পাঠানো যার সেজ্ঞা ডাক্তার কণজপত্র তৈরি করছেন। ভেলটোকে জানাতে হবে তার পশমের পোশাক দরকার।

হাসপাতালে ফিরে যাবার পথে-বাগানটা পেরোবার সময় তার প্রিয় জগতটাকে চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখল সিস্টার লুক। মনের মধ্যে ছাপ তুলে নিচ্ছে যেন, পথিক যেমন যাত্রার প্রাক্কালে রসদ সংগ্রহ করে নেয়। গ্রীষ্মাকালের নির্দেহ চন্দ্রোদয়ান্না বহু দূরে রক্তাভ পৃথিবী সংগে মিশেছে—আগুন-রক্তা দীপ্ত দিগন্তে। রোদের তাপে পাতা জলে গেছে গাছগুলোর। শুকনো ষোপ-ঝাড় কাঁটা-সার হাত উঠে তুলে বৃষ্টির আশায় উদ্ভূত হয়ে আছে।

হাসপাতালের চারদিকে ছিম্ছিম বাগান, পরিচ্ছন্ন পথগুলোর দু'পাশে চুবকাম করা পাথরের নিশানা। অন্ধকার হয়ে গেলে চাঁদের আলোর দেখা যায় ঐ সাদা পাথরগুলো। নাইট-ভিউটির নাস'রা ওগুলোর নির্দেশ মেনে ঠিক পথে চলে, না হলে বৃষ্টির পর আশেপাশে অনেক সময় গোখরো সাপ লুকিয়ে থাকে।

তেমনি এওটা পাথরের ওপর একটা গিরগিটি বসে আছে স্থির হয়ে। ভংগীটা এমন যেন উৎকর্ষ হয়ে শুনছে কি। বিধাতার জীবন্ত সৃষ্টির মত যত না মনে হচ্ছে ওটাকে তার চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে শ্রবণ-মুহুরা ধরা তারার ছাঁচ বেন একটা।

অক্ষুটকণ্ঠে তাকে বলল, স্তম্ভের জীব। আমি ফিরে আসছি আবার। ফিরে আসছি, শুনলে?

একবলক বক্তাবতার মধ্যে মিলিয়ে গেল গিরগিটিটা। সিস্টার লুক দেখল তাকিয়ে তাকিয়ে।

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

মাদার ম্যাথিল্ডা যেমন বলে দিয়েছেন হাসপাতালে কিংবদন্তি  
রক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার নিজের ডেকের বসে খুব পূর্ণ  
দেখিলেন, চোখ তুলে দেখে কাজের গুরুগাভীয়ে মাথা নাড়লেন।

চটপটে ভাব দ্রুতকণ্ঠে বললেন, এই যে সিস্টার, আমাদের তো  
মনেক কাজ করবার রয়েছে। এয়ারেবোর্টের সমস্ত পুথানো ফাইলটা  
রকার—সব ক'টা স্থাল এক্সের, ল্যাব টেস্ট, কল্যাণটেশন রিপোর্ট...

নোট বই বার করল সিস্টার লুক। এই একবারও অজান্তে  
ডাক্তার যে মাথা ঘামাচ্ছেন না সে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে।  
তন্তু বোধ করছে সেজ্ঞা। নির্দেশগুলো সংক্ষেপে লিখে নিল।  
তনদিনের রেলের পথে ভ্রম-স্বপ্ন ঘূমের ওয়ুধের বিধান, প্রাণোজন হলে  
কছু বাধাবোধের ব্যবস্থা—ডাক্তারের শ্রুতিবিশিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন লাগবে  
তার, লোবিতো অবধি সঙ্গে যাবার জন্ম কোস'পাবলিক থেকে  
জন এদেশীয় গার্ডের ব্যবস্থা। তারপর জাতাজের ডাক্তার দায়িত্বের  
গগ নেবেন। জাতাজের ডাক্তারের নামটা নোট করার সময় স্তব্ধার্থে  
মানান করে দিলেন।

একই রকম গুরুগাভীর কাজের সুরে যোগ করলেন তারপর,  
হাকে একটা চিঠিও লিখে দেব আমি। রোগী যে কোন জন বুঝিয়ে  
দেতে হবে তো।

চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল ডাক্তারের মুখে ব্যাগের হাসি।  
এ হলে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাচ্ছেন উনি! স্থির হয়ে অপেক্ষা করে  
ইল পরবর্তী আক্রমণের জন্ম।

—আমি ঠাটা করছিলাম সিস্টার। আপনার কর্তব্যানুসারে  
রিজল টেস্ট করছিলাম।

—অবশ্য-করণীয় বিষয়গুলো বিবেচনা করে উত্তর, আমি বলি  
শুধু কাজের কথাই আলোচনা করেন যদি তো ভাল হয়।

সামান্য একটু ভাবান্তরও হ'ল না ডাক্তারের, সে যেন কোন  
কথাই বলে নি। একভাবেই বলে চললেন। কথাটা আমার মধ্যে  
নয়। এরপর আপনাকে যে পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হবে তাতে  
সত্যিই আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার ছিল।


সিস্টার লুক একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ডাক্তারের ছোট ছোট লাল চোখের দৃষ্টিতে শানিত ছুরির তীক্ষ্ণতা।  
মুখভাবে কিংবা কঠিনের ব্যাগের আভাসও আর নেই।

—এ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে এত নিশ্চিত আপনি, উপলব্ধি  
করতে পারছেন না সিস্টার যে সেই শক্তিই আপনার পরীক্ষার  
মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বেলজিয়ামে আপনার মাদার হাউসে  
চুকবেন যে মুহূর্তে কড়া নিয়ন্ত্রণবর্তিতা, পাচিলের বেড়া আর নীরবতার  
মধ্যে পড়ে এই শক্তি আপনার পরীক্ষার মুখে পড়বে। ধরুন,  
অনির্দিষ্টকালের জন্মে আটকে রাখল আপনায়। কনভেন্টে যে কোন  
ঘটনাই ঘটিতে পারে তা আপনিও ভালই জানেন। তখনও কি এ  
শক্তি যথেষ্ট হবে সিস্টার?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

উত্তর শুনে মনে হবে যেন উভয়ের মধ্যে টেবিলের ওপর



হেন হোব্বের  
তজা ফুল

**কোলে**

ক্রিম ক্র্যাকার

বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ,  
কলিকাতা-১০

PPS/KB-9/64-BEN

একটা দেহ শাসিত আছে আর ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছেন সব ঠিক আছে তো।

—ঠিক জানেন সিটার হব যথেষ্ট? জানেন এটা হওয়ারো একশত্বে ইচ্ছে নয় কেন? সোজা এর শেষ পরিণতি পূর্ণস্ব ভাবে দেখেছেন?

হিনটে প্রায়ের উত্তরেই মাথা ন্যাড়ল শুধু কথা বাড়তে ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ আগে গেলেন ডাক্তার, তাই বৃষ্টি। আমি কিন্তু নিঃশব্দ নয়!

বিষয়বিধি সিটার লুক তাঁর আবেগের মুখে সংয়ের বানান ভুল ধরা পড়ে গেল।—তা হলে সবাইকে ছেড়ে আমার নামটাই বা করলেন কেন মাদার ম্যাথিল্ডার কাছে?

দীরে দীরে কঠোরকণ্ঠে ডাক্তার বললেন, আপনার ভুলটা আপনাকে ধরে দিতে। এই বছরে যে কথাটা বলবার বলেছি আপনার সেই কথাটা প্রমাণ করতে—তার জগ্গে আপনাকে হারাতে হলেও! প্রমাণ করতে—

আমি বলবার সুযোগ দিল না সিটার লুক।

ব্রিস্তপায় অক্ষিৎ ছেড়ে যেতে যেতে বাড়ি ফিরিয়ে বলে গেল, কেসটার জগ্গ কি নিতে হবে না হবে আলোচনা করবার সময় হবে যখন আপনার আমার একটা ফোন করে দেবেন উঠ।

অমৌক্তিক অস্বাভাবিক সমস্ত ব্যাপারটাই নিজের মনেই বুঝে। তবু মনের মধ্যে সংয়ের বোজ একটা উপ হ় গাছে। কাটার মত বিধে সেটা খচ-খচ করে...যে শক্তির ওপর এত আস্থা রাখে সে কি সত্যই কেবল কংগোর পক্ষেই যথেষ্ট? কাটাটা বিধে যত সিটার লুক ততই চেষ্টা করছে ভাবনাটার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে। প্রিয় বস্তুর কথা ভাবতে চেষ্টা করছে, প্রিয় মানুষগুলার কথাও।

এমিল। কংগোর দেওয়ার প্রথম বছর তার, সারামুখে বিশ্বস্ততার ছাপ মাথানো।...এখন তার দিকেই আসছে দেখতে পাচ্ছে দূর থেকে। ওর সংগে দেখাশোনা শেষ হবে এবার, আর কতদিনই বা বাকি।

হাসপাতালের ছাদে ঘুরাম করে বসে পড়ছে। বৃষ্টির এই রোমাঞ্চকর শব্দ, হঠাৎ নাকে এসে লাগা রৌদ্রবহু মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ—বুনো, তার, অশুভ মিষ্ট...সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনছে নিজেকে।

মাশার ম্যাথিল্ডা টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন তাকে। বৃষ্টির শব্দের চেয়ে নিয়ন্ত্রণে বাধা স্বর, তবু বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে।...অপিরিয়রের গলার স্বর স্তন্যে স্তন্যে তাঁর কাছ থেকেও নিজেকে পৃথক করে আনল—চেনা-পরিচিত সব মানুষের মধ্যে তাকে সে বেশি ভালবেসেছে।

বা কিছুই ছেড়ে দিলে আঘাত দিলে খুবই, তবু শাস্তমনে স্থির বিশ্বাসে ভাবেছে বিচ্ছেদ যদি আসেই বিচ্ছেদের বেদনাও সহ্য হবে তার। সর্বশ্রমিকানা ঈশ্বরের জগ্গ সহ্যেই হবে, তাই বলি তাঁর ইচ্ছা হয়। অবশেষে নিজের মনে ব্যাখ্যাশূন্য বিশ্লেষণটা চালিয়ে যেতে যেতে এক

অসুস্থ সত্য আবিষ্কার করল। মাদার ম্যাথিল্ডার পর ডাক্তারকে ছাড়াই সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে।

তাঁর মুখের রাগত ভাবটা ভালবাসার মত দেখায়। এই এতগুলো বছর একসঙ্গে কাজ করার সময় সনাতনতর্ক পাহারায় নিজেকে তো বটেই তাঁকেও ঘিরে না রাখত যদি—তাই হয়ে পীড়িত সম্ভবত। আকাশের গায়ে হলদেটে চানচান স্পষ্ট যেমন, ওর চিন্তায় ঐ রুক্ষ মুখখানাও তেমনি। তার মতামতের ওপর তাঁর আস্থা, পূর্ণ বিশ্বাসে তার একার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়া, অপারেশন টেবিলের ওপর শায়িত কম্পমান নীলশিখার মত কোন জীবনের সংগে যে রক্তবাস দুঃসাহসিকতার বন্ধন তাদের বেঁধে রাখে...স্বালপেল, হেমোফট, ক্যাটগাট, সিটার...নিঃশব্দ যুগ হলেও নিঃশব্দ, উল্লস, নাকী এখনও পাওয়া যাচ্ছে বেশ...বছরের পর বছর অন্ধকার উদ্যায় এই তাদের একমাত্র কথোপকথন...কঠোরভাবে এক এক করে সেগুলো ছোট ফেলেছে সিটার লুক মন থেকে।

ডাক্তারের টেলিফোন। ভাবনায় ছেঁদ পড়ল। ত্যাগাণ্ডি হল পেরিয়ে চলে এল।

ডাক্তার নিজের ডেক্সে বসে, কেস ফাইলের বিরাট এক স্তুপের ওপর হাত ছ'বানা স্থিরভাবে মুড়ে রাখা।

ভবসনার দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে, আপনার ব্যাপার দেখে আমি তাক্সব সিটার, কাজেব মধ্যে হঠাৎ পালিয়ে গেলেন যে! যেন এই প্রথম ডায়গনোসিসে মতের তফাৎ হল আমাদের। যে হাসিটুকু ক্ষমাপ্রার্থনা করল তাকে মধুর বলা চলে না।—যেন জানেন না কেউ প্রতিবাদ করলেই চটে যাই আমি। সব সময়ই আমার ভয় কখন একশ' বারের মধ্যে একবার আপনার কথাটা ঠিক হয়ে যায়!

—একশ' বারে একবার! কি সাংঘাতিক দার্শনিক আপনি! বলল বটে অভ্যাসবশে, এটাকেও সরিয়ে দিল মনে মনে...তাদের যুদ্ধ আর সন্ধির পদ্ধতি...চোখ নীচু করে নিজের স্বাট-পরেটে নোট-বুকটা হাতড়ে ফিরছে, গোথের জলটা ধরা না পড়ে।

তিন সপ্তাহ পরে মাশার হাউসের পথে পাড়ি দিল সে।

বয়রা তার কামরাখানাকে বিবাহোৎসব কুঞ্জের মত সাজিয়ে দিয়েছে। দেওয়াল, ছাদ, বসবার আসনগুলো রাশি রাশি সাদা ফুলে ভরা। কোণে কোণে বড় বড় উইস্টারিয়ার স্তবক ঝোলানো, প্রাক্টিক ফুলের আড়ালে উপহার লুকোনো আছে। অতিকার এদেশী বুদ্ধিতে মেঝে পর্যন্ত ঢাকা—ঝড়িতরা বাছাই-করা আম, পেঁপে, শিগার, আরও অনেক রকম দেশীয় ফল। সব ওপরে অঙ্গুলী পরিমাপ ছোট ছোট বিটিকা কলার কাঁদি। বয়রা জানে এগুলো তার প্রিয়।

পাশের কামরাটা মসিমে গ্র্যান্ডমার্টের। তাঁর দরজার বাইরে ফোর্স পাবলিকের দু'জন দেশীয়-পুলিশ পাহারার পাড়িয়ে। ট্রেনটা ছাড়বার আগে রোগীকে সামান্য একটু ঘুমের ওষুধ দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকর মিষ্টতা-ভরা কুঞ্জে ফিরে এল। জানলার পাড়িয়ে

## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

দেখবে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে তার ধর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কটা বছর।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদায় নেবার সময় সব আবেগ অশেষ নৈপুণ্যে দমন করে রেখেছিল, বিশ্বাসটা জ্বিইয়ে রেখেছিল সে ফিরে আসছে। রিক্রেশননে সিস্টারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, সার্জারির অতি-পরিচিত পুরোণো যুদ্ধক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছ থেকেও। এমনই শান্তভাবে ঘেন দিন তিনেকের জংগল-সফরে যাচ্ছে। কিন্তু হুইসিং বেজে উঠল বনন—মা-মা-মা-মাথি! আর তার ডেসিং-বহরা তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল, হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এক মলক বেদনা উঠে এস গলা পর্যন্ত—সাদা ফুলের ফেরের মধ্য থেকে হাসিমুখেই তবু চেরে আছে তখনও।

শেষ দুগ্ধে স্টেশনের পিছনে মিমোসা গাছের তলায় দণ্ডায়মান আবছা কনভেন্ট-ফোর্ডটা দেখা পথন্ত অপেক্ষা করছিল, তারপর সানলার পাশে বসে পড়ল। তার বহরা এই একটিমাত্রই বসবার মত সারথী খালি রেখেছে। অপস্বয়মান কংগোকে দেখবার জন্য বাইরের দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই। কংগো তার সঙ্গে সগো রয়েছে এই কামরার মধ্যেই। মনে হল কাছেই ফুলের একটা মোড়কের মধ্যে কি রয়েছে। আবলুণ কাঠের মূর্তি বেরোল একটা।

প্রায় ইকি-পনেরো দীর্ঘ মূর্তি একটা, নতজাহু মেয়ে একটা। বড়মূলে নিকলসের তলায় উৎকৃষ্ট চকচকে কালো ছুটি পানোঁদিত বহর অভাস, মোড়া ছাউ ছুটির ওপর ছোট ছোট কঠিন ছুটি হাত।

পূর্ণ সৌন্দর্যে উন্নমিত মুখখানি, অর্ধ-নিম্নমিত ছুটি চোখ, কক্ষবর্ণ পুরু অধরোষ্ঠ নীরব মিনতির অভিযান্ত্রিক—সামনে এমন এক প্রচণ্ড দেবতা বেন, যার সঙ্গে কথা বলা বা যার দিকে চোখ তুলে চাওয়া সহজ নয়। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে মূর্তিটা—চৌকোবা পায়ের গোড়ালির ওপর বক্র মূর্তিটির নিতম্বভার ক্ষুণ্ণ আর সেই পায়ের পাতায় দুটো নাম পোদাই করা আছে—‘এমিল ও বাকোগো’।

আবলুণ কাঠের মূর্তিটি কোলের ওপর বসাল সিস্টার লুক। হুঁচোখে ক্রন্দন প্রাণন।

কক্ষটা তার বেদনা-বিকৃত মুখখানা অগ্নি বাত্মীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেছে। কাচের দরজার বাইরে ইতস্তত খোঁজাফরা করেছে তারা, ভিতরের দুগুটা কৌতুহল উদ্বেক করেছে। একটা খেতকায়া সিস্টার বিবাহোৎসবকক্ষে বসে কোলের ওপর জীবন্ত কিছু মত ধরে আছেন এই অসত্য দেশ তৈরি মূর্তি একটা—বাছবের তরফ থেকে এগুলো সংগ্রহ করে ‘নিগ্রো-আফ্রিকান আর্ট’ লেবেল আঁটা শুরু হয়েছে তাই, না হলে তার আগে পথন্ত হাতে বাজারে ক’গজ কাপড়ের বিনিময়ে যে কেউ কিনতে পারত এগুলো।

কিছুক্ষণ পরে মূর্তিটাকে তার পুণশযায় বসিয়ে দিল আবার। মেঝের দিকে তাকাল। কংগো-গ্রামস্থল উজ্জল বহুচেতু জমকালো বুদ্ধিগলার মধ্যে তার পেপিয়েমেশের স্ট্রাটেকশটা গরীব আত্মায়ের মত বসে। ভেদমটা সবচেয়ে ছোট। যেটা পেয়েছেন সেটাই দিয়েছেন, তাই নিয়ম। যে নান মাদার হাউসে ফিরছে যে সব মালপত্র বা



## এতীশ কবিরাজের মহাভূক্ষরাজ

### তৈল

ইহাই একমাত্র কেশতৈল আয়ুর্বেদীয়  
ভেষজের ওপাণ্ডীক রাসায়নিক —

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য  
ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ  
কর্তৃক পরীক্ষিত ও স্বাক্ষরিত।



আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

পৌখিক বদলানো দরকার সেইগুলোই তাকে দেওয়া হয়। নীচু হয়ে নিজের স্মৃতিকেশ থেকে ইজেকশানের ব্যাগটা নিল আর একটা বুদ্ধি থেকে একমুঠো কুসলী-পরিমাপ কলা।

পাশের কামরায় গেল ছোটখাট শাস্ত্র মাদ্রাসটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। উপনিবেশের কালের জ্ঞান রাজ্য লিওপোল্ড স্বয়ং তাঁকে একদিন সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

প্রহরী দু'জন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্ট্রালুট করল, মামা লুক।

—তোমরা তোমাদের কামরায় চলে যাও, লোবিটোর আগে তোমাদের দরকার হবে না।

সুনে ওরা মাথা হেঁট করছে দেখে তখনই কিসুওয়াহিলিতে বলল, আমাকে এখন একা থাকতেই হবে, সার্ভিসটির প্রেতগুলোকে তাড়াব কি না। তাড়িয়ে দিলে সেগুলো এখন করিডরে ঘুরে বেড়াবে, কাজেই আমি চাই তোমরা নিরাপদে সরে যাও।

তার মুখের স্মিতহাসিতে মর্যাদা ফিরে পেল ওরা। স্ট্রালুট করে নিজেরদের স্লিপিং কারে চলে গেল পিঠি টান করে।

দরজা খুলে কামরায় ঢুকল, ইচ্ছে করেই রোগীর দিকে পিছন ফিরে সেটা আবার বন্ধ করল টেনে। ছিটকিনি নিতে দিতে নিজের মনের বিষাসটাকেই আওড়াল নিজের মনোবল দৃঢ়তর করতে। অপ্রকৃতিস্থতা কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবে না ওঁর মধ্যে।

ভগবানকে শ্রদ্ধা করল একমুঠো। হে প্রভু, তুমি সহায় থেক।

জানলার কাছে গিয়ে ঢাকা নামিয়ে দিল আফ্রিকার স্থূকে আঁড়াল করতে। আলোটা বেদনা দিচ্ছে তাকে। তার রোগীর চোখকেও। পাশে বসে তাঁর সঙ্গে কলা ভাগ করে নিল তারপর।

ঈশ্বর অশ্রুমানস্বতারা আসলাপ শুরু করল, ম'সিয়ে এ্যাংগেব্যাট, বাপ হয় তো আমার কামরায় আপনাকে নেমস্কর করতে পারি আমি—এই পাশেই ঠিক। কামরটা যাদা ফুল আর ফলের বুদ্ধিতে ভর্তি একেবারে। তিব্বক নেত্রে একবার দেখল তারিকের।—চকোলেটের বাস্কও আছে। লোবিটো পৌছানোর আগেই একলো আপনাতো-আমাতো খেয়ে শেষ করতে হবে। এসব তো থাকবার জিনিস নয়, নষ্ট হয়ে যাবে।

পূর্ব সম্মতিতে হেসে চাইলেন ম'সিয়ে এ্যাংগেব্যাট।—আরও এই দুর্ভিক্ষ গরমেব জন্মে সিস্টার। তার বাড়িয়ে-ধরা হাত থেকে আর একটা ছোট কলা নিলেন তুলে।

## ১৬

কংগার বিরটিভ সমগ বেলজিয়ামকে খব্ব করেছে, কিন্তু মানার হাউসকে পারে নি। বিশালাকার বৃন্দারতা অট্টালিকা, দুর্গভদর্শন, নৈব্যক্তিক। চুকেতে গিয়ে গাটা শিরশির করে উঠল। প্রথম পদচ্যুলাট হয়ে ঢুকেছিল বখন তখন যেমন করেছিল।

চৌকাঠ পেরোবার আগে আগে ধর্মজীবনটা গোড়া থেকে শুরু হল যেন। পোটটারের কায়গার যে নানটি বসে, উঠে এসে কে মল ভাবে আলিঙ্গন করল সে। এ আলিঙ্গন কেবল প্রহাঙ্গতা মিশনারীদেরই প্রাপ্য। একবার সেও এমন পোটটারের জাগরায় ছিল। তাকে অভ্যর্থনা করছে যে ছেলেমানুষ সিস্টারটি তারই মত সেও গৃহগতা সিস্টারটির বোমোপোড়া তামাতে মুখ আর বিলুপ্ত প্রত্যাশাদৃষ্টির দিকে একবার মাত্র চেয়েই বাধ্য চোখ দুটো নামিয়ে

ফেলেছিল...যে ছেঁড়া স্মৃতিকেশটা দরজা থেকে হাতে এসে পৌছেছে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেনি—তার স্মৃতিকেশে আবার কল-অনুমোদিত ওজনের বেশি ওজন আছে...বাক্যাগো মৃতিট...সিস্টার ইউডোকুসি স্বভাবতই বাজেরাপ্ত করবেন ওটা।

কেউ যে তার দিকে তাকছে না এ অমুভূতিটা অচেনা হয়ে গেছে। সরে নিতে ফরোতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবটু। মনে পড়ল ফিরে আসবার পর নাকের প্রথম কর্তব্য চ্যাপেলে যাওয়া।

ভেসপারের খণ্টা বাজছে...

চ্যাপেল-অভিযুখী সিস্টারদের সারিতে চুকে গেল সিস্টার লুক। নিজেকে নিজের প্রোতাস্বার মত লাগছে! কালো প্রোতাস্বা একটা।

পাশে পাশে যে নানটি যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটি আইরিশ মেয়ে নডিস ছিল সেই মেয়েটির সঙ্গে তার খুব আদল আসে। এখন এমনই নিখুঁত ছাঁচে ঢালা নান হয়ে গেছে যে নীলাভ চোখের হাসি দেখে তবে বোকা বাবে এ সই কি না। কিন্তু সাংগিনীর হুঁচোখ নত, পূর্ব বিশ্বাসে চিন্তা তার ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত। সিস্টার লুক যেদিকে তাকাল একই দুশ্চিন্তা...মনে মনে স্মৃতিত আকাঙ্ক্ষা একজোড়া চোখ অন্তত তার দিকে চেয়ে পরিচিতির আলোয় ছলে উঠুক...বহুক্ষণ পরে সেই শিরশিরে অমুভূতিটা কেটে গিয়ে দৌলখোপলজি ফিরে এল।

তারপর কায়দা-দল গ্রেগারিয়ান গুব গাইতে শুরু করল বখন বাড়ি ফেরার অভ্যর্থনা স্তনতে পেল তার স্ববে-ছন্দে। কংগো-কমিউনিটির পনেরোটি গলার কায়ারের পরে মানার হাউসের এই শ'বানেক মোপ্রানোর গান...স্তনতে স্তনতে পারবে ভর হারিয়ে ভেসে যাচ্ছে যেন! চোখ বুজে শুনেছে ওদের কুমারী-গলার ভাজিনের গান। চোখ মেলে চাইল বখন দৃষ্টি অনেকখানি প্রসারিত হয়ে গেছে। নীচে সামনের দিকে ছোট টুপি-পরা পদচ্যুলাটদের সারি। সিস্টারদের সঙ্গে গান গাইবার অমুমতি এখনও পায় নি তারা, চোখের দৃষ্টিও পূর্ণায়ত্তে আসে নি—অব্যর্থ দৃষ্টি এদিক-ওদিক গিরে পড়ে। জিভি কলদের প্রান্তরমর্জিত সাংসিটার পড়ে ওদের গোপন দৃষ্টি বা আবিষ্কার করতে চাইছে চ্যাপাগলার গাঁত এ্যানটিকোন সেই গোপন তথ্যটারই উদঘাতা...বিশাল এক উত্তরাধিকার বহন...

সিস্টার লুক চোখ নামিয়ে নিজের কালো স্বাশুনারের দিকে তাকাল। জিভি কলের পোয়াক...সত্যই কি সে জিভি কল এখন? প্রভু জানান সে কথা, এ প্রান্তের উত্তর সে দিতে পারবে না।

উপাসনা শেষে স্তম্ভিরিয়র জেনারেলের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। অফিসের লাগোয়া ছোট ঘর নিম্নতর নানরা থেকে বসে আছে সমাধিমন্ডার মত। রেভারেন্ড মানারের সঙ্গে দেখা করবেন বল অপেক্ষা করছেন। সিস্টার লুক তাঁদের মধ্যে গিয়ে বসল। কেউ স্টিল অফিস পড়ছেন, বেউ মালা জপ বরছেন, আর একজন—ওহই মত রোগা, বাদামি-নিশ্চয় সম্প্রতি বনগ্রেগেশানের কোন উকাঙ্ক্ষ উপনিবেশ থেকে ফিরেছেন—একদৃষ্ট তাকিয়ে দেখছেন ঘরের অনাড়ম্বর সাজ সজ্জাগুলো। নগ্ন দেওয়াল, কাপটীহীন মেঝে, দুটো গাখিক ঝাঁচের ওককাঠের চেয়ার, একটা হেকলে ডেজের ওপর দাঁড় করানো ক্রশ আর একটা ছোট দিনপঞ্জী—তাতে প্রাত্যহিক শতীদিবস, তারিখ আর সাল দেওয়া আছে।

## পূর্ণপ্রাণে চাঁবার বাঁধা

আজকের তারিখটার দিকে তাকাল সিফ্টার লুক। ১৫ই মার্চ, ১৯৩৯। সকালে এ্যাং-টোয়েপের জেটিতে মঁসিয়ে এ্যাং রবার্টকে তাঁর আত্মীয়দের হাতে দিয়ে দিল যখন—জেটিতে ওঁরা যে সাইক্লারিফিক্টকে এমেছিলেন সঙ্গে এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন তিনি যে, তাঁর তুলনার মঁসিয়ে এ্যাংরবার্টকেই অনেক স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল, হকার ছেলেগুলো কাগজের হেডগাইন ঠাঁকছে শুনেছিল।—জার্মান সৈন্যের ঢেক বোহেমিয়া দখল—

কনভেন্টের কালো লিফুজীন গাড়িতে ব্রাসেল্‌সের পথে পপলার গাছের সারি দেওয়া পাহাড়ে-রাস্তায় জাহাজ-যাত্রীদের যুদ্ধালোচনা মনে পড়ছিল।—যুদ্ধ শুরু হয় যদি কনভেন্টে থাকটা কি রকম হবে? ভাবতে অবাক লাগে কেমন। একবার সিফ্টার ইউচেরিসিয়া এ সম্বন্ধ বলেছিলেন কিছু, কিন্তু কি যে বলেছিলেন এখন আর খেয়াল নেই তার।

একজন নান বেরিয়ে এলেন সুপিরির জেনারেলের অফিস থেকে, আর একজন ঢুকলেন। বেঞ্চে একটা জায়গা এগিয়ে বসল সিফ্টার লুক।

—যুদ্ধ যদি বাধে কনভেন্টে থাকার অর্থ এইভাবে থাকা। একবারে ঠিক এইভাবে, কোথাও কোন রদ-বদল হবে না। আমরা প্রত্যেকে গোপনে গোপনে সংগ্রাম করব কোন প্রাকৃতিক সমস্তা নিয়ে, অথবা অস্ত্রের কোন সমস্তা। রেভারেণ্ড মাদার ইমালুয়েলের অস্ত্রভেদী দৃষ্টির তলার গিয়ে দাঁড়ানোর জন্তে অপেক্ষা করব। সে দুটি সোজা অস্ত্রের সংগ্রাম স্থলে গিয়ে ঢুকবে। অস্ত্রের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে

যুদ্ধবিরতি কখনও ঘটে না, কখনও না। ক্রাইস্টের কা। আরও হওয়ার পর থেকে কখনও ঘটে নি—

—যুদ্ধ বিরতি হয় না কখনও।

ইতোমধ্যে আর এক ধাপ এগিয়ে বসেছে।

কি কথা বলবে সুপিরির জেনারেলের সঙ্গে মনে মনে কিছুই ঠিক করে নি। মনটা বরাবর বদ্ধ দরজার বাইরে টানা করিডরে চলে গেছে আপাতত—পারের আঙলে ভর দিয়ে সাদা পোষাক-পর্যায় নভিসরা যাচ্ছে যেখান দিয়ে, কাজের ঘানিতে বাঁধা ওঁরা। যেতে যেতে আড়চোখে এক-একবার চেয়ে দেখছে লিভিং রুলদের দিকে, রেভারেণ্ড মাদার ইমালুয়েলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বেরিয়ে আসছেন ধীরে। কারো মুখে হাসি, কারো চোখে জল—এখনই হয় তো পদোন্নতি হয়েছে, অথবা অবনতি—প্রশংসা পেয়েছেন, কিংবা ভৎসনা।

কিছুক্ষণের জন্ত নভিসদের নিঃশব্দ বাতায়তে সেও ঢুক গেল।

তারপর দেখা করবার পালা এল তার।

অফিসে ঢুকতেই রেভারেণ্ড মাদার ইমালুয়েল উঠে দাঁড়ালেন। মিশনারী সিফ্টারদের প্রতি বিশেষ সম্মানের অভিবাদন এটা। সিফ্টার লুকের ধারণা মিশনারী সিফ্টারদের সবার চেয়ে বেশি মূল্য দেন তিনি। সুপিরির জেনারেল নিজেও মিশনারী নান ছিলেন, যে সংগ্রামে দিন কাটে তাদের স্মৃতির স্তরে স্তরে ব্যুথ তার উপলব্ধি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সিফ্টার লুক নতজাহা হতে হতে সোজা তাকাল তাঁর অলঙ্কারে চোখের দিকে।

## কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী



ডক্টর গার্ডার

মনোরম গন্ধযুক্ত “ডুঙ্গল” আয়ুর্বেদীয়  
মতে প্রস্তুত মহাভুঙ্গরাজ কেশ তৈল।  
ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদগমে সহায়তা  
করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

**ডুঙ্গল**  
সুগন্ধি মহাভুঙ্গরাজ  
কেশ তৈল



নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি  
প্রচলিত হইয়াছে। বড়  
শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি: কলিকাতা-২৯

অপিরিয়র জেনারেল সামনে এগিয়ে এসে নত হয়ে আলিঙ্গন করলেন। অন্তরংগ উচ্চতার প্রকাশটুকু তহুভব করল সিস্টার লুক। তহুভব করল এক সংবেদনশীল হৃদয় স্থান দিয়েছে তাকে তার অন্তরঙ্গে।

উঁচু-পিঠি চেয়ারে ফিরে গিয়ে বসেছেন অপিরিয়র জেনারেল। কক্ষ-চক্ষুর চুষকশক্তি এমনই আবিষ্ট করে রেখেছে প্রথমটার ডেক্সের শিচ্চনে বৃক্ষ-শেলকের ওপর এমিলের দেওয়া আবলুশ কাঠের নতজাহু বাকোপোন্তী-মূর্তিটা দেখতেই পায় নি। পাশ করে রাখা হয়েছে মূর্তিটা, প্রার্থনার ভংগীটা প্রকাশ পায় যাতে।

অপেক্ষা করে আছে ঐ কণ্ঠের স্তম্ভের বলে।

...যে কণ্ঠের বার বছর আগে বলেছিল, এ জীবন প্রকৃতি-বিমুখ...

...আর সাত বছর আগে বলেছিল, মনে রেখ, তুমি একটা বস্তাবন্ধ...

রেভারেন্ড মাদার ইমাহুয়েল শ্রিতহ্রসে চাইলেন, ফেরার পথে কেমন এসে মাই চাইল্ড? ভাল তো?

—খুব ভাল রেভারেন্ড মাদার। পথে আমবা বাগীর মত বাবহার পাট। সিস্টার লুক শাসন করল নিজেকে, মূর্তিটার দিকে তাকাবে না আর।

—শরীর কেমন আছে তোমার!

—চমৎকার, রেভারেন্ড মাদার। আমার আত্মিক স্বাস্থ্যও—খুব ভাল।

—এ তো খুব ভাল কথা সিস্টার লুক। তা হলেও শরীর তোমার এখন সাবাস্তে হবে। ভুললে চলবে না অনেকগুলো-বছর কিভাবে একটানা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে তুমি।

অন্তভেদী কালো চোখের দিকে চেয়ে সিস্টার লুক দেখছে যে দৃষ্টিতে এক অপিরিয়র তাঁর নানদেব বিষয় যা সিংগেছেন তার সাক্ষিপ্ত বিবরণ যেন অনেকগুলো পটিকের টুকরোর মত ছলছে। অপিরিয়র জেনারেল কিছু ভোলেন নি, তুচ্ছ কথাও না।...একবার আমাশয় হয়েছিল, মাদার যেতেই বসেছিল প্রায়...তারপর যক্ষ্মা—ঈশ্বরের করুণায় নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছ আবার।...একমাত্র কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারে কোন নান, তুমি কিন্তু বোপ কর প্রারশই সে ক্ষেত্রের বাইরেও প্রয়োগ করতে তোমার বিচার-বিবেচনাগুলো, আর কিছু মানব-সংস্কারের ক্ষেত্র ছিল একটু চেষ্টা করলেই যেতলাকে অতি প্রাকৃত পথায় নিয়ে গিয়ে দেগতে পারত তুমি, কিন্তু অপর দিকে...

—তারপর, কি ভাবছ বল! নিয়ম হ'ল মিশনারীরা অন্তত একমাস এখানে থাকবেন, এই শান্তিময় পরিবেশে বিশ্রাম নেবেন শুধু। মনটাকে পুনর্নির্গলস্ত করে নেওয়াই একমাত্র কাজ থাকে তখন। কমিউনিটির উপাসনায় নির্দিষ্ট সময়গুলি ছাড়া যে কোন সময় আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পার তুমি। আমার ইচ্ছে সকালে রোজ ছুটা বাজলে তুবে উঠবে, উপাসনার যোগ দেবে পিউ থেকে নয়, চোর থেকে। যেমে একটু হাসলেন।—এ নয় যে তোমার বয়স হয়ে গেছে বা এত অস্থির তুমি যে উপাসনার সময়টুকুও ঠাড়াতে পারবে না, আমি চাই কিছুদিন তুমি প্রভুর চরণতলের মেঘশাবকটির মত

ভাব নিজেকে। মাথা তো অনেকদিন ছিলে সিস্টার, এখন চেষ্টা কর মেরী হতে।

—আমি চেষ্টা করব মাই মাদার।

চোখ তুলে তাকাতেই শেলকের ওপর আবলুশ কাঠের মূর্তিটার চোখ পড়ে গেল...আর একটু মূর্তি—হাতীর পাতে বোঁদ। যেন—তার দিকে একটু ঝুঁকে সামনে বসে...মুহূর্ত্থানেক দু'টি মূর্তি পাশাপাশি জেগে রইল মনে। উভয়েরই প্রেরণার মূলে যে ঈশ্বর দু'ক্ষেত্রে তাকে ভিন্ন বলে মনে হচ্ছে না, তিনি এক, তিনি অদ্বৈত।

—প্রথম প্রথম তোমার উত্তেজিত লাগবে, কোন কাজ নেই, কোন বিক্ষিপ্ত আত্মা নেই, বাক সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। রেভারেন্ড মাদারের চোখ দুটো জ্বল উঠল।—এতজনকে কনভার্ট করেছ সিস্টার তুমি কলোনিতে—সবার কাছেই এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। ঈশ্বরের প্রিয়পাত্রী তুমি, যেসব আত্মার সঙ্গে লড়াই করেছ তাদের সঙ্গে তাঁর সন্ধ্যোগের সেতু। উপনিবেশবাসীদের পরিবারগুলো থেকে, মিশনারী ফাদারদের কাছ থেকে বড় চিঠি পড়েছ আমি, সবাই তোমার ভাল কাজের প্রশংসা করেছেন। সেই দু'বিশদে প্রত্যেকে পছন্দ করেছে তোমায়, শ্রদ্ধা করেছে। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে শেলকে যেখানে আবলুশ কাঠের মূর্তিটা রাখা আছে সেদিকে তাকালেন।...তোমার কালো বস্ত্রও, দেখতেই পাচ্ছি।

এ ইংগিতের পর সে সোজাঅজি তাকাতো পারস এমিলের দেওয়া মূর্তিটার দিকে। ঐ মশণ কালো কাঠের প্রতি বাকটি ওর আঙুলগুলো চেনে। স্নেহভরা চোখ দুটো একপলক আটকে বইল ওটার দিকে। তখনই আবার গাখিক ছাঁচে গড়া মাতৃমূর্তিটির দিকে তাকাল। একমাত্র তিনি পাবেন কণ্ঠের তাক ফিরিয়ে দিতে।

আকস্মিক স্বরে রেভারেন্ড মাদার বললেন, উপহারটি ভারী সুন্দর সিস্টার। ঐ অঙ্ককার মহাদেশটার বড় সুন্দর প্রতীক। তুমি কি চাও তোমার বাবাকে দিই এটা?

অপিরিয়র জেনারেলের প্রশ্নের অন্তরালবতী ইচ্ছাটিকে বেশ দেখতে পাচ্ছে সিস্টার লুক।...তোমার মনের দিকে চেয়ে আমি সন্ধ্যাসংকরণে চাই এটার ওপর কোন দাবী না রাখ তুমি...একবারে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পার যেন। তোমার মন যেন এটুকু ভুলিও সঞ্চর করে না রাখ যে ওটা তোমার পরিবারে আছে।...

প্রায় প্রলুদ্ধ করার মত করে বললেন, তোমার বাবা খুশি হবেন এটা পেয়ে, ডেক্স সাক্ষিরে রাখার পক্ষে সুন্দর মনে করবেন! কি বল?

অগ্রিপারীক্ষার আহ্বানটা হাসিমুখে গ্রহণ করল সিস্টার লুক।

—আমার ইচ্ছে রেভারেন্ড মাদার কনগ্রেগেশানে রাখা হোক ওটা, কনগ্রেগেশানেরই তো আসল দাবী ওর ওপর। যখন আমি চলে যাব এখান থেকে এক কথা ভাবতে ভাল লাগবে আমার যে আমার দেওয়া কোন কিছু মাদার হাউসের মিউজিয়ামে রাখা আছে।

রেভারেন্ড মাদার ইমাহুয়েল বললেন, তুমি মহাত্মভব সিস্টার।

সিস্টার লুক জানে বিশেষ কারণ না থাকলে তিনি কখনও মূর্তিটার কথা উল্লেখ করতেন না, ঐ শেলকের ওপর রাখাই থাকত। মাঝে মাঝেই ওখানে বিশ্রাম করে কোন স্টাটিকেশনের মধ্যে থেকে বার করে আনা সিংহলের সেপ্তন কাঠের হাতী, ভারতের বহু বাহুবিশিষ্ট



## পূর্ণপ্রাণে চাবার বাহা

দেবতা, মীনর হাতীর-শীতের মুহূর্ত্তি। বসে থাকে মস্তব্যতীন, নামহীন। কার স্মৃতিবশে স্মৃতিচিহ্নটা পাওয়া গেল সে উল্লস বখনও থাকে না। শুধু বার স্মৃতিতে ঐ চিহ্নটুকু চির-অজান সেই মিশনারী সিস্টারটি নতজানু হয় বখন এ অফিসে, চেষ্টা করে তার প্রিয় ভিনিসিটি দিকে না তাকাতো। আশাতরা সাহসে পূর্ণ ভাগের দ্বারে নামিয়ে দিয়েছে তাকে, সে ত্যাগ দুল্ল না হয়।

চঠাং মনে হ'ল কংগার ওপর তার আবরণ যতটা দৃষ্টমান বলে তার দাণেরা সম্ভবত তার চেষ্টে বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

—আমাদের বাট, ভিনিসের একর বাড়াবে এটা। তুমি ভাল করে বিশ্রাম নাও সিস্টার। তারপর কোনদিন হয় তো তোমাকে রিক্রিয়েশন বসে তোমার সিস্টারদের তাদের কংগার সতীর্থদের খবরাখবর বলতে বলব। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্তে সর্বশেষ উৎসব হয়ে থাকে তারা।

সিস্টার লুক মাথা নাড়ল বাধা মেয়ের মস্ত। কিন্তু মনে মনে ভাবছে শাস্ত্রভাবে কংগার কথা বলতে পারবে কি না। বিশেষত এখন। বেশ পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছে মাদার ম্যাথিল্ডা যা ইংগিত দিয়েছিলেন বেলজিয়ামে তার চেয়ে বেশিদিন থাকতে হবে তাকে।

চলে আসতে আসতে অল্পভর কপড় চুপকী চোখ দুটো দরজা পর্যন্ত অমূল্য করছে তাকে। রেভারেন্ড মাদার ইমালুয়েল আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছেন যে-কোন সময় অন্তরঙ্গ আলোচনা-আলোচনার ইচ্ছে হলেই যেন অফিসে আসে সে। বেরিয়ে এসে দরজাটা পিছনে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে ভাবল, ফিরেই আসবে। আসবে, কারণ এ ভরসা তার আছে যে কংগা-প্রত্যাবর্তনের কথা জিজ্ঞাসা করে দুর্বলতা প্রকাশ করবে না বখনও। প্রথম দিনের কথাবার্তাতেই প্রশংসা হয়ে গেছে যে প্রশস্তা! স্বপ্নের কেন্দ্রে দালা দিয়ে ফেরে চঠাং সে প্রশস্তা করে না বসার মত মনোবল তার আছে। খুব সম্ভবত চোখ থেকে প্রশস্তা বয়ে পড়ছিল তার, তবু জিতটাক সাহস করে রাখতে পেরেছিল।

দেখা করতে প্রথম এলেন বাবা।

প্রথম তাকে ছাটিট পরে দেখে যেমন ভাবে বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে বললেন, বেটি তুমি রোগী হয়ে গেছ।

বহুদিন পরে দেখা পিতা-পুত্রীতে। জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। একটু দূরে ঝাঁড় করিয়ে দেখতে লাগলেন তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নীলাভ চোখে সমালোচনার দৃষ্টি।

—অবশ্য আমি কোনদিনই বিশ্বাস করি নি কংগার তোমার টি-বি হয়েছিল—বাজে কথা যত সব। ট্রপিকে অসুখ করলে কেউ বাঁচে নাকি? অস্বাভাবিক।

অবশ্য ডাক্তারি আলোচনার পুনর্মিলন সহজ হ'ল এরপর। না হলে কথা খুঁজে বেড়াতে হ'ত।

বাবার প্রত্যেকটি বিরোধিতার যথার্থ উত্তর দিচ্ছে বসে, কিন্তু একবারও বলে নি এক-রেঙুলো দেখতে। এসব কৃত্রিম সাহায্যগুলোকে ক্রিয়ম দস্তুরের উপেক্ষা করেন তিনি ভালই জানে। তার চেয়ে কেঁপে-কেঁপে দিয়ে স্বর্ণের বা স্তনবেন তার দাম অনেক বেশি তার

কাছে, তার ওপর তার অনেক বেশি আস্থা। ডাঃ ফরচুনাটির নিজস্ব চিকিৎসার বর্ণনা দিতে গিয়ে বেলজিয়ামের পাতুর মুখখানা ভাসছে চোখের সামনে। তার বদলি সিস্টারটির সঙ্গে বিভ্রাটে মানিয়ে নেবেন তিনি অস্বাভাবিক লাগছে ভারতে... গাছের ওপর সেই ঘরখানা... সে পাথরটির করত যখন ফেলল তার ছুঁতাতের মতো থেকে উঁকি মারত সোনালি চোখ বার করে!... প্রফুল্ল মনে অফিস আবৃত্তি করত বীদর চানটাক ছেড়ে দিয়ে... গাছের ঢালে যিঁঝিঁ পোকা খুঁজে বেড়াতে সে।...

বাবার কাছে বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করতে গিয়ে স্মৃতির টানটান পোড়েনে নতুন সত্য আবিষ্কার কবেছে: কি সময়ের ব্যবধানে ঠিক কতগুলো গোড় ডাক্ট ইন্জেকশন নিয়েছে, ঘুম আর অতিরিক্ত আহারের শাসন কতটা মানতে হয়েছে কংগার ভাবনের সেই অবস্থিতি সে বিস্তৃত করতে পারে, তার বেশি আর কোন কথা নয়। তবে মনে হ'ল বাবাও যেন ধরেই নিয়েছেন যখন রোগটির ওপর যে কংগার তার শত্রুরা জয়লাভ করল, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আর কিছু নেই।

—কিছুদিন চুটিতে হাওয়া বদলানো হলে ওরা তোমাকে নিশ্চয় ফেরৎ পাঠাবে কংগার।

—হয় তো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয় যদি...

সিস্টার ইউজ্যারিসিয়া যুদ্ধকালীন মিশনের কথা বলতেন মনে পড়ে গেল। প্রতিটি শব্দ অলঙ্কার করে ভাসছে তার স্মৃতিতে।

—চৌদ্দ সাল থেকে 'আঁরো' সাল অবধি মাদার হাউস বা স্বদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। উপনিবেশের সৈন্তদল জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এখানে... এইভাবে শাস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষরের পর রোয়ান্ডা ওরাণ্ডির শাসনাবধীন হলাম আমরা। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল মর্ধ্য চার বছর পরে পাওয়া আমাদের প্রিয় মাদার জেনারেলের চিঠিখানা। তারপর সিস্টাররা আবার কলোনিতে আসতে শুরু করল...

চোখের তারা দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে কখন অজানিতে। বাবার ডাকে চমক ভাঙল।

—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে গ্যাবি?

**ডাঃ বসু**  
**মেমোরি কার্ডিয়েল**  
কার্যকরী স্বাস্থ্য, শক্তি  
ও গোপনীয় বক্ষণ করে  
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিম.  
কলিকাতা-৯

—না, না তো। জোর করে হাসি টেনে আনল মুখে।—হঠাৎ নিজের মনে যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে শুরু করেছিলাম। তারপর ভাবছিলাম যুদ্ধের অর্থ কি দাঁড়াবে।

—যুদ্ধ হবে না। বাস্তবিকভাবে আমার বিশ্বাস হয় না যে জার্মানির ঐ উদ্ঘাটনা আর একদফা গোলমাল শুরু করবে। দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে হিটলার সংক্রান্ত কিছু ডাক্তারি তথ্য শোনালেন আধুনিক জার্মানির দার্শনিক প্রচারগুলো ব্যাখ্যা করতে তদগতভাবে বললেন তারপর, অবশ্য এ সবকিছুই আমার খেয়ালি ভাবনা হতে পারে। এন্টোনি রিজার্ভে রয়েছে, তবে ডাক পড়ার অপেক্ষাও তার সহিবে না। ছোট ছুঁটোরও অবশ্য ফৌজে যাবার বয়স হয়েছে।

—বাক্সা ছুঁটোরও। সব শেষ দেখেছে এখন তাদের নিকারবাকার পরা ছোট ছোট ছেলে তারা। কনকটের গতিহীন বছরগুলোর তারা আর বড় হয় নি তার চিন্তায়।

বাবার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কৈপে উঠল সে।

দেখে বাবা কোমল গলায় বললেন, মার্চের হাওয়াটা সয়ে না যার বতদিন, একটু ক্যাফাইন খেও।

বাবা চলে যাবার পরও ইচ্ছে করছিল এট বসবার ঘরেই একা বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবে। কিন্তু তা হবার নয়। কমিউনিটর অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে চারপাশে—সদা-সতর্ক, বিশাল! সিক্টার লকের প্রত্যাবর্তনের জন্ত যেন অপেক্ষা করে আছে সে। দু'শো কোড়া চোখ তার সদা-আনত, তবু কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না।

ভিতরে ঢোকবার দরজাটা খুলতে খুলতে সে আরও একবার কৈপে উঠল।

নিজেকে বলছে এতে অভ্যস্ত হয়ে যাব আমি। নিজেকে জানে না কিসে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা ভাবছে। এই আবহাওয়ায়! না কি এই এক ছাদের নীচে এতজন নানকে দেখতে?

পকেট থেকে একটা ক্যাফাইন-ক্যাপসুল নিয়ে মুখে পুরে দিল। মাদার হাউসের জনাকীর্ণ যাত্রায়তের পথ দিয়ে নানদের ড মিতোরির দিকে যাচ্ছে। রেভারেণ্ড মাপার ইমামুয়েলকে কথা দিয়েছে প্রথম সপ্তাহটার এই সময় আধবটী বিশ্রাম করবে।

এই ক্যাফাইন ক্যাপসুলে জাহাজের ক্যাপটুলন্তার মত ত্যাগাতাড়ি কাজ হয় না।—খড়ের বিছানার শুয়ে পড়তে, পশুখসু আওরাজ হচ্ছে নড়তে-চড়তে। মাদার ম্যাথিন্ডার কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

—আমার বেপা যেমন দিয়েছিল নিজের বেলাও তেমনি তোমার মেডিক্যাল ব্যাগে ক্যাফাইন নিও...বলজিয়ায়ে সারাক্ষণ থরথর করে কৈপেছি আমি।—

তখনই অমুভব করল হৃৎপিণ্ডের ওপর ক্যাফাইনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। স্পন্দন দ্রুত হয়েছে, জোরালোও। প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছোল। প্রতিটি কোষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে...জগৎ শুয়ে আছে, সম্পূর্ণ সচেতন।—মেটেরিয়া মেডিক্যাল ফারমাকোলজি থেকে লাইনের পর লাইন মুখস্থ বলে যাচ্ছে আপন মনে...দাঁড়ি, বহু বছর তো ভাবও নি, কথাগুলো, তবু একটা কথাও ছেড়ে যাচ্ছে না বলতে গিয়ে।  
...ক্যাফাইন সেবনে রোগীর মানসিক শক্তি, বিশেষত

বিচার-ক্ষমতা ও শ্রুতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ক্লান্তি দূর হয়। কল্পনাশক্তি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফসিফল অল্পক্ষণের জন্ত স্থায়ী হয়।

সেই অল্পক্ষণের জন্ত সে চোখ বন্ধ করল।

...অমনি মনে হ'ল কনকট ফোর্ড চড়ে বসেছে। এক হাতে নিম্বর ভেলটা ধরা, অঙ্গ হাতে যন্ত্রপাতির ব্যাগটা। এমিল বাইরে ডাইভারের পাশে বসে। একটু পাশ ফিরে বসেছে, মামা'লুকের সঙ্গে চিকিৎসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলার বাসনা, কাললুক তাক লাগিয়ে দিতে পারে যাতে। শহর ছাড়িয়ে এল তারা, একটা দেশীয় হাসপাতালে অপারেশনের জন্ত সব তৈরি করল। কাজ শেষ হয়েছে সেবে, ডাঃ ফরচুটি সেই ছোট নিরাভরণ অপারেশনের ঘরখানায় এসে চুপলেন।—টেবিলে শোরানো দেহটার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না, যন্ত্রপাতির ট্রে দিকেও না,—তার দিকে চাইলেন।

বললেন, আপনার বদলি নানটিক শিখিয়ে-পড়িয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট নার্স করে নিচ্ছে। কিন্তু ওর দৌড় ঐ পগুই, আপনার জায়গা ওকে তা' বলে নিতে হচ্ছে না। একবারে রোখ নেই, আমার ভুল হলেও তা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে পারবে না।—

...অপর্যাপ্ত স্থাংলোক আর কোড়া বাতাস...তারই মাঝে অসীম শূন্য চকুকে সোনালি একটা আলো ছলছে যেন। ও না, ওটা ডাঃ ফরচুটির মুখ।

—ও যেহেঁটা নান হতেই জন্মেছে...হেঁটাই বেড়েছে ওর, মনটা আছে সেই শৈশবের স্তরে। হাজার বছরেও রকম আপনি হতে পারবেন না রেভারেণ্ড সিক্টার।

ঠঠনের মত অস্বপ্নে হৃদয়ে মুখখানায় মাঝটা পরিচয় দিয়েছে এমিল। ক্রুদ্ধ ভাবটা ঢাকা পড়ে গেছে। মাস্কের ভিতর থেকে চোখ দু'টা মানবিক দেখাচ্ছে এবার।—রডি? সেই মানবিক চোখ দু'টা জিজ্ঞাসা করছে। কালো জু হুঁটা উঁচু হয়ে কোড়া লেগে গেছে লবু পরিহালে। দস্তানা পরা হাতে প্রথম যন্ত্রটা তুলে দিলে সে।—

—তুমি ওর প্রেমে পড় নি তো? মাদার ম্যাথিন্ডা জিজ্ঞাসা করেছিলেন

কংগোয় তার দ্বিতীয় বছর দেটা, ম্যাডাম গুরেল সব তাঁর পঞ্চম কন্যাটির জন্ম দিয়েছেন। বেনজিয়াবের ইজা ছিল টিউব বেঁধে দেন তাঁর—অবশ্য গোপনে। সামনে যেন ভাগ করবেন সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর নেই, ভ্রমহিলার বয়স হয়ে গেছে। সেবার যেরকম তর্কাতর্কি হয়েছিল হুজ'ন তেমন আর বখণও হয় নি। প্রেও বাগবিতণ্ডার পর সে ঠাকতে পেরেছিল ডাক্তারকে। তাঁকে কাপুস্ব বলেছিল—এই পাঁচবারের বার এক পুত্র বৃদ্ধু পিতার সামন-সামনি হতে পারছেন না বলে, তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারছেন না বলে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা অজ্ঞকেম। বাগড়া করে সার্জারি থেকে বেরিয়ে আসছিল বখণ, কথাটা বলে ফেলার লজ্জায় মুখপানা লাল হয়ে উঠেছে। মাদার ম্যাথিন্ডা সেই সময় দেখেছিলেন তাকে। [ক্রমশ।

অম্ববাদিকা—প্রগতি মুখোপাধ্যায়

‘মাদিলা,

তোমার ১৪ই মার্চের চিঠি আজ সকালে পেরেছি। খুব ভালো লেগেছে। এটা মামুলি কথা নয়, তোমার প্রত্যেকটা চিঠি আমার এত ভালো লাগে। আমি নিজেই মনে মনে আশ্চর্য হয়ে বাই, প্রতিবারেই এত নতুন করে ভালো লাগে কেন। অথচ কি লেখা তুমি! তোমার রিসার্চের বিষয় ছাড়া আর কিছু না। সবাই বলে, গবেষণার বিষয় মাত্রেরই নীরস, শুকনো পাণ্ডিত্য, কিন্তু তুমি যে ভারতের পূর্ব-উপকূলের মন্দিরগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আমি যেন সেখানে মনে মনে তোমাকে অনুবর্তন করতে পারি। তুমি কি কেবল তথ্য সংগ্রহ করেই বেড়াচ্ছ? আচ্ছা, তুমি অনুভব কর না কিছু? আমার

কিন্তু ঠিক উল্টো, তোমার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে বৃক্কের মধ্যে অসুস্থ একটা বোধ হতে থাকে, আমি ঠিক বোঝাতে পারি নে-....’

অন্তরীম চিঠি লেখার বাধা পড়ল। ওদেবই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রী রুবি নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের পিছনে হাত রেখে। ওর সর্কোভুক ভঙ্গি দেখে মনে হয় ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মুচকে হেসে বললে, ‘নিশ্চয়ই মধুপাত্র লেখা হচ্ছে-..’ স্পষ্টত, বহু-বাবলত শব্দটা ওরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে না।

‘তুই! বেশ-..’ চমকে উঠল অন্তরীম, ঘাড়খানা কাৎ করে বললে, ‘কতক্ষণ থেকে দুই মিনিটে করে দাঁড়িয়ে থাকি হয়েছে শুনি-..’ সঙ্গে সঙ্গে রুবির হাত ধরে পাশে বিছানায় এসে বসবার জগা গুকে আহ্বান করল।

‘কতক্ষণ? যতক্ষণ তুই ওয়ার হয়ে মধুপাত্র রচনা করছিলি-..কিন্তু লিখাছিলি কাকে? মিঃ মুখার্জীকে নিশ্চয়ই-..গল্পে মুখার্জী-..সত্যি, ওর নামের সঙ্গে তোরা ওতনো নামটা ম্যানায় না, হওয়া উচিত বিজয়লক্ষ্মী-..’ বলতে বলতে চেয়ারের পিছন থেকে ঘুরে রুবি ওর সামনে এল এবং বিছানায় না বসে টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ‘এত গভীর মনোযোগ দিয়ে কি লিখছিলি রে-....’

তরুণীর স্বভাবসুলভ লজ্জা মুহূর্তের জগা অন্তরীম মুখের ওপর ছোপ ফেলে গেল যেন, কিন্তু পরক্ষণেই ওর গভীর কালো চোখের দৃষ্টি তাক্ত হয়ে উঠল, ‘মিঃ মুখার্জীকে! কথখানা না-..’

অন্তরীম আকস্মিক উত্তেজনা খট করে লাগল রুবির মনে, কিন্তু একটু আগেকার পরিস্থাপ্তি ভাবটাই কাজ করতে লাগল ওর মধ্যে, ‘লুকোচ্ছিস তো; কিন্তু লুকোলে আর কি হবে, তোর হবু-বরটিকে কেউ তো কেড়ে নিচ্ছে না।-....’

‘তবু মনে হচ্ছে যেন একটু জেলাস হয়েছিল-..’  
‘তা সত্যিই তোকে হিসেব হয়।’ বিত্তের সরস্বতী, রূপে অপরী, গানে কিরণী-..স্তার ওপর কে-বি ইণ্ডাস্ট্রিজের টায় এগজিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার বার জন্তে পাগল-..আচ্ছা, রবজিববাবু কবে থেকে তোর কাকার এ্যাসিস্ট্যান্ট হলেন রে-..’

‘আচ্ছা, ঠিক করে বলতো, আগ্রহটা কার জন্তে, সেই এঞ্জিনিয়ার না আমার জন্তে-..’

এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রুবি বললে, ‘সত্যি কথা বলব, তোর জন্তে। কলেজ-শুদ্ধ মেয়েরা তোর গান শুনে উজ্জসিত, কিন্তু দেখ, তোর মস্তক পপালার নীচে এই ভুজ, আর তোর চোখের দৃষ্টি-..কতবার হিংসে হয় আমি যদি অমনটা পেতাম না, আমি যদি ছেলে হতাম-..’ বলতে বলতে দুই হাতের তেলোর মধ্যে অন্তরীম মুখখানা নিয়ে তুলে ধরল রুবি, আর কুণ্ঠিত অথচ অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অন্তরীম তুলে-ধরা মুখের মধ্যে একটা মুহূর্তসি ফুটে উঠল, আগেকার উত্তেজনাটা কেটে আসছিল আঙে আস্তে, কিন্তু বৃক্কের মধ্যকার নিঃশব্দ বদন। ওর হাসিটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারল না। বললে, ‘কাকে চিঠি লিখছি পিছন থেকে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে দেখেছিল। না দেখে থাকিস তো চিঠিখানা এখনো খোলাই রয়েছে দেখ না-..’

‘দেখার দরকার নেই, বুঝতে পারছি মিঃ মুখার্জীকে নয়-..কিন্তু অন্তরীম তোর যেন কি হয়েছে, লুকোচ্ছিস নিজে-..’ বলতে বলতে নিজের হাতের তেলো দু’টো টেনে নিলে।

## পরীক্ষার্থীনা



## শ্রীগুণময় মামা

অন্তরীম মুখখানা মুঁকে পড়ল, নিটোল গ্রীবার দেখা দিল, ভাঁজ, কঠার গাছে গলার রক্তশ্রোত কাঁপছে লক্ষ্য করা বারণ। সেই অবস্থায় অন্তরীম বললে, ‘তোকে লুকোচ্ছি না, কিন্তু একটু আগে তুই যে বলছিলি তুই যদি পুরুষ হতিস-..সত্যিই যদি তাই হত!’

এক মুহূর্ত অনিশ্চিতভাবে থেকে রুবি বললে, ‘এটাতে আরো আড়াল তোলা হল-..’

বীকৃতিতে বাড় কাৎ করল অন্তরীম, কিন্তু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, ‘খেরেছিস তুই? সেকেন্ড বেল পড়েছে বোধ হয়-..’

‘ও মা, তুই বাস নি। সেকেন্ড বেলের অনেকটা পরেই তো আমি গেলাম, ফিরবার পথে তোকে এই অবস্থায় দেখে-..ভাবলাম তুই খেয়ে এসেছিস।’

‘লক্ষীট, আমার সঙ্গে কিচেনে আর একবার চল, অবিশ্যি’র বকুনি খানিকটা ভাগ করেই নিবি না হু-..’

আনন্দপুর ছাত্রী-নিবাসের রান্নির খাবার শেষ বস্তু সত্যিই অনেকক্ষণ আগে পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দফার নীচের ক্লাসের ছাত্রীরা হঠাৎপুটি করে খাওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির হয়, বস্তু পড়ার আগের থেকেই কেউ কেউ গিরে জারগা দখল করে। সমস্ত হোর্টেল তখন জোয়ারের মতো কলরবে উজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এই পর্ব শেষ হয়ে নতুন দলের জন্ত জারগা হতে আথবস্তু থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। দ্বিতীয় দলের খাওয়া বখন চলতে থাকে, তখন কমন-রুমে আর এক প্রস্থ ডেটে ওঠে কলরবের: খবরের কাগজ আর মাসিকের পাতার সামনে, ক্যারামবোর্ড আর পিং-পং-এর টেবিল ঘিরে। আজ সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছিল, কমন-রুমে উজ্জ্বাসের রেশ তখন মিলিয়ে এসেছে, আর খাওয়ার ঘরে তখন কেউ ছিল না।

দরজার মুখে রুবি ‘হাতে মুহু চাপ দিয়ে ওকে থামাল অতসী, আমার ওপর তুই রাগ করেছিল। দোতলা থেকে নেমে এতটা পথ এলাম, একটা কথাও বলছিস না। আমি তোমার কথা উত্তর দিতে পারি নি তখন, সত্যিই লুকোবার জন্তে নর, নিজের কথাটা কেমন করে শুধিরে বলব সেইটেই ঠিক করতে পারছি না-..’

রুবির অভিমান হয় নি—তা নয়, কিন্তু কৌতুহলটাই বড় হল ওর কাছে। তা ছাড়া, অতসীর কিরিয়ে-নেওরা মুখে যে বেদনার ছাপ দেখেছিল সেইটেই তুলিয়ে দিলে ওকে। বলতে: ‘সখ, প্রত্যেকেরই এমন কতকগুলো কথা আছে, কিছুতেই বা অন্তরে কাছে বলা যায় না। সেই জন্তেই আমি পীড়াপীড়ি করতে চাই নে, তোকে ভুলও বুঝব না’...

অতসী আবার কথার মোড় ফেরাল, ‘কিন্তু তোর সেই কথাগুলোই আমাকে না বললে আমি রাগ করব-..পরীক্ষার পরই তো তোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। ঝাঁর সঙ্গে ঠিক হয়েছ তোর কথা আমাকে বল কিছু, তিনি যেন কোন ছুলের টিচার, না?’

হেসে ফেলল রুবি, ‘বিশ্বাসের গইলা গ্রামের রান-বংশের মেয়ের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা, আমরা যেমন, তেমন আমাদের ঘর হবে তো?’

‘তুই আমাকে বোঁচাচ্ছিস, কিন্তু আমি তোকে বোঁচা দিতেও চাই নি, তোর কথা গারে মাথখিও না। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে তোর মতো ভাগ্য যদি আমারও হত, তা হলে কি না খুশি হতাম?..বলতে বলতে অন্তমনস্ক হয়ে উঠল অতসী।

‘আচ্ছা, তুই কি মি: মুখার্জীকে ‘বিরে করতে চাস না? কিন্তু কেন’..সত্যিই বিস্মিত হল রুবি।

পারে পারে ওরা ঘরের মধ্যে চলে এসেছিল, সামনের যে কোনো একটা বেঞ্চেই বসে পড়ল ওরা। ঘরের ও-প্রান্তে বলরাম একহাতে বালতি অজ্জহাতে ভাতা নিয়ে শেষদফার বেশ পরিষ্কার করে চলে যাচ্ছিল, এদিকে দৃষ্টিপাত করে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বললে, ‘অতসী দিদিমণিকে খেতে দাও ঠাকুর-..’ পরে এদিকে আবার লক্ষ্য করে বলে উঠল, ‘রুবি দিদিমণি আবার খাবেন না কি-..’

ঠাকুর: ‘হুই-তিন দফার ডাল-ভাত-ভরকারি দিয়ে চলে গেল। স্পষ্টত এইরকম দেরি করে আসাটা ওরা পছন্দ করল না। অতসী ভাত সামনে রেখে বসে রইল কতক্ষণ, রুবি খেতে বলার পর নাড়াচাড়া

করতে লাগল। হঠাৎ বললে, ‘তোমার কাছেই শুনেছি, তোর ভারী খন্তরের চালের আড়ৎ আছে রামপুরহাটে। তোর শাতড়িত দেখতে এসেছিলেন তোকে, আগেকার আমলের লোক তো, নিশ্চয়ই তোর মধ্যে মেয়েদের লক্ষ্মীলি দেখে পছন্দ করে গেছেন-..আমি বেশ বুঝতে পারি তোকে বরণ করে নবেন তিনি। বোঁ হিসেবে তোর স্বাধীন চলা-ফেরার অনেকটা বাধা পড়বে, রান্নাবান্না, গেরস্থালীর কাজেই কাটিবে অনেকটা সময়-..’

নিজের অজান্তেই একটা খুশির আভাস ফুটে উঠল রুবির মুখে, কিন্তু ও বললে, ‘এই বস্তুটা তো সব মেয়ের পক্ষেই সত্যি, আমাদেরই বিশেষ হল কি করে-..’

‘না, সব মেয়ের পক্ষে সত্যি নয়। অন্তত আর সবার পক্ষে যেটা অত্যন্ত সহজেই আসে, আমার পক্ষে সেটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়, অথচ তোরাই আমাকে হিসে করিস। ওখানে গিয়ে আমি কি পাবো? স্বরকল্পার দায়িত্ব থাকবে না, প্রাসাদের মতো বাড়ি, কিন্তু তার সবটাই ঠাকুর-চাকর-আর-বেয়ারার বহুৎবে চলবে। আমাকে দায় নিতে হবে সোসাইটির, ওদের সামাজিকতার। আমাকে ক্লাবে যেতে হবে আর কিছুটা টেনে আনতে’ হবে বাড়িতেও। আমার গানের সম্বন্ধে মি: মুখার্জী উৎসাহিত, কিন্তু গান ভালো বা উনি গান বোঝেন সে জন্তে নর-..সত্যি কথাটা বুঝতে অন্তর্বিধে হয় নি আমার-..আর্টিক মেরেকে তিনি বিয়ে করতে চান, তার কারণ অন্তরে চোখে তিনি বিশেষ হয়ে উঠবেন বলে-..’

‘তুই রাগ করিস না, একটা কথা বলছি, নিজেকে বাড়িরে তুলছিস না তুই? তোর কথাটা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মি: মুখার্জীকে ডিক্টেশানের অভাব আছে কিছু?’

‘সত্যি। আমারও অবাক লাগে। মেয়েদের ঠিক পত্নী হিসেবে দেখে না ওরা, যে কেবল ঘরের গৃহিণী। পত্নী-নির্বাচনে অন্তদের উপর একটা টেকা দিতে পারলে খুশি হয় ওরা, একটা অলক্ষ্য কম্পিটিন যেন আমি বুঝতে পারি। ব্যাপারটা যেন একটা আকস্মিক প্রকিটের মতো জমকালো, অন্তদের চোখ ঝাঁপিরে দেবার মতো-..’

‘আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, আর তোকে অবিশ্বাসও করি নে আমি। কিন্তু তোর যদি এতই খারাপ লাগে, তা হলে বিয়ে না করলেই হু-..’

হাসল অতসী, এবার রুবি অমরোহ না করলেও খেতে আরম্ভ করল। বললে, ‘জানিস, নিজেই অনেকখানি জড়িয়েছি, শার্ভ ইয়ারের পর গেল সামারে মাসখানেক, কাকুর্মাওখানে হিলাম জানিস তো-..শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি নে। আজ হোক কাল হোক এর একটা সমাধান আমাকে করতেই হবে। আমারও মেয়াদ তোরই মতো, এপ্রিলের শেষে পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত-..যে কথা বুকের মধ্যে শুমরে মরছে, তুই না জিজ্ঞেস করলে তা বেরোত না। কিন্তু এ ব্যাপারে তুই পারিস নে আমাকে সাহায্য করতে?’

॥ ২ ॥

খাওয়ার সময় এবং তার পরেও অতসীর ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলল ওরা, অতসী নিজের বুকখানা উজাড় করে মেলে ধরল। কিন্তু তাতে কি বন্ধুর থেকে সত্যিই কোনো সাহায্য পেয়েছিল ও, নিজের সমস্ত সমাধান হয়েছিল কিছু? না, তা হবার নয়, জীবনের পরম

## পরীক্ষাধীন

সন্ধিক্ষণে যে সমস্ত আসে, জীবন দিয়েই তার সমাধান করতে হয়। অতীত আশ্চর্য হয়ে দেখলে, এতদূর কথা বলার পর বৃকের ভারটা হর তো কিছু কমেছে, কিন্তু ভিতরে আনন্দটা তখনও বিকিঞ্চি ছিল। তখনই ওর ইচ্ছে হল, সুরেলডাঙার মার কাছে একবার যেতে, তাঁর হয় তো সে কিছু নির্দেশ পাবে। মার কথা মনে হতেই বৃকের ভেতর একটা মোড় অন্বেষণ করল অতীত। মালিনী দেবী তার মা, সুরেলডাঙা গাল'স স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বাবা নেই, কোনো ভাইও নেই তার। বাবার নিজের হাতে-গড়া ঐ স্কুল আর একমাত্র মেয়ে নিয়ে গার মঙ্গলটিকে এতদিন বৃকে করে রেখেছেন তিনি। এখন বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্যহীন, সৌভাগ্যহীন জীবনে একমাত্র স্বামীর এবং নিজের মাদরাসকে মনে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

ঠাকুরা ছিলেন কলকাতার এক ছোট বাড়ী মেশিন-শপের মালিক। তে মহাযুদ্ধের সময়ই তিনি নিজের কারখানা এবং বিত্ত সম্পদ উজ্জ্বলিত ভিত্তিতে বাড়িয়ে তোলেন। বিনয়শঙ্কর আর সুরেশশঙ্কর তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলে বাবার আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। অনেকদিন ধিন্ত তিনি বরিশালের গ্রামেই কাটিয়েছেন, তারপর পশ্চিম বাংলার লে আসেন নিজের দ্রাক নিয়ে। সুরেলডাঙার গড়ে তোলেন দ্রাক্রী গ্রামে মালিনী দেবী গাল'স স্কুল। প্রথম থেকে স্বামীস্বত্বী হ'জেনেই ছিলেন গ্রামের শিক্ষক। অতীতের শৈশবে বিনয়শঙ্করের মৃত্যু হলে মালিনী দেবীই সব ভার হাতে তুলে নিয়েছেন।

আর তাঁর ছোট ছেলে হলেন সম্পূর্ণভাবে বাবার অনুগামী। দ্রাক্রী ঠিক পরেই আমেরিকা-ইন্ডিয়াও বুর এসেছেন তিনি। বাবার তার পর সমগ্র শিক্ষা-স্বাস্থ্য তাঁর হাতে পড়েছে। অনেকবারই মাদ্রি আর ভাইবিকে নিজের কাছে নিয়ে বাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু সফল হন নি। বাবা-মার কথা মনে হলে অদ্ভুত একটা গর্ভ অনুভব করে অতীত, ঠিক এখনও একটা কঠিন আবেগ বৃকের ভেতরটার রে উঠল, 'ওঁরা যদি লড়াই করতে পেরে থাকেন, তা হলে আমিও পারব'—মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করল ও। আর মনে হল এ াপারে মাই তার সহায় হতে পারেন।

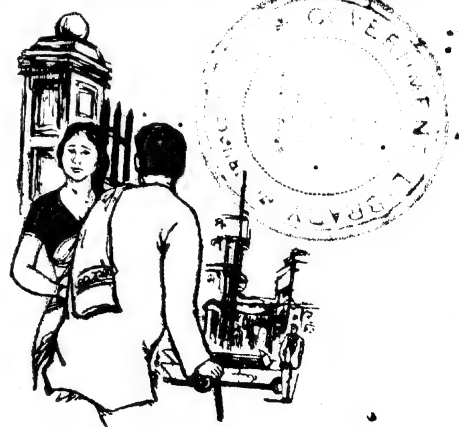
হাই তুলে একবার টেবিলের ওপর মাথাটা রাখল অতীত। ঙ্গুতো ভাই মণিশঙ্করকে যে চিঠিটা লিখতে বসেছিল সে, াবলে যে সেটা শেষ করবে। কিন্তু হাতে কলম নিয়ে লখতে গিয়ে দেখলে, তখনকার আবেগ অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে, মাস্থানকার কঁক পড়তে চিন্তাটাও কেমন এলোমেলো যে উঠেছে। এতদূর কবিকে যে কথাগুলো বলছিল তা মনে রবার চেষ্টা করল। হঠাৎ ওর মনে হল, সব কথা অমনি মর কবিকে না বললেই হত। মণিশা'কে বা বলবার কথা সবছিল ও, একটা অসতর্ক মুহুর্তে সেগুলোই কবিকে বলেছে। গার নিজের দিক থেকে বতই শুদ্ধপূর্ণ হোক, কবি এটা কিভাবে ময়েছে কে জানে। সে কি তার কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝবে?

দেয়াজ টেনে মণিশঙ্করের শেষ চিঠিখানা বের করতে চাইল অতীত, তখন বার উত্তর লিখতে বসেছিল। খানকরক চিঠিই থিয়ে এল একসঙ্গে। কেমন একটা ঝোঁকের মতো লাগল ওর, সবগুলোর ওপরই চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। কোথাও কথাও চমকে যেতে হল ওকে, কিন্তু আছে আছে ওর পরিচিত

প্রিয়-জগতের মধ্যে এসে পড়ল। ওর মনে হল, মণিশা' তার চিঠিতে যে সব কথা লেখে, কোথায় তার সঙ্গে নিজের জীবনের যোগ আছে। এক জায়গায় সে লিখেছে, 'এই পুরানো মন্দির-গুলোতে প্রাচীনকালে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল, নৃত্যগীতনিপুণ তরুণী কস্তাদের মন্দিরে উৎসর্গিত করা হত। এতে ধর্মের সমর্থন ছিল। অথচ সত্যি কথা বলতে কি, রাজসভার নটী আর এই সব মন্দিরের মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য ছিল না। আমার কি মনে হয় জানিস, আমাদের সামাজিক গঠন ছিল এমনই, তাতে নারীদের সম্মানের আসন দিতে পারি নি আমরা, নিজস্বের পাশ আর ক্রটি সঞ্চারিত করেছি তাদের মধ্যে, তাদের কাছে সেটা তুলে ধরেছি সম্মানের জিনিস বলে, নিজস্বেরও ঠিকিয়েছি। এখনও যে অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা মনে হয় না, কেবল তার রূপের বদল হয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগে, কোথাও নারীজাতির প্রািন্দ নেই। এই দুরীধকালের ইতিহাসে নারী নীরব, পুরুষ তাকে যে দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে সেই দিকেই চলেছে। উত্তরের মধ্যে কান্ডের পক্ষে তাতে ভালো হয়েছে কি?'

আর এক চিঠিতে মণিশঙ্কর লিখেছে, 'দেখ অতীত, দিনে দিনে আমাদের পারিবারিক-জীবনে একটা সফট অন্বেষণ করছি, দেখছি বাবার পথ আমার নয়। বাবা আমার সবচেয়ে দৃঢ়, হতাশাও বোধ করেন, এ জগত তাকে দোষ দিতে পারি নে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আমার সবচেয়ে আশা করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই, অথচ আমার ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। কিন্তু কবি (অতীতের খুড়তুতো বানের নামও কবি) আমাদের পারিবারিক আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক মিশে গেছে। শুধু তাই নয়, সেই পরিবেশের মধ্যে সে নতুন প্রাণসঞ্চারও করেছে। কবি যদি আমার ভাই হত। প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব-বোধের মধ্যে সফল উত্তরাধিকারের ধারণাও জড়িত, আমি সেখানে বাবার মুখ রক্ষা করতে পারি নি। বি বাড়ির মেয়ে হলেও হয় তো সেটা পারবে। ভালো কথা, তুই কি জানিস, কবি'কিছুদিন হল অল্পফোর্ডে গেছে, ও কি তোকে লেখে?'

এই চিঠিরই শেষ দিকে হঠাৎ সে লিখেছে, 'মণিশা' যদি



জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে হতাব। এটাকে হয় তো অলস মস্তিষ্কের উর্বরতা বলে ঠাটা করবি, কিন্তু সেটা ভাবতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমার ইচ্ছে করে তুই আর আমি দুই ভাইবোনে একই জারগার একই সঙ্গে থাকবো, আমাদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নিয়ে আসব আমরা। জ্যাঠামশাই যে ব্যক্তিত্বের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন, তাকেই আমরা একই সঙ্গে রূপ দিতাম, নিজের জীবন-প্রেরণা পেতাম তার থেকে।

শুভে বাবার জন্ম চোর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অতসী। যে চিঠিগুলো খুলেছিল, সেগুলো পুনরায় ভাঁজ করে রাখার মতো উৎসাহ ছিল না ওর, সেই অবস্থাতেই দেবাজের মধ্যে ঠেলে রাখল। ফুলের মতো যে স্নায়ু ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে, সৌরভ ছড়াবার জন্ম উদ্ভূত হয়ে রয়েছে, সেটাই বেদনার্ত হয়ে উঠল। কান্নার বেগে খরখর করে কাঁপতে লাগল তার দেহ। মণিশঙ্করের চিঠির মধ্য দিয়েও অতসী আশঙ্কা করে, তার জীবনকে ঘিরে একটা কালাছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। কিন্তু মণিশা'র কি হল? সেও কি নিজেকে এমনি অসহায় বোধ করছে? কি তার যন্ত্রণা? সে ছেলে, নিজের ওপর জোর আছে তার, সে যদি নিজেকে না শেষ করতে চায়, কে তাকে ধরবে? কিন্তু তবু সে একটা উৎসাহবোধও করে। তারা দুই ভাইবোনে চিন্তায়-বেদনার একটা জারগাতেই দাঁড়িয়ে আছে পথ কেটে বেরোতে পারবে না তারা?

আলো নিবিরে বিছানার যেতে গিয়েই থমকে গেল অতসী, একটু

এগিরে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস কপালে-মুখে এসে লাগল, ঠিক এখনই অতসী বুঝতে পারল তার মাথা ঘরেছে, দুই রগ টিপটিপ করছে। সামনেটা ভালো করে দেখা যায় না, বাগানের গাছপালায় হৃর্দয় জ্বালের মতো তৈরি হয়েছে। দিনের বেলা তো এমনি মনে হয় না। কতক্ষণ সেই অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে রইল অতসী, একসময় যন্ত্রণা এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

আজ চুল বাঁধা হয় নি, সন্ধ্যার দিকে এলা খোঁপায় জড়িয়ে রেখেছিল, এখন সেটা খুলে দিতে গিয়ে একটা ভ্যাপসা গন্ধ অনুভব করল অতসী। ডান হাতখানা মুড়ে কপালের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল ও। 'মা গো, কেন আমার এমনি হয়...সবারই কি তাই?'—আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রেস্টো বুকের মধ্যে কুর-কুরে খেতে লাগল। আন্তে আন্তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানা মুখ। প্রথম পরিচয়ের সময় যে অসীম আগ্রহ নিয়ে এই মুখখানা দেখেছিল অতসী, তা কবে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু তার অনেক আশা এবং নৈরাশ্রের চেতু এই মুখখানা হয় তো তার জীবনে চিরকালের জন্ম কাঁটার মতো রইল বিঁধে।

॥ ৩ ॥

সুজয়শঙ্করের ফার্মের চাক একজিকুটিভ অফিসার রণজিৎ মুখার্জী কার্যত সুজয়শঙ্করের ডান হাত হয়ে উঠেছিল। নিজের ছেলের সম্বন্ধে নৈরাশ্র এবং অস্বস্তি সুজয়শঙ্করকে বেশি করে আকর্ষণ করেছিল



ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলুন

ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলা এবং নিয়মায়ুক্ততার ওপারেই একটা জাতির শক্তি নির্ভর করে। আমাদের স্বাধীনতা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, একমাত্র একতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সেই বিপদ দূর করতে পারে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করুন।

ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করে তুলুন

যুগটির দিকে। ওপরওয়ালার নৈর্যাত্তিক আগ্রহ অপেক্ষা তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগটাই ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল। তাঁদের ক্লাবে এবং নিকট-মহলে সুজরশঙ্করের অকথিত ইচ্ছা সরব হয়ে উঠছিল যে, মেয়ে কবির সঙ্গে তিনি রণজিতের বিবাহ দেবেন। এই নিয়ে একটা উত্তেজক কানায়ুহারও সৃষ্টি হল। কবির বহু-প্রার্থীর মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যে প্রত্যাশার সঞ্চার করেছিল, এটা এল তার বিপরীত তরঙ্গ হিসেবে। কাছাকাছি বন্ধুদের পক্ষে সত্যাসত্য যাচাই করা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল। রণজিৎ মুখার্জীকে বললে কথাটা সে এড়িয়ে যেত। আর কবির বন্ধুরা তাকে চেপে ধরলে বলত, 'বিয়ে তো করতেই হবে, কিন্তু তার দেরি আছে। একবার বিলেতটা ঘুরে আসতে চাই। বাবা গিয়েছেন, বাঁর সঙ্গে আমার নাম জড়ান্ধিস তিনিও ঘুরে এসেছেন একবার--আমাকে অন্তত তাঁর যোগ্য হতে হবে।'

ঠিক এমনি সময় দৃশ্যপটে অতসীর আবির্ভাব। ও তখন গরমের ছুটিটা কাটাবার জন্তে কলকাতার কাকার বাড়িতে এসেছিল। রণজিৎ আর কবিকে নিয়ে যে আর্ব সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা এখন অতসীকে নিয়ে নতুন পথে মোড় ফিরল। মফস্বলের মেয়ে অতসীর পক্ষে এদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কথা নয়, কিন্তু অতসীর দেহে ছিল সত্যাকার নারী-সৌন্দর্য এবং কোনো কৃত্রিমতার জন্ত তার সজীবতার ওপর মোটেই প্রলেপ পড়ে নি। হঠাৎ রণজিৎ মুখার্জী অতসীর প্রতি অন্তরঙ্গ

আগ্রহাব্যক্ত হয়ে পড়ল এবং সেটাকে সে গোপন করার চেষ্টা করল না। সুজরশঙ্করের বাড়িতে নিয়মিত আসা ছাড়াও কখনও কবি আর অতসী দুই বোনকে একসঙ্গে, কখনো অতসীকে একলাই গাড়িতে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে লাগল। এ ব্যাপারে প্রকাজে কবি উৎসাহ দেখার আর আড়ালে হাসাহাসি করতে থাকে বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু অতসীর অস্বাভাব্য হয়ে পড়লে আবিষ্ট কিশোরী মতো। রণজিৎ মুখার্জী গোপন করার আঁট জেনেও বা গোপন করতে চায় নি (কাদের ও টেকা দিতে চাইছিল তা বুঝই স্পষ্ট)—অতসী সেই আঁট জানত না বলেই সেটা গোপন করতে পারল না। অগ্রদের চোখের সামনেই নিজেকে রণজিতের একেবারে কাছাকাছি এনে ফেলল ও।

কবির বন্ধুরা বললে, 'গ্রামের মেয়ে, পুরুষ কখনো দেখে নি তো। কিন্তু মুখার্জীটা কি রকম, পুরুষরা এমন বোহারা হতে পারে তা জন্মেও ভাবি নি--'

কবি বললে, 'এটা অত্যাঁহ হচ্ছে, তাদের পেছনে ঘুরলে বোধ হয় সেটা বোহায়াপনা বলতিস না--'

'তোমার কি ভাই, পাঁচটার মধ্যে চারটে বাদ দিলেও একটা বাকি থাকবে--'

'ইস, শেষ পর্যন্ত আমার ওপরই কটাক। শোন, নিরাশ হস নে, যাদের কখনো একজনের পিছনে ঘোরার অভ্যাস হয়েছে তারা অন্ধদের পিছনেও ঘুরবে--' দু'একটাকে তোদের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

# লেন্ড্রিন

সর্প দংশনের সুবিখ্যাত মহোষধ

সর্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে। কাকড়াবিছা

ও অন্যান্য বিষাক্ত দংশনের দ্রুত ঔষধ।

"Snake Bite" পুস্তক আবার পাওয়া যাইতেছে; দাম ৫/-

বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয়।

পি, ব্যানার্জী, মিহিজাম

কলিকাতা-অফিস:

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

এরই মধ্যে ওদের ক্লাবের মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে সমস্ত বিক্রপ আর বিদ্রুপতা সত্ত্বেও ওরা চমৎকৃত না হয়ে পারল না। রণজিৎ কথার কথার অন্তরীক একবার বলেছিল তাদের ক্লাবে একদিন গান গাইতে, যদিও সে ভাবে নি যে অন্তরী সত্যিই রাণী হয়ে যাবে। এর মধ্যে অন্তরী গান সে শোনে নি, গান সবচেয়ে তার কোনো উৎসাহও ছিল না। অন্তরী বললে, 'আপনি কি সত্যিই চান যে আমি গান গাই, আপনি খুশি হবেন তাতে?' 'সার্টেনলি, ভাটল বা এ পাস স্কাল ফেভার টু মী-'

সত্যি কথা বলতে কি, রণজিৎ যখন অন্তরীর নাম শিল্পীদের তালিকাভুক্ত করার জন্ত ওদের সেক্রেটারিকে জানাল, তখন ওর কেমন ভয়ই করছিল, ব্যক্তিটা না নিলেই ভালো হত। ওদের নাম ছড়িয়ে যে হাস্যাহাসিটা চাপা ছিল, সেটা কেমন শাণিত বিজ্ঞপে ছিটকে পড়বে তা অনুমান করতে ওর অনুবিধে হল না। ভেবেছিল অনুষ্ঠানের দিন ওর সঙ্গে আসবে না, কবির সঙ্গে অন্তরী চলে যাবে। কিন্তু অন্তরী যেন ঠিক তার বিপরীতটাই ভেবে নিয়েছিল এবং অদ্ভুত আগ্রহ দেখিয়ে ওর সঙ্গেই আসতে চাইলে। বললে, 'আপনাদের ক্লাবে আমি প্রথম যাবছি, এর আগে কখনো কোনো ক্লাবেই বাই নি আমি, একলা গেলে আনাড়ির মতো কিছু করে বসব-'

'ক্লাব-এটিকেটার কথা বলছেন? এ ব্যাপারে আপনার বোন আমাকে তিনবার পাশিল করতে পারেন-'

'কবি? ওরা তো আগেই বেরিয়ে গেছে, বললে যে ক্লাবে যাবার আগে আর কোথায় যেতে হবে। কিবা কে জানে, হয় তো আনাড়ি ভেবে এড়িয়ে গেছে-'

রণজিৎ মুখার্জীর বৃকের ভেতর দক করে উঠল, মেয়েটা এত সরল যে অভিশ্রয় সত্য কথাটাও বুঝতে পারে না, নয় তো এমন গোথালো যে বৃকও স্বীকার করতে চায় না। দু'টো সম্ভাবনাই ওর বৃকের ভেতর ঘুলিয়ে তোলে। কিন্তু পরিস্রাসের ধারাটা বজায় থেখে বললে, 'আমি কিন্তু আপনাকে একটু আনাড়ি বলেই মনে করছি। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে এই সব অনুষ্ঠানে পোশাকপত্র ফিটিং হওয়া দরকার-'

'আমার পোশাকের কথা বলছেন? জানেন, আমি এই শাড়িটা পরেই কলেজের লার্ক সোত্বে গান গেয়েছিলাম, খুব ভালো হয়েছিল। আমি ইচ্ছে করছি এই শাড়িটা পরে এসেছি।'

'কেন, আপনার বোনকে দেখেন নি? সত্যি কথা বলতে কি তাঁর সবকিছুই আমার পছন্দ-হয় না, কিন্তু সে ফার এ্যাক্স ড্রেস ইজ কনসান ড-'

বুহুত্তের জন্ত চূপ করল অন্তরী, কবির কথা ভেবে লজ্জার একটা ছোপ পড়ল ওর মুখের ওপর। বললে, কবি আর আমি বোন, আমরা দু'জনে দু'জনকে খুই ভালোবাসি, কিন্তু আপনি হয় তো জানেন, আমাদের জীবন ঠিক একভাবে গড়ে ওঠে নি। ও আমাকে বোন বলে সব জায়গায় পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, ওরও কোনো কোনো জিনিস-যেমন এট যে পোশাকপত্রের কথা বললেন, সত্যিই ভালো লাগে না আমার। তার মানে, বুঝতেই পারছেন কেউ কাউকে দোষ দিতে পারি নে আমরা-'

'হ্যাঁ হয় আপনি একটু একরোখা। আচ্ছা, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা হক-'

অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। অন্তরীর পালা আসবার আগে পৃথক্ কেমন মনমরা হয়ে রইল ও। এই প্রথমবারের জন্ত ওর মনে একটা সংশয় উপস্থিত হল যে, এখানে এসে সে ভালো করেছে কি না। রণজিৎ মুখার্জী হয় তো সেটা বুঝল, বুহুত্তের জন্ত একটা সমবেদনাও বোধ করলে। কিন্তু সবারই আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে, কবিরের দলে গিয়ে ও নিজের আসন নিলে এবং সরবে গল্প করতে লাগল। ঠিক এইখানেই এল সেই পরিবর্তন। যে নিশ্চিত এবং পূর্বসূচীত বিক্রপ ফেটে পড়ার অপেক্ষার ছিল, সেটা হিম্মর এবং প্রশংসার রূপান্তরিত হল। অন্তরীর প্রথম গানের শেষে রণজিৎ মুখার্জীকে নিয়ে পড়ল ওরা, নতুন শিল্পীর সন্ধানের জন্ত ওদের অভিনন্দন জানালে এবং দ্বিতীয় গানের শেষে অন্তরীকে নিজেরের মধ্যে আব্বান করে নিয়ে এল। বারা ওকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত, তাদের মাঝখান থেকে সেদিন সহজে ও ছাড়া পেল না। অন্তরী জানত না যে জিনিস ও জয় করে নিয়েছে তাকে নিজের জন্ত গ্রহণ করা ওর পক্ষে কতখানি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এরপরে মাঝখান একটা দিন বাদ দিয়ে রণজিৎ মুখার্জীর সঙ্গে সেই বোঝাপড়ার সময় উপস্থিত হল। রণজিৎ আশাবিত, উজ্জসিত এবং নতুন জয়ের আনন্দে অবির হয়ে উঠেছে। কবি কার্যত তাকে প্রত্যাখ্যান করে যে আঘাত দিয়েছিল, তার প্রত্যুত্তর দিতে পারবে সেই সম্ভাবনার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও। কথা উঠেছিল ওদের ক্লাবের আগামী অনুষ্ঠানে যে নাট্যাভিনয় হচ্ছে, তাতে অন্তরীর অংশগ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে। অন্তরী অস্বীকার করেছে এবং রণজিতের অমুনর সত্ত্বেও তাতে মত দিতে পারছে না। স্তম্ভরশব্দের বৈঠকখানায় অন্তরীর পাশে বসে তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রণজিৎ বলছিল, 'দেখুন, (ইচ্ছে সত্ত্বেও এতদিনেও রণজিৎ অন্তরীকে 'তুমি' বলতে পারত না) বারবার কেন না বলছেন? সকলের কাছে আপনি কতখানি সম্মান পাবেন, আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে কতখানি। আমার ভাবতে ভালো লাগে, আপনার নাম কাপজে বেরোছে, সকলেই জানাচ্ছে অভিনন্দন, আপনাকে দেখবার জন্ত সকলের চোখেই আগ্রহ, আর তার মাঝখান থেকে আপনাকে আমি নিয়ে আসছি-আপনি আমাকে সেই গৌরবের অধিকারী করতে চান না?'

'আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নে, আমি বা ঠিক তাকেই আপনি স্বীকার করতে পারেন না, না?' পরিপূর্ণদৃষ্টিতে রণজিতের দিকে তাকাল অন্তরী, সেই দৃষ্টিতে একই সঙ্গে বেদনা আর অমুনর ফুটে উঠল।

'তা নয়, আপনার সঙ্গে আমার যে দেখা হয়েছে সেটাকে আমি পূনরুদ্ধার বলেই মনে করি। কিন্তু বিয়ের সবচেয়ে ট্রাডিশনাল ধারণাটা আমি পছন্দ করি নে। বিয়ে সবাই করে, বিয়ের পরদিন তাদের আর কেউ মনেও রাখে না। কিন্তু আমাদের একটা সমাজ আছে, সেখানে হুঁটি মাছুষ বিয়ের দিনের পরেও বিশেষ হয়ে রইল এইটে কি চাইবার মতো জিনিস নয়?'

বুদ্ধিমত্তী অন্তরীর পক্ষে একবার অর্ধ বোঝা কঠিন নয়। ও



## পরীক্ষার্থী

সুস্থভাবে বললে, 'আমার ধারণা কিন্তু ঠিক তার উল্টো।' বিয়ে হবে একান্ত ব্যক্তিগত, একমাত্র ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বা অন্তরে কৌতূহলী চোখের সামনে আসবেই না। বা কিছু লোক-লৌকিকতা তা সেই সবটিকে কেন্দ্র করেই থাকবে..'

'সেখানে অফিস থেকে ফেরার পর স্বামীকে জী চা করে খাওয়াবে, জাত খাবার সময় পাখা হাতে করে বসবে, শোবার সময় পদসেবা করবে..'

হেসে ফেলল অতসী, কিন্তু গভীর হতে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সেটাই তো ইচ্ছা উচিত।'

অতসীর হাতখানা ছেড়ে দিলে রঞ্জিত মুখার্জী, সিগারেট ধরাবার অহিলার একটু দূরে সরে গিয়ে বসল এবং সিগারেট বের করে বাস্তব উপর ঠুকতে লাগল। এইরকম জীবন সন্তাননাতেও ওর বুক ভেতরে কেমন করে ওঠে। ভিত্তিকর্তে বললে, 'সে কথা বাক, কিন্তু এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে আপনার আপত্তি কোথায়, জানতে পারি?'

শুর কেটে গেল, এতকণ কথ বলার যে আগ্রহ বোধ করছিল অতসী সেটা অর্ধশব্দ হয়ে উঠল। তবু কথাটা শেষ করা দরকার সেইজন্য বললে, 'পুরুষদের সঙ্গে আমি কখনও অভিনয় করি নি, মা সেটা পছন্দ করবেন না। তা ছাড়া, আমার কলেজ তখন খুলে যাবে..'

'সত্যিই, আমার অবাক লাগছে, আমি আপনার সব্বন্ধে' কি ভেবেছি। পুরুষদের সঙ্গে আপনি এর আগে অভিনয় করেন নি। এই পৃথিবীতে আপনি আগে ছিলেন না, কিন্তু এখন তো বেশ চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন..'

উঠে ঈড়াল রঞ্জিত, অসম্ভব সিগারেট শুধু পি ছে দুইহাত মুড়ে পায়েচর করতে লাগল। তার কথার কোনো উত্তর প্রত্যাশা করে নি সে, কিন্তু অতসী বললে, 'আমার বিশ্বাস, আমার ইচ্ছার ওপর কোনো লঙ্কাই আপনি রাখতে চান না?'

শাঠিত ব্যাপারটা কলহে এসে ঈড়াল। রঞ্জিত এটা আশঙ্কা করে নি, সুস্থওর মধ্যে সেই কর্মিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী, সুন্দা যুবকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক পা এগিয়ে এসে অতসীর দিকে খিরদৃষ্টিতে তাকাল, বললে, 'ঠিক তার বিপরীত, আপনিই আমার সব্বন্ধে কোনো শ্রদ্ধা রাখতে পারছেন না। কথার খেলা আমি পছন্দ করি নে, কিন্তু আমার ইচ্ছেটাও আপনি জানতেন। আমি আপনাকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যেখানে আমি আছি, আমি চেয়েছিলাম সেখানকার আপনি কল্লেখমণি হয়ে উঠবেন..'

'শুধু, আপনি বা বলছেন তার থেকে গর্বের বিবরণ কোনো মেয়ের পক্ষে হতেই পারে না। কিন্তু তার ব্যাখ্যাটা আমি অন্তরকম বুঝি। আমাকে আপনি সাজাতে চান ঠিক কবি আর তার বন্ধুদের মতো..'

'দেখছি যে আপনি আমাদের সমাজকে ভীষণ ঘৃণা করেন। তা না হলে এসব কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা কেন বুঝতে পারেন না যে আপনাকেই আমাদের সমাজে আসতে হবে, আমাকে নিশ্চয়ই আপনারদের মধ্যে নিয়ে যাবেন না..'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল অতসী, একটা দুঃস্থ কান্নার বেগ থেকে প্রাণপণে নিজেকে সংবত করল। সুস্থভাবে বললে, আপনি একটু আগেই বলছিলেন ট্রাডিশনাল ধারণা আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু এটা হচ্ছে মেয়েদের প্রতি পুরুষের চিরকালের নিদে..'

রঞ্জিতের দৃষ্টিতে আহত বিশ্বয় ফুটে উঠল, কিন্তু কি বলতে গিয়ে সংবত করল নিজেকে। অতসীর বিপরীত দিকে সামনের একটা কোচে বসে বীরে-স্বস্তে বললে, 'লোটে আস চেষ্টা দি টপিক, আপনি আর কতদিন কলকাতার আছেন?'

'বোধ হয় দিন-পাঁচেক, মাঝে অনেকদিন দেখি নি, চিঠিও পাই নি..'

'আচ্ছা, আপনারদের বাড়িতে কে কে আছেন?'

কথাবার্তার মধ্যে একসময় ও অনুরোধ করলে, 'আচ্ছা, এক মধ্যে একদিন আমাদের বাড়িতে আপনার বাঙালি সম্ভব হবে, ধরুন পরশু দিন সন্ধ্যা সাতটার?'

অতসী সম্মতি দিতে তখনকার মতো কথাবার্তা শেষ হল।

কলকাতা থেকে আসার আগের দিন স্তম্ভশঙ্কর অতসীকে বললেন, 'আমি একটা কথা ভাবছি। তুই যদি ট্রালকার নিয়ে এসে আমাদের এখানে থেকে পড়িস তা হলে কেমন হয়?'

'কেন.. না, মানে, আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না..'

'বুঝতে ঠিকই পারছিস, কবুল করতে চাস নে..'' যেন ওকে অনুমান করতে দেখার ক্ষমতা একটুখানি খামলেন স্তম্ভশঙ্কর, তারপর বললেন, 'এই এতবড় বাড়িতে একলা থাকতে ভালো লাগে? যদি বাইরে বাইরেই কাটার, কবি করেন বাবার চেষ্টা করছে.. আচ্ছা, তোকে এখনই উত্তর দিতে হবে না, বৌদিকে আমি লিখব..'

ঠিক তখনই নয়, কিন্তু অতসীর পরে বুঝতে অনুবিধে হয় নি স্তম্ভর কেন তাকে কলকাতার গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। তাঁর জীবনের সব আশাই তাঁর শিল্প-শ্রুতিষ্ঠানটির ওপর নির্ভর করছে, আর সেই পুরো রঞ্জিত তাঁর কাছে অপরিহার্য। কবিকে দিয়ে বখান তাকে রাখতে পারেন নি, তখন তাঁর কাছে অতসীর প্রয়োজন হল। ক্রমে ক্রমে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

## II 8 II

ছাত্রী-নিবাসের সকালবেলাকার চা-পর্ব শেষ হয়ে গেছে এমন সময় অতসীর ঘুম ভাঙল। বেলা পর্বন্ত ঘুম না ভাঙলে বা হয়, ওর সমস্ত শরীর ভাব-ভার, মাথা টিপ-টিপ করছে, অতসী অনুভব করল ওর গলায়-কপালে বায় মিশেছে; শাড়ির আঁচলে মুহূর্তে-মুহূর্তে ক্রান্ত ভঙ্গিতে আরনার সামনে এসে ঈড়াল ও, কিছু না ভেবেই। হঠাৎ চমকে উঠল ও, দুই চোখের কোণা থেকে গাল আর নাকের ওপর ছুঁটি কালো দাগ নেমে এসেছে। ইস, ও কি রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে কেঁদেছে না কি?

সহসা একটা তীব্র প্রাণি অনুভব করল অতসী, কি হয়েছে তার? কাল রাত্রিতে যদিও কে চিঠি লিখতে বসে বা আরম্ভ হয়েছিল, সেটাই সমস্ত রাত্রি ধরে তার বুক ভেতর কুসে-কুসে খেয়েছে? যে জিনিসটা এতদিন চাপা পড়েছিল সেটাই হঠাৎ এমনভাবে বিহ্বল করে ফেলল তাকে। বন্ধুর সহানুভূতিই কিংবদন্তি কারণ? তা নয়

সেই আঘাতের বেদনাটা সে ভুলতে পারে নি বলেই তাকে এমন অজান্তে হয়ে পড়তে হয়েছিল।

নিজেকে শক্ত করে তুলল ও। সামনেই পরীক্ষা, কাল রাতে খাওয়ার পর পড়া হয় নি, সেইটে খারাপ লাগল ওর। আন্তে আন্তে পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে গেল ও; কিন্তু ওর পক্ষে এই স্বস্তি পাবার কথা নয়। দশটা নাগাদ একটা চিঠি পেল ও, সুরেলডাঙা থেকে বীণা সেনগুপ্ত লিখেছেন তার মায়ের অসুস্থতার খবর দিয়ে। বীণা ওখানকার স্থলেরই শিক্ষয়িত্রী, তাদের প্রতিবেশিনী, অতসী তাঁকে মামিমা বলে ডাকে। চিঠি পেয়ে অস্থির হল না অতসী, এই রকম একটা খবরই যেন সে প্রত্যাশা করেছিল। একটা অন্তত ছাত্রা যেন আন্তে আন্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এর আগে কোনদিন নিজেকে সে এতটা বিষন্ন নিজেকে মনে করে নি।

আনন্দপুর থেকে সুরেলডাঙা মাত্র পনের মাইলের পথ, মটর অগ্নিমা বিশ্বাসকে বলে দুপুরের গাড়িতে রওনা হয়ে গেল অতসী। কবি তাকে বিদায় দেবার সময় চোখের জল ফেললে। অল্প মেয়েরা সামনেই তার পরীক্ষার কথা ভেবে ভয় করতে লাগল। কিন্তু অতসীর বৃকের মধ্যে যে ভয় ছিল, তাতে এই আশঙ্কা তাকে স্পর্শই করতে পারল না। ওর মনে হতে লাগল, সুরেলডাঙায় গিয়ে মাকে আর দেখতেই পাবে না। বতই জায়গাটার কাছাকাছি হল ও, ততই ওর বৃকের ভেতর খামচে ধরতে লাগল।

সুরেলডাঙা স্টেশন থেকে মিনিট-পাঁচেকের পথ ওদের স্থলের দেওয়া কোয়ার্টার, এক রকম ছোট্ট মতো করেই রাস্তাটা পার হল ও। দূর থেকে দেখলে ওদের বারান্দাটা খালি, কিন্তু দরজা জানালা খোলা, পরিচিত পর্দাগুলো বাতাসে ভুলছে। আশ্চর্য স্বস্তির মতো লাগল ওর। বারান্দার পা দিয়েই ও ডাকল, 'মা--'

দুর্বল, পরিষ্কার উচ্চারণে কিন্তু বিশ্বরমাখানো স্বরে মালিনী দেবী ভেতর থেকে বললেন, 'তুই--কি ব্যাপার? আর--'

মন হল আসন ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু তার আগে অতসী ঘরে ঢুকে বললে, 'কেমন আছ?'

উত্তরটা যেন মায়ের মুখ থেকে না শুনে নিজের পড়ে নিতে চাইলে ও। না, বোধ হয় তার আশঙ্কা অমূলক, বিছানার পাশে আরাম-কোয়ার্টার মা চেনা-ভালোতে শুয়ে রয়েছেন, হাতে করে কখনো চিঠি। অতসীর জন্য একটুখানি সোজা হয়ে বসেছেন। অতসী পায়ের হাত দিতেই বললেন, 'বীণা বুঝি তোকে আসতেই লিখেছিল?'

ভুরু কুচকে উঠল তার।

'না, কিন্তু এই খবর শুনে না এসে থাকি যায়?'

'কিন্তু ক'দিন পরেই তোর পরীক্ষা--এই সময় কোনোরকম ডিকার্ব্যাঙ্গ না হলেই ভালো, আমারও এমন কুখর, চঠাং--বাক গে, তুই যেমন আছিস বল? মুখ এক তুকনো কেন--?'

বৃকের ভেতর থক করে উঠল অতসীর, মুহূর্তেই বললে, 'আমি ঠিকই আছি মা। কিন্তু তোমার ঠিক কি হয়েছে বলা তো--' বলতে বলতে মায়ের পায়ের কাছে মেয়েতেই বসে পড়ল অতসী। মালিনী দেবী ওকে বিছানার ওপর উঠে বসতে বললেন। একটু আগে যে চিঠিগুলো পড়ছিলেন তিনি, সেগুলো রাখলেন ঠিক ওর পাশেই। অতসী লক্ষ্য না করে পারল না মায়ের ওপর অস্বস্তিকর

হাতের অক্ষর। 'ওমা, কাকা কি এর মধ্যে এতগুলো চিঠি লিখেছেন মাকে--' অতসীর মনে পড়ল, গেল বারে কলকাতা থেকে আসার পরই তার কলকাতা বাওয়ার প্রস্তাব করে কাকা লিখেছিলেন। অতসীর তীব্র আপত্তির জন্য সেই প্রস্তাবটা স্বীকৃত হয় নি--ওর ভালোই লেগেছিল যে মাও তাতে রাজী হন নি। কিন্তু তারপর এই চিঠিগুলো কবে লিখলেন তিনি, মা তো সে নিয়ে কিছু বলেন নি তাকে। মা নিশ্চয়ই উত্তর দিয়ে লিখেছেন, তা না হলে একতরফা এতগুলো চিঠি হবে কি করে। একটা কৌতূহল বোধ করল ও, কিন্তু অস্বস্তিই বেশি করে লাগল, কে জানে তাকে নিয়ে কি হচ্ছে।

মালিনী দেবী ওর কথার সূত্র ধরে বলছিলেন, 'ট্রাবল্ সেই একই রকম, বৃকে-পাঁজরার ব্যথা, এবারে বেশি হয়েছিল এই বা--' প্রেসার কত আমাকে বলে না। কিন্তু সে আর কি--আজ এটা কাল ভটা আছেই--' চঠাং অতসীর চোখের দিকে চোখ পড়ল ওর, বললেন, 'তোমার কাকার চিঠি, পড়ে দেখতে পারিস--'

মুখখানা টান হয়ে উঠল অতসীর, বললে, 'আমাকে পড়তে বলছ কেন? পড়তে হচ্ছে করছে আমারও। কিন্তু--মা?'

মালিনী দেবী বলতে গেলেন, 'ন', ভয় করবার কিছু নেই তো--', কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেন, ঠোট দুটো কঁপে কঁপে স্থির হল। যে উদ্বেগটা চেপে রেখেছিলেন তিনি, ঠিক একক্ষণ পরেই সেটা ফুটে উঠল ওর রোগশরীরে।

বাইরে হাকা চটির শব্দ শোনা গেল, আর পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন বীণা, অতসীর মামিমা। 'এই যে, তুই এসেছিল। বাব্বা, আমি এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু এত চুপচাপ কেন সব, আমি বুঝতেই পারি নি--'

মালিনী দেবী বললেন, 'তুমি ওকে কি লিখেছিলে বীণা? ও চলে এল, সামনেই পরীক্ষা ওর--'

'হোক পরীক্ষা, ওর ভয় কিসের, তোমারই মেয়ে তো--'

'ঠিক তাই, ও যদি আমার মেয়ে না হত--' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন মালিনী দেবী। কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বীণা, তুমি অনেকক্ষণ এসেছে, ওর কিছু খাওয়া হয় নি এখনো। তোমার ওখানে নিয়ে যাও না ওকে--'

'না-না, মামিমা, আমার এখন খাবার দরকার নেই কিছু, তুমি বসো--'

'বিরক্ত করিস নে তুমি, চলে যা। পাঁচুর মা'র আসতে দেরি আছে--' বলে মালিনী দেবী ওদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

সন্ধ্যার কতক্ষণ পরে পাঁচুর মা কাজকর্ম, রান্নাঘর দিয়ে চলে গেল। বীণা একসঙ্গে গল্প করছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। আজ আর রাত্রিতে থাকার প্রয়োজন নেই, অতসীই থাকবে। মালিনী দেবী বিছানার অনেক আগের থেকেই শুয়েছিলেন, অতসী মেঝের থেকে উঠে গিয়ে পায়ের কাছে বসল। হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আন্তে আন্তে।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে মালিনী দেবী মুহূর্তেই বললেন, 'তোমার কাকার চিঠিগুলো পড়লি?'

'পড়লাম--' অতসীর হাতখানা খেঁষে গেল, 'এর মধ্যে ব্যাপারটা

## পরীক্ষার্থী

অনেকদূর এসিগেছে দেখছি। সব কথা জানতে আমারই খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু তোমার এই অবস্থার কোনো কথা না বলাই ভালো। তুমি একটু সুস্থ হয়ে ওঠো, আমারও পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

‘দেখ, তোকে বীণা চিঠি লিখে আনাক এটা আমি চাই নি, কিন্তু তুই বরন এসে পড়েছিল তখন ভালোই হয়েছে। কতকগুলো কথা তোকে না বললেই নয়...’ খামলেন মালিনী দেবী, হয় নিজের আবেগটা সযত্ন করতে চেষ্টা করছিলেন, নয় তো কি বলবেন ভাবতে পারছিলেন না। ‘তুই কি ভালিস, আমার কত একসা, মানে...তুই কোনোদিন আমাকে ছেড়ে নিজেকে ভেবে দেখেছিস? কি মনে হয় তোকে...’

অতলী বুকল তাকে কথা বলতে হবে। ‘কোনোদিন কিছুই মনে হয় নি আমার, কিন্তু চিঠিগুলো পড়ে মনে হচ্ছে আমাকে নিয়ে তুমি খুব বেশি ভাবছ। মা, বাবা আমার ছেলেবেলার কবে মারা গেছেন, কোনোদিন তো কিছু মনে হয় নি তোমার? আমাকে একলা ভাবতে দিয়েছ তুমি?’

‘একটা কথা অস্বীকার করতে পারিস... আমার দেহের এই অবস্থা, আজ হোক কাল হোক...’

‘মা, তুমি এমন নিষ্ঠুর হতে পারো? এসব কথা বলছ কি করে তুমি...’

‘বলছি, তার একমাত্র কারণ তুই-ই, সেটা বুঝতে পারছিল না... তোমার জন্তে মরেও আমার শাস্তি নেই।’

মাঝে মাঝে কথারবার্তা এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যার জন্ত কান্নাই প্রস্তুতি থাকে না। কোনোদিন মায়ের কাছে কড়া কথা শুনেছে বলে অতলীর মনে পড়ে না, এইরকম তিরস্কার তো নয়ই। এতক্ষণ নিজের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখেছিল ও, এখন সহসা মায়ের দিকটা তার চোখের সামনে অনাবৃত হয়ে উঠল। মালিনী দেবী কথাটা বললেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাঁর চোখে অশ্রু নেই, বরঞ্চ পরাজিতের একটা গ্রানি তাঁর মুখখানাকে কালো করে তুলছে। একটু আগেই যে সম্ভাবনার বিকশে সংগ্রাম করবার জন্ত মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল ও, দেখলে মা তারই বিকশে এককাল মাথা উঁচু করে ঝাঁড়িয়ে

থেকে আজ ভেঙে পড়েছেন। নারী কি চিরকাল এমন করেই ভেঙে পড়বে। ‘না, তা হতে পারে না, অসম্ভব...’ তীব্রকণ্ঠে উচ্চারণ করতে গেল ও, মায়ের এতদিনকার শিক্ষা আর জীবন মায়ের বিকশেই উত্তেজিত করতে গেল ওকে, কিন্তু ঐ নিস্তেজ নিঃশেষিত মুখের দিকে তাকিয়ে বৃকের ভেতর সঙ্কল্প হয়ে উঠল ওর। নিজেকে সযত্ন করে আশু আশু ও বললে, ‘মা, কাঁকাবাবুর চিঠিগুলো সব আমি পড়লাম। আমাকে কি করতে হবে তুমি বলো...’

চোখ ফেরালেন মালিনী দেবী। যেন কথাগুলো তাঁর নিজের নয়, আগের থেকে কেউ ভালিস দিয়ে রেখেছে এমন করে বললেন, ‘দেখ, ওদের সঙ্গে মাঝখানে দীর্ঘকাল আমাদের যোগ ছিল না, কিন্তু তার

## — প্রত্যেক মানুষের জেলে রাখা উচিত —



চুল পাকলে অথবা  
মাতার চুল উঠে গেলে  
আপনার সৌন্দর্য্য  
বর্ষ হয়ে যায়...

## ইলোরা কুঁচ অয়েল

চুল উঠা বন্ধ করে  
মাথা ঠাণ্ডা রাখে

ইলোরা কেমিক্যাল . কলিকাতা-২

আগে বরিশালের গ্রামে আমাদের পরিবার একই ছিল, এখন বেগমুজ্জটা আবার গড়ে তোলাই ভালো..’

‘মা, এখন সেটা ওদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হবে না?’

‘তুসী, উনি তোরা বাবার নিজের ভাই, কাকু..’

এর উত্তর অতসীর অজানা নয়, অনেক দিনই সে কথা ভেবেছে ও। রক্তের সন্ধন বে বন্ধনে বাঁধে, মানুষের নিজের কীর্তি তাকে অস্বীকার করে চলে। গেলবার অন্তত এটা বুঝে এসেছে যে, স্বজন্মশঙ্কর যেখানে নিজেকে নিয়ে গেছেন, সেখানে অতসীর সঙ্গে তাঁর রক্ত-সম্পর্কের দোহাই বুঝা। বললে, ‘আচ্ছা মা, বাবা মারা যাবার পর এসব কথা তো তোমার মনে হয় নি। বাবা যে খুল রেখে গিয়েছিলেন..’

‘খুল! মালিনী দেবী গাল’সু খুল হয় তো থাকবে, কিন্তু মালিনী দেবী থাকবে না। অনেকদিন থেকেই নেই। তুই কি জানিস, তোরা বাবার খুল অনেকদিন মরে গেছে, আদর্শ নেই, সে রীতিনীতিও নেই..কিন্তু আজ থাক, তুই শুয়ে পড়। আমার ইচ্ছের কথা তুই জেনে রাখলি, তাকেই এখন নিজের জন্ত সমাধান খুঁজে বের করতে হবে..’ বলে পাশ ফিরে শুনে মালিনী দেবী।

॥ ৫ ॥

সুদেলভাটা থেকে ফিরে এসে পড়াশুনোর মনঃসংযোগ করল অতসী। বৃক্ক ভেতর যে আগুনই জ্বলুক না কেন, স্পষ্টতই ও বুঝতে পারল যে ওকে শাস্ত থাকতে হবে। মা বলার ‘সময় বা ওর মনে হয় নি, এখানে ফিরে নিজেকে সত্যিই একলা মনে হতে লাগল ওর। সেটা কাটাবার স্তম্ভ ও বেশি করে পড়াশুনো নিয়ে গড়তে হল ওকে।

আশ্চর্য এই, মানুষের মন ঘটনা-নির্ভর হলেও ঘটনা মানুষের মনের সঙ্গে তাল রেখে চলে না। অতসী জানত না, পরীক্ষা দেবার পর মায়ের সঙ্গে আর তার দেখা হবে না। ইতিমধ্যে মায়ের অসুখ বাড়তে তাঁর ইচ্ছামুসারেই কলকাতার খবর দেওয়া হয়েছিল, স্বজন্মশঙ্কর নিজে এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরীক্ষার পর খবরটা সে পেল অজুতভাবে। পরীক্ষা সে ভালোই দিয়েছিল। সহপাঠিনী বন্ধুদের সঙ্গে এরপর হয় তো আর দেখাই হবে না, সকলেই আনন্দ-কলরব করে দু’দিন কাটিয়ে দিলে। অবিমাদির কাছে বাড়ি যাবার অনুমতি চাইতে তিনি বললেন, ‘তোমার বাড়ি যাওয়া নিয়ে কথা আছে, আমার ঘরে দেখা কোর..’

সকালবেলা সমস্ত হোস্টেল পরিক্রমা করে নিজের ঘরে যখন তিনি এলেন তখন অতসীর মনে হল তিনি একটু পরিশ্রান্ত, হয় তো ঊষং উত্তেজিত। অল্প উপলক্ষের মতো সোজা হুজি কাজের কথাই এলেন না তিনি, কেবলই দেরি করতে লাগলেন। ঝিকে দিয়ে চা আনিরে নিজে চুখ দিতে লাগলেন, অতসীকেও বললেন খাওয়ার জন্ত।

একটি মাত্র আশঙ্কাই অতসীর বৃক্কের ভেতর খামচে ধরল, স্থিরমুষ্টিতে ওর ঝিকে তাকিয়ে বললে, ‘দিদি, মায়ের সন্ধকে কোনো খারাপ খবর আছে?’

মেটন ওর কথার উত্তর না দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘স্বজন্মশঙ্কর রায় তোমার কে হন?’

‘আমার কাকু..’

‘ও, এতবড় একজন লোক তোমার কাকু! এর আগে কোনো

দিন তো বলো নি। তিনি আজ দুপুরে তোমাকে নিতে আসবেন। তোমার মায়ের কথা তিনিই তোমাকে শোনাবেন বলেছেন..’

‘দিদি, আমার মা কি আর নেই?’

‘তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে। তোমাকে সাধুনা দেবার ভাষা আমার নেই। কিন্তু বে ঘটনার ওপর আমাদের কান্নারই হাত নেই..শোনে..’ বাঁহাতের কমাল মুখের ওপর তুলে ধরে অতসীর কাছে উঠে এলেন তিনি, তাঁর মাথার ওপর হাত রাখলেন।

অতসী নিজের ঘরে গিয়ে নিশ্চুত হয়ে বসে রইল। ছাত্রী-আবাসিকাদের কাছে অতসী সর্বদাই বিষয় আর শ্রদ্ধার পাঞ্জী, এই সংবাদে সত্যাকার একটা বেদনাবোধ করল ওরা। সাধুনা দেবার জন্ত ওরা ছুটে এল, কিন্তু কেবল ভিড় করে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না। অতসী কবিরে বললে, ‘আমি একটু একলা থাকতে চাই..’, বলে দরজা বন্ধ করতে যেতেই কবি বললে, ‘ওরা যাক, কেবল আমি থাকি..’ অতসী বোধ হয় কথাটার অর্থ বুঝল, বললে, ‘আচ্ছা..’। কবির উদ্বিগ্ন, স্নেহাতুর, সাধুনীর উৎসুক চিত্তেও অতসীর কটন নীরবতা দুর্ভেদ্য বলেই মনে হতে লাগল, একসময় উঠে গেল সেও।

বেলা একটার পর ওর বন্ধ দরজার টোকা পড়ল। মেটন বললেন, ‘স্বজন্মশঙ্করবাবু এসেছেন, তুমি এসে..’

একবারে তৈরি হয়েই বেরিয়ে এল অতসী। মেটন বললেন, ‘তুমি এখনও খাও নি, যাবার দিন কিছু খেয়ে যাবে না সেটা ভালো দেখার না..’

উত্তরে অতসী কেবল প্রশ্নম করল তাঁকে। বন্ধুদের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও, কবির হাতে নিজের হাতখানা একবার রেখে বললে, ‘আমি যাচ্ছি..’

ওদের চোখের জল বাধা মানল না।

ভিজিটর-কমে স্বজন্মশঙ্কর বসেছিলেন। তাঁর পরিচিত শাট-ট্রাউজার নেই, ধূতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। এই পোশাকে তাঁকে ঘরোয়া এবং কতকটা বিবর, দুর্বল বলে মনে হল। কিন্তু সহসা একটা সাদৃশ্যের কথা মনে হল অতসীর। বাবা এই পোশাকই পরতেন, তাঁর ছবির মূর্তির সঙ্গে এই চেহারা অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু তিনি ছিলেন অনেক বেশি প্রসন্ন আর উজ্জল।

অতসী আসতেই উঠে এলেন স্বজন্মশঙ্কর, ‘থাক, থাক, প্রশ্নম করতে হবে না..’ ওর মাথার হাত রাখলেন তিনি। অমন জাঁদরল মাথুটিও কথার জন্ত হাতড়াতে লাগলেন, ‘তাঁর পরীক্ষা কেমন হল..’

ঘাড় নাড়ল অতসী। মুহূর্তেই বললে, ‘কাকু, চলুন..’

মনে হল আরো কিছু বলবেন স্বজন্মশঙ্কর। অতসীকে বিহ্বল অবস্থায় দেখবেন আর তাকে শাস্ত করতে হবে এই ছিল তাঁর ধারণা, কিন্তু অতসীকে অসাধারণ শাস্ত, আশ্চর্য দেখে নিজেই কেমন বিহ্বল হয়ে উঠলেন। ‘আমি গাড়ি এনেছি, চল। বাই দি বাই, তুই তো জানতিস কবি অক্সফোর্ডে গেছে। চিঠি পেয়েছি ওর, লিখেছে যে ভালোই করেছে..’

‘কাকু, মরিদা এখন কোথায়?’

প্রশ্নটা স্বজন্মশঙ্করের ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু নিজেকে

## পরীকার্ণিনী

অতিক্রম করে বললেন, 'ওর লার্ক চিঠি পেয়েছি তুবনেশ্বর থেকে... কি হল?'

ছাত্রী-নিবাসের সামনের ছোট বাগানটি পেরিয়ে মেন-গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অতসী। বাস্তব উপর সজ্জরশঙ্করের পরিচিত মূল্যবান কার দাঁড়িয়ে, আর গাড়ি থেকে নেমে প্যাটের পকেটে হাত ভরে পাড়চারি করছে বর্ণিত মুখাঙ্গী। স্পষ্টত, সেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে নিয়ে যাবে। বৃক্কের ভেতর থক থক করে উঠল ওর, সজ্জরশঙ্করকে বললে, 'কিছু না...', কিন্তু গেটের বাইরে বেরিয়েই ও জিজ্ঞেস করলে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'কেন, কলকাতার, আমাদের বাড়িতে...', তৎক্ষণাৎ ওর চোখে একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল, 'আশা করি এতে তোর আশ্রিত নেই?'

কিন্তু অতসীকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, 'তোরা বোধ হয় মনে আছে গেল ছুটিতে তোকে কি বলেছিলুম... মণি-রবি হু'জনেই কলকাতার বাইরে... বাড়িতে আমি একলা, আমার ভার তুই নিতে পারিস না?'

'কাকু, আমি কলকাতাতেই থাক...'

সজ্জরশঙ্কর আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বর্ণজিৎ এগিয়ে এসে হু'হাত তুলে নমস্কার করল অতসীকে। বললে, 'আমুন, আপনি বৈশোক পেরেছেন তাতে সান্থনা দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।'

অতসী ঈর্ষং মাথা মত করে এটা স্বীকার করে নিলে এবং তারপর গাড়িতে উঠে বসল। সজ্জরশঙ্কর ওঠার পর বর্ণজিৎ স্টাট দিলে। অতসী পেছনে ছাত্রীদের দিকে একবার তাকাল। বৃক্কের ভেতর কঁদে উঠল ওর। ওরা তাবছে অতসীর নিজের কাকা এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছেন, নিজের ঘরেই ফিরে যাচ্ছে ও, কিন্তু ওরা জানল না সত্যিই ও কোথায় ভেসে চলেছে।

ঘ্যাণ্ড ট্রাক বোড দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে হাওড়ার দিকে ছুটে চলেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সুরেলডাঙা এসে পড়বে, তারই পাশ দিয়ে বেতে হবে ওদের। বাইরের দিকে মুখ করে বসে রয়েছে অতসী, আর সজ্জরশঙ্কর খানিকটা উৎসব খানিকটা সতর্কতার সঙ্গে ওর দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ অতসী ওর দিকে ফিরে বললে, 'কাকু, মায়ের মৃত্যু কবে হয়েছে?'

'দিন-পনেরো আ গে, বো ল ই এপ্রিল...'

'মায়ের অস্থখ কবে বাড়ল আর কবেই বা নিয়ে গেলেন আপনারা?'

সজ্জরশঙ্কর উত্তর দিতে যেতেই হঠাৎ আবার ও বলে উঠল, 'কাকু, আমি জানতে পারি কেন আমাকে মায়ের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় নি, কিছুই জানানো হয় নি কেন আমাকে?'

এই প্রশ্নের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন সজ্জরশঙ্কর, কিন্তু তরুণী তাইকিটির চোখে

যে কান্না দেখবেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন, সেখানে একটা বঠিন আক্রোশ দেখে শঙ্কিত হলেন। ওর কাছে সরে এসেন তিনি, মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুসী, শোন, একটা জিনিস তোর কাছে প্রত্যাশা করব? বল, সব না শুনেই আমাকে আগামীর কাগড়ার দাঁড় করাবিনে? বারোই, তোদের কে বীণা সেনগুপ্ত, তাঁর কাছে থেকে চিঠি পেলাম বৌদির বঠিন অস্থখ। নিজেই এসেছিলাম আমি, জিজ্ঞেস করলাম তোকে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। বৌদিই জেদ করলেন তোকে খবর না দেবার জন্য। তোর তা হলে পরীক্ষা দেওয়া হবে না, এট ছিল তাঁর আশঙ্কা। আর সে আশঙ্কাটা অমূলক নয়। কলকাতার গিরেও খবর দেওয়ার কথা ভেবেছি। কিন্তু সেই একই নিষেধ, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে যেন কোনো খবরই না দেওয়া হয়। খারাপ কিছু ঘটলেও না। আর তুই তো জানিস, দাদা বা বৌদির কোনো ইচ্ছাকে অমাত্র করার সাথে আমাদের নেই। তোদের বীণা সেনগুপ্তও তো তোকে খবর দিতে পারতেন, দিতে পারলেন না কেন? শোন... ভেবে দেখ, বছরখানেক আগেও তাঁকে কলকাতার নিয়ে যাবার কথা ভাবতেও পারতাম না, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় গেছেন, তা না হলে...'

'কাকু, এই যে আমাকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, এটাও কি মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য...'

ওছূত অধিনয় ওর কঠিনের, বর্ণজিৎও পেছনে ফিরে তাকাল একবার। সজ্জর স্টো গায়ে মাখলেন না, 'কেন, তাতে কি তোর অধিষ্ঠান হয়? তবে বলতে পারিস, সে ইচ্ছার সঙ্গে আমারও ইচ্ছা যুক্ত হয়েছে, অনেক আগে থেকেই সেটা ছিল তুই জানিস।'

'আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন এটা আমার বিচ্ছেদ বড়ায় নয়? আমি ভাবতেই পারি নে মা-ও তাতে যোগ দেবেন...'

আবার বর্ণজিৎ ফিরে তাকাল, বৈধব্যটি ঘটল সজ্জরও, বললেন, 'কি বলছিস, তুসী? তুই বৌদির সবচেয়ে সন্মান রেখে কথা বলতে পারছিস না? তোর প্রতি কি অগাধ স্নেহ ছিল তাঁর, তোর কল্যাণই চেয়েছিলেন তিনি, আর...'

অতসী মাথা নীচু করে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমিই। আমার ভালোর জন্যই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু কাকু, আমার ভালোর জন্য

পেটের ময়ূরবা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন !  
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া  
দ্বারা বিশুদ্ধ  
মতে প্রস্তুত

# বাকলা

ভারত গণ্ডা রোজি নং ১৬৮৩৪৪

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ  
রোগী আরোগ্য  
লাভ করেছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,  
মুখে টকভাব, তেলুর ওঠা, বমিভাব, বনি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজালা,  
আহারে অরুচি, স্বল্পপনিদ্রা ইত্যাদি রোগ মত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।  
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাত হয়েছেন, তাঁরাও  
স্বাস্থ্যবন্দ্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বকোষ মূল্য ফেরৎ।  
৩৮৪ গ্রাম প্রতি কোটা ৩ টাকার, একপ্রো ৩ কোটা ৮'৫০ নাক ডাঃ মাঃ ও পাইকারীদের পৃথক

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭  
(মহোত্তর অফিস - শ্রীমাল, পূর্ব পাঞ্জাবী)

আমি যখন পরীক্ষা দিয়ে চলেছি, তখন মা তিলে-তিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তারপর মৃত্যুবরণ করেছেন। যে পরীক্ষার কথা ভাবছিলেন তিনি... কেন, সেই পরীক্ষার ক'টা দিনও বেঁচে থাকতে পারতেন না... কেন... আর পারল না অতসী, সেই সকালবেলা থেকে যে নীরবতা ওর মধ্যে কঠিন হয়ে উঠছিল, একটা আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে তা ভেঙে পড়ল। দু'তাকে মুখ ঢেকে কঁোপাতে লাগল ও।

রণজিৎ মুখ ফেরাতে সাহস পেল না। স্তম্ভ ওর পিঠের ওপর হাত রেখে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কেবল গাড়িটারই এটা বুঝতে পারার কথা নয়, তার বার্ষিক শব্দ আর দোলার সঙ্গে ক্রন্দনের—এই তরুণীর দেহের আক্ষেপ মিশে গেল।

কতক্ষণ পরে মুখ তুলল অতসী, আন্তে আন্তে জিজ্ঞেস করলে, 'কাকু, কতদূর এলাম আমরা, সুরেলভাড়া পেরিয়ে গেছি?'

'না, এখনি এসে পড়ব...'

'যদি আমি একবার আমাদের ঘরটা দেখে যাই, তা হলে আপনি রাগ করবেন?'

শঙ্কিত হলেন স্তম্ভ, যদি অতসী বিস্ত্রিত করে। কিন্তু ওর সঙ্কল্প মুখখানা ছুরির মতো ঠঁক বৃক বিধল যেন। বললেন, 'আজকেই যাবি? তোার মনের এই অবস্থা... আর একদিন আসতাম না হর আমরা...'

'না-না, আমি একবার দেখে যাই। মনে হয় আমার আর আসা হবে না...'

'আস! হবে না কেন? কিন্তু তুই বলছিস যখন আমরা একবার ঘুরেই যাই...'

সুরেলভাড়ার এদের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায় না, পানিকটা দূরে নেমে পড়ল ও। স্তম্ভ গাড়িতেই বসে রইলেন, রণজিৎ তার সঙ্গে হল। একটা সংখ্যের ধাক্কা লাগল অতসীর মনে কিন্তু সেটাকে স্বীকার করতে লজ্জা পেল ও। কিছু না বলে এগিয়ে গেল। তবু একটা কথা না ভেবে পারল না সে। গেলবার কলকাতা থেকে ফেরার পর একদিন সন্ধ্যার স্টেশনে মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল সে। কতক্ষণ পায়েচাির করার পর এই পথেই বাসার ফিরে আসছিল ওরা। মালিনী দেবী থুটিয়ে থুটিয়ে কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। একসময় হঠাৎ শুধিয়েছিলেন, 'আচ্ছা, রণজিৎ ছেলেটিকে সব মিলিয়ে তোার কেমন মনে হল—'

একটু খেমে উত্তর দিয়েছিল অতসী, 'থু ইনটেলিজেন্ট আর শক্ত লোক...'

ঠিক সেই পথে সেই রণজিতের সঙ্গেই তাদের বাসায় যাচ্ছে সে, এখন আর মা নেই। এর মধ্যে অনেকপানি বদলে গেছে সব। মনে হল রণজিতের স্বাস্থ্য অনেকখানি ভালো হয়েছে। কিন্তু থাকে মনে হয়েছিল ইনটেলিজেন্ট, তাকেই এখন মনে হয় কুটিল, শক্ত নয় নির্মম।

রণজিৎ একটু পা চালিয়ে ওব পাশাপাশি হল। বললে, 'আপনার মা'র কথা বারবার আমার মনে পড়ছে। শেষ দু'তিনটে দিন তাঁর কাছে থাকবার সুযোগ হয়েছিল আমার। সত্যি অর্থেই সজ্ঞানে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর; আমি তখনই জেবেছিলাম সুরেলভাড়ার একবার

'আপনি মা'র কাছে ছিলেন।...' নিদাঙ্গণ বিষয়ে থমকে দাঁড়াল অতসী। যে দুঃসহ বেদনাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ও, তা আরো একবার অর্গলমুক্ত হল। ওর এই মুহূর্তে জানতে ইচ্ছে করল, সেই ক'দিন মা ওকে কি বলেছেন, তার সবকিছু কি কথা হয়েছে। কিন্তু ও কেবল বললে, 'কেন, কাকুদের কি নার্সিং করার লোকের অভাব ছিল। আমি বুঝতে পারছি না...'

আরো কয়েক পা চুপচাপ হাঁটার পর রণজিৎ বললে, 'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর নেই তা নয় কিন্তু এর উত্তর না দিলেই ভালো হয়। শুধু আমার ওপর নয়, আমাদের সবার ওপরই অজ্ঞার করছেন আপনি...'

সত্যিই তো, এ কি করছে সে। মায়ের মৃত্যু সবক্ষেত্রে সে আর শ্রদ্ধা রাখতে পারছে না। কাকু যা বলছিলেন? কিন্তু রণজিতের কথাটাও কি বকম, 'আমাদের...'. ওর বুকের ভেতর অসহ বেদনার জ্বলে ওঠে, ওরা কি মা'কে ওদের দলে টেনে কথা বলবে! আর—সত্যি তো তাই-ই, মা-ই ওই বকম ভাববার অবকাশ দিয়েছেন।

অতসী বলতে গেল, 'আমিই অজ্ঞার করছি। কিন্তু আমার ওপর অজ্ঞারটা কাকুর চোখে পড়ে না কেন সেটাই আশ্চর্য।' কিন্তু তার আগেই বীণা ওদের দূর থেকে দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, হাত ধরলেন অতসীর, আর কিছু বলতে না পেরে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'মাসিমা আমাদের ঘরটা বন্ধ দেখছি, চাবি রয়েছে আপনার কাছে?'

'না, সেক্রেটারি নিয়ে গেছেন—তুই আর।'

রণজিতের কিছু বলার ছিল না, কিন্তু এরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে সেটা হয়তো পানিকটা বুকেছিল ও। অতসীদের বন্ধ বাড়িটার সামনে পায়েচাির করতে করতে ঘনঘন বাড়ির দিকে তাকাতো লাগল ও।

প্রায় মিনিট-দশেক পরে বেরিয়ে এল অতসী। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই রণজিৎ বুঝতে পারল সব। অতসী বললে, 'আপনি যান, কিছুতেই আমি যেতে পারব না মায়ের এই জাগরণ ছেড়ে। আপনারাও স্নেহ আমি বৃষ্টি, কিন্তু আমার পক্ষে তা অসম্ভব। কাকুকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে...'

'আচ্ছা, আপনার কথা আমি জানাব তাঁকে... আমাদের ভুল বুঝবেন না কিন্তু। নমস্কার... বলল রণজিৎ চলে গেল।

॥ ৬ ॥

সুরেলভাড়ার পরিচিত পরিবেশে যদি অতসী হঠাৎ একবার না এসে পড়ত, তা হলে ঠিক এরকমটি হয় তো হত না। সে যে স্তম্ভরশঙ্করের গাড়িতে চড়ে কলকাতার জঙ্গ রওনা হয়েছিল, তার কারণ ভেবেছিল, যে বাড়িতে মা মারা গেছেন সেখানে গিয়ে সে পৌছোতে পারবে। কিন্তু মায়ের কর্মক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ বিপরীতটাই সে ভাবল: মা তুল করেছেন অস্ত্রস্বতার জঙ্গ সন্ধানের প্রীতি ভালোবাসা তাঁর সন্ধানকে পাশে সরিয়ে দিয়েছে। অতসী বুঝল, বাবার যে আদর্শ ছিল—মা যে আদর্শ এতদিন এগিয়ে নিয়ে এসে শেষকালে আর পায়নি নি, সেটাই একমাত্র তার লক্ষ্য হতে পারে। এইখানে দাঁড়িয়েই সে

## পরীক্ষার্থিনী

সন্ধ্যার কাছাকাছি বীণা মাসিমার সঙ্গে সেক্রেটারি রামকমলবাবুর খামার উপস্থিত হল অতীত। হঠাৎই শাতলা-পানা বৃক্ষলোকটি নিজের শোক প্রকাশে এবং মালিনী দেবীর গুণকীর্তনে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। অতীতের গুণগণনা ঘোষণাতেও পিছিয়ে রইলেন না তিনি। পড়াশোনায় এত ভালো মেয়ে তিনি এর আগে আর দেখেন নি। শেষকালে কাজের কথা আসতেই বললেন, 'আহা-তা, তুমি এসেছ একটা খবর দিলেই আমি চাবি পাঠিয়ে দিতাম। তুমি তিনদিন, বাড়ি ছাড়ার দিন-সাতকে ঘরটার থাকতে পারো। মালিনীদি'র মোর তুমি, তোমাকে ওখানে রাখতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম..'

'আমি সেই কথাই আপনাকে বলার জন্য এসেছিলাম। মায়ের জ্বরগায় আমাকে যদি নেন... আমি ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি, দিদির। আমার স্বপ্নে ভালোই বলেন..'

'ওরে বাবা, আমাকে তুমি আইনের দারে ফেলতে চাও। তুমি ছেলেমানুষ, জান না, মালিনী দেবী বি-এ ছিলেন, অডিনারি পাশ... এ নিয়ে বোর্ড থেকে কতবার নোট এসেছে তার ঠিক আছে। আগাগোড়া ফাইট করেছি আমি... অন্তরী কত বলেছে, কিন্তু... আচ্ছা মালিনী দেবীর জন্যে ফাইট করব না আমি? তাঁরাই এই খুলে গড়েছেন হাতে করে... বাক গে, ওসব প্যাসপোর্ট কথা, বোর্ড চায় একজন এম-এ, বি-টি, এর মধ্যে এ্যাপারেন্টমেন্ট দিয়েছিও আমরা একজনকে..'

'আমি এই খুলে একটা চাকরী পেতে পারি না? কোনো একজন শিক্ষক...'

'নিশ্চয়ই, তা পায়ে না কেন। কিন্তু এখন কোনো ডেক্যান্সি নেই, শীগগির হবে আশা করা যায়... তা ছাড়া, তোমার রেজাল্টটা এর মধ্যে বেরোন দরকার...'

ওরা যখন চলে আসছে, তখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে উনি খানিকটা এগিয়ে এলেন। সাতদিনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে তোমাদের ভিনিসপত্রগুলো বের করে নিতে হবে, মা হস্তী। নতুন হেডমিস্ট্রেস আবার শীগগির এসে যাচ্ছেন তো... মালিনীদি'র কথা ভেবেই তোমার হাতে চাবিটা দিলাম। আমাকে আবার বিপদে ফেলো না যেন..'

রাত্রিতে মায়ের পরিত্যক্ত বিছানায় তাঁরই একটা সাদা খান পেতে শুয়েছিল অতীত। বীণাও ওর পাশে বসেছিলেন, আলিঙ্গিত জগৎ এক সময় শুয়ে পড়লেন ওরই পাশে। বললেন, 'তুমি, তুমি কিছু বলছিল না এটা আমার খুব খারাপ লাগছে..'

'বলার কি আছে, আপনি তো সবই দেখতে পাচ্ছেন...'

'তা ঠিক, কিন্তু তুমি কিভাবে সব ব্যাপারটাকে দেখছিল সেইটে জানতে ইচ্ছে করে।'

'মাসিমা, আমি কলকাতার গেলাম না ওদের গলগ্রহ হতে হবে বলে, কিন্তু এখন দেখছি আমি গলগ্রহ হয়েই আছি। আচ্ছা, যেহেতু কি কোনো সময়ই নিজের পায়ে ভর দিয়ে পাঁড়াতে পারব না...'

'তুমি এসব কথা ভাবতে যাচ্ছিস কেন বল তো, একটা কিছু...'

'সেক্রেটারি কি বললেন? কতখান করে থাকতে গিয়েছেন তিনি এ

আনন্দ উৎসবে

# ক. হোডের

সম্মান সামগ্রী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪

থাবে...মাসিমা, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আজ আপনার ঘরে থেয়েছি, এই কদিন খাব...এসব জিনিস যে এমনি, এত বিজ্ঞি...মা কি সেটা বুঝেই গেলবার এত জেদ করেছিলেন?...কাল কি ছিলাম আমি আর আজ কি হয়েছি...তবু কি জানেন, বাবা নিঃশ্বাস হাতে এখানে এসেছিলেন, নিজের জন্ম কিছুই রেখে যান নি...সেইটে জানি নে কেন করে আমাকে জোর দেয়। একটা কথা ঠিক, যদি আমি মরেও যাউ, মরবার আগে শেষ চেষ্টা করে তবেই সেটা স্বীকার করে নেব...'

বাবা ওর হাতখানা টেনে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ওর হাতের কাঁপা কাঁপা ভাবটা বোঝাল কতখানি অভিভূত হয়েছেন তিনি...একটা মাঝুলি সাধনার কথাও শোনাতে পারলেন না। শেষকালে বললেন, 'দেখ, তোর এসব কথা শুনলে আমার ভয় হয়। কিন্তু তোর মাঘের কথাটা একবার ভেবে দেখ...কিসের জন্ম তুই এত হৃৎ স্বীকার করে নিবি? কাকার বাড়িতে তোর কিছুই অভাব থাকবে না, তোকে পর বলেও ভাববে না...'

'ঠিক সেই জন্মেই আমি যেতে চাই নে। সব জারগাতেই ওরা সোনার খাঁটা তৈরি করে রেখেছে আর মেয়েরা সোনার শিকলি পরবার জন্মে পা বাড়িয়েই রয়েছে। কত রকম করে সাজাতে চায় ওরা আমাদের...বিহুনী মেয়ে, রূপসী মেয়ে, আধুনিক মেয়ে, আর্টিস্ট মেয়ে...ছি-ছি, ভাবতেও ঘেন্না লাগে...'

'মেয়েদের ভাগ্যই যে তাই...এই দেখ, আমি চাকরী করছি, আমি না স্থানীয়? কিন্তু সেক্রেটারিকে তুই নিজেই পরব করে এসেছিস আজ...তোরা মেসোমশায়কেও জানিস তুই, আমাদের সংসারও তুই চিনিস...'

'মাসিমা, সেই ভাগ্যটাকেই আমি মানতে চাই নে।'

'কি জানি বাবা, সেটা হয় কি না আমি জানি না, কখনো ভাবি নি সেরকমভাবে...সত্যি কথা বলতে কি, এই যে বিয়ে করেছে, সংসার হয়েছে, চাকরী-বাকরীও করছি...গায়ে এসে পড়েছে আর স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু মনে হয় তুই হয়তো পারবি, বা তুই বুকেছিস। তোর জোর আছে...'

'মাসিমা, আশীর্বাদ করুন যেন তাই হয়...অতীত-মুখখানা বীণার বৃকের কাছে আরো সরে এল।

প্রত্যেক চিন্তারই একটা নৈমিত্তিক উপসংস্কার আছে। অতীত যে পথে চলছিল, তার সম্ভাব্য তরুণী স্বপ্নর যে-পথে নির্দেশ দিচ্ছিল তাকে, তার মধ্যে কোন 'তুল' ছিল না, কেবল তার শেষটাই দেখা হয় নি তখনো। পরদিন সেটার একটা উপলক্ষও এল, কিন্তু কে জানে, তা দেখে ওর বুক কঁপে উঠেছিল কি না।

সকাল নটা-দশটা নাগাদ ওদের পুরানো ঝি পাঁচুর মা হঠাৎ ওদের ঘর খোলা দেখে ভেতরে ঢুকে গেল এবং অতীতকে দেখেই কাঁদতে আরম্ভ করলে। তারই কঁকে কঁকে অতীতের মার সবকিছু অনেক প্রশংসাবর্ণী উচ্চারণ করল এবং বারবার একটা কথা অজুর্বাগের সুরে বলতে লাগল যে, গতকাল অতীত এসেছে—এর মধ্যে তাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি কেন। ওরই মধ্যে মনে মনে হাসল অতীত, কার কথা কে কাকে জানায়। একটু পরেই পাঁচুর লম্বা-দেহের তটো ঘর আর বারান্দাটা ঘাঁটি দিতে আরম্ভ করল।

ঘরের জিনিসপত্রগুলো সব কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে দেখে, আমাকে একটু সাহায্য কর দেখ...'

পাঁচুর মার মুখখানা প্রথমে বিরস তারপর কঠিন হয়ে উঠল, 'তুমিদি, ই বোলা ত' পারব নাই ইসব করতে, বিকালবেলা লজ আসব। পাঁচুর বাবা কণী মাছুয়, আমি এখন না গেলে উয়ার চারটি মুখে পড়বে নাই গো। আমার হঠাৎ সবদিকে ছাল...'

'আর এইমাত্র আমার ওপর তুমি সহানুভূতি দেখাচ্ছিলে! বসতে গেল অতীত, কিন্তু একদিকের টাল সামলাতে গিয়ে যেমন হঠাৎ বিপরীত দিকেই টলে পড়তে হয়, তাই হল। সত্যিই তো, অসুস্থ মার কাছে থাকতে না পারার দুঃখ সে জানে, তা হলে অসুস্থ স্বামীর জন্ম ওর উদ্দেশ্যকে সে সন্দেহের চোখে দেখে কেন! অতীত বললে, 'পাঁচুর বাবার কি অসুস্থ, কতদিন হয়েছে?'

'সে আর বলবেন নাই তুমিদি, আজ দেড়মাস-দু'মাস হল, কি করে যে চালাচ্ছি...'

'কি বললে, তা হলে তুমিই চালাচ্ছ সংসার, মানে কি করে চলে...'

'পাঁচুর মা অতীতের ভাষান্তরটা বুঝল, কারণটা বুঝল না। বললে, 'সে আর বলবেন নি দিদি, এই দেখেন না...একটা লম্বা ক্রিস্টি দাখিল করল পাঁচুর মা। কথাগুলো যেন গিলে খাচ্ছিল অতীত, যদিও নিজের এই ভাষান্তরের কারণটা তখনই সে বুঝতে পারছিল না। দেখলে যে পাঁচুর মার অভিযোগ-অজুর্বাগ আর কান্নার মধ্যে তবু অজুত একটা আত্মবিশ্বাস আর গর্ভ ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ অতীত প্রস্তাব করে বসল, 'পাঁচুর মা, আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে?'

'সে কি বলেন গো, আপনি কি আমাদের ঘর যাবেন...কতদূরের পথ আর এই রোদ...'

সত্যিই মেমসের রোদ ঝাঁঝী করছিল কক্ষ মাটি আর শুকনো গাছপালার ওপর। দুহুঁতের জন্ম ভয় পেল অতীত, কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল পাঁচুর মাঝেও এই পথ দিয়ে যেতে হবে। তখনই নিজের ছাতটা টেনে নিয়ে তৈরি হল ও। কেবল একবার দেখে নিলে মাসিমা স্থূল বেরিয়ে গেছেন কি না। জানতে পারলে আপত্তি করবেন হয় তো।

শ্রবলডাঙার মতো ছোট মফস্বল শহরের মাঝখান থেকে কয়েক পা গেলেই গ্রামের মধ্যে এসে পড়তে হয়। প্রথমেই ছোটখাটো বস্তি, তারপর একটা বড় মাঠ, সেই মাঠ পেরিয়ে পাঁচুদের বাড়ি পৌছোতে হবে। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা মোটা আলোর রাস্তা গ্রাম পর্বন্ত গিয়েছে বটে, কিন্তু গ্রামের শুকনো মাঠে পায়ে পায়ে সব দিকেই রাস্তা হয়ে গেছে। পাঁচুর মা ঠিকই বলেছিল, সমস্ত মাঠ রোদেই ঝিমঝিম করে উঠেছে। তাপের হুঙ্কার চোখমুখ ঝলসে দেয়, জ্বালা করতে থাকে। মাঠের মধ্যে কাছে-দূরে এখনও বহুশোক ঝাটাঘাট করছে, কোনো সমরই বোধ হয় বন্ধ হয় না, কেবল বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে।

অতীত দেখলে মাঠের লোকজনদের মধ্যে মেরেই বেশি, ছোট



## পরীক্ষার্থী

মতো শহরে খি-চাকরের কাজ করে এখন ফিরে ছোটখাট সওদা করে, নয় তো হাটে গিয়েছিল সজ্জি বিক্রি করার জন্য। অতসী খবর নিয়ে জানতে পারল, কতক মেয়ে আছে যারা নিয়মিত এই বাবসা করে, পাঠিকারদের কাছ থেকে মাল কিনে হাটে বিক্রি করে। গ্রামে চোকাবা মুখে দেখলে ছোটখাট খেলতে ভরে থান নিয়ে যাচ্ছে কলে ভানতে, স্পষ্ট এসব নিজেদের ব্যবহার করার জন্য, ভানিয়ে নিয়ে এলে তারপর রান্না হবে। গ্রামের পাথে দেখলে কতকগুলি প্রৌঢ়া এবং যুবতী মেয়ে মাথার সারের ঝোড়া নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে, ঘামে সারের গুঁড়োর সমস্ত শরীর কালো হয়ে উঠেছে।

পাঁচুর মার পাথের শব্দ পেলেই ভিতর থেকে রোগজীর্ণ, খনখনে গলার পাঁচুর বাবা কাতর উঠল, 'বেলা হুঁতর কাটি' এলি মাগি, তোর আঁতর বাবু! তাকে ছাড়ল এতক্ষণ...

সমানে উত্তর দিল পাঁচুর মা, 'হাঁ ছাড়ল, না হলে উদরে ঢুকবে কি করে তোমার... চোখের মাথা খেইছ, ঘরে তন্দনোকের মেয়েছেলে এসছে...'

অতসী তখনো বাইরের উঠানে ঝাঁড়িয়ে ছাতার নীচে থামছে। অল্পসময় হলে, তাদের স্ব-সমাজ হলে এটা তার কাছে অস্বাভাবিক, কুসংস্কৃত মনে হত, কিন্তু এখন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল। অতসী খাওয়ার-দাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল, পাঁচুর মাকে বললে সে খেয়ে এসেছে। সারাদুপুর একটা অক্লান্ত জীবন নিয়ে ডুখানেই থেকে গেল ও। দেখলে যে, পাঁচুর মা হুতুই খেঁকিয়ে উঠুক, বাস্তব সজ্জা স্বামীকে রান্না করে খাওড়াল। স্পষ্টত সামান্যই চাল ছিল, নিজে ছাড়ু ভিজিয়ে খেলে। অতসীর জন্য চারটি মুড়ি ছাড়া আর কিছু সংগ্রহ করতে পারল না ও। অতসী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গ্রামের মেয়েদের কথা, তারা কি ভাবে থাকে, অভাবের সময় কি করে সংসার চালায়, এই সব জিজ্ঞেস করতে লাগল। প্রথমটা উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিল পাঁচুর মা, তারপর ভাঁটা পড়তে লাগল, তার খাওয়ার পর স্বামীর কাছেই বসে গেল সে।

বিকলে পাঁচুর মার সঙ্গেই ফিরে এল অতসী। সারাদিনের উপোস, দু'বার মাঠে পেরিয়ে বাতাসান্ত—তার ওপর একটা ভুল করে বসল অতসী, ফেরার কিছুক্ষণ পরেই স্নান করে বসল। সন্ধ্যার পর থেকেই শরীরটা কেমন বোধ করছিল, খাওয়ার পর শুতে গিয়ে বুঝল তার অর হয়েছে। সমস্ত রাত্রি তার ঘুমটা কেমন আচ্ছন্ন, ঘোলাটে হয়ে রইল। স্বপ্নের মধ্যে কত কি অসংলগ্ন ঘটনা তার চেতনার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে ছেড়ে কান্ডাতে লাগল ও। শেষদিকে দেখলে গ্রামের সেই মাঠের মধ্যে অল্প মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় যেন যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু সেই ভায়াগার আর পৌছোতে পারছিল না। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছিল ওরা। সকলের মাথার বোঝা, সকলেই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। অতসীর সম্বন্ধে প্রথমটা ওরা ছিল সন্দেহ, তারপর তর্জন গর্জন আরম্ভ করে দিলে। পাঁচুর মা কর্কশকণ্ঠে বার বার বলতে লাগল, 'আমাদের সঙ্গে এস নি তুমি, তুসীদি, ফিরে যাও...!' আর একজন বিরাট একটা বোঝা নিয়ে এসে বললে, 'বাড়টা গেল, লাও না একবার নিজের মাথার, লাও না...!' বলে নিজের বোঝাটা দিলে তার মাথার চাপিয়ে। উঃ, গেল, মাথা গেল, তবু অতসী কাতর অশ্রুনের সঙ্গে

বলতে লাগল, 'লাও, আমাকে দাও, আমি তো নেবার জন্যই এসেছি।...' মাথার ওপর বোঝাটা আর একবার তুলে ভালো করে বসাবার জন্য ঠুকে দিলে। উঃ।

পরের দিন সকালে সমস্ত দেখেতখন বাঁধার চক্ষুস্থির। সত্যিই উদ্ভিন্ন হলেন তিনি। কাল তীকে না। বলে যাওয়ার জন্য বসলেন। ইচ্ছা করে যাওয়ার আগে ওর পথের ব্যবস্থা করলেন, অতসীর জেদের জন্য ওরদের বন্দোবস্ত করতে পারলেন না। কিন্তু উনি যতটা আশঙ্কা করেছিলেন, ততটা হল না। আস্তে আস্তে অতসীর অরটা ছেড়ে গেল, এমন কি বিকলে বিছানা ছেড়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল ও। শেষকালে হাঁফিয়ে উঠে একটা চোরাগর টেনে নিয়ে বারান্দার বসে পড়ল।

চোখের সামনে অনেকটা খোলা, দূরে রাস্তাটা স্টেশনের দিকে বেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে দূরে একটা যুবকে যেন লক্ষ্যহীনভাবে ঘোরাক্ষেরা করতে দেখছিল ও, খোলা করেও করে নি। একটু কাছাকাছি এসে কাউকে যেন কি জিজ্ঞেস করলে। আরো কাছে আসতেই তাকে চিনতে পারল অতসী। চোরাগর ছেড়ে উঠে ঝাঁড়াল ও। যুবকটিও তখন ওকে দেখতে পেয়েছে আর সোজা এগিয়ে আসছে। 'মগিদা', 'তুমি'... বাবান্না থেকে নামল অতসী, কিন্তু মণিশঙ্কর ওর হাত ধরে আবার বারান্দার ফিরিয়ে নিয়ে এল।

'কি রে, তোর চোখ-মুখ ভীষণ খারাপ মনে হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ নয় তো...'



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত  
'শিখা ও নন্দু'

মার্কী গেম্প্রী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

-রিটেল ডিপো-

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯৫৫

‘মণিলা’, তুমি এলেছ। আঃ, আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছি না। তোমাকে কত দরকার ছিল আমার..’

‘আমাকে নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছিলি, কিন্তু পোন, আই এ্যাম জাকি এ যেসেজার..’ তার সঙ্গে একটা পত্র বহন করে এনেছি..’

বৃকপতেট থেকে একখানা চিঠি বের করে নিয়ে ঘরে ঢুকল মণিশঙ্কর, নিজের জিনিসগুলো জড়িয়ে রাখবার জন্য।

অতসীর চিঠিখানা লিখেছে রণজিৎ। অস্বাভাবিকভাবে চিঠি লেখার জন্য প্রথমেই কমা প্রার্থনা করেছে সে, জানিয়েছে যে মৃত্যুশঙ্করের নির্দেশ তাঁরই কথাগুলি তাকে জানিয়েছে। খানিকটা বাখ্যা করে সে মন্তব্য করেছে, ‘সৈন্য আপনি চঠাং মত-পরিবর্তন করতে উনি খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন। আপনাদের ওখানে থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে রকম ডিপ্রেসড, অবস্থার পাড়ছিলেন, তাতে আমার ভয়ই করছিল। এখন কিন্তু তাঁর চিন্তা অন্তরকম, ভাবভেন যে, আপনি নিশ্চয়ই ওখানে খুব অনুবিধের পড়েছেন। ঠর ইচ্ছে আপনি ঠর ওখানে থেকে পড়াশুনো করেন। আপনার সম্মতি পেলে, আমাকেই গাড়ি নিয়ে তিনি পাঠাতে চান। আপনারদের ঘরোয়া ব্যাপারে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে বলে আশা করি সেদিনের মতো ভুল বুঝবেন না.. আমার মনে হয় যদি মণিবারুর সঙ্গে চলে এসে আপনি ঠর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে বান খুব ভালো হয়..’

অতসী কয়েকবারই বীণার খোঁজ করল, কিন্তু ইকুলের পর তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন নি। খবর দিয়েছেন যে কোন মিষ্টি-এব জন্ত সেখানে আটকে পড়েছেন। অতসী চা করে খাওয়ার মণিশঙ্করকে। সন্ধ্যার মুখে মণিশঙ্কর বললে, ‘মনে হচ্ছে তোদের এখানে বেড়াবার চমৎকার জায়গা..’ নিয়ে যাবি?’

অতসী বলল না যে সে অনুহা দুর্বল। বললে, ‘কোথায় যেতে চাও?’

‘সেটা তো তোরাই বলার কথা..’

স্টেশনের কথা ভেবে বেরোল অতসী, কিন্তু কি মনে করে যে পাখে কাল পাঁচুর মা’র সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিল, সেই পথেই নিয়ে গেল মণিশঙ্করকে। শহরের সামান্য বস্ত্র পরিচয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়ল ওরা এবং একটা উঁচু আলের গুপের বলল। তখন সূর্য অস্ত গেছে, ‘পূর্বদিক অন্ধকার হয়ে উঠেছে।

অতসী প্রশ্ন করল, ‘তুমি আমার চিঠিটা পড়েছ?’

‘হ্যাঁ কুড আই?’ রণজিৎ মুখার্জী সিঁকেছেন তাকে।..’

পূর্বোপরি দৃষ্টিতে অতসীর চোখের দিকে তাকাল মণিশঙ্কর, একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা আর একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটে উঠল সেই চোখে।

‘তা হলে চিঠিখানা পড়ে দেখ..’ বলে আমার ভাঁজ থেকে পামটা বের করল অতসী। ‘আচ্ছা, মণিদা’, শেষ পর্যন্ত তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিলে! এই অলঙ্কা, অদ্ভুত মড্যক..’

চিঠির গুপের দ্রুত চোখ বুলোতে বুলোতে মণিশঙ্কর বললে, ‘ঠিক বুঝতে পারছি না আমিও ওদের বড়োয় যোগ দিয়েছি কি না, তবে এটুকু বলতে পারি, তার ইচ্ছে ছিল না এখনও নেই..’

‘তুমি ঠিক করে বলা তো, কেন এখানে এলেছ?’

‘বলছি। জ্যোতীর মতুর খবর আমাকে জানানো হয় নি, পরে জানলাম তাকেও না। কলকাতার এসে দেখলাম, ব্যাপার

অনেক দূর গড়িয়েছে। মনে হয় তোর গুপের ওদের একটা আশা ছিল, সেটা তুই ভেঙে চূষবার করেছিল। তখনই তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য আসব বলে ঠিক করলাম, মি: মুখার্জী চিঠি দিলেন তখন..’

‘আচ্ছা, এই চিঠি মি: মুখার্জীকে দিয়েই লেখানো কেন, তোমার মারফৎ কাঙ্ক বলতে পারতেন না?’

‘নিশ্চয়ই পারতেন, চান না আর কি। তবে একটা জিনিস সত্যি, বাবা খুব শক পেয়েছেন..’

‘আশ্চর্য, সবাই আমার জন্য শক পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কি ভাবছে পাবে না তারা আমাকেও শক দিতে পারে আর দিচ্ছেও..’

‘নাঃ, এটা কেউ ভাবতেই পারে না, তোর পক্ষেও সেটা অসম্ভব!’

‘তুমি এই কথা বলছ! আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তুমি কি বল..’

‘নাঃ, তোর সম্বন্ধে তাকেই বলতে হবে..’

পূর্বদিকের আকাশে এককালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, সমস্ত মাঠটা আলো-আঁধারি হয়ে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চূপ করে রইল অতসী। কালকের সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল ওর, সেই স্থপের কথা। কতক্ষণ আচ্ছন্নের মতো বসে রইল ও, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, ‘মণিদা’, আমি কি কিছুই করতে পারি না?’

‘নিশ্চয়ই পারিন, করছিসও তো অনেক কিছু..’

‘দেখ, আমি নিঃশ্ব, একলা। ভেবে দেখলাম নিজের পায়ে গুর দিয়ে ঝাঁড়াতে হলে আমার এম-এ পড়তে হবে, সেটা কি করে সম্ভব বলতে পারো?’

‘তোর বিত্ত কত?’

‘আমি এখন কলেজে প্রথম পড়তে হাট, তখন মায়ের পাশ বইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা ছিল, এখন দেখছি চারশো সাঁইত্রিশ টাকা আছে। সবটা আমার জন্যই খরচ করেছেন তিনি..’

‘তা হলে কলকাতার বাবার কাছে যেতে হয়, নর তো এম-এ পড়ার আশা ছাড়তে হবে..’

আবার সেই মাঠের দিকে তাকাল অতসী, চমকে উঠে বললে, ‘মণিদা’, মা শেষ জীবনে কলকাতার গিয়ে মরেছেন, আমাকেও মরবার জন্য ইঙ্গিত করে..’

মণিশঙ্করের সব মুখরতা হঠাৎ শুক হয়ে গেল। হাসি-ঠাট্টার অন্তরালে কান্দনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল ও, অতসীর কথার মধ্যে একটা পরিণতি দেখার জন্যে। বুঝল সে।

আস্তে আস্তে বললে, ‘তুসী, তুই আমার সঙ্গেই কলকাতার চল। তাকে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে যাব..’

‘কলকাতার থাকবে না তুমি? তাহলে আমি কেমন করে থাকব..’ উৎকণ্ঠার মণিশঙ্করের হাতখানা জড়িয়ে ধরল ও।

মণিশঙ্করের গলা ভার হয়ে এল, বললে, ‘কলকাতার আর ফেরার ইচ্ছে নেই।’

‘কেন? তোমার খিসিস সাবমিট করবে না তুমি!..’

‘না, যে জিনিস জীবনের সত্য, তা নিয়ে কেউ গবেষণা করে না।’

‘মণিদা’, মণিদা’, আমার গুপের ভাগ কোর না তুমি, আমাকে ঘৃণা কোর না। আমাকে ছেড়ে বেঘো না..’ মণিশঙ্করের হাত ছেড়ে ওর পায়ে জড়িয়ে ধরল অতসী। সেই আবেছা আলাতে, তার গহকালকর সেই কঠিন পরিচয়ের মাঠের গুপের পাড়ে ফুলে ফুলে কীদতে লাগল।



## ভগিনী নিবেদিতার চিঠি

[ A letter of Sister Nivedita, addressed to Hindu Women on 23rd Dec, 1902 at Triplicane (Madras) ]

প্রিয় এবং প্রিয়তম মহিলাবৃন্দ,

আমার পক্ষে, সে দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই, যে দৈবদুর্ভাগ্যকে, এটী অপরাধ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—এবং অগ্রপক্ষে নানা দুঃদ্রাস্তর থেকে আপনারা এসে সমাবেশ হয়েছেন।

আমি অমূল্য করছি, আমার মহান গুরু (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা এত বিপুল সাখ্য আপনাদের একত্রিত করেছি এটী টনডামন্ডলম্ (Tondamandalam) উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

ইহা আমার পক্ষে এক অগ্নীয় আনন্দের কারণ হতো, যদি আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে স্মৃতি বর্ণনা করতে পারতুম—কিভাবে গুরুদেব আমাদের পাঁচাত্তা দেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে কি অস্তু আশা তিনি স্বপ্নের পোষণ করতেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ভারতের ভবিষ্যৎ—পুরুষদের চেয়ে, নারীদের উপরেই বেশি নির্ভরশীল এবং তাঁর বিশ্বাস আমাদের সকলের প্রতি কত গভীরই না ছিল। ভারতীয় নারী, পুরাকালে—স্বামীর মৃতদেহের পাশে সমরপণে অঙ্গস্ত চিত্তার আনন্দের সঙ্গে কাঁপিয়ে পড়তেন—তাঁদের বিরত করবার মতো বলিষ্ঠ হস্ত তখন ছিল না। সীতা ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ। অমূল্য সাবিত্রীও। মহাদেবকে পার্শ্ব পাবার জন্মে, গৌরীর তপস্তার চিত্র—ভারতীয় নারীর আদর্শ। গুরুদেব যুক্তি প্রেরণ করতেন, এমন অজ্ঞা কি কর্তব্য আছে, যার দ্বারা নারীর গৌরব এঁদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে?

প্রত্যেকটি দেশে, পবিত্রতা এবং শক্তিই হচ্ছে জাতির সেই সম্পদ যা' নারীরাই রক্ষণ



ভগিনী নিবেদিতা

করে পুরুষদের চেয়ে বেশিভাবে। এখানে—দেখানে মাত্র কয়েকজন পুরুষ শিক্ষকরূপে চিহ্নিত হ'তে পারেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই কঠোর জন্মে পরিশ্রম করতে হয়। গুচের তাঁদের অমুপ্রেরণা নিত্য নতুনতা লাভ করে—তাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের আন্তরিকতা ও মহত্ব নারীর তপস্তার মধ্য থেকেই আসে। আপনারা, ভারতীয় বধূরা ও মাতৃগণ, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া শিশুধাজন—গাম্ভীর্য, শ্রীকৃষ্ণ এবং শঙ্করাচার্য—তাঁদের জননীর কাছে কত ধ্বনি। নারীর শাস্ত্র, নীরব জীবন—গুচে গুচে তপস্বিনীর মতো তাঁরা বাস করেন, তাঁদের গর্ভ অমূল্য করা উচিত, কি বিশ্বস্ততার, কি অধ্যবসায়ের, সর্বোপরি পরিপূর্ণতার আদর্শ, ধর্মরক্ষার ও পবিত্রোদ্দেশ্যে তাঁরা যা' করেন তা' বস্ত্রতই বাইরে যে কোন যুদ্ধ বা প্রকাশ করা সম্ভব নয়—তার চেয়ে অনেক বেশি।

আজ আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ) এবং তার ধর্ম—

'হৃদগৌরব নতশির অপমানে লাভে'—

আজ বিশেষভাবে তার মেয়েদের এই মুহূর্তে আহ্বান জানাচ্ছে এগিয়ে আসতে, যেভাবে আগের যুগে তারা এসেছিল, পূর্বম প্রজন্ম দেশকে সাহায্য করতে। আমাদের প্রশ্ন—'কিভাবে দেশের আহ্বানে কাজ করতে পারবো?' প্রথমেই বলবো, আত্মন—ভারতীয় মাতেরা তাঁর সন্তানদের জন্মকর্তৃপালনে আগ্রহান্বিত করুন। ইহার অভাবে আমাদের জাতি তার প্রাচীন শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট করবে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যে দেশে ছাত্রদের আদর্শ এর চেয়ে উন্নতমানের, আর যদি ভারতবর্ষ থেকে ইহাকে নির্বাসিত করা হয়, তবে জগৎ ক'র

কাছ থেকে এই আদর্শকে উজ্জীবিত করার প্রেরণা পাবে? সমস্ত শক্তি এবং মনস্তত্ত্ব মূল নিহিত আছে প্রকৃতিতে। আশুন, প্রত্যেক মায়েরা সংগ্রহ নিন, ভারতের সন্তান বড় হউক।

আর দ্বিতীয়ত আমরা আমাদের নিজস্বের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পরোপকারবৃত্তি গণি করে অমূল্যলন করি। এই সগামুদ্ভূতি থেকেই সমস্ত মানুষের দুঃখ ও বেদনার সংবাদ নিতে আমরা ব্যগ্র হ'বো, আমাদের ভ্রাতৃভূমির ক্রন্দন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করবে। আজকের আধুনিকজগতে আমাদের শত্রুর বিপদের ভয় রয়েছে কোথায়—এবং এভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করেই আমরা কাঁঠার কমিউনে রূপান্তরিত হ'বো। সেই কাজ আমরা কর্মের আনন্দেই সম্পাদন করবো (work's sake)—মরবো ভয় পাবো না, যদি আমাদের কাজে দেশের ও জনগণের সেবা করতে পারি।

আশুন, আমরা শরণ করি আমাদের দেশ আমাদের জন্তে কি করেছে, কিভাবে দেশ আমাদের সৃষ্টি করেছে, খাতা দিচ্ছে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দিয়েছে—সর্বোপরি দিয়েছে গভীর বিশ্বাস। এই দেশ কি আমাদের জননী নয়? আমরা কি আবার তাকে দেখতে চাই নে 'মহাভারতের' মধ্যে? প্রিয় বোন এবং মায়েরা, আমার বিশ্বাস, আমার গুরুত্বী (স্বামী বিবেকানন্দ), আবার অনেক শ্রমের করে এসব কথা আপনাদের বলেছেন, সে সামর্থ্য আমার নেই।

আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিই, আমার মতো অযোগ্যকে সম্মান দেখিয়ে—আপনারা আমার গুরুদেবের প্রতিই প্রণাম করছেন। আপনাদের আমি বিনয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি তাঁর পক্ষ থেকে, বিনি তাঁর মেহেরূপে আমাকে গ্রহণ করেছেন; স্মরণ্য আপনাবা, দেশের মহিলাগণ, আমাকে ছোটবোনের মতো ভাবছেন এবং আমার জন্তে প্রার্থনা করবেন। আমি এই শ্রমের 'ও পূণ্যভূমিকে ভালবাসি—আর চাই আবার বেশিভাবে আপনাদের সেবা করতে। আমি আপনাদের শ্রমণ করিয়ে দিতে চাই তাঁর কথা বিনি আমার গুরুকেও পথ দেখিয়েছেন—শ্রীমদ্ভক্ত পরমহংসের কথা এবং বিশ্বজননী কালীর কথা—দীর্ঘ রূপায় আমরা কাজ করছি। মা আমাদের যে কারও মধ্যে নিঃসন্দেহে কাজ করাবেন—যেই তাঁকে ডাকবে।

সেই জগৎজননী মায়ের নামে এবং তাঁর স্বরূপায় আপনাদের সামনে আমি বলছি—

আপনাদের একান্ত প্রিয় বোন,

নিবেদিতা

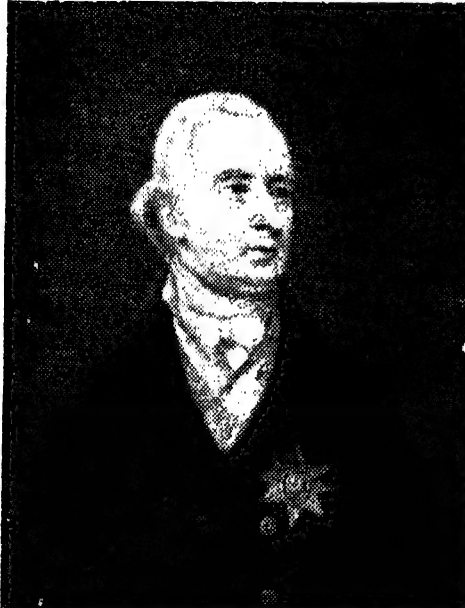
(শ্রীমদ্ভক্ত-বিবেকানন্দের চরণে)

অনুবাদক—শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে।

## কয়েকটি দুঃপ্রাপ্য ঐতিহাসিক পত্র

পরিচালকমণ্ডলীকে লেখা হেস্টিংসের পত্র

৩রা ডিসেম্বর, ১৭৭৪



আমার ক্ষমতাসীল যে বিসংগতি সম্বন্ধে আমাকে আলোচনার প্রবৃত্তি হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে তাহা এত নগণ্য এবং লঘু যে, তাহাদের প্রতি কনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে ভাবিয়া আমার লজ্জার সীমা নাই। তাহারা আমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে এই মর্মে যে, তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা আমি তাহাদের দিই নাই। অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, তাহাদের আগমন ঘটিলে মাত্র এতদ্বার তাৎক্ষণিক দ্বারা তাহাদের আপ্যায়িত করা হয়; তাহাদের সমাদর জানাইবার জন্য বাহিনীকে সেখানে জাহির করানো হয় নাই; তাহাদের সহিত কাউন্সিল হাউসের পরিবর্তে আমি আমার বাসগৃহে সাক্ষাৎ করিয়াছি; সাধারণ ঘোষণার নূতন পরোচনানা জাহির হইতে তিন দিবস বিলম্ব হইয়াছে অর্থাৎ সূত্রবাদের পরিবর্তে উচ্চ জাহির করা হইয়াছে সোমবার; বখাবোগ্যভাবে নূতন সরকারের ঘোষণাও জাহির হয় নাই।

আমি এক্ষণে এই পাঁচটি অভিযোগ সম্বন্ধে এক-এক করিয়া আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি—

১নং—আদেশটি ছিল যে প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে সতেরবার তোষণধর্ম দ্বারা স্বাগত জানান হইবে। জেমারেল ক্লেভারিং সম্বন্ধে অসুস্থতায় সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তোষণানীর খোদ পরিচালকমণ্ডলি আদেশ পাঠাইয়াছিলেন ত্রার এডওয়ার্ড হিউসকে [পনেরবার] তাৎক্ষণিক 'মারবৎ' শরণ করিতে—যোড়ের প্রতি সদস্যদের

আর যদি একত্রে আসেন তাহা হইলে সর্বাঙ্গ সংখ্যক ধনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নির্গত করা হইবে। এই ব্যবস্থাই প্রচলিত এবং অভাববিহীন অবস্থিত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়মকে অস্বীকার করার আমার পক্ষে কোন যুক্তিতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহারা একত্রেই আসিয়াছিলেন এবং স্বভাবতই তাঁহাদের স্বাগত জানান হইয়াছে সতেরবার ধনি দ্বারা।

২নং—তাঁহারা যদি দুর্গে পূর্ণাঙ্গ করিতেন তাহা হইলে সমগ্র বাহিনী নিশ্চয়ই তাঁহাদের অধিবাসন করিতে অংশগ্রহণ করিত—কিন্তু দুর্গ হইতে দুঃখভর্তী কোন স্থানে তাঁহাদের সামরিক সন্মান প্রদানের জ্ঞতা সমগ্র বাহিনী হইতে কিছু দৈন্য বিচ্ছিন্ন করা আমি সামরিক নিয়ম-বিকৃত্ত বলিয়া মনে করি।

৩নং—আমার গৃহের পরিবার্তে কাউন্সিল ভবনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহা যদি বিন্দুমাত্রও পূর্ণাঙ্গ অনুমান করিতে পারিতাম বা সাক্ষাতের স্থানের এক্স আলোচনার বস্ত্তে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাদের বাসনার অন্তকূলে কাজ করিতাম। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্ধানের জ্ঞতা ঘাটে প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিত রাখা এবং তাঁহাদের সত্যতার অভ্যাগতদের নগর পরিদর্শন করানায় ও আমার বাসভবনে তাঁহাদের সার্ব আপ্যায়ন জানানো তাঁহাদের প্রতি সন্মানের যথেষ্ট পরিচায়ক বলিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম এবং বলিতে বিন্দুমাত্র বাধা নাই—এখনও করি।

৪নং—পরোয়ানা জারির তিন দিনের বিষয় আমার নির্দেশই হইয়াছে তাহাদের মর সৎসঙ্গ আমি পূর্বে গোপন ব্যতীত সংগ্রহ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার সংগৃহীত সংবাদ সম্পূর্ণ ছিল না। তত্পরি আমার অধিকার ও ক্ষমতা ভ্রাসকরণে ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিরোগ ও প্রথমজন অপেক্ষা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ক্ষমতাদানের এই অসঙ্গতি আমাকে অস্ত্রের দিক দিয়া বিশেষভাবে বখিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে, যখন আমি এইরূপ অভাবিত আচরণে ক্ষুব্ধ তখন আমি অমরোধ করি হয় আমাকে আমার নির্দিষ্ট ক্ষমতার মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখা হইক নতবা পূর্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কোম্পানীর সেবা সমাপ্ত হইক—নতন ব্যবস্থার বিবরণ প্রকাশ সম্বন্ধে নিজের মনে আমাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া হইক।

৫নং—নতন সরকারের ঘোষণা সংক্রান্ত ক্রটর জ্ঞতা বোর্ডের সদস্যরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁহারা সংখ্যার অধিক, বাচা খুশি বলিতে বা করিতে পারেন কিন্তু একবার বিবরণস্তুতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তবে আমার প্রতি অভিযোগের তীক্ষ্ণ শব্দগুলি প্রয়োগ করিলে গাঃসঙ্গত হইবে। এখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লিখিত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘোষণার প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা সামরিক নিয়মকেই অধিক প্রাধান্য দিলেন। তবে কার্পালনের দিক দিয়া আমার আরোণে যদি কোন স্থান বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে উহা উচ্চাপূর্বক নহে বিশেষতঃ ইহা যখন নতন সরকারকে কেন্দ্র করা—যে সরকারের স্বর্গদ্বার ও স্তম্ভ সম্পর্কে তাহার শীর্ষস্থানে আসনগ্রহণকারী হিসাবে আমি অধিকমাত্রায় সচেতন।

সামরিকভাবে, নিঃস্বার্থ এ কথা আমি সোচ্চারে বলিতে পারি যে এই বিশেষ অভ্যাগতদের সম্মানীয় আর বাঁহারা একাধিক এই

দেশের মুক্তিকার অবতরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের তুলনায় অনেক বেশি সন্মান, সম্মান ও সমাদর ইহারা লাভ করিলেন। এমন কি ইহাদের তুলনায় বাঁহারা যথেষ্ট কর্মশক্তি এবং অভাবনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়া এ দেশের নরনারীর মধ্যে চিরসংখ্যীয় হইয়া রহিয়াছেন—বাঁহাদের কর্মকুশলতা, কৃপণতার প্রতিজ্ঞা এবং অনমনীয় উত্তম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—সেই লাইভ বা ভ্যালিটাই বখন গভর্নররূপে প্রথম আসেন তখন সেই কর্মবীরেরাও এ জাতীয় সন্মান পান নাই। তাঁহাদের আপ্যায়নের ভক্ত সমগ্র কাউন্সিল আমার ভবনে জমায়েত হইয়াছিল—প্রকৃতপক্ষে তাহার ফলে আমার আবাসটি কাউন্সিল ভবনে পরিণত হইয়াছিল—তথাপি তাঁহারা ভুট্ট হইলেন না—ইহাও খোলাগুলি বলিয়া রাখা তাহারা বোধ হয় নিজেদেরই খোদ সরকার ভাগিয়া সেই প্রাণ্য সন্মানের স্বর্গ দেখিয়াছিলেন এবং স্বপ্নের ঘোরে তাঁহারা এইটুকুই মাত্র তুলিয়াছিলেন যে তাঁহারা আরও সরকার নন—মাসলে তাহার একটি অংশমাত্র।

জ্যোকে লেখা ডাঃ হানককের চারখানি পত্র

বিষয় : হেন্টিংস ও মিসেস ইমহফ

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৭২

আর মিঃ হেন্টিংস আসিয়া পৌঁছাইলেন। তাঁহাকে খুব কুশল এবং দুর্বল দেখাইতেছে। তবে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া সামগ্রিকভাবে তিনি কুশলেই আছেন।

এপ্রিল ১৭৭২

মিঃ হেন্টিংস সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিতে তোমার নিকট আমি প্রেরিত আছি। বাংলাদেশের বহু প্রচলিত প্রথার বিশোপাশন করিতে তিনি বহুপরিকর, বলা বাহুল্য এই মনোভাব এখনকার অধিবাসীদের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মিসেস ইমহফ নামে এখানে একজন মহিলা আছেন—মহিলাদের মধ্যে তিনিই হেন্টিংস-এর বিশেষ প্রীতি ও পক্ষপাতের পাাত্রী। হেন্টিংসের সহিত একই জাহাজে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বামী জার্মান সার্ভিসের একজন অফিসার এবং মাত্রা ড ক্যাডেট হিসাবে তিনি আসিয়াছেন। যুদ্ধবস্তির দ্বারা সাধারণবিবাহ তাঁহার দ্বারা স্ত্রীকল্পে সম্পন্ন হইতেছিল না। যুদ্ধবস্তির দ্বারা অজিত অর্থ তাঁহার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। চিত্তাক্রান্ত বিভ্রান্তেও তিনি দক্ষতাসম্পন্ন ছিলেন। কিছু কিছু ছবিও কঁকো-কঁকো তিনি আঁকতেন শেষে অল্প ত্যাগ করিয়া তুলিকেই পূর্ণাপূর্ণিভাবে গ্রহণ করিলেন। মাত্রাজে প্রায় সকল প্রসিদ্ধ নরনারী ও বন্যচ পরিবারের সদস্যদের চিত্র অঙ্কিত করিবার পর যখন দেখা গেল যে ক্ষেত্রে আর কেহই অবশিষ্ট নাই—সকলেই তাঁহার তুলিকার দ্বারা পড়িয়াছেন—তখন তিনি হৃদয়ে আসিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের তখন একবারে শোষণশেষ। তাঁহার সহধর্মিণী কিন্তু স্বাভাবিক মাত্রাজেই রহিয়া গেলেন এবং তিনি বাস করিতে লাগিলেন হেন্টিংসেরই ভবনে। এই মহিলার বয়স্ক্রম ছাড়াই বয়স্ক্রম মহিলাটি কি আচরণে, কি আলাপনে, কি রূপসম্পদে সন্তান দিক দিয়াই অতুলনীয়। ঈশ্বর এই মহিলাটিকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য

বিকশিতা করিয়া তুলিয়াছেন। তৎসহ তাঁহাকে অধিকারিনী করিয়াছেন নানাবিধ গুণের ও দক্ষতার। ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি বিদ্যমান তাহা ছাড়া ইনি একজন রীতিমত রসিক। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে মডিলিটি নিজেই একটি নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি। গভ্র অক্টোবর তাঁহারও কলিকাতার আগমন ঘটয়াছে। তাঁহাদের হেষ্টিংসের সংসারে একীভূত না দেখিলেও হেষ্টিংসের ঘরোয়া মিলনচক্রগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবেই দেখা যায়। মিঃ ইমহফ নিজে আসলে একটি খাঁটি জার্মান। মিসেস ইমহফ সম্বন্ধে আমি এই দীর্ঘ বর্ণনা হইতে বিরত থাকিতাম, কিন্তু হেষ্টিংস প্রসঙ্গে তাঁহার অবতারণা করিতেই হয় আর ইহা আমি ভালভাবেই জানি হেষ্টিংস সংক্রান্ত একটি অতি তুচ্ছ, উপেক্ষণীয় সামান্যতম তথ্যও তোমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং আকৃষ্ট করে।

ফেব্রুয়ারি ১৭৭৩

মিঃ ইমহফ ইংল্যান্ড যাত্রা করিতেছেন। তোমার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে একটি পরিচয়পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্ত সমর্পণ করিব। তাঁহার সহিত আলাপ করিও। তবে তাঁহার সহধর্মিণী এইখানেই থাকিয়া বাইতেছেন।

ডিসেম্বর ১৭৭৩

যে তৎকালি এই পত্র তোমার হাতে সমর্পণ করিব সে মিঃ ও মিসেস ইমহফের পুত্র। আমার পূর্বপত্রে ইহার সম্বন্ধে তোমাকে আমি আলোকিত করিয়াছি। তুমি ইহার প্রতি স্নেহপূর্ণ লক্ষ্য রাখিলে এবং ইহার মঙ্গল সম্বন্ধে চিন্তা করিলে তোমার প্রতি হেষ্টিংস যথেষ্ট পরিমাণে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। হেষ্টিংস ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল এবং এই তরুণের আজ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক, সেই কারণে আমি ইহাকে শুধু তোমারই নিকট পাঠাইতেছি জানিবে।

জ্যাকো লেখা স্মার ফিলিপ ফ্রান্সিসের পত্র

হীরকের কর্ণাণের বা তোমার অভিক্রিষ্ট ক্ষুধায়ী যে কোন অলঙ্কারের ক্রয় করার জন্য উপহারস্বরূপ কলিকাতা হইতে তোমাকে নীচশত পাউণ্ড পাঠাইতেছি। ভাগ্যানন্দী আমার প্রতি তাঁহার কক্ষণ উজাড় করিয়া দিয়াছেন তাঁহার অবিবাহিত কুপায় আমাকে ভ্রমপূর করিয়া রাখিয়াছেন—আমি তো তাঁহাবই সেবকসে সেবক। তাঁহার নিকট আমার স্বপ্নের সীমা-পরিসীমা নাই। তোমার তো অজানা নয় যে একদা অভাব-অনটন জনিত কি নিদারুণ দুর্ভোগের ঝড় আমাদের উভয়ের জীবনকে বিপদস্ত করিয়া দিয়াছিল। তাহা দেখ, কি ভয়ঙ্কর দিনগুলিই না আমাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

পত্রের উত্তর

নভেম্বর ১৭৭৭

আমরা উভয়েই ভাগ্যানন্দীর নিকট নিশ্চয়ই গভীর ঋণে স্থগী। সে কারণে আমি নিশ্চিতরূপে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ। অতীতের সেই অভাবমূল দিনগুলি মনে পড়ে বৈ কি, জীবনের উপর তাহার যে সকল ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা তো আর জলের

দিনগুলির স্মৃতি, সত্য কথা বলিতে কি—আমাকে আনন্দই দেয় আমার অন্তরে বেননার স্মৃতি করে না। তখন একটি নিটোল শান্তি আমাদের পরিবারে বিরাজ করিত। প্রথম শান্তির প্রতিষ্ঠা আমাদের সর্বভাভাবে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল, পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য সমস্ত দুঃখ, দৈনন্দন জর করিতে পারিয়াছিল, একে অপরকে শক্তি জোগাইয়াছিল, জোগাইমাছে প্রেরণা, দু'জনে দু'জনকে অতি ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিবিড়ভাবে পাইয়াছি—সে যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, কি সুখ—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজ বিরাট সাফল্য ব্যাপক প্রতিপত্তি তোমাকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে কিন্তু আমার নিকট হইতে তোমাকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে—একত্রে থাকার আনন্দ সমগ্র নিষ্ঠুরের মত কাড়িয়া লইয়াছে। এই বিচ্ছেদ যে আমার পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক তাহা আমি জানি, তথাপি ইহা আমাকে মানিয়াই লইতে হইবে এবং তাহা আমাকে সহ্যও করিয়া চলিতে হইবে। তোমার পত্রগুলি পাইয়া, ওগো প্রিয়তম ফিলিপ কি অভূতপূর্ব আনন্দ যে লাভ করি তাহার বিবরণ দান দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

জ্যাকো লেখা ফ্রান্সিসের আর একটি পত্র

আমার প্রথম পত্রবিত্তা,

তোমাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করার জন্য যে আমি কতখানি অর্বেচনাইয়া উঠিয়াছি তাহা কিভাবে যে ভাষায় প্রকাশ করি ভাবিয়া পাইতেছি না। আমি নিজেকেও যখন তুলিয়া যাঃ—তোমাকে সকল সময়েই শরনে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে মনে পড়ে। আনন্দের চরমে তখনই আত্মহারা হই যখন ভাব যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম। নারী আমার আদিকারে যাহাকে বাদ দিলে আমিই আত্মহারা হই, চলি, বিদায়।

ফ্রান্সিসকে লিখিত তদীয় পত্নীর আরও তিনটি পত্র

আরও একটি বৎসর তোমাকে ভারতে অতিবাহিত করিতে হইবে ইহা শুনিয়া রীতিমত হতাশ হইলাম। আমার প্রিয় ফিলিপ, কি কারণে তুমি আরও একটি বৎসর ভারতে থাকিতেছ, অবশ্য আমি ভালভাবেই জানি যে তুমি স্বদেশেই থাক কি বিদেশেই থাক—তোমার নিকট ওভয়েই সমতুল্য—কিন্তু তোমার তো ইহা অজানা নয় যে আমার নিকট তাহা সমতুল্য নহে। আমি অন্তর হইতে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে আমার থাকিছু আনন্দ, শান্তি, স্বাস্থ্য সবাকিছুই নির্ভর করিতেছে তোমার সান্নিধ্য স্নেহের উপর কিন্তু আশ্চর্য, তোমার দিক হইতে লক্ষ্য করিতেছি তাহার ব্যতিক্রম।

১৫ ডিসেম্বর ১৭৭৮

অন্ত প্রাতঃকালে আমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্যাকেটটি গ্রহণ করিবার জন্য আমি ইণ্ডিয়া হাউসে গমন করিয়াছিলাম। আমি তোমার ছবিটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে তাহার তোমার ছবিটি আমাকে দেখাইলেন। ছবিটি সুন্দর সন্দেহ নাই—তবে আসলটি ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণ সুন্দর।

ডিসেম্বরের শেষভাগ ১৭৭৮

তোমার ছবিটিকে আমি প্রায় সর্বদাই চুম্বিত করি—তাহার সহিত আমার কথা হয়—সে যেন ছবি নয়, সে যেন সর্বশেষে জীবন্ত হইয়া আমার নিকট প্রাণের।

## হেমলতা দেবী

বর্তমান বাঙালী প্রবীণতম লেখিকা, প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা]

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মোক্ত প্রত্যক্ষ করার জন্ম

সৌভাগ্য বঁদের অধিকারগত তাঁদের কেউ কেউ আমাদের অসীম সৌভাগ্য এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান থেকে আমাদের দৃষ্ট করে চলেছেন। পূর্বস্রব নবদ্বীপকে নগ্নভবে অবলোকন করে তাঁরা কৃতার্থ—তাঁদের আমাদের মধ্যে পেরে আমরা ভাগ্যবান। পরম শ্রদ্ধেয়া হেমলতা ঠাকুর দেই তালিকার একটি উজ্জ্বল নাম।

জীবনের নব্বইটি বছর তাঁর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ জীবন তাঁর কর্মের ও সাধনার এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। সে সাধনার এখনও তাঁর ছেদ পড়ে নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যিনি দর্শন করেছেন, রামমোহনের সঙ্গে বীর রক্তের সম্পর্ক, দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের বাড়ির যিনি বধু সেই হেমলতা দেবী আজ চৈতন্য-চরণস্পৃষ্ট পূত্রীধাম প্রবাসিনী। নারীকল্যাণ এবং সাহিত্য সাধনার পূণ্যকর্ম নিমগ্ন। এখনও তাঁর উত্তম, উৎসাহ অশ্রুতরণযোগ্য—সুতীক্ষ্ণ অসাধারণ।

১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসের এক ভোরবেলায় হেমলতা দেবীর জন্ম। গোরাড়ি-কৃষ্ণনগর তাঁর জন্মস্থান। পুণ্যশ্রী রামমোহনের তিনি পৌত্রীর পৌত্রী। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন যোগীবর স্বর্গীয় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রখ্যাত রাঢ়ীণি ও সুবীর্য স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অগ্রজ। ১৮৯০ সালে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত অমৃততীর্থ তাঁর আগমন ঘটল মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র পুন্ড্রনীর বিজ্ঞেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশুদ্ধাক দীপেন্দ্রনাথের সহধর্মিণীরূপে। রামমোহন ও তাঁর মানসপুত্র দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক যোগসূত্র অগ্রজ তার আগেই স্থাপিত হয়ে গেছে। মোহিনীমোহন ও তাঁর মধ্যম অমৃত স্বনামগত রমণীমোহন বিজ্ঞেন্দ্রনাথের কন্যাদ্বয়ের পালিত্রয় করেছেন। হেমলতা দেবীর চতুর্থ অগ্রজ রজনীমোহনের বিবাহও তখন সম্পন্ন হয়েছে মহর্ষির ভ্রাতুষ্পৌত্রী শিল্পীশ্রেষ্ঠ সুনয়নী দেবীর সঙ্গে।

বিবাহের পর হেমলতা দেবীর সাহিত্যচর্চা অপ্রতিষ্ঠিত গতিতে চলতে থাকে। পড়া আর লেখা সমান তালে এগোতে থাকে। তা ছাড়া তখন জোড়াসাঁকোর পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া হেমলতা দেবীর সৃষ্টিধর্মী রসপিপাসু মনকে যে কানার কানার ভরিয়ে তুলছে এবং নব নব ভাবে উদ্দীপিত করছে তা সহজেই অমৃতে। পুণ্যকর দেবেন্দ্রনাথ তখনও বর্তমান। বিজ্ঞেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্পকুমারী, তা ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বলেন্দ্রনাথ, সুবীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, স্বতেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা, সুনয়নী, হিব্রুদাসী, সরলা প্রমুখ তৎকাল-তৎকালীণ সৃষ্টির অভিসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না হেমলতা দেবীর পক্ষে। সেই মিছিলে নিজেকেও তিনি দিলেন যুক্ত করে।

শাস্ত্রানুশাসনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিজ্ঞেন্দ্রনাথও স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধলেন শাস্ত্রানিকেতনে। দীপেন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবীও। কবিজ্ঞায়া সুপালিনী দেবীর অকালমৃত্যুর পর আশ্রমের তলানীস্থান বালক-বালিকাদের পরিচর্যা ও লালন-পালনের ভার নিলেন হেমলতা দেবী। এদের লালন-পালনে সর্দিন তিনি যে



যত্ন ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা মেলে না। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁর দেবপুত্রেরা তাঁকে 'বদমা' বলে ডেকে থাকেন বা থাকতেন—সেই থেকে দেখতে দেখতে সকলের ঘরাই তিনি সন্ধ্যামিতা হতে থাকলেন 'বদমা' বলে। মাতৃষের প্রতিমূর্তি হেমলতা দেবীর এ সার্থক সন্ধান।

সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর অদ্বৈতপূর্ণ শক্তি পরিচয় পাওয়া গেছে। আজকের মহিলা লেখিকাদের মধ্যে তিনি প্রবীণতম। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গল্প এবং কাব্য উভয় রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। ছনিয়ার দেনা,



হেমলতা দেবী

মৈত্রেয় কথ্য, দু'পাক্ষা, পৃথিবীর ডাক (নাটক), দেহলি (গল্প), জ্যোতি (কাব্য), আলোর পানি (কাব্য) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্য-কীর্তি পরিচায়ক। তাঁর লেখা পৃথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি বর্তমানে প্রকাশের পথে।

১৯২২ সালে দীপেন্দ্রনাথের স্বর্ণলাভ। ১৯২৬ সালে বিজ্ঞানসাধন শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে কলকাতায় বাসা বাঁধেন হেমলতা দেবী। যোগ দেন সরোজ নলিনী মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'বঙ্গজ্ঞানী' নামে যে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় দীর্ঘকাল তার সম্পাদনা করেছেন তিনি, এখনও তার পরিচালিকামণ্ডলীর শিরোদেশে তাঁর নাম শোভা পাচ্ছে। ১৯৩০ সালে পুরীতে এলেন হেমলতা দেবী। এলেন স্বর্গীয় তার প্রভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সচর্মিণী ও স্নেহবচস্করের মুক্তি-চিন্তার অকৃত্রিম সেনাপতি মেজর জেনারেল এ সি (অনিলেন্দ্র) চট্টোপাধ্যায়ের জননী লেডী বসন্তকুমারীর আহ্বানে। গড়ে তুললেন 'বসন্তকুমারী বিদ্যাব্রত'। আজও ঐ আশ্রমের শীর্ষস্থানে তিনি সম্মানে সমাসীন। নারী-জাগরণের ইতিহাসেও তিনি অস্বীকার্য হয়ে থাকবেন, নারীদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং অধিকার আদায়ে তাঁর সাধনা অবিচলবীর্য। মূৰ্খ অশিক্ষিত নারীদের, অসহায় বিধবাদের শিক্ষাদানে ও স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা অস্বকাব্য। তাঁর কল্যাণে কত নারী যে বেদনা, বকনা ও অজ্ঞতার কল্যাণাস থেকে মুক্তি পেয়ে নবজীবনের আলোকধারায় স্নাত হয়েছেন তার সীমাসংখ্যা নেই।

ইংরেজপন পরিভ্রমণের সময় তিনি ব্রিস্টলে পূর্বপুরুষ রামমোহনের সমাধি মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মস্ত্রান্ত পুরীতে তাঁর একানব্ব্ব ইতিম জন্মদিন পরম সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়, এ উপলক্ষে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়—স্বর্ণসেতু। ছ'টি বিশেষ যুগের মধ্যে আজ সত্যিই তিনি এক স্বর্ণসেতু।

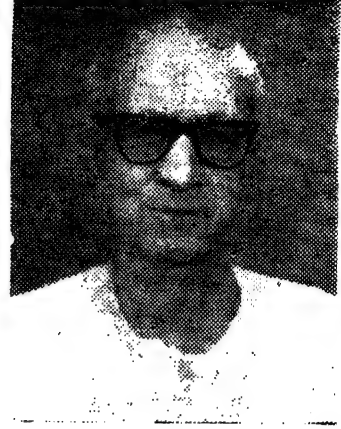
যোড়শী বধু হয়ে যেদিন তিনি কোড়সাঁকোর আসনে, সেদিন মাতৃহার। ছ'টি শিশুকে তিনি বৃকে তুলে নিয়েছিলেন অপর্যাপ্তস্নেহে—তাঁরা দীপেন্দ্রনাথের প্রথম সচর্মিণী সুনীলা দেবীর পুত্র-কন্যা-সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ও নলিনী দেবী। উভয়েই আজ পরপারের বাসিন্দা। দিনেন্দ্রনাথের দুই ছাত্রী সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণাশাণি দেবী (হেমলতা দেবীর ভাতৃপুত্রী) এবং কমলা দেবী ও নলিনী দেবীর দ্বারা প্রথম চৌধুরী অমল ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীও আজ ইহলোকে বর্তমান নেই। কিন্তু হেমলতা দেবীর সন্তান 'আজ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। শত শত সন্তানের তিনি প্রথম প্রকার 'বড়মা'।

## স্বাধাচন্দ্র সরকার

[ প্রখ্যাত প্রকাশক, বহীর্গমন আইনবিদ ]

প্রকাশন ব্যবসারে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে বীর্য দেণ-জননীর মুখ উজ্জ্বল করেছে শ্রীযুক্ত স্বাধাচন্দ্র সরকার মহাশয় সেই গলিকায় একটি অবিদ্যবীর্য নাম। শুধু প্রকাশক হিসাবেই নয় নাইনজীবী হিসাবেও বহুপল প্রসাদ তাঁর অধিকারগত।

বন্যবীজ পরিবারের বন্যমণ্ডল সন্তান তিনি। পিতৃদেব স্বর্গীয়



স্বাধাচন্দ্র সরকার

রায়বাহাদুর মহিমেন্দ্র সরকার ছিলেন বৃত্তবিদ্য পুরুষ। সাবজজ এবং গ্রন্থকার ও গ্রন্থ প্রকাশক হিসাবেও তিনি অস্বীকার্য। সাহিত্য-সাধিকা স্বর্গীয়া সরোজালা সরকার ও বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশক ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত সুরীন্দ্রেন্দ্র সরকার যথাক্রমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্নী ও অমল বহরমপুর ১৯১২ সালের ২২-এ শ্রাবণ (অগাস্ট ১৮৮৫) তাঁর জন্ম। রাজশাহী কলেজিতে স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজ-জীবনে তিনি পাঠ নিয়েছেন জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি 'ইনস্টিটিউশন (বর্তমানের 'স্ট্রিট চার্চ') ও সিটি কলেজে। ১৯১০ সালে আইন পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ।

গত শতাব্দীর শেষপার্শ্বে মহিমেন্দ্র প্রকাশনা ব্যবসারে আত্মনিবেশ করে। আইন সম্পর্কিত গ্রন্থ তিনি লিখতেন এবং প্রকাশ করতেন। বাঙালীদের মধ্যে কাইনগ্রন্থ রচনায় তিনি ছিলেন পথিকৃত। তা ছাড়া প্রকাশক জগতের চেহারা সেদিন আজকের মত ছিল না। প্রকাশন ব্যবসায় এগিয়ে আসতে কোন বাঙালীকে তখন বড় একটা দেখা যেত না। সেদিন সেই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন মহিমেন্দ্র, টম্বরের বুপার ভাগ্যরক্ষীর অফুরন্ত আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল তাঁর শিরোদেশে। স্বাধাচন্দ্রে মিতি হলেন পিতার সঙ্গে এই মহৎ প্রচেষ্টায়। আইনগ্রন্থগুলির সম্পাদন করতে থাকেন। প্রতিষ্ঠা হ'ল সুবিখ্যাত এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স, পুস্তক জগতে একটি বিশেষ উল্লেখের আজ যে অধিকারী।

১৯১১ সালে মূল্যে নিযুক্ত হওয়ার স্বাধাচন্দ্র প্রতিষ্ঠানের ভার তুলে দিলেন স্বাধাচন্দ্র সুরীন্দ্রেন্দ্রের প্রতি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অংশীদার হিসাবে তিনি লিপ্ত ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, তারপর তার সমস্ত স্বত্ব সুরীন্দ্রেন্দ্রকে দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স। ১৯৩৪ সালে কলকাতার ছোট আঞ্চলতে তিনি অন্ততম ষিয়ারক নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি অবসর নিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি লাভ করলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। ১৯৪৯ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিচার সংস্থার কমিটির



সভা নির্বাচিত হন। ল অফ এভিডেন্স, ল অফ সিভিল প্রেসিডিওর, ল অফ ক্রিমিনাল প্রেসিডিওর, মডার্ন এড্‌ভোকেসি এ্যাণ্ড কনস্ট্রাক্‌শন এন্ড ইন্সট্রাক্‌শন আইনগ্ৰন্থের তিনি সার্বজন্য রচিত। আইন-জগতে তাঁর গ্রন্থগুলি অসাধারণ এনেছে, বিচারকমণ্ডল ও ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় তাঁর সুরক্ষিত ও সারগর্ভ মতামতগুলির বখেই মূল্য দিয়ে থাকেন। দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারকগণ তাঁর মত ও ভাবধারা অবলম্বন করে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্সও প্রকাশক হিসাবে বখেই প্রসিদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

১৯০৩ সালে ইনি ইতিহাসচর্চার আধুনিক ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আচার্য শ্রীর বটুনাথের অগ্রজ কুমুদনাথ সরকার মহাশয়ের কন্যা নিরুপমা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর ছুই পুত্রই বখেই কৃতী। জ্যেষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র সরকার এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং সাহিত্যরসিক ও কনিষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া'র ডাইরেক্টর চেল সবকার। কন্যায় পরলাকগতা। সুপ্রসিদ্ধ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কীরোরচন্দ্র চৌধুরী তাঁর জামাতা।

বহু ইংরাজী আইনগ্রন্থের রচিতা হলেও বাঙলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর অপরিণীয়। বাঙাল সাহিত্যের তিনি একজন বিদগ্ধ পাঠকও। বাঙলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন তাও বিশেষভাবে মর্য্যব। আজ তিনি অসীতিতে উপনীত—কিন্তু কর্মশক্তি এখনও জ্বলন্ত বাত্‌স্বক্কন আত্মসমর্পণ করে নি। তাঁর উদ্ভম, উৎসাহ এবং উদীপনা এখনও বিশেষভাবে লক্ষ্যীয়। বর্তমানে চক্ষুপারীকর্মে তিনি ইংলাণ্ডে অবস্থান করছেন। সিদ্ধকাম হয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন সর্বাঙ্গকরণে এই প্রার্থনাই করি।

## বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[ বাঙলা চলচ্চিত্রের জনক ]

বাঙলা ছাত্রজীবির আভ্যন্তরীণ দিনে গৌরবের আর প্রসিদ্ধির অস্ত্র নেই। দিবিদিকের তার জয়যাত্রা আজ অপ্রতিহত। সারা বিশ্বের তার আজ অকুণ্ঠ সমাদর। ছাত্রাচার্য কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় এক বিরাট শিল্পে পরিণতি লাভ করে অসংখ্য নবনরীর মুখে আজ তুলে ধরেছে অন্ন, ভরিয়ে তুলছে তাদের যশ, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার। বহু বছর পূর্বে বাঙলা ছবি নির্মাণের বাসনা যে তরুণের স্বপ্নদর্শী মনে প্রথম দানা বেঁধে উঠেছিল, বাঙা ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন সর্বপ্রথম যিনি দেখেছিলেন, আজকের দিনের বিশ্ববাসিত বাঙলা ছবির নির্মাণের হুঃসাহসের পরিচর যিনি সর্বপ্রথম লিখেছিলেন তিনি নিঃসংশয় সমগ্র চিত্রজগতের নমস্কার। বাঙলা চলচ্চিত্রের শ্রষ্টা সেই পৃথিবীতের শ্রেণীর নাম—বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সময়ের অগ্রগমন সেই তরুণকে আজ পরিণত করেছে বাস্তবের বছরের বুকে। স্মৃতির বিষয় বসস তাঁর কর্মশক্তিকে রান করতে পারে নি, অসাধারণ উদ্ভম এখনও তাঁর আয়ত্তে।

বরিশালের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও

আলতার স্বনামধন্য জমিদার কালীকিশোর রায়চৌধুরী কন্যা বিরাজমোহিনী দেবীর ছয় পুত্রের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ পঞ্চম। দ্বিতীয় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যারিস্টার, বিবাহ করেন সুপ্রসিদ্ধ সমাজনেতা ও সাহিত্যসেবী চিরঞ্জীব শর্মা (ব্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) কন্যাকে, অরুণা আসক আলি ও স্বর্গতা পূর্ণিমা বন্দোপাধ্যায় এদেরই দুই কন্যা। তৃতীয় দ্বিকপাল পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জামাতা। চতুর্থ তারদ্রাবাদের চীক ইঞ্জিনীর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা শরৎকুমারী দেবীর দৌহিত্রপতি। খ্যাতনামা শিল্পী স্বর্গা মুখোপাধ্যায় এদের কন্যা।

১৮৯৩ সালের ২৬শে মার্চ কন'ওয়ালিশ স্ট্রীটের ১৩ নং বাড়িতে বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। সেই বাড়িতে তখন এটি পরিবার ছাড়া বাস করতেন বিনিচন্দ্র পাল ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উনয়েই ছিলেন বামনচন্দ্রের স্ত্রী। বারো বছর বয়সে বীরেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের তখন আদিপর্ব রবীন্দ্রনাথ নিজে পড়াতেন ইতিহাস, জগদানন্দ রায় পড়াতেন বাঙলা, ভূপেন্দ্র সান্যাল পড়াতেন সংস্কৃত। গান শোখাতেন শিল্পেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করাতেন, এটি অভিনয়ের মাধ্যমেই ছাত্রদের ইতিহাস পড়া হয়ে যেত, এমনই বিশেষত্বসম্পন্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদারী। এই সময় থেকেই অভিনয় বীরেন্দ্রনাথের মনে প্রথম স্বাক্ষর বেধে যায়। কলকাতায় এসে 'ভর্তি' হলেন সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে। এখানে ছাত্র থাকাকালীন 'বেঙ্গল রগড' অভিনয়ে তিনি হাটে 'নৈপুণ্য' দেখান, এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন—স্টাটসহের বর্ড কারমাইকেল ও লেডি কারমাইকেল। এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আড়াই শ' টাকা বেতনে বামবা রাজ্যে একটি বর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তের শ' টাকা বেতনে তারদ্রাবাদের শিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকে চলচ্চিত্র তাঁর মনে জুড়ে থাকে, চলচ্চিত্রই সাধনার বস্তুতে রূপ নিল, অবসর সময়ে চলচ্চিত্রের উপযোগী পুট তৈরীকতেন, স্থির চিত্রের সাহায্যে সেগুলি প্রকাশ করেন। কাহিনীগুলিকে পল্লবপু, অমুঘারী স্থিরচিত্রের মাধ্যমে রূপ দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই ধরনের সত্যখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলির নাম ভাবের অভিযুক্তি (একশ' খানি চিত্র-সমগ্র), ইংরাজি, বাঙলা ও হিন্দী ভাষার প্রকাশিত হয় (বিবে, ফুলশাখা, কেবল হাসি, বড়বেগড়, আমায় বেশ (জাতীয়তা উদ্দীপক)।

এই পরিকল্পনা তিনি শ্রুতিলেন ম্যাডানকে। ম্যাডান আমন্ত্রণ জানালেন বীরেন্দ্রনাথকে। তের শ' টাকার মাইনেব পাকা চাকরী একব'কো ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে উপেক্ষা করে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বীরেন্দ্রনাথ, ম্যাডান চাইলেন 'রিফর্ম' করতে। বীরেন্দ্রনাথ ভার নিলেন, অমুমতি সংগ্রহ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ম্যাডানের প্রতিষ্ঠানে তখন ভিতরে ভিতরে এক আগুন জ্বলছে। বাঙালীদের 'শালক' বিশেষণ প্রয়োগে তাঁরা তখন দরজা দিল। সেই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার তখন সন্ত পরলোকগত নীতিশচন্দ্র সাহিড়ী। নীতিশচন্দ্র বীরেন্দ্রনাথকে জানালেন

সে কথা। বললেন—আমরা ছেড়ে যাচ্ছি, আপনি পারবেন এই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে, আশুন নিজেরা কিছু গড়ে তুলি।

১৯১৮ সালে গড়ে তোলা হ'ল ইণ্ডিও ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী। বাঙালীর অর্ধ ও শ্রমে নিমিত্ত প্রথম চিত্র প্রতিষ্ঠান। প্রথম ছবি এঁদের বিলাত ফেরৎ। (মুক্তিলাভ ১৯২১) পরবর্তী ছবি যশো-নন্দন সাধু-কিশোরতন। বীরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় এই সব ছবিতে নীতাশচন্দ্রও অভিনয় করতেন। আবার ফিরে গেলেন ছায়দ্রাবাদে, সৃষ্টি করলেন লোটাস কোম্পানী, উপহার দিলেন ন'খানি, ছায়াচিত্র। ১৯২৬ সালে বাঙলা দেশে প্রত্যাগমন করে মিত্র থিয়েটারে যোগ দিলেন বীরেন্দ্রনাথ, সেখানে প্রায় শতাধিক রজনী তিনি অঙ্গীকবাবু নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা হ'ল অবিস্মরণীয় ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মসের। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীরেন্দ্রনাথ আটখানি ছবি উপহার দেন—ফ্রমস অফ ফ্রমস, টাকাম কি না হয়, নটি বর, অঙ্গীকবাবু, পঞ্চাশ, মম্বাংর পরে, সোমাস্ত চোর, চরিত্রহীন। বাঙলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের অমরত্ব অনস্বীকার্য। শিকানবীণ বা সহকারী হিসাবে বহু বিখ্যাত নট-নটী, কুশলী এইখানে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন, এইখানেই তাঁদের হাতেসড়ি—সেই তালিকায়—চিত্রাচার্য দেবকীকুমার। চিত্রজগতের গৌরব প্রদায়ক, সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন দাস, চিত্রশিল্পী দিব্যেন্দ্র ঘোষের বাবা সতীশ ঘোষ, জামাপদ বসু, রাধা ফিল্মস স্টুডিওর অগ্রন্থত কর্ণার কানাই ঘোষাল, নবদীপ হালদার, ১৩৮ রাসের রাবা সতুরাম, বাণীবাবু, কৃষ্ণাংগপাল, চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্তর বাবা হেম গুপ্ত, প্রেমিকা দেবী, সবিতা দেবী, রাধারাণী, ভিলিসিগা ব্লক প্রেমকুমারী নেত্রক, অমিয়া দেবী প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট নাম। দেবকীকুমার, প্রমথেশচন্দ্র, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ দিকপাল পরিচালকবৃন্দ বীরেন্দ্রনাথের সহকারী ছিলেন। তা ছাড়াও দেবকীকুমার প্রমুখ আন্তরক দিনে খ্যাতির উত্তর শীর্ষে অধিষ্ঠিত অসংখ্য শিল্পী ও কুশলীর সম্মানে এই জগতের দ্বার বীরেন্দ্রনাথই প্রথম উন্মুক্ত করে দেন। সেই নামগুলির পূর্ণতালিকা প্রকাশ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য। অভিজাত ও ভদ্র-পরিবারের মহিলাদের চিত্রজগত সর্বপ্রথম লাভ করেছে বীরেন্দ্রনাথেরই কল্যাণে। তাঁর সহধর্মিণী প্রেমিকা দেবী (কানাইলাল ঠাকুরের কন্যাংশীয়া) রমলা দেবী নামে ছায়াচিত্রে অবতীর্ণ হন, তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত পরিবারোদ্ভূতা যিনি ছায়াচিত্রে অভিনেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ ভদ্র ও অভিজাত অগণিত মহিলা চলচ্চিত্রে যোগ দিয়ে তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা চিত্রজগতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, কিন্তু অতীতে বীরেন্দ্রনাথ যেন এই সম্বন্ধে আত্মনিয়োগ করেন, তখন তাঁর ভাগ্যে ছুটেছিল যথেষ্ট উপহাস, লজ্জা বাজ বিজ্ঞপ। বাঙলা দেশের ছায়াচিত্রের জনক বীরেন্দ্রনাথ তাঁর যাত্রারস্ত্রে পাথেররূপে লাভ করলেন যথেষ্ট অসহযোগিতা এবং নিন্দা ও বিজ্ঞপ তাঁর পথরোধ করে পাড়িয়েছে, বাধা-বিপত্তি বারংবার তাঁর সম্মান এসেছে। সহস্র দুর্যোগ তিনি অতিক্রম করে গেছেন, অপার মনোবল অসীম ধৈর্য এবং অসাধারণ দৃঢ়তায়। অবশেষে এই বৈধ, মনোবল ও দৃঢ়তাই তাঁর সাধনায় এনে দিল সিদ্ধি, বিজয়লক্ষীর জরটিকার উজ্জ্বল হল তাঁর

লাট, ভাগ্যলক্ষীর প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ধিত হল তাঁর উদ্দেশ্যে অমৃতধারার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ বছরের জন্ম তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন গায়েরাভিভাগের অফিসারদের ছদ্মবশ সম্পর্ক শিক্ষানবীর। রূপসজ্জার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষজ্ঞ।

বর্তমানে 'মনের মতন' নামে একটি ছায়াচিত্র নির্মাণে তিনি ব্যস্ত। সাধারণ্যে একটি বিশেষ অভিজ্ঞতায় তিনি সম্বোধিত—ডি জি বীরেন গাঙ্গুলী ছাড়া এরকম আরও একটি অর্ধ হতে পারে সেট—ডাইরেক্টর জু গ্রেট।

## শ্রীবনযজীবন ঘোষ

[ নির্ধাতিত দেশকর্মী, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব

কমিশনার ও গ্রন্থকার ]

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, কঠোর পরিশ্রম ও কর্মে সত্যতা যে সব মানুষের জীবনে সাফল্য এনেছে আর যাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ঢল নিনাদ নেই, সেই সব ব্যক্তির তালিকায় শ্রীবনযজীবন ঘোষ এমন একটি উল্লেখযোগ্য নাম—যিনি একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র, অধ্যাপক, নির্ধাতিত দেশকর্মী, বিপ্লবী, সংস্কারোৎসাহী ও অভিজ্ঞ প্রশাসক, সমাজসেবী ও লেখক।

জন্ম ১৯০৭ সালের ৮ই মে (২৫-এ বৈশাখ) মাতুলালরে ভগলী জেলার ধামানি গ্রামে হলেও শ্রীবনযজীবন ঘোষের পরিবার পূর্ববঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী: স্বাধীনতা-যুদ্ধে মেদিনীপুরের নাম সর্বাগ্রে করা যায়, স্বাধীনতা-যুদ্ধে এই পরিবারের



শ্রীবনযজীবন ঘোষ



মাসিক বহুমতী

ভিমির বিদারি

॥ আলোকচিত্র ॥

—বৈজনাথ ভট্ট

ওড়নার আড়ালে

—দেবু

ভাদ্র / ১৭১





—গোপালকৃষ্ণ পাল

মাসিক বহুমতী । ভাদ্র / '৭১



—অসিত মিত্র

॥ ভোরের ভৈরবী ॥

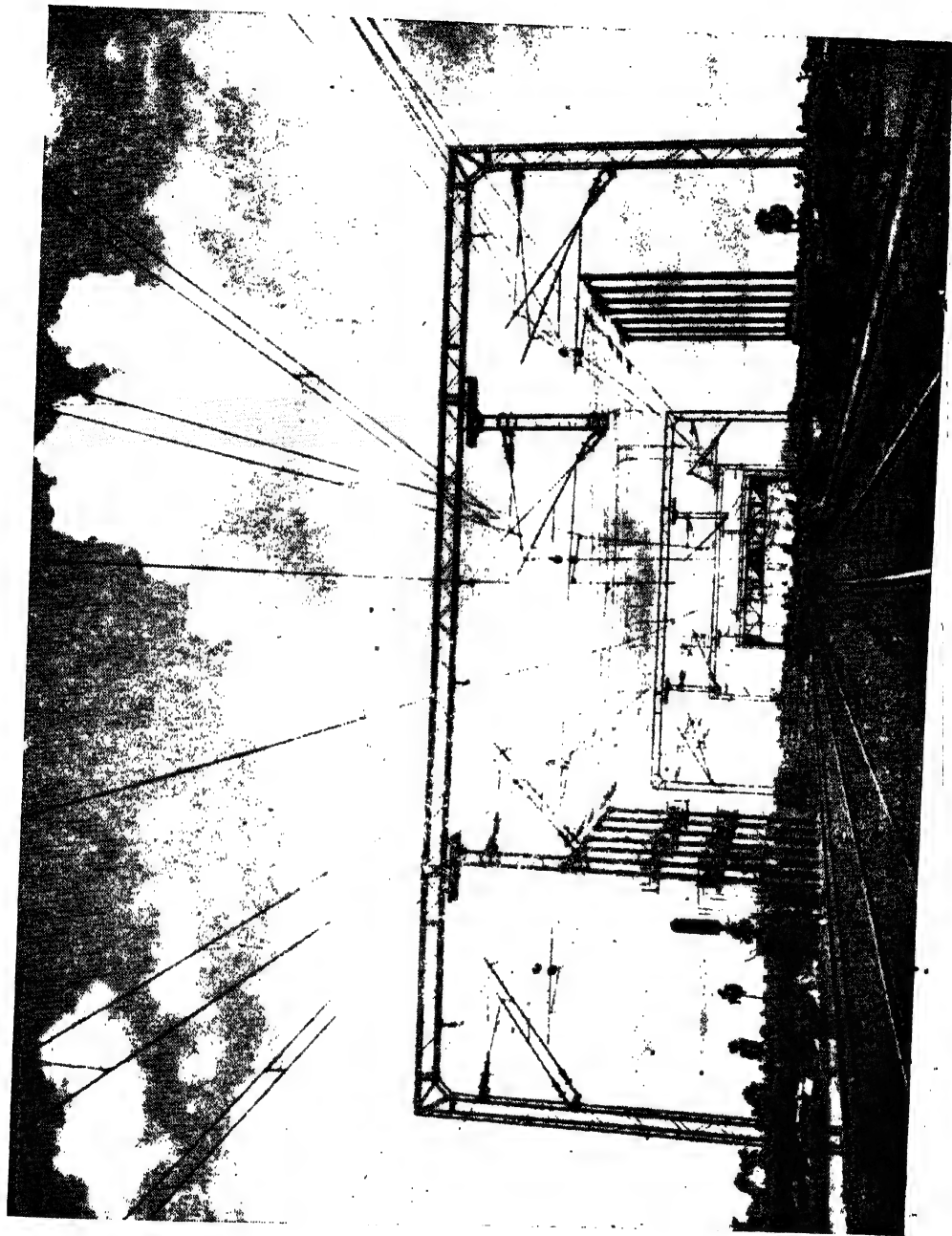
—মেঘনাদ সাহা



—প্রভাতকুমার বসু

—এস এম হারদাস





মাসিক  
বহুমতী  
ভাদ্র / '৭১

১২ হতে  
দ্বিতীয়ে  
বিনয় মুখোপাধ্যায়



## এস মা জননী

দানও অপরিশোধ্য। আর এই বিখ্যাত বিপ্লবী পরিবারের একজন বিনয়জীবন। তাঁর বাঁকা স্নানমথ্যাত বোগজীবন ঘোষ বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম যুগে মেদিনীপুর বোমা যুদ্ধে মামলায় দশ বছর দীপান্তরে দণ্ডিত হন। বিনয়বাবুর তৃতীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়জীবন পেড়ীহত্যার লিপ্ত থাকার কারণে দু'বছর মোট বাবো বছর রাজবন্দী ছিলেন। চতুর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবজীবন রাজবন্দী থাকাকালীন সন্দেহজনক পরিবেশে মুহুমুখে পতিত হন। পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্মলজীবনের বার্জহত্যা যুদ্ধে মামলায় কাসি হয়। এইসব কারণে সমগ্র পরিবারের ওপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার চলে। বিনয়জীবনও তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। বিনয়বাবুর পিতা মেদিনীপুরের ডাকল জীবামিনীজীবন ঘোষ ৭৯ বছর বয়সে এখন জীবিত। তাঁর মহিষী মাতা জীবমতী প্রভাসরঞ্জিনী ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে পরলোকগমন করেন।

জীবনয়জীবন ঘোষ মেদিনীপুর কলেজের ছাত্র, মেদিনীপুর বালক ও কলকাতার স্কটস চার্চ কলেজে শিক্ষাগ্রহণের পর ১৯৩০ সালে ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৩১ সালে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ গ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্যে স্বাধীনতাকামী যুগক বিনয়জীবন বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাই ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার প্রচেষ্টায় সন্নিহিত থাকায় তিনি অধ্যাপক পদ হতে বরখাস্ত ও মেদিনীপুর হতে বহিষ্কৃত হন, ছাড়তে হল তাকে শিক্ষাব্রত, ছাড়তে হল দেশ। চলে এলেন কলকাতার।

শরৎচন্দ্র বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় বিনয়জীবন ১৯৩৭ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী বিভাগে প্রবেশ করেন। সং ও দক্ষ কর্মচারী হিসেবে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি সরকারী কোণ হতে নিষ্কৃতি পান নি। কর্পোরেশনে চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধে ১৯৪১ সালের মে মাসে জীবনয়জীবন ঘোষকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৫ বছর বাংলা দেশে বানানি জেলে তিনি আটক থাকেন। তারপর ১৯৫১ সালের প্রারম্ভেই

তিনি কর্পোরেশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১৩ বছর সেই পদ সংগোহণে অলঙ্কৃত করার পর ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের শুরুতে কর্পোরেশনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাকে চার মাসের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার পদের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়। এই গুরুদায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে বহন করেন ও চার মাস শেষ হলে তিনি কর্পোরেশনের চাকুরী হতে স্বচ্ছন্দে পদত্যাগ করেন।

চাকুরী ছাড়লেও তিনি তাঁর স্বভাবজ জনহিতকর কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি, তাই 'অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ভারত-সেবক সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার অর্থনৈতিক সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। বহু বছর পূর্বে তিনি কলকাতার মেদিনীপুর সমিতির প্রার্থী করেন। তাঁর নিরলস কর্মব্যস্ত জীবনে তিনি সাহিত্যকে ভোনে নি, তাঁর সাহিত্য-প্রীতির স্বাক্ষর পাওয়া যায় বিভিন্ন সাবাদপত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধাদির মাধ্যমে। এ ছাড়াও তিনি 'অগ্রযুগের অন্তর্ভুক্ত হেমচন্দ্র', 'Murder of British Magistrates' ও হ'সারসাম্রাজ্য 'চকিত-চমকে' নামে দু'খানা বাংলা ও একখানা ইংরেজি বই লেখেন। প্রথম দু'টি বইয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক অলিখিত দিকের উদ্ঘাটন হয় আর শেষোক্ত গ্রন্থে তাঁর স্ববসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগতজীবনে ঐতিহাস্য, বিনয়-ভরপুর, এই সদালাপী স্বয়ংসিক মাদুরটির সারিধা ঘাঁরা এসেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, তাঁর আত্মজন্মশুলভ আচরণকে।

কর্পোরেশন হতে তাঁর বিদায়ক্ষেণে কাউন্সিলরগণ ও সকল স্তরের কর্মচারীরা তাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা জানান। পৌর-প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্ররূপে মেঘর জীতিসুত্রজন চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণ বলেন—

'May your integrity, your devotion to duty, your forth rightness be a beacon in a blackout for all.'

আপনার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সবল স্পষ্টাচার অক্ষতাবে অসলোবহিকরূপে হোক সকলের পথনির্দেশক।

## এস মা জননী

### শ্রীমতী শান্তি বসু

এস মা জননী কলুয়ানিশিনী

এগ বরাভর প্রাণিনি

বাখিতে মোদের মান

আজি অন্ন-বস্ত্র, হাহাকারে

দৈন্ত-দুঃখ, ব্যথা ভারে

ভর্জরিত তব সন্তান

স্নেহের পরশে তব,

দূরে বাক্, অমঙ্গল সব

দেহে জাগুক, নব প্রাণ

আমাদের পূজাসরে

ফিরে যেও, শিশুসারে

অন্ন-বস্ত্রের, করে সংস্থান

নিরে যদি বাস মা ধরে

স্থানকা বাজিরের, সঙ্গে করে

আমরা পাই পরিত্রাণ

সিংহ লেলিরে, দে মা পিছে

নইলে মোরা, বাঁচি না বে

কে করে, চোরার সন্ধান।





মাধবী মুখার্জীর সৌন্দর্যের গোপন কথা

## ‘আমার স্বকের সৌন্দর্যের জন্যে লাক্সই দায়ী’

সুন্দরী চিত্রতারকা মাধবী মুখার্জী বলেন, “ত্বকের  
যত্ন নিতে বিশুদ্ধ কোমল লাক্স টয়লেট সাবানের জুড়ী  
নেই। লাক্সের সরের মত নরম ফেন। আর সুন্দর মিষ্টি গন্ধ  
আমার ভারী ভাল লাগে। আপনিও আমার মত প্রতিদিন  
লাক্স ব্যবহার করুন, আপনার ত্বকও সুন্দর হয়ে উঠবে।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য সাবান



হিন্দুস্থান লভারের তৈরী

সাদা আর রাশমধুর চারটি রঙে

LTS. 181 140 BQ



অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

# বাতাসী মজিল



[৩নটবর মিত্রের ডায়েরি থেকে]

কি আমার এই বিশ্বটিকে ছাপাইয়া উঠিল আরেকটি বিশ্ব। ঠিক এমন সময় কিছুদূরে কে যেন বাঁশের বাঁশি বাজাইতে শুরু করিল। অমন আশ্চর্য বাঁশি বাজানো জীবনে কখনো শুনি নাই। বাঁশির সুর যে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মন-প্রাণ এমন আকুল করিতে পারে, তাহা জানিতাম না। আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আড়া-আড়িই বাহাদের জীবনের বৃত্তি ও ব্রত, তাহাদের একটি প্রধান ডোরায় এমন সংগীত শুনিব আশা করি মাই। বাঁশিতে দরবারী কানোড়া রাগের অতি অপূর্ণপ আলাপ বাজিতেছিল, যাহা শুনিয়া বৃষিতে পারিলাম বাদক শুধু বশীবাদনেই অসামান্য দক্ষ নহে, রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও অসাধারণ। স্বয়ং তানসেনও তাঁহার সৃষ্ট এই রাগের এমন রূপায়ণ শুনিলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন। আমিও আত্মহারা হইলাম। সমস্ত পরিবেশটাই যেন ঐ সুরের মধ্যে বল্লাইয়া গেল।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম, 'কে এমন আশ্চর্য বাঁশি বাজাইতেছে, বাতাসী বিবি ?'

বাতাসী বিবি বলিল, 'পাঠকজি। টান্দনীরাতে ঘুমাইবার আগে তিনি এইরূপ বাঁশি বাজান।'

'পাঠকজি এমন আশ্চর্য বাঁশি বাজান ? ইহা আমার বঙ্গনারও অতীত ছিল।'

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'পাঠকজির আপনি আর কতটুকু জানেন, বাবুজি ! বাঁশের লাঠি চালাইতে তাঁহার জুড়ি

ছিল না ; বাঁশের বাঁশি বাজাইতেও তাঁহার জুড়ি নাই। ফুল-বাগানের শেষ দিকে একটি দেওলার গাছের তলায় একা বসিয়া তিনি বাঁশি বাজাইতেছেন। এ সময়ে ওখানে কাহারো ঘাইবার লক্ষ্য নাই, এমন কি আমারও নহে।'

বোম্বেভাঙ্গা পাঠকের নিজের মুখেই শুনিয়াছি তিনি একাধিক মাহুঘ খুন করিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা বাতাসী বিবির নির্দেশে এখনও ক্যাননবদনে আরো মাহুঘ খুন করিতে পারেন। ইহা তাঁহার মিথ্যা বড়াই নহে, সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নাই। এ তেন সাংঘাতিক মাহুঘের হাত হইতে বাঁশি এমন মন-মাতাল-করা সুরলহরী আদায় করে কি করিয়া ?

বাঁশির অতুলনীয় সংগীতে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য বাতাসী বিবিকেও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল যেন বহুদূরে কোনো স্থানের জগতে চলিয়া গিয়াছি। সে জগতে দুখে নাই, শোক নাই, হিংসা-দ্বন্দ্ব কিছুই নাই, আছে শুধু সংগীত আর আনন্দ। চাঁদের স্থান পরিবর্তনের ফলে চাঁদের আলো কখন ঘরের আরো ভিতরদিকে ঢুকিয়া আসিয়াছিল খোয়াল করিতে পারি নাই। বাঁশির সুর কণি হইতে কণিতর হইয়া অবশেষে নারব : হইয়া গেল, তখন নাইটকেল পাখির গান ধামিরা গেল কবি কাটস্ (Keats) যেমন ভাবিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ভাবিলাম :

'স্লিড ইজ তাত মিউজিক :  
ডু আই ওয়েক অর স্লীপ ?'  
(Fled is that music ;  
Do I wake or sleep ?)

সঙ্গীত খামিরা গিয়াছে: আমি কি জাগিয়া আছি না ঘুমাইতেছি?

সহসা মনে হইল আমি বৃষ্টি স্বপ্নই দেখিতেছি। আমার সামনে বসিয়া এক অপূর্ণা নারীমূর্তি। কোথার গেল সেই মুখ-জঙ্ক। বাতাসী বিবি? এ নারীর সম্পূর্ণ অনাবৃত মুখ চাঁদের আলোর হাসিতেছে, চাঁদের আলোও যেন ঐ আশ্চর্য মুখের স্পর্শসৌভাগ্য লাভ করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেছে।

‘আমি চমকিত হইয়া প্রশ্ন করলাম, ‘কে তুমি?’

নারী মুহূর্তে হাসিয়া ভাব দিল, ‘আপনার বানী, বাবুজি। বাতাসী বিবি।’

তব্বল সেই কণ্ঠস্বর, বীশি খামিয়ার কিছুকণ আগে পর্যন্ত যে কণ্ঠস্বর শুনিতে ছিলাম। বাঁশির সুর যে অপ্রত্যাশিত চমক লাগাইয়াছিল, তার চেয়ে বড় চমক কাগাইল মুখাবরণহীন বাতাসী বিবির আবির্ভাব। যেখের ঘন আড়াল হইতে সহসা চাঁদের আবির্ভাব হইল যেন। কিন্তু না, ঐ মুখে চাঁদের স্নৈতলতা ছিল না, চাঁদের মাধুর্যের উপর বিদ্যুৎ-চমকের উৎকর্ষ উজ্জ্বলতার প্রাঙ্গণ লাগানো সম্ভব হইলে যাঃ! ঝাঁড়ার, তাহাই ছিল। নারী-মুখো রূপ যে মনকে এমন চক্কল করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও যেন আজই প্রথম হুঁশিলাম।

আমি বাধা হইয়া কিছুকণ অপহবনেতে বাতাসী বিবির মুখের দিকে তাকাইয়া বহিলম, আগ্রাণ চেষ্টাতেও অন্তরিক দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। ঐ বহুশ্রমীর হৃৎপিণ্ডে কিসের ব্যর্থ ছিল জানি না, যাঃ! চুপকরে মতো আমার হৃৎপিণ্ডে তারাকে আকর্ষণ করিতেছিল। অদ্ভুত ভাললাগা, অদ্ভুত ভয়। আর অদ্ভুত অশান্তির বিচিত্র মিশ্রণে এক অনির্বচনীয় অসুস্থতাই যেন মোহে-মনে আচ্ছন্ন বোধ করিতেছিলাম।

ভাবিশ্রম বাতাসী বিবি কি মায়াবিনী? নহিলে আমার মনের গোপন বাসনা জামিল কি করিয়া? বাঁশিতে দরবারী কানাদার আগ্রাণ বধন খামিরা গেল তখন, অথবা তাহার আগেই, মুখাবরণের আড়ালে লুকনো মুখটি দেবিবার কোঁতল আমার মনে অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। হয় তো কিছুকণ বাদে মরিয়া হইয়া নিজের হাতেই আঁরণ উন্মোচন করিবার জগ্গ হাত বাড়াইতাম। কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না, বাতাসী বিবি যেন আমার ইচ্ছা পূর্ণিত পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে আপন হাতেই সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিল।

কি জানি কেন একটু ইংরাজি ছড়ার দুটি লাইন মনে পড়িয়া গেল:

‘কাম ইন্টু মাই পার্লামেন্ট,

সেইড তু স্পাইডার টু ফ্লাই’

(Come into my parlour,

Said the spider to the fly)

কর্থাৎ মাকড়সা মাছিকে অসম্মান জানাইল: এসো আমার ঘরে। মাকড়সার জালের ঘরে গিয়া মাছির যে অবস্থা হইয়াছিল, আমারও কি সেই অবস্থা আসন্ন?

বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম আমার এই স্বপ্ন আর জাগরণের মিশ্রিত অবস্থা কি বাঁশির ব্যস্ততার পাঠকবির বাঁশির চরের মাদকতা এবং

বাতাসী বিবির ঐ আশ্চর্য মুখের রূপের মাদকতার ফল? অথবা আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থার আমাকে যে হেকিম তরল দাওয়াই পান করানো হইয়াছে, তাহারই ফল এতকণে গাঢ় হইয়া ফলিতে শুরু করিয়াছে?

বাতাসী বিবি বলিল, ‘বাবুজি, আপনার সামনে মুখ খুলিলাম, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।’ তাহার কণ্ঠে যে আবেদনের সুর ছিল, তাহা বাস্তবিকই আন্তরিক, না। ছলনাময়ীর অভিনয়, ঠিক বুলিতে পারিলাম না। আমার বুদ্ধি বলিল ইহা কুটবুদ্ধি মতলবী মায়াবিনীর আন্তরিকতার ছলমাত্র, ইহার পিছনে কোনও গভীর অভিসন্ধি কাজ করিতেছে। কিন্তু আমার হৃদয় এই বহুশ্রমীর রূপমীর আবেদনকে ছলনা ভাবিতে কিছুতেই রাজী হইল না। স্বদয়ের কাছে বুদ্ধি হারিয়া গেল। এই কথাটা এখন যেভাবে বুলিতেছি, তখন ঠিক সেভাবে বুলিতে পারি নাই। তখন যেকণ মোহের ঘোর আচ্ছন্ন ছিলাম, তাহাতে মস্তিষ্ক ঠিক স্বাধীন’ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে পারিতেছিল না।

বাতাসী বিবি বলিল, ‘বাবুজি, আপনি জেনানা হইতে দূরে দূরে থাকেন। এমন কি জেনানা আপনার কুস্তি দেখিবে তাহাতেও আপনার আপত্তি ছিল। আপনার আপত্তির কথা বিবেচনা করিয়াই ভাবিয়াছিলাম আপনাকে মুখ দেখাইব না। কিন্তু না দেখাইয়া পারিলাম না। না দেখাইলে আমার চলিত না। কারণ গরজটা আমার।’

শুনিয়া আরো বিস্মিত হইলাম। আমাকে নিজের মুখ দেখাইতে বাতাসী বিবির অত গরজ কেন? একি অদ্ভুত ব্যাপার? মনের প্রশ্ন মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। তাহার প্রয়োজন হইল না।

বাতাসী বিবি বলিল, ‘আপনাকে আমার বড় প্রয়োজন বাবুজি! ঝাঁককে এতবড় প্রয়োজন, তাঁহাকে মুখ না দেখাইলে চলিবে কেন?’

বিশ্বয়ের উপর বিষম। ছুনিয়াম এত লোক থাকিতে এই ছুঁমুনীয়া বহুশ্রমীর বড় প্রয়োজন হইয়াছে আমাকেই এবং এই কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে মনের ভিতর সাহস সঞ্চয় করিবার জগ্গ সে এতকণ সময় নিয়েছে!

বাতাসী বিবি বলিল, ‘আপনাকে আমার বড় প্রয়োজন, বাবুজি!’—বাতাসী বিবির এই আবেদনে যে ব্যাকুল মিনতির সুর, তাহা মিথ্যা নহে। মনে হইল এত ঐশ্বর্যবল, এত প্রতিপত্তি, এত প্রভাব, বিরাট শাস্তিশালী দলের উপর এতবড় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও বাতাসী বিবি কোথার যেন বড় অসহায়, আর সেইখানেই সে যেন বড় ব্যাকুলভাবে আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে।

ইহাতে মনে মনে যে কিছুটা পুলকিত অহঙ্কার বোধ হইল না, এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতও হইয়া উঠিলাম। বাতাসী বিবি কি কোনও বিশেষ মতলবে আমাকে তাহার এই যে-আইনী, অপরাধ-ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিতে চায়? ভাবিলাম একবার বধন ইহার প্রশ্নে পড়িয়াছি, তখন আমি ইহার আওতা ছাড়াইতে চাহিলেই কি ছাড়ান পাইব? মগের হুলু ক বাস করিতেছে না, বাস করিতেছে প্রবল প্রত্যাশিত

## বাতাসী মজিল

ইংরেজের রাজত্বে, তাহা জানি। কিন্তু বাতাসী বিবির কুখ্যাত দলের বে-আইনী প্রতাপকে যদি কোনও একারে চটাইয়া বসি, তাহা হইলে ইংরেজের প্রতাপ তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত মাথা বামাইবে কি? এবং মাথা বামাইলেই কি আমি নিশ্চিত না নিরাপদ হইতে পারিব? বাতাসী বিবির নজরে—যভাবেই হউক—বখন একবার পড়িয়াছি, তখন তাহার মজিল বিকস্বতা করা নিরাপদ হইবে না বলিয়াই মনে হইল।

মনের শঙ্কিতভাব গোপন করিয়া বলিলাম, 'আমি তোমার দলের কোন কাজে লাগিব, বাতাসী বিবি?' বলিয়া অনেক কষ্টে সহজ হাসি হাসিবার চেষ্টা করিলাম।

বাতাসী বিবি বলিল, 'আপনাকে প্রয়োজন আমার দলের জগত নহে বাবুজি, বত আমায় জগত।'

তারপর মাথা নাড়িয়া আরো জোর দিয়া বলিল, 'না বাবুজি। দলের জগত নহে, আমারই জগত আপনাকে আমার প্রয়োজন।'

একথা শুনিয়া আমার ভীষণ চাকিইয়া উঠিলাম। দলের প্রয়োজনে নহে, তাহার নিজেরই প্রয়োজনে বাতাসী বিবি আমাকে দাবি করিতেছে। ভাষাটা ভিকার এবং ভঙ্গিটা মিনতির বটে, কিন্তু পিছনের সুরটা দাবির এবং হুকুমের, যে দাবি প্রত্যাখ্যান করিলে এবং যে হুকুম তামিল না করিলে আমার নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

জানি না চাঁদের আলোর বাতাসী বিবির মুখে হঠাৎ কি দেখিয়া আমি ভরসা করিয়া বলিতে পারিলাম, 'বাতাসী বিবি, যদি অতর দাও তো একটি প্রের করিব।'

বাতাসী বিবির মুখখানি এক আশ্চর্য হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, 'বাতাসী বিবি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই, বাবুজি। আপনার চুলের ডগাও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

অভয় পাইয়া প্রের করিলাম এই প্রয়োজনবোধটা তাহার এমন হঠাৎ মনে জাগিল কেন।

বাতাসী বিবি হাসিয়া বলিল, 'হঠাৎ নহে বাবুজি। আপনি আমাকে আজই প্রথম দেখিলেন। কিন্তু আপনি আমার কাছে নূতন নহেন।'

বাতাসী বিবি বলিতে লাগিল, 'বাবুজি, হুকুম চালাইতে চালাইতে আমি হয়রান হইয়া গিয়াছি, আমার উপর হুকুম চালাইবার কেহ নাই। আমি হুকুম শুনিবার জন্ত, হুকুম তামিল করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি।'

লক্ষ্য করিলাম এই কথা বলিতে বলিতে বাতাসী বিবির আশ্চর্য মুখের তীব্র রূপটি যেন হঠাৎ কোমল শিথলতার ভরিয়া উঠিয়াছে এবং দুই চোখে আশ্চর্যপ্রতিষ্ঠার চাইতে বদল যেন আশ্চর্যমণ্ডলের বাসনাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে কি বাতাসী বিবি চাহিতেছে এমন একজন মানুষ যে তাহার উপর হুকুম চালাইতে এবং তাহার হুকুম তামিল করিয়া সে তাহার বহাদুরের অতৃপ্ত ভূলা মিটাইবে? এবং সেই হুকুমকারীর পদ অবিকারের জগত আমাকেই যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া আনয়ন জানাইতেছে?

আমি বলিলাম, 'কেন, পাঠকজি আর হেকিম সাহেব?'

অর্থাৎ এই দুই প্রবীণ নিশ্চয়ই তাহার উপর হুকুম চালাইবার লায়েক, তাহার তাঁবেদার নহেন।

কিন্তু না। বাতাসী বিবি যেন সখেদেই জানাইল তাহার উপর 'হুকুম' চালাইবার ক্ষমতা ইহাদেরও নাই, হুকুম-ভূষণত বাতাসী বিবির জীবন যেন এই কারণেই বিঘ্ন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবনে যেন ইহাই ট্র্যাজেডি।

বাতাসী বিবি বলিল, 'বাবুজি পাঠকজি, হেকিম সাহেব—ইহারা আমাদের দুনিয়ার মানুষ। এই দুনিয়ার মানুষ। কি ছোট, কি বড়, সবারই শির আমাদের সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে। আমাদের দুনিয়ার কেহ আমার উপরে হুকুম চালাইবার কথা কল্পনাই করিতে পারে না।'

বুখিলাম অপরাধ-জগতের, অর্থাৎ 'ক্রিমিনাল'দের জগতের, কেহ এই পদের যোগ্য নহে, সেই কারণেই 'ক্রিমিনাল' জগতের বাহ্যের 'ভদ্রসমাজ' হইতে সে—কি রহস্যময় কারণে জানি না—আমাকে চাহিতেছে তাহার ব্যক্তিগত হুকুমদাতা, পরামর্শদাতারূপে।

বাতাসী বিবি যে জগতের জীব, সে জগৎ সমাজ-বিরাগী, সে জগৎ বে-আইনের, পাপের, অশুভের, সে জগৎ নানা রহস্যে, নানা বীভৎসতার ভরা। চাঁদের আলোর বাতাসী বিবির আশ্চর্য মুখের



ডার্লি ও কাকিও  
**দুলালের**  
**তালমিছুরী**

দিকে তাকাইরা আমার মনে হইতে লাগিল এ জগতে তাহার জন্ম নহে, এই পক্ষে এ হেন পক্ষের জয় হইতে পারে না, বাতাসী বিবি ভাঙ্গাবিপর্যয়ে—হয় তো নিজের অজ্ঞানিতেই—এ জগতে আসিরা পড়িয়াছে, 'ক্রিমিডাল' বা অপরাধী-রক্ত বাতাসী বিবির জীবনের উৎস নহে।

এমন কি হইতে পারে না যে জালে সে জটিলভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে সেই জাল হইতে, সেই পাপচক্র হইতে সে মুক্তি চাহিতেছে এবং সেইজন্তই সে আমার সহায়তার ভিখারিনী ?

মুগ্ধমনে মুগ্ধচোখে বাতাসী বিবির মুখের দিকে তাকাইরা সশরের দোলায় দুলিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম বাতাসী বিবি সম্বন্ধে এইমাত্র বাহা ভাবিনাম তাহার মূলে কি সত্য আছে ? না আমি রহস্তময়ীর মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হইরা অজীক কল্পনা বিলাসে মাতাছি মাত্র ?

মনে হইতে লাগিল কিসের নেশার যেন আচ্ছন্ন হইরা পড়িতেছি ; হুই চোখের পাতা ঘুমে ভারী হইরা আসিতেছে কি ?

বাতাসী বিবি আমার আরেকটু কাছে আসিরা বসিল, চোখের আলোকে আরো ভালভাবে তাহার সম্পূর্ণ দেহের উপর পড়িতে গিল, তাহার ব্যাকুল মুখখানিকে আরো কাছে, আরো স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, মনে হইল তাহার হুঁটি চোখের তারায় যেন অসীম অবসাদ আর অসীম মিনতি, হুঁটি চোখের কোণে যেন মৃদু অশ্রুধর

আভাস। কিংবদন্তী-কুখ্যাতা ক্রিমিডাল-সজ্জনেত্রী বাতাসী বিবির রূপ হইতে এ রূপ একেবারে আসাশা। এ যেন অসহায়, অভিভাবিকাহীনা নারী একান্ত নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিতেছে।

নেশা যেন দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। মনে পড়িতেছে আমি যেন সেই নেশার ঝাঁকেই উদার হইরা বাতাসী বিবির প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলাম, বাতাসী বিবি আমার অভিভাবকীর আশ্রয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিল।

কখন ঘুমাইরা পড়িয়াছিলাম খেয়াল নাই, চোখ মেলিয়া দেখিলাম ভোরের আলো ঘরের ভিতর উঁকি দিয়াছে, বাতাসী বিবি নাই, আমার সমুখে ঝাঁড়াইয়া বোমভোলা পাঠক। তিনি জানাইলেন জুড়ি-গাড়ি প্রস্তুত এবং পাঠকজির উপর বাতাসী বিবির নির্দেশ আছে আমাকে গৃহে পৌছাইয়া দিরা আসিবার। পাঠকজি সেই নির্দেশ অনুযায়ী জুড়ি-গাড়িতে আমার সঙ্গে আসিরা আমাকে বাড়ি পৌছাইয়া দিরা গেলেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা অন্তত স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। বিধাতা আমাকে বাতাসী বিবির সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলিলেন তাহা স্বপ্নও ভাবিতে পারি নাই। জানি না ইহাখারা আমার জীবনে কিসের সূচনা হইল—মহাবিশ্বের, না মহাসম্পদের।

[ক্রমশঃ]

## অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন জরুরের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মিক ও জ্যোতিষবিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত ত্রীমুকু রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত কলিত ও গণিত সত্যার সত্যাপতি এবং কাশীর বারানসী পণ্ডিত মহাসত্যার হারী সত্যাপতি। ইনি দেখিরাই মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে নিদ্বন্দ্বিত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও শুভ গ্রহাবির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-ন্যায়সম্মান, তারিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক কলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্য্যোগের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পণ্ডিত্য কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক কন্যাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলন্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশেই মনোবীক্ষণ তাহার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুগ্ধ তাহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিল্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া নটমাতা মহারাজী জিপুরা টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় ভারতীয় সম্মানার্থ মুখোপাধায় কে-টি, সম্রাটের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ভারতীয় সম্মানার্থ রায় চৌধুরা কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীর গুপ্তমন্ডের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীপ্রসন্নবর্ষ রায়কন্ত, কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল ভারতীয় কল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংসাই নন্দীর মিঃ কে. রতনচন্দ্র

প্রত্যক কলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তত্ত্বোক্ত অভ্যাসার্থ কবচ

বঙ্গকণ কবচ—ধারণে বঙ্গদেশে প্রভুত বলবত, মানসিক শক্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তত্ত্বোক্ত)। সাধারণ—১১৮/০, পঞ্জাবী—২১৮/০, মহাশক্তিালী ও নন্দর কলপ্রদ—২২৮/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক পুত্রী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কৰ্তব্য)। লক্ষ্মীকণ কবচ—ধারণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীকার ফল ২১৮/০, বৃহৎ—৩১৮/০। মোহিনী (বঙ্গকণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত ব্রী ও পুত্র বনীবৃত্ত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১৮/০, বৃহৎ—৩১৮/০, মহাশক্তিালী ৩৮৮/০। বঙ্গলক্ষ্মী কবচ—ধারণে অভিলষিত কৰ্মোত্তি, উপরিহ মনিকে সন্ততি ও সর্বপ্রকার রায়সাহেব জরাজীর্ণ এবং প্রবল শক্তমান ২৮/০, বৃহৎ শক্তিালী—৩১৮/০, মহাশক্তিালী—১৮৮/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাগ্যমাল সন্মানী জরী হইরাছেন)।

(হাণ্ডিভা ১৯০৭ খঃ) অল ইণ্ডিয়া এণ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এণ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫—২ (ব), বর্তমান ট্রাট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (প্রবেশ পথ ৮৮/২, ওয়েলসলী ট্রাট গেট) কলিকাতা—১০। ফোন ২৪—৪০৫৫। সদর—বেঙ্গাল টাট হইতে ৭টা। ব্রাক অফিস ১০৫, প্রে ট্রাট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৫৫। সদর প্রান্তে ৮টা হইতে ১১টা।

# পিঁপড়ের লড়াই

রাণী মজুমদার



বাঁড়ের লড়াই, মৃতগীর লড়াই, বিঁবি পোকার লড়াই, মাছের লড়াই প্রভৃতির কাহিনী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। হাজার হাজার লোক এদের লড়াই দেখবার জন্য ভিড় করতো। এদের লড়াইয়ের কথা বান দিয়ে এখানে কেবল পিঁপড়ের লড়াইয়ের কথা বলবো। রূপ-স্বাধীন, চীন-জাপান যুদ্ধের তুলনায় পিঁপড়ের লড়াই কোন অংশে কম নয়। লড়াইয়ে এরা যেভাবে আত্মরক্ষা

এবং আক্রমণ করে তা নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস অসম্ভব হতে হয়। পিঁপড়ের লড়াই পৃথিবীর নানা দেশেই দেখা যায়। এই লড়াই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা তাদের চক্ষুসাকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। হয় তো তা অনেকটাই পড়ে থাকবে।

নানা কারণেই পিঁপড়দের মধ্যে লড়াই বাধে। সাধারণত দেখা যায়—সম্মান ও ডিম লুণ্ঠ, বাসা দখল, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই লড়াই শুরু হয়। রণক্ষেত্রে একদল সম্পূর্ণ বিপরীত না হওয়া পর্যন্ত পিঁপড়ের লড়াই সাধারণত খামে না। এদের লড়াইয়ের দুই রীতিমত রোমহর্ষক। লড়াই লাগবার পর এদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা যায়—সর্বট্র সাজ সাজ ভাব, হাজার হাজার পিঁপড়ের রণ-উত্তেজনা দেখবার মতো, তা ঠিক ভাবার বর্ণনা করা যায় না। মারমুখে পিঁপড়েরা একতর ভাবে, কখনও বা দলবদ্ধভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করবার জন্য ছেঁড়ে ছাড়ে। কায়ডাকামডি আর ধস্তাধস্তি হচ্ছে এদের লড়াইয়ের প্রধান কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে পিঁপড় প্রতিক্ষণেই পৃথুদন্ত করবার জন্য যত্নসহকারে নিজের দেহচিন্তিত বিষবাল্প প্রয়োগ করে থাকে। পরস্পর পরস্পরকে এমন ব্যাধ দিত হার যে প্রাণ গেলেও সেই 'মরণ কামড়' আর ছাড়ে না। শত্রুকে এরা কামড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। লড়াই শেষ হলে বিজয়ী দল বিজিত দলের খাদ্য, মৃতদেহ, ডিম ও বাচ্চা লুট করে নিয়ে যায়। সময় সময় বিজয়ী পিঁপড়েরা পরাজিত পিঁপড়ের মৃতদেহ উদরসং করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—রণক্ষেত্রে এরা নিজেদের দলের পিঁপড়কে ঠিক চিনতে পারে, শুঁড়ে শুঁড়ে ঠেকিয়ে বা অল্প কোন উপায়ে যে যার দণ্ডভূক্ত সঙ্গীদের চিনতে পারে। লড়াই অবসানে রণক্ষেত্রে এক অচুত স্তব্ধতা বিরাজ করে।

অনেকদিন আগের কথা। কোলকাতার কাছাকাছি সোনারপুর অঞ্চলে একটা বাগানের আমগাছের একটা ডাল ডাল লাল পিঁপড়ের বাসা সমেত (লাল পিঁপড়ে লালসো নামেও পরিচিত) বেড়ার একটা খুঁটির খুব কাছেই বাথারির সঙ্গে ঝুলছিল। হয় তো বড়ের বেগে ডালটা ভেঙ্গে গিয়ে বাগানের বেড়ার গায়ে আটকে গিয়েছিল। কারণ, আগের দিন সেখানে বড়-বুড়ি হয়েছিল। বাসাটার মধ্যে ছিল হাজার হাজার পিঁপড়ে, কতকগুলি পিঁপড়ে বাসার উপর এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। আবার কতকগুলি পিঁপড়ে ডালটার গা বেয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে। গতিবিধি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল—তারা ঐ ঝুলন্ত ডাল বাসা থেকে অল্প কোথাও বাথারির রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু তাদের বাইরে বাথারির সব রাস্তাই বন্ধ। কারণ, যে বাথারিটার সঙ্গে বাসাটা ঝুলছিল—সেই বাথারিটার উপর দিয়ে

একসার লাল পিঁপড়ে বাথারিটা বরছে। বাগানের এককোণে একটা ঘোপের ভিতর আগে থেকেই আর একদল লাল পিঁপড়ে বাসা তৈরি করে বাস করেছিল। তারাই বাথারিটার প্রায় ৩০-৩৫ ফুট লম্বা লাইন করে একটা সজ্জাকটা কচ্ছপের খোলা থেকে মাংসের টুকরো সংগ্রহ করে বাসায় তুলছে। ঝুলন্ত বাসার পিঁপড়েরা ডাল বেয়ে বাথারির কাছে এসে উক্ত পিঁপড়ের দল দেখে আর এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না। অথচ বাথারির উপরের পিঁপড়দের না ডিলিয়ে তাদের তত্ত্বয় বাথারি উপর নেই। ডাল বাসাতো বেশিদিন থাকে যায় না। একে তো শত্রু কাছে, তার উপর পাতা শুকাবার সঙ্গে সঙ্গে বাস কুঁচকে যাবে, নর তো শুকনো পাতা কুঁচকে গিয়ে বাসার জোড়া মুখ খুলে গিয়ে ভাগ্যগার ভাগ্যগার ঘটল দেখা হবে। কাজেই এই বাসা ছেড়ে অল্প নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করা খুবই দরকার। বিশেষত বাসায় মধ্যে অসংখ্য ডিম ও বাচ্চা রয়েছে—তাদেরকেও নিরাপদ স্থানে রাখা একান্ত দরকার। এইসব নানা কারণে বিভ্রান্ত হয়ে ঝুলন্ত বাসার বাসিন্দারা বিহব উত্তেজিত হয়ে এদিক-সদিক ছুটাছুটি করছিল। বাথারির উপর দিয়ে বাসা বাতায়িত বহুদিন—সম্ভবত তারাত এই আগন্তুক দলের সন্ধান পোহেছিল, কারণ তারা তখন ভীষণ উত্তেজিত। তারা ক্রমে ক্রমে ঝুলন্ত ডালটার কাছে এসে জমায়েত হতে থাকে। এই অবস্থা প্রায় ৩০ মিনিটের বেশি সময় স্থায়ী ছিল। একমাত্র উত্তেজনা বা একস্থানে দলবদ্ধভাবে ভিড় করা ছাড়া লড়াইয়ের আর কোন দৃশ্য দেখা গেল না।

অবশেষে ঝুলন্ত বাসার প্রায় ৫ গুণ পিঁপড়ে ডাল বেয়ে বাথারিটার কাছে এসে ইতস্তত করতে থাকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সেই দলের গোটা তিনেক পিঁপড়ে বাসার দ্বিগুণ হয়। বাকি বাসা হইলো—তারা শুঁড় উঁচু করে যেন বাথারির উপরের দলকে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে। ইতিমধ্যে একটা পিঁপড়ে অসীম সাহসে ভর করেই হঠাৎ অতি দ্রুতবেগে ছুটে বাথারির পিঁপড়দের লাইনের মধ্য দিয়ে পার হতেই একটা তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। বাথারির দলও যেন তৈরি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ১০-১২টা পিঁপড়ে তাকে একসঙ্গে কামড়ে বন্দী করে রাখে। বন্দী করবার কার্যক্রমটি বড় অচুত। বন্দী পিঁপড়ের ছটটা ঠাঁগে ছটটা পিঁপড়ে কামড়ে যথাসম্ভব টেনে ঝাঁক করে রাখে। আর দু'জন বন্দীর হুটি শুঁড় টেনে ধরে রাখে। ফলে বেচারীর আর কোন নড়াচড়া করবার উপায় থাকে না। এই ঘটনার ফলে—দুই দলের মধ্যে ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে যায়। দুই দলের সৈন্য-সামন্তরা শুঁড় উঁচিয়ে পৃষ্ঠদেশ শূন্য তুলে প্রবল উত্তেজনার বেন তাম্বব নৃত্য শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে এক একটা পিঁপড়ে অল্প

একটা পিঁপড়ের শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কি যেন বলছিল। সে তৎক্ষণাৎ বাসায় চলে যায় আর পরক্ষণেই একদল নূতন সৈন্য বাসার ভিতর থেকে চলে আসে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভিড় বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে বাথারি উপরে দল শত্রুপক্ষের একটাকে বন্দী করে উৎসাহের বশে আফলন করতে করতে ভাঙা ডালটার খুব কাছে এগিয়ে যায়। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়—তারা প্রতিপক্ষের বাসার দখল নিতে যাচ্ছে।

কিন্তু ভয়ানক ফল হলো বিপরীত। মুহূর্ত্তা মধ্যেই ভাঙা বাসার পিঁপড়েরা তাদের শত্রুপক্ষের ৫৭টি অগ্রগর্তী সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে ধরে একেবারে তাদের আস্থানার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আস্থা সৈন্য সামন্তরা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। কয়েকটার দেহ তারা কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল আর বাকিগুলিকে টানা দিয়ে বন্দী করে রাখল। ২৩ মিনিটের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটে যায়। এদিকে বাথারি ও যুদ্ধস্থল ডালের সংযোগস্থলে দ্বৈরথ লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। দুই দলের সৈন্য সামন্তরা একজন আর একজনকে আক্রমণ করেছে—অর্থাৎ দু'জন করে লড়াই চলতে থাকে। টানাটানি, ধস্তাধস্তি, কামড়া-কামড়ি চলছে পুরাবোধে। বাথারির দলের কয়েকটা সৈন্য যুদ্ধ ভাঙা বাসার কয়েকটা সৈন্যকে শুঁড়ে কামড়ে তাদের দিকে নেবার চেষ্টা করেছে। আবার যুদ্ধ বাসার সৈন্যগণও এক-একজনে এক-একটি করে শত্রুসৈন্যকে শুঁড় কামড়ে তাদের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করেছে। যাকে টানছে—সে প্রাণপণে পিছু হটবার চেষ্টা করেছে, আবার কেউ কেউ ছুটি পা দিয়ে অবলম্বন স্থান আঁকড়ে বসেছে। অনেকক্ষণ টানাটানির পর কেউ কেউ শত্রুর মুখে শুঁড়ের তর্জনি ধরেই উল্লস হাসে পালাবার চেষ্টা করেছে। ক্রমশ লড়াই এমন ভীষণাকার ধারণ করে যে, ২৩ হাত চওড়া জায়গার মধ্যে প্রায় সর্বত্র এইরূপ টানাটানি, কামড়া-কামড়ি চলতে থাকে। শুধু কামড়া-কামড়ি নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিষমাপোষ অব্যবশ্রাব্য গতে থাকে, এতগুলি পিঁপড়ের সৈন্যসহ বিস্ময়কর উত্তরগন্ধ চারদিক ভর্তি হয়ে যায়। কামড়া কামড়ি আর জড়া জড়ি করতে করতে শত শত পিঁপড়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ করে নীচে পড়তে থাকে। লড়াই লাগবার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই দুই দলের এত পিঁপড়ে মরে মাটিতে পড়েছিল যে, তাদের মৃতদেহের নীচে ঘাস-পাতা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ রূপে দেখে বোঝা গেল—দুই দলের সৈন্যের সংখ্যা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা তখনও ছুটাছুটি করছিল—তাদের প্রত্যেকের শুঁড়ের বাঁ পায়েই সঙ্গে 'মরণ-কামড়' দিয়ে মুলে রয়েছে—শকর ছিন্ন মাথা বা শরীরে সামনের অংশ।

বাথারির উপরেই পিঁপড়েরা ভাঙা বাসার দখল করার চেষ্টা সর্বদা চেষ্টা করতে থাকে। দেখা গেল—এত লড়াইয়ের পরও তাদের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমে নি। তাদের বাসা থেকে নতুন নতুন সৈন্য এসে আবার নবোজ্জ্বল আক্রমণ শুরু করে। এবার মনে হলো বাথারির পিঁপড়েরাই লড়াইতে জিতেছে। যুদ্ধ ভাঙা বাসার পিঁপড়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। এরা শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে বা অল্প কোন উপায়ে কে শত্রু আর কে মিত্র তা চিনে নিচ্ছিলো। এদিকে বাথারি পিঁপড়ের দলের ২৪টি সৈনিক ক্রমে ক্রমে যুদ্ধ ভাঙা বাসার উপরে যেতে শুরু করে। কিন্তু তারা ভয়ে ভয়ে সম্ভরণে

যাচ্ছিলো—তা তাদের চাল-চলন দেখেই বোঝা গেল। কিছুক্ষণ বেশ চূপচাপ, যুদ্ধ ভাঙা বাসার পিঁপড়েরা যে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল—হাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ তাদের তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু ভাঙা বাসার ভিতরে অসংখ্য পিঁপড়ে পাটা আক্রমণের স্বযোগের অপেক্ষা ছিল।

প্রায় ৫.৭ মিনিট এভাবে বেরে গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল—গোটা কয়েক পিঁপড়ে ভাঙা বাসার মধ্যে থেকে অপরিণতবয়স্ক বাচ্চাগুলিকে মুখ করে নিয়ে বেরিয়ে এলো—পিছনে আছে একদল সৈন্য। এরা পাহারা দিতে দিতে চলেছে। বাচ্চাবহনকারীরা কোন দিকে না চেয়ে অতি দ্রুতগতিতে ডাল বেয়ে বাথারির উপর দিয়ে বেড়ার খুঁটির উপর উঠতে থাকে। সৈন্যগণও তাদের পিছু পিছু চলছিল। এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে শত্রুরা তাদের বিশেষ বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। কেবল দু-একটা করে টানা দিয়ে বন্দী করে রাখছিল। তখন অন্ধা সেখানে বাথারির দলের পিঁপড়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, আর যারা ছিল—তারা লড়াই করার চেয়ে যুদ্ধ ভাঙা বাসার কাছে লুট করার তালে ছিল। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল—আরও অনেক ডিম ও বাচ্চাগুলিকে মুখ নিয়ে দলে দলে ভাঙা বাসা থেকে বের হয়ে প্রাণপণে নিজেদের ঘাঁটির দিকে ছুটতে থাকে।

এবার দুইদলে পুনরায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধস্থল ভাঙা বাসার ভিতর এতক্ষণ অসংখ্য সৈন্য যেন দম নেবার জন্য চূপ করেছিল। এবার তারা দলে দলে যুদ্ধ ভাঙা বাসা থেকে বেরিয়ে বাথারির পিঁপড়েরা প্রচণ্ডবেগে হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে। বাথারির পিঁপড়েরা তারা কামড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। এরই ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের ডিম ও বাচ্চাদের নিরাপত্তা স্থানে অর্থাৎ নূতন বাসার সরাতে থাকে। আর একদল কর্মী বিদ্রোহে গাছের পাতা ছুঁড়ে নতুন বাসা তৈরি করা শুরু করে দেয়। বাসা তৈরি শেষ হতে না হতেই—তারা ডিম ও বাচ্চাদের তার মধ্যে স্থাপনার জমা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লড়াইও চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—যাদের আগে জয় বলে মনে হয়েছিল অর্থাৎ বাথারির দল—তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে।

পিঁপড়ের এই একটি লড়াইয়ের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়—এদের লড়াই কি সাংঘাতিক। এই বিচিত্র লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বাংলার প্রসিদ্ধ প্রকৃত-বিজ্ঞানী, বনবিজ্ঞানী মন্দিরের প্রাণিবিজ্ঞান গবেষক শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

## ম্যাজিক দেশলাই

(গল্প ম্যাজিক শিক্ষা)

কাতিক ঘোষ

পাড়ার ছেলে পন্টু।

ও যখন-তখন আমাকে এসে আশ্রয়ন করে। পড়া নেই শোনা নেই শুধু একটা খামখেয়ালী স্বভাব। খুটখাট একটা না একটা কাজ নিয়েই আছে। শুধু কষ্টনিষ্ঠ করার চিন্তা।

কি করলে বাড়ির লোক, পাড়ার লোক এমন কি গোটা

## ছোটদের আলস

কালকাতার লোককে তাক বানিয়ে দেওয়া যায় এই গুর একমাত্র সক্ষ্য।

শুধু তাই নয়, এক এক সময় এমন মজার মজার খাঁখা তৈরি হবে, যা ধরতে অনেককেই অনেক সময় গোলকর্থাবার মধ্যে ঘেমে নিয়ে যেতে হবে। তবে একথা স্বীকার করতে দোষ নেই—পন্টুটা বশ চালাক-চটপটে বুদ্ধিমান ছেলে।

এই তো সেদিন রবিবার দুপুর বেলায় হঠাৎ এসে ঢুকলো আমার ঘরে। গুকে দেখেই চেয়ারে বসে বসেই আমি ঘুমের ভাণ ক'রে চোখ জুড়ে চুলতে লাগলুম। কিন্তু তা হ'লে কি হয়, পন্টু তার হতাকস্থলভভাবেই বলে উঠলো—আরে ঘুমোচ্ছেন কি,—আজ যা রবিবার। বলতে বলতে একেবারে আমার কাছে এসে লাড়ালো।

ওর কাঁজালো গলা শুনে আমি আর চোখ বুজে থাকতে সাহস পলাম না। তাই দু'চোখ মেলে বেশ ভালো ক'রে গুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কি বলছে?

—কি আর বলবে, একটা ম্যাজিক দেখাতে এলাম আপনাকে। হাতে বলতে পন্টু গুর প্যাণ্টের পকেট থেকে ফস ক'রে একটা টেক্স-মার্কা দেশলাই বার ক'রে ফেললে।

আমি হাঁ হ'য়ে রইলুম।

—এই দেখুন। আমার কাছ থেকে একই সরে ঝাঁড়িয়ে পন্ট দেশলাইটা খুলে তুলে ধরলে বেশ সাবধানে। দেখছেন তো ভর্তি দেশলাই।

—হ্যাঁ। যা দেখছি আমি তাই বললুম।

পন্টু দেশলাইটা আবার বন্ধ ক'রে ফেললে। তারপর কাঠিভর্তি দেশলাইটা মুঠোর নিয়ে মন পড়তে লাগলো,—

দেশলাই কেসলাই

সব কাঠি ফুঃ—

ঠকঠক ঠকঠক

হুকা হুঃ।

বলেই গোটা দেশলাইটা খুলে তুলে ধরলো বেশ সতর্কতার সঙ্গে। গোটা দেশলাইটার কাঠিগুলো সত্যি সত্যি উধাও হ'য়ে গেছে দেখে আমি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠে পন্টকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম।

—সাবাস পন্ট, সত্যিই তুমি একজন বিখ্যাত জাদুকর হ'তে পারবে। আমার কাছে এই রকম শুভেচ্ছা আর উচ্ছসিত প্রশংসা পয়ে পন্টুও যেন একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলো সেদিন। তারপর সেই ঘাড়টোটা কাটিয়ে ও সত্যি সত্যিই আবার একদিন এসে পড়লো আমার কাছে। তখন ও নিজেই শিখিয়ে দিলে ম্যাজিকটা।

বললে, প্রথমে একটা খালি দেশলাইয়ের ওপরের মার্কা দেওয়া কাগজ সাবধানে খুলে আর একটা দেশলাইয়ের পিছন দিকে (যেদিকে কোন মার্কা দেওয়া কাগজ থাকে না) ভালো ক'রে এঁটে নেবেন। তার পরে সেই দেশলাইটার খোলার ঊর্ধ্বে দিকে আঠা মাখিয়ে কিছু দেশলাই কাঠি (এক সরল রেখার ত্রুটি এঁটে নেবেন। তখন ঘুরে থেকে দেশলাইটার আরেকটা খুলে দেখলেই মনে হবে বুঝি একবার দেশলাই-কাঠি। আবার তার পিছনের দিকটাও থাকবে ঊর্ধ্বে দিকের মতো মার্কা, কিন্তু, খোঁটা আসলে কাঁকা। ম্যাজিক দেখাবার সময় দেশলাইটা শুধু একটু

উর্ধ্বে নিতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। তা হ'লেই দর্শকরা একবার দেখবে ভর্তি দেশলাই আর একবার দেখবে খালি।

পন্টুর কথামতো আমিও একটা ম্যাজিক দেশলাই ক'রেছি— সত্যি মজার। তোমরাও ক'রে দেখো। কেমন।

## শালকি পাখি

### শ্রীস্বাণীসহায় গুহসরকার

শালকি পাখি, হাড়ি বড়,  
বলছি পাখি, পাখি চড়।  
নইলো পরে ঠ্যাঙটি ভেঙে  
খাইতে হবে ভিক্ষা মেঙে।  
শালকি পাখির গানটি মিঠা,  
খাইতে শিল্প আসুকে পিঠা।  
শালকি বে, তুই কোপে-ঝাড়ে  
গোকা খুঁজে মরিস না বে,  
খাঁচার পাখি ছাতু-ছোলা,  
কামরাঙা-ফল পাকা কলা।  
ঘোরে পুড়ে জলে ভিজে  
বল দেখি তুই কলটা কি বে।  
হলদে ঠোঁট আর হলদে ঠ্যাঙে  
জলের ধারে খুঁজিস ব্যাঙে।  
খাঁচার বসে খাবার খাবি,  
মনের সুখে গানটি গাবি,  
গ্রামের সুরে, মাঠের সুরে,  
গাইবি জলের ঘাটের সুরে,  
হাডা সুরে হাড়ি পাখি  
গাইবি সবাই শুনেবে নাকি?

## কুরুক্ষেত্রের কথা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীলাধনা কর

॥ ৪ ॥

কর্ণ এবার উৎসাহভরে চললেন দুর্ধোধনের কাছে। বললেন

—এবার আমি অস্ত্র গ্রহণ করব, যুদ্ধে যোগ দেব।

নতুন উদ্যোগের দুর্ধোধন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কর্ণ দিচ্ছেন রণে যোগ, এবার জয় অনিবার্য। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্রোণকে সেনাপতি করলেন।

দ্রোণ বললেন—বৎস, আমি তোমাকে বলেই দিছি—পাণ্ডবদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব, কিন্তু পাঁচ ভাইয়ের একজনকেও হত্যা করা সম্ভব হবে না। তারা কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত—যত্না তাদের কাছে যেসতে পারবে না—এ তুমি স্বীকার করে। আর নাই কুরো, এ জতি সত্য।

দুর্ধোধন অত্যন্ত কষ্ট হলেন। মরণকালে ওষুধ রোগীর রোচে না, দুর্ধোধনরও তেমনি হিতব্যাক্যে অভিকৃতি নেই। শ্রোণ তথাপি বললেন—এ কথাও জেনে রেখো,—আমাকে হত্যার নিমিত্তই ধুইছাদের জন্ম। এ ভিন্ন তোমার আর বা অভিশাপ আছে বলা, আমি তাই পূর্ণ করব।

দুর্ধোধন বললেন—তাই যদি হয়, আমি তবে আর কিছুই চাই নে—আপনি শুধু যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আনবেন—এই আমার প্রার্থনা।

বিস্মিত হলেন শ্রোণ—এ কি কথা বলে দুর্ধোধন! যুধিষ্ঠিরের মৃত্যু কামনা না করে কেবল বন্দী করে আনা! শুভবুদ্ধি জেগেছে তবে! বংশ ও কুলনাশে দুর্ধোধন হবেন বিরত! শ্রোণ জানিতে চাইলেন এই অভিশ্রাবের উদ্দেশ্য।

দুর্ধোধন অভিসন্ধি গোপন রাখতে পারলেন না। শ্রোণ যদি যুধিষ্ঠিরকে মারতে সক্ষমও হন তবু কৌরবদের জয় হবে না। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব বর্তমান থাকবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে যদি বন্দী করে আনা যায়, আবার দ্রুতক্রোধাঙ্কলে পরাজিত করে দীর্ঘদিনের জন্তু তাঁদের বনে পাঠিয়ে দিয়ে কৌরবগণ নিশ্চিন্তে রাজভোগ করতে পারেন।

সুনে শ্রোণ হাসলেন। পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর নিগূঢ় প্রেম, সে স্নেহকে রোধ করা তো সহজ নয়। কুটালে তিনিও কম বান না। হেসে বললেন—সেখো, অর্জুন তো কেবল আমার কাছেই অস্ত্র শেখে নি, দেবতাদের কাছেও তার শিকলাভ হয়েছে। সে আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা। অর্জুন যদি যুধিষ্ঠিরের কাছে থাকে, তবে কখনোই যুধিষ্ঠিরকে আমি বন্দী করতে পারব না।

দেবালরও কান আছে, যুদ্ধের সময় গুপ্তচর সর্বত্র। শ্রোণের কথা গিয়ে পৌঁছল পাণ্ডবশিবিরে। যুধিষ্ঠির বললেন—অর্জুন, একমাত্র তুমিই আমার রক্ষাকর্তা। আচার্য শ্রোণ কৌশলে সে কথাই প্রকাশ করেছেন।

অর্জুন হেসে বললেন—ভয় নেই তাত, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আচার্য আপনাকে বন্দী করা দূরে থাক্ একটু নিগ্রহও করতে পারবেন না।

একাদশ দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ হল। শ্রোণ অধিন ক, শকট-বৃহৎ তৈরি করে সংগ্রাম শুরু করলেন। সে সংগ্রামের ভয়াবহতা কল্পনা করা যায় না। শ্রোণের প্রধান চেষ্টা হলো—যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা। বিরাট ক্রন্দর সাত্যকি ধুইছাত্র কাকুর সাধ্য হল না শ্রোণকে বাধা দেবার। যুধিষ্ঠির ধরা পড়েন আর কি! পাণ্ডব সৈন্তের মধ্যে তুয়ঙ্গ অর্জুন উদ্ভিত হল—বন্দী হলেন, মহারাজ বন্দী হলেন।

অর্জুন ছিলেন দূরে, বিদ্রোহেণে ঘেয়ে এলেন। অগণিত বাণদ্বারা ছেয়ে ফেললেন জঙ্গ-ছল-অস্ত্ররীক। শ্রোণচার্য দেখলেন সূর্য অস্তগত। তিনি যুদ্ধ দ্বাস্ত দিয়ে শিবিরে প্রত্যাগত হলেন। রক্ষা পেতে গেলেন যুধিষ্ঠির।

দুর্ধোধন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ হতে বললেন—আচার্য, আপনি পারলেন না যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে, এই কথাই সত্য হল।

শ্রোণচার্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—দেখ, অর্জুন কাছাকাছি থাকলে দেবতাদের পর্বজ্ঞ এ ক্ষমতা হবে না। একমাত্র উপায়—

অর্জুনকে যদি কেউ দূরে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারে, নিশ্চয়ই তা বন্দী হবেন যুধিষ্ঠির।

ত্রিগর্তরাজ সে যুদ্ধেতে প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন—কাল আমি হত করব অর্জুনকে, নয় দেব প্রাণ।

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য, সূর্য্য, সূর্য্য, সত্যাবধা, সত্যাব্রত, সত্যে এবং সত্যকর্মা অযুত রথী নিয়ে অগ্নিসাক্ষী রেখে শপথ করলেন—অর্জুনকে বধ করব, নিশ্চয় বধ করব।

এ রাই পরিচিত হলেন সংশপ্তক নামে।

ষাটশ দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হল। সংশপ্তকগণ অর্ধচন্দ্রবৃহৎ তৈরি করে অর্জুনকে আহ্বান করলেন যুদ্ধে। অর্জুন বিপদে পড়লেন যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করতাই হবে; এদিকে যুধিষ্ঠিরকে বধ করবে কে?

অর্জুন বললেন—তাত, শ্রোণচার্যের অভিশ্রাব স্পষ্ট বেদন যাচ্ছে। আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি আপনাকে বন্দী করে ইচ্ছুক। আজ আপনাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পাঞ্চালরও সত্যজিৎ। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, আপনি নিমেষকালও রণক্ষেত্রে থাকবেন না।

অর্জুন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। রণক্ষেত্রে হল। সংশপ্তকগণ এমন সংগ্রাম করতে লাগলেন যে, অর্জুন একবারও এদিকে আসতে পারলেন না।

শ্রোণচার্য ভীম-বিক্রমে পিপড়ার মতো সহস্র সহস্র সৈন্ত ধরে করে চললেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না। সেদিন যুদ্ধ শেষে অভিমানে ফেটে পড়লেন দুর্ধোধন—আজও আপনি—আজও আপনি যুধিষ্ঠিরকে হাতের কাছে পেয়ে বন্দী করে আনলেন না। আপনিই আমাকে বর দিয়েছিলেন, আপনিই তার অস্ত্রাধা করছেন।

শ্রোণ লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—মহারাজ, আপনি প্রিয়কাজ করতে আমি বখালাধ্য চেষ্টা করছি, তবু কেন আমার উপর এমন দোষারোপ করছেন। আমি শপথ করছি, কাল এম বৃহৎ রচনা করব বা দেবগণেরও অভ্যন্ত। অর্জুন ব্যতীত কাকুর সাধি হবে না সে বৃহৎ প্রবেশ করে। এমন কৌশল করতে হবে যাতে পাণ্ডব সে বৃহৎর কাছেই না থাকতে পারে। এই বৃহৎর দ্বারাই পাণ্ডবগণ পরাজিত হবেন।

পরম তুষ্ট হলেন দুর্ধোধন। পরদিন শ্রোণ সপ্তরথী নিয়ে রচনা করলেন চক্রবৃহৎ। সে চক্রে রইলেন স্বয়ং শ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্ধোধন, দ্রুপাদিন, শকুনি আর জয়দ্রথ। অর্জুনকে সেদিন সংশপ্তকগণ কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে বৃহৎর যুদ্ধে রত রাখলেন। তিনি জানতেও পারলেন না এ বৃহৎর কথা।

পাণ্ডবদের বিষম সংকট। কিভাবে ভেদ করা যায় বৃহৎ। এর কৌশল যে জানেন মাত্র কুরু অর্জুন আর কুরুপুত্র প্রহ্লাদ। উৎসাহে জ্বলে উঠল তরুণ বালক অভিমত্যা। বললে—আমি জানি চক্রবৃহৎ ভেদ করে ভিতরে দ্বারার পথ, কিন্তু বের হতে জানি নে।

যুধিষ্ঠির বললেন—বৎস, মান রক্ষা করো আমাদের। তোমার সঙ্গে আমরা সবই আছি। তুমি প্রবেশ করো, পিছনে পিছনে আমরাও তবে প্রবেশ করতে পারব।



## হুইদের আলি

অভিমত্যা সকলের আশীর্বাদ নিয়ে তেলোদীপ হয়ে বৃদ্ধারস্ত রলে। কৌরবগণ বোড়শবর্ষের বালককে চক্রবাহ ভেদ করতে ভিরাবী দেখে পরিহাসে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন—চুন্নপুত্রকে হত্যা করলে অর্জুনের অর্ধেক শক্তি নশ করা হবে।

উৎসাহে এগিয়ে এসে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কার সাধ্য ক্রোধের পথ বোধ করে। শরাঘাতে সে ভর্জরিত করে তুললে বিপক্ষকে। প্রোণাচার্য বিষয়ে-আনন্দে-প্রাণসার পঞ্চমুখ হলেন। তাই সে ক্রোধে-ক্ষোভে তীব্রতর হলেন কর্ণ—অর্জুন আচার্যের পরম হতর পাত্র। তারই পুত্র বলে আচার্য এমন মুগ্ধ হয়েছেন। সপ্তমী মিলে সিন্ধু হয়ে ঘিরে ধরলেন বালককে—জয়প্রথ রইলেন হতর মুগ্ধ বন্ধ করে।

দিত্যশাবক যেন আবদ্ধ হলো শাদূলমণ্ডলীতে। অভিমত্যার শক্তি কাশ হলো দ্বিগুণ—ভর পেলে না, শংকা জাগল না, মরামোদে লৈ মেতে। বিভ্রাতের মতো গতি, শ্রাবণের বারিধারার মতো বপাত, মার্ত্তণ্ডের মতো ভেজ। সহ করতে পারা দুঃসাধ্য। একা লোক সপ্তরথীর মার সহ ক'রে আকুল ক'রে তুললে সকলকে। দেলোক থেকে রব উঠলো—সাধ! সাধু! নরলোক ধনিত হল—ধু! সাধু! এমন যুদ্ধ কেউ কখনো দেখে নি, ভয়ে পালিয়ে যেতে গেল কৌরববৈদ্য। দুর্ধোদ নর পুত্র লক্ষ্মণ হত হল। দুঃখেকোভে ধ্বন হয়ে দুর্ধোদন বদতে লাগলেন—এ! লককে আজ বধ করা হই-ই।

শতুনি পরামর্শ দিলেন একা একা যুদ্ধ করে পারা যাবে না বধ রতে। সকলে মিলে একসঙ্গে আক্রমণ ক'রে তবে একে নিঃশেষ রতে হবে।

প্রাণ বললেন—এর দেখে রয়েছে অভেদ কবচ। এ কবচ রণের কৌশল আমিই শিখিয়েছিলাম অর্জুনকে। তারই কাছ থেকে অভিমত্যা শিখে নিয়েছে। এই কবচ এবং ধর্ম্মধর্ম্ম যতক্ষণ ওর সাথে থাকবে ততক্ষণ এই বালক দেবতাদেরও অজয়। যদি বধ রতে চাও আগে ওকে রথ ধর্ম্মধর্ম্ম ও কবচ-বিহীন করো, তারপরে হা করতে পারবে।

কৌশল জানা গেল। কর্ণ দ্বিরিতে শর দিয়ে ছেদন করলেন ভিমত্যার কবচ ধর্ম্মক, রথের অধ; কুপাচার্য বধ করলেন সারথিকে, প্রাণের প্রোণ, কুপ, কর্ণ, দুর্ধোদন, দুঃশাসন মিলে ঘিরে ফেললেন লককে।

পাণ্ডবগণ বৃহৎ-বৃহৎ ভেদ করার নিয়ম জানেন না, বৃহৎ হারে বসম জয়প্রথ। শিবের কাছে তাঁর পিতা বর পেয়েছেন—যে, অর্জুন ডাঃ আর চার পাণ্ডবকে জয়প্রথ পরাস্ত করতে পারবেন। আজ ইন্দ্রিণ সমাপত্ত। তাই জয়প্রথকে হটিয়ে বহু চেষ্টা করেও যুধিষ্ঠির, মৈ, নকুল, সহদেব কেউ পারলেন না ভিতরে ঝকতে। হার হার রতে লাগলেন, যুদ্ধতে লাগলেন প্রাণপণে—একবারও যদি হটান তি জয়প্রথকে, রক্ষা করতে পারতেন অমিতবীর্ষ অভিমত্যা। তক্ষণ যুদ্ধতে পারে ঐটুকু তক্ষণ বালক সপ্তরথীর সমবেত আক্রমণের পক্ষে। অন্তরীক থেকে আর্জুনাদ উঠল, দেবলোক থেকে বিজ্ঞার িন। গেল। এই কি রীতি, এই কি নীতি, এই কি ধর্ম্ম।

তখন কোথার ধর্ম্ম, কোথার বা রীতিনীতি, কোথার স্নেহ, কিসের

বা বিচার-বিবেচনা। ক্রোধ প্রবল, পরাজয় লক্ষ্যজনক, প্রতিশোধ-ল্লাহা হুঁবর। চিরকাল মাথার নিয়ে সপ্তরথী মিলে নিরস্ত করলেন একটিমাত্র কিশোরকে। অমনি দুঃশাসনের ছেলে এগিয়ে এসে গদাঘাতে অভিমত্যা কে নিধন করল। মহা উল্লাসে যুদ্ধ শেষ করে কৌরবেরা ফিরে গেলেন শিবিরে।

যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করার হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন অভিমত্যা।

সেদিন সশস্ত্রকদের বিনাশ ক'রে চক্কলচিহ্নে শিবিরে ফিরলেন অর্জুন। তাঁর বা চোখ নাচছে, প্রাণ হাহাকার করছে, যুদ্ধ করতে লাগছে না মন। কেন এখন হল। কুব্ধক তিনি দ্রুত রথ চালনা করতে বললেন। সর্বস্ত কৃষ্ণ। নির্বিকারভাবে নানা কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে রথ নিয়ে এলেন শিবিরে। অর্জুন চমকিত হলেন—কৌরবশিবিরে আনন্দ-কোলাহল, পাণ্ডবশিবির কেন স্তব্ধ। কে নিহত হলেন এ পক্ষে। যুধিষ্ঠির কি হয়েছেন বন্দী। শংকিতমুখে অর্জুন এসে পীড়ালেন যুধিষ্ঠিরের শিবিরে—জ্যেষ্ঠকে দেখে আশস্ত হল মন। কিন্তু নিদারুণ কালার পাণ্ডবশিবির উচ্চকিত হয়ে উঠল—কোথার রইলে আজ অর্জুন, কোথার সারাদিন বৃধা যুদ্ধ কাটালে। অমূল্যরতন অভিমত্যা কে যে সপ্তরথী মিলে নিধন করলো, সে তো জানলে না!

## রহস্যময় বাহুকর মহম্মদ চেল

### বাহুকর বি দাস

[ম্যাজিকের কথা উঠলেই অনেকেই বাহুকর ছড়িনীর উদাহরণ দিয়ে থাকেন। এর জন্তে কি ছড়িনীর অতিপ্রাকৃত খেলাগুলোই দারী? তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে প্রচারকৌশলের কৃতিত্বও অনেকখানি। আমাদের দেশে বাহুবিক্রাক জনপ্রিয় করার জন্তে প্রচারের উপযোগিতা বাঁধা বৃদ্ধতে পেরেছিলেন অনেকদিন আগেই—বাহুকর মহম্মদ চেল তাঁদের অন্ততম। পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ না করলেও ভারতের কোন কোন অংশে তাঁর কথা এখনও শোনা যায় লোকের মুখে।]

প্রাচীরের দিনে বাহুকরের প্রদর্শনীর আগে কত বিচিত্র প্রচার-কৌশলের যে সাহায্য নিয়ে থাকেন, তার ঠিক নেই। ছাণ্ডিল, পোকার, প্রোগ্রাম তো 'আছেই', তা ছাড়া চোখ বেঁধে সাইকেল, মোটর-সাইকেল বা গাড়ি চালাতেও দেখা যায় অনেককে। নিয়ন-লীপের ব্যবহারও ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে বাহুকরদের প্রচারকার্যে।

প্রায় ৭০ বছর আগে ভারতের এক বাহুকর মহম্মদ চেল প্রচারের মূল্য বৃদ্ধতে পেরেছিলেন কিন্তু লেখাপড়া না জানার Printed Publicity-তে বেশ সুরিখে করতে পারেন নি। পথে-ঘাটে-মার্কেট-ময়দানে অলৌকিক (!) সব খেলা দেখিয়ে লোকের মনে নিজেকে এমন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, সবাই তাঁকে সত্যিকার বাহুকর বলেই ভাবতেন। মহম্মদ চেল ছিলেন পশ্চিম ভারতের লোক। প্রায় ৬৫ বছর আগে মৃত্যু হয়েছেন তাঁর, কিন্তু লোকে আজও তাঁর কথা বলে থাকেন—যেন সেদিন মাত্র দেখেছেন সেই বাহুকরের খেলা। অনেকের বিশ্বাস যে, তিনি সত্যি সত্যি অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী ছিলেন।

‘চলন্ত ট্রেনের গতিরোধ করা’ তাঁর বিস্ময়কর খেলাগুলির মধ্যে একটি। বক্তৃতা না আদেশ দিতেন ততক্ষণ বয়স্কদের সাধ্য ছিলো না একচুল নড়াচড়া। আর একটি বিশিষ্ট খেলা ছিলো খালি একটি খালা চাদর-টাকা দিয়ে তাঁর মধ্যে দর্শকদের পছন্দমত খাবার জিনিস নিয়ে আসা। এই খেলাটির কথা সেদিনও শুনেছি একজন বৃদ্ধ মুসলমানের কাছে। বয়সান্তির সাহায্যে যে তিনি খেলাগুলো দেখাতেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুসল ছুটির পর ছোট ছোট ছেলেদের তিনি হাওরা থেকে খাবার ধরে ধরে খেতে দিতেন আর গরীবদের হাওরা থেকে ধরে দিতেন মুঠো মুঠো টাকা। এত সুন্দর আর সহজ ছিলো তাঁর প্রদর্শনভঙ্গী, যে কেউ ধারণাই করতে পারতো না—ঐ খেলার জন্তে তাঁকে আগে থেকেই প্রস্তুত হতে হয়েছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি হয়ে উঠছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। টাকা রোজগার করার জন্তে যে তিনি খেলা দেখাতেন সে রকম কোন লক্ষণই দেখা যেতো না। সাধারণ লোকে না জানলেও রাজা-মহারাজার সামনে অলৌকিক সব বাহুর খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ তিনি উপার্জন করতেন একথা সত্যি। তা ছাড়া তাঁর কয়েকজন ধনী বন্ধুর অবাচিত অর্থসাহায্যে জীবনটা বেশ আরামেই কাটিয়ে গেছেন। লোক-দেখানো যে সামান্য টাকা তিনি গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলি করতেন, উপার্জনের তুলনায় তা অতি নগণ্য।

মুসল ছুটির পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফেরবার সময় বাহুর চেল হাওরা থেকে চকালেট, লজ্জেল ধরে ধরে দিতেন তাদের হাতে। মহানন্দে বাড়ি ফিরে গিয়ে সবার কাছে বাহুরকের ভৌতিক-কাণ্ডের গল্প করতে পক্ষমুখে। কাগজে কাগজে প্রচারের চেয়ে এ উপায়টাও মন্দ নয়।

একবার কয়েকজন রাজা-মহারাজার সামনে খেলা দেখাবার জন্তে আমন্ত্রিত হন তিনি। খেলা আরম্ভ করার আগে বললেন যে, তাঁর স্মৃতিতে বহু খেলাই আছে কিন্তু মাত্র একটি খেলা তিনি দেখাবেন সেদিন। একটা ছোট টেবিলের ওপর বসানো ছিলো সুন্দর একটি মার্বেল পাথরের মূর্তি। বাহুরক তাঁর কাঁধের চাদর দিয়ে সেটি ঢেকে দিলেন। তারপর—চাদরটা ধরে টান মারতেই হাওয়ার মিলিয়ে গেলো নিরেট মূর্তি! চাদরটা কাঁধে ফেলল জানালার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই সবাই তাকালেন সেদিকে। মূর্তিটা বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর সোজা ঝাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাহুরক চেল তাঁর খেলাগুলো কৌশলের সাহায্যেই দেখাতেন, একথা জানা গেছে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখ থেকে। লোকে অবজ্ঞা জানতো যে, তিনি সত্যিকার বাহুরিকার ঘায়াই খেলাগুলো করে থাকেন। আমাদের দেশে বহু লোককেই গলায় চাদর স্লিমে বেড়াতে দেখা যায় আজও। স্তম্ভরং এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছুই নয়। বাহুরক চেলের কাঁধে চাদর থাকতো। তাই কারো মনে কোন সন্দেহ জাগাতো না। আসলে কিন্তু চাদরটিতে বখেট কৌশল করা থাকতো। ঐ চাদর দিয়ে তিনি বিভিন্ন জিনিস অদ্ভুত করা বা দর্শকদের পছন্দমত খাবার খালি খালায় এনে দেখানোর কাজ হাসিল করতেন। বলা বাহুল্য যে সব জিনিস

বার করতে হবে সেগুলো আগে থাকতেই তাঁর কাছে লুকো থাকতো।

মামুষের মন সবচেয়ে জন্মগত একটা জ্ঞান তাঁর ছিলো। দর্শক কি পছন্দ করবে না করবে তা তিনি আগে থেকেই মোটামুটি আন্দা করতে পারতেন এবং তাঁর ধারণাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যি প্রমাণ হতো। রাস্তার ধারে বা চলন্ত ট্রেনে, যেখানেই অনেক লোক একত্রি হতো—সেখানেই তিনি আরম্ভ করতেন তাঁর অদ্ভুত বাহুর খেলা। ফলে লোকমুখে অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচার হয়ে পড়তো তাঁর নাম।

সামান্য সুযোগের কেমন সদ্ব্যবহার তিনি করতেন তার ছে একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। একবার তিনি এক দর্শকের সোন আঁটি কুরোতে কেসে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। পেছনে পেছনে চলে একটি ছোটখাট জনতা মজা দেখার জন্তে। আঁটির মালিকের অব তো বুঝতেই পারছেন? এক জেলে এক হুড়ি মাছ নিয়ে সেই গিরেই যাচ্ছিলো বাজারে। বাহুরক তাকে ধামালেন। তার হুড়ি থেকে সবচেয়ে বড় আকারের মাছটি বেছে ছুরি দিয়ে পেট টি ফেলতেই সেই মাছের পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো দর্শকের নিশা দেওয়া আঁটি! অবাক-বিস্ময়ে সবাই তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মালি আঁটিটা নিতে পর্বস্ত ভুলে গেছেন। এ কি করে সম্ভব!

ভাবুন তো, কালিদাসের যুগে বাহুরক চেল থাকলে শকুন্তল আঁটি খেয়ে মাছটা হজম করতে পারতো—না! শকুন্তলা বা লেখাই হতো।

## বিদ্যুটে জানোয়ার

মুলেখা হাও

কিছুত কিমাকার

অদ্ভুত মজাধার

নাই তার

এককোটা পুছ।

বিদ্যুটে জানোয়ার

মগজটা কাঁকা তার

সব কিছু

করে দেয় তুচ্ছ।

দিন-রাত গজ,গজ,

বজ,বজ, বজ,বজ,

এই ছাড়া

কাজ নাই কিছু।

চোখ দু'টো পিটপিটে

শরতান মিটমিটে

ঠিক বেন

বসে আছে বিচ্ছুঃ

# বঙেনা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রোমক্স মিত্র

টেডের কাছে সমস্ত গল্পটাই তারপর শুনেছিলাম।

গল্প হিসেবে জমট কিছু নয়। শুধু তার পরিণতিটা বা ভাবা বার তার থেকে একটু ভিন্ন ধরণের।

টেড শেষ পর্যন্ত দেবরাজের ভক্ত হয়ে উঠেছিল এটা অবশ্য আগে থেকেই অস্বাভাবিক। কিন্তু যুগ। বিবেক থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসাতে পৌছোবার পথটাই আলাদা।

না, দেবরাজের কোন আধ্যাত্মিক জ্যোতির ছটা দেখে টেড মুগ্ধ অভিভূত হয় নি। দেবরাজ ধর কি আধ্যাত্মিক কোন আলোচনার দ্বার দিয়েও যায় নি সেদিন। শুধু টেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মন খেয়েছিল।

ব্রীট টেডকে নিয়ে টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হবার পরই কেমন একটু ঝাঁক। কৌতুকের দৃষ্টিতে টেডের দিকে চেয়ে দেবরাজ বলেছিল,— বোসো ট্যাঙ্কসজ কারবোইরাক।

টেডের পুরো জিভ আড়ষ্ট করা নামটাই দেবরাজ উচ্চারণ করেছিল, ব্যঙ্গভরে নয় প্রশংসা পরিহাসের সুরে।

তারপর বলেছিল,—তোমার কেন আজ নিমন্ত্রণ করে আনিরেছি জানো?

কঠিন মুখে অবজ্ঞার স্বরে টেড বলেছিল,—নিমন্ত্রণটা তোমার তা জানিতাম না। জানলে আসতাম না বোধ হয়।

আচ্ছা নিমন্ত্রণ তা হলে বলব না, বরো চ্যালেঞ্জ। দেবরাজের মুখে সেই কৌতুকের হাসি।

টেড ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে উঠেছিল। মুখটা মুখোশের মত ভাবলেশহীন করে রেখে দাঁতে চিবোন চাপা গলার বলেছিল,—চ্যালেঞ্জ যদি হয় ত' গ্রহণ করলাম। অল্পটো কি হবে?

অল্প!—দেবরাজ টেডের দিকে চেয়ে হেসেছিল এবার।

তারপর রেস্তোরাঁয় একজন ওয়েটারকে ডেকে হু'পাড় বীরার দেবার আদেশ দিয়ে টেডের দিকে ক্রির গাভীরে ভাণ করে বলেছিল,— অল্প এই।

টেড ক্রকুটি করে তাকাতো দেবরাজ আবার বলেছিল,—বীরার খাওয়ার কলেজের ছোকরাদের মধ্যে তুমি নাকি চ্যাম্পিয়ন, তাই

তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই। যে হারবে, আজকের সব খরচ তার।

ব্রীট কেমন একটু বিমূঢ় শক্তিকণ্ঠে বলে উঠেছিল,—সরকার!

আর ঘুবার চোঁট বেকিরে টেড বলেছিল,—এদেশে আসার আগে বীরার কাকে বলে জানতে?

না তা আর কি করে জানব!—দেবরাজ হেসে ঠাট্টা করেই বলেছিল,—তবে এদেশে জলীরা বধন কাঠ লতা পাতার কুঁড়ে বাঁধতেও শেখে নি তখন আমরা নাকি সোমরস খেয়ে বৃন্দ হতাম শুনেছি।

ঠাট্টার সুরটা সংঘেও টেড গরম হয়ে উঠে টিটকিরি দিয়ে বলেছিল,—শুনেছ। কবরখানার কি ছিল তারই দৈম্যক ত' তোমাদের সম্বল। দেবরাজ তখনও কিন্তু কৌতুকের দৃষ্টিতে টেডের দিকে তাকিয়ে আছে।

টেড তাতে আরো বেশ বলে উঠে তীব্র অবজ্ঞাভরে বলেছিল,—না, তোমার এ চ্যালেঞ্জ নিলাম না। পোকা-মাকড় বধ করার বাহাদুরিতে আমার কচি নেই।

ভর পাচ্ছ তা হলে! দেবরাজ সেই এক সর্কোতুকসুরেই বলেছিল।

ভর পাচ্ছি!—লাল হয়ে উঠেছিল টেড, তারপর দাঁতে দাঁত চের্পে বলেছিল,—আচ্ছা তোমার সখ তা হলে মিটিয়ে দিচ্ছি। এদিক দিয়েই তোমার শিক্ষা একটু হোক।

বীরার এসেছিল তারপর পাতের পর পাত। আশপাশের টেবিলেও তখন অনেকে অল্পবিস্তর কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

দেবরাজ সমানে টেডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাংকার্ডের পর ট্যাংকার্ড শেব করে গেছে শান্ত একটু সর্কোতুক হাসি মুখে নিয়ে।

ব্রীট শুধু ক্রমশ শঙ্কিত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল। তারপর এক সময়ে আর থাকতে না পেরে ব্যাকুলভাবে বাবা দেবার চেষ্টা করেছিল, না। না এ পাসপালি তোমরা করতে পারবে না।

ওয়েটার তখন নতুন যে হু'টো পাত হু'জনের সামনে ধবে দিয়ে গেছে তার মধ্যে দেবরাজেরটা টেনে নিয়ে বলেছিল—এ তুমি কি করছ সরকার? এ তোমার সঙ্গে না।

স্বিকৃতিভাবে হেসে অথচ দৃঢ়হাতে পাত্রটা ব্রীটের কাছ থেকে আবার টেনে নিয়ে দেবরাজ বলেছিল—ভর পাছ কেন? শিশু কি তলোয়ার নিয়ে ত' লড়াই না। কি আর হবে এতে। বড়জোর বেসামাল কি বেশ'স হব খানিকক্ষণের জন্যে। দেখাই থাক না টেড শেষ পর্যন্ত তার নিজের নামটাই উদ্ধারণ করতে পারে কি না।

টেড একটু অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করে নিজের পাত্রটা একচুর্নকে শেষ করে দিল। দেবরাজও পিছিয়ে থাকে নি।

তারপর রাত বেড়ছিল। কৌতূহলী দর্শকের ভিড়ও পাতলা হয়ে গেছিল ক্রম ক্রমে। রেস্টোর'র—সংগে একটু যেন অশ্রুস্রব্ধেই দু-একবার এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের টেবিলের ধারে। মুখে কিছু না বললেও ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়ানো হয়ে যাচ্ছে বলেই তার মুখের ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ব্রীট শেষপর্যন্ত অর্ধেকের সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল,—না তোমরা যদি এখনো না খামো ত' আমি চললাম।

বেশ খামব! হেসে বলেছিল দেবরাজ—টেড তা হলে নিজের নামটা বলুক।

নাম বলবার কড়ার নিয়ে বসি নি।—টেড তীক্ষ্ণ বিজ্ঞপের স্বরে বলেছিল,—উঠতে চাও ত' তার স্বীকার করে যেতে পারো।

উত্তরে দেবরাজ ওয়েটারকে আরো হু'পাড় আনবার ইঙ্গিত করেছিল।

ওয়েটার তা টেবিলে রেখে বাবার পরে নিজেরটা টানতে গিয়ে টেডের পাজ থেকে খানিকটা চলকে পড়ে গিয়েছিল তার হাত কাঁপার দক্ষণ।

দেবরাজ নিজের ট্যাকার্ড থেকে তাতে খানিকটা চালতে চালতে হেসে বলেছিল,—সমান সমান করে দিচ্ছি।

জলন্তদৃষ্টিতে দেবরাজের দিকে তাকিয়ে টেড সে-পাজ মুখে তুলতে গিয়ে কিন্তু পারে নি। ধরার দোষে বা হাত শিথিল হবার দক্ষণ পাজটা হাত থেকে খসে সশব্দে মেঝের পড়ে গিয়েছিল তার পোষাক ভিজিয়ে। মোটা কাটা-কাচের হওয়ার দক্ষণই বোধ হয় পাজটা তবু ভাঙে নি। বুকে পড়ে সেটা মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে কেমন টাল সামলাতে না পেরে টেডের নিজেরই চেয়ার থেকে পড়ে বাবার উপক্রম হয়েছিল।

ওয়েটার ছুটে এসেছিল দূর থেকে। তার আগেই টেডকে সাহায্য করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল দেবরাজ। তারপর সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেছে।

জান যখন হয়েছে তখন দাঁড়িয়ে ওঠার পরই কাটা গাছের মত সোজা মেঝের ওপর পড়ে বাওয়ার কথা সে মনে করতে পারে নি। মনে পড়েছে কোন একটা পাড়িতে করে কোথাও বাওয়ার অস্পষ্ট স্মৃতি। তারপর ধাবার করে কোন একটা ঘরে তাকে এনে শোয়ানো। কপালে-বাড়ে ঠাণ্ডা জল বা কিছুর স্পর্শ। চাপা গলার কয়েকজনের আলাপ। তারপর ঘরের আলো নিভে যাওয়া।

খুব বেশিক্ষণ এ অবস্থা বোধ হয় থাকে নি। একসময়ে দেবরাজ নিজে থেকেই বিছানার উঠে বসেছিল। তারপর হাতড়ে হাতড়ে

আলো জ্বালার পর নিজের ঘরেই যে তাকে আনা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিল। খুইচটা যথাস্থানে পাওয়ারই অবশ্য তা বোঝা উচিত ছিল আগেই।

নিজের ঘরেই আছে জেনে যেটুকু বিস্মিত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছিল টেডকেও সেই ঘরেই তার পড়বার টেবিলের ওপর কবল মুড়ি দিয়ে স্তরে থাকতে দেখে।

আলো জ্বালার পর টেডও তখন চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পরস্পরের দিকে খানিক তাকিয়ে দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে হেসে ফেলেছিল তারপর।

টেড এবার উঠে বসেছিল টেবিলের ওপর। বলেছিল একটু জল খাওয়ারতে পারো সরকার।

আর বীয়ার নয় ত'—?—ঠাটা করে জিজ্ঞেস করেছিল দেবরাজ।

তা হলে মন্স হত না। কিংবা আরো কড়া কিছু, খোরাদি ভাঙার তাই নাকি গুণ। বিয়ে বিফল।

অত্যন্ত দুঃখিত।—ট্যাপ থেকে গেলসে করে জল আনতে আনতে বলেছিল দেবরাজ।

জলটা খেয়ে গেলাসটা টেবিলের ধারেই রেখে বিকৃত মুখভঙ্গী করে টেড বলেছিল—জল না কি খেলাম বুঝতে পারলাম না। জিবটা যেন অসাড় রুটি-পেপার।

আমারটা পাশোব।—হেসে বলেছিল দেবরাজ।

চোখ দু'টো ছোট করে দেবরাজের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে টেড এবার জিজ্ঞেস করেছিল,—সত্যি কথা বলে ত' সরকার। আগে কখনো এসব কিছু খেয়েছ।

না।—বলে দেবরাজ কাছের একটা চেয়ারে বসেছিল। মাথাটার তখনও যেন সীসেতে ঠাসা, থেকে থেকে ঘরটা সবকিছু নিয়ে একটু পাক খাবার চেষ্টাও করছে।

আমি তা গোড়াতে বুঝতে পারি নি।—টেড বলেছিল—তোমার ধরণ দেখে সন্দেহ হয়েছিল তুমি পাকা লোক। নইলে আনকোরা আনাড়ি হলে কি ওরকম সমানে চালিয়ে যেতে পারে।

আনকোরা আনাড়ি বলেই হয়ত পেরেছিলাম।—দেবরাজ হেসে বলেছিল।—

বুঝেছিলাম ঠেলা দেওয়া ভাঙা দেওয়ালের মত সটান ওরকম মেঝের ওপর পড়ে বাওয়ার।—টেড সরলভাবে স্বীকার করেছিল—আমি ত' ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের অবস্থাও যদিও তখন কাহিল।

তুমিই কি আমার নিয়ে এসেছ—জিজ্ঞাসা করেছে দেবরাজ।

সঙ্গে আসাকে যদি নিয়ে আসা বলে।—হেসেছিল টেড—নিজে এসেছিল রেস্টোর'রই 'জন লোক,—হাসপাতালে নিয়ে বাওয়ারটা বেস্টোর'র মালিকও এড়াতে চায় বলেই হয়ত। তোমার এখানে পৌছে আমারও আর নড়বার ক্ষমতা বা সাহস হয় নি।

আর ব্রীট?

ব্রীট এখানকার গেট পর্যন্ত এসেছিল এইটুকু মনে আছে। তারপরের কথা সব ঝাপসা।

## নভেল

যে হাসি দেখা গিয়েছিল, তাতে লজ্জা বা কুঠার তেমন চিহ্ন  
কিন্তু ছিল না।

কিন্তু কেন?—এবার এক জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল  
টেড—এরকম কেলেঙ্কারী হবে হয়ত ভাঙতে পারো নি, তবু এ-  
রকম সখ বা খেলা হ'ল কেন তোমার?

বিশ্বাসের ছাড়পত্র পাবার জন্তে।—হেসে বলেছিল দেবরাজ।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টেড এ-বারের আলাপের মধ্যে প্রথম  
একটু রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল,—ভারতীয় ইরানী ছাড়ছ

না, টেড, সত্যি কথাই বলছি।—দেবরাজের আন্তরিকতাটা ভাল  
বলে মনে করতে পারে নি টেড—তোমাকে গোটাঁকতক কথা বহুবার  
জগে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সাধারণভাবে তোমার ডেকে  
বসলে তুমি তা বিশ্বাস করবে না আর উন্টো ফলও তাতে হতে  
পারে বলে সন্দেহ ছিল। তাই ত্রীটকে দিয়ে তোমার ডেকে আনি  
এরকম অদ্ভুত চ্যালেঞ্জ করেছিল।। এটি পর্যন্ত তাতে সন্তুষ্ট  
হয়েছিল তুমি জানো। আশা ছিল যে নেশার চুর হয়ে আমাকেও  
তা হ'তে দেখলে আমার সখকে তোমার মনের কয়েকটা বেড়া হয়ত  
আলগা হতে পারে।

একটু খেমে ঈষৎ কৌতুকের সুরেই দেবরাজ আবার বলেছিল,  
ভেবেছিলাম, আমাকে অবিশ্বাস করলেও আমার নেশাকে তুমি  
করতে পারবে না। আমার কথাগুলো বলে তখন তোমার বিশ্বাস  
করতে পারব। কিন্তু নিজের মাত্রা না বুঝে সব ভুল করে  
কলসাম।

আমার বিশ্বাস করানোর এত কি দার তোমার, যাতে নিজের

খভাব-চরিত্রের বিরুদ্ধেও তোমার এমন উৎকট বক্তৃতি নিতে হয়।—  
টেড একটু কটিনস্থরে বলেছিল,—তোমার কথা আমি শুনি না। শুনি  
আর বিশ্বাস করি না করি তাতে কি আসে-যায় তোমার?

আসে যায় টেড।—গাঢ়স্বরে বলেছিল দেবরাজ,—অকারণও  
কান্নার দুখ কি আঘাত পাবার উপলক্ষ হয়ে আমি নির্বিকার হয়ে  
থাকতে পারি না। তোমাকে আমার কথাটা শুনিবে বিশ্বাস  
করাবার জন্তে তাই এত ব্যাকুলতা।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকেছে টেড। তারপর শান্ত কটিন  
স্থরে জিজ্ঞাসা করেছে,—কি সে কথা? ত্রীটকে নিয়ে কিছু কি!

হ্যাঁ,—টেডের মুখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছে দেবরাজ,—  
ত্রীট ও আমার সম্পর্ক নিয়ে। মনে মনে তুমি যত্না পাচ্ছ আমি  
জানি। বিশ্বাস করো আর না করো, শুনে রাখো যে এ-সম্পর্কের  
মধ্যে তোমার সন্দেহ বা ঈর্ষা করবার মত এককথা বস্তুও নেই।

তুমি কি নপুংসক না সমকামী?—হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠেছিল  
টেডের কণ্ঠ,—স্বন্দরী যুবতা মেয়ের সঙ্গে দিনের-পর-দিন কাটিয়েও  
নিষ্কাম হয়ে থাকো।

হুই-এর কোনটাই নই টেড! অক্ষুণ্ণ প্রসন্নতার সঙ্গে বলেছিল  
দেবরাজ,—কিন্তু যে-কোন রূপসী জরুরীর সঙ্গে বনিষ্ট হবার সুযোগ  
হলেই ভালবাসার খেলা খেলবার উৎসাহ বা সজ্ঞাগের সোলুপতা  
যে আমার জাগে। সেটা আমার চরিত্র ও শরীরের একটা বোধ হয়  
ত্রুটি। তা ছাড়া তুমি বুঝবে কি না জানি না। ত্রীট আমার কাছে  
শিয়ার মন নিয়ে আসে। প্রাচ্য দেশ ও বিশেষ করে ভারতবর্ষ  
সখকে গুরু মনে একটা গভীর মোহ আছে। তুমি জানো কি না

## স্বাধীনতা বিপন্ন সর্বস্বান্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন

—জহরলাল নেহরু



বেশী উৎপাদন করুন,  
কম ব্যয় করুন

উৎপাদনের ফল-  
গুলি দাবি করার

প্রথম অধিকার হ'ল  
প্রতিরক্ষা ব্যবহার। প্রতি-  
রক্ষার জন্য যাতে বেশী জিনিষ-  
পত্র পাওয়া যায় সেজন্য  
আমাদের বেশী উৎপাদন করতে  
হবে এবং কম ব্যয় করতে  
হবে। এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ  
করতেও সাহায্য করা হবে।  
সমস্ত রকম ব্যয়বাহ্য ও  
অপচয় বন্ধ করুন।

আপনার মিতব্যয়িতা ভারতকে শক্তিশালী করবে

জানি না, ওর পিতামহ মিশনারী হয়ে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন অনেক কাল আগে। সেখানে কিছুকাল থাকার পর বেশ একটু অগৌরবের মধ্যেই নিজের মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর ছিন্ন হয়। তিনি সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখান এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। মিশন থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি দেশে ফেরেন নি। ভারতবর্ষেই কোন সন্ন্যাসী না সাধুর দলে যোগ দিয়েছিলেন বলে ব্রীটনের পরিবারে কিংবদন্তী আছে। তিনি শেষ পর্যন্ত কোথায় কেমনভাবে মারা যান পরিবারের কেউ জানে না, তবে তাঁর মিশন ত্যাগ করার পর লেখা করেকটা চিঠি ওদের কাছে আছে। পরিবারের কান্ডর কাছে দেগুলি লজ্জার ও অবজ্ঞার, কান্ডর কাছে আবার সবিষ্ময় কৌতূহলের বস্তু। ব্রীট ফেলেবো! থেকেই সেই পিতামহের কাহিনী সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সঙ্গ্রহ আকর্ষণ অমুভব করেছে। বড় হবার পর সেই আকর্ষণ থেকেই বেড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই একটা মোহাচ্ছন্ন অমুভাব। আমি ভারতবাসী জেনেই আমার সঙ্গে ও নিজে থেকে আলাপ করেছিল নানা কৌতূহল মেটাবার আশায়। ওর সে সব প্রশ্ন শুনে নিজের দেশ সম্বন্ধেই আমার বিরাট অজ্ঞতা টের পেয়ে আমি লজ্জিত হয়ে উঠছি। ওর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্মেই নিজেকে তৈরি করার চেষ্টায় ভারতবর্ষকে বেন আমি নতুন করে আবিষ্কার করছি। আমার দিক থেকে 'ত' নয়ই ব্রীটের দিক থেকেও তার এ মোহাচ্ছন্নতা ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে নি বলেই আমার বিশ্বাস। হয়েছে সন্দেহ করলে আমি নিজেই সরে আসতাম।

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে দেবরাজ নিজেই উঠে গিয়ে ট্যাপ থেকে একগেলাস ফল এনে খেয়েছিল।

টেড তখন স্তব্ধ গভীর হয়ে বসে আছে। কথাগুলো কিভাবে সে নিয়েছে তার মূখ দেখে বোঝা যায় নি। জিজ্ঞাসা করে তা জানবার চেষ্টাও করে নি।

পর্দাটানা কাচের জানলার এবার ভোরের আলোর আভাস দেখা গেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে একটু টলে টেবিল ধরে সামলে টেড

বলেছিল, তোমার ঘরে আশ্রয় দেবার জন্মে ধন্যবাদ সরকার। আমি এখন বাছি।

ধন্যবাদটা একটু বেশি ব্যঙ্গ হয়ে গেল কিম্ব। হাভাসের সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করার চেষ্টায় হেসে বলেছিল দেবরাজ,—আশ্রয় দেবার মালিক কি আমি তখন ছিলাম!

না তা ছিল না বটে। তবে তোমারও যেমন আশ্রয় দেবার অবস্থা ছিল না আমারও তেমনি আতিথ্য চাইবার। থাকলে বোধ হয় চাইতামও না, তোমার এ ধীর কৈকিঞ্চ শোনবার সৌভাগ্যও অবশ্য হ'ত না তা হলে।

কথাগুলোর প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর ছিল কি না টেডের মূখ দেখে বা গলার স্বরে ঠিক বোঝা যায় নি।

এতক্ষণও যখন হঠাৎ একটু কফি খেয়ে যাবে না! দেবরাজ সহজ হবার চেষ্টা করেছিল এবারও।

না, আর কেউ জানবার আগেই বেতে চাই। দৃঢ়স্বরে বলেছিল টেড,—তোমাদের জ্যানিটর অবশ্য সবই জানে। তবে ব্রীটকে দেখে সে একটু নরম হয়েছিল। স্মৃতরাং গোলমাল তেমন কিছু হবে না বলেই আশা করি।

ব্রীট খুব আশ্বস্ত পেয়েছে নিশ্চয় আমাদের হ'জনেরই কাণ্ড দেখে। ইমং বিবরণ সুরে বলেছিল দেবরাজ।

না পেলেই অবাক হবার কথা। বলে টেড চলে গিয়েছিল।

ব্রীট তারপর সত্যিই দেবরাজকে এড়িয়ে চলেছিল।

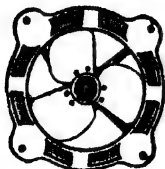
অনেকদিন বাদে নিজে থেকে একদিন তার কাছে যে এসেছিল, সে টেড।

টেড ঠিক এইভাবে সেদিন বনের মাঝে এ কাহিনী বলে নি। তার কাছে যা শুনেছিলাম তাই সামান্য অস্বাভাবিক মিশিয়ে আমি এইভাবে কল্পনা করেছি। সে কল্পনার পরবর্তীকালে অল্প সূত্রে পাওয়া উপাদান মিশে বাগদা আকর্ষণ নয়।

টেড তারপর আরও হস্তাধারক ধীবাগুরার ছিল।

তার নিজের রূপান্তরের যে বিবরণ টুকরো-টুকরো ভাবে তখন শুনেছিলাম, এ কাহিনীতে তাও অবাস্তব নয়। [ক্রমশঃ]

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিম্বাক



মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিলো পর্বত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো

(প্রাঃ) লি:

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ লকাল ১০টা

হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বোলা থাকে



# সাহিত্য পরিচয়

## Legacy of a President / U. S. I. S.

জন ফিটজেরাভান্ড কেনেডি, এ শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় এবং মহৎ সন্তানবীর প্রতীক; আজ অবশ্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ রয়ে গেছে অম্লান, স্মৃতি ঝুঁটি। মানবতার কঠিনতম পূজারী কেনেডি চেয়েছিলেন বিশ্বকে এক অচ্ছেদ্য শান্তির স্বপ্নে বাঁধতে। মানুষের বিকাশের পথের বাধা দূর করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তিনি। এক কথার মনোবাক্যের পথে মানুষকে উত্তীর্ণ করে দেওয়াটাকেই ব্রতস্বরূপ নিয়েছিলেন তিনি, আর তাঁর স্বপ্নস্বাহী কিন্তু গৌরবদীপ্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটি ব্রত পালন করে গেছেন; বর্তমান গ্রন্থে এ কথার সমর্থন মিলবে। স্বর্গত কেনেডি যেখানে যা বলেছেন, আমেরিকান গণতন্ত্রের সাধারণ সদস্য হিসাবে, সেনেটর হিসাবে ও সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনি যে সব নির্ভীক ও মূল্যবান উক্তি করেছেন তার প্রায় সবই সত্যতঃ সঙ্গৃহীত হয়েছে এর রচনার পুস্ত্যার পাতায়। পার্থক্য এ গ্রন্থপাঠে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিভ্রমকেই প্রত্যক্ষ করবেন না, পরজ্ঞ তাঁর মহান স্বর্গত নেতা কেনেডির জীবনদর্শন সম্বন্ধেও সন্মত ওয়াকিবহাল হবেন। কেনেডির মতন সাহস, তাঁর স্বপ্নভীর দূরবশিষ্ঠা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সমানুভূতি এ সবই উজ্জল রেখায় আঁকা ছবির মত সম্পৃষ্ট হয়ে উঠবে পাঠকের মনে; মানুষ হিসাবে এই বীরযোদ্ধা যে হারানো কত বড় ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থের চিত্রে চিত্রে স পরিচয় চুড়ানো রয়েছে। এ রচনার আঞ্চলিক উচ্চাঙ্গের, ছাপা ও বাঁধাই 'কন্টিনেন্টাল' যুক্তরাষ্ট্রের 'রিপাব্লিকান' 'ড্যান রাঙ্ক' ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট 'লিঙ্কন ও কনসন' লিখিত দুটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এ গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকটতম ও কর্মজীবনেব কর্মকর্তা হুন্ড আলোচ্য গ্রন্থে এ গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়েছে, সেগুলিও কম উপলোভ্য। আমরা বইটি হাতে পেরে সত্যই গভীর আনন্দ পান করছি ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রকাশক—ট উনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।

## হু'টি গোলাপ

### একটি কুঁড়ি / অ্যালফা-বিটা

আলোচ্য উপগ্রন্থে লেখক নারীর মাতৃব নিরে-  
তে উদ্ভূত তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। হু'টি নারী ও  
ওকজন পুরুষকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী বয়ন করা  
য়েছে তাতে কাঁচা হাতের ছাপ অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ-ভাবে দেখতে গেলে রমেশ ও অমৃতাচার্য দাম্পত্যজীবনে শুধুমাত্র  
সন্তানহীনতার জঙ্ক যে সমস্তা লেখক সৃষ্টি করেছেন, তা আজকের দিনে  
সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হতে বাধ্য এবং শুধু সন্তান কামনার একটি  
কুমারীর দেহের ভ্রমারে কোন পুরুষের পক্ষে আবেদন জানানোটায়  
সন্তানবাস্তা সম্বন্ধেও সর্বশেষ সন্দেহ করা যেতে পারে। এখনও  
বত্বদীন অমৃতাচার্য করে তারপর সাহিত্যের ক্ষেত্রে পদার্পণ করলে  
সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন লেখক, বর্তমানে বাঙালী সাহিত্যের মান  
এই উন্নত যে এত দুর্বল রচনার সম্বন্ধে আশা করার মত কিছুই  
নেই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—সুখেন্দু সরকার,  
প্রকাশক—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স, কলিকাতা, দাম—পাঁচ টাকা।  
পটিল পরদা।

## কিরো—হস্তরেখা অভিধান/আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স

জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাও  
যেমন অগাধ, কৌতুহলও তেমনি অসীম, আলোচ্য গ্রন্থপাঠে এ  
দুটোরই নিয়ম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীবিশিষ্ট গণ্যকার  
কিরোর নাম অনেকেই অবগত আছেন, লেখক এইই অবলম্বিত  
হস্তরেখা বিচার পদ্ধতির এক সূত্র, পরিচয় বিধৃত করেছেন এই গ্রন্থে।



- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ভবনে সম্প্রতি এশিয়া পাবলিশিং  
হাউস কর্তৃক প্রকাশিত প্রায় তিনশত পুস্তক প্রদর্শিত  
হইয়াছে। ই'হার স্বর্গত নেত্রের পুস্তকালয়ী এবং নানা বিষয়ে  
প্রায় নয়শত পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গিক বড়  
পুস্তক প্রকাশক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে কিরো যে সব গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন Language of the hands তার মধ্যে অল্পতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে, আলোচ্য গ্রন্থটি এইই সরল বঙ্গীয়বাদ। লেখকের শৈলী সাবলীল হওয়ায় দূরই বিষয়বস্তুও স্ফুটনময় করা যায় সহজেই; জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকের কাছে এর রচনা মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। জ্যোতিষ-সম্রাট কিরোর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি মুক্ত হওয়ার গ্রন্থের আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছে। প্রজ্ঞা ও অপরাপর আঙ্গিক জটিলীন। লেখক—কিরো, অমৃতবাধক—পরীক্ষিত, প্রকাশক—আর্ট গ্রাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এডিট্রা, জবাফুল্লম হাউস, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

### তুচ্ছ মম / বাক্ সাহিত্য

বহু ইজম ও কমপ্রোজ কটাকাধীর্ণ কথাসাহিত্যের আসরে সহজ সরল সুরে বলা মিষ্ট প্রেমের গল্প ক্রমেই বিরল হয়ে উঠেছে, বর্তমান উপন্যাসটিকে তাই গুণমোটা গরমের পর হাত্তা একপাশলা বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা চলে স্বচ্ছন্দেই। শৈশবে মাতৃহীনা একটি মেয়ের জীবনায়ন করেছেন লেখিকা এই গ্রন্থে। বিরাট একান্তবর্তী সংসারে মাতৃহীনা শর্মিষ্ঠার শৈশব কেটেছিল পরম উপেক্ষা ও ওদাসীজ্ঞের পরিবেশে, শিশুমন স্বভাবতই হর স্নেহবুকু, হরত বা সজ্ঞাই পরবর্তীজীবনে শিক্ষিতা, সুন্দরী প্রাণচক্ৰ্য। তরুণী শর্মিষ্ঠা অতীতকে প্রায় বিস্মৃত হতে গিয়েও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে নি কোনদিনই, আর তারই ফলে আর একটা শিশুর মধ্যে নিজের বেদনাময় অতীতকে প্রত্যক্ষ করে সহজেই তাকে বুক তুলে নিয়েছিল সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে। শিশু টুকুনের প্রতি শর্মিষ্ঠার আকর্ষণ তার চরিত্রকে যেন এক মহিমময় মর্যাদা দিয়েছে; বস্তুত এই চরিত্রটিকে লেখিকা সত্যই বড় উজ্জলভাবে আঁকেছেন, প্রকৃতপক্ষে এই একটি চরিত্রের জন্মই যেন অপরাপর চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে— শুভজিত, দেবানীষ, নন্দিতা, দীপঙ্কর সবাই যেন শর্মিষ্ঠার প্রভেদ করেই উপগ্রহ মাত্র। শুভজিত ও শর্মিষ্ঠার প্রেমও শর্মিষ্ঠাই বেশি উজ্জল হয়ে ফুটেছে। অস্বস্তি শুভজিত-এর মানসিক স্বপ্নের যে চিত্রটি লেখিকা আঁকেছেন তাও বড় কম কৌতুহলপ্রদ নয়। একটি সরল মধুর প্রেমের কাহিনী হিসেবে বর্তমান রচনাটি সত্যই উপভোগ্য; সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা প্রায় নবাগতা হলেও রচনার তিনি যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দিয়েছেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতুহলী হওয়া চলে। প্রজ্ঞা, ছাপা ও বাঁধাই বথায়থ। লেখিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনার—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—পাঁচ টাকা।

### বৈজ্ঞান্যনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বসু/শ্রীভূমি পারিশি

যে তরুণ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের গবেষণার একদিন স্বপ্ন আইনকান্টাইনও আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়েছিলেন, বর্তমান রচনা তাঁরই জীবন ও কর্মের পরিচায়ক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্ভাবিত আলোকবর্ণের সংখ্যাগনিক নৃত্য আধুনিক তত্ত্বের পদার্থ বিজ্ঞানে এক বৃগাঙ্ককারী আবিষ্কার এবং স্বপ্ন আইনকান্টাইন এই নৃত্যকে প্রামাণ্য বলে অভিনন্দিত করে ব্যাপকভাৱে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন।

বাস-সংখ্যাগন বলে সেই অবধি এই নৃত্যটি পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়ে আসছে এবং এটি বর্তমানে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সুদৃঢ় হুটি ভিত্তিস্তম্ভের অল্পতম বলেই স্বীকৃত, আলোচ্য গ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের এই মূল্যবান গবেষণা ও অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা বিশদভাবেই আলোচিত হয়েছে। বাংলার এদ-সার্বক সন্তানের গৌরবোজ্জ্বল এই জীবনকথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। লেখকের ভাষারীতিও প্রশংসনীয়রূপেই সাবলীল। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই বথায়থ। লেখক—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা—১, দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### প্রফুল্ল / ওরিয়েন্ট বুক

প্রফুল্ল—বিখ্যাত নাট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের অল্পতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। সাধারণ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের পটভূমিতে রচিত এ নাটক এককালে নাট্য-বসপিপাসু বাঙালীকে কম আলোড়িত করে তোলে নি। নাটকটি প্রথম শ্রেণীর কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এর দুর্গার গতিশীলতা ও আবেদন সম্বন্ধে ভিত্তি নেই, আর প্রধানত সেটাই এর প্রশংসতা। এই পুরাতন ও বহুসমাদৃত নাটকটিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা টীকা-টিপ্পনী সমেত নবকলেবরে প্রকাশ করে প্রকাশক বিজ্ঞার্থী ও সাহিত্যরসিক মাথেরই দৃষ্টিবান্ধন হলেন। নাটকটি ভাল করে বুঝতে হলে এইসব মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন বড় কম নয়, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা যে আলোচ্য গ্রন্থটির সমাদর করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। নতুন কাগজ পুরোন নাটকটি যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, নাট্য সাহিত্যের একটি বিশেষ দিগন্তই যেন নতুন করে উন্মোচিত হয় পাঠকের মননে। সম্পাদনার উৎকর্ষ বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। প্রজ্ঞা ও অপরাপর আঙ্গিক বথায়থ। লেখক—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক—ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী, প্রকাশনার—ওরিয়েন্ট বুক কোং ১ স্তামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

### মেবার পতন / ওরিয়েন্ট বুক

চারণকবি খিজুরসালের অনন্ত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূল্য অসীম, আলোচ্য নাটকটি তাদেরই অল্পতম। বিশেষ করে, সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অস্বাভাবিক টীকাটিকে মূল্যবান ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনীর নব-কলেবরে প্রকাশ করা হয়েছে। 'মেবার পতন' রাজপুত জাতির দৌর্য, বীর্য, গর্ব ও পতনের ইতিহাস, প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর রাণা প্রতাপের বংশধর রাণা অমরসিংহের রাজত্বকালই বর্ণিত হয়েছে। এ নাটকে প্রধানত চরিত্রগুলির মধ্যে প্রায় সবই ঐতিহাসিক, দেশপ্রেমই নাটকোক্ত কাহিনীর মূল উপজীব্য, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নাটক যখন রচিত হয় তখনও ভারত ব্রিটেনের শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতালাভ করতে সক্ষম হয় নি, পরাধীনতার যে বেদনা এ রচনার প্রশংসতা শুধু ইতিহাসের পটভূমিতেই তা জন্মলাভ করে নি, রচনাকারের নিজস্ব উপলব্ধির আভাসেও তা প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। খিজুরসালের অনন্ত দেশপ্রেমও মৃত



## সাহিত্য পরিচয়

হয়ে রয়েছে এর রচনার মাঝে। কাহিনী এক মহৎ আদর্শকে যেন সর্গসঙ্গী সমগ্রতার কুটিরে তোলে পাঠকের মননে, স্বভাবতই আবেগ-প্রধান হওয়ার এর আবেদনও অত্যন্ত তীব্র। আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথার্থ। লেখক—শ্রীধিরেন্দ্রলাল বার, সম্পাদক—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১, গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—চার টাকা।

## বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত / নয় প্রকাশ

আলোচ্য গ্রন্থ আদিযুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বা লা সাহিত্য সে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পদক্ষেপ করেছে তারই প্রামাণ্য দলিল। দেশের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক পরিমলিকার সেকালীন সাহিত্য যেভাবে বিস্তারলাভ করেছিল, বর্তমান রচনার মাধ্যমে সেই ইতিহাসকেই বিবৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখিকায়। শিক্ষার্থী ও সাহিত্য-স্নিহুদের মাঝেরই কাছে সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের এ ইতিহাসের মূল্য অসীম, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গ্রন্থ বিশেষ একটি মূল্যমানের অধিকারী। বাঙালির অমরকবি কৃত্তিবাস সন্থকে যে সব নতুন তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে তাও বিশেষ কৌতুহলপ্রদ। বাঙলা প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিম্নলিখিত এক মূল্যবান সংযোজন। আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখিকায়—ডঃ রসী ঘোষ ও ডঃ রসী প্রভা বার, প্রকাশনায়—নয়া প্রকাশ, ২০৬, বিধান সরণী, কলি-৬, দাম—সাত ছয় টাকা।

## সাহিত্যলোচনার মূলসূত্র / নব ভারতী

আলোচ্য বইটিতে লেখক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই দেশীয় সাহিত্য বোদ্ধাদের মতামতই তিনি বিচার করে দেখিয়েছেন, ফলে সীমিত পরিধির মধ্যে তাঁর রচনা সহজেই প্রামাণ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। সাহিত্যের ভাব, ভাবনা, আদর্শ, বৈচিত্র্য, অভিব্যক্তি, বিচার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি অজবিস্তর আলোচনা করেছেন, আকারে সস্ত হলেও সে সবার মূল্য কম নয়, সাহিত্য রসিক ও সাহিত্য শিক্ষার্থী এই দ্বিবিধ পাঠকই যে বর্তমান সমালোচনা গ্রন্থটি পড়ে কানন্দ লাভ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। বইটির আঙ্গিক, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—অধ্যাপক দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ। পরিবেশক—নব ভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১, দাম—তিন টাকা।

## পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ / ওরিয়েন্ট বুক

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এক অনন্ত সৃষ্টি, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই কাব্যটিকেই বিস্তৃতভাবে পথ্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গ এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী কাব্য রচনার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে এক নতুন পথ অবলম্বন করেছেন, আর লেখকের মূল বক্তব্যও সেটাই। অনেক সময়ই লেখকের নতুন দৃষ্টিদর্শন সন্থকে একটু-আধটু ইঙ্গিত আগে থেকে গেলে পাঠকের পক্ষে লেখার রস সম্যক উপলব্ধি করা সহজ হয়। পুনশ্চ কাব্য গ্রন্থটির রসোপভোগ করতে ও বর্তমান রচনাকে তাই একটি সহায়িকারূপে বর্ণনা করা যেতে

পারে। পুনশ্চ কবি কি বলতে চেয়েছেন, কোথায়ই বা নিহিত এর গভীরতর জীবনসত্তা। আলোচ্য গ্রন্থ লেখক বহু পরিশ্রমে সেই সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন পাঠকের মননে; আন্তরিকতা ও সত্যতার তিনি তাতে সফলও হয়েছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করলে পুনশ্চের ভাবরূপটি সহজেই ধরতে পারা যায়; মননশীল ও কাব্যোৎসাহী পাঠকের কাছে এ রচনা তা মূল্যবান বলে পরিগণিত হতে বাধ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ত্রুটিহীন। লেখক—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১, গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা।

## বিশ্বসাহিত্যের সূচাপত্র / বাক্ সাহিত্য

আলোচ্য গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্য এবং সাহিত্যিকের এক সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, কেবলমাত্র বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়-ধন্য সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্য বলে পরিগণিত হয় না। সাহিত্যরসই এ ধরনের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য; রূপ ও রসের গঠন সাধারণে ডুব দিতে পারলেই শুধু কোন রচনা শিক্ষার্থীর হয়ে উঠতে পারে আর তখনই তার আবেদন দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। স্রষ্টার নিজস্ব সঙ্গ সাহিত্য মিশ্রিত হলে পরে শুধু তা সম্ভব হয়ে থাকে এবং যে সাহিত্যিকের রচনার তার আশ্রয় মেলে শুধু তিনিই বিশ্বসাহিত্যিক-এর আখ্যায় ভূষিত

## বৈষ্ণবোচ্চাৰ্য

## ডঃ রাখাগোবিন্দ নাথ

মহাশয় সম্পাদিত

## শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

[চতুর্থ সংস্করণ]

দীর্ঘদিন পরে এই অনুল্য গ্রন্থ

প্রকাশিত হইয়াছে।

।। অনুসন্ধান করুন ।।

সাধনা প্রেস প্রাঃ লিঃ

৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

ফোন : ৩৪-৩৯৬৬

হয়ে থাকেন। বর্তমান রচনার লেখক এই পর্যায়েরই আটজন সাহিত্যিক ও তাঁদের বিখ্যাত কয়েকটি রচনার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণার অধিকারী লেখক, তাঁর আবেগের সঙ্গে যুক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার তাঁর রচনা সহজেই বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পেরেছে, যে কোন সাহিত্যাত্মবাসী পাঠকই এই মননশীল অথচ দৃঢ় রচনাবলী পাঠে পরিতুষ্ট হবেন। সাহিত্য শিক্ষার্থীর পক্ষেও এ রচনার অবদান বড় কম নয়, আমরা এ গ্রন্থ পাঠে সত্যি আনন্দলাভ করেছি। বর্তমান গ্রন্থটি এই পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড, পরবর্তী খণ্ডগুলির জ্ঞাত আমাদের সাগ্রহ প্রত্যাশা রইল। আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—নাসকর্, প্রকাশনা—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১, দাম—আট টাকা।

### দূরের আকাশ / রবীন্দ্র লাইব্রেরী

বিদেশের পটভূমিতে সাহিত্যরচনা করে বীরা খ্যাতিমান হয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসের লেখক তাঁদের অন্ততম। বৃটেনের এক পল্লী-শহর কাড়িকের পটভূমিতে কাহিনীর পরিবেশ গঠিত হয়েছে; কর্মোপলক্ষে সেখানে বাসা বেঁধেছিল একদা অতমু মিত্র ও তারই মত আরও কত ভাগ্যবতীর সন্তান। হাসি-কান্না, স্বাধীন-অনন্দ, স্বপ্ন-দুখে ওয়েলসের এই ছোট শহরটিতে বহুদিন কাটল প্রবাসী অতমু মিত্রের, যাওয়ার বাঁধা বেদিনি বাজল হঠাৎ সেদিনই যেন সে নতুন করে আবার আবিষ্কার করল, জীবিত বাঁধনে বিদেশ তাকে কি গভীরভাবেই না বেঁধেছে। অত্যন্ত সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে লেখক বিদেশ ও বিদেশী পটভূমিতে একটি বাঙালী যুবকের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছবি একেছেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও অত্যন্ত জীবন্ত, লেখকের দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণরূপেই মানবিক, তাঁর রচনায় ভিড় করে আসা চরিত্রগুলিই তার সাক্ষীস্বরূপ, চিরন্তন মানবপ্রকৃতি যে সাদা-কালো চামড়ার প্রভেদ রাখে না সেই মহা সত্যই সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই ক্রটিহীন। লেখক—পার্শ্ব চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫১ স্ক্রামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দাম—তিন টাকা।

### চার দেওয়ালের গল্প / আর্ট অ্যান্ড লেটার্স

জীবনের দৈনন্দিন চলার পথে সাধারণ মানুষ নিয়তই যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়, বর্তমান রচনা তারই দর্পণস্বরূপ। লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগত হলেও, জীবনের বিস্তৃততার পরিসরে ইতিমধ্যেই আপন পরিচয়ে ধন্য। এক্ষেত্রেও যে তিনি সফল হতে পারবেন আলোচ্য রচনায় তার সমর্থন রয়েছে। সংসারকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার পেছনে যে প্রয়োজন সামান্য স্বার্থত্যাগের, স্বকিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতার এ কথাটাই তাঁর রচনার মূল বক্তব্য। নাটকের মাধ্যমে এই বক্তব্যটুকুই সার্থকভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, সম্পর্কভরতা ও মমতার ছোঁয়ায় তাঁর রচনা এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। সংলাপ রচনাতেও তাঁর শক্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—পার্শ্বপ্রতিম চৌধুরী। প্রকাশক—আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স,

জবাকুতুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### ফুটেবে আবার ফুল / অ্যালফা-বিটা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি প্রোগ্রামের ভঙ্গিতে রচিত, সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাগুলির কাব্যরস খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও কবির মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত হওয়ায় এ কাব্য সর্বজনবোধ্য এবং সেটাই এ কাব্য-গ্রন্থটির স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় বলার মত কথা। গ্রন্থটির আয়তন ও আঙ্গিক বিবেচনাকালে এর মূল্য কিছু বেশি বলে মনে হতে বাধ্য। লেখক—অনিলকুমার বিশ্বাস, প্রকাশনা—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন, দাম—পাঁচ টাকা।

### ওরা কাজ করে / বাক্ সাহিত্য

শহরের গড়ির মধ্যে ধরা না দিলেও দেশের প্রাণসত্তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে যে জীবন্ত মানুষের মিছিল, বর্তমান গ্রন্থে তাদেরই জীবনায়ন করেছেন লেখক। কাজ করতে যারা ইচ্ছুক, কাজ করার সামর্থ্যও তাদের কম নয় তেমন মানুষেরা যে কোন বেকার জীবনের মানি ও দৈন্ত বহন করতে বাধ্য হচ্ছে, এই রচনার মাধ্যমে যেন দেশের সেই অগণ্য মানুষেরই অমুচ্যরিত প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থের পটভূমিস্বরূপ যে গ্রাম ও গ্রামাঞ্চলের ছবি একেছেন লেখক, তা কোন বিশেষ স্থান কাল বা পাত্রের ছবি নয় বর্তমান বাংলারই তা যেন এক সামগ্রিক পরিচয়ে ধন্য। এ রচনার পাত্র-পাত্রী, চাষী-মজুর, চন্দন, মুকন্দ, ফকির, অধর, শিবু প্রভৃতিও যেন পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তা নয় বাংলার অগণ্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা যেহনতি মানবসত্তারই এক ও অখণ্ডরূপ। যে মানুষেরা কাজ করে তবু নিরন্ন তাদেরই জীবনের সুখ-দুখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, হাস্য-নীতি, ধর্ম-কর্ম বিজড়িত বিচিত্র জীবনের স্তম্ভ রূপায়ণে এ রচনা উজ্জ্বল। লেখক যে সম্পূর্ণরূপেই সমাজ-সচেতন এ কাহিনীর ছক্রে-ছক্রে তার পরিচয় আঁকা রয়েছে। মানবিকতা ও সমাজবোধে বলিষ্ঠ এ উপন্যাসকে প্রামাণ্য বলে অভিহিত করাতেও বাধ হয় অসঙ্গতি নেই কোন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—প্রভাত দেবসরকার, প্রকাশক—বাক্ সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১, দাম—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### নিমোথেরি / বুকল্যাণ্ড

নিমোথেরি—হতাশাস মানবতা যেখানে ঘুঁজে পেয়েছে একই আশা একই আশাস; দিল্লী থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে গড়ে উঠেছে এই ছোট উপনগরী, স্বাধীনতার অন্যতম বলি একদল উদ্বাস্তর আশ্রয় শিবির। লেখক প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এই উপনগরী গঠনের কাজে, কয়েক সহস্র ছিন্নমূল মানুষ আজ যেখানে নতুন করে গুরু করেছে জীবন, সেই জীবনকে সামনে থেকে দেখেছেন তিনি দিনের পর দিন, উপলব্ধি করেছেন সেই মহাসত্যকে। স্বাধর উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই; তাই তাঁর রচনায় শুধু আন্তরিকতার স্বাদই

## সাহিত্য পরিচয়

যেলে না প্রামাণ্যভাৱে তা অনন্ত। নতুন দিনে নতুন মাথুৰে  
আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বথ-স্বঃ, আনন্দ-বেগনা বেন মূৰ্ত্ত হয়ে উঠেছে  
তাঁৰ লেখনীমাধ্যমে, সহস্র সহস্র ছিন্নমূল মাথুৰকে স্থায়ী নিরাপত্তা  
দিতে দেশেৰ জাতীয় সরকার সামূহিক বিকাশ আন্দোলনেৰে পৰীক্ষা-  
নিৰীক্ষা চালিয়েছেন, নিলোথেরি তাৰই প্রত্যক্ষ ফল, লেখকেৰ  
আন্তরিক উত্তমে নিলোথেরিৰ এ ইতিহাসও তাৰই প্রত্যক্ষ দলিল  
হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রহ্লাদ সন্দ্বৰ, ছাপা ও বাঁধাই উজ্জ্বল।  
লেখক—এস কে দে, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১, শঙ্কর  
ঘোষ লেন, কলিঃ-৬, দাম—পাঁচ টাকা।

## জন্ম-জয়ন্তিকা / সর্বোদয় প্রকাশনী

ইংৰাজিতে 'বাৰ্ণ-ডে-বুক' বলে বা প্রকাশ হয়, আলোচ্য ডায়েরি  
তাৰই বঙ্গ সংস্করণ; বাৰ্ণ-ডে-বুক বা জন্মদিনেৰ বই বঙ্গ-বান্ধব, আত্মীয়-  
স্বজন, দেশী-বিদেশী মহাপুৰুষদেৰ জন্মদিন স্মরণ রাখাৰ বই।  
বিদেশে এ ধৰণেৰ বইয়েৰে প্রচলন সমধিক, কিন্তু বাংলাৰ এৰূপ  
দেওৱাৰ প্রচেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম চল, সেদিক থেকে দেখলে বৰ্তমান  
স্মৰক গ্ৰন্থটিৰ এক বিশেষ মূল্য আছে। ডায়েরিৰ আকাৰে গ্ৰন্থিত এ  
বইয়ে বিশেষ করে বাংলাৰ বৰণা সন্তানদেৰ নাম ও জন্মতারিখ উদ্ধৃত  
কৰে দেওৱা হয়েছ; প্রতিপূৰ্ণাৰ একদিকে মাসেৰ তারিখ ও অপর  
দিকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য ও গীতিগ্ৰন্থ থেকে সন্দ্বৰ স্তম্ভ  
উদ্ধৃতি দেওৱা হয়েছ; এক হিসাবে বইটি যেন রবীন্দ্রনাথেরই স্মারক  
গ্ৰন্থ, এয়ুগে বাস করে রবীন্দ্র-ভাবধাৰাকে অতিক্রম করে সত্য, শিব ও  
চন্দ্রদেৰ সন্ধানী হওৱাৰ প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র, এ গ্ৰন্থেৰ সম্পাদক যে  
এ সত্য সন্ধান সম্পূর্ণ অবহিত তাতে সন্দেহমাত্র নেই।—বাংলা  
ভাষায় এই নতুন ও সন্দ্বৰ প্রচেষ্টাৰ জন্ম এই বইয়েৰে প্রকাশকও  
প্রভূত সাধুবাদেৰে অধিকারী। বিখ্যাত শিল্পী রসেনস্টাইন অঙ্কিত  
রবীন্দ্রনাথৰ ছবিটি সংযোজিত হওৱায়, গ্ৰন্থেৰ মগদা বেড়ে  
গিয়েছে। প্রহ্লাদ শোভন, অপরূপৰ আঙ্গিক যথার্থ। গ্ৰন্থনা—  
নিরুপমা দেবী, সম্পাদনা—পরমেশ বসু। প্রকাশনা—সর্বোদয়  
প্রকাশনী মণ্ডল। সাহেবনগর, নদীয়া। দাম—সিক বাঁধাই—  
তিন টাকা, কাগড় বাঁধাই—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## পাহাড় অরণ্য উপত্যকা / আশনালা পাবলিশিং

বাঙলা-বিস্তাৰেৰ সীমান্তে সাঁওতালদেৰ ছোট গ্রাম রাজমাটি, লাল  
পলাশ মন্ডয়াৰ দিগন্তবিস্তৃত বন, মাটিৰ লাল ৰং নেশা ধরিয়ে দিল  
যেতনপাৰাসী এক বিদেশীৰ মনে। রাজা মাটিতে মিশনাৰীদেৰ ছোট

গিৰ্জাৰ ধৰ্মধাক্ক কলিল ভালবাসল এই মায়াভরা ছোট গ্রামটিকে,  
আপন করে নিল সহজ সরল বন্ধ মাথুৰবলোকে। সাঁওতালদেৰ  
বিচিত্র জীবনযাত্রাৰ এক পরিচ্ছন্ন আভাস পাওয়া যায় কাহিনীৰ কাঁকে  
কাঁকে, লেখকেৰ আন্তরিকতাৰ কাহিনী উপভোগ্যতাৰ রম্য। ছাপা,  
বাঁধাই ও প্রহ্লাদ যথার্থ। লেখক—নির্মল সান্নাল, প্রকাশক—  
আশনালা পাবলিশিং হাউস, এ-৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট মাৰ্কেট,  
কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা।

## শ্যামল বনানী / জ্ঞান ভারত প্রকাশন

আলোচ্য গ্ৰন্থটি এক কাব্যসংকলন, অনেকগুলি কবিতা একত্রে  
গ্রন্থিত হয়েছ। ভাব বা আঙ্গিকে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও,  
সহজ একটা মাথুৰেৰ আভাস পাওয়া যায় কবিতাগুলিৰ মাঝে, সাধারণ  
পাঠক হয়ত এদেৰ একেবাৰে অবজ্ঞাৰ চোখে দেখবেন না। প্রহ্লাদ,  
ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—মনীষোগোপাল আইচ, প্রকাশক—  
জ্ঞান ভারত প্রকাশন, ৩২, অভয় বিজ্ঞানসংস্কার রোড, কলিকাতা-৩৪,  
দাম—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

## আধুনিক কোরিয়ার কবিতা / কপোতাক্ষী

আধুনিক কোরিয়াৰ কয়েকটি স্বনামজ্ঞা কবিৰ রচনা, অনূদিত হয়ে  
সংকলিত হয়েছ এই কাব্যগ্ৰন্থে। দেশেৰ সমাজ, সামাজিক,  
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধাৰায় যখন যে বকম পরিবর্তন দেখা  
দেয়, সমসাময়িক সাহিত্যে সর্বদাই তাৰ প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়,  
সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই কাব্যগুলিৰ মূল্য শুধু সাহিত্যেৰ দৃষ্টিকোণ  
থেকেই বিচার্য নয়, কোরিয়াৰ সাম্প্রতিক জীবন-চেতনাৰ এয়া এক  
মূল্যবান দলিল। তাই বলে আলোচ্য কবিতাগুলিৰ মাথুৰ্ণ সন্ধান  
অবশ্য অমুযোগেৰে কৰাৰ মত কিছু নেই, স্বতঃ-উৎসাহিত এক সরল  
গভীৰ সৌন্দৰ্যে এয়া এমনভাবেই মগ্নিত যে পাড়তে পড়তে মন আবিষ্ট  
হয়ে ওঠে; গভীৰ বেদনা ও স্বাভাবিক আনন্দকে কয়েকটি কবিতাৰ  
মাঝে এত সহজে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় বা সত্যিই বিস্ময়কর।  
মনে হয় আধুনিক কোরিয়াৰ কবিৰা আস কিছু জাহ্নন বা না জাহ্নন,  
সহজ স্বরে মাতৃয়েৰ চিরকালীন গান গাইতে জানেন, আঙ্গিক বা  
কণ্ঠেৰ বেড়াঙ্কালে তাঁরা যে ধরা দেন নি সেজ্ঞ তাঁরা ধ্বজবাদাই'।  
প্রহ্লাদ বিষয়োচিত, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। সংকলনকর্তা ও  
অম্ববাদক—জাহ্নকায়ী চৌধুরী। প্রকাশনা—কপোতাক্ষী। ৩৪,  
জিন্নাহ এভেন্যু, ঢাকা-২। দাম—তিন টাকা।

## এ মাসেৰ প্রচলন

এই সখাৰ মাসিক বহুমতীৰ প্রহ্লাদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—ঐশ্বৰ্যেন সেন।

বহুমতী : ভাদ্র '৭১

# বার্থকে

## বারানসী

নীলকণ্ঠ

### সাতচল্লিশ

কলকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে বেশ কয়েক বছর আগে এই অষ্টন ঘটে। এক ভ্রমলোকের বাড়িতে একটি কুকুর সতৃষ্ণনয়নে বাড়ির মালিকের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করে। প্রথমে ব্যাপারটা এমন ব্যতিক্রম কিছু মনে হয় নি। যেমন আর পাঁচটা কুকুর কখনও কখনও গাভার বা আদরের লোভে কিংবা অকারণ পুলক করে থাকে, তেমনই মনে হয়েছিলো। তারপর দেখা গেলো তা নয়। কুকুরটি একই বেশি রকমের কাতাল। খাওয়া কিংবা আদর বা অকারণ পুলক নয়। সে যা বলতে চায়, সে যা বলতে পারছে না তা কোনও গভীর গুরুতর ব্যাপার। মনে হলো একথা বাড়ির কারুর, বাড়ির কর্তা তার তেমন কোনও গুরুত্ব দিলেন না। বরং বিরক্ত হলেন বেশ। দূর দূর করে তাড়াতে চাইলেন কুকুরটিকে। কুকুরটি অবশ্য গেল না। ভ্রমলোকের মন থেকেও না; সেই স্থান থেকেও না।

স্বপ্ন দেখলেন বাতে তাঁর কাছে এসে বলছেন একজন : আমি তোমার গুপ্তজন্মের পিতা। গহিত কোনও অপকর্মের জন্তে কুকুর হয়ে জন্মেছি। তুই আমার মুক্তির জন্তে গয়ায় যাবি। সেখানে কি করতে হবে তাঁকে সে কথা স্বপ্নে বলে দেন তাঁর পূর্বজন্মের পিতৃভর দাবীকার। স্বপ্নভংগ হলে ভ্রমলোক অস্বীকার করেন স্বপ্নাদেশকে। সারাদিন ওই কুকুরটির চিন্তা তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল বলেই এই আজগুবি স্বপ্ন,—এই তাঁর ধারণা হয়। ধারণার বশবর্তী হয়ে কুকুরটির ধারণা-কাছ মাড়ান না তিনি।

পরের দিন রাতে দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন হয়, এবারেও সেই একই মূর্তি আবির্ভূত হয়ে বলেন আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ প্রমাণ দিচ্ছি, মিলিয়ে নে।

এই কথার পর তিনি একটি জায়গার কথা বলে দেন যেখানে মাটির নাচে বেশ কিছু টাকা পোতা আছে বলে তিনি জানান।

অর্ধবহু বাস্তবের গন্ধ পাওয়া মাত্র এবারে স্বপ্নকে অস্বীকার করা গেল না আর। মাটি খুঁড়বার জন্তে কুলি-কামীন যোগে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলেন বাড়ির মালিক এবং বেশ কিছু টাকা পেলেন মাটির নীচে থেকে। সে টাকা এবং গুপ্তজন্মের পিতাকে তাঁর পাশ থেকে যথারীতি উদ্ধার করলেন এবার। তারপর বাড়ি করলেন একখানা সেই টাকার। ষটনার নিষ্পত্তি হলো না এখানে।

ভ্রমলোকের এ জন্মের ভাই দাবী করলেন বাড়ির অংশ। তাই

নিয়ে মামলা হলো। মামলার প্রমাণিত হলো এ জন্মের পিতার অংশ সে বাড়ি হয় নি, অতএব ভাইয়ের কোনও দাবী থাকতে পারে না এই বাড়িতে।

এ ঘটনা যিনি আমাকে বলেছেন তিনি এসব অষ্টনে বিশ্বাস করেন না এবং মিথ্যাকথা বলেন না।

আমি জানি। এ অষ্টনকে অবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দেবার লোক আছে। কিন্তু তাতে এসে যাবে না কিছু। কারণ বিশ্বাসের আলোক আমার কাছে যুক্তির বহ্নিরশ্মির চেয়ে ছোটো নয়। লজিক্যাল এবং এক্সট্রালজিক্যাল,—দুয়েরই মূল্য আছে আমার কাছে। গণনার কোনও কথা মিলে গেলে, যদি একটা কথাও হয়, যেহেতু তা লজিকে পাকি না সেইহেতু তা গণনার ধরব না, বা কাকতালীর বলে উড়িয়ে দেব, এ আমার ধর্ম নয়। যুক্তি মানি বলে, যুক্তির চেয়ে বড় কিছু মানি না,—এ আমি মানি না। এই অমাত্র্য করাকে আমি ধর্ম বলি না, আমি অধর্ম বলি। যা শুনব, যা দেখব, তাই বিশ্বাস করব, কিংবা অবিশ্বাস করব—এ আমারই ধর্ম নয়।

আমার 'বার্থকে বারানসী'-র দ্বিতীয় পর্বের জীবন-নদীর বধ এবার সিদ্ধান্তে প্রবেশ করবার মুহূর্তে বীকে স্মরণ করছে তাঁর নাম,—শক্তিপদ বসুভায়। কানীশ এবং আমার জীবনে অবিস্মরণীয় এই মানুষটিকে প্রণাম। এই একটি লোকের জন্তেই,—এই একটি পরমাশ্রম আলোকের জন্তেই মানুষের মহত্তম তীর্থ, মহাকালের সত্যার্থ কানীশ-দর্শন সার্থক। একজন লোক,—জ্ঞানীলোকের চেয়েও বড় আকর্ষণের চুম্বক হতে পারে, রমণীর চেয়ে কত রমণীয় হতে পারে একজন মানুষের সংগ, নম্বর পৃথিবীতে কি 'অবিনশ্বর বাণীর প্রতিমূর্তি' হতে পারে একজন, এই 'একজন' সেই আর 'একজন'—এর প্রতিচ্ছায়ের জ্বালাতে পারে মরলোকে অমরলোকের আলো,—শক্তিপদ বসুভায়কে যে চোখে দেখে নি তার ধারণা করা শক্ত। চোখে দেখলেও সত্যের পক্ষে তা সহজ নয়। কারণ আমরা সবাই প্রায় অন্ধ। কেউ অর্ধে, কেউ কামে, কেউ খ্যাতিতে, কেউ রূপে। পরমার্থে কিংবা অপরাধ কদাচ। তবু কেউ কেউ, কোনও কোনও ধ্যানী, নিঃসংগ কোনও কোনও বিহগ কেঁদে বেড়ায়, অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, সম্ভলতা নয়... আরো এক বিপন্ন বিষয়।

না। বিপন্ন বিষয় নয়, সম্পন্ন আশ্বাসের জন্তে যদি কেউ আকুল হয় দৈবরূপায় তা হলে তার কূল মিলাবে কানীশে; বাটের ওপর সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে অসাধারণ গৃহস্থ শক্তিপদ

## বাধক্যে বারাগণী

বস্তুরকে যদি সে দেখতে পায়। চর্মচক্ষে নয়। মর্মচক্ষে সে দেখবে,— মানবজীবন 'নিরুদ্দেশযাত্রা' নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য,—নিজেকে জানা। কোটি জন্মের স্রষ্টার কল একটি মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তখন থেকে আর কোনও জন্ম তার বিফলে যায় না।

শক্তিপদ বস্তুরায়,—শক্তিবা বা শক্তিবাণী সাধু, যে নামেই ডাকে। তাঁকে একই আলো বিচ্ছুরিত ছ' চোখে সারাক্ষণ। ভালোবাসার আলো, আলো আর আশার করুণাধারার বিগলিত ছ'টি চোখ। মর্ত্যের কিংবা অমর্ত্যালোকের কোনও স্ত্রীলোকের চোখে এ জাহ্নু নেই। এ চোখ আসক্ত করে না; নিরাসক্ত করে। রূপের উজ্জ্বল বয় না এ চোখে; অপরূপের উভস খুলে দেয় ছ' চোখে। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে চিরকালের আভাস।

শক্তিপদ বস্তুরায়ের কাছে কাশীর ঝিঝিহরী সাধক-পণ্ডিত আসেন, রাজনীতির বুদবুদ ব্যক্তি আসেন, সুরসাধক, লেখক, ডাক্তার, অধ্যাপক, ধর্ম-অধ্যাপক নর-নারী আসেন। কথা শুনতে আসেন, কথা বলতে আসেন। লৌকিক ও অলৌকিক প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কিন্তু শক্তিপদ বস্তুরায় আমার চোখে লৌকিক সাজ্জল্য ও অলৌকিক দীনতার কোন অংক বড়ো। তাঁর ওপর বিদেশী আত্মার ভর হয়েচে, এমন কথা শুনে আমার বিশ্বাস উল্লসিত হয় না। হিমালয়ের মানব পঙ্খক্ষেপ-মুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তপুঙ্খের পদক্ষেপ পড়ে, এর মধ্যে বিশ্বাসের বিচ্ছুরণ নেই। শক্তিপদ সাধু—একদা রাজনীতিকর, কাজী নজরুল ও সুভাষের

অমুরাগী, শক্তিপদ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী,—এই বাহু। শক্তিপদ বস্তুরায়ের ঘরে কলকাতার নামকরা ডাক্তারকে দেখেছি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও; কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির খাওয়া-আসা আছে শুনেছি। অতি সাধারণ [আমাদের পরিভাষায়] নর-নারীকে প্রণাম করতে দেখেছি। চিঠি পড়ে থাকতে দেখেছি, দূরের ও কাছের। কিন্তু এও তুচ্ছ।

শক্তিপদ বস্তুরায় থাকেন মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে। গংগার ওপর হরস্বয়ং হাওয়ার মধ্যে তাঁর থাকা-খাওয়া। সিগারেট প্রায় অনর্গল চলে। চা-ও চলে ঘন ঘন। খাওয়ারতে ভালোবাসেন খুব। খেয়ে খুশি হন। কেউ, শক্তিপদ সাধু মনে করে গেলে, বলে দেন স্পষ্ট, 'আমি সাধু নই, সাধারণ গৃহস্থ।' আমাকেও আর ভেত তাই বলেছিলেন যে, 'আমি কিন্তু সাধু-টামু কিছু নই।'

অবিনয়ে বলেছিলাম তৎক্ষণাৎ: আমি অত্যন্ত অসাধু পুঙ্খ, কাজেই সাধুর সন্ধানে আমি আসি নি; আমি এসেছি আপনাকে দেখতে কেবল।

সত্যিই তাই। লোকে পূর্ণিমার রাতে তাম্রমহল দেখতে যায়; সূর্যোদয়ে যায় টাইগার হিলে উঠতে; তীর্থে যায় পূণ্যসঞ্চয় করতে; জীবন দেখতে যায় বাবে এবং বারবনিত্যর গৃহে। আমি কাশী বাই, তীর্থে করতেও নয়, পূণ্য করতেও নয়। কাশীর দ্বিদিমার কাছে বাই আর দেখতে বাই-শক্তিপদ বস্তুরায়কে।

মানুষের মধ্যে আর একজন কতবড় মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে,



বড় বড় হোক

নিম টুথ পেট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।

নিম টুথ পেট-ই হল একমাত্র টুথ পেট যার মধ্যে নিমের বীজ-বীরক, দুগ্ধকলাশ ও কসায় গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট দস্তা-বিজ্ঞান-সম্মত উপাদানের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেট পাইওরিয়া, কেরিজ এবং টাটার বিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের স্বচ্ছ দৃশ্য কণে প্রকাশ সুরভিত করে।

নিম-এর তুলনা নেই।

**নিম টুথ পেট**

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লি: কলিকাতা-২৯।

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সত্যকায় পুঙ্খকা পাঠান হয়।

শক্তিপদ বহুৱায় তাৰ দ্বিতীয়-বহিত দৃষ্টান্ত। 'মাহুঘেৰ ভালো হোক', শক্তিপদ বহুৱায় যেন তাৰ জীৱন্ত মন্ত্ৰ। জাতিধৰ্মনিৰ্বিশেষে মাহুঘকে দেখেই মনে মনে বলা : ভালো হোক। শুধু এই মন্ত্ৰো-জপ জপতে জপতে মন তোৰ উধাও হোক সীমাৰ গণ্ডী পেরিয়ে অসীমে।

অন্ধকাৰ আলো হোক মুহূৰ্ত্তে; মৃত্যু থেকে অমৃত্তে বাত্ৰা হোক আৱন্ত। মাহুঘেৰ ভালো হোক,—এৰ চেয়ে বড় কথা, মাহুঘেৰ মুখে আমি শুনি নি। মানবজীৱনে সবই মন্ত্ৰণা; মন্ত্ৰ কেবল ওই,—মাহুঘেৰ ভালো হোক। এ মন্ত্ৰ নিবন্তৰ বলতে বলতে মাহুঘেৰ ৰোমকূপ অমৃত্তনিস্তানী হয়; চলার ছন্দ হয় পৰিবৰ্ত্তিত। মাহুঘেৰ নিখাস-প্ৰেৰণা বহুতে থাকে অন্ধ বাতাস। মাহুঘেৰ চোখে উদ্ভাসিত হয় অন্ধ এক আকাশ। চোখে দেখা যায় যে আকাশ তাৰ চেয়ে অনেক নিকৃপম। নিবিড়তৰ নীল; তাৰ চেয়ে অসীমতৰ। এ আকাশে ওড়বার পাখা ওই মন্ত্ৰে পায় মাহুঘ;

ক্ষমা কর সবে, ভালোবাসো।

অন্তৰ হতে বিধেযবিধ নাশো!

এ মন্ত্ৰ উচ্চারণমাত্ৰ ৰণ শেষ। মৰণ পৰান্ত! মল,—পরিমল। শক্তিপদ বহুৱায়েৰ চোখেৰ তৱাৰ আৰ এই মন্ত্ৰময়ী তৱাৰ কোনও তফাৎ নেই। চেয়ে দেখো ওই চিৱন্তন ভাৱতৰ চোখেৰ দিকে। সে বলছে, মৃত্যুদীপনো জীৱনেৰ জ্যোতিৰ্ময়ী তপস্যায় বাঁজা জেনেছেন মাহুঘ অমৃত্তেৰ সন্তান, তাঁৰা জেনেছেন অন্ধকাৰ থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃত্তে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে বাত্ৰাই জীৱনেৰ উদ্দেশ্য। চেয়ে দেখো তাঁদেৰ চোখে, গ্ৰামলাবিপুল্য এ ধৱাৰ দিকে চেয়ে আছে অনন্তকাল ধৰে এক অধৱা। নক্ষত্ৰচিহ্ন নীলাধৱা সে বিৱহবিধুৱা। পূৰ্বিমায় পাত্ৰে আনন্দেৰ অমৃত্ত বহন কৰবে সে আৰ কতকাল! অস্তহীন অমায় অবিখাস ছিন্নভিন্ন কৰে কৰে দেখা দেবে, মাহুঘেৰ কণ্ঠে তাৰ নিকৃপম নীৰৱ বীণাখানি : ভালো হোক!

ভালো হোক সকল মাহুঘেৰ। বিখাসেৰ আলো হোক বত ৩.বিখাসেৰ কালো। টেলিভিসান থেকে ভিসানে, কামকট থেকে কনটেনমেণ্টে, কম্পিউটাৰ থেকে আন্তৰ্জালমাহিত্তে, সাংগ্ৰাম থেকে

শান্তিতে, মৃত্যু থেকে জীৱনে ফিৰো চলো। জয়ধ্বনি কৰে 'নিৰ্বেধ' নবজাতকৰে। বলা, মাহুঘেৰ জয় হোক। সে জয় দেশেৰ স্বাধীনতা হৰণেৰ নয়। দেশ ও কালৰ কাছে মাহুঘেৰ অধীনতা-মুক্তিৰ বিষয়। দেশ জয় নয়, স্বাধৰ জয় কৰ মাহুঘেৰ। বলা,—এ হালোক! মধুময়, মধুময় পৃথিৱীৰ ধূগি।

সেই মধু,—মধু ও কৈটেৰে মুক্তিকে কল্ক মধুৰ!

শক্তিপদ বহুৱায়-এৰ জীৱন উপজ্ঞাসেৰ মতো অলীক নয়; কিন্তু উপজ্ঞাসেৰ চেয়ে অলৌকিক। যে কোনও উপজ্ঞাসেৰ চেয়ে যে মাহুঘেৰ জীৱন অনেক বৃহৎ, একথা কে জানতো শক্তিপদকে না দেখালে।

শক্তিপদ বহুৱায়ও একদিন অবিখাসী ছিলেন। একদিন তিনি জীৱনেৰ দেওয়াল জুড়ে লিখেছিলেন, লিখে চলেছিলেন—God is nowhere! আৱেকদিন তাঁৰ নিজের হাতে সেকথা মুছে দেৱাৰ জন্তেই লিখেছিলেন—এখন সে কথা মুছে নিজের জীৱন দিয়ে যে কথা লিখছেন, God is now here!

যতবার মাহুঘ যুদ্ধ কৰেছে মাহুঘেৰ সংগে, ততবার লেখা হয়েছে এই অসত্য উক্তি : God is nowhere। যতবার মাহুঘ মাহুঘকে দেখে বলেছে, ভালো হোক। ততবার লেখা হয়েছে এই সত্য ভাষণ : God is now here।

শক্তিপদ বহুৱায়েৰ কাছে বাবাৰ সময় সাক্ষ্য কৰে বাট, God is nowhere! কাছে গিয়ে মনে হয়, God is now here।

God মানে আকাশে কোনও চতুৰ্ভুজ অবস্থানকাৰী নয় [Beware of the man whose God exists in the heaven]। God হচ্ছে Good-এৰ সামটোটা। মাহুঘেৰ Good যে চেয়েছে সেই God-এৰ দেখা পেয়েছে। বৰনই বলেছে তখনই। 'God is now here,'—সন্তৰ হয়েছ।

মাহুঘেৰ Good-ই আছে মাহুঘেৰ God! শক্তিপদ বহুৱায় কাছে গেলে এই Good-এৰ, সেই God-এৰ স্পৰ্শ পাই! এই স্পৰ্শ সেই স্পৰ্শাত্মেৰ ছাড়া আৰ কাৰ!

[ ক্ৰমশঃ ]

Super craftsmanship  
in  
JEWELLERY

ROY COUSIN & CO.  
JEWELLERS & WATCHMAKERS  
4, DALHOUSIE SQ. EAST. CAL. - I



# রুদ্র গান ব্যাঙ্গলো

## রুদ্রবীণা

শ্রীপ্রভাকর সেন

অনেক যুগ আগে, সে প্রাচীন হিন্দু যুগে বীণার সৃষ্টি হয়। এই বীণার আলোচনার পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীত সৰ্বস্বত্র বলা দরকার। বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞাণ বসেছেন যে, ভাষার জন্মের বহু পূর্বেই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে। মানুষ যেদিন প্রথম শব্দগুলি বিধে বিভিন্ন ধ্বনি, সেইদিনই জন্ম নিল সঙ্গীত। ধ্বনিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের।

ভাষাতত্ত্বের যখন শুরু হল বিশেষ সভ্যতা, সেই সময়ে জন্ম নেন, বহু ধ্বনি; এই সময়কে বৈদিক যুগ বলে মনে হয়। এর সঙ্গীতকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই উন্নত করে মানুষ কতৃক যাতে বিভিন্ন উপায়ে সেই সব ধ্বনির পুনঃসৃষ্টি হয় তার সকল পদ্ধতির উদ্ভাবন কালেন। ক্রম ক্রমে সেই সব ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নবরূপ ধারণ করল এবং নতুন নামে পরিচিত হল—সুর।

সুরের সৃষ্টি হওয়ার পর তাকে কিভাবে সুরের মাধ্যমে পুনঃসৃষ্টি বা প্রকাশ করা যায় তার উপায় স্থির করতে লাগলেন সুসিরা। এইভাবে গবেষণা করতে করতে আবিষ্কার করেন 'বীণা'। কাজেই, প্রাচীনযুগের দিক থেকে বীণা যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কোনও কোনও মতে বলা হয়েছে যে প্রথম বীণাই রুদ্রবীণা; আবার অন্যজ্ঞাণা বলেন সরস্বতী বীণা। এই দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রাচীন তা সঠিক নির্ণয় করা শক্ত। রুদ্রবীণা উত্তর ভারতে এবং সরস্বতী বীণা দাক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। সঙ্গীত গ্রন্থকারেরা বলেছেন যে রুদ্রবীণার সৃষ্টিকর্তা দেবদেব এবং সরস্বতী বীণা সৃষ্টি করেন দেবী সরস্বতী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কিছু মতে দেবদেব ও দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাদের সৃষ্ট যন্ত্র প্রদান করেন মর্ত্যলোকে তা প্রচার করার জন্ত। তা হলে ব্যাণার এই রকম পীড়ার যে, মহাদেব এবং সরস্বতী দেবী তাঁদের বীণা যন্ত্রের স্বয়ং প্রদান করেন মর্ত্যলোকে প্রচার করার জন্ত; এই যদি হয় তবে বলতে হবে উক্ত বীণা দুটি স্বয়ংদের সৃষ্টি নয়, তাঁরা এই যন্ত্রের শিক্ষাদাতা ও প্রচারক মাত্র। সে যুগে অবশ্য এই রকম ঘটনা ঘটত, তার নজিরও কম পাওয়া যায় না। এখন তা হলে দেখা গেল যে বীণার সৃষ্টির সম্বন্ধে দু'রকম মত পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম মতে, বীণা স্বয়ংদেরই সৃষ্টি; তাঁরা মহাদেব ও সরস্বতী দেবীর নামে যন্ত্রের নামকরণ করে তা প্রচার করেন। দ্বিতীয় মতে, দেবদেব

এবং দেবী সরস্বতী যথাক্রমে রুদ্রবীণা ও সরস্বতী বীণায় আবিষ্কার বা সৃষ্টি করেন এবং তা স্বয়ং কতৃক মর্ত্যলোকে প্রচলিত হয়।

রুদ্রবীণার সৃষ্টি সম্বন্ধে একটু মনোহর কাহিনী চলিত আছে। কোনও এক স্বর্বাশ্রয় পরকালীন আলোকে পুষ্প শব্যাম দেবী পার্বতী শরিত আছেন। তাঁর এই অপূর্ণ শরনভঞ্জে মহাদেবের এক কল্পনা আসে। এই কল্পনা শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনার পর্যাবসিত হয়। দেবীর পুষ্প অলঙ্কার সম্ভূত বাহুর যন্ত্রের উপর স্তম্ভ; তাঁর মুখমণ্ডল কেশবাশি দ্বারা জড়িত এবং শোভিত; তাঁর সমস্ত দেহ এক অপূর্ণ লাবণ্যপ্রভা বিস্তারে সজ্জিত। দেবীর হাস-প্রশংসা এবং প্রকৃতির মন হর বাতু-হিরোলে জন্ম নিল মনোমোহকর 'সঙ্গীত'। মহাদেব অচিভূতর জ্বায় এই দৃশ্য দর্শন এবং এই সঙ্গীত শ্রবণ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দেবীর শরিত অবস্থার মধ্যে রুদ্রবীণার রূপ আবিষ্কার করলেন। দেবীর দেহ থেকে জন্ম নিল বীণার দণ্ড; বক্ষস্থল থেকে জন্ম নিল বীণাসংগের দুই লাউ, বাহুর যন্ত্রের অলঙ্কার থেকে বীণার পর্বা, কুন্তলদাম থেকে বীণার তার, কেশের অলঙ্কার থেকে তারের খুঁটি বা কান, অঙ্গুলির অঙ্গুরীর থেকে মিজাব এবং শিরের মুকুট থেকে ময়ূরের উর্ধ্বাংশ (রুদ্রবীণার নিম্নভাগে ময়ূরের অধরবের উর্ধ্ব অংশের প্রতিমূর্তি থাকে) এইভাবে মহাদেব রুদ্রবীণার উদ্ভাবন করেন। অংশ এই কাহিনী যে পৌরাণিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এছাড়া, এই কাহিনী কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য।

রুদ্রবীণার অপর নাম 'বাণ'। উত্তর-ভারতে রুদ্রবীণার স্থান রাজসিংহাসনে। রুদ্রবীণা যন্ত্রশ্রেষ্ঠ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বে যত্র যত্র আছে তাদের মধ্যেও রুদ্রবীণার স্থান সর্বোচ্চ। পাশ্চাত্য-জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হল 'পিয়ানো'। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রুদ্রবীণা বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে যত্র উন্নত, পিয়ানো কত্র এই যন্ত্রটির তুলনায় বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তত উন্নত নয়। একবাক্যে একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্র এই রুদ্রবীণা। বীণ যন্ত্র যেভাবে বিভিন্ন স্রুতি, স্বরের আলোচন, কন্ঠন, বিভিন্ন গ্রাম দর্শন সম্ভব তা কিন্তু অন্য কোনও যন্ত্র সম্ভব নয়। কাজেই পিয়ানোর ঐতিহ্য বাণ-এর ঐতিহ্যর কাছে রানু হয়ে যায় একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে পিয়ানো তান্ত্র

জোরাল আওয়াজে বীণ-এর ক্ষীণ আওয়াজকে অনেক গুণে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এ এমন কিছু গর্বের বস্তু নয়।

বীণ-এর ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করলে মনঃচক্ষুত ভেসে ওঠে কয়েকটি মুগ্ধকর চিত্র—বৃন্দাবনের নিকটবর্তী বনে নাদসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য বৈজুবাওয়া বীণ বাজিয়ে চলেছেন একাগ্রচিত্তে। তাঁর অত্যাশ্চর্য যৌগিক ক্ষমতার সারা বন যেন আলোকিত হয়েছিল, বজ্রপত্রের তাঁর নিকটবর্তী হয়ে আত্মহারা হয়ে সেই মহাসঙ্গীত শ্রবণ করছে। কিংবা কোন সিদ্ধ রাজপুত্র নারীরা উপর আলোকে বীণ বাজিয়ে সমস্ত প্রাণীকে শিহরিত করে দিচ্ছেন। অথবা কোন সঙ্গীতসিদ্ধ মহাযোগী পুরুষ বীণাবাদনে নভে মেঘ সঞ্চার করছেন।

আমরা বিশ শতাব্দীর মাহুমেদা হযরত এইসব কাহিনীকে বা কিংবদন্তীকে উপেক্ষা করে নিছক বয়সী বলব বা হযরত অবজ্ঞা-বুঢ়ক কোন মতামত দেব। কিন্তু আমরা জানব না যে কতবড় মিথ্যাবাদী আমরা। যে প্রক্রিয়ায় যে বিজ্ঞাবলে এইসব সম্ভব হত সেগুলি আমাদের বহু পিছনে ফেল চলে গেছে কোন এক অজানা লোকে। বাক সে কথা। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

## সঙ্গীতে উদাযমান শিশুশিল্পী

পিয়ানোবাদক হিসেবে পশ্চিম জার্মানীর শিল্পনগরী বিয়েলেফেণ্টের যে দশ বছরের শিশুশিল্পীর এতো খ্যাতি তার নাম মাইকেল গিজ। কড়া সঙ্গীত সমর্থদাররা 'হেলেকটিক ওয়েকফিল্ডার মোংজার্ট' বলতেও বিধা করছেন না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে অবাস্তব হবে না যে, মোংজার্ট যখন স্নরের তরঙ্গ সুরোপের সবক'টি রাজধানী ভাসিয়ে দিচ্ছেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল সবে দশ। মাইকেল এখনো সব রাজধানীতে যাত্রীন, তবে যেখানে যেখানে সে ইতিমধ্যে বাজিয়েছে, সেখানকার সঙ্গীতরসিক মাহুদের কাছে সে অজস্র প্রশংসা লাভ করেছে। সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় সে সদস্যনে উত্তীর্ণ হয়েছে যখন তাকে সালৎসবুর্গের মোংজার্ট কলাভবনের আচার্যদের সামনে তার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিতে হয়েছিল। এই কলাভবনের বাছাইকরা ছাত্রদের মধ্যে মাইকেল আজ বয়সে সবচেয়ে তরুণ।

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাইকেল। বিয়েলেফেণ্ট গান গিথিয়ে কোনমতে তার বাবা সংসার চালাতেন। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ভাড়াকরা পিয়ানো বাজিয়ে মাইকেলের হাত রপ্ত করতে হয়েছে। মাইকেল যখন সালৎসবুর্গ কলাভবনে ভর্তি হ'ল, পৌর কর্তৃপক্ষ তাকে ৬৮০০ মার্কের বৃত্তি মিলেন। মাইকেলের মা ও বাবা বিয়েলেফেণ্ট ছেড়ে ছেলের সঙ্গে সালৎসবুর্গ গেলেন। কলাভবনে শিক্ষার প্রথম ধাপে মাইকেল যখন সবচেয়ে গুণী ছাত্র হিসাবে নাম কিললে তখন বৃত্তির টাকা ফুরিয়ে গেছে। এদিকে সালৎসবুর্গ এসে মাইকেলের বাবা গান-বাজনা শেখাবার কোন কাজ যোগাড় করতে না পেয়ে উপার্জনহীন হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে ছেলেকে কলাভবন থেকে ছাড়িয়ে বিয়েলেফেণ্ট ফিরে এলেন। একটি কণকল্পা ছেলের অর্থভাবে শিক্ষা বন্ধ করতে হ'ল তখন অনেক সঙ্গীতার লোক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।



● দশ বৎসর বয়স্ক পিয়ানোবাদক মাইকেল গিজ। বিশেষজ্ঞদের মতে গিজ একটি অসাধারণ প্রতিভার আধার

মার্ক ভাতা বন্দোবস্ত করার মাইকেল-পরিবার আবার সালৎসবুর্গে ফিরে এলেন এবং মাইকেল আবার মোংজার্ট কলাভবনে ভর্তি হ'ল।

সঙ্গীত-বিশারদরা মনে করেন মাইকেল একদিন স্নরের বন্ধারে বিশ্বজয় করবে। —ডি এ ডি

## বনে 'রবার্ট শূমান স্মৃতিসৌধ'

সঙ্গীত-রচয়িতা রবার্ট শূমান যে গৃহে থাকতেন এবং যেখানে তিনি শেখনিশাশ ভ্যাগ করেন, গত মহামুখে সেটি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গৃহটিকে বর্তমানে সুসংস্কৃত করে 'শূমান স্মৃতিস্তম্ভন' হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই গৃহের দুটি কক্ষে শূমানের নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি জিনিস, তাঁর ও তাঁর পত্নীর আলোকচিত্র ও তৈলচিত্র, চিত্রপত্র ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। আর আছে শেষ জীবনে শূমান যে পিয়ানোটি বাজাতেন সেটি তাঁর পত্নীর তৈরি পিয়ানোর ফুলতারা ঢাকা, সঙ্গীত-গচয়িতা একগুচ্ছ কেশ, মৃত্যুর স্মৃতিস্তম্ভ ও তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এক বিশদ বিবরণী। এতদ্ব্যতীত শূমান গৃহটিকে সঙ্গীতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এখানকার সঙ্গীতের লাইব্রেরীতে ৪০০০



যেহেতু

পুস্তক ও ২০০ রেকর্ড আছে। এই গৃহে ম্যাকরেগের ইন্সটিটিউটের কেন্দ্র ও স্থাপিত হয়েছে যেখান থেকে বেগের সমগ্র রচনাবলী ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। —ডি এ ডি

## একটি উপভোগ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান

সম্প্রতি শ্রীঅম্বিকাননাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের উদ্যোগে একটি মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুসম্পন্ন হয়। কল্যাণী রায়, বাণী ঠাকুর, মুন্নাওয়ার খাঁ (ওস্তাদ বড় গোলাম আলীর পুত্র) ও নবকুমার পাণ্ডা প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পবর্গ সম্প্রতি একটি সাংস্কৃতিক সফর সমাপ্ত করে নেপাল থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়াই এই অনুষ্ঠানের উৎসাহরূপে বর্ণিত হয়। কল্যাণী রায়ের অনবদ্য সেতার বাজনা, বাণী ঠাকুর ও মুন্নাওয়ার খাঁর গান, নবকুমার পাণ্ডার সঙ্গীত এবং প্রায়শ্চৈতন্য গৃহস্থামীর কণ্ঠা কচিরা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত সমাগত অভাগিতবৃন্দকে অফুরন্ত আনন্দে ভরিয়ে তোলে। এই আয়োজন সামগ্রিকভাবে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। অতিথিবৃন্দের আপ্যায়নের দিকে গৃহস্থামীও যথেষ্ট যত্ন নেন।

## আমার কথা (১১৪)

### সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনে সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বাঙলা দেশের যে তরুণবৃন্দ যথেষ্ট সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন শ্রীসন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের নাম সেই তালিকার অবশ্য করণীয়। বর্ধমান জেলার কুলান গ্রামে তাঁদের নিবাস। পিতৃনাম—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৬৬ সালের ১১ই মার্চ (জানুয়ারী ১৯৩০) কলকাতার সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। শৈশব থেকেই মাতুলসঙ্গে মাতামহ স্বর্গীয় ভানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হতে থাকেন। সঙ্গীতের প্রতি এই অল্পবয়সের মূল মাতামহের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পরিপূর্ণরূপে বিস্তারিত। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতশিক্ষাও শুরু হয়। প্রথমে সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন শ্রীঅননাথনাথ বসুর কাছে। তারপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিষ্যত্বপাভ করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীচিরায় লাহিড়ীর। এ ছাড়াও স্বর্গত সুরবল দাশগুপ্ত, লক্ষণ হাজারী ও কাদের বক্স প্রভৃতি শিল্পীদের কাছে লব্ধসঙ্গীত সব্বদে শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে যখন ইনি পাঠ্যরত, সেই সময়ে বহু সাংস্কৃতিক এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দেন এবং তার বিনিময়ে লাভ



সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

করেন প্রভূত সুনাম এবং যথেষ্ট সুখাতি। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে ভরিয়ে দেন বিপুল উৎসাহে।

১৩৭১ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে তাঁর গান প্রথম রেকর্ডেড হয়। গান দুটির প্রথম কথাগুলি হল 'যথাক্রমে—'কিরি কিরি স্বরবা বহে' ও 'মোহনীর বাঁশি'। পরের বছর তাঁর আরও দুটি গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়। সেই গান দুটির প্রথম কথাগুলি হল যথাক্রমে—'মৌরীফুলের মৌবনে' ও 'তীবনের এই দরিয়ার'। তারপর সুরকার হিসাবেও তাঁর প্রতিভার প্রকাশ ঘটতে থাকে। রেবর্তে গৃহীত বহু জনপ্রিয় গানের সুরসংযোজনার রত্নতরু তাঁর। মহেশ্বর সাকী এই ঘটনামের অন্তরালে চুখানি ইংলান্ড গানও তিনি রেকর্ড করেন। বিখ্যাত বাউল পূর্ণ দাসের বক্টে চাখানি গান তাঁর পরিচালনার গৃহীত হয়। বর্তমানে 'লব্ধ' নাটকে ইনি সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী হিসাবে যুক্ত আছেন।

আকাশবাণীর মাধ্যমেও তিনি নিরন্তর শিক্ষা হিসাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

লব্ধসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে ইনি সমধিক পরিচিত হলেও মার্গসঙ্গীতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। এ বিষয়ে যাদের সন্নেহ উৎসাহ তাঁকে লাভবান করে তুলেছে, তাঁদের নাম ওস্তাদ বড় গোলাম আলি খাঁ, ডি ডি পান্ডাশঙ্কর এবং ভাষ্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

যেহেতু তোমার সঙ্গে এখন ঘোঁষন বজার  
কল-কল্লোল, মদির নহনে বিজলী খিলিক হানে,  
বকের গভীরে দিবানিশি তুমি সরোবর বজার—  
নিব্রাহীহীন রাত্রি আমার ভরে পদাবলী গানে।

যেহেতু তোমার সঙ্গে এখন বসন্ত গান গায়,  
খশিৎকল প্রজাপতিগুলি পুষ্পবিতানে নাচে।  
তোমার গোপন কামনা করে যে চৈতন্যলী সন্ধ্যার  
ইবাণী মেয়ের চোখের মতন আমাকে টানবে কাছে।

# শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

(পূর্বসূচী)

চাকলাত রায়চৌধুরী

[মাসিক বহুমতীর গত সংখ্যা থেকে এই বহনটি প্রকাশিত হচ্ছে। লেখিকা ঈশ্বরী চাকলাত রায়চৌধুরী দ্বিখণ্ড শিল্পী ও ভাস্কর ঈশ্বর দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী। অস্বাভাবিক রচনাটির মধ্যে লেখিকা তাঁদের দ্বৈতজীবনের এক অপরূপ আলেখ্য চিত্রিত করেছেন। অন্তরালের 'দেবী প্রসাদ' সংক্ষেপে রচনাটি এক অমূল্য উপাদান। দেবী প্রসাদের অমূল্যগীরা তথা সমগ্র পাঠকসমাজকে লেখাটির বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী যথেষ্ট আনন্দান করবে এ বিশ্বাস আঘরা রাখে।—স]

একজন শিল্পীর সঙ্গে শেষ অবধি ঘর করার দীক্ষাগ্রহণ বিভাবে করলাম, সে বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনার আগে এ সংক্ষেপে যিনি আমাকে পাঠ দিয়েছেন, তাঁর জীবনের গঠন ও বিকশের সংক্ষেপে কিছু বলা অপরিহার্য বলে মনে করি।

ঈশ্বর দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী এ সংক্ষেপে আমার অদুরন্ত কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে, শৈশব অতিবাহিত করেছেন যথেষ্ট ভোগ-বিলাসের মধ্যে। তাঁর বাবা ও মা—উভয়ই বাঙালার এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর মা আমার শাসুড়ী ছিলেন



● চাকলাত রায়চৌধুরী

রাণের অভ্যর্গত তাজহাটের বর্গীর মহারাজার ঘরে। দীর্ঘকাল তিনিই ছিলেন মহারাজার একমাত্র সন্তান। সেই কারণেই তাঁর বাবা-মার আদর তিনি একটু অধিকগাত্রাতেই পেতেছিলেন, এমন কি তাঁর বিয়ের পরেও বছরের একটা বিরাট অংশ তিনি কাটাতেন তাজহাটেই। গল্প শুনেছি যে, তাঁর সাতাব্ব কাটার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সেতুই তৈরি হয়েছিল। সোনার মোহর নিয়ে খেলাও করেছেন তিনি।

এই পরিবেশের মধ্যেই দেবী প্রসাদের চরিত্র রূপ নিতে থাকে। সেই ভুলেই এত আশঙ্ক হওয়ার কিছু থাকে না, যখন জানা যায় যে, যে বয়সে অল্প শিশুরা আদেশ পালন করে সেই বয়সে দেবী প্রসাদ আদেশ জারি করতে থাকেন। এই স্বভাবটী বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল এবং চিত্রিত হতে থাকল তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্বরূপে।

শিল্পের প্রতি তাঁর অনুব্রাগ ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু এই অনুব্রাগ সেদিন ভরে ওঠে নি পরিজনদেরও স্বীকৃতিতে। তাজহাটে দুর্গাপুজা হ'লে খুব জাঁকজমকের মধ্যে, বিরাট ধুম হত। আমোদ-আহ্লাদের আয়োজনে তিলমাত্র ক্ষুদ্র থাকত না। তিল তিল প্রায়ের লোকেরা অক্ষুণ্ণ আনন্দে তাজহাট: পূজা দেখতে এসে এক বিরাট মিলনভূমি গড়ে তুলত। মহারাজার বিরাট সুরেশ্বর আগুনি ভরে থেক বাজীকরে, সার্কাসের তাঁবুতে, মেলায়, খিচুড়িতে, নাচের আসরে, গানের ভলসায়—সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। শিশু দেবী প্রসাদ তাঁর শিশুমনের অমরা কোঁচুল নিয়ে ঘরে বেড়াতে প্রায় প্রতিটি তাঁবুতে তাঁর সঙ্গিনী চোখ নিয়ে। এত বৈভব, এত আড়ম্বর—সব বিলাসের এই বহুমুখ্য উপকরণ—সবকিছুর মধ্যে তাঁর মন পরিতৃপ্তিতে ভরে যেত মূর্তিকবটির সাল্লিগে। শিল্পী তত্ত্বায় হয়ে গড়ে চলেছেন দেবী দুর্গার প্রতিমা', তথৈবিক তত্ত্বায় হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে চলেছেন দেবী প্রসাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেইখানে বসে থেকে। শিল্পীর চোখ পড়ে বালকের প্রতি, বালকের এই সহজাত শিল্পাসক্তি তাঁর পুঙ্খ মনে এনে দেয় এক অপূর্ব ভরসূক্তি। খানিকটা মুক্তিকা তিনি থুপি হয়ে তুলে দেন বালকের হাতে। মনে মনে এই সুযোগই তো খুঁজছিলেন দেবী প্রসাদ। মনপ্রাণ আনন্দে নেড়ে ওঠে—সে এক অভাবিত হর্ষ। শিল্পীর কাছে ক্ষণকালীন ছেঁদ পড়ে। শিল্পীকে উঠে যেতে হয় আহারের ক্ষেত্রে। সেই সুযোগটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার গ্রহণ করলেন দেবী প্রসাদ। একটি সাপ গড়ে ফেললেন—অতি কৌশলে মূর্তির পিছনে তাকে লাগিয়ে দিলেন। নিশ্চিন্ত মনে আহার সমাধা করে শিল্পী এলেন তারপরেই এক গগনভেদী চিংকার, লোকজন ছুটে আসে—সাপ সাপ, বিষময় কণাধারী ভূজঙ্গ—শিল্পী আতুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, চোখে ভয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন। তারপর যখন আবিষ্কৃত হল যে এই কণা নিষ্কির, এই সাপ নিরাপ, তখন শিল্পীর মন ভরে গেল যুগপৎ লজ্জায় এবং আনন্দে। শিশুর এই অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর শিল্পমনে দোলা লাগিয়ে দয়।

দেবী প্রসাদের পিতামহ ছিলেন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর তাঁর অনুব্রাগ ছিল যথেষ্ট। তিনি চরেছিলেন তাঁর পৌত্রও এই ছাপ বহন করুক। সেই মানসে নাতিকে পাঠালেন স্কুলে। স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম ও প্রাণহীন পরিবেশ তাঁর মন ভরিয়ে তুলতে পারে না। এই বীধাধরা পণ্ডিত জীবনের কল থেকে মুক্তির জন্য প্রাণ তাঁর হাঁকিয়ে উঠতে থাকে—মুক্তি পেলেন

## শিল্পীর জীবনসঙ্গিনী

চুইমির মধ্য দিয়ে। শিক্ষকের চেয়ারে মার্বেল দিয়ে রাখা আবার শিল্পীর সঙ্গে তাঁকে নিশ্চিত পত্তন থেকে বন্ধা করা। নিশ্চিত পত্তনের শিখার দড়ি বেঁধে দেওয়ার মতোই এই সুশীল সুবোধ শাস্ত্র বালকটি বাঁধাধরা পরিবেশের বাস্তবিক দেখতে পেলেন। পিছনের বেঞ্চ একতাল মাটি লুকিয়ে রাখতেন, কি শিক্ষকের কি কোন ছাত্রের মূর্তি গড়ে চলেছেন—মাথার, অঙ্গবেষণের গঠন, বিশেষত্ব জামিন্তি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রেখে।

নিরমের গণ্ডিতে পড়াশুনার পরিবর্তে এইভাবে সময় কাটে তাঁর।

একদিন এইভাবে মূর্তি গড়ার সময় পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর কাছে, থেরালট নেট—শিক্ষক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষক দেখাচ্ছেন যে, মূর্তিটি তাঁরই—রাগে ফেটে পড়েন—কি স্পর্শ! দুর্বিণীত ছাত্রের।

দেবীপ্রসাদ দেখলেন এই পরিবেশ তো কিছুতেই তাঁর সৃষ্টির পিপাসা মেটাতে পারবে না—চার দেওয়ালের আবেষ্টনীর মধ্যে কল্পনার রূপদান অসম্ভব হয়ে উঠল তাঁর পক্ষে—আন্তান। গাঢ়সবন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে—স্কুলের খুব কাছে। মাথার উপর হিরটি বিশাল অনন্ত আকাশ, সে আকাশে পাখা মেলে উড় চলেছে কত ভাসা-জানা-অজানা পাখি, চারপাশে সবুজ ঘাসে সমাবেশ কত গাছ কত ফুল। আনন্দে কাজ করেন দেবীপ্রসাদ। আনন্দপাশে অসংখ্য লোক ভ্রমতে থাকে—দেবীপ্রসাদ যেন এক তপস্বী সাফল্যের স্পর্শ পান। চার, তদুপে এ স্থল সইল না। কথাকাঁটা কানে উঠল প্রশ্ন শিক্ষকের। আনন্দমীকে থেকে আনন্দ হ'ল, বসল বিচার, রায় হ'ল ঘোষিত। আনন্দমীকে টিফিনের সময় এক সন্ধ্যাত জমা'দার প্রাক্তনে স্কুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তি দেবীপ্রসাদ কি যেন নেবার পাত্র—কিছুতেই না। তাঁর অভিজ্ঞাত মন এই চরম অসম্মানে বিদ্রোহী হয়ে উঠল—তা ছাড়া মুক্তির পথও তিনি খুঁজছিলেন—সহসা প্রহরীকে একটি কামড়াত ভূপাতিত করে দেবীপ্রসাদ একশারে সেই স্থানগণে প্রস্থান করলেন—সেই স্থানে ভাবনে আর কোনদিন পরাণপূর্ণ না করার সম্ভব নাই।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর বাবা তাঁকে একখানি চিঠি দেখালেন—চিঠিতে প্রধান শিক্ষক তাঁর বাবাকে জানাচ্ছেন, এই অবস্থা চর্বিনীত বালকটির নাম তাঁদের চাক্ষুসিক এবং এরপাও অস্বভাব করে রাখার অক্ষমতা। বাবা ছেলের সঙ্গে কলসেন আড়ি। অজুত ফল ফলস, কিন্তু শিক্ষকের হস্তাক্ষ, বেদদণ্ড, কঠোর শাস্তি বা কপটে পারে নি—বাবার এই অসহযোগ সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রসূ হ'ল—বামুজীর (বাবাকে এইভাবে দেবীপ্রসাদ ডাকতেন) মনে হুখে হুয়েছে এই নিদারুণ বেদনা সঞ্চারিত করল তাঁর মনে। ছু ছেল লক্ষী হয়ে গে—শাস্ত হয়ে গেল স্কুল—তবে অল্প স্কুলে ভাবানীপূরিত সাউথ সাবার্গাণে বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা এগোতে থাকে। দেখতে দেখতে প্রবেশিকার প্রেক্ষিতে পৌঁছে গেলেন—হঠাৎ নজর পড়ল এক সার্কাসদল—দড়ির খেলা দেখিয়ে মানুষকে খুশি করে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে স্ট্রাইনের চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়লেন সার্কাসদলে। বৈচিত্র্যের আবেষণে। তবে এ জীবন বেশিদিনের নয় আবার তিনি মন দিলেন অধ্যয়নে—যোগ দিলেন বিজ্ঞানে। হঠাৎ একদিন আবার তাঁকে



● দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

দাঁড়াতে হল দুর্ভাগ্য সহ-প্রদান শিক্ষকের ভয়ঙ্কর শাসনের সামনে। হাত পেতে নিতে হল খেঁচাবাত, নীরবে সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ করে গেলেন কিন্তু হাত একবারও সরিয়ে নিলেন না। রক্ত নির্গত হতে থাকে হাত দিয়ে, প্রাথমিক ঔষধের আদেশ হয়—সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর ঘেন্না আহত ছাত্র—‘ধরাবাদ, প্রয়োজন হবে না’। ছাত্রদলকে আদেশ দিলেন পাঠ্য বইগুলি আনতে, সকলের দামনে বইগুলি পুড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান থেকে বেরিয়ে গেলেন দেবীপ্রসাদ। স্কুল-জীবনের সেইখানেই তাঁর বানিকা।

বাড়ি এসে প্রাক্তন স্বীকারোক্তির দ্বারা বাবাকে জানালেন যে পূর্বপরিভাষাই তিনি শিল্পী হতে চান এবং শিল্পকেই জীবনের সাধনা হিসাবে গ্রহণ করতে চান—বাবার খুব একটা সমর্থন না থাকলেও পুত্রের জীবনের উন্নতির পথে অস্বাভাবিক কোন বাধারই সৃষ্টি করলেন না। কিন্তু প্রবল বাধা এল পিতামহের কাছ থেকে, এল মাতৃকুল থেকে। বাপের ছেলে শেষে পেশাদারী শিল্পী হবে—এই নিদারুণ বক্তব্যে অনুপায়—তা ভেবে রাগে দিশাহারা হয়ে যান পিতামহ। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, দেবীপ্রসাদরা পিতাপুত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্তদের কাছে অজুত হয়ে গেলেন।

নির্ভীক দেবীপ্রসাদ একমানে পৃথিবীর সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে থাকেন আপন অভিপ্রেত সন্ধানে। একলাবোর মতই দেবীপ্রসাদ মনে মনে তাঁর আপন স্বপ্নকে বরণ করে নিয়েছিলেন

টাকে দর্শনের বহু পূর্বই। একদিন সকালে দুরু দুরু বকে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সামনে। জানালেন তাঁর বাসনা। তাঁর কাজের নিদর্শন ভূপ্ত করল গুরু অবনীন্দ্রনাথকে। সেইদিন থেকেই অবনীন্দ্র-শিষ্য তালিকার আরও একটি নাম যুক্ত হয়ে গেল—দেবীপ্রসাদ। দিকপাল গুরুর নির্ধন্যার, শিক্ষার লাভবান হতে থাকলেন দেবীপ্রসাদ। তাঁর ছবি প্রদর্শিত হতে থাকল বিভিন্ন প্রদর্শনীতে। দেবীপ্রসাদের কাছে ধরা পড়ে গেল প্রাচ্য-শিল্প এবং পাশ্চাত্য-শিল্পের মধ্যবর্তী দৃষ্টান্ত ব্যবধান। প্রাচ্য শিল্পশৈলীর সঙ্গে ততদিনে তাঁর যথেষ্ট মিতালি গড়ে উঠেছে, পাশ্চাত্য শিল্পবাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাসনা নিয়ে সুবিখ্যাত ইতালীর চিত্রকর মিঃ বোদীর কাছে গ্রহণ করলেন পাশ্চাত্য-শিল্পশিক্ষা, গুরুকে সম্বর্ধিত করতে, তাঁর বিভা। নিজের দখলে আনতে কোন কাজই তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয় নি শিক্ষার্থী শিল্পীর কাছে, একদিন আকস্মিক সকালে দেখা গেল গুরুর গৃহে তালি ঝুলছে, গোপনে তিনি ভারত ত্যাগ করছেন। অবশ্য বাসনা নিয়ে সেইদিন দেবীপ্রসাদ মিঃ ছিলেন তাঁর ছবি গুরুকে দেখাতে।

বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায় দেবীপ্রসাদের। সাধ মেটে না, স্বপ্ন হয় না সঙ্গল। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার সেই মূর্তিকরকে, যার কাজ দটোর পর ঘটা দেখে যেতেন দেবীপ্রসাদ, যে এক অপূর্ণ শিল্পমারীর বিস্তার বয়েছিল তাঁর শিশুমনে, চোখের সামনে যেন নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন দেবীপ্রসাদ, এক নবস্তর ধারার ইঙ্গিত, ভাঙ্কর বিস্তার পাঠ নিতে মনস্কির করলেন। লক্ষ্যের অস্পষ্টিক ভাঙ্কর হিরণ্যময় রায়চৌধুরীর কাছে শিক্ষা নিতে থাকেন। ভাঙ্কর হিসাবে হিরণ্যময় যেমনই অসাধারণ ছিলেন তেমনই আরও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ তাঁর অধিকারভুক্ত। (এমন কি তিনি যদি নিজের ছাত্রও হন) শিষ্যকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয়। শুধু যে এইটুকুই তিনি ভালভাবে জানতেন তা নয়, অল্প শিল্পকে যতদূর সম্ভব প্রাঙ্গণ করার ও স্বীকৃতি দেওয়ার মতং গুণটুকুও তাঁর মধ্যে পুরোপুরি বিস্তারিত ছিল। বাবার মূর্তি গড়লেন দেবীপ্রসাদ। মা বললেন—‘এ যেন বিশ্বের বোঝা তাঁর ঘাড়ে চড়ে আছে। আর একটু উজ্জ্বল করে করতে পার না।’

বাস্তিলা করে দিলেন সেই মূর্তি—হিরণ্যময় এলেন একদিন, মাটিতে রাখা সেই শিরোদেশ দেখে বললেন—‘এ যদি তোমার কাজ

হয়, তা হলে বলব, তোমাকে শেখাবার আমার খবর কিছু নেই, আমার কাছে তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।’

ভাঙ্কর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থাও প্রতিফল হতে থাকে। ঠাকুরদী বন্ধ করলেন পুত্রের ও পৌত্রের মাসিক হাতখরচ। নিজের জন্তে নয় কিন্তু দেখলেন তাঁরই জন্তে তাঁর বাবাকেও বই সহ করতে হচ্ছে—এ বৈশনা সহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। কেরিওয়ালার মত ছবি বিক্রি শুরু করলেন তিনি। তখন এইসব শিল্পকর্মের কিই বা মূল্য ছিল বা পিতা-পুত্রের আর্থিক সমস্যা ঘোচাতে পারে। চাকরীর খোঁজ করতে লাগলেন দেবীপ্রসাদ মাসের শেষে একটা নির্দিষ্ট টাকা বাতে হাতে আসে। পঁচাত্তর টাকা বেতনে এক শিল্পীর রক্ত গোলাব কাজে সহকারী নিযুক্ত হলেন—তাও হারাতে হল কারণ উক্ত শিল্পী দেখলেন সহকারী তাঁর তুলনার অনেক কুশলী, অনেক শক্তিম্যান—এ হেন লোককে কি আর সহকারী রাখা চলে?

আন্তোভোরে কাছে গেলেন দেবীপ্রসাদ। সোজা বললেন যে একটা ডুই-মাস্টারের কাজ চাই। আন্তোভাব বললেন তুমি চৌধুরী বাড়ির ছেলে না, তুমি ছুগ মাস্টার হতে চাইছ, বাড়িতে বগড়া করেছ বুঝি? —মিত্র ইনস্টিটিউশানে অল্প শিক্ষকের পদ তৈরি করে দেবীপ্রসাদকে দেওয়া হল। বেতন নির্ধারিত হল চল্লিশ টাকা।

তাঁর দুই বছর উল্লেখ তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যায়। সাংবাদিক জগতের নমস্ত্র দিকপাল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুত্রবধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। এরা উভয়েই দেবীপ্রসাদের দর্শনের বন্ধু। এরা নিজেরা তাঁর ছবি কিনেছেন। নানাস্থানে ছবি বেচিরও দিয়েছেন। এঁদের সেই সহায়ত। কোনমতে ভোলবার নয়। আস্তে আস্তে শিল্পীর দ্রিঘায় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকল, তাঁর ভাগ্যের আকাশের পূর্বকরণ তখন একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে। মাসিক পাঁচ শ টাকা আন্দাজ তখন তাঁর আ। শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি তখনই তাঁর অধিকারে এসে গেছে। এই সময়েই আমাদের বাড়িতে তাঁর পদার্পণ। তাঁকে দেখে মনে হ’ল যেন সৈনিক। তাঁর পুরুষকার অমিত শক্তির অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, বলিষ্ঠতার প্রাচুর্য আমার সারা মনে দোলা দিয়ে যায়, ১৯২১ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারি অস্বস্তিত হ’ল তাঁর সঙ্গে আমার পরিণয়। [ক্রমশঃ]

অমুবাদক : কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

## উত্তরণ

রূপশ্রী ঘোষ

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা থাক্ নির্জলা আকাশ,  
রাত্রির তমিস্রা যদি মনস্তর আনে—  
মনের মশাল, জ্বলে খুঁজি অবকাশ  
নীলাভের বেধা আঁকি শূন্যতার পানে।  
এও জেনো স্বপ্ন এক বল্লনা বিলাস  
মনের মেঘরক্ষণে বৈশাখী পূর্ণিমা—

গোলাপের রং নেই শুধু যে নির্বাস  
সাহিত্যের ভোজে তার এইটুকু সীমা।  
সীমার বন্ধন এই অতিক্রম করে  
বিহঙ্গ-ছন্দর আজ কোন্ স্বপ্ন দেখে?  
নীলিমার তটিনীতে আপন স্বাক্ষরে  
চেতনার মুক্তি চায় অমৃত-নিবেকে।

# বৈঠকখানা থিয়েটার

অমল মিত্র

১৮২৪ সাল।

বিখ্যাত চৌরঙ্গী থিয়েটার ভবন চলছে। ১৭৭, বৈঠকখানার নতুন এক নাট্যশালায় বারোদশটন হল (২৪শে মে, ১৮২৪)। নাম বৈঠকখানা থিয়েটার (Boitaconnah Theatre), বৈঠকখানা অঞ্চলের ইতিহাস আজ গল্পের মত শোনাবে। বৌবাজার এবং সাকুলার রোডের মোড়ে বিশাল এক বটগাছ ছিল। বহুকালের প্রাচীন বট। অগণিত ডালপালায় সুবিশিষ্ট ছায়া মেলে বহুদিন সে ঝাড়িয়েছিল রাস্তার ঐ কোণে। আপজন তাঁর ১৭১৪ সালে আঁকা মানচিত্রে গাছটিকে দেখিয়েছেন। তার পাশে থাকত সত্তর ফুট উঁচু এক জগন্নাথের রথ। সে যুগের কোন ধর্মিকের কীর্তিত স্মৃতি। সে রথ আজ কোথায় জানি নে। তবে আজো ওখানকার রথের মেলা প্রসিদ্ধ। কলকাতার আশপাশ থেকে ব্যবসারীরা এসে জড়ো হতেন ওই বটতলায়। চৌকি-ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধে আসা-যাওয়া করতেন। সেই বৃক্ষশা্রে ছায়ার বসে বেচা-কেনা, লেন-দেন চলত। বৈঠক বসত। ওই পরিবেশের নাম তাই বৈঠকখানা। শোনা যায়, জব চানক ও একদিন ওর ছায়ার বসে ভামাক টানতে-টানতে কলকাতা পত্তনের স্বপ্ন দেখেন। অনেকের মতে, অবশু সেটি নিম্নতলার মিকের একটি বটগাছ। হতেও পারে। সুতরাং অঞ্চলই প্রথম তিনি পরিচয় করেন। আজ সে বটগাছ বিলুপ্ত কিন্তু তার সুবর্ণ ঐতিহ্য বাস্তবী ভোলে নি। বৈঠকখানার গাছটিও ১৭১১ সালে নির্মূলিত হল, বৌবাজারের রাস্তা বাড়াবার জন্তে। কিন্তু গাছ নির্মূল করল যে কুঠার, সেটা কালের কুঠার নয়। তাই বোধ হয় নাম এবং স্মৃতি এখনও জুটি আছে। কলকাতার এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকখানা রঙ্গালয়।

রঙ্গালয়গৃহের বাইরের রূপসজ্জা তেমন নয়নাভিরাম ছিল না। কিন্তু ভেতরটি ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর। ব্যাবস্থাপনা, অভিনয় সকল দিক দিয়েই। হাওড়ার একজন দর্শক 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদককে লিখেও ছিলেন সে কথা। বলেন—

'On arriving, I felt rather disappointed at the outward appearance of the Theatre, which was bot very inviting..I went in, and was highly pleased at the neat and elegant manner in which everything was fitted out...The drop-scene was beautiful and un-ivalled by anything I saw before.'

দমদম রঙ্গালয়ের শেষদিনে বহু হৃদয়ী শিল্পীই ছড়িয়ে পড়লেন বৈঠকখানা এবং চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ে। মাদুর্ঘ-স্বরূপিনী মিসেস ফ্র্যাংলিস বৈঠকখানা থিয়েটারে বোগ দিলেন। মিসেস কোহেনও। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অভিনেত্রী মিসেস ফ্র্যাংলিস সবচেয়ে একজন দর্শক মন্তব্য করেছিলেন—

'I may safely say she is one of the finest ornaments to the theatre.'



এতগুলি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সমাবেশে অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠল রঙ্গালয়টি। 'রেন্জি' 'দি উইণ্ড', 'বোম্বাস্টস কিউরিয়োসো', 'ইচ ফর হিমসেলফ', 'রম্প', 'দি লাইং ডায়েল', 'এ টিউ টু ক্যান্সে', 'মিসিং ড্রাফট', 'দি উইক্স আফটার ম্যারেজ', 'দি মেয়র অফ গ্যারট', 'র ডেভিলস', 'দি ইয়ং উইডো', 'মাই ল্যাণ্ডলডিস গাউন' প্রভৃতি অনেক নাটকেরই সার্থক অভিনয় সেখানে হল। সংবাদপত্রের পাতাও নতুন রঙ্গালয়ের প্রশংসা ভরে যেত। প্রায় প্রতি রাত্রে অভিনয়েরই পূর্ণ বিবরণী তাঁরা প্রকাশ করত। অভিনয়ের সমালোচনাও থাকত কাগজে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সব সমালোচনা বা প্রশংসা পত্রিকা-সম্পাদককে লেখা দর্শকদের চিঠিগুণে পাই। কাগজগুলোর' সেখানকার হুচক অভিনয় সবচেয়ে কোন মন্তব্য করে নি। মনে হয়,



● বোম্বাইয়ের বনামঞ্চা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুরেশা

অনেক বিশিষ্টতার পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিষ্ঠিত অভিজাত চৌরঙ্গী থিয়েটারটির প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব ছিল। শুধু অভিনয় নয়, চৌরঙ্গী থিয়েটারের খুঁটিনাট্য সকল খবরই তারা প্রকাশ করত। কিন্তু বৈঠকখানা রঙ্গালয়টি সম্বন্ধে তারা ছিল নিষ্কণ্টক। যাই হোক, মর্শবদের চিঠিপত্র থেকেও বৈঠকখানা থিয়েটার সম্পর্কে কম খবর মেলে না। যেমন, একরায়ে 'থি উইকস অফটার ম্যারেজ' ও 'প্লিপিং প্রাক্ট'-এর অভিনয় দেখে বেঙ্গল হংকরার একজন লিখলেন,—

'অভিনয় অপূর্ণ করেছেন মিসেস ফ্রান্সিস এবং ডিমিটির অংশে মিসেস কোহেনের অভিনয় আমাদের আশ্চর্য করেছে।...'

'প্রকৃতই রঙ্গালয়ের তিনি গৌরব।' আর একরায়ে 'রেন্জি থি উইকস' ও একখানি প্রংশনের অভিনয় দেখে সেদিনের জনবুল পত্রিকার সম্পাদককে একজন লিখলেন—

সকলেই উচ্চরয়ের অভিনয় করেছেন। পেগির চরিত্রে মিসেস ফ্রান্সিসর অভিনয় নিখুঁত সুলভ। আর, ডিক্টাইলার ভূমিকায় তো তাঁর অভিনয়ে সমুদ্রল হাসির জোয়ার লগে ছিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। অভিনয়ের কিছু কিছু দোষত্রুটি সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। যেমন—

'...Greater neatness in shifting the scenery is also requisite, and...a better band.'

অভিনয়রায়ে বহু বিশিষ্ট দর্শক প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকতেন। মাঝে মাঝে শিল্পীদের জন্তে বেনিফিট নাইটেরও ব্যবস্থা করতেন কতৃপক্ষেরা। কিন্তু, কেন জানি না, সেদিনের পুরুষ অভিনেতাদের বৈঠকখানা রঙ্গালয় তেমন আকর্ষণ করতে পারে নি। সকলেই তারা চাইতেন চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ে যোগ দিতে। সেদিনের কাগজেও এর উল্লেখ দেখি। জনবুল পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখ করেই একজন লেখেন—

'I lament the very limited number of Amateurs at present apparently attached to this theatre, and among so many amateur gentlemen in Calcutta, who have borne away laurels at another theatre in the second walks of the Drama, I am surprised that some of them do not step forward to support this Thespian Band. Are they tenacious of their talent? The audience were most



respectable, and some of the first gentlemen of the settlement, who are willing to pay the tribute to merit, were in the house. Though small, the House is beautifully fitted up, and the scenery very well painted, and in my humble opinion, altogether worthy the patronage it scenes beginning to acquire.... But all I hope, sir, is, that gentlemen who possess theatrical talents, will step forward to support this little House with their aid, and we may then have amusement which may in some measure suffice for the loss of that our Chowringhee Drury once afforded.'

('John Bull,' 13th July, 1824)

এ আকর্ষণের কারণ সহজেই অনুমেয়। চৌরঙ্গী থিয়েটারের সমস্তমাত্র নাম শ্রবণে। বড়লাট থেকে শুরু করে শহরের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট সকলেরই যাত্রায়াত ছিল সেখানে। তা হলেও সময়সূচী দর্শক ও সামাজিকপন্থী অভিনয়ীদের সমাবেশেই বৈধকথানা থিয়েটার সেদিন খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গ প্রত্যাশাগ্রস্ত করে চলে থাকে। তার পক্ষে শক্ত। তাই মাত্র ক'বছর রসিকজনদের চিত্তবিনোদন করে একদিন নিঃশেষে তার পাদপ্রসঙ্গের আলো নিয়ে নিঃশব্দ ওজালার প্রতীকীভাষা। কিন্তু অন্তর্বিলীন স্বর্গ মতো। তার আভা চড়িয়ে রেখে গেল রঙ্গালয়টি ইতিহাসের পাতায়।

## ভ্যাল মুহুর্তের জনক অ্যালফ্রেড হিচকক

ক্যারিভের রমা পরিবেশে উপস্থিত হিচককের শাস্ত্র ও নিকটস্থ মুখের দিকে তাকালেই আমি, চারিধারে সজ্জিত গুপ্তাশ্রয়গুলি পর্যন্ত যেন এক গোপন বোম্বাঙ্ক ছোঁয়ার মুহূর্ত বাঘের হয়ে উঠল, মনে হল যেন মুহূর্তমধ্যে প্রাণ পেয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে তারা; কল্পপ্রায় হবে সমুদ্রের মৃৎটিকে প্রাণ করে বলসাম; অরণ্য করতে অমুরাধ কবলম। সেই অস্বাভাবিক অণ্টকে, যখন তিনি সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন ভ্যাল বোম্বাঙ্কের ভয়াবহ বিভ্রাসে।

১৯২৬ সালে প্রথম বোম্বাঙ্কর ছবি তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আমি, ছবিটির নাম 'দিল লজ্জার'।

সাধারণত বীভৎসতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বোম্বাঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নই আমি, আমার উদ্ভট দর্শকের সামনে একটা পরিবেশ উপস্থাপিত করে ছেড়ে দেওয়া, যাতে বাকিটা তাঁরা নিজেরাই কল্পনা করে নিতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, সাইকোর সেই 'অ'ন'গারে তত্বে দৃষ্টির কথা অরণ্য করুন, প্রায় পঁয়তালিশ সেকেন্ডব্যাপী সেই দৃষ্টি বাহ্যিকটি বিভিন্ন চিত্রাংশ একত্র গ্রন্থিত হয়েছিল, অথচ চিত্রায়িত করার সময় একবারের জন্তও কোন নারী-বেতের কাছে কোন ছবি কাকে নিয়ে যাওয়া হয় নি।

নারিকাকে প্রথম সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রদর্শন করার সময় দেখেছি ভীতি-বিহবলা হয়ে উঠতে কারণ চিত্রগ্রহণের সময় তার সামগ্রিক রূপায়ন সম্বন্ধে কোন ধারণা ঘটবারই অবকাশ ছিল না।





‘রিয়ার উইণ্ডো’ নামক ছবিটিতে জেমস স্ট্রাটকে জানালায় রম্য নিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়ার দৃশ্যটি আমি গ্রহণ করেছিলাম করেকটি ক্লোজ-আপের মাধ্যমে। একটি পা, একটি হাত ও একটি মাথার ক্লোজ-আপ নিয়ে সেগুলো যুক্ত করেছিলাম, আর তাতেই ফল হয়েছিল বৈচিত্র্যিক।

ভরল ও রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে। সত্যিকার হিসাবেই যে শুধু হিচকক এসিদ্ধ তা নয়, রোমাটিক চিত্র নির্মাণেও রয়েছে তাঁর অধিসংবাদী নৈপুণ্য।

‘যৌন আবেদনকে সস্তা প্রদর্শনী করে তুলি নি আমি কখনও’—মন্তব্য করলেন তিনি।

—যৌনতাকে আচ্ছাদিত অবস্থার রাখাটাই আমার মতে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি, কারণ, সবকিছুর মত ওটাও আবিষ্কারসাপেক্ষ।

আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্পকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলেই, যৌন-আবেদনের স্থলপ্রকাশ প্রয়োজনীয়। আমি সে ধরণের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে উৎসুক নই। আজকের দিনের বেশির ভাগ ছায়াচিত্রই বাক্যরত করেকটি নব-নারীর চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিচকক লগুনো জমাগ্রহণ করেন ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই



● প্রাকৃতিক পরিবেশে—খাম্বীলা ঠাকুর



● ক্রীমতী ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়—ছায়াচিত্রের বাইরে

শিক্ষা সমাপ্ত করেন। স্বপতি বিজ্ঞা ও শিক্ষকলা-বিজ্ঞা অর্জনে করেছেন তিনি সেখানে, তাঁর মতে ছায়াচিত্র নির্মাণে এই উভয়বিধ বিজ্ঞাই প্রয়োজনীয়।

চিত্রনাট্য রচয়িতা, শিল্পনির্দেশক ও আলোকসম্পাত-শিল্পীর পদে যথাবিহিত নিপুণতার কাজ করার পর পরিচালকরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। বৃটিশ থ্রিলার ইণ্ডাস্ট্রিতেই শুরু হয় তাঁর চিত্রজগতের কর্মজীবন।

বর্তমানে ডায়ালগ-নির্মাতা মরিয়ার বিশিষ্ট গ্রন্থ, ‘দি বার্ডস’-এর চিত্রণ নির্মাণে ব্যস্ত আছেন তিনি। হিচককর মতে তাঁর এই নির্মাণমাণ চিত্র বিশেষভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে আনবে।

বর্তমান জগতের বহু চিত্র-নির্মাতা হিচককর দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রকৃতপক্ষে চিত্রজগতের সামনে অ্যালফ্রেড হিচকক আজ আর শুধু একটি নামমাত্র নয়, এক নতুন জগতের উদগাতা, এক বিচিত্র অনুভূতির জনক।

সামনের পাত্র থেকে বস্ত্রাভ একটি আপেল তুলে নিয়ে বাতাসে ফেলেন তিনি, চোখের দুই সটান হয়ে রইল, চিবানোর সশব্দ হিচকক আয়োজ্যে খণ্ডিত হল কক্ষমধ্যস্থ নৈশেদ্য।

টেলিফোনের ঘটা বেজে উঠল তীব্র হয়ে, দৃঢ় সবল পদক্ষেপে প্রায় ভয়ালভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন তিনি সেদিকে।\*

\* বিদেশী সাময়িক পত্র থেকে সংকলিত।



## আরোহী

কল্পপ্রতিষ্ঠা কথাশিল্পী বনফুল রচিত দুটি গল্প অবলম্বনে 'আরোহী' চিত্রটি রূপ নিয়েছে। এবটি মহৎ মানুষের জীবনের অবিরাম সাধনাই চিত্রটির উপজীব্য। জমিদারী কামলের পটভূমিতে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। নারক অর্জুন মণ্ডল সন্তোষ এবং অধ্যবসারের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ক্ষুদ্র বাস্তবচরিত্রের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট বিশাল আকাশকে তার প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করার স্বপ্ন ও সাধনার বিচিত্র কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে অতীত দক্ষতা সহকারে। শক্তিশালী পরিচালক তপন সিংহের প্রতিভার সজীবতার এবং চিত্রাধারার সারস্বতীর ছবিটি বৈশিষ্ট্যের ছোঁয়ার ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে। কাহিনী গ্রহণে, বিবরণে, পরিবেশ গঠনে তপন সিংহ যে অনন্ত নৈপুণ্যের ও স্বকীর্ত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটি দর্শকের হৃদয়ে দাগ রেখে যার এবং স্তম্ভ পরিচয় ও রঙের স্বাধীনতা সঞ্চারে সর্বতোভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার আর একবার পরিচয় পাতলা গেল। বিকাশ রায়, শিপ্রা মিত্র, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমেনচাঁপা দাশগুপ্তের অভিনয়ও চিত্তস্পর্শী এবং তাঁদের শক্তির পরিচায়ক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুবাসজনাও বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

### সাধক কবি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি 'মহাজাতি সন্দন' মঞ্চ নিবেদিত হল 'সাধক-কবি'। শব্দবাচ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পৃথক ভারতের সাধক-কবির ভাবনী এই নৃত্য-নাট্যটির উপজীব্য। ভারত মহাপুরুষদের কীলানুষ্ঠান। যুগ-যুগ কত মনীষীর, সাধকের, স্তম্ভের শাবক পদরঞ্জে ভারতের মাটি দল হয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া যায় না। এই পটভূমিতে রচিত নৃত্যনাট্যের উৎকর্ষ এবং বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধক কবির পুণ্যজীবন অপরূপ কুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। একটি অমূল্য চণ্ডীদাসের, জয়দেব, মীরাসাদি, কবীর, রামপ্রসাদ, তুহু সীদাস, রবীন্দ্রনাথের পদাবলী, দোহা, ভজন, শ্রীমঙ্গলী এবং গানগুলি শ্রোতৃবর্গ শোনার সুযোগ পেয়েছেন। নৃত্যাংশ সুপরিচালিত, গানগুলি সুগীত এবং অভিনয় অনবদ্যতার পরিচায়ক। নৃত্য-নাট্যটির রচয়িতা নরেশ চক্রবর্তী। প্রতিটি শিল্পীর কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সার্থক এবং বিপুল অভিনয়নের দাবী রাখে।



● বলাকা মহিলা সজ্জা কর্তৃক অভিনীত 'পথের দাবী'র মহিলা শিল্পিবৃন্দ

## মহিলাদের নাট্যপ্রয়াস : পথের দাবী

কলকাতার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'বলাকা মহিলা সজ্জা' অগ্রগম্য। এই প্রতিষ্ঠানটি দাক্ষিণ্য কলকাতার সম্মানিত পরিবারের মহিলাদের নিয়ে রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি এই সজ্জার উদ্যোগে অভিনীত হল শব্দচর্চের পথের দাবীর নাট্যরূপ। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ধেনে স্বকীয়তা উদ্ভবী বঙ্গ, মীনাক্ষা গোষ্বামী, ভারতী দাশগুপ্ত, গুণ ঘোষ, প্রোতমা দাশগুপ্ত, অর্চনা চৌধুরী, স্বত বসু, সাবিত্রী বসু, সাবিত্রী কোর্তি, অপরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমেলি কোর্তি, শবিত্রী বসু, গীতা সেনগুপ্ত, অর্চনা রায়, বেলা সরকার, মৃণাল গুপ্ত, মনিমজুমদার, প্রণতা ভট্টাচার্য, নান্দিতা বসু, গীতা সেন, আরতি ঘোষ, উমা মুখোপাধ্যায়। এদের মধ্যে সব্যসাচী অপরূপা, শ্রীমতী ও ভারতী ভূমিকায় যথাক্রমে মীনাক্ষা গোষ্বামী, ভারতী দাশগুপ্ত, প্রণতা ভট্টাচার্য ও নান্দিতা বসুর অভিনয় স্বকীয়ত্বের ও শক্তির পরিচায়ক। অজ্ঞাত শিল্পীও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ও তাঁদের চরিত্রায়ণ সাধকতার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মহিলাদের প্রচেষ্টায় এই মুহূর্ত ও সাড়া জাগানো নাটকটির স্তম্ভ ও চিত্তাকর্ষক অভিনয় দর্শকচোখে দাগ রেখে যার। এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্যলাভের জন্য আন্তরিক আভিনন্দন এঁদের অবশ্য প্রাপ্য।

## সংবাদ বিচিত্রা

কলকাতার কুঁড়িও-প্রাণবন্ততার কর্মী ও কুশলীদের নিয়ন্ত্রণ পারিশ্রমিককে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে জটিলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি তার অবসান হয়েছে। মিনিমাম ওয়েজের এ্যাজেন্ডা নির্ধারিত অঙ্কটি কর্তৃপক্ষ মেনে নেওয়ার বিভিন্ন কুঁড়িও ল্যাবরেটরিগুলি থেকে বিক্ষোভের মেঘ সরে গেছে, এই কারণে যে ধর্মঘটটি আশঙ্কিত হয়েছিল তারও মূলোচ্ছেদ ঘটেছে। পারস্পরিক সংযোগিতার পরিচায়কস্বরূপ মালিকপক্ষের 'এই ব্যবস্থা গ্রহণ শুধু কর্মী ও কুশলীমহলেই নয়, সাধারণ চিত্রামৌলীসমাজেও' যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছে।

বোম্বাইয়ে সজাতিত যে সাম্প্রতিক ঘটনাটি সারা ভারতের জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে—বোম্বাইয়ের চিত্র-ভারকানের গৃহ অতিক্রান্ত সরকারী হানা। এই হানার বে-আইনীভাবে সংরক্ষিত সর্বসম্মত প্রায় চল্লিশ চক্ক নগর টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা এবং মাদকদ্রব্যাদি উদ্ধার হয়েছে। সর্বাপেক্ষা অধিকনাংক টাকা পাওয়া গেছে মালা সিনহার বাড়িতে। তাঁর বাসভবনে নগদ কুড় লক্ষ টাকা, বস্ত্র হাজার টাকা, মূল্যের চার শ' স্বর্ণমুদ্রা, কিছু বর্মী মুদ্রা, কয়েক বোতল সুরা ও দুটি টালিস্টার গুলিশের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সমগ্র অভিযানটির নেতৃত্ব করেন বোম্বাইয়ের ডেপুটি কমিসার্স মিঃ ডি. বি. জি. হুইটব্রাউন। যে সব শিল্পীদের গৃহে এই অভিযান চালানো হয়, তাদের নাম—১. জকাপুর, বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রনাথ, মালা সিনহা, প্রেমনাথ, বাণা দাস, সুরকার শঙ্কর এবং রবি।

সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যে, ফিল্ম ফাইনাল করপোরেশন সংক্রান্ত যে প্রশাসনিক দায়িত্ব এ ব্যবসায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের উপর দায় ছিল, বর্তমানে সেই ভার অর্পিত হয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রকের প্রতি।

পাকিস্তান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পাকিস্তানে যি চিত্রমেলায় আরোজন চলছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান ভারতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ফিল্ম ফেঁকিডাল অফ মডার্ন ক্লাসিক্স—এই শিরোনামের ১১ই নভেম্বর থেকে সাহায়ে, করাচিতে এবং ঢাকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলায় একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র এবং একটি শিল্পী এবং/অথবা পরিচালকের প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করতেও ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জনপ্রিয় চিত্রভারকা দিলীপকুমার বর্তমানে ফিল্ম প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া সভাপতির আসনে সমাসীন। মেহবুব খান মুক্তার পর ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার এক্সপোর্ট করপোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীতে তাঁর শূন্য আসনে দিলীপকুমারই মনোনীত হয়েছেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা সম্পর্কে সবিশেষ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যে ভারতীয় প্রতিনিধিদলটি আমেরিকা যাত্রা করছেন, সেই তালিকায় দিলীপকুমারের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শিল্পী এবং প্রযোজক হিসাবে সুশীল দত্ত অল্প বয়সে জনপ্রিয়তার অধিকারী। পরিচালক হিসাবেও এবার তাঁর পরিক্ষণ শুরু হচ্ছে।



● মহল ফ্রেম্বর্তা পরিচালিত 'দিনান্তের আলো'র সেটে প্রতীভাময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ব্যক্তিমান

সুনীলের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অজন্তা আর্টসের তৃতীয় অর্থ তীর্থই পরিচালনার রূপ নেবে। ছবিটির গঠনকল্পনার তাঁর প্রাণী এক অসাধারণ উচ্চাশী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যে ছবিটি অতুলনীয় হয়েই দেখা দেবে। সমগ্র ছবিটি মাত্র একটি সেটে গড় উঠবে—চিত্রকল্পে এ ঘটনা অল্প প্রথম নয়, তবে সমগ্র ছবিতে একজন মাত্র শিল্পী—এ অল্পট অল্পতপূর্ণ ঘটনা এবং তা এট ছবিতে ঘটল। প্রযোজক-পরিচালক সুনীল দত্তই ছবিটির একমাত্র শিল্পী। ছবিটির কাজ শুরু হয়েছে—এবং কাহিনী রচনা করেছেন শিল্পীজায়া—এককালের দর্শকসমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষে সমাসীন শ্রীমতী নাগিমা।

ওয়ার্ল্ড অফ শাহ—ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসংক্রান্ত অসীম চরিত্র। অযোধ্যার এই শেষ নবাবের কানী অবস্থানে উজ্জ্বল হয়েছেন বোম্বাইয়ের পুষ্প শিকারী। পরিকল্পিত ছবিটির নামকরণ হয়েছে—সাম-এ-উদ। বিশিষ্ট তারকা শ্রীমতী মীনা কুমারী প্রধান খ্রী-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

সুপ্রসিদ্ধা মিশরীয় তারকা জোহরা গামাল সম্প্রতি কারবো থেকে বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছেন। অং ইণ্ডিয়া শিকারীর প্রযোজনায় নির্মাণ 'সিন্দবাগ, আলিবাগ এবং আলদিন' ছবিটির অল্পতপূর্ণ ছবিটি নাচে আশ্রয়ণ করার জল্প জোহরার ভারতে আগমন। তাঁর নেতৃত্বে বাইশটি স্থানীয় নর্তক-নর্তকীর সমন্বয়ে সমগ্র নৃত্যটি রূপ নেবে।



● অমল দত্ত পরিচালিত 'অশ্র দিয়ে লেখা' চিত্রে

—অসিতকরণ ও জোহরা বিখাস



● বোম্বাইয়ের লাক্ষ্মী অভিনেত্রী—শ্রীমতী নাগ

## রঙ্গপট প্রসঙ্গ

নেপালীচিত্র 'মাইতি ধর' সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে সংবাদ, সেটি এই প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বয়ং নেপালীরাই মহত্বের সংযোগ। প্রযোজক বা পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নয়, গীতিকার হিসাবে রাজা মহেন্দ্র এই প্রচেষ্টার নিজেকে যুক্ত করেছেন। ছবিটিতে নারিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হছেন মালা সিনহা—এ তথ্য অনেকেরই সুবিদিত যে, মালা ব্যক্তিভাবে নেপালেই মেয়ে।

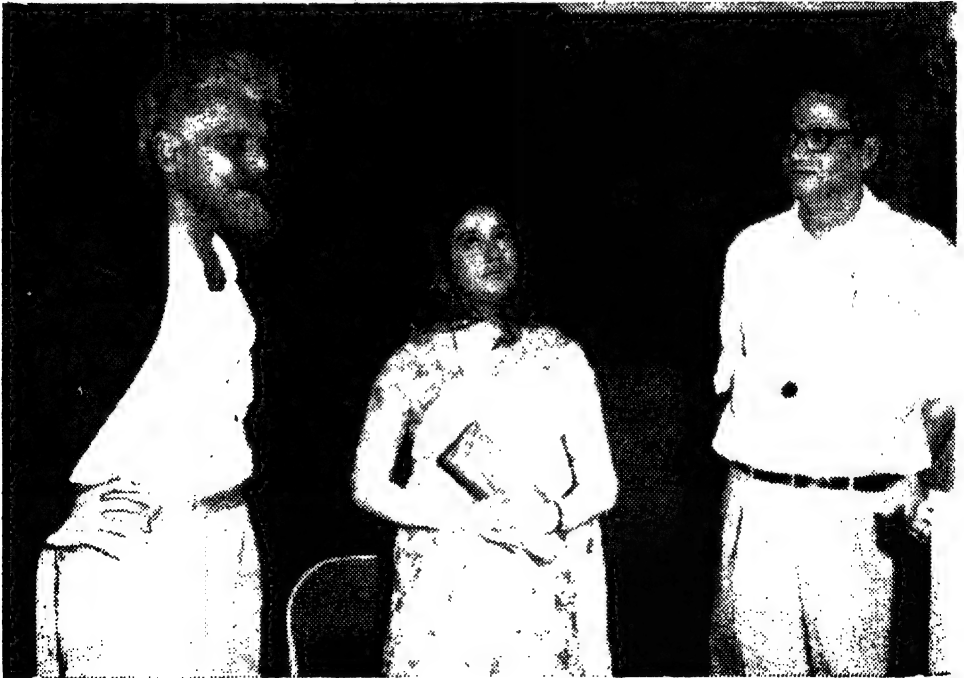
বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার আর্থার মিলারের 'আফটার ত ফল'-এর চিত্ররূপে নারিকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তেত্রিশ বছর বয়সী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন। অনেকের দৃঢ়ধারণা যে, মিলার তাঁর প্রাক্তন সহধর্মিণী হলিউডের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর একটি তারকা স্বর্গতা মেরিলিন মনরোকে কল্পনা করে ঐ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রটিতে মেরিলিনই আগাগোড়া লক্ষিত হছেন। সেই অনুসারে বলা যায়, অভুলনীরা মেরিলিনের চরিত্রে দেখা যাবে—অভুলনীরা সোফিয়াকে।

পুণ্যলোক রাজর্ষি রামমোহনের মহিমাবিত্ত জীবনী অবলম্বনে বিজয় বহুর পরিচালনায় ও অবোতার প্রযোজনায় যে চ্যাপিট্রটি রূপ নিচ্ছে, তার বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অশুভ বরণ, বসন্ত চৌধুরী (নাম ভূমিকায়), কালী সরকার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, ছন্দা দেবী প্রমুখ শিল্পীগণ।

কথাসিঁদী সমরেশ বহুর গল্প অবলম্বনে আলোর ফেরা ছবিটি রূপ নিচ্ছে। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীমোহন ভট্টাচার্য, রবি ঘোষ, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণী দেবী, স্মৃতি সান্যাল প্রমুখ তারকারা।

প্রথিতযশা সুরকার হামল মিত্রের প্রযোজনায় নির্মায়ণ 'রাজকথা' ছবিটির কাহিনীকার স্বত্বিক ঘটক। রূপায়ণের ভার জপিত হয়েছে উত্তমকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশা দেবী, রীণা ঘোষ প্রমুখ অভিনেত্রীদের প্রতি।

● অগ্রদূত পরিচালিত 'অন্তরালে' ছবিতে বিকাশ রায়, সন্ধ্যা রায় ও পরিচালক নিউজিল্যান্ড



এই সংখ্যার রঙ্গপট বিভাগে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি হাসিক বহুমতীর পক্ষ হইতে সর্বস্বী বীরেন ধর, মোনা চৌধুরী.

# শাস্তি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

দুইমথমে গলা শোন! গেল অরুণের। তিন বকুই তাকাল  
সামনের পরী-মহলের দিকে। ভাবন—উত্তমজীবন ফুটেছে  
ওখানে। ব্যাক-ডেটেড, অনাধুনিক হবার প্রয়াস নেই ওখানে।

—না। ওদের মত একটুও নয় তপতী।' স্বীকার করল  
ভাস্কর।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? ওর সঙ্গে আমার জীবন ভড়িয়ে বাবার  
প্রায় তুলছে কেন ? হতেও তো পারে তোমাদের কুইনকে লোকলের  
খোঁটা দিয়ে বোঁ বানিয়ে দেব আমিই।'

হাসল তিনটি 'যুবক, তার মধ্যেও আনমনা দেখা গেল  
প্রবীরকে।

—'যাচ্ছ কোথা ?' প্রাধান্যভিত্ত অরুণাভ্যাক জিজ্ঞেস করল  
ভাস্কর।

—'কুইনের সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ চরিত্রাঙ্ককে শাসন করবার  
জন্ম ফেনসিং শিখতে।' হাসতে হাসতে চলে গেল অরুণ, যেখানে  
লিলির পিন্নানোর উপর ঝুঁকে রয়েছে দিলীপাল। ভাস্কর মন দিল  
প্রবীরের প্রতি—'কি ভাবছ ?

—'ভাবছি ?' আবছা হাসল প্রবীর। 'ভাবছি আমার নিজের  
কথা।'

—'ইন্টারেস্টিং : বলবে নাকি ভাবনাটা ?'

—শোন ভাস্কর ! জরাজীর্ণ কথা শুনার পর হতেই নিজের  
কথা ভাবছি আমি। ও সর্বদা বলে—তুমি কে ? বিমান বোসের  
হেলে ছাড়া আর যে পরিচয় আছে তোমার তাই বল আমাকে।  
একজন মনুষ্যকে, স্বাধীন মানুষকে বিয়ে করতে চাই আমি—কোন  
বড়লোকের ছেলেকে নয়। অবশ্য এতদিন ওর কথাই তেমন মন দিই  
নি। ভেবেছি—ওর অতিরিক্ত সাবধানী মনের ভবিষ্যৎ ভাবনা—এসব।  
কিন্তু আজ তোমার কথাই নিজেকে প্রথম ভাল করে দেখতে পাচ্ছি  
আমি। আমার নিজের বলে কোন পরিচয় নেই।'

—'ডোট, বিসিটিমেটাল। ও-সব ভাবনা ওরেক্ট পেপার  
বাস্কেটে ফেলে, কাজে লগে যাও।'

—'কাজ ! জান তো আট বছর ওদেশে কাটানোর  
ইতিহাস ? স্ব্যাণ্ডাল জোগাড় করেছি হ' হাত ভরে।  
কোয়ালিফিকেশন—নীল।'

—'সাব-কন্ট্রাক্ট নেবে ? ক্যাপের ? বিশেষ টাকার দরকার

নেই কেবল খাটতে হবে খুব, আর উন্নাদিক মনটাকে কাজের করে  
তুলতে হবে।'

—'কে দেবে আমার সাব-কন্ট্রাক্ট ?'

—'লোক আছে দেবার। শৈলেন ধায়। তারপর চুনোরিয়া  
তো তোমার বাবার বন্ধুই।'

—'নাঃ, আর বাবাকে নয়।'

—'দূর পাগল। ও তো আমাদের জন্মগত্রে পাওয়া অধিকার।  
ছাড়বে কেন দাবী ? বাই দি বাই। সত্যি বিয়ে করছ জরাজীর্ণকে ?'

—'সত্যি। অবশ্য যদি জরাজীর্ণ রাজী হয়।'

—'সেকি ! রাজী হবে না কেন ? সবাই তো বলছে ওই  
আড়িভালো।'

—'সবার মত তুমিও তুল কর না।' ভাস্করর হাত ধরল  
প্রবীর।—'জরাজীর্ণ যদি কিছুর লোভে আমার কাছে এগিয়ে আসতো,  
করেও গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে—কিছু দামী প্রজেক্ট, হোটেল খাওয়া—  
শেষ করে দিতাম স্পোর্ট। ও অপরূপ। ওর মত কেবল আর  
একটিমাত্র মেয়ে দেখছি আমি—স আমার বোন লিলি।'

—'হালো ভাস্কর ! উইশ ইওর গুড লাক।' সামনে দিলীপাল।

—'হেইম টু ইউ ! কবে ফিরলে ?'

—'ফিরেছি গত সানডেতে। ক্লাবে আসি নি ? আষ বোল না  
ভাই। দিল্লী হিটে এফদম রোস্ট হয়ে গেছি। হেল ! রং-টং একটু  
তাজা না করে আসতে-পারিনি। নাউ, হোরাত অ্যাবাউট ইউ ?  
সবাই বলছে মিত্র কে-ম্পানী কাজ পাচ্ছে ?'

—'তুমি কি বল ?' জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—'আমি ? দেখ ভাই, তুমি কাজটা পেলে বাবুজি আমার উপর  
নারাজ হবেন কিছুটা। ইন-এক্সিস্টেন্ট বলে গালাগালিও করবেন  
ওপেনলি। কিন্তু আমার কিছু মনে হবে না। এতদিন কাঙ্ক্ষিত  
পেয়েছে, এবার নয় ত' সুমোহন মিত্র শেল।'

হাসতে হাসতে চলে গেল দিলীপাল।

—'দিল্লী ওর বাবার মত নয়। ছোটবেলা হতেই ও অন্তরকম।  
মনে নেই তোমার ভাস্কর ?'

—'হ্যাঁ। আর ওদের গ্রোইং জেনারেশনের আউটলুকও ব্রড।'  
প্রবীরের কথাই উত্তর দিল ভাস্কর।

—'প্রবীর নামটা অলকুণে।' জরাজীর্ণ চুলের গোড়াড় শক্ত হাতে

কিতে বাঁধতে বাঁধতে র দিলেন ঠাকুমা। ক'দিন একটানা বৃষ্টির পর আলোর ঝলক। ঠাকুমার মনটাও খুশি আছে, চুল বাঁধছেন বড় লম্বনীর। মেঘের ঘন একরশ চুল, বড় কই তেমন। না সময় তেলটুকু, না হটকু! বড় আদরের প্রথম পৌরী। চোখে চোখে, বকে বকে রেখও আশ মিটত না, আর এখন দিনরাত গাঃমন্। দোষ? দোষ কিছু করে নি জ্বা। মেয়ে-সন্তান, বয়স হয়েছে। বিয় নিতে পারছে না তোমরা, নিজেই বর যোগাড় করে নিচ্ছে। দোষটা কোথার? হামেশা হচ্ছে এসব আত্মকাল। হতো আগের দিনেও। শান্ত্রে আছে কত কুমারী কণ্ঠে বেছে নিচ্ছে নিজে বর। আর বর তো ভালই বেছে চে জ্বা। রাজপুত্রের মত বর। একটু খুঁত-খুঁতানি ঐ নামটো—অলক্ষ্মণে, অলক্ষ্মণ নাম।

—‘ওমা! ঠাকুমা বলছ কি? কি সুন্দর নাম ‘প্রবীর’। হাতের আকারে ভিত ঠেকালে মীরা।

—‘সুন্দর হলে কি হয়। রাখতে নেই ওসব নাম। দেখিস না সীতা—অমন সুন্দর নাম, কিন্তু রাখে না কেউ। জনম-দুখিনী মেয়ে যে।’

—‘প্রবীরও জনম-দুখী ছিল বুঝি?’

—‘জনম-দুখী নয় রে, অলক্ষ্মণ। প্রবীরের গল্প জানিস না তো। কপাল! জানবি কোথা ততে। না পড়লি রামায়ণ-মহাভারত, না সুনলি কথক ঠাকুণের কথকতা। জানবি কি কার এমন সব গল্প।’

—‘প্রবীরের গল্পটা দ্বিদিবে শুনিবে দাঃ না দিহু! দেখছ তো তেমন তাকাতু।’

হুঁকে মীরার হাঁটুতে চড় লাগালো জ্বা। টান পড়ল চুলে—‘উঃ ঠাকুমা! বাখা।’

—‘জাঃ। বাখা। নিজেই তো মাথা নাড়ুড়িস্ বারবার, আর কি জটই পড়েছে চুল। কেবল সামনটুকু আঁচড়ে ফুলে ঘাস। সামনা পরিপাটি!’

সমুখ চিহ্ন দস্তব বি

সাজছ শুভছ নাইছ নি?

তোদের হচ্ছে সেট বিহাস্ত।

—কত যে ছড়া আছে দিহু তোমার ভাঁড়ারে। হাসল দুই মেয়ে।

—‘ধাকধে না? আমার জেঠামশাই যে প্রশ্ন কাব্যতীর্থের শিখা ছিলেন,—বখতাবিশারদ তুসল কাব্যতীর্থ। কত শুনেছি ছড়া, পাঁচালী। আজকালের মেয়ে তোরা—ফলকে পড়ে বিড়বা। আমাদের সময় কি ছিল এত ইঁদুল কলজের ছড়াছড়ি? ঐ রামায়ণ মহাভারত আর কথকতা।’

—‘আমরা কত মজার গল্প পড়ি।’ ঠাকুমার কাছে এসে পা ছড়িয়ে বসল এগার বছরের কু। জ্বনে একুণি গল্প বলবেন দিহু, আর কি সুন্দর সে গল্প। শুনে শুনে ইচ্ছে করে ফুপ—কেবুর অঙ্গ পড়ে সেও গাঃের মাল্লব, ছবির মাল্লব হয়ে যাবে।

—‘পড়িস ত’ বিলেতের মেমসাহেবের গল্প। বাঙালীর মেয়ে আর রইলি কই তোরা! মাঝমণ্ডলের ব্রত করে ফুল-দুর্বার গুছিতে দুর্ঘের ঘুম ভাঙালি না, ক্ষীরের নাড়ুর ঘুঘু বমকে খুশি করে করলি না রম্যপট। শ্রোতের জলে নাইলি কি একদিন? আ-

কাঠালের বাগানে আর ‘উজকি ধানের মুড়কি’ ছড়ার মাংসই রয়ে গেল, বোমাদ পেলি না ভোর।’

—‘তা হোক এখন তুমি প্রবীরের গল্পটা বল। দ্বিদি শুনে চাইছে।’ বলল মীরা।

—‘বললাম না অলক্ষ্মণে গল্প।’

—‘হোক। হুগা, হুগা, হুগা’ বিপদনাশিনী বলে, দোষ কাটিবে নেব। বল তুমি গল্প।’ সাগ্রহে ঠাকুমার গা ঘেঁষে বসল কু।

শাড়ির আঁচলে তেবট্টি বছরের কুঁচকান মুখ হুঁকে মীরার ঠাকুমা—‘সেই সিঁখাত কথকতাবিশারদের শিষ্যের ডাইবি, নাতনীজের প্রবীরের গল্প শোনাতে বসলেন—

মাতেবতী পুরীতে অশান্তি আতঙ্ক হয়েছে। রাজপুত্র প্রবীর এক ঘোড়া ধরে এনেছে। যে সে ঘোড়া নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির—‘সেই যজ্ঞের ঘোড়া। পাণ্ডুর? একাদশ অক্ষৌহিণীপতি হুয়াধনকে নিমূল করে তিনি সিংহাসনে বসছেন, নিত্য তাঁর সচার নবরূপে নারায়ণ, লক্ষ্মী সেবা করেন রমণীমূর্তিতে।

—‘সেই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব। সমস্ত পৃথিবীময় ঘুরে ঘোড়াছে ঘোড়া। কেউ ছুঁতেও সাহস করে নি, তার রক্ষক যে বৃকজু—

প্রবীর কিন্তু ভয় পায় নি। কেন ভয় পাবে? সাক্ষাৎ অনলক্ষ্মণী বাণী জনার গর্ভে, জননী চাফবীর আশীর্বাদে জন্ম। তার। শিরার শিরার অমিতবীর্ষ্যশ্রাত তুঙ্গ কুমার। নরনারায়ণকে ভয় নেই তার। ঘোড়ার কপালের জয়পত্র তুচ্ছ করে ঘোড়াকে বঁধেছে প্রবীর। বাপ কাঁপছেন, বৃকজু বাপ। মাঃেরও ইচ্ছা ঘোড়া ফিরায়ে প্রবীর বন্ধু হোক পাণ্ডবের।

অতিমান হল প্রবীরের। বীরের অতিমান। কোন্টে গলা কুন্ড, কপালে ঘনাল রক্তিম রোয়াবেশ। জানতে চাইল মাঃের কাছে—গলা কি তাঁকে কাপুষ পুর ‘বর’ দিচ্ছেলেন। বলল কুমার, যদি ঘোড়া ফেরাতে হয়, সেও রাজপাট ছেঁড় হবে নিকৃৎশ। তানবাং ক্ষত্রিয়কুলের গানি হয়ে রাজার মুকুট মাথায় পরতে পারবে না প্রবীর।

জনা বুঝলেন সব। স্বামীকে সম্মত করলেন, একত্র করলেন সৈন্যদল। যুদ্ধ বাঁধলো। ভয়ানক সে যুদ্ধ। মাকে প্রমাণ করে যুদ্ধবাত্র। করলে দেব-নরের অসাধ্য প্রবীর। বৃকজুকে রক্ষা করবার জ্ঞাত ছিল করলেন। অস্ত্র তরণ করা হল। মাকে প্রণাম করতে পেল না ছেলে যুদ্ধে যাবার আগে। যেমন করে বর্ণকে হতবল করেছিলেন, তেমনি হতবল করে—‘একরকম অস্ত্রায় যুদ্ধই প্রবীরকে মেয়ে ফেলা হল।

—‘বুঝি তো কেন প্রবীর নাম অলক্ষ্মণে?’

—‘প্রবীরের গল্পটা কিসে আছে দিহু? রামায়ণ না মহাভারতে?’ কু জানতে চাইলে।

—‘বলেছি যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের কথা। রামায়ণ হয় কি করে?’ বিরক্ত হলেন ঠাকুমা।

—‘সত্যি, রুণটা একবারে হাঁপা।’ কুণকে চোখ টিপল জ্বা।

—‘তোরাও কম হাঁপা নোস। প্রবীরের গল্প জানিস না। মহাভারত নয়ত পড়িস নি, পড়িস নি গিরিশ বোম্বের নাটক—‘জন’? কি যে লেখাপড়া করিস, তোরাই জানিস। কত সুন্দর সব বই ছিল আমাদের কালে,—পলাশীর যুদ্ধ, বুদ্ধসংহার।’

—‘দাতৃ বৃদ্ধি তোমাকে সব বই কিনে দিতেন?’ মীরা জিজ্ঞেস করল।

—‘দিতেন তো। আমি তখন দিঘলী, দেশের বাড়িতে থাকতাম। উনি ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় কত বই কিনে নিয়ে যতেন। দুপুর বেলা কাঁঠালবাঁচি পোড়া আর মুন নিয়ে বসতাম। কত কি-বো। হক্কদিদির পাড়া বড় সুন্দর ছিল, সেই পড়ত, আমরা সব সুনতনাম।’

সেই পুরানো দিনগুলির স্মৃতি বিমলা করে দিল ঠাকুমাকে। ফোলাটে চোখ মেলে তিনি সামনের একচিলতে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন একটু সময়, তারপর উঠে পড়লেন—সপ্তে নেই একটাও।

ভাবতেই অবাক লাগে, মনে মনে বলল মীরা!—অল্পবয়সের দিচ্চ, কবিতার, গল্পের বই, কাঁঠালবাঁচি পোড়া। অবিকল তাদের মত। কেবল তারা কাঁঠালবাঁচির বদলে ডালমুট খাচ্ছে আর পড়ছে—টুক, কাবতার বই পড়ে না তারা। উন্টোরখ হতে শুরু করে বাংলা নভেল সব, আর ইংরেজী নভেলও কিছু কিছু পড়ছে তারা। কিন্তু মনে করে রাখবার মত চোখে জল আসবার মত বই কি পড়ে? দিহর মত গলা বন্ধ হবে আবহাওয়া বই পড়ে? না। হতেই পারে না। পৃথিবী এখন পলকে পলকে রং বদলাচ্ছে। মানুষের মিছিলে সজে দ্রুতগতিতে, বইয়েরও। একটি বই, কয়েকটি বই মনে রাখবার সময় নেই কারো। একজন যা বলল তা বীরে-স্বপ্নে মনে বসবার অবকাশ আছে কি? বইয়ের মিছিলে হারিয়ে যায় যে সব ভাবনাগুলো প্রকাশ্য হয়ে।

—‘বুলি দিদি! ঠাকুমার জন্ম সামনের মাসে দু’টো বই কিনে দানব, তাঁর সেকালের বই।’

গাটর উপর থুনি ঠেকিয়ে কি ভাবছিল জয়ন্তী, একটু চমকাল। দূর! ও সব বই কি পাঠ্য? যায় আভ্যকাল?

—‘যায়, নতুন করে প্রকাশ করা হচ্ছে।’

—‘কি মজা!’ হাততালি দিল রুণ—‘আমরাও পড়ব। টমারগ কিনো মেজদি!’

হঠাৎ মীরার মনে পড়ল জয়ন্তীর সেদিনের কথা। বোনকে দাড়ে টেনে আনল—‘ছারের রুণ! তুই নাকি ভিক্ষে করছিলি দাদীঘাট পার্কে?’

—‘আমি? ভিক্ষে?’ খতমত খেল রুণ।

—‘হ্যাঁ, তোর সঙ্গে টুহুও ছিল। দিদি বলল। ছি ছি! এমন সুন্দর মেয়ে, কি সুন্দর চুল, কি সুন্দর চোখ—সে ভিক্ষুক দৈত্য চার? ভগবান তো তা হলে তোকে ভীষণ কুণ্ঠিত করে দিলেই গরতেন। আর মা এ কথা সুনলে তাঁর কি কষ্ট হবে বল?’—সুঁটি করে চোখের জল পড়ল রুণের গাল বেয়ে।

জয়ন্তী সুনতে লাগল মীরার কথা। যেন মা হয়ে কথা বলছে মীরা—‘ভেমন শাস্ত গলা, বুঝানোর ভঙ্গি। আর কত সহ গুর—মনে মনে ভাবল জয়ন্তী।

—‘কে বলেছে ভিক্ষে করছিলাম? ভিক্ষে ভিক্ষে খেলছিলাম তো আমরা।’

কিটে ছাড়া জাগিয়া কোমরে গুঁজে সামনে এসে পাড়িয়েছে টুহু। কচকে চোখে আর সমস্ত শরীরে চকলতা।

—‘খেলা? ভিক্ষে ভিক্ষে খেলা? অবাক দুই দিদি।

—‘খেলাই তো।’ আবার জোর দিয়ে বলল টুহু আর ভিক্ষে চোখ মুছতে মুছতে রুণও সমর্থন করল টুহুকে।

—‘কি হয়েছ জান মেজদি?’ ইন্সুলের বইতে আছে না দুর্ভিক্ষের কবিতা? সেই—

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপূরে ঘরে,  
জাগিয়া উঠিল হাহারবে

তখন বৃক্ষের এক শিখা মেয়ে সুরিয়া তার নাম,—সে তো ভিক্ষে করে সবাইকে বাঁচিয়েছিল। জান তো সে কথা? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন না সেই?

—‘তা তো লিখেছেন, কিন্তু তাতে তাদের ভিক্ষে ভিক্ষে খেলতে হল কেন?’

—‘আহা!’ ছোট মুখে বক্তার দিল টুহু।—‘এ যে পার্কের পাশের রাস্তাটার একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে একজন ভিখারী মা না খেয়ে মরে যাচ্ছে না? আমরা ঠিক করেছিলাম ভিক্ষে করে, পরমা বোগাড় করে ওদের বাঁচাব। ভিক্ষেটা তো আর ঠিক ঠিক ভিক্ষে নয়, ওটা তো খেলা—যেমন সুরিয়া করেছিল।’

মীরার চোখে জল এল, মুখ নামাল জয়ন্তী।

সুন্দর! এসে ঘরে ঢুকল। চার কতাকে এমন চুপচাপ দেখতে অভ্যস্ত নয় সে। আর টুহু দেখানে, গোলমাল তো দেখানে থাকবেই। মায়ের কোলে সবচেয়ে ছোট ভাই—আটমাসের বাচ্চা। সজ বৃষভান্ধা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আর চোঁট ভেঙ্গে কান্নার উপক্রম করছে।

—‘এমা! উঠে গেছে দুটোটা! দাও, দাও ওকে আমার কাছে। তুমি একটু শোগে—বাবা তো ভাল আছেন। এই পাঞ্জী! আর।’ ভাইকে নিতে হাত বাড়াল মীরা। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন ঘর হতে।

—‘স্বর্ণ-সিঁদুরাকু দিয়েছ ত?’

—‘ছ’টার সময় দিতে বলেছেন বাবা।’ বৌ উত্তর দিল।

—‘তাই দিও।’ আবার ঘরে ঢুকলেন শাশুড়ী। সেই বড় নাতিরা চাকরি পাওয়ার খবর শুনে ভিঁমি। এখনো শয্যাগত, তবে ডাক্তার বলেছে ভয় নেই, সময় লাগবে সারতে। তা লাগুক। বিশ্রাম বলে তো কিছু আর নেই কত বছর ধরে। অস্ত্রের ফাঁকে বিশ্রামটা হয়ে বাবে এবার। টাকা? অভাবেরই সংসার তো, বেড়েছে আরো অভাব। আফিস হতে মিলেছে বটে মাইনে—পাওনা ছুটি, কিন্তু রোগের খরচ আছে না? ডাক্তার, তারপর ভাল ভাল পথি। তা একেবারে নিঃসম্বল নন তিনি। আছে বাজার নীচের তলার শান্ত-কানির মধ্যে লুকানো মোটাসোটা ‘করেকথানা’ সোনার গয়না। রেখেছিলেন—নাতি-নাতনীদেব রিয়েতে দেবেন, নিজস্বেরও সময় অসময় আছে তো! ছেলে না পারলে তখন বের করে দেবেন তাকে অসময়ে। তা এর চেয়ে অসময় আর কই! দরকার পড়লে দেবেন তিনি জিহ্বার তল করে বাধা সেই জীবনভূল্য গয়না কটি। বলে সবার সেরা মাণিক, মেয়ে-জীবনের সার রক্ত—ছেলের অস্থখ। তার আবার গয়না। অবশ্য ভাল সময়ও উঁকি দিয়েছে যেন। বড় খোঁকা, জরা, মীরার চাকরি, আবার বিয়ে বড় নাতনীর। ঠাকুরের ইচ্ছা।

—‘দাঁও মা খোকনকে।’

—‘ওকে নিয়েই শোব আমি।’ মীরার কথার উত্তরে বলল সুরমা। ‘তুই বং ওদের বিকেলের খাবারটা দিস—জরার চুল বাঁধা হল এর মধ্যে! বেকুচ্ছিস?’ মা তাকালো বড় মেয়ের দিকে।

—‘কোথার!’ তাড়াতাড়ি দিদির হয়ে জবাব দিল মীরা।—‘ভান্ডারবাবু আসবেন তো সাড়ে পাঁচটার সময়। দিদি বেকুবে কি! দিহুর মেজাজ-পত্তর আন্ত যে ভাল আছে তারই সাক্ষী দেখছ দিদির চুলে।’

—‘আর মেজাজ! বড়ো হয়েছেন। নানা কষ্ট। মেজাজ না হয়ে পারে। কত আর সুইবেন।’

—‘মা আমি কিছু মুড়ি খাব না কিছুতে।’ ঘোষণা করল টুই।

—‘বা, মুড়ি তো ভাল। তেল-জুন, না মেজাজ?’ শান্ত কুপু শান্তি চাইল।

—‘আঃ টুই! মা তুমি বাও না শুভে, আমি সব ঠিক করে দেব। শোন টুনটুনি, টুনটুন। আমি একটা মজার জিনিস খেতে দেব আজ।’

—‘কি, কি?’ মেজদির গলা ধরে স্নিগ্ধেস করল টুই।

—‘আমার কাছে একটা টাকা আছে, আনিরে দিবি কিছু?’ জরজর চাইল মীরার দিকে।

—‘দূর। ওসব কানানো-টানানো হলে আর মজাটা কি? আমি আলুকাবলি-গুলাার খেলা করব। ঠোঙ্গার করে আলুকাবলি বেচোবা।’

—‘গরমা দিতে হবে?’ জানতে চাইল টুই।

—‘সে তো দিতেই হবে, খেলার মিছিমিছি পরমা। আমি আঙলে বাজিয়ে বাজিয়ে নেব।’ হাওয়া দিয়ে আঙল বাজাল মারা।

—‘সত্যি সত্যি ঠোঙ্গা আর কাঠি? লেবুর রস?’

উত্তেজিত হল কুপু টুই—‘চল কমলকে ডেকে আনি।’

—‘উঃ। কি যে মজা হবে আজ!’

হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে চলে গেল তিন বোন।

বিকেলের খাবার আর খাবার নেই। রূপকথা হয়ে গেছে, খেলা হয়ে গেছে, মজা হয়ে গেছে।

বোনদের খাবার পথের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়লো জরজর। বেশ আছে মীরার। ক’দিন—মাত্র ক’দিন আগে সেও তো বেশ ছিল। মীরার দৈর্ঘ্য আর শান্তি কখনোই তার নেই সত্যি; তবু এমন করে সব ভাল লাগাগুলোকে সেও সন্দেহের চোখে দেখত না। খেলা, বগড়া আর প্রত্যাশার ভরা দিন, রাতে গা-ভরা নিটোল ঘুম। এখন যে কি হয়েছে—কেবল একটা জ্বালা। ছবি আঁকতে বসলেও সেই জ্বালা বেরিয়ে আসে তুলির উগার। হুকো হাতে চোখ ঢোকা, কাঁদি-পাওয়া বড়ো, বাচ্চের হাত ধরে ধুকছে ভিখারিণী, মরা দেহের উপর উড়ন্ত শকুনের লোলুপদৃষ্টি—সব জরজরীর অন্তরের আলার প্রকাশ। কেন? কেন এমন হোল? অভাব? সে তো কোন্ ছোটবেলা হতে সঙ্গ নিয়েছে, তবু তো কত ভাল লাগত জীবন। মাত্র এক বছর আগেই সে একেছিল রাঙা শালুক-ফোটা একপুকুর টলটলে জল। মীরার আর তার চাকরীর হাত ধরে আনন্দ এসেছিল বাড়িতে। বড় বড় সন্দেশের দিকে চেয়ে ঠাকুরার চোখের জল চক্‌ক্‌,

বাবার খুশি। অলক আবার বৃদ্ধি করে একটা বাট পাওয়ারের ব্যস্ত লাগিয়ে দিয়েছিল। উজ্জল আলোর কাপড় পরে হেসে উঠেছে নতুন হয়ে, রোজকার মলিন ঘর। তার পরদিন সকালে উঠেই জরজর আঁকতে পেরেছিল ভরা পুকুরের ছবি।

ভারপর? তারপর প্রবীর এল, এল ভালবাসা। সে কি আলো: মত? মস্ত বড় আকাশের মত, না পদ্মফুলে-ভরা এক দীঘির মত? সে ব্যথার মত। দুঃসহ ব্যথার বিবর্ণ হয়ে গেল জরজর। কি অসহ অমুভূতি! সমস্ত জীবন যে প্রত্যাশার উন্মুখ হয়েছিল, তাকে নিঃশব্দ করে দিচ্ছে পরিবারের দীনতা এই দুঃসহ ক্ষোভ জরজরকে বৃষ্টি পাগল করে ছাড়বে। এখন পদে পদে কেবল সন্দেহ বাবার চোখে, মাঝে হাত বুলানোর সন্দেহ, বিচার আর বিতর্ক। কেবল নিজেকে চেয়ে রাখবার, দুঃখপা দেখাবার প্রাণান্ত চেষ্টা। প্রবীরের চোখের আঙ্গো ছুঁ দিয়ে উঠে বধন কত কথার মুখের হতে চার জরজরী, তখনো তা সামনে দিয়ে উড়ে উড়ে যায় নিষেধের পায়রা। তাদের ডাক বাপ্টানের জরজরী শোনো, বাবার ‘রাগ, মায়ের কান্না। সেই স্নান স্নান দিন আর ফিরে পাবে না সে। আঁচল উড়িয়ে আলুকাবলি চাখতে না পারার দুঃখে চোখে জল এল জরজরী।

প্রবীর। আচ্ছা প্রবীর যদি বিমান বাসের ছেলে না হয়ে, হতে একশ’ আশি টাকা মায়নার কেরানী? তবে তো একদিন সস্তা বেনারস আর দু’ এক চিলতে সোনাপরী জরজরী অনাগ্রাসে তার বৌ হতে পারত। তখন জরজরীর দেড়শ’ টাকার ভরসার প্রবীর বাসা বদলাবার চেষ্টা করত, কিনতে যেত হয় তো কাঠের দেকো-হাও টেবিল, চেয়ার, আলনা। উঃ! ভাগ্যিস তা হয় নি। একটা বন্ধগলি ছেড়ে আ একটার চুকতে যাচ্ছে না জরজরী। আর্থিক অনটনের এমন ইনিত প্রবীরকে না দেখলে বুঝতই মা সে। মীরা এখনো স্বপ্ন দেখে ছোটবেলার,—দেখুক। জরজরী পারবে না আর বানিয়ে বানিয়ে স্বপ্ন দেখতে। স্বপ্ন দেখতে চাইল না জরজরী তবু তো চোখের সামনে হতে ছবি মুহুর্তে চার না—দুঃখের ছবি, একটা জেনারেশনে দুর্গতির ছবি। তারা হেরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, সর্বত্র তার পরিচয় চঞ্জিশ বছরের মায়ের কোলে আটমাসের বাচ্চ। মায়ের বুকে নেই, দুঃখ কিনবার পয়সা নেই বাপের পকেটে, তবু বাচ্চা, আটা বাচ্চা। ফুটপাথে হাঁটা যায় না, করপোরেশনের স্কুলে জায় নেই। একটা পরমা, আর্থখানা বিস্কুট, ছেঁড়া প্যাঁট, রোগ কঙ্কালসার, লোভী বাচ্চা। বই ভরে লেখা হচ্ছে এই পরাজয়ে কথা, একটা শ্রেণীর মৃত্যুর কাহিনী। বিদেশীর ক্যামেরার উঠে-হাড় বের-করা শীর্ণ ভিখারিণীর কোলে ধুকছে শিশু। কে পে পুরস্কার? ক্যামেরার কান্ধাকার্য? না, না। অনাহারে দুঃখ মৃত্যু, সর্বজয়ার বাসন বিক্রি করে অন্নসংগ্রহের মর্মান্তিক চেষ্টা কর সফল করে দেখানো হয়েছে তাই জিতে এনেছে জরমালা।

অনেক রাতে বধন ভাবতে ভাবতে মাথা গরম, ঘুম পাগি। যায় অনেক দূরে, তখন দেখেছে জরজরী তারা—তার মা, তাপে পরিবারও আনতে পারে অনেক পুরস্কার তাদের ছবি দেখিয়ে হাততালি দিয়ে বলবে দর্শক—কি শুল্লর ছবি। কি বাস্তব একেবারে নিখুঁত। সত্যই দেখছে হার আর মৃত্যু? সর্বনাশ-বিলুপ্তি।



# নিশ্চিন্ত বিশ্রাম

আজকের দিনে মানুষের চিন্তার আর শেষ নেই। চিন্তা যখন নিতান্ত সঙ্গী তখন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ যে ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে সে আর বেশী কথা কি? নিতান্ত দুঃস্থ নন্দ্য মানুষের মাথার আর সন্তোষের যখন বিকাশ করে আনে তখন সেহে আর মনে আসে অপরিণীত রুগি—বৈদ্য ভাষা মন্দির তাই অষ্ট বিশ্রাম বা বিকিণ্ড নিদ্রায়।

জ্বরাক্রম তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে তাই নিরবিশ্র জ্বরাক্রম তেল ব্যবহার করলে শানিকটাও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম যে সম্ভব তা এ বাতারেও বোঝে করে কথা চলে।



কেশ তেল

## জ্বরাক্রম



জ্বরাক্রম তেল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লি:

জ্বরাক্রম হাউস

কলিকাতা-১২

১, টাকার্প লেন, বড়বজর, মাদ্রাসা-১

মনে পড়ল জয়ন্তীর সরস্বতীর পাথে দেখা একটা গল্প—পড়েছে একগলা কাশাজলের মধ্যে। যত উঠবার চেষ্টা, তত চুকছে পাকে। রাজ্যের ছেলেগুলো হাততালি দিচ্ছে, ঢিল ছুড়ছে। বড় মজা। দুষ্টটা আঁকলে চিত্রকরের ভাগ্যে মিলতে পারতো অনেক প্রশংসা, কালজয়ী হত তার চিত্র। কিন্তু ভেবেছিল জয়—কাদার আঁকঠ নিমজ্জিত গল্প—বড় দিল্লিক চিত্র তবু আরো, আরো একটা জিনিস সেখানে যেন ছিল দেখবার। গল্পটার উঠবার প্রাণান্তকর চেষ্টা, যা দেখে আমোদ পাচ্ছে ছেলেগুলো, তা যদি একবার আঁকা যেত? পরাক্রমের ছবি, অসহায়ের ছবি দেখল সবাই, দেখত যদি জয়ী হবার চেষ্টার ছবি? সমস্ত প্রাণ এসে জমা হয়েছে চোখের মধ্যে, আঁরাণ চেষ্টার একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে চাইছে পাড়ের দিকে। হয় তো পারবে না। একবারে তলিয়ে যাবে থকথকে পচা গলিত মৃত্যুর মধ্যে তবু এই যে উঠতে চাইছে, এটোও কি আঁকবার মত ছবি নয়? ঐ যে দোড়ো এসেছে আট বছরে কালো রোগা নোটপরা ছেলেটা, শীর্ণ হাত দু'টি দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে তার গরুকে জীবনের দিকে, অতল যেখানে শেষ হয়েছে সেই শুকনো মাটির দিকে—তার কথা? তার কথা যদি লিখতো কেউ, একে রাখতো একটা ছবি—বুঝ করবে আর জিতবে সেই কথা।

জয়ন্তী জানে সে পারবে না। প্রবীরকে ভালোবেসে তার যুদ্ধ করবার ইচ্ছাই চলে গিয়েছে। এখন সে কেবল পালাতে চায়। ধূলোর রানির উপরে উঠে নিজেকে দেখাতে চায় জ্যোতির্ঘটা। কিন্তু মীরা পারবে, অলক পারবে। হয় তো পারবে রুণু ইঁহুও, যদি নষ্ট না হয়ে যায়। ওরা যুদ্ধ করতে পারবে, আর কে জানে—হয় তো বা জয় হবে ওদের। জয়ন্তী দেখছে মীরার চোখে মায়ের সেই স্বপ্ন, আজো যা কল্যাণ উদ্ভাসিত হয়, কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিতে। মীরার চোখের আশার আলো মাঝে মাঝে নিভির দিতে চায় আশঙ্কা এসে, কিন্তু আবার ভাইবোনদের দিকে চেয়ে উজ্জল হয়ে ওঠে সে। জয়ন্তী জানে—মীরা ভাবছে, ভাবছে—তারাও এই নিমজ্জিত পরিবারকে টেনে আনবে অথৈ জল হতে কুলের দিকে। স্বপ্ন তো দেখছে সবাই। স্বপ্ন না দেখে অব্যাহতি আছে নাকি কারো? স্বপ্নগুলোই যে মানুষকে প্রত্যাহের মৃত্যু হতে বাঁচিয়ে রাখছে। ঐ যে ঘরের মধ্যে সন্তর বছরের বুড়ো দাছ, উনিও স্বপ্ন দেখছেন। পিছনে ফেল আশা দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে বেঁচে আছেন কোনমতে। জয়ন্তী উঠে পড়ল। অনেকদিন পর আজ একটা ছবি আঁকবে সে—সন্তর বছরের বুড়ো মানুষের হারানো দিনের সোনার স্বপ্ন।

সোনার স্বপ্নই দেখছিলেন জীনিবাস সোম। তিরিশ বছর বয়সের স্বপ্ন। কলকাতার ম্যাকটিস কোম্পানিতে চাকরী, কিন্তু দেশ সেই পদ্মাপাড়ে দিখনী গ্রামে। নদীর ভাঙ্গন কুলে বাড়ি, কয়েক বছর হল ক্ষয়প্রাপ্ত সন্ধান করেচে পদ্মা—পাতলা চর পাড়েছ গ্রামের তলা ঘেঁষে। কি হৃদয় কাশকুলের সাদা চর, চামর, কাল কাশ্মের হলেদে কুলে পুজার সাজ।

পুজার সময় বাড়িতে যেতেই হবে। কতদিন আগে হতে তোড়জোড়। নাইনিভাল আলু, পাঁপড়, পোস্ত আর ফুলকফি। ছবি আঁকা জাপানী মানুষেরও ফরমাস আছে একথানা।

আবছা ভোরে চৌবাচ্চার বাসি জলের শিরশিরানি। ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ায় ছাঁকরা-গাড়ির আড্ডা। পাঁচসিকা। যাত্রী, জুলা আরো করজন, শেয়ার করে ভাড়া। শেরাললা টিকেট করবার লাইনেও কি কম রোমাঞ্চ। প্রচণ্ড ভিড়, রাগ, টেসায়েলি, টেচমেচি। দেখা দেখা কেমন বুদ্ধি করে জায়গা নিয়ে নিল এক অতি চালাক যাত্রী। কি গরম? বিল্লী ঘাম। ঐ, ঐ! দুসছে সবুজ স্ল্যাগ, ছাইশিলের চিল-চিংকার—ঘটাংঘট—আঃ, কামরার চুকল একঝলক হাওরা। বাড়তে লাগল গতির বেগ, ঠাণ্ডা হয়ে এল শরীর।

গোয়ালন্দেবর খাল-খাল তরকারী আর পুরী-গরম মুখে লেগে আছে এখনো। কীমারে উঠলোই বাতাস ছিটকে দিত কুচিকুচি পদ্মার জল চোখে মুখে। ডেকে শতরঞ্চি বিছিয়ে টান-টান। গেঞ্জিও খুলে ফেলতেন গা হতে। আঃ! শরীর জুড়ানো হাওরা! সে হাওরা মুছে নিত কলকাতার সব দুর্গন্ধ গা হতে, মন হতে। ইলিশ মাছ ধরছে জেলে-ডিঙি নিয়ে মাঝ-গাড়ে, শুক্ক লাকিরে লাকিরে দেখাচ্ছে তার কালো কোলা শরীর। খানিকপরেই রাজবাড়ি কেষ্টন। ছোট ছোট নৌকা 'আছড়ে আছড়ে পড়েছে নদীর ঢেউয়ে। নৌকোতে ফেরিওয়ালা। গরম রসগোল্লা, সোনারঙের মর্তমান কলা। ভোম্ভেরের পাত-খীর। কিংহই বেড়ে গেছে পদ্মার হাওরায়। পাঁচস হোটেলের একআনার ভাত আর দু'গম্ভার ডাল-তরকারী নয়, আঙা একটা ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে একখালা ভাত। কোমরে গামছা বেঁধে উঁচু পুকুরের পাড় হতে বাঁপ দিয়ে জলে পড়া, হাতে জড়িয়ে বাকি-জাল, পুকুর হেঁকে তোলা মস্ত মস্ত থরয়, পুঁটি আর মলুন্দি। মুড়লীর বাঁট যেটে পড়ছে, দু' টানে ভেঁটি বড় ঘটিটা।

সাত দিনে ফিরে যেত চেহারা। বৈঠকখানার আটচালা ঘরে দাবা-পাশার আড্ডা, মহলা চলছে—সাজাহান। শিউলীর গন্ধ, কোজাগরী পূর্ণিমার আলপনা। শীত আসবার বাতাস। দেশের বাড়িতে পনের দিন কাটালে আবু বাড়ত পনেরো বছরের।

তারপর বাবা-মা গেলেন এক বছরের মধ্যে। সংসার নিয়ে আসতে হল কলকাতায়। মাইনে বেড়েছে, বাবাও দিয়ে গেছেন হাজার কয়েক টাকা। কুণ্ডু লেনের বাড়িতে ঠিক দেশের মত আঁকজমক করে বিটে হল ছোটবোন নয়নতারার। তখনো বছর বছর যাওয়া হতো বাড়িতে। কি যে হল শেষে! মেয়েদের বিয়ে দিয়ে হাতের টাকা শেষ। পেন্সন কমুট করে করে তাকেও এজোবারে মিনমিনে করে ফেলছেন। ছেলের চাকরীর ভরসায় থাকতে চাইল না মন। বন্ধু ব্রজেন দত্ত নামাল শেয়ার-মার্কেটে। দেশের বাড়ি, জমি বেচে টাকা আনলেন, কিছু লাভের মুখও দেখা গেল; লোভ গ্রাস করল শত হাতে। ধার, ধারের পর ধার। আশায় আশায় বাড়ল ধার। দরজায় কার্ণালওয়ালা, আদালতের শমন—একবারে সর্বস্বান্ত।

বাইরে শোনা গেল বিয়ের কর্কশ গলা, বাসনের বন-বন। একটা কাক ডাকল সন্ধ্যাে এটোর ভাগ নিতে। স্বপ্ন ভেঙ্গে তাকালেন জীনিবাস সোম, বাপুসা চোখে দেখলেন সেজ নাতনী মীরা শাদুপায়ে ঘর চুকছে তাঁর বিকেলবেলার চা নিয়ে।

—আরো পাটনার চাইছিল কেন? তোর ইচ্ছে যদি একটুও বুঝতে পেরে থাকি! কত খেটে তোর বাবা একাই তো ব্যবসা গড়ে

তুলছেন। অস্তুর হাতে দিবি সেই ব্যবসা? রসকে নিতে চাইছিস, বেশ! কিন্তু আবার মেশো, মামাকে টানছিস কেন?’

সকালের খাবার টেবিলে কথা তুলল সুরকল্যাণী। ক’দিন ধরে ক্রমাগত চলছে আলোচনা-আলোচনা, পরামর্শ। বৈয়াকিক কথাবার্তায় না থাকতেই অভ্যস্ত সে। অবস্থা স্বামীর ব্যবসার প্রথম দিকে সেই ছিল প্রাইভেট সেক্রেটারী। কত পাঁতা-পাঁতা টাইপ পর্যন্ত করে দিয়েছে, সব শলা-পরামর্শ তার সঙ্গে। এখন আর অফিসের কথা থাকত না কল্যাণী। ব্যবসা বড় হয়েছে। অনেক কর্মচারী, যোগ্য ছেলে! দরকার কি তার সব ব্যাপারে কান পেতে! এবার—ভর চলেছে সুরকল্যাণীর, বুঝিবা ছেলের সঙ্গে একটি মতান্তর ঘটতে বসেছে তাদের। ‘ভাবরের ইচ্ছা অফিসের চেহারা বদলে দেবে, স্বামীর কি অসম্মতি তাকে? কিছু বুঝে না কল্যাণী। সুযোগ পেয়ে বাপের সামনেই ছেলেকে প্রস্তাব করলো আজ মা।

ভৈরব হৃদয়ের মধ্যে মরিচগুড়ো মেশাচ্ছিল ভাস্কর। মুখ তুলে চাইলো। দেখল বাবাকেও। বুঝল, প্রস্তুত মায়ের নিজস্ব, বাবার জিজ্ঞাসা উদ্ভাবিত হয় নি মায়ের মুখ দিয়ে। হলে বিশী লাগত নিঃসন্দেহে। ভাস্কর বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বুদ্ধিশাণিত মনের অবচেতনায় বসে আছে এখনো অতিরিক্ত স্নেহ-লালিত অভিমানী ছেলে। বাবা তাকে বকবেন, শাসন করবেন—এখনো তা চায় সে, কিন্তু অস্তুর মুখ দিয়ে, সে মুখ মায়ের হলেও—তার সঙ্গে কথা বলবেন—অসহ্য এ ভাবনা।

—‘কথা বলছিস না বে? কল্যাণী জিজ্ঞাসা করল।

—‘পারেস দিচ্ছ না কেন মা আজকাল লাকে? কার্ড ভাল লাগে না? পারেস পাঠিও। কি বলছ? আরো পাটনার কেন চাইছি। পাটনার না হলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হবে কি করে?’

—‘দরকার কি প্রাইভেট লিমিটেড করে? বা আছে তাও তো ভালই!’

—‘ভাল নয় মা!’

—‘ভাল নয় কেন?’

—‘কেন? কর্তাকে জিজ্ঞেস কর না। বাবাই ভাল বোঝাতে পারবেন সে কথা।’

—‘কিন্তু ভাস্কর কি বলছে?’ স্বামীকে জিজ্ঞেস করল কল্যাণী।

—‘কিন্তু’। হাতের পত্রিকাটা রেখে দিলেন স্নেহোহন। ভাস্কর ব্যবসা বাড়তে চায়। মূলধন না বাড়ালে ব্যবসা বড় হবে ক করে? তাই প্রাইভেট লিমিটেড করে পাটনার নেবার কথা ছে।

—‘বেশ তো! রস আসছে, আবার দাদা, জামাইবাবু কেন?’

—‘শোন মা!’ চারে শেষ চুমুক দিল ভাস্কর। ‘রসের আর টাকা আছে বল? তুমি, আমি, মানেই তো বাবার টাকা। ঐ শাই ক্যাপিটেল নিয়ে কখনো কমপিশিগন ঠাঁড়তে পারবে না আর কোম্পানী। দেখছ তো নতুন কাজটা পেলে টাকা ধার করতে হবে!’

—‘গভন মেন্টের লোন নে না!’

—‘এই ত মুখিল! সরকারী লোন মানেই সিন্স পারসেন্ট টারেক্ট। ও তো ক্যাপিটেলের মধ্যে পড়ে না। তারপর দেখ,

সব কোম্পানী বোনাস দিচ্ছে অন্তত তিন মাসের আর মিত কোম্পানী স্কোনমতে পুঞ্জের সময় এক মাসের বোনাস দেয়। অবস্থা মাইনে এখানে ভাল, কিন্তু উপরি টাকাটা না পেয়ে ইঞ্জিনীয়ার হতে শুরু করে ক্লার্কেরও পর্যন্ত মুখ ভার। কাজের অল্পপাতে রেমুনারেসন পাচ্ছে না তারা। মেসোমশাইয়ের অত টাকা আর মামার বুদ্ধি-বিজ্ঞা কাজে না লাগালে ঠকব আমরাই। কি বল বাবা?’

কল্যাণী চুপ করে বইল। বুঝতে চাইল ছেলের কথা।

—‘তুমি কি বল?’ স্বামীকে জিজ্ঞেস করল সুরকল্যাণী।

—‘বলেছে ভাস্কর ঠিক কথাই। প্রাইভেট টারি বিজনেস করে মার্কেটে ঠাঁড়ানোর দিন চলে গেছে। বিশ্বদার মেলা টাকা আইডল শাডে রয়েছে, আর ব্যবসায় নামবার প্রস্তাব উনিই দিয়েছেন ভাস্করকে। তোমার ছেলে যে নন-বেঙ্কলী চায় না, নয় তো শোভান জয়েন করত।’

—‘আবার তো টাকা ধার করতে হবে শোভানের কাছ হতে? অবস্থা কাজটা যদি পাও।’

—‘উঃ মা! পারো কি? পেয়ে গেছি স্নেনো। খবরটা সরকারিভাবে আসতে বা দেরি।’

—‘সত্যি? কান্দীদাস পাচ্ছে না এবার?—কি বলছিস?’

শশীকে উঁকি দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করল কল্যাণী শেষের কথাটা।

—‘সরকারবাবু? ওমা! তা বাইরে কেন? যা, যা এখানে নিয়ে আর।’

ঘরে এসে ঢুকল অন্নদা সরকার। দরকারি চিঠিতে সই করাতে চলে এসেছে বাড়ি।

—‘এসো ঠাকুরপো! দেখ গরম কচুরি। ভাল ঘি, খাও, খাও। অস্থল হবে না। শশী, কচুরি আন গরম।’

—‘আর বোঁঠাকুর! খেতে আর পারি না। ঠাঁতগুলো যেতে বসেছে। অস্থলও ধরেছে শক্ত হাতে। না হলে আপনায় সেই সরবে দিয়ে কই মাছ ভাতে—’

অন্নদা খুব অল্প করে খেতে গিয়ে, আট, ন’খানা কচুরি খেয়ে ফেলল।

—‘ভেজছে তো শশে ব্যাটা চমৎকার। আপনায় ট্রেনিং তো! কাজের কথা বলছেন? তুখাড়ি ছেলে আমাদের ভাস্কর। তাহজ্ব করে ছেড়েছে, কান্দীদাস ব্যাপার জেনে চোখ কপালে।’

—‘কি করেছে ভাস্কর?’ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল কল্যাণী।

—‘করেছে? সে এক মহাকাণ্ড। অফিসে যখন কান্দীদাস আমাদের রোট বের করে নিয়েছে, আর নিজের টেণ্ডার সাবমিট করেছে তার চেয়ে দু’ পার্সেন্ট কম ধর, ভাস্কর তখন বাড়ি বসে আলদা টেণ্ডার টাইপ করছিল নিজের হাতে। কাকপুখীও জানতে পারে নি রোট। আমিও কি জানতাম না কি? দু’দিন হল সব স্তনে হেসে আর বাঁচি না। কান্দীদাসের চেপেও কম রোট আমাদের। তবে ই্যা, রোট কম হলেই তো আর কনট্রাক্ট পাওয়া যায় না, যাতে পাওয়া যায় তার জন্য তথির-তাল্লাস করেছে ভাস্কর খুব। রসেরও প্রাণান্ত চেষ্টা। সেক্রেটারী মুখ শুকিয়ে আমসি।

—‘সেক্রেটারী? ভকত? আর ওর উপরেই এত বিশ্বাস তোমার?’ আশ্চর্য হয়ে স্বামীর দিকে চাইল কল্যাণী।

মুহু মুহু হাসছিলেন মিত্রসাহেব। শুনছিলেন সবার কথাবার্তা, এবার ভাবা দিলেন— কান্দীদাস ছাড়া আর সব বিষয়ে বিখ্যাসী ভক্ত। জিজ্ঞেস কর অরুণকে।

—‘হ্যাঁ, বিখ্যাসী ভক্ত। যোগ্যতাও আছে, অকিসের চেহারাও বদলে দিয়েছে এট ক’বছরে, তবে সব মানুষের মতই ভক্তও আশ্বিনাসু। কান্দীদাস বড় কাজ ছাড়া হাত দেয় না, অটেল টাকা। কাজ তুলবার ভাবনা নেই। আর মিত্র কোম্পানীর বড় কাজ মানেই ধার। সুতরাং মোটা টাকা নিয়ে মিত্র কোম্পানীর টেওয়ার রোট কান্দীদাসকে জানিয়ে দিয়েছে সে কয়েকবারই, ধারণা—তাতে ক্ষতি হয় নি কোম্পানীর। এবার পারল না! ভাস্করের চাতুর্যে হেরে গেল সে। টাকা নেওয়া হয়ে গেছে, কান্দীদাসের কাছে মুখ দেখবার উপায় নেই। ক’দিন হতে তাই টাই আর স্নাটের ভেমন চমক নেই, ছুতার মসৃণ কণ।

শুকনো মুখের পরিচয় পাওয়া গেল না দিল্লীলালের চেহারা। না, অনেক লক্ষ্য করেও ভাস্কর কোন ব্যতিক্রম দেখছে না তার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গীতে। ক্লাবে দেখা হচ্ছে সপ্তাহে প্রায় দু’দিন— সেই ফুর্টবাল্জ আমুদে দিল্লী।

—‘দেখছ দিল্লীর অবস্থা?’ অরুণের কথায় চমকালো ভাস্কর। দিল্লী আসছে ওদিক দিয়ে ঘুরে। কি হয়েছে তার—হাসি, ফিটকাট স্নাট, সব তো ঠিক, তবে? ও! দৃষ্টি তীব্র করলো ভাস্কর—দিল্লীর পালের নীলচে আভা গাঢ়।

—‘ব্যাপার কি?’ দিল্লীর নিটোল গালের দিকে ইঙ্গিত করল ভাস্কর।

—‘ব্যাপার?’ গালে হাত বোলাল দিল্লী করুণমুখে।

—‘অনেক কৈফিয়ত করে আপ্যয়েটমেন্ট করেছি লিলির সঙ্গে, সেটা নষ্ট করতে চাই না, তাই উল্লুকেট সঙ্গে বেহুতে হয়েছে।’

—‘লিলির কাছে কথা দিয়েছ নাকি আদমি যুগে ফিরে যাবে?’

—‘আবে না ভাই। ভুঁমি বুঝবে কি আমার বস্ত্রণ। একে তো লিলি আমাকে হাকউইট ভাবে রেখেছে। তারপর দাড়ি কামাতে গিয়ে গত দু’দিন লেট। সব আরেঞ্জমেন্ট ওর বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। আজ তাই আর—’

—‘উঃ? আজ তাই কামানো বাদ বিয়েই এলে? নাইস। দু’দিন পর পর এই চেহারা বজায় রাখতে পার,—সি উইল লিভ ইউ ফর এভার। ভাস্কর তো ঐতিহাসিক হয়ে গেছে, দেন, ফিল্ড ইজ ওপন ফর মি।’

সিগারেট ধরাল অরুণাংগ।

—‘ভাস্কর! ইজ ইট এ ফ্যাক্ট? হ্যাড ইউ সেটল্ড ইয়ার মাইণ্ড?’

ভাস্করের বৃকে টোকা দিল দিল্লীলাল।

—‘ধরে নাও আমি রিট্রিট করেছি। বাট অরুণাংগ ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর ইউ। দাড়িটা কামালেই ভাল করতে।’

—‘লিলি দাড়ি পছন্দ করে। এক প্যারেজির দাড়ি দেখে একবার উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।’ গভীর মুখে জানাল সোঁতাং।

সাঁতল সির সন্ধ্যার সৌন্দর্য-রহস্য সেই সিলিকে দেখা গেল

আসছে চাওলার সঙ্গে। একটা আর্ট-একজিভিশন খুলবে লিলি। অবশ্য উত্তোক্তা ক্লাবই, কিন্তু ক্লাবের মধ্যমণি তো লিলি বোস। অনেক টাকার দরকার একজিভিশন করতে। সবাই চান দিচ্ছে মুক্তহাতে কিন্তু চাওলা আর দিল্লীর চান চারকুদ ছাড়িয়ে গেছে। সবাই বুঝছে প্রতিবন্ধিতা চলছে দু’জনের মধ্যে।

টাকা ও ডিগ্রী থাকলেও একটা ইনফিররিটি কমপ্লেক্স আছে এদের মনে। ‘সম্মতিবান নয় বলে কুখ্যাত হবার ভয় রাখে। আর আণ্ডারকন্ট্রোল আছে একটি আকাঙ্ক্ষা—লিলি, লিলি বোস, মানস সরোবরের রাজহংসী। কালো হীরে দুটি চোখ চাঁদের আলোর মত নয় আর রাজকুমার গরিমা চলনে। আশ্চর্য ভাস্কর! সবাই বোঝে লিলির পক্ষপাত আছে তার প্রতি। সামান্য চোঁয় ভাস্কর জিনে নিতে পারে লিলির হাতের বয়মাল্য; কিন্তু সে চোখ ফিরিয়েছে, নাম প্রত্যাখ্যার করে নিয়েছে স্বয়ংবর-সভার রাজপুরুষের তালিকা হতে।

ছোটবেলার বন্ধু অরুণ। লিলিকে নিয়ে ঠাট্টা করলেও ভারী হত বৃক, যখন ভাস্করের বাহুবলিতা লিলিকে দেখেছে নাচের ফ্লোরে। এখন স্বাস্থ্যের নিখোঁস ফেলছে অরুণাংগ। ফিরে এসেছে শৈশবের নির্বেদ বন্ধু। চাওলা আর দিল্লীকে ধ্বংসের মধ্যে আনে না সে। টাকা? টাকা? টাকা দেখে চমকাবে না লিলি বোস। প্রবাল তার ওঠে, শতকণ্ট আনু চোখে তো বরছে হাজার তারার আলো। লিলির হৃদয়? কোথায় আছে সেই হৃদয়? হাসিভরা লিলির চোখের মধ্যে ক’বে কতবার অরুণ খুঁজতে চেয়েছে তার হৃদয়কে, পায় নি। নেই, নেই। লিলির হৃদয় নেই। সে অনায়াসে পারে যুবরকে রাজানো। পাপেপায় মুছতে তার হাই ছিল। গুণে গুণে পরাজিত পাণিপ্রার্থীর মাথার মালায় সাজাতে পারে লিলি উত্তরকুম।

তাই! তাই তো পালিয়েছে ভাস্কর। পরম শ্রামলা ঘানের রাজ্যে, চাঁদের আলোর বেখানে হৃদয় দেওয়ান-ওয়ার হাট বসেছে, সেই রূপকথার রাজ্যে গিয়ে ভাস্কর বেসাতি করেছে একটি নরম কোমল বৃক, মধুর আঁখি-ভাঙা। সেই বৃকে মুখ ডুবিয়ে বেগে চেয়ে চোখে চোখে, সেতারের তানে তানে বিশ্রামের অন্তরে নেমে যাবে সে। নাচের দূর্গ, রমরমে অর্কেস্ট্রা, অগ্নে নেভানো দাগ আলানো আলোর চাতুর্ঘ্য, ঝাঁকানো গ্রাসে পানীরের বৃন্দবৃন্দ তার ভাস্করের বিশ্রামকে উত্তাল করে দিতে পারবে না। সকাল হবার খরর দেবে ওর কানে কানে সেতারের গুন্‌গুন্‌। সন্তোজ, সন্তোজ, শাস্ত্র ভাস্কর।

অরুণ জানে ছোটবেলা হতেই অমনি ও। নম্বর পেত সবার চেয়ে ‘বেশি। ছবি, রেসিটেশন—সব প্রাইজ তার। আবার হাইজাম্পে অরুণে হার মানাত; শু জোয়ার ছেলে অনিন্দ্যকে। হাফি সিনেমা, সেক্টরেট। মনে হত ভাস্করও মেতে উঠেছে তাদেরই মত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার সময় কখনো ভুলত না মায়ের গল রজনীগন্ধা কিনতে।

মনে আছে ভাস্করের সারেল পড়বার কথায় হেডমাস্টার বলেছিলেন: বিজ্ঞান? তা ইচ্ছে করলে বৈজ্ঞানিকও হতে পারবে ভাস্কর, আবার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী হলেও অবাধ হবেন না তিনি। এমনও হতে পারে গানটান শিখে হর তো একটা নৃতন স্বাবানার সৃষ্টিও করে বসল ও। অল্প সবাই ফেসেটল সেদিন, কিন্তু অরুণরা বকেছিল হেডমাস্টার

## শাখতী

বাজে কথা বলেন নি, সব হতে পারে ভাব্য। যোগ্য স্থানেই পক্ষপাতী হয়েছি লিপি তবু দামী ইভনি: স্টার্টের নীচে টনটন করে উঠতো সাতাশ বছরের চোদ্দশো টাকা মাইনে পাওয়া অক্ষয়বংশ ঘোষের বুক।

অন্নদা সরকারের পরবর্তী বছরের দিদি পুনরায় কাশী শাবার সঙ্কল্প চুকঠে ঘোষণা করছে। ভাইয়ের সংসারের গিল্লিপানায় আর তার কুচি নেই। ছেলে নেই, পিলে নেই—একপাল কুশোষা। অনেক সওয়া হয়েছে, আর না। ভাল্লা ভাতের কটী দিন, তারপর কাশী। টাকা? বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে তো পড়বে, ব্যবস্থা কববার ভার তাঁরই ওপর। অত আর ভাববে না দিদি। অন্নদার কি হবে? হোক যা ইচ্ছা। ভাইয়ের কথা ভেবেই তো পরকাল খুঁয়ে তরঙ্গ এতদিন ক্ষেত্র দানর মত সংসার আগলে বসেছিল।

বোয়াকে বসে মোচা কুটতে কুটতে দিদি উচ্চকণ্ঠে নিজের বক্তব্য চমকান্ধিল, মাথা মুছতে মুছতে স্নানঘর হতে বেরিয়ে এল অন্নদা—বাণীর কি? সাত সকালে উঠেই বিশ্বনাথের অরণ কেন?

—‘না, বিশ্বনাথকে অরণ করবে না, জ্বালাতন হবে একপাল কুশোষা নিয়ে।’

অন্নদা সরকারের কুণ্ডলিগুলি বারান্দাভেই ছিল। কল্লটেরিয়ার মরী বাড়া দুটো কোন্ডাকুল্লি লাগিয়েছে, খাবার মখে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মেয়ী, কান তার ঝাড়। মিনি-পুথি ধ্যানমগ্ন বাজারের দিলর উদ্দেশ্যে। খাঁচার একপাল মুনিয়ার কিচ, কিচ।

অন্নদা বিপত্নীক। সেই কোন সন্ধ্যা, পঁচিশ বছর বয়সে তার বোঁ ঢাঙে। জোয়ান ছেলে, বলতে গেলে বিয়ের বয়সই হয় নি এখনো। ঠাকুমা আদর করে নাতির বিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তান হতে গিয়ে অন্নদার বোঁ আশারাগী মারা গেল। মরা মেয়ে। তা অমন যত্নে আবার ঘর-সংসার করে মানুষ। অন্নদা অচল-অনড়। সেই থকে বিবাহী হয়ে রইল। কিছুতে কান পাতল না বিয়ের কথায়। বশি বললে ঠিকিচিরে উঠত। মনে মনে ভাবত—লজ্জা নেই আমার। রা মেয়ে বুক ঠেকে পনেরো বছরের মেয়েটা মরলো, বিয়ের শাড়িগুলো বিস্তৃত তখনো সব পশা হয় নি। কত সাধ-আজ্ঞাদের কথা বলত পিচুপি। খেতে চেয়েছিল বেনেদের বাড়ির কামরাতা। সবুজ চের ধনেখালি শাড়ির সখ ছিল একখান।—সেই বোঁ গেল। যার মণের অর্ধেক দায় অন্নদার, তাকে আমকাঠের তলে গুঁজে দিয়ে আবার হয়ে সংসার, যে সন্তান হতে আশা গেল সেই সন্তান।

অন্নদার মনের কথা ব্যত না কেউ। হুণে বুক নিয়ে চোখ বলেন বাপ-মা, যত দায় পড়ল তরঙ্গর মাথায়। খন্তরবাড়ি শেষ রে নেমে-ধুয়ে বসেছে কি না—বাপের ঘর ছাড়া জায়গা কৈ কড়ে-দিয়ে-মেরে। এখন ভাইয়ের স্বচ্ছল সংসার, টাকা-কড়ির অভাব টি। একপাল পশু-পাখি, আত্মীয়-স্বজনও এ.স. ঘাড়ে চাপে যায়। এই হতজ্ঞাড়া সংসারে আর মনটা টেকে না তরঙ্গর। সম্প্রতি শি অস্থির হয়েছে চিত্ত, আর তার কারণও আছে।

পাশের বাড়িতে একতলার কাঠ-করলা রাখবার ঘরটাতে সম্প্রতি সছে নুন ভাড়াট—পাকিস্তানী, নিজের দেশের মানুষ। টিকতে গেবে পালিয়ে এসেছে শেষমেষ। মন্ত মন্ত তিন মেয়ে। বাড়টির

বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে—আঁঠা জগজ্জাতীর মত রূপ। আর কি হাতের কাজ। সেলাই, গান সব জান। কেমন ছোয়ালো গড়ন-পিটন। খোঁপা খুলল তো চুল নামবে কোমর ছাড়িয়ে হাঁটু ছুঁই ছুঁই। কি যে মিষ্টি স্বভাব। সেট মেয়ে দেখে, আর নানা কথা ভাবে তরঙ্গ। বাহান্ন বছর আবার বয়স পুরুষের। চুলে পাক ধরে নি। মট মট ভাঙছে আন্ত স্তপূরি। দিকি কাঁচা ম’হুঘটা। অহল? শোন কথা! অমন কাঁকড়া চচ্চড়ি, বাটি বাটি আম-কাস্তমি—কার না অহল হবে! অহল আবার একটা রোগ। সেই কথাই তো বলছে মমতার মা কুন্ডি-বাজগেরে মানুষটা—তার আবার বয়স! হুঃ যত সব! স্তবরা কাশী বাবেই তরঙ্গবালা। যে ঘরে শিশুর কান্না নেই, সে ঘর তো আশানতুল্য। কিসের লোভে পরকাল খুঁয়ে পড়ে থাকা ভাইয়ের সংসারে,—যেখানে একটা দাসী-বান্দীর কথারও দাম নেই।

অন্নদা দিলির প্রস্তাব শুনে হেসে উড়িয়েছে প্রথম প্রথম, তারপর রাগ। ককক রাগ আঁতুড়ঘরের ছেলে মানুষ করেছে তরঙ্গ। বুড়ো বয়সের পেটকাঁচানো ছেলেকে মা তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে, সেই ছেলের গোসাকে ভয়—তারপর একটা জীবন যে যেতে বসেছে চোখের সামনে? জীবন বাগদার নয় ত’কি! কথাটা শুনেল বুঝবে সবাই।

মমতার বাপ চাকরী পেয়েছিল একটা তেওয়ারী-মেওয়ারী কাষ গদীতে। সাতপুরুষ বাংলা দেশে থাকলেই বাঙালী হল আর কি! বাক গে, মক্ক গে; বাঙালী হলেও বারণ করতে বাচ্ছ কে আর হুদররামকে। কিন্তু ভাতে হাত দিতে আসে কেন? বিয়ে করতে চায় মমতাকে—আশ্পর্ধাটা দেখ একবার। হুদররামের মক্কে পোয়াতি বোঁ ময়েছে মাসকর হল, নজর দিয়েছে ব্যাটা মমতার দিকে। কোনদিন দেখে গেছে, বাপের খোঁজে এসে। পাঁচশো টাকা দেবে বিয়ের খরচা বাবদ। আর স্বস্তির চাকরী—মান্না তো বাড়বেই। রাজী হয়েছে পরাশর বিশ্বাস। রাজী না হয়ে উপায় কি। সিনটে মেরে, নিজেরা জী-পুরুষ। ঐ চাকরীটুকুই ভরসা, আর পেটকাপড়ে বেঁধে আনা দু-চার কুচি সোনা।

মমতার মা কেঁদে কেঁদে বলেছে তরঙ্গদিককে সব। গাঁয়ের লোকজন দেশ ছাড়লেও ভিটে কামড়ে পড়ে ছিল তারা। আসতে কি প্রাণ চায়? চকমিলান বাড়ি। ফেল-ছড়িয়ে বছরের দান, পুকুরেরা মাছ, গরুর দুধ—কতবা খেয়েছে, বিলিয়েছে কতবা। মেয়েদের বিয়ে কি হত না? তাও হত। দেশ ছেড়ে যে পালালো সব ভাল ভাল ছেলে, ছুতো-নাতা-হ—ধরে নিয়ে জেলে পুরছে কি না। প্রাণের প্রাণ মমতা, চিরকুমারী থাক—তবু, বাপ বলল—অপদার্থের হাতে দেবে না। বড় হোল মেয়ে, বড় হোল সবিতা অমিতাও। সর্বদা গা ছমছম। কি সর্বনশে দিন এসেছে। গাঁয়ের মুসলমানরা কিন্তু আছে আগের মত। বৌঠান, বাকী ডেক উঠানে বসে পিঁড়ি পেতে, কল্লপুজোর প্রসাদ খায় খুশিমনে। মুন্সিল করল অবাঙালীগুলো এসে। তাদের নজর কেবল হিঁদুর বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামারে নয়, হিন্দুমেয়েদের উপরও।

ক্ষেত্র-সংক্রান্তির কাজ সেরে রাস্তা মমতার মা গুমেছে টেঁকিবয়ের

সোরটির কাছে আঁচল বিছিয়ে, চোখাটো লেগে এসেছে পুকুরের ঘিরঝিরে হাওয়ায়। কাছে এসে ঈঁড়াল নজর আলির বোঁ। শুকনো মুখ, ফিস ফিস কথা। খবর দিল এক সর্বনাশের। ঐ বিটকেল মরদগুলো মতলব এঁটেছে কাল রাতেরবেলা লুই করে নিয়ে যাবে বিশ্বাসবাড়ির তিন মেয়েকে। সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, কলমা পরিয়ে সাদী করবে তাদের। রকম-সকম ভাল লাগে নি শুক্লেশ্বর। ছেঁচতসার ঈঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছে তাই কথাবার্তা। গা কাঁপতে লেগেছে তার। খসম ঘরে এলে বলছে—বেইমানী কর না।

নজু কি বেইমানী করবে চার? কিন্তু প্রাণের ভর যে তারও এখন খবর পাঠিয়েছে—নিশ্চিন্ত বাতে আজ খালের মুখে নাও রাখবে সে। বিশ্বাস চাচা বেন একবস্ত্রে বেরিয়ে আসে মেয়েদের নিয়ে। জান-কবুল, নজুমিঞা পৌঁছে দেবে তাদের সিরাজগঞ্জের ঘাটে; কিন্তু সাবধানে একটুও সোর যেন তোলে না তারা। তা হলে নিজেরা তো যাবেই, নজুও কেঁলা কাঁক।

কাঁপতে কাঁপতে গিরি আর মেয়েদের নিয়ে রাতের অপেক্ষার রইল বিশ্বাস কর্তা। দরজার তিন টোকা, বারোটার মেল যাবার পর। খানিক আগে চৌকিদার সাড়া চোখে গৃহস্থের, কে জানে সর আছে নাকি তার সঙ্গে। সাবধানের মার নেই ভেবে নাক ডাকিয়ে বিশ্বাসমশাই জানিয়েছে গভীর ঘুমের নিশানা।

ঘর হতে বেরিয়ে এল সবাই-ই টোকার শব্দে। পায়ের তলে পাঁতা পড়লে কাঁপে বুক। মেয়েদের আঁচল বাঁধা করবী ফুলের গোটা। বেগতিক হলে খেয়ে নেবে, তখন তাদের মান বাঁচাবার জন্ত স্বর ধর্মাজ পেরাদা পাঠিয়ে দেবেন। নাও ছেড়ে দিল নজর আলি। প্রাণ দিয়ে বাইতে লাগল বাপ-বেটা, পক্ষীর ডানা হল ছুই বৈঠা। তিন পুকুরের চাকর নজুগা, বিশ্বাসবাড়ির নিমকের হার শুখল এবার। ভোরের তারা ডুববার আগেই পৌঁছে দিল সিরাজগঞ্জ।

ট্রেনে উঠেও কি বুকের খরখরি বায়। বাপ বলল, 'এবার ফেলে দে আঁচলের বিকস।' মেয়েরা উত্তর দিল, 'না, থাক।' শব্দ-বন্দর কলকাতা। কি জানি তার আবার কি রূপ! মেয়েদের মান বাঁচে কি না সেখানে। দরকারে তো লাগতে পারে। আজ্ঞা আছে কবরীর গোটা মেয়েদের বাজের তলার।

এখন মা-বাপের দুঃখ লাঘব করবার জন্ত প্রাণ দিতে পারে মমতা, কাটিতে পারে নিজের হাত-পা একটা একটা করে—খারাপ বিয়ে তো কোন ছার কথা। উপায় নেই। লাগচোখো সেই যাঁড়টার পারে জড়ায়ে তার স্বর্ণলতা। চোখের জলের আর বিরাম নেই মমতার মায়ের। তরঙ্গের চোখেও জল। কার না কষ্ট হবে এমন দুঃখের কাহিনী শুনে। অন্নদার মত পাষণ প্রাণ তো নয় কারো।

তা একেবারে পাবাণও নয় অন্নদা।

অনেক উপকারের প্রস্তাব করেছে সে বুত্তান্ত শুনে, কিন্তু দিদির এককথা—বিয়ে কর মেয়েটাকে। আর সহিতে না পেরে কাল রাতে বলে দিয়েছে অন্নদা এক মোক্ষম কথা—বেশ। করবো বিয়ে। অপেক্ষা করতে বল ওদের। তোমার জন্তও বুঁজে বের করি এক পাঁচালু বর, একসঙ্গে ভাই বোনের হবে ছ্যাড়া ছ্যাড়া!

রাগে ছলে গেছে তরঙ্গের সর্ষ শরীর। কপাল না পুড়লে তরঙ্গের ছেলে হতে পাবত ভাইয়ের চেয়ে বরসে বড়, তার মুখে এমন কথা।

ঠাট্টা? না, এমন ঠাট্টা-টিসারা ভাল লাগে না বাপু। দরকারটা কি এখানে আর পড়ে থেকে অপমানী হবার? কাশী বাবার জন্ত পুঁতলী বেঁধেছে কাল রাতেই তরঙ্গবালা।

মাথা মুছে দিদির পাশে মোড়টি নিয়ে বসল অন্নদা।

—'কি, মোচা নাকি আজ? কচুর শাক রাখবে না? বুকেল দিদি। সেদিন যে বেঁধেছিলে একখানা শাক—একবারে বাঁধিয়ে রাখবার মত। মোচার ঘট, লাউ-চিড়িও তুমি বাই বল না কেন, তোমার হাতের মত ওরোর না কারো হাতে।'

অড়িচোখে ভাইয়ের দিকে চাইল তরঙ্গ। খোসামোদ। কত না অজ্ঞ হাতের রান্না খেয়েছে, যে তারতম্য বুঝবে। তা খোসামোদ ভিজবে না মন। মুখের মস্তিতে আর ভুলবে না দিদি।

—'আজ্ঞা দিদি।' গায়ে হাত বুলানোর গলা অন্নদার—'কি করে বিয়ে করতে বল তুমি এ বরসে? একটা সাখ-আছাদ আছে না মেয়েটার, বুড়ো বর মন উঠবে কেন তার বল?'

কথাটি কইল না দিদি। জাগজ্ঞ মাঝুকে জাগাবে কে? জদররাম তো আর একটা বুড়ো মোষ নয়। এক গা চুল, মিশমিশে রং, বাট বছরের যুবা। পাবশু। কি কলে ফেলেছে বাপটাবে! বিয়ে না দিলে চুরির দায়ে দড়ি দেবে হাতে। অন্নদা বিয়েটা করলে সর্বক্ষণ। দেখবার-শুনবার একটা ভরসা, মস্ত বল। অজ্ঞখানো চাবণু দিতে পারবে অন্তরাগে।

অন্নদা ভাবল কিছুক্ষণ।—শোন দিদি। বিশ্বাসমশাইকে আমি একটা ভালো চাকরী যোগাড় করে দেব, আর মেয়ের বিয়ের জন্ত কিছু টাকা, অল্প পাত্রে বিয়ে দিক।

—'তোমার করতে বাখাটা কি?' এতক্ষণে কথা বলল তরঙ্গ।—'এখনো মনে করে আছিঁস সেই বোঁকে? এত ভালবাসতিস তাকে যে একটা গোটা পরিবার বাঁচাবার জন্তও গোঁ ছাড়তে পারিস না?'

—'ভালবাসার কথা বলছে কে। মুখই মনে নেই আশালতার, কিন্তু মনে আছে তার মৃত্যুর কারণ। মনে আছে শ্মশানের সব বীভৎস দৃশ্য—শেষ কাজগুলো অন্নদাকেই করতে হয়েছিল তো। তারপর কতদিন চোখ বুজতে পারে নি সে সারারাত ধরে। যে ফুটি করেছিল হুঁজনে মিলে, তার শান্তি মেয়ে বলেই বইতে হল আশালতাকে—যে তার চেয়ে বরসে ছোট, শরীরে দুর্বল আর একান্ত নির্ভর স্বামীর ওপর।

একটু একটু করে মনের কথা এত বছর পর খুলে বলতে লাগল অন্নদা। বলল—'যদি বেগে ভুগে বোঁ যেত, বাবা-মা আর তোমাকে কষ্ট দিতাম না। যা বলতে তাই স্তন্যতাম। বিয়ে, ছেলেমেয়ে সব হত, কিন্তু এ যে অজ্বরকম ব্যাপার। বুঝছ না বিশ্বম্ভট্টা? যেন খুন করলাম আমি, কাঁসী গেল খোলংদার। বিধির বিধান এই রকম তা বুঝি, কিন্তু তবু আর বিয়েতে প্রবৃত্তি হয় নি। এখন তো বুড়োই হয়েছি। ক্ষ্যামা ষাও দিদি।'

প্রায় চোখের জল ফেলে দিদির হাত ধরলো ভাই। তরঙ্গ আর বলবে কি! তারো তো গলা বন্ধ, চোখে জল। না, বিয়ের কথা শুকে বল—'তবে একটা চাকরী করে দিতেই হবে পরশব বিশ্বাস—মমতার বাপকে। লেখাপড়া ভাল জানে সে, আই—এ পাশ।

মিত্রসাহেবকে ধরে একটা ব্যবস্থা হল বিশ্বাসের। তারপর

মমতার বিয়ের জ্ঞা সাহায্যের প্রস্তাব। কিন্তু, কিন্তু করল বটে, আবার মতা খুঁটিতে গেলও গেল বাপ-মা।

বড় ভাল লোক, মতা সদাশয় ব্যক্তি অল্পা সবকার। কে দিতে চায় পরের জ্ঞা এত টাকা জলাঞ্জলি! হ্যাঁ, দিত বটে সকালে। তাদের গ্রাম ভাতশালা নামে বিখ্যাত তো, ভূমিদার রাধাবৃন্দের অল্পসজ্জের সত্তাই। কত বিয়ে, পৈতে দিয়ে গেছেন তাঁরা। এখন? এই কলির শেষকালে কেউ থসাবে পরের দায়ে নিজের একটি কড়ি? ত্রিভুজনে কেউ শুনছে এমন কথা?

পত্রিকার 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিভ্রাটপানে খোজ চলল সন্তানদায়ের বার। দু'মুঠো খেতে দিতে পার, পোট থাকে একটু কালির আঁচড়, —দোকানেকই ভাল। মেয়ের তো বহুস হয়েছে। দেখা গেল, দু'একটা ঠিক একেবারে মনের মত না হলেও সাধারণ মত। হবে আর কি? দাও লাগিয়ে উদ্ভাগ-মায়েজন করে এই সামনের ঠাই অজ্ঞাপে।

সন্ধ্যাবেলায় খালি গায়ে ছায়ে মাতুর পোতে গড়াগড়ি দেওয়া চিবকেলে অভ্যাস অল্পদার। ফুবুরে হাওয়া, ঘুম নয় আবার ঘুম ঘুম। চোপ চাইলে মস্ত আকাশ, বড় আয়াম। আবারো বাগ পড়ল সেদিন। হাক্কা হাক্কা শায়ের শব্দে চোপ মেলে তাকিয়েই একেবারে তাজব্ব অল্পদা। চাদে, প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে এক কল্পে। আঁহু-আঁহাবেও তাঁর হত্বে চাপাফুলি বং। দহমড় কবে উঠে বসল অল্পদা। আঁহুড গা, কবির বাদন ঢিল—একটা বেয়াংকলে অবস্থা। উঃ! দিদির যে কি বুদ্ধি! দু'একটা ঢোক গিলে নিজেকে সামলে ফেলল অল্পদা। এসেছে তো, এসেছে। ভারি! বাহান্ন বছরের বুড়ো তার আবার লজ্জা পাতশর বিশ্বাসের অ-বিয়েতো মেলকে। মেয়েটার তো দেখি লজ্জা-সরমের নামগন্ধও নেই। শুটুম্বের বসে পড়ল ছাঁদের উদর, উগুড হয়ে পেছাম ঠুকল ধুলার মধ্যই তারপর নিজেই আরম্ভ করল কথা—'দেখুন, আমার বিয়ের জ্ঞা আপনাদের টাক দেবার দরকার নেই।'

এ কি কথা! রাগ হল অল্পদার। আচ্ছা বেহায়া মেয়ে ত! একটু সময় চুপচাপ। শোনা গেল মেয়ে-গলা—'বাবার চাকরী দিচ্ছেই আপনি আমাদের মতা উপচায় করেছেন, কিন্তু আমার বিয়ের জ্ঞা চিন্তা করবেন না।'

এবার কথা বলল অল্পদা—'তোমার বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে আমার।'

—'না, বাবার সঙ্গে কোন কথাই নেই। আমি আপনাকে শেষ কথা জ্ঞানিয়ে গেলাম।'

উঃ! তাই বাচ্ছল মমতা।—

—'বসো, বসো!' অল্পদা বলল। এতক্ষণ সন্দেহ হয়েছে তার—বুঝি পছন্দের লোক আছে মেয়েটার। আর সে কথা বললেই তো হয়, সেখানেই বিয়ে দেওয়া হবে। মতা লাগল অল্পদার। অল্পসজ্জের খবর নিল মমতার পছন্দের বর।

—'না! হাঙ্গি শোনা গেল, দেখা গেল তাঁদের চিকমিক।—'আমি কি পছন্দের মেয়ে যে, আমাকে কেউ পছন্দ করবে? এক

করেছিল হুন্সরাম, সে তো আপনিই ভেঙে দিলেন। সে কথা নয়। আমি বিয়েই করব না। লাভ কি মানুষকে বিপদে ফেলে।'

—'বিপদ? বিয়ে বিপদ হবে কেন?' তাজব্ব অল্পদা।

—'হয়, তেমন মেয়ে হলে বিয়েও বিপদ হয়ে ওঠে। আপনিও তো বিপদে পড়েছিলেন।'

—'নাও ঠালা! আরে আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি।'

—'আমিও। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়। আমার পর্যাপ্ত। বিয়ে যে বুড়ো বয়সে বিপদ—সে তো আপনিই বলছেন।'

খমকে গেল অল্পদা সবকার, বাহান্ন বছরের মিত্র কোম্পানীর হেড-ক্লার্ক—যাকে ওয়ার্কিং ডিরেক্টর হতে হবে নাকি কদিন পর। কি বলতে চাইছে মেয়েটা? অল্পদা বিয়ে করতে চায় নি বলে রাগ করেছে? অভিমান? বাহান্ন বছরের বুড়ো বুঝ কি মেয়ের বাসে এখনো দক করে ওঠে? আরে। এ যে প্রায় ভালই লেগে আছে মমতার বাগটা। ফুঁপিয়ে কাদছে মমতা। কেন? অল্পদা বিয়ে করতে চায় নি বলে অপমান হয়েছে? কি যে সব গোলামেলে ব্যাপার। একই বলে সাধু বাংলায়ে—'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' অবস্থা। নীচে শোনা যাচ্ছে দিদির গলা। নির্খাত সেই পাঠিয়েছে শলা দিয়ে মমতাকে এখানে, আর মতা দেখছে বিপাকে ফেলে।

—'শোন মমতা, শোন।' আর শোন। কৈসে কৈসেই কথা বলতে লেগেছে মেয়েটা—

'আপনি নিজে থাকে বিয়ে করবার একেবারে অযোগ্য মনে করেন, কেন তাকে পারব বাড়ে ফেলতে চাইছেন? কক্ষণে—কক্ষণে, বিয়ে হবে না।'

চোপ মুছতে মুছতে ঢলে গেল মমতা। অল্পদা চুপ। কি করে যোগাবে—অযোগ্য ভেবে নয়, অসম্ভব বলেই সে বিয়ে করতে চায় না। কোন মেয়েরই কি উচিত সব শুনে তাকে বিয়ে করা? ভাল লাগা উড়ে, রাগ এলো অল্পদার মনে।

—'দিদি!' রাগিগলা অল্পদার। ভাইয়ের রাগ বুঝে কোকলা মুখে হাসলো তরঙ্গবাল।—'আমি কি করবো? অমনি তেজী মেয়ে মমতা। বলে—'ঘম্মার আমার বিয়ে কবল না, টাকা দেবে বিয়ের জ্ঞা! ভিখারী নাকি আমি যে ভিক্ষে দেবে? ভিক্ষে করব তো, হাত পাতব সব দুয়োরে। একা ওঁর ঠাই নেব কেন সব ভিক্ষে?—আদত্ত ব্যাপারটা কি জানিস?'

ফিস ফিস করে বলল দিদি—'দেখছে সাজান-গুছান সঙ্গার। মহাধবের মত মাহুঘটা তারপর আশাও দিয়েছিলাম আমি। দুঃখ হয়েছে আর কি! তুই আর রাগ কবিস নি ভাই! হুঁ' কথা শুনিয়েছে তো হয়েছে কি? গেরস্থ তো হলি না, বোমাদ জানলি না মেয়েমাঝুরের রাগ-বালোর। মস্তক গে। টাকা দিয়ে দরকার নেই। আর সতি তো, বয়সও হয়েছে মেয়েটার।'

শুন মেয়ে অল্পদা ঘরে গিয়ে ঢুকল। ফ্যান খুলে খাটে জ্বলা চিৎ হয়ে। চেনা নেই, শুনা নেই, বলে গেল কতগুলি কথা। অপরাধ? অল্পদা উপকার করতে চেয়েছে। বড় রাগ হল অল্পদা সবকারে। কিন্তু মনের কোন গোপন তলা হতে একই বেন পুষ উঁকি-বুঁকি মারছে। কাজের মধ্যে বাবাবাব শোনা যাচ্ছে বেন অভিমানে কান্না। নাঃ, বিপদ হলো।

বিপদ সত্যি হল। অন্নবার নয়, পরাশর বিশ্বাসের, শমিতা অমিতা দুই মেয়ে, তারাও খোঁচা-পোঁচা নয়। টুকটুক না হলেও কচি আমশাতার রং গায়ে পূবখালার স্বাস্থ্য আর কোমর ছাড়িয়ে একরাশ চুল। তারাও পড়েছে অনেক বই-পত্ৰ, বিজ্ঞা আছে পেটে। চালাক-চতুর দুই মেয়ে। ঐক্য ক্যাক্টরিতে কাজ যোগাড় করে নিয়েছিল তারা—লবঙ্গ লাগানোর কাজ। তিরিশ তিরিশ বাট টাকা ঘরে আসতো। সংসার সজ্জা হয়েছিল। মমতার মা কালীঘাটে গিয়ে কিনে এনেছিল এতাদৃশ পিতলের কলসী আর বগীখালা একখানা। কর্তাকে টিনের পায়ে ভাত দিতে চোখ ফেটে জল আসত তার। বাড়িতে গিন্দুকভরা কত বাসন। খাগড়াই কাঁসার বাসন সব। একই ছাই ঘষলে সোনার জেরা দেয়। একবস্ত্রে গাঁ ছাড়তে হোল—তা আর বসন। বাক গে। এখন মানুষকে ভাত দেবার খালা তো হোক। শাক ভাতও ভাল পাত্রে খেয়ে সুখ।

তা—সুখের মুখ দেখার দিন গেছে মমতার মায়ের। গোড়া-কপালীরা ছিল বড় ভাল। গাঁয়ের মধ্য নাম ছিল বিশ্বাসবাড়ির মেয়েদের। বিয়ে না হওয়া আরো মস্ত মস্ত মেয়ে ছিল তো গাঁয়ে, কিন্তু এদের মত সুখ্যাতি কি কারো? সেই সোনার মেয়েরা বড়টী বাদে, আর দুটোই বললে গেছে একবারে। মাই চিনতে পারে না যেন তাদের। শহর কলকাতার হাওয়ার উড়ে উড়ে বেড়ায় বিব, সেই বিষে ধরেছে শামু-ধমক। পেট দেখানো জামা, কাঁপানো চুল। গা কাঁপাতো মায়ের। মনে পড়ত মুষ্টি-আলানের ছড়া—

‘ঘর থাকিতে বাইর রাখে  
অন্ন চুল ফুলটীরা বাক্যে  
সাঁজ-দুপুরে বেড়ায় পাড়া  
সেই নারী হয় কল্মীছাড়া।’

মমতা মাকে বোকাতে—কেন ভয় পাচ্ছ! খাটছে, বুটছে, সপ করুক একটু। বরষা তো হয়েছে ওদের, ভালমন্দ বুঝবে নিজেরাই।

কত বুঝল ভালমন্দ! দুটো ময়েই বিয়ে করেছে কারখানার দুটো মানুষকে। অজাত, বাতালীই নয়। বাপ-মা বাধা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাফ জবাব দিয়েছে—তাদের যা ইচ্ছা করবে, আইন নাকি তাদের দিকে।

বাপের বাধা দেবার অধিকারই নেই। হা ভগবান! ভাতশালা গ্রামের মুন্সেবা, পাঁচখানা গাঁ মানত বাক্যে—তার মেয়ে অজাতের ঘরে গেল। পিতৃ-পুত্রের মুখে চুবকালি পরাশর হতে। সড়সড় করে রক্ত উঠল গির মাথার, ভিঁমি খেল বিশ্বাস রাস্তার মধ্যে। ভাগ্যিস গাড়ি চাপা পড়ে নি, সতীলক্ষ্মীর এরাতি বজায় আছে।

তরঙ্গ বুক দিয়ে পড়ল এসে বিপদে আর দিদি এলে ভাই কোন না এসে পারে। সময়-অসময় নিয়ে কথা! বারবারই আসতে হল অন্নদাকে। ডাক্তার-বাঁজ, পরামর্শ। অন্নদা মমতাকে দেখল দিন-দুপুরে, সকালে-রাত্রে। মা-দুর্গার মত আগলে রেখেছে খা-খাওয়া বাপ-মাকে। ঘর, স্থির না! বড়ই প্রশংসার মেয়ে। স্বীকার করতেই হল অন্নদাকে।

একটু সুস্থ হতে অন্নদার হাত জড়িয়ে ধরল পরাশর—একটা আশ্রম-টাশ্রম ব্যবস্থা করে দিতে হবে মমতার জন্য। তারা স্বামী-স্ত্রী

আর মুখ দেখাতে পারবে না। কত গাঁ-দেশের লোকের বাস এখানে, নিত্য দেখা হবে। বড় উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে। মমতা টুকটুক বাড়ি নাড়ল। আপত্তি নেই তার আশ্রমে থাকতে। কাণ্ড দেখ! কেমন সব বিপদ। আশ্রম? আশ্রম আর কোথায় পাবে অন্নদা! আশ্রয় মিলতে পারে একটা, মাথা শুঁজবার মত আশ্রয়।

আশ্রয় পেল মমতা। পাড়ার লোকের টিটকারী, অমিমে হাসি-তামাসা। ভোজও হল একটা মাঝামাঝি রকম। দিদির চোখে জল, মুখে হাসি।

—‘এ! শিবপুজোর এই ফল? একটা তিনকেলে বুড়ো বর পেলো!’ বৌকে বলল অন্নদা একদিন।

—‘শিব তো বুড়োই।’ বড় বড় চোখ স্বামীর দিকে মেলে উত্তর দিল মমতা।

—‘ভাস্কর। তিন দিন অ্যাবসেন্ট যে? ব্যাপার কি?’

—‘এই! একটা বিয়ের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলাম।’

—‘বিয়ে?’ জ্ঞ বাকাল লিল।

—‘ঐ আর কি! তুমি তো জান আমাদের অন্নদাবাবুকে।’

—‘শেম! ত্রাট ওন্ড ফেলো।’

—‘ইজ ইট এ কমপ্লিমেন্ট ভাস্কর?’ জানতে চাইলো অন্নদা।

—‘থ্যাক্স গড, আমি নই, শুটা বল: হয়েছে আমাদের অফিসের অন্নদা সরকারের উদ্দেশ্যে, বিয়ে করেছেন বিনি উত্তর-পঞ্চাশে।’

নাক ও টোটার সৌন্দর্য অবসর না করে অন্নদার প্রতি ঘূর্ণা দেখাল শ্রোতৃমণ্ডলী। বিতুষ্য প্রকাশের অপূর্ব কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হল উপস্থিত দর্শকজন।

—‘চামিং প্রশংসাও বসিত হল দিল্লীর কঠ হতে।

—বুড়োর অনেক টাকা আছে বুঝি?’ জিজ্ঞেস করল দেবকী।

—‘তা আছে মন্দ না। বাড়িও আছে ছোট একটা।’ উত্তর দিল ভাস্কর।

—‘বাঃ! মেয়েটা খুব চালাক তো। দেখো, এবার মোটা ইঙ্গিত করাবে বুড়ো-’

—‘স্লোপারজন করবে তারপর।’ বললো আগাখা কৃষ্ণির অধুরাগিনী রমলা।

—‘বুড়োর কাছ হতে ক্লাবের জুজ মোটা ডোনেশন আদায় কর।’ মিহিগলা তেগুর।

সেদিন ক্লাবের কথাবার্তা চলল অন্নদা সরকারের বিয়ের সংবাদ কেন্দ্র করে। ছেলেরা পাঞ্জীর চহারা এবং আশ্রয় দৃষ্টে মাঝে মাঝেই ভাস্করের কাছে খোঁজ নিল। মেয়েরা মুহুর্তে তাদের মতামত প্রকাশ করতে লাগল। লিলি বিরক্ত। ট্রাইফিংলি ম্যাটার! নষ্ট হল কত সময়, দরকারী আলোচনা ছিল আসন্ন একজীবন সম্বন্ধে।

অন্নদার বিয়ের কথাই সর্বত্র।

পরদিন সন্ধ্যায় শৈলেন রায়ের বাড়ি উপস্থিত হতেই তপতা উচ্চসিত। ‘কি মজা! আপনাদের সেই সরকারকাকুর বিয়ে হোল না?’



চট্‌চটে তেল না দিয়েও সারাদিন চুল পরিপাটি রাখা যায়  
...কখনো ক্লান্ত দেখায় না



আপনার বেয়াড়া চুলগুলোকে  
বশে আনতে কি চট্‌চটে  
তেল ব্যবহার করেন ?  
—কেয়ো-কার্পিন এমন একটি  
তেল যা মোটেই চট্‌চটে না,  
—আর ভেৎজ গুণ সম্পন্ন  
এই আশ্চর্য্য তেলের গন্ধও  
মনোরম। কেয়ো-কার্পিন  
বেয়াড়া চুল বশে আনে, সারা-  
দিন পরিপাটি রাখে।  
আজই এক শিশি কিনুন।

**কেয়ো-কার্পিন**

দ্বিবিধ ২০০০মিলিগ্রাম কেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস্  
প্রাইভেট লিঃ  
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী  
মাদ্রাজ • পাটনা • গোহাটি  
কটক • জয়পুর

PXDMKB-5

—এ মা! মজানর? জানেন। আমি সব দেখেছি। ওরা থাকে আমার দায়র বাড়ির পাশে তো। সেই মিলি একতলা বাড়িটাই তো অরদা বর, আর তার ঠিক সামনের লালবাড়িটা দায়র।’

—সব দেখেছো? বর-কনে?’

—সব। আমিই তো গিয়েছি বৌভাতের শাড়ি নিয়ে। দ্বিহর শরীর ভাল নয় কি না। কি সুন্দর বৌ। বৌকড়া-বৌকড়া কত চুলা—আর কি কদা।’

—বর? তার বরস-টরস জানো ত?’

—জানি তো। বরস হয়েছে তাতে কি? আমার কিন্তু বরস হওয়া মাছুই ভাল লাগে। দায়র, বাবা।’

—স্বামীর বরস হলো?’

—বদি আমার ভালই লাগে, বরসের বাধা কি করবে সেখানে?’ গভীর হল তপতী।

—কিন্তু পকাশের পর বিয়ে করবার মধ্যে একটা কুৎসিত জিনিস লুকিয়ে আছে তা মান তো?’

—মোটেই নেই। বিয়ে করাটাই তা হলে একটা কুৎসিত বিষয় হয়ে উঠবে। জোর করে বিয়ে করা যিকি, সে যে কোন বরসেই হোক। কিন্তু সেখানে ইচ্ছা করে দু’জনে একত্র হচ্ছে, সেখানে বরসের প্রসঙ্গ তো অব্যবহার।’

—পাঠ বোঝা গেল রেগেছে তপতী। চোখ চকচকে, স্বর উচ্চগ্রাম।

—বলব একথা তোমার মাকে?’

—কি কথা?’

—মনে হচ্ছে কোন বুড়ো প্রফেসরকে পছন্দ হয়েছে। দত্ত নন তো?’

—বাঃ! সত্যি কি যে সুন্দর পড়ান প্রফেসর দত্ত, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে নাকি?’

—সর্বনাশ। মিসেস দত্তকে তো হুঁশিয়ার করা দরকার। কোনদিন হয় তো বা বুড়ো ডাইভোস’ আনতে ছুটিবে।’

—এ মা! ভারি অসভ্য!’

একবার তাকাল ভাস্করের দিকে তপতী। চোখ নীচু করল, লাল হল। পরিবেশ বোম্বাঙ্কিত। হেমন্তের রাত আটটার শিরশিরে হাওয়া। মনের মধ্যে ডেউ উঠল ভাস্করের পুরুষের প্রথম নারীর জন্ত আকাজকা। ইচ্ছা হল হাত বাড়িয়ে তুলে ধরে নত মুখটি; গ্রহণ করে সুধার পাত্র হতে প্রথম চুমুক। কিন্তু ভাস্কর জানে সব মাধুরী বরে বাবে তা হলে। বড় বড় চোখ দুটি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে চরে থাকবে।

—চুপচাপ কেন?’

যে ঢুকলেন শৈলেন রায়, মীনাকী। সোফার এলালেন বাপ। বা সমালোচনার চোখে চাইলো মেয়ের অপ্রসারিত চেহারা দিকে। কেন, কেন ভাস্করের ভাল লাগবে এ মেরেকে? বঃ তো প্রায় কালোই। না দীপ্তি আছে দেখে, না কথাবার। এম-এ পড়ে? সেতার বাজার? হঃ! সেতার বাজানো! ব্যাক-ডেটেড ব্যাপার, আর এম-এ পড়া তো দত্তর মত ডিকোয়ালিফিকেশন। সোসাইটির কোন মেয়ে! এম-এ পড়ছে? নাম মনে করতে চাইলো মীনাকী। না, কেউ না। লোরেটো—সিনিয়র কেমব্রিজ—বাস। চবি জাঁকা।

গান, কালচারাল পরিমণ্ডলী। বিয়ের পর অবশ্য কোন বাধা নেই। বা খুশি করা যায় তখন। আজকাল সোশ্যাল সার্ভিস দেওয়া ফ্যাশন বড় ধরনের মেরেদের। ক্যাটিন। শিল্প-বিভাগের—কত ফিল্ড আছে ওপন। কুমারী মেয়ের তো এ সব করলে চলবে না। অপ্রাপ্যীরা হতে হবে তাকে, প্রায় অশুশ্রুত। দেখাতে হবে এই পৃথিবীর সকলের আলোয় প্রথম চোখ খুলেছে সে। মধুর, কোমল। পৃথিবীর সব সবল হাতের আশ্রয় প্রদায়িত হবে তার জন্ত।

মীনাকী অবশ্য মেরেকে প্রথম তৈরি করে নি, কিন্তু তারপর? বি-এ পরীক্ষার পর? সে কি চেষ্টা করে নি তপতীকে অমনি করার জন্ত? কিছু হল না। ভিতরে ভিতরে ভীষণ জেদী মেয়ে। সেই ভর্তি হল এম-এতে। টেস্টেটিল করে বাস উঠছে, যেমে ক্লাস্ত হয়ে বাড়ি। বই পড়ে পড়ে ক্লাস্ত চোখ,—এখন চশমা নিলেই যোলকলা পূর্ণ হবে। এই যে বসে আছে! একটুও আকর্ষণীয় লাগছে কি ওকে? ক্রাফ্ট সবুজ রং-এর শাড়ি, পায়ের চটি নেই, মুখে নেই একতিল প্রদান। যেন প্রায় রান্নাঘর হতে উঠে এসেছে মেয়ে।

বাগ হল মীনাকীর। কিন্তু মুদ্রিল, তা প্রকাশ্য করবারও জো নেই। ততক্ষণ ভাস্কর আর শৈলেন রায় আরম্ভ করে দিয়েছে তাদের ব্যবহার প্রসঙ্গ—পুকুয়াল কথা।

—প্রবীর এসেছিল সেদিন, বুকলে ভাস্কর।’

—প্রবীর? ও! প্রবীর নিজে ব্যবসা করতে চায়। আপনার অ্যাডভাইস দরকার আছে ওর।’

—কিন্তু স্ক্রাপের কাজ ও পারবে না হে! বিস্তার ঘরতে হয় আর মিশতে হয় বহু বাজে লোকের সঙ্গে।’

—তা প্রবীর পারবে। ওর একটা প্রমিস আছে। ইচ্ছা করলে অবাক করে দেবে সকলকে কাজ দেখিয়ে।

—তুমিও তা অবাক করে দিচ্ছ। ব্যবসায়ীমহলে তো ছোট মিত্তরের কথাই শোনা যাচ্ছে আজকাল। কান্দাদাস নাকি পাতা পায় নি এবার?’

—এখনো সরকারিভাবে খবর বেরায় নি, তবে জেনেছি কান্দাদাস আমাদের কোম্পানীই পাবে।’

—প্রাইভেট লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে মিত্র কোম্পানী?’

—হ্যাঁ। মেসোমশাইকে ঢোকান হচ্ছে। মেলা টাকা অকেজো পড়ে রয়েছে ওঁর ব্যালান্স।’

হাসল ভাস্কর।

—‘অমোহনদার’ কাছে শুনলাম সব। তোমার আইডিয়াটা ভাল।’ সিগারেট ধরালেন শৈলেন রায়। ‘ভাস্কর?—খাও না? গুড়। দেখছ মীহু! বিলেত-খোয়া ছেলে সিগারেট খাচ্ছে না।’

—‘তাতে আমার কোন বিশেষ ক্রেডিট নেই।’ তাত্তাতি বলল ভাস্কর—‘নিকোটিন এলাজি আমার, লিকারেও সুত্তরা—’

—‘এলার্জি? বেশ ব্যাপার এই এলাজিটা। নুতন নাম, অভিজাত্যও আছে। আমাদের সময় কোথায় যে ছিল এই সব মহা মহা অহুধেরা। অল্পা সরকারকে ওয়ার্কিং ডিরেক্টর করা হচ্ছে। বেশ, বেশ। হি ডিজার্ডস। প্রথম হতে আছে তোমাদের কোম্পানীতে।’

—কিন্তু লোক বিশেষ ভাল নয় সরকার।’

স্বামী ও ভাস্করের সঙ্গে এবার যোগ দিল মীনাঙ্কী।

—‘ভাল নয়? ওকে তো খুব বিশ্বাসী আর কাজের বলেই—  
ত বল ভাস্কর?’

—‘না না। মিসেস রায় অল্প মীন করছেন। সরকারকাকু  
প্রতি বিয়ে করেছেন, তাই বোধ হয় তাঁর রাগ হয়েছে।’

—‘রাগ? সুখী হয়েছে এবং স্তন্যদেয় প্রত্যেক মেয়েরই হবে।’

কঙ্কার মত যে ঠিক বিপরীত তা আর বলল না ভাস্কর। হাসল  
একটু। নড়েচড়ে বসল তপতী।

—‘সামনের রোববার টুইন জন্মদিন। নিশ্চয় আসবে কি?’

—‘রোববার?’ সামনে চাইলো ভাস্কর। দিদির কানে কানে  
একটা দরকারী কথা সাগরিল টুই। এসব অশ্রুভাষা চেষ্টা করেও  
করতে পারছে না মীনাঙ্কী। অল্প তপতীই দায়ী এর জন্য;  
শে বছরের টুই জন্মের মত মেয়ে—সট মেবী স্কুল পড়ে।

ইংরেজী পোষাক আর কথার স্বরে অবিকল গিলেই যাচ্ছিল। এমন  
তপতীর পাশে পড়ে অনবরত চান্দার পাখি হাত টানটানি, কানে  
কানে কথাও দিবি বস্তু হয়ে গেছে।

—‘টুই নিজে না বললে কিভাবে আসবে না?’

টুই এগিয়ে এল ভাস্করের কাছে। ‘ছাটদের সঙ্গে ভাব ক্রমাতে  
ওতাদ সে। বাস্করের গাল টিপে, চুল টেনে জেপিয়ে তোলে, আবার  
লাভনীয় বৃথও বেরিয়ে আসে তার পকেট হতেই।

—‘বাবো! তোমাকে তো নিমন্ত্রণই করব। আমি নিজে কার্ড  
ছাপছি যে, না দিদিভাই?’

—‘কার্ড ছাপাচ্ছ?’ তা তো তেলে উঠলেন শৈলেন রায়।  
‘ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে সাবালিকা হয়ে উঠল এমি মনো!’ জ্বর  
নিকে চাইলেন।

আশ্চর্য হল মীনাঙ্কী—‘সে কি রে? আমি তো জানি  
না কিছু।’

—‘আমাদের একটি বন্ধুর বাবার প্রেস আছে—এতক্ষণে গলা  
শোনা গেল তপতীর—ও টুইর কার্ড করে দেবে।’

টুই গম্ভীর। চোখ ফোলাল, ভাবখান—‘বোঝ একবার ব্যাপারটা।’

—‘তা কার্ড পাচ্ছি কে? আমিও পাবো তো?’

—‘সকল—সকলকে কার্ড দেবো।’ বদান্ততার বান ছুটিয়ে বলল  
টুই। ‘মুনিয়াকেও একটা দেবো, না দিদিভাই?’

জমাদানের মাতৃহীন মেয়ে মুনিয়া রোজ বাণেশর সঙ্গে আসে।  
টুইর বয়সী সে।

মীনাঙ্কী বিরক্ত হল—‘ছি ছি টুই, ওর সঙ্গে আবার খেসড়িসু বৃথি?  
সামনের বছর তোকে বোর্ডিং-এ না পাঠালে চলবেই না।’

—‘মুনিয়ার সঙ্গে খেললে কি হয়? ভাল তো শু।’

—‘ভালো?’ মীনাঙ্কীর রাগ মাত্রা ছাড়াল। ভাস্কর উপস্থিতি  
ভুলতে পারছে না তাই, না হলে কান টানতো মেয়ের।—‘তোমার  
টেডিটা চুরি করেছিল কে?’

—‘মোটো চুরি করেছিল মুনিয়া। কতবার বলেছি না, আমি  
নিজে দিচ্ছি শুকে। তুমি কেবল ভুলে ভুলে যাও মা।’

ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠল, মায়ে মুখ টকটকে। শৈলেন রায়  
হাঙ্কী করতে চাইলেন পরিস্থিতি।

—‘তা চোর না হলো, নোরা যে মুনিয়া এতো মানতেই হবে  
তোকে?’ মেয়েকে কোলের কাছে টানলেন বাবা।

—‘কক্ষণো না।’ সন্তোজ প্রতিবাদ টুইর। মুনিয়া কি পরিহার।  
সানলাইট দিয়ে রোজ স্নান করে, জামাও ফর্সা।

তপতী উঠে ঝাঁড়াল। বোনকে নিয়ে এল কাছে।—‘তুই  
বড় বোকা টুই! বুঝছিল না তোকে ঝাণাতে চাইছেন সবাই।  
সবার প্রথম তো মুনিয়াকেই কার্ড দেওয়া হবে। চল লিষ্ট করি গে।’

টুইর হাত বসে তপতী চলে গেল ঘর ছেড়ে, শোনা যেতে লাগল  
তার গল—‘কি যে সন্দেহ হবে কার্ডটা! সকলের লোভ হবে এমন  
চিঠি পাবার জন্য। গোলাপী রং, সোনালী পাড়—থোকা থোকা  
ফুল—।’

টুইর জন্মদিনের পাটি। তপতীর বার্ষিক-পাটির মত অত  
জম-জমাট নয়। দরকার ‘কি তার। টুই’সবে দশ বছরের হল—  
তার জন্যই পাটি ডাকতে এখনো এক যুগ দেরি। ডাকা হয়েছে  
কেবল অন্তরঙ্গদের। লিলির মা বর্তার সঙ্গে দিল্লীতে, হুতরাং আসতে  
হল লিলিকে। ইচ্ছে ছিল না একটুও আসবার, পিন পিন স্তন্যবায়  
তপতীর সেতারের। জানে এমন হুযোগ কক্ষণো মিস করবে না  
সে। আগে এখানে সেখানে দেখা হয়েছে তাদের মাঝে মাঝে।  
লিলি কিছুটা অকম্পাই করতে আন্তোয়া কলেজে পড়নি গোবেচারী  
মেয়েটাকে। নিজের পরিমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থিতা লিলির হৃৎস্পন্দে ছিল  
না তপতীর কোন ইন্টারফিরেন্সের কল্পনা। কি যে দেখেছে ভাস্কর  
মিত্র ওর মধ্যে, একবারে ক্ষেপে গেছে। কমনসেন্সও বিসর্জন দিয়েছে।  
পায়ে পায়ে জড়ানো বোকা মেয়েটাকে নিয়ে না-ঘুরছে কেন জারগা  
নেই। সবাই চেপে অস্থির ভাস্করের চরমে দেখে। আনসফিক্টকেটেড?  
ইন্সন্যেস্ট? ‘আহা রে! অল্প এসব ভাবনা লিলির মুখ দেখে  
বোঝা যায় না কিছু, ভাষাতে তো নই।’

দেবকী-রমলার হাসাহাসি তপতীর সাজ দেখে। কি ম্যাচ  
হলুদে-সবুজে কাপো মেয়ের। শিববে কোথায়। তপতীর উপদেষ্টা  
তো মীনাঙ্কী রায়। বৃদ্ধি! জানে না কি টয়লেটের কিছু!

অবশ্য বিজ্ঞ ছাড়া আর কোন ভাবের উদয় হল না ওদের  
মনে। ভাস্কর মিথের টেস্ট যে অত লো নয়—জানে ওরা।  
তপতীকে নিয়ে যোবে? আত্মীয় যে। তা ছাড়া বিলেতে বোধ হয়  
থেকে এসেছে বহু কড়া লিকার, দেশী সরবতে মুখ বদলে নিষ্কল  
একটু! দেবকীদের ভয় লিলিকে নিয়ে। সাজ, টাকা বা রূপ  
নয়—কথা। কি যে কথা বলতে পারে লিলি। ওকে সমকক্ষ  
শত্রু করাই যায় না। মনে হয় অনেক উপরে বসে অবজায়  
দেখছে সবাইকে।

বন্ধুত্ব? অসম্ভব। লিলি বোসের বন্ধু কে আছে? বর্ণা  
সোম? হতে পারে—হতে পারে। সেও অমনি উদ্ভাসিক।  
চলে গেছে জার্মানী এক খাড়া নাক, চোখ ডোবানো জার্মান  
প্রফেসর বিয়র করে।

চাওলা, অরুণাশ্রু, গৌতম বন্দ্যো—সব সেবা সেবা ছেলে  
বিকিরে আছে লিলির পায়ে। ভাস্কর? ভাস্কর-ও তেঁা ঘুরছে।  
ভাস্করের প্রতি বেন দেখা যাচ্ছে দেবীর কিছু করণ। ● তবে বলা

যার না, ভাস্কর তো বন্ধু প্রবীর বোসের। সেজ্ঞা ঘনিষ্ঠতা না কি কে বলবে। ওর কি পছন্দ হয় ইতিহাস, বাঙালী ছেলে? নিজে কিছু করার না, পথও ছাড়বে না। বিবতরা চোখে তাকালো সব মেয়ে লিলির দিকে।

সুন্দর গ্রেট। অট্টমস্কীম, শ্রাণ্ডউটচ, পেশ্তাভডানো নরম সন্দেশ। একটু ঘরোয়া দেশী ধরণের পার্টি।—‘মীনাঙ্গী রায় তো বন’ আন্টিস্টাফট নয়’—ফিস ফিস করল মেয়েরা। ক’বছর আগেও শৈলেন বায় ধৃতি পরে বাসে বুলতে বুলতে উন্টাডাডা গেছে ফ্যান্টারী পরিদর্শনে। বিলক্বে গেল তো—সেদিনের কথা।

সুন্দর বাস্তনা হচ্ছিল।—‘তুমি বাস্তাবে না তপতী?’ জিজ্ঞেস করল লিলি।

—‘পারব না বাস্তাবে।’ আভুল পুড়ে গেছে।’ আভুল দেখাল তপতী।

—‘সে কি! আভুল পুড়ল কি করে?’

—‘আলু ভাজছিলাম।’

—‘আলু ভাজছিলে?’ হাসি চাপল অনেক কণ্ঠে দেবকী-রমলায়।

—‘কেন তোমাদের পানটি-হাণ্ডের কি হল?’ জিজ্ঞেস করলেন তপতীর পার্শ্ববর্তিনী মিসেস তরফদার রমলার মা।

—‘পানটি-হাণ্ড।’ সেটা আবার কি বস্তু! একটু ভাবতে হ’ল তপতীকে—ও ঠাকুর বৃষ্টি!

—‘কিছু হয় নি তার মিসেস তরফদার। আমারই ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল আলু ভাজতে।’

চোখে চোখে বিজলী খেল গেল মেয়েদের।

—‘তুমি তো এম-এতে ভর্তি হয়েছ, না?’

—‘হ্যাঁ। এনসিওট হিস্ট্রি।’

—‘ভুলেছি। আচ্ছা এনসিওট হিস্ট্রি কেন তপতী?’ লিলি বলতে লাগল—‘পৃথিবী চলছে, বসলোছে, আর তোমরা এখনো পড়ে থাকবে প্রাচীন যুগে? তার চেয়ে ইংরেজীতে পড়তে কিংবা পলিটিক্যাল সায়েন্স?’

—‘আমার হিস্ট্রি ভাল লাগে। ইংরেজীতে তো আমাকে পারমিশন দিত না। বি-এতে মোটে পাস-মার্ক ছিল। তা ছাড়া আমার সাবজেক্ট হিস্ট্রি যে।’

লিলি বিম্মিত হল তপতীর সারসল্যে। ইংরেজীতে তার অসুবিধার কথা ভুলেছিল লিলি ভাস্করের কাছে, কিন্তু এই পার্টিতে, ফাসন চমকোছে যেখানে আধুনিকতম প্রকাশে—এ কথা স্বীকার করলো তপতী। ও কি জানে না—ইংরেজী জানে না স্বীকার করার একুণি কি বিদ্যপের আলো খেলবে চোখে-চোখে?

একটু দূর ছাড়িয়ে ভাস্কর টুইব সঙ্গে তার সত্তাপাওয়া উপহারগুলি দেখাচ্ছিল, লিলির বিষয় লক্ষ্য করল সে।

—‘তা হলে মডার্ন হিস্ট্রি পড়তে।’

—‘হিস্ট্রি যদি ব্যাকওয়ার্ড সারভেক্টই হয়, তা হলে মডার্ন হলেও সে শোষ কাটবে না তার লিলি।’ হেসে হেসে বলল তপতী।

—‘মডার্ন হিস্ট্রি, তো অন্তত তোমাকে আন্তরিক খবর দেবে।’

—‘কিন্তু আন্তরিক হলে আর পরিত্রা কি করে জগৎজগতের মতো

এসে পৌঁছাল তার খবর দেবে।

সেও তো পুরানো কথাই ভাই। হিস্ট্রি মানেই পুরানো না। তখনও কেবল কম আর বেশি পুরানো নিয়ে। যদি এটা নটেলমেট, নেপোলিয়ানের কলোনিয়াল সিস্টেম পড়তে যি, তবে অশোকের ধর্মবিজয়, কবিদের মহাসাহসি দোষ করলো কি?’

খমকে গেল লিলি। তপতী এভাবে কথা বলতে পারে না কি। কিন্তু আলোচনা আর চালালো না, পারলও না। হঠাৎ এলিয়েটের ওয়েস্টল্যান্ড, পাউণ্ডের কার্টাস, সমঝাতে পারত লিলি, বিশ শতকের মানুষ চলছে কোন দিকে। কিন্তু অপর পক্ষ আগেই যেনে নিয়েছে ইংরেজীতে নানতা। কথা উঠেছে এমন বিষয় নিয়ে, যার কিছু কিছু নাম ঝাপসা মনে হয়, আর সব ব্রান্ড। কথা হস্ত বাহত অগ্রহিক, কিন্তু তক্ষুণি ঘরে চুকল টুইব একদল বন্ধু, বেগুন আর জাপানী-পাখা হাতে—একরকম রঙিন প্রজ্ঞাপতি। ওরা নাচ দেখাবে।

—‘তপতীর সঙ্গে এসব কথায় কাজ কি?’ ফিস ফিস করল দেবকী।—‘বোঝে তো কেবল প্রাচীন ইতিহাস আর আলুভাজা। হয় তো প্রেমে পড়েছে কোন প্রফেসরের সঙ্গে, ইতিহাসের মাস্টার—চাঘের সঙ্গে আলুভাজা যাব মনোরম ব্রেংফার্ম।’

দেবকীর হিটমারে হাসির ঢেউ উঠল ছোট ছোট। লিলি কিন্তু যোগ দিল না হাসিতে। একটু সরে বসে সে তাকালো ভাস্করের দিকে। ও কি সব ভুলেছে? হালছে মনে মনে তপতী লিলিকে চুপ করিয়ে দিতে পেরেছে বলে? লিলি বুঝল যতটা ব্লাট সে ভেবেছিল, ঠিক ততটা নয় তপতী, আর ভাস্করও সে খবর রাখে। মুগ্ধ হয়েছি কি সে? বোনের চুলে ক্লিপ আটকাতে ব্যস্ত তপতীর দিকে তীক্ষ্ণ সমালোচকের চোখে তাকাল লিলি। ষষ্ঠাম তহু। জর্জবিলাস নেই। কোন বিলাসই নেই মুখে, চোখে, কথায়, ইঙ্গিতে। ভাস্করকে মোহিত করবার একবিন্দু চেষ্টাও নেই তপতীর। নেই কাউকেই মুগ্ধ করবার প্রয়াস। মনে মনে ভাবল লিলি—তপতী ভাগ্যক্রমে এমন পরিবারে, পরিবেশে জন্মেছে, যেখানে এখনো বিয়ে দিচ্ছেন অভিবাসকরাই ঠিকুজি মিলিয়ে মোটা মোটা যৌতুক দিয়ে। ভালই হচ্ছে। বেঁচে গেছে মেয়েগুলো কাউকে ভালোবাসবার দার হতে মুক্তি পেয়ে। পাত্রের যৌতুক লিলিদের সমাজেও কম নয়, কিন্তু তাদের রাজী করার ভার পড়েছে পাত্রীদের উপর। স্বয়ংস্ব-সভায় তাই ঈর্ষা-বিদ্বেষের, ঠেলাঠেলি-ছড়াছড়ির আর শেষ নেই।

পার্টির ব্যাপারটা ভাল করেই লক্ষ্য করল মীনাঙ্গী। বুঝল—তপতী তেরে গেল। লিলির সঙ্গে কি তুলনা ওর? তেজী, যাড়-বাকানো আরবী অখীর পাশে ঝাঁড়ে-বসা চন্দনা,—ভালো করে শিস দিতেও শেখে নি।

—‘তোমার মেরের সবকু দেখ। ভাস্কর বিয়ে করবে না ওকে।’

—‘কি বলে ভাস্কর?’—কাগজ হতে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন শৈলেন রায়।

—‘বলবে আবার কি? কেউ পছন্দ করবে এমন মিনমিনে, প্যানপেনে পানসা মেয়ে?’ ক্ষোভে-চুপে ঘর ছেড়ে, বেরিয়ে গেল মীনাঙ্গী।

পানসার ঘরে ছোট পছন্দ আর মা। জিনি নিজেও জানে নি—

মনে মনে ভাবলেন শৈলেন রায়। অতীতের কয়েকটা বছর এসে কাঁড়াল চোখের সামনে। কতদিন আগে—বাইশ? তেইশ—খাক গে। অনেকদিন আগে তপতীর মা এণাকীকে বিয়ে করে এনেছিলেন তিনি, কিন্তু একটুও সুখ পান নি। আজকের মত এতটা অ্যাডভান্স না হলেও, তখনো মেরেরা যথেষ্ট খুল কলেজে পড়েছে, বিলতে গেছে, বিয়ে করেছে ভালবেসে। তাঁরও স্বপ্ন ছিল একটা জীবন-চকল মেয়ে। সব কল্পনা গুঁড়িয়ে, এল ঠাণ্ডা, ভীতু এণাকী। তপতীও হয়েছে তার মত। কিন্তু—বাইশকাল চশমার ওপর দিক দিয়ে অগমন্য দৃষ্টি জানালার বাইরে পাঠালেন শৈলেন রায়। তিনিও ভাল ব্যবহার করেন নি তার সঙ্গে। নির্মম অবহেলা পেয়েছে এণাকী। অসহ্য লাগত ওকে। আর সব বুঝেই নিজে হতে এণাকীও সবে গিরেছিল দূরে। কখনো, কোন ছলে কাছে আসতো না। না, না। মান পড়ল শৈলেনের—একবার খুব কাছে এসেছিল এণা। বাবা মারা গেছেন। পাটনার জৈবরাম জালান হয়ে গেল তার টাকা নিয়ে। কথা হল পাঁচ হাজার টাকা বেশি দিলে, ব্যবসার গুড-উইল থাকবে শৈলেনের। প্রাণান্ত চেষ্টা। টাকা যোগাড় হোল না। বিছানার মুখ গুঁজে পড়েছিলেন শৈলেন। এণা এসে কাঁড়িয়েছিল কাছে। জানতে চেয়েছিল বিপর্যস্ত হবার কারণ। বিহবল শৈলেন এই দ্বিতীয়বার তাকে দিলেন স্ত্রীর অধিকার,—বললেন সব কথা। সমস্ত দিন স্বামীর পাশে বসে রইলো এণা। তারপর জ্বর কবে স্থান-খাওয়া করিয়ে সস্থত করেছিল তাঁকে। হাতে দিয়েছিল ডেলভেটর মেয়ে-খলি। থলি উণ্ড করত বেরিয়ে ছিল—এবার গরনা। বাপের বাড়ির, শশুরবাড়ির পাওয়া সব কলকার। হাতের দুটি চুড়ি ছাড়া স্বামীর ব্যঙ্গসংকেত সব গরনা দিল এণাকী।

শৈলেন সহজে গরনা নিতে রাজী হয় নি, কিন্তু কি স্মরণ হলে তাকে রাজী করেছিল এণা। তারপর ব্যবসা কাঁড়াল,—বড় হল। এণাকী কিন্তু আর কাছে এসে না। এখন সন্দেহ হয়, শৈলেন রায়েব,—বুঝি অবহেলার অভিমানেই দূর রইল সে।

তপতীর দিকে চাইলেই মনে কখন যেন সঙ্কোচ আসে শৈলেন রায়েব। ঠিক সেই বয়সের এণাকী হয়ে উঠেছে তপতী। ওর চোখের মধ্য দিয়ে চেয়ে থাকে ওর মা। বাস্তব হয়ে জানতে চান তিনি—কি, কি দরকার তপতীর।—কিছু না। পেনের কালি ফুরিয়েছে, নেবে বাবার টেবিল হতে। ঠিক অমনি ছিল এণাকী।

শৈলেনের জ-কৌচকানো জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতো—দরকার? দরকার আবার কি। ঘরের কোণে ঝুল জমেছে, পরিষ্কার করতে এসেছে।

তপতী যা চায়, সব দিতে রাজী বাবা। কিন্তু তার চাওয়াটা বোকা যায় না একটুও। মীনাকী অবশ্য ইদানীং তপতীর পুরোপুরি মা হয়ে উঠেছে, আর সব কর্তব্যই করছে। ভাস্কর ছেলে ভাল। কল্যাণী আর সুরমোহন তো চমৎকার। যেতে হবে ওদের কাছে ব্যাপারটার ফরসালা করতে। এ বিয়ে হয় তো হয়ে যেতে কবেই। মীনাকীই হাজারো বাফাল, বলল—‘বোকা না কেন, বিশেষ-খোরা ছেলে। কখনো নিজের পছন্দ না হলে বিয়ে করবে বাপ-মায়ের কথায়?’ তা পছন্দ করাবার ভায় বোধ হয় নিজেই নিয়েছিল, এখন হালে পানি না পেয়ে, স্বামীর শরণ নিয়েছে। আরে। তপতী হল এণাকীর

মেয়ে। সেজেগুজে কোন ছেলেকে আকৃষ্ট করার ইচ্ছাই নেই ওর রক্তে। হয় তো ঠাণ্ডা, মাছের মত ঠাণ্ডা রক্ত ওদের। আর তা যদি না হয় এবং সেটাই সম্ভব বেশি—তবে এমন মানসিক অভিজ্ঞাত্য এই মেয়ের, বার ধারে-কাছেও পৌছাতে পারবে না মীনাকীর চেঁচা।

উঠে পড়লেন শৈলেন রায়। সমস্ত দিন আজ বাড়িতে। ক’টা বেজেছে? সাতটা? সবে সন্ধ্যা। ‘মধু ডাইভারকে বল গাড়ি বের করতে।’

গাড়ি বাসবিতারী অভিনিউতে পড়তেই দেখা গেল তপতী, ঠেটে ঠেটে যাচ্ছে ট্রায়ের লাইন ধরে। ‘গাড়ি থামালেন শৈলেন রায়।

—‘কোথার যাচ্ছ? চল নামিয়ে দেব।’

একটু ইতস্তত করে গাড়িতে উঠে বসল তপতী।

—‘আমি মনোহরপুত্র—মীরার ওখানে যাবো।’

—‘মীরা? ও, তোমার সেই বন্ধু? সেও কি এম-এ পড়ছে না কি?’

—‘না না। ও কাজ করছে টেলিফোনে।’

—‘বেশ! বেশ! আজকাল আসে-টাসে তোমার কাছে? কাল দেখলাম না তো। বল নি আসতে?’

—‘বলেছি।’ একটু হাসল তপতী।—‘কিন্তু এলো না কেন।

—অনেক দিনই কেন আসছে না, সেই খোঁজ নিতেই যাচ্ছি।’

মনোহরপুত্র। মীরার বাড়ির সামনে কাঁড়াল গাড়ি, মীরা বাইরেই ছিল, বেঁদে ফেলল তপতীকে দেখে।

—‘কি? কি হয়েছে মীরা?’ তপতী হুঁহাতে ধরল মীরাকে। শৈলেন রায় বাস্তব হয়ে নেমে এলেন গাড়ি হতে।

—‘মীরার বাবাব খুব অসুখ। লো প্রেসার। অজান হজে গিয়েছিলেন। ডাকনক খাওয়া অবস্থা। হয়তো বাঁচবেনই না।’

—‘পাগল!’ বললেন শৈলেন রায়—‘কত বেরিয়ে গেছে প্রেসারের ওয়ুথ। কে দেখাচ্ছে? মোড়ের ডাক্তার গুহ? রায়-চৌধুরীকে দেখাও নি কেন! এসব ব্যাপারে রায়চৌধুরী অব্যর্থ। যাও, বাও, তাঁকে খবর দেবার ব্যবস্থা কর। ও! আচ্ছা, আচ্ছা! এই বীরেন, চল ক্রীক রো, ডক্টর রায়চৌধুরী।

তিন মাস যমে-মানুষ টানটানি। অবশেষে জরী হল জীবন। কৃতজ্ঞতায় থরো-থরো হাত হুঁখানির দিকে চেয়ে, পায়ের কাছে আনত মেয়ে দুটির মাথায় হাত রেখে, বুড়ো বয়সে চোখে জল আসতে চায় আর কি। শক্ত হলেন শৈলেন রায়।—‘বাস, বাস। বলেছিলাম—সেবে যাবেন। সব পাগল, এখন মাকে খুব করে গুম পাড়াও তো।

আস্তে আস্তে সূস্থ হতে লাগল অনাদি সোম। জরী, মীরা, অলকের অন্নবয়সী হাত তাকে টেনে তুলতে লাগল মৃত্যুর অন্তল গহবর হতে। রকমারী ওয়ুথ, পুষ্টির খাবার। উঠে বসলো অনাদি সোম। বাইরে বেকল, অফিসে।

—‘মা’। সন্ধ্যাবেলা মাকে নিজের ঘরে ডেকে নিল জরী।—

—‘মা! শোন যা বলছি, বেশ ভাল করে ভেবে দেখো। মেসোমশাই—তপতীর বাবা, বলছিলেন ওঁর অফিসের ম্যানুজার চলে যাচ্ছে ‘হব অ্যাও হক্’ এ চাল পেয়ে। বাবা সেখানে কাজ

করলে খুব ভাল হয়, উপকার হয় ওর—উপকারটা অবশ্য আমাদেরই।’

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাসল জয়ন্তী। সুরমা চূপ করে রইলো। দেখা মীরার উদ্দেশ্য। মনে মনে বুক তার কারণ। তপতী মীরার বন্ধু। খুব বন্ধু ছোটবেলা হতে। আর্থিক বৈষম্যের প্রশ্ন করণো ওঠে নি। তপতী তো অশ্রুত বোকেই না, মীরা বুকলেও বন্ধুর চেয়ে নিজেকে ছোট ভাববার সময় পায় নি। তাদের ঘরই তপতীর ক্লাব। মীরা বালীগঞ্জে গেলে তারও সমাদরের অভাব ঘটে নি কখনো। বাবার অস্থির সময় অর্থ আর উৎসাহ দুই দিয়েই সাহায্য করেছেন শৈলেন রায়, কিন্তু তিনি মেয়েদের মোসামশাই হয়ে এসেছিলেন। তাঁর অফিসে অনাদি ঢুকলে, মীরা তপতীর বাবার কর্মচারীর মেয়ে হয়ে বাবে।

মা আর বোন দুজনের দিকে চেয়ে হাসলে জয়ন্তী।—  
‘তুমিও বন্ধি মীরার ভাবনার পড়ে গেলে?’

মীরার কপালের ঝুলে-পড়া চুলের গুটিটা সরিয়ে দিতে দিতে জয়ন্তীর দিকে চাইলে সুরমা।

—‘তা, একই ভাবতে হচ্ছে ‘তা। তুই ভাবছিস না?’

—‘বা! ভাবনারই কথা যে, তাই তো মোসামশাই বাবাকে না বলে আমাকে—’

—‘দিদি শোন,’ আবেগভরা ডাক মীরার।

—‘দরকার কি বাবার পুর্বনো অফিস ছেড়ে? মায়না কম, কিন্তু ওরা তো খাটুনি কমিয়ে দেবে কলছে। ধার-টার স্তরে শোধ হয়ে গেলে, আমাদের সবার মিলে তো অনেক টাকা।’

—‘অনেক টাকা!’ মনে মনে ভাবল জয়ন্তী। দাদুর অধিমু্যাকারিতার দরুণ ধার হয়েছিল। তা শোধ করতে প্রত্যাকবার হত নতুন ধার। তাদের চাকরী পাবার পর নতুন ধার হচ্ছে না সত্য, কিন্তু পুরানোটা শোধ হতেও অনেক দেরি। শৈলেন রায় বাবাকে মিতেন সাতশো টাকা। বেঁচে যেত পরিবারটা। মিথ্যা আশ্বাসমানের অভিমান কিছুতে ছাড়া যাবে না জেনেও জয়ন্তী কথাটা মাকে বোঝাতে চেয়েছিল।

মায়ের মুক মুখে তার মনের কথা পড়ে নিল সুরমা। এট দারিত্র্যের মকড়মি আর সইতে পারছে না জয়ন্তী। সে নিজেরও তো অসহ্য অভাব হতে মুক্তি চায়, কিন্তু মীরার মোসামশাই ওর বাবার সাহেব বলে ত’ বড়ই খাপস লাগবে। সুরমাও যে তা হলে শৈলেন রায়কে আর হাসিমুখে নারকোপদর সন্দেশ, জলখাবার ধর দিতে পারবে না, বসতে দিতে পারবে না রান্নাঘরের দরজার মোড় পেতে।

—‘কেমন লাগলো প্রবীরকে?’ বেড়াতে যাবার দু’দিন পর, লাইব্রেরীর মাঠে, কানার কেয়ারীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তপতীকে জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—‘ভালো, খুব ভাল। মীরারও ভাল লেগেছে।’

উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিল তপতী।

—‘একটি দিনের আলাপ আর এত বড় সার্টিকিট হই বন্ধু। প্রবীরের জোর ভাগ্য। কি বল?’

—‘কি বললাম আমি?’

মুখ নীচু করল তপতী। ভাস্কর বৃষ্ণ—সে ভাল বলেছে, তার বিশ্বাসের আলেয় উজ্জ্বল হয়েছে প্রবীর। আলোদা করে বিচার বিবেচনার ধার-কাছেও যেসে নি হই বন্ধু। মীরার বাবার অস্থির গোলমালের দরুণ মীরার সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় ঘটাতে দেবি হয়ে গেল। এখন সব বাধা কেটে গেছে। বিরতে এখন রাজি অনাদি সোম। পাত্র তো প্রস্তুতই ছিল, বিশ্ব ঘটাল পাত্রী নিজে। বলল—অপেক্ষা করে দেখা থাক। একদিকের বাধা যখন কেটেছে, দেখা থাক আর একদিকের বাধা কাটে কি না। কিন্তু সে বাধা কাটিতে যে বড় মুশিল তা ভাস্কর জানে ভাস্কর। তপতীও আনন্দ করেছে কিছু কিছু। অগত্যা যা করবার মত হাতে ছিল, তাই করল ভাস্কর। মীরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল প্রবীরের। একটি দিন তারা কটাল সোনারপুরের ঝোপঝাড় ঘুরে, শ্রাণ্ডউট, ডাব আর সন্দেশ খেয়ে। কিন্তু অল্প মনে ভাবছিল ভাস্কর, আর এক কথা, তার প্রতি তপতীর এত বিশ্বাস জন্মাবার কথা!

—‘কি ভাবছেন?’

—‘ভাবছি কি জানো? সার্টিকিট দেবার দায় অনেক। তোমরা প্রবীরকে ভাল বলই খেমে গেলে, গোলমালে পড়লে দেখিয়ে দেবে আমাকে, আর তখন কৈফিয়ৎ দেবার দায় আমার।’

—‘কৈফিয়ৎ কিসের?’ চোখ তুল কানকে চাইল তপতী।

—‘প্রবীরের ভালদেব। অস্তবিতার পড়লেই জয়ন্তী সগোষ্ঠী চেপে ধরবে আমাকে। তখন?’

—‘আপনার সার্টিকিট নিয়ে তবে কি জয়াদি’ প্রবীরকে ভাল বেসেছে? কেউ কি তা বাসে?’

—‘না, না। আমি ঠিক ও ভাবে’—

—‘কিছু ভাববেন না আপনি। আপনি জানেন প্রবীর ভদ্র মিশবার মত, আর তাই তো বলেছেন আমাদের কাছে। জয়াদি’র কি আসে যায় কেউ প্রবীরকে ভাল বা মন্দ বললে? ও প্রবীরকে ভালবেসেছে কারো সাহায্য ছাড়া, তাই সব ভাল মন্দের দায় ওর। জয়াদি’র কক্ষণে অতুল সে ভাগ নিতে ডাকবে না।’

অনেক কথা আঁচকাল বলে তপতী। বৃদ্ধির কথা, যুক্তির কথা। লজ্জা পাবার, আড়ষ্ট হবার দিন কেটে গেছে। প্রায় তিন বছরের চেনা। মাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে তপতী, ভাস্কর গিয়েছিল তার বার্ষিক প্যাঁততে। আর এখন এম-এ পরীক্ষা এসে গিয়েছে—সামনের নভেম্বরে।

—‘এই, ম্যাগনোলিয়া!’

গেটের কাছে গিয়ে ছুঁটা ম্যাগনোলিয়া কিনল তপতী। ঘাসের উপর বসল পা ছড়িয়ে। অগত্যা বসতে হল ভাস্করকেও।

—‘ইস্! ঠাণ্ডা শিরশির করছে শীত।’

—‘কি দরকার ছিল রান্ধা হতে ম্যাগনোলিয়া কিনবার? রেস্টোরার খাওয়া যেত স্ট্রাফড পাইন-আপেল।’

—‘বিক্রী বেস্ট রেন্ট।’ অক্লেশে জানাল তপতী।

—‘বিক্রী?’ হতবাক হল ভাস্কর।

—‘বিক্রী নয়? একপাল লোক, তাও আবার সবাই চেনা

## শাশ্বতী

অবিকল লিলি আর দেবকীর স্বর নকল করল তপতী। ভাস্কর এমন জোরে হাসল যে, গাছে জল দিতে ব্যস্ত মালীরা ফিরে ফিরে দেখল।

—‘হাসছেন কেন?’ কাঠিটা ছুড়ে ফেলল তপতী দূরে।—‘বা মুন্সিগল পড়েছি আমি, বিপদ যাকে বলে।’

—‘ব্যাপারটা জানতে পারি?’

—‘কি করবেন তা হলে?’

—‘চেষ্টা করব মুন্সিগল আসানের।’

—‘তা আর হয় না। এ আপনার ক্রাফের কম্বন্ধনে বাজনার সঙ্গে উজিড়ি-লাফানো নয়।’

—‘তা তো নয়ই। এ হোল প্রাচীন ইতিহাস। যাকে বলে শিলা-তত্ত্ব, মাটি খুঁড়তে হবে। কোদাল আর গায়ের স্কোর চাই।’

—‘দখন রাগাবেন না। পরীক্ষা দোরে, আর সব বইগুলোই নাকি ঠিক পাইড। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।’ ঘাসের শিব ছিড়ে গায়ে কাটলো তপতী।

—‘আঃ! ওগুলো মুখে দিচ্ছ কেন! লাইব্রেরিয়ানের কাছে যাও। একটা ব্যবস্থা হবে।’

—‘ছাই হবে। কি করবে লাইব্রেরিয়ান? ছেলেকুশে ভীষণ ঢোলক আর স্বপ্নের।’

—‘তা হলে যাও ডক্টর দাশগুপ্তের লাইব্রেরিতে। ঠিক কালেক্সন তো সাক্ষিসিফট শুনেছি।’

—‘মার তান সাক্ষিসিফট, কিন্তু জালাপ নেই যে ভাল। আর ঠর সেই বই চুরি বাবার পর হতে একটা মাছিও জ্যালাউ করছেন না লাইব্রেরিতে।’

—‘সেজ্ঞা ভাবনা নেই। দাশগুপ্ত বাবার বন্ধু। আমি জামিন থাকব বইয়ের জ্ঞান।’

—‘কত জনের জামিন করেন আপনি? প্রবীর, আবার আমার জ্ঞানও। গিলি ফেপে যাবে যে শুনে।’

উঠে পড়ল তপতী। শাড়ি কুঁচকে গেছে, ঘাস লেগেছে। একটু ঝেঁড় নিল।

—‘লিলি হঠাৎ ফেপতে যাবে কেন?’ সকেটুকে জিজ্ঞেস করল ভাস্কর।

—‘আগ! জানি না যেন।’

—‘কি জানো?’

তপতীর লম্বা বেগী টেনে দিল ভাস্কর।

—‘এই নিয়ে তিন দিন চুল টানলেন, চারদিনের দিন রাগ করবো।’ জানাল তপতী।

—‘এই নিয়ে দশবার বললে—রাগ করবে। এগাণে বাবের বার অপমানিত বোধ করব কিন্তু।’

হুঁজনের মিলিত হাসি।

গাড়িতে বসে যেতে যেতে বলল তপতী—‘আচ্ছা, রোজ নিতে আসছেন কেন বলুন তো? আমি কিন্তু একাই যেতে পারি। লিলি নিশ্চয় রাগ করছে সম্ভাব্যেলায় আপনাকে আটকাবার জ্ঞান। বিয়ে কবে আপনাদের?’

—‘বিয়ে? ও! হ্যাঁ। দেখি কবে হয়।’ বললো ভাস্কর।

রাস্তার চূপচাপ চোখ পেতে তপতী ভাবল লিলির কথা। কি সুন্দর লিলি! লাল জর্জেট দেখায় যেন হেলসিংস্‌র আখলেটের হাতের লাল মশাল।

—‘তপতী!’ চমকাল তপতী। একহাতে স্কিরাংগি ধরে অঙ্ক হাতে নিজের দিকে তার মুখ ফেরাল ভাস্কর।

—‘লক্ষ্মীটি! আজ্ঞেবাজে কিছু ভেবো না এখন। পরীক্ষা সামনে। ভাল করা চাই।’

তপতীকে বাড়ি নামিয়ে দিয়ে ভাস্কর একটু গাড়ি চালানল কাঁচা রোড ধরে। তপতীর নীরবতার কারণ ঠিকই বুঝেছিল সে। তার নিজের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব কেটে গিয়েছে, কিন্তু ভাস্কর জানে, তবু অপেক্ষা করতে হবে। সে ঘর বানিয়ে আসার সাক্ষিহেছে কিন্তু তার বধুর বরণমালা এখনো রাখা হয় নি। সাদা জেগেছে, ফুল তোলার আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু ঠিক লগ্গি আসে নি এখনো। আজ্ঞা তপতীর কুমারী মনের বেশের ভাগ জুড়ে রয়েছে ছাত্রীটি। আগের সে নিষ্ঠা নেই সত্য, মাঝে মাঝেই বিক্ষিপ্ত চিন্তের মাঝখানে এসে গাঁড়োচ্ছে কেউ, তবু ধুক জাগে নি টঙ্কার। যেদিন জাগবে—ইতিহাসের পাতা, পরীক্ষা, সব ছেলেমাছির পড়ে থাকবে। এক বেগীমাছির কুমারী বাহুবন্ধে ধরা দিতে ছুটে আসবে। তার দেহিও খুব বেশি নেই।

লিলির কথা মনে পড়লো ভাস্করের। শতদলে বিকশিত কনক-পদ্ম। লিলিকেও ভাল লাগে। ভাল লাগবার মতই যে সে। উৎসবের রাণী লিলি। কিন্তু বখন বহুবিকৃত কর্ণধারে স্নাত্তি জাগে, ক্রাধ, লম্বা ডাইড—কিছুতেই মন ভরে না, তখন যে মেয়ে এসে পাশে গাঁড়ো—সে তো লিলি নয়, তপতী।

গাঁড়ালো তপতী ভাস্করের পাশে নিজের স্থানটি নিয়ে, আর সেকথা জেনে চমকাল।

ইতিহাসের পাতার ময় মনকে নাড়া দিল মীরা।

—‘দিন দিন তুমি দেখতে বেশ চচ্ছিস তপতী।’

—‘বেশ চচ্ছি? মানে? পরীক্ষার বাঁকি কদিন জানিস? বেশ হবারই সময় এখন। কইদিন সাবান পুস্ত মাখছি না ভাল করে।’ বকণ মুগে গলে হাত বোলল তপতী।

—‘ভাস্কর নাকি তোকে ভীষণ শ্রদ্ধ করছে। অফিস ছাড়া সব বন্ধ তার?’

—‘ভাস্কর? আমাকে? হ্যাঁ।’ ছেলে ফেললো তপতী, আর তক্ষুণি বুঝল কি হয়েছে তার; আবে। কবে? কখন? একটুও তো টের পার নি তপতী কবে হতে তার সব সশর কেটে গেছে। নাঃ। মার্জার হল সুব। কবিতা নয়, ফুল নয়, কান্ধন মাস পুস্ত নয়, শ্রাশনাল লাইব্রেরীর বইয়ের স্তূপে বসে, ডক্টর দাশগুপ্তের নোট নিতে নিতে একেবারে ভালবেসে ফেলেছে সে ভাস্করকে।

—‘দিদি বলছিল—ভাস্করের সঙ্গে নিশ্চয় তোার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সব সময় দেখা যাচ্ছে তোরা একত্র।’

—‘জরাদি’ দেখেছে? ও। প্রবীর বোস বলেছে বুঝি?’

প্রবীর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—লিলি।

# ভ্রম দীপ্ত

## ব্রজেননাথ

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতভূমি দীর্ঘকাল পরগণনিত থাকিলেও তাহার জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক জগৎশীলনের স্বাধীনতা ও বিশ্বব্যাপী স্ফুর্তি কোন শক্তিশালী কোনকালেই বোধ করিতে পারি নাই। পৃথিবীর হৃৎকণ্ঠ দেশ ছাড়া ভারতের সভ্যতা ও সাংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য অজ্ঞাত দেশের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। ইতিহাসের আলোকশিখার দেখা বাইতেছে শুধু অতীতে ভারতের সজ্জনতা দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতির পরম পবিত্র বাণী বহন করিয়া পাড়ি জমাইতেছেন দেশ-দেশান্তরে, ভিন্ন দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেছেন ভারতবাণী, দীক্ষিত করিতেছেন ভারতের মহামিগনমস্ত্র পৃথিবীর অগণিত নরনারীক। এ দেশের শাশ্বত সভ্যতার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সঙ্গ্রাম করিয়া অর্পণ করিয়াছেন পৃথিবীর অসংখ্য মণীষী, চিন্তানায়ক।

ভারতের বৃক্ষ এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান ঘটনাবলি বহু বহিঃ গিয়াছে কত সাম্রাজ্যের পতন-উত্থান কত নগর-জনপদের পতন-উত্থান, কত সমাজের আকর্ষণ-নিরাক্ষর, তাত্ত্বিক উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ষিক শিকার, সন্ধ্যা, তুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, কিন্তু জ্ঞানচর্চার সেই দারাবি কোনপ্রকারে ছিন্ন হয় নাই বরং সময়ের অগ্রগমনে তাহা উজ্জল বস্তু হইতে বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সমাজের প্রভাবশ্রুতি চিন্তানায়কদের চিন্তাধারা এই সমগ্র ভারতের মনীষীসকলকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকে।

আমাদের জাতীয়জীবনে উদ্বিগ্ন শতাব্দী আদিগড়িল এক নবতর জীবনানন্দের বাণী বহন করিয়া শিক্ষা, দীক্ষা, সাংস্কৃতি, সমাজবিপ্লব, রাষ্ট্রনেতৃত্ব সকল দিক দিগন্তে উদ্বিগ্ন শতাব্দী এক নতুন যুগের স্বপ্নাবলম্বন করিয়াছিল। অগোচর পটভূমিতে যেন

এক বসন্ত ইমারত গড়িয়া উঠিল বর্তমানের মালমশায়া। এই সময়ে জ্ঞানগগনে দেখা দিলেন অনেকানেক উজ্জল তার—ইহাদের আশোকধারার অস্তরকার, কৃদাস্থ্যের এবং শূন্যতার আবসান ঘটয়া পূর্বপ্রাপ্তির এক পরিপূর্ণতার জাতীয় জীবনের ভাগ্যাকাশে যেন এক

সারিতে উপনীত করিল বিদেশের বৃক্ষ ভারতীয় মহিমার প্রচার ও ভাষণে পোষিত হইল বাহাদুরের কল্যাণে, ভারতের গর্ব ও গৌরব বিবর্ধনে বাহাদুর গ্রহণ করিলেন এক বিরাট ভূমিকা—দর্শনাচার্য ব্রজেননাথ সেই তালিকায় নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা একটি অবিমলোদয় নাম।

আমাদের দেশের বেদে ও উপনিষদে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যোতিতে

সমুদ্ভাসিত যে ঋষিকুলের বিবরণ পাঠ্য— ব্রজেননাথের মধ্যে যেন তাঁতাদেরই ছায়া দেখা যায়। সনাতন ভারতের সেই তপোবন সভ্যতার, সেই শাস্ত্র, সরল, অনায়াস জীবনধারা, সেই জ্ঞানের দৃশ্যের তপস্যা যব কিছুই যেন পুনরুজ্জ্বলিত এ যুগে যাঁরা ব্রজেননাথের মধ্যে, সুতরাং সে দিক দিয়া আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, ব্রজেননাথ সর্বতোভাবে ভারতের স্মরণীয় সভ্যতার নবযুগের বার্তাবহ, সেই গরিমামণ্ডিত ত্রীতথ্যে যোগ্যতম ধারক ও বাহক।

তাঁহার জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, মনীষার অনন্যত্ব এবং পাণ্ডিত্যের সীমানাহীনতা কি একমাত্র তাঁতাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, শুধু এই জগৎই কি বৃন্দবনের ঘরে ঘরে আজও তিনি গুজা পাঠিতেছেন শুধু কি এই কারণেই—তাঁহার এই শতবর্ষ পুতিতে তাঁতার উদ্দেশ্য শ্রদ্ধার কথা সাক্ষাৎই আছে?—ইহা সম্পূর্ণ নয়। ব্রজেননাথের একটি খণ্ড পণ্ডিত্যমাত্র। ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার এক অপূর্ণ সমগ্র ঘটনাছিল তাঁতার মধ্যে, তাহারই ফলে তাঁতার নিকট হইতে দর্শনের এক অভিনব ভাষা পাওয়া গিয়াছে। ব্রজেননাথ এ যুগের ফসল, বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের সাংস্কৃতিক সংযোগ কপিল, কণার, জৈমিনি, বাস, ক্যাট, হেগেলের যুগের মত কঠোর



মনীষী ব্রজেননাথ শীল

নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের ভগ্ন সন্নিবেশে অনন্ত আগ্রহ লইয়া দৃষ্টি নাবিকের মত লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন অচার্য ব্রজেন, ডুব দিয়াছিলেন গভীর হইতে গভীর, তাহার অস্তর অস্ত হইতে আহরণ করিয়াছেন মুখো মুখে রক্ত, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত তাঁতার প্রগাঢ় পরিচয় সত্ত্বেও বারেকের তরে কোথাও কখনো তাঁহার দ্বারা



করিয়েছেন সানসে, কিন্তু তাহাকে স্বীকৃতি দিতে বাইরা কখনও প্রাচ্য দর্শনকে কোথাও তিনি লঘুমান দেন নাই। মনে-প্রাণে তিনি প্রাচ্যই ছিলেন, এই স্বাতন্ত্র্য তিনি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। বলিয়া তাঁহার মধ্যে দুই দেশের ভাবধারার সমন্বয় এত সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিয়াছিল। প্রতিভার সন্তুর্ভাগ্য উপনীত হইয়াও শুধু আপন সাদনাতাই নিরন্ত ছিলেন, দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বর্তীয়া সঞ্চা-  
হিনি কখনও উদাসীন হন নাই শিক্ষাদানের মহান ত্রুটি তিনি তদা-  
তাৎপর্য ফলে আমরা পরবর্তীকালে অগণিত দার্শনিক পণ্ডিতকে  
আমাদের মধ্যে লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছি বীতানের বিবর্তিত  
আমাদের পিপাসুমনকে নানাভাবে পূর্ণ করিয়াছে।

আচার্য শীলের পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন বা তাহার মান নিকপণ  
কিছু ভাষার সাহায্যে বা কয়েকটি বিশেষণের প্রয়োগে করা সম্ভবপ-  
নয়। ব্রজেননাথের সমশ্রেণীর কোন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া তাঁহার  
পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন অল্পের পক্ষে অসম্ভব। এ যুগের সাংবাদিকত্বের  
শিরোমণি স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ একদা কথাপ্রসঙ্গে  
আমাদের বলিয়াছিলেন—“ব্রজেন শীল কারো সঙ্গে যদি এমন দুটো  
সাংসারিক গুঁথ-দুঃখেরও কথা কইতেন, তাহাও মধ্যে খিঁচিস দেখার  
অনেক উপকরণ থাকত”—এত স্বল্পপরিসরে ব্রজেননাথের অগাধ  
পাণ্ডিত্যের এত সুন্দর ব্যাখ্যা। সমগ্রচর শোনা যায় না।

ব্রজেননাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বিদেশের পাণ্ডিত্যমাজে  
ভারতীয় মনশীলতা ও চিন্তাধারা সঙ্ক্ষে সচেতনতা আনিয়া দেওয়া।  
এ কাজে যদিও ব্রজেননাথ একমাত্র মাম নন তথাপি একটি বিশেষ  
গুরুত্বপূর্ণ নাম—যে নাম বারংবার এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও মহানদের

সহিত উল্লিখিত হওয়ার দাবীদার। একটি সময় আসিয়াছিল যে সময়ে  
ইয়োরোপে নতুন করিয়া ভারতীয় গৌরবের প্রচার অসম্ভব হইয়াছিল,  
ইয়োরোপের জনসমাজে সাময়িকভাবে সেই সময়ে ভারত সঙ্ক্ষে ধারণা  
অসুবিধাপূর্ণ বা শ্রদ্ধার স্পর্শযুক্ত ছিল না। ভারত ইল্যাপ্তের  
পদানত—এই পণ্ডিতেরই প্রদেশ সেদিন ঐ মহাদেশের নিকট অধিকতর  
পরিচিত ছিল—ভারতের মহান সন্তানরা সেদিন আবার নতুন করিয়া  
ভারতের ভাবধারা ও শাখত বাণীর প্রচার শুরু করিলেন। তাঁহাদের  
কবিতা রচনায়, বাণীতায়, গবেষণায় এবং অবদানের মধ্যে ভারতীয়  
সভ্যতা আবার নতুন রূপে, নতুন দীপ্তিতে, নতুন মহিমায় আত্মপ্রকাশ  
করিতে থাকিল। ইয়োরোপে অথবা বিশ্বে প্রত্যক্ষ করিল যে  
প্রশাসনের দিক দিয়া ভারত পুরাতন হইলেও তাহার সাংস্কৃতিক  
এবং রাষ্ট্রমত ইয়ার উজ্জ্বলকারী। বিদেশের সমাজ জননী  
তদাত্মক অবলুপ্ত মর্যাদার পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রজেননাথ প্রমুখ  
দেশের পূজ্য সন্তানগণ যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান  
করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং অমরত্বের  
বীজ বাল্যেও অকৃত্রিম হয় না।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁহার গৌরবাক্স জীবনের শতবর্ষ পূর্তি  
ফিল। মহানগরীতে ভাবগভীর পরিবেশে তাঁহার শততম জন্মদী  
উদ্‌যাপিত হইল। তাঁহার দ্বারা অমূল্যরূপে করিয়া এবং তাঁহার  
প্রজ্ঞার রশ্মিতে দ্রাভ হইয়া এ কালের জ্ঞানতাপসসকল প্রতিভা এক  
নবদীপ্ততার উদ্‌গমন করুন ও ভারতীয় দর্শনের এক নবতর ভাষা  
রচনা করুন এই কামনা জানাইয়া এই জ্ঞানতপস্বী আচার্যের উদ্দেশে  
আমরা আমাদের প্রার্থনা অর্পণ নিবেদন করি।

## রামেন্দ্রসুন্দর

বিষয়বস্তু বস্তুভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ও শ্রীকৃষ্ণ  
ইতিহাসে যে কয়টি নাম একতারা দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া

রহিয়াছে, বাঙলা ভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধির সাধনায়  
বীণার জীবন উৎসর্গিত, সাহিত্যের নতন  
ধারা অমূল্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—  
পূর্ণাঙ্গীক রামেন্দ্রসুন্দর ঐক্যবীর্য নাম সেই  
তালিকার একটি অবিচ্ছেদ্য নাম।

১৮৬৪ সাল একাধিক শক্তিময় সন্তানকে  
উপহার দিয়াছে। সেদিক দিয়া ১৮৬১র  
পরেই তাহার স্থান। ১৮৬৪ সালে ভ্রমগ্রহণ  
করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে যে বরণীয় বাঙালী  
সন্তানরা অভাবনীয় কীর্তির স্বাক্ষর রাখিয়া  
আপন আপন অমরত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত  
করিয়া গেলেন তাঁহাদের সখ্যা নগণ্য নয়।  
আন্তোয় মুখোপাধ্যায়, ব্রজেননাথ শীল,  
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ক্যারোদপ্রসাদ বিজা-  
বিনোদ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, কবি কামিনী  
বায়, লেডী অবলা বসু প্রভৃতি সেই তালিকায়  
এক-একটি উজ্জ্বল নাম। এ কারণে ১৮৬৪  
সালের নিকট আমাদের যুগের সীমা নেই।



রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন ও স্বতন্ত্র ধারা অমূল্যরূপে  
করিয়াছিলেন। গতাহুগতিকতার অশ্রয় তিনি অবলম্বন করেন নাই।

তিনি সেই পথ অমূল্যরূপে করিয়াছিলেন যে পথে  
তাঁহার পূর্বসূরী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ছিলেন  
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাঙলা সাহিত্য বিজ্ঞান-  
ভিত্তিক রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের অবদান  
অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান  
সঙ্ক্ষে বাবতীর জিজ্ঞাসা, শাশয় নিয়ম,নে,  
প্রাক্কলভাবে বিজ্ঞানের জটিল দুর্ভূত তত্ত্বগুলির  
ব্যাখ্যান তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্যের  
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাব্যবস্থা।  
ইহার ফলে সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান  
সঙ্ক্ষে বাথের কৌতুহল, আগ্রহ বাড়িয়াছে  
এবং এই বিজ্ঞানসচেতনতা তাহাদের মনের  
উপর যে ছাপ ফেলিয়াছে তাহা সুফলই  
ফলাইয়াছে। জটিল দুর্ভূত তত্ত্বের জাল কাবছ  
বিজ্ঞান-গম্বায়ে সাহিত্যভূমির উপর দিয়া  
প্রবাহিত করা ইয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দর—এ বিষয়ে  
তাঁহার কৃতিত্ব ভগীরথ অপেক্ষা কোন অংশেই  
নয় নৈয়। পরবর্তীকালে দেখা গেল একাধিক

গুণীযুক্তি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সমন্বয় ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিকে যত্নবান হইলেন। কিন্তু যখন রাখিতে হইবে যে, এ বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর খ জল্প করেকজন ছিলেন অগ্রদূত।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস যেমনই বিচিত্র তেমনই চিত্তাকর্ষক। যুগে যুগে বিভিন্ন গুণী কুশলী হাতের স্পর্শে যেভাবে তাহার সংস্কার ও নবরূপায়ণ ঘটিয়াছে তাহার কাহিনী যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই অননুসাধারণ। এই কুশলীদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও অন্ততম। বাঙলা ভাষার পদ্ধতি মোচন করিয়া তাহাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তোসার ক্ষেত্রে তাহার অবদান অসামান্য।

সাহিত্য ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণবস্তু। তিনি মর্মে মর্মে অমূল্য করিয়াছিলেন সাহিত্যই জাতির প্রাণ। সাহিত্য, ব্যতীত একটি জাতি কখনও প্রাণধারণ করিতে পারে না। সাহিত্যের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগঠনে ও পরিচর্যায় তাই তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের মাধ্যমে একটি পরম শ্রীতি ও ঐক্যের বাণী প্রচার করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আর একটি দিক সম্বন্ধে উল্লেখ না করিলে আলাচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে ইংরেজ শোষণে ভরজিত বাঙালীজাতির মুক্তির এক নব দিগন্তের দিক নির্দেশ দিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পাঁচ সালের জাতীয় আন্দোলনে তিনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সম্মুক্ত করিয়া জাতির মুক্তিযজ্ঞকে সফল করিয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বুঝি বলেন যে, শুধু বহুতা ও সভাসমিতির দ্বারা উদ্ভ্রাণ লিঙ্গ হইবে। তিনি অবলম্বন করিলেন ভিন্নতর পথ, মাতৃপুত্র্য। তিনি প্রথম মস্তোদ্ধারণ করিলেন—‘ময়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই’—সেই মন্ত্রে উদ্বোধিত হল সারা বঙ্গদেশ। বাঙালী উদ্দীপিত হইল এক অভিনব জাতীয় চেতনায়, রামেন্দ্রসুন্দরের নেতৃত্বে বাঙালী মুক্তিযজ্ঞে নৃতন করিয়া দীক্ষিত হইল। বড়লাট কার্জনের অসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বিক্ষেপে বাঙালী জনগণের মনে বিদ্রোহের চেতনা জাগাইয়া বাঁহারা দেশের মুক্তিযজ্ঞ রূপ দিয়া গিয়াছেন রামেন্দ্রসুন্দরের নাম তাঁহাদের মধ্যে উজ্জ্বল। প্রকৃত বিদ্রোহ বলিতে যাগা বোকার ইহারা সেই বিদ্রোহই পরিচর্যাকার। বিদ্রোহের নাম অনর্থক উপদ্রব তাঁহারা প্রদান করেন নাই, তাঁহাদের নির্দেশিত বিদ্রোহ জাতীয় জীবনে এক বিরাট ও মহৎ পরিণতি লইয়া দেখা দিয়াছে। পরবর্তীকালের মুক্তি যোদ্ধাগণকে দিয়াছে শক্তি, জোগাইয়াছে প্রেরণা। ইংরাজের অবিচার, ভীতির

দিয়াছিল সে মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল নয়, পাঁচ সালে সারা বাঙলাবাসী যে জাগরণ সূচিত হইয়াছিল, জাতীয় ঐক্য ও সাহিত্যের যে বিকাশ দেখা গিয়াছিল, যে সম্ভবত আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তুতিপূর্ণ শুধু হইল তাহা সময়ের অগ্রগমনে বিরাট পরিণতিলাভ করিল এবং সারা ভারত তাহার সফলে ভাগ বসাইল। ইহাদের নেতৃত্বে সৈন্য বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যে স্বাধীনতার উপাসনা চালাইয়া ভারতের ওজাস্বা অঙ্গল তাহা হইতেই স্বাধীনতার নীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতবাসীকে মুক্তিচেননার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল বাঙলা দেশের এক দুর্বার আন্দোলন। রামেন্দ্রসুন্দর বাঙলার মাতৃরূপটি বাঙালীর মনের মধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। বঙ্গবাসী, গরীব, লক্ষ্মীস্বপ্নিণী বঙ্গজননী, মহিমময়ী মাতৃমূর্তি আমাদের হৃদয়ে তিনি অঙ্কিত করিয়া দিলেন। দেশীয় সম্পদের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্ট ফিরাইলেন, দেশীয় বস্ত্র, ধাতু প্রভৃতির পূর্ণ সম্মানের দিকে আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করিলেন। দেশীয় বস্ত্র, ধাতু প্রভৃতি অজ্ঞান সম্পদের দিকে দেশবাসীর দৃষ্ট আকর্ষিত হওয়ার স্বাধীনতার প্রস্তুতি যে অনেকের অগ্রসর হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই। বস্ত্র, ধাতু প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গজননীর যে শাখরূপটি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের জাতীয় মানসে ফুটাইয়া তুলিলেন আমাদের অন্তরে তাহা এক ব্যাপকতার মুক্তিচেননার উন্মেষ করিল।

দীর্ঘকালের মেয়াদে রামেন্দ্রসুন্দর পৃথিবীতে বর্তমান ছিলেন না। স্বল্পপরিমিত জীবনের সমগ্র অংশই তাহার কর্মের আলোর উজ্জ্বল, সার্বিকতার আলোকে ভঙ্গুর।

গত ২১শে আগস্ট তাহার জন্মশতবার্ষিকী যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত একাধিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পালিত হইল। তাহার দায় কর্মবীরের, দেশপ্রেমিকের ও সাহিত্য সাধকের জীবন, বর্ষ ও ভাবধারা এ যুগের দেশবাসীর মনে এক নব আদর্শের সঞ্চার করুক, তাহাদের জীবনের পথে পদক্ষেপ করিবার শক্তি জোগাক, তাহাদের সমুখ সার্বিকতার অমূল্যলোকের সিংহদ্বার অর্গলমুক্তি করিয়া দিক, এই কামনা এই শুভক্ষেণে সর্বাঙ্গতঃ করণ করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি যে, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবতীর প্রসার আরও ব্যাপক হওয়া উচিত এবং তাহার সাহিত্যের সচিত্র দেশবাসীর পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড় হওয়া প্রয়োজন বিশেষভাবে অমূল্য করা যাইতেছে। বিজ্ঞাননৈতিক তাহার প্রেক্ষাবলীর সহিত এ যুগের বাঙালী যদি বিশেষভাবে পরিচিত হন তাহা হইলে বিজ্ঞানের বহু জটিল দুঃসহ তত্ত্বগুলি অতি প্রাঞ্জলভাবে তাহাদের নিকট বোধগম্য হইয়া উঠিবে এবং বঙ্গ বাঙালী তাহারা নানাভাববৈ লাভবান হইবেন। এই প্রসঙ্গে এই কর্মসাধকের ও দেশীয় বঙ্গাধিকারী সাহিত্য নায়কের পশ্চাত্তির উদ্দেশ্যে আমাদের

## আজাদ কাশ্মীর

মাত্র তিনটি মাস পূর্ণ হইয়াছে নেহরুজীর লোকান্তরবাত্তর।

ভারতের সর্বজনবলিত প্রাণমনসীর আকস্মিক তিরোহানে শুধু ভারতেরই বিভিন্ন অঞ্চল নয়, পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই মর্মান্তিক সংবাদ অভিভূত হইয়া লোকন্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছে আপন আপন প্রতিনিধি। সেই সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের বিরাট সমাবেশে চক্ষু লক্ষ শোকাকুল জনতার সম্মুখে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেম শেখ আবদুল্লাহ। নেহরুজীর তিরোহানে এত গভীর আঘাত নাকি তিনি পাটয়াছিলেন যাহা স্মরণ করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। সেইসকলই চোখের জলে একটি ছোটগাটো যমুনা তৈরি করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তিনটি মাসের মধ্যেই সব শোকের উপশম! চোখের জল তিন মাস থাকার নজীর সচরাচর মেলে না, কিন্তু আবদুল্লাহর দেখা যাটতেছে চোখের জলের সঙ্গে তাঁহার চোখের চামড়াও অদৃশ্য হইয়াছে—যতখানি ইহা তাঁহার জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে তাহা আমাদের জানা নাই! তিন মাসের মধ্যেই সেই চিরচরিত স্বরূপেই রাজনীতিব আসরে আবার তিনি হাজির।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সইয়া যে বিরাট সমস্যা আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতমত তিক্ততার স্রষ্টা করিয়া চলিয়াছে, যে তিক্ততার অবসানের জন্য কত দৌত্যের আয়োজন হইল পরিণামে সকল দৌত্য নিফল হইয়া পরিবেশকে তিক্ত হইতে তিক্ততর করিয়া তুলিল—সেই সমস্যার এক অপরূপ দাওয়াই তাঁহার উর্বর মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়াছে। সোজাধ্বজি তিনি বিগান দিয়া বসিলেন—আজাদ কাশ্মীর হইলেই সব গোলমাল মিটিয়া যায়।

দাবাটটি নিতেছেন কে? আবদুল্লাহ! আবদুল্লাহ যদি ভারতের জন্য আজ স্বাগতও উপভূমিতে আসেন তথাপি তাঁহার আন্তরিকতা ভারতবাসীর মনে কখনই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। শরণ থাকিতে পারে যে, ইহাঁর শোভাবাত্তা বাহির হইয়াছিল আশুবের প্রতিকৃতিকে পুরোভাগে রাখিয়া। মনে-প্রাণে ইনি যাক-প্রেরী। আশুব তাঁহার ইষ্ট। এ হেন তিনি ভারত-পাক বিরোধ অবসানের পথ দেখাইতেছেন ইহা অপেক্ষা ক্রোধোদ্দীপক আর কি থাকিতে পারে তাহাই চিন্তনীয়। ইনি জননেত হিসাব আদৌ অভিজিত হইতে পারেন কি না তাহা আলোচনার বিষয়, তবে জিনেহা হিসাবে তিনি যে কুশলী এ বিষয়ে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

আজাদ কাশ্মীর অর্থাৎ স্বাধীন কাশ্মীর। পাকিস্তানের এই বিরাট চাল না বুঝিবার মত বুদ্ধিহীন ভারতবর্ষ নয়। আবদুল্লাহ যে পাকিস্তানের দাবার ঘুঁটি তাহা কি কাহারও অজানা? তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যেখানে পাক-সরকার বড়ক নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁর স্রীমুখের প্রতিটি বাণী যেখানে পাকিস্তানের নির্দেশ নিঃসৃত হয় সেখানে কোন যুক্তিতে মানিয়া লওয়া যায় যে এই উদ্ভটি তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবিত।

পাকিস্তান সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে দুয়ারে কাঁহনি গাছিল ভারতের সঙ্কে ভারতের কুংসার তাহার উৎসাহ ও উদ্ভাসের লেখি সমারোহ—কিন্তু ফল কি হইল? কেহই তাহাকে পাতা দিল না। যে ছ' একটি রাষ্ট্র তাহার দিকে দিক্‌তার হস্ত প্রসারিত করিল সংখ্যার তাহার এত নগণ্য

যে সে ক্ষেত্রে কিছুই আসে-যায় না। এখন পাকিস্তান কি করিবে—ভূখণ্ড অধিকার করার স্বপ্ন তো তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে অথচ ভূখণ্ড লাভ তাহার ভাগ্যে কিছুই হইতেছে না, মাতৃসালয়ের আশ্রয় সে যাবতর করিল ততবারই প্রত্যাখ্যাত হইল, শেষে অসুগৃহীত ভক্ত শাবরুল্লাহকে দিয়া 'আজাদ কাশ্মীর'-এর ধূধা তোলা, বাস, তাহার পর দিবি কাশ্মীরকে নিশ্চিন্ত ভোগদখল।

কাশ্মীরকে লইয়া এত সমস্যা, এত বাধিততা, এত আলোপ-আলোচনা ইহার জন্য দায়ী বে—ভারত কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা নয়, কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা পাকিস্তান। সকল দিক দিয়া কাশ্মীরের উপর ভারতের ক্রাঘ অধিকার। ভারত কখনও পরব্রাহ্মের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই বরং ভারত নানাভাবে তাহার উদারতা এবং শিখসেরটি খোদাং দিয়াছে—কাশ্মীর কখনও পাকিস্তানের নয়, কাশ্মীর চিরদিনই ভারতের।

শেখসাহেব 'আজাদ কাশ্মীর'-এর ধূধা তুলিলেই কি অমনি কাশ্মীর তাঁহার কৃষ্ণগত হইবে? কাশ্মীর কি জনমানবশূন্য কোন বসতি—সেখানে তিনি বলিলেই অমনি আজাদ কাশ্মীর গড়িয়া উঠিবে? কাশ্মীর রাজ্যটি তো আর দাবাখেলার ছক নয়—তত্ত্বশুরি আর একটি দিকও বিবেচ্য যে কাশ্মীর প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের মুখে দিনের অন্ন তুলিয়া দেওয়ার পরিধানের বস্ত্র জোগাইবার ক্ষমতা কি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আওতে—তাহা যদি না হয় তাহা হইলে শেখসাহেব নিশ্চয়ই জানেন যে, তাহাকে বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে—এবং কোন কোন বিষয়ে ও কোন কোন দেশের নিকট সেই চিন্তা কি শুদ্ধা ফেজ ভের করিয়া শেখসাহেবের চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে? কাশ্মীরকে তিনি পরমুখাপেক্ষীও করিতে তাহলে পশ্চাৎপদ নন—কাশ্মীর রাজ্য 'আজাদ' হইয়া শেষে নানা বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিল এবং বীরে বীরে পাকিস্তান তাহাকে অসুসাহ্য করিল—সারা বিশ্ব কি তাহা হইলে এইবার এই দৃশ্য দেখিতে পাইবে—এ অবস্থাতেও যিনি কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র করিবার স্বপ্ন দেখেন তাহাকে আর বাতাই বলা চলে অস্ত্রত দেশপ্রেমিক বলা চলে না। এ বিষয়ে কোনপ্রকার মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে বরং বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ হেন ব্যক্তিকে 'ভয়ঙ্কর', 'স্বাধীন্যদী', 'দেশপ্রাণী' প্রামুখ্য বিশেষণগুলিতে বিভূষিত করিতে বাধা কোথায় তাহা আমাদের জানা নাই।

আবদুল্লাহ চাহিলেই যে ভারত-রাষ্ট্র সত্তিরা কাঁড়াইবে ইহাও যদি তিনি ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে বসিতে হয় তিনি স্বপ্নাঙ্কুর। কাশ্মীরকে ভারত-অঙ্গ-হইতে বিচ্ছিন্ন করার কুংসিত চক্রান্ত ভারতবাসীর পক্ষে বরদাস্ত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখার সময় আজ আসিয়াছে যে ভারতের এক-একটি অঞ্চল যদি পৃথক হইতে চায় স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার, স্বতন্ত্র পরিচরে, স্বতন্ত্র সুবিধানে তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব থাকে কোথায়—'ভারত' নামটির ইতিহাসে পরিণত হইতে তা হ'লে তো আর বিলম্ব থাকে না।

আমরা অঞ্চল ভারতের উপাসক, এমনতেই আমাদের দুর্ভাগ্যবশত ইতোমধ্যেই ভারত অঞ্চল-বিধগু হইয়া গিয়াছে। ত্রুক্ষ পূর্বেই বিদ্বিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান মানিয়া লইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছে, আবার যদি ভারতের অঙ্গ কর্তন করা হয় তাহা হইলে দুঃখের অস্ত্র থাকিবে না। ভারত মানে শুধু দিল্লী নয়—ভারত মানে ভারতই। মাথার উপর হিমালয়, পারের তলার কলকাতা—তাহার মধ্যবর্তী বিরাট বিশাল ভূগণ্ড—ভারতবর্ষ। শত শত মনীষীর লীলাক্ষেত্র। বিশ্বসভ্যতার অগ্রতম জন্মভূমি, সভ্যতার উত্তর বিকাশার্থ এই ভারতভূমির প্রকৃত স্বরূপ সেই অঞ্চলতার মধ্যেই নিহিত ভাগ্যের দুর্বিপাক্যে ঐক্য, সত্যতা ও মিলনের প্রতীক এই অঞ্চলতা যতটুকু বিনষ্ট হইয়াছে তাহা ভাবিয়া চিন্তাশক্তি করিলে আজ আর অবশ্যই কোন ফল হইবে না। তবে, যেটুকু অঞ্চলতা আজও আমাদের মধ্যে বিত্তমাত্র সেটুকু বাহ্যতে তিলমাত্র বিনষ্ট না হয় সর্বশক্তি

নিয়োগ করিয়া সেমিকে লক্ষ্য রাখাই আজ আমাদের প্রতিটি ভারতবাসীর এক জাতীয় কর্তব্য। উচিত।

অবশ্য 'আজাদ কালী'র-এর প্রস্তাব যিনি উপাধন করিয়াছেন তাঁহার এই জাতীয় উক্তি কীক বা লুণ্ঠনীর বাসিন্দাদের উক্ত সমূহের সমপর্ক্য-ভুক্ত বর্ণিয়া গণ্য করিলে কি যুক্তীনতার পরিচয় দেওয়া হইবে এবং ঐ বাসিন্দাদের উক্তি দুই শ্রেণীর হয়—প্রথম শ্রেণীর উক্তিগুলি অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তিগুলি শুনিলে তাহাদের যথেষ্ট শাসনের প্রয়োজন হয়। শেখসাহেবের উক্তিগুলি এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত অতএব বাহ্যতে এই প্রকার অভিশঙ্কমূলক-বাক্য আর কখনও তাঁর দ্বারা উচ্চারিত না হয়—সে সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভারত সরকারের উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

## ॥ শৌক-সংবাদ ॥

ভারতের সলিসিটর জেনারেল ও আইনজগতের অগ্রতম মহারথী ডঃ হেমনাথ সান্দাল গত ২৩শে ভাদ্র ৬২ বছর বয়সে তাঁর দিল্লীস্থ সরকারী-ভবনে আততায়ীর হাতে গভীর রাত্রিে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। ৩৬শুরের এক বিশিষ্ট জমিদার-পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অর্থশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশযাত্রা করেন। বিদেশে তিনি কৃষ্ণজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপল লাভ করেন, পি এইচ ডি উপাধি অর্জন করেন ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে ইনি আইনব্যবসার শুরু করেন ও অল্পকালের মধ্যে আইনজগতে একটি গণ্যমানজনক আসন লাভ করেন ও সারা দেশে আইনজ্ঞ হিসাবে প্রভুত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'টেগোর ল লেকচারার' নিযুক্ত করেন (১৯৫৬-৫৭)। ১৯৫৭ সালে তিনি ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এবং গত মার্চ মাসে সলিসিটর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির অগ্রতম অধি ও কার্যনির্বাহক সমিতির অগ্রতম সনাত ছিলেন। স্থাপত্য এবং চিত্রাঙ্কনেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা এবং অমুগাং ছিল। করণীর হেমনাথ ছিলেন প্রচারবিদ্যুৎ। বহু পত্র-পত্রিকা তাঁর জীবনী প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন কিন্তু তাঁর শ্রিয় পত্রিকা মাসিক বহুমতীর 'চারজন' বিভাগেই তিনি প্রথম তাঁর জীবনী প্রকাশ করার অমুমতি দেন (আখিণ ১৩৬৪ প্রট্য)। তাঁর মৃত্যুতে সারা ভারত বে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হল এবং একটি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানকে হারাণ সেই বেদনা বিশেষ উপলব্ধিসাপেক্ষ।

নাটোরের মহারাজা সাহিত্যসেবী ষোণীন্দ্রনাথ রায়ের সহধর্মিণী মহারানী ইন্সমতী দেবী গত ২০-এ ভাদ্র ৬৪ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর শান্তিড়া, স্বামী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা ও অগ্রজ আত্মপরিজন বর্তমান।

ট্রিগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অগ্রতম নায়ক, বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং অধুনা পৌরসভার ডেপুটি কমিশনার (এক) লোকনাথ বল ১৯-এ ভাদ্র ৫৭ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। স্বপ্নসিদ্ধ চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে বীর বিপ্লবী স্বয়ং সেনের নেতৃত্বে ইনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও দীর্ঘ দিনের মেয়াদে দণ্ডভোগ করেন। ১৯৪৬ সালে ইনি মুক্তিসাভ করেন। ১৯৪৯ সালে দুর্নীতিদমন বিভাগের অফিসাররূপে ইনি পৌরপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী প্রতিমা বল তাঁর সহধর্মিণী।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক স্বামিনীকান্ত সোম গত ৭ই ভাদ্র ৮২ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। বাঙালী দেশের শিশুসাহিত্যের সেবার এর জীবনব্যাপী নিরলস সাধনা অনস্বীকার্য। প্রথম জীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনার সূচনা এবং শেষ জীবনেও তাঁর লেখনী অক্লান্তভাবে শিশু পাঠক-পাঠিকার খোরাক জু'গিয়ে গেছে। বহু জনপ্রিয় গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূবনেশ্বরী পদকে সম্মানিত করেন।

অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সেক্রেটারী সতীশচন্দ্র গুপ্ত গত ২২-এ ভাদ্র ৮৮ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সে যুগের অগ্রতম শৈ্ষস্থানীয় সাতালয়ান বিহারীলাল গুপ্তের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় ইনি সদস্যনে উত্তীর্ণ হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব জ্যোজ্জ্ব গুপ্ত এবং লোকসভার সদস্য জ্যোজ্জ্ব গুপ্ত—তাঁর দুই পুত্র। তাঁর সহধর্মিণী প্রিয়বালা গুপ্ত (কবি কামিনী রায়ের সপত্নীকন্যা) গত বৎসর পরলোকগমন করেছেন।

প্রখ্যাত চিত্রপটচিত্রকর বীরেন নাগ গত ২২-এ ভাদ্র মাত্র ৪৪ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন। চিত্ররংগে ইনি শিল্প নির্দেশক হিসাবে যোগ দেন ও কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের চিত্ররংগে প্রভুত সুনাম অর্জন করেন। তাঁর পরিচালিত 'বিশাল বাদ' এবং 'কোহরা' ছবি দু'খানি জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণে সমর্থ হয়।

# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, সত্যি বলতে কি এমন সর্বাঙ্গসম্পন্ন পত্রিকা কোথাও আমি দেখি নাই। সবচেয়ে তার আকর্ষিত স্ক্রিনিস হচ্ছে প্রচ্ছদপট। বৈশাখ থেকে পত্রিকা উত্তরোত্তর আরও সুন্দর হচ্ছে। নমঃস্রনাথ খোষাল (প্রাণ সংখ্যার বীর চিঠি ছাপা হয়েছিল) এবং আমি একমত। কারণ সত্যিই আপনি একটি পাকাত জড়ী। প্রায়শই 'নভেনীল' অপূর্ণ লাগছে। রাণু ভৌমিককে আর একটা উপগ্রাস লিখতে বলুন, তাঁর লেখা ভাল। আমরা এই পত্রিকাটিতে যেন আপনার উপগ্রাস দেখতে পাই। নীহার গুপ্ত, তাগাশঙ্কর, যাবাবর এদের লেখা আর দেখতে পাই না কেন? আপনারদের একটা বিশেষ সংখ্যা বরা উচিত। রঙ্গপট বিভাগটা যার একটু বাড়লে আনন্দিত হবো। আমরা চাই আপনি ও আপনার পত্রিকা হংসর লেখক-লেখিকাদের যেন ভগবান মঙ্গল করেন। বাজে লিখে হতে আপনার মূল্যবান সময়টা নষ্ট করলাম। মাপ করবেন। ইতি—ভবন, দীতা ও শীলু পাল। পক্ষেসীমা হাই স্কুল। পোঃ—ছোটপাকলীয়া, সিদ্ধু, বিহার।

মহাশয়, আমি আপনারদের মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত গ্রাহক। মাসিক বসুমতীতে 'চারজন' পর্বে বাংলা দেশের সর্বাঙ্গের কৃতী সন্তানদের পরিচিতি তাঁদের বহু গুণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়—সঙ্গে সঙ্গে গর্ব বুক ফুলে ওঠে, শুধু তাই নয় তাঁরা কিভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে একাগ্রতার গুণে আজ যশস্বী হয়েছেন তার কাহিনী আমাদের ছেলের মনে উৎসাহ জাগায়। মাসিক বসুমতীর 'চারজন' পর্বে যদি বাংলা দেশের কোন কৃতী পর্বতারোহীর জীবনী প্রকাশ করেন তাহলে আমাদের ছেলেরা সে কাহিনী পড়ে হৃৎসাসিকতার উৎসাহ পাবে। ১৯৬১ সালে আশ্বিন সংখ্যায় বিশ্বদেব বিশ্বাসের 'নন্দা' ঘটি অভিনয় ও পর্বতারোহণ শিক্ষা' প্রবন্ধটি চীতিমত আগ্রহসহকারে সকলে পাড়েছে এবং ভাল লেগেছে। নমঃস্রনাথ—শ্রীজ্ঞানকুমার নাগ, ৪ বেলগেছিয়া রোড, কলিকাতা-৪,

মহাশয়, আমার নমঃস্র গ্রহণ করিবেন। আমি একজন মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহক। আজ আপনাকে এই পত্রে একটি অমুগোষ জানাইতেছি। আশা করি, আপনি আমার ও অজ্ঞাত অনেক আগ্রহশীল পাঠকদের মনোবাশনা পূর্ণ করিবেন। বহু বিষয়ের সমালোচনাপূর্ণ আপনার পত্রিকা আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। কতকগুলি সংখ্যাতে বিপ্লবী স্ক্রিনিয়ের বিষয় আলোচনা পাইয়াছি। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনী ১৭খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। গত বৈশাখ সংখ্যাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও জগৎশেঠের বিষয় অল্প-প্রাঙ্গণের আলোচনার মাধ্যমে পাঠ করে বিশেষ আনন্দিত হইতামি ও অনেক অজ্ঞাত স্ক্রিনিস আলোচনার মাধ্যমে

পরিচয়। তাই আজ আমার অমুগোষ যে মহাপুরুষদের জীবনী এভাবে প্রকাশ করেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবেন। ক্রমশঃ প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণ জীবনী লিখিলে আমরা আনন্দিত হইব। এভাবে একের পর এক একটি মহাপুরুষদের জীবনী প্রকাশ করিবেন। মাইকেল, শ্রী আশুতোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ, নেতাজী জীবনী একের পর এক যদি প্রকাশ করেন, তা হলে আপনি আমাদের অনেক উপকার করিবেন। বহু আশা নিয়ে আপনার কাছে অমুগোষ জানাইলাম। ইতি—বর্গেন্দ্রনাথ মিত্র। ৪১, মনহাটলা লেন কলিকাতা-২৩।

এবারেরই উচ্চতা প্রসঙ্গে

[মাসিক বসুমতীর বিগত পৌষ সংখ্যায় এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্য কিছু ভুল থাকার এক পত্রে ডেরাদুন থেকে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র জিওডেটিক অ্যান্ড সিসার্চ ব্রাঞ্চে সহযোগী পবিচালক কর্নেল কে এল খোসলা আমাদের দুই আকর্ষণ করেছেন এবং ভুল সংশোধিত করে দিয়েছেন। আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য পত্রটি আমরা দ্বিধা প্রকাশ করলাম—স]

Sir,

Please refer to the news appearing in your issue for December 1963-Jan. 1964 on the subject of height of Mount Everest.

2. We may add for your information that the Survey of India department had carried out fresh observations to refix height of Mount Everest during the years 1952-54 and the height of Mount Everest now stands corrected to 29028 feet.

3. We do not now propose to carry out further work on this subject in the immediate future.

You are therefore, requested to correct the news item accordingly and inform us, preferably by sending us a copy of the journal containing the correction.

Dated—July 14, 1964.

Yours faithfully,

Survey of India

K. L. Khosla

P. B. No.—77

Colonel

Dehra Dun (U.P.)

Dy. Surveyor General II &

India

Dy. Director (C & P. D.)

ਪਾਠਕ-ਪਾਠਿਕਾਰ ਚਿੰਨ੍ਹ

ষেচতে চাই

দ্বাদশ, আশ্রমের স্থিতিতে মাসিক বসন্তমতী পাঠক আশ্রম  
 স্থাপন হইতে। অগ্রগণ্য পুস্তক আশ্রমের মাসিক বসন্তমতীর মারফত  
 জানাইয়া দিলে বাণিত হইবে—আশ্রম প্রায় ১০।১২ বৎসরের ‘মাসিক  
 বসন্তমতী’ (কতক বাধান কতক অব্যাহন) বিক্রয় করিতে চাই।  
 ফরোজ ব্যক্তিগণ—আমার নিকট খোজ করিতে পারেন। ইতি—  
 শ্রীসেবাসা সেন, ২০।১ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা—২০।

মহাশয়, আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক ছিলাম অধুনা পাঠক।  
আমার কাছে ১৩৬৮ সনের মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এবং ১৩৬৯ সনের  
বৈশাখ হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ১৪টি মাসিক বসুমতী আছে। কোন  
গ্রাহক বা পাঠক কিনতে চাইলে অগ্রগ্রহণপূর্বক জনালাল বা বোগোবাগ  
দ্বারস্থ হইতে হইবে। নমস্কারান্তে—দীপক দেব। মেটাল বক্স,  
৫৯সি, চৌরাসী, কলিকাতা-২০।

মহাশয়, আমার নিম্নলিখিত বৎসরের মাসিক ব্রহ্মমতী বিক্রয়  
 করিতে চাই। কেহ কিনিতে ইচ্ছুক থাকিলে এই টিকানার যোগাযোগ  
 স্থাপন করিতে অনুৰোধ করি। এই বিজ্ঞাপনটি আপনার মাসিক  
 ব্রহ্মমতীর আগামী সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে বিজ্ঞপিত  
 হইলে বাধিত থাকিব। নমস্কার জানিবেন। ১৩৬৫ কার্তিক ও  
 চৈত্র, ১৩৬৬ বৈশাখ ও আশ্বিন, ইতি—শ্রীমতী বনকরেণু ঘোষ।  
 ২৮/৪ কনকোটে রোড, ফ্লাট নং ডি, এটলি, কলিকাতা-১৪।

আহক-আহিকা হইতে চাই

শ্রীমতী লতিকা সেন, 'লতিকা কুমারী' সি।৮২, নিউ দিল্লী  
সাইব এক্সটেনশন, পাট—২, নিউ দিল্লী—১৬, \*\*\* শ্রীভক্তান্নাথ  
পট্টনায়ক, শিক্ষক, ইসমাইলিক, এইচ এস বিজালয়, ডাক—রাইচক,  
জেলা—মেদিনীপুর \*\*\* ক্রীতাবরকনাথ চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম ও ডাক  
—মণিগ্রাম, জেলা—পূর্ববঙ্গ \*\*\* প্রধান শিক্ষক, সেনাবাদ  
মণিগ্রামে বিজাপুরী, ডাক—খাগড়া। (বহরমপুর) জেলা—  
মুন্সিগঞ্জ \*\*\* সচিব, মহেশ শ্রীমাক্ষক গ্রন্থাগার, ডাক—রায়ড়া,  
জেলা—হুগলী \*\*\* সচিব, তালচর ক্লাব, এন, সি, ডি, সি ডি:  
তালচর কোলিয়ারী, জেলা—খেনকানল, উড়িষ্যা \*\*\* শ্রী এস কে  
বন্দ্য, অধ্যক্ষ, জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ইটাচুমা, জেলা—হুগলী  
\*\*\* শ্রী এইচ এন কুণ্ডু, সহকারী স্টোরকিপার, ডি বি কে  
রেলওয়ে প্রোজেক্ট, ডাক—রাষ্ট্রওয়ান, জেলা—বস্তার, (এমপি)  
\*\*\* শ্রী ডি এন মুখোপাধ্যায়, বি, এসও অফিস অফ দি জি ই  
ফ্যাক্টরী, কানপুর—১ \*\*\* শ্রীমতী লক্ষ্মীবাণী ত্রিপাঠী, অবধারক—  
শ্রী এন এন ত্রিপাঠী গ্রাম ও ডাক—নন্দীগ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর  
\*\*\* শ্রীসত্যবান দেবান্দী, গ্রাম ও ডাক—মহুয়াপুর (সাঁওথরা  
হরে) বীরভূম \*\*\* শ্রীমতী শোভারণী পাইচ, অবধারক—  
শ্রী বি সি আইচ, ১৬০, কসবা রোড, কলিকাতা-৪২ \*\*\* শ্রী বি পি  
গুপ্ত, ড, সিসোলা বিজি, কাক, পূর্ণা—৪ \*\*\* শ্রীমদনলাল জেন,  
৬৮, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা—৭ \*\*\* The Office  
Commanding No. 0507/66. XXX III Corps  
Signal, Regiment C/o 56 A P O শ্রী আর সি কালী,

ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি, বি জে মেডিক্যাল কলেজ, আমেনাবাদ  
 \*\*\* শ্রীউমাপতি চক্রবর্তী, ধনিয়াগাছি উচ্চ বিজ্ঞালয়, ডাক—  
 ধনিয়াগাছি, জেলা—মেঘনীনুর \*\*\* সচিব, সিংকা রিক্রিশেন  
 ক্লাব, সিরকা কোলিয়ারী, ডাব—গ্যারগাদা, হাজিরাবিবাগ \*\*\*  
 শ্রীচকুমার ঘটক, দুয়নি টি এস্টেট, ডাক—দুয়নি, কামরূপ \*\*\*  
 শ্রী কে চৌধুরী ১১৩১২৪৬, স্বরূপনগর, কানপুর—২ \*\*\* শ্রীমতী  
 কমলা ত্রিপাঠী, অবধাবাব—শ্রী বি ত্রিপাঠী, আই এ এস, কালেক্টার,  
 গঙ্গাম, উড়িষ্যা।

আপনার পত্রাভিযায়ী—১৩৭১ সালের বায়িকমূল্য ১৫৯ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে মাসিক বসন্তপত্রী পাঠাইবেন। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম ! আমিনাবাদ, সপ্তর্ষী ।

Remitting Rs. 20/- to cover one and half years subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Hony. Genarel Secretary, Bharati Bhabon, Burdwan.

Please receive the annual subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati. K. N. Banerjee, Retd. Supdt. Jail, 182 Motiali Nehru Nagar, Allahabad.—2.

বার্ষিকমূল্য ১৫৭ পাঠাইলাম। নিম্নলিখিত প্রতি মাসে মাসিক  
বস্তুমতী পাঠাইবে। শ্রীমতী বর্ণারানী সিংহ, অবধাহক—ডাক্তার আব  
এন সিংহ, পাটনা—৪।

We are interested to be the subscribers of 1½ years in payment of Rs. 20/- as published. Please send the magazine every month. Secretary Jayashree Club Po. Rishra, Dt, Hooghly.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫ পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা ৪ইতে প্রতিমাসে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, শ্রীমতী সেবাদেবী চক্রবর্তী, গোরক্ষপুর, ইউ পি।

I am sending herewith the s m of Rs. 15/- only being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month. Head Master, Jhargram K K Institution. P. O. Jhargram, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর চন্ডা ১৫ পাঠাইলাম। নিম্নমিত্ত মাসিক  
বসুমতী পাঠাইয়া বাদিত করিবেন। শ্রীমতী জ্যোতিষ্মী রায়চৌধুরী,  
অবধারক—এস রায়চৌধুরী, গুজ্জরাবাগ, পাটনা—৭।

বর্তমান বৎসরের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এন এন চট্টোপাধ্যায়, অবধারক—  
ডাক্তার সি আর চট্টোপাধ্যায়, ডাকঘর—ঘরবেশগঞ্জ জিলা—পূর্ণিমা।

I am sending the subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati for one year. Please send the magazine regularly. Secretary, Suhrid Prosad and Hem Chandra Library, Langertoli,

# ଓଷଧ ସୂଚୀ

ବିଷୟ	ଲେଖକ-ଲେଖିକା	ପୃଷ୍ଠା
୧ । କଥାସ୍ତୁତ	( ଯୁଗବାଣୀ ) ...	୮୮୧
୨ । ମାନସିକ ରୋଗର କାରଣ—ଛୁଟି ଶ୍ୟାଂସ	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଡାଃ ନାଗ	୮୮୩
୩ । ଆମରା ସବାହି ଚୋର	( ବନ୍ଧା-ରଚନା ) ତୀରନ୍ଦାଜ	୮୮୪
୪ । ଯୋମାହିର ତାବା	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ସୁରାସିକ	୮୮୫
୫ । କୌଟର ପ୍ରତିରୋଧ	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଶ୍ରୀବିଜ୍ଞାନୀ	୮୮୬
୬ । ଇସ୍ ରକ୍ତ	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ନାରୀ ମିତ୍ର	୮୮୭
୭ । ଆପଣ କି ମୋଟର ଚାଲାନ ?	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଶ୍ରୀମତୀ	୮୮୮
୮ । ମାତୃପୂଜା	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଅନିଲବରଣ ରାୟ	୮୮୯
୯ । ବୋବା ରାତେ	( କବିତା ) ଆଶୁତୋଷ ମାତାଳ	୮୯୦
୧୦ । ଭାରତେ ମାହାଧନା	( ପ୍ରବନ୍ଧ ) ଧ୍ୟାନେଶନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ	୮୯୧
୧୧ । ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା	( କବିତା ) ବିମଳଚନ୍ଦ୍ର ସୋନ	୮୯୨

ଦେଶ ସେବାୟ ନିଯୋଜିତ,

ଏଆଲବାଟ୍ ଡେଭିଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍

କଲିକାତା—୧୦

ନୀତି ଓ ବିଜ୍ଞାନାନୁସାସୀ ଓଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣର ଅଗ୍ରଣୀ

—ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମୂହ—

ବୋମ୍ବେ - ମାଦ୍ରାଜ - ଦିଲ୍ଲୀ - ନାଗପୁର  
ବେଞ୍ଗାଳୁରୀ - ଶ୍ରୀରାମ - ଗୋହାଟୀ

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১২। ষাঁদের সংস্পর্শে এসেছি (স্মৃতিচিহ্ন)	জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ...	৮৯৫
১৩। মৃত মন (কবিতা)	সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ...	৮৯৬
১৪। আকবরের আমল থেকে রামরাজকে (প্রবন্ধ)	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী ...	৮৯৭
১৫। অখণ্ড অমিয় ত্রীগৌরঙ্গ জীবনী-রচনা)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	৯০০
১৬। প্রতিধ্বনি (কবিতা)	শান্তনু দাস ...	৯০৩
১৭। শেষ পর্যন্ত (কবিতা)	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯০৪
১৮। নাগফণি (ভ্রমণ-কাহিনী)	প্রভাত মুখোপাধ্যায় ...	৯০৫
১৯। শীর্ষবিদ্যুৎ (কবিতা)	সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ...	৯১২
২০। বিগতভাব (কবিতা)	অরবিন্দ ভট্টাচার্য ...	৯১
২১। হীরাম্বিল (ঐতিহাসিক রচনা)	কুঞ্জবিহারী সাহা ...	৯১
২২। দেবতার সান্নিধ্যে (কবিতা)	স্ট্যানলি কুনিটজ্ : অনুবাদক—সঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯২০ (ক), ১০০০ (খ)
২৩। আলোকচিত্র—	...	...
২৪। পত্রগুলি—	...	...
২৫। বিগত (কবিতা)	নিখিলরঞ্জন মাইতি ...	৯২৪

## ॥ নতুন বই ॥

পিছনের জীবনকে ফেলে রেখে মানুষ এগিয়ে চলে নতুনের দিকে।  
কিন্তু অভ্যস্তের সংস্কার ও রীতি: অনেক দিনই জড়িয়ে  
থাকে জীবনের সঙ্গে। কালিপদ গ্রামের একজন নেতা। আন্দোলনের  
সে প্রধান শরিক হয়েও কেন পারে না। ব্যক্তিজীবনের আবর্ত  
থেকে পুরাতনের জঞ্জালকে দূর করতে? হ্রী কি শুধু ধর্মশক্তিনী, সে  
কি কর্মশক্তিনী নয়—এই ভাবনাই অহরণিত হয় সুন্দরীর মনে মনে।

কৃষকজীবন ও আন্দোলনের জীবনযাত্রা রূপায়ণ “কমরেড”

দাম—সাত্ৰ চার টাকা



সম্প্র প্রকাশিত একটি বই

মিখাইল শালোখভ

কুমারী মাটির ঘুম ভাঙলো ৮.০০

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত



## সুচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
২৬। চারজন— (বাঙালী-পরিচিতি)		
(ক) প্রমথনাথ বর্ধন	...	২২৫
(খ) ভুবনমোহন মজুমদার	...	৬
(গ) মন্ডার মল্লিক	...	২২৬
(ঘ) নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২২৭
২৭। নুট হামসন (স্মৃতি কথা)	সুনীলকুমার নাগ	২২৯
২৮। বাতাসী মঞ্জিল (উপহাস)	অজিতকুমার বসু	২৩৫
২৯। টু-সু-র দু'টি কবিতা	...	২৪১
৩০। বিজ্ঞান বাতী—	...	২৫২
৩১। অজম ও প্রাজ্ঞ—		
(ক) নীলদার স্বপ্ন (গল্প)	অমিতা পালিত	২৫৫
(খ) পাশাপাশি (কবিতা)	জাবণ্য পালিত	২৫৮
(গ) আনন্দমুখর আটটি দিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	বন্দনা মুখোপাধ্যায়	৬
(ঘ) হোস্টেলের চিঠি (কবিতা)	স্বপ্না জাহিদী	২৫১
(ঙ) বসন্ত প্রবাসের দিন (ভ্রমণ-কাহিনী)	কৃষ্ণা বসু	৬
(চ) একান্ত (কবিতা)	অমিতা ঘোষাল	২৫৪

<p style="text-align: center;"><b>ডঃ বিমল রায় প্রণীত</b></p> <h2 style="text-align: center;">ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ</h2> <p>। মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীতিক ইতিহাস ॥</p> <p>মধ্যযুগের ভারতীয় সঙ্গীত-নায়কদের জীবন-কথা ও</p> <p>গাধনার তথ্যসমৃদ্ধ মনোজ্ঞ আলোচনা। মূল্য : ৬.০০</p>	<p style="text-align: center;">মণি বাপচী প্রণীত</p> <h2 style="text-align: center;">জীবনী জিজ্ঞাসা গ্রন্থমালা</h2> <h3 style="text-align: center;">শিক্ষাণ্ডর আশুতোষ ৫.০০</h3> <p>সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫.০০ রামমোহন ৪.০০</p> <p>রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথ ৬.০০ রামশচন্দ্র ৫.০০</p> <p>মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪.৫০ কেশবচন্দ্র ৪.৫০</p> <p>আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৪.৫০ মাইকেল ৪.০০</p>
<p style="text-align: center;">আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত</p> <p style="text-align: center;">কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ</p> <p>দিলীপ মুখোপাধ্যায় : সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু ৬.০০ ॥ প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪.০০ ॥ সুনীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০.০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বন্ধিমচন্দ্র ৬.০০ ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫.০০ ; পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৬.০০/৭.৫০ ॥</p> <p>ডঃ রাধাকৃষ্ণ : হিন্দু-সাধনা ৩.০০</p> <p>ডঃ জাকীর হুসেন : ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন ১.০০</p>	<p style="text-align: center;">দেবভূমি বক্রেশ্বর ৫.০০</p> <p style="text-align: center;">প্রেমদাস তীর্থঙ্কর</p>
<p>নিউ স্প্রিং ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাডভিনিউ। কলিকাতা - ২৯</p>	

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৩২। হৃদয় পাতে ( উপহাস )	সুলেখা দাশগুপ্ত ...	৯৫৫
৩৩। অনায়ত্ত উপকূল ( কবিতা )	রূপশ্রী ঘোষ ...	৯৬০
৩৪। পূর্ণপ্রাণে চাবার ঘাঘা ( উপহাস )	ক্যাথরিন হিউম : অম্ববাদিকা—প্রগতি মুখোপাধ্যায় ৯৬১	
৩৫। যতদূর মনে পড়ে ( স্মৃতিকথা )	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত ...	৯৬৫
৩৬। মুক্তি ( গল্প )	থগেন্দ্র দত্ত ...	৯৭২
৩৭। রাত্রির তপস্যা ( গল্প )	রাধা ভৌমিক ...	৯৮০
৩৮। রেলপথের প্রধান সমস্যা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ	...	৯৮৫
৩৯। স্বর্ণ অলক ( কবিতা )	এডমণ্ড স্পেনসার : অম্ববাদিকা—নন্দদুলাল ঘোষ ৯৮৬	
৪০। পুষ্পধনু ( কবিতা )	বন্দে আলী মিয়া ...	ঐ
৪১। স্বর্ণ খেলনা ( উপহাস )	সুজাতা ...	৯৮৭
৪২। ছোটদের আসর—		
( ক ) সমুদ্রে বিভীষিকা—হাদর ( প্রবন্ধ )	রাণী গজুদার ...	৯৯৮
( খ ) মহাভারতের গল্প ( কাহিনী )	সুলতা কর ...	১০০০
( গ ) বাদল এলো ( কবিতা )	শুভ্রা গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০০২
( ঘ ) কবি জয়দেব ( প্রবন্ধ )	নিরঞ্জন সেন ...	ঐ



## বস্ত্রশিল্পে মোহিনী দিলের

অবদান অতুলনীয় !

মূল্যে, স্থায়িত্বে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন  
১ নং মিল— ২ নং মিল—  
কুষ্টিয়া, নদীয়া। বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ম্যামেনজিং এজেন্টস্—

চক্রবর্তী, সঙ্গ এণ্ড কোং

সেজি. অফিস—

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
(ঙ) পটুয়া	(কবিতা) রেবতীভূষণ বোধ	১০০৪
(চ) এগিয়ে যাও	(রূপকথা) ছবি বসু	ঐ
(ছ) উটোরাজ্যের দেশে	(কবিতা) গৌরী মোদক	১০০৫
৪৩। পরিসংখ্যানের আলোকে সোভিয়েট নারী (সংগ্রহ)	...	ঐ
৪৪। শান্ততা	(উপন্যাস) নমিতা চক্রবর্তী	১০০৭
৪৫। প্রচ্ছদ-পরিচিতি—	...	১০১৬
৪৬। শলোকিতের সান্নিধ্যে	... প্রয়াসী	১০১৭
৪৭। সাহিত্য পরিচয়—	...	১০১৮
৪৮। শিল্পী ও দার্শনিক নিকোলাস রোমেরিক	...	১০২২
৪৯। তগো মানস-কথা	(কবিতা) সাধন চৌধুরী	১০২৫
৫০। নাচ-গান-বাজনা—		
(ক) রুদ্রবীণা	(প্রবন্ধ) প্রভাকর সেন	১০২৬
(খ) রেকর্ড-পরিচয়	...	১০২৭
(গ) আমার কথা (শিল্পী-পরিচিতি)	প্রফুল্লকুমার দাস	১০২৮

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীমত বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ৭ তারানাথক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস <b>ভুবনপুরের হাট ৬</b>	গোপাল ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস <b>শেষ প্রদীপ শিখা</b> চার টাকা পঞ্চাশ নং পঃ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপন্যাস <b>জবানবন্দী ৬১০</b>	প্রাণতোষ ঘটকের নতুন উপন্যাস <b>সুখের লাগিয়া ৪১০</b> জগদীশচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস <b>শহীদ ৫ যাত্রিদল ৬</b>
তপতী রায়ের উপন্যাস <b>একটি সোনা মন ৬</b> কুয়াশার রঙ ৪ নগেন্দ্রকুমার গুহবায়ের সত্ত প্রকাশিত <b>মহামোগী শ্রীঅরবিন্দ ৫১০</b> সুখম ঘোষের সত্ত প্রকাশিত উপন্যাস <b>মেঘ ডাঙা রোদ ৫১০</b> অনাথবন্ধু বেদন্ত <b>সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ৫১০</b> চিত্রগুপ্তের <b>এরা অভিব্যক্ত আসামী ৩১০</b>	অভিযাত্রীর উপন্যাস <b>স্মৃতির মুকুর ৬-৫০</b> অনির্বাক শিখা ৫ নট্টচন্দ্রের আলো ৬ প্রবোধ সাহায়ে <b>গল্প সংগ্রহ ৪, বন্দীবিহঙ্গ ৩১০</b> <b>এক বাঙালি কথা ৪, জমতা ৩</b> প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস <b>লাল পাথর ৩</b> রামপদ মুখোপাধ্যায় <b>হুরত মন ৩, মাটির গন্ধ ৪</b> <b>দীপারিতা ৫</b> সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস <b>সুন্দরী কথাসাগর ৫১০</b>	তারানাথক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস <b>আন্তরিক মুখো—জামালার ধারে ৪</b> <b>বনফুল—উজ্জ্বলা ৩১</b> <b>পূর্ণচন্দ্র কই—পথ হতে পথে ৩</b> <b>বিভূতি মুখো—আনন্দ নট ৩</b> <b>শক্তিপদ রাজগুরু—বনমধ্যবী ৩১</b> <b>আশাপূর্ণা দেবী—অভিজ্ঞান ৩১</b> <b>সত্যব্রত মৈত্র—বনমধ্যবী ২১</b> <b>মানিক ভট্টাচার্য—যুগের মূল্য ৩</b> <b>নিরা মুখো—জটিলি বস্ত্রালার বাটে ৩১</b> <b>ইন্দ্রজিত ভট্টাচার্য—আতপ কাঞ্চন ৩</b> <b>বেলা দেবী—জীবন তীর্থ ৩</b> <b>প্রভাবতী দেবী—উদয় অন্ত ২</b> <b>বিমল কর—দ্বিবারাজি ৩</b> <b>সৌরভ মুখো—লেকরোড ৩</b> <b>গজেন্দ্র মিত্র—সোহাগপুরা ৪</b> <b>রাজকুমার মুখো—শরভাভের জলা ২</b> <b>তারকদাস চট্টো—কুমারী ধরম ৫৫</b> <b>কৃশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়—কালো চোখের তারা ৩১</b>

## সূচীপত্র

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৫১। খেলার মাঠে হট্টগোলের মনস্তত্ত্ব (সংগ্রহ)	...	১০২৯
৫২। বাধাকৈ বারাগসী (তীর্থ-দর্শন)	নীলকণ্ঠ	১০৩০
৫৩। বিশ্বাদপুর (কবিতা)	মঞ্জুশ দাশগুপ্ত	১০৩২
৫৪। রঙ্গপট—		
(ক) নিউ ইয়র্কের নাট্যজগৎ	...	১০৩৩
(খ) নটগুরু জন্মদিনে	...	১০৩৭
(গ) সংবাদ বিচিত্রা	...	১০৩৮
(ঘ) রঙ্গপট প্রসঙ্গে	...	১০৪১
(ঙ) সৌখীন সমাচার	...	১০৪২
৫৫। সম্পাদকীয়—		
(ক) আনন্দময়ীর আগমনে	...	১০৪৩
(খ) সব ঠিক ছায় : খান্দেরীর মতে	...	১০৪৪
(গ) বিশ্বাসভা বনাম বিচারভা	...	১০৪৫
৫৬। শোক-সংবাদ—	...	১০৪৬

পূজায় সর্বভারতীয় শাড়ীর বিরাট সমাবেশ !  
ডেক্রন ★ টেরিলিন ★ ঢাকাই ★ চান্দেরী ★ ট্রিকল.

মল্লোরম  
বিবাহের  
বিছানা

# শৈললাল মণিলাল

১৬৯, বহু বাজার ফ্রিট  
কলিকাতা ১২ ... ফোন-৩৪-২১২৬

মল্লোরম  
জড়ারী  
পোষাক

মানব জীবনে গুরু হ'ল অতি উচ্চে। গুরু বিনা কেহ কোন মস্ততত্ত্বের অধিকারী হয় না। গুরু তাই আমাদের দেশে নমস্কার ও প্রণাম। শ্রবণ ও বর্ণনা গুরু লক্ষণ, মাহাত্ম্য সাধারণ মাহাত্ম্যের কাছে দুর্বোধ্য। শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুগ্রহণ অপরিহার্য। জপ, দীক্ষা, পুরস্কার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে গুরুর নির্দেশ অনবরীক। বহুমতীর চির-ঐতিহ্যময় সাহিত্যসেবায় এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ। বাঙলা ও বাঙালীর ধর্মপথের পথ-নির্দেশক।

\* শ্রীশ্রী গুরুশাস্ত্র \*

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের ও কর্তব্যাকর্তব্যাদি, দীক্ষাপ্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র ও পুরস্কার প্রভৃতির সার সংগ্রহ। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

উৎসাহ প্রবর্তিত  
এনেছি

বাংলা ইংরেজী গল্প  
কবিতার সুনির্বাচিত  
সংগ্রহ আর পাছাই করা  
শারদীয় সংখ্যার জন্য

মনীষা



গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড  
৬/৩ বি, বাক্সম চ্যোটাঙ্গি স্ট্রাট  
কলিকাতা ১৮

মহাবাগী—ত্রিলোকের মহাত্মিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুপন  
পন্থা—অসংখ্য তত্ত্বশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাংসার সঞ্চলনে—প্রত্যেক সত্য—সত্ত্বসংগ্রহ সাধনার অপূর্ণ সময়।

তত্ত্বশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দেব

## বহু তত্ত্বসার

—স্বাধীনত বঙ্গানুবাদ সহ বহু সংস্করণ—

দেবানন্দেব মহাদেব স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন—কলিতে একমাত্র তত্ত্বশাস্ত্র জাগ্রত—সত্য কলপ্রদ—জীবের মুক্তিদাতা। অল্প শাস্ত্র নিখিত—তাহার  
সাধনা সিদ্ধল। স্বপ্নানে সাধনাময় মহাদেব পক্ষমুখে কলিমুখে তত্ত্বশাস্ত্রের মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়া—সংখ্যাতীত তত্ত্বশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া—  
মুক্তি ও সিদ্ধির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই সীমাতীত তত্ত্বসরূপ মথিত করিয়া, মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ সরল সহজ বোধগম্যভাবে সাধক-সম্প্রদায়ের  
শক্তি-বীজ নিখিত অমূল্য রত্ন এই বহু তত্ত্বসার আজীবন কঠোরতম সাধনায়—জীবনাত্তরক পরিশ্রমে সংগ্রহ—সঞ্চলন—সারাংসার সমাবেশ করিয়া  
মানবের মঙ্গলবিধান করিয়া গিয়াছেন

তত্ত্ব-ভব ও তত্ত্ব-রহস্য—পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুণসাধন কাহার নাম? অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের  
সাধনা—তাত্ত্বিক সাধনায় শাস্ত্র ভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তত্ত্বসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রদ্বিগ্নে সুশোভিত—অম্লুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহু ব্যয়ে—আমুষ্ঠানিক তাত্ত্বিক পণ্ডিত মহাশয়গণের সহায়তায় কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া  
বহুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে! পূজা, পুরুষচরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বসিধান, সাধনা,  
সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তত্ত্বসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবুদ্ধি বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরক সাহেবের  
অমূল্যলন—মহানির্বাণ তত্ত্বের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশকালাবধি তত্ত্বগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত  
চট্টোপাধ্যায় কৌশল্য দেবিতার দ্বি আত্মক সাধনায় সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অম্লুষ্ঠান সমাবেশ—সর্বতত্ত্বের সময়—কৃষ্ণানন্দেব

# স্মরণীয় ৭ই • অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থটির্থ

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের মূল্য বই প্রকাশিত হয়

এ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহর

আকাশ ও পৃথিবী ১০.০০

(পল্লীকারে বিজ্ঞান, অসংখ্য চিত্র শোভিত)



আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছোটদের বই

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অদ্বিতীয় ঘনাদা

২.৭৫

তাল নবমা

২.৫০

আবার ঘনাদা

২.৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর

প্রতিভা বসুর

চুলাচেরা শোধবোধ

২.০০

সবচেয়ে যা বড়

১.৫০

হাসনুহানা

২.৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ইতিহাসের রক্তাক্ত

সদাশিবের

প্রান্তরে ২.০০

হৈ হৈ কাণ্ড ২.০০

হে ইতিহাস গল্প বলা ২.০০

গোয়েন্দা ভূত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

ও মানুষ ২.০০

পানুর চিঠি

২.৫০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ



( ৬৯১৫ )

অকাল বোধন

—শ্রীঅন্নদা মুন্সী অঙ্কিত

মাসিক বসুমতী

[ ১৩৭১ ]





৪৩শ বর্ষ

আশ্বিন ১৩৭১



প্রথম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা

# মাসিক বসুমতি

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

আম্রজয়ের জন্ম যিনি চেষ্টা  
করিতেছেন, তদপেক্ষা কঠিনতর  
সংগ্রাম কে করে ?

আপনাকে আপনি জয় করা, দিন দিন  
আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং  
ধর্মে বদিত হওয়া, ইহাই আমাদিগের একমাত্র  
কর্তব্য।

## কথামৃত

### ঈশা অনুসরণ

৪। এ জগতে সবল পূর্ণতার মধ্যেই অপূর্ণতা আছে  
এবং আমাদিগের কোন তত্ত্বাস্থানই একেবারে সন্দেহ রহিত  
হয় না।

গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাস্থান অপেক্ষা আপনাকে  
অকিঞ্চৎকর বলিয়া জ্ঞান করা ঈশ্বরপ্রাপ্তির নিশ্চিত পথ।

কিন্তু বিজ্ঞা গুণমাত্র বলিয়া অথবা কোন বিষয়ের  
জ্ঞানদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে, নিশ্চিত নহে; কারণ,  
উহা কল্যাণপ্রদ এবং ঈশ্বরাদিষ্ট।

কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে, সদ্ব্যক্তি এবং সাধু  
জীবন বিজ্ঞা অপেক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেকেই সাধু হওয়া অপেক্ষা বিদ্যান হইতে অধিক  
যত্ন করে; তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময় তাহারা

৫। অহো! সন্দেহ উত্থাপিত করিতে  
মাছুন যে প্রকার যত্নশীল, পাপ উন্মূলিত  
করিতে এবং পুণ্য রোপণ করিতে যদি  
সেই প্রকার হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে  
একশ্রমকার অমঙ্গল এবং পাপ কার্যের বিবরণ  
থাকিত না এবং ধর্মিকদিগের মধ্যে এতাদৃশী  
উচ্ছ্বাসিতা থাকিত না।

নিশ্চিত শেষ বিচার দিনে কি পাড়িয়াছি তাহা  
জিজ্ঞাসিত হইবে না; কি করিয়াছি, তাহাই জিজ্ঞাসিত  
হইবে। কি পটুতা সহকারে বাক্য-বিভাগ করিয়াছি,  
তাহা জিজ্ঞাসিত হইবে না; ধর্মে কতদূর জীবন  
কাটাইয়াছি, ইহাই জিজ্ঞাসিত হইবে।

ঈহাদের সহিত জীবদর্শন্য তুমি উত্তমরূপে পরিচিত  
ছিলে এবং ঈহারা আপন আপন ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি  
লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিত এবং অধ্যাপকেরা  
কোথায় বলিতে পার?

অপরে ঈহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে এবং  
নিশ্চিত বলিতে পারি, তাহারা ঈহাদের বিষয় একবার  
চিন্তাও করে না।

জীবদর্শন্য ঈহারা সারবান বলিয়া বিবেচিত হইতেন,

৬। অহো! সাংসারিক গরিমা কি শীঘ্রই চলিয়া যায়! আহা! তাঁহাদের জীবন যদি তাঁহাদের জ্ঞানের সদৃশ হইত, তাহা হইলে বুদ্ধিতাম যে, তাঁহাদের পাঠ এবং চিন্তা কার্যের হইয়াছে।

ঈশ্বরের সেবাতে কোনও যত্ন না করিয়া, বিজ্ঞানদে এ সংসারে কত লোকই বিনষ্ট হয়!

জগতে তাহারা দীনহীন হইতে চাহে না, তাহারা মহৎ বলিয়া পরিচিত হইতে চায়; সেই জন্তই, আপনার কল্লানা-চক্ষে আপনি অতি গর্বিত হয়।

তিনি বাস্তবিক মহান, ঈহাধার নিঃস্বার্থ মহামুভূতি আছে।

তিনিই বাস্তবিক মহান, যিনি আপনার চক্ষে আপনি অতি ক্ষুদ্র এবং উচ্চপদ লাভরূপ সম্মানকে অতি তুচ্ছ বোধ করেন।

তিনিই যথার্থ জ্ঞানী যিনি গুপ্তকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত সকল পার্থক্য পদার্থকে বিষ্ঠার জায় জ্ঞান করেন।

তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পল্লি-চালিত হন এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### কার্যে বুদ্ধিমত্তা

১। প্রত্যেক প্রবাদ অথবা মনোবেগজনিত ইচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের কখনও উচিত নহে, পরস্তু, সতর্কতা এবং ধৈর্যসহকারে উক্ত বিষয়ের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিবে।

আহা! আমরা এমনি দুর্বল যে, আমরা প্রায়ই অতিমহজে অপরের সুখ্যাতি অপেক্ষা নিন্দা বিশ্বাস করি এবং রটনা করি।

ঈহাধার পবিত্রতায় উন্নত, তাঁহারা সহসা সকল মন্দ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন না; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, মহুগের দুর্বলতা মনুষ্যকে অপরের মন্দ রটাইতে এবং মিথ্যা বলিতে অত্যন্ত প্রবল করে।

২। যিনি কার্যে হঠকারী নহেন এবং সবিশেষ বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বেও আপন মতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা ঈহাধার নাই, যিনি যাহাই শুনে, তাহাই বিশ্বাস করেন না এবং শুনিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ রটনা করেন না, তিনি অতি বুদ্ধিমান।

৩। বুদ্ধিমান এবং সন্নিবেচক লোকদিগের নিকট হইতে উপদেশ অন্বেষণ করিবে এবং নিজ বুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া, তোমা অপেক্ষা ঈহাধার অধিক জানেন, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়া উত্তম বিবেচনা করিবে।

সাধুজীবন মনুষ্যকে ঈশ্বরের গণনায় বুদ্ধিমান করে এবং এই প্রকার ব্যক্তি যথার্থ বহুদর্শন লাভ করে।

যিনি আপনাকে আপনি যত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন এবং যিনি যত পরিমাণে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, তিনি সর্বদা তত পরিমাণে বুদ্ধিমান এবং শান্তিপূর্ণ হইবেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

#### শাস্ত্র পাঠ

১। সত্যের অনুসন্ধান শাস্ত্রে করিতে হইবে, বাকচাতুর্যে নহে। যে পরমাত্মার পেরণায় বাইবেল লিখিত হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে বাইবেল সর্বদা পড় উচিত। (ক)

শাস্ত্র পাঠকালে কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কল্যাণমাত্র অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

যে সকল পুস্তকে পাণ্ডিত্য সহকারে এবং গভীরভাবে প্রস্তাবিত বিষয় লিখিত আছে, তাহা পড়িতে আমাদের যে প্রকার আগ্রহ, অতি মনঃপ্রভাবে লিখিত যে কোন ভক্তির গ্রন্থে সেই প্রকার আগ্রহ থাকা উচিত।

গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি অথবা অপ্রসিদ্ধি যেন তোমার মাকে বিচালিত না করে। কেবল সত্যের প্রতি তোমার ভালবাসা দ্বারা পরীক্ষাচিত হইয়া, তুমি পড় কর। (গ)

কে লিখিয়াছে, সে তদ্ব না লইয়া, কি লিখিয়াছে, তাহাই যত্নপূর্বক বিচার করা উচিত।

২। নাহুল চলিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সত্য চিরবল থাকে।

নানারূপে ঈশ্বর আমাদের কাছে বলিতেছেন, তাঁহার কাছে ব্যক্তিবিশেষের আদর নাই।

অনেক সময় শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে যে সকল কথা আমাদের কেবল দেখিয়া যাওয়া উচিত, সেই সকল কথা মর্মভেদ ও আলোচনা করিবার জন্ত আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়ি। এইপ্রকারে আমাদের কেতুলল আমাদের অনেক সময় বাধা দেয়।

যদি উপকার বাধা কর, নম্রতা এবং সরলতা এবং বিশ্বাসের সহিত পাঠ কর এবং কখনও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার বাগনা রাখিও না।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

ক। 'নৈমিষ তর্কেণ মতিরাপনোমা' তর্কের দ্বারা ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা যায় না, —শ্রুতিঃ।

খ। আদমীত শুভাং বিখ্যাং প্রাশস্তাদবদাদপি।

নীচের নিকট হইতেও যত্নপূর্বক উত্তম বিজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

# মানসিকরোগের কারণ-দুটি গ্র্যাণ্ড

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন মানুষ মারবার নিত্য-নূতন কৌশল আবিষ্কারের জন্তে কোমর বেঁধে লেগেছেন—অন্যদিকে কিন্তু যুদ্ধকে বাঁচাবার জন্তেও তাঁদের উদ্যম কিছু কম দেখাচ্ছে না। প্রসঙ্গত বলতে হয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা। ত্রিশ বছরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে, এর আগের আড়াইশ বছরেও দেখা যায় ততখানি যিনি। আজকের দিনে অনেক পুরনো অনিবার্যভাবে পদব্যাধির হাত থেকে আমরা প্রায় নিঃশঙ্কভাবেই রেহাই পাই। এটা কি কম কথা!

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে আবার মানসিক রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে যে উন্নতি হয়েছে তা এককথায় বলায়কর। নরদেহে ঈশ্বরের পরশ আমরা পাই একমাত্র রোগীদের মনে। সেই মন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে আগেকার দিনে সে ব্যক্তি সবার রূপার পাত্র হয়ে থাকতো তো বটেই, কোনো বা অহেতুক শাস্তির পাত্রও হয়ে উঠতো। বিগত এক শতাব্দী ধরেই অবস্থা এ-দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং একজন ‘পাগল’ যে হাসবার পাত্র নয়, সে-ও যে কলেরা টি-বি-গ্রন্থদের মতই একজন রোগী, এ-সত্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা হয়। আজকের দিনে কিন্তু দর্শনের সাথে মনোবিজ্ঞানের একটা জটপাকানো অবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরেই চলে আসছিল। কাজেই বিগত শতাব্দীতে পাগলের গণ্যে কখনো-সখনো ডাক্তারী প্রক্রিয়া জটিলও, বেশির-ভাগ সময়ই তাকে ডাক্তারের দর্শনশাস্ত্রের চাপে পড়ে যেতে তো। ফল সহজেই অনুমেয়।

ক্রমশঃ অবস্থা অবস্থার রূপান্তর ঘটতে থাকে। মনোবিজ্ঞান দর্শনিকের কঙ্কর বাইরে চলে আসতে সক্ষম হয়েছে এবং রাজকের দিনের পাগলকে আর দার্শনিকের খোয়াল পূর্ণ করতে হয় না। ডাক্তারবাদের সর্বজনজ্ঞেয় পদ্ধতির বাইরে গকে যেতেই হয় না। এখনো অবস্থা একটা ব্যাপারের দোহা হয় নি। সে হলো ‘মন’ প্রথম মানসিক চিকিৎসার দ্বিতীয় আর শরীর প্রথম পদ্ধতি। ধরা ‘সাইকোপ্যাথ’ মনে, তাঁদের একরকম পদ্ধতি অর্থাৎ ধারা মনে বরেন য রোগীর নিজের মনের সাহায্যেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়—শুধু কথাবার্তা এবং চিন্তা-গমনের সাহায্যে। কিন্তু ধারা ভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী-ধারা সর্বদাই মানসিক বিকৃতির জন্তে শারীরিক কারণ জ্ঞে থাকেন। এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে

ঐক বর্তমানে পৃথিবীর অন্তত একশটি হাসপাতালে দুটি গ্র্যাণ্ডকে একটা প্রধান মানসিক ব্যাধির একমাত্র কারণ মনে করে পরীক্ষাকার্য চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ গবেষকই বর্তমানে এর যথার্থ্য সম্বন্ধে একমত। রোগটি হলো সিজোফ্রেনিয়া। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সত্য এবং অসত্য, বাস্তব এবং অস্বাভাবিক সীমানা হারিয়ে ফেলে। এরকম রোগী হয় তো কখনো বলে বসবে যে, কাল রাতে ভগবান যুধিষ্ঠির, মহাকবি কালিদাস এবং পরমহংসদেব একই সময়ে তাঁর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি নিজে তাঁদের পদধূলি নিয়েছেন। তাঁর স্বামী দেখতে পান নি ওদের, কারণ তিনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। এর মানেটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, স্বামী যে ঘুমুচ্ছিলেন সে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যুধিষ্ঠির, কালিদাস এবং পরমহংসদেবকে নিয়ে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তিনি মিশিয়ে ফেলেছেন। এই ব্যাপারটা যখন ব্যাপকভাবে চলতে থাকে—যখন ঘুমুচ্চা থাকে, তখন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক জীবন বলে আর কিছু থাকে না।

শতাব্দিক হাসপাতালে প্রায় এক সহস্র মনোবিজ্ঞানী গত দুই যুগ ধরে নানা পরীক্ষাকার্য চালানোর পরে আজকের দিনে মনে করছেন যে, সিজোফ্রেনিয়ার একমাত্র কারণ হলো দুটি গ্র্যাণ্ডের ক্রটি—এ্যাড্রিনাল গ্র্যাণ্ড দুটির উপযুক্ত কর্মক্ষমতার অভাব। এ্যাড্রিনাল গ্র্যাণ্ড দুটি থেকে যে রস নির্গত হয়, তাকে বলে এ্যাড্রিনাল করটিক্যাল হরমোন। হাত বা পা নাড়ির মতো একটা সামান্য প্রয়াস থেকে, দুটো বা হকি খেলা বা পাঁচ শি নাইল বেগে প্লেন চালানো—প্রত্যেকটি উত্তমের জন্তেই এ্যাড্রিনাল করটিক্যাল হরমোনের প্রয়োজন হয়—এই জিনিসটির দ্বারাই শরীর এবং মন সক্রিয় হয়ে ওঠে। কয়েক হাজার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শতকরা আশীটি সিজোফ্রেনিক রোগীরই এ্যাড্রিনাল গ্র্যাণ্ডস যথেষ্ট সক্রিয় এবং সতেজ হয় না। ফলে যে কোনো নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সে তার মন বা শরীরের সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে পারে না—অর্থাৎ তার যে শারীরিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, তা এক কথায় অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়—কাজেই সেও অপকৃতিস্থ হিসেবে গণ্য হয়।

অনেকেই মনে করেন যে, এই গবেষণা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন উন্নতি ঘটাবে তেমনি বিপ্লব ঘটাবে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে। মন যে সর্বতোভাবেই শারীরিক কারণবশত বিকৃত হয়ে যায়—এটা ব্যাপক

# আমরা সবাই চোর

ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, আমরা চাই বা না চাই; সত্যের পাতিত্রে এ কথাটা সব সময়েই স্বীকার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, প্রকৃত সং এবং নিখুঁত মানুষ প্রায় নেই বললেই চলে। অনেকে হয় তো ভাবছেন যে ‘পারফেকশন’ আমাদের আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও ‘পারফেকশন’-এ পৌঁছানো প্রায় অসাধ্য বলেই এই মণ্ডকাতে কয়েকটা নীতি কথা শোনাচ্ছি আপনাদের। কিন্তু বাস্তবিক সে রকম কোনো অসং উদ্দেশ্য আমার নেই। মানুষের অক্ষমতাকে নিয়ে বিজ্ঞপ করা আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়। বরং কয়েকটি বিষয়ে আমরা মানুষেরা যে কতো অসহায় সেই বিষয়ে আপনাদের নজর আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। সকলেই জানেন, যে কোনো জটিকে দূর করবার জন্তে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হলো সজ্ঞানভাবে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা। যদি সজ্ঞানভাবে কোনো জটিকে আমরা দূর করবার জন্তে চেষ্টা করি, তা হলে হয় তো বা কালক্রমে তা আমরা দূর করে উঠলেও উঠতে পারবো—নচেৎ সেই সমস্ত জটটিগুহই আমাদের চোখ বুজতে হবে।

যাই হোক, যা বলছিলাম। সং মানুষের কথা—সত্যতার অনেক দিক আছে বা থাকতে পারে। বিস্তারিতভাবে সে আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আসুন আমরা একটু সীমিত-ভাবে জিনিষটা আলোচনা করি। সত্যতা—যেমন, বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি ইত্যাদি সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক না কেন—এইটাই তো আজকের দিনে একটা প্রধান সমস্যা এবং বোধ হয় অল্প সমস্ত সমস্যাও বেশ খানিকটা এই একটি সমস্যার মধ্যেই যে-ভাবেই হোক না কেন নির্ভর করে আছে।

প্রসঙ্গত একটা পুরনো গল্প মনে পড়ে গেলো।

প্রাচীন গ্রীসে পণ্ডিতপ্রবর ডায়োজেনিসের একদিন মনে হলো যে, রাজধানী অথেন্সে সং-ব্যক্তির সংখ্যায় কি পরিমাণ এটা একটু দেখা দরকার। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজি (অর্থাৎ অনুসন্ধান) চালাবার পরে নিরাশ হয়ে এ কাজে ইস্তফা দিতে হয়েছিল তাঁকে—মানে সং লোক তিনি একটিও পান নি। একবার ভাবুন অবস্থাটা। একটা গোটা নগরে দ্বিতীয় আর একজনও সং লোক পাওয়া গেলো না। ডায়োজেনিস দেখেছিলেন যে যে ব্যক্তির অল্প কোনো খুঁত নেই—তারও একটি খুঁত আছে—অর্থাৎ কি না চোর। ই্যা চোর। সকলেই চোর। তফাৎ শুধু ডিগ্রির। কেউ বড়ো চোর—কেউ ছোটো চোর—আদৌ চোর নয়—এ রকম লোক

আজকের অথেন্স বা রোম, কিঙ্গা লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মস্কো, কোলকাতা, পিকিং বা টোকিও যদি কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় তা হলেও ঠিক ডায়োজেনিসের অভিজ্ঞতাই হবে। চোর নয়, কিছুমাত্র চুরির অপরাধ কখনো করে নি বা করে না এরকম ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া একটা নিদারুণ সমস্যা হয়ে উঠবে বৈ কি।

বলাই বাহুল্য, এখানে চুরি কথাটা একটু ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হলো। ‘না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়’—অবশ্যই, কিন্তু তার পরেও কথা থাকে। দ্রব্য কিছু না লইলেও চুরি করা হয়। যেমন ধরন, কাপো অফিসে হাজিরা দেবার কথা ঠিক দশটায়, সে যদি কোনোদিন সোয়া দশটায় হাজিরা দেয়, কিন্তু পুরো দিনের বেতন নেয় তা হলেও একদিক থেকে সেটা চুরি করা হলো বৈ কি। চুরি অবশ্য সে প্রত্যক্ষভাবে কোনো ‘দ্রব্য’ করলো না। করলো কিছু সময়, কিন্তু সেই সময় তাকে পয়সা এনে দিলো তো?

চুরির কথা বলতেই সাধারণত মনে পড়ে কবে কোথায় সিন্দুক ভেঙ্গে ছুঁশো ভরি সোনা চুরি গিয়েছিল বা ব্যাঙ্গ থেকে লাগ টাকা চুরি গিয়েছিলো বা মস্ত একটা জলহস্তীর হাঁ-এর মতো সিঁদ কেটে গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত করা হয়েছিল অর্থাৎ কি না ছ’ বছর, চার বছর বা পাঁচ বছরের শ্রীঘর ঘুরে আসবার মতো জমকালো চুরি। কিন্তু এ সবের প্রতি নজর আকর্ষণ করা যে আমার উদ্দেশ্য নয়। তা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। ‘চোর’ আখ্যাপ্রাপ্ত হতভাগাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জায়গা এ নয়। ভদ্র, মাধু এবং ‘চোর-নয়’ আখ্যাপ্রাপ্তদের মধ্যে যে চুরির কাজটা কি রকম নিয়মিতভাবে চলে থাকে, সেই কথাই আমি বলতে চাই।

নিউইয়র্কে একটি প্রতিষ্ঠান আছে—সওদাগরী প্রতিষ্ঠান সমূহকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হলো যার কাজ, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নরম্যান জেসপার কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে, বিভিন্ন সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের (দোকান-পসার সহ) কর্মচারীরা (যারা চোর আখ্যাপ্রাপ্ত নয়) সমবেতভাবে যে চুরি (দ্রব্য) সারা বছর ধরে করে থাকে—চোর আখ্যাপ্রাপ্তদের সমবেত চুরির পরিমাণ সে তুলনায় কিছুই নয়।

আমুন এবার ব্যাপারটা একটু সতর্কভাবে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ভেবে দেখা যাক। ধরন অমুকবাবু একটা অফিসে চাকুরী করেন। দিনের শেষে কাজের টেবিলের ওপর থেকে তিনি অধেক খয়ে-যাওয়া পেন্সিলটা তাল

## মৌমাছির ভাষা

আমাদের, পেন্সিল একটা চাইলেই পাওয়া যায়—আর তা ছাড়া এ-তো অধিকটা নাই-ই এটা বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর এমন কি দৌলের? কি-ই বা এর মূল্য। সবাই তো নিয়ে থাকে এরকম। (অমুকবার মনে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয় যে, ছেলেবেলায় তিনি দেখতেন বাবা-কাকারও অর্মন অনেক আনতেন। কখনো রাফ খাতার কাগজ আসতো, কখনো ভালো ভালো 'নিব' আসতো কখনো বা ব্রটিং-পেপার কখনো বা কালি ইত্যাদি ইত্যাদি।)

এই সমস্ত কথা মনে এসে যেতেই অমুকবার নিষ্পাপ মনে পেন্সিলের টুকরোটা বাড়ি নিয়ে চলে এলেন। একদিক থেকে ব্যাপারটা এই রকমই একান্ত বৈশিষ্ট্যহীন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এ বাজটাকে 'চুরি' করা হলো বললে যেন 'চুরির' অমর্যাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারটার অজ্ঞ একটা দিকও আছে। আশুন এবার সেই দিকটা ভাবা যাক। ধরুন আশু পেন্সিলটার দাম ছিলো আট আনা। কাজেই আদখানা পেন্সিলের দাম হবে চার আনা। এবার ভাবুন, অমুকবার একটা ব্যাকের কর্মচারী, চাই কি ক্যাশিয়ার! চার গুণা পরমা আর কি! এই মনে করে যদি তিনি মানে-মানেই একটা করে সিকি ক্যাশবায় থেকে তুলে নিয়ে নিষ্পাপ মনে বাড়ি ফেরেন—তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? তিনি যে চুরি করছেন এ-বিষয়ে কি আর কিছু সন্দেহ থাকবে? এবং তাঁর অপরাধ যে দণ্ডনীয় অপরাধ, সে বিষয়ে কি আর দ্বিমত থাকতে পারে?

মাছুষ বেন যে চুরি করে এ নিয়ে বহুকাল ধরে মনো-বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং আজ পর্যন্ত যে এ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য সব জানা হয়ে গেছে এমন কথা কেউই বলেন না। কেন যে মাছুষ চুরি করে সে বিষয়ে অনেক উত্তরের মধ্যে কয়েকটি হলো—

১। লাভ—অর্থাৎ অর্থ বা দ্রব্যপ্রাপ্তিজনিত লাভ।

২। মজা অর্থাৎ লাভ কিছুই নেই তবু চুরি করে থাকে কেউ কেউ (বিশেষ করে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা)।

৩। নিজেকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার একটা বিকৃত প্রয়াসবশত।

৪। দলে পড়ে।

৫। সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অগ্রসৃত্ত অবস্থায় নেহাৎ অবস্থার চাপে (যেমন পরীক্ষার হলে অনেক সময় ঘটে থাকে; কিম্বা ট্রান-বাস যাত্রীদের মধ্যেও কম হয় না)।

৬। অবচেতন মনের তাগিদ।

বিজ্ঞানীরা এই শ্রেণীভেদে বলেন ক্রেপ্টোম্যানিয়াক। এই ক্রেপ্টোম্যানিয়া ব্যাধিটি অতি সাংঘাতিক। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায় সময়েই চুরি করে থাকে, এমন কি নিজেরও অজ্ঞাতে। চৌর্যলব্ধ দ্রব্য অনেক সময় এমন কি সে নিজেও ভোগ করে না বা তার বাসনাও থাকে না। কিন্তু তবু চুরি তাকে করতেই হবে। এ যেন তার বিধির নির্দেশ।

সব মিলিয়ে তা' হলে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তা নিশ্চয়ই দুঃসদায়ক—মাছুষের নানা অসহায়তারই একটা দিক আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

একটা শেষের কথা আছে, যা অবশ্যই বলা দরকার: চুরি করবো না, কোনমতেই কিছু চুরি করবো না। একম একটা সজ্ঞান দৃঢ়তা থাকলে এক যারা 'ক্রেপ্টোম্যানিয়াক' তারা ছাড়া আর সবাই চুরি না করেও পারে—শুধুমাত্র তখনই আমরা শং এবং 'চোর নয়' আখ্যা যথার্থভাবে দাবী করতে পারি। আর ক্রেপ্টোম্যানিয়ার উপদে'উত্তে হলে, দ্বিতীয় এক ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন—অর্থাৎ ডাক্তার-মনোবিজ্ঞানী।

—তীরন্দাজ

## মৌমাছির ভাষা

নিজের মনোভাব অজ্ঞকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা মাছুষের যতো নিভুল ঠিক এতোটা আর অজ্ঞ কোনো প্রাণীরই যে নেই—এ বিষয়ে সব অহুসদ্বানকারীরাই একমত। আর এ একটা এমনই বিষয় যে, সাধারণ যে কোনো বালকেরও বোধ হয় এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নিজেকে অপরের কাছে

ব্যক্ত করবার যোগ্যতা সম্পর্কে মাছুষের পরেই দ্বিতীয় স্থান কার প্রাপ্য? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, মাছুষের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে নিশ্চয়ই এইরকম কোন জীবই এই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী—যেমন কুকুর, বিড়াল, গরু কিম্বা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, উট প্রভৃতিদের কেউ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন

যে, তা সত্য নয়। নিজেকে স্বশ্রেণীর অঙ্গদের কাছে নিভূর্তভাবে ব্যক্ত করবার শক্তিসম্পন্ন হিসেবে মানুষের পরেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলো মোমাছি।

বলাই বাহুল্য, পরম্পরের সঙ্গে খবর বা চিন্তা আদান-প্রদানের জন্তে মানুষকে যতোটা ঘন ঘন এবং যতো বিচিত্র কারণে নিজেকে ব্যক্ত করবার প্রয়োজন দেখা দেয়, ততোটা তো দূরের কথা—এমন কি তার শতাংশও অল্প কোনো জীবের হয় না। মানুষোত্তর প্রাণীদের প্রধানতম প্রয়োজন খাদ্যসংগ্রহ, আশ্রয়স্থান, এবং বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন মোটাবার জন্তে স্বশ্রেণীর অঙ্গদের কাছে নিজেকে ব্যক্ত করতে হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে—এ কাজটা মোমাছি যতো নিখুঁতভাবে করতে পারে, ততোটা আর কেউই পারে না।

আমুন এবার মোমাছিদের ব্যক্ত করবার পদ্ধতি, অর্থাৎ তাদের ‘ভাষা’ সম্বন্ধে কিছু দেখা যাক। মোমাছিদের ভাষা মানে হচ্ছে ‘নাচ’। অর্থাৎ নেচে নেচে তারা একে অপরকে সংবাদ জানায়; খাবারের সংবাদ, বিপদের সংবাদ, জানায় মিলনের আহ্বান।

আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে মোমাছিদের ‘ভাষার’ স্বত্বভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। খাবারের সন্ধান করার গায়িত্ত সাধারণত জ্বী-মোমাছিরাই নিয়ে থাকে। মনে করুন একটা বাগানে একটি মোমাছি কিছু খাবারের সন্ধান পয়েছে। তার দলের অল্প সবাই রয়েছে অগতঃ—কিন্তু দু’শো গজ দূরে। এই দলবলের অবস্থিতি যদি ঐ গাণের সমান ‘লেভেল’-এ হয়, তা হলে ঐ সন্ধানরত

মোমাছি সোজা ওপরের দিকে কয়েক ফুট উড়ে যাবে এবং গিয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গ এবং পাখনা একটা নির্দিষ্ট তাল বজায় রেখে নাচাতে থাকবে।

এর মানে দাঁড়াবে: তোমরা সোজা আস্তানা ছেড়ে সমান উচ্চতা বজায় রেখে লাইন সাজিয়ে এগোও (মোমাছির সাধারণত লাইন দিয়ে উড়তে পছন্দ করে)। কিন্তু ঐ সন্ধানী মোমাছিটি যদি প্রথমে উপরে উঠে তারপর আবার কিছুটা নীচের দিকে নেমে নাচতে থাকে তা হলে তার দলবল বুঝবে যে, খাত্তের সন্ধান পাওয়া গেছে তবে যে দিকে সে নাচছে সে দিকে নয়, তার ঠিক বিপরীত দিকে। যে খাত্তের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ মোটামুটি কতোটা তাও মোমাছির প্রায় সঠিকভাবেই জানাতে পারে—সে জন্তে নাচের ভিন্ন ছন্দ আছে। খাবারের জায়গার গতি নির্দেশ করবার পরেই সাধারণত তারা সেই তালে নেচে নেচে জানায় যে দলবলের কতো সংখ্যক মোমাছির আস্তানা ছেড়ে আসা দরকার খাত্ত সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার জন্তে।

ভয় পেয়ে গেলে সাধারণত মোমাছির অল্প কিছুক্ষণের জন্তে ঘুরতে থাকে একটা কিছু কেন্দ্র করে। কিন্তু এই ভয়ের কবল থেকে যদি কাছপিঠের অল্প মোমাছিদের পালাবার সন্ধেত জানাবার প্রয়োজন হয়, তা হলে তারা ঘুরতে থাকবে নাচতে নাচতে। অর্থাৎ আগে যেখানে শুধু বৌ করে উড়ছিল এবার সেখানেই নাচতে নাচতে চক্র দিয়ে উড়বে; কাজেই তার গতিটা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা কম হবে।

—সুরাসিক

## কাঁটের প্রতিরোধ

আজকাল সাধারণ গৃহস্থের ঘরে, দোকান-পসারে এবং বড়ো বড়ো স্টোর বা ফসলের ক্ষেতে পোকামাকড় বং কাঁট ধংস করবার জন্তে কত রকম তেলই না ব্যবহার রা হচ্ছে। এই তেলটা যে নেহাৎ জলেই যাচ্ছে তা, তবে অনেক সময় পোকামাকড়ের তেল যে আশাহুরূপ ফল জে না, তাও সত্য।

ইরোপ এবং আমেরিকার কয়েকটি দেশে পোকামাকড় াসের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর কয়েকজন বিজ্ঞানী নানা িক্ষাকার্যের পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আশ্রয়স্থান জাতবৃত্তি ছাড়াও বড়ো বড়ো পোকামাকড়ই শুধু নয়, টো ছোটো কাঁটেরাও তাদের স্বভাব এবং জীবনধারণ তিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধির বিরুদ্ধে তে পারে। শুধু লড়তে পারে তাই নয়—লড়ে জিততেও

ধরে নিন বিশেষ একটা ব্র্যাণ্ডের কাঁটনাশক তেল আপনি আপনার ফসলের গুদামে নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছেন। তিন কি চার মাস এভাবে করতে থাকলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, আপনার গুদাম অবাঞ্ছিত পোকামাকড় এবং কাঁট-মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার পর থেকেই আবার ক্রমশ দেখা যাবে যে, ঐ কাঁটনাশক তেলের ব্যবহার চলা সন্ধেও আপনার গুদামে একটু-দুটি করে আবার কাঁট এবং পোকার আবির্ভাব ঘটতে আরম্ভ করেছে। এটা যে সম্ভব হচ্ছে তার কারণ, কাঁটের নবলক প্রতিরোধের শক্তি। আপনি যখন আপনার গুদামে কাঁটনাশক তেল নিয়মিত ব্যবহার করে চলেছেন, তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পেনেন যে, আপনার গুদামের আশপাশের অঞ্চল থেকে নানা জাতের পোকামাকড় এবং কাঁট একই একই করে আসতে থাকে।

ঐ কীটনাশক তেলের সঙ্গে হতে থাকে তাদের পরিচয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে জৈবিকক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

কীটনাশক তেলের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্তে কখনো গুদামের খুব কাছে এসে পড়ে, কখনো বা আবার একটু পিছিয়ে যায়। এইভাবে পোকানাশক এবং কীটেরা ক্রমশ তাদের পক্ষে মারক, মাহুষের আবিষ্কৃত অস্ত্রের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে আরম্ভ করে। এবং এভাবে কয়েক সপ্তাহ চলবার পরে, অনেক সময় দেখা গেছে যে, ঐ গুদামঘরে নিয়মিত সেই একটি বিশেষ ব্র্যাণ্ডের কীট-

নাশক তেল ব্যবহার করা হচ্ছেও সেই গুদামে পোকানাশক এবং কীটদল বেশ বহাল তরিতেই ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য মনে করেন যে, একটা গুদামে নিয়মিত বিশেষ একটা রকমের কীটনাশক তেল ব্যবহার না করে বরং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রকমারী তেল ব্যবহার করা উচিত। কারণ তা হলে পোকানাশক বা কীটেরা কোনও বিশেষ একটা কীটনাশক তেলের রাসায়নিক দ্রব্যগুলির সঙ্গে নিজেদের শরীরের খাপ খাওয়ানোর সুযোগ পায় না।

—শ্রীবিজ্ঞানী

# ইস্ রক্ত

ইস্ রক্ত! একফোঁটা নজরে এলেই সারা শরীরে যেন একটা নাড়া লাগে, কারো মাথা ঘোরে। কারো বা গা গুলোয়, কারো বা মাথা গরম হয়ে ওঠে। গঙ্গোত্রী থেকে বন্দোপসাগর পর্যন্ত সবটাই গঙ্গা, যে কোনো জায়গা থেকে একফোঁটা নিলেই গঙ্গাজল নেওয়া হলো। আমাদের শরীরেও তেমনি ৫, ৭ কি ১২ সের রক্ত থাকলেও মাত্র একটি ফোঁটাই যথেষ্ট। ঐ একটি ফোঁটার মধ্যেই রয়েছে শরীরের সমস্ত রক্তের ইতিবৃত্ত, সম্পূর্ণ পরিচয়।

শুধুই কি শরীর, রক্ত যে মাহুষের মনের পরিচয় দিতেও সক্ষম। একমতা রক্তের বরাবরই ছিলো, আমরাই জানতুম না কি করে রক্তের কাছ থেকে কথা আদায় করতে হয়। এই শক্তি মাহুষ অর্জন করেছে মাত্র বছর দশেক আগে। একবার ভাবুন তো—একফোঁটা রক্ত শুধু ফ্রাইডের ওপর পলেই আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা শুধু যে আপনি কি কি রাগে ভুগছেন, সেই কথাই বলে দিতে পারেন তাই নয়। সেই সঙ্গে শতকরা অন্তত পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে তাঁরা বলে দিতে পারবেন আপনি বাঙালী না ফরাসী জাপানী না বরওয়েজিয়ান; শতকরা অন্তত পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে তাঁরা বলে দিতে পারবেন, আপনি নারী না পুরুষ; শতকরা প্রায় আশীটি ক্ষেত্রে নিভুলভাবেই বলে দিতে পারবেন—আপনি তরুণ, প্রৌঢ় না বৃদ্ধ। এসব গেল যেমন-তেমনি; আজকের দিনে কিন্তু রক্তের কাছ থেকে বিজ্ঞানীরা আর একটি খবরও আদায় করে মিতে সক্ষম যা হয়তো অনেকের পক্ষে মোটেই ভালো খবর নয়।

একফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করে আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা এ কথা বলে দিতে পারেন যে, অদূর অতীতে আপনি কোনো অপরাধ করেছেন কি না। বলাই পাছা। এটা নির্ভর করে সেই বিশেষ অপরাধের সঙ্গে

ব্যক্তির মনের যোগাযোগের গভীরতার ওপর। প্রায়ই অপরাধ করতে করতে অপরাধে দাঙহ হয়ে গেছে এমন ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করে তা হলে তার অপরাধও রক্ত-পরীক্ষা করে ধরা যায়, তবে তিন-চার দিনের মধ্যে তার রক্ত বিজ্ঞানীর পরীক্ষার টেবিলে পৌঁছানো দরকার। কিন্তু সেই একই অপরাধ ধরুন যদি কোনো ব্যক্তির সেই প্রথম অপরাধ হয়, তা হলে এমন কি পনেরো দিনের মধ্যে তার রক্ত পরীক্ষা করেও সে অপরাধ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হতে পারেন। অবশ্য অনেক সময় তারও পরে ৬, ৮ কিংবা ১০ সপ্তাহ পরেও এটা সম্ভব হতে পারে—যদি সেই অপরাধ অপরাধীর প্রথম অপরাধ হয় এবং সে কাজটা তার মনে একটু বেশি রকম নাড়াচাড়া দিয়ে থাকে।

রক্তের এই যে গোপনতা ফাঁস করে দেবার ক্ষমতা, এটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকেই পৃথিবীর অনেক দেশের বিশেষভাবে গুয়াকিবাহাল অপরাধীরা—আজকাল ‘ট্রান্স্‌ই-লাইজার’ খেয়ে অপরাধের কাজে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে—এ রকম কিছু কিছু ঘটনার কথাও পুলিশ এবং বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। অপরাধীদের মধ্যে আবার যারা খুবই ‘আধুনিক’ সভাবের তারা আবার ‘ট্রান্স্‌ইলাইজার’ খেয়ে যেমন কিছুক্ষণের জন্তে মনটা ঠাণ্ডা করে অপরাধের কাজে নামে, তেমনি আবার রক্ত সহ কিছু ফাঁস না করে দেয় সেই জন্তে রক্তের একটি সাময়িক পরিবর্তন ঘটাবার জন্তে এক-আধটা ইনজেকশনও নেয় দেখা গেছে।

কিন্তু, একটা কথা। বিশেষ করে রক্তের বিশুদ্ধতা, রক্তের বৈশিষ্ট্য (বিশুদ্ধ রক্ত বা বিশিষ্ট রক্ত বলে আসলে কিছু নেই) সযত্নে রক্ষা করে মনে মনে শান্তি পান ধারা, তাঁরা জেনে রাখতে পারেন যে, এতো সব কল্লোও রক্তকে

একেবারে কাবু করা সম্ভব হয় না। এতো সব করেও যদি কেউ অপরাধ করে তা হলেও তার রক্ত পরীক্ষা করলে রক্ত তা ফাঁস করে দিতে পারে। তবে এই সমস্ত বিশেষ ক্ষেত্রে,

তিন-চার দিন নয়, তিন-চার ঘণ্টা কি বড়ো জোর পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীর রক্ত বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয়।

—নার্স মিত্র

## আপনি কি মোটর চালান ?

বর্তমানে মোটর গাড়ির প্রচলন খুব বেশি এবং তজ্জনিত দুর্ঘটনাও বড় কম ঘটে না, এর একমাত্র কারণ এই যে, গাড়ি চালাতে হলে যতটা যোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন, অধিকাংশ মোটর-চালকই তা নন।

এক্ষেত্রে অবশ্য শুধু চালকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথাই ধর্তব্য নয়, যে গাড়িটি তিনি চালাবেন সেটির অবস্থাও হওয়া চাই নির্দোষ।

চালকের কথা বাদ দিয়ে প্রথমত শেযোক্ত বিষয়েই মনোনিবেশ করা যাক; দুর্ঘটনা সম্পর্কীয় সীমিতর আইন অনুসারে, কোন গাড়ি রাস্তায় চালু করার আগে সর্বপ্রথম তার ব্রেক বা গতি নিরোধক যন্ত্রটি ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার; আজকাল সব মোটর গাড়িতেই প্রায় হাইড্রলিক ব্রেক ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সত্যক পূর্ববেক্ষণে থাকলে যানাকি প্রায় ক্রটিহীন, কিন্তু দেখাশুনো ঠিকমত না হলে এর মাধ্যমেই আসে বিপর্যয়।

একেবারে বিকল না হওয়া পর্যন্ত সচরাচর হাইড্রলিক ব্রেক বিগড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখায় না চালানোর সময় এবং যে কোন অসত্যক চালক তা থেকেই বিপদে পড়তে পারেন স্বচ্ছন্দে।

এছাড়া প্রতিমাগেই গাড়ির ব্রেক ঠিক কাজ করছে কি না তার একটা চেক-আপ হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

লগুনে সম্ভ্রুতি অনুসন্ধান জানা গিয়েছে যে, প্রতিবছর অন্তত চোদ্দশো মোটর চালক ও পঁচাশী হাজার মোটর আরোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে থাকেন, সংখ্যাটি সত্যই আতঙ্কজনক নয় কি ?

আমাদের দেশেও মোটর গাড়ির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে এবং সঠিক সংখ্যা বলা না গেলেও, এখানেও যে দুর্ঘটনার প্রাবল্য কিছু কম নয় একথা অনস্বীকার্য।

সেফটি স্ট্র্যাপ বা বিপদ নিরোধক স্ট্র্যাপের উদ্ভাবনও হচ্ছে ইতিমধ্যে এবং গাড়িতে এর ব্যবহার করেও আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে; অবশ্য এলোপাতাড়ি গাড়ি চালিয়েও সেফটি স্ট্র্যাপের বলয়গে অটুট থাকার চিন্তা করাটা বাতুলতা মাত্র, তবে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, সাধারণত কোন দুর্ঘটনার সময় চালক বা আরোহীর দেহ যদি বাইরে

বেগ হয় দুর্ঘটনার কালে গাড়ির যে গতি ছিল তারই সঙ্গে সমতা প্রাপ্ত; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি দাঁটার ঘাট মাইল গতিতে গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনা ঘটান ও তাঁর দেহ উইণ্ডস্ক্রীন বা স্ক্রিনিং-এর সঙ্গে ধাক্কা খায় বা বাইরে পড়ে তা হলে সে দেহেরও তৎকালীন গতিবেগ হবে দাঁটার ঘাট মাইল হারেই।

সেফটি-স্ট্র্যাপ ব্যবহার করলে অধিকাংশ সময়েই এত ধরনের অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, এবং মনে রাখা দরকার যে, গাড়ি চলার সময় সমস্তক্ষণই এটি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জনাকীর্ণ রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে সহজেই, কাজেই এ ধরনের পক্ষে কর্মব্যস্ত মুহুর্তে গাড়ি চালাতে হলে সেফটি-স্ট্র্যাপের প্রয়োজনীয়তাও সন্মতিক।

এবার আসছে চালকের পালা, মুহুর্তের জ্ঞাত ভুললে চলবে না যে, চালকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গাড়ির যান্ত্রিক যোগ্যতার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী নয়; দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার না হলে চালকের আগনে ব্যার যোগ্যতা থাকতেই পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহুজন গাড়ি চালানো শেখার সময়ে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা হেতু যথাবিধি চশমা ব্যবহার করলেও, পাকোপাক্ত চালক বনে যাওয়ার পর অনেক সময়ই অসাবধান হয়ে খালিচোখে গাড়ি চালান, এর থেকে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে—কাজেই এ অভ্যাস সর্বথা বর্জনীয়।

দৃষ্টিশক্তিই মোটর চালানোর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ভূমিকার অধিকারী, কাজেই এ সম্পর্কে সব ধরনের মোটর-চালকেরই বিশেষভাবে অবহিত থাকা আবশ্যিক।

শরীরের সাধারণ অবসাদগ্রস্ত অবস্থাতেও মোটর চালানোর ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। কারণ তাতে অস্বস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে; অতএব কোনদিন যদি চালাতে চালাতে হঠাৎ ক্লান্তি এসে ছেয়ে ফেলে আপনার শরীর-মন, তা হলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দিন গাড়ির গর্জমান ইঞ্জিনটাকে; পথের ধারে থোলা হাওয়ায় বিশ্রাম নিন একটু, যখন দেখবেন ঘাসের সবুজশিবে হাওয়ার একটু কঁপন দেখে হঠাৎ ভালো লাগারই খুশিতে ভরে উঠছে হৃদয়-মন, তখন বুঝবেন বিশ্রাম আপনার পক্ষে কার্যকরী হয়েছে; এবার জুপুপায়ে উঠে আনুন ফেলে-রাখা যন্ত্রপাতির কোল,



# মাহাত্ম্য

শ্রীঅনিলবরণ রায়

বাংলা দেশে পূজা বলিতে বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীভূর্গা পূজাই বরণ্য। এই পূজার মহিমা অসীম। হিন্দু-ধর্ম সাধনা, আধ্যাত্মিক সাধনার মার মঞ্চলন করিয়া যেন এই মহাপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, পুনাগতয়ের ভিতর দিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতে হিন্দুর যে সভ্যতা, যে শিক্ষা-দীক্ষা, যে সাধনা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—সব যেন বাঙালীর এই মাতৃপূজার মধ্যে ধরা দিয়াছে। তাই বাঙালী সমস্তর ধরিয়া এই পূজার জন্য দিন গণনা করে, পূজা আসিলে তন্ময় হইয়া তাহাতে লাগিয়া যায়। বাঙালী-জীবনের যাহা কিছু শক্তি, যাহা কিছু প্রতিভা, যাহা কিছু ঐশ্বর্য এই মাতৃপূজা, এই শক্তি-পূজাকে ধরিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিনদিন ধরিয়া গোড়শোপচারে বিধিমত শ্রীশ্রীভূর্গা পূজার যে আয়োজন, তাহাকে ভারতের বৈদিক যাগযজ্ঞাদির আধুনিক সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বৈদিক যজ্ঞেরই ভাষা ইহাতে দেবগণকে আহ্বান আছে, নানা যুঁটিনাটি বিধি অমুসারে নৈবেদ্য, বলিদান, হোম, অচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। পূজাতে বর প্রার্থনা আছে,

ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, যাশো দেহি—

তাই বলিতেছিলাম, বাঙালীর ভূগোঁস্বর বৈদিক-যজ্ঞেরই আধুনিক সংস্করণ। বস্তুত এই পূজা যজ্ঞ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মহাভারতে শান্তিপর্বে আমরা দেখিতে পাই—যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

‘আমি শুনিয়াছি, বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কালক্রমে লোপ পাইতেছে। সত্যযুগে ধর্মের এক রূপ, ত্রেতাযুগে আর এক রূপ, দ্বাপর যুগে ত্রিম রূপ, আবীর কলিযুগে অত্র রূপ। বেদবাক্য সনাতন সত্য, বেদ হইতেই নানা শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, দেশকালভেদে অধিকারীভেদে বেদ বিভিন্ন ধর্ম-সাধনার ব্যবস্থা দিয়াছে।’

যুগভেদে ধর্মের রূপও বিভিন্ন হইয়াছে। বেদের পর

উপনিষদের যুগে কর্মধাতুর সহিত জ্ঞানধাতুর বিরোধ হইল, যাগযজ্ঞাদি অত্যাচার দ্বারা দেবতাপ্রাণকে তুচ্ছ করিয়া ভোগসুখবাঞ্ছা করা নিন্দনীয় হইল। সাংসারিক ভোগসুখ বর্জন করিয়া জ্ঞানের চর্চা করা, একমাত্র পরমতত্ত্বের সন্ধান করা। পরমতত্ত্বের সন্ধান হওয়াই পরমার্থ বলিয়া ঘোষিত হইল।

এই যে সংসার-বিমুক্ততা, কর্ম-বিমুক্ততা উপনিষদে প্রচারিত হইল, ইহাই কালক্রমে ভারতের ইতিহাসের গতি ফিরাইয়া দিয়াছে, ভারতবাসী আধ্যাত্মিকতায় গভীর হইতে গভীরতর অন্বেষণলাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা অল্প কয়েকজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে—আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই কর্মত্যাগ, ভোগত্যাগের শিক্ষা প্রচারিত হওয়ার জাতীয় জীবনে ভারতের আশেয় ক্ষতি হইয়াছে। অন্যধিকার চর্চায় ধর্মযজ্ঞের হইয়াছে, সাধারণ লোক সংসার ত্যাগ করিতে পারে নাই, ভোগ ছাড়িতে পারে নাই, অথচ উহাকে নিথ্যা, নীচ, নিন্দনীয় ভাবিয়া আদর্শ বিপর্যয়ে জীবনযাত্রায় দিপথ্য হইয়া পড়িয়াছে। গীতা এই সংসার-বিমুক্ততা, কর্ম-বিমুক্ততার কুফল সমাক উপলব্ধি করিয়া মহান কর্মযোগের শিক্ষা প্রচার করে। পূণবীকে ভোগ করিবার শিক্ষা প্রচার করে—

ভোগ্যসে-মহতীম

কিন্তু ঘটনাক্রমে গীতার এই পরম কল্যাণময় শিক্ষা ভারতবাসী স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, পরে শঙ্করাচার্য কতৃক মায়বাদ প্রচারের ফলে গীতার কর্মের শিক্ষা চাপা পড়িয়া যায়। এইভাবে ক্রমশ ভারত শক্তিহীন, প্রাণহীন, ঐশ্বর্যহীন হইয়া পড়ে এবং ইহার চরম ফল হইয়াছিল ভারতের পরাধীনতা।

জীবন নিথ্যা, মায়ী, এই যে বৈরাগ্যের শিক্ষা ইহার বিবন্ধে দাঁড়াইয়া আবার বৈদিকযুগের দ্বিত্যভাগের

আদর্শ ফিরাইয়া আনিয়াছে তত্ত্ব। তত্ত্বের মতে সংসার মিথ্যা নহে, সংসারে ভগবানেরই লীলার বিকাশ হইতেছে—এই সংসার হইতে সরিয়া যাঁতে হইবে না, এই লীলার সাথী হইয়া ইহার পূর্ণ আনন্দ গ্রহণ করিতে হইবে, মানুষের মধ্যে ভাগবতসত্তা লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে জীবনের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, মানবজীবনকে দেবজীবনে পরিণত করিতে হইবে। এই যে যোগ ও ভোগের সমন্বয়, এই যে সংসারের দিব্যালীলা—ইহারই প্রতিমা শ্রীচরণ। শত্রুদলনের দিব্যশক্তি চাই, বিজ্ঞা চাই, সম্পদ, ঐশ্বর্য চাই, সৌন্দর্য চাই, সিন্ধু চাই। পার্শ্বিক বৃত্তিসমূহ যে উচ্চজীবনের বাধা, তাহাদিগকে বশ করিয়া উচ্চজীবন গঠনেরই কাজে লাগাইতে হইবে, আন্তরিক শক্তিসকলকে পরাজিত করিতে হইবে,—অন্তরের মধ্যে দিব্যশক্তিকে আত্মনা করিয়া তাহারই সাহায্যে এইরূপ দিব্যজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানবজীবনের এই যে অত্যুচ্চ নহান্ আদর্শ, ইহাই সাধককবি দশভূজা দুর্গা মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তত্ত্বাক্ষর গৌরাদ্দী, পরি-পূর্ণযোবনা, অপক্লপ জাবনাময়ী মাতৃমূর্তি, দশভূজা দর্শনকে প্রসারিত, সংসারের কোন দিকই বাদ পড়ে নাই, দক্ষিণে লক্ষ্মী ঐশ্বর্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞানদায়িনী, সন্দেশে দিব্য-পুরুষ কাক্তিকেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাহনরূপী পশুরাজ শত্রুদলনে নিযুক্ত, অস্তুর নাগপাশে বন্দী—

জীবনের ইহা অপেক্ষা মহান আদর্শ কে কোথায় কল্পনা করিতে পারিয়াছে? ইহা ত' শুধু মাটির প্রতিমা নহে, তত্ত্ব-সাধক অন্তরের মধ্যে মাগের যে রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ইহা যে তাহারই বাহুগতীক!

শ্রীসামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মাটি কি গো! চিয়ায়ী প্রতিমা।' আর ইহা কেবল মনগড়া কল্পনা নহে। তত্ত্ব-মনের মাঝে যে মূর্তি গঠন করিয়া ভগবানকে আরাধনা করেন, ভগবান ঠিক সেই মূর্তি গ্রহণ করিয়া তত্ত্বকে দেখা দেন, তিনি যে তত্ত্ববাহু-কল্পনাক—

যে যথা মাং প্রপচ্ছন্তে ভাস্তৃণ্থৈব ভজাম্যহং।

—গীতা ৪।১১

অতএব এই মাটির পূজা শুধু মাটি পূজা নহে, অর্থহীন পৌত্তলিকতা নহে, ইহা সেই একত্ব, একভগবানেরই পূজা—

আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম

ধর্মার্থ সব ছেড়েছি।

আমরা দেখিলাম বেদে যে যোগ ও ভোগের আদর্শ ছিল, রূপরসাদি সকল বিষয়ের দিব্যভোগ দেবতার উপাসনা করিয়া লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরি-গণিত ছিল, তত্ত্ব আবার সেই আদর্শকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু তত্ত্ব এক নূতন তত্ত্ব দিয়াছে যাঁহা বেদে পরিষ্কৃট

হয় নাই—তাহা মাতৃরূপে ভগবৎ উপাসনা। উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রে আমরা শক্তি, প্রকৃতি, মায়ার কথা পাই। এই বিশ্বলীলা প্রকৃতিই বিকাশ করিতেছে—সাংখ্য বলে এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। বেদান্ত বলে প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি, উভয়েরই মতে এই প্রকৃতি বা শক্তি বা মায়াই জগতের মূল। উভয়েরই মতে জগৎ দুঃখময়, সংসার অনিত্য, অতএব এই প্রকৃতির খেলা বন্ধ করিতে হইবে। এইজন্ম সাধকগণ প্রকৃতি হইতে, শক্তি হইতে ফিরায়া পুরুষের, ব্রহ্মের উপাসনা করেন, পুরুষ বা ব্রহ্ম জীবন হওয়াই তাঁহাদের আদর্শ। কিন্তু তত্ত্ব দেখাইয়াছে, সংসার যে দুঃখময় ইহা প্রকৃতির নীচের খেলা, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানের খেলা—ইহার উপর জগজ্জনানীর দিব্য মাননের খেলা আছে। এই মর্ত্যজগতেই সেই মাননের বিকাশ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য জগজ্জাতাই উপাসনা করিতে হইবে। ভগবান তাহার স্বামী, পিতৃ পরমেশ্বরের ভোগের জন্য এই জগৎ লীলাবিস্তার করিতেছেন, ইহা মাননীয়, পোষনীয়, সৌন্দর্যময়, মানুষ অজান, অপর তাই সেই মাননীয়তার আনন্দ পায় না, মায়ার অধীনে থাকিয়া অশেষ দুঃখ পায়। এই অজান বা মায়াকে অতিক্রম করিয়া দিব্যজীবন লাভ করিতে হইবে জগজ্জাতার উপাসনা করিতে হইবে।

এই মানার বীজ আমরা গীতাত্রেই দেখিতে পাই। ভগবানের ভোগের জন্য তাহার দিব্যশক্তি পরাপ্রকৃতিই এই বিশ্বলীলার বিকাশ করিতেছেন। ভগবান অঙ্গ দ্বিরা আছেন, দর্শন করিতেছেন, অক্ষমতি দিহিতেছেন, শ্রোগ করিতেছেন,—

উপদর্শীহুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ (১।৩।৩)

তাঁহার কহুই প্রকৃতিই সব কিছু করিয়া চলিতেছে, মন্যাক্ষেপ প্রকৃতি স্বয়ং সচরাচরম্।

হেতুনানে কৌন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে ॥

—গীতা ৯।১০

এই বিশ্বজননী ভাগবতশক্তিই জীবরূপে আবিভূত হইয়াছেন, সমস্ত জগতকে দ্বিরা রাহিয়াছেন—

জীবভূতাং মহাবাহো যযেদং বার্ষতে ভগৎ

যে জগজ্জাতী জগজ্জননী বিশ্বলীলার বিকাশ করিয়া নিজ প্রভুর তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, সেই লীলার অংশীদার হইয়া তাঁহার পূর্ণ আনন্দ গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর কি গতি আছে? জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ জগজ্জাতাই ভিতর দিয়া, জগজ্জাতাই আনন্দদায়কে ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারেন, ভাগবতজীবন দান করিতে পারেন। নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আমরা নির্বাণ লাভ করিতে পারি, কিন্তু পূর্ণ ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে পরমভাবে লাভ করিতে পারিন

না, আমাদের জীবনের পূর্ণতম বিকাশও সম্ভব হইবে না। যাহারা সংসারবাগী সম্যাসী হইতে চান, জীবনলীলা পরিচাল্য করিতে চান, তাহারা নিঃশর্ত ব্রহ্মের উপাসনা করুন, কিন্তু যাহারা দেখেন, এই সংসারের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছে, সর্বভূতের জ্বয়ে বিরাজমান থাকিবা সকল লীলা তিনিই উপভোগ করিতেছেন, যাহারা দেখেন এই সংসারই আনন্দ-বাগান, যাহারা এই সংসারের মজা মুচিত চান, তাহারা ব্রহ্মপ্রসাদের মত গীতবেন,—

প্রমাদ বলে ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেতোর হাসি।

আমার ব্রহ্মময়ী স্বৰূপে পদে পদা পয়া কাশী ॥

সংসার লীলার মূলে রাইয়াছে কামিনী। দৈবলীলা যেমন দৈবজননীকে দীপ্য পাওয়া উঠিয়াছে, তেমনিই মনুষ্যের সাম্যাত্মিক জীবনও নারীশক্তিকে অবলম্বন করিয়া পাওয়া উঠিয়াছে, নারীই সংসারের অবিচ্ছিন্ন দেবী।

এইজন্য যাহারা সংসারচারণকেই জীবনের উচ্চতম আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাহারা ভুলিয়াছেন, আর্য নরকের দ্বারস্বরূপ, কারণ নারীই পুরুষকে সংসারে বিনয়িত রাখে। কিন্তু নারীকেই কাছে এই সংসারই স্বর্গ, ইহাও জানেন, ভগবানের দেবীমত তনাই প্রকৃতি এই সমস্তবস্তুর স্রষ্টা করিয়াছে। সংসারেরীতুর দিয়াই নারীকে ভজনা করিতে হয়—অতএব, সংসারের মূল বিনিনীকে নারীকে বালিয়াছে স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। তাত্ত্বিক দৈবজননীকে উপাসনা করে এবং বলে যে, সংসারের প্রত্যেক কণাই ভগবানের পদাঙ্গুস্পর্শ এক একটি দণ্ড—

বিকার্য সনাতন সংসার ভগবৎ — চণ্ডা

মজা, মাদ্য, কামনা লইয়া আশারকরাষ্ট্র চারিবাগ করিয়া যাহারা পালিবে তাত্ত্বিক আনন্দের বাচ্চার করে, তাহারা নিজেদের জন্য নরকের পথ পরিষ্কার করে, তাহাদের দ্বারা সমাজের যে কত গন্ধিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যাহারা প্রত্যেক রমণীতেই জগন্মাতাকে নীতিমতী বলে, স্মৃতিতে বোধগম্য তাহার চরণ উল্লেখে ভীতভয়ে পোষা করা যাহাদের আনন্দের আদর্শ, তাহাদের মধ্যে কান্ডাচরণের উল্লস হইতে পারে না।

বেদও তদে যে ভোগের আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে, তাহারূপে হীকরূপী বা নাচের প্রকারের ভোগ নহে। রামপ্রসাদ পাইয়াছেন—

হীকর্য অশব যার দেবতা কি বশ তার।

রামপ্রসাদ বলে নারীপাড়ে ঘাসা এক কখনও ফলে?

ইহাই শক্তিমাননার মূলবশা, হীকর্য যাহার অশব সে দৈবাজীবনের দিবা আনন্দের আরাধনা লাভ করিতে পারে না। হীকর্যনিচরকে বশভূত করিয়া কামজোবা দিগন্ত উপরে উঠিয়া জগন্মাতার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তিনিই দৈবজীবন বিকাশ করিয়া দেন,

তখন মাগুন এই সংসারেই স্বর্গভোগ লাভ করে। ভাগ্য ও ভোগের সমন্বয়—ইহাই উপনিষদের সেই মহাবাক্য,—

‘তেন ত্যজেন ভূজীথাঃ।’

রামপ্রসাদ সহজ ভাষায় ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন—

যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ  
নার ইচ্ছা যোগ ভোগ ভজনে আছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এতদিন শক্তিপূজা করিয়া মায়ের পূজা করিয়া বাঙালী এত শক্তিহীন হইয়া পড়িল কেনন করিয়া? কোথায় তাহার দিব্যজীবন, দিব্য-ভোগ? পূর্ব-বস্তার মুখে দুইবেলা দুইমুঠা অন্ন সে দিতে পারিতেছে না। চারিদিকে শত্রু ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বাঙালীর বিপদ-বিসমট কোথায় নাই? দুর্গতিহারিণী শ্রীকৃষ্ণার পূজা বৎসর বৎসর মোড়শোপচারে করিয়াও বাঙালীর আজ এত দুর্গতি কেন? যাহার কটাক্ষে স্তম্ভি স্থিতি হয় হয় সেই মা যদি বর দিতেন, অভয় দিতেন তাহা হইলে কাহার সাধা আজ বাঙালীকে স্পর্শ করে? বাস্তবিকই বাঙালীর মাতৃপূজায় অশেষ গলদ রহিয়াছে, তাহি সে মায়ের রূপালাভ করিতে পারিতেছে না। শুধু মুখে মা-মা বলিয়া কিছু পুষ্প ও নৈবেদ্য মায়ের চরণে উৎসর্গ করিলেই মায়ের রূপা পাওয়া যায় না। মায়ের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত মতই উৎসর্গ করিতে হইবে, নিজের জগৎ কোন বাদনা, কোন আকাজ্জা রাখা চলিবে না, ধর্ম-জন-পুত্র-পরিবার কিছুই নিজের বলিয়া ভাবা চলিবে না। সব মায়ের কাছে লাগাইতে হইবে, মায়ের ইচ্ছা পূরণে সমস্ত ধনসম্পদ পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিবার সঙ্গ করিতে হইবে, কোন কিছু বাঁক রাখিলে চলিবে না, কোন কিছু দাঁব করিলে চলিবে না। অহংকার, দম্ব, নাচ ভোগের লালসা, যশ-মান প্রভৃদ্ধ-প্রতিষ্ঠার লালসা সম্পূর্ণভাবে বজন করিতে হইবে। আমাদের জীবনকে দোখতে হইবে যে উহা ভাগবতলীলা বিকাশে সহায়তা করিবার জগৎ, জগতে মায়ের কাজ সম্পাদন করিবার জগৎ আনাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ পূর্ণ বিশ্বাস, আত্মবিক্রম ও আত্মসমর্পণ যাহার মধ্যে বিকাশিত হইবে—কেবল সেই মায়ের রূপা লাভ করিতে পারিবে। তখন মায়ের অভয় ছায়া তাহাকে সকল দিক হইতে ঘিরিয়া রক্ষা করিবে, তখন সে হইবে সংসারের অজ্ঞেয়, তখন তাহার কাজ হইবে অব্যর্থ, কারণ তখন তাহা হইবে তাহার ভিতর দিয়া স্বয়ং জগন্মাতারই কাজ, তখন আর এই জগতের বা অদৃশ্য অজ্ঞ কোন জগতের কোন শক্তি হইতেই তাহার ভয় থাকিবে না, কোনকিছুই তখন আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আজ এইরূপ পূর্ণবিশ্বাস ও আত্মবিক্রম হইয়াছে একান্ত অভাব। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির বক্তার প্রসব

অমর বধের আজগুবি কাহিনীতে বিশ্বাস করিতে পারে না। আর অজ্ঞ-অশিক্ষিতেরা মনে করে জগন্মাতা বুঝি সত্যিই ঐভাবে দশ হস্তে দশ অঙ্গ লইয়া সিংহের পৃষ্ঠে চাপিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এসব যে নিছক রূপক স্থূল কাহিনীর ভিতর দিয়া উচ্চতম অধ্যায়সত্য সকল প্রচার করা হইয়াছে সে বোধ তাহাদের নাই। আর এইরূপ অজ্ঞান তামাসিক পূজার কোন ফলই হয় না।

অশ্রদ্ধা হৃতং দত্তং তপস্তত্তং কৃতং চ যৎ ।

অসাদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রোত্য নো ইহ ॥

—গীতা ১৭।২৮

শ্রীশ্রী-দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে গীতার মধ্যে এবং জগন্মাতার যথার্থ স্বরূপ ও চারিত্র্য শ্রীমদ্রবিন্দ দিব্যদৃষ্টি লইয়া অপর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন 'The Mother' পুস্তকে। এই দুইখানি গ্রন্থের সাহায্যে মাতৃপূজার প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া লইয়া পূজাকে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার দিন আসিয়াছে।

ভাই বাঙালী! তোমরা মায়ের পূজারী বলিয়া এই পতিত অবস্থাতেও তোমাদের মধ্যে যে শক্তি দেখা দিয়াছে, যে প্রাণের স্মরণ হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও তাহা দেখা যায় না। 'আজ সমগ্র ভারত তোমাদের মূগ চাহিয়া আছে, তোমরা তাহাদের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে—এই যে মহান কার্যের ভার তোমাদের উপর পড়িয়াছে, তাহার জন্য শক্তি সংগ্রহ কর, তোমার মাতৃপূজাকে সার্থক কর। স্বার্থ তুলিয়া যাও, আপনাকে তুলিয়া যাও, মায়ের কাজের জন্য ঐকান্তিকভাবে জীবন মন যথাসর্বস্ব অর্পণ কর, দেখিবে তখন সর্বমঙ্গলা মায়ের রূপায় তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে, সকল শত্রু ধ্বংস হইবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, তোমার সর্বার্থ সাধিত হইবে। সকল হৃদয় লুটাইয়া মাকে প্রণাম কর—

সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যমকে গোবিন্দ নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

## বোবা রাতে

### শ্রীআশুতোষ সাহায্য

বোবা রাতের নরম নিকষ-কালো আঁধারে  
শুনেছি কি কোনোদিন কান পেতে  
অস্তরের অন্তর থেকে উৎসারিত  
গভীর, নিঃসীম, নিখর শূন্যতার শব্দহীন আঁতলাদ ?  
গৃহ কপোতের পাখার কাপটায়  
আর বরাপাতার মর্গরে  
কোনোদিন—কোনো বিনিময় ব্যাকুল মুহুর্তে  
জেগে উঠে নি ময়ূরচৈতন্যের কেন্দ্রস্থলে  
বহিস্থাবী দুর্বীর বেদনার নৈব্যক্তিক ধূসর হাহাকার ?  
জাগ্রত জীবনের নিবোধ অর্থহীন আঁতস্ত,  
সৃষ্টির মর্মমূলের অন্তলীন কারশ্য  
অজ্ঞান রাতের বিল্লিমজ্জমূর্খারিত প্রান্ত প্রহরে  
তোমাকে করে তোলে নী উৎসাহপূর্ণ বিবশ বিহ্বল  
কোনোদিন—কোনো গলস অসত্য মুহুর্তে ?  
'আলত' স্টিকিটপাতের মতো তোমার কোমল স্মৃতিপু  
আর স্বপ্নাত নৈশ স্বপ্ন ভেঙে হয় নী চুরমার ?  
নক্ষত্রের আলি-গন্ধের মেলে নী যার উত্তর,—  
যা' শুধু নিশীথের নিঃস্বপ্ন নৈঃশব্দ্যের উপর

মাথা কুটে মরেছে—

সেই উত্তরোল উন্মুখর জীবন-জিজ্ঞাসা

আর দৈবী অহুপ্তির তুনিবার দাহ

তোমাকে করে তোলে নি অস্থির উন্মাদ আকুল চঞ্চল ?

ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—

তবু অন্ধ উদাসীন হৃদয়হীন প্রকৃতির হাতের

অসহায় ক্রীড়া-কল্লুক ;—

পশুর গার দেবত্বের অদ্ভুত অপূর্ব সমাবেশ,—

এই তো তুমি আর আমি ?

মরণের বেলাবালুকায় বসে অবোধ শিশুর মতো

রাজ্য বাঁশি বাজিয়ে চলা ;

যৌবনের পুষ্পিত প্রলাপের পাশে জরার মোহমুগ্ধার—

আবৃত্তি,—

এই তো তুলত ছুসহ জীবন ?

এই প্রচণ্ড প্রহসন, এই শাস্বত অচেতিকা,

এই আঁচস্ত্য অসদ্বিত

তোমার হৃদয়ের শাস্তিক করে নি বিব্রিত ব্যাহত—

কোনোদিন—কোনো নিগুন নিবস্তর

# ভা র তে যা ত্ সা ধ না

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

মানবিশিষ্ট জন্মের পরমুহূর্তেই আশ্রয় লাভ করে মাতৃ-অংকে। তারপর, তাঁরই অসীম স্নেহে এবং অরূপণ করুণায় জীবনের পথে সে করে শুভযাত্রা। মাতৃপ্রদত্ত শক্তিই তাঁর চলার পথের পাথর। তাই, মাতৃশক্তির প্রাতি আদিমযুগ থেকেই মানুষ নিবেদন করে আসছে শ্রদ্ধা-ভক্তির অঙ্ক-চন্দন। কালক্রমে পারিপত্য-বৃদ্ধিতে সে আবিষ্কার করে বিশ্বজীবনেরও পশ্চাতে রয়েছে এক মহতী মাতৃশক্তি। সেই মাতৃশক্তির বন্দনায় তাই সুপ্রাচীন কাল হতেই মানব-সন্তানের বণ্ড মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর আদি জ্ঞানসিন্ধু শ্রুতিতেও তাই রয়েছে মাতৃগীতি।

ভারতের মতো পৃথিবীর আরো বহু দেশে অতীতে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের দহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলা, মিশরের ইস্তার, আইসিস আভুতি মাতৃদেবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপে একসময়ে সিংহবাহিনী পবিত্রবাসিনী এক দেবী পূজিতা হ'তেন। অতীতে এই একই মাতৃচেতনা মিশ্রিলিঙ্গের দেশ-দেশান্তরে বিভিন্নরূপে গণ-মানসকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও সেই চেতনা তার দাবাবাহিকভাবে এমনভাবে রক্ষা করতে পারে নি। একমাত্র ভারতই যদু বৈদিকযুগ হতে আজ পর্যন্ত এই মাতৃবন্দনার দারাটি বেগবতীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বাঙলার শারদোৎসব তথা দুর্গাপূজা তারই এক অনিন্দ্যসুন্দর আভিনব রূপ। এই দুর্গাপূজার উৎস-সন্ধান যোগ্য করলে আমাদের উৎসাহ হতে হবে শ্রুতির উত্তরণ শৈলশিখরে।

শ্রুতি ভারতীয় অদ্বৈতচেতনার প্রথম প্রকাশ। বৈদিকী এবং তান্দ্রিকী—এই দুই স্তরে বিভক্ত হচ্ছে শ্রুতি। বেদে এবং তন্ত্রে বহু দেবতার সংগে সংগে বহু দেবীরও উল্লেখ রয়েছে। এই সকল দেবদেবী একই পরব্রহ্মের বিভিন্নরূপ বাস্তবীভূত আর কিছুই নয়। সমীম সাকারী সাধকের হিতের জগৎ অসীম নিরাকার ব্রহ্মের রূপকল্পনা তদুক্ত স্মিয়ার অমূল্যভিত্তিক সত্য—

‘চৈদ্যস্যাধিতীয়ন্ত নিমলন্ত পরামন্তঃ  
সাদকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনাঃ’

—উপনিষদ

বিভিন্ন দেবীগণ স্থান কাল পার্থক্যসারে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক হলেও মূলত এক। একই সনাতনী

মহতী দেবী এই বিভিন্ন দেবীমূর্তিতে বিলসিতা হয়ে রয়েছেন।—

‘নির্ভৈর সা জগদ্ধীর্ভিত্তয়া সর্বমিদং ততম্।’—চণ্ডী  
যাক্ষের ‘নিকঞ্জে’ রয়েছে একই দেবতার বিভিন্ন মহিমার ফলেই বহাদ্রপ নামের উৎপত্তি।—

‘তাস্য মহাপ্রাণ্যঃ একৈকস্তাপি হুনি  
নামধেয়ানি ভবন্তি।’

—নিরুক্ত ৭।৫

বৃহদেবতাম বলা হয়েছে নিবাস, কর্ম, রূপ, মাংগল্যদান, বাক্য, আশিস, ঘটনা, প্রযুক্তি, জন্মরহস্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্বেগ সাধনাদির জগৎই দেবতার বিভিন্ন নামের উৎপত্তি।—

‘নিবাসঃ কর্মণা রূপান্ মাংগল্যায় আশিবঃ।

যদুচ্ছয়োপবসনাং ত্রাণান্যায়গাচ্চ যৎ ॥

চতুভ্য ইতি তত্রাহঃ যাক্ষগার্গ্যরথীতরাঃ।

আশিমোখার্গ বৈরূপ্যাদ্ বাচঃকর্মণ এব চ ॥

সর্বণ্যোতানি নানানি কর্মতস্তাহ শৌনকঃ।

আশীকরণং চ বাচ্যঞ্চ সর্বভবতি কর্মতঃ ॥’

যদুচ্ছয়োপবসনাং ত্রাণান্যায়গাচ্চ যৎ।

তথা তদপি কর্মৈব তচ্ছব্দঃ চ হেতবঃ ॥’

এইভাবেই সকল প্রকার দুঃখ-দুর্গতি ও ছুরিতনাশিনী বদেই মহাশক্তি দুর্গা নামে হন পূজিতা। ঋগ্বেদে দুর্গতি অর্থে দুর্গা শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

‘জাতবেদসে সুনবাম সোমনরাভীযতো নিদহাতি বেদঃ।

স নঃ পযদাতি দুর্গানি বিদ্বানাবেবাসিদ্ধং ছুরিতত্যাগঃ ॥’

—ঋগ্বেদ ১।৯৯

‘জাতবেদা স্মিয়ার উদ্দেশ্যে আমরা যেম নিবেদন করছি। শত্রুদের নিধন করে তিনি নাবিকের মতো দুঃখদুর্গতিরূপ সমুদ্রে আমাদের পার করিয়ে দিল এবং আমাদের সমস্ত পাপ বিনাশ করল।’

দুর্গ বলতে এখানে দুঃখদুর্গতি এবং ছুরিত বলতে পাপকে বুঝিয়েছে। তাই, দুর্গাতিনাশিনী যিনি তিনিই ‘দুর্গা’ নামে আখ্যাত। ঋগ্বেদের দেবীহুক্ত এবং রাজসুক্তে রয়েছে মহাদেবীর ভাবগম্যতার বন্দনা-ময়। এই প্রাচীনতম বেদেরই ১৩ম মণ্ডলের ১২৭ সংখ্যক রাজসুক্তের পর ‘দুর্গা’ নাম উল্লেখ করেই একটি অপর ‘দুর্গাস্তোত্র’ রয়েছে—

‘ত্রামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তী বৈরোচনাং

কর্মণ্যলেক্ষ ইষ্টাং।

দুর্গাদেবীং শরণমহংপ্রাপ্তো হুতরাসে তরসে।

নমঃসুতরসি তরসে নমঃ ॥’ (১২)

‘হে অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবি, তুমি স্বকীয় তপস্রায় জাজ্ঞ্যমানা (সায়নাচার্যের মতে স্বীয় তাপে শত্রুদহন-কারিণী), স্বমহিমায় প্রকাশমানা এবং কর্মফলদায়িনী। তাই তোমারই শরণ নিলাম। তুমি সহজে আমাকে দুর্গম ভবসাগরের পারে নিয়ে যাও। তোমায় প্রণাম।’

যাজ্ঞিক উপনিষদের ১০ম অধ্যায়ের প্রথম দুর্গা-গায়ত্রীর সন্ধান মেলে—

‘কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কত্বাকুমারী ধীমহি।’

তন্মৈ দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥’ (১০।১।৭৪)

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ ২।৪ অধ্যায়ে দুর্গনিবেশ প্রসঙ্গে যে অপরাজিতা দেবীর মন্দির নির্মাণের নির্দেশ রয়েছে, তিনিও দেবী দুর্গাই। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত ‘ললিত বিস্তর’ নামক গ্রন্থে কাত্যায়নী, দেবী ও মাতৃদেবীর পূজা প্রচলিত রয়েছে জানা যায়। এই কাত্যায়নী হচ্ছেন দেবীদুর্গা। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের ‘অমরকোষে’ স্বর্গবর্গে শিবানী মহাদেবীর বিভিন্ন নামের মধ্যে ‘দুর্গা’ নামটিও বিদ্যমান। এইভাবে ভারতে যুগে যুগে দুর্গাদেবী বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে সেই বৈদিক যুগ হতে আজ পর্যন্ত সম্পৃক্ত হয়ে আসছেন। কালক্রমে ভারতীয় সাধক উপলব্ধি করেছেন যে জগদাত্মা মাতা দুঃসামুদ্র তানে মানবশিশুর প্রাণরক্ষয়িত্রী পরমেশ্বরী গো এবং দেশমাতৃকা এই পরমাশক্তি মহাদেবীরই রূপবিশেষ।—

‘সর্ব প্রসূজ্যমভূমিঃ জননী গোঃ পরমেশ্বরী।’

মহাশক্তিজগদাত্মাঃ প্রতিকূপা স্রোতাঃ ॥’

তাই, বর্তমান যুগে বঙ্গ-ভারতের নবজাগরণে দেশ-মাতৃকার বন্দনাগানে ধ্বনিত হয়েছে দুর্গাত্তহারিণী মহাশক্তিরই স্ততিগীতি। ঋষিবল্লভদেব তাঁর ‘পুষ্পাঞ্জলি’ (১৮৭৬) গ্রন্থে জমজুমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘অধিভারতী’কে অন্নদানরতা মাতৃমূর্তি এবং দুর্গতিনাশিনী মহাদেবী মূর্তিতে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করে স্ততি রচনা করেছেন।—

‘মাতর্নামনি ভবতীঃ সতীদেহরূপাঃ’

মাতননামি বসুধাতলপূর্ণাভীর্ণাঃ।

মাতর্নামি পদযুগ্মপ্রত্যমুদ্রাঃ

মাতননামি হিমপৌরী করীটভূষাম্ ॥

হেমাভা হরিদম্বরী পদবলে নীলাঙ্গুলীলীলিকা

সিদ্ধা বিষমতরংগিণী সুরধুনী পশুপতিনামিনী।

সূর্যেন্দু-প্রতিবিম্বিতাধরলয়ংস্রাবয়-মৌলিজলা

সৌম্যা ‘অদিশিতারতী’ ভয়হরা নিত্যগ্রন্থা শাস্তয়ে ॥’

বর্তমান ভারতে মাতৃমন্দের সার্বক উদ্ভাস, ভূদেবের ভাবশিখা, সাহিত্যস্রাট শাকিনচক্রের কর্তৃত্ব তাই সৌন্দর্য ধ্বনিত হয়েছিল—

‘বদেমা বদম্’

এই শারদোৎসবে তাঁরই সঙ্গে কর্তৃক মিলিয়ে আমরাও আজ উচ্চারণ করি—

‘বাহতে তুমি না শক্তি জদয়ে তুমি না ভক্তি

তোমারি প্রতিমা গাঢ় মন্দিরে মন্দিরে।’

‘বলেনাভদম্’

## ত্রিপর্য্য

### বিমলচন্দ্র ঘোষ

এখানে গহন অরবা

স্বাপদের পর্জন।

এখানে অর্পিত অগণ্য

অন্ধ প্রতিটি নন ॥

এখানে তোমাকে বলবো না,

‘প্রিয়তমা কাছে এসো।’

এ পাণ-চিকায় জলবো না

দূর থেকে ভালবেসো।

সংসারনয় অতীত জটিল

প্রণয়ের দেনা-পাওনা,

গুরুদায়িত্ব পালনের ভয়ে

ধরা দিতে তাই চাও না।

সংসার নয় উজ্জ্বল প্রিয়ে,

প্রেম নয় প্রজাপতি।

বৈধমিলনে পদে পদে আছে

নিখুন রাত

তন্দ্রা নেই

ফুল ফোটে ফুল ফারো

নৌল ছায়া

কাপড়ে নৌল

অরণ্যের মর্মরে ॥

# যাঁ দে র স ং স্পর্শে এ সে ছি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

লর্ড কিচনার

রুয়র যুদ্ধের বিজয়ীবীর জেনারেল লর্ড কিচনার ১৯০৪ সালে ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে কলিকাতার নোট উইলিয়ামের ক্লাইভ-দরবার উপর সুরমা-সোপে বাস করিতেছিলেন। রুয়র যুদ্ধের প্রবল প্রতাপাশ্রিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর জেনারেল লর্ড রবার্টস প্রকৃতির পৃথুদন্ত বিবরণ ঘনিষ্ঠাভিলাষ। সেই অভিযানের অজুতন বীর সেনাপতি লর্ড কিচনার অব খাইমেরও নাম শোনা ছিল। ভাবি নাই যে, এই বীরপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ হইবে।

মে-মাস মনোবী সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ মহিমা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহারই সঞ্চকে এই সব অধ্যায় লেখা হইতেছে। লর্ড কিচনার মধ্যোক্তকালীন অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক তথ্য ও বিবরণ লিখিত হইবে। এইগুলি যদি ভবিষ্যতে বাংলা বা ভারতের ইতিহাস লিখিবার কাজে লাগে—তাহা হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

১৯০৪ সালে লর্ড কিচনার নোট উইলিয়াম কেল্লার দুর্গে তাঁহার আবাস সংস্কার করাইতে ছিলেন। তিনি ভারতের বহুপ্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড কার্জনের পত্নী লেডী কার্জনের মনোভাষ্যে বিবাহ করেন। তাঁহার চিত্রবিনোদন ও দৃষ্টান্তবিধানের জ্ঞান নোট উইলিয়াম দুর্গের প্রধান সেনাপতির প্রায়োটি মনোবাস করিয়া পুনর্গঠিত হইতেছিল। সেই প্রায়োকার্যের ভার মনোবী যুগ্মতাত্ত্বিক রুয়র যুদ্ধ এও সঙ্গ ঐক্যবাদের উপর স্থাপ্ত হয়। সেনাপতি কিচনার অতি প্রগতিত সমুদ্রত বীরকায় পুরুষ। তাঁহার কথাবার্তা ও মলচলন যেনন বীরোচিত তেমনই ভীতি উৎপাদক ছিল এবং তাঁহার ইংরাজী বুলিও সহজে বোধগম্য হইবার নয়। সেইজন্ম সত্ত্বে এট্রাঙ্গ পদাঙ্গ দিব্যর পর অবসর সময়ে যুগ্মতাত্ত্বিক মনোবী এই দুর্দান্ত বীরপুরুষের সহিত আলোচনা করিবার ও নির্দেশ লইবার ভার আমার উপর স্থাপ্ত করেন।

তখন নোট উইলিয়াম দুর্গটি ভারতের প্রধান বৃটিশ শক্তির পরিচায়করূপে কলিকাতার বকে অবস্থিত। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে এই নোট উইলিয়াম দুর্গ বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস সৌধের স্থানে ছিল। এইখানেই অন্ধকূপ-দ্রুত সম্পাদিত হয়। পিতলের ফলকের দ্বারা সে স্থান চিহ্নিত ছিল, তাহা দেখিয়াছি। বর্তমান দুর্গের গঠন-পদ্ধতিও অভিনব। এই দুর্গ মাটির নীচে গভীর পরিখা-বেষ্টিত হইয়া নির্মিত। গোরা সৈন্ত পরিবৃত্ত, যে বৃটিশ রাজ্যে সূর্য অস্ত হইতে না—সেই বৃটিশের রাজ-প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা চারিতলা ভালহার্ভাস সৈন্ত

ব্যারাকের উপর সগর্বে উদ্ভীন থাকিত। একটি উচ্চ গোলাকার স্তম্ভ ছিল। তাহার উপরে গোলাকার বল ঠিক মধ্যাহ্ন ১টার সময় কিঞ্চিৎ উঠিয়া শব্দ করিয়া পড়িত। তখনই কেল্লার রামপাট হইতে গভীর গর্জনের সহিত তোপধ্বনিতে কলিকাতাবাসীরা শিহরিয়া উঠিত এবং নগরবাসীগণ ঘড়ি মিলাইত। এই কেল্লাটি গড়ের মাঠ হইতে ঢুকিবার তোরণ, ঢালু রাস্তার উপর নির্মিত। তাহার কলিকাতা, পলাশী, চৌরঙ্গী, ক্লাইভ ও পাণির দরজা বলিয়া অভিহিত হইত।

যদিও লর্ড কিচনার খুব রুচ প্রকৃতির বীরপুরুষ, তথাপি মন কুস্ত্রেরই মতই কোমল এবং চারু-সুকুমার শিল্পের বিশেষ সম্বাদার ছিলেন। ইহা বলিলে অবান্তর হয় না যে, ইংরাজ সেনাবাহিনীর বীরপুরুষগণই ভারতের অতীত-গৌরব, শিল্প-স্থাপত্যরই উদ্ধারকর্তা। এই সঞ্চকে জেনারেল ফাণ্ডসন, জেনারেল কানিংহাম, জেনারেল কিটো, আর জন মার্শাল সৈন্যদলের নাম চিরস্মরণীয়।

লর্ড কিচনার তাঁহার মধ্যাহ্নভোজের পর প্রতিদিনই তাঁহার প্রাসাদের সংস্কারকার্য পরিদর্শন করিতেন এবং নির্দেশ দিতেন। প্রথম প্রথম ভীতিচিন্তে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার সরল-সদাশয় সুকুমার-বৃত্তিতে অতিভূত হইয়া পড়িলাম এবং প্রকৃত শিল্পীর মত তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি জয়পুরের পঞ্চের কাজ, অশ্বরের ময়ূরের পেখম বিস্তার, আগরার ফুল-পাতার সন্ধ্যা প্রয়োগ অতি নিপুণভাবে দেখাইয়া দিতেন। Art & Architect সঞ্চকে আমার চেতনা উন্মীলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারই কৃপায়। তিনিও আমার শিল্পমনের আদর করিয়াছিলেন এবং একটি প্রশংসাপত্র আমার পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

প্রায় তিন মাস তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার এই জ্ঞানীশক্তির মধ্যে অনন্ত-অসীমের মহিমা অহুভূত করিবারও ক্ষমতা আছে। ইহার প্রমাণ পাইলাম যখন ১৯০১ সালে ভারতভূমির শেষ স্থলবিন্দু কল্যা-কুমারিকায় যাই তখন 'কিচনার রক' (Kitchener Rock) বিবেকানন্দ রকের পাশে দেখিলাম এবং Empire নামে তদানীন্তন একটি সচিত্র পত্রিকায় এই 'কিচনার' রকের বিষয় পড়িয়াছিলাম। লর্ড কিচনার যখন কল্যা-কুমারিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখনই তিনি বিবেকানন্দ নামে রকটির ভারতকূলের দিকে আরেকটি রকের উপর বসিয়া অনন্ত-অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন। জানি না কি ভাবিয়া ছিলেন।

সেই অবধি ইহা 'কিচনার' রক নামে বিখ্যাত, তাই  
কবির কথা মনে হয়—

সীমার মাঝে, অসীম ভূমি  
বাজাও আপন সুর।  
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ  
তাই এত মধুর।

### স্বামী বিবেকানন্দ

উনিবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার কয়েকজন  
মহাপুরুষের সংশ্লেষে আশিবার দোভাষ্য হইয়াছিল।  
তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ।  
ভারতের স্বাধীনতা লাভ, বাঙালীর মধ্যে নরনারায়ণের  
পূজা, বাঙালীকে উন্নত স্বাধীনতাপ্রিয় মন গঠনে  
বিবেকানন্দই ছিলেন সবপ্রধান মহীয়ান ও গরীয়ান নায়ক।  
সে প্রভাব মদীয় কিশোরমনের উপর পড়িয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের নবভারত গঠনের এবং ভারতের শিক্ষা  
ও সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করার যে মহান অবদান  
তাহা বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই। বহু বহু জ্ঞানী গুণী  
মাধক স্বামীজীর বিষয় আলোচনা ও বর্ণিত করিয়াছেন।  
এখানে একটিনাশে শুভ অমুখানের বিবরণ উল্লেখ করিতেছি।

১৯০১ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায়  
বিদেশ হইতে আগমন করেন। তখন তাঁহাকে  
কলিকাতা মহানগরীর নরনারায়ণ বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন  
করিয়াছিলেন। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর বিশাল নন্দলাল

বসুর প্রাসাদ অবস্থিত। তাহার সম্মুখে বিরাট ময়দান।  
প্রাসাদটি খুবই প্রকাণ্ড এবং সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য। বলিতে গেলে  
কি তদানীন্তন বড়লাটের ভবন (বর্তমান রাজভবন বা  
Government House) এই প্রাসাদের তুলনায় মহিমাম্বিত  
নয়। এই নন্দবসুর বাটীতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখী-  
পূর্ণিমা প্রভৃতি সকল জাতীয় ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত।  
প্রায় দশদিক আকুলিত ও ভীতি-শ্রদ্ধাপূর্ণ চক্ষে সেই  
বিশাল প্রাঙ্গণে সমবেত। প্রাসাদটি পথেপথে সুসজ্জিত।

এমন সময়ে চারি ঘোড়ায় চালা ল্যাণ্ডো—(Land-o)-  
গাড়িতে সেই আজাদুল্লাহ উন্নতবঙ্গ পুরুষসিংহ গেরুয়া-  
বস্ত্র ও পাগড়িদারী বীরসম্রাসী-প্রকৃতি দেখিয়া মোহিত  
হইয়াছিলেন। বিশাল জনতা ভেদ করিয়া সেই ল্যাণ্ডো  
গাড়ির দিকে দৌড়াইল। দোড়া খুলিয়া দেওয়া হইল।  
সেই ল্যাণ্ডো জনগণ চিনিয়া প্রাঙ্গণ মধ্য দিয়া প্রাসাদমধ্যে  
লইয়া গেল। এই অবসরে সেই মহাপুরুষের পাদম্পর্শ  
করিয়া জগা দত্ত করিলেন এবং সেই গাড়ি চিনিয়া  
চলিলেন।

তাহার পর প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া স্বামীজীর উদাস্তস্বর  
ও মহাবাগী শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিল। বয়স তখন মাত্র  
চৌদ্দ বৎসর। তাঁর সে মহাবাগী শুনবার ভাগ্য হইলেও  
গভীর তথ্য বুঝিবার বুদ্ধি ছিল না। তথাপি তাঁহাকে  
ছুঁইবার বা তাঁহার গাড়ি চিনিবার সৌভাগ্যের কথা এখনও  
আমার প্রাণে প্রদীপ্তমান।

## মৃত মন

### স্বধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মনের নিঃসংগ মূল বিসর্পিত তমসার বৃক্—

তাই বুঝি উজ্জ্বল কৌতুকে  
বিবন্ধে গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব হইল না।

কঠিন আঘাত আর মলিন ছলনা

বিকৃত করেছে চোখ। হাসিমুখে

সর্বা কল্প মেনে নেওয়া পরিপূর্ণ স্নেহে

মনে হয় ক্রটিমত্ত। প্রতি পদক্ষেপে

চিহ্ন মোর ভরে আছে নিবিড় আক্ষেপে।

আকাশের আলো সেই মৃত মনে আশ্বাস আনে না,

বসন্তের সত্যরূপ তাই বুঝি হয় নাকো চেনা।

দৌন্দর্ঘ্যে বিকার আনি, নাধুর্যের তিক্ততায় ভরি

পিত্তার নির্মল চোখে অপবিত্র ছায়াপাত করি।

অমৃদার অসন্তোষে তাই বুঝি বিসাক্ত বাতাস,

মনে হয় পৃথক্স আমারে করিল পরিহাস।

অনেক মিথ্যায় আর ছলনায় জড়ানো পৃথিবী

মলিন করেছে মন। একে একে গেছে নিবি

পবিত্র প্রদীপ শিখা যত।

এবার আনত অন্ধকারে অভিশপ্ত মন;

তির্থক ভংগীতে চাহে সহজ নয়ন।

সত্যের ব্যঞ্জনা নেই, উপসর্গমুখী স্বজনের ত্রাত

আমায় সাধনা হতে হয়েছে বিগত।

আজ শুধু অন্ধকারে মেলে রাপি অবসন্ন চোখ;



# আকবরের আমল থেকে রামরাজত্বে

শ্রীতাবীশঙ্কর চক্রবর্তী

পরাধীন ভারতে গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতার পর রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে কি সুখ-সুবিধা ছিল তা জানি না। তবে এটা বুঝতে পারি, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্ত যিনি সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন—তার রাজত্বে প্রজার ঘোল আনাই সুবিধা ছিল।

স্বাধীন ভারতের যারা কর্ণধার হয়ে বসলেন, তাঁরা দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—‘কি আমাদের ভবিষ্যৎ? কি হবে আমাদের প্রচেষ্টা? সাধারণ কৃষক ও শ্রমিককেও স্বাধীনতার সুযোগ দিতে হবে। দারিদ্র্য, রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার অবসান ঘটাতে হবে।’

‘আমাদের দেশের জাতীয় আয় বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে হবে—যাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট পরিনামে বৃদ্ধি পায়।’

বিদেশীর শাসনে নিঃস্ব ভারতবাসী সেদিন এই আশার বগীতে উষ্ম হয়ে নবজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। তার দুঃস্বপ্নের রাজি প্রত্যাহা হল। বিপ্লব স্বাধীনতার এক যুগের মধ্যেই ভারতবাসীর সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর যে হলাহল ও অমৃত উঠেছে তার বটনের অব্যবহার ফলে জাতির জীবনে এক চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মুষ্টিমেয় শাসকবৃন্দ ও ধনী ব্যবসায়ীর দল আজ দেশের অমৃতভাণ্ডারের অধিকারী। আর সমগ্র হলাহল ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবাসীর জনজীবনে। নিঃস্ব, রিক্ত ভারতবাসী সেই হলাহল পান করে আজ নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

আজ গোটা ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষ বাঁচার অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চলেছে। বাঁচতে হলে যে খাওয়ার প্রয়োজন, তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আজ বলাহীন অবস্থায় উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। দেশের যারা কর্ণধার আছেন, তাঁরা যাত্রাদলের ভীমের গদা ঘুরিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে চোখ রাঙাচ্ছেন।

বর্তমান বর্ষের ৬ই সেপ্টেম্বরের চাল-পমের বাজার দর লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, চরম দুর্ভিক্ষের মুখে দেশ এগিয়ে চলেছে। অনাহারে মৃত্যুকে সরকারী ব্যাখ্যাভার দল বিভিন্ন রোগে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে কংগ্রেস সরকারের মান রক্ষা করছেন। ইংরাজের আমলেও ঠিক এমনটাই দেখেছিলাম। আজকে গমের দর ৩৮৭ মণ, অথচ দু’ সপ্তাহ আগে ৩০৭ ছিল। যে চাল ৩৫৭ থেকে ৪২৭ মণ কয়েকদিন আগেও বিক্রি হচ্ছিল, আজ তা ৪৫৭ থেকে ৬০৭। ৪৫৭ চাল যা পাওয়া যাচ্ছে তা পশুর খাদ্য। ছোলা—যা এককালে ঘোড়ার জন্তাই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত আজ তার দাম ৪২৭ থেকে ৫০৭ বিক্রি হচ্ছে।

আজকে আমরা যে গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি—তার যারা দারুণ ও বাহক অমানবদনে অনাহারজনিত মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন ল্যাটিন অথবা গ্রীক নাম ব্যবহার করবেন। ইংরাজ আমলে সংবাদপত্রে কৈশিকদল বেশ ভয় করতেন—আজকের গণতন্ত্রের যুগে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

খাদ্যবস্তু ও অস্ত্রাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মহাবর্ষতা সম্পর্কে নানাজনে নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করছেন এবং স্বদেশী সরকারের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র হুংকার ছাড়া এ পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই করা হয় নি।

বর্তমান এই মহাবর্ষতা সন্দেহ মোগলযুগে সম্রাট আকবরের আমলের জিনিসপত্রের দামের একটা তুলনামূলক বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে—দেশের আর্থিক দুর্দশা কয়েক শ’ বছরে কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছে। ঐ সময়ের প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ কিম্বা বিবরণীতে সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এবং সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটকদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি—ষোড়শ শতাব্দীতে সাধারণ লোকের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। তাদের খা দৈনান্দন রোজগার হ’ত, তা দিয়ে তাদের জীবিকা নিবাহ হ’তে বিশেষ কষ্ট হ’ত না। তখন ভারতের সর্বত্র প্রচুর আহাৰ্য পাওয়া যেত। সেই সব জিনিসের দামও বেশ সস্তা ছিল এবং লোকের অভাব-অনটনও কম ছিল।

আইন-ই-আকবরীতে এক জায়গায় আবুল ফজল লিখেছেন, ‘বাংলা দেশে শস্য সব সময়েই ভালরকম জন্মাত।’ ‘ভালো’ নামে একজন পরিব্রাজক এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালী হ’তে এদেশে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, বাংলা দেশের মত এত অধিক পরিমাণে শস্য, চিনি, আদা এবং তুলা পৃথিবীর অন্য কোথাও তখন পাওয়া যেত না এবং এখানকার মতন ধনী বাণিকও তিনি কোথাও দেখেন নি। এই দেশ থেকে প্রতি বছর অনেক জাহাজভর্তি তুলা ও রেশমের জিনিস ভারতের বিভিন্ন স্থানে তুর্কী, সিরিয়া, পারস্য, আরব ও ইথিওপিয়াতে রপ্তানী হ’ত।

বারবোসা নামে একজন পণ্ডিতগীষ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। তিনিও এখানকার তুলা, আখ, আদা, সাদা চিনি, লঙ্কা, কমলালেবু ও মসলিনের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায়, সিংহল, ভারত মহাশাগরের ষাঁপপুঞ্জ, আরব, পারস্য, আর্মেনিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে তখন বাংলার বাণিজ্য খুব ভালরকম চলছিল, ভালো ও বারবোসা উভয়ের বিবরণ হ’তে জানতে পারি খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশ সস্তা ছিল।

আকবরের আমল থেকে রামরাজকে

১৫৫৬ খৃস্টাব্দ হতে ১৬০৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আকবর রাজত্ব করেছিলেন, এই সময়ে ভারতে যে তারার পয়সার প্রচলন তাকে 'ডাম' বলা হত। চল্লিশ 'ডামে' এক টাকা। বর্তমানের ২৥ পয়সায় এক ডাম। এ ছাড়া ছোট ছোট মুদ্রা ও কড়িরও প্রচলন ছিল।

উত্তরপ্রদেশে সেই সময়ে একজন সাধারণ মজুর দিনে রোজগার করত ২ ডাম—অর্থাৎ বর্তমান হিসাবে ৫ পয়সা অথবা পূর্বের ৩ পয়সা। মাটি কাটার মজুরে রোজ মজুরী ছিল ৩ ডাম—অর্থাৎ ৭ পয়সা এবং পূর্বের ৪৫ পয়সা থেকে সাড়ে ৫ পয়সা। একজন ছুতোরের রোজ মজুরী

ছিল ২ থেকে ৭ ডাম, অর্থাৎ ৫ পয়সা থেকে ১৭৥ পয়সা এবং পূর্বের ৩ পয়সার কিছু বেশি থেকে ১১ পয়সার কিছু বেশি। একজন রাজমিস্ত্রির দৈনন্দিন বেতন ছিল ৪ ডাম থেকে ৭ ডাম।

আকবরের সমসাময়িক সময়ে যুক্তপ্রদেশে বাজারদর কিরূপ ছিল এবং সাধারণ দিন-মজুরের ক্রয়ক্ষমতা কি ছিল, তা নিম্নের তালিকায় বোঝা যায়। সেই সময় ওজনের পরিমাপ ছিল বর্তমানের ১১ ছটাকে ১ সের। এইরূপ ৪০ সেরে ছিল ১ মণ অর্থাৎ বর্তমান হিসাবে প্রায় ২৭৥ সের।

জিনিসের নাম	তখনকার প্রতি মণের দাম (বর্তমানে প্রায় ২৭৥ সের)	একজন সাধারণ মজুর প্রতিদিন ২ ডাম (বর্তমান ৫ পয়সা অর্থাৎ পূর্বের ৩ পয়সা) রোজগারে কতটা কিনতে পারত
...	...	...
১। গম	১২ ডাম—বর্তমানের ৩০ পয়সা	তখনকার ওজনে ৬ সের ১০ ছটাক বর্তমান ওজনের ৪৥ সেরের বেশি
২। বালি	৮ ডাম—বর্তমানের ২০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১০ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ৬ সের ১৪ ছটাক)
৩। চাল (সর্ষোৎকৃষ্ট)	১১০ ডাম—বর্তমানের ২ টাকা ৭৫ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ পোয়া (বর্তমান ওজনে প্রায় ১৥ সের)
৪। চাল (নিকৃষ্ট)	২০ ডাম—বর্তমানের ৫০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ২ সের ১২ ছটাক)
৫। মুগ	১৮ ডাম—বর্তমানের ৪৫ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের ১২ ছটাক (বর্তমানে ৩ সের ১ ছটাক)
৬। মাসকলাই	১৬ ডাম—বর্তমানের ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৫ সের (বর্তমান ওজনে প্রায় ৩ সের ৭ ছটাক)
৭। ছোলা	১৬৥ ডাম—বর্তমানের প্রায় ৪১ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৪ সের ১২ ছটাক (বর্তমান ওজনে প্রায় ৩ সের ৫ ছটাকের বেশি)
৮। জোয়ার	১০ ডাম—বর্তমানের ২৫ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৮ সের (বর্তমান ওজনে ৫৥ সের)
৯। চিনি (সাদা)	১২৮ ডাম—বর্তমানের ৩ টাকা ১৮ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১০ ছটাক (বর্তমান ওজনে প্রায় ৭ ছটাক)
১০। চিনি (লাল)	৫৬ ডাম—বর্তমানে ১ টাকা ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ১ সের ৪ ছটাকের অল্প বেশি (বর্তমান ওজনে প্রায় ১ সের)
১১। ঘি	১০৫ ডাম—বর্তমানের ২ টাকা ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ পোয়ার অল্প বেশি (বর্তমান ১৥ সেরের অল্প বেশি)
১২। লবণ	১৬ ডাম—বর্তমানের ৪০ পয়সা	তখনকার ওজনে প্রায় ৫ সের (বর্তমান ওজনে ৩ সের ৭ ছটাক)
১৩। ধুশ	২৫ ডাম—বর্তমান ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ৩ সের ২ ছটাকের বেশি (বর্তমান ওজনের ২ সের ৩ ছটাকের বেশি)
১৪। মাংস (পাঁঠার)	৪৪ ডাম—বর্তমান ১ টাকা ৩৫ পয়সা	তখনকার ওজনে ১৥ সের (বর্তমান ওজনে ১ সেরের অল্প বেশি)
১৫। মাংস (ভেড়ার)	৬৫ ডাম—বর্তমান ১ টাকা ৬২ পয়সা	তখনকার ওজনে ১ সের ১ পোয়ার অল্প

## আকবরের আমল থেকে রামরাজ্যে

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের টেরীসাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেছেন মাহের দাম এত সস্তা ছিল যে, একরকম কোন দামই ছিল না। তিনি আরও বলেছেন যে, রাজ্যের সর্বত্র প্রচুরভাবে জিনিসপত্র পাওয়া যেত।

মোগল সাম্রাজ্যের পরে এল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দল। রাজ্যের আঙুন লাগল। জিনিসের দাম ক্রমশ চড়তে লাগল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ওলটাম সাহেব মুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলা সম্পর্কে লিখছেন, ঐ সময়ে ১ টাকায় যে ফসল পাওয়া যেত, আকবরের সময়ে কমপক্ষে তার চতুর্গুণ পাওয়া যেত। আকবরের আমলে ১ টাকায় গম পাওয়া যেত ২ মণ ১৪ সের, ১৮৬৬-৭০ খৃঃ ১ টাকায় পাওয়া যেত ১৯ সের। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়ায় ১৪ সের। ইংরেজ চলে যাবার অব্যবহিতপূর্বে পাওয়া যেত টাকায় ৪ সের। এখন রামরাজ্যে পাওয়া যায় টাকায় ১ সের।

বালি আকবরের সময় পাওয়া যেত ১ টাকায় ৩ মণ ১৬ সের, ১৮৬৬-৭০ সালে দাঁড়ায় প্রায় ২৯ সের, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় ২২ সের, ইংরেজ চলে যাবার আগে টাকায় ৬ সের—বর্তমান রামরাজ্যে টাকায় ১৯ সের। খ্রিঃ ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে ১ টাকায় ১১ পোয়া পাওয়া যেত। সরসের তেল টাকায় ৪ সের—বর্তমান রামরাজ্যে ৪ টাকা সের। গুড় টাকায় ১৬ সের পাওয়া যেত—বর্তমানে টাকায় ১ সের। ইংরেজ আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিনি পাওয়া যেত সাত আনা অর্থাৎ বর্তমান ৪২ পয়সা। রামরাজ্যে রাবণদলের স্পর্শভুক্ত হয়ে ১২৫ পয়সা সের বিক্রি হচ্ছে সরকারী দোকানে। বাংলা দেশের '৪৩-এর মস্তকুরে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম কালো বাজারের কথা শোনা যায়। বোকার মতন অনেকেই প্রশ্ন করেছে—কালো বাজার কোথায়? আজ সেই প্রশ্নের আর উত্তর দিতে হবে না—গোটা ভারতবর্ষের বাজার রামরাজ্যে কালো হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে গিয়ে প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ গুণ হয়েছিল—কিন্তু শোকার আয় ২৫০ থেকে ৩০০ গুণের বেশি বাড়েনি। ১৯৩৯ সালে জিনিসপত্রের যা দাম ছিল আজ তা বেড়ে ৬০০গুণ হয়েছে। অথচ সাধারণের আয় সেই তুলনায় কিছুই বাড়েনি। একজন ২২ রোজের মজুর তার পরিবারের জন্য কেবল গম আর হুন কিনলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এই রোজগার সকলের নয়।

ডঃ রামমোহন সোহিয়া বর্তমান রামরাজ্যের অধিনায়কদের প্রশ্ন তুলেছেন ভারতবর্ষের ২৭ কোটি মানুষ দৈনিক ৩ আনা মাত্র রোজগার করে। অর্থাৎ আকবরের আমলের মাত্র ৭ ডাম। বর্তমানে তারা এই রোজগার দিয়ে ৩ ছটাক গম কিনতে পারে।

কিন্তু আমাদের নন্দজী বলছেন ভারতে নিম্নবিত্তদের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন গ্রামাঞ্চলে জনপিছু রোজ ৪২ পয়সা খরচ করে ও শহরে ৫৫ পয়সা খরচ করে। কজের হিসাব বাদ দিলে দাঁড়ায় গ্রামে ৩৩৬ পয়সা, শহরে ৪৪ পয়সা।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করলে দেখা যাবে কিভাবে চরম সঙ্কটের মুখে এগিয়ে চলেছে। গত দশ-বিশ বছরে আয় যা বেড়েছে—জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বহুগুণ। মুদ্রাক্রান্ত জাতিকে কোণায় নিয়ে চলেছে তার ঠিকানা বোধ হয় বিত্তমন্ত্রী কৃষ্ণমোহনচাঁদ জানেন না।

১৯৩৯ সালে খাবার জিনিসের দামের সূচকসংখ্যা যদি ধরা হয় তা হলে দেখা যাবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, স্বাধীনতার পর বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৪৯। ১৯৫৭ সালে জুন মাসে আরও দশ বছর পরে সেটা বেড়ে হল ৪৮৮। ১৯৫৮ সালের জুন মাসে আরও বেড়ে হল ৫০৮ এবং বর্তমানে ৬০০ ওপরে—ঠিক সংখ্যাটা বলা কঠিন। ১৯৩৯ সালে চালের দাম ছিল ৩ আনা সের ১৯৪৭ সালে কমটোলে মার্চে ৬ আনা আর বর্তমানে ৬০ টাকা মণ অর্থাৎ ১৯০ টাকা মণ ১ সের, ১২৫ পয়সায় যে চাল পাওয়া যাচ্ছে তা পশতল পর্যায়ের মানুষেরা গলাধঃকরণ করতে পারে।

শিক্ষার কথা যদি রামরাজ্যে বলা যায় তা হলে সরকারী শিক্ষানীতির অব্যবহিত চিন্তার কথাই বলতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে ছেলেদের লেগাপড়া শেখান এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শহরে সাধারণ মধ্যবিত্তের মোট খরচের শতকরা ১৬ ভাগ খরচ হয় শিক্ষাখাতে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের জেতে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাতে তবিশ্যৎ জীবনের চলার পক্ষে কতটুকু উপকার হচ্ছে? স্বদেশী শাসক-সম্প্রদায় সর্ব-ভারতীয় ঐক্যতার এক হুজুগ তুলে সকলের ঘাড়ে হিন্দী চাপাবার ব্যবস্থা করেছেন—তাতে ছেলেরা না শিখছে নিজেদের মাতৃভাষা, না শিখছে হিন্দী, না শিখছে ইংরাজী। অথচ তারা আমাদের উপর হিন্দী ভাষা চাপাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের Public School-এ ইংরাজী পাড়িয়ে মাহুষ করার চেষ্টা করছেন। তাই যত হিন্দীর হুজুগ বাড়ছে, তত ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠিত কনভেন্টের নতুন নতুন বাড়ি উঠছে।

আমরা যতই পঞ্চবাণিকী পরিব্রজন্যের কথা বলি, যতই কলকারখানা বানাই, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করি, এইসব পরিব্রজন্য আশীর্বাদ যতদিন পর্যন্ত ওপর থেকে চুইয়ে ভারতবর্ষের দরিদ্রতম মানুষের কাছে গিয়ে না পৌঁছোচ্ছে, নিত্য অনশন-অধর্শনের অভিশাপ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুক্ত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সব উন্নয়নের সংখ্যাভাষা সব নিরর্থক।

# অন্তিম শ্রীমদ্ভগবৎ অষ্টাদশোহস্রম প্রবৃত্ত

৭৩

ভিতর-প্রকোষ্ঠে—গম্ভীরায়—প্রভু গুরুছেন।  
দ্বারপ্রান্তে শুয়েছে গোবিন্দ আর স্বরূপ দামোদর।  
রোজ রাতে কৃষ্ণনামকীর্তন করে জেগে থাকেন প্রভু,  
আজ নিশিদ কেন? কী হল?

দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভু নেই।  
ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভু অন্তহিত।

মশাল জ্বলে খুঁজতে বেরল সকলে। দেখল  
জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদ্বারের উত্তরে  
চৈতন্যগোসাই পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিষয়। প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ' হাত  
দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটি হাত-পাও প্রায় তিন  
হাত করে লম্বা। সমস্ত অস্থিগ্রন্থি শিথিল, ছ' অস্থির  
মাঝে প্রায় একবিঘ্ন করে ব্যবধান। শুধু গায়ের  
চামড়াই ছুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মাঝে সংযোগ রেখেছে।  
দেহ নিশেচতন, নিখাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র  
হয়ে আছে, লাল। বরছে মুখ দিয়ে।

দেখে সকলেই শোকে-হুখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে  
লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—অত্যাচ্ছ ভক্তরাও যোগ দিল  
উচ্চারণে।

ধীরে-ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভুর হৃদয়ে  
প্রবেশ করল। ফিরে এল বাহাজ্ঞান। অমনি 'ইরি-  
বোল' বলে প্রভু গজ্ঞান করে উঠলেন।

কোথায় আর অস্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর  
অমানুষিক দেহদৈর্ঘ্য? প্রভু স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

'এ আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।  
'হাতি চলে। সব সজলি হোয়াসক।'

প্রভুকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল।  
বললে, তাঁর অন্তর্ধানের কথা, দেহবিস্তারের কথা।

'কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।'  
বললেন প্রভু, 'শুধু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম  
শ্রীকৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্ঞানপ্রায়  
দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেলেন।'

কৃষ্ণ তো প্রেমবিচ্ছেদ রোগ জানে না, জানে  
না তার কী যন্ত্রণা! আর প্রেমও এমন, তার স্থানঃস্থান  
জ্ঞান নেই। আমরা যে কত দুর্বল কত ভুল্লর তা  
আবার কন্দর্পজানে না। অপর কি অপরের হৃৎ  
যোঝে? নিজের জীবনকেই বা বিশ্বাস কী। যোঝের  
আয়ু তো ছ'তিন রাত্রি। হে বিধাতা, আমার কী  
পতি হবে?

লোচনদাস ঠাকুর বলছে:

প্রেম ছরাচার না করে বিচার  
স্থানঃস্থান নাহি জানে।

সে শঠ লম্পট কুটিল কপট  
নিশি দিশি পড়ে মনে॥

হাম কুলবতী নবীনা যুবতী  
কান্থর পীরিত কাল।

তাহাতে মদন হইয়া দারুণ  
হৃদয়ে হানয়ে শাল॥

আনের বেদন নাহি ঠাণে আন  
শুনলো পরাণ সখি।

মোর মনোহুখে তুমি নাহি দেখ  
আনজনে কাঁহা লখি॥

নারীর যৌবন দিন ছুই তিন  
যেন পদ্মপত্রের জল

বিধি মে'রে বাম না হেরিল আঁম

মন্দিরের প্রভাতশখ বেজে উঠল। স্নানান্তে প্রভু চললেন মন্দিরে।

প্রভুর এই শাস্ত্রলোকাভীত লীলা সাক্ষাৎপ্রাপ্তি ছাড়া আর কে বিশ্বাস করবে? গৌরে যাদের গাঢ় প্রীতি তারা করবে। অগ্র লোকে না করুক কী আসে যায়?

নবজাত প্রেম ভঙ্গের দুঃখ কৃষ্ণ বুঝবে কী করে? বাইরে ভদ্র, ভিতরে বিপ্রিয়, সে শঠের শিরোমণি। 'পরনারী বধে সাবধান।' বাক্য-ভঙ্গিতে আর ব্যবহারে খুব মধুর—কিন্তু অন্তরে প্রাতি-ক্ল্যা। প্রলুব্ধ করে শেষে প্রত্যাখ্যান করতেই নিপুণ।

সুখের জন্তেই লোকে ভালোবাসে। এ যে বিপরীত হল! প্রেমের গতি স্বভাবকুটিল। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথই সে বেছে নেয়। সোজা সুখের দিকে না গিয়ে তাই বাঁকা পথে চলল সে দুঃখের দিকে। আর আমার এমন দণ্ড, কৃষ্ণ শঠ কৃষ্ণ নিষ্ঠুর জেনেও তাকে আমি ছাড়তে পারছি না। তার গুণভোরের গ্রন্থি খুলে ফেলে মুক্ত হয়ে যাই তারও সাধ্য নেই। মদন তম্বুহীন হলে কী হবে, পরদ্রোহে সে প্রবীণ, অগ্রকে যন্ত্রণা দিতে পারলেই সে খুশি। চূর্ণল জেনেও আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। এত দুখে বৈধ ধরব কী করে, ধরবই বা কতদিন? আমার যৌবনই বা কতক্ষণ থাকবে! নারীর যৌবনধনেই তো কৃষ্ণের আকর্ষণ। তার আয়ু তো হুঁচকারিনের। আমার যৌবন চলে যাবার পর যদি কৃষ্ণ আসে তা হলে তাকে আমি কী দিয়ে সেবা করব?

দুঃখের ছুয়ার হাট করে দিয়ে প্রভু বিষাদে বিলাপ করছেন।

একদিন প্রভু সমুদ্র স্নানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে ভাবলেন গোবর্ধন বলে। অমনি চটকের দিকে ছুটলেন প্রেমাবেশে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিন্তু সাধ্য কী প্রভুকে ধরে।

সকলে চিৎকার করে উঠল। ছুটলও সঙ্গে-সঙ্গে। স্বরূপ গদাধর জগদানন্দ, রামাই নন্দাই নীলাই শঙ্কর-পণ্ডিত। খোঁড়া ভগবান আচার্য, সেও চলল।

কতদূর যেতেই প্রভুর 'স্তুভ' ভাব উদয় হল, শরীরে জাড়া দেখা দিল। দেখা দিল স্বরভঙ্গ। আর

দুই চোখে যেন গঙ্গা যমুনা নেমে এসেছে। পাত্তবর্ণ শব্দের মত সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে গেলেন। গোবিন্দ জল ছিটিয়ে চাইল স্নান করতে। প্রভুর অঙ্গে আট-আট সাত্ত্বিক বিকার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণনামের ধ্বনি তোলা।

হরিবোল বলে প্রভু আবার আশ্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যা দেখছিলেন এতক্ষণ তা যেন আর পাচ্ছেন না দেখতে।

'গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে?' স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, 'কৃষ্ণলীলা দেখছিলাম, কিন্তু সাধ মিটিয়ে দেখা হল কই? কৃষ্ণ আর গোচারণ করে কি না দেখবার জন্তেই আমার গোবর্ধন যাওয়া। গোবর্ধনে গিয়ে দেখি পাহাড়ে চড়ে কৃষ্ণ বেণু বাজাচ্ছে আর চারদিকে খেয় বিচরণ করছে। বেণুদ শুনে রাধাসাকুরাণী এসে উপস্থিত। সখি, রাধার-রূপ আর ভাব বর্ণনা করতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ গোবর্ধনের নিম্নত গহবরে প্রবেশ বরল। সখিরা আমাকে বললে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস। রাধাগোবিন্দের সেবার জন্তে ফুল তুলতে যাচ্ছি, তোমরা কোলাহল করে উঠলে, আমাকে ধরে নিয়ে এলে এখানে। অনর্থক দুখে দেবার জন্তে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না।' কাঁদতে লাগলেন প্রভু।

প্রভু বুঝি এখন গোপীভাবে আবিষ্ট। কিন্তু এই গোপীভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাধাও কখনো কখনো নিজেকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা বলে ভেবেছে।

পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসে হাজির। তাদের দেখে 'প্রভুর বাহাদশ সম্পূর্ণ ফিরে এল। দু'জনে প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করলে। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এতদূরে কেন এনেছ?'

'তোমার লীলা দেখতে। দিব্যোদ্ভাসলীলা।'

কৃষ্ণের রূপসেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ কী! কৃষ্ণরূপ আমার চোখ দ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণকথা আমার জিহ্বা দ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণশাস্ত্রগুরু

আমার নানিকদ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শ আমার 'হৃক' দ্বারা সেবনীয় আর কৃষ্ণ কণ্ঠস্বর ও কৃষ্ণবংশীধ্বনি আমার কান দ্বারা সেবনীয়। এই সেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যর্থ। যে পাষণ ও শুষ্ককাঠে কাজ হয় না তা আমি সারাজীবন বহন করে মরি কেন।'

যে নয়ন কৃষ্ণের মুখখানি না দেখে তার মাথায় বাজ পড়ুক। যে কান কৃষ্ণকথা শোনে না তা সচ্ছিদ্র কানাকড়ির মত মূল্যহীন। যে নাক কৃষ্ণাঙ্গ সুবাস পায় না তার সঙ্গে কামারের হাপরের তফাৎ কী। যে জিহ্বায় কৃষ্ণনাম নেই তা তো ভেকজিহ্বা। আর যে কৃষ্ণকরতল বা কৃষ্ণপদতল স্পর্শ করতে পারল না তার শরীর দক্ষলোহ।

যখন স্বপ্নে বা দৈবাৎ কৃষ্ণকে আমি দেখি আমার হৃদয় শত্রু এসে উপস্থিত হয়। এক শত্রু আনন্দ, আরেক শত্রু মদন। হায় প্রেমানন্দও আমার শত্রু। প্রেমানন্দে যে সেবানন্দে বাধা পড়ে। তারপর মিলনের লালসায় চিত্তে মত্ততা জাগে। হৃদয়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে নিল। নয়ন ভরে আর দেখা হল না।

এইভাবে রাত্রিদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন। কখনো ভাবে মগ্ন, মানে অন্তর্দর্শা, কখনো অধঃবাহুদর্শা, কখনো বাহ্যজ্ঞান। দেহস্বভাবে স্নানাহার ও দর্শন চলছে। একদিন মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথকে দেখতে দেখলেন, ত্রেজেন্দ্রনন্দন বসে আছেন। কৃষ্ণের পঞ্চগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—একসঙ্গে প্রভুর চিত্তে ফুরিত হল, পঞ্চ রত্ন দিয়ে বেঁধে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করল। টানাটানিতে প্রভুর মন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগল—কোন দিকে আগে যায়।

স্বরূপ আর দামোদরের কণ্ঠ ধরে বিলাপ করতে লাগলেন প্রভু।

সখি, যিনি মৌন্দর্ঘ্যাত্তিসিকুর তরঙ্গে ললনাচিত্ত সংপ্রাণিত করেন, যাঁর রম্যবচন পরিহাসমুন্দর ও কর্ণমুখদ, যাঁর অঙ্গ কোটিচন্দ্র থেকেও সুশীতল, যিনি তাঁর পাত্রসৌরভে সমগ্র জগতকে আমোদিত করেন, যাঁর ছাঁটি অধর পীঘঘরমণীয়, তিনি বলপ্রয়াগে আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করছেন।

যার মাধুর্য বলে শেষ করা যায় না সেই কৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দেখে আমার পঞ্চজ্ঞান, মানে

অন্থ, সে একই সঙ্গে পাঁচ দিকে ধাবমান হয়েছে। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় মহালম্পট দম্ভা, পরধন হরণেই সুদক্ষ। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের পঞ্চরস লুটে নিতেই তারা সমুৎসুক। এক মন কোন দিকে যাবে? সবাই যদি একসঙ্গে টানে ঘোড়া বাঁচে কী করে?

কৃষ্ণের অমৃতসিকুর কথা তোমাকে আর কী বলব! সেই সিকুর একবিন্দু তরঙ্গ সমস্ত জগৎ ভাসিয়ে দিতে পারে। কুলকামিনীরা তাদের পাতিব্রতের সে উচ্চ গিরিচূড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই চড়ায়েই এই তরঙ্গ আগে ডোবায়। কৃষ্ণের বচনমাধুরী নানা রসে পরিহাসময়। সে টানছে কানকে। টানাটানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কৃষ্ণের শীতল অঙ্গ নারীর সশৈল-বক্ষকে টেনে বেঁধে আনছে। কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ মুগমদের অহঙ্কার হান করে দিচ্ছে। তারপর তার অধরামৃতের কথা কে বলে!

'আমাকে উপায় বলে দাও, কী করলে কোথায় গেল পাবো আমার কৃষ্ণকে?' প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন, 'আমার কৃষ্ণ ছাড়া দিন কাটে না।'

আরেকদিন সমুদ্র স্নানে যেতে আচম্বিতে একা একা একটা ফুলবাগান দেখলেন প্রভু। ফুলবাগান দেখে মনে হল এই বৃষ্টি বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন ব্যাবুল হয়ে। রাসস্থলী থেকে রাধাকে নিয়ে অমৃতহিত হবার পর গোপবধূরা যেমন বনে বনে ভ্রমণ করেছিল তার তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করেছিল তেমনি এক কৃষ্ণাধেষণ ও কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পেয়ে বসল প্রভুকে। তিনিও বৃন্দলতাদের সাহায্য করে জানতে চাইলেন তাঁর কৃষ্ণ কোথায়? কোন পথ ধরে কোন দিকে সে চলে গেল তোমরা কি কিছু দেখেছ? আমাকে পথের হৃদিস দেবে?

হে তরুণগণ, তোমরা পরার্থভব, পরোপকারের জন্মেই তোমাদের জন্ম। নিজের ফুলও তোমরা নাও না, ফলও তোমরা খাও না। পরের জন্মে সমস্ত উৎসর্গ করে বাও। তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা তোমারই শাখায় বসে যদি তোমাকে আঘাতও করে তাকেও কিছু বল না, বরং তোমার ডাল যে ছিন্ন করেছে তাকে সেই কাটা ডালটাও অনায়াসে নিয়ে যেতে দাও। তোমরা পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী,

## প্রতিধ্বনি

পরাপকার সাধন করাই তোমাদের জীবনের ত্রুটি।  
সুতরাং কৃপা করে বল আমার কৃষ্ণ কোথায় হারাল ?

বৃক্ষদের নীরব দেখে ক্ষুব্ধ হলেন প্রভু। বললেন,  
'এ সব পাছ নিশ্চয়ই পুষ্ক, তাই কৃষ্ণের সখাতুল'।  
তারা আমাকে সঠিক খবর দেবে কেন ? কিন্তু  
বৃক্ষলয় এই লতাগুলি তো জীজ্ঞাতি, এরা  
নিশ্চয়ই আমাদের মনের দুঃখ বুঝবে। তোমরা  
দেখেছ কৃষ্ণকে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে তাই বঁচে  
পাকে। তোমাদের আর ভয় কী। তোমরা আমার  
সখিতুল্য। এবার তবে বলে দেবে আমার কৃষ্ণ  
কোথায়।'

লতারাও নিরুত্তর। তারা বলবে কেন ? তারা  
যে কৃষ্ণের দাসী। তাদের পত্রপুষ্পে যে কৃষ্ণের  
অঙ্গভূষণ হয়। তারা তাই কৃষ্ণের লোক, কৃষ্ণের  
ভয়েই তারা স্তব্ধ হয়ে আছে।

দেখ, কৃষ্ণ-অঙ্গের পক্ষ পেয়ে হরিণী এসেছে।  
দেখ তার চোখ দুটি কী উজ্জ্বল আর প্রসন্ন। নিশ্চয়ই  
সে দেখেছে কৃষ্ণকে। এস তাকে জিজ্ঞেস করি :

হে মৃগপত্নী, তোমরা কি দেখেছ আমার কৃষ্ণবক্ষের  
কুন্দমালা রাধাবক্ষের কুঙ্কমে লিপ্ত হয়েছে ? তার  
থেকে পক্ষ উঠেছে অপূর্ণ ! বলা, আমরা রাধার  
প্রিয়সখী, আমাদের কাছে তোমার সঙ্কোচের কারণ  
নেই। তোমায় সুখ দিতে কৃষ্ণ কি রাধাসহ এসেছিল  
এখানে ? ধরেছিল মদনমোহন বেশ ? আমরা জানি,  
বলে দিতে পারি, রাধার কোন অঙ্গের সঙ্গে কৃষ্ণের  
কোন অঙ্গের সঙ্গ হয়েছে। হ্যাঁ, দূর থেকেই বলে  
দিতে পারি, আর তা শুধু বাতাসে ভেসে অসা  
গন্ধের থেকে। আমরা রাধার কুচকুম্ভের পক্ষ জানি।  
সেই পক্ষের সঙ্গে মিশেছে কুন্দপক্ষ আর কুন্দের মালা  
কৃষ্ণের গলার। তুমি বলে দাও রাধাসহ তিনি  
কোথায় অদৃশ্য হলেন।

মৃগী নিজেই হয় তো কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। ওই  
আমার কথাই সে শুনেছে না। উত্তর দেবে কী !

আর এই গাছগুলোর এমন দশা কেন ?  
ফলপুষ্পভারে ভয়ে পড়ে তারা ভূমি প্রায় স্পর্শ  
করে আছে। তার মানেই তারা কাউকে নমস্কার  
করছে। তবে সন্দেহ কী, এখানে এসেছিল কৃষ্ণ,  
আর—তাকে নমস্কার করবার জন্তেই গাছগুলো  
ফলেপুষ্পে আভূমি নত হয়ে পড়েছে।

বলা, তোমাদের প্রণাম কি কৃষ্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে  
অঙ্গীকার করেছে ? যখন তোমরা প্রণাম করছিলে  
তখন হয়তো কৃষ্ণ লীলাপত্র সঞ্চালন করে তার  
প্রেয়সীর মুখ থেকে ভ্রূককে তাড়বার চেষ্টায় অচ্যুতিত  
হয়েছিল, তোমাদের প্রণাম সে দেখতে পায় নি।  
বলা তোমাদের কি কৃষ্ণ অপমান করেছে ?

গাছের মুখেও কথা নেই। তারা বলবে কী,  
তারা তো নিজেরাও শোকাকাতর, যেহেতু তারা  
কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণের বিরোধানে তারা নিজেরাই  
হতভঙ্গ।

তারপর প্রভু যমুনা ভাবলেন সমুদ্রকে। সেখানে  
কদম্বের নিচে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে—কোটি  
মন্মথমোহন মুরলীবদন কৃষ্ণ।

আনন্দের আতিশয্যে মুহিত হলেন প্রভু। আবার  
বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে বসলেন—এখনি যে  
কৃষ্ণকে দেখছিলাম, সে কোথায় গেল ? কোথায়  
লুকাল তার বাঁশি ?

নবজলধরের চেয়েও সুন্দর দেহকান্তি, নববিজ্ঞানের  
চেয়েও মনোহর বসন, মুরলীশোভিত মুখখানি যেন  
অকলঙ্ক শাদেশশী, কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছ আর  
তারকার মত উজ্জ্বল মুক্তাহারের শোভা—এমন যে  
কৃষ্ণ মদনমোহন, সে আমার নেত্রস্পৃহা ক্রমশই  
বাড়িয়ে চলেছে। [ক্রমশ।

## প্রতিধ্বনি

শাহুদাস

এত আলোয় পথ চেনা যায়

মুখ চেনা দায় তবু আলোর বাঁজে,

স্বপ্নবেরা রঙিন গড়ক

মানব খেঁচা বেয়ে—

অনেক পথ পেরিয়ে এলাম

পেরিয়ে মেঠো সাঁকো,

উষ্ণ ঠোঁটে স্মৃতির চিৎক

অনেক দূরে নদী,

মন্দিরে সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

# শেষ পর্যন্ত

## শ্রীপ্রভাতামাহন বাল্যোপাখ্যান

সোমেশ দাদা গোমেশ লেনে থাকে,  
মোদের মতে যমে সে নিলে তাকে  
আমরা তারে বুঝাই নানা মতে,  
'রোমিও' সম ভ্রমিয়ো নাকো পথে  
করণ পান গেয়ো না হেঁড়ে স্মার,  
সুহৃদগণে ফেলো না ঠেলি দূরে ।'

অমিত হাতী হোমিওপ্যাথি করে,  
নক্স ভ্রমিকা ছ' ভোজ খেলে পরে ।'  
মদীয় গৃহে যদিও স্থানভাব,  
করাই স্নান, খাওয়াই কিন' ডাব,  
বুঝায়ে বলি, মেয়ের ভাবনা কি ?  
নাসিকা নাগ, উচ্চকিতা চাকী,

রাঁটা ঘটক, লতিকা মতিলাল,  
উমসী ঘোষ, পল্লবিনী পাল,—  
ট্রিপল্ এম-এ, ডি-ফিল, পি-আর-এস,  
প্রেমের দায়ে বিকায়ে গেল শেষ !  
বলে সে শুধু, 'আসিয়া মোর প্রিয়া,  
থাকো না ডুবি' অপরে করি' বিয়া,—

অস্থানেতে মজ্জেছে হতভাগা,  
বারাটি তার ব্যারিস্টার বাঘা,  
সোমেশ তাই অনেক কায়ক্লেশে  
ব্যারিস্টার হইয়া অবশেষে  
খবর পেল এয়ারোডোমে নামি'

প্রেমে সে পড়ি' গিয়াছে সম্প্রতি  
ইহার চেয়ে হ'ত না বেশি ক্ষতি  
'না-ফেলা চিঠি জমিয়ো নাকো মিছে  
অমিয়প্রিয়া রায়ের পিছে পিছে  
কমিয়ো নাকো খাওয়া ও ঘুম, দাদা  
কানেতে কথা নেয় না বোকা, হাঁদা

বলে সে, 'সারে বমি ও প্রেমরোগ—  
খাবে না, আছে কপালে ভুভোগ  
নদীও নাই নিকটে, কল খুলে  
চালাই ক্ষুর দাড়িতে—কাঁচি চুলে ।  
কাহারে চাও বলে। না খুলি' খালি,—  
সোনালি সেন, ঢলঢলতা ঢালী ।

কোকিলা কর, অরুন্ধতী ধর,  
লুকিয়া নেবে যে কেহ তেন বর ।'  
বাজারে তার হাজার কুড়ি দাম,  
ঘরেতে বোন, আমরা ঠিকিলাম ।  
চাহে না ফিরে ।' বুঝাই, 'তার প্রেমে  
ক্ষতি কি ? ছবি বাঁধায়ে রেখো ফ্রেমে !'

অমিয়প্রিয়া হাঁকায় এরোপ্লেন ।  
ব্যারিস্টার জামাই চেয়েছেন ।  
বিলাতে গেল করিয়া ধারধোর ;  
ফিরিয়া এল না যেতে ছ' বছর ।  
আগের দিনই অমিয়প্রিয়া সেন,—



## ॥ আট ॥

### জার্মানী, জু ও জুজু।

যুদ্ধকালীন অল ইণ্ডিয়া রিডিতে গোলানী করার সময় উল্লেখ্যে যোষণা করতে হয়েছিল যে জার্মানজাতটাই সভ্যতার দক্ট ও দেশটা যতদিন আছে অগতে ততদিন শান্তি নেই। বাসিনে, কেন জানি না ঐ কথাটিই বারবার মনে পড়ে গেল। দূর থেকে জাতের কলঙ্ক শুনেছি, কাছে এসে সেটা যাচাই করতে গিয়ে দেখি, যুদ্ধের পর জার্মানী নিজেকে নিয়ে যতটা বিব্রত হয়েছে, জার্মানীকে নিয়ে আমেরিকা বিব্রত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। হিটলার লাগালো যুদ্ধ, বুটন নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সরগরি উঠে পড়ল আমেরিকার কাঁপে। সেই কাঁপের ওপর বাস মহানন্দে যুদ্ধের করে আমেরিকাকে বুটন বলল—‘যুদ্ধ জিতেছি, অতএব জার্মানী এখন তোমার।’

সেই জার্মানীই এখন হয়েছে আমেরিকার শাখার করাতে। জার্মানীকে ভাঙা চলে না কারণ সেরগোডায় রাশিয়া দড়ি নিয়ে বাসে আছে। পশ্চিম জার্মানী যাওয়া মানেই সারা য়ুরোপ চলে যাওয়া। ওদিকে, জার্মানীতে থাকতে গেলে পুনর্গঠন অবস্থাধারী। তার জন্য অংশই চাই মার্শাল-এড। তাতেও নিশ্চিত হবার উপায় নেই। জার্মানী অনুবর্তক বলছে আমাদের পুনর্গঠনের প্রথম এবং অপরিহার্য সোপান হল আমাদের ফ্যাক্টরি চালু করা। জার্মান ফ্যাক্টরি মানেই অস্ত্র। উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকা যদি বলে ‘কর চালু।’ তো সারা য়ুরোপ হাঁ হাঁ করে ওঠে—কর কী? বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে কোন সুনির্ধারিত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মার্শাল-এডের মোটা অঙ্ক জার্মানীতে ছড়াতো হচ্ছে। তাতে আবার য়ুরোপের ঘোরতর আপত্তি! ওরা বলতে চায়—জার্মানী যুদ্ধ বাধালো, আমরা সর্ববর্ণণ করে সাহায্য করলাম, তুমি যুদ্ধ জিতলে অথচ ডলার পাবে ওরা—এ কেনমদ্যার কথা? মাঝখানে বসে মজা দেখছে রাশিয়া।

ওদিকে আবার সরকারিভাবে না হ’লেও বেসরকারিভাবে বহু আমেরিকান ব্যবসায়ার জার্মানীকে তোরগত করতে নারাজ। বুটন জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানীর স্বভাব যুদ্ধ করা। ফ্রান্স জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানী ফ্রান্সের বৃকের ওপর বসেছিল ছ’বছর। তারপর যুদ্ধ হেরে আমেরিকার ডলার পাচ্ছে ওদের চেয়ে বেশি। আমেরিকানরা জার্মানীকে দেখতে পারে না কারণ জার্মানী জুদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। জার্মানী ছ’ কোটি লোককে মরে ৬০ লক্ষ জু মেরেছে, অতএব আমেরিকান জুদের হিসেবে, গড়পড়তা প্রত্যেক দশজন জার্মানের মধ্যে একজন খুণী! তার চেয়ে বেশি—প্রত্যেক জার্মান কম করে দশ ভাগ খুণী!

আমেরিকার সমস্তা ওদেরই খুক। আমি কেনেডি নই, জুশেভ নই আর মার্শাল-এডের টাকাও আমার পকেটে আসছে না।

এবার জু-সাগ্রা ধরা যাক। বেসরকারি হিসেবে যাই হোক, সরকারি হিসেব জার্মানী গত মহাযুদ্ধে জু মেরেছে ৬০ লক্ষ। এখন প্রশ্ন হল, কে মেরেছে? জার্মানী, না হিটলার? একটু ভাবলেই বোকা যাবে জার্মানী মারে নি, মেরেছে হিটলার। হিটলার শুধু জুই মারে নি জার্মানীকেও জাতে মেরেছে। হিটলার যদি যুদ্ধ জিততো তো কোন সমস্তাই হত না। হয়েছে বলেই গণ্ডগোল বেঁধেছে। জার্মানী যদি যুদ্ধ জিতে লাগত নাহিল, স্ট্যালিন এবং কুজডেন্টসকে

# নাগরিক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

### প্রভাত যুথোপাধ্যায়

নিরে হিটলার য়ুরেমবর্গ বিচার প্রহসন অমুষ্ঠিত করতে তা হলে অবশ্যই দেখা যেত যে বুটন, আমেরিকা আর রাশিয়া জার্মানীর চাইতে বড় খুণী। আর নয়ট বা কেন?

জু হত্যা! জার্মানীর একচেটিয়া জাতাবাসা নয়। অর্কিট হাও জু হত্যা করেছে। হাজারি ক্যাননবদনে লাখ লাখ জু জার্মানীর হাতে তুলে দিয়েছে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জখাই হবার জন্য। ফ্যানিয়া, বুলগারিয়া, যুদ্ধের সময় জু-হত্যা কম করে নি। পোলাণ্ডে যুদ্ধান্তরকালে জু-হত্যা যে পরিব্রজন, যাকে বলা হয় ‘পোগ্রোম’—তার খবর পৃথিবীর কোণে অবিস্তিত নেই। রাশিয়া তো সেই স্ট্যালিনের প্রথম পার্জের সময় থেকে ক্যাননবদনে এবং অকাতরে লোক মারছে জাতি-ধর্ম-নির্ধিশেষে। বুটন ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে মেরেছে চার লক্ষ দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো মেরেছে হাজারে হাজারে। আজ আফ্রিকার কি ঘটছে? ‘অবসারভার’ পত্রিকার পিটার আড্রাহাম লিখছেন—প্রতি বছর ওখানে গড়পড়তা নিগ্রো মরে দশ হাজার, নিগ্রো রম্যীব ওপর পাশবিক অত্যাচার হয় প্রায় ছ’ হাজার আর মার খায় প্রায় এক লক্ষ। দেশের কাছে এসে দেখুন পাকিস্তান—সেখানে অমুসলমান হত্যার হিসেব নেই। দেশের মধ্যে এসে দেখা যায় স্বাধীনতার সময় মুসলমান মেরেছিল প্রায় চার লক্ষ। এইসব দেশ বিভিন্ন দলভুক্ত। হিটলার জিতলে এইসব দেশ একত্রিত করে দেখিয়ে দিতে পারত যে, এদের তুলনায় ওর জু-হত্যার অপরাধ নিতান্তই নগণ্য। শুধু তাই নয়। আরও প্রমাণ করতে পারত সে যে কোন লোক জার্মানীর হাতে মরলে খুশি হত, কারণ জার্মানীর নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হত্যার তুলনায় অল্প যে কোন দেশের লোক মারার পদ্ধতি ক্রুর নৃশংস এবং পাশবিক। ইসরাইল-আইকম্যানকে ক্রাসিতে লটকিয়েছে—তার একমাত্র কারণ আইকম্যান ছিল পরাজিত দলে। কৈ পোলাণ্ডের ‘পোগ্রোম’ কতাদের দিকে হাত বাড়ুক তো! রাশিয়া শ্বেক টুটি চিপে ধরবে? হাঙ্গারীর দিকে দৃষ্টি দিক। সেখানেও রাশিয়া!

কাজেই, সারা জগৎ ভেঙে, ধানিকটা রাশিয়ার প্রায়োচন্য, বেশিটা য়ুরোপের নিবৃদ্ধিতার এবং অনেকটা ইসরাইলের উৎসাহে, জু হত্যার অপরাধে জার্মানীকে হীন প্রতিপন্ন করার যে নিখুঁত বড়মুখ চলছে, সেটা নিতান্তই অমুচিত।

একদল লোক আছেন বীরা বলেন হিটলার মানেই তো জার্মানী। জার্মানী যদি হিটলারকে গদিতো না বসাতো তা হলে কি বঁচ সাগত.

না জু মরত? আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিসঙ্গত হলেও, এই ধারণার গোড়ায় গঙ্গদ আছে। হিটলার কি করে গদিত্তে বঙ্গ সেটা অনুমানসাপেক্ষ। তবে এটা ঠিকই যে অর্ধেক জার্মানীর লোক গুকে ভোট দিয়েছিল। তারা কি জু-মারা হবে জেনে দিয়েছিল, না যুদ্ধ করা হবে ভেবে ভোট দিয়েছিল? স্বাধীনতার আগে যখন আমরা জওহরলাল আর সর্বদা প্যাটেলকে দেশের নেতা বলে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম তখন কি দেশ বিভক্ত হবে বলে মনেছিলাম, না আমরা জানতাম যে ওদের রাজনৈতিক লীলাপেলার তিন লক্ষ ভারতবাসী খুন হবে পাকিস্তানে?

হিটলারকে কেউ ভোট দিয়েছিল স্বাক্ষর, কেউ ভয়ে, কেউ ভক্তিতে। কেউ ভেবেছিল দেশের ভাল হবে, কেউ মনে করেছিল জীবনের উন্নতি হবে। হিটলার ভুল পথে দেশকে নিয়ে গেছে, সেটা ওদের হুঁত্যা। যুদ্ধে জয়লাভ করলে, এই হুঁত্যাগাই হয়ে উঠত পরম সৌভাগ্য। ভাগ্যের এমনই ভয়ানক ভাগ্যভাগি।

প্রথম নির্বাচনে দেশের শাসনভার হিটলারের হাতে যাওয়ার পর দেশ আর ভাববার অবকাশই পায় নি। মানে, হিটলার সে অবকাশ দেয় নি। যারা হিটলারের কাছাকাছি থাকত তারা অবশ্যই মনে করত হিটলার দেবতা। আর ঐ কাছাকাছি গুয়লাদের আশে পাশে যারা থাকত, তারা ওদের মনে করত উপদেবতা। বাকি জার্মান-জাতিটা স্তূর্ণি বারো বছর এই দেবতা আর উপদেবতাদের ভয়ে এবং ভক্তিতে কিছু ভাববার সুযোগই পায় নি। টানা বারো বছর ধরে ওরা দিনের পর দিন শুনলো যে, জাত হিসেবে জার্মান পৃথিবীতে অনন্ত, মানুষ হিসেবে জু-রা জঘন্য। নির্ভল মিথ্যার জাল বুনে আর নির্মম অত্যাচারের ডর দেখিয়ে হিটলার সম্প্রদায় সারা দেশকে সহজেই বৃত্তিরে দিল যে, যুরোপকে জয় করতে না পারলে জার্মানীর বাঁচবার পথ নেই। আর যুরোপ জয়ের একমাত্র পথ হল যুদ্ধ। বাধল যুদ্ধ, বাজল বিজয়ের বণদামা। আর মরল জু।

হিটলারের অগ্রগতি সারা দুনিয়াকে চমকে দিল; জার্মানী যে চমকে উঠবে এ আর এমন বড় কথা কি? হঠাৎ একদিন জার্মানী দেখল যে হিটলার ওদের হান্সির কব্জে বুটনের দোরগোড়ার আর রাশিয়ার রান্নাঘরে। ফ্রান্স, পোল্যান্ড ইতিমধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যও পালসাই পালসাই করছে। বৈজয়ন্তী সমারোহে হিটলার হয়ে উঠল অতি-দেবতা আর জার্মান হয়ে উঠল শ্রেষ্ঠ জাত। বিজয়ের আনন্দে ওরা শু-জানসেই না, বিশ্বাসও করে নিল যে পৃথিবীর প্রভু যে ওদেরই একমাত্র অধিকার। এটা ওদের অপরূপ নয়, উপদেবতার অপকীর্তি।

মানুষের মনে মিথ্যা অহঙ্কার জাল ছড়ায় ছড়িয়ে-পড়া জলের যায় মতন। অহঙ্কারটা মানুষকে এমনই অন্ধ করে দেয় যে, সত্যের স্বরূপ চিনেও সে চিনতে পারে না, জেনেও সে বুঝতে পারে না। জার্মানীর হল ঠিক তাই। প্রথম পরাজয়ের ধাক্কা হিটলার বলল—শীতের পরতানী। দ্বিতীয় পরাজয়ের ধাক্কা—ভাগ্যের বিভ্রম। তারপর থেকেই অপরাধের বোঝা আর পরাজয়ের কলঙ্ক নির্বিবাদে চাপাতে আরম্ভ করল দেশবাসীর কাছে। দেশ দিশে হারিয়ে ভাবল

মারেরা নামল পথে। ছেলেমেয়েরা পরল উর্ধ্ব, বুড়োরা কাঁধে তুলল বনুক। যুদ্ধে বাওনার উত্তেজনা তখন এমনই প্রবল যে কোথাও যাবে জানল না, কেন যাবে ভাবলে না।

বুটিশ আর মার্কিনী বোমার বিধ্বস্ত হয়ে যখন পেটল ফিরে তাকালো তখন দেখল সারা দেশ মাটিতে আর দেশাধিপতির হিটলার মাটির তলার। আরও দেখল সারা দেশব্যাপী ধ্বংসস্তূপের তলার চাপা পড়েছে ওদের জাতির ঐতিহ্য, শেষ হয়ে গেছে ওদের বাঁচবার ক্ষীণতম আশাইকু এবং দেখল একমুদ্র প্রত্যুৎপন্নাত্মক বদলে পেরেছে চার প্রহু। সেই থেকে ওদের দেশের দুর্ভাগ্য আজও ঘটল না। আমরা অসীক ভয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের বলি জু-জু। যুরোপ জার্মানীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—জু। জু।

এবার আপনাই বলুন দেখাটা কি আমাদের এবং কতখানি?

এসবই আমার বলেছিলেন হের ডক্টর ডট্ট ডোগাটা। হের ডক্টর পূর্ব-বালিনের অধ্যাপক। নামটা বদলেছি তাঁর নিরাপত্তার খাতিরে, নইলে কমা দাঁড়ি পর্যন্ত তাঁরই। উনি পূর্ব-বালিনে থাকেন সেই নির্জন রাস্তার ওপর ভাড়া ফ্ল্যাটবাড়ির দোতালার যার নীচে এই দু'দিন আগে আমাদের বাসটা দাঁড়িয়েছিল এক যুহুঁতার রথ মুছেছিল চোখের জল। হের ডক্টর কথের বাবা। আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে এক ভরসাঙ্কার প্রাকালে। বাওনার স্থিতি অবশ্যই ছিল না। পূর্ব-বালিনে একটি রবিবার সকালের সঙ্কুচিত অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরব সেটা মনে চায় নি। ইচ্ছে ছিল কাজের দিনের পরিপূর্ণতার পূর্ব-বালিনকে আর একবার ভালো করে দেখব। তাই গিয়েছিলাম।

খুব একটা পরিবর্তন কিছু দেখি নি। দোকানপাট খোলা, ট্রাম বাস চলছে, ছোটবড় গাড়িও যে মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে না তা নয়। কিন্তু প্রাণশ্লথন অত্যন্ত ক্ষীণ। সবচেয়ে পুতুলখেলার সাজানো সংসার, দমে চলছে, নিরমমফিক নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদ আর হুকুমের তামিলে হাত-পা নাড়ছে। কোনকিছু প্রের করলে অবাক হয়, সন্দেহ করে, ভয় পায়, কথা বলে না। কারো দিকে চেয়ে হাসলে সে গোমড়া মুখ ঘুরিয়ে ভাবতে বসে কোন নিয়মটা ভাঙল এবং কেউ দেখল কি না। তারপর ধানিকটা পথ দূরে গিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দেখে, চারিদিকে কড়া নজর বুলিয়ে, সুরোপ বুঝে কিছু করে একটু হাসে আর হনু হনু করে ছুটে হারিয়ে যায়।

দোকান আছে। জিনিসের ভালোমন্দ বিচার বার দিলেও কিন্তু কেনবার উপায় নেই। জিনিসে হাত দেবার আগেই জবাব দিতে হয় পারমিট আছে কি না। পারমিট মানে জিনিস কেনার সরকারি অনুমোদন। থাকলো তো আমি মানুষটা ভালো। না থাকলে এমনভাবে ভাংকায় যেন "পাগল কিং" জেল-পালানো আসামী। অস্পষ্ট তো বটেই, বিনা পারমিটে কেনা যার বই, সিনেমার টিকিট, প্রামোফোন রেকর্ড আর অফিসারের চরিত্র। বাসু আর কিছু নয়। বই-এর দোকানে বিদ্যাকী রচনা নিষিদ্ধ। ইংরেজি বই বা আছে সবই রাশিয়ার জয়গান। সিনেমাতো

## নাগর্যকণ

কারদের ছয়লাপ, প্রেমিক প্রেমিকাকে পায় ট্রাউন্স চালানায় বাহাদুরী দেখিয়ে মস্তান্তে মেডেল পাবার পর।

বই কেনার প্রয়োজন ছিল না, সিনেমা শেষ পর্যন্ত দেখার বৈধও হারালাম আধাবটার মধ্যে। ট্যাক্সির অভাব নেই বললেই চলে। ট্রায়ে উল্লেখই মনে হয় বাধাঘাটে থাকি। অগত্যা ইটতে থাকি। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম রাশিয়ান সৈন্তের স্মৃতিসৌধে।

এটা একটা বাগান। চমৎকার। কার্পেটিভন সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে আর সারি সারি কাউগাছের পা ছুঁয়ে লাল কাঁকর বেছানো পথ, নানান প্রান্ত ঘুরে গিয়ে পড়েছে মারবেল-গাঁথা শ্রুতিকলকের তলায়। দুটি ফসক। দুটোই কালো মার্বেলের। দু'ধার থেকে প্রায় দুড়ি ফুট ওপরে উঠে পরস্পরের দিকে সামান্য ফেলে পড়েছে। তারই তলা দিয়ে এসে দাঁড়ালে দেখা যায় সামনে আরও সবুজ মাঠ, মাঝখানে বাগানো লতা লতা চৌবাচ্চা আর তাদের প্রত্যেকটির মাঝখানে ফোয়ারা। দূরে, প্রকাণ্ড কাউগাছগুলো ভিড় করেছে ভরা পাতার। সামান্য বাতাসেই পাতাগুলো কানাকানি করে।

ভালোই লাগছিল। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়ান প্রহরী বুঝতেই পারি নি। আপাদমস্তক বেখে প্রশ্ন করল ইংরেজের শান বাগানে ইংরেজিতে—কেমন দেখছেন?

চমৎকার।

হাসলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন ঔপাখ্য অনেক দূরের মাছুকেও কাছের মনে হয়। স্মৃতিফলক দুটো দেখিয়ে প্রহরী বলল, ইটালীয় মার্বেল।

ও।

ফিটলারের প্রাসাদ ভেঙে এখানে আনা হয়েছে। আমাদের দেশের যেসব সৈন্য এ দেশের মাটিতে প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্ত এটা।

ও!

ওর সর্গর্গ উক্তিতা অবগাই কানে বাজল। এখানকার সহজ সরল আবহাওয়া ওর কথাগুলো বেশ মানান। আরও খাড়াপ লাগল, যখন বলল—লোকটা ইতর ছিল।

সে তো মরেই গেছে।

ইতর ছিল।

তাকালাম। কথা বাড়ির লাভ নেই। প্রদক্ষ পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় বললাম—চমৎকার সবুজ ঘাস।

লোকটা চারিদিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল—এখানকার মাটি, ঘাস, ঐ গাছ সব রাশিয়ার থেকে আনা।

সত্যিই রাশিয়ার ঘাস।

জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। নেমে ওলাম নীচে। বালি পারে দাঁড়ালাম ঘাসের ওপর।

আমাদের দেশের ঘাসে আর রাশিয়ার ঘাসে কোথায় তফাৎ? লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল, কি করবে, কি বলবে ঠাণ্ড করতে পারল না। সন্ধ্যা গিরে পেলেই সহজ মাছুঘটা হয়ে উঠল সজাগ প্রহরী। কাঁধের সাদা দড়িতে বাঁধা ছইসিল বাগিয়ে এমন জোরে হাটতে যে নিজের মাটিপা না থাকলে মৃত সৈনিকরাও

নিখাং ছুটে এসে সজীব বাগাতো। এস আরও প্রহরী। আরও অনেক। পুরো একটা গ্রাউন্ড। রাশিয়ান ডায়ার চলল ওদের উত্তেজিত আলাপ—তাও বহুক্ষণ। আমি ঘাসের ওপরই বসে আছি। এক বিরাটাকার দৈত্যাকৃতি সৈনিক এসে বলল—পাসপোর্ট?

দেখালাম। ও দেখল তারপর নিয়ে গিয়ে আবার কনফারেন্স শুরু করে দিল। আমার পা দুটো ঠাণ্ডার কনকন করছে; উঠে এসে জুতো-মোজা পরলাম। লোকটা আবার আমার কাছে এসে প্রশ্ন করল—ইণ্ডিয়ান?

সহজ বাংলায় জবাব দিলাম—দেখতেই তো পাছ বাণু। পাসপোর্ট তো তোমার হাতেই আছে।

আমি কি বললাম ও বুঝল না। ও কি বলল আমিও বুঝলাম না। পাসপোর্টটা কিরিয়ে দিয়ে বলল—গো।

আমি হাসলাম। ও আরও গভীর হল। দেখা হয়েছে, দাঁড়াবার আর দরকার নেই। ঘোরার পথে পা বাড়লাম। আমার দু'ধার দাঁড়াল বনুকাধারী। কাঁকর-বেছানো পথ দিয়ে চলেছি। শেখ বিকলের দিকে আলোর ঘাসের রং পালটেছে। কাউ-সারির ওপর আলোছায়ার খেলা। সবুজের বহুধরী সন্সার ওদের দৃষ্টি সামনের দিকে। সোজা। একেবারে চকুয়ের দড়ি দিয়ে বাঁধা। এসে পৌছেলাম দু'তলা উঁচু লোহার গেটে। বললাম—ওড বাই।

প্রহরী গেটটা টেনে বন্ধ করতে করতে বলল—আর কখন এখানে এসো না। তুমি আমার দেশের মাটিকে অপমান করেছে তার ওপর পা দিয়ে!

রাশিয়া দেশটা দেখবার সখ আমার বহুদিনের কিন্তু আমার দেখছি আর যাওয়া হবে না। মাটিতে পা না দিয়ে হাঁটা আমার বাবার বাবাও কখনও পারে নি।

আবার পথ। সারাদিনের কান্ড। চা না হ'লেই নয়। পকেটে পরস আছে কিন্তু পারমিট নেই। রুথ আগেই সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু সতর্ক হই নি। সামান্য চারের বেলাতেও আইনের বাধন এমন শক্ত হবে ভাবিই নি। রুথ বাবার ঠিকানা দিয়েই দিওছিল। পা বাড়ালাম। বাড়ি খুঁজে পেতে সমুদ্র লাগল না।

হের ডক্টর ডক্টর ভোগার্টের নেময়েটে জেলাসীক্লের আবর্জনা জমেছে। নামের আগে দু'বার ডক্টর লেখার কারণটা তখন বুঝি নি, পরে জানলাম। জার্মান জাতটা ক্যাডার কড়া নিয়মে বাঁধা, বিশেষ করে যুদ্ধ-পূর্ণ জার্মান।

নামের সঙ্গে যদি কোন বিশেষ সম্মানের যোগাযোগ ঘটত তাহলে সেটা আমরণ কার্যক্রম হয়ে গেল। একবার ডক্টরেট পেলে হের ডক্টর; দু'বার পেলে হের ডক্টর ডক্টর ('হের'টা কেন যে ঘের ব্যবহৃত হয় না তার কোন সঙ্গত কারণ আমি পাই নি)। সারা সন্ধ্যাতে যদি সাত শো বার হের ডক্টর ডক্টরকে সম্বোধন করতে হয় তা হ'লে সেই সাত শো বারই বলতে হবে হের ডক্টর ডক্টর। একবার বাদ দিলেই সব বরবাদ। হের ডক্টর ডক্টরের সম্মানহানি এক আপমান সম্বৎ বিপদ।

হের ডক্টর ডক্টর বাড়িতেই ছিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচর্যার বাহুল্য। চায়ের টেবিলে আমার বসিয়ে কুথের হাতের লেখা ঠিকানাটার দেশলাই ধরালেন। ওঁদের জাতীয় আপ্যায়ন কফি। চা-টা ভয়তর কৈফিয়ৎ। তবু ভালো লাগল। আর ভালো লাগল কুথের মা'র সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার বিশেষ ধারা। উনি জার্মান ছাড়া আর কোন ভাষাই জানেন না; আমি তো আকাট মুখ। তবুও কথা হল, কখনও আমার অল্প জার্মান ভাষার হাতের অভিব্যক্তিতে, কখন হের ডক্টর ডক্টরের মধ্যস্থতায়, বেশির ভাগ ইসারায় আর প্রায় সবটাই হাসির বাহুল্যে। চা খেলাম, রাত্রে খেয়ে খাওয়ার প্রতিক্রিয়াও দিলাম। সাদাসিধে মানুষটি অল্পক্ষণ পরেই চলে গেলেন রান্নাঘরে, তাঁর দেহাধিকার ব্যস্ততায়। বহু ব্যথা ও ব্যর্থতা-চিহ্নিত বার্ককে ওঁদের সম্ভাবনাতাবের হাহাকার একেবারে স্পষ্ট। আসবাববিহীন ঘরে ঘড়ির সশব্দ চলার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শ্রোণস্পন্দন কান পাতলেও শোনা যায় না। হের ডক্টর ডক্টর থেকে থেকেই তাঁর পাকা চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে বলে ওঠেন 'মাইন গট।' ওটা বাঁচার শব্দ নয়, বৈতে মরে থাকার মর্মান্তিক প্রকাশ।

একটা নিতান্ত মাঝুলি চুকট এগিয়ে দিলেন। মাত্রাতিরিক্ত ক্লিরাও তার চেয়ে ভালো সিগারেট খায়। বললেন—থেরে দেখুন। এ দেশে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।

বাধ্য হ'য়ে নিতেই হল। দু'টান মেরে বার দশেক কাশলাম। আমার মতন পোক সিগারেট খাইরেও হ'র মানল।

শ্রদ্ধ করলেন—সঙ্গে পাসপোর্ট আছে ?

হ্যাঁ।

পারমিট ?

না।

বেশ বোঝা গেল উনি খানিকটা বিরত বোধ করলেন। কিছু অবশ্য বললেন না। উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে এসে শ্রদ্ধ করলেন—কুথ কেমন আছে ?

ভালো।

কোন চিঠি পাঠিয়েছে ?

না।

ওটা। বিদেশীদের প্রায়ই ওয়া খানাতল্লাসী করে। পারমিট না থাকলে তো কথাই নেই।

খানিকটা অভিজ্ঞতা আজ আমার হয়েছে।

কোথায় ?

শুনেন উনি রাগ করলেন। আঙুন নিয়ে খেলা করাটা নিতান্তই ছেলোমামুষি। উঠে গিয়ে দরজাটার চাবি ঘুরিয়ে এলেন। বসেও নিশ্চিন্ত নন। আবার উঠে জানলাটা খুলে চারিদিকে ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে এসে বললেন—কলো করে নি তোমার কে বলতে পারে।

থেরে আবার বলেন—ওরা সব পারে।

সেটা অবশ্যই বোঝা গেল। না হ'লে বিদেশী অতিথির সঙ্গে আলাপের আগে এত সতর্কতার আর কোনই কারণ থাকতে পারে না।

বিবাদে বন্দী। কথা যোগায় না, তাই বলি বাকিদের এই অশ্রু-খুব চুপচাপ।

চুপচাপ নয়, মৃত।

আবার আমরা চুপচাপ। পাশের ঘর থেকে কুথ মাতার রান্নার শব্দ আসে। মায়ে মায়ে গ্যাস উত্থানের শব্দটা শোনার শক্তি টানা দীর্ঘনিশ্বাসের মতন। উনি থেকে থেকে সিগারেট টান দেন আর আমি সেই আলোর খেলা দেখি ওঁর কপালে স্পষ্ট দাগগুলোর ওপর।

আমি বোধ হয় আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটলাম।

কি ভাবছিলেন জানি না। চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, উঃ ? কি বললেন ?

আমি বোধ হয় আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটলাম।

না। আগে ছিল পড়ানো। এখন শুধু পার্টি ডক্ট্রিন (Party doctrine) মাথা লাগে না, মুখস্থ করলেই চলে।

মানে ? আপনি তো ইতিহাস পড়ান। কুথ বলছিল।

পড়াতাম। এখানে ইতিহাস তার ঐতিহ্য হারিয়েছে। আমরা রিসার্চ করে ইতিহাসকে খুঁজে বের করতাম। এরা পার্টি অফিসে ইতিহাস লেখে। আমরা মুখস্থ করি আর মুখস্থ করাই।

থেরে আবার বলেন, শুধু পড়ালেই হয় না। সামনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। কে পড়ছে, কে পার্টি'কে উপেক্ষা করছে। পেছনের দিকেও মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় কে আমার দেখছে।

রিপোর্ট করতে হয় ?

হয়। করি। করলে মনের জাত যায়। না করলে জীবিকা।

একমুহূর্ত থেরে যান হের ডক্টর ডক্টর। সিগারেট শব্দটান দিয়ে ফেলে দেন। ঘুরে বলেন, কিন্তু কেন ? কি হবে এমনি করে লেখাপড়া শিগিরে ? এমনি ক'রে কবে কোন পার্টি টিকল ? এই ধর জার্মানী...

উত্তেজনার উঠে ঠাড়িয়ে ঘরঘর পাগচাির করতে থাকেন হের ডক্টর ডক্টর আর বলে যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেইসব কথা—যা ইতিহাসের পাতায় নেই, আছে সর্বহারা মানুষের হাহাকারের মধ্যে, সম্ভবতঃ পিতার দীর্ঘনিশ্বাসে। যা আছে মনের কোণে কোণে পার্টি ডক্ট্রিনের কড়া শাসনকে ব্যঙ্গ করে, জুসচেভের হৃদয়কেও উপেক্ষা করে। উনি বলে চলেন হিটলারের রাইক-স্ট্যাগে আঙুন লাগানোর কথা নয়—সেই প্রসঙ্গে বুটনের কাপুরুষতার বলহীনতা। বারোবায়েই হিটলারকে খুশি করার বার্ষ প্রচেষ্টার কথা।

রাত গভীর হয়। হের ডক্টর ডক্টর ক্রান্ত হ'য়ে থেরে যান। সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে উনি দেখেছেন কেমন নিশ্চিন্তভাবে সভ্যতা শেষ হয়ে আসছে। মানুষ মরতে বসেছে। কাল হিটলার জমকি দিয়েছিল, আজ রাশিয়া পার্টি ডক্ট্রিনের চাবুক মারছে, কাল আবার আমেরিকা ডেমোক্রেসির আঙুন আলবে। মাধারণ মানুষের হুঁসুটি যে এইসব রাজনীতিক যড়যন্ত্র সেই-ই হয় সবচেয়ে নির্ধাতিত। জানলাটা খুলে দেন হের ডক্টর ডক্টর। বাইরে আলো নেই, গোলমালও নেই। আছে জমাট বাঁধা অন্ধকার আর অত্যাচারের তীতি। কথা শেষ করে উনি ঘুরে ঠাড়িয়ে শ্রদ্ধ করেন—মাপনিই বলুন। দোষটা

## নাগফলি

জবাব দিই নি। দেবার কিছু ছিল না। জানবাব কৌতূহল ছিল, বলবার ভাষা নেই। উনি জবাবের আশাও করেন নি। ডাক দিলেন—দেখে বান।

জানলাম ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে নিমন্ত্রণ পথ দিয়ে :ধূরগতিতে চলেছে মিলিটারি ট্রাক। তার ওপর জনকুড়ি স-রাইফেল সৈনিক। ট্রাকের হেড-লাইটটা পড়ছে সামনে, পথের মোড়ে অন্ধকার বাড়িটার দিকে। যেখানেও হুঁজন রাইফেলধারী সৈনিক। ট্রাকের আলো পড়তেই তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। হের ডক্টর ডক্টর বললেন—আমরা সভ্যজগতের মানুষ নই। আমরা বন্দী।

রাত বারোটো।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে দরজার চাবি খুলে অন্ধকার সিঁড়িটা ভালো করে দেখে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আমার বিদায় দিলেন দরজার ভেতর থেকেই। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নাওতে নাওতেই সুনসান দরজার চাবি দেওয়ার শব্দ। মনে হল ওটা ঘরের চাবি নয়, বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার দায়িত্ব আনল।

জনবিরল পথ।

নিজের পায়ে শব্দ ওৎপাতা ভীতিতে প্রতিক্ষণিত হয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। বাঁ দিকে পশ্চিম বার্লিনের আকাশে আলোর আভা কোথাও লাল, কোথাও নীল। আন্ধারে ঠাঁহর করতে চেষ্টা করি কোনটা কিসের। লালটা বোধ হয় জীভাম ফ্রন্টের আর নীলটা কুডামের। কিংবা বোধ হয় দুটোই কুডামের। ওই নীচে আছে স্বাধীন মানুষের আনন্দ-কালাহল। কান শোনা যায় না, মনে তার অহুভুতি। ভাবনার খেঁচি হারানো বীভৎস চিত্রবারে। ইরেজি অল্পবদে সেটা হল হন্ট।

হুঁজন সৈনিক। হাত রাইফেল।

পাসপোর্ট ?

দেখলো।

পারমিট ?

দেখলো। কুথের বাবা ওটা আমার দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ওটা ফ্রান্স।

কোথায় গিয়েছিলে এত রাত্রে ?

বেড়তে।

কোথায় ?

সিনেমায়। মোমোরিয়ালে। তারপর পথে পথে।

কোথায় বাজ ?

উ বান ট্রেনাটির হুলায় ট্রেন)।

আপোষে ওরের পরামর্শ হল। তারপর একজন রইল, অল্পজন আমার সঙ্গে পা বাড়লো।

চল

ভালোই হল। পথটা আমার ঠিক জানা ছিল না। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দি।

নিচেন (না)।

হাসলাম। ওরা বোধ হয় নিজেরাই নিজেদের খিঁচা করে না। বাঁ দিকে মোড় ফিরলাম। সৈনিকটা চট্ট করে পেছনটা একবার তাকিয়ে বললে, সিগারেট ?

দিলাম। একটা লম্বা টান দিয়ে বললে, আমেরিকান ? হন্ট।

উ বান বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাম তো আগেই হয়েছিল। ট্যাক্সিও নেই একটা। বাধ্য হয়ে হেঁটেই চলেছি। পথের দু'পাশে ভাঙা ভাঙা বাড়ি। দেওয়ালের মধ্যে থেকে ডাল-পালা গজিয়ে ছ। পথে জনমানব নেই। কোথাও বেড়ালের চোখ ফুটেছে, কোথাও সৈনিকের পদশব্দ। দৈবাৎ যদি একটা গাড়ি আসে তো মনে হয় আশে পাশের বাড়িগুলো বুকি উল্টে পড়বে ঐ বিরাট শব্দের কানিতে।

বাঁ দিক সবুজ প্রান্তর। আরতনে বিধে দুই কিনি। মাঝখানে উঁচু চিঁচি। বিদিশু দু'একটা বেকি। ফুটপাথে যে আলো জ্বলছে তা তই সেটুকু দেখা যায়। সৈনিক বলে হিটলার করব।

লোকটা জার্মান। মোড়ের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকায়।

আর একবার ঐ করবার দেখে নেয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে, হিটলার।

আমি বলি হেইল হিটলার।

হাসে। সৈনিক নয়, ও এখন সহজ মানুষ। বলে সিগারেট ?

দিই ওকে আর একটা। মহানন্দে শিশু দিতে দিতে চলে। এসে পড়ি পলিডামের প্লাটজ-এ। তার আগেই ও আঁখাওয়া সিগারেটটা নিবিয়ে টুপি মধ্যে লুবিয়ে নেয়। প্লাটজ-এ আরও সৈনিক, সজীন উঁচিয়ে সজাগ। ও গিয়ে কিছু একটা বলে। সর্গার আমায় আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ছাড়পত্র দেয়। গেটের তলায় পৌছাই। এইখানেই আমাদের ছাড়ছাড়ি। একটা সিগারেট দি। ও সবলে পেছন তাকায়। আমিও দেখি কম করে অটোডোটা চোখ আমাদের স্তনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ ও টুপিটা ধরে অভিবাধনের ছলে হুইয়ে পড়ে। আমিও ও দিসৃষ্টি কবে বলে সিগারেট ?

পুরো প্যাকেটটাই ওর টুপি মধ্যে ফেলে দিই। ও হেসে টুপিটা মাথায় দিয়ে বলে ওড নাইট।

ও মিশিয়ে গেল রাশিয়ান এলাকার অন্ধকারে। আমি পা বাড়াই স্বাধীনতার আলোর দিকে।

দু'পা গিয়েই দু'সারি ট্যাক্সি। ওরা দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। একটাকে উঠতে যাবে, পেছন থেকে চেনা কণ্ঠে শুনি—ওড ই হনিং।

কৃষ্ণ। অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করি—তুমি ? এখানে ?

শেষ গাড়িটার এলে না দেখে খানিকটা ভয় পেলাম। ভাবছিলাম কি করি !

ভাবনার কি ছিল ?

ট্যাক্সি আর নেওয়া হ'ল না। হাটতে হাটতে এসে বসি ছোট রেষ্টোরাঁয়। লুকুম হল বীহার। তারপর ওর স্বভাবসুহৃৎ ভ্রমিতে সোনালী চুলগুলো কাঁধ বদল করে বললে—হনেক।

ও পাড়র মেয়ে নেই।

থাকলে ভালো হত। তবু বোঝা যেত যে তোমার মন আছে। তুমিও মানুষ

ওর ভুল বাতুলে দিই।

বোকা যেত য় আমি পুরুষ।

কথ সিগারেট ধরাছিল। কলকাতা দেশলাইয়ের কাঠিটা একতুহুত স্থির হয়ে যায় সিগারেটের মুখে। নীচু মুখ, তোলা চোখ। বলে—  
আমি যু?

আমি হাসি। জবাব দিই না। সে ছোট ক'রে সিগারেট ধরায়। বলে—টেল মি। আর যু?

এবার জবাব দিতেই হয়। বলি—এক জায়গায় আমি পুরুষ।  
এক জায়গায় আমি পিতা। এখানে আমি পথিক।

বুঝা বীর নিয়ে আসে। অভিবাধন চানায়। কথ বীরের লব। গানটা হোটেব কাছে লাগিয়ে, ফেনার ওপর দিয়ে আমার আড়চোখে দেখে বলে—পথিক তুমি প্রথম নও।

আমি ভারতীয় পথিক।

তাও 'অগে' এসেছে এবং তোমারই দেশ থেকে।

বীরের চুমুক দিয়ে বলে—দিনের বেলায় তিনি থাকতেন দেশের নারিকার হোটেলে। রাত কাটাতেন গণিকার ঘরে।

তিনি বোধ হয় শুধুই পথিক।

না। পরিচালক। তিনিও ছবি এনেছিলেন। আর—থেকে  
আবার বলে—সঙ্গে এনেছিলেন পুরুষের ধর্ম।

আমি তা হ'লে অ-ধার্মিক?

এঁবার কথ হাসে। একেবারে ছেলেমানুষের মতন বিলখিল ক'রে। এদিক-ওদিক থেকে সবাই ঘুরে তাকায়। কথ উচ্চৈঃস্বরে ক্ষমা চেয়ে নিম্নস্বরে বলে—অ-ধার্মিক নও। একেবারে নাস্তিক।

প্রভেদ কোথায়?

খুব সোজা। অ-ধার্মিক ধর্ম মানি কিন্তু উপেক্ষা করে। নাস্তিক  
বিশ্বাসই করে না।

আমি তা হ'লে নাস্তিক।

উৎসুক হ'য়ে প্রশ্ন করে—বট ছোরাই?

আমার প্রেমের সাধনা।

কার প্রেম?

একটি মেয়ের।

কে সে?

এমন একজন যে দেশে আমার ভালোবাসতো। বিদেশে এসে  
ভুলেছিল।

বিয়ে করে নি তোমার?

তার চেয়ে বড় আঘাত।

কি?

আমার ভালোবাসাকে সে বিশ্বাস করে নি।

বীরের শেষ ক'রে কথ উঠে গাড়ায়—চল।

কোথায়?

কথ চারিদিকে দেখে খাটোগালায় বলে—যেখানে ঈর্ষার মলমলে  
চোখ নেই। গোলমাল নেই। ভিড় নেই।

হোটেলের সবীতে একগাণী লোক। তারপর আরও আরও

সজ্জার এটিকেটের বাঁধ ভেঙেছে। রাত্রির প্রথম প্রহরের উদ্ভাস  
মুখোদগু মুছে গেছে মদের মানস্কতার। এলোমলো চুল আর বোলা  
কোলা টাই দেখলেই বোকা যায় নাচের তালে আকাঙ্ক্ষার চর  
পাকিয়েছে। আমি চাষি নিতে গেলাম রিসেশন কান্টোনে, ও  
খামের গায়ে ভর দিয়ে তালে তালে পা ঠুকল।

নাচবে?

জানি না।

কথের বাক্য হোটের হাসিতে বেদনার ছায়া আর অবিশ্বাসের  
ইসারা।

কামরা। সেদিনের মতন ও আজ আর বিছানায় গড়িয়ে পড়ে  
না। সোফায় বসে সিগারেট ধরালো। আমি পূর্ণাঙ্গ টেনে মাথা  
দিলাম। সারাদিনের পথ চলার যে গভীর অবসাদ এবার তার  
তাকে আটকানো যায় না। আমি বিছানায় শুয়ে সিগারেট ধরাই  
ও উঠে এসে সোফা থেকে, বিছানায়। জুতোটা খুলে কব্জীটা পায়  
জড়িয়ে দিয়ে বললে—ব্যাখ্যা কর।

কি?

তোমার প্রেমের সাধনা।

আমার মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্পটা অন্ধ। তাইই লাল সেফট  
উবছে পড়ছে রঙিন আলো। ওর ধবধবে মুখে আলতো লাগে  
মধুর আবেশ। দিনের আলোর ওপর সৌন্দর্য পরিমিত। আমার  
সাময়িক বাস্তবের অপরিমিত নির্জনতার আর নির্বিড় নীরবতা  
ওর আকর্ষণ অপরিমেয়। লাল আলোটা যে লালসার কটাক্ষ করছে  
না তাও নয়।

কৈ, বললে না?

কি চাও? আলোচনা না তর্ক?

আমার সন্দেহ হল ওরত তর্কে আমার হারিয়ে দিয়ে বিশ্বাসের  
বাঁধ ভাঙবার চেষ্টায় আছে। বললে—কানটা নয়। শুধু মনতে।

কেন?

বুদ্ধান্তর পৃথিবীতে তুমি অবিখ্যাত। তাই।

কেন?

তা হলে তো অনেক কথাই বলতে হয়।

বল।

হাসতে হাসতে কথ বলে—তুমি ভীতু তাই প্রসঙ্গটা পাশ্টাতে  
চাইছ।

ঠিক তা নয়।

হেসে বলি—তোমার কথা আগে শুনেছি 'কারণ' তোমার  
দিকটা জানলে আমার দিকটা জানানো সহজ হবে

আবার একটা সিগারেট ধরালো কথ ওর পুরোনো সিগারেটের  
মুখ থেকে।

আমার কথা বাদ দাও। আমার কিছু নেই।

অর্থাৎ?

যুদ্ধে আমারও সব হারিয়েছি। শুধু আমি নয়, আমরা। জাত

হুমাদের ঘর বাঁধবার বাসনা নেই কারণ ভাঙনকে 'আমরা' ভয় পাই।  
কি? বৈত থাক। ঐটুকুই আমাদের একমাত্র আনন্দ।  
আজকের মেঘের আঁচে আমিরবোধ। পুরুষদের আঁচে  
কুণ্ডলবোধ। এই নিয়ে আমাদের দম্ব। আমি জানি আমার কি  
আছে। পুরুষ ভানে সেটা পেতে হ'লে কি দিতে হ'ব।

কি?

কিছু ভিনার, কিছু ডনার। এক-আধ দিন নাইটক্লাব, আর...  
আব??

প্রথমটা শুধু করে থাকে। বয়স আমার প্রায় ছড়িয়ে পড়ে  
হুজুড়ার মতন।

আবার বলি—আব???

মাতৃ প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বতি।

মাতৃ মামো না?

কল্প করি নারীদের ওটা একটা অঙ্গ—প্রধান অঙ্গ।

ছিল। শুয়ে ওর নিবিড় নৈরাজ।

কোন একদিন। আজ আর নেই। হিটলার, চার্চিল, ক্রুশ্চেভ  
আর আমেরিকান সৈন্য সে বিশ্বাস আমাদের ভেতর-দুইয়ে দিচ্ছে।  
বাজ আমাদের ছেলে কাল যে সাইবেরিয়া থাকবে না কিবা স্ট্রের  
সংগতি হবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? আমাদের বুকের ওপর  
ফাল্গুন বৃন্দা, আমেরিকা আমাদের চালিয়ার রাশিয়া।

থেকে প্রস্থ করে যুদ্ধ কাকে বলে জান?

নিজের উত্তর দেয় স্পষ্ট নাহে; যুদ্ধ আমার মনে নেই তবে হুজুড়ার  
মতই মনে আছে নামকরা অধাপকের মধ্যে হয়েও আমাকে  
আমেরিকান সৈনিকদের ক্যান্টিনের সামনে ঝাঁড়িয়ে কটি চাইতে  
হয়েছিল দিনের পর দিন। পেরেও ছিলাম। শুধু আমি নয়। আমরা  
অনেকে। আট থেকে আশী পর্যন্ত সবাই।

থেকে যায়। ওর গলগাটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে ওঠে। চোখ হুটো  
ভিজে ভিজে।

কি দিয়ে শুনবে? বল।

দেহ। তখন আমার বয়স এগারো।

অথবা নীরবতা। মাঝে মাঝে নীচে থেকে ভেসে-আগে মার্কিনী  
গানের সুর। নিগো বাণ। গোটেলটাও মার্কিনী ডপারের চাকচিকা  
দিয়ে মোড়। সামনের সরানো পর্দার মধ্যে দিয়ে নানান রঙের রামধমু।  
নিওন বিজ্ঞাপন। কোনোটা নেড়ে কোনোটা ঝলে, কোনোটা স্থির  
হয়ে নিজেই প্রচার করে। তার মাঝখানে সবচেয়ে বড় যেটা সেটাই  
সবচেয়ে মিথ্যা মনে হয়। 'ফ্রীডম ফ্রন্ট'।

আমাদের জেই ফুড প্যাকেট আসত ওদের দেশ থেকে।  
ওদেরই মা বোন স্ত্রী পার্শ্বতো আমাদের দুর্দশার কথা ভেবে। ওরাই  
সেগুলো বিলি করত ঐ দামে।

থেকে থেকে বহু—প্রথম দু-তিন দিন ফিরে এসেছি যুগায়া  
তারপর দু-তিন দিন গেছি ক্রিমের জালার। তারপর বখন চারদিকে  
তারি দিয়ে দেখছি মানের মূল্য নেই, নীতির বাসাই নেই, নারীদের  
সম্মান নেই, আজ কেবল ক্ষুধা তড়িৎ আর বেঁচে থাকার তাগিদ,  
তখন গেছি আমিওকে জলাঞ্জলি দিয়ে। তবু আমি নয় আমরা

আব বাকি?

তার মরছে। কেউ অন্যায়, কেউ অসহ্যতা করে।

থেকে বলে—তখন মরি নি। আজ মরিছি। দিনে দিনে।  
প্রহর-প্রহর। প্রতিদিন মরতে হবে মাফারগানের ব্যক্তিগত।

আজ তো আমাদের অভাব নেই।

অভাব নেই। নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমেরিকা আমাদের  
রাশিয়ার হাত থেকে বাঁচাবে। আমরা বাঁচব। সে বাঁচবে মূল্য  
দিতে হবে না? শুধু আমেরিকা কেন। সবাই মূল্য চায়। বাবা  
আসে। তোমার দেশের লোকও! তাই তো তোমার মনে হয়  
অবিশ্বাস। ...এবার তুমি তোমার প্রেম-সখিনার ব্যাখ্যা।

সেটাও তোমার মনে হবে অবিশ্বাস।

তবু তুমি ...মাগে বল, তোমার স্ত্রী আছেন?

মেয়েও।

ছবি নেই?

আছে।

দেখি।

দেখলাম। ওর হাসির মানেটা বুঝলাম না।

হাসলে যে?

না, এমন। ঐা এবার বল। আবার বাবা দিয়ে বল তুমি  
আরেকটি মেয়ের কথা বলেছিলে।

ঐা।

তার ছবি আছে?

না।

সঙ্গে রাখো না তুমি?

না।

কেন?

সে আমার জীবনের বাইরে। অস্তরের বলতে পারো, প্রচারের  
নয়।

বুঝলাম।

কি বুঝলে?

তোমার ভাবনে কিছু জট পাঁকিয়েছে। বাক গে। সাধনা কার  
জন্মে জানতে চাইবে না কিন্তু তখনতে চাই নিজেই বকিত কেন কর?

নিজেকে মানুষ তখনই বকিত করে যখন সে তার প্রাণা কাল না  
নেয়।

তোমরা আমার প্রাপ্যের অংশ নও।

ক্ষমর তো দিয়েছে, বুঝলাম। সেই তো তোমার।

দেহের মধ্যেই ছায়ে বস। বলতে পারো সেইটা ভালোবাসারও  
ভাষা।

তার বাইরে?

দেহ অপবিত্র হয়। ভালোবাসা ব্যর্থ হয়। আসলে কি জানো।

আমার অন্ধবিশ্বাস, যাকে ভালোবাসি আমার সন্তার ওপর একমাত্র  
শুধু তারই নিঃশেষ অধিকার। ভালোবাসার বিলুপ্ত হয়, তবেই আমি  
সার্থক। এটাই আমার প্রেমের সাধনা।

খানিকক্ষণ চপ ক'রে থাকে কথ। সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখাকার

নীচের ব্যাণ্ড খামি খামি করেও খামছে না। মাঝে মাঝে ট্যান্ডি ছোটর শব্দ। থেকে থেকে মত্ত গাছের উন্নত চিৎকার। বাইরে আলোর আর ঔজ্জ্বল্য নেই। জলছে এইটুকুই বাক্য। যায়।

তুমি কি মনে কর অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রেমের সাধনা সম্ভব?

প্রশ্নটা ঠিক বুলি না। কথ বলে আমার নিজের কথা বলছি।

এবার বুঝতে পারি ওর প্রশ্নের ধারা। বলি সাধনা মনেব। দেহ সাহায্য করে। সার দেয়।

অর্থাৎ?

মনের মলিনতা যদি মুছে দিতে পারো, দেহ আপনাই পবিত্র হয়ে উঠবে। আলো আললে অন্ধকার যেমন যায়। দৈহিক আনন্দের শেষে থাকে নিখিলতা। মন ভরে পাওয়ার মধ্যে আছে পরিপূর্ণতা, পরিনির্বিণ্য আনন্দ, পরমতম সৌন্দর্যবোধ। বৈদ্যনিন্দা জীবনে সেটাই হল 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।' দি টু, দি মিল্পল, দি বিউটিফুল।

কথ অবাক হয়ে শোনে। বাইরের আলো আর মনের আলোড়নে ওকে আরও সুন্দর দেখায়। একদম আলোদা মায়ায়। বিধ্বস্ত জাফানীর জরাজীর্ণ নারী নয়, বাঁচার তাগিদে দেহ বিকাব্যে কথ নয়, দোভাষী কথ নয়। এ নতুন স্বর্ষের প্রথম আলোর উদ্ভাসিত কথ, পূর্ণাক্ষরের পবিত্রতায় পরিপূর্ণ কথ। এ সেই মেয়ে যে মরে নি, হিটলার যাকে মারতে পারে নি, ক্রুশ্চভের ভয় থাকে জয় করতে পারে নি। আমি বলে যাই—কথ, আজ এখন এই মুহূর্তে আমি যদি আমার দেহকে হার খেতে বিচ্ছিন্ন করে বিকিয়ে দিই তোমার কাছে, তা হলে কি হয় জানো?

কি?

দেহ আমার কবিত্বের আনন্দ পাবে, মন পাবে অপবিত্রতার বোঝা। সব বিষয়ে বেহেজ দূষিত করবে, ভালোবাসার ভবিষ্যৎ হবে কলঙ্কিত। তার চেয়ে এই ভালো। তুমি রইলে আমার জীবনে আমার সাধনার সোপানে আরও একধাপ ওঠার আনন্দ। আমি রইলাম তোমার জীবনে এতটুকু মানসিক আনন্দের স্বাক্ষর।

ওটাকে কি বলে?

## শীর্ষবিবন্ধু

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ কোন শীর্ষ থেকে যায় না দেখা স্বর্ষ  
মেঘের পাখি কাজল-শোকে ছড়ায় যদি পাখা—  
বুকের মাঝে ব্যাখ্যার প্রলীপ এখন কি যার রাখা?  
যন্ত্রণার স্ববর্ণপুর বাজার শুধু তুর্ঘ।

তা' হলে এট পরম শোকে ছ' চোখ বৃক্ষে থাকবো  
অমল-আলোর মুহূর্তের কগন ছুটে আসবে  
এব: আমার উজ্জল হয়ে কখন ভালবাসবে  
যখন আমি ছ'চোখ ভরে জলের ছবি আঁকবো।

কোনটাকে?

তোমার ছবিতে হিরোইন যা করেছিল হিরোর পায়ের কাছে?

ঐ যে, যেটাকে তুমি বললে...

প্রণাম।

পা ছুঁয়ে করে, না?

হ্যাঁ, মন যদি মানে।

ও মাথাটা মুইয়ে দিল আমার পায়ের ওপর। আমি পা-টা সরিয়ে নিলাম।

ও বললে, প্লিজ, পা সরিও না। আমার প্রণাম নাও।

উঠে ঝাঁড়ল প্রণাম সেরে। বললে, আমি যাই। সাতটা বাজে।

চুলটা আয়নার ঠিক করতে করতে বললে: আমি এসেছিলাম তোমার জয় করতে।

জানি।

হেসে বলে, একটা কথা কিন্তু জানো না।

কি?

হরজার কাছে যুরে ঝাঁড়ায়, আমার বেনরান ভার।

আমি ভাবছিলাম, সেটা বুলি তোমার শেষ হল।

না। বাড়ল।

ফেন?

তোমার দেশের মেয়ে হয়ে জন্মায় নি বলে।

ভাবছি কুমিয়ে নিলে কেমন হয়, দরজার মুখ করাখাত হল।  
বেস-বয়। কলকাতার চিঠি। হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারি ভাগ্যে  
কি লেখা আছে। খুলে পড়ি। যা ভেবেছি ঠিক তাই। বাংলাদেশ  
গিয়ে ঝাঁড়াই। ওই নীচে কথ বাজে। ইচ্ছে হল ডেকে বলি আমার  
দেশের মেয়ে হয়ে জন্মাও নি বলে দুঃখ করার কারণ নেই। তুমি বাঁচার  
তাগিদে হারিয়েছ। আমার দেশের মেয়ে হারিয়েছে নামের মোহে  
আর ঐশ্বর্যের প্রলোভনে। ভালোবাসার সাধনাকে তুমি প্রণাম করছ।  
সে অপমান করেছে। [ক্রমশঃ]

## বিগতাতর্বা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ছ'চোখে জড়িয়ে এক জরাজীর্ণ অতীতের শ্রুতি  
অন্ধকারে ঢেকে মুখ বসে আছে। বিগত-বৃষতী  
পাথর-নিশ্চল। বাইরে সমর-বৃষ্টি, ছোট লাগে শরীরে ও মনে।

জীবনে সজ্জা এলো রোদ-ভরা দুপুর পেরিয়ে—  
প্রীত্বের নদীর মত শ্রোতোহীন। ছগরে ঝাঁড়িয়ে  
আরো বাঁচার সাধ। ভারত বিহীন মন মুহূর্তের পদশব্দ শোনে।

পাথের অনেক ছিল: পথে পথে কোথায় কখন  
হারিয়ে ফুরিয়ে গেছে। এ যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ  
অসম্ভব। রাত হল। বীরানন্দা-শৌর্ধ কই? ছ'চোখে কাজল  
নৈরাজ্যের অন্ধকার। পৃথিবীর পাশ্চাত্য



তারপর—বিলাসপারায়ণ দৌহিত্র সিরাজের সার কল্পলান  
সরাবও নারী—ক্রম ক্রমে প্রেমের পেয়ে। ছুঁয়ের প্রতি—আগক্তি  
এত বেশি বেড়ে গেল যে, তার গুহাই সিরাজের নিত্য প্রয়োজন হয়  
অধিকতর মাদক-শক্তিসম্পন্ন সুরা এবং নিত্য নূতন নূতন রূপবতী  
নারী। কাজেই যেমন আদোনি করা হয় বাছা বাছা মুকুশা  
সেরা নারী দেশ-বিদেশ থেকে, তেমনি আদোনি করা হয় উৎকৃষ্ট  
মূল্যবান সুরা সিরাজ থেকে ফ্রান থেকে—সুতরাং বিলাস প্রোভে  
ভাসমান সিংহের অব্যক্ত প্রয়োজনীয় হয় একটা পৃথক নিয়াল্লা  
বিলাস ভবন—যেখান চলতে পারে তাঁর ডেপার্টমেন্টের অবার  
প্রোক বাধাহীন গতিপথে।

এ জন্মই—হয়ত সিরাজ প্রবীণ নবাব নাজিমের অমুমতিও পেয়েছিলেন সহজেই। কিন্তু শুধু এই কারণেই জন্মলাভ করে নি হীরাবিল বা মনসুরগঞ্জ প্রমোদনিকুঞ্জ। আগের একটি অন্তঃসলিলা ধারা, একটি গুঢ় রহস্যও গভীরভাবে নিহিত ছিল হীরাবিলের রূপাংগণের মূলে। আলিবর্দীর অকৃত্রিম জামাতা নোওরাজেস মহম্মদ খাঁর (সিরাজের মেসোমশারের) মতিবিল ছিল সিরাজের চির-চক্ষুশূল। মতিবিলের চিত্তবিমোহন সৌন্দর্য ছিল যেমন দেশ-বিদেশের দর্শক মাজেরই অতিশয় মনলোভা, মতিবিল প্রাসাদও ছিল তেমনি সুন্দরমান আমলের অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় সৌধ। কিন্তু সিরাজের নিকট মতিবিলের এ-সৌন্দর্য, মতিবিলের এ খ্যাতি ছিল অত্যন্ত হিংসার বস্তু। বিলাস-বাসনাসক্ত, নোওরাজেসের মতিবিলের বোধশোপচার বিলাস সজ্জারত ছিল ততোধিক হিংসার বিষয়। এ জন্মও অনেক দিন থেকেই তিনি দুটুকর হয়েছেন যে, এমন এক অপরূপ সুন্দর—এমন এক অপূর্ব মনোহর বিল আর তার সুশীতল শ্রীম-শোভাময় তীরে এমন এক স্বর্গোত্তান, এমন এক ইন্দ্রপুত্রীতুল্য রমণীয় প্রমোদভবন নির্মাণ করবেন, যা স্বর্ণাভরণ ব্যঙ্গ করবে, উপহাস করবে মতিবিলকে। নোওরাজেসের বেশ-বিশ্রুত ‘মতিবিলের সৌন্দর্যখ্যাতিকে করবে খর্ব, বর্বর হীনপ্রভ। আর হিংসা চরিতার্থতা সার্থক করে সিরাজ তখন স্বপ্নপূরীতে বঁসে মনের স্বথে নিবৃত্ত করবেন তাঁর পূর্বপ্রমাণ ভোগস্পৃহা। এমন এক শিল্প-শোভাময় বিচিত্র প্রমোদভবন-সুন্দর করবেন, যার নাম হবে ‘হীরাবিল’। আর মতিবিলকে তখন লজ্জার গ্লান করবে ধরা-স্বর্গ হীরাবিল। যার রূপের কাছে, যার খ্যাতির কাছে বাধ্য হয়েই মাথা নত করতে হবে মতিবিলকে। উক্ত দুই কারণেই হয় হীরাবিলের জন্ম।

দেশ-বিশ্বাসী মারাঠা আক্রমণের অব্যবহিত পরেই—দারুণ অর্ধাভাব ঘনন,—যখন রাজকোষ শূন্যপ্রায়,—তখন প্রিয় দৌহিত্রের এই অসম্ভব আশ্বাদে সাড়া দিতে হিমশিম খেতে হল রেহাতুর দাড়াহুকে। দারুণ বিপর্ষয় সব দিকে,—অর্থের স্বচ্ছলতা নেই মোটেই, সৈনিকদের বেতনই দিতে পারছেন না নিয়মিতভাবে, রাজকাজ পরিচালনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে অর্ধাভাবে। চারদিক থেকে কেবল ‘দেহি দেহি’ অথচ নিজের অস্বাভা তখন ‘নেই-নেই, বর্পনক নেই।’ একগু হুঁসুড়ার মতো আতুরে দৌহিত্রের ‘চাঁদ ধরার জুলুম’ মহা লমস্যার সম্মুখীন করল আলিবর্দিকে।

অবশেষে অনগ্রোপার দাড়াহুকে ‘বাধ্য’ হয়েই মেনে নিতে হল রেহের দুলাল দৌহিত্রের আর্জি। ভেবে দেখেও কোথাও কোনো অসঙ্গতিও ত’ দেখতে পেলেন না সিরাজের আর্জিতে। সত্যই ত’ কেনা নিজামতের স্বল্পপরিসরে,—একই প্রাসাদের স্বল্প আরতনে কি তরুণ দৌহিত্র—যিনি বর্তমানে শাহজাদা পদবাচ্য এবং দাড়াহুর অবর্তমানে যিনি সবে বাংলার গৌরবময় মনুদের উত্তরাধিকারী—এবং মুতাপখাত্রী বৃদ্ধ দাড়াহুর সঙ্গে একত্রে বাস করতে গেলে কখনো মানায় না সব দিক দিয়ে খাপ খায়? সত্ত্ব-প্রস্তুত অগুণ্ড পুষ্প কি বাসি শুদ্ধ পুষ্পের সঙ্গে একপাত্র শোভা পায়? বারে পড়া শুকনো ফুল আলিবর্দীর সাথে এক সেকলে প্রাসাদে বাস

স্বপ্নের পাশে। তাই তিনি বাধ্য হয়েই, তথা সঙ্গত মনে করেও ঘটে, অজস্র অর্থ মুক্তহস্তে উজাড় করে দিতে সম্মত হ’লেন পথম স্নেহভাজন সিরাজের নিজস্ব প্রমোদ-ভবন নির্মাণের জন্ত।

অপ্রাচীন গোড়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে খুঁজে—তার ভর, অর্ধভগ্ন বা ভাণ্ড ভূপতিত প্রাসাদ অট্টালিকাসমূহের প্রাচীর, ছাদ, দরজা থেকে—এমন কি মেরে পর্বন্ত খুঁড়ে খুঁড়ে সংগৃহীত করা হল কত রাশি রাশি সৌধ-উপকরণ—কত খটক, কত স্বচ্ছ মর্মর, কত শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্তনীল, সবুজ রঙের মস্তন মূল্যায়ন প্রস্তুত,—কত দুশ্রাব্য মনোহর গৃহোপকরণাদি, যার কোন লেখাজোখাই করা হয় নি। সবে বাংলার নবাবের আদেশে ডাক পড়ল বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সৌধ-শিল্পীদেরই নয় শুধু, বিপুল অর্থব্যয়ের অক্লান্ত প্রদেশ থেকেও আনীত হল সেকালের নিপুণ কারিগরগণও। অক্লান্ত শ্রম তথা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে বিচক্ষণ শিল্পীগণ একদিন গড়ে তুললেন এমন এক মনোরম বিল এবং তার মনোহর তীরে তীরে এমন এক অপরূপ প্রমোদ-উত্তানধরা চিত্তবিমোহন বিলাসভবন,—বা মুগ্ধ-বিম্বিত করল জনসাধারণকে।

দেখতে দেখতে মনসুরগঞ্জ সুশোভিত হ’য়ে উঠল এক অভিনব স্বপ্নযেবা মারাণুহীতে। মনোহর উপবনশোভিত প্রমোদভবন-সহ স্বচ্ছ বিলের নামকরণ হল হীরাবিল। ‘স্টিক-স্বচ্ছ হীরাবিলের অনির্বচনীয় রমণীয় শোভা সত্যই সেদিন হীনপ্রভ করল অতুলনীয় সৌন্দর্যময় মতিবিলকে। সেদিন থেকে চিরতরেই যেন খর্ব হল মোওরাজিস খাঁর সাধের মতিবিলের খ্যাতি। সত্যই ত’ স্বচ্ছ হীরাব সমুজ্জ্বল বলকের কাছে স্বভাবতই হার মানতে হয় ক্ষণজ্যোতি মতিকে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ হীরাবিলের জন্ম সত্যই এক বিস্ময়ের বিষয়। ঠিক যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রতীপের বাহুবলে অকস্মাৎ এক অলৌকিক রহস্য-পূরীর আবির্ভাব। সত্যই হীরাবিল এক ঐতিহাসিক গুরুত্ববহনকারী স্মরণীয় স্মৃতি। এ অবিদ্যময় স্মৃতি স্মরণীয় হ’য়ে আছে জনসাধারণের হৃদয়ে। লোকের মুখে মুখে চলে আসছে হীরাবিলের কথা, হীরাবিলের কাহিনী আজো। দেশ-বিদেশ থেকে আহৃত সুন্দর সুন্দর পুষ্প-তারি দিয়ে বিচিত্র মনোহর করে সাজানো এ হীরাবিল। কত মনোহর লতাবিতান, কত অসুগু পুষ্প-বীথিকা, কত মনোহর নিকুঞ্জ, কত সুসজ্জিত সুসুন্নত মঞ্চ দিয়ে বিচিত্র সুন্দর করে সাজানো এ হীরাবিল। কত অগণন রমণীয় কোয়ারা ইতস্তত পরিবেশিত যথাবধ স্থানে। কত বিচিত্রগঠন শ্বেত-কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত বিবিধ দর্শনীয় ভৌবজ্ঞান, জীবন্তবৎ প্রতীয়মান সুন্দর সুন্দর মূর্তি ইতস্তত সুসমঞ্জস করে সাজানো।

বিচিত্র মনোহর উত্তানময় বিচিত্র পদ্ম-পক্ষীর মনোমুগ্ধকর গুঞ্জনই বা কত। মনোহর কুসুমকল্যাণ-শোভিত নানা জাতি কুসুম-বৃহৎ মৎস্তকুলের সানন্দবিহরণ মুখরিত চিত্তাকর্ষক ত্রুণতীরে অনির্বচনীয় শোভাময় লোকবিমোহন অপরূপ প্রাসাদ। কত চত্বর, কত মহল তার দিকে দিকে। রঙমহল, ‘গোলকর্ষাধা’, দরবার-মহল ছাড়াও আরো কত মহল রকম রকম। মহলে মহলে কত সুসজ্জিত গৃহ। গৃহে গৃহে কত কক্ষ। কক্ষে কক্ষে কত শোভা, কত সৌন্দর্য, কত সাজ, কত সজ্জা। হর্ষামধ্যে কত বিচিত্রিত থিলান। কত রতনর জজ।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল করে তুলুন  
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস  
মিষ্টি ব্যবহারেই  
হা সম্ভব।



সতর্কীকরণ :-

কিনিবার সময়  
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্তি  
পিলফার প্রফ ক্যাপের  
উপর R.C.M. মনোগ্রাম  
ও প্রস্তুতকারক  
এম, এল, বসু এণ্ড কোং  
দেখিয়া লইবেন।

**লক্ষ্মীবিলাস তৈল**

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ  
লক্ষ্মীবিলাস হাউস - কলিকাতা - ৯

হুত,—কত লতা-পাতার বিচিত্র চিত্রাঙ্কন। কন্দের ছাদে ছাদে কত শিল্পকলাসম্ভার। কক্ষতলে কত কাশ্মীরী, কত পারস্য দেশীয় মনোহর গালিচা, কত কাক্ষ্যর্ধচিত্র মহাৎ গৃহসজ্জা, কত রত্ন-বেরঙের দেওয়ালগিরি, কত মহামূল্য আয়না, কত বিচিত্র বেলায়ারি ঝাড়—শতদল-সহস্রদল। মণিময়রক্কে বিচিত্র আলোর কি অপরূপ লুকোচুরি,—শ্বেত, লোহিত, সবুজ, নীলাদি বিবিধ আলোতে আলোময়, যেন অপরূপ স্বপ্নময় মারাপুরী। রক্তে, আলোতে, চিত্রে, ছবিতে বিচিত্র সমাবেশ, বিচিত্র-সমাবেশ।

হীরাবিল নির্বাণের শেষ পর্যায়,—বখন আর্থের অভাব-অনটন হেতু-নির্বাণার্থ ব্যাহত, তখন এক কক্ষি আটলেন চতুর সিরাজ প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করবার উদ্দেশে। বৃদ্ধ দাত্তকে কানে ফেলে উপযুক্ত অর্থ আদায় করা ছাড়া আর উপায় নেই সিরাজের। তাই একদিন বর্ণা দিলেন দাত্তর ঘারে—হীরাবিলে পদখুলি দিয়ে মেহনত দৌহিত্ত্যে কৃতকৃতার্ধ করবার আকুল প্রার্থনা নিয়ে।

মেহনত দাত্ত কি উপকার করতে পারেন প্রাণাধিকার আমন্ত্রণ। তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন এনিমন্ত্রণ। এক শুভদিনে দৌলতখানার পদখুলি পড়ল গরিবখানার। সপারিষদ দাত্তকে পেয়ে মহাখুশি হলেন চতুর সিরাজ। হাতে স্বর্ণ পেয়ে গেছেন অপ্রত্যাশিতরূপে এইরূপ ভাগ দেখালেন প্রতি কাজে, প্রতি কথায়। আমির-ওমরাহগণসহ গোটা হীরাবিলই দেখলেন তিনি ঘুরে ঘুরে। বিশেষ চমৎকৃত হলেন সব দেখে। বাঃ! কি অপরূপ; কি অদ্ভুত, কি অবর্ণনীয় সৌন্দর্যময় সব কিছুই,—যেমন চমৎকার বিল, তেমনি বিচিত্র উদ্যান,—তেমনি রমণীয় প্রমোদভবন।

এক বিরাট ভোজের আয়োজনও বধাহীতি অঙ্কিত হয়েছিল মহামাভ দাত্তর বোগ্য আপ্যায়নের জন্য গোলকর্ধার এক সুরম্যকক্ষে। হীরাবিলের অশেষ প্রশংসা করলেন সৌন্দর্যপ্রিয় আলিবর্দি,—ভূ-র-ভূয়ো! বাহবা দিলেন হীরাবিল পরিব্রজনায়। সর্বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে অবশেষে বিদায় চাইলেন তিনি। কৃত-কৃতার্ধের মত ভাব দেখালেন যদিও শ্বেভাজন সিরাজ—তবুও এক কৌশল অবলম্বন করে দূর্ততার সঙ্গে গোলকর্ধার কার্ঘ্য আটক ক'রেনে শুবে বাংলার নবাব নাভিমকে। মুক্তির জন্য ছুটকট করতে লাগলেন প্রবীণ নবাব। কত কাক্ষুতি-মিনতি করলেন স্বেচছুর সিরাজকে, কন্দের অভ্যন্তর থেকে। কক্ষপার্শ্ব আলিখে ঝড়িয়ে বাতায়নে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হৃৎপিণ্ডে হাততালি গিটে থাকলেন পরম কুতূহলে সঠাগর। দুই নাতির কারসাজিটা মশ উপভোগ্য হল না যদিও, তবুও বেশ বিস্তৃত হয়ে পড়তে হল তাঁকে শেষকাল। কত সাকাতর অমুন-ব-বিনয় ক'রে চললেন অসহায় মাতামহ ভিতর থেকে, আর আনন্দের আভিলিখে সমধিক উৎফুল্ল হ'লেন শ্বেয়ালি দৌহিত্ত্য বাইরে থেকে জালবদ নিকারের দুর্ভাগ্য দেখে।

দাত্ত-নাতির রহস্যের পালা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। বিনা পশে বিব্রত দাত্তকে মুক্তি দিতে বাঁকী হলেন না সিরাজ। একটা মোটা বকমের মুক্তিপণ হেঁকে বসলেন 'শিকারী' সিরাজ। সেই মুহূর্তে,—সেই গোলকর্ধার বসে কোথায় পাবেন একসমস্ত মুক্তিপণের, বিপুল অর্থ,—কোথায় পাবেন তখনই তা 'বিন্দর'

ছুট-ছুটি করতে লাগলেন কোটি কোটি প্রজ্ঞার দণ্ডমুণ্ডের বর্তা হয়েও নবাব আবির্ভাব। বন্ধ হ'তে বন্ধান্তরে গমনই হল সার,—কোন পথেই নির্ধারণ করতে পারলেন না রহস্যময় গোলকর্ধা থেকে। ঘুরে-ফিরে এতই অভ্যর্থনা-কক্ষেই আসতে হচ্ছিল বার বার।

অবশেষে পারিষদবর্গ উদ্ধার করলেন তাঁকে মুক্তিপণ হিসাবে স্ব স্ব অঙ্গ থেকে হীর-মুক্তোর বহুমূল্য অঙ্গসম্ভার,—রত্নময় আভরণাদি স্বেচ্ছায় খুলে দিয়ে। কথিত হয়ে থাকে এ সাক্ষের মূল্য থেকেই অভাবগ্রস্ত সিরাজের তৎক্ষণাত্ হস্তগত হয় কনুন পাঁচ লক্ষ টাকা। একাডাও আর দু'টো অধিকার দিয়েও সিরাজকে খুশি করতে ব্যর্থ তন অসহায় নবাব। তার একটি হল 'মনসুরগঞ্জ' দান (মনসুরগঞ্জ অর্থাৎ বিজয়ী শস্যাগার) অপরটি হল শুবে বাংলার ক্ষমিদারগণের নিকট থেকে একটি আব'গোদাব' (অতিরিক্ত বর) আদায়ের অধিকার মঞ্জুর।

এমনি রহস্যময় চাল দিয়ে অর্থ ভাব দূব করলেন চতুর সিরাজ। তখন থেকে অবাধ বিলাস-ব্যসনের উত্তাল তরঙ্গ—বল্লনাভীত সুরা ও নারী উপভোগের আকাশচৌর্য তৃফান উঠল দিনরাত হীরাবিলের বুকে। আমদানী হ'ত থাকল নিত্য নূতন-নূতন নারী, নিত্য নূতন-নূতন পানীয়। নিত্য আসতে লাগল লক্ষী দিল্লীর বাছা বাছা নর্তকী। দেশ-বিদেশের অপরূপা 'ছরী-পরা'। বিলাসের উদ্দ্যম শ্রোতে মনের আনন্দে ভাসতে লাগলেন সখমহীন তরুণ সিরাজ। নিত্য নূতন নূতন সেরা সুলক্ষী আউরৎ আমদানী হ'তে থাকল ইরাণ, তুরাণ, ইম্পাহান, আরমানী, কাস্মীর থেকে।

বহুমূল্য বিভিন্ন সরাবের টেট খেলতে লাগল হীরাবিল মঞ্জিলে। তবুও মেটে নি সিরাজের নারী-উপভোগ ক্ষুধা। সারা বাংলার ক্রাসের বন্ধা বইয়ে দিচ্ছিল নারীলোলুপ যুবকের উদ্দ্যম লালসা। একটা চাকিত লক্ষা, একটা অনাগত আতঙ্কের দারুণ দুশ্চিন্তা, নিঃসাহীন রজনী বাপন ক'রতে হ'ত সে গৃহীকে, যে গৃহে আছে দুর্ভাগ্য সুলক্ষী নারী। কত নিরীহ কুলসম্প্রদী, কত সরলা অবলা কুলবালা, কত সতী-সাম্প্রদীকে আসতে হয়েছিল হীরাবিলের রত্নমহালে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। কাউকে বা জানা হ'ত প্রলোভনে লুপ্ত ক'রে, কাউকে বা জোর জবরদস্তি ক'রে, কাউকে বা অপহরণ করে। ভোগের সীমাহীন সাগর মনের সাথে লীলা করতে লাগল যুবক ইয়ার যুগের নিয়ে। কত নিপাণ নারাক ভোগ ক'রতে হ'ল অবধ্য বন্ধুদের নিয়ে। কত ভোগের হাটে,—জঘন্য পথ্যরূপে আশ্রয়-বিক্রীত হ'তে নিলিচন গুণ্য ভোগের হাটে,—জঘন্য পথ্যরূপে আশ্রয়-বিক্রীত হ'তে অশ্রু-কুহিতহু। কত সতী-সাম্প্রদী ক'রমূল্য নারীদের হ'ল অবর্ণীয় লাঞ্ছনা। নিরীহ-ফকীর জার কত অসহায় নারীর গগনভেদী কক্ষণ আত্ননাদ ভূমিবম্প সৃষ্টি করল রত্নমহালের রুদ্ধ কক্ষতলে, কত ভাগ্যাহতার প্রবল বক্রা বান শিখিল ক'রে দিল হীরাবিলের ভিত্তিকে। অবমানিতা, নিষাধিতা, লাঞ্ছিতার পূর্বপ্রমাণ অভিলাপের গুরুভার পড়ল সাধের হীরাবিল মঞ্জিলের মস্তকে চেপে। সহ ক'রতে পারল না সে গুরুবম্পানের ভয়াবহ বাকি, সহ ক'রতে পারল না সে দুর্বীর বান, সহ ক'রতে পারল না দুর্বহনীর ভার। স্বল্পকাল মধ্যেই অসুখবু হ'ল ইন্দ্রপুত্রীতুল্য—রমণীয় হীরাবিলের।

শুধু বিশ্বরকর উপরন মঞ্জিলই নয় হীরাবিল। হীরাবিলের জগত বিলাস-ঐতিহাসিক গুরুত্ব ত'ল অর্থ-মতাবলী-জগতসদ

## হীরাখিল

জড়িয়ে আছে নবাবকুল সিরাজউদ্দৌলার উপান-পতনের বিষয়ক কাহিনী। হীরাখিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গুপ্তপ্রোতভাবে অভিশপ্ত বালায় প্রাণের কথা। হীরাখিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত হাসি, কত উৎসব, কত অশ্রু, কত মর্মব্যথা। হীরাখিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কলঙ্কিত বালায় দুদিনের ঘনঘটা। হীরাখিলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিদেশী-বণিক দলের অবিখ্যাত ভাগ্যোদয়-কাহিনী। হীরাখিল হল সেকালের বালায় এক প্রামাণ্য ইতিহাস।

জটিল রাজকাণ্ড ভারাবহত সর্বনাশা মারঠা সমগ্ররাজ্য বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি বেদিন মুতুসুখায় শায়িত,—সেদিন আমির, ওমরাহ, পাত্র, মিত্র—পশামাশা নাগরিকগণের সমুখে পরম স্নেহভাজন পুরাতন প্রিয় সিরাজকেই তদীর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত পদে মনোনীত করে গৌরবময় শ্রবণ-বালায় মহান মসনদে বসানোর জন্য উপস্থিত সকলকে প্রতিক্রিয়াবদ্ধ করে যান এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পার্শ্ববর্তী পবিত্র শরণ গ্রহণান্তর বেদিন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে শেখ নিখাস ত্যাগ করেন, সেদিন আশার আনন্দে উৎফুল্ল সিরাজ কত রতিন খপ্পের জাল বুনেছিলেন এই হীরাখিলে এসে। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই ছুটে বাত তাঁর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে যায় তাঁর বীণার তার। সহসা একদিন নিভিয়ে দেয় উৎসবের প্রাণীপালোক কোথা থেকে এক প্রবল দমকা হাওয়া এসে।

আলিবর্দির অভ্যুত্থান সম্পন্ন করেই নিজামত কেল্লা পুরাতন প্রাণদ থেকে হীরাখিলে চলে এলেন সিরাজ। এই প্রাসাদেই মহা ধুমধামে অনুষ্ঠিত হলো সিরাজের সিংহাসনারোহণ-উৎসব। সে এক দেখবার মত আরোহণ, আনন্দের তুফান উঠেছিল হীরাখিলের বুকে সেদিন। সারা বাংলা বাহবা না দিয়ে পারে নি সিরাজকে। সজ্জার বাহার, আলোকের সমারোহ, বাঁশীর মোহন সুর আর নাচগান, খানাপিনা সন্ধ্যায় ছড়াছড়ি। উৎসবের মত একটা উৎসব বটে। সাকুল নিজামত দরবারই সেদিন পার বেরেছিলেন তিনি—কল্লা নিজামত থেকে হীরাখিলের প্রবেশ ভবনে। সেদিন এখানেই কত রতিন আশার অপরাধ জাল বুনেছিলেন শ্রবণ-বালায় মহিমামিত মসনদে বসে। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর কাল ভাগ্য। সহসা একদিন ছিঁড়ে গেল তাঁর সাধের জাল।

চুট-শনিগ্রহরূপে এই সময়ে অব্যাহত ইংরাজ বণিক উদ্ভিত হলো সিরাজের ভাগ্যাকাশে। উৎসব শেষ হতে না-হতেই তাই সিরাজকে পরতে হল সাময়িক বশ, উৎসবের সাজসজ্জা ছেড়ে। হীরাখিল থেকেই সর্বনাশা পলাশী প্রান্তরে বিঘট শৈল্পবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি দুঃসাহসী বণিকদলের অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য দমনকল্পে। সেদিন বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে মোটেই শুভযাত্রা হল না—সে যুদ্ধযাত্রা। কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কার সেদিন কঁপ উঠেছিল নবীন শ্রবণদোরের উৎফুল্ল স্বর। সেই যাত্রাই হল তাঁর কাল। সেইদিনই এক অন্তঃ দৈববাণী যেন গুনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরলোকে, সেইদিনই অলক্ষ্যে কে যেন এক অমঙ্গলমুহুর্ত ভবিষ্যদ্বাণী, আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা স্পষ্টরূপে ধ্বনিত করেছিল তাঁর কর্ণমূলে। স্পষ্টই যেন সেদিন গুনতে পেরেছিলেন—নেই—নেই—কোন আশা নেই সিরাজ। সর্বনাশ এসে থাকে দিচ্ছে

তোমার সাধের নিরুজ্জ্বল। অবশ-জড়িত পদেই সেদিন তিনি অন্তঃপ্রবৃত্তি করেছিলেন রান্নাশী পলাশী অভ্যুত্থান—দিগ-দিগন্ত থেকে ধ্বনিত দৈববাণী গুনতে গুনতে মারঠা পথ,—

‘কোন আশা নেই তোমার হৃদয়গা নবাব! পতন তোমার অনিবার্য। তোমার জীবির পতন অনিশ্চিত। তোমার হৃদয়ময় সর্বনাশ অবশ্যজ্ঞাবী!’

পলাশ হাজার অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী অগণিত ভীষণ ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র, অপরিমিত বারুদ-সহ বৃহদাকার ৫০-৬০টি সশস্ত্র যমুখ্য —কামান নিয়ে শিবিরস্থাপন করলেন রাল পলাশী প্রান্তরে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল যথাসময়ে। যুদ্ধ নয়ত,—একটা যেন ছেলেখেলা বা যাত্রার দলের যুদ্ধের অভিনয়মাত্র হল বলা চলে। জয়ের সজ্জাবনা নিশ্চিত সত্ত্বেও পরাজয়ের ঘৃণা গ্লানি নিয়ে ব্যথা-ভর্য হৃদয়ে ত্যাগ করতে হল তাঁকে যুদ্ধ-বিধি—ত্যাগ দাগাবাজ-শিপাহী-শালারের সুপরিচালিত কারসাজিতে দ্রুতগামী উদ্ভূত আরোহণ করে অবশেষে প্রত্যাগমন করলেন সাধের হীরাখিলেই।

ভয়ঙ্কর-সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে আবহান করলেন মন্ত্রপরিহত। কোন সুরাহাই হল না অবিশেষণ, সত্ত্বেও ত’ দূরের কথা, কোন আশাজনক আশা বা ভরসার বাণীও বেগল না হস্তাধর মুখ থেকে। কাঠের পুতুলের জায় নীরব নিশ্চল হয়ে রইলেন সবার। সভাবল ত্যাগ করলেন তিনি স্বপ্ন-ভাঙা নিঃশাখতের ছায় টলতে টলতে। সর্বনাশ যে ঘনিয়ে এসেছে ভাব্যপাই—বুঝলেন তা স্পষ্ট করাই। চারদিক থেকে ককণর্দন এসে বাজতে লাগল যুদ্ধের আনমনা কর্ণমূলে—

‘পালাও সিরাজ! পালাও মুর্শিদাবাদ ছেড়ে। কেউ চায় না তোমায়।’

জড়িতপদে তৎক্ষণাত্ প্রবেশ করলেন গড়হালা। প্রিয়সঙ্গিনী স্ত্র-ভ্রাতৃগণ তৎক্ষণাত্ গুহ্যচোরাগার হাত ধরে ছদ্মবেশ ধারণ করে ছিন্ন মলিন বস্ত্র—সামান্য কিছু মাণ-রত্ন সঙ্গে নিয়ে এক বিপুল খোজায়ে সাথে নিয়ে টোপল-ঘেরা গরুর গাড়িতে চড়ে রত্নীয় অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয় হীরাখিল থেকে। চিরবিদায় নিলেন সাধের হীরাখিলের কাছে, চোখের ভুলে ভাসতে-ভাসতে। চিরবিদায় নিলেন প্রাণপ্রিয় মুর্শিদাবাদের কাছে উজ্জ্বল হৃদয়বেগে অভিভূত হয়ে। প্রাণ-ফেটে চৌচির হতে লাগল প্রিয় মনুস্বরণ থেকে চোখের তার পালান্বে। উপায় নেই, তাই বাধ্য হয়েই বাপিয়ে পড়লেন অন্ধকার সমাজের ভবিষ্যতের গভীর গহবরে।

বিকৃত স্বর হতভাগ্য ভুললেন না চিরবিদায় নিতে মাতৃসমা স্নেহময়ী ভাগীরথীর কাছে, বীর শ্রেয়োচ্ছল শাস্ত্র স্মৃতিভল বন্ধ চঞ্চল বালকের জায় কত চুচুচুটি করেছেন মনের আনন্দে জয়ের দিন থেকে। তাঁর উদ্ভ্রান্ত অজ্ঞান-কণা ঢেলে চিরবিদায় নিলেন এই বধে—

‘রইল মা তোমার ধনজনপূর্ণ মুর্শিদাবাদ, রইল মা তোমার পীযুষপূর্ণ সোনার বাংলা। পারল না তা রক্ষা করতে তোমার অযোগ্য অধম সন্তান। তুমি রক্ষা করো মা তাকে—রক্ষা কর মা তাকে তোমার স্নেহীভল চঞ্চলতলে।’

অবরুদ্ধ হৃদয়ভেদী-মর্ম ব্যথার ভেগে পড়লেন তিনি এই ভেবে যে, সিরাজ যদি বিরগভাভন হয়ে থাকে দেশবাসীর—যদি মৃত্যুশূন্য শাসক

না হয় সে—তবে কেন উপযুক্ত বিচার করল না দেশবাসীরা মিলে—  
কেন তারা? যোগ্য দণ্ডবিধান করল না তার? কেন এমন করে  
বিনামূল্যে বিলিয়ে দিল একটি মহাসমৃদ্ধসোনার রাজ্যকে বিদেশী  
সওগারের পদতলে? হায়! বুক যে ফেটে যায় অসহ্য মর্মপিড়ায়!

যুগ-পরিবর্তন হারী পলাশীর যুদ্ধাভিনয় হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের  
২৩শে জুন। পট-পরিবর্তিত হয় কালনিশা পোহাতে না পোহাতেই।  
কি মর্যাদাস্ত ক্রানি। কি শোচনীয় দুর্নাম, কি দুর্ভাগ্য কলঙ্কের ডালি  
বেঙ্কায় তুলে নিজেছিল বাঙালী জাতি সেদিনে। কি করেছিলেন  
তখন মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র, কি করেছিলেন ধনকুবের জগৎ শেঠ,  
কি করেছিলেন রাজা রাজবল্লভ, কি করেছিলেন প্রবীণ জানকী রায়,  
কি করেছিলেন বিচক্ষণ রাধাকৃষ্ণ? মস্তক বিকৃত ঘটেছিল কি  
সবাই? সারা বাঙালি কি যাবতল মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল সেদিন? কি  
শক্তিবলে জিতেছিলেন একদা এক সামান্ত কেরানী বরাত? ক্রাইভ  
ছলানম্বরী পলাশী বন্যজনে? শক্তি ছিল না বাঙালার, জনকতক  
নিভাঙ্ক গোঁয়ার বিদেশী বণিককে শায়েস্তা করার মত? নিজ  
নিজ স্বার্থের বন্দিভূত হয়েই, জব্বর যড়বয়ে সবাই মিলিত হয়েই ত'  
ঐ সকল হোমর-ডামরাই করেছিলেন এক-কাজ! সবাইকেই  
তাই বইতে হল এ কসঙ্কের ভারী বোঝা। এতবড় একটা  
বিরাট বাহিনী বুধাই জড় করতে হত না বেরাদপ ইংরাজকে  
ভাড়াতে। 'পলাশী-জয়ী' ক্রাইভ সাহেবই তো নিজমুখে স্বীকার  
করেছেন যে—

'ইচ্ছা করলে কেবল ইট-পাটকেস লাঠি-শড়কি নিয়েই শুধু  
মুর্শিদাবাদ শহরবাসীই দূর করে দিতে পারত ইন্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানীর নগণ্যসৈন্যকে ইংরাজকে সাত সমুদ্র তেব নদীর পারে।  
কোন দরকারই ছিল না কামান বন্দুকের, দরকারই ছিল না  
গোলাগুলির।'

পট-পরিবর্তন হলে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক মিরজাকর আলি  
ক্ষতগতিতে সবলবে এসে উঠলেন সিরাজ-পরিভ্রাতা হীরাখিলে বা  
মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে। হস্তগত করলেন অরক্ষিত রাজধানী, অরক্ষিত  
ধনাগার সব কিছুই বিনা বাধায়। পলাশী থেকে ফিরবার পথেই  
দহম-মহরম শেষে শলা-পরামর্গ ও হয়ে গেছে প্রাণের বন্ধু ক্রাইভের  
সঙ্গে দায়গুণে। এখন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল যথারীতি  
হীরাখিলেই দেশীয় বন্ধু ও সহযোগীদের সহিত।

অচ্যুত ক্রাইভ সর্বদীন মনে করলেন না মিরজাকরের সঙ্গে  
রাজধানীতে প্রবেশ করা। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন মতিবিলে  
মিরজাকরের মতিগতি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে। শুশ্রূষার ছড়িয়ে  
দিলেন তিনি মুর্শিদাবাদের অলিতে-গলিতে—মিরজাকরের প্রকৃত  
মনের ভাব জানবার জন্য। নিঃসন্দেহ এক নিশ্চিন্ত হয়ে অবশেষে  
কর্তব্য স্থির করলেন সুবে-বাংলার শূন্য মনসে সর্বপ্রায়ে মিরজাকরকে  
প্রতিষ্ঠিত করতে। মনসদরানের দিনস্থির হল—২১শে জুন এবং  
স্থান নির্বাচিত হল হীরাখিলে। মনসুরগঞ্জ প্রাসাদস্থ নিজামত  
দরবার-খ্য। শোকহারাচ্ছন্ন হীরাখিলকে সেদিন সাজানো হল  
নানা সাজে, নানা সজ্জায়। সত্ত-বিধবা হীরাখিলকে পরানো হল  
রত্নালঙ্কার ভূষিত নববধর বেশ। বিসময় চলল অপর রাজ্যের

অসুজ্জিত দরবারি কক্ষে বখাসময়ে সমাসীন হয়েছেন স্বয়ং  
মিরজাকর আলি সাহেব। রাজা-মহারাজা, পাত্র-মিত্র, আমির-ওমরাহ,  
বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সভাস্থ হয়েছেন বখাসময়েই বখাযখ আসনে—  
মর্যাদার ক্রমহিসাবে। সভাগৃহ উৎসব আগ্রহে চেয়ে আছে  
'মহামাত' ক্রাইভ সাহেবের আগমন পথের দিকে। অনতিবিলম্বেই  
প্রতীক্ষিত সত্যাক্ষর সত্যাগমন হল 'বিশিষ্ট' অতিথির—মিরজাকর আলি  
খাঁর সমভিষাহারে। উৎসব হয়ে উঠল সভাস্থ জনগণ, সামরিক  
বাজপত্রনিতে মুখরিত হল হীরাখিলের আকাশ-বাতাস, বখাবিহিত  
কুনিশ সহকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন অপেক্ষমাণ মিরজাকর  
আলির দিকে। সম্মানে হাত ধরে উঠালেন কশ্মিত দেহ আসদ  
নবাব নাজিম সাহেবকে। তারপর তাঁকে শিষ্টাচারমুখারী হাত  
ধরেই বসিয়ে দিলেন সুবে-বাংলার মহামহিমাবিত মনসদে। সর্বশ্রেষ্ঠ  
সম্মান সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবলাভের প্রতীকস্বরূপ তিনিই সর্বপ্রায়ে রজতপাত্র  
ভিত্তি স্বর্ণমুদ্রা নজরানা রূপে উপহার দিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার  
নবাভিষিক্ত নবাবকে।

উল্লেখযোগ্য তথ্য শ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ হল বিদেশী কিরিজ বণিক  
সেনাপতির ভাগ্যে। সভাস্থ অস্ত্রাভ্যাগী তাঁর দৃষ্টান্ত অমূল্য  
করলেন পদমর্যাদাক্রমমুখারী একে একে। নব্বি উঠেছে—  
হেকে চলল—'সুজা' উলমুলক হিসামউদ্দৌল। মিরজাকর আলি খাঁ  
বাহাদুর মহব্বত জঙ্গ—শাহান শাহের রাজ্যভিত্তিক বোখা চিরাচরিত  
রীতি অনুসারে। সাধারণের নিকট বিশিষ্ট উৎসবের বোখা করা  
হল প্রচলিত তোপধ্বনি দ্বারা। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (অর্থাৎ  
মিরজাকরের সিংহাসনচ্যুতি পর্যন্ত) হীরাখিলই ছিল সুবে-বাংলার  
রাজধানী, হীরাখিলস্থ মনসুরগঞ্জ প্রাসাদেই প্রতিষ্ঠিত ছিল নিজামত  
কাছারি।

শ্রেষ্ঠগৃহে সম্পাদিত-সজ্জিত শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন ইংরাজ  
সেনাপতি ক্রাইভ মিরজাকরকে মনসদ দান করে। পরে সর্ব প্রথম  
প্রশ্ন উঠল তাঁর নিজের পাওনা, সঙ্গীদের পাওনা, কোম্পানীর পাওনা  
নিরে। নিজেকেই স্বার্থ সব সময়েই মনে আছে হ'শিয়ার কিরজী  
ক্রাইভের। বেগের জাত ত'—নিভুল তাঁর হিসাব-নিকাশ। কাজেই  
মিরজাকর ব্যথা হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন সিরাজের  
ধনাগারে। সিরাজের ধনাগার—বা বাঙালার ধনাগার। যে-সে  
ধনাগার 'নর'; সোনার বাংলার ধনাগার। কত রাশি রাশি ধনরত্ন,  
মণিমুক্তা, হীরা-জহ্বৎ স্তূপাকার হয়ে আছে সে ধনাগারে। কত  
বিপণ্য গেছে—গেছে কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব, কত লুণ্ঠন, কত রাষ্ট্র  
পরিবর্তন, গেছে মারাঠা আক্রমণের ভ্রায় ভরাবহ বিপদ দেশের উপর  
দিয়ে। তবুও নিশেব হয় নি এ অফুরন্ত ধনাগার। এ-বে কুৎসের  
ভাণ্ডার।

এ ধনাগারের অবস্থান হীরাখিলেরই এক নিভৃত নিরাপদ  
আশে—ভূগর্ভস্থ গুপ্তগৃহে। বিষয়কর এ ধনাগার। আরব্যোপভাসের  
আজগুবি কাহিনীর ভ্রায় নিভান্ত অবিশ্রান্ত এ ধনাগার।  
অচিন্তিত, কল্পনাভীত এ ধনাগারের কথা। ইংরাজ বণিক  
সেনাপতি বিশ্ববিদ্যুৎ হ'র দীপ্তির গোলে ধনাগারে প্রবেশ করে।

এটি নরম  
গরম  
ও প্রসঙ্গী...



## এটি ঋব নিটিং উল!

বোনার উলের মধ্যে ঋব উলের ধারেকাছে কিছু লাগেনা...  
১০০% খাঁটি উল...নরম, মোলায়েম, অকৃত্রিম মননীয়...  
খেপে যায়না, ঝুলেও পড়েনা... বাছাইকরা ফ্যাশনমাত্তিক  
রকমারি রঙে পাওয়া যায়। ঋব উলে বোনা পোশাক-  
পরিচ্ছদ বারবার কাচলেও তার জৌলুয ঠিক বজায় থাকে।  
সর্বোৎকৃষ্ট বেষ্টন্যর মূলে ঋব



ঋব উলেন মিলস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বম্বে ১৩.

থাবতীর বাবসা-সংক্রান্ত খোঁজখবর এখানে করবেন: জে. এণ্ড পি. কোটস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড  
বম্বে: ৮১ পল্টন রোড, দিল্লী: গারটিন ব্যাস্টিয়ন রোড, মাদ্রাজ: ১৯ ভানিয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা:  
৪০ বি. প্রিন্সিপ স্ট্রীট, কোরাট্ট: কোরালা স্টেট, গোহাটি: এ. টি. রোড, টোকোবাড়ি, আসাম.

‘মাননীয় চেগারম্যান সাহেব। আজ ভেবে আশ্চর্য্য ইই যে, কিরূপ মোহমুগ্ধ হ’য় পড়েছিলাম আমি সে স্বপ্নমরকে প্রবেশমাত্র। বর্ণনার অতীত, কল্পনার অতীত সে অপরিমিত ধনসম্পদপূর্ণ কোথাগার। দর্শনমাত্র বিষয়ে জ্ঞানহারা, আত্মহারা এক অভূতপূর্ণ ভাবে অভিভূত হয়েছি আমি। এত রাশি-রাশি ধনসম্পদ একত্র সমাবেশ,—সে এক অভাবিত দৃশ্য, এক স্বপ্নমর ব্যাপার। সার সার সাজানো আছে টেমুক দার বকরকে চকচকে বাজ, পেটিকা, আলমারি অগণন। কত রক্তমুদ্রা, কত মোহর, কত মণি—লাল, নীল, সবুজাদি বিবিধ বর্ণের, ধরে-ধরে সাজানো আধারের থাকে-থাকে। স্বর্ণ-তালেরও দেখাজোখাই নেই। কত বিচিত্র রঙের বিচিত্র প্রতিকলন কক্ষমর, রঙ-বেরঙের আলোর আলোময়, শত রামধন্য বৈচিত্র্যময় জলুসে ঘেরা সে অনির্বচনীয় স্বপ্নপুরী। কতক্ষণ পরে মনে নেই, তবে কিছুটা আত্মস্থ হয়েছি যখন, তখন দেখি আমি নীরবে দাঁড়ির আছি—ওয়াটস্ (রেসিডেন্ট) ওয়াটস্ (Commissary of the Army), ল্যান্সিটন, আমেন বেগ খাঁ, নবকৃষ্ণ (হুসি), রামচাঁদ (কেরানী) প্রভৃতি কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে মারাগুচের কক্ষতলে মিরজাফর আলির ঠিক পাশে। প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পারলাম, অবাস্তব জগতে নয়—বাস্তব জগতেই এক অপূর্ণ ভূগর্ভগুহে কতক্ষণ মোহাবিষ্টাবস্থায় ছিলাম আমি।’

সের উল হুতাকরণের অনুবাদক Raymond সাহেব বলেছেন যে সেনাপতি ক্লাইভের উক্তি সর্বৈব সত্য, অতিরঞ্জিত নয় একটুও। তাঁর মতে ধনাগারের ধনসম্পদ আনুমানিক পরিমাণ ও বিবরণ সহজে তালিকাভুক্ত করা হয়—একটি স্তম্ভস্থ আধার-রক্তমুদ্রাপূর্ণ (১৭৬০০ পাউণ্ড), একপাত্র মোহর (স্বর্ণমুদ্রা ২৩০০০০ পাউণ্ড), দুই সিন্ধু স্বর্ণপিণ্ড (তাল), চার সিন্ধু হীরা, মুক্তা, মতি, মণি-মাণিক্যাদি সমৃদ্ধ। দুই পেটিকা অগণিত চুণি, পান্না, প্রবালাদি, বাহা জগতে দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য। এটাও হল বহিঃ-ধনাগার। আর একটি

অধিকতর ধনসম্পদপূর্ণ শুণ্ড ধনাগারের অবস্থানের কথাও জেনেছেন তাঁরা। সেটা ছিল রঙমহালের কোন গুপ্তকক্ষে।

কিন্তু আশ্চর্য্য যে, তার কোনই নিশানা করতে পারেন নি তাঁরা, মিরজাফর আলিও নয়। কে কত ভাগ নিয়েছেন ধনাগার লুণ্ঠনের, কোন তালিকা করা হয় নি তার। তবে স্বয়ং ক্লাইভ সহস্রাধিক ভাগ পেয়েছিলেন লুণ্ঠনেই, তা বয়ে নিয়ে যেতে অনেক বানবাহন, অনেক পাহারা দরকার হয়েছিল তাঁর। ধনাগারের ধনের যে পরিমাণ নিয়েছেন তাঁরা তাও মনে হয় সঠিক নয়। কারণ কোন অভিজ্ঞ জহরী ছিল না তাঁদের সাথে। যে মূল্য অবগত করেছেন তাঁরা দুর্লভ মণি-রত্নের—তা কেবল বামনের হস্তার আকার বিষয়ে ধারণা মাত্র। ধনের পরিমাণ যে অনেক বেশি ছিল তার সত্যতা নিশ্চিত হবে একটি দৃষ্টান্ত থেকেই। ধনাগার লুণ্ঠনের কিছু না কিছু অংশ পেয়েছেন সব সাথীই। ভাগ্যবান কেরানী রামনাথও পেয়েছিলেন দেবতার প্রসাদের কদিকা ভাগ। পলাশী যুদ্ধের দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তিনি ধনসম্পত্তি বা রেখে বান, তার পরিমাণ করা হয়েছে এইরূপ :— ৭২০০০ পাউণ্ড মগদ ও বিল, ধনসম্পদপূর্ণ ৫৮৩ বড় বড় সিন্ধু— তার মধ্যে ৮০টি সিন্ধু পরিপূর্ণ স্বর্ণপিণ্ড, অবশিষ্ট ৩২০টি সিন্ধুভর্তি রৌপ্যপিণ্ড, তু-সম্পত্তি ও মণি-মাণিক্যের পরিমাণ ২০০০০ পাউণ্ড, স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ডের আনুমানিক মূল্য পরিমিত হয়েছে ১৮০০০ পাউণ্ড ব’লে।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবের যুগ স্বয়ং—মাত্র অর্ধশতাব্দী। এই অত্যন্তকাল মধ্যে যেসব গর্বের কিছু গড়ে উঠেছিল বিরাট শতরমর, তার মধ্যে হীরাবিল অজতম। হীরাবিল নিজেও বিস্ময়কর—তার কথা, তার কাহিনী, তার ইতিহাসও বিচিত্র। দুঃখের বিষয়, আজ আর কিছু অবশেষই নেই সিরাজের সাধের হীরাবিলের। অনেক গৌরবের দ্রষ্টব্যই হারা হয়েছে মুর্শিদাবাদ দিনে দিনে। মুর্শিদাবাদ ছিল বিশ্ব জুড়ে গৌরবময়, আজ সে অভিশপ্ত। হার। কালের কি গতি!

## দেবতার সান্নিধ্যে

(স্ট্যানলি কুনিটজ্)

বিষ্ণু চোখের কাবাগাং,  
ধূসর, কৃষ্ণ, বক্সা কাঁটাগাছের  
আড়ালে বৃদ্ধ দেবতার বসে আছেন।  
যেন স্বর্গের বিগত-প্রমথিলের বাজনা,  
তাঁদের দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম বজ্রের কাঠিক।

ভাবার কঠিন অব্যবহ—সমাবিষ্ট আবার প্রেম।  
অনর্গল কবিতার নয়, সমগ্র জিনিসের আকৃতি  
নিরে তাঁরা সত্যতা বিচার করেন  
আর শূন্যতাকে ছিন্নভিন্ন করেন  
যখন শুণ্ডতা সমতলে নেমে আসে।

ভগিনী আর আমার বাগবন্তা,  
তোমরা দু’জনেই যেথ আর পাখি ছিলে।  
যখন জৈবিক স্বর্ণবটীর সঙ্গে জিউস্ নেমে এলেন,  
শোন, আমরা এই পৃথিবীটা তৈরি করলাম।  
আর আমি স্তন্যে পেলুম সমস্ত বটনাপ্রবাহ  
অনন্ত আধারের মধ্যে দিয়ে এসে সেখানে সঞ্চিত হল।





মাসিক

কুলু রমণী . .



তালতলা

—প্রভাতকান্তি ঘোষ



বহুশের ভাল

—পাণ্ডিত্য সাহা

পাঠিকা

—বিভূতিভূষণ রায়





শাসিক বসুমতী

আশ্বিন / '৭১

সপরিবারে  
—রাণী স্টুডিও (কলিকাতা)

ভারতীয় কলা

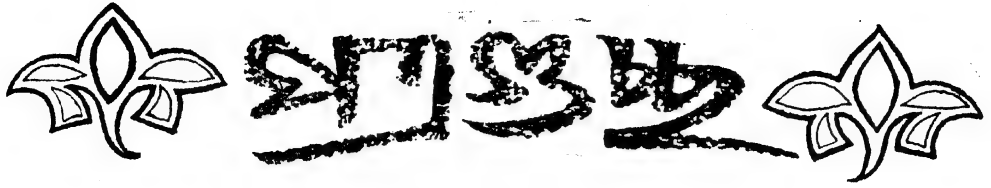
—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়



মিষ্টি হাসি







## মহাকাব্য কীটসের পত্রাবলী

[সত্যের মধ্যে যিনি অন্ধরকে দেখেছিলেন এবং অন্ধরের আশ্রয়ে যিনি করেছিলেন সত্যের প্রতিষ্ঠা, সেই মহাকাব্যের নাম হ'ল কীটস (১৭৯৫-১৮১১)। পৃথিবীর সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বসমাজের শ্রেষ্ঠ কবিদের অত্যন্ত কীটসের কবিতা পত্রাবলী বর্তমান সংখ্যার 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে প্রকাশ করা হল। পত্রগুলির মধ্যে কীটসের কল্পনার প্রগতিশীল এবং স্বাধীন ভাববোধের এক অনবদ্য কাব্যধর্ম ও জাতিতত্ত্বপূর্ণ ভাবায় প্রকট হয়ে উঠেছে। পত্রগুলি বাংলায় অমূল্য করেছেন শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার পাল। —স।]

জর্জ কীটসকে লেখা

জর্জ কীটস, ১৮১৬

প্রিয় জর্জ,

জীবনে এমন অনেক দুঃসময় কাটিয়েছি, যখন আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি, যখন আমার মন চিন্তার ভারে নেতিয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, আমার পক্ষে নীল আকাশের সৌন্দর্যের মধ্যে কাব্যের স্বর শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়; যদিও তখন আমি আকাশের যে সুন্দর প্রান্তে বিহ্বলনের খেলা চলেছে, সেই প্রান্তের দিকে বিষয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছি; নীচে সুদূরপ্রসারী চেউ-খেলানো ঘাসের উপর টাঁড়িয়ে নক্ষত্রপাচিত আকাশে স্বর্গীয় সৌন্দর্য অচ্ছন্ন করতে পেরেছি। তখন আমার মনে মনে হয়েছে, এটিপোলার সঙ্গীত আমি আর কোনদিন শুনতে পার না, যদিও ছমছাড়া মেন অন্তর্যমনি সূর্যের রশ্মিতে জান করা জাগতিক পশ্চিম আকাশের আগে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং জ্বলন্ত মেঘের মধ্যে সোনালী বীণা অপ্রতিরোধ্য দেয়া যাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে যে, মৌলিচির একটানা অন্তর্যমনির মধ্যে আমি আর গ্রাম্য-সঙ্গীতের স্বর শুনতে পার না; অন্ধর চোখের বাঁকা চাহনি আর আমার মনে কাব্যের স্বর জাগিয়ে তুলবে না, আমার হৃদয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাবে না, জাগাবে না আমার মনে পেনের কথা বলার ও আলিঙ্গনের তীব্র কামনা।

কিন্তু এমনও সময় আসে যখন প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গী জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়; যেন হঠাৎ এক আলোকের সন্ধান পায়; জলে, স্থলে, বাতাসে কাব্যের ধ্বনি শুনতে পায়। প্রিয় জর্জ, একটা কথা শুনতে পাওয়া যায়, যে কথা আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং কবি স্পেন্সারও (Spenser) বিশ্বাস করতো; কথাটা

এই যে, কবি যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ে তখন বাতাসে যে খেত অস্বাভাবিক অশ্রু পদকানি শুনতে পায়; হঠাৎকৈ নাইটদের দ্বৈরথ সময় দেখতে পায়; সাধারণ মানুষ তুলের বশে যাকে নিরুৎসাহ চকচকি বলে মনে করে, তা আসলে হুর্গের প্রবেশদ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হওয়া; প্রতিহারীর শিঙার শব্দ পৃথিবীতে পৌছয় না; তা শুধু কবির কানে পৌছয়; অস্বাভাবিক প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিরাট হলঘরে পান-ভোগনে মত্ত হয়; তাদের এই উৎসবমুখর দুঃখ শুধু কবিরই দেখতে পায়; দূর থেকে মনে হয়, নাইটদের অচরাগিণীরা যেন দেবদেবীর চোখেও স্বপ্নের আবেশ নামিয়ে আনে; তাদের পানপান একহাত থেকে অত্যাচারে পুরতে থাকে; সে পানপাত্র থেকে যখন সুরা ঢালা হয়



জর্জ কীটস

তখন যেন মনে হয় আকাশ থেকে তারা খসে পড়ছে; আরও দূরে কুজবন অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ততদূরে পৌছয় না। এ্যাপোলো একথা ঠিকই বুঝেছে যে, ঐ কুজবন যদি সম্পূর্ণই দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে কবি ঐ কুজবনের গোলাপের সৌন্দর্য দেখে চরম অস্বস্তি বোধ করবে; তাই ঐ কুজবনের সবটা কবি দেখতে পায় না; দেখা যায় শুধু গোয়ারার জলধারা, সে জলধারা যেন নানাদিক থেকে এসে পরস্পরকে চুষন করছে, সে জলধারা যেন ডলফিনের পুচ্ছের আলোড়ন।

যার মন কাব্যরসে ভরপুর, সেই শুধু এই অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখতে পায়। সন্ধ্যায় উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাণ-শীতল-করা মৃতুমন্দ বাতাসে সে শুক নীল আকাশকে রক্তশোভিত দেখতে পায়; ছমছাড়া মেঘের মধ্য দিয়ে চাঁদ যখন ক্রমশ উপরে উঠতে থাকে তখন চাঁদকে যেন মনে হয় ঠিক ষ্বেতবস্ত্রপরিহিতা কোন পূজারিণীর মতো। কবি প্রকৃতির আনন্দ কোলাহল শুনতে পায়, অনাশিার রহস্য অন্বেষণ করে। আমিও যদি কোনদিন অন্বেষণ করি তোমাকে বলবো, ভাই।

বর্তমানের এই আনন্দ নিয়েই কবির জীবন; কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের পাওনা অনেক বেশি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্বভরে সে এই কথাই বলে, 'নীরস পার্থিব জীবন আমি ছেড়ে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমার আত্মা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে জীবনের মহান বার্তা বয়ে নিয়ে যাবে। আমার ডাকে দেশপ্রেমিক সাড়া দেবে, তরবারী খুলে দাঁড়াবে কর্তব্যের আঙ্কানে। রাজসভায় আমার কাব্যের ছন্দ রাজপুরুষকে জাগিয়ে তুলবে তার তন্ত্রা থেকে। আমার মধুময় রাগি ঋষির মঞ্চে লীন হয়ে যাবে। আমার কাব্য ঋষির মনে উন্মাদনা এনে দেবে, তখন আমি স্বর্গ থেকে তাকে উৎসাহিত করে তুলবো। আনন্দ-ভরা আমার কাব্য তরুণীর কণ্ঠে স্নমধুর সঙ্গীতের রূপ লাভ করবে বিবাহের মধুমামিনীতে। মে মাসের ভোরবেলায় আনন্দমুখর গ্রামের মানুষ ক্রীড়া-কৌতুকের শেষে ক্রান্ত হয়ে বৃত্তাকারে বসবে ঘাসের উপরে; তাদের মাঝখানে বসবে লাস্যময়ী এক তরুণী—মাকে তারা ধরে নেবে তাদের রাগি; তার মাথায় থাকবে লালাল, সাদা, লাল প্রভৃতি নানা রং-এর ফুলের তৈরি মুকুট। সে মুকুটের ফুলগুলো যেম অতৃপ্ত প্রেমিকের প্রতিচ্ছবি। তার কণ্ঠের ছোঁয়া-না-পাওয়া বকের মাঝে থাকবে একটি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ। এই রাগি যুবকের প্রাণে জাগাবে শিহরণ; সে শিহরণ যুবককে করে তুলবে অস্থির; আশা ও ভয়ের মাঝে তুলবে তার মন। এরকম অহুত্বিত আবার যৌবনেও এসেছিল।

তার কর্তৃত্বের মূর্ত্তগুলো বালমলিয়ে ওঠে। আমার গানের সুর মা'র বকে শিশুর চোখে ঘুমের মধুর আবেশ টেনে আনে। সুন্দর পৃথিবী, বিদায়! তোমার বকের পাহাড় ও উপত্যকা আমার দৃষ্টির বাহিরে চলে যায়, তোমার ক্ষুদ্র গাণ্ডি ছাড়িয়ে আমি মহাশূন্যে ক্রমশ লীন হয়ে যাই। একথা ভেবে আমি পরিতৃপ্ত যে, আমার কাব্য তোমার সুন্দর সম্মান-সম্মতির প্রাণ-মন সঞ্জীবিত রাখবে।'

ভাই, একাধারে তুমি প্রিয়বন্ধু। আমার তীব্র বাসনা জাগে, আমিও যদি এই আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম! আমি অনেক স্থখী হ'তাম; সমাজ আমাকে সাদরে গ্রহণ করতো। যখন আমার মনে কোন মহৎ চিন্তার উদয় হয়েছে, তখন আমি জীবনের দুঃখ-কষ্ট অনেক পরিমাণে ভুলতে পেরেছি। সেদিন আমি এতো আনন্দ পেয়েছি, যে আনন্দ মহামূল্যবান কোন গুণধন আবিষ্কারও নেই। যেনন ধরো আমার মনেট। আমি জানি অচ্য কেউ তা পড়বে না। কিন্তু আমার সাহসনা এই যে, তুমি অস্তত আমার মনেটগুলো পড়বে। একদিন ঘাসের উপরে পা ছড়িয়ে বসে গুণ্ডলো আমি তোমার জন্তেই লিপেছি। আমি ভেবেছি আর লিপেছি, মৃতুমন্দ বাতাস আমার চোখে-মুখে স্পর্শ বুলায়ে গিয়েছে। এখনও আমি রাশি রাশি ফুলের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছি; ফুলগুলো সমুদ্রের ধারে ছোট পাহাড়ের চূড়া সুন্দর করে ঢেকে রেখেছে। ফুলের ডাঁটা ও পাপড়িগুলো মিলিয়ে কি সুন্দর আচ্ছাদন; ওট গাছে ঢাকা মাঠ; মাঝে মাঝে পিপগাছও মাথাচাড়া দিয়েছে; এ মাঠ দিয়ে চলতে মানুষের অনেক অস্বাভাবিক হয়, কারণ আগাছাগুলো পোষাক আটকে ধরে। অতাদিকে, সুন্দরপ্রসারী নীল সমুদ্র; কখনও দেখতে পাই জাহাজ এগিয়ে আসছে, জাহাজের সমুখভাগ রূপালী আবরণে ঢাকা; আবার দেখি, লার্ক পাখি বাসায় ফিরছে; আবার দেখি, শিরটি সামুদ্রিক পাখি অস্থিরভাবে উড়ছে; যখন সে পাখা মেলে না, তখনও যেন মনে হয়—অশান্ত সমুদ্রের তালে তালে তার হৃদয় নাচছে। আমি পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাই, দেখি পশ্চিম আকাশে অভায়মান সূর্যের সোনালী কিরণে ছেয়ে গিয়েছে; কিন্তু কেন পশ্চিমদিকে তাকাই? তাকাই, বিদায় জানাবার জন্তে; আমার মন চায় তুমি আমার হাত তুলে নিয়ে চুষন করবে, ভাই জর্জ!

জন হার্মিণ্টন রেনল্ডস্কে লেখা

রবিবার, ৯ই মার্চ, ১৮১৭

সুপ্রিয় রেনল্ডস্,

তোমার সহমর্মিতা আমাকে এতো মুগ্ধ করেছে যে, আমি

## পরশু

ছোট ছোট বাক্যই সীমাবদ্ধ থাকবে। তোমার সমালোচনা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে; আমি যেন তোমাকে প্রতারণা না করি।

হাজলিট বলবে, এটা ভগবানের মহৎ সৃষ্টি। যা হোক, আমি আশা করি তোমাকে প্রতারণা করবো না। আমার কিছু পরিচিত মানুষ রয়েছে, যারা দাড়ি চুলকাবে; আমার মনে হয়, তাদের উপরে আমার কোন আকোশ নেই; অন্যতম, আমি প্রার্থনা করি তাদের যেন নগ্নগুলো বড় বড় হয়। তোমার সমস্যাচার জানবার জন্য তৈরি থাকব।

পবর পেলাম, একজন সৌন্দর্যী নতুন বিরোগান্ত নাইটকে লিখেছে; ভগবান তার মঙ্গল করুন; আমি এক সপ্তাহের মধ্যে যেমন করে হোক তার সঙ্গে পরিচিত হবো; তোমার কোনো আশা করি ভাই-এর ও আমার কথা মনে রাখবে।

ভবদীয়  
জন কীটস

সোমবার, ১০ই মার্চ, ১৮১৭

সুপ্রিয় রেনল্ডস,

আমি একাই গ্রামে যাব; একথা শুনে আমার ভাইয়েরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে; তারা আমার ভ্রাতৃত্ব ভক্ত। হেডন বলেছে, আমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমার একাই যাবো উচিত; কাজেই আমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন থাকবার আনন্দ থেকে তারা বিকৃত হচ্ছে; তবে আশা করাছি পরে তারা এ আনন্দ পাবে। শাপ্পিগরই আমি শহর ছেড়ে যাব। তুমি তাড়াহাড়ি সমস্ত বাবেলো চুকিয়ে ফেলবে। আমিও তাই করবো; কিন্তু থেকশিরালের মতো, নতুন বাড়ির কাঁকের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থ, জীবনের আশ্রয়-আয়েস, মদ, সম্মতি—সবই ত্যাগ করা যায়; কিন্তু স্বাস্থ্য রইল না তো পৃথিবীতে কিছুই রইল না।... আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইব এবং আমার ভাই-এর মাধ্যমে মিসেস ডিলকির কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠাব।

প্রীত্যর্থা  
জন কীটস

চার্লস কাউডেন ব্ল্যাককে লেখা

বুধবার, ২ই অক্টোবর, ১৮১৬

শ্রীশ্রীতিল্যেয়ু,

কর্মব্যস্ততা শেষ হয়েছে, তাই এখন তোমার নির্দেশ অহুযায়ী হান্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারব। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হবে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি যথেষ্ট উদগ্রীব।

কাণ্ডটা এই যে, কাব্যের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে ঝাঝ শ্রেয়গীতার এবং ডারউইনকে মিলিয়ে জগাধিচুড়ি পাকান না, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া কম আনন্দের কথা নয়। কিছুদিন আগে কয়েক লাইন কবিতা লিখেছিলাম, তা থেকে কিছু নকল করেছি। কিন্তু ঐ কয় লাইন কবিতা আমার এনে খারাপ লেগেছে যে, আমার মনে হয় তার ভাল অংশও আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে। যদিও 'ম্যাগিউ'-এর উদ্দেশ্যে ঐ লাইন কয়টি লিখেছিলাম, কিন্তু কাব্যদেবীর কথা বার বার উচ্চারণ করা সত্ত্বেও 'হান্ট সাহেব' বাধা পাবেন। 'হোবের্স' (Herace) বলেছেন, ভগবানের উপযুক্ত নয় এমন কোন কাজ ভগবানের নামে চালানো না। হোবের্সের উপদেশ শ্রবণ রেখেও আমি পাপের কাজ করে ফেলোঁছি। শেষবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তোমার কয়েকটা কথা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, তোমার কাছে এমন কিছু আছে যা আমি অবশ্যই দেখব। তোমাকে একথা শ্রবণ করিয়ে দেব। শহরের উপকণ্ঠ পশুর ব্যবসার উপযুক্ত সন্দেহ নেই; চার্লসকে এনোমেলো রাস্তা; তবুও চনং ডিন স্ট্রীট খুঁজে বের করা কঠিন নয়; লণ্ডন ব্রীজ পেরিয়ে প্রথমে বাদিকে ঘুরবে, তারপরে ডার্লিংকে ঘুরে আমার বাড়ি আসবে; আমার বাড়ি আসা তোমার পক্ষে মহাহুতবলতার পরিচায়ক হবে। সেট পল বলেছেন, মহাহুতবলতা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যেমন করে হোক তাড়াহাড়ি উত্তর দেবে, যদি তোমার হাতের আঙুল বাতেন টন টন করে তবুও।

তোমার জন কীটস

বৃহস্পতিবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৮১৬

সুপ্রিয় ডোঁভ,

ক্লোভার থেকে নবু আহরণের জন্যে বৌমাছি যেমন ঠিক সময়মতো হাজির হয়, আমিও তেমন ঠিক সময়মতো উপস্থিত হবো। আমি খুবই আনন্দিত যে, আমি এতো তাড়াহাড়ি লক্ষ্যপ্রাপ্ত 'হেডন'কে এবং তাঁর সৃষ্টি চাক্ষুষ দেখতে পাব। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম; 'ডলিয়ার'-এর সঙ্গে কবে দেখা করবে এবং ওলবার কোথায় থাকে—আমার অহুরোধ আমাকে জানাবে। সেই সঙ্গে আমাকে আরও জানাবে কবে তুমি আমাকে একটা নিয়ানন্দ দিন অকারণে নষ্ট করতে সাহায্য করবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জন কীটস

মঙ্গলবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮১৬

সুপ্রিয় চার্লস,

তুমি এখন নির্ভয়ে জানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভার ছত্রছায়ায় নির্ভর করতে পার। আমি দেখতে পাচ্ছি,

আমার ভয় ও বিষয় জাগানো প্রতিচ্ছবি তোমাকে জন্ম ডোরির মতো করে তোলে নি। ছায়াতই তুমি ঐ প্রতিচ্ছবির একপান্না কর্প পাবে। আমি তোমার জন্ত সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবো। হেডনের বাড়িতে রেনল্ডস্-এর সঙ্গে কয়েকদিন ভোরবেলা দেখা হয়েছে; সে কথা দিয়েছিল আজ বিকেলে আমার কাছে আসবে এবং সেতানও আসবে ব'লে গতকাল জানিয়েছে; তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমিও কথা দিয়েছিলে তুমি আজ বিকেলে আমার কাছে আসবে; কাজেই অবশ্যই আসবে। 'এণ্ডি মাইন' কাবিতাটা নিয়ে সম্প্রতি বিষয় কিছু করি নি; আশা করছি, আর একবার বসেই কাবিতাটা শেষ করবো; মনে হয় তুমি জানো যে, আমি 'রিচার্ড'-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম; সে রাজিউ এতো ছুঁধোগময় ছিল যে, পরের দিন সারাক্ষণই আমাকে সেখানে থাকতে হয়েছিল। সে তোমার কথা স্মরণ রেখেছে।...

চিরদিন তোমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই জানব। আমার আন্তরিকতায় সান্নিধ্য হও না; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

জন কাট্‌স

প্রিয় চার্লস,

মঙ্গলবার, ২৫শে মার্চ, ১৮১৭

আবার আমাদের কখন দেখা হবে, কে জানে? স্বপ্নে, না নশকে, না কোন গভীর প্রদেশে? সাত পাক পাওয়া ছোট গলিতে, নার্কি সোলিসবারির সমতল প্রান্তরে আবার আমাদের দেখা হবে? নার্কি, ড্রির লেনে আবার আমরা ভিড় করবো? আমার কথা যদি বলো, তা হলে বলবো, আমি জানি না কোথায় দেখা হবে, শুধু এইটুকু বলতে পারি, আগামীকাল সন্ধ্যাবেলায় মিঃ নোভেলোর ওখানে দেখা হতে পারে; সেখানেই মিঃ হার্ট এবং আমি যাচ্ছি? মিঃ নোভেলো মিঃ হার্টকে অস্বরোধ করেছেন তোমাকে চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে সেখানে যাবার জন্তে, নিমন্ত্রণ করার তার আমিই নিয়েছি। কাজেই আশা করি, আগামীকাল সন্ধ্যায় সেখানে তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে; মিঃ হার্ট একটা কাবিতা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছে; কাবিতাটা জলপানীদের নিয়ে; এ ব্যাপারে যে বেশ ভালভাল কথা বলেছে; 'রিচার্ড' কাবিতার উপরে আমি একটি সনেট ও এমনি কয়েক লাইন মন্তব্যও লিখেছি; আমি আগামীকাল সনেটটির একটি অঙ্কলিপি তোমাকে দেব; মিঃ হার্টের ইচ্ছা, তুমি তাকে ভুলে না যাও।

প্রীত্বার্থ—জন কাট্‌স

## বিগত

### শ্রীনিখিলরঞ্জন মাইতি

বিগত দিনের স্মৃতি  
লুপ্তপ্রায়।  
যজ্ঞাহীন যজ্ঞের মতন।  
সমুদ্রের বহু গর্জনের—  
উন্নতভায়—প্রশ্ন করেছি তাকে  
বার বার।  
কি পেলান?  
মুক্তজীবনের সুশাস্ত পল্লবে—  
কেন তার আগমন—  
প্রথম দর্শনের—  
লজ্জাবতী ফণিনীর মত?  
অস্তরের নিগূঢ় চরমে—  
বিশ্বের দেখে—  
কেন সে আসন পাতে  
পসারিণী মালিনীর মত

পুষ্পের পরাগাণোড়ী  
ভ্রমরের মত—ভুল নয়  
প্রীতির বন্ধন; মিছে নয়  
স্মৃতির—ক্রন্দন।  
চেতনার কারাগারে আমার  
ভ্রমন; বিস্মৃতির পরপারে  
আমার পতন।—  
উত্তম ঘূর্ণির বকে দৈর্ঘ্যশীল  
নারিকের—আশ্বাস।  
তাই মোর অভিসার  
অতি চুপে চুপে  
স্থির-স্থায়ী জীবনে



## মেজর জেনারেল প্রমথনাথ বর্দন

[ পুণা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ]

বহির্বিশ্বে আপন আপন কর্মক্ষেত্রে বাঙলার যে সুসজ্ঞানের দল যথেষ্ট যোগ্যতা ও অপরিহার্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দেশজনমীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, এবং জাতীয় গর্ব বৃদ্ধি করেছেন পুণা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল প্রমথনাথ বর্দনের নাম সেই তালিকার অন্যতম লিপিবদ্ধ করা যায়।

সৌম্যদর্শন, সদালাপী অধ্যক্ষ বর্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বার বার যে কথাটি মনে হয় তা হল যে, প্রতিভার সর্বতোমুখী বিকাশ রেনেসাঁর জীবনাদর্শের নামান্তর যাকে বলা চলে, প্রমথনাথ নিজের জীবনে সেই আদর্শেরই সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর করেছেন।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং প্রবীর রসবোধদীপ্ত এই মানুষটির পিতৃভূমি বামুনলাইড়া এবং মাতুলালয় কিশোরগঞ্জ। পিতৃদেব মর্যাদজনী বর্দন সিদ্ধাপুরে চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন যথেষ্ট ব্যক্তির অধিকারী। ১৯০৬ সালে প্রমথনাথের জন্ম। ময়মনসিংহের জাতীয় বিজ্ঞানতন্ত্রের প্রথম ডাক্তার হিসাবে তাঁর ছাত্রজীবনের সূচনা এবং সিদ্ধাপুর কিং এডওয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজের কৃত্তী ছাত্র হিসাবে সেই ছাত্রজীবনে সার্থক পরিণতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পিতৃদেব অক্লান্ত চিকিৎসক। পিতৃ পদাঙ্কে অনুসরণ করলেন প্রমথনাথ। সিদ্ধাপুরের পাঠ সম্পূর্ণ করে ১৯৩২ সালে বিলেত অভিমুখে পাড়ি জমালেন প্রমথনাথ। বিদেশে এল, এম, ডি, পি, এইচ; ডি, আর, সি, ও, জি; এম, আর, সি, পি; প্রমুখ



প্রমথনাথ বর্দন



চিকিৎসাশিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি সম্মানে উত্তীর্ণ হলেন প্রমথনাথ। ১৯৩৭ সালে প্রমথনাথ যোগ দিলেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের সামরিক শাখায়। তারপর তাঁকে দেখা গেছে চর্মরোগ-বিশারদ মেডিক্যাল স্পেশালিষ্ট শ্রীজীবিত্তাবিশেষ্য এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক হিসাবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এতগুলি বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্যেই তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে এবং হৃদয়ের আলোর মত তা স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

১৯৬২ সালে মেজর জেনারেল বর্দন তাঁর বর্তমান পদে সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং আশার ও আনন্দের কথা কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষক হিসাবে তিনি কলকাতা, বোম্বাই এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

ফরাসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিবান। পুণা বুষ্ঠ নিবাসী সর্গমিত্র সভাপতির আসন তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়াও আরও বহু লোকসংস্করণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত। তন্মধ্যে রোগীর রূপ, বয়েজ স্কাউটস, মনোবিজ্ঞানী সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখনীয়। শোভোক্ত প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্রের সম্পাদক এবং সংস্থার সভাপতির দায়িত্বও তিনি সফলভাবে পালন করেছেন।

## ভুবনমোহন মজুমদার

[ বিখ্যাত প্রকাশক—শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরীর স্বাধিকারী ]

মুহূর্ত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারে এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতায় প্রকাশক সম্প্রদায়ের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখের দাবীদার। এ দিক দিয়ে বাঙলা দেশের গর্ব ও গৌরবের অন্ত নেই। সাহিত্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকদের মধ্যে শ্রীশঙ্কর লাইব্রেরী অন্ততম। যে মানুষটির সাধনা, কর্মদক্ষতা

ও ঐকান্তিকতা সমগ্র প্রতিষ্ঠানিকে তার আজকের এই বিরাট ও ব্যাপক রূপদান করেছে তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মজুমদার।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর সাবডিভিশনের বাখরা-বাজার গ্রামের জমিদার বংশোদ্ভূত স্বর্গীয় দীনবন্ধু মজুমদারের পুত্র ভুবনমোহনের জন্ম হয় ১৩০৯ সালের ২৫ এপ্রিল



ভুবনমোহন মজুমদার

(সেপ্টেম্বর ১৯০২)। দেশেই তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। ঢাকা থেকে পাশ করলেন আই, এস, সি। ১৯২৫ সালে বি, এস, সি, পাশ করলেন বহরমপুর কলেজ থেকে।

বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজধানী কলকাতায় এলেন ভুবনমোহন। আরম্ভ হল এম, এস, সি, পড়া। এম, এস, সি, অধ্যয়নকালেই ভুবনমোহন চলে যান কুমিল্লায়। দীর্ঘ মেয়াদেই বেশ কয়েকমাস সেখানে ছিলেন। কুমিল্লা উপলক্ষে তাঁর হারিয়ারে যাওয়ার উদ্দেশ্য, প্রাণকারণে অংশগ্রহণ করা। তিন মাস তিনি হারিয়ারেই রইলেন আরও তিনমাস দিল্লী প্রমুখ আরও নানাস্থানে অতিবাহিত করে কলকাতায় ফিরে এলেন। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ভুবনমোহনের। মাত্র সাতের বছর যখন বয়স, জীবনের সেই ভোরের লগ্নেই জীবনাতীতের আত্মা শুনতে পেয়েছিলেন ভুবনমোহন। সীমার জগতের মাটিতে দাঁড়িয়ে অসীমের হাতছানি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৯১৯ সালের একদিন তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করলেন ভোলা গিরি

বিখ্যাত শ্রীগুরুলাইত্রেয়ীর প্রতিষ্ঠাকরলেন ভুবনমোহন ১৯২৭ সালে। আজকের দিনের অত্যন্ত অগ্রবর্তী পুস্তক প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত জয়যাত্রার শুভমুচনা হল। অর্ডার সরবরাহের কাজও করতেন ভুবনমোহন। বসুমতী এবং প্রবাসীর গ্রন্থাদির অর্ডার তিনি সংগ্রহ করে সরবরাহ করতেন। ১৯৩০ সালে শ্রীগুরুলাইত্রেয়ী তার বর্তমান গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ধর্মপ্রাণ ভুবনমোহনকে ভোলা গিরি আশ্রমের সচিবের আসনে দশ বছর সমাসীন থাকতে দেখা গেছে।

শ্রীগুরুলাইত্রেয়ীর বিরাট এবং ব্যাপক কৃতিত্ব সম্বন্ধে এই অল্পপারিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সকল বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেই তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্য ও সাক্ষ্য প্রদর্শন করেছেন। বঙ্গ বাহিন্য, এই বিরাট সাফল্যের মূলে ভুবনমোহনের একক অবদান অনস্বীকার্য।

দাবাখোলা তাঁর এক বিশেষ সঙ্গ। দেশভ্রমণও। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলকাতার বাইরে তিনি বৌরয়ে পড়েন অবকাশ এবং দেশ দর্শনের বাসনায়।

ভোর চারটেই ত্রাধমুহুর্তে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। তাঁর চরিত্রের নানাদিকের মধ্যে তাঁর আত্মীয়স্বজন অমায়িক আচরণ বিনয়স্ফূর্তি এবং বন্ধুবাৎসল্য, সারল্য ও বিনয়গুণ বিশেষভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে যান।

## মন্দার মল্লিক

[ ব্যঙ্গ ছায়াচিত্রের পথিকৃত ]

বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের অবদান এবং জাতীয়জীবনে তার গুরুত্ব সর্বতোভাবেই অনস্বীকার্য। বাঙলা ছায়াছবিবর একটি বিশেষ বিভাগের পথিকৃত হিসাবে যাকে অনায়াসে আঁতর্ভূত করা চলে, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক। বাঙলা দেশে দর্শকসাধারণকে প্রথম কাটুন চিত্র উপহার দেওয়ার পৌরব নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রাপ্য। একাধিক কাটুন চিত্র নির্মাণে চিত্রজগৎকে তিনি যেভাবে সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছেন, সে সম্বন্ধেও কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

১৯০৭ সালের শুভ বড়দিনে বহরমপুরে তাঁর জন্ম। বহরমপুরের প্রখ্যাতনাগা নাগরিক স্বনামধন্য আইনজীবী স্বর্গীয় জ্ঞানউপেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। বাঙলার সাংবাদিক-জগৎও একটি উজ্জল নাম ও দেশের মুক্তসাধনার অত্যন্ত মহান সৈনিক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ছিলেন শ্রীযুক্ত মল্লিকের জননীর একমাত্র সহোদর। শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিকের শিক্ষারম্ভ বহরমপুরেই হয়। স্কুলজীবন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে

গ্রাস থেকে দেশের মুক্তির জগ্ন মরণপণ সংগ্রাম ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর, দূচ থেকে দূচতর, তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে।

গৌরাঙ্গ প্রেসে যোগ দিলেন শিক্ষানবীশ হিসাবে। ছাপাখানার যাবতীয় কাজ তাঁর আয়ত্তে এল গৌরাঙ্গ প্রেসের মাধ্যমে। আলোকচিত্রের চর্চা শুরু হল ১৯২৮-২৯ সাল থেকে। আনুমানিক ১৯৩০-৩১ সালে একদিন একটি কাটুর্ন ছবি দেখে ভয়ানক প্রভাবিত হয়ে পড়লেন তাঁর দ্বারা। তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে বিকৃত প্রসারিত হল এই ছবিটির প্রভাব। এ ছবিটি এমন এক আবহন তাঁর মনে জাগিয়ে তুলল—যা হয়ে উঠল তাঁর কাছে অনাতিক্রম্য। তাঁর চোখের সামনে এই ছবিটিই তুলে ধরল এক অস্বপ্ন সত্যবনার পথনির্দেশ।

এ সম্বন্ধে অমৃৎকান শুরু করলেন, অনেক কিছুই তখন তিনি এ সম্বন্ধে জানতে চান, চান বরতে। কিন্তু প্রতিবারই তাঁকে মুগ্ধাশ্রিত হতে হয় নৈরাশ্রের সঙ্গে। যাদের কাছেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কেউই কোন উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু কেউ না পারলেও দু'জন পেরেছিলেন তাঁর জিজ্ঞাস্য মনকে তৃপ্ত করতে। এই দু'জন—শ্রীযুক্ত জ্ঞান রায় এবং কবিগীতা কথাসিদ্ধী অন্নদাশঙ্কর রায়ের অল্পজ শ্রীযুক্ত অজয়শঙ্কর রায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞান রায় স্বর্গীয় নির্মল পালের সঙ্গে মিলিতভাবে এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাঁরপর 'গেম' নাম দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এঁরা একটি ছবি নির্মাণ করলেন। পাঁচশ' দুট দীর্ঘ এই ছবিটির মুক্তির ভার গহনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন চিত্রবিদ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু আলোকচিত্রকর্মে ক্রটি ছিল। এঁরা ছবিটির মুক্তি দিলেন না। ছবিটি দেখেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযতীন মিত্র। ছবিটি দেখে তিনি শ্রীযুক্ত মল্লিককে অনুরোধ করেন নিউ থিয়েটার্সের শিরোনামায় একটি ছবি করে দিতে। পরিকল্পিত ছবিটির গল্পাংশ মন্ডার মল্লিক বলে যান। তাঁর চিত্রনাট্য রচনা করলেন খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শেষ অবধি এ ছবিটিও সাধারণ্যে মুক্তলাভ করে নি। শ্রীযুক্ত মল্লিকের পরবর্তী প্রয়াস 'আকাশ-পাতাল'। প্রাইমা ফিল্মসের শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নানের উদ্যোগে ছবিটি নির্মিত হয়ে মুক্তলাভ করল ১৯৩৮ সালে। ১৯৪২ সালে মুক্তি পেল অমরলিপি (শ্রী পি এম বাগচীর সহযোগিতায়)। পরবর্তী ছবি কুইন এ্যাণ্ডোফিলিস (ম্যালেয়া সংরক্ষণ)।

জাতীয় সঙ্কল্প সাটিফিকেটের উপর 'সঙ্কল্পিতা' নামে একটি ছবি তিনি করেছিলেন, তবে এটি পুরো কাটুর্ন নয়। বর্তমানে তিনি আবার একটি বিজ্ঞাপ্যক কাহিনীকে বাস্তবিক রূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন।



মন্ডার মল্লিক

বিখ্যাত চিত্র-সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নল্লজেন্দ্র ভট্ট পরিচালিত 'মৌচাকে জিল' ছবিটির টাইটেল তিনি করেছিলেন। একটি ব্লক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের তিনি স্বরাধিকারী। 'মন্ডার স্টুডিও' তাঁর কলকাতার অত্যন্ত প্রাক্ট পরিচালক।

মন্ডার মল্লিক যেসময়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কার্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ছিল না। বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, সংগ্রাম করতে হয়েছে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। পরিণামে এসেছে ভয়, এসেছে সঙ্কল্প। প্রমাণিত হয়েছে মহৎ প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগে বার্থ হওয়ার নয়। মন্ডার মল্লিকেরা যখন কাজ শুরু করেন তখন যুগপতি পর্যন্তও তাঁদের তৈরি করে নিতে হতো—এ প্রসঙ্গে এ কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আগামী প্রচেষ্টা সর্বাত্মক জয়যুক্ত হোক, সর্বাঙ্গবর্তন এই কামনা করি।

## নরেন্দ্রনাথ মিত্র

[প্রখ্যাত কথাসিদ্ধী]

সাঁইহোবর গাতায় জীবনের সার্থক প্রতিষ্ঠায় ভূমিপ্রান্তের সমুদ্রত শীর্ষে যাদের আসন সর্গোববে নির্ধারিত, বলিষ্ঠ সজ্জনধর্মী রচনা যাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে অক্ষরপু যশের ভগতে, যাদের তীক্ষ্ণ লেখনী ভরিয়ে তুলে চলেছে অগণিত পাঠক-পাঠিকার পিপাসু মন—কথাসিদ্ধী নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অত্যন্ত। আজকের দিনের বিদগ্ধ কথাসিদ্ধীর তালিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটি বিশেষ নাম।

জীবনের একটি শতাব্দীর অর্ধাংশ এখনও অজিকান্ত



নরেন্দ্রনাথ মিত্র

হয় নি। ১৯১৬ সালের ৩০শে জাহ্নবীরী স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও স্বর্গীয়া ধীরাজবালা মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুরের অন্তর্গত সদরদিতে।

সদরদি নথ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার সূচনা। ভাণ্ডাইইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ দিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে। এখানেই সহপাঠী হিসাবে লাভ করলেন এ-যুগের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ কৃপাশিল্পী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। দৈনিক দ্বিবেদেও রাজেন্দ্র কলেজ তাঁর মনে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। কলেজজীবনের সেই পরিচয় উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উভয়কে ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে তুলল। ১৯৩৫ সালে আইএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এলেন কলকাতায়। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় সফলকাম হলেন ১৯৩৯ সালে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল সেই বছর।

স্কুলজীবনে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য-সভা আয়োজন, গ্রন্থাগার গঠন প্রভৃতিতে নরেন্দ্রনাথকে দেখা যেত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে। কলেজজীবনে সভাপতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'জয়যাত্রা' নামে একটি

নরেন্দ্রনাথকে পাঠকসমাজ সাধারণত গল্পকার, উপন্যাসিক হিসাবে চিনলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা কবিতাই। 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'মুক'। প্রথম গল্পও প্রকাশিত হয় 'দেশ'-এই। গল্পটির নাম 'মৃত্যু ও জীবন' (১৯৩৬)। তারপর প্রবাসী, বিচিত্র, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকাদিতে তাঁর লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। নরেন্দ্রনাথের লেখা যে সময়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন পরিচয় সম্পাদনা করতেন কবি মনসুই সূর্য্যক্লনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস দ্বীপপুঞ্জ ('দেশ' পত্রিকায় এই উপন্যাসটিই 'হিরণ্যক' নামে ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।) ১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি অসমতল (গল্প সংগ্রহ) তারপর অসংখ্য সার্গিক, জনপ্রিয় এবং বহুজনসমাদৃত গ্রন্থ তাঁর লেখনী থেকে রূপ নিয়েছে। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা বর্তমানে পঞ্চাশ।

ছায়াচিত্রেও তাঁর কয়েকটি কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। 'গোধূলি' তাঁর রচনার প্রথম চিত্ররূপ। অসবর্ণা, হেডমাষ্টার, শান্তি ছবি তিনখানি তাঁরই কাহিনী অনুসরণে গড়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'মহানগর' ছবিটির কাহিনী তাঁরই রচনা। বগমহলে অভিনীত 'দূরপ্রাণী' নাটকটির কাহিনীকার তিনিই। ১৯৫১ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। তার পূর্বে স্বরাজ ও সত্যযুগ প্রভৃতি পত্রিকাদের সঙ্গে তিনি কর্মসম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন।

পিতৃদেব মহেন্দ্রনাথ ছিলেন রসগ্রাহী পুরুষ, সাংস্কৃতিক অতুলীনে মগ্নচিত্ত। অভিনয়ে ছিল তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা, সঙ্গীতে ছিল যথেষ্ট দখল আর ছিল প্রগাঢ় শিল্পাচরণ। সব মিলিয়ে তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হয়ে উঠেছিল সর্বতোভাবে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের স্পর্শসমৃদ্ধ। সেই পরিবেশেই মানুষ হয়েছেন নরেন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনে বাবার প্রভাব তাই এত অসামান্য। বাবার প্রেরণাই তাঁর জীবনের যাত্রাপথে এক মহামূল্য পাথর।

নরেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীমতী শোভনা মিত্র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যথেষ্ট অমুরাগিণী এবং স্নেহলব্ধ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র নরেন্দ্রনাথের অমুগ্ধ। অমুগ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—'ওতো শুধু আমার ভাই-ই নয়, ও একাধারে আমার ভাই, বন্ধু, সহায়ক'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও তাঁর অন্তরঙ্গ লেখকবন্ধুদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং জ্যোতির্জিৎ নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রনাথ সাধারণত সকালেই লেখেন। লেখার আগে একবার পার্কে একটু বেড়িয়ে আসেন। চিঠি

# নূট হা ম জু ন

সুনীলকুমার নাগ



**বিংশ** শতাব্দীতে গোটা পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে বিশ্বব্যাপী। এমন কোনো দেশ বা ভাষা-গোষ্ঠী

পাওয়া যায় না যেখানে কিছু না-কিছু কালজয়ী সৃষ্টি না হয়েছে বা নতুন ধরনের সৃষ্টি না হয়েছে। সাধারণভাবে এ কথাটা পৃথিবীর সব দেশের পক্ষে কমান্বশি সত্য। কিন্তু বর্তমানকালে এমন দেশ রয়েছে মৌলিকতার দাবীতে যে সমস্ত দেশের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি অগ্রগণ্য।

নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যান্ড রাজনৈতিক ব্যাপারে অত্যন্ত দিনে আলাদা আলাদা পাঁচটি দেশ হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বহুতে গেলে প্রায় এক। সেইজন্মেই দেখা গেছে বিগত দেড় শ' কি দু'শো বছরে এখানকার রাজনৈতিক মানচিত্রে বজ্রবাহ পরিবর্তন হয়ে গেছে। কখনো দু'টো কখনো বা তিনটে দেশ মিলে একটি রাষ্ট্রের পত্তন করেছে, কখনো বা আবার সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। যেমন এখন হয়ে রয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে কারোই বুঝতে থাকি থাকে না যে, একে একে কখনই হয়েছে জনগণের ইচ্ছাতেই হয়েছে, কারণ সহজ-সরল পক্ষে চলবার জন্তে সাধারণ মানুষের মধ্যেই সবসময়েই একটা স্বতন্ত্রবৃত্ত আশ্রয় দেখা যায়। কিন্তু পৃথক কখনই হয়েছে প্রত্যেকবারই সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণী, তথা শাসনব্যক্তির ক্ষমতাপ্রিয় ছোটো ছোটো দলের প্রচার ও প্রচারণার বিঘেই হয়েছে। কারণ একটা কি দু'টা সরকার ভেঙ্গে চারটি কি পাঁচটি করতে পারলে একদিকে যেমন শাসিতেরা থাকে চরল তখন তেমনি বড়ো বড়ো পদের

যাই হোক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং আইসল্যান্ড এই যে পাঁচটি দেশ, সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা এক। এদের সবাইকে নিয়ে যদি একটি গোষ্ঠী ধরা যায়, তা হলে দেখা যাবে পৃথিবীর যে কোনো দেশ বা ভাষা গোষ্ঠীর চাইতে এই স্বাধীনভিারান গোষ্ঠীর সৃষ্ট সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। ইংরেজী (আমেরিকানসহ), ফরাসী বা রুশ সাহিত্য পরিমাণের দিক থেকে অনেক বেশি সম্বল নেই, কিন্তু স্বর্ণগতভাবে স্বাধীনভিারান সাহিত্য অধিতার বললেই চলে। এই শ্রেষ্ঠতার কারণ শুধু নোবেল প্রাইজ পাবার জন্মেই নয়, (এই অঞ্চলের নরওয়ে এখান পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, যদিও যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ইবসেন, তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি); বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গি তথা শিল্পাত্মকতার মৌলিকতাই এই অঞ্চলটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। ইবসেন, বয়র, হামসুন, বিয়র্সন, লেগারলক, উনসেট, সিলানপা, নেস্ট্রো, জেনসেন, লী, কেলান, ল্যান্সনেস—এঁদের প্রভাবের বাইরে আজকের পৃথিবীর খুব বেশি লেখক রয়েছেন কি? কোথাও এঁরা সরাসরি অল্প লেখককে প্রভাবিত করেছেন, কোথাও বা অল্প কোনো লেখকের মাধ্যমে।

আমাদের বর্তমানের আলোচ্য নূট (কন্ট) হামসুন ছিলেন নরওয়ের লোক। বাস্তবধর্মী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হিসেবে হামসুনের লম্বক কাউকে আজ পর্যন্ত খুব বেশি দেখা যায় নি। তাঁর আগে 'নরই,

হামসুনের সাহিত্য আলাচনার পূর্বে তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার। কারণ, ব্যক্তিকে কিছুটা জানা থাকলে তাঁর সৃষ্টির রসগ্রহণে সুবিধে হয়।

**জীবন**—নূট (কনুট পেডারসেন) হামসুন (১৮৮১-১৯২১) ছিলেন একটি কৃষক-পরিবারের ছেলে। এই পরিবারটির কয়েক পুরুষের কুলপঞ্জী আছে। শতাধিক বছর ধরে কৃষিকর্ম ছিলো এই পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা। কাজেই মাটির সঙ্গে যোগাটা যে এদের কতো গভীর ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে পড়বার ফলে হামসুনের দেখান্তনো এবং তাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব এসে পড়ে এক কাকার ওপর। এদের পদবী ছিলো পেডারসেন। 'হামসুন' ছিলো ওদের খামারটার নাম। কিশোর বয়স থেকেই নূট খামারটার নামই নিজের পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে কেউ বাপাটারাকে বালকের খেলা বললে গ্রাম্যের মধ্যেই আনেন নি; কিন্তু পরে এইটাই স্থায়ীভাবে তাঁর পদবী হয়ে পড়ে।

লেখাপড়ার দিকে পেডারসেন পরিবারের কারোই বিশেষ আগ্রহ ছিলো না। ছেলেরা সবাই যাতে গায়ে-পায়ে খেতে খেতে পারে বড়োরা সেইদিকটাতো লক্ষ্য রাখতেন। হামসুনও খুলে পড়াশুনো করবার সুযোগ পান নি কোনোদিন। ঠর কাঁকা একবারে বালক বয়সেই হামসুনকে এক মুচির কাছে দিলেন কাজ শেখবার জন্তে। এই মুচিটি ছিলো বিশেষ অবস্থাপন্ন এবং কারিগর হিসেবেও নিপুণ। শহরের জানী, গুণী এবং অবস্থাপন্নদের অনেকেই মাঝে মাঝে আসতেন জুতো এবং চামড়ার তৈরি বিভিন্ন জিনিসের অর্ডার দিতে। তাঁদের শোষক-আশাক, তথ্য মার্জিত কথাবার্তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতো হামসুনকে। বিশেষ করে এদের সান্নিধ্যে এসেই হামসুনের মনে বাসনা জাগে কিছু লেখাপড়া করবার। অক্ষর পরিচয়টা অবশ্য আগেই হয়েছিলো।

এবার প্রথম কিছুদিন চললো এলোপাঠাড়াভাবে পড়াশুনো। হাতের কাছে যা পেলেন তাই পড়তে আরম্ভ করতেন। মাসকয়েক এইভাবে কাটবার পরেই হামসুন নিজেই বুঝতে পারলেন যে মোটেই এগোনো যাচ্ছে না। কারণ যা পড়ছেন তার বেশিরভাগই বুঝতে পারছেন না। তারপর একটা ছুলের সিলেবাস সংগ্রহ করে তার নির্দেশ অনুসারে পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। এতে আশ্চর্য ফল দেখা গেল। প্রতি বছর অন্তত তিন বছরে পঠনীয় বই পড়ে শেষ করতে লাগলেন হামসুন। মাতুরো বছর বয়সের সময় দেখা যায় হামসুন একটা লোকানের কেরাণীর কাজ করছেন এবং বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই করছেন। কিছুদিন এই চাকুরীটা করবার পরে হামসুন ব্যবসা করবার ধাক্কায় কয়েকটা মাস নষ্ট করলেন। তারপরেই দেখা যায় ঠুকে একটা খুলে শিক্ষক হিসেবে। খুলের পাঠাসূচী অনুসারে পড়াশুনো শেষ করবার পর থেকেই বিশেষ করে সাহিত্যবিষয়ক বইপত্র পড়তে আরম্ভ করেন হামসুন। জন্মশ এই পড়ার দিকেই হুঁকে পড়লেন উনি। প্রায় এক বছর শিক্ষকতার পরেই দেখা যায় হামসুন আবার অন্য একটা চাকুরীতে ঢুকেছেন এবং দু-একটা সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা, প্রধানত কবিতা পাঠাচ্ছেন : এর মধ্যে

করবেন। 'এতদিন' নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে ছোটো একটা শহর ছিলেন উনি, এবার তাই দক্ষিণে চলে এলেন। বাস্তবানী তৃপ্তো এবং জিশিয়ানী প্রভৃতি সব বড়ো বড়ো শহরই দেশের দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু বড়ো শহরে এসেও আলোর মুখ দেখতে পেলেন না হামসুন। কোনো কাগজে চাকুরীও জুটলো না বা লিপেও তেমন কিছু রোজগারের সম্ভাবনা দেখা গেল না। তাই আবার কিছুদিন ছোটোখাটো কাজ করেই জীবিকা অর্জন করতে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভাবে চলতে চলতে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হামসুন। স্বদেশে থেকো নিজের স্বপ্নকে কোনোদিনই সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যাবে না মনে হলো হামসুনের। তাই ভাগ্য পরীকার জন্তে হামসুন সাগরপাড়ি দিলেন, চল এলেন আমেরিকায়। আমেরিকায় এসেও জীবিকা অর্জন করতেই হামসুনকে এতটা বাতিবাশ্ত হয়ে পড়তে হলো যে, সাহিত্যসাধনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবারই উপক্রম হলো। কখনো ফলস বাগানের মজুর, কখনো গমের গোধের মজুর, কখনো বা ট্রামের কণ্ডাক্টরের কাজ করতে হয়েছে হামসুনকে। নিউফাউন্ডল্যান্ডে কিছুদিন জেলের কাজও করেছেন উনি।

ট্রাম-কণ্ডাক্টরের কাজ থেকে হামসুন সেভাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাই থেকেই বোঝা যায় খুল-কলেজের লেখাপড়ায় বঞ্চিত হলেও হামসুন কতো নিরলসভাবে পরিশ্রম করতেন নিজেকে শিক্ষিত কবে তুলবার জন্তে। একশানি বই ঠর পুকেট সব সময়েই থাকতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কখনো পাঁচ মিনিট ফুরসৎ এসে গেলেও হামসুন সেই সময়টার, একপৃষ্ঠা 'কি হু' পৃষ্ঠা, নিম্নেন কয়েকটা লাইন হলেও একই পড়ে নিতেন। গ্রীসের প্রাচীন কাব্য, নাটক এবং ইতিহাস হামসুন এইভাবেই পড়ে শেষ করেছিলেন।

একদিনের কথা বলি। ট্রাম চলছে, চলন্ত ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বই পড়ছেন হামসুন। একটা ঠপে এসে থামলো ট্রামটা। একজন বাড়ী ওঠবার সময় বাধা পেলেন হামসুন দাঁড়িয়ে থাকবার জন্তে। একটা ধমক দিয়ে ভদ্রলোক মীটে গিয়ে বসলেন। হামসুন নিজের ত্রুটির জন্তে মার্জন চাইলেন। সেইদিনই ডিউটির শেষে টাকাকড়ি জমা দেবার জন্তে অফিস গিয়ে স্তনতে পেলেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা। সেদিনের বাড়ীটো তো নালিশ কবেছেনই তাঁর আগে আরো কয়েকজন একই নালিশ জানিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে—ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় সময়ই বই পড়ে কণ্ডাক্টর হামসুন। আর তারই ফলে বাড়ীদের ওঠা-নামার বাধা সৃষ্টি হয়।

ট্রাম কোম্পানীর অফিসার বসলেন—কি পড়ছিলে তুমি অতো ওয়ায় হয়ে?

—জাজে মিডিয়া।

—মিডিয়া? সে আবার কি বাপু?

—মিডিয়া, মিডিয়া, মিডিয়া জানানো না? ইউরপিদেসের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক, অবশ্য অলেকশান্ডিসও কম যায় না, তবে মিডিয়ার মতো অতোটা.....।

—চোপ রও ছোকরা, এটা অফিস, তোমার নাটকের কথা বলবার জায়গা নয় : গিক জ্যাংক, সোল পোলক হেনি সপ্লেক

## নূট হামসুন

এটা কখনো সেটা করে বছর দুই আমেরিকার কাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন হামসুন। কিন্তু দেশেও ভাগ্য ফেরাবার কোনো কৌশল উদ্ভাবন করতে পারলেন না হামসুন। তাই আবার বছর দুই বাদে আমেরিকাতেই এলেন। এবারও কাটলো দু' বছর আমেরিকাতে, তারপর আবার দেশে ফিরলেন।

এটা ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের কথা। উনিশ বছর থেকে আরম্ভ করে এই দশটা বছর বলতে গেলে একটানা অনিশ্চিত অবস্থার নিরাক্রম কষ্টের মধ্যে কাটলো হামসুনের।

ছাপার অঙ্কের প্রথম বই অল্প এর আগেই প্রকাশ করেছিলেন হামসুন; একখানি ছোট উপন্যাসিক। কিন্তু সে বই প্রকাশ করে প্রকাশকের গিয়েছিলো লোকদান হয়ে, তাই সহসা আর কিছু প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধেও করে উঠতে পারছিলেন না, যদিও একাধিক পাতুলিপি তাঁর তৈরি ছিলো। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরে হামসুন তাই আর গোটা বই ছাপাবার চেষ্টা না করে একখানা উপন্যাসের কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত আকার লিখে ডেনমার্কের একটি মাসিক পত্রিকার ছাপবার জন্যে পাঠালেন। এই রচনাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্যান্টিনেভিয়ার হামসুন বাস্তবায়িত বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই রচনাটি বিখ্যাত 'হাস্কার'-এর সংক্ষিপ্তরূপ।

এটা ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের কথা। এর পর থেকে জীবিকার ভাঙে লেখা ছাড়া কখনো আর কিছু করতে হয় নি হামসুনকে। পরিণত বয়সে, ঘাটের কোঠার পা দিয়ে (কখনো নোবেলপ্রাইজ পাবার পরে) পৈতৃকবৃত্তি কৃষিকর্মের দিকে হামসুন একবার মন দিতেছিলেন বটে, তবে সে নেহাৎ খোরালের বশে; প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

সাহিত্য—হামসুনের রচনাবলীর মধ্যে প্রধান হচ্ছে তেরোখানি উপন্যাস—হাস্কার, আলো সয়েল, গ্রোথ অব দি সয়েল, পান, ডিমার্স, মিস্টার্স, দি উওমান এন্ড দি পাল্প, চ্যান্টার দি লাস্ট, ভ্যাগাবণ্ডস্, অগাস্ট, দি রোড লীডস্ অন, দি রি-ইজ, ক্রেপুড এবং লুক বাক অন অ্যাপেনিস।

হামসুনের সাহিত্যের মধ্য থেকে প্রধানত দুই জাতীয় চরিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। প্রথমত যে জাতীয় জীবনধারার সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তার ফলস্বরূপ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত কিছুটা অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী টাইপ, এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত অবস্থার বেঁচে থাকে, ভবগুরের জীবনে বাধ্য হয়ে অভ্যস্ত হয়ে-পড়া অপূরণে দুঃখভরা সঙ্গে মিটমিট করে চলতে অনভ্যস্ত, যেমন দেখা যায় হাস্কার, ভ্যাগাবণ্ডস্ প্রভৃতি উপন্যাসে; আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আর একজাতীয় চরিত্র যারা সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জ্ঞে সদাই আগ্রহশীল। জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে চলাই যাদের প্রকৃতি—কখনো সাধারণ মানুষ। এ জাতীয় চরিত্র হামসুনের লেখার সবচাইতে ভালোভাবে ফুটেছে 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এ। আমরা তাই হামসুনকে বোঝবার সবচাইতে নিশ্চিত উপায় হিসেবে দুই জাতীয় দু'খানা বই হাস্কার এবং গ্রোথ অব দি সয়েল নিয়ে আলোচনা করবো।

হামসুনের জীবনের মোটামুটি যে আভাসটুকু আমরা পেয়েছি, তা থেকেই বোঝা যাবে যে, 'হাস্কার'-এর কাহিনীভাগ হামসুনের নিজেরই

আমেরিকা যাবার পূর্বে তুলো এবং ক্রিশ্চিয়ানাতে লিখে জীবনে পীড়ার চেষ্টা যে মারাত্মক অসুপারিস্টে করতে হয়েছিল হাস্কার যে তারই অশ্রুসজল বেদনাবিশুদ্ধ বাস্তব কাহিনী—এ কথা মনে করবার একাধিক কারণ আছে।

হাস্কার-এর কাহিনী 'আই' অর্থাৎ আমি'র জ্বালীতে লেখা। আলোচনার প্রয়োজনে এই 'আমি'কে আমরা হামসুনই বলবো।

কাহিনীর শুরুতে একেবারে প্রথম তিন লাইনেই হামসুন বলেছেন:

‘...সেই সময়কার কথা বলছি যখন আমি ক্রিশ্চিয়ানাতে জনশনসিষ্ট ছয়ছাড়ার মতো অনিশ্চিতভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াইতাম; ক্রিশ্চিয়ানা, ও: কি অস্থিতির এক নগরী! যে কেউ একবার এ নগরীতে এসে পড়েছে, সেই দেখবে যাবার সময় এ নগরী তার মনে কি ক্ষত সৃষ্টি করেছে!’

ভোর হয়েছে। চাই কি বেশ একটু বেলাই হয়েছে। হামসুন বুঝতে পারছেন বিহীনভাবে কোলাহলমুখর হয়ে উঠছে; সবাই যে বার কাজে ব্যস্ত। শুধু তাঁরই কোনো কাজ নেই। হামসুন বেকার যুবক। দারিদ্র্য বেকার। তাই ভোগেও শুয়ে রয়েছেন বিছানায়। আর মনে হচ্ছে, আগামী দিনের জন্যে উৎসুক হবার কোনো কারণ আছে কি? সহস্র প্রশ্নও সম্ভবিসম্ভব কোনো জবাব আসে না ভেতর থেকে।

‘...বিছানা ছেড়ে উঠলাম, বিছানার এককোণের দিকে একটা নাপিল পড়েছিলো, খাবার মতো যদি কিছু পড়ে থাকে ওর মধ্যে এই আশার হাত বাড়ালাম। কিন্তু না: কিছু নেই!’

অসংখ্য জারগার চাকুরীর জন্মে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন হামসুন—কোথাও সরাসরি এবং স্পষ্ট না শুনেছেন, কোথাও বুঝা আশ্বাস দিয়ে লোকে হরদান করেছে; কোথাও বা চাকুরী একটা হতে পারতো এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছাত পারলে। কোথাও নগদ সিকিউরিটি রাখবার অক্ষমতার জন্যে চাকুরী জোগাড় হলো না—এই বকম সব। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ফাগার ব্রিগেডের কর্মী হবার জন্মে আরো অনেকের পাশে বুক ফুলিয়ে গিয়ে পীড়ালেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও হলো না কিছু। অফিসার জানালেন তোমার যে চোখ খারাপ। পরদিন হামসুন চশমাটা পকেটে পুরে আবার এসে লাইনে পীড়ালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অফিসারই আজ্ঞা এলো এবং একনজরে দেখেই চিনতে পারলো; সে আগের দিনই জেনেছে যে হামসুনের চোখ খারাপ, কাজেই কিছুটা হলো না।

সর্বত্র এইভাবে বার্থমনোরথ হতে হতে শেষ অবধি হামসুন নিজেই বুঝতে পারলেন যে, বেকার সাইস আর মনের বল কি ভীষণভাবে কমে গিয়েছে; তা ছাড়া ভয়ঙ্কর ভাবে কারো সামনে গিয়ে পীড়াবার মতো জামাকাপড়েরও অভাব দেখা দিলো।

‘...রাস্তায় রাস্তায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরতে লাগলাম, কখনো একটানা চলছি, কখনো বা এখানে-সেখানে থামছি একবার, দেখছি একবার এদিক-ওদিক, আবার চলছি...মহাশূন্য। বন্ধ এবং উজ্জ্বল, আমার মাথার মতোটাও যেন অমনি ঝাঁক হয়ে গেছে।’

সেদিন হামসুন তাঁর ওয়েস্টেকাটাটা এক মহাজনের কাছে বন্ধক

‘...আমার কেবলই মনে হতে লাগলো যে খুব ভগবান আমার পেছনে লেগেছেন...বখন যেখানে যাই শুধুই হতাশা আর হতাশা।’

ওয়েস্টকোট ঘোঁ টাকা ক’টি স্বপ্ন করে একটি প্রবন্ধ রচনার কাজে উঠেপড়ে লেগে গেলেন হামসুন। একটা কাগজের সম্পাদকের খুবই ভালো লাগলো রচনাটি। তাই নগদ কয়েকটি টাকা দক্ষিণাও দিলেন। কিন্তু তারপরে বেশ কিছুদিন চেষ্টা করেও আর যেন মনের মতো লেখা তৈরি হচ্ছে না দেখা গেলো। তবু বারকয়েক ঘোঁ-ফেরা করলেন সম্পাদকের কাছে। এই সম্পাদকমশাই তরুণের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল, নানাভাবে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেন তাঁকে। গুরু ব্যতীত এতই ভক্ত এবং শিষ্ট যে, তার কাছে হাত পেতে সাহায্য চাইতেও বাধে হামসুনের। এদিকে অজ্ঞা দু-একটি কাজের সম্ভাবনা দেখা দিয়েও শেষ পর্যন্ত ছুটলো না। কাজেই আবার শুরু হলো অনশন। দিনের পর দিন চলতে লাগলো একইভাবে।

এদিকে যে ঘরটার রাত কাটাতেন হামসুন—এক বাড়িওয়ালীর ভাড়া-চোরা পরিভ্যক্ত একখানা ঘর, তারও ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন ধরে। বাড়িওয়ালী ছিলো কিছুটা ভক্ত প্রকৃতির। শিক্ষিত বেকার যুবকের দুর্দশাটা যে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে তা বুঝতেন। তাই বড়ো একটা ভাগাদা দিতেন না। কিন্তু হামসুনের বিবেক এবং বিচারবোধ এখনো যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। ক্ষুধার তাড়না মাঝে মাঝে তাঁকে উদ্ভাদপ্রাণ করে তুলেও এখনো বেশিরভাগ সময়েই তিনি সং এবং স্বাভাবিক চিন্তাই করে থাকেন। কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাড়িওয়ালীকে কিছু দেবার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বসেন। বাড়িওয়ালী বুঝতে পারে যুবকের বাস্তবজ্ঞানের অভাবের কথা। কাজেই কথামতো টাকা না পেলেও কিছু বলে না। বাড়িওয়ালীর এই ভক্তব্যবহারের ফলে হামসুনের মনে দেখা দেয় আরো লজ্জা। লজ্জা এবং দ্বিধার। নিজের কাছে মরমে মরে যান হামসুন। কখনো মনে হয় নিজেকে অযোগ্য বলে, কখনো মনে হয় যেন গোটা দুনিয়াটা, ভগবান পৃথক যেন বড়দত্ত করেছেন তাঁকে তিলে তিলে মেরে ফেসবার জন্তে।

একবার কথামতো বাড়িভাড়া না দিতে পারার লজ্জায় হামসুন আর বাড়িতেই ঘিরবেন না ঠিক করলেন। কিন্তু দারুণ জীতের তাড়নার বাইরে টিকতে না পেরে যদিও ফিরলেন কিন্তু দেখা গেলো চাবিটা হারিয়ে গেছে। এতো রাতে দরজা ভাঙা ঠিক হবে না মনে করে স্তরে রইলেন এক পাঁকে। কিন্তু এখানেও স্থিতি নেই। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেলো থানায়; তাঁকে গৃহহীনদের একজন মনে করে। কিন্তু হামসুন নিজেকে এখনো গৃহহীনদের সামিল মনে করতে পারেন না। এখনো জীবন সম্পর্কে তিনি একেবারে হতাশ হন নি। তাই থানার অফিসারের কাছে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলে মিলিয়ে পরিচয় দিলেন।

সাংবাদিক শুনেই রাতের মতো ভালো খোঁবার বন্দোবস্ত হলো কিন্তু খাবার কিছু পাওয়া গেলো না—কারণ, অফিসার মনে করলো উনি তো আর প্রবৃত্ত অভাবগ্রস্ত নন; কোনো কারণে সময়মতো

পেলে হামসুন বান্নে। হামসুন ঝোঁক করতে লাগলেন শরীর ভেতরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে—এবটু একটু করে পুড়ে নিশেষ হচ্ছে।

আবার রাস্তা। এ রাস্তা যেন অফুরান।

‘...যেঁচে থাকবার জন্যে অর্ধসংজ্ঞার সমস্তরকম পরিচিত উপায়েই আমার চেষ্টা করা হয়ে গেছে। সব দিকেই অসফল্য। কে যেন আমার বুকের ভেতর বলতে শুরু করলো : ‘আরে নির্ধোঁ, তুমি যে মরতে শুরু করছো।...’

‘...পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে পেলাম একখানা ছোট্ট ছড়ি পাথর। সেখানা কুড়িয়ে নিলাম। কোটের ওপর একটু বুলিয়ে সাফ করে নিয়ে পুরলাম মুখে—কিছু একটা না চুষতে পারল গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছিলো।...’

‘...বুঝতে পারছিলাম আমার চোখ দুটো ক্রমশ মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছিলো।...’

কিছুদিন আগে একটা মেরেকে পথ চলতে দেখে ভালো লেগেছিলো হামসুনের। একদিন আবার দেখা হয়ে গেলো তার সঙ্গে। হামসুন বুঝতে পারলেন যে মেয়েটিও চার ঠোঁক, কিন্তু নিজের শীমাহীন দারিদ্র্যের জন্যে পিছিয়ে আসেন।

এক কসাইয়ের দোকানের কাছে এসে থামলেন হামসুন।

‘...একখানা হাড় দিতে পারেন, দয়া করে? আমার কুকুরটার জন্যে, শুধু একখানা হাড় হলেই চলবে...’

কসাই দিলে একখানা হাড়। হাড়ের গায়ে কিছুটা মাংসও লেগেছিলো।

‘...আমার বুকের ভেতরটা সজোর দপ,দপ, করতে লাগলো। হাড়খানা কোটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে একটা সড় গলির মধ্যে ঢুক পড়লাম ‘...কোনো আশ্বাস পেলাম না। কাঁচা বজ্রের গন্ধে গা জ্বলিয়ে উঠলো। তারপরই মুহূর্তে বমি।...’

একদিন পথে এক জাহাজীর সঙ্গে আপ্যায় হলো হামসুনের। না চাইতেও তাঁর অবস্থা বুঝে কয়েকটা টাকা তাঁকে দিলো হামসুনকে। সেই টাকা স্বপ্ন করে উঠলেন গিয়ে এক পাঁছশালার। এবার একটা কিছু লিখে ফেলেতেই হবে মনস্থ করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন দুঃখকষ্টের ফলে মগজে যেন আর কিছু নেই। লেখা বেরতেই চায় না। এদিকে টাকাও ফুরিয়ে আসতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আবার রাস্তা।

এমনিধারা একটানা সংগ্রাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত জাহাজখাটার এক ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় হলো হামসুনের। এই ক্যাপ্টেন রাজী হলো তার জাহাজে তাঁকে কাজে নিতে। এইভাবে আপাতত রক্ষা পেলেন হামসুন।

‘হাজার’ যেমন মানুষের দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতার কাহিনী, ‘গোঁথ অথ দি সরেল’-এ আমরা তেমনই স্থবসমুষ্টি এবং মানুষের সমাজবদ্ধ মানুষের সংগঠনী শক্তি এবং স্বজনী-প্রতিভার সাফল্যের স্বাদ পাই—

আইজাক একজন শ্রমজীবী কৃষক। নগরসভায় বিরক্ত হয়ে চলে যায় প্রায় নির্জন একটা গ্রামে। সেখানে গিয়ে শুরু করে চাষ-আবাদ। ক্রমে সম্পূর্ণ নিজের কায়রকশমের ওপর নির্ভর করে গুরু



## নূট হামসুন

আইজাকের সঙ্গী বলতে শুধু তিনটি ছাগল। বসন্তকালে আইজাকের একজন সঙ্গী ছুটলো। পাশের একটি গ্রামে বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এলো একটি মেয়েকে। নাম তার ইঙ্গার। ইঙ্গার তরুণী, কিন্তু তবু তখন পর্যন্ত সে ছিলো অবিবাহিত। বিয়ের তার কোনো সম্ভাবনাও ছিলো না। কারণ তার মুখে ছিলো একটি খুঁত। ওপরের টেটিখানি ঠিক নাকের তলার দিকে ছিলো। চেরা—অনেকটা পরগোসের মতো। এরকম মেয়েকে আর কে গিয়ে করবে? ইঙ্গার চলে এলো আইজাকের সঙ্গে। দু'জনে মিলে নতুন উজ্জম ঘর বাঁধলো ওরা। ইঙ্গারের টেটের খুঁতটা সবাই পরিচায়কের দৃষ্টান্তে দেখলেও আইজাক সত্যমুড়তির সঙ্গেই দেখতে আরম্ভ করেছিলো একবারে প্রথম থেকে। আভাবিকভাবেই আইজাক কিছুটা সদয় প্রতিক্রিয়া মাত্র। ক্রমে গভীরভাবে ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে লাগলো। ওরা দু'জনে মিলে অবিভ্রান্তভাবে পরিশ্রম করে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা আনলো। যথাসময়ে ওদের প্রথম সন্তান হলো—একটি ছেলে। ছেলেটির বয়স বখন এক বছর পূর্ণ হলো তখন ওরা একদিন পাশের গ্রামের গির্জায় এলো। ছেলের নামকরণের জন্তেও বটে, আবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজদের বিয়েটাও করা সরকার।

এ গ্রামে এসেই ওদের সংসারের ওপর যেন শনির দৃষ্টি পড়লো। ইঙ্গারের এক বয়ীসী বিধবা আত্মীয় ওদের স্বপ্নসমুদ্র দেখে উৎসাহে উঠলো। ইঙ্গার নিজের মুখের খুঁত সন্তোষে সর্বসময়েই সচেতন। প্রতিটি সন্তানের জন্মের পরে ও সহকৃৎ দৃষ্টি রাখে ওর খুঁতটা তাদের কারো মধ্যে বস্তার কি না দেখেবার জন্তে। প্রথম দু'টি সন্তান নিখুঁতই হলো। কিন্তু তৃতীয় সন্তানটি জন্মের সময় ঐ বিধবা আত্মীয় ইঙ্গারের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করলো, তার মধ্যে মায়ের খুঁত দেখা দিলো, সাধারণত ঘরে মাংসের উপচায়ের পাত্র যাতে না হয়ে থাকতে হয়, সেইজন্তেই ইঙ্গার তার শিশুকে নষ্ট করবে মনস্থ করে বেগিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে। অলিভ নামে ঈশাকাতর আর একটি লোক ব্যাপারটা সবাইকে জানিয়ে দেয়। ইঙ্গারকে আইজাক মার্জনা করলো বটে, কিন্তু দেশের আইন মার্জনা করলো না। আট বছরের জন্তে জেলের হুকুম হলো তার। কিন্তু আইজাক-পরিবারের একজন প্রকৃত বন্ধু গেইলসারের তরুণের ফলে বহুবাকানক বাদেই ইঙ্গার ছাড়া পেলো। জেলে যাবার সময় ও ছিলো অন্তঃসত্ত্বা। জেল থেকে ফিরলো একটি নবজাত শিশু নিয়ে। এটি একটি মেয়ে। ঐ বিধবা আত্মীয়ার প্রভাবটা এক্ষেত্রেও কাজ করেছিলো। মেয়েটিরও ওপরের টেট দু'খানি পরগোসের মতো কাটা। কিন্তু এবার বিজ্ঞান এগিয়ে এলো ওদের সাহায্য করার জন্তে। একটা অপারেশন করে কাঁটা টেট জোড়া লাগানো হলো।

জেলে কিছুকাল থাকবার ফলে ইঙ্গারের মধ্যে অবশ্য কয়েকটি পরিবর্তন দেখা দিলো। চাষবাস এবং পাড়াগাঁয়ের ঘর গৃহস্থালী এখন তার আর ভালো লাগে না।

আইজাকের বড়ো ছেলে এলিসিয়াস এক এয়রিন্দারের নজরে পড়ে গাঁ ছেড়ে চলে এলো শহরে। চাষবাস তারও ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত ও আমেরিকা চলে গেলো এবং সেখানেই

এদিকে আইজাকের জমির তলার তামার খনি আবিষ্কৃত হলো। তার ফলে আর্থিক অবস্থা গেলো আরো ভালো হয়ে। ক্রমে এ গ্রামে অজ্ঞাত লোকজনও এসে ছুটলো বসবাসের উদ্দেশ্যে। আইজাক একফলের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। নতুন ঘারা এসে ক্ষেতখামার পল্লন করলো তাদের একজনকে নাম এলেক্স। এলেক্স বারত্রো নামে একটি তরুণীকে নিয়ে এলো কাজকর্মের সাহায্যের জন্তে। ওরাও স্বামীস্ত্রী মতোই চলতে লাগলো। বারত্রোর ছেলে হলো যথাসময়ে। বারত্রো হলো শহর ঘেঁষা মেয়ে। শহরের এক বাড়িতে একসময়ে কাজও করেছে ও। কাজেই কোনোরকম ভাববাধা বাড়তে ও রাজী নয়। সেই জন্তেই দেখা যায় নিজের শিশুকে ডুবিয়ে মারে। বিস্ত ভাগ করে যেন একটা দুখানা ঘট গেছে। পুলিশ হেফাজতে বারত্রো চলে যাবার পর মামলা শুরু হলো শিশু হত্যার জন্তে। কিন্তু মহিলা নেন্তা মিলেস হোরাকলের নিপুণ ওকালতির জন্তে বারত্রো বেকশুর খালস পেলো। বারত্রোকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যেতেও চাইলেন। কিন্তু বারত্রো গেলো না। সে যে আবার সন্তানসম্ভবা।

এলেক্স কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে মতোই এগে করলো বারত্রোক। ওর শুধু দুশ্চিন্তা একটা ব্যাপারে। সে পারিবারিক অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীর কোনো সমস্যা নয়, বারত্রো যদি আবার মারে তার সন্তানকে—তাও নয়। এলেক্স একান্তভাবেই অর্থসম্পদের শাস্তিতে বিশ্বাসী। ওর শুধু চিন্তা এবার ফসলের কাজে আর স্ত্রীর সাহায্য পাওয়া বাবে না। একাই করতে হবে সব কিছু।

তাদ্রার এবং গ্রোথ অব দি সেয়েল স্পাইটই ত্রিমুখী হ'টি রচনা। দু'টি গ্রন্থক জগৎ। একটি নগরসভাকার নানা সমস্যার জর্জরিত অসহায় মানুষের হৃদয়; অণুটি প্রাতিষ্ঠিক পরিবেশে সবল, বর্মিত মানুষের বিজয়গাথা।

তাদ্রার নামক বাস্তব জীবন বাস্তব-টোকট চিত্রিত আছে। তাদের মধ্যে ত'জন বাদে আর প্রায় সকলেই যেন একটা মিছিলে চলেছে, একবার দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক সমস্যাটাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে বা একটু অজ্ঞানকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রোথ অব দি সেয়েল-এ তা নয়। প্রতিটি চিত্রিত তিনটি বাস্তব আসছে যেমন স্বাধীনভাবে, সরেও যাচ্ছে ঠিক যেমনি। এ যেন সভ্যজগতের একেবারে বাইরে কোনো জায়গা—কিবা বলা চলে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টির পূর্বে কোনো কাহিনি।

এই দু'খানা উপন্যাসেই হামসুন তাঁর বাস্তববাদকে এমন প্রকট করে একেছেন যে পাঠকমাজেই মনে একটা স্থান ছাপ থেকে যায়। এ দু'খানা বইয়েই সাধারণত থাকে 'নগর' বলা হয় তা বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত নগরতাও হামসুনে সাবদেশনীয় শিল্পবোধের জন্তে শিল্পই হয়েছে—নগরতা নয় নি। আইজাক এবং ইঙ্গার; এলেক্স এবং বারত্রো যে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যাবার পর থেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা ভুলে গিয়ে একসঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করলো—বা তাদের সন্তান হতে লাগলো, এগুলি আপাতদৃষ্টিতে নগরতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারেন এবং

যেন কেমন উর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছে। এ ঠিক স্বর্গীয় প্রেম নর, অথচ সমাজবিবোধীও কিছু নয় (তারা যে সমাজপ্রতিষ্ঠার বীজ বপন করছে) বরং বলা চলে যেন কিছুটা বুনা। আদম এবং ঈভের নগ্নতা যেমন একটা প্রাকৃতিক সুষমার ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো, এও যেন অনেকটা তাই। নয় কিন্তু অঙ্গীস নয়।

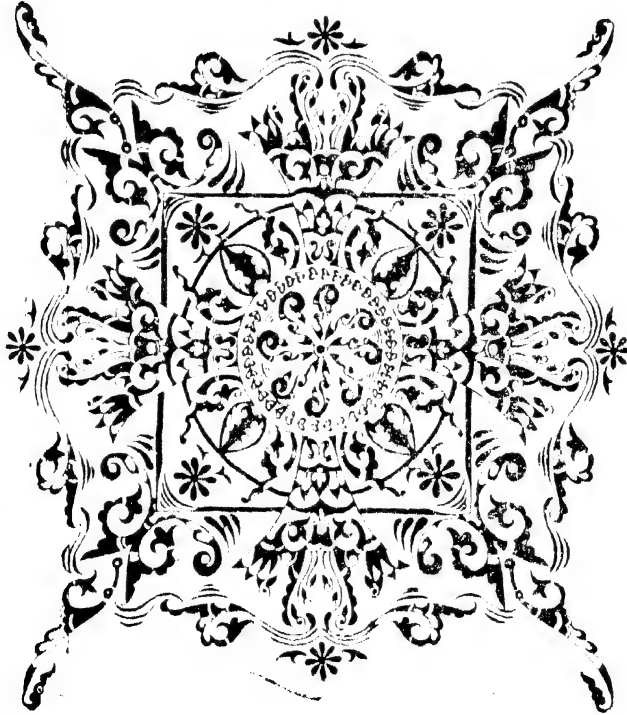
ঠিক তেমনি হাজারেও অন্তত দু'টি জায়গা আছে যা চূড়ান্ত অঙ্গীল হতে পারতো, কিন্তু হামসুন তাঁর শিল্পগুণ দিয়ে সবকিছু ঢেকে ফেলতে পেরেছেন।

দু'টি নরনারী পরস্পরের প্রতি যখন এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য বেশ কিছুটা পরিবেশের চেতনাহীন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটে তা প্রাকৃতিক নির্দেশেই ঘটে; মানুষ সেখানে অসহায় যন্ত্র মাত্র। তাই দেখা যায়, হামসুন যেদিন ইলাজালির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, শরীরটা তাঁর দুখাজর্জর হলেও মনে তাঁর মুক্তির আবাদ।

হাজারের অর্গ একটি জায়গাতে দেখা যায়, যে পান্থশালায় হামসুন আশ্রয় নিয়েছিলেন তার কত্রী একজন বোর্ডারের সঙ্গে পৈশাচিক আনন্দে লিপ্ত। এই কত্রীর স্বামী নিজেই হামসুনকে ডেকে দেখালো দু'শুটা দরজার একটা ফুটো দিয়ে। হামসুন দেখলেন বন্ধ ঘরটার মধ্যে একদিকে যেন আছে কত্রীর পসু এবং বুড়ো বাপ। আর একেবারে তার চোখেরই সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা। এ যে শুধু অর্থকষ্টের ফল নয় তা হামসুন বুঝলেন, এ হচ্ছে আরো অর্থের নেশা। এ যে নরকের চাইতেও ঘৃণ্য। হামসুন ঘৃণার শিউরে উঠে চোখ সরিয়ে নিলেন। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করলেন যেন বুড়োটা এখনি মারা যায়। হ্যাঁ, এখনি।

চরম বাস্তবচিত্র একেও হামসুন তাঁর এই ধরণের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের জন্তেই সাহিত্যে অমরত্বের অধিকারী।

আলপনা—শিল্পী—রমা বন্দ্যোপাধ্যায়



অজিতকৃষ্ণ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

# বাস্তবী মঞ্জিল



‘কাল বরং একটু আগেই চলে আসবেন, রোদটা কিমিয়ে পড়লেই।’ বলেছিলেন ভূতপূর্ব অ্যাটর্নী নিমাই মিত্তির।

রোদটা কিমিয়ে পড়বার একটু পরেই গিরে ঈড়ালাম অ্যাটর্নী বাড়ির গেটের মুখোমুখি উন্টো দিকের ফুটপাথে। আমার পিছনে অনতিদূরেই বড়ো স্থলতান মিয়ার ‘আদি ও অকুরিম’ অগুণী তামাকের দোকান।

হ্যাঁ, তখনো ও বাড়িটা অ্যাটর্নী বাড়ি। ‘দিনের শেষে যখন সন্ধ্যা নামে, তখন এ বাড়ি হয়ে যায় বাস্তবী মঞ্জিল।’ বলেছিলেন নিমাই মিত্তির। ‘তারপর সারারাত বাস্তবী মঞ্জিল। তারপর রাত ভোর হয়, রোদ ওঠে, তখন ফের অ্যাটর্নী বাড়ি।’

এখনই যাবো, কি একটু পরেই যাবো। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে ভাবছিলাম।

সহসা স্বপ্নভঙ্গ হল যেন। পিছনে গুনলাম বড়ো স্থলতান মিয়ার কণ্ঠস্বর: ‘সালাম আলারকুম, বাবুসাহেব।’

পিছন ফিরে সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধের মুখখানা দেখে মনটা খুলি হয়ে উঠল। বললাম: ‘আলারকুম সালাম, স্থলতান মিয়া।’

‘আপনাকে দেখতে পেয়ে দোকান থেকে উঠে এসলাম, বাবুসাহেব। বড়বাবুর কাছে যাবেন তো?’

‘হ্যাঁ, স্থলতান মিয়া।’

‘তেনার সবুজ কেডিলেক গাড়িখানা এই একটু আগেই যেখানে যেতে দেখলাম, বাবুসাহেব।’

‘গাড়িতে কি কিফি ছিলেন?’ তার কিমিয়ে পড়লেই আমাকে

একটু ফুরা স্বরেই বললাম কথাটা। আমাকে কাল সন্ধ্যা ভাষার একটু আগেই আসতে বলে তিনি আজ একটু আগেই বেরিয়ে যাবেন, এটা ভাবতেও দুঃখ হলো।

‘গাড়িতে বড়বাবু ছিলেন কি না সেটা ঠিক নজর করে দেখতে পারি নি বাবুসাহেব। আপনি যে আজ আসবেন। তাতো জানা ছিল না। অবিশিষ্ট উনি গিরে থাকলেও এমন হতে পারে যে খানিকবায়েই ফিরবেন। ততক্ষণ আপনি বরং মেহেরবানি করে বান্দার দোকানঘরে এসে একটু বসুন না।’

‘বসব?’

‘আপনার মেহেরবানি। অবিশিষ্ট ও বাড়িতে ঢুকে গেলেও আপনার খাতিরের কোনো কমতি হবে না, বড়বাবু থাকুন চাই না থাকুন। ছোটবাবু, মানে এখন বিনি অ্যাটর্নী, তারি উদ্দর-লোক কিনা—ইদিক দিয়ে লম্প-ব্যাটার ডুতনে সমান। খি, চাকর, ডেরাইভার, দারোয়ানগুলো সবাই উদ্দরলোক, নইলে ও বাড়িতে চাকরি থাকবে না কাকর কি।’

ভাবলাম নিমাই মিত্তির বাড়িতে আছেন কি না সেটা যখন নিশ্চিত জানা নেই, তখন বরং নিমাই মিত্তিরের সবুজ ক্যাডিল্যাক গাড়িখানার প্রত্যাবর্তনের প্রতীকই করা বাক সপ্তদয় স্থলতান মিয়ার দোকানে বসে বসে। অন্তত অ্যাটর্নী-বাড়ির বাস্তবী মঞ্জিলরূপে পরিণতি পর্যন্ত। বিশেষ করে যখন তাতে সহজেই খুশি হবে বড়ো স্থলতান মিয়া, ঐ অ্যাটর্নী বাড়ি তথা বাস্তবী মঞ্জিলে প্রবেশের সুযোগলাভের জন্য আমি বার কাছে থগী।

দোকানের অম্বী তামাক বিভাগে। দোকানের ওদিকের বিভাগে বসে বুড়োর পুত্র ইউসুফ আর পৌত্র জুলফিকার আধুনিক খদ্দরের সিগারেট, চুস্ট, পাইপ টুবারকোর চাহিলা মেটাচ্ছে, বিড়ি রসিকরাও অবহেলিত হচ্ছে না। ধূমপায়ীদের দেহান্ত্রে আত্মোৎসর্গ করে দোকানের একধারে বুলানো একফালি একআঙুল পুরু দড়ি ধিকি ধিকি আগুনে পুড়তে পুড়তে তলার দিক থেকে ক্রমেই ওপর দিকে ছোট হচ্ছে।

সুলতান মিয়ার চোখের দৃষ্টি বার্বাক্যে কাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু আমার পাত্তাবির পকেটে কাগজের তড়া এড়াল না তার নজর।

‘আপনার লেখা পড়িয়ে শোনতে নিয়ে চলেছেন বুঝি বড়বাবুকে, বাবুসাহেব?’ প্রশ্ন করল সুলতান মিয়া।

‘পড়িয়ে শোনতে নয়, মিয়াসাহেব। ফেরৎ দিতে। আমার লেখাও নয়, বড়বাবুরই হাতের লেখা, পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে। ঠিক বাবার রাজনামটা থেকে নকল করা।’

‘ও!’ বলল বুড়া সুলতান মিয়া। অশোভন, অব্যক্তীয় প্রশ্ন করল না এই লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। হয়তো ভাবল সে আদার বাপসারী মাত্র, এই জাতাজের খবরে তারি দরবার নেই। শুধু বলল, ‘কাল বেতে দেখেছিলাম আপনাকে; কখন ফিরেছিলেন জানি নে, কেয়াটা দেখতে পাই নি। কেমন দেখলেন আটুর্নী নেমাট মিস্তির মশাইকে, সেইটে বলুন একবার। দেবতুল্য মানুষটি কি না।’

সুলতান মিয়ার মুখে ‘দেবতুল্য’ বিশেষণটির উচ্চারণ বড় মিটে লাগল। আর মনে হলো ঠিক ঐ বিশেষণটাই নিমাই মিস্তিরের সবচেয়ে যোগ্য বিশেষণ। বললাম, ‘সত্যিই বড় চমৎকার মানুষ তিনি, সুলতান মিয়া। কালই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ, অথচ মনেই হয় না তাঁর সঙ্গে আগে কখনো আলাপ ছিল না।’

‘ছোটবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে কি, বাবুসাহেব?’

‘না মিয়াসাহেব।’

‘তলে বুঝতেন।’

‘কি বুঝতাম, সুলতান মিয়া?’

‘এদিক দিয়ে বাপে-ছাওয়ালে কোনো তফাৎ নেই। আলাপ করলে মনে হতো যেন আপনার অনেক দিনের জানাশোনা আটুর্নী কানাই মিস্তিরের সঙ্গে। অবিশি তার কারণ আছে।’

‘কি কারণ, সুলতান মিয়া?’

‘সব কারণ তো বলতে পারব না বাবুসাহেব, একটি শুধু বলতে পারি। সেটি হচ্ছে এ বাড়ির গেটের ভেতর দিয়ে কেউ বড় একটা ঢোকেন না—না আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু বান্ধব, না অপর কেউ—অবিশি নিছক কাজের তাড়ার বীদের আসতেই হয় তাঁরা ছাড়া, যেমন মজল, দর্জি, দোকানদার, ধোপা। এ বাড়ি যেন কেমন কেমন ছাড়া ছাড়া একধারে গোছের, চারধারের মস্ত দেহালের বাইরের ছিনা থেকে আলাদা।’

সুলতান মিয়ার কথা শুনে কিছুকাল নীরবে চিন্তা করে

আগন্তুক-সঙ্গ তৃণার্চ করে রেখেছে। আগন্তুক এ বাড়িতে দুর্ভেদ বলেই, দুর্ভেদ আত্মকল্পে আমি এমনভাবে সমাদৃত হয়েছি।

‘কিন্তু এরকম কেন হয়, সুলতান মিয়া?’ শুধালাম আমি।

‘এরা তো মানুষ খুই ভালো, তাই না?’

‘ভালো বৈ কি! দেবতুল্য, বললাম তো আপনাকে।’ বলল সুলতান মিয়া। ‘তবে কি না একটু আলাদা ধরণের, ছিনার আর পাঁচজনের মতন নন। নন বলেই আর পাঁচজনের মতন বীরা তাঁরা এনাদের সঙ্গে তেমন খাপ খান না। একটু কেমন কেমন অসোয়াস্তির চোখে দেখেন। একটু হয় তো ভয় ভয়ও করেন। এনাদের কেউ বলেন দেমাকী, কেউ বলেন খামখেয়ালী, কেউ বলেন মাথা-খারাপ, কেউ বলেন ভুলে পাওয়া—আরো কত কি সব। তার ওপর, বাবুসাহেব, এই বাড়িটার ওপরও নাকি অনেকের কি রকম ইক্টিশান আছে শুনছিলাম।’

‘ইক্টিশান?’ প্রশ্ন কবলাম আমি। ‘ইক্টিশান কিসের?’

দোকানের ওদিকে আওয়াজ ছুড়ে দিয়ে ছেলেকে লক্ষ্য করে সুলতান মিয়া বলল, ‘ওরে ইউসুফ, বল না বাবুকে, কিসের ইক্টিশান।’

ইউসুফ বসে বসে বিড়ি বানাচ্ছিল—এ দোকানের বিড়ি সারা শহরে, এমন কি শহরের বাইরেও বিখ্যাত। পিতার জুকুমের জবাবে সে বলল, ‘জায়ে, ও একটা ইক্টিজি কথা। এক বাবু বলছিলেন সেদিন—সুপারিফিশান।’

বাপারটা এইবার পরিষ্কার হল। বললাম: ‘সুপারিফিশান (Superstition)?’

বুড়া সুলতান মিয়া খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল, ‘হ্যাঁ বাবুসাহেব, এইবার ঠিক মনে পড়েছে। সুপারিফিশান।’

বললাম, ‘এই বাড়িটি সম্পর্কে অনেকের মনে অনেক রকম সুপারিফিশান আছে। এই তো ব্যাপার?’

‘হ্যাঁ, বাবুসাহেব।’

‘কি সেই সুপারিফিশান, সুলতান মিয়া?’

‘বাতাসী বিবির নজর এখনো ছেড়ে যায় নি এ বাড়ির ওপর থেকে।’

বাতাসী বিবির নজর। বিদেহিনী বাতাসীর নজর। ব্যাপারটা যেন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল। বিশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত মানুষের মনেও এতেন কুসংস্কার? বহু বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যে বাতাসী বিবি, সে এখনো তার পিছনে ধেল-যাওয়া বাতাসী মঞ্জিলের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি?

কুসংস্কারগ্রস্তদের কল্পনাপ্রবণ মনের ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করে করে সুলতান মিয়া বলতে লাগল বাতাসী বিবি অশবীরে এখনো নাকি অনেক সময় পায়চারি করে খেড়ার বাতাসী মঞ্জিলের দালানের মস্ত ছাদে, ফুলের বাগানে, সবুজ ঘাসে ঘাসে, পুকুরের কিনারে-কিনারে; মুহূর্তে-নামা করে সিঁড়ি বেয়ে; পুকুরের ধারে শ্বেতপাথরে বাঁধানো স্নানের ঘাটে বসে থাকে ভালো পা ডুবিয়ে। শুধু এই নয়, আরো নানারকম গা-ছমছম করানো কিংবদন্তী। বাতাসী

# শিগগীর চুল আঁচড়ে দাও খেলতে যাব -এখন হবে না, দেখাচ্ছ না ব্যস্ত আছি!

ছোট মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মাকে চুল আঁচড়ে দিতে অনুরোধ করে কিন্তু  
মায়ের সময় হয় না কারণ সামারের নানান খুঁটিনাটি আর পূর্বতপ্রমাণ  
কাজ। চুল সময়মত আঁচড়ানো হয় না তার ফলে চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনই  
মান হ'তে শুরু করে। ধুলো ময়লা আর খুস্কী জমে চুলের  
গোড়াগুলির মুখ বন্ধ করে দেয়। মেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে কিন্তু তার  
মুখের অতিরিক্ত সৌন্দর্য অমত্রে বঞ্চিত চুলের রূপ প্রকাশে  
অনেকখানি ঢাকা পড়ে যায়। এমনি ঘটনা প্রতিদিন প্রতি  
ঘবেই ঘটছে। চুল মানুষের সৌন্দর্যের একটা স্বাভাবিক প্রকাশ  
তাই তার যত সর্বপ্রথম নেওয়া উচিত। ছোট মেয়েদের  
চুল দিনে অন্তত দু'বার ভাল করে আঁচড়ে পরিষ্কার করা  
উচিত। আনের আগে কয়েক ঘোঁটা জবাকুসুম বেশ করে  
চুলের গোড়াগুলিতে ঘষে চিরা। জবাকুসুম চুলের খাদ্য  
তুলিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।



কেশ তৈল

## জবাকুসুম

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড  
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ALPANA JK 628

১, টাকার্স লেন, ব্রডওয়ে মাদ্রাজ - ১



## বাঙালী মহিল

পরিকল্পনা অনুসারে—বিদেশী বাতাসী বিধি সম্পর্কেও ভেতন  
কিছদন্তী ছড়িয়েছে কিছু কিছু।

কিছদন্তী সত্যতার সুলতান মিয়া বিখ্যাসী কি না জানবার  
কৌতুহল হল। বললাম: ‘এসব কি সমস্ত গাঁজাখুরি কথা,  
না সত্যি, সুলতান মিয়া?’

‘আমি সত্যি বলেই মানতে চাই, বাবুসাহেব।’ বলল ব্যাকুলকণ্ঠ  
বুড় সুলতান মিয়া। আর একবার, শুধু আর একবার দেখতে চাই  
বাতাসী বিধিকে।

মর্যাদিক আকুলতা ধনিত হয়ে উঠল সুলতান মিয়ার কণ্ঠে।

‘হ্যাঁ, সব সত্যি বাবুসাহেব।’ বলতে লাগল সুলতান মিয়া।  
‘আমার দিল বলছে পর পর কটা রাত্তির যদি বাতাসী মঞ্জিলের ছাদে,  
পুকুরপাড়ের বাগানে বা মাঠে ঘুর ঘুর করতে পারি, তা হলে একবার  
না-একবার মোলাকাত হয়ে যাবেই বাতাসী বিধির সঙ্গে।  
কিন্তু তার তো উঁপায় নেই বাবুসাহেব।’

‘কেন, সুলতান মিয়া?’

‘বললে ওঁরা নারাজি হবেন না জানি বাবুসাহেব, কিন্তু  
ওঁদের গিয়ে কিছুতেই বলতে পারব না আমাকে রক্তের বেলায়  
আপনারদের ছাদে, বাগানে, পুকুরপাড়ের, মাঠে ঘুর ঘুর করতে  
দিন। এ কি কখনো বলা যায়, না বলা উচিত? আপনিই  
বলুন।’

স্বীকার করলাম অমন অল্পবোধ আশোভনই হবে বটে এবং  
প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাও যে তাতে একেবারে নেই, তাও নয়।

আরেকটা কথাও ভাবলাম। ওভাবে ঘুর ঘুর করে না  
দেখা পর্যন্ত সুলতান মিয়ার মনে এই আশার আলোটুকু ক্ষীণভাবে  
লেগে আছে যে, বাতাসী বিধিকে আবার দেখতে পারার অন্তত  
একটি উপায় তার হাতে আছে। কিন্তু উপায়টি অবলম্বিত  
হয়ে বার্ষ প্রমাণিত হলে সেই শেষ আশার আলোটুকু নিবে  
বাওগার ব্যাধা সুলতান মিয়া সইবে কি করে?

‘তা ছাড়া আরেকটা কথাও ভেবে দেখলাম, বাবুসাহেব। সে  
হলো যাকে বলে আপনার গিয়ে—বার ওপর মাহুয়ের কোনো  
হাত নেই। সেদিন দুশারয়ার বসে হাফেজ সাহেব একখানা  
শের শুনিয়ে গেলেন, বার মানে এ ঢাকা কেবল সামনের দিকেই  
যোকে, পেছন দিকে যোয়ানো যায় না।’

বুড়লাম সম্প্রতি কোনো উহঁ কবি-সম্মেলনে উহঁ কবি হাফেজ  
সাহেবের টুকরো কবিতা মনে লেগেছে অপরী তামাকের বনৌ  
শোকানদার সুলতান মিয়ার।

শুধুলাম, ‘এ ঢাকা কিসের ঢাকা।’ সুলতান মিয়া?’

‘আজ্ঞে, বরসের ঢাকা।’ বলল বুড়ো সুলতান মিয়া, সাদা  
দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে। বাতাসী বিধির সাথে যখন  
শেষ দেখা হয়েছিল, তখন আমি দশ-পনেরো বছরের ছোকরা।  
আমার মতো ভালো বেসেছিলাম বাতাসী বিধিকে। তারপর  
তো অনেক সালের পর অনেক সাল কাবার হয়ে গেল, কোথায়  
আজ সেই ছোট সুলতান? বাতাসী মঞ্জিলের পুকুরঘাটে যদি

কমেন করে বলব: ‘আমি তোমার ছোট সুলতান, বাতাসী  
বিধি?’

খুশি হলাম এই কথা ভেবে যে, সুলতান মিয়া শুধু যে  
অপরী তামাক বেচে তাই নয় তার কল্লনাশক্তিও একেবারে  
অমূল্য নয়।

সুলতান মিয়ার বোধ করি হঠাৎ খেয়াল হল সে তার  
নিজের কথাই বড় বেশি বলছে এবং সেটা শোভন নয়। তাই  
হঠাৎ সে প্রদঙ্গ পরিবর্তন করে বলল: ‘ও-বাড়ির ছোটবাবুর কথা  
বলছিলাম আপনাকে, মানে আটুর্নী কানাই মিস্ত্রি। মাহুঘাট।  
একটু অদ্ভুত বলে পরমা পরমা মনে হতে পারে বটে, কিন্তু ঐ অদ্ভুতের  
পরমা ধাক্কাটা সামলে নিতে পারলে দেখবেন দিল তো নয় যেন  
হীরের টুকরো। হুঁহাতে ঢাকা কামাচ্ছেন, কিন্তু যকের মতো ঢাকা  
আগলাবার নামটি নেই, হুঁহাতে ঢাকা ওড়াতে এতটুকু পরোয়া  
করেন না। ফুটি বলুন, চাঁদা বলুন, খরাত বলুন, জিনিসপত্রের  
কেনাকাটা বলুন—কণ্ঠে নেই কিছুতে। তবে কি না এখনতক  
ছাওয়াগ পরমা হল না ছোটবাবুর, এইজন্মে বড়বাবুর বড় মন  
থায়। দুঃখ করেন। অপরী তামাক নিজের হাতে পৌছতে  
যাই যখন, তখন স্বথ-দুঃখের অনেক কথাই হয়। একবার নাকি  
নাতির মুখ দেখাবার জন্তে বলেছিলেন ছোটবাবুক, কিন্তু বলে কোনো  
ফরদা হয় নি। তারপর থেকে আর কিছু বলেন না বড়বাবু।  
কি আফসোসের ব্যাপার ভেবে দেখুন আপনি।’

তামাকের শোকানদার আটুর্নীবাড়ির ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা  
ঘামাচ্ছে দেখে বিরক্তি বোধ হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বুড়ো মিয়ার  
কণ্ঠে যে অসামান্য দরদ ধনিত হয়ে উঠল তাতে সে সম্ভাবনা দূর  
হয়ে গেল। নিঃশব্দে অল্পবোধ করলাম এই আটুর্নী-পরিবারটিকে  
সত্যিকারের দরদ দিয়ে ভালোবেসেছে সুলতান মিয়া।

বললাম, ‘সে দুঃখ আমার কাছেও প্রকাশ করেছেন নিমাই  
মিস্ত্রি।’

সুলতান মিয়া বলল, ‘করবেন বৈ কি। আমাকে উনি বড়  
নেকনজরে দেখেন কি না। সুলতান মিয়া বলতে একেবারে  
অজ্ঞান।’

সুলতান মিয়ারে খুব স্নেহের চোখে দেখেন বলে নিমাই মিস্ত্রি  
দাদু হতে না পারার দুঃখ আমার কাছে কেন প্রকাশ করবেন সেটা  
প্রথমে একটু হেঁয়ালির মতো মনে হলো। একটু পরেই বুড়লাম  
সুলতান মিয়ার সুপারিশপ্রাপ্ত বলেই আমাকে এত সহজে এবং এত  
শীঘ্র অন্তরঙ্গ করে নিয়ে নিমাই মিস্ত্রি আমার সামনে খুলে দিয়েছেন  
স্তার অন্তরের দুয়ার—বিনা দ্বিধার, বিনা সংশয়ের, বিনা সংকোচে।

‘বড়বাবু আর আমি বরসে কাছাকাছিই হবো, হুঁটার  
বছরের ইদিক-উদিক।’ বলল সুলতান মিয়া। ‘বড়বাবু আমার  
চাইতে বড়ই হবেন হয় তো। কিন্তু ঐ দেখুন আমার  
নাতি জুলফিকার, লারেক হতে ওর বাপের সাথে বসে বিড়ি  
বানাচ্ছে। চোখে দেখে শেলাম আমি, এখন চোখ বুজলে কোনো  
দুঃখ নেই। কিন্তু বড়বাবুর কথা ভাবুন একবার। আজতক

## বাঙালী মহিল

সুলতান মিরার কথা। বিখ্যাত একটা অ্যাটর্নী-পরিবার নির্বাণ হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে কানাই মিস্ত্রির সঙ্গে সঙ্গে, এই দুঃখে হাহাকার করছে নাতি-সৌভাগ্যবান সুলতান মিরার হৃদয়।

কথাটা বেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এইভাবে সুলতান মিরার হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করল: 'অ্যাটর্নীবারুর বিবিকে দেখেছেন বাবুসাহেব? মানে, বড়বাবুর বৌমাকে?'

'না।'

'বেহুস্তের ছরী। আপনাদের জবানে লক্ষী পিতৃস্নেহে। ছোটবাবুকে দেখেছেন?'

'না।'

'আপনাদের জবানে কার্তিক ঠাকুর। এদের দু'জনায় গোদা যে

জোড় মিলিয়েছেন তার ছুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বিলকুল বেকার হলো এই জোড় মেলানো। শাদীর পর পাচ পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল, একটা ছাগলা এলো না বৌমার কোলে। বড়বাবুকে বলি বলি করেও বলতে ভরসা পাই নে—কে জানে বলতে গেলে উনি কি মনে করবেন?—কিন্তু আমার কি সম্প্রদায় জানেন?'

প্রশ্নের ভক্তি থেকে মনে হলো কানাই মিস্ত্রির সন্তানহীনতার পিছনে কোনোরকম রহস্য আছে। প্রশ্ন করলাম, 'কি সন্দেহ হয়, সুলতান মিরার?'

সুলতান মিরার আমার কানের কাছাকাছি মুখ এনে বলল, 'কেউ তুকেতাক কিছু একটা করেছে।'

মারশ, উচ্চাটন প্রভৃতি 'নানারকম তাম্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনেছি, কিন্তু তার কোনো উদাহরণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নি। এ সাবে আমার বিশ্বাসও নেই; আমার বিশ্বাস এগুলো সব গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

বললাম, 'এ আমি বিশ্বাস করি না, সুলতান মিরার।'

বিশ্বিতকণ্ঠে সুলতান মিরার বলল, 'হিঁ হুয়ে আপনি তুকেতাক বিশ্বাস করেন না, বাবুসাহেব?'

আমি বললাম, 'ওসব হচ্ছে সরল বিশ্বাসী, অশিক্ষিত বা কুসংস্কারগ্রস্ত বোকালোকদের ভাঁওতা দেবার জন্ত

করসাজি। ও সবে সত্যি সত্যি কিছু হয় না, সুলতান মিরার।'

আমার অনভিজ্ঞতাগ্রস্ত অধঃতা দেখে দুঃখিত হয়ে সুলতান মিরার বলল: 'সত্যি সত্যি হয় বাবুসাহেব। আপনি দেখেন নি, তাই জানেন না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। মস্তর-তস্তর, তুকেতাক, বাণ-মারার দিয়ে ভালো আর মন্দ দুই-ই করতে দেখেছি। আর ভালোর চাইতে মন্দটাই সহজে হয় বাবুসাহেব। পাকা গুণিন লাগিয়ে আড়াল থেকেই তুকেতাক করে, বাণ মেয়ে মেয়েমানুষকে বাঁজা আর জোয়ান পুরুষমানুষকে না-মরণ বানিয়ে দেওয়া যায়।'

আমি বললাম, 'তা যদি সত্যিও হয়, সুলতান মিরার, তা হলেও



এই দয়ামত ঘটনাই ঘটে,  
যখন আজ তেল নাথাক্য হেথা ছিল উঠে যায়...  
তাই আজ প্রত্যেক বুদ্ধিমতী মহিলাই চুসেচুসে  
রম্যমান জল্য  
**ইমলোরা** কুঁচ অয়েল  
ব্যবহার করুন

**ইমলোরা কেমিক্যালস • কলিকাতা - ২**

আটনি বাড়ির ওপর অমন তুচ্ছাকৈ কে করবে, আর কেন করবে? মিস্তিরদের এমন কোনো শব্দ আছে কি?’

‘অসম্ভব নয়, বাবুসাহেব। ভালো মানুষের তো আজকাল শব্দেই অভাব হয় না। তা ছাড়া শব্দ না থাকলেও এমন আপনজন থাকতে পারেন, ছোটবাবু নির্বাক হয়ে গেলে আটনি-বাড়ির এলাতি সম্পত্তি—টাকা-কড়ি, জমিন-জায়গাদা যাদের হাতে চলে যাবে। ছোট মুখে বড় কথা ভালো দেখায় না তো, তাই বড়বাবুকে বলতে ভরসা পাই নে। দু’চার দিন বাক, আপনার সঙ্গে আসাপ-পরিচেষ্টা আদেবু ভালো করে জমুক, কথাটা মওকামতো একবার বড়বাবুর কাছে পাড়বেন মোহরবানি করে। এমন ভালো একটা পরিবার নিবশ হয়ে মিস্তিরদের সম্পত্তি অগ্নি হাতে চলে যাবে, ভারতেও কুটী ফেটে যায়।’

বুদ্ধ সুলতান মিয়া’র এ উদ্বেগটাও আন্তরিক, এ বিষয়েও আমার সঙ্গেই বইল না, তুচ্ছাকৈর ব্যাপারটা সত্য তোক বা নাই হোক।

কথাটা মওকামতো নিম্নেই মিস্তিরের কাছে পাড়ান, একথা জানিয়ে প্রশ্ন করলাম: ‘আটনি কানাই মিস্তিরের বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বছর হল?’

‘আজ্ঞে না, তার মাসকয়েক বেশিই হবে।’ বলল সুলতান মিয়া। অগ্নী তামাক দেনার পুড়েছিল বিষের মজলিশে আটনি-বাড়িতে, আর অশুভটি দিগন্ত আর চুকট—সমস্ত যোগান গিয়েছিল আমাদের এই দোকান থেকেই। আঃ, সেই ক’টা দিন আর রাতের কথা কি আর ভুলতে পারি, বাবুসাহেব? আজো যেন চোখের সামনে ভাসছে বহুদল কারো’

‘তারপর, সুলতান মিয়া?’ বললাম আমি। তথ্যই শ্রীকো শুনতে চাই সেই ক’টা দিন আর রাতের কথা। ভালো লাগছে শুনতে।

রাস্তার ওপারে আটনি-বাড়ির গেটের দিকে তাকাল সুলতান মিয়া। বলল: ‘এই টোটে গেটের মাথার ওপর মন্দিরের মতো করে মাগে বেঁধে নহবৎ বসানো হয়েছিল। সানাই বাজাচ্ছিল সানাইয়ের বাদশা দিলওয়ার হোসেন। ভোরবেলা থেকে। আঃ, সে কি সানাই! ওর স্বর শুনে দর দর করে ভাঁচোথ থেকে তাঁত বগছিল সন্টার। তারপর শাদী করে বিবি নিয়ে ফুল নিয়ে সাজানো মন্বপখা মোটির গাড়িতে চড়ে ফিরে এসেন ছোটবাবু, আটনি কানাই মিস্তির। নহবৎ-মন্দিরে বেজে উঠল নহবৎ। গেটের হাশারে রাস্তার ওপর জমে গেল মানুষের ভিড়, আটনি-বাড়ির নতুন বৌ দেখবে বলে। বৌর নাম মেনাকিনি।’

‘তারপর?’

‘আমি তখন এই দোকানে বসে। আমার মনে পড়ে গেল প্রায় পৌনে তিন কুড়ি বছর আগেকার একদিনের কথা, যেদিন বাতাসী বিবি প্রথম এসেছিল এই বাতাসী মজিলে, তার মেটিগাভুরের ডেরা ছেঁড়, ছুটি মস্ত টগবগ শাশা বোড়ার-টানা জুড়িগাড়িতে চড়ে। আর যে গাড়ি চলেয়ে আনছিল আমার আকাজান, ইমান খালি। আমি ছুটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম

‘বুড়ো আমি’ সুলতান মিয়া, দোকান ছেড়ে উঠে গেলাম এই গেটের সামনে, মন্বপখা মোটিরগাড়ির মুখোমুখি। খোলা মোটিরগাড়ি। নতুন ‘বৌ’ মেনাকিনি বসে আছে নতুন বর কানাই মিস্তিরের বা পাশে। মাথার চুলের ওপর খানিকটা কাপড় টানা।

‘তারপর?’

‘রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকিয়ে রইলাম মন্বপখা গাড়িতে বসে আটনি বাড়ির বৌর মুখের পাশে। অমন এক অদ্ভুত কাণ্ড।’

‘কি কাণ্ড, সুলতান মিয়া!’

‘মিস্তির বাড়ি নতুন বৌর মুখের দিকে তাকিয়েই সেই পৌনে তিন কুড়ি বছর আগেকার বাতাসী বিবির মুখের সঙ্গে যেন ভেঁটে মিলে গেছে মনে হল। আরো দু’হাতের টিংকাট করে উঠলাম বাতাসী বিবি। অনেক কণ্ঠে সামলে নিলাম। তারপর মন্বপখা মোটিরগাড়ি চুক গেল এই গেটের ভেতর দিয়ে। মনে হলো সেই পুরোনো বাতাসী বিবি যেন আমার অনেকদিন বাদে নতুন সাজে এসে চুবল বাতাসী মজিলে। শুনে আপনার হয় তো ভাবি তাজব মালুম হবে বাবুসাহেব, কিন্তু সেদিন আমার ঠিক ঐরকম মনে হয়েছিল, আজো কসম বলছি আপনাকে।’

দুটিই ভাবি অদ্ভুত লগস সুলতান মিয়া’র কথা শুনে। নিম্নেই মিস্তিরের পুরনু মন্বপখার চোরাং সুলতান মিয়া বড় বছর আগে শেষ দেখা বাতাসী বিবির মুখের আদল দেখতে পেয়েছিল। তবে কি তার দায়গা বাতাসী বিবি নতুন ভয় নিয়ে আমার তার পরম প্রিয় বাতাসী মজিলে ফিরে এসেছে মিস্তির বাড়ির পুরনু হাশ? তবে কি পুরনুও বিশ্বাস করে সুলতান মিয়া? না এ তার বুদ্ধ মগজের উদ্ভট কল্পিতা কল্পনা? অথবা ইংরেজিতে যাকে বলে ‘উইশফুল থিংকিং’ (Wishful thinking)?

আমাকে নীচে ভাবতে দেখে সুলতান মিয়া কি ভাবল যেন। তারপর দীরে দীরে ফল, বাবুসাহেব, আপনি হয় তো ভাবছেন বুড়ো সুলতানের বুদ্ধি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। মাথা আমার খারাপ না ভালো জানি নে, তবে মনে হয় বুড়ো বয়সে হয় তো মনের ভেতর হেঁচকরকমের ভাবন, হেঁচকরকম খোলা আনগোনা করে। আপনার মতো জোয়ার বয়সে যেমনটি হয় না। আমি না হয় মুখস্থ-স্বপ্ন মাছুয়, দেখাপড়া না-জানা তামাকের দোকানদার সুলতান আল, কিন্তু বড়বাবুর কথাটা একবার ধরুন আপনি। ডাকসাইটে আটনি ছিলেন এই মাসকয়েক আগেও বিজ্ঞানজির জাহাজ—আমাদের মতো মুখ্য নন। তিনি কি বলেন জানিন।’

অব্যস্ত কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘কি বলেন তিনি?’

কথাটা আমাকে বলা উচিত হবে কি হবে না ভেবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তারপর সুলতান মিয়া বলল: ‘একদিন অগ্নী তামাকের যোগান দিতে গেছি। গিয়ে বললাম এবারকার মাগটা বড় খাশা তৈরি হয়েছে বড়বাবু, খশা বড় হয়েছে তারিয়ার জুড়ি নেই। মনে



## টু-ফু-র দু'টি কবিতা

হাতের তৈরি জুগুী তোমাক তোমার আগনার হাতের সাজা  
ছিলিমে খাব, সে তো বড় খুশির বাত।

সেজে দিলাম। ধোঁয়া টানতে-টানতে নানান কথা কইতে  
লাগলেন বড়বাবু—তুখের কথা, দুঃখের কথা, আরো কত সব কথা।  
কথায় কথায় উঠে পড়ল ছোটবাবুর কথা—ম্যাটনো কানাই মিত্তির।

‘তার কথা কি বললেন নিমাই মিত্তির?’

‘বললেন, সুলতান মিয়া, আমার বাবা আমাকে ভালোবাসতেন  
কুই, সেদিকে একটিল কমতি ছিল না, কিন্তু লুকুমের সময় বড়া  
লুকুম চালাতেন আমার ওপর, সে লুকুম কড়ায়-ক্রান্তিতে তামিল  
কবতে হত, তা থেকে বেহাই ছিল না। আমি ভালোবাসি আমার  
ছেলে কানাই মিত্তিরকে, কিন্তু ওর ওপর কোনোদিন এতটুকু লুকুম

চালাতে পারি নি, পারি নে, পারব না। লুকুম করলে সে নিশ্চয়  
তামিল করবে জানি। কিন্তু লুকুম ওকে আমি কিছুতেই করতে  
পারব না।’

‘তুনে আমি বললাম, কেন পারবেন না, বড়বাবু?’

‘বড়বাবু বললেন, সুলতান মিয়া। ওর মুখের দিকে তাকালেই  
আমার মনে হয় আমি আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।  
নাতির মুখ দেখে যেতে পারেন নি তিনি। কাটাতে পারেন নি  
মিত্তির বাশের মায়া, তাই আমার এ বাড়িতেই ফিরে এসেছেন  
নিজেরই নাতি হয়ে।—এই আমাকে বললেন বড়বাবু।’

সম্ভার অঙ্ককার ঘন হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়,  
ওপাশের আটনী-বাড়ি হয়ে উঠল, ‘বাতাসী মঞ্জিল।’ [ক্রমশঃ]

## টু-ফু-র দু'টি কবিতা

টু-ফু (স্বঃ ১৮৭৭) প্রাচীন চীনের অস্কাচন শ্রেষ্ঠ কবি। কারও কারও মতে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর  
কবিতায় সভ্যবন্যায় ইন্দ্রিয়বন্যতা, বিশেষ করে গাড়া-র বিরুদ্ধে উচ্চারিত বেদনামগ্নতা এবং যখন মৌলবাদী দ্বিত  
প্রকার মোহাবেশ ইত্যাদি প্রণের জন্ত কেউ ইউরোপের কবি শাল বোদলেয়ারের সঙ্গে টু-ফু-র তুলনা করে থাকেন।]

### রাত্রির রুষ্টি

বুড়ি পাড়ে বুড়ি জানে কখন পড়তে হয়  
এসেছে এই বসন্তে বাজের গোড়ায় জল ঢালতে  
পছন্দ তার রাত্রি বাতাসে পাড়ে আলয়ে  
চুপ চুপ ভিজিয়ে দেয় সমস্ত পৃথিবীটা  
কালো মেঘ মাথায় বুনো নিজন রাত্রি  
একটি মাত্র দীপ জল জল করছে নৌকায়  
লাল আর সজল দেখাবে সবই কাগ সকাগে  
‘আর এই উপত্যকা ভরে যাবে গুচ্ছ গুচ্ছ ফোটা ফুলে ॥

### সাক্ষাৎ

নাঝে নাঝে বিচ্ছিন্ন হ'তাম  
মগ্নমি আর শুকতারার মতো  
কোন রাত্রি আজকে  
দীপালোকে আমরা মিলেছি।

যৌবন আর কতোদিন থাকে  
আমাদের এখন পাকা চুল সকলের  
বন্ধুদের অর্ধেক মৃত

এই সাক্ষাৎ আমাদের জ'জমাকের অবাক করেছে।

কে জানে হয় তো বিশ বছর পর

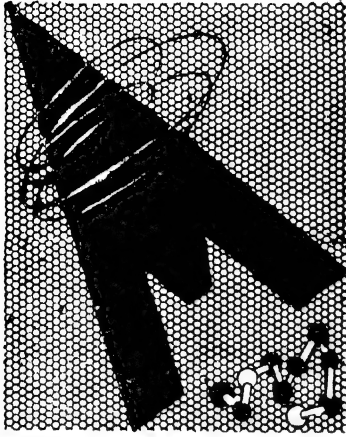
দেখা করতে যাবে  
তোমার সঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা কইতে  
তোমার সঙ্গে শেষ দেখা যখন তখন তুমি বিবাহিত ছিলে না  
আর এখন তোমার পুত্র হয়েছে কথা হয়েছে  
তারা তাদের পিতার বন্ধুটিকে ভবতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করছে  
আর জিগেস করছে কোথেকে আমি এসেছি।

যখন আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করা ছ  
তোমার পুর কথারা পানীয় তৈরি করতে স্লক করে ছে  
এই বুষ্টির রাজিতে তারা সংগ্রহ করেছে বসন্তের পালং  
ভোজের জন্তে রেখেছে রেঁপে যত্ন করে।

তুমি বললে, এ এক স্বর্গীয় সুযোগ যে আমাদের  
দেখা হ'লো

এক নিশ্বাসে আমরা দশ পাত্র পান করলাম  
আমি মাতাল নই, যদিও সব মদ আমি শেষ করেছি  
তোমাকে বাছবা দিই তোমার এই ভব্য বন্ধুতার জন্তে  
আগামীকাল দেখা দেবে পর্বত শ্যবধান আমাদের মধ্যে  
না জানো তুমি না জানি আমি যে সৌন্দর্য আসবে ॥

অনুবাদক : পৃথ্বীজ চক্রবর্তী



# 

ডেল্টা রকেটের সাহায্যে সিনকম

কক্ষপথে স্থাপন

অনুসন্ধানী

সিনকম এ নামে মহাকাশে নতুন মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ হয়েছে। তিনটি কার্যের জন্য এটি মহাকাশে স্থির বলে প্রতিভাত হবে। এই তিনটি হচ্ছে : এটিকে পূর্বাভিষ্মী হতে হবে, সরাসরি বিশ্বব্রহ্মার উপরে থাকবে। আর পৃথিবী থেকে থাকবে প্রায় বাইশ হাজার তিনশ' মাইল উপরে। এই উপগ্রহের পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে লাগবে চলিশ ঘণ্টা এবং পৃথিবীরও আপন মেরুদণ্ডে ভর করে একবার প্রদক্ষিণ করতে লাগবে চলিশ ঘণ্টা। এইজন্য এদের আপেক্ষিক অবসান একই থাকবে। তারই জগ্রে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটি স্থির বলে প্রতিভাত হবে, মনে হবে যেন এটি মহাকাশে স্থলে রয়েছে।

এর আগে সিনকম শ্রেণীর যে ছ'টি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ হয়েছিল তাদের সম্পর্কে বার্তাবহ উপগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সঠ পূরণ করা হলেও একটি সঠ পূরণ করা সম্ভব হয় নি। তাদের ঠিক বিশ্বব্রহ্মার উপরে স্থাপন করা যায় নি।

ঠিক বিশ্বব্রহ্মার উপরে কেন উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থাকলে এ বিষয়ে সুবিধা হতো। কিন্তু সেখানে কোন কেন্দ্র নেই। তাই এটি স্পারিডার কেপ কেনেডি কেন্দ্র থেকে চারপাশের অতি শক্তিশালী ডেল্টা রকেটের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মার সঙ্গে ২৮ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে মহাকাশে উৎক্ষেপণ হয় এই রকেটটি ৫,৩৪,০০০ পাউণ্ড ঝাঁক সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পর্বতীয় রকেটটি ছাড়বার পর এটি ২০ মিনিট উৎক্ষিপণে চলে। তারপর তৃতীয় পর্বতীয় রকেটটি চালু হয়।

এই সময়ে এর কক্ষপথে হয় বৃত্তাকার অর্ধচন্দ্র ২২ হাজার ৩০০ মাইল এবং অর্ধচন্দ্র ১০০ মাইলের কিছু বেশি, অর্ধচন্দ্র পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরত্ব; অর্ধচন্দ্র সর্বনিম্ন দূরত্ব। চতুর্থ পর্বতীয় রকেট এটিকে চক্রাকার কক্ষপথে এনে স্থাপন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গ এবং অস্ট্রেলিয়ার উমেবার তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্র কর্তৃক ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার গোভার্ড স্পেন লাইট সেটারে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতেই সেটারের বিজ্ঞানীগণ এর গতিপথ নির্ধারণ করে থাকেন ও নির্দেশ দিয়ে যাবেন।

চতুর্থ পর্বতীয় রকেট এটিকে চক্রাকার কক্ষপথে স্থাপন করায় বিশ্বব্রহ্মার সঙ্গে এই উপগ্রহের যে ১০ ডিগ্রী কোণ ছিল সেই কোণ শূন্যতে এসে ঝাঁড়ায়। তবে এটিকে বিশ্বব্রহ্মার এবং আন্তর্জাতিক সময়সেবা যেখানে পরস্পর ছেন করেছে, পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ৩০০ মাইল উপরে সেখানে স্থাপন করার জন্য আর একটু কলকৌশলের প্রয়োজন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে যাতে চলে না যায়, তারই ব্যবস্থা করবে এই মধ্যে যে ছোট ব্যবস্থা রয়েছে তাই।

একটি সাক্ষাৎকার

হেনরী ব্রাউন

ইতিহাসের এক কঠোর পরিকামূলকক্ষে আমি ডাঃ রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রথম স্পুটনিক মহাশূন্যে প্রেরণ করেছে এবং এতে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবাদী নেতৃত্ব যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আত্মহীন রয়েছে, তা যেন হঠাৎ আমেরিকাবাসীদের প্রতিশোধে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। তারা বিশ্রিত, ক্রুদ্ধ, প্রকলিত। দেশের সর্বকোণে ক্রোধের আভাস, কি করে রাশিরা আমাদের আগে যেতে পারলো! সকলের মুখে এই এক প্রশ্ন। এবং সবাই এর জন্য কৈফিয়ত, নির্দিষ্ট অপরাধীর বিচার ও প্রতিকার চাইছিল।

ডাঃ রবি তখনও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সমিতির চেয়ারম্যান এবং আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি-ই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি। বিরাট বৈজ্ঞানিক, ১৯৪৪ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সরকারের কঠোর সমাজমূলক সিদ্ধান্তের সর্বাঙ্গীণ নিকটতম ব্যক্তি। প্রশ্ন শুধু এই নয় যে, মহাশূন্যে রাশিয়ার এই বিজয়ে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে কি বিপর্য-প্রশ্ন এই যে, আমেরিকার শিক্ষা নিয়মে এ থেকে কি দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে, এই পিছিয়ে পড়ে থাকবার জন্য যা অনেক পরিমাণে দায়ী হয়েছে।

২৪ ঘণ্টার নোটিশে ডাঃ রবি তাঁর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি শান্তভাবে আমাকে এক স্বাগত জানালেন। ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যিনি কি বলতে চান তা জানেন—খর্ব রূপ দেহ, ছোট পা এবং টু শব্দ তিনি বলতে গেলে পথিবীটা কাঁধে বহন করতে সক্ষম।

## বিজ্ঞান বাক্য

ও সামাজিক সংশ্লেষ ও ভবিষ্যৎ সত্যতার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের প্রভাব তাকে সর্বাঙ্গীকৃত করে তোলে।

তিন বৎসর বয়সে ডাঃ রবি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে এখানে এসেছিলেন। নিউইয়র্কে তাঁর পিতার হৃদির দোকান ছিল এবং তরুণ রবির চাকরীও সেখানেই ছিল না। কিন্তু এ দেশে আসবার তেত্রিশ বৎসর পরে মোলদুয়ার রাগি আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান। তিনি ১৯৫০ সাল থেকে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির রসায়নের হিগিন্স অধ্যাপক এবং যুদ্ধের পর থেকে তিনি আমেরিকার নিউক্লিয়ার প্রতিরক্ষা বরখাস্তাতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি ৩০ 'এটমিক এনার্জী কমিশনের সাধারণ উপদেষ্টা সমিতি'র সভ্য এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন—বর্তমান না ডাঃ কিলনে প্রেসিডেন্টের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হন।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কালে ডাঃ রবি ঐতিহাসিক সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করেন—গানের উদ্দেশ্য ছিল হাইড্রোজেন বোমার সম্প্রদারণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। ট্রুম্যানের শাসনতন্ত্রে তখন পরস্পরবিরোধী মতে পূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক বা কোন মিসিত মত নিয়ে যেতে পারেন নি।

মিঃ ট্রুম্যান সেই সংশ্লেষে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রায় করেন, যদি আমরা না করি, তা হলেও কি রাশিয়া এটা প্রস্তাব করতে পারবে?

সোভিটরা তিনি বলেন, হ্যাঁ, পারবে।

মিঃ ট্রুম্যানের সরল সিদ্ধান্ত, বেশ তা হলে, আমরা চাচ্ছি যে বা। এবং তাই হিঁচুর হলো।

ব্রাউন। রাশিয়ার দুটি উপগ্রহ পশ্চিম জগতকে চমকে দিয়েছে। রাশিয়ার এই অগ্রগতির জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অথবা জাতীয় সরকারকে দায়ী বলে আপনার মনে হয়।

রবি। স্পুটনিক এমন কিছু সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক অবদান নয়। এ প্রধানত কল-কল্লুর ব্যাপার। আমাদের খুব দ্রুত নতুন আলানী খুঁজে বের করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক চালক নিয়ম ও ইঞ্জিনের নমনু পরিবর্তিত করতে হবে। এ সব কিছুই মৌলিক বিজ্ঞান নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রাশিয়া মৌলিক বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে—তারা হয় তো রকেটের ব্যাপারে কিছুটা আগে আছে। আমাদের প্রগতি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ওপরে নয়—আরও অর্থ ও লোক নিয়োগ করা হবে কি না তার ওপরে নির্ভর করে। এটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়। আরও অর্থ ও অধিকতর চেষ্টায় আমরা অনেক দ্রুত অগ্রসর হতে পারি। অবশ্য, এর জন্য অল্প দিকে—শিক্ষা ও গবেষণা বাধ্যপ্রাপ্ত হবে—কিন্তু আমরা তা করতে পারি।

ব্রাউন। আমি এ বকর শুনেছি যে যুক্তরাজ্যে মহাশূন্য পথিকল্পনার প্রতিষ্ঠিত অনেক আছে কিন্তু প্রধান সমস্যা মহাকাশ ইঞ্জিনারের।

রবি। এ কথা এখনও প্রমাণ হয় নি কিন্তু আমার মনে

আমার মনে হয় যদি আমরা আমাদের প্রচেষ্টা একই স্থানে প্রতিফলিত করি তা হলে আমাদের অনেক লোক আছে।

ব্রাউন। যুক্তরাজ্যে ইউনিভার্সিটিতে কি মহাকাশ শিক্ষাবিভাগ আছে? রাশিয়ার আছে কি?

রবি। এখানে সে-বকর কিছু আছে বলে জানা নেই কিন্তু রাশিয়ার এই বকর সব আছে। কয়েকজন রুশদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তারা টেলিভিশনের অধ্যাপক। আমেরিকা অথবা ইংলণ্ড অপেক্ষা রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা আরও বেশি শিক্ষাপ্রাপ্ত।

ব্রাউন। রাশিয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানের দৌড়ে পশ্চিমকে কি করতে হবে।

রবি। মূলগতভাবে জনসাধারণকে প্রথমত বিজ্ঞানকে সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে নিতে হবে। যদি তা ঘটে তা হলে সেকেন্ডারী স্কুলে এবং আপনাদের দেশের পাবলিক ও প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যক্রম বদলাতে হবে। গণিত ও বিজ্ঞানে আরও অনেক সময় দিতে হবে। যখন বিজ্ঞানকেও আমাদের সাধারণ শিক্ষার মাতৃভাষার মতো মূল্যবান মনে করা হবে, তখনই সব বিপন্ন কেটে যাবে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি ধুঁ না শিখিয়ে—ঐতিহাসিক পটভূমিকার মানব-প্রচেষ্টা—প্রত্যেক চিন্তাধারাতেই বিজ্ঞানের প্রভাব হিসেবে দেখাবো। এটা বিষয়কে কতগুলি চাতুর্ঘ্যের সমষ্টি হিসেবে না দেখিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিসূলক কাজ দেখাতে হবে।

রাশিয়াতে বিজ্ঞান সাধারণ শিক্ষাতেই অথবা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা পাচ্ছে—আর যুক্তরাজ্যেও ইংলণ্ডে মহা-উনিভার্সিটির শিক্ষা পাচ্ছে।

ব্রাউন। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা শিক্ষা-ম্যানেজার, পরিচালক সাধারণ কাজের লোকের মধ্য থেকেই আসে।

রবি। হ্যাঁ, রাশিয়া তাদের বিপ্লবকে বিজ্ঞানের দিকে ঠেলে দিয়েছে—যদিও অনেক সময়ে তা শুধু বিজ্ঞান-নামধের। গাই হোক না কেন তা তরুণমনের পক্ষে আন্দোলনকারী মূর্তি। পশ্চিমে বৈজ্ঞানিকরা বিলম্বিত আগত এবং সমাজ দ্বারাও ওভাবে গৃহীত হয় নি। দিন দিন-ই অথচ অগ্রণ বাড়ছে। বর্তমানে কোন ব্যক্তির যদি কলাশিল্পে রুচি না থাকে তাকে সর্বাধীনতা বলা হয়। কিন্তু যদি তার বিজ্ঞানে রুচি না থাকে তবুও সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের সভ্যতার এই মূলগত দুর্বলতা। বর্তমানে এতেই ধ্বংস আসতে পারে।

ব্রাউন। অনেক সময় শুনেছি যে, বৈজ্ঞানিকরা এই দেশের চিরায়ত বুদ্ধিবাহীনতা তাঁদের স্বীকৃতির পথে বাধা ভাবে।

রবি। হ্যাঁ, আমরা অত্যন্ত ধনী এবং ধনবানরা প্রায়ই বুদ্ধিবাহী হয় না। যা হোক, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে অধ্যাপকদের অত্যন্ত উচ্ছ্বাস। তারা সম্প্রদায় ও সরকারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি—অত্যন্ত দেশ অপেক্ষা অনেক শাস্তিশালী ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু জনসাধারণের সেই মনোভাব থেকেই গেছে—এবং বৈজ্ঞানিক হবার পক্ষে এই জন-মনোভাব-ই এখনও তরুণদের মনে দ্বিধা

ব্রাণ্ডন। এই জন-মনোভাব কি ম্যাকার্থিরাবাদের ও অধ্যাপক ওপেনহামারের বহিষ্কার দ্বারা প্রভাবিত ?

রবি। এত শীঘ্র ম্যাকার্থির দোষকারী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অধ্যাপক ওপেনহামারের বহিষ্কার যিনি দেশের জগৎ কত করেছেন দেশ ও কৰ্তৃপক্ষের এই প্রকার দানে বুদ্ধিগত ও বস্তুগত মূল্যায়নের ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করে যখন তিনি জাতীয় সরকারের কর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবেন—তখনই শুধু প্রমাণ হবে যে জনবহুর পরিবর্তন হয়েছে। সমগ্র বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে সে ঘটনা উৎসাহের উৎস হয়ে উঠবে। যা হোক না কেন, আমেরিকার বিজ্ঞানে সংস্কার অত্যন্ত বেশিরকম বেড়ে গিয়েছে আমার আগ্রহের অভাবে রাশিয়ার উন্নতির নিকট হেরে বাই নি। আমার মনে হয়, প্রধান সমালোচনা এই নয় যে, আমরা বিরাট মূলধন নিয়োগ করছি না—কথা হচ্ছে যতটা পারি এবং যতটা পারা উচিত, তা করছি না।

ব্রাণ্ডন। স্বাধীন-বাসসারীতির দ্বারা কি পশ্চিম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ? আমাদের বৈজ্ঞানিকতা—ফল, সার্বভৌমতা দেখাবার জন্য অত্যন্ত বেশি চাপগ্রস্ত হয়—যা পশ্চিম বৈজ্ঞানিকের পক্ষে করা কঠিন।

রবি। আমার মনে হয়, একথা ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্ট সম্পর্ক সত্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সরকার, বেসরকারী শিল্প এবং দান থেকে অত্যন্ত বেশি সাহায্য পাওয়া যায়। অবশ্য, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আর মূলধন নিয়োগ বা পেশা হিসেবে বিজ্ঞান চিত্তাবর্ধক করতে পারব না। আর একটা বড় ভুল এই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপকদের খরচ বিস্মৃতি লাভ করছে, কিন্তু তাঁদের সমানো টাকা অধ্যাপকদের বেতনে না গিয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়ানোর জন্য কটাক্ষিক সম্প্রসারণে ব্যরিত হয়েছে।

ব্রাণ্ডন। দুটি উপগ্রহ থেকে রাশিয়া কি বকম সুরিধে পেরেছে ?

রবি। বৈজ্ঞানিক হিসেবে, অস্তুত আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি বলব, বিজ্ঞান নিজেই নিজের পুঙ্খবাহ—আমাদের এই পৃথিবী, বিরাট বিশ্ব, বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদির অভিযানে মনে অপূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দ হয়। কাজেই, তারা যে সুরিধে পাচ্ছে তা হচ্ছে যে, তারা মনুষ্যোচিত ব্যবহার করছে এবং বিশ্ব সম্বন্ধে জানিছে এবং আমি নিশ্চিত জানি যে, অধিকাংশ ক্রম-বৈজ্ঞানিক এইভাবে ব্যাপারটা নিচ্ছে। এর যদি আর কোন সুরিধে—যেমন সামরিক গুরুত্ব থাকতে পারে এবং তা ছাড়া সাধারণভাবে মর্যাদাবুদ্ধি তো আছেই। কিন্তু, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে মহাশূন্য আছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে জানিবে।

ব্রাণ্ডন। এতে কি রাশিয়া আমাদের আগে চাঁদে পৌঁছতে পারবে ?

রবি। নিশ্চয়ই। বরেন ছোট ছিলাম, তখন যেমন দক্ষিণ ও উত্তরমেরুতে পৌঁছবার চেষ্টা হয়েছিল, তেমনি চাঁদে পৌঁছবারও বাস্তবসম্মত চেষ্টা হচ্ছে।

ব্রাণ্ডন। আপনার মনে কি চাঁদে বাবার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে ?

ব্রাণ্ডন। চাঁদে রকেট অথবা ব্যক্তি পাঠানোর কি সুরিধে ? একটি চমকপ্রদ সিদ্ধিপ্রাপ্তি ?

রবি। হ্যাঁ, এতে মনে আনন্দ হয়।

ব্রাণ্ডন। এতে বৈজ্ঞানিকদের মনে আনন্দ হয় ?

রবি। সমগ্র জগতের। আমার মনে হয়, রাশিয়ার সিদ্ধিলাভে সমগ্র জগৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। এটা খুবই সার্থক ব্যাপার।

ব্রাণ্ডন। আমি এ ছাড়াও চলতে পারতাম। এই রচম ব্যাপারে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠি না।

রবি। কথা হচ্ছে এই যে, আমরা সভ্যতা ছাড়াও বাঁচতে পারি। দশ হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বসূর্যরা অনেক কিছু ছাড়াই চালিয়েছেন—তারা জীবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। টি এস ইলিংটনের কবিতা ছাড়াও আপনার চলতে পারেন ..

ব্রাণ্ডন। আমার মনে হয়, উৎসাহিত না হয়ে বরং এই দেশ রাশিয়ার সঙ্গে পালা দেবার জন্য নিজেকে চেষ্টা বিতরণ করতে প্রস্তুত। আমার মনে হয়, এখনই অগ্রদ্বৈতমণ্ডির ডাকে ডাকবার সময়।

রবি। স্বীকার করছি। বিলম্বের চেয়ে এখনই তত্ত্বাভিলা। কিন্তু, এ কথাও মনে হচ্ছে যে, এতে অগ্রদ্বৈতমণ্ডির উপরেও কিছু প্রয়োজন। এতে কিছুটা বুদ্ধি চাটুর্ষের প্রয়োজন।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি বলতে চাইছেন ?

রবি। আমি বলছি যে, একটা নীতি গঠন দশ বৎসর থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে যা সমগ্র দেশের নীতি নয়—সামরিক নীতি। এটি প্রায় বহুসংস্কৃত সত্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা ধর্মসেব দিকে এগিয়ে চলছি। কিন্তু, পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞানী রাজনীতিবিদগণ সেদিকে এগিয়েই চলেছেন।

ব্রাণ্ডন। আপনি কি এই অনুসন্ধানের প্রতিরোধের কথা বিশ্বাস করেন না ?

রবি। ওঃ, আমি ভাবি বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের নিকট এরা প্রতিরোধমূলক কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা কি যুদ্ধ সংঘটন করেন ? সর্বাপেক্ষা অনুবিদা এই যে, যতই প্রতিরোধ বেড়ে ওঠে—ততই একটা সামান্য ভুলের ফল সাংঘাতিক হয়ে ওঠে—প্রতিরোধ মনস্তত্ত্বমূলক ভিন্ন কিছুই না এবং আমি জানি না যে, কেউ মানব-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ও বিশ্বাস রাখবার মতো জ্ঞান আছে কি না ? এই প্রকার মৌলিক প্রতিরোধ গড়ে উঠতে উঠতে বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে—কিন্তু এটি আমার মত।

ব্রাণ্ডন। আপনার মতি কি আইসেনহাওয়ারের নিকট আমেরিকা ও বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের গভীরতর সংযোগের প্রয়োজন জানিয়েছেন এবং আপনার কি মনে হয় অণুবীক্ষণ আইন ?

রবি। নিশ্চয়ই এবং প্রেসিডেন্ট এই সংযোগের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এতে আমাদের প্রচেষ্টা দৃঢ়তর হবে। অণুবীক্ষণ শক্তি নিয়ম অনুসারে আমার মনে হয় এটা পরিবর্তন করতে হবে। এখনও রক্ষণমূলক আইন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন—যেমন মাদকদ্রব্যের



মাসিক বসুমতী  
 ॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ ॥

( জ্যৈষ্ঠ )

মিলন  
 —দ্বিতীয় চন্দ্র (১) অঙ্কিত  
 চিত্র-শিল্পী (২) প্রদর্শন



## বীণার স্বপ্ন

অমিতা পালিত

যেদিন সুধীরা বেবী নীলাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাঁদের বংশাবলী প্রথা অনুযায়ী শাস্ত্রীর দেওয়া হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলেন—সেদিন বীণার মাথাটা যেন কিরকম ঘুরে গেল। ঠোঁট ছুটি অসম্ভব রকম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, একনিমেষে কে যেন মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। আপনা থেকেই মাথাটা নত হয়ে গেল।

নীলার এই ভাব দেখে সুব্রত তাকে জোর করে নিয়ে গেল ময়দানে, নিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে। জলোচ্ছ্বাস নীলা ফিরে পেল নিজেকে।

তোমার মা এ কি করলেন? যোজাযুক্তি প্রমাণ করেছে সুব্রতকে।

বিস্ময় প্রকাশ করেছে সুব্রত—কেন মা কি কিছ্র প্রমাণ করেছেন নীলা?

সুব্রত, তুমিরা জান না আমার অতীত জীবন।

প্রয়োজন কি নীলা? তোমার-মানার বর্তমানই থাক, ভবিষ্যৎ থাক, কিম্বদন্তি হঠাৎ তুমি এত উত্তলা হয়েছ কেন?

বারবার চেষ্টা করছি সুব্রত, তোমার সব কথা খুলে বলব—কিন্তু প্রতিবারই তুমি দিয়েছ বাধা।

তুমি তোমার কাজের কথা মনে করে বলছ? তোমার ব্রত 'সেবা'-এর চেয়ে মহান বর্ম আর কি আছে নীলা?

না-না তুমি ভান না সুব্রত কত আঘাত আমি পেয়েছি। জীবনে কত ভাগ্যভ্রমার মধ্যে দিয়ে পারি হতে হয়েছে। যে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস—আমি বলতে চাই—শোন।

আউটারাম ঘাটে জাহাজগুলোর ডলের থাকা লাগছে। জলের আওয়াজে সুব্রত সখিৎ ফিরে পেলো।

চল নীলা বাড়ি ফেরা যাক।

নীলা ফিরে এলো নিজের কোথাটারে। কোন সত্যই আজ সে গোপন করে নি সুব্রতের কাছে। কতদিনের কথা তবু মনে হয় যেন সেদিন।

অন্ধকার ঘর। আলোটা ইচ্ছে করেই জ্বলে নি। নীলাদি' আছেন?—

এস কুহ।

বা, বেশ লোক আপনি—চলুন আপনার জন্তে সবলে খাওয়ার টেবিলে হাতগুটিয়ে বসে আছেন, আর আপনি—আজ শরীরটা ভাল নেই ভাই। ঠুঁদের খেতে বেলো।

একটু দুধ খাবেন—নিয়ে আসি?

তোমার খাওয়া হলে এনো।

এই কুহ মেয়েটিকে তার খুব ভাল লাগে।

দশ বছর আগের নীলাকে সে খুঁজে পায় ওর মাঝে।

## ঐশ্বর্য ও প্রাণ

আর পাঁচজনের মত ওদেরও ছিল সুখের সংসার। বাইরে গানের মাফারী করেও অরুণের আশ মিটতো না—ঘরে নীলাকে বোজ গান শেখার তাগাদা দিত। শাস্ত্রী রাগ করতেন—সংসারের কাজকর্ম নেই কেবল তোর মত গান-বাজনা নিয়ে থাকলে চলবে!

বাড়ির নৌ কি চাকরী করতে যাবে?

সেই চাকরী—চাকরীর চেষ্টায় একদিন তাকে ঘুরে বেড়াতে হলো।

কোথায় চলে গেল অরুণ? কেন গেল?

আজ কোথায় কে জানে—। ভুলে গেল মাকে-বাবাকে, ভুলে গেল নীলাকে। কাগজে কাগজে কত বিজ্ঞাপন কিম্বদন্তি পাতা পাওয়া গেল না।

সেদিন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

বোমা কি হবে? ভরসা দিয়েছিল সেদিন বোল বছরের নীলা।

চাকরী যে পেলো না—সামান্য ম্যাটিক পাশ টেনিং চাই। পড়তে চলল নাসিং।

সামান্য যা পূর্জ সব শেষ হল একে একে।

শেষ হল টেনিং, ফিরে এলো দিল্লী থেকে—সেদিন বজ্রে শস্ত্র-শাস্ত্রীর কি কান্না।

বেশিদিন বাচেন নি তাঁরা। হেলের অবহেলা দিন-রাত কটোর মত বিধতো। একদিন শস্ত্র তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—নীলা তুমি আমার বিয়ে করো।

শাস্ত্রীর উদাস দুষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নীলা ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

মনে হল ধরণী দ্বিধা হও।

দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিক টক্‌টক্ করে উঠলো। নীলা চমকে উঠলো।

তারপর সে আর বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে টিকতে পারে নি। শূন্য বাড়িটা মনে হতো যেন সব সময় হাঁ করে গিলতে আসতো।

এখানে এসে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

কুহ কি সুন্দর দুধটা লাগছে।

আপনার খাওয়ার ইচ্ছে নেই বলে ফ্রিজিডের দুধে কোকো দিয়ে নিয়ে এলাম।

তুমি গতজন্মে আমার কেউ ছিলে কুহ।

আপনাকে ভালবাসে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাই নীলাদি' ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

ই্যা সে ঘুমাবে।

আজ বেশ ভাল করেই ঘুমাবে আর দেখবে স্বপ্ন।

নতুন এক স্বপ্ন। সে আর স্মরণ। ভুলে যাবে তার পিছনে ফেনে-আসা অন্ধকার-তমসাক্রম দিনগুলো।

সে বাঁচবে। আর পাঁচজনের মত বাঁচবে।

সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সে ভবে তুলবে সকলের জীবন। যেমন করে রোগীদের সে এখান থেকে হাসিমুখে বিদায় দেয়। যেনন ভাবে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল অসীমাকে তার মার হাতে।

অসীমা এসেছিল তাদের নাগিংহোমে। অনেকদিন ছিল। সুধীরা দেবীর প্রতিমিত্য কি ব্যাকুলতা। আশ্বাস দিয়েছেন ডাক্তার—সামুদ্র দিয়েছে নীলা—আজকাল এই টিউবার অপারেশন কিছুই নয়। অসীমার বাড়ি ফেরার দিন ডাক্তার সুধীরা দেবীকে বলেন—মিসেস মিত্র,—আমরা আমাদের সামান্যত করেছি কিন্তু আপনার মেয়ে সুস্থ হয়েছে এমনি নীলার সেবা-শুশ্রূষার গুণে।

তারপর থেকেই নীলা অসীমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেছে।

স্মরণ অসীমার দাদা, প্রতিদিন নাগিংহোমে এই মেয়েটির মধ্যে নারীর কল্যাণী মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে। মাকেও বলতে শুনেছে কেউ যে এত দরদ দিয়ে সেবা করতে পারে তা আগে জানতাম না। নীলা আমার আর এক মেয়ে। জীবনে দুঃখ, কষ্ট, আঘাতের পর আঘাতে মন যখন অসাড় হয়ে গিয়েছিল, সে সময় সে পেলো স্মরণের আহ্বান—পেলো মায়ের স্নেহ-ভালবাসা, মনের গভীরে প্রতিমিত্য উঠলো আলোড়ন। হৃদয়ে-হৃদয়ে হলো ক্ষত-বিক্ষত।

আজ সেই বাড়ির রাস্তের হ'ল অবসান—হ'ল পরাজয়।

ইস্ ঘরের মধ্যে কত রোদ এসে গেছে।

এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে আছে? গভীরত্বের কথা মনে হল।

ই্যা অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারে নি। মাথায় জ্বল দিয়েছে অনেকটা, তারপর ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। যাক আজ সকালে তার ডিউটি নেই এই রক্ষে।

স্নান সেরে এলো নীলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল জাঁজড়াতে গিয়ে নিজেকে ভাল করে দেখল—দেখে অবাক হয়ে গেল—না কোন ক্লান্তির ছাপ নেই। মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে।

৫।৭ মিনিট লাগে যেতে, তবু সন্ধ্যা ছাঁটার পর থেকেই নীলা হাতের টুকটাকি কাজ সেরে নিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে।

আয়া কাঁফ ও টোষ্ট দিয়ে গেল। যেদিন নাইট ডিউটি থাকে, যেদিন এর বেশি সে খেতে পারে না।

নীলা নাগিংহোমের দিকে এগিয়ে চলল। কাঁফ-ক্রমে নীলা হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে বসার উপক্রম করছে এমন সময়—দিদিমাণি আপনাকে কনেল সাহেব ডাকছেন, বেয়ারা ডানিয়ে গেল।

আসব?

এস।

এস বললই কনেল ভট্টাচার্য হাতের কাজে আবার মন দিলেন।

এই একটি লোক, যিনি ধড়ির কাঁটার তালে তালে চলেন। নীলার মনে পড়ে না কখনও একে চূপ করে বসে থাকতে দেখেছে। এই সৌন্দর্যটির সামনে সকলের মাথা সম্মনে নত হয়ে যায়।—শোন নীলা, দু' নম্বর কোবনের একটি রুগীকে তোমার দেখতে হবে। ব্রেনে আঘাত লেগেছে একটু বেশিরকম মেগজ্ঞে ভালভাবে আজ রাতটা 'ভ্যাচ' করতে হবে। প্রয়োজন বোধ করলে আনায় ডেকে।

এই রগী আর ভর্তি করা হয়েছে আর?

ই্যা, আজ রাতটা একটু ভয়ের। নীলা, তোমার উপর ভরসা রাখি। এই নাও রিপোর্ট ও টেম্পারেচার চার্টের সীট।

নীলার অফুট সর শোনা যায়—'অরুণ রায়।'

দীপের দীপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নীলা।

কে এই অরুণ রায়?

কি হ'ল পা দু'টো এর মধ্যে যেন অসাড় হয়ে গেল? একটু আগে যখন কোয়ার্টার্স থেকে হোমের দিকে সবুজ ঘাসের 'লেনের' উপর দিয়ে আসাচ্ছিল, মনে হয়েছিল সব মাটি মাড়িয়ে সে যেন চলেছে না।

ফিকে নীল আলোয় কোবনটা যেন কিরকম হয়ে আছে। রুগীর জ্ঞান নেই। মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা। মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে। মুখ দেখে স্পষ্ট বোকা যায় না। খোঁচা খোঁচা পোঁফ-দাঁড়িতে সারা মুখ ভর্তি।

নীলা নিজের বৃক্কের স্পন্দন যেন নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। না না, নাভাস হলে চলবে না। তার সামনে রুগীর জীবন-মরণ সমস্ত।

আজ রাতটা কাটলে আশা হবে।

ডাঃ ভট্টাচার্যের কথা মনে হল—নীলা, তোমার উপর আশা রাখি।

নীলা কো কোমলভাবে কাজে অরুণকে কান দি। ৫৮



## অরুণ ও প্রাণ

রুগীর টেম্পারেচার নিয়েছে—না, অরুণ বরফ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভালই মনে হচ্ছে।

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে জলের ট্যাপ খুলে নীলা চোখে-মুখে জল দেয়।

সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এই কি অরুণ? এই দশ বছর সে কোথায় ছিল?

হঠাৎ এল কোথা থেকে?

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল।

রাতের নিস্তরতা ভেদ করে নার্ভিসিসের ঘড়িতে ছুঁটি বাজল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। দূরে রাস্তায় একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

উঃ না—গো।

নীলা ছুটি এল।

না—পালস ভাল। বেশ হয় বিপদ কেটে গেল। আর কোন সাড়া নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান অবনত কেনে নি। পাশেই ইন্জিনিয়ারটির বসল নীলা। একদিন রুগী পুনোলে নীলা এখানে বসে বই পড়েছে, আর আঁক?

আজ সকালেই স্বস্তির বণামত—সে ছটির দরখাস্ত গিয়েছে। স্বপ্ন সম্ভব জীবনমন্দিরের মধ্যে ছুটি মঞ্চর হয়ে যাবে।

একদিন এই অরুণ তাদের কত অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে চলে যায়। নীলার প্রতি অরুণ কি কর্তব্য করেছে?

অরুণ তার জীবনে বিভীষিকা। অরুণকে কে চেনে? নীলা যদি অস্বীকার করে?

দশ বছর আগের নীলা আর নেই। নতুন করে তার জন্ম হয়েছে।

না—না স্বস্তর তার বন্ধু। স্বস্তর তার সব। সে এনে দিয়েছে শান্তি। তারা দেখেছে স্বপ্ন। সে স্বপ্ন চলেছে সত্যি হতে, বাস্তবে রূপায়িত হতে। নীলা স্বস্তরকে ভুলতে পারে না—তাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ভোরের আলো কটে উঠেছে। আন্তে আন্তে রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছে।

নীলা ফিফিং কাপে জল ধরে রুগীর মুখে।

অরুণের বিস্ময়চকিত চোপ ছুটি নীলার মুখের 'পরে' স্থির হয়ে যায়।

ছুঁটি ছুটি কেঁপে ওঠে—নী-লা।

দশ-দশ বছর পরে।

চোখের কোণে জল গড়িয়ে যায়।

নীলার রাতের স্বপ্ন নিম্নে টুটে যায়।

## বেণারসের দল বেণারসী?

বারাণসীর কারবানা হইতে সিদ্ধ সেণ্টারের বেণারসী কাপড় বাছাই হইয়া সরাসরি কলিকাতার বিক্রয় কেন্দ্রে 'আসার জন্ম' মধ্য পর্যায়ে বুলার বৃদ্ধি না হওয়ায় সিদ্ধ সেণ্টারের বেণারসীর দাম কম এবং ডিজাইনও নিত্য নূতন।

বিবাহের বেণারসী বা যে কোন রূপ বেশম বস্ত্র জয়ের পূর্বে সিদ্ধ সেণ্টারে পদার্পণ করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

## সিদ্ধ সেণ্টার

বেণারসী ও বেশম বস্ত্র প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

বহুবাজার মার্কেট (বহুবাজার কলেজ স্ট্রীট মোড়) কলিকাতা • ফোন ৩৪-৪৮১০

বারাণসী কেন্দ্র : ডি১৭/১০৩, দশাশমেধ রোড।



## পাখাপাখি

### লাবণ্য পালিত

রাতের তারা তুমি  
আকাশ হ'ব আমি,  
সাজাবে নানা সাজে সোনালী ফুল।  
আমার এলোচুলে, সাজাবে ফুলে ফুলে,  
গলায় দোলাবে হার কানেতে ঢুল ॥

বাতাস তুমি হও...  
ধীরে সে কথা কও,  
চাঁপার গন্ধটুকু বকেতে নাও...।  
রাতের সমীরণে—  
ডেকে গো বাঁহাননে...  
মধুর পরশেতে ভারিয়ে দাও ॥

তুমি গো হও নদী  
দেখিব নিরবধি...  
তরীটি আমি হব তোমার কূলে।  
গাহিবে মিঠে গান...  
শুনিব সুর তান...  
ছন্দে ছন্দে তালে রহিব ছলে ॥

## আবক্ষ্মুখর আর্টস্ট দিব

### বন্দনা মুখোপাধ্যায়

গত মার্চ মাসে বাইরে যাওয়া ঠিক হোল। এবারকার বেরোনোর মধ্যে কিন্তু একটু বৈচিত্র্য ছিল, কারণ সমস্ত ভ্রমণটাই করেছিলাম মোটরে। এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্য আমার স্বামীর এক বালাবন্ধুর জন্তে, তাই ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ করার আগেই তাঁর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একটি নামকরা চা-বাগানের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার আমার স্বামীর এই বন্ধুটি এবারকার ছুটিতে তাঁর নতুন গাড়ি নিয়ে আসাম থেকে কোলকাতায় এসেছিলেন। ইঠাং খেয়াল হোল রাঁচীতে কিছুটা জমি কিনবেন।

তাই তাঁরই উৎসাহে আমরা ১লা মার্চ সকাল সাতটায় কোলকাতা ছাড়লাম। যাত্রীর মধ্যে আমরা দু'জন, আমার স্বামীর বন্ধুরা—স্বামী, স্ত্রী—রজন, রাণী, তাদের ছোট্ট মেয়ে রজনী আর তার প্রাণের বন্ধু 'বউ-বউ'—একটি

বি-টি রোড ধরে বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরিয়ে এলাম। ক্রমশঃই মিলিয়ে এল কর্মব্যস্ত মহানগরীর কোলাহল। ব্যাঙের ছাড়িয়ে কিছুটা আমার পর লোকের ভিড় কাটিয়ে ফাঁকা রাস্তায় পড়া গেল। সকালবেলার রোদে চারিদিক ঝলমল করছে, এদিয়ে জীবনযাত্রার থেকে ছুটি পেয়ে সকলের মনই তখন খুশিতে ভরা। রাণী ধরে বসল গান গাইতে হবে। প্রথম শুরু করেছিলাম—

‘আজ কি তাহার বারতা পেল রে’

তারপর সারা রাস্তাই আমরা গান গাইতে হয়েছে। ঘন্টা তিনেক ড্রাইভ করার পর গাছের ছায়ায় কিছুটা বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তারপর সেখান থেকে সোজা এসে থেমেছি ‘বদমান’ রেলওয়ে স্টেশনে। খেতে বসেছিলাম সকলে, কর্তা বললেন যে তিনি কষ্ট করে খবর নিয়ে এসেছেন দুর্গাপুরে নতুন ‘ট্যুরিস্ট লজ’ খুলেছে, রাস্তারটা সেখানেই কাটান যাবে। তারপর দুর্গাপুর দ্বারের ছেঁড় ওপরকার সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি রাঁচী পৌছান যাবে। কাজেই খাওয়া এবং বিশ্রামের পালা শেষ করে আমরা দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং খুঁজে-পেতে ‘ট্যুরিস্ট লজ’-ও বের করা গেল। কিন্তু হলে কি হবে, কর্তা মশায়ের খবর নেওয়ার টোনায তিনি নিজে এবং আমরা সকলেই একমাস আগে পাকতে ‘এপ্রিল ফুল’ হয়ে গেলাম। খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে গোট্টা খোলা হবে আট তারিখে। তখনও তার ভেতরে মিস্ট্রীরা তাদের কাজের শেষ ছোঁয়া দিচ্ছিল।

রজনী বললেন, ‘যা ‘ট্যুরিস্ট লজ’ দেখালে বাবা, না-জানি আরও কত কিছু দেখাবে।

‘ট্যুরিস্ট লজ’ের বহির্দৃশ্য দেখে কিন্তু চোখ জুড়িয়ে গেল। সামনে দিয়েই বয়ে চলেছে দানোদর। বিকেলের আবহাওয়ায় তার শান্ত রূপ দেখে ভাবলাম, এই কি সেই রজমূর্তি দানোদর, যার বস্তা রোধ করবার জন্তে এত মানুষের এত প্রচেষ্টা? জায়গাটায় থাকতে ভারি ভালো লাগছিল, তাই ঠিক করা গেল ভেতরে থাকতে না পারলেও বাইরেই কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাওয়া যাক। রজনীও গাড়ির মধ্যের বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে মহা উৎসাহে লজের সামনে বিছানো হুড়ি নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছিল। কর্তারা বললেন, পামাই যখন হোল, কফি তৈরি কর।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসানসোলের পথ ধরলাম। রাতের একটা আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে, কিন্তু কোথায় তা জানি না। স্বর্ঘদেব তখন পাটে বসেছেন। চারিদিকে সন্ধ্যার আয়োজন চলেছে। সারাদিন গরম ভোগ করার পর তখনকার আদ্যঃপ্রাণী বড় সুন্দর লাগছিল তাই নিজের মনেই গান ধরেছিলাম—

আমাদের মনেও তখন কবির সেই ছন্দ বাজছে—

‘এখন আকাশ রান হল, ক্রান্ত দিবা চকু বোজে—  
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তব মিথ্যা খোজে।’

কিন্তু খোঁজা আমাদের মিথ্যা হয় নি। শেষ পর্যন্ত ‘কুন্ট’তে এসে ‘কুন্ট হোটেল’ে জায়গা পেয়ে গেলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চমৎকার হোটেল।

২রা মার্চ। সকালে রান ও প্রান্তরাশের পালা শেষ করে আবার শুরু হোল আমাদের পথ চলা। চলার পথে বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করলাম ‘মাইথন’ ড্যাম দেখে। মাইথনে অবস্থা আমরা নামি নি, গাড়ি থেকেই উপভোগ করেছি সেখানকার অপূর্ব দৃশ্য। তার পাথর-কাটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাড়ি চালান রজনবাব খুব উপভোগ করছিলেন আর আমরাও প্রাণভরে মিটিয়ে নিচ্ছিলাম দৃষ্টির ক্ষুধা, কাজেই মাইথন ড্যামের ওপরকার পথ ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ধানবাদের পথ ধরলাম। ধানবাদ পেরিয়ে ‘চার’ রোড ধরে মুরী পৌঁছতে প্রায় বেলা ১টা বাজল। মুরী ডাঙার পর সম্মুখ ৬টা নাগাদ রাঁচী পৌঁছলাম।

কালের গতির সঙ্গে সবাকিছুর ভেতরেই আসছে পরিবর্তন। রাঁচীর রূপটাকেও চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলাম। আমাদের ছোটবেলাকার সে শান্ত ছাঁব আর শেঁই। চারিদিকে শস্যশিল্পের বিকাশ তাকে যেন ক্রমশই যক্ষিত করে তুলছে। আসলে যে উদ্বেগ নিয়ে রজনবাব রাঁচীতে এসেছিলেন তার কিন্তু কিছুই হোল না। রাঁচীর বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি সেদিক দিয়েও গেলেন না। এর আগেও তাঁর এখানে এসেছেন, কাজেই দেখার আকর্ষণ বিশেষ কিছু ছিল না।

৩রা মার্চ। এদিন গেলাম ‘দশনঘাঘ’ বর্ণা দেগতে। ‘দশনঘাঘের’ পথ ধরেই তৈরি হচ্ছে রাঁচী-জামসেদপুরের হাইওয়ে। তাই বেশ বয়েক মাইল, ওখান রাস্তার থেকে বিচ্ছিন্ন করা উঁচুনীচু রাস্তার ভেতর দিয়ে খুব বঠ করে ড্রাইভ করার পর আমরা একটা বাকের মুখে এসে পড়লাম। সেখান থেকে ত্রাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে ‘দশনঘাঘের’ পথ বেকে গেছে সাঁওতাল বাস্তুর ভেতর দিয়ে। দশটা ধারা থাকার জন্তে বর্ণাটার নাম হয়েছিল ‘দশনঘাঘ’। কিন্তু তার সবগুলো এখন আর নেই। আমরা ছ’টা ধারা দেখতে পেলাম। যাত্রীদের সুবিধার জন্তে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি হয়েছে সিঁড়ি আর জায়গায় জায়গায় একেকটা রেলিংঘেরা চষর—সেখানে থেকে বর্ণার দৃষ্টি উপভোগ করা যায়। ওপরে একটি ছোট রেষ্ট হাউসও আছে।

৪টা মার্চ। এ তারিখটাও আমরা রাঁচীতে কাটলাম। সেদিন গিয়েছিলাম ‘হাভীয়া’ দেখতে। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না জঙ্গল কোট কি চমৎকার একটা শহর গড়ে

উঠতে চলেছে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে জায়গাটার নাম রাখা হবে ‘জগন্নাথ নগর’। নামটা রাখার একটা তাৎপর্য আছে। কারণ জগন্নাথ পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠছে এই শহর, যার তলায় প্রতিবছর রাঁচীর বিখ্যাত রথের মেলা বসে।

৫ই মার্চ। রাঁচীতে আর ভালো লাগছে না, সকাল আটটায় তাকে বিনায় জানিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারকার লক্ষ্য হোল রাজগীর আর নালন্দা। রাঁচী থেকে হাজারিবাগের পথে পড়ে ‘চুঁচালুর’ ঘাট। আগেও বহুবার এই ঘাট পেরিয়েছি কিন্তু পাহাড়-কাটা উঁচু রাস্তার ওপর থেকে সুন্দর বিস্তৃত উপত্যকার শোভা আমার কাছে কোনদিনই পুরোন হয় নি। আবার নতুন করে তাকে উপভোগ করলাম। গাছে গাছে পলাশের সমারোহ যেন বনের মাঝে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। রামগড় পেরিয়ে আমার পর অল্পক্ষণের জন্তে ছাড়িয়েছিলাম হাজারিবাগে, তারপর একেবারে এসে থেমেছি তিলাইয়া ড্যামে। এতক্ষণ ড্রাইভ করার পর বড় সুন্দর লাগল তিলাইয়ার সুন্দর শান্ত পরিবেশ। তার ছবির মত দৃশ্যকে সামনে রেখে আমরা রেষ্ট হাউসের বারান্দায় বিচ্ছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। ছ’পাশে কোডারমার গভীর জঙ্গল, তার মাঝ দিয়ে একেবেঁকে চলে গেছে সুন্দর পিচালা রাস্তা। রজনবাব বললেন, এরকম রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে ভারি আনন্দ পাওয়া যায়। ফেরবার সময়ও আমরা এই পথেই ফিরব।

কিন্তু তখনও জানি না কি বিপদ আমাদের কপালে লেগা আছে। গয়া জেলায় পড়বার পর থেকেই শুরু হোল অসহ্য গরম ধুলোর ঝড়। গাছপালার সংখ্যা খুবই কম, ছাঁদিকে ধুঁধু করছে শুধু শুকনো প্রান্তর। তার মার্চ মাসের ঝড় রূপ দেখে এপ্রিল-মে’র কথা বলনা করতেও ভয় হচ্ছিল। মর্মে, মর্মে উপলব্ধি করাছিলাম কেন এখানে গরমের দিনে লোক মারা যায়। রাঙোলি পেরিয়ে নওয়াদার আগে আমরা ঝাঁদবের রাস্তা ধরলাম। বারণ এটাই গয়া জেলার ভেতর দিয়ে রাজগীর যাবার সংক্ষিপ্ত পথ।

তিনটে নাগাদ রাজগীর পৌঁছলাম। এবারে রাঁচী থেকেই সার্টি হাউসে থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, কাজেই সোজা সেখানে এসেই নামলাম। রাজগীর পৌঁছানর ঘটনাক্ষণের মধ্যেই আমরা নালন্দা দেখতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। নালন্দার পথে কিছুদূর এগিয়ে দেখা গেল যে পেট্রল যতটা বয়েছে তাতে ফিরে আসা যাবে না। কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও পেট্রল স্টেশন না থাকায় আমাদের বিহারশরিফ পর্যন্ত যেতে হোল। পেট্রল নিয়ে আবার নালন্দার পথ ধরলাম। কিছুদূর

আসার পর রক্তনা হঠাৎ 'বউ-বউ, বউ-বউ' করে কান্না জুড়ে দিল। খুঁজ-পেতে দেখি তার 'বউ-বউ' গাড়ির ভেতর নেই। আমি আর রাণী এদুট অসম্ভব হয়েছিলাম, সেই ফাঁকে কখন সে তাকে স্কেলে দিয়েছে। তক্ষুণি গাড়ি থামান হোল। সকলেই মহা ভাবনায় পড়েছি, কারণ 'বউ-বউ' ছাড়া তাকে ভোলান অসম্ভব। কিন্তু একটু পিছিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম বেচারী 'বউ-বউ' তখন একটি ছোট হেলের পায়ের লাথি খেতে খেতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তাকে ফিরে পেয়ে রক্তনার সে কি আনন্দ।

কিন্তু সবকিছুর পালা শেষ করে নালন্দায় পৌঁছে দেখি সেদিনকার মত তার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা ফিরে আসা ছাড়া আর কোন উপায় বইল না। রাজগীরে ফিরে নানের জতো কুণ্ডতে গেলাম, কিন্তু সেখানেও দেখি অসম্ভব তীর্থযাত্রীর ভিড়। সারাদিনের ক্লান্তির পর আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সার্কিট হাউসে ফিরে জান বরাই ঠিক বরলাম।

ভই মার্চ। সকাল আটটা নাগাদ আবার গেলাম নালন্দা দেখতে। যাত্রীদের দেখবার জতো ন'টার সময় গেট খুলে দেওয়া হয়। একটি গাইড সঙ্গে নিয়ে আমরা দেখা আরম্ভ করলাম।

ভূগর্ভস্থিত মহাবিহারের একটি পুরাতন প্রবেশ পথই এখন যাত্রীদের প্রধান প্রবেশ পথ। তার দু'দিকে মঠের প্রাচীর। প্রধান প্রবেশ পথের ভেতরকার আরেকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে খানিকটা আসার পর আমরা একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়লাম। তার পশ্চিমদিক দিয়ে মন্দিরের এবং পূর্বদিক দিয়ে মঠের সারি চলে গেছে। কিন্তু প্রধান মন্দিরটিকে দেখা যায় তার বিশিষ্টতা বজায় বেগে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণদিকের একপ্রান্তে। গঠনের দিক দিয়ে এইটাই সব থেকে বড় এবং দৃষ্টি আকর্ষক।

পরিকল্পনা এবং সাধারণ আকৃতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমস্ত মঠগুলি মোটামুটি প্রায় একইভাবে তৈরি। একটি টানা বারানার কোণ ঘেঁষে রয়েছে ছোট ছোট কক্ষের সারি। বারান্দাটির সমুখভাগ প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। কক্ষগুলির ভেতরে প্রবেশ করলে একপাশে দেখা যাবে আরেকটি করে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ। কক্ষগাত্রে একটি সুরু এবং নীচ প্রবেশ পথ দিয়ে এই প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। গাইডের মুখে শুনলাম তখনকার দিনে জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান জিনিসপত্র তাঁরা এই প্রকোষ্ঠে রাখতেন। কোন এক সময় মঠে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে সম্রাণী এবং ছাত্রগণ কিছু সময়ের জন্তে মঠ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। পুড়ে যাওয়া কাঠের কড়ি-বরগা, দরজা, মূর্তি এবং শস্যের ধ্বংসস্তূপের ভেতর এখনও তার

মঠ দেখা শেষ করে আমরা মন্দিরগুলি দেখলাম। প্রধান মন্দিরটি একটি দৃঢ় এবং বিশাল স্থাপত্যের নিদর্শন। তার চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বহু ছোট ছোট স্তূপ। গাইডের কাছে শুনলাম অনেকগুলি মন্দিরকে একই জায়গায় দু-তিনবার বার গড়ে তোলা হয়েছে। খনন কার্যের দ্বারা দেখা গেছে যে, অতি ক্ষুদ্র মূল মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর পরবর্তীকালে বর্ধিত আকারে মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে এবং এইভাবেই তার আকার ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে একটি পর্যায়ের মন্দির খুবই চিত্তাকর্ষক এবং সমৃদ্ধ রক্ষিত। গাইডের কাছে জানতে পারলাম সেটি নানিক পঞ্চম পর্যায়ের নির্মাণ করা হয়েছিল। এর চারদিকে চারটি স্তম্ভের ভেতর এখন তিনটিকে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গির্জার পার্শ্ব প্রাচীর গাভী ও স্তম্ভগুলি সারিবন্দী কলুঙ্গির দ্বারা শোভিত। আর তাদের মধ্যভাগে দেখা যায় অপরূপ শ্রীমণ্ডিত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের চিত্র। ঐতিহাসিক প্রমাণই এখন এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু মন্দিরগুলি দেখতে দেখতে মনে হোল এক সময় হয়ত এর আদ্য-বাস্য মুগ্ধিত করে বেজে উঠত সেই মহান মন্ত্র—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,

ধর্মং শরণং গচ্ছামি,

সত্ত্বং শরণং গচ্ছামি।

খনিত স্থান দেখা শেষ করে আমরা সংগ্রহশালায় এলাম। এখানকার সংগৃহীত বস্তুর মধ্যে রয়েছে বহুসংখ্যক প্রস্তর আর ব্রোঞ্জ-এর তৈরি নানান দেব-দেবীর মূর্তি। বঙ্গা বাহুল্য তার মধ্যে বুদ্ধমূর্তিই বেশি। তা ছাড়া পাথর, তামা আর ইটের ওপর খোদাই করা বহু লিপি, কারুকার্য-খচিত ধাতু ও মাটির ফলক, কার্যক্ষেত্রে হিসাবে ব্যবহৃত নানারকম শীলমোহর আর মাটির বাসন-কোসন ইত্যাদি। মাটির বাসনের মধ্যে অনেকগুলি বিস্তৃত মুখ পাত্রের গায়ে দেখা যায় নানারকম জঙ্ঘ-জানোয়ার, ফুল ইত্যাদির কারুকার্য করা। আবার কতকগুলির ওপর চিক্ চিক্ করছে অতুর্গ। সংগ্রহশালাটি দেখতে দেখতে ভেবে অবাক হতে হয় যে, কত যুগ আগেও ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা কত উন্নত ছিল। নানান ভিক্ষায় ও নানান আসনে অধিষ্ঠিত মূর্তিগুলি তাস্কর্ষের অপরূপ নিদর্শন। বুদ্ধমূর্তিগুলির বিভিন্ন মূদ্রার ভেতর দিয়ে কুটে উঠেছে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি।

## হোস্টেলের চিঠি

স্বপ্না লাহিড়ী

বা—

শীতের আমেজ লেগেছে রোদ্দুরে,  
 তেরচা করে রোদ এসে পড়েছে,  
 পশ্চিমের ঝুল-বারান্দায়।  
 আমি জানি তোমার ওখানে  
 তুমি এখন বসে আছ কোচে।  
 তোমার কাঁচা-পাকা চুল খোলা,  
 ছড়ানো রয়েছে পিঠের ওপরে  
 হাতে রয়েছে, বই কিংবা পশম-কাঠি।  
 পায়ের কাছে শুয়ে প্যাঞ্জি, মাঝে মাঝে  
 পিট পিট করে দেখছে তোমার মুখের দিকে।  
 ধারের কোচে বাপি রয়েছে বসে, পাশে র‍্যাশট্রেতে  
 আধখানা সিগারেট জ্বলা।  
 বাপির কোলে খোলা রয়েছে,  
 আজকের আসা বাংলা কাগজের যাহুকর ম্যানড্রেক।  
 দরজার পাশের চেয়ারে বসে দিদি,  
 ধৈর্য ধরে পড়ছে, শহর কলিকাতার আদি-পূর্ব-গ্রাম  
 মাঝে মাঝে দেখছে তেরচা চোখে প্যাঞ্জিকে  
 প্যাঞ্জি নিবিড়কার।  
 কোণের রেডিও থেকে ভেসে আসছে বিলিতি স্বর  
 তোমার কানে তখন বাজছে—তিনটি গলায় কলরোল  
 বকতে গিয়েই নিজের মনেই হয় তো  
 হেসে ফেললে! দেখ তো কাণ্ড?  
 ওরা তো এখানে নেই—বাগড়া করবে কারা—  
 বকব কাকে?  
 বাপি, কাগজ পড়তে পড়তে,  
 পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখেন  
 টোব্যাকো পাচ খালি।  
 আনমনা বাপি বলতে গেলেন—চিনার, তামাকটা  
 নিয়ে এসো তো বেটা।  
 তখনই মনে পড়লো—আরে! চিনার তো  
 বসে রয়েছে ন'শ মাইল দূরে!  
 তামাক খাওয়া হল না বাপির, কাগজ রেখে,  
 উঠে দাঁড়ালেন! অফিস যাবার সময় হলো!  
 প্যাটবন নামটা কানে যেতেই—চমকে উঠলো দিদি  
 বলতে গেল, ওরে জয়—তোর প্যাটবন।  
 বই রেখে উঠে দাঁড়ালো দিদি  
 জয়কে একটা চিঠি লিখতে হবে।  
 তোমাদের স্তব্ধ, স্তব্ধ চন্দ্রে ভরা দিনগুলি  
 উৎপাতে ভরে দিচ্ছে না সেই তিনটে ভূত  
 যারা আজ এই মুহূর্তে এম সি হোস্টেলের  
 এই ছোট ঘরের ছুটি খাটে  
 কান্না বই দিয়ে বসে আছে—

## বস্টন প্রবাসের দিন

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণা বসু

ওয়ার্শিংটনে ছুটি

ওয়ার্শিংটনে যদি যেতেই হয় তবে চেরী-ব্লসম টাইমে  
 যাও, বন্ধুবান্ধব সকলের মুখেই এক কথা। বসন্তকালেই  
 ওয়ার্শিংটন রমণীয় হয়ে ওঠে। এপ্রিলের গোড়ায় 'শ'  
 ঠিক করলে 'ভেকেশন' নেবে। আমেরিকানরা খুব ভেকেশন  
 বিলাসী জাত। এরা খাটেও যেমন আত্মরিক, তেমনি  
 ছুটি উপভোগ করতেও জানে। সারা সপ্তাহ প্রাণান্ত  
 পরিশ্রম করবে তারপরই বোরিয়ে পড়বে উইক-এণ্ড করতে,  
 মোটরগাড়িতে পিকনিক বাস্কেট তুলে সপরিবারে চলল  
 হয়ত বা সমুদ্রের ধারে। কিন্তু উইক-এণ্ড ছাড়াও বছরভোর  
 পালা করে ঘুরে ঘুরে ভেকেশন নেয় সবাই, তখন পাড়ি দেবে  
 দূরে, তেমন তেমন সংগতি থাকলে হয়ত যাবে ঘুরোপে।

আমাদের ভেকেশন আমরা ওয়ার্শিংটনে কাটা'ব স্থির  
 করলাম। এপ্রিলের প্রথমে ওয়ার্শিংটনে চেরীফুল লোটে,  
 চেরীফুলের সৌন্দর্য ফাগিক। কিন্তু যে দশ-বারোদিন  
 ফুলের বাহার থাকে ওয়ার্শিংটনের পথঘাট, ঘরবাড়ি,  
 পাবলিক মল্লমেরের আলাদা শ্রী দেখা দেয়। তা ছাড়া  
 আবহাওয়ার দিক থেকেও চেরীফুল ফোটার এই দিন ক'টি  
 মেৎকার। ওয়ার্শিংটনের নাগরিকেরা এইসময় আয়োজন  
 করে চেরী-ব্লসম ফোর্স্টভাল বা চেরীফুলের উৎসব।

অতএব এপ্রিলের গোড়ায় একদিন বস্টন থেকে বেরিয়ে  
 পড়া গেল। বস্টন তখনো শীতে কাতর গাছপালা রিক্ত  
 ফুলপাতার চিহ্নহীন। টিপ্, টিপ্, বৃষ্টির মধ্যে শীতে কাপতে  
 কাপতে সাউথ স্টেশনে এসে বেশি রাতের দিকে একটা ট্রেনে  
 চেপে পড়লাম।



রাত্রির অন্ধকার টেনে পার হয়ে সকালবেলা ওয়াশিংটনে মেসেই মনে খুশির চমক লাগল। চারিদিকে গাছপালা স্নিগ্ধ, সবুজ যে কোন ভারতীয়ের চোখ জুড়িয়ে যাবার কথা। বিশেষ করে সে যদি বস্টনের তীব্র শীত আর ক্লান্ত ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে সবমাত্র এসে থাকে। কোন শহরকে প্রথম ধাক্কায় ভাল লেগে গেলে তার সবকিছুই ভাল মনে হয়। ১৬নং স্ট্রীটের ওপর যে হোটেল উঠলাম তার ঘরখানা ভাল লাগল, ছিমছাম করে সাজানো। দেয়ালের গায়ে উজ্জ্বলতার ছাঁকানা ছবি। হোটেল রজডেন্ট—নামটাও যেন মনে হল বেশ।

স্টেশন থেকে আসবার সময় এক দীর্ঘকায় নিগ্রো ট্যাক্সি ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে চড়ে আমি সারাটা পথ একটু সশঙ্কিত হয়ে বসেছিলাম। নিকম কালো রং, পুরু ঠোঁট, পোল চোখ, কদমছাঁট চুল, পেশীবহুল চেহারা। আমার দিক থেকে ছ'একটা আড়ষ্টমত হাঁ-হাঁ জবাব পেলেও নিরুৎসাহ না হয়ে সারা পথ মিং মুর আপনমনে বকবক করে চলেছিল। একসময় হঠাৎ ফস করে একটা পকেটবই অর্থাৎ কিনা



মনিবাগ বার করে একটি ক্ষুদ্র ছবি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে সজ্জভাবে বললে, আমার মেয়ের ছবি—মাসখানেক বয়স হল। কোন ভীষণ-দর্শন ব্যক্তির চেহারায় যে এমন আশ্চর্য বমনীয়তা ফুটে উঠতে পারে, মিং মুরকে না দেখলে আমার জানা হত না। ঠিক সেই মুহূর্তে তার কালো চেহারা আলো করে ফুটে উঠল এক কোমল, স্নেহশীল পিতৃহৃদয়। ওয়াশিংটনের রাজপথে দেখা পেলাম যেন কাবুলিওয়ালার আমেরিকান সংস্করণ।

সেই থেকে মিং মুর আমাদের বেজায় বন্ধু হয়ে পড়ল। কোথায় কোথায় যাবে তোমরা, কি দেখবে ওয়াশিংটনের বুলো—আমিই নিয়ে যাব। ঘন ঘন টেলিফোন করে, আজ কি প্রোগ্রাম? আমার ক্যাব নিয়ে আসব কি?

বুটিশ ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস যে আমাদের ভারতীয়দের মন স্পর্শ করে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বস্টনের পথে-ঘাটে এ সংগ্রামের অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। বস্টন ছাড়া আর যে ছুটি শহরে গিয়ে ওদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনগুলি বিশেষভাবে মনে পড়েছিল তার একটি হল ফিলাডেলফিয়া অন্যটি এই ওয়াশিংটন।

লিঙ্কন মেমোরিয়াল পিছনে ফেলে পোটোম্যাক নদীর ওপর সেতু পার হয়ে মিং মুর তার ক্যাব ছেঁছ করে ছুটিয়ে দিলে। চলেছি মাউন্ট ভেরনন্, জর্জ ওয়াশিংটনের বাসগৃহ দেখতে। ওয়াশিংটন থেকে মাউন্ট ভেরনন্ রাজপথের দু'পাশে প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিক সুন্দর। পথের মধ্যে ম্যারিন মেমোরিয়ালের সামনে পাড়ি দাঁড় করালো মুর সাহেব। আমেরিকার নৌবহরের সম্মানে উৎসর্গীকৃত বিরাট ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। কয়েকটি নাবিকের মূর্তি, আমেরিকার জাতীয় পতাকা স্থাপন করার ভঙ্গিতে। আশ্চর্য বলিষ্ঠ ও জীবন্ত শিল্পকীর্তি।

মাউন্ট ভেরননে ওয়াশিংটনের এস্টেট অনেকটা আমাদের দেশ-গায়ের জমিদার বাড়ি আর কি। অনেকখানি জমিজমার মাঝখানে দোতলা বাসগৃহ। ঘরগুলি সব সমস্তে রক্ষিত। জর্জ ওয়াশিংটনের নিজের শোবার ঘর, মার্শা ওয়াশিংটনের আগের পক্ষের নাতি-নাতনীদের জন্ম বাচ্চাদের ঘরে পাতা ছোট খাট, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী সেখানে তার ব্যবহৃত ডেস্ক ও চেয়ার, বসবার ঘর, খাবার ঘরে টেবিলপাতা, প্যান্ট্রিতে মার্শার প্রিয় নীল ও সাদা কাচের বাসনের সেট। মনে হয় বাড়ির কর্তা-গর্গাম-ছেলেমেয়ে বাইরে গেছে এখনি ফিরবে। বাইরে আলাদা রান্নাবাড়ি, এ কিছু মর্ডান আমেরিকান ক্রাচেন নয়—বেশ এলাহি বাপারের ব্যবস্থা।

## অজ্ঞান ও প্রাণ

অবশেষে একপাশে ছোট সমাধি মন্দির জর্জ ও মার্থার দেহাবশেষ বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুরে ঘুরে সবটা দেখতে সময় মন্দ লাগে না। কিন্তু সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না। মনে হল আমেরিকার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৫ খৃস্টাব্দে। আট বছর পর সেনাপতি পদে অবসর গ্রহণ করে মাউন্ট ভেরননের নির্জনতায় ফিরে এলেন। কিন্তু আবার ডাক পড়ল ফিলাডেলফিয়াতে কয়েক বছরের মধ্যে। এরপর ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টের পদে বৃত্ত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন। ইচ্ছা করলেই তিনি যাবজ্জীবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন। কিন্তু ছুটো টার্ম-এর বেশি প্রেসিডেন্ট পদে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি এই নিলোভিত ও মহৎ মানুষটি। তাই ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে আবার এলেন তাঁর প্রিয় বাসগৃহ মাউন্ট ভেরননে। এখানেই মৃত্যু পরের বছর।

শোনা যায় ১৭৯১ খৃস্টাব্দে নতুন রাজধানী হিঁসেবে ওয়াশিংটন শহরের পত্তন করা হবে বলে যখন স্থির হল তখন এই শহরের নাম 'ওয়াশিংটন' রাখা নিয়ে প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

মাউন্ট ভেরননের ঠিক বাইরেই কাকোতে বসে কফি ও স্ন্যাক্স অর্ডার দিলাম। পরিচালকদের পরনে ওয়াশিংটনের আমলের সুদীর্ঘ কুল্ডারলা পোষাক। কফির অপেক্ষার বসে থাকতে থাকতে আনন্দের কল্যাণ করছিলাম, হেনরি লীর কথাগুলো খুবই মত—

‘যুদ্ধেও প্রথম, শান্তিতেও প্রথম, তাঁর দেশবাসীর হৃদয়েও প্রথমতম, ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট, স্নেহবৎসল মুহূর্তগুলিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।’

ফিরতি পথে আরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা সৈনিকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম আমরা। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও কোরিয়ার যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি নিবেদিত।

উৎকর্ষ করা আছে সমাধির গায়ে—

‘এখানে শায়িত রয়েছে এক আমেরিকান সৈনিক যার পরিচয় একমাত্র দৈবদর্শী জানেন।’

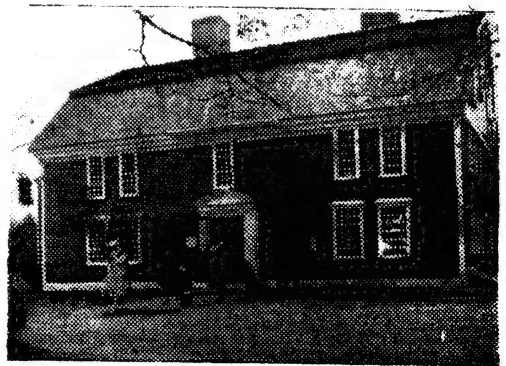
একজন শাস্ত্রী দিনরাত্রি পাহারা দিচ্ছে এখানে, শাস্ত্রী বদল হয় থেকে থেকে। নীরব দর্শকের ভিড় গাভীরূপে শাস্ত্রী বদলের অস্থান দেখে দাঁড়িয়ে।

ওয়াশিংটনের স্মৃতিপূত মাউন্ট ভেরননের পরেই যেখানে গিয়ে আমেরিকার জনসাধারণের ইতিহাস-সাহচর্য

মনের পরিচয় আবার পেয়েছিলাম তা হল লিঙ্কন মেমোরিয়াল ও লিঙ্কন মিউজিয়াম। সার-সার ভ্রম্ভে ঘেরা লিঙ্কনের স্মৃতিসৌধের স্থাপত্যের মধ্যে এমনিতাই একটা অনাড়ম্বর গাভীরূপ ও বলিষ্ঠতা আছে। সেটা আরো বেশি অস্বাভাবিক আসে স্মৃতিমন্দিরের ভেতর দাঁড়িয়ে চেয়ারে-বসা লিঙ্কনের বিরাট মূর্তির সামনে দাঁড়ালে। উনিশ ফিট দীর্ঘ এই মার্বেলের মূর্তিটি ভাস্কর ডেনিয়েল চেস্টার ফ্রেকের এক অবিদ্যমানীয় মাস্টার-পিস। স্মৃতীকৃত নাক, কোটরগত জল-জল চোখ, দাঁড়ি, লম্বাটে ক্রশমূলে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ—মূর্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল এ চেহারার ভাস্কর্যে গোলেও ভাল।

১০ নং স্ট্রীটের ওপর সাদাশিধে দেখতে বাড়ি লিঙ্কন মিউজিয়াম। ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল কিন্তু এই সাধারণ বাড়িটি ছিল ফ্যাসনেবল ফোর্ড থিয়েটার। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ও তাঁর পত্নী এসেছেন থিয়েটার দেখতে। তৃতীয় অঙ্ক চলছে, সকলের চোখ স্টেজের ওপর এমন সময় প্রেসিডেন্টের বক্সে জন বৃথ নামে এক অভিনেতা সন্তর্পণে প্রবেশ করল, পরমুহূর্তে একটা গুলীর আওয়াজ হল, প্রেসিডেন্ট তাঁর চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

নাটকীয়ভাবে আততায়ীর হাতে লিঙ্কন যেখানে প্রাণ হারালেন সেই ফোর্ড থিয়েটার আজ লিঙ্কন মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে লিঙ্কনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা দলিল, চিত্রপত্র, ছবি সব রয়েছে। রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর পিস্তল, বৃথ পালাবার সময় স্টেজে লাফিয়ে পড়ে যখন তখন তার বটের সঙ্গে জড়িয়ে যায় বক্সের মাঝখানের পতাকা, সেটাও রয়েছে। বৃথ কোন পথে গিয়েছিল পায়ের দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা আছে দর্শকের জন্ত।



● লংফেলোর কবিতায় অমর হয়ে আছে ওয়াশিংটন-লিঙ্কন

লিঙ্কন মিউজিয়ামের ঠিক সামনের বাড়িটিও ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রক্ষিত আছে। ১৮ই এপ্রিলের সেই রাত্রেই এই বাড়ি ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে। আহত প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে নেবার চেষ্টা বৃথা জেনে ডাক্তাররা কোনমতে তাঁকে সামনের বাড়ির একতলার শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। যেখানে মৃত্যুশয্যায় প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন, সামনের ঘরে শোকাতুরা প্রেসিডেন্ট পত্নী আর পিছনের ঘরে চলছে ক্যাবিনেটের জরুরী মিটিং। পরদিন সকালে সব শেষ হয়ে গেল। মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে যুদ্ধ সেক্রেটারী স্ট্যানটন বললেন—

Now he belongs to the ages

ওয়াশিংটনে আমরা পুরোপুরি ট্যারিস্ট জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলাম। কোনদিন যাই ক্যাপিটল দেখতে, কোনদিন হয়ত হোয়াইট হাউসের দর্শকদের ভিড়ে ঢুকে ঘুরে আসি ভেতরকার বিখ্যাত ঘরগুলোতে ব্লু, গ্রীন বা রেড রুম-এ। অবশ্য ওয়াশিংটনে আমার সবচাইতে প্রিয় যাবার জায়গা দাঁড়িয়েছিল ত্রাশনেল গ্যালারি অফ আর্ট। খুব সুন্দর গুছিয়ে সাজানো, তুলনায় বর্তন মিউজিয়াম মনে হল একটু এলোমেলো। একদিন যাওয়া হল জেফারসন মেমোরিয়াল, চারদিকে চেরাইকুলের বাহার মাঝখানে সুদৃশ্য স্মৃতিসৌধ। আর পাঁচশ' পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল তো এড়িয়ে চলার উপায় নেই। আসতে-যেতে সবদিক থেকেই চোখে পড়ছে।

হয়ত ওয়াশিংটনে আমাদের শুধু ট্যারিস্ট ভ্রমণের স্মৃতিই থেকে যেত। কিন্তু তা হতে দিল না মার্গারেট গ্রীয়ার। গ্রীয়াররা আমাদের এক বর্টনিয়ান বন্ধু-পরিবারের বন্ধু। নিঃ গ্রীয়ার একজন আইনজীবী, মার্গারেটদের বেশ স্বচ্ছল পরিবার। দু'টি শিশু-কন্যা ও দু'টি নিগ্রো পরিচারিকা নিয়ে ওদের সংসার। এই প্রথম সাধারণ আমেরিকান পরিবারের পরিচারিকা দেখলাম, তাও একটা নয় দু' দু'টো। একজন রাঁধে, আর একজন বাচ্চাদের দেখে। বর্তনে বড়জোর দেখেছি সপ্তাহে এক-আধবার আসে ক্লিনিং উওম্যান—ঘর-দোর পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। মার্গারেট আমাকে বললে শুদিককার চেয়ে এদিকে ডোমেস্টিক হেল্প পাওয়া সহজ এবং সস্তাও।

মার্গারেট আমাদের ঘুরিয়ে দেখাখো শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের পাড়া, তারপর পুরোনো শহর জর্জ টাউন যেখানে ছোট ছোট খেলনা বাড়ির মত দেখতে বাড়ি, ছবির মত দেখায়। চলে আসার আগে একটা ভাল ডিনারেং আয়োজন করলে মার্গারেট, রুপোর বাতিদানে মোমবাতি জালিয়ে, টেবিল সাজিয়ে বেশ সমারোহ করে ক্যাণ্ডেল

এক পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাওয়ায় আমাদের খুবই ভাল লাগল।

দেখতে দেখতে চেরী-ব্লসম ফেস্টিভালের দিন এসে গেল। বিকেলে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা বেরোবার কথা। এদিকে সকাল থেকে আকাশের অবস্থা সঙ্গীন। প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত, তারপর শুরু হল ফ্লিট-বর্ষণ আর বিকেল বেলায় হয়ে গেল একচোট স্নো-ফল্। এসময় এরকম তুষারপাত অপ্রত্যাশিত। বহুদিন পর নাকি এইভাবে স্নো-ফল্ হয়ে চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল মাটি হল।

সেজন্তু আমাদের মনে বিশেষ স্কেভ ছিল না অবশ্য। পরদিন দেখলাম তুষারের আঘাতে স্নান হয়ে গেছে চেরীফুলের কণভঙ্গুর সৌন্দর্য। কিন্তু আমাদের বর্তন ফিরবার দিন এসে গেছে। ইউনিয়ন রেলওয়ে টার্মিনাল থেকে ছাড়ল আমাদের বর্তনগামী ট্রেন।

[ আগামীবারে ওয়েলকাম হোম।

## একাত্ত

### অমিতা ঘোষাল

বিদ্রোহী মন উধাও যে আজ কোনখানে  
জানলো না কেউ গোপন গায়র কে টানে  
ইজ্ঞানীল ঐ আকাশ পারের নন্দনে  
সপ্তগ্রহের গভীর সুরের বন্ধনে।

জানলো না কেউ তাদের মাঝে এই আমি  
সুন্ধনিতর কণে কণে যাই থামি  
বিক্রপ আর ভৎসনাতে দুর্বহ—  
যতই আঘাত হানিল জীবন দুঃশঃ।

জানি বৃথা বিফলতায় লজ্জাময়,  
এই যে জয় অত্যাচারে দুঃখে ক্ষয়।  
যার বেদনার হিসাব কোথাও নেই ধরা  
তারি লাগি আজকে আকাশ গান ভরা।

তারি লাগি বকুলশাখে ফুল জাগে





(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মূলধা দাশগুপ্ত

মা তুমি না থাকবে বলছিলে। কাচ্চি বলল শিবানীর  
অন্তঃমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে।

থাকো।

খাবার দেওয়া হয়েছে।

শিবানী উঠে দাঁড়াল।

নাথার কাঁটাগুলি টেনে টেনে ড্রেসিং-টোবিলের উপর  
ছুড়ে ফেলে খোপাটা খুলে ফেলল। বোধ হয় কাঁটাগুলি  
আলগা হয়ে গিয়ে ঘাড়-মাথায় ফুটছিল। নইলে  
খোপা খুলবার কোন দরকার ছিল না। খোলা খোপা  
ফের হাতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর ঘর থেকে  
বেরিয়ে গেল। কাচ্চি দেখল শিবানী ছাদের দিকে  
যাচ্ছে। বুল ওর কথা শিবানীর কিছুই কানে যায় নি।  
থাকো—উত্তরটা একটা যান্ত্রিক উত্তর মাত্র।

শিবানী ছাদে উঠে গেছে নিশিতে-পাওয়া লোকের  
মতো। তার মাথা এখন চিন্তা দিয়ে ঠাসা। সেখানে  
কোন কথা ঢুকছে না। কাচ্চি জানে আরো বহুক্ষণ ঢুকবে  
না। ফের ছাদে গিয়ে শিবানীকে খাবার তাগিদ দিয়ে  
লাভ নেই। যখন নেমে আসবার তখন সে আপনি নেমে  
আসবে। এখন ওকে অপেক্ষা করতে হবে।

এই এখনটা যে কতক্ষণ তা বলা কঠিন। হতে পারে  
দু'ঘণ্টা। হতে পারে একঘণ্টা। হতে পারে রাত  
তিনটে—হ্যাঁ, রাত তিনটেও হতে পারে।

এমন অনেক হয় শিবানীর। কখন হবে এরকম—  
ডাক্তার যেমন রোগীর চোখের ঘোর থেকে জর কত  
উঠবে বঝতে পারে—কাচ্চি তেমনি শিবানীর চোখের

রং দেখলে বুঝতে পারে। আজ তার বোঝা উচিত ছিল।  
অবশি তা হলে কাচ্চি তার অনেক আগেই ছাদে উঠে  
যাবে। বসে থাকবে শিবানীর পেছনটিকে, নয় তো আঁচল  
বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে তার কাছে-ধারে।

কিন্তু সে অনেক গরের কথা। বর্তমানে কাচ্চির অনেক  
কাজ। রাত দশটা বেজে গেছে। বাড়ি খানসামার  
হাজিরার কাজ। সকাল ছাটায় আসে রাত দশটায় চলে যায়  
তারা। তারপর ইন্দ্রনাথের খাবার তদারক করে আবহুল।  
শিবানীর কাচ্চি।

শিবানীর খাবার টোবিলে সাজানো রয়েছে। সেগুলি  
তুলে রাখতে হবে। যখন শিবানী নেমে আসবে, ফের  
গরম করে পরিবেশন করবে। সাহেব আজ আর থাকেন  
বলে মনে হয় না। তবু আবহুল কিছু ফ্রাই ফ্রিজের  
রেখে গেছে তুলে। যদি হঠাৎ সাহেব রাতে-বেরাতে  
ফিরে খাবার চেয়ে বসে তবে যেন অসহায় বোধ না করে—  
আবহুল সে বিষয়ে দু-একবার ঠেকে গিয়ে এখন খুব  
সচেতন। ডিনারের নেমস্তম্ভ আছে, থাকো না বলে  
গিয়েও সাহেব—রাতে-বেরাতে খাবার চেয়ে বসেন, এমনও  
হামেশাই ঘটে। তাই আবহুল কিছু না কিছু খাবার  
তুলে রাখেই।

টোবিলের সাজানো খাবার তুলে রাখতে রাখতে কাচ্চির  
এতো দুঃখ হতে লাগলো! আজ সে বড় আহলাদ করে মেহ  
করে দিয়েছিল। কত মাথা ঝাড়েছিল। কচি আয়ের  
অম্বল খেলে শরীর ঠাণ্ডা হয়।

তাই সে গ্রীষ্মের দাপট দেখে কচি আয়ের অম্বল

করতে দিয়েছিল। বাটিভরা অম্বল তেমনি পড়ে রইল। কাল বাবুটি মোহের তলায় হাসবে। বলবে, তুমি খেয়ে ফেল আয়া। শরীর এমন ঠাণ্ডা হবে যে, তোমায় লেপ গায়ে চাপাতে হবে। স্নেহক্রান্ত কি সাথে বলে! শরীরকে কেবল ভাতাতেই জানে—আর ভাতাতেই চায়। ঠাণ্ডা রাখতে, ঠাণ্ডা করতে জানেও না, চায়ও না। কাঁচা আয়ের অম্বল, স্নক্তোর ঝোল তিতে ঝোল রাখতে বললে প্রথম হঠিয়ে দিতে চায়। তারপর অবহেলা করে রাখে। তারপর যখন সাহেব মুখে তোলেন না, শিবানী কাচ্চির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু খায়, বাকি সব পড়ে থাকে তখন মোহের তলায় হাসে। কালকেও হাসবে অম্বলের বাটি হাতে নিয়ে। টক করে বাটিভরা অম্বল কাচ্চি বেশিনের ভেতর ঢেলে দিল। আমের ঝোলটা পড়ে গেল। আমের টুকরো আটকে রইল বেশিনের মুখে। সেগুলি তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে কাচ্চি যেন আরামবোধ করলে। তারপর তার যা কাজ বাকি ছিল একে একে সারলে।

শিবানীর খাবার ইলেকট্রিক-রেঞ্জের ভেতর ঢুকিয়ে মুছ তাপের চাবি ঘুরিয়ে খাবার গরম থাকার ব্যবস্থা করলে। নিজের খাওয়ার কথা ভাবলে। সবাই খেয়ে নিয়েছে। আবদুল ও খেয়ে নিয়ে সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে সিঁড়িতে। সেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু শিবানী যতক্ষণ না খাচ্ছে ততক্ষণ সে খায় কি করে। যদি সাহেবের মতো শিবানী বাইরে থাকত; তার বাইরে খেয়ে আসার সম্ভাবনা থাকত, না খেয়ে এলে বাড়ি এসে খেতো, তবে কাচ্চিও আবদুলের মতো খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু এ যে শিবানী না খেয়ে রয়েছে। সে খায় কি করে।

কিংবা হয় তো এ জন্তেও নয়। আবদুলের সাহেব ডাকার মতো সেও যদি শিবানীকে মেনসাৰ ডাকতো শিবানীও ইন্দ্রনাথের মতো সাহেব হতো—তবে ভাত গলা দিয়ে নামতো, সেও খেয়ে নিতে পারতো। এখন যতক্ষণ শিবানী উপোস থাকছে ততক্ষণ ভাত তার গলা দিয়ে নামতে চাইবে না—তাই সে চেষ্টা করে লাভ নেই। একপ্লাস জল খেয়ে এসে সে শোবার ঘরে ঢুকল শিবানীর। বিছানার বেডকভার তুলে শয্যা প্রস্তুত করলে পরিপাটি করে। ড্রেসিং-টেবিলের উপর চুলের কাঁটাগুলি ছিটিয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছিল শিবানী। সেগুলি এদিক-ওদিক থেকে তুলে কাঁটা-ক্লিপ সেক্টিপনের ছোট্ট টেঁটোতে গুছিয়ে রাখলে। ঘরের আরো যা একটু-আধটু গোছগাছ করার ছিল তা করে ঘরের উঁচু পাওয়ারের বাতিটা নিভিয়ে নীচু পাওয়ারের সবুজ বাতিটা জ্বলে দিলে। তারপর কি ভেবে কে জানে কাচ্চি শিবানীর আর ইন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যখানের ভারী ভেলভেটের পর্দাটা একটু সরিয়ে ইন্দ্রনাথের ঘরটার দিকে

এই শুল্কঘরটার দিকে তাকিয়ে কেন যে সে দাঁড়িয়ে রইল তা সে জানে না। হয় তো শুল্ক ঘরটাকে নয়, এ ক'দিনের কথায় মুখরিত ঘরটাই সে দেখছিল ঈশৎ চোখের জলের বাপসা অস্পষ্টতার ভেতর দিয়ে। সে বুঝছিল এ ঘর আর শীগগির মুখরিত হবে না। এ ক'দিনের মধ্যে কতবার তাকে টেঁটে গাজিয়ে দু'ভনার খাবার এখানে বসে আনতে হয়েছে। শিবানীর কত ছোটবড় ডাকে বার বার ছুটে আসতে হয়েছে। সাহেবের কত অমুরাগ আর আমুগতোর প্রকাশ হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে আর শিবানীর চোখে-মুখে লজ্জার আভা খেলে যেতে দেখেছে।

কি স্নেহের হাওয়াই না বহঁতে শুরু করেছিল।

সেই স্নেহের হাওয়ায় সেও ভেলে বেড়াচ্ছিল। শিবানী ওর কাছে শুধু মানিব নয়, শুধু মানবী নয়, শিবানী ওর কাছে দেবী। শিবানীর ছুঁচোখের দৃষ্টিতে বরাভয়। তাই শিবানী তার গায়ের কালো রং-এর উল্লেখ করে কিছু বললে, সে আঁতকে ওঠে। সে গান শুনছে,—

কালো মেয়ে পায়ের তলায়—

দেখে যা আলোর নাচন।

রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব—

যার হাতে মরণ বাঁচন—।

শিবানীর মুখের ওপরও এমনি আলোর নাচ কি দেখতে পায় না সাহেব?

কি করে পাবে।

সাহেব তো শিব নয়।

তাই শিবানীর রূপ সাহেব দেখতে পায় না।

সাহেবকে ক্ষমা করে ফেলে কাচ্চি সে মুহূর্তে আর দায়িত্ব গিয়ে চাপে আরও বেশি করে শিবানীর ওপর। তুমি দেবী।

তুমি ক্ষমা করো মা সাহেবকে।

আজও ক্ষমা করো।

শিবানী যেন ক্ষমা করলো। সঙ্গে সঙ্গে শুল্কঘরটা যেন মুহূর্তে কাচ্চির চোখে ভস্মে উঠল। হেসে উঠল। গেয়ে উঠল শিবানীর কণ্ঠের গুনগুন গান—

আমার মনে নবীন মেঘের সুর লেগেছে—

সিঁড়ির মুখে সাহেবের প্রতীক্ষারত উপবিষ্ট আবদুলকে —মেমসা'ব ছাদে গেছেন তাই সে ছাদে যাচ্ছে জানিয়ে ছাদে উঠে এলো কাচ্চি।

শহরের দালান-কোঠা মানুষ-ঠাসা বাড়িগুলির মাথার ওপর একটুকরো রেলিং ঘেরা বাধানো জমি—যার বুক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর বোদে তেতে-পুড়ে ফেটে ওঠে। বর্ষায়

চট্টাটে তেল না দিয়েও সারাদিন চুল পরিপাটি রাখা যায়  
...কখনো ক্লফ দেখায় না



আপনার বেয়ড়া চুলগুলোকে  
বশে আনতে কি চট্টাটে  
তেল ব্যবহার করেন ?  
—কেয়ো-কাপিন এমন একটি  
তেল যা মোটেই চট্টাটে না,  
—আর ভেজল গুণ সম্পন্ন  
এই আশ্চর্য্য তেলের গন্ধও  
মনোরম। কেয়ো-কাপিন  
বেয়ড়া চুল বশে আনে, সারা-  
দিন পরিপাটি রাখে।  
আজই এক শিশি কিনুন।

**কেয়ো-কাপিন**

দ্বিবিধ মনদায় কেশ তৈল



দে'জ মেডিক্যাল স্টোরস্  
প্রাইভেট লিঃ  
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী  
মাদ্রাজ • পাটনা • গোহাটি  
কটক • অমরপুর

PXDMKB-5

স্বাভাসেতে হয়—ছাদ বলতে এই যে ছাঁচটা চোখের উপর ভেসে ওঠে, এ ছাদ তা নয়।

কর্পোরেশনের আইন মানা কোনমতে চার হাত জমি ছেড়ে দেওয়া মধ্যবিস্তৃত পাড়ার ঘিঞ্জি বাড়ি—এগুলি নয়। এগুলি অভিজাত পল্লীর প্রচুর জমি ছেড়ে দেওয়া বাগানওলা বাড়ি। এখানে খোলা ছাদেও আশে-পাশের খোলাদৃষ্টি এসে পড়তে পারে না গায়ের উপর। পাড়া নির্জন। বাড়িগুলি শাস্ত। ছাদগুলি আরো। এসব পল্লীর ছাদে এসে বসলে এই কলকাতা শহরের বৃষ্টি আসা মাঝুরের মাথার উপর বসেও কিছু নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব। শিবানী ওণ টেলে জায়গাটাকে তৈরি করে নিয়েছে। রোদ বৃষ্টি কোনটাই যেন তার ছাদে এসে বসা বন্ধ করতে না পারে সেজন্ত ছাদের পূর্ব কোণ উঁচু করে বাঁধিয়ে নিয়ে তার উপর বসিয়েছে এক মস্ত জাপানী ছাতা। ছাতার মাথার উপর লতিয়ে দিয়েছে চামেলি ফুল আর সন্ধ্যামালতী লতা। সমস্ত ছাদ ঘিরে নানা দেশী-বিলেতি ফুলের টব। ছাতার তলায় আছে আরামকেন্দ্রা, টেবিল দু'চারখানা বইরাগার সেলফ। আছে আলোর ব্যবস্থা। এমন কি যদি গুনট গরম পড়ে। বাতাস না থাকে ছাদেও। তাই আছে লম্বা স্ক্যাণ্ডে বসানো পাখা। ড্রিং-রুম সবার বসবার ঘর। এটা শিবানীর একার বসবার জায়গা। এটা গুরু চুপ করে বসে থাকবার জায়গা। আকাশ দেখবার জায়গা। বৃষ্টি দেখবার জায়গা।

যে চাঁদটা সন্ধ্যাবেলা ললিতাদের বাড়ির জানালা দিয়ে একটুকরো ক্ষীণ আলো পায়ের কাছে ফেলেছিল, সে চাঁদটা এখন গোল হয়ে মাথার উপর উঠে এসেছে। চাঁদের সাদা আলোটাকে সকাল ভেবে কাকগুলি বাড়ির নিমগাছটা থেকে এক একবার কা-কা করে ডেকে উঠছে। পাখা ঝাপটে বের হয়ে এসে এ-ডাল ও-ডাল করছে কিন্তু তারপরই ভুল বৃত্তে পেরে চুপ করে যাচ্ছে। শিবানীর ছাদের নিঃশব্দের জগতে মাঝে মাঝে এই শাস্ত কাকের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ উঠছে না। এসে পৌছোবার মতো শব্দ এখন এ পল্লীর কোথাও হচ্ছেও না। অভিজাত পল্লী এটা। শিবানীর কানকে উত্ত্যক্ত করে না এরা। করাটিকে বর্বরতা জ্ঞান করে। রেডিও ছাড়ে নিজেদের কানের মতো করে—পড়শীদের ক্ষিপ্ত করে তুলবার মতো করে নয়। যদিও বা দিনের বেলা বা সন্ধ্যারাত্রে উচ্চগ্রামে ছুঁটো ডাক হাঁক আর রেডিওগ্রামের বাজনা কানে আসে আটটার পর আর তাও আসবে না। হাসি-গল্প-গানের চৌহদ্দি তারা নিজেদের চারদেয়ালের গিঁড়ের বাইরে তো যেতে দেবেই না, দুর্দান্ত রাগ, কথা কাটাকাটি ঝগড়াও নীচু গলায়, কথা দাঁতের তলায় চেপে করে। সত্য নাগরিকের দাবিত্ত সম্বন্ধ এলা সম্বন্ধে।

শিবানী টের পেলো কান্নির এসে পেছনে বসা।—বসে বসে হাই তোলা। শুয়ে পড়া। ঘুমিয়ে পড়াটা আর আগের গুলির মতো—অমূল্যে ব্যতীত হলো না। কান্নির গভীর নিঃশ্বাসের মৃদুন্দ ফোসফাস ধনাই তা ঘোষণা করতে লাগলো। কান্নি অমূল্য বুদ্ধিমতী। ও যদি ওদের মতো লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেতো তবে নিশ্চয় কিছু করতো। গাছের মাটি থেকে রস টেনে নেবার মতো যেয়েটা যেন শিবানীর শিক্ষা-দীক্ষা থেকে আলো টেনে নেয়। এক-এক সময় বিস্মিত করে দেয় কান্নি ওকে তার দোকার এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়ে।

কান্নির ঘুম দেখে শিবানীর ইচ্ছে করতে লাগল এই যে শুয়ে-পড়া মাত্র ঘুম—এই ঘুমটার জন্ত দু'হাত জোড় করে সে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা করে।

এখন যদি শোবামাত্র কান্নির মধ্যে গুরু দু'চোখে ঘুম নেমে আসত, তবে সে নিশ্চয়ই গিয়ে শুয়ে পড়ত।

দু'চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে শুয়েই হোক আর এখানে ওখানে যেখানে বসে চোখ মেলেই হোক আজকের রাত ওকে জেগে কাটাতে হবে জানে বলেই বসে রয়েছে। নইলে ঘুমের মতো শান্তিকে ঠেলে রেখে ও কি অশান্তচিত্ত নিয়ে এখানে বিলাস করবার জন্ত বসে থাকত। ঘুম না এলে রাতে বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করতে পারে না। তার চাইতে বই পড়ে, আকাশটাকে লম্বা কল্পনা করে তাই নিয়ে তীরে বসে সুন্দর কাটিয়ে দিতে পারে।

দেয়ও। আজ বলে নয়। অনেক রাতই অনেক সময় শিবানীকে জেগে পার করতে হয়। মন নাড়া খেলে চেউ উঠল আর ঘুম গেল। মনটিও খাসা—যেন অ্যাটলান্টিক মহাসাগর! চেউ-এর নৃত্য লোগ আছেই। কোথাও এককণা প্রশান্তি নেই। কোনদিক থেকে একটুগানি হাওয়া লাগল কি অমনি উদ্দাম ঝড় উঠল। আজ গুরু এতো উত্তাল হয়ে উঠবার কি কোন যুক্তি আছে?

ও কি একদিনের তরেও ইন্দ্রনাথের উপর ভুলেও আস্থা স্থাপন করেছিল?

না।

এবারও কি ভেবেছিল সত্যকে পেলাম?

না।

তবে কি ইন্দ্রনাথ মিথ্যা দিয়ে ভুলাচ্ছে ভেবেছিল?

না, তাও ভাবে নি।

সত্য আর মিথ্যা দু'টো দু'প্রান্তের শেষ কথা। মাঝখানে আরো কিছু কথা থাকে যা সত্য নয় বলেই মিথ্যা হয় না। মিথ্যা নয় বলেই সত্য হয় না। এটা ইন্দ্রনাথের

## দুদয় পাঠো

ইজ্রনাথের সত্য চোঁটাটাকে সম্মান দিচ্ছিল সে। আর এ তো বাইরের সম্মান দেওয়া নয়। এর ভেতরই তো তার প্রাণ। তাই সে ইজ্রনাথের হয়ে ওঠার ইচ্ছাটাকে দু' হাত আঁকড়ে ধরেছিল.....

না, ওর আজকের এই তীব্র অশান্তিপনার ভেতর ওর নিজের দিকে পা রেখে দাঁড়াবার মতো কিছু যুক্তি আছে। এ কেবল তার ভাবপ্রবণ মনের—যে মন তাকে ব্যাধির মতো ভোগায় তারই প্রকাশ নয়। যে মাটিটুকুর উপর দু'পা রেখে দাঁড়াতে চাচ্ছি। যে খুঁটিটাকে জীবন বলে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছি—হঠাৎ যদি দেখা যায় পায়ের তলার সেই মাটি, হাতের মুঠোর সেই খুঁটি দু'টোই ভূয়া তবে কিছুটা ছটফটানি প্রথম ধাক্কাই ক্ষমার।

ক্ষমা করা গেল তোমায় শিবানী।

নিজেকে মার্জনা করে দিলো শিবানী।

কিন্তু তারপর শিবানী? স্বভাবটা তো রয়েই গেল তোমার। আজকের ক্ষমা দিয়ে কি তার কিছু সংশোধন হলো? স্বভাবকে সংশোধন করো শিবানী। নিজের ভেতর সমাহিত হও। নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করার সাধনা করো। তবেই আর বাইরের জেঁদে ছটফট করতে হবে না। বাইরের কাছে কাঙালপনা করে সুখ চাইতে

গেলে সে পেয়ে বসে। তার দোঁরাওয়ার অন্ত থাকে না।

‘বাগী বাজাও মম অন্তরে’—

অন্তরের বাগী বাজিয়ে তোল শিবানী তবেই আর বাইরের তুলান তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। নিজের ভরা মনটির মাঝখানে নিবিড় হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসার উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারবে।

চোখ বুজে স্মরণ করলো শিবানী—ঠোট নেড়ে মস্তের মতো বলতে লাগল, আমাদের যা কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড় আনন্দ—তার ভাঙার যদি বাইরে থাকে তা হলে আমাদের ভাবি মুশকিল, কেন না, বাইরের পথে বাধা দটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষে চাওয়ার অভ্যাশ আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েছি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্তে যেন আমরা গভীরভাবে রতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে কিছু জিনিস পাই নি, সৌন্দর্য থেকে যা কিছু বাধা আসছে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁত খুঁত করি, ছটফট করতে

# লেক্সিন

## সর্প দংশনের সুবিখ্যাত মহৌষধ

সর্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করে। কাকড়াবিছা

ও অ্যানা বিষাক্ত দংশনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

“Snake Bite” পুস্তক আবার পাওয়া হাইতেছে; দাম ৫/-

বিনামূল্যে বিবরণী পাঠান হয়।

## পি, ব্যানার্জী, মিহিছাম

কলিকাতা অফিস:

১১৪এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৫

থাকি তা হলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চক্কলতা নিতান্তই বুধা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে বাজে।

শিবর হব, প্রসন্ন রাখব তা হলেই আমাদের মন এমন একটি স্বক আকাশে বাস করবে যাতে করে অকৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আনাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না।

অনেকটা সময় চোখ বুজে রইল শিবানী।

রাত বাড়তে লাগল। সব বাড়ির বাতি নিতে গেছে। কেবল দু-একটা গাড়ি বারান্দায় অথবা গেটের মাথায় বাতি জ্বলছে।

কাচ্চি একবার জেগে ধ্যানস্থ শিবানীকে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজল।

একসময় ঝকঝকে আকাশের দিকে ঝকঝকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল শিবানী। সাদা সাদা তুলো পেঁজা মেঘ ধীরমস্থর গতিতে ভেসে চলেছে। ওর আরাগ কেন্দারায় বসা গা-ছাড়া ভাবের মতই তাদের চলায়ও একটা গা-ছাড়া ভাব। যেন চলছে বলেই চলছে। থামতে হলেই থামবে। চাঁদের আলোটাকেও ভীষণ মৃত লাগতে লাগল শিবানীর। যেন কোন সুন্দরী নারীর রক্তশূন্য মৃত মুখের সাদা ফ্যাকাশে ধূং আলোটার। কথটা মনে হতেই পিঠটা কেমন শিরশির করে উঠল—

বাজে মিল যত!

মন যখন বাজে হয়ে থাকে তখন এমন সব বাজে মিল মনে আসে।

মন যদি এমন বাজে হয়েই থাকবে তবে চোখ বন্ধ করে বলল কি সে? কিই বা মনের মতো করে বলল?

আরামকেন্দারী থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বলল শিবানী—ভাবতে লাগল—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে যেন আনন্দের সাড়া পেলো শিবানী। তারি আশ্চর্য তো। আনন্দ যেন ঘুঁমিয়েছিল, ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে। না ডাকলে বুঝি তারও সাড়া পাওয়া যায় না। আবার ভাবলে সে—

বেশ লাগছে—

অপূর্ব লাগছে—

এই ঝকঝকে চাঁদ, তারাতারা আকাশ, আলোভরা ছাদ, শিরশিরে হাওয়া, টবে টবে রং-বেরং-এর হাওয়ায় আন্দোলিত কল, তাপানী ছাত্তার চারপাশে ঝুলেপড়া শোভাযমান থোকা থোকা ঘুঁই, চামেলী, সন্ধ্যামালতীর গুচ্ছ, তাদের সুমিষ্ট আশ্রাণ, সব কিছু—সব কিছু অপূর্বরমণীয়। আঃ,

আকাশভরা সূর্য-তারার বিশ্বভরা প্রাণ,

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান।

কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,

ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,

জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,

বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান—

কে ইন্দ্রনাথ? ওর জীবনে তার এতো কি মূল্য? কেনই বা সে এতো মূল্য দিয়ে রেখেছে? একটা লোকের ওপর বাড়তি মূল্য চাপিয়েই যত অ-সুখ জীবনে সেধে ডেকে আনে মেয়েরা। মেয়েদের এ এক আশ্চর্য আত্ম-নিপীড়ন ক্রীতি! এ থেকে ওদের উঠে আসতে হবে।

কি আসে-যায় ইন্দ্রনাথ না ফিরলে? মদ খেয়ে ফিরলে? মাতাল হয়ে অত্ন কোথাও পড়ে থাকলে? কিম্বা একেবারেই তার জীবনে অল্পপরিহৃত থাকলে?

আকাশভরা সূর্য-তারার বিশ্বভরা প্রাণ,

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান—

গান শুনে ছুঁচোখ কচলে কাচ্চি উঠে বলল। কান পেতে গান শুনে লাগল। ওর দিকে নজর পড়লে শিবানী উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলে উঠল, ভীষণ কিদে পেয়েছে। চল খেতে দিবি।

নীচে নেমেই দেখতে পেলো, ইন্দ্রনাথ মাতাল পায়ের বারান্দা পার হচ্ছে। আবড়ল তার পেছন পেছন চলছে।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে শিবানী আঙড়ালো—

আকাশভরা সূর্য-তারার বিশ্বভরা প্রাণ,

তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান— [ক্রমশঃ]

## অনায়ত্ত উপকূল

রূপশ্রী ঘোষ

বহুদূর বিস্তৃত রহে আমার অনায়ত্ত উপকূল  
মেঘে আর জলে মিশে নিত্য তার ঘননীর রঙ—  
তারে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় নিত্য কোন্ পাখির বেতুল,  
পালকেতে সূর্যস্নান, আকাশেতে গোড়সারঙ

দিন দিন বেড়ে যায় উপকূল বিস্তৃত নিঃসীম,  
আরো কত বেড়ে যাবে—ছড়াবে ধূসর অয়িকর্ণা—  
মনে মনে ঈর্ষাক্ষিপিক। গ্রস্ত হবে আকাশ নীলিম,  
মেঘ আর জল রঙ। লাল রঙে প্রলয়-ভাবনা।

# পূর্ণ প্রাণে

## চাবার হায়া

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

ক্যাথরিন হিউম



সিঁটার লুক চোখ মেলে চাইল। আসেল্‌স্‌ কনভেন্ট  
সেলের ধূসর পর্দাটা বাতাসে ঝুলছে অঙ্গ-অঙ্গ।  
তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল স্পেনীয় শেঁলায় মত  
দেখাচ্ছে ওগুলোকে।...নদীপথে যাচ্ছে মাদার ম্যাথিল্ডার  
সঙ্গে। ফ্রেন্সে প্রশ্ন করেছেন তিনি, দাঁড়ি দ্বারা বরাতে  
পারবে না।

—কেন না, তুমি যদি প্রেমে পড়ে থাক আর সে কথা না  
বলে থাক আনায়, মাই চাইল্ড, বেদনায় মন ভেঙে যাবে  
আমার।

—ও না, মাই মাদার। ত্রিভুবন যেন মুহূর্তের জন্ম  
ছুলে উঠল তার চোখের সামনে। উপলব্ধি করতে পারছে  
এ প্রশ্ন করার আগে পুরো একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করেছেন  
সুপারিয়র সে কিছু বলে কি না দেখতে। পূর্ণ একটা  
সপ্তাহ—উৎকর্ষায় আর প্রার্থনায় ভরা। একই প্রশ্নে  
ক্ষতবিক্ষত করেছেন নিজেকে—নিজের অমনোযোগিতায়  
একটি আত্মা তিনি হারালেন কি না।—প্রেমে আমি কখনই  
পড়ি নি। আমি কেবল ঠেকে শ্রদ্ধা করি মাই মাদার,  
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। কোন জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন  
যখন থাকে যে স্বার্থহীন দক্ষতার প্রকাশ দেখি ঠুর মধ্যে  
তারই জন্তে শ্রদ্ধা করি ঠেকে। আমার সবসময় মনে হয়  
অপারেশনের ছুরি ঠুর হাতে থাকে যখন সেই অপার্থিব সময়ে  
ভগবানের খুব কাছাকাছি থাকেন উনি।

নৌকোর সামনের দিকটা জলের ওপর উঁচু হয়ে উঠেছে  
...সামনের বেদীর মত আসনটার ওপর মাদার ম্যাথিল্ডা  
দাঁড়িয়ে আছেন...জাহাজে ঝোলানো পুতুলের মত দেখাচ্ছে।

সহজ সুরে বললেন, ভারি খুশি হলাম সিঁটার যে তুমি  
লব খুলে বললে আমায়।

খানিক পরে কল্লনার ছবিগুলো মিলিয়ে 'গেল।  
সেলের পর্দাটার দিকে চেয়ে এখন কেবল দেখতে পাচ্ছে  
জায়গায় জায়গায় ছাই-রঙা উল দিয়ে নিপুণ হাতে বিপু  
করা।...শীত আর বরছে না, শুধু বুকের কাছটায় কেনন  
একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু উদ্দীপক ঐ ওয়র্কটার সংগে  
তার কোন যোগ থাকবার কথা নয়।

ভেঙ্গারে যাবার পথে অবশিষ্ট ক্যাফাইন কাপসুলগুলো  
করিডরের ধারে একটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিল।  
পরিচ্ছন্ন হাউসটিতে এদিক-ওদিক যেতে-আসতে যেতকম  
কাগজ নানরা সবসময়ই নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে বাস্কেটে  
ফেলে দেবে বলে তেমনই একটা কাগজে বুদ্ধি করে মুড়ে  
নিয়োগ ছিল।

নিজের পিউতে নতজানু হয়ে হাতজোড় করল।

—হে প্রভু, ঐ সব স্থিতি থেকে মুক্তি দাও আনায়,  
আনায় সাহায্য কর। অর্ধেক পথ তো আমি এগিয়েই  
এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে—ক্যাফাইনগুলো ফেলে  
দিয়ে এলাম...স্থিতিকে ওরা আরও ধারালো করে তোলে।  
তার বদলে সব সময় কাঁপতে হবে অবস্থা, তাই ভাল। কি  
করে মেরী হব প্রভু, কংগো যদি এমন করে আমার রক্তে  
মিশে থাকে? তাঁর মত যেন হতে পারি, এই তুমি  
কর। যেন তাঁরই মত পূর্ণ মাধুর্যে বলতে পারি, 'তোমার  
ইচ্ছা'।

প্রার্থনা করছে আর লিটল অফিসের পাতা ওটাচ্ছে  
যথাযথ, ঠোট নাড়ছে...সিঁটারদের সংগে স্তবগমাই  
করছে যেন।

—এখনও অঝা লাগছে ব্রেসেড লর্ড, এই অফিস  
গাইতে গাইতে কিঁকিঁ পোকাক ডাক শুনে পাচ্ছি

না। কংগোয় ভেঁস্পার শুরু হয় যখন তোমার ইজ্ঞজাল বিছানোর সময় হয়ে আসে। আগতপ্রায় লক্ষ্য... অরণ্যে তোমার সৃষ্টি ইতোমধ্যেই ঘুম ভেঙে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে—রাতের শিকারের জন্তু শাপ দিয়ে নিচ্ছে ঠোঁটে-থাবায়... প্রার্থনার শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছাতাম যখন, রাত্রির আঁধার-সমুদ্র দিগন্ত-সীমার ঠিক নীচে তখন।

প্রার্থনা সত্ত্বেও স্মৃতিগুলো জড়িয়ে ধরে আছে।

অনন্তর অবসর' বড় বেশি গুরুভার হয়ে চেপে বসল যখন, একদিন মাদার হাউস হাসপাতালের ক্যানসার-ওয়ার্ড দেখতে যাবার অমুখিত চেয়ে নিল সিস্টার লুক।

পুরোনো অসাধ্য রোগী সব। ওরা জানে না, যে ও একজন সম্ভ্রুতি কংগো-প্রত্যাগত সিস্টার। কিন্তু বহু বছর এই দুঃসহ রোগভোগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা এটা ঠিক জানতে পেরেছে মিশনারীরা কেউ ফিরে এসেছেন। কারণ সব ব্যাণ্ডেজের চেয়ে যেগুলো প্রিয় তাদের সেই ব্যাণ্ডেজগুলো আবার দেখা যাচ্ছে ড্রেসিং কার্টে। সিস্টার লুকের টিনের ট্রান্সে ট্রিপিক্যাল হাবিটের ছেঁড়া টুকরোগুলো এসেছে ওদের বীভৎস ক্ষতগুলো এখন তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা।

ছেঁড়া হাবিটগুলো সিস্টার ইউভোরিয় বেছে নিয়েছেন সর্বদা ব্যবহারের জন্তু। যে অংশগুলোয় স্মৃতি ঠাস আছে এখনও ঠাস আছে সেগুলো কেটে নিয়ে মোটারনিটি ওয়ার্ডের তোয়ালে হয়। আর যে জায়গাগুলো একেবারেই পিঁজে গেছে—সাধারণতই স্বাক্টের রিপু করা সামনের দিকটা, যেখানটায় প্রার্থনার সময় হাঁটুর চাপ পড়ে...পুড়িয়ে ফেলবার আগে শেষবার নরম ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহারের জন্তু ভাঁজ করে রাখা হয়। ক্যানসার রোগীদের ধারণা এগুলো বিশেষ উপশম এনে দেবে।

রোগ-পাণ্ডুর হাতে ওরা ঐ ভাঁজকরা জীর্ণ কাপড়গুলো চাপড়াচ্ছে দেখলে ওর মধ্যে কি একটা অমুভূতি ঠেলে ওঠে লুকের কাছে। ওদের বলতে হচ্ছে করে, ঐ জরাজীর্ণ স্মৃতিগুলোর ভাঁজে বহু বছরের প্রার্থনা লুকিয়ে আছে। এই দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আর হৃদয়-বেদনাও। আর যে পরিভ্রতা তোমরা করনা কর, তাও।

সংগিনী নানটি ফিল্মফিস করে ধলেছিল, এই ড্রেসিংগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্তে সরিয়ে নেওয়া হয় যখন, ওরা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভাবি অবাক লাগে ভাবতে ৩৩৩ কি করে জানল আপনাদের মিশনারী সিস্টারদের এই

এমন জায়গা কোথাও নেই মাদার হাউসে সিস্টার লুক যেখানে স্মৃতির টানা-পোড়েন থেকে রেহাই পেতে পারে। অস্বস্তি লেগে থাকে তাই সর্বদা—চলতি জীবনটা বুঝি আর তার কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত নয়। সে যেন একটা প্রেত-দর্শক...খুশিমত আসতে-যেতে পারে...আর হাতে তার বড় বেশি সময়।

যখন-তখন শোনে, ডাঃ ফরচুতাটি বলছেন, ধরুন যদি অনিশ্চিত কালের জন্তে আটকে থাকতে হয় আপনায়... শক্তিতা যথেষ্ট মনে হবে তো তখন?

সেই শাণিত ছুরির মত চোখ দুটোর সামনে যেমন উত্তর দিত এখন এই বিজ্ঞপায়ক কণ্ঠস্বরের উত্তর আরও খোলাখুলিই দেয়। বলে, তাতে একেবারে কোন মনেই নেই উত্তর। এখন আমার মধ্যে এই যে অস্থিরতা এসেছে এ কেবল আমার কাজ নেই বলে। কাজে ফিরে যাওয়াটা প্রয়োজন মনে করি আমি, এই পর্যন্ত।

বুলেটিন বোর্ডের বদলি আর পুনর্নিয়োগের তালিকাগুলো সমন্বয়যোগে দেখে রোজ। বারবার করে দেখে।

মাদার হাউসে তখন তার প্রায় মাসখানেক কেটেছে, ভাইদের নিয়ে পিসিমা এলেন দেখা করতে। যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হ'ল ক'জনে। বাবা দেখা করে যাবার পর যুদ্ধ আরও নিকটবর্তী হয়েছে।

সিস্টার লুক বলছিল, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।

পিসিমা ভীতকণ্ঠে বললেন, এরকম জায়গায় তাই স্বাভাবিক। রেডিও নেই, খবরের কাগজ নেই, কোন আলোচনা নেই...কিন্তু বাইরে গ্যাংবি এখন অবস্থাটা ঠিক '১৪-'১৮র মত। তোমার অবাক লাগবে—কত লোক যে এর মধ্যেই পাসপোর্টে স্পেনের ভিসাও জুড়ে নিয়েছে। মুখ বেঁকিয়ে হাসলেন একটু।—গত যুদ্ধে যে পরিবারগুলো দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল ঠিক তাই।

—আর আমরা যারা থাকব...আবারও সেই একই অবস্থা হবে তো?

—সম্ভবত। ছোটখাট যুদ্ধ হবে, আর তারপরই দখল।

এটোনি লম্বা হয়েছে খুব, সুন্দর চেহারাটি। তর্ক করছে পিসিমার সংগে। আয়ত্তরকার বিশাল আয়োজনের শর্ণনা দিয়ে সগর্বে বলছে দ্বিতীয় দফায় আর কখনই ছেঁদে যাবে না বেলজিয়াম। পিসিমা ভাইপোর দিকে বিষন্ন সহামুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

সিস্টার লুক চুপচাপ শুনেছে কেবল। ভাবছে যুদ্ধ যদি গতাই শুরু হয়, এইখানেই দুঃখ-হৃদশার শেষ থাকবে না,



..শক্তি দিয়েছেন কেবল আমার জিতটায় লাগাম টেনে রাখতে..যাতে জিজ্ঞাসা করে না ফেলি..

পিসিমা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন!—তুমি হয় তো এটাকে ছেলেখেলা ভাবছ এটোনি—চিনের সৈন্ত আর খেলাধরের দুর্গ! তুমি জান না, গতবারের দখলের দুর্ভোগ যখন ভুগেছি তুমি একেবারে বাচ্চা ছিলে। বাড়ি অর্ধশতাব্দীর দখলে আর তোমার বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে.. তার মাথার দাম ঘোষণা হয়ে গেছে তখন! গুপ্তচরগিরির অপরাধ!..আমার দিকে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থেক না, তাকেই জিজ্ঞাসা কোর। নাক বেড়ে চোখের জল মুছলেন পিসিমা।—কাজেই যে মুহুর্তে ঐ জাফানরা এদেশের মাটিতে পা দেবে আবার এদেশ ছেড়ে যেতে হবে ওকে।

সিফার লুক এবার সবিস্ময়ে বলল, এখানে থাকতে তো কোনদিন একথা বলে নি আমায়।

—কাউকেই কখনও বলে না। রাগতন্ত্রের উত্তর দিলেন পিসিমা। বলার মধ্যে একটু গর্বও বেশানো ছিল।

যতই অবিশ্বাস্ত হোক, যুদ্ধের আলোচনা 'সিফার' লুকের মন থেকে কিন্তু কংগোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে একটু পিছনে। তাড়াতাড়ি কংগোয় ফিরে যাবার যে বাসনাটা সবসময় জড়িয়ে ছিল, তার বাঁধন শিথিল হয়েছে কিছুটা। অল্পভব করেছে এখন আর সেই জলন্ত ইচ্ছেটা চোখ দিয়ে উপছে পড়বে না, অক্ষুণ্ণ বক্তব্যটা কাঁপবে না জিহ্বাগ্রে। অল্পভূতিটা সাহস দিল রেভারেণ্ড মাদার ইশাম্ময়েলের কাছে যেতে।

—আমি কাজের মধ্যে ফিরে যেতে চাই রেভারেণ্ড মাদার—যেখানে হোক। আপনাব্যুৎ আশংকা ছিল অবসর কিছুটা উত্তেজিত করবে আমায়, করেছেও। খাঁটি মেরী হতে পারছি না আমি, হাত দু'টো অস্থির হয়ে উঠছে। শিত হাসিতে তার সনির্বন্ধ যিনতির আভাস পাওয়া গেল।—এই হাত দু'খানার জন্তে যে কোন কাজ একটা খুঁজে দিতে পারেন না রেভারেণ্ড মাদার?

রেভারেণ্ড মাদার বিস্ময় প্রকাশ করলেন না একটুও। এই অর্ডারের অফিসে বসে কাটল বহুদিন—এর আদর্শই হল প্রার্থনা আর কাজে ডুবে পাক। এমন মিশনারী পেয়েছেন কি না সন্দেহ প্রাপ্য শিশ্রাম সময়টা পুরো নিশ্চিন্তে শুয়ে-বসে কাটাতে পেরেছেন যিনি।

—ঠিক জান এত তাড়াতাড়ি কাজের উপরন্তু হয়ে গেছে তুমি মাই চাইল্ড? ট্রিপকে যে পরিশ্রম করে ফিরেছ, দীর্ঘতর বিশ্রামের অধিকার আছে তোমার।

—গত মাসে দু'কিলো ওজন বেড়েছে আমার রেভারেণ্ড মাদার। এই ক'বছরের কম ঘুমও পূরণ হয়ে

গেছে। জীবনটাকে বারবার বিশ্লেষণ করে দেখেছি—ভগবানের দয়ায় আধ্যাত্মিক দিকটাকে শৃংখলাবদ্ধ করতে পেরেছি। কিন্তু এখন এই হাত দু'টো..

বাসনাটুকু সোজাখুজি চোখে তারায় প্রকাশ পেতে দিল।

—কি ধরণের নাসিংয়ের কথা ভেবেছ, সিফার?

—টি বি নাসিংয়ের কথা ভাবছিলাম রেভারেণ্ড মাদার। অল্পখটা আমার নিজেরই হয়েছিল, কাজেই প্রতিরোধ-ক্ষমতাটা বিশেষভাবে রয়েছে। টি বি রোগীদের ওপর বিশেষ একটা সহানুভূতি আছে আমার চিরদিন..ওদের ঐ অনন্ত আশা আর সাহস! আমার কেমন মনে হয় ওরা ভগবানের অন্তরংগ সান্নিধ্য পায়।

সুপিরিয়র জেনারেল তাঁর নোটবইটা দেখলেন।

অনিচ্ছাভরে বললেন, দেখছি সত্যিই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ খালি আছে এখন। খুব কঠিন কাজ। অবশ্য তোমাকে এ দায়িত্ব দেওয়ার আগে আমাদের ডাক্তারের মতামত নেব আমি। নোটবই থেকে মুখ তুলে তাকালেন।—কাজটা হল্যাণ্ড বর্ডারে আমাদের হাসপাতালের পালম্যানারি সার্জারির এ্যাসিস্ট্যান্টের।

পালম্যানারি সার্জারির কাজ খালি থাকবে স্বপ্নেও ভাবি নি আমি। এই তো আসল নাসিং রেভারেণ্ড মাদার।

—আর সবচেয়ে কঠিনও। চাকিত একই হাসি খেলে গেল সুপিরিয়র জেনারেলের মুখে। তারপর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু আর একটা কারণেও ইতস্তত করছি আমি। ওখানকার সুপিরিয়র মাদার ডিভাইস মনে-প্রাণে মিশনারী সিফার, অথচ সেই মিশনের স্বপ্ন ঠুকে ছাড়তে হয়েছে। পারিচালনদক্ষতার গুণে তবে এত বেশি প্রয়োজনীয় ডীন এখানে যে, কোনদিন ঠুকে আমরা মিশনের কাজে ছেড়ে দিতে পারি নি। সে হতাশা খুব সাহসের সংগেই জয় করে ফেলেছেন তিনি, কিন্তু কোন মিশনারী সিফারকে তাঁর কাছে যখনই পাঠাই, আমি জানি সেই পুরোনো আকাজ্ঞাগুলো নতুন করে বেদনা দেয় তাঁকে। তোমার এই ভাষাতে মুখখানা তিনি দেখবেন যখন..

রেভারেণ্ড মাদারের শক্তিময় চোখে সাবধানবাণী প্রকাশ পেল।

গলার স্বরটা কড় হয়ে আসতে চাইছে, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব দৃঢ়স্বরে সিফার লুক বলল, ভগবানের রূপায় আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন আপনি, রেভারেণ্ড মাদার।

..ব্যাহত মিশনারী..এ গোপন বেদনার কথা আমিও জানি কিছুটা..

—খুব ভাল কথা তা হলে সিফার। দেখি কি করতে

পারি। যেভাবেও মান্দার আশীর্বাদ করতে হাত তুললেন।

দেখি কি করতে পারি... দেখি কি করতে পারি... ক'টি মাত্র কথা—কিন্তু বিচার-বিবেচনার সুপ তার পিছনে। কোন ভক্তারের খানকয়েক ছেলুং চাটের চেয়ে অনেক বেশি স্বপ্ন আর নিহুঁল। সিস্টার লুক জানে তার মনের অবস্থা সুপিরিয়র জেনারেলের মনে স্বপ্ন তুলাদেও যাচাই হবে। তারই ফলাফলের ওপর সব কিছু নির্ভর করেছে। মান্দার হাউস থেকে ছাড়া পেয়ে কাজে যোগ দেওয়া, আর সেটা এমন একজন সুপিরিয়রের অধীনে, তার উপস্থিতি বেদনা দেবে ঠিকে।

পরের দিনগুলো অধিকাংশ সময়ই চ্যাপেলে কাটল। বার বছরের অভ্যাসে দু'ইটিতে শক্ত কড়া পড়ে গেছে, পাথরের নেকের বর্ষণে ইম্পাতের মত কঠিন হয়ে গেছে পায়ে পাতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে বসে নতজাহু-প্রার্থনা করতে পারে। সুদূর বিশ্বাসে। প্রার্থনার প্রত্যন্তর সে পাবে।

পাঁচদিন পরে বুলেটিন বোর্ডে নিজের নাম দেখতে পেল। হল্যাণ্ড বর্জরের হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে তাকে।

নোটিশটার তলাতেই চলতি ঘটনাবলী আটকানো আছে—তারিখ ২২শে মে, ১৯৩৯। উক্ত দিনে জার্মানি আর ইটালি বালিনে এক দশবছর মেয়াদী সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। একটুকরো জাগতিক খবরই আটকানো সন্দেহ নেই—যে শান্তির জন্তু অবিরত প্রার্থনা করছে নানরা এটা তারই প্রতিপাদন বলে তারা বুঝতে পারে যাতে, তাই।

নিছক কর্তব্যবোধে চোখ বুলিয়ে গেল সিস্টার লুক। এর সংগে তার নিয়োগের যে কোন সংযোগ থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবল না। ভবিষ্যতের ইঙ্গারায় যে যোগাযোগ ঘটল তা একবারেই তার চোখ এড়িয়ে গেল।

বছর ঘুরে না আসতেই কথাটা স্মরণ করতে হয়েছিল তাকে—যখন দেখতে হ'ত আকাশ থেকে ছোট ছোট সাদা কুণ্ডলীর মত কিছু নেমে আসছে নীচে, প্রথমে সেগুলোকে মেঘের মত লাগত, তারপর মাটির কাছাকাছি চলে এলে প্যারাসুট হয়ে যেত... অদৃশ্য স্থতো ধরে নাজি সৈন্য বুলে থাকত তাতে।

[ক্রমশ।

অনুবাদিকা—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

## সেভিংস অ্যাকাউন্টের আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- সদন — বার্ষিক শতকরা ৫%
- টাকা তোলায় উর্দনসীমা নাই
- বছরে ২০০ বার তোলা যায়
- নিম্নতম ব্যাল্যান্স ৫ টাকা মাত্র
- সব অ্যাকাউন্টেই চেক ব্যবহার করা যায়

সেবার



প্রতীক

### ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

পোষ্ট: অফিস . ৪, ক্লাইভ হাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

[ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনিরদরঞ্জন দাশগুপ্ত আইনজগতে  
মিঃ এন আর দাশগুপ্ত নামে সমধিক পরিচিত। ব্যারিস্টার  
হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বহু জটিল  
ও দুঃসহ ফৌজদারী মামলার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অকাটা যুক্তির  
সাহায্যে প্রাজ্ঞল সমাধান করে ও দুর্ভেদ্য রহস্যের জাল উন্মোচন  
করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই রচনাটিতে  
লেখক তাঁর আইনজ্ঞ জীবনের বহু ঐতিহাসিক বোমাধ্বকর  
ও বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করেছেন। স্মৃতিকথামূলক  
ধারাবাহিক এই লেখাটি পাঠক-পাঠিকার সামনে অতীতের  
বহু পরিচিত সত্য ঘটনা নতুন করে তুলে ধরবে।—স ]

# যতদূর মনে পড়ে

শ্রীনিরদরঞ্জন দাশগুপ্ত (বার-এ্যাট-ল)

## দেশে-বিলেতে

মা'ঘরের জীবনধারা! কোনদিক দিয়ে কোণায়  
গিয়ে কিভাবে পরিণতি লাভ করে—  
সে মা'ঘরের ইচ্ছা সাপেক্ষ ত' একেবারেই নয়, এমন কি  
বন্ধনা সাপেক্ষও নয়। কোন অদৃশ্য মহাশক্তির সূক্ষ্ম  
অন্তঃপ্রেরণায় সে ধারা আপন গতিতে বেয়ে চলে—  
তা সে নিজেই কি জানে? যদি পরিণত রূপে  
অতীতের দিকে তাকাই, অবাধ হয়ে এই সত্যটুকু হয়  
তো বা কতকটা উপলব্ধি করি।

ব্যারিস্টার হব—একথা ছেলেবেলা থেকে কখনও  
ভাবি নি, কল্পনাও করি নি।

পূজনীয় পিতৃদেব ছিলেন সে-যুগের ডেপুটি  
ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরেছি এবং  
বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষালভ করেছি। পরে তিনি যখন  
কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন—  
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এ, বি-এ, এম-এ  
পাশ করেছি। কিন্তু বরাবরই ভেবেছি—পিতৃদেব বড়  
সরকারী চাকুরী করেন—আমিও যা হয় একটা কিছু  
ভাল সরকারী চাকুরী পাব। এর বেশি উচ্চাশা আমার কিছু  
ছিল না।

তবে ই্যা। একটা দিক দিয়ে আমার মনের  
বাসনা প্রবল ছিল—আমি নামজাদা সাহিত্যিক হব।  
প্রথম যৌবনে অনেক কবিতা অনেক নাটকও লিখেছি।  
বন্ধ-বান্ধবদের পড়ে শুনিয়েছি তাঁরাও বাহবা দিয়েছেন  
—এদিক দিয়ে আমার মনের বাসনা বেড়েই চলেছিল।

সে যাই হোক, তেমন ভাল চাকুরী কিন্তু আমার  
জুটল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ঐ ধরনের চাকুরীর অনেক  
চেষ্টা করলাম, কিছুই হল না। পেয়েছিলাম শেষ  
পর্যন্ত একটা সাব-ডেপুটির চাকুরী—সে-যুগে সাব-ডেপুটির  
মাহিনা খুব কম ছিল—পিতৃদেবের মনও তত সায়  
দেয় নি—চাকুরীটা নিলাম না।

আয়ুজীবনী নয়। তাই এসব কথা অবাস্তব মনে হতে  
পারে। কিন্তু কি করে, কি মনোভাব নিয়ে আমি  
শেষ পর্যন্ত আইন-আদালতের প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম,  
কেন যে আইনস্কুল বড় বড় দেওয়ানী মামলার ধার  
দিয়েও ঘেঁষি নি, ফৌজদারী মামলা নিয়েই জীবন  
কাটিয়েছি—আইন-আদালতের এই কাহিনীর দিক দিয়ে  
এসব কথা কিছু সার্থকতা হয় তো আছে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত E. D. Sassom & Co  
বলে তখনকার দিনের একটা নামজাদা ব্যবসা-বাণিজ্যের  
আপিসে একটা চাকুরী জুটল। চাকুরীটি অবশ্য  
জুটল কলকাতায়, আমার পিতৃদেবেরই প্রতিপত্তিতে।  
চাকুরীটি মন্দ ছিল না। ভবিষ্যতে উন্নতির আশাও  
যথেষ্ট ছিল। প্রথম বৎসরটা শিক্ষানবিশীর সময় তাঁরা  
আমাকে একশত টাকা করে মাসে মাহিনা দিত।  
এক বৎসর পরে পাকা হলে দু'শো-আড়াইশো টাকায়  
মাহিনা শুরু হবে—ক্রমে বাড়বে, এই ছিল কথা। সেকালের  
পক্ষে বেশ ভালই।

কিন্তু মাস ছ'য়েক চাকুরী করতে না করতে ক্রমে  
আমার অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল। টাকাকড়ির  
হিসেব, আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা  
খুঁটিনাটি আমার মোটেই ভাল লাগত না। এসব  
কাজে কোনও উৎসাহ বা অন্তঃপ্রেরণা একেবারেই পেতাম না।  
অথচ পিতৃদেবকেও কিছু বলতে পারি না—কি ই বা  
বলব!

বহুখানেক যেতে না যেতে, যখন পাকা হয়ে  
মাহিনে বাড়ার সময় এসেছে—আমার মন ক্রমে বিদ্রোহী  
হয়ে উঠল। অথচ উপায়ই বা কি?

এমন সময় একদিন আমার জ্বর হল—অল্প জ্বর।  
বেশ মনে আছে, সংস্কৃত রাত জ্বরের নেশায় হটফট  
করতে করতে খালি এই কথাটিই মনে হতে লাগল  
—আমার জীবনে কিছুই হল না।

এ চাকুরীতেও শাস্তি পাচ্ছি না, অথচ অল্প কোনও  
ভাল চাকুরী পাওয়ার আর কোনও আশাও নেই।

হুটুট করতে করতে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে গিয়ে চট করে একটা কথা মনে এল—আমি ব্যারিস্টার হই না কেন? কথাটা মনে হতেই মনটা যেন একেবারে শান্ত হয়ে গেল। কোথা থেকে হঠাৎ এই অনুপ্রেরণা এল জানি না। আমাদের এক নিকট আত্মীয় মিঃ এন্স কে সেন ব্যারিস্টার ছিলেন। যদিও খুব বেশি দিন তিনি ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন নি—তবুও ইতিমধ্যেই তিনি বেশ নাম করেছিলেন এবং রোজগারও করতেন প্রচুর। চোখের সামনে তাঁরই আদর্শ কি আমার অন্তরতম অন্তরকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

সকালবেলা জর ছেড়ে গেছে। বিছানা থেকে উঠে বাইরে এসে মনটা আমার অবসাদে ভরে গেল। পিতৃদেব কি আমাকে বিলেত পাঠাতে রাজী হবেন? বিলেত যেতে ত' অনেক টাকা লাগে শুনি। পিতৃদেব কি অত টাকা দিতে পারবেন? ধীরে ধীরে পিতৃদেবের কাছে গিয়ে বললাম।

একথা-দুঃখের পর কথাটা বললাম তাঁকে। বললাম—এ চাকুরী আমার মোটেই ভাল লাগছে না, আমি বিলেত যাব ব্যারিস্টার হতে। তিনি খুব বেশি কথা বলতেন না। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ তাই হবে। আমার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

পিতৃদেব তখন কি ভেবেছিলেন জানি না। সাধারণ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে উন্নতি করে তিনি তখন কলকাতার অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন কি—তাঁর প্রতিপত্তিতে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলে ক্ষোভদারী আদালতে কিছু কিছু টাকা আমি পাবই এবং তার ফলে রোজগার চাকুরীর রোজগারের চেয়ে অনেক বেশি হবে; তারপর যদি আমি কাজে দক্ষতা দেখাতে পারি—ইত্যাদি?

সাহিত্য-সাধনার কথা আমি ভুলি নি। ভেবেছিলাম—ভালই হবে, আইন-আদালতে বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হলে সাহিত্যের গোঁরাক পাব আরও বেশি। কি ভুলই ভেবেছিলাম। গোঁরাকের অভাব হয় নি কিন্তু আইন-আদালতের মধ্যে তলিয়ে গেলে সাহিত্য-সাধনার সময় কোথায়? সত্যিকারের সাহিত্য যে কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। আইন-আদালতের সার্থকতাও বিনা সাধনায় অর্জন করা যায় না। বিলেতে একটা চলতি কথা আছে—

Bar is a jealous mistress.

বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়বার চারটি প্রতিষ্ঠান—Inner Temple, Middle Temple, Lincoln's Inn, Greys Inn.

অনেক ভাল। তাই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আমি Middle Temple-ই বেছে নিলাম।

এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ক্লাশ হত এবং সেইসব ক্লাশে বিলেতের বড় বড় আইনজ্ঞেরা পড়াতেন অর্থাৎ লেকচার দিতেন। কিন্তু এসব লেকচার শোনা মোটেই বাধ্যতামূলক ছিল না। Percentage বলে কিছু ছিল না এইসব ক্লাশে। তাই প্রথম প্রথম দু-চার দিন ক্লাশে গেলো—ক্রমে ক্লাশে যাওয়ার উৎসাহ নিভে গেল। থাকতাম অনেক দূরে। তাই বোধ হয় ঐ শীতে সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে, বাসে করে ক্লাশে যাওয়ার উত্তম আর রইল না। শেষ পর্যন্ত ক্লাশ করা একেবারেই ছেড়ে দিলাম। পড়াশুনা যা একটু-আধটু করতাম, তা বাড়িতেই। বন্ধু-বান্ধবীও ত' ক্রমে অনেক জুটে গেল। তবে ই্যা, প্রত্যেক Term-এ অন্তত ডটা করে সাক্ষাতোজনে (Dinner) উপস্থিত থাকতেই হত। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের এইসব সাক্ষাতোজনে, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বড় বড় আইনবিদগণও উপস্থিত থাকতেন। হয় তো ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে এবং কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগের দিক দিয়ে এইসব সাক্ষাতোজনের কতকটা সার্থকতা ছিল। তাই এগুলিকে খানিকটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

বিলেতে আইনের ছাত্র হিসাবে দু'টি ব্যাপার আজও আমার কাছে রহস্য হয়েই আছে—তার কোনও সমাধান আজও করতে পারি নি। আমি এদেশ থেকেই বি এল পাশ করে গিয়েছিলাম। তাই বোধ হয়—যতদূর মনে পড়ে—যাওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে আমি পরীক্ষার প্রথমভাগ (Preliminary) দেওয়ার অধিকার পেলাম এবং ফেলে না রেখে পরীক্ষা দিলামও। তিনটি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছিলাম—Hindu Law, Constitutional Law এবং Criminal Law. পড়াশুনা, আগেই বলেছি, সামান্য কিছু কিছু করেছিলাম—এমন বিশেষ কিছু নয়।

যাই হোক, Hindu Law এবং Constitutionl Law-এর পরীক্ষা মোটামুটি দিলাম—নেহাও মন্দ হল না। কিন্তু Criminal Law-এর পরীক্ষা দিতে বসে প্রশ্নের কাগজ দেখে আমি ত' অশাক। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, একটা প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর আমি জানতাম না। আর সবই ইংরাজীতে যাকে বলে Problem—অর্থাৎ এই এই ঘটনা ঘটেছে, অমুক পক্ষ তোমার কাছে এসেছে তোমাকে দিয়ে আদালতে তার পক্ষ সমর্থন করাবার জন্ত—আইনের দিক দিয়ে কোন ধারার অপরাধ হল এবং তুমি তার জন্ত কি করতে পার? এই ধরনের সব প্রশ্ন।

একবার ভাবলাম উঠে যাই—এই Criminal Law-

যতদূর মনে পড়ে

যখন বসেছি পরীক্ষা দিতে, আঁকাড়ে যা' হয় কিছু কিছু লিখে যাই। ক্ষতি ত' নেই।

বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা লিখলাম—মনে আছে। অর্থাৎ—এরকম লোক আমার কাছে এলে সম্ভাব্য করে তাকে আমি বসাৰ, ধীরভাবে তার কথা আমি শুনব, তারপর আইনের বই দেখে আইনের সঙ্গে ঘটনা মিলিয়ে নেব। তারপর আদালতে গিয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব নানারকম করে ফেনিয়ে ফেনিয়ে আজ-বাজে কথা লিখে একখানা খাতা ভরিয়ে দিয়ে বোধ হয় আর একখানা খাতা চেয়ে নিয়েও কিছু কিছু লিখলাম।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রথিতযশা অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র, এইসময় বিলেতে আমার সঙ্গে ছিল। আমরা একসঙ্গেই বিলেতে গিয়েছিলাম। সোমনাথও ব্যারিস্টারী পড়তেই গিয়েছিল, যদিও সে শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারী পড়ে নি। আমরা তখন এক বাড়িতেই ছিলাম। সে-ও পরীক্ষা দিয়েছিল, তবে মাত্র একটা বিষয়—Criminal Law. সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী কৃতী ছাত্র, ভাল করে পড়াশুনা করেই পরীক্ষা দিয়েছিল। বাড়ি এসে যখন তার সঙ্গে আলোচনা হল, আমার

প্রশ্নোত্তরের কথা শুনে সে ত'হেঁসেই অস্থির। বুঝিয়ে দির্গ কোন প্রশ্নের কি জবাব। আমি ধরেই নিলাম—Criminal Law-র পরীক্ষা আমাকে আবার দিতেই হবে।

মাসখানেক পরে পরীক্ষার ফল বেরুল। তখন Times পত্রিকায় পরীক্ষার খবর বেরুল। আমার মনে আছে—সকালবেলা সোদিন সূর্য উঠেছিল এবং পরিষ্কার সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝকঝকু করছিল,—আমি একখানা Times পত্রিকা কিনে Middle Temple-এর পিছনে, টেম্‌স্‌ নদীর ধারে ছোট একটি পার্কে একটি বেঞ্চের উপর বসলাম। Times খুলে পরীক্ষার ফল দেখতে শুরু করলাম। প্রথম দেখলাম—Constitutional Law কোনও-রকমে তৃতীয় বিভাগে পাশ করবার চেয়ে বেশি কিছুই আশা করিনি। দেখলাম তৃতীয় বিভাগেই আমার নাম রয়েছে। মনটা একটু খুশি হল, তবে পাশ করব আশাই ত' করেছিলাম। তারপর দেখলাম—Hindu Law. তাতেও তৃতীয় বিভাগে পাশের তালিকায় আমার নাম। তারপর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আর কে কে পাশ করেছে—তাদেরও নাম দেখলাম। তারপর Criminal



# কপচর্চা কে.হোডের প্রমাণী



কে.হোড ২৩ কোং কলিকাতা-১৪

Law-এর ফলাফল দেখতে শুরু করলাম। পাশের তালিকায় তৃতীয় বিভাগে দু-একজন বন্ধুর নাম দেখলাম—কিন্তু আমার নাম ছিল না। মনে একটুও খারাপ হল না—কেন না এরকম আমার মনে ত' প্রস্তুতই ছিল।

তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ভারতীয় ছাত্রেরা কেউ পাশ করেছে কি না দেখতে লাগলাম। সে-যুগে প্রথম বিভাগে পাশ করা খুবই কঠিন ছিল, দ্বিতীয় বিভাগেও প্রায় তাই। আমার জানা-শোনা ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে কারও নাম পাব বিশেষ আশা করি নি। হঠাৎ চমকে উঠলাম—আজও মনে আছে। Criminal Law-এর দ্বিতীয় বিভাগে আমার নাম—গুপ্ত নীরদরঞ্জন দাশ। অবাক হয়ে টেমসের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

কি করে যে এ সড়ব হল, এরকম আমার কাছে আজও পরিষ্কার হয় নি। আমার হাতের লেখা খুব পরিষ্কার ছিল না। খারাপই ছিল বলতে হবে। তাই সোমনাথ ঠাটা করে বলেছিল—অনেকটা লিপেছ অথচ পরীক্ষক তোমার হাতের লেখা একবর্ণও পড়তে পারে নি, তাই এমন হল। পরীক্ষক ছিলেন—যতদূর মনে পড়ে সার, ব্রেক অজার্স (Sir Blake Odgers) সে-যুগের স্নানামধ্য অধ্যাপক ও আইনবিদ। যাই হোক পরে ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে—এ বোধ হয় সেই অদৃশ্য মহাশক্তির একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। ঐকজদারী আইনের ভিতর দিয়েই আমার ব্যারিস্টারী জীবনের পথ।

এই আইন পরীক্ষার দিক দিয়ে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল—সেটাও কম আশ্চর্য নয়। সেটা ঘটল শেষ (Final) আইন পরীক্ষার বেলায়। আগেই বলেছি আমি কোনদিনই বড় একটা ক্লাশের লেকচারে যেতাম না। প্রথম প্রথম দু-চার দিন গেলেও শেষ পরীক্ষার বেশ কিছু দিন আগে থেকে একেবারেই যাই নি। বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে গল্পগুজব, হাইডপার্ক প্রকৃতি স্থানে বেড়ান, সারপেটাইনে নৌকা বাওয়া, এইসব নিয়ে সময় কেটে যেত—লেখাপড়াটা হয়ে গেল গৌণ। কিন্তু যখন পরীক্ষা প্রায় এসে পড়ল, মনের অবস্থিতে সমস্ত দিনের পর রাত জেগে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেছিলাম। মনে বিশ্বাস ছিল—আমি ত' দেশে আইন পাশ করেই এসেছি, একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা আরম্ভ হল, কিন্তু Civil Procedure Code-টা আমার একেবারেই পড়া হয়ে উঠল না। শেষদিনের পরীক্ষার বিষয় ছিল—Civil procedure Code, Civil Procedure Code-এর একখানা চিঠি বই আমার ছিল। ভেবেছিলাম—পরীক্ষার আগের দিন রাতে

সন্ধ্যাবেলা আমার এক বন্ধু নাম শ্রীমুরেন লাহিড়ী আমাকে বলল, 'এক শেয়াল কফি খেয়ে নাও, রাত জাগতে সুবিধা হবে।' সন্ধ্যাবেলা তারই বাড়িতে এসে গল্প-গুজব চলাছিল। সে আমাকে এক পেয়াল কফি করে এনে দিল। কফি আমি কোনদিনই খাই না—ভালও লাগে না। রাত জাগতে ত' হবেই। ওষুধের মতন এক পেয়াল কফি শেষ করলাম।

রাতে বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে Civil Procedure Code-টা নিয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বইটা দারুণ কঠিন বলে মনে হতে লাগল—অর্থাৎ সহজে আয়ত্ত করা যায় না। বিষয় করতেই ত' হবে—প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত বইটা যখন প্রায় শেষ হয়েছে—তখন জানালাম ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে। ওদেশে তখন ভোর হত—যতদূর মনে পড়ে—সাড়ে সাতটা-আটটার সময়।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে, দশটা কি সাড়ে দশটায় পরীক্ষার ঘরে গিয়ে হাজির ছলাম। পরীক্ষা হয়েছিল—যতদূর মনে পড়ে—Greys Inn-এর একটা হলে।—আমি যেখানে ছিলাম—Powis Garden's—সেখান থেকে ওখানে পৌঁছতে অসুস্থ ভিন কোয়ার্টার সময় লাগত। বাসে যেতে যেতে শরীরটা একটু খারাপ বোধ করতে লাগলাম। ঢেকুরে আগের দিন সন্ধ্যার সেই কফির গন্ধ পেলাম।

পরীক্ষার হলে বসে, প্রশ্নপত্র যখন আমার সামনে দেওয়া হল, দেখলাম প্রশ্নপত্রের কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্ত কেমন যেন ফাঁকা মনে হচ্ছে—আগের দিন রাতে যে কি কি পড়েছি কিছুই মনে নেই।—অনেকক্ষণ প্রশ্নগুলো ভাব করে পড়তে পড়তে মনে হল—একটা প্রশ্নের খানিকটা জবাব হয় তো বা লিখতে পারি। সেইটুকুই লিখতে শুরু করলাম। কিন্তু কি হবে—মন ঘুঁচিচ্ছায় ভরে গেল।

একপাতা আন্দাজ লিখেছি—হঠাৎ আমার শরীর দারুণ খারাপ বোধ হতে লাগল—সমস্ত শরীর অস্থির করে একটা বমি বমি ভাব। গার্ভের অসুখাতি নিয়ে, উঠে গিয়ে বাথরুমে খুব খানিকটা বমি করলাম। মুখ-হাত ধুয়ে এত সুস্থ বোধ করলে, আবার এসে লিখতে বসলাম।

লিখব কি ছাই। ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া কোনও প্রশ্নে ত' জবাব কিছু মনে আসছে না। প্রশ্নপত্রের উপরে নিতে ছিল—অসুস্থ পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নি আমার একটি প্রশ্নেরও উত্তর ভালভাবে লেখা হল না।

হঠাৎ শরীর আবার খারাপ বোধ হতে লাগল—আসেই বমি বমি ভাব ও কফির ঢেকুর। মাথায় একটা বুঝে—হাজির হালাও ত' বয়স তখন কম ছিল। খা

## যতদূর মনে পড়ে

বসে লিখতে পারছি না, আশা করি পরীক্ষক মহাশয় আমাকে মার্জনা করবেন। খাতায় সব মিলিয়ে এক পাতার বেশি বোধ হয় লিখি নি। খাতা দিয়ে চলে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে, প্রাঙ্গণে শ্রী জে এন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল। তিনিও ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে পরে কিছুদিনের জন্ত হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। তিনি অত সকাল সকাল আমাকে পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? চলে এলে যে?' বললাম, 'কি জানি—কি সব প্রশ্ন দিয়েছে। Summons for discretion না কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।' তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠলেন। আসল কথাটা 'Summons for Directions'—আইনের একটা সোজা কথা—সবাই জানে। পরে কলকাতায় হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের লাইব্রেরীতে এই গল্পটি সকলের কাছে শ্রীমজুমদার কতবার যে মজা করে বলেছেন তার ঠিক নেই।

যাই হোক তারপর একমাস মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রইল—অছশোচনায় ভরা। ছিঃ ছিঃ—একি হল। শিশুদের আমাকে বিলেতে পাঠিয়েছেন, কত আশা করে, মাসে মাসে বিলেতে আমাকে মোটা টাকা পাঠাতে হয় তো

আর্থিক দিক দিয়ে কষ্ট হয় তাঁর। আর আমি কিনা পড়াশুনা না করে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারীর শেষ (Final) পরীক্ষায় ফেল করে বসলাম! শেষ (Final) পরীক্ষা ঠিক প্রাথমিক (Preliminary) পরীক্ষার মতন নয়। এ দেশের মতন সবগুলি বিষয় পাশ না করলে পাশ হওয়া যায় না।

সে-যুগে ব্যারিস্টারী পাশ করা যে খুব সহজ ব্যাপার ছিল—তা নয়। ভারতীয় ছাত্রেরা অনেকেই দু-একবার ফেল হতেন। আমার এই অবস্থায় অনেকেই আমাকে বললেন—ক্রাশে গিয়ে লেকচার শুনতে হয়, ঝাঁরা লেকচার দেন তাঁরাই ত' পরীক্ষক; তাই তাঁদের লেকচার শুনলে বোঝা যায়, কি ধরনের প্রশ্ন আসবে; কোন বিষয়ের কোন দিকটা তাঁরা জোর দিচ্ছেন; ক্রাশে গিয়ে লেকচার না শুনলে পরীক্ষা পাশ করা কঠিন।

এসব বুদ্ধি পরীক্ষার আগে ত' কেউ আমাকে দেয় নি।

ফলে, শেষ-পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি রীতিমত রোজই ক্রাশে গিয়ে লেকচার শুনতে এবং নোট নিতে শুরু করলাম। তখন শীতকাল—থাকতাম আমি Powis Gardens-এ, লেকচারের হল থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূর। ঐ শীতে, রাত থাকতে উঠে তৈরি হয়ে কাঁপতে

## সিঙ্গারের নিবেদন সিন্ধ্যাক আর্ট নিটার

সিঙ্গার ঘরী সবে সিন্মাক আর্ট নিটার উপহার দিচ্ছে। এটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সহজে চালনাযোগ্য আধা স্বয়ংচালিত হাতে বোরাব কল হাতে করেই ঘটার মাথাই আপনি পুরো মাপের একটি আদ্যম বৃত্তে পারাবেন। উল, সাধারণ বুতো কিংবা কৃত্রিম বুতো গিরে এতে নিহুৎ বোরা যায়।

সিঙ্গারের এই কলের সাহায্যে আপনি ক্রত, সহজে বুনে, ক্রত সহজে লাভ করতে পারবেন। অতি সামান্য পুঁজি নিয়ে আপনি একটি অগ্নি লাভজনক সুখ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন।

ঘরে রাখবেন ভারতে বোরা আদ্যমাপড়ের হাতিয়া ওয়র স্বস্তি মনে সবে কাটিতে হয়।

আপনার কাছাকাছি অনুমোদিত সিঙ্গারের বিক্রেতার কাছে কিংবা দোকানে পাওয়া যায়।



সেল পেন্স একটাই

সিঙ্গার ম্যায়িং মেশিন কোম্পানী

বুধে • কলিকাতা • দিল্লী • মাদ্রাস

\* সিঙ্গার কোম্পানীর একটি ট্রেডমার্ক

মেরিট সেমাইকলের



কল ভারতে সুবিখ্যাত

BSC. 6.2

কাঁপতে বাসে উঠে রোজ লেকচার শুনতে যেতে যে কি কষ্ট হত—তা এখনও ভুলি নি। আমার নিজের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে—মনকে বোঝাতাম।

এইভাবে পুরো একমাস কি আরও কিছু বেশি সময় কাটল। আগেই বলেছি—আমি তখন থাকতাম Powis Gardens-এ। সেই সময় কিছুদিন আমার বন্ধু শ্রীসুরেন লাহিড়ী (পরে ইনি ডাক্তারী পাশ করে এসে রেলওয়েতে বড় চাকরী করতেন) আমার সঙ্গে থাকত একই ঘরে। একদিন ভোরবেলা আমি লেকচার শুনতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, সুরেন ঘরে ছিল না, কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমাদের ঘরটা ছিল পোতালায়—হঠাৎ সিঁড়িতে দুপদাপ পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম এবং পরক্ষণেই সুরেন ঘরে এসে ঢুকল, হাতে একখানা Times পত্রিকা।

পত্রিকাখানি আমার সামনে একটা ছোট টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে চাঁৎকার করে বলল, 'এই নাও, পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে—গুপ্ত নীরদরঞ্জন দাশ।'

চমকে উঠে কাগজখানি তুলে নিয়ে দেখলাম, সত্যিই আমি পাশ করেছি। অবাক হয়ে সুরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে, শুধুলাম, 'কি করে হল?'

কি করে হল—আজও ঠিক জানি না। তবে এখন আমার মনে হয়—ওদের দেশে প্রব্লেম উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করার রীতি-নীতি ঠিক আমাদের দেশের মতন নয়। হয় তো বা আমি যে লিখেছিলাম—আমি অসুস্থ ইত্যাদি—পরীক্ষক মেনে নিয়েছিলেন। হয় তো বা অল্প অল্প বিষয়ের প্রস্তোত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পরীক্ষকগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন—এ ছাত্রটির পাশ করাই উচিত। আমাদের দেশে পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই সরলদৃষ্টিটুকুর পার্চায় কি পাওয়া যায়?

ছাত্রজীবনে বিলেতে থাকার সময় একটা ঘটনা আমার মনকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল—সেইটে বালি। সে সময় একটা বিখ্যাত মামলা হয়েছিল—Greenwood Trial (গ্রীনউডের বিচার)। গ্রীনউড বলে একটা সলিসিটর নিজের প্রাক্তন ছাত্রা করেছিল—যতদূর মনে পড়ে। আঙ্গিনিক বিষ খাইয়ে—এই ছিল অভিযোগ। গ্রীনউড একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আইন-আদালতের সঙ্গেই তাঁর কারবার, তাঁর বিরুদ্ধে এইরকম গুরুতর অভিযোগ—কাজেই মামলাটা ইংল্যান্ডে একটা চাক্ষুস্যের সৃষ্টি করেছিল। এই চাক্ষুস্য আরও ঘনীভূত হল, যখন খবরের কাগজে বড় বড় করে বেরুল যে, স্বয়ং সার এডওয়ার্ড মার্শাল হল (Sir Edward Marshal Hall) বিচারে গ্রীনউডের পক্ষ সমর্থন করবেন।

কৌজদারী ব্যাক্তিকার। আজও তাঁর নাম অনেকের জানেন। তিনি তখন কাজ থেকে প্রায় অবসর গ্রহণই করেছিলেন—আইল অফ ওয়াইটে একটি বাড়ি করে সেইখানেই প্রায় থাকতেন। খুব বড় বড় মামলায়, ধনী ব্যক্তিরাই মাঝে মাঝে তাঁকে কোর্টে নিয়ে আসত।

যাই হোক, তখন প্রায় রোজই খবরের কাগজে এই মামলা-সংক্রান্ত কিছু না কিছু খবর থাকতই। গ্রীনউডের ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল এবং নানাভাবে মার্শাল হলের ছবিও বেরুত প্রায়ই—হয় তো বা তিনি তাঁর ঘরে বসে মামলার বিষয় আলোচনা করতেন অথবা তিনি গাড়ি থেকে নামতেন, কোর্টে যাওয়ার ভুলে ইত্যাদি।

আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের আইন-আদালতের অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু দেখেছি যে, এদেশে কোনও মামলাই—যতই গুরুতর হোক না কেন—অতটা চাক্ষুস্যের সৃষ্টি করে না। আমাদের দেশে অনেক মামলার খবরই খবরের কাগজে বিস্তারিত বেরোর বটে, কিন্তু কাগজের প্রধান খবর হিসাবে প্রথম পাতায়ই বড় বড় হরফে তার স্থান হয় না।—কারও ছবি ত' বেরোয়ই না, এমন কি আলীহর বোমার মামলায় শ্রীযুববিন্দর ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল কি না সন্দেহ।

আমি Daily Express নিতাম এবং Daily Express বেশ নামজাদা কাগজই ছিল। একদিন কাগজে দেখলাম লিখেছে—আদালতে গ্রীনউডের বিচারের সময় অত্যন্ত ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা। তাই কর্তৃপক্ষ টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন, অমুক জায়গায় গেলে টিকিট পাওয়া যাবে ইত্যাদি। আরও লিখেছে—কোর্টে সার এডওয়ার্ড মার্শাল হলের জেরা, ভাষণ, ইত্যাদি শোনা কোনও থিয়েটারে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার অভিনয় দেখার চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। বিচারটি দেখবার খুব আগ্রহ হল এবং টিকিট পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলাম; কিন্তু টিকিট জোগাড় করা হল না। কাজেই রোজ সকালবেলা খবরের কাগজে মামলার বৃত্তান্ত পড়া ছাড়া আর উপায় বা কি ছিল।

কোর্টে মামলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এইবার মার্শাল হল জুরীদের নিজের ভাষণ শোনাবেন। আমি অপরাহ্নে, চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের কাছে লায়ন্স কনার হাউস বলে একটা চাক্ষুস্যাবারের দোকানে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় বাইরে খবরের কাগজের ফেরীওয়ালাদের চাঁৎকার শোনা গেল—Marshal Hall faints addressing the Jury (মার্শাল হল জুরীর ভাষণ দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন) বা ঐ ধরনের একটা কিছু। হঠাৎ কোরকাল হল। সমগ্র অঙ্গিন



যতদূর মনে পড়ে

পড়ে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—মার্শাল হল জুরীর ভাষণ দিতে দিতে মনের আবেগে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পরের দিন খবরের কাগজে মামলার ফল বেরুল—জুরী দোষী বলেছে। মার্শাল হলের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার বিষয়ও কাগজে লিখেছিল। জুরীর ভাষণ শেষ হওয়ার পর কাগজের রিপোর্টারেরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে একটি রিপোর্টার একই হেসে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা, একটা কথা সত্যি বলবেন? আপনি কি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন না ওটাও জুরী ভোলাবার একটা কৌশল? মার্শাল হল একটু মুহূর্ত হেসে চলে গিয়েছিলেন, কোনও জবাব দেন নি।

পরে রিপোর্টারদের সঙ্গে কথাবার্তার বিস্তারিত খবর বেরুল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—ভাল নোজদারী ব্যারিস্টার হতে হলে কি কি গুণ থাকা দরকার। তিনি সংক্ষেপে গোটাঁকতক কথা বলেছিলেন—সে কথাগুলি আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল—তাই মোটামুটি আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—

১। নোজদারী আইনটার মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা দরকার—কিন্তু আইনের স্বাক্ষর বিশ্লেষণ কংবা কুট তর্কের মধ্যে হারিয়ে না যাওয়াই ভাল।

২। মামলার বৃত্তান্তটির উপর সর্বাঙ্গীণভাবে একটা দখল থাকা উচিত—কিন্তু তার খুঁটিনাটির মধ্যে তালিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

৩। নোজদারী ব্যারিস্টারের কৃতিত্ব যে গুণটার উপর বিশেষকরে নির্ভর করে, সেটা হচ্ছে—Sense of Drama. (স্বাক্ষর নাট্যবোধ)।

পরে ইংল্যান্ডের আর একজন সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার সার প্যাট্রিক হেস্টিংস (Sir Patrio's Hastings) এর লেখা একখানা বইতে পড়েছিলাম, তিনি মার্শাল হল সম্বন্ধে বলেছেন—‘মার্শাল হল কোনও নোজদারী মামলার আসামীপক্ষ সমর্থন করার জন্য কোর্টে ঢুকলেই নাটক হত শুরু এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অবসন্ন হয়ে বসে পড়লে নাটক হত শেষ।’

লেখা পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। আজও মনে আছে। মার্শাল হলের কথাগুলি যেন আমার মনের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। দেওয়ানী মামলার পুরানো দলিলপত্রের স্বাক্ষর বিশ্লেষণ বা আইনের কুটিল ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানো—কোনকালেই আমার ভাল লাগে নি। আর Sense of Drama—সরলভাবেই বলি—আমার বিশ্বাস ছিল আমি ভাল অভিনয় করি। কেন না ইতিমধ্যেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অনেক অভিনয় করেছিলাম এবং সবসময়ই সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমাকেই দেওয়া হত। এবং অভিনয়ের সময় বাহবাও পেতাম যথেষ্ট। অভিনয় করতে মতাই আমি খুব ভালোবাসতাম এবং এ-যুগের মতন সে যুগে যদি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও ঘণা না থাকতো, হয় তো আমি অভিনেতাদের দলেই যোগ দিতাম। মার্শাল হলের কথাগুলি পড়ে তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম—দেশে ফিরে গিয়ে নোজদারী ব্যারিস্টারই হব।

আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে অনেক বড় বড় নোজদারী মামলার অভিজ্ঞতার ফলে, মার্শাল হলের কথাগুলি যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ—সমস্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করছি।

[ক্রমশঃ]



ডার্লি ও কার্ভিও  
**দুলালের**  
**তালমিছুরী**



### থাগেজ দত্ত

অবশেষে নতুন প্রস্তাব এল। নতুন পরামর্শ। প্রতিবেশী রামুকাই দিলেন পরামর্শটা। কেমন এক ভক্তগদগদ গলায়। কিছুটা শঙ্কা, কতকটা প্রদ্বা-মেশীনো স্বরে বললেন : বাঁচতে চাও তো পাশের গায়ে যাও। বড়োশিবতলায় বটগাছের নীচে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে।

আশ্চর্য হয়ে রামুকাকার কথাটা শুনলো বিপিন। শুনলো মুগ্ধ তন্ময়তায় উৎকর্ষ হয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখের সামনে একটা আলোর রেখা দেখতে পেল। ধীরে ধীরে অতি সন্তপণে ওর চেতনার পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়লো অনাবিল আনন্দের একটা শিহরণ।

নিম্পলক দু'টো চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো বিপিন। রামুকাকার দু'টো চোখের তারায়, মুখের রেখায় রেখায় অবিচ্ছিন্ন কোন চিহ্নই নেই। বরং বিচ্ছিন্নের মূর্ত প্রতীক বলেই মনে হচ্ছে। এতদিন পর তা হলে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন? দীর্ঘদিনের অসুখের একটা কিনারা হল তা হলে। তাই তো হয়েছে। রামুকাই এসব দেখে-শুনে চুল-দাড়ি পাকিয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি অনেক। তাঁর কথা শুনলে, পরামর্শমতো কাজ করলে, হয় তো ভালো হয়ে যাবে বিপিন। সেয়ে যাবে অসুখ।

এ অসুখে আক্রান্ত হবার পর বছর শেষ হয়ে এল প্রায়। অসুখ ওর কিছুতেই সারে নি। অসুখটাও বিদঘুটে। কেমন যেন অস্বাভাবিক। বিকেলের দিকে খুঁখুয়ে জর।

নয়। চিকিৎসা করালেই সেয়ে যাবে, ভালো হয়ে যাবে বিপিন।

সে আশ্বাসেই চিকিৎসা করিয়েছে বিপিন। যখন ঘোঁদকে স্নায়োগ পেয়েছে, তখন সোঁদিকেই চিকিৎসা করিয়েছে। প্রথম দেড়মাস হোনিওপ্যাথি খেয়েছে, তাতে কাজ হয় নি দেখে কবিবাজার আশ্রম নিয়েছিল। সে আশ্রমে প্রায় মাস তিন কাটিয়েছে। কিন্তু ফল হয় নি কিছুই। দু'টোর কোনটাতেই সারে নি অসুখ। ভালো হয় নি বিপিন। বরং খাবারের পথেই এগিয়েছে দিন দিন। শরীর ভেঙেছে ক্রমে ক্রমে। ক্ষয় হয়েছে দিনে দিনে। দেহ দুর্বল হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে। টাকা-পয়সা খরচা হয়েছে, আশ্রমে আশ্রমে সংসার হয়েছে অচল। রোজগেগে বলতে তো বিপিন একাই। সংসারও ছেঁটি নয়। মাথাগুণ্টিত পাঁচজনের সংসার। তিন তিনটে ছেলেমেয়ে আর ওরা দু'জন। দু-ছোটো পুরো আর তিনটে অর্ধেক। এদিকে বাজারের হাল-চাল তো খুবই খারাপ।

দু'দিনের বাজারে পেট চালানোই যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে অসুখের চিকিৎসা তো একধরনের বিলাস। বিশেষকরে বিপিনের যা অসুখ—তাতে টাকার স্রোত না হলে অসুখ সারানোর কথা কল্পনাও করা যায় না। সে টাকা কোথায় বিপিনের, কোথায় ওর সে সঙ্গতি?

## শক্তি

কাজ না করে ওর তো উপায় নেই। গায়ে কি পাঁচ-পাঁচটি প্রাণী? তাই এ দুর্বল শরীর নিয়েও কাজে বেরতে হচ্ছে মাঝে-মাঝে। অসুখে আক্রান্ত হবার আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। তখন রোজ কাজে বেরতো বিপিন, রোজ কাজ করতো। পয়সা উপায় করতো। একটু একটু জর যখন সবে দেখা দিচ্ছে তখনও ও কাজে বেরতো, জর গায়েও দিনমজুরী করতো। মাঠ থেকে ধান বয়ে আনতো চাসাঁর বাড়ি, মুদির দোকানের সওদা বয়ে আনতো নদীপার থেকে। তখনও দেখে বল, মনে অসাধারণ জোর।

সে বল, সে মনের জোর হারিয়ে ফেললো বিপিন। ঘুমঘুমে জর নিয়ে বেশিদিন কাজ করতে পারলো না। আগের মতো ভারী বোঝা বহিতে পারলো না। ওভাবে শরীরও টানতে পারলো না বেশিদিন। দুর্বল হয়ে পড়লো, শক্তি-সামর্থ্য হারালো। শারীরিক অক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে মনের অক্ষমতাও ঘিরে ধরলো ওর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে।

আত্মীয়-স্বজনরা ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিল। কবিবাজির কথা উঠতে ওরা বললোছিল : কবিবাজিতে হবে না, ঐ দুর্বল বোগ সারানো হোমিওপ্যাথিরও কাজ নয়।

প্রথম প্রথম বিপিন কারও কথাই শোনে নি, কারিও পরামর্শই নেয় নি। মাস পাঁচ-ছয় গত করেছে কবিবাজি আর হোমিওপ্যাথির উপর নির্ভর করে। ভেবেছিল, তাতেই সেরে যাবে। কিন্তু নিরাশ হতে হল শেষ পর্যন্ত। কোন ফলই পাওয়া গেল না।

নিরাশ হয়েই বড় ডাক্তার দেখাতে যাবার কথা ভাবছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবুর ফি-এর অঙ্কটা শুনে চোখ কপালে উঠেছিল। মফস্বল শহরের ডাক্তার। নামডাক আছে। যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। তাই বলে এতগুলো টাকা ফি? দু'টাকা নয়, চার টাকা নয়, পনের টাকা ফি! কোথায় পাবে এতগুলো টাকা? তাও আবার একসঙ্গে, একই দিনে। দশ-বিশ যা হাতে ছিল, তাও তো হোমিও-আর কবিবাজি দেখাতেই শেষ। এখন উপায় কি হবে? ডাক্তার না দেখিয়েই বা কি করবে? আবার ঐ ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন সে টাকাই বা কোথা থেকে আসবে? বিপিন মনে-প্রাণে ভেঙে পড়েছিল।

চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বেধেছিল, চাপচাপ অন্ধকারের স্রোত। ছাঁটো কানের কাছে অবিশ্রান্ত ভ্রমর-গুঞ্জন।



..রূপ হবে রুম্ননীয়

রুক্ষ আবহাওয়ায় কোমল ত্বকের লাভ্যা ও মন্থগতা অটুট রাখতে যুগ যুগ ধরে হিমালী স্নো ঘরে ঘরে সমাদৃত। ভারতে তৈরী প্রথম স্নো হিমাবে এর ঐতিহ্য সর্বজন স্বীকৃত। সত্যি কথা বলতে ফাউণ্ডেশন বা ভিভি-প্রলেপে হিমালীর জুড়ি নেই। প্রসাদন সামগ্ৰীতে হিমালী শুধু মাত্র একটি নাম নয়, যুগান্তরের প্রমাণিত উৎকর্ষতার এটি একটি জাতীয় ঐতিহ্য।

.. প্রসাদনে জাতীয় ঐতিহ্য

**হিমালী**  
স্নো

ডিনটি আকারে পাওয়া যায়



হিমালী প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১

রাধা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে গুটি গুটি পায়ের। এসে তাকিয়ে থেকেছিল কয়েকটি পলক বিপিনের দুঃস্বপ্ন-স্নান মুখের দিকে। নির্বাক। এক সময় বলেছিল : তুমি অত মুখড়ে পড়েছ কেন? ডাক্তার দেখাবার টাকা দরকার? টাকার ব্যবস্থা আমিই করছি।

বিপিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেছিল : টাকার ব্যবস্থা তুমি করবে? কি করে, কোথায় পাবে এতগুলো টাকা?

— কেন? আমার কানপাশা আর ছ'গাছা হাতের চুড়ি ঘরেই তো রয়েছে।

ও!

ক্রান্ত বিবস্ত্র দু'টো চোখ ধীরে ধীরে রাধার মুখ থেকে নামিয়ে এনেছিল বিপিন। স্থির রেখেছিল ঘরের মেঝেতে। কানপাশা আর চুড়ি ছ'গাছা আছে, সেও জানে। বিয়ের সময় রাধার বাপের বাড়ি থেকেই পেয়েছিল। তাও ঘর থেকে বের করে দেবে ওরই প্রয়োজনে, ওরই অসুখ সারাতে? নিজের রোজগার করে একরতি সোনার কোন একটা কিছু গড়িয়ে দিতে পারে নি আর ওর নিজের অসুখের মাশুল জোগাতে হাত পেতে নেবে রাধার বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সেই সামান্য সোনার গয়না?

রাধা ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলেছিল : মাছুষ বাঁচলে তবে তো গয়না, আগে তুমি, তারপর তো অল্প সব, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকলে অমন কত গয়না হবে।

অমিতা-শ্রমতা করেও রাধার কথা শুনেছিল বিপিন, দ্বিধা-সঙ্কেচ কাটিয়ে কানপাশা জোড়া হাতে নিয়ে উঠানে নেমেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিল ওর অসুখ সেবে গলে, আবার কাজ-কর্ম শুরু করলে কিছু কিছু সঞ্চয় করবে, আর সে সঞ্চিত টাকা দিয়ে রাধাকে একগানা সোনার হার গড়িয়ে দেবে।

উঠান পার হয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল বিপিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল কানপাশাজোড়া নিয়ে কি করা যায়? বিক্রি করে দিলে কেন্দন হয়—এ কথাটাও মনে এসেছিল সে-মুহূর্তে। আবার পরমুহূর্তে মনে হয়েছিল, বিক্রি করে দেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে? বন্ধক রাখবে জানাশোনা কোন লোকের কাছে?

রাধা বিক্রি করে দেবার পক্ষেই মত দিয়েছে। তা হলে ডাক্তারের ফি-এর উপরেও কয়েকটা টাকা বেশি পাওয়া যাবে, সে টাকা দিয়ে ওষধ-পত্র

বিক্রি করা 'নানে জিনিসটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। পরের হাতে চলে যাবে চিরকালের মতো, তার চেয়ে বন্ধক রাখা ভালো। একদিন না একদিন নিজেদের হবে, নিজের হাতে নিয়ে আসা যাবে। অসুখ যখন সারবে, আবার যখন রোজগার করবে তখন—হ্যাঁ, তখনই কানপাশাজোড়া ছাড়িয়ে আনবে। স্নদটা দিতে হবে, এই যা। তবু ভালো। ঘরে জিনিস বলতে তো এই। অথচ দুর্দিনের বন্ধু। বিপদে-আপদে বাঁচিয়ে দেবে।

ফি দেওয়ার মতন টাকা নিয়ে ডাক্তারবারু কাছে গিয়েছিল বিপিন। ডাক্তারবারু অনেক সময় ওকে দেখেছিলেন। ওর দেহ পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে খুঁটিনাটি প্রশ্নও—। তারপর একটুখান চিন্তা করেছিলেন, কি যেন ভেবেছিলেন গম্ভীর মুখে। আবার দু'একটা প্রশ্ন। তারপর আস্তে আস্তে আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে ডাক্তারবারু বলেছিলেন, রোগ এখনও সারানো যায়। এখনও আয়ত্তের বাইরে যায় নি অসুখ।

ডাক্তারবারু! উল্লসিত বিপিন আর কিছু বলতে পারে নি।

বল...

সত্যি বলছেন ডাক্তারবারু আমার অসুখ সারবে?

সারবে। তবে...

মাথা নীচু করে প্রেসক্রিপশন লিখতে শুরু করছিলেন ডাক্তার বাসু।

তবে—কি ডাক্তারবারু?

টাকা ঢালতে হবে, অনেক টাকা খরচা করতে হবে, রোজ ইনজেকশন, সঙ্গে ভালো ভালো খাবার। তাজা মাছ, মাংস, ডিম, আপেল এসব খেলে অসুখ নিশ্চয় সেবে যাবে। ঘুমঘুমে জ্বর বন্ধ হবে, কাশিও সেবে যাবে।

কথা শেষ করতে গিয়ে স্টেথিস্কোপটা জড়িয়ে নিয়েছিলেন গলায়। মণিবন্ধে জাঁটা ঘড়িটার উপর দৃষ্টি ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করেছিলেন। তাঁর নিজের প্যাডের পাতায় লিখে দিয়েছিলেন রাজহুয় চিকিৎসার ব্যবস্থা।

প্রেসক্রিপশন হাতে নিশ্চুপ বেরিয়ে এসেছিল বিপিন, রোজ ইনজেকশনের কথা শুনে ওর মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার উপর খাবারের ফিরিস্তি শুনে নিশ্বাসও বন্ধ হবার জো। বাইরে এসে দু'একজন জানাশোনা লোককে প্রেসক্রিপশনটা দেখিয়েছিল, তারাও ওষধ আর

মুক্তি

হিতাকাঙ্ক্ষীরা শুনে থ হয়ে গিয়েছিল। ওরাও কোন কথা বলতে পারে নি। কোন কথা জোগায় নি ওদের মুখে। নির্বাক নিম্পলক তাকিয়ে থেকেছে বিপিনের মুখে। রাতার ধারের পাছে হেলান দিয়ে পাড়িয়ে অবশেষে বলেছে : এ তো জমিদারবাড়ির চিকিৎসা, রোজ ইনজেকশন, ডিম, মাছ, মাংস আর ফল? রাজা-বাদশার কারবার আর কি! মুঠোমুঠো টাকার খেলা!

বিপিনের মুখে কোন উত্তর জোগায় নি। ধীরে ধীরে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে।

বাড়ির সানানায় পা রাখতেই কাছে ছুটে এসেছিল রাধা। এতক্ষণ যে ও উদ্বেগ এবং ব্যাকুলতা নিয়ে ঘরবার করেছে, তা ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারলো বিপিন। ওর কাছে এসেও কোন কথা বললো না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু একটা সুখবরের গোত্যাণায় অর্ধেক মুহূর্ত গুণতে শুরু করেছিল রাধা। ওর দু'টো চোখ ও ছিল নিম্পলক। সেই নিম্পলক চোখ দু'টো স্বামীর দীর্ঘ কাঠামো, অবশ্য মুখের রেখায় আর ক্রান্ত দু'টো চোঁটের দিকে কি যেন ঝুঁতে বেড়িয়েছিল। একসময় নিচ্ছে থেকে ক্রান্ত হয়ে পড়েছিল, হতাশ হয়েছিল, স্বামীর দু'টো

চোখের তারায়, মুখের রেখায় কোন আশ্বাস নেই। নেই কোন আলোর নিশানা। বিবর্ণ কালো মুখের গুচ্ছনপটে রাজ্যের সব নৈরাশ্রই যেন পুঞ্জীভূত। ডুকে কেঁদে উঠেছিল রাধা। দু'টো চোখের কোল কান্নার ফোঁটায় ভিজ়ে উঠেছিল। বলেছিল : কি বললেন ডাক্তারবাবু? অসুখ কি সারবে না তোমার?

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে যেতে দিয়েছিল বিপিন। ব্যাকুলতা উপচেপড়া রাধার দু'টো চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছিল। শীতল-কাপানো সেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল : অসুখ সারবে রাধা, অসুখ নিশ্চয় সারবে। আজকাল অনেকরকম নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। সে ওষুধে কতো শক্ত শক্ত অসুখ সেরে যাচ্ছে, আমার এ অসুখ তো কোন দার...

সারবে তোমার অসুখ, সত্যি বলছো তুমি? দু'টো চোঁটে হাসির আভা ফুটে উঠেছিল, মনে জেগেছিল খুশির প্রাবন। সে-মহুর্তে ওর মনে হয়েছিল—অন্তরঙ্গ আলো বাতাসে ওদের ছোট ঘর ভরে উঠেছে, শুধু ঘরই নয়—সামনে যতটা পথ দেখা যায়—সমস্ত পথটাই আলোয় আলোময়। কোথাও এতটুকু অন্ধকার নেই। এতটুকু আবহা নয়—অনাগত দিনগুলো।



# এতীশ কবিরাঙের মহাভূম্বরাজ

## তৈল

ইহাই একমাত্র কেশতৈল আয়ুর্বেদীয়  
ভেষজের ওষাণ্ড ঠিক রাখিয়া —  
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিশ্ব  
বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য  
ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ  
কণ্টক পরীক্ষিত ও সুবাসিত।



সর্বত্র  
পাওয়া যায়  
আর্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১৭

বিপিন তখন বলেছিল : সারবে আমার অসুখ। ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার অসুখ এখনও চিকিৎসার বাইরে নয়। এখনও চিকিৎসা চালালে সেরে উঠবো। তবে অনেক টাকার দরকার। অনেক সময়ও।

অনেক টাকা? কি হবে অত টাকা দিয়ে?

টাকার দরকার নেই? রোজ ইনজেকশন, দুধ, মাড়, মাংস, ফল খেতে হলে টাকার দরকার আছে বৈকি!

বিপিনের শেষ কথায় আবার অন্ধকারের অর্ধে সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিল রাধা। আর মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছিল কয়েকটি শব্দ—রোজ ইনজেকশন, ডিম, মাছ, মাংস, ফল। বারেবারে অক্ষুট উচ্চারণ করেছে শব্দগুলো। আর কিছু বলতে পারে নি। আর কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পায় নি। মনে হয়েছিল, ওর পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেছে। শুধু পায়ের তলা থেকেই নয়, চোখের সামনে থেকেও যেন সব সরে যাচ্ছে। বাড়ি, ঘর, উঠান—উঠানের পর আম-জামের গাছগুলো, তারও পরে পুকুর এবং সে পুকুরের জঙ্গলমতো সব যেন ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রাধার মাথাটাও ঘুরে গেল। ঘরের দরজার পাল্লা ধরে কোনরকমে টাল সামলে নিয়েছে রাধা।

আর দিশেহারার মতো ঘুরছে বিপিন। এর-ওর কাছে টাকা ধার চেয়েছে। হাত পেতেছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে ওর চাওয়া, হতাশ হয়েছে ওর মন। শুধুহাতে ফিরছে সকলের কাছ থেকে। কে দেবে টাকা? কার ক্রমতা আছে এ-দুর্দিনে টাকা ধার দেবার? অধিকাংশ লোকই তো দিন আনে দিন খায়। আত্মীয়-স্বজনরাও গরীব, অভাবগ্রস্ত। তা ছাড়া চিকিৎসার ফিরিস্তি শুনে ভয় পেয়ে গেছে সবাই।

নিকট আত্মীয়রা বলেছে : এ কি রোগ রে বাবা! এ রোগের চিকিৎসা করানো কি আমাদের কর্ম নাকি! দু-দশ টাকা হলে তবু দেওয়া যায়। এ তো আর দু-দশ টাকার ব্যাপার নয়, দু-চারহাজার টাকার ব্যাপার। সে টাকা তোমায় জোগাবে কে?

এ কথা'র জবাব দিতে পারে নি বিপিন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে শুনেছে শুধু। আর একসময় আশ্তে পা টেনে টেনে সরে এসেছে সেই আত্মীয়দের সামনে থেকে।

ঘরে বসে চারিদিকের ব্যর্থতার কথাগুলো শুনেছে রাধা। শুনে বোবা হয়ে থেকেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়েছে ঘরের ভেতর। শক্ত ঘরের দেওয়াল, তার চেয়েও শক্ত ছাদ। কঠিন ঘরের ভিত। তার চেয়েও কঠিন এ সংসার। আশার সামান্য আলোকরেখা কোথাও নেই।

জাঁচালে মথ ঢেকে মেঝের উপরই বসে পড়েছিল রাধা।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদে কঁদে মন হাঁকা করতে চেয়েছিল। কান্নার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল মনের সব ক্ষোভ, সব গ্লানি। চোখের কোল, দু'টো গাল প্রাবিত ক'রে দিনরাত চোখের জল বারিয়েছিল।

ডাক্তারবাবুর ফি দিয়ে যে কয়েকটি টাকা হাতে ছিল, তা নিয়ে আবার নতুন কবিরাজের কাছে ছুটল বিপিন। কবিরাজের কাছ থেকে আবার ওষুধ নিয়ে এসেছিল। সে ওষুধ শেষ হলে আবার এনেছিল।

এ ছাড়া অন্য কাজও করেছে। পয়সা খরচ করতে হবে না এমন পরামর্শ পেলেই গ্রহণ করেছে। কেউ পরামর্শ দিয়েছে—মাছুলি নাও। তাই নিয়েছে বিপিন। মাছুলি এনে হাতে বেধেছে। কেউ বলেছে দক্ষিণপাড়ার ঘোমেনদের বাড়িতে দৈব ওষুধ পাওয়া যায়। যে কোন অস্ত্রণে অব্যর্থ। নিয়ে এস, ভালো হয়ে যাবে।

তাই এনেছে বিপিন। ছুটে গেছে ঘোমেনদের বাড়ি। পান আর সুপ্রতির বিনিময়ে নিয়ে এসেছে দৈব ওষুধ। ধারণ করেছে কবচ করে। তারপর আশায় আশায় দিন গুণেছে—একদিন সুন্দর প্রভাবে ওর অসুখ ঠিক সেরে যাবে।

কিন্তু তা হয় নি। সে দৈব ওষুধও অসুখ সারে নি। কোন ভালো ফল পাওয়া গেল না। জর কমলো না। কমলো না কাশি। বরং শরীর আরও দুর্বল হয়েছে, কাশিও বেড়েছে। কাশির সঙ্গে রক্তও বারছে ফোঁটা ফোঁটা।

দিশেহারার মতো ছোট্টাছুটি করল বিপিন। কি করবে ভেবে পেল না। যে যা বলল তাই শুনল। যা গেতে বলল তাই গেল, যা করতে বলল তাই করল। কিন্তু অসুখ সারল কোথায়! পাড়া-প্রতিবেশীরা যেমন পরামর্শ দিল তাই শুনলো, তাই করল।

এদিকে সংসার অচল। যৎকিঞ্চিৎ ধারও মিলেছে এতদিন। কেউ চাল দিয়েছে, কেউ দিয়েছে ডাল, টাকা-পয়সাও দিয়েছে কিছু কিছু। ইদানীং তাও মিলছে না। দিতে চাইছে না কেউ। রাধা বসে বসে চোখের জল ফেলেছে। কাঁদছে ছেলেমেয়েরা। বিপিনও ভেঙে পড়লো। এমন সময়ে রামুকাঁকা এসে দাঁড়ালেন সামনে। তিনিই দিলেন নতুন পরামর্শ। তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গেল শেষ আশ্বাস। পাশের গাঁয়ে বুড়োশিবতলায় যাবার পরামর্শ দিলেন।

রাধাও শুনলো প্রস্তাবটা। শুনে অস্থির হলো। চঞ্চল হলো। অর্ধেক হয়ে পায়চারি করল ঘরময়। উতলা হয়ে উঠল ওর মন। বলল : যাও, আজই যাও তুমি। রামুকাঁকার পরামর্শটা শোন।

হ্যা, আমিও বলাচ্ছি। তুমি কথাটি শোন। যাও বড়োশিবতলায়।

বিপিন আর ঝিক্‌ঝিক্‌ করল না। দেঁরিও করল না। ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকল। তাদের বকে জড়িয়ে আঁদর করল, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াল ঘরের ভেতর। গায়ে চমো খেল। মাথায় পিঠে হাত বললো। তারপর হাসিমুখে বিদায় নিয়ে পাশের গায়ের দিকে পা বাড়াল। বাধাও গেল সঙ্গে বেশ খানিকটা পথ।

কতকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে এল কাশা। দুটো হাত আড়াআড়িভাবে বকে চেপে দরজায় ছেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওপরের দিকে মুখ করে বললো : আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ভগবান। অনেকক্ষণ ধরে আপনমনে গুণ্‌গুণ্‌ করলো। তার নম্রাধর—এ ক’দিন যে কামনা মনের মধ্যে বকের বক্‌ দিয়ে গলন করেছে তা সত্যি হোল।

এদিকে বড়োশিবতলা খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয় বিপিনকে। লোকজন আছে, দোকানপাটও আছে। পাতাঙ্গ দেবতা বলে নাম-ডাক বড়োশিবের।

রামুকাঁর পরামর্শমতো পাশের পুকুরে ডুব দিচ্ছে বিনগাছের নীচে এল বিপিন, শুচিস্নাত মন নিয়ে এসে

বসল। চোখের সামনে নতুন স্বপ্ন। মনের মধ্যে আশার তরঙ্গমালা। রামুকাঁ বলেছেন হতো দিতে হবে। চুপচাপ বসে থাকতে হবে। অথবা শুয়ে শুয়ে কাঠিতে হবে সময়। আর বাকি সময় মনের সামনে রাখতে হবে একটি নাম। স্মরণ করতে হবে। ক’টা আর দিন? পাঁচ-সাতটা দিন বড়জোর। পাঁচ-সাতদিনের কষ্ট আর এমন কি? তারপরই তো সেরে উঠবে। সুস্থ হবে, সবল হবে দেহ।

সেরে উঠলে ওর অনেক কাজ। দিনমজুরী করতে পেরবে। মাস-দেড়মাস কাজ করতে পারলে রাধার কানপাশা-জোড়া নিশ্চয় ছাড়িয়ে আনতে পারবে। তারপরও কাজ থাকবে। ছোটখাট অঙ্কের দেনাগুলো পরিশোধ করতে হবে। খণ্ডমুক্ত হয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে।

কানপাশা বন্ধকের যে গণ তার জজ কত দিতে হবে ভাবতে চেষ্টা করলো বিপিন। সূদে-আসলে কত দাঁড়াবে মনে মনে একবার হিসেব করে দেখল। হিসেব করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। একবারে নাগালের বাইরে যায় নি। যাবেও না। কাজ করবার শক্তি-সামর্থ্য ফিরে এলে, কাজ শুরু করলে ঐ টাকা রোজগার করতে ক’দিন? কে না ভালোবাসে ওকে? কাজে ফাঁকি দেওয়া স্বভাব ওর নয় বলেই সবাই ওকে ভালোবাসে। কাজের জজ



যেব ভোরের  
ভাজা ফুল

**কোলে**

থিন এরাউট  
বিস্কুট

কোলে বিস্কুট কোং  
প্রাইভেট লি.,  
কলিকাতা-১০




— PPS/KB-8/64-888

ডাকে। বসে থাকতে হয় না, বসে খেতে হয় না কোনদিন। বাড়ি এসে নিয়ে গিয়ে কাজ দেয় প্রতিবেশীরা।

আজ কত কষ্টই না করছে ছেলোমেয়েরা। দিনান্তে একবেলাও হয় তো মুখে তুলে দিতে পারছে না রাধা।

এবার আর অত কষ্ট থাকবে না। কোনরকমে পাঁচ-সাতটা দিন। তারপরেই তো আবার আগের দিনে, আগের জীবনে ফিরে যাবে বিপিন। শক্ত-সমর্থ পুরুষ, অসুরের মতো খাটতে শুরু করবে। খেটে রোজগার করবে। ছেলোমেয়েদের আর রাধাকে যতটা সম্ভব স্থখে রাখবার চেষ্টা করবে। এক মাসের দুঃখ-কষ্টকে সুরের মধ্যে রেখে তুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

গা-কাড়া দিয়ে উঠে বসলো বিপিন। এ সব কি ভাবছে ও? মনের সব ভাবনাকে দু'হাতে দু'রে ঠেলে দিয়ে বুড়োশিবঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলো বিপিন। বিস্ত একাগ্রমনে ঠাকুরকে ডাকতে পারে কোথায়? মাঝে মাঝে নিজের মনের অগোচরে অল্প ভাবনাগুলোও ভিড় করে আসে মনের সামনে। এলোমেলো অসংলগ্ন অনেক রকমের ভাবনা। অসংখ্য অগোঁজ। সে ভাবনার জোয়ারকে ও মানসিক দৃঢ়তায় প্রতিরোধ করে বুড়োশিবঠাকুরকে মনের সামনে রাখার গাধনা শুরু করলো ও। কুহিনানা বুড়ো বটগাছটার নীচে ও একা নয়। আরও আছে কেউ কেউ। সবলেই কোন না কোন রোগে আক্রান্ত। তাদের আত্মীয়-পরিজনরা আসে সকাল-বিকেল। খোজ-খবর নেয়। পূজা দেয়। মানৎ করে নতুন করে। এমনি করে দিন গত হয়, রাত আসে। রাত গত হয়ে দিন। এক-এক করে তিন দিন, তিন রাত গত করেছে বিপিন। তবু মনের বিশ্বাস হারায় নি। আশে-পাশে তিন-চারজন লোক হতে দিয়ে পড়ে আছে। কারও মাত, কারও আট দিন। মুখে একটুও জল নেই, পেটে নেই দানাপানি। কষ্ট হচ্ছে, অসহ্য জ্বালা। তবু পড়ে আছে ওরা। ওদের দিকে তাকায় বিপিন আর নিজের মনে বলসঞ্চয় করে।

তৃতীয় দিনে একবার রাধা এসে দেখে গেল, সাহস দিয়ে গেল। দৈর্ঘ্য ধরে থাক, সুফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বুড়োশিবের কাছে এসে যে লোক ফিরে যায়—তার অসুখ সারে না, দৈর্ঘ্যের পরীক্ষায় পাল করলেই তিনি মুখ তুলে চাইবেন। সেই আশ্বাসেই চারটে দিন কাটিয়ে দিল বিপিন, বসে আর শুয়ে অতিবাহিত করলো চার-চারটে রাতও। তারপর আর পারলো না। সারা শরীরে অবসাদ, অপরিসরী ক্লান্তি। দেহের তার যেন আর সহিতে পারছে না। শুয়ে শুয়ে আরও দু'টো দিন, দু'টো রাত। প্রতি মুহূর্তে ওর চেতনায় একটি আশ্বাসই কাজ করল—আজকের দিনই হয় তো শেষ দিন। আজকের রাতে ঘুমের ঘোরে

নিশ্চয় দেখা দেবেন বুড়োশিবঠাকুর। হাত বুলায়ে দিয়ে যাবেন মাথায়। কিংবা কোন গাছের শিকড় ধারণ করতে বলে যাবেন। আর তাঁর হাতের ছোঁয়ায় কিংবা সেই শিকড় ধারণ করে বিপিন সুস্থ-বল মাল্লু হয়ে উঠবে। ফিরে পাবে আঠাস বছরের টগবটিয়ে-ওরা যাবেন। বিস্ত কোথায়? দিন যায় রাত আসে। রাতও গত হয়। কেউ আসে না ঘুমের ঘোরে। কারও হাতের ছোঁয়া লাগে না মাথায়। বড় দুর্বল হয়ে পড়ে বিপিন। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই। বড় ক্লান্ত। এক ক'দিন এক-ফোঁটাও জল পড়ে নি পেটে। ক্ষুধায় অবসাদে ক্লান্তিতে মাথা তুলতে পারছে না বিপিন।

তবু দৃঢ়বিশ্বাসে মন বাঁধে ও। এ-রাতই বাকি ওর শেষ রাত। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ি যাবে। বৌ-ছেলোমেয়েদের সঙ্গে হাসবে, কথা বলবে, আদরের সোহাগে ভরে দেবে ছেলোমেয়েদের মন।

কিন্তু বৃথা হয়ে গেল দীর্ঘ আট দিন, আট রাতের প্রতীক্ষা। আর পারে না বিপিন। ক্লান্তি আর অবসাদে ওর অহুত্বিত পর্যন্ত ভৌঁতা হয়ে গেছে। ভাবনার প্রসারতা হয়েছে স্থিমিত। তবু অস্ত্রিন আশ্বাসে শুয়ে রইলো। ওর পাশের দু'টো লোকও চলে গেছে। দৈর্ঘ্যের পরীক্ষায় হেরে গেছে ওরা। সাধনায় সফল হতে পারে নি। বুড়োশিবের আশীর্বাদ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

বিপিন হারবে না। উঠবে না ওরান থেকে। উঠলেই বা যাবে কি করে? উঠে দাঁড়াবার শক্তি কোথায় তার? হাত-পা অসাড়। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছে।

নয় দিনের দিন খোঁজ নিতে এল রাধা। ঢাসে দেখল বিপিন শুয়ে আছে। তরতর করে এগিয়ে এল ওর কাছে। এসে বসল বিপিনের মাথার কাছে। গায়ে হাত রেখে বলল : কেমন আছ? কোন জবাব নেই।

রাধা ভাবলো, লোকটা ঘুমোচ্ছে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওর চেতনা। ধাক্কা দিল একটা আঙুলে করে। তবু নড়ল না বিপিন। কোন সাড়া দিল না, নিথর-নিশ্পন্দ পড়ে আছে।

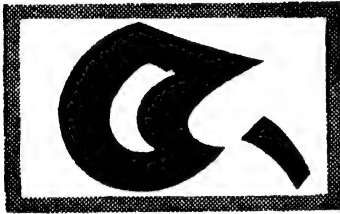
এ কি! রাধা চমকে উঠলো। মুখের কাছে মাটিতে জমাট বেঁধে আছে একথালি রক্ত। মাছি উড়ছে, বারবার বসছে মুখের কাছটোতেই।

আবার ধাক্কা দিল। এবারও নড়ল না বিপিন। কোন সাড়া দিল না, কোন শব্দ করলো না। আশ-পাশের লোকজনও এগিয়ে এলো। হায় হায় করলো সবাই। কেউ কেউ বললো : মুক্তি পেয়েছে। বুড়োশিবের পায়ে মাথা রেখে ধুজ হয়েছে। আর সকলের কানাকানি, ফিসফিসানিকে ছাপিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো রাধা— বুড়িয়ে পড়লো বিপিনের হিমশীতল দেহের উপর।



খুবই সহজ।

# আপনি মাত্র



## টাকায়

গ্যাসনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ-এ

একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

খুলতে পারেন



ব্যাঙ্ক চার্জ লাগেনা—  
বরং বছরে ৩% হিসেবে  
সুদ পাওয়া যায়

আজই আপনার নিকটবর্তী শাখায় দেখা করুন :

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(বুকট্রাস্টের সমিতিবদ্ধ • সদস্যদের দায়িত্ব সীমিত)

NGB/618 BEN

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১১, নেতাজী হত্যার রোড ; ২১, নেতাজী হত্যার রোড, (লয়েডস ব্রাঙ্ক) ; ৩১, চৌরঙ্গী রোড ; ৪১, চৌরঙ্গী রোড, (লয়েডস ব্রাঙ্ক) ; ৫, চার্চ লেন ; ১৭, ব্র্যাবোর্ন রোড ; ১বি, কন্ডেক্ট রোড, ইটালী ; ১৭এস/এ, নলিনী রঞ্জন এভিনিউ, নিউ আলিপুর (সেক ডিপোজিট ব্যাঙ্ক) ; ১০০, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ ; ১৩৯সি, বিধান সরণী, ডামবালায়।

আজ আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলবো। এই আমার প্রথম ও একতম চিঠি—কারণ এই আমার শেষ চিঠি। দুঃখ রইলো যে, এ-চিঠিতে আমি তোমাকে কোন সম্বোধন করতে পারি নি।

যে ডাক মনের মধ্যে গুমরে উঠে—সেই ডাকে ডাকবার অধিকার কি আমার আছে? জানি তুমি আমাকে সব অধিকার দিয়েছো কিন্তু তবু... অধিকার কি দিলেই পাওয়া যায়? অধিকার অর্জন করতে হয়।

তুই বৎসর হলো আমি তোমার স্বামী। এ-বাঁড়িতে আমি এভাবে দূরবো—এ স্বপ্ন তো আমার আজকের নয়, একযুগ আগের। কিন্তু এই ঘর, এই পাট, এই আসবাবের স্বপ্ন আমি দেখি নি। আমার স্বপ্ন...

সাত বৎসর আগে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। দৈবাৎ নয়, চাকরির ক্ষেত্রে। তবু আজ মনে হয় তা নিতান্তই দৈব।

দৈব! দেবতার অভিপ্রায় তাই দৈব। দেবতা অর্থহীন তো স্তম্ভবুদ্ধি। সেই স্তম্ভবুদ্ধির অভিপ্রায়ে আমি তোমার দেওয়া দান গ্রহণ করেছিলাম। তাই তো, আজ আমার জীবন এমনিভাবে ভরে উঠেছে।

ভরে উঠেছে। আয়নার ছায়াটা একটু হাসে। আজ যখন জীবনকে শেষ করতে যাচ্ছি তখনই মনে হলো পূর্ণতার কথা।

কিংবা, আজ জীবনে পূর্ণতা এসেছে বলেই মরণকে ভয় পাচ্ছি না। এতদিন দুঃখ, কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা কম ভোগ করি নি—ঝাঁপিয়ে পড়েছি অল্প স্রোত থেকে

খরস্রোতে। একের পর এক ঘূর্ণিতে ঘুরে ঘুরে তলিয়েছি, আবার সোজা ভেসে উঠেছি। কতদিন মনে হয়েছে মরে যাচ্ছি—শেষ হয়ে যাব এই মুহূর্তে কিন্তু কখনও আত্মহত্যার কথা মনে হয় নি।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে ছোট শহর—হাসিপাতালে তুমি ছিলে ডাক্তার—আর আমি নার্স। লোকে জানতো তুমি রক্ত, সাদা বিরক্ত, অসামাজিক। তুমি রোগ ভালোবাসো রোগীকে নয়। দিনের পর দিন আশ্চর্য যত তুমি রোগীকে ভালো করে তুলতে—তারপরে স্তম্ভ হয়ে যে যদি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দত্তবাদ দিতো, তুমি মুক্তিবিধে নিতে—বলতে শুধুমাত্র চারটে অক্ষরে মূল্য শোধ করা যায় এত কম কাজ আমি করি নি।

অপ্রতিভ হয়ে ওরা বলতো, না, না যে কি বাবাজি?

তুমি আর কিছু বলতে না।

তারপরে হয় তো পথে দেখা হলো। বিনয়ে গলে গিয়ে ওরা নমস্কার করতো।

—আপনাকে আমি চিনি না। গতবার মুখে তুমি বলতে।

ওরা অবাক চোখে তাকাতো।

—আমি অস্বস্তকে চিনি—স্বস্তকে নয়।

ওখানে প্রবাদ-গল্পের মতো চলিত হয়ে গিয়েছিল তোমার কথাগুলি। তুমি ছিলে ওপানকার সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়। তাই ডাক্তারবাবুর এই কথাগুলি সম্মুখে পরিচালিত হলো তারা পরস্পরকে।

কিন্তু, যারা তোমাকে শুধু চিনতো না জানতো, তারা অস্বস্তক করতো তুমি কত মহৎ। হিমালয় পাহাড়ের মতো। ওটা কঠিন। কিন্তু, কেউ যদি অশাবসায় ও চেষ্টা সেখানে উঠতে পারে, তবে দেখবে আকাশের কোলে লাড়িয়ে আছে।

যাকে মাধুভদ্রায় বলে চট্টলা, ইংরেজীতে ফ্লার্ট, বাংলায় ঢালানি ওদের মতো আমি ছিলাম তাই। ঠিক কথা, জন্মগত স্বভাবে কি ছিলাম জানি না, কিন্তু সচেতন প্রমাসে তাই হতে চেয়েছিলাম। প্রেম করবো কিন্তু প্রেমে পড়বো না—এই ছিল আমার লক্ষ্য। তাই আমি সবাইকে দেখে হাসতাম—একটু পারচয়ে কটাক্ষ করতাম।

ঠিক তেমনি অভ্যাসগতভাবে তোমাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, তুমি আমার



রাণু ভৌমিক

রাণু ভৌমিক  
তপস্যা



সন্ধ্যা রায়ের সৌন্দর্যের গোপন কথা...

## ‘প্রতিদিন লাক্স ব্যবহারেই আমার স্বক লাভণ্যময় থাকে’

লাভণ্যময়ী চিত্রতারকা সন্ধ্যা রায় বলেন,  
আমার রূপচর্চার নিত্যসঙ্গী লাক্স টয়লেট  
সাবান। লাক্সের সরের মত নরম ফেনা  
আমার ত্বকে কোমল সুন্দর করে তোলে...  
অপূর্ণা মিষ্টি গন্ধে লাক্স ঘন ভরিয়ে দেয়।  
আপনিও আপনার ত্বক সৌন্দর্যের জন্য  
লাক্স ব্যবহার করুন।



লাক্স টয়লেট সাবান — চিত্রতারকাদের প্রিয় সৌন্দর্য সাবান

সাদা ও স্নায়ুধর চারটি রঙে  
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরি

দিকেরই তাকিয়ে আছি। কেউ যে ওভাবে তাকাতে পারে সে খাবার ছিল না আমার।

অপ্রতিভ হয়েছিলাম—চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম—মূরে গিয়েছিলাম। নিজের চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ভেবেছিলাম তোমার কথা। কি ছিল তোমার চোখে? কি চেয়েছিলে তুমি?

আজ পর্যন্ত হাজার হাজার দৃষ্টির সার্চলাইট আমার মুখে পড়েছে—তাদের ছাঁটো মাত্র রং আমি দেখেছি—কিংবা একই রংয়ের একটি রকমের। কান্না আর প্রশংসা—আর এই ছাঁটো রং এমনভাবে মিশে পাকতো যে, তাদের মধ্যে তখন আমিও অনেক সময়ে করতে পারতাম না।

কিন্তু, তোমার দৃষ্টিতে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আলো দেখলাম। সেখানে উদাসীন ছিল, অস্বস্তিক্রিয়া ছিল, একাগ্রতা ছিল। কিন্তু একটি পূর্ণ-যৌবনা স্নন্দর নারীর দিকে দৃষ্টিবাহিত প্রোট (তোমার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ) ভদ্রলোক যেভাবে তাকায় তার কিছুই ছিল না।

কেন ছিল না? আর যদি নেই-ই তবে কেন তুমি তাকালে? অনেকক্ষণ ভাবলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না।

আরও অবাক ছলাম, যখন এক বৎসর পরে তোমার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলো। প্রস্তাব রীতিমতো দেশীয় রীতিতে। ঘটক পাঠিয়ে আমার বিধবা মার কাছ। মা হাতে স্বর্ণ পেলেন। আমার পাঁচ বৎসর বয়স হতে না-হতে তিনি আমাকে বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন—আর এমন পাঁজ। যখন আমি ছেলে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলাম—তিনি কেন্দ্রে ভাগিয়ে দিলেন।

তা, উনি কীদুন। বিয়ের প্রস্তাব তো আর আমার এই পঁচিশ বৎসর জীবনে কম আসে নি—শুধু যার কাছ থেকে এই প্রস্তাবের কল্পনায় একদা আমার রাতের স্বপ্ন মধুর হয়ে উঠেছিল—তার কাছ থেকেই—

ডাঃ জ্যোতির্ময় রায়ের প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দেবার পক্ষে কোন দ্বিধা ছিল না। শুধু একবার একটি কৌতূহল হয়েছিল। জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, যিনি একবারও আমার দিকে সাধারণ দৃষ্টিপাত করেন নি, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলেন নি, তিনি হঠাৎ কেন আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন! কিছুদিন ভাবলাম—তারপরে সব ভুলে গেলাম।

ভুললাম বলেই বোধ হয় নতুন করে জানতে পারলাম। হঠাৎ-ই একদিন জানলাম জ্যোতির্ময় রায়—আর তখনই রাজী হয়ে গেলাম। শুধু রাজী হওয়া নয়—নিজের এগিয়ে গেলাম।

ফলশ্রুতির রাতটার জুই আমার সবচেয়ে ভয় ছিল।

অনেক রাতে তুমি ঘরে ঢুকলে। আমি খাটের এককোণে বসেছিলাম আর ভাবছিলাম আসন্ন যন্ত্রণার কথা। তুমি বিস্ময় আমার দিকে তাকালে না—একটি কথাও বললে না। কোণের টেবিলে বসে টেবিলল্যাম্প জালিয়ে বই পড়তে আরম্ভ করলে।

মুক্তির আনন্দে এতো উল্লসিত হয়ে উঠলাম যে, তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমার মনে কোন প্রশ্ন উঠলো না। আমি শুধু ভাবছিলাম—

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরবেলায় জেগে দেখি তুমি ওপাশে আর মানখানো একটা পাশবাঁলিস।

সেদিন আমার ভাববার সময় ছিল না—আজ ভেবে অবাক হচ্ছি, কেন তোমার ব্যবহার আমার চোখে ঠেকে নি। আর একটি প্রশ্ন সর্বদা আমার মনে তোলপাড় করে তুলেছে—কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?

তোমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম! তোমার চেহারা ভালো নয়। কঠিন পরিশ্রমে, অশ্বলে, রক্ত আবহাওয়াতে সে চেহারা আরও খারাপ হয়ে গেছে—তবুও তুমি দুঃস্বস্তিত নও। কিসের ছায়া—সে কি একটা ব্যথা, অনির্দেশ বেদনা—যা তোমার অস্বন্দর দেহে এনে দিয়েছে অপক্লপ নাহিমা।

সেদিকে তাকিয়ে পাকতে পাকতেই বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম। আর বিভ্রাক্ষীপ্তির মতো একটি কথা আমার গা থেকে মাথা—মাথা থেকে জন্ম পর্যন্ত জ্বালা ধরিয়ে দিল—এসেছে—সেই মুহূর্ত এসেছে। যে মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছি—সেই মুহূর্ত এসেছে।

গাড়ির শব্দে বাড়ির সবাই উঠে পড়েছে। একটা খানন্দ কোলাহল। বাড়ির মেজাজে সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়ে নিয়ে বাহিরে গিয়েছিল। বড়ভাইয়ের বিয়ের খবর পেয়ে ভাড়াভাড়ি ফিরে এসেছে।

পাশের একটা ঘরে চূপ করে ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়েছিলাম যেন কি একটা করতে চুকেছি—চুকে ভুলে গেছি।

—বৌদি। উল্লাসভরা কণ্ঠে চৈচিয়ে ঘরে ঢুকতেই আমি মুগ ফেরলাম। একসেকেণ্ড ছুঁজনে ছুঁজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম! আমার চোখে আশ্চর্য স্রাবের ছাঁস। ওর মুগ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ।

—জু...তুমি.....

ওর স্বাী এসে ঘরে ঢোকে।

—বৌদিকে আধুনিক কায়দায় 'তুমি' করে বলবার রীতি থাকলেও আমি কিন্তু 'আপনি' বলাই পছন্দ করি, ঠাকুরপো, হেসে হেসে উত্তর দিই।

—আমিও। ওর স্বাী উত্তর দিল, অত আধুনিক

## ঘাটের তপস্বী

এর মুখে-চোখে অদৃষ্ট আগুনের জ্বালা। আমি একটা হাসলাম। এই জ্বালা জ্বালাতেই তো এসেছি।

ফুলশয্যার পরদিনই তুমি চলে গিয়েছিলে। তোমার চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও উদারতার এমন আশ্চর্য সমন্বয় যে, বাড়ির লোকরা তোমার কোন কাজে বিস্মিত হতেন না বা সমালোচনা করতেন না। তখন খেয়াল করি নি কিন্তু আজ আমার জানতে ইচ্ছে করছে, সেদিন কেন তুমি একটা কথাও না বলে চলে গিয়েছিলে?

হাসিতে, গালে, গল্লে হিরণ্ময়কে যেন পাগল করে তুললাম। আমার প্রশংসায় সমস্ত বাড়ি মূৰ। বাড়িতে দুটি নাজ বধু—ওর স্ত্রী বেলা ও আমি। যদিও সম্পর্কে আমি-ই বড় তবুও বড়ভাই পরে বিয়ে করেছে—কাজেই আমি বয়সে ছোট ও নবাবগত।

নূতন হওয়া মানেই পানিকটী খুবশে পাওয়া। ভাড়াটা আমার গচেতন প্রয়াসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুটি ছেলে নিয়ে নিয়ে বেলার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

হিরণ্ময়ের মূখের হাসি মুখে যায়—হযতো রাতের দুমণ্ড, বাড়ির কারো গৃহে ও কথা বলে না। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

তবু বুঝতে পারি থাকে ও একদা হেলায় ত্যাগ করেছে থাকে পাবার জন্তে আজ এর অসীম আকৃতি। এমনিই হয়। কত না জিনিষ আমরা দাস্তার ফেলে দিতাম যদি না জানতাম অথ কেউ তা কুড়িয়ে নেবে।

সেদিন দুপুর রাতে হঠাৎ জেগে পেলাম। এর আগেও অনেক রাত জেগেছি, কিন্তু একমুহুরিত আর কখনও হয়নি।

বিবরবিবিয়ে বুট্টি পড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বুট্টি আর রাত্রির অন্ধকারে পূর্ণিবার একটা আবছা পর্দায় ঢাকা—সেখানে দেখতে পেলাম একটা মেয়েকে—চোখে তার সাগরের গভীরতা, সেই অসীম, অতল গভীরতার যে ভালো বেসেছিল একজনকে। শুধু ভাগ্যবাসিনী—উচ্ছ্বাসিত বজাপারায় কূল হারিয়েছিল।

ওদের দুজনকে দেখলাম অনেক জায়গায়—রেইংব্রেট, গন্ধার ধারে, ট্যান্সিতে।

দেখলাম মেয়েটি কাদছে। চোখের জলে বুট্টিখানা মোটা হয়ে গেল।

অনেক কাদলো সে। তারপরে ওর চোখে দেখলাম সেই খালো—যে আলো জ্বলিছিল প্রতিহিংসাপরাধীনা দ্রোপদীর চোখে।

যে মেয়ে সৃষ্টি হয়েছিল নিতান্তই পরোয়া-ভাবে সেই হল বাইরের। একজনের সেবার যার জীবন কেটে যেতো সে হলো অগণিত লোকের সেবিকা।

শুধু সেবিকা নয়—যেন আরও কিছু। আকর্ষণ করবার

মতো রূপ এর ছিল—পালিশে তা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রূপের দুয়ারের সবগুলি দরজা খুলে দিল—আর সদয়ের দুয়ার দিল একদম বন্ধ করে।

সে মেয়ের সদয় ছিল না বলেই জানতাম, কিন্তু—

কিন্তু, আজ এই বিবরবিবের বুট্টির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞপের একটা একটা মুচকি হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ তোমার ছবির দিকে চোখ পড়লো! ওর—আর—

আর ও কেঁদে ফেলে। কি আশ্চর্যভাবে তাকিয়ে আছে তোমার ছবির চোপ দুটি।

তারপর থেকে প্রতি রাতে শোবার সময়ে ঐ চোপ দুটি দেখতাম—আর দিনেও মাঝে মাঝে। শেষটি কিছুই ভালো লাগতো না—সব সময়ে ঐ চোপ দুটি-ই ভাসতো।

আজ সকাল থেকেই আবার সেই টিপি-টিপি বুট্টি। বহুকাল। বুট্টি তো হবেন-ই। কিন্তু এট বুট্টি যেন মনের মত তত্ত্ব আলপা করে দেয়।

দুপুরে আমি জানালার কাছে চুপ করে বসেছিলাম। ভেজানো দরজা খুলে ও এসে দাঁড়ালো।

বাড়ির সবই নিমগ্ন রাস্ততে গিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল ও আজ আসবে এই ঘরে। এট নির্জনতার স্বযোগ নিয়ে দাঁড়াতে আমার সুযোগ্য। এট প্রথম ওর বিবরে আমার হিমসের মিলে গেল। এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। যা দেখতে চেরেছিলাম—নাই।

কিন্তু, আমার আনন্দ হলো না; দুঃখ হলো, করণা হলো।

—দীপিকা! তুমি কি চাও?

**ড্যা বক্স**

# অশোক কার্ডিয়াল

করীর স্বাস্থ্য, শক্তি  
ও পৌষ্কর্য বর্ধন করে

ড্রাগ স্টোর-কলকাতা:

ডাঃ বক্স ল্যাবরেটরী লিমি.

কলিকাতা-৯

—কিছুই না। শাস্তকণ্ঠে বলি।

ব্যঙ্গ নয়, বিদ্রূপে নয়, মনের সত্য কথাটিই বললাম। হঠাৎ আমার মনে হোল এর কাছে আমি কিছুই চাই না, কিছুই চাইবার নেই।

—তবে, তুমি এসব করেছ কেন?

চপ করে রইলাম। সত্যই তো, অনেক কিছু করেছি। অনেক আয়োজন অনেক অনুষ্ঠান, অনেক ছলনা এই দিনটির জন্য। কিন্তু জয় যখন করায়ত্ত তখন কেন এই ক্রান্তি?

—আর করবো না। শাস্ত, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলি। মুছে নিতে চাই সমস্ত দাহ, জ্বালা।

কিন্তু, মুছতে চাইলেই কি মোছা যায়? তাহলেই পৃথিবীর ইতিহাস যে অন্ধরকম হোত।

এই কথার পরে ওর চলে যাওয়া উচিত। আমি শুকে নৃত্তি দিয়েছি। কিন্তু তা ও গেল না। অবাক মুখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, কেন?

কেন? কি উত্তর দেব? সচেতন মনে যাই ভাবি না কেন—প্রতিশোধ—পতিহিংসা—আরও কত বড় বড় কথা—কিন্তু, আমার অবচেতন মন তো স্পষ্টভাবে জানে—ওকে দেখবার জন্য—ওর সাম্রিক্য পাবার জন্যই আমার এই দুর্বল প্রয়াস।

—আমি ক্রান্ত। ধীরে ধীরে, বলি।

—ক্রান্ত! ও চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দেয়, আশ্চর্য জালিয়ে এখন ক্রান্ত হলে চলবে কেন স্তম্ভরী?

নীরবে মনে নিই ওর বিদ্রূপবাক্য। সত্যই তো, যে নরকের আশ্রয় জালিয়েছি তা থেকে কি করে পালান?

—আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

চমকে উঠলাম। এই ক'টি কথা শোনবার জন্যই কি এতদিনের এই যন্ত্রণা ভোগ! তাই এই পরিবেশে সম্পূর্ণ নিজের অগোচরেই বোধ হয় মুখে ফুটে ওঠে কোমল আভা।

আমার দিকে তাকিয়ে ও এবারে খুঁশি হল। এতক্ষণ, আমার ওদাসীতা ওর আত্মসম্মানবোধকে পীড়া দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ, তাই হবে। তৃপ্তমুখে ও বলে। এখন ডিভোর্স দিল পাশ হয়ে গেছে—আর কোন অস্বাধিদে নেই।

যেন সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছে এভাবে ও চলে গেল। আমি একাই বসে রইলাম। সন্ধ্যার পরে ধীরে ধীরে পুষ্টি থেমে গেল, আর চারিদিকে ফুটে ওঠে চাপা আলোর আভা। যে আলো বর্ষাক্রান্ত আকাশ ভিন্ন অন্ধ কোণাও দেখা যায় না।

সেই আলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার সমগ্র মন যুগায় আমারই বিরুদ্ধে বিরোধী হয়ে ওঠে। এই কি চেয়েছিলাম?

জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এতদিনের আনন্দ, উল্লাস, জ্বালা, যন্ত্রণা, রাগ, বিষে, তিক্ততার এই পরিণতি। একটি অসহন নারী ও দু'টি শিশুকে ভাসিয়ে দিয়ে আমার চলে যাচ্ছি।

না, না, না। এ তো আমি চাই নি। আমি বিবাহ দিতে চাই নি দুইটি কিশোর-প্রভাত। আমি জীবন তাকে দিতে চাই নি একটি যৌবন-মধ্যাহ্ন।

আনন্দে যার জগা হয়েছিল তার সমাপ্তি এতো দীর্ঘ কেন?

তারপরে আমি সব-ই বুঝতে পারলাম। বুঝে পারলাম আমি এতদিন যা চাইছিলাম তা কাম—কামন করি তাই দুঃখ পাই। শ্রদ্ধা ছাড়া প্রেমের জন্ম হতে পারে না। আজ আমার মনে যে গোপন পদ্ম ফুটি উঠেছে—তাই প্রেম। পাকে ফুটে উঠেছে এই পঙ্কজ।

অনেকক্ষণ ভাবলাম। কামের সেবা এতদিন করেছি—কাম-ই আমাকে টানছে। কিন্তু আমি যে বদলে গেছি—আমি যে ভালোবাসে ফেরেছি। ইতি

দীপিকা।

চিঠি শেষ করে দীপিকা উঠে দাঁড়ায়। পাখা টানবার লকটাই সবচেয়ে স্মারবেজনক। চিঠিটার একটা পান্ডুলিপি দরকার। টিকানা লিখে একটা পামে ভরে টিকিট এঁটে দিল।

তারপরে, জ্যোতির্ময়ের ছবিটা টেবিল থেকে তুলে ধরে—আশ্চর্য! ঠক করে টেবিলের ওপরে পড়ে একটি ছোট পাম। ওপরে তার নাম লেখা।

দীপিকা অবাক হয়ে যায়। একটানে খুলে ফেলে থামটা। ছোট একটি চিঠি।

প্রিয়তমাসু,

জানি, যেদিন তুমি আমাকে ভালোবাসবে সেদিনই এই চিঠির খোঁজ করবে। তাই নিশ্চিতমনে তোমাকে প্রিয়তম সম্বোধন করলাম। আমার ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু, উপযুক্ত সময় ছাড়া তা দিতে তুমি তা শুনতে না। আজই ঠিক সময়।

তোমার মধ্যে আমি দেখতে পেরেছিলাম স্নেহ দেবে একটি অস্বস্ত মন। পরে আমি জানতে পারলাম এই অস্বস্ততার জন্য দায়ী আমারই আত্মীয়।

আমি জানতাম ওর সম্পর্কে এলেই তোমার মোহ ভেঙে যাবে। তুমি নিজেই ফিরবে। কারণ, তুমি স্নেহের এবং সৌন্দর্য কখনও কোন কৎসিত কাড় করতে পারে না। ইতি

জ্যোতির্ময়।

চিঠিটা পড়ে দীপিকা একটু হাসে। নিজের লেখা চিঠিটা বার করে সম্বোধন লেখে—প্রিয়তম আমার।

তারপরে, নিশ্চিতমনে অনেকদিন পরে ঘুমিয়ে

বিনা-টিকিটের যাত্রী সূত্র সমাজজীবনে এক দুষ্টকৃত। যারা অকারণে বিপদজ্ঞাপক শিকল টানে—আর যারা রেলের সম্পত্তি বেপকোয়া ক্ষতি করে এরা তাদেরই সগোত্র। এই তিনের পাপচক্র আমাদের সমাজের এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে, আজ এর মূলোচ্ছেদ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা সমাধানের কাজ রেলওয়ের দিকই। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও এইসব সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে পূর্ব রেলওয়েকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

ধরুন বেকার যুবক চলেছে বড়কণ্ঠে জোপাড়-করা একটা চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে। হঠাৎ তার ট্রেনের চাকা খেমে গেল মাঝপথে। নিশ্চয়ই কেউ শিকল টেনে থামিয়ে দিয়েছে। যথাসময়ে পৌঁছতে না পেরে তার আর ইন্টারভিউ দেওয়া হ'ল না। বেচারার অবস্থাটা বুঝুন। আবার দেখবেন, দরিদ্র বিধবার একমাত্র আশা-ভরসা পুত্র চলেছে পরীক্ষা দিতে। একই কারণে সেও নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির হতে পারলো না। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই ধরনের ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক।

বিপদজ্ঞাপক শিকল রাখা হয়েছে, জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থার জ্ঞা। কাজেই খুব সাবধানে একে ব্যবহার করা উচিত। অথচ যখন তখন অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে যথেষ্ট শিকল টানা হচ্ছে। এটা যে কোন বিশেষ একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ বা সবযাত্রীই শিকল টানেন তা নয়। সব রেলপথেই নির্দিষ্ট এক ধরনের যাত্রী আছে, তারাই এ কাজ করে থাকে। এক-এক ডিভিশনে এদের কার্যকলাপ এক-এক রকমের হতে পারে, কিন্তু এদের ধরা মুশ্বিল। অজ্ঞ-গ্রাম্য মামুষ অথবা শ্রান্ত-ক্লান্ত নিত্য যাত্রী ট্রেন তাদের গন্তব্যস্থল ছাড়িয়ে গেলেও কখনো শিকল টানতে সাহস করবেন না। এক শ্রেণীর ছাত্র আছে তারা তাদের স্কুলের কাছাকাছি লেভেল ক্রশিং-এ শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে নেমে পড়ে। আবার ছুটির দিনে হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ায়ার জন্তেও এক শ্রেণীর লোক দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। এরা যদি দেখে খেলার মাঠ বা সার্কাসে যেতে ক্রেশন থেকে যতটা হাঁটতে হবে লেভেল ক্রশিং-এ নাগলে তার থেকে এক ফাল'ৎও কম হাঁটতে হবে তা হলেই আর কোন বিচার-বিবেচনা না করে শিকল টেনে দেয়। এতে অজ্ঞাত যাত্রীদের কত অসুবিধা কত ক্ষতি হয় তা যে তারা জানে না তা নয়, তবুও এই অগৎ আচরণ তারা করবেই। ওদের নিরস্ত করার জন্তই পূর্ব রেলওয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করেছেন, এতে বেশ কিছু কাজও হয়েছে। গত মে মাসে যেখানে ১০৭৬ বার শিকল টানা চমকছিল জুন ১৯৭২ বারের নেমে এসেছে।

টিকিট ফাঁকি দিয়ে ভ্রমণের সমস্যা'ই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ শিকল টানার ঘটনা বিশেষ একটি শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু বিনা টিকিটের যাত্রী তো সব শ্রেণীর মধ্যেই রয়েছে। ছাত্র, অফিস কর্মচারী, ছোটবড় ব্যবসায়ী আর ঝাঁর নানান কারণে মাঝে মাঝে ট্রেনে চড়েই তাঁরাও টিকিট ফাঁকি দেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমাজের সর্বস্তরেই এই পাপ বাসা বেঁধেছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে, শিক্ষক তথা বিধানমণ্ডলীর মাননীয় সদস্যকেও টিকিট ফাঁকি দেবার অপরাধে আটক করা হয়েছে। আবার বড় বড় দল বেঁধে টিকিট না করে যাতায়াতের ঘটনাও অনেক, এরা গায়ের জোরে চলে। টিকিট চেয়ে চেকাররা অথবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত কর্মচারীরা এদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন এরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। এই কিছাদিন আগেই তো বনগাঁ সেক্সনের এক ট্রেনে একদল ছাত্র টিকিট ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল চেকার তাদের ধরেছিলেন। ফলে, তাঁকে বেদন গ্রহণ করা হয় শেষে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়, বিব্রাঙ্ক করান আর না করান এর পাণ্ডা হলেন এদেরই এক শিক্ষক।

সত্যি বলতে কি, বিনা টিকিটে ভ্রমণ আমাদের সমাজ জীবনকে এমনভাবে কলুষিত করে দিয়েছে যে, এখন লোকে ভেজাল খাতশস্ত্র বা কালা টাকার মতো একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। এই অভ্যাস এত ব্যাপক হয়ে উঠেছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও কি করে যে একে বন্ধ করা যাবে তা ভেবে ঠিক করতে পারছে না। বিনা টিকিটের যাত্রীদের ধরা মতাই কঠিন, গণতন্ত্রী দেশের জনগণের মর্যাদা আছে, তাই একটা বিরাট টিকিট পরীক্ষা বাহিনী পুষে রাখা অথবা প্রত্যেকটি মেশিনকে এক-একটি দুর্গ বানিয়ে গোটা দেশটাকে কার্যত পুলিশ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যায় না। ফলে বিনা টিকিটের যাত্রীদের শতকরা সামান্য অংশই ধরা পড়ে। তা ছাড়া ওদের সংগঠন ব্যবস্থাও চমৎকার! কোথায় কখন বিশেষ পরীক্ষার ফাঁদ পাড়া হবে আগে থেকেই ওরা জেনে ফেলে এবং যথা সময়ে সঙ্গীদের হুঁশিয়ার করে দেয়। তা সত্ত্বেও গত মার্চ মাসে ৭৩,২০৫ জন ধরা পড়েছিল। তাদের কাছ থেকে ভাড়া আর জরিমানা বাবদে মোট ১,৮৫,৬৬৩ টাকা আদায় করা হয়েছে।

পাটনা-গয়া ও কিউল-গয়া সেক্সন এ ব্যাপারে কুখ্যাত। গত জুলাই মাসে এই দুই সেক্সনে জোর পরীক্ষা চালান হয়েছিল। তাতে ১৮,০২২ টি ঘটনায় মোট ৪৬,৬৩৪ টাকা রোজগার হয়। গত ২৫ শে আগস্টও হাওড়া সেক্সনে ৮২২ টি ক্ষেত্রে ৪,২২৫ টাকা আদায় করা হয়েছে।

১৯৬৩-৬৪ সালে রেলের ফিটিংস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের কাঁচা ও ওয়াগনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম চুরি ও ক্ষয়-ক্ষতির বাবদ পূর্ব রেলওয়ের ৪,৭২,৬১৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এই গত এপ্রিল মাসে পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল, ধানবাদ ও দানাপুর এই ৫টি ডিভিসনে কয়লার ইঞ্জিন চালিত ট্রেনের সরঞ্জাম চুরি ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য মোট ৬৮,৬০০ টাকা লোকসান দিতে হয়েছে।

কিন্তু এই সব ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনে চালু নতুন সুবার্ন বৈদ্যুতিক ট্রেনের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র এবং বস্তুগুলির ক্ষতির তুলনায় নগণ্য। গত ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শিয়ালদহ ডিভিসনে যে ২৫ K V A C বৈদ্যুতিক ট্রেন-গুলি চালু করা হয়েছে সেগুলি আজ উচ্চ গতির ব্যাপক দীর্ঘায়ুতে পরিণত। গত এপ্রিল মাসে উন্নতির মত ধ্বংসসাধনের ফলে শিয়ালদহ ডিভিসনকেই ৬০,০০০ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। মে মাসে এই অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৬৬,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

শুধু একটি বীভৎস আনন্দ উপভোগের জন্যই সমাজ-বিরোধীরা সুন্দর ও সুদৃশ্য কোচগুলি যেভাবে তচনছ করে ফেলে তা ভাবলে বেদনার অন্ত থাকে না। এদের হাত

থেকে কোন কিছুই অব্যাহতি নেই। ধ্বংসকর্মে এরা সম্পূর্ণ জড়তাযুক্ত, রবারের আসন, রৌপ্য কাপড় এবং প্যান্ট ক্যানভাস ও ব্যাবহুল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এর ছিন্নভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলে।

গত মে মাসে ট্রেন থেকে ৪১,২৩৫ টাকা মূল্যের আলোব সরঞ্জাম এবং ৮৯,১২১ টাকা মূল্যের রোলিং স্টকের জিনিষ পত্র চুরি গেছে। স্টেশন ইয়ার্ডে পড়ে থাকাকালেই নয় চলন্ত ট্রেন থেকেও চুরি হয়, পুলিশ এই সব অপরাধ প্রতিরোধ করতে গাফিলতী করে না। কিন্তু দলবদ্ধভাবে এরা যত হানা দেয় তখন ধরা কঠিন।

এই দুর্নীতি আমাদের সমাজজীবনের গভীরে এর দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে, এই পাপচক্রের বিরুদ্ধে প্রত্যেক নাগরিকের একযোগে ঝুঁকি দাঁড়ানো দরকার। কেবল কতৃপক্ষ তাদের যথাযথ চেষ্টা করে যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেইসঙ্গে যেখানে স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের জনমতকে এর মর্ধ্যাদা দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই সমস্যা কে নিজস্ব বলে মনে করতে হবে। তাই সমাজজীবন থেকে এই পাপচক্রের মূলোচ্ছেদের কাজে পূর্ব রেল কতৃপক্ষ দেশের সবশ্রেণী জনসাধারণের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন।

## স্বর্ণ অলক

[ Edmund Spencer-এর Amoritti Sonnet

XXXVII-এর অনুবাদ ]

- কি সে মায়া জাগে ঐ সোনালী অলকে  
(যারে) তেকেছে সোনার জালে চতুরা ললনা  
(কত) নিপুণ চাতুরীভরে? জ্যোতির চমকে  
(যার) আঁখি করে ভুল! কেবা চুল কেবা সোনা  
(কেহ) না পারে বুঝিতে? এই সোনার শিকলে  
(যবে) পুরুষের তোলা আঁখি পড়ে রে লুটায়  
(তার) যতই গরব থাকে এ ফাঁদে পড়িলে  
(তার) দুর্বল হিয়া বাঁধা পড়ে রে প্রণয়ে  
(হায়) নাহি যদি রয় তারা অতি সাবধান!  
(ঐ) সোনার কবরী পানে তাকাশ নে আর  
(বলি) ওরে মোর আঁখি তোরা হারাবি পরাণ  
(যদি) যদি পড়িস ও মায়াজালে নাহি উদ্ধার  
(সে যে) সোনার শিকল ওরে হোক না সোনার  
(শুধু) স্বাধীনতা চাই, নয় বন্ধনভার ॥

## পুষ্পধনু

বন্দে আলী মিয়া

একটি কবিতা কি গো রূপ ধরে এসেছিলো পাশে।  
এসেছিলো হেথা যেন নীড়হারা একটি চাতকী।  
একটি গানের ছবি আঁকি নাই তাহার লাগিয়া  
এসেছিলো তাই কি সে বুদ্ধদাসী সৃজাতার সম!

শরীরী কি চেয়ে আছে দু'টি আঁখি মিনতি কাতর—  
একটি উদয় তারা হেরেছিল প্রদায়ের বেলা।  
সেদিনের পটভূমি মুছে গেছে ইতিহাস হতে  
কালের পাতায় র'লো হৃদয়ের একটি পরশ।

আজি কি তোমার মনে আছে আর এতটুকু স্মর!  
জনতা অরণ্যে মোরা খুঁজিছিল দু'জনে সেদিন—  
নয়নে আছিলো কথা—অচেনারে ছিলো সংশয়,  
ছিলো না নিরালা কোণ—ছিলো নাকো কণিষ্ঠ অবকাশ

সেদিন আকাশ ছিলো মেঘ-ভার বাষ্প মলিন  
গুধিনীরা দল বেধে চলেছিলো সান্ধ্য-হুলায়।  
আমার জীবন-স্বপ্ন শেষ হলো উদয় লগনে—



কদিন জরের পর আজই প্রথম মছা স্কুলে যাবে। সকাল থেকে মা রান্নাঘরে। কি নাকি স্নজি রুটি আর মশলা ছাড়া মাছের বোল রান্না হচ্ছে, যা নিজেই করছেন, নতুন বাতুনি এ সব জানে না, রান্নার ফাঁকে ফাঁকেই মা এসে তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন—

মো, তোমার স্কুলের ব্যাগ গোছানো হয়েছে?  
আয়া, মো বাবা কা কাপড়া ঠিক হয়? জলদি করো।  
আবার চলে যাচ্ছেন রান্নাঘরে।

মো ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আর পেছন ফিরে ফিরে নাকে দেখছে; নাকে দেখতে তার ভীষণ, ভী-ব-ণ ভালো লাগে, মার মুখটা কি সাদা, আর গালের কাছটা কি লাল দেখাচ্ছে এখন। মো জানে রান্না করলেই মার মুখটা এরকম লাল দেখায়। আর মার মুখটা যখন বাগানের গোলাপ ফুলের মত এরকম রঙিন দেখায় তখন কিছতেই মো-এর নাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না—

খালি ইচ্ছে করে মার কোলের কাছে বৈশে বসতে, মার মুখ থেকে সেই গন্ধটা শুনতে; সেই যে গন্ধে—

রাজপুত্র সাদা খোড়া জোরে ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গিয়ে বান্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনল।

এই গন্ধটা অনেকবার শোনা হলেও মার মুখ থেকে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে তার। আচ্ছা, বান্দিনী রাজকন্যাটা কে! মহয়ার কেনন যেন মনে হয়, না-ই সেই রাজকন্যা, আর মাকে উদ্ধার করতেই...

মো!  
মা এসে মহয়ার পিঠে হাত রাখলেন, খাবে চল।  
তুমি কিন্তু আজ আমায় খাইয়ে দেবে বলোহ।  
দেব, এস।  
মার সঙ্গে সঙ্গে মহয়া এসে খাবার ঘরে ঢুকল।  
বাবা এখনও সামনের বারান্দায় বসে বন্ধু সাফ করছেন, মহয়ারকে দেখে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? মো এত সাজগোজ করে সাত সকালে কোথায় চলেছে!

স-স্কুল।  
মুখ ফুলিয়ে মো বলল।  
হো হো করে মো-এর বাবা হেসে উঠলেন।  
খুব অনিচ্ছা মনে হচ্ছে?  
তারপর মার দিকে ফিরে বললেন, ওর না জ্বর হয়েছিল।  
সেরে গেছে।

— কখন বাচ্চকে বাচ্চকে মা বলেন।

একটু ভাল করে সারলেই না হয় পাঠাতে। বন্ধুকের মধ্যে এষাচোখ রেখে বাবা আবার বলেন—

এত তাড়া কিসের।  
ই্যা মা। বাবা ঠিক বলেছে, আমি কাল স্কুলে যাবো, আজ না।

মো: চেয়ারের ওপরেই একে বৈকে সরে গেল।  
মো!

মার সেইরকম ঠাণ্ডা গলা, যে স্বর শুনে মো-এর আদর আদার সব বন্ধ হয়ে যায়, আর বন্ধের মধ্যে কেমন একটা হয়, সেটা হলে মো-এর মোটেই ভাল লাগে না। মো এগিয়ে এসে মার হাত থেকে রুটির টুকরো মুখে নিল।

কেমন লাগছে স্নজির রুটি?  
ভাল!  
মো একচুমুক জল খেল।  
আঃ মো, খেতে বসে আগেই ঢকঢক করে জল খেয়ো মা তো।

মার হাত আবার এগিয়ে এল মো-এর মুখের কাছে।

আর খেতে পারছি মা।  
আঃ! মো! আবার দুইমু।  
পেট ভরে গেছে।  
চুপ করে খেয়ে নাও।

মা মো-এর মুখের মধ্যে গুঁজে দিলেন মাছের টুকরো আর রুটি।  
খেতে যদি মা চায় জোর করছ কেমন? হয়ত এখনও শরীর ভালো নয় নি; জোর করে খাওয়ানো ঠিক নয়।

## স্বজাতা

এইজতেই মো-এর বাবাকে এত ভাল লাগে; বাবা কখনও জোর করে রুটি-ভাত খেতে বলেন না, আর স্কুলে যাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও বলেন না। বলেন—থাক, থাক! একদিন স্কুলে না গেলে কি আর হবে! কিন্তু মা! ওরে বাবা! আজও মা তেমন করে বাবাকে বকে উঠলেন।  
তুমি থানো তো। দুইকরো রুটি খেয়েই ওর পেট ভরে গেল। আমি জানি কতটা খেলে ওর পেট ভরে।  
মা আবার মুখে গুঁজে দিলেন একটুকরো রুটি।  
তাড়াতাড়ি কর মো; স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে; বাবা বাড়ি ফিরিয়ে মো-এর দিকে চেয়ে হাত উন্টোলেন; অর্থাৎ হোল না বাবা আজ মোকে বাঁচাতে পারলেন না। আজ মোকে স্কুলে যেতেই হবে।

আরো কয়েকটুকরো রুটি খেতে হোল মহয়ারকে তারপর সুন্দর লেবুর গন্ধ দেওয়া একঘাস ফোল; এই বোলটা খেতে মহয়ার খুব ভাল লাগে।

খাওয়া। ঘোল খাওয়া যায় না, ঘোল ত' 'লিকুইড'  
তাকে ত' 'ড্রিক' করতে হয়, মাদার বলেছেন, বুঝিয়ে

দিয়েছেন 'ইট' আর 'ড্রিক'-এর তফাৎটা কোথায়, আর  
তাই ত' মহয়ার জল খাওয়া ঘোল খাওয়া শুনলেই আজকাল  
হাসি পায়।

মাদার জেরোম। ঘোল 'পান' করতে করতে মহয়ার  
বলল।

গ্রাস মুখে নিয়ে কি বিড়-বিড় করছ ?

মা আবার বকে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি কর, দেরি হয়ে যাচ্ছে মৌ !

মার গলাটা শেষের দিকে ঠিক যেন মাদার  
জেরোমের মত শোনাগে। উনি যখন ডাকেন মা-ছ-য়া,  
মার মৌ ডাকটাও ঠিক তেমনি শোনাগে। মৌ-এর কামে।  
স্কুলের মধ্যে মাদার জেরোমকে মহয়ার সবচেয়ে ভাল লাগে।  
উনিও কি সাদা! সব মাদাররাই সাদা কিন্তু মাদার

জেরোমের মত এত ভাল সাদা আর  
কেউ নয়। মাদার সুপিরিয়রের মুখটা  
ত' সাদা নয় টকটকে লাল। ভয় করে  
দেখলে। উনি কিন্তু মোটেই বকেন না।  
আর মহয়ারদের ত' উনি পড়ানই না, খালি  
পিয়ানো বাজান আর বলেন, মহয়া খুব  
ভাল পিয়ানো বাজাতে শিখবে। এই  
যাঃ। আর একটা কাজ করতে বলে  
দিয়েছেন যে উনি। কি ভুল হয়ে গ্যাল,  
ইস্ !

তাড়াতাড়ি ঘোলের গ্রাস নামিয়ে  
মহয়া মাকে ডাকল--

মা, মা !

কি রে ?

মহয়ার টিফিনের বাস গাছাতে  
গাছাতে মা বললেন—কি হোল ?

কি সন্ধান শ হয়েছে গেল !

সে কি রে ?

মা অবাক চোখে তাকালেন।

আর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন,  
সন্ধান হয়েছে গেল একদম মৌরাগী !

প্রেরার করতে ভুলে গেলাম যে  
থাবার আগে। মাদার সুপিরিয়র বলে  
দিয়েছেন, সব সময় প্রেরার করবে খেতে  
বসার আগে। জিঙ্গাস ক্রাইস্ট যে রাগ  
করাবন !

বাবা এয়ার হো হো করে ঘর ফাটিয়ে  
হাসলেন, সত্যিই তো! সাংঘাতিক  
সন্ধান হয়েছে গেল মহয়া রাগীর



## স্বর্ণ খেলনা

বাবা হাসলেন, আর মার হাসি হাসি মুখটা কিন্তু কেমন যেন হয়ে গেল; মহয়ার মনে হল মার সাদা রংটা হঠাৎ যেন কেমন কালো দেখালো। বাগানের ফুলগাছের ওপর দুপুরে হঠাৎ বাড়ির ছায়া পড়ে যেমন কালো কালো দেখায় লাল লাল ফুলগুলোকে, তেমনি দেখালো মার মুখটা।

তুমি হাসছো ?

মার গলাটা কেমন অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। আমার কিন্তু হাসি আসছে না। তখনই তোমায় বারণ করেছিলাম মিশনারী স্কুলে মেয়ে দিতে, তুমি তো আমার কোন কথা শুনবে না।

মার গলাটা ধরে এল। বাবা বস্কু ছেড়ে মার কাছে উঠে এলেন, পিঠে হাত রেখে বললেন—আচ্ছা! তুমিই বলো, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে মেয়েদের ভালো স্কুল আর কোথায় আছে, আর ওদের শিক্ষা দেওয়াটা যে ভালো এটা ত' মানবে!

হয়ত ভালো, কিন্তু আমাদের দেশের রীতিনীতি আচার-ব্যবহারকে ত' ওরা শ্রদ্ধা করতে শেখায় না।

তার জন্তে বাড়িতে তুমিই আছ।

বাবা হাত বাড়িয়ে মার গালে একটু হোঁচালেন। মা তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে সরে এলেন, আঃ কি কর!

মহা তাড়াতাড়ি ঘোলের গ্লাসে মুখ নামাল, ও জানে, বুঝতে পেরেছে, এখন যদি ও এখানে না থাকত তা হলে বাবা নিশ্চয়ই মার ঐ ফরসা সাদা গালে চুমো খেতেন। যেমন একদিন খেয়েছিলেন সেই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে। মহা হঠাৎ ছুটে এসেই থমকে দাঁড়িয়েছিল আর মার মুখটা কি লাল হয়ে গিয়েছিল। মা তাড়াতাড়ি কত কথা বলেছিলেন মহয়াকে। ছোট বোনটিকে কোথায় ফেলে এলে। আয়া আছে ত' ওর কাছে। মহয়ার চুলের রিবন কোথায় গেল। এই সব আরও কত কি!

মহা কিন্তু ঠিক বুঝতে পেরেছিল মা লজ্জা পেয়েছেন।

আচ্ছা! চুমু খেলে মা এত লজ্জা পান কেন? বাবা ত' মহয়াকে খেঁচি বোনটি তুলতুলিকে সবসময়ই চুমু খান, কোলে নেন। কই! মহয়ার ত' কখনও লজ্জা কত না, খুব ভাল লাগে। মা যেন কি! মহা যখন মাকে চুমু খায়, মা কিন্তু তখন একটুও লজ্জা পান না। আঃ! কি হচ্ছে বলে সরেও দাঁড়ান না, বরং মহয়াকে কেমন কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর কপালে গালে সারা মুখে চুমো খান আর তখন মহয়ার খুঁট-ব ভাল লাগে, মাকে আরো ভাল-বাসতে ইচ্ছে করে।

মো! হোলো তোমার?

মা এগিয়ে এলেন।

হঁ।

মা এসে আমার হাত থেকে বাগ নিয়ে টিফিনের বাস্কট জে দিলেন ভেতরে। এগারটার সময় কফি ব্রেকে বাড়িতে তৈরি এই ছানার সন্দেশ আর পেপের টুকরো খাবে মহা, আবার খেতে হবে দুপুরে, গিরিধারী ঠিক একটার সময় হাজির হবে সেই বেতের বাস্কেটটা নিয়ে; যারাগ লাগে মহয়ার গিরিধারীটাকে দেখলে। খেলা হয় না কিছু না, খেতে গেলেই সব সময় কেটে যায় টিফিনে। কিন্তু আজ বোধ হয় আর মহয়াকে দুপুরে ঐ সব মাছ, মাংস, ভাত, তরকারী খেতে হবে না, আজ ত' গেয়েই গেল, অল্প দিনের মত ডিম সেক্স আর মাখন রুটি খায় নি ত' আজ সকালে।

কি খেয়েছে আজ? সূজির রুটি! যা খুব সহজে হজম হয়, ইয়া! মা কাল সন্ধ্যাবেলায় বলছিলেন আয়াকে, আচ্ছা হজম কথাটা কি মজার না? হ-জ-ম। আর সেই যে হজমিগুলি পাওয়া যায় স্কুলে। কি ফাইন খেতে, ইস! আবার একটা ভুল হল; ফাইন কথাটা খাওয়ার সঙ্গে ঠিক কি যায়? কি যেন শব্দটা...।

চল খোকী। গিরিধারী এসে হাত ধরল।

আঃ! মহা আবার একেবেকে হাত ছাড়িয়ে নিল।

কি হচ্ছে মো? গিরিধারীকে হাত ধরতে দাও, দুইমুখী করো না।

মা ঠিক দেখতে পেয়েছেন; কি করে যে মা সব দেখতে পান।

জোরে চল খোকী কদম বাড়িও, দেরি হচ্ছে, স্কুল বসে যাবে।

বাস্তায় হাটতে হাটতে বারবার গিরিধারী মহয়াকে তাড়া দিল, আর স্কুলের কাছাকাছি এসে মহা সেই

পেটের মর্সনা কি মারাত্মক তা ভুত-ভোগারাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা তির্যকভাবে মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া  
দ্বারা বিশুদ্ধ  
মতে প্রস্তুত

**বাকলা**  
ডায়ট গড্ডা রোজি: নং ১৬৮৩৪৪

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ  
রোগী আরোগ্য  
লাভ করেছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেংর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বৃকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত দূরত্বই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্যের সাথে সবিনয়ভাবে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বজুড়ে মূল্য: মেক্স৩। ৩৮৪ গ্রাম প্রতি কোটা ৩ টাকা, একট্রেড কোটা ৮'৫০ নং ডায়. মা. ও পাইকারী দর পৃথক

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঙ্গ-৭ (হেড অফিস- বঙ্গালুরু, পূর্ব পাঞ্জাব)

মজাটা করল। গিরিধারীর ধরা হাতস্বন্ধ বোঁ করে ঘুরে গেল পিছন দিকে, হাত খুলে গেল আর ছুট, ছুট, ছুট।

গিরিধারীর চীৎকার শোনা যাচ্ছে, খোকী মৌ-বাবা, পড়িয়ে যাবে, ছুটো না, আস্তে চল, ছুটো না।

কিস্ত মহয়া তো ছুটবেই; কেন আস্তে যাবে; কেন? এখন কেন? এতক্ষণ ধরে যে মহয়াকে জোরে যেতে বলা হচ্ছিল; তার বেলা!

ছুটতে ছুটতেই মহয়া স্কুলের কাছে এসে পড়ল। গিরিধারীকে আর দেখা যাচ্ছে না, দূরে পড়ে আছে গিরিধারীটা; বেশ হয়েছে; মহয়া আর একটু জোরে দৌড় দিল, আর রাস্তার মোড় পেরিয়ে স্কুলের সামনের রাস্তায় আসতেই—এই রে! গিরিধারীটা ঠিক পেছনে এসে গেছে।

খোকী কি হচ্ছে! ছুটো না, মাকে বলিয়ে দেবে।

উত্তরে মহয়া পেছন ফিরে জিভ বার করে ভেংচি কাটল গিরিধারীকে; ছোট্টা থামাল না, গিরিধারীর আগেই এসে পড়ল স্কুলের কাছে; আর গেটে ঢোকবার আগেই কেমন যেন একটু অস্থিরকম মনে হল স্কুলটাকে। স্কুলের বাগানে অনেক লোকের ভিড়, স্কুলের মেয়েরাও তার মধ্যে দু-একজন আছে, এই নতুন লোকেরা, মেয়েরা সব মিলে কেমন একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, যেটা একটুও অজ্ঞানদের মত নয়।

খোকী!

মৌ পেছন ফিরে দেখল, গিরিধারী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে উপস্থিত হয়েছে; গিরিধারী মৌ-এর হাত ধরল।

খোকী? ঘর চল; ইধার গোলমাল লাগছে।

ধ্যাৎ! স্কুল না গেলে মা বকবেন।

মৌ আবার গিরিধারীর হাত ছাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

অনেক লোক, সব বাঙালী। মৌ নিজের মনেই বলল, এতসব ধূতিপরা বাঙালী, কি করছে এরা এখানে? মৌদের স্কুলে কেন এসেছে! এত বাঙালী এক দুর্গাপূজার সময় কালীবাড়িতে দেখেছে মৌ, আর কখনও দেখে নি। ইস কত, কত বাঙালী। হঠাৎ একজন বাঙালী হাত ধরলেন মহয়ার।

খুকুমণি!

মহয়া অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকাল। আমার নাম মহয়া। মহয়া বন্দোপাধ্যায়।

ও তাই নাকি? আচ্ছা শোন মহয়া, আজ স্কুলে যেতে হবে না, বাড়ি ফিরে যাও; আজ ছরতাল।

মহয়া ভাল বরতে পায়ল না কি তিনি

না, তার আগেই তিনি আবার বললেন, যাও মহয়া, আজ চলে যাও।

স্কুলে না গেলে মা বকবেন।

না আজ বকবেন না, বোল—

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে পেল না, কিরকম একটা হৈ-হৈ উঠল গেটের কাছে, আর একটা হিসহিস শব্দ বাগানের এধার থেকে ওধারে ছুটে গেল, পুলিশ, পুলিশ।

ভদ্রলোক আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যাও, খুকু যাও, শীগগির বেরিয়ে যাও, হাত দিয়ে তিনি মহয়াকে ঠেলে দিলেন গিরিধারীর দিকে—

লে যাও খোকী কো।

গিরিধারী মহয়ার হাত ধরে টানল, আও খোকী।

মহয়া পা বাড়াল, আর তখুনি কানে এল সেই পরিচিত কঠিন কণ্ঠস্বর—

মহয়া! কোথায় যাচ্ছ? চলে এসো।

মহয়ার সামনে যেন বাজ পড়ল। মিসেস দে। মহয়ারদের অন্ধ শেখান আর ড্রিল করান। মহয়ার যা ভয় করে মিসেস দে'কে। মহয়ার পা আটকে গেল; গিরিধারীও ভয় পেয়েছে মনে হোল মিসেস দে'কে দেখে।

ফিরে এসো বলছি। ঐ দুই লোকগুলোর কথা শুনো না।

দুই লোক! এমম সুন্দর চেহারা যার, একটু আগেই যিনি খুকুমণি বলে ডেকে মহয়ার হাত ধরেছিলেন তিনি ভালো নয়? মহয়ার বলতে ইচ্ছে করল না উনি দুই নন, খারাপ নন, আমি তাঁর কথাই শুনব, বাড়ি যাব।

কিস্ত মহয়া মুগ্ধ খোলবার আগেই ভদ্রলোক মিসেস দে'র দিকে এগিয়ে গেলেন। আজ স্কুল হতে পারে না যা; জানেন ত' আজ বাংলার প্রিয় সন্তান...

ভদ্রলোকের মুখের কথা শেষ হোল না, মিসেস দে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

বাজে বকবেন না! ট্রেচারের দল! পথ ছাড়ুন!

ভদ্রলোক দু'হাত ছিড়িয়ে দাঁড়ালেন দরজার ওপর, যা আজ বড় দুর্দিন!

তবে রে! গায়ের জোর!

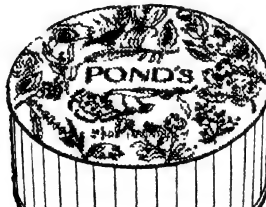
মিসেস দে ভদ্রলোকের হাতের তলা দিয়ে গলে যাবার চেষ্টা করলেন। বিশাল বগু যথেষ্ট ফাঁক পেল না যাবার— আর ভদ্রলোক সেই মুহূর্তে এক আশ্চর্য কাণ্ড করলেন; সটান শুয়ে পড়লেন মাটিতে, দরজা আগলে চৌকাঠের উপর।

তাঁর ধবধবে খন্দরের ধূতি-পাজাবী ধুলোর মাথামাখি, মুখে সেই সঙ্কর গমিনীতি।



## পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডারে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ... মনোরম মুখশ্রী

পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডারে আপনার রং একেবারে অকৃত্রিম দেখাবে—মুখশ্রী হবে আশ্চর্য উজ্জ্বল। এই পাউডার মুখের ওপর আলতোভাবে লেগে থাকে ... কখনও জেবড়ে যায় না বা দাগ পড়ে না; মুখের এতটুকু দোষক্টিও সবদে নিখুঁতভাবে ঢেকে রাখে। পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার হাল্কা ও মিষ্টি—রকমারি রঙের পাবেন। একবার মাখলে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার মুখখানি লাবণ্যে মনোমুগ্ধকর থাকবে।



**পণ্ডস**  
ড্রীমফ্লাওয়ার  
ফেস পাউডার

একমুখ হাসি নিয়ে বিজয়িনীর মত তাঁর হিল-পরা এক পা রেখেছেন ভদ্রলোকের বুকের ওপর, আর এক পা চলে গেলো ভেতরে। ঐ, ঐ পার হয়ে গেলেন মিসেস দে,— স্বচ্ছন্দে ঢুকলেন ভেতরে।

মহয়া স্পষ্ট দেখতে পেল, ভদ্রলোকের সুন্দর হাসিমাখা মুখটা যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল, চোখের কোণে দেখা দিল জলের ফোঁটা, আর সেই মুহূর্তে মহয়ার মনে হল এক ধাক্কা দিয়ে মিসেস দে'কে ফেলে দেয়।

মিসেস দে'র হৃদয় আবার শোনা গেল।

কি হল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলে এস ভেতরে; দেখলে না আমি কেনন করে এলাম!

না!

হঠাৎ প্রবল বেগে চাঁৎকার করে উঠল মহয়া, না।

চোখের জলে সমস্ত অন্ধকার; বুকের মধ্যে কিসের আওয়াজ। মিসেস দে'র উপর যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে, কানড় দিতে পারত মহয়া, কিন্তু কিছু করা গেল না। তাঁর নির্দিয় আচরণের প্রতিবাদে একটি শব্দই বেরলো মহয়ার মুখ থেকে।

না।

আর তারপরেই আবার ছুটতে আরম্ভ করল মহয়া। ছুটতেই ছুটতেই শুনতে পেল অনেক লাঠির আওয়াজ; হৈ, হৈ; ওর বুকের মধ্যে কেনন একটা হতে থাকল।

মা, মা কই? বাবা!

মহয়া প্রাণপণে ছুটতে লাগল, আর ছুটতে ছুটতেই দেখল কম্পাউন্ডের বাইরে গেটের পাশে গভীর সজলমুখে দাঁড়িয়ে মাদার জেরোম; কই উনি ত' তোকে নি মিসেস দে'র মত ওদের বুক পায়ে নাড়িয়ে; মহয়া আবার পেছন ফিরল, স্কুলবাড়ির সব দরজাতেই একজন করে সাদা ধুতি-পরা লোক শুয়ে, আর কত কত পুলিশ; ফটাফট কিসের আওয়াজ, কি গোলমাল, কি হৈ-হৈ, মহয়া ভয়ে দু'হাতে কান চাপা দিয়ে আরো জোরে ছুটল।

আশ্চর্য। মা কিন্তু একটুও বকলেন না মহয়া স্কুল যায় নি শুনে। মহয়াকে কাছে বসিয়ে সব শুনলেন, তারপর আদর করে কপালে চুমো খেলেন আর বললেন, বেশ করেছ স্কুলে না ঢুকে; ওরকম করে কি যেতে আছে।

মিসেস দে কেন গেলেন?

উনি...

কি যেন বলতে গিয়ে মা সামলে নিলেন, শুধু বললেন, তুমি অমন করে মাছবের ওপর দিয়ে হেঁটে যাও নি বলে আমি খুব খুশি হয়েছি মৌ।

মু, ওঁরা কারা মা? ঐ সব বাঙালী? কেন ওঁরা

ওঁরা দেশের-সুসন্তান। মার মুখটা উজ্জল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। দেশকে স্বাধীন করার পণ ওঁদের, ওঁরা...

স্বাধীন কি মা? দেশ কে?

মা কেনন একরকম করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন মহয়ার মুখের দিকে, তারপর হাত বাড়িয়ে মহয়াকে বুকের আরো কাছে টেনে আনলেন, শোন তবে।

মহয়াকে কোলে বসিয়ে মা অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন অনেক কথা; আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ আমরা এদেশে জন্মেছি, কত সুন্দর কত ভাল দেশ আমাদের, সেই দেশে এল বিদেশী রাজা...

শুনতে শুনতে মহয়ার মনে হল এমন আশ্চর্য রূপকথা সে আর শোনে নি। দেশ কে? মহয়ার আবছা আবছা মনে হল গল্পের সেই বন্দিনী রাজকন্যাই যেন এই দেশ, আর সেই রাজকন্যা তো মা-ই; মহয়া কতদিন রাতে শুয়ে শুয়ে স্পষ্ট দেখেছে, মা সেই সাতশ' রাফস-ঘেরা পায়গপুর্নীরে বন্দিনী। মা, রাজকন্যা, দেশ সবই তো একজন, আর সেই একজনকে, সেই সুন্দরী রাজকন্যার কি গভীর দুঃখ, কি নিদারুণ কষ্ট, দুশ' বছর ধরে সে বন্দিনী হয়ে আছে, মা বললেন, তাকে মুক্ত করতে হবে—স্বাধীন হতে হবে, আর তাই নাকি ঐ সব খন্দর-পরা লোকেরা, আজ সকালে ধারা মহয়াদের স্কুলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আর তাঁদের মত আরো অনেকে মুক্ত করছে; কিন্তু মুক্ত যদি, তা হলে তলোয়ার কই? বর্শা কই? মহয়া কথটা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু মার চকচকে চোখ আর ঘামে-ভেজা লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ওর কেনন যেন সাহস হল না। মার এমন মুখ মহয়া কখনও দেখে নি; মহয়া মার সব কথা বুঝল না, কিন্তু একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে; খন্দর-পরা লোকেরা খুব ভাল, সায়েবরা দুটু (মাদার জেরোমও ত' সাহেব!) আর দেশ বলে কি যেন আছে, (সেই ত' মার মত দেখতে বন্দিনী রাজকন্যা) যার ভাষা হাসতে হাসতে মরা যায়।

সেদিনের সন্ধ্যাটাও মহয়া জীবনে ভুলবে না, বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই মাকে ডেকে কি সব বলতে লাগলেন, আর মার মুখটা ক্ষণে ক্ষণে তেমনি লাল হয়ে উঠতে থাকলো, মার সেই সুন্দর বাদামী চোখ যেন জ্বলতে লাগল আর বারবারই মহয়ার কানে এল ছুঁটো শব্দ—দেশ, স্বাধীনতা।

বাবা বললেন, অমরেশবাবুর ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, ওদের সব নাকি জেলে রেখে দেবে।

আচ্ছা! চুরি করলে তবে ত' জেলে যায়,—আয়া বলেছে। সেই যখন মহয়া পেটমোটা লালাজীর বাগানে

## বর্গ খেলনা

খন আয়া বকেছিল—বলেছিল, সালানী নাকি ছয়াকে জেলে দেবেন। সব চোবেরাই নাকি জেলে ায়। তবে! অমরেশবাবুর জেলে সুনীলদা' কি চোর? তিনিও কত ভাল, দেখা হলেই মহয়াকে লজ্জা-টপির দেন, ততদিন মহয়াকে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে পরিচয় এনেছেন। সেই সুনীলদা' চোর?

না স্বদেশী। আয়া বলল; ও লোণ স্বদেশী ছায়, হিসিলিয়ে জেল জানা পড়া।

স্বদেশী হলে জেলে যেতে হবে কেন, মহয়া ঠিক বঝতে পারল না, কিন্তু স্বদেশী আর চোর যে এক নয় এ সম্বন্ধে মহয়ার সন্দেহ নেই; সন্ধ্যাবেলা মাও আবার সেই কথাই বললেন,—এ জেল খাটা নাকি গৌরবের, ভাবি সম্মানের; বলতে বলতে মা কেনন অস্থির হয়ে উঠলেন; কাপড়ের কোণ দিয়ে চোখের জল মুছেলেন বাববার, বললেন মার কোন পিসতুত দাদাও স্বদেশী আর তিনিও অনেকদিন ধরে জেলে আছেন। মার কোন কাপড়ও নাকি জেলে ছিলেন—জেলেই নারী গোছেন, দাদা নাকি বোমা তৈরি করেছিলেন; মারা সন্ধ্যাটা মা কেনন যেন হয়ে থাকলেন। সন্ধ্যাবেলা কত লোক এসে ব্যাডতে, কত চেনা-অচেনা সব লোক; মা ছুটোছুটি করে ঘরের চা-খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, আর আয়াকে ডেকে বললেন মহয়া আর তুলতুলিকে খাইয়ে দিতে।

এরকম কখনও হয় নি; মহয়া অবাক হয়ে গেল; মার যতই কাজ থাকে, যতই ব্যস্ত থাকুন, মহয়ারের খাবার সময় ঠিক কাছে এসে বসেন, তুলতুলিকে খাইয়ে দেন আর মহয়াকে গল্প বলেন; মার মুখের সেই অপকৃপ রূপকথা শুনতে শুনতে কখন যে মহয়ার খাওয়া হয়ে যায় মহয়া বুঝতেও পারে না।

এখনি রোজ হয়। কখনও এর ব্যতিক্রম হয় নি; এমন কি দাদা সেদিন হোস্টেলে চলে গেল দেরাছনে, সেদিনও মা অত তাড়াছড়োর মধ্যেও ঠিকই তুলতুলিকে খাইয়ে দিয়েছেন নিজের হাতে; মহয়াকে খাওয়ান নি যদিও কিন্তু গল্প করেছেন মহয়ার সঙ্গে। সেদিনও মা বাববার আঁচলে চোখের জল মুছছিলেন, মহয়াও সেদিন খুব কেঁদেছিল; দাদা চলে গেল; ট্রেন করে দেরাছনে চলে গেল, সেখানেই থাকবে; থাকে, শোবে, িওখানেই থাকবে রোজ রোজ।

সেও ত' কতদিন হয়ে গেল; দাদার কথা মনে হলে মহয়ার এমন কান্না পায়; দাদা নেই, কার সঙ্গেই বা সকালে ও শিকারে বেরবে। মহয়া দেয়ালে কোলানো এয়ার-গানটার দিকে তাকাল। দাদার এয়ার-গানটা মহয়া কাউকে ছুঁতে দেয় না, লছমনকেও নয়; মহয়া এয়ার-গানটা নিজেরই ঝাড়ে, মোছে; আবার টাঙিয়ে দেয় দেয়ালে; দাদা এলে আবার তোরবেলা বেরবে মহয়া আর মহয়ার দাদা। দাদার কাছে এয়ার-গান আর মহয়ার পিঠে সেই হাটার আকবাগ। ভোরে উঠেই পাখি মারতে বেরোবে ওরা; 'পাখি অবশ্য এখন পর্যন্ত একটাও মারা যায় নি, যা ছুঁ ওরা, দাদা টিপ করতে করতেই ওরা উড়ে পালায়, কিন্তু একদিন একটা মস্তবড় টিকটিক মেরেছিল দাদা। অবশ্য শিকার থেকে ফেরার সময় তাহি বলে খালি ব্যাগ নিয়ে কখনও ফেরে নি মহয়া, কাঁচা পেয়ারা, পাকা কুল আর বুনা কুলে সব সময়ই ব্যাগ বোঝাই থাকত তার।

মো বাবা! খালেও জলদি; কেনা চুপসে ব্যাঙ গিয়া।

খাচ্ছি ত'! পালায় মহয়ার গলা বুজে এল; মা কাছে না থাকলে কখনও খাওয়া যায়? তুলতুলিটা কিন্তু বেশ পাচ্ছে আবার হাত থেকে। হঠাৎ মহয়ার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল বারে পড়ল। মহয়া হাত গুটিয়ে বসল। আর ঠিক সেই সময়ই মা ঘরে ঢুকলেন।



# আর্গিকল

গোবিন্দ হওয়ার ঔষধ

আর্গিক, ডুমুরাজ, পাইলোকারণাশ  
প্রভৃতি ভেষজ সহযোগে প্রস্তুত। ইহা  
অকালপক্কতা ও পতন নিবারক এবং  
কেশবর্ধক ও মস্তিষ্ক শীতলকারক

মহেশ লেবোরেটরিস

প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা-১১

এজেন্টস

এম. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৭৩, মেডানী স্ট্রাভ রোড, কলিকাতা-১

ফোন : ২২-২৫৩৬



মৌ! কি হল মা! কীদছ কেন?  
মৌ হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে ছ'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে  
য়ল।

মা—আ—

মাকে জড়িয়ে ধরে মৌ-এর কান্না আর থামতেই চায় না।  
কি রে, কি হোল কি?

মা বারবার জিজ্ঞেস করলেন, আর মৌ মার বুকে মাথা  
রাখে ফুঁপিয়ে চলল।

কেন কীদছে মৌ তার কি জবাব দেবে, কেন কান্না পাচ্ছে  
মৌ নিজেই কি জানে, হঠাৎ কেন ছুঁতে ভাব উঠল  
ওর মন; মনে পড়ল সকালবেলায় সেই খন্দর-পরা সুন্দর  
হুদুলেকের মুখটা কেনন কালো হয়ে গিয়েছিল মিসেস দে  
খন উঁচু ছিল দিয়ে তাঁকে মাড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন;  
নে পড়ল মা আজ মহয়ার খাওয়া দেখছেন না ওর সামনে  
সে, সেই সঙ্গে মার শূন্য চেয়ারটা দেখে বুকের মধ্যে হঠাৎ  
কমন করে উঠল—আর অমনি কোথা থেকে চোখে এসে  
গল জল।

চল, শুবি চল; খুব সুন্দর গল্প বলব আজ একটা।

মা হাত দিয়ে মহয়ার কান্নাভেজা মুখটা বুকের ওপর  
সপে ধরলেন। এতক্ষণে মহয়া শান্ত হোল, আর মার  
কে মাথা রেখে মহয়ার মনে পড়ল, সেই সুন্দরী রাজকন্যাকে,  
'শো বছর ধরে বন্দী হয়ে আছেন যিনি।

চং-চং করে সিঁড়ির বড় ঘড়িতে চারটে বাজল;  
ঘুমড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল মহয়া।

ইস! এর মধ্যেই চারটে বেজে গেল, এই ত' মোটে শুল  
লে বিছানায়, এরই মধ্যে হয়ে গেল ছ' ঘণ্টা!

বাবাঃ! বিছানা থেকে নেমে চটির মধ্যে পা গলাতে  
লাতে ভাবল মহয়া।

কবে যে পরীক্ষাটা শেষ হবে, ঘুমিয়ে বাঁচব একটু।

কোনো মানে হয় ঘুমিভাসিটির এরকম শীতের পরে  
রীক্ষা নেবার।

পাশের চেয়ার থেকে ছাঙ্কা কান্দারী কোঁটটা নিয়ে  
য়ে দিয়ে মহয়া দরজা খুলে বেরিয়ে এল; পূব আকাশে  
খনও শুকতারটা দপদপ করছে, একটু পরেই ভোরের  
রয় আলোয় ছেয়ে যাবে সমস্ত আকাশ, পাখিরা ডাকাডাকি  
করবে, ঠিক সেই সময় মহয়া লজিকের নোট ছেড়ে আর  
কবার বেরিয়ে আসবে বাবান্দায়, চোখ ভরে দেখে নেবে  
বার আকাশ আর গা পেতে দেবে ঠাণ্ডা শিরশিরে  
ওষায়।

আপাতত লজিকের নোটে মন দেওয়া যাক, ঘণ্টা  
তেনের মত।

টেবিলের চেয়ার এখনও খালি; দাদা এখনও পড়তে  
বসে নি, ডাকবে নাকি দাদাকে? না থাক! আহা বেচারী,  
ঘুমোক একটু; মহয়ার মত ও ত' শুতে যায় নি রাত দশটার  
সময়, দাদা রাত জেগে পড়ে, ভোরে উঠবে কি করে। মহয়া  
চেয়ারে হেলে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিল; তারপর  
দুলে দুলে পড়তে লাগল—

পারফেক্ট ফিগার—বারবার ভেরিয়াই, সেলারেট  
ফেরিও...মৌ!

বাবা মহয়ার কাঁধে হাত দিলেন।

কি বাবা? বাবা! তুমি এত ভোরে উঠেছ কেন?

তোরা উঠেছিল আর আমি পারি না! নে এটা  
খেয়ে নে।

হাতেধরা কমলালেবুর রসের মাসটা বাবা এগিয়ে  
দিলেন।

কেন বাবা, তুমি আবার ভোরে উঠে কষ্ট করতে  
গেলে?

না রে, কষ্ট আবার কি? নে খেয়ে নে।

বাবার হাত থেকে কমলালেবুর রসের মাসটা নিয়ে  
মহয়ার মন বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায়  
ভরে গেল। বেচারী বাবা! এত কোমল মন বাবার,  
যেয়েদের মত। বাবা বিছানা থেকে কদল টেনে মহয়ার  
পায়ের ওপর বিছিয়ে দিলেন, আরাম করে বোস, ঠাণ্ডা  
লাগাস না।

না বাবা, কোথায় ঠাণ্ডা? তুমি দিন দিন বড়ো হচ্ছে  
বলে...

তাই না কি?

বাবা মহয়ার মাথায় আস্তে আস্তে একটু হাত ছোঁয়ালেন।

আর তোমার দাদাভাই গেলেন কোথায়? তাঁরও তো  
একজামিন; না কি?

দাদা অনেক রাত অবধি পড়ে কি না বাবা, তাই একটু  
দেরিতে ওঠে।

মহয়া তাড়াতাড়ি দাদার পক্ষ নিল।

হঁ, রইল ওর লেবুর রস এইখানে—দিয়ে দিস। বাবা  
বাবান্দার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন; নাঃ,  
দাদাটার এবার ওঠা উচিত, আর সত্যি দাদা বেন স্তম  
সিরিয়াস নয় পরীক্ষার ব্যাপারে। এই তো কালই  
লারাদিন বালিগঞ্জের মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলল,  
পরীক্ষা এসে গেছে এখন কি এভাবে সময় নষ্ট করা ভাল?  
অবশ্য বি এস সি পরীক্ষার দেরি আছে এখনও; কিন্তু  
তা হলেও; কলম কামড়ে ভাল মহয়া, দাদাটা বড় ফাঁকি  
দেয়, একটুও পড়াশোনা করে না, আর ও তো এই রকমই  
চিরকাল। ই্যা সেই ছোটবেলা থেকেই। সেই যখন ওয়া



স্বর্গ খেলনা

ছিল না বলে দাদাকে বাড়িতে পড়াতেন ছুঁজম টিচার, তাঁরা কিন্তু প্রায়ই নালিশ জানাতেন বাবাকে—

সকল বড় ফাঁকিবাজ; বড় দুই; কিছুতে পড়ায় মম দেয় না।

তারপরেই বাবা হঠাৎ দাদাকে পাঠিয়ে দিলেম দেয়াতুন; মার খুব ইচ্ছে ছিল না, বাবা একরকম জোর করেই দাদাকে নিজের গিয়ে রেখে এসেছিলেন দেয়াতুন স্কুলে; আর দাদার যাবার দিন মহয়া যা কেঁদেছিল; দাদা চলে যাবার অনেক অনেক দিন পর পর্যন্ত মহয়া রোজ কাঁদত দাদার জন্তে। পেয়ারা বাগানে নালী যখন কাঁচা পেয়ারা তুলে দিত মহয়ার হাতে, আর একগাল হেসে বলত—আচ্ছা আমরুদ, খোকী, খা লে।

তখন সেই টগটগে সবুজ কাঁচা পেয়ারার দিকে চেয়ে দাদার জন্যে মহয়ার চোখে জল আসত; আর বিকেলে যখন টেনিস লনে বাবার বন্ধুরা এসে টেনিস খেলতেন, আর মহয়া গিয়ে দাঁড়াত বড় গাছটার তলায় তখন দাদার জন্যে মহয়ার বুকের মধ্যে কি যে একরকম হতে থাকত, সে কষ্ট মহয়া আজও ভোলে নি।

আর তারপর সেই স্বদেশী আন্দোলন, কয়েকটা দিন, প্রায় একবছর, তাদের বাড়িতে সেই সব স্বদেশ-পরা লোকজনের আসা-যাওয়া, মার থেকে থেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠা, আর সন্ধ্যাবেলায় মার কাছে বসে, মার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাওয়া—‘বল বল বল হবে’ আর নয়ত ‘দেশ দেশ নন্দিত করি,’ ‘বন্ধ আমার জননী আমার,’ ‘ধন ধাতো পুষ্পে ভরা,’ এসব গানই মহয়া কতবার মার সঙ্গে গেয়েছে, মার কাছ থেকেই বাংলা গান শেখার ওর হাতেখড়ি।

সেই একটা বছরে মহয়া অনেক কিছু শুনেছে, বুঝেছে, শিখেছে। আর আজ মনে হয় সেই একটা বছরেই মহয়া যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। মনে আছে মীরাটে শেষের

দিকে যা কি রকম অস্থির হয়ে উঠেছিলেন দেশে, মানে বাংলা দেশে চলে আসবার জন্তে—

প্রায়ই বাবাকে বলতেন—

কবে ট্রান্সফার হবে!

সে কি আমার হাত?

তুমি ভাল করে চেষ্টা করছ না—

বাবা হাসতেন।

এখানে কিছু খাপ খাপ আছ রাণী।

মার নাম ধরে বড় একটা বাবাকে ডাকতে শোনে নি মহয়া, কিন্তু কখনও কখনও, যখন বাবা রাতে বড় শেজ বাঁতিটা জেলে আরামকেন্দারায় শুয়ে কাগজ পড়তেন, আর মা কাঁধে সোফাটার বসে মহয়ার জামার লেস বুন্ডেন কি কাপেটে পশম দিয়ে কুটিয়ে তুলতেন প্রকাণ্ড বাঘ কি পেখন তোলা ময়ূর, তখন বাবা এক একদিন হঠাৎ মার ডাকনাম ধরে কথা বলতেন।

এখানে কিছু খাপ খাপ আছ রাণী?

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো যে সব হিন্দুস্থানী হয়ে গেল।

ও দু’দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। ছুঁমাস একটানা বাংলা দেশে থাকলেই দেখবে আবার ওরাই হিন্দী বেমানাম ভুলে যাবে।

মা তখনকার মত চুপ করতেন, আবার কয়েকদিন বাবে বলতেন একই কথা।

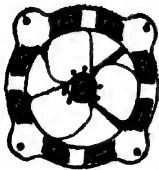
কি হোল তোমার ট্রান্সফারের?

বাবা হাসতেন, আর জোরে জোরে চুকে টাম দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিতেন মার মুখের ওপর।

আঃ কি য়ে ছেলোমুখী কর; বুদ্ধি আর ভোমার হল না।

মা-র গা-ব-রে-ই-সে-হাই-এ-র-বাক্স নিয়ে পাশের ঘরে উঠে যেতেন। একদিন বাবা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছিলেন

মূল্যবান আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশে আপনার ভিউয়



মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিলো পর্বত  
কোন বাড়িতে খরচ নেই  
মার্কনী ইলেকট্রিক কর্পো  
(প্রাঃ) লি:

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

সবিশার বাজীত প্রভাষ সর্কাল ১০টা  
হাইতে রাজি চটা পর্যন্ত বোলা থাকে



মার আঁচলটা, আর মহুয়া খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। মা কি রেগে গিয়েছিলেন বাবার ওপর; বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমাচ্ছে?

মা রাগ করলেও মহুয়ার সেদিন মনে হয়েছিল মা যেন সত্যি রাগ করেননি। যেন রাগ-রাগ খেলা করছিলেন মহুয়াদের সামনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহুয়াদের কলকাতায় আসা হোল। সেই যে মহুয়াদের নতুন ভাইটি হয়েই দু'মাস পরে মারা গেল আর মা দিনরাত কাঁদতে লাগলেন, সেই সময়ই একদিন বাবা এসে বললেন—হয়ে গেল, কলকাতায় ট্রান্সফার হয়ে গেল—

খুশিতে মার মুখটা যেন দপ করে জলে উঠেছিল। সত্যি।

সেদিন অনেকদিন পরে মাকে হাসতে দেখেছিল মহুয়া। আর সারা সন্ধ্যা সেদিন মাকে গুনগুন করতে শুনেছিল।

অত খুশি হয়েছিলেন কলকাতা আসবেন বলে, তবু আসার দিন কি কাল্লাটাই কাঁদলেন মা। মহুয়ার কিন্তু খুব মজা লেগেছিল। নতুন জায়গায় যাব, দাদাও ত' সঙ্গে যাবে। মা বলেছেন আর দাদা দেহাছুনে হোস্টেলে থাকবে না, কলকাতায় শেট জোভিয়াস' স্কুল আছে সেখানে পড়বে। সবাই আবার ওরা একসঙ্গেই থাকবে, কি মজা।

এই মৌ! এর নাম পড়া!

সন্ধ্যা এসে কখন মৌ-এর পাশে দাঁড়িয়েছে। কার ধ্যান করা হচ্ছিল শুনি! চোখের সামনে বই খুলে রেখে।

ভাগ, ধ্যান আবার কার করব। মনে মনে মুখস্থ বলছিলাম।

আমি জানি না, কোনটা তোর ধ্যান আর কোনটা মুখস্থ বলা!

সন্ধ্যা মহুয়ার সামনের টেবিলে বসল।

এই মৌ কি দিন-রাত্তির গাধার মত পড়িস মুখ বুজে।

কি যে বলিস! একমাস বাদে ফাইজাল আমার।

তোর সেই ভোরের আলো দেখার কি হল? ক'দিন থেকে দেখছি, তোর চিরদিনের মনিংগ্লাসও বন্ধ হয়ে গেছে ব্যাপার কি?

ব্যাপার আবার কি, সন্ধ্যা নেই, আবার সব হবে মার্চ থেকে; এখন ওঠ তো, পড়তে দে আমার।

মর তুই গাধার মত মুখস্থ করে; যেমন গাধার মত

এই দাদা! তোর লেবুর রস!

বাবাঃ! আয়াটা এত ভোরে উঠতে আরম্ভ করেছে—

আয়া কোথায়? বাবা!

সত্যি! গশ!

সন্ধ্যা টাউন্সিপের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

এই দাদা! তুই সিগারেট খাচ্ছিল?

হঁ স্নোক করছি, করি, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

দাদা! মা শুনলে মরে যাবে।

শুনবে কেন? তুই বলে দিবি?

বলাই উচিত! তাতে যদি তোর শিক্ষা হয়।

দেখ মৌ!

সন্ধ্যা আবার এসে টেবিলে বসল পা খুলিয়ে।

তোর কিম্বদন্তি হবে না।

তার মানে?

তুই শুধু ঐ মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশই করবি। আর কিছু হবে না তোর দ্বারা।

পাশাপাশি সেই আমার একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং তাতে ব্যাধাত না খট্টিয়ে দয়া করে উঠে পড় ত'!

মহুয়া দাদাকে ঈশং ঠালা দিল। ফেল করে মরবি তুই বলে দিলাম।

সন্ধ্যা উঠে পড়ল, শিশু দিতে দিতে চলে গেল নিজের টেবিলে, আর মহুয়ার মনটা হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল; সত্যিই কি শুধু পরীক্ষা পাশই তার একমাত্র লক্ষ্য! তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সবই কি চরম পরিণতি—পরম সার্থকতা পাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার?

মহুয়া টেবিলের সামনে টাঙানো রবীন্দ্রনাথের বড় ছবিটার দিকে তাকাল।

না, অনেক বড় লক্ষ্য, অনেক উঁচু আশা, স্নানর স্বপ্ন—সব তাকে সত্য করতে হবে, সফল করতে হবে চিরদিনের বাসনা, সেই নিত্যন্ত শিশুকাল থেকে মীরার টের বাগানে পাতাকাঁপা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট মহুয়া কত যে স্বপ্ন দেখেছে; কত আশা, কত কল্পনা...

মৌ, মৌ বাবা! আয়া হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে এল।

জলদি আ যাও, মাইজি কা তবিরৎ বহৎ খারাব হায়!

সে কি! মহুয়া চীৎকার করে উঠল;

দাদা!

কি রে?

মার শরীর...

মহুয়া কথাটা শেষ করতে পারল না, চটির মধ্যে পা গলাতেও সময় পেল না। ছুটে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে

## খর্গ খেলনা

আর মুখটা অসম্ভব সাদা। বাবা মাথায় হাঁওয়া করছেন আর পাশে রাখা পেয়লা থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন চোখে-মুখে।

কি হয়েছে বাবা?

কান্নাজেজা গলায় মহয়া বলে উঠল; অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মা! মা!

মহয়া মার বকের ওপর হুঁকে ডাকল—মা।

মৌ একটা চামচ আর ব্রাণ্ডির শিশিটা।

মৌ উঠল। পেছন ফিরে দেখল দাদা নেই। আশ্চর্য! এমন সময় গেল কোথায়। দাদাটা যেন কি! তুলতুলিরও দাদার চেয়ে বেশি কাণ্ডজ্ঞান আছে।

বাবা চামচ দিয়ে মার দাঁত ফাঁক করে ব্রাণ্ডি ঢেলে দিলেন। একফোঁটা, দু'ফোঁটা, তিনফোঁটা। আঃ! বলে মা চোখ খুললেন, আর এই সময়ই দাদা ঘরে ঢুকল এক ভক্তিরূপে সজ্জা নিয়ে।

ও, দাদা তা হলে ভক্তির আনতেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। ছি, ছি, একটু আগেই মহয়া কি ভুলই না ভেবেছিল দাদাকে।

মা চোখ খুললেন। ভক্তির মাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, তারপর গভীর হয়ে বললেন, মাঝখানে থাকতে হবে, রক্ত নেই একদম, আর পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

একরাশ ওয়ুধ-ইনজেকশানের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন ভক্তির। মহয়া আর সজ্জা মার ছুঁপাশে বসল, বাবা বিছানার পাশে রাখা মোড়োটা বসে মার একটা হাত টেনে নিলেন—নিজের হাতে।

রাণী! এবার একটু যত্ন নাও নিজের প্রতি।

কান্না পাণ্ডুর মুখে মা সুন্দর করে হাসলেন, কেন ব্যস্ত হচ্ছে বল ত? আমি ঠিক আছি।

না, তুমি ঠিক নেই।

ওরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

মা! তুমি একদম আর বিছানা থেকে উঠতে পারবে না; যা করবার আমরা করব, তাতে সংসারের যা হয় হবে, আমি দেখব সব।

মা মহয়ার দিকে ফিরে আবার হাসলেন, ওরে মৌ! হোর যে পরীক্ষা।

দেব না পরীক্ষা! তোমার চেয়ে কি আমার পরীক্ষা বড়?

মহয়ার গলা বজে এল কান্নায়।

বাবা আবার কথা বললেন, না না, কাউকে কিছু করতে হবে না, আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দেখ না।

হৌ হৌ করে হেসে উঠল সবাই। ব্যবস্থা করবেন হীবেজনাথ! মার চশমা, চুরুটের বাসটি পর্যন্ত রাখারাগীকে হাতে তুলে দিতে হয়।

হীবেজনাথ অপ্রস্তুত হলেন। আহা, আমি কি আর নিজের হাতে কিছু করব, একজন ভদ্রমহিলাকে আনাচ্ছি।

আমাদের অফিসের যতীনবাব বলছিলেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের ছাত্র আদ্যমী কোন ভদ্রবাড়িতে কাজ করতে চান, মানে রায়ের কাজ করতে চান আর কি।

বাড়ি না হলে তোমার চলবে! মার ক্রান্তিস্বর শোনা গেল।

বাড়ি থাক না।

তবে।

তিনি করবেন সংসার দেখাশোনা, মানে এই বেশব নিয়ে তুমি সকাল থেকে পেটে বর।

তিনি আর দেবেন, আর আমি করব কি।

আপাতত বিশ্বাস। আবার সজ্জা আর হীবেজনাথ একই সঙ্গে বলে উঠলেন।

যা হয় করো।

রাখারাগী ক্রান্তিতে চোখ বুজলেন।

[ ক্রমশ।

*Super craftsmanship*  
in  
**JEWELLERY**

**ROY COUSIN & CO.**  
JEWELLERS & WATCHMAKERS  
4, DALHOUSIE SQ. EAST. CAL. - I



## সমুদ্রের বিভীষিকা—হাঙ্গর

রাণী মজুমদার

ডুগবান জেলের কথা হয় তো অনেকের মনে আছে। কয়েক বছর আগে সে পরপর দু'দিন কি তিনদিনে কলকাতার গঙ্গা থেকে কয়েকটা হাঙ্গর ধরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় হাঙ্গর শুনলেই আমরা চমকে উঠি! লোকের ধারণা হাঙ্গর থাকে সাগরে। কিন্তু *Carcharias Gangliticus* নামে একজাতের হাঙ্গর গঙ্গা নদীতেও দেখা যায়। গঙ্গায় কানাইদেব হাঙ্গরের আক্রমণে আহত বা নিহত হবার সংবাদও শোনা গেছে।

মিষ্টি কথায় লোক তুষ্ট হয়—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা হাঙ্গরদের নানারকম মন-ভোলানো নামে অভিহিত করতো। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের বাসিন্দারা তো এদের কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য এদেরকে পূজা করতো। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়—বাগে পেলে এরা কাউকে রেহাই দেয় না।

বিজ্ঞানীদের ভাষায়—হাঙ্গরও একজাতের মাছ আর এদের জাতও অনেকরকমের প্রায় দুইশ পঞ্চাশ থেকে তিনশ পঁচিশ। এর মধ্যে মাত্র কয়েক জাতের হাঙ্গরই হচ্ছে সাংঘাতিক মাছ—থেকো। সাদা হাঙ্গর, বাঘ হাঙ্গর, বালি হাঙ্গর, হাতুড়িমাথা হাঙ্গর, গ্রেনাস হাঙ্গর, ম্যাকো হাঙ্গর এবং ম্যাকারেল হাঙ্গর সাংঘাতিক মাছ—থেকো। এ ছাড়াও অবশ্য আরও কয়েক জাতের মাছ—থেকো হাঙ্গর আছে।

প্রাচীনকালের দিক থেকে হাঙ্গরও কম যায় না। বিজ্ঞানীদের ধারণা দশকোটি বছর আগে হাঙ্গর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত আকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়া এদের অত্ৰ কোন পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নি।

বিভিন্ন জাতের হাঙ্গরের দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন রকম। তবে সবচেয়ে বড় জাতের হাঙ্গররা লম্বায় সাধারণত চল্লিশ থেকে বাই ফুট পর্যন্ত হয়। বেশির ভাগ হাঙ্গরই ছোট জাতের।

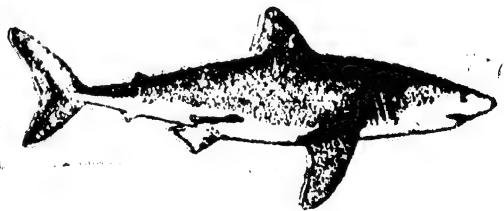
শুনতে অদ্ভুত লাগে যে—প্রাচীনকালের যেসব হাঙ্গরের দ্বীবাশ্রয় পাওয়া গেছে—তা লম্বায় ছিল একশ ফুট। আর তাদের চোয়াল এতই বড় ছিল যে, ছ'জন মানুষ অনায়াসে তাদের মুখের ভিতর চোয়ালের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো। এ থেকেই বুঝতে পারছেন সে-যুগের হাঙ্গরদের কি ভীষণ দানবাকৃতির চেহারা ছিল।

হাঙ্গরদের আমরা যত হিংস্র বলে মনে করি আসলে কি এরা তত হিংস্র? এই সম্বন্ধে কোন কোন হাঙ্গর বিশেষজ্ঞের

মত হচ্ছে—অধিকাংশ জাতের হাঙ্গরই খুব নিরীহ এবং ভীত প্রকৃতির। খুব ক্ষুধার্ত না হলে বা বেকায়দায় না পড়লে এরা মানুষকে পারতপক্ষে আক্রমণ করে না। আবার সংখ্যায় অল্প হলেও কোন কোন জাতের হাঙ্গরদের মেজাজ সর্বদাই উগ্র এবং স্বভাবও ভীষণ হিংস্র। কারণে-অকারণে স্বেচ্ছায় পেলেই মানুষকে আক্রমণ করতে বিদ্যুৎ হস্ত প্রয়োগ করে না। হাঙ্গরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের হাঙ্গর হলো—তিমি হাঙ্গর, রোদ-পোহানো হাঙ্গর এবং ঘুমন্ত হাঙ্গর। এদের মেজাজও খুব ঠাণ্ডা।

মাছ—থেকো সাদা হাঙ্গর ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। এদের দেহ সুগঠিত। দ্রুত সাঁতার কাটতেও এরা ওস্তাদ। মেজাজও এদের ভীষণ কড়া। আর নর-মাংসের প্রতি লোভও খুব। সময় সময় ভেলা, নৌকা প্রভৃতি আক্রমণ করতে পিছপা হয় না। এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ অকালে প্রাণ হারিয়েছে।

মাছ—থেকো ম্যাকো হাঙ্গরদের কবলে পড়েও অনেকে মারা গেছে। এরা অনেক জোরে লাফাতে পারে। সেজন্যে এদেরকে হাঙ্গরদের মধ্যে লম্বাবীর আখ্যা দেওয়া যায়।

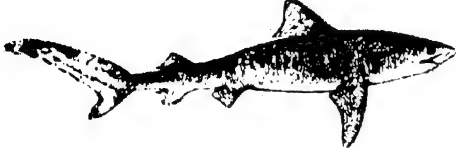


সাদা হাঙ্গর বা হোয়াইট শার্ক

অস্ট্রেলিয়ার মুন্ডা-সন্ধানী ডুবরীদের কাছে বাঘ-হাঙ্গর ভীষণ আতঙ্কের কারণ। পশ্চিম ভারতীয় বাপপুঞ্জে এদের অত্যাচার বড় কম নয়। এরা কলের মধ্যে বাপট মেরে থাকে। স্বেচ্ছায় পেলেই মানুষ বা অন্য কোন শিকারকে আক্রমণ করে অগভীর জলাংশে টেনে নিয়ে গিয়ে উদরসাৎ করে। এরা সর্বদা—সে সময়ের মধ্যে

## ছোটদের আলস

লেমন-শার্ক বা লেবু-হাঙ্গর সমুদ্রোপকূলে ৩৭ পোতে থাকে শিকারের আশায়। অবশ্য এরা সত্যি মানুষকে আক্রমণ করে কি না সে সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। তবে ১৯১৯ সাল এবং ১৯৩৩ সালে দক্ষিণ-ক্যারোলিনা সমুদ্রোপকূলে স্নান করবার সময় অনেকে লেমন-শার্কের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

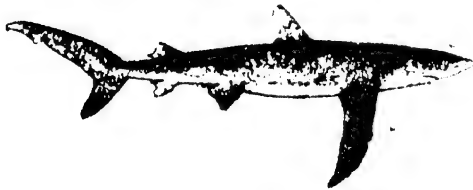


বাঘ হাঙ্গর বা টাইগার শার্ক

নীল-হাঙ্গর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমুদ্র-যাত্রীদের মধ্যে দারুণ বিতর্কিতকার সৃষ্টি করেছিল। সে সময় জীবন-ভরিতে ভাসমান বহু অসহায় যাত্রী নীল-হাঙ্গরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। হাঙ্গর কর্তৃক পাইকাবাহারে মানুষ হত্যার ইতিহাসে সম্ভবত 'নোভা কোসিয়া' ভূমধ্যসাগরের কাহিনী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং করুণ। এরকম ব্যাপকভাবে হাঙ্গর কর্তৃক মানুষ হত্যার কাহিনী এর আগে আর শোনা যায় নি।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রণতরী 'নোভা কোসিয়া' দক্ষিণ-আফ্রিকার কিছুদূরে রাত্রিতে শত্রুপক্ষের টর্পেডো দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। ফলে ১০০০-এরও বেশি ব্যক্তি প্রাণ হারায় হাঙ্গরের আক্রমণে। পরের দিন সকালবেলা দেখা গেল—লাইফ-বোটের বাঁধা বহু পা-হীন মৃতদেহ সমুদ্রের বকে ভাসছে।

শাও-শার্ক বা বাজি-হাঙ্গরও মানুষ খায়। এদের সেহাঙ্কতি বেশ বড়। সুযোগ পেলেই এরা মানুষকে আক্রমণ করতে ভেড়ে যায়।



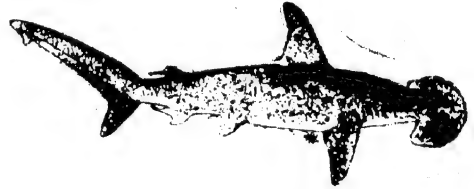
ম্যাকো হাঙ্গর

হামার হেডেডশার্ক বা হাতুড়ী মাথা হাঙ্গর সুযোগ পেলেই মানুষ আক্রমণ করবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। হাতুড়ী মাথা হাঙ্গরের মাথাটা দেখায় ঠিক হাতুড়ী বা নৌকার হালের মত। এরা দক্ষ সাঁতারু। সমুদ্রের তীরের

জলের উষ্ণতা হাঙ্গরের আক্রমণাত্মক স্বভাবের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে কি না—এই বিষয়ে গবেষণা করে হাঙ্গর-বিশেষজ্ঞগণ বয়েকটি বিশেষত্ব দেখতে পেয়েছেন। গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলেই হাঙ্গরের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। বিম্বরেখার ৩০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণস্থিত সমুদ্রেই আক্রমণের কথা সবচেয়ে বেশি শোনা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত হাঙ্গর-বিশেষজ্ঞ ভি এম কোপলসনের মতে—জলের উষ্ণতা যখন ৭০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও বেশি থাকে—তখনই হাঙ্গর বেশি আক্রমণ করে থাকে। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। দেখা গেছে—জলের উষ্ণতা ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তারও কম থাকলে—হাঙ্গর আক্রমণ করে।

হাঙ্গর সামুদ্রিক প্রাণী হলো—অনেক সময় এরা উজান স্রোতে ভেসে নদীতে চলে আসে। অ্যান্জল, আফ্রিকার সেনেগ্যাল ও জাম্বোজ, এশিয়ার গঙ্গা, ইউরোপীয় ও টাইগ্রিস, মালয় ও শ্রাম দেশের নদী বোনিওর উত্তর সারিওয়াক এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট ও ফিংসরয়



হাতুড়ীমাথা হাঙ্গর বা হামার হেডেড শার্ক

প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের নদীতে হাঙ্গর থাকে। এ ছাড়া প্যারিস উপসাগর থেকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত আইওয়া জ শহরের নিকট করুণ নদীতেও ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ২৭ জন হাঙ্গরের কবলে পড়েছিল।

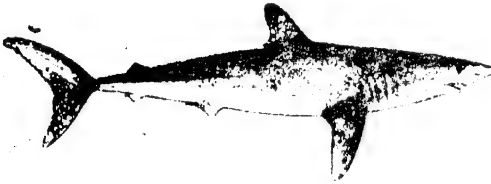
সমুদ্রে বা নদীতে হাটু-জলে দাঁড়ানো অবস্থায় মানুষ সাধারণত হাঙ্গর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হচ্ছে পায়ের গোড়ালী ও পা। কিন্তু এদের সঙ্গে পান্টা ধস্তাধস্তি করলে—এরা মানুষের হাত এবং শরীরের অন্যান্য অংশেও আক্রমণ করে। হাঙ্গরের কামড়াবার সময় নাকি কোন জালা-যক্ষণ টের পাওয়া যায় না। চুপি চুপি এসে কাজ হাসিল করে চলে যায়।

হাঙ্গরের কামড়ে মানুষের শরীরের ধমনী ছিঁড়ে যায় এবং তীরে পৌঁছবার আগেই প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। আর এজতাই এদের আক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ প্রচুর রক্তপাত ও 'শক'-এর ফলে মারা যায়। জেরা যে

টের পাওয়া খুবই কঠিন। মাছ-খেকো হাঙ্গরের সঙ্গে মাছ-খেকো বাঘের খুব মিতালী। একবার যদি এরা সমুদ্রের কোন অংশে মাছ শিকার করে—তবে সেখানে সহজে এরা ছেড়ে যেতে চায় না। বছরের পর বছর সেখানেই ঘোরাঘুরি করে শিকারের আশায়।

পেটের চিন্তাতেই এদের সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। খাওয়ার কোন বিরাম নেই। যখন যা পায়—তখনই তা পেটের মত উদরসাৎ করে। তবে রাত্রিতেই নোদ হয় এদের উদরের জালা প্রবল হয়। শিকারের সম্মানে তখন তাঁদের কাছাকাছি বিচরণ করে।

দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তির তুলনায় হাঙ্গরের জ্ঞানশক্তি খুব প্রখর। শিকারী কুকুরের মত এরা জলের মধ্যে সামান্য গন্ধ শুঁকেও নির্দিষ্ট বস্তুর কাছে ঠিক যেতে পারে। হাঙ্গরের কানদের চিহ্ন পরিষ্কারভাবে বোকা যায়। ক্ষতস্থানে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত দাগ দেখা যায়। ক্ষত গভীর হলে সেখানেও দাঁতের দাগ থাকে। অনেক সময় ক্ষতের মধ্যে দাঁতের তাক্সা টুকরাও পাওয়া গেছে।



নীল-হাঙ্গর বা ব্লুশার্ক

নোকা, দাঁড়, ভেলা ইত্যাদি যা মানুষের পক্ষে তাই হাঙ্গর ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ করে—কোন বাছ-বিচার নেই। প্রতিপক্ষের আক্রমণে হাঙ্গরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হলেও সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে—শক্তি থাকা পর্যন্ত সমানে আক্রমণ চালাতে থাকে।

শুধু যে এরা দাঁতের সাহায্যেই শিকারকে ধায়েল করে তা নয়—হাঙ্গরের গায়ের খসখসে চামড়াও শিকারকে কব্জ করতে সাহায্য করে। যখন এরা শিকারকে টেনে নিয়ে যায় তখন খসখসে চামড়ার দ্বারা শিকারের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। ডুবরীরা সমুদ্রের তলদেশে হাঙ্গরের আক্রমণের আশঙ্কায় সর্বদাই সতর্ক থাকে। তৎসত্ত্বেও অনেক ডুবরী এদের মারাত্মক আক্রমণে শোচনীয়ভাবে আহত বা নিহত হয়েছে।

সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—আমাদের শোনা আছে সাপ নাকি তার অনিষ্টকারীকে অত্যাচারের মধ্য থেকে ঠিক খুঁজে বের করে এবং তাকে দংশন করে প্রাতিশোধ গ্রহণ

ভিড়ের মধ্য থেকে বের করতে পারে। এই বিষয়ে হাঙ্গরের নাকি কোন ভুল হয় না।

হাঙ্গর মাছয়ের নানা কাজে আসে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে হাঙ্গরের মাংস মাছয়ের খাত্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাঙ্গরের শুকনো মাংস কুকুরের খাত্ত হিসাবে বিক্রি হয়। হাঙ্গরের শিরদাঁড়ায় ছড়ি তৈরি হয়। এদের যকৎ থেকে তৈরি হয় শিরীষ এবং পাখনা থেকে প্রস্তুত হয় এক প্রকার মূল্যবান তেল।

## মহাভারতের গল্প

### মূলতা কর

(তা) মরা নিশ্চয় সবাই মহাভারত পড়েছে। মহাবীর ভীমসেনের গল্প কেই বা না জান।

ভীমসেনের মত শরীরের শক্তি কারো ছিল না, সেকথাও জান। ভীমসেন নিজের জানতেন তাঁর তুল্য শরীরের শক্তি ত্রিভুবনে কারো নেই। দেবতা, মাছ, যক্ষ, রক্ষ কেউ তাঁর সঙ্গে পদাঙ্কে পারবে না। আর এই কথা ভাল করে জানতেন বলেই মনে মনে খুব অহঙ্কার ছিল। এখন আমাদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে লেখা আছে দর্পহারী মধুসূদন। অর্থাৎ অহঙ্কার বেশি বাড়লেই ত্রিভুবন অহঙ্কার চূর্ণ করবেন। ভীমসেন সব সময় সবার কাছে নিজের শক্তির অহঙ্কার করেন। অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে সবাইকে তাচ্ছিল্য করেন, এ সব কথাই ত্রিভুবন জানতেন আর মনে মনে ভাবতেন ভীমসেনের এই শরীরের শক্তির অহঙ্কার ঠিক সময় এলেই চূর্ণ করতে হবে। ঠিক করে দর্পহারী মধুসূদন ভীমসেনের দর্প চূর্ণ করলেন তাই নিয়ে মহাভারতে একটি মজার গল্প আছে। সেই গল্পটি শোন—

তোমরা জান যে দুর্যোধনের সভায় বসে কূটবুদ্ধি শকুনির সঙ্গে পণ রেখে পাশা খেলে যুদ্ধিগিরি যথাসর্বস্ব হারালেন। সমস্ত রাজ্য হারালেন। শেষে পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদীকে বনবাস আর অজ্ঞাতবাস করতে হল। রাজবেশ ছেড়ে সামান্য বস্ত্র পরে দীনদুঃখী বনবাসীদের মত দুর্গম বনে বনে তাঁরা ঘুরতে লাগলেন। এমন এক সময় কিছুদিন তাঁরা বদরিকাশ্রমে এক ঋষির অতি স্নানর আশ্রমে আতিথ্য নির্যেছিলেন। সেখানে থাকবার সময় একদিন ভোরে দ্রৌপদী একা একটি নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটি সহস্রদল পদ্ম কে জানে কোথা থেকে ভেসে এল। হাজার হাজার ক্রোশ সেই পদ্মের স্পর্শে ভয়ে উঠল। পদ্মটি হাতে করে নিয়ে তার গন্ধ শুঁকে দ্রৌপদী বিহ্বল হয়ে গেলেন। জীবনে এমন ফুল তিনি দেখেন নি।

সিক  
বসুমতী  
ন / '৭১

সুনাথ  
সঙ্গর্ভনে  
পণ্ডিতজী

মানা চৌধুরী



মাসিক  
বহুমতী  
আধুনিক / '৭১

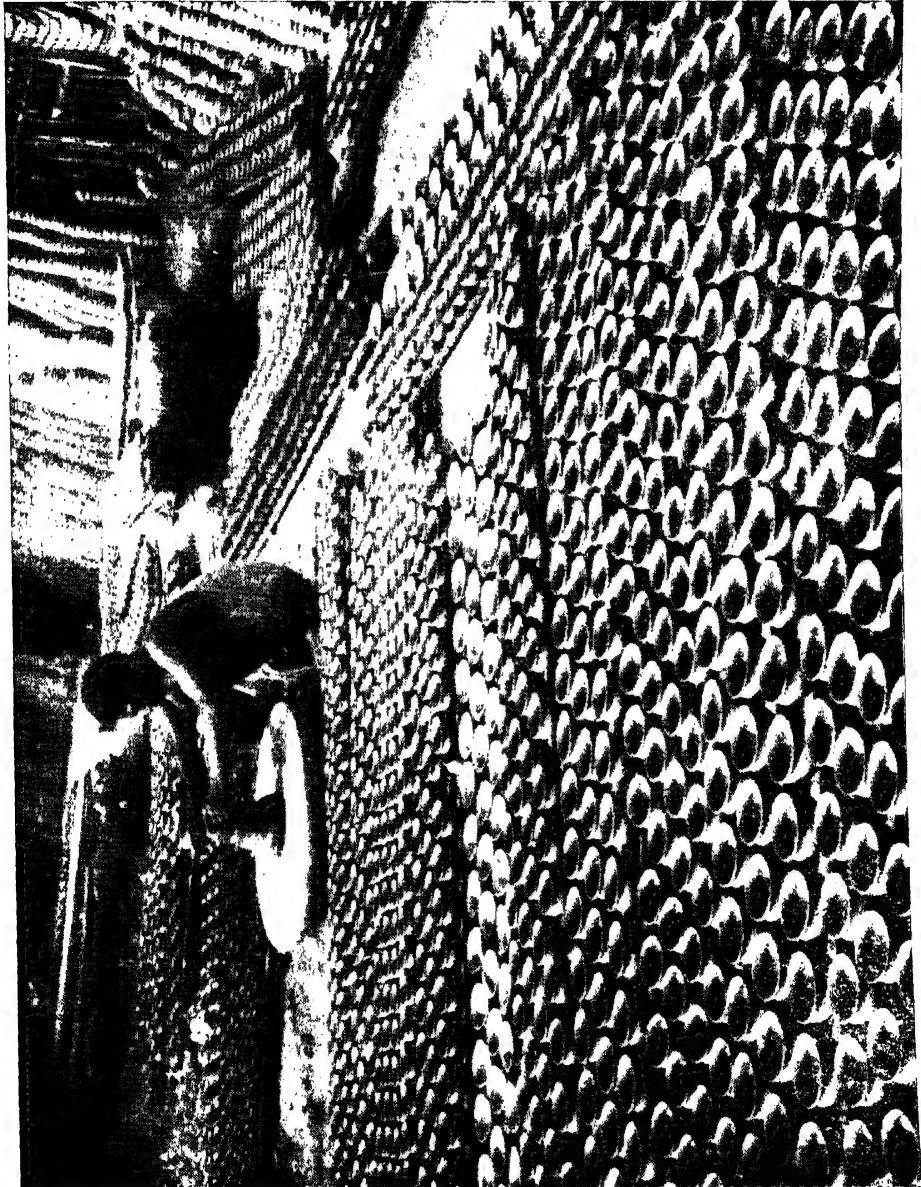
নিখন পঠন  
—অনিষ্টকায় আইতি





মাসিক  
বহুমতী  
আশ্বিন / '৭১

কৃষ্ণকার  
—ইশান দত্ত



## ছোটদের আগর

কতক্ষণ বাদে যক্ষণা একটু কমল, তখন ভীমসেন স্থির হয়ে উঠে বসলেন। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন—প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী দেবতা। আমার শরীরের শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ করবার জন্যই বাদরের রূপ নিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন শরীরের শক্তির অহঙ্কার করবার মত দম্ভ আর আমার নেই। এখন দয়া করে বলুন আপনি কে ?

ভীমসেনের স্তুতি শুনে সেই বাদর অতি অপূর্ণ, কাস্তিমান বীর হুম্মান মূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন—ভীমসেন, সত্যই আমি বড়ো বাদর নই। আমি কে বলছি। আমি হলাম শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত বীর হুম্মান। সীতা দেবীর বরে অমর। সেজন্যই আমি এতদিন বেচে রয়েছি। আমি তোমার বড় ভাই। এই কলার বনে এসে কি ভীষণ বিপদে তুমি পড়েছিলে, তা তুমি নিজেই জান না। ভাগ্যক্রমে আমি এখানে এসে বিশ্রাম করছিলাম। তা না হলে তোমার গোণ বাঁচত না, তোমার জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল। শোন তবে খলিতোমার বিপদের কথা।

এই কলাবনের সীমানা পেরোলেই মর্ত্যের সীমানা পার হয়ে স্বর্গে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিধির বিধানে কোন মানুষ তার নরদেহ নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবে না। যে মুহূর্তে তুমি কলাবনের সীমানা পার হতে সেই মুহূর্তে তোমার মৃত্যু হত। সেই মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচলাম। আমি তোমার বড় ভাই, এত আমার কর্তব্য। আর আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছ। দ্রৌপদীর জন্ম সহস্রদলপদ্ম নিতে এসেছ। কিন্তু ওই পদ্ম ত' এই পথে পাবে না। এই পথ ছেড়ে ওই যে দক্ষিণ দিকে পথ দেখা যাচ্ছে সেই পথে তুমি যাও। একটু গেলেই যক্ষরাজ কুবেরের রাজপ্রাসাদ। তাঁর রাজপ্রাসাদের সামনের এক সরোবরে রাশি রাশি সহস্রদল পদ্ম ফুটে আছে। কুবেরের যক্ষ, রক্ষ প্রহরীরা ওই সরোবর পাহারা দিচ্ছে। সহস্রদল পদ্ম কাকেও তারা বিনা যুদ্ধে নিতে দেয় না। কিন্তু আমি তোমার পরিচয় যক্ষরাজ কুবেরকে দিয়েছি। তিনি তোমার মত মহামান্য অতিথিকে পেয়ে ধস্তা হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন তুমি যত ইচ্ছা সহস্রদলপদ্ম নাও; রক্ষীরা তোমাকে বাধা দেবে না।

বীর হুম্মানের কথা শুনে ভীমসেন মাটিতে লুটিয়ে আবার তাঁকে প্রণাম করলেন। বললেন—মহাবীর! আপনি আমার বড় ভাইয়ের উপযুক্ত কর্তব্য পালন করেছেন। ছোট ভায়ের জীবন রক্ষা করেছেন। সহস্রদলপদ্ম জোগাড় করে দিয়েছেন আর সরোবর থেকে ভাল কাজ করেছেন,

বীর হুম্মান হাসতে হাসতে বললেন—ভাই, তুমি কখনও অহঙ্কার করো না। কি শক্তির অহঙ্কার, কি বিজ্ঞার অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, সব অহঙ্কারই পাপ। প্রভু শ্রীরামের রূপা হলে তবেই মানুষ ক্ষমতা পায়। সব সময় এই কথা মনে রেখ। অহঙ্কার ছেড়ে বিনয়ী হয়ো।

এইভাবে মহাবীর ভীমসেনের একদিন শরীরের শক্তির দর্পচূর্ণ হয়েছিল।

মহাভারতে এই মজার গল্পটি লেখা আছে।

## বাদল এলো

### শুভ্রা গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ পথে ছাওয়ার রথে,  
বাদল এলো বর্ষপরে,  
কমল কুমুদ চেউয়ের তালে  
লুকিয়ে হাসে হর্ষভরে  
মেঘের কঁাকে কিরণরাশি,  
তরুর শিরে ফোঁটায় হাসি,  
চাতক শিশুর আনন্দস্বর  
মর্ম সবার স্পর্শ করে ॥  
কৃষক ধুর টোঁটের কোণে  
চাপা হাসির লহর খেলে  
বিলের বুকে সঁাতার কাঁটে  
পাড়ার যত দুই ছেলে।  
বিজলী ছটায় স্বরূপ ঢেকে,  
ফিরছে দেয়া দমকু হৈকে,  
দেবের আশীষ পন্নীবুকে  
বারনা ধারায় দিচ্ছে ঢেলে ॥  
মেঘ বাদলের উৎসবে আজ  
বিশ্ব নিখিল আত্মহারা,  
আনন্দেরই জোয়ার ছোটে  
বাধন টুটে পাগলপারা।  
শিরহাড়ের মনের মাঝে,  
বীণার স্তরে বেদন বাজে  
উষ্ণ ভুবন লীতল করে  
কালো মেঘের নয়নধারা ॥

## কবি জয়দেব

### শ্রীনিরঞ্জন সেন

মধুর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেবের নাম তোমরা সবাই জান।—কেমন ?

## ছোটদের আসর

গ্রামটি। ভক্তকবির পুণ্যস্থিতি বিজড়িত-মহাতীর্থ স্থান।  
কবির পবিত্র সজ্জার উপলব্ধির উৎস এই পল্লী-নিকেতন।

কণ্ঠিত আছে,—বঙ্গদেশের মহারাজা আদিশূর পুর  
কামনায় এক যজ্ঞ করেন তাই তিনি (আদিশূর) কালকুজ  
থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনেন। কবির পিতা ভোজদেব  
মুখোপাধ্যায় ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের একজন।

শোন এবার,—

ছোটবেলায় জয়দেব খুব আপনতোলা ছিলেন।  
হরিনাম করতে করতে গ্রামের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতেন।  
সমগ্র সজাই যেন কবির সার্থকতার কাছে যেতে চাইত—  
ধর্মময় তাঁর পথ। তাঁর ধর্মীয় সজ্জার প্রকাশ—নবরূপে,—  
নবভাবে,—নবভাষিতে—তাই গ্রামবাসীরা অনেকেই  
পাগল ভাবতো।

আসলে সবই ভগবানের লীলা তখনকার সেই কিশোর  
ভক্তের মাধ্যমে।

জয়দেব তখন বেশির ভাগ সময়ে 'কদমখণ্ডীর' ঘাটে  
ধ্যান করতেন বলে জানা গেছে। ঐ ঘাটের কাছে এক  
শিবমন্দির আছে। শিবের নাম 'কৃষ্ণেশ্বরশিব'।  
'কদমখণ্ডীর' ঘাট মহা পবিত্র তীর্থস্থান—। হাজার  
হাজার পুণ্যার্থী নরনারী মকর সংক্রান্তিতে (বা উত্তরায়ন—  
সংক্রান্তি) 'কদমখণ্ডীর' ঘাটে স্নান করেন।

ভক্ত জয়দেব রাধামাধবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন  
অজয়ের বক্ষ থেকে তুলে এনে—অবশ্য এ আদেশ ভক্ত  
জয়দেবকে দেন স্বপ্নে জগন্নাথ দেব, ঐসঙ্গে আরও আদেশ  
দেন পদ্মাবতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে।

ভক্তকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' লিখে চলেছেন—  
লিখতে লিখতে—

‘ময়গরল খণ্ডনাং, মন শিরাস মণ্ডলং’...

এই পর্যন্ত লিখে আর পারছেন না লিখতে ভাবসাগরে  
সাঁতার দিয়েও। শেষে তিনি স্নান করতে বেরিয়ে পড়েন।

সেই সুযোগে শ্রীহরি ভক্তকবি জয়দেবের বেশ ধারণ  
করে এসে সহস্রে লিখে দেন অসামান্য কলিটি...

...‘দেহ পদপল্লব মুদারম্’।—

—তারপরে 'রাধামাধবের' পূজা করেন এবং পদ্মাবতীর  
(কবিপত্নী) হাতের রান্না ভাত-তরকারী ইত্যাদি খেয়ে  
চলে আসেন...

তারপরে সেই থালাতে পদ্মাস্ত্রীও খেতে বসে  
খেয়ে চলেছেন এমন সময়ে অতুলস্বামীকে দেখে লজ্জাকণ  
মুখখানি তুলে বিশ্বব্যবাকুল পতিব্রতা নারী স্বামীকে  
সব ঘটনাই বলে গেলেন

তা হলে তোমরা বুঝে দেখ ভক্তের প্রতি ভগবানের মহিমা।  
লক্ষণ সেন তাঁর পঞ্চরত্ন সজ্জার শ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করেন  
কবি জয়দেবকে। তিনি প্রমাণ করে দেন তখনকার

শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবই! কবির কণ্ঠ ছিল অশ্রুত স্নমধুর।  
তাঁর সুরেলা মধুরা বর্ণের জন্তু তাঁকে বলা হতো  
বাংলার কোকিল।

ছুটি ঘটনা শোনা যায়—এক ছুটি ঘটনা তা তোমাদের  
বলাই শোন। তবে কি জান—অনেকে বিশ্বাস করেন,  
আবার অনেকে বিশ্বাস করেন না। তবু তোমরা ছুটি  
ঘটনাই জেনে রাখ। কেমন।

কবি রোজ আসারো ক্রোশ পথ পেরিয়ে পদ্মায় স্নান  
করতে যেতেন। কবির বয়স যখন বেশ বাড়ল তখন আর  
গঙ্গায় স্নান করতে যেতে পারতেন না, তখন তাঁর ছুগের  
অস্থি ছিল না। তখন গঙ্গাদেবী ভক্ত জয়দেবকে স্বপ্ন  
দেন আমি অজয় দিয়ে মিশব।

ভক্তের আকুলতায় ভগবান মাড়া দেন—এ তো  
তোমরা জান।

না কি বল?

ঐ তো গেল একটি ঘটনা—আর একটি ঘটনাও শোন,—  
কবি জয়দেবের মা বামা দেবীও নারী গঙ্গায় স্নান  
করতেন। তিনি ছিলেন পুণ্যবতী নারী। পদ্মার  
পুণ্য মিলিলে স্নান না করলে সবই তাঁর বৃথা যত্ন হতো!  
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বামা দেবীরও পদ্মাস্নান বন্ধ হলো!

তাই মাহুভক্ত জয়দেব পদ্মার ধারা অজয়ে এনে গেলেন  
ছিলেন।

বর্তমানে জয়দেবের মন্দিরে যে রাধাবিনোদের মূর্তি  
আছে তা জয়দেব প্রতিষ্ঠিত নয় বলে পাণ্ডিত্যপণ্ডিত প্রকাশ  
করেছেন। তাঁরা বলেছেন,—বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি শ্যাম-  
কপাল গড় থেকে আনা। যি সঙ্গে তাঁর আরও বলেছেন,—

বর্তমান মন্দিরটিও 'মতী'র নয়। বর্তমান মন্দিরটি  
বর্তমানের মহাপার্বী টেনরাগ দেবী দৈতীর কবান আধ্যাত্মিক  
১৬৯২ খৃষ্টাব্দে।

ভক্ত জয়দেব প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মূর্তির নাক হলো  
তাই বলাই শোন, পণ্ডিতগণ যা বলেছেন।—

কবি জয়দেবও পদ্মাবতী ছুগের শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র  
শ্রীবৃন্দাবনে আসবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু রাধামাধবের গুজ  
আসতে গুরা পারেন নি—তা ছাড়া রাধামাধবকে ছেড়ে  
থাকতেও পারবেন না।

তাই রাধামাধব স্বপ্নে 'গুদের বলেন—আমি  
শালগ্রামশিলা হয়ে যাব তোমাদের সঙ্গে!

তারপরে জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে শালগ্রামশিলা  
হয়ে কেন্দুবিল্ব ভাগ্য করেছিলেন জয়দেব প্রতিষ্ঠিত  
রাধামাধব...

ওপরে ঘটনাটিও না কি কিংবদন্তী—এও জেনেছি  
নানান আপোনি পড়ে।

কবি জয়দেব আজ আর নেই। আছে তাঁর পবিত্র

শ্রুতি নিয়ে মহা তীর্থস্থান হয়ে কেন্দ্রবিশ্ব। আছে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর গীতগোবিন্দ!

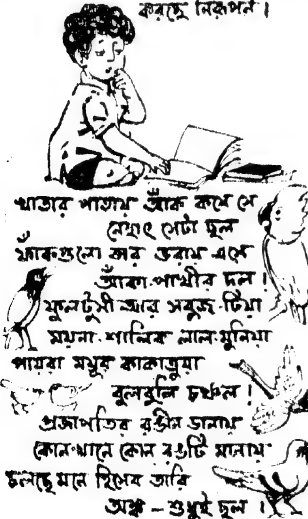
গীতগোবিন্দ এখন অনেক ভাষাতেই অনূদিত।

তোমরা বড় হয়ে কেন্দ্রবিশ্ব যেও। প্রতি বছর মকর-সংক্রান্তিতে (উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি) মেলা বসে—

মন্তবড় মেলা। বহুদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী আসেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাঁরা স্নান করেন কদমখণ্ডীর ঘাটে! তোমরাও ঐ সময় যাবার চেষ্টা করবে এবং কদমখণ্ডীর ঘাটের পুণ্য সলিল স্নান করবে! তন্ত্র কবি জয়দেবের পবিত্র লীলা-নিকेतন ও তাঁর মহা সৃষ্টির স্পর্শে তোমাদের তীর্থ-পরিক্রমা সাংঘর্ষিক হয়ে উঠবে নিশ্চয়!



চোখ বজায়ে বইএর পাতায়—  
গাছের পাতায় ছর  
চুইটি খুলে আরছে বাবিন  
ছুইটি সারাখর।  
সুন্দর পাতা এ যে পাতা  
পাতায় সব হৃদয়মাঝে  
নালচে পাতা কালচে পাতা  
নতুন-পুস্তক  
হৃদয়ে আর হালকা নীল  
কাজখানি মিশিয়ে দিনে  
কটি পাতার বড় ফেনে জা  
করছে নিরুপন।



খাতার পাতায় আরু কমে যে  
মেঘে মেঘে ছিল  
খাকপুস্তক আর ডরাম-এক  
আকাশ-পাখীর দল।  
ফুলটুঙ্গী আর সবুজ টিয়া  
ময়না-শাবরিক নান-মুনিয়া  
পায়রা ময়ূর কাকাতুয়া  
বুলবুলি চফফ!  
প্রজাপতির বস্ত্রের ডানায়  
কোমলান কোম বৃষ্টি মনোম  
চলছে মনে হিমের তারি  
অঙ্ক—সুখই ছল

## এগিয়ে যাও

(একটি উড়িয়া রূপকথা)

ছবি বসু

এক গ্রামে এক গরীব কাঠুরে বাস করত। সে সারাদিন বনে কাঠ কাটত আর সন্ধ্যার সময় সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই তাকে বনে যেতে হ'ত কাঠ কাটবার জন্য। বেচারাকে এজন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হ'ত। প্রচণ্ড শীতে তার শরীরে কাঁপুনি ধরত। প্রথর রোদে নাথার চাঁদ ফেটে যাবার মত হ'ত আবার সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে সাঁদ-কাঁশিতে ভুগত। যা সামান্য উপার্জন করত তাতে তার সংসার চলত না। ছু'বেলা ছু'মুঠো ভাতও সে পেটপূরে খেতে পেত না। খাটতে খাটতে সে বড় কাঁহিল হয়ে পড়ল। শরীরে হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছুই রইল না।

একদিন কাঠুরে তার কুড়ুলখানা কাঁধে নিয়ে বনের দিকে চলেছে। পথে দেখা হল এক সম্রাসীর সঙ্গে। কাঠুরে তাঁকে প্রণাম করল।

তার অবস্থা দেখে সম্রাসীর মনে দয়া হ'ল। তিনি তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

কাঠুরে ভাবল, সম্রাসী কেন আমাকে আরও এগিয়ে যেতে বললেন? আচ্ছা, ওঁর কথামত এগিয়ে গিয়ে দেখ কি হয়।

এই ভেবে সে গভীর বনের মধ্যে ঢুক পড়ল। সেখানে ছিল এক বিশাল চন্দন বন। মনের আনন্দে কাঠুরে চন্দন কাঠ কেটে বাজারে এনে বিক্রি করল। সাধারণ কাঠ অপেক্ষা চন্দন কাঠের দাম বেশি। তাই সেদিন সে অনেক টাকা উপার্জন করল, এর পর সে প্রত্যেকদিন বাজারে চন্দন কাঠ বিক্রি করতে লাগল। ফলে তার সংসারে আর অভাব রইল না।

একদিন চন্দন বনে গিয়ে বেঁচে সে কাঠ কাটতে যাচ্ছে এমনি তার মনে পড়ে গেল সম্রাসীর কথা—বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

সে কাঠ না কেটে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় দেখল এক প্রকাণ্ড তাহার খনি। কাঠুরের আনন্দ তো আর ধরে না। কোমরে বাঁধা চাদরটায় যত পারল তাহা বেঁধে এনে বাজারে বিক্রি করল এবার আরও বেশি টাকা হোজগার হ'ল।

এমনিভাবে কিছুদিন গেল। হঠাৎ একদিন আবার তার সম্রাসীর কথা মনে পড়ল। বনের ভেতর সে আরও

## ছোটদের আসর

রূপার খনি। কাঠুরের মন খুশিতে ভরে গেল, বাজারে রূপা বিক্রি করে সে অনেক টাকা উপার্জন করল।

এইভাবে কিছুদিন শাবার পর আবার সন্ধ্যাসীর কথা তার মনে পড়ল—বাবা, আরও এগিয়ে যাও।

সে বনের মধ্যে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল। সামনে পড়ল এক সোনার খনি। বরফেই তো পাঁচছ সোনা বিক্রি করে সে মস্ত বড়লোক হয়ে গেল। সে দেশে তার মত ধনী আর কেউ ছিল না। কাঠুরে ভাল, আমার তো আর অভাব নেই। এখন বনে না গেলেও চলে।

কিন্তু সন্ধ্যাসীর কথা তার মনে পড়ে গেল। তাই সে প্রত্যেকদিন বনের মধ্যে কিছুদূর এগিয়ে যায় আর একে একে তার সামনে পড়ে হীরা, মৌলা, মণি-মাণিক্যের খনি। শেষে সে এমন ধনশালী হ'ল যে সকলে তাকে হিংসা করতে লাগল।

## পরিসংখ্যানের আলোকে সোভিয়েট নারী

জনসংখ্যার সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মোট নারীসংখ্যা ১২ কোটি ১৬ লক্ষ। সাম্প্রতিক লোক-গণনার তথ্যাদি হইতে জানা যায়—রাশিয়ার সুপ্রিয় সোভিয়েটে ৩৯০ জন নারী ডেপুটি আছেন। অর্থাৎ সুপ্রিয় সোভিয়েটের মোট ডেপুটির শতকরা তিরিশ জন মহিলা। এই স্বত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে রুশি পার্লামেন্টে মোট মহিলা-সদস্যের সংখ্যা ৩১, যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে ১৭ এবং ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে ও সেনেটে ১৩। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিভাগীয় দপ্তর, কমিটি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে অন্যান্য ৬৯,৬০০ মহিলা কর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিতা আছেন। বিভিন্ন ইনস্টিটিউট, গবেষণাগার, কল-কারখানা, থিয়েটার ও সিনেমা হাউস ও বিক্রয়কেন্দ্রের ডিরেক্টর পদে এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারের চেয়ারম্যানের পদে অধিকারের অধিক মহিলা রহিয়াছেন। প্রায় ২২০ জন মহিলা ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক আসনে আছেন। সেখানে দশ হাজার মহিলা আইনজীবী, যোজ্ঞার ও জজ রহিয়াছেন। জাতীয় অর্থনীতিতে রাশিয়ার মেয়েরা কার্যকরী অংশগ্রহণ করিতেছেন। দশ লক্ষাধিক নারী কৃষি-বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন সেখানে, নারী পশু-বিশেষজ্ঞ ও পশু-সাজেন রহিয়াছেন ৬৯,৬০০ জন। উদ্ভিদবিদ রহিয়াছেন ৬৭,৭০০ জন। শুধুমাত্র সোভিয়েট রসায়নশিল্পে ২২৬,৬০০ জন মহিলাকর্মী আছেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রেই মেয়েদের স্থান সর্বাগ্রগণ্য।

## উল্টো রাজার দেশ

### গৌর মোদক

কালকে আমি গিয়েছিলাম উল্টো রাজার দেশে, তেরো মদীর ঘাট পেরিয়ে, সাত সমুদ্রের শেষে। গৌর গণেশ রাজা সেখায় মন্ত্রী হাদারাম, রাজা যোগায় প্রজাদের খাজনা অবিরাম। জিমিসপত্তর বেচে সেখায় পয়সা দিয়ে লোকে, ওষুধ কভু খায় না তারা পাছে রোগে ভোগে। হাটতে গেলে টিকিট লাগে কাশতে গেলে ট্যাক্স, দিনের বেলায় জালায় লোকে হাজার পেট্টোম্যাক্স। সারা বছর সেখায় বক থাকে অফিস আদালত, পুলিশকে চোর খুঁজে বেড়ায় চোরেরা সবাই মগ। চুরি করলে হয় না সাজা, সাধুরা যায় জেলে, স্থলে যায় না ছেলেরা সেখায় বেড়ায় কেবল খেলে। গণ্ডগোলে প্রথম হলে, মেলে দামী পুরস্কার, করলে পড়া ছেলেরা সব কেবল খায় মার। উল্টো দেশে উল্টো ব্যাপার চলছে দিনরাত, দেখতে পায়ে ডুমিও ভাই মুলে আঁখিপাত।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট আছেন ৩৬ লক্ষ ৭ হাজার মহিলা। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদ্যমী, অধ্যাপিকা, এম এল সি ও বিজ্ঞানে ডক্টর মহিলার সংখ্যা ৩১,০০০। মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ—১০ লক্ষ ৪২,০০০ তরুণী বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় মহিলা ডাক্তারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিশ্বের অভূতপূর্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ৪৪৮,০০০ জন মহিলা চিবিৎসক আছেন সেখানে, মোট ডাক্তারদের ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ২৫,৬০০ জন লেখিকা, মহিলা-সাংবাদিক, প্রেস ও রেডিও-কর্মী আছেন। মহিলা-শিল্পী ও মহিলা-স্থপতি আছেন ১৫,৬০০ জন। পরিসংখ্যান অনুসারে সোভিয়েট মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স ২২ বৎসর হইতে ২৪ বৎসর। মেয়েরা কেহই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবার পূর্বে বিবাহের কথা ভাবে না। যুক্তোত্তর রাশিয়ায় ১৬,৭১৫,০০০টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে ৬৯,০০০ জন রাশিয়ান মেয়ে দশটি সন্তানের জননী। সন্তান গড়িয়া তুলিবার জ্ঞান তাঁহার রাষ্ট্রীয় সাহায্য পান। সাধারণত রাশিয়ার মেয়েরা একটি বা দুটি সন্তানের জননী। তিনটি সন্তানও অল্পই দেখা যায়। রাশিয়ার পরিবারের সাধারণ আকার বর্তমানে শহরে ৩.৫ জন ও মফস্বলে ৩.৯ জন। রাশিয়ান মেয়েদের সাধারণ আয় ৭০-৭৫ বৎসর। ১৬,২৭৬ জন মহিলা আছেন বিবাহের বয়স ১০০-১০৪ বৎসর।



নতুন খরখুলার  
**স্নাতলাইটে**

**আরও ঝলমলে কাচা হয় !**

নতুন করখুলার স্নাতলাইট — কী চমৎকার নতুন মোড়ক, কী স্বন্দর নতুন গড়ন ! আর সেইসঙ্গে আরও ঝলমলে করে কাচার কী আশ্চর্য্য নতুন শক্তি ! প্রতি ধোপ কাচবার পরে দেখবেন আপনার কাপড়জামা আরও ধবধবে, আরও ঝলমলে হয়ে উঠছে !

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী

U. 32-140 BO

# জহতী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নমিতা চক্রবর্তী

না, না। লিলি কষ্ট পাচ্ছে কেন? তপতী কি কষ্ট পেতো? উন্টা ব্যাপারটা হলে? পেতো না? চমকে গেল তপতী। বুক ফেটে যেত তার, পড়া হোত না, কিছু না। কিন্তু লিলি কি ভাবকে ভালবাসে? ভালবাসে তার মত? ভাবের কি লিলির কাছেও দিনের আলো আর রাতের আকাশ হয়ে গিয়েছে? মুছে যাবে সব আলো, ঘুচে যাবে আকাশের সীমান্তিনীতা! তবে? তা হলে কি হবে? ভয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল তপতী।

—‘মীরা! জহাদি’কে কি বলেছে প্রবীর?’

—‘কে জানে। নিদি বলল—মীরা, ছুটির আপ্রিকেশন কর। বন্ধুর বিরে যে ভাবের সঙ্গে তাতে সন্দেহ নেই। সব জায়গায় তপতীর বডি-গার্ড ভাবের মিত্র।’

প্রবীর কিছু বলে নি। হয়তো সে জানেই না লিলির মনের কোন খবর। ভাল তপতী।

—‘লিলি কি করছে বে?’

—‘ও মা! জানিস না তুই? লিলি বোস? মস্ত একটা সাংস্কৃতিক কাজ খববেছে। আট একজিভিশন। টোট বাকালো মীরা।’

—‘বা! ওরকম করছিস বেন? আট একজিভিশন তো ভাল।’

—‘হবে। তবে কি জানিস ওদের বড়লোকদেরই মানায়। ফুল, ছবি, পাখি, টাকা, বাড়ি, গাড়ি—সেখছিস কেমন মিল খেস হচ্ছে?’

তপতী দুঃখিত হল একটু। মীরার সর্বদা এক কথা। কিছু বলবার আগেই ভয় পেতে হয়—বুঝি একুণি গরীব আর টাকার কথা উঠে পড়বে।

বেশিক্ষণ মন খারাপ করার সময় পেল না তপতী। মীরার উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাতের শেষবলার আকাশ খোলা জানালার পাখে হাতছানি দিল তাকে। ‘বাপা! দু’কটা তারা, আলোর ভয়ে আকাশের নীলে গা ডুবিয়ে চোরে তাচ্ছে একঘালি চাঁদ। কখন ভালোবাসল তপতী ভাবেরকে? আর ভাবের?

ফলের দোকানও কি কম ঝঁঝানাকি? তাজা তরতর আপেল—লালে ফেটে পড়ছে গাল, আভ্যের টসটেসে রূপ! কিনবে? দূর। শু বুঝি খেতে ভাল! তা ছাড়া কি হবে কিনে—ওদের সঙ্গচ্যুত হবে? একসঙ্গে আছে বলেই না এত বাহার। সুতরাং ডালমুটী মুখে পুরতে পুরতে, দেশভ্রমণ সারছিল তিন মেয়ে মার্কেট ঘুরে।

—‘তপতী মীরা! মরেছি।’ জহতীর আত্মনাদে চমকে উঠল কাশীর-গালিচার কাককাব দশনে ময় দুই সখী।

—‘কি হল?’ কথাটা ভাল করে উচ্চারণ করার আগেই বোনের হাত ধরে পাশের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ল জহা। হতভম্ব তপতী দেখল—সামনে দাঁড়িয়ে লিলি। লিলিকে দেখে ভয় কেন? প্রবীর ওর দাদা তাই? তাই, লিলিকে ভয় পায় জহাদি! আচ্ছা! মেয়ে জহতী! লিলি ওকে খেয়ে ফেলবে নাকি? বেশ ভাল, মিষ্টক মেয়ে লিলি। ভদ্রানক হাসি পেল তপতীর। মুখে কি বড় বড় কথা! যেন বাঁগির রাগি কল্লোবাই জম্মেছে বাংলা দেশে ফুল করে। এদিকে হবু ননদিনীকে দেখে পালাবার তাড়া দেখ!

—‘কি কিনলে তপতী?’ লিলি জিজ্ঞাস করল।

—‘ডালমুটী।’

—‘ডালমুটী কিনতে এতদূর? আর কিছু কেনো। সন্মর এই জেনটা, কি বল?’

—‘ভারি সন্মর।’

—‘বেশ। আমিই তোমার প্রজেক্ট করলাম এটা।’

—‘উপলক্ষ?’

—‘বানিয়ে নাও একটা। ধরে নাও আজ আমার জন্মদিন।’

—‘জন্মদিনে তো উপহার পাবে। দেবার কথা নয়।’

—‘জানো না, আমি আর জন্ম মুহারাগী ছিলাম? রাজকোষ খুলে যেত আমার জন্মদিনের দাক্ষিণ্যে। এবার হয়েছে, লিলি বোস, প্রজার বদলে বন্ধুদের উপহার দেই এটা-ওটা।’

লিলির কথায় একবারে মুগ্ধ হয়ে গেল তপতী। ইস! কি ধার, কি বলক!

—‘চলো আমাদের বাড়ি।’

—‘তোমাদের বাড়ি?’

—‘আপত্তি আছে?’

—‘বা! আপত্তি কিসের? পাশের দোকানে উঁকি দিল  
—‘আমি লিলির সঙ্গে যাই।’

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ঘুরছিল তপতী, মীরা আর জহতী। চমৎকার ডালমুটী মার্কেটের, ফলের দোকানগুলি অপূর্ব। বাড়

তপতীকে নিয়ে লিলি গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—‘ওদের সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্ব কিসের তপতী? ওরা আর তুমি কি এক স্তরের?’

—‘তুমি বুঝি আকিউজিকি? বুঝেছ পরীক্ষা করে আমি প্রাইমিভিভাসিক আর জরাদি’, মীরা মধ্যযুগীয়?’

হেসে ফেলল লিলি—‘নেখতে নিপাট ভাল, হুটুতো কখনও তুমি। মহানীর গাড়ি তোলা।’

নিজের ঘরে তপতীকে নিয়ে এসে লিলি। পাখা, ফ্রিজিডেরের ঠাণ্ডা লেমনস্কায়াস।

—‘লিলি!’ একটু পানীর চেখে ডাকল তপতী।

—‘জরাদি’ তোমার দাবার খেঁ হবো, একথা তুমি সম্ব করতে পারছ না, কেমন?’

চুপ করে রইল লিলি।

—‘কেন পার না লিলি? ওরা গরীব বলে?’

আশ্চর্য এবার অসহিষ্ণু হল লিলি। ভাস্করও ঠিক এই প্রদ্বষ্ট করে। যেন দারিদ্র্য ছাড়া আর কোন জটাই নেই জগতীর। গন্তীর মুখে বলল—‘গরীব তো বটেই, কিন্তু দাবার খেঁ হবার মত কি যোগ্যতা আছে ওর বল? কালো, রোগা, ছবি বিক্রি করে খায়, কালচার নেই, কানেকসন নেই, সম্মানবোধও নেই।’

হাসল তপতী।—‘তোমার কথাগুলো যদি একটু অরল বহল করে নাও, দেখবে জরাদি’র রূপান্তর ঘটবে। বল—তবী, গ্যাম, শিল্পী নিজের পরিচয় বহন করছে ও নিজ, আর অসম্মান ওকে স্পর্শ করতে পারে না বলেই সম্মান বাবার ভয়ে বিপর্যস্ত নয়। লিলি! আমরা মনকে বখান বিকল্প করি ভাই, কাবোর কোন গুণ চোখে পড়ে না। তুমি জরাদি’র উপর বিকল্প, তাই ওর সবকিছু তোমার কাছে কুৎসিত হয়ে গিয়েছে। না হলে দেখতে এক টাকার অভাব ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোন গুণের অভাব নেই। তুমি যদি ভেবে দেখে যে, এই জগতই শুধু, তুমি একটি ভাল মেয়েকে মেনে নিতে পারছো না, তা’ হলে কিন্তু তোমার নিজের কাছেই সমস্যা পেতে হবে।’

লিলি শুক হয়ে রইল। সত্যি কি তপতীর কথাগুলো? শুধু গরীব বলেই তার এত যিঘেয জগতীর প্রতি? দারিদ্র্য লিলি ভয় করে, ঘৃণা করে দ্বিত্বকে, কিন্তু তা বলে নিশ্চয়ই সে এত ভেইন নয় যে, কেবল অর্ধ-কই সবার উপরে স্থান দেবে। তা যদি হোত, চরিত্র বহুরেও পিতৃভবন আলো করে থাকত না। কতজন ধর্ম রিচ্ছে ঐশ্বর্য আর উপাধি নিয়ে, লিলি তবে ধরা দেয় না কেন? ধন-মানের চেয়ে তার কাছেও কি বড় মাছুষ নয়? ধন লিলি চায়, মানও, কিন্তু মাছুষ বাদ দিয়ে নয়।

—‘লিলি!’ লিলির হাত ধরল তপতী।—‘রাগ করলে আমার উপর।’

একটু হেসে তপতীর হাত নেড়ে দিল লিলি। মনে মনে বলল—‘তুমি এমন মেয়ে তপতী যে, তোমার উপর রাগ করা যায় না।’

এনে, বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। কত কেলেকারী সেখানে। বাবার দু’লাখ টাকা তো গেছেই, ভাস্কর না থাকলে জেল হত দাবার; এখানে এসে ছ’মাস চূপচাপ ছিল; আবার শুরু করেছে। ভেনো, ঘিরে করলেও বিবাহিত-জীবন কখনো দাবা বেশিদিন বংশান্ত করতে পারবে না। আবার হবে নতুন কেলেকারী। কি যে হবে, ভাবতে পারি না ভাই। আমার মাকে দেখলে মারা হবে তোমার। প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন দাবার আলার।’

—‘এখন তো ভালই আছেন, কাজকর্ম শুরু করেছেন।’

—‘হ্যাঁ। চাকরী করবে পৌঁ ধরেছিল, মান বাঁচাতে বাবা কানোয়িয়ার সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।’

—‘তুমি জরাদি’র সঙ্গে আলাপ করবে লিলি?’

—‘না।’

—‘না, কেন? ভয় করে?’

—‘বা? ভয় কিসের?’

—‘ওরা নাকি কথার কথার অভিধাণ দেয়, যা তা কথা উচ্চারণ করে।’

—‘কিছু জান না তুমি লিলি। বত বাজে ধারণা করে রেখেছ। সব ভুলে শিক্ষিত মেয়ে। খোঁজ করলে মিলবে তোমার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় ওদেরই সমাজে। একবার তোমার জর্জেট সিকন ছেড়ে নেয়ে এসে দেখি, চল আমার সঙ্গে—মিলে যাবে একেবারে জরাদি’র ফর্সা বোন স্কুইব সঙ্গে।’

আরো হয় তো চলত কথা। লিলির মা এসে ঢুকলেন ঘরে। গৌরবরণ, মহিলার সব মর্দালা মুখে-চোখে।

—‘তপতী এলো তোর সঙ্গে?’

—‘হ্যাঁ মা। মার্কেট হতে ধবে এনেছি।’

—‘বেশ করেছিস।’

মস্তবড় কেক আনালেন লিলির মা।

—‘উঃ! এত খেতে পারবে না মাসীমা।’

—‘খাও। আজ লিলির জন্মদিন, কাউকে বলতে দিল না। তুমি এলে, বড় ভাল লাগল।’

মা চলে যেতে, লিলির দিকে চাইলো তপতী।

—‘সত্যি তোমার জন্মদিন?’ আঙুলে ছিল হস্তার আঙুটি, পরিচয় দিল লিলির অনামিকায়। বাধা দেবার সময় পেল না লিলি।

—‘কি পাগলামি করছ তপতী?’

—‘পাগলামি কেন ভাই? যেয়ার কত কি পাতার, জন্মদিনে আঙুটি দিয়ে, বোন পাতালাম তোমার সঙ্গে। আলিঙ্গনে বন্ধ হল দু’টি তরুণ দেহ।’

তপতীকে পৌঁছে দেবার পথে আবার কথা তুলল লিলি—‘তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি তপতী, জগতী, আফটার অল—একটি মেয়ে। তাকে ঘিরে কথা চল দাবার। কিন্তু জগতীর কি ভয় নেই? কোন সাহসে সব জেনে বিপদের মুখে পা বাড়িয়েছে ও? এতে কি মনে করা অভয়া যে জগতী অ্যাথিসাস? দাবার টাকার



—‘তবে?’

—‘তবে আবার কি? দেখছ না জহাদি’ ভালবেসেছে তোমার কাছে হঠাৎ তো যা সবাই ভাবে বলে ভয় পায়, নিজেকে কথায় লে বেড়াচ্ছে। ওর ভালবাসাকে লোকের ঝাঁকটোখের সামনে এনেছে চার না।’

—‘ভালবাসা? দানিকে ভালবেসে কি হবে? কোনদিন দানি ভালবাসার মর্যাদা নিতে পারবে? হু’নির বামশু, তারপর ডে থাকবে ঝালটে আকাশ। ইচ্ছে করে নিজেকে ঠিকার দেয় কন জহাদি?’



বোন পাতালম তোমার সংগে। আলিসনে--

—‘না, লিলা না। ভালবেসে কেউ কখনো ঠেকে না। ওর মনে আলো হয়ে গেছে। কাছে গেলে টের পেতে, জহাদিকে ছুঁলে আনন্দের শক লাগে।’

হাসিল লিলা।—‘কাজ নেই শক লেগে। কান্নার সমুদ্র রয়েছে সামনে, সে আর শক দেয় না। ডুবিয়ে মায়ে।’

—‘তাহেও ভয় নেই লিলা—It is better to love and lost. Than never to have love at all.’

লিলা স্তব্ধ হল।

প্রেমহীন ছবরের চেয়ে ভাল প্রিয়কে-হাবানো জীবন, কিন্তু প্রেমের প্রিয়তম কথাটাই যে ব্যাক ডেটেড। যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব

করতেন জর্জ দি ফিফথ, এদেশের মেয়েরা বহুটো ঢাকা ব্লাউজ আর

উঁচু ছিল জুত, পরে কলেজ যেত, তখন খুব প্রেম পড়ত মেয়েরা—

ছলবল। লোকের জলে ডুবুড়, বিয়ে করে নি সমস্ত জীবনে এমন

যদি মোটেই বিবল ছিল না। এখন? এই বিশ শতকের প্রায়

শেষের দাপে পা দিয়ে কি স্টিটিমকটিকিটর স্থান আছে না সময়

আছে মানুষের জীবনে? একমাত্র বিশ্বাস—গতি। সেই গতির

সঙ্গে পা মেনাতে যে না পারবে, মহাকাশের রথ থাকে চূর্ণ করে দেবে।

একটা মহাপ্রলয় ব্যর্থ হচ্ছে না পৃথিবীর উপর দিয়ে? আণবিক

মহাত্ত্ব, ফুগাব মিছিল, প্রতিষেধের মল্ল বৃষ্টি। এর মধ্যে

ভালবাসাও সময় কই? বা মনাক ডুবিয়ে দেওয়া চলে, ভাল থাকে

যার বাজনার গোলমালে, নাচের স্থিতিতে আর সফেন

পানির।

ভালবাসা কি তবে মরে গেছে? মরবে কেন? সব তরুণ-

তরুণী—দেবকী, রমলা, বেণু, বজ্র গৌরম সবাই কো পেতেছে

ভালবাসার গেল। লিলা? লিলাও বৈ কি। নানা রং-এ, নানা

কথায়, বোড টালছে গেল। শাস্ত্র ভাগে বিজ্ঞ পদ-পানি তুলবার

কথা ভাবতে চাতল নই কারো। তারপরেই মা ঘর, জীবন, বাস্তব।

সমাজে আছে ঠিকবার ভয় তাবার—তারবার স্থান।

ভাস্কর এসে যোগ দিয়েছিল এই খেলাঘরে, জুট করেছিল

লিলাকে। নেশা যখন বদার দরবে, তখন চোখে পড়ল আশ্চর্য

ব্যাপার। আছে তে, এখনো বৈ আছে সজিকারের ইঁদুর লতা

শুকনুও হয়ে। কফরাস কাদের প্রাণ-প্রচুর্ষ। হাত ভরে দেয়

ফুলে, মন আর গন্ধ। ভাস্কর পালিয়ে এস। পালিয়ে এস বিশ

শতকের পশ্চিমী টেউয়ে দেওয়া যোগ্য ছিল ভেগেটে বন্ধুর,—

সেই আধুনিকতম যুগ তাকে। পালিয়ে বাঁচল সে। নাকের নেশায়

জিলিঙ্গার কলে না তার জুট তানিয়ে গেল, পালিয়ে গেল। কড়া

দাঁড়া আর বিলতি সরবরের বদুবের আপদা হয়ে গেল ভাস্করের যুগ।

চোপ ফরাতে তাকে খুঁজতে সময় পেল না লিলা।

ভাস্কর খুঁজে পেল একটা বিশ্বস্ত জঘর মার্জিত বৃদ্ধ—সজ্ঞা-যগ

চক্ৰবর্তীর কুঁড়ি। ডানায় ভর দিয়ে মহাশাশ উড়লো ঈগল গুহ-

নীতের খোঁজ।

কাজ, কাজ, কাজ : কাজে ডুবে গেল ভাস্কর। ক্রোধে যাচ্ছে

এদাচং—মাসে বোধ হয় দু’দিনও নয়। সাক্ষী দিল্লীর বস্ত্র কাজ

পাড়ার গেল। সুনাম বাড়ল মিত্র কোম্পানীর!

স্বমোহন মিত্র চাটালেন স্ত্রীর নিকে।

—‘দেখছ ভাস্করের কাজ?’

চোখ টান করে রটল সুরঙ্গাণী : ভাবনা—এ আর বেশি কথা

কি। তুমি বরা দেখ, কেমন ছেলে আমর!

—‘এবার বিয়ের যোগাড় করা যাক। আজই তুমি ফোন কর

মিহুক।’ স্বামী বললেন।

—‘এ-এ পরীক্ষা শেষ হোক কপালী।’ ডালের বসটা সবিয়ে

বেবে উত্তর দিল শ্রুতগাণী।

—‘আর পাড়ে দরকার কি?’

—‘তোমার ছেলের ইচ্ছেই তো বেশি। বোজ লাইব্রেরীতে নিয়ে যাচ্ছে।’

—‘হতে পারে—হতে পারে। আমিও তোমার বি-এ পরীক্ষার জন্ত কি জেদ ধরেছিলাম মনে নেই?’

—‘নেই আবার মনে।’ সেদিনের স্মৃতি একটুকুও উপভোগ করলেন পরিণত বয়সের দম্পতি।

—‘ওরা এ বাড়িতেই থাকবে তো।’ নীরবতা ভাঙলেন স্ত্রীমোহন।

—‘কি যে বল! যাবে কোথায় আবার? যে তাবলা মেয়ে এগাব! বই আর দেখার ছাড়া জানে না কি কিছু?’

—‘এখন বৃষ্টি জানিচ্ছে কবল ভাস্করকে?’ খুশির হাসি হাসলেন স্বামীশ্রী।

—‘কত দেরি পরীক্ষার?’

—‘দেরি কই নভেম্বরে তো।’

—‘আজ তোদের কিসের মিটিং ছিল থোকা?’

—‘জেনারেল। বাবা বলেন নি?’

চোরের এসে বলল গঞ্জিপাক্ষ্যার ঘরোয়া ভাস্কর। মুখে পুরে দিল আন্ত ডিম।

—‘দেখ, ছেলের কাণ্ড। গলার লাগবে না? খুব ক্ষিখে পেয়েছে বৃষ্টি?’

—‘খুব? ভীষণ।’

—‘তপতীর পরীক্ষা কবে?’ জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীমোহন মিত্র।

—‘ছাবিশে নভেম্বর।’

—‘খাটছে-টাটছে তে, না সখের পড়া?’

—‘নিজের তো খাটছেই, খাটিয়ে মারছে আমাকেও। তোমার বন্ধু—সেই রাগী দাশগুপ্ত? তাঁর খোসামোদ করতে চলে বইয়ের জন্ত। রাজী কি চন? নেহাৎ তোমার রেফারেন্স পেলেই পাবে না তাই। প্রথম প্রথম পাহারা থাকত ঘরে। এখন অবশ্য খুব খুশি, নিজেরই নাট দিচ্ছেন তপতীকে। মা আরেকটা ভালু দাও।’

—‘ওকে নিয়ে আসিস একদিন।’ মা বলল।

—‘ও যে বাবা! কোথাও বাবার কথা বললে মারতে আসে। সেদিন বললাম—মেয়েটোতে ‘গন উঠখ দি উঠিও’ জনেকদিন পর আবার এসেছে, চল দেখে আসি। চোখ-মুখ কুঁচকে একবারে শিম্পাঞ্জীর মত হেঁচ কাটল।’

—‘দাঁড়া! বলব তোর এসব কথা তপতীকে।’

—‘অন্যায়সে। আমি সামনেই বলেছি।’

স্বামী চোখ দিয়ে উদ্‌গার দিলেন স্ত্রীকে অংকো: কিছু জিজ্ঞেস করতে। সুকল্যাণী প্রাঙ্গ করল—‘রাগ কর নি?’

—‘রাগ? বা রাগী মেয়ে—’

তপতীর রাগের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাস্করের হাঁশ তল—অনেকটাই বলেছে সে। ইস্। কি ভাবলেন বাবা! ইঃ! হাসছেন স্ত্রীমোহন—

—‘চা দাও, চা দাও শীগ্গির, গলা বন্ধ হয়ে গেছে।’

গোলমাল স্রাব উঠলো ভাস্কর।

প্রবীর কিন্তু সত্যি শান্ত, সংযত, উদ্ভ্র হয়েছিল। পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে মস্তবড় একটা। এ কি বিলেতি পরজ্ঞার শিক্ষা না জহাজীর ভালবাসা? লিলি জিজ্ঞেস করল নিজেকে, উত্তর চাইল ভাস্করের কাছে। ভাস্কর কই? খোঁজ নিল দেবকীর কাছে—

—‘ভাস্কর ক্লাবে আসে নি দেবী?’

—‘ভাস্কর? সে তো দুলভ আজকাল ক্লাবে। দেখেছ তব শীগ্গির?’

—‘কেন? কি হয়েছে ওর?’

কি হয়েছে। চোখ টোপাটোপি হল সবীসলের মধ্যে। এতদিনে ঘুম ভাঙল গরবিনীর। ভাস্কর চলে গেছে হাতছাড়া হয়ে।

—‘ভাস্কর এখন প্রি-রিফরিক এজের একসাডেকট করছে। উত্তর দিল বেণু হালদার। কথাটা রহস্যগম্বী। উৎসুক হল লিলি।

—‘তপতীর সঙ্গে ঘুরছে বৃষ্টি খুব?’

—‘ঘোরা? ভাস্কর একবারে ডুব দিয়েছে। ডুবুরী নামাঙ্কিত উদ্ভার করতে পারবে না তাকে। অবশ্য নিজে চেষ্টা করলে এখনো কি হয়, বলা যায় না।’ বললো রমলা।

—‘সে কি! আমি তো জানতাম তপতী ইতিহাস পড়ছে প্রেম আন্ত করল কবে হতে?’

—‘যেবে পেল অরক্ষিত দুর্গ। ইতিহাস পড়ছে! ত: পড়াটাই তো ওর কৌশল। জানাতে চায়—ছাত্রী জীবনই কাটবে এখনো। মৈত্রেরী। ভাস্করের কাছে আঁটির বদলে ব্রহ্মবিদ্যা চাইছে।’ উদ্ধত কর্তা বেণু।

কল কল, খল খল করে হেসে উঠলো সবাই।

—‘এনগেজ-এট হয়ে গেছে নাকি? কই সেরকম তো শুনি নি কিছু। দাদাও বলে নি।’ বললো লিলি।

—‘বসবার আর স্তনবার সময় কই তোমার? দিন কাটালো আটগালগা সাপাত—আট একজিবিশন হবে।’

প্রায় এক বছর ধরে লিলি ব্যস্ত ছিল একটা আট একজিবিশনের ব্যবস্থায়। মস্ত খরচ আর খামেলার কাক। এত টাকার দরকার যে কোন বাঙালী নন্দনই একেবারে হাঁকিয়ে না পড়ে সম্পূর্ণ সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং লিলি শরণাপন্ন হয়েছিল চাণ্ডলা আর দিল্লীদালার। ওদের সঙ্গে ঘুরছে, নানা জায়গায় গিয়েছে। এর মধ্যে এত কাণ্ড ঘটে গেছে! মনে পড়ল কিছুদিন আগের দেখা তপতীকে। কি অশ্লব হয়ে উঠেছে ও! বৃকর মধ্যে জালা ধরতেই চোখ গেল হাতের ঠাঁও মুক্কাটির প্রতি। নিজেকে সযত কবল লিলি। একটু বেসামাল হলেই লিলি বাসেদে জ্বলন্ত ভাস্কর কাহিনীতে যেতে উঠবে সবাই। শক্ত হোল, হাসলো তার বাগল হাসি।

—‘ইস্। কি চুসংবাদ দিলে। আমি না হয় ব্যস্ত ছিলাম। তোমরা কি করছলে? উড়বার উপক্রম দেখেই পক্ষচ্ছেদ কর নি কেন বিশ্বাসঘাতক? দেবকীর গানে তো মুগ্ধ ভাস্কর।’

—‘আর দেবকী! চেয়ে দেখ, হাতে পরছে রজতের আঁটি।

## শাশ্বতী

—‘আরে! কবে? কিছু বল নি দেখকী।’ গীড়াও মজা দেখাচ্ছি রক্তকে।’

হেসে, নেচে, গান গেয়ে উপচে পড়ল লিলি।

—‘কি! বলেছিলাম’না! ও আবার ভালবাসবে কাউকে—’ লালগি করল রমলা, বেণু।

বাড়ি ফিরে একলা ঘরে নিজেকে দেখল লিলি। এতক্ষণের সব ঐর্ষ্য ফেলে এসে সে দরজার বাইরে। বন্ধবার যে ময়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, সে বন্ধ মনের আকাঙ্ক্ষা-গণিতা লিলি নয়। ‘ব’ ময়ে ভালবেসেছে, আর ফিরে পায় নি তার প্রতিদান—তারই মত কাঁদল লিলি। কাল্মা যত বাড়তে লাগল, তত কাল্মার সুখ লাগল তার বুকে। ভাস্করের জন্ম কেঁদেও আনন্দ? কই এত সুখ তো পায় নি যখন কাছে ছিল, পাশে ছিল সে! বুঝল লিলি—ভাস্করকে পেল না সে, কিন্তু ভালবাসা তার নিজের। এক বাধা দেবে তাকে ভালবাসতে—সুখ পেতে, দুঃখ নিতে? বুঝলো—না। বেসেছে তপতী, ততই সেদিন বলেছিল—

‘It is better to love and lost,  
Than never to have love at all.’

ভাস্কর হারিয়ে গেলো জীবন হতে, কিন্তু ভালবাসা কখনো হারাবে না, মরবে না—সে থাকবে জীবনভরে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে এসে লিলির উত্তপ্ত কপাল। ভাবনার সময় পেল। এখন কতবারটা কি? বাস্তবায়িত ভালবাসে বিরহিনী সাজবে? পুরোচাত জামা, সাদা শাড়ি আর সোশ্যাল-ওয়ার্ক? পারবে না। পারবে না লিলি আধা-বিশ্বাস সাজে, সবার ককণা কুড়তে। অতএব, ওঠো লিলি বোস। সাজো জর্জেরটি-সিফনে-কণমালায়। হাতাশালান্তে বিভ্রম আনো ভক্তমান।

দানবের অবিজ্ঞান্য বরনা-ধারে বান করলো লিলি। তপতী পেয়েছে কোতিন্দু। লিলিরও আছে কিছু—বাথার বিয়ে নীল হীরের কেরাটি পড়েছে তার ভাগে। থাকুক বন্ধ বৃকের কোটোয়, নীলার দম কম না কি! পাউন্ডাবে ফ্যাকাশে হয়ে লিলি চলে এলো থাথার টেবিলে।

—‘মা, ভাস্করের না কি বিয়ে তপতীর সঙ্গে?’

মা বিন্দিত হলেন ময়ের হাসিমুখি দেখে। তবে কি ভুল বোঝেন এতদিন! তাঁর মনে শাস্তি ছিল না, ভাস্কর-তপতীর বিয়ের কথা শুনে। লিলি প্রবীরের মত নয়। হোট কায়েদ সে নিজের অঙ্গচ্ছেদ সহিতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গস্থান ঘটােব না কখনো। অবাঞ্ছিত হয়ে ভাস্করের পথ আগলাবে না সে, কিন্তু চিরদিনের মত খান-খান হয়ে যাবে। একটু স্বস্তি হোল ময়ের কথায়। মুখে বললেন—‘সেই রকম তো শুনিছ, স্পষ্ট বাধে হয় কোন কথা হয় নি এখনো। কেন, তুই জানিস না? তোর বন্ধু তো ভাস্কর।’

—‘তপতীও’ মাছের টুকরো মুখে দিল লিলি।

—‘যা মুখশ্লে পড়েছিলাম একজিবিখনের কামলা নিয়ে। সব স্পারেল হোত। বাঁচিয়ে দিয়েছে চাওলা আর দিল্লীলাল। দাশা কই? এখনো এর ঘরে বসেই থাকে না কি? শোন মা, তোমার বলতে

ভুলে গেছি—সেদিন মার্কেটে মুখোমুখি দেখা জহরতীর সঙ্গে। আমাকে দেখে কি দৌড়!’

খুব হাসল লিলি।

—‘ভাস্কর আর তপতীর নাকি বিয়ে। শুনেছিল তুই?’

ভাইয়ের একটু উৎসাহ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল লিলি। অবশেষে দাদাও বক্রবা করবার চেষ্টা করছে নাকি! হাসল লিলি। ‘শুনেছি। তোমরাও করে ফেল।’

—‘আমরাও?’

—‘হ্যাঁ, তুমি আর জহরতী। আর কত কোটিশিপ চালাবে? তিন বছর হয়ে গেছে।’

বোনের কথায় হাসলো প্রবীণ—‘জহরতী যে রাড়ী হচ্ছে না। সে ভেবে দেখেছে, তার নাকি বিয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে। স্তত্রবাং চুক্তি সাপেক্ষে কাটাতে হবে কিছুদিন আরো।’

—‘চুক্তিটা কি?’ জ্ঞা কাল লিলি।

—‘বেশ হালদারের দিকে তাকাব না, দাস্তানীর সঙ্গে নাচ বন্ধ। অর্থাৎ এক জহরতী ছাড়া অন্য সব রাজ্যতীর বন্ধ বজায়।’

ভাইয়ের কথায় লিলি আমোদ পেল, স্বস্তিও। হৃদয় যখন রক্তক্ষরণ করছে, বাইরে তখন হৈ-চৈ কার কাটানো বড় সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিল লিলি।

—‘দাদা, বোস না। তোমার সঙ্গে তো দেখাশু হয় না। তোমার জহরতীর গল্প কর একটু।’

প্রবীণ চাইলো বোনের দিকে। মনে মনে বুঝলো কিসে এতটাই দুর্গল হোল লিলি যে, দয়াক্ষের সব গুণ খুলে আঁক কস্তুরসহায় নমনীয় হয়ে উঠেছে। বুকের মতো বাধা কবে উঠলো, বিজ্ঞ জ্ঞান পোনের স্বভাব—একটু সহ্যহুভূতি দেখালেও দপ করে জল ঠেঁবে। তা ছাড়া—ভাবল প্রবীর, এসব ডেসিক্রেট বাপার নিজ নিজ স্টেট করা ভাল।

—‘জহরতীকে একদিন দেখ না।’

—‘ওকে তো সেদিন দেখলাম একবার মুখোমুখি তপতীর সঙ্গে মার্কেটে। তবে আঁপা আর হতে পারল না, দৌড় পালাল তোমার ক্রাইড।’

সেদিনের ঘটনা শুনেছিল প্রবীণ হাসলো।

—‘জহরতী অমনি। মুখে খুব হাসল—কাজের বেলা ভীতুর একশের।’

—‘ভয় কিসের?’

—‘ওরা যে ভয় ফিচের জন্মায় খরবার চাইতে ভয় আনন্দে ভয়, ভালবাসতেও ভয়ের ছুঁই’ বীর থাকে ওদের।’

—‘তপতী তো খুব হাত সাটফিকের দিচ্ছে জহরতীর! অমন মেয়ে নাকি দুটি মেলা ভার।’ ‘তুমি কি বল?’

—‘আমি?’ আবার বোনের দিকে চাইলো প্রবীর। একটু ক্রান্ত অংগর বেন। নিজের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না, তাই শুনে চার অপরের কথা।

—‘তোমার লাগছে কেমন? শুভুই ভাল না জটিল আছে কিছু কিছু?’

—‘কুটী তো প্রচুর—অস্তুত আমালের পক্ষে। ও এমন ঘরের মেয়ে, যখানে অভাব হচ্ছে দিনের প্রথম কথা। সুতরাং কুশণ। আমি কখনো ওর সঙ্গে বেহিচে কুড়ি টাকাব বেশি একবারে খরচ করতে পারছি বল মনে পড়ে না।’ আর—

চেসে কেলস প্রবীর। ‘শব টুকরোটি পরন্তু পাবে, আরেজ্ঞারাসের তুলানী। টিপ সু দিতে যাবার আগেই পরমা তুল নেবে। তবে, ভালো হচ্ছে কি কানিস—প্রান্তেই দেবার দায় নেই। দবল কববার, আমার মনিদারি স্টাটাস জানবার কিছুবার আগ্রহ নেই। কেবল—’ একটু খমচাল প্রবীর। —‘এই আগের ব্যাপারগুলো জানে-টনকে চাব আর কি।’

—‘বাসনা। বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ তো। নাঃ, এ বিয়ে আমাদের টিকাবে।’ কবে ফেল।’

—‘তুইও এবার বিয়ে কর না।’

—‘কাকে কহি বল তো?’ এক প্রার্থীর ভিত্তি যে, বুঝেই পারছি না যথার্থ কুপার পাঠটিকে হাত পায়ে।’

ভাইরেনে বতরিন পর হাসল শৈশবের হাসি।

—‘করবাস্তু তো বেশ।’

—‘খুব বেশ।’ (গীতুডা ঢুল, পালিশ মুখ।)

—‘চাওলো? মিষ্টিলাল?’

—‘বাহুসী নয় যে, স্বরজ্ঞ তুঁতনে একমস্ত তলে বেশ তত—কি টাকটা।’ জঙ্গ কবে নিঃশ্বাস কেলসে লিলি।

—‘তুমি কবিস নে। মন ঠিক করে এবার বিয়েটা করে ফেল।’

—‘না তলে? বরস বাড়ি মাছ? এর পর বর জুঁবে না?’

—‘নারে লিলি। আমার ভক্ত বাণামার দুঃখের শেষ নেই, সোসাইটিতে মূব নষ্ট। দেখিস না, মা কোন মিম্বরণ যান না। তোর ভাল বিয়ে তলে—’

—‘কদের অবস্থান উন্নতি হবে? কামাইয়ের গুণে ঢাকবে ছেলের দোষ? তার চেয়ে তুমি জয়ন্তীকে বিয়ে করে নিয়ে এস। বাবাকে রাজী করিয়ে দিচ্ছি।’

—‘হাক কিছুনি। মাত্র ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে। একটা বছর তা দামি।’ আশ্চর্য হল লিলি ভাইয়ের কথায়। এহটা উন্নতি হয়েছে নারি দাদার। মুখে বলল—‘তোমার বিয়েতে টাকার প্রসঙ্গ ওঠে কোথা হতে?’

—‘তার মানে বাবার টাকা আছে তাই বলছিস? আমিও একদিন সে কথা ভাবতাম, ভাঙ্করকে দেখে তুল ভাঙ্কল। ওর বাবারও টাকা কিছু কম নেই, কিন্তু পাটিছে দেখে বাতরিন।

লিলি খুশি হোল।—‘বেশ তো দাদা! বছরখানেক দেখ। তোমার বিজনেস ঈর্ষিয়ার বাবে। তারপর তুঁতনেই বিয়ে করব। তার আগে তুমিও আমাকে তাড়া দেবে না, আমিও কিছু বলব না তোমাকে।’

কিছু বললো ভাঙ্করকে লিলি। রবিবার ধরল তাকে ক্লাবে—

নীল শাড়ি সাদা পাখয়ে লিলিকে লাগছিল সুসুন্দর।  
মত—হাসিখুশি লিলি।

—‘করতে পার। মেরে ভাল তপতী।’

—‘কিন্তু মেরে ভাল হলোই সে বে পাখী ভাল হয় না এতো তোমারি কথা।’

—‘ধাংগা বল। সে ধারণা আর নেই।’

—‘কে বোচাল? তপতী? তপতীর সঙ্গে এত ভাব হোল কি করে?’

—‘ভাব তো ছিলই। বজুয়ে বনোদ্ধৃত হরছে সম্রাতি।’ আঙুল তুলে আঁটি দেখান লিলি।

—‘এমন মেরে! কাউকে বশ না করে চাড়বে না! আমার বার্থ-ডেত বাড়ি এনেছিলাম ওকে। আঁটি বিয়ে, বোন-টোন পাঁহকে একাকার।’

লিলির হাসিতে ঈর্ষিত করলো। আরামের নিঃশ্বাস চাফল ভাঙ্কর। তপতী তার সব মন ভরে দিয়েছে, তবু কোথায় যেন ছিল একটু বাধা। একটু অস্বাচ্ছন্দ্য আঙুরের আগে।

—‘তোমার আঁটি একজিবিশনের কি হোল?’

—‘ওতো জাম্বুগারিতে। উঃ। যা খেতেই দিল্লীসাল কা চাওলো।’

—‘বরদান করবে তো?’

—‘কাকে যে করি সে এক ভাবনা।’ দাদার কথা শুনেচ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল লিলি।

—‘প্রবীর? কেন? প্রবীর তো ভাঙই। কাজকমে মন দিয়েছে।’

—‘বেশি রকম ভালভাবে দিয়েছে। জরাজী ওকে মাস্তুম কবে ছেড়েছে। মা খুব খুশি, বাবাও।’

—‘তবে আঁ কি? লাগাও বিয়ে।’

—‘ওরা নিশ্চেরা প্রস্তুত নয় যে এখনো।’

—‘তুমি? তোমার ব্যাপারটা কি?’ অরুণ কি বলে?’

—‘গীতুডা। একজিবিশনটা হোক আগে। একা অরুণ কেন? সব ক্যান্ডিডেটদেরই আনে কঁনেসটা বুঝি। জরাজী সেমের একটা ছবি রাখব ভাবছি, কি বল?’

—‘খেঁচো।’ খুশি হল ভাঙ্কর। ‘দেখেছ নাকি ওর ছবি?’

—‘সেই বিখ্যাত ছবিটাই দেখেছি—বেটাতে বাম। মুখ।’

—‘ও। নবীর ছবি।’

—‘বাং।’ বেণু জরুজিত করল।—‘দেখছ সীমা! লিলির কাণ্ড। কি বে আন-কটোরেকি? কথাতে চমক লাগাত ওস্তাদ ও।’

—‘ঐ জ্ঞানী তো মুখ অরুণান্ত। ভাবছ—এমন উটে বালো দেশে শুদ্ধায় নি, শুদ্ধায়ে না।’ বললো রমলা।

—‘কি বলছ আমার কথা?’ এগিয়ে এস নিপুণ টাইবাধা অরুণান্ত।

—‘ভাঙ্কর যে। কতদিন পর? খুব ব্যস্ত বুঝি।’

—‘ভরনক।’ হাসি চমকাল লিলির চোখে।

—‘তপতী ব্যাককে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ ভাঙ্করকে।’

## শাশ্বতী

তপতী রায়। তপতী? কোন্? কোন্ মেয়েটি? অনেকেই দেখে নি তপতীকে। বাবা দেখেছে, বিশদ বর্ণনা দিল তার। সুন্দর। সুন্দর মেয়ে। ভাল শেতার বাজার। এম-এ পড়ছে। ভাগ্যবান ভাস্কর। কনগ্রাটুলেশন?

—‘কি দেখল ভাস্কর তপতীর মধ্যে যে একেবারে মুগ্ধ না হয়ে পারল না?’ রমণা বলল লিলিকে। একটু খুশি, অনেকটা উৎসাহ। লিলির মত চমক তাদের হয়ত নেই, তা বলে তপতী! আশ্চর্য পছন্দ!

লিলি হাসল—‘হাসচ কি? কি বল অরুণ! এমন কিছু একক’। চান্স আছে তপতী বায়েব?’

—‘ছািমি তো দেখতি না।’ উত্তর দিল অরুণ।

—‘তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেনই তো চান্স হলে না?’ বলল লিলি তার স্বভাবসিদ্ধ দাবাল কথা।

—‘বেশ তো! তুমি তো একজন বিশেষজ্ঞ, তুমিই বল না কি আছে তপতীতে?’ জি ভসিমা করল রমণা।

—‘অন্তত ভাল লাগলে দৌলধ গলে যাবার আশঙ্কা নেই তপতীর। আর—ও কারো নকল নয়, একেবারে নিজস্ব।’

রাজহাস্যের ঢাল লিলি চলে গেল হাসার ঝলকে।

উত্তেজিত তপতী গ্রাস দাঁড়াল ভাস্করের অফিসের সামনে। একুণ তাকে ভাস্করের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ইচ্ছাকৃত করবার কথা মনও এসে না, সোজা রিসেপশনে গিয়ে জানাল—‘দেখা করবে ভাস্কর মিত্রের সঙ্গে। রিসেপশনিস্ট আসে নি সেদিন।’ ইংল্যান্ডে না, কি মাথাধাখা। ইন্টারেস্টিং-মহিনবাগানের খেলাও হতে পারে। কাজ চালাচ্ছিল চাপরাশি তারাপদ। গছুরিভাবে সে তপতীর দাকার জানতে চাইলো।

এবার থমকালো তপতী। বাধে-বাধে গুণায় বললো—‘মি: মিত্রকেই বলবে দরকার, তিনি তাকে জানেন। অগত্যা উঠল তারাপদ।

ভাস্কর তখন একটা টেবুলের নিম্নে মাথা ঘানচ্ছিল। কামু এও কোম টেবুলের দিচ্ছে। তাদের চেয়ে বেশি হলে, ভাস্কর কাজ পাবে না। আবার বেশি-কম হলে, কাজ তোলাই হবে মুশ্কল।

তারাপদ জানাল একটা মেয়ে দেখা করতে চায়।

—‘মেয়ে?’

—‘আজ্ঞা হ্যাঁ।’ তারাপদ নিঃসন্দেহ ছিল যে, তপতী মেমসাહેব নয়। টাইপ-রাইটারের মতই মেয়ে।

ভাস্কর ভাবল একটু। কে মেয়ে হতে পারে? ও! সম্ভ্রান্ত তো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে স্টেনোগ্রাফিক্স-এর জন্য।

—‘নিম্নে যা সুয়েনবাবুর কাছে।’

একট্রা-মেট অফিসার সুয়েনবাবুর ঘরে সোজা তপতীকে পৌঁতে দিল তারাপদ।

বুড়ো মাফু সুয়েনবাবু বুঝলেন নতুন মাফু চাকরীর বাজারে বেরিয়েছে।

—‘সুয়েনবাবু! সত্যি কি। কত মেয়ে চাকরী করছে

আজকাল। দেশের অবস্থা ই বললে গেছে, মেয়েরাও চাকরী না করলে চলে না। তা—স্পীড কত আপনাব? স্টেনোগ্রাফী শিখেছেন কোথা হতে? একটু পরীক্ষা করে নিতে হবে যে। আগে কাজ করেছেন? সার্টিফিকেট আছে?’

ফাইল ওপ্টেতে ওপ্টারে কড় ছোটালেন সুয়েনবাবু।—‘দরখাস্ত কই।’

চোখে অঙ্ককার দেখল তপতী। টাইপ, স্টেনোগ্রাফী, স্পীড—এসব কি বে বাবা! অনেক কষ্টে গিজেস করল—‘ভাস্কর মিত্র আসেন নি অফিসে?’

—‘ক? ছোট সাতেব? বিলক্ষণ! তিনি না এলে চলে কখনো? না, এসব আপপয়েন্টমেন্টের কাজে তিনি তো আসেন না—তবে—’ তপতীর দিকে চাইল সুয়েনবাবু হালদার—বড়ঘরের মেয়ে—সাক্ষ্য দিচ্ছে আচার, আচরণ চোরা।—‘আছে নাকি সাহেবের নামে কোন কেমেন্টেশন লেটার?’

—‘একটু পর দিন তাকে—তপতী ব্যয় দেখা করবে।’

মরিয়া হয়ে বললো তপতী।

তপতী অফিসে? সুয়েনবাবুর ঘরে? হে ভগবান! তাকেই বা পাঠিয়েছে ভাস্কর স্টেনোগ্রাফী ভেবে! ছুটে এস নিজে, নিজের ঘরে নিয়ে বসাল চোরা।

—‘ব্যাপার কি?’ আর ব্যাপার! ততক্ষণে চোখে জল এসে গেছে তপতীর খরখর বস্ত্র-কলর।



বিখ্যাত  
‘শঙ্খ ও পদ্ম’

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহার বক্রন

রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯২৫

—‘ইস! কি ভুল। আরে কি হি, এত বড় মেয়ে কীদে নাকি।  
শোন, শোন তপতী! আমি কি বুঝছি, তুমি এসেছ?’

প্রায় পিঠে হাত বোলাস ভাঙ্কর। শান্ত হয়ে এস তপতী।

—‘বল কি খবর।’

—‘একুশ দাবানল। বিল্ডিং হতে এসেছি। রেকর্ডে আউট  
হয়েছে।’

—‘হয়েছে? গুড, গুড। তবে যে বলেছিলে আগামী সোমবার  
বেকবে? কি? কি?’

—‘সেকেন্ড ক্লাশ—কার্ট।’

—‘বা, বা। দিনটা তো সেলিট্রেট করতে চর তা হলে। বাবা  
কি বললেন? মা খুশি?’

মুখচোখ উজ্জ্বল তপতীর—‘কেউ জানে না। আমি একা একা  
ট্রায়ে চলে গিয়েছিলাম, এইমাত্র ফিরেছি। সব প্রথমেই—’

মুখ নত করল তপতী। শুক্ল হল ভাঙ্কর। সবার আগে  
পুরুষের দুগুটি তাকে দিতে এসেছে তপতী। সেট মুহূর্তে, শুকনে।  
চল, রোহালাগা মুখের সজ্ঞা এম-এ পাস করা বাইশ বছরের মেয়েটির  
মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করল চিবনিদের নব অমুরাগিণীকে। ভালবাসার  
উজ্জ্বল হল পুরুষের বুক। মনোর কথা বিজ্ঞ প্রকাশ পেল না  
মুখে। উঠে কাঁপে হতে কেউ তুলে নিল ভাঙ্কর—

—‘চল বাড়িতে স্বখবরটা পৌঁছে দেওয়া যাক। তারপর আজকের  
প্রোগ্রাম ঠিক হবে, কি বল?’

এতক্ষণে হাসি ফুটল তপতীর মুখে। উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে এসে  
চোখের মধ্য হতে, ভাঙ্করের হাত ধরল।

—‘আর অফিসে কাজ নেই?’

—‘আরো কাজ? পাগল! আজ আর কাজ নয়—শুধু  
‘ছন্দোবন্ধ গ্রন্থাগার, এসো তুমি প্রিয়ে।’

ভাঙ্করের বলিষ্ঠ দুই বাহুর মধ্যে ঢোখের নিমিত্তে পিঠে হয়ে গেল  
তপতী। দু’হাতে জড়িয়ে ধরলো সে-ভাঙ্করের গলা। উর্ধ্ব মুখটি  
তুলে নিঃশেষে নিবেদন করল নিজেকে। কতক্ষণ বহুক্ষণ!  
বোধ হয় একমুগ পার হয়ে সপ্তদ্বীপ হোল দু’জনেই।

—‘তপতী!’ নাড়া দিল ভাঙ্কর বক্ষস্রোকে—‘কি হোল?’

—‘বাও।’ মুহূর্তটাকা দিল ভাঙ্করের বুক তপতী।

—‘বাও তো বুঝলাম, এখন লিলি যদি ডায়মন্ডস্ট আনে?’

—‘ইস! তার আগেই নিজের নামে ডেলিভারি নিয়ে ফেলবো।’

—‘বটে যে দুই ময়ে! আমি বস্তাপাচা মাল?’ আবার, আর  
বার, ভাঙ্কর চুপন করল দীর্ঘ বিবস্ত্র গুঁঠাধরে।

বাড়ি পৌঁছবার জন্ত তাড়াতাড়ি করলেও দেয়ি হয়ে গেল  
তাদের। অতুস্ত তপতী একপ্রট চিপ্স আর মাছভাঙ্গা খেল।

—‘দুপুরের রেকর্ডেই খুব ভাল। কেমন কম কম লোক।  
মা ভারি খুশি হবেন, বাবাও—’

—‘ভাল পাস করেছে বলে না?’

—‘হেঁ। বুদ্ধি কোথাকার। পাস করে যে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি  
তার জন্ত।’

—‘অতটা স্যাক্সন হওয়া কিন্তু ভাল নয়। আমি মত বললেও

—‘বললেও কেনেতে পারি?’ ছোট জেটি কাটলো তপতী—  
‘কিছু বুঝি না আমি। বোকা, না?’

—‘খুব বুদ্ধি বুঝি? তবে তো ভারি ঠকেছি।  
ভেবেছিলাম সরল, ইন্সোসেট—Sweet sixteen still  
unkissed।’

—‘ভেবেছিলে? ভেবেছিলে একথা? বোলো বছরে কেউ  
এম-এ পাস করে?’

ভাঙ্করের কোলের উপর ভেঙে পড়লো তপতী। নিকরু আবেগ  
ছাড়ি পেয়েছে। লজ্জা করবার, লজ্জা পাবার কিছু হাতে না রেখেই  
নিজেকে বিলিয়েছে সে ভাঙ্করের কাছে।

—‘চল বাড়ি চল। মাকে সব বলবে। তোমার মা অমত  
করবেন না তো।’ শব্দা ফুটলো তপতীর চোখে।

—‘পাগল! মা অস্থির হয়ে আছেন তোমার জন্ত। পরীক্ষাই  
শেষ হয় না।’

—‘সত্যি! বিস্ত্রী পরীক্ষা। শেষের দিকে তো দিতেই ইচ্ছা  
করছিল না। এইটখ পেপারটা যা লিখেছি—’

—‘সর্বনাশ! ফেল করতে যদি?’

—‘আগ! এম-এ ফেল যেন করতে নেই। আর একটু  
দিতে বক না চিপ্স।’ প্রেট হতে একটু আলুর কুচি মুখে ফেলল  
তপতী।

—‘আর না। এবার বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে, ভাল করে  
খাবে।’

—‘আবার? এই বলে চিপ্স চিপ্স করছে।’ খুঁটে নিল ছোট  
আর একটু কুচি তপতী।

—‘ওঠো তপতী। বাড়িতে সবাই খুব ভাবছেন নিশ্চয়।’

ভাবছিল খবট। সেট ভোরবেলা বেরিয়েছে তপতী। পাঁচটার  
সময়ও কিরছে না দেখে প্রিয়বালা ব্যাপারটা মীনাঙ্কীর গোচরে  
আনল।

বিরক্ত হল মীনাঙ্কী।—‘এ রকম হয় নাকি মাঝে মাঝে?  
আমার কখনো বল না কেন?’

ভর পেল প্রিয়বালা। ‘ঐ মীরাদি’দের বাড়ি যায় তো,—তাই  
আপনাকে আর—’

—‘হয়েছে, হয়েছে। সর্গারী সবটাকতে।’ গিয়েছে মীরা  
কাছেই। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে! এখানো বাড়ি কিরবার সময় হোল  
না। মনে মনে ভাবল মীনাঙ্কী।

আবোল ভাবোল অনেক ঘরে, ঝড়ো কাকের মূর্তি মেয়ে এসে  
পৌঁছল বাড়ি, সঙ্গে ভাঙ্কর। হস্তবাক মীনাঙ্কী। এই চেহার।  
আর পোশাকে ভাঙ্করের সঙ্গে বেড়ানো। রাগে চোখ লাল, বিজ্ঞ  
ভক্ততা বজায় রাখতে হাসতে হোল। জীবনে প্রথম মা বলে  
মীনাঙ্কীকে ডাকল তপতী—

—‘মা, দেখো, ভাঙ্কর দিয়েছে।’ পায়ের আংটিটা গুঁজে দিল  
মীনাঙ্কীর হাতে।—‘বাবা, আমি পাস করেছি। সেকেন্ড ক্লাস—  
কার্ট।’

তারপরই তাৎক। সমস্ত সময় কেটে গেল।

পড়লো লোকান্তরিতা বোনকে। তপতী? তপতী কই? বাথরুমে দরজা বন্ধ, জল পড়ছে স্বরস্বর—ওকি বেতবে আঁক সহজে।

মীনাঙ্কী আশ্চর্য হল। ভাবুর! সবার এত কামনার ভাস্কর—সে কি দেখে, কিসে মুগ্ধ হোক? এবটুও চেষ্টা না করে, তপতী তেলার হারিয়ে দিল লিলিকে! মনে মনে নিজেকে প্রশংসা করতে চাইলে, মীনাঙ্কী—তার পরিপাটি আলোজ্ঞান-ব্যবস্থার কথা শ্রবণ করে, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থান করতে পারল না। সে গরব চাইলো তপতীর দিকে। প্রসাধন-চতুরা মেয়েগুলির কাছে কি নিস্ত্র ভতপতী! নিস্ত্র? চোখে স্রবের আলো! কপাল গাল সব আলো। তপতী যেন আকাশ হয়ে গেছে—নিশিথ-দায়ী আধিনেব আকাশ।

নিজেকে—অজব্বারের নিজেকে মনে পড়লো মীনাঙ্কী। প্রায় লিতির মতই প্রাচুর্য ছিল তারও। মনে মনে—ককণা কবিতা দিলিকে। জানতো! শৈশবের শেষ নেই, তার সঙ্গে তুলনায় দিদি কিছু না হয়ে গিয়েছে। সেই দাবা-নিষ্ঠেই তপতীর মস্তকও হতাল হয়ে পড়েছিল সে। এবটু ভাবলো মীনাঙ্কী। তার কি শৈশবেরই সেদিন এগাফীর—সেই গুমল গুমল স্মৃতি বৃথাত পারেনি?

তাহা যেন নিজেকে একটু সস্তা আর গেলো নমন হল মীনাঙ্কীর। মনে হল—লাভ কি টুটনকে ইংরেজী জুলে খাটি, মিস্টার কাছে পড়িয়ে? অন্যর আকস্মিক দিয়ে ইংরেজী বলে কিন্তু বাংলা লিপিতে গোলমাল। খাটা ফক, ছাঁটা চুনের মেয়ের মধ্য ভবিষ্যৎ লিলিকে যেন দেখতে পেল মা, আর তাকে একটুও খুশি হোল না। লিলি! ইস! লিলি পারল না ভাস্করকে জয় করতে! নিজের ভাবনার চমকাল মীনাঙ্কী। সে কি তার মনে মনে তপতীর হারট চাইছিল নাকি? না, না ককণা না। তপতী! থু! গালে এ লাগল মীনাঙ্কীর চকল পার সে গিয়ে ঢুকল তপতীর ঘরে।

কানালার পাশে, ছোট টেবিলেতে হাতের উপর মাথা বেগে তপতী পড়ে বই—গল্পের বই। বরীন্দ্রনাথের 'নৌকাচুরি'। বড় সেকলে পড়ল মেয়েটির। কি, কি জানি! সেকলে হওয়াই বৃষ্টি আভাস আধুনিকতার পরিচয়।

—'থু!' মেয়ের সামনে এসে বসল মা।

—'কি চাই বল।'

—'কিসের?' অর্থাৎ চোখে তাকাল তপতী। চোখে তার নৌকাচুরির কমনার কন্ডা।

—'এই গমনা-টিনা আর কি?'

—'গমনা? ও।' একটু ছাড়া ছাড়া হোল তপতীর মুখ।

—'ওসব আমি জানি না কিছু।'

—'না জানলে চলে বৃষ্টি? মুক্কা তো ভালবাসিস তুই?'

—'ভালবাসি। মা, শোন—'এবটু ভেবে নিল তপতী, চাইল মীনাঙ্কীর বৈশিষ্ট্য মুখের দিকে। সে ভেবেছিল কথাটা বলবে বাবাকেই, কিন্তু মায়ের চেয়ে বাবা যে আরো অচেনা।

—'কি বলছিস?' মেয়ের কথা শুনতে ব্যাকুল হোল মা। সেই

মুখের দিয়ে চেয়ে—ব্যাকুল আর মমতামাখা মুখ, তপতী তার ক'দিনের ভাবনাটা গিলে ফেলল। মিথো বানাতে হত নিশ্চর, রক্ষা করল টুটন।

—'মা, চল, চল। দরজা এসেছে।' টানতে টানতে মীনাঙ্কীকে নিয়ে গেল টুটন।

গায় ছেড়ে বীচল তপতী। স ভাবছিল, মায়ের একখানা ছবি নিয়ে যাবে তার সঙ্গে—যে মা বড় চমনি, একটুও বনলান নি—সেই তার তরুণী মায়ের ছবি। ছবি আছে, জানে তপতী, মায়ের কম বয়স পরে বাপা ফটে। ঢাকাত শাড়ির পাড় লতিয়ে গেছে হাতের উপর দিয়ে, ঘামটার ছায়া মুখে সেট ফটো আছে বাজাঙ্কী হয়ে বস্করমে। কিন্তু মীনাঙ্কীকে—কি বলা যায় সে কথা? বলা যায়—আমার সেই এগাফীর ছবি নিয়ে যেতে চাই আমি।

—'থু!'

অসম্ভব চমকে ঠোঁট ঠাণ্ডালো তপতী। বাবা! জীবনে ষোড়শম প্রথম এসে মায়ের ঘরে ঢুকলেন শৈশবের রায়। তারিয়ে তারিয়ে দেখলেন চারদিকে। এই খাটে একদিন শিশু মিত্রছেন তিনি। এগাফীর শেষ নিশ্বাস পাড়েছিল এই ঘরে। হাতের ট্রাউজ কাগজে মোড়ি একটা কিছু এঁগিয়ে দিলেন মায়ের দিকে।

—'তোমার—এই তোমার মায়ের ছবি আর কি। তোমার সঙ্গেই থাকুক।'

এক মিনিটের জগা চোখে ব্যাপসা দেখলো তপতী। বাবা? বাবাকে ঠিক ভাস্করের মত লাগছে যেন দেখতে।

কাগজের আবরণ সরাতো দেখা দিল কষ্টাদশী এগাফী। তপতীর তারা হওয়া, বাতাস হওয়া মা চলে এসেছে ছবি হয়ে, বড় বড় চোখ মেলে তারিয়ে আছে মেয়ের দিকে। কোথায় ছিল? কোথায় ছিল এগাফী? কাঠের ফ্রেমে বন্ধী, বাস্কের মধ্যে কোণের ঘরে? শৈশবের মায়ের নিজেরও অজানা মনের একটি খোপে? চোখের জল মুছে ফেললো তপতী। একুণি আসবে মীনাঙ্কী তাকে কি দেখানো যায় চোখের জল আর বাবার উপহার—এই ফটো।

তার চেয়ে খাঁজ নেওয়া বক ভাস্করের পাতা নেই কেন সাতদিন ধবে। ভুলে গেছে? ভুলে গেছে তপতীকে? তবে কি হবে। আলনার হাত বাড়াল তপতী। চুকে চিকণী, খুচরো পরসা ব্যাগে, ট্রাম।



ক্যালকাটা অগটিক্যাল কোং (প্রাইভেট) লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা : ডাঃ কান্তিকচন্দ্র বসু এম-বি

৪৫ নং আমহাষ্ট্র ট্রাট কলিকাতা-২

ফোন : ৩৫-১৭১৭

আম-ক্যালঅপটিকে

ক্লাবের দরজা। কোনদিন এখানে একা আসে নি তপতী।  
অবশ্য আসাটাই ঘটেছে কশাচিৎ। এমন জায়গার এসে দাঁড়িয়েছে  
যে, প্লাস-ডোর একটু ঠেলে দিলেই একেবারে আসলো, সাজে, নাচে,  
গানে পরীয়াজ্ঞা দেখা দেবে। বয় বেরিয়ে এসে আইসক্রীমের শুল্পপাত্র  
নিরে। একি! তাড়াতাড়ি দরজা টেনে ধরল, তপতী পৌছালো  
গিরে আনন্দেব অন্তরমহলে।

হৈ-টৈ উঠল একটা। আবে। তপতী! মিস রায়! তপতী  
রায় এসেছে। ভাস্কর? ভাস্কর কই? পালিয়েছে? গ্রেপ্তার  
করতে শ্রীমতীর আগমন?

হাসি, উচ্চাঙ্গ বিপবন্ত হল তপতী। অবস্থা বুঝে তাড়াতাড়ি  
এগিয়ে এলা লিলি—এসো, এসো তপতী! বাড়ি গিয়েছিলে  
বুঝি? পাও নি আমার? আমি কি এখন বাড়ি থাকি?

এক নিমেষে সব প্রশ্ন খামিয়ে দিল লিলি। ও! লিলির  
খোঁজে এসেছে তপতী। মোরোর উৎসাহ বাড়ল—কেন? কেন?  
শাড়ির, বা, নেকলেসের স্টোন? বেশি দেখি,—পান্না! পান্না  
কেন দিল ভাস্কর? খুব ফর্দা না চল পান্না মান্যর না  
তেনন।

হাঁফ ধরলো তপতীর। সে চমকছিল লিলির সাধনা কবনার  
তৎপবন্তা দেখে, কৃতজ্ঞ হয়েছিল, বিস্ত্র এখন? এখন কি উত্তর  
দেবে? হাসলো কেবল দেহকাদের নিকে চেয়ে কল্প কল্প।

অবলম্বহাসের প্লাস ঠেলে দিল তপতীর নিকে। 'খাও।  
না, স্টোন-ফান নয় বেণু। আমিই খুঁজছিলাম তপতীর—  
একটা কানেকশন করাবার জুজ। ওর বন্ধু জুজুট্টা সোম—  
আর্টিস্ট। নিজস্ব এন্টা ভুজি আছে জুজুট্টা। তার চ' একটি  
ছবি রাখবে। একজিগিশনে—না'ন প্রতীতির আবিষ্কার।

—'ও! একজিগিশন! বোঁরা! বত সব— মেয়েরা ফিরে  
গেল নিজের কারখান—লাগল কাকলী দিল্লারে, তপতীকে নিয়ে  
কোরিয়ে গেল লিলি।

—'ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয় নি আজ, না?'

—'সাতদিন'। ঘোরে কল এসে গেল তপতীর।

—'একেবারে পাগল তুমি।' হুঁকতে তপতীর মুখ তুলে ধরলো  
লিলি।

—'হয় হো কোন কাজে পড়ে গেছে। জানি তো মস্তবড়  
অর্দর পড়েছে, হারিয়ে দিয়েছে কাঙ্ক্ষাসকে?'

—'জানি।'

—'তবে? বোকা মেয়ে।' লিলি বোসের এমন ব্রহ্মবরা গলা  
শুনলে অবাক হোত তার আলস্যী যে কেউ।

—'তোমার গাড়ি কই?'

—'গাড়িতে আসি নি। ট্রামে।'

—'আচ্ছা! কান্ড। এমন উতলা হয় নাকি এম-এ পাস  
একটা মেয়ে? মগাবীর—নিজের ডাইডারকে ডাকল লিলি—  
'মিসিথারকে আপনার। কোটীম ছোড় দনা—এই তো ভাস্কর।  
কোথার ডুব ঘেবেছিল সাতদিন? তপতী চিন্তার ক্লাবে চলে  
এসেছে। কান তো এখনকার বাপার!'

তপতী ক্লাবে? কি আশ্চর্য! অবাক হোল ভাস্কর। কাকের  
চাপে সাতদিন মাথা তুলবার সময় পায় নি সে। ক্লাবের সার্বক্ষণসনটা  
দিয়ে যেত তপতীর ওখানে। এত চিন্তার কি আছে!

—'যাচ্ছে, যাচ্ছে। ওসব বুঝবে না তুমি। আজ আর চুকতে  
হবে না ক্লাবে। ভাগো। বেড়িয়ে এস গে হুকনে। আমি?  
পেয়ে ফলবে অকল।'

হাসতে হাসতে পালিয়ে গেল লিলি।

গঙ্গার ধারে নিবাল দেখে তপতীকে নিয়ে বসলো ভাস্কর।  
জলে চায়ের বাক ছাত্র, দূর দূর একটা-দুটো নৌকা।

—'খুব মন কেমন করছিল বুঝি?' তপতীর হাত মুঠোয় ভরলো  
ভাস্কর।

—'তোমার তো আর করে নি।' ধরা গলা তপতীর।

—'করে নি? ভাব খাওয়া লাগছে কদিন ধরে। স্বাদ  
পাচ্ছি না মাথের রান্না ডিমের দমে পর্বন্ত।'

—'যাঃ। জান ভাস্কর, ওরা বলছিল—পান্না আমাকে মান্যর না।  
ফর্দা নই তো আমি।'

—'ক বলেছে? দেবতা রমসাবা তো?'

—'হুঁ। বলছিল খুব ফর্দা হাত না হলে পান্না ভাল লাগে না  
দেখতে।'

—'আমার নল লাগে পান্না হোমার আড়লে। তপতীর বা  
হাতটি মেলে ধরল ভাস্কর, অকস্মাতে অকস্মক করে উঠলো পান্নার  
সবুজ চোখ। শাস্ত্র স হের বসে বাড়ল হুঁ ঘটা। কদাচিৎ ছোট  
ছোট বখার ডেট, আর চুপচাপ। ছুটি ভরা মন কাছাকাছি—  
কথার অবকাশ কই। পুরুষের হুঁ একবার মনে পড়ল টেবিলের  
ফাটকুণ্ডল। মেয়ের মনে গত আর আগামী কোন ভাবনা নেই—  
কেবল বর্তমান। আকাশ তার হীরের চোখ মেলে দেখতে লাগলো  
সংসার-পালানো ছুটক। এ-নি দেখে 'আসছে বুঝি স্মৃতির প্রথম  
দিনটি' শুভে, আর দেখে দেখে দেখাতা পুরাণো হচ্ছে না একটুও।  
সংসার-পালানোদের জুজুট্টা তো টান নদীর জলে চুপি-চাপিরের বাতি  
খালার, রাত ঘন করে নিরাল বচনা করে রাখে।

[ক্রমশ।

এ মাঝে প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার মাসিক বহুযত্নের প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন

শিল্পী—সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়





● নৃত্যগীতের আসরে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ও বিখ্যাত লেখক শলোকভ

## শলোকভের সান্নিধ্যে

পরনে ছোটহাতা সাদা মাট আর প্যাণ্ট—নির্মল হাসিতে ভরা মুখ—বাতাসের বাপটায় রেশমের মত শুভ্র চুলগুলি এলোমেলো—রাশিয়ার মানুষ তাঁর চেহারার আভাসমাত্রে চিনতে পারে তাঁকে, একডাকে ঢেনে তাঁর নাম—শলোকভ। রাশিাবাসী ভালবাসে তাঁকে, ভালবাসে তাঁর সৃষ্টিকে। শলোকভ শুধু রুশ সাহিত্য-জগতে বরণ্য একটি নামমাত্র নয়, শলোকভ বিশ্ব-সাহিত্যে অতি পরিচিত একটি নাম।

শলোকভ মানব-জীবনালেখ্য শিল্পী। মানব-জীবনটাকে আকণ্ঠ পান করেছেন তিনি—তার ক্ষীরটুকু থেকে বিষটুকু—সব। কলম ধরেছেন তারপর। আর তাঁর হাতে-ধরা সেই কলম সৃষ্টি করেছে অমূল্য চরিত্ররাজি—বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা, তাদের জীবনের মাধ্যমে রুশ-ইতিহাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পথের বাক প্রতিফলিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এই বাকগুলোকে গণজীবন দিয়ে দেখতে চাইবে যে শলোকভ-সাহিত্য বিস্তারিত পাঠ করতেই হবে তাকে, সমন্বয়যোগে, সনিষ্ঠায়।

স্বদেশে শলোকভ একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক—এটা অতি তুচ্ছ কথা। জনপ্রিয়তা তাঁর সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। আমেরিকা, ভারতবর্গ, জাপান, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও বহুতর অত্যাশ্চর্য দেশে মানুষ সাগ্রহে জানতে চায় কি লিখছেন শলোকভ, কি ভাবছেন, কবে প্রকাশিত হবে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস।

শলোকভ-সৃষ্টির অন্তর-ঐশ্বর্য এই ভালবাসা এনে দেয়। তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছ থেকে। এ ঐশ্বর্যের প্রভা দীপ্ত করে সর্বদেশের সর্বকালের পাঠকমন। আশ্চর্য এই, শলোকভ-সাহিত্যের পটভূমিকা তাঁরই দেশ, তাঁরই কালের গণ্ডিতে সীমিত, শলোকভ-সাহিত্যের চরিত্রগুলি একান্তভাবে তাঁরই দেশের মাটি দিয়ে গড়া—ডন নদীর তীরের মাটি। তবু এতটুকুও অসুবিধা কোথাও বোধ করে না বিদেশী পাঠক, সুর কাটে না কোনখানে, রসের উৎসে কখনও কোন দৈর্ঘ্য বোধ করে না। 'And Quiet Flows the Don,' 'The Virgin Soil Uplturned,' 'Fate of a Man,' 'Azure' তৃণভূমি-র গল্পরাজি সব মানুষেরই বড় আপন ভাই, দেশ-কালের

সীমারেখাকে অতিক্রম করে লোকে লোকে বিজয়যাত্রা তাদের।

যুদ্ধ শুরু হয় নি তখনও—শলোকভের বয়স তিরিশের সীমানা পেরিয়েছে সেই সবে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি তখনই তাঁর গ্রামখানির ক্ষুদ্রগুণী ছাড়িয়ে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডন নদীর কূলে কূলে ছড়িয়ে পড়েছে বত কাহিনী তাঁর—শলোকভ তখনই কিশকস্তীর নায়ক।

ঐ নদীর কূলে কূলে আজও শলোকভের পাঠক খুঁজে পাবে তাঁর চিত্রগুলোকে—একবারে বাস্তব তারা জীবন্ত। চারপাশের জনজীবন থেকেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন সাহিত্যিক—দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না থেকে যুদ্ধের করাল কবলে পতিত মানুষের ভয়াল অভিজ্ঞতা অবধি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যে, অমৃত-সিদ্ধনে চিরন্তন করেছেন, তাদের অমর করেছেন।

যে সব বাস্তবজীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন শলোকভ, তাঁর গ্রামের আশে-পাশে এখানে-ওখানে অনেক সময়ই সন্ধান মেলে তাদের দেখা হয়ে যায় কারো কারো সংগে। শলোকভের গ্রামের কাছাকাছি এক গোলাবাড়িতে পাঠক বুড়ো সেই মানুষটিকে দেখতে পাবে—শচুকার নাকি সেই। প্রমাণ-স্বরূপ নিজের ঠোঁটটা দেখাবে সে—একবার একটা বড়শি গায়ে গিয়েছিল তারও ঠোঁটে। নিরপেক্ষ মানুষটি, তার 'The Virgin Soil Upturned' গ্রন্থের শচুকারের সব কথা জানে সে, সব কথা। আর এক কোজাক আছে, তার কাহিনী সুনলে গ্রিগরি নেলেকভকে মনে পড়বে। এমনি আরও বত।

'And Quiet Flows the Don'-এর সংগে সমগ্র তেহেংস্কায়া জেলাটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেন। শলোকভ তাঁর গোটা দেশটাই বেঁধে ফেলেছেন তাঁর উপন্যাসে। এখানে নতুন আগন্তুক যারা আসে, খুঁটিনাটি নানা চেনা জিনিস খুঁজে পায় তারা, চেনা ছবি দেখে। পথে যখন প্রথমে চোখে পড়ে স্বর্ষালোকে

বিক্রমিক করছে নীল ডনের ধানশস্যের রূপ তখনই কে জানে কোন অমোঘ প্রভাবে দর্শকদের পাঠকসভা রশ দপাশিল্লীর অনবচ্ছা উপন্যাসখানির কথা ভাবে।

মিখাইল আলেকজানড্রোভিচ শলোকভ—নামটা যত বড়, হৃদয়টা অনেক গুণ বড় তার চেয়ে। সবারই জ্ঞান অব্যবহিত তাঁর গৃহদ্বার, সবারই জ্ঞান তাঁর হাসিভরা প্রাণবন্ত মুখ—সেই যে মানুষটির জীবনের কুসল অতিবিচিত্রে অভিজ্ঞতায় ভরা, সেই যে মানুষটি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ এসে দাঁড়াতে দেখেছেন সামনে এবাধিকবার—ভীষণ হতে ভীষণতর পরিবেশে।...আজ তাঁর মাছ ধরার নিয়মণ রূপে এসে ধরা হল কত তরুণ লোক, কবি।

—এসো, কোপার নদীতে মাছ ধরবে—চমৎকার মাছের স্ত্যপ পাওয়া যাবে।

আন্তরিকতার উষ্ণ গৃহ সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। জীবন-শিক্ষা সংগে নিয়ে বেরোবেন বেড়াতে আর দেখাতে। মুখে-মুখে চলবে স্মৃতিচারণ—অতীত দিনের স্মৃতি, কত ভয়ানক দিনের স্মৃতি, মৃত্যুর তৃপ্তি-শ্বাস চোখে-মুখে এসে লেগেছিল যেদিন।...নদীর তীরে...শস্যক্ষেত্রে...অগ্রশস্ত্র মেঠো রাস্তা...স্ববিস্তারী তৃণভূমিতে বন হয়ে আছে পথের ছ'পাশ...গিগিরিখাত মাঝে মাঝে।

সেই পথেরই একস্থানে গাড়ি এসে থামবে।

সাহিত্যিক তাঁর অতিথিদের চিনিয়ে দেবেন জায়গাটা, এখানে এই টিলা গুলোর তলায় আমার বন্ধুরা ঘুমিয়ে আছে, আমার কন্মরেডরা।

অতিথির স্থির হয়ে দাঁড়াতে মাথা নীচ করে।

জীবনের দক্ষ রূপকার নীচ হয়ে একগোছা বুনো ফুল তুলবেন নিজে হাতে, প্রত্যেকের হাতে দেবেন একটা করে।

—এ ফুল শুকায় না কোনদিন। নিশ্চয় সেই প্রকৃতির রাজ্যে ধীর শাস্ত কণ্ঠ আবার শোনা যাবে, ধীরপ্রবাহিনী ডনের গভীরতার স্পর্শ বৃষ্টি তাতে।—প্রয়াসী

## সাহিত্য পরিচয়

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত / ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—বিবচিত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—গল্প সংস্করণ মধ্যলীলা (১) ও (২) ও অন্তলীলা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিবচিত্র শ্রীচৈতন্য

একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, বস্তুত ভক্ত বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এই উভয়বিধ পাঠকের কাছেই এ গ্রন্থের মূল্য অসীম, এই গ্রন্থের সর্বজনবোধ্য ভাষায় সন্নয়ন গভীরভাবে করে অনুবাদক বহুজনের কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন। মূলগ্রন্থ পয়ার ছন্দে লিখিত বলে তার মাঝে কিছু কিছু ভ্রমোদ্যতা আছে

## সাহিত্য পরিচয়

প্রকাশ করেছেন, পয়ারগুলিকে সাবলীল বাংলা গজে অম্ববাদ করে তৎসহ টাকা-টিঙ্কনী। যোগ করে মনোরম করে তুলেছেন, তাঁর শৈলী এতই স্বচ্ছন্দ যে, অতি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী পাঠকও অবলীলাক্রমে এই মহৎ গ্রন্থের রসগ্রহণ করতে সক্ষম হন। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রাক-সন্ন্যাস-গৃহজীবনকে আদিদলীলা ও উত্তর-সন্ন্যাস-জীবনকে শেষদলীলা বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, শেষদলীলা আবার দুই ভাগে বিভক্ত মন্য ও গন্ত্য, বর্তমান গ্রন্থগুলি এই মন্য ও গন্ত্যদলীলার পর্যায়ভুক্ত। সন্ন্যাস গ্রন্থের পর মহাপ্রভু চাঁপশ বছর প্রাকটী ছিলেন, এর প্রথম ছয় বৎসর কালকে মধ্যদলীলা কাল ও বাকি অষ্টাবো বৎসরকে গন্ত্যদলীলা কাল বলে অভিহিত করা হয়; এই চাঁপশ বছর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যেভাবে জীবন আতিবাহিত করেছেন, যেভাবে ধর্মশিক্ষা প্রদান করেছেন, তার মধুর ও পুণ্ড কাহিনী অম্ববাদকের আত্মবিকল্পে যেন জীবন্ত হয়ে দূর দেয় পাঠকের মননে। মহাপ্রভুর জীবনের যুদ্ধ অসাদৃশ্যভাবে জড়িত তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগুণের জীবনকথা ও কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশিত; যেসম্পদ রয়েছে বহু কৌতুহলোদ্দীপক লোককথা ও গাঁথা। একদিন বীর কল্যাণে সমগ্র বাংলায় ভক্ত ও প্রেমরসের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তাঁর অপরূপ দিবাজীবন-কথাকে সাধারণ বাঙালীর আঁচনায় পৌঁছে দিয়ে অম্ববাদক এক পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের পূণ্য লাভ করলেন। যাতে 'শাণ্ডপুর ডুব ডুব, নদে ভেসে যায়' তাঁর মহিমা বাঙালী পাঠক অতি সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে সত্যিই থম্ব হলে। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও অম্ববাদক উভয়ত আমাদের তথা সমগ্র বাঙালী ভক্তজনের প্রভুত সাধুবাদের আধিকারী; আমরা এই মহৎ অম্ববাদকর্মের সমাদ্রাণ সামল্য কামনা করি। গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদ সজ্জা অতি মনোরম, অপরাপর আঙ্গিকও ক্রটিহীন। মূল লেখক—শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কাঁবরাজ, অম্ববাদক—শ্রীকুম্ভরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রকাশক—শ্রীকুম্ভরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি ভবন, রিলকু, শিলং সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিলং, দাম—যথাক্রমে মধ্যদলীলা (১)—সাত টাকা; মধ্যদলীলা (২)—ছয় টাকা ও অন্ত্যদলীলা—সাত টাকা।

## বাংলা কাব্যপ্রবাহ / রূপা অ্যাণ্ড কোং

বাংলা কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আজ অর্বাচ যথেষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে বটে কিন্তু ঠিক এ ধরনের সমাদ্র-সুন্দর কোন সমালোচন গ্রন্থ লেখবার প্রচেষ্টা বিরল, সৌন্দর্য দিয়ে দেখতে গেলে গ্রন্থকার একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছেন।—প্রাচীন বাংলায় প্রথম কাব্য-সাহিত্যের আবিষ্কার ঘটে চর্যাপদের মাধ্যমে। এ গ্রন্থে

সেই যুগ থেকে কবি ভারতচন্দ্র অবধি যে কাব্যযুগ, তারই এক ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে।—প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল সীমা পর্যন্ত যে যুগ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই ইতিহাস তার মধ্যেই সীমিত, বলা বাহুল্য আধুনিক কালের কাব্য-সাহিত্য এই পরিক্রমের অন্তর্গত নয়, যার জন্ম এ রচনাকে সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস বলা সম্ভব নয়।—লেখক য যুগের দাব্যদাবকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার মধ্যে এমন সব রচনাকেই বেছে নিয়েছেন—যার মধ্যে বিশেষভাবে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য প্রকট এবং সেজন্যই তাঁর রচনা সবতোভাবেই বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব পটভূমিকেই প্রকাশ করে।—আলোচ্য কাব্য-সমালোচনা গ্রন্থটিকেও সেজন্যই বাংলার কাব্য-প্রবাহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভূমিকাধরুপই উল্লেখ করা চলে।—বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বাঙালীর যে প্রাণসম্পন্ন নিন্ত্য প্রবহমান, নিপুণ বিশ্লেষণে সেটাকেই যেন তুলে ধরেছেন লেখক পাঠক মনে।—সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিক্ষার্থী এই উত্তরাবধ পাঠকেই বর্তমান গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হবেন।—বাংলা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন।—প্রবন্ধ শোভন, ছাপা ও বান্ধাই যথাযথ।—লেখক—চিত্তরঞ্জন মাইতি, প্রকাশনায়—রূপা অ্যাণ্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দশ টাকা।

## গুরুদাবর শান্তিনিকেতন / বুকল্যাণ্ড

বর্তমান গ্রন্থটিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে সেকালের শান্তিনিকেতন ও তার পরিবেশ।—শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মৌলিক আদর্শ ছিল, তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে। লেখক কবিত্বেরে বহুদিন কাটিয়েছেন সেকালের শান্তিনিকেতনে, প্রত্যক্ষ করেছেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে, উপলব্ধি করেছেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাটিকে। এজন্যই তাঁর রচনা হয়ে উঠতে পেরেছে একাধারে প্রামাণ্য ও চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন এ দুয়েরই একটি ছাঁচ তুলে ধরতে পেরেছেন তিনি পাঠকের চোখে।—শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারত, যদি লেখক শৈলী সম্বন্ধে আর একটু সাবধান হতেন। তাঁহার প্রসাদগুণে বাঞ্ছিত হওয়ার জন্যই যেন তাঁর বক্তব্য মাঝে মাঝে বেশ দুর্বল ঠেকে।—আঙ্গিক, ছাপা ও বান্ধাই যথাযথ।—লেখক—প্রবুলকুমার সরকার, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১, শঙ্কর ঘোষ সেন, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

## The Conscience of A Liberal / আত্মারাম অ্যাণ্ড সন্স

আলোচ্য গ্রন্থ শুধু এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরই স্বাক্ষর বহন করছে না; জাতির আদর্শ ও রাজনৈতিক চেতনায় লেখকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাকেও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। আজকের ছুনিয়ায় বুদ্ধিবাদী ও চিন্তাশীল গণনাগরীরা যে পথ অবলম্বন করতে চাইছেন, তার আভাস বহুদিন পূর্বেই লেখকের মননে উঁকি দিয়েছিল আর সেই পথেই তিনি আজ পর্যন্ত সন্ধানার্থ চালায়ে এসেছেন। কাজেই এ গ্রন্থে শুধু একটামাত্র মানুষেরই রাজনৈতিক মতামত প্রতিফলিত হয় নি সমস্ত যুগোৎসাহকেই মূর্ত করে তোলা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে বর্ণবৈষম্য পর্যন্ত বহুবিধ সমস্যাতে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেছেন লেখক। মানুষের অগ্রগমনের পথে আজও যা বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে তার সবগুলির সম্বন্ধেই তিনি চিন্তা করেছেন, আর শুধু চিন্তা করেই নিরস্ত হন নি, সমাধানের পথও খুঁজেছেন। আজকের ছুনিয়ার এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম দলিল স্বরূপ এই গ্রন্থ, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে আদৃত; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ গ্রন্থ শ্রীচেকার বোলসের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী থেকে সংকলিত এক সংগ্রহ, যাকে একটা অণ্ড ও দারাবাহিক পূর্ণতায় গ্রথিত করা হয়েছে। প্রজ্জদ মনোরম, প্রপরাপার আঙ্গিক ক্রটিহীন, লেখক চেকার বোলস্। সম্পাদক—হেনরী স্টীল ক্যাম্ব্রজ, প্রকাশনা—আত্মারাম অ্যাণ্ড সন্স, বকসেলার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কাম্ব্রী গ্রেট, ইংল্যান্ড—৬। দাম—নয় টাকা।

### ভ্রাম্যমাণ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

আলোচ্য গ্রন্থ দিলীপকুমারের বহুপুর্বে প্রকাশিত আর একটি রচনা 'ভ্রাম্যমাণের দিন পাঞ্জাব'র নবতম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। লেখকের আধিকাংশ রচনার মতই এ রচনাও স্বাধীচারণের চংএ লেখা। বাংলা দেশে বর্তমানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে জনপ্রিয়তা সর্বত্রই চোখে পড়ে, পাঁচশ-তিন বছর আগে তা একরকম অভাবনীয়ই ছিল। মার্গসঙ্গীত তখনও সাধারণ বাঙালীর মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি। মুষ্টিমেয় ধনী ও মৌণীন ব্যক্তির কাছেই তার তখন যা কিছু আদর-কদর। গৃহস্থ ভদ্রসন্তান যে আবার রাগসঙ্গীতকে জীবিকা স্বরূপও বরণ করতে পারে, একথা তখনও অকল্পনীয় সাধারণের পক্ষে। সেইসময় লেখক পারব্রাজক হয়েছেন রাগসঙ্গীত শোনা ও

হয়েছেন ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রাণসত্তার সঙ্গে, কত বড় বড় গুণীর সংস্পর্শে এসেছেন, গান শুনেছেন প্রাণভরে। কলঙ্কের ভয় তুচ্ছ করে এমন সব স্থানে পদার্পণ করেছেন, যাতে অপযাণ অজিত হয়েছে। কিন্তু গান তিনি শুনেছেন। শিখেছেন; কাঁটার ঘা খেয়ে সঙ্গীতের রক্তগোলাপ তাঁর মুঠোয় এসেছে। আত্মাণে ভরে গেছে চিন্তা, পূর্ণ হয়ে উঠেছে হৃদয়। আলোচ্য রচনা এরই স্বাধীচারণ সঙ্গীতাত্মক পাঠ্যকর্ম—এই যে এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দিলীপকুমারের শৈলী স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হলেও, তার এক অল্পম মধুর্য আছে, স্নন্দর স্নন্দর শব্দচয়ন করে তিনি ভাষার মালা গাঁথেন; কাব্য বস্তুত মধুরনা এই ভাষার প্রমাদে তাঁর বক্তব্যও হয়ে ওঠে রূপকথারই মতো অপকৃপ। আলোচ্য গ্রন্থেও এর স্বাক্ষর মিলবে। প্রজ্জদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—দিলীপকুমার রায়। প্রকাশনা—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—মাত্র টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### শরৎচন্দ্রের জীবনের

#### একদিক / পূর্বাচল প্রকাশনী

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষের কদিনের এক আকর্ষণীয় রোজনামচা এই গ্রন্থ। লেখক শরৎচন্দ্রের দানিষ্ঠ আত্মীয়। এই দিকপাল কথা-সাহিত্যিকের জীবনের শেষ কটা দিন তাঁর সামিধ্যে কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন লেখক। আলোচ্য রচনায় তারই স্বাধীচারণ করেছেন। লেখকের শৈলী এতই সাবলীল যে, ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের এক পরিচ্ছন্ন পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাঁর রচনায়। শরৎচন্দ্রের খোয়ালী ও উদাসীন মানসিকতা বড় স্নন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে টুকরো টুকরো কথা ও দৈনন্দিন ছোট-গাট ঘটনার মাধ্যমে। মানুষ শরৎচন্দ্র যেন একেবারে কাছটিতে এসে ধরা দেন। রোগযন্ত্রণার যে বিবরণ লেখক দিয়েছেন, তাতে হৃদয় বেদনা-বিধুর হয়ে ওঠে, সব মিলিয়ে যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন, তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই প্রাণবন্ত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিকের জীবনের শেষ কটা দিনের এই ছবি তাঁর অগুরাগী পাঠকবৃন্দকে একাগ্রারে অভিভূত ও আনন্দিত করে তুলবে বলেই আমরা আশা করি। প্রজ্জদ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—পূর্বাচল প্রকাশনী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

### রম্যায়ণ বীক্ষা / হিমাচল পর্ব (এ মুখার্জী)

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের ঐচ্ছিক পুস্তক।

## গাইহত্য পরিচয়

মহাভারতের প্রাপ্ত পেকে প্রাপ্ত, আর সন্মমণের সেই অভিজ্ঞতাকেই উপস্থিত করেছেন রেখার বাধনে বেঁধে। এই পর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেইসঙ্গে হিমালয় উপত্যকারও। বসন্ত হিমালয় প্রদেশের কাহিনীই প্রধান ভূমিকার অধিকারী বল এর নাম হিমালয় পর্ব। লেখক দেশদমণ করেছেন, টারিস্টের সন্ধানী চোখ নিয়ে নয়, দার্শনিকের নেজাঙ নিয়ে। তাই তাঁর বিনয়বস্ত্রশ্রেণে নেই গতাভ্যুগতিক সঙ্গকারীর বৈশিষ্ট্যহীনতা। ভারতের জলবায়ুর বিশ্লেষণ না করে তিনি চেয়েছেন ভারত আশ্রয় মর্যাদার করতে, সেইসঙ্গে মানবের ইতিহাস পুনরায় করতে, তাই তাঁর কাহিনী এত বিচিত্র, এত জীবন্ত। এক অদমা কৌতুহল পাঠককে টেনে নিয়ে যায় গ্রন্থসমাপ্তির মুহূর্ত পর্যন্ত, ভাল রচনা বলেই তাই শুধু এর রচনার পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নয়, ভালোলাগার মত রচনা হয়েই এর সার্থকতা। লেখকের শৈলী অসহ্য আকর্ষণীয় ও সাবলীল। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত্র, ছাপা ও বাধাই জটিল। লেখক—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী, প্রকাশক—এ, মুখার্জী এন্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১, বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—আট টাকা।

## কঠিন / গ্রন্থজগৎ

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্য-সংকলন। কাব্যের স্বাচ্ছন্দ্য মোট সাতাশটি কাব্যের সংগ্রহ। এই সংকলনে। বেশ একটা সহজ অথচ সাবলীল সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যায় কাব্যভাষার মাঝে। কয়েকটি কাব্যের মাঝে লিরিকের ব্যঙ্গনা খুঁজে পাওয়া যাবে। অসম্ভব 'ভূমি এলে' কাব্যটি উল্লেখ্য বিশেষভাবেই। কয়েকটি কাব্যের ভাব কঠিন শব্দের প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত। এসব ক্ষেত্রে কাব্য শব্দচয়নে আর একটু সাবধান হতে পারতেন। সে যাই হোক আধুনিক কাব্যভাষায় পাঠক এ কাব্য-সংকলনটিকে সন্মদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাধাই যথাযথ। লেখক—মুকুল গুহ। প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

## রাধা-মদনমোহন / আর কে পাবলিশিং কোং

আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী কিশোরস্তম্ভমূলক। বৌদ্ধধর্ম নয়, এই শহর কলকাতারই এক অঞ্চল বাগবাজার, যেখানে আজও সগৌরবে বিরাজিত, বাগবাজারের বিখ্যাত মিত্র-বংশের কুলদেবতা 'মদনমোহন'। বর্তমান গ্রন্থেরও মূল উপজীব্য এই বিগ্রহ। প্রায় আড়াইশো বছর আগে, বাগবাজারের স্নানমন্ডপে শ্রীগোকুল মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন মদনমোহনকে বিশাল মন্দির নির্মাণ করে। তার আগে এ বিগ্রহ ছিলেন বিষ্ণুরূপে। সে যাই হোক, কিশোরস্তম্ভ আজও

এই ৬গোকুল মিত্রের সেবায় তুষ্ট হয়ে ও লীলাসাম্পদনরূপে বেছে নেন মিত্রজার অনিন্দ্য-সুন্দরী বিধবা কন্যা রাধাকে। এই রাধাই সেই রাধা, যিনি আত্ম বিব্রাজ করছেন শ্রীবিগ্রহের পাশে, স্বপ্নে আশ্রয় পেয়েই নারিক ৬গোকুল মিত্র স্মরণ করার অনুরূপ মুক্তিরূপে রাধারাগীর মূর্তি প্রস্তুত করান। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক আকর্ষণীয় ভিত্তিতে কাহিনীটি সুবিস্তারে বিবৃত করেছেন, লেখক পাঁচের মিত্র দংশজ ও বর্তমানে রাধা-মদনমোহনের সেবায় সজেনই তাঁর রচনা তথ্যানুগত ও গোপন্য হয়ে উঠে গেলেও, সেই সঙ্গে রয়েছে সেকালের কলকাতার গাইহত্য তথা কবিওয়ালা, পক্ষীর লড়াই, হাক্কি-আক্কি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সন্ধানী ও সম্ভাব্য এই উত্তরাবদ পাঠকের কাছেই আলোচ্য রচনাটি মূল্যবান বলে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। আমরা এ বই পড়ে সত্যিই আনন্দিত হয়েছি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত্র, ছাপা ও বাধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশনায়—আর কে পাবলিশিং কোং। ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন, মদনমোহনতলা, কলিকাতা-৫। দাম—পাঁচ টাকা।

## Chandi's The Third Eye

### View / ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়

কাটুন বা বাক্সাচর অন্ধনে আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের দক্ষতা সর্বত্র স্বীকৃত, শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও তাঁহার নাম সুপরিচিত। বর্তমান গ্রন্থ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কাটুন সমূহের এক সুন্দর সংকলন। আলোচ্য কাটুনগুলি শুধু চিত্রধর্মী নয় সম্পূর্ণরূপেই সমান সচেতন, অর্থাৎ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের এক পরিচ্ছন্ন আভাসে সমৃদ্ধ, আর সে জন্যই এই বাক্সাচর সংকলনটিকে শুধু উপভোগ্য না বলে মূল্যবান বলাই সম্ভব। আমরা এ গ্রন্থের সর্বস্বাধীন সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থটির আঙ্গিক মনোরম, ছাপা ও বাধাই যথাযথ। লেখক—শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী, প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ৬-এ, বাক্সারাম অক্ষর লেন, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

## New Steps / শিশুসাহিত্য সংসদ

আলোচ্য রচনাটি শিশুপাঠ্য, শিশুদের উপযোগী ইংরাজী বর্ণমালার অনুরূপ অত্যাশেই কিশু ঠিক এই ধরনের একটি সচিত্র বর্ণপরিচয় বড় একটা চোখে পড়ে না। এতে শুধু ইংরাজী বর্ণমালারই পরিচয় প্রদত্ত হয় নি, তাদের নিভুলভাবে উচ্চারণ করতেও শেখানো হয়েছে।—বিদেশী ভাষায় ঘরের ছেলেমেয়েদের হাতেখড়ি দিতে বর্তমান পুস্তকটি বিশেষ সহায়তা করবে বলেই মনে হয়।—বইটির আঙ্গিকও আকর্ষণীয়।—লেখক—সুখলতা রাও, প্রকাশনায়—শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিমিটেড, ৩-এ, আচার্য প্রমুখচন্দ্র



● নিকোলাস-পুত্র বিখ্যাত শিল্পী ভেটোম্লাভ রোয়েরিক

কু উপত্যকার প্রাচীন নাম কুলুতা, এই উপত্যকার  
আমলাকলে অবস্থিত নাগর একটি ছোট গ্রাম।  
সম্মুখে ধ্যানমগ্ন তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গ, এখানে দেওদার  
ও ঘন পাইনবনের আড়ালে একটি বড় চতুষ্কোণ স্থতিস্তম্ভ  
চোখে পড়ে। তাতে লেখা—

—‘১৯৩৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এখানে তারতের

আজ ৯ই অক্টোবর আমার স্বর্গত পিতা নিকোলাস  
রোয়েরিকের ৯০তম জন্মদিবস, এই পূর্ণাদিনে আমি  
তার সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলতে চাই।

পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী জগদ্বলাল নেহরু আমার  
পিছুদেবের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বলেছিলেন—

‘যখন আমি নিকোলাস রোয়েরিকের কথা ভাবি, তার

## শিল্পী ও দার্শনিক নিকোলাস রোয়েরিক

৯ই অক্টোবর অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিকের ৯০তম জন্মাবসিক উপলক্ষে  
ভেটোম্লাভ রোয়েরিকের বেতার ভাষণ।

মহান কৃশীৰঙ্গ নিকোলাস রোয়েরিকের মরদেহ সমাধিত  
হয়েছে—এখানে শান্তি বিরাজ করুক।’

খেয়ালি প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া প্রায় চতুষ্কোণাকার  
এই স্থতিস্তম্ভ এক পূর্ণাঙ্গীতরূপে বান্ধিত। মনে হয়  
নিকটস্থ গিরিগোত্রচাত এই প্রস্তরখণ্ড যেখানে  
হিমালয়ের চারপার্শ্ব মহানিদ্রাবৃত যেখানে তার নন্দরদেহ

বহুমুখী কার্যকলাপ এবং বিচিত্র স্বজনী প্রতিভা আমাকে  
বিস্ময়ভূত করে। মহান শিল্পী মনীষী ও লেখক,  
গায়নামা প্রকৃতিদ্বন্দ্ব ও আবিষ্কারক হিসাবে তিনি তার  
মনীষার দীপ্তিতে মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে আলোকিত  
করে গেছেন। তার শিল্পকর্ম সংখ্যায় বিপুল। হাজার  
হাজার ছবি তিনি এঁকেছেন এবং প্রত্যেকটিই অনবদ্য।

## শিল্পী ও দার্শনিক নিকোলাস রোয়েরিক

পর্বতমালার আঁক্কি রূপটি সুপরিষ্কৃত, আমাদের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত সাধার্ম্যিক ঐতিহ্যের মূল বিষয়বস্তু যে নিপুণ তুলনায় নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে তা শুধু অতীতের নয়, ভারতের চিরকালীন শাস্ত্র সম্পদের কথা স্মরণ থাকে। নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর চিত্রকলায় এই মহৎ ভাবটি সুন্দর করে পরিষ্কৃত করেছেন, তাই তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারি না।

যে মানুষ এমনি এক লোকোন্তর স্বীকৃতিপত্র করে গেছেন এবং একটি বিরাট উত্তরাধিকার রেখে গেছেন—এই সংক্ষিপ্ত বোতাম ভাষণে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা উৎসাহ, তাই আমি শুধু তাঁর জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করবো।

আমার পিতৃদেবের কথা যখনই মনে পড়ে তাঁর শুধু স্মৃত প্রশান্ত মুখখানি—সর্বদা আমার সামনে ভেসে ওঠে। তাঁর জ্ঞানদীপ্ত চক্ষু, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে, আমি একদিনও তাঁকে কড়া কথা বলতে শুনি নি। তাঁর প্রসন্ন মুখ মানসিক শান্তি ও চারিত্রিক আদর্শের প্রতীক। পিতৃদেবের কঠোর কোনলে মিশ্রিত ব্যক্তিত্ব, রস-স্নিগ্ধ মননশীলতা তাঁকে উন্নত জীবনবোধে প্রদীপ্ত করেছিল। তাঁর আবার আবারও একটা স্মৃতি সামঞ্জস্য ছিল। কখনও কোন বিষয়ে তিনি ভাবাহুড়ো করেন নি। তবু তাঁর সৃষ্টিসংখ্যা বিপুল, যখন তিনি ছবি আঁকতে বা লিখতে বসছেন বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি বসছেন। গোটা গোটা করে বড় বড় অক্ষরে তাঁর লেখা কোনদিন তিনি কাটতেন না বা কোন অংশ তিনি সংশোধন করতেন না, তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং ভাবধারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উৎসারিত ছিল, পিতৃদেবকে কখনও দৈর্ঘ্যাত হতে দেখা যায় নি, চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি অবিচলিত থাকতেন।

ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই তিনি ইতালীর নব জাগরণের মহানায়ক লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর মতবাদের সাথে পরিচিত হন, সত্য ও সুন্দরের সাধনা ও সেবাবলে অতুপ্রাণিত হয়ে তরুণ রোয়েরিক এই মহানায়কদের চিন্তাধারাকে অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৫ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ-এর এক বনেদী স্ট্রোভিনোভীয় পরিবারে রোয়েরিকের জন্ম। একই সঙ্গে তিনি ললিতকলা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রাধিবিভাগীয় বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এমন কি পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা ছিল অদম্য এবং স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে একবার যা শুনতেন তা কোনদিন ভুলতেন না।



● স্বর্গত নেহরু এবং শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক  
(কল, মে ১৯৪২)

মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অন্বেষণ শুরু করেন। যে ৪৩ বছর তিনি রাশিয়ায় ছিলেন তা তাঁর অসামান্য ত্যাগ ও কৃতিত্বে সমৃদ্ধ। শিল্পকলা ও অগ্রাধি বিষয়ের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। এ ছাড়া নানান ধরনের সংস্থা ও সংগঠন তিনি গড়ে তুলেছিলেন এবং নানা রকমের কাজ-কর্মে তাঁকে জড়িত থাকতে হয়েছিল। এত সমস্ত করেও তিনি হাজার হাজার ছবি আঁকেছেন। বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ও গীর্জার, প্রাচীর-প্রাচীরের নক্সা ও মেজের অলঙ্করণ, এমন কি অনেক অভিনয় মঞ্চ ও কক্ষের নক্সা ও সাজসজ্জা পর্যন্ত তাঁকে করে দিতে হয়েছে, পিতৃদেব শিল্পকলা ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ, ছোট গল্প, রূপকথা ও কবিতা তিনি লিখতেন, আবার গবেষণাও করতেন প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস আর শিল্পকলা সম্পর্কে। এসব বাদে

আবার মূল্যবান চিত্র ও শিল্পকলা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য তাঁকে অনেক সময় দিতে হতো। রোয়েরিকের আঁকা প্যারিসের কয়েকটি বিখ্যাত রক্ষনকের নাম আজ 'রাসিকের' পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দুঃখের কথা, প্রাচীরগাত্রে ও দেওয়ালে তাঁর আঁকা নয়াগুলির অধিকাংশই যুদ্ধে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন রকমে যে ক'টি টিকে গেছিল সেগুলির পুনঃসংস্কার করা হয়েছে, আমার পিতার গ্যাতি অজয়স থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে তিনি যখন বিশ্বদর্শণে বেরুলেন তখন সর্বত্রই তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন।

প্রাচ্য-দর্শনের প্রতি পিতৃদেবের আকর্ষণ আশ্চর্য। এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই রাশিয়ায় শ্রীযাক্ক-বিবেকানন্দ সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। লিথুয়ানিয়ান কবি বালটিক সাহিত্যিক বব্রিন্সনাথের কবিতা রশ ভাষায় অনুবাদ করেন, এই সময় বাথানায়া রুশ-শিল্পী পলুবোভের উদ্বোধনে প্যারিসে ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রদর্শনীতে পিতৃদেব একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তার শেষে তিনি লিখেছিলেন :—

'Beauty still lives in India.

Beckons to us.

'The great Indian path.'

পরবর্তীকালে এই 'পথ'ই আমার পিতাকে ও তাঁর মাধামে প্রত্যক্ষ শিল্পরসিকদের সুন্দর দেশ ও এর হিমালয়ের অপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ছবি আঁকার দুর্বীর আকর্ষণে আমার পিতৃদেবের মনকে টেনেছিল। তাঁর আত্মজন্মস্থানের যে নিরবচ্ছিন্ন পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল সে তাঁর প্রাচ্য-দর্শন অমূল্যলনের ফল। এই আত্মজন্মস্থান পিতৃদেবের সমগ্র জীবন একটি স্বর্ণস্থলে গ্রথিত করে রেখেছিল।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তিনি যা খুঁজেছিলেন তা পেয়েছিলেন কি? ইয়া, হাজার বার বলবো ইয়া। জীবনের অন্তরালোকে যে রসরূপকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁকে অনির্বচনীয় আনন্দানুরাগে উত্তরণ করেছিল।

কেবল রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা নয়, এশিয়া এমন কি মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে তিনি মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন ও জাপান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এজন্য বহু দুঃখ-কষ্ট তাঁকে বরণ করতে হয়েছে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে, একবার একটি পার্বত্য পথ অতিক্রম করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের হাতে তাঁকে ভীষণ দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। মাঝপথে তারা এই যাত্রীদলকে আটকিয়ে রাখে। ১৬ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে শীতবস্ত্র ছাড়া সারা শীতকালটা কাটাতে হয় প্রচণ্ড

শীতে আর গাভাতাবে তাঁদের সঙ্গের ভারবাহী পশুগুলি সব ক'টিই মারা যায়। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও আমার পিতা তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সুন্দর সুন্দর ছবিও আঁকেছেন।

আমার মা ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গিনী। তিনিও ছিলেন দর্শনের দ্বাত্রী। অনেক বইও তিনি লিখেছেন। পিতৃদেবের সমগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার তিনি অংশভাগিনী ছিলেন। তাঁর অনেক ভাবকল্পনা পিতার তুলির টানে অমর হয়ে আছে। পিতৃদেব তাঁর অনেকগুলি বইও মার নামে উৎসর্গ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মূল উৎসের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ খটেছিল। মারা ভারতবর্ষ এবং হিমালয়ের সমগ্র অঞ্চল তিনি ঘরে দেবার পর কলু উপত্যকায় বসবাসের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪৭ সালে জীবনের আন্তিমযাত্রা পর্যন্ত তিনি এখানেই কাটিয়েছেন। রুশ-ভারত সম্পর্ক ঝিক করে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা যায় এই চিন্তাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়। মঙ্গোলিয়া যুদ্ধের সময় ভারত সম্পর্কে এক পবনের শেষে তিনি লিখেছিলেন :—

'হে সুন্দরী ভারত, তোমার প্রাচীন নগর মন্দির, পথ-প্রান্তর, তোমার পবিত্র নদ-নদী ও হিমশিখরি ভূমি যে উদার মহত্বে গম্ভীরবিত করে রেখেছে সেজন্য তোমায় জানাই আমার আন্তর প্রণতি।'

শিল্পী হিসাবে রোয়েরিকের একটি নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গী রয়েছে। তিনি ছিলেন রংয়ের যাক্ষর। তাঁর মন যে বিচিত্রচিত্র কল্পনার জাল বনে চলতো তার ওপর বিচিত্র রং ফলিয়ে তিনি ছবি আঁকে চলতেন। বিখ্যাত রূপ-সাহিত্যিক পোঁকি তাঁকে 'সেরা সহজদ্রষ্টা' বলে ডাকতেন, লিওনিড এগুরুজ তাঁর চিত্রকলাকে 'রোয়েরিকের বাস্তব দর্শন' বলে অভিহিত করেছেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃদেবকে লিখেছিলেন, 'আপনার আঁকা ছবিগুলি আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছে, একটা জিনিস আমি এগুলির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যা সুস্পষ্ট হলেও ব্যাধার উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সে হচ্ছে—সত্য, অসমী ও অনন্ত। আপনার ছবিগুলি নিখুঁত, কিন্তু ভাষায় তার ব্যাখ্যা চলে না। আপনার শিল্পকলা তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ।'

যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ যাতে রক্ষা পায় সেজন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে রোয়েরিকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই চুক্তি পিতার জীবিত থাকার সময়েই 'রোয়েরিক চুক্তি' খ্যাতিলাভ করেছিল। ১৯৫৪ সালে হেগ-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে চুক্তি



স্বাক্ষরিত হয় সেটি মূলত ঐ রোয়েরিক-চুক্তির ভিত্তিতেই রচিত।

পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর একটি বিরাট তালিকা রয়েছে। এক ডজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থ রয়েছে। এ ছাড়া বহু খ্যাতিমান লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক পিতৃদেবের চিত্রকলা ও রচনার উপর শত শত প্রবন্ধ লিখেছেন। পিতৃদেবের অপ্রকাশিত অনেক পুস্তক প্রকাশনের তোড়জোড়ও চলছে। একটি সংকলন সোভিয়েট ইউনিয়নে সমুদ্র প্রকাশিত হয়েছে।

জীবদ্দশাতেই তাঁকে বহু দেশ সম্মানিত করেছে। কয়েকটি দেশের সর্বোচ্চ সম্মানেও তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। প্রায় ছয়টিরও অধিক একাডেমীর তিনি 'ফেলো' ছিলেন। এ ছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট ও সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে তাঁর চিত্রকলা ও রচনা। তাঁর রচনা ২৭টি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বহু রচনা এখনও অপ্রকাশিত থেকে গেছে। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :— 'Collected Works,' 'Flame in Chalice,' 'Altai Himalaya,' 'Heart of Asia,' 'Realm of Light,' 'Fiery Stronghold,' 'Shambhala,' 'Paths of Blessings,' 'Gates into the Future,' 'Himalayas—Abode of Light.'

রোয়েরিকের ৭ হাজারেরও বেশি ছবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যাদুঘরে এবং শিল্পরসিক লোকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে

আছে। ভারতেও তাঁর অনেক ছবি আছে। কালী, ত্রিবাক্রম ও এলাচাবাদের যাদুঘরে স্বতন্ত্র কক্ষে তাঁর ছবি সংরক্ষিত হয়েছে। চণ্ডীগড় যাদুঘরেও স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পিতৃদেবের সমগ্র জীবনকে একটি 'নিরবচ্ছিন্ন অমুসন্ধিৎসা' বলা যায়, এই অমুসন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি, স্বজনদর্শন, কার্যকলাপ ও সেবার মধ্যে একটি সুষ্পৃশু সময় সাধন।

শৈশবেই তিনি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমের মাধ্যমে পবিত্রতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করা যায়। সচেতন কর্মের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর মতে কোন কাজকে সন্দেহের ও নিষ্পত্তি করে তোলার ইচ্ছা ও একাগ্রতা আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। এই পূর্ণতার সম্মান, নিষ্পত্তি প্রকাশের আকুলতা, কর্মসাধনার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ— এই সব মিলিয়েই আমার পিতৃদেবের জীবনদর্শন। 'কর্ম ব্যতীত বিশ্বাস প্রাণহীন'। হাতুড়ির ক্রমাগত আঘাতে জড় ধাতুকেও ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেওয়া যায়। 'নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, কর্ম ও ধৈর্য এই কয়টি গুণ আমার পিতা শিশুকাল থেকেই অনুশীলন শুরু করেন, ফলে প্রত্যেকটি কাজে তিনি দৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতেন এবং সাফল্যও অর্জন করতেন।

'সৌন্দর্যে আমরা এক

আমরা উপাসনা করি সুন্দরের

জয়ী হই সৌন্দর্যে।'

## গুণো মানস-কথা

সাধন চৌধুরী

মুকুলের মতো মৃদিয়া নয়নতারা—

নির্বাসন সম কেন ফেল শুধু অজস্র অশ্রুধারা ?

দীর্ঘস্থানে দিন যদি হয় শেষ,

অমরাগে যদি না রচ স্বর্ণ প্রিয়তর পরিবেশ—

মৌমাছি মতো মধু খুঁজে খুঁজে আমি আর কতকাল

মন-মোচাকে রচিব স্বপ্নজাল !

তুমি সোহাগের স্বর্গচাঁপা বাসনায় কর বাস ;

আমার ললাটে তোমার উষ্মধ্বাস

প্রতি মুহূর্তে অমৃভব করি অমৃতভূত-উত্তাপে,—

উল্লাস মন মুখোমুখি হলে মধু-মর্মরে কাঁপে !

গুণো স্বপ্নের সন্ধানী,

তব করতলে কামনার কিস্কিণী

কেবল বুঝি ললিত লগ্নে বাজে—

সুখ-তৃষ্ণার সফল সাধনা মাঝে।

জাঁখির অতলে ক্ষণ-বেদনার রক্তিম মধুরিমা

তপ্ত তমুর তরঙ্গ-ভঙ্গিমা—

থরো থরো কাঁপে আজিকে অলকে-আড়ালে।

কেবল তোমায় বুঝি দেখা যায় বিলাস-বাসরে দাঁড়ালে।

আগুনের মতো দহন জালায় আমি করি হাহাকার ;

বাক্সার মতো আবেগের বেগে ভাসিয়া তোমার দ্বার—

গুণো মানস-কথা,

তটিনীর মতো পাঠাবারে চাই মোর অমরাগ-বজ্র।



# লাউ গান বাজনা



## রুদ্রবাণা

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

প্রভাকর সেন

বাণ-এ প্রায় পঞ্চাশৎ বিভক্ত অংশ থাকে, এই সমস্ত অংশ যুক্ত হলে বাণ-এর আকৃতি পূর্ণরূপ ধারণ করে। রুদ্রবাণার দণ্ডটি প্রায় দুইহাত কিংবা আড়াইহাত লম্বা। দণ্ডটি উৎকৃষ্ট বংশ-নির্মিত। উত্তম বংশের অভাবে উৎকৃষ্ট কাঠও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দণ্ডের দুইপাশে দু'টি বৃহৎ লাউ (লাউয়ের খোল) থাকে। সাধারণত লাউ দু'টি কাল্পকার্ঘ্যমণ্ডিত থাকে। দণ্ডের নিমাংশে ময়ূরের উর্ধ্বাংশের প্রতিমূর্তি এবং দণ্ডের উপরিভাগে বাণ-এর তারের কানগুলি অবস্থিত। কোন কোন বাণ-এ ময়ূরের প্রতিমূর্তি সোনা বা রূপা-নির্মিত হয়। আবার বংশ-নির্মিত বা কাষ্ঠ-নির্মিত ময়ূরমূর্তিও কোন কোন বাণ-এ থাকে। দণ্ডের সম্মুখভাগে প্রায় দ্বাবিংশতি সংখ্যক ঘাট বা সারিকা বা পদা থাকে। সারিক গুলি প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা। পদাগুলি কালো মোম দিয়ে দণ্ডের সঙ্গে লাগানো থাকে। দণ্ডের উপরের ভাগে পাঁচটি কান থাকে। ঐ কানগুলির তার নিয়ে ময়ূর প্রতিমূর্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে। দণ্ডের একপাশে কিছু ব্যবধানে দু'টি কান থাকে : এই তারগুলির নাম 'চিকারী'। বাণ-এর তার সাধারণত পিতল, লোহা বা ইস্পাত ও অস্ত্র নির্মিত হয়।

রুদ্রবাণা যন্ত্রের বাদনপদ্ধতি অতি কঠিন। সঙ্গীত শাস্ত্রমতে বাণ বাদনে জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টিতে মিজ্জাব পরা হয় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দু'টিতে নখ বৃদ্ধি করে, তার সাহায্যে চিকারীতে বন্ধার সৃষ্টি করা হয়। শোনা যায়—পূর্বেকালে আচার্যেরা মিজ্জাব ব্যবহার না করেই মাত্র অঙ্গুলির নখের সাহায্যে বাণ বাজাতেন। বামহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি ত্রয়ের ব্যবহার হয় স্বর উৎপন্ন করার জন্ত। সারিকার উপর উক্ত অঙ্গুলির স্পর্শে স্বর উৎপাদন করা

হয়। এ ছাড়া বামহাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠা অথবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা ছড়ের তারে বন্ধার উৎপন্ন করা হয়।

প্রথমে বাণ-এর নিম্নস্থিত লাউটি কোড়দেখে এবং উপরিস্থিত অপর লাউটি বামহস্তে স্থাপন করতে হয়। ডান হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির নখ দিয়ে চিকারীতে বন্ধার দিতে হয়। বামহাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির সাহায্যে সারিকা বা ঘাটের উপর স্পর্শে, ঘর্ষণে, তার টেনে স্বর উৎপন্ন করা হয়। পরন্তু, বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কিংবা কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দিয়ে ছড়ের তারে বন্ধার সৃষ্টি করা হয়।

রুদ্রবাণার চিকারীর তার যথাক্রমে মধ্য ও তার সপ্তকের ষড়জ সুরে বাধা থাকে এবং ছড়ের তারটিও মন্ত্রসপ্তকের ষড়জ সুরে বাধা থাকে। চিকারীর পরবর্তী তার মধ্য-সপ্তকের মধ্যম সুরে, পরবর্তী তার মন্ত্রসপ্তকের ষড়জ সুরে, তার পরেরটি অতিমন্ত্রপঞ্চম বা মধ্যম সুরে, পরবর্তী তার অতিমন্ত্রষড়জ সুরে বাধা থাকে। সব শেষেরটি ছড়ের তার। বাণ-এ মোট চারটি তারে স্বরবন্ধার ও তিনটি তারে কেবল বন্ধার সৃষ্টি হয়। সরল কণায়, চিকারী ও ছড়ের তার বন্ধারের তার ও অপর সকল তার বাজাবার তার।

বাণ-এ স্থায়ী, অন্তরা, সঙ্কারী ও আভোগ এই চার অংশে আলাপ বাজানোর পর মধ্য জোর (মাধ্), ঠৌক, ঝালা, বোল, পরণ বাজানো হয়। পরণ বাজাবার সময় পাণোয়াজ সঙ্গত করা হয়। বাণবাদন পদ্ধতি অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধ।

স্বরগায় বাণকারদের মধ্যে স্বামী হরিদাস, নায়ক বৈজু বাউরা, মহারাজা সমোখন সিংহ (সিংহলগড়), মিশ্র সিংহ (পরবর্তীকালে নবৎ খান নামে পরিচিত), নিয়ামৎ খান (শাহ সদায়দ), শাহ নির্মল খান, ফিরোজ খান, জীবন শাহ,

লক্ষ্মী প্রসাদ, মহম্মদ খান, ওয়ারিস আলি খান, মুশারফ আলি খান, উজ্জীর খান প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

বাণীবাদনের উৎকর্ষসাধনে রাজা সমোখন সিংহ ও তত্ত্ব পুত্র মিশ্র সিংহ (নবম খান), নিয়ামত খান, শাহ নির্মল খান, ফিরোজ খান, মুশারফ আলি খান, উজ্জীর খান প্রমুখ সঙ্গীত নায়কদের অবদান চিরস্মরণীয়।

হিন্দুধর্মে বাণ (রক্তবাণী) ও বাণী (সরস্বতী বাণী) বাদন পদ্ধতিতে বহুল সাদৃশ্য ছিল। কঠোরসঙ্গীতকে মাত্র অল্পসরণ করাই বাণ এর কাজ ছিল। কিন্তু সঙ্গীতসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী হরিদাস উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ আলোড়ন আনেন। তাঁর অনবদ্য অবদানে সঙ্গীতে শব্দ, ছন্দ ইত্যাদির বাহ্যিক পরিবর্তে স্বর-নাধ্বনের বিকাশ বিশেষরূপে বিকশিত হয়। তাঁর রূপায় সুরলহরী অত্যন্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে জীবকুলকে বিশেষ মোহিত করে। তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁর সঠিক পথ অবলম্বন করে ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ অধ্যায় যোজন করেছেন। উপযুক্ত সঙ্গীত নায়কেরা নানাপ্রকার সুরের অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকাশের অল্পপন শৈলী উদ্ভাবন করে সেগুলি বাণধ্বয়ে প্রয়োগ করেন। ফলত বাণধ্বয় স্বকীয়ভাবে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাণী (সরস্বতী বাণী) সেই আদিকালের ঐতিহ্য বক্ষা করে আসছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, আদর্শ যুগ রক্তবাণী যখন বাজে, তখন একটি গভীর গম্ভীর ভাব বিভাজ করে। বাণ শ্রোতাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র মতে বাণ যদি নিখুঁতভাবে বাজানো যায়, তবে তাতে অনেক অলৌকিক ফল পাওয়া যায়। কথিত আছে—রামপুরের কোন নবাব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর রাজবাগিকার (court veenkar) দীর্ঘদিন যাবৎ নিরামিত জয়জয়ন্তী রাগ বাজিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলেন। নায়ক বৈজু বাউরা বনমধ্যে একান্তে বসে প্রদীপ বাগ বাজিয়ে হরিণ, শশক, পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আপনার সঙ্গিকটে রাখতেন। এ ছাড়া মেঘমল্লার বাদনে গগনে পুঞ্জীভূত মেঘ আনয়ন করে রুটি নামানোর কাহিনী ত' বহুপ্রচলিত।

বাণ বাদনে এই সব অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব। এই ক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিজ্ঞান প্রয়োজন। গুরু থেকে—শিষ্য, এইভাবে বিজ্ঞান দান করা হত। গুরু শিষ্য ভিন্ন অপর কাউকে এ বিশেষ বিজ্ঞান দিতেন না। সঙ্গীতসম্রাট মিজা তানসেনের দৌহিত্যবংশ বাণ যন্ত্র বিশেষ চর্চা করেন ও উন্নতি সাধন করেন—এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বাণ বাদনের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই পক্ষে বলবৎ হয়ে যায়। একমাত্র তানসেনজীর কণ্ঠ বা দৌহিত্য বংশধর ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির বাণ বাদনের অধিকার নাই। পিতা



বি বি সি ইণ্ডিয়ান সার্ভিসের সদস্যবর্গ দণ্ডায়মান (বাম থেকে দক্ষিণে) বি রায়, এ হাসান, আর ভারতীয়, পি এল পাণ্ডা, এ রামপাল। উপবিষ্ট (বাম থেকে দক্ষিণে) ভি আর কৃষ্ণমূর্তি, এম এন বাউল, ডি এইচ এ স্ট্রাইড, জি এস যোশী, জি মি কৌশিক।

এখানে গুরু এবং পুত্র এখানে শিষ্য। পিতা সমস্ত বিজ্ঞান পুত্রকে দিতেন। ফলাফল বিবেচনা করলে বলতে হবে—এই প্রথা ক্ষতিকারক। কারণ, পিতা তাঁর পুত্রকে সব বিজ্ঞান দান করবেন সত্য, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে পুত্র উপযুক্ত না হওয়ার দরুন বিজ্ঞান অপব্যবহার হয়েছে। এক পিতার হয়তো চার পুত্র আছে, এমনও দেখা গিয়েছে যে, চার পুত্রই উপযুক্ত না-হওয়ার যথাযথভাবে বিজ্ঞান সম্ভাব্যতার করতে পারে নি। কিন্তু সে তুলনায় গুরু-শিষ্য প্রথা অনেক সফল বা উপকারী। গুরুর এক শিষ্য থাকত না; তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কোন একজন উপযুক্ত প্রাধান্য শিষ্যরূপে নির্বাচন করতেন। এক গুরুর শত শিষ্যের মধ্যে কোন না কোন শিষ্য উপযুক্ত থাকত—এ ত' আঁত স্বাভাবিক। কাজেই তাই সব বিজ্ঞান দান করতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক পিতার অগণিত পুত্র থাকা সম্ভব নয়। অতএব সেই সঙ্গীতগম্ভীর মধ্যে বিচরণ করতে সঙ্গীতের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সেই মহাবিজ্ঞান আজ লুপ্ত!

## রেকর্ড-পরিচয়

এবার পুঞ্জীয় হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলাম্বিয়া রেকর্ডে অনেক ভালো ভালো গান-বেঁধিয়েছে, এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি:

### হিজ মাস্টার্স ভয়েস

এন্ ৮৩০৮৩—আমল মিত্রের কণ্ঠে দু'খানা দরদস্তার আধুনিক গান—'কেন ডাকো তুমি মোরে' ও 'কী ভাবে আজ বলো না রক্তগী'।

এন্ ৮৩০৮৪—'দুটি জলে ভেজা চোখ' ও 'আজ মনে হয়'

ছ'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন—সতীনাথ মথোপাধ্যায়।

এন ৮৩০৮৬—‘ঐ প্রজাপতি মন’ এবং ‘কত কাল আর কতদিন’—উৎপলা সেনের গাওয়া ছ'খানি নতুন ধরণের আধুনিক গান।

এন ৮৩০৮৭—নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া ছ'খানি চমৎকার পল্লীগীতি—‘আয়না দিয়ে দেখলাম রে’ ও ‘আমার ননদীর কয়।’

এন ৮৩০৮৮—‘হাতে হাতে সব হাতঘড়ি বাঁধা’ ও ‘সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে’—অভিনব আদিকের রচিত আধুনিক গান ছ'খানি গেয়েছেন—সুবীর সেন।

গান ছ'খানি সত্যোজ্জ্বল দে রচিত, উভয় গানই মাসিক বসুমতীতে পূর্বে কবিতা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

### কলম্বিয়া

জীদি ২৫১৮৭—‘এমন মধুর ধ্বনি’ ও ‘ফুলেরই সাজ পরেছ আজ’—রাগপ্রধান ও আধুনিক গান—পরিবেশন করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জীদি ২৫১৮৯—পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে কাস্তকবির ছ'খানি বহুপ্রচলিত গান—‘আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছো’ এবং ‘কবে তুমিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব’—ভাব-ব্যঞ্জনায় অনবদ্য।

জীদি ২৫১৯০—চাল তেল মাছের কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত ‘প্রণা তোমায় কি লিখি’ এবং বাপের মৃত্যুতে হঠাৎ বড়লোকের ফিল্ম ব্যবসার ভিত্তিতে ‘হায় মোটা টাকা রেখে’—ছ'খানি জনপ্রিয় গানের সুরে রচিত কোতুক-গীতি দু'টি গেয়েছেন—মিষ্টু দাশগুপ্ত।

জীদি ২৫১৯১—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—‘মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর’ ও ‘আমি ছার খুলে আর রাখবো না’—একদা বহুলপ্রচারিত ছ'খানি নজরুলগীতির সার্থক রূপায়ণ।

জীদি ২৫১৯২—‘পথে যেতে যেতে দেখেছি’ ও ‘পথ নির্জন চলো না এগন’—আধুনিক ছ'খানি গান—গেয়েছেন মৃণাল চক্রবর্তী।

### আমার কথা (১১৫)

#### প্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসঙ্গীতের দেশব্যাপী অহুশীলন ও সাধনার ইতিহাসে যে নেপথ্যচরিত্রের নাম বিশেষ উল্লেখ ও অকুণ্ঠ স্বীকৃতির সুযোগ্য দাবীদার—সেই গুণী ও কুশলীদের মধ্যে সঙ্গীতবিদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস অন্যতম।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ (জুন ১৯২২) সালে নোয়াখালিতে প্রফুল্লকুমারের জন্ম। আদিনিবাস ঢাকা। পিতৃদেবের

নাম শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস। নোয়াখালিতেই বিদ্যালয়-জীবন অতিবাহিত হয়। ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু, ভাগ্য-দেবতা তাঁর ললাটে লিখে রেখেছেন অগ্নি লিখন। তাঁর জীবন-নদীর স্রোত অগ্নি ধারায় প্রবাহিত হবে তাঁর অবশিষ্ট পথে। জীবনের পূর্ণতা নির্দিষ্ট নয়—তাই শেষ অবধি কলেজীপড়া অসমাপ্ত রেখেই এলেন শান্তিনিকেতনে, যোগ দিলেন সঙ্গীতভবনে। তাঁর জীবনের যাত্রাপথ এভাবে যদি পরিবর্তিত না হোত, তা হলে হয় তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বিরাট কোন শক্তির পরিচয় পেতাম তেমনই একজন সুদক্ষ, নিষ্ঠাবান ও দরদী সঙ্গীতশিক্ষককে এবং সঙ্গীতবিশারদকে পেতাম না।



প্রফুল্লকুমার দাস

প্রফুল্লকুমার নিজেরই হয় তো কলেজে প্রবেশ করার পরও ভাবতে পারেন নি যে, অল্পকালের মধ্যেই এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হবে। বিবিলিপি অখণ্ডনীয়, প্রফুল্লকুমারের জীবনের মধ্যেই এই শাস্ত্রত মহান সত্যটি আর একবার প্রকটিত হল।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে এলেন প্রফুল্লকুমার। চার বছর পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পেলেন ডিপ্লোমা। পঞ্চম বর্ষান্তে এবং ষষ্ঠ বর্ষান্তে ডিপ্লোমা লাভ করলেন, যথাক্রমে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এবং এশাজে পঞ্চম বর্ষে যোগদান করার সময় থেকেই তাঁর শিক্ষক-জীবনের সূচনা। তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। ১৯৪৮ সালের শেষভাগে কলকাতায় এলেন প্রফুল্লকুমার। যোগ দিলেন বিশ্বনাথকৌল গায়কসংসদে

স্বরলিপি বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হয়ে। সহকারী হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিহাসে আর একটি স্বর্ণীয় নাম শ্রীযুক্ত অনাদিভূমার দাস্তিদারের। আজও ঐ কর্মে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

বিশ্বভারতীতে যোগদানের অল্পকাল পরেই গীত-বিতানের অত্যন্ত শিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ দিলেন। ১৯৫৫ পর্যন্ত গীত-বিতানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বর্তমানে সুরঙ্গমার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়াও দিনে দিনে সঙ্গীতায়তন, ত্রাণবালিকা গীতমন্ডল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-গুলিও তাঁকে লাভ করেছেন শিক্ষক হিসাবে।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বাল্যকাল থেকেই এক মহাজাত আকর্ষণ ছিল। ছাত্রজীবনে শুরুতে তিনি পেয়েছেন শ্রদ্ধা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শৈলজারজন মজুমদার, শান্তিদেব ধোখ প্রভৃতিকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছেন ভি ভি ওজালভারের কাছে, এমাজের শিক্ষা নিয়েছেন সঙ্গীত-নায়ক গোপবন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনামধন্য

ভাট্টশ্যাম, অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি মিউস এবং গীত-বিতানের ডিগ্রী পরীক্ষার পরীক্ষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

প্রত্যহ সকালে তিনি নিয়মিতরূপে রেওয়াজ ও ব্যায়াম করে কর্মসূচী জীবনযাত্রা শুরু করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি দিয়েছেন যথেষ্ট আন্তরিকতা ও যত্নের পরিচয়। লাভ করেছেন অগণিত ছাত্রছাত্রীর শ্রদ্ধা ও রাসিকসমাজের অকল্পিত স্বীকৃতি ও প্রীতি।

তার লেখনীও তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করে চলেছে। তাঁর লেখা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ গ্রন্থটির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে রাসিকসমাজের অভিনন্দনে ভরে উঠেছে। এই গ্রন্থের আরও দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। তাঁর রাগাঙ্গুর গ্রন্থটিও প্রকাশের প্রতীক্ষায়। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের ইতিহাস গ্রন্থটি এখনও মূদ্রায়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থটির লেখক হচ্ছেন সঙ্গীতজগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

## খেলার মাঠে ইটুগোলের মনস্তত্ত্ব

এক জায়গায় অনেক মানুষ একসঙ্গে জড় হলে কেন তারা শাসনের বাইরে চলে যায়, এ নিয়ে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে। দেখা গেছে সমস্রের চীৎকার করা বা সকলের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জনতার মনস্তত্ত্বের অঙ্গল রূপ নয়, অঙ্গল বাপার হ'ল জনতার মধ্যে ব্যক্তি তার সন্তা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেন হারায়, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা সত্ত্বেও, এর মূল কারণ এখনও আবিষ্কার হয় নি। এ সম্বন্ধে যেকথা প্রায় শোনা যায়, তা হ'ল, জনতার মতামতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে আদিম মানব আছে, তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষ তার বিবেক হারিয়ে নিম্নস্তরের জীবের মত ব্যবহার করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর পুলিসের পত্রিকায় একটি লক্ষণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পুলিসের সঙ্গে কাজ করেছেন, এরফম বহু অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা ফুটবল খেলার মাঠে যেসব অসঙ্গত, অভদ্র আচরণ লক্ষ্য করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁরা সকলেই একমত যে ফুটবল খেলার মাঠে যেসব মাঝামাঝি হয়ে থাকে, তার মূলে সর্বদাই একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কাজ করে। এাই যুগে জনতার মনে আশুন্দ জালায়। এই সম্প্রদায় সাধারণত ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে খেলাধুলার তাৎপর্য বোঝার বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্ট্রেফ গালাগালি কিম্বা হাতাহাতি করার উদ্দেশ্যেই এরা খেলার মাঠে জড় হয় এবং খেলার

মাঠকেই তারা তাদের অবদানিত শক্তি ও আবেগ উজ্জ্বল করার প্রকৃত স্থান মনে করে। অপর একজন মনোবিজ্ঞানী লিখেছেন যে, আজকাল ফুটবল খেলার মাঠে তিন শ্রেণীর দর্শক আসে। একশ্রেণীর দর্শকরা খেলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ একসময়ে যারা নিজেরাই ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। এরা জনতার মনস্তত্ত্বে মাড়া দেয় না। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল প্রথমের দিক উল্টো, এরা সব ছেলে-ছোকরার দল, এরা আসে খেলার মাঠে তাদের বেপরোয়া মনের উদ্দাম পরিচয় দিতে। সারা ছুনিয়ার খেলাধুলা পণ্ড করতে এরাই যত নষ্টের গোড়া। তবে দর্শক হিসেবে সবচেয়ে বড় দল হল সব বয়সের, সমাজের সব শ্রেণীর, সব পেশার এবং শিক্ষা-দীক্ষাসম্পন্ন অগণিত মানুষ তাদের ওপর নিভর করে খেলার মাঠের প্রকৃত আবহাওয়া। এরা কেন খেলা দেখতে আসে তা তারা নিজেরাই জানে না। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন যে, মনের তারসমান বজায় রাখার জেজাই এরা খেলা দেখে। জীবনটা দিন দিন যত একঘেয়ে হয়ে উঠছে, মানুষ তত ব্যক্তিগত উত্তেজনা খুঁজছে। আর খেলাধুলার প্রতিযোগিতা এমন একটা জিনিস যা আমাদের সুপ্ত ও অবদমিত মনোভাবকে নাড়া দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার একটা সুযোগ এনে দেয়। সেদিক দিয়ে খেলার মাঠে উজ্জ্বল আচরণ আমাদের অবদমিত মনের আগল ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

—ডাঃ জোহান মাউথেনের

# বার্থকে

## বারানসী

নীলকণ্ঠ

### আটচল্লিশ

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘ বাসেছিলো ঘরের মধ্যে। যে হোট্টা ঘুপাচি, সেখানে ঘাপটি মেরে। যারা এসেছিলো বাঘ দেখতে তারা মনঃকল্প। বাঘের ফুল পোট্টেইট না দেখা গেলে আর কি দেখতে আসা গেল চিড়িয়াখানা। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে শোনা গেল আশ্বাসবাণী। কে যেন কাকে জিজ্ঞেস করছে : বাঘ দেখাবি? যেন দেখতে ইচ্ছে করলেই বাঘকে তুড়ি দিয়ে টেনে এনে হাজির করবে, গরাদের ওপারে, তার পূর্ণ ন্যাজেঙ্কিতে পাড়া বাঘকে এনে দাঁড় করাবে মুখোমুখি। যাকে জিজ্ঞেস করা তার সানন্দ সম্মতির আগেরই, আশ্বাসদাতার চোখ বাঘের চোখের ওপর পিয়ে পড়েছে। মনুষ্য ও ব্যাঘ্রের শুভ ও অশুভ দৃষ্টি বিনিময়। ছংকার দিয়ে বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়েছে লোহার গরাদের ওপর। মাঝখানে লোহার গরাদ, তবু ভরসা হয় না যেন। আরেকবার চোখে চোখ পড়ে গেলে, এ গরাদের বাধা বাঘ আর মানবে বলে মনে হয় না। যে ব্যক্তি বাঘ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেছেন অজ্ঞাত।

সে লোক কে? সে লোক শক্তিপদ বসুন্ডায়, যার ছুঁচোখের দীপে নিরন্তর জ্বলছে একটি আলোক : মানুষের ভালো হোক।

‘র্যাটম-হাইড্রোজেন-নিউটন, মনার্কি-ডিষ্টেটারশিপ-সোশ্যালিসম-কম্যুনিসম,—এসবই মজ্ঞা; মজ্ঞ কেবল ওই একটিই,—মানুষের ভালো হোক! অন্তর থেকে নিরন্তর উথিত এই একটি মজ্ঞধ্বনি, মৃত্যু থেকে অমৃত, অন্ধকার থেকে আলোয়, অসৎ থেকে সৎ—এ নিয়ে যেতে পারে কোটি কোটি মানুষকে। এই বিশ্বাস মূর্ত করে তোলাই হচ্ছে মূর্তি-পূজা! মূর্তি-পূজাই মুক্তি দিতে পারে লোককে, সীমার বন্ধন মোচন করে দিতে পারে মুহুর্তে, মানুষের চেয়ে অনেক বড় করে দিতে পারে মানুষকে।

দস্যুভক্তি যখন বলেন, একটি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতক্ষণে না সমস্ত মানুষ মিলে করবে, ততক্ষণে দেখা দেই তাঁর

সে নবজাতকের উদ্দেশে এই জয়ধ্বনি অনবাবতীর দিকে উঠে গেছে : জয় হোক মানুষের, জয় হোক চিরজীবিতের, তখন এই মন্ত্রই উচ্চারিত : মানুষের ভালো হোক!

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন : ‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ’,—তখন যে মন্ত্রে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তা ওই অমোঘ অব্যর্থ বাণী : ‘মানুষের ভালো হোক—’ জিসাস ক্রাইস্ট যখন সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক করবার জন্তে ক্রসবিদ্ধ, তখনও যখন বলেন : ওরা জানে না ওরা কি করছে, তুমি ওদের ক্ষমা কর,—তখন এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কাছে দানবের মজ্ঞা হার মানে।

যে কোনও লোক যদি তার জীবন দিয়ে জালতে পারে এই আলোক : মানুষের ভালো হোক, তা হলে তার ওপর আক্রমণ আসবে দেবলোক থেকে। ইজের আসন ঈশ্বর চঞ্চল হবে। ‘ওয় নয়, নয় লোভে, শক্তি কামনা করে নয়, রূপ-জয়-যশ প্রার্থনার কারণে নয়, শত্রুর নিধন চাই,—এই রক্তিম বাসনাতেও নয়, একটি মানুষের প্রতি নিঃশ্বাসে যদি এই মন্ত্র নির্গত হয়, যে, মানুষের ভালো হোক, তা হলে, ‘মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে জাগে রোগাক, ওই মহামানব আসে।’

ম্যান থেকে সুপারম্যান জন্মায় মজ্ঞা করে নয়; মজ্ঞ থেকে,—মানবজীবনের সে একমাত্র মজ্ঞ আজও উচ্চারিত হবার অপেক্ষায় : মানুষের ভালো হোক!

ভারতবর্ষের তপোবনে তাই এ বাণী একদিন প্রাণ পেয়েছিলো কয়েকটি মহৎ মানুষের জীবনে : এ ছালোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। প্রাক্কের মন্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি। যদি এমন কেউ কোথাও থাকে, অপূত্রক কোনও হতভাগ্য, তা হলে তাঁর অতৃপ্তি মোচনের উদ্দেশে এই অঞ্জলি উৎসর্গ করি। কোনও মানুষের মুখে এর চেয়ে মহত্তর কথা কোনও দেশে কোনও কালে কেউ উচ্চারণ করেছেন বলে আমি জানি না। তবো থেকে মহত্তম পৌছনর পথ একটিই। ভালোবাসা। কোনও জাতি, কোনও দেশের প্রতি বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে মানুষ আজও পর্যন্ত কোথাও পৌছয় নি। কোনও যোগ, কোনও যজ্ঞ

তত্ত্ব-মঙ্গলা, কোনও সিদ্ধাই, সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প, এই একটি জীবন-মঙ্গলের কাছে কিছু না। মানুষের ভালো হোক। সকল দেশের সকল মানুষের ভালো হোক,—এই মার; আর সবই অমার।

শাসিনা জানতেন এ মতা। তাই তাঁরা বলেছেন: মধুবাতি পাতায়তে। শাসিনের চেয়ে নতুন কথা কেউ কোনও কালে বলে নি। কারণ নতুন কথা কিছু নেই। চিরপুরাতনই, চিরনবীন।

কার্ল মার্ক্স কোনও দর্শন নয়; অর্থনৈতিক তত্ত্বমাত্র। ওপরের লোককে নীচে নামিয়ে আনলে, নীচের লোক ওপরে উঠবে। তাতে সমস্তার সমাধান হবে না কখনও। কম্যুনিসমের পর আসবে নতুন ইস্যু। মানুষ যে অরণ্যে ছিলো একদিন, সেই অন্ধকারেই বাস করবে। অর্থনৈতিক সাম্য, রাজনৈতিক অধিকার, এর চেয়েও বড় স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের ভালো হোক, এই মস্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রুটির সমস্তা সবচেয়ে বড় সমস্তা, একথা ঠিক। সে সমস্তা মিটে গেলে মানুষের সব সমস্তা যদি মিটে যেত, তা হলে শবের সঙ্গে মানুষের কোনও তফাৎ থাকত না। কারণ, শবের সব আছে, ক্ষধা নেই।

দেশের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, মানুষের বাগের বদলে অমুসারগের জন্মের মধ্যেই রয়েছে সেই 'নবজাতক', যার উদ্দেশ্যে সকল দেশে উঠছে জয়ধ্বনি: জয় হোক মানুষের, চিরজীবিতের।

শক্তিপদ বসুরায়ের সমস্ত শক্তির উৎস ওই এক মস্ত: মানুষের ভালো হোক!

শাসিনের অলৌকিক জীবন ও বাণীতে ঘোরতর অবিশ্বাসী এক মানুষকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে শক্তিপদ বুদ্ধির অতীত এমন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করান, যার ফলে আমূল রূপান্তর ঘটে তার,—এমন ঘটনা আমার জানা। কেবল বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণরাই যে রূপান্তর ঘটান তা নয়, আমাদের অজানা এমন মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি আছেন, দানবকে ঈশ্বর দেবতা করবার মস্ত জানেন। সে মস্ত কাগজে বিজ্ঞাপিত নয়। স্বপ্নে তাকে পাওয়া যায় না। সে আরোগ্য কোটিতে গোটিক। তাও তা যে সম্ভব তার প্রমাণ কেবল শক্তিপদ বসুরায় নন; আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন।

কিন্তু আমার কাছে আরোগ্যকারণের চেয়ে আরোগ্যমন্ত্রের আকর্ষণই বেশি। সে মস্ত ওই,—মানুষের ভালো হোক। সমস্ত শক্তির চেয়ে, নিরাসক্তির আধার এই উজ্জীবন-মন্ত্র,—মানুষের মনের আধার দূর করে অনেক দ্রুত।

একজন লোক শক্তিপদ বসুরায়কে এসে ধরে, তার মরা শাক দেগাতে হবে। শক্তিপদের পরিচিত এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরলোকগতকে এনে হাজির করাতে পারতেন সশরীরে। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও

মাসিক বসুমতীর আগামী সংখ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

সাদা জাগানো বড় গল্প

নগরী ও নাগরী

ও

মাদাম লাক্সার কারাবাস

(পৃথিবীর বিখ্যাত হত্যা রহস্যের কাহিনী)

বিশ্ব মুখোপাধ্যায়

পরে রাজী হন। যখন ঘরের মধ্যে পরলোকগতা মহিলা তাঁর পুত্র এবং সেই যোগীর সাক্ষাৎকার ঘটেছে, তখন শক্তিপদ সেখানে ছিলেন না। সিগারেট কেনবার জন্তে বাড়ির বাইরে গৌছিলেন। ফিরে এসে শোনে, লোকটির মৃত্যু মা সশরীরে উপস্থিত হয়ে বলে গেছেন, যে ঐ লোক তার ভাইকে ঠিকিয়েছে সম্পত্তির ব্যাপারে। যিনি পরলোকগতাকে নামিয়ে এনেছিলেন তিনি শক্তিপদকে বলেন, এ-ধরণের লোকের জন্তে কোনও কাজ তিনি কেন করতে নারাজ ছিলেন, এখন তা শক্তিপদেরও নিশ্চয়ই মর্মগত হয়েছে। শক্তিপদ লোকটিকে ছাড়েন না; বরং তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে ছাড়েন যে তার ভাইকে সে তার জাযা প্রাণা ফিরিয়ে দেবে।

লোকটি কথা দিলেও তার কথা রাখে না, গাড়িমসি করে। আসল কারণ তার অনিচ্ছা নয়; স্বীর ভয়। জমির ব্যাপারে সে ভাইকে ফাঁকি দিয়েছিলো। সে দলিল ছিলো শব্দবাবুড়িতে স্বীর কবলে। সে প্রস্তাব করে, যে জমির বদলে ভাইকে দাম ধরে দেবে তার। শক্তিপদ তাতে রাজী হন না। বলেন মা-কে কথা দিয়েছ, যা নিয়েছ তাই-ই ফেরৎ দেবে। যদি না দাও তাহলে জেনো আমি সাধু-

পুরুষ নই, এক সময়ে বাঙলা দেশের বিপ্লবীদের সংগে কাজ করেছি। এমন শাস্তি তুমি পাবে যার চেয়ে জমির দাম অথবা স্বাধীন ভয়, দুটোই তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত এই কথাতাই কাজ হয়।

শক্তিপদ কেবল নামে নয়, কাজেও শক্তিমান পুরুষ।

এ ঘটনা পড়তে পড়তেই কোনও কোনও কৃত্তিকি পাঠকের চোটে বিদ্রোহের মতো হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাবে। মানুষের ভালো হোক, যার মন, সে কেন মানুষকে এমন ভয় দেখাবে?—এই হচ্ছে সেই ব্রহ্মের বিদ্রোহ-বিলিক জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর হচ্ছে এই যে, ওতেই ওই মানুষের ভালো হবে জানেন বলেই শক্তিপদ,—শক্তিপদ এবং আমরা তিন-চতুর্থাংশ মানুষ দ্বিপদ হয়েও আসলে চতুষ্পদ। লোকে মনে করে, এই ব্যবহার এবং ওই মন্য বসি শক্তিপদের চরিত্রে একটি আপত্তিযোগ্য কট্টাডিকসান। না। কট্টাডিকসান নয়। মহৎ মানুষের চরিত্রের এই হচ্ছে প্রপার ডিকসান; হার্মান। কী রকম, জানতে চাইছেন। জবাব দিচ্ছি।

যে লোকটি তার ভাইকে ঠকিয়েছি মনে করছে, আসলে ঠেকেছে সেই। শক্তিপদ জানেন যে লোকটিকে এই সামান্য প্রতারণার জন্তে কি অসামান্য শাস্তি পেতে হবে। তাই ভয় দেখিয়েই তিনি আসলে অভয় দেন। পাপ ও শাস্তির হাত থেকে লোকটিকে বাঁচানোর জন্তেই অভয়ংকর শক্তিপদ ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাকে শাসন করেন। সে লোকটি কোনওদিন জানবে না যে, কি 'লোক' সে পাবে মৃত্যুর পর। সেই অন্ধকার-লোক থেকে ঈশ্বর আলোকে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্তেই, ক্রমি ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন শক্তিপদ। না দিলে, মৃত্যুভয় দেখিয়েছিলেন। না দেখালে স্বাধীন ভয় থেকে মুক্ত হতো না সে লোক। এর পরেও কি বলা যাবে, মানুষকে ভালোবাসার সংগে এই ভয় দেখানোর কোনও বিরোধ আছে?

আরও এক জায়গায় লোকের সাংঘাতিক গুলিয়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, 'সব, না কিছু দটবে, সব ঠিক হয়ে আছে আগে থেকে।' সব—প্রিডিস্টিন্ড। আবার সেই শাস্ত্রই বারণ করে অত্যাচার করতে; উপদেশ দেয়,—সংকম করবার। একমুখে এমন উটো-পান্টা কথায়, কোথায় না লোক বিভ্রান্ত বোধ করবে। যদি সব ঠিকই হয়ে থাকে আগে থেকে, তাহলে আবার অত্যাচারের জন্তে শাস্তি এবং সংকাজের জন্তে পুরস্কার কেন? যে অত্যাচার করেছে সে তো অত্যাচার করবে বলেই ঠিক হয়ে আছে। তাহলে তার অপরাধই বা কি এবং সে দায়ীই বা হবে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেবল হিন্দুরাই দিয়েছে; দিতে পেরেছে। কারণ হিন্দু আচার্যদের মতো জীবনের এমন গভীরে আর কোনও দেশে কোন কালে আর কেউ প্রবেশ করেছে? মানব-জীবনে অতল রহস্তের তল তাঁরা খুঁজেছেন। তাঁরা কন্ট্রাডিকসান থেকে হার্মনিতে, বিরোধ থেকে মিলনে, অসৎ থেকে সৎ, মৃত্যু থেকে অমৃত্যে যাত্রার পাপেয় জুগিয়েছেন চিরকাল। তাঁরা কখনও এমন কথা বলতে পারেন যার মধ্যে মিল নেই?

‘এ ছয়ের মাঝখানে আছে কোন মিল, নাহিলে নিগিল, এত বড় প্রবন্ধনা, কখনও সহিত না’,—

প্রিডিস্টিন্ড একথাও ঠিক, আবার, ‘অত্যাচার কোরো না’,—একথাও বৈদিক নয়। কি রকম? না, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য, অত্যাচার-মায় ভেদবুদ্ধি থাকছে, যতক্ষণ তোমার এ বোধ না জাগ্রত হচ্ছে যে শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, ত্যাগ-অত্যাগ, সবই ‘সে’ যে ‘এক’ বহু হয়েছেন। যার এ জ্ঞান হয়েছে, তার জন্তে কোনও বারণ নেই। ত্রৈলংগ স্বামীর—মূত্র আর গংগাজলে কোনও পার্থক্য নেই। মল ও পরিমল তুল্যমূল্য। তাই মূত্র ছিটিয়ে মায়ের গায়ে ত্রৈলংগ বলতে পারেন, ‘গংগোদকং।’

ত্রৈলংগর যা সাজে তা সকলের সাজে না। এমন কি অজ্ঞানেরও,—না। [ক্রমশঃ]

## বিবাদপুর

মজুমদার দাশগুপ্ত

তুমি বলেছিলে দেখো না পিছনে  
হেঁটে যাও শুধু সমুখে বিজনে  
ভারপরে পাবে দেখা—

সমস্ত দিকে হয়তো দুঃখ  
ভঙ্গুর পথ হয়তো রক্ত  
তবু অস্ত্রমে রয়েছে স্বপ্ন  
একটি আলোক রেখা।

হঠাৎ পিছনে শাড়ির গন্ধ  
পায়ে নুপুরের নিবিড় হুম—  
তার অধরে কি ঘন আনন্দ  
রহস্য কালো চুলে?

জলধারা বয়ে সুরের নদীর  
ভারি কল্লোল করেছে বধির  
কোন অমৃত্যুতীর্থে কাঁপায় শরীর!  
নির্দেশ গেছি তুলে।

যেই ফিরিয়েছি তুমি চোখ আমার  
বরে পড়ে যেন আঁধারের ভার  
আমার পিছনে যার অভিসার  
পলকে মিলায় দূরে।

তাই পড়ে আছি অভিশাপ বৃক  
বহু বেদনার গভীর অস্ত্রধে  
আঁধারে বিবাদপুরে।



## নিউ ইয়র্কের নাট্যজগৎ

নিউ ইয়র্কের মঞ্চজগতে হাল-আমলে যে এক অভূতপূর্ব নবজীবনের জোয়ার এসেছে, রসিক সমাজ এ সম্বন্ধে আর দ্বিমত নন।

নাট্যাঙ্গুলীনের ক্ষেত্রে, এ কথা বলাই বাহুল্য যে, নিউ ইয়র্ক এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। শুধু বিশেষ উল্লেখেরই নয়, বিশেষ বৈশিষ্ট্যেরও। তার উপরোক্ত সংবাদ রসিক-সমাজে শুধু আনন্দেরই স্পর্শ আনে নি, আনন্দের সঙ্গে সমপরিমাণে বহন করে এনেছে আশ্চর্যেরও স্বাদ। প্রায় আসতে পারে যে, নাট্যাঙ্গুলীনে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী নিউ ইয়র্কের মঞ্চজগতে গ্যাংচাকল্যের জোয়ার আসায় আশ্চর্য হওয়ার কি থাকতে পারে?—এর উত্তর খুঁজতে গেলে নিউ ইয়র্কের রঙ্গমঞ্চগুলির গত বছরের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়।

গত বছর নিউ ইয়র্কের নাট্যমোদীদের কাছে যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছে সেখানকার নাট্য-প্রচেষ্টাগুলি। কিন্তু, এ বছর দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ নাটক সম্বন্ধে যেন সচেতন হয়ে উঠেছেন আরও অনেক বেশি। নতুন নতুন নাটকের প্রীতি তাঁদের আগ্রহও বেড়েছে যেন যথেষ্ট। নাট্য-জগতের উন্নয়নের ও সর্ধৈব প্রগতির দিকে তাঁরা যেন আরও যত্নবান হয়েছেন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নাট্যজগতকে



চেকভের 'সি গাল' নাটকের একটি দৃশ্যে নাট্যরূপদাত্রী পরিচারিকা ইভা-লে-গ্যালিয়েন ও ডেনহম হিলিয়ট



পতন-উত্থানেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা যে, নিউ ইয়র্কবাসী রঙ্গমঞ্চকে শুধু প্রমোদকেন্দ্র হিসাবেই দেখেছেন না, রঙ্গমঞ্চকে শিল্পসংস্কৃতির এক মহান তীর্থ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যেই তাঁদের প্রগর শিল্পচেতনার এক প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ব্রডওয়েতে ১৯৫১-৫২ সালের পর গত বছরের তুলনায় এত অধিকসংখ্যক নাটক অল্প কোন বছর মঞ্চস্থ হয় নি।



'রাইট হিউ আর' নাটকের এক দৃশ্যে কৌনি কাটিস, জাঁ ফার্নাঁ, রিচার্ড উডস এবং জ্যান্স মারসাঁ

১লা জুন ১৯৬০ থেকে তা এসে ১৯৬৬ পর্যন্ত এই সময়সীমার মধ্যে ব্রডওয়েতে অভিনীত হয়েছে একাত্তরটি নাটক অথচ তার পূর্ববর্তী এক বছরে ব্রডওয়েতে অভিনীত নাটকের সংখ্যা ছিল সাতায়। অতএব এক বছরে চৌদ্দটি বেশি নাটক দর্শক-সাধারণ দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ-তো খাস ব্রডওয়ের খবর। ব্রডওয়ের বাইরে ছোট ছোট থিয়েটারগুলিতে গত বছর যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তার মোট সংখ্যা একশো' সাত। জনপ্রিয়তা বা উৎকর্ষের দিক দিয়ে সবগুলি নাটকই সমানভাবে উল্লিখিত হওয়ার দাবীদার অবশ্যই নয়। কতকগুলি দর্শকের হৃদয়ের গভীরে

রেখে গেছে ছাপ, আবার কতকগুলি মানুষের মনে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। দেখা গেছে, প্রতি বাইশটি নাটকের মধ্যে আটটি উপনীত হতে পেরেছে সাফল্যের সপ্তস্বর্ণ। এই সময়ে প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে একদিন মাত্র অভিনীত হয়েই যারা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল, সে ধরনের নাটকও বিরলদৃষ্টান্ত নয়, গত এক বছরের মধ্যে এই জাতীয় নাটক ছ'খানি প্রযোজিত হয়েছে।

এবার নাটকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। বছরে অভিনীত মার্কিন নাটকগুলির প্রত্যেকটিই যে প্রথম শ্রেণীর এবং রসোত্তীর্ণ তা অবশ্য বলা চলে না। কিন্তু তা হলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, দর্শক-সাধারণ অনেকগুলি উপভোগ্য এবং বলিষ্ঠ নাটকের রসাস্বাদন করার সুযোগ পেয়েছেন। এই উপভোগ্য নাটকগুলি এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বিদেশী মাটির ফসল। তাদের মধ্যে ইংল্যান্ডের 'লুথার,' 'জার্মান ডেপুটি,' সাউথ আফ্রিকার 'ব্রাদ নট' উল্লেখযোগ্য। 'হামলেট'-এর নামও এই তালিকায় প্রাণধানযোগ্য। হামলেটের প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন রিচার্ড বাটন, ভূমিকালিপিতে বৃটিশ এবং আমেরিকান শিল্পীদের এক অভূতপূর্ব সম্মেলন ঘটেছিল।



বিভিন্ন বস্তু পরিচালিত 'রাজা রামমোহন' চিত্রের নাম-  
ভূমিকার খ্যাতিমান অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী

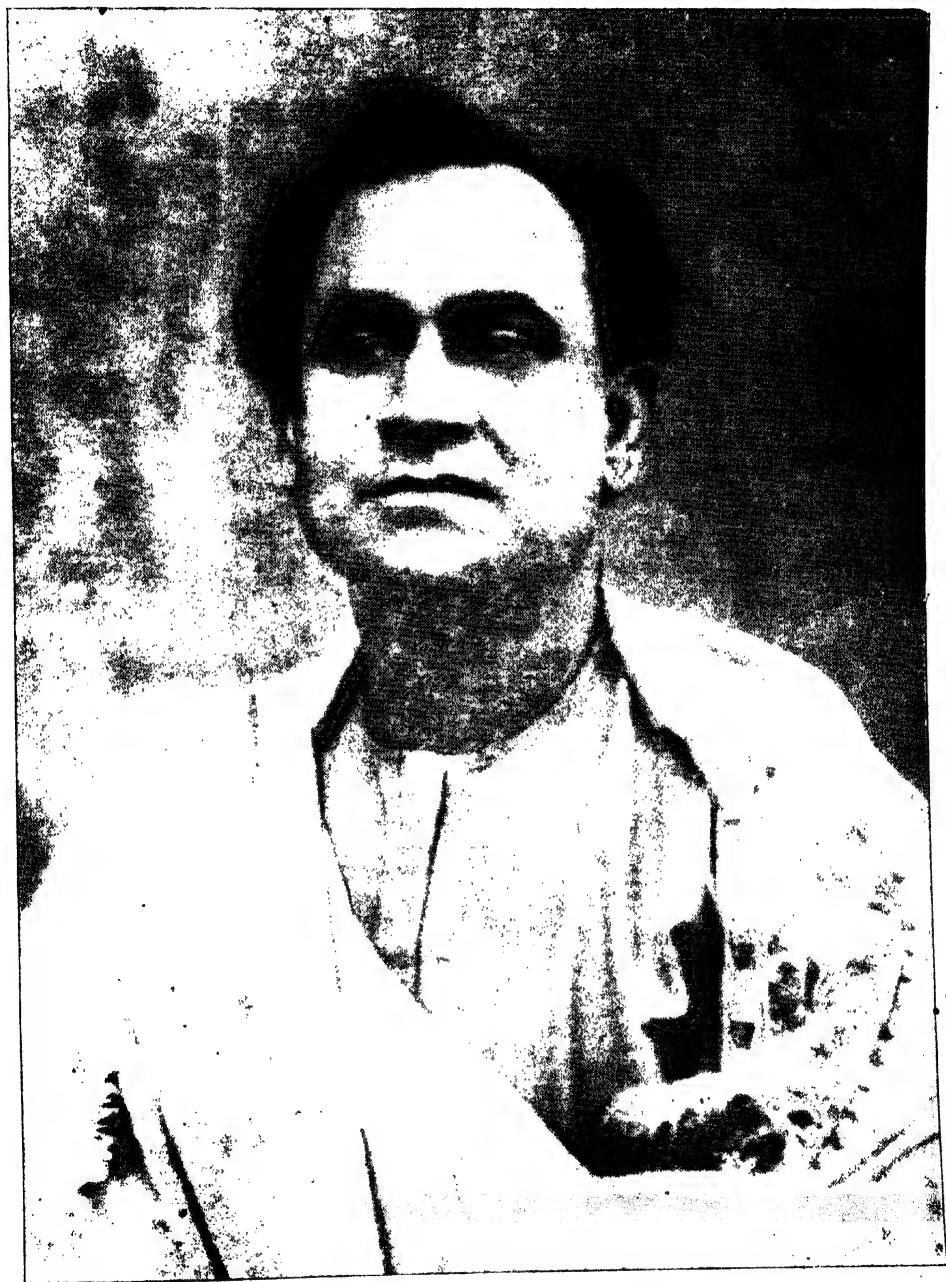


অমল দত্ত পরিচালিত 'অশ্রু দিয়ে লেখা' চিত্রে অনিল  
চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

ইউরিপিডিসের 'স্টোজান উওমেন' নামক বিখ্যাত নাটকটির অভিনয় বহিঃউদ্দেশ্যে বিপুল জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়ে ছ'টি পুরস্কার লাভ করে, তার প্রায়োগনৈপুণ্য ও অভিনয় উৎকর্ষের স্বীকৃতিস্বরূপ।

মার্কিন নাটকগুলির মধ্যেও এডওয়ার্ড গ্র্যান্ডার 'ব্যালার্ড অফ দ্য স্ট্রাড কাকো' (কাসন ম্যাককালসের উপন্যাসের ভাবাবলম্বনে রচিত), 'স্পুন রিভার' বিচারশালা কেন্দ্রিক নাটক 'এ কেস অফ লাইবেল' প্রভৃতি নাটকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত হয়েছে। প্রায় তিন যুগ পূর্বের ন্যায়রথন নাচে আবহাওয়া যুগের গণ্ডী অতিক্রমে একালের আঙ্গিনায় আবার গড়ে উঠেছিল অভিনেত্রী জুন হাভকের 'ন্যায়রথন ৩৩'-এর মাধ্যমে। সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে মনে দাগ রেখে গেছে জেমস বন্ডুইনের বিতর্কমূলক 'রুস ফদ মি: চার্লি' এবং 'ইন হোয়াইট আমেরিকা'। এই দু'টি নাটকের মধ্যে জনগণের মতে সমাজজীবনের এক প্রাণাণ চিত্রে ফুটে উঠেছে।

দু'টি নাটক স্মরণীয় হয়ে আছে শিল্পীর গুণে। 'জ



● নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের একটি অপ্রকাশিত চিত্র

হোয়াইট হাউস' এবং 'ডিলান' নাটক দুটিকে সাধারণের মনে উজ্জ্বল করে রেখেছে—যথাক্রমে হেলেন হেস ও স্তার আলেক গিনেসের অনন্তসাধারণ অভিনয়। প্রথম নাটকটিতে গার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁদের সহধর্মিণীদের কাহিনী এবং দ্বিতীয় নাটকটিতে ওয়েলসের কবি ও পৃথিবীর কাব্যজগতের অগ্রতম উজ্জ্বল তারা টমাস ডিলানের শেষজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তরুণ নাট্যকার ফ্র্যাঙ্ক ডি গিলরয় কয়েক বছর পূর্বে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার স্বাক্ষর 'হু উইল সেভ ডা প্রোবয়'-এর মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন, গত বছরের শেষাংশে তাঁর 'দ্য সাবজেক্ট অফ রোসেস' নাটকটি জনসাধারণের মধ্যে এক আলোড়ন এনে তাঁর দীর্ঘকাল পরে প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত অভিনন্দনে ভরে দেয়। গৃহে প্রত্যাগত এক সৈনিক এই নাটকের নায়ক। এই নাটকটির সারবস্তা ও জীবনবোধ নাট্যজগতে নাট্যকারের মর্যাদা আরও বর্ধিত করে তোলে।

হাস্তরসাপ্রয়ী নাটকগুলির মধ্যে তিনটি নাটক বিশেষ উৎকর্ষ ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে। রোনাল্ড আলেকজান্ডারের 'নো বডি লাভস এ্যান এ্যালবার্টস'-এ এক প্রতিভাহীন অথচ সুদর্শন টেলিভিশন প্রযোজকের কাহিনী, নীল সাইমনের 'বোয়ারফুট ইন দ্য পার্ক'-এ এক নববিবাহিত

দম্পতির বিচারের কাহিনী এবং ম্যুরেল রেসনিকের 'এনি ওয়েডনেসডে'তে একটি মেয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সঙ্গীতপ্রধান নাটকগুলিও আলোচনার প্রসঙ্গে যথেষ্ট উল্লেখের দাবী রাখে। এ প্রসঙ্গেও শিল্পীদের অবদান সর্বাঙ্গে উল্লেখনীয়। থনটন ওয়াইল্ডারের নাটক 'ম্যাচমেকার' অবলম্বনে 'হালো ডলি' ক্যারল চ্যানিঙের, ফ্যানি ব্রাইসের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ফানি গাল' বাব্রী স্ট্রেশার বাড স্মালবানের উপস্থাপন অবলম্বনে রচিত 'হোয়াট মেকস স্যামি রান?' এ স্টিভ লরেন্সের, ১৯৩০ সালের হালিউডকে কেন্দ্র করে রচিত বিজ্ঞপাত্তক 'কেড আউট কেড ইন'-এ ক্যারল ক্রনের, নোয়েল কাওয়ার্ডের প্রেততাত্ত্বিক রচনা 'হি' স্পিরিটস' অবলম্বনে 'ব্রিদ স্পিরিট'-এ বৃটিশ শিল্পীর অভাবনীয় অভিনয়সৌকর্য সমগ্র প্রচেষ্টাকে সফলতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

এই সকল নাট্যপ্রচেষ্টাগুলির সফলতা সত্ত্বেও বা সামগ্রিক খ্যাতি সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কের নাট্যানোদীরা এগাবৎ একটি অভাববোধ করে আসিছিলেন একটি স্থায়ী নাট্যভাণ্ডারের। বহু যুগের পর সম্প্রতি এই শূন্যতার অবসান ঘটেছে। এই ব্যবস্থায় একটি স্থায়ী নাট্যপ্রাতিমান





অর্ধেন্দু সেন পরিচালিত 'স্বশান্ত সা' চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় গড়ে উঠেছে প্রতি সপ্তাহে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এই শুভপ্রচেষ্টা নিউ ইয়র্কবাসী থালা বাচ্চা সাদেই গ্রহণ করেছে। এই দরবের নাট্যভাণ্ডার শুধু একটিই নয়, তিনটি রূপ নিউ ইয়র্কের বৃক। এর ফলে নাট্যাঙ্গুশীন যে আরও কত লাভবান হল তা সহজেই অনুমেয়। এই তিনটির নাম—রিপাটার থিয়েটার অফ লিঙ্কন সেন্টার, গ্র্যান্ড রিপাটার থিয়েটার এবং এ্যাসোসিয়েসন অফ প্রোডিউসার অর্গান।

প্রথমটি অনেক বাদ-প্রতিবাদ, তর্ক-বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। গত জাহুয়ারী মাসে আর্থার মিলারের নতুন নাটক 'আফটার ছ ফল'-এর দ্বারা তার যাত্রার শুরু। তারপরই বাদানুবাদের ঝড় বইতে আরম্ভ হল। কেউ বললেন নাটকটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং হৃদয়স্পর্শী, আবার কেউ বললেন না তা নয়। পরবর্তী নাটক 'ইউজিন ও' নিলের বিজ্ঞপায়ক নাটক মার্কো মিলিয়াস, এস এন বারমানের হাস্যরসাত্মক নাটক 'ব্যাট ফর হুম চার্লি' এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে বাত্রী লোডেন, জেসন রবার্ডস জুনিয়ার এবং ডেভিড হোয়েনের অভিনয় কৃতিত্ব অভিনবনীয়। শেষোক্তজন এর পূর্বে খ্যাত ছিলেন হাস্য আনন্দরসের পরিবেশক হিসাবে।

দ্বিতীয়টির উদ্ভব ১৯৬১ সালে বিখ্যাত অভিনেত্রী পরিচালিকা ইভা-লি-গ্যালিয়েনের দ্বারা। এই প্রতিষ্ঠানের নামে গ্র্যান্ড নাটকটির প্রয়োগ মার্কো। স্থানে স্থানে কলেজে কলেজে, বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এরা পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাট্যসেবার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল আর্থার মিলারের জু'শবল, আনুইলের 'সিং এ্যারাউড ছ মুন' এবং স্বয়ং পরিচালিকা অনুদিত চেকভের 'সি গাল' প্রভৃতি। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্ম চার বছর আগে। কয়েকজন উত্তমী অভিনেতার এ রূপদাতা।

## নটগুরুর জন্মদিনে

১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) তারিখটি নটগুরু শিশিরকুমারের জন্মদিন। আজ যদি আমাদের মধ্যে তিনি বর্তমান থাকতেন তা হলে এই তারিখটিতে তাঁর জীবনের পচাত্তর বছর পূর্ণ হোত।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পূতপাবিত্র পদরঞ্জন বাঙলার নাট্যশালার এক দুর্ভাগ্যবশত জিহ্বামরজনীতে শিশিরকুমারের আবির্ভাব। সেই মঞ্চটুকুল রূপমুহুর্তে শিশিরকুমারই প্রভাতস্বর্য, মধ্যাহ্নের আকর, সন্ধ্যানীশিক্তিতে তরপুর, অক্ষরগু রাশ্মান। বাঙলার রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের পত্তন হল।

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্য আর বেদনার তো অণু নেই, তবু তারই মধ্যে আমাদের গর্ব ও গৌরবের সুলিও পরিপূর্ণ সে ছত্তে দ্বারা দায়ী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার সেই তালিকারই একটি উজ্জ্বল নাম। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রতিফলন পারিলাক্ষিত হয়েছিল তাঁর যে মানসপুত্রদের মধ্যে শিশিরকুমার তাঁদেরই 'অন্ততম'।

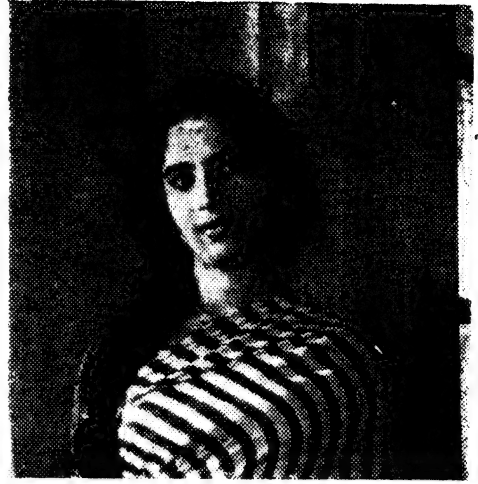
শিশিরকুমার যেদিন নবযুগের ভারতা বহন করে পাদপ্রদীপের সামনে আবিস্কৃত হয়েছিলেন সেদিন



সুমিতা সাহা—ছায়াছবি বাইরে

নাট্যজগতের একে তো সঙ্কটকাল তার উপর সমাজজীবনে নটরূপের মূল্য, গুরুত্ব, সম্মান কতটুকু ছিল সে বিষয়েও কারো অজানা নয়। সেই সন্ধিক্ষণে যে নিরাকরণ অগ্নি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন শিশিরকুমার তা শুধু তাঁর স্রষ্টামনেরই পরিচয় বহন করে না, করে বিদ্রোহীমনেরও। সুনিশ্চিত অধ্যাপনা ছেড়ে অনিশ্চিত উদ্ভট ভবিষ্যতের হাতে হাত মেলানো তাঁর পক্ষেই সম্ভব যার জন্মপত্রিকায় সপ্তম লগ্নে রবির স্বাক্ষর মিশে আছে।

শুধু ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রঙ্গমঞ্চ নয়। জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বেদনাহত মন নিয়ে নিজস্ব হয়েছেন অভিমাত্রী স্রষ্টা। নিজের জন্তে তিনি কিছু চান নি, চেয়েছেন নাট্যশালার জন্তে। সেই চাওয়া তাঁর ফলপ্রসূ



‘শেষ তিন দিন’ চিত্রের নায়িকা সুমিতা সান্যাল

হয় নি। ব্যক্তিস্বার্থ তাঁর উপাস্ত্র হলে সরকারী গেতার তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন না, প্রয়োজনের মুহূর্তে লেভনীয় অঙ্কের সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিতেন না ফিরিয়ে। অথচ তাঁর স্বপ্নের তাঁর সাধনার সেই জাতীয় নাট্যশালা আজও গড়ে উঠল না, ব্যবস্থা হল না তাঁর কোন উপযুক্ত স্থিতিরক্ষার, এমন কি ভাবগম্ভীর পরিবেশে মুখোজ্জ্বল সমাবেশে তাঁর জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পর্যন্ত উদ্‌যাপনের সময় হয় না। তাঁর শুভজন্মদিনে তাঁর স্থিতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি উৎসর্গ করে তাঁর আদর্শ, তাঁর ভাবধারা, তাঁর প্রদর্শিত পথ্যর দিকে দেশবাসীর সচেতনতা আমরা আকর্ষণ করি।

এই সংখ্যায় নটগুরুর যৌবনকালের একটি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র প্রকাশ করা হল।

## সংবাদ বিচিত্রা

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনমথ রায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩-৬৪ সালের গিরিশ অধ্যাপক নিযুক্ত করে সম্মানিত করেছেন। এই বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু হবে—স্বাধীনতা আন্দোলনে নাটক ও নাট্যশালার অবদান। বাংলা দেশের নাট্যকলার সর্বাদ্বীণ শ্রীবুদ্ধি ও অপ্রতিহত জয়যাত্রার মূলে মনমথ রায়ের বিপুল অবদানও প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে স্মরণ্য।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কর্মপরিষদের অত্রতম সদস্য হিসাবে মনোনীত করেছেন স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাধাচরণের জটানারায়ণকে।



সন্ধ্যা দীপের শিখা চিত্রের নায়িকা সূচিত্রা সেন



‘নিশাচর’ চিত্রের দৃশ্যে শঙ্কু মিত্র ও মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়

সদস্য নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধি বর্ধিত। তন্মধ্যে রুডিউজন পদাধিকার বলে সদস্যশ্রেণীভুক্ত। অবশিষ্ট পাঁচজন মনোনীত হন সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-কলা-অভিনয়-সঙ্গীত-শিল্পের জগৎ থেকে। সেই বিচারে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের এই মনোনয়ন সমগ্র অভিনয়জগতের পক্ষে পরম গৌরবের কথা সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় অভিনেতা হিসাবে খ্যাত হলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য আইনের ডিগ্রীধারী এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট পারদর্শিতার।

ভারতের সাংস্কৃতিক গগন থেকে একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্র অপরিস্রব হলেন। সম্প্রতি লোকান্তরিত করেছেন লক্ষকীর্তি বিঠল ভগবান ওয়ারেরকার (যামা ওয়ারেরকার নামে সমাধিক প্রসিদ্ধ) একাশী বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটেছে। আধুনিক মারাত্মক সাহিত্যের তিনি জনক। মহারাষ্ট্রের এ যুগের সাহিত্য ও নাট্যকলার ক্ষেত্রে তিনি নবযুগের বরণীয় প্রবর্তক। নির্বাক যুগে চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে তিনি অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। নাট্যরচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর আসন পুরোভাগে। বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর পরম নৈকট্য। বাঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বহু রচনা তিনি অমূল্য করেছেন মারাত্মক ভাষায়। শিবাজী, তিলক ও বাঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম গাঁৱ প্রভাব বিস্তার করে তাঁর মনে, তারই প্রমাণ মেলে তাঁর জাতীয়তাবাদী রচনাগুলির মধ্যে। বর্তমানকালে তাঁরই প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে মারাত্মক সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণ আপন আপন লক্ষ্য অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। লোকান্তরিত স্রষ্টার আত্মার আমরা সদগতি কামনা করি।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি, সংগ্রামী জননায়ক ও বিশিষ্ট সুধী স্বর্গত ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের (১৮৮৪-১৯৬৩) একটি জীবনীচিত্র নির্মাণের আয়োজন চলছে। পরিকল্পিত ছবিটিতে তাঁর কর্মময় ঘটনাবলি জীবনের নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করা হবে। দেশের মুক্তিযুদ্ধে ও নবভারত গঠনে তাঁর বিরাট অবদানই হবে ছবিটির প্রধান উপজীব্য। এ উপলক্ষে রাজেন্দ্র প্রসাদ মেমোরিয়াল ফিল্ম কমিটি গঠিত হয়েছে। দীপনারায়ণ সিংহ হয়েছেন তার আহ্বায়ক। এই কমিটির স্বেচ্ছাশ্রম সদস্যই ডক্টর প্রসাদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে ধনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই ছবিটি থেকে সংগৃহীত অর্থ ডক্টর প্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার কাজেই ব্যয় করা হবে। এই পরিকল্পনায় সহায়তা করার জন্য ফিল্ম ফাইন্স কর্পোরেশন ও কয়েকটি রাজ্য সরকারকে আবেদন জানানো হয়েছে।



শিল্পীচক্রের ‘স্বপ্ন’ নাটকের একটি দৃশ্যে বেলা রায় ও নিতাই রায়





‘প্রথম প্রেম’ চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও  
গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কোন একটি পত্রিকায় এই মর্মে এক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে রাজকাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা নিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এই ধারণার সংবাদ নাকি চলচ্চিত্রমহলে ছড়িয়ে পড়েছে। পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে যে, শোনা যাচ্ছে সহধর্মিণী কৃষ্ণার সঙ্গে রাজকাপুরের সম্পর্ক এখন প্রেমমধুর নয় এবং কৃষ্ণা নাকি স্বামিগৃহ ত্যাগ করে বর্তমানে বোম্বাইয়ের একটি বিলাসবহুল প্রথম শ্রেণীর হোটেলে বাস করছেন।

বর্তমান ভারতের চলচ্চিত্র দর্শকসমাজে যে শিল্পীরা জনপ্রিয়তার শিখরে আসন লাভ করেছেন কিশোরকুমার তাদের অন্যতম। বাংলার এই কীর্তিমান সন্তান বাংলার বাইরে চিত্রেজগতে আপন প্রতিভায় তাঁর স্বনামধন্য অগ্রজের মতই এক প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে আজ সমাদৃত।



কালকটা ফ্রেমস ব্যুরো নিবেদিত ‘প্রফুল্ল’ নাটকে যোগেশ্বর  
ভূমিকায় পরিচালক তরুণ লাহিড়ী ও জ্ঞানদার ভূমিকায়  
কেতকী দত্ত

‘দূর গগন কি ছাওমে’ ছবিটি তাঁর সাম্প্রতিক সৃষ্টির একটি নিদর্শন। এই ছবিটি প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সংবাদটি হল যে এই ছবিতে কিশোরকুমারের প্রযোজক, পরিচালক, লেখক, শিল্পী, গায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালক-রূপে পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার আধার এই একটি ছবি। একটি ছবির এতগুলি বিভাগের দায়িত্ব সগৌরবে একজনের দ্বারা পালনের নজীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আমরা যতদূর জানি বিরল। বাংলা কিশোরকুমারের এই সাফল্যে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করি।



‘মেরী দস্তের ফাটি’ চিত্রে নবাগতা আরতি দাস

বোম্বাইয়ের মফসল মালাড অঞ্চলের গাংকান রোডটির নাম সম্প্রতি স্বর্গত শিল্পী পান্নালাল ঘোষের নামে পরিবর্তিত করা হয়েছে। স্মৃতিস্মৃতি এই শিল্পীর বাসগৃহ এই পথেই অবস্থিত। এ উপলক্ষে আয়োজিত অহুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বোম্বাইয়ের মেয়র ডাঃ বি পি ডিভগী। পৃথীরাঙ্গ কাপুর, ফণী মজুমদার, নবেন্দু ঘোষ, কাহ্ন রায় এবং আরো অনেকে এই অহুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি লোকসভায় জানিয়েছেন যে, ভারতে টেলিভিশন যন্ত্রের আমদানির বিষয়টি চতুর্থ পরিকল্পনায় বিবেচনাধীন অবস্থায় আছে। শ্রীমতী গান্ধীর অভিযতে টেলিভিশন শুধু নিছক প্রমোদেরই উপকরণ নয়, লোক-



শিক্ষারও অত্যন্ত মাধ্যম। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, শোনা গেছে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী। ভারতে টেলিভিসন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় কুশলীদের ঐ বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদানে সহায়তা করার জন্য ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র সরকারের ইচ্ছার আভাস পেয়েছেন।

জাপানের চিত্ররাজ্যের বাস্তব এখন প্রতিকূলে বইছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে জাপানের চিত্ররাজ্য এখন এক বিরাট প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। তার দর্শকসংখ্যা ক্রমশই নিম্নগামী। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে এক বছরে জাপানের চিত্রদর্শকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ মহল টেলিভিসনের ব্যাপক প্রসারকেই এ জন্য দায়ী মনে করছেন। কোন কোন বিনয় চিত্রনির্মাতা এই পরিস্থিতিতে আপন ব্যবসায় ছেড়ে হোটেল ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন বলে জানা গেল।

সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসে উইন্ডসরের ডিউক একটি বরণীয় মানুষ, একটি স্বর্ণীয় নাম। মানবজীবনে প্রেমের এক অভিনব ভাষাকারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। একান্তর বছর বয়স্ক জনগণপ্রিয় এই সাম্রাজ্যাত্যাগী প্রেমিক পুরুষের বিচিত্র জীবন চলচ্চিত্রে রূপ দিতে উজোগী হয়েছেন ছেচলিশ বছর বয়স্ক জ্যাক লা ভিঁয়ে। ডিউকের আত্মজীবনী অনুসরণ করে ছবিটির চিত্রনাট্য পরিকল্পিত হয়েছে। ছবিটির মধ্যে অস্তিত্ব একটি ঘোষণায় স্বয়ং ডিউকের কর্তৃত্ব শোনা যাবে। বর্তমানে ফ্রান্সের অধিবাসী ভূতপূর্ব ভারত-সম্রাটের এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ওয়ালিপের কয়েকটি চিত্র তাঁদের বাস্তববনে গৃহীত হয়ে ছায়াচিত্রের অস্তিত্ব হবে।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গ

### দু শাস্ত সা

বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীনিবাসরঞ্জন দাশগুপ্ত। (মিঃ এন আর দাশগুপ্ত নামে সমধিক গ্যাত) রচিত দুশাস্ত সা গ্রন্থটি একদা আলোড়ন এনেছিল বাঙলার পাঠকসমাজে। তাঁর এই জনপ্রিয় রচনাটির বর্তমানে চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে অধেন্দু সেনের পরি-

চালনায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন কমল মিত্র, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ, জহর রায়, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি।

### দোলনা

সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে দোলনা চিত্রটি রূপ নিচ্ছে তরুণতম পরিচালক পাণ্ডপ্রতিম চৌধুরীর নির্দেশনায়। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, নির্মলকুমার, বিশ্বনাথন, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অম্বপকুমার, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি), নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, যজ্ঞ দে, আরতি মজুমদার, রেণুকা রায়, শর্মিলা ঠাকুর (অতিথি) প্রভৃতি। বিশিষ্ট সুরাশিল্পী অসীম ভট্টাচার্য ছবিটির প্রযোজিকা। বোম্বাইয়ের শ্রীমতী তলুজাও এই ছবিটির একটি বিশেষ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন।

### থানা থেকে আসছি

আজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' কাহিনীটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কমল মিত্র, উত্তমকুমার, মিলীপ মুখোপাধ্যায়, পশাশ্বকুমার, জহর রায়, ছায়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক প্রভৃতি।



'একটুকু বাসা' চিত্রের একটি দৃশ্যে বিশ্বজিত ও সন্ধ্যারানী

## সৌখীন সমাচার প্রফুল্ল

ক্যালকাটা ক্রেমস ব্যুরো রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ মঞ্চস্থ করলেন মহাকাবি গিরিশচন্দ্রের কালজয়ী নাটক প্রফুল্ল। যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নাট্যশিলালক তরুণ লাহিড়ী (নেটওয়ার্ক শিশিরকুমারের ভাগিনেয়)। অগ্নাতা ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অঞ্জন সেনচৌধুরী, রাম-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, রঞ্জিত রায়, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাননী দেবী, কেতকী দত্ত, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, লীলাবতী (করালী) দেবী, বীণা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।



শিশুর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারিণী

### সম্পত্তি সমর্পণ

শিল্পী যাবাবর সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের নাট্যরূপ। পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন বিনোদ দে ও জগন্নাথ বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন হীরক মুখোপাধ্যায়, বিনোদ দে, জগন্নাথ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, সুভাষ দাস, সন্দীপ ঘোষ, বলরাম বসু, অভিনন্দন ঠাকুর, প্রলয় ঘোষ, শ্রীমান তরুণ ও শ্রীমতী সাধনা পাইন।

### আনন্দমঠ

পঞ্চিক সম্প্রদায় দর্শকসমক্ষে নিবেদন করলেন ঋষি বক্তৃতির অমর রচনা আনন্দমঠ। 'আনন্দমঠ'কে নাটকে রূপায়িত করেছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণের ভার নেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ (নাট্যনির্দেশক), সনৎ বসু, মণি শ্রীমানী, দিগ্বিজয়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার গুপ্ত, শেফালি দে, শবরী চক্রবর্তী, রীণা ঘোষ, প্রার্থনা ঘোষ

# সম্মাদ কী য়

## আবন্দময়ীর আগমনে

‘আনন্দময়ীর আগমনে

আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে’

রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের লিখিত একটি বিখ্যাত কবিতার এই প্রথম দু’টি লাইনে বাঙলা দেশের জাতীয়-জীবনের একটি অবিস্মরণীয় লয়ের এক অত্যুজ্জল আলোখা পেশুটিত হইতেছে। শারদীয়া মহাপূজা আমাদের জাতীয়-জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এক পরম প্রতীকিত লয়। জীবনোত্তীহাসের বর্ষপরিব্রমার একটি উজ্জল মুহূর্ত। দুর্গাপূজা বাঙালীর গোণের উৎসব। মায়ের আবির্ভাবে বিবাদ-বিসম্বাদ, কলহ যে কোথায় অন্তহিত হইয়া ক্ষণকালের জগা মানুষকে মিনান ও প্রীতির রাগীবন্ধনে একত্র করিয়া দেয় তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে পুলকানুভূতির সীমা থাকে না। মহাপূজা শুধু নগরেরই নয়, মফসসলে গ্রাম, গ্রামান্তরেও সমান গাড়া জাগাইয়া তোলে মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু, স্পন্দনহীন পরিবেশেও এই সময় এক অভূতপূর্ব প্রাণচাক্ষুণ্য ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

পূজার্চনার ক্ষেত্রে বাঙালীর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দেব-দেবীর সহিত আমাদের কেবল ভয়-ভক্তির সম্পর্ক নয়, আমাদের অন্তরের সমগ্র নিভর আমরা ঐ পদপ্রান্তে মিশাইয়া দিয়াছি। জগজ্জননীকে আমরা দেবীর তুলনায় জননী হিসাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙলা দেশে যে শাক্ত-গাহিত্যের উদ্ভব হয়, তাহার মাধ্যমে শাক্তগীতিকারগণ দেবী দুর্গাকে সম্পূর্ণ মানবীতে পরিণত করিয়াছেন। পৌরাণিক আধারে যে সমাজচিত্র, গাঁহস্থ্য জীবনের আলোখ্য জীবনের সুখ, দুঃখ, বেদনা, অশুভূতির ইতিবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের সামাজিক জীবনের অবিকল প্রতাবিষ পরিলক্ষিত হয়। স্বর্গের দেব-দেবীর ও মর্ত্যের বাঙালীর মধ্যে এই নৈকট্যসাধনে শাক্ত গীতিকার, সাধক সম্প্রদায় এবং কবিবৃন্দের অবদান অনস্বীকার্য।

‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি’—

সত্যোজ্জননাথ দত্তের এই রচনাংশটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখনীয়।

কিন্তু আজ, বাঙলা দেশের সে চিত্র অম্লপস্থিত। দুর্লভ্য প্রপীড়িত লাক্ষ্যনায় নির্পীড়িত, সর্বস্ব-শোষিত, বাঙলা দেশের ভয়াবহ চিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার কিছু নাই, দেশের রাজনৈতিক চিত্রেও উজ্জল নয়। চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের ভারতের প্রতি আচরণও বীতিমত আশঙ্কাজনক। চীনের সমরসজ্জা মারা ভারতবাসীর মনকে অনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বাজারে প্রতিটি জিনিস শুধু মহাঘর্ষই নয়, দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমনতাবস্থায় মানুষের মনে আনন্দের উৎসের স্রোতোমুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

তবু, মায়ের আগমনে বাঙালী তার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহার দ্বারাই—ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিভরতার দ্বারা মায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেছে। জননীর নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের শক্তি দান করুন অজায়, অসুন্দর, অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার। তিনি আমাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শুভবুদ্ধি, অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস দান করুন। তাঁহার রূপায় দেশের অচলাবস্থা দূর হোক, দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ফিরিয়া আসুক। মানুষের জীবন পুনরায় ছন্দময়, মধুময়, লালিত্যপূর্ণ, সৌন্দর্যবিমণ্ডিত হউক, মানুষ অন্ধকার হইতে আলোয়, অজানতা হইতে জ্ঞানে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে, অসুন্দর হইতে সুন্দরে, অসংহতি হইতে সংহতিতে উপনীত হউক।

সমাজের রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও পরিবর্তিত হইতেছে। শরৎকালের সেই প্রাকৃতিক আবহেষ্ণনী আজ চোখের আড়ালে। সেই প্রাকৃতিক মাধুর্যমণ্ডিত চিত্তহারী শোভা আজ কোথায়? শরৎ শেষ হইতে চলিল, তারিখ হিসাবে হেমন্ত দুয়ারে সমাপ্ত, কিন্তু বর্ষার অভিসার এখনো অব্যাহত—আকাশে মেঘের ঘনঘোর, অবিরাম বর্ষণের ধারা। জিজ্ঞাসা এই বৃষ্টি কি শুধু প্রকৃতিরই বিচিত্র লীলার পরিচায়ক, না লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের অব্যক্ত কান্নার ঐ একটি সামগ্রিক নিদর্শন?

## সব ঠিক হ্যায় : খাদ্যমন্ত্রীর মতে

একুশ বৎসর পর দেশে-আবার ভূত্বিক দেখা দিয়াছে। চতুর্দিকে শুধু নাই-নাই রব। ঘরে ঘরে অন্নাতাবের হাহাকার। পথিপার্শ্বে কেবল বন্ধনার মিছিল, বেদনার সমারোহ আর শূন্যতার অভিসার। খাদ্যদ্রব্যের অভাব যেভাবে দিনের পর দিন প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে ইহার ফলে উপবাসের শেখ সীমায় উপনীত হওয়ার সেই সাম্প্রতিক মুহূর্তটি দুয়ার হইতে অদূরেই। দেশের খাদ্যবস্তুর শোচনীয় চিত্রের আজ আর রচনার মাধ্যমে ভাষার প্রলেপে উদ্ঘাটনের প্রয়োজন নাই, সে চিত্র মানুষের চোখের জলে আরও সজীব হইয়া উঠিয়াছে, সে অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেক পরিচয় প্রতিটি দেশবাসীর। এমতাবস্থায় যদি কেহ উক্তি করেন যে 'দেশের খাদ্যবস্থা সম্ভবজনক' তাহা হইলে হয় তাঁহার মস্তিষ্কের স্বস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইতে হয়, নতুবা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে মনুষ্যত্বের অবশিষ্টটুকুও যে লোপ পাইয়াছে সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার সংশয়ই থাকে না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উক্তি করিয়াছেন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী। কোন প্রদেশের নয়, বোধ কেম্বের। মাদ্রাজে তিনি সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের খাদ্যবস্থা ভালই। এই অক্টোবর হইতে মাঠ হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইলে খাদ্যবস্থা ভাল হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। মহাভারতের দ্রোণপর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি উক্তির সহিত এই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধের ছায় উক্তি তুলনীয়। অশ্বখামা হত 'ইতি গজ'র ছায় একটি প্যাট তিনি মারিয়া রাখিয়াছেন 'আশা করা যায়' বলিয়া। খাদ্যবস্থা যে ভাল হইবে—এই কথাটুকুও জোর দিয়া তিনি বলিতে পারেন নাই। মন্ত্রী মহোদয় জানাইয়াছেন যে, অন্নাগ্ন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যায়ন নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

আমাদের বক্তব্য, যে ধানের সম্বন্ধে তিনি তো একটি ধোঁয়াটে আখাস দিলেন কিন্তু অল্প খেণ্ডলির ব্যবস্থা পরে করিবেন বলিতেছেন—এই পরে আর কবে আসিবে? সমগ্র দেশ দশন হইবার পর। সমগ্র রোম যেদিন ভস্মীভূত হইতেছিল নীরো সেদিন বংশীবাদনে রত ছিলেন, সমগ্র দেশ যেদিন অগ্নিশনে পরিণত হইবে খাদ্যমন্ত্রী

সি. কুমার দিল্লীর উপাচার্য্য হলেও পানিসম-পানিসম

হইয়া আরামে দিন কাটাইতে কাটাইতে স্বপ্নের ঘোরে বলিবেন—'সব ঠিক হ্যায়?'

কাজের চাপে ভুল হওয়া অস্বাভাবিকও নয়, বিরলও দৃষ্টান্তও নয়। মন্ত্রী মহোদয়ও তারই শিল্পদপ্তর হইতে যখন খাদ্যদ্রব্যের ভার গ্রহণ করেন তখন জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে 'হয় কালোবাজারী নয় আমি'—বোধ করি কাজের চাপেই স্বীয় প্রতিশ্রুতি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা দেশে মন্ত্রী হিসাবে তিনি এবং কালোবাজারী সম্প্রদায় দুগুণে আজো বিরাজিত কেমন করিয়া?

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম হয় তো অনেক খবর রাখেন বলিয়াই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ বিশেষ খবর রাখিবার তাহার অবকাশ হয় না। কিন্তু দেশের বিরাট সংখ্যক জনগণ এই সকল সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত নন এবং এই সংবাদগুলি তাহাদেরই কেন্দ্র করিয়া। প্রতিটি নিত্য

প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তিনগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মূল্য বাড়িয়াও সমস্তার শেষ হয় না, জিনিসই দুস্প্রাপ্য। মঞ্চল উজাড় করিয়াও মানুষ দিনের অন্ন সংগ্রহে প্রস্তুত, কিন্তু জিনিস দোকান-বাজারে অদৃশ্য। আটা কিনিবার জন্য যা লাইন হয় তাহা বোধ করি সিনেমার লাইনের দৈর্ঘ্যকেও ম্লান করে। সামান্য মূল্যের আনাজ-তরকারীর যা মূল্য তাহা শূন্যে সাধারণ মধ্যবিত্তকে হ্রদরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। দ্রুতগত্যক্রমে এই সকল তথ্যগুলিই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কর্ণগোচর হয় না। আর যদি এই সকল বিষয়ে অবহিত হওয়া

সম্ভবে তিনি ঐ উক্তি করেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমরা এই রচনার প্রারম্ভেই যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাই যথার্থ প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য থাকে না।

সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য-ভাণ্ডার, শস্তাভাণ্ডার লুণ্ঠ হইতেছে, ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখিয়াছি এই জাতীয় অযোগ্যতা এবং বিবেচনা-শূন্যতার ইহাই নির্দিষ্ট পরিণতি।

বিলাসদ্রব্য বাদ দিতেছি, দিনের প্রয়োজনের দ্রব্য, দিনের অন্ন যদি তিনগুণ মূল্য দিয়াও মানুষ সংগ্রহ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার যে কি পরিণাম, পৃথিবীর বিভিন্ন রাগের বিভিন্ন দোষের ইতিহাসে যে



● সুব্রহ্মণ্যম

তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। আইনের মুদ্রিত বিধি-বিধানের দ্বারা আমরা যতই খণ্ডন করি তথাপি ইহা কি সত্যই অস্বীকার করা চলে যে—অতাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। এই অবস্থার আরও প্রসার ঘটিলে সারা দেশের দুর্নীতিও যে কতজন বিবশিত

হইবে সে শব্দকে যথেষ্ট চিন্তার সময় আঁসিয়াছে। একে অতাব অমহানীতা তদুপরি রক্ত রক্তে দুর্নীতির ব্যাপ্তি এবং তার পরিণতি জনজীবনে ব্যাপক অশান্তি। সারা ভারতবর্ষের যে কি অবস্থা ঘটাঁইবে সে বিষয়ে কে দায়ী থাকিবেন?

## বিধানসভা বনাম বিচারসভা

ভারত রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধান রূপে সন্মত অমুদ্রিত যে সকল ঘটনা সাধারণত যথেষ্ট আলোচনার স্থান করিয়াছে এবং যাহার দ্বারা নানা প্রকার বাদ-বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক সূচিত হওয়ার ফলে সবসাধারণের দৃষ্টি যাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীর স্থান তাহাদের পুরোভাগে। উত্তর প্রদেশের রাজনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে আজ কেবল মনস্তার ভিত্তি। জটিলতা, দলীয় স্বার্থসিদ্ধি, দ্বিধাবিত্ত পরিবেশ আজ সেখানে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীর মধ্যে উত্তর প্রদেশ বিধানসভা এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের ক্ষমতা কৌতুক বিবোধের ও তাহার সন্মুখে সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়দান এই রচনার প্রধান আলোচ্য। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিধানসভার অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে গোকুলপুরের সমাজভঙ্গী দলের অজ্ঞাতনামা নায়ক কেশব সিংকে স্পীকার প্রেস্তারের আদেশ জারী করেন। তাঁহাকে প্রেস্তার করা হইলে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্ত করেন। বিচারপতি বেগ ও বিচারপতি বেহগাল কেশব সিংকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। এই মুক্তি আজ বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাহার চটিয়া আগুন হইলেন, এই লইয়া বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্কের বড় বইয়া গেল, শেষে স্থির হইল কেশব সিং তো নিষ্কর্যই, তাহার উকীল ও বিচারপতিদ্বয় ও সমান অপরাধে অপরাধী, অতএব সকলকেই প্রেস্তার করা সমীচীন। বিচারপতিদ্বয় ও উকীল শ্রীমলোমন বিধানসভার নির্দেশ কার্যকরী না করার হুজ্বা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন দাখিল করিলেন। হাইকোর্টের ফল বেধ স্পীকারের উপর এই মর্মে আদেশ জারি করিলেন, অবস্থা যখন শেষ সীমায় উপনীত হয়-হয় তখন সময়

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ও বিরোধের আশু সম্ভাবনাকর সমাধানের জন্ত রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টে পাঠাইলেন। সুপ্রীম কোর্টে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিচারকদের লইয়া বিশেষ বেঞ্চটি বাসিল তাহার মধ্যে স্বয়ং প্রধান বিচারপতি শ্রীজজেন্দ্র গদকার অজ্ঞাতম। বিচারপতি সরকারও এই তালিকায় অজ্ঞাতনাম।

সুপ্রীম কোর্ট সমগ্র বিষয়টি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করিয়া কি অভিমত দেন তাহা জানিবার জন্ত সারা দেশবাসীর কৌতুহলের অন্ত ছিল না। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আগ্রহী জনসাধারণ প্রহর গুণিত হইলেন। অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, উহা প্রকাশিত হইয়া এক ইতিহাসের সৃষ্টি করিল।

উত্তরপ্রদেশ হয় তো বিস্মৃত হইয়াছিলো যে গণতন্ত্রের আইন, শাসক ও বিচার এই প্রাতিষ্ঠি বিভাগই নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাদের অধিকারের সীমানা গণতন্ত্রেই স্থানদ্বিষ্ট রহিয়াছে। অন্যতরায় একে অপরের অধিকারে অত্যাচার হস্তক্ষেপ করিলে গণতন্ত্রকে যথেষ্ট দুর্বোলের সম্মুখীন

হইতে হয়। বিধান করিয়া বলার প্রয়োজন হয় না যে, গণতন্ত্রের দুর্বোলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কটেরই নামান্তর মাত্র। অথচ উত্তর প্রদেশের বিধানসভা কেন যে মনে করিয়া বাসিলেন যে তাহার যা হা ইচ্ছা করিবেন, গোলখুশি মারফিক কাজ করিবেন, নিজেদের অধিকারগত গণ্ডীর বাইরে যথেষ্ট বিচরণ করিবেন ও সম্মানিত বিচারপতিদের যথেষ্ট অপমান করিবেন—তাহার কোন সত্ত্বের কোন বুদ্ধিজীবী-চিন্তাশীল মস্তিষ্কে উদ্ভিত হয় না। আনন্দের বিষয়, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে বিধানসভার এই জাতীয় কার্যকলাপ সমর্থিত নয়। কোথাও এ জাতীয় কার্যাদি করিবার অধুমতি বিধানসভা ওভিলে দেওয়া হয় নাই।



● অশোককুমার সেন

ভারতের ত্রায় একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের বিধান সভা-  
গুলির ভূমিকা যদি তাহার সদস্যগণ বিশ্বত হইয়া সেখানে  
বিশৃঙ্খলার এবং নীতি-বিরোধী কার্যাদি করিতে আরম্ভ  
করিয়া তাহার গৌরবে মসিলেপন করেন, তাহা হইলে বিধান-  
সভার আসল দায়িত্বগুলি কিভাবে এবং কাহার দ্বারা  
পালিত হইবে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা  
উচিত।

### শোক-সংবাদ

বয়সান সাহিত্যিক এবং লক্ষপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ডক্টর  
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ৩রা আশ্বিন ৮৩ বছর বয়সে  
পরলোকগমন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে  
এবং সেবার তাঁর অবদান ও দক্ষতা অশেষ প্রকারে সঙ্গ  
স্বরণীয়। বাঙলার সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি এক  
স্বরণীয় নাম। অসংখ্য সার্থক উপস্থাপনের তিনি জন্মদাতা।  
তাঁর রচনা একদা বাঙলার সাহিত্য-সমাজে যে অভূতপূর্ব  
আলোড়ন এনেছিল তা এক কথায় অবিস্মরণীয়।

পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ও বিশিষ্ট জননেতা এবং  
সমাজ সংগঠক অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী গত ৩০-এ ভাদ্র ৬৯  
বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস ত্যাগ  
করার পর কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ও প্রজা সোশ্যালিস্ট  
পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আত্মনিবেদন পরিষদের  
সদস্যপদে তিনি দীর্ঘদিন এবং সর্বভারতীয় খাদি বোর্ড ও  
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য খাদি বোর্ডের সদস্যপদে তিনি আমৃত্যু  
সমাসীন ছিলেন।

দীর্ঘপতিয়ার রাজা প্রতিভানাথ রায়ের গত ১৫ই  
আশ্বিন ৭০ বছর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। ক্রীড়াবিদ  
হিসাবে ইনি একদা বাঙলা দেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন  
করেন।

বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাবিদ সোমনাথ মৈত্র গত  
১২ই আশ্বিন ৭০ বছর বয়সে লোকান্তরযাত্রা করেছেন। দীর্ঘ-  
দিন প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গ ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক-  
রূপে তিনি যুক্ত ছিলেন ও ১৯৪৯ সালে উক্ত বিভাগীয় প্রধান  
হিসাবে অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। রবীন্দ্রনাথের  
অসংখ্য রচনা তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

কলকাতা আরক্ষাবাহিনীর প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার  
রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুন্সেপাধ্যায় ১২ই আশ্বিন পোষ্ট-  
স্ট্রোরে ৬৮ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। ১৯১৯  
সালে পুলিশবাহিনীতে যোগ দেন এবং লণ্ডন, স্কটল্যান্ড  
প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন।

মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রীর পুত্রবধু ও উডিয়ার প্রখ্যাত  
কবি মধুসূদন রাওয়ের কন্যা অবস্তী দেবী ৮৩ বছর বয়সে

গঠনার পরিশেষে আমরা এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী  
শ্রীশোককুমার সেন মহাশয়ের অভিমতের দিকে সর্বসাধারণের  
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিচারপতিত্বকে এইভাবে লালিত  
করিবার অধিকার আইনসভার নাই—এই মতটি তাঁহার  
দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার ত্রায়  
একজন ধুরন্ধর আইনবেত্তার অভিমত যে সবতোভাবে  
গ্রহণীয় এবং যথেষ্ট মূল্যবান তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

গত ১২ই আশ্বিন গতায়ু হয়েছেন। বহু লোকহিতকর কাজে  
এবং সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।  
শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংল্যান্ডের ডায়েরি তাঁর সম্পাদনায়  
প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ও ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত  
নন্দকিশোর ঘোষের সহধর্মিণী মায়ারাণী ঘোষ গত ১৭ই ভাদ্র  
মাত্র ৫১ বছর বয়সে পরলোক্যাত্রা করেছেন। সমাজ সেবার



মায়ারাণী ঘোষ

ক্ষেত্রে ইনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। জনকল্যাণকর  
কার্যাদিতেও তাঁর উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছিল অক্ষুরন্ত।  
ইনি মেদিনীপুরের স্বর্গত রায় মন্মথনাথ বসু বাহাদুরের  
একমাত্র কন্যা ছিলেন।

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী মনোরঞ্জন গুপ্ত গত ২৩-এ ভাদ্র  
মহেশ্বরকে করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত রায়প্রাণ  
গুপ্তের পুত্র মনোরঞ্জন জীবনীকার হিসাবে এবং তথ্যবহুল  
প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

বয়সান বিপ্লবকর্মী ও শোণাবাড়ার গুলীচালনার (১৯১৪)  
অগ্রতম নায়ক নির্মলকান্ত রায়ের গত ১৯শে ভাদ্র ৭০ বছর  
বয়সে প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে ইনি  
ভারতীয় রেলবিভাগের সঙ্গ জড়িত ছিলেন। কর্মজীবনেও  
ইনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে গেছেন।

# পাঠক পাঠিকার চিঠি

## পত্রিকা-সমালোচনা

শাশ্বতী

মহাশয়,

বহুল-প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় লরপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশিত হবার মধ্যে সম্পাদকের কৃত্তিত্ব খুবই কম, কারণ নামী সাহিত্যিকেরা সাধারণ নিজেরাই এ-জাতীয় পত্র-পত্রিকায় লিখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এই সব প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকদের লেখাও যখন অনেক ক্ষেত্রে লেখার ধারে না কেটে তাঁদের নামের ভাবেই কাটতে চায়, সাহিত্য রস-পাশ পাঠক-পাঠিকারা তখন তাঁদের প্রিয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নতুন লেখক-লেখিকার সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ রচনার সম্মান পেতে চান। আর যে সম্পাদক এধরণের নতুন সাহিত্যিককে সম্মতিভীর আমরে হামির করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সম্পাদক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ-জাতীয় সম্পাদক বাংলা পত্র-পত্রিকায় ক্ষেত্রে প্রায় দুলভ হয়ে উঠছেন বললেই চলে। মুষ্টিমেয় দু'একজন সম্পাদক, আজও বীরা সাহিত্যরাসিক পাঠক-পাঠিকার পরম ভরসার স্থল, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক হিসাবে নিঃসন্দেহে আপনি তাঁদেরই একজন। অতীতে কয়েকজন সাহিত্যিককে আপনি আবিষ্কার করেছেন বীরা আজ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে লক্ষপ্রতিষ্ঠ। এঁরাও কিন্তু আপনার টেলিফোনে সাহিত্যিকাদের এমন একটি অজানা জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েছে যার আংশিক দীপ্তিতেই মাসিক বসুমতীর বহু পাঠক-পাঠিকার মত আশ্বিত্য বিদ্যমান। হা, আমি 'শাশ্বতী' দ্বারা বাহ্যিক উপজ্ঞানের লেখিকা নমিতা চক্রবর্তী কথায় বলছি। আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনার এই নতুন আবিষ্কারটির জন্য। আশা সংখ্যায় প্রকাশিত শাশ্বতী উপজ্ঞানের প্রথমংশ পড়ে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর চিঠিতে যা লিখেছিলেন, যে সম্বন্ধে আমি একমত হলেও মনে ভরনও আমার কিস্কণ্ড সংশয় ছিল যে, হয়তো পরবর্তী সংখ্যা থেকে লেখিকার লেখার *sta daud*-এর অবনতি ঘটবে। কারণ, দু'একটি সংখ্যা পড়েই বহু লক্ষপ্রতিষ্ঠ উপজ্ঞাসিকের রচনা পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকাকে অনেকক্ষেত্রে হতাশ করে বসে। কিন্তু পর পর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত শাশ্বতীর অনেকখানি অংশ পড়বার পর আমার সমস্ত সংশয় কেটে গেছে। লেখিকার অনস্বকরণীয় ভাষা, অভিনব প্রকাশভঙ্গী,

আশ্চর্য পরিমার্জিতবোধ আর সর্বোপরি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। বহুদিনের বহু সাধনাতে একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষেও যা আয়ত্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, একজন নতুন লেখিকার পক্ষেই করে তা এত অনায়াসে সম্ভব হ'ল, তা ভাবতে বসে শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে যে, নমিতা চক্রবর্তী হচ্ছেন সেই জাতের লেখিকা যাদের আমরা আপাদ দিয়ে থাকি স্বভাব-শিল্পী বলে। তাই বহুদিন ধরে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তাঁকে এ দুলভ ক্ষমতার আবিষ্কারী হতে হয় নি। সম্মতিভীর ক্ষেত্রে আমরা নতুন ধরণা সৃষ্টি হবার কথা শুনেছি। বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে, বাংলা উপজ্ঞাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীমতী চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে এক নতুন ধরণা সৃষ্টি বরবার প্রতিষ্ঠিত নিয়ে এসেছেন। প্রাণতোষবাবু! আপনার এই নতুন ও মার্কক আবিষ্কারটির জন্য আবার আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।  
—শ্রীশঙ্কু মুখোপাধ্যায়, ৪।১৬, চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকাতা-৩২।

### পত্রিকার আলোকচিত্র

মহাশয়, আমি গত এক বৎসর ধরিয়৷ মাসিক বসুমতী পাঠ করিতেছি। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত নতুন প্রবন্ধ বা ধারাবাহিক উপজ্ঞাস সম্পদ আমার কৌতূহলের সীমা নাই। বিশেষ করিয়া আপনার পত্রিকার আলোকচিত্র বিভাগটি মাসিক বসুমতীর যথেষ্ট শোভাবর্ধন করে। আমি একজন আলোকচিত্র-শিল্পী। (Amateur Photographer)। বহুদিন যাবৎ আমি আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছি। আপনাদের পত্রিকায় গৃহ সংখ্যাগুলিতে পি সাহানার গৃহীত আলোকচিত্রগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এ জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আশা করি যেন তাঁহার গৃহীত আলোকচিত্র স্থান পায়। পত্রিকায় এই ধরণের নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ আলোকচিত্র থাকায় আমি আপনাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনায় সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী তার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলুক। ইতি—অশোক গুপ্ত, অবধারক কে কে গুপ্ত এও ব্রাদার্স, চিটার মাচেটস, পোঃ রাণীগঞ্জ, বধমান।





